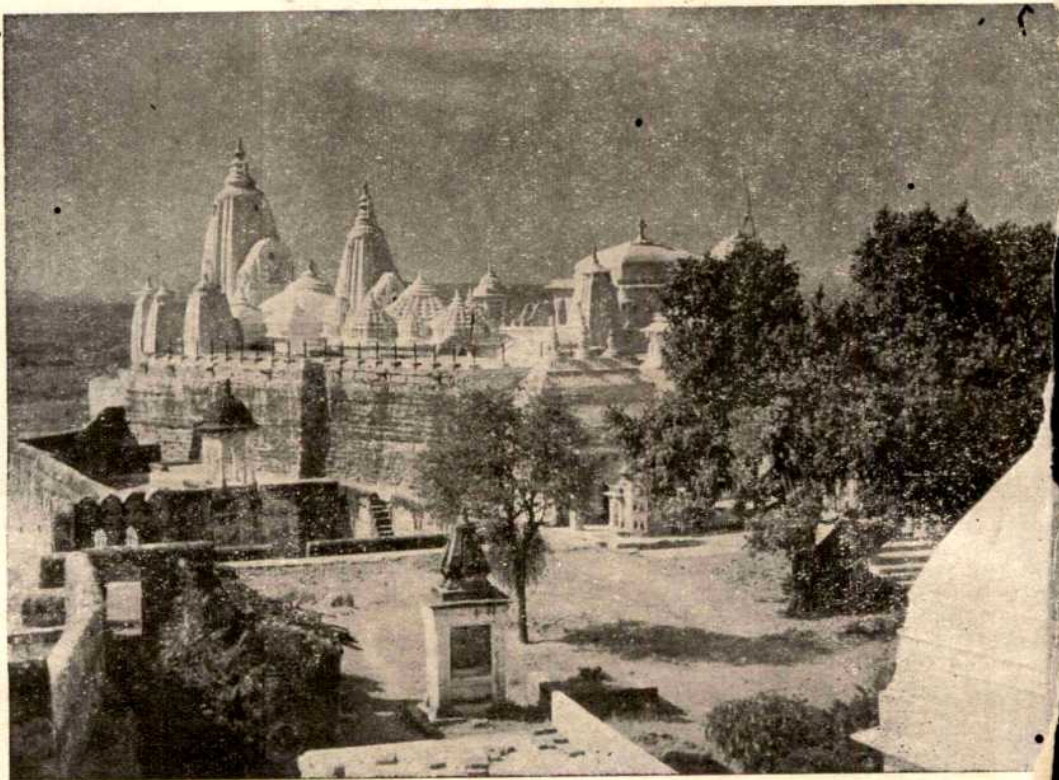


17. EUC-H01894-85-P3651

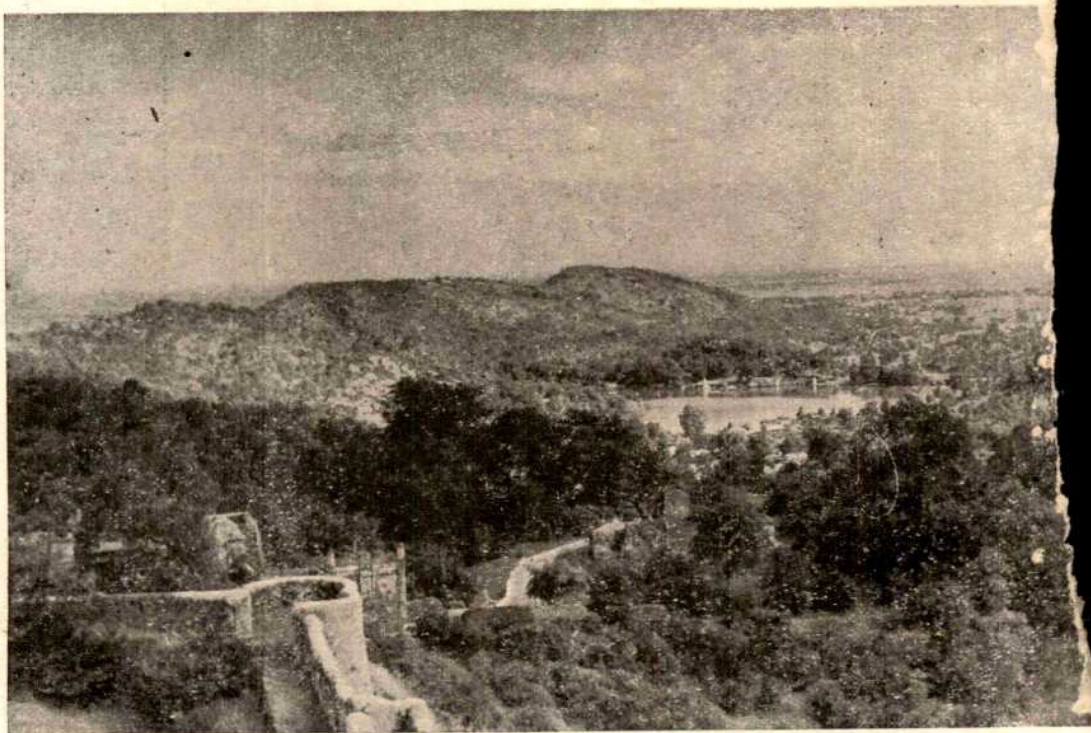


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গণেশ-জননী
শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



রামটেক মন্দির



রামটেক মন্দির হইতে অশ্বা হ্রদের দৃশ্য

কবিতা

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নামস্মাত্মা বলহনেন লভ্যঃ”

P 36,181

85

১৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

কাঙ্ক্ষিক, ১৩৫৮

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূজা

গাগতপ্রায়। বাঙালীর ঘরে আগমনীর সুরের সঙ্গে
হয়, নগরে পল্লীতে—গ্রামে গ্রামে উৎসবের
ত বহিয়া যায়। আজ সে উৎসবের মধ্যে
বিবাদের ছায়া, সে আনন্দ যেন মনে হয় কষ্ট-
শ বহিয়াছে অভাবের ক্ষত, লোকের মুখে
অভিশাপ। শান্তি নাই কোথায়ও, সঙ্কট
ও ঘরে।

দাসত্বের দিনেও বাঙালীর ঘরে “বারো মাসে
নি” ছিল, এবং সে সকল পূজাও তো উৎসবের
হইত। আজ স্বাধীনতার দিন, চার বৎসর
হইয়া গিয়াছে আমাদের স্বাভাবিকতার পর।
গণের কেন এ অবস্থা, কারণ কি এই নিদারুণ
মানসিক অবসাদের? আজ কেন মনে হয় বুধাই
আবাহন, নিরর্থক এই দেবতার বোধন?

এক দিন হৃদয় অতীতে, যখন বাঙালীর শক্তির
ছিল সার্থক। তখনও বাংলায় সন্তানের
দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও জর্জরিত হয় নাই,
শিখায় উত্তপ্ত শোণিতের প্রবাহ ছিল।
গগত ও ব্যক্তিগত অধিকার ও সন্তান-সন্ততি,
ট্রের মানমর্যাদা, সম্পত্তি রক্ষার্থে জীবনমরণ
সে শোণিততর্পণে কুণ্ঠিত বা বিচলিত তখন
হুজু শক্তিতে সে অতিক্রম করিত দারুণ
বিপদ, অর্থ বুঝিত সে দেবীর ঐ আবাহনের:

“অহং জনায় সমদং কৃণোমি”

তখন ছিলেন জাগ্রত, তাহার পূজারী ছিল
তজ্জ, বজ্রসম কঠোর নির্ধম। মায়ের সন্তান তখন
করিত সমরাসনে, শত্রুর রক্তে অসিফলক রঞ্জিত

করিয়া, আত্মবলিদান দিয়া। শৌর্য ছিল তাহার, বীর্ঘা ছিল
তাহার, তিতিক্ষা ছিল তাহার অন্ধের ভূষণ। উদাত্ত হৃদ
ছিল সেই পৌরুষদৃষ্ট শক্তির পূজারীর। তখনই ছিলেন
দেবতা জাগ্রত।

সেদিনের জাজল্যমান সাক্ষ্য রহিয়াছে পঞ্চভূমের
ইতিহাসে, সে পূজারীর পরিচয় আছে বারোভূয়ার
ইতিবৃত্তে। তাহারও পূর্বে তাহার বিবরণ আছে
“দুই শশাঙ্কের” অভিযানে, শত বিদ্রোহ-বিপ্লবের
কিঞ্চদস্তীতে।

তাহার পর বাঙালী গা ঢালিয়া দিল বিলাস-ব্যসনের
শ্রোতে। পূজারী ভুলিল পূজার অর্থ, দেবতার নির্দেশ
অগ্রাহ্য করিয়া উন্নয়নগামী ও লালসাগ্রত হইয়া চলিল সে
ধ্বংসের পথে। দেশ হইল শত্রুকবলিত।

তার পর গিয়াছে যুগযুগব্যাপী দাসত্বের বন্ধন, ক্রৌবত্বের
অভিশাপ। অযোগ্য অধম সন্তানের অপোগণ্ড শিশুবাং
ক্রন্দন, আবেদন-নিবেদন, অভিমান-আবদার তত দিন বুধাই
গিয়াছে। দেবতার নিদ্রাভঙ্গ হইল কখন?

আবার আসিল একে একে সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের
উত্তরাধিকারী পূজারী, সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, সহায়সম্মলহীন।
কিন্তু তাহাদের চিত্ত ছিল সবল, সিদ্ধান্ত ছিল অটল। বিপ্ল-
বিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিয়া তাহারা শোণিততর্পণে সন্তুষ্ট
করিল দেবতাকে; দেশের লোক বুঝিয়াও বুঝিল না,
ভাবিল বুধাই এ আত্মবলিদান, অনর্থক এই নিদারুণ কুরু-
সাধন। সাধারণ লোক পূজার সেই প্রাচীন সনাতন অর্থ
তখন ভুলিয়াই গিয়াছে। শুদ্ধ দান ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন
অসম্ভব, এ কথা কেহই জানে না।

আজ দেশের ভাগ্যচক্র ফিরিতেছে, ঐ চক্রের পেঘণ
সহ করিবার বৈধ্য ও পৌরুষ কি আমাদের আছে? যদি

থাকে, তবে কিসের এই বিলাপ-প্রলাপ, কেন এত ক্রোধ-ঈর্ষা ও ঘেব ? স্বাধীনতার মূল্যদানে যদি আমরা অসমর্থ, তবে অনর্থক সকল পূজার আয়োজন, বৃথাই এই শক্তির আবাহন।

স্বাভিন্যের মূল্য নিরবচ্ছিন্ন সজাগ সতর্কতা এবং শক্তি পূজার অর্থ শকাহীন, নির্মম কঠোর হৃদয়ে বীরগতি কামনা, এ কথা যেদিন দেশ বুঝিবে সেদিনই হইবে পূজা সম্পূর্ণ সার্থক।

পশ্চিমবঙ্গ বাঙালীর শেষ দুর্গ একথা বহু বার আমরা বলিয়াছি। এই দুর্গ জীর্ণ ও ভগ্ন এবং ইহার অধিবাসিগণ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী বিদেশীর উৎপীড়নে ক্লিষ্ট। ইতিহাস-বিখ্যাত পঞ্চভূমির মধ্যে সিংহভূম, মানভূম ও শিখরভূম আজ বিদেশীর চক্রান্তে ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের অতি হীন মনোবৃত্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং উহার অধিবাসিগণ অবাঙালীর অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্ত। পশ্চিম-বঙ্গের স্বতন্ত্রাঙ্গনের আশাভরসা যাহা কিছু ছিল—স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে যাহা বশেষেই বর্ধিত হয়—সে সকলও ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও কি আমাদের পূর্বসূরীর মনোভাবই থাকিয়া যাইবে ?

দাসত্বের যুগে, ক্রীতদাসপ্রাপ্তির ফলে “পাঠাবলি দলাদলি” দিয়া দুর্গাপূজা, কালীপূজা চলিত। আজ স্বাধীনতার আলোয় আমাদের সে সকল কলঙ্ককালিয়া আরও ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার অবসানের কোনও চিহ্ন তো দেখা যাইতেছে না।

দেশ ত বিভক্ত। শুধু পূর্ববঙ্গই বিচ্ছিন্ন হয় নাই—যদিও এক দল লোক চীৎকার করিয়া তাহাই জানাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্বিখালী অঞ্চল, যেখানে অমূল্য খনিজ সম্পদ রহিয়াছে, তাহা গিয়াছে। পূর্ণিয়া, করিমগঞ্জ ইত্যাদি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাঙালীও এখন বিহারী ও অসমীয়ার অধীন। স্বতরাং বাংলার আছে কি ?

অথচ এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিকার ও সম্পত্তি লইয়া কাড়াকড়ি ও টানাহেঁচড়া চলিতেছে। দেশের যাহা কিছু ভবিষ্যৎ আশা ছিল তাহাও সেই সঙ্গে রসাতলে যাইতেছে। যদি বুঝিতাম যে দেশের লুপ্ত সমৃদ্ধি উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে, যদি বুঝিতাম তাহার শ্রী ফিরাইবার পথ লইয়া মতবৈধ হইয়াছে, তবে ঐ দলাদলির একটা অর্থ পাইতাম।

বাঙালীর অস্তিত্ব লইয়াই প্রশ্ন। ভিন্ন প্রদেশে আমাদের স্থান সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে শূন্যে মিলাইতে চলিয়াছে। এই দরিদ্র প্রদেশে যাহা আছে তাহাতে দেশেরই সম্মান যাহারা

তাহাদেরই সম্মুলান হওয়া অসম্ভব। অথচ এ বিস্তার বা ভারতের অন্য ক্ষেত্রে বাঙালী বুদ্ধির কোনও সম্মিলিত প্রচেষ্টা নাই।

“উহাকে বঞ্চিত করিয়া আমাদের দাও” অ সম্মানের মুখের গ্রাস আমার সম্মানকে দাও। ক্ষেত্রে তাই, জমিজমার ক্ষেত্রে তাই, এখন এবং ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনেও তাই। যদি বোধ্যতার মাপকাঠিতে ব্যবহার, বা যদি বুদ্ধিতা অধিকার নির্ণয়ে বিচারের প্রশ্ন, তবে বলিতাম

পথে ঘাটে ফাঁকা কথাব ছড়াছড়ি চলিতেছে বিদ্রোহ”, “গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র”, “গণমত গণবিঃ গালভরা শব্দ ও শ্লোগানে আকাশ মুখরিত সত্য-মিথ্যার বালাই নাই, কিসে উপকার-ত তাহার বিচার নাই, এক দল যাহা করে অন্য দ লেখে যে সে সবই মিথ্যা, কপট ও অনাচারপূর্ণ পান্টা জবাবও সঙ্গে সঙ্গে আসে।

দেশের অবস্থা ত অবনতির দিকেই যাইতেছে। প্রতিকারই ত প্রার্থনীয় ? তবে পরমুখাপেক্ষে পরকে দোষ দিয়া কি লাভ হইবে ? বিদেশী সরকার ছিল তত দিন তাহাকে দোষ দেওয়া ছাড়া অস্ত্র না। এখন ত স্বাভিন্য আসিয়াছে, যদি বর্তমান পছন্দ হয়, নতুন সরকার গঠনে অবহিত হউন। চিনেন, যাহার ইতিবৃত্ত জানেন, তাহাকেই বল হইতে এবং তাহাকে সাহায্য করুন দেশের নৃত গঠন করিতে।

দেশের লোক যদি উৎসাহ উত্তম দেখায়, বা তাহার অধিকারচ্যুতি হইতেছে দেখানে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হয় তবে এই জীর্ণ দুর্গই বিজয়ের আক দেশের প্রাচীন গৌরব ও পুরাতন শ্রী ফিরিয়া হতোত্তম হইয়া নির্বিঘ্ন সর্পের মত গজ্জাইলে শত কাঞ্চোদ্ধার ত হইবেই না। অমকাতর বা লোকের স্থান আজিকার জগতে অতি অল্প, এবং প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জন লোক দেখানে স্থানের অভাব। এই সকল কথা শ্রবণ রাখিয় হইয়া অভিমান করিতে হইবে। যদি তাহা হ গৌরবের সহিত বাঁচিয়া থাকিবে, অন্ত্যায় তাহার অস্তিত্ব লোপ সূনিশ্চিত।

যদি শক্তির বোধন কাম্য হয়, যদি সার্থক ব থাকে এ পূজা, তবে প্রথমে দূর কর মনের অন্তরের কলুষ-কালিমা, শরীরের আলস্য। আশীর্বাদ তাহারই প্রাপ্য যাহার আত্মনিবেদন ঐ

খাদ্যসমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এ বৎসর প্রথমটী অনাবৃষ্টির জন্য ফসলের ফল খুব খারাপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। চাউলের দরও চড়িয়া গিয়াছিল। পরে বৃষ্টি হওয়ায় শেষ রক্ষা হইবে মনে হইতেছে, কিন্তু চাউলের দর কমিতে চাহিতেছে। গত চার বৎসরে চাউলের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারী পেকেটে ইহার যে সাপ্তাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা একত্র করিয়া দেখিলে আশঙ্কা বাংলাদেশে খাদ্যের অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন হইয়াছে। এবার আর এক বিপদ হইয়াছে—বহু ধান-জমিতে পানি হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষে খুব লাভ হইবার সময়, কারণ পাট পচাইবার ও বুইবার জলের এখানে অভাব। শ্রোতের জল ছাড়া বহু পচা জলে ভাল লাগে না। কলিকাতার নিকটবর্তী যে সকল স্থানে পানি আছে সেখানে অহুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে পানি হইয়াছে কিন্তু জলের অভাবে ভাল পাট পাতিতে পারে না। এবার ধানের জমিতে পাট চাষ করার আড়িয়াছে, ডলার সমস্তার সমাধান কতটা হইবে তাহা। পাট বা তুলার নিক্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইয়াও যে শিল্প এবং খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে চটকল চালানো যার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের খাজের উপরেই বেশী ওড়া দরকার।

র মূল্যবৃদ্ধির হিসাব পেকেট হইতে সংকলন করিয়া ওয়া হইল। ইহাতেও ফসল বৃদ্ধি আলোচনের হচিত্ত হইতেছে :

	জুলাই '৪৮	জুলাই '৪৯	জুলাই '৫০	আগষ্ট '৫১
না) ২০,	২০/০	২২৮/৮	২৯/৫	
১৬,	১৭৮৫	২২/০	১৬৮/০	
১৮,	১৬,	১৯,	১৬৮/০	
১৭৪০	১৭৮৫	২১,	২২৮/০	
২৬৮/০	২৬,	২৪,	৩২,	
২১/৪	২৯/৫	২৯/৫	৪০,	
২৬৮/০	৩২,	৩২,	৪৪৮/০	
২৪৮/০	২২৮/৮	৩০৮/৭	৩২,	
২১/০	২২৮/৮	৪০,	২২৮/০	
কপুর ২৪,	২০,	২৩,	৩৫৮/০	
৩৩৮০	২৪,	২৪,	৩৩৮/০	
৩০৪০	২২৮/৮	৩২,	৪২৮/৮	

সমস্ত দর ঐ সব জেলার সর্বোচ্চ মূল্য। কতকগুলি

বাড়তি কর্তন এলাকা ছাড়া অধিকাংশ স্থলেই উহাই চাউলের মূল্য। এই ভাবে উত্তরোত্তর প্রতি বৎসর দাম বাড়িতেছে ইহা খুব আশঙ্কার কথা।

খাজের অপচয়ও বহু বেশী হইতেছে। গত বৎসর ত্রীভুজী প্রামাণিকের সভাপতিত্বে অপচয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। উহার সদস্য ত্রীমাস্তরক হালদার মকবলের প্রোফিউরমেন্ট ওয়াশ দেখিতে চাহিলে তাঁহার সহিত কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর মতভেদ হয়। ত্রীমাস্তরক হালদার অপচয় খুব বেশী হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি অপচয় করিবার জন্য গীড়াগীড়ি করিতে থাকিলে কমিটির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ত্রীদেবেন সেন খাজসচিবকে প্রেরণ করিয়া যে সমস্ত তথ্য উদ্ধৃতি করিয়াছেন তাহাতে অপচয় অতি সাংখ্যিক রকমের হইতেছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। খাজমন্ত্রী চাউলের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন :

	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
মণ	মণ	
বৎসরান্তে মজুত ধান	১৮,১২,৭৫৩	১৭,২১,২৯২
ঐ চাউল	১৫,১৭,৩৩৩	৩১,৭৩,৫৬৭
বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান	৭১,৪০,০৩৬	২৮,৭০,০৫৪
ঐ চাউল	১,৫৩,৮৫,১৫০	১,৩৭,২৪,৩৮৮
বৎসরের মধ্যে বিক্রীত চাউল		
এ গ্রেন্ড	২,১২,৭১০	১,২৩,৭৮৭
বি "	১,৩২,৮৫,৪২০	১,৩৪,৪৬,৯৯৬
বৎসরান্তে মজুত ধান	১৭,২১,২৯২	৩৩,০৩,০৪২
চাউল	৩১,৭৩,৫৬৭	৩০,৪২,৮৩৫

বৎসরান্তে মজুত ও বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান চাউলের পরিমাণ বৎসর মধ্যে বিক্রীত ও বৎসরান্তে মজুত ধান চাউলের সমান হইত। সামান্য অপচয় হইতে পারে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৫০,৫১,৬৭৪ মণ চাউল বাট্টি হইতেছে এবং ১৯৪৯-৫০ সালের বাট্টির মাত্রা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইতেছে ৫৮,০২,৮৭৫ মণ। ত্রীদেবেন সেন খাজমন্ত্রীকে এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাঁচ মিনিট সময় চাহেন। কিন্তু মিলাইতে পারেন না, কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারেন না, অগত্যা তখনকার মত দায় এড়াইবার জন্য তিনি নোটিশ চাহেন এবং সে নোটিশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় খাজ সর্বদা আলোচনা এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে ঐ আলোচনা হইতে দিলেই ভাল হইত। খাজমন্ত্রী শুধুপক্ষে হিসাবের এই মারাত্মক গলদ বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাইতেন।

খাজসমস্যা লইয়া বিরোধী পক্ষ আলোচনা করিতে

চাহিতেছেন আর সরকার পক্ষ কেবলই উহা এড়াইয়া যাইতে-
ছেন ইহা উচিত নহে। বাংলার খাজসমস্তা এমন অবস্থার
আদিয়া পৌছিয়াছে যে সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া
উহার সমাধান সুদূরপর্যন্ত। খাজসমস্তাকে রাজনীতির
বাহিরে রাখিয়া উহার সমাধানের জন্ত সকলের সম্মানভাবে
চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত আবশ্যিক।

একটি মহৎ প্রচেষ্টা

“খাজ উৎপাদন” (পাক্ষিক) পত্রিকার ১লা আশ্বিন সংখ্যার
নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তার লেখক
শ্রীরামপুর মহকুমার এগ্রিকালচারাল অফিসার :

“কিছুদিন পূর্বে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, অধিক খাজ উৎপাদনে যিনি
নূতন পথের সন্ধান দিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধার
পাত্র। এরূপ একজন লোকের কথাই এখানে বলিতেছি।
তিনি হইতেছেন তারকেখের অন্তর্গত বৈজপুরের বহু-শ্রী
সরকারী কৃষি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের অগ্রতম মালিক শ্রীগোলোক
বন্দোপাধ্যায়। চীন ও জাপানে মাছের মল ব্যবহার করিয়া
সেখানকার চাষীরা যে আমাদের দেশের অপেক্ষা দুই-তিন
গুণ অধিক ফলন পান, কৃষি-কর্মচারীদের নিকট একথা শুনিয়া
তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন এবং মলের প্রতি স্থানীয়
কুসংস্কার, ও চাষীদের রক্ষণশীলতা ও বিরুদ্ধ মনোভাবের কথা
জানিয়াও তিনি তাঁর জমিতে মল সার ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হন।
তারকেখর শহর হইতে তাঁহার বাড়ী এক মাইল। মেঘরদের
সহিত বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত শহরের মল তিনি তাঁর জমিতে
এক-দেড় হাত অন্তর ছোট ছোট গর্তে গত্ত মাখ মাস হইতে
ফেলা আরম্ভ করেন। বৈশাখ মাস পর্যন্ত মল ফেলা হয়।
মেঘরদিগকে তিনি প্রতি জালা মল বহনের জন্ত চারি আনা
করিয়া দিতেন। জ্যেষ্ঠের শেষে তিনি উক্ত জমি চাষ করিতে
মনস্থ করিলে, মজুরেরা উক্ত জমিতে মল ব্যবহৃত হইয়াছে
বলিয়া চাষ করিতে অস্বীকৃত হয়। স্থানীয় লোকের ও কৃষি-
কর্মীদের চেষ্টার অন্তঃপর তাহার চাষ করিতে রাজী হয় এবং
আষাঢ় মাসে জমিটি ভালভাবে চাষ করা হয়। আশ্বিন মাসে
‘পাটনাই ২৩’ নামক কৃষিবিভাগের নির্বাহিত ধান রোপণ
করা হয়। ইতিমধ্যেই উক্ত জমির ধান অত্যন্ত ধানকে
জাপাইয়া উঠিয়াছে এবং স্থানে স্থানে এক একটী কাণ্ডে ৭০টি
পর্যন্ত গাছ হইয়াছে।”

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন,
তাহা দিকে দিকে বিকীর্ণ হউক।

ময়ূরাক্ষী নদী ও খাল

“আগে অন্ন ছিল, এখন নাই। কিন্তু আগের লোক-

সংখ্যার চাইতে এখন যে কারণেই হোক, লোক অ-
বাড়িয়া গিয়াছে। আগে যে হারে উৎপাদন হইত, এখন ত
শতাংশের এক ভাগে দাঁড়াইয়াছে। নদী-মাতৃক দেশ, ও
বাংলা ছিল শস্যভূমি। আজ নদী-খাল-বিল সব
গিয়াছে—আজ উৎপাদন বাড়াইতে হইলে সর্বাগ্রথম
সেই নদী-প্রবাহ অব্যাহত রাখা। আজকের গবমে-
সকল কাজ কেলিয়া সেই দামোদর-ময়ূরাক্ষীর বাঁধ
ব্যস্ত।

এই বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে, বীরভূমে মুন্সারী মহাসাট,
হাট, ময়ূরেশ্বর, মোল্লারপুর মহেশ্বরবাজার, সিউড়ি,
নাঙ্গুর, লাবপুর, ইলমবাজার ও বোলপুর থানার
মুর্শিদাবাদে সাগরদীঘি, নবগ্রাম, খবগ্রাম, ভরতপুর,
ও মির্জাপুর থানার অঞ্চল এবং বর্ধমানে কেতুগ্রাম
অঞ্চল সেচের জল পাইবে। এই সমস্ত এলাকা
মাইল বিস্তৃত এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বিঘার ধানক্ষেত জল
ভরা ছাড়া রবিশস্তের কালে প্রায় তিন লক্ষ বিঘা
জল পাইবে। পতিত জমি উদ্ধার হইবে ৭৫০০
সেচের জলের মূল খাল ১৪০ মাইল ও শাখা-প্রশাখা
মাইল কাটা হইতেছে এবং অনেকদূর অগ্রসর হইয়া
কাজ শেষ হইলে, বাংলার খাজসমস্তার পরিমাণ
৯০ লক্ষ মণ বেশী জমাইবে। আর দামোদর ত
সম্পূর্ণ হইলে সমগ্র বর্ধমান ও হুগলী জল পাইবে।

“সৈনিক” (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ১০ই আশ্বিন
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ময়ূরাক্ষী
উপর বেদন আশা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সার্থক হ

সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্তাবলী

গত আশ্বিন মাসে ডায়মণ্ড হারবারে পশ্চিমবঙ্গে
সুন্দরবন অঞ্চলের নানা সমস্তাবলী আলোচনা
একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রাম্যপ্রসাদ
সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তথায় যে
গৃহীত হয়, তাহার চূড়ক উদ্ধৃত হইল :

হাসনাবাদ, সন্দেশখালি ও হাডোয়া পুলিশ থানা
লক্ষ লক্ষ বিঘা ধান-জমির সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি
গত সেপ্টেম্বর মাসে কয়েক স্থানে বাঁধ ভাঙিয়া
উক্ত জমিগুলিতে লোনা জল ঢুকিয়া পড়ে। সাগর,
মথুরাপুর, জয়নগর ও ক্যানিং থানার অন্তর্গত
ইউনিয়নও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের
গণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইয়াছে এবং
সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। সহস্র সহস্র কুটির বিধ্ব
ও বহু গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। পানীয় জল
দেখা দিয়াছে এবং বন্যা-বিধ্বস্ত কয়েকটি এলাকা

মারীমপে দেখা দিয়াছে। উক্ত অঞ্চলে বস্ত্র সরবরাহ বন্ধ আছে।

(১) প্রথমেই প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্ত অনতিবিলম্বে সংখ্যক বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া একটি তদন্ত কমিটি এবং উক্ত তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যবস্থা অবলম্বন।

২) “বাঁধ” রক্ষার সমস্তাই হইল সুন্দরবনের সমস্ত। প্রকৃতি হইলে যে কেবল বৎসরের শস্যই নষ্ট হয় তাহা নিবৃত্ত হইত তিন বৎসরের জন্ত জমির উৎপাদনী শক্তিও যায়। এই কারণে দেশে লক্ষ লক্ষ বিধা ধানজমি দী অববাহ্য পড়িয়া থাকে। সুত্তরাং বাঁধগুলি যথোপযুক্ত নির্মাণ করিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং যে সব অববাহ্য খারাপ সেইগুলি যথাযথভাবে মেরামতের ব্যবস্থা হইবে। উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কেবল প্রারম্ভেই সমাধান হইবে না, পরন্তু অনশনক্লিষ্ট কৃষিক্ষেত্র হইবে কারণ তাহারাই এই বাঁধগুলিতে কাজ এবং জীবিকানির্ব্বাহের পথ খুঁজিয়া পাইবে।

প্রত্যেক ইউনিয়নে ভাষা মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত পুলিতে হইবে। অসহায় ও জরাজীর্ণ লোকদের সাহায্য দিতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রজা মারফত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে

স্থানীয় এজেন্সী মারফত জনগণকে কাপড় সরবরাহের দিতে হইবে।

পানীয় জলের জন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপ খননের দিতে হইবে।

চাষ-আবাদের জন্য বীজ ও বলাদ জন্মের নিমিত্ত কৃষি-হইবে। ইহাতে অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযান লাভ করিবে।

সুন্দরবন এলাকার মধ্যে অববাহ্যে ধান চলাচলের দেওয়া উচিত।

সঙ্গেশখালি ধানার অন্তর্গত গোসাবা ইউনিয়নের দূর প্রান্তে এবং হাডোয়া ও ক্যানিং পুলিশ ধানার বেওলী নামক স্থানে পুলিশী জুলুমের যে অভিযোগ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা

৩) সুন্দরবন অঞ্চল বহুসংখ্যক উদ্বাস্ত কৃষিক্ষেত্রের পুনর্নির্মাণের উপযুক্ত স্থান। কারণ উক্ত অঞ্চলে শ্রমশক্তির যথেষ্ট রহিয়াছে।

৪) সুন্দরবন ব্যবস্থা হিসাবে সুন্দরবনের সমস্ত এলাকা সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনা উচিত এবং জমিদারী আইন প্রচলনের পরীক্ষা এখানেই হইতে পারে। সুন্দরবন

অধিবাসীদের দুঃখহ্রদশা লাঘবের জন্য যৌথ কারবারের ব্যবস্থা করা উচিত।”

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে মানা নির্দেশ বা দাবি আছে। কিন্তু এই অঞ্চলের লোকসমষ্টি কি করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহা জানাও প্রয়োজন মনে করি। কোন কোন সমস্তা রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া মিটিতে পারে না, ইহা সত্য। ততোধিক সত্য মারফতের দায়িত্ববোধ। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশদ নির্দেশ থাকা উচিত ছিল। এই অঞ্চল হইতে ধান চাল ও বস্ত্র চোরা পথে পাকিস্তানে ব্যাপক ভাবে চালান হয় এ কথা সর্বজনবিদিত। এমন প্রস্তাব অস্বাভাবিক অবস্থা ধান চলাচল হইলে তাহা বাড়িবে না কমিবে তাহা বলা বাহুল্য। বাঁধ রক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় লোকের উদ্যম কতটা প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহারও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ৩৫ লক্ষ পরিবারের বৃত্তি-ব্যবসায়গত সংখ্যা মোট কত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ তিন বৎসর অহুসন্মানে তাহা স্থির করিয়াছেন। এই হিসাবানুযায়ী ২ লক্ষাধিক পরিবার কৃষি-কার্য করে, ৮৬ হাজার মাছ ধরে, ৬০ হাজার তাঁত বোনে, ১৭ হাজার ছুতারের ও ২২ হাজার কুম্ভকারের কাজ করে, ১৬ হাজার বাঁশ ও বেতের কাজ করে, ১১ হাজার বর্ণকারের ও ৩৪ হাজার মুচির কাজ করে। কাঁসা-পিড়লের কাজ, সোলা ও লাঁকের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, রেশম কাঁচ পালন, শিল্পের কাজ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এমন পরিবারের সংখ্যাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার সংখ্যা হই হইতে দশ হাজারের মধ্যে। পরিবার পিছু পাঁচ জন হিসাবে লোক-সংখ্যা ধরা হইলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই কোটি দাঁড়ায় ইহার মধ্যে পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ কত, নারী ও শিশু কত, কত লোক এই সকল বৃত্তি ব্যবসায় অহুসরণ করে এবং পরিবার পিছু মাসিক বা বার্ষিক আয়ের পরিমাণ কত, এগুলি নির্দ্ধারিত হইলে তবে পরী-বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এতৎসম্পর্কে এক ‘দৈনিক’ সহযোগী বলিতে-ছেন যে শেষোক্ত তথ্য সংগৃহীত হইলে বুঝা যাইবে কেন আমাদের দেশের লোক শহরের দিকে ঝাওয়া করিতেছে, পূর্বাণের না ভাবিয়া শহর ও নগরের বড় হাওয়ার মধ্যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পথ খুঁজিতেছে। এই সমস্তা সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু তুলিলে চলিবে না যে, এই সমস্তা উদ্ভব হইয়াছিল প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে; এবং ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে ১০০

বৎসর পূর্বে। এই দুইটি তথ্য সহজে কোন বিতর্ক নাই। অনেকই বীকার করিয়া লইয়াছেন যে পল্লী অঞ্চলের অবনতি প্রাকৃতিক বিবর্তনের অঙ্গ। এই ভাবে ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করিলে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে দোষী করা যাইবে না।

ইংরেজী শিক্ষার ফল

“শিকারভী” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ব্রীজব্রহ্মচন্দ্র চক্রবর্তী “বঙ্গক শিক্ষা সম্বন্ধে দু’চার কথা” প্রসঙ্গে যে ঐতিহাসিক তথ্য শুনাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইংরেজী শিক্ষার অশেষ দোষ। কিন্তু সর্বদোষ হরণ করিয়া ইহা এমন একটি অঘটন ঘটাইয়াছে যে, তাহা উল্লেখ না করিলে ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করা হইবে। প্রফুল্লবাবুর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা আনোচনা করিব। কারণ তাহার ভাব বা মত পরাবীচীন দেশের সাধারণ জনমতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

“ইংরেজী শিক্ষা ইংরেজ শাসন এ দেশে সূদূর পরিবার উচ্ছেদই প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং সে কারণে তাহা কখনও জাতীয় উন্নতির সহায়ক হয় নাই। এ শিক্ষা কখনও জাতির প্রাণশক্তিকে জাগায় নাই, বরং এই নিষ্পেষিত দেশকে আরও নিষ্পেষিত করিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার শাসন ও শোষণের বাহক উক্ত বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতিকে সর্বত্র প্রবর্তন করা দরকার। ইহা জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সর্বপ্রাথমিক প্রয়োজন। যদিও শিক্ষা-ব্যবহার কিছু কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তথাপি উক্ত প্রাথমিক কার্যের অসম্পূর্ণতার জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে এদেশে গভীর ভিন বৎসরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।”

ইংরেজ শাসন সূদূর পরিবার জন্ম দিয়াছে। জাতি-রাজ নিজেদের পরীক্ষিত শিক্ষা এদেশে আনয়ন করিলেন। তাঁহাদের যাহা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল তাহাই এদেশে প্রবর্তিত হয়। তাহার ফলে ব্রিটিশ-রাজের অবসান হয়। এদেশে এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যাহারা তাহা ভাবে ভাবনার, আচার আচরণে পাকাতা দেশীয়। কিন্তু ইহারা ইংরাজ আন্দোলনের শত্রু। এবং জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষক। এই সংস্কৃতির উপর তাহাদের কোন প্রভা বা বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মমতা ছিল এবং এই মমতার প্রেরণায়ই নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। “ইয়ং বেঙ্গলে”র আদি ও অন্তের ইহাই হইল সত্য ইতিহাস।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

গত এই আশ্বিন আত্মীয়ভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী মোলানা আবুল কালাম আজাদ এই উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের “বিশ্বভারতী”—তাঁহার সাধনার ধন

নব-কলের ধারণ করিল। এই উপলক্ষে “বিশ্বভারতী” হিতৈষীরা আনন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন তাঁ মনে জাগিয়া উঠিবে। তাহার নানা কারণ আছে। “ভারতী”র বীজমূল ছিল—“সত্যম্ শিবম্ আনন্দম্”। ভারতের বিধান পরিষদ, অজ্ঞাত কারণে, বামবেমালি ব বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করিবার কালে “সত্যম্ শিবম্ আনন্দম্” বিসর্জন। এই খেলাল কাহার তাহা জানি না।

সেইজন্যই নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং এই বিষয়ে “প কলা বঙ্গ পত্রিকা” ৮ই আশ্বিন সংখ্যায় যে সম্প্রদায় মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা বাঙালী মনের নারী-পরিচায়ক : “...রবীন্দ্রনাথ একক প্রচেষ্টায় যাহা চাহিয়াছিলেন, সহস্র শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাহার বিরোধিতা করিয়াছে, প্রতিজ্ঞাশীল বঙ্গদেশী প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়াছে, চতুর্দিক হইতে পিষ্ট করিয়াছে, কষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী চাহে, চলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরোধিতা করিয়াছে। প্রতি উপলক্ষে সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মের নামে মূল তিমি রোধ করিতে পারেন নাই।

“বর্তমানে বিশ্বভারতীর যে পরিবর্তন ঘটিল, তাহার আশঙ্কা, সেই পরিবর্তন কি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পরিবার সহায়তা করিবে? আজ বাহাদুরের কর্তৃত্ব শিক্ষার নির্দেশে বিশ্বভারতী পরিচালিত হইবে, তাহারা ১৯৪৯ নাথের আদর্শে বিশ্বাস করেন? যে সত্য, হৃদয়ের উৎসব বাণী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-আদর্শের মূল ভিত্তি। আমরা কি তাহাদেরই কর্তৃত্বাধীনে চূড়ান্ত অপমান, লাঞ্ছনা বৈত্তি সে সম্পূর্ণ হইতেছে না? যে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সৃষ্টি, সেই যান্ত্রিকতাই কি বর্তমান ব। পত্র অহুত্ব, চেতনাকে প্রস্তরীভূত করে নাই?”

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

প্রায় দুই মাস পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড হইয়াছে। একজন পেন্সনপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ, ব্রীজব্রহ্মচন্দ্র সরকার কর্তৃক তাহার সভাপতি হইয়াছেন আর আর সভ্যগণও ‘মনোনীত’ বলিলে নানা বলা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘আ’ বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক অমুহোদিত, সরকারের খেদমত, মনোনীত; উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিমিহি। গভ মনোনীত; কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ বা তাঁদের অমুহোদিত স্থানীয় শিক্ষাবিদগণ, অভিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত রাজক অবগতির লোকসমষ্টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্তব্য, প শিক্ষার নিয়ামক, যে শিক্ষা এতদিন কলিকাতা হি। উল্লেখ কর্তৃক পরিচালিত হইত।

প্রারম্ভিক সংগঠন হিসাবে ইহার বেশী গণতন্ত্রমূলক কোন প্রকল্প গঠন করা হইত বর্তমানে সম্ভব হয় নাই। প্রায় ১৯৫২ সাল হইতে আমাদের পরিচিত ম্যাট্রিকুলেশন শিক্ষার খেলা শেষ হইল। আরম্ভ হইল নুভন নামের 'স্কুল স্কল' পরীক্ষা। 'স্কুল কাইনাল' নামের অর্থ হইল স্কুলের পরীক্ষা। ইহা পরিচালনা করিবেন এই স্কুল শিক্ষা বোর্ড। কোন্ শিক্ষার অন্ত, তাহা এই নুভন বুঝা যায় না।

এই সব শাসনিক চুলচেরা প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া, এখন এই প্রবার্ডের কার্যপদ্ধতি ও আদর্শ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাই। সম্পাদকীয় মন্তব্যের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে তাহা আলোচনা করা যায়, এবং এই বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য ও নানা প্রকার নানা আলোচনার গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। সেইজন্য শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া; বোর্ডের সভ্যগণের কথাবার্ত্তা হইতে অনেক সত্য উদ্ধৃত করিয়া নাইতে হয়। সেইরূপ জ্ঞানই আমাদের মন্তব্যের উপকরণ।

কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে বোর্ডের কার্যপদ্ধতি আরম্ভ হইয়াছে। এক দলের দলপতি নাকি প্রথম দলপতি মুখোপাধ্যায়, অল্প দলের দলপতির নাম জানি নাই। সভ্যগণ কে কোন্ দলের তাহা জানি না। দলের ও ভোটাত্মক সংবাদ এখন পর্য্যন্ত অতি বড়ো ভাষা হইয়াছে।

এই দলদলি বা ভোটাত্মক সংবাদে আমরা হই নাই। আজকাল পল্লীগ্রামে যতদূর উচ্চ ইংরেজী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২৫ বৎসর পূর্বে কলিকাতা তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে যেমন লোকে ইংরেজী শিক্ষার প্রগতিবিদ্যুৎ জ্ঞান হারাইয়াছিলেন সেইরূপ এখন পল্লী-গ্রামে ইংরেজী আমাদের পেন্সনপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদগণ হইতে চাহেন শিক্ষার প্রসার, অল্প দিকে দাবি করিতে-রেন এমন কতকগুলি দোষ্টব যাহাতে এই শিক্ষার প্রতিরোধ হইবে।

সরূপ এগুলির উল্লেখ করিতেছি। আমরা দেখিতেছি গণগণবলী সম্বন্ধে এমন অনেক কিছু সর্ব্ব আরোপিত পল্লীবাসীর শক্তি নাই তাহা গ্রহণ করিতে বি-টি শিক্ষক চাই, বিলাত ফেরত হইলে আরও ব্যাখ্যামের জন্ত চাই গ্রাজুয়েট শিক্ষক। ব্যাখ্যামের প্রশ্ন গ্রাজুয়েট হইবার প্রয়োজন কি? আমাদের বাণীন রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা কি হওয়া মাধ্যমিক শিক্ষার মান কি হইবে; কোন্ পদ্ধতি করিলে আমাদের আর্থিক সম্ভতির উপযোগী হইবে; এর বাঙালী-বর, খেলার মাঠ, জিমন্যাসিয়াম, টিউব ওয়েল

কতখানি আবশ্যক? বোর্ডের সম্পাদকের হস্তে এই প্রশ্নের সন্তুস্তর পাওয়া যাইবে কি?

গ্রেস মার্ক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইস-চ্যালেঞ্জার প্রিশুতনায় বন্দোপাধ্যায় 'মুগাডর' আপিসে এক বক্তৃত্তর প্রসঙ্গ হইতে এক নম্বরের জন্ত ফেল করা হইয়া যে আন্দোলন হইতেছে তাহা ঠিক নহে। বস্তুতঃ দশ নম্বর গ্রেস দিবার পর ইহার এক নম্বরের জন্ত ফেল করিয়াছে, অর্থাৎ পাস মার্ক অপেক্ষা আসলে ইহার ১১ মার্ক কম পাইয়াছে। ইহাদিকে পাস করাইলে আবার এক দল এক নম্বরের জন্ত ফেল করিবে, সুতরাং ইহার শেষ কোথায়? তিনি পরে একটি কথা এই বলিয়াছেন যে ১৪ জন হেড এগজামিনার তাহাকে লিখিত ভাবে জানাইয়াছেন যে খাতা উদারভাবে দেখা হইয়াছে।

আইস-চ্যালেঞ্জারের উক্তি আমরা মনিতে পারিলাম না। তিনি ইংরেজীর কথা বলিয়াছেন, ইংরেজী ভিন্ন আর কোন বিষয়ে গ্রেস দেওয়া হয় নাই, সুতরাং সাধারণ ভাবে গ্রেস মার্কের প্রশ্ন উঠে না। ইংরেজীতে একটি পেপারের প্রশ্ন অত্যধিক কঠিন হইয়াছিল এবং ইহা হেড এগজামিনারের স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই গ্রেস নম্বর দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা ঐ পেপারে ১০ পাইয়াছে, প্রশ্ন সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে সেদিকে হইলে ইহারাই হয়ত ৩০ পাইত। সুতরাং ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা যায় না। এক প্রশ্ন কঠিন, তাহার উপর খাতা দেখার নির্দেশও খুব কঠোর রকমের দেওয়া হইয়াছিল। প্রশ্নে এবং খাতা দেখার অতিরিক্ত কড়াকড়ি করিয়া ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া কর্তব্য শেষ হইল ইহা মনে করা অবিচার।

বাংলার প্রশ্ন অত্যধিক কঠিন হইয়াছে। অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ হইয়াছে। ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট, বি-এ তিন পরীক্ষাতেই বাংলার প্রশ্ন সব রকমে ধারাপ হইয়াছে। বি-এতে যে রচনা লিখিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়ের দুই ঘণ্টারও লিখিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহার জন্ত বহু পরীক্ষার্থী ফেল করিয়াছে। যে ছাত্র সব বিষয়ে ৬০০-র বেশী পাইয়াছে তাহাকে বাংলায় ১ নম্বরের জন্ত ফেল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে ছেলে মোট ৬০০-র বেশী পাইয়াছে, পদার্থবিদ্যায় শতকরা ৯০ পাইয়াছে, তাহাকে বাংলায় ২১ নম্বরের জন্ত ফেল করাইবার কি সাধকতা থাকিতে পারে আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। আগে নিশ্চয় ছিল যে কোন ছাত্র সব বিষয়ে ভাল নম্বর পাইয়া এক বিষয়ে অল্প কয়েক মার্কের জন্ত ফেল করিলে ঐ বিষয়টি উদার ভাবে দেখিয়া তাহাকে পাস করাইয়া দেওয়া হইত, যে নম্বর কম পড়িত তাহা মোট নম্বর হইতে কাটিয়া লওয়া হইত। এই



নিয়ম পালনে বাধা কিসের? কেমিস্ট্রির প্রস্নে যে সব ভুল ছিল তাহা কলঙ্কজনক। এর দৃষ্ট যে সমস্ত ছাত্র ফেল করিয়াছে তাহারা অল্প বিষয়ে পাস করিয়া থাকিলে উদার ভাবে খাতা পুনঃ পরীক্ষা করিয়া পাস করাইয়া দেওয়া যাইত। তাহা না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে পুনঃ পরীক্ষার মার্ক আরও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। হেড এগজামিনাররা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা উদারভাবে খাতা দেখিয়াছেন। ইহার কোন ঠ্যাগার্ড আছে কি না জানি না। যে হেড এগজামিনার পরীক্ষকের দেওয়া ৮ কমান্ডইয়া ১ করিয়াছেন তিনিও ত উদারভাবে খাতা দেখিয়াছেন বলিয়া সহি করিয়াছেন? পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার একসঙ্গে আমূল পরিবর্তন না হইলে বর্তমান অনিশ্চয়তা আরও বাড়িবে। ইহাতে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও দেশবাসী তিন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

ডাইন-চ্যালেঞ্জার মহাশয়ের এ বিষয়েও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে শিক্ষার মান ও পরীক্ষার মান অসম হইলে ছাত্রের প্রতি অবিচার করা হয়। সে জ্ঞান তাঁহার আছে বলিয়া মনে হয় না। এবারে পরীক্ষার অভায় ও অবিচার অতি সুস্পষ্ট, সুতরাং ডাইন-চ্যালেঞ্জার মহাশয়ের “চুণ প্রলেপ” চেষ্টা অসমীচীন হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বেথুন স্কুল ও কলেজের শতবার্ষিকী গ্রন্থ

গত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার শত-বার্ষিকী উৎসবের সূচনা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে যে পরিচালন-সমিতি গঠিত হয় তাহার কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে, বাংলাদেশে জীশিক্ষার ইতিহাস রচনা এই উৎসবের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হউক। উপরুক্ত গবেষক ও ঐতিহাসিকের হাতে তাহার ভারার্পণ করা হয়। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল আমরা পুস্তকাকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্ত পরিচালন-সমিতিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যে সব বাঙালী ঐতিহাসিক এই আড়াই শত পৃষ্ঠার পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের সংকলন করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙালী শিক্ষিত সমাজে সম্মানিত। এই পৃষ্ঠা-সংখ্যার মধ্যে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায় লিখিত। বঙ্গভাষার সংকলিত অংশে ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সাহিত্যে বঙ্গনারী” ১৯৫-২১১ পৃষ্ঠা ভাষ্যে পূর্ণ। ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বাগলের “বেথুন স্কুল ও কলেজের কথা” প্রবন্ধে ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্মকথা ও ক্ষমোন্নতির বিবরণ আছে (২১২-২২৪ পৃষ্ঠা)। বেথুন কলেজের জনৈক ছাত্রী ত্রীমতী ভারতী রায় শতবার্ষিকী উৎসবের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। “রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বঙ্গমহিলা”—রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালী নারীর যোগদানের বিবরণ; লেখক ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বাগল। রাজনীতির

ক্ষেত্রে নারীর অবদানের সত্যকার প্রমাণ পাওয়া যাইবে জাতির সংগঠনকার্যে। সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত।

এই পুস্তকের প্রধান অংশ ইংরেজী প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ। ১-১২৫ পৃষ্ঠায় ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বাগল সমসাময়িক সরকারি দলিল-পত্র, এবং অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িকপত্রের উপর নির্ভর করিয়া বেথুন স্কুল ও কলেজের প্রামাণ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ বর্তমান যুগে বাংলাদেশের জীশিক্ষার ইতিহাস বলিলে তাহার প্রকৃত বর্ণনা হইবে। আচার্য্য যছনাথ সরকারের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের যোগেশবাবুর একটা স্থান আছে। শতাধিক বর্ষব্যাপী কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাসমূহের একটি শুভ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়া ত্রিভুজেন্দ্রনাথ লিখিত। (পৃ. ১২৬-৬৯)।

বাঙালী সমাজ এক শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিশাল শাসনের ও পরদেশী সংস্কৃতির সম্মুখীন হইয়া কি করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে, আজ হইয়া এই দুইটি বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এখনও প্রায় সপ্তাহে সংবাদপত্রের স্তম্ভে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বেথুন ও কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যে ইতিহাস হইয়াছে তার মধ্যে বাঙালী সমাজের অনেক দোষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেই দোষ-গুণ সর্ব-ভারতীয়।

আমরা সুখী হইতাম যদি সর্বভারতীয় জীশিক্ষার ইতিহাস এই উপলক্ষে নুতন করিয়া সংগৃহীত হইত। সালে যখন এই উৎসবের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় পরিচালন-সমিতির নিকট তখন আমরা এইরূপ করিয়াছিলাম। শুনিতে পাইলাম যে, পরিচালন-সমিতি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাস্তাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শিক্ষিত সমাজ তৎসম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখান নাই। লিখিয়া উত্তর পাওয়া যায় নাই। জীশিক্ষার সেবার নিবেদিত শিক্ষিত মন এরূপভাবে কুণ্ঠরসিত অবলম্বন পারেন, ইহা বর্তমান যুগের অসুযোগী এবং তার কল্যাণের পরিগম্য।

সাধারণ নাগরী লিপি

ভারতবর্ষে লিপি-সমস্যা—নানা অঞ্চলে ও সমাজে বিভিন্ন অক্ষর থাকার দৃষ্ট যে সমস্তার উদ্ভব তা তৎসম্বন্ধে আচার্য্য বিনোবা ভাবে যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত উপায়ে কথ্য আমরা কল্পনা করিতে পারি না। এই আশ্বিনের বাংলা “হরিজন” পত্রিকায় তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আমাদের পাঠকবর্গের দৃষ্টিভূমি দিলাম :

“দৃষ্টান্তরূপ বিনোবা ভারতবর্ষের ভাষাসমস্তার করিয়া বলেন, হারাদরাবাদ রাজ্যে মারাঠি, কানার

উর্দু ও হিন্দী প্রভৃতি যে পাঁচটি ভাষা বলা হয় তার সবগুলির জন্মই নাগরী লিপি অবলম্বন করিলে তাহারা ভারতের ভাষা-সমস্তার সমাধানের দিকে সাহায্য করিতে পারে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর হইতে বেশী পৃথক নয়; কিন্তু তাহাদের লিপিগুলি পৃথক এবং এক হইতে অচক্রে আবৃত্ত রাধিব্যার পক্ষে সেগুলি দেওয়ালের মত কাজ করে। সকল-গুলির পক্ষে এক সাধারণ লিপি থাকিলে তাহাদের লেখাপড়ার সুবিধা হইবে এবং তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকটে আনিয়া দিবে। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, লিপির বিভিন্নতার তাঁহাকে অশেষ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। এই রাজ্য অথবা কোন পুস্তকপ্রকাশক যদি প্রত্যেক ভাষার সংস্কৃতি নাগরী লিপিতে প্রকাশ করার ভার নেন, তবে ভারতের মহা উপকার করা হইবে।

“উর্দু যদি নাগরী লিপি গ্রহণ করে তবে তাহার দ্বারাই ইহা হিন্দীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে এবং তাহা হিন্দীকে সংস্কৃতের কৃত্রিম প্রভাব হইতে রক্ষা করিবে। বিনোবা একথা বলিতে চান না যে, উর্দু বা কানাড় লিপিকে একেবারে বর্জন করিতে হইবে। কিন্তু যদি এগুলির সঙ্গে তাহারা নাগরী লিপিও গ্রহণ করেন এবং তাহা ব্যবহার করেন, তবে তাহারা কালক্রমে এমন এক আদর্শ হিন্দুস্থানীর সৃষ্টি করিতে পারিবেন, অথ সকলে বুঝি হইয়া যাহার অহুসরণ করিবে। বর্তমানে যদিও তাহারা জাতীয় ভাষার আবশ্যকতা স্বয়ং একমত, তবুও সে ভাষা দেখিতে যে কেমন হইবে তাহা কেহই জানেন না এবং সেজন্মই তীব্র অথচ নিফল আলোচনার সৃষ্টি হয়। তাহাদের আদর্শ হিন্দুস্থানী এই সকল তীব্রতার অবসান ঘটাইবে। উর্দুর সেখানে ব্যবহার চলে এবং তাহার বেশ উন্নতিও হইয়াছে। তাহাদের কেবল ইহাকে একটু সহজ করিতে হইবে এবং ইহাকে নাগরী লিপিতে লিখিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহারা জাতীয়-ভাষা-সমস্তার সমাধানে উল্লেখযোগ্য দান করিতে পারিবেন। ভারতের সমস্তা সমাধানে কেমন করিয়া তাহারা সাহায্য করিতে পারেন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।”

আচার্য্য ভাবের প্রভাব কোন রাজ্যের সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লোকের মিত্যা ভীতি ভাঙ্গিবে। ভীতি অপেক্ষা পরের লিপির প্রতি সহজাত সংস্কারই বর্তমান সমস্তা উৎপাদন করিয়াছে। এক আদর্শ, এক ভাষা, এক লিপি এই ত্রয়ের সংযোগ না হইলে মহাভারত সৃষ্টি হইতে পারে না। তবুও আমাদের মন এই আদর্শের আশা ছাড়িতে পারে না।

পূর্ববঙ্গে বাধ্যতামূলক উর্দু শিক্ষা

পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ সম্প্রতি এক নির্দেশ জারী

করিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গের মুসলমান মুসলমান ছাত্রদের বর্ণ পরিচয় উর্দু ভাষায় শুরু করিতে হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তাহারা কেবল উর্দু ভাষাই শিখিবে এবং চতুর্থ শ্রেণী হইতে ইচ্ছাধীন বিষয়রূপে বাদলা সওয়া চলিবে। উর্দু বরাবরই অবশ্যপাঠ্য ভাষা রূপে পরিগণিত থাকিবে। পূর্ববঙ্গ সরকারের এই আদেশে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার আবুল পরিবর্তন দেখা দিবে। এই আদেশ যদিও মুসলমান ছাত্রদের প্রতি প্রযোজ্য, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রেরাও এই আদেশের আওতায় পড়িবে। কারণ পূর্ববঙ্গের হিন্দু ছাত্র ও মুসলমান ছাত্র একই স্কুলে বিভাজ্যাস করিয়া থাকে। স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের উর্দু শিক্ষার সঙ্গে হিন্দু ছাত্রদের বাংলা শিখিবার ব্যবস্থা থাকিবে এরূপ কোন কথা এই আদেশে নাই, সুতরাং হিন্দু ছেলেরদেরও এই সঙ্গে উর্দুতে বর্ণ পরিচয় হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। কলে হয় তাহা-দিগকে স্কুল ছাড়িতে হইবে নতুবা উর্দু পড়িতে হইবে।

রাজনীতি ও নিষ্ঠুরতা

গত ১লা আশ্বিনের “অজয়” পত্রিকার (কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পল্লীসমাজের সাপ্তাহিক, সুবপজ) “অপপ্রদান” শিরোনামে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে-পৃথিবীর ধ্বংসের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে :

“সহযোগী সংগঠন পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের ইত্তাহার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সহযোগী বলিতেছেন, ‘আমরা জানি দেশে দুর্ভিক্ষ হইতেছে না দেখিয়া কোন কোন নেতা ও শিক্ষিত ব্যক্তি নিতান্ত বিমর্ষ হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ না হইলে লোকে যে নির্বাচনে কংগ্রেসকেই আবার ভোট দিবে, এই আক্ষেপ কাহারও কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের পরাজয় দেখিবার সুযোগ লাভের লোভে নিজেদের একেবারে অমাহুষ করিয়া ফেলিতেও ইহাদের আপত্তি নাই।’

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নির্বিকার চিত্তে আমাদের শুনাইতে-ছেন যে তাহাদের গবেষণাগারে এমন সব বিষ আবিষ্কৃত হইয়া গুদামজাত হইয়া আছে যে তাহা বাতাসে ছড়াইয়া দিলে ২১ ঘণ্টার মধ্যে এক একটা জনপদ—পশ্চিম ইউরোপ বা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনপদ—প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে; তাহার গাছপালা পুড়িয়া যাইবে। আমাদের পূরণ প্রভৃতি পুস্তকে যে দ্বাদশ স্বর্গের আবির্ভাবে সৃষ্টি পুড়িয়া যাইবে এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী পাঠ করিয়াছি, তাহা নিজেদের জীবনে দেখিবার সুযোগ হইবে না কি ?

আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রতীক

আগামী পৌষ-মাঘ মাসে ভারতবর্ষে নতুন নির্বাচন

হইবে। প্রায় ১৭ কোটি নরনারী এক কি দু'দিনের ক্ষুদ্র দেশের নিয়ামক হইবেন। কারণ তাঁহাদের পছন্দ বা খেয়াল মত যেসব সদস্য নির্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে মুসলিমওলী মনোনীত হইবেন এবং এই ভাবে তাঁহারা ই আগামী পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া দেশের শাসনকার্য্য চালাইবেন। এই ভোটভূমিতে নানা দল প্রতিযোগিতা করিবেন, এবং অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত নর-নারীর সুবিধার জন্য নানা চিহ্ন নানা দল পছন্দ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নির্বাচন পরিচালক ক্রীমকুমার সেন সকল দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। নিম্নে তার তালিকা দিলাম :

করওয়ার্ড ব্লক—	দাঁড়ান সিংহ
ঐ (কুইকার পহী)—	মাহুঘের হাত
অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা—	ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার
কিমাণ-মহুঘর-প্রজাদল—	কুঁড়ে খর
অখিল ভারত রামরাজ্য পরিষদ—	উল্লীমান খুর্বা
ভারতীয় তপশীলী ফেডারেশন—	হাতী
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—	জোয়ালে বাঁধা এক জোড়া বলদ
ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল (সোশ্যালিষ্ট পার্টি)—	গাছ
ভারতীয় সাম্যবাদী দল (কুম্মনিষ্ট পার্টি)—	বানের শীষ ও কাণ্ডে

কয়েকটি প্রকাণ্ড ভুলের পরিণাম

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখের “আনন্দ বাজার পত্রিকা”র যে “স্বাধীনতা” সংখ্যা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ক্রীমলেন্দু সেনগুপ্ত একটি মন্তব্য করিয়াছেন যার ফলে কোন ভুল কমিয়া যায় নাই বা কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বর্তমানের সঙ্কট অবস্থা ৪ বৎসর পূর্বের কয়েকটি প্রকাণ্ড ভুলেরই পরিণাম, ইহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। এই প্রকাণ্ড ভুল কয়টির মধ্যে ভারত-বিভাগে স্বীকৃতি সর্ব প্রধান। এই মন্তব্যের মধ্যে যে যুক্তি আছে তাহা মার্কিনী সাংবাদিক হানসন বন্ডউইনের সমপর্যায়ের। রুজভেন্ট ও চার্কিল ইয়াণ্টার “যে প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছিলেন তার ফলে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা নাকি বিপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ নেহরু ও প্যাটেল ভারত-বিভাগ স্বীকার করিয়া ৩৫ কোটি বা ৪০ কোটি নরনারীর জীবন, সম্মান ও বিত্ত বিপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ বক্তব্যাদির যুক্তি স্বীকার করিয়া লইতাম যদি ইয়াণ্টার রুজভেন্ট-চার্কিল আর কি করিতে পারিতেন তাহা বন্ডউইন প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার-গণের প্রবন্ধে দেখিতে পাইতাম। সেইরূপ দিল্লীতে নেহরু-প্যাটেলের গত্যন্তর কি ছিল, তাহা দেখাইতে পারিলে অমলেন্দু বাবুর বক্তব্যের মূল্য ছিল। নেহরু ও প্যাটেলের নীতির সমর্থক না হইয়াও তাঁদের হইয়া এই কথা বলা যায় যে “পাকিস্তান” প্রতিষ্ঠার সম্মতি না দিলে আমাদের কোটি কোটি নর-নারীর অবস্থা বর্তমানের অপেক্ষা উন্নততর হইত তাহা প্রমাণ-ভাবে অগ্রাহ্য।

একই ডালে পেচক ও দাঁড়কাক

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত “পূর্বাচল” (সাপ্তাহিক) পত্রিকার গত ২৩শে ভাদ্র সংখ্যায় আসাম রাজ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিত্রালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যারা আসামের রাজ-নৈতিক হালচালের সন্ধান রাখেন তাঁরা এই “নিকাহ” বিবাহের সংবাদে আশ্চর্য্যাবিত হইবেন না। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে যান তুলিবার সময়, পাটি তুলিবার সময় এরূপ অগুণ্টি বিবাহ হয়। প্রায়ই ২৩ মাস পরে “তালাকে”র ঘুম পড়িয়া যায়। আমাদের কেবল জানিতে কৌতূহল হয় যে এই ব্যাপারে কে বর ও কে কনে—যুগ ও যুগ।

“...ভারতবর্ষকে ‘সেকুলার’ রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টায় জওহরলালজীকে সাহায্য করাই হইল তাহাদের কংগ্রেসে যোগদানের অল্পমম উদ্দেশ্য। তাহাতে লীগ-নেতা জমাব সৈয়দ সাদউল্লা ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছেন, যেন ভারতবর্ষ বাস্তব ক্ষেত্রে আচার-আচরণে কার্য্যতঃ ‘সেকুলার’ বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নহে বা অধরূপ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ হীন ইঙ্গিত একমাত্র লীগ-নেতা ও তাঁহার সাদ্রাতদের পক্ষেই সম্ভব। ইহা ‘সেকুলার’ বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র না হইয়া যদি পাকিস্তানের মত সাম্প্রদায়িকতা-বাদী ধর্মাত্মক রাষ্ট্র হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে চারি কোটি মুসলমানকে শাস্তিতে ও নিরুদ্ধে বসবাস করিতে দেখা যাইত না। আজও যে চারি কোটি মুসলমান সন্মান, ও শাস্তিতে এই রাষ্ট্রে বাস করিতে পারিতেছেন, তাহাই ভারতবর্ষের সেকুলারিজম এর জলন্ত নিদর্শন।

“প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতাবাপন্ন দুইটি প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও লীগের মিলন কিরূপে সম্ভব হইল? মুসলিম লীগ উৎকৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান না হইলেও ইহা বর্তমানে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল। সমস্বার্থের ভিত্তিতেই এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্মিলন সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতিগত কারণেও এই দুইটি দুষ্ট এহের মিলন ঘটয়াছে। একটি স্থলে দুইটি প্রতিষ্ঠানের যে অপূর্ণ চারিত্রিক সাদৃশ্য আছে তাহা হইতেই উদ্ভবই প্রতিক্রিয়াশীল।”

“প্রতিক্রিয়াশীল” শব্দটি স্থানে স্থানে এত অধিক ব্যবহার করা হইতেছে যে তার কোন জালা নাই। কিয়ার বিরুদ্ধে হয় প্রতিক্রিয়া। ভারতরাষ্ট্রে কিসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে? প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন আজ বিশ্ব-জনীন হইয়া পড়িয়াছে, কেবল কংগ্রেসই তৎকর্তৃক অভিহৃত হয় নাই। কিন্তু আসাম রাজ্যে যাহা ঘটতেছে তাহার গভীরে ঘাইতে হইবে এবং তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে ভাষা-বিদের আশ্রয় লইতে হয়। এরূপ একজন ভাষাবিদ উক্ত

স্বনীতিভূমির চট্টোপাধ্যায়। তিনি বহুদিন পূর্বে আসামের ভাষা-সঙ্কট সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আজও তাহা সত্য; আজও ভাষার দ্বন্দ্ব রাজনীতিকে নিরস্ত্রিত করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রের চিরশত্রু মুসলিম লীগের সঙ্গে মিতালী রাষ্ট্রদ্রোহের সমান।

স্বনীতিবাবুর বক্তব্য এইরূপ ছিল :

“...উপস্থিতকালে আসামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর ভাষা অসমীয়া; ইহা কেবল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার, এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিম অংশে গোয়ালপাড়া জেলার বাংলাও প্রচলিত। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন পাহাড়ী ভাষা প্রচলিত—যথা গারো খাসিয়া মিকির ডিমাঙ্গা বা কাছাড়ী নাগা এবং মণিপুরী কুকী ও লুশাই। ইহাদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খাসিয়া ও মণিপুরীরা বিশেষ উন্নত এবং আমি নিজে মণিপুরে ও শিলঙে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই যে আসামের এই সকল পার্বত্যজাতি নিখিল-আসামের রাজ্যভাষা হিসাবে বরং হিন্দীকে চায়—মণিপুরীদের অনেকের বাংলাতেও আপত্তি নাই—কিন্তু অসমিয়া কেহই চাহে না। আসামের পার্বত্য জাতিসমূহ এখনকার আসামের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ আসামের বাংলাভাষী। কোন্ ভাষা এক-তৃতীয়াংশের ভাষা (এবং সেই ভাষার সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, ব্যাপারিক ও রাজনীতিক প্রাধান্য অল্প আর একটি তৃতীয়াংশের ভাষা অপেক্ষা গুরুতর ইহা কেহ বলিবে না) অল্প ছই-তৃতীয়াংশের উপরে জোর করিয়া চাপানো যাইতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসীর অল্পতম মৌলিক অধিকার হইতেছে যে সে ভারতের যে অংশেই বাস করুক না কেন, তাহার ভাষা এবং ভাষাগত সংস্কৃতি সে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।...

আসাম প্রদেশের সুক্তিসঙ্গত নাম হওয়া উচিত “পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ এবং এই পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের চারিটি বিশিষ্ট বণ্ড, ইহার প্রত্যেকটির অধিবাসী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র—(১) হিমালয়ের সাহুদেশের পার্বত্যজাতি আবর, মিরি, মিশমি ও ডকলা প্রভৃতি দ্বারা অধ্যুষিত, বালিপারা ও সদিয়া সীমান্ত অঞ্চল; (২) অসমিয়া ভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, এই অঞ্চলের পশ্চিমে বাঙালীদেরও বাস; (৩) পার্বত্য অঞ্চল—গারো, খাসিয়া জয়ন্তিয়া, নওগাঁ জেলার মিকির পাহাড় এবং নাগা পর্বত অঞ্চল, মণিপুর ও লুশাই পাহাড়; (৪) বর্মী উপত্যকার কাছাড় ও ত্রিহট্টের অংশ—এখানে বাংলাভাষা প্রচলিত।”

শতকরা ৩৩ জন লোক যদি নিজেদের স্বার্থ বাকী ৬৭ জনের উপরে স্থাপিত করিতে চায় তবে এরূপ অস্বাভাবিক “নিকাহ” ছাড়া অন্য গতি কি আছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ

গত ১৮ই ডিসেম্বর “জনশক্তি” (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় “ত্রিবাণ্ডব” এই ছদ্মনামে এক জন লেখক যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় কেন ত্রিপুরার প্রজাবর্গ পাকিস্তানীর আশঙ্কায় দিন কাটাইতেছে। পুরাতন কথার, আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের অকর্মণ্যতার কথা উল্লেখ করিতে চাই না। এখন “যাত্রা” শেষ হইলে রাষ্ট্রের মঙ্গল।

“ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আসাম-কাছাড়ের সংযোগ নিয়ে যে অভূত কাণ্ড ঘটে গেছে, তা সর্বজনবিদিত।

সংযোগের পরিকল্পনা প্রস্তুত হ’ল, নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ার এসে আসানো গাড়লেন ত্রিপুরায়। কত কন্ট্রাক্টর এলেন, তাদের দিয়ে কাজও আরম্ভ হ’ল, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হতে লাগল। কিন্তু তার পর? যখন কন্ট্রাক্টররা বিলের টাকা নিয়ে ঘরে উঠেছেন, তখন দেখা গেল, পথের যাত্রা হয়েছে ভুল পথে আর টাকাগুলো গেছে মাঠে মারা। ইঞ্জিনিয়াররা স্থান ত্যাগ করলেন অথবা করতে বাধ্য হলেন, এলেন নতুনদের দল, আবার আরম্ভ হ’ল নতুন রাস্তা, এলেন নতুন কন্ট্রাক্টর। এবার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু হ’ল।...”

বর্মী আরাকানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

গত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের শেষে একটি সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তার মর্মার্থ এই: পাকিস্তানের সাহায্যে এবং সমর্থনে একদল মুসলিম ‘মুজাহিদ’ বা ধর্মযুদ্ধের সৈনিক ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলে ‘জেহাদ’ চালাইতেছে এবং বুধিডং-এ তাহারা সম্প্রতি একটি ‘শরিয়তী সাধারণতন্ত্র’ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

উক্ত ‘সাধারণতন্ত্রের’ প্রধান হইতেছেন আবুল কাশিম নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ‘ল’ গ্রাজুয়েট। আরাকানের তিনি একজন বনী জমিদার। তাঁর দলে কয়েক শত সশস্ত্র ‘মুজাহিদ’ আছে। যে ‘সাধারণতন্ত্র’ তাহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সেটি অবশ্য একটি ‘ভ্রাম্যমাণ সাধারণতন্ত্র’। ব্রহ্মদেশীয় দৈত্য-দলের দৃষ্টিগোচর হওয়ার উপরই ইহা নির্ভরশীল। নাক নামে যে নদীটি ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চল এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, সেই নদীর কূলে কাশিম দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল শক্ত খাঁটি তৈয়ারী করিয়াছে। কাশিম-বাহিনীর কার্য-কলাপ এখন মডডঙেই জোর চলিতেছে।

কাশ্মীরের কারদা এখানেও চলিতেছে, আরাকানের এই সমস্ত ‘মুজাহিদ’কে গোলাবারুদ কে জোগাইয়াছে—অবশ্য প্রকাণ্ডে ও সরকারীভাবে নহে—তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নাই। সম্প্রতি পাকিস্তান হইতে মুজাহিদগণ চার ইঞ্চি

মর্টার এবং অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র পাইরাছে। জানা গিয়াছে যে, গত যুদ্ধের সময় আরাকানের জঙ্গলে লুকান ব্রিটিশের কিছু অস্ত্রশস্ত্রও মুসলিম যুজ্জাহিদের হাতে পড়িয়াছে।

একটি ‘বাহিনী’ও তাহাদের আছে। এই দ্বিতীয় বাহিনীর অধিনায়ক হইতেছে ব্রহ্মদেশীয় পুলিশের জৈনক প্রাক্তন সাব-ইন্সপেক্টর, নাম জাকর। বিমানযোগে জাকর করেকবার করাচী যাতায়াত করিয়াছে। কিছু কান্দীরী মোজা সে আরাকানে আমদানী করিয়াছে।

কিছুদিন হইল কাশিম ও জাকর মিলিত অভিযান চালাইতেছে।

আরাকানের এই যুজ্জাহিদের স্থানীয় মুসলমান বা ব্রহ্মের বিজোহীদের সহিত কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই; সংযোগও কিছু নাই। এই ‘জেহাদের’ উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ আকিরাব পর্যন্ত চাউল-উৎপাদনকারী সমগ্র অঞ্চলটি পাকিস্থানের আওতাধীন আনা। আকিরাব বন্দরের সামরিক গুরুত্বও রহিয়াছে।

ব্রহ্ম সরকার এই ‘জেহাদকে’ তাহাদের ‘খরোয়া’ ব্যাপার ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন, তাই পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তাহারা নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ উত্থাপন করে নাই।

‘যুজ্জাহিদের’ লড়াইয়ের কারণ এই : ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদল দেখা গেলেই তাহারা পার্শ্ববর্তী পূর্ব-পাকিস্থানে চুকিয়া পড়ে এবং নিজেদের পরিচয় দেয় আরাকান হইতে আগত মুসলিম উদ্বাস্তু বলিয়া। ‘তাহারা বলে, আরাকানীদের অভ্যাচারে তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্থানে সম্প্রতি আরাকানীদের বিরুদ্ধে প্রচার চলিতেছে। ব্রহ্মদেশ হইতে পূর্ববঙ্গে চাউল চোরাই-কারবার প্রসিদ্ধ।

এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমাদের মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা—এই কর্মের ফলে পাকিস্থানী মনোভাব হুনিয়ার চোখে আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। কম্যুনিষ্ট “পঞ্চমবাহিনী”র মত পাকিস্থানীদের নিজেদের রাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনে তৎপর দেখা যাইবে।

ভারতরাষ্ট্রে অভ্যের খনি ও ব্যবসায়

“যুগান্তর” পত্রিকায় অভ্যখনি ও ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এখন পর্যন্ত এই খনিজ দ্রব্যের বাজার বিদেশে, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বিলাতে। যুদ্ধের সময় অভ্য অনেক সামরিক প্রয়োজনে লাগিয়াছে। সুতরাং তাহার মূল্য বাড়িয়াছে।

“ভারতীয় অভ্যের বেশীর ভাগই পাওয়া যায় বিহারের অভ্যখনি অঞ্চল থেকে। হাজারীবাগ জেলার কোডারমা, গাঁওরা, সাতগাঁওরা, জামুয়া প্রভৃতি থানা, গম্বা জেলার রকৌলি থানা

ও যুদ্ধের জেলার ঝাঁঝা টেশনের নিকটবর্তী কতকাংশ নিয়ে গঠিত ষাট মাইল লম্বা ও বার মাইল চওড়া বিহারের এই অভ্যখনি অঞ্চল। ছোট বড় অসংখ্য অভ্যখনি আছে এই অঞ্চলে। বিহার তথা ভারতবর্ষে অভ্য-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হাজারীবাগ জেলার কোডারমা ও তার পরেই-গিরিডি। ছোটনাগপুরের ভরদ্বায়িত ভূমিতে অবস্থিত এই দুটি জায়গা পৃথিবীর সমস্ত অভ্য-ব্যবসায়ীর কাছে সুপরিচিত। মাদ্রাজ প্রদেশের নেলোর জেলা ও রাজপুতানার কিষণগড় প্রভৃতি ঠেটেও অভ্য পাওয়া যায়। গুডুর ও ভিলওয়ারা যথাক্রমে মাদ্রাজ ও রাজপুতানার অভ্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্র।

খনি বিজ্ঞানে বলে বাজুসার কোয়ার্টজ খনিজের গ্লিত স্রোত যাহাকে “পেগমেটাইট” বলে, যখন অভ্যধারক “মাইকা সিষ্ট” স্তরকে ভেদ করে, তখনই অভ্যের জন্ম হয়। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ঐরূপ দ্রবময় আগ্নেয় স্রোত বহিয়াছিল। আজ নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পরে ঐরূপ ঘটনাস্থলগুলি অভ্যখনিতে পরিণত হইয়াছে। অভ্যখনিতে দেখা যায় পেগমেটাইটের মধ্যে পাথরের ভিতরে চাপ চাপ অভ্যের “পকেট” রহিয়াছে।

“অবশ্য সব পেগমেটাইটেই সমান অভ্য পাওয়া যায় না। কোনও জায়গায় খুবই সামান্য পাওয়া যায়—আবার কোনও জায়গায় বেশী পাওয়া যায়। অভ্যখনি অঞ্চলে অনেক জায়গায়ই অভ্যখণ্ড-মিশ্রিত এই ‘পেগমেটাইট’ ভূপৃষ্ঠে দেখতে পাওয়া যায়। বিক্ষারক ব্যবহার ও হাতুড়ি, শাবলের সাহায্যে এই পেগমেটাইট কেটে মাহুয় নীচে নেমে যায়, আর ভাঙা পাথরের ভিতর বকবকে অভ্যখণ্ডগুলি বেরিয়ে পড়ে। এমনভাবে সোজা পঁচিশ তিরিশ ফুট কেটে আবার পেগমেটাইটের ভিতর দিয়ে লম্বা হুড়ঙ্গ কাটা হয়, আর পাথর কাটিয়ে অভ্যখণ্ডগুলি উপরে নিয়ে আসা হয়। এমনি করে এক একটি ‘অভ্যখনি পাঁচশ’ ছ’শ ফুট নীচে পর্যন্ত যায় এবং তাতে পঁচিশ-ত্রিশ ফুট অন্তর অনেকগুলি হুড়ঙ্গ কাটা হয়ে যায়, বেশ লম্বা লম্বা। অভ্যখনিগুলি বেশী চওড়া হয় না। কারণ পেগমেটাইটের দুই পাশেই সাধারণতঃ থাকে মাইকা সিষ্টের দেওয়াল। এই ‘সিষ্ট’-এর মধ্যে অভ্য পাওয়া যায় না বলে এগুলিকে আর কাটা হয় না।

মাটির নীচে অমনি হুড়ঙ্গ কেটে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। মাটির নীচে যত যাওয়া যায়, ততই গরম—আর ওখানে উপরের মত এমনি মুক্ত হাওয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বায়ু চলাচলের জন্য প্রত্যেক খনিতে ছুই বা ততোধিক মুখ করতে হয়—মাটির নীচে অন্তকারে কিছুই দেখা যায় না, তাই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় মোমবাতি বা লণ্ঠন—তাতে খনির নীচে গরম গুমোট জায়গা আরও গরম হয়ে ওঠে। তার পর উপর থেকে মাটি-পাথর চাপাও পড়তে পারে, তারও যথোচিত ব্যবস্থা করতে হয়। পাথরগুলোকে কাটাবার জন্য ব্যবহৃত

হয় ডিনামাইট। বিস্ফোরণে পাথরগুলো কেটে চৌচির হয়ে যায় আর পাথরের খণ্ড ছিটকে আসে বুলেটের চেয়েও জোরে। প্রমিকেরা-কিন্তু প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে পালাক্রমে দিনরাত এই সব পাতালপুরীতে কাজ করে যাচ্ছে, আর ভূগর্ভ থেকে উঠিয়ে আনছে অতি প্রয়োজনীয় এই সম্পদ। অনেক যন্ত্রপাতি দরকার হয় বড় বড় খনিতে কাজ করার জন্যে—যেমন খনির নীচে জল হয়—সে সব জল উপরে তুলে ফেলবার জন্য চাই বড় বড় পাম্প। অজ ও পাথর উপরে তোলবার জন্য চাই বড় বড় ‘হয়েস্ট’—তা ছাড়া এই সব পাম্প ও হয়েস্ট চালাবার জন্যে থাকে বড় বড় এঞ্জিন ও বয়লার। ‘এয়ার কম্প্রেসার’ চাই এই সব শক্ত পাথরে গর্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় যে মেশিন ড্রিল তার জন্ত।

অজ স্বচ্ছ ও মৃৎ—কিন্তু ভূগর্ভে অজ্ঞাত জিনিসের সংস্পর্শে এসে এর স্বচ্ছতার কিছু ব্যতিক্রম ঘটে ও অনেক সময় নানা দাগ পড়ে এবং ভূগর্ভে প্রাণের চাপে থাকে বলে কিছু কিছু অজ অমৃৎও হয়। যত বেশী দাগযুক্ত বা অমৃৎ হবে, ততই তার দাম যাবে কমে—কারণ এগুলির বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ রোধ করার শক্তি কমে যায়। তাই এরূপ শ্রেণীবিভাগ দরকার হয়ে পড়ে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে অজগুলিকে ভাগ করা হয় :—সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, দাগযুক্ত মৃৎ যে অজগুলিকে সেগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে দামী ও প্রয়োজনীয়—এগুলিকে বলা হয় ইংরেজীতে ‘ক্লিয়ার এস এস’। তারপরে পর্যায়ক্রমে ‘গুড স্টেনড’, ‘কেয়ার স্টেনড’, ‘হেভিলি স্টেনড’, ‘ব্যাডলি স্টেনড’, ইত্যাদি। এমনই শ্রেণীবিভাগ করে অজগুলিকে গুণায়িত করে রাখা হয়। তারপর বিদেশ থেকে যেমন যেমন চাহিদা আসতে থাকে, বাজ ভর্তি করে এগুলিকে চালান দেওয়া হয়।

কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের পরিকল্পনা

প্রতি যুগে এক একটা শব্দের ব্যবহার মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, তাহাদের কর্মশক্তি হরণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের যুগে, যেদিন হইতে মার্কিনের ধন ও বৈভব ছনিয়ার উপরে ধবরদারি করিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতে “প্লায়নিং পরিকল্পনা” শব্দটি বর্তমান জগৎকে পাইয়া বসিয়াছে। যেন একটা অদ্ভুত আবিষ্কার এই শব্দের মধ্যে নিহিত আছে।

অথচ সাধারণ লোকে ভাবিয়া পায় না যে শব্দটির ব্যবহার কেন এত জনপ্রিয় হইয়াছে। ভাহারা ত তাহাদের “অশিক্ষিত” বুদ্ধি দিয়াও বুঝে যে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত “পরিকল্পনা” ছাড়া কোন কাজ করে না। বর্ধার জন্ত খাঁত সঞ্চয় ও আবাসস্থানের ব্যবস্থা একরূপ, শীত ও গ্রীষ্মের ব্যবস্থা অন্তরূপ। খাদ্য-প্রতিষ্ঠানের মধ্যমিকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ত্রীকিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই সম্বন্ধে আমাদের অনেক তথ্য শুনাইয়াছেন; তাহার আশ্রিত মক্ষিকার নানাবিধ কোশলের গল্প বলিয়াছেন। এই অশিক্ষিতপটু লাভ ক্রিয়ার জন্ত বিরাট কলকারখানার বা

গবেষণাগারের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য অনেক সময় ভাবি “পরিকল্পনা” শব্দটি জপিতে জপিতে আমরা এরূপভাবে আত্ম-হার হইলাম কেন।

তবুও অস্বীকার করি না যে গবেষণাগার ও কল-কারখানার প্রয়োজন আছে; অতীতেও ছিল। সেইজন্য ভারতব্রাহ্মণের পরিচালক ত্রীজবাহরলাল নেহরু যখন অনবদ্য ভাষায় “পরিকল্পনার” গুণকীর্তন করেন, তখন মন দিয়া শুনিলাম। আত্ম ভাণ্ডাও নুতন হইয়াছে। একটা নুতন শব্দ আবিষ্কার না করিলে ব্যবসায় অচল হইয়া যাইবে যে।

গত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দিল্লী হইতে একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম নিয়ে উদ্ধত করিলাম :

ভারতীয় কয়লা হইতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-বিষয়ক গবেষণা পরিষদের গবর্ণিং বডি ভারত-সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাউন্সিলের তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের পর পুরোক্ত সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি সাধনের জন্ত পরিষদকে দৃঢ়বাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনা হিসাবে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু আমাদের আত্ম-প্রশংসারও অনেক কারণ আছে। “বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট পরিষদের কার্যকলাপ প্রশংসার। ইতিমধ্যেই দুইটি বীক্ষণাগার খোলা হইয়াছে এবং সেখানে কাজ চলিতেছে। যেভাবেই হউক, আমরা ভাল কাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।...আধিক্য অনটন হেতু গবর্ণর্মেণ্ট গবেষণা এমন কি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে তিনি-পরিষদকে উচ্চল ভবিষ্যতের আলোকে প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার বৃদ্ধির জন্ত উৎসাহ দানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

ভারতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সহিত পরামর্শক্রমে একটি পরিকল্পনা রচনার জন্ত পরিষদ একটি কমিটি গঠন করেন।

বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে ইহার পর এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি নক্সা প্রস্তুত করা হয়।

পরিষদ এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যত সস্তার সম্ভব এই পরিকল্পনা অল্পসারে কার্যারম্ভ হওয়া আবশ্যক। অর্থ-নৈতিক কারণে অন্তরায় ঘটান আদৌ উচিত নহে। “কপাস” ইল ইউ এস এ যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পরিষদ

ভারত-সরকারকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত পরিকল্পনায় ২২ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনামুসারে ভারত ৭০ হাজার টন বিমান চালনার পেট্রল, ১৫ লক্ষ টন পারিবারিক ব্যবহার্য কয়লা, কিছু পরিমাণ পেট্রলিয়ামজাত দ্রব্য লাভ করিবে।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে কর্পাস ইন্ডের রিপোর্ট পরীক্ষার ক্ষমত পরিষদ নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞদিককে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন; যথা—শ্রী জে আর ডি টাটা, শ্রী জি ডি বিড়লা, শেঠ কান্ত রতাই লালভাই, লাল। শ্রীরাধ, ডাঃ এস এস ভাটনগর, ডাঃ জে সি ঘোষ, এবং ডাঃ ডি এন গুয়াদিয়া। তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার ক্ষমত কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে স্বাভাবিক পেট্রোলিয়ম পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানের ক্ষমত পরিষদের উত্তোগে ভারত-সরকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থতাত্ত্বিক তথ্যসম্ভারের তীব্রতা বৃদ্ধি করেন। তদুপরি খনিজ পেট্রোলিয়ম খনিদ করিয়া ভারতীয় বন্দরসমূহে দুইটি বা তিনটি শোধানাগারে উহা শোধন করা সম্ভবপর কিনা, তাহাও তাঁহারা পরীক্ষা করেন। ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থতাত্ত্বিক তথ্যসম্ভারের ফলে এ পর্যন্ত দেশের কোথাও তৈলবাহী এলাকার সন্ধান মিলে নাই; তদুপরি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের সুচিন্তিত অভিযত এই যে, দেশের কোথাও তৈলবাহী এলাকা হয়তো থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা পরীক্ষার করিতে ও কাজে লাগাইতে বহু বৎসর অতীত হইবে। সুতরাং এইরূপ কোনও সূত্র হইতে পেট্রল সংগ্রহ করিয়া দেশের প্রয়োজন মিটাইবার আশা সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পরিষদ এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রাপ্তির পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা-পরিষদের পরিচালক সমিতি গবেষণা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় হইবে।

ভারতের ৫৬ মাস অতীত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে প্রস্তাবিত উপলক্ষে কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ভরসার কথা এখনও শুনি নাই।

তুনিয়ার বাণিজ্য পোতের হিসাব

সম্প্রতি আমেরিকা ম্যারিটাইম কমিশন (U.S. Maritime Commission) বিভিন্ন দেশের সমুদ্রপোতের 'টনেজ' বা মালবহন ক্ষমতার এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কি অবস্থা ছিল এবং বর্তমানে তাহা কি অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায় যুদ্ধের বিষয় ক্ষয়-ক্ষতি কাটাওয়া জাহাজী টনেজ অতি কষ্টে ১৯৩৯ সালের পরিমাণ সামান্যমাত্রায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বান্ধুদের

গুরু দূর হইতে আসিয়া আসিতেছে। যদি বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধ খনাইয়া উঠে, তবে সমুদ্রপোতের অবস্থা যে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই হিসাবে দেখা যায় :

	১৯৩৯	১৯৫০
মোট বাণিজ্যপোতের সংখ্যা	১২,৬৬৫	১০,৭০৮
জাহাজী টনেজ	৭,৯১,৩৯	৮,১৮,১২
ইংলণ্ড	২,১৫,৮৭	২,২০,১৮
আমেরিকা*	১,০২,১৯	১,৩৯,৯১
নরওয়ে	৬৯,৩১	৭৫,৬৭
পানামা	—	৪৯,৮৪
নেদারল্যান্ড	৩৪,২৫	৩৬,৭২
ফ্রান্স	২৯,৯৯	৩৫,৯৫
সুইডেন	২০,৩৩	২৭,০৫
গ্রীস	২৭,৯১	১৯,৩৩
সোভিয়েট রুশ	—	১৮,২৪
অপর্যাপ্ত সম্মিলিত	—	১,৬১,৪১
জাপান	৭১,৪৫	—
জার্মানী	৫১,৭৭	—
ইটালী	৩৯,১০	৩৩,৮২

সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় জাহাজ মালিক সমিতির সভাপতি শ্রী জি. টি. কামদার ইহার বার্ষিক অধিবেশনে উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতরাষ্ট্রের টনেজ মাত্র ৪ লক্ষ টন। ভারতের জাহাজী-বাণিজ্য সুচারু ভাবে চালাইতে হইলে উপকূলের ক্ষমত আরও ১,৭৫,০০০ টন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষমত ১,৫০,০০০ টনের জাহাজ প্রয়োজন। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৩০,০০০ টনের জাহাজ যাত্রী বা যাত্রী ও মাল ভারত সমুদ্রে গমনাগমনের ক্ষমত প্রয়োজন। এই জাহাজ ক্রয় করিতে ৭ হইতে ৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। সমস্ত উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইলে আরও ১৪ কোটি হইতে ১৬ কোটি টাকা এবং আমেরিকা, ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দূরপ্রাচ্যে গমনাগমন ও বাণিজ্যপোতের ক্ষমত আরও কমবেশী ১,২০,০০০ টনের জাহাজ কিনিতে ১২ হইতে ১৩ কোটি টাকা প্রয়োজন।

এই অভাব মিটাইবার ক্ষমত ভারত গবর্নমেন্ট এককালে বিদেশী জাহাজী কোম্পানীকে ভারতে আনিয়া কাজকারবার আরম্ভে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় ৩৫ কোটি টাকার ৭৫ ভাগ শতকরা ২ টাকা হুদে

* ইহা হাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক কমিশনের তাঁবে যে ১৯,৯৫,০০০ টনেজ আছে বা সেনাবিভাগের অন্তর্গত ষাট টনেজ আছে, তাহা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নহে।

অগ্রিম দিলে বাকী টাকা শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেশের মধ্যে সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এই প্রসঙ্গে আত্মবশের জ্বরের ও পরবশের দুঃখের কথা আমাদের হৃদয়দম করিতে হইবে। তবেই দেশের মুদল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সাহায্য

নিম্নলিখিত বিবরণটি “আমেরিকান রিপোর্টার” (বাংলা সংস্করণ) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুবেরের দেশ বলিয়া পরিচিত কেন তাহা এই সাহায্যের পরিমাণ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়।

এতৎসম্পর্কে দুই-তিনটি কথা আমাদের মার্কিনী বন্ধুবর্গের জানিয়া রাখা ভাল। প্রথম—হাঁহারা উপরুত হইতেছেন, তাঁহারা এই দানে সুখী মন। একটা অব্যক্ত ভীতি তাহাদের মনকে নাড়া দেয় যে দাতা এই দানের প্রতিদানে কিছু উত্তল করিয়া লইবেন। দ্বিতীয়—এরূপভাবে দান করিয়া মানুষের মন ক্ষয় করা যায় না। চীনদেশ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বকসার বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণরূপ বহু কোটি টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে পড়িয়াছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির নিদর্শনরূপ এই টাকার মুদ্রা লওয়া হইল না। তাহা ব্যয় করা হইল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চীনদেশীয় যুবকবৃন্দের শিক্ষার উন্নতিকল্পে।

তার কলে তাঁহারা মার্কিনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিলেন, ভাব ও চিন্তায় হইলেন মার্কিনী, যেমন ইংরেজের আমলে আমরা হইয়াছিলাম। চিয়াং-কাই-শেক, মাও-সে-তুং ছাড়া চীনের নেতৃবর্গ প্রায় সকলেই ছিলেন এইরূপ ভাবে মার্কিনের নিকট ঋণী।

আজ দেখিতেছি কি? এই নিঃস্বার্থ দানের কথা চীন-দেশের কেহ কি মনে-প্রাণে স্বীকার করেন? সেইজন্যই বলিতে চাই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এশিয়া ও আফ্রিকাকে কম অর্থসাহায্য করিতেন তবে তাহা কল্যাণপ্রসূ হইত বেনী এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই শান্তিতে থাকিতে পারিতেন।

“আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও আর্থিক সমস্যা সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শ-দাতা পরিষদ জানিয়েছেন যে, ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি মোট ৫০০ কোটি ডলার সাহায্য পাইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে।

কোন দেশ কত ডলার সাহায্য পেয়েছে তার হিসেব এইরূপ :—

ভারত ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, ব্রহ্মদেশ ৫০ লক্ষ ডলার, চীন ১৭৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, ইন্দোনেশিয়া ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, ইরান ৩ কোটি ডলার, ইসরাইল ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, জাপান ২ শত কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, রিপাবলিক অব কোরিয়া (দক্ষিণ কোরিয়া) ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার, কিলি-পাইন ৭৬ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, রিউক দ্বীপপুঞ্জ ৬ কোটি

ডলার, সৌদি-আরব ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, থাইল্যান্ড ৬০ লক্ষ ডলার এবং তুরস্ক ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার।

আফ্রিকার দেশসমূহ : মিশর ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, লাইবেরিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ১০ লক্ষ ডলার।

ওশেনিয়া : অস্ট্রেলিয়া ২ কোটি ডলার, নিউজিল্যান্ড ৭০ লক্ষ ডলার এবং ওশেনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ৪০ লক্ষ ডলার।

পরামর্শদাতা পরিষদ নিম্নলিখিত সুপারিশও করেছেন :

(১) ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনার যদি কোনও দেশ যোগ দেয় তা হলে সে দেশকে “পরিবর্ত আমানত” জমা রাখতে হবে, কেননা এ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় সম্পদ হস্তান্তরের ভিত্তিতে। তবে কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ ভিত্তিতে হয় না।

(২) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সৌকর্যার্থে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই যাহাতে সামরিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত এই “পরিবর্ত আমানতে”র অর্থ পাওয়া যায়, তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত আর্থিক বছরে যে সব বিশেষ ধরনের বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া হবে, তাও হবে ঐ সম্পদ হস্তান্তরের ভিত্তিতে, সামরিক সাহায্যও ঐ একই ভিত্তিতে দিতে হবে। কখনই ঋণ দানের ভিত্তিতে ঐ সাহায্য দেওয়া চলবে না।

(৪) বৈষয়িক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য যে অর্থ দেওয়া হবে, তা হবে ঋণের ভিত্তিতে। তবে এরূপ সাহায্য দেওয়া হবে শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই, যেখানে দেখা যাবে যে, ঋণ গ্রহণ করে ঐ পরিকল্পনা সফল হতে পারে এবং সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও যথোপযুক্ত ধরনের।

(৫) সম্পদ হস্তান্তরের (দান) ভিত্তিতে যে বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া হবে, সেই সাহায্যকে “কোনও মতেই স্বর্ণ ও ডলারের মজুত তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলবে না এবং বিপরীত পক্ষে যে সব দেশ দেশরক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দেবে, তাদের বর্তমান মজুত তহবিল হ্রাস করা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যদাতার প্রাথমিক সর্ত্ত বলে বরা হবে না।

উক্ত পরামর্শদাতা পরিষদ আরও দেখিয়েছেন যে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি রপ্তানি ব্যাঙ্ক ৩৩০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছেন। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কাগজ বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১০৭ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিশ্বত বিপ্লবী

মহারাষ্ট্র দেশে বহুদেব বলবন্ত ফাড়কের (Phadke) নাম অরুণকাঙ্ক্ষা বিপ্লবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮৭৭ সাল বা

তদ্বিকটবর্তী কালে মহারাষ্ট্র দেশে মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে প্রভৃতি শিক্ষিত নেতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সময়েই এই প্রায় অশিক্ষিত যুবক সশস্ত্র বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। ব্রিটিশ শাসকবর্গ এই চেষ্টাকে কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষের (agrarian discontent) ফল বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালীন বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারী বলিয়াছিলেন তাঁহার নিকট প্রমাণ আছে যে, ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন চলিতেছে। ফাঙ্কের বিদ্রোহ তার প্রথম প্রকাশ। আজ মহারাষ্ট্র বলবত্তের যোগ্য সম্মান দিতেছে।

ভারতবর্ষে পূর্বাঞ্চলে অসুস্থরূপে চেষ্টা হইয়াছিল প্রায় ১৮৬০ সালে, ‘সিপাহী বিদ্রোহ’র ২৩ বৎসর পরে। সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ‘মধুবন’—সোনারাম আওসেন। তিনি কাছাড়ী ছিলেন। গঞ্জুর ছিল তখন মহম্মদের সদর শহর। সুতরাং ‘মধুবন’ ধরনি তুলিলেন—‘চল গঞ্জুর’। পাশাপাশি একটি সরকার স্থাপিত করিলেন। প্রায় ১২ বৎসর এই অসম যুদ্ধ চলিল। শেষে ‘মধুবন’ বিধ্বাসঘাতকের কোশলে ধরা পড়িলেন। তখন তিনি কোম গ্রামে কবিরাজী ব্যবসায় করিতেছিলেন। তাঁর জীবন-কথা অবলম্বন করিয়া অনেক পল্লীগীতা রচিত হইয়াছিল। তাহা সংগৃহীত হওয়া উচিত।

“বিশ্ব-ভাগবতী ও ভক্তি-নিকেতন”

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় আসামের ডিরেঞ্জর অব পারিক ইন্সট্রাকশন ছিলেন। সরকারী দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বৃন্দাবন বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইস্-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি যে বিরাট কর্মভার মাথায় তুলিয়া লইতেছেন, তাহা যৌবন-মূলভ কর্মশক্তির উপযোগী। সেই সঙ্গে থাকা চাই ভক্তি ও পাণ্ডিত্য। একটি বিবরণে দেখিতেছি যে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া তিনি ভক্তিশাস্ত্র, ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে প্রায় ১৯০ খানি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করিতেছেন।

এই বিরাট কার্য একার দায়িত্বে সম্পন্ন হয় না। সতীশবাবু নবদ্বীপধাম, কলিকাতা, শিলং প্রভৃতি স্থানের ভক্ত, পণ্ডিত ও লোকনায়কদের আশীর্বাদ ও অনুমোদন লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা জরুরী সেবা-সমিতি

এই সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী হাকুমার ও যুগ্ম-সম্পাদিকা শ্রীকুলীপ এইচ সিং ও শ্রীঅশোকা গুপ্তার বিয়তি হইতে নিম্ন-লিখিত তথ্যাবলী সংকলন করা হইয়াছে:

“পঞ্চাব হইতে আগত লক্ষ লক্ষ গৃহহারা উদ্বাস্তু যখন উত্তর ভারতের নিদারুণ দীর্ঘ কষ্ট পাইতেছিল তখন তাহাদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তৈরী জামা পোশাক

দেওয়ার জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের উদ্যমীকৃত রাজ্যপালের পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার পশ্চিম-বঙ্গ মহিলা জরুরী সেবা-সমিতি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নারীসংঘের আন্তরিক সহায়ত্ব এবং আমাদের বর্তমান রাজ্যপাল ডাঃ কাটজুর সহায়ত্ব পৃষ্ঠপোষকতার ইহার কার্যাবলী বিভিন্ন দিকে বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন কার্যগুলি সম্পাদিত হইতেছে: (১) সমিতি ১৮টি চরখাকেন্দ্রের পরিচালনা করিতেছে এবং এই ১৮টি কেন্দ্রে বর্তমানে ৫৪২ জন মহিলাকে বোনো ও স্বচী-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই সব চরখাকেন্দ্রে হইতে ইতিমধ্যেই ১৩০৪ জন শিক্ষার্থিনীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। (২) তিনটি কেন্দ্রের স্বচী শাখার প্রায় ১৩০ জন মহিলাকে স্বচী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; এই তিনটি কেন্দ্রে হইতেছে বেহালা, কালু ঘোষ লেন ও সরকারী ভবন। (৩) বয়ন শাখায় ১৫ জন বালিকাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই শাখায় খাদি, মুতি, শাড়ী, চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। (৪) বয়নে শিক্ষয়িত্রীগণকেও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এ পর্যন্ত তিন দফার ৪১ জন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৩ জনকে সরকারী বিভিন্ন শিবির ও অগ্রাঙ্ক সমিতিতে নিয়োগ করা হইয়াছে। (৫) হিন্দী শিক্ষা ক্লাশে চতুর্থ দফার শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষাদান করা হইতেছে। (৬) সমিতির সাধারণ সেবাকার্যের মধ্যে উদ্বাস্তুদের ভিতরে বিতরণের জন্য জামা-পোশাক সংগ্রহ, উদ্বাস্তু রোগিদগিকে চিকিৎসা সাহায্য-দান, উদ্বাস্তু বালিকাদের বিবাহের জন্য আর্থিক সাহায্য, উদ্বাস্তু শিশু ও মহিলাদিগকে উৎসব উপলক্ষে শিবিরে মাঝে মাঝে আহ্বান দান ইত্যাদি রহিয়াছে। একাধারে স্বেচ্ছাসেবিকাদের সাহায্য সাদরে গ্রহীত হইবে।”

কলিকাতা নগরীর মধ্যে এইরূপ সেবা-সমিতির সংস্থা অগণিত। সাময়িক প্রয়োজনে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ নূতন সমাজ-গঠনের প্রয়োজন অনুসরণ করিতেছে। সেই জন্য “জরুরী” শব্দটি অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রস্তাবিত পরিবর্তন সাধিত হইলে সমিতির পরিচালকবর্গ ও কর্মসূচী গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত হইবেন।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় ২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) হইতে ২২রা কার্তিক (২০শে অক্টোবর) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

কর্মধ্যক্ষ—“প্রবাসী”

যুক্তি ও জিগির

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের মূলে রয়েছে যুক্তি। যুগে যুগে যারা মানুষের মনকে নতুন নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছেন, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতিতে তার পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁদের সবারই প্রেরণা ছিল যুক্তি, আর আবেদনও ছিল একান্তভাবে সাধারণ মানব-মনের ঐ সহজ যুক্তি-প্রবণতার প্রতি।

যুক্তির প্রতিধ্বনি হচ্ছে জিগির। এতে যুক্তির আলো নাই, আছে শুধু হুকার। জনগণের মন এতে শুধু মোহাচ্ছন্নই হয়, বিন্দুমাত্রও সমুদ্র হয় না। জিগিরের বহুল প্রচলনে উন্নতির প্রবাহ বরং ব্যাহতই হয়ে থাকে। এর প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে।

প্রাচীন যুগের বেদ-উপনিষদের বাণী যাগযজ্ঞের জিগিরে পর্যাবসিত হয়েছিল। প্রতিবাদ এনেছিলেন বুদ্ধদেব। পরবর্তী যুগে জিগিরের প্রতিধ্বনিতে তাঁর বাণীও বিকৃত হতে বেশী দিন লাগে নি। শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য সবার সম্বন্ধেই অল্প-বিস্তর একথা খাটে। তবু জিগিরের জয়যাত্রার বিরাম নাই।

কলিকালে নাকি নামেই যুক্তি। নাম ছাড়া অন্য গতি নাই—ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারেরা তিন সত্যি করে বেশ জোরের সঙ্গে একথা বহুপূর্বেই বলে গিয়েছেন। শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রেই নয়, সম্প্রতি জীবনের সর্বত্র আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা অক্ষরে অক্ষরে এই আশু বাক্যের সত্যতা প্রতীপাদনে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছি। কর্মের প্রেরণার স্থান অধিকার করেছে এখন এদেশে নামের জিগির। সংঘম এবং নিষ্ঠা, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা যা অধিগত হবার কথা, আমরা তাকে কেবলমাত্র আবৃত্তি দ্বারাই আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছি।

শুধু মাত্র আবৃত্তি দ্বারা শাস্ত্রবোধ হয় কি না সে বিষয়ে মতভেদের বিস্তর অবকাশ রয়েছে। কিন্তু শুধু কথায় যে চিঁড়ে ভেজে না এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য। শাস্ত্রবোধ সূক্ষ্ম ব্যাপার; তার অভাবের অন্ধকার আবৃত্তির ধোঁয়ায় আলোকিত না হলেও হয়ত দরকার মত চাপা দেওয়া যেতেও পারে। চিঁড়ে কিন্তু অতি স্থূল পদার্থ। ওর বেলায় শিশুকেও ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

বর্তমানে আমরা সেই অসাধ্যসাধনেই ব্যাপৃত আছি। নবাজ্জিত স্বাধীনতার দীপ্তি, তার সহজ প্রেরণা, তার একাগ্র আহ্বান ও উদ্দীপনাকে অনায়াসে ধূলোকে

নির্বাসিত করে সবাই আমরা আগে ও পাছে, দক্ষিণে ও বামে দল বেঁধে দলে দলে কেবলমাত্র কথার জোরেই আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাস্তু, শিক্ষা-আদি করে সমুদয় সমস্তারই সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছি। এতে করে কর্মপ্রচেষ্টা থেকে অবচ্ছিন্ন হয়ে বুদ্ধি আমাদের শুধু একাগ্রতাকেই হারায় নি, বেশ খানিকটা তমসাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের কাছে অধর্মই ধর্ম বলে মনে হবে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই।

মাত্র কয়েক বছর আগে এই দেশেই ত জনগণের একান্ত সাধনায় ও সমবেত শক্তিতে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের অঘটন-ঘটন-পটিলসী সেই উচ্ছ্বসিত ধারা সহসা কোন্ মরুপথে হারিয়ে গেল! স্বরাজ্যভার সঙ্গে সঙ্গে যখনই আমরা রাষ্ট্রের হাতে দেশের গঠনমূলক সমস্ত কর্মের দায়িত্ব নিঃশেষে সমর্পণ করে নৈকর্য্য সিন্ধির সাধনায় লেগে গেলাম, সেই দিন থেকেই এই অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। বৈদেশিক শাসনের অজস্র প্রতিকূলতা, সহস্র বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, শুধু জনগণের আগ্রহে, ত্যাগ আর সেবার পাদপীঠের উপর যে সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, স্বরাজ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়ের পর্যায়ে পড়ে গেল। চরকা-সজ্জ, গ্রাম-উত্তোগ-সজ্জ, তালিমি-সজ্জ প্রভৃতি অখিল ভারতীয় অল্পহস্তানগুলি কর্মীগণের ওদামীন্যে অসংকৃত, অবজ্ঞাত হয়ে কোনমতে বেঁচে মরে রইল।*

যাদের নেতৃত্বের দিকে সমস্ত দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাঁদের অধিকাংশেরই মনের ছয়ার খুলে গেল মন্দিরভা, আইনসভার সোনার মন্দিরে। খাদি, কুটীর-শিল্প, বনিয়াদি-শিক্ষা, হরিজন-উন্নয়ন, জনসাধারণের অক্ষরজ্ঞান—এ সব তাদের সহজ এবং স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে অপস্থত হয়ে প্রবেশ করল সরকারী দপ্তরে। ভাড়াটে ঘোড়া দিয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ টানাবার ব্যবস্থাও বোধ করি এর চেয়ে খুব বেশী বিশ্বয়কর ব্যাপার হ'ত না।

ভারতের বিপুল গণ-আন্দোলনের যিনি ছিলেন ভগীরথ তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। অহেতুকী ভাবপ্রবণতা কখনও তাঁর মনকে আবিষ্ট, দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ভক্তগণের জিগির তাঁর যুক্তিকে ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করবার সম্ভাবনা মাজেই তিনি

উত্তম আন্দোলনের গতিবেগ পুনঃপুনঃ প্রশমিত করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেননি। ভাবোন্নত জনতাকে তিনি বারবার কর্মের পথে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। অবসাদগ্রস্ত কর্মসঙ্গিগণকে তিনি নিজ আচরণ দ্বারা কর্মের পথে অবিলম্বিত রেখেছেন। স্বাধীনতার অর্থ ছিল তাঁর কাছে সেবার পূর্ণ অধিকার। জীবন পণ করে তিনি সারা ভারতের জন্য সে অধিকার অর্জন করে গেছেন। কি সচিবহার করেছে ভারত তার ?

বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে বহু আবর্জনা এদেশের ঘরে বাইরে জমেছে। এক দিকে বর্ণজ্ঞানহীন পল্লীবাসী জনসাধারণের বিরাট অজ্ঞতা, আর এক দিকে বৈদেশিক শিক্ষায় অভিমাত্রী মুষ্টিমেয় শহরবাসীর বুদ্ধির বিকৃতি, দেশাত্মবোধের অভাব। এ দুইটি পরিস্থিতিই অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয়ের সমন্বয়ে এ দেশে যে সমস্ত ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্ত্ত থেকে এ পর্যন্ত, তার তুলনা বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। শোনা যায়, চীনদেশে নাকি অল্প কিছু দিন আগেও রণ-দুর্ম্মদ নেতারা অজ্ঞশব্দে স্তম্ভিত, প্রায় অল্পবয়স্ক বিবর্তিত, বিপুল বাহিনী নিয়ে সমস্ত দেশটা তোলপাড় করে বেড়াতে, নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করার জন্যে। ব্যাপারটা নিতান্ত অশান্তিকর হলেও মোটেই জটিল ছিল না। আর, ও রোগের ওষুধও ওর ভেতরেই হয়ত ছিল। আমাদের সমস্তা কিন্তু ওর চেয়ে লক্ষ গুণে জটিল।

দলাদলির জিগিরে স্বাধীন ভারত আজ প্রগীড়িত। কয়েকটা বছর আগেই কিন্তু পরাধীন ভারতের আপামর সাধারণ সমবেত হয়েছিল একচ্ছত্র জাতীয় মহাসভার পতাকাভালে—স্বাধীনতার সংগ্রামে। জাতীয় মহাসভা ছিল জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা-মূর্ত্ত প্রতীক। সেই স্পৃহা প্রয়াসশূন্য মিথ্যাচারের জিগিরে পরিণত হতে পারে নি, তার কারণ জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে ওতঃ-প্রোতভাবে গাঁথা ছিল ত্যাগ, সেবা ও গঠনমূলক কর্মের তপস্যা। জাতীয় মহাসভার শক্তির উৎস ছিল সমস্ত জাতির সমবেত সমর্থন। ঐ সমর্থন জিগিরের হাওয়ায় চড়ে আসে নি, এসেছিল কর্মের বাহনে। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে; কিন্তু সেই আরম্ভ কর্মের রথচক্র যেন কুরুক্ষেত্রে রণরাস্তা কর্মের রথচক্রের মতই নিশ্চল হয়ে পড়েছে। আর এতে বরংই নানারকম সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে।

বিরাট কর্মক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নেতৃমণ্ডলীর যে কর্মশৈথিল্য তার প্রতিক্রিয়া এক দিকে যেমন সমগ্র জাতির মনোজগতে বিভ্রান্তি এনেছে, অপর দিকে তেমনি মহাসভারও প্রচুর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছে। যে মহাপুরুষের অতদ্রুত নেতৃত্বে জাতীয় মহাসভার কর্মধারণ লোকসেবা কর্মে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হয়েছিলেন, তাঁর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতে তাঁদের অনেকেরই কর্মোৎসাহ এ দিকে যেন মন্দীভূত হয়ে যেতে লাগল। বোধ হয়, তাঁদের অজ্ঞাতসারেই অবস্থাটা দাঁড়াল ‘বামুন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর’ কতকটা সেই ধরণের। এঁদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা বিভাগের নিয়ামক হলেন তাঁদের সমগ্র কর্মশক্তি এবং মনোযোগ সম্ভবতঃ প্রধাবিত হ’ল আমলাতন্ত্রের বশীকরণে আর প্রজাতন্ত্রের সম্প্রতিষ্ঠায়। আর সরকারী দপ্তরের বাইরে যারা রইলেন তাঁদের হাতে স্থগিতকৃত গঠন-কর্মসূচী এবং সম্মুখে সত্ত্ব রাজনৈতিক পরাধীনতা-পাশমুখ ভারতের সুবিশাল কর্মভূমি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ন যথো ন তত্বে অবস্থায় হয় সতৃষ্ণনয়নে, নয় সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন—মন্ত্রিসভা, আইনসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দিকে, মিশ্র মনোভাব নিয়ে।

সাতচল্লিশ সালের মার্চ মাসে এলাহাবাদ নগরে ভারতের বিভিন্ন কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক-গণের সম্মেলনে যে গঠনকর্মসূচী গৃহীত হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অস্থমোদন পেয়েছিল তাকে কার্যে পরিণত করার যদি আন্তরিক চেষ্টা দেশে হ’ত, তা হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের হাওয়া বদলে যেত, এবং অনেক দুর্গতির হাত থেকে দেশ রেহাই পেত। কিন্তু তা হয় নি। যার স্থান হওয়া উচিত ছিল সবার আগে তাই রইল নিতান্ত কোণঠাসা হয়ে সবার দৃষ্টির অগোচরে। স্বাধীনতা আর সাম্প্রদায়িকতার জিগিরে দেশের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে গেল, আর নেতৃবর্গের দৃষ্টি গ্রামে জনসাধারণের দিকে প্রসারিত না হয়ে নিবন্ধ রইল নগরীর বিধান সভায়, আইনসভায়, মন্ত্রণাসভায়। সেবা ও কর্মযজ্ঞের স্থান নিঃশেষে-অধিকার করল জিগির ও জটলা।

এমন ধারা ব্যাপক নৈকর্ম্যের ফল যে কি হতে পারে তা ত গীতাকার বহুপুর্বেই শ্রীভগবানের জবানিতে বলে গিয়েছেন :

উৎসীদেয়ুর্মিমে লোকা ন কুর্থাৎ কর্ম চেষ্টহম্।

সঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তা স্তামুপহতামিমাঃ প্রজাঃ।

প্রজার দুঃখ যে আজ চরমে উঠেছে সে বিষয়ে আশা করি দুই মত হবার কোনোই আশঙ্কা নাই। সঙ্করের শোভাযাত্রাও যেমন সাড়ফর চলেছে তাতে তাও যে

কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। সবার আগে চলেছে লাঠিসোটা নিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবকসঙ্ঘ, সঙ্গে সঙ্গে বোমা বাল্ব নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর সবার পিছনে রয়েছে সর্বোদয়ের শিঙা হাতে কৃষক-মজুর-প্রজা পার্টি। এই সব সঙ্ঘ-সভা, ব্লক-পার্টির ধারা অগ্রণী তাঁদের অনেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে জাতীয় মহাসভায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেই ছিলেন। বর্তমানে এঁদের জিগির আলাদা আলাদা, রীতিনীতি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক কিন্তু লক্ষ্য এক। সেটা হ'ল জাতীয় মহাসভার মোহ থেকে দেশকে মুক্ত করা, জাতীয় মহাসভার হাত থেকে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র নিজেদের হাতে নেওয়া। এ কাজে শোনা যায় তাঁরা নাকি পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতেও প্রস্তুত হয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক অভিব্যক্তিতে এ এক নতুন অধ্যায়, সন্দেহ নাই। সিক্কিয়া-ভৌসলা-গায়কোয়ার-হোলকার মহারাজদের যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমনধারা স্ববুদ্ধি হ'ত তা হলে আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের যে এ দশা হ'ত না এ কথা নিঃসন্দোহেই বলা চলে।

যখন বহিঃশত্রুর গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে সংহতির একীকৃত প্রয়োজন ছিল তখন আমাদের সেই সব নেতারা পরস্পর হানাহানিতে শক্তি ক্ষয় করে বিদেশী শাসনকে এদেশে কায়ম করেছিলেন। তারও আগে বিদেশী যখন স্বপ্নেও এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা ভাবে নি, তখন এই বাংলা দেশেরই ধনিক আর সৈনিকে মিলেটুলে দিয়েছিল দেশটাকে বিদেশী বণিকের হাতে। রাজনৈতিক ব্যাপারে অকাজে একতা আর কাজের বেলায় অনৈক্যের দৃষ্টান্ত যুগে যুগে আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করেছে। আর আর দেশে সঙ্কট সময়ে অনৈক্যের মাঝে ঐক্য স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে। জাতির বিপদে দলাদলি ভুলে তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এমনটি কদাচিৎ হয়েছে; আর এর বিপরীত দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের ইতিহাসে প্রচুর। স্বাধীন ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে মনে হয় ইতিহাস তার পুরাতন অভিশাপের পুনরাবৃত্তি করতেই বুঝি আবার চলেছে।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গণদেবতার উদ্বোধন এ দেশে সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এ পথে এখনও আমাদের বহুদূর অগ্রসর হতে হবে। পথের সন্ধান যিনি দিয়েছেন তিনি পুনঃ পুনঃ দেখিয়েছেন ও পথ পল্লী অভি-মুখীন, দিল্লী অভিমুখীন আদৌ নয়। এ পথেই আসবে জাতির প্রকৃত কল্যাণ। যতদিন না জনমত জাগ্রত হবে ততদিন পুরাতন অভিশাপের ভূত, যা কি না এদেশে

পাঠান, মোগল, ইংরেজ একে একে সবাইকে হাতছানি দিয়ে ভেঁকে এনেছিল, সে আমাদের স্বল্প থেকে এক পাও নড়বে না—এ স্থনিশ্চিত। এ ভূত জিগিরে যাবে না। ফাঁকা আওয়াজে পাখী ত দূরস্থান, গাছের পাতাও পড়ে না—নড়েও না। আওয়াজ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, রেখে যায় খানিকটা ধোঁয়া; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভারতের রাজ-নৈতিক গগন আজ সমাচ্ছন্ন।

৩

কথা উঠেছে ভারতের পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না এবং তার কারণ হচ্ছে সর্বত্র কংগ্রেসী সদস্যগণের আত্যন্তিক সংখ্যাধিক্য। সংখ্যাধিক্যের কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু তা না হলেও গণতন্ত্র সার্থক হবার সম্ভাবনা ছিল না। তন্ত্র আছে, তন্ত্রধারীও আছে এদেশে বহু, কিন্তু গণ কোথায়? মাথা না থাকলে মাথা ধরার প্রশ্নই ওঠে না।

দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ধারা চান, প্রাথমিক কাজ তাঁদের পার্লামেন্টেও নয়, ব্যবস্থাপক সভাতেও নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রাম হ'ল তাঁদের কর্মক্ষেত্র। কুমোর যখন প্রতিমা গড়ে, তখন প্রথমে গড়ে খড়ের ধড়, তারপর করে একমেটে, পরে দোমেটে, সর্বশেষে মুণ্ড বসায়। পার্লামেন্ট, আইনসভা এ সব হ'ল গণতন্ত্রের মুণ্ড। খড়ের উপরেই মুণ্ডের প্রতিষ্ঠা। মুণ্ড থেকে ধীরেস্থে ধড় বেরলে, সে ইয়াণী রূপকথা যতই বিস্ময়কর হোক না, নিতান্ত অচল হবে তাতে সন্দেহমাত্র নাই। অপরপক্ষে, গণদেবতা যদি উদ্ভূত হন, তবে তাঁর মুণ্ড যেমনই হোক, জাতির সিদ্ধির পথ থাকবে অব্যাহত। কাজেই স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের বর্তমান অবস্থায় দেশ-সেবকের প্রধান কাজই হবে জনমতের উদ্বোধন।

এ কাজে উত্তেজনার অবকাশ নাই। দলাদলির আশঙ্কা নাই। জাতীয় মহাসভা যখন জাতির মুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে, শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, শত নির্ধাতন সহ করে জাতির মনকে স্বাধীনতা সময়ে একাগ্র করে তুলছিল, তখন কংগ্রেস একটা দল ছিল না। কংগ্রেসের ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জীবনপাত করে ধারা এতে শক্তি সঞ্চার করেছেন, তাঁরা কোনো দলেরই ছিলেন না। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র, আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, এক কথায় এর উদ্দেশ্য এবং বিধেয় ভারতের সার্বজনীন। বিদেশী শাসনের ভেদনীতির অজস্র কুটকৌশলও সে সার্বজনীনতা খুব বেশী ক্ষুণ্ণ করতে পারে নাই। আর, আজ যখন স্বাধীন ভারতের অগণিত নরনারী মুক্তির আলোকের অংশ পাবার জন্ত অপেক্ষমান, যখন যুগ যুগ

ব্যাপী দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জাতির সমবেত শক্তির বিজয় অভিযানের মাহেস্ত্রক্ষণ সমাগত, তখন কংগ্রেসের সেই সার্বজনীনতা বিধবস্ত হতে চলেছে তারই বহু বিশিষ্ট কর্মীর কথায় ও কাজে।

সম্প্রতি কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধক বিচ্ছিন্ন করে, কায়মনো-বাক্যে এঁরা কংগ্রেসের অহিতসাধনে তৎপর হয়েছেন। স্বদীর্ঘকাল স্বদেশ সেবায় ঝাঁপা ছিলেন সতীর্থ, ঝাঁপা ছিলেন গুরুভাই, স্বদেশপ্রেমের অমৃত ধারায় পূত হয়ে ঝাঁপা বৈদেশিক রাজরোষ অগ্রাহ্য করে এক সঙ্গে কারাবরণ, অশেষ নির্ধাতন সহ করেছেন, আজ তাঁরাই অবস্থার পরিবর্তনে নিজ রোষ সঞ্চরণ করতে পারছেন না। তাঁদের সাম্প্রতিক ভাষণে ও আচরণে সর্বত্র তাঁরা তাঁদের এই নবজাত ক্রোধের নগ্ন পরিচয় দিচ্ছেন। ও-সবে যুক্তি এত কম আর জিগির এত বেশী যে স্বভাবতই মনে হয় যুক্তির অভাবকে জিগিরের হুকুর দিয়েই তাঁরা পূরণ করছেন।

কিন্তু কেন এই ক্রোধ। শাস্ত্রে বলে কামনা থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। কিসের কামনা প্রতিহত হয়ে, কোন বিষয়ে নিরাশ হয়ে তাঁদের এই ক্রোধ? দেশমাতৃকার সেবাই যদি তাঁদের কাম্য, তার ত সহস্র পথ খোলা ছিল। আজ চার বছর হতে চলেছে, বিদেশী শাসক আমাদের পথের দাবী মেনে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, আমরা সে পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছি?

কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ আর সম্মোহ থেকে জন্মে স্বতিবিভ্রম। মোহের বশেই আমরা মনে করি শাসনযন্ত্রের স্ফুট পরিচালনা আর ব্যবস্থাপক সভার স্বল্প তর্কবিতর্ক দিয়ে দেশের জন্ত উন্নতি অতি সহজেই সম্ভব হবে। অর্থাৎ কিনা, ওদের বদলে আমরা যদি ওখানে যাই তবে রাতারাতি দেশের হালচাল, রীতিনীতি দরকার মত রদবদল করে সব সমস্তারই সমাধান অচিরে করে ফেলতে পারি।

বহুকালের পরাধীনতার ক্রমে রাজশক্তির সার্বভৌমিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সন্মুখে আমাদের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস স্বতঃই জন্মে গেছে। আমরা মনে করি, রাজা যখন দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তখন দেশের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি তাঁরই ইচ্ছায়, ইচ্ছিতে বা আদেশে সম্ভব। এমনতর ধারণার কোনোই ভিত্তি নাই। ওরকমটা যদি সত্যিই হ'ত তা হলে স্বদীর্ঘ মুসলমান রাজত্বের পরে এ দেশে একজনও হিন্দু থাকত কি না সন্দেহ। প্রজার উন্নতি-অবনতি যতটা না রাজার উপরে নির্ভর করে, রাজার উন্নতি অবনতি তার চেয়ে ঢের বেশী অনিশ্চিত ভাবে প্রজার উপরে নির্ভর

করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির সন্মুখেও এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য। কাজেই ঝাঁপা মনে করেন রাষ্ট্রশক্তি অধিগত হলেই দেশের সর্বদীন উন্নতির রথ 'হুই দণ্ডে চলে যাবে ছ'মাসের পথ' তাঁরা নিতান্তই ভুল ধারণা পোষণ করেন।

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রশক্তি প্রজাশক্তিরই প্রতীক। পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রজার প্রতিনিধি; জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাকে ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত করাই তাঁর কাজ। জনসাধারণের নিয়ন্তা, প্রভু বা গুরু হিসাবে সেখানে তিনি প্রেরিত হন না। জনসাধারণ তাঁর ইচ্ছাতে পরিচালিত হবে না, তিনিই জনসাধারণের ইচ্ছা যাতে কার্যে পরিণত হয় ব্যবস্থাপক সভায় তার ব্যবস্থা করবেন। সেই উদ্দেশ্যেই জনসাধারণ তাঁকে সেখানে পাঠায়। এর ব্যতিক্রম হলে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়।

কাজেই দেশের শাসন যন্ত্রই হোক, অথবা পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থাপক সভাই হোক, সব প্রতিষ্ঠানেরই কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনা স্থনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। যে-কোনো গণ-তান্ত্রিক দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এ কথা স্থম্পষ্ট হবে যে প্রজার শক্তিতেই দেশ বড় হয়েছে, আর তার পার্লামেন্ট শক্তিমান হয়েছে।

মন্ত্রিসভা, পার্লামেন্ট, ব্যবস্থাপক সভার মহিমায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাদের স্বতিবিভ্রম ঘটেছে, ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৬-এর "হরিয়জন পত্রিকায়" প্রকাশিত মহাত্মাজীর স্বাক্ষরিত বাণী থেকে নীচের ক'টি পংক্তি তাঁদের উপহার দিচ্ছি :

"জন্মতে বাহা ঘটতেছে তাহা যদি আমরা ভাল করিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারিব যে আইনসভার বাহিরে বাহারা থাকে তাহারাই দেশকে সভ্য সভ্যই চালায়। যদি তাহা না হইত, তবে প্রতি দেশের শাসনযন্ত্র আশু অচল হইয়া যাইত; কারণ দেশের জীবনকে পরিচালিত করার কাজ হুশিাল এবং তাহার তুলনায় আইনসভার শক্তি নিতান্ত নগণ্য। ঠিক কথা হইল এই যে, সমুদ্রের সহিত জলবিন্দুর যে সম্পর্ক, জাতীর জীবনের সহিত পার্লামেন্টের সম্পর্ক তাহার চেয়ে বেশী নয়।" (ইংরেজীর অনুবাদ। নিউদিল্লী, ২০-৪-৪৬)

৪

ঐ যে কথা উঠেছে, পার্লামেন্টে বলিষ্ঠ একটি বিরুদ্ধ দল না থাকলে গণতন্ত্র ঠিকমত কাজ করবে না ওর মধ্যে যুক্তির চাইতে জিগির আছে ঢের বেশী। আমরা জানি, গিরি-জায়ার বাঁটা পিঠে না পড়লে দিগ্বিজয়ের মনে ভালবাসার আমেজ জন্মত না,—তাই বলে সর্বত্রই প্রণয়ের পক্ষে সমাজজনী অপরিহার্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে না নিশ্চয়ই।

দেশপ্রেমের একটা লঘিষ্ঠ সাধারণ চেতনা, দেশের ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য সন্মুখে একটা স্বাভাবিক সন্মবোধ, এক

কথায় জাতীয় বিবেকবুদ্ধির উন্মেষ না হলে তথাকথিত গণ-
তান্ত্রিক দলাদলিতে লাভের চাইতে আমাদের লোকসানই
হবে বেশী। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে শত অর্নেকের মধ্যেও
যে জাতীয় স্বার্থগত একটা সহজ ঐক্যবোধ আছে,
আমাদের দেশে এখন সেটা সবেমাত্র গড়ে উঠছে। সেই
ঐক্যবোধই হবে জাতির স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। তার
উপরেই হবে জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতিষ্ঠা। দেশের
যাঁরা নেতা, দেশসেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে নেবার
অধিকার এবং অবসর যাদের আছে, তাঁদের কাজ হবে
স্বাধীনতার সেই পাদপীঠকে স্ফূট করা, সমুন্নত করা। আর
তাঁদের পক্ষে অকাজ হবে এমন কিছু করা যাতে করে
জাতির বিবেক বিভ্রান্ত হয়ে সেই ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে
আসে।

যুগব্যাপী পরাধীনতায় যে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক মনোভাবে
আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা
নিতান্তই বাতিল হয়ে গেছে। তবু অভ্যাসের বশে তাই
আঁকড়ে ধরে আমরা আছি। লোকায়ত্ত শাসনের আলুগত্য
কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়ে, স্বাধীনতার দায়িত্ব এবং
শৃঙ্খলাবোধকে আমরা সহজভাবে অঙ্গীকৃত করতে যেন
পারছি। ফলে, একদিকে যেমন নিরঙ্কুশ সমালোচনার
শ্রোত দেশের সর্বত্র বয়ে চলেছে, অন্যদিকে গঠনাত্মক
সহযোগিতারও তেমন অভাব হয়েছে। পরাধীন ভারতের
অসহযোগের জের যেন স্বাধীন ভারতে এসে আজও শেষ
হয়নি। আর এতে করে প্রতিপদে আমাদের অগ্রগতি
বাহত হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির মন্তরতায় যাঁরা অসহিষ্ণু
হয়ে, আগামী নির্বাচনে ব্যবস্থাপক সভায় বা পার্লামেন্টে
তাঁদের মত উষ্ণ মনোভাবাপন্ন লোক যাতে সমধিক সংখ্যায়
প্রবেশলাভ করতে পারে তারই সাধনায় তৎপর হয়েছেন,

তাঁরা খুব সম্ভব মনে করেছেন সোঁয়ার বদলালেই আজকার
বেতো ঘোড়া কাল পক্ষীরাজ ঘোড়ায় রূপান্তরিত হবে।
কিন্তু তা হয় না, হবেও না।

আর, উগ্র সাম্যবাদীর দল যাঁরা বোমা-বাল্ব দিয়ে
কেল্লাফতে করবার চেষ্টায় আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ
সন্দেহ নাই; তবে উপায়টা যে তাঁদের সহুপায় নয় তা ত
তাঁরা নিজেরাই বলেন। আমরা শুধু বলি অমন সরাসরি
উপায়ে স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। ও উপায় বাইবেলের আদি-
কাণ্ডে পৃথীব্যাপী প্লাবনের অল্পপান দিয়ে ভগবান নিজেই
একবার পরখ করেছিলেন; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও দর্শনাজ্য
স্থাপনের চেষ্টায় কতকটা ঐ রকমই তিনি করেছিলেন
যুগোপযোগী উপকরণ দিয়ে। অল্পপানের ক্রটি উভয়ত্র
কোথাওই হয়নি। কিন্তু ফল যা হয়েছে, তা ত দেখতেই
পাওয়া যাচ্ছে।

অসহিষ্ণুতা ও অল্পদারতার বশে দেশের বত সমস্তা, যত
দুর্ভোগ সবকিছুর দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে
খানিকটা মিথ্যা আত্মপ্রসাদ পাওয়া গেলেও যেতে পারে,
কিন্তু তাতে করে দুর্ভোগের বোঝা আমাদের এতটুকুও
হালকা হবে না, সমস্তাও সমাধানের পথে এক পদও অগ্রসর
হবে না। বরং বোঝা আমাদের আরও ভারী বোধ হবে,
সমস্তাও আরও নূতন নূতন আকারে দেখা দেবে।

যেখানে রোগ, চিকিৎসাও সেইখানেই প্রয়োজন।
সত্যিই দেশের দ্রুত অগ্রগতি যাদের লক্ষ্য হবে, তাঁরা
ব্যবস্থাপক সভায় বা পার্লামেন্টে 'বলিষ্ঠ বিরুদ্ধ দল' গঠনের
নিফল চেষ্টায় মন না দিয়ে, ও সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর
বাইরে, গঠন কর্ত্তের ভিত্তির উপরে, বিশাল ভারতের বুকে
কোটি কোটি নর-নারী নিয়ে বিশাল ভারতীয় সেবাদল
গঠনকার্যে মনোনিবেশ করলে অনেক সমস্তার উপরেই
সমাধানের আলোক পড়বে—এ অতি স্থনিশ্চিত। আর,
স্বল্পমধ্যস্থ দর্শন জায়তে মহতো ভয়াৎ।

কবিতার দুঃখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

P 36, 161

বড়ি মানুষের স্বপ্ন দুখ ভাগী,
বাস করি এক ঘরে,
কিন্তু আমি তো ভুগিতে পারিনে
প্রীতি কি কম্পজরে।
দেখি তাহাদের অল্পকষ্ট,
নানা দিকে ক্ষতি-ক্ষয়,
কিন্তু তাদের দৈনন্দিন
দিই না কোঁ পরিচয়।

তাতে কি সার্থকতা,
হাঁপাইয়া আমি যদি তাহাদের
কহি হাঁপানীর কথা ?
২
দাবানলে যুগ-মরকের কথা
বলে না'ক যুগনাভি,
মুক্তা করে না লবণ-জলের
প্রতিনিধিত্ব দাবি,

রৌদ্রও আছে, জলকণা আছে,
সন্দেহ নাই অণু,
তবু মেঘ নয়, রৌদ্রও নয়,
রামধনু, রামধনু ।
পঙ্কেতে রয় বোঁটা,
কি দোষ, যদি না রহে পঙ্কজে
পঙ্কের ছিটা-ফোঁটা ?

৩

হীরক রাখে না আবেষ্টনীর
কয়লা কালিমা লেশ,
অকথিত থাকে খনির আঁধার,
খনি-শ্রমিকের ক্লেশ,
সাপের মাথার মাণিক—তাহারো
আনন্দ দিতে সাধ,
সেও দেয় নাকো বিষদংষ্ট্রার
গরলের সংবাদ ।

শুভ শঙ্খ স্বন—

শমুকদের 'শুঙের' কাহিনী
করে না তো নিবেদন ?

৪

'চোক গেল' বলে পাপিয়া ফুকারে,
সেটি হয় সঙ্গীত,
ক্ষুধিত ব্যাঘ্র গর্জন করে
সেটা তার বিপরীত ।
অতিক্রম যে করে সঙ্গীত
সব বাতনার সীমা,
ছন্দে ও স্বরে রাজে তার চির
বাসন্তী পূর্ণিমা ।
তিক্ততা রহে দূর
গীত যে সাগর-উথিত স্থা
সব তার স্বমধুর ।

এসেছে দারুণ যন্ত্রস্তর,
মাহুষ করিবে কি ?
লাভ তো কিছুই হবে না, করিয়া
মনকে হতশ্রী ?
স্বধাকর নাম না দিয়া চাঁদকে
যদি বলা হয় 'খেটে',
পড়িবে কি একমুঠা বেশী ভাত
তাতে ক্ষুধিতের পেটে ?

কে হবে তাহাতে ধনী ?

খুলে লও যদি ধরাগাত্রে
সুখমার আবরণী ।

৬

অধিকারী ভেদ সবেতেই আছে,
কি বলিবে মহাজনে ?
কাশ্মীরী শাল, না বুনে, শিল্পী
'গাম্‌ছা'ই যদি বোনে ?
যারা অজস্র 'মাদুর' গড়েছে,
খ্যাত যারা চরাচরে,
কলালক্ষ্মীই কাঁদিবে—তাহারা
যদি শুধু 'ঢেঁকি' গড়ে ।
বাড়িবে বিড়ম্বন,
সকল লেখনী লাঙল হইলে
উপবাসী রবে মন ।

৭

ভেব না নেহাৎ উদাসীন আমি,
নাহিক সহানুভূতি,
যদি না ফসল ফলাইতে পারি,
জোঁগাতে না পারি ধুতি ।
আমি তোমাদেরি আশা-আকাজক্ষা
বেদনার কথা কই,
স্তরপূরে তাহা পাঠাবার শুধু
যোগ্য করিয়া লই ।
বুঝিতে করো না ভুল,
বাণী-অর্চনা হয় নাকো দিয়া
গোবরের বর্জুল ।

৮

যুগ-উপযোগী হতে কহ মোরে
তাতে মোর রুচি নাই,
সব দেশ, কাল, জাতির আমি যে
মর্যাদা পেতে চাই ।
ধনিক, বণিক, শ্রমিক ক্ষণিক,
কারো প্রীতিকামী নহি,
আমি জগতের যজ্ঞের চক্র
দেবতার তরে বহি ।
আর কিছু নাহি পারি,
আমি তোমাদিকে করি আনন্দ
অমৃতের অধিকারী ।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

শ্রীহরিহর শেঠ:

মানবদেহ ধারণ করিয়া সর্বাপেক্ষা যাহা আবশ্যক তাহা শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত জীবনলাভ করা। এই দুইটির মধ্যে যে গুরুত্ব নিহিত এবং তাহা কাহার কতটা আয়ত্তের মধ্যে আছে তাহার পরিমাপক কোন আখ্যা নাই, মাপিয়া দেখিবার কোন যন্ত্র বা পন্থা নাই। যেমন বিচার মাপকাঠি এখন মুখ্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি তেমন কিছু নাই। তবে এখন মানুষের পরিচয় অনেকটা তাহার ধনসম্পদের বহিঃপ্রকাশে। আর তাহার সঙ্গে যদি সংযোগ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, তাহা হইলে সোনায়ে সোহাগা। অতি অল্পক্ষেত্রে ভিন্ন সাধারণতঃ দেখা যায়, ধনশালী ব্যক্তিগণই রাষ্ট্র ও সমাজের প্রায় সকল বিভাগেই প্রাধান্য পাইয়া থাকেন, আর তাঁহারাষ্ট্র প্রধানতঃ মানব-মাজে প্রখ্যাত। শিক্ষিত ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে তাঁহাদের মধ্যে নাই বা থাকিতে পারেন না একথা কেহই বলিবেন না। দুঃখের বিষয়, সে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব বা মানবতার মর্যাদা আজ কোথায়! মনুষ্যত্বসম্পন্ন বিত্তহীন মানুষ সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন এমন সৌভাগ্যবান অধুনা কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়?

মনুষ্যত্ব বা মানবতাবিহীন ‘মনুষ্য’ নামধারী জীবের সঙ্গে বনচারী পশুর খুব বেশী পার্থক্য নাই। মানুষই একমাত্র জীব যাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বসবাস করিয়া থাকে। সেখানে মানবোচিত ধর্ম লইয়া জীবনযাপন করিতেই হয়। অন্তর্নিহিত স্বপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া জগতের কল্যাণে রত হওয়াও মানুষের ধর্ম। সেই জন্ত আমরা নানাবিষয়ক বিদ্যার সাধনা করিয়া থাকি। বিচার প্রভাবে জগতের বহু উপকার সাধিত হইয়া থাকে সত্য। আজ বিজ্ঞানবলেই জগতের এই রূপ—অসম্ভব বলিয়া এতাবৎ যাহা কল্পনার অতীত ছিল তাহা এখন প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এসব যে বিচার প্রভাবেই, একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু মানবজীবনে এই সব স্কুল-কলেজী বিদ্যাই যে শুধু মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে তাহা নহে। বিদ্বান ব্যক্তিমাঝেকেই আমরা সাধারণতঃ শিক্ষিত বলিয়া থাকি। বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি যে যে বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করিয়াছেন সেই সেই বিষয়ে তিনি সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায় তিনি যে তাহা হইবেনই এমন কোন কথা নাই। বর্তমানে বিদ্যার্জনের জন্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র পথ। তথা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতিতে অনেক কিছু লাভ হয় সত্য। বিদ্যালোচনা জ্ঞানলাভের সহায়ক। কিন্তু সমাজে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের জন্ত তাহাই যথেষ্ট নহে। সেজন্য যাহা কিছু জ্ঞান প্রাপ্তি তাহা তথায় পাওয়া যাইবেই এমন কথাও বলি, ঠিক না। সেই জ্ঞানার নামই শিক্ষা। সেই জ্ঞান এবং জানিয়া সেই মত চলা বা প্রয়োগ করাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, মানবতাবিহীন প্রতীক এমন শ্রেষ্ঠ মানুষের উদ্ভব যে অসম্ভব বা তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই যে তিনি মনুষ্যত্ব বিবর্জিত হইবেন একথা কেহই বলিবেন না। একরূপ শিক্ষিত লোক যেমন অনেক পাওয়া যায়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শহীন এমন কি নিরক্ষর-দিগের মধ্যেও জ্ঞান ও মানবতার উচ্চ সীমায় আকৃষ্ট লোকের দৃষ্টান্তও জগতে বহু আছে। মানুষের ইন্দ্রিয়-গোচর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাহ্য শক্তির সহিত অন্তরেন্দ্রিয় জ্ঞান, শৃঙ্খল ও অধ্যাত্ম বিষয়ের জ্ঞান এবং শৃঙ্খল-অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত মানবোচিত প্রচ্ছন্ন গুণাবলীর বিকাশ ব্যতিরেকে শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। মানুষের যাহা কর্তব্য তাহা পালনই তাহার ধর্ম। মানুষের মনুষ্যোচিত কর্তব্য পালন করিতে হইলে হিংসা, ঘেঁষা, লোভাদি রিপূর তাড়না হইতে প্রথম মুক্ত হইতে হইবে। ত্যাগের অশূলীন, আত্মসংযম অভ্যাস, দেশের কল্যাণ-চিন্তা ও তাহাতে রত হওয়া দরকার, ইহাই মনুষ্যত্ব। দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন আবশ্যক। বহুমুখ্য এই মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন,—

“চৌধুরের ধর্ম কি?—লোহাকর্ষণ। অগ্নির ধর্ম কি?—দাহকতা। জলের ধর্ম কি?—দ্রাবকতা। বৃক্ষের ধর্ম কি?—ফলপুষ্পের উৎপাদকতা। মনুষ্যের ধর্ম কি?—মনুষ্যত্ব।”

এই মনুষ্যত্বই যখন মানবজীবনের সার্থকতা, স্বতন্ত্রতা উহাই চরম সম্পদ, তখন মানবতার সাধনার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সে দিকে যে লক্ষ্য রাখা উচিত, মনে হয় এ বিষয়ে নেতৃবর্গের উদাসীনতা আছে। আধুনিক ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যে হারে মানুষ জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছে, পূর্বের যখন এ শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, আক্ষরিক শিক্ষা স্বল্পলোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল বা যখন গুরুমহাশয়ের

পাঠশালা টোল অথবা গুরুগৃহই বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র ছিল, তখন অনেক মানুষই এখনকার মত বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত না হইলেও শিক্ষিত জ্ঞানীর সংখ্যা যে কম ছিল তাহা নহে। পূর্বের সহিত তুলনা করিতে হইলে একথা অবশ্য স্বীকার্য, এখনকার মত তখন জীবনযাপন এত জটিল হইয়া উঠে নাই। তখন যে-সব শিক্ষার তত প্রয়োজন ছিল না এখন তাহা আছে। যাহার প্রয়োজন আছে তাহার অনুশীলন চাই-ই, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্বের বিসর্জন দিয়া নহে।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণাদিতে আমার কোন জ্ঞান নাই; কিন্তু গল্পে কথায়, যাত্রা কথকতায়, থিয়েটারের পৌরাণিক কাহিনী হইতে এবং বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে যে ধারণা মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহাতে এখনকার মত মনুষ্যত্বের এমন লাঞ্ছনা, এমন অবমাননা আর কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যাদান করিতে, বিদ্যার নানা দিকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি। বঙ্গভাষার অবাধ প্রচলন, উন্নতি এবং উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ত আমাদের মনীষীরা সর্বদা সচেষ্ট; এমন কি আমাদের এই বঙ্গভাষা যাহাতে ভারতের সর্বত্র প্রসারলাভ করিতে পারে সেজন্ত আমরা উদ্যোগী হইয়াছি। ইহা অবশ্য ভালই। ইহার দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মনুষ্যত্বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, যাহার অভাবে আজ আমাদের পারিবারিক জীবন বিপর্য্যস্ত, সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত, নূতন রাষ্ট্রিক জীবন কলঙ্কিত তাহা লাভের জন্ত কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ত দেখি না। বিদ্যা ও শিক্ষা, মানুষ ও মনুষ্যত্বের স্বাতন্ত্র্য বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ ও পালন করিবার জন্য তাঁহাদের ঐদাসীন্য পরিহারের বিশেষ চেষ্টা কি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র-সমূহে পরিদৃষ্ট হয়? এই অপূর্ণতা দুর্বলতার জন্য আমাদের কত সম্পদ হৃত হইয়া সর্বনাশের পথ স্রগম হইতেছে কে তাহা নির্ণয় করিবে।

আমার এই সব মন্তব্য হইতে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট এক সংখ্যালঘু বিদ্বান সম্প্রদায় হইতে হয়ত কথা উঠিবে, সে শিক্ষা এবং তাহার পরীক্ষা কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্ভব হইতে পারে। যদি একথা উঠে, ইহার ঠিক মত উত্তর দেওয়া বা পথ নির্দেশ করার মত ক্ষমতা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তত্ত্বতরে এই কথাই শুধু বলিতে চাই, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস ও শিক্ষা এসব যাহা এখন কল্পনার বিষয় হইয়াছে, লোক শিক্ষার পুরাতন ব্যবস্থাদি এখন আজ লুপ্তপ্রায়, যখন সরকারনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ভিন্ন

আমাদের জ্ঞানার্জনের এখন অন্য পথ নাই, তখন তাহার মধ্য হইতেই আমাদের মানুষ হইবার মত শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে, কি উপায়ে তাহার পরীক্ষা লওয়া সম্ভব এসব কথা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রের নয় রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা করিতে হইবে। বিশেষভাবে লিখিত পুস্তক পঠনব্যবস্থা, কি পোষ্ট গ্রাজুয়েটের অপর কোন নূতন বিভাগ খোলার দ্বারা ঐ কার্য্য স্রগম হইবে বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট স্থল কলেজের শ্রেণী ছাড়াও তৎসহিত কথকতা যাত্রাদি অথবা ঐ সকলের স্থলাভিষিক্ত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের সহায়তা দ্বারা লোকশিক্ষার অন্য পথ গ্রহণ আবশ্যক সে সকল বিষয়েও চিন্তা করিতে হইবে।

আমার এই যে আলোচনা ইহা হয়ত 'ছোট মুখে বড় কথা'র মতই প্রতীয়মান হইতে পারে। আমাদের চরম পরীক্ষার দিন সম্মুখে। আমি দীর্ঘদিন হইতে যাহা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি, শিক্ষা প্রসঙ্গে রক্ততা অথবা প্রবন্ধাদিতে বা সভাসমিতিতে বলিয়া আসিতেছি তাহাই একটু বিশদ ও স্পষ্ট করিয়া এখানে বলিলামাত্র। আমার কথা, যদি আমার এই চিন্তাধারা যাহা আমার বিশ্বাস বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই ভাবিয়া থাকেন—তাহার কোন সার্থকতা থাকে তবে জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ বিষয় অবহিত হইতে হইবে। ইহার সারবত্তা অনুভূত হইলে সরকার সে শিক্ষার পথ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

এক্ষণে স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হইয়াছে। আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত এই অর্বণনীয় দুর্দিনে রাষ্ট্রনায়কগণ বহু চিন্তা-গ্রন্থত পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে অজস্র অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন। আশা করা যায়, ইহার স্রফল এক দিন পাইবই; কিন্তু ভয় হয় স্বাধীনতা পাইবার মাত্র এক যুগ পূর্বেও মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে আমরা যাহা ছিলাম এক্ষণে তাহা হইতে কত নামিয়া গিয়াছি, এই নিম্নগামী গতিবোধ করিয়া আমাদের মধ্যে নূতন করিয়া মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে না পারিলে সম্যকভাবে তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের এই বর্তমান দুর্দশার একটা বড় কারণ যে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিলোপ-প্রাপ্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা স্বাধিকার লাভ ত সকলেরই কাম্য, কিন্তু সে স্বাধীনতা মানুষের হইলেও মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত মানুষের যদি হয় তাহা অনিষ্টেরই মূলীভূত কারণ হইবে। বহু কাম্য বিপুল ভাগ্যলব্ধ স্বাধীনতা হয়ত স্থলিত হইয়া যাইবে। অমানুষের হস্তে অধিকার পাওয়ায় কখনও কল্যাণ হইতে পারে না।



শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

সকালবেলা গোপাল যুধ্জ্জে তাহার ছোট মনিহারী দোকানের সামনে একখানা তিনপায়া টুলের উপর বসিয়া বিড়ি টানিতে-ছিল। মাঠের উপর অল্পস্র সোনালী রোদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বাতাসে একটা নাহ-না-জানা ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে অথচ গোপাল যুধ্জ্জের মন যথেষ্ট প্রক্লম নয়। গ্রামের বাজারে একাধিক মনিহারী দোকান, বেচাকেনা খুবই কম, একটা লোকের মোটা ভাতকাপড় কোটানও মুশকিল, এ অবস্থার গোপালের মন প্রক্লম থাকিতে পারে না।

সংসারে গোপাল একা, তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃ-কুলে কাছাকাছি কেহ নাই। অবিবাহিত গোপালের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, শৈশবে কিছুদিন কুলে গভাস্তা করিয়া-ছিল বটে, কিন্তু বিভালাভ বিশেষ বটে নাই।

স্বষ্টিকর্ভা এক একটি মাহুষের স্বষ্টির ভিত্তর দিয়া এক একটি রসস্রষ্টি করিয়াছেন। কোন মাহুষটি আদিরসপ্রধান, দেখিতে কন্দর্পের মত সুন্দর, কোন মাহুষটি বীররসপ্রধান, সর্বদাই যুদ্ধং দেখি ভাব, কোন মাহুষটি করুণরসপ্রধান, চোখ দুটি হল হল যুগে হাসি নাই, একটা অদৃষ্ট হঃখের বোকার বিনম্র, আবার কোনটা হান্তরসপ্রধান—যেমন এই গোপাল যুধ্জ্জে। স্ত্রীমবর্ণ গোপাল বেঁটে মাহুষ, হাত-পা শীর্ণ অথচ পেটটি মোটা, উপরের দাঁতগুলি উঁচু থাকায় মুখখানি সব সময়ই হাসি হাসি।

তিনপায়া টুলের উপর বসিয়া গোপাল আশ্রমের বিড়ি টানিতেছিল—আজ সকালে ধরিত্রীর যেন অভ্যুত্থানের চেয়েও কম। পথ দিয়া যে দুই-চার জন চলিতেছে তাহারা দোকানের দিকে ক্রিয়্যাও তাকাইতেছে না। বিড়িটি পুড়িয়া গেলে সেটি কেলিয়া দিয়া গোপাল অভ্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনপায়া টুলটির

ভারসমতা রক্ষা করিয়া পা' দুটি তুলিয়া টুলের উপর আসন-পিড়ি হইয়া বসে এবং মনে মনে দেনা-পাওয়ার হিসাব খতায়।

হঠাৎ একখানা মত্ত বড় বকবকে মোটর পথ ছাড়িয়া তাহার অভ্যন্ত নিকটে আসিয়া থামে এবং ভিতর হইতে দুটি সুইপরা ভজলোক নামিয়া আসেন। গোপালের মানসাক গোলমাল হইয়া যায়, সে অভ্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনপায়া টুলটি হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়। প্রথম ভজলোক আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করেন, “মেধুন, আপনি শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জীকে চেনেন?” গোপাল মাথা নাড়ে, কেননা নামটা তাহার হইলেও সে বুঝিতে পারে মোটর গাড়ীর বাবু দুটি তাহার মত নগণ্য লোককে খুঁজিতেছে না। পিছন হইতে দ্বিতীয় ভজলোকটি প্রশ্ন করেন, “হ্যাঁ মশায়, বলুন ত এ গ্রামের নামটা কি?” এই বার গোপাল কতকটা নির্ভয় হয়, সঙ্গত্রে জবাব দেয়, “আজ্ঞে এ গ্রামের নাম বেলগাছি।”

তিনিয়া ভজলোক বলেন, “গ্রামের নামও মিলে যাচ্ছে, মনিহারী দোকানও মিলে যাচ্ছে, অথচ দোকানের মালিক শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জীকে আপনি চিনেন না—আশ্চর্য্য!” প্রথম ভজলোক হাসিয়া বলেন, “নাও চিনতে পারেন, সবটা পরিচয় ত দেওয়া হয়নি, সবটা দিলে হয়তো চিনতে পারবেন, আমরা খুঁজছি ঐক্যদাস মুখার্জীর প্রপৌত্র, ঐহরিন্দাস মুখার্জীর পুত্র শ্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জীকে।” তিনিয়া গোপালের মুখটা প্রথমে লাল হইয়া ওঠে, তারপরে সেই পরিমাণে কালো হইয়া যায়। দ্বিতীয় ভজলোক এইবার হতাশ হইয়া বলেন, “তা হলে আপনি গোপাল যুধ্জ্জেকে চিনেন না দেখি।”

থাকত খাইয়া ভীত গোপাল এইবার বলিয়া ফেলে, “আজ্ঞে আমিই গোপাল মুখুজে।”

মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ এক কলসী ঢাকা পাইলে মাহুষের অবস্থা যেমন হয় গোপালের উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক ছুইটির সেই অবস্থা হইল, তাঁহার সম্মুখে চোঁচাইয়া উঠিলেন, “পেয়েছি—পেয়েছি।” তারপরে প্রথম ভদ্রলোকটি দুই হাত জোড় করিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে নমস্কার করেন, আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক বাঁ হাতে নেকটাই সামলাইয়া একেবারে খুঁকিয়া পড়িয়া গোপালের পদধূলি লন।

ইতিমধ্যে ছুই-চারি জন করিয়া গ্রামের অনেকেই আসিয়া পড়েন। প্রথম ভদ্রলোক সেই সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আজ আমাদের এক মহা আনন্দের দিন, এক মাস বরে আমরা যে রত্নের সন্ধান করছিলাম আজ তা এইখানে এই মুহূর্তে পেয়ে পড়া হল। আপনারা নিশ্চয়ই শক্তিপুরের জমিদারদের নাম শুনেছেন, আমি হচ্ছি সেই জমিদারীর উকিল, আর ইনি হচ্ছেন ম্যানেজার। আপনারা হয় তো জানেন না যে, শক্তিপুরের জমিদার ত্রিগুণেন্দ্রনারায়ণ রায় বিলেত থেকে আসবার পথে এরোপ্লেন ভেঙে মারা গেছেন—সে আজ ছ’মাসের কথা। রণেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন অবিবাহিত এবং তাঁর নিকট-আত্মীয়ও কেউ নেই—এ অবস্থায় আমরা তাঁর দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারীর সন্ধান শুরু করি এবং যথাসময়ে ত্রিগোপালচন্দ্র মুখার্জীর নাম ঠিকানা পাই। গোপালবাবুর মাসীর খুশরের মামা হচ্ছেন শক্তিপুরের জমিদারদের দৌহিত্র। এক মাসের খোঁজাখুঁজির পর আজ আমরা শক্তিপুর জমিদারীর শূচ সিংহাসনের মালিককে পেয়েছি।” শুনিয়া সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে—গোপালের মাথা ঘুরিয়া যায় এবং পা কাঁপিতে থাকে।

ইহার পরে কি অবস্থায় এবং কেমন করিয়া গোপালকে মোটরে তোলা হয় তাহা ভাহার খেয়াল নাই।

নূতন জমিদারের আগমন উপলক্ষে কয়েকদিন বরিয়া শক্তিপুরে মহোৎসব চলে। গোপালের দিনগুলি একটা স্বপ্নাতুর অবস্থার ভিতর দিয়া কাটিতে থাকে; প্রকাণ্ড রাজ-বাড়ী, সাজান বড় বড় ঘর, আসবাবপত্র, ঝাড়, গালিচা, আমলা গোমতা, পাইক, পেয়াদা, দাসদাসী ইত্যাদির মালিক সে, এবং কেজ্জল। অবশ্য বেলগাছির ছেঁড়া হাফশার্ট-পর গোপাল আর সে নাই, পোশাকে-আষাকে তাহারও ভোল একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

সেদিন সকালবেলা গোপাল সপরিষদ রাজবাড়ীর বাগানে বেড়াইতেছে এমন সময় কে একজন ভদ্রলোক খুঁত-চাদর বেসামাল অবস্থায় হড়মুড় করিয়া তাহার পায়ের কাছে দণ্ডবৎ

হইয়া পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মুষ্টিটি উঠিয়া নাকের উপরকার স্তম্ভ-বাঁধা চশমা জোড়া সংযত করিয়া জোড়হাতে কহিতে থাকেন, “আহা কি সৌম্য সমাহিত ভাব, বদন মণ্ডলে কি দিব্যজ্যোতি, দর্শনে মহাপুণ্যলাভ হয়। মহারাজ আপনি মহাপুরুষ, মহাপুরুষ।” গোপাল পরিচয় পাইল ভক্তট স্থানীয় পণ্ডিত এবং মহা ধর্মপ্রাণ। পণ্ডিতবর উপস্থিত অল্প সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, “এই যে এত লোক তোমরা এখানে উপস্থিত আছ, কৈ, কাউকে দেখে ত মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। অথচ য়েই মহারাজকে দেখলাম অমনি ভক্তিতে মাথা ঝুঁর পায় আননিই হয়ে পড়ল।” পণ্ডিত মশায় অনেকক্ষণ বরিয়া বেদবেদান্ত হইতে কল্পার বিবাহসঙ্কট ও পুত্রের শিক্ষাসমতা পর্যন্ত অনেক কথা বলেন। বিদায় লইবার সময় আবার পদধূলি লইয়া কহেন, “রাজা অনেক দেখেছি কিন্তু রাজর্ষি এই প্রথম দেখলাম।”

জমিদার বাড়ীর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় সন্ধ্যাবেলা আসর জমিয়াছে, মাঝখানে ভাকিয়া ঠেস দিয়া গোপাল সমাসীন, চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে সভাসদৃন্দ, স্নগদ্বি তামাকের ধোঁয়ার ঘর ভরপুর। সাহিত্যিক আনন্দবাবু কথা কহিতেছেন, বলিতেছেন, “বারিপাত না হলে যেমন ফসল ফল না ভেমনি রাজার রূপাদৃষ্টিপাত না হলে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, রাজা বিক্রমাদিত্য অল্পগ্রহ করেছিলেন বলেই কালিদাস কাব্য লিখতে পেরেছিলেন।” শ্রোতার বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়ে, আনন্দবাবু উৎসাহিত হইয়া বলেন, “আরও দেখুন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ইতিহাস, কৃষ্ণচন্দ্রের রূপাতেই তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। মহারাজ, আপনিই বলুন একথা যথার্থ কি না?” মহারাজ কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পান না, অথচ একটা কিছু বলিতেই হয়—অবশেষে মুহূর্ত করিয়া বলেন, “হ্যাঁ, কথা ঠিক, কৃষ্ণচন্দ্রের রূপায় কালিদাস যশস্বী হতে পেরেছিলেন।”

শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হয়, কেহ বলে, “কি অগাধ পাণ্ডিত্য,” কেহ বলে, “কি স্বল্প রসবোধ।” আনন্দবাবু গদগদ কণ্ঠে বলেন, কি গভীর গবেষণা, কালিদাস যে বাঙালী ছিলেন এক কথায় মহারাজ তা প্রমাণ করে দিলেন—মহারাজের চরণতলে বসে কত যে শিবলম, কত যে লিখব।”

দেউলে ব্যবসায়ী সত্যপদবাবু একটু মেরিতে আসিয়া পিছনে বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতক্ষণে ঘষিতে ঘষিতে সামনে আসিয়া পড়িয়াছেন, আনন্দবাবুকে এক রকম থামাইয়া দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “সাহিত্য তো সামান্ত বিষয়, আমাদের মহারাজের ব্যবসার বুদ্ধি এত প্রখর যে টাটা বিরলা ঝুঁর চরণতলে বসে শিক্ষালাভ করতে পারে।” মহারাজ যে ইতিপূর্বে একটা ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ খবর উপস্থিত সকলেরই জানা ছিল, সত্যবাবুর কথায় সকলেই

তাই একবাক্যে সায় দিয়া উঠে। সত্যবাবু সোংসাহে বলেন, “মহারাজের মত প্রতিভাবান মানুষ যদি আজ ব্যবসায়ক্ষেত্রে না এমন তা হলে একটা বিপ্লব ঘটে যায়।” আনন্দবাবু হটিবার পাত্র নহেন, কথার তাঁহার উপর। তিনি বলেন, “প্রতিভার ক্ষেত্র ব্যবসায় নয়, প্রতিভার ক্ষেত্র সাহিত্য, বিরলা টাটা দু’দিনের কিন্তু কালিদাস রবীন্দ্রনাথ চিরকালের।” ইহার পরে আনন্দবাবু ও সত্যবাবুতে হাতাহাতি হইবার আগেই সভা ভঙ্গ হয়।

নিশ্চয় রাত্রি, আলবোলায় শেষ কলিকা চড়াইয়া দিয়া খাগ চাকর বিদায় লইয়াছে, পালকে শয্যা প্রস্তুত, শুইলেই হয়, অথচ গোপাল জানালার ধারে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালাবিত ধরণীর দিকে তাকাইয়া আছে। ধরণীর দিকে তাকাইয়া আছে বলার ভুল বলা হইল, কেননা গোপাল আসলে তাকাইয়া আছে তাহার ব্যক্তিত্বের দিকে। কি আশ্চর্য্য, এতদিন সে নিজেই জানিত না কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাহার। সে মহাপুরুষ, রাজর্ষি, সে একটা বিরাট প্রতিভা। বেলগাছির বাজারে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই, পারিবেই বা কেন? গুপ্তজনের আদর গুপ্তসমাজেই হইয়া থাকে। ভগবানকে সন্বেদন করিয়া সে মনে মনে কহিল, “হে প্রভু, আমাকে লইয়া কি মহান খেলা তুমি খেলিবে তা তুমিই কেবল জান।”

আপিস ঘরে ম্যানেজারবাবু গোপালকে জমিদারী সংক্রান্ত দু’একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ও গোটা কয়েক সই লইতে আসিয়াছেন। মহারাজের এত প্রথম বুদ্ধি যে ম্যানেজার ঘাহা বুঝাইতেছেন তিনি তাহাই বুঝিতেছেন, আইনের বড় বড় ধারাগুলিতে পর্য্যন্ত আটকাইতেছে না। আশ্চর্য্য হইয়া ম্যানেজারবাবু বলিতেছেন, “মহারাজ আইন পড়েন নি জানি, কিন্তু না জানলে কিছুতেই বলতে পারতাম না আইন পড়েন নি।” মহারাজ একটু একটু হাসিতেছেন এবং কাগজে সই করিতেছেন এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর জানাইল আনন্দবাবু দরজায় উপস্থিত—মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে চান। ম্যানেজার কাগজপত্র গুছাইয়া বিদায় লইলে আনন্দবাবু ঘরে ঢুকিয়া পদখুলি লইলেন এবং হাতজোড় করিয়া কহিলেন, “আজ একটা মহাকাব্যের স্রচনা করব তাই মহারাজের পায়ের ধুলো নিতে এলাম।”

মহারাজ বসিতে অমরোষ করিলে আনন্দবাবু চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং একটা গভীর ভাবমগ্ন অবস্থায় তাঁহার মহাকাব্যের মোটা কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া ইহা লেখা হইবে, মহারাজের কীর্তি, খ্যাতি ও প্রতিভার কথার প্রত্যেকটি অধ্যায় ঠাসা থাকিবে। অবশেষে উপসংহারে বসিলেন, “অতীতকালে রাজামহারাজাকে কেন্দ্র

করে যদি মহাকাব্য লেখা সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে একালে কেন হবে না—নিশ্চয় হবে, আমি দেখিয়ে দেব হবে।”

ইহার পরে সাধারণ কথা শুরু হয়। আনন্দবাবু বলেন, “একখানা উপভাস ছাপতে প্রেসে দিয়েছি, কিন্তু টাকার যোগাড় হচ্ছে না, মহারাজের কাছে তাই সামান্য হাজারখানেক টাকা প্রার্থনা করছি।” সেদিন টাকা না পাইলেও আনন্দবাবু আশা পাইয়া উঠিলেন।

বিকালের দিকে পদখুলি ও সেই সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ লইতে সত্যপদবাবু একটা মণ্ড বড় কাইল বগলে করিয়া উপস্থিত হন। এদিকে কোন কাগজের মিল নাই, একটা মিল খুলিবার সব ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে, কেবল টাকার ব্যবস্থা হয় নাই, এই বিষয়ে মহারাজের উপদেশ চাই। টাকা ঘরে রাখার চেয়ে কারবারে খাটানো যে লাভজনক একথা মহারাজের মত ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে বলিয়া দিতে হইবে না, তিনি অগ্রণী হইয়া মিলের অর্ধেক শেয়ার কিনিয়া লইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন বাকি রহিল মহারাজের আশীর্বাদ, তাহা পাইলেই মিলের প্রতিষ্ঠা ও ত্রীমুখি অনিবার্য্য। ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ বিষয়টী ভাবিয়া দেখিতে রাজী হইলেন।

ইহার পরে রাজবাড়ীতে সত্যপদবাবুর আনাগোনা ক্রমেই বাড়িয়া যায়, লোকে গোপনে বলাবলি করে ব্যবসায়-সংক্রান্ত কথাবার্তা ছাড়া আরও একটা কথা চলিতেছে। শেষে যেদিন সত্যপদবাবুর অশিক্ষিতা ও রক্তরী ভগ্নী মালিকা দাদার কাইল হাতে করিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন সেদিন কথাটা আর গোপন থাকে না। অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু নাই, কেননা মহারাজের বয়স হইয়াছে এবং পাত্রীটিও ভাল।

মালিকাকে গোপালের সত্যই ভাল লাগে। সেদিন সন্ধ্যার দিকে মালিকার শাড়ীর রং, চুলের গন্ধ এবং হাসির সুর এমন একটা আশ্চর্য্য পরিবেশের সৃষ্টি করে যে, গোপাল তাহার মনের কথাটা বলিয়া ফেলে। মালিকা ইহার দ্রুত প্রস্তুত ছিল কি না বলা যায় না, তবে মত দিতেও সময় নষ্ট করে না। অতঃপর দুই জনে প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু খায়। গোপাল রহস্য করিয়া বলে, “আমার মত বুড়ো বরকে তোমার পছন্দ হবে মালিকা?” মালিকা জবাব দেয়, “পৃথিবীতে আপনার মত সুন্দর কে?”

আকাশে অগণ্য তারা, পৃথিবী নিদ্রিত, রাজবাড়ীর ভেতলার ছাদে একাকী পদচারণ করিতেছে গোপাল। তিন মাস অতীতের ইতিহাস, অধ্যাত দরিত্রজীবন, বেলগাছির বাজার, মনিহারী দোকান, এ সব তাহার কাছে আজ স্বপ্নের মত অস্পষ্ট। এমন একটা কুৎসিত অতীত তাহার জীবনে

আদর্শেই ছিল কি না সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হয়। সাধারণ সে নহে, হইতেই পারে না। পায়ের নীচে ঐ যে ধূলিময় ধরণী, উহা যেন দূরে আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে, মাথার উপর ঐ যে ভারকাণ্ডিত বিরাট আকাশ উহা যেন কাছে, আরও কাছে নামিয়া আসিতেছে। গোপাল শুধু হইয়া দাঁড়ায়, আপনার বিরাটত্বকে আপনি অনুভব করে। জানে সে বড়, শুধু সে বড়, দেখা গেল রূপেও সে বড়। পৃথিবী যদি তাহার কাছে জোড়হাত করিয়া না দাঁড়ায় তবে দাঁড়াইবে তাহার কাছে? তবে একটা কীট। তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে খচখচ করিয়া বিঁধে, সেটাকে সে আর দেরি না করিয়া তুলিয়া ফেলিবে, গোপাল নামটাকে বদলাইয়া হয় মহীপাল না হয় ভূপাল করিবে।

অনেক রাত্রে শোওয়ার ভোরের দিকে ঘুম ভাঙিতে গোপালের সেদিন বেশ বেলা হয়। উঠিয়া দেখে চাকর নিত্যকার মত আলবোলায় নল লইয়া মাথার কাছে দাঁড়াইয়া নাই, ডাকিয়াও সাড়া পায় না। গোপাল রাগিয়া আঙন হইয়া উঠে, দ্বির করে জুতা মারিয়া তাহাকে আজই তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু এতক্ষণে একটা চাকরও কি আসিতে পারে না? না—ইহারা অন্তত আশ্চর্য পাইয়া গিয়াছে, একটাকে তাড়াইলে হইবে না, সেই কে সেই তাড়াইতে হইবে। গোপাল ক্ষেপিয়া বাহিরে আসে, মনে মনে ভাবে হাতের কাছে যাহাকে পাইবে তাহাকেই মারিয়া ফেলিবে, কিন্তু হাতের কাছে কাহাকেও পায় না। গোপাল তারঘরে ঢেঁচাইতে থাকে, এইবার সাড়া দেন রয়ং ম্যানেজারবাবু। ম্যানেজার বাবু সামনে আসিয়া দাঁড়ান এবং যুঁহু হাসিয়া গোপালের সমস্ত রাগ জল করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বুধা, ম্যানেজারের হাসিটুকু জলের কাজ না করিয়া বরং তেলের কাজই করে—ম্যানেজারের বেয়াদবীটাও তো কম নয়, পায়ের ধূলা লইতে তুলিয়া যায়।

গোপাল একটা কঠিন কথা বলিতে যায়, কিন্তু রাগে গলা দিয়া কোন আওয়াজ বাহির হয় না। ম্যানেজার-বাবুর যুঁহুহা হা বিজ্ঞতর আকার ধারণ করে, তিনি বলেন, “এই যে, উঠে পড়েছেন গোপালবাবু।” গোপালবাবু। একি মহা অপমানজনক সম্বোধন। ম্যানেজারটা দেশা করিয়াছে নিশ্চয়—গোপাল ছ’পা পিছাইয়া যায়। ম্যানেজারবাবু সেই ছ’পা আগাইয়া আসিয়া বলেন, “পালাবেন না, শুধু, একটা খুব জরুরি কথা বলবার আছে—যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমাদের জমিদার শ্রীরঞ্জননারায়ণ রায় মারা যান নি, কাল তিনি কায়রো থেকে হেঁটে কলকাতা পৌঁছেছেন, এক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হচ্ছে আর কালবিলম্ব না করে এখান থেকে সরে পড়া।” সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে, মাতলামিরও একটা সীমা আছে, গোপাল আর সহ্য করিতে পারে না, ধমক

দিয়া উঠে—বলে, “ধায়ুন, ধায়ুন, ঢের বেয়াদপি সহ্য করেছি, আর সহ্য করব না, বেরিয়ে যান আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যান।”

ম্যানেজারবাবুর মুখ হইতে হাসিটুকু এবার মিলাইয়া যায়—নরম হইয়া বলেন, “বেরিয়ে যাওয়াটা সম্ভ্রান্ত আপনারই দরকার হয়ে পড়েছে গোপালবাবু, জানেন না তো আমাদের জমিদারটাকে, চকিশ ঘণ্টা মদ খান, হাতের কাছে আপনাকে পেলে ঘরে চাবুক মারবেন। ভাল কথা, যাবার আগে পোশাকটা বদলে ফেলুন তো, ভারতঃ রাজবাড়ীর কোন জিনিষই আপনি নিয়ে যেতে পারেন না, পরনের ঐ কুপড়-খানাও না, অতএব ওখানা রেখে আপনার সেই আগেকার হাকশার্ট আনু হুতি পরে নিনু, অনেক কষ্টে এ ছুটো উদ্ধার করে এনেছি, ছুঃধের বিষয় ছেঁড়া চটি জোড়ার কোন সজান পেলাম না। নিনু, একটু তাড়াতাড়ি করুন।”

ম্যানেজারের পুঁটলিটি হইতে হাকশার্ট আর হুতি বাহির হইল—গোপাল দেখিয়াই তাহাদের চিনিল।

পুরোনো হাকশার্ট আর হুতি পরিয়া ধালি পায়ে গোপাল পথে বাহির হইয়া পড়ে। রাগে, ছুঃধে ও লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সে পথের একটা ঘর দিয়া চলিতে থাকে। এই অবস্থায় কেহই তাহাকে চিনিতে পারে না, মাত্র যে ছুটি লোক চিনিতে পারে তাহারা হইতেছে শুভ পণ্ডিত মহাশয় এবং সাহিত্যিক আনন্দবাবু। আজ গোপালের পায়ে আশাভিরিক্ত ধূলি ধাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয় পদধূলি না লইয়া হাসিয়া পাশ কাটান, আনন্দবাবু মহাকাব্যের মূল চরিত্রকে হাতের কাছে পাইয়াও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান।

পথ চলিতে চলিতে গোপাল ভাবে সে কোথায় যাইবে, কি করিবে। ভাবিতে ভাবিতে সত্যপদবাবুকে মনে পড়ে, গোপালের একটা সমস্তার সমাধান হয়, সে সত্যবাবুর কাছে যাইবে এবং নিজের অমূল্য ব্যবসায়-বুদ্ধিটা তাহার হাতে ধরিয়া দিবে। সত্যবাবু তখন চা খাইতেছিলেন, গোপালের প্রস্তাবটা শুনিয়া হাসিয়া বলেন, “ওটা নিজের কাছেই রাখুন, মনিহারী দোকানটা আবার চালাতে হবে তো।”

গোপালের চোখে ছনিয়া অন্ধকার হইয়া আসে; পা চলিতে চায় না, ধূলিময় ধরণীকে বড় কাছে, বড় আপনার বলিয়া মনে হয়—সে বসিয়া পড়ে। মনের মধ্যে চিন্তা ভালগোল পাকাইয়া যায়, কত যুঁহু ভাসিয়া আসে, ভাসিয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ একটি হাসি হাসি যুঁহু ফুটিয়া ওঠে, তাইতো, গোপাল এতক্ষণ এই যুঁহুটিকে কেমন করিয়া তুলিয়া ছিল? সর্বোপাে তাহার মালিকার কাছেই ছুটির আসা উচিত ছিল, মালিকা যে তাহাকে ভালবাসে। এ ছুঁকিনে সে তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না, দারিদ্রকে বরণ করিয়া মালিকা হাসিযুঁহুে তাহার হাত ধরিয়া এক অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু করিবে।

বাগানের ভিতর দিয়া আবছায়া অন্ধকারে গোপাল জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। হাঁ, সে ঠিকই আসিয়াছে, এই তাহার প্রিয়তমার মন্দির। গোপাল চাপা গলায় ডাকে, “মালিকা, মালিকা।” হৃদয়ের আহ্বান কখনও ব্যর্থ হয় না, মালিকা জানাল দিয়া উঁকি মারে। গোপাল আকুল কণ্ঠে বলে, “আমি এসেছি মালিকা।” মালিকা জবাব দেয়, “আমিও আসিতেছি প্রিয়,” তারপরে ছুটিয়া চলিয়া যায়। গোপাল উদ্বেল হৃদয় লইয়া অপেক্ষা করে। হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া যাহা বেগে আসিয়া পড়ে তাহা মালিকা নয়, এক ধান ইট। বিহ্বল-বেগে মাথা সরাইয়া লইলেও গোপালের নাকটা কিঞ্চিৎ জ্বলম্বল হয় এবং ধান ইটখানা পায়ের বুড়া

আঙ্গুলের উপর আসিয়া পড়ে—গোপাল আর্দ্রনাদ করিয়া উঠে।

বেলগাছির বাজারে সাধুসম্মতের দোকানের সামনেই গোপাল যুগুজের মনিহারী দোকান। ডিন মাসকাল যাবৎ সে দোকান বন্ধ, তালায় মরিচা ধরিয়াছে, সাইনবোর্ডখানা কাত হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন সকালবেলা সাধু দোকানের ঝাঁপ ভুলিতে গিয়া দেখে পথের ওপাশের দোকানটির দরজা খোলা, সাইনবোর্ডখানা সোজা হইয়া ঝুলিতেছে এবং চির-পরিচিত গোপালের মূর্তি ভিনপায়া টুলটির উপর বসিয়া বিড়ি টানিতেছে।

ধর্মসাধনায় রবীন্দ্রনাথের নূতন ইঙ্গিত

শ্রীশুধীরচন্দ্র কর

কি করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার সনাতন স্রষ্টা পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মননে, ব্যাখ্যানে ও আচরণে চলেছিল তারি সন্ধান। সে সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ধর্মের তাত্ত্বিক কিম্বা ব্যবহারিক দিকে নয়, পেয়েছিলেন অভিনব একটা দৃষ্টির সাহায্যে। “কালান্তর” গ্রন্থের ছোট ও বড় প্রবন্ধে তিনি সেই দৃষ্টির প্রসঙ্গে বলেছেন : “বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যায় দৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালকদের পক্ষে ছর্ব্বল বা কলুষিত না হয়, আমি এই লক্ষ্যে দুট করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্য্যে ইংরেজ সাংস্কৃতিক জীবন উপহার দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই।”

জীবনের অপরাহ্নে এসে “মানুষের ধর্ম” গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও আর একবার রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলেছেন—“বহু কালে মেলে দিলে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই শিল্প সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলাবার দিকেই যায়।”—ইহাও সেই “ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যায় দৃষ্টি”র কথা। এর মধ্যেই বিশ্বমানবের মিলন-সাধন-স্রষ্টার ইঙ্গিত মেলে। সেটি পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া দরকার।

গোটা মানব-সমাজের পথের বিবিধ পরীক্ষার কথা রয়েছে তার ইতিহাসে। এই ইতিহাসই তার সভ্যতার বাহন। মহা-কালের বুকে সভ্যতারই জরাজাহ্ন চলছে। কালে কালে তার সঙ্কটটা যত বড়, যত সাংঘাতিক, যত দীর্ঘস্থায়ী হোক, তবু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, সেটা সাময়িক। সেটা স্বর্ধ-গ্রহণ মাত্র, স্বর্ধশূভতা নয়।

বার্ণের বাষায় বর্ডমানের ক্ষুদ্র দেশকালে লোকে মিলতে পারে না। কিন্তু ইতিহাসের বিরাট পটভূমির দিকে তাকালে দেখতে পাই যে মানুষ মানুষের চিন্তে আত্মীয়তার আবেদন আনে দেশকাল অতিক্রম করে। এমন কি, মহা অত্যাচারীও সেখানে ক্ষমার্ত্ত হয়ে উঠে।

মানুষের মিলনধর্মী মহান আশ্রয় দেখা পাই সকল ধর্মেই, তাঁদের উদার মিলন-বাণীরও অভাব নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ বাণীর প্রভাব সফল করা নিয়মই যত সমস্ত। আচার বা নীতির চেয়ে মূল সভ্যতাকে গ্রহণ করাই আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, এ চেষ্টা এ পর্য্যন্ত প্রায় সকল ধর্মব্যবস্থাতেই এসে দাঁড়িয়েছে বহু ছক্কাটা নীতির নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অভ্যাসে। রবীন্দ্রনাথের প্রক্রিয়া কিন্তু নীতিগত নয়, বলা যায় তা দৃষ্টিভঙ্গিগত। তা হচ্ছে অখণ্ড ইতিহাসকে বা চিরন্তন বাস্তবকে দেখা। কালোত্তীর্ণ মানবকীর্ত্তির নিদর্শন—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্পদগুলি দেশকাল নির্বিশেষে মানুষের কি আকুল অহুভুতির বিষয়, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারে তা বিলক্ষণ দেখা গেছে। মানুষ ঘরোয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য তুচ্ছ ঘটনাটির গায়ে করেছে চিত্রালঙ্করণ। মানুষের ভিতরকার ঐখ্য ঐ সব শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ তাতে দেখেছে একালের সঙ্গে অরণ্যভীত অহর সেকালের যোগ। তার মনের মধ্যে পেয়েছে কোন্ সেই অচেনা মানুষের অন্তর্বেদনার মিল, স্রুমার সমধর্মিতা। রাজ্য-সাম্রাজ্য ভুলিয়ে যায়, কালের কপোলতলে শুভ্র সযুজ্জল হয়ে থাকে এই বেদনাই। বেদনাতেই মানুষ এক, এইটেই তার চিরন্তন আকৃতি। যে সব কাজে এর প্রকাশ হয়ে চিরকাল মানুষকে আনন্দ দান করতে

পারে, সেই সকল কাজের সাধনাই মানুষের যথার্থ ধর্মসাধনা।

রবীন্দ্রনাথ কথামূলি বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে। রোগশয্যা থেকে উঠেছেন। উত্তরায়ণে পূজবধু প্রতিমাদেবীর শিল্পগৃহ “চিহ্নভাঙ্গ”তে ভখন তিনি বাস করছিলেন। সেই সময় তাঁর “বিশ্ব-পরিচয়” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছিল। প্রেস কপিতে ভাষা সংশোধনের সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষম্মীর প্রক্ষণও দেখে দিচ্ছিলেন তিনি নিজেই।

বইটির “সৌরভগৎ” অধ্যায়ের এক স্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে, সৌরমাণ্ডলিক গবেষণার একটি সংবাদে অসংখ্য ঠেকে গিয়েছিল বিজ্ঞানী ডাঃ ডগলাসের একটি সিদ্ধান্ত। “ঐনিচ মানবজ্ঞান বিভাগ থেকে সংবাদ নিয়ে” সেই ভাষাটি জানা যায়। এই গবেষণার ভাষাটি সেবারে বইয়ে নতুন যোগ করা হয়। প্রফের এই স্থলে এসে কবির সঙ্গে বর্তমান লেখকের একটু আলোচনা চলল। ডাঃ ডগলাসের সেই হারানো ভাষার আবিষ্কার কোথায় গেছে তলিয়ে, কিন্তু তাঁর সাধনার ফল চিরকালের জন্তে মানব-সমাজের উত্তরাধিকারের সম্পদ হয়ে রইল। আজ যিনি পরিচিত, সেই ডাঃ ডগলাসও হয় শু একদিন যাবেন তলিয়ে কালে কালে, এই ভাবে নাম-হারানো কত ব্যক্তির সাধনা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছে নব-নব আবিষ্কারে, এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে পূর্ণতার পথে বিস্তৃত করে। মানুষের সাধনা বিজ্ঞানে যত নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকে; এমন যেন আর কিছুতে নয়।—এমনি ধরণের কথাই বলে-ছিলাম।

শুনে কবি বললেন, সাধনা মানুষেরই বিশ্বরূপ আছে; মানুষের বিশ্বরূপও তার মধ্যে দিয়েই প্রকাশমান। দেশে, জাতিতে, বর্ণে, ধর্মে, আমরা আজ যে পৃথিবীব্যাপী স্বার্থ-সংঘর্ষের মধ্যে লোকের ক্ষুদ্র রূপ দেখছি এ তার ব্যক্তিগত সাময়িক রূপ। তার যা চিরন্তন রূপ, তার মহৎ প্রকাশ এরূপ নৈর্ব্যক্তিক বিকাশেই হয়েছে। বিজ্ঞানের মত সব কাজেরই সেইরূপ বিকাশ দেখা যায় ইতিহাসের পটে। উক্ত বিজ্ঞানচর্চা সাহেবটির নিকটে তাঁর হারানো পুত্রটি প্রকাশ পেয়ে অকুলে তাঁকে সাহায্য দিয়ে আনন্দিত করেছিল। বিশ্বত অজীভ থেকে মহেঞ্জোদারোর অখ্যাত লোকদের যে শিল্পনিদর্শনগুলি মিলল, সেগুলো মানুষকে তার মানব-হারার উদ্ভট-ইতিহাসের ভাষার সন্ধান দিয়ে তাকে করেছে তেমনি অভিভূত। দান আছে, দাতা নেই, বুঝা যায়, সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র পেরিয়ে এক বিরাট অনন্ত অর্থও মানব-সাধনা চলেছে। এই ইতিহাসই শু মানুষের আসল স্বরূপ, যথার্থ সত্তার আধার, —তার সত্য পরিচয় এখানেই নিহিত।

কবি উজ্জ্বল মুখে বলে চলেছিলেন; হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে বেদনার সুর বাজল, তিনি বললেন, “কোথায় মানুষ তাকে

দেখবার দৃষ্টি নিয়ে বড় হবে, তা নয়, ক্ষুদ্র দলাদলি চুলোচুলি নিয়েই সকলে ব্যস্ত। সব জাতির দান, সব দেশের দান, সব ব্যক্তির দানই একটি সংহত সমগ্ররূপে দেখা দিয়েছে এই মানব-সভ্যতার অভিধানের মধ্যে। নতুন নতুন কীর্তির যোগান দ্বারা এই সভ্যতার সেবার লেগে থাকে, এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের হাতে সেই সভ্যতাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই হচ্ছে মানুষের আসল কর্তব্য। স্বার্থের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে হলে এই অর্থও অপৌরুষেয় মানব-সভ্যতারই ধ্যান করতে হবে, সেই ধ্যানই নিয়ে যাবে তাকে পরার্থতার।

আমরা দেহরক্তধারা-যোগে ধরবাড়ী সম্পত্তিতে বা চিন্তা-ধারায় নিজের ছাপ এঁটে দিয়ে সব কিছুকে অক্ষয় করে রাখতে চাই। বেঁচে থেকে জীবিতকালে এখনও যেমন ভোগ করব, আমি বেঁচে না থাকলেও আমার ছাপমারা কীর্তির মধ্যে আমি চিরকাল সেই গৌরবাধিকার নিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকব, এইটি দেখে যাবার, বুঝে নিয়ে যাবার জন্যই স্বার্থের ব্যাকুলতা। কিন্তু মহাকালের ধর্মে কি দেখছি? সে লোককে কেবলই সকল কিছু থেকে ছাড়িয়েই নেয়—কেড়ে নেয় তার কীর্তিকণ্ড। মানুষের কাজগুলি যদি বা এই দেখা পৃথিবীতে দু’দিন স্থানও পায়, মহাকালের খেলার শ্রোতের মুখে এই পৃথিবী, এই তার ইতিহাস—সব যায় ভেসে।”

আগে থেকেই কবির ভাবনায় ও লেখায় এই চিন্তারই প্রবাহ চলেছিল। “মানুষের ধর্ম” গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, “পুরোনো সভ্যতার মাটি-চাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্য মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অহুতব করেছে তারই দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরে ব্যবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তিগত মানুষের খেলারকে প্রচার করতে চায় নি, বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্তে তার হুঁসোখ সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্ম-পরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মার সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন।”

চিত্রবহুল মহেঞ্জোদারোর বইগুলি কবির দপ্তরে আসার পর থেকে সেগুলির প্রভাব তাঁর অনেক রচনার উৎস হয়েছে। প্রায় একটা গোটা কাব্য—“শেষ-সপ্তক” বৃষ্টি হ’ল মহেঞ্জোদারোর প্রেরণা থেকে। তার পর থেকে অনেক কবিতায় এবং ভাষণেই এসে গেছে মহেঞ্জোদারোর সেই প্রভাবই। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মৃত্যুর

হ'মাস আগেকার ১৩৪৭ সনে প্রদত্ত এই পৌষের সর্বশেষ ভাষণ—“আরোগ্য”। তাতে না-ধর্মী মানব-সাধনার পক্ষে নিষ্ফল বর্ণিত হ'ল-ধর্মী সাধনার আদর্শরূপে কবি ধরে দেবিয়েছেন চীনকে, আর ঐতিহাসিক আদর্শরূপে মহেশ্বোদারো-শ্রেণীয় নামহীন অচেনা মানব-সাধনাকে। কবিকে জীবন-সাম্রাজ্যে ইতিহাস ও বিজ্ঞান—বাস্তব বিস্তার এই দুই শাখাই—অধ্যাত্ম-উদ্দীপনার বিশেষ সহায়তা করেছে। ইতিহাসের প্রেরণার কথা এখানে বলা হ'ল—এমনি খাঁটি বিজ্ঞানের প্রেরণা নিজেও বলায় কথা কবির জীবনে আছে। কবি বলেন, “যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আঙ্ক মিলনের অপেক্ষা আছে।” “বিশ্ব-পরিচয়” গ্রন্থের ভূমিকার তিনি বলেছেন, “আজ বয়সের শেষ পর্বের মন অভিভূত নব্য প্রাকৃতভক্তে—বৈজ্ঞানিক মাস্তাবাদে।”

বিশ্বভারতী পরিষদের ভাষণেও পূর্বে কবি বলেছেন : “বৃহৎ কালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মতত্ত্বী পলিটিকের দিকে যুরোপের আত্মব-মাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ—কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই যুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে।” (১৩৩২)।

ইতিহাসও আজ বিজ্ঞানের পর্যায়ের উত্তীর্ণ হতে চলেছে। বিশেষতঃ মাটি খুঁড়ে ধাতু, জাতিভেদ বা ভাষার স্তর ধরে পুরাতত্ত্বের সাহায্যে ইতিহাসের যে অংশ সক্রিয়, তাকে বিজ্ঞানের অঙ্গ বলেই ধরা যেতে পারে। মহেশ্বোদারোর পুরাবিদ্যা ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে ভাবের ও ভাষার বিনিময় হচ্ছে একালে-সেকালে। দুই কালের আচার-বিচার ছাপিয়ে উঠেছে এই ভাষা। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ “বিদ্যাস্তবনে” ও “কলাস্তবনে” এই চিরকালের ভাষাকেই করেছেন তাঁর সাংস্কৃতিক ধর্মের সাধনমন্ত্র। বিশ্বভারতীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ফুটেছে এই দুটি বিভাগে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নিজেই একথা বলেছেন।

হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের থেকেই জীর্ণস্থানীয় রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছেন কম। কিন্তু তারই মধ্যে কবির সমকালে “বিদ্যাস্তবনে”র পণ্ডিত বিধু-শেখর শাস্ত্রী মহাশয় এবং মোলানা জিয়াউদ্দিনের মধ্যে যে ঐতিহ্য ও হৃদয় আচরণ লক্ষ্য করা যেত, তা ছিল আদর্শ-স্থানীয়।—দুই ধর্মের-দু'জনের মধ্যে ছিল মানবিক ঐতিহ্য। কবির আশ্রমের পরিবেশে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাতি-

ধর্মের হাজার নীতি-বৈচিত্র্যের উপরেও তার প্রভাব ছুটি মাত্রকে মিলিয়েছিল আপন করে। স্বপাক ছাড়া যিনি আহ্বার করেন নি, এমন মহাপণ্ডিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, জীঠান পান্ডী দীনবন্ধু এগুরুজের পদধূলি নিতেন। মেথরের মাল্য-জলও সেই ব্রাহ্মণের কাছে সমান ঐতিহ্যেই গ্রহণীয় হয়েছিল। এ ঘটনা শান্তিনিকেতনে সহজেই ঘটেছে। এখানে ধর্মের বাহন পূজা-অর্চনা নয়—মানবিক ব্যবহার। মত ছেড়ে ব্যক্তি-গত জীবনেও যে বাস্তবতা কিরূপ কাঙ্ক্ষ্যকর হতে পারে, বিদ্যা-ভবনের কর্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ এঁদের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক-পরিষৎ-সভার ১৩৩২ সনের অধিবেশনে “আচার্যের অভিজ্ঞাষণে” বিশ্বভারতীর সাধনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন—“মহাজাতিক একা সম্বন্ধে দেশে বা কাস্ত সমস্ত প্রকাশ করা হয় কিন্তু ওদিকে জাতি-সম্বন্ধে লেগেই আছে।” আকালী শিখ আন্দোলন ও মাল্যাবারের মুসলমান মোপলা দৌরাত্ম্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—“মাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি ভারাই আমাদের জাতি। ভারত-বর্ষের লোক-পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজাতি হবে তখন ভারী মহাজাতি হতে পারবে। সেই জ্ঞানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি।” এ সাধনায় শাস্ত্রীমহাশয় কবির আদি সহায়ক ছিলেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন : “একদা যে-দিন হুহুদর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্বসম্প্রদায়ের বিদ্যা-গুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্ত উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করে-ছিলেম। তার কারণ শাস্ত্রীমহাশয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষাদার পথেই বিদ্যালাত্ত করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাকেও প্রকার সঙ্গী স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদার ভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর যুগে এ কথার সত্য বিশেষ ভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অশ্রুতব করেছিলেম এই ঔদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সমন্বয় আভিধ্য এইটাই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়—সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক রোমকদের কাছে থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পছন্দ গ্রহণ করেছিলেন তখন স্নেহে গুরুদের ঋণিকর ব'লে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নাই। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র রূপগত ঘটে থাকে তবে জানতে হবে আমাদের মধ্যে সেই বিপুল ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।”

জিয়াউদ্দিন সাহেবের মধ্যেও ধর্মের কোনো আড়ম্বর ছিল না। তিনি ছিলেন সহজ সাদাসিধে ভাবের, অথচ সুভীক্ষ-বুদ্ধি, নিরহঙ্কার লোক। তাঁর কাছে গেলে ধর্মের কোনো

অমৃত্যুনের কথা মনে হ'ত না, কিন্তু ধর্মের সার-রস যে প্রীতি ও আনন্দ—তার সান্নিধ্যে তা পাওয়া যেত, অমৃত্যু কর। যেত সংস্কৃতির উজ্জলতা। কবি যাদের সম্পর্কে বলেছেন, “ধর্ম-গতির বহির্বির্ভা পরকে সে-খুব তীব্র ভাবেই পর বলে জানে কিন্তু সেই পরকে সেই কাকেরকে বরাবরকার মত ঘরে টেনে আটক করতে পারলেই সে খুসী।” সেই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিমূলক প্রাণবান ধর্মপ্রেরণা পৌছেছিল এবং মানুষের মত মানুষ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আপন স্বভাবের মধুর স্পর্শ বিলিয়ে মৌলানা নিজ ধর্মের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

এই মৌলবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বন্ধুত্বের ‘সম্বন্ধ’ এ সম্বন্ধই মানব-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের প্রেরণাই—মানবধর্ম। এই ধর্মেরই বাণী “যিনি বেদনীয় সে পূর্ণ মানুষকে জানো;—অন্তরে আপনার বেদনার যাকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনার জানো, জানে নয়, বাইরে নয়।”

কবির জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখি জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সারা জীবন ধরে চলছে তাঁর বিচিত্র কর্মসূচী। কিন্তু আত্মতানিক ক্রিয়াকাণ্ডের চেয়ে জ্ঞানকেই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন; এখানে দেখা যাচ্ছে সব ছাড়িয়ে উঠেছে বেদনার কথা। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রেও কর্ম হচ্ছে জ্ঞান-অমূল্যনের স্তর মাত্র।

কবির আত্মানে আশ্রমে আরও যাত্রা এসে মিলেছিলেন, ইংরেজ পিল্লাসর্ন এবং এওজ ছিলেন তাঁদের অতীতম। কিন্তু এঁরা সকলেই নিজ নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান থেকেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মানুষের এক বেদনাবোধযুক্ত অথও মানবধর্মে।

চীনাভবন হিন্দীভবন প্রভৃতি গড়ে উঠছে রবীন্দ্রসাধনার বিস্তারের সঙ্গে। নানা সাধক ও শিল্পী বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে আসা-যাওয়া করেছেন; রবীন্দ্রনাথের সাধনার মন্ত্র ও তার আয়োজন দেশ-দেশান্তর থেকে এঁদের যেমন আকর্ষণ করেছে, তেমনি এঁরাও আশ্রমের আদর্শকে নানাভাবে রূপায়িত করেছেন।

অবশেষে একটি অভিনব ব্যাপার দেখা গেল। প্রবন্ধের অল্প ধর্মসাধনার উপায়স্বরূপ কবির যে ঐতিহাসিক যোগ-দৃষ্টির ইচ্ছিতের উল্লেখ করা হ'ল শান্তিনিকেতনে আর্জি টিক সেরূপ সাধনারই ধারা-বান্ধবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠের সাধক স্বামী শঙ্করানন্দ শান্তিনিকেতনে চীনাভবনে সম্ভ্রান্ত গবেষক হয়ে এসে একটি কঠোর সাধনার রত হয়েছেন। তাঁর সাধনার বিষয় হচ্ছে—মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও শিল্পকলার কাঠামোর বিভিন্ন মানব-সভ্যতার মূলস্রোতের আবিষ্কার।

আরও একজন সংস্কৃতি-সাধকের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন—তিনি হিন্দী-

ভবনে মাসেকাল মাত্র যাপন করেন। চীনাভবনেরই কক্ষে এক সন্ধ্যায় তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। দেশে দেশে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জাতি-বর্ণ-ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি-প্রকৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে শাখত এক মানব-ধর্ম পথ করে চলেছে; তার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাতে ইনিও নিরত। বলেছিলেন—রাশিয়াতে তিনি ভ্রমণ করেছেন। ট্রেনের কাছরায় দুঃসহ শীতের এক রাত্রি। শুদেশের এক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা পরস্পর কুলগণ্ড যোগের সন্ধান পেলেন। হৃদয় হুই দেশের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দের মূল ভাড়া সম্বন্ধে বিচারের দ্বারা ট্রেনে অবস্থিতির স্বল্পকালটুকুর মধ্যেই সে খনিষ্ঠতা আরও দানা বাঁধে। রাশিয়ার একটি মন্দির এবং মূর্তির কথাও রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছিলেন। বিশ্বভারতী বিভাগভবনের আধুনিক গবেষণা-গ্রন্থ ‘গোর্থবিজ্ঞানের’ মধ্যেও সেই মন্দিরের উল্লেখ সম্ভ্রান্তি চোখে পড়ল। গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিত আছে: “অমুমান হয়, মহাজ্ঞান সাধক-গণের তপঃপ্রভাব...হিমালয়কেও অভিক্রম করিয়াছিল। প্রতিবেশী জাতিদেরও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। ...ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া নাথ-যোগ আরব পারস্ত এমন কি রাশিয়া পর্যন্ত এককালে বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা, অমুসন্ধানের বিষয়।” পাদটীকায় আছে: “রাশিয়ার বাকুতে জালামুখী দেবীর মন্দির শৈব নাথযোগীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরপাঞ্জে খোদিত লিপি আছে।” নানা ক্ষেত্রে একেবারে একরূপ অমুসন্ধান যেমন বিদ্যাভবন চীনাভবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলছে, কলাভবনেও শিল্পের বেদীতে মানবধর্মের সেই সন্ধান ও সৃষ্টির একই অর্থ্য নিবেদিত হচ্ছে। আশ্রমের অভ্যন্তর বিভাগে পুরা-কালীন সন্ধানের চেয়ে বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও সৃষ্টির ভাগিদাই বড়।

কবি তাঁর “মানুষের ধর্ম” গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টিতে একটি বোধ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তার তাৎপর্য হচ্ছে সংসারের সর্ব-জীব-কল্যাণ। সেই সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিজের বিশেষ কামনাটি যুক্ত করে বলেছেন, “দুঃখ আসে ত আনন্দ, মৃত্যু হয়তো হটক, ক্ষতি ঘটে ত ষটুক, মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হটক, সমুদ্র দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক—‘মোহম্’।”

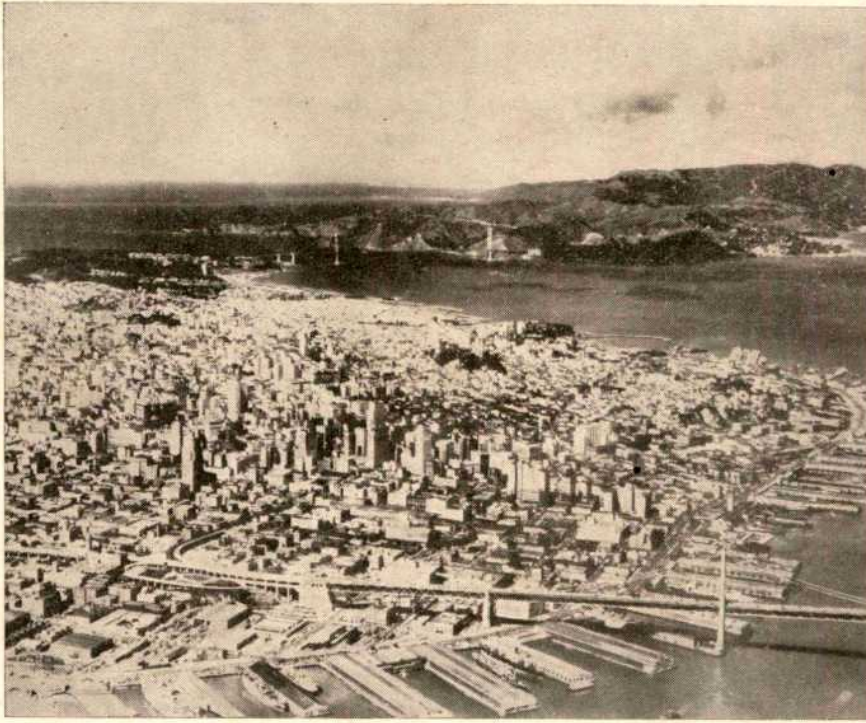
বুদ্ধদেব যে সর্বজীব-কল্যাণ চেয়েছিলেন, কিভাবে তা সাধন করতে হবে, তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই ধর্ম বলেছিলেন—“একপুত্রবতী মাতা যেমন করে নিজের পুত্রটিকে রক্ষা করে, সেই মমতা ও প্রেমের সকল জীবকে সেবা করতে হবে।” রবীন্দ্রনাথের অন্তরের নিহৃত প্রদেশ হতে সমগ্র জগতের প্রতি আমরা সেই বেদনাটিরই প্রবাহ উৎসারিত দেখতে পাই।



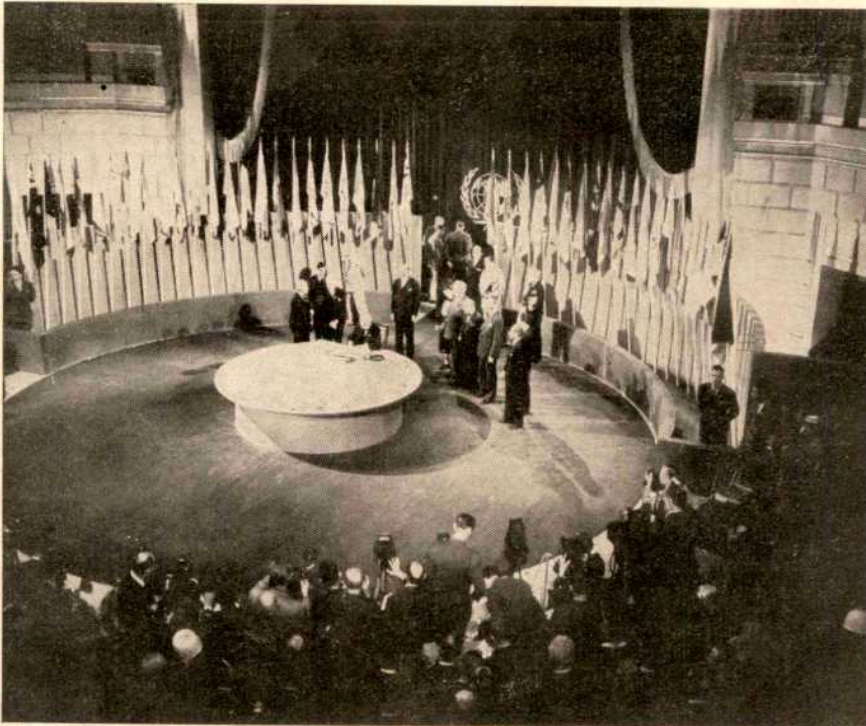
ওয়াশিংটনে মিসেস বি. কে, নেহরু কর্তৃক মিসেস গুহরকে ভারতীয় পরিচ্ছদের একটি মডেল প্রদান



কোরিয়ায় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের ভারতীয় সভ্য ডক্টর অনূপ সিংহকে
কোরিয়ান বালিকার ফুলের তোড়া উপহার



সান ফ্রান্সিস্কো, ক্যালিফোর্নিয়া—এখানে জাপ শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে



১৯৪৫ সালে সান ফ্রান্সিস্কোতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সৃষ্টি

মেয়েদের কাছে লেখা হুঁ একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বেদনা-অনুভূতি-প্রবণ মনটির পরিচয় মেলে। স্নেহ, সেবা, বৈধ্য দিয়ে মেয়েরা নিজের মনে বিধ্বমনকে অধিকার করবে, বহুকে এক করে বাঁধবে এবং বহুর মধ্যে এক বিস্তৃত হয়ে অধৈর্যের বিশিষ্ট রসটিকে নানা ভাবে আশ্বাসন করবে—এই ভাবটিই তাঁর সেই পত্রগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে, সেটিই নামান্তরে তাঁর পরিণত জীবনের উপলব্ধি ‘সোহহম’ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রায় মধ্য জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি এক-একখানি পত্রে এসব অনুভূতির কথা লিখেছেন তাঁর পরিজনমণ্ডলীকে। কুঁড়ির মধ্য দিয়ে যেন বিকশিত হয়ে উঠছে রসনিকার মহী-রুহের প্রাণসুধা। মহাবাক্য প্রাত্যহিক মানব-সদ্বর্গে অবলিষ্ট হয়ে তাত্ত্বিকতার শুষ্কতা ছুটিয়ে দিয়েছে। কবি ভখন বিলাতে। খুব সম্ভব ১৩১৮ সনই হবে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষক অজিত চক্রবর্তীর প্রথমা কন্ঠার সুমধুর লীলাময় শৈশব-বিষয়ে কবি পত্র পেয়েছেন এবং অজিতবাবুর স্ত্রী শ্রীমুক্তা লাভণ্য দেবীকে তিনি তাঁর যে উত্তর দিয়েছেন তাতে কবি মাতৃহের শিখাটিকে কোথায় তুলে ধরতে বলেছেন তা আছে পত্রের কয়টি পঙ্ক্তিতে।

ও

কল্যাণীয়াসু

লাভণ্য, এবার আশ্রম থেকে কেবল তোমাদের হুঁজনের চিঠি পেয়েছি। তোমার চিঠিতে অমিতার জীবনযন্তার কুস্তকটি আভাস পেয়ে খুব খুশি হলুম। তাকে দেখবার জন্য আমার মনের মধ্যে খুব উৎসুক্য আছে। তাঁর সঙ্গে পূর্ন-রাগের পালা আমি পূর্বেই শেষ করে এসেছি—এবার কিরে গিয়ে রাগবৈচিত্র্য স্তব্ধ করতে হবে।

তোমার হৃদয় প্রদীপে যে মাতৃহের শিখাটি জ্বলে উঠেছে সেটি কেবল তোমার কন্ঠার মুখের উপর পড়লে চলবে না—তাতে বিধ্বজনমীর আরতি করতে হবে—যখন সকল ছেলের উপর এই আলো বিকীরণ করতে থাকবে তখন সেই জনমীর আরতি হবে।...আমরা নরনারী যে কেউ আশ্রমে এসে জুটেছি প্রত্যেকেই পূজার অর্ঘ্য নিজের জীবন দিয়ে পূর্ণ করব এই সেবার ভাবই আমাদের উপর আছে—কারো বা শতদল পত্র কারো বা পাঁচটি পাতার করবী। সেই অর্থের দ্বারা তোমা-দের ঘরের কাছে অপেক্ষা করছে—বেলা বয়ে যেন না যায়।

আশীর্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একখানি পত্র লিখেছিলেন এই লাভণ্য দেবীকে। তখন কবি শিলাইদহে। পুত্র রবীন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সংসারে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান, সেই পরম আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়ে কবি পত্র লিখেছেন। কবির চিন্তা সকল সময়েই সকল বিষয়ে অসীমের

দিকে অগ্রসর হয়ে আছে; এই কয়েকটি পত্রে আমরা পাই তাঁর সংসারের কল্যাণময় এই অস্থানটিকে কেন্দ্রীয়ভাবে উত্তীর্ণ করে দেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলের জন্যেই তাঁর মঙ্গল-কামনা চিরদিন এমনি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে:

ও

শিলাইদহ

নদীয়া

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। আমার সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হবে, আমি অনুভব করব তিনিই একে চালনা করছেন, তাঁর প্রসন্নতায় আমার গৃহ আলোকিত হয়ে থাকবে—সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে তাঁর প্রকাশ উজ্জল হয়ে উঠবে, বিনয় সেবাপরতার কাছে ভোগমুখের ঔরত নত হয়ে রইবে এই আমি আশা করে আছি। তাঁকে মনে প্রাণে অত্যন্ত নিকটে উপলব্ধি না করলে সত্যতা থাকে না, শৈথিল্য এসে পড়ে, কথায় কথায় আত্মবিস্মৃতি ঘটে—সংসারের পবিজ্ঞতা এবং শাস্তি নষ্ট হয়। এইজন্য প্রতিদিনই তাঁকে পাবার সাধনা এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা চাই। মেয়েদের মনে ঈশ্বর যখন ভক্তিরসকে উৎসারিত করে দেন তখন যে মাধুর্য, যে স্ত্রী, যে সাধনীতার বিকাশ হয় প্রতিমার মধ্যে আমি সেইটি দেখব এই আমার মনের আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরের মধ্যে যে কল্যাণময় মাতৃভাব আছে, যা সংসারের সমস্ত কালিমা-ধূয়ে দেয়, সমস্ত উপদ্রব সহ করে, সমস্ত ক্ষুধা যেটার, দাহ জুড়ায়, অত্যাচার করে, ধার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, যা সকলের উপরে থেকেও সকলের কাছে নত, যা সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েও সকলের শেষে আপনাকে স্থান দেয়, যার অভিমান নেই, ঔরত নেই, নিজের অধিকার নিয়ে অন্যের উপরে দাবি করতে চায় না, নিজের অধিকারকে খর্ব করেও অন্যের দাবি যে প্রসন্ন মুখে মিটিয়ে দেয়—বিধ্বাতার সেই সুধাময় মাতৃহকে আমি বৌমার মধ্যে আমার ঘরে আবির্ভূত দেখব। এই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর যদি দয়া করেন তবে যেন রক্তে নয় এই অমৃত্যুই আমার ঘর পূর্ণ হবে।...বৌমাকে ও শ্রীমাকে আমার আশীর্বাদ দিও।

ভক্তাভ্যাসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই অমৃত্যুের সাধনা চলেছিল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ব্যাপে। কোনো বিষয়েই তা থেকে বাদ পড়েনি। তাই না তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এমন একটি তত্ত্ব যা শুষ্কতা ত্যাগ করে এক পরম অধ্যাত্মলোকের সিংহদ্বার আমাদের সমক্ষে উদঘাটিত করেছে।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬

এত বড় উৎসবের ঝাঙ্কাতেও বড় বাড়ীটা সরে গেল না। ওখান থেকে চলে আসার পরও প্রভাতের চিত্তারাজ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল বাড়ীটা। ওই বাড়ীতে লক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একদা—আজও ভক্তিরে উরা প্রণাম করেন লক্ষ্মীরূপিণী সেই শক্তির উদ্দেশে। কিন্তু লক্ষ্মী কি সত্যই ওখানে অধিষ্ঠিত হয়ে উঁদের প্রাণে প্রেরণা দেন? লক্ষ্মীকে হারিয়ে কিংবা না পেয়ে—লক্ষ্মীপূজার ঘটা যেমন প্রভাতদের মত মধ্যবিন্ত সংসারে—তেমনি আচার-উপকরণের বোঝার ভারী হয়ে ভক্তির প্রকট হয়ে উঠেছে কি ওখানে? এই ভক্তির অর্থ আজও প্রভাতের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তার মনে প্রশ্ন রয়েছে সত্যই কি ভগবানকে ভালবাসি আমরা? এই যে সংসারে এত আচরণ নিষ্ঠা পবিত্রতার অহুষ্ঠান—গ্যান ধারণা পূজা পাঠের আড়ম্বর—বর্জিত ভক্তির চাপে চোখ দিয়ে হ-হ করে জল পড়া—কণ্ঠ আবেগে রক্ত হওয়া—বায়ুত্যাগিত বেষ্টসপঞ্জের মত সারা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠা—এ সবই কি ভিতরের জ্বিনিস? হয়তো তাই—হয়তো তা নয়। হয়তো মনের মধ্যে ভাবলোকের ভূমিতে এই গাছ-গুলি সহসা সতেজ হয়—শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে সংসারকে কিছুক্ষণের জন্য আঁড়াল করে রাখে। ভবু এই ভক্তিকে প্রভাত ভাবে—নীতকালের ধোঁয়ার মত। সে ধোঁয়া যেন এবং সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও উর্ধ্বের বায়ুস্তর ভেদ করতে পারে না। উপরের হিমকণার চাপে মাটির সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে ছুড়র। সংসারী মানুষের বারবরত পূজা-পার্বণ নিত্য গৃহস্থ ঘরে যা অহুষ্ঠিত হয়, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ভোজপাঠ পুষ্প চন্দন গ্যান মন্ত্রের জপ প্রণামের নিষ্ঠা অশ্রুর দরদর ধারা বেদকম্প এই সবও বুঝি উর্ধ্বতর স্তর ভেদ করে অনন্ত শূন্যের সহযাত্রী হতে পারে না। এই সংসারের শত পাকে জড়িয়ে ভক্তির যুহুর্ভগুলি, হয় অভ্যস্ত রূপহারা এবং ভাবের আয়ু বাষ্পের চেয়েও লবু সংকীর্ণ। যাই হোক বাড়ীটা স্পষ্ট হয়ে রইল মনে। তৈলচিহ্নের মানুষ এখনও কান্না ধারণ করে তৈলচিহ্নের নীচের এসে দাঁড়ায়। তাঁর মুখে প্রসন্ন দীপ্তি—কণ্ঠে অপূর্ব সাধুনা। ওই বর্ষারসী যেন প্রভাতের জগতে চেনা মানুষ-গুলির থেকে আলাদা। ও বাড়ীর পিলসুজের ওপর যে তেলের প্রদীপটি জ্বলছিল তারই মত স্নিগ্ধ—আপন বস্তুর মধ্যে সুসম্পূর্ণ একটি শিখা। প্রচারের আভিষ্য নাই—তমঃ দাশের শক্তিও রাখে।

বাড়ীতে মা তো এমন করে কথাগুলি বলতে পারেন না। সেকালের যে গল্প মা করেন—তার মধ্যে একালের বড়নার ফোড়টাই বেদী কোটে।

একালে ভোদের না আছে খাওয়ার ভোগ—না আছে পরবার সুখ। মনের আনন্দ থাকবে কি করে। তখন টাকার পনেরো সের আধমণ চাল, দুশ দশ সের আর ভাল মাছের সের খুব মাগুগি হ'লো তো আট আনা। লোকের পাপে পাপে সব নষ্ট হয়ে গেল।

—পাপ করছে কারা—এর সঠিক উত্তর পাওয়া মুশকিল। অভিযোগকারী ছাড়া পাপ হয়তো সবাই করে। কিন্তু উনি গল্প বললেন কি সুন্দর করে। একালের শিক্ষা যাদের সেকালকে ঘৃণা করতে শেখায়, ঘৃণা না হোক খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফোটো—ভাদের সবাইকে ডেকে ওই গল্প শোনাবার ইচ্ছা হচ্ছে প্রভাতের। ওর ইচ্ছা হচ্ছে বলে—সাহস ও প্রত্যাশমন্ডিত সেকালেও দুর্লভ ছিল না—শক্তির অর্থ তাঁরা ভুল বুঝেন না—সর্বোপরি রাখতেন দৃঢ় বিশ্বাস আপনার উপর। কিন্তু আত্মপ্রচারে অহঙ্কার আসে বলে—সেই বিশ্বাস ন্যস্ত করতেন ঈশ্বরের উপর। এই ঈশ্বরকে পিছনে রেখে মানুষ এগিয়ে চলেছে আজ। কিন্তু শূন্য, শূন্য,—অমিত্যভের বাণীর মত একটা কিছু আঁকড়ে ধরে একটা কিছুতে স্থির হয়ে থাকতে চায়—চারদিক থেকে শ্রোত উত্তাল হয়ে ঠেলে দেয় তাকে সামনে। শূন্য, শূন্য, সেই পথ দিয়ে তার নিরুদ্দেশ যাত্রার শুরু।

পর পর কয়েকদিন প্রভাত গেল ওখানে। শুভঙ্কর প্রত্যেক বারেই ওকে ডাকতে আসে। বলে, চলুন মেক জ্যোঠাইয়ার হুকুম।

প্রভাত সে হুকুম মানে। সেই ঘরটিতে গিয়ে বসে। মেক জ্যোঠাইয়া আসেন মিষ্টির রেকাবি নিয়ে। সবদিন সন্দেশ নয়—বরে তৈরি নারকেল নাড়ু—সরের নাড়ু—কোন দিন বা চিঁড়ের পায়স। বলেন—মিষ্টি মুখ কর তবে গল্প বলব। অফুরন্ত তাঁর গল্পের ভাণ্ডার। সেকালের ঐশ্বর্য যেন সঞ্চিত রয়েছে গল্পগুলিতে। এই বাড়ীর গৌরবগাথা নয়—অপকীর্তিও—এদের অতিথি সংসারের পাশে প্রজা নির্ধাতনের কথা—দানের সঙ্গে শাসনের নিষ্ঠুরতা—ভক্তির সঙ্গে ভোগ-পক্ষিতার আবর্ত—মহুয়া চরিত্রের ছুজের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে। কালের পৃষ্ঠে গ্রহির পর গ্রহি পড়ে—কালের শ্রোত শিথিল করে গ্রহির বন্ধন—ভেসে যায় মানুষ—তার ধর্ম—তার অধর্ম—হিংসা ধ্যানি দত্ত ভালবাসা প্রজা প্রতি-

হিংসা—ভক্তি ও ভেদবুদ্ধি ফুল পাতা ধড়কুটা সব নিয়ে
স্রোতের গতিতে ভেসে চলে সংসার। তবু মানুষ চায়
ধামতে—একবার পিছন ফিরে দেখতে—যা ছিল অথচ পায়
নি তাই নিয়ে কল্পনার ফুল ফোটাতে—কি হৃদয় সে কল্পনা—
ভেমনি রামরাজ্য প্রতি মানুষের মনকেই বুঝি প্রলুব্ধ করে।
কোন একটি বিশেষ কালে নয়—সর্বকালে।

একদিন প্রভাত শুভঙ্করকে বললে, আচ্ছা তোমাদের
বাড়ীতে তো পরদা-প্রথা এখনও ? কেন রয়েছে ?

শুভঙ্কর আরক্ত মুখে বলে, আমি মানি না।

কি মানিস না রে শুভ ? রেকাবি-হাতে মেজ জোঠাইমা
ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শুভঙ্কর সলজ্জে উত্তর দিলে—এই পরদা-প্রথা—যা
তোমরা আজও মান।

মেজ জোঠাইমা হাসলেন, আমরা যে বড় ছর্ব্বল আর
আমাদের কালটাও ছিল রাজা-বাদশার, তাঁরা ইচ্ছে করলেই
প্রকার সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারতেন।

এখন তো আর সে কাল নেই।

অভ্যাস আর সাহসের অভাব। কিন্তু হঠাৎ বাইরে
গিয়ে ঘোমটাচুচিয়ে দাঁড়ালেই কি আমাদের সব দোষ খণ্ডন
হয়ে যাবে রে ! আগুন আবর্জনা পুড়িয়ে দেয়—সে তার
ধর্ম ; বাহাছরি নেবার চেষ্টা তার মধ্যে নেই।

তা যাই বল—তোমাদের কালের পোশাকগুলোও কি
বিশ্রী ! যেমন ঘোটা—ভেমনি জ্বরজ্বর।

—ওরে ওগুলো তৈরি হ'ত আমাদের রুচিতে—তোদের
নয়।—তোদের পরেও রুচি বদলাবে—নতুন লোকেরা
হাসবে তোদের পোশাক দেখে। এমনি হয়—না হলে মানুষ
যে পুরোনো হয়—পৃথিবী যে একঘেয়ে হয়।

একথা স্বীকার করে প্রভাত। পৃথিবী তাই আজও পুরাতন
হ'ল না—আজও আকাশের নীল, গাছের সবুজ, পাখীর
কাকজি—ঋতুদের আসা-যাওয়ার হিসাব হ'ল না পুরাতন।
কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবে এই যে বহু যুগের পৃথিবী পুরাতন হয় না
মানুষের কাছে—একি শুধু তার বাহ্য বৈচিত্র্যের প্রভাবে—না
মানুষের মনে নিত্যকালে সৃষ্ট হচ্ছে যে পৃথিবী তারই রঙে
তারই বর্ণে গন্ধে ধনিতে অপরূপ হয়ে উঠছে চির পুরাতন
বস্তু ? প্রাণী শুধু মানুষকে সৃষ্টি করেন নি—সৃষ্টি করেছেন মন।

সেই মনের নিত্য রসাস্বাদন-ক্রিয়ার মূলে রয়েছে নতুন সৃষ্টির
প্রেরণা। ক্ষুদ্র শিশু মাটির চেলা গড়ে আনন্দ পায়—বড়দের
সাজানো জিনিস ভেঙ্গে-চুরে বিশৃঙ্খল করেও তার আনন্দ।
অচ্ছের সৃষ্ট জগতে বাস করতে সে গীড়া অহুভব করে—সে
চায় নিজের হাতে কিছু গড়তে—নিজের সৃষ্ট আনন্দ-লোকে
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই তার সর্বোত্তম উপভোগ। এই
বীজ মানুষের জন্মের কণে উগ্ঠ হয়—জ্ঞানের সঙ্গে হয়

অনুপ্রাণিত ; পৃথিবী ও জীবন নতুন বৈচিত্র্যে ও জীলার
সমৃদ্ধ হয়।

আশ্চর্য্য, এই একটি কালের মধ্যে বাস করে আর
একটি কালকে প্রত্যক্ষ করতে পারে খুব কম লোকেই।
বর্ডমানের শব্দ ও আলো অতীত বা ভবিষ্যতের মৌন ভাষাকে
বাঙ'ময় হতে দেয় না—ওই শব্দ-আলোর সমারোহ নিয়ে
মানুষ মত্ত হয়ে ওঠে—সে পিছনে চায় না, সামনেও অল্প দূর
পর্যন্ত তার দৃষ্টির প্রসার। যেন চোখে ঝুলি পরানো বোড়া
চাবুকের স্পর্শভরে চালকের ইচ্ছিতে উর্দ্ধ্বাসে ছুটে চলেছে—
দিগ্বিদিক্ হারা হয়ে।

ওঁর মুখে সেকালের গল্প শুনে সেকাল সম্বন্ধে নতুন করে
জানবার প্রজ্ঞা জেগেছে প্রভাতের মনে। সেকাল সভ্যতার
অনেক পিছনে পড়ে নাই। এই কালের মতই মানুষ প্রভূত
মহত্ত্ব বৈরাচারে ব্যসনে ও জনসেবায় সঙ্গৃহীত হয়ে উঠেছে।
সেকালের অত্যাচার ছিল স্থূল—তার প্রতিরোধ-চেষ্টাও তেমনি
স্থূল। একাল রাজনীতিতে হুস্ম কলা-কৌশল বিস্তার করে
মানুষকে হাসি ও জরুরির মধ্য দিয়ে কখন কাছে টানছে,
কখন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একালের কর্ম্মী মানুষের স্রষ্টা রূপ।
কখনও বর্ণের, কখনও বা বরাভয় তার প্রেরণ। রাজনীতির
খেলার দক্ষ মানুষের এ ছাড়া গতি নাই।

ডান হাতে তোর থড়ো বলে

বাঁ হাতে করে শব্দা হরণ।

বৈভ-জীবনের সাধনার সিদ্ধি লাভ করতে চায় মানুষ।

আশ্চর্য্য, এই বৈভ-জীবনের রহস্য সেকালের বড় বাড়ীতেও
প্রকাশ পেল একদিন। প্রভাতের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—চলতে
চলতে ওর সামনে পড়ল প্রকাণ্ড এক গহ্বর—অভঙ্গম্পর্শী
মৃত্যুপুতী।

মাত্র দু'দিন আগের কথা। প্রভাত আর শুভঙ্কর মেজ
জোঠাইমার আসর থেকে গল্প শুনে কিরছিল সেই গল্পিপথ
দিয়ে। গল্পিপথ শেষ হলে বৈঠকখানা ঘরে ওরা পৌছল।
হঠাৎ শুভঙ্কর চক্কল হয়ে উঠল। বললে, একটু দাঁড়াবেন
স্তার—আমার একটা জিনিস ভুলে ফেলে এলাম ওখানে।

কি জিনিস—কবিতার খাতা নয় তো ?

হাঁ—লজ্জার খাখা নামিয়ে শুভঙ্কর উত্তর দিলে। খাতাটা
কাল সিঁপা নিয়েছিল—কিরিয়ে দেয় নি।

আর একটা দিন বেশী রইলই বা তাঁর কাছে—

না—সেজ্ঞ নয়। কাল কলেজ ম্যাগাজিনে একটা কবিতা
দেব, আপনি সিলেক্ট করে দেবেন। একটু দাঁড়ান আসুছি।

ও চলে গেল। প্রভাত একলা দাঁড়িয়ে ঘরের আসবাব
সজ্জা দেখতে লাগল। বেশী কিছু নাই ঘরে তবু যা আছে তা
সাধারণতঃ আজকালকার ঘরে থাকে না। এর ছাদ এত উঁচু,
মেঝে এত চওড়া আর দৈর্ঘ্য এর এমন অদ্ভুত যে স্বভঃই প্রশ্ন

‘ছাগে মানুষকে তুচ্ছ করে দেওয়ার এই আয়োজন কেন? প্রথম দিন এই ঘরে বসে প্রভাতের গুণ মনে হরেছিল এত ক্ষুদ্র আমি। আর কি নগণ্য! ওঁরা ঘর ভৈরি করে মানুষকে করেছেন অসহায় অর্থাৎ ঘরের মহত্ব মানুষ অভিভূত হয়ে কোথায় মিশিয়ে যায়।

কোথায় ছিলেন জিলোচন সেন—সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, প্রভাত এই অপরাহ্নে তুমি কি মনে কর হে?

আজ মেজ ঘোঁঠাইয়ার কাছে এসেছিলাম।

ওড—ওড। জিলোচন সেন হর্ষধ্বনি করলেন। প্রভাতের মনে হ’ল ওঁর স্বর ঈষৎ জড়ানো—উচ্ছ্বসিত আবেগ—প্রখর। মনে হ’ল অস্বাভাবিক।

জিলোচন সেন বললেন, নিজে দেখে-শুনে কাজ করা ভাল। আমাদের কাল ছিল আলাদা। গুরুজনেরা বললেন, অযুক দিন তোমার বিয়ে—তথ্যস্ত। কোথায় বিয়ে—পাজী কেমন—কত বয়স এসব জানবার অধিকার আমাদের ছিল না, এসব জানানও ওঁরা কর্তব্যবোধ করতেন না। এক কথায় বিয়ে হয়ে যেত—আর আমরা যে ঠিকতাম তাও নয়। কতীদের দূরদৃষ্টি ছিল আশ্চর্য রকমের। ঠিকজী কোজী—রাশি গণ ঘোটক এসব বিচারের উপরেও নিজেদের চোখে দেখতেন লক্ষণ, পায়ের গড়ন, চলন, মাথার চুল কপাল চোখ আর জ ঠোঁট চিবুক গলার স্বর হাসির আওসাক গায়ের লোম তন্ন তন্ন করে মিলিয়ে ঘরে আনতেন সুলক্ষণ কণা। বোঝ করি আমরা ঠিকিনি তাতে। তুমি তো দেখেই কয়েকখানা অয়েল-পেজিং ছবি। ভাল লাগে নি তোমার?

প্রভাত অস্বস্তি বোধ করছিল। এ প্রশ্ন কেমন তুললেন উনি? ওঁর অস্বাভাবিক স্বরের প্রভাব কি?

কি হে—চূপ করে রইলে যে—ভাল লাগে নি? কণ্ঠে জোর দিয়ে প্রশ্ন করলেন। আদেশের সুর সেই প্রশ্নে।

প্রতিকূল মন্তব্য অভ্যর্থনার নামান্তর। তা ছাড়া অভ্যর্থনার কারণও যখন নাই। ওঁদের ছবি কতখানি শ্রদ্ধা আদার করতে পারত সে প্রভাত জানে না কিন্তু গল্প ছবিগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। শক্তিময়ী, সৌন্দর্যময়ী নারী।

প্রভাত শ্রদ্ধাযুক্ত স্বরে বললেন, চমৎকার। ওঁদের যে শক্তি—

শুভঙ্কর ফিরে এসে।

জিলোচন সেন বললেন, ভাল জী শুধু সংসারের সম্পদ নয়, জাতিরও সম্পদ। মুসোলিনীর আত্মজীবনী পড়েছ তো? ভাল-গৃহিণী গড়তে চেয়েছিলেন তিনি—জাতিকে তুলবেন বলে। হিটলারও চেয়েছিলেন ভাল মা যিনি এসব করবেন স্বাস্থ্যবান ছেলে—জাতির সম্পদ।

শুভঙ্কর প্রভাতের হাত ধরে বললে, আহ্নন।

মানে?—জিলোচন সেন উচ্চস্বরে বললেন, সবটী না

শুনেই? ভাল লাগছে না বুঝি? প্রভাতের পানে ফিরে বললেন, আমি চাই—তোমাদের নিজের পছন্দ মত...মানে আমাদের কাল তো আর নাই যে, পিতার আদেশে...তবে তোমাদের চোখ—অর্থাৎ দৃষ্টিও তো পরিষ্কার নয়—একটু ঘোলাটে। তা হয়ই—কালে সবাইয়ের দৃষ্টি অমন হয়ই। তাই ভাল-মন্দ বিচারের একটা খেঁই ধরিয়ে দেওয়া কর্তব্য আমাদের। নয় কি?

প্রভাত হতভম্বের মত বললে, আজ্ঞে হাঁ।

ওড্। জিলোচন সেন ছয় চাপড়ে টেচিরে উঠলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত তোমার কথা শুনে। ভেরি গ্ল্যাড টু হিয়ার—

শুভঙ্কর তখন প্রভাতকে টেনে নিচে নিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে মেজ ঘোঁঠাইয়ার গলার স্বর প্রভাত শুনলে।

ছি, জ্ঞান হারিয়েছ? যারা তোমার ছেলের মত—

ছেলের মত? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ছেলের মত?

আজ বাদে কাল যে জামাই হবে—জামাই আর ছেলেতে তফাৎ আছে কিছু? তোমার জ্ঞান খুব টনটনে, নয়? জিলোচন সেনের উচ্চকণ্ঠ একতলা থেকে শুনলে প্রভাত।

একটা রূঢ় আঘাতে ওর বগ্ন ভেঙে গেল। এই জামাই কি সাহিত্য-সভাশেষে শুভঙ্কর ওকে অঙ্কপুর্বে নিয়ে গিয়েছিল? মহিমময়ী নারীর ভূমিকায়—সামনে এলেন মেজ ঘোঁঠাইমা—হাতে তাঁর মিষ্টির থালা। তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বরে বললেন সেকালের গল্প। কেন বললেন? এই বাড়ীর ঐশ্বর্য্য মহত্ব বীরত্ব মহামুভবতা সবকিছু দিয়ে প্রভাতকে অভিভূত করে দেবেন বলে?

প্রভাত হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল।

শুভঙ্কর পিছন থেকে ডাকলে, প্রভাত-দা?

প্রভাত মুখ ফিরিয়ে চাইলে না।

শুভঙ্কর পিছনে চলতে চলতে বললে, রাগ করলেন?

প্রভাত ফিরে চাইলে। অকালব্যর্থীর মত ধমধমে ওর আকৃতি—গলার স্বরটাও বেশ ভারি। বললে, রাগ করবার কারণ কি নেই?

শুভঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কি কারণ?

এই মাত্র ওপরে যে-কথা হ’ল তা বোঝ করি শোন নি?

বল, এ ব্যাপারের কিছু জ্ঞান না?

প্রভাতের স্লেষোক্তিতে শুভঙ্কর বতমত খেয়ে বললে, আমি—আমি কি করে জানব।

ওর বিব্রত ভাবে প্রভাতের মায়ী হ’ল। সত্য এ অবোধকে ভৎসনা করে লাভ নাই। কবিশেষ:প্রার্থী তরুণ—মনের উচ্ছ্বাস কবিতার পঞ্জপুটে সঞ্চয় করেই ওর আনন্দ—সংসারের কুটিল পথেরবার সঙ্গে ওর পরিচয় থাকা সম্ভব নয়।

সন্মুখে শুভঙ্করের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, ঘেয়ো এক

দিন আমাদের বাড়ীতে তোমার খাতা নিয়ে—যাবে তো ?

যাব। আপনি আমার ভুল শুধরে দেবেন তো ?
দেব।

শুভ্রভ্রত অকস্মাৎ আনন্দে অধীর হয়ে প্রভাতের পায়ের কাছে অবনত হ'ল।

১৭

খানিকটা দেরিতেই ঘুম ভাঙল। দিনের আলো প্রখর হয়ে চোখে লাগছে। কানে আসছে তরকারি রান্নার শব্দ, একটা অস্বস্তিকর গন্ধে ঘুমের আলস্য ভেঙে গেল। প্রভাত উঠে বসল।

আহ্নিকগতিতে পৃথিবী পুরাতন দাগেই পৌঁছেছে—চারিদিকের ঘটনাপুঞ্জ সময়ের স্রোতে একই জায়গায় জমবে, ক্লান্ত নয়ন যা থেকে সংগ্রহ করবে অবসাদ। ছোট্ট উঠানের মাথায় এক ফালি বর্ণহীন আকাশ—চারিদিকের রুদ্ধ প্রাচীরে প্রতিহত ক্ষীণ বাতাস—মাছ তরকারি বাসি ভালের কটু অন্ন গন্ধ—আর ওপাশের কলহপরায়ণা গৃহিণীর একটানা অভিযোগ-অভিশাপের র্রুদ্র—জীবনকে বিবাদ করে দেবার সুপ্রচুর উপকরণ বলেই জানে প্রভাত। জীবনের স্রোতধারা এর মধ্যেই বিলুপ্ত হবে না। ওই ফালি আকাশে উদয়াচলের শোভা না ফুটলেও তার বাণী বহন করে আনে কোমল রঙ; বাতাস সাগর-পারের উদার স্পর্শে নুতন উত্তমে সঞ্জীবিত করে আশাকে; সৌন্দর্য্য ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে সুধার পাত্র। জীবন-রসায়নে জীবনযাত্রা হ্রদোবদ্ধ হয়।

মুগ্ধহাত ঘুরে গলিটার দিকে চাইলে—উৎসব-ক্লান্ত আসরের মতই সেটা ত্রিযমাণ। গত কালের অপরিমিত বাগ্ম্যহল্যে ওর পুঁজি ফুরিয়েছে। নিশানগুলি এখনও গৃহ-অলিন্দে জানালায় বারান্দায় নানা ভঙ্গীতে টাঙানো রয়েছে—ফুলের মালা শুকিয়ে গেছে, দীপের শোভাও নাই। কয়েক দিন আগে সরবে যে বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—আজ তা অন্তর আশ্রয় করেছে। স্বাধীনতার মর্যাদাকে অতঃপর আসন দিতে হবে অন্তঃপুরে।

একটা রেশন-ব্যাগ নিয়ে মা ঘরে ঢুকলেন। একবার বাজারে যেতে হবে বাবা—ওর পেটে ব্যথা উঠেছে।

নিরাপত্তিতে ব্যাগটি হাতে নিলে প্রভাত।

মা একটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, এইতেই যা হয় আনিস।

প্রভাত বললে, মাছ, আলু সব তো এতে হবে না।

চুনোমাছ আনবি—আর আলু না এনে বরং কচু আর পেঁপে আনবি। গলার স্বর নাগিয়ে বললেন, ক'দিনই এটা ওটার খরচ হয়ে গেল বেশ—আজ তো মাসের শেষ।

প্রভাত বললে, তবে থাক না বাজার।

পাগল! ঘরে এক ছিলকে তরকারি নেই—খাবি কি দিয়ে ভাত।

প্রভাত বললে, সেদিন বল নি কেন আমার যে সংসার-খরচ থেকে স্বাধীনতা-দিবস পালন করা যাবে না।

এমন জিনিস যা কখনিকালে কেউ দেখে নি—তা বারণ করতে পারি। দিন যে ভাবে হোক চলে যাবে।

ভাই হয়ত যাবে। এই আশ্বাসে মা চল্লিশ বৎসর সংসারের হাল ধরে আছেন—বাবা দশটা পাঁচটার জীবন বাঁধা রেখেছেন। অন্যেরা যেখানে উৎসবে বেপরোয়া আনন্দে মাতল—এ সংসার সেই পরম ক্ষণেও হিসাবের অঙ্কপাত করল মনে মনে। চারিদিকের ঝড়ঝঞ্ঝা বাঁচিয়ে অতি কষ্টে কোথা থেকে ছিনিয়ে আনা হ'ল আনন্দকে—ক্ষীণ আয়—উপরে ধিতানো অন্ন জল নীচের তার জমে আছে পাক।

ধলি হাতে সে বাজারে বেরিয়ে গেল। বাজারের রাস্তায় বহু রকমের পণ্য নিয়ে বসেছে কত লোক—বহু কণ্ঠের বিভিন্ন ঘোষণায় ক্রেতাকে করছে বিভ্রান্ত। আজ এদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে প্রভাত। এরা কি উপভোগ করেছে স্বাধীনতার আনন্দ? যে পরম বার্তা রেডিও যোগে বিবোষিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রাসাদে কুর্গীরে—শহরে পল্লীতে—এরা কি ভাবে নিয়েছে সে ঘোষণা?

না—উৎসব অন্তে এরা ত্রিযমাণ নয়—নীচের জমা পাক উপরে ধিতানো জলের বর্গকে মলিন করে নি। এরা চিরকাল বেহিসাবী বলেই—পরিণাম নিয়ে মাথাব্যথা করে না। এই যে একটি পরিবার পথের ফুটপাথে বেচছে লেবু, আমড়া, কচি লশা আর চালতা। বর্ষায়গী গৃহিণী বুড়ি থেকে জিনিসগুলি দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের হাতে—ছেলেমেয়েরা কেউ বা ন্যাকড়ায় কেউ বা ফুটের রকে কেউ বা হাতে করে চৈচাচ্ছে—আনামে ভিন—বাবু আনামে ভিন। মাখন লে যাও বাবু—আমার রাজ্যবাবু লে যাও। বিচিত্র সুর—জগতের ভঙ্গিতে ফিরে চাইছে ক্রেতা—জিনিস হাত থেকে গিয়ে উঠছে ধলিয়ার। এ পরিবারটিকে জানে প্রভাত। গেল ভাদ্রে, ডাইরেইট অ্যাকশনে প্রাণ দিয়েছে বৈজু।

তার জন্ত কয়েকদিন মাজ হা-হতাশ করেছে মনিরা। দিনের পর দিন শোককে টেনে জীবনযাত্রাকে পঙ্কু করে তোলে নি। বৈজু থাকতেই ওরা বিক্রয় নিয়ে পথের ধারে এমনি করে টেঁচাত—সংসার-চালনার কোশল ছিল আরম্ভে। ওদের সংসারে একটি লোক কমলে—মনে খানিকটা আঘাত লাগে—কিন্তু সংসারের গায়ে তার আঁচ পৌঁছায় না। একটি মাহুষের উপার্জ্জনে বহুগোষাভারপ্রাপ্ত সংসার নির্ভর করে না।

সমাজের সর্কনিয়ম শুধে দারিদ্র্য আছে—কিন্তু জীবন-যাপনের সমস্যা তেমন অটল নয়। সর্করিক্ত দারিদ্র্যের কটখোলা প্রণালীতে সামাজিক মানদণ্ডের গঠনটি ভিন্নতর।

এদের বাড়ীর কুলবধূরা পায়ে হেঁটে এক বাড়ী থেকে অল্প বাড়ীতে কিংবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গেলে পথ তাদের মর্যাদা হরণ করে না—নূতন অতিথির আগমনে—বিয়েতে বা আত্মবাসরে লৌকিকতার দণ্ড দেওয়া না—দেওয়ার উপর মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে না—কিংবা সংসারের কলঙ্ক নিয়ে সমাজে অচল হবার ব্যবস্থাও নাই। স্বর্ঘ্যের আলো অকুপণ ভাবে যেমন পূজাবেদীতে আর নন্দামায় পড়ে—স্থান বিচার করে না—এদের বেঁচে থাকবার চেষ্টাও সেই জাতীয়। আকস্মিক দৈবহর্ষিপাকে এরা কতিপয় হয় বটে—হৃর্ভিক্ষে—জলপ্লাবনে—ভূমিকম্পে—যুদ্ধে কিংবা ব্যাধিতে হাজারে হাজারে এরা নিশ্চিহ্ন হয়—তবু সেই যত্নের অগৌরব কম। মর্যাবিশ্বের সংসারে যত্ন—দিনের পর দিন—যে ভাবে উঁকি মারে যে ভাবে আবিপ্ৰভ্য বিস্তার করে—ক্ষয় করে জীবনী শক্তিকে...প্রভাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। তাবলে এরা মর্যাবিশ্ব নয় বলেই এদের সমস্যা হয়ত বুঝতে পারছি না—এদের যত্নকে ভাবছি—তেনম-ভয়বাহ নয়—তবু আকাশ আচ্ছাদনে ও দর্ভশয়নে—শুধু অন্ন বা ছাতু-আটার সংযোগে—এদের জীবনযাপন-প্রণালী যে গ্রহিহীন একথা অস্বীকার করি কেমন করে। শুধু প্রাণধারণের নীতিতে এরা রাস্তালতা নয়—পথের দুর্কীদল পদতলে পিষ্ট হলেও সহজে বিনষ্ট হয় না। ছুটি যুদ্ধের অভিশাপ পৃথিবীতে ছাড়া বিস্তার করেছে, আগামী যুদ্ধেও ছাড়া গাঢ়তর হবে। সর্বহারা আর সর্বমর্যদের স্বন্দে রাষ্ট্র রূপ পরিবর্তন করেছে—যারা ধরের নয়—ঘাটেরও নয়—অর্থাৎ মর্যাবিশ্ব—তাদের কথাটা ভাবছে কি কেউ? না, তারা থাকবে না—। তাদের চিন্তা, বুদ্ধি, প্রতিভা, আকাশ আর পাতালকে বেঁধে রেখে মাধ্যাকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত করছে। তাদের নিয়েই পৃথিবী, অথচ পৃথিবী থেকে তারা মুছে যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় অনন্ত আপিস থেকে ফিরে এসে ডাকলেন, প্রভাত।

প্রভাত এলে বললেন, তুমি উপযুক্ত ছেলে—তোমার কাছে আমি এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। বুঝতে পারছ না? কাল জিলোচন সেনকে অপমান করেছে তুমি।

আমি? বিস্মিত প্রভাত পিতার পানে চাইলে।

নয় ত কি। উনি আদর করে তোমায় ডেকেছিলেন, তুমি ভদ্রতার মর্যাদা রাখনি। ঠাঁর বাড়ীতে গিয়ে ঠাঁকে অপমান করার সাহস হ'ল তোমার।—আশ্চর্য্য।

পিতার ভৎসনায় প্রভাত আলো দেখতে পেলে। কখনও সে পিতার কথার প্রত্যুত্তর করে নি—আজ সে পারলে না যৌন থাকতে। বললে, উনি ত মাজা রেখে কথা বলেন নি।

থাম। অনন্ত গর্জন করে উঠলেন। জান উনি কত বড় মানী লোক? নিজে এসেছিলেন—আত্মীয় হবার দাবী নিয়ে—তুনেছেন লেখাপড়ায় তোমার কেরিয়ার ভাল—তাই—

প্রভাত বললে, বেশ ত—সে কথা আপনার সঙ্গে কইলেই যথেষ্ট হ'ত—আমাকে টানবার কারণ বুঝলাম না।

ঠাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাবছ সব শেষ হয়েছে? এখনও যা, আছে সেই সব একজন বুদ্ধিমান বিদ্বান ছেলের তত্ত্বাবধানে দিয়ে উনি নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। ছেলে নাই—ছুটি মাত্র মেয়ে। একটি মারা গেছে, আর একটিকে কাছে রেখেই—অর্থাৎ যত দিন উনি বেঁচে থাকবেন—

প্রভাত বললে, স্পষ্ট করে যদি বলতেন এ কথা তা হলে অসম্মানের কারণ ঘটত না।

অনন্ত নরম হয়ে বললেন, অত বড় মানী লোক—সরাসরি কথাটা পাড়তে কতখানি লজ্জা ভাব দেখি। আমি অবশ্য বুঝেছিলাম—ভবেছিলাম তুমি বুদ্ধিমান—তুমিও বুঝবে।

প্রভাত নম্রকণ্ঠে বললে, হাঁ বাবা—আমিও বুঝতে পেরেছিলাম।...তাই কিছু অভদ্রতা করে ফেলেছি। কিন্তু উনি একথা কেন বুঝলেন না যে ঠাঁর মানসস্তম্ব যেমন উঁচু, অতের মানসস্তম্ব তেমন উঁচু না হলেও খানিকটা আছে। কোন আত্মমর্যাদাশীল ছেলে ঠাঁর প্রভাবে রাজী হতে পারে না। কথা শেষে প্রভাত আর সেখানে অপেক্ষা করলে না।

শুভ্রিত অনন্তের বাঙালি সম্পত্তির অবকাশ রইল না। চিরদিনের নম্র নিরীহ প্রভাত বলে কি। তার স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা আছে একথা কোন দিন ভো অনন্তের ধারণাতে ছিল না। স্বতন্ত্র মত, এও বিচিহ্ন বটে। তাঁদের কালে...কিন্তু সে কালের, দুষ্টান্তে এ কালের তরুণরা অহুপ্রাণিত হয় না, কতকটা উপহাসের ভিত্তিতে তারা সে কালের কাহিনী শোনে। তাঁর নিজের সংসারে আজ্ঞা-অবহেলার মনস্তাপ এ যাবৎ ভোগ করতে হয় নি—আপিসের সহকর্মীদের কাছে শোনা বহু কাহিনী মনে রাখা আছে। সে সব কাহিনী শুনেছেন মাত্র—মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় নি। পৃথিবীটা বেয়াভা রকমে বদলে যাচ্ছে এই ধরণের ক্ষোভ কিছু প্রকাশ করেছেন, কতকটা তাচ্ছিল্য, কতকটা মজা-দেখার মত বার্তাগুলি মনের উপভোগ-রসে পরিপাক হয়ে গেছে, নিজ কালের গৌরব প্রচারে সত্য বলতে কি আনন্দ লাভই করেছেন এতদিন—আজ ছেলেবেলায় পড়া পতপাঠের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে:

কি যাতনা বিয়ে বুঝিবে সে কিসে,

কতু আশীবিধে দংশনি যারে।

সুন্দরী ধরে চুকে দেখলেন, হু'হাতে বুক চেপে ধরে অনন্ত বালিশে উপুড় হয়ে শুয়েছেন। বললেন, বুকের ব্যাথাটা কি বাড়ল?

হঁ।

গরম জল এনে দেব?

না। শোন, এদিকে এস।

সুনয়নী কাছে এসে বসতেই বললেন, আর কোন আশা নেই, বুঝলে ?

কিসের আশা ?

প্রভাতের বিয়ে দিয়ে বউ আসবে—বুড়ো বয়সে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বউয়ের সেবা থাকে—

সুনয়নী বললেন, সে আশা করি নে।

নিশ্চয় কর—মিথ্যা বলো না। প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন অনন্ত। আশা কর না তো সংসার কিসের জন্ত ? কার জন্ত ভুতের ব্যাগার খেতে মরছ !

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুনয়নী বললেন, যা দেখি চারদিকে তাতে ভরসা হয় না যে বউয়ের সেবা পাব।

কি দেখ ?

কেন—মিষ্টান্নদের বাড়ী—মুখুজ্জদের বাড়ী—দণ্ডদের বাড়ী—শীলদের বাড়ী—যে দিকে তাকাবে সব শেয়ালের এক রা। কেউ বলে না যে ছেলের বিয়ে দিয়ে সুখী হয়েছি।

তোমাদের কালেও এ ব্যাপার ছিল তো। মুখ নামিও না—আমি জানি—মার কাছে অনেক কথা শুনেছি তুমি—অনেক সয়েছি—

সে হস্ততত্ত্বজ্ঞাবের জন্য—

টিক তা নয়। তবু মা তোমাকে ভালও বাসতেন না। নিজের গায়ের গহনা তোমার পরিয়েছেন—নিজের মুখের খাবার তোমার তুলে দিয়েছেন।

হৃৎকেনেই ধানিকরণ মৌন হয়ে রইলেন। অতীত যত অকরণই হোক—স্মৃতির কিনারে কোমল রঙ একটু লেগেই থাকে। হয়ত সে বর্ণ বিলাসের—তবু তা আনন্দদায়ক।

অনন্ত বললেন, এতটুকু বেলায় এ সংসারে এসেছিলে। মা বলতেন—একটা বিড়াল ছানাকে নাড়লে চাড়লে মাথা জমায়, আর মানুষের ওপর মায়া পড়বে না ? কিন্তু আজ যারা আসে—তারা আলাদা সংসারের স্রীতি নীতি নিয়ে—আলাদা সংসার গড়বে এই সঙ্কল্প নিয়েই আসে। তাদের এক করে বাঁধতে পারা কি তুমি সহজ ভাব ?

যাক—ওসব কথা ভেবে মন ধারাপ করো না—

না—বুড়ো বয়সে নিজের পায়ে বল থাকে না বলেই ভাবনা। আমাদের কালে কর্তব্যটা ছিল বড়—এরা মানুষকে বসায় তার ওপরে। তারা—তারা—দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে ছফফা ছাফলেন অনন্ত।

তুমি প্রভাতকে পড়া ছেড়ে কাজে ঢুকতে বলেছিলে ?

হাঁ—কিন্তু ভেবে দেখলাম ভুল করেছিলাম। ওকে ত চোখ রাত্তিতে পারি না যে পড়াবার ক্ষমতা আমার নাই। ও ছেলে পড়িয়ে টাকা বোজগার করছে—ও স্বাধীন।

না—না—প্রভাত তেমন নয়। সবাই ওর সুখ্যাতি করে। আশ্বাস দিলেন সুনয়নী।

অনন্ত প্রত্যুত্তর না করে লম্বাটে জুজ্বলী স্পর্শ করে হাসলেন।

১৮

এরপর পুজো এল।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শারদীয়া। কাগজে কাগজে এর বার্তা বিবোধিত হচ্ছে। কিন্তু সন্দেহ জাগে, পঞ্জাবে আর বাংলায় বাঙালীরা বিপুল সংখ্যায় শরতের আনন্দকে ফুটিতে দেবে না এবার। রিডক্স পঞ্জাব আর বাংলাতে সংখ্যালঘু হিসাবে যারা পড়ে রইল—ভাদের জ্ঞান দূর করতে পারে এমন অভয়পাণির সন্ধান কে দেবে ? বরাভয়দায়িনীর মহিমা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে কি ?

সাহিত্যের বাজারে নতুন শারদীয়া সংখ্যার আবির্ভাব—আর সব অভাব মোচন করবে এ আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। পুরাতন লেখকদের যে যেমন পেরেছেন নতুন নৌকায় টেনে তুলেছেন উত্তোক্তারা—যেমন বেহুড় মঠের পারাপারের নৌকায় হাঁকডাক করে যাত্রী বোঝাই করা হয়। আর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কুমারটুলির কারিগর দখলের। কে কত ভাল প্রতিমা আনতে পারেন তারই উত্তোগ আরোজন চলছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়েছে উৎসবটাও সেই গৌরব অহুয়ারী হওয়া চাই—টাকার হিসাব রাখার প্রয়োজনই বা কি। পাড়ার পাড়ার চাঁদা সংগ্রহের ধুম লেগে গেছে।

প্রভাতদের বাড়িতে চাঁদা আদায়কারীরা এল। এক দল নয়, দুই দল।

অনন্ত বললেন, গেল বার তো এক জায়গায় চাঁদা দিয়েছি, এবার হুঁজুরগায় কেন ?

এবার একটা নতুন পুজো হচ্ছে তার।

তা হলে চাঁদাটা ভাগ করে নিও।

তা কি করে হয় স্যার। আর গেল বারে যা দিয়েছেন এবারে তার চেয়ে বেশী না দিলে—বুঝতেই তো পারছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম পুজো—

অনন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, ভারত স্বাধীন হয়েছে, আমাদের আয় তো বাড়ছে নি বাপু।

স্বাধীনতার জন্ত কত দেশের লোক কত কষ্ট সহ্য করেছে তার—সামাজ হুঁটাকা চাঁদা—

অনন্ত চটে উঠলেন, যখন উপার্জন করবে তখন এসব লম্বা লম্বা কথা বল, আছ তো বাপের হোটেল—

ছেলেরা চটে উঠল, আমাদের ইন্সপ্ট করছেন। আচ্ছা দেব্ লেদে।

সবাই একযোগে চীৎকার করে উঠল, জয় হিন্দু।

প্রভাত বেরিয়ে এসে বললে, শুধু শুধু টোকাছ কেন ?

দেবুন প্রভাত-দা—আপনার বাবা আমাদের অপমান করেছেন—উনি যতক্ষণ না মাগ চাইছেন ততক্ষণ আমরা

মৌগান আওড়াব। বলে ছেলেটি দলের দিকে ফিরে চীৎকার করে উঠল।

দেশের শত্রু—

সম্বরে সকলে প্রতিধ্বনি তুলল, যুদ্ধবাদ।

প্রভাত হাত জোড় করে বললে, আমি ক্ষমা চাইছি।

ছেলেদের দলপতি সামনে এসে বললে, আচ্ছা—সে যা হয় হোক—চাঁদাটা এখন পাব কি?

পরশ এসে।

সবাই জয় হিন্দু ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল।

অনন্ত ততক্ষণ কোধে কোধে কাঁপছিলেন। বললেন, তুই ওদের টাকা দিবি বলজি কেন? যত সব গুণ্ডার সর্দার—পুজোর নামে গুণ্ডামি।

প্রভাত বললে, আপনি নেয়ে নিন গে—আপিসের বেলা হ'ল।

অনন্ত বললেন, কিন্তু বলে রাখছি প্রভাত—ওদের নিয়ে যদি আমরা স্বাধীনতার বড়াই করি সে বড়াই বেশী দিন থাকবে না।

প্রভাত বললে, বাবা, ডাইরেক্ট একশনে এরা পাড়া বাঁচিয়েছে।

হুঁ—তাই গুণ্ডামিতে হাতটি হয়েছে পাকা। এসিড বাল্ব, বোমা তৈরী, ষ্টেনগান চালানো, ছোরা মারার কায়দা আর সেই সঙ্গে গুণ্ডাদের মত সু সু উচ্চারণ—

প্রভাত তর্ক তুললে না। শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি নেয়ে নিন্ গে।

অনন্ত গজ গজ করতে লাগলেন।

বাড়ীর মধ্যে আসতেই সুনয়নী বললেন, ওরা চৈচাচ্ছিল কেন গো?

পুজোর ঢালা চায়—যত সব মা-মরা বাপে-বেদান ছেলের মাতৃভক্তি দেখলে পিড়ি গুড় রি রি করে জলে।

সুনয়নী বললেন, তা ওদের যেন বিদেয় করলে—মেয়ে জামাইকে তো—

তত্ত্ব করতে হবে—নয়? তিন বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে—এখনও তত্ত্ব? সাধ-আজ্ঞাদ যে থই থই করে উথলে উঠছে।

অনন্তর তিক্ত হাসি দেখে সুনয়নী আপনাকে সামলে নিলেন। নরম গলায় বললেন, লোকত: বর্ষভ: না হোক—আপন সন্তান—

পরগোজের মেয়ে আবার আপন হয় কখনও। ওদেরও দেখি দেখি রব। আমাদের মত যারা—ভাদের বর্ষ নেই—সমাজও নেই—আমরা সব বৃষ্টি ছাড়া—কালাপাহাড়। বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন অনন্ত।

সুনয়নী চুপ করে রইলেন। স্বামীর মনের বেদনা তাঁর মনেও যে সঞ্চারিত হয় নি তা নয়—কিন্তু পারদীয়ার দিনে

মেয়ের স্নান স্থখানি—তার কল্পনাকে গীড়িত করে তুলছে। বংসরান্তে একখানি কাপড় দিয়ে স্নেহ প্রকাশেরও সুযোগ বুঝি তাঁর ঘটবে না।

অনন্ত বললেন, সন্তার দিমেও খুন্সর মশার তিন বছরের বেশী কাপড় দিতে পারেন নি—আমাদের গায়ে নিশ্চয় সে ছুঁবে লেগে নেই। সুনয়নীর মনে কাঁটার মত বিঁধে আছে সে ব্যথা। অদৃষ্ট কাঁটা—চোরা বেদনা। সে গভীর ছুঁবে আজও অনুভব করেন তিনি তাই নিছের মন দিয়ে মেয়ের মনকে স্পর্শ করেন বার বার। ছুঁবে গায়ে লেগে থাকে না সত্য কথা—কিন্তু বাইরেটা যদি মাছুষের সব হ'ত।

মেয়েকে আনবে না এবার? অনেক দিন দেখিনি তাকে।—অভ্যন্ত জোমল কণ্ঠে সুনয়নী বললেন।

সে স্বর অনন্তর মনকে স্পর্শ করল—একটি নিঃশ্বাস বুকের মাঝে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, মেয়েকে কে আর না দেখতে চায় বল। কিন্তু রেশনের বাজার—চাল জোগাব না কচি ছেলের ছুঁবে জোগাব। মা আসেন বটে বছর বছর—কিন্তু কি দেখতে যে আসেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাসটা আর চাপতে পারলেন না।

মা এলে যারা খুসী হয়—তেমন তেমন লোকের সংখ্যাও বাংলাদেশে কম নয়। সেটা মাঝে দেখবার আগ্রহ নয়—বৈচিত্র্য-সন্ধানী মনেরই খেলা হয় ত।

এর মধ্যে অনিমেয় দিন তিনেক প্রভাতদের বাড়িতে এসে ফিরে গেছে—প্রভাতের সঙ্গে দেখা হয় নি। এক দিন দু একটা চিঠি দিয়ে বলে এসেছিল—বিশেষ দরকার, তাকে এক বার অবশ্য করে পাঠিয়ে দেবেন। বলেছিল নেপথ্যাচারিণী সুনয়নীকে উদ্দেশ করে।

সহজ মেলামেশার মধ্যেও বৃহৎ একটি ব্যবধান ছিল দু' বাড়ীর। প্রভাতের সঙ্গে দীপা বা অনিমেয়ের অন্তরঙ্গতা থাকলেও ওরা কোন দিন প্রভাতদের অভ্যুত্থানে আসে নি। এ বিষয়ে ওদের স্কোচ কতটা ছিল বলা কঠিন, কিন্তু প্রভাত সন্তুষ্ট হয়ে উঠত ওদের ডাক শুনে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ওদের টেনে নিয়ে যেত অন্তরিক্তে। এ বাড়িতে ওদের অভ্যর্থনা করার সাহস কোন দিনই প্রভাতের হয় নি। বাড়ীর সুপ্রকৃতিত দৈর্ঘ্য অথবা অভাবগ্রস্ত মাছুষের মাজাজানহীন আলাপের অসৌজন্য—কোনটাকে ভয় করত, প্রভাত, কে জানে। ওদের যা কিছু আলাপ পথের দিকের একমাত্র জানালার মাধ্যমে স্পন্দিত হ'ত।

ইদানীং প্রভাতের স্কোচটা বেড়েছে। বিশেষ করে টিউশানি না নেওয়ার পর। ওরাও এই প্রসঙ্গটিকে সম্বন্ধে এড়িয়ে গেছেন—তবু মনে হয়েছে ওদের আলাপের স্বচ্ছন্দ সুরটি ঠিক মত আর বাজছে না। অনিমেয়ের কাছে ও বেশ খানিকটা অপরাধী হয়ে আছে।

প্রভাত বাতী ফিরলে সুনয়নী বললেন, বড় বাড়ির ছেলে এসেছিল—এই যে চিঠি। বলেছে বিশেষ দরকার, দেখা করতে। একটু থেমে বললেন, তুই বুঝি আর ওদের ওখানে ঘাস নে?

প্রভাত বললে, যাবার সময় হয় নি।

সে কি রে—তোর কি এত কাজ যে বহুর সঙ্গে দেখা করতে সময় পাস না। ওরা তোকে ভালবাসে বলেই না খোঁজে! বড়লোকের সঙ্গে অসম্ভাব করলে নিজেরাই কষ্ট পাবি—

প্রভাত আহত হয়ে নিজের ঘরে এসে বসলে। স্কুলের আলাপের এমন অর্থ কোন দিন ওর কাছে স্পষ্ট হয় নি। টাদের আলোর প্রাসাদ ও কুটির স্বপ্নপূরী সৌন্দর্যে বজমল করে—বহুত তো টাদের আলোর সমগোত্রীয়। প্রত্যাশার স্নল মূর্তি ওরই সৌন্দর্যে লুপ্ত হয়ে ছিল—আর সত্যিই তো কোন প্রত্যাশা ছিল না প্রভাতের মনে। সত্যিই ছিল না কি প্রত্যাশা? স্নদের রুচি ও সংস্কৃতির মহামূল্য মণিমাণিক্যের চেয়ে ওকে ছদ্মবার আকর্ষণ করেছে। ও লোভীর মত ছুটে গেছে—লোভীর মত কাটিয়ে দিয়েছে বর্টার পর বর্টা সেই আলাপ-আলোচনার পরিমণ্ডলে।

—সেই লোভের চেহারা এমন কুংসিত নয়—চিন্তাসক্ত মনেও জমত না গ্লানি। টিউশনি পাবার প্রত্যাশায় একবার মাত্র তার স্নলমূর্তিটা প্রভাতকে রূঢ় আঘাত করেছিল। সেই সাংঘাতিক মুহূর্তও নিঃশব্দে সরে গেছে—কিন্তু অভাবপ্রস্ত সংসারের ক্রন্দরাশির কিছু অংশ প্রভাতের মনে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ও তেমন সহজ ভাবে অনিমেষদের সঙ্গে মিশতে পারছে না।

•• পরের দিনও ও অনিমেষদের বাড়ীতে গেল না। অনিমেষ কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় পথের মাঝে ওকে ধরলেন। কিয়ে—একেবারে উধাও? চিঠিটা পাসনি তো?

পেয়েছি।—

তবে? ওবেলায় বহুক্ষণ অবধি অপেক্ষা করলাম—এলে না?—সুনয়নী কি একটা সমিতি নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে।

একটা কিছু চাই তো। প্রভাত হাসলে।

এবার বোধ করি পুজোতে কোথাও বেরুবে না?

পুজোতে বেরুবার সাহস আমাদের—

এ যেন সেকালের দেশভ্রমণ। পায়ে হাঁটা পথ—পথে চোর ডাকাত। অনিমেষ শব্দ করে হাসলে।

তা ছাড়াও সাহসের দরকার হয় না?

হঁ—টেন কলিশন? আচ্ছা প্রভাত—প্রাণের মায়ী তোর এত বেশী হ'ল কবে থেকে?

প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত বলেই তো—

তৈপোমি রাখ। অনিমেষ তাক দিলে। তোর কাছে

একটা পরামর্শের জুজু ছ'বেলা হাঁটছি—তোর কিন্তু এঁই নেই।

কি এমন পরামর্শ?

এবার পুজোটা কি কলকাতায় কাটাতে হবে? না কিছুতে নয়। আমি বলছিলাম দিল্লীতে বেড়িয়ে আসা যাক—

মন্দ কি—রাজধানী-দর্শন।

দীপা বলছে দার্জিলিং।

আরও ভাল। একেবারে মামার বাড়ী।

মামার বাড়ী?

নয়? যা তো কি বহর ওখানেই আসেন এই সময়ে।—ওই হিমালয়ে।—ওটা আমাদের মামার বাড়ী নয়?

অনিমেষ হো হো করে হেসে উঠল—তাই ভাল—কি বলিস?

মন্দ কি। প্রভাত নিরুৎসাহ গলায় জবাব দিলে।

মানে? সবিস্ময়ে প্রভাতের পানে চেয়ে হেসে উঠল অনিমেষ। যেন তোর পক্ষে কলকাতাতে থাকাও যা—পাহাড়ের বাওয়াও তাই।

উদাস দৃষ্টিতে অনিমেষের পানে চেয়ে প্রভাত বললে, তা ছাড়া কি।

তা হলে তুই যাবি নি?

প্রভাত স্পষ্ট না বলতে পারলে না। বহর ছুই আগে ওরা শিলং গিয়েছিল—স্বপ্নমূর্তির মত তার রেখা এখনও সমস্ত রুজিতে লেগে রয়েছে। পাণ্ডুঘাটে গীমার থেকে মোটরে ওঠা—নাংপোর ক্রসিং—এ আপ-ডাউন ছ'বারের মোটরগুলির সাক্ষাৎকার—পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের কাছে কমলালেবু কেনা আর সপিল পাহাড়ের পথে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে মন্থণ গতি মোটরের দক্ষ অভিযান আজ স্বপ্নে দেখা দৃষ্ট বলে মনে হয়। সেদিনও তা স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল। পবিত্রসাহুতে তরঙ্গায়িত যোজন-বিস্তৃত গ্রাম-সমারোহ—নীলের চন্দ্রাতপের সঙ্গে তার মিতালী—সে যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে আরও কোন পৃথিবীর বার্তা। প্রত্যাহের ধূম-ধূলিমলিন পৃথিবী নয়—কলহ-কোলাহল মাথা গুঁহাদনও নয়, শান্তিমুখ ভীরের আঘাতে বিহীন জীবন ধারণের বিচিত্র সমস্তাও নয়—স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত উৎসের মত স্রবের বন্ধার তুলে দৃষ্টি থেকে নেপথ্যে অন্তর্হিত হয়েছে এবং নেপথ্য থেকে অন্তরে আশ্রয় নিয়েছে সে জগৎ। সে জগৎ স্বপ্নে পাওয়া অথচ চিরজীবী।

কিয়ে—যাবি তো? অনিমেষ ওর খাড় ধরে নাড়া দিল।

প্রভাত খাড় নাড়লে।

দীপা বললে, মনে আছে সেবার বিশপস ফলস থেকে ফিরতে পাহাড়ের মাথায় এক বাঁক রডোভেনড্রন দেখে তোমার আশ্রু, 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোভেনড্রন গুচ্ছ।'

দীপাঙ্কে নিয়ে গেল চারের টেবিলে—নিপুণ হাতে
বাবার-ভরা প্লেট রাখলে সামনে—পেয়ালার পেয়ালার ঢাললে
চা—পিয়ানোর তুললে সুর। হাসিতে গল্পে কল্পনার মশগুল
হয়ে কেটে গেল দীর্ঘ সময়।

বাড়ীতে ফিরে এসেও স্বপ্নের ঘোর আর সুরের মোহ
কাটল না প্রভাতের। মনে হ'ল পৃথিবীর তপস্বাই হ'ল—এই
জগৎকে আয়ত্ত করা। স্বপ্নের মাধুর্য স্থায়ী হয় বাতবের
উপকরণ নিয়েই। বস্তুকে বাঁধবার কৌশল যার আয়ত্ত নয়
তার পক্ষে স্বপ্ন শুধু বিলাস নয়—গীড়নও বটে। বহি-সমর্পিত
পতঙ্গের জালা...

জানালাটি খুলে দিলেই গলির ওপ্রান্তে ভেতলা ঘরখানি
দৃষ্টিতে পড়ে। সন্ধ্যার মুখে ও ঘরে নীলবাতির আলো জলে—

সে আলো রাত্রির মধ্যযামেও জলে—রাত্রিশেষে প্রভাত-তারার
সঙ্গেও পাল্লা দেয়। কাচে-খেরা ফাটসের আলোর চারবারে
পতঙ্গেরা ডানা বাপ্টায়—ডানা বাপ টাতে বাপ টাতে প্রায়
মুছিত হয়ে পড়ে, তবু আলোর মোহ তাদের ধোঁচে না।

কত বিনিময় নিশীথে ভেতলা ঘরের ওই আলো দেখে
প্রভাতের মনে হয়েছে—ওই আলো জ্বালার তপস্বাই পৃথিবীতে
সার্থক হওয়ার মানদণ্ড। যশ—সৌভাগ্য—স্বর্থ—কল্পবৃক্ষের
ফলের মতই অনায়াসে চয়ন করে নেওয়া যায়—সম্পদের
দক্ষিণা যদি করতলগত হয়। সে সম্পদ বিধাতা দেন না—
ভাগ্যও দেয় না—বুদ্ধি আর উত্তমের আকর্ষণ দিয়ে পেতে
নিতে হয়।

ক্রমশঃ

যুগসন্ধি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ নাহা

বসুধা তেমনি বিচিত্র আর আকাশ তেমনি নীল,
হারিয়েছে শুধু প্রকৃতির সাথে মাহুষ মনের মিল।
জ্যোৎস্না ত আর হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে পারে না তার,
অরুণ পারে না পুঞ্জীভূত সে দূরিতে অঙ্গকার।

সৌন্দর্যের সন্ধানে কেহ যাত্রা করে না সুর,
স্নেহ-করুণায় অন্তর কারো কাঁপে নাকো ছরু ছরু।
প্রতিহিংসায় মত্ত মানব, অন্তরে পুষ্টি' ভয়
জগৎবিচারদভাষ করে সে বিচারের অভিনয়।

মাহুষ জানে না—কি তার ইচ্ছা, জানে না কি-বা সে চায়,
পৃথিবী এ কোন্ অনিশ্চিতের রয়েছে প্রতীকায়?
কোথা আনন্দ? হৃদবিহীন জীবনে বাজিছে ব্যাথা।
কোথা প্রশান্তি? অহুভব করে দারুণ অস্থিরতা।

কুলু কুলু কুলু কল-ধ্বনিত এ নহে শান্ত নদী,
আপনার মনে একটানা স্রোত বহে নাকো নিরবধি।
এ যে সীমাহীন ক্ষুদ্র সাগর, ধামে না আন্দোলন,
বায়ুর আঘাতে বার বার বারি করে ওঠে গর্জন।

দেখিয়া শেখেনি, চৈকিয়া শেখেনি; কে তারে সত্য কহে,
আদি-মানবের আদিমতা আঁকো রক্তে যাহার বহে।
বিচূর্ণ হ'ল—ছিল যাহা—কিছু স্নেহময় স্মরণ।
শোনা যায় শুধু যুদ্ধের রথ-চক্রের রর্ধর।

প্রলয়-সাধনা-মগ্ন মাহুষ ক্রীড়ার প্রার্থী নয়,
চাহে হৃদীর বিপুল শক্তি, চাহে নির্মম জ্বর,
চাহে প্রভুত্ব, একাধিপত্য, ক্ষমাহীন সংগ্রাম,
জীবনচিহ্ন-বিলুপ্তি—বুঝি শান্তি তাহার নাম।

প্রকৃতির স্নেহ, শোভা ও সুখমা মুগ্ধ হৃদয়ে ভরি'
জীবন-সাধনা করিতে হবে যে আবার নতুন করি।
কেন বিক্ষোভ? কেন এ বিরোধ? কেন এত সংঘাত?
বহু, নিজের অন্তর-পানে কর গো দৃষ্টিপাত।

আকাশে আকাশে সূর্য-তারার যে সুর স্পন্দমান;
সেই সুরে আজ বাজিয়া উঠুক জীবনের যত গান।
যুগের সন্ধ্যা এসেছে—জান না? এল সন্ধিকণ,
আর দেবী নয় মনোমন্দিরে কর পূজা-আয়োজন।

কিন্নর-দেশ

শ্রীধর্মদেব শাস্ত্রী

অম্ববাদকল্পী বীরেন্দ্রনাথ গুহ

[কিন্নর বা কিন্নরভূমি সাহিত্যিকদের কল্পনার সৃষ্টি নহে। কিন্নর-দেশ একটি আছে—হিমালয়ের কোলে, তিব্বতের গায়ে। কিন্নর ও তিব্বতের যোগাযোগ অতি প্রাচীন ও অতি ঘনিষ্ঠ। আকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও আচারগত সাদৃশ্য এতদূর অতিক্রম করেছে। কিন্নর-পন্নীতেও লামা আছে। কিন্নরেরা অত্যন্ত গরীব হরিজনশ্রেণীর লোক—নিপীড়িত। তিব্বতে কমানিষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এতাবৎ অজ্ঞাতপ্রায় কিন্নরদের ও কিন্নরভূমির কথা যেকোন দিন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হইয়া উঠিতে পারে।

লেখক কিন্নরদের অর্দ্ধদেব বলিয়াছেন। এমনই অভিনব তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য, আর অপূর্ণ তাহাদের মিহি কণ্ঠস্বর। পাঠক অজ্ঞাত-প্রায় এই হিমাচলবাসী আদিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষার, জীবিকার, সামাজিক রীতি-নীতি ও আর্থিক অবস্থার চিত্র এই লেখার পাইবেন।

লেখক এগার মাস আগে লিখিয়াছিলেন—“হিমাচলপ্রদেশের রাজধানী শিমলা সহিত এই সীমান্তপ্রদেশের মোটর ও টেলিফোন দ্বারা সংযোগবিধান রাষ্ট্রসংস্কার দিক হইতেও প্রয়োজন।” আজ এই প্রয়োজন সবিশেষ উপলব্ধ হইতেছে।

প্রাগজ্যোতিষপুরের কামরূপের সহিত হাজার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কিন্নরের প্রাচীন রাজধানী কামরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল কি? আবার দেখিতে পাই চীনতে বাণাহরের দুর্গ ছিল—অম্ববাদক।]

এক সময়ে লোকে মনে করিত হিমালয় অলজ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে উভয় শব্দও আর অলজ্য নহে। বিজ্ঞানের প্রসাদে স্থান-কালের ব্যবধান আজ প্রায় মালুম হয় না। কিন্তু কিন্নর-দেশ-যাত্রীর কাছে বিজ্ঞানের সব চমৎকারিতা একেবারে বুট্টা মনে হয়। এ কথা যে বলিতেছি তাহার কারণ শিমলা হইতে ১৪০ মাইলের দূরত্ব, মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব অপেক্ষা বড় কম মনে হয় নাই। কিন্নর প্রদেশের প্রধান স্থান চীনা শিমলা হইতে ১৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

১৯৪৮ সালে শিমলা ও পূর্ব-পঞ্জাবের রাজ্যগুলি লইয়া হিমাচলপ্রদেশ গঠিত হয়। অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের মধ্যে প্রধান ছিল রামপুর, বুশহর, সিরমোর, মন্ডী ইত্যাদি। ভারত-সরকার হইতে ইহাদের ভাতা দেওয়া হয়। মন্ডীর রাজা অপর সকলের অপেক্ষা বেশী পান। এই প্রদেশের ক্ষেত্রফল ১০৬০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯৩৫০০০। হিমাচল-প্রদেশে বিলীন বুশহর রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৩৮০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১১২০০০। বুশহরের কিন্নর-অধ্যুষিত ভূ-ভাগের ক্ষেত্রফল ২০৬০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ৩৫০০০। কিন্নর-প্রদেশকে ‘কুনোর’ এবং কিন্নরদের ‘কুনোরা’ বলা হয়। আমরা কিন্নর শব্দটি ব্যবহার করিব। কিন্নরের পূর্ব-পশ্চিমে তিব্বত; পশ্চিমে কুলু (পঞ্জাব); উত্তরে—লাহোল; দক্ষিণে—রামপুর রাজ্য। কিন্নর-দেশ ভারতের সীমান্তপ্রদেশ।

ইহার সীমা তিব্বতের নগম্যা গ্রামে মিলিয়াছে। নংলগ গ্রাম শিবকী তিব্বতের সীমান্ত অবস্থিত। এই স্থানে দুই দেশের সীমানা মিলিয়াছে। এই পথেই প্রাচীনকাল হইতে দুই দেশের আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে তিব্বত ও কিন্নরের মধ্যে খুব সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু



কিন্নর প্রদেশের অশোক আশ্রমের কর্মসূচ্যদল
শ্রীধর্মদেব শাস্ত্রী ও শ্রী আর. এস. মিশ্র

তিব্বতীয়গণের অপেক্ষা কিন্নরবাসীদের উন্নততর মনে হয়। এই সীমান্তপ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশ বুঝা যায়। পান-আহারে, রীতিনীতিতে ও বেশভূষায় তিব্বতবাসীদের সহিত এদের অনেকটা মিল; সব চাইতে বড় ব্যবধান, তিব্বতে বর্ণ-ভেদ নাই, কিন্তু কিন্নরদের মধ্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত। তেমনি তিব্বতীয়দের অপেক্ষা কিন্নরদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধি সম্বন্ধে বিকশিত। তাহা প্রাচীন আর্ধ্যধর্মের দান। বৌদ্ধ-ধর্ম উহারই এক শাখা। আর উভয় ধর্মের সমসিক্রান্ত অহিংসার ও তপস্যার বিস্তার জনসাধারণের বৌদ্ধধর্মের প্রসাদেই হইয়াছে।

দেব-জাতি কিন্নর

সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য বাদ দিলে, কিন্নর ও তিব্বতীয়দের আকার-প্রকারের ভেদ সুস্পষ্ট। কিন্নরেরা দীর্ঘাকৃতি, তিব্বতীয়েরা অপেক্ষাকৃত খর্বকায়। আকৃতিতে কিন্নরেরা প্রাচীন আর্ধ্যদের মত। কালিদাস কিন্নরদের অশ্বমুখ বলিয়াছেন। তাহা ঠিকই মনে হয়? যে অর্থে বানর অর্দ্ধ-নর, কিন্নর সে অর্থে অর্দ্ধদেব। ইহার মাছুষ ও দেবতার মধ্যবর্তী। এত প্রাচীনত্ব, এরূপ অতিমানব দেহ-সৌষ্ঠব, এমন অপূর্ণ

কণ্ঠস্বর আর কোথাও শুনি নাই। কিন্তু দারিদ্র্য অপরিণীয়। অঞ্চ চুরি এখানে নাই-ই। রাত্তার শান গম কেহ ফেলিয়া গেলে, অপর কেহ তাহা ছোঁয়ও না। ব্যভিচার নাই বলিলেই হয়। বহু-পতি-প্রথা থাকিলেও কোন জীলোক মতপান বা অস্ত্র নেশা করে না। এখানকার লোক কোন কোন বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকাল হইতে এই জাতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। পুরাণে, মহাভারতে, এমন কি উপনিষদে পর্য্যন্ত কিন্নরদের উল্লেখ আছে; প্রাচীন সাহিত্যকারেরা কিন্নরদের গন্ধর্ব্ব, যক্ষ আদি



কিন্নর সেবাসভের দুই জন সভ্যসহ ত্রিধর্ম্মদেব শাজী

দেবজাতিতে ভুক্ত করিয়াছেন; নৃত্য, গুতি ও সঙ্গীতকলার সহিত তাহাদের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। চিরদিন ইহারা শান্তিপ্রিয় ও কলা-প্রেমিক। তাহাদের প্রাচীন রীতি-নীতি আজও সুরক্ষিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে আর্থিক ও মানসিক দৈন্ত পরিব্যাপ্ত। জীবনধারণোপযোগী আহারও তাহাদের মিলে না। অনেককে আমরা জঙ্গলে বাস-পাতা খাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

কালসীতে যাতায়াত করে এমন বহু কিন্নর বহু গত ভিন্ন বংসর আমাদের চীনীতে যাইতে অহুরোধ করিতেছিলেন। নিকায় কর্মচারী ঠিকর বাপার পরামর্শে হগনলালভাই পরীথের সঙ্গে এবার কিন্নর-দেশে যাত্রা করি। শীতকালে কিন্নরেরা শুভা-দ্রাগল লইয়া নীচে চলিয়া আসে। যে সব স্থানে তাহারা আসে তথ্যে কালসী প্রধান। কিন্নর-কালসীর এই সদয় পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কালসী এক সময়ে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। আর সংস্কৃতির দিক হইতে, ইহারই নদীর ধারে মহারাষ্ট্র অশোকের চৌদ্ধ শিলা-লেখ বিদ্যমান। তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন।

গত দুই বংসর এক আদিবাসী হরিজন কিন্নর-দম্পতি শীতকালে আশ্রমে আসিয়া থাকিতেছে। তাহাদের নিকট হইতে আশ্রমবাসীরা নিরলস কর্তব্যের মুখ প্রেরণা পাইয়াছে। কিন্নরেরা নিম্নত এখানে যাতায়াত করে। তাহাদের দেখিয়া

পর্কতবাসী সাদাসিধা মেঘ-দ্রাগ পালক কিন্নরদের স্মৃতি সদা মনে জাগরিত হয়। ভ্রমণকালে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি এখানে দিতেছি।

এই হতভাগ্য প্রদেশের দিকে যদি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ত আমাদের অম সাধক মনে করিব। এক সময়ে যে জাতি উন্নত ছিল আজ তাহারা অমৃত—অবস্থা তাহাদের শোচনীয়। অস্ত্র সব আদিবাসীর মত আদিবাসী বলিয়া গণ্য হওয়ার ও আদিবাসীদের বিকাশের নিমিত্ত যে সব সুযোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পাওয়ার পূর্ণ দাবি তাহাদেরও আছে। স্বাধীন ভারতের সরকার ও জনসাধারণের নিকট হইতে এ দিকে অনেকটা আশা করা যাইতে পারে।

বেশভূষা

পশম উৎপাদন ইহাদের জীবিকা। পরিষেও ইহাদের পশমে তৈরী। ছোট বড় সকলের হাতেই কাঠের তকলি; অবসর পাইলেই তাহাতে তাহারা পশমের সুতা কাটে; পায়ে কোশের পর কোশ চলিতেছে, আর হাতে তকলি ঘুরাইতেছে। মেঘ-পালন প্রধান ব্যবসায়। মরনারী উভয়েই ফেণ্ট ক্যাপের মত এক প্রকার টুপি পরে। টুপিতে একটি পট সংলগ্ন—শীতকালে তাহা দিয়া কান ঢাকে। কিন্নরীরা বেণী বাঁধে। বেণী টুপির নীচ হইতে ঝুলিয়া থাকে। পর্দা যে কি তাহা তাহারা জানে না। জীলোকেরা কবলের মত মোটা পশমী শাড়ী পরে। অভাবে পড়িলে তাহা দুইয়া কবল রূপে বিক্রয় করিয়া দেয়। মেঘদের পরিষেয় বলিতে বুঝায়, দোড় (শাড়ী), টেপা (টুপি) ও চোলী (হাতাবিহীন রাউজ বিশেষ)। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ স্থলে শাড়ী দিয়াই চোলীর কাজ সারিয়া লয়। পুরুষেরা পশমী পায়জামা ও আচকান পরিধান করে—নীচে কোন কোর্টা থাকে না। তাহারা পশমে তৈরি জুতা ব্যবহার করে—নাম ম্পন্দ। আচকান (ছোয়া) এখানকার প্রাচীন বেশ। বরফের উপর দিয়া চলার জন্য যে জুতা তাহারা ব্যবহার করে তাহা ছাগলের লোমে তৈরি হয়। জীলোকেরা কানে রৌপ্যভূষণ ধারণ করে—দেখিতে কাঁটার মত। ধনীদের অলঙ্কার সোনার তৈরী, গরীবদের নিকৃষ্ট ঝাড়ুতে।

ভাষা ও সাহিত্য

কিন্নরদের ভাষা স্বতন্ত্র—নাম হমস্কত। লিপি ভিন্ন নহে। সাহিত্য বলিতে কিছু নাই। লোকগীতি খুবই সুন্দর। নাগরী লিপির প্রচলন হইতেছে। কয়েকটি শব্দ :

কিন্নর	হিন্দী	কিন্নর	হিন্দী
তী	পানী	নংগ	ধাল
কিম্	মকান	রাউচ	বহন
বোলংগ	পেড়	তেতে	দালা
লঠরী	মোটা	অমা, ওম্	মাতা

কিন্নরদের মধ্যে ব্রাহ্মণ নাই। সংস্কারাদি নিজেরাই নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। সংস্কার অহুষ্ঠানে অগ্নির স্থান নাই। ধূপ-ধূনা জ্বালিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্মের গুরু লামারাও সংস্কার নিষ্পন্ন করাইয়া থাকে। কিন্নর-গ্রামেও লামা আছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠভূমি

কিন্নরদের পুরাতন রাজধানী কামরু। যখন বৃশহরের রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন তথায় ঠাকুর রাজত্ব করিতেন। এখানে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কেন্দ্র আছে। আত্মবিশ্বাস কয়েকদশের সেখানে রাখা হইত। চারিদিকে বহু প্রাচীর; দরজা একটিও নাই। দড়ি দিয়া কয়েকদশের ভিতরে নামাইয়া দেওয়া হইত। খাড়াও ঐ ভাবেই দেওয়া হইত। ভিতরে যে ঘাইত, জীবনের জন্ত ঘাইত। 'চীনা' কিন্নর-প্রদেশের মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান ও কেন্দ্র। এখানে বাণাসুরের দুর্গ বর্তমান। চীনা হইতে আঠার মাইল দূরে শতজ-তীরে মোরংগ নামক স্থানে পাণ্ডবদের একটি দুর্গ আছে : লোকে বলে অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা এক রাত্রি উহা নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। শুনিলাম ৩২ মাইল দূরে লামরংগে এইরূপ আর একটি দুর্গ আছে।

পাণ্ডবদের বাসর-গীত বিবাহ-রাত্রি কিন্নরেরা গাহিয়া থাকে। লোকে বলে এখানকার বহুপতি-প্রথা পাণ্ডব-সংস্কারই ফল।

'দেবতার' গোলামি

উত্তরাঞ্চলকে লোকে দেবভূমি বলে। 'কিন্নর'ও এই কথার ইঙ্গিত মেলে—অসংখ্য দেবদেবীর পূজা তার সাক্ষ্য। প্রত্যেক গ্রামের দেবতা ভিন্ন। আর তাদের নামে সম্পত্তি ও জায়গীর রহিয়াছে। পাছে দেবতা বিরূপ হন এই আশঙ্কায় লোকে সদা তটস্থ। দেবতার আধিপত্য সর্বক্ষেত্রে। দেবতাদের দাসত্বে কিন্নররা আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। কোনও জুলের কথা প্রসঙ্গে জটনৈক শিক্ষক আমাকে কোনও দেবতাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তত্বতরে আমি বলি—“পরমায়ী এক মাত্র দেবতা, আর সবই অর্থোপার্জনের বাহানা।” এ কথার লোকটি বলিয়া বলিল—‘দেবতার বিরুদ্ধে এখানে বলা চলবে না। সে অধিকার কারও নেই।’ এক গ্রামে দেখিলাম, দেবতা পালকে উপবিষ্ট হইয়া এদিক-ওদিক হেলিতে হুলিতেছেন। আর দেবতার এদিক-ওদিক হেলা দোলাকে ভক্তেরা নিজ নিজ প্রেমের উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। কোণার দেবী হইতেছেন মুখ্য দেবতা। বদরীনাথ, মহেশ্বর, নাগল আদিকেও প্রধান স্থান দেওয়া হয়। জনশ্রুতি, সরহান বাণাসুরের রাজধানী ছিল।

পিতার মৃত্যু হইলে কোন পরিবারের ভাই-বোনদের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া ঝগড়া বাধে। কোণার দেবী নাকি জমা-জমি ভাগ-বীটোয়ারা করিয়া বিবাদের রফা-নিষ্পত্তি

করিয়া দেন। এখানকার দেব-দেবী বীরের রূপে পরিকল্পিত। সব দেবতার কাছেই মংগ আর মাংস নিবেদন করা হয়। বৌদ্ধমন্দিরের দেবতারও বাদ যান না; তাঁহাদের কাছে পর্যন্ত মাংস ভোগ চড়ান হয়। দুই দেবতার মধ্যে এইটুকুই



একটি আশ্রম বিভাগের কিন্নর বালক-বালিকাবৃন্দ

মাত্র পার্থক্য যে বৌদ্ধ-দেবতা মেলা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে মন্দিরের বাহিরে যান না। এই দেবতার নাম হোকী-ই-রোল—রকক দেব। চীনের বৌদ্ধ মন্দিরে মাটির তৈরি সুন্দর সুন্দর বিশাল মূর্তি আছে। ভগবান বুদ্ধের রক্তাশ্রিত চিত্র দিব্য সুন্দর—শিল্পকলার উত্তম নিদর্শন। ভূত-প্রেতের হাত হইতে রক্ষার জন্তও অনেক মূর্তি তৈয়ার হইয়াছে। অনাবৃষ্টি হইলে দেবতাদের সন্তোষ বিধানের জন্ত লোকে উদ্ভূত অন্ন (ধান বা গম) পর্যন্ত পূজারীদের দিয়া দেয়। সরহানের ভগবতী-মন্দিরে প্রত্যহ দশ-বারটা হাগ ও হাগ-শিশু বলি দেওয়া হয়। ঐ মন্দির হইতে প্রায় দুই মণ রূপা ও পঞ্চাশ তোলা সোনার তিনটি হাতা চুরি গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম। ইহা হইতে মন্দিরের সম্পত্তির পরিচয় মেলে। মন্দিরের খাজানা নাই। মন্দিরের সম্পত্তি হইতে অনার্যাসে বহু স্কুল চলিতে পারে। এখানে হরিজনদের ছায়া পর্যন্ত পড়িতে পায় না। দত্তনগর গ্রামের মন্দিরের কার্যকরী সমিতিতে দুই জন সংস্কারপন্থী যুবক আছে। তাই তথায় একটি স্কুল পরিচালিত হইতেছে। উপরেই বলি-য়াছি, মন্দির যাজকেরই প্রভূত সম্পত্তি। এখানকার সার্বভৌম মন্দিরগুলি এখন হিমাচল-প্রদেশ-সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। সরকার ইচ্ছা করিলে এদিকে অবশ্যই কাজ করিতে পারেন। সর্বসাধারণের সহযোগিতা নিঃসন্দেহ পাওয়া যাইবে। পশু-বলি বন্ধ হওয়া ও হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার স্বীকার করা আশু কর্তব্য। দেব-দেবতা স্বার্থপর লোকের উদরপূতির উপায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার সংস্কার হওয়া দরকার। সাধারণের মনের পরিবর্তন-সাধন কঠিন কাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া কিন্নরদের উন্নতি হইবার নহে। সর্বদাকীণ সংস্কারের ইহা ব্যাপক ক্ষেত্র। সংস্কারের জন্ত কিন্নরেরা

উদ্ভাবিত হইয়া রহিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হইবে। ইহারা দেবতা ও গৌমত্যাদের মাকড়সা-জালে আটক পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন জাতির বিকাশ-কালে আধ্যাত্মিক দিক হইতে সবিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

বহুপতি-প্রথা

পরিবার-প্রথার বিকাশক্রমে এক সময়ে গ্রী পরিবারভুক্ত সব ভাইদের পত্নীরাপে আসিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই বহুপতি-প্রথার সূত্রপাত হয়। পাণ্ডবদের সময়ে হয় তো তাহা সাধারণ প্রথা ছিল। আজও যেখানে এই প্রথা প্রচলিত সেখানে লোকে লোকগাথার আদরপূর্বক পাণ্ডবদের কথা স্মরণ করিয়া থাকে।

শিমলা হইতে রওনা হইয়া আমরা কুমারসেনে পৌছি। তার পরে কোঠগড়-রামপুরে যাই। এই প্রথা তথায় নাই। কিন্তু সেখান হইতে নয় মাইল দূরে গেরা নামক স্থানে রাজ-পুতদের মধ্যে বহুপতি-প্রথা বর্তমান; হরিজনদের মধ্যে নাই। আশ্চর্যের ব্যাপার। জৌনসারবাওর ও রওয়াই-এ অহুসান করিয়া জানিতে পারি যে, তথায় এই প্রথা সকল জাতির মধ্যেই বর্তমান। এ স্থানের (গেরার) আশপাশে চাষ-আবাদের জমি নাই, আধিক বাতাল্যও লোকের নাই তাই কোলী আদি হরিজনদের সম্মিলিত বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। যাহাদের মধ্যে বহুপতি-প্রথা প্রচলিত তাহাদের চিন্তাধারা এইরূপ: ভাইয়েরা পৃথক পৃথক বিবাহ করিলে পৃথক ভাবে থাকিতে আরম্ভ করিবে, জমি-জমা ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া যাইবে, আর কমিবে। কঠোর ছন্নছাড়া পাহাড়ী জীবন যুগ্ম করার ক্ষমতা বহুপতি-প্রথা প্রয়োজন একথা তাহারা মনে করে। শিক্ষার পূর্ণ বিস্তার হওয়ার পূর্বে এই প্রথার অবদান ঘটাইলে কিন্নরদের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইবে, আমরাও ইহাই বিশ্বাস। শিক্ষা পাইলে তাহারা বুঝিবে, এক পরিবারে এক অঙ্গে থাকিতে হইলে সম্মিলিত বিবাহ যে করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। এখানে এই প্রথার অর্থ ইহা নয় যে, কোন গ্রীর সব পতি সকল সময়েই বাড়ীতে থাকে। ভেড়া-ছাগল চরাইবার ক্ষমতা তাহাদের আলাদা আলাদা থাকিতে হয়। সকলে যখন একত্র হয় তখন গেরা নামক স্থানের প্রথা অহুযাদী প্রত্যেক ভাই ক্রম-অনুসারে দুই দিন করিয়া পায়। দুই ভাইয়ের এক পত্নীও থাকে। দুইয়ের অধিক ভাইদের পৃথক পত্নীদের সহিত ভাইদের সহবাস ভেদন নিন্দার নহে।

কিন্নর-দেশে এই প্রথা রীতিবীকৃত ও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সব ভাইয়ের একই পত্নী—আট নয় ভাই হইলেও। পত্নীর উপরে সকলের সমান অধিকার। বিবাহও এক সঙ্গেই হয়। জৌনসারবাওর ও রওয়াই-এ পত্নীর উপর জ্যেষ্ঠের অধিকার বেশী। ফল তার ভাল নহে। কিন্নরে এইরূপ

নহে; এখানে গ্রীর ঘর পৃথক এবং যখন কোন পতি ভিতরে যায় তখন দরজায় টুপি রাখিয়া যায়। এই নিদর্শন দেখিলে অপর কোন ভাই গ্রীর ঘরে প্রবেশ করে না। ইহাই এখানকার ব্যবস্থা। অতএব এই ব্যবস্থা নাই। জৌনসারবাওর ইত্যাদি স্থানে যে ভয়ঙ্কর রোগ দেখা যায় তার কারণ এই ব্যবস্থার অভাব। কিন্নরে এই ব্যাধি নাই।

বিবাহ-পদ্ধতি

বিবাহ বেশী বয়সে হইয়া থাকে। সুরক্ষিত হইলে কণা আঠার বৎসর পর্যন্ত কুমারী থাকিতে পারে। ব্যভিচার নগণ্য। বিবাহ মাতাপিতার সম্মতিক্রমে হয়। পরস্পরের সম্মতিক্রমেও কখনও কখনও হয়। পিতামাতার অনুমোদিত বিবাহে অধিক ব্যয় হয়। তাই যে যুবকের অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই সে সোজা যুবতীর সহিত কথা বলিয়া বিবাহ করিয়া থাকে। মাতাপিতা সব ছেলের একটাই মাত্র বিবাহ দেয়। এই নিয়ম এখন কতকটা শিথিল হইয়াছে।

‘বধু’-যাত্রার রীতি

উন্নীর (শিমলা হইতে এই স্থান ১২৫ মাইল দূরে) ঠাকুর দিং নামক রাজপুত জমিদারের বিবাহ দশ মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে হয়। কনে ও বরের বয়স যথাক্রমে কুড়ি ও একুশ ছিল। পিতা সম্বন্ধ স্থির করে। বরপক্ষ যখন কন্ডার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কন্ডাপক্ষ টাকা (ভিলক) বাবদ এক টাকা আদায় করিল। কনেকে লইয়া লাড়া (বর) যখন নিজ বাড়ী রওনা হইবে তখন কনে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শাশুড়ীকে কুড়ি টাকা দক্ষিণা দিতে হইল, আর পিতার কাছ হইতে কনেকে ছাড়াইতে আরও কুড়ি। শালী এবং ছালাক পত্নীকেও দশ দশ টাকা অহুরূপ দক্ষিণা দিতে হইল। জামাতার কাছ হইতে টাকা আদায়ের এই এক রীতি। অগ্নি, সপ্তপদী ইত্যাদি সংস্কার-অনুষ্ঠান বিবাহে নাই। বরপক্ষে ছিল চার, আর কনেকে লইয়া ফেরার সময় সঙ্গে আসিল আনী। চার বেলা তাহাদের আদর-সমাদর করিতে হইল। কিছু আয়োজনও পূর্বেই ছিল। তার উপর আরও আটটা ভেড়া ও তিনটা ছাগ কাটা হইল। বধুযাত্রা এমনই ব্যয়-সাপেক্ষ।

ঘরে আসিয়া বধু অজ্ঞ পতিদের ভিলক পরায়। তার মানে সে এখন তাহাদেরও পতিত্বে বরণ করিল। বিবাহের জন্ম কেবল বড় ভাই-ই কনের বাড়ী যায়। বিবাহ বসন্ত: কনের বাড়ীতে হয় না, হয় বরের বাড়ীতে। এইরূপ বিবাহে মধ্যমাংসের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। ধূপ জালান আর ভিলক ছাড়া বিবাহের অজ কোন সংস্কার পালন করা হয় না।

পিঠের বোঝা

টুংডার নিকটে ঘরাট (জল স্রোত চালিত জাঁতা) আছে। আমাদের আগে আগে এক যুবক-যুবতী চলিয়াছে। যুবতীর পিঠে গমের বোঝা, যুবক ধালি হাতে। ঘরাটে পৌছিয়া যুবতী ভিতরে গেল; যুবক ছ'কা টানিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম :

‘এ কে?’

সে কহিল—‘জী’

—তোমার বয়স?

—বলতে পারি না, কুড়ি হবে।

—তোমরা ক’ ভাই?

—পাঁচ।

—পাঁচ ভাইয়ের ক’ জী?

—এক জনই।

—জাতে তোমরা?

—লোহার।

—তোমার জী ঘরাট চালাচ্ছে। পিঠে যে গম বয়ে এনেছে সে ত নিজ চক্ষেই দেখেছি। সাহায্য বুঝি তুমি একটুও কর না? জীমাক টানতে বসে গেছ।

—আমাদের পাহাড় অঞ্চলে মেয়েরাই সব কাজ করে।

আমি বোঝা বইতে যাব কেন?

দেখিলাম যুবতীটি শীলবতী ও পরিশ্রমী। যুক ভাষায় সে যেন বলিতেছিল—‘পিঠের বোঝা যত দিন না আমাদের হাল্কা হবে তত দিন স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের নাই।’

জীলোকের সংখ্যাধিক্য ও ‘জোমো’

এখানে বহুপত্নী-প্রথা নাই। কচিং কোথাও কোন পুরুষ যে একাধিক বিবাহ কোনক্রমেই করে না তাহা নহে। কিন্তু তাহা একান্তই বিরল। ফলে শত শত মেয়ে অবিবাহিত থাকিয়া যায়—আজীবন কুমারীও থাকে। এইরূপ অবিবাহিত মেয়েরা অধিকাংশ স্থলে আমাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ‘জোমো’ হয়। বাৎসরিক পরের চড়াইয়ে দুইটি ‘জোমো’ জীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী বলিতে পারিত। মস্তক দুই জনেরই মুণ্ডিত। এক জনের পরিধায়ে জাল বস্ত্র। উভয়ের গলাতেই ধালা। টুপির পরিবর্তে মাথায় কুমাল জড়ানো। স্বাভাবিক বহুপত্নী-প্রথার দরুন বাধ্য হইয়া এদের ‘জোমো’ হইতে হয়; আর দুর্বল এবং কম সুন্দরী হইলেও। তাহাদের কতক ত স্বভাবতঃই স্বর্গাভিমুখী হইয়া থাকে—তাহারা স্বৈচ্ছায় ‘জোমো’ হয়। ‘জোমো’ হওয়ার পরে পিতৃগৃহেই তাহারা থাকে। আমাদের কাছে ভিক্ষণী ভাষা শিখিয়া, ঐ ভাষার একখানি বই রাখে ও তার পূজা করে।

বিনা পয়সার মজুর

‘জোমো’ হইয়া দীক্ষা গ্রহণের পরেও কুমারীরা মাতাপিতার কাছেই থাকে—বাড়ীর কাজ করে। মাতাপিতা ইহাতে খুবই খুশি, কারণ ‘জোমো’ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিনা পয়সায় থাকিবে।

বহুপত্নী-প্রথা

ভাই যখন পৃথক হয়, গৃহে ‘জোমো’ না থাকিলে, চাষ-বাসের জন্য সে আর একটি বিবাহ করে। কিন্তু ইহা নিয়মের



একটি জোমো জীলোক

ব্যতিক্রমের মতই। বহুপত্নী-প্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত নহে। চীনা যাত্রার পথে সড়কের উপরে ঘেঁষ-রক্ষকদের তাঁরু সারি সারি। তাঁবুর এক যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘তোমার বিয়ে হয়েছে?’

‘না, এখনও হয় নি।’ তাহার কণ্ঠস্বরে ও চেহারায় বেদনা ফুটিয়া উঠিল। পাশে তার ভাই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—‘আমাদের পাহাড়ী মেয়েদের বিয়ে চব্বিশের আগে হয় না।’ তরুণীর বয়স কুড়ির কাছাকাছি।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বহুপত্নী-প্রথা যেমন কিন্নর-দেশে প্রচলিত, তেমনি বিবাহ-বিচ্ছেদও। বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার পতি-পত্নী উভয়েরই আছে। বিচ্ছেদের পূর্বে তাহারা নিজ নিজ ব্যবস্থা করিয়া লয়। বিচ্ছেদের অমুমতি লইতে হয় জীর পিতার কাছ হইতে। অতএব মেয়ে যখন বাপের বাড়ী যায় তখন তালাক হয়। কেহ যদি পতিগৃহ হইতে কোন জীলোককে ফুসলাইয়া লইয়া যায় ত তাহাকে পূর্বপতির প্রার্থিত টাকা দিতে হয়—দুই শতও হইতে পারে। তালাক মাতাপিতার অমুমতিতে হইলে আগে পাঁচ হইতে কুড়ি টাকা মাত্র।

জী বিক্রয়ের বস্তু

ভারতীয় সংবিধানের ২৩ : ১ অনুচ্ছেদে আছে : ‘মামব-পণ্য (জী ও বালকের ক্রয়-বিক্রয়), বেগার, খাটান, অথবা

ভবিষ্যৎ জোর-জবরদস্তি শ্রম আদায় নিষিদ্ধ করা যাইতেছে। এই বিধির উল্লেখন অপরাধ বলিয়া পরিগণিত ও আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।’

মনে হয় সংবিধানের এই অঙ্গচ্ছেদের প্রতি হিমাচল প্রদেশ-সরকারের দৃষ্টি আজও আকৃষ্ট হয় নাই। আজও সেখানে জী-বিক্রয় এবং বেগার খাটানো ইত্যাদি সবই চলিতেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্ত টাকা আদায় জী-বিক্রয়েরই সামিল। এ কথা যখন লিখিতেছি তার মাত্র দুই দিন আগে আশ্রমের সমুখ দিগ্ন রোক্তমান্না একটি মেয়েকে পুলিশ ধরিত্তা লইয়া গেল। তাহার বিব্রতের ওয়ারেন্ট ছিল এই: তার একাধিক পতি ধানায় অভিযোগ করিয়াছে,—সে না বলিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। ভর্তুকির পতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘ব্যাপার কি?’ উত্তর পাইলাম:

‘শ্রী অপর কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাই বাপের বাড়ী চলে গেছে।’

‘তোমরা তাকে রাখতে চাও, এই না?’

‘না।’

‘তবে কি চাও?’

‘যার কাছে এ যেতে চায় তার কাছ থেকে আমাদের টাকা নিয়ে দিক; ব্যস, এই আমাদের কথা।’

‘কত টাকা?’

‘শাজীদা, আপনি ত জানেনই যে আজকাল সব জিনিষই মাগুপি; ছোট একটা ছাগি তা-ও এক শ’ টাকার কম মেলে না। বিয়েতেও খরচ হয়েছে। টাকার অভাবের কথা ধরতে যান ত এই জীর জন্ত আমাদের দাবি কম পক্ষে দু’ হাজার।’

‘জী ত গুরু-মোষ নয় যে এরূপ দাম তুমি করছ? বিয়েতে খরচ হয়েছে ত তার জন্তে জী দায়ী কেন হবে? ভাল, সে ত তোমাদের ঘরে অনেক দিন ছিল। সে তোমাদের কাজ করেছে। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। মূল্যই যদি বার্ষ্য করবে ত এ সবে মূল্যও তোমার ঘরতে হবে।’

‘শাজী মহাশয়, আপনি নূতন আইনের কথা বলছেন। আমাদের পাহাড়ে চিরকাল যে আইন চলে এসেছে তাই চলবে। জীদের কাছ থেকে যদি এরূপ আদায় না করা হয় ত তারা স্বাধীন হয়ে যাবে। একের অধিক পতির কাছে

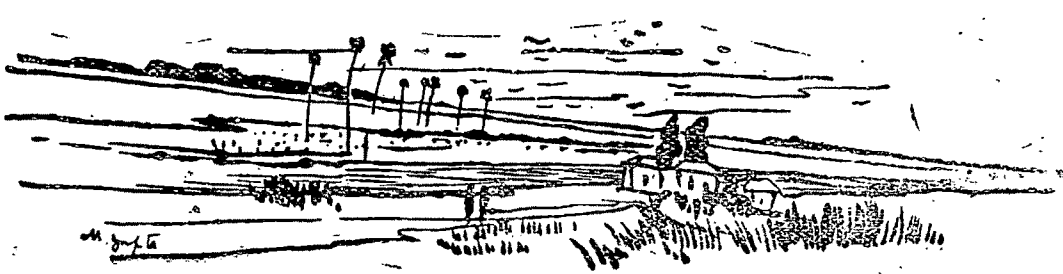
থেকেও জী আজ ভালাক চাচ্ছে। আপনি ত সবই জানেন। মূল্যবস্তির জন্ত এখন মেয়ে ও মোষের দাম বড় আক্রা।’

এ কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমার কানে ধ্বনিত হইতেছে ‘মেয়ে ও মোষের দাম বড় আক্রা।’ ইহা জী-বিক্রয় নয় ত কি? জীদের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিতেই হইবে; স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে রচিত নূতন সংবিধানোক্ত সুবিধাও এদের দিতে হইবে।

হিমাচল প্রদেশ প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রশাসিত স্থান। অতএব এই দিকে কেন্দ্রীয় সরকারেরই দৃষ্টি দিতে হইবে। নূতন বিধানে দেশের পুরানো আইন-কাহ্ননের রদবদল করা হইয়াছে। তদ্রূপ পুরাতন দেশীয় রীতি-প্রথারও আবৃত্তিক পরিবর্তন করা কর্তব্য। এই সব প্রথা আদালতে আইনের মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। যে সব স্থানীয় প্রথা নূতন সংবিধানের বিরোধী যাহাতে সেগুলি আদালতে গ্রাহ্য না হয়, অন্ততঃ পক্ষে এ নির্দেশ ত আদালতগুলিকে দেওয়া চাই-ই।

অভিশপ্ত নারী

অধোপার্জনের উপায় হিসাবে কিয়দ-দেশে নারীর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তার নিজের স্থান নেহাউই ছীন। পুরুষ লালস ধরে ও কুড়াল চালায়। ব্যস, ইহার অধিক কিছু সে করে না। সব কাজ জীলোকদেরই করিতে হয়। ক্ষেতে জল ধরার পালা যদি রাজিতেও পড়ে ত সারা রাত জাগিয়া জীদেরই সে কাজ করিতে হয়। এ কাজটাও মেয়েদেরই। ছ’কা টানিতেই পুরুষেরা সমধিক ওস্তাদ। যে পুরুষ নিজে ক্ষেতে কাজ করে, লোকে তাকে রূপার চক্ষে দেখে—ভাবটা এই: আহা! গরীব বেচারী কি করে। ধরে ত তার মেয়েমানুষ নাই, তাই নিজ হাতেই করতে হয়। সকাল পাঁচটা হইতে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করিয়াও জীর নিস্তার নাই। রাজে নিজ ঘরে একাধিক পতির সন্তোষবিধান তাহাকে করিতে হয়।—যে নারী এত কাজ করে, যাহার আর্থিক গুরুত্ব এত বেশী, সে স্বং নিঃস্ব। ভাল-মন্দ কোন রকমের বাড়ী এখানে নাই যে প্রসব-কালে সহায়তা পাইবে। স্তত্রাং প্রসব-কালে বহু জীলোকের অকালমৃত্যু ঘটে।



কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা সত্যই আশ্চর্যম্বিত। শুধু তাই নয়, ভুলে যাওয়া আমাদের ঘেন্না ঋণ। নইলে মাত্র বারো বছর পূর্বে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী মারা গেছেন, এর মধ্যেই আমরা তাঁকে ভুলতে বসেছি। অথচ তিনি ছিলেন বাংলার একজন খাঁটি কবি।

কবি ভুজঙ্গধরের পিতৃনিবাস চব্বিশ-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিবহাটি গ্রামে। ১৮৭২ সনের আগষ্ট মাসে পিতার কর্মস্থান মেদিনীপুরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে পুরীতে। পুরীর সমৃদ্ধ সৈকতেই ভুজঙ্গধরের কবিত্ব-শক্তির উদ্বেগ হয়। এগার-বারো বৎসর বয়সে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন।

পুরী থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। তারপর কলকাতায় আসেন কলেজে পড়তে। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজ কবিদের কাব্যের প্রতি তাঁর মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। শেলী, বাসরগ, কীটস ছিলেন তাঁর নিত্য-সঙ্গী। তাঁর বহু কবিতার রচনাকাল ১৮৯৩ সন। এই সনেই ভুজঙ্গধর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর বছর ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পাস করেন।

ভুজঙ্গধর আইন পরীক্ষায় সাকল্যালাভ করে ওকালতী কর-বার জন্ত ১৮৯৭ সনে জলপাইগুড়িতে যান। সেখানে ছিলেন ১৯০০ সন পর্যন্ত। ভুজঙ্গধরের কবি-মানস কিন্তু সর্বত্রই সক্রিয় ছিল। এই জলপাইগুড়িতে বসেই শশীভূষণ নির্যোগীর সহায়তায় “জিশ্রোতা” নামক একখানা মাসিক পত্রিকা তিনি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করেছিলেন। এর পর তিন মাস মাত্র হাজারিবাগে ছিলেন, ওকালতীতে সেখানে সুবিধা হয় কিনা পরেই বলা যায়। এর পরেই তিনি নিজ মহকুমা বসিরহাটে চলে আসেন।

বসিরহাটে ভুজঙ্গধর ওকালতী আরম্ভ করলেন। তিনি যদি শুধু ওকালতীই করতেন, বনখর্বো অল্প দশ জনের মত তথাকথিত বড়লোক হতে পারতেন। কিন্তু এতে তাঁর মন উঠল না। কাব্যলক্ষীর সেবাত্তেই তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজে-কেনে নিয়োজিত করলেন। পল্লী-জননী তাঁর সমগ্র মন-প্রাণ জুড়ে ছিলেন। যত্নাকাল পর্যন্ত তিনি বসিরহাটেরই স্থায়ী বাসিন্দা রইলেন। ছারোপা অস্থলের চিকিৎসার জন্ত শেষ সময়ে মাস দুয়েক তাঁকে কলকাতায় থাকতে হয়। ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হলেই তিনি স্বস্থানে ফিরে যাবেন এই ছিল তাঁর কামনা। কিন্তু বিধি বাম। তাঁর অস্থলের আরোগ্য হ'ল না। ১৯৪০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি ইহাশ্বম ত্যাগ করেন।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ভুজঙ্গধর বসিরহাটে বাস করে-

ছিলেন। তিনি এখানে থেকেই বরাবর সার্থকভাবে কাব্য-লক্ষীর আরাধনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর বহু কবিতা দেশবহু চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত নারায়ণে, এবং মানসী ও মর্শ্ববাণী, ভারতী, হিন্দু পত্রিকা ও অন্যান্য বহু খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ সন থেকে যত্নের কিছু পূর্বে পর্যন্তও তিনি অবিরত কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রচিত কবিতা ও কাব্য-সমূহের কিয়দংশ মাত্র পুস্তকে এখিত হয়েছে।



কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

বসিরহাট ক্রমে বাণী-চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভুজঙ্গধর ‘বাণী-সম্মিলনী’ নামে একটি সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সম্মিলনীর সভাপতিরূপে জলধর সেন, নিখিলনাথ রায়, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী ও ঔপন্যাসিক বসিরহাটে গিয়েছেন। ভুজঙ্গধরই ছিলেন তাঁদের প্রধান আকর্ষণ। তিনি ‘পল্লীবাণী’ নামে একখানা মাসিক পত্রও অতি যোগ্যতার সহিত বহু বৎসর ধরে সম্পাদনা করেন। পল্লীবাসীর আদি-ব্যাধি, আশা-আশঙ্কা, সুখ-দুঃখের কথা ‘পল্লীবাণী’ দিকে দিকে প্রচার করত।

ভুজঙ্গধর পণ্ডিত-প্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং দেশবহু চিত্তরঞ্জনের প্রীতিলাভ করেন বিশেষভাবে। তাঁর আধুনিক বৈষ্ণব কবিতাবলী দেশবহু প্রিয় ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে ভুজঙ্গধরের পাণ্ডিত্য দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথের বিশেষ আদরের বস্তু ছিল। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর ‘গীতা’র (পঞ্চাঙ্গবাদ, প্রকাশকাল ১৩৪৩) ছমিকাই শুধু লেখেন নি, এর পূর্বে

১৩২০ সালে প্রকাশিত কবিতা-পুস্তক ‘ছায়াপথ’র ভূমিকার তিনি ভূজঙ্গধরের কবি-প্রতিভারও প্রশংসা দিয়েছিলেন।

এবার আমরা তাঁর কবিতাবলীর আলোচনার আসি। ভূজঙ্গধরের কবিতাকে আমরা প্রধানতঃ দু’ভাগে ভাগ করতে পারি—মৌলিক কবিতা এবং অম্ববাদ কবিতা। আগেই বলা হয়েছে, যেমন ইংরেজী ভেমনি সংস্কৃত সাহিত্য তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে, অম্ববাদের ভিতর দিয়ে এর সারবস্ত্র সরস করে পরিবেশন করতে তিনি সমর্থ হন।

ভূজঙ্গধর কবিতা রচনা করতে গিয়ে শিশু ও কিশোরদের ভোলেন নি। আমরা স্থলে পাঠকালে একবার এবং কলেজে দ্বিতীয়বার ঐর ‘এলিজি’ পড়েছি। ভূজঙ্গধর এর যে রসসিক্ত অম্ববাদ “পল্লীসমাধি-গাথা”র (১৩২৫) দিয়েছেন তা সত্যই অম্বপম। এর ছুটি শব্দক মাত্র আপনাদের শোনাব। স্থলের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন।—

“কত নিরমল রতন উজ্জল অগাধ অতল আধারময়
রহে জলধির গোপন গরভে লোক-লোচনের দূরে,
নয়ন আড়ালে ফুটিয়া বিরলে মধুভরা কত কুসুমচয়,
বিলার সুরভি উলাস পবনে বিকল মরুর পুরে।

হেথা চিরতরে হয়ত বা কোন ঘুমাণ গ্রাম্য শিবাজীবীর
জনম যাহার দমিতে ক্ষেত্র-স্বামীর অত্যাচার,
হেথায় মৌনী অধ্যাত-নামা কবি কালিদাস রাখিল শির,
স্বজন-শোণিত-ক্ষরণ-রক্ত প্রতাপাদিত্য আর। (পৃ. ৪)

এই অম্ববাদে ‘ক্রমওয়েলে’র বদলে ‘শিবাজী,’ ‘মিণ্টনে’র পরিবর্তে ‘কালিদাস’ ও হ্যাম্পডেনের স্থলে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ লক্ষণীয়। সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকেও তিনি বিস্তর পদ্যাম্ববাদ করেছিলেন, এর ভিতরে মাত্র ‘সতী’ (১৩৩৪), ‘গীতা’ (১৩৪৩) ও চণ্ডী (১৩৪৯) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ ‘গীতা’র ভূমিকায় বলেছেন, ভূজঙ্গধর আক্ষরিক অম্ববাদের পরিবর্তে ভাবাম্ববাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এর ভাল-মন্দ হৃদিকেই আছে। কিন্তু ভূজঙ্গধরের অম্ববাদ, নিজের কবি বলে, বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। শারদীয়া সমাগণ। ভূজঙ্গধর-রক্ত চণ্ডীর অম্ববাদ থেকে একটি শব্দক মাত্র আপনাদের শোনাচ্ছি :

মঙ্গল যাহা	তারি মঙ্গল-কূপ
কল্যাণি। তব	কল্যাণতম রূপ
পরম শান্তি	অদ্বয় তুমি শিবা
নিশান্ত রূপা	তুমি আনন্দ দিবা।
অর্থ-সাধিকা	অযতের তুমি দাজী
তুমি মা জীবের	পরম শরণ পাজী।

তুমি মা গৌরী জ্যোতির তুমি মা জ্যোতি
জিলোক জিগুণ জিদেবের তুমি গতি।

জয় জয় জিনরনী।

নমি তোমা নারায়ণি। (পৃ. ১৫৯)

ভূজঙ্গধরের মৌলিক কবিতার মধ্যে ‘শিশির’ (১৩১৮) কিশোরদের জন্য রচিত। ‘মঞ্জীর’ (৭); ‘গোধূলি’ (১৩১৮) ‘ছায়াপথ’ (১৩২০), ‘রাকা’ (১৩২৩) তাঁর কয়েকখানি প্রসিদ্ধ কবিতা পুস্তক। শেষ পুস্তকের নামানুসারে তিনি ‘রাকার কবি’ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। ‘মঞ্জীর’-এর কবিতানিচয় অধিকাংশই ১৮৯২ থেকে ১৮৯৯ সনের ভেতরে রচিত। বাকুড়ার অবস্থানকালে ৯/৩/৯৩ তারিখে রচিত ‘মাসবীলতা’ শীর্ষক কবিতার প্রথম ক’পংক্তি এই :

“কোমল ও তনু দিয়ে জড়াবে
সমস্ত শরীরখানি নিঃ-বিত্তপীর
ভিজ্ঞ প্রাণ সিক্ত কর প্রেমরস ঢালি’
কে তুমি গো প্রেমময়ি ?” (পৃ. ১৩৬)

আবার ‘গোধূলি’ কাব্যে ‘শরৎ’ শীর্ষক কবিতায় পাই :
আকুল করিছে মহী হৃদয় পবন বহি’
পুষ্পভার-মত শাখে মধুগ-বন্ধার,
মধুর পিঙ্গাসে অলি ফুটাইছে ফুল-কলি,
প্রিয়া-বিরহিত চিতে জনমে বিকার।

মেঘ-গুপ্ত মুক্ত করি’ চন্দ্রমুখী বিভাবরী
ছোঁছনা-হুকুল পরি’ করে বলমল,
কণ্ঠেতে তারার মালা মরি কি রূপসী বালা
বিকচ যৌবন-রসে করে টল টল। (পৃ. ৭৮)

‘রাকা’র কবি-চিন্তা যেন সকল দিকেই পরিণতি লাভ করেছে। অধ্যাত্ম-চিন্তা তাঁর মনকে সাধারণের অনধিগম্য স্তরে নিয়ে যায়। আবার বৈষ্ণব সাহিত্যও তাঁকে দীন হতে দীনতর করে তোলে। তাঁর আত্ম-জিজ্ঞাসা বেড়ে চলে। এখানে এসব কথা বিশদ ভাবে আলোচ্য নয়—মাত্র ‘রাকা’র প্রথম কবিতাটি (পৃ. ৩) আপনাদের শুনিতে স্বভাব-কবি ভূজঙ্গধরের স্মৃতি-তর্পণ সাদ্ধ করি :

“না ফুরাতে সঙ্গীতের দ্বিতীয় চরণ

কেন গেল ধামি ?

না আসিতে অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন-তপন

কোথা গেল নামি ?

কেন ফুল পড়ে ধসি না হইতে বাসি,

কার অভিলাষে ?

বসন্তের মাঝখানে কেন বর্ষা আসি

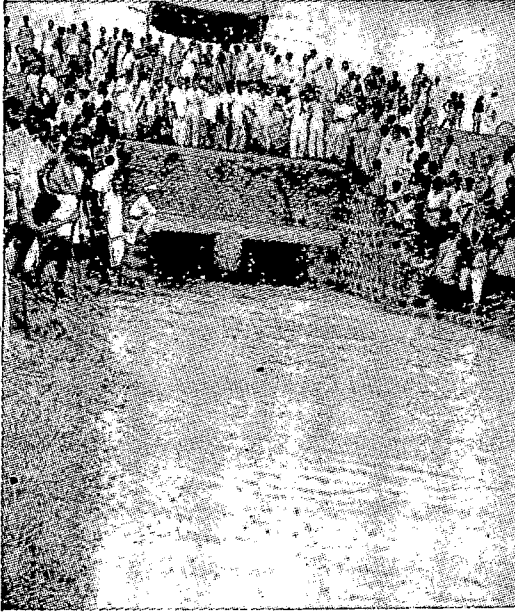
সহসা বিলাপে ?”

* অল-ইন্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত ও বোতার-কর্তৃপক্ষের অম্বয়োদনক্রমে প্রকাশিত।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলার উন্নয়ন

শ্রীকেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে বাঁকুড়া জেলার স্থান। এই জেলা এক দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অল্পম, অন্য দিকে ইহার অধিবাসিগণ যুগব্যাপী অনাবৃষ্টি, প্রাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দুর্ভিক্ষ ও নিদারুণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। জেলার আদি অধিবাসীদিগের এক অংশ দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে মানভূম ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খাদে কাজের চেষ্টায় চলিয়া যায়, অন্য দিকে দামোদরের বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়ায় আরও বহুলোক সর্বস্ব বেচিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

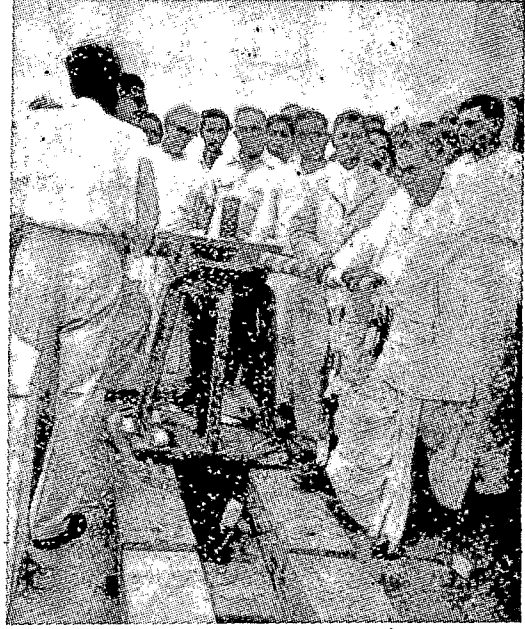


শুভঙ্কর দাঁড়ার সেচনালীর দৃশ্য

এইভাবে লোকক্ষয় হওয়ার ফলে এই জেলার অনেক জমি পতিত হয় এবং দেশের সাধারণ শ্রম-সম্পদ ক্রমেই কমিতে থাকে। বর্তমানে জেলার আয়তন অল্পপাতে কৃষিক্ষেত্র শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র এবং উহার কয়ল ও রেশমী কাপড়, তামা-লোহা-পিতলের বাসন ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ কুটীরশিল্প ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

বিষ্ণুপুর-রাজের অধীনে এই অঞ্চল শৌর্যবীর্যে দুর্দ্ব বলিয়া ইতিহাস-প্রখ্যাত ছিল। যোগল-পাঠান, বর্গী-মরাঠা, কেহই ইহাকে বশে আনিতে পারে নাই, এবং সেই গৌরব-

ময় অতীতের স্মারক গাথা-কাহিনী ও স্মৃতিচিহ্ন আজও এই দেশের রাজধানীর আশেপাশে রহিয়াছে। কিন্তু ১৯০৫

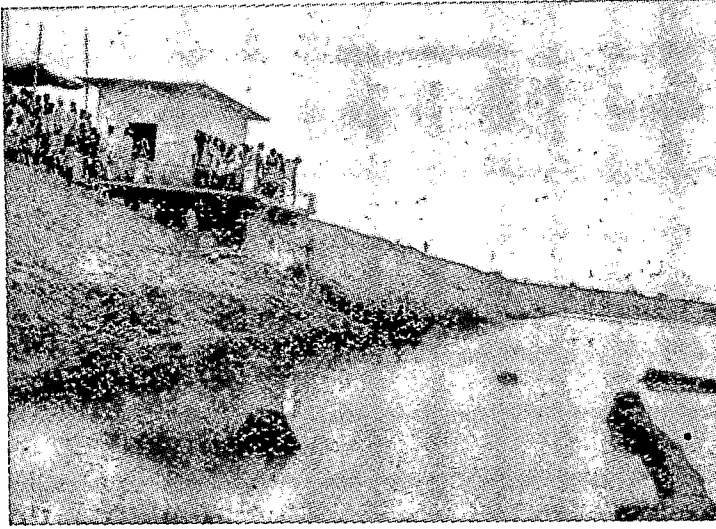


শ্রীভূপতি মহম্মদার কর্তৃক শুভঙ্কর দাঁড়ার জলযুগ উন্মোচন

সালে বি. এন. রেলওয়ের লৌহবস্ত্র দেশের জননিকাশের পথ নষ্ট করে এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া মহামারীর ন্যায় দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যে বাঁকুড়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও হাজারিবাগ হোটনাগপুরের ন্যায় স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, যাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে বাগদি, রজপুত, মাল, লোহার ইত্যাদি জাতি অতি সবল ও শক্তিশালী ছিল, আজ সেখানকার লোক রোগক্লিষ্ট, উত্তমবিহীন, জীর্ণশীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সর্বপ্রথমে দেখিতে হয় বাঁকুড়াবাসীর এই নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ কি?

বাঁকুড়ার শ্রীসম্পদ ছিল কৃষি, কুটীরশিল্প, অরণ্য ও পশুচারণ ভূমিতে। বাঁকুড়ার ভূপৃষ্ঠ বাংলার অন্যান্য জেলার মত সমতল নহে, রাঢ়ের অন্য অঞ্চল অপেক্ষাও ইহার অধিক গিরি-উপত্যকা ও পার্বত্য নদ-নদীপূর্ণ। জমি সমতল না হওয়ায় বর্ষাকালের জল কৃষিক্ষেত্রে অল্পই দাঁড়ায়,



শুভঙ্কর দাঁড়ার বাঁধ

ডাঙ্গা বা ঢালু জমিতে একেবারেই থাকে না। সেইজন্য এই অঞ্চলের চাষী জল ধরিয়া রাখিবার জন্য উঁচুনীচু জমি ধাপে ধাপে বাঁধিয়া রাখে (terrace cultivation) এবং বিষম কার্যিক পরিশ্রমে, জলের আগম-নির্গমের পথ স্বসংবদ্ধ করে। এ অঞ্চলের নদ-নদী শ্রোতস্বতীতেও জল বেশী দাঁড়ায় না, কখনও বা নদীতে প্রচণ্ড বন্যা, কখনও বা তাহার জলরেখা শীর্ণ ও ক্ষীণ।

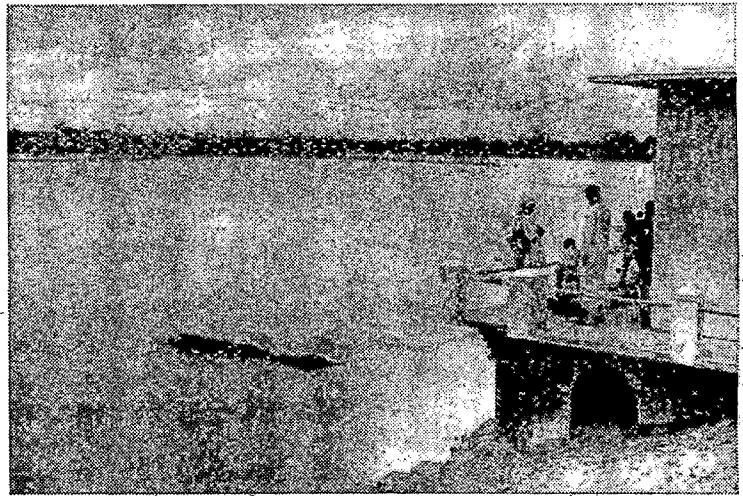
পূর্বেকার দিনে বাঁকুড়ার গিরিমালা ও অধিত্যকা বনরাজিপুর ছিল। বর্ষার জল বনের বৃক্ষগুলোর পাতায় ডালে ও শিকড়ে বদ্ধ হওয়ায় ধীরে ধীরে মুক্ত হইত, ফলে নীচের জমি ঐ জল অনেক দিন পাইত ও সরস থাকিত। সে সকল বন মানুষের অদূরদর্শিতার ফলে আজ নির্মূল হইয়াছে, শালের বন রেলের স্পিয়ার, কয়লার খাদের খুঁটি ও জালানি কাঠে পরিণত হইয়াছে। যে কাটিয়াছে সে ভবিষ্যতের দিকে তাকায় নাই, সুতরাং চাষা রাখিয়া বন বাঁচাইবার চেষ্টা হয় নাই। এখন বর্ষার প্রবল বারিপাতের জল দ্রুত গড়াইয়া নদী-নালায় জোরে পড়ে এবং সেখানে প্রচণ্ড গতিতে বান ডাকিয়া সমুদ্রের দিকে ধাইয়া যায়—চাষার প্রয়োজনের সময় নদীতে থাকে বিশাল বালুতটের মধ্যে অতি ক্ষীণ জল-রেখা। শুধু তাই নয়, এরূপ প্রচণ্ড বেগে জল নামিবার ফলে উঁচু

জমির বৃক্ষ চিরিয়া ফাটল দেখা দেয়, প্রশস্ত ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়ের চিহ্ন—“খোয়াইয়ে” ভরিয়া যায়, পথ-ঘাট লোপ পায়—এরূপ ভাঙন ফাটলের ফলে ক্রমে শস্তের ক্ষেত্রও যায় খোয়াইয়ের কৃষ্ণিতে। এই ভূমিক্ষয় (erosion) ও জলাভাব বাঁকুড়ার চাষীর মারণাস্ত্র।

অতীতেও ছিল এই জলসমশ্রু, কেননা বন-জঙ্গল জলধারার গতিবেগ হ্রাস করে, জল ধরিয়া রাখিতে পারে না। অথচ জল পাইলে চাষী একই জমিতে দুই ফসল, এমন কি তিন ফসল ফলাইতে পারে। সেই কারণে আগেকার দিনের রাজা ও বিত্তশালী লোকেরা দরিদ্র প্রজার সহায়তার জন্ত ঐ জলের পথে বিরাট জাদ্বাল বাঁধিয়া বিস্তৃত জলাধার “বাঁধ” রচনা করিয়াছিলেন।

উপরন্তু ঐ সকল জলাধার এবং বর্ষার জলে স্ফীত নদ-নদীবক্ষ হইতে কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য সুন্দর ও সুপরিকল্পিত সেচখাল—যাহা এ অঞ্চলে “দাঁড়া” নামে পরিচিত—কাটা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরজের দেওয়ান গণিতশাস্ত্রবিদ্যারদ, কায়স্থকুলতিলক শুভঙ্কর রায়ের “শুভঙ্কর দাঁড়া” বিখ্যাত।

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে চাষী সম্বৎসর জল পাইত এবং পরিশ্রমের পরিবর্তে তাহার গোলা ধান, সরিষা, গম, কলাইমটরে পরিপূর্ণ থাকিত। চাষীর অর্থের অনটন ছিল না, সুতরাং কামার, কুমার, কাঁসারী, ছুতারের ক্রেতার অভাব

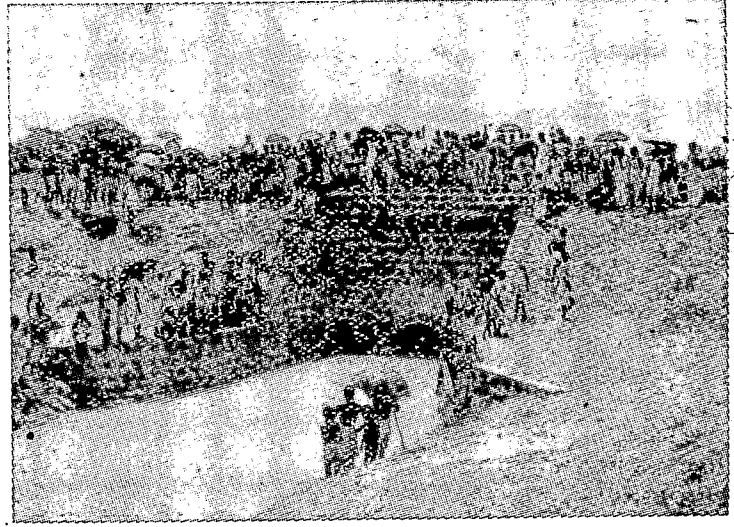


শুভঙ্কর দাঁড়া—জলাধার

ঘটিত না; বনে প্রান্তরে পশুচারণের
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ছিল, স্তত্রবাং দুধ ঘি
ছাড়াও ভেড়ার পশম প্রচুর পাওয়া
যাইত; বনে তসরের গুটি ছিল
অপর্যাপ্ত, উপরন্তু নিপুণ কুটারশিল্পী
ঘরে তুঁত পাতায় গরদ-রেশমের গুটি-
পোকা পালন করিত। কার্পাস জন্মিত
বড় নদ-নদীর পাড়ের জমিতে। স্তত্রবাং
দেশে অন্ন-বস্ত্র এমন কি শীতবস্ত্র ও
উৎসবের বস্ত্রও ছিল প্রচুর। মাত্র
বিশ বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়ার কঞ্চল,
বিষ্ণুপুর সোনাখোর গরদ-তসর ছিল
প্রসিদ্ধ, সস্তা ও টেকসই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, যখন ভাবী
দুর্দিনের ছায়ামাত্র দেখা দিয়াছে,
আমরা দেখিয়াছি বাঁকুড়ার চাষীকে
উন্নতদেহ, সবল সুপুষ্ট ও শ্রমপটু,
গৃহস্থকে দেখিয়াছি অভাবমুক্ত ও প্রসন্ন, যদিও তখনই
অতীতের উত্তরাধিকার আমরা হেলায় ও নিশ্চিন্ত ভাবে
জুত খোয়াইতে চলিয়াছি।

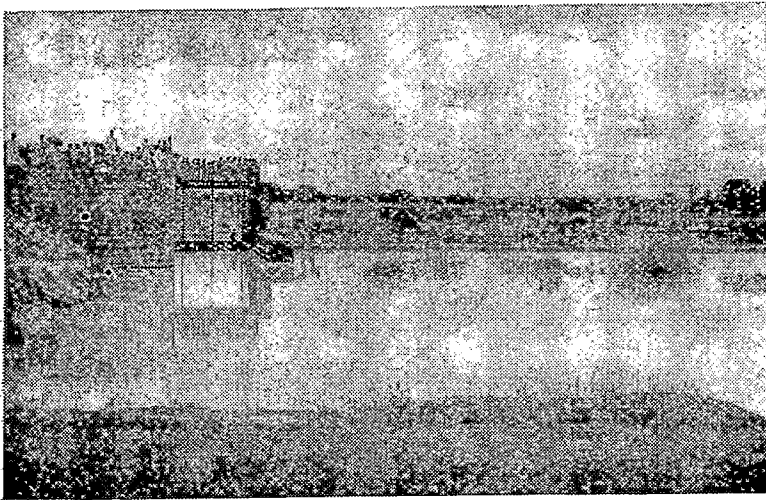
এই সেদিন এক বিদেশী-শিক্ষার ছাপযুক্ত, বিচার-বুদ্ধি-
হীন বাচাল উচ্চকণ্ঠে বলিতেছিলেন, “চতুর্দিকে, বাজারে
বার-লাইব্রেরীতে, লোকে বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা বিদেশী
সরকার ছিল শতগুণে ভাল।” যদি তাঁহার ক্ষণ মস্তিষ্কের
ক্ষমতা থাকিত বিগত দেড় শতাব্দীর স্মৃতি ধারণ করার,
যদি তাঁহার চপল বুদ্ধির শক্তি থাকিত বিদেশীর শেখানো
বুলি উচ্চারণ করার বাহিরে, তবে তিনি বুঝিতেন এ কথা
বলা কত বড় মূর্থতার পরিচায়ক।



বিড়াই খালের সেচনালীর মুখ

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ ইংরেজ কোম্পানীর সহজ অর্থাগর
ও ইংরেজ বণিকের ধনলুপ্তনের পথ স্বগম করিবার জন্য
নির্মিত হয়, ঐ রেলের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের পথঘাট অবহেলায়
নষ্ট করা হয়, কেননা যদি পথ-ঘাট ঠিক থাকে তবে দ্রুত
দেশের শ্রমপটু লোক পয়সা খরচ করিয়া রেল চড়িয়েই বা
কেন, মালই বা রেলপথে পাঠাইবে কেন? যাঁহারা প্রসিদ্ধ
“অহল্যাবাদিয়ার সড়ক” ও বীরভূমের শিউড়ি-হেতমপুর-
ইলমবাজারের পথ অল্পদিন পূর্বেও দেখিয়াছেন তাঁহারা
একবার মর্ম্ম বুঝিবেন। তারপর ই. আই. রেলপথ বাঁচাই-
বার জন্য দামোদরের বর্ধমানের পাড়ে উঁচু বাঁধ দেওয়া
হইল। ইহাতে জল চলাচলের

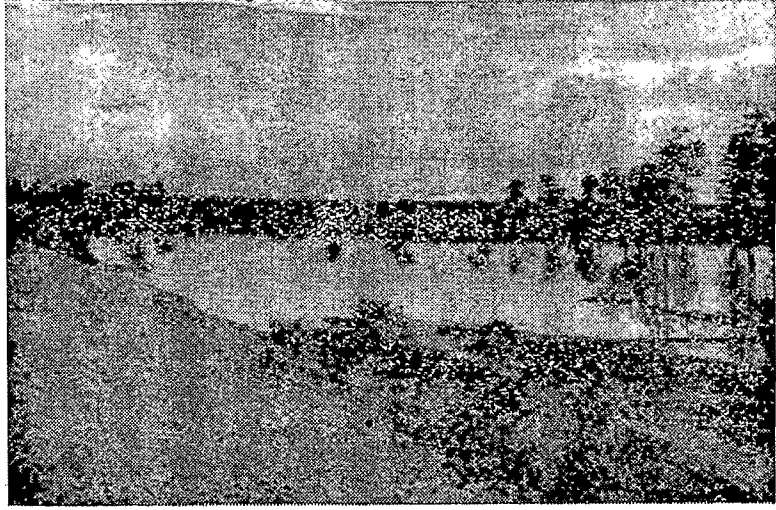
পথ নষ্ট হওয়ায় বর্ধমান ম্যালেরিয়ায়
বিধ্বস্ত হইল। সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ
বিধা জমি জলবদ্ধ হইয়া রোগের
আকর হইল, শস্যের ফলনও গেল
রসাতলে। অন্য পক্ষে বাঁকুড়ার
দিকে বাঁধ দেওয়া হইল না, কেননা
সেদিকে রেলপথ বা অন্য বিদেশী
স্বার্থের নিদর্শন ছিল না। দামোদর
এক পারে বাধা পাইয়া অন্য দিকে
রুদ্ধলীলা আরম্ভ করিল। বাঁকুড়ার
বিস্তৃত অঞ্চল বৎসরের পর বৎসর
বন্যায় ভাসিল। শুধু তাই নহে,
বাঁকুড়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেচখাল
বন্যার বালি ও পলিমাটিতে মজ্জিতে
লাগিল।



বিড়াইয়ের জলাধারের এক অংশ

দেশের বিশাল দীর্ঘ-বাঁধের সংস্কার পূর্বের দিনে রাজ-কোষ হইতে চলিত। বিদেশী-রাজের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা আরও কঠোর হইল, কিন্তু রাজস্ব-ব্যয়ের খাতে চাষী বা গৃহস্থ-সাধারণের প্রয়োজনের কথা উপেক্ষিতই ছিল। সুতরাং সংস্কার অভাবে সেগুলিও মজিল। দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে আমাদেবের উত্তম ও বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, সুতরাং আমরাও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিলাম না, কেবলমাত্র বিদেশীকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আজও সেই দাসত্বের বীজাণু আমাদের শিরায় শিরায় রহিয়াছে, তাই গালি ও নিন্দায় আমরা পঞ্চমুখ।

সমগ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁকুড়ার এই জলসেচ ও পথ ঘাটের সমস্যা অতি জটিল, কেননা এই অঞ্চলে সমতল ভূমি অল্প, গিরি-অধিত্যকা উপত্যকায় চতুর্দিকে বিস্তৃত। সুতরাং ঐ সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন, সেই সঙ্গে চাই প্রাদেশিক সরকারের সজাগ ও ক্ষিপ্ত কার্যকারিতা এবং দেশের লোকের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা। কোন একটি বিরাট সেচ-পরিকল্পনার সমস্ত জলসেচ-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে, কেননা জল নীচের



ভালুকা-জোড়ের জলাধার

দিকে যায়, উপরের জমিতে জলপ্রবাহ সাধারণভাবে লওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সমস্ত জেলা অনেকগুলি ছোট-বড় অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির জন্য পৃথক জলাধার গঠন ও ছোট-বড় জলনালী কর্তন ভিন্ন উপায় নাই। পথ-ঘাটের ব্যাপারে প্রাচীন, সহজে নির্মিত গ্রাম্য পথগুলির কিছু অংশ সংস্কার এবং সম্পূর্ণ নতুন স্থগঠিত রাজপথ (Arterial Roads) গঠন নিতান্তই প্রয়োজন।

বহুদিন হইতে জেলার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন। “প্রবাসী” সেই আন্দোলনের মুখ-পত্র ছিল ও আছে। কিন্তু ইতিপূর্বে বিদেশীর ও বিদেশীর

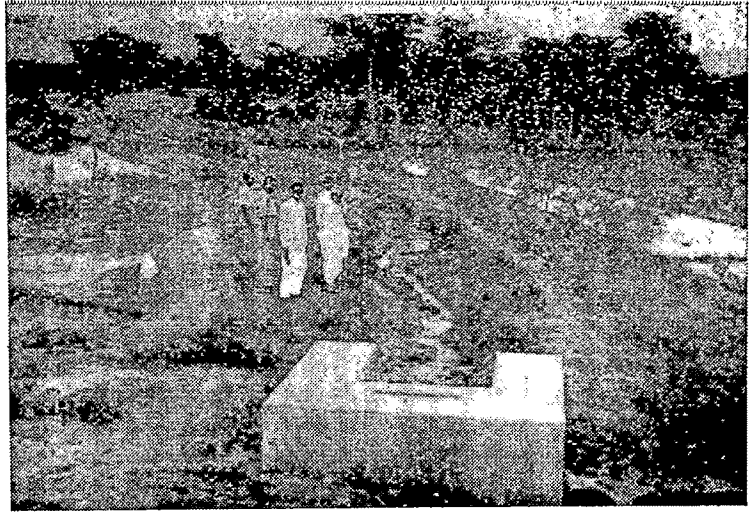
অগ্রহপ্রাপ্ত লীগ সরকারের অবহেলায় এবং আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় কিছুই হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সরকার কিছুকাল যাবৎ এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ইহার ভার সেচমন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদারের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। তাহারই নির্দেশে সেচ ও পথ-ঘাটের কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি এই দুই বৎসরের কাজের ফলাফল দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। প্রায় আড়াই শত মাইল ঘুরিয়া বাহা দেখিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত-বিবরণ দিতেছি।



ভালুকা-জোড়ের বাঁধ

প্রথমেই বলি সেচের কথা। পূর্বে বলিয়াছি বাকুড়ায় ভূপৃষ্ঠ যেরূপ অসমতল তাহাতে এই জেলায় ময়রাঙ্গী পরিকল্পনা-জাতীয় একটি বিরাট সেচ-পরিকল্পনায় কৃষিসমৃদ্ধি পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য অসংখ্য ছোট-বড় বাঁধ ও সেচ-খালের প্রয়োজন। বর্তমানে দুইটি মাঝারি ও কয়েকটি ছোট পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে বা শেষ হইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি, “শুভঙ্কর দাঁড়া”র দশ-আনি ছয়-আনি অংশ ও বিড়াই-খালের এক অংশ।

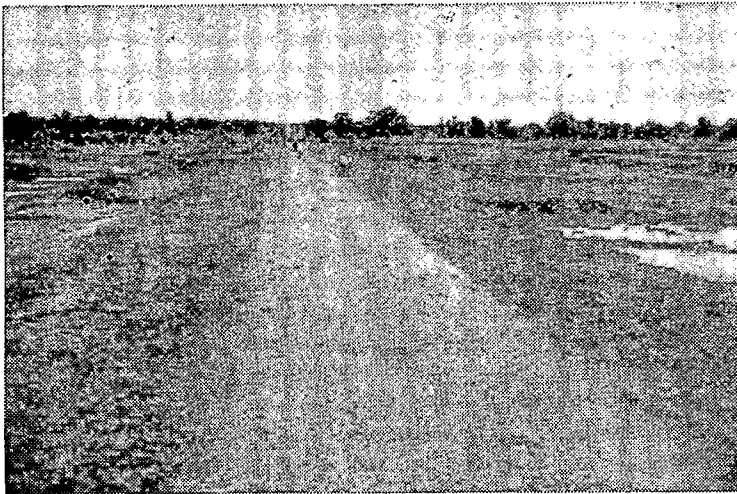


ভালুকা-জোড় সেচপথ

শুভঙ্কর দাঁড়ার দামোদরমুখী অংশ “দামোদর উপত্যকা” পরিকল্পনার অংশ, স্তত্রাং তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-গ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। যে অংশের নাম “দশ আনি ছয় আনি” তাহারই উদ্বার, তাহার জন্য বিশাল জলাধার গঠন ও নালী-প্রণালী সংযোগের কার্যই এ বৎসর শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দুই বৎসর পূর্বে এই প্রাচীন কীর্তির নিরর্থক ধ্বংসাবশেষ মাত্র ছিল। এখন চতুর্দিকের জলপথের মুখ বাঁধিয়া ও ফিরাইয়া, একটি বড় বাঁধ দিয়া, জলাধার গঠিত হইয়াছে এবং সেই জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া সেচ-খালের পথে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। এ

বৎসরই প্রায় ১৮০০০ বিঘা জমিতে উহার সাহায্যে চাষ হইয়াছে।

আমরা যখন ঐ অঞ্চল দেখি তখনও বৃষ্টির অভাবে চতুর্দিকের ক্ষেত খাঁ খাঁ করিতেছে, মাত্র চার-ছয় আনি জমিতে চাষা রোপণ হইয়াছে বা হইতেছে। শুভঙ্করের দাঁড়ার দুই পাশের জমিতে কিন্তু পূর্ণ আবাদ হইয়া বহুদূর-ব্যাপী হরিৎ ক্ষেতের শোভা দেখা যায়। আমরা উহার যেখানেই গেলাম চাষী দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল। বিড়াইয়ের জলাধার আরও বিস্তৃত ও গভীর হইবে।



ভালুকা-বানলা বাঁধপথ

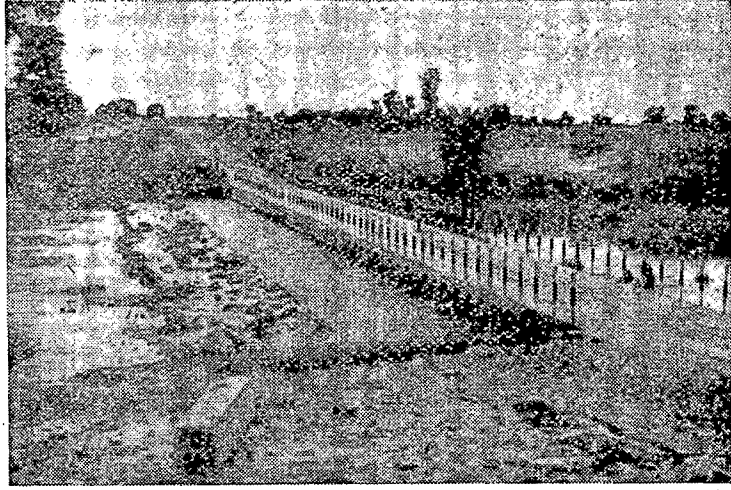
এ বৎসরই ১৫০০০ বিঘায় জল পাইয়াছে ও আবাদ হইয়াছে। বিড়াইয়ের পথে ওন্দা থানার নিকট দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জলাভাবে আবাদ হয় নাই দেখিলাম। বিড়াইয়ের জলাধারের নীচে আবার দেখিলাম ধানক্ষেতের শ্রামল শোভা। বিড়াইয়ের বিস্তারের ব্যবস্থাও দ্রুত চলিতেছে নজরে পড়িল।

ঐ দুইটি ছাড়াও দেখিলাম ছোট বড় অনেকগুলি বাঁধ, বাহা ছোট ছোট জোড় বা নালায় বাঁধ দিয়া জলাধার প্রস্তুত করিয়া জল-নিয়ামক যন্ত্র বসাইয়া সেচকার্যে লাগানো হইয়াছে। এরূপে ভালুকা জোড়ের মুখে বাঁধ গঠন করা হই-

যাচ্ছে যাহাতে এ বৎসরই প্রায়
৩০০ বিঘায় পূর্ণ জলদান সম্ভব
হইয়াছে।

ইহা ভিন্নও বহু ছোট বাধ ও
নালা দেখিলাম, তাহার কিছু
কৃষি-বিভাগ হইতে নির্মিত বা পুন-
গঠিত হইয়াছে। এগুলিতেও বহু
গ্রামের ক্ষেত জল পাইয়াছে ও
পাইতেছে।

এই সকল অঞ্চল পরিদর্শন
করিতে কয়েক ক্ষেত্রে পথের অভাব
বুঝিলাম। সেখানে জিপগাড়ীকে
নদী-নালায় পাড় বাহিয়া ডাঙ্গা
ময়দানের উঁচু-নীচু জমির উপর
দিয়া চলিতে হইল। কিন্তু বড়
বড় রাজপথগুলির সংস্কার করা
হইতেছে দেখিলাম এবং কয়েক স্থলে, যেখানে কখনও পথ
ছিল না সেখানে দেখিলাম সেতু ও কজংয়ে-যুক্ত প্রশস্ত
রাজপথ তৈয়ারী হইয়াছে। তালডাঙ্গরা-বানসা রাজপথ
উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। তাহার এক অংশে ১৪
মাইল পথ সরল রেখার মত পাহাড়-উপত্যকার উপর চলিয়া



জয়পাণ্ডা 'কজংয়ে'

গিয়াছে। উহা যেখানে জয়পাণ্ডা জোড়ের উপর গিয়াছে
সে স্থানটি বড়ই সুন্দর।

দেখিলাম অনেককিছু, আর বুঝিলামও অনেককিছু।
সে সকল কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

কোজাগরী

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

স্বচ্ছ সূর্য স্বপ্নালু নভে পূর্ণ চাঁদিনী লেখা,
মৌন প্রকৃতি নীরবে দাঁড়ায় কা'র আগমন লাগি';
জ্যোৎস্না-প্লাবিত বহুধার বৃক্ষে কা'র পুত পদ-রেখা,
পুষ্পিতা ধরা বসিতে তাহারে তাই কি র'য়েছে জাগি'।

অসীম উজ্জ্বলি' করিছে চাঁদিনী স্নানল বনানী-শিরে,
ভরল স্বর্ণ-ধারার আকুল ধরণী যে অবগাহি'।
শারদ-রাগীর শুভাশিস' করে দ্বিধা শিশির-নীরে,
অলপ-অমিষ্টা নামিছে ধরায় দীপ্ত জোছনা বাহি'।

বনপথে ফোটে শুভ শেফালি স্বপ্নল বাসে ভরা,
মনে পড়ে যায় দূর অতীতের বিস্মৃত যত স্মৃতি,
মালতী রজনীগন্ধা-সুবাসে সুরভিত আঁজি ধরা,
সারাদি পৃথিবী ছাপিয়া উঠিছে শান্ত প্রাণের গীতি।

জোছনা-উজ্জ্বল আঁজি এ নিশায় শারদ-লক্ষ্মী নাকি,
নামিবে মরতে মানবের লাগি' দীপ্ত-কনক-রথে;
কল্যাণ-দানে ভরিবে জুবন কিছুই হবে না বাকি,
কত না শান্তি, স্নেহমা জাগিবে ধরণীর গুলিপথে।

কোন্ সে অতীতে কোন্ সে ললনা এমনি জাগিয়া নিশি,
পেয়েছিল তাঁর বহু-বাহিত দুর্লভ দরশন;
কে আঁজ জাগিয়া এমনি সাধিয়া কত শত দিশি দিশি,
শারদ-লক্ষ্মী কিরৈছিল যবে গৃহে গৃহে অগণন।

আবার এসেছে আঁজি সেই নিশা, ওগো বধু ভূমি আজ,
নিদ্রাবিহীন নয়নে তোমার জেগে থাক সারা রাত্তি;
মন্দির ভব যুক্ত ধাক্কাক রেখে দিও শত কাজ,
বরুক শেফালি, ফুটুক দোপাটি, জলুক কনক-বাতি।

পূর্বপুরুষের নামকীৰ্ত্তন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পিতৃপক্ষে পূর্বপুরুষের নামে জলাঞ্জলি দান আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও অনেকে করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই অনুষ্ঠানের একটা মূল্য আছে যাহা উপেক্ষণীয় নহে। সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যে এক পক্ষকাল কিম্বা অন্ততঃপক্ষে মহালয়ার একদিন পূর্বপুরুষের নামমালা যথাযথ স্মরণ করিয়া পারিবারিক ইতিহাসের মূল উপাদান অংশতঃ পরিরক্ষিত হয়। সারা বৎসরটা বিষয়কক্ষে মগ্ন থাকিয়া, ক্ষণকালের জন্ত এই পবিত্র কার্যে সকলেরই রুচি হওয়ার কথা, কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অথবা বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম ঠিকমত খুঁজিয়া বাহির করা এখন ঘরে ঘরেই প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সেকালে প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে এক পৃথক ঘটকসম্প্রদায় এই সকল নামমালা রীতিমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহ অধুনা বিলুপ্ত ও অনাদৃত হওয়ার পারিবারিক ইতিহাসের প্রামাণিক ও মূল্যবান উপকরণরাজি বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার স্থান অপ্রামাণিক ও কৃত্রিম রচনা দ্বারা পূরণ হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ে পূর্বপুরুষের বিশুদ্ধ নামমালা কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া জ্ঞানমরা প্রকাশ করিয়াছি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৮)। তদুপরে যাহাদের কোতুল উদ্ভিক্ত হইয়াছে তাঁহাদের গোচরার্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চারিজন বাঙালী মহামনীষীর পূর্বপুরুষের নামমালায় যে অনুপেক্ষণীয় ভ্রম চলিয়া আসিতেছে তাহা সংশোধন করিয়া লিখিত হইল। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহাদের বর্তমান বংশধরগণ কেহ এ বিষয়ে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনীর অংশবিশেষও ভ্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, এই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখিত হইল—ও তত্ত্ব পরিবার মাত্রেয় মনস্তপ্তির জন্ত নহে।

১। ভূদেবের পূর্বপুরুষ

স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১২৩০-১৩০১ বঙ্গাব্দ)

মহাশয়ের কুলপরিচয় ছিল “কামদেব পণ্ডিতের সন্তান”। মুখবংশের এই ধারার সাক্ষাতিক সংজ্ঞা “বিং মুং” সমস্ত কুলপঞ্জীতে পরিগৃহীত হইয়াছে—বিশ্বেশ্বর (সংক্ষেপে বিশো) নাম হইতে তাহার উৎপত্তি। আমরা পূর্ববং রাঢ়ীয় সামাজিক ইতিহাসেব যুগত্রয় ধরিয়া নামমালা বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সর্বস্বায়ত্ত্ব একটি মারাত্মক ভ্রমের কথা বলা আবশ্যক। ভরদ্বাজগোত্র রাঢ়ীয়

ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিপুরুষ “শ্রীহর্ষ”র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং এক সময়ে এই শ্রীহর্ষ নৈষধকার কিনা তদ্বিশেষে বহু বাদানুবাদ চলিয়াছিল। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার যে আজ শতাব্দিক বংসর মধ্যে একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেন নাই, প্রামাণিক লেখানুসারে এই শ্রীহর্ষ মোটেই গোড়দেশে আসেন নাই। সর্বপ্রথম আসিয়াছিলেন শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র “মেধাতিথি” এবং এই মেধাতিথির শ্রীহর্ষ নামে কোন পুত্র ছিল না। সুতরাং আদিশূরের সভাগত মেধাতিথি হইতে নামমালা কীৰ্ত্তিত হইলে শ্রীহর্ষের নাম তন্মধ্যে পড়েনা। নবদ্বীপে আমরা ঙ্গবানন্দ-রচিত অতি-দুল্লভ “মহাবংশাবলী” নামক গ্রন্থের কতিপয় পত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ “মুখ্যটীকুল” প্রায় সম্পূর্ণ আছে। এডুমিশ্রের কারিকানুসারে (১৫ শ্লোক) মেধাতিথি আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন। ঙ্গবানন্দের উক্ত গ্রন্থানুসারে বল্লালী আদিকুলীন উৎসাহ মেধাতিথির অধস্তন একাদশ পুরুষ। যথা, মেধাতিথি—আবর ত্রিবিক্রম—কাক—ধাধু (“মুখে খ্যাতঃ”)—জলাশয়—বাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর—গুপ্তি—আচার্য্য মাধব—উৎসাহ; লক্ষ্য করা আবশ্যক, মেধাতিথির পঞ্চম পুরুষে প্রথম “গাঞি”-সৃষ্টি হইয়াছিল। আধুনিক কুলপঞ্জীতে যাহা পাওয়া যায়, এডুমিশ্র-ঙ্গবানন্দের নবাবিস্কৃত লেখাদ্বারা তাহা অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন হয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ১৪১) দুই জন “মেধাতিথি” কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম মেধাতিথির নাম বলপূর্বক ছন্দোভঙ্গ করিয়া পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকে চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক হরিশিখর ও মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষের নাম লিখিয়া যান নাই। এই ১১ পুরুষের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। কেবল উৎসাহের সম্বন্ধে লিখিত আছে, “উৎসাহস্ত সমঃ পুত্রিকুৎসাহো ভূবি বিশ্রুতঃ।

লক্ষণ সেনের অভিষেককালে উৎসাহ জীবিত ছিলেন না। তন্নিমিত্ত প্রথম সমীকরণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহিতের নাম শীর্ষস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসাহের ১৬ পুত্র ছিল—তন্মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ছিলেন “মহাদেব”। তিনি পঞ্চম সমীকরণে ভ্রাতৃপুত্র লৌলিকের সহিত একসঙ্গে পূজিত হইয়াছিলেন। মহাদেবের কুল-কারিকায় ঙ্গবানন্দ (মহাবংশ, পৃ: ৫) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া-

ছেন—“দত্তজমাধবেনাসৌ রাজ্ঞা পূর্বং পুরস্কৃতঃ।” এডুমিশ্র প্রভৃতি সামাজিক-প্রধান ব্যক্তির সহিত লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেন “তুরুক্ষেত্র” ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া “বঙ্গে” দত্তজমাধবের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন—এই অতি-মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য স্বয়ং এডুমিশ্র লিখিয়া গিয়াছেন (৩২-৩৩ শ্লোক)। সম্প্রতি (দামোদরদেবের পুত্র) “অরিরাজদত্তজমাধব শ্রীদশরথদেবে”র একাধিক তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় কেশবসেনের সমকালীন ঐ রাজার সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এডুমিশ্র ও ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলচাণ্ডীদের গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্যক প্রতিপালিত হইয়াছে। অথচ অদ্যাপি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই কুলপঞ্জীর প্রামাণ্যে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন।

মহাদেবের অধস্তন ৮ম পুরুষ কামদেব। যথা, মহাদেব—বিশ্বেশ্বর (মহাবংশ, পৃ. ৭)—ভব (পৃ. ১২)—পশো (পৃ. ১৮)—কৃষ্ণ (পৃ. ৩৩)—মহেশ্বর (পৃ. ৫৮)—হরি (পৃ. ৮৪)—কামদেব (পৃ. ১০৭)। অর্থাৎ প্রত্যেকেই সম্যকরণভুক্ত প্রধান কুলীন ছিলেন। কামদেবের ১১ পুত্র, তন্মধ্যে মধুসূদনের কারিকা ধ্রুবানন্দ লিখিয়া গিয়াছিলেন (পৃ. ১২৮)। লক্ষ্য করা আবশ্যক, ধ্রুবানন্দ মধুসূদনের পুত্রদ্বয়ের নামও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে, ঐ পুত্রদ্বয় (অনন্ত ও সন্তোষ) ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কুলপঞ্জী-সমূহে কামদেবের অধস্তন বংশধারার অতি বিস্তৃত পারিবারিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা সম্যক পরীক্ষা না করিয়া “ভূদেবচরিতে” যে নামমালা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বয়জনক ভ্রম পরিদৃষ্ট হয়। বিশ্বয়ের হেতু হইল—এই যে, ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ কুলগ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন (ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, পৃ. ১৬) এবং স্বয়ং ভূদেবও বহু ঘটকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আমরা সংশোধনপূর্বক একটি বিস্তৃত নামমালা সংকলন করিতেছি। কামদেবের উপাধি ছিল “পণ্ডিত” এবং তাঁহার একমাত্র উপাধিদারী পুত্র ছিলেন “মধুসূদনাচাৰ্য্য”। মধুসূদনের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তোষের উপাধি ছিল সমস্ত কুলগ্রন্থসমূহে “মুকুট রায়”—তৎকালে এই উপাধি রাজকাৰ্য্যে মন্ত্রিভাদি প্রধান পদাধিকারীর জন্ত প্রচলিত ছিল। তিনি আলিবর্দী খাঁর বিরুদ্ধে “ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত মিলিত হন” (ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, পৃ. ৩)—ইহা সম্পূর্ণ প্রমাদকল্পিত একটি আকাশ-কুসুম। সন্তোষ আলিবর্দীর আয় ২০০ বৎসর পূর্ববর্তী ছিলেন। এবং তদ্বিয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ধ্রুবানন্দকর্তৃক তাঁহার নামোল্লেখ ব্যতীত অপর একটি

মূল্যবান প্রমাণ কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি। সন্তোষের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র অপুত্রক “চণ্ডীদাসে”র নাম কুলপঞ্জীতে প্রায়শঃ লিখিত পাওয়া যায় না। বর্দ্ধমান অঞ্চলের একটি পুথিতে (১২২১ পত্র) তাঁহার নাম ও বিবরণ আছে—“হড়সার্কভৌমস্ত কণ্ঠাবিবাহঃ।” এই হড়সার্কভৌম ছিলেন ইছাপুরের চৌধুরীবংশীয় স্বপ্রসিদ্ধ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রামভদ্র সার্কভৌম এবং রামভদ্রের পৌত্র প্রতাপশালী “রাজা রঘুনাত চক্রবর্তী চৌধুরী”র প্রদত্ত ১০৭০ সনের (১৬৬৪ খ্রীঃ) দানপত্র আমরা দেখিয়াছি (নদীয়ার ৪৩২৮৩নং তায়দাদ)। চৌধুরীদের পরমাঙ্গীয় সন্তোষ মুকুট রায় চৌধুরীদের সঙ্গে মোগল-পাঠান সংঘর্ষকালে কোনপ্রকারে বিপন্ন হইয়া থাকিতে পারেন, যদি বস্ত্তঃ এক্ষণে কোন কিছদন্তী সন্তোষের সম্বন্ধে প্রচারিত থাকে।

সন্তোষের দ্বিতীয় পুত্র রামকান্ত (রামকান্ত নহে) এবং তাঁহার দশ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র গোপীবল্লভ (অথবা গোপীজনবল্লভ) প্রথম কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। যথা, “পশ্চাৎ চঃ কামদেব রায়স্ত কণ্ঠাগ্রহণাভঙ্গঃ ততঃ কন্যা অপাত্রে গতঃ” (অশ্বমুকটে রক্ষিত পুথির ১৫৩২ পত্র)। “বিভো-চট্ট” বংশীয় এই কামদেব রায় নদীয়ার চৌধুরী ছিলেন, তখনও নদীয়ার বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। গোপীবল্লভের পুত্র রামকানাই কুলভঙ্গ করেন (ভূদেব-চরিত, পৃ. ৩)—এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গোপীবল্লভের রামকানাই নামে কোন পুত্রই ছিল না এবং গোপীবল্লভ স্বয়ংই কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই ভুলের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী “সম্বন্ধনির্ণয়” (৩য় সং, পৃ. ৬৪১)। গোপীবল্লভের সাত পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন “নকড়ি” (নামান্তর কান্ত)। একটি গ্রন্থে তাঁহার বাসস্থান লিখিত আছে—“সাং চানক”। বোধ হয় গোপীবল্লভই কুলভঙ্গ করিয়া সমাজস্থান “খড়হ” পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্রগণ নানাস্থানে বসতি স্থাপন করেন। নকড়িরও সাত পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র “রামনাথের” দশ পুত্রের অন্যতম “রামকানাই ন্যায়বাগীশ”ই ভূদেবের পূর্বপুরুষ। যথা, রামকানাই—রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ—হরিনারায়ণ সার্কভৌম—বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (১১৯৯-১২৭৩ বঙ্গাব্দ)—ভূদেব। গণনাভূসারে আদিশুর আনীত মেধাতিথি হইতে ভূদেব হইলেন ঠিক ৩০ পুরুষ। হরিনারায়ণ পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন (ভূদেবচরিত, পৃ. ৫)। ভূদেবের ১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গত হন (ঐ, পৃ. ৬-৭)। কিন্তু ইহা ঠিক কিনা সন্দেহ। হরিনারায়ণের ৮ পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথের জন্মকালে তাঁহার বয়স হইয়া পাড়ে ৪৬—ইহা একান্তভাবে অসম্ভব, না হইলেও

অত্যন্ত তুল্লভ ঘটনা এবং বিশ্বাস করা কঠিন। ভূদেবের উদ্ধৃতন চারি পুরুষ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন।

বন্ধিমচন্দ্রের পূর্বপুরুষ

বন্ধিমচন্দ্র স্বয়ং ‘সঞ্জীবনী-সুধা’য় লিখিয়াছেন: “অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীন-দিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।” এই ক্ষুদ্র পরিচয় তিনি নিঃসন্দেহ লালমোহন বিদ্যানিধির নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সঙ্কল্পনির্গয়ের পরিশিষ্টে (বংশাবলী, পৃ. ২৪৩-৪৪) এই পরিচয়ই বিবৃত হইয়াছে, কেবল বিদ্যানিধির মতে “ইহার হরিপালের অধিবাসী ছিলেন।” বিদ্যানিধি প্রকাশিত নামমালা স্বভাবতঃ প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থেও (২য় সং, পৃ. ২৬৩) তাহাই লতাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থে (বন্ধিমচন্দ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০) একটি অতিরিক্ত পুরুষের নাম (“পীতাশ্বর”) দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গলার যে কোন সমাজের যে কোন কুলগ্রন্থ একবার দেখিলে এই বহুকাল প্রচারিত বংশলতার বিশ্বয়জনক ভ্রম সংশোধন করা যায়। গঙ্গানন্দ অতি প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন বংশধরের বহু বিবরণ কুলপঞ্জীতে সুপ্রাপ্য।

আদিশুর আনীত কাশ্মপগোত্র বীতরাগের বংশে প্রথম বল্লালী কুলীনের নাম “বহুরূপ” (মহাবংশ, পৃ. ১)। তাঁহার ৮ পুত্রের অতম ছিলেন “গাহী” (পৃ. ৫)। তৎপুত্র সর্বেশ্বর “অবসথী” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন:

নামা সর্বেশ্বর: খাতো দানৈ: কল্পমহীকৃৎ।

অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাং। (পৃ. ৯)

ঘটনাটি এই—ঘোষালবংশীয় “আভোক” নামক সামাজিকের যজ্ঞশালায় সর্বেশ্বর ও তাঁহার সমকক্ষ কুলীন ঘোষালবংশীয় “পণ্ডিতে”র শাস্ত্রীয় বিবাদ হইয়াছিল এবং তদবধি উভয়েরই “অবসথী” খ্যাতি হয়। কিন্তু পণ্ডিত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া একা সর্বেশ্বরই ঐ মর্যাদাভাজন হইয়াছিলেন।

পণ্ডিতস্ব সমানোহসো চট্টসর্বেশ্বর: কৃতী।

আভোক-যজ্ঞশালায়াং বিশাদেন ঘয়োরাপি।

অবসথীতি বিখ্যাতিস্তস্ত পুত্রো ন চান্ধবঃ। (পৃ. ৮)

ইহা খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা এবং তখনও দেশময় যাগযজ্ঞাদির অল্পষ্ঠান এবং যজ্ঞবিদ্যার অল্পশীলন প্রচলিত ছিল। কুলগ্রন্থের এই সকল প্রামাণিক কথা বিশ্বৃত হইয়া বর্তমানে অবসথী শব্দের নানারূপ কল্পিত ব্যাখ্যা অনেকে করিতেছেন। গঙ্গানন্দ ছিলেন সর্বেশ্বরের

অধস্তন নবম (অষ্টম নহে) পুরুষ। যথা, সর্বেশ্বর—তেকড়ি (পৃ. ১৫)—সিধো (পৃ. ২৫)—নখো বা লক্ষ্মীধর (পৃ. ৪৫)—দিগম্বর (পৃ. ৭২)—জগন্নাথ (পৃ. ৯৬-৯৭)—শ্রীগর্ভ (পৃ. ১১৮)—ভগবান্ (পৃ. ১৪২)—গঙ্গানন্দ। ভগবানের কারিকায় গঙ্গানন্দের নাম ধ্রুবানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবান্ সর্বশেষ সমীকরণের কুলীন ছিলেন।

গঙ্গানন্দের অধস্তন নবম পুরুষ বন্ধিমচন্দ্র। যথা, গঙ্গানন্দ কৃষ্ণবল্লভ—নন্দরাম (ভদ্র)—রামজীবন—রামকান্ত—রামহরি—শিবনারায়ণ—যাদবচন্দ্র (১২০২-৮৭ বঙ্গাব্দ)—বন্ধিম (১২৪৫-১৩০০)। রামজীবন পর্যন্ত নাম বহু কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণবল্লভের পাঁচ পুত্রের মধ্যে নন্দরাম (নন্দগোপাল নহে) ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি কুলভঙ্গ করিয়া নানাস্থানে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে এমন গ্লানিকর কথা আছে যাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার পুত্রসংখ্যা বারোয় কম নহে—তন্মধ্যে কৃত্রাপি রামকান্তের নাম নাই, আছে রামজীবনের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথিতে রামজীবনের সাত পুত্রের মধ্যে রামকান্ত এবং তাঁহারও চারি পুত্রের নাম আছে—“রামহরিশ্রীহরিগঙ্গানারায়ণজগন্নাথঃ” (২৭০-৭১ পত্র)। হুতরাং যিনি রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়া কাঁটালপাড়া আসিয়াছিলেন তিনি রামজীবনের পুত্র রামকান্ত, নিশ্চিতই রামকান্তের পুত্র রামজীবন নহেন। ঘটকের প্রামাণিক লেখা অগ্রাহ্য করিয়া, কি করিয়া এই অদ্ভুত নাম-বিপর্যয় সাধিত হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। যাদবচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামজীবন নিশ্চিতই রঘুদেব ঘোষালের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পূর্ববর্তী ছিলেন। কোন গ্রন্থেই পীতাশ্বরের নাম নাই।

গঙ্গানন্দের বাসগ্রাম ঠিক কোথায় ছিল এখন নির্ণয় করা অসাধ্য। তাঁহার এক পুত্র “বিশ্বেশ্বর” ফুলিয়ার রামেশ্বর ঠাকুরের কন্যা “গঙ্গা”কে বলপূর্বক স্বগৃহে আনিয়া-ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থে কৌতুকজনক কথা আছে—“তস্তাং মৃত্যুয়াং বিশ্বেশ্বরপুত্রেণ রামনাথেন বিমাতৃমৃত্যুয়াং ‘দীর্ঘগঙ্গে’ জ্ঞানং কৃতং” (কামালের পুথি, ফুলাপ্রকরণ, ১৬২ পত্র)। এতদ্বারা অনুমিত হয়, গঙ্গানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ অধুনাতন বৈদ্যবাটীর সংলগ্ন প্রাচীন দীর্ঘগঙ্গ অথবা দিগন্ধের অধিবাসী ছিলেন।

আশুতোষের পূর্বপুরুষ

কুলশাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ সুসাহিত্যিক স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সর্বপ্রথম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষের নামমালা বহু পরিভ্রমে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ

করিয়াছিলেন (সন্দর্ভসংগ্রহ, ১৩০৫, ৫ম প্রস্তাব)। তাহাই সম্বন্ধনির্ণয়ের ওয় পরিশিষ্টে (১৩২১, পৃ. ২৬০) সংক্ষিপ্ত-কারে পূর্বতন বংশলতার সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সংশোধনপূর্বক সম্পূর্ণ নামমালা লিখিতেছি। আদিশূর কর্তৃক আনীত ভরদ্বাজগোত্র মেধাতিথির অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ আহিতের পুত্র “উধো” (মহাবংশ, পৃ. ৪), তৎপুত্র শিষো “বজ্র” (পৃ. ৮), শিষোর তিন পুত্র হইতে মুখবংশের তিনটি প্রদিক সমাজস্থানের উৎপত্তি—নুসিংহের ফুলিয়া সমাজ, রামের ‘স্বল্পফুলিয়া’ ও দ্যাকরের কাঁচনা। রামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ “গোপাল ঘটক” স্বনামে মেল করিয়াছিলেন। যথা, রাম (পৃ. ১৪)—স্বজো (পৃ. ২২)—জয়পতি (পৃ. ৪০)—গদাধর ঘটকাচার্য (পৃ. ৬৬-৭)—গোপাল (পৃ. ৯১)। তৎপুত্র মাধব “লক্ষ্মর” (পৃ. ১১৪) এই বংশেরই ধনপতির পুত্র মাধব হইতে পৃথক ব্যক্তি। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ ধনপতির পুত্র হইতেই বংশ বর্ণনা করিয়াছেন (লালমোহন মুখোপাধ্যায়-রচিত মুখবংশ, পৃ. ৮২)। ঘটকের পুত্রের “লক্ষ্মর” উপাধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যিক, ঋবানন্দও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্বারা পাঠান আমলে রাজ্যতন্ত্রের সেনা-বিভাগে মাধবের উচ্চপদাধিকার সূচিত হইতেছে। ঋবানন্দের কারিকায় (পৃ. ১১৪) মাধবের ছয় পুত্রের নাম আছে। বিদ্যানিধির মতে (সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট, বংশাবলী, পৃ. ১৩১) জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরানন্দের দ্বারায় আশুতোষের জন্ম। ইহা কোন পুথিতেই পাওয়া যায় না, স্তত্রাং ভ্রমাত্মক। পরবর্তী ঘটক গ্রন্থানুসারে মাধবের পুত্র “বধু লক্ষ্মর” ভিন্ন অপর পাঁচ পুত্রের “কুলাভাব” ছিল। বধু সম্বন্ধ করিয়া মালাধরখানী মেলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র ‘কুমুদে’র সম্বন্ধে লিখিত আছে, “কুমুদস্ত বিবাহদোষঃ কত্রা অপাত্তস্থা” (অশ্বদীপ্য পুথির ৮৯১ পত্র), অর্থাৎ, তিনিই প্রথম কুলভঙ্গ করেন।

কুমুদের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ “পুরুষোত্তম তর্কবাগীশ” দিগন্তই নিবাসী ছিলেন। নামমালা যথা, কুমুদ—হরিদেব—রামনারায়ণ—কৃষ্ণবল্লভ—পুরোষোত্তম। কোন কোন গ্রন্থানুসারে হরিদেব ছিলেন কুমুদের ভ্রাতা দেবীদাসের পুত্র (কুলকল্লভম, মুখবংশ, পৃ. ২১৫)। হুগলী কালেক্টরীর ৪৫২৯৭নং তায়দাদে, পাওয়া যায়, (সাবর্ণ-চৌধুরবংশীয়) বিদ্যাধর রায় মুখবংশীয় পুরুষোত্তম তর্কবাগীশকে দীর্ঘস্থই গ্রামে ভূমি দান করিয়াছিলেন—১২০৯ সনে তাহার অন্যতম দখলকার ছিলেন “হরেকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর”। পুরুষোত্তমের এক পুত্রের নাম রাজারাম—রাজারামের জ্যেষ্ঠপুত্র বলরামও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মহেন্দ্র-

নাথ বিদ্যানিধির মতে তাহার উপাধি ছিল “ন্যায়ালঙ্কার”, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮১৫ সংখ্যক পুথিতে (৩৫৬১ পত্রে) আছে “বলরাম ন্যায়বাগীশ”। এই পর্যন্তই কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়। অতঃপর মহেন্দ্রনাথের পরিশ্রমসাধ্য লেখাই আমাদের উপজীব্য, বলরামের তিন পুত্র—হরেকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগর), রামজয় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্থতির পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। রামজয়ের ১১৯৬ সনে অল্প বয়সে মৃত্যু হয়—তৎপুত্র বিশ্বনাথ (জন্ম ৪ কার্তিক ১১৯৪, মৃত্যু ১ কার্তিক ১২৫৬) গঙ্গাপ্রসাদের পিতা এবং আশুতোষের পিতামহ। মেধাতিথি হইতে আশুতোষ ঠিক ৩২ পুরুষ।

রামানন্দের পূর্বপুরুষ

স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীতে যে বিস্তৃত বংশাবলী লভ্যাকারে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার প্রথমংশ ভ্রমপ্রসাদপূর্ণ। এই বংশের প্রকৃত পরিচয় হইল “নান্দোর চট্ট” সংক্ষেপে (‘নাং চং’), কিন্তু ঐ চট্টবংশ ঠিক কোন্ দ্বারার অন্তর্গত তাহা অন্নায়াসে নির্ণয় করা সম্ভব হইলেও আমরা তাহাতে অসমর্থ। যে দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। নাং চং মহাকালের পুত্র পদ্মগর্ভের নাম ঋবানন্দ লিখিয়াছেন (মহাবংশ, পৃ. ১২৫)। পদ্মগর্ভের পুত্র হরিরাম। হরিরামের ছয় পুত্র—রামশরৎ, রামনারায়ণ (ভঙ্গ), সীতারাম (ভঙ্গ), বাহু (নিঃসন্তান), মাধব ও সন্তোষ। এই সন্তোষ রামানন্দের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন না। তাহার বংশ অদ্যাপি “নিকষ” কুলীন এবং নামমালা কুলপঞ্জীতে স্থপ্রাপ্য। যথা, সন্তোষ—রামচন্দ্র—বিশ্বনাথ—ধনঞ্জয় প্রভৃতি ছয় পুত্র (বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিল)। সকল গ্রন্থানুসারেই রামচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র ছিল বিশ্বনাথ। যদি সন্তোষের পুত্র রামচন্দ্র এই বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া চির-প্রচলিত প্রবাদ বা প্রমাণ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অহুমান এই সন্তোষ পূর্বোক্ত পদ্মগর্ভের এক বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইতে পারেন। যথা, পদ্মগর্ভ—অভিরাম (ভঙ্গ)—লোকরাম—সাতু বা কৃষ্ণজীবন—সন্তোষ। কিন্তু এই সন্তোষের পুত্রাদির নাম আমাদের পরীক্ষিত কোন গ্রন্থে নাই। পদ্মগর্ভের উদ্ধতন পুরুষের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ কুলগ্রন্থে স্থপ্রাপ্য—তিনি আদিকুলীন বহুরূপের অধস্তন একাদশ পুরুষ। যথা, বহুরূপ—গোবিন্দ—চক্রপাণি (চাকু)—পুরুষোত্তম (পুরো)—নন্দন—জগন্নাথ—ত্রিলোচন (তিলানী)—চন্দ্র (চাঁদ)—মধু—মহাকাল—পদ্মগর্ভ। কুলগ্রন্থানুসারে পুরো নদীকুলবাসী ছিলেন বলিয়া ‘নান্দো’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

তিব্বতের টাকাকড়ি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ভারতের টাকাকড়ি তিব্বতে চলে; কিন্তু তিব্বতের নিজস্ব মুদ্রাও আছে। তিব্বতের বাজারে আমাদের টাকার কদর আছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকা বা ভিক্টোরিয়া মার্ক টাকার আদর সবচেয়ে বেশী। আমাদের আধুলি সিকি বড় দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি পূর্ব-তিব্বতের কোথাও কোথাও নাকি একমাত্র ভারতীয় টাকার সাহায্যেই কেনাবেচা হয়। উহাকেও নাকি তিব্বতীয় প্রথায় কাটিয়া অল্পমূল্যের মুদ্রার কাজ চালানো হয়।

তিব্বতের মুদ্রা আগে নেপাল হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিত। খাদের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে এখন লাসাতেই টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার টাঁকশাল যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা যদি মনে করেন যে, তিব্বতের টাঁকশালও ইহার অনুরূপ তাহা হইলে ভুল করিবেন। উহা বাংলা দেশের কামারশালার বড় সংস্করণ।

তিব্বতে প্রচলিত মুদ্রার নাম “ত্রঙ্গকা”। উহা পাতলা ও গোলাকার—রূপা ও তামা মিশাইয়া তৈয়ারি হয়। এক ত্রঙ্গকার ক্রয়মূল্য আমাদের ছয় আনার সমান। তিব্বতের অবস্থানকালে কিন্তু আমি হাটেবাজারে ভারতীয় এক টাকায় তিন ত্রঙ্গকা পাইতাম। তিব্বতে কয়েকপ্রকার ত্রঙ্গকার প্রচলন আছে, যথা (১) গ্যন্ডেন্ পোডঙ্গ ত্রঙ্গকা, (২) কোঙ্গ্কার ত্রঙ্গকা, (৩) টুঙ্গ্-ট্যাঙ্গ্ ত্রঙ্গকা (৪) চোতঙ্গ্ ত্রঙ্গকা, (৫) পা-ন্যাঙ্গ্ ত্রঙ্গকা। এগুলির মধ্যে প্রথম প্রকারের ত্রঙ্গকারই প্রচলন বেশী। উহার এক পিঠে লেখা আছে “গ্যন্ডেন্ পোডঙ্গ্ চোলে ন্যন্ গ্যন্”। ইহার অর্থ বাংলায় করা যাইতে পারে—“সকল দিক হইতে বিজয়ী পবিত্র প্রাসাদ”। অপর পিঠে লেখা থাকে “ট-পি টগু” অর্থাৎ সৌভাগ্যের অষ্ট লক্ষণ।

একবার লাসা গবর্ণমেন্টের সহিত রেটিং গোন্দার বিবাদ বাধে। তাহা মিটাইতে আসেন চীন হইতে একজন উচ্চ রাজকর্মচারী। টুঙ্গ্-ট্যাঙ্গ্ ত্রঙ্গকা তাহারই নাম অনুসারে হয়, বলিয়া প্রবাদ আছে। পুরোক্ত ত্রঙ্গকার মত ইহারও এক পিঠে সৌভাগ্যের অষ্টলক্ষণ আছে, কিন্তু অপর পিঠে কিছু লেখা নাই। আছে কেবল শোভাবর্দ্ধক কারুকার্য।

কোঙ্গপ্যর ত্রঙ্গকাতেও কোন লেখা নাই। কেবল এক পিঠের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ আঁকিয়া উহার মধ্যে একটি তিব্বতী সংখ্যা লেখা আছে।

চো-ট্যাঙ্গ্ ত্রঙ্গকা আসলে নেপালী মুদ্রা। ইহা নেপাল

হইতে তৈয়ারী হইয়া আসে। উহাতে নেপালের রাজার নাম, সন, তারিখ ইত্যাদি লেখা আছে। ইহার নেপালী নাম ‘মোহর’।

তিব্বতে ত্রঙ্গকা কাটিয়া অল্প মূল্যের মুদ্রার কাজ চালানো হয়। গ্যন্ডেন্ পোডঙ্গ্ ত্রঙ্গকা সাধারণতঃ কাটা হয় না। চোতঙ্গ্ ত্রঙ্গকাকেই বেশী কাটা হয়।

এক ত্রঙ্গকার মূল্য আমাদের ছয় আনার সমান। কাজেই উহাকে ঠিক অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া তিন আনার মুদ্রা করা হয়। তখন উহার নাম হয় “চি-কো”। তিন ভাগ রাখিয়া কাটিলে উহা চারি আনার কাজ চালায়, এবং তখন ‘সো-কঙ্গ’ নামে পরিচিত হয়। এক-তৃতীয়াংশ মাপে কাটিলে উহার নাম হয় “কঙ্গা” বা “কঙ্গুমঙ্গা”। উহার মূল্য দুই আনা।

ত্রঙ্গকাকে কাটিয়া অল্প মূল্যের মুদ্রা তৈয়ারি করিবার সময় কর্মকার যে লোভে পড়িয়া কিছু ধাতু না রাখা তাহা নহে। উহাতে বাস্তবিকই অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিব্বত গবর্ণমেন্ট দুই পয়সা (খক্-চে) ও এক আনা মূল্যের (খ-ক্যাঙ্গ) তাম্রমুদ্রার প্রচলন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এক টাকা দুই আনা মূল্যের “শুঙ্গ-চেড্” এবং দুই টাকা চারি আনা মূল্যের “স্যঙ্গ-ক্যাঙ্গ” এই দুই শ্রেণীর রৌপ্যমুদ্রারও চলন হইয়াছে।

চীন হইতে আমদানি করা রৌপ্য-পিণ্ডও তিব্বতে মুদ্রার কাজ চালায়। ধাতুর ওজন হিসাবে উহার মূল্যের তারতম্য হয়।

তিব্বতে পণ্যবিনিময়েও কেনাবেচার কাজ চলিতেছে। মৃগনাভি, গমচূর্ণ, যব, চা প্রভৃতি মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে চলে। যেমন, প্রায় নয় পোয়া যব এক টাকার প্রতীক। পণ্যবিনিময়ে কেনাবেচা করা বিষয় ঝকমারি ব্যাপার। প্রথমতঃ কাহার কি প্রয়োজন তাহা বাহির করিয়া যোগস্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর দরকষাকষি। ইহাতে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই-ই স্ব স্ব পণ্যের গুণকীর্তন ও অপরের দ্রব্যের গুণহীনতা প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য বক্তৃতা করে।

জর্নৈক তিব্বতী বন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মুদ্রাসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কি আপনারা এখনও অনুভব করেন না?”

তিনি বলিলেন, “অনুভূতি জাগিয়াছে—সংস্কারের বেশী দেরী আছে বলিয়া মনে হয় না।”

বর্তমানে তিব্বত চীনের তাঁবে আসিবার পর নূতন চীনের মুদ্রাও তিব্বতে চলিতেছে।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীশুশীলচন্দ্র বোষ

১

বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনালোকের বাংলা ও বাঙালী আজ ধ্বংসের পথে। আনন্দমঠের ব্রহ্মচারীকে যখন মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “মা কে”, তখন ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন “আমরা তাঁহার সন্তান।” মহেন্দ্র আবার যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কে তিনি?” ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন “সময়ে চিনিবে।” পরে মহেন্দ্র এক “অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্ন সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি” দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “ইনি কে?” তখন ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন “মা যা ছিলেন।”

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রহ্মচারী যখন বলিতেছিলেন “আজি দেশের সর্বত্রই ঋশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী” তখন তাঁহার চোখে দর দর ধারা পড়িয়াছিল। আজ বাংলা দেশে সেই ব্রহ্মচারীর ত্রায় সর্বভাগী নেতা কোথায়? আর মহেন্দ্রের ন্যায় সেই দেশপ্রেমিকই বা কোথায় যাহারা আবার বাংলার রূপ বদলাইতে পারেন?

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা প্রদেশই প্রকৃতিদত্ত সম্পদে অধিক সমৃদ্ধশালী হইলেও ভারতের অল্প সমস্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙালী জাতি আজ দরিদ্র। বাংলার সহস্র সহস্র কার্যক্ষম উচ্চশিক্ষিত যুবক আজ উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে পাইতেছেন না। যে জাতি এতদিন সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সমগ্র ভারতের চিন্তার ধোরাক জোগাইয়াছিল সে আজ অল্প প্রদেশবাসীর নিকট সকল বিষয়ে অবহেলিত। রাজনীতিবিদ স্বরেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র এক সময় সারা ভারতবর্ষে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবার মত নবীন বাংলায় কাহাকেও আজ দেখা যাইতেছে না কেন তাহা ভবিষ্যৎ কথ্য।

একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, এই যুগে সারা বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তা একই স্বরূপে গাঁথা। পূর্বে পরাধীন ভারতের কখনও পুরাপুরি ভাবে এই সমস্তার সম্মুখীন হইবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু এ যুগে যে জাতির অর্থনৈতিক শক্তি নাই রাজনীতিক্ষেত্রে সে জাতি কখনও মাথা তুলিতে পারে না। এই কারণেই আজ বাংলা ও বাঙালী অন্যান্য প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর অনেক পিছনে পড়িয়া আছে এবং দিনের পর দিন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে আগাইয়া যাইতেছে।

ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসী ও নেতারা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থে অগ্রে বজায় রাখিবার পর তবে সমগ্র ভারতের স্বার্থে দিকে লক্ষ্য করেন। তাঁহারা এ মনোবৃত্তিকে “প্রাদেশিকতা” বলিয়া মোটেই মনে করেন না। কিন্তু অধুনা বাংলার প্রায় সকল নেতাই বঙ্গমাতাকে তুলিয়া একমাত্র ভারতমাতার বন্দনায় ব্যস্ত। তাঁহাদের মতে বাংলার স্বার্থ অগ্রে রক্ষা করিলে উহা নিছক “প্রাদেশিকতা” হয়।

বাঙালী জাতিকে যদি আবার মাথা তুলিয়া বিশ্বের দরবারে দাঁড়াইতে হয় তাহা হইলে অগ্রে এই কাল্পনিক “প্রাদেশিকতার” কলরবকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ব্যবসা ও বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহাকে বাংলার বাহির হইতে ও ভারতের বাহির হইতে অর্থোপার্জন করিতে হইবে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থ বাহাতে বাহিরে চলিয়া না যায় তাহার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যখন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম তখনও বাংলাদেশ হইতে ষড় টাকা বিদেশীরা লইয়া যাইত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ টাকা ভারতের অপরাপর প্রদেশে চলিয়া যাইত। ইহার মোটামুটি হিসাব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ইহা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা বরং এই টাকার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থার জন্য কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের দোষ-দেওয়া কোনমতেই উচিত হইবে না। যদি গুজরাট, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসীরা বাংলাদেশে আসিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যাইতে পারে তবে বাংলার অধিবাসীরা কেন তাহা পারিবে না? একটা জাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমুন্নত করিয়া তোলা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। দেশের সমগ্র অধিবাসীর প্রাণের সঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকা একান্ত আবশ্যক। এজন্য বাংলার প্রত্যেক সন্তানকে মানসপটে স্বজলা স্বফলা শশুশ্রামলা বঙ্গমাতার আরাধনা করিতে হইবে। তবেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গভীর দুঃখে লিখিয়াছিলেন—

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুখা জননী;

রেখেছ বাঙালী করে মাছুষ করোনি ॥

বাংলার নবীনরা কি এখনও কবির এই মর্মব্যথ্য অনুভব করিতে পারিতেছেন না?

নারায়ণী সেনা

ত্রিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সমস্ত দিন সমস্ত রাত গাছের উপর কেটে গেল।

সমস্ত দিন বলাটা একটু ভুল, কেননা দুপুর পর্যন্ত আমরা ছিলাম হাতীর হাওদার উপর। আমি আর নলিনীবাবু। পূজার ছুটিতে আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে এসেছিলাম আমাদের উভয়ের বন্ধু আনন্দের বাড়ী, নলিনীবাবু কলকাতা থেকে আর আমি এদিক থেকে।

আনন্দের পুরো নামটা হচ্ছে আনন্দকিশোর থাপা। ওরা তরাইয়ের নেপালী জমিদার। ওর পাঠ্য জীবনের কতকটা কার্টে পাটনায়, এবং কতকটা কলকাতায়। বরাবরই বাঙালী-ঘেঁষা, তাইতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয় পাটনায়, আমরা উভয়েই তখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বি-এ পাস করে আর আমার কাছে বিভাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে আনন্দ কলকাতায় চলে গেল। সেখানে এম-এ পড়ে চার বছর, ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, তাই বোধ হয় সরস্বতীর উপর ভক্তিটা মরে এসেছিল। কিন্তু এম-এ না পাস করে ও বাড়ী ফিরে গিয়ে আমায় যে চিঠিটা লিখেছিল সেটি একেবারে ঘরোয়া বাংলায়। তাইতেই প্রথম কাঁহুনী গাইলে—একলা পড়ে গেছি, বনবাস, নিশ্চয় আসবি একবার, যত শীগগির পারিস—শিকারের লোভ দেখান ছিল, আবার ঐ একই চিঠিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে 'বনবাস'ের শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনের উচ্ছ্বসিত গুণ-গানও ছিল।...বি-এ ক্লাসেই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে লেখক হবার পায়তারা ভাঁজছি, আনন্দকিশোর সেটা জানত।

তারপর এক বছর ধরে এই রকম চিঠি মাঝে মাঝে বরাবর এসেছে; কিন্তু চারদিক দিয়ে প্রলুব্ধ হলেও এতদিন গিয়ে উঠতে পারি নি।

আর কখনও যাওয়ার দুর্ভাগ্যও না হয় যেন। প্রথমতঃ দূরত্ব এবং পথের দুর্গমতা। রূপনগর নিকটতম রেল-স্টেশন থেকে আঠার মাইল। রাস্তা নেই বললেই চলে। ভারতের সীমানার মধ্যে মাইল তিনেক একটা কাঁচা সড়ক, তারপর সীমানার একটা খাল পেরিয়ে তার আদলটা কিছুদূর পর্যন্ত গেছে বটে, কিন্তু সেই কোন্ যুগে প্রথম তোয়ের হবার পর তাতে আর কখনও মাটি পড়েছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, অল্পপরিসর, কিন্তু অত্যন্ত গভীর আর খরশ্রোতা। জঙ্গল পড়ে গোটা-পাঁচেক, তার মধ্যে দুটো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। রাস্তা ঠিক মাঝখান দিয়ে যায় নি বটে, তবুও খানিকটা ভেতরে যাবার পরই গভীর অন্ধকার; কতকটা এই খমখমে অন্ধকারে, কতকটা একটা অজানা আশঙ্কায়, বেরিয়ে

আসবার পর মনে হয় যেন পুনর্জন্ম হ'ল। গ্রাম খুব দূরে, পাহাড়ের দিকে যতই এগুনো যায় আরও এসেছে কমে, আর এই যে নিজের-মনে-গড়ে-ওঠা রাস্তা এটা হয়ে উঠেছে উঁচুনীচু, জায়গায় জায়গায় পাথুরে, আর সেটাকে খণ্ডিত করে যে সব নদী বয়ে গেছে তাদের সংখ্যা গেছে বেড়ে।

যানবাহন হাতী, ভারতসীমানা পেরিয়ে খানিকটা পর্যন্ত একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, বৈচিত্র্য হিসাবে। হাতীই চরম বৈচিত্র্য মনে করে আমরা যাবার সময়ে স্টেশন থেকে নেমে তাইতেই সওয়ারী হই। ভুলটা যখন বোঝা গেল তখন আর গরুর গাড়ির পথ নেই।

কতকটা স্মৃতি আছে শেষের দিকে। গ্রাম থেকে বোয়রে প্রায় মাইল চার পর্যন্ত থাপা-পরিবারের জমিদারির তরফ থেকে একটা আবার রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে, বিজুরিয়া বলে একটা নদীর ধার পর্যন্ত; বাড়ীর দিকে রাস্তাটা মাইলখানেক পাকাও। এইটুকুতে আনন্দ-কিশোরদের মোটরটা যাতায়াত করে।...মোটরটা আদৌ এখানে পৌঁছেছিল কি করে সে একটা আলাদা কাহিনী।

এই হাড়ভাঙা অভিযানের পর কিন্তু আমরা যে দশটা দিন ওখানে ছিলাম, বড় আনন্দেই ছিলাম। রূপ-নগর জায়গাটা খুব মনোরম। গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়ে গেছে, তারপর স্তরে স্তরে উঠে একেবারে শেষ দিকে তুষারমুক্ত। সকালে, আর বিকেলে একটু নরম হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর যে রক্তাভা পড়ে তার উপমা হিমালয়ের এদিকে কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আনন্দকিশোরের পিতা জগৎ-কিশোর সৌধীন লোক, নিজের গ্রামটুকুও বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছেন। শরতের স্বচ্ছ আকাশের নীচে রূপনগরকে একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় নীলাম্বরীপরা কোন্ মায়ের কোলে সাজগোজ করা একটি শিশু যেন শুয়ে রয়েছে। এখানে থাকাই আনন্দ, তার উপর নিত্য হজুগ। আজ শিকার, কাল বিজুরী-অভিযান, পরন্তু পাহাড়ের উপর গিয়ে পিকনিক; ছোট ছোট শিকার ছাড়া একদিন হাতী নিয়ে, লোকলস্কর সঙ্গে করে একটা বড় শিকারও হয়ে গেল—দুটো চিতাবাঘ গোটা পাঁচ হরিণ, দুটো বুনো শূকর। এর উল্লাস সামলাতেই দু'দিন গেল কেটে। আহা! তো শেষ পর্যন্ত একটা দুশ্চিন্তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—জল অত ভাল হওয়া সত্ত্বেও।

তবুও যে কেন বলছি আর যাবার দুর্শ্বর্তিটা যেন না হয় তার বিতীয় কারণটা এবার বলি।

সাতটা দিনের প্রোগ্রাম ছিল আমাদের। ওঁদের অল্পরোধ-উপরোধে সেটাকে আর একটু বাড়িয়ে আমরা দশম দিন সকালে যাত্রা করলাম। বিজুরী নদী পর্যন্ত পরি-বারের এক রকম সকলেই মিলে আমাদের মোটরে পৌঁছে দিলেন—পদ্মা নেই, আনন্দকিশোরের স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি কয়েকজন মেয়েছেলে পর্যন্ত। নদীর মাঝখানটুকু নৌকায় পেরিয়ে আমরা এপারে এসে হাতীর ওপর চড়লাম।... শেষ দৃশ্যটুকু যেমন অপূর্ব তেমনি বিষাদময়। হিমালয়ের তুষারমুকুট, তার নীচেই ঘনারণের নীল রেখা, তার পর খানিকটা সমতলভূমি, বিজুরীর উত্তরভাটে আনন্দ-কিশোরেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, গৌরকান্তি মেয়েদের রংচঙে পোশাক, আনন্দকিশোর আর কয়েকজন রুমাল নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, নীচেই বিজুরীর উপলহত উচ্চল জলস্রোত আর সমস্তটুকুর উপর শরৎপ্রভাতের ঝলমলে রোদ।

হাতীটা খানিকটা এগিয়ে এলে নলিনীবাবু বললেন, “এবার ঘুরে বহ্নন শৈলেনবাবু, যা ছেড়েই আসতে হবে তার দিকে এরকম করণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা বীর-ধর্ম নয়।”

নলিনীবাবুর কথা বলা হয় নি। একটি জটিল চরিত্র, কিন্তু সঙ্গী হিসাবে চমৎকার; আমুদে, গল্পপ্রবণ, যে অবস্থাতেই পড়ুন তার মধ্যে থেকে রস বের করে সেটাকে উপভোগ্য করে। নেবার ক্ষমতা আছে; মোটের উপর নামে-ধামে-স্বভাবে এক জন আদর্শ কলিকাতার মানুষ, আসবার সময় উনি না থাকলে যে কি অবস্থা হ’ত, আর যাবার সময়ও যদি উনি না থাকতেন তো...

কিন্তু সে কথা পরে হচ্ছে; এখানে মাত্র এইটুকু বলে রাখি যে ওঁর থেকে থেকে ঐ ‘বীর-ধর্ম’ কথাটা ব্যবহার করবার বাতিক আছে। একবার রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করতে বললেন, “শৈলেনবাবু, ভেতো বাঙালী, এসেছি এমন দেশে যেখানে সবার কোমরেই একটা খুরকি ঝুলছে, এখানে জিভের ডগায় অন্ততঃ একটা ধারালো কথাও না নিয়ে থাকলে মানাবে কেন?”

বললাম, “কিন্তু আনন্দ তো আমাদের স্বরূপ চেনে।”

উত্তর করলেন, “জিগোসও করেছিল এ নতুন মুদ্রা-দোষের কথা, বললাম, খেটে অভ্যাস করেছে। নইলে তোর মান থাকবে কেন?”

আরও কীর্তি আছে নলিনীবাবুর, কিন্তু সে কথাও যথাস্থানে। সকালের দিকটা আমাদের বেশ কাটল। স্নানাদি সেরে বেশ ভালভাবে জলযোগ করে বেরুনা গিয়েছিল, হাওদার উপর তুলতে তুলতে, গল্প করতে করতে,

সিগরেট পোড়াতে পোড়াতে আর নস্ত্রি নিতে নিতে আমরা তৃপ্ত পর্যন্ত গ্রাম থেকে প্রায় মাইল বারো দূরে রামফেরী জঙ্গলের ধারে এসে পড়লাম।

খিদে পেয়েছে, খাবার সময়ও হয়েছে, তা ভিন্ন জায়গাটা এমন অপরূপ যে এইখানে বসে হিমালয় তরাইয়ের শেষ নিদর্শন হিসাবে এটাকে মনে গেঁথে নেবার ইচ্ছাটাও প্রবল হয়ে উঠল। আমাদের ডান দিকে উঁচু-নীচু জমির উপর নিবিড় শালবন, সেটা যেখানে পাতলা আর সরু হয়ে এসেছে সেইখান দিয়ে আমাদের রাস্তাটা। আমাদের বাঁ দিকে একটা ছোট পাহাড়, সমস্ত জায়গাটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছলে এসে যেন এই শেষ ঢেউয়ে থেমে গেছে, এর পরেই তরাইয়ের সমতল, উঁচু জমিতে রয়েছে বলে কতদূর পর্যন্ত যে দেখা যায় তার হিসাব নেই। সমস্ত জায়গাটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে একটি ছোট নদী। জায়গাটা উঁচু-নীচু বলে মাঝে মাঝে তার স্রোত গেছে আটকে, জল হয়েছে জমা, তার পর সেই সঞ্চিত জলের চাপেই সেটা তোড়ে বেরিয়ে এসেছে; চার দিকে ঝরঝর, ঝরঝর শব্দ; একটি নদীই ঝরণার মালা গেঁথে চলেছে, একটি নৃত্যচপল মেয়েরই পায়ে নৃপুর, হাতে তালি, কর্ণ সঙ্গীত।

মাহত করন বাহাদুরকে বললাম, “হাতীটাকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে চল, ঐ গাছতলাটায় নেমে আমরা আহারটা সেরে নেব।”

ঠিক যে বললাম তা নয়, খানিকটা ইঞ্জিত, খানিকটা হিন্দী আর এইখানে দশ দিনের চেষ্টায় ওঁদের ভাষার গোটাকতক শব্দ যে আয়ত্ত্ব করেছিলাম তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু দিয়ে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দিলাম। বেশ বুঝল, কিন্তু না এগিয়ে খানিকটা ভাষায় আর খানিকটা ইঞ্জিতে জানিয়ে দিলে যে সমতলে নেমে খানিকটা এগিয়ে ওর একটা ভাল জায়গা জানা আছে, সেইখানই যাচ্ছে। সাধারণতঃ নেপালীদের মুখটাই হয় অত্যন্ত গম্ভীর আর ভাবলেশহীন; সেইজন্তেই, আর তার বক্তব্যটা পুরোপুরি বুঝতে না পারার জন্যেও নিশ্চয়, আমাদের মনে হ’ল লোকটা অযথাই জিদ করছে। তাই আমরাও গম্ভীর হয়ে গিয়ে ওকে আমাদের নির্দেশ পালন করতেই হুকুম দিলাম। এদের আর একটা দোষ চট করে চটে যায়। আর কিছু বললে না, হাতীর মুখ ঘুরিয়ে গাছটার দিকে চালিয়ে দিলে, তার পর বেশ স্বন কাছাকাছি এসেছি, এই হাত পক্ষাশেকের মধ্যে, হঠাৎ দাঁড় করিয়ে জানালে যে জায়গাটায় বাঘের ভয় আছে, বনের শেষে এই ঝরণা, প্রায়ই ওরা জল খেতে আসে এখানে।

আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক এইভাবে সঙ্কটের

সামনে এনে ফেলে কথটা প্রকাশ করার জন্যে লোকটার উপর একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু ঠিক এই ধরনের লোককে আর চটানো বিবেচনার কাজ হবে না বুঝে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

নলিনীবাবু বললেন, “শাস্ত্রে এর ভাল ব্যবস্থা আছে শৈলেনবাবু—যঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু এ হতভাগা আমাদের পরীক্ষা করছে, তায় সেদিন একটা বাঘ মারবার যশটা আমিই নিয়েছিলাম, মারি আর নাই মারি—তাই ভাবছি কি করে অর্ডারলি রিটিউট করা যায় যাতে বীর-ধর্ম রক্ষা হয়।”

সাহসী বলে আমারই যে খুব নাম আছে এমন নয়, তবে ভরা মধ্যাহ্ন, জঙ্গল প্রায় নেই বললেই চলে, এমনই কেমন ভয় আসে না, তার উপর একটা ভাল বন্দুক রয়েছে শৈলেনবাবুর হাতে। আমি একটু ভেবে নিয়ে উত্তর করলাম, “এক কাজ করা যাক না মাঝামাঝি, গাছ-তলাটাতেই যাই, তার পর হাতীর পিঠ থেকে না নেমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেই হবে।”

মনের কথাটাও বললাম, “শেষে জলখাওয়াটা শুধু ঐ ঝর্ণার জলে সারবার ইচ্ছে আছে নলিনীবাবু, নইলে আপশোষ থেকে যাবে।”

নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন, বললেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ থেকে আরম্ভ করে ক্যান্টের ক্রিটিক অব পিওর রিজন্—এতগুলি বইয়ের মধ্যে আসল বই কথামালাটাই আপনার বাদ পড়ে গেছে শৈলেনবাবু? আমরা নীচে জল খাচ্ছি, আর উপর থেকে বাঘ যদি বলে—ওরে অর্ধাচীন, তুই আমার পান করিবার জল ঘোলা করিতেছিস কোন্ সাহসে?—তখন?”

হো হো করে হেসে উঠলাম। হ’লও ভাল, বিপদের মুখেই হাসি, বীর-ধর্ম ভাল করেই বজায় রইল, সঙ্গে সঙ্গেই করণ বাহাদুরকে ইসারা করলাম হাতীটাকে এগিয়ে দিতে।

করণ বাহাদুর হাতীর কানের গোড়ায় হাঁটু ছুঁতে চেপে ‘অঘঃ’ না ঐরকম কি একটা শব্দ করলে—সামনে যাবার। হাতী কিন্তু এগল না। তিন-চার বার ঐরকম করবার পরও যখন অগ্রণর হ’ল না তখন কান থেকে অঙ্কুশটা খুলে নিয়ে মারলে উটো দিক দিয়ে একটা বাড়ি, তার পর তাতেও নড়ে চড়ে না দেখে দিলে খোঁচার দিকটা খানিকটা বসিয়ে। হাতীটা আর্জুনাদ করে উঠল, কিন্তু নড়ল না। তার পরই তার ভঙ্গি গেল বদলে, শুঁড়টা চালাতে লাগল, শরীরটাতে আস্তে আস্তে দোল দিতে লাগল, একটা ঘেন কি রকম নূতন ধরনের ভাব। করণ বাহাদুর সামনে গলাটা

বাড়িয়ে কি যেন পরীক্ষা করছিল, হঠাৎ হাতীটা সামনে হনু হনু করে এগুতে আরম্ভ করলে।

করণ বাহাদুর মাথাটা একবার ঘুরিয়ে বললে—“হজুর, কবে হাওলা ধরে থাকুন...”

“কেন রে?”

“হাতী পাগল হবে...হয়েছে...”

বলতে বলতেই হাতীটা গাছের নীচে এসে পড়েছে, ধারেই একটা নীচু ডাল ছিল, হাওলায় লেগে মটাস্ ক’রে গেল ভেঙে, আমরা হাওলায় পাদানের কাছে ঝুঁকে পড়েছিলাম বলে বেঁচে গেলাম, সরু ডাল বলে হাওলাটাও নষ্ট হ’ল না, কিন্তু বেশ খানিকটা একপেশে হয়ে গেল। করণ বাহাদুর মার ছেড়ে আদর খোসামোদ ধরেছে, আমরা গাছের মাঝখানে একটা বেশ মোটা ডালের নীচে এসে পড়তেই বললে—“এই ডালটা ধরে উঠে পড়ুন হজুর, আর কোন উপায় নেই, ক্ষেপেই উঠেছে।”

আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে বাঁ হাতটা পেছনে করে ক্রমাগতই তাগাদা করতে লাগল—উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাল ধরে উপরের মোটা ডালটায় চলে যান—নইলে...”

আমরা আর বিলম্ব না করে ডালটা জড়িয়ে উঠে পড়লাম। সেই ডালটা থেকে একটা ফ্যাকড়া বেরিয়ে উপরে একটা বেশ মোটা ডাল ঘেঁষে উঠে গেছে, সেইটে বেয়ে আমরা তার উপর গিয়ে বসলাম। হাতীটা তখন একেবারে ক্ষেপে গেছে, প্রথমে শরীরটাতে ঝাঁকানি দিয়ে হাওলা আর মাহত ছুটোকেই ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে, হাওলাটা একেবারে পেটের কাছাকাছি নেমে এল, করণ বাহাদুর কিন্তু ঝুঁকে পড়ে ওর কানের গোড়া ছুটো ধরে চেপে পড়ে রইল। হাতীটা শুঁড়টা আছড়াচ্ছে ওকে ধরবার জন্তে, কিন্তু অল্প জায়গার মধ্যে এমন ভালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে যে ওকে স্পর্শই করতে পারছে না ভাল করে।

আমরা প্রায় উঠে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা এ ডালটার তলা থেকে সরে গিয়েছিল, ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আবার ফিরে এল, তারপর আমরাও টেঁচিয়ে উঠেছি ‘তুমিও উঠে এসো করণ বাহাদুর’ বলে, সেও ঘাড়টা কি ভেবে একটু তুলেছে, এমন সময় হাতী ডালটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলে, বার তিন-চার হুলিয়ে হুলিয়ে যেন দেখে নিলে কতটা শক্ত, তারপর একটা প্রচণ্ড নিনাদের সঙ্গে মড় মড় করে ডালটা ভেঙে ফেললে। নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন—“শাস্ত্রব্যাক্যের মূল্য আছে শৈলেনবাবু।”

বললাম—“ভাবছি, করণ বাহাদুরও উঠে এল না কেন—”

“বোধ হয় শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ বলে...আমাদেরই প্রথম চান্স নিতে দিলে, মূর্খের নানা দোষ তো...”

ডালের গোড়াটা তখনও গুঁড়ির সঙ্গে লেগে রয়েছে, হাতীটা সেইটে চেপে চেপে ধরতে লাগল নিজের গায়ে, অর্থাৎ করণ বাহাদুরকে পিষে মারতে চায়, হাওদাটা দিতে লাগল বাধা, পেট থেকে বুলে পড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে আর সেইজন্যেই শরীরের সঙ্গে ডালটার একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছেই। শেষ পর্যন্ত কি হ’ত বলা যায় না, কিন্তু কতকটা এই রকম টানাটানিতে এবং কতকটা নিজের ভাবে ডালটা এক সময় আলাদা হয়ে গিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। হাতীটা আবার ছুলিয়ে ছুলিয়ে তুলে নিয়ে দেখলে সন্ধ্যাহার করা যায় কি না, তারপর আবার একটা চীৎকার করে হন্ হন্ করে গাছের তলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। করণ বাহাদুর একবার ঘাড়টা একটু বেকিয়ে কি বললে—“আজ-ইজ্জ” দিয়ে হলেও বেশ বুঝলাম, বলছে—“ভয় ক’রো না আছি।

নলিনীবাবুরও পরিহাস-প্রিয়তা বন্ধ হয়ে গেছে, বললেন—এত ভয়ের মধ্যে লোকটা এখনও শুধু আমাদের ভয়ের কথাই ভাবছে মশাই! কি কাণ্ড! কি ধাতু দিয়ে এরা তৈরি!”

হাতীটা বাড়ীর দিকেও না, ষ্টেশনের দিকেও নয়, রাস্তা একেবারেই ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের সমতলের দিকে এগিয়ে চলল। শেষ বা দেখলাম—একখানি প্রায় মণখানেকের পাথরের চাই তুলে নিয়ে পেছন ঘেঁষে ছুঁড়ে মারলে। পাথরটা করণ বাহাদুরের হাতকয়েক দূর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাওদাখানিকে চুরমার করে দিলে। এর পর গোটা দুই আওয়াজ ছাড়া হাতীর খবর আর কিছু পাওয়া গেল না, শেষটা মনে হ’ল, মাইল দুয়েক দূরে কোনখান থেকে এল যেন।

এবার চিন্তা হ’ল কি করা যায়। হাতীর আওয়াজ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বা দেখা গেল তার পর নামতে আর কান্নার সাহস হচ্ছে না। করণ বাহাদুর ভরসা দিয়ে গেল, কিন্তু সেও নিতান্ত অনিশ্চিত একটা ব্যাপার, হাতী যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাকে শেষ করে না ফেলে, তবু ও-হাতীতে চড়ার আর কথাই উঠতে পারে না। এক, যদি ওটাকে কোনরকমে রূপনগরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেখান থেকে তাঁরা তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করবেনই।

গাছেই বসে আছি, শরভের ছোট বেলা, ছপুর্ গড়িয়ে

বিকেল এসে পড়ল, যৌদ হয়ে উঠল হলদে। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিন্তু উপায় কিছু নেই। যতই সময় যেতে লাগল, আলোর সঙ্গে আশাও হয়ে আসতে লাগল স্তিমিত; এই ভয়টাই মনে অধিকার বিস্তার করতে লাগল—নিরন্তর উপবাস দিয়ে সমস্ত রাত্রিটা গাছের উপর কাটাতে হবে নাকি! একটা কোন ব্যবস্থা করে নিতেই হবে যে।

গাছটা চেনা গাছ নয়, কোনও ফলও নেই যে চেনা না হলেও পরীক্ষা করে দেখা যেত। গাছের নীচেও মাত্র লম্বা লম্বা ঘাস, মত হাতীর দাপটে বিমদ্বিত হয়ে রয়েছে। সমতলের মধ্যে সিগারেটের টিন, আর আর্য্য নস্তির ডিবে। এক সময় একটা সিগারেট টানতে টানতে নলিনীবাবু বললেন—“এ অবস্থায় নিশ্চিন্দ হয়ে সিগারেট টানার মধ্যে একটা বীরভাব আছে বটে, কিন্তু তাতে চলবে না। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল, একবার নেমে একটু সন্ধান নিতেই হবে। পাহাড়ে আতা থাকা খুব সম্ভব, তার কয়েকটা গাছও আমি দেখেছি আসতে আসতে...দাঁড়ান হয়েছে, একটা জায়গাও আমার মনে পড়ছে, পথের ধারেই, বেশী দূরও নয়...”

এ ডালটা বেশ মোটা, মাঝখান থেকে অনেক ছোট বড় ডাল বেরিয়ে যাওয়ায় পড়বারও ভয় নেই। নলিনীবাবু একটা ডাল ধরে উঠে পড়তে বাচ্ছিলেন, হঠাৎ নীচের দিকে দৃষ্টি পড়তে এক রকম চোঁচিয়ে উঠলেন—“শৈলেনবাবু জোর বরাত—উত্তোগিনপুরুষসিংহ—কি যে বলে...ঐ দেখুন!”

ওঁর তর্জ্জনী অনুসরণ করে দেখি অন্তপ্রায় সূর্য্যের রাঙা আলো পড়ে ঘাসের ভেতর কি একটা চিকচিক করছে। একই লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম—আমাদের টিফিন কেঁরয়ারটা। তার একটু দূরেই আর একটা কি চিকচিক করে উঠল, ঠাঁহর করতেই বোঝা গেল আমাদের বন্ধুকা—হাওদা কাং হতেই দুটো নিশ্চয় নীচে পড়ে গিয়েছিল।

আমি নলিনীবাবুকে ধরে ফেললাম, বললাম, “আপনি কলকাতার মানুষ, মল্লমেন্ট হলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু গাছে উঠা-নামা করাটা আমারই এলাকার মধ্যে পড়ে, বসুন আপনি।”

একই অহুযোগের দৃষ্টিতে চাইলেন নলিনীবাবু, বললেন, “আমি দেখলাম, আর আপনি আত্মসাৎ করবেন, তার পর ‘আমার কলকাতা আর আপনার বেহারের পেট’ এই ছুতোয় বড় ভাগটা দখল করবেন—এ বীর-ধর্ম্ম হয় না শৈলেনবাবু...”

ডালপালার মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি পর্যন্ত বেশ গেলেন নলিনীবাবু, তার পরে নামতে যাবেন, কি যেন একটা দেখে

থমকে গেলেন, তার পর যেভাবে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ফিরে এসে আবার বসলেন আমি বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, “ব্যাপারখানা কি নলিনীবাবু, ফিরে এলেন যে।”

বেশ বোঝা গেল গলা শুকিয়ে গেছে. টিনটা আমার কাছে ছিল, বললেন, “সিগারেট একটা।”

দু-একটা টান দিয়ে বললেন, “সর্বনাশ হয়েছে শৈলেন-বাবু, আর ফিরে যেতে হবে না—”

“সে কি?”

একটা চরম ভয় আর নিরাশার জট্টাই বোধ হয় নলিনীবাবুর স্বভাবসিক কৌতুকপ্রিয়তা আবার ফিরে এসেছে, সিগারেটেও বোধ হয় একটু কাজ হয়েছে, বললেন, “পুরুষ-সিংহ চিত্তার পাল্লায় পড়েছেন, স্তন্দরী আবার সদ্য-প্রসূতি...”

“কোথায়?”

নলিনীবাবু নীচু হয়ে এক দিকে চাইলেন। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি প্রায় শ’খানেক হাত দূরে একটা ছোট; হাততিনেক উঁচু টিলার উপর হামাগুড়ি দিয়ে একটা চিতা রসে মাঝে মাঝে লেজ আছড়াচ্ছে আর দুটি বাচ্চা সেই লেজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করছে।

অসুস্থিত সূর্যের আভাষ একটা দুর্লভ-দৃশ্য, কিন্তু সে দেখবার আর সময় নেই। আমরা যে ডালটা ধরে উঠে-ছিলাম এই বড় ডালে, তাড়াতাড়ি সেটি ধরে নীচের ভীলে নেমেই কোমরের র্যাপারটা খুলে ডালে বাঁধতে আরম্ভ করলাম। শৈলেনবাবু প্রশ্ন করলেন—“ব্যাপারখানা কি? অতর্জনীয় যাচ্ছেন? আরে, সেই রাজা কি, তাঁর মতন অতিথি-সৎকারটাই তো ভালভাবে করা যাবে—”

বললাম, “আপনিও নেমে আসুন তাড়াতাড়ি এই ডালে, গেরোটা চেপে ধরুন, বন্ধুটাই নিয়ে আসি, অত ঘুরে যাবার সময় নেই।” উনি আসতে আসতেই আমি র্যাপার ধরে পা-টা নামিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আর এগুনো গেল না।

এখান থেকে দৃষ্টির আর কোন প্রতিবন্ধক নেই; মনে হয় হাতীর ব্যাপার থেকেই চিতাটার বোধ হয় এই জায়গাটির উপর লক্ষ্য ছিল, র্যাপারটা খুলে পড়তেই বোধ হয় একটু সতর্ক হয়ে পড়েছিল, আমার পা নামতে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। তার পরেই হুম্যানের মত আগে পিছে তুলে তুলে অগ্রসর হ’ল। আমি যে উপরের ডালটা পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারলাম, তার কারণ নিশ্চয় বাচ্চারা পিছু ডেকে দিয়ে থাকবে। একটু পরেই শাবক দুটিকে সঙ্গে করে আধ-ছোটা হয়েই এসে ঘাড় তুলে একটা আওয়াজ করলে।

নলিনীবাবুর চরিত্র দেখে বিস্মিতই হয়ে গেলাম, সম্মুখ বিপদের মধ্যে ওঁর কৌতুকপ্রিয়তাটুকু যেন আরও ফুটে বেরিয়েছে। বোধ হয় এইটে বজায় রেখে উনি চিত্তার পথটা রাখছেন পরিষ্কার। বললেন, “শৈলেনবাবু, মশাই, সামান্য একটা চিতা-বাঘিনীর ভয়ে হাত-পা আলগা হয়ে পড়ে যাওয়া বীর-ধর্ম্য হবে না, তার চেয়ে এক একটা ডালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখি আসুন র্যাপার দিয়ে।”

বললাম, “চিতা তো কিন্তু গাছে ওঠে।”

“জানি, বাঁধা থাকলে আমাদের লড়বারও সুবিধে হবে, ‘উই শুল ফাইট উইথ আওয়ার ব্যাক টু দি’ ডাল।... নিন্ এইবার এই ক’টা হাত দিয়ে বেশ ভাল করে গুঁড়ো করুন দিকি। আপনার তো বেহারের খৈনি দলা হাত।”

টিনে গোটা চল্লিশ সিগারেট ছিল, অর্ধেকগুলো আমার দিলেন, প্রশ্ন করলাম, “একি হবে?”

“বারুদ, আপনার নস্তির ডিবেটাও উজোড় করতে হবে। কিছু নাও হতে পারে, তবু কোন জিনিসই অবহেলার নয়, একেবারে সামনাসামনি এলে, দু’মুঠো বেড়ে দেব, চোখে নাকে যদি যায় তো দিতেও পারে কাজ। বেটি তো পণ্ডিতবংশের মেয়ে নয়—নস্তি নাও বরদাস্ত হতে পারে।”

নীচে থেকে একটা আওয়াজ হ’ল, “হুম্!” একটু গা ঢাকা হলে বোধ হয় বেশী খোলে।

নলিনীবাবু চাপা গলায়ই উত্তর করলেন, “বেশ তো, বসে বসে শাস্ত্র আলোচনা করা যাবে।”

আমরা বেরিয়েছিলাম জ্যোদশীর দিন। দিনটাও শুভ, আর অস্তুত পূর্ণিমাটা বাড়ীতে কাটাও এই রকম ইচ্ছা ছিল। সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ হয়ে উঠল স্পষ্ট।

সৌন্দর্য্যে ভীষণতায় অত অপরূপ পৃথিবীকে আর কখনও দেখি নি। আমার মনে হয় সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতর করে বিকশিত করবার জন্যে তার পেছনে চাই একটা ট্রাজেডি। তাই হয়েছিল সে রাতে, আর তো তোমায় ছেড়েই যাচ্ছি হে মুগ্ধে ধরণী—হে চির-নবীনা পুরাতনী...

না, একথাটা বোধ হয় একটু বেশী রকম ভাবালু হয়ে পড়ল। আমরা যে এত নিবিড়ভাবে সেদিন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পেরেছিলাম তার আরও একটা কারণ ছিল—যতই রাত এগুতে লাগল ততই বুঝতে লাগলাম বাঘিনীর গাছে উঠবার কোন অভিসন্ধি নেই। আশ্চর্য্যই বোধ হতে লাগল—প্যাছারই হোক, লেপার্ডই হোক, গাছে উঠা চিতাবাঘের রপ্ত, কিন্তু সেদিকে আমাদের নৈশ অতিথির কোন রকম তাগিদ নেই। একবার স্মৃষ্ণ গোড়ার দিকে গুঁড়ির কাছে এসে ঘাড় উঁচু করে যেন তদারক করে গেল, তারপর আর কিছু নয়। ঠিক বুঝতে পারা

যাচ্ছে না; হতে পারে, উপরে যখন শত্রুই রয়েছে, বাচ্চাগুলোকে একা ফেলে রেখে যেতে চায় না, এও হতে পারে যে মানুষ-শত্রুরই অভিজ্ঞতা আছে। কিংবা এও হতে পারে ভেবেছে—শিকার ত মুঠোর মধ্যে কিসের তাড়া এত, অবরোধের দ্বারা শত্রুকে করতলগত করা যাক না।

জ্যোৎস্নায় ক্রিনিক ফুটছে, আমাদের সামনে গভীর অরণ্য, ওদিকে বিস্তীর্ণ সমতল, মাঝখানে আমাদের এই কতকটা পাতলা পাহাড়-বন। আমাদের গাছটা খুব পুরনো, কিন্তু খুব ঘন ডালপালার নয়, দিকচক্রবাল পর্যন্ত সমস্তটুকুই আমাদের দৃষ্টির সামনে ঝলমল করছে। রাত্রির প্রথম অংশটা ছিল স্তব্ধ, তারপর যতই গভীর হতে লাগল ততই এদিকে-ওদিকে এক একটা যে আওয়াজ উঠতে লাগল তা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর।

আমাদের পায়ে নীচে আমাদের মৃত্যু। স্থানিশিত, বেশ জানি, একটু যে অনিশ্চয়তার কথা ভাবছি সেটা একটা সাঙ্ঘনা মাত্র, যতক্ষণ খাস ততক্ষণ আশও তো।

নলিনীবাবু বললেন, “শৈলেনবাবু, বাঘিনীই তো, নোলা আছে, আমাদের জ্যোৎস্নায় জারিয়ে নিয়ে তারপর যাবে।”

এক সময় ডি. এল. রায়ের সেই গানটাও ধরলেন—
আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো... বেশ উন্মুক্ত গলাতেই।

নীচে থেকে মাঝে মাঝে বাঘিনী—হুম্ হুম্ করে সাই দিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সঙ্গত।

এক সময় ভাবের ঘোরে বলে উঠলেন—“শৈলেনবাবু, মরবার আগে ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে যাই আর যেন মানুষ হয়ে জন্মাতে না হয়। বড় কুৎসিত আমরা। চেয়ে দেখুন নীচে, কি অদ্ভুত স্থান! ভাবছি, মানুষ আমরা কাপড়-জামার ফাঁকি বাজির সৌন্দর্য নিয়ে লোপাটাই হয়ে গিয়ে ওদের জায়গা ছেড়ে দিই না কেন এবার, বুদ্ধির যুগের বোকা মিটা দেখাও তো হ’ল অনেক, এবার একটা সৌন্দর্যের যুগই আসুক না।”

ভোর হ’ল। আমরা মানুষের জগতে ফিরে এলাম। আবার একটা অদ্ভুত ধরণের আশা বাঁচতে হবে, উপায় বের কর।...আদি যুগ থেকে যে বিবস্মান মানুষকে এসেছেন বাঁচিয়ে, বেদ-সঙ্গীতে নিয়ে এসেছেন পূজা, তাঁকে যুক্তকরে অভিনন্দন করলাম।...হে দেব, যাচ্ছি, তবু মানুষের হয়ে তোমায় যে শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার অবসর পেলাম, এত তো পরম সাঙ্ঘনা।

আজও বাঁচালেন, দিবালোকে রহতটা প্রকাশ পেল।

সকাল হতে বাঘিনীর চেহারা গেল বদলে।...এ কি রকম কথা!—সমস্ত রাত ছাঁপো নিয়ে উপোসী বসে আছি, কিনা শ্রেফ গান গেয়ে রাত কাটিয়ে দিলে!

লেক্স আছড়াতে লাগল আর উপরে চেয়ে চেয়ে হকার, তার পরেই ছুটে গিয়ে তর তর করে গুঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠে গেল। তার পর কিন্তু সেখান থেকে এক লাফে নেমে পড়ে মাটিতে মুখ রগড়ে থাকা দিয়ে মুখ আঁচড়ে আবার বাচ্চাদের মধ্যে এসে বসে হাঁকাতে লাগল। আমাদের অবস্থা সহজেই অহমেয়, দু’জনেই কাঠ হয়ে বসে আছি।

বারচায়েক এ রকম হয়ে গেলে, নলিনীবাবু উঠলেন, আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুনলেন না, বললেন, “এ বীর-ধর্ম নয় শৈলেনবাবু, হুম্মরী আসতে পারছেন না, দেখতে হয় তো সিংহদ্বারে কি বাধা পাচ্ছেন।”

পরে টের পেলাম আন্দাজটা করে নিয়েছিলেন বলেই এত সাহস। নিষ্কম্প পদে প্রায় ডালের গোড়ার কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন, তার পর খানিকক্ষণ ধরে দেখে দেখে চীংকার করেই উঠলেন একরকম—“শৈলেনবাবু, নারায়ণী সেনা! লীগুগির দেখে যান—ভয় নেই...” বাঘিনীও খানিকটা এগিয়ে এল, কিন্তু তারপর আর কেন এল না বলতে পারি না, সেইখান থেকেই একটা হকার ছাড়লে। নলিনীবাবু তাচ্ছিল্যভরে বললেন—“ধাম্ মাগী, বোঝা গেছে মুরোদ!”

এমন কিছুই নয়, কাঠপিঁপড়ে, কিন্তু এত যে সমস্ত গুঁড়িটি যেন হলদে করে রেখেছে। একটা চাপ, আস্তে আস্তে উপরেও যাচ্ছে নীচেও আসছে, কিন্তু প্রয়োজন হলে যে কত ক্ষিপ্ত—তাও দেখে নিলেন নলিনীবাবু, পকেট থেকে রুমালটা দিলেন সেই চাপের গায়ে ছুঁড়ে। কে যেন লুফে নিলে রুমালটা, মিনিটখানেকের মধ্যে সেটা একটা হলদের স্তূপ হয়ে গেল।

নলিনীবাবু বললেন আর ভয় নেই। এইবার শুধু যুদ্ধটা আরম্ভ করে দেওয়া।

বিস্মিতই হয়ে গেছি, প্রশ্ন করলাম, “সেনারা তো আমাদের দিকেও আসতে পারে, আসেই নি বা কেন?”

নলিনীবাবু বললেন, “ঠিক বলতে পারছি না মনে হয় মাঝের গুঁড়িটার উপরই কোন বড়গোছের ভোজ পেয়েছে...আমাদের সন্ধান পায় নি এখনও এটাও ঠিক। যাক, তাড়াতাড়ি লড়াইটা আরম্ভ করে দেওয়া যাক।... খুব কিন্তু তরস্ত হতে হবে আর খুব সাবধান...”

একটা লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে তার মাথাটা পিঁপড়ের চাপের উপর ধরলেন। মিনিট দুয়ের মধ্যেই সামনের পাতার অংশটা হলদে হয়ে গেল; নলিনীবাবু গোড়াটা

আমায় ধরিয়ে দিয়ে বললেন—“আলগোছে ধরে নিয়ে গিয়ে শীগ্গির বেটির সামনে ফেলে চলে আসুন।”

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডাল ভেঙে নিলেন।

বাধিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ডালটার উপর, কে জানে, বোধ হয় আমাদেরই একজন পড়ল ভাবলে।

অবস্থাটা বুঝতে না বুঝতে একেবারে গোটা চার ডাল তার ঘাড়ের পিঠে গিয়ে পড়ল ঝপ ঝপ করে।

তার পরই সে কি আছড়ানি আর চীৎকার! গাছের গোড়াটা যেন চষে ফেললে, তার পর উঠে আর বাচ্চাদের দিকে নজর না দিয়ে সোজা দৌড়, স্বর্ণা ডিঙিয়ে, পাহাড়

ডিঙিয়ে সমতলের দিকে, তার পর ভুলটা বুঝতে পেরে ঘুরেই সোজা শালবন।

আর দেরি করা নয়, বন্দুকটি আগে হাত করা দরকার। ডালে আলোয়ান বেঁধে আমরা নেমে এলাম, খুলে আনবার উপায় পরে ভাবা যাবে।

বাচ্চা দুটো কিরকম হকচকিয়ে গেছে, মায়ের অবস্থা দেখে ওদিকে এগোয়ও নি, একটাকে তুলে নিয়ে নলিনীবাবু বললেন, “গেরো দেখুন না, এখন ওঁর ছেলেমেয়ে মাছুষ কর তোমরা ব’সে ব’সে !...”

আগে চল

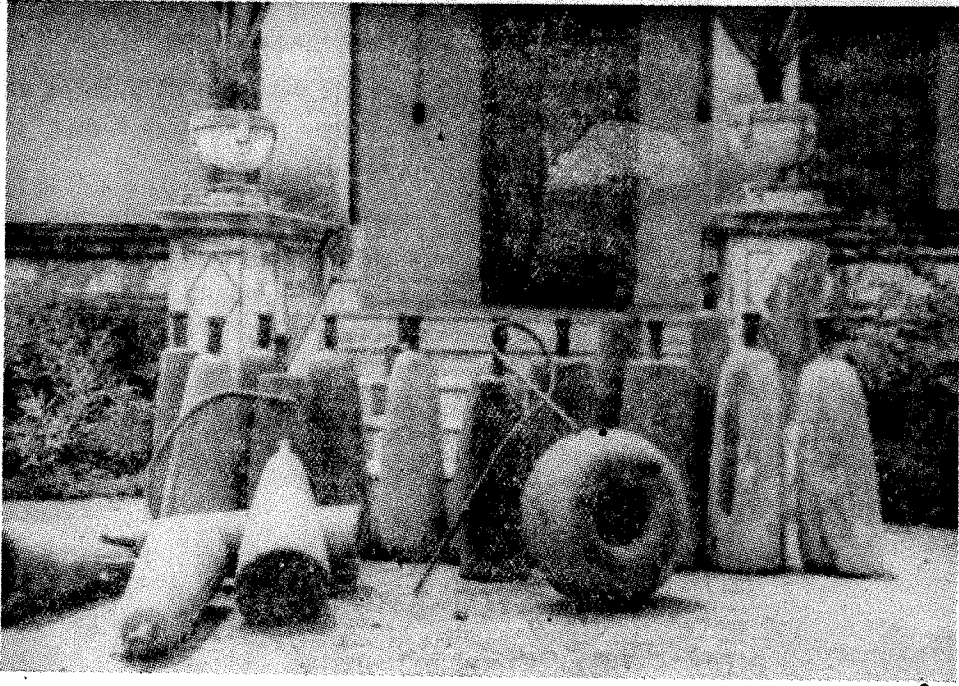
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে বিশ্বকর্ম, শোন শোন আজ নিরন্তর চলার গান,
পেরে চলে কবি, কণ্ঠে কণ্ঠে হটক সে চলমান।
বিদ্যাপ্রগতি সত্ত্ব অশ্ব স্বর্ধোর রথ টানে
চলে অবিরাম দিগ্ দিগন্তে আশ্বারের সন্ধানে।
রথচক্রের স্বর্ধরে ওঠে গতিবেগ চকল
আলোকের ধূলি ঠিকরিয়া পড়ে আলোকিরা নভোভল।
দিনের স্বর্ধ্য নিশীথে দীপ্ত উদয়-অস্ত নাই,
আকাশ হইতে পৃথিবীতে পড়ে আলোক সর্বদাই।
অবিরাম গতি অক্ষর জ্যোতি পৃথিবীর সম্বল
চলমান ধরা, মধুআবাদী চলার অস্তর ফল।
স্বর্ধোর পানে চেয়ে দেখি তার অরন অব্যাহত
অচলারতনে আপে সজ্জাস, তমিস্র পরাহত।
স্বষ্টির আদি হ’তে চলা তার দিনেকও বিরাম নাই,
অতএব চল আপে চল হবে, আরো আপে চলে যাই।

যে নদী বহিয়া চলে অবিরাম নির্মল তার বারি
যে বীণার তারে অনাহত সুর মহাকাশে ঠাই তারি ;

যে ফুলের রঙে দাগ ধরে নাকো, সে ফুলে দেবতা পুজি’
অক্ষর মাঝে আমার আমিরাে স্তম্ব হয়ে বুঁজি।
ধ্বিতে ধ্বিতে চন্দন দেয় সুগন্ধ মনোলোভা।
প্রবল প্রবাহ কীণ ভরলে বাড়ার নদীর শোভা।
শরানে থাকারে বলি কলিকাল, দাপর জাগিয়া ওঠা,
উঠিয়া দাঁড়াই সেই জেভায়ুগ, সত্যযুগই শু কোটা।
দেহ-আত্মার চরম বিকাশ নিরন্তর চলার মাঝে
সব পাপ সব হীনতা নাশিরা আপনি মুক্তি রাখে।
বসিরা বসিরা দিন গণে যারা হারার শ্রেষ্ঠ বন
পাপ ঢোকে তার জীবন-রক্তে, শ্রীহীন শ্রান্ত জন ;
অপ্রাণীর সবা সহচর দেবতা দাঁড়ান পাশে
যে বসিরা থাকে তাহার ভাগ্য বসিরা বসিরা হাসে ;
যে উঠে দাঁড়ায় তার সাথে তার ভাগ্য দাঁড়ায় উঠে
হারানো দিনেরে কিরায়ে আনিতে বুধ যে বৃথা ছুটে।
অতএব চল, আপে চল তাই, চেয়ো না পিছন কিরে
দেখ সম্মুখে উদয় স্বর্ধ্য, জীবন-সাগর-তীরে।





রাজা রঘুনাথ মল্লের বয়স ও শক্তি অস্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন ওজনের ব্যায়াম সরঞ্জাম, যে লৌহদণ্ড পাঁচ লাগাইয়া আবার পুলিশছিলেন তাহা এবং হাতের চাপে যে লৌহদণ্ডকে বক্র করিয়াছিলেন তাহার আলোকচিত্র

[কটো—লেখক]

রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালঘণ্ডেব বাহাদুর

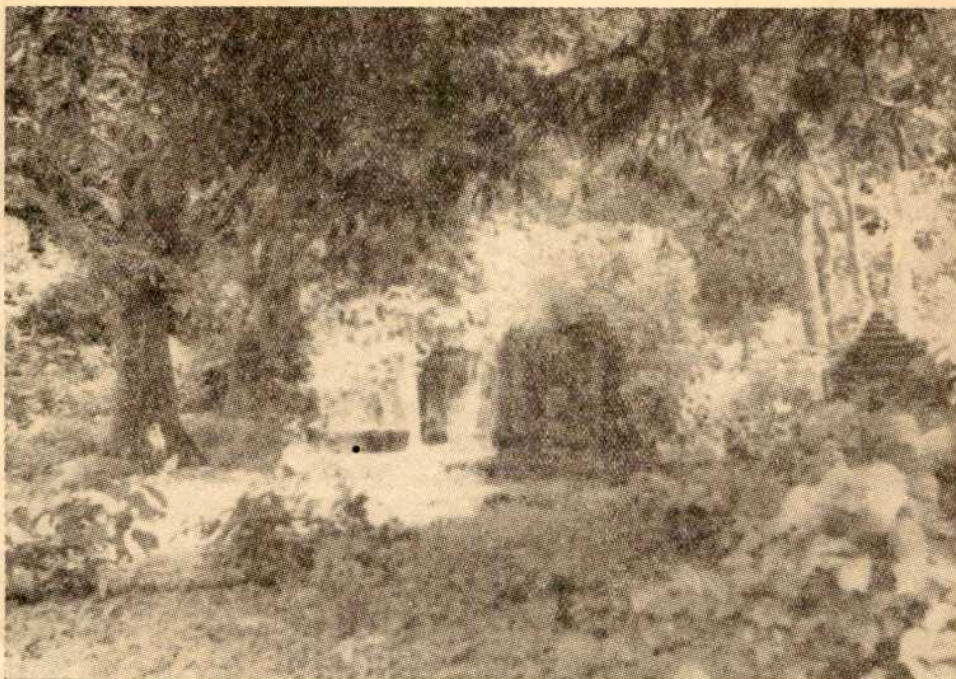
ত্রিবিধুভূষণ জানা

কাকদ্বীপ মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা শহর। অতীত কালে ইহা উড়িষ্যাশিপতির শাসনাধীনে ছিল। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে রাজা রঘুনাথের পূর্বপুরুষ রাজা সর্বেশ্বরনারায়ণ মল্লদেব সিক্কী কতেপুর অঞ্চল হইতে পুণ্ড্রী ত্রিক্ষেত্র পর্য্যটন করিতে আসিয়া এই মহকুমার বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে তিনি কাকদ্বীপে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা উগালঘণ্ডেব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ইহার বংশধরেরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিজেদের বাহুবলে রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুর রাখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে নাম মাত্র রাজ্যে ইহারা ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করেন।

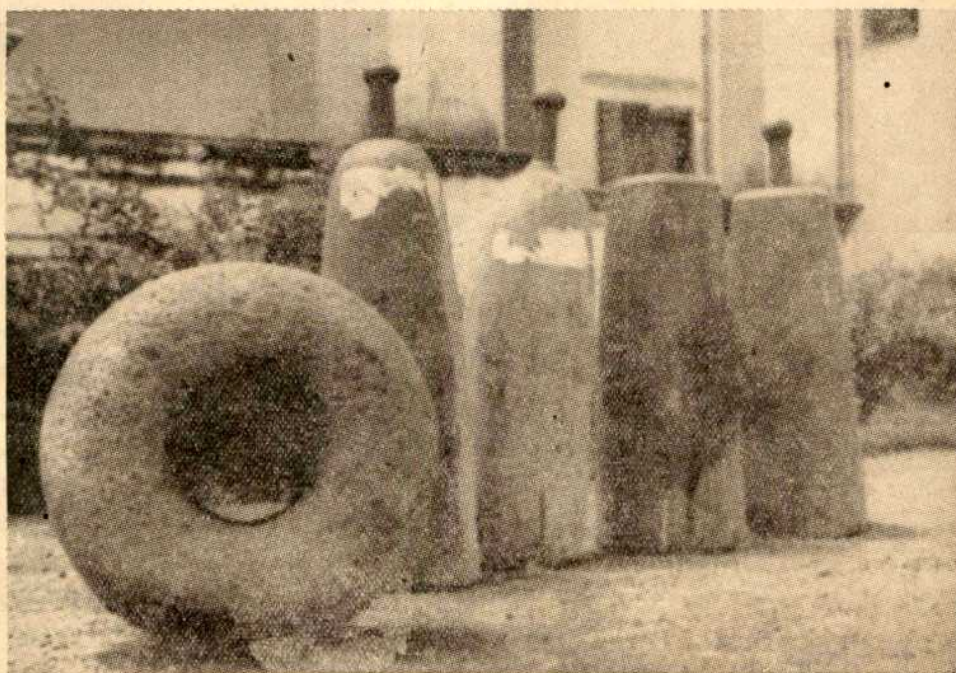
এই বংশের রাজা সর্বেশ্বর একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে ও শক্তি-পরীকার শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়া রাজন্যবর্গের দ্বারা 'মল্ল' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহার অবশ্যন প্রায় অষ্টাদশ পুরুষের রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালঘণ্ডেব জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা জাতিতে কাকদ্বীপ।

রাজা রঘুনাথ একজন অমিত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শক্তি-কীর্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এদেশের শরীরচর্চার ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। বর্তমান কালের কীর্ণকীবী ও দুর্বলদেহীদের নিকট তাহা বিশ্বাস্য মনে হইবে। কারণ আজকাল সাধারণ ভাবে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ত মানুষ বাংলাদেশে অতি বিরল। সামান্য ও মহাত্মারতোক্ত বীর-শ্রেষ্ঠদের কাহিনী আমাদের নিকট এখন মিথ্যক গল্পে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনেকে পান্ডিত্যের ভাণ্ডে ও রাশিয়ার ক্রোমারের শক্তির পরিচয় বিস্তৃত হইয়াছেন। এবং আমাদের দেশের জামাকাড়, তীম ভবানী ও রামমূর্তির কাহিনীগুলিও গল্পের তার বোধ হইতেছে। এমন কি প্রদেব ত্রিহুত গোবর বাবুর কথাও যেন লোকে ভুলিতে বসিয়াছে।

আমি রাজা রঘুনাথের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। রাজপরিবার ও প্রতিবেশী প্রাচীন মাতব্বরদের দ্বারা তাহা যাচাই করিয়া লইয়াছি। আমি আরও হই জন অনভাসাধারণ শক্তিশালী



বাহাদুর রাজপরিবারের প্রাচীন ব্যায়ামাগার। উচ্চ-উগাল পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে অবস্থিত
[কটো—লেখক

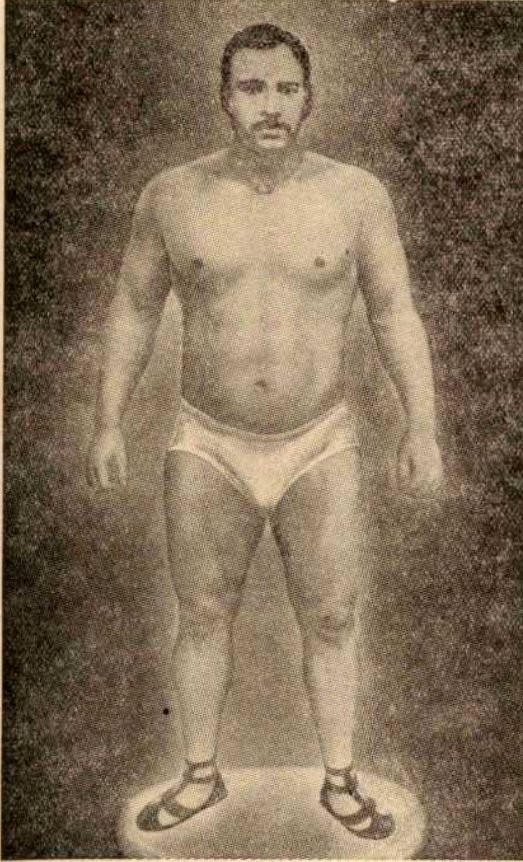


ব্যায়াম-সরঞ্জাম। প্রস্তর নির্মিত একটি বৃহৎ নাল। ইহা ভার-উত্তোলনের ব্যায়ামে ব্যবহৃত হইত।

১ম দিকের এক জোড়া যুগলের ওজন একমণ পঁচিশ সের, ২য় জোড়ার ওজন একমণ বত্রিশ সের।

রাজা রঘুনাথ এই সরঞ্জামগুলি লইয়া ব্যায়াম করিতেন। [কটো—লেখক

পুরুষের বিষয় জানিতে পারিয়াছি। এ সমস্ত আমার সংগৃহীত তথ্যের পরিপোষক। অহুসন্ধান করিলে তারতবর্ষে এরূপ আরও শক্তিমান পুরুষের পরিচয় পাওয়া যাইবে।



রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালমণ্ডদেব বাহাদুর

রাজা রঘুনাথ ১২৭২ সালে আশাঢ় মাসে রথোৎসবের পূর্ব-দিন ঝাড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় এক দিন তিনি কোন কারণে ঝাড়গ্রামে কিরিবার গাড়ী ধরিতে পারেন নাই। মেদিনীপুরে রাজি-বাপনের অহুবিধা বুঝিয়া পদব্রজে ঝাড়গ্রামে রওনা হইলেন। মেদিনীপুর হইতে ঝাড়গ্রামের পথ জঙ্গলাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র ভল্লকের আবাসস্থল, সুতরাং সন্ধ্যার পূর্বেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার জন্ত তিনি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দৌড় বন্ধ করিলেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে রাজি হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে অবিরাম দৌড়াইতে হইয়াছিল। তিনি নিজ গড়ে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে সকলে বিস্ময়ভিত্ত হইয়া যায়। ইহা সহপাঠী ও প্রতিবেশীগণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায়,

তিনি একাধিক বার অবিরাম দৌড়ে এই সুদীর্ঘ ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বাল্যজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী।

রঘুনাথ আঠার বৎসর বয়স হইতে ঝাড়গ্রাম গড় পরিবেষ্টিত প্রসিদ্ধ ও সু-উচ্চ উগালের বহির্ভাগে ‘ভৈরবমন্দির প্রাঙ্গণে’ তাঁহাদের প্রাচীন আখড়ায় নিয়মিত শক্তিচর্চার মনোযোগী হন, তিনি প্রথম মধুরার অধিবাসী ছয়ারী চোবে নামক একজন প্রসিদ্ধ মল্লকে নিযুক্ত রাখিয়া মল্ল-ক্রীড়ার সঙ্গী করেন এবং ক্রমে ক্রমে শক্তি-চর্চার অহুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পঞ্জাবের গোলাপ বাঁ ও সাহাদালী বাঁ, গুজরাটের ববরি মিঞা, এটোয়ার সুন্দর সিং এবং কাশীর শালগ্রাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে প্রায় পমর-কুড়ি বৎসর নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ইহাদের সহিত প্রায়ই তাঁহার শক্তিপরীক্ষা হইত। রাজবাড়ীতে যে-কোন উৎসবের সময় মল্লযুদ্ধ ও নানাবিধ শক্তি-ক্রীড়ার প্রদর্শনী একটি বিশেষ অস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজা রঘুনাথ প্রায় এক মণ করিয়া দুইটি মুণ্ডর দুই হাতে ভাজিতেন। আড়াই মণ ওজনের পাথরের ‘পাল’ এক হাতে মস্তকের উপর উত্তোলন করিতেন। কাষ্ঠনির্মিত বহু ‘জাদাল’ (প্রায় তিন মণ) দুই হাতের সাহায্যে মাথার উপর তুলিতে পারিতেন।

রাজা রঘুনাথ এক মণ ওজনের মুণ্ডরকে একটি হস্তাঙ্গুরের উপর রাখিয়া খেলা দেখাইতেন। খোঁচি খেজুর ও ভাল গাছের জট ধরিয়া অনায়াসে উৎপাটন করিতেন। বহু ভাল ও শাল গাছের উপরের কিছু শিকড় ও মাটি উঠাইয়া মূলদেশে শিকল বাঁধিয়া অবনত দেহে তাহা নিজ কন্ধদেশে জড়াইতেন এবং সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া বৃক্ষটিকেও উৎপাটিত করিতেন। চারিটি অহুচ্চ গুড়িকার্টের খুঁটির উপর দুইটি বহু কাঁঠের বীম সমান্তরালভাবে রাখা হইত। তাহার উপর হাতী উঠাইয়া, বীমের নীচে নামিয়া—বীম দুটিতে পৃষ্ঠদেশ লাগাইতেন। অতঃপর বীম সহ হাতীটিকে পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া তারসাম্য বজায় রাখিতেন। দুই হস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য ও ৩-৪ ব্যাসের লৌহদণ্ডে দড়ির জার গাঁট দিতেন। এক সময় মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার কীরোদ বিহারী মুন্ড মহাশয় ঐ প্রকার একটি লৌহদণ্ড আনিয়া রাজা রঘুনাথকে গাঁট দিতে বলিয়াছিলেন—রঘুনাথ অনায়াসে তাহাতে গাঁট দিয়া কীরোদ বাবুকে হতবাক করিয়াছিলেন। কীরোদবাবু এই গাঁট দেওয়া লৌহটিকে পাশ্চাত্যের কোন এক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য যতটুকু তদপেক্ষা একটু অধিক ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি ধামে, দুইটি বৃক্ষে অথবা দুইটি বহু খুঁটির মধ্যে উপুড় ভাবে শয়ন করিয়া পদদ্বয় দ্বারা ও হস্তদ্বয়ে ধাম দুইটিকে ঠেলিয়া কান্দ করিয়া দেওয়ার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভূমির সহিত সমান্তরাল

ভাবে শরীরকে ধাম ছুইটির শীর্ষদেশে উত্তোলন করিতেন ও কুতলে নামাইতে পারিতেন। একবার একটি বিশাল নিধ-রুদ্ধের ছুইটি বিপরীত দিকে প্রসারিত শাখার ব্যবহানে এই প্রকার প্রচাপন দেওয়ার রুদ্ধের মূল কাণ্ডট ছুই শাখার সহিত যিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বুদ্ধের উপর পনর-ঘোল মণ ওজন গ্রহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া দেখাইতেন। তিনি টাং-অফ-ওয়ারে একক একদিকে থাকিয়া প্রায় একশত সাধারণ ব্যক্তির গতিরোধ করিতেন।

তিনি কেবলমাত্র শক্তি-সাধনায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে, বরং তিনি বিভিন্ন বিদ্যায়ও সফলতা-

লাভ করিয়াছিলেন—জ্যোতিষ বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ও বাজ্যন্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

রঘুনাথের দৈহিক ওজন ৩ মণ, উচ্চতায় ৫'-১১" ইঞ্চি, বাহু ২০ ইঞ্চি, ছাতি ৫২ ইঞ্চি ছিল। তিনি বাং ১৩১৭ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজা রঘুনাথের পৌত্র রাজা মরগিংদেব নিজ বদান্ততা শুণে বাঙালী মাহেদুরই প্রজা ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। তিনিও একজন কৃতী ব্যায়ামবীর এবং শিকারী, তিনি প্রগতিমূলক ও জাতীয় কল্যাণকর বহু প্রতিষ্ঠানের স্থাপনিতা এবং একজন বিজ্ঞানসাহী ব্যক্তি। বর্তমান সময়ে তাঁহার তুল্য দাতা ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল।

রাজনগর

শ্রীনীমাত্ম চৌধুরী

স্বদেশী ও বয়স্কট আন্দোলন, সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদন, অসহযোগের ভীতি, বাংলার হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা, ভারতবর্ষের অত্যন্ত কয়েকটি প্রদেশে বাঙালীর আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি, কিছুই সরকারী নীতির পরি-বর্তন করিতে পারিল না। ১৬ই অক্টোবর হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলা বিভক্ত হইবে স্থির হইল।

বাঙালী জাতির একতা ও অবিভাজ্যতা প্রমাণ ও শ্রমণ করিবার জন্য ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) বাঙালীকে রাষ্ট্রবীৰ্য্যদ্বন্দ্ব উৎসব ও প্রতিগৃহে অরুণ ভ্রত পালন করিবার উপদেশ দিয়া রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী, ভুপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির স্বাক্ষরে সংবাদপত্রে এক আবেদন প্রচারিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা দিলেন, উভয় বন্ধের মিলন-চিহ্নরূপ পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া মন্ত্র বলিতে হইবে—

তাই ভাই এক টাই, ভেদ নাই ভেদ নাই—

আমরা এক, আমরা অখণ্ড।

বাংলার সর্বত্র হিন্দুরা ৩০শে আশ্বিন শোক-দিবস পালন করিলেন। কোম গৃহে উল্লস ঘলিল না।

কলিকাতায় কি ভাবে ৩০শে আশ্বিনের রাষ্ট্রবীৰ্য্যদ্বন্দ্ব-উৎসব পালন করা হইল জানিবার জন্য দেবানন্দ ও তাহার বন্ধুরা ব্যগ্রভাবে সংবাদপত্রের অপেক্ষা করিতেছিল। কলিকাতার সংবাদপত্র আসিলে দেবানন্দ আগে একখানি কাগজ সংগ্রহ করিয়া এই বিবরণ পড়িতে বসিল। সে পড়িল রাজধানীতে দোকানপাট, বাজার, যানবাহন চলাচল সব বন্ধ ছিল।

সকালের দিকে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। বালক, যুৱক, শিশু, ছাত্র, মাষ্টার, ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার, ভদ্র ও সাধারণ উভয় শ্রেণীর অসংখ্য লোক ধালি পায়ে গান করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। গোটা কলিকাতা শহর যেন রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। মোড়ে মোড়ে সওয়ার পুলিশ, সার্জেন্ট, কমেণ্ডবল টাড়াইয়া, তাহাদের ডাব দেখিয়া মনে হয় যেন শহরে একটা বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছে তাহার।

কেডারেশন প্লীটের মাঠে বিরাট সতায় অখণ্ড বদন্তবনের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। সতায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য ক্রম, যত্নপূর্ণ্যজী আনন্দমোহন বসুকে আরাম কেদারায় শয়ান অবস্থায় সভাস্থলে আনা হইল। সভাশেষে ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও আন্ততঃ্য চৌধুরী। ছাত্র ও ছাত্রীরা সমবেদ কণ্ঠে গান করিল—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,

বাংলার বায়ু, বাংলার স্নান,

পুণ্য হটক, পুণ্য হটক, পুণ্য হটক হে ভগবান।

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,

বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,

সত্য হটক, সত্য হটক, সত্য হটক হে ভগবান।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,

বাঙালীর ঘরে বসে তাই-বোন,

এক হটক, এক হটক, এক হটক হে ভগবান।

বাংলার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে বালক ও যুৱকগণ প্রভাতী সঙ্গীত গাহিয়া নগর ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করিল; বালক,

বুড়, যুবক পরস্পরের হাতে রাধী বাঁধিয়া দিল। সকলে মিলিয়া স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। বাংলার আকাশ-বাতাস সেদিন বন্দোবস্তমুখরিতে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গের বেদনায় গোষ্ঠীগত ভাবে সেই প্রথম অভিজুত উভয় বঙ্গের বাঙালী দেশের হাটে, মাঠে, খাটে ঘোষণা করিল :

ভাই ভাই এক ঠাই,
ভেদ নাই ভেদ নাই।

প্রাদেশিক ও অর্থনৈতিক রূপ অতিক্রম করিয়া বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সর্বাত্মক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল সেই স্মরণীয় ১৯০৫ সালের ৩০শে অগ্নিনি হইতে।

বাংলার প্রবল উত্তেজনার ভরদ উৎকল, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাবে শিক্ষিত-সমাজ ও ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা আনিল। দূর নৌশেরা, রাওয়ালপিণ্ডি, ফিরোজপুর হইতে স্বদেশী সভার সংবাদ আসিতে লাগিল। একখানি কাগজ লিখিল—স্বদেশী আন্দোলন ভারতবর্ষের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিতে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবে মনে হইতেছে।

মাদ্রাজে ছয় হাজার ছাত্র সভা করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহায়ত্ব জ্ঞানাইয়া টেলিগ্রাম পাঠাইল। মধ্যপ্রদেশ হইতে খবর আসিল অমরাবতী সরকারী স্কুলের কয়েকজন ছাত্র স্বদেশী-সভায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া শিক্ষকগণ তাহা-দিগকে বেত্রপ্রহার করিয়াছেন ও স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। খালি পায়ে স্কুলে যাইবার অপরাধে ঢাকা কলেজ ও স্কুলের ২৭৫ জন ছাত্রকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির করিয়া দিবার ও বাকী ছাত্রদের নিকট কৈফিয়ত চাহিবার খবর পৌছিল। বাংলার ছাত্রমহলে বিক্ষোভ দেখা দিল।

দেবানন্দ বরিশাল কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। কলেজের ছুটি ছেলের সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ইহাদের নাম মহেন্দ্র ও অতুল। অতুল ছিল শক্তিশালী, স্পষ্ট-বাদী ও সাহসী, ইংরেজের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। মহেন্দ্র ছিল নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রবণ ছেলে। সে ভাল গান করিতে পারিত। রাজনীতি চর্চাতেও তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাহার প্রিয় কাগজ ব্রহ্মবাক্য উপাখ্যায়ের সন্ধ্যা। তাহা ছাড়া হিত-বাদীতে কাব্যবিশারদ কি স্বদেশী কবিতা লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ কোন নুতন জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিলেন—এ সকল সে সাগ্রহে সংগ্রহ করে ও বন্ধুদের পড়িয়া শোনার।

কলিকাতা ও মকস্বেলের অনেক স্থানে স্বদেশী-প্রচারের জন্য ছাত্রকমিটি গঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার কমিটি ছাত্র-সমাজের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া বিরূতি প্রচার করিল। এই বিরূতি প্রকাশের ফলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষভাবে ছাত্র-সমাজের উপর পড়িল এবং কুখ্যাত লারন ও কারলাইল সারকুলার বাহির করিবার প্রস্তাব উঠিল।

নুতন বঙ্গবঙ্গের প্রথম দিকের কথা।

কলেজের ছোট্টেলে অতুল ও মহেন্দ্রের ঘরে অথবা ছোট্টেলে পিছনের দিকে বকুলতলায় মাঝে মাঝে স্থানীয় ছাত্র কমিটির বৈঠক বসিত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট্টেলে ঘরে বৈঠক বসিলে অতুল পকেট হইতে কয়েকখানা ছাণ্ডবিল বাহির করিল। বলিল, দেবানন্দ, তুমি কেবল খুঁতখুঁত কর কোন কাজ হচ্ছে না, এই দেখ।

সে চোঁচাইয়া একখানি ছাণ্ডবিল পড়িতে লাগিল—

“বাংলার ঘরে ঘরে স্বদেশীমন্ত্রের প্রচার।

স্বদেশীমন্ত্র পালানের উদাত্ত আস্থানে দেশবাসীর অগুরু সাড়া।

বঙ্গভঙ্গে মর্যাদিত বাঙালীর বঙ্গকঠোর পণ।

মিশনরী স্কুলের খ্রীষ্টান শিক্ষারীক্ষীগণ জুতা ও মোজা ত্যাগ করিয়া খালি পায়ে স্কুলে যাওয়াতে পাদ্রীপুত্রবের কোষ। মৈয়মনসিংহের মুচীগণ বিলাতী জুতা মেরামত করিতে অস্বীকার করিল। ধোপাদের নুতন বিলাতী কাপড় কাচিতে অস্বীকার। কাজীঘাটের ধোপারা আর বিলাতী কাপড় কাচিবে না। বাথরগঞ্জের উড়িয়া পাচক ও ভৃত্যেরা সভা করিয়া জ্ঞানাইয়াছে যে সকল বাড়ীতে বিলাতী জিনিস ব্যবহার হয় তাহার লেখানে কাজ করিবে না।

আরও শুধুন—বিলাতী সিগারেটের ধূমপানী বাবু-ভায়াকে খোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল। বিলাতী কাপড় বেচিতে না পারিয়া মাড়োয়ারীদের মাথায় হাত। বঙ্গ-কুলললনাগণ কাঁচের চুড়ি ও চীনা মাটির খেলনা ভাঙ্গিলেন। নেটিভ খ্রীষ্টান সমাজ বিরাট সভা করিয়া ঘোষণা করিলেন—বিলাতী জিনিস বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ। ভাটপাড়ার পণ্ডিতস্কুল-চুড়ামণির বিহারের ছেলেরা ছেলেরা স্বদেশী প্রচার।”

অতুলের পড়া শেষ হইলে সকলে হাততালি দিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিল। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এ ছাণ্ডবিল কোথায় পেলেন?

অতুল—নদীর ধারে ছোট ছোট ছেলেরা বিলোজিল।

নির্মল নামে একটি ছেলে বলিল, অতুলদা, আজকের ‘প্রতিজ্ঞা’ কাগজে একটা গ্র্যাণ্ড কবিতা বেরিয়েছে, শুনবেন?

অতুল—কি বলেছে কবিতায় আগে বল শুন।

নির্মল—বলেছে বিলাতী মার্কেটদের মালভর্তি জাহাজ-গুলো বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়ে দাও।

অতুল হাসিল। বলিল, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া বটে। কবি ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরুত বল? ইন্ডিয়ান মিরর এই কবিদের সম্বন্ধে কি বলেছে শুনবে? বলেছে, বাবা-সকল, স্বদেশীর জন্য স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন কর, ভালই কিছু বস্তা বস্তা ছাতু ঢেলে অল্পে ক্যানেল বঙ্গ করবার, পটকা মেরে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবার প্রস্তাবগুলো আর করে না,

বহুতা-মধ্যে উঠে পাগলা দরবেশের নাচ দেখিও না আর। সবাই হাসে এতে।

নিখুল অতুলের হাসিতে ও কথাই ফুট হইল। অতুল বলিল, তুমি চটো না নিখুল, তোমার এই “নাচ নাচ চামুড়া” আর “হে মাতঃ দুর্গা অমরদলনী” এই জাতীয় আফালন আমি সহ করতে পারি নে। মা মা করে চীৎকার করলে লিভার-গুলের লবণ আর ম্যানচেস্টারের কাপড় বোকাই জাহাজগুলো ভুস করে তলিয়ে যাবে বঙ্গোপসাগরে?

নিখুল চটয়া গেল। বলিল, আপনার কানে এ ছাড়া আর কিছু পৌছায় না দেখছি। ভাল কান দুটো তৈরি করেছেন অতুলদা। রাজপুত বীরদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্ত আবেদন, বাংলা মায়ের হুঃখমোচন করবার জন্ত চীন ও জাপানের পথে চলবার আবেদন—এ সব কানে পৌছয় না। শিবাজী মহারাজের গৌরবগাথা আপনি শুনতে পান না।

নিখুলকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে মহেন্দ্র বলিল, অতুল ঘোর নাস্তিক, ওর কথা ছেড়ে দাও। স্বদেশীভ্রত সকল করবার জন্ত কালীঘাটে পূজা এবং হোমের কথা শুনে ও হাসে। মা কালীর সামনে স্বদেশী ভ্রত পালন করবার প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে শুনে ওর হাসের উদ্বেক হয়। কিন্তু ইংলিশমান কাগজ রাগে কাঁপছে, বলছে—বাঙালী বাবুর দল স্বদেশী ভাণ্ডা দিয়ে নিরক্ষর জনসাধারণকে বিপথে চালিয়েছে, গবর্ন-মেন্টের উচিত এর প্রতিবিধান করা।

দেবানন্দদের ছাত্র কমিটির কাজ তেমন ভাল চলিবেছিল না। ফুলারী-শাসনে দমননীতির চাকা জোরে ঘুরিতে লাগিল। শীঘ্রই ফুলারের বন্দেমাতরম-বিরোধী সারকুলার জারি হইল। তারপর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের লয়লালটি সারকুলার, কারুলাইল ও লায়নের সারকুলার। অনেক অভিভাবক ভয় পাইলেন, অনেক ছাত্রের উৎসাহে ভাটা পড়িল। ইতিমধ্যে কলিকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এন্টি-সারকুলার সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ও মফস্বলের অনেক শহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইল। দেবানন্দ, অতুল ও মহেন্দ্র পুরাতন ছাত্র-কমিটির কয়েকজনকে লইয়া একটি শাখা স্থাপিত করিল।

ইহার কয়েকদিন পরে লালমোহন ঘোষ দিনাজপুরে ভাটার বিখ্যাত অসহযোগের বহুতা দিলেন। তিনি বলিলেন, আইন-সভার দেশী সভ্যরা, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ, ম্যুনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ডের সভ্যগণ এবং ইউনিয়ন পঞ্চায়ৎগণ পদত্যাগ করুন, দেশের সকল লোক এক বৎসরের জন্ত শোক-চিহ্ন ধারণ করুন, সকল রকম আনন্দ-উৎসব বন্ধ রাখুন।—এই বহুতা কয়েকদিন খুব উত্তেজনার সঞ্চার করিল দেশের মধ্যে। কিন্তু উত্তেজনা কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিল না।

দমননীতির চাকা আবর্তিত হইতে লাগিল। রংপুরের

কীর্ত্তমান ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এমার্সন বদলী হইয়া আসিবার পর হইতে শহরের হাওয়া গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে-দিন সমস্ত শহরময় উত্তেজনার বহু বহিতে লাগিল। মিঃ এমার্সনের আদেশে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিবার অপরাধে কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলেকে বেজ-প্রহারে জর্জরিত করা হইয়াছে, খবর রটিল।

সন্ধ্যার দিকে হোষ্টেলে অতুলদের ঘরে কয়েকজনের মধ্যে অন্ত্য উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছিল। দেবানন্দকে সকলের অপেক্ষা বেশী উত্তেজিত দেখাইতেছিল। অতুল গুম হইয়া তাহার ভক্তপোষের উপর বসিয়া ছিল।

মহেন্দ্র বলিল—ফুলার, এমার্সন ও কেন্স মিলে বরিশালকে শেষ করবে ঠিক করেছে। শুনলাম সেদিন কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ জ্যাকের বোট লক্ষ্য করে নদীতে নাকি মাটির টেলা ছুঁতেছিল। এই অপরাধে বানরীপাড়ায় পিটুনি পুলিশ বসাবার আদেশ দিয়েছে ফুলার সাহেব। বরিশালে বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া বন্ধ করবার জন্ত গুর্খা সৈন্ত আমদানী হচ্ছে। তাও শুনেছি।

দেবানন্দ বলিল—ছেলেরাও চূপ করে বসে নেই। বন্দেমাতরম বলার ভয়কে দিলে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছেলেরা জুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ঢাকার চার হাজার ছেলে সরকারী জুল কলেজ ছেড়ে চলে এসেছে। আসান-সোল জুলের ঘাট জন ছেলেকে এই অপরাধে বের করে দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের বহু ছেলে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া দেবানন্দ আবার বলিল—তোমরা এমার্সনের আদেশে বন্দেমাতরম বলবার জন্ত ছেলেরা বেত মারার ব্যাপার শুনে উত্তেজিত হয়েছ, কিন্তু তোমরা জান না সেদিনকার স্বদেশীসভায় যোগ দিয়েছিল বলে জেলা জুল ও টেকনিক্যাল জুলের প্রত্যেক ছেলেকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করবার আদেশ দিয়েছে এমার্সন। এদিকে মানারি-পুরে কি হয়েছে জান? এক সরকারী চাপরাশির সঙ্গে বন্দেমাতরম বলা নিয়ে ছেলেরা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। চাপরাশির ভয়কানিতে উত্তেজিত হয়ে ছেলেরা তাকে বাঁকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে ফুলারের আদেশে ছাত্রদের প্রকাশ্যে বেতমারা হ'ল আর জরিমানা হ'ল দেড়শো টাকা।

খানিকটা রাত করিয়া দেবানন্দ সে দিন বাড়ীতে ফিরিল। জীবানন্দ আপিসঘরে তখনও কাজ করিতেছিলেন। পূত্রকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। বীর স্বরে বলিলেন—কাল থেকে সকাল সকাল বাড়ী ফেরবার চেষ্টা করো। সময় ভাল নয়।

দেবানন্দ দাঁড়াইয়া পিতার কথা শুনিল, তার পর ভিতরে

চলিয়া গেল। তাহার কানে সংবাদ পৌছিয়াছিল যে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্পের সঙ্গে তাহার পিতার কি একটা বিষয় লইয়া গোলমাল চলিতেছে। ম্যাজিস্ট্রেট এমাদানও তাহার প্রতি প্রসন্ন নহেন।

কয়েক দিন পরে দেবানন্দ ছুইখানি চিঠি পাইল। একখানি চিঠি ইঞ্জের। অল্পখানি লক্ষ্মী লিখিয়াছে। লক্ষ্মীর চিঠি পাইয়া তাহার আনন্দ হইল। ভাবিল লক্ষ্মীর হাতের লেখা খুব ভাল হইয়াছে। লক্ষ্মী লিখিয়াছে—তীক্ষ্ণচরণে মাদা, আপনার ছুটি কবে আরক্ত হবে? ইন্দ্রদাদার ছোট বোন চিন্ময়ীর বিষয়ে হ'ল। আপনি নিমন্ত্রণ খেতে পেলেন না। নিম্নামত চৌকিদারের চাকরি গেছে। রাধীবন্ধনের দিন বাড়ীতে সে রান্না করেছিল বলে হরিচরণকে বমক দিবেছিল। হরিচরণ খানায় বলে দেয়। হরিচরণকে সবাই একঘরে করেছে। ইন্দ্রদাদার পাঁচ টাকা জরিমানা হয়েছিল। রাজনগরের স্কুল নাকি ভেঙ্গে যাবে। এখানে বন্দেমাভরম্ বলা মানা হয়েছে। চৌকিদার দেখলে ছোট ছোট ছেলেরা জোরে জোরে বন্দেমাভরম্ বলে। যা বললেন, বাবার শরীর নাকি ভাল নয়, ভিনি ছুটি নেবেন। আপনি বাবার দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন। তাঁর ষাওয়া-দাওয়ার অযত্ন অনিয়ম না হয় দেখবেন। ঠাকুর শরীর বন্ধ ধারাপ হয়েছে। আগের মত আর উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন না। কবে বাবা বাড়ী আসবেন জিজ্ঞাস করেন রোজ। চিন্ময়ীর স্বস্তরবাড়ীর লোকেরা নাকি ভাল নয়। থুঙ্গীর মা যি বললে। সে চিন্ময়ীর সঙ্গে গিয়েছিল। শাশুড়ী ভারি কড়া আর ক্যাটকটে কথা বলেন। আপনি কেমন আছেন? প্রণাম নেবেন। ইতি—সেবিকা লক্ষ্মী

ইঞ্জের চিঠিখানা বেশ বড়। অনেক কথা সে লিখিয়াছে। ইন্দ্র লিখিয়াছে—দেবুদা, একবার বাড়ী এস। এখানকার অবস্থা তোমাকে চিঠিতে কি আর জানাব। আমাদের সমিতি ভেঙ্গে যাবার মত হয়েছে। ছেলেরা বেপরোয়া, কিন্তু বুড়োর ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছেন। এক দেখছি বাবা এখনও আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। পুলিশ সে খবর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লাগিয়েছে। বাবা অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছে, তুমি চাকুরি ছেড়ে দাও। তবে কাকা ও মনুসুদন দাদার জেল হয়েছে। উল্লিপুর্ ও কাজলার বিলের মধ্যে গাঙুলোতে বাইরের মৌলবীরা যাতায়াত বন্ধ করবার পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মৌলবীরা প্রচার করছে হিন্দুদের জমি বর্গাচাষ করা না, হিন্দু মহাজনদের টাকা দিয়ে না, ছোটলাট সাহেব মুসলমানদের পক্ষে, ঢাকার নবাব বাহাদুরের কথায় তিনি উঠেন বসেন।

সরকারী উকিল দেবেন বাবুকে জানত। ছোটলাটের শহরে আসবার সময় অভিনন্দন দেবার প্রস্তাবে তিনি ভোট

দেন নি মিউনিসিপ্যালিটির সভায়। তাই তাঁর চাকুরি গিয়েছে। টাউন স্কুলের ছেলেরা না কি কোন বাড়ীতে এক সভায় বন্দে-মাভরম্ বলেছিল। স্কুল ইন্সপেক্টর স্টেপলটন সাহেব আদেশ দিয়েছে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত সব ছাত্রকে খাতায় ছয় শ' বার লিখতে হবে “ইট ইজ ফুলিশনেস এন্ড ওয়েইট অব টাইম টু ক্রাই বন্দে মাভরম্।” হেড মাষ্টারকে সব ছেলের খাতা সংগ্রহ করে সাহেবের কাছে পাঠাতে হবে। উকিল-পাড়ার এক বাড়ীতে হরিসংকীর্তন হচ্ছিল। পুলিশ এসে বললে—বন্ধ কর কীর্তন। উকীল বাবু বললেন—হরিসংকীর্তন শু আর স্বদেশী সভা নয়, কেন বন্ধ করব তোমার কথায়? পুলিশ ফিরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত আদেশ ও এক ডজন লাঠি-ধারী কনেষ্টবল নিয়ে এল। সংকীর্তনের সময় বন্দেমাভরম্ ধ্বনি দেওয়া হতে পারে এই আশঙ্কায় সংকীর্তন বন্ধ করবার আদেশ হয়েছে। ইচ্ছায় বন্ধ না করলে কনেষ্টবলেরা লাঠির গুতোয় ভেঙ্গে দেবে। এই কীর্তন বন্ধ করা নিয়ে খুব হৈ চৈ হ'ল কয়েকদিন।

এর চাইতে আরও মজার ব্যাপার হয়েছে। টাউনের জয়কালী বাড়ী দেখেছ ত? কাছেই একটা পুলিশের ফাঁড়ি আছে। ফাঁড়ির একজন লোক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে বললে, কালীবাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা প্রণাম করতে গিয়ে ছেলেরা বন্দে-মাভরম্ বলে। অমনি ছেলেরা কালী বাড়ী ষাওয়া বন্ধ করবার আদেশ জারি হ'ল।

পঞ্চকোণীর ব্যাপার শুনে তুমি কি বলবে জানি না। কয়েক দিন আগে এস. ডি. ও. গিয়েছিল ওখানে। রাণী দিয়ে যাবার সময় নয়-দশ বছরের কয়েকটি ছেলে তাঁকে দেখে বন্দেমাভরম্ বলে পালিয়ে গেল। ছপুর্ এস. ডি. ও. স্কুলে গিয়ে হাজির। নীচের ক্লাসগুলিতে গিয়ে সে বেছে বেছে চার পাঁচটি ছেলেকে অপরাধী বলে বের করলে। হেড মাষ্টারকে হুকুম দিলে—লাগাও বেত। বছর নয়কের যে ছেলেটিকে প্রথমে বেত মারবার জন্ত হেড মাষ্টারের সম্মুখে হাজির করা হ'ল সে তাঁর হাতে বেত দেখে কঁদে উঠল। কঁদতে কঁদতে হেড মাষ্টারের দিকে করুণ ভাবে তাকাল। চাকুরি হারাবার ভয়ে হেড মাষ্টার রামলোচন বাবু ছুই তিন ষা বেত মারবার পর নিজেই কঁদে কেলসেন; তাঁর হাত কাঁপতে লাগল। কি করে ছেলেরা শাস্ত্যস্ত। করতে হয় দেখাবার জন্ত এস. ডি. ও. নিজে বেত নিয়ে ঐ কচি ছেলে-ক'টিকে দশ ষা করে বেত লাগালেন। স্কুলের সব মাষ্টার ও ছাত্রেরা চুপ করে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল।

এখানে গুজব রটেছে বরিশালের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কেম্প সাহেব নাকি জীবানন্দ কাকাকে অপমান করেছে, তাঁকে ডিগ্রেড করতে পারে।

ইঞ্জের চিঠিতে পিতার অবস্থার আভাস পাইয়া দেবানন্দের

মন বিষন্ন হইল। মনে হইল, সারাজীবন সরকারের সেবা করিয়া শেষবয়সে তাঁহাকে মনিবের হাতে লাঞ্ছনা ও স্বদেশ-বাসীর হাতে অপমান সহিতে হইবে। সরকারের অত্যাচার ও উৎপীড়নের যন্ত্র বলিয়া দেশের লোকের কাছে পুলিশ ঘৃণার পাত্র হইয়াছে। দেবানন্দ একবার ভাবিল পিতাকে বন্দিবে চাকুরি ছাড়িয়া দিন। কিন্তু পিতাকে উপদেশ দিতে তাহার বাধে।

সে লক্ষ্য করিয়াছে দমননীতির উগ্রতার ফলে লোকের মধ্যে অসহায় বিবলতার সঙ্গে একটা অক্ষয় আক্রোশের ভাব জাগিতেছে। এদিকে সভা-সমিতিতে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া প্রতিবিধানের আর কোন উপায় কেহ বুঝিয়া পাইতেছে না। সে ভাবিল, আন্দোলন দমন করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ভো করিবেই। আমাদের প্রতিবাদে ভয় পাইয়া ইংরেজ ভাড়া বাংলা জোড়া ভো দিবেই না, বরং দমননীতি আরও কঠোর হইবে। বন্দোবস্তের ফলিত বিরুদ্ধে সারকুলার জারি হইয়াছে, সভা-সমিতির বিরুদ্ধে হইবে, খবরের কাগজের বিরুদ্ধেও হইবে, যুগ্ম আর কলম বন্ধ করিতে পারিলে আন্দোলন ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। ইঙ্গের চিঠিতে রাজনগরের ওদিককার মুন্সলমানদের মধ্যে স্বদেশী-বিরোধিতার সংবাদ পড়িয়া চকিতে তাহার মনে একটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল—এই আশঙ্কাকে সে আমল দিতে চাহিল না।

নানা রকমের চিন্তায় তাহার মন বিপর্যস্ত হইয়া উঠিবার মত হইল। নিজের উপরে কেমন একটা অনির্গণ্য বিরক্তিতে তাহার মন ভার হইয়া উঠিতেছিল। কেন সে এমন কোন পথ বাছিয়া লইতে পারিতেছে না যে পথে নিজের সমস্ত শক্তি সমস্ত উৎসাহ চালিয়া কাজ করিতে পারে? দেশের আন্দোলনের দ্বারা সে মন বসাইতে পারিতেছে না অথচ কোন নূতন পথ বাহির করিবার শক্তি তাহার কোথায়?

মনে এই ঘন্ট লইয়া দেবানন্দ বন্ধুদের সঙ্গে এটি-সারকুলার সোসাইটির কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। ইষ্টারের ছুটিতে বরিশালে কনকারণে হইবে, তাহার প্রাথমিক আরোজন আরম্ভ হইয়াছে। এই কাজেও সে যোগ দিল। তাহার পিতার অস্থূল চলিতেছিল মাঝে মাঝে। ইতিমধ্যে একদিন মাতার গুরুতর অস্থিরের সংবাদ পাইয়া জীবানন্দ রাজনগরে রওনা হইলেন।

মাস দুই রোগ ভোগ করিয়া জীবানন্দ বিজারত মহা-শয়ের বিধবা সর্বমঙ্গলার যত্ন হইল।

যত্নাকালে তাহার মনের একটা ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল। এই ইচ্ছার কথা তাহার পুত্রবধূ জিনরনী ছাড়া আর কেহ জানিত না। তাহার ইচ্ছা ছিল পৌজী লক্ষ্মীকে ইঙ্গের হাতে দেন। জিনরনীর মনের গোপন কোণেও যে এই ইচ্ছা একটুকু ছিল না তাহা নহে, কিন্তু ইহা এত অসম্ভব বলিয়া তিনি জানিতেন যে,

কোন দিন এই ইচ্ছার প্রস্তর দেন নাই বা কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। শয্যাশায়ী হইবার আগে সর্বমঙ্গলা একবার ভরসা করিয়া জগন্নাথীর কাছে কথাটা পাড়িয়াছিলেন—অবস্থা অন্তের দ্বারা। পক্ষকোশীর জমিদার-পরিবারের কণ্ডা ও রাজনগরের জমিদার-পরিবারের বধূ জগন্নাথী যে জবাব দিয়াছিলেন তাহাতে নিজেদের বংশমর্যাদার জন্য তাহার উন্মাদিকতাই পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, মেয়ে স্তম্ভরী হইলেই কি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে হয়? পুত্রবধূ আনিবেন তিনি সমান ঘর হইতে, তাহাদের বৃত্তিভোগী পুরোহিত-বংশের মেয়ে ঘরে আনিতে পারিবেন না। জিনরনীকে সর্বমঙ্গলা সব কথা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই, দীর্ঘনির্ধাস ফেলিয়া শুধু বলিয়াছিলেন—ভগবান তাহার সব কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, শুধু একটি অতি প্রিয় কামনা পূর্ণ করিলেন না।

মাতার শ্রাদ্ধশাস্তি শেষ করিয়া কর্মস্থলে ফিরিবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা জীবানন্দ হরিনারায়ণের বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। বেনীর ভাগ কথা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে। শেষে বলিলেন—দাদা, বাবার আশাভঙ্গ করে ও তাঁর মনে ব্যথা দিয়ে—ইংরেজী বিজ্ঞা শিখেছিলাম লোভের বশে। অপমানে আর অশান্তিতে আজ সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি। ভাবি এই দণ্ডে চাকুরি ছেড়ে ফিরে আসি রাজনগরে, আবার ভাবি ছেলেরা মানুষ হ'ল না, যেহেতু বিয়ে দিতে পারিনি এখনও, যে আশায় এত অপমান সহ করে আসছি তার কিছুই যে পূর্ণ হ'ল না। দেবানন্দের কথা তুলিয়া বলিলেন—ছেলের মতিগতি ভাল নয়। হাসিয়া বলিলেন, —ভাল নয় মানে বাপ যার পুলিশের চাকুরে তার পক্ষে ভাল নয়। নিজের চাকুরির ক্ষতির ভয় দেখিয়ে ছেলেকে শাসন করতে লজ্জায় বাধে। হয়ত বাবার পুণ্যের ফলে এই লজ্জা-বোধটুকু এখনও রয়ে গেছে। মনে মনে ভাবি ভগবান মালিক, যা করবেন তাই হবে। অপমান, লাঞ্ছনা ও অনেক সয়েছি, দেখা যাক এর শেষ কোথায়। চাকুরি ছাড়তে হয় মধ্যম ভরফের ফ্রিয়ার্জন্ম আছে, চলে যাবে এক ভাবে।

শেষের কথাগুলি বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন, হরিনারায়ণও হাসিলেন।

হরিনারায়ণ বলিলেন—তোমার নিজের শরীর ভাল যাচ্ছে না জীব। ছুটির দয়খাত করেছিলে জানি, কি হ'ল?

জীবানন্দ—সাহেব'ঘরে রেখেছে। আমি ওপরে তদ্বির করছি, মাসখানেকের মধ্যে ছুটি পাব বোধ হয়।

হরিনারায়ণ—ছুটি পেলে এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে কোন ভাল জায়গায় চলে যো।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন—বিশ্রাম পেলে এখানেই ভাল হয়ে উঠব দাদা, কোথাও যেতে হবে না।

পরদিন জীবানন্দ চাকুরিহলে চলিয়া গেলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া জীবানন্দ রাজনগর হইতে চাকুরি-
হলে ফিরিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে জগদ্ধাত্রীর অন্তর্ধের
আবার বাড়াবাড়ি হইল। ইহাতে হরিনারায়ণ বিশেষ চিন্তিত
হইলেন।

বড় ছেলে এসনের অন্তর্ধানের পর হইতে জগদ্ধাত্রীর শরীর
ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পূর্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পান
নাই। কিছু দিন হইতে হরিনারায়ণের স্বাস্থ্যও একটু একটু
ফিরিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষা
দিয়া ফল বাহির হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। বৈষয়িক
কাছে মাঝে মাঝে তাহার ডাক পড়িত। জগদ্ধাত্রী প্রস্তাব
করিয়াছিলেন ইহাকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া এবার বিষয়-সম্পত্তি
দেখিবার কাছে বসাইয়া দাও। হরিনারায়ণ বলিয়াছিলেন
— শুধু শুধু কেন তার লেখাপড়া বন্ধ করব? আমি যতদিন
আছি সে নিশ্চিতে লেখাপড়া করুক।

স্বামীর শরীর ধারাপ হইতে দেখিয়া জগদ্ধাত্রী ভয় পাইয়া
গিয়াছিলেন। স্বামীর আগে যেন তিনি যাইতে পারেন
জগবানের কাছে মনে মনে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন।
মাঝে মাঝে ভাবিতেন ইহের বোঁ আনিয়া তাহাকে সংসার
বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিবেন। বড় ছেলের কথা
তাহার মনে পড়িত। বিবাহী হইয়া সে না চলিয়া গেলে এত
দিনে তাহার বোঁ আসিয়া সংসারের হাল ধরিত। তাহার
গত জন্মের পাপের শাস্তি পাইয়াছেন। এ জন্মে ত কোন
পাপ করেন নাই—আগের জন্মের পাপ না থাকিলে কপালে
এত শাস্তি লেখা ছিল কেন?

ইহের সম্বন্ধে স্বামীর কথার উপর তিনি আর কিছু
বলিলেন না। স্থির হইল, পাস করিলে সে সদরে পড়িতে
যাইবে।

ইহা এখন উন্নতদেহ, বলিষ্ঠ তরুণযুবক। আগেকার
উচ্ছ্বাস-প্রবণতা ধানিকটা চলিয়া গিয়াছে, তাহার জায়গায়
আসিয়াছে চিন্তাশীলতা ও গভীরতা। অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে কথা
বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে দৃষ্টি উচ্ছল হইয়া উঠে, চাপা
হাসিতে বলকাইয়া উঠে, চিবুকের ভীর্ণতা কোমল হইয়া
আসে। বাহিরের কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহার
মনে হয় ইহার কৈশোর এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই।

জগদ্ধাত্রী অন্তর্হ হইয়া পড়িবার দিন ছই আগে নিজের ঘরে
বসিয়া দেবানন্দের সঙ্গে চিঠি-পত্রে যে সব আলোচনা চলিতে-
ছিল ইহা তাহাই ভাবিতেছিল। পুলিশের অত্যাচারের ফলে
স্বদেশী আন্দোলনে যেন ভাটা পড়িয়াছে, এখন কি করা কর্তব্য
দেবানন্দ সেই কথা লিখিয়াছিল। দেবানন্দের কথাগুলি নিজের
মনে আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল
সর্বমঙ্গলার মৃত্যুর দিনকয়েক আগেকার কথা।

তাহার অন্তর্ধের সময় ইহা প্রতিদিন খবর লইবার জন্ত
টোলপাড়ায় যাইত। প্রথম দিন গিয়া লক্ষ্মীকে দেখিয়া সে
একটু অবাক হইল। চিনির বিষের পরে লক্ষ্মী আর তাহাদের
বাড়ীতে বিশেষ যায় না। কয়েক মাস পরে ইহা তাহাকে
দেখিল।

লক্ষ্মী এখন আর অনর্গল কথা বলে না। তাহাকে দেখিলে
— এই যে ইন্দির দাদা বলিয়া সম্ভাষণ করা অনেক দিন হইল
সে ছাড়িয়াছে। আজকাল দেখা হইলে চকিতে একবার
চাহিয়া সে ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে
ছই-একটি কথায় জবাব দেয়। তাহার এই নুতন গাভীয়া
দেখিয়া সে হয়ত কখন-সখন একটু ঠাটা করে। ঠাটা শুনিয়া
সে মুখ হাসে, আগের মত পাটা ঠাটা করিবার চেষ্টা করে না।
পথে-বাটে হঠাৎ দেখা হইলে সে যেন একটু জড়সড় ভাব
দেখায়। পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করে। ডাকিলে
দাঁড়ায়, কিন্তু মাথা নীচু করিয়া এমন অবস্থির ভাব দেখায় যে,
ইহা আশ্চর্য বোধ করে।

প্রথম যেদিন সে সর্বমঙ্গলাকে দেখিবার জন্ত টোলপাড়ায়
গেল সেদিন তাহাকে দেখিয়া কোন সম্ভাষণ না করিয়া লক্ষ্মী
এমন দ্রুতভাবে সরিয়া গেল যে ইহা বিস্মিত হইল। পরের
দিন লক্ষ্মীদের বাড়ীতে চুকিতে গিয়া সে দেখিল লক্ষ্মী বাহিরে
কোথায় যাইতেছে। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে,
ইহা তাহাকে ডাকিল। লক্ষ্মী দাঁড়াইল। ইহা জিজ্ঞাসা করিল,
লক্ষ্মী, তোমার কি হয়েছে? আমার সামনে তুমি অমন কর
কেন? - বিস্মিত হইয়া সে দেখিল লক্ষ্মীর মুখ সিঁহুরের মত
লাল হইয়া উঠিয়াছে। অতি ধীরে সে বলিল, কিছু ত হয় নি।
তারপর যাইবার জন্ত পা বাড়াইল। কি ভাবিয়া ফিরিয়া
দাঁড়াইল। ইহের কাছে একটু সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া
ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি কি
রাগ করেছেন আমার উপর? ইহা অপ্রত্যাশিতভাবে বলিল, না
না, রাগ করব কেন? লক্ষ্মী ফিরিয়া চলিল। কয়েক পা
গিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল। ইহা দেখিল তাহার চোখ-মুখ
খুশীতে বলয়ল করিতেছে। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল ইহা
সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে
প্রবেশ করিল।

এই সামান্য ঘটনাটা প্রায়ই ইহের মনে পড়ে। তাহার
মনে হইত একান্ত সহজ ব্যাপারটার আড়ালে কি বেশ একটা
খটকা গেল। লক্ষ্মীর এত খুশী হইবার কি ছিল, সে রাগ করে
নাই এই কথা কয়টি শুনিয়া? আর সেই-বা এই তুচ্ছ ব্যাপার
লইয়া এত মাথা খামাইতেছে কেন? কিন্তু তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া
দিলেও কথাটা প্রায়ই তাহার মনে পড়ে।

জগদ্ধাত্রীর অন্তর্ধের বাড়াবাড়িতে এ সব চিন্তা কোথায়
চাপা পড়িয়া গেল। সদর হইতে সাহেব ডাক্তার আসিল,

চিরায়ী শব্দর বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনা হইল। চিরায়ী বড় বোন যুগ্মীর গ্রামেই বিবাহ হইয়াছিল। নিজের সংসার ফেলিয়া সে মাতার যোগশয্যার পাশে দিন-রাত বসিয়া রহিল। দিদি শুধু বসিয়া বসিয়া কাঁদে, তিনি ছেলে-মাছুষ, ইল্ল নিজে টোলপাড়ায় গিয়া জিনয়নীকে ডাকিয়া আনিল। হরিনারায়ণ জীর অল্পেই কেমন অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাহার নিজের শরীরও ভাল নয়। সমস্ত দায়িত্ব ইল্লের কাঁধে আসিয়া পড়িল। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া জিনয়নীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কয়েক দিন যমে মাছুষে টানাটানি করিয়া জগদ্ধাত্রী এই ঝাঝা একটু যেন সামলাইয়া লইলেন। হরিনারায়ণ জীকে বলিলেন, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি। তোমার শরীর আর একটু ভাল হলে বাইরে গিয়ে মাস কয়েক থাকব। চুনার কিংবা বিদ্যাচলে বাড়ী নেব ঠিক করেছি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন, তুমি যত শুধু খাওয়াও, ডাক্তার দেখাও—আমার শরীর আর ভাল হবে না। তা ছাড়া রাজনগর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

হরিনারায়ণ—কি স্বপ্ন?

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তারপর বলিলেন, স্বপ্নে দেখলাম আমি যুত্মশয্যায়। কিসের আশায় যেন প্রাণ বেরুচ্ছে না, অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। হঠাৎ চোখ মেলে দেখলাম ছায়ায় মত কে একজন এসে আমার শিরে দাঁড়াল। তোমাদের কারো নজর পড়ল না তার উপর, আমি দেখেই চিনলাম তাকে। আমার বড় ধোকা। বললাম, ধোকা ফিরে এলি বাবা? আমি যে তোয় হাতের আগুনের পিত্ত্যশে মরতে পারছি নে। আমি উঠে বসে তাকে আদর করতে যাব এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল। ধোকা নিশ্চয় ফিরে আসবে। রাজনগর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। আজ কয় বৎসর হইল প্রসন্ন চলিয়া গিয়াছে, জগদ্ধাত্রী এখনও দিন-রাত কেবল তাহার চিন্তা করেন।

জিনয়নী প্রতিদিন আসিয়া শুধির করিতেন। তিনি ভার লওয়াতে ইল্ল নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিল। এখন মাতা একটু সুস্থ হইয়া উঠার সে কিছু অবসর পাইল। সে সকালের দিকে কিছুসময় বিষয়-সম্পত্তির কাজ দেখিত, তারপর সারা-দিনের অবসরে রাজ্যের চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিত।

ইল্ল নিজের মনে হুঃখ করিত দেবুদার মত তাহার মনের জোর নাই। সে বড় দুর্বল প্রকৃতির মাছুষ। বাপের কথা ভাবে, মায়ের কথা ভাবে, সংসারের কথা লইয়া মাথা ঘামায়। সংসারের ভাবনা এত বেশী ভাবিলে কি আর দেশের কাজ করা যায়? তাহার মনে এই চিন্তার উজ্জেক হইত। ভাবিত—

হয়ত তাহার আর পড়াশুনা করা হইবে না। সকালে বিকালে কাছারিতে বসিয়া নায়েবের সঙ্গে বকাবকি, মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ, মোড়লদের দরবার শোনা। এই করিয়া তাহাকে সারাজীবন কাটাইতে হইবে। তাহার পিতা অবসর সময়ে পড়াশুনা, সঙ্গীতচর্চা, শিকারচর্চা করিয়াছেন। আপদে-বিপদে গরীব লোকদের সাহায্য করিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে সালিশী করিয়াছেন। সমাজ, সংসার সকলের দাবি তিনি সাধ্যমত মিটাইয়া দিয়াছেন বরাবর। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশের দাবি উপস্থিত হইলে, তাহাও পূরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কর্তব্য পালনে তাহার কোথাও কোন ত্রুটি নাই। সে ভাবিত, তাহা হইলে সে কেন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে না?

অনেক চিন্তা করিয়া সে এই প্রশ্নের একটা সমাধানের খুঁজ পাইল দেবানন্দের কয়েকদিন আগের এক পত্র হইতে। দেবানন্দ নিজের মনের স্বপ্নের কথা তুলিয়া লিখিয়াছে, তাহার পিতার মত বয়সের দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের কাছে দেশের দাবি যে ভাবে আসিয়াছে তাহার কাছে ত সেভাবে আসে নাই। শুধু তাহার কাছে কেন, তাহার যুগের, নূতন শতাব্দীর কোন বাঙালীর ছেলের কাছে সেভাবে উপস্থিত হয় নাই। তাহার পিতা যে যুগের মাছুষ সে যুগের মাছুষদের কাছে স্বদেশী আন্দোলন আসিয়াছে মরা গাঙে হঠাৎ আসা ছোয়ারের মত। আর দেশ যখন এই ছোয়ারের জলে প্রাণিত ভখন তাহাদের জন্য। ছোয়ারের জল সরিয়া যাইতেছে, এই প্রাণনের মধ্যে যাহাদের জন্য হইয়াছে, বাঁচিবার জন্য তাই আজ তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইল্ল ভাবিল—ঠিক কথা, কিন্তু রাজনগরে বসিয়া, সংসারের ভার কাঁধে লইয়া সে কি চেষ্টা করিতে পারে? দেবুদা কি চেষ্টা করিতেছে তাহাও সে কিছু খুঁজিয়া লেবে নাই।

ইল্ল সংসারের কাজকর্ম করে, পিতার কাছে, মাতার কাছে দুই বেলা নিয়মিত বসে, জিনয়নী রোগীর সম্পর্কে যাহা করিতে বলেন তাহা করে, কিন্তু সর্বদা তাহার মাথায় এক চিন্তা থাকে—সে কি করিবে? জিনয়নীর সঙ্গে লক্ষী তাহাদের বাড়ীতে আসে, হরিনারায়ণের সঙ্গে আলাপ করে, জগদ্ধাত্রীর আরামের জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা করে। নিজের চিন্তায় ইল্ল এত অস্তমনস্ক থাকে আজকাল যে, কোনদিন তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা বলে, দুই-চারি দিন আবার তাহাকে লক্ষ্যই করে না। মাঝখানে কিছুদিন লক্ষীর কথা যখন ভখন তাহার মনে পড়িত, মাতার অল্পে, নিজের মনের অশান্তিতে সে সব কবে চাপা পড়িয়াছে। ইল্লের সহজে লক্ষীর মনোভাব অনুমান করা কঠিন, সে নিজে যে সে সতর্ক সচেতন ছিল তাহা তাহার ব্যবহারে কিছু বুঝা যাইত না। কিন্তু ইল্লের প্রতি

সে যে দৃষ্টি রাখিত তাহার পরিচয় পাওয়া গেল শীঘ্রই। সে লক্ষ্য করিত যে ইন্দ্র সর্বদা অশ্রুমনক, কি একটা ভাবনা রহিয়াছে তাহার মনে। একদিন সে চিন্ময়ীকে বলিল,

—চিন্ময়ী, ইন্দ্রদাদা সারা দিন কি ভাবেন এত? জ্যোষ্ঠাইয়া ত অনেকটা ভাল হয়েছেন তবু কি ভাবেন এত?

চিন্ময়ী হাসিয়া বলিল—তুই জিজ্ঞেস করলেই পারিস। দাদা কি ভাবে তা নিয়ে তোর এত ভাবনা কিসের?

লক্ষ্মী একটু বিব্রতভাবে বলিল, ভাবনা আবার কিসের? কথারটা মনে হ'ল তাই বলছি। তুই ছোট বোন, তুই জিজ্ঞেস করতে পারিস নে?

চিনি—ছোট বোন গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, হাঁ দাদা, তুমি দিবানিশি কার ধ্যান কর বল না শুনি? তাই না? দাদা যদি বলে, যা যা কাঙ্ক্ষিত মেয়ে, তোর অন্ত খবরে কাজ কি, তখন?

লক্ষ্মী—তা কেন বলবেন? তুই ভাল করে জিজ্ঞেস করবি।

চিনি—ভাল করে জিজ্ঞেস করব মানে? গলায় ঝাঁচল দিয়ে হাত ছোঁড় করে বলব? না পা জড়িয়ে ধরে বলব? বরং তুই গিয়ে একটু মিষ্টি করে হেসে বললে কাজ হবে। দেখবি হয়ত বলে ফেলবেন, লক্ষ্মী গো, আমি দিবানিশি তোমায়ই—

লক্ষ্মী চিনির মুখে হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, তুই বড় যা তা বলিস চিন্ময়ী। মুখে কিছু বাধে না।

চিনি লক্ষ্মীর হাত সরাইয়া দিয়া তুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, একটা কথা বলবি ভাই? দাদা—

লক্ষ্মী বলিল, দাঁড়া ভাই, বহু জ্যোষ্ঠামশাইকে তামাক দিয়েছে না পড়ে পড়ে ঘুঘুচ্ছে দেখে আসি। চিনির হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল।

চিন্ময়ীর অন্তরবাড়ী হইতে হঠাৎ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত। তাহার শাওড়ী বড় কড়া লোক। অন্তর পিড়ামাতাকে দেখিবার জন্ত তিনি পুত্র-বধূকে পনের দিনের ছুটি দিয়াছিলেন। তাহার হুকুম ছিল পনের দিনের দিন বাপের বাড়ীর লোক যেন তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া যায়। চিন্ময়ী একথা বাড়ীর কাহাকেও বলে নাই। সত্তের দিনের দিন কড়া পুত্র লইয়া লোক আসিতে তাহার খেয়াল হইল। মাতা এখনও শয্যাশায়ী, পিতার শরীর ভাল নয়, তাহার এখন যাইবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পুত্র শাওড়ীর মেজাজের আভাস পাইয়া সে আপত্তি করিবার সাহস পাইল না। ইন্দ্র চট্টয়া লোক ফিরাইয়া দিতেছিল, সে নিষেধ করিল। বলিল, ছোড়দা, যাদের ঘরে আমাকে দিচ্ছেন তাদের চট্টয়ে কি হবে? শুধু আমার লাঞ্ছনা গল্পনা বাড়বে বই ত নয়?

রওনা হইবার আগে চিন্ময়ী মাতার কাছে গিয়া বলিল। কিছুক্ষণ একথা ওকথা বলিয়া শেষে বলিল, মা, আমার একটা কথা শোন। সংসারের এই অবস্থা। তোমাকে, বাবাকে দেখবার লোক নেই। দিদির নিজের সংসার আছে, সে আর ক'দিন করবে? আমার অবস্থা ত জানই, ছোড়দার বিয়ে দাও।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, আমি সে কথা ভেবেছি চিন্ময়ী। ওঁকে দেখবার এক জন লোক না হলে চলছে না। আমি বিছানায় পড়ে আছি, ধমক-ধামকে কি চাকর দিয়ে কাজ করাতে হয়। নিজে হাতে কিছু করতে পারি নে। ওঁর কি হবে ভেবে মরতে শুরু পাচ্ছি নে। ভাল মেয়ে পেলে ছোট খোকার বিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বৌজন্মের করে কে?

চিন্ময়ী—এত বৌজন্মের দরকার কি মা, ভাল মেয়ে তোমার হাতের কাছেই রয়েছে। রূপেপুণে ওরকম মেয়ে কোথায় পাবে?

জগদ্ধাত্রী অসুস্থমান করিলেন মেয়ে কাহার কথা বলিতেছে। তবু তিনি বলিলেন, কার কথা বলছিস তুই?

চিনি—তোমার কি চোখ নেই? লক্ষ্মীর কথা বলছি।

জগদ্ধাত্রীর মুখ বিরস হইল। কিছুক্ষণ ভিনি কোন কথা বলিলেন না, শেষে বলিলেন, ছেলের বৌ করব সমান ঘরের মেয়ে এনে। টুলো পণ্ডিতের ঘরের মেয়েকে আমি ঘরে আনতে পারব না, তা মেয়ে বড় ভালই হোক। বংশের গৌরব নষ্ট করব?

চিন্ময়ী রাগ করিল। বলিল, এ তোমার অজায় কথা মা। তা ছাড়া কাকাবাবু ত টুলো পণ্ডিত নন, তিনি বড় চাকুরে।

জগদ্ধাত্রী—চাকুরের আবার ছোট বড় কি? যে চাকুরে সে-ই চাকুর। ও-ঘরের মেয়ে আমি আনব না।

চিন্ময়ী রাগ করিয়া বলিল, যেমন তুমি তেমনি দিদি। তাকে বলতে সেও তোমার মত নাক সিটকালো। কি যে বংশের বড়াই তোমাদের। অমন সোনার প্রতিমার মত মেয়ে—। আমি চললাম, কিন্তু এই বলছি তোমাকে, দেখো গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে। এক দিন হয় ত এ মেয়েকেই যেচে—

জগদ্ধাত্রী বিরক্ত হইয়া বাগা দিয়া বলিলেন, যাবার সময় কি যে অলক্ষণে কথা বলিস চিনি।

চিন্ময়ী উঠিয়া পিতার ঘরের দিকে যাইতে দেখিল লক্ষ্মী আসিতেছে। কাছে আসিয়া লক্ষ্মী বলিল, আমার দেবী হয়ে গেল ভাই আসতে। ভয় হয়েছিল তুই বুঝি চলে গেছিস।

চিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুই যে আবার আসবি আমি ভাবি নি। সকালে কাকীমাকে প্রণাম সেরে তোর সঙ্গে দেখা করে এলাম, কি জানি সময় যদি না পাই, যা তাড়াহুড়ো।

লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া সে নিজের ঘরে আনিল। বলিল, যাবার আগে তোকে একটা কথা বলব বলে এ ঘরে আনলাম। শোন, যুগ তুলে তাকা দেখি আমার দিকে।

লক্ষ্মী যুগ তুলিয়া চাহিল। চিন্ময়ী বলিল, ভূই ছেলেবেলা থেকে শিবপুজো, ব্রত, নিয়ম কত কি করহিস। ঠাকুরের কাছে বর চাইবি—ঠাকুর, এতদিন ঘরে ভোমাকে কত ফুল হকো দিলাম, চিন্মর ছোড়নার সঙ্গে আমার বিয়ে ঘটয়ে দাও। পারবি বর চাইতে?

লক্ষ্মীর মুখ হইতে ঘেন সবটুকু রক্ত সরিয়া গেল, সে কোন উত্তর দিল না।

চিন্ময়ী তাহার গালে ঠোনা মারিয়া বলিল, জবাব দে। বর চাইতে পারবি না?

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীর চোখ হইতে এক ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। চিন্ময়ী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিল। বলিল, তোর মনের কথা আমি জানি। মনে মনে ঠাকুরের কাছে এই বরটা চাস ভাই। আমি যাবার সময় তোকে মাথার দিব্যি দিচ্ছি।

একটু পরে তাহার দুই জনে ঘর হইতে বাহির হইয়া হরিনারায়ণের ঘরে চুকিল।

ক্রমশঃ

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দের দেহাবসান হয়। ইহার বৎসরের কাল পরে শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বারীজকুমারের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সার্থক হইতেছে না দেখিয়া, একবার বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রত্যাবর্তনের মূল যন্ত্রের অন্বেষণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙালী জাতির পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের সহিত শ্রীঅরবিন্দের জীবন যে সমস্মৃতে গ্রথিত, ইহা তলাইয়া না বুঝিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার এই যুগ-পর্বটো চির অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। বেদান্তের কেশরীগর্জন তুলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মুহুর্তপ্রস্থান করিলেন, অল্পকাল পরে শ্রীঅরবিন্দ সব্যসাচীর জায় বাংলার কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন, সে ধর্ম ভারতেরই ধর্ম। সে ধর্ম ভারতের সনাতন যোগতত্ত্ব। শ্রীঅরবিন্দ একাধারে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুইকেই আশ্রয় দিলেন; কেননা রাষ্ট্রও ভারতের রাজধর্ম। ভারতের স্বাধীনতা অভিনব উপায়ে আসিবে—মহাত্মা বিষ্ণু ভাস্কর লেলে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্তর-সাধনা ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম-যোগপথে সেই সময় হইতেই মোড় ফিরিতে আরম্ভ করে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী সামন্তল আলমের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ ধৃত হন। ২০শে ফেব্রুয়ারী বীরেন্দ্রের গুরু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বন্দী হইয়া ইংরেজের আদালতে অভিযুক্ত হন। বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসী হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী। শ্রীঅরবিন্দ ২১শে

ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। যতীন্দ্রনাথ প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দকেও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত করার প্রয়াস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অতঃপর “কর্মযোগিনে”র প্রবন্ধের জন্ত রাজদ্রোহের মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। সেই প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহা “An open letter to my countrymen” শিরোনামায় প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীঅরবিন্দের “Last political will and testament” বলিয়া জাতীয়তাবাদিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। তদানীন্তন ব্রিটিশরাজ ইহা রাজদ্রোহ-মূলক বোধে শ্রীঅরবিন্দ ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন। নিয় আদালতের বিচারে মৃত্যুর মনোমোহন ঘোষের দণ্ড হয়। কিন্তু উচ্চ আদালতের বিচারে তিনি বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। উপরন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক নহে বলিয়া উচ্চ আদালতের বিচারপতি রায় প্রদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত প্রতিদিন অপরাহ্নে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎকার হইত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহু অনেক সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার মুখে তাঁহাকে পুনরায় ধরিবার আয়োজনের কথা শ্রবণ করেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে কোনও বিদেশী রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। পরে নিজ অন্তর-বাণী পাইয়া উক্ত প্রস্তাব তিনি সিদ্ধান্তরূপে

বরণ করিয়া লন। রামচন্দ্র মজুমদার ধর্ম ও কর্মযোগিনী আপিসে শ্রীঅরবিন্দের সহকারীরূপে কাজ করিতেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আহিরীটোলার ঘাটে এক পাল্লী ভাড়া করিয়া তাঁহার চির প্রস্থানের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গী হন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ও হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই চন্দননগরের রাণীর ঘাটে তাঁহার নৌকা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। চারুচন্দ্র রায়ের নিকটে হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মারফত তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরিত হয়। চারুচন্দ্র আমাদের লইয়া সম্প্রতি সারস্বত উৎসব সমাপনান্তে বিজ্ঞান করিতেছিলেন। সামন্তল আলমের মৃত্যুর পর চন্দননগরে এই প্রসিদ্ধ সারস্বত উৎসব সম্পন্ন হওয়ায়, বিপ্লবীগণ এই কার্য চারুবাবুর অতীত বিপ্লবকর্মের উপর চূর্ণকাম করার নীতি বলিয়া রহস্য করিয়াছিলেন। মনে হয়, চারুচন্দ্র জেল হইতে ফিরিয়া স্বদেশ-সাধনের সাংস্কৃতিক পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সারস্বত উৎসব তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দের আত্মগোপন ব্যাপারে চারুবাবু আর কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের থাকা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই হরেশচন্দ্রকে ফিরাইয়া দেন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ কানাইলাল দত্তের অতি-নিকট বন্ধু। এই দুই জনেই চারুচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই কথা চারুচন্দ্র রায়ের মুখে শুনিয়া অতি ক্রুত আশার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আমি তাঁহার কাছে সকল কথা শুনিয়া, শ্রীঅরবিন্দকে আমার বাড়ীতেই আশ্রয় দিই। এই কথা অনেক ক্ষেত্রে উক্ত হওয়ায়, তাহা আর এখানে বিস্তৃত করিয়া বলার প্রয়োজন বোধ করি না। আমার স্থায় একজন অপরিচিত মানুষের হাতে শ্রীঅরবিন্দকে রাখিয়া হরেশচন্দ্র ও শ্রীনলিনীকান্তও যে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিদায় লইয়াছিলেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যয় আমার উপর কতখানি হইয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপন করিবার জন্তই এখানে আসিয়াছিলেন এবং কোথায় ভবিষ্যতে যাইবেন, তাহা নির্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই বাস করিতে চাহেন। ইহাই আমার রাজনৈতিক বিপ্লবীদের চন্দননগরে আশ্রয়দানের প্রথম দীক্ষাস্বরূপ হয়। শ্রীঅরবিন্দ আমার বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলেন, তাঁহার অমরাগের স্পর্শ আমি পাইয়াছিলাম। লোক-জানাজানির ভয়ে তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিতে হইয়াছে। তিনি এক রাত্রি আমার এক বন্ধুর পিড়াপিড়িতে তাঁহারই বাড়ীতে বাস করেন।

কিন্তু একরাত্রি বাসের পরই বিরক্ত হইয়া পরদিনই আমার ভবনে চলিয়া আসেন। তারপর গোলন্দপাড়ার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে তাঁহাকে রাখিয়া আসি; সে বিবরণ অতিশয় বিচিত্র।

কেমন করিয়া নিজের আশ্রয়স্থল হইতে গাড়ী-ঘোড়া বাহির করিয়া, নিজেই চালক হইয়া গাড়ী ছুটাই, তাহার বৃত্তান্ত আমার “জীবন-সঙ্গিনী” গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। গোলন্দপাড়া হইতে কটকগোড়ায় কবের বাগানেও তাঁহাকে কিছুদিন রাখা হয়। সেখানে বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধে অনেক কথাই হইয়াছিল। তিনি আমায় অধ্যাত্ম-সাধনার কথাই শুধু বলিতেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেন। আমার অন্তরের প্রবণতা কোন দিকে, শ্রীঅরবিন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনায় তিনি আমায় উদ্বুদ্ধ করিতেন।

গোপনে রাখার দায়িত্ববোধে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহাকে লইয়া আসা হইত। কবের বাগানের পর আমারই বাড়ীর নিকট শ্রীজীজগন্নাথদেবের মন্দিরপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীখানি ছিল তাহা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে সর্বশেষে সেখানে গোপনে রাখা হয়। তাঁহাকে এই সময় বিপ্লবী স্বদর্শন চক্রবর্তী নামে এক তরুণ যুবককে লইয়া আসা হয়। স্বদর্শন কলে চাকুরী করে বলিয়া এই বাড়ী ভাড়া লয়। প্রত্যহ প্রাতঃ ৯টা বাজিলে সে সদর দরজায় তালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত ও সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিত। শ্রীঅরবিন্দ সারাদিন এইখানে বন্দী থাকিতেন। এই সময়ে তিনি আহার করিতেন কিস্মিস, বাদাম আর পেস্তা। সারাদিন বন্দীজীবনের পর রাত্রি চন্দননগরের বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের এই অজ্ঞাত-বাসকালের তিনটি ঘটনা আমার মনে বিশেষ ভাবে আঁকা আছে।

আমার বাড়ী হইতে তিনি ক্ষেত্রঘারী মাসের শেষে গোলন্দপাড়ায় প্রস্থান করেন। এই কয়দিন আমি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার প্রাণপণ প্রয়াস করি। কিন্তু এক জনের নিকট তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই কথাই এখানে ব্যক্ত করিতেছি।

সেদিন আমার বাড়ীর কয়েকটি অব্যবহার্য্য গৃহ বে-মেরামতে চেয়ারের গুদামে পরিণত হইয়াছিল। গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতাম। এক দিন ইহা ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। আমি শ্রীঅরবিন্দকে একট

স্বল্প কক্ষে রাখিয়া আমাদের চেয়ারের কারখানায় যথারীতি কর্ষ করিতে গিয়াছি। উৎকর্ষার সীমা ছিল না। যথাসময়ে তাঁহাকে বাহির করিয়া বৈঠকখানায় আনিলাম। তাঁহাকে সেযুগে দেখিয়াছি আত্মভোলা শিবের ছায়; চলিতেছেন যেন মাটিতে পা পড়িতেছে না। যখন খাইতেন তাহাও শব্দহীন। হাত-পা নড়িতেছে; কিন্তু কে যেন তাঁহার নিয়ন্তা। শ্রীঅরবিন্দকে আনিয়া অবধি এইরূপ আত্মহারার ন্যায় দেখিয়াছি। তিনি এই সময়ে আত্মসমর্পণ-যোগের কথাই বলিতেন। নিজের হাতখানি উপরের দিকে উঠাইয়া বলিতেন, তুমি মনে করও না আমি হাতখানি উঠাইতেছি, আমার মধ্যে কোন এক তৃতীয় শক্তি কাজ করিতেছে—আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহার অপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতাম—তিনি আর ইহজগতের মানুষ নহেন; শুধু দেহটা এই বিশ্বে বিচরণ করে ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধনে। সেদিন তাঁর চোখের দৃষ্টি আরও অপলক। আমি তাঁহার অপরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নত শিরে তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলাম। ভুলিয়া গেলাম তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছে। এই ঘরেই তাঁহাকে স্নান করাইতে হইবে। নতুবা কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িলে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার এত প্রয়াস সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে যে; শ্রীঅরবিন্দের মুখে বাণী সরিল,—তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “মতি! আমার কালী-দর্শন হইয়াছে। আজ যাতুমুষ্টি সন্দর্শন করিয়াছি।”

এই দিন হইতে শ্রীঅরবিন্দ আমার নিকট “কালী” রূপে পরিচিত। তাঁহার অসংখ্য পত্রের শিরোনামে “ডীয়ার এম্” (Dear M); তাহার পর পত্র শেষ করিয়া “Kali” এই শব্দটি লিখিলেন। তখনও বুঝি নাই শ্রীঅরবিন্দ এই “কালী”-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতেই চলিতে শুরু করিয়াছেন। এদিকে আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা-মাত্র আমার পত্নীর মুখে শুনিলাম—তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে চেয়ার বোঝাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে চেয়ার সাজানো, তাহার মধ্যে অরবিন্দের আসন পাতা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে সেইখানে উপবিষ্ট ছিলেন। চেয়ার সরানোর শব্দে চাহিয়া দেখিলেন। আমার স্ত্রী তখন অসম্বত। তাঁহার হাতে সন্মার্জনী ছিল। তিনি অকস্মাৎ এই গৃহমধ্যে এক পুরুষমুর্ত্তিকে দেখিয়া সলজ্জ বিশ্বয়ে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার

দিকে চাহিয়া থাকেন। আমার স্ত্রী এইভাবে কিছুক্ষণ স্তম্ভ মুর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া পরক্ষণেই সসঙ্কোচে গৃহ হইতে নিষ্কাশ্তা হন। এই গোপনতার ব্যবস্থা যে আমারই কীর্ত্তি, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সব কথা শুনিয়া তিনি অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের সেবায় অকুণ্ঠ হইয়া ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দেরই অম্বরোধে সঙ্গীক পণ্ডিচেরী যাই। সে কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। বাল্যকাল হইতেই কিছু-না-কিছু লেখার অভ্যাস আমার ছিল। তখন সবে “উদ্বোধন” নাটকখানি লিখিয়া এক রাত্রে বাড়ীতেই আমরা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া অভিনয় করিয়াছিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দ্বিতীয় সঙ্ঘের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আত্মসমর্পণ যোগের কথাই এই নাটকে লিখিয়া-ছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আগাগোড়া তাহা শুনিলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, “তোমার লেখার অভ্যাস আছে; আমার ইচ্ছা ‘ধর্ম’ পত্রিকায় তুমি নিয়মিতভাবে লিখিবে।” রামচন্দ্র মজুমদার তখন সাপ্তাহিক “ধর্ম”র পরিচালক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে আমি ‘ধর্ম’ লিখিতে আরম্ভ করি। রামচন্দ্র হয়তো মনে করিতেন লেখাগুলি শ্রীঅরবিন্দের। বস্তুতঃ লেখার দীক্ষা শ্রীঅরবিন্দই আমায় প্রদান করেন। এইবার সর্বশেষ ঘটনার কথাই বলি। আমার বাড়ীর অতি নিকটেই তিনি বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি বেশী দেখা সাক্ষাৎ করিতাম না। নিজের সাধন-ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার সকল প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্বটুকুই আমার ছিল। স্তম্ভদর্শনের মধ্য দিয়া তাহা যথারীতি সম্পন্ন করিতাম। একদিন শ্রীঅরবিন্দ আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাত্রে তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। তিনি আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন আছ?” আমি বিশ্বয়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তখন ব্রহ্মচর্য রক্ষার দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়াছি। সংযমের মাত্রা যেন আর রক্ষা হয় না। অন্তর-দর্শী শ্রীঅরবিন্দ যেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি আমার অবস্থার কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। তিনিও অনেক উপদেশ দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি কালই চলিয়া যাইতেছি। শ্রীশচন্দ্র কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তোমাকেও কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।”

আমি শুনিলাম—তিনি পণ্ডিচারী যাইবেন। পণ্ডিচারী করাসী রাজ্যের রাজধানী। সেখানে তিনি নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। শুনিয়া বুকটা যেন ভাঙিয়া গেল; দুই মাস তিনি ছিলেন, হৃদয় যেন পূর্ণ থাকিত। অকস্মাৎ

তাঁহার মুখে প্রস্থানের কথা শুনিয়া আমি সবিশেষ বিচলিত হইলাম।

তার পর দিন তাঁহার বিদায়ের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া; সহজভাবেই রাত্রিযাপনের জন্য যথাসময়ে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলাম। শয্যাও গ্রহণ করিলাম। নিদ্রা হইল না। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিল। অন্ধকার-গৃহে নতুবা পত্নীর নিকট ধরা পড়িতাম। মধ্যরাত্রে শ্রীশচন্দ্রের গলা শুনিলাম। পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রিকালেও কি তোমার অবসর নাই?” আমি তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দের বিদায়-বার্তা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “মাস্তুলটির শেষ বিদায়ের দিনে তোমার এইরূপ নিশ্চিন্ততা—সকল কাজেই শেষ রক্ষা করতে পার না!”

আমি ঘরের বাহির হইলাম। জ্যোৎস্নায় সর্বদিক্ উদ্ভাসিত। শ্রীশচন্দ্রের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি দুই বাহু দিয়া আমার বৃকে ধরিলেন। সেই স্পর্শ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তার পর বাঁধন খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, “তোমার হবে। যোগ তুমি পাবে। আমার কথা মনে রাখিও।”

মর্ধ্য বিদীর্ণ হইয়া ভাষা বাহির হইল, “আপনার সহিত আবার কি দেখা হবে?”

তিনি স্নেহে উত্তর দিলেন, “হবে হবে। অনেক কাজ তোমার সঙ্গে আমার করার আছে।”

তার পর তিনি নৌকায় গিয়া উঠিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি,

যতদূর দৃষ্টি চলে—নৌকাখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তার পর ঘরে ফিরিলাম ভগ্ন হৃদয়ে। কি হইল, তাহা অবর্ণনীয়!

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাস শেষ হয়। সংবাদ না পাইয়া শ্রীশচন্দ্র আসিয়া জানাইল, “ব্যাপার কিছু বুঝা যাইতেছে না, স্বদর্শনকে পণ্ডিতারী পাঠাইয়া দিব মনে করিতেছি।” স্বদর্শন পণ্ডিতারী গেল। যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে তাহার একখানি আঁটখাম। খামের উপরে আমার নাম লেখা। খামখানা খুলিলাম, সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনটি মন্ত্র তাঁহারই হাতে লেখা—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের। মনে পড়িল তাঁহার অজ্ঞাতবাসকালে পার্থের কক্ষে পত্নী-বালকদের লইয়া হাজার বার চীৎকার করিতাম—“জ্ঞান, শক্তি, প্রেম দে।” এ সেই জ্ঞানের মন্ত্র, শক্তির মন্ত্র ও প্রেমের মন্ত্র। তিনি নির্দেশে দিয়াছেন—“প্রত্যেক মন্ত্রটি ১০০৮ বার জপ করিতে হইবে।” শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই সময়ে ধ্যান করিতেন, মন্ত্র জপ করিতেন স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমারও গুরুমন্ত্র ছিল, সাধনাও ছিল। শ্রীঅরবিন্দের এই মন্ত্রদানে আমার অন্তরে হৃদ বাধিল। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রই সাধিলাম। সেই পত্রের পাশে একটি ঠিকানা লেখা ছিল, ইহা পণ্ডিতারীর কোন ভদ্রলোকের ঠিকানা। স্বদর্শন বলিয়াছিল, “অন্তঃপর এই ঠিকানায় তিনি পত্র দিতে বলিয়াছেন। রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম সকল বিষয়ক নির্দেশই আপনার নিকট আসিবে, আপনি শ্রীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।” সে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন—আমি পূর্ব-দীক্ষিত হইলেও, শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষা সর্বাস্তঃ-করণে গ্রহণ করিলাম।

দেবতা হইয়া জাগো

শ্রীনীলরতন দাশ

শরৎ প্রভাতে শেকালিকা বরে শিশিরসিক্ত হাসে,
সবুজ ধানের নবীন শীর্ষে বর্ণ-কিরণ হাসে।
চারপের দল চন্দনা-ভ্রামা-বন্দনা গায় বনে,—
অন্তরে কত কামনা যে জাগে, কত ভাব আসে মনে।
কত না ছনে সে ভাব প্রকাশ করি আগমনী গানে,—
তবু কি জননী সাদা দাঁও তা’তে? জাগো কি মোদের প্রাণে?
তোমার প্রতিমা গন্ধিয়া বোধান করি মাগো দশভুজা,—
ষোড়শোপচারে মহাসমারোহে করি মোরা তব পূজা।
যুগে ভক্তির বজা যে বহে, অন্তরে মন্ত্রভূমি;
সকলি হলনা, সকলি মিথ্যা, সব কাঁকা,—কানো তুমি।

লালসা-কামনা-কলুষকালিনা-হিংসার জঙ্কর
অহুরের লীলা-ক্ষেত্র আদিকে মাহুঘের অন্তর।
অহুর সেধার নাচে তাণ্ডব হাসিয়া অটহাস,
প্রেম-পিপাচেরা উল্লাসে ফেলে কলুষিত নিঃশ্বাস।
গুরু পায়ণ উষর হৃদয়ে নাহি ভক্তির ঠাই,—
দেবতারে দূরে পরিহরি’ মোরা দানবেরে পুজি তাই।
অহুর-নাশিনী। দহুজদলনী। সন্তানে করি’ কমা
করুণারশিণী জননীর বেশে এস মাগো নিকুপমা।
যন্ত্ররীপে নৃতন চেতনা দাঁও চিরমী মাগো,—
দানবীয় এই মানবের বৃকে দেবতা হইয়া জাগো।

তপোগিরি বা রামটেক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনে হয়, দূরত্ব ও প্রচারের অভাবেই মধ্যভারতের বিখ্যাত তীর্থস্থান রামগিরি বা রামটেক সারা ভারতের তীর্থযাত্রীর কাছে বিশেষ পরিচিত হয় নি। পুরাতন বিবরণীর নজরে এই রামটেক যে-কোন বড় তীর্থস্থানের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে।

মধ্যভারতের প্রধান শহর নাগপুরে পৌঁছেই মনে হ'ল রামচন্দ্রের রামটেক যেতে হবে। ক'দিন আগে কার্তিক মাসে উৎসব হয়ে গেল, কিন্তু উৎসবের ভিত্তে সব ক্রিনিষ ভাল-ভাবে দেখা সম্ভব নয়, তাই সে সময়ে যাওয়া হয় নি। ধ্যান করতে হলে নির্জনতার প্রয়োজন। যেখানে বহুলোকের হৈ চৈ সেখানে দেবতা অপেক্ষা তার পাণ্ডা ও ভাদেব আত্মব্রতই মনকে দেবতার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়।

রামটেকের দূরত্ব নাগপুর থেকে উত্তরপূর্বে ২৮ মাইল। এই ক্ষুদ্র শহরটি জঙ্গলাকীর্ণ আবাদ্য পর্বতশ্রেণীর দ্বারা প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত। রামটেক পর্যন্ত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটি শাখা লাইনের যোগ আছে। রেলপথ ছাড়া ভাল রাস্তা দিয়েও যোগাযোগ আছে—নির্ভরশীল সময়ে বাস চলাচল করে। শহরটি রামটেক পাহাড়ের পাদদেশে বেশ সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে—দেখে মনে হ'ল ক্রমবর্ধমান। শহরের ভিতর সরকারী তহশিল আপিস আছে। রেল স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় হ' মাইল।

বহুদূর থেকে রামটেক পাহাড়ের উপরে সাদা সাদা মন্দিরগুলি দেখতে পাওয়া যায়—রামটেক স্টেশনে নেমেই এই মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে কিছুক্ষণও অভিযাহিত করা যাবে এই ভেবে মনটা খুশি হয়ে উঠল। সঙ্গী জৈনধর্মাবলম্বী বন্ধুটি বললেন, শান্তিনাথের বিখ্যাত মন্দির, বিগ্রহ, গুরুকূল ইত্যাদি দেখে সোজা পথে পাহাড়ে উঠা যাবে। শান্তিনাথ-দেবের বিগ্রহাদি দেখে যাওয়াই ঠিক হ'ল।

শান্তিনাথদেবের মন্দির ও গুরুকূল রামটেক পাহাড়ের পরেই একটি ছোট পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ভগবান বুধের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পূর্বে বর্জমান মহাবীর আর্ধ্যধর্মের শাখা বিশেষরূপে জৈন-মতাবলম্বী এক সম্প্রদায় গঠন করেন—অহিংসাই তাদের মূলমন্ত্র। কথিত আছে, ঋষভদেব এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দননাথ, শান্তিনাথ প্রভৃতি চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীরই শেষ তীর্থঙ্কর।

তিন শ' বছর আগেও শান্তিনাথদেবের মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না। তৎকালে সেখানে স্থানীয় কয়েক ঘর আদিবাসী

ছাড়া বিশেষ লোকজনের বসতিও ছিল না। প্রায় সমস্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তখন ঐ সকল স্থান নাগপুরের জেঁসলে মারাঠাবংশেজ্ঞ আপ্পা সাহেবের অধীন ছিল। আপ্পা সাহেব একদিন মন্ত্রী বর্জমান শাহজীর সহিত শ্রীরামজীর দর্শনে রামটেক আসেন। জেঁসলে রামসীতার পূজা শেষ করার পর প্রসাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু মন্ত্রী শাহজী বলেন যে, কোনও জীনমূর্তি দর্শন না হলে তিনি জলগ্রহণ করতে পারেন না। শাহজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে নিকটেই কোথাও ভগবান তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে, কারণ জৈনশাস্ত্রে লেখা আছে, শ্রীরামচন্দ্র একজন ভক্ত জীন ছিলেন। আপ্পা সাহেব শাহজীকে তাঁর হাতী নিয়ে কমাটির জৈনমন্দিরে যেতে বললেন, কিন্তু শাহজী মনের বিশ্বাসবশে আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করার জানতে পারলেন যে, ছোট পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক নগ্নমূর্তি আছে। শাহজী জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্তে লোক নিযুক্ত করেন এবং ভক্তের বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়। পর দিন প্রায় ২০ ফুট উচ্চ শান্তিনাথদেবের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। যোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথদেব-মূর্তি আবিষ্কার করার পর শাহজী জলগ্রহণ করেন। এই লুকাইত তীর্থঙ্করের মূর্তি আবিষ্কার করার শাহজীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপ্পা সাহেব এই মন্দির-সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। বর্তমানে এই মন্দির নাগপুরের দিগম্বর জৈন-সমাজের কর্তৃত্বাধীনে আছে।

পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, আদিনাথ—এই সকল তীর্থঙ্করের মূর্তিসমেত আটটি মন্দির আছে। প্রধান মূর্তি শান্তিনাথ-দেবের। মন্দিরগুলির বয়স হ'ল বছরের কিছু বেশী হবে, কিন্তু শান্তিনাথদেবের মূর্তিটি আনুমানিক হ'ল হাজার বছরের পুরাতন। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি যখন রামটেকে মেলা হয় তখন এখানেও মেলা বলে এবং বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

দিগম্বর জৈনসমাজ শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত মন্দির-সংলগ্ন একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে শ্রীশ্রীশান্তিনাথদেব গুরুকূল (বিদ্যালয়) ও ছাত্রাবাস অবস্থিত। এই গুরুকূল ১৯৪৩ সালের ১৪ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারই প্রধান লক্ষ্য নয়—প্রাচ্য সংস্কৃতি, বিশেষ করে জৈনশাস্ত্র শিক্ষাদানই প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্র-সংখ্যা কম, বর্তমানে ত্রিশটির বেশী নয়। ছাত্রদের থাকা খাওয়া ইত্যাদির জন্য কিছু খরচ দিতে হয়। অবশ্য গরীব ছাত্ররা এই খরচ দেওয়া থেকে রেহাই পায়। আমাদের নিজস্ব আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার যে মহতী প্রচেষ্টা এখানে চলছে তা

দেশে খুব আনন্দ হ'ল। ছাত্ররা ইংরেজী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বা কাশীর 'বিশারদ' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, নাগপুরের বিখ্যাত সমাজসুধা শেঠ কিশোরী-লাল রায়চৌধুরীর অর্থে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

সারা সকাল শান্তিনাথদেবের আশ্রয়ে কাটল। মন্দিরের সেবক ও বিতালয়ের ছাত্রগণের মধুর ব্যবহারে বেশ আনন্দ পাওয়া গেল। প্রধান দ্রষ্টব্য রামগিরি, তার সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল।

আমরা রামগিরি অভিমুখে রওনা হলাম। ছোট পাহাড়টির পরেই বড় রামটেক পাহাড়। শহরের বস্তী-সীমানা এখান পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পাহাড়ের গা দিয়ে একটা সরু রাস্তা উপরে উঠেছে। এটা ঠিক তীর্থযাত্রীদের রাস্তা নয়, স্থানীয় লোকেরা এই রাস্তায় পাহাড়ে উঠানামা করে, গোচারণ করে নড়রে পড়ল। পাহাড়ের গা বেঁসে হেলেরা খেলা করছে, বিদেশী নুতন লোক দেখে কোন কৌতূহল নেই। এরকম যাত্রী দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সাধারণতঃ তীর্থস্থানে অভ্যস্তভাবে হাত পাতার নমুনা দেখে বিরক্তি জাগে। কিন্তু এরাও দরিদ্র তবু আত্ম-মর্যাদাবোধ আছে, মা-বাপের কাছে হাত পেতে দাঁড়বার শিক্ষা পাননি।

পাহাড়ের গা বেঁসে রামজীর দর্শনে এগুনো গেল। রামটেক পাহাড় বিভিন্ন নামে পরিচিত—রামগিরি, সিদ্ধুরা-গিরি, তপোগিরি ও শৈবালগিরি। উইলসন সাহেব প্রভৃতির মতে রামটেকই মৈথবৃত্তের রামগিরি। সেখানে :

যক্ষকক্ষে জনকতনয়ান্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধায়া তরুণ বসতিং রামগির্ধ্যাশ্রমেবু ॥”

কেহ কেহ অবশ্য বলেন, রামগড় বা অমরকটক পাহাড়েই কালিদাসের রামগিরি আশ্রম। যা হোক, দৃষ্টি দেখে মনে হয় সত্যই কালিদাসের মত কবির কাব্যপ্রেরণা জাগাবার উপযুক্ত স্থান। ‘কান্তা বিরহগুরুণ’ যক্ষ ‘শাপেনাস্তংগমিত-মহিমা’ বর্ষকাল এই পাহাড়ে অবস্থান করেন। সেই ‘কণ্ঠা-প্লেষপ্রণয়িনী’ বিরহী যক্ষ তাঁর প্রণয়িনীর কাছে ‘প্রিয়ান্নাঃ সন্দেহং মে হর’ এই বলে অলকাপুরীতে প্রিয়ার নিকট মনের ভাব প্রেরণের বাসনা জানান। অনবশ্য মন্দাকান্তা ছন্দে এরূপ কাব্যরস-পরিবেশন স্থান-মাহাত্ম্যেই সম্ভব মনে হয়। রাম-টেকের নিকটেই নন্দর্দন বা নগর্দন নামে একটি গ্রাম আছে, এই গ্রামটি চতুর্থ শতাব্দীতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। মনে হয়, এটি সেই সময়ে কিছুকাল বিদর্ভদেশের রাজধানী ছিল। বিদর্ভদেশের এই রাজধানীতে অবস্থানকালেই কবি কালিদাস রামটেক পরিদর্শন করেন ও সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে মেঘদূত রচনা করেন।

পাহাড়টির অপর এক নাম সিদ্ধুরাগিরি। পাহাড়ের

পাথর ভাঙলে পাথরগুলি লাল রঙের মনে হয়—এবাদ হিরণ্যকশিপুর রক্তে এগুলি লাল হয়ে গেছে। হিরণ্যকশিপুর ও তাঁর পুত্র ভক্ত প্রজ্ঞাদের পৌরাণিক কাহিনী সুপরিচিত।

রামটেক পাহাড়ের প্রধান দ্রষ্টব্য—‘তপোগিরি’ এই নামের সঙ্গে যুক্ত। কথিত আছে, ত্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে শব্দুক নামে এক ভক্ত শূদ্র এই পাহাড়ের উপর কঠোর তপস্বী আরম্ভ করেন। শূদ্রের পক্ষে এরূপ কঠোর তপস্বী করা তখন ছিল অশাস্ত্রীয়, এবং এই অশাস্ত্রীয় কাজের জন্যে এক ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকালমৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের সময়ে রাজার নিকট যে-কোন বিষয়ে অভিযোগ জানানোর অধিকার প্রচার ছিল। বহু অল্পসঙ্কানের পর শব্দুকের সেই অশাস্ত্রীয় তপস্যার কথা রামচন্দ্র জানতে পারেন ও রাজা রামচন্দ্র তাঁর চন্দ্রহাস তরবারির সাহায্যে শব্দুকের যুগ্ধক্ষেত্র করেন। ছিন্ন মস্তক উর্দ্ধে উঠে রাম নাম জপতে থাকে। ভক্ত শব্দুককে রামচন্দ্র বর প্রদান করতে চাইলে শব্দুক প্রার্থনা করেন তাঁর তপস্যার দ্বারা উন্নত এই পাহাড়—যা তপোগিরি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেইখানে রামজী যেন চারি যুগ বসবাস করেন। অন্য বরে শব্দুক নিজ দেহের শিবলিঙ্গপ্রাপ্তি কামনা করলেন। রামচন্দ্র ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। সেই শিবলিঙ্গই এখন—ধূত্রেখরশিব নামে প্রসিদ্ধ। রামজীর অবস্থিতির নিদর্শন হিসাবে এই মন্দিরের উপরে মাঝে মাঝে সকালের শুকতারার দ্বারা এক জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায়। ভক্ত হিন্দু এই জ্যোতি-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আকুলভাবে ত্রীরামচন্দ্র ও ভক্ত শব্দুকের কথা স্মরণ করেন।

এই পাহাড়টিকে শৈবগিরি বা শৈবালগিরিও বলা হয়, কারণ শব্দুর মহাদেব এই পাহাড়ে অবস্থানের জন্য আপন ভক্ত বহু শৈবকে আনেন। শূদ্র শব্দুকের শান্তিবিধানের পর ত্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির আশ্রমে আসেন, কিন্তু তাঁর জ্যোতিঃ-মূর্তি ও পদচিহ্ন নিদর্শন হিসাবে সেখানে থেকে যায়। রাম-গিরি পাহাড়ের উপরে যে ত্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন ছিল তা কালিদাসের মেঘদূত পাঠে জানা যায়। যক্ষ তাঁর অলকা-পুরীতে অবস্থিতা প্রিয়ার নিকট সম্বেশবাহী মেঘকে বলছে—বন্দে পুংসাং রত্নপতিপদৈররুজিতং মেঘনাম ॥ এই পদচিহ্ন কালিদাস কর্তৃক পুজিত হয়েছিল অসুমান হয়। এই পদচিহ্নের কথা আরও স্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় প্রভাবতী গুপ্তার তাত্ত্বিকলক থেকে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের) কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হয় বিদর্ভের ভেকটরাজবংশের দ্বিতীয় ক্রতসেনার সহিত। বিবাহের কয়েক বৎসর পরই ক্রতসেনার মৃত্যু হয় এবং প্রভাবতী গুপ্তা শিশু পুত্রের নামে রাজত্ব চালাতে থাকেন। বেরারের বাধনপুরের এক তাত্ত্বিকলকে আছে যে, ১২ই কার্তিক শুক্ল তারিখে রামগিরির তগবানের পদচিহ্নের পূজার উদ্দেশ্যে প্রভাবতী দেবী জমি দান করছেন। মহা-

কবি কালিদাসের রচনা ও প্রভাবতী শৃঙ্গার বিবরণ থেকে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও এই পাহাড়ের উপরে ভগবান ত্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কালক্রমে তা লোপ পেয়েছে, অথবা প্রত্যক্ষ চিহ্ন বিলুপ্ত করে ভারি উপর মন্দির তোলা হয়েছে। এরূপ প্রত্যক্ষ চিহ্নের বিলুপ্তির কথা বহু প্রাচীন ভীর্ণের পূর্বে-ইতিহাসে পাওয়া যায়। রামসীতার মন্দিরের পরে অজ্ঞাত বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এটাই সাধারণের অজ্ঞান। রামজী ও সীতাদেবীর পুরনো বিগ্রহ দুটি মুসলমানগণ কর্তৃক ভগ্ন ও কলুষিত হলে দেবতার স্বামী-দেবীর ফলে এই মূর্তি দুটি পাওয়া যায় ছুৰওয়লা পুন্ডরিগী থেকে। ভাস্কর্য্যকর তারিখ অজ্ঞানারে শুক্লা কাণ্ডিকের শেষে এখনও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের সময়ে রামটেকে প্রায় এক সপ্তাহকাল মেলা হয়। মধ্যপ্রদেশ ছাড়া ভারতের অজ্ঞাত অঞ্চল থেকেও কিছু কিছু ভীর্ণবাজীর সমাবেশ হয়। প্রধান উৎসব দিনে মধ্যরাত্রে হলদে রঙের (পীতাম্বর) বস্ত্র রামচন্দ্রের মন্দিরের উপরে পোড়ান হয়। পুরাণে আছে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্ত দেবদেবের মহাদেব ত্রিপুরাসুর দৈত্যকে হত্যা করেন, সেই পীতাম্বর কাঁচ ব্যাপারটি সম্ভবতঃ মহাদেবের ত্রিপুরাসুর-হত্যার স্মারক হিসাবেই অনুষ্ঠিত হয়। ত্রীরামচন্দ্রের জন্মদিবস রামনবমীতেও এখানে বহু বাজীর সমাবেশ হয়।

শান্তিনাথদেবের মন্দিরে আগে না গিয়ে ষ্টেশন ছেড়েই স্মরণীয় ভীর্ণবাজীরা যে পথ ধরেন সেই পথে শহর পার হয়েই পড়ে আখালা নামে জলাশয়। এই জলাশয়টি বনানীশোভিত পাহাড়-পরিবেষ্টিত ও জলাশয়ের চতুর্দিকে সাদা সাদা অনেকগুলি মন্দিরের সমাবেশ। এ স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম। প্রবাদ আছে যে, একদা স্বর্ধাবংশীয় রাজা অথ এই পার্বত্য-অঞ্চলে শিকারে আসেন। রাজা অথ ছিলেন কূঠরোগগ্রস্ত। রাজবৈদ্যরা তাঁকে নিরাময় করতে পারেন নি। সে সময়ে এখানে জলাশয় ছিল না, ছিল মাত্র একটি ঝর্ণা। তৃষ্ণার্ত অথ ঝর্ণার জলপানে পরিতৃপ্ত হয়ে হাত পা ধুতে থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর দেহের যে যে স্থানে সেই ঝর্ণার জল লগ্নে সেই সেই স্থানে কূঠরোগের চিহ্ন লোপ পেয়ে যায়। এতে ঝর্ণাপং বিস্মিত ও আনন্দে উৎক্লম্ব হয়ে রাজা সেই জল দ্বারা সর্বাঙ্গ ধোত করলেন। বিষয়ের উপর বিষয়—তারপর রাজার দেহে কূঠরোগের আর লেশমাত্র চিহ্নও রইল না। রাজা অথ কূঠরোগীদের উপকারের জন্ত সেই জল আবর করে জলাশয় সৃষ্টি করেন। এই জল স্বর্গের মন্দাকিনী ও বারাণসীর গঙ্গার স্তায় পবিত্র। এখানে পূর্বে-পুরুষের অস্থি-বিসর্জন বিশেষ পুণ্যকৃত্য বলে গণ্য হয়। রাজার নামানুসারে জলাশয়ের নাম হয়েছে আখালা হ্রদ।

আখালা হ্রদে স্নান-পূজা সেরে রামটেক পাহাড়ের উপরে

উঠতে হয় অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে। পাথরের সিঁড়িগুলো কোথাও উঁচু, আবার কোথাও নীচু, রাস্তাটি বেশ মনোরম। পাহাড়ের উপর বিরাট ভূগর্ভপ্রকার বেষ্টিত স্থান, ভারি ভিতর মন্দির। শিবাজীর মারাঠাশক্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে, রামটেক প্রতিষ্ঠিত স্থান নাগপুরের ভোঁসলের অধীনে আসে। সেই সময়ে মুসলমানদের প্রতাপ মন্দীভূত হয়ে এলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। তাই ভোঁসলেরাজকে সর্বদা সজাগ থাকতে হ'ত। এই পাহাড়ের উপর এরূপ সূচক ভূগর্ভ নির্মাণ করার দুই উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ স্থানটিকে অজ্ঞাতম প্রতিরোধ-বাঁটিতে পরিণত করা, আর দ্বিতীয়তঃ রামজীর পদাঙ্কিত ও মন্দিরাদি-শোভিত হিন্দু-ভীর্ণকে মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা।

বেষ্টনীর প্রবেশ-পথের আগে একটু বাঁ দিকে গেলেই শম্বকের লিঙ্গমূর্তি ধুত্রেখর মহাদেব। মন্দিরের কাছেই একটি ক্ষুদ্র বস্তী ও দোকান—খাবার জিনিস বেশ পাওয়া যায়। এর কাছেই প্রায় সম্পূর্ণ একটি ছোট মসজিদ নির্জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মুসলমান-অভিযানের সাক্ষ্যরূপে। এই মসজিদটি নাকি সত্রাট আওরঙ্গজেবের এক সেনাপতির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, তারপর দীর্ঘকাল অভিযাহিত হয়েছে, দেশের বুকের উপর কতই না পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু পরধর্ম্মসিঁড়ি হিন্দু এই স্মৃতিচিহ্নকে যথেষ্ট সন্মোহণ থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস করেনি। তবু শম্বকের ধুত্রেখর মন্দিরটি অনাদৃত অবস্থায় আছে, লোকসমাগমও কম হয়।

ভূগর্ভপ্রাচীরের নিকটেই ভগবানের নরসিংহমূর্তি। হিরণ্য-কশিপুকে হত্যার পর নৃসিংহাবতার তাঁর বৃহৎ গদা যেখানে নিক্ষেপ করেন সেখানে একটা ক্ষুদ্র পুন্ডরিগীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমই অতিক্রম করতে হয় বরাহ-দরজা, এখানে একটা বৃহৎ বরাহমূর্তি আছে। ভগবানের এই বরাহমূর্তির উদরের শিয়-ভাগে হামাগুড়ি দিয়ে পার হবার মানত থাকে অনেকের, কিন্তু পার হতে গিয়ে কৃতকার্য্য না হলে তাকে পানী বলে ধরে নেওয়া হয়। বরাহ-দরজার পর সিংহপুর দরজা এবং তারপর মারাঠা-কামানশোভিত ভৈরব দরজা। সেদিনের রক্ষিণ সম্ভবতঃ মহাদেবের আশিস্ লাভ করে অমিত বিক্রমে এই দরজা রক্ষা করতেন। ভৈরব-দরজার পরেই প্রধান দরজা—গোকুল দরজা, অভ্যন্তরভাগে গোকুলের অধীশ্বর ভগবান ত্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ। এই দরজা পার হয়ে হিন্দু ছাড়া 'অজ্ঞ ষর্ধাবলম্বীর প্রবেশ বিবেচ্য। ক্যামেরা নিয়ে যাবারও নিয়ম নেই—এই সীমার ওপারে। তাই ভপোগিরির রামসীতার ছবি পাওয়া যায় না।

উচ্চ পাহাড়ের উপর স্মন্দর শুভ্র রামসীতার মন্দিরটি—শান্তিনাথদেবের মন্দির বা ছুরবর্তী স্থান থেকে ডানা-মেলা

খেত কপোতের মত মনে হয়। বিএহের সামনে নাটমন্দিরে ভক্তেরা সমবেত হন, মন্দিরে পূজা হচ্ছে, কেউ কেউ ভজন গান করছেন মনের আনন্দে। নাটমন্দিরটিতে ভৌসলে রাজাদের ছবি আছে আর আছে দোহুলামান কয়েকটি ভয়বানি, মনে হয় একদা সফটকালের জন্ত এদের কিছু প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন কেবল শোভাবর্ধন করছে। কষ্টি-পাথরের তৈরী এই বিএহের ভক্তের প্রাণে আনন্দ জাগিয়ে তুলছে কত যুগযুগান্তর ধরে।

রামসীতার মন্দির ছাড়া লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, হনুমান প্রভৃতির ছোট ছোট মন্দির আছে, সেগুলি বেশী পুরনো মনে হয় না। বামদেবের মন্দিরটি বরং অপেক্ষাকৃত পুরনো মনে হয়। এই মন্দিরটি ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার উপহিত পুরাতত্ত্ব বিভাগের ভদ্রাবধানে আছে। ভৈরব-দরজার উপরে ছোট বর ও কাঁকা জায়গা আছে। সেখানে বসে শহরের

দৃশ্য, বিশেষ করে অধালা হ্রদের দৃশ্য অতি মনোরম বলে প্রতি-ভাত হয়। মনে হয় যেন এক অপূর্ণ রাজ্য এসে পড়েছি।

রামজী ও অশ্বাশ্ব মন্দির দেখা শেষ হ'ল, ইতিমধ্যে স্বর্ষ্যদেবও অনেকটা পশ্চিম দিকে নেমে এসেছেন। তাই যুজ্জের মহাদেবের মন্দিরের পথ ধরে অবতরণ করতে হ'ল। রামটেক শহরটি ছোট, কিন্তু লোকসংখ্যা দশ হাজারের বেশী। পোষ্ট-আপিস ইত্যাদি সবকিছুই আছে, ডাকে হু'খানা চিঠি কেললাম। রামটেক ষ্টেশনের কিছু দূরে ম্যাদানিদের খনি আছে—ষ্টেশনের প্রয়োজন এই কারণে আরও বেশী। ষ্টেশন-মাষ্টার একজন বাঙালী ভদ্রলোক দেশ ছেড়ে সবে প্রবাসী হয়েছেন চাকরিস্বত্বে। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে গাড়ী প্রাটিকরমে হাজির হ'ল। তারপর রাত দশটার নাগপুরের পাহনিবাসে পৌঁছে, সে রাত্রির মত আশ্রয় লওয়া গেল।

শিঙ্গীরা ব্যথা

ঐআন্তোষ সাহান

আমারে চেনো না তুমি,—তোমারেও নাহি আমি চিনি ;—
সুহৃদের পারাবার আমাদের মাঝে
কল্লোলিছে রাজি-দিন।

তোমার হৃদয়মন মোর কাছে চির অন্ধকার।
তবু আমি আপনার আনন্দবেদনা, জীবনের অল্পভুতি;
আবেগ-উচ্ছ্বাস

ছন্দায়িত ক'রে তুলি সমভনে বসি'
তোমারি লাগিয়া শুধু হে আশ্রয় আশ্রয় আমার।
যে-পুলকে উচ্ছলিয়া উঠে এ হৃদয়,—
তব মর্ম্মতটমূলে সে কি কভু ভোলে কলতান ?
সঙ্গোপনে

যে হৃৎ নীরবে সহি আপনার মনে,—
তোমার অন্তরে কিগো লাগে তার তীব্র বহিঃতাপ ?
অথবা কি সব ভুল ?

যার হৃৎ, যার ব্যথা তার তাহা একান্ত আপন ?
বিশ্বজন

নাহি পায় কভু তার নিগূঢ় আশাদ।

এ অক্ষম সীমাবদ্ধ ভাষা

কতটুকু পারে তোমা দিতে পরিচর-

মোর স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা ?

কি আকৃতি জাগে প্রাণে প্রকাশের লাগি'—কেমনে

বুঝিবে তুমি।

বলিবারে চাই যাহা, কতটুকু অভিব্যক্তি তার—এ ক্ষুদ্র •

কবিতাখানি মোর।

বাগবিত্ত পক্ষী যথা মরে যথা পক্ষ বাপটিয়া—উড়ে উঠিবারে

ঐ মতো উঠে হিয়া আকুলি' ব্যাকুলি'

অভভেদী তাবলোকে করিতে বিহার,—

উড়ে যেতে সুহৃদগম মনোলোকে তব

এ ছবিল কল্পনার পক্ষভরে মোর।

কোথা তুমি—কোথা আমি।

আমার এ ব্যাকুলতা, অশ্রান্ত প্রয়াস

তাহার করুণ ইতিহাস—কেমনে জানিবে তুমি।

কেমনে বুঝিবে তুমি ওগো বন্ধু মোর,—

এ শুধু কবিতা নহ্ন—মর্ম্মের মুকুর,—

জীবনের অবিকল প্রতিবিম্ব মোর,—

এ কেবল ছন্দ নহ্ন—হৃদয় স্পন্দন।

ধূপের নীরব দাহ দেখ নাই চোখে ; শুধু তার জ্বাণ

মাভারে তুলেছে তব প্রাণ।

আমি শিল্পী—আমার জীবন

তিলে তিলে পুড়ে-মরা আরতির ধূপের মণ্ডন ;—

দাহটুকু মোর শুধু—সৌরভ তোমার।

আমার চীনভ্রমণ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

আমার চীনভ্রমণের কিছু ভূমিকা আছে। এই ভ্রমণ-ব্যাপারটি আসলে রফার ব্যাপার। হুতরাং বিশ্বের কিছু নেই। রফা করে চলায় আমরা অনেক দিন ধরে অভ্যস্ত। যা চাই তা পাই না, খুশি থাকতে হয় তার পরের



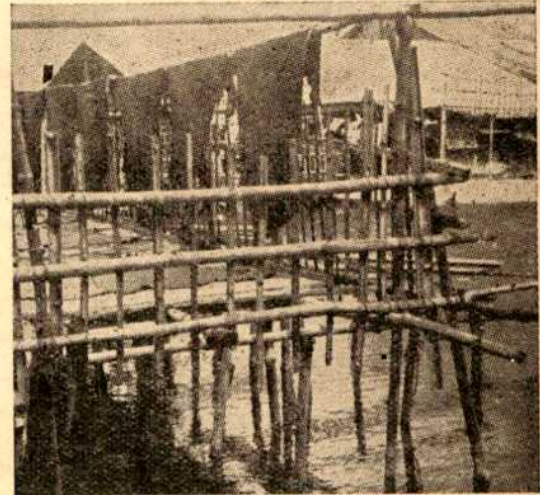
ল-চং-গী

জিনিসটিতে। ইংরেজীতেই কথাটি শোনায় ভাল—next best। অর্থাৎ যেটি পাওয়া গেল না, তার বদলে তার অল্পকল্প আর একটি জিনিস। চালের অভাবে যেমন গম, ধুতির অভাবে হাফ-প্যান্ট। কিছুক্ষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি, তার পর নিশ্চিন্তমনে সব মেনে নিই।

আমার চীনভ্রমণও এই অগত্যা মেনে নেওয়া। বাংলা-দেশ থেকে সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ১৯৫১) যে সব সৌভাগ্যবান চীনদেশে রওনা হচ্ছেন, বলা বাহুল্য আমি তাঁদের দলভুক্ত নই, অথচ আমারও চীনদর্শন-বাসনা প্রায় চীনের মতই প্রাচীন। হয় তো এই বাসনা হাজার দুই বছর আগেকার চীন-ভারত মৈত্রীর প্রভাব। যারা সে যুগে চীন থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারত থেকে চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের অদৃশ্য হাত আজও চীন-ভারত মৈত্রীগঠনে সাহায্য

করছে। তাই শুধু আমার নয়, সম্ভবত ভারতবাসীমাজেরই মনে চীনভ্রমণের একটি চেতন বা অবচেতন বাসনা আছে। অথচ বর্তমান সময়ে এ বাসনা পূরণ করায় অহবিধা আছে খুবই। বর্তমান চীন তপ্ত তৈলকটাহ, ভবিষ্যৎ চীনগঠনের মশলা ভাজা হচ্ছে সেখানে। এ চীন নিশ্চিন্ত মনে দেখা চলে না। নিশ্চিন্ত মনে দেখতে হলে দেখতে হয় কনফিউ-সিয়াস বুদ্ধ লাওং-সের চীন, ফা-হিয়েন হিউয়ান-সাঙের চীন। অর্থাৎ প্রাচীন চীন।

সৌভাগ্যবশত একটা স্বযোগ জুটে গেল বাংলাদেশের

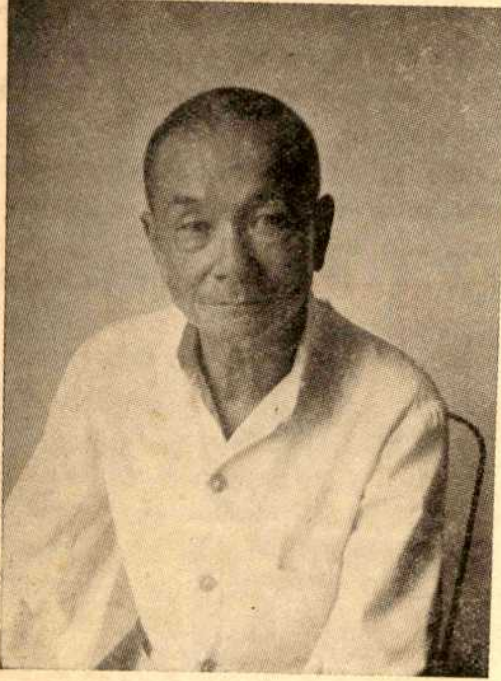


ধাপার জলা অঞ্চলে চীনাদের চামড়ার কাজ

নিমজ্জিতদের চীন রওনা হবার পূর্বমুহুর্তে—ল-চং-গী নামক এক চীনা যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাকে দেখেই মনে এল সেই ইংরেজী কথাটি—next best।

অবিলম্বে চীনভ্রমণ আয়োজন শেষ করে ফেললাম। এক দিন সকালে গলায় লাইকা ঝুলিয়ে ছু'জন রওনা হলাম ধাপা অভিমুখে। আমার এ চীন ধাপার জলাভূমির চীন, কলুটোলা, ছাতাওয়ালা গলি, টেরিটিবাজার, ফিয়ার লেনের চীন। ল-চং-গী বলল ধাপা থেকেই শুরু করা যাক আমাদের প্রথম পর্ব। এখানে এক চীনা শহর গড়ে উঠেছে চামড়ার কাজ উপলক্ষে। রওনা হতে বেলা প্রায় ন'টা হ'ল। বেলেঘাটার পথে বাস-এ গিয়ে হাঁটতে হবে মাইলখানেক। পথ অত্যন্ত খারাপ। রিক্সা চলা প্রায় অসম্ভব। ভাঙা উঁচুনীচু পথ মেরামত হচ্ছিল,

সর্বত্রই পাহাড়সমান উঁচু খোয়ার গাদা। ততুপরি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। চলতে পা ক্ষতবিক্ষত হ'ল, ততুপরি কাদা এবং জল। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু রোদ তা প্রায় আগুনের মতো গরম।



ল-৭-২৭

ক্রমে এগিয়ে চলেছি আর বড় বড় কারখানা সব চোখে পড়ছে। সবই চামড়ার কারখানা। সমুদ্রের মতো জলাভূমি। জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে পুঁতে কাঠের তক্তা বিছিয়ে প্রকাণ্ড এক একটা মাচা করা হয়েছে। মাচায় একের পর এক চামড়া বিছিয়ে মজুরেরা তাতে বসে মাথাচ্ছে। পাশে কতক চামড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রোদে শুকানোর জন্তে। কিন্তু ঘন বর্ষণে কোন কাজই ঠিকমত হচ্ছে না।

দুঃখের পথ অতিক্রম করে ল-চং-গী ও আমি গিয়ে উঠলাম ল-চং-গীর এক পরিচিত বাড়িতে। সেখানকার সব বাড়িই ট্যানারির সঙ্গে যুক্ত। আশা ছিল কতকগুলো কারখানা ঘুরে দেখব। কিন্তু ভাগ্য নিতান্তই অগ্রসর, ষাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘন কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে এল এবং একটু পরেই প্রবল বৃষ্টি। আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে পৌঁছেই বাঁশের মাচার এক অংশের মাত্র একখানি ছবি নিয়েছিলাম, দেরি করলে তাও হ'ত না। চলার পথে কারখানাগুলো বাইরে থেকে দেখেছিলাম, তার বেশি আর দেখা সম্ভব হ'ল না। কল চলেছে সব

কারখানায়। কোথাও চামড়া পালিশ হচ্ছে, কোথাও ঘষা হচ্ছে শাদা সোয়েড তৈরির জন্তে। দু'এক জন (অসুস্থ সম্ভবত) লেপের মত চামড়া গায়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চামড়ার গন্ধ সমস্ত বাতাসে, তবে জায়গাটা একান্তই খোলা বলে গন্ধ উগ্র নয়। বৃষ্টির মধ্যে ঘরের আশ্রয়ে বসে বসে যেটুকু সংবাদ শুনলাম তা হচ্ছে এই যে, চামড়ার কাজে অথবা জুতো তৈরিতে যারা নিযুক্ত তাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাদের নাম হচ্ছে "খে"। এই খে-সম্প্রদায় বহু প্রাচীন



চান-চুই-জীর কাঠির সাহায্যে ঝাওয়া

কাল থেকে চামড়ার কাজে হাত পাকিয়েছে। ক্যান্টনের খে নামক জায়গা থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

চীনদেশের এক একটা এলাকার লোকেরা এক একটি বিশেষ শিল্পকাজে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। যেমন ক্যান্টনের আর এক সম্প্রদায় দারু-শিল্পে ওস্তাদ। ড্রাই ক্লোনিং এবং ডায়িং-এর কাজে ওস্তাদ সাংহাইবাসীরা। এমন কি দাঁত তোলা এবং দাঁত বাঁধাইয়ের কাজেও একটি বিশেষ জায়গার লোকেরা বিশেষজ্ঞ। এরা ক্যান্টনের ওপাম নামক জায়গার অধিবাসী। এই-যে প্রদেশ বা সম্প্রদায় ভেদে কর্মভেদ এটা এমনই এদের মজাগত হয়ে পড়েছে যে, এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের কাজ করতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যারা পথে পথে কাপড় ফেরি করে বেড়ায় তারাও একটা বিশেষ এলাকার লোক। এরা নাকি শানটুংবাসী এবং অধিকাংশই মুসলমান।

আমার সঙ্গী ল-চং-গীর পরিচয় কোতুহলোদ্দীপক। এর পৈতৃক বাড়ি চীনদেশের আময় প্রদেশে, কিন্তু চীন সে

দেখে নি, বাংলাদেশেই তার জন্ম, বরিশালে। এর পিতার নাম ল-খে-হং। ল-খে-হং-এর বর্তমান বয়স প্রায় সত্তর বছর। তাঁর বয়স যখন বারো বছর তখন তিনি তাঁর পিতা ল-চিন-খি-র সঙ্গে আময় থেকে কলকাতা আসেন এবং

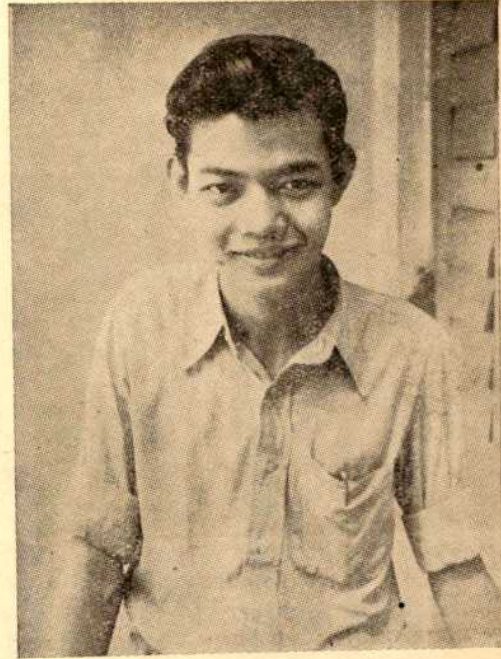


কলেজের ছাত্রী ছায়-ছ

ছ'বছর কলকাতা বাসের পর বরিশাল যান তাঁরই সঙ্গে। ল-চিন-খি বরিশালে সুপারি, তামাক ও লঙ্কা চালানোর ব্যবসা আরম্ভ করেন। ল-খে-হংও সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের এই তিনটি জিনিস সিঙাপুর, পেনাং প্রভৃতি জায়গায় চালান হয়। দীর্ঘকাল বরিশালে কাটাবার পর, দেশ বিভাগ হলে তিনি গত ১৯৪৮ সনে কলকাতা চলে এসেছেন। স্ততরাং ল-চং-গীও এসেছে পিতার সঙ্গে। ল-চং-গী বাইশ বছরের যুবক, আজন্ম বাংলাদেশ থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, বাংলা লেখে, বাংলায় কথা বলে। গত আই-এসসি পরীক্ষায় পাস করে এখন 'স্পেশাল বেঙ্গলী' নিয়ে বি-এ পড়ছে। ম্যাট্রিকুলেশনে সংস্কৃত পড়েছিল। এদের পৈতৃক ব্যবসা এখনও চলছে, সঙ্গে আছেন আর এক জ্ঞাতি ভাই—নাম চান-চুই-তী। ল-খে-হং বুদ্ধ কিন্তু এখনও অসাধারণ পরিশ্রমী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমার চীনভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হ'ল এঁদের তিন জনের সঙ্গে। কলুটোলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৌছলাম

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের এক আধুনিক চীনা বাড়িতে। ল-খে-হং এবং চান-চুই-তী এঁরা দু'জনেই বাংলা বলতে পারেন, ল-চং-গী বাংলা অবশ্য আরও মার্জিত। স্ততরাং এঁদের সঙ্গে আলাপে আমার কোনই অসুবিধা হ'ল না। যে পরিবারটির কাছে গেলাম তাঁরাও যথাসাধ্য আমাকে তাঁদের ঘরের খবর জানায় সাহায্য করলেন। এঁরা প্রায়



আধুনিক চীনা ছাত্র
আং-ম-বা

চার পুরুষ যাবৎ বাংলাদেশে আছেন। গৃহকর্তা বুন-চং বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী এখন বৃদ্ধা, বয়স তিরিশী বছর। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং পোশাক-পরিচ্ছন্ন। বুন-চংও সুপারি তামাকের ব্যবসা দিয়ে জীবন শুরু করেন। তাঁর ছ'টি পুত্র এবং দু'টি কন্যা। দু'টি পুত্র লগু, ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং অন্তরা বিদেশে চাকরি করে। একটি কন্যার তিন কন্যা ও এক পুত্র। এই তিন কন্যার এক জন বি-এ পাস, এক জন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। ছেলেটিও ইন্টার-মিডিয়েট পড়ে। কলেজের মেয়েটির নাম ছায়-ছ এবং ছেলেটির নাম আং-ম-বা। বুন-চং-এর ছয় পুত্রের তিন জন খ্রিস্টান। দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীরা সবাই খ্রিস্টান। দেখলাম একটি টেবিলে মাতা মেরি, দুটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি হাস্যরত বুদ্ধমূর্তি (Laughing Buddha) সাজানো রয়েছে, একই সঙ্গে যার যেমন ইচ্ছা পূজা বা উপাসনা চলে। দুটি

ধর্ম পাশাপাশি, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নেই এবং উপাসকেরাও একই পরিবারভুক্ত। এই ঘটনাটি আমার বড়ই ভাল লাগল।



‘পা’ ঢাকনার চিত্র

ঘরে নানারকম চীনা-শিল্প আছে, তার মধ্যে একটি পাত্র দেখতে বড়ই সুন্দর। চীনাভাষায় এর নাম পা। টিফিন-কেরিয়ারের মতো চারটি গোল কাঠের পাত্র পর পর সাজানো—এবং সেই রকমই হাতে ধরে তোলা যায়। পাত্রগুলি দেড় ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। উপরের ঢাকনায় সুন্দর ছবি। ঢাকনাটা খুলে দাঁড় করিয়ে রেখে একটি ছবি তুলে নিলাম।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে হ’ল।

আমার চীনভ্রমণ পরিকল্পনার আর একটি অঙ্গ এখনকার চীনা মন্দির দেখার। এইখানে আবার আমার সহায় হলেন চান-চুই-তী। ল-চং-গী তো সর্বদাই সঙ্গে আছে।

আমরা তিন জন নানা গলিঘুঁজি পার হয়ে পৌছলাম গিয়ে ডেমজেন লেনের প্রাচীনতম চীনা বৌদ্ধমন্দিরে। মন্দিরটির নাম থান-ও-বিও। প্রকাণ্ড বাড়ি। মন্দিরটি দোতলায় অবস্থিত। একটা অদ্ভুত শাস্ত্র আবহাওয়া। দোতলায় খোলা প্রশস্ত ছাদ। তার পর মন্দিরের দালান, তার পর মন্দির। তিনটি সুসজ্জিত দরজা। প্রত্যেকটি দরজায় স্বকৃতিসম্মতভাবে সিঁহের চিত্রিত পর্দা ঝোলানো।

একটি দরজার সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে “হাফ-কি-ই-পাব।” শুনলাম এর অর্থ “প্রবাসীদের কল্যাণার্থে”।

মন্দিরের ভিতরটা চীনা কাগজের ফুল ও নানারকম চীন-মাটি ও ধাতুনির্মিত মূর্তিতে সাজানো। এক দিকে উঁচুতে ঝোলানো ড্রাম, অন্যদিকে ঘণ্টা। বিশেষ উপলক্ষে এ দুটি বাজানো হয়। মন্দির কেন্দ্রে ছ’ধারের ফুলের সজ্জার পিছনে একটু উঁচুতে বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরে কিছুক্ষণ কাটাবার পরেই নিঃশব্দ পদক্ষেপে এক শীর্ণ বুদ্ধ চীনা উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। তার বয়স ৯০ বছর। এমন



থান-ও-বিও মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি

শাস্ত্র এবং কল্প তার চাহনি যে দেখলেই মনে হয় এই থান-ও-বিওর প্রশান্ত তথ্যগত মূর্তির আবহাওয়ায় আশ্রয় বাস করার ফলে সে নিভেই শান্ত এবং আত্মগত হয়ে উঠেছে। কিংবা সেই কল্প চাহনি সম্পূর্ণ আফিং-এর ক্রপায় কি না কে জানে। এই বুদ্ধ বিশেষ উপলক্ষে মন্দিরের ড্রাম ও ঘণ্টা বাজায়।

ইতিমধ্যে চান-চুই-তী কয়েকটি মোমবাতি নিয়ে মূর্তির সম্মুখে জালিয়ে দিলেন। এই বাতিগুলি মন্দিরেই থাকে, চীনে টৈরি, গায়ে ছবি আঁকা। মন্দিরের ভিতরের বা পাশের দেয়ালে কতগুলো তাক আছে। সেখানে চীনাভাষায় লেখা কাঠের অনেকগুলো স্মৃতিফলক খাড়া

করে রাখা হয়েছে। বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর মন্দিরে যদি কোন অর্চনা হয় তবে তাঁর নাম-সম্বলিত এই স্মৃতি-ফলক এখানে রাখার নিয়ম আছে। একে বলে “চিন চ্যু:।”

অতঃপর আমরা টেরিটি বাজার স্ট্রিটের আর একটি মন্দিরে গেলাম। এটির নাম “কোয়ান-ইম-কো-বিও”। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত—প্রবেশদ্বারে লেখা আছে। এই মন্দিরটি আকারে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী হলেও

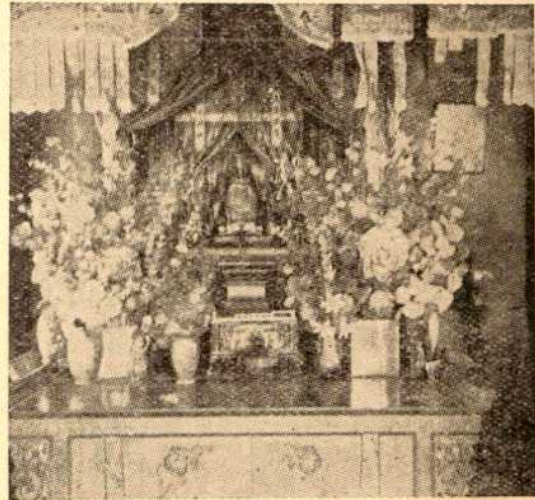


ধান-ও-বিও মন্দিরের ১৩ বৎসর বয়স্ক শতাব্দিক

এর মধ্যেও চীনা শিল্পের বিচিত্র সংগ্রহ আছে। সজ্জা সবই প্রায় ধাতুনির্মিত। মন্দিরে বাইরের লোকের প্রবেশ বা কোটো নেওয়ার সম্পর্কে কোথায়ও কোন বাধা-নিষেধ নেই বলেই মনে হ'ল, অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দক্ষিণা দিতে হয়েছিল।

এইখান থেকে বেরিয়ে খাঁটি চীনা পল্লীতে এসে দাঁড়লাম। চীনা দাঁতের ডাক্তার, গুয়ুথের দোকান, চীনা-মাটির জিনিসের দোকান। চীনা কাঠের মিস্ত্রী কাঠের কাজে নিযুক্ত আছে কোনো কোনো ঘরে। চীনা গুয়ুথের দোকানে গিয়ে উঠলাম। দোকানে মেয়ে পুরুষ সবাই কাজ করে। সিঁড়ির উপর বোদে মাছ শুকানো হচ্ছিল। ভেষজালায়ে অনেক মাছও বিক্রি হয়। ছবি নেওয়ার

সময় মাছগুলো তাঁকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। কতকগুলো দোকানে চীনা মাটির পুতুল বুদ্ধমূর্তি চায়ের পাত্র



ধান-ও-বিওর ভিতরের দৃশ্য

পেয়লা ইত্যাদি আছে। কিন্তু নাম বা গুনলাস লোকে চমকে উঠতে হয়। এই চীনা পল্লীতে কোনো



মন্দিরমধ্যস্থ ধাতুনির্মিত সিংহমূর্তি

স্থপারি হলুদ চীনাবাদাম প্রভৃতি বীচ করার কাজ করে। গুদামের মধ্যে এক শ দেড় শ দু'শো বস্তা স্থপারি বা বাদাম

রেখে সেখানে গন্ধক জ্বালানো হয়। গন্ধকের ধোঁয়ায় (সালফার ডাইঅক্সাইড) এই সব জিনিসের রং পরিষ্কার করে দেয়, তাতে বেশি দামে বিক্রী করার সুবিধা হয়, কারণ দেখতে ভাল হয়। এক শ বস্তা স্থপারি ব্লীচ করতে সের দশেক গন্ধক লাগে।



বুন-চং পরিবারের কন্যা

চীনারা কলকাতা শহরের অন্তত ছ'শো বছরের বাসিন্দা। ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের সময় মুর্গীহাটা এলাকা ইংরেজ,

ফরাসী, গ্রীক, আরমেনিয়ান, পোর্টুগীজ প্রভৃতির প্রধান ঘাঁটি ছিল। ব্লাইভ স্ট্রীট, এজরা স্ট্রীট, ক্যানিং স্ট্রীট প্রভৃতির মাঝখানে ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট স্বরণ করলেই বোঝা যাবে শুধু 'চীনাবাজার' নয়, সেটি 'ওল্ড চীনাবাজার'। সে যুগের ব্যবসায়ী চীনাদের মধ্যে চী-জীবনের খারাপ দিকটাও জাহাজ বোঝাই হয়ে অবশ্য এদেশে এসেছিল, এবং হয় তো এখনও একটা স্তরে তার অস্তিত্ব আছে। জুয়াখেলা, নেশা করা, দাঙ্গা করা ইত্যাদি। অনেক গল্প শোনা যায় এ বিষয়ে। বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনেছি কোন কোন বাঙালীও নাকি চীনাভাষা আয়ত্ত করে নিয়ন্ত্রণের চীনা জীবনের অদ্বীভূত হয়ে অনেক কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করেছেন।

কিন্তু আমি আমার এই চীনভ্রমণ শেষ করেছি মাত্র তিন দিনে। এই তিন দিনে এদের ভাল দিকটাই দেখার চেষ্টা করেছি একান্তভাবে। চিত্রশিল্পে, দারুশিল্পে, চামড়ার কাজে, ডায়িং-এর কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে চীনাদের স্বভাবগত যে নৈপুণ্য আছে এদেশে তার পরিচয় যথেষ্ট মিলবে। এরা আমাদেরই মতো প্রাচীন জাতি এবং বহুকাল আমাদের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও আমরা ওদের চিনি না, সহজে চেনবার উপায়ও হয় তো কিছু নেই। কিন্তু তবু আকস্মিকভাবে ল-চং-গীদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ওদের সম্বন্ধে কৌতুহল জাগল এবং পরিচয়ও কিছু পেলাম। ল-ধেং-হং, চান-চুই-তী এবং ল-চং-গীর অক্লান্ত সাহায্য এবং সবিনয় ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমি এদের ভিতর দিয়ে চীনা জীবনের মধুর দিকটির যে একটুখানি স্বাদ পেয়েছি তা আমার কাছে অবশ্যই অমূল্য।

সাহিত্যের ফুল

শ্রীকালিদাস রায়

সাহিত্যবাজারে নাই ফুলের আদর
একথা যে বলে সে ভ আসল বাদর।
সাহিত্য রসের বস্ত্র রসনার বশ,
আসা শুধু গন্ধ বুঝে বুঝে নাক রস।
ফুলকপি, দেখ গিয়ে বিক্রী হয় ঢের,
বিকায় সজিনা ফুল আট আনা সের।

কুমড়ার রাঙা ফুল গোছাবাঁধা হয়ে
আনা-ছোড়া বিক্রী হয়, যায় সবে লয়ে।
বকফুলও বিক্রী হয় সেথা মুঠোমুঠো।
বিকায় কদলীফুল ছ'আনায় হুটো।
বাকি যত ফুল ছিল সব বিলফুল,
অভিমান হলে গেল ডুয়ের ফুল।

রামানন্দ-স্মরণে

শ্রীউষা বিশ্বাস

৩০শে সেপ্টেম্বর ভক্তিজ্ঞান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণের দিন। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর দেহাবসানের পর অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হবে। তাঁর যুত্যা-বার্ষিকীর পূণ্যতিথিতে তাঁর বরগীর স্থতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। শ্রদ্ধাঞ্জলি শুদ্ধ করে স্মরণ করি সেই অক্লান্তকর্মী সাধকের কাছে দেশের ও জাতির অশেষ ঋণ। ভারতের পরাবীনতার নাগ-পাশ আজ উন্মোচিত হয়েছে। যে সকল মহাপুরুষ আজীবন ভারতের মুক্তিকল্পে কঠিন সংগ্রাম করে গিয়েছেন তাদের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই অমৃতম। তাঁর মহাপ্রয়াণের পূণ্য দিনটি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন।

আজ আমাদের “সোনার বাংলা”র ঘোর দুর্দিন। ঋষি বক্রিমচন্দ্রের ধ্যানের বাংলা-মায়ের যে সুন্দলা, সুন্দলা, শত-শ্রমলা মুষ্টিটি প্রতিভাত হয়েছিল তার সঙ্গে বর্তমান বাংলার বাস্তব রূপের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সারা দেশ ছুড়ে আজ নিদারুণ অন্নভাব, বজ্রাভাব। অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আজ আর একটি দুর্ভিক্ষও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেটি হচ্ছে দেশে প্রকৃত মানুষের দুর্ভিক্ষ। আজকের দিনে সেই ক্ষুধেই আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা তরুণদের চোখের সামনে বিশেষ করে তুলে ধরতে হবে যাঁটি মানুষদের জীবন-দুর্গকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন যাঁটি মানুষ—যাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল “ব্রাহ্মণের মনীষা” ও ক্ষত্রিয়ের বীর্য। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর জীবনের ছোট বড় অনেক কাজে ও ঘটনায় পরিস্ফুট। তাঁর চুরিজে দৃঢ়তা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। যে কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তিনিই জানেন তাঁর অন্তরটি কত কোমল—কত স্নেহময়তার পূর্ণ ছিল। তাঁর যুত্যাতে তাই তাঁর পরিচিত অনেকেই আত্মীয়বিরোগব্যথা অনুভব করেছিলেন। আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই সেই সোম্য, শান্ত, আত্মসমাহিত ঋষি-প্রতিম মানুষটিকে। তাঁর স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর আজও যেন কানে বাজে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত স্নেহশীল—মাতৃভক্ত, পত্নীপ্রেমিক, সন্তানবৎসল ও বন্ধুবৎসল। অথচ সাংবাদিক ও সংস্কারক রামানন্দ ছিলেন অজ্ঞানের বিরুদ্ধে কুলীশ-কঠোর—বজ্রের চেয়েও কঠিন এবং অনমনীয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি এক জন আদর্শ সাংবাদিক মাত্র, দেশের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কই ছিলেন? তিনি কি শুধুই একজন একনিষ্ঠ দেশসেবক ছিলেন? তা বললে তাঁকে ছোট করে দেখা হবে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত হলেও সেটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। মানুষ রামানন্দ

সাংবাদিক রামানন্দের চেয়ে ঢের বড় ছিলেন। আজ সেই আদর্শ মানুষের চরণোদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। কবির ভাষায় বলি—

“তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,

তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার

বারবার।”

বদেশপ্রেমই ছিল এই কর্মযোগী সাধকের জীবনের মূল-মন্ত্র। বদেশপ্রেম তাঁর কাছে শুধু ভাববিলাস মাত্র ছিল না। নিঃস্বার্থ জনসেবাই ছিল তাঁর কর্মময় অনলস জীবনের ভ্রত। এই স্বার্থলেশহীন জনকল্যাণ-কামনাই তাঁর জীবনে সকল কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁর বদেশপ্রেমে উদ্ভাসনার আভিযাত্র বা ভাবোচ্ছ্বাস ছিল না। তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা যেমন সরল, অনাড়ম্বর ও বাহ্যল্যবর্জিত ছিল, তাঁর কর্ম জীবনেও তেমনি এই সকল বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচনায় ও বক্তৃতায়—কোথাও বাহ্যল্য বা আড়ম্বরের স্থান ছিল না। কেউ তাঁকে কোনও দিন আবেগমগ্নী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সভা মাঠাতে দেখেন নি। বদেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন সাংবাদিক। বদেশপ্রেমের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই তিনি হয়েছিলেন সমাজ-সংস্কারক—দেশমাতৃকার একজন একনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী। আজ তাঁর তিরোধানের পর বিচার করবার সময় এসেছে দেশের শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি কি অমূল্য দান রেখে গিয়েছেন।

প্রথম জীবনে শিক্ষাব্রতী রামানন্দের কাম্য ছিল অধ্যাপনার মাধ্যমে দেশে প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলে দেশসেবা করা। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। কোনও অবস্থাতে পড়েই তিনি তাঁর জীবনের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। তাই রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটল। অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি হলেন সাংবাদিক। সাংবাদিক রামানন্দ জনশিক্ষার ভিতর দিয়েই গ্রহণ করলেন বদেশসেবার সুমহান ভ্রত। সাংবাদিকের ভ্রত গ্রহণ করেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর কর্মক্ষেত্র, মানুষের সেবা ও বদেশ সেবার প্রশস্ততর পথ।

শ্রীযুক্ত শান্তাদেবী ‘রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা’ নামক গুণ্ডকে লিখেছেন—“শুধু মুষ্টিমেয় ছাত্রের সেবার তাঁহার তৃপ্তি ছিল না। তিনি যে গভীর জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যে নানা বিভাগ সম্মোহিনী বংশীধ্বনি তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, দেশব্যাপী যে দুর্গতি, দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা তাঁহাকে মর্মে

মর্মে গীড়িত করিতেছিল, তাহাতে শুধু কলঙ্কের কক্ষে চারিটি দেওয়ালের মধ্যে বসিয়া ছাড়াবের কেবল ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্য পড়িয়াই পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। জম্মুখিমির প্রতি আপনার কর্তব্য করিয়াছি এ সাধুনা তিনি নিজেকে দিতে পারিতেছিলেন না। যে সেবাত্রয়ের দ্বন্দ্ব যৌবন প্রারম্ভে তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সেবার দ্বন্দ্বই তিনি পরেও বার বার লেখনী গ্রহণ করিলেন—সেবার ক্ষেত্র তাঁহার বৃহত্তর হইয়া পড়িল। “The pen is mightier than the sword.”—এ উক্তির সত্যতা আজ সকলেই স্বীকার করবেন। দেশের লোকের চিন্তাশক্তি জাগাতে ও জন্মগত গঠন করতে সাংবাদিকের দায়িত্ব যে কত বেশী তা আজকের দিনে সকলেরই জানা আছে। দেশের পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি স্বাধীনচেতা রামানন্দের জায়নিষ্ঠ অন্তরে অহরহ বেদনা জাগাত। সেইজন্য তিনি শক্তিশালী বিদেশী শাসক-মণ্ডলীর অস্তায় আচরণের বিরুদ্ধে আত্মজীবন লেখনী চালনা করে গিয়েছেন। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তাঁর একমাত্র কামনা ছিল না। তিনি তাঁর যুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তাই স্বদেশের সর্বোচ্চ উন্নতিই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও কাম্য। দেশের এই সর্বোচ্চ উন্নতিসাধনের আদর্শ মনে হয় তিনি পেয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের কাছ থেকে। সংস্কারক ও সাংবাদিক রামানন্দ সামাজিক-দুর্নীতি, অসাম্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও চিরদিন লেখনী চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতে—“সর্ববিধ সংস্কার পরস্পর-সাপেক্ষ” ও “জাতীয় উন্নতি সর্ববিধ সংস্কার-সাপেক্ষ”। ভাঙার চেয়ে গড়ার দিকেই তাঁর বেশী দৃষ্টি ছিল। দেশের প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী। পুরাতনকে ও অতীতকে আঁকড়ে ধরে থেকে নতনের বিপুল সম্ভাবনাকে তিনি কোন দিনই স্বীকার করেন নি। প্রকৃত প্রগতিমূলক আন্দোলনে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস, শুধু তার “বিকৃতভেদই আপত্তি”। তাঁর চির তরুণ মন নতনকে অকুণ্ঠ ভাবে বরণ করে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নি। এখানেও তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের, দৃঢ়তার ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই তিনি দেশের যাবতীয় গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজ এবং আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নীরব কর্মী—আত্মপ্রচারে একান্ত বিমুখ।

সাংবাদিক রামানন্দ ছিলেন অস্তায়ের কঠোর সমালোচক এবং জায় ও সত্যের পূজারী। স্পষ্টবাদিতা, নিরপেক্ষতা,

নির্ভীকতা ও স্বয়ংক্রিয় ছিল তাঁর সমালোচনার বিশেষত্ব। তাঁর অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, নিরপেক্ষতা ও স্পষ্টবাদিতা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এবং স্বয়ং বিবেচনাপ্রিয় শক্তি দেশের ও বিদেশের সুবীর্ঘের প্রীতি আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাঁর নির্ভীক সমালোচনা ও স্বাধীন যত্নামতের সাহায্যে শিক্ষিত দেশবাসীর চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বের দরবারে হৃগত ভারতের বাণী বহন করে দেশের স্বাধীনতার পথকে সুগম করতে অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। সাংবাদিক জগতে তিনি যুগান্তর এনেছিলেন—এক সম্পূর্ণ নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর ভেজবিতা, নির্ভীকতা, জায় ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংবাদিকদের অহুকারণীয়। সাংবাদিক রামানন্দ চেয়েছিলেন তাঁর পত্রিকার সাহায্যে দেশসেবা করতে—বিদেশী শাসকবর্গের হাত থেকে স্বদেশীয়দের স্বার্থ রক্ষা করতে—স্বদেশের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে—স্বদেশবাসীদের সকল বিষয়ে উন্নত করতে। ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা, নারীপ্রগতি প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ তাঁর পত্রিকা ছুটি তখনকার দিনের মাসিকপত্রের খারাই বদলে দিয়েছিল।

আজ আমরা একটা যুগসন্ধিক্ষেপে এসে উপস্থিত হয়েছি। প্রায় দু’শ বছরের পরাধীনতার পরে ভারত আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও সে পায় নি। আজ সময় এসেছে দেশকে নতুন করে, সুন্দর করে গড়ে তুলবার। আজ আমাদের দেশে রামানন্দ চটোপাধ্যায়ের মত আদর্শ সাংবাদিকের বিশেষ প্রয়োজন। দেশের অগণিত মুক জনগণের কল্যাণই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁর মন্বর দেহের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তাঁর অবিদ্যমান আদর্শের মৃত্যু নেই। তাঁর সেই আদর্শ অনির্বাক্য দীপশিখার মত আজও তেমনি উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি আজও বেঁচে আছেন তাঁর আদর্শের মধ্যে—সেই অক্লান্ত-কর্মী সাধক অবশ্য তাঁর জীবিত কালে স্বীয় সাধনার সর্বোচ্চ সাফল্য দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সেই সুমহান আদর্শ, সেই হৃদয় ভরপূর্ণ ও কঠোর সংগ্রাম কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। সর্ব বিষয়ে উন্নত, জ্ঞানে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে গরীবান্ যে গৌরবময় স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন—তাঁর সেই বিরাট স্বপ্ন যেদিন তাঁর স্বদেশবাসী বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারবেন সেইদিনই তাঁর স্মৃতি তর্পণ করা পার্থক্য হবে। আজ সমগ্র দেশ আদর্শ মহীয়ান, গৌরবে সমুজ্জ্বল সেই অনাগত ভবিষ্যতের পানেই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে।

একতারা

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মাহুষের অন্তরে যে এত মধু আছে রাজকুমারী শোভা তা জানত না। জমরের মত নিত্য সে ছুটে আসে জীবন-কবির পাশে।

অতিবৃদ্ধ জীবন-কবি একতারা বাড়িয়ে গান গায়। যৌবনের গান। উবাদনা ও উদ্দীপনার গান। শোভা শোনে। তার রক্ত-প্রবাহে অহুতব করে প্রাণের স্পন্দন ও যৌবনের চঞ্চলতা। আনন্দের আভিনবো খুঁজে পায় কেঁচ-ধাকার সার্থকতা।

বনীর ফুলালী শোভা—প্রচুর ভূদম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। শোভার মাতা গী বহুদর চান শোভা তার ধন-সম্পদের মাদকতা অহুতব করুক। দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতে শিখুক। কিন্তু শোভা চায়—অতি দীন জীবন-কবির ভাঙা কুটরে গিয়ে বসে থাকতে। প্রকৃতির পূজারিণী হতে ও কাব্য-রসে-প্রাণমন-অভিব্যক্ত করতে। মা ও মেয়ের এ মতবিরোধের মীমাংসা হয় না।

শোভা বলে—কবিকে আমি ভালবাসি। তার সঙ্গে আমার ভাল লাগে...

অতিবৃদ্ধের প্রতি মেয়ের এই অহরাগকে অজ্ঞ কোন উপায়ে বিদ্রিত করতে না পেরে মা বলেন—তা হলে কবিকে ডেকে আন এখানে। তুই কেন যাবি সেই নোংরা গরীরের আত্মনাশ?

এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শোভা কিছু বলতে পারে না বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবে—কবি কি এখানে আসবে?

বিরাই সৌধ। পুষ্পোজানে ঘেরা। কজিম ফোরারার উজ্জ্বলিত জলধারার গায়ে রামবহুর সাতরঙা খেলা। নারী ও পুরুষের প্রস্তরমূর্তি দিকে দিকে সাজানো। মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ ও পুষ্পবীধি স্বপ্নের স্বপ্নায় রিঞ্চ। বহুদরার ইচ্ছা—শোভা এই প্রাচুর্যের দোলায় দোলে। কিন্তু শোভার মন কেন বাহু অর্ধেক্ষণে ভোলে না?

নিঃসঙ্গ অষ্টাদশী শোভা চারদিকে ঘুরে বেড়ায় যেন এক চকলা হরিণী। বহুদরা তাকে সাজান—নানাবিধ বেশভূষা ও অলঙ্কার দিয়ে। কিন্তু তার মন চায় দেহের বিলাস নয়, মনের ধোঁরাক। সেকথা বহুদরা বোঝেন না। রাজপ্রাসাদে শোভার মন-প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বহুদরার প্রতিবাদ অগ্রাহ করে ছুটে যায় কবির কুটরে।

জীবন-কবির হাত ছুঁতে চেয়ে ধরে শোভা বলে—কবি। চলো আমাদের বাড়ীতে। সেখানেই তুমি থাকবে...

কবি হেসে জিজ্ঞাসা করে—কেন বল তো?

—আমি আর ছোটো ছোটো করতে পারি না...

—তাই নাকি? কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—না, তা হয় না। এই কুটীরের দীনতাই ভাল লাগে আমার। প্রাসাদের অহঙ্কার সইতে পারি না।

শোভা হঃসিত হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি। রাজপ্রাসাদের সুবৈখর্যকে তুমি এত মূল্যহীন মনে কর কেন? জীবনধারণের অর্থ-অবিধা কি নিরর্থক?

শুভ্র কেশে অহুলি-সঞ্চালন করে জীবন-কবি বলে—অর্থ যদি তার কিছু থাকে, সে শুধু অনর্থ ঘটাবার জুড়েই...

—তার মানে?

—বলতে পার জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য কি? মাহুষ কি চায়?

শোভা ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু অহুতব করে। এই লতাপাতা-ঘেরা দারিদ্র্য-সাহিত্য জীর্ণ কুটীরে এসে কবির পাশে বসলেই তার প্রাণে লাগে আনন্দ। এই আনন্দই ত মাহুষের কাম্য। প্রাসাদে কেন আনন্দ নেই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শোভা বলে—বুঝতে পেরেছি কবি। তুমি কি বলতে চাও।

—কি বল তো?

—তোমার মনে আছে দৈত্বে অহঙ্কার, তাই তুমি প্রাসাদের প্রাচুর্যকে ঘৃণা কর।

—ঠিক বলেছ। দৈত্বে অহঙ্কারই আমার মনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই ত এত পাকা চুলেও বেঁচে আছি আমি। কাঁচা চুল নিয়ে তুমিও এখানে ছুটে আস—সেই বাঁচার ভাগিদে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ঐধর্যের প্রাচুর্যে মরে যাচ্ছি তুমি। আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবতে চাও কেন? বাঁচতে দাও—আমার বাঁচতে দাও...

—কি সর্বনাশ। এতদিন সেকথা বল নি কেন? কাল থেকে আমি এখানে আসব একেবারে নিরাভরণ। সেই পাথরের মূর্তিগুলির মতই নিরুত্তর অঙ্গ-সৌভব নিয়ে। কি বল? তা হলে তুমি আমাকে খুব ভালবাসে দেখবে তো?—বলেই শোভা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। এলিয়ে পড়ে কবির গায়ের উপর।

জীবন-কবি একভারার ভার হিঁড়ে যায়। প্রভু ও
বিপর্যস্ত কবি বিরজিত প্রকাশ করে। একান্তে সরে গিয়ে,
তার-হেঁড়া একভারাটা তুলে নেয়। গভীরভাবে কান-মুচড়ে
আবার সুর বাঁধে।

আতুল আগ্রহে জীবন-কবির হাতখানা ধরে শোভা বলে
—দোহাই কবি। অন্তত একবার চল আমার সঙ্গে। প্রাসাদে
নয়।

—তবে কোথায় ?

—বাইরের কুলবাগানে।

—কেন ?

—তুমি যা চাও, সেখানে তা আছে ?

—কি চাই ? কি আছে ?

—জটিল যৌবন মূর্ত হয়ে আছে—নির্মূল আকর্ষণ। প্রাণ-
বস্ত্র অপূর্ণ সৌন্দর্য। পোশাক নেই, পরিচ্ছদ নেই, একেবারেই
নিরাভরণ শিল্প-চাতুর্য। বলেই হাসতে হাসতে লুটোপুটি
ধায় শোভা। কবিকে জড়িয়ে ধরে।

বিপন্নভাবে জীবন-কবি বলে—হিঃ। সেখানে প্রাণ
নেই, আছে শুধু চোখবলসানো রূপের ঠাট...আমি যাব না।

জীবন-কবি একদিন জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা শোভা।
তোমার নাকি বিয়ে ?

—হ্যাঁ।

—বিয়ের পর তুমি এখান থেকে চলে যাবে ?

—কেন যাব ?

—বর বুঝি এখানেই থাকবে ?

—তাই বা কেন থাকবে ?

—তবে ?

—তবে আবার কি ? সেও থাকবে না—আমিও যাব
না।

—তবে ত বিয়ের কোন মানেই হবে না।

—মানে না হলেও মজা ত হবে বুঝি ? বিয়ের পর
হুঁজুনেই হুঁজুকে নমস্কার আশাব প্রতিপদের চাদের মত,
তিনি হবেন উদয়, আমিও যাব অস্তে।

জীবন-কবি হেসে বলে—আর, আমার এই চোখ বুঝি
সন্ধ্যাতারার মত চেয়ে থাকবে—তোমাদের সেই উদয়ান্তের
সাক্ষী হয়ে ?

একটি অল্পমনস্ক ভাবে শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা
কবি। বলতে পার—চাড়ে কি আছে ?

—জ্যোহনা আছে...

—আর কি ?

—জানি না, জানতেও চাই না।

—কেন ?

—সেখানে সাপ আছে, কি বাঘ আছে, তা ভেমে আমার
কি লাভ ?

—তুমি তো বেজায় ব্যবসাদার ?

—কেন ?

—এত লাভ-লোকসানের হিসেব কর কেন ?

—তোমার ভিতরে কি আছে—জান শোভা ?

—কি ?

—অতি বিদ্রি-কঙ্কাল।

—তাই যদি সত্যি হয়, তুমি তা দেখতে চাও না কেন ?
ভয় পাও বুঝি ?

—হ্যাঁ ভয় পাই। শুধু ভয় পাই না—কঙ্কালকে অভ্যস্ত
ঘৃণাও করি। তোমার চেয়ে, তোমার কঙ্কালটা সত্যিও নয়,
অন্দরও নয়। তোমার ওই কমনীর চোখ দুটি উপড়ে ফেলে,
সেখানে একটি কুংসিত গহ্বর তৈরি করার কি কোন মানে
হয়। তোমার ওই রাঙা ঠোঁট ছবানি বাদ দিলে, ছুঁপাটি
মুক্তোর মত দাঁত যে কত বীভৎস দেখাবে—তা আমি জানতে
যাব কেন ?

—তুমি জানতে না চাইলেই কি সে মিথ্যে হয়ে যাবে ?

—সত্যিও হবে না। বা অহুন্দর তাই তৈরি মিথ্যে।
কঙ্কাল যখন মাহুঘের ভিতর থেকে বাইরে এসে সত্যি হতে
চেষ্টা করে তখনই আসে তার বার্কক্য। অরা বা বার্কক্য
মিথ্যে বলেই প্রাণ তাকে ত্যাগ করে। প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে
সর্বদায় যৌবন যখন মেতে উঠে তখন কঙ্কাল থাকে চোরের
মত লুকিয়ে।

—তুমি অহুন্দর কর বুঝি ?

—নিশ্চয়ই। তাই তো আমার নাচের হৃদয় আর গুনের
সুর আজও বেঁচে আছে...

—তা হলে আমাকে নাচ শেখাও, গান শেখাও—আমিও
বেঁচে থাকতে চাই...

জীবন-কবি গাঃ—

ভেল ফুরানো প্রদীপ আমার

ক'দিন বলো জলবে আর ?

তোমার আলো করবে না দূর—

আমার বুকের অন্ধকার।

শোভা বুঝল—যৌবনই সত্য, আর বার্কক্য মিথ্যা।
প্রাণ চায়—জল, বাতাস, আর আলোর পরমায়ু। বার্কক্যকে
অগ্রাহ্য করে যৌবনকে আকড়ে থাকাই প্রাণের হৃদয়।
আনন্দই যৌবনের উপজীব্য। নিরানন্দ বার্কক্য কেন আসবে
কবিকে প্রাণহীন করতে ? যৌবন কেন কণহারা ?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি। বলতে পার—
আমার বর কেমন হবে ?

—কি করে বলব? তাকে তো দেবি নি এখনো? সে যদি এসে জিজ্ঞাসা করে—আমার বধুট কেমন হবে? তা হয়ত বলতে পারি...

—বলো তো?

—কাকে বলব?

—আমাকেই বলো...

—প্রশান্তি স্তনতে চাও?

—তাতে কি তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই। তবে, তোমার কতি করে তোমার বরের লাভ আছে। আমার কি?

—আমার কতি করে আমার বরের লাভ আছে? বলো কি?

—বিয়ে মানাই তো ভাই। বিয়ের পর দেখবে—হয় সে জিতেছে, তুমি হেরেছ—আর না হয়, তুমি জিতেছ, সে হেরেছে...

—হুঁমুনাই জিতবো না?

—দৌড়ের ঘোড়া আঙ-পিছু হবেই। তবে বধুরা অনেক সময় হেরেও যেতে। বরেরা জিতেও পারে। বিয়ের হারজিত বুঝি বাইরে থেকে বুঝে সোজা নয়। তার হিসেব নিকেশ অন্তরের অনুভূতি দিয়ে—হামে ও অভিমানে, হাসি ও কান্নায়...

—তা হলে আমি বিয়ে করবো না...

—তা কি হবে? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। যৌবন কণহারী হলেও—বিয়ের কামনা মিথ্যে নয়। ফুলের পরিণতি যে কীল, তা ফলবেই...

—তা হলে বলো, আমার বর কেমন হবে?

—আমি তো গণংকার মই?

—তবু বলো...

—একই মাটিতে ততো নিম, আর মিঠে আঙুর কলে। বেঁটু কোটে, গোলাপও কোটে। তোমার বর নিম হবে কি আঙুর হবে—বেঁটু হবে কি গোলাপ হবে—বিয়ের আগে তুমিও তা বুঝবে না...

—যদি নিম হয়?

—হতে পারে, আঙুরের বাদ যে জানে না, যৌবন-রাগে নিমকেই সে মনে করবে আঙুর। বিয়ে নিকল হবে না...

—কি ভয়ানক কথা!

—কথাটা মোটেই ভয়ানক নয়। ক্ষয় মৃত্যু বিয়ে—অন্ধকারের অদৃষ্টলিপি। জন্মের আগে কেউ যদি সে দেখা পড়তে পারতো, তা হলে দরিদ্র মা-বাপ সন্তানের মুখ দেখত না। সর্প-দংশনে কারও মৃত্যু হ'ত না। বর-বধুর সুখ-স্বপ্নও ভেঙে যেত না...

৩

শোভার বিয়ের বাজনা বেজে উঠে। জীবন-কবি কান

পেতে শোমে। দুরাগত শানাইয়ের সুরে সুর মিলিয়ে সেও গায় গান। একভাষাও বাজে। কিন্তু তার রক্তার উঠে না। তবু চলে আঙুরের কসরৎ। আনন্দে চোখের জল বেরিয়ে আসে।

সুখী অন্তঃপেছে। রক্ত ঢেলে রাঙিয়ে রেখে গেছে পশ্চিম আকাশ। এই তো গোখুলি? বোব হয় বরের হাতে শোভার হাত বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন কত নিবিড়—কত মধুর! সে শুধু হাতের সঙ্গে হাতের বাঁধন নয়—প্রাণের সঙ্গে প্রাণের।

জীবন-কবি ভাবছে—নিশ্চয়ই শোভা এখন বসেছে বরের পাশে। পাভলা ওড়নার ভিতর দিয়ে চুরি করে দেখছে বরের মুখ। কি সুন্দর বর। কি সুন্দরী বধু! সার্থক এই যৌবন-যজ্ঞের আয়োজন। কত পবিত্র এই শুভ মিলন-মঞ্জ। বর-বধু সুখী হোক।

একভাষা হাতে নিয়ে জীবন-কবি একলাই নাচে আর গায়—

জাগো, বর-বধু যৌবন-কুঞ্জে—

অন্তর-মধু-সন্ধানী।

সার্থক এ যৌবন-যজ্ঞের আয়োজন

সার্থক এ মিলনের বাণী।

পরের দিন অতি প্রভাতেই শোভা ছুটে আসে জীবন-কবিকে প্রণাম করতে। চিপ করে পায়ের উপর মাথাটা রাখতেই—রাঙা রং লাগে কবির পায়ের পাতায়। কপালের সিঁদুর লাগে তার পায়ে।

কবি আশীর্বাদ করে—এ সিঁদুর অক্ষয় হোক...

শোভা বলে—স্বামী যে এত সুন্দর, এত মধুর, তা তো জানতাম না কবি।

—ভাই নাকি? প্রীত সৌন্দর্য ও মধুর্য যে কত, তাও কি স্বামী জেনেছেন?

আনন্দে উৎফুল্ল কবির মুখে হাসি ধরে না। শোভা লজ্জার মাথা হেঁট করে থাকে।

কিছুক্ষণ কবির মুখের দিকে চেয়ে শোভা বলে—তা হলে এখন আমি আসি?

—কোথায়, কতদূরে যাচ্ছ—তা তো বললে না? ছাখিত ভাবে কবি জিজ্ঞাসা করে।

—আমি তা কি করে জানব? এখন যদি তিনি যমের বাড়ী নিয়ে যান—তাও যেতে বাধ্য হবে—এইটুকু জানি...

বলেই সে ছুপ করে যায়। আবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! স্বামী কি দেশার মত?

জীবন-কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—তার চেয়েও বেশী, তোমার মত মেয়ের কাছে...

—আমার মত মেয়ে, কেন বলছ?

—দোষটা তোমার নয় আমার এই একভাষার। এই

হুঁরেই যে তোমার সুর বেঁধেছি আমি। বেশ বুঝতে পারছি—
তোমার স্বামী নিম্ন হলেও, তোমার মুখে হবে আনন্দ।

একভারা বাড়িয়ে জীবন-কবি নেচে নেচে গায়—

যৌবন-জোয়ারে তাসে ভরী।

শোভা জিজ্ঞাসা করে—বল ত কবি। আমার স্বামীও
তোমার মত নাচতে-গাইতে জানে কি না?

—নাচ-গান সবার ভিতরেই আছে। তুমি যদি নাচতে
পার, তাহলেই নাচবে। গাওয়াতে পারলেই, গাইবে।
আত্মহারা হও না—তুমি যে প্রকৃতি। পুরুষকে নাচানো
আর গাওয়ানো যে তোমারি কাজ...

—তোমাকে নাচায়-গায় কে?

—তুমি...

—আমি?...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শোভা চলে যায়। জীবন-কবি
উদাসভাবে চেয়ে থাকে। তার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

জীবন-কবির মনে অশ্রুশোচনা জাগে—এই ত সে চলে
গেল। কোন দেশের সুপুরুষ রাজকুমার এসে তাকে নিয়ে
গেল। যৌবনের গান গেয়ে গেয়ে কেন সে শোভার ঘুমন্ত
মনটাকে জাগিয়েছিল। শোভাও তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেয়
নি। কিন্তু আজ?

ঘুমিয়ে পড়লেই ত ককালটা জেগে উঠবে? কি সর্বনাশ।
জীবন-কবি ভয়ে শিউরে ওঠে। না, না, না, তা হতে পারে
না। এখনও তাকে জেগে থাকতে হবে, ভাবীকালের আগমনী
গাইবার জন্তে। নতুন আগন্তুক যখন আসবে তাকে কোলে
তুলে নাচতে হবে—গাইতে হবে। একভারাটা হাতে তুলে
নিরে জীবন-কবি নাচে আর গায়—

ওরে আসবে কে তা জানি—

ফুলের বুকে কচি হাতে ফলের ও হাতছানি,

তারে মানি রে ভাই, মানি।

আমার হাতের একভারা সে—হাত বাড়িয়ে ধরতে আসে,
জানছি আমি হারবো—তবু করবো টানটানি।

৪

কিছু দিন পরে। জীবন-কবি তার একভারাটা ঘুরে চলে
কেলে দেয়। নাঃ, আর পারি না...

কুটীরের বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাহুর বিছিয়ে, চোখ বুঁজে
পড়ে আছে কবি। তার ভিতর থেকে ককালটা যেন মাঝে
মাঝে চীৎকার করে উঠছে—মায় ভুখা হ'।

জীবন-কবি বলে—ওরে অনন্দর। ওরে মিথ্যে।
যৌবন তোর আবেদন গ্রাহ্য করবে না। প্রাণ তোর কুৎসিত
আচরণ সহ্য করতে পারবে না। তোকে দেখলেই সে পালিয়ে
যাবে। তবু তোর বাইরে আসার এ হুঁশা কেন? শোভার

কোলে যে মনবীরের শুভাগমন হবে, জীবন ছাড়া তাকে অভি-
নন্দিত করবে কে? সে যে হবে এই জীবন-কবির অন্তর-মধু।
ওরে বীভৎস ককাল। আমাকে বাঁচতে দে—বাঁচতে দে...

হুটী বহর চলে যায়, জীবন-কবি চালায় ককালের সঙ্গে
বুঝাপড়া।

হঠাৎ শোভা আজ ফিরে এসেছে—জিন্ন বেশ, ক্রম কেশ,
শুক যুগ। এ কি। কেন সে এমন নিরাশ্রয়? কোথায় গেল
তার ঐশ্বর্যের অহঙ্কার? সর্বদাঙ্গ অলঙ্কারের উজ্জ্বল্য? রাজ-
কুমারীকে এমন দীন-হুঃখিনী ভিখারিণী সাজিয়ে দিয়েছে কে?

কবির ককালসার দেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে টেনে
তোলে শোভা। কেঁদে কেঁদে বলে—কবি ওঠ। ওঠ
তোমাকে বাঁচতে হবে। নাচতে হবে, গাইতে হবে।
আমাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি যে ফিরে এসেছি।

—ফিরে এসেছ? কেন—কেন শোভা? জীবন-কবি
বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে শোভার মুখের দিকে।

শোভা কেঁদে কেঁদে বলে—সে পালিয়ে গেছে চিরদিনের
মত আমার নাপালের বাইরে। তাকে তো আর ফিরে পাব
না কবি।

শোভা বলে কি? জীবন-কবি যেন কিছুই বুঝতে পারে
না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শোভার নিশ্চিন্ত মলিন মুখের
দিকে।

শোভা কাঁদে। জীবন-কবি সাজুনা দেয়।

হঠাৎ শোভার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ত্রিময়ণ ও
অবলম্ব কবির কাঁধটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে—আমাকে সে
ভালবাসে নি সত্যি। কিন্তু আমার ভালবাসার প্রতিদানে
আমাকে সে কি দিয়ে গেছে জানো?

—কি?

—তার স্মৃতি। সে কত সুন্দর দেখবে?

—দেখব। দেখব। তাকে দেখবার জন্তেই তো বেঁচে
আছি।

জীবন-কবি সাক্ষিয়ে ওঠে। তার বুকে দুটো জলে ওঠে। শুষ্ক
হৃদয়তেও স্পন্দন অনুভব করে চোখ মুছে ভাঙা একভারাটা
আবার মেরামত করতে বসে। কণ্ঠে জাগে সুর। পায়ে
বল ফিরে পায়। গানের তালে নাচতে চায়। না, না, কবি
এখন মরবে না। মরতে সে পারবে না। ককালকে বলে—
সাবধান। আর চীৎকার করিস নে।

হুঃখিত ভাবে শোভা বলে—কবি। থোকা তো
তোমার কাছে আসবে না। তোমাকেই যেতে হবে তার
কাছে...যাবে?

—আমাকেই যেতে হবে?

—তা ছাড়া আর উপায় কি?

একটু চিন্তা করে জীবন-কবি বলে—বেশ, তা হলে ভাই

হোক। আমাকেই নিয়ে চল তোমাদের প্রাসাদে—আমি যাব।

—তুমি যাবে? শোভা উৎকল হয়ে ওঠে। জীবন-কবির হাত ছাড়া চপে ধরে সাপেছে জিজ্ঞাসা করে—সত্যই কি তুমি যাবে আমাদের প্রাসাদে?

—তোমার কণ্ঠে যাইনি, কিন্তু তার জন্যে যাব। তোমার মনের মত করে তাকে গড়ে তুলব আমি। সে যে হবে আমারই অন্তর-মধু—আমার এই একতারার মালিক—আমার সুর, আমার গান, আমার বন্ধার—এ সবই তো হবে তার...

—প্রাসাদের অহঙ্কার সইতে পারবে?

জীবন-কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—তোমাদের সেই অহঙ্কার চূর্ণ করতেই যাব। ঐ হবে আমার হাতের হাতিয়ার। বহু গম্বীষ-হুঃখীকে বধনা করে, তোমার বাপ-ঠাকুরদা যে সব ভোগ-বিলাসের উপকরণ আহরণ করেছিলেন, সে সবই সে বিলিয়ে দেবে। নিজের বলে কিছুই রাখবে না।

—তা কি করে জানলে?

—সেই কথাই তো বলছি—সে হবে তোমার নয়, আমারও নয়, সকলের। আমি তাকে খাঁটি-মাছুষ তৈরি করব। এই হাতে তারও সুর বাঁধব আমি। তা যদি না পারি মিথ্যে আমার এই একতারার কান-মোচড়ানো।

বৈবাহ্যের আলা সইতে না পেরে—শোভা বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছিল। ছেলের যুথের দিকে চেয়ে কেলে দিয়েছিল হাতের বিষ। কিন্তু মন যে এখনো বিষিয়ে আছে। বৃক্কের রস শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে উঠছে।

কবির কথা স্তনতে স্তনতে—হঠাৎ তার চোখের দীপ্তি ফিরে আসে। দেখে যেন কোন্ এক নুতন আলো আর নুতন জগৎ! যে জগতের খাঁটি মাছুষ হবে তার সন্তান। শোভা কি আর মরতে পারে?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! বলতে পার—মৃত্যুর পর সে এখন আছে কোথায়?

—কোথায় আবার থাকবে? তোমার কাছেই আছে...

শোভা চমকে উঠে। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কাছেই আছে, মানে?

জীবন-কবি হেসে বলে—হাতের চুড়ি ভেঙে গলার হার তৈরি করলে সোনা তো সোমাই থাকে। তোমার ভালবাসার আভিশ্য সইতে না পেরে, সে সরে গেছে। গলার হার হয়ে আজ সে তোমার বুকে ছলবে। দেখবে—কত ভালবাসতে পার তুমি? আজ তার দাবি—তোমার স্নেহ। ভালবাসার চেয়ে স্নেহের গভীরতাও বেশী, মধুরতাও বেশী। বামীকে যা দিয়েছিলে, তার প্রতিদানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তোমার মনে। আজ তুমি দেউলে হয়ে শুই দেবে। পাবে না কিছুই।

—কেন পাব না? খোঁজকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমি যে আনন্দ পাই—তা কি মিথ্যে?

—কেন তা মিথ্যে হবে? সেই তো সত্যি আনন্দ! সে আনন্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে নয়—দেওয়ার ক্ষেত্রে ভোগের জন্যে নয় ভ্যাগের ক্ষেত্রে। সে আনন্দ মর্তের নয়, স্বর্গের। ছেলে যখন তোমাকে মা বলে ডাকে—তোমার বুক উথলে উঠে। তুমি কি পার তাকে বাধা দিতে?

জীবন-কবি একতারা বাড়িয়ে নেচে নেচে গায়—

এই কুটীরে, ফাগুন দিনের প্রাতে—

বাগবে আমার 'একতারা' তার হাতে।

৫

রাজকুমারী শোভার মা রাগি-বহুধরা পুত্রহীনা বিধবা। শোভা বিধবা হলোও, পুত্রবতী। শোভার পুত্র নরেশ এই দুই বিধবার একমাত্র সন্তান ও শান্তি।

নরেশকে খাঁটি মাছুষ তৈরি করবার ভার নিয়েছেন জীবন-কবি। বহুধরার আপত্তি ছিল। শোভা ছাড়ে নি। জীবন-কবিকে টেনে নিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদে। কবির অভিমত—শিশু-নরেশ শুধু নেচে-গেয়েই মাছুষ হবে।

নরেশ দাঁড়াতে শিখলেই—কবি তাকে নাচতে শেখালেন। যুথ কথা মুটলেই, সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে শেখালেন। গুরু হাতের একতারার দিকে শিয় খুব নজর রাখে। কখনও বেহরো গায় না, বা ভালও কাটে না।

ক্রমে নরেশ বড় হয়ে উঠল। তার কোমরকে ছাপিয়ে যৌবন জাগল। এতদিন গুরুও নেচেছেন শিখের সঙ্গে। এখন আর গুরুর পায়ে বল নেই। শিশু একাই নাচে। গুরুর দম ফুরিয়ে আসে—শিষ্য সুর টেনে রাখে।

চলনে ও রূপসজ্জার বীরে বীরে নরেশ যেন হয়ে উঠে জীবন-কবির একটা প্রতিচ্ছবি। কবির পাকা চুলের ছড়ার মত—সেও বাঁধে একটা কাঁচা চুলের ছড়া।

রাগি-বহুধরার চোখ জলে। শোভার চোখ জুড়ায়। বিরক্ত বহুধরা শোভাকে জিজ্ঞাসা করেন—বলি, তোর উদ্দেশ্য কি? নরেশ কি রাজকুমার সাজবে না? পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য নেই। বিলাসিতার দিকে দৃষ্টি নাই। ওই নোংরা জীবন-কবির মত নরেশও কি শুধু গান গাইবে, আর নাচবে?

শোভা হাসে। বহুধরা রেগে যান। জীবন-কবির শিক্ষকতায় নরেশের এই রুচি-বিকার বহুধরা আর সইতে পারছেন না। প্রচুর ঐখ্যের উত্তরাধিকারী নরেশ। মন-সম্পদের প্রতি তার এই অস্বাভাবিক বিভ্রাট ও আত্মহুখে অমনোযোগিতা, বহুধরা খুবই অসদৃশ মনে করেন।

উত্তেজিতভাবে বহুধরা একদিন বলেন—না, না, শোভা! এ চলবে না...

—কি চলবে না মা ?

—নরেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাতে হবে... সে শুধু নাচ-গান শিখবে—এ ব্যবস্থা মানব না আমি।

—বেশ তো জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাও। নাচ-গানের সঙ্গে তো তার কোন বিরোধ নেই। বন্দোবস্ত কর—একজন বিজ্ঞানী এসে রোজ ছ'ঘণ্টা ওকে বিজ্ঞান শেখাবে...

—কবিকে ভাড়িয়ে দাও...

শোভা চমকে উঠে। দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—তা হতে পারে না মা। কবি আছে—তাই নরেশ আছে, কবি না থাকলে, নরেশও থাকবে না...

বিস্মিত ভাবে বহুস্বরা বলেন... কবি না থাকলে নরেশও থাকবে না? বলিস কি? ওকে আমি বেঁধে রাখব, উচ্ছৃঙ্খল হতে দেব না...

কোর্টপার্ট-পর্য্য একজন বিজ্ঞানী আসে। হাতে তার বেজদণ্ড।

পড়ার ঘরে বসে নরেশ জিজ্ঞাসা করে আপনার হাতে ওটি কি সার ?

—বেত।

—বেত দিয়ে কি হবে ?

গভীরভাবে বিজ্ঞানী বলে—আমার নির্দেশমত না চললে, বা লেখা-পড়ার অমনোযোগী হলে—তোমাকে আমি বেত মারব।

—বেত মারবেন ?

—হ্যাঁ, তোমার দিদিমার আদেশ...

—দিদিমা বলেছে, আমাকে বেত মারতে? নরেশ বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে।

—হ্যাঁ বলেছি—আড়াল থেকে সামনে এসে, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন বহুস্বরা।

—কেন দিদিমা? আমার অপরাধ কি?

—তুমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছ! বছর বার বারগ করেছি—ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো না। গাছে উঠো না। নদীতে সাঁতার কেটো না। যখন ভখন, যেখানে সেখানে নাচগান করে বেড়িয়ে না। আমার এ আদেশ কেন শুনছ না?

—আমাকে রাজপুত্র সাজতে হবে?

হ্যাঁ, তুমি একজন কোটিপতির বংশধর। এই রাজ্যধর্ম্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার বংশধর্ম্যাদা আর আভিহাত্যাবোধ বাড়িয়ে তোলবার জুড়ে ঐ মাষ্টার তোমাকে বেত মারতেও দ্বিধা করবে না।

নরেশের মন বিরজিতে ভরে ওঠে। মুখে কিছু বলে না।

বিজ্ঞানী মাষ্টার একটা চেয়ার পেতে বসে। নরেশকে ইঙ্গিত করে—সামনের টুলটার উপর বসতে। মাঝখানে একটা ছোট টেবিলের উপর খাতা, কলম আর বই।

বইখামি হাতে নিয়ে বিজ্ঞানী-মাষ্টার বলে, শোনো—স্বর্ধ্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়...

নরেশ বলে—সে কথা আমি স্বীকার করি না। মাপ করবেন...

—তার মানে? বিজ্ঞানী বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে নরেশের মুখের দিকে।

নরেশ বলে—আরতনে বড় হলেই সে বড় হয় না। স্বর্ধ্য ত একটা আঙুলের পিণ্ডি। দূরে আছেন তাই রক্ষে। তবুও মাঝে মাঝে কাছে এসে পৃথিবীকে আলিরে পুড়িয়ে হাই করে দিচ্ছেন...

একটু হেসে বিজ্ঞানী বলে—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কবির কাছে শুনেছি—প্রতিপদ থেকে চাঁদকে তিনি টাকতে শুরু করেন। অমাবস্তার রাতে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেন। এ নীচতার কারণ কি? বারো মাস পূর্ণিমা থাকলে আমাদের কি ক্ষতিটা হ'ত শুনি? চাঁদ আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।

—ভুল বুঝছ। কবি তোমাকে অবৈজ্ঞানিক ভুল কথা বুঝিয়েছেন। স্বর্ধ্যরশ্মি আছে বলেই আমাদের জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে।

—কি করে জানলেন? স্বরূপ স্বর্ধ্য নেই। দিনটা হ'ল রাত্তির। রাত্তিরে পেলাম আমরা অকুরন্ত জ্যোত্স্না! শুধু চাঁদ থাকলে, এই পৃথিবী কি স্তম্ভর হ'ত? কত ঠাণ্ডা থাকত পৃথিবীর আবহাওয়া। কবি বলেছেন—মাছুষের মনে সব দুঃস্বাদ আঁর দুঃস্বাদি জাগিয়ে তোলার কারণ হচ্ছে—ঐ স্বর্ধ্যতেজ। চাঁদ আছে—তাই পৃথিবীতে এখনও আছে মাছুষের প্রতি মাছুষের সহানুভূতি। স্নেহ, দয়া ও মায়া।

—একেবারেই অবৈজ্ঞানিক।

—বিজ্ঞান কি একথা স্বীকার করে না?

—কখনো না। চাঁদের যে আলো জ্যোত্স্না, তাও স্বর্ধ্যের কাছ থেকে ধার করা। স্বর্ধ্য না থাকলে চাঁদও থাকে না।

—বুঝলাম...

—কি বুঝলে?

একটু হেসে নরেশ বলে—কবির কাছে শুনেছি—আমার দাদামশাই নাকি টাকা ধার দিয়ে, স্ত্রদের স্ত্র আদায় করে বড়লোক হয়েছিলেন, স্বর্ধ্য তা হলে আমার সেই দাদামশায়ের মত? আলো ধার দিয়ে, অমাবস্তার অন্ধকারে স্ত্র আদায় করেন? তার চেয়ে চাঁদকে তিনি মুক্তি দিল না? কিছু আলো চাঁদের নিজস্ব হয়ে থাক। আমরাও চাঁদের আলোর মেচে গেয়ে স্তবে থাকি। স্বর্ধ্য-ভেজের এ দাস্তিকতা সহ করি কেন বলুন ত?

বিজ্ঞানী উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ায়। চীৎকার করে

বলে—তবু চাঁদের আলোর বাঁচতে হলে পৃথিবীর লোকগুলো সব 'থাইসিসে' মরে যাবে।

বহুদূর ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছে, কি হয়েছে?

বিজ্ঞানী বলে—আপনার নাভিকে বিজ্ঞান শেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়...

—কেন?

—কবি গুর মাথাটি খেয়ে বলে আছে...

কবি ছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে। বরষের ভারে মেরুদণ্ড ভেঙে ম্যাজ হয়ে পড়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া দেহটাকে খাড়া রাখবার জন্তে দরকার হয়েছে তৃতীয় পা—একটা মোটা লাঠি।

অষ্টাব্জের মত ভলিতে এগিয়ে এসে, কবি বলে—মা! তু! হলে এখন আমি আসি। বিদায়...

শোভা ছুটে এসে বাধা দিয়ে বলে—কেন কবি?

—আর ত দরকার নেই শোভা! নরেশকে আমার চেয়েও ঢের বেশী পণ্ডিত করে দিয়েছি। আমার বিচ্ছেদ ফুরিয়ে গেছে, আমিও ফুরিয়ে গেছি...

—না না, তুমি যেতে না...শোভা অস্থিরতা প্রকাশ করে।

বহুদূর গন্তীর ভাবে ডাকেন—শোভা!

—কি মা?

—কবিকে যেতে দাও...

—কেন?

—কবির কুশিকা নরেশকে চরম উজ্জ্বল করে গড়ে তুলেছে। আর নয়। কবিকে আর সহ্য করব না আমি...

—দোহাই তোমার, কবিকে তাড়িয়ে দিও না...

—সেদিন নরেশ কি করেছে জান?

—কি?

—একজন প্রজা এসেছিল—খাজনার টাকা পরিশোধ করতে। শুনলাম—নরেশ নাকি ম্যানেজারের হাত থেকে দাবিলাখানা কেড়ে নিয়ে—তাকে দিয়ে দিয়েছে। আর বলে দিয়েছে—টাকা দিতে হবে না তাকে...

উৎফুল্ল ভাবে নরেশ বলে—আর একটা কাজ কি করেছি জান মা?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—কি?

—সেই বুড়ো প্রজাটা, এই পৌষের নীচে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। দিদিমা আমাকে যে শালের জোড়া দিয়েছিল—তাই নিয়ে তাকে জড়িয়ে ঐ গেটের বাইরে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

—তাই নাকি? আনন্দের আতিশয্যে জীবন-কবি নিজের বুকের ভিতর চেপে মরে নরেশকে। আত্মহারা হয়ে বলে—বাঃ, বাঃ! তার পর, একতারা বন্ধার দিয়ে গেয়ে ওঠে—

কে জানে মোর চারা-গাছে,

ধরবে এ কল অকালে?

তোদের রবি উঠবে না, মোর—

চাঁদ উঠেছে সকালে।

বহুদূর গমক দিয়ে বলেন—কবি! থাম...

—কেন থামবে? নরেশ প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—গাও কবি। আমি নাচব...

—না! এ প্রাসাদে আর নাচ-গান চলবে না...বহুদূর উদ্বেজিত হয়ে ওঠেন।

একটু হেসে নরেশ বলে—আচ্ছা দিদিমা! আত্মতনে বড় হওয়াই কি সত্যি বড় হওয়া?

—তার মানে?

—মা সেদিন বলছিল—তোমার ওজন নাকি দু'মণ হ্রাস পের। কবি আর বৈজ্ঞানিক দু'জনকেই যদি দাঁড়িপাল্লার এক দিকে তোলা যায়—তবু ওঁরা তোমার সমান হতে পারেন না। তবে আর দরকার কি? তাড়িয়ে দাও—দু'জনকেই। তুমিই পারবে আমাকে পিষিয়ে দিতে—কি ভাবে গরীবের টাকা কেড়ে নিয়ে, দুধ-ঘি খেতে হয়, আর মুটিয়ে যেতে হয়...

নরেশের সেই মারাত্মক যন্তব্য শুনে জীবন-কবি চমকে ওঠে। বন-গর্জিণী বহুদূরকে আঘাত করবার জন্তে নরেশের ভূশে আর কত বাণ আছে তাই বা কে জানে? না না, এখানে আর নয়। জীবন-কবি মাথা নীচু করে চলে যায় নিজের কুঠীয়ে। মনে মনে আর একবার বলে যায়—বাঃ বাঃ!

৬

রাগে বহুদূর চোঁচি মুখ রঙি হয়ে ওঠে। ঐ একরঙা ছেলে তাঁকে ঘি-দুধ খাওয়ার পরিহাস করে? শোভা পর্যন্ত তাঁর সামনে মাথা তুলে কথা বলতে সাহস করে না। সেই শোভার ছেলে নরেশ! সে-করে রাগী বহুদূরকে অসম্মান?

মাষ্টারের হাত থেকে বেতখানা টেনে নিয়ে বহুদূর বলে—মাষ্টার! এই বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। তুমি ওকে পড়াও...

—পড় নরেশ! বিজ্ঞানী আবার চেয়ার পেতে বলে। নরেশও ভয়ে ভয়ে গিয়ে বসে টুলের উপর।

বিজ্ঞানী বলে—পড় নরেশ! উত্তর মেরুতে হ'মাস দিন আর হ'মাস রাত্রি...

নরেশ বলে—সেখানে বোধ হয় হ'মাস থাইসিস আর হ'মাস কলেমা!

—আঃ! বাজে ব'কো না...

—বাঃ রে! কিছু আগে, আপনিই শু বললেন, খুঁচা-রাখি না থাকলে থাইসিস হয়...

—আচ্ছা, এ বই এখন থাক। বাতা কলম নাও, আঁক কব...

বহুদূর বসেন, হ্যাঁ ঠিক ! আঁক কষাও । টাকা-আনা-
পাইয়ের হিসাব শেখাও...আমি একটু ঘুরে আসছি...

বহুদূর চলে গেলে নরেশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে । হ'মশ
হজিঁশ সের দিদিমার হাতে বেত দেবলে, কোন্ নাতির পিলে
না চম্কার ?

নরেশ বলে, শুভুম সারি । আঁকগুলো যেন পচা নর্দমার
পোকায় মত্ত, আমার মাথার ভিতর গিয়ে কিলবিল করে ।
তার চেয়ে গুন গুন করে একটা গান গাই শুভুম...

—রাগি বহুদূর আমাকে মাইনে দিচ্ছেন, তোমাকে লেখা-
পড়া শেখাবার জন্তে । তোমার গানের তারিক করবার জন্তে
মর...বলেই বিজ্ঞানী তার পকেট থেকে সিগারেট-কেসটা বের
করে । একটা সিগারেট ধরায় ।

হাত পেতে নরেশ বলে, আমাকেও একটা দিন্দা-সারি ।

—তুমি সিগারেট খাবে ?

—দোষ কি ?

—সিগারেট খেলে জাঙ স ধারাপ হয়...

—আপনার লাঙ স নেই ?

—বড্ড অসত্য ছেলে তুমি...

—বাঃ রে । সিগারেট খাচ্ছেন আপনি, আর অসত্য হচ্ছি
আমি ?

জানিলা-পথে দূর থেকে বহুদূরকে আসতে দেখে বিজ্ঞানী
তার সজ-ধরানো পোটা সিগারেটটা জুতোর তলার মাড়িয়ে
দেয় ।

নরেশ একটু হেসে বলে, আমার পায়েও খড়ম আছে
লাহু । আমিও ও তাবে লুকোতে পীরতাম...

বহুদূর এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি হচ্ছে ?

বিজ্ঞানী বলে, নরেশ আঁক কষতে রাজী নয়...

চোখ রাঙিয়ে বহুদূর কৈফিয়ত তলব করেন, কেন নরেশ ?
যন্ত্রণার অভিনয় দেখিয়ে নরেশ বলে, বড্ড পেট ব্যথা
করছে দিদিমা ।

—পেট ব্যথা করছে ? থাক, থাক, তা হলে আঁক আর
পড়াশবোর দরকার নেই । ওষুধ খাবি এস...বলেই বহুদূর,
ঘর থেকে বেরিয়ে যান ।

নরেশ ভাবে, তাইত । এখন কি করা যায় ? পিঠ
বাঁচিয়েছি পেটের দোহাই দিয়ে । এখন পেট বাঁচাবার
উপায় কি ?

শোভার কাছে ছুটে গিয়ে, নরেশ তাকে জড়িয়ে ধরে
কঁদে কঁদে বলে, মা । আমি মিছে কথা বলছি । সত্যি
পেট-ব্যথা করছে না আমার । শুধু দিদিমা আমাকে ভেতো
ওষুধ গেলাবে...

—কেন মিছে কথা বললে ?

—সত্যি কথা বললে দিদিমা বেত মারত ।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ । শোন মা । আজই আমি কবির কাছে চলে
যাব । সেখানে সত্যি কথার শান্তি বেত আর মিছে কথার
শান্তি ভেতো ওষুধ, সেখানে আর একটা দিনও থাকব না
আমি ।

শোভার চোখ জলে ভরে ওঠে । চোখ মুছে নরেশের
মাথার হাত রেখে সে বলে—আচ্ছা এসো ।

—যাব ?

—হ্যাঁ, এখানে থাকলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে, চোর হবে,
ডাকাত হবে ।

—তুমি যে আমার জন্তে কাদবে ।

—না বাবা । একটুও কাদব না । তুমি কবির কাছেই
যাও । আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসব । এখানে যদি
থাক তা হলে আমাকে দিনরাত কঁদতে হবে ।

নরেশ শোভার পায়ের ধূলা মাথার নিরে উঠে দাঁড়াতেই
সে তার মুখখানা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে কপালে চূষন করে ।
নরেশ চলে যায় ।

এক হাতে ওষুধ আর এক হাতে বেত নিয়ে বহুদূর এসে
জিজ্ঞাসা করেন—নরেশ কই ?

—চলে গেছে ।

—কোথায় ?

—কবির কাছে ।

—তোমাকে বলে গেছে ?

—হ্যাঁ ।

—বাঁধা দাও নি ?

—না ।

—কেন ?

—কবিই তার মা-বাপ । আমি কেউ নই । এখানে সে
থাকবে না ।

—সে কথার মানে ?

—মানে তোমাকে বোঝাতে পারব না মা । নরেশের
আশা তুমি ছেড়ে দাও ।

—আশা ছেড়ে দেব ?

—হ্যাঁ ।

—তা হলে শোন শোভা । তোমাকে আবার বিয়ে দেব
আমি ।

শোভা চমকে ওঠে । কি ভয়ানক কথা । চোখ দুটো
বন্ধ করে দারুণ বিষয়ে শোভা জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি বলছ
মা ?

—তোমার এই বৈধব্যের কোন মানে হয় না । পুরো
ছোটো বছরও তুমি স্বামী নিয়ে সুখী হও নি । আবার তোমাকে
আমি বিয়ে দেব এলকয় আমার স্থির । বিজ্ঞানী ।

দিকে এসো... দরজার দিকে যুধ ফিরিয়ে বসুন্ধরা বিজ্ঞানীকে ডাকেন।

বিজ্ঞানী এসে ঘরে ঢোকে। বসুন্ধরা তাকে বলেন—
শোভাকে বুঝিয়ে দাও তার মত বাল-বিধবার বিয়ে হওয়া
উচিত কি না?

সসঙ্কোচে ও সবিনয়ে বিজ্ঞানী নিবেদন করে—সে বিষয়ে
আলোচনা করতে উনি যদি রাজী না হন?

শোভা বলে—হ্যাঁ রাজী আছি। বসুন আপনি।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উৎসাহিত ভাবে বিজ্ঞানী বসে।
বসুন্ধরা বেরিয়ে ঘান ঘর থেকে।

শোভা বেশ বুঝতে পেরেছে—প্রস্তাবটা খুব হঠাৎ আসে
নি তার কাছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীর সঙ্গে বসুন্ধরার আলো-
চনা হয়েছে পূর্বেই। বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নরেশের
শিক্ষকতা হলেও, পরোক্ষে তার লক্ষ্য দৃষ্টি পড়েছে শোভার
প্রতি। শোভাকে পেলেই ত রাষ্ট্রোৎসর্গ পাওয়া হবে? শোভার
মনে ছেগেছে বিজ্ঞানীকে একটু যাচাই করবার কৌতুহল।
তাই জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি বিধবা-বিবাহ সমর্থন
করেন?

—নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ আপনার মত বাল-বিধবার বিবাহ
না হওয়া অত্যন্ত অন্তঃ ও অসঙ্গত?

—আপনি কি বিবাহিত?

—আজ্ঞে না...

—একটি বাল-বিধবার হৃৎকর দূর করবেন?

—নিশ্চয়ই করব। আমার জীবনের একটা পবিত্র সঙ্কল্পই
তাই। বহু কুমারীকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আজও
অবিবাহিত আছি...

—বলবাদ। আজ, আসুন তা হলে। কাস আবার
আসবেন। আমার পরিচিত একটি বাল-বিধবা আছে। মা-
বাপহারা কন্যহুঃখিনী। তাকে উদ্ধার করবেন?

—দেখুন, আমি... আপনাকেই...

—বেরিয়ে ঘান এ ঘর থেকে... শোভার চোখে-মুখে যেন
আগুন জলে ওঠে। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে বিজ্ঞানী
বেরিয়ে যায়।

কবির কুঠীতে গিয়ে শোভা দেখে—কবি যত্ন-শয্যায়।
নরেশ তার সেবায়ত্ন করছে। গান গেয়ে শোনচ্ছে। কবির
একতারা আজ নরেশের হাতে। চোখ বুজে ঝঙ্কার শুনতে
শুনতে কবি বলছে—বাঃ বাঃ।

চাষী-পল্লী থেকে নরেশের সমবয়সী বন্ধুরা সবাই এসে
জুটেছে সেখানে। কবির কুঠীতে আজ কোনও কিছুর অভাব
নেই। কত ফুল, কত ফল। যত্না যেন মহোৎসব। জীবন-কবি
তার অহুর্গতদের নিকট থেকে চির-বিদায় নিচ্ছে। সকলের

চোখ সজল। কিন্তু কবির বিদায় মুখে হাসি যেন বরছে না।
এ কি যত্নার আনন্দ।

শোভা কঁদে বুক ভাঙছে। কবি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে
বলে—কঁদ না শোভা। আমার কহাল আজ পুড়বে—আমার
হবে যুক্তি। হৃৎকর না। যত্না কিছুই নয়। আমি ত বেঁচে
থাকব তোমার নরেশের মনের মধ্যে।

চোখ মুছে শোভা ফিরে আসে। বহু মূল্যবান আসবাব-
পত্র সাজানো একটি কক্ষের এক কোণে বসেছে সে। খোলা-
জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। চলেছে জীবন-
কবির শববাহী শোভাযাত্রা।

হঠাৎ পিছন থেকে বসুন্ধরা ডাকলেন—শোভা।

শোভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে—বসুন্ধরার সঙ্গে একটি
অপরিস্রবিত লোক।

বসুন্ধরা লোকটিকে দেখিয়ে বলেন—ইনি এসেছেন
তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে।

—কে উনি?

—একজন বিখ্যাত দার্শনিক...

দার্শনিক প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—না না, কথটা আপনার
ঠিক বলা হ'ল না, বসুন্ধরা দেখী।

—কেন?

—বসুন আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন, আলাপ-পরিচয়
করতে আপনার মেয়ের সঙ্গে...

—একই ত কথা...

—আজ্ঞে না—কথটা এক নয়... তবে, বিজ্ঞানী আমার
বন্ধু। তার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা যখন ঠিক হয়ে গেছে... তখন...
আমি নিজে এলেও...

উজ্জ্বলিত ভাবে বাধা দিয়ে শোভা বলে—মা! এ সব
কি? তুমি আমাকে কি ভেবেছ বল ত?

—কি ভেবেছি?

—আমি বিধবা নই। আমাকে আর বিরক্ত করো না...

বিস্মিতভাবে বসুন্ধরা বলেন—বটে! তুমি বিধবা নও?

—না। তোমরা আমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছ না।

আমি দেখছি—আমার এই বুকের ভিতর বেঁচে আছেন তিনি
...তার স্পর্শ আমি অনুভব করি...

—কি সর্বনাশ। এই মেয়েকে বিয়ে দিতে চান আপনি?
দার্শনিক বিষম প্রকাশ করেন।

বসুন্ধরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—বিয়ে ওর দিতেই হবে—
সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ শুনতে চাই না।

দার্শনিক শোভার বিশ্বাসকে সমর্থন করে বলেন—বীর মন
বিধবা হয় নি—তিনি কখনই বিধবা নন... একথা আমি
বলবই...

বিজ্ঞানী বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। বসুন্ধরা তাকে ভিতরে

ডাকেন। শুৎসনার মূরে বলেন—কেন তোমার এই দার্শনিক বন্ধুকে নিয়ে এসেছ ?

দার্শনিক বলে—বিজ্ঞানী যুগে বলেই রাজকুমারী শোভাকে চিনতে পারে নি। বিজ্ঞানী করি—কেন ওঁকে আপনি বিয়ে দিতে চান বলুন ত ?

—আমার এই অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে ?

—যারা ভোগ করবে—তারা আসছে।

—কারা আসছে ?

—যারা এই শোভা দেবীকে মা বলে ডাকবে। তারা একজন নয়, দু'জন নয়, হাজার হাজার ক্ষুধিতের দল...

—কোথার তারা ?

—দেশে কি দেখছেন না ছুঁড়ির পূর্বাভাস ? অনার্য ণ্ড অল্পা আরম্ভ হয়েছে। শীগ্গিরই শুনতে পাবেন অরহীন প্রজা-সাধারণের হাহাকার। যাদের কারিক শ্রমের মূল্য আহরণ করে গড়ে উঠেছে আপনার এই রাজপ্রাসাদ।

উত্তেজিতভাবে বসুন্ধরা বিজ্ঞানী করেন—বিজ্ঞানী ! কেন এই দার্শনিককে নিয়ে এসেছ এখানে ?

বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী বলে—ভুল করেছি...

—ভুল কর নি বন্ধু। এই শোভা দেবীকে তুমি চিনতে পার নি। আমার দৃষ্টি নিয়ে ওঁকে চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা কর। স্বার্থ-চিন্তা মানুষকে অধুর ও অসদত করে...ক্ষুধাভাব দার্শনিক বলে।

বসুন্ধরা বুঝেছেন—এই দার্শনিক একটা বিশিষ্ট মতবাদের সমর্থক, যারা বলে—ধনীর সম্পদে নির্ধনের দাবি আছে। কবিও বলত—দার্শনিকও বলছে—ধনীরা পরস্বাপহারী দস্যু ! দেশে হুঁড়ি বা অশান্তি ঘটলে ধনীর ভাণ্ডারঘার খুলতে হবে। নিরন্তরে অন্ন দিতে হবে। কিন্তু কেন ? এই সব মতবাদী যে অত্যন্ত পরত্নীকাতর সে বিষয়ে বসুন্ধরার মনে কোনও সন্দেহ নেই। উত্তেজিতভাবে বসুন্ধরা বিজ্ঞানী করেন—দার্শনিক ! তোমার উদ্দেশ্য কি ?

—কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ত এখানে আসি নি...

—শোভার দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেন ?

—দেখছি...

—কি দেখছ ?

—অপূর্ণ মাতৃহৃতি। ক্ষুধিতের দল যখন মা, মা, বলে আপনার ঘারে এসে কাঁদবে, তখন এই শোভা দেবীর মাতৃ-হৃদয় নিশ্চয়ই কেঁদে উঠবে। ভাণ্ডার-ঘার খুলে দিতে বাধ্য হবেন আপনি...

—বাস্য্য তব ?

—নিশ্চয়ই। শোভার হেলেমেয়েরা অনাহারে শুকিয়ে মরবে, তা কি হতে পারে ?

—যাদের অন্ন ছুটবে না, তারা মরবে। সে যত্ন্য তাদের বিধি-নির্দেশ শাস্ত। আমার কি ?

—বিধি-নির্দেশের কথা তুলবেন না। সে নির্দেশ চিরন্তন নয়, পরিবর্তনশীল। আজ যারা মরবে, মরার আগে তারা জানতে চাইবে—কেন মরছে ? কে তাদের বাঁচার অধিকার হরণ করেছে ? এ প্রশ্নের সমাধান যদি তারা করতে চায়, তা হলে আপনারাও বাঁচবেন না...

—আমরাও বাঁচব না ?

—নিশ্চয়ই নয়। মা মা, বলে কেঁদেও যদি মাকে জাগাতে না পারে তা হলে সে ডাইনী-মাকেও তারা মারবে...

—তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

—যে আজ্ঞে, যাচ্ছি...কিন্তু তুমি কি করবে বন্ধু ? বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞানী করে দার্শনিক।

—বসুন্ধরা দেবী যদি শোভাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেন, তা হলে এই রাষ্ট্রধর্ম্য রক্ষার দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করব...

—পারবে ?

—কেন পারব না ? এমন সব মারণাজ ব্যবহার করব, যাকে অগ্রাহ করা কোন আক্রমণকারীর পক্ষেই সম্ভব হবে না...

—মাফ-মারা বুঝ সোজা। কিন্তু তার মনকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন। উপস্থিত তুমি যে আক্রমণ চালাচ্ছ, তার ফল যে কি হবে, তাও ভাব একবার।

—আমি আক্রমণ চালাচ্ছি ?

—নিশ্চয়ই। রাণী বসুন্ধরার সাহায্যে বন্ধু দিয়ে যিরে, শোভাকে হরত বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু তার মনকে তুমি পাবে না বন্ধু। সে থাকবে তোমার নাগালের বাইরে...নমস্কার বসুন্ধরা দেবী। আসি তা হলে।

দার্শনিক চলে যায়। শোভার কাছে গিয়ে বসুন্ধরা দেখেন, শোভা মুচ্ছিত।

বন্দিনী-শোভার বিয়ের বাজনা বেজে ওঠে। কবি বেঁচে নেই। কবির সেই নিরানন্দ কুটীরে বসে নরেশ শোনে সে বাজনা।

অদূরে চাষীপল্লী। সেখানেও আনন্দ নেই। অনার্য ণ্ডির ফলে মাঠের মাটি শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। চাষীরা লাভল চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ককালগার গরুগুলি কাঁধের লাভল কাঁধে নিয়েই শুকনো মাটিতে শুয়ে পড়ে। টানতে পারে না। গরুর অপরাধ কি ? তারা মাটি শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়ায়। কোথায়ও এক গাছি সবুজ তৃণের সন্ধান পায় না। পুকুর-ডোবার জলও শুকিয়ে আগতে। পল্লীঘেরেরা উলু দিয়ে আর শাঁখ বাজিয়ে পূজনা-দেবের পূজা করছে। হেঁঠাকুর, জল দাও—জল দাও !

কবির মৃত্যুর পর ছ'মাস কেটে গেছে। শোভা ত আর একটি বারও আসে নি কবির কুটীরে। মা তার সন্ধানকে

তুলে গেছে? অনাবৃষ্টি ত হবেই। শোভা যে বলিনী
তা ত নরেশ জানে না। সেই স্নেহময়ী এই আচরণের কথা
ভেবে ভেবে নরেশের মনে বিষয়ের অন্ত নেই। আজ শোভার
বিয়ের বাজনা শুনতে শুনতে নরেশের মন বিষয়ে ভরে যায়।
না না, পঙ্কজদেব। তুমি এক কোঁটা জলও দিলে না।
এ দেশ জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তোমার ত বজ্র আছে?
তার একটা ফেলে দাও এ রাজপ্রাসাদের চূড়ার।

নরেশ শুনল চাষীপল্লীতে বিরাট জনসভার সমাবেশ
হয়েছে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নরেশও যায় সেখানে। চূপ
করে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে।

সমবেত চাষীদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন দার্শনিক।

—ওরে অন্নহীন বস্ত্রহীন, মুক ও বধিরের দল। তোরা
কি শুনতে পাস না—রাজপ্রাসাদের নহবতে আজ কিসের
বাজনা বাজে? কান পেতে শোন্—বলিনী বিধবা রাজকন্তার
বিবাহোৎসব।

নরেশ চিংকার করে বলে ওঠে—রাজকন্তা বলিনী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলিনী। দার্শনিক উত্তেজিত ভাবে বলেন—
রাজপুরী আজ সঙ্গীনধারী সৈনিক দিয়ে বেহা। আমি জানি
শোভা দেবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিবাহের আয়োজন। তুরি-
ভোক্তাদের বিরাট ব্যবস্থা। দেশ-দেশান্তরের ধনী-মহাজনরা
এসে বিবাহসভার শোভাবর্ধন করবেন। তোমরা অন্নহীন।
কিন্তু রাজপুরীতে মঙা-মিঠাই গড়াগড়ি যাচ্ছে। এক কোঁটা
তুষ্কার জল পাও না তোমরা, রাজপুরীতে বয়ে যাচ্ছে অতি
উগ্র ও তীব্র পানীয়ের টেউ। তোমাদের প্রেমের মূল্য দিয়েই
এ রাজপ্রাসাদটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু কই? কোনো
উৎসবেই ত তোমরা নিমন্ত্রিত হও না সেখানে?

একজন বৃদ্ধ চাষী কপালে করাঘাত করে বলে—আমা-
দের অদৃষ্ট।

দার্শনিক বলেন—অদৃষ্টকে দেখতে চেষ্টা কর, বুঝতে চেষ্টা
কর। এ রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে তোমাদের
সঙ্গত আছে। রাগী বস্ত্রহারা কে? তাঁর নিমন্ত্রণের অপেক্ষা
কেন করবে? হাজারে হাজারে গিয়ে হাজির হও এ রাজ-
ঘারে। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও বলে চীৎকার কর। এই
হুড়িকের দিনে বিলাসী-ধনীদের আনন্দোৎসব কি তোমাদের
অদৃষ্টকে পরিহার্য করছে না? সে পরিহার্য তোমরা কেন
সহ করবে? অনাবৃষ্টির প্রতিকারের জন্তে যদি পঙ্কজদেবের
কাছে জল চাইতে পার, ধনী-মহাজনদের কাছে বেঁচে থাকার
দাবি জানাতে পারবে না কেন? তাদের সুবৈধব্য কাদের
জন্তে?

নরেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় দার্শনিকের দিকে। খুব
কাছে গিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কে?

—তুমি কে—আগে তাই বল...

—বিধবা রাজকন্তা আমার মা। আমি তাঁর একমাত্র
সন্তান।

দার্শনিক চমকে উঠেন। বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকেন
নরেশের মুখের দিকে। অক্ষুট স্বরে বলেন—তুমি তাঁর ছেলে?
তিনি ছেলের মা?

—বিধবা যে পুত্রবতী, তা কি আপনি জানতেন না?

—না। আমার বিজ্ঞানী বন্ধুর কাছে শুনেছি—তিনি
নিঃসন্তান। কি আশ্চর্য্য। তুমি এ বিবাহে প্রতিবাদ করছ
না কেন?

নরেশ একটু লজ্জিত ভাবে বলে—কেন করব? আমার
মায়ের মনের অবস্থা যে কি তা আমি জানি না? বিবাহে
যদি তাঁর আগ্রহ থাকে, আমি কেন বিয় বটাব?

—তুমি বুঝি রাজপ্রাসাদে থাক না?

—না। রাগী বস্ত্রহারা অত্যাচার সইতে না পেয়ে এই
কৃষক-পল্লীতে বাস করছি। এই চাষীরাই আমার অন্তরঙ্গ
বন্ধু। এদের আমি ভালবাসি...

—তাই নাকি? দার্শনিক উৎফুল্ল ভাবে বলেন—তা হলে
চল—এ হাজার হাজার ক্ষুধিত অন্নহীনের দল তোমার
নেতৃত্বেই প্রবেশ করবে রাজপ্রাসাদে। তোমার দাবি মায়ের
সঙ্গে দেখা করা।

জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বহু কণ্ঠের কোলাহলে
প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়। সাজ, সাজ রব পড়ে যায়।

কেউ কেউ সন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানায়—আমরা মিরজ।
সঙ্গীনধারী সৈনিকেরা যদি আক্রমণ করে—তখন আমাদের
কি অবস্থা হবে? সেকথাটা ভাব। যেতেই যদি হয়—
চল, তৈরি হয়ে যাই। খোঁজা কোদাল, দা-কুড়ুল, ধার যা
আছে নিয়ে এস...

দৃষ্ট কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে নরেশ বলে—না, কেউ কোম
অস্ত্র নিতে পারবে না। শুধু আমার হাতে থাকবে—এই
একতারা। তোমাদের সবার আগে থাকবে আমার এই বুক।
বুক দিয়ে সঙ্গীন ঠেলে এগিয়ে যাব আমি। আমার মৃত্যু
না দেখে, তোমরা কেউ পিছু হটতে পারবে না।

নরেশের সে বোষণায় সমর্থন জানিয়ে অহিংস অভিযানের
মাহাত্ম্য প্রচার করে দার্শনিক। চারদিকে উৎসাহ ও
উদীপনার বঙ্গা বয়ে যায়। জনশ্রোত যাত্রা করে রাজ-
প্রাসাদের দিকে।

বহুমূল্য অলঙ্কারে আর বেশভূষায় শোভা আজ রূপসজ্জা
করেছে—যেন রাজরাজেশ্বরী। কি অনিন্দ্যহৃদয়ের তার যুগ্মতী।
সে যেন মৃতিমতী সৌন্দর্য্য। মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিজ্ঞানী চেয়ে থাকে
শোভার মুখের দিকে।

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা বিজ্ঞানী! কি মনে কর এই দেহটাই আমি?

—না।

—ভবে?

—তোমার মনও আমি চাই...

—চাও? তাই নাকি? কি করে পাবে?

বিজ্ঞান বিজ্ঞানী বলে—দেহকে পেলেই ত মনকে পাওয়া যাবে...

শোভা হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করে—তোমার বিজ্ঞান তাই বলে বুঝি?

—হ্যাঁ, শুধু বিজ্ঞান কেন ইতিহাসও তাই বলে। ব্যক্তি বা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসে শুধু দৈহিক সামর্থ্যের জয়-যোষণা ছাড়া আর কি আছে? কত বিদ্রোহী মন শক্তিমানের কাছে মৃত হয়ে অধীনতা স্বীকার করেছে।

—সে বর্বর যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। এ যুগে দৈহিক প্রাধান্য কেউ মানবে না। এখনও সাবশাম হও বিজ্ঞানী! মনকে উপেক্ষা করো না। মা-বহুস্রার রক্ত চক্ষু আর তোমার কোমরের ঐ পিঙ্গলকে ভয় করব না আমি! —শোভা গভীর হয়ে ওঠে।

—সত্যিই কি তুমি আমার হবে না শোভা? কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে বিজ্ঞানী।

—আমি যদি এক টুকরো মাংস হতাম—তা হলে তোমার মত হাংলাকে বলিয়ে দিতে পারতাম। আমি যে কি তা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না...

—কি তুমি? কেন এমন ভুবনমোহিনী রাজরাজেশ্বরী সেজেছ?

বহুস্রা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেন—বিজ্ঞানী! সর্বনাশ হয়েছে...

—কি হয়েছে মা?

—হাজার হাজার ভিথির আসছে রাজপুরী আক্রমণ করতে...

—বেশ ত, আশুক না। ভয় কি? রাজপ্রাসাদ খুব সুরক্ষিত আছে। কেউ ঢুকতে পারবে না। আমিও যাচ্ছি তাদের অভিযানা করতে—বলেই কোমরের পিঙ্গলটা হাতে বাগিয়ে নিয়ে, বিজ্ঞানী বেরিয়ে যাব বর থেকে।

বহুস্রা চিন্তিতভাবে একটা আসনে বসে পড়েন। মাথাটা চেপে ধরেন।

শোভা কাতরভাবে বলে—মা! ভিথিরদের রক্তে স্নান করে খুব পুণ্যসঞ্চয় করবে, না?

—উপায় কি? বোধ হয় নরেশও আছে ওদের সঙ্গে। তাই ত তাবহি—কি হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নরেশ সিন্ধুই আছে—শোভা ছুটে যায়

জানালার ধারে। বাইরে উঁকি দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। চীৎকার করে বলে—মা! দেখে যাও—দেখে যাও—আমার নরেশ কি সুন্দর সাজে সেজে এসেছে...

চাষী বাসকেরা ফুল-সাজে সাজিয়েছে নরেশকে। গলায় তার বিচিত্র ফুলের মালা। চূড়াবাঁধা কেশগুচ্ছ ফুল দিয়ে জড়ানো। কানে ফুলের কুণ্ডল। হাতে ফুলের কঙ্কণ। তন্তু-কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল তার স্নকুমার দেহের দীপ্তি। পদ্ম-পাপড়ির মত জলভরা আয়ত চোখ দুটি টিলমল করছে। মুখত্রীতে অপূর্ব সজ্জের দৃঢ়তা। ছেলে তার মাকে দেখতে এসেছে।

শোভা তার অঙ্গের অলঙ্কার বলে খরময় ছড়িয়ে ফেলে। খোঁপা বলে চুল এলিয়ে দেয়। মূল্যবান বেশভূষা ছেড়ে পটবস্ত্র পরে। বহুস্রা চূপ করে বসে দেখেন। কোনও প্রতিবাদ করেন না।

নরেশের পাশে দাঁড়িয়ে, দ্বাররক্ষীদের সম্বোধন করে দার্শনিক বলে, এই তরুণ-কিশোর কে? তোমরা কি চিন্তে পারছ একে?

নরেশকে দেখেই তারা চিনেছে। তার মুখখানি যে শোভার মুখের প্রতিচ্ছবি। দ্বাররক্ষীরা অভিবাদন জানিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।

পিঙ্গল-হাতে বিজ্ঞানী এসে হুকুম দেয়, সদরের গেট বন্ধ কর...

দ্বাররক্ষীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে অত্যন্ত হুকুম তারা মানবে কেন? তাদের ভাবীমনিব রাজকুমার নরেশকে তারা বাধা দেবে কার হুকুমে? বিজ্ঞানী ফিরে যায় বহুস্রার কাছে। দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটির খবর শুনে, বহুস্রা ম্যানেজারকে পাঠান, একা নরেশকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে আনবার জন্তে।

নরেশ সে প্রস্তাবে রাজী হয় না। যারা তার সঙ্গে এসেছে, তাদের সবাইকে দিঙে হব প্রবেশাধিকার। রাজকুমার শোভা ত আত্ম একা নরেশের মা নন? হাজার হাজার সজ্জন তাঁর। সবাই এসেছে তাদের মাকে দেখতে। কোন বাধা কি তারা মানবে? বহুস্রার হুকুম অমান্য করে সবাইকে নিয়ে নরেশ চুকে পড়ে, সদরের গেট পার হয়ে, প্রাসাদের সমুখে, বিস্তীর্ণ পুষ্পোচ্চানে।

প্রাসাদের দরজায় গুলিভরা পিঙ্গল হাতে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানী। দূর থেকে তাকে দেখে নরেশ একটা নমস্কার জানায়। তার পর কয়েক জন সাহসী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে ওঠে সোপান বেয়ে।

বিজ্ঞানী বলে, যদি প্রাণের মমতা থাকে, আর অগ্রসর হয়ো না...

উপেক্ষার হাসি হেসে নরেশ বলে, প্রাণের চেয়েও, মা যে সত্যমের কাছে কত বেশী প্রিয়—তা কি আপনি জানেন না? আপনার বোধ হয় মা নেই? ওলি করুন আমাকে।

বহুদূর এসে বলেন, নরেশ। তুমি একলা ভিতরে এস।
ওদের ফিরে যেতে বল...

—তা কি হয়? তা হলে আমরা কেউ ভেতরে যেতে চাই
না। আমাদের মাকে একবার বাইরে আসতে বল। তার
পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা সবাই ফিরে যাব...

বহুদূর উত্তেজিত ভাবে বলেন, সে এখানে আসবে না,
আসতে পারবে না...

—কে তাঁকে বাধা দেবে? আমি যাব তাঁকে আনতে,
এই চাষীদের তিনি আশীর্বাদ করবেন...

—সাবধান নরেশ। সে আমার মেরে...

—কিন্তু আমার মা। আমি তোমার হুঁইখর্বোর প্রভাণী
নই। আমার মা যদি আমার কুটীরে গিয়ে শুখাধুণী সাজতে
চায়, তোমার কোন অধিকার নেই তাঁকে বাধা দেবার...

দ্বিতলে শোভার কক্ষটিকে বাইরের দিক থেকে রক্ত করে
এসেছেন বহুদূর। গবাক্ষ পথে একটি পরিচারিকা এসে

উঁকি দিয়ে দেখে। গলার বছল্যা হারছড়া পরিচারিকার
গায়ে ছুঁড়ে মেরে শোভা মিনতি জানায়—দরজাটা খুলে দে—
খুলে দে—তোর পায় পড়ি খুলে...

পরিচারিকাও পূজবতী। নরেশের মুখের দিকে চেয়ে
ভারও মনে পড়ে নিজের ছেলের মুখ। কিন্তু কি করবে?
বহুদূরার ভয়ে সে কাঁপে। তবু হঠাৎ যখন দেখে, বিজ্ঞানীর
পিপুলটা নরেশের বুকের উপর—তখন আর স্থির থাকতে
পারে না। ছান্দা দিয়ে হারছড়া কিরিয়ে দিয়ে, দরজাটা
খুলে দেয়। তার পর পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

উমাদিনী শোভা ছুটে যায়। শাবকহারা সিংহিনীর মত
আক্রমণ করে বিজ্ঞানীকে।

বহুদূরার নিকটাক ভাবে চেয়ে থাকেন শোভার সেই
ভেছোদুগু মুখের দিকে। কোন কথার বা কাছের প্রতিবাদ
করবার সাহস নেই তাঁর...

নরেশ এসে শোভাকে জড়িয়ে ধরে বলে—মা।

কোশী-বাঁধ

শ্রীশিশিরকুমার কর

গত ১৫ই জুলাই হুইতে কোশী নদীতে জল বাড়তে থাকে এবং
বিহারের যে-সব অঞ্চলে দারুণ অনাভাব ভারতই কতকটা
অংশ কোশীর বড়ায় সম্ভ্রতি জল-প্রাণিত হয়ে তাদের দুর্ভাগ্যের
উপরে আরও দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এইভাবে সাহাসী
এবং পূর্ব-দ্বারভাঙ্গার এক শতের উপর গ্রাম জলপ্রাণিত এবং
লক্ষাধিক লোক বিপন্ন হয়, সমস্ত জায়গায় বুকসমান জল
দাঁড়িয়ে যায়। প্রাচীন শতক্ষেত্রের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে
অ্যুগমৌ বংসরেও দুর্ভিক্ষের আগমমবার্তা ঘোষণা করে
চলেছিল। একমাত্র নৌকা ভিন্ন অন্য সমস্ত যানবাহন
চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বড়ার ফলে যত্না ছাড়া,
বহু লোকের সর্পাঘাতে যত্নরও সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল।
মাধেপুর ধানার তিনটি গ্রাম—যা কোন দিন বড়ার বিধ্বস্ত
হয়নি, কোশী এবার তাদেরও আক্রমণ করেছিল।

এবারকার বড়ার অপূরণীয় ক্ষতি এই হয়েছে যে, মাধেপুর
নারায়ণ ত্রিভুগবানপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত
রাঘবাচারী শাস্ত্রীর বাড়ীটা সম্পূর্ণ ধ্বংস-মুখে গেছে। সেই
সঙ্গে তালপাতার উপর হাতে লেখা বহু দুস্ত্রাপ্য প্রাচীন
পুঁথি নষ্ট হয়। তার মধ্যে একখানা পুঁথি ছিল যা সাত মত
বৎসর আগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বামদেব উপাধ্যায় কাশ্মীর থেকে
মিথিলায় এনেছিলেন।

প্রথম পর্য্যায়

কোশীর এই দুর্ভয়নীর বড়াকে প্রতিরোধ করবার জন্যই
কোশী-বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্ভ্রতি ভারত-সরকার

এই কোশী পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায় শেষ করবার জন্য সাড়ে
দশ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। এটা বিহারবাসীর
পক্ষে সত্যই সুসংবাদ। বিহারের অর্থসচিব ডাঃ অম্বুএ-
নারায়ণ সিংহ কিছু দিন পূর্বে বলেছেন যে, অক্টোবর মাসে
এই কাজ হাতে নেওয়া হবে। প্রথম পর্য্যায়ের যোগবাণী থেকে
নেপালের বরাহক্ষেত্র পর্য্যন্ত ৪০ মাইল রেল-রাস্তা, কোশীর
উপরে একটা ব্যারাজ, কয়েক মাইল দীর্ঘ নেচের খাল,
প্রত্যেকটি দশ হাজার কিলোগ্রাট শক্তিসম্পন্ন দুইটি বিদ্যুৎ-
উৎপাদক যন্ত্র সমেত একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র এবং বিহারে
ও নেপালে বিদ্যুৎ-পরিবাহক তার লাগানো হবে। এই কাজ-
গুলি শেষ করতে চার বছর সময় নির্ধারিত হয়েছে।

কোশী ও তার বড়া

দুর্ভাগ্য কোশী তার ধ্বংসলীলার জন্য বিহারের আভ্যন্তর
দাঁড়িয়েছে। কোশীর প্রাচীন এমনই দুর্ভাগ্য যে, ২৪ ঘণ্টার ৩০
ফুট জল বেড়ে উঠতে দেখা গেছে। এই প্রাচীন বহুরের পর
বহুর কত মাহুষ, কত গৃহপালিত পশু, কত গরীবের কুঁড়ে ঘর,
কত ধনী প্রাণদ, কত গোলাভরা শস্য, কত শতক্ষেত্র
ভেসে যায় তার পরিমাপ করা হুঃসাধ্য। সময় সময় এই
প্রাচীন প্রায় কুড়ি মাইল চওড়া একটা চলমান সযুগ্মের আকার
ধারণ করে। তখন প্রতি সেকেন্ডে ২,৪০,০০০ ঘন ফুট জল
সবেগে বয়ে যায়। এই প্রাচীরের ফলে বিহার ও নেপালের
এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কয়েক মাস যাবৎ জলমগ্ন অবস্থার চাষ-
জীবাদের অল্পমুহুর্ত হয়ে পড়ে থাকে। চলাচলের রাস্তা বন্ধ

হয়ে যায়। বহু জায়গা বহু জলাশয়ে পরিণত হয়ে মশক ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হয় যে, হুঁহাজার থেকে তিন হাজার বর্গমাইল উর্বর শস্যক্ষেত্রের উপর বালি জমে' তাকে বহু বৎসর পর্যন্ত কৃষির সম্পূর্ণ অস্থ-যোগী করে রাখে। এইজন্তই কোশীকে "বিহারের হুংথের নদী" এবং "বিহারের আতঙ্ক" ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯৩৭ সালে এই প্লাবন নিরোধের উপায় নির্ধারণের জন্ত সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে এক কমিটি বসে। তাতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“দেশের এমন সর্বনাশ না করে এই অতিরিক্ত জলরাশিকে বের করে দেওয়ার কি কোন উপায় নেই? একটা কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করে এই বিরাট জলরাশিকে দরকারের সময় সেচের কাজে লাগানো কি সম্ভব হতে পারে না?” তার উত্তরে ত্রীযুক্ত জে. বি. সেন বলেন—“কোশীর এ দারুণ বজা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হচ্ছে, যেখানে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এই নদী নেমে এসেছে সেখানে একটা বাঁধ বেঁধে দেওয়া, এবং জল-রাশিকে একটা 'উইয়ারের' মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেওয়া। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, তেমন জায়গা শুধু নেপালের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে এবং এটা বহু ব্যয় সাধ্য।” দেশবাসীরা হওয়ার পর থেকেই ভারত-সরকার এদিকে সম্যক্ অবহিত হয়েছেন, সেজন্য তাঁরা শুধু বিহারবাসীর নয়, সমগ্র দেশবাসীর হস্তবান্ধব।

কোশীর ধ্বংসলীলা

কোশীর ধ্বংসলীলা সংক্ষেপে প্রথমে যে আভাস দেওয়া হয়েছে সেটা সাময়িক এবং অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। এই ধ্বংসলীলা অত্যন্ত রূপাক, দীর্ঘস্থায়ী এবং এর মূল গভীরে। তাই এটা সম্যক্ ধারণা করতে হলে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

কোশীর তিনটি উপনদী আছে। (১) সান কোশী পশ্চিম-দিক থেকে ৭,৪২৪ বর্গমাইল জায়গায়, (২) অরুণ উত্তরদিক থেকে ১৪,১০৬ বর্গমাইল জায়গায় ও (৩) তিমুর পূর্বদিক থেকে ২,২৭৮ বর্গমাইল জায়গায় বৃষ্টির এবং বরফগলা জল হয়ে এনে নেপালের পবিত্র ভীর্ণ বরাহক্ষেত্রের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে একই জায়গায় এসে মিশেছে। এই ২৩,৮০৮ বর্গমাইল জায়গায় মধ্যে ২,২২৪ বর্গমাইল জায়গা চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের অংশ। নেপালের পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে কোশী যেখানে ভারতের সমতল ক্ষেত্রে এসে নেমেছে সেখানে এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, হিমালয় থেকে উদ্ভূত বড় বড় নদ-নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্রের পরই তার স্থান। তারপর বেলে এবং দো-আশলা মাটির প্রায় সমতল জমির ভিতর দিয়ে কতক-গুলি চওড়া নদীগর্ভের (channels) সৃষ্টি করে তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গলার সঙ্গে মিশেছে। জলের সঙ্গে কোশী

যে বালি এবং পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসে তা জমে জমে শীঘ্রই এই নদীগর্ভগুলি ভরে ওঠে। কয়েক বছর পরে আবার যখন দিনকয়েক ক্রমাগত অতিবৃষ্টি হতে থাকে তখন কোশী তার পুরাতন পথ ছেড়ে নতুন জমি কেটে নতুন পথ তৈরি করে নেয়। এমনই করে কোশী পূর্বদিকে পূর্ণিমা থেকে পশ্চিম দিকে ঝারভাঙ্গা পর্যন্ত বিহারের ২০০০ থেকে ৩০০০ বর্গমাইল উর্বর শস্যক্ষেত্রের ধ্বংস সাধন করেছে। এ ছাড়া নেপালের নষ্ট করেছে ৩০০ থেকে ৫০০ বর্গমাইল উর্বর শস্যক্ষেত্র। এই জায়গায় জন-বসতির পরিমাণ হচ্ছে প্রতি বর্গমাইলে ৯০০ জন। তাই কোশী বছরের পর বছর ১৮ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ লোকের সমূহ ক্ষতি করেছে।* এর পরও কি বিহারের দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে অগ্রজ যাওয়ার দরকার হয়?

বহুমুখী পরিকল্পনা

এটা একটা বহুমুখী পরিকল্পনা। এতে নেপালের বরাহ-ক্ষেত্রের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে, যেখানে কোশী ছাড়া নামক পাহাড়ের খাদের মধ্য দিয়ে সরু পথ করে নেমে এসেছে, সেখানে ৭৮৩ ফুট উঁচু একটা বাঁধ বেঁধে দেওয়া হবে। এতে লক্ষ একর ফুট বজার জল বয়ে রাখবার বন্দোবস্ত থাকবে। নেপালে এবং বিহারে দুইটা ব্যারাজ, আর সেই সঙ্গে ছোট খাণ্ড খাল বাধে ১,৬৯৩ মাইল দীর্ঘ বড় খাল কাটা হবে। এই সবগুলি মিলে বজার উদ্যম প্রবাহকে আয়ত্তে আনতে পারবে। ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে—তার মধ্যে অনেক জমিতে বছরে দুইটা ফসল ফলানো সম্ভব হবে। সব সময়ের জন্ত নব্বই হাজার কিলোওয়াট এবং ষাট অস্থায়ী আরও পরিত্যাগিত হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। জমির ক্ষয় বন্ধ হবে। বজার বালি এসে জমি নষ্ট হওয়া বন্ধ হবে। যে-সব জায়গা বহু জলাশয় পরিণত হয়ে রয়েছে সে-সব জায়গার সংস্কার হয়ে চাষের উপযুক্ত হবে। ম্যালেরিয়া দূর হবে। বিরাট আকারে মাছের চাষ সম্ভব হবে। উপরে নীচে জলযান চলাচলের সুবন্দোবস্ত হবে। তা ছাড়া এতে করে প্রভূত খাতশস্ত্র উৎপন্ন হওয়ার ফলে বিহারের লোকে পেট ভরে বেতে পাবে। সম্ভার বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়ার বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং কৃষিক্ষেত্রে বহু লোক কাজ পাবে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

* ত্রীদীপনারায়ণ সিংহের মতে উত্তর-বিহারের এই জন-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮৫ জন একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভর-লীল এবং গড়ে মাত্র দুই বিঘা জমির উপরে তাদের জীবিকা নির্ভর করে।

+ এক একর জমির উপরে এক ফুট পরিমাণ উঁচু হলে তবে 'এক একর ফুট' বলা হয়।

এ সমস্ত বাদ দিলেও শুধু বজা নিরোধের জন্য এই পরিকল্পনার পেছনে যত টাকা খরচ হবে তা সার্থক হয়ে উঠবে।

কয়েকটি আপত্তি এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা

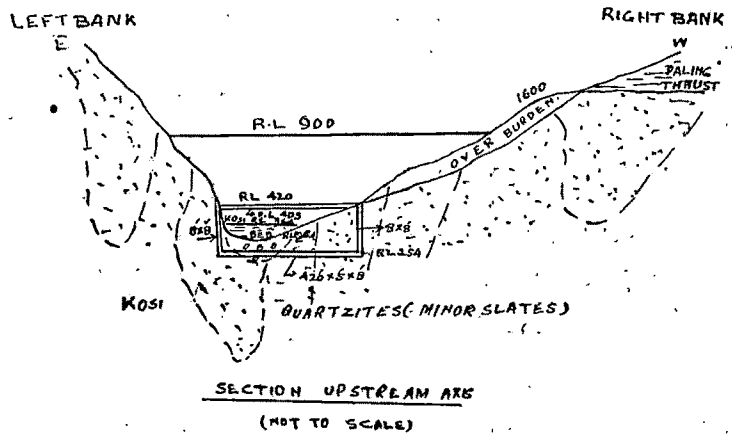
বর্তমানে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি তোলা হচ্ছে। অনেকে হয়ত এটা করেছেন এই বিরাট পরিকল্পনার সমস্ত বুটিনাটি তথ্য না জানার জন্য। আবার কেউ কেউ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে করেছেন বলে মনে হয়। প্রথম আপত্তি হচ্ছে—বাঁধ ধ্বংস পড়ে কয়েক হাজার বর্গমাইল জায়গা ধ্বংস হবে এবং হাজার কয়েক লোক মরবে।

কেউ কেউ আমেরিকার সার্গা স্রব্দ নদীর উপরের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ষ্টেটসম্যান পত্রিকাও দেখছি অনেকটা সেই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরা বিহারের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন—“অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই পরিকল্পনার কাছে অগ্রসর হওয়া উচিত। এ বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায় তা হলে ভাগলপুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কলিকাতারও ক্ষতি হতে পারে।” • সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার সংপরামর্শ অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। আমার মনে হয়, এই সব অহেতুক আশঙ্কা ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং কর্মক্ষমতার প্রতি অনাস্থাপ্রসূত। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগে পূর উন্নতিলাভ করেছে যাতে এরূপ ধারণার কোন সম্ভাব্য কারণ আছে বলে মনে হয় না।

এমনি ধরনের ব্যাপার ঘটে তখনই যখন বাঁধের ওজন তার ভারবহন ক্ষমতার চেয়ে বেশী হয়; অথবা বাঁধের নীচে কিংবা ছ’পাশে এমন পাথর থাকে যার ভিতর দিয়ে জল চুইয়ে যেতে পারে এবং চোরাবার সময় ঐ পাথরেরও কিছু অংশ খুঁয়ে নিয়ে যেতে পারে। অথচ ঐ সব ক্ষেত্রে জলনিরোধ করবার এবং পাথরের শক্তি বৃদ্ধি করবার মত বিজ্ঞানসম্মত কোন আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। আজকালকার দিনে কোন বাঁধ তৈরি করার আগে এই সমস্ত বিষয় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদগণ সমবেত ভাবে সম্পূর্ণ অমু-সন্ধান করে এবং মডেল তৈরি করে তার উপরে পরীক্ষা চালিয়ে সমস্ত বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নজা তৈরি এবং বাঁধের স্থান নির্ণয় করেন।

কোশী বাঁধ লম্বায় হবে ১,৯৮৫ ফুট, ভিতের সবচেয়ে নীচ জায়গা থেকে উচু হবে ৭৮০ ফুট। চওড়া হবে তলাতে ৮৪৮ ফুট; উপরে ৩৫ ফুট। বাঁধের ভিত্তি এতখানি কংক্রিটের ভার সহ্যে পারবে কিনা সেটা পরীক্ষা করেছেন শ্রীযুক্ত কে. কে. দত্ত, এম-এসসি সহকারী ভূতত্ত্ববিদ; মিঃ ডে. বি. অডন তত্ত্বা-

বহারক ভূতত্ত্ববিদ এবং শ্রীযুক্ত পি. সি. দে হাজারা বি-এসসি, (লণ্ডন), এ-আর-সি-এস বর্তমান তত্ত্বাবহারক ভূতত্ত্ববিদ। আমেরিকার বহু বড় বড় বাঁধ নির্মাণ সম্বন্ধে হাজারা মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বাঁধের ভিত্তির নীচে থেকে ড্রিলিং করে পাথরের নমুনা তুলে এনে এবং বাঁধের ছ’পাশের দিকে বহু ছোট ছোট স্রব্দস্ খুঁড়ে, সেখানকার পাথর পরীক্ষা করে তাঁরা যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এই :—“বাঁধের ভিত্তির নীচে ৫০ ফুট পুরু কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তর আছে। তার ভিতরে ভিতরে সামান্ত প্লেটের পরদা এবং কনগ্লোমারেট চূর্ণ-



পাথর আছে। এর ভার-বহন-শক্তি যথেষ্ট।* এই পাথরের স্তরগুলির অবস্থান এমনি যে তাদের ধ্বংসে পড়ার বা তাদের ভিতর দিয়ে জল চুইয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এটা সত্য যে, কোশী অত্যন্ত দুর্দান্ত নদী এবং যে জায়গায় বাঁধের স্থান নির্ধারিত হয়েছে সেটা ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থানের সরিকটে। তাই ভূতত্ত্ববিদগণ কোশীগর্ভের নিম্নতম স্থান থেকে ৩০ ফুট নীচে দিয়ে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ৪২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট উঁচু একটি স্রব্দস্ খোঁড়ার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। এ কাজটা কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছে (চিত্র দেখুন) এটা হয়ে গেলে ভূতত্ত্ববিদ এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ, বাঁধের সম্পূর্ণ ভিত্তি পরীক্ষা করে নিশ্চুত ভাবে পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন। পাথরের ভিতর তখন সামান্তমাত্র দুর্বলতার নিদর্শন পেলো মানুষের শরীরে ইন্জেকশনের তার পাথরের ভিতর তরল সিমেন্ট চালিয়ে (Grouting) তাদের একীভূত করে ভিতের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া চলবে। তা ছাড়া এই সিমেন্ট চালানোর ফলে ভিত্তির এবং ছ’পাশের চারদিকে জল-নিরোধক সিমেন্টের একটি পাতলা পরদা গড়ে উঠবে। কাজেই এই ধরনের আশঙ্কাজনক ব্যাপার যে ঘটবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

* পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই পাথর প্রতি ঘন ইঞ্চিতে ১৪'৪৪ টন ভার সহ্য করতে পারে।

একথা এখানে বলা উচিত যে, বাঁধের ভিত্তির সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য নদীর নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দেবার মত নিখুঁত অমূল্যমান অস্ত্র কোন বাঁধ তৈরির আগে করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। এ সত্ত্বেও এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এরূপ ভীতি-উৎপাদক প্রচারকার্য সত্যই পরিতাপের বিষয়।

দ্বিতীয় আপত্তি—যেখানে বাঁধ তৈরি হবে তা ভূকম্পনের উৎপত্তি-স্থলের সরিকটে অবস্থিত। তাই এক দিন হঠাৎ ভূকম্পনের ফলে বাঁধ ভেঙে অনর্থ ঘটাবে। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার-গণ—যারা এরূপ সুহৃৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাঁরা এত বড় একটা বিষয় ভুলে যাবেন এমন ধারণা লোকের মনে আসা সমীচীন নয়। যা হোক, প্রত্যেক বাঁধের পরিকল্পনা করার সময় এর জন্য অতিরিক্ত সামর্থ্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাৎক্ষণিক বাঁধের জন্য ভূমিকম্প নিরোধের নিমিত্ত অতিরিক্ত সামর্থ্যের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২০ বছর আগে মাণ্ডি ষ্টেটে যে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরি হয়েছে তাতেও এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা যারা তৈরি করেছেন তাঁরা যে এ বিষয়টা ভুলে যান নি তা এই থেকে বুঝা যাবে যে, ভূতত্ত্ববিভাগ এবং আবহাওয়া বিভাগ (Meteorological Department) সমবেত ভাবে এই জায়গার ভূকম্পন বিষয়ক অমূল্যমান (Seismological Survey) করেছেন। বর্তমানে এ জায়গা থেকে অনতিদূরে একটা ভূকম্পন রেকর্ড করার কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা চলছে।

তৃতীয় আপত্তি—বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল নিয়ে। কোশী জলের সঙ্গে যথেষ্ট বাধি এবং পলি নিয়ে আসে। তাই এই জলকে বলা চলে যে, “পান করার পক্ষে বড় গাঢ় কিন্তু চাষ করার পক্ষে অত্যন্ত পাতলা।” সেইজন্য কেউ কেউ বলেছেন যে, মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে এই বাঁধ বাধি ও পলিতে ভরে যাবে। তার মধ্যে দশ বছর ত বাঁধ তৈরি করতেই লেগে যাবে। তাই তাঁরা বলেন যে, এ বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল হবে মাত্র ২০ বছর। জানি না এটা তাঁরা কোন্‌ ভণ্ডার উপর নির্ভর করে বলছেন।

ভারত-সরকারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর অধোধ্যনাথ খোসলা ভারতের এবং ভারতের বাইরে মিশর, আমেরিকা এবং ইউরোপের বহু দেশের নদনদীর পলিবহন বিষয়ে অমূল্যমান এবং গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রতি ১০০ বর্গমাইল জায়গা থেকে প্রতি বৎসর যে ধোয়ানী নেমে আসে তা থেকে ৭৫ একর জমির উপরে এক ফুট পলি জমতে পারে। কোশীতে এই ধোয়ানী আসে ২৩,৮০৮ বর্গমাইল জায়গা থেকে। কাজেই কোশী প্রতি বৎসর পলি বয়ে আনে $\frac{২৩৮০৮ \times ৭৫}{১০০} = ১৭,৮৫৬$ একর ফুট।

কোশী বাঁধের দ্বারা যে জলাশয় তৈরি হবে তার পরিমাণ হবে ৭৩'৭৬ বর্গমাইল। এতে জল ধরবে ১ কোটি ৯ লক্ষ একর ফুট। তার মধ্যে নীচের ২৪ লক্ষ একর ফুট হবে বদ্ধ জল (dead storage)। এই ২৪ লক্ষ একর ফুট ধারণা পলিতে ভরে গেলেও বাঁধের কার্য্যকরী ক্ষমতার কোন ইতর-বিশেষ হবে না। প্রতি বৎসর ১৭,৮৫৬ একর ফুট করে পলিতে ভরলে এই বাঁধের অকেজো ২৪ লক্ষ একর ফুট অংশ ভরতে লেগে যাবে ১৩৪ বৎসর। তা ছাড়া যে-সব জায়গা থেকে ধোয়ানী আসে তার মধ্যে চির-তুষারচ্ছন্ন অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকি জায়গার গাছ লাগিয়ে দিলে জমির ক্ষয় বন্ধ হবে, কলে ধোয়ানীর সঙ্গে পলি, বাধি, মাটি ইত্যাদি কম আসবে। তা ছাড়া বাঁধের জলের উচ্চতম সীমার (highest pond level) উপরে কোশীর ঐ তিনটা উপনদীতে কয়েকটি ছোট ছোট বাঁধ (Check Dams) বেঁধে দিলে এই প্রধান বাঁধের কার্য্যকরী জীবন বছরদিন বেড়ে যাবে; কারণ ঐ বাঁধগুলি পলিতে না ভরে যাওয়া পর্যন্ত প্রধান বাঁধে পলি আসতে পারবে না।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দীর্ঘ পঞ্চাশ-বৎসর পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হয়েছে যে, ৬৮০ ফুট উঁচু তাৎক্ষণিক বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল হচ্ছে ৩০০ বছর। তখন লোকে কি করে মনে নিতে পারে যে, ৭৮৩ ফুট উঁচু (পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ) কোশী বাঁধের কার্য্যকরী জীবনকাল হবে মাত্র ২০ বছর?

উদ্দেশ্য	তাৎক্ষণিক বাঁধ	কোশী বাঁধ
কতটা জায়গার ধোয়ানী আসে	জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচ বস্তা নিরোধ	জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচ, বস্তা নিরোধ
বহুদায় কত জল আসে	২২,০০০ বর্গমাইল	২৩,৮০০ বর্গমাইল।
জলাশয়ের পরিমাণ	সেকেন্ডে ১৩,২,০০০ ঘনফুট	সেকেন্ডে ২,৪০,০০০ ঘন ফুট।
বাঁধে জলের পরিমাণ	৫২ বর্গমাইল	৭৩ ৬৭ বর্গমাইল।
বাঁধের উচ্চতা	৭৩,৮০,০০০ একর ফুট	১,০২,০০,০০০ একর ফুট।
সেচব্যবস্থা	৬৮০ ফুট	৭৮৩ ফুট।
প্রধান খাল	৬০ লক্ষ একর	৩০ লক্ষ একর।
বিদ্যুৎ-উৎপাদন	২৪০ মাইল	১,৩২০ মাইল।
	৪ লক্ষ কিলোওয়াট	২০ হাজার কিলোওয়াট (সর্বদা)
		৪৫ হাজার কিলোওয়াট (কোন কোন ঋতুতে)

কাছের মানুষ শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ ঠিক বাইশ বছর হতে চলল তাঁর চরণছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার। ২২শে নবেম্বর ১৯২৮ থেকে এই ডিসেম্বর ১৯৫০। এতদিন হিলাম তাঁর আলোক-পরিধির মধ্যে, তবু কোন স্বচ্ছ উত্তর পাই নি এই প্রশ্নের যে কি কারণে এমন অসম্ভব সম্ভব হ'ল—কেমন করে আমার মতন চ্যুতিভরা অপূর্ণ সত্যের মন টানল তাঁর মতন অচ্যুত সত্য? শুধু টেনে আনা নয়, ধরে রাখা। তাঁর প্রতিভার দরুন? তাঁর হাতে ছিল “দেবতার দীপ”, যুগে উপলব্ধির জ্যোতি—তাই কি? না, বহুদিন ধরে রেজ্জায়ত বিজ্ঞবাসের ফলে রহস্যের যে এক অনামী মহিমা-মণ্ডল গড়ে ওঠে তার হাতছানি? না, তাঁর চারদিকে যে অপকল্প নৈঃশব্দের ঘেরাটোপ গড়ে উঠেছিল তার অভিভূতি—না, তাঁর শক্তিসামিধ্য, দৃষ্টির আলো আলোক-লোকের বাণী যে আনত বহন করে? না, সেই শান্তিসমুদ্রের ঘোনকল্লোল যা তাঁকে ঘিরে থাকত যেমন প্রলয়পন্থায় নিরাশ্রয়কে? সংসারে শান্তির কাঙালন কে? অথচ—লীলা বটে লীলাময়ের—শান্তি কাছে আসতে না আসতে উঠি আমরা অশান্ত হয়ে:

স্বভাববিযুক্ত ধরা ভাবরূপান্তর-সাধনার;
চিরন্তনের স্পর্শ অহঃসহ মরতার কাছে:
ব্যোম ও বহির সাথে চিরবিসম্বাদ তার—হেন
বিযুক্ততা সহে না দেবতা—তাই তার দেবভয়;
• ওমরে সে অমরার হুঃখহীন স্মৃতি—আলোকের
বর তার যেন প্রায় দ্বৈত করে প্রত্যাখ্যান...
আপনার পক্ষে করে ছ্যলোকের দেবদৌত্যে স্নান:
তারিণী শুভদা করুণার কর সাথে সাথে বাদ,
• • অস্থতির পুঙ্গবে সর্বধরা হত্যায়, লাহনে।*

কিংবা জীবন ও নিয়তি সম্বন্ধে যে গভীর পাঠ তিনি দিয়ে-
ছিলেন এসেছিল তারই টানে—এই বিশ্বাসে যে, ব্যাধির এমন
নিদান দিতে পারে যে মহামানব তারি তো নাম বহুস্তর:
নিগূঢ় বৈরিতা এক বিশ্বপ্রগতির নিয়ন্তর
করে আক্রমণ; চিন্তা ভাষা কর্মে যায় চিহ্ন রেখে:

* Hard it is to persuade earth-nature's change;
Mortality bears ill the Eternal's touch:
It fears the pure divine intolerance
Of that assault of ether and of fire;
It murmurs at its sorrowless happiness,
Almost with hate repels the light it brings . . .
It sullies with its mire Heaven's messengers:
Its thorns of fallen nature are the defence
It turns against the saviour hands of Grace;
It meets the sons of God with death and pain.
—Savitri, Book I, Canto I—SRI AUROBINDO

প্রতি সাধনার চ্যুতি কলঙ্কের ছাপ চিরাক্রান্ত;

ভাহার অন্ত্যেষ্টি বিনা হবে শান্তি নিষিদ্ধ ধরায়।†

মনে এ ধরনের প্রশ্ন আজও ওঠে বৈ কি—যদিও জানি না এ-সবের জবাব কি। এক সময়ে ভাবতাম বুদ্ধির আলোর চরম মুশকিল আসানের হৃদিস পাওয়া যাবেই যাবে। কিন্তু তখন আমার মন ছিল খতিয়ে বুদ্ধিরই পূজারী বলব। কিন্তু আজ নেই আর বুদ্ধিতে সে অটল আস্থা। থাকবে কেমন করে—এই বাইশ বৎসর ধরে এমন একটি মাছঘের সঙ্গে লড়াই করার পরে (বুদ্ধির) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে যায় জুড়ি ছিল না। আমি ত আমি, বুদ্ধির ভর্তুকিরে তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন কোন্ মহারথী? কার তুণীরে ছিল অমন যুক্তিহস্তা উপলব্ধির, দৃষ্টির নারায়ণাঙ্গ?

যুক্তির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে আশ্রমবাসের সেই প্রথম দিককার কথা—যখন ভগবানে সবে একটু ভক্তিবিদ্যাস এসেছে—অথচ মন তবু কেন জানি না খুঁশি হয়ে ওঠে ভগবানকে কেউ যুক্তিবাণ দিয়ে বিধেছে দেখলে। শ্রীঅরবিন্দ বহু পক্ষে আমাকে লিখেছেন ভাগবতী চেতনাকে মানবিক চেতনা বুঝতে পারে না যদি সে তার মানবিক চেতনাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। তাই ত আমরা পদে পদে ভগবানকে ভুল বুঝি। মনে পড়ে শ্রীমার কথা। বুদ্ধের দর্শন তিনি প্রায়ই পেভেন—বলেছিলেন আমাকে। একবার বুদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন:

“আজ

ওঠো বলকিয়া আপনার কিরণের পরিমায়।

ঝটিকার কেন ভয়?

সমীরণ আমাদের ভুট হতে দূরে ল'য়ে যায়

শুধু

এসে দিতে আরো ব্যাপ্ত বিশ্বপরিচয়।

ঈশ্বরী করুণা তব উজ্জ্বল দিবে না ছ'হাতে?

—প্রেমের ঐশ্বর্য-উৎস পারে কি ফুরাতে?

কেন কুণ্ডা তবে?

পাছে ভুল বোঝে সবে?

কবে হার

দেখেছ—মানবমন বুঝিগছে ভবে দেবতার?”‡

সাবিজীতে গুরুদেবও একথা বারবারই লিখেছেন—যে

† A secret enmity ambushes the world's march;
It leaves a mark on thought and speech and act:
It stamps stain and defect on all things done;
Till it is slain peace is forbidden on earth.

—Savitri: The Book of Fate—SRI AUROBINDO

‡ শ্রীমার করানী অতুলেখন থেকে অন্তিত। সমস্ত প্রার্থনাটি “অর্ধ্য” নামক কাব্যগুচ্ছে ছাপা হয়েছে আশ্রম থেকে।

মানুষ মানুষ বলেই ভগবানকে চান না বুঝে। মুখে বলে পারি না বুঝে। কিন্তু গুরুদেব বলতেন (যে কথা বারবার ঠেকে শিখেছি) যে, আমাদের ‘পারি-না’-র মধ্যে প্রায়ই ‘চাই-না’ থাকে লুকিয়ে। তাই ত ভগবানের ভাগবতী শক্তিকে ব্যঙ্গ করে মানুষের এত তৃষ্ণা, তাঁর লক্ষ সৌরভগং-চালিনী প্রতিভার ক্রিয়াকলাপকে আমাদের দেড়পোয়া বুদ্ধির বাটখারা দিয়ে মাপবার এত স্পর্ধা, অহংকার। তার উপরে আমি বিজ্ঞান একটু-আটু পড়েছিলাম, কাজেই ঈশ্বর অসিদ্ধ—“প্রমাণাত্যাবৎ” এ জাতীয় বৈজ্ঞানিক আদ্যমস্ত্রে সাড়া একটু দিয়েছিলাম বৈ কি? ভাবটা—বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু বিশ্বাস না করতে পারলেই বেশি মুশি হয়। শুনতে হয়ত একটু অদ্ভুত, কিন্তু অকরে অকরে সত্য।

এছেন ছ’নৌকার পা দিয়ে যখন পার হতে চেষ্টা করছি সেই সময়ে আনাতোল ফ্রাঁসের *Dieux Out Sif* (দেবতার। তুষার্ত) উপজ্ঞানটি হাতে পড়ে। তাতে ব্রতো বলে একজন রসিক ভাগবত-ক্ৰটিক বলে :

“Ou Dieu veut empêcher le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il le veut et le peut. S’il le veut et ne le peut, il est impuissant; s’il le peut et ne le veut, il est pervers; s’il ne le peut ni ne le veut, il est impuissant et pervers; s’il le veut et le peut, que ne le fait-il, mon pere?”

অর্থাৎ—

“হয় ঈশ্বর করতে পারেন দুঃখ নিরারণ,
শুধু শক্তি-নেই—তা হলে অক্ষম সেজন।
পারেন তিনি খুবই, শুধু চান না—যদি হয়,
বলতে হবে এমন হরি হিংস্রক নিশ্চয়।
চান না এবং পারেন না এই কথাই যদি ঠিক,
বলব তিনি অক্ষম এবং হিংস্রক—ধিক, ধিক।
পারেন তিনি করতে, তথা চানও—যদি হয়,
করছেন না কেন—পারেন বলতে মহাশয়?”

গুরুদেবকে ফরাসী প্রায়টি উদ্ধৃত করে লিবি : “গুরু। কি বলেন? একটু হাসলেনই বা। আর যদি সম্ভব হয়—একটা জবাব দিন না এ মোক্ষম প্রশ্নের।”

পরদিনই এস জবাব—মোক্ষমের উত্তর মোক্ষম প্রত্যয় :

“আনাতোল ফ্রাঁসের কথা সর্বদাই মজার বৈকি—তা তিনি ভগবানের সম্বন্ধেই লিখুন, বা খ্রীষ্টানিটির সম্বন্ধেই লিখুন বা বুদ্ধিবাদী পাশবিক মানবতার বুদ্ধির তথা আচরণের বোকামির সম্বন্ধেই লিখুন। কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে যখন ভগবানের দেখা হয় (কোন এক বিজ্ঞপের স্বর্গেই হবে, কাল মার্কসের স্বর্গে হবার কথা নয়—যত্নের পূর্বে তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও) তখন ভগবান তাঁর নিজস্বতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা তুমি শোনো নি বুঝি?

ভগবান তাঁর কাছে সরাসর গিয়ে বললেন : ‘ও আনাতোল! তোমার নাস্তিক ঠাট্টাটি মোক্ষম হয়েছে, মানভেই হবে; কিন্তু হয়েছে কি, আমার নিজস্ব থাকার খুব সম্ভব কারণ ছিল। একদিন যুক্তিদেবী এসে আমাকে বিষম বমকালেন : ‘দেখ হে, তুমি আছ এ ভান কর কেন? তুমি বেশ জান তুমি নেই এবং কোনদিনই ছিলে না। আর যদি তুমি সত্যিই থাক তা হলেও তুমি তোমার স্বষ্টি নিয়ে যে অনাস্বস্তি কাও করেছ তারপরে তোমাকে আমরা আর বাহাল রাখতে পারি নে। যেই তুমি সরে যাবে সেই জগৎ হয়ে দাঁড়াবে চমৎকার—সাবাস থাকে বলে। আমার মেয়ে বৈজ্ঞানিক দেবী ও আমি সব ভোড়জোড় ঠিক করে রেখেছি। তুমি যেতে না যেতে মানুষ তার দীপ্ত শির উঁচু করে চলবে—‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ এই তথ্য পরে, মহিমায়িত ও স্বাধীন হয়ে, সাম্যভাবাপন্ন, ভ্রাতৃত্বাপন্ন, গণতান্ত্রিক হয়ে, নিজের বাইরে আর কারুর মুখ না চেয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজের চেয়ে আর কাউকে বড় বলে না মেনে। তখন না থাকবেন ভগবান না দেবদেবী, না পাণ্ডাপুরুষ, না ষষ্ঠাচরণ। তখন লুপ্ত হবে সব অভ্যাস, দারিদ্র্য, যুক্তিগ্রহ। যন্ত্রতান্ত্রিকতার বরে জগৎ প্রাচুর্য্যে উঠবে টাইটনুর হয়ে, বাণিজ্যের হাওয়ার লক্ষ্মীর সোনার পাখা হবে সর্বগামী, বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুণে অজান হবে নিশিচ, মানুষের মস্তিকে সূচতার বা অযৌক্তিকতার পদার্পণ হবে অবাস্তব। মানুষ হবে বিদগ্ধ, স্বায়ত্ত, বুদ্ধিবাদী, বৈজ্ঞানিক, প্রাজ্ঞ—সবকিছুর সবটা জেনে শুনবে ও বিচার করে পৌছবে জেনে জেনে যথাযথ সিদ্ধান্তে। বৈজ্ঞানিক ঔষা বিশেষজ্ঞদের ভারসর সর্বত্র পড়বে ছড়িয়ে—ছাড়বে না মানুষকে পাবিব স্বর্গে সরাসর পৌছে না দিয়ে। একেবারে নিখুঁত সমাজ। জেনে জেনে হবে স্বাস্থ্যবান অতিবিকশিত; চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধানের গুণে; সবকিছু হবে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত, বিজ্ঞান উঠবে চূড়ান্ত, হবে অজ্ঞাত, সর্বক্ষম ও সর্বজ্ঞ। প্রজেলিকার হয়ে যাবে সমাধান; বিশ্বমানবতার আমদরবার, নিখিল জাতিসমূহের প্রতিষ্ঠা; বিবর্তনের ফলে মানুষ, মহতো মহীয়ান মানুষ, চলবে প্রকৃতির পথে যার চরম পরিণতি হবে মহান্ শ্রেষ্ঠজাতিদের মধ্যে, মানবিক দৃষ্টান্তে হাত ধরে বীরে বীরে উঠিয়ে আনবে তারা তাদের কৃষ্ণ ভাজ ও লীলাভ ভ্রাতৃগণকে; শান্তি; শান্তি; শান্তি! যুক্তি, ব্যবস্থা, ঐক্য হবে বিশ্বতোষার্থ। আনাতোল! এইভাবে আরও কত কি যে তিনি করলেন ঘোষণা। শুনে আমার মনে হল, ‘বা, বা! কি চমৎকার!’—আর সুবিধেই কি কম? ভেবে দেখ, আমাকে না হবে কিছু করতে, না হবে কিছু দেখতে শুনতে। কাজেই আমি সব কাজ থেকে মিলাম নিজেকে গুটিয়ে—কারণ তুমি জান, আমি বরাবরই স্বভাবে একটু প্রহান-প্রবণ, সুদিনের যুগেও নিজেকে একটু পর্দানীন

করে বা পিছন দিকে রাখতে ভালবাসি। কিন্তু এ কি শুনি আজ? যে-সব খবর কানে আসছে তাতে ত মনে হচ্ছে না যে, এমন কি বিজ্ঞানের সাহায্য পেয়েও যুক্তিদেবী তাঁর প্রতিভা পূর্ণ করেছেন? যদি না করে থাকেন তবে কেন করেন নি বলবে আমাকে? কারণ কি এই যে তিনি করতে চান নি, না পারেন নি? না, তিনি চানও নি, পারেনও নি? না, তিনি চেয়েছিলেনও বটে, পারতেনও বটে, কেবল যে-জন্মেই হটুক হরে ওঠে নি। তা ছাড়া দেখ আনাতোল, বিজ্ঞান ও যুক্তিদেবীর এই সম্মানগুলি—রাষ্ট্র, যন্ত্রশাস্ত্রিকতা, ধনতান্ত্রিকতা—এদের রক্ষণসকল যেন কেমন কেমন লাগে: যেন এক অতিকায় রাক্ষস, তার উপর হাতে পেয়েছে বুদ্ধির শক্তিসামর্থ্য তথা বিজ্ঞানের সরঞ্জাম, সাজসজ্জা! অথচ আশ্চর্য্য, কই মনে ত হয় না যে, রাজা ও ধর্ম্মের যুগে মানুষ যতটা স্বাধীন ছিল তার থেকে সে আজ বেশী স্বাধীন হতে পেরেছে। ব্যাপার কি? কিংবা এও কি সম্ভব যে যুক্তিদেবী না সর্ব্বৈসর্কারী, না অজ্ঞান—এমন কি আমার চেয়েও বেশী অনাস্থি কাণ্ড করে বসেছেন তিনি নবস্থিতি করতে গিয়ে? তাঁদের কথালাপের রিপোর্ট এই পর্য্যন্তই পেয়েছি আমি; জানি না এর কতটা সত্যি—কারণ ত্রে ভগবানের ছবি আনাতোল ফ্রাঁস এঁকেছেন তাঁকে আমি নিজে চিনি না।*

কিন্তু এই যে দীপ্ত মনীষা, মহান ব্যক্তিরূপ তার দিশা দেব কেমন করে তাদেরকে যারা জানে নি এ অপকৃপ মানুষটিকে কোন দিনও? না জানলে তাদের জানানো যাবে কি করে কেন তাঁর পাশে মস্ত সব দীপ্ততম তুঙ্গতম প্রতিভাকেও মনে হ'ত বামন? তা ছাড়া জানাতে চাই এ স্পর্ধাই বা কেন—যখন নিজেই ভাল করে জানি না কিসে কি হয়—এমন কি কোন্‌ টানে এসেছিলাম তাঁর কাছে তারও পুরো খবর পাই নি মনকে প্রশ্ন করে? মোমাছি ফুলের কাছে আসে মধুর টানে, কিন্তু তার পিছনে থাকে তার প্রাকৃতিক সহজাত সংস্কার। কিন্তু আমি? আমি কেমন করে টের পেলাম তাঁর আঙুরে আছে অক্ষয় অমৃত? কোন্‌ সংস্কার এ? অন্তত বুদ্ধির নয় এ নিশ্চয়—কেননা বুদ্ধিই ত ছিল আমার এ বিশ্বাসের পরম ও চরম বৈরী যে একলা যে-মানুষ রয়েছে বছরের বছর, না করে দেখা, না কয় কথা, না লেখে চিঠি—এহেন মানুষ কোনও কাজে আসতে পারে বিশ্বাস্যবের। রাসেলের ভক্ত আমি চিরদিন। তাঁর কথা চিরদিনই মনে হয়েছে অকাটা যে, “প্রকৃতি মানুষকে গড়ে তোলেন নি একলা দাঁড়াবার জন্যে।”† অথচ কি বলা যাবে এহেন অভূত মানুষের

সাধনাকে যে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়ে দিল একটামাত্র ঘরে—কাকুর সঙ্গে দেখাশুনা না করে বললেই হয়! জগতে কত কি কাণ্ড ঘটে গেল অথচ তিনি জানলেন না কিছুই। শুনে-ছিলাম তিনি নাকি কোনও দিন সিনেমা পর্য্যন্ত দেখেন নি। জলময়ী ভেনিস নগরীতে এমন মানুষ নাকি আজও মেলে যে চর্ম্মচক্রে কোনও দিন ঘোড়া দেখে নি। খ্রীঅরবিন্দের কখনও সিনেমা না দেখা আমার কাছে তার চেয়েও অকল্পনীয় মনে হ'ত। মনে হ'ত বাস্তবপরায়ণ। এহেন বর্ণালী মূর্খির মৌন ব্যাখ্যানে ছিন্নসংশয় হবে ক'জন মেধাবী?‡ এভাবে একলা থেকে জগতের উপর কি প্রভাবই বা তিনি বিস্তার করতে পারবেন? অবিশি কখনও কখনও ভক্তির ভাবোদয়ে—মনে হ'ত: পারবেন না বলি কেন? চোখের দেখাকে ত বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে না। কাজেই সম্ভব অসম্ভবের ব্যাপারে ইঞ্জিয়পুষ্ট বুদ্ধির রাসকে প্রামাণ্য মনে করতে গেলাম কি হুঃখে? কিন্তু উঃ, ব্যবহারিক বুদ্ধিকে এত সহজে নাকচ করা চলে না। তাই ভক্তি-বিশ্বাসের রঙীন প্রহর কেটে যেতে না যেতে আস্ত নেশাভাঙার পরের অবস্থা—the morning after—তখন ছেয়ে আস্ত মনে বর্ণাঢ্য আবেশের প্রতিক্রিয়া—কিনা ধূসর সংশয়। মনে হ'ত তখন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা: “বিশ্বাসের কি একটা লিমিট থাকবে না দিলীপ?” মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথের কথা: “কবির মুশকিল এই যে অতীন্দ্রিয়লোকের গুণবের আভাস না পারে সে বিশ্বাস করতে, না অবিশ্বাস করতে।”

এই নিয়েই বা ভুগেছি কি কয়? এক দিকে অবিশ্বাসীর জেরা শুনে পায় হাসি, মনে পড়ে খ্রীঅরবিন্দের আমাকে লেখা একটা চিঠি:

“But if the intellectual mind is inferior (to spiritual experience), how can it challenge, judge, make the Divine stand as an accused or a witness before its tribunal, summon Him to appear as a candidate for admission before a Board of Examiners or pin Him like an insect under its examining microscope?”†

(“বুদ্ধি যদি অধ্যাত্মের চেয়ে ছোট হয় তবে কোন্‌ স্পর্ধায় সে ভগবানকে আসামী করে কাঠগড়ার দাঁড় করাত্তে

* চিত্রং বটরোহুর্লে বুদ্ধা: শিষ্যা গুরুযুবা।

‡রোহো মৌনব্যাক্যানং শিষ্যন্ত ছিন্নসংশয়া: ॥ (শঙ্করাচার্য্যের দক্ষিণমূর্ত্তি স্তোত্র)

বড়ই আশ্চর্য্য যে বটরুক্ষের মূলে শিষ্যেরা দেখি বুদ্ধ, আর গুরু হলেন বুবা।

গুরুর মৌন বেই হ'ল কিনা ব্যাখ্যা—অথচ তাতেই কিনা শিষ্যদের সংশয় হ'ল ছিন্ন!

† মূল পত্রটি আন্তর্জাতিক আমেরিকান এডিশন *Among the Great*-এ ছাপা হয়েছে: ২৪৫-৫০ পৃষ্ঠা।

* খ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরেজী পত্রটি আমেরিকান সংস্করণ *Among the Great*-এ ২৫১-৫০ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

† “Nature did not construct human beings to stand alone.”—*Marriage and Morals*, Chap. 9.

—BERTRAND RUSSELL

চায়—যেন ভগবান উমেদার, তাঁকে ষাণ্ণবিধি জেরা করে তবে বাহাল করা যেতে পারে, অথবা পিন দিয়ে বিধে বৈজ্ঞানিক মাইক্রোস্কোপের সামনে ধরে তবে পরীক্ষা করতে হবে।”) অতঃমুখে অভিবিশ্বাসীরা দেখি তাবে ত্রীশ্রবিন্দ যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন (যদিও ত্রীশ্রবিন্দ লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, “I do not deal in miracles.” “আমি জোজ-বাজি নিয়ে কারবার করি না।”) ধরে নেয়—তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান। এক মাতোয়ারির কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভু এসেই আশ্রমের এক সাধককে জিজ্ঞাসা করলেন : “কৌন্ কামরা ?”

—“এ দোতলায়। জানলা খোলা ?”

—“বিস্ বরস্ ?”

—“তব্ ক্যা ?”

চোখ বড় বড় করে মহাবিশ্বাসী বললেন চুপি চুপি : “ক্যা ? উড় জাতা ?”

এ ধরনের বিশ্বাস ত্রীশ্রবিন্দ চাইতেন না এ কথা আমি শুধু জোর করে বলা নয়—প্রমাণ করতে পারি—কিন্তু তবু বহু বুদ্ধিমানের মধ্যেও দেখছি যা তা বিশ্বাস করার হুর্দমনীয় প্রবৃত্তি—তা আবার বড় বড় প্লোফের খাঁড়ি উঁচিয়ে—সাবধান, নইলে—। এঁরা ভাবেন এরই নাম যথার্থ গুরুভক্তি, আহুগত্য—জয়লাট। স্তনতে স্তনতে প্রায়ই আমার মনে হ’ত—আমার মতন ডিসলরাস শিষ্য বুঝি ভুত্বারতে ছুটি নেই। বহু ভুগে ও পোড় খেয়ে ক্রমশঃ বুঝেছিলাম—গুরুদেবের আখাস পেয়ে আরও—যে উদ্ভটপৌরাণিক ও অধ্যাত্মবাদী সমার্থক নয়। কিন্তু তবু বুদ্ধির অহঙ্কারে আঘাত লাগতে না লাগতে মন তুলত শিরপা—তথাকথিত মানবপ্রকৃতির ধরণধারণ যে খুব ভরসাপ্রদ নয় কেনেও এ প্রকৃতির অদলবদল করতে চাইত না কিছুতে। অথচ মজা এই যে, ত্রীশ্রবিন্দকে দেখবামাত্র বা তাঁর চিঠিপত্র পেতে না পেতে মনে জেগে উঠত এমন এক ভাবের জোয়ার যে তখনকার মত সব সংশয়ের ষড়কুটে পলিমাটি কোথায় যে যেত ভেসে। উচ্ছ্বাসের সে-কর্ণায়ু লগ্নে সাধারণ মানবপ্রকৃতি বা লৌকিক বুদ্ধিতে আস্থা হারানোর জেতে নিজেই একটুও মনে হ’ত না নিরাশ্রয়। বাইরের জগতে হিংসার তুফান চলেছে ত চলেছেই—মাকে মাকে বাঁধ ভাঙে, তার পর স্তর হয় ফের মারণ-স্রোতের বিরুদ্ধে কি ধরনের অতিকায় বাঁধ দেওয়া যায় তার জল্পনা-কল্পনা।

ত্রীশ্রবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ঋণিকতা স্বায়ত্ত হতে না হতে সত্যিই যেন দেখতে পেতাম যে বুদ্ধির মেরামতে কোনো স্থায়ী শোধনের বা স্বজনের কাজ হবে না হতে পারে না। অম্মনি মনে হ’ত—তা হলে বুঝি বুদ্ধি ছাড়া অস্ত্র কোনো বন্দরে এনে-ছেন তিনি অজান্তে আমার নাহেহাল ধোয়াকে টেনে। একথা যার মনে হয় সে যা জানে বলে মনে করে তার চেয়ে বেশি জানে না ত কি ? অস্ত্র ভাষায়, আমি নিজেই যে ভাবে এসেছি যদি সত্যি আমি তাই হতাম তা হলে আমার মনোবাসী বুদ্ধি-মস্তের আপত্তিকে নিরস্ত করে আমারই মধ্যকার কৌন্ শক্তি ? কেন আমি এমন অভিভূত হই ত্রীশ্রবিন্দের সাধনলব্ধ বাণীতে :

মানব। বহন করো এ বিশ্বের বেদনাবিশান,
হৃৎখার্তা ধরার অভি-দুর্গম এ যাত্রাপথে তব
অন্নরার মহাশক্তি হোক তব আত্মার নির্ভর,
হও উর্দ্ধ সত্যমুখী, প্রেমের শান্তির সুরাশী।
অন্নায়ু আনন্দ তুমি লভিষ্যাহ নভোলোক হতে,
ক্ষণিকের দিব্যস্পর্শ—দৈনন্দিন মানব-জীবনে,
প্রতিদিন হোক তব ভীর্ণব্রত-উদ্দ্যাপন সম।*

বুদ্ধির অভিমানে যা লাগলে যখনই বাজত তখনই মনে হ’ত তিনি যে বুদ্ধিলোকের মস্ত্রীকে চরম দিশারি মনে করেন না একথা কেনেও তাঁর শরণাপন্ন হতে গেলুম কি হৃৎখে ? বুদ্ধি যতই কেন ‘না না’ করুক এতে ওতে তাতে—যতই কেন না মনে করি এ নিষেধের রাশ ধরে আছে সাবধানী মন—তবু সেই উন্টো পথেই উধাও হতে চাই কেন কেনেস্তনে যে এ পথের দিশারি বুদ্ধি নয়—এ ডাক বুদ্ধির বোধগম্য নয় ? তাই না এ ডাকে আমি সাড়া দিয়েছিলাম সাড়া দিতে না চেয়েও। কেমন ক’রে দিলাম তার কিছু হৃদিস দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু তার আগে এই বিচিত্র উপলব্ধির উপর একটু জোর না দিইই পারছি না যে আমার সজ্ঞার যে অংশ তাঁর এ ডাকে সাড়া দিয়ে-ছিল—আমার অনিচ্ছুক পার্থবুদ্ধি সেই পার্থসারথিকে মানতে না চেয়েও মানতে বাধ্য হয়েছিল না যেনে উপায় ছিল না বল্লেই।

* O mortal, bear this great world's law of pain,
In thy hard passage through a suffering world
Lean for thy soul's support on Heaven's strength,
Turn towards high Truth, aspire to love and peace.
A little bliss is lent thee from above,
A touch divine upon thy human days:
Make of thy daily way a pilgrimage:

—Savitri: Book of Fate—SRI AUROBINDO



অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক বোম্বার ন্যায় কার্যকরী।
দাদেয় মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭



অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শিব, মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, কালিকা, শীতলা, বর্ষা, সারদা, দক্ষিণরায়, সূর্য প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সকল কাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহাদের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। দেবদেবীকে অবলম্বন করিয়া রচিত যে সব ছড়া ও কাহিনী প্রচলিত আছে, গ্রন্থকারের মতে 'প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের মর্যাদায় ইহাদের আর একখানিও উন্নীত হইতে পারে নাই'—তাই তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা বর্জন্যমান গ্রন্থে করেন নাই। পঞ্চাশত্রে গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ, ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব্য ও বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল এই তিনখানি ঐতিহাসিক কাব্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অথচ মঙ্গলকাব্যের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পরিচিত-অপরিচিত বিভিন্ন দেবদেবী-বিষয়ক কাব্য ছড়া কাহিনীর সহিত ইহার সম্পর্ক অন্ততঃ বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া ঘনিষ্ঠতর সন্দেহ নাই। এই সাহিত্যের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়ক কৃষ্ণমঙ্গল এবং দেবসদৃশ যোগী-দের মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক গোরক্ষবিজয়, গোপীচাঁদের পাঁচালি প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা বিভিন্ন পুস্তকের মধ্য দিয়া নিত্যও কম হয় নাই। কিন্তু শনির পাঁচালি, সত্যনারায়ণের পাঁচালি, জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিয়মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মঙ্গলচণ্ডী, ক্ষেত্রপাল, শুভচনী, অসমরনারায়ণী, নিরাকুল বামদেব, ইণ্ডু প্রভৃতি বিভিন্ন লৌকিক দেবতার যে সমস্ত কাহিনী এখনও মহিলাদের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচলিত সেগুলির সামান্য কিছু কিছু বিবরণ বিভিন্ন অনতিস্থূলত পত্র-পত্রিকায় ছড়ান রহিয়াছে—এসম্বন্ধে শৃংখলাবদ্ধ বিশেষ কোন আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। অথচ কোন কোন পাঁচালির রচনার মধ্যে কবিত্ব

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না এমন নহে—ইহাদের ছন্দের চাতুর্য ও শব্দসমিবেশের নৈপুণ্য পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কালিদাসের সত্যনারায়ণের পাঁচালির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাহিনীগুলির মধ্যেও অনেক স্থলে প্রাচীনকালের বাঙালী-সমাজের সুখ-দুঃখের অপরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালীর লৌকিক ধর্ম্মাভিমানের ইতিহাসের দিক দিয়া ইহাদের মূল্য সর্বোপরি। এইরূপে নানা দিক দিয়া মূল্যবান এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত হইলে ইহা পূর্ণাঙ্গ হইত বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের আলোচনার উপক্রমে গ্রন্থকার লৌকিক দেবতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, লৌকিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক তথ্য জ্ঞানিবার আশা ছিল।

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থগুলি যে অবস্থায়, যে আকারে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে তাহাতে তাহাদের আসল রূপ, রচনাকাল ও রচয়িতাদের পরিচয় নির্ধারণ করা অতি দুঃস্বপ্ন ব্যাপার। যাহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। আলোচনাকারীদের অশোভন পক্ষপাতভেদের জন্য এককল আলোচনার ফল কোন কোন ক্ষেত্রে বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। যেমন, একজন বঙ্গমূল ধারণা—‘সংস্কৃতিবিহীন’ পূর্ববঙ্গে কখনও কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয় নাই বা হইতে পারে না—প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যাহা কিছু ভাল তাহা পশ্চিমবঙ্গের অথবা যাহা কিছু পশ্চিমবঙ্গের তাহাই উৎকৃষ্টতর। এই অজুহাদ ধারণা তাঁহার শ্রমবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাকে অনেক স্থলে বিকৃত ও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে—পরমত সম্বন্ধে তাঁহাকে অসহিষ্ণু ও উগ্র করিয়া তুলিয়াছে। সুখের বিষয়, বর্তমান গ্রন্থকারের লেখার মধ্যে এইরূপ ক্রটির সম্ভাবনা পাওয়া যায় না—বিরোধী মত খণ্ডনের সময়েও তিনি অসংযত ও অসঙ্গত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তবে অনেক স্থলেই তিনি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মত বণ্ডন ও সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রতিষ্ঠা করিলেও মাত্র বার দুই পাদটীকায় (পৃ. ৫৯৫, ৬৭১) অল্প প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। অবশ্য সেন মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে একবারও ডাউচার মহাশয়ের নাম বা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সে স্বতন্ত্র কথা।

১। অবশ্য এই আলোচনার সকল অংশের যুক্তি, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ও তর্কাতীত বলিয়া মনে হয় না।

হিন্দুর ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই শাস্ত্র ও প্রচলিত রীতিবিরোধী কথা বলিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগিতা এই সব কার্যে অপরিহার্য। ডাউচার মহাশয়ের গ্রন্থেও এ জাতীয় ক্রটি কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। ধ্যান শব্দ-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ. ১৩৫, ১৪৭), কাত্যায়নকে ঘোড়শ-মাতৃকার অন্ততম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে (পৃ. ৬৭২)। খুঁটিনাটি হইলেও এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। তাহা ছাড়া, ‘কল্পযজ্ঞ’ নামটি কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও ইহা সাধারণতঃ ‘অতিকায়জ্ঞ’ নামে অধিকতর পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অরণ্যযজ্ঞের ব্রতকথা বলিয়া গ্রন্থকার কোন বস্তুর ইঙ্গিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। রঘুনন্দনের সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি ভদ্রের অন্তর্গত ত্রিংশতত্বকে ‘রঘুনন্দনের রচিত বলিয়া পরিচিত’ এইরূপে উল্লেখ করার (পৃ. ৫৬) হেতু প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। আজকালকার বাংলা গ্রন্থসমূহে প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশে বর্ণাশ্রমের বাহুল্য যেন একটা নিয়মের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান গ্রন্থেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

এই সব সামান্য ক্রটিবিশিষ্ট সত্ত্বেও গ্রন্থখণ্ডি স্থলিবিৎ এবং সুপাঠ্য। ইহার পক্ষে পক্ষে গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্বমোদীর ত কথাই নাই, সাহিত্য-রসিক বাঙালী পাঠকমাত্রই ইহা পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।*

* বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বুতপূর্ব অধ্যাপক ত্রীআশুতোষ ডাউচার এম-এ প্রণীত। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩৫৭। কলিকাতা বুক হাউস, ১১, কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

সত্তা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাংক অফ বাঁকুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাংক জগতে বিরাট বিপ্লব সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিন্দ্রাস ব্যানার্জি

দেশ-বিদেশের কথা

কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সদ্বীতি

একাদশ বাৎসরিক অধিবেশন

গত ৬ই আশ্বিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজ হলে কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সদ্বীতির একাদশ বাৎসরিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। অধ্যক্ষ শ্রীহুবাংকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের প্রভাবে এবং শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্যের সমর্থনে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে পরিচালক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সদ্বীতির একাদশ বর্ষের কার্যবিবরণ পাঠ করেন। সদ্বীতি কর্তৃক অঙ্গীকৃত কবি ভারত-



সভাপতিসহ সাহিত্য-সদ্বীতির কর্মকর্তৃগণ সদস্য

চন্দ্র স্মরণোৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজেঞ্জ শ্রুতিরক্ষা বিষয়ে সদ্বীতির প্রচেষ্টা সাক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কার্য-বিবরণ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সদ্বীতির আদর্শ বর্ণন-প্রসঙ্গে আধুনিককালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধনা ও আদর্শনিষ্ঠার অভাবের কথা উল্লেখ করেন। এই চরবস্থার প্রতিকারের জন্ত তিনি লেখক, পাঠক, গ্রন্থপ্রকাশক এবং সভা সমিতির উত্তোজকগণকে সমবেতভাবে একাত্মিক চেষ্টা করিতে আহ্বোধ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সঙ্কট ও তাহা দূরীকরণের উপায় নির্দেশ করেন। এই বিষয়ে সাধারণের কর্তব্যের কথা তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন।

কবি শ্রীজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয়কে স্বত্ববাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীমতী বৈজয়ন্তী সাত্তাল, শ্রীমতী মঞ্জু সাত্তাল, শ্রীমতী রেণু ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী মাধুরী আচার্য্য ও শ্রীমতী মীনা চক্রবর্তী কয়েকটি সমন্বয়পযোগী সদ্বীতি গাহিয়া সভাস্থ সকলের আনন্দবিধান করেন।

৭ই আশ্বিন সন্ধ্যায় এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু 'হিন্দু সমাজ' বিষয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ধামুয়াতে আদিবাসী ও অহুমত সম্প্রদায়ের
শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন

বাংলাদেশের আদিবাসী ও অহুমত জাতিসমূহের উন্নয়ন-ক্ষেত্রে গত জুন মাসে কলিকাতায় ভারত মহাজাতি মণ্ডলী নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ধামুয়ার সাধনাপ্রাঙ্গনে মহাজাতি মণ্ডলীর অঙ্কভূক্ত, আদিবাসী ও অহুমত সম্প্রদায়ের শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেখানে একটি সভা হয়। মহাত্মা শ্রীনীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি মহাজাতি মণ্ডলীর উদ্দেশ্য ও কর্তব্যপন্থা বিবৃত করিয়া এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির অহুরোধে শ্রীনির্মলকুমার ভট্টাচার্য্য আদিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া বলেন, "মহাত্মা গান্ধী তাঁর গঠনমূলক কর্মবিধির ষোল নম্বর ধারায় আদিবাসীদের সেবাকার্য্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কর্মীর অভাব দেখে তিনি "The harvest is rich but the labourers are few"—অর্থাৎ, 'কসলের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু কর্মীর সংখ্যা বড়ই কম', বলে আক্ষেপ করে-ছিলেন। তাঁর এই আক্ষেপ মেটানোর জেতে দলে দলে কর্মীদের আজ এই সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।"

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, অবিলম্বে এই শিক্ষাকেন্দ্রে আদিবাসী এবং অহুমত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষাদান, কুটীর-শিল্পের প্রবর্তন, আশ্রমের পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য্য, লোকসদ্বীতি প্রচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই শিক্ষাকেন্দ্রে কর্মী তৈয়ার করিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, আদিবাসী ও অহুমত জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে। এই আশ্রমে একটি নারীশিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে নারীদের, বিশেষভাবে আদিবাসী প্রীলোকদিগের লেখাপড়া ও বিভিন্ন রুচিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির স্বামী ভবেন্দ্রনাথের উপর ধামুয়ার শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার সর্বমুখ্য কর্তৃত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টা

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টা গত ১৫ই আগষ্ট পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৩০২ সালে নদীয়া শান্তিপুরের স্তম্ভরাগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিভাগিকার জন্ত তিনি কলিকাতায় আসেন। প্রথম জীবনে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সহিত কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী কার্যে ইন্তকা দিয়া সমাজ-সেবার আত্মনিয়োগ করেন এবং শিক্ষকতার কার্যে ত্রুতী হন। পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র শ্রুতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের

পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্য-সাধনা করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। বিজ্ঞাননাথ শুধু দক্ষ শিকাত্রতীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সুবক্তা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বাংলার বহু বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং “বিশ্ব বৈতালিক” ও “পান্থপাদপ” নামক কবিতার বই দুইখানি বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে। সিঁধি বৈষ্ণব সন্মিলনীর তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। তাঁহার সভাপতিত্বে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সিঁধিতে বহু বৈষ্ণব মহাজনের স্মৃতিসভা অহুষ্ঠিত হইয়াছে।

কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়

গত ২রা ভাদ্র রবিবার চুচুড়ার লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ ব্রজ-বল্লভ রায় স্বর্গত হইয়াছেন। ১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসে কাঁচড়াপাড়ায় সন্ন্যাস বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র রায় চুচুড়ার কবিরাজ ছিলেন। ব্রজবল্লভ সহজাত কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। কয়েক বৎসর চুচুড়ার ক্রী চার্ক স্কুলে ও পরে মূল্যাজোড় সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া তিনি কাব্যকণ্ঠ উপাধি অর্জন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ লোকনাথ মল্লিকের নিকট তিনি চরকাদি আত্মকর্মে-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে বাংলার একজন শীর্ষস্থানীয় কবিরাজরূপে প্রভুত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আহ্বকৃত্যে তিনি সাহিত্যচর্চার বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে সাপ্তাহিক “সুবোধিনী” পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় বাহির হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স ক্রিষ্ণাব্দিক ১৪ বৎসর মাত্র। পরে তিনি “বহুদর্শী” নামে পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তিনি পিতৃতর্পণ, সুধাংগু সন্মিলন, সন্তপ্ত সহোদর, শায়ক-শয়ন প্রভৃতি নাটক, উষামঙ্গল, চুয়া ও চন্দন প্রভৃতি ষণ্ডকাব্য

শ্রীমলিনীকুমার ভদ্রের নূতন বই

আদিবাসীদের বিচিত্র কথা

(সচিত্র) মূল্য—২৮

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক মূল্যবান গ্রন্থ। ইহাতে আছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, বিশেষতঃ বাংলা ও আসামের আদিবাসীদের ঐতিহাসিক বর্ণনা আর খাসিয়া, কাছাড়ী প্রভৃতির মৌরোবান্দল অতীত ইতিহাসের বিবরণ। আদিবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী এই পুস্তকের সর্বপ্রধান আকর্ষণ। অজুঁর ‘কেণ্ডা ডোরা’দের এবং খাসিয়া সামন্ত-রাজা তীরত সিং-এর সশস্ত্র বিদ্রোহ, ভীল-নেতা মোতীলাল তেজাবৎ পরিচালিত মুক্তি-অন্দোলনের কথা বাংলা ভাষার প্রথম এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। নাগা-রাণী গাইডিলিউ, মুণ্ডানেতা বীরসা ভগ্যান সদ্যেও বহু অজ্ঞাত তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দেশবন্ধু বুক ডিপো—৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড, কলি: ৬



ব্রজবল্লভ রায়

এবং আত্মকর্মেদের ইতিহাস ইত্যাদি গভীরগাম্ভীর্যক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রিকাসমূহে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

জ্যোৎস্নাময়ী বসু

গত ২১শে শ্রাবণ সিটি কলেজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ত্রীকেশবচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী জ্যোৎস্নাময়ী বসু মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে পরিবারের এক ভৃত্যের হস্তে নিহত হন। তখন তাঁহার স্বামী নিজের কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজেও আহা করিয়া তাঁহার কর্মস্থল হাওড়ার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে যাত্রা করিতেছিলেন। এমন সময় এই শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। শোকতপ্ত কেশবচন্দ্রকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

বীরেন্দ্রনাথ দাস

গত ২৪শে ভাদ্র বীরেন্দ্রনাথ দাস তাঁহার হাইলাকান্দিহিত বাসভবনে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথের বাড়ী ত্রীহট্ট শহরের নিকটবর্তী আশালিখা গ্রামে ছিল। তিনি বহু বৎসর ত্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ত্রীহট্টের যে সব দেশসেবক ছুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করিয়া-ছিলেন, বীরেন্দ্রবাবু তাঁহাদেরই অঙ্গভূম্য। ত্যাগ, মিঠা ও নিঃস্বার্থ দেশসেবা দ্বারা তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন করিয়াছিলেন।

পুস্তক পরিচয়

পদার্থবিজ্ঞান নবযুগ—শ্রীচরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় সাধারণের উপযুক্ত করে লেখা কঠিন কাজ। একটি কারণ—পারিভাষিক শব্দ যথেষ্ট নেই, যা সম্প্রতি সংকলিত হয়েছে তাও সাধারণের পরিচিত নয়, এবং বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রকাশের রীতিও ভাল করে গড়ে উঠে নি। আর একটি কারণ—বিজ্ঞান (বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান) চর্চার জন্য যে ভিত্তি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক তাও অনেকের নেই। ষাঁরা ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখেছেন তাঁদেরও অনেকে বাংলা বৈজ্ঞানিক সম্বর্ভ দুর্বোধ মনে করেন। বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যান অপেক্ষাকৃত হ্রদাধা, কারণ দর্শন-চর্চার উপযুক্ত ভাষা এবং বহু পারিভাষিক শব্দ আমাদের আছে।

ষাঁরা আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান লিখে থাকেন তাঁদের অনেকে রচনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আরম্ভ করতে পারেন নি। এঁরা ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখেছেন, ইংরেজীতেই ভাবেন, এবং ইংরেজী বাক্যরীতির বধ্যবধ অনুকরণ করেন। এক ভাষা থেকে অল্প ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ অসম্ভব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যরীতির পরিবর্তন করতে হয়, অনেক শব্দের প্রতিশব্দ না দিয়ে অল্প ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়, এইসব বিষয়ে অবহিত না হলে রচনা উৎকট হয়ে পড়ে। Sensitized paper স্থানে 'স্পর্শকাতর কাগজ', Low protein diet স্থানে 'নীচু প্রোটিন খোরাক' ইত্যাদি অন্তত অনুবাদ অনেক দেখা যায়। সহজে বোকা বাবে মনে

করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেন, যেমন 'কোষ্ঠকাঠিন্য জীবাণুর পক্ষে বদুর কাজ করে'। 'বে অণুর মধ্যে যত প্রকারের স্বাভাবিক কাঁপন, তত রকম ভাবে এক একটা আলোকণার থেকে কাঁপন চুরি যেতে পারে'।

যে অল্প কয়েকজন বাংলা ভাষায় সার্থক বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ লিখে যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের শীর্ষে আছেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বহু লোকের মধ্যে এঁর অধ্যাপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। এর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সাত্বনার বিষয় 'এই যে, ইনি কলেজের গণ্ডির বাইরে এসে চূপ করে বসে নেই, ধর্ম্মকর্ম্মেও ডুব দেন নি, নানা ব্যাপারে বাস্তব থেকেও মনোহর মাতৃভাষায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে বিজ্ঞান বিতরণ করছেন।

চারুবাঁবুর নবতম গ্রন্থ পদার্থবিজ্ঞান নবযুগ। জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত যেসব তথ্য আজকাল অদৃশ্য লোকের অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়, যেমন ইলেক্ট্রন, বেতার, রেডিয়াম, আটম ভাঙ্গা-গড়া, আটম-বোমা, আপেক্ষিকতা-বাদ প্রভৃতি, তারই বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে আছে। পদার্থবিজ্ঞান অল্প অর্থাৎ মাপজোখের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনেকে লেশমাত্র অল্প সহিতে পারেন না। তাঁরাও নির্ভয়ে এই বইটি পড়তে পারেন। গ্রন্থকার অল্প পরিহার করে অতি সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থ পড়লে পাঠক বিস্ময়াবিষ্ট হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দলাভ করবেন।

শ্রীরাজশেখর বসু



সুকোমল কমনীয় কেশবার্ণি

সম্বতন পরিচর্য্যার অপেক্ষা রাখে

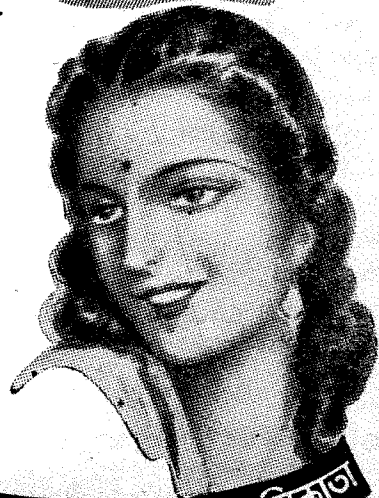
ক্যালকেমিকোর ক্যাষ্টরল

কেশ পরিচর্য্যার অপরিহার্য্য সম্পদ।

ক্যাষ্টরল

সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং. লি: কলিকাতা



কতিপয়—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত। ভারতী গ্রন্থ-ভবন। ৫, জামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

যে প্রচুর চিন্তাধারার পরিণতিতে মানুষের বহুবিচিত্র ব্রীতিনীতির উদ্ভব, কার্যকারণ সম্পর্কের বিচারে সব সময়ে সেগুলি হয়তো স্পষ্টতর হয় না, কিছু অসম্পূর্ণতা, কিছু বা রহস্য কোথায় যেন লাগিয়াই থাকে। এই সব জট-পাকানো আচার-আচরণ বিষয় এবং কৌতূহলের বস্তু। মনস্তত্ত্বের এই সূত্রের মধ্যেই কথা-সাহিত্যের পরিপুষ্ট। বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের সংঘাত দুয়ের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী। অবশ্য লেখকের দর্শন ও অনুভূতির রসে সিক্ত হইয়া বিষয়বস্তু যতই প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় না করিলে—গুরু উত্তরাইয়াছে বলিয়া রসিকজন খাঁকর করেন না।

আলোচ্য গ্রন্থ-সংগ্রহখানি পড়িয়া এই কথাটিই মনে হয়—লেখকের দৃষ্টি ও অনুভূতির সঙ্গে শিক্তিময় ও যথেষ্ট সচেতন। অতি সুন্দর ডুচ্ছ ঘটনা বা বৃত্তিসমূহের স্বরূপ তিনি জানেন এবং সেগুলি হৃদয় করিয়া, পুষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও রাখেন। ...এগুলিতে গল্পের রস আছে—কিন্তু বাঁধনিটা নাটকীয়—বাদ্যও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত বা চরিত্র-বিকাশের অবকাশ ইহার মধ্যে নাই। কঠোর বাস্তব এবং অব্যর্থ কল্পনা দুটিকেই লেখক চরম পর্মাণে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন রচনা হঠাৎ শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাটকীয় ভঙ্গীর বাহা প্রধান উপজীব্য অর্থাৎ সংলাপ তাহার গতি একটুও ব্যাহত হয় নাই, ভাবকে অনারাসে বহন করিয়া সে রসলোকে পৌঁছিয়াছে। চিত্রগুলির বেদনা, আনন্দ বা কৌতুক সমজাতীয় নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাসব' ও 'বনান্তরালে' দুইটি চিত্রের বেদনার তুলনা দেওয়া যায়। একটিতে অতি-বাস্তব ঘটনার রূঢ় আঘাতে মন ভারতুর হইয়া উঠে, সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষতিতে মন বিধাইয়া উঠে, অস্ত্রটি স্বপ্নজগতের মধুর একটি আশ্বাদে মনকে মেদুর করিয়া তুলে। 'রাজপুত্র' গল্পে উদ্ভিন্ন-যোবনা অতিসাধারণ একটি মেয়ের মনের কামনা নিখিলের নারী-চিত্তেরই প্রতিবিম্ব। 'ভূতের দেশে' পাই বুদ্ধোত্তর যুগের বিকলাঙ্গ ভগ্নমনোরথ বাসনাধিক কতকগুলি মানুষকে। 'তিনটি বেজে সাত মিনিট'-এ আছে আসক্তি-জড়ানো জীবনের একটি দিকের সত্যাকার পরিচয়। আসলে এগুলি রেখাচিত্র। সমগ্র জীবনের না হোক—জীবনের কোন অংশের সামান্ততম বৃত্তির অথবা বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাঙা-চোরা টুকরা—যেগুলিকে একত্র করিয়া লেখক চিত্রা করিবার ও রস উপভোগের যথেষ্ট অবকাশ পাঠককে দিয়াছেন। সমস্ত ছবির রং বা রেখা সমান নহে—রসও হয়তো সর্বত্র গাঢ় হইতে পারে নাই, তথাপি এইগুলিতে লেখকের স্বজন-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে—ভবিষ্যতে পূর্ণতর জীবন-চিত্র অঙ্কনের প্রতিশ্রুতিও বিদ্যমান।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

“ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-বাহ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাঁউথ ৮৮১

ইঙ্গিত—শ্রীমদ্বোধ বসু। গ্রন্থাগার, পি-৫৮, ল্যালডাউন রোড, কলিকাতা। দাম ২।০ টাকা।

এই উপজ্ঞাসাধানিতে বর্তমানকালের রাজনীতির ও রাষ্ট্রনায়কদের গতি ও চরিত্রের বহু অংশ প্রতিফলিত হইয়াছে।

প্রচুর ভাৱুড়ী অর্থবান ব্যক্তি—সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রসারিত করিবার আয়োজনে যে বুদ্ধি-কৌশলের আবশ্যক তাহা ভাৱুড়ী মহাশয়ের প্রচুর পরিমাণেই আছে। হুতরাং পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁহার কার্যকলাপ সমর্থন করেন, লেখকেরা তাঁহার নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র শ্রীমন্তকে সেক্রেটারীরূপে কিনিয়া লওয়াও তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিয়াও শ্রীমন্ত বৃত্তিতে পারে, সমাজ বা অর্থনীতির মূল সূত্রটি কোথায় বিধৃত রহিয়াছে। এই বোধের সঙ্গে শ্রীমন্তের অন্তরের দ্বন্দ্ব, তাহার ভাগ্যকে কোন পথে লইয়া গিয়াছে—‘ইঙ্গিত’ের প্রতিপাত্ত তাহা নহে। নেতায় নেতায় আয়ত্ত্বাতী কলহ, বৈতনীর প্রয়োগ, লোভ ও ক্ষমতালোভের মত্ততা জাতীয় জীবনকে কি ভাবে কলুষিত ও গঙ্ঘিল করিয়া তুলিতেছে, ইঙ্গিতের মূল উপজীব্য সেইগুলি। বলা বাহুল্য, লেখক তাঁহার বক্তব্য ভালভাবেই গুছাইয়া বলিয়াছেন। উপজ্ঞাসাধানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে, নিছক কল্পনার জগতে বিচরণ করিতেছি। আঙ্গিকার মিনে যে তিক্ত সত্য মানুষকে প্রায় নিরাশাবাদী করিয়া তুলিয়াছে, ইঙ্গিত তাহারই মর্ম্মকথার উদ্ঘাটক এবং এই কারণে ইহার চরিত্রগুলিও বাস্তবায়ুগ। শ্রীমন্ত, প্রচুর ভাৱুড়ী, কালীকঙ্কর, হুতরা দেবী প্রভৃতিকে আমরা সকলেই কমবেশী জানি।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়



= পূজার উপহারের ভাল ভাল বই =

অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ প্রণীত

নেতাজীর মত ও পথ

নেতাজীর মত ও পথ নিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সাথে মত-বিভেদ ও তার কারণ নিয়ে নিখুঁত বিশ্লেষণ। সংবাদপত্রসমূহে ও পাঠকমহলে উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য ৩।০

শ্রীভীমাঙ্গদ ঘোষ প্রণীত

স্মার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১।০

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

নীল আকাশের অভিযাত্রী ১।৫০

শ্রীনীলগোপাল চক্রবর্তী প্রণীত

ছেলেদের হাতের কাজ

বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে যে সব জিনিস তৈরী করা যেতে পারে তাদের কথা গল্পের মত সরস ও সাবলীল ভাষায় লেখা : বহু চিত্রে সুপরিষ্কৃত। মূল্য ২. টাকা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রণীত

রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য ১।৫০

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত

যাঁরা ছিলেন মহীয়সী ২।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী প্রণীত

পূজার পড়া ১।০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

সৌম্য-পারে ১।৫০

পি. সি. সরকার প্রণীত

মেসমেরিজম ৩.

• রমেশচন্দ্র দাশ প্রণীত

সাগরিকা (১ম) ১।০

সাগরিকা (২য়) ১।০

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বহুদিন পরে এর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। রঙিন প্রচ্ছদ শোভিত। মূল্য ১।০

শ্রীস্বরেন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত রমেশ-গ্রন্থমালা

বঙ্গ-বিজেতা ১।০

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ১।০

নলিনী দাশগুপ্ত প্রণীত

হাসির দেশ ১।০

শ্রীভারাপদ রাহা প্রণীত

রবিনহুড ২.

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্তী প্রণীত

দুঃসাহসী ১।৫০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

শঙ্কর (১ম) ১.

শঙ্কর (২য়) ১.

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সুবিস্তৃত পদার্থ-বিজ্ঞান

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত

= বিজ্ঞানের চিঠি =

আচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা সম্বলিত

কতকগুলি পত্রের মাধ্যমে এতে আলোচিত হয়েছে—আলোকের বিকিরণ-লীলা, বিদ্যুচ্চৌম্বক মতবাদ, আলোকজ বৈদ্যুতিক ক্রিয়া, পরমাণবিক তত্ত্ব, মহাজাগতিক রশ্মিতত্ত্ব, প্রাক পরমাণববাদ ও বিজ্ঞানের আরো অনেক তত্ত্ব।

আচার্য বসু বলেন—“সহজসাধ্য ক’রে লেখা জটিলতম নানা পদার্থ-বিজ্ঞান-তত্ত্ব পরিবেশিত

এ গ্রন্থখানা বাঙলাভাষী প্রত্যেককেই ভাল ক’রে পড়বার জন্ত অহুয়োধ করছি।”

১৫৭ খানা বর্ণ ও রেখাচিত্রে ভূষিত

::

মূল্য ৮. টাকা

আশুতোষ লাইব্রেরী-পি

৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ০ ৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ ০ ৭৮৬, লায়েল স্ট্রীট, ঢাকা

মারকে লেঙ্গে—প্রিয়মল গোস্বামী। রীডার কন'র,
৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম চারি টাকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ সালে, আর আজ '৫১ সালের শেষ
ভাগ। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয়
ঘটিয়াছিল আজও তাহার জের চলিতেছে। এই এক যুগ ধরিয়া যে জীবন
আমরা বাপন করিতেছি তাহা স্বপ্নও নহে, স্বাভাবিকও নহে।

আমাদের এই বিপর্যয় এবং বিকৃত সমাজ-জীবনেরই ছায়া প্রতিফলিত
হইয়াছে 'মারকে লেঙ্গে'র গল্পগুলিতে। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৮ এই ছয় বৎসর
গল্পগুলির রচনাকাল। যুদ্ধকালীন ব্র্যাকআউট, চোরাকারবার, পঞ্চাশের
মহাস্তর এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালের মুসলিম লীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম,
ও 'এক হো' জিগীর তুলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের জাটাজাটি, কাপড়
ও ছাত্তার কট্টোঁল ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় লইয়া লেখক এই পুস্তকে
কতকগুলি রেখাচিত্র আঁকিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—
“গল্পের চেহারা থাকলেও সবগুলি ঠিক গল্প নয়, ক্যারিকচার বা কাটুন
চিত্র।”

১৯৪১-এর মাঝামাঝি ব্র্যাকআউটের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ
পর্যন্ত একই নীতি অনুসৃত হইয়া চলিয়াছে। তাহা বহু লোককে
সর্ব্বাঙ্গ করিয়া মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের স্বার্থসিদ্ধির নীতি। ইহাই
“মারকে লেঙ্গে” নীতি এবং আজ এই অপধর্ম্মই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যুগধর্ম্ম।
চোরাকারবারের প্রসার, পঞ্চাশের মহাস্তর প্রভৃতি এই অপধর্ম্মের অঙ্গতম
ফল। যাহারা এই অপধর্ম্মের আচরণ দ্বারা মানুষের দুর্গতির বোঝাকে
দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে তাহারা “সবাই এক একটা মুখোশ পরে
যেড়াচ্ছে, যে বা নয় তাই সে দেখাবার জন্তে বাস্ত।” (মারকে লেঙ্গে—
'অভিনেতা গান্ধী')।

প্রিয়মলবাবু তাঁর গল্পগুলিতে এই সমস্ত স্বার্থঘেযীর মূখোশ খুলিয়া
দিয়াছেন, মানুষের অত্যাচার স্বার্থবুদ্ধি, জ্ঞানামি এবং ভণ্ডামিকে তিনি
তীব্রভাবে কশাবাত করিয়াছেন। 'গুহ এণ্ড পাল' গল্পের মোবদ্বীন গুহ এবং
প্রজ্ঞাত পাল 'পরাদীনতার ফলে'র মহাদেববাবু প্রভৃতির লোক-খেতানো
দেশহিতৈষণার মূলে কোন প্রবৃত্তি, লেখক তাহা আমাদের চোখে আঙ্গুল
দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রিয়মলবাবু ব্যঙ্গ-রচনায় দিক্‌হস্ত এবং তাঁর রসিকতাও স্বতঃস্ফূর্ত।
মারকে লেঙ্গে 'ছাত্তা' প্রভৃতি কোন কোন গল্প রসরচনার পরাকাষ্ঠা বলিয়া
গণ্য হইতে পারে। গল্পগুলি এই বাহু রূপই হয়তো সাধারণ পাঠকের

আনন্দবিধান করিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এই বহিরাবরণ ভে
যিনি গল্পগুলির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন তিনিই উপর
বেন যে, গভীর বেদনাবোধ হইতে ইহাদের জন্ম।—লেখক জীব
তম অভিজ্ঞতাসমূহকে রসিকতার প্রলেপে মিষ্টবাদযুক্ত করিয়া
নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। মনে হয় যেন দুর্ব্বলের উপর
অত্যাচার, ধনিকের শোষণ, চোরাকারবারীর দুর্নীতি এই সম
অগণিত সাধারণ মানুষের শোচনীয় দুরবস্থা তাহার মর্ম্মস্থলে
ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, হাংকা হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া
ক্ষতের জ্বালাকে তুলিয়া থাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু 'ন
'নূতন পরিচয়' প্রভৃতি গল্পে মর্ম্মবেদনাকে তিনি লুকাইতে পা
তাহার বেদনাবিরোধী জনহের ক্ষত-স্থানটি আমাদের নিকট উন্মো
পড়িয়াছে। এই বইয়ের 'কবি-শিল্পী-কথা' শীর্ষক গল্পটির চেহার
—ইহা ব্যঙ্গ-রচনা নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যেমন লেখকের কবি
তেমনি তাঁর আদর্শবাদী মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ব
দুর্যোগই যে, ভবিষ্যতে নবযুগের সূচনা করিতেছে—গল্পটিতে এই
আছে। লেখক বলিতেছেন—“রক্তধরও কবি সেও শ্রুতি, বি
বিষয়বস্ত্ত মানুষ—যে মানুষ মাটির কাছাকাছি বাস করে। :
দেখে পায়ে চলার পথে, যাদের সে দেখে নীচের ধাপে। মানব
মানবতার অপমানে সে ক্ষুব্ধ হয়। সে দাঁড়ায় জীবনের কারখান
নিজ হাতে সে নূতন পৃথিবী গড়ার কাজে লাগে।”

প্রিয়মলবাবু জাত-লেখক। তাঁর রচনা মিতব্যাক। তিনি যেমন
লিখিতে পারেন, তেমনি কোথায় থাকিতে হয় সে কৌশলটিও তাঁর
তাঁর রচনা মেদবর্জিত, নিরলঙ্কৃত, অথচ সূক্ষ্ম সাহিত্যিক কারুক
—তাহাতে বতটুকু প্রকাশিত হয় তাহার চেয়ে বাঞ্ছনা থাকে অন
রচনার এই সমস্ত গুণ 'মারকে লেঙ্গে'তে সুপরিষ্কৃত। পুস্তকখা
সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ বলিয়া রসিকজনের স্বী
করিবে। বিশেষ একটা কাল-সীমার মধ্যে সংঘটিত ঘটনাসমূ
গল্পগুলি রচিত বটে, কিন্তু কতকগুলি গল্প এমন প্রাণময়তায় পূ
সেগুলি কালোত্তীর্ণ হইবার দাবি রাখে।

বইয়ে সংযোজিত ব্রিটশ চক্রবর্তীর আঁকা কাটুন চিত্রগুলি
বাঞ্ছনীয়, তেমনি সেগুলিতে আছে স্থানীয় কল্পনার খেলা।
যে ছবিটি মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠে, রেখার তা সৃষ্ট ভাবে রূপান্তরিত
মনে পুলক-সঞ্চার হয়।

শ্রীনলিনীকুমার

টোল ও কোম্পানীর



বরানগর, কলিকাতা

দাদ ও কাউন্সেল
এম্বার্স মলম

ক্রিউটা-টোন
পোড়া বেদনা ও চর্ম্মরোগের জন্য

নিম্ন মলম
থোস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য





বিংশতি মহামানব—গ্রীকনক বন্দোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি
এও কোং লি., কলিকাতা। পৃ. ২৭৭, মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় “প্রকাশকের কথা”র বলিয়াছেন :—
“পুরুষসিংহ রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বভাবচন্দ্র পর্য্যন্ত
যে বিংশতি মহামানব অনাগত বাংলার জন্ত নূতন ঐতিহ্য গড়িয়া
তুলিয়াছেন তাঁহাদের জীবন-কাহিনী বাংলার শিশু এবং কিশোরদের হাতে
দিবার জন্ত ‘বিংশতি মহামানবের’ পরিকল্পনা।” রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ,
বিজ্ঞানাগর, মধুসূদন, পদ্মহংস, বঙ্কিম, গুরুদাস, হরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র
মগীন্দ্রচন্দ্র (মহাশয়), রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ
রামানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অবনীন্দ্র, অরবিন্দ, শরৎ চন্দ্র, স্বভাবচন্দ্র এই কুড়ি
জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেশবচন্দ্রকে বাদ
দেওয়া ঘোর ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ত্রিবিধ চিত্র সন্নিবেশ,

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের দিক দিয়া বইখানি যত চমৎকার হইয়াছে, তথ্যের দিক
দিয়া ততখানি নিখুঁত হইলে আমরা আরও খুশী হইতাম। তথাপি
মহতের বিষয় আলোচনা এবং দেশের কিশোরদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য
রাখিয়া সেই আলোচনা সর্বদাই প্রশংসনীয়।

ব.

অর্থ্য—শ্রীসরলাবালা সরকার। আমল-হিন্দুস্থান প্রকাশনী,
কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীসরলাবালা সরকার হৃদীয়কাল সাহিত্য-সেবা করিতেছেন। পনের
বৎসর বয়সে তাঁহার কবিতা “ভারতী ও বালকে” প্রথম প্রকাশিত হয়।
এখন তাঁহার বয়স ছিয়াত্তর। এমন দীর্ঘ এবং অক্লান্ত কাব্যসাধনার দৃষ্টান্ত
বিরল। আশ্চর্য্য এই, বয়সের সঙ্গে তাঁহার কবিতা সজীবতা হারায় নাই।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু খ্যাতিনামা



সর্বদাই পুরোভাগে

ভারতীয় জীবন বীমার অগ্রগতির পথে “হিন্দুস্থান” সর্বদাই পুরোভাগে
রহিয়াছে। যে আর্থিক সারবত্তা, সংহতি ও সম্মতি-শক্তি হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য,
১৯৫০ সালের বার্ষিক বিবরণীতেও তাহাই পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা
মোট সংস্থান
বীমা তহবিল
প্রিমিয়ামের আয়
দাবী শোধ (১৯৫০)

৬৩,১৬,৬০,৫২৭ টাকা
১৭,৭০,৭০,৬২৪
১৫,২৭,৪৭,৫৪৮
৩,৪০,৪৭,৩৩৮
৭২,২২,৮৫০

নূতন বীমা

১৩,৭৫,৩৯,৮৫১

কিন্তু হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের যে অকুণ্ঠ আস্থা পূর্বাগর তাহার
ক্রমোন্নতির পথে পাথেয় রূপে সহায়তা করিয়াছে, সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ
সম্পদ তাহারই জন্ত হিন্দুস্থানের প্রকৃত গোরব। হিন্দুস্থানও তাহার
ঐকান্তিক সেবা দ্বারা সেই গোরব অক্ষুর রাখিবে, নূতন বৎসরে
ইহাই তাহার প্রতিশ্রুতি।

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লি:
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৬

নারী-কবির আবির্ভাব ঘটয়াছিল। লেখিকা আধুনিককাল পর্যন্ত সেই গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করিয়া আনিয়াছেন। সরলাবালা শুধু কবিনন, বহু গল্প এবং প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। সারাজীবনের কাব্যসঞ্চয় “অর্থো” নিবন্ধ হইয়াছে। নীরার প্রার্থনা, নিবেদিতা, বাত্মকি, অহল্যা, রক্তজবা, রমণীর ব্রত, গভীর নিশীথে প্রভৃতি কবিতাগুলি বড় ভাল লাগিল। বিবেকানন্দের উপর লিখিত ‘পৌষ-কৃষ্ণ-সপ্তমী’ এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে লিখিত ‘তুমি আমাদের লোক’—দুইটি বিশিষ্ট কবিতা। বহু কবিতাই স্বদেশপ্রণেমে উদ্ভল।

“ভালবাসা বিনা নাহি পারে কেহ মরতে দেবতা হ’তে।”

অথবা—

‘তপস্তা মুরতি ধরে এসেছিলে ধরা’পরে
তপস্বিনি অরি!’

অথবা—

‘আকাশে যে তারে তারে গাখা তার-হার
অপূর্ণ সে বীণাযন্ত্রে, শুনেছ কি কোন দিন
অপূর্ণ স্বাক্ষর?’

প্রভৃতি বহু পংক্তিই মনের উপর একটি গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। “জাগরণী” খণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত কবিতাই একটি অপূর্ণ জাগরণের হয়ে চিত্তকে উদ্ভুদ্ধ করে। “অর্থো” পাঠক প্রকৃত কবিদের সন্ধান পাইবেন।

অনাগত—প্রফুল্লকুমার সরকার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রফুল্লকুমার সরকার শুধু প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি খাত-নামা উপস্থানিক এবং প্রাবন্ধিকও। “অনাগত” উপস্থান। ১৩৩৪ সালে

ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ বহু পূর্বেই নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। ‘প্রকাশকের নিবেদনে’ শ্রীমুরেশচন্দ্র মজুমদার বলিতেছেন, “পর্যায়ীতার দুঃসহ বন্ধনমোচনের জন্ত একদা বাংলার যে সব তরুণতরুণী স্বর্কষ পণ করিয়া কুরধার পথে বাত্মা করিয়াছিল, তাহাদের জীবন-কথা এই উপস্থানের বিষয়বস্তু। পর্যায়ীতার পটভূমিতে এই উপস্থানের ঘটনাসংস্থান হইলেও স্বাধীন-ভারত-গঠনের ইঙ্গিত ও নির্দেশ ইহাতে আছে।” উপস্থান হিসাবে বাঁহারা “অনাগত” পাঠ করিবেন তাঁহারাও কাহিনীর বৈচিত্র্যে এবং ঘটনার সাবলীলতার আনন্দলাভ করিবেন, প্রতিমা এবং অনিলিতার চরিত্রে মুগ্ধ হইবেন। কিন্তু “অনাগত” শুধু উপস্থান নয়, ইহাতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আছে, ভাবী রাজনৈতিক মতবাদের সম্মেলন আছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে রচিত এই উপস্থানস্থানির রাজনৈতিক পটভূমিকা এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। রসামুত্তরিত সহিত মননশীলতার সংমিশ্রণ পুস্তকখানিকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কারাকক্ষে মোহিতের সুহিত প্রতিমার শেব সাক্ষাৎ বড় করণ এবং মধুস্পর্শী। “অনাগত” আজিকার দিনের তরুণ পাঠকেও প্রেরণা দিতে পারিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যভূষণ। সাহিত্য-মন্দির, পাবনা, মূল্য দশ আনা।

‘কবির স্বপ্ন’ রবীন্দ্রনাথের ‘খেয়া’ কাব্যের সমালোচনা-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া আজকাল বাজারে বহু সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দুই-একখানির কথা বাদ দিলে ঐ ধরণের সমালোচনা গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই সরল কথার জটিল বাখ্যায় পরিপূর্ণ।

অদ্বিতীয় লিভার টনিক

“কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকন্তু রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা করে। “কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্রা—ইহা একটি অদ্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

কুমারেশ

৯ মিসারকে দুই ও সতেজ
রাখে—



ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া * হাওড়া

ইহাতে সমালোচকের পাণ্ডিত্যভিমান তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু পাঠক ও লেখকের মধ্যে ব্যবধান দূরত্ব হইয়া উঠে। অথচ সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য রচনার মৰ্শার্থকে পাঠকের নিকট সহজ ও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা—লেখক ও পাঠকের মধ্যে রসোপলব্ধির সংযোগসেতু রচনা করা। আধুনিক অনেক সমালোচনার ধার আছে, পাণ্ডিত্য আছে, বুদ্ধির শাবিত উজ্জ্বল আছে, কথার তীক্ষ্ণ চাবুক আছে, ভঙ্গীর চটক আছে—নাই শুধু আন্তরিকতা। প্রায় আটশ বৎসর পূর্বের রচিত 'খেয়া' কাব্যের এই দরদী সমালোচনা পড়িয়া তাই চমক লাগিল। কি অনাড়ম্বর বলিবার ভঙ্গী, কি সহজ, প্রাঞ্জল ভাষা—রসাধানের জন্ত কি অকৃত্রিম এবং আত্মরিক আলোচনার ধারা। পড়িতে পড়িতে কাব্যরসের মন্ডাকিনী প্রবাহে পাঠকের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বাখা-বিরোধের এইখানেই চরম সার্থকতা। দীর্ঘকাল পূর্বে লিখিত হইলেও এই নিবন্ধ-পুস্তকখানি আজও সমভাবে কুতূহলী পাঠকের চিত্তকে রসানুভূতির সহস্রধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক ভূগোল—পৃষ্ঠা ১৪০।

মূল্য দুই টাকা।

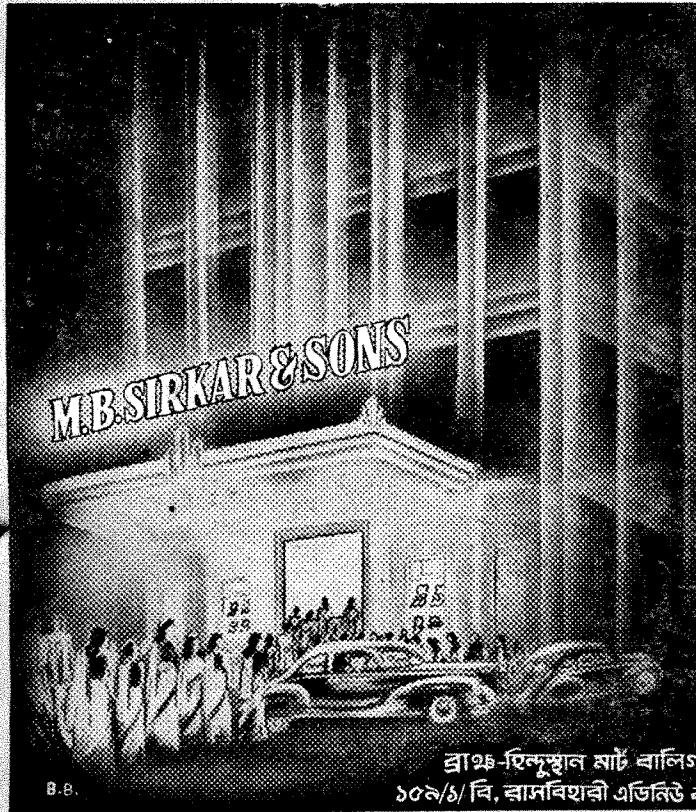
ভারতবর্ষের পরিবহন ব্যবস্থা—শ্রীশিবপ্রসাদ মুখো-
পাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৪। এইচ. চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লি., কলিকাতা। মূল্য
দেড় টাকা।

দেশ-বিভাগের পরে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে

তাহাতে অনেক জিনিষই নুতন করিয়া গড়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্যে হৃষ্ট পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাহারও পূর্বে খণ্ডিত বাংলা ও ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার একটি সম্পূর্ণ ধারণা না লইয়া কাঁধে আরম্ভ করিলে সফলতালভ সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক ভূগোলসমূহে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষি, বাণিজ্যসম্পদ, খনিজ ও আরণ্যসম্পদ, শিল্প, পরিবহন-ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা দ্বারা শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ পাঠক যে জ্ঞানলাভ করেন ব্যবহারিক জীবনে তাহা খুবই আবশ্যক। বাংলাভাষায় এ ধরনের পুস্তকের প্রকাশ সম্ভব আরম্ভ হইয়াছে। ইহা খুবই সমরোচিত ও মূল্যবান। লেখকের রচিত ইংরেজী বইয়ের আলোচনাকালে আমরা তাহাকে এই বিষয়ে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। গ্রন্থকার বাংলাভাষায় অর্থ-নৈতিক ভূগোলবিজ্ঞানের প্রচারে ত্রুটি হইয়া বেশবানীর একটা অভাব দূর করিলেন এবং শিক্ষার্থীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। পুস্তকখানি মূল্যবান এবং জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পূর্ণ। ইহার বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

লেখকের দ্বিতীয় পুস্তকখানি পরিবহন সম্বন্ধে। এই বইখানি লিখিয়া লেখক বাংলাভাষায় একটা অভাব দূর করিলেন। ইহাতে রাজপথ, রেল-পথ, বিমানপথ ও জলপথের বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে এবং ছয়টি মানচিত্র দ্বারা বিষয়বস্তু বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য একশা সত্য যে, এদেশের পরিবহন-ব্যবস্থা খুবই অসম্পূর্ণ। লেখক সরকারী পরিকল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু আশার কথা আছে।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত



**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
এও সন্স

সুপ্রস্তুত নির্মিত ও অলঙ্কার নির্মাণে
প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী

ফোন, বি, লি, ১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস্

ব্রা২৫-হিন্দুস্থান মার্চ বালিগঞ্জ
১০৯/১/ বি, রাসবিহারী এডিন্ট কলিকাতা

অসুস্থরীপ—শ্রীমদন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনী, ১৫৭, স্ট্রামাচরণ দে ট্রাট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ব্যক্তিত্বের অতি সাম্প্রতিক সমাজ-জীবনের পটভূমিতে উপস্থাপন করিত্বগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার গতি ছাড়াইয়া রাতারাতি 'আল্ট্রা মডার্ন' হইতে যাওয়ার রাসবিহারীর সংসারে যে বিপর্যয় দেখা দিল তাহা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

জোড়াস কোঁ অঙ্কলের পুরাতন বনেদী পরিবারের রাসবিহারী হঠাৎ একদিন তার পূর্বপুরুষের ভিটা বিক্রয় করিয়া দিয়া বালিগঞ্জে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। মা বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু ফল হয় নাই। ঘোবনের আশা আর স্বপ্নে তার মন ছিল আচ্ছন্ন, কিন্তু এই আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যাইতেই এক দিন তিনি আবিষ্কার করিলেন যে কালের গতির সহিত সমানতালে পাকিলিয়া চলিতে তিনি সক্ষম হন নাই—এমন কি তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়েরাও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাসবিহারী আক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু নিজেকে এই আধুনিক আবহেষ্ণী হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

এই অতি-আধুনিক কতকগুলি মেয়ে এবং পুরুষের চরিত্র আঁকিতে বসিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। মাতৃস্বের পবিত্র মহিমাকে পর্য্যাপ্ত এই উপস্থাসে কলুষিত করা হইয়াছে। কালিঘাটের যজ্ঞধরুলার গলির একটি বাড়ীতে যে শুকারজনক দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। অথচ এই অংশটিকে অনায়াসে বাদ দেওয়া চলিত। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সার্থক রচনার অসুতম শ্রেষ্ঠগুণ সংঘম। তাহার অভাব এই লেখকের রচনার দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গীতায় স্বরাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী। শ্রীমোহন প্রেস, ৫, চিত্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-২। পৃষ্ঠা ২৭২। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকার স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করায় ব্রিটিশ বৎসর ব্রিটিশের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। দশ বৎসর দীর্ঘায়ু বাসের পর তিনি কলিকাতার আলিপুর জেলে প্রেরিত হন। আলিপুর জেলে থাকাকালে তিনি সমালোচ্য পুস্তকখানি রচনা করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী 'পরিচিতি'তে এই গ্রন্থকে 'গীতার টীকা' বলিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র গীতার সংস্কৃত শ্লোকগুলির সরল অনুবাদ ও বাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ত্রেলোক্য মহারাজের গীতাবাখ্যা কোন প্রচলিত ভাষা বা টীকা অবলম্বনে লিখিত না হইলেও ইহা সত্যই অজিনব এবং যুগোপযোগী। বাখ্যাতা উপক্রমণিকার গীতোক্ত মূলতত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় বাখ্যাতা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রাধান্যযোগ্য। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীন ভারতকে গীতার আদর্শে না গড়িতে পারিলে দেড় শত বৎসরের পরাধীনতার যে কুফল আমাদের মজাগত হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে না। গীতোক্ত আদর্শ সত্ত্ব-স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে রূপায়িত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসী কাপুরুষতা, উচ্ছ্রালতা ও দুর্নীতি অপসৃত হইবে না এবং আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশও ঘটিবে না।

লেখকের ভাব প্রাণস্পর্শী এবং ভাবো সাবলীল।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১। সাধন বাণী ২। জীবন সাধনার পথে—

স্বামী আত্মানন্দ। ভারতসেবাস্রম সম্বৎ, ২১১, রাসবিহারী এফ্রিনিউ, কলিকাতা-১২। মূল্য বাথাক্রমে আট আনা এবং এক টাকা।

প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার মানবের বিশেষ কলাপত্র এক শতটি হাচকিত বাণী পরিবেশন করিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে 'জীবন লক্ষ্য', 'প্রার্থনা-মন্ত্র ও প্রার্থনার নির্ণয়' শীর্ষক বিয়াল্লিশটি অধ্যায়-আলোচনা হইল।

পাইয়াছে। আদর্শ জীবনগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অতীব সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বৌদ্ধগান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ টাকা।

সে কাল আর এ কাল—রাজনারায়ণ বহু। মূল্য ১।

পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য ১।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬।

আলোচ্য তিনখানি পুস্তকই শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র প্রথম সংস্করণ (১৩২৩) বাহির হইবার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. শহীদুল্লাহ, ড. হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদগণ পুস্তকের চর্যাপদগুলি সম্পর্কে বহু গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। ফলে এ সময়ের কিছু কিছু পাঠ-সংস্কারও সাধিত হইয়াছে। পূর্ব সংস্করণে বাংলাভাষায় চর্যাপদগুলির কোন বাখ্যা ছিল না। পরিষদের পুঁথিখানার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য বহু আয়াসে উক্ত ভাষাতাত্ত্বিকগণের গবেষণার নিরিখে এবং নিজ বিচার-বুদ্ধিতে এ সকলের বাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এই বাখ্যায় পদগুলির অন্তর্নিহিত রস ও ভাবগাভী রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। একারণ ইহা পাঠে বাংলাভাষা শিক্ষার্থী, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের উচ্চতন ছাত্র-ছাত্রীর সাহায্য হইবে। পরিষদ এই শোভন সংস্করণটি প্রকাশে বাংলাভাষী মাঝেই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

রাজনারায়ণ বহুর "সে কাল আর এ কাল" সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই। এখানিও দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রাপ্য ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ 'জাতীয় সভা'র রাজনারায়ণ উক্ত শীর্ষক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহাই পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া বক্তা কর্তৃক পরে পুস্তকাকারে প্রণীত হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে এখানির দুইটি সংস্করণ মাত্র বাহির হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচাত্তর বৎসরের বাঙালীর হালচাল, শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক রীতি-নীতির গতি-প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা ইহাতে আছে। রাজনারায়ণ বহুর মনষিতার পরিচয় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায় সুশ্রুত। বাংলাদেশের নব-জাতীয়তার উদ্বোধকগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানে। যে 'জাতীয় সভা'র তিনি এই বক্তৃতা দেন তাহা হিন্দু মেলারই অন্তর্গত, আর ইহার ভাব-প্রেরণা রাজনারায়ণ যোগাইয়াছিলেন। বর্তমান সমালোচকের 'রাজনারায়ণ বহু' এবং 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলায় ইতিবৃত্ত' পুস্তক দুইখানিতে রাজনারায়ণের মনষিতা এবং স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশে বাংলা-সাহিত্যের একটি অমূল্য বস্তু সাধারণের নিকট হস্ত হইল।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজস্থানের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি বাংলা কাব্যে পরিবেশন করিয়া সেযুগে নব্যশিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে জাতীয়তাবোধের উদ্রেকের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এইরূপ একখানি কাব্য। "স্বাধীনতা হীনভায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়" শীর্ষক পংক্তিগুলি এই উপাখ্যানের ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহার একটি অংশ এই:

"অতএব রণভূমে চল দুরা যাই হে,

চল দুরা যাই।

দেশহিতে মরে যেই, তুলা তার নাই হে,

তুলা তার নাই।"

বঙ্গমূল্যে এসকল পুস্তক সাধারণের নিকট সহজপ্রাপ্য হওয়ার বাংলা-ভাষী ও বাংলা-সাহিত্যসেবী বিশেষ উপকৃত হইবেন নিঃসন্দেহ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

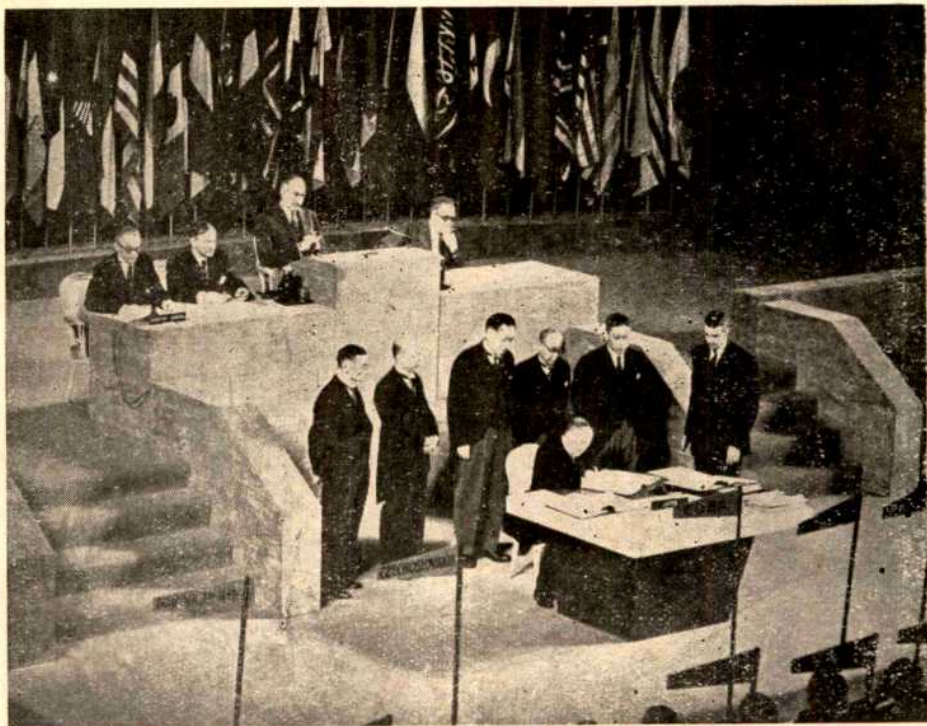


হাসানী হোস, কলিকতা

শিকারী
শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী



নিউ দিল্লীতে চীনা সংস্কৃতি-মিশন, মধ্যাহ্নে রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার পার্শ্বে ত্রীজবাহরলাল নেহরু



শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর-রত জাপানের প্রধান মন্ত্রী। একচল্লিশটি রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন

এবাস

“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্
নামমায়া বলহীনেন সত্যম্”

১৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থী

আগামী সাধারণ নির্বাচনে সকল দলের প্রার্থী-মনোনয়ন তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস-তালিকা সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই তালিকা দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। প্রার্থী বাছাই করিবার জন্য পাঁচটি ‘চালুনি কমিটি’ (Screening Committee) গঠিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা পরিশ্রম করিয়া প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যাচাইয়ের ফল দেখিয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় নাই বলিলে কম বলা হইবে, সকলেই অভ্যস্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং কংগ্রেসের উপর অনাস্থা ইহার পর আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ এলাকাতেই লোকে দেখিতেছে যে, তাহাদের অঞ্চলের সুপরিচিত, দুর্নীতি-পরায়ণ এবং রাজনৈতিক অপাৎক্রেয় ব্যক্তি তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছেন। সেখানকার কোন যোগ্য লোক মনোনয়ন তো পানই নাই, প্রার্থী-নির্বাচনের আগে ক্রাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই।

প্রার্থী-নির্বাচন প্রথমেই করিয়াছে জেলা-কংগ্রেস কমিটি-গুলি। গত পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে অধিকাংশ কমিটি দুর্নীতি-পরায়ণ লোক কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল একথা পণ্ডিত নেহরু নিজেই বলিয়াছেন এবং বারু পুরুষোত্তমদাস টাঙনের সহিত তাঁহার বিরোধেরও ইহাই ছিল মূল কারণ। নাসিক কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন লইয়াই নেহরু-টাঙন বিরোধের স্রোত। জেলা কমিটিগুলি দুর্নীতির প্রধান ঝাঁট, চোরাকারবার এবং জালজুরাচুরির কেন্দ্র বলিলেই হয়—ইহা আজ দেশব্যপী লোক জানে। প্রাথমিক প্রার্থী বাছাইয়ের তার ইহাদের উপর পড়িয়াছিল। প্রথমেই ইহার। সেই সেই অঞ্চলের ভাল লোকদের বাদ দিয়া নিজেদের লোক লইয়া প্রার্থী-তালিকা রচনা করিয়াছে। কংগ্রেসের কোন উপদল কখনো আসন পাইবে ইহাই লইয়া যা কিছু ঝগড়া হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু বাহিরের ভাল লোক আনিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার। তাহা যথাযথভাবে করে নাই। যে কয়জন

বাহিরের লোক আসিয়াছে তাহারা হয় একই শ্রেণীর নহিলে প্রায় অল্পভরত। কোন একটি ক্ষেত্রেও আমরা দেখি নাই যে, জেলা কংগ্রেস মনোনয়নে ভাল লোক ও দুর্নীতিপরায়ণ লোক লইয়া মতভেদ হইয়াছে। সর্বত্র একই কথা—প্রার্থী কংগ্রেসের কোন উপদলের লোক, অথক মার্কী অথবা শুক মার্কী। এই হাঁকাই শেষ হওয়ার পর তালিকা গেল প্রাদেশিক কংগ্রেসে। সেখানেও এই একই ভিত্তিতে তালিকাকে প্রাদেশিক রূপ দেওয়া হইল। গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়ার সময় যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল জেলাখাতি। এবারকার মাপকাঠি হইয়াছে প্রধানতঃ টাকার ধলি। তাহার পর স্থান পাইয়াছে, দুর্নীতিপরায়ণতা ও কুটিল রাষ্ট্রনীতির সুপোয়া। দেশের গবর্নেন্ট পরিচালনের ক্ষমতা ইহাদের আছে কিনা সেদিকে কোন প্রদেশেই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। বর্তমান প্রাদেশিক গবর্নেন্ট নিজে যাহাদিগকে কর্পোরেশন বা জেলা-বোর্ড পরিচালনের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তার জন্য কর্পোরেশন অধিকার করিয়াছেন বা জেলা-বোর্ডের কর্তৃকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনসমূহ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবিয়াছেন তাহারাও কংগ্রেসপ্রার্থী তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে।

এই মনোনয়ন-তালিকা তৈরি করিবার পর চালুনির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চালুনির কাজ ভালোয় মনে মিশানো বস্ত্র হাঁকিয়া মন্দকে বাহির করিয়া দেওয়া। আমরা সমস্ত প্রদেশের বেলাতেই দেখিতেছি ঠিক তার উল্টা হইয়াছে। চালুনি কমিটি সব কয়টি ভেজালকে সবড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বেলায় অন্ততঃ দেখিলাম যে—প্রাথমিক তালিকা এবং চূড়ান্ত তালিকায় অভিশ্রমিত রদ-বদল হইয়াছে। চালুনি কমিটি বসাইয়া ভেজাল বাহির করিয়া দেওয়ার প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে উহা বসানো উচিত ছিল জেলা কংগ্রেসে। তাহা না করিয়া শেষপ্রান্তে বসাইয়া চালুনির সার্টিফিকেট দিয়া ভেজাল তরাইবার চেষ্টায় ইহাই সন্দেহ হয় যে একেজো বাছাই করা আসল উদ্দেশ্য নয়, মূল অভিপ্রায় সাফাই গাঁহিয়া জনমত বিভ্রান্ত করা। নির্বাচনী চালুকির ইহা একটি বড় অঙ্গ।

কংগ্রেস-তালিকায় কংগ্রেসের নিজের মূলনীতিও রক্ষিত হয় নাই। নেহরু দুর্নীতিপরায়ণতা দূর করিবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তালিকায় তাঁহারই হাত দিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডের অমুদ্রাদলক্রমে, অতিশয় সুপরিচিত দুর্নীতিপরায়ণ, চোরাকারবানী প্রভৃতি পার হইয়াছেন। মতপার্থী কংগ্রেসের কার্যকরী সভ্য হইতে পারে না। এই শ্রেণীর অনেকে তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছেন। কংগ্রেসকে কোন নির্বাচনে কেহ পরাজিত করিয়া থাকিলে তাঁহাকে কখনও কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়া হয় না। এই শ্রেণীর একাধিক ব্যক্তি মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। বড় বড় শনিক শ্রেণী, বড় বড় জমিদার বাহাদুরের কোনরূপ খ্যাতি কোম কালেও নাই তাঁহারা নিজেরা, তাঁহাদের কর্মচারী, উকীল, সলিসিটর, ম্যানেজার প্রভৃতিও কংগ্রেস-মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। কোনরূপ নীতি, ভায় বা যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া কংগ্রেস-তালিকা রচিত হয় নাই। অসাব্য লোকদের লইয়া উহা প্রস্তুত হইয়াছে, যাহারা বড় ও শক্তিশালী উপদলের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহারাই অধিকতর পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু সেদিন বলিয়াছেন যে, তালিকায় বহু অবাস্তিত লোক ঢুকিয়া গিয়াছে। তিনি এখন তাহা বুঝিয়াছেন তবে আর করার কিছু নাই, কারণ বড়ই দেরি হইয়া গিয়াছে। আমরা এই কথাও মানিতে পারিলাম না। তালিকা রচনায় যে অজ্ঞান করা হইয়াছে তাহা জানিয়া শুনিয়া সজ্ঞানে হইয়াছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ ছিল। কাজেই এইরূপ সাক্ষ্য আসিবে ইহা আমরা আগেই ভাবিয়াছি এবং পণ্ডিত নেহরুর ঐ বক্তৃতার আগে নবেদর মাসের 'মর্ডার রিভিউ' এ লিখিয়াছি। অজ্ঞান বুঝা গেলে তাহার সংশোধনই নিম্নম। অজ্ঞান বুঝিয়া ও জানিয়া সংশোধন না করা অপরাধ। অজ্ঞান সংশোধনের কোন সময় নির্দিষ্ট নাই। যে কোল অবস্থায় যে কোন সময়ে অজ্ঞান বুঝিবামাত্র যে লোক তাহা সংশোধন করিতে পারে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনোয়তের অধিকারী। আজ বাহাদিগকে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে তাহার পাঁচ বৎসর গবর্নেট চালাইবে ইহা ভাবিয়াই তাহা করা হইয়াছে। অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর লোকের হাতে গবর্নেট পড়িলে দেশের কি অবস্থা হয় বর্তমান কংগ্রেস গবর্নেট তাহার প্রমাণ। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রার্থীর যোগ্যতা দেখা হয় নাই, দেখা হইয়াছিল কেবল কংগ্রেসের ছাপ। বাধীনতার পর এই শ্রেণীর লোকের মূল্য লোকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। কাজেই আজ এই ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। কেবলমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী কংগ্রেস হইতে দেওয়া উচিত ছিল। পণ্ডিতজী যে মুহুর্তে বুঝিলেন যে এই নীতি কংগ্রেস-তালিকায় রক্ষিত হয় নাই অতঃপর যদি তিনি উহা বাতিল করিয়া দিতেন এবং নতুন তালিকা রচনার সময় দেওয়ার ক্ষমতা ছই বা তিন সপ্তাহ

নির্বাচন পিছাইয়া দিতেন তবে এই ভুল শোধরাইবার ব্যবস্থা হইত। পাঁচ বৎসর এক দল অযোগ্য লোকের হাতে গবর্নেট সমর্পণ করা অপেক্ষা তিন সপ্তাহ নির্বাচন পিছানো অনেক ভাল দেশভক্ত লোক ইহা বুঝিত। ইহাতে কংগ্রেসের মর্যাদাও অনেক বাড়িত। কিন্তু নেহরু তাহা করিলেন না। আজ তাঁর এই স্বীকারোক্তিকে লোকে সত্যতাপূর্ণ উক্তি বলিয়া মানিবে না, ইহাকে বরং অধিকতর অপরাধের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি নতুন একটা অজ্ঞান কাজ করিবার আগে পূর্বকৃত কার্য ভুল হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়া জনমত শাস্ত করিতে চায়, দলের ছই-চারিটি লোককে বিভাতিত করিয়া জনমতকে ভাঙতা দিতে চেষ্টাও করে। পণ্ডিতজী এই পন্থাই অমুসরণ করিতেছেন ইহা বুঝি হৃৎকের বিষয়। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁহারই মতে প্রেসিডেন্ট কাজ করিবেন। বর্তমান তালিকায় নাম লেখা লোকেরা নির্বাচিত হইলে আগামী পাঁচ বৎসর দেশে কুশাসন ঘটিবে বলিয়া তিনি নিজে যেখানে বুঝিতে পারিতেছেন সেখানে তার সংশোধনের ক্ষমতা অনায়াসে তিনি প্রেসিডেন্টকে ছই-তিন সপ্তাহ নির্বাচন পিছাইবার পরামর্শ দিতে পারিতেন। ইহা না করার আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় নাই, প্রমাণিত হইয়াছে এই যে তিনি মনের মধ্যে পাপ লইয়া এই কাজ করিয়াছেন। ডাক্তার রায়ও এই দোষে দোষী।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ বাম উর্দ্ধ অংশে ক্রিশান কোণ নৈঋত কোণ ইত্যাদি সর্বস্থানের পার্টিবৃন্দ তাহাদের মনোনীত প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। যাহার একটা প্রার্থী তরাইবার সাধ্য নাই সেও একশ'টি নাম ছাপাইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, দেশে কংগ্রেস ছাড়া আর কোন সুপণ্ডিত রাজনৈতিক দল নাই, কাজেই আর কাহারও পক্ষে গবর্নেট গঠন করা সম্ভব নহে। বামপন্থী দলগুলি একমত হইতে পারিতেছে না এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। আগামী ব্যবস্থা-পরিষদে যে ভিত্তিতে বাছাই হইয়া কংগ্রেসপ্রার্থীরা আসিতেছেন তাহাতে কোন 'Stable' বা স্থায়ী গবর্নেট গঠন সম্ভব হইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। দেশসেবা, দেশের উন্নতি ইহাদের লক্ষ্য হইবে না, হইতে পারে না, ইহারা তার অসুপায়ক। কংগ্রেস দলের একমাত্র লক্ষ্য হইবে স্বার্থসিদ্ধি। ইহাতে বিরোধ এবং দল ভাঙাভাঙ্গি অবশ্যজ্ঞাবী। প্রার্থী মনোনয়নের বেলাতেই দেখা যাইতেছে যে, যিনিই মনোনয়ন লাভ করেন নাই তিনিই কংগ্রেস ছাড়িতেছেন এবং নতুন দল করিতেছেন। নির্বাচনের পর পরিষদ-গ্রহের ভিতরে লিবিং সাপ্লাইয়ের মধু পাইলে ইহা আরও সহস্র গুণ বাড়িবে। প্রার্থী মনোনয়নে বামপন্থী নামে পরিচিত দলগুলি আরও শোচনীয় স্বার্থপর

মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে। নিজের দলের স্বার্থ কেহই ছাড়িবে না। এই সুযোগে ইউ-এস-ও এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি অল্প দলগুলিকে সঙ্গে রাখিয়া কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছে, উহা আদৌ সম্ভব কিনা, ভাঁওতা কয়দিন টিকিবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই। ফরওয়ার্ড ব্লক চার-পাঁচ টুকরা হইয়াছে। বামপন্থী একটা দল যেখানে নিজেরা একত্র থাকিতে পারে না, সেখানে তাহারা প্রদেশব্যাপী একত্র গড়িয়া তুলিবে ইহা আশা করাও বাতুলুতা। কম্যুনিষ্ট দল বাহিরে কতকটা নরম ভাব রাখিয়া ভিতরে রীতিমত দরকষাকষি করিতে গিয়া তালগোজ পাকাইয়া বলিয়াছে। বামপন্থী একের নামে এখন ইউ-এস-ওর অন্তর্ভুক্ত গোটা দুই উপদল এবং কম্যুনিষ্ট দলের ছোটকে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। দল হিসাবে অধিকাংশ বামপন্থী দলই ইহাদের বাহিরে 'চলিয়া' গিয়াছে। আই-এন-এ পার্টির দোহাই ইহারা দিয়াছে, কিন্তু এই দলের কোন অভিজ্ঞ এখন আর নাই। তোসলে অনেক দিন কংগ্রেসের সহিত হাত মিলাইয়াছেন। শাহনওয়াজ কংগ্রেস মনোনয়ন লইয়াছেন, মহবুব গব্বের্টের চাকরীতে গিয়াছেন, শাহনওয়াজ এবং বীলন কলিকাতার দুই উপদলের হইয়া লড়িয়া গিয়াছেন। ইহার পরেও আই-এন-এ পার্টি আছে—বলিতে হইবে? সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যে কম্যুনিষ্ট দল নেতাজী সুভাষকে দেশমোহী বলিতে ছাড়ে নাই, তাঁহাদের সংগ্রামের যাহারা সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল, নেতাজীর ঐতিহ্যের দাবিদার ক্যোরবার্ড ব্লক বা ইউ-এস-ও এবং আই-এন-এ দলের সহিত সেই কম্যুনিষ্ট দলের মিলন ও একত্র কি করিয়া হইতে পারে? কোন আদর্শের ভিত্তিতে এই মিলন ঘটতে পারে না, ব্যক্তিগত বা উপদলগত স্বার্থ এবং লোভের ভিত্তিতেই ইহা সম্ভব।

দেশবাসীকে আজ আর বাম বা দক্ষিণ টিকিট দেখিলে চলিবে না। ভোট দেওয়ার সময় পার্টি টিকিট অগ্রাহ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। ইহা না করিলে আগামী পাঁচ বৎসরের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কাদিবাদ অধিকার কাহারও থাকিবে না।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নানা ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাবনার অন্ত নাই। ডাক্তারী করিবার সময় তিনি ব্যক্তিবিশেষের রোগের নিদান করিতেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। রোগী ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ ভাবভবনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে দেখাইতে পারিরাছি, এই আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাইতে পারিত। কিন্তু আজ সমাজদেহের নানা রোগ লইয়া তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না,

এবং কাহাকে সন্তুষ্ট করিলে যে চৌচামেচি কম হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

গত ২৪শে কার্তিক নিজের বাসগৃহে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যে বিবৃতি দান করেন তাহার মধ্যে আমরা উপরোক্ত দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করিতেছি। এই বিবৃতির চূড়ক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমাদের মন্তব্য হইবে তাহা অবলম্বন করিয়া। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সমস্তাসমূহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভরকের বিষয়। আমরা তাঁহার বিবৃতির চূড়ক প্রকাশ করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের যুক্তিগুলি বিচার করিবার জন্য পাঠকবর্গকে সুযোগ দিব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন—দেশের লোক আজ ভুলিতে পারেন না যে, মধ্যবিত্ত সমস্তা এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বিপুল-সংখ্যক মধ্যবিত্ত উদ্বাস্ত সমস্তাই ভারতের এই সমস্তাবহুল রাজ্যের প্রধান সমস্তা। অনেক রাজনৈতিক দল কৃষক-প্রজা-মজদুর, পুঞ্জিপতি প্রভৃতির কথা বলিতেছেন। কিন্তু কেহই মধ্যবিত্তের কথা বলিতেছেন না।

ডাঃ রায় বলেন, কৃষাণ ও মজদুরের জীবিকার ব্যবস্থা আছে; তাহাদের উপার্জনের পথ আছে। কিন্তু জীবিকা অর্জনের উপায়হীন মধ্যবিত্তের কথা কেহই চিন্তা করেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহ বুদ্ধিজীবীরা যদি খাদ্য ও আশ্রয় না পান, যদি তাহাদের সর্বদাই জীবিকার জন্য চিন্তিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্রমশঃ ক্ষয়বৃদ্ধিতে পরিণত হইবেন এবং তাহারা ফলে দেশের ক্ষতিই হইবে। সুতরাং এখন হইতেই মধ্যবিত্তদের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

ডাঃ রায় বলেন, তিনি এই মধ্যবিত্ত সমস্তা সমাধানের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণত করিয়াছেন। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলকথা হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য বসতি স্থাপন করা। তিনি আশা করেন যে; উত্তর কলিকাতা বিহৃতীকরণ পরিকল্পনা দ্বারা যে অঞ্চলে বিহৃত্য সরবরাহ হইবে সেই এলাকার মধ্যে তিনি কয়েকটি মধ্যবিত্ত বসতি স্থাপন করিতে পারিবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের প্রকৃত সমস্তা হইতেছে জীবিকা নিরীহোপযোগী জমির সমস্তা। সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায়, এই রাজ্যের বহু-সংখ্যক চাষীকে বৎসরের প্রায় তিন-চারি মাসের খাদ্য বাজার হইতে কিনিতে হয়। কাজেই এই সমস্ত চাষীকে অল্প কাজে নিযুক্ত করিবার সমস্তাও আছে। চাষীদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবহারকর পশ্চিমবঙ্গে জমি উন্নয়নের দ্বারা চাষীদের মধ্যে জমি পুনর্বন্টনের প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে জমিবন্টনের প্রথমটি এই রাজ্যে কি পরিমাণ জমি পাওয়া যাইবে তাহার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যে অবশিষ্ট জমির পরিমাণ খুবই স্বল্প। জীবিকা-নির্বাহোপযোগী জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলে হিসাব অনুযায়ী অন্ততঃ প্রত্যেক চাষীকে ৫০ বিঘা করিয়া জমি দিতে হয় এবং ঐ ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে বহু চাষীকে জমি হইতে উৎখাত করিতে হয়। কাজেই ইকনমিক হোল্ডিংয়ের ভিত্তিতে জমি পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলে সরকারকে জমি হইতে উৎখাত চাষীদের বিকল্প রীতিতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডাঃ রায় বলেন যে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্য যে সকল রাজ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হইয়াছে তিনি তাহাদের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং চাষীদের জীবিকার উপযুক্ত পরিমাণ জমি অথবা বিকল্প রূপের ব্যবস্থা করিবার সমস্তা তাহারা কিভাবে সমাধান করিতে পারেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি সরকার এই সমস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আজও পর্যন্ত তাহার সমাধানের পথ বাহির করিতে পারেন নাই।

“পশ্চিমবঙ্গের জমিদারপণ তাহাদের জমিদারী বিক্রয় করিয়া দিতে বিশেষ উৎসাহী—একথা আজ আমি বলিতে পারি। জমিদারী বিক্রয়ে তাহারা খুব খুশী হইবেন।” তিনি বলেন—কিন্তু জমিদারী ফর করিয়া তাহা দ্বারা চাষীদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা যাইবে কিনা তাহাও সরকারকে এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী রাষ্ট্রীয়-করণের প্রশ্ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন—সাময়িকভাবে তিনি অন্ততঃ জমির ফলন বাড়াইবার একটি উপায় করিয়াছেন। অনেকেই জানেন না যে, সরকার গত ৫৬ বৎসরে সেচ ও উন্নত ধরণের বীজ এবং ভাল সার বিতরণের ক্ষেত্রে লাভ কোটি টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। জমির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাষীদের আর্থিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পথ খুলিয়া দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য ছিল। তিনি আরও বলেন যে, তাহার এই নিজস্ব সমাধানের উপায় লইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। খাসমহলের জমি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ তিনি দিয়াছেন।

এই বিবৃতির মধ্যে ডাঃ রায় ‘মধ্যবিত্ত’ সমস্তাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। দুই লোক বলিবে যে, আগামী ভোট-মুহুর্তে তাহাদের ভোট সংগ্রহ করিবার জন্ত তিনি তাহা করিয়াছেন। আমরা মনে করি, মধ্যবিত্তের সমস্তা বহু-বিভাগ দ্বারা জটিলতর হইয়াছে মাত্র। তাহা গত ৮০।৯০ বৎসরের নানা কার্যের ফল। তৎসম্বন্ধে বাহারা গবেষণা করিয়াছেন তাহারা জানেন

যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অপর প্রদেশবাসীদের মত গ্রাম ছাড়িয়াছিল অভাবের তাড়নায় বা স্বাস্থ্যের অবেশ্যে। এই ব্যাখ্যা সহজে বুঝা যাইবে যদি আমরা মোগল রাজত্বের অবসানের ফল পর্যবেক্ষণ করি। ‘আমীর-ওমরাহ, সেনানী-সৈন্য বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে বা পশ্চিমে ইংরেজের কল্যাণে যেসব নতুন বস্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কষ্ট বোঝাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা নগরীতে ও জাহাজঘাটার এবং রেলওয়ের কর্মীরূপে তাহারা ভিড় করিল। অল্পরূপ অভাবের তাড়নায় শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আজ উত্তর-ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রমাণ সরকারী দপ্তরে, সওদাগরী আপিসে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্ততঃ গত এক শত বৎসর হইতে এই দুই অবস্থার দ্বারে ঠেকিয়া গিয়াছিল। কলিকাতার সওদাগরী আপিস, লালদীঘির উত্তর দিকে সরকারী দপ্তর, গঙ্গাভীরে অবস্থিত হাইকোর্টের দৌলতে প্রায় ৫০ বৎসর তাহারা একপ্রকার স্তব্ধ ও বস্তিতে কাটাইয়াছে। আপদ জুটিল ম্যালেরিয়া রূপ ধারণ করিয়া; তাহাদের গ্রামছাড়া করিল। স্বাস্থ্যের অবেশ্যে তাহারা বাহির হইয়া পড়িলেন বাংলাদেশের বাহিরে।

একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, সীওতাল পরগণা হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত বাঙালী স্বাস্থ্যবেধীরা যে সব বাড়ীঘর করিয়াছিলেন তার মূল্য অন্ততঃ পক্ষে ৩০।৪০ কোটি টাকা। মনে হয়, বি. এন. রেলওয়ের ষ্টেশন ও উড়িয়ার বাঙালী বসতি এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। আজ এ সব বাড়ীঘর, সম্পত্তির মূল্য কত তাহা সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সমাজদেহের এই ব্যাপক রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে। কেবল ‘বসতি’ স্থাপন করিলে রোগ দূর হইবে না এবং সরকারী ‘বসতি’ স্থাপন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে, তাহা খুব আশাশ্রিত নয়। ‘মুগাভর’ পত্রিকায় গত ১৩ই কার্তিকে প্রকাশিত এক পত্রে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে :

“পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের অষ্ট ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ায় ‘আর্য্য’ কলোনী গড়িয়া উঠিতেছে এবং ইতিমধ্যেই এখানে বহু পরিবার সরকার কর্তৃক নির্মিত দুই কামরাযুক্ত বাড়ী পাইয়া তথায় বসবাসের চেষ্টা করিতেছেন। অনেক বাড়ী এখনও খালি পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক বাড়ী পাইবার পর সরকারের নিকট হইতে বাড়ীর অধিকার লইয়া বাস করিবার পরিবর্তে ভাড়া লাগাইয়া বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়াছেন। অনেক বাড়ী এখনও বিল-বন্টন করা হয় নাই। বাড়ীগুলি খালি পড়িয়া থাকিবার ফলে, পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের লোকান্তাবে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এই সকল গৃহের

মালিক যে কবে আসিবেন অথবা একেবারেই আসিবেন কিনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

যাহারা এখানে বসবাস শুরু করিয়াছে, তাহাদিগকে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। আন্দোলনের বিষয় কর্তৃপক্ষ দেখিয়া শুনিয়াও এই সকল অসুবিধা দূর করিবার দিকে মোটেই নজর দেন না। অনেক বাড়ীর সম্মুখে পুরাতন রাস্তা ভাঙিয়া ফেলিবার ফলে যে গভীর গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আজ পর্যন্ত ভরাট করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অনেক বাড়ী এত নীচু যে, সামান্য বৃষ্টি হইলেই জল জমিয়া থাকে।

প্রায় পাঁচ শত পরিবার বসবাস শুরু করিলেও আজ পর্যন্ত এখানে পোষ্ট অফিস, স্বামী বাজার, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। শোনা যায়, গীর্জাই স্কুল, বাজার হইবে, চৌধুর আছান করা হইয়াছে। কিন্তু কবে যে ইহা বাস্তবে পরিণত হইবে, তাহা কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। তাহা ছাড়া কলিকাতার সহিত সহজ যোগাযোগের অভাবই শহর-পরিকল্পনা সাক্ষর্যমণ্ডিত হইবার প্রধান অন্তরায়। এখানে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টা হয় নাই, কাজেই এখানকার অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই কলিকাতা মহানগরীতে চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জড় ছুটাইয়া দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ষ্টেট-বাস সার্ভিস চালু করিয়া অনায়াসেই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। কলিকাতা যাতায়াতের সহজ উপায় না থাকাতে বাধ্য হইয়া অনেকের পরিবারবর্গকে এখানে রাখিয়া কলিকাতার থাকিতে হয়। কলে, দুই জায়গায় ব্যয় মিস্ত্রী করা এই বাজারে যে বিরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা সহজেই অস্বীকার করিবে। কলিকাতার সহিত সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হইলে তালা-দেওরা বাড়ীগুলির দরজা খুলিয়া যাইতেও দেখি হইবে না এবং পুনর্কাসন পরিকল্পনাও তখন সাক্ষর্যমণ্ডিত হইবে। আর একটি অসুবিধা পানীর জলের। ২০।২৫টি বাড়ীর পর মাত্র একটি করিয়া টিউবওয়েল রাস্তার ধারে বসাইয়া পুনর্কাসন-কর্তৃপক্ষ জলের সমস্যা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা শুধু কলোনী বাসীদের যে বিরূপ কর্তৃপক্ষ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবেন কিনা সন্দেহ। ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য অসুবিধা রহিয়াছে।

এই ‘আক্রান’ কলোনী দুই বৎসরের অধিককাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—”

পঞ্জলৈখক নিজের নাম দিলে ভাল করিতেন। তিনি যে সব অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অত্যধিক আছে। এই কলোনী বাসী কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন জানি না। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে যে পরিবার-পরিজন হিরণ্য হইয়া পড়ে তার ইতিহাস অজ্ঞাত নয়। প্রায়-

বিশ্ব না হইলে ‘গভীর গর্ত’ বুজিয়া যাইত; তাহার সরকারী কোন বিভাগের দিকে চাহিয়া থাকিতেন না। আমাদের এ সব অক্ষমতা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করি যে, পুনর্কাসন বিভাগ নিজের কর্তব্যপালন করেন নাই। সরকারী মাল কিস্তার মধ্যে তাহার যেমন আটকাইয়া গিয়াছেন, তাহাদের বেসরকারী সাহায্যকারীকেও সেই ভাবে জড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া হঃঃ হয় এবং যাহারা এই বেড়াঝাল ছিড়িয়া বাহির হইবার স্পর্শ করেন, ডাঃ রায় ও তাহার সাক্ষোপক তাহাদিগকে কোশলে সম্বাইয়া দেন। তাহার উদাহরণ—১৯৪৯ সালে ইউরোপে যাইবার পূর্বে খুব খটা করিয়া তিনি একটি পুনর্কাসন বিভাগ স্থাপন করেন। তাহার পরিণতি কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা তিনি কখনই এত শীঘ্র তুলিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য ডাঃ রায়ের বিরতির মধ্যে আমরা বিশেষ কোন আশার আলোক দেখি না এবং মনে করি যে, কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর “কলোনী” বসাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সমাধান হইবে না।

ডাঃ রায় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন নতুন বস্তির সৃষ্টি করিতে হইবে। কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ কৃষক যে তিন-চারি মাস কর্মহীন বসিয়া থাকে তাহাদের জন্যও; তবেই বাঙালী সমাজ আত্মস্থ হইবার সুযোগ পাইবে। নানা পরিকল্পনা আছে জানি। ডাঃ রায়েরও একটা থাকিবে না কেন? কিন্তু সে সব পরিকল্পনাকে রূপ দিবে কে বা তাহারা? একজন গুলজারীলাল নন্দ বা একজন বিধানচন্দ্র রায় কার্তবীর্য্যজ্ঞানের মত সহস্র-বাহু হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না যদি না “দ্বিগুণ কোটি ভুক্ত” এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করে। অমেকেই তাহা করিতে উৎসুক। কিন্তু সরকারী দপ্তরখানার উত্তপ্ত বাতাসে তাহারা মুগ্ধাইয়া পড়েন। ইহা ত বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বাঙালী কৃষকের সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা মোটামুটি সত্য। তাহাদের জমি যথেষ্ট নাই; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেককে “৫০ বিঘা করিয়া জমি” দিবার পরিকল্পনা অজ্ঞাত অবাস্তব। পাঁচ বিঘা করিয়া দিলে দেশের লোক তাহার স্মৃতি জমর করিয়া রাখিবে এবং সেই পরিমাণ জমিও পশ্চিমবঙ্গে আছে কি না তাহা সন্দেহজনক। আমাদের মনে হয় যে, শ্রেণীবিশেষে বিধান না করিয়াও ডাঃ রায় শ্রেণীবিশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইজন্য তাহার অসুস্থ পরিকল্পনাদির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছি। সমগ্র বাঙালী সমাজ ভণ্ড সমগ্র ভারতীয় সমাজ নতুন করিয়া গঠিত করিতে হইবে। অধিবাসী শিল্পবর্গের জন্য গান্ধীজীর সে স্বপ্ন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। সেজন্য “পণ্ডিত” জবাহরলাল নেহরু প্রধানতঃ দায়ী। ডাঃ রায় কখনও গান্ধীনীতি গ্রহণ করেন নাই বা তাহা করিবার ভান করেন নাই। তিনি

বর্তমান যুগের “বৃহৎ যন্ত্র”—কলকারখানার বিখ্যাসী। নিজের জীবনে তাহার পরিচয় দিয়াছেন বিভিন্ন ধরনের পিল প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং তাহাদের সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়া। সেইজন্য তিনি “মধ্যবিভ” শ্রেণীর সম্মান হইলেও পুঁজিপতি হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে সদা ব্যগ্র।

কিন্তু দেশের হুর্ভাগ্য যে ভারতরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহাদের একজন—নিজেদের কথা অনুসারে কাছ করিতে পারিতেছেন না এবং গান্ধীনীতি কার্যকরী করিতে উৎসাহ পাইতেছেন না। ইহাই পণ্ডিত নেহরু ও ডাঃ রায়ের মত লোকের হুর্ভাগ্য। বর্তমান ভারতের, স্বাধীন ভারতের, নানাবিধ ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপাল

নবনিযুক্ত রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাহার সহবাসিনী শ্রীমুক্তা বঙ্গবালী দেবীকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক-জীবন আরম্ভ হয় বিগত শতাব্দীর শেষভাগে। কলিকাতা সিটি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশ। তাহার প্রতিভা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। আমরা মনে করি যে, তাহার শিক্ষক-জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তাহার বিরাট দানের মধ্যে পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, বিহারীলাল মিত্র—এই তিন জন বাঙালী দাতার পরেই ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র “ক্যালকাটা রিভিউ” (মাসিক) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বেও মনে হয় সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে তাহার নাম প্রকাশ পাইত। সেই সূত্রে সাংবাদিকগণের সঙ্গে তাহার পরিচয় ও সন্ধর্ভ আরম্ভ হয়। তাহা মধুর ছিল ও আছে। আজ তিনি পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছেন। সাক্ষাৎভাবে তিনি কিছু করিতে না পারিলেও তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মন্ত্রিমণ্ডলী ও সরকারী কর্মচারীবর্গ পরিচালিত হইবেন, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

শিক্ষকের কর্তব্য ও শিক্ষকের হুঃখ তিনি বুঝেন। আমরা আশা করি যে, তিনি তাহার বৃত্তির সম্মান বর্জন করিতে সাহায্য করিবেন। শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে যে হা-ছত্যাশের বন্যা বহিয়াছে তাহা রোধ করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করিবেন না এ কথা আমরা জানি।

নেপালের মন্ত্রিসভা

মহারাজা ক্রীমোহন শামশের ক্ষুদ্র নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা

গঠিত হইয়াছিল তাহা পদত্যাগ করিয়াছে। ভৎপরিঃ নেপালের অধীশ্বর ক্রীষ্ণভুবনদেব শাহ নেপাল কংগ্রেস নেতা ক্রীমাভূকাপ্রসাদ কৈরালাকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন জরুরী করিয়াছেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন ও চূড়ান্ত মন্ত্রিসভাও গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী মাভূকাপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

কি কারণে এক মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন হইল এবং আর ৫ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইল তাহা জানি না। মোহন-মা সভার কংগ্রেস পক্ষীয় সচিববৃন্দ প্রথমাধিবেশী—১৯৫১ সালে মার্চ মাস হইতে—প্রকাণ্ড অভিযোগ করিতেছিলেন। রাণাবংশের মন্ত্রিবৃন্দ গণতন্ত্রের বিধানাদি অমান্য করিতেছে নানাভাবে প্রাচীন “রাণা-শাসন” ও তাহার কৌশল অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। রাণাপক্ষের বক্ত আমরা জানিতে পারি নাই। সেইজন্য ছুই দলের অভিযে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিব না। তবে ইহা জানি নেপালের কংগ্রেস ও রাণাবংশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ২ কথাকষি চলিতেছিল।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সম্পদ লইয়া বিরোধ নেপালে নতুন ন প্রায় ২০০ বৎসর রাণাবংশ কি করিয়া রাজবংশকে কোণঠ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা জানি। ১৯ জাগরণের কল্যাণে এবং রাণাবংশের বর্তমান প্রতিনিধি মধ্যে আত্মকলহের ফলে আজ মহারাজা ক্রীষ্ণভুবনদেব ২ ক্ষমতা ফিরিয়া পাইয়াছেন। তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করি পারা যায় কয়েকজন রাণাবংশের মন্ত্রীর নাম ধারার কংগ্রেস তালিকার স্থান পাইয়াছেন। নেপালের রাজধানী কাটম হইতে ২৯শে কার্তিক যে বার্তা প্রেরিত হয় তাহার মা আছে এই কয়টি নাম—সুবর্ণ শামশের জঙ্গ, জেনারেল কো শামশের জঙ্গ, মেজর-জেনারেল শর্দা শামশের—রাণা বংশে একজন যেন রাজপরিবারের প্রতিনিধি—ক্রীমোহনবিজয় শাহ অজ্ঞান্যেরা মধ্যবিভ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। প্রজাপুত্র প্রতিনিধি কে বা কাহারো তাহা বুঝিতেছি না।

রাণাবংশের শাসনের অবসান হইল। এই বিরাট বিপ্ল তাহাদের স্ফল্য হউক; নেপালের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক, আশা ভারতরাষ্ট্রের সকলেই করিবেন। মহারাজা ক্রীষ্ণভুবন শাহ নতুন কর্তব্যের দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লইলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজ্য হইবার শক্তি ও বুদ্ধি তাহার কার্যকলা ফুটিয়া উঠুক, এই প্রার্থনা করিতেছি। কংগ্রেসীদের নেত যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইতেছে, বাস্তববুদ্ধির প্রেরণায় তাহা চাচি হউক। তাহা না হইলে ভারতীয় কংগ্রেসের মত তাহা নিন্দাভাজন হইবেন।

রামমোহন রায়

“দেশ” পত্রিকার ১৯শে আশ্বিন সংখ্যায় চিত্তাঙ্গীল বাঙা

লেখক জনাব নৈয়দ মুজতবা আলী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

“তার পর ভারতবর্ষের যে অবিস্মৃত অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুপাণ্ডী, মজব-মাজাসার সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী কোনগতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি ছোর করে কিছু বলা যায় না।

তার পর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এবং আমাদের পরম শ্রাব্য সম্পদ এই বাংলাদেশেই জন্মালেন এক বাবা পণ্ডিত, এক জ্বরদন্ত মৌলবী—যিনি কি আল-বীকুনী, কি দার-শীকুহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা দন্দ, নানা সংঘাতের উর্দ্ধে সে সত্যশিব-সুন্দর আছেন, যার অতিদ্রুত স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যসুন্দরশিবকে তিনি হৃদয়ে অমুণ্ডন করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিত্তর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফারসী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হিব্রু, গ্রীক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্ট—এই চার ধর্মজগতে তিনি অনার্যানে অতি বহুদন্দে স্থানপ্রদান গ্রহণ করে, অন্তরের খাণ্ড অন্বেষণ করে, যে শক্তি সঞ্চয় করিতে পেরেছিলেন, সে শক্তি যে শুধু সে-যুগের বৃঢ়তা জড়তাকে ক্ষয় করতে পেরেছিল তাই নয়, সে শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষে যে নব নব অভিজ্ঞানের পথ খেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অতীতকার জীবনমুণ্ড অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোঝায়, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রত্নীকৃনাথের ছিল, ব্রজেননাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তার বহুযুগী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনো হয় নি।

নিগীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন এক কথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিগীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে সে নিগীড়ন এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বুঝে অস্বীকার হয় না—তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সর্বধর্মের পণ্ডিতগণ।”

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধ

এই দুই দেশের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমশঃই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে কেন ওৎসবকে আলোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রাদিতে হইতেছে। আমাদের দেশের মনোভাব অনেকটা “পণ্ডিত” জবাহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে। পাশ্চাত্য গণভক্ত-শাসিত রাষ্ট্রগুলি চায় যে, আমরা তাহাদের কয়ুনিষ্ট-ভীতি দ্বারা পরিচালিত হই এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধী হইয়া উঠি। মতবাদ সম্বন্ধে কখনও ভারতবাসীর কোন

গোড়ামি ছিল না, এখনও নাই। সেইজন্যই প্রধানমন্ত্রীর নিক্সিসোধী নীতি আমরা সমর্থন করি।

যুক্তরাষ্ট্র এই মনোভাব বুঝিতে পারে না। সেইজন্যই মনে করে যে, টাকা-পয়সা ধার দিয়া বর্তমান বিজ্ঞানের নানা কৌশলাদি শিক্ষা দিয়া আমাদেরকে দলভুক্ত করা অধিকতর সহজ হইবে। এই ভ্রম ভাঙিবে কিনা বুঝিতেছি না। আর্থিক সাহায্য দিয়া কোন জাতির মন যে বেশী দিন বাঁধিয়া রাখা যায় না, তাহার প্রমাণ চীন দেশ। ১৯৪১ সাল হইতে মার্কিন রাষ্ট্র প্রায় দশ-বারো শ’ কোটি টাকার দ্রব্যাদি ও অন্ত্রশস্ত্র দিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। তাহার ফলে কি পাইয়াছে আজ তাহা অজানা নয়। মার্কিনী অর্থ ও বিজ্ঞা-বুদ্ধি চীনদেশে বিখ-বিজ্ঞানের স্থাপন করিয়াছিল; চীনা যুবক-যুবতীকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছিল; হাভার্ড, ইয়েল, প্রিন্সটন, কর্ণেল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বৃত্তি দিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। বর্তমান চীনের শাসকবর্গের মধ্যে এক চিন্মাংকাই-শেক ও মাও-সে-তুঙ ছাড়া প্রায় সকলেই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

এত বড় বিরাট সাহায্যের কথা আজ চীনদেশ তুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সংবাদপত্রে যেসব মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয় তাহার ভঙ্গী সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংবাদপত্রের ধরণ-ধারণ হইতে কম অসংযত নয়।

এই পরিণতির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মার্কিন চিন্তানায়কগণ ও শাসক-শ্রেণী বুঝিতেন কেন চীনদেশবাসীরা চট্যাচ্ছেন। মার্কিন জাতি তাহাদের স্বার্থ-বুদ্ধিকে নিরস্ত্রিত হইতে দিতেছে না। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশের উন্নতিকল্পে কিছুই করে নাই, এই কথা আমরা মনে করি না। তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, সভ্যতার অভিমান—এই মনোভাবের প্রেরণায় তাহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে বর্তমান যুগোপযোগী অনেককিছু দিয়াছিল প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে। সেইরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পৃথিবীর সকল “অনগ্রসর” দেশে অগ্ররূপ চেষ্টা করিতেছে এবং মার্কিনী সাংবাদিকেরা নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, এরূপ দানে সকলকে তাহাদের অগ্রগামী করা উচিত। তাহা যে হয় না, এরূপ আশা যে ছরাসা তাহা যদি চীনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা বুঝিতে না পারেন, তবে আর কিরূপে বুঝিতে পারিবেন?

সেইজন্য নুভন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোলস্ গত ১৯শে কাণ্ডিকের একটি বিষয়টিতে যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত নুভন গম্ভীর নির্দেশ করিলে আমরা স্থবী হইব। যাহাতে আমাদের “সুপ্রাচীন সংস্কৃতি” নিরাক্রান্তে থাকিতে পারে তার জন্যই ভারতরাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটা

হুঁসুম বা সুনাম আছে—“শান্ত হিন্দুধর্ম” (mild Hindu)—এটি বোম্বার যুগে এই বিশেষণ সম্মানের নয়। এটি বোম্বার ভয় হইতে মুক্ত হইবার কৌশল ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষাইতে পারে—অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল লোক কিন্তু এই বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করেন। তাহারা গান্ধীজীর উদাহরণ দেখাইয়া থাকেন স্বপ্ন-ভাষন। চেষ্টার বোলসের এরূপ কোন ব্যর্থতা আছে কিনা জানি না। তিনি অত্যন্ত কাঁকা কাঁকা ভাবে আমাদের “স্বপ্রাচীন সংস্কৃতির” প্রশংসা করিয়াছেন যেমন করিয়াছেন নিজেরদের সহায় ও সভ্যতার।

আমরা এই দুই সংস্কৃতির তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চাই। কিন্তু আমরা মনে করি যে, আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় দিবার চেষ্টা কদাচ আমেরিকায় হইয়া থাকে। আমরা অনেক প্রচারপত্রিকা পাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার বিভাগের আত্মকৃত্যে। দুইখানি দৈনিক ইংরেজী ও বাংলা পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার মধ্যে পাই কেবল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্য-কলাপের নানা কারণের ব্যাখ্যা এবং দুইখানি পত্রিকায়ই ভারতীয় লেখক তাহার প্রশংসা করিয়া যে-সব পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিতে হয়। মার্কিন সংস্কৃতির ব্যাখ্যা প্রায়ই দেখি না। এমারসন (Emerson) প্রভৃতি “বোষ্টন ব্রাহ্মণগণ” (Boston Brahmins) হইতে আরম্ভ করিয়া যে আদান-প্রদান চলিয়াছিল রামমোহন রায়ের সময় হইতে, তাহার কোন উল্লেখ দেখি না। অহরোধ করিয়া ও—দিল্লী নগরীর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়াও, ফল হয় নাই, দুই-এক জন বাঙালী সাংবাদিক এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাহারা রাজনৈতিক আলোচনা করিতে চান নাই। কিন্তু দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের কথা বলিবার জন্য অহরোধ করিয়াছিলেন এবং প্রথমে মার্কিন সংস্কৃতির পরিচয় দিবার কথা বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে হস্ত ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি ও নিজের কথা বলিতেন।

পরস্পর ভাষা ভাষা প্রশংসা করিলে কোন ফল হয় না। এই অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। চেষ্টার বোলস তাহা করিতে পারিবেন কি?

চীন ও ভারতের সম্বন্ধ

সম্প্রতি চীনদেশের পক্ষ হইতে একটি সংস্কৃতি মিশন ভারত-রাষ্ট্রের নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী নগরীতে এক সভায় (গত ১৩ই ফার্ভুয়ারি) ভারতের পক্ষ হইতে তাহাদের অভ্যর্থনা করা হয়। সভাপতি ছিলেন আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ডক্টর আকির হুসেন। বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি বলেন : “আমাদের ভারতীয়গণ অপেক্ষাও প্রাচীনতর একটি জাতির, অথচ আমাদের সাধারণতর রাষ্ট্র অপেক্ষাও নবীনতর একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে আপনারা এখানে

অভিনন্দিত হইতেছেন। তাহা ছাড়া আপনাদের এই ভারত পরিদর্শন উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার নূতন যুগের স্বচেনারূপ; এক্ষণে আপনাদিগকে যিগুণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইতেছে।”

এই অভিনন্দনের উত্তরে মিশনের নেতা ভিং সি লিন বলেন, “ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দীর্ঘজীবী হউক। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দেশগুলির প্রতিটি লোকের সমৃদ্ধি এবং দেশের নিরাপত্তা কামনা করি। ইহার জন্য চাই উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ়তর করা। ইতিহাস ইহার ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বিগত দুই বৎসরে আমাদের উভয় দেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাই এই দুই দেশের পূর্বোন্নিখিত মৈত্রীর জাজ্বল্যমান প্রমাণ।”

এরূপ শুভ ইচ্ছার মূল্য আছে। কিন্তু তাহা রাজনৈতিক নয়। আমরা বড়াই করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ-ধর্মের জন্ম, বুদ্ধদেবের ধর্ম আমরা চীনকে দিয়াছি। চীন-দেশের পক্ষ হইতে এই ধর্ম অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু চীনদেশীয় নর-নারীর মনে একটা অভিমান আছে যে, তাহারা কেবলমাত্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক লোক-সংখ্যার অধিকারী নর, তাহাদের দেশ শিল্প-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির অজ্ঞাত প্রকাশের ক্ষেত্রে অনন্তসাধারণ অনেককিছু দান করিতে পারে। এক জন্ম জার্মান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, যে জাতির নরনারী যে-কোন আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে পারে, যাহারা বা-তা খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে, তাহারা অজন্ম।—সেই কথাই এখন প্রমাণিত হইতেছে। ভারতরাষ্ট্র হইতে সংস্কৃতি মিশন চীনদেশে গিয়াছিল। তাহার এক জন সদস্য—গ্রীহাভী সিং যাহা বলিয়াছেন তাহা এই যতের সমর্থক :

“...উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী বিদ্যা জানা না থাকা সত্ত্বেও চীনরা কাজ করিয়া যাইতেছে। চীনের বিরাট জনসম্পদকে পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে, ২০ লক্ষ লোক কোদালি হাতে লইয়া হুয়াই নদীর বজানিরোধ পরি-কল্পনা কার্য্যকরী করিতেছে। মাফুরিয়ার বেকার নাই। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা কৃষিক্রিয়া উৎপাদনের সহিত অজ্ঞাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে। ভূমি-সংস্কারের পর চীন খাদ্যে স্বাবলম্বী হইয়াছে। এখানে নিশ্চয় একতরফা মতবাদের স্থান নাই। কমপক্ষে আরও ২০ বৎসর ব্যক্তিগত পুঞ্জির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে।

চীনা জনসাধারণ বৃদ্ধিতে পারিয়াছে, সমৃদ্ধিে হর্বৎসর। তবে তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে, অতীতের তুলনায় বর্তমান উন্নত। সরকারী অফিসাররা অত্যন্ত সাদাসিধা জীবনযাপন করেন। তাহারা বেতন পান না, খাদ্য ও সামান্য ভাতা

পান। চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং মাত্র ৮ শত টাকা ভাতা লইয়া থাকেন।”

এই উক্তির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

চীন ও ভারতবর্ষের পার্থক্য

মহা-প্রকাশিত “নিশান” পত্রিকা এই ছই দেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য দেখা দিয়াছে তার নিদান অঙ্গুসন্ধান করিতে গিয়া বলিতেছেন :

“আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই, চীনের বেলার অস্বাভাবিক কোন কিছুই হয় নাই। চীন লক্ষ লক্ষ জাতি-মোহীকে বলি দিয়াই আধিকার কমান্ডিট গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বুলডজার ও গ্রীষ্ম বোলাবের সাহায্যে দেশ পালিশ করিয়া নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এখানে তাহা হয় নাই। গান্ধীনীতি অঙ্গুসন্ধান করিয়া বিনা রক্তপাতে আপোষে স্বরাজ আসিয়াছে। তাই যুগে বলিলেও কার্যভঃ একজনও কালো-বাজারী বা জমিদারকে ল্যাম্প-পোটে ফাঁসি দিতে পারে নাই। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করিয়া প্রত্যেকের জীবন ধন-সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য-মান দিয়া তবে ধীরে ধীরে অঙ্গুর হইতে বাধ্য হইতেছে, ইনকুম্বট্যান্স ফাঁকিদাতাকে তাহার সমস্ত দিয়া দিয়া আপোষে একচল্লিশ কোটি আঠার লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছে। সুতরাং বিপ্লবের পথে চলিয়া ছই বৎসরে চীন যাহা করিয়াছে, গতানুগতিক নিয়মনিষ্ঠার পথে ততখানি অঙ্গুর হইতে ভারতের লাগিবে অন্ততঃ ২০ বৎসর। সুতরাং সন্মুখে শুধুই অন্ধকার।”

এই “আত্মলাবকারী পরমোৎসাহ” (রবীন্দ্রনাথ) সহজে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। চীন যে মূল্য দিয়াছে “স্বরাজ” পাইবার জন্য, আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলাম কি? এখনও আছি কি? গান্ধীজী আমাদের প্রকৃত বুঝভেদ বলিয়াই অহিংসার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজনীতি সহজে উৎসাহী বাহারা তাহারা ত নেতাজীকে সাহায্য করেন নাই। করিলে হয়ত তিনি দেশত্যাগ করিতেন না।

তারপর এই চারি বৎসর আমরা কি করিতেছি? সকলেই যে আমরা অহিংসাবাদী, বাক্যে, মনে ও কর্ণে অহিংস এমন কথা বলিতে পারি না। তাহাদের মধ্যে কেহ কি কোন কালোবাজারীকে নিজ হস্তে শাস্তি দিয়াছেন? একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। যেমন প্রজা তেমন রাজা হয়। জোর করিয়া মানুষকে সং করিলে হিটলারের দশা ঘটে। সেইখানেই গান্ধীনীতির স্বেচ্ছা।

ব্রহ্মশিল্পে ভারত ও জাপান

কয়েক মাস পূর্বে জাপানী ব্রহ্মশিল্প পরিচালক সমিতির কোন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—ব্রহ্ম শিল্পে জাপান এই দাবি করিতে পারে যে, সে ব্রহ্ম-রপ্তানী

জগতে ‘এক নম্বর’ স্থান অধিকার করে। ইহার প্রত্যক্ষরে সরকারী ব্রহ্ম নিঃস্রবকারী বিভাগের কোন দাখিলদারী কর্মচারী বলেন যে, এই কথা সভ্য নয়; ভারতরাষ্ট্রই এই দাবি করিতে পারে। তার প্রমাণরূপে তিনি এই তথ্য উপস্থিত করেন, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে স্থল ও জলপথে প্রায় ১২০০ কোটি গজ ব্রহ্ম রপ্তানী হইয়াছিল; সেই বৎসরে জাপানী হিসাবমতে ঐ দেশ ১০৬৪ কোটি গজ ব্রহ্ম রপ্তানী করে।

সংবাদভেদে এই যুক্ত আমাদের কোন উপকারে আসে না, ভারতের সাধারণ নাগরিক তাহাতে কোন আনন্দ পায় না। সরকারী ব্রহ্ম নিঃস্রব বিভাগ যতই বড়াই করুক, দেশের লোক যখন দেখে যে একখানি ধূতী বা শাড়ী অথবা এক গজ ‘মার্কিন’ কিনিতে তাহাদের লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং ২৩ ঘণ্টা অপেকার পর খালি হাতে ফিরিতে হয় তখন জাপান ও ভারতের এই প্রতিযোগিতার সংবাদে তাহারা কেবল গালি দিতে পারে অদৃষ্টকে এবং তাহাদের অর্থে পুষ্ট সরকারী নিঃস্রব-বিভাগকে।

ইহার মধ্যে আবার সংবাদ আসিয়াছে যে, দ্বিষ্ট কম হওয়ার কারণে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে বিজলী-শক্তি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে বস্ত্রাভাব, কালোবাজারীর লাভ ও সরকারী নিঃস্রবকারীর উপরিপ্রাপ্তি কিছু হইবে। এই একটা মাত্র কারণে মেহফু সরকার তথা কংগ্রেসী সরকার ভোটযুদ্ধে হারিয়া যাইতে পারিতেন যদি দেশের অধিকাংশ লোক নিরাকর না হইত।

ভারতীয় ভাষা-নীতি

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ নামা স্থানে ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেছেন। ইহা তাহার কণ্ঠ্য। এই সমস্ত ক্রমশঃ ইংলিশে জটিল হইয়া উঠিতেছে। আদিতে দেবনাগরী ও উর্দু লিপি সহজে যে তর্ক ছিল তাহা বহিয়া গিয়াছে। এখন প্রতি রাজ্যের স্থানীয় ভাষা ও লিপি নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করিবার জন্য বন্ধপত্রিকর। যতই শিক্ষাক্ষেত্রে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া হিন্দী স্বীকৃত হইতেছে, ততই বিকোভ বাড়িতেছে এবং মানাভাবে তাহা রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া যাইতেছে। “হিন্দী সাত্ৰাজ্যবাদ” ইহার কারণ। আমাদের মনে ভয় যে, প্রতি রাজ্যে আগামী ভোট-যুদ্ধে এই বিষয়টি কংগ্রেস শাসনের কণ্ঠ বলিয়া প্রচারিত হইবে।

সেইজন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাম্প্রতিক বিবৃতি হইতে সমস্ত সম্ভাব্যদের একটি উপায়ের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। বাংলা “ভিজেন” পত্রিকায় তার অঙ্গবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :

“প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষার বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে প্রাচীন ও অর্ধ-প্রাচীন সকল প্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডার করিয়া তুলিতে হইবে, সকল প্রকার শিক্ষার বাহন করিতে হইবে।

হানীর গবর্ণমেন্টের যতদূর সাধ্য এই কার্যে সাহায্য করিতে হইবে। বর্তমানে ভাষার যে রূপ ও শব্দসম্পদ আছে তাহারই উপর গঠন করিতে হইবে এবং অল্প সমঝাতীর ভাষা হইতে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সম্পদ গ্রহণ করিয়া সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। ভাষার আদি উৎসে পাওয়া যায় না—অতএব নতুন কথাভঙ্গী বা ব্যাকরণের নতুন কোন কিছু গ্রহণ করিব না, এরূপ শুচিতা-বিলাস ব্যর্থ হইবে। তাহাতে ভাষা সমৃদ্ধ না হইয়া তাহার দৈর্ঘ্যই বৃদ্ধি পাইবে।

তাহা ছাড়া, দুই নাও যদি হয় তথাপি এই সকল অনাবশ্যক ব্যাপারে ক্ষয় করিবার মত শক্তি আমাদের নাই। দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য আমাদের সর্ব-প্রকারে নিজ শক্তি রক্ষা করিয়া তাহার স্রষ্ট প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাষার ব্যাপারে শুচিতা রক্ষার চেষ্টার কোন অর্থ নাই, কারণ ভাষা ও ভাবের বাহন, আর কোন শব্দ-প্রতীক যদি কোন ভাবে স্রষ্টভাবে প্রকাশ করে, তবে সেই শব্দ বৈদেশিক কোন ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কোন অঞ্চলের ভাষার বিকাশ সেই দিকেই হওয়া চাই যে-দিকে সেই ভাষা জনসাধারণের নিকট অধিকতর গ্রাহ ও বোধগম্য হইবে। ভাষার বিষয়বস্তু, লেখনভঙ্গী ও শব্দসম্পদ সাধারণ লোকের জীবন ও কণ্ঠের যত সন্নিবিষ্ট হয় ততই ভাল। আমি মনে করি, অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠানের মত ভাষাও যদি মায়াবীর বুকের কাছে পৌঁছে তবেই সম্যক উপকার হয়।

আমাদের দেশ বহু ভাষাভাষী। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বাহাতে পরস্পরের সহিত এবং সমগ্র জাতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য আমাদের একটি সাধারণ ভাষা চাই-ই। সম্যক বিবেচনার পর বিধান-পরিষদ ভারতীয় সংবিধানে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীকে ভারতের এই সাধারণ ভাষা বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন। ভারত ইউনিয়নের সরকারী ব্যাপারে সংখ্যার অল্পগুলি হইবে বর্তমানে সর্বভারতে চলিত অক্ষ।

এই সিদ্ধান্তের ফলে কোন অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রত্যেক ভাষাগত অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা উচিত—ইহার চেয়ে বেশি কিছু বলা প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহা হইলে বাহাদের ভাষা হিন্দী নহে তাহাদের ক্রোধও কোনও কারণে অনুবিধায় পড়িতে হইবে না।

ভারতরাষ্ট্রে “জাহাজী” কর্ম্মী

ভারতরাষ্ট্রের জাহাজী ব্যবসায় লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট চিন্তাধিত হইয়াছেন। এতদিন যে-সব পুঞ্জিপতি,

শেঠ ও মালচাঁদ হীরচাঁদ প্রভৃতি ব্যবসায়ী এই ব্যবসায় করিতেন তাহারা হঠাৎ “লাভ হয় না” বলিয়া হাত গুটাইতেছেন। সিঙ্গিরা গ্লিম-নোভিপেশন কোম্পানী যটা করিয়া জাহাজ নিখাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন বিশাখাপত্তম পোতাশ্রয়ের নিকটে (Vizagapattam Port & Naval Base)। এখন তাহা সরকারের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং সংবাদাদি পাঠে মনে হয় যে, গতন্তর নাই বলিয়া সরকার তাহা করিতে বাধ্য হইবেন।

কিন্তু এই স্বার্থের লোভ ছাড়া আরও লক্ষ লক্ষ লোক এই জাহাজী ব্যবসায় উপর জীবিকা উপার্জনের জন্য নির্ভর করে। তাহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ৯০,০০০ হাজার এবং শতকরা ৮০ জন পাকিস্তানী—পূর্ববঙ্গ, সিন্ধুদেশ ও পশ্চিম পঞ্জাবের মুসলমান। একটা পররাষ্ট্রের নাগরিকের হাতে জাহাজী ব্যবসায়ের জীবনমরণের কাঠি রাখিয়া দিবার বিপদ কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবুও বাধ্য হইয়া এই অব্যবস্থা আমাদেরকে সহ্য করিতে হইতেছে। কারণ পাকিস্তানীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে তাহা করিতে সময় লাগিবে, এই অভিজ্ঞতা ও কৌশল শিখাইতে সারেন্দ্রগণ খিলখ করিবে।

আমরা জানি যে, বহু হিন্দু যুবক চেষ্টা করিয়া নিজের নানা সংস্কার অগ্রাহ করিয়া জাহাজী (খালসী) হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু “সারেন্দ্রের সুখানির” অপকৌশলে বার্ষমনোরণ হইয়া তাহাদের কিরিতে হয়। সে আজ বহু বৎসর পূর্বের কথা—বিপ্লবী যুগের কথা। আজ ভারতরাষ্ট্রের অনেক নাগরিক এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু ইহারা মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের সন্তান। জাহাজে শ্রম ও কষ্ট ক্রিয়ার শক্তি ইহাদের নাই। “সারেন্দ্র সুখানির” অভ্যাচার সহ্য করিবার বৈধা ও প্রবৃত্তি নাই। সেইজন্য কৃষক শ্রেণীভুক্ত পাকিস্তানী-খালসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।

ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক—পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক কৃষক-শ্রেণী এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের বাওয়া-পরার সংস্কার আর একটা বাধা। অথচ এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। কেবল রাষ্ট্রের রক্ষাকল্পে নয়, বিলাট উপার্জনের উপায় এই বৃত্তির মধ্যে আছে। তাহার একটা ধারণা পাওয়া যায় গত ২৩শে আগষ্টের এক সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণে। ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে :

“বর্তমানে এক জন নাবিকের মূল বেতন মাত্র ৩৬ টাকা। এই আক্রার বাজারে এই টাকায় পরিবার-পরিজনদের ভরণপোষণ করা অসম্ভব। কাজেই বেতন বৃদ্ধি করিয়া অজ্ঞাত ভাতাসহ সর্বনিম্ন ১২৫ টাকা পর্য্যন্ত উচিত।

কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষার কোন বাধা-
বরা, অথু নীতি এই ব্যাপারে অগ্রসরণ করা হয় না।
প্রত্যেক নাবিককে দুই বার করিয়া বোর্ডের সম্মুখীন হইতে
হয়। একটি সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ড, অপরটি
কাহাজের কর্তৃপক্ষের তৈরি বোর্ড। আসলে দেখা গিয়াছে,
সরকারী বোর্ডের মতামত মালিকের বোর্ড আমল দেয় না।
প্রথমোক্ত বোর্ড কাহাকেও কাজের উপযুক্ত ঘোষণা করিলে
শেষোক্ত বোর্ড তাহা মানিয়া লয় না।

মোট ১০ হাজার নাবিকের নাম এই পর্যন্ত রেজিস্ট্রি করা
হইয়াছে। তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জন পাকিস্তানী এবং
বাদ বাকী ভারতীয়। ইহাদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশ
কাহাজের কাছে নিযুক্ত এবং আরও এক-তৃতীয়াংশ কাজের
জন্ত বসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের কোন ভাড়া দেওয়া
হয় না। বাকী ৩০ হাজার ছুটিতে থাকে। বর্তমানে
নাবিকদের দৈনিক প্রায় ১২ বর্গী কাজ করিতে হয়।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, প্রতি মাসে
১০১২ হাজার পাকিস্তানী নাগরিক কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা
উপার্জন করে। সেই অর্থ ভারতবাহ্যের কোন প্রয়োজনে
লাগে না।

ভারতবাহ্যে পাটের চাষ বৃদ্ধি

ইংরেজী সাংবাদিক বাংলাদেশে উৎপাদিত এই দ্রব্যের
নাম দিয়াছেন “সোমার তন্তু”। সুতরাং ভারত-বিভাগের
পর ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া
হইতেছে। কারণ পূর্ববঙ্গের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা
উচিত নয়। হাঙ্গেরির সকল কাজের মত এই প্রচেষ্টার ভাল-
মন্দ দুই দিক আছে। তাহাই “আনন্দবাজার পত্রিকা”র
বাণিজ্য-সম্পাদক গত ১৩ই কার্তিকের সংখ্যায় বলিয়াছেন।
শেষ মন্তব্যটির প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে
চাই। আজ পাটচাষের ও খাজশস্ত্র উৎপাদনের মধ্যে সম্বন্ধ
যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা দুই সতীনের যান।—

“প্রথম পূর্বাতাস

জমির পরিমাণ

১৯৫০-৫১

১২,২৭,৪৩৫ একর

১৯৫১-৫২

১৮,২০,১৮১

বৃদ্ধির হার—৪৮.৩%

“শতকরা ৫০ ভাগ পাটচাষের জমি বৃদ্ধি চায়ী, পাটকল-
মালিক ও ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা। পাটের
দাম এখন খুবই চড়া এবং বানচাষে যেমন সরকারী বাধ্যতা-
মূলক ফলনের পরিমাপের সংবাদ দেওয়া বা সরকারী দাবি
মিটাইবার হাদাশা আছে, পাটচাষে সে সম্ভাবনা নাই, বরং
সরকারী উৎসাহ আছে, সুতরাং চাষীর পক্ষে পাট চাষ বৃদ্ধিতে
আনন্দ আছে।

পাটকল-মালিকদের আনন্দ—আর পাটের অভাবে কল
বন্ধ রাখিতে হইবে না; যতই মাল উৎপন্ন হউক এবং যে দরই
নির্ধারিত করা হউক, ক্ষেতার অভাব নাই; সুতরাং লাভের
অঙ্ক ক্ষীত হইবার সুযোগ উপস্থিত।

স্বয়ংস্ফীত লাভবান হইবে। পাটজাত রপ্তানীর উপর
যে হারে শুল্ক বসিয়াছে, তাহাতে এই খাতে স্বয়ংস্ফীতের
প্রচুর আশ হইতেছে, সুতরাং পাটচাষ বৃদ্ধিতে স্বয়ংস্ফীতের পক্ষে
আনন্দিত হইবার কথা।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য ব্যবসায়ী প্রকাশ ও তাহা অপেক্ষা
অধিক অপ্রকাশ লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন, কারণ
বর্তমান অবস্থায় পাট সংক্রান্ত ব্যবসা একেবারে তাহাদের
মিকিট সাক্ষাৎ কলরবের সমতুল।

ভাবিতেছে তাহারা যাহারা পেট পুরিয়া রাইতে পার না;
পয়সার অভাবে সামনে বিক্রয়ার্থ চাউলের শু প দেখিয়া দীর্ঘ
নিশ্বাস ফেলিয়া অনাহারী ক্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি লইয়া কুঠিরে
দিন যাপন করে। বান ফলিলে হয়ত এক সময় বাজারে
চাউলের দর কম হইত, এখন বানের জমিতে পাট ফলিলে
যাহারাই লাভবান হউক, তাহার অর্থ-সামর্থ্যের মধ্যে চাউল
ক্রয় করিবার সম্ভাবনা ক্রমেই দূরে সরিয়া রাইতেছে।”

খাজশস্ত্র এবং অর্থকরী শস্তের মধ্যে কি অল্পপাত রাখিলে
একটা সামঞ্জস্য থাকে সেটা নির্ধারণ করার ক্ষমতা বা চেষ্টা
তো বাংলা-সরকারের নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের তাব্দেদারী
করিয়া আর কতদিন চলিবে?

পশ্চিমবঙ্গ কি বাট্টি অঞ্চল ?

এই বিভর্ক বছদিনের; অন্তত ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের
সময় হইতে তাহা নানাভাবে আলোচিত হইতেছে। পশ্চিম-
বঙ্গের বর্তমান খাজশস্ত্রী ত্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই বাট্টি-ভত্ত
প্রচারে বিশেষ উৎসাহী। তাঁর দেখাদেখি তাঁর বিভাগ তথ্য-
শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করেন। অনেক অবসরপ্রাপ্ত
সরকারী কর্মচারীও ঐ পথের পথিক হইয়া পড়িয়াছেন
দেখিতেছি। তাহাদের মধ্যে একজন ত্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
খাদ্যের গুণাগুণ বিচারে তিনি কেন্দ্রীয় স্বয়ংস্ফীতের রাসায়নিক
ছিলেন। উপরোক্ত প্রশ্ন করিয়া সম্ভ্রান্তি তিনি একখানি পুস্তিকা
লিখিয়াছেন।

এই বিভর্ক ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় অনেক হইয়াছে। আমরা এই
বাট্টি-ভত্ত সম্বন্ধে সন্দিহান। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য
ও বর্তমানে মন্ত্রী ত্রী আর. কে. সিং মহাশয়ের মতেও ভারত-
রাষ্ট্র খাজবিষয়ে বাট্টি নয়। তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা করি-
য়াছি। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র বাণিজ্য-সম্পাদক লিখিত
বিশেষ প্রবন্ধ সিং মহাশয়ের মতের সমর্থক। ইন্দুবাবুর পুস্তিকা
সম্বন্ধে এক সংখ্যাতত্ত্ববিদের মন্তব্য আমরা নিম্নে প্রকাশ

করিতেছি। ইন্দুবাবু সংখ্যার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন :

"১-২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কোন মন্তব্য নাট, কারণ এই কয়েকটি পৃষ্ঠাতে লেখক পশ্চিমবঙ্গে বাসাবস্থা বুঝাইবার জন্য ভূমিকার অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। ২৫ পৃষ্ঠায় ১৩মং তালিকাতে লেখক পশ্চিমবঙ্গের ১৫ আউল হিসাবে তৎকাল বাদ্যের পরিস্থিতি দেখাইয়াছেন। বাদ্যপরিষ্কৃতি আলোচনা করিতে হইলে মোটামুটি তিনটি ক্রিম্বের সঠিক হিসাব প্রয়োজন—(১) মোট ফসলের পরিমাণ, (২) লোকসংখ্যা, (৩) বাদ্যের হার। এই ভিত্তিতে উপরোক্ত তালিকা আলোচনা করা প্রয়োজন। লেখক প্রথমেই ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সালের গড়পড়তা উৎপাদন বরিয়াছেন, ইহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উক্ত পুস্তিকার ৯মং তালিকাতে পশ্চিমবঙ্গের চাউল উৎপাদন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় :

পশ্চিম বাংলার চাউল উৎপাদন
(হাজার টন)

১৯৪৬	২৮৯৫
১৯৪৭	৩৬৫৮
১৯৪৮	৩৪৫২
১৯৪৯	৩৩৪০
১৯৫০	৩৫৮৮

যদি কোন বৎসরে অস্বাভাবিক ভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কম থাকে তাহা হইলে গড় কৃষিবার সময় তাহা বরা মোটেই মুক্তিযুক্ত নয়, কারণ এক বৎসরের সংখ্যা সমস্ত হিসাব সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাইবে। বর্তমান তালিকাতে ১৯৪৬ সালে দেখা যায় যে, উৎপাদন অত্যন্ত বৎসর অপেক্ষা অনেক কম, ইহার জন্যই ১৩ মং তালিকাতে মোট চাউলের উৎপাদন পরিমাণ এক কম আসিয়াছে। চাউলের খুঁটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রতি বৎসরের আমদানী-রপ্তানীর হিসাব লইয়াই করা উচিত, গড় লইয়া হিসাব করিলে তাহার সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয় না। তাহার উপর দেখা যায়, ১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত মোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ১৬৮৮০ হাজার টন, অতএব তাহার গড় ৩৩৭৬.৬ হাজার টন। কিন্তু ৯মং তালিকাতে তাহা ৩৩৫০ হাজার টন দেখান হইয়াছে। ১৯৫১ সালের হিসাবে অনুযায়ী লোকসংখ্যা বরা হইয়াছে ২,৪৮,১৪,০০০। লোকসংখ্যার মধ্যে শিশু, বালক, যুব, বৃদ্ধ প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে, যাহাদের প্রত্যেকের বাদ্যের হার বিভিন্ন। লেখক যে এখানে ১৫ আউল গড় হিসাবে বরিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। লোকসংখ্যা "population studies" হইতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীতে গড় কত বাদ্য প্রয়োজন তাহা হিসাব করিতে হইতে, নচেৎ প্রদেশে বাদ্যের খাটতির পরিমাণ নির্ণয় করা মোটেই সম্ভব নয়।"

সংখ্যা বিশ্লেষণের ভুল দেখাইয়াও সংখ্যাতত্ত্ববিদ মহাশয় মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ বাদ্যশক্ত সম্বন্ধে খাটতি অঞ্চল। বর্তমানে এই তর্কমতে লগ্ন হইতে চাই না। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" নামক "অ-দলীল" পত্রিকার গত ১লা আশ্বিনের সম্পাদকীয় মন্তব্য আমাদের মুক্ত মোটামুটি সমর্থন করে :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যচাষ বিভাগের পক্ষে প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত দ্বিবার্ষিক পত্রিকা 'বহুধরা'। ইহার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার এক বণ্ড হাতে আসিয়া পড়ে। পাতা খুলিতেই ৫ম পৃষ্ঠায় দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখা—পশ্চিম বাংলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না ও তাহার নীচে বিভিন্ন ফসলের আবাদের পরিমাণ একর হিসাবে দেওয়া আছে। আমন ধানের আবাদের পরিমাণ ৭৭,২৫,১১০ একর; আউল ধান ১৪,৬৯,৬৩২ একর; বোরো ধান ৫৪,৭৮৮ একর ও গম ১,০০,২০৪ একর। প্রতি একরে আমন চাউল ১২ মণ, আউল ১০ মণ ও বোরো ৭ মণ এবং গম ৯ মণ করিলে মোট উৎপন্ন চাউল ও গমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,১৫,২৯,২৯২ মণ। বর্তমান সেনসাস অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ। গড়ে লোকের দৈনিক ১৬ আউল হিসাবে বৎসরে প্রয়োজন হয় প্রত্যেকের সাড়ে চার মণ। সমগ্র প্রদেশের জন্য বৎসরে ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ মণ চাউল ও গমের প্রয়োজন। দেখা যায়, এ হিসাবে সমগ্র প্রদেশে উৎপন্ন হয় ১ কোটি ১৯ লক্ষ মণ। উৎপন্ন চাউল ও গমের অগচ্ছ শতকরা ১০ ভাগ করিলেও খাটতি হয় না। প্রদত্ত লোক-সংখ্যার হিসাবের মধ্যে ২ বৎসর বা অনধিক বয়স্ক শিশু বহিষ্কার, তাহাদের সংখ্যাও প্রায় ৫০ হাজার হইবে। মোট লোকসংখ্যা হইতে ইহাদের বাদ দিলে উৎপত্তের পরিমাণ আরও আড়াই লক্ষ মণ বেশী হয়। ভুট্টা, যব ও ছোলার আবাদের পরিমাণ ৫,২৫,৩৪৪ একর; মসুর ১৯৮,২৮৫ একর। মুর্শিদাবাদের পূর্বাঞ্চল নদীরা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোলা, যব ও মসুরের 'মিশলা' কুটি বাণিজ্য প্রচলন আছে। এই ৫ লক্ষ বিঘা জমি হইতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্যের সরবরাহ করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পশ্চিম বাংলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট না ভরায় কোনও সমস্ত কারণ থাকিতে পারে না। গবর্নমেন্টের অব্যবস্থা, সরকারী কর্মচারীদের অনেকের অসাবধানতা এবং মহাজন ও জোতদার প্রভৃতির অতি লোভ ও চোরাকারবারই এই দেশব্যাপী অনটন ও অভাবের জন্য দায়ী..."

যে সংখ্যাতত্ত্ববিদ মহাশয়ের মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তিনিও বলেন, "খাদ্য খাটতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অব্যবস্থা সমভাবে দায়ী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশন নীতি, পরিদর্শকের অসিদ্ধমূল্যবোধতা ও

অসাব্যস্তা খাজ-পরিস্থিতির জটিলতা বহুলাংশে বৃত্তি করিয়াছে। লেখক বর্তমান পুস্তিকাতে তাহা সম্পূর্ণ আলোচনার বাহিরে রাখিয়াছেন। আমার ধারণা এই সমস্ত বিষয় আলোচনা না করিলে পশ্চিমবঙ্গের খাজ-পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।”

আমরা খাদ্য-বিভাগের উদ্ভবের প্রত্যাশায় আছি। কারণ ইন্দুবাবু তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে অনাঙ্ক প্রকাশিত “পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসম্পদ” প্রবন্ধটির প্রতিও আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

‘বাকুড়া-দর্পণ’ পত্রিকায় এই সম্বন্ধে যে একটি তথ্যপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সকলের জানিয়া রাখা প্রয়োজন :

“বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, দেশের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ অরণ্যাবৃত্ত থাকি আবশ্যক। কিন্তু হুংবের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগের ১৪ শতাংশ মাত্র অরণ্যাবৃত্ত এবং এই বনভূমি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও ২৪ পরগণা জেলায় সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বনভূমিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) সরকার-সংরক্ষিত বনভূমি এবং (২) ব্যক্তিগত বনভূমি। সমগ্র বনভূমির মোট আয়তন ২৪,৬৯,৬৮০ একর (৩,৮৫৯ বর্গমাইল) এবং ইহার মধ্যে সরকার-সংরক্ষিত বনভূমির আয়তন ১৬,৯৭,০৬৮ একর (সমগ্র স্থলভাগের ৯৭ শতাংশ মাত্র) ও ব্যক্তিগত বনভূমির আয়তন ৭,৭২,৬১২ একর (স্থলভাগের ৪৩ শতাংশ মাত্র)। নিয়ে ইহাদের জেলাগত বণ্টন দেওয়া হইল :

শ্রেণী বিভাগ (Types of forest)

পশ্চিমবঙ্গের বনভূমিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা—(১) পত্র-পতনশীল বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forest), (২) পার্বত্য অরণ্য (Hill forest) এবং (৩) উপকূলীয় অরণ্য (Tidal or Littoral forest)।

(১) পত্র-পতনশীল বা পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forest)—শাল, দেগুন, লোহাকাঠ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ এই বনের বৈশিষ্ট্য। মূল্যবান আসবাবপত্র ও যানবাহনাদি প্রস্তুত করিতে এই সকল পর্ণমোচী বৃক্ষের কাঠ ব্যবহৃত হয় বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং মেদিনীপুর, বাকুড়া ও বীরভূমের পশ্চিমাংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য বর্তমান।

পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ শিল্প—বিশেষতঃ কাগজ ও দিয়াশলাই শিল্প—বৃক্ষ বা বৃক্ষজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই প্রদেশে বনভূমির স্বত্ব অত্যধিক। সুতরাং এই বনভূমির সজলারণ ও সংরক্ষণ সরকার এবং জনসাধারণের

কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। সুবের বিষয়, সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বনবিভাগের পর সরকারী বন-বিভাগ ৫,১২৪ একর জমিতে পরিকল্পনামুখী বৃক্ষোৎপাদন করিয়াছেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই শ্রেণীর বনভূমির পরিমাণ ৮,০০০ একরে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি সমগ্র ভারতব্যাপী যে বৃক্ষোৎপাদন সত্তাহ প্রতীপালিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু বৃক্ষোৎপাদনে উৎসাহদানের জন্ত বাকুড়া জেলায় তিনটি নার্সারি স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল নার্সারি হইতে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের এক লক্ষ চারা গাছ স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।”

বনমালী খাল

আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইতে হুগলী জেলার সিঁচুর গ্রাম জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত সক্রিয় পরীক্ষাগার হইয়া আছে। সুবেঙ্গ-নাথ মল্লিক মহাশয়ের অর্থ ও চেষ্টা এই প্রসিদ্ধির মূলে বর্তমান। সেই বাস্তু-ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষও এ অঞ্চলের প্রজা অর্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বনমালী ঘোষ তাহার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর জন্ত স্থানীয় লোক নতুন করিয়া একটি খালের নামকরণ করিয়াছেন। সেই উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া “গ্রামের ডাক” পত্রিকা নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন :

“ডাঃ ঘোষ সিঁচুর বাস্তুক্ষেত্রের কর্মস্বার্থকে সরকারী ফাইল দপ্তরে বন্ধনলা হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রামসেবার খাতে প্রবাহিত করার স্বপ্ন লইয়া শহরের আরামপ্রদ চাকুী ছাড়িয়া ম্যালেরিয়া প্রণীড়িত সিঁচুর অঞ্চলে তাহার কর্মক্ষেত্র বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাহার সে স্বপ্ন তিনি বহুলাংশে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। সিঁচুর বাস্তুক্ষেত্রের অধীন শতাধিক গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত পরিকল্পনা রচনা করিয়া তদনুযায়ী যে কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি তিনি করিয়াছিলেন তাহা সাধারণভাবে যে কোনো সরকারী কর্মস্বার্থের চরিত্রে একান্ত ছলিত। গ্রামকে ভালবাসিয়া, গ্রামের মানুষকে আপন করিয়া এবং গ্রামের মানুষের আপন হইয়া তিনি কাজ করিতেন। সরকারী দীর্ঘমুহুরতা, জড় মনোভাব ও শাসকের অভ্যন্তর সম্পূর্ণভাবে ব্যাধিয়া তিনি গ্রামের মাটির সন্তান হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে কর্মী ও উৎসাহী ব্যক্তিদের লইয়া, গ্রাম্য বাস্তুক্ষেত্রটি গঠন করিয়া, নিজে প্রত্যেক সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখিয়া সরকারী পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন।

ডাঃ ঘোষের ছিল সত্যিকারের গ্রামস্থলী মনোভাব। কর্মীদের সহিত নিজহাতে কাজ করিয়া, বিগ্রামের কাঁকে থবরের কাগজ পাতিয়া মুড়ি-ছোলার জলযোগ করিয়া আপন-জ্বোলার মত গ্রামের কাঁধ করিয়াছেন। গ্রামের পক্ষে মূল্য

পরিধানের পোশাক ধারাপ হইবার সংকোচ তাঁহার ছিল না, শাসকের মিথ্যা আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইবার ভয় তাঁহার ছিল না, গ্রামের রোগপ্রিষ্ট অবহেলিত মানুষজন হইতে কৃত্রিম পার্থক্য রক্ষায় রাধিব্যার কষ্টকল্পিত প্রয়াস তাঁহার দেখা যায় নাই। সাধারণ প্যাট-কোর্টের আড়ালেও যে একজন গ্রামিক মানুষের মন বাস করিতে পারে, তাহা বুঝিতে কাহারও এতটুকু কষ্ট হইত না। তিনি যে একজন পরাধীন যুগের সরকারী কর্মচারী, তাহা কেহই মনে করিবার সুযোগ পাইত না।

গ্রামের কথা'র নিয়মিত পাঠকপাঠিকারূপে সিদ্ধুর অঞ্চলের হুঁটাখালী, চুলকানী নামে প্রায় হাজার বিঘা পরিমাণ হাজা-মজা-ডুবো জমির কথা শ্রবণ করিতে পারিবে। এই ডুবো মাঠের জল নিকাশের সুযোগ না পাইয়া মাঠের পূর্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত সরস্বতী নদীতে না পড়িয়া মাঠেই জমা হইয়া থাকিত এবং বহু কৃষকের সোনালী স্বপ্নকে আঘাতের পর আঘাতে চূরমার করিয়া দিত। বিশ বৎসরাদিক কাল পূর্বে একবার এই মাঠের সংস্কারের চেষ্টা হয়; কিন্তু তাহা আদৌ ফলপ্রসূ হয় নাই। ডাঃ বোষ উক্ত মাঠ দুইটির জলনিকাশ করিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলিকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার স্বপ্ন দেখিতেন এবং স্থানীয় কর্মীদের এই কার্যে উৎসাহিত করিতেন। তিনি পরলোকে; নতুবা দেখিয়া ভীত আনন্দ বোধ করিতেন যে, স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের নেতৃত্বে, জাতীয় সরকারের সাহায্যে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় মাঠ দুইটির মজা খাল সংস্কার করা হইয়াছে, ডুবো জমিতে ফসল ফলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। স্থানীয় কর্মীরূপে তাঁহার স্বর্গত মহান আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবার ও তাঁহার কর্মময় পঞ্জীপ্রাপ্ত জীবনব্যয়কে অমর করিয়া রাধিব্যার জন্য হুঁটাখালী-চুলকানী মাঠের নব সংস্কৃত খালের নামকরণ তাঁহার নামানুসারে করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সত্যিকারের কর্মীরূপের পরিচয় দিয়াছেন।”

পরাজিত বাংলা

এই নামের একখানি ৪১ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। লেখক এক জন সাময়িক কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সাত বৎসর কাজ করিয়া (পেশোয়ার হইতে ইমফল পর্যন্ত) তিনি কাজে ইতুফা দিয়াছেন এবং পরাজিতের মনোভাব লইয়া বইখানি লিখিয়াছেন। আমরা ভাবিয়া পাই না ইহা কিরূপ শিক্ষা বাহা যোদ্ধাকে এমন ভাবে মানসিক জরাজীর্ণ করে।

এই পুস্তিকা আজকালকার বিধা-বিহ্বল বাঙালী মনের পরিচয় দেয়। সেইজন্য লেখকের মনোভাবের সঙ্গে ১৩-১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত “হাজাকর্মী”র মনোভাবের সাদৃশ্য নাই। এই কর্মী “পূব বৈদ্য হাজার আশাবাদী”। তিনি বলেন—“নৈরাশ

হাজার চেয়ে হুজিহীন আশাবাদকেও আমি ভাল মনে করি...”

তার পর আমরা দেখা পাই—নমঃশূন্য অভয় ব্রহ্মচারীর। তিনি খুলনার অধিবাসী। ‘সাধক’—পরাজিত বাংলার সাধক। পিরোজপুরের আলতাভ মিক্কার সঙ্গে গ্রামবাজারে হঠাৎ দেখা। তিনি ফোন্ডের সঙ্গে বলিলেন—“আমার স্বদেশ আমার বিদেশ হয়ে গেল...ঈশা খান আলিবর্দীর জাত আপন এতিহ্য বিন্যস্ত হয়ে করাচীর দাসত্ব মেনে নিল।...” এই হইল চুনীলালুর “সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার”। সুতরাং তিনি সখিৎ ফিরিয়া পাইবেন, এই ভরসা আমরা করিতে পারি। তখন “পরাজিত বাংলা” লেখার ক্ষমতা লজ্জিত হইবেন।

জনশিক্ষা

সরকারের জনশিক্ষা বিভাগ সরকারী চালে এই শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। তার জন্য মাত্র একটি বিভাগ পুষ্টিবার নিমিত্ত তিন-চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ—রামকৃষ্ণ মিশন, নারীশিক্ষা সমিতি, সরোজনলিনী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বয়স্কশিক্ষা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান—তাঁহার দশ গুণ কাজ করিতেছে। অবশ্য সরকার—পক্ষ বৎসরে ‘হ’ হাজার হইতে বার হাজার টাকা সাহায্যব্যয় দিতেছেন। তাহার মোট পরিমাণ সরকারী বিভাগ পুষ্টিবার ব্যয়ের পরিমাণ হইতে অনেক কম। সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণ না পাইয়াও আমরা এই কথা বলিতেছি।

সরকারী চাল যে কি বস্তু তাহা আমরা জানি। সেইজন্য ১৯৪১ সাল হইতে আমরা বলিতেছি যে, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহার উপর এই ভার দেওয়া হউক। পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে দেখা যাইত যে, তাঁহার এই শিক্ষার বিস্তার করিতে পারেন কিনা যেমন করিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিষয়টি বয়স্ক শিক্ষা কমিটিতে আলোচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ সভ্য ভয়ে তাহা গ্রহণ করেন নাই এ সংবাদ পাইয়াছিলাম। ভয়ের কারণ এই যে, এই নূতন ব্রত গ্রহণ করিতে বেসরকারী লোক কেহ আগাইয়া আসিবেন না। অথচ তাহারা জানিতেন যে সরকারের বহু পূর্বে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের ক্ষুদ্র অর্থশক্তি অনুসারে জনশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। আজ যখন স্বীকার করা হইয়াছে যে, জনশিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্রের বিকাশ হইতে পারে না তখন এই শিক্ষার ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দিলে সঙ্গত হইত।

আন্তর্জাতিক শ্রমসঙ্ঘ

গত ১৯১৯ সালে ‘লীগ অব নেশনস’-এর সহযোগী স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানরূপে আন্তর্জাতিক শ্রমসঙ্ঘের উদ্ভা-

ফ্রেন্সাইয়ের সন্ধি ও অসামান্য শান্তিচুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ইহার মূল নিয়ম-কানুনগুলি রচিত।

কর্তব্য

সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে সত্যিকারের বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করাই আন্তর্জাতিক শ্রমসংজ্ঞার লক্ষ্য। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্ত এই প্রতিষ্ঠান নিম্ন-লিখিত কার্যাবলী গ্রহণের চেষ্টা করে :

- ১। কার্য-সময় নির্ধারণ (সারাদিনের ও সপ্তাহের সর্বোচ্চ কার্য-সময় স্থির করাও এর অন্তর্গত) ;
- ২। শ্রমিক যোগান এবং বেকার সমস্যা প্রতিরোধ ;
- ৩। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত প্রয়োজনীয় উপার্জন ;
- ৪। অসুস্থতা, রোগ ও কার্যকালে আঘাতপ্রাপ্ত কর্মীদের রক্ষা করা ;
- ৫। নারী, শিশু ও যুবকদের রক্ষা করা ;
- ৬। আহত ও বৃদ্ধদের যত্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- ৭। নিজ দেশের বাহিরে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বার্থ-রক্ষা ;
- ৮। একই কাজের জন্ত একরূপ পারিশ্রমিক দেবার নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা ;

৯। সম্ভবস্ততার স্বাধীনতার নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া ;

১০। কারিগরী ও অসামান্য যুক্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ;

১৯৪৪ সালে ফিলাডেলফিয়ার অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম-সংজ্ঞার এক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, জাতি-ধর্ম-প্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ও সম্মানজনক ভাবে জাহাদের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কাজে এবং আর্থিক নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এই ঘোষণা পরে আন্তর্জাতিক শ্রমসংজ্ঞার গঠনতন্ত্রে সংযোজিত হয়। এই ঘোষণায় আরও বলা হয় : শ্রম কোন পণ্য নয়, স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও সম্ভবস্ততার উন্নতির সহায়ক। কোন স্থানের দারিদ্র্য প্রত্যেক সমৃদ্ধ স্থানের বিপদ সৃষ্টি করে এবং অভাবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া অমিত বিক্রমের সঙ্গে কাজ করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নীতি হওয়া উচিত। এই ঘোষণায় সংজ্ঞার নিয়ম-কানুন মানিয়া লইয়া পৃথিবীব্যাপী এক ব্যাপক কর্ম-তালিকা গ্রহণ ও তাহা রূপান্তরিত করার জন্ত নিয়মপূর্ণ কাজ করিয়া যাওয়ার কথাও স্বীকার করা হয় :

- ১। পূর্ণ কর্ম সংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা ;
- ২। কর্মী তার মৈথুণ্য প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায় এমন জীবিকা সংস্থান ;
- ৩। শ্রম শিক্ষা ও শ্রম বদল করার সুযোগ রাখার ব্যবস্থা করা ;
- ৪। মজুরী নীতি, সময় ও সকলের উন্নতির সহায়ক

কাজকর্মের স্বেচ্ছাসমত সর্ব এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের সর্বনিম্ন মজুরী ;

- ৫। উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত কার্য পরিচালনা ব্যাপারে সহযোগিতার স্বীকৃতি ;
- ৬। সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ;
- ৭। প্রত্যেক বৃদ্ধির শ্রমিকদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা ;
- ৮। শিশুকল্যাণ ও প্রযুক্তিদের রক্ষা ব্যবস্থা ;
- ৯। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসগৃহ এবং সাংস্কৃতিক ও আমোদ-প্রমোদের সর্বজনীন সুযোগ-সুবিধা দান ;
- ১০। পুষ্টিগত ও কারিগরী শিক্ষা ব্যাপারে সমান সুযোগ দান।

এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমসংজ্ঞা শ্রমিক, পরিচালক ও সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত সকল সভ্যের জন্ত সর্বনিম্ন মান স্থির করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য জগতের প্রধান সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই দুই প্রবল শক্তির মধ্যে পড়িয়া ব্রিটেনের কি দশা হইবে, ভৎসনসহে ব্রিটিশ চিন্তানায়কেরা পর্যন্ত ভাবিত হইতেছেন। গত অক্টোবর মাসের “এমপায়ার রিভিউ” পত্রিকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে দার্শনিক ডক্টর ফোয়ার্ডের একটি বক্তৃতার চূষক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, “পশ্চিমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পূর্বে রাশিয়ার বৃহৎ জাঁতাকলের (great mill-stones) মধ্যে পড়িয়া আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইব—যুদ্ধ ক্ষেত্রে যতটা নয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ভাষাইয়া দিয়াছে তাহার ছায়াচিত্র, তাহার বেতার বক্তৃতা, তাহার খাভলশ ও বিলাস দ্রব্যের বস্তার দ্বারা।” ইহার ফলে “ব্রিটিশ যুবক-যুবতী তবিশ্বং সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া প্রোচক্ষে পৌঁছিব ; তাহার উপর আছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়।” এই মনোভাব রোধ করিতে যিনি বা যে দল পারিবেন, এই পরাজিতের মনোভাব রূপান্তরিত করিতে পারিবেন, তাহারাই হইবেন নব-ব্রিটেনের স্রষ্টা। ১৬ বৎসর বয়সে উইনষ্টন চার্চিল এই দুর্ভাগ্য কর্তব্যের বোঝা খাড়ে তুলিয়া লইয়াছেন আর আমাদের দেশে ৭০।৭১ বৎসর বয়সে জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, বিত্তশালী লোক ভোট-যুদ্ধে নামিতে সাহস পান না। এ পার্থক্য কেন জন্মিয়াছে ? এই নিষ্প্রভতাবের সঙ্গে মার্কিন বাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি ? স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির জীবনকথা অনুধাবন করিয়া তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

ঋণশোধ উপলক্ষে দরকষাকষি

যুদ্ধের সময়ে ঋণ ও ইজারা চুক্তি অমুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে যে সকল সমর-সরঞ্জামাদি দিরাছিল তাহার মধ্যে তিনখানি বরফভাঙ্গা জাহাজও ছিল। উহার মধ্যে দুইখানি ফেরত দেওয়া হইবে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানাইয়াছে। আগামী মাসে জার্মানীর অন্তর্গত জেরারহাভেন নামক বন্দরে জাহাজ দুইখানি ফেরত দেওয়া হইবে।

জাহাজ দুইখানির নাম 'নর্থ উইণ্ড' ও 'ওয়েস্ট উইণ্ড'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অমুসারে উত্তরে রাশিয়া করেকবার জানাইয়াছিল যে, জাহাজ দুইখানি ল্যাপল্যাও সমুদ্রে বরফে আটক পড়িয়াছে। ১৯৪৪ সালে উত্তর মহাসাগরের তুষারায়ত প্রবেশ-পথ পরিষ্কার করিবার জন্ত এই তিনখানি জাহাজ দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় জাহাজখানি ইতিপূর্বেই ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

ঋণ ও ইজারা চুক্তি অমুসারে আমেরিকা কর্তৃক রাশিয়াকে প্রদত্ত যে সকল ঋণ যুদ্ধের পরেও অবশিষ্ট ছিল এবং যাহা শান্তিকালীন কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা ফেরত চাহে এবং তাহা লইয়া গন্ত কয়েক বৎসর বহিরা উত্তর দেশের প্রতিনিধিদের মধ্য আলোচনা চলে। বরফভাঙ্গা জাহাজ কয়খানি ছাড়াও চুক্তি অমুসারে আমেরিকা রাশিয়াকে আরও ৬৭২ খানি জাহাজ ও অন্যান্য প্রকারের জলযান প্রদান করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলিও ফেরত চাহিয়াছে।

ঋণ ও ইজারা চুক্তি অমুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে যে সকল ঋণ প্রদান করে তাহার মোট মূল্য হইবে ১০৮০ কোটি ডলার (প্রায় ৫ টাকার এক ডলার)। যুদ্ধের পরে শান্তিকালীন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ যে সকল ঋণ রাশিয়ার ছিল তাহার মূল্য বাবদ ৮০ কোটি ডলার ও এই জাহাজগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেরত চাহে; এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে ঋণাদির সঙ্গত মূল্য বলিয়া আমেরিকা যে পরিমাণ অর্থ দাবি করিয়াছে রুশ প্রতিনিধিগণ তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই।

ইরান ও মিশর

এই দুইটি রাষ্ট্র লইয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছেন। ইহা বুঝিবার জন্ত পুস্তন সংগ্রহাবাদের কথা তোলা নিম্নোক্তজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ব্রিটিশরাজ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তার উত্তরাধিকারী রূপে দেখা দিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ইংরেজ তার স্বগোষ্ঠ উত্তরাধিকারীকে হিংসা ও ভয় করে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরধর্মী সোভিয়েটকে ভয় করে। কিন্তু তার স্বগোষ্ঠকে ছাড়া

কেলিতে পারিতেছে না, কারণ দুর্বল ব্রিটেনের বুদ্ধিবল ও অভিজ্ঞতা এখনও তার কাজে লাগিবে—এই আশায় সে ইরান ও মিশরের সদ্যজাগ্রত ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে আমল দিতেছে না। সোভিয়েট রাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধের সুযোগ লইতেছে।

ইহাই হইল বাহ্যিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কারণ। ইরান ইংরেজের হাত হইতে তার তৈল মুক্ত করিতে চায়। বর্তমান শাহের পিতা রেজা শাহ পঞ্চলী চাপ দিয়া ইংরেজ তৈল কোম্পানীর নিকট হইতে কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিশস্তির বলে ও কৌশলে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাষ্ট্র এই কাজে লিপ্ত ছিলেন। এই অপমানের স্মৃতি ইরানী মরনারী জ্বলে নাই।

মিশরের বিবাদ ইংরেজের সঙ্গে। ১৮৮২ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজের দাপট নীল নদের তটভূমির অধিবাসী সহ্য করিয়াছে। শেষোক্ত বৎসরে মিশর "স্বাধীন রাষ্ট্র" বলিয়া ঘোষিত হয়। এই অমুগ্রহ-প্রসঙ্গ স্বাধীনতা মিশরের আত্মসম্মানে আঘাত করে। অত্যাচারের মধ্যে সর্কাপেক্ষা অপমানজনক ছিল মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার অজুহাতে ব্রিটিশ নৈসর্গবাহিনীর উপস্থিতি। সেই নৈসর্গবাহিনী আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার স্মৃতি ধালের তীরবর্তী অঞ্চল হইতে সরিতে চাহিতেছে না।

কেন—তার কোন সঙ্কটের পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার জন্ত নূতন ভাবে জোট পাকাইতেছে। এই আয়োজন-উদ্যোগে যোগদান করিবার জন্ত তুরস্ক ও আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী নিমন্ত্রিত হইতেছে। মিশর দরকষাকষি করিতেছে নিজের বিশেষ স্বার্থের প্রয়োজনে। অল্প আরব রাষ্ট্রগুলি তাহাকে পূর্ণ সমর্থন করিতেছে না। বাহিরের দর্শক আমরা মিশরের স্বাধীনতার ব্যাপারে যোগ দিতে পারি না। বিশেষ করিয়া সুদান দেশের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হুমকাজ্ঞার আমাদের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। সুদানের জনসংখ্যার মধ্যে হাবশীরা সংখ্যাগুরু। তাহার মিশরের প্রভুত্ব চায় না। এই অবস্থায় ইংরেজ এক নূতন সুযোগ পাইয়াছে। তাহার হাবশী জাতির স্বাধীনতার রক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অত্যাং রাষ্ট্রপুঞ্জ-পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশন উপলক্ষে প্যারিস হইতে অনেক মুরোচক সংবাদ পাওয়া যাইবে। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আপোষের চেষ্টা হইবে নিশ্চয়। তার কলাকল সংকে সন্দেহান হইলেও, ভারতের সঙ্কটস্থ সংকে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ সামগ্রিক শান্তি ছাড়া এই অঞ্চলে আমাদের কোন স্বার্থ নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব

শ্রীমন্নথানথ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের প্রাধান্য বিশেষ কিছু নতুন কথা নহে। বাংলা দেশের বহু শিক্ষকই রেমন্টের *Principles of Education* নামক পুস্তকে বহুকাল পূর্ব হইতেই পাঠ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন :

Incessant activity is a law of the child's being, and the first requisite of a wise system of control is that this activity should be 'directed' into desirable channels;

ডিউই, ব্যালার্ড, এবট, উড প্রভৃতি শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মনীতির অপরিহার্যতা বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকেরাও শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে এই সত্য একেবারে ভুলিয়া যান নাই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি যখন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যতালিকা হইতে হাতের কাজ, সেলাই, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বর্জন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল তখন ব্রিটিশ সরকার এই বলিয়া উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন :

There are strong objections to the omission of these subjects from the course. The three R's are only a means to an end. To attempt nothing more than Reading, Writing and Reckoning would create a dislike in the mind of the child for other works which would be sufficient to combat in later years.

প্রকৃত পক্ষে শিশুশিক্ষায় কাজের নীতি (activity) বহুকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সহকর্মীগণ সেই নীতিকেই ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন।

কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষায় পৈশিক কর্মের উপর অর্থাৎ হাতের কাজের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কর্মপ্রধান অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক ততটা হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যধারার বিশিষ্ট ধারক ভক্তার কুমারপ্লা লিখিয়াছেন :

The whole of basic education was founded on and woven round work for the young, work for the adult and work for the old; work developed human personality and when they neglected it they sank to the level of life that sustained on violence.

ইহার সহজ অর্থ হইল এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মই হইতেছে একমাত্র মুখ্য বস্তু এবং এই কর্মের 'by-product' বা অঙ্গসিদ্ধান্ত রূপে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহার

অতিরিক্ত আর কিছু শিক্ষণীয়ও নয়, গ্রহণীয়ও নয়। আর সকলই একান্ত গোণ। শিক্ষণীয় যাহা কিছু আছে- তৎসমুদয়ই হাতের কাজের মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে, কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কাজকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া আর একমাত্র কাজের মধ্যেই সমগ্র শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করা এক কথা নয়। এবট অথবা উড, ডিউই অথবা ব্যালার্ড হাতের কাজের কাজকে শিশু-বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু শুধু হাতের কাজের কাজকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্বন্ধে তাঁহাদের যত্নামত খুব সন্দেহ নহে। শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের দাবি স্বীকৃত হওয়ার পর ইংলণ্ডের সাফোকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে, চিলিতে, গুয়াতিমালায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ট্যাসমানিয়া ও ভিক্টোরিয়ায় 'এরিয়া স্কুল' নামে যে সকল আদর্শ গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে সেগুলির সকল ক্ষেত্রেই গ্রাম্য শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমান আসন পাইয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই শুধু শিল্প বা হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পিত হয় নাই। তবে বুনিয়াদি শিক্ষায় অন্ততঃ নীতিগতভাবে তাহাই করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনার সমর্থনে বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করেন নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। কিন্তু যাহারা এই নতুন বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রবর্তনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুনিয়াদি শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের অনেকেই অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ। কিন্তু তথাপি মনে হয়, তাঁহারা বুনিয়াদি শিক্ষার সমর্থনে যে সকল মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই একদেশদর্শী এবং ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

কাজ করা শিশুজীবনের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি, সুতরাং কাজকে কেন্দ্র করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা স্বাভাবিক এবং সহজ হইবে। এই যুক্তি বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু কাজ বলিতে যখন শুধু হাতের কাজের কাজকেই বুঝান হইয়া থাকে তখনই যুক্তিটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। শিশুর কর্মপ্রাচুর্যের পশ্চাতে শৈশব হইতেই যে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এমন কি বিশেষ এক প্রকারের

মানসিক শক্তি অনবরত কাজ করিয়া থাকে, এই মনস্তত্ত্ব-টুকুকে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার উপেক্ষা করিয়াছেন; শারীরিক ক্রিয়ার মত মানসিক ক্রিয়াও যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির একটি অঙ্গ একথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

বুন্নার সাহেব তাঁহার *From Birth to Maturity* বইয়ে শিশুদের ক্রিয়ার যে বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, দেড় বৎসর বয়স হইতে শিশুর পৈশিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। শিশুর পৈশিক কার্যকলাপের এই পর্যায় ছয় বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই সময় সে ইটের ঘর, কাঠের পুল, কাগজের নৌকা এবং আরও কত কি বস্তু তৈয়ার করে। ইটের ঘর যখন সে তৈয়ার করিতে বসে তখন প্রতিদিনকার দেখা ঘরের একটা অস্পষ্ট ছবি তাহার মনে ভাসিয়া উঠে। সেই অস্পষ্ট ছবি হইতেই সে ঠিক করিয়া লয় কোন্ ইট-খানার উপর কোথায় কি ভাবে অপর একখানা ইট রাখিলে তাহার পৈশিক ক্রিয়ার ফলটি তাহার মানসছবির অঙ্গরূপ হইয়া উঠিবে। এই সময়কার শিশুজীবনের অধিকাংশ পৈশিক কর্মই এইরূপ কোন-না-কোন মানসিক ছবি ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ চিন্তা বা কল্পনার ফল। এই সময় হইতেই শিশুর মানস-ক্রিয়ার উদ্ভব হয়; লক্ষ্যহীন পৈশিক বিক্ষেপ ক্রমশঃ লোপ পায়। অজ্ঞাতসারে এবং অস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য তাহার পৈশিক ক্রিয়াকে সচেতন করিয়া তোলে। পৈশিক চাক্ষুশ শিশুর পক্ষে যতখানি স্বতঃস্ফূর্ত, এই মানসিক ক্রিয়াও তাহার পক্ষে ততখানি স্বাভাবিক। হাতের কাজ যদি শিশুশিক্ষায় মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে হয় তাহা হইলে এই মনের কাজও তাহার পক্ষে মনস্তত্ত্ব-বহির্ভূত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া হয়ে হইতে পারে না। এ যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজ তথা শারীর-ক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করায় এক প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মনের কাজকে উপেক্ষা করিলে শিক্ষায় অপর এক-প্রকারের দোষ বর্তিবে। এই উভয়বিধ কর্মকে কেন্দ্র করিয়াই শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ আপাততঃ যতই শৃঙ্খল ও স্বন্দর হউক কালক্রমে ইহার ভিতরে পুনরায় পঙ্কজ দেখা দিবে। পৈশিক ক্রিয়ার জগৎ যেমন হাতের কাজের প্রয়োজন, মানসিক শিক্ষার জগৎ সেইরূপ বিখের জ্ঞানী ও গুণী লোকদের পূর্বাঙ্কিত অভিজ্ঞতার আবশ্যক। এইখানেই শিক্ষাকে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষায় হাতের কাজের মত ইহাও অপরিহার্য।

মনস্তাত্ত্বিকগণ বলেন, শিশুর মধ্যে প্রচুর সহজাত শক্তি (instinctive energy) রহিয়াছে। শিশুর কাজের মধ্য দিয়া তাহাই স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশলাভ করে। এই কাজ-বাহাতে সমাজ-পরিপন্থী বা অসামাজিক না হইয়া

সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় তাহার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বতরাং শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক হওয়াই মনস্তত্ত্ব-সম্মত। কিন্তু কাজের যে একটা মানসিক দিকও আছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বতরাং পৈশিক কর্ম বা হাতের কাজই শুধু শিক্ষার বাহন হইতে পারে না। জীবনের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তির তুলনায় মানসিক কর্মও শিশুর কাছে কম প্রয়োজনীয় নহে। ১৯৩৭ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে শ্রীযুত অনাথনাথ বসু বলিয়াছেন :

Contemplative gratification (of instinct) is relatively passive in as much as it utilises other people's experiences in a second hand manner.

কিন্তু, অপর লোকের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে বলিয়াই কর্মশক্তির মানসিক তৃপ্তি যে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা গৌণ বস্তু মাত্র এবং পৈশিক কর্মের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ইহা স্বীকার করিতে কষ্ট হয়। প্রাক্তন অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে কাজে লাগাইবার যোগ্যতাই সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। উৎপাদনমূলক কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষাও এইরূপ অভিজ্ঞতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইতে না পারিলে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষারও অপয্যুত্যা অবশ্যস্বাধী। তুলা কতখানি পিজিয়া লইলে উহার পাঁজ করা যায় তাহা ঠিক করিয়া লইবার জগৎ অপরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। নচেৎ উপযুক্ত পাঁজ তৈরি হওয়ার পূর্বে প্রচুর পরিমাণ তুলার অথবা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং পুনঃপুনঃ ব্যর্থতার দীনতা শিক্ষার্থীর মনে গভীর বিতৃষ্ণাও হয়ত সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে। তাই হাতের কাজ করিতেও অপরের অভিজ্ঞতাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় এবং অপরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করারই নাম পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা। ইহা “অগ্রাহ্য” এবং “অপেয়ম” কোন অবাস্তব বস্তু নহে।

আবার কতকগুলি সহজাত বৃত্তি রহিয়াছে যাহা শুধু হাতের কাজের মধ্য দিয়া, শুধু স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া আদৌ পরিপুষ্ট বা পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। আলসগত্যা, বিরক্তি, সঙ্কলিপ্সা, আবেদন, সহানুভূতি, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আনন্দ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৃত্তিকে সমাজহিতকর করিয়া তুলিতে হইলে মুখ্যতঃ যে বস্তুটির সহায়তা প্রয়োজন তাহা হইল মন। শিক্ষক এতৎসম্বন্ধীয় বহুজনলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কতখানি আবেগময় করিয়া শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিলে শিক্ষার্থীর অনুভবশক্তি-প্রতিক্রিয়া-চঞ্চল হইয়া উঠিবে—তাহারই উপর এই বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ (“sublimation”) নির্ভর করিবে।

অপরের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীর মন এখানে গৌণ ত
নহেই বরঞ্চ অত্যন্ত প্রধান।

শিশুর স্বভাব আক্রমণাত্মক। এই আক্রমণাত্মক শিশু-
প্রকৃতির সঙ্গে বহির্জগতের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহার
ফলে শিশুমনে একপ্রকার অপরাধ-বোধের সঞ্চার হয়।
এই অপরাধবোধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে শিশু-মন বৃদ্ধির পথে
বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজে শিশুর এই অপরাধ-বোধ বা দুঃখ-
বোধের লাঘব করিয়া মনের ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি পূরণ
করিয়া দেয়। শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন :

Constructive work gratifies one of the deepest
needs of child,—namely the needs of restitution.

কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ একমাত্র হাতের কাজের মধ্য
দিয়াই হয় না। যে শিশু অন্যায় করিয়া তাহার ছোট
বোনটিকে ব্যথা দিয়াছে তাহাকে যদি দশটি অঙ্ক করিতে
বা দুইটি জ্যামিতিক কূট সমাধান করিতে দেওয়া যায় তাহা
হইলেও অন্যায় করিবার ফলস্বরূপ তাহার মনে যে অপরাধ-
বোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অনেকখানি লাঘব হয়।
অবশ্য হাতের কাজের বা পৈশিক কর্মের জিয়া এই ব্যাপারে
গভীরতর এবং স্ববিৎফলপ্রসূ।

কিন্তু অপরাধ-বোধ ও তজ্জনিত অল্পশোচনাকে পরি-
পূর্ণ ভাবে মন হইতে ঝাড়িয়া-মুছিয়া ফেলিবার নীতিটি
সামাজিক মনের স্বস্থ গঠনের পক্ষে সহায়ক কিনা সে কথা
ভাবিবার আজ সময় আসিয়াছে। অতিরিক্ত অপরাধ-
বোধ মনের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করিয়া মনকে বিকার-
গ্রস্ত করে ইহা যেমন সত্য, অপরাধ-বোধের ঐকান্তিক
অভাব, অপরাধের প্রতি অপরাধীর ঘৃণা হ্রাস করিয়া দিয়া
তাহার মনের অপরাধপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয় ইহাও তেমনই
সত্য। দেখা গিয়াছে, বাহারা দিনের অধিকাংশ সময় কার্যিক
পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকে তাহারা নিঃসঙ্কোচে যে পরিমাণ
অপরাধ করিতে পারে অপর লোকেরা ততটা নিঃসঙ্কোচে
তাহা পারে না। ইহার মনস্তাত্ত্বিক কারণ এই যে, নিরন্তর
পৈশিক কর্ম তাহাদের অপরাধ-বোধ লোপ করিয়া দেয়
এবং তাহাদের কার্যের অবশ্যস্বাভাবী ফলস্বরূপ অপরের বতই
ক্ষতি হউক অথবা নীতির মানদণ্ড যতই অবনমিত হউক
তৎপ্রতি তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠে। সুতরাং
অপরাধ-বোধ হইতে মানুষকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা
শিক্ষার মাধ্যমে করা উচিত হইবে কিনা সেই বিষয়ে আজ
সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কর্মকেদ্রিক শিক্ষায় পৈশিক কর্মের
আতিশয্য আছে। ইহার ফলে মানুষ জীবনের প্রয়োজনীয়
অর্থোপার্জন করিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে
নিঃসঙ্কোচ অপরাধপ্রবণতাও নৃশংস ভাবে বৃদ্ধি পাইতে

পারে। কর্মকেদ্রিক শিক্ষার আতিশয্যে পৃথিবীর মানুষ
কর্মঠ, লাভজনক, উৎপাদনবহুল অথচ হৃদয়হীন একটি বৃহৎ
যন্ত্রে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। আধুনিক জগতে যে
সকল দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া
হইয়াছে তাহার মধ্যে রাশিয়া ও আমেরিকা উল্লেখ-
যোগ্য। রাশিয়া সম্পর্কে নিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা
কষ্টকর। কিন্তু আমেরিকা যে ক্রমশঃ একটি নিয়মনিষ্ঠ
প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহা মনে করিবার
কারণ আছে। বহু পূর্ববেক্ষণের অভিজ্ঞতা হইতে মিসেস্
ম্যানিং বলিয়াছেন, আমেরিকা একটি বিরাট দেশ, কিন্তু
তাহার হৃদয় নাই। এই পরিণতির জন্য হাতের কাজের
প্রাচুর্য কতখানি দায়ী তাহা ভাবিবার অবকাশ আমেরিকা-
বাসীদের জীবনে আজ দেখা দিয়াছে। তাই জীবনযাপনের
সর্বশ্রেষ্ঠ মানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সার্বজনীন শিল্পশিক্ষার
পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমেরিকা যেন থমকিয়া
দাঁড়াইয়াছে। জীবনযাপনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড তাহাকে
ভুগুটি দিতে পারে নাই। আজ সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বোধ
করিতেছে মানবতার ক্ষুধা।

আধুনিককালে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের
উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই
মহীশূরে অল্পাধিত ১২৪৮ সনের সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনের
সভাপতি রামস্বামী মুদালিয়ার এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ
করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আজ যদি কর্মকেদ্রিক শিক্ষার
প্রতি এই অশোভন পক্ষপাতিত্ব হইতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে
মুক্ত করিতে না পারা যায় তাহা হইলে শৈশব হইতে
আরম্ভ করিয়া সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপিয়া কর্মকেদ্রিক
শিক্ষার সুদীর্ঘ পদ্ধতির মধ্যে যে দানবীয় মনোভাবের সৃষ্টি
হইবে তাহা আমাদের সমগ্র সভ্যতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া
দিবে। একদা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিদেশী বর্বরদের
অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের
বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসের দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই
স্বন্ধে আসিয়া বর্তিবে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ
রবার্ট হাচিন্স সত্যই বলিয়াছেন:

Other civilisations were destroyed by barbarians
from without we creed our own.

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষা এবং যে-জন্ত শিক্ষা, এই দুইটি
বস্তু নাকি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ। ইহার ফলে শিক্ষার লক্ষ্য
শিক্ষার্থীর নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে,
শিক্ষা প্রীতিপ্রদ এবং সহজ হয়। যে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা
দেওয়া হইয়া থাকে তাহাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা
হইলে হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বয়ং শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞদের ধারণা

অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া মনে হইবে, নচেৎ মানব-জীবনের বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের চিন্তাধারা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করিতে হইবে। কাপড় বোনা বা অল্পরূপ দুই-তিনটি হাতের কাজই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সে শিক্ষায় বর্তমান পৃথিবীর সার্থক মানুষ তৈয়ার হইবে কিনা সন্দেহ। মাধ্যম রূপে নির্ধারিত কর্মকে শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করিলে আপাতদৃষ্টিতে আর্থিক সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান সম্ভব হইলেও ব্যাপক অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর আকর্ষণ বেশী। তাহার ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য উহার প্রতি তীব্রতর হয়। ইহার একটি কারণ এই যে, কর্ম শিশুর সহজাত শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ-মাত্র। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, কর্ম অর্থ শুধু হাতের কাজই নহে; কর্মের একটা মানসিক দিকও রহিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই লক্ষ্য শিক্ষার সমগ্র লক্ষ্যের একটি দিক মাত্র; সমগ্র লক্ষ্য নহে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত লক্ষ্য চোখের সম্মুখে অহরহঃ সুস্পষ্ট থাকিলে দৈনন্দিন এক্ষেপে কর্মতালিকার মধ্যেও উৎসাহ এবং আগ্রহের স্রষ্টি হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য পৌছিবার পথটি যদি সুদীর্ঘ হইয়া উঠে তাহা হইলে লক্ষ্য যতই না সুনির্দিষ্ট হউক, পথ চলাটা শিশুর পক্ষে কোতুলক ও উৎসাহ-জনক না হইয়া একান্তভাবে যান্ত্রিক হইয়া যাইবে এবং কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক বুনিয়াদ ধরিয়া পড়িবে। সুস্পষ্ট লক্ষ্যের গেরো যখন ছিঁড়িয়া যায় তখন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কর্মও এক্ষেপে হইয়া উঠে। পুস্তকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে ইহার আর তখন বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। ঠাকুর-পূজা যখন দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে পরিণত হয় তখন ঐ পবিত্র কর্মটির প্রতি সাধারণ মানুষের না থাকে, নিষ্ঠা না থাকে অন্তরের গভীরতা। তখন বেতনভুক পুরোহিতের উপর এই ভারটি হস্ত করিয়া দিতে সে উৎসুক হয়। তুলার পাঁজ করা যখন বহুদিন ধরিয়া দৈনন্দিন কাজে পরিণত হইয়া যায় এবং ঐ কাজ করার মধ্য দিয়া যখন শিশুকে প্রত্যহ একই প্রকারের কঁড়াকিয়া, সেরকিয়া প্রভৃতি শিখিয়া লইতে হয় তখন তাহার ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ বজায় রাখিতে কোনও প্রকার নূতন প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কাজ শিশুর ভালবাসে, ইহা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। কিন্তু

একই কাজ পুনঃ পুনঃ করিতে বা একাদিক্রমে বহুদিন ব্যাপিয়া করিতে শিশু বিতৃষ্ণা অনুভব করে। ইহাও মনস্তাত্ত্বিক সত্য। বিতৃষ্ণা এবং বিরক্তি শুধু পুস্তকেন্দ্রিক শিক্ষারই প্রাপ্য নহে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষারও ইহা অবশ্যস্বাবী পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে কোনও শিক্ষাপদ্ধতি শিশুদের পক্ষে আনন্দদায়ক ও স্বথকর হইবে কিনা তাহা শিক্ষাপদ্ধতির উপর যত না নির্ভর করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষাপদ্ধতিটি মাটির ঢেলা মাত্র। কুস্তকারের কৃতিত্বানুযায়ী তাহা হইতে ভয়ঙ্কর দানবও নির্মিত হইতে পারে আবার কোলে-তুলিয়া-লওয়া কোমল পেলব লক্ষ্মীরও স্রষ্টি হইতে পারে। পদ্ধতিটা করণ কারক। শিক্ষকই প্রকৃত কর্তা।

শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের প্রচলন অপরিহার্য। শিক্ষাকে সকল দিক দিয়া স্তন্যর ও মঙ্গলময় করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পৈশিক কর্মকে একটা বিশেষ স্থান দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু হাতের কাজ বা পৈশিক কর্মের মধ্যেই সমগ্র শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করার যে পরিকল্পনা তাহা ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে পুরাপুরি কল্যাণকর হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, পুস্তকেন্দ্রিক শিক্ষার যে সকল দোষত্রুটি রহিয়াছে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও তাহা হইতে মুক্ত নহে। ইহার একটি মাহুষকে যন্ত্র-দানবে পরিণত করিবে, অপরটি মাহুষকে সমাজ জীবন-বাগানে একান্ত অনুপযুক্ত একটি জীবে রূপান্তরিত করিবে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই মাত্র শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। হাতের কাজ ও মনের কাজের মধ্যে এমন সঙ্গতি রাখিতে হইবে যেন একের প্রতি পক্ষপাতিক্স দেখাইয়া অপরকে হ্রাস করা না হয়। পুস্তকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক এই উভয়বিধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি শিক্ষাকে মুখ্য এবং অতীতের বহুজনলব্ধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুস্তকেন্দ্রিক শিক্ষাকে গৌণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে এবং ইহার অবশ্যস্বাবী ফলস্বরূপ আমরা হয়ত আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার সংস্পর্শ হারাইয়া এমন একটি স্তরে গিয়া পৌছিব যেখান হইতে ইউরোপ ও আমেরিকা সভয়ে পশ্চাৎপদ হইবার উত্তোষ করিতেছে।

ভারত-মহিমা

শ্রীকৃষ্ণদরশন মল্লিক

১

ধন্য আমি এ পুণ্য-বিশাল
ভারতের সন্তান,
শত দৈন্যেরও মানে মানি আমি
পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তুষ্টির লাগি
আমি করি তর্পণ,
করি যে সর্বকর্মের ফল
শ্রীহরিরে অর্পণ,
মধু রাজস্বিনিব।
গোটা ভারতের আরতি করিয়া
জলে মোর গৃহদীপ।

২

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি
শুদ্ধ ও সিক,
ভক্তের পদ পরশে নিত্য
সে অপাপবিক্র।
এখানে বুথায় অপ-শক্তির
দম্ব-দোষ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধুলায় মিশিবে
বাসুকী নাড়িলে মাথা।
নাহি কোনো ভয় নাহি।
জ্বালামুখী-শিখা সর্বাবিষ্ট
সর্বদর্প-দাহী।

৩

মন্দির ভাঙি উপলব্ধ
যাহারা গিয়াছে লয়ে,
সে দেশ সে জাতি রহিবে না গর
যাবে আপনার হয়ে।
শ্রদ্ধা তাদের থাক বা না থাক
না থাকুক নিষ্ঠা,
অজ্ঞাতে তারা করেছে সেখানে
শিবের প্রতিষ্ঠা।
অশেষ কষ্ট সহি'
বিফলে তাহারা পাষাণের ভার
লয়ে যায় নাই বহি।

৪

ভারতের ধনরত্ন লইয়া
যাহারা করিছে ফেরী,
ক্ষতি কিছু নাই বিনিময়ে তার।
হয়ে গেছে আমাদেরি।
সপ্ত নদীর বন্যার জল
প্রবেশ যেখানে লভে,
এই ভারতের ভাণ্ডার চির
প্রসারিত সেথা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী,
হরণ করেছে, বরণ করিতে
করিবে না বেশী দেবী।

৫

আনন্দ মোর কতই নিরিড়
কি বিপুল হর্ষ,
আমি ও আমার প্রতি অণুটুকু
এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়া, কাশী, আমি অযোধ্যা
পুরী ও বৃন্দাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর,
সোমনাথ-পত্তন।
আমি তো ক্ষুদ্র অতি,
কিন্তু বিরাট-ওই হিমাঙ্গি
আমার গোত্রপতি।

৬

ভারত-তনয় অমৃতপুত্র
আমি মৃত্যুঞ্জয়,
পুণ্যবাহিনী গঙ্গা আমাকে
আদরে অঙ্কে লয়।
হোক ইউরোপ, হোক আফ্রিকা
হোক না সে আমেরিকা,
আমার চিত্তার অগ্নি যেখানে
সেখানেই হোমশিখা।
যেখানে রবে সে ছাই
চিরদিন তরে ভারতবর্ষ
হয়ে যাবে সেই চাই।

পিতৃস্নেহ ও তার স্বরূপ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

মানুষের মন সীমাহীন গহন অরণ্যের মতই রহস্যময়; কোথায় এর আরম্ভ আর কোথায়ই-বা এর শেষ কিছুই বুঝবার উপায় নাই। এ অরণ্যের ভিতর স্বর্ষের কিরণ প্রবেশ করে না, কাজেই স্পষ্ট করে কিছু প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয়। শুধু অন্তঃসন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের নিজের মনের যে অংশটুকু দেখা যায় তা অবলম্বন করেই মানুষ অপরের মনঃপ্রকৃতি সম্বন্ধেও অনুমান করে নেয়। নিজের মনের উপর আত্মানুসন্ধানের আলো ফেলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মানব-মনের কত দুজ্জ্বল রহস্যের খোঁজখবর সংগ্রহ করেন। মানুষের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণের উৎস সন্ধান করতে গেলে মনের নিবিড় গহনে প্রবেশ করতে হবে। যে নদী আমাদের ঘরের কাছ দিয়ে কুলুকুলু স্বরে বয়ে যায়, তার উৎস সন্ধান করতে হলে যেতে হবে বহু দূরের তুষারক্ষেত্রে; যে শতদল জলের উপর পাণ্ডি বিকাশ করে সৌরভে বাতাস মত্ত করে দেয়, তার মূল খুঁজতে হবে জলের তলায়, মাটির নীচে। তেমনি আমাদের আচরণও অদৃশ্য সংযোগস্থলে মনের বিভিন্ন ভাব-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত। আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-নৈরাশ, কল্পনা-বাসনার যে ভাব-বুদ্ধি নিরন্তর মনের তলায় আলোড়ন তুলছে, তারই বহিঃপ্রকাশ মানুষের আচরণে। এই ভাব-কামনাগুলির তীব্রতা কমবেশী থাকলেও সকল মানুষের মানসক্ষেত্রেই এগুলি বিরাজ করে। তাই আমরা নিজের মন দিয়ে অপরের মন বুঝতে পারি, নিজের ভাবাবেগের অনুভূতি থেকে অস্বরূপ অবস্থায় অপরের ভাবাবেগ কিরূপ হতে পারে তা অনুমান করে নিই। এ অনুমান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য হয় এইজন্য যে, মনের মৌলিক উপাদানগুলি সকলেরই এক; একই রূপ সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) এবং প্রস্ফোট বা ভাবাবেগ (emotion) মনের গভীর থেকে মানুষকে নানা আচরণে উদ্ভূত করেছে। এদের স্বরূপ বুঝতে পারলে জীবের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানেন্দ্র খুলে যায়; তখন অন্যের মনের গহনেও সে আলোকপাত করতে পারে।

স্নেহের উৎস কোথায়

সন্তানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি, জীবের রক্তের সঙ্গে এ মিশে আছে। অপত্যস্নেহ জীব-মাত্রেয়ই স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতি সকল জীবের মধ্যে এই

সন্তানবাৎসল্য এমন মাত্রায় দিয়েছেন যাতে তারা সন্তান-সন্ততি বাঁচিয়ে রেখে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হয়ে পশুমাত্রেই সন্তান পালন করে। বাদ্যের পালনীশক্তি কম তাদের সন্ততির সংখ্যা দেখা যায় প্রচুর। মাছ-ব্যাঙ প্রভৃতি নিম্ন স্তরের প্রাণীর অসংখ্য ডিম হয়—এক-একটি মাছ বা ব্যাঙের ডিমের পরিমাণ হবে কয়েক কোটি! এদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানদের রক্ষার ব্যবস্থা এরা করে, কিন্তু এই সংগ্রাম-সঙ্কল জীব-জগতে বেঁচে থাকা বা শৈশব পার হয়ে আসা অতি অল্পসংখ্যকের পক্ষেই সম্ভব হয়। ইতর প্রাণীদের জগতে দেখা যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ পুরুষের চেয়ে স্ত্রীজাতীয়দের মধ্যেই বেশী প্রবল। জনকের কবল থেকে সন্তানদের বাঁচাতে জননী ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শিশুসন্তান নিয়ে সে কিছুকাল লুকিয়ে কাটায়—প্রাণিজগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সন্তানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জীবের সন্তায় মেশানো রয়েছে; বাইরে থেকে এ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে হয় না। সন্তানের জন্ম হলে স্বাভাবিক নিয়মে জনক-জননীর মনে এর স্ফুরণ ঘটে। তখন সন্তানকে অবলম্বন করেই এই আদিম প্রবৃত্তি একটি নূতন রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। সন্তানলাভের পূর্বে অপত্যস্নেহ পুরুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না; স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও একথা খাটে, তবে তাদের মন স্বভাবতই কোমল বলে এদিকে প্রবণতা বেশী এবং সন্তানলাভের সম্ভাবনা দেখা দিলে সন্তানকে কোঁলে পাবার আগে থেকেই বাৎসল্যরসে তাদের মন স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে।

অপত্যস্নেহ মাতৃহৃদয়ে কতকগুলি প্রবল প্রেরণা জাগিয়ে তোলে; তাদের মধ্যে প্রধান হল সন্তানকে রক্ষা করার তীব্র বাসনা ও উদ্যম। অসহায় কচি শিশুটি যেন তাঁরই দেহমনের একটি অংশ, যেন তাঁরই অভিনব সৃষ্টি। এটিকে বুক জড়িয়ে ধরে, স্তন্যপান করিয়ে তাঁর পরিতৃপ্তি। স্তন্যপায়ী শিশুটি একান্তভাবে যে তাঁর উপরই নির্ভরশীল এ ভাব নিজের অজ্ঞাতসারেই জননীর মনে গর্ভমিশ্রিত পুলক-শিহরণ সঞ্চার করে। সন্তান স্ত্রী, কি কুৎসিত, স্ত্রীম কি অন্ধহীন এ সব বিচার করে মাতৃস্নেহ কম বা বেশী উৎসারিত হয় না। জননীর স্নেহকাজল মাখানো চোখে সন্তানমাত্রেই অপূর্বহৃদয় দেবদূত; এদের মঙ্গলকামনাই তাঁর অন্তরের নিত্যকার জপমন্ত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে

সন্তানের প্রতি নির্মল উদার আশীর্বাদ শুনতে পাই কবির
কথায়—পুত্রনামা আত্মা অসি স্বং জীব শরদাং শতম্ ।
তুঙ্গি আমার আত্মা, পুত্ররূপ ধরে এসেছ; তুমি শতবর্ষজীবী
হও ।

পিতৃস্নেহের বৈশিষ্ট্য

সন্তান যখন অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে থাকে তখন
ক্রমে ক্রমে তার উপর মাতৃস্নেহ কমে আসে। ক্রী-
জগতের এই নিয়ম। শিশু স্বাবলম্বী হয়, তাকে পালন
করার, রক্ষা করার দায়িত্ব আর জননীর উপর থাকে না।
স্বস্থ সবল আত্মনির্ভরশীল সন্তান অপেক্ষা দুর্বল, রুগ্ন,
আত্মশক্তিহীন প্রতীহি মায়ের স্নেহ স্বভাবতঃ প্রবলতর
ভাবে প্রবাহিত হয়।

পিতৃস্নেহের স্বরূপ কতকটা ভিন্ন। অসহায় ক্ষুদ্র শিশুকে
দেখে তার প্রতি জনকের মমতার উদ্বেক হয় সত্য, কিন্তু
তা জননীর স্নেহের মত এত প্রবল এবং সক্রিয় নয়। পুত্রের
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পিতার স্নেহ তাকে অব-
লম্বন করে দানা বেঁধে উঠতে থাকে; পিতার আশা-
আকাঙ্ক্ষা যেন তাকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করতে
চায়। এই কামনার মধ্যে দুইটি ভাবের মিশ্রণ ঘটে—
নিঃস্বার্থভাবে পুত্রের কল্যাণ কামনা ও আত্ম-অহমিকা
পরিতৃপ্তির কামনা। পিতৃস্নেহের মধ্যে এই দুইটি কামনা
এমন ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে যায় যে, পিতা ক্রমে পুত্রকে
নিজ থেকে অভিন্ন করে ভাবতে থাকেন। পুরুষ কারও
কাছেই পরাজিত হতে চায় না; তথাপি পিতা পুত্রের
কাছে পরাজয় কামনা করেন, তার কারণ পুত্র বিজয়ী হলে
সে বিজয়গৌরব তার নিজেরই। পুত্রের গুণগরিমার জন্য
তিনি যেমন আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, তার দোষত্রুটি এবং
পরাজয়ের মানিও তাঁর বৃকে সমান ভাবে বাজে। বিখ্যাত
মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেছেন :

... whatever is admissible about it (child) brings
satisfaction to his (father's) positive self-feeling;
whatever is defective humbles him, excites his negative
self-feeling; its shame or disgrace is his shame, its
triumphs are his triumphs.—William McDougall:
Social Psychology, p. 143.

অর্থাৎ, সন্তানের মধ্যে যা-কিছু প্রশংসনীয় তা পিতার
মনে আত্মগৌরবের সন্তোষ আনে, সন্তানের দোষত্রুটি
তাঁর আত্মপ্রাণকে হীন করে; সন্তানের লজ্জা ও
অপমান তাঁর পক্ষে লজ্জা ও অপমান, সন্তানের সাফল্যে
তাঁর সাফল্য।

পুত্রকে অবলম্বন করে পিতৃস্নেহ এবং পিতৃস্নেহের
বাসনা মূর্ত হতে চায়; প্রয়োজন হলে পুত্রের সঙ্গে একই

হৃৎসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুত্রের সমুদ্রখণ্ডাগী হতেও পিতা
কুণ্ঠিত নন। বহুসাময় মনোজগতের এই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ
পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্রের বেদনাস্কন্ধ কর্তে অননুকারণীয় ভাষায়
রূপ দিয়েছেন। কপটদূতে রাজ্যলাভ করে দুর্ধোধন
পিতাকে প্রণাম করতে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রের মুহু-
তিরস্বারে দুর্ধোধন ক্ষুব্ধ হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে
বনবাসে বাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন :

হার বৎস অভিমানী। পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হ'ত শুনি হৃকটোর
হৃদয়ের নিশ্বাসকা,—হইত কল্যাণ।
অধমে দিয়েছি বোণ, হারিয়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর
এত স্নেহ।...
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা
দিলু তোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা-
অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিরাছি।...

আসন্ন বিপদে
কটকিত কলেবর, তবু দৃঢ় করে
ভয়ঙ্কর স্নেহে রক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবেগে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি যুগ মত্ত অটহাসে
উদ্ধার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—

...
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক ঘম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ আর নহে কেহ।

(গান্ধারীর আবেদন—“রবীন্দ্র-রচনাবলী”, ৫ম খণ্ড; পৃ. ৭১)

ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়তঃ রাজ্যের অধিকারী হয়েও শুধু অন্ধের
বিকলতার জন্য সিংহাসন থেকে বঞ্চিত। তাঁর রাজ্য-
লোভাতুর অন্তরের চিরবঞ্চিত কামনা পুত্রের সাফল্যের
ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। দুর্ধোধন এই
অন্ধ পিতার রুদ্ধ কামনারই মূর্ত বিগ্রহ; পিতা এবং পুত্র
এদিক দিয়ে অভিন্ন।

গান্ধারী যখন ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে পাপী দুর্ধোধনকে
ত্যাগ করতে আবেদন জানানলেন, ধৃতরাষ্ট্র তখন বললেন :

পাপী পুত্র তাজা বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তার
একমাত্র; উন্নত ভরঙ্গ-মারুখানে
যে পুত্র স'পেছে অঙ্গ তারে কোন প্রাণে
ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি,
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
ভারি সাথে এক সাথে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি

অকাতরে, অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্থ ফল ভোগ করি তার দুঃখের;
সেই তো সান্ত্বনা মোর,—

পিতা যখন শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে পুত্রকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকেন তখন থেকে পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ ঘনীভূত হতে থাকে। পুত্রের সার্থক আশ্রয়বিকাশে তাঁর চেষ্টা, উদ্যম, স্বার্থত্যাগ তাঁকে নিবিড় ভাবে পুত্রমুখী করে তোলে। তিনি যেন কোন একটি বড় ব্যবসায় তিলে তিলে মূলধন নিয়োজিত করছেন। এর সাফল্য পিতাকে যেমন আনন্দিত করে তেমন আর করবে কাকে? তেমনই এর ব্যর্থতার বেদনা পিতার চেয়ে আর কারো বৃকে এত নিদারুণ হয়ে বাঞ্জে না।

শিক্ষক হিসাবে পিতা

আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি—কদাচিত্‌ এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও—পিতা নিজ সন্তানের আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না। এর কারণ এ নয় যে, তিনি সন্তানের শিক্ষায় উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করতে নারাজ। আসল কারণ বরং এর বিপরীত। তিনি কামনা করেন তাঁর সন্তান দ্রুত সকল বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠুক—পুত্রের সাক্ষ্যে তাঁর অহং ভাব হয় পরিতৃপ্ত। সন্তান তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না

পারলে পিতার অহংবোধ আহত হয়; তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। যে বিষয়টি তাঁর কাছে এত সহজ সেটি সন্তান কেন বোঝে না এবং এটুকু বুঝতে না পারলে সে কি করে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করবে এ চিন্তা তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই মনের আকাশে ঝিলিক দিয়ে যায়; অদীর হয়ে তিনি ছেলের বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দেন আর না হয় মারমুখো হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ পিতার সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য; সন্তানের মঙ্গলের জন্য যিনি অভিমান্রায় আগ্রহী তাঁর পক্ষে আরও বেশী প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে সন্তান যদি মোটামুটি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তো পিতা মনে করতে পারেন, তাঁর পুত্রের মত বুদ্ধিমান শিশু খুব কমই আছে। তাঁর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। পুত্র যদি পিতার এই মনোভাবের আভাস পায় তবে সেও মনে মনে গবিত হয়ে উঠতে থাকে। এতে ফল ভাল হয় না। স্নেহ ও শাসন এ দুটির মধ্যে মধুর এবং সুসমঞ্জস মিলন সাধিত না হলে সক্রিয় পিতৃস্নেহ অনেক সময় মঙ্গলের চেয়ে পুত্রের অমঙ্গলই সাধন করে বেশী। পুত্রের কল্যাণকামী পিতাকে একথাটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।*

* আর্থ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে" শীর্ষক প্রবন্ধের ক্রমানুবর্তন।

স্মরণীয়

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

১. স্মরণীয় আছিলে আপনার মনে তোমার নামটি প্রিয়;
পেয়েছি তোমার অমির মাধুরী স্মরণ রমণীয়;
ভূমি কাছে নাই, দূরে চলে গেছ, তবুও তোমার লাগি,
আপনার মনে তোমারেই ডাকি, তোমারি বিরহে জাগি।

আমার কল্প-কাননে সেদিন যে ফুল ফুটিয়াছিল,
মোদের মিলন-সুখটির রেণু ঘাষিয়া লুটিয়া নিল,
তোমার আমার প্রেম-পারিজাত বেসেছিল যারা ভালো;
ভায়া আজি হায় শূন্য আশায় ব্যাধার বিষেতে কালো।

আকাশে যে ভায়া জাগিয়া সেদিন দেখেছিল অনিমেখে,
মোদের দেহের কানায় কানায় সুহার পাড়টিকে,
আজি রজনীতে হুঁজিতেছি রূপা, কোথাও না পাই তারে,
ছায়াপথ ছাড়ি, অভয় সুনীলে, ডুবিয়েছে আপনারে।

আমার বৃকের 'পরেতে যখন সেদিন আছিলে তুমি,
অগ্নি পরমাণু হয়েছিল লয় অঙ্গে অঙ্গে চুমি';
অন্তরু সে প্রেম উছসি উঠিছে তোমার নামেতে প্রিয়,
লুকায়েছে ভায়া, শুকায়েছে ফুল, তবু তুমি স্মরণীয়।



বাঁশী

শ্রীতারাপদ রাহা

বুকেটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। কেমনই যেন হয়ে গেল। মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে উৎকর্ষ হয়ে উঠল। বাসটা আরও খানিকদূর এগিয়ে এসে থামল। বুকের মাঝে অনেক দিন আগের ভুলে যাওয়া একটা পুরানো বেদনা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল : একটা লোক বাঁশী বাজাচ্ছে। এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তার সুর, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার মুখ আর চেহারা। সাতাশ আটাশ বড়জোর ত্রিশ বৎসর বয়সের এক যুবক, কপালে ছোট একটা কাটার দাগ, কাঁধে ঝুলান একটা ধল শরতি নানা সাইজের নানা রকমের বাঁশী। বিক্রী করতে এসেছে নিশ্চয়, কিন্তু বিক্রীর কথা তার মনেও নেই। আশে পাশে তার যেসব লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে—তাদের মাঝে কয়েক লোক ছুঁচর জন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাদের দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না একবার—চক্ষু মুদ্রিত করে দেহের উর্দ্ধাঙ্গে তাবের তরঙ্গ উৎক্ষেপ করে সে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে।

বাঁশীওয়ালার পথে কতই ত বাঁশী বাজিয়ে থাকে, কিন্তু কৈ মনটা ত ঠিক এমনি করে ওঠে না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী, তাই বলে কি? না, তাও নয় : বংশীবাদন কতবাঙালীরই ত বাঁশী শুনেছি, মনটাকে এমনি করে আচ্ছন্ন মুছিতপ্রায় করে তুলতে পারে নি ত কেউ, তা ছাড়া শিল্পকে ছেড়ে প্রাদেশিকতাকে বড় করে দেখবার মত মন ত আমার নয়।

চক্ষু দুটি বাস্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—গারে কাঁটা দিচ্ছিল, বুকের মাঝে কেমন যেন একটা বেদনা বোধ করছিলাম। এই সব অহুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই মন বিচ্যন্ন করে চলেছিল কেন এমন হ'ল, এ কি? হঠাৎ মনে হ'ল, এই সুরটা—সুরটারই এই গুণ। ছেলেবেলার একটু-আট্ট সঙ্গীত-চর্চা করেছিলাম, বুঝতে কষ্ট হ'ল না লোকটা আশোয়ারী বাজাচ্ছে, হাঁ ঠিকই, আশোয়ারী নইলে মনকে এমনি উদাস করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে আর কোন সুর পারে? কিন্তু আশোয়ারীও ত আরও কিত শুনেছি—কত বড় বড় ওতাদের যুখে, মনটা এতখানি অভিভূত হয়ে পড়ে নি ত কোনদিন।

আরও ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করলাম। হাঁ, আশোয়ারীর সঙ্গে আরও কি যেন বেশানো রয়েছে, ঠিক যে কি করতে পারছিলাম না, তবে আছে, তাতেই সুর বুঝি এত মধুর হয়ে উঠেছে। হয়ত এ ছাড়া আরও কিছু আছে : শিল্পীর দরদ, তার অন্তরতা অথবা তার নিজের মনের গোপন কোন

ব্যথা, হয়ত এও সব নয়, এ ছাড়া আরও কোন কিছু যার ঠিক সন্ধান পাচ্ছি না আমি—

বাস ঠাঁট দিলে। চলতে শুরু করলে বাস। নিজের বয়সকে শত বিকার দিলাম মনে মনে : কিশোর বা যৌবনের প্রথম দিক হলে এই ডবল ডেকারের উপর থেকে খটাখট শব্দ করে এক দোড়ে নীচে নেমে গিয়ে বাঁশীওয়ালার পাশে গিয়ে দাঁড়াভাম।

বাঁশীর সুর ক্রমে আমার প্রবণের আয়ত্তের বাইরে হয়ে গেল, কিন্তু মনের মাঝে সে তখনও তরঙ্গ তুলছে। সেদিন রাতে শুয়ে কারও সাঙ্গ একটু কথা বলতে পারি নি—অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতে পারি নি।

এর পর থেকে মহানগরীর পথে ট্রামে-বাসে যেতে বাঁশীর সুর কানে গেলেই লোকটাকে খুঁজি। সুর শোনার পর অবস্থা আর লোক খোঁজার প্রয়োজন থাকে না, কারণ মন জানে ও সুর শুধু একজনের বাঁশী থেকেই বেরুতে পারে। ভাগ্যচক্রে আর একদিনও বাসে আসতেই লোকটার দেখা মিলল। দূর থেকে বাঁশীর সুর কানে যেতেই বুঝতে পেয়েছিলাম—এ সেই! বাঁশীতে বাজছিল সেদিন পুরিয়া, মাদ্রি আটটার কাছাকাছি মেট্রোপলিটন ইনসিওরেলের নৃত্যন-কেনা বাড়ীটার সামনে। যাত্রীতে ডবল ডেকার ঠালা, বেশিকণ দাঁড়াল না বাস। তা ছাড়া প্রথম দিনের মত অভট্টা শিহরণও আগে নি মনে। বাঁশীওয়ালার অভট্টা আত্মহারা হয়ে বাজাচ্ছে না সেদিন, বিক্রীর দিকে বেশ খানিকটা মন রাখতে হয়েছে তার। বেশ একটু রাগ হচ্ছিল লোকটার উপর, কিন্তু তখনই বিচারবুদ্ধি এসে মনকে ধমক দিলে : খেতে হবে না ওর—রোজগার না করে কেবলি তোমার বাঁশী শোনাবে।

বাসে আসতে আসতে আমি বেশ উপলক্ষি করলাম—বাঁশী শুনে লোকটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, আরও বুঝলাম প্রেমের দ্বিতীয় স্পর্শ প্রথম স্পর্শের মত অত মারাত্মক নয়।

আমার এই নৃত্যন ম্যাগনেটটিকে আরও দু'দিন পথে দেখলাম বাঁশী বাজাতে নয়—বিক্রী করতে। বাজনা হয়ত একটু আগে শেষ হয়ে গেছে, সেটা সন্দেহও ওর পণ্যপ্রবোয় বিজ্ঞাপন। শিল্পীকে ব্যবসায়ীর মূর্তিতে কল্পনা করতে স্পর্শ-কাতর মন নারাজ হয়ে ওঠে, তবু লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ একেবারে যায় না।

একদিন রাজি দশটার কাছাকাছি—গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থেকে নামতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দূর থেকেই ওর বাঁশী শুনছিলাম—সেদিন বেহাগ বাজাছিল। বাস মোড়ে থামতেই ওর বাজনা থেমে গেল : কে একজন বাঁশীর দর-দস্তুর করছে। শৃঙ্গপ্রায় বাস থেকে নেমে আমিও যন্ত্র-চালিতের মত এগিয়ে গেলাম কাছে। ক্রেতাকে দরদস্তুর করতে দেখে ও যুহু হেসে বললে, এক দামে বিক্রী ভাই, এই মিসময় কি দর-কষাকষি করবার ফুরসৎ পাবেন আপনারা ?

এই কথাগুলির মাঝে লোকটার শিক্ষা ও কুচির যেন বেশ খানিকটা পরিচয় পেলাম আমি। হাসিটিও বড় মধুর, দাঁতগুলিও সুবিশুভ বকবকে। লোকটিকে এত কাছে পেয়ে কথা বলার আগে তার চোখে মুখে সর্বদা একবার দ্রুত চোখ বুলাবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না। চেহারাটা এমন কিছু কন্দর্পের মত নয়—তবে সুন্দর। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, আর শিল্পপ্রতিভার জ্বলস। গায়ের রংটা হয়ত একদিন কয়সাই ছিল, কিন্তু এখন তাহাটে। মাথার চুল ঘন এবং অনেক দিন কাঁচি পড়ে নি—তাই একটু দীর্ঘ, অবিশুভ। এসব দিকে তার খেয়াল আছে বলেই মনে হয় না।

যে ছেলেটি বাঁশী দর করছিল সে পাঁচ সিকে দিয়ে একটা ‘বি-ক্লুট’ কিনে নিয়ে চলে গেল। এর পরই আমার পালা। একটু লজ্জা করছিল। মনকে কষে ধমক দিলাম, অস্ত্রাভ যন্ত্রের মত বাঁশীও একটু সুর-যন্ত্র, বেহালা ভূমি বাজাও, আর বাঁশীতেই এমন দোষ করলে।...আগে অবশ্য আমার ধারণা ছিল বয়স কুড়ি পেরুলেই আর কারও বাঁশী বাজান উচিত নয়। এ বয়সের পর আমি নিজেও বাঁশী ছেড়েছি কিনা। যাই হোক শিল্পের দোহাই দিয়ে মনে জোর এনে সঙ্কোচ কাটিয়ে কোন রকমে বলে বললাম, “G” আছে ?

উদার! না মুদার, বাবু ?

উদার।

আজ ত উদার! আর নেই বাবু—ছুটো ছিল বিক্রী হয়ে গেছে, বলেন ত কাল এনে দিতে পারি।

কত দাম ?

ভাল বাঁশের ভাল ক্রিনিস করা মোটা ‘জি’ একটা ছ’ টাকা পড়বে, আর অর্ডিনারি সাত সিকে।

বেশ, ভালটাই আনবেন—

লোকটা কেমন একটু স্নান সলজ্জ হাসি হেসে বললে, আমাকে আপনি বলছেন ?

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন, আপনি বলব না কেন, না বলবার কারণ কি ?

লোকটা আর একটু বিষন্ন হাসি হেসে বললে, বড় কেউ বলে না কিনা, ভাই বলছি।

না বলবার ত কোন সম্ভব কারণ নেই—চেহারা দেখে মনে হয় আপনি ভদ্রলোকের ছেলে।

লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে মাটির দিকে ভাকাল।

তা ছাড়া মনে হয় লেখাপড়াও কিছু করা হয়েছে—

বলেই একটু হকচকিয়ে গেলাম : আমার বাক্যবিহাঙ্গ! আপনি আর ভূমির মাঝামাঝি হয়ে গেল। পরক্ষণেই ব্যাপারটা শুধরে নিতে বললাম, দেশ কোথায় আপনার—পূর্ববঙ্গে বোধ হয় ?

স্নান হেসে লোকটি বললে, আজ্ঞে হাঁ।

আশে-পাশে ভেতন লোক ছিল না, ক্রেতাও কেউ আসছিল না, সুতরাং আমার এই নূতন ম্যাগনেটের সঙ্গে পরিচয়ের এই সুযোগ। বললাম, আপনাকে আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, বাজনাও শুনেছি। বৌবাজারের ওদিকেও আপনি যান।

আজ্ঞে হাঁ, কলিকাতার সর্বত্রই আমার যাতায়াত, সুবর্ণেও মাঝে মাঝে যাই—

বুঝলাম অসুস্থমান আমার মিথ্যা নয়—লোকটা লেখাপড়া সত্যিই জানে। বললাম, হাঁ, একদিন ডবল ডেকারে আসতে বৌবাজারের মোড়ে আপনাকে বাঁশী বাজাতে শুনেছি, আলোয়ানী বাজাচ্ছিলেন। বড় ভাল লেগেছিল আমার। ‘এমন বাঁশী আমি’—বলতে যাচ্ছিলাম ‘জীবনে আর শুনি নি’, কিন্তু সামলে নিয়ে বললাম, ‘জীবনে কম শুনেছি’—

কথাটা শুনে দেখলাম গ্যাসের আবহা আলোতেও মুগ্ধতা তার একটু লাল হয়ে উঠল। যুক্ত করে চুহু ছুটি অর্ধমুদ্রিত করে সে কাকে প্রণাম জানাল।

বুঝলাম না এ আমাকে, না তাঁর গুরুকে, না কোন দেবতার উদ্দেশ্যে। বললাম, বেশ শিখেছেন আপনি। এ.কোন গুরুর কাছে শেখা—না শুধু নিজের চেষ্টাতেই ?

প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা ক্রমে কেটে আসছিল লোকটির। বললে, এ আমার বাবার কাছে পাওয়া, বাবু। শিখেছি আমি অবশ্য নিজের চেষ্টাতেই, কিন্তু প্রেরণা পেয়েছি, উত্তরাধি-কারহুকে পেয়েছি আমি এ বাবার কাছ থেকে। তিনি খুব গুণী লোক ছিলেন, প্রায় সব রকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন, বাঁশী অবশ্য তিনি বাজাতেন না, বাজাতেন সব তারের যন্ত্র—রাগ-রাগিণী সবই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। বাঁশী বাজানো আর বানানো অবশ্য আমি নিজের চেষ্টাতেই শিখেছি—

এই সময় একজন খরিদার এসে দরদস্তুর করে কয়েক মিনিট সময় আমাদের নষ্ট করে দিয়ে গেল,—কারণ বাঁশী সে কিনলে না। বাঁশী না কিনে শুধু শুধু কথা বললে যদি ব্যাপারীর সময় নষ্ট করা হয়,—তবে আমার বেলায়ও এ সম্ভ্য।—মনে হতেই একটা ডি-বাঁশী বের করতে বললাম লোকটিকে।

দাম কত ?

দেড় টাকা।

পকেট থেকে টাকাটা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, বাঁশীটার একবার এক কলি বাজিয়ে দিন আপনি, আওয়াজটা একবার দেখে নি।

কথাটা বলা হ্রত আমার ঠিক হয় নি। লোকটি যুহু হেসে বাঁশীটা একবার মুখে তুলে নিলে। পরক্ষণেই মনে হ'ল—আকাশ থেকে আমার কানে যেন এক পশলা সুধারুষ্টি হয়ে গেল।

বেশী শুনে চাওয়া উচিতও নয়, তার সুযোগও মিলল না। আর একটা ডবলডেকার এসে গেল, তা থেকে বাড়ী নামল এবং দুটি তরুণ এসে বাঁশীর দরদস্তুর শুরু করলে। নিজের বাঁশীটা হাতে নিয়ে, পরের দিন মোটা জি-বাঁশী আনবার কথা শ্রম করিয়ে দিয়ে আমি সেদিনকার মত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় লোকটির কাছ থেকে মোটা 'জি' কেনবার সময় তার নামটি জেনে নিয়েছিলাম। পুরো নামটা অবশ্য প্রথমে সে আমার বলতে চায় নি। প্রথমে বললে বি. গুহ।

হেসে বললাম, এ ত ঠিক দেশের দস্তুর হ'ল না—বংশের নামের চেয়ে বাপমায়ের দেওয়া নামটারই এখানে কদর বেশী—

সামান্য একটু সঙ্কোচ—তার পরেই সজ্জ হাসি হেসে বললে, ভৈরব গুহ।

নামটা একটু সেকেলে ভেবে হ্রত লোকটি সঙ্কোচ বোধ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল অল্প কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কন্ঠ হয়েছিল বুঝি প্রভাতে ?

• হাঁ, কি করে জানলেন ?

আর নাম রেখেছিলেন বুঝি আপনার বাবা ?

লোকটি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হাঁ, কিন্তু সব আপনি ঠিক ঠিক বলছেন কি করে বুঝি না ত।

সেকথা বলব না দিয়ে বললাম, বড় সুন্দর নাম রাখা হয়েছে আপনার, নামদাতার শিল্পজ্ঞান আর কুচির প্রশংসা করতে হয়।

কথাটা শুনে লোকটি তেমন খুশি হয়েছে বলে মনে হ'ল না। জি-দুটি তার ঝংঝং কুণ্ডিত হয়ে উঠল, বললে, কেন বলুন ত ?

বললাম, আপনি এত সঙ্গীতচর্চা করেছেন আর এটা বুঝলেন না ? ভৈরব হচ্ছে প্রভাতের একটা রাগের নাম, অন্য কথার থাকে বলে ভারমো, প্রভাতের বন্দনার সুর—বিষদেবতার বন্দনা, বড় দিব্য গভীর এর রূপ।

এক মুহূর্তে লোকটির মুখের বিরক্তি আর অস্থির রেখাগুলি নিঃশেষে মুছে গেল, বললে, তাই ত, এতদিন ত কথাটা ভেবে দেখি নি—

কয়েকটি নতুন জেতা এসে দাঁড়িয়েছিল, আর বিশেষ কথা সেদিন হতে পারল না; কথার প্রয়োজনও আমার তেমন নয়, প্রয়োজন আমার ওর বাঁশী শোনা, আর সে-ও যে সে রাগ-রাগিণী নয়—সেদিনকার মত সেই আশোয়ারী—কিন্তু সে ত ফরমাস দিয়ে যেখানে সেখানে হতে পারে না, লোকটির সঙ্গে ভাব রেখে একদিন তাই শোনার সন্তাবনাইটুকু শুধু বড় করে রাখতে চাই।

আর এই সন্তাবনাই আর একদিন আমার জীবনে কেমন আশ্চর্য্য রকমে সফল হয়েছিল সেই কথাই আজ বলব।

ভৈরবের সঙ্গে আরও দু-এক বার আমার অবশ্য দেখা হয়েছে, তার কাছ থেকে আমি আরও দুটো বাঁশী কিনেছি, আমার পরিচয়ও সে কিছু কিছু পেয়েছে, কিন্তু কোথায় থাকে সে, সে খবর আর আমি রাখি নি।

বিজ্ঞান হ'দিন পর একটা কলোনিতে গিয়েছিলাম প্রণাম করতে আর প্রীতি জানাতে। সেখানে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় আত্মনা গেড়ে বাস করছেন। আত্মীয়-বাড়ীতে বৈকালিক জলযোগ সেরে এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখছিলাম। এসব জায়গায় ঘুরতে আমার বেশ লাগে। বাইরের সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল আত্মশক্তি মাত্র সবল নিয়ে মাহুয নিজে থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যে আয়োজন করছে তা দেখে সত্যিই আনন্দ লাগে। অথবা নাগরিক ক্রটিমতার খোলস-খসা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র রূপের এক অপূর্ণ সমাবেশ এখানে দেখতে পাই।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরার পর বাস-ষ্টপের সামনে এক চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। বাস আসতে একটু দেরী আছে—তা ছাড়া সন্ধ্যার দিকে বাসে ভিড়ও থাকে খুব। একটু দেরী করেই যাব ঠিক করেছিলাম। আসল কথা এখানে এই চায়ের দোকানে বসে লোকের কথা শুনেও আমার বেশ ভাল লাগে। সুতরাং পেয়ালার পর পেয়ালার করে অন্ততঃ তিন চার কাপ চা আমার এখানে অনায়াসে চলতে পারে।

দোকানে বসে সবে প্রথম পেয়ালার চুমুক দিয়েছি এমন সময় 'ও নরেন্দ্র'—বলে ঘরে ঢুকল কে। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত। চেয়ে দেখি ভৈরব। মুখ থেকে অমনি বেরিয়ে গেল—আরে আপনি।

ভৈরব আমার দিকে চাইতেই খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকেও বেরুল—বাবু, এখানে।

ভৈরবের মুখে বাবু কথাটা অবশ্য আমার তেমন ভাল লাগল না। তার সঙ্গে যত পার্থক্য আমি রাখতে চাই, অথবা

আমার বিচারমতে মতটা পার্থক্য হওয়া উচিত, বাবু কথটা যেন সে সব ওলটপালট করে দেয়। তবু তখনকার মত কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে বললাম—হ্যাঁ আমার কয়েকজন আত্মীয় থাকেন এখানে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলাম—বিছয়ার পর—

ভৈরব মিমতির সুরে বললে—তা বাবু আমার ওখানেও একটু পায়ের ধুলো দিতে হচ্ছে যে, আপনি এসে দোকানে—

বললাম, তা কি হয়েছে—এখানে আমার বড় ভাল লাগে।...আপনার বাড়ীও এখানে বুঝি?

ভৈরব হাসল : বাড়ী আর কি করে বলি, বাবু, একটু মাথা গুঁজবার স্থান করে নিয়েছি।

দোকানের মাঝে আর প্রাণ ধুলে কথা বলতে পারছিলাম না ভৈরবের সঙ্গে। চারের দাম মিটিয়ে বাইরে আসতেই ভৈরব আবার চেপে ধরল, চলুন বাবু—কাছেই আমার বাড়ী—পেয়েছি যখন আপনাকে, কিছুতেই ছাড়ছি না।

ভৈরবের আন্তরিকতার মুক্তি হচ্ছিল আমি—কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না—এমন কি পেয়েছে সে আমার কাছ থেকে যাতে সে আমার এমন ভক্ত হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক—ভৈরবের আহ্বানে 'না' করতে পারলাম না, তা ছাড়া মনে মনে কোঁড়ুলও হয়ত ছিল—বাড়ীতে কি জীবন সে যাপন করে তা দেখতে।

গড়িয়াহাটী মেন রোড ছেড়ে গলিতে ঢুকে ভৈরব আর এক বার বাবু বলতেই আমি ধমক দিয়ে উঠলাম—দেখুন ভৈরববাবু, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া জানেন—আমাকে এমনি বাবু, বাবু—করা আমি পছন্দ করি না। আমার পরিচয়ও আপনি পেয়েছেন—ভেমন কিছু হোমরা-চোমরা আমি নই। দরকার হলে আমাকে কল্যাণবাবু ডাকতে পারেন—আর যদি বৌ আপনাকে বলে মনে করতে পারেন—তা হলে দাদা বলতে বাধা দেখি না।

বেশ, তা হলে আমাকেও আপনি বলবেন না আপনি, শুধু ভৈরব বলে ডাকবেন—আমি তা আপনাকে কত ছোট।

আচ্ছা, তাই হবে।

মনটা খুশি হয়েছে উঠল : ভৈরবের সঙ্গে এই রকম অন্তরঙ্গতাই চাইছিলাম আমি। কিন্তু একটু পরেই মনটা আমার আবার হঠাৎ খিচড়ে গেল—যখন কানে এল ভৈরব ডাকছে—দাছ, ডাইনে—এইবার এইদিকে কিরন্তে হবে আমাদের।

মনের উদ্ভ্রা আর চেপে রাখতে পারলাম না—বললাম, দেখ ভৈরব, এই দাছ, দাছটা বিক্ৰী লাগে আমার কানে, তুমি আমার কল্যাণ-দা—অথবা শুধু দাদা বলে ডাকলে খুশি হবে।

ভৈরব আমার উপর রাগ করলে কিনা কে জানে। কথা

বললে সে একেবারে বাড়ীর সামনে এসে : এসে গেছি, দাদা, আপনি এক সেকেণ্ড দাঁড়ান—দেখে আসি আমি কি অবস্থায় আছে।

বেশীকণ দাঁড়াতে হ'ল না আমার—প্রায় পরক্ষণেই ফিরে এসে কেমন একটু হেসে বললে, আহুন দাদা, আহুন—হাসছে যে।

আর বলবেন না—কাপড়টা পালটাতে বলছিলাম—তা ও কিছুতেই শুনলে না, বলে—যেমন আছি তেমনি থাকব—কাপড় পালটানো ত আর্টিফিসিয়ালিটি—

আমিও হাসতে হাসতে ওদের ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই যাকে দেখলাম তাকে দেখেই কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না—ভৈরব এরই মুখের কথাটা হুবহু আয়ত্তি করে শুনিয়েছে আমার অর্থাৎ ইংরেজী শব্দটিও এরই উচ্চারিত। দেখেই মনে হ'ল আধ ময়লা কাপড় পরে দেবী সরস্বতী দাঁড়িয়েছেন আমার চোখের সামনে।

মুখে মধুর শিঙ হাসি। হাত জোড় করেই নমস্কার করলে মেয়েটি। প্রতিনমস্কার করলাম। ভৈরবের সঙ্গে তুমি বলে কথা বলতে শুরু করেছি, কিন্তু বয়সে এত ছোট হলেও রীতিমত ভাবতে হয় এর সঙ্গে কথা বলতে মধ্যম পুরুষের কোন শব্দটি ব্যবহার করা উচিত—শিক্ষা এবং কৃতির এমন একটা দীপ্তি রয়েছে এর মুখে।

ভৈরবের দিকে চেয়ে মুহূর্তেই বললাম, ভৈরব, আমার এ ছোট বোনটির নাম কি?

মেয়েটি হাসল। বড় মধুর সে হাসি। সে-ই জবাব দিলে, আমার নাম শান্তি।

শান্তিই বটে—মনে মনে ভাবলাম আমি : চারদিকে তখন দ্রুত একবার চোখ বুজিয়ে নিচ্ছেছি আমি। রাগিগঞ্জের টালি ছাওয়া বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট ঘরবানির এক পাশে এক তক্তপোষে নাতিশুল্ল একটা বিছানা পাতা—তারই মীচে একটা জলচৌকীতে সোনার মত করে মাছা থালা ষট্টি বাটি গেলাস, ঝকঝকে পেয়লা ডিশ। বেড়ার গায়ে ছাদ থেকে একটা খুলান বাঁশের আলনার আবহময়লা ও করলা কয়েকটা জামা কাপড় সাজী রাউজ সাজ। যেদিকে তক্তপোষ তার উণ্টো দিকে একটা ছোট বেঞ্চে ঢাকনা দেওয়া একটা হারমোনিয়ামের বাজ ও একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরে একটা টাইমপীস; আর ওদিককার দেয়ালে ঢাকনা দেওয়া একটা সেতার খুলানো। ওদিকে নজর পড়তেই বলে বললাম, বউমা বাজান বুঝি?

শান্তি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এই যে একটু আগে বললেন, আমার বোন, বলে মুহূর্ত হাসল।

বোন আর বউমাতে তফাৎ কি আছে?

তা আছে বই কি—রউমা বললে ঠুর সম্পর্কটাই বড় হয়ে ওঠে, আমি হয়ে যাই ছোট।

ওঃ—

বলে হো হো করে হেসে উঠলাম—হার মানলাম দিদি।

শান্তি বললে, আর একটা ভুল করলেন দাদা, আমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ‘বাকান’ বলা আপনার উচিত হয় নি, বলা উচিত ছিল, বাকায়; বোনের সঙ্গে আপনি আপনি করে কেউ কথা বলে না।

শুনেন মনটা যেমন জুড়িয়ে গেল, বিশ্বয়বোধ করলাম ততোধিক। হেসে বললাম, হার মানতে হ’ল, বোনটি।

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভৈরব হাসতে হাসতে বললে, হার মানতেই হবে আপনাকে, উনি যে, সরস্বতীর মানসকন্ডা, যুক্তিতে পেয়ে উঠবেন না ওর সঙ্গে, আমাকে কথায় কথায়—

জা কুঁচকে অপার দৃষ্টিতে শান্তি শাসন করলে ভৈরবকে, তার পর আমার দিকে চেয়ে বিছানা দেখিয়ে বললে, বহুন, দাদা আপনি, আমি একটু চায়ের জল চাপিয়ে আসি—

ভৈরব অমনি টিগমি কাটলে, দাদা, দাদা ত করছ, কিন্তু এদিকে যে হঠাত জোড় করে নমস্কার করলে দাদাকে, বিজয়ার পরে একটা—

শান্তি অমনি লজ্জা পেয়ে ছুটে এসে পায়ের কাছে এক সম্ভক্তি প্রণাম করে গেল।

শান্তি বারান্দায় চায়ের জল গরম করতে গেল, আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, শান্তি গান বাজনা ছুই-ই জানে বুঝি?

ভৈরবের চোখ মুখে যেন একটু লাল জ্বালা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, বললে, গান বাজনা ষোটাছুটি এক রকম সবই জানে, তবে সবচেয়ে বড় কথা, সুরের একেবারে পাগল। একটা ভাল সুর শুনলে একেবারে কঁাদতে বসে যাবে।

বারান্দা থেকে বাকার এস, দেখ, ভাল হবে না বলছি—

ভৈরব যুহু হেসে উত্তর দিলে, না না, ও সব আর বলছি না আমি। তার পর আমার দিকে চেয়ে অস্থির কণ্ঠে বললে, ওর পরিচয় শুধু এটুকু নয়, লেখাপড়া ওর কাছে বসে দশ বৎসর আমি শিখতে পারি : ও গ্রাজুয়েট আর আমি আই-এ অবধি পড়েছি—

শান্তি এবার জলন্ত একখানা কাঠ নিয়ে উঠে এস, দেখুন ত দাদা।

আমি হেসে উঠলাম, না না, শান্তি তুমি কি করে যাও, আমি ওকে শাসন করে দিচ্ছি : একজন গ্রাজুয়েট কখনও একজন আই-এ পড়া ছেলেকে দশ বৎসর পড়াতে পারে, যত সব ইয়ে—

‘আপনিও ওর পক্ষ নিলেন’—বলে অভিমানের কান্নার সুর নিয়ে শান্তি বারান্দায় ফিরে গেল—

আমি হাসতে হাসতে তাকে সাবুনা দিতে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। দেখি শান্তি হেঁট মুখে উঠুনের ধারে বসে সত্যিই কঁাদছে—

বিশ্বয়ে আমি ওকে সাবুনা দিতে ভুলে গেলাম, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি আজ যেন এক স্বপ্নলোকে এসে গেছি, অথবা সত্যিই স্বপ্ন দেখছি।

কয়েক সেকেন্ড পর আমি আমার পূর্ণস্মৃতি ফিরে পেলাম, ওকে সাবুনা দিবারও কিছু নেই, ও ত এ হুঃখের কান্না কঁাদছে না। ওর কান্নার মূল কারণ খন রহস্তে আবৃত।

এই বার ওর উঠুনের দিকে নজর পড়ল। জাল দিচ্ছে ও পাহাড়ে তরল বাঁশের কুচি দিয়ে, যে বাঁশ দিয়ে ভৈরব তার বাঁশী-ভেঁরি করে। বারান্দার অপর পাশে পাঁচ-ছয় হাত লাঠির মত লম্বা ঐ বাঁশেরই বোঝা বাঁধা রয়েছে।

শান্তির এ কান্নায় আমার কিছু করবার নেই বুঝে আমি বেকুবের মত আবার ঘরে ফিরে এসে বসলাম। ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ আর বেরাও নি—না?

না। লক্ষ্মীপুজোর আগে আর বেরাব না। এ সময়টা আমাদের দেশে আত্মীয়স্বজনরা সব দেখাশুনো করতে আসেন—নিজেকেদেরও যেতে হয়।

হেসে বললাম, জানি, আমিও ত তোমাদেরই মত ও অঞ্চলেরই লোক।

কোথায় বাড়ী ছিল আপনার?

যশোর।...শান্তির পিতৃকুলের বাস ছিল কোথায়?

ভৈরব একটু গভীর হয়ে উঠল যেন : ওঁরা এইখানেরই লোক।

শান্তি বারান্দা থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না, দাদা না, আমাদেরও আদি নিবাস ছিল করিমপুরে।

করিমপুরে, কোথায়?

মাদারীপুর সাবডিভিশনের রতনডাঙ্গা।

রতনডাঙ্গা। রতনডাঙ্গায় ত আমার মাতুলালয়। রতনডাঙ্গার কান্না বল ত?

শান্তি বারান্দা থেকেই উত্তর দিলে, রতনডাঙ্গার সনাতন বাঁড়ুজের নাম শুনেছেন? আমার বাবা তাঁরই বংশধর। সনাতন বাঁড়ুজ ছিলেন আমার প্রপিতামহ—

বিশ্বয়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে : সনাতন বাঁড়ুজ! বাঁড়ুজ, আর এ দিকে হচ্ছে ওহ—ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ।

নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তির কথায় জবাবে বললাম— হ্যাঁ, সনাতন বাঁড়ুজের নাম শুনেছি বই কি—তিনি ত ওখানকার ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। পরক্ষণেই একটু কৌতুকের লোভ সংবরণ করতে না পেয়ে ভৈরবকে বললাম, তোমাদের তা হলে দেখছি এ ‘লাভ ম্যারেজ’, সবই ‘আর্টিফিক্’

তোমাদের—বলেই একটু উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলাম। ভৈরব কেমন গভীর হস্তে রইল, কোন জবাব দিলে না।

আমিও এর পর—কি বলতে কি বলে বসব—ভেবে কিছুক্ষণ চূপ করেই রইলাম। শান্তি পেয়ালা নিতে ধরে এল। নিজে হাতে তৈরি খাবার বের করলে। একটু পরে একখানা থালায় উপর ছ' কাপ চা আর এক প্লেট খাবার নিয়ে ধরে এল। এতক্ষণ চূপ করে থাকার পর এবার আবার কথা বলবার সুযোগ পেলাম আমি। খাবারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শান্তিকে বললাম, এ সব তৈরি করতে কান ছুমি?

যুহু হাসল শান্তি : কিছু জানভাম, বাকী শিখে নিয়েছি।

প্রথম দিন এসেই এদের অনেক কিছু জেনে নিয়েছি বলে বোধ হয় একটা অপরাধের ভাব মনে চেপে বসেছিল। আলাপ বেশ সহজ হয়ে উঠছিল না, তবু জোর করে শান্তিকে বললাম, আজ রাত হয়ে যাচ্ছে, আর বিরক্ত করতে চাই না, এর পর যেদিন আসব গান বাজনা শোনাতে হবে কিন্তু।

শান্তির মুখ থেকে ছেলেমানুষির ভাব কেটে গিয়ে আবার সেই প্রথম দেখা বুদ্ধির দীপ্তি আর গভীরতা ফুটে উঠেছে। কোন রকম ভাওয়ামি না করে শান্ত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, আসবেন, যেটুকু পারি শুনতে চাইলে শোনাব বই কি, শুনতে চাইলে ঘাদের গুমোর বেড়ে যায় আমি তাদের দলে নই।—বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ভৈরবের দিকে চাইলে।

ভৈরব অমনি কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বললে, মিছে অপবাদ, কেন, শোনাই নে আমি তোমার বাঁশী?

তা বটে!

অতিমানে কে যেন খট করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সাত্বে নটা বেজে গিয়েছিল। আর দেবী করলে বাস পাব না। শেষ বাসখানা ৯-৪৫এ আসে। সুতরাং উঠতে হ'ল। হারিকেন ধরে শান্তি আমার এগিয়ে দিতে এসে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললে, আবার আসবেন দাদা—রবিবার সন্ধ্যার পর উনি বাড়ী থাকেন—

গান শোনাতে হবে কিন্তু।

—বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। শান্তি ওখান থেকেই বললে, শোনাব—আপনার লেখা বই দিতে হবে কিন্তু আমার, নইলে আড়ি—

কণ্ঠধরে আবার সেই বালিকার সারল্য কিরে এসেছে। যেতে যেতেই হেসে উঠলাম : আচ্ছা, আচ্ছা সে হবে'ধন। মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল, আমার সম্বন্ধেও কিছু কিছু শুনেছে তা হলে ভৈরবের কাছ থেকে। নিজেও বোঁজ-ধবর রাখে নিশ্চয়, লেখাপড়া ত জানে।

ভৈরব আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল—এগিয়ে দিতে এসেছিল।

বাসে উঠবার আগে তাকে বলে এলাম, সামনের রবিবারে নয়, এর পরের রবিবারে আবার আসব।...বড় আনন্দে কাটল তোমাদের এখানে—

ভৈরব প্রত্যুত্তরে বললে, আমাদেরও যে কত আনন্দ হ'ল এখন বোঝাতে পারব না—পরে এলে বুঝবেন। আসবেন দাদা—

আসব—

বাস ছেড়ে দিলে। এদের এখানে যা দেখে গেলাম—সে রাজ্যে তারই স্মৃতি আমার একটা গানের সুরের মত অভিভূত করে রেখেছিল।

নির্দিষ্ট রবিবারে ওদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের লেখা ছুখানা বই দিয়ে এসেছি—শান্তির গান বাজনা শুনে এসেছি। ভৈরবকে বাঁশী বাজাতে বললাম, সে কিছুতেই রাজী হ'ল না, বলে 'মুড়' নেই দাদা।—শান্তির গানের সঙ্গে অবশ্য সে বাঁশী ধরেছিল, কিন্তু তাতে ঠিক ভৈরব গুহের সেই বাঁশীর সুর আসে না।

কবে তার মুড় আসবে সেই আশায় প্রায় প্রতি রবিবারেই ওদের ওখানে যাওয়া সুরু করলাম। তা ছাড়া ওদের ছ-জনকেই আমি দস্তরমত ভালবেসে কেলেছিলাম। তাদের এই অভূত রহস্যময় জীবনও আমার কাছে কম আকর্ষণের ছিল না। যত দিন যাচ্ছিল ততই যেন আরও বেশী রহস্যময় হয়ে উঠছিল।

এদের জীবনের অনেক কথাই আমি ধীরে ধীরে জেনে নিয়েছি। এদের 'বিয়েট' যে অসবর্ণ সেকথা অবশ্য আমি প্রথম দিনই বুঝে গিয়েছিলাম, কিন্তু শান্তির দিক দিয়ে সে যে কি হুনাহসিক সাধনার সিদ্ধি ভাবলে অবাক হতে হয়। আমারই মত সেও ভৈরবের বাঁশী শুনেই প্রথম আকৃষ্ট হয়—আকৃষ্ট হয় বললে হয়ত কিছুই বলা হয় না—সে একেবারে পাগল হয়ে যায়। প্রথম দিন ভৈরবের বাঁশী শুনে ড্রাইভারকে বলে সে মোটর থামিয়ে শুদ্ধ হয়ে বসে থাকে। সে রাজ্যে নাকি ঘুমুতে পারে নি। পরে সন্ধ্যার পরে বেড়াবার ছলে মোটর নিয়ে সে পথে পথে ভৈরবের বাঁশী শুনবার জন্যে ঘুরে বেড়াত—কোন দিন ভাগ্যে বাঁশী শোনা জুটত, কোন দিন বাঁশী বিক্রয়-রত ভৈরবকে সে দূর থেকে দেখেই ফিরে যেত।

বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, শান্তির বাবা প্রায়ই বাইয়ে বাইরে থাকতেন। শান্তি আর ভৈরবের মধ্যে কি করে যে আলাপ পরিচয় এবং পত্র বিনিময় সুরু হ'ল সে অনেক কথা। ঘনিষ্ঠতা হবার পর প্রায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পত্র লেখার পালা চলে। ভৈরব জানিয়েছিল তার দৈন্তের কথা, শান্তি তার উত্তরে বলেছিল, ওসব কোনো

কিছু দরকার নেই...শান্তি একদিন ভৈরবকে সিঁড়ি ম্যারেজ
এক অহুসারে বিয়ে করে বসল।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মিঃ ব্যানার্জি প্রবাসে শান্তির চিঠি
পেলেন—বাবা, ভালবেসে আমি এক সুর-সাধককে বিয়ে
করেছি। রাগ করো না—আশীর্বাদ করো আমরা যেন সুখী হই।

মিঃ ব্যানার্জি পাকা লোক। অন্তরে জলে গেলেও বাইরে
বিরূপ ভাব দেখান নি তিনি। জামাইকে নিজের কার্খ
চাকরি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কি কারণে
বুঝলাম না তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। ব্যাপারটা
খানিকটা রহস্যের মতই রয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। আর
আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে, এদের সব কিছুই রহস্যময়।

ওদের জীবনের কোন কথাই জোর করে জানতে চেষ্টা
করি নি আমি। এক দিন হঠাৎ কেন জানি না, সেই দুর্ঘটতি
হয়ে গেল। সে রবিবারে কলোনীতে আমার সাবেক আত্মীয়-
দের সঙ্গে দেখা করে একটু সকাল সকাল এসে গিয়েছিলাম
ওদের ওখানে। ভৈরব সবো মজা বাড়ী ফিরল আর শান্তি
বেরিয়েছে বাজার করতে। ওদের দু'জনের কাছেই ঘরে
চুকবার আলানী চাবি থাকে।

ভৈরব আমার অন্তে নিজেই চা তৈরি করে নিয়ে এল।
চোরকী থেকে কিছু কাজু বাদাম কিনে এনেছিল ভৈরব;
শান্তি না কি এ খেতে বড় ভালবাসে।

বাদাম সহযোগে চা খেতে খেতে হঠাৎ বলে বসলাম,
শান্তি তা হলে কাজু বাদামের কথা ভুলতে পারে নি?

ভৈরব হেসে উঠল : না।

সুযোগ পেয়ে বসলাম, আচ্ছা, ভাই, একটা কথা আমি
প্রায়ই ভাবি, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠি না।

ভৈরব জিজ্ঞাসু নেড়ে তাকাল।

কথাটা হচ্ছে...মানে দেখতে পাচ্ছি শান্তি তার পূর্ব-
জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ্যের আবাদ একেবারে ভুলতে পারে নি,
অথচ এ সব ভোগ করবার সুযোগও তার ছিল। তোমার
বুকের না কি তাঁরই কার্খ তোমার চাকরি দিতে চেয়েছিলেন,
সেটা নিলে ত আর—

ভৈরব আমার মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস
ছেড়ে বললে, কি করব, দাদা, ও কিছুতেই রাজী হয় না, বলে
তা হলে আমি তোমাকে হারাব, সে আমি কিছুতেই সহ
করতে পারব না। আপিসের বাবু বা বড় ব্যবসায়ীকে বিয়ে
করতে চাইলে ত আমি অনারাদেই করতে পারতাম। সে
ত আমার স্বপ্ন নয়। যে রূপে তুমি আমায় দেখা দিয়েছ—
সেই রূপকেই আমি চিরদিন আমার জীবনের প্রবর্তনা করে
রাখতে চাই। তোমার অন্ত মূর্তিতে কল্পনা করতে গেলেই
আমি মারা যাব—

অবাক হয়ে গেলাম আমি ভৈরবের কথা শুনে। বললাম,
তাকে বললে না কেন, এ যে অভাবের জীবন, এ যে
দারিদ্র্যের জীবন।

মান হেসে ভৈরব বললে, সে সব বলতে কি কিছু বাব
রেখেছি, দাদা—

কি বলে ও?

ও বলে, তাতে দুঃখ কি, এ জীবন ত আমার খেছারত।
ওর ধারণা আমি অন্ত কিছু করলেই ওর স্বপ্ন ভেঙে যাবে,
আমি আর ওকে ভেমনি করে বাঁশী শোনাতে পারব না।

কিন্তু এ জীবনেও ওকে ঠিকমত বাঁশী শোনাতে পার
কি, যা ক্লান্ত হয়ে আস—

আবার মান হাসি দেখা দিলে ভৈরবের মুখে : পারি
কি না জানি না—তবে চেষ্টা করি—

কবে, কখন?

মাসে একবার, পূর্ণিমার রাত্রিতে—রবিবার সন্ধ্যার ছাড়া
পূর্ণিমার রাত্রেও আমি ঘরের বার হই না, সেইদিন আত্ম
ওকে বাঁশী শোনাই, ও আমাকে—

বলতে গিয়ে একটু ধেমো গেল ভৈরব।

ধামলে কেন, বল, বল—

আপনি দাদা, তবু আপনার কাছে আমাদের গোপন
কিছুই নেই, সেইদিন ও আমাকে নিঃশেষে নিজেকে উন্মোক্ত
করে দিয়ে ভালবাসে, আর উনত্রিশ দিন ও আমার শুধু
অভিপ্রিয় বন্ধু, সাথী—

কিছুক্ষণ শুদ্ধ হয়ে শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে
রইলাম। তার পর এক সময় নিশ্চিন্তা ভঙ্গ করে বসলাম,
ভাই ভৈরব একদিন আমি তোমার বাঁশী শুনেই তোমার দিকে
আকৃষ্ট হয়েছিলাম—বহুদিন আমি তোমার সে রকম
বাঁশী শুনি নি—একদিন পূর্ণিমার রাতে শান্তির মত আমাকেও
শ্রোতা করবে তোমার বাঁশীর?

হাসল ভৈরব : আপনার কোন অহুরোধে কি আমি
'না' বলতে পারি—

কি, কি অহুরোধ হচ্ছে দাদার? বলতে বলতে ঘরে
চুকল শান্তি। সহসা আমার কোঁতুকবোঁধ ভেঙ্গে উঠল—
বসলাম, বলো না বলো না ওকে ভৈরব, হঠাৎ আমরা ওকে
একেবারে চমক লাগিয়ে দেব।

এর দিন পাঁচেক পরেই এক পূর্ণিমা পাওয়া গেল। মাঘের
পূর্ণিমা। সন্ধ্যার একটু পরেই আমি ওদের ওখানে গিয়ে—
হাজির হলাম। রাত্রির রান্না শান্তি আগেই সেরে রেখেছিল।
আমি গেলে শুধু আর এক বার চা করলে।

সবাই যেন কেমন গভীর। আমি নিজেও ভেমন বেশী

কথা বলতে পারছিলাম না। বহুপ্রত্যাশিত দিনের আকাজক্ষায় যেন মনে নেশা ঘনিয়ে আসছিল।

বাইরে সেদিন—‘ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।’ আমাদের গ্লান ছিল—এই মধুর, ভরা ছোছনার রেল লাইনের পাশে উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে বাঁশী শুনব, কিন্তু বিদায় নেবার আগে শীতটা সেদিন আবার একটু জেঁকে পড়েছিল তাই গ্লানটা আমাদের পালটে দিতে হ’ল।

পরম কাপড়ের শার্টের উপর একটা জাম্পার এঁটে ভৈরব খাটের এক পাশে একটা বুটিতে ঠেস দিয়ে বসল, আমরা বসলাম তার অপর পাশে ছই কোণে। কথা বলছে না কেউ। ভৈরব চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে বসেছে...বীরে বীরে এবার সে বাঁশীট তুলে নিলে মুখে। আমার পুরানো বুটটা স্পন্দিত হতে চায় যেন—শান্তির দিকে চেয়ে দেখলাম একবার সে হাত দুটি কোলের উপর তুলে নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছে—

যরের সেই গভীর নিস্তরতা ভঙ্গ করে সহসা বাঁশী বেজে উঠল। প্রথমে অনেক টানা টানা কেমন যেন এক কান্নার মত...না, না—কান্না বললে ঠিক হবে না, কেমন যেন মন উদাস করা, তাও নয়—কেমন যেন এক গভীর অহুতাপের সুর। বীরে বীরে সুর জলদে অঙ্গুর হতে থাকলে বোকা গেল পুরবী বাজছে...

সারা দিনটা কেটে গেল—করবার মত কাজ কিছু করা হ’ল না, সূর্য উদিত হয়ে দিবা আলো বিকীরণ করে তাপ দিয়ে আঁধার-সমুদ্রে মিলিয়ে গেল। এমনি করে আমাদের জীবনসূর্য্যও অন্তিমিত হতে চলেছে, কিছুই যে করা হ’ল না জীবনে—জন্মটা যে বুঝাই কেটে গেল।

সুর উদাত হতে হতে এক সময় হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। বুকে রইল শুধু তার স্বাক্ষর।

কিছুক্ষণ শুধু স্তব্ধতা।

মিনিটখানেক পরে ভৈরব আবার বাঁশী মুখে তুলল। এবারের সুরে—আগেকার সেই ভাবটাই যেন গভীর, আরও গভীর করে তুললে, তার সঙ্গে আরও কি যেন যেশানো আছে। বুঝলাম পুরিয়া বাজছে...শেষে বাজল বেহাগ।

মিনিট পনের পরে বেহাগের কান্নাও শেষ হয়ে গেল...। ভৈরব বাঁশী ধামিয়ে একবার শান্তির একবার আমাদের মুখের দিকে চাইল। শান্তি স্রষ্টাখিতের মত জড়িত কণ্ঠে বললে, সেইটা—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—

বৌবাক্যের মোড়ে যে সুরটা বাজিয়েছিলে সেই—

কথা বলা আর আমার শেষ হল না,—ভৈরব তখন চোখ বুজে বাঁশী তুলে নিয়েছে মুখে—কম্পিত বক্ষে ভাবতে লাগলাম, আমার নির্দিষ্ট সুর বাজায় যদি শান্তির লাগবে আঘাত, আর শান্তির ইতিমত বাজায় ত আমি পাব মনঃকণ্ঠ—

বেশীক্ষণ ভাবতে সময় পেলাম না। পরমুহূর্তে দেখি ভৈরব আমার সেই অতিপ্রিয় প্রথম দিনের শোনা আশোষারী সুর করছে। এক মুহূর্তের জুড় শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিরজিত বা অসন্তোষের আভাস তাতে বিন্দুমাত্র নেই। পরমুহূর্তে শান্তির মত চক্ষু মুদ্রিত করে আমিও এক মহা আবির্ভাবের আশ্রয় দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে রইলাম। বাঁশী বাজতে শুরু করেছে—সূর্য থেকে যেন কার আহ্বান আসছে। সংসারের সকল লাগ্না পাওয়া, সকল বাঁধন ছাড়িয়ে নেওয়ার আকুল আহ্বান। উদাস করা সেই পরম প্রিয় যেন ক্রমেই কাছে আসছে—বড় কাছে এসে গেছে সে। হৃদয়ের সকল বাঁধন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে, স্নায়ুগুলি সব বুলে বুলে যাচ্ছে, এ কি হ’ল আমার, আর একটু হলে সকল অহুভুতিও যে হারিয়ে ফেলব আমি। বুটটা ছই হাতে চেপে ধরতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে শক্তিও আর নেই...নিষ্ঠুর বাঁশী বেজেই চলেছে—

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাঁশী থামল। একটু স্থির হয়ে চেয়ে দেখি শান্তি তখনও আধা উপুড় হয়ে ছই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, বাইরে চেপে রাখলেও অন্তরটা আমারও ঠিক অমনি কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছিল—ভৈরবের দৃষ্টি শুধু মদির, ধ্যানস্তিমিত।

সে রাতে বিদায় নেবার আগে ওদের সঙ্গে কথা বলা আর সম্ভব হ’ল না, মুখ থেকে বেরুল শুধু, ‘চলি’—



অসুর জাতি

শ্রীশৈলেন্দ্রবিজয় দাসগুপ্ত

বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর অঞ্চল বহু আদিম জাতির বাসভূমি। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক কম পরিচিত এবং জনসংখ্যায় লঘু অসুর জাতি। অসুর নাম ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নয়, কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অসুরদের সঙ্গে এই অরণ্যবাসীদের কোনরূপ যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

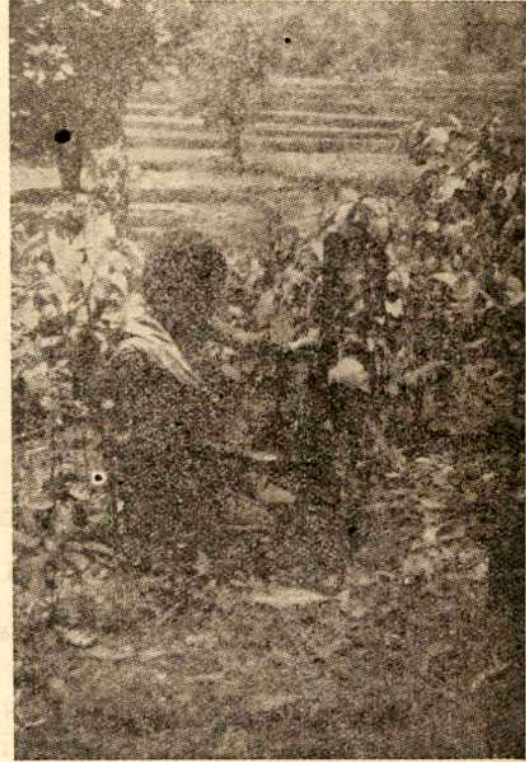
রাঁচি ও পালামো জেলা এবং সুরগুজা টেটের প্রান্তবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে ইহারা বাস করে। পল্লী বলিলে অবশ্য এগুলির গৌরবই করা হয়, কারণ অধিকাংশ পল্লী চার বা পাঁচ ঘর বাসিন্দা লইয়া গঠিত। এক ঘর লোক বলিতে সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যা বুঝায়। এক পল্লী হইতে অপর পল্লীর দূরত্ব ন্যূনাধিক চার-পাঁচ মাইল এবং উচ্চতার ব্যবধানও স্থানে স্থানে এক হাজার হইতে দেড় হাজার ফুট। বাসস্থানের এই দুর্গমতা অসুর জাতিকে বর্তমান জগৎ হইতে এত দূরে রাখিয়াছে যে, উরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি পার্শ্বজাতিতে আমরা যে অর্থে অরণ্যচারী বলিয়া থাকি এই সব জাতি ও অসুরদেরও সেই অর্থে অরণ্যচারী বলা চলে। জঙ্গলের ফলমূল আহরণ, বহু পশুপক্ষী শিকার, জঙ্গল-কাটিয়া শস্তোৎপাদন, গোচারণ ইত্যাদি জীবনধারণের বাবতীয় কার্যে শৈশব হইতে বার্তিক্য পর্যন্ত জঙ্গলের সঙ্গেই ইহাদের ঘনিষ্ঠ সন্মিলন। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে স্থানীয় অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ইহাদের মিল অনেকখানি। তথাকথিত সভ্য মানুষের সমপর্যায়ে স্থান না দিলেও কঠোর সরল জীবন-যাপনে রত এই মানুষগুলিকে জঙ্গলের পরিবেশে বেশ মানায়। “বনোরা বনে সুন্দর” কথাটি মনে হয় ইহাদের বেলায় খুব ভাল খাটে।

অসুররা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) বীর অসুর বা জাত অসুর এবং (২) সোইবা অসুর অথবা বিরবিয়া অসুর। উভয় দলের জীবনযাত্রা-প্রণালী এক প্রকার হইলেও বীর অসুরেরা অনেকের প্রাচীন পদ্ধতিতে লৌহ নিষ্কাশন করে এবং বিরবিয়ারা কেহ কেহ লৌহ নিষ্কাশন করিলেও জঙ্গল কাটিয়া পাহাড়ের গায়ে বেঁওড় চাষ করাই ইহাদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। ভারতের পূর্বদীপান্তে এই প্রকারের চাষকে জুম চাষ বলে। এই দুই অসুর শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদির আদানপ্রদান নাই।

যে ভাষায় ইহারা কথা বলে পণ্ডিতেরা তাহার নাম

দিয়াছেন অসুরী ভাষা। মুণ্ডা ও সাঁওতালী ভাষার সহিত ইহার মিল অনেকটা। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অসুর আবার বুদ্ধবিন্দি ছোটনাগপুরী হিন্দীতে কথা বলিতে পারে।

বীর অসুর নিজেকে বিরবিয়া অপেক্ষা বড় মনে করে। কারণ তাহার পূর্বপুরুষ “বীর অসুর” ঘোড়ার লাগাম তৈয়ার করিবার জন্য ভগবান ছদ্ম কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং স্বয়ং ভগবানই বীরকে সেই প্রয়োজনে লৌহ নিষ্কাশন-প্রথা

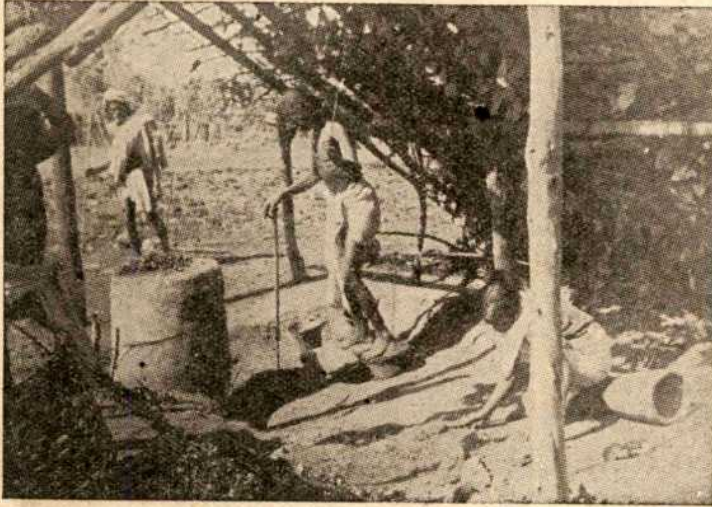


একটি অসুর রমণী মূল তুলিতেছে

শিখাইয়া দেন। বীর মুণ্ডাঘাতে বড় বড় শালগাছ ভূপাতিত করিয়া তাহা পোড়াইয়া কাঠ-কয়লা তৈয়ার করিত এবং তাহার সাহায্যে ছোট ছোট চুল্লীতে লৌহময় প্রস্তর গলাইয়া লৌহ নিষ্কাশন করিত। সেই লৌহ শিটাইয়া লাগাম তৈয়ার করিত এবং গলা লোহার পিণ্ডই তাহার খাদ্য ছিল। সেই আদি পিতা বীর হইতেই বংশপরম্পরাক্রমে লৌহ নিষ্কাশন-প্রণালী বর্তমান অসুরেরা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিরবিয়ার উৎপত্তির কাহিনী আর এক রকম। ভগবান মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করেন এবং তথায় অড়হরের চাষ করেন। অল্পদিন পরেই সুন্দর শ্রামলিমায় শস্তক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল। মহাদেব পার্বতীকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে বেড়াইয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। এক দিন দেখিলেন বনের হরিণ এক স্থানে অনেক চারা খাইয়া পলাইয়াছে। এই অপচয় নিবারণের জন্য মহাদেব চিন্তাকুল। তখন পার্বতীর উপদেশে খেজুর পাতার এক মন্ত্যামৃষ্টি তৈয়ার করিয়া এক বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর তাহাতে শব্দস্ফার করিলেন। বাতাসে যখন এই পুত্তলিকা নড়ে অমনি সে “হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ” করিয়া উঠে ও বনা জীবজন্তু শস্তক্ষেত্র

চুল্লীতে গলাইয়া লৌহ নিক্ষেপন করিত। সেই লোহা হইতে লাঙ্গলের সরু সরু ফাল, টাঙ্গী, তীরের ফলক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ার করিত এবং ঐ সবের বিনিময়ে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাড় করিত। অপর দিকে দুই-তিন পল্লীর বিরবিয়ারা মিলিয়া পাহাড়ের ঢালু গায়ে এক থণ্ড জঙ্গল কাটিয়া, পোড়াইয়া এক প্রকার খস্তির সাহায্যে অড়হর ও মাক্কাচর চাষ করিত। শস্ত ফলিত প্রচুর এবং তাহার বিনিময়ে তাহারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিত। দুই-তিন বৎসর ঐ স্থানে চাষ করিয়া বনান্তরে আর এক থণ্ড জমি এই ভাবে চাষোপযোগী করিয়া লইত। কিন্তু সেই সময় জঙ্গল কাটা নিষিদ্ধ ছিল না। বর্তমানে সরকারী জঙ্গলে বিনা অনুমতিতে একটি



লৌহ-নিষ্কাশন-রত একটি অস্থর পরিবার

হইতে পলাইয়া যায়। এই পুত্তলিকাই নাকি আদি মানুষ এবং বিরবিয়ার আদি পিতা।

প্রতি যুগে মানুষ “কোথা হইতে আসিয়াছে”, “কেন আসিয়াছে” এবং “কোথায় যাইবে” এই আদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরিখে উত্তর সৃষ্টিও করিয়াছে। সেই উত্তরই ত ঐ যুগের মানুষের দর্শন। এই অরণ্যবাসী মানুষগুলিও চিন্তা করে, উত্তর খোঁজে এবং উত্তর পায়ও। তথাপি জীবনধারণের কঠোর তাগিদে প্রতিটি মুহূর্তেই তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়।

এক সময়ে তাহাদের এই আরণ্য জীবনে বাধা পাওয়ার মত বিশেষ কিছু ছিল না। মনের স্থখে গাছ কাটিয়া কাঠের কালি করিত এবং লৌহময় প্রস্তরের সহিত মিশাইয়া

গাছ ও কাটিবার উপায় নাই। তাই এই আরণ্য জাতির সম্মুখে এক মহা-সঙ্কট সমুপস্থিত। “বন মহোৎসবে”র কলরব সেই আরণ্য প্রদেশে পৌঁছিয়াছে কিনা কে জানে। তবে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ‘বন বাড়িবে’ এই সংবাদ তাহাদের যতখানি সুখশ্রদ, ‘গাছ কাটিতে পারিবে না’—এ আদেশ তেমনই নৈরাশ্রজনক। বহুদিন পূর্বেই হয়ত ইহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইত যদি কতিপয় জমিদার কতক নিজের স্বার্থে, কতকটা উদারতা বশত: জঙ্গল কাটার উপর বিধিনিষেধ শিথিল না করিতেন।

আদমজন্মাবীর গণনায় দেখা যায়—অস্থর ক্ষয়িষ্ণু জাতি। ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের গণনায় রাঁচি ও

পালামৌ জেলায় ইহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭১৬, ২২৪৫ এবং ২০২৪। নূতন পরিবেশের সহিত যে জাতি নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না, ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্তিই তাহার অমোঘ নিয়তি। অস্থর জাতিও এই পরীক্ষার সম্মুখীন। এখন দেখা বাক, ইহারা বৎসরের বারো মাস কি করে।

পরিবর্তিত অবস্থায় অস্থরগণ লাঙ্গলদ্বারা চাষ আয়ত্ত করিয়াছে। উন্মুক্ত সমতল ক্ষেত্র সামান্য হইলেও লাঙ্গল দিয়া চাষ-আবাদ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু পার্বত্য প্রদেশে এই প্রকার ক্ষেত্র পাওয়াই দুষ্কর। বেওড় বা জুয় চাষ, লাঙ্গল-চাষ, লৌহ-নিষ্কাশন ইত্যাদি দ্বারা ইহারা বৎসরের মাত্র কয়েক মাসের আহাৰ্য্য সংস্থান করিতে পারে। বাকী কয়েক মাস কাটে প্রকৃতিঃ কৃপার উপর নির্ভর করিয়া অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে।

ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পূর্বে পূর্বে মাসে সংগৃহীত অড়হর, গুন্দলী, মাকুয়া ইত্যাদি খাদ্যশস্য কিঞ্চিৎ সঞ্চিত থাকে। বেওড় চাষের নিমিত্ত এই সময় জঙ্গল কাটা, পোড়ান, বীজ বপনাদি পরিশ্রমের কাজ করিতে হয়। গৃহে আহাৰ্য্য থাকিলেও পর্যাপ্ত নয় বলিয়া আগামী দিনের কথা ইহাদের সব সময় চিন্তা করিতে হয়। তাই এই সময় তীর, ধলুক, কুঠাব, লাঠি লইয়া তাহারা দলবদ্ধ ভাবে জঙ্গলে শিকারে যায় এবং মহুয়া ফুল আহরণ করে। শিকারে



শৈশব-শিকারের কল

ভাল কিছু লাভ হইলে তদ্বারাই দুই-এক দিন চালাইয়া দেয়। জঙ্গর মধ্যে খায় না বলিতে কিছু নাই। মৃত বাঘ বা ভল্লুক পাইলেও পরম আগ্রহের সহিতই ইহারা খাইয়া থাকে। সাধারণতঃ হরিণ, শূকর, ছাগল, খরগোস, সজারু ইত্যাদিই বেশী শিকার হয়। শিকারের ঋতুতে কেবল মাংস খাইয়া কাটাইয়া দেয়। এই সময়ে ইহারা মাসে পাঁচ-ছয় বাব দলবদ্ধ ভাবে শিকারে যায়। উরাও প্রভৃতি অন্যান্য জাতিদের মত এই শিকারে যাওয়া তাহাদের একটি পরব না, পরন্তু জীবনধারণের অবলম্বনবিশেষ। মহুয়া ফুল ইহাদের আর এক খাদ্য। বৎসরের এই সময়ে ইহারা মহুয়া ফুল সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং মাঝে মাঝে সিদ্ধ করিয়া খায়। এতদঞ্চলে প্রচুর মহুয়া হয় এবং সেই মহুয়া ফুল প্রতি পরিবারের প্রায় এক মাসের খোরাক যোগায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসেও দুই-একবার ইহারা সমষ্টিগত ভাবে শিকারে বাহির হয়। কিন্তু আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসই ইহাদের সর্বাঙ্গপেক্ষা অভাবের সময়। তখন সঞ্চিত যতরকম খাদ্য ফুরাইয়া আসে, অথচ ক্ষেতের নানা রকম কাজ এই সময় করিতে হয়। বনের মধ্যে জন্তু ধরিবার কল এই সময় বসানো হয়। বড় বড় গাছের টুকরা ভারী পাথর চাপা

দিয়া এমন কৌশলে রাখে যে, বনা শূকর, নেকড়ে বাঘ, খরগোস ইত্যাদি জন্তু বাত্রির অন্ধকারে আহাৰ্য্য অন্বেষণে এই স্থানে পৌঁছিলেই চাপা পড়িয়া আটকাইয়া যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা বিরাট অভাবের কতটুকুই বা পূরণ হয়। তদ্বির করিয়া হাটে মধ্যাহ্নের নিকট যদি কর্জ ও পায় ত সে ভাগ্যবান। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যখন বেওড় ফসল ঘরে আসিবে তখন এক মণ কর্জ-করা ধানের বিনিময়ে দুই মণ অড়হর নিয়া পুনঃ পরিশোধ করিবে। তৈতুলবীচি সিদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দাঁতের নীচে কায়দা করিতে পারে অথচ বিষ নয়, এমন সব জিনিসই বোধ হয় আহাৰ্য্যরূপে ব্যবহার করিতে ইহারা চেষ্টা করে। তা ছাড়া অর্দ্ধাশন ও অনাশন ত আছেই। ভাদ্রের শেষে ভারী ফসল কিছু কিছু হয়, তুট্টা উঠে স্বতরাং আবার স্বদিনের মুখ দেখে—পেট ভরিয়া খাওয়া কাহাকে বলে-জানিতে পারে।

আশ্বিন, কা্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে অশ্বর-পরিবারে লক্ষী অচঞ্চলা। বেওড় হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম বড় ফসল এই সময় ঘরে আসে, আনন্দের সীমা থাকে না। আশ্বিন-কা্তিক মাসে ক্ষেতের ধারে ধারে পাতা মোরগ ধরার জালে বনমোরগ ধরে—নিঝাঁরী, নদী-নালায় মাছ ধরিয়া দিন এক প্রকার সুখেই কাটে। এই সময়ই সামাজিক কাজকর্মের, বিবাহাদি ব্যাপারের, লোক-লৌকিকতার সময়, যুবক-



একটি অশ্বর-পল্লীর পূর্ণ জনসংখ্যা—দুই ঘর

যুবতীর অপরিসীম আনন্দের সময়। অগ্রহায়ণ হইতেই শুরু হয় ‘আগেবা’য় নৃত্যগীত, নাকাড়া ও মাদলের শব্দে বন-জঙ্গল মুগরিত হইয়া উঠে।

পৌষ মাস হইতেই আবার আরম্ভ হয় নানা প্রকারে আহাৰ্য্য সংরক্ষণের প্রয়াস। মেয়েরা খন্টি হাতে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া মাটি খুঁড়িয়া নানাবিধ মূল আহরণ করে। এই সময় মাটি শক্ত হইয়া যায় না, খাদ্যোপযোগী মূলও

যথাযথ রূপ বাড়িয়াছে। এই সব মূল সিদ্ধ বাইয়াই এক-প্রকার চলিয়া যায়।

এ সকল ছাড়া প্রতি অশ্বর-গৃহেই পালিত শূকর, ছাগল, গরু, মুরগী ইত্যাদি দেখা যায়। চরম অভাবের সময় ইহারাও কম সাহায্যে আসে না। কেহ কেহ আবার বাঁশের চুবড়ী, শাল, সেগুনপাতার ঝুড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করে। ঘরের কাজেও লাগে, হাটে বিক্রয় করিতে পারিলে মদ ক্রয় করিবার পয়সাও যোগাড় হইয়া যায়।

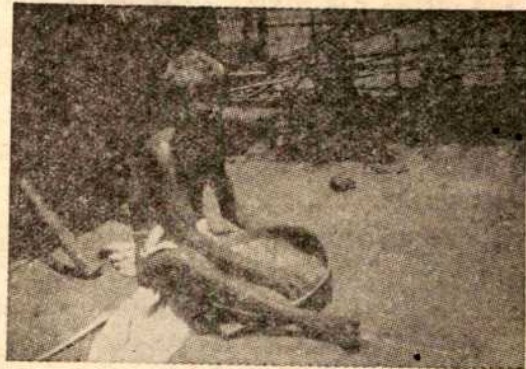


বিবাহযোগ্য অশ্বর যুবক
(গলায় ময়ূরপুচ্ছের হার)

হাটে বাঁশের ব্যাপারটা সহজসাধ্য কাজ নয়। কারণ অশ্বরপল্লী হইতে ইহার দূরত্ব ছয় মাইল হইতে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় প্রতি হাটে অবস্থিত সরকারী ভাটিখানা পরম আকর্ষণের স্থান। তাই দেখা যায় কেহ কেহ প্রত্যাষে হাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া গভীর নিশীথে অথবা পরের দিন বাড়ী ফিরিয়াছে। অবশ্য এই সময়ের অধিকাংশই কাটিয়াছে পথ হাঁটায়।

মদ চোলাই করা নিষিদ্ধ কাজ। কিন্তু মল্লয়া ফুল ফুটিবার সময় ঝোপঝাড় লুকাইয়া দুই-এক বোতল মদ চোলাই করিয়া রাখে না এইরূপ পরিবার কম। সারা বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দুই বেলা যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পারে না মদের নামে তাহারা সব ভুলিয়া যায়। মদ কেবল তাহাদের জীবনের কঠোরতার বিশ্কারক নয়, ইহা তাহাদের ধর্মজীবনের অপরিহার্য উপকরণ।

অশ্বররা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরে জীব মৃত্যুপূর্ব আকৃতি লইয়াই পৃথিবীতে থাকে। দেহটিই কেবল হাওয়া-বাতাসের মত স্পর্শ করা যায় না। মৃত পূর্বপুরুষেরাই তাহাদের পরম আত্মীয় এবং তাহাদের নিমিত্ত প্রতি অশ্বরগৃহে একটি প্রকোষ্ঠ পৃথক্ করা থাকে। তাহাকে “ওরা ভিতর” বা ভিতর-ঘর বলে। এই ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি রাখা যায়, কিন্তু রাজ্যে কেহ শোয় না। পরবে-পার্কণে গৃহকর্তা এই প্রকোষ্ঠে মুরগীর বাচ্চা বলি দিয়া মদ পরিবেশন করিয়া মৃত পূর্বপুরুষগণের তৃপ্তিবিধান করে। তাহাদের বিশ্বাস জীবনের প্রতি মুহূর্তে মৃত পূর্বপুরুষেরা অলক্ষ্যে থাকিয়া আপন সমুত্তিগণের কল্যাণসাধন করে। ইহা ছাড়া অশ্বররা বিশ্বাস করে প্রতি গিরিশৃঙ্গ, গভীর জঙ্গল, নদীনালা, বড় গাছ, পর্বতগুহা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রত্যেক জিনিসেরই একটি করিয়া অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে। ইহাদের কেহ কেহ মাহুঘের শুভাহুধায়ী, কেহ কেহ শত্রু-ভাবাপন্ন, আবার কেহ কেহ বা নিরপেক্ষ। সেই জন্য এই সমস্ত দেবতার তৃপ্তার্থে সারনায় অথবা “ভিতর-ঘরে” প্রতি পরব উপলক্ষে ছোট মুরগীর বাচ্চা বলি দেওয়া হয় ও মদ নিবেদন করা হয়। সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অপদেবতা দুইটি—(১) বাঘুত ও (২) চুরাইল। প্রথমটি ব্যাঘ্রদ্বারা নিহত ব্যক্তির প্রেতাত্মা এবং দ্বিতীয়টি মৃত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা। ইহাদের পরিতুষ্টির জন্য বইগা নামধেয় বৈষ্ণ



হৃতপ্রেতের তৃপ্তিবিধানেরন্ত বইগা বা পুরোহিত

বা পুরোহিত আছে—তুর্কতাক আছে। বস্তুতঃ মদ না হইলে এই সমস্ত কৃত্য হয় না। স্বয়ং ভগবানই নাকি তাহাদের আদিপুরুষকে মদ তৈয়ারীর প্রণালী শিখাইয়া ছিলেন। বেওঁর চাষই ত ছিল তখন প্রধান উপজীবিকা। সেই বেওঁড়ে বড় বড় শশা উৎপন্ন হইত। এই শশার এক মুখ কাটিয়া রাগু (Ferment) সাহায্যে মদ তৈয়ার হইত।

চাউল, ভূট্টা, মছয়া ইত্যাদি হইতে মদ তৈয়ারি করা পরে শিখিয়াছে।

স্বভাৱতঃ কাৰ্য্যের উপর পরলোকবাসীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ইহাদের জীবনে এত প্রগাঢ় যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাদি স্বাভাবিক বিষয় পর্যালোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাদির সংঘটন সমস্তার সমাধান সহজেই হইয়া যায় মহাদেব ও তদীয় সহধর্মিণী পার্শ্বতীর কাহিনী অবতারণায়।

এত সব সত্ত্বেও আপাত দৃষ্টিতে ইহাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ত্রুটি কমই লক্ষিত হয় নাই। পরিবারের কর্তার কথাই সর্বোপরি। তাহার কথাই অন্যদের মানিয়া চলিতে হয়। আবার কয়েকটি পল্লীর বৃদ্ধ পুরুষদের লইয়া পঞ্চায়েৎ আছে। পঞ্চায়েতে বগড়া, বিবাদ, অন্যায় কাৰ্য্যাদির বিচার হয়, শাস্তিবিধান হয়—সমাজে থাকিতে হইলে এই বিধান শিরোধার্য্য করিতে হইবে। আবার সামাজিক রীতি-

নীতির বিশেষ কোন ব্যত্যয় হইলে “কুটুমায়েৎ” ডাকা হয়। অম্মর জাতির সমুদয় পরিবার হইতে বয়স্ক পুরুষ-প্রতিনিধির এই কুটুমায়েতে উপস্থিত থাকা নিয়ম। এই সমাবেশে বাহ্য ঠিক হইবে তাহাই সমগ্র জাতির নির্দেশ বলিয়া গণ্য হইবে। কুটুমায়েৎ আহ্বানকারী “লোটাাদার” আছে। সে এক লোটা জল লইয়া পল্লীতে পল্লীতে অম্মর মাতব্বরদের আহ্বান করিয়া আসিবে। সমাবেশে বয়স, বাক্‌চাতুরী এবং আর্থিক অবস্থা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। এই তিন বিষয়ে যে ব্যক্তি উচ্চ সে-ই এই সব সমাবেশে নেতৃত্ব করে। সাঁওতালদের মত স্থপরিচালিত সমাজ-শাসকগোষ্ঠী ইহাদের মধ্যে না থাকিলেও শত শত বৎসরের সংস্কার ইহাদের মধ্যে জাতির প্রতি অম্মরায়ণ ও বশুতা-স্বীকারের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং জাতীয় সংহতিরক্ষায় ইহাদিগকে অধিক বেগ পাইতে হয় না।

রাজগৃহ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভগবন্ত, আজ এসেছি তোমার স্মৃতি-বিপ্লুত দেশে,
আবার কি তুমি নুতন করিয়া দাঁড়াবে সমুখে এসে ?
স্নিগ্ধ শাস্ত গভীর কর্তে তোমার অমর বাণী
মনে হ'ল যেন ধ্বনিয়া উঠিবে, দূরবে সকল গ্রামি।

গিরিভঞ্জেতে গিয়েছি আমরা পঞ্চ পাহাড় বেঁধে,
সুদূর অতীত নিকটে এখনো যেথা বরে ধোরাফেরা।
ভীমার্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুরে
আসিল গোপনে কি ছদ্মবেশে, কোন্‌ গিরিপথ ঘুরে।

বিশ্বাস্যের রাজধানী হেথা—মগধের অধিপতি,
বুদ্ধের রাজশিষ্য প্রধান, পরম বর্ষে মতি,
জন্মিল তাঁহার অপার করুণা নৃপতি ভাগ্যবান।
গৃহকূটের নির্জন গুহা—সে যে পূণ্য স্থান।

এইখানে সেই অমিতাভ আসি বিতরিল উপদেশ—
অয়ুধ-ভারতী—শিষ্যবর্গে করিয়া যে উদ্দেশ।
তাদের কি আমি ? মনে হ'ল যেন হেথা বেগুনম্নে এসে
জ্বলিতোছি বাণী বুদ্ধের পানে চাহিয়া নির্নিমেখে।

অজাতশত্রু রচিল প্রাকার—আজো যেন দুর্জয়,
কত যে চৈতন্য, কত গুপ, যুগ-যুগান্তে নাহি কম।
যেথা বরে যায় ভিমিত তপোদান দুর্গপ্রাকার-মূলে,
আবাস নিয়েছি সেই মম্বর সরস্বতীর কূলে।

জ্ঞানের তীর্থ—হোথা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
সারা পৃথিবীর বিভাব্যার চিত্ত করিল জয়।
শ্রেষ্ঠ আসন—শীলভজের কোন্‌ শিলাসমধানি,
প্রাচীরে প্রাচীরে প্রহত আজো কি দীপকরের বাণী ?

প্রাচীন অতীত আজো জীবন্ত এই রাজগৃহ মাঝে,
কত সহস্র বর্ষ হেথায় মূর্ত্ত হইয়া আছে।
লক্ষ রথের চক্রচিহ্ন-অঙ্কিত রাজপথ,
মনের নমনে গরিমা তাহার ভাসিছে স্বপ্নবৎ।

মহাবীর তাঁর বর্ষ প্রচার করিল হেথায় এসে,
শত সাধকের সাধনার স্মৃতি বাতাসে বেড়ায় ভেসে।
বুড়, তোমার শরণ লইল কত রাজ-মহারাজ,
খুঁজিতেছি সেই চরণের রেণু এই ধূলিকণা-মাঝে।

নন্দদা অঞ্চলে শারদীয় উৎসব

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

শরৎ এসেছে তার সোনারী আকাশ আর মিষ্টি বাতাস নিয়ে। চার দিক থেকে যেন আগমন-গীতি ভেসে আসছে। মনটা হঠাৎ আনন্দে ভরে গেল, কিন্তু তার পরই এল অবসাদ, সুদূর ঋতুস্রাব ঋতুস্রাবনে আনন্দময়ীর আগমন হবে কি? মনে পড়ল সুফলা সুফলা শস্যশ্রামলা বাংলারামায়ের কথা। যদিও আজ রাজনৈতিক কারণে বাংলা দ্বিখণ্ডিত, বাংলার বুকের উপর দিয়ে বহু অত্যাচার, বহু রক্তপাত হয়ে গেছে, তবু সর্বহারা রক্ত বাঙালীর মুখেও কণি হাসি ফুটে উঠবে।

কিন্তু এদেশে সে উৎসব নেই। শরতের প্রারম্ভে গণেশ-চতুর্থী এল, মহারাত্রীর আর হিন্দুস্থানীদের ঘরে ঘরে গণেশ-উৎসব জাঁকজমক করে শেষ হ'ল। তারপর দুর্গাপূজা। বিজয়ন্তী চলে গেল, সপ্তমী চলে গেল, অষ্টমীর দিন মনে হ'ল একবার খুঁজে দেখতে হবে এ অঞ্চলে শারদোৎসবের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা। জামলাম এ সময়ে শহরের বাইরে সুদূরে একপ্রান্তে ভবানীর মন্দিরে উৎসব চলে। একথানা ট্যাক্সি ভাড়া করে সেদিকে চললাম, শহর ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটল মন্দির অভিমুখে। শহরের দৃষ্ট ভেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অপরিচ্ছন্ন অলিগলির রাস্তাও অনেক আছে, ওগুলো অতিক্রম করে গ্রাম্য রাস্তা ঘরে গাড়ী চলল। রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর টুকরো টুকরো কালো পাথর বসিয়ে তৈরি, দেয়ালের গায়ে গিরিমাটি দিয়ে বিবিধ চিত্র একে রেখেছে, ঘরের চালে দু'একটা কুমড়া গাছ, খিঙগাছ লতিয়ে উঠেছে, দু'চারটি শিশু এধার ওধার খেলছে, পরনে হস্ত রান্ধিজ বাঘরা, নরত ইজের কুর্ভা। মন্দির-প্রাঙ্গণে গাড়ী এসে থামল। অর্ধ জলকীর্ণ স্থানের মধ্যে ছোট-খাটো মন্দির।

মন্দিরের সামনেই দীপমালা। পাথরের একটি অমুচ্চ স্তম্ভ, তার চারদিকে দীপ রাখবার জন্ত ছকের মত ইট গেঁথে রেখেছে। পুজোর ও দেওয়ালীতে যখন এর ওপর প্রদীপ জ্বালান হয় তখন বড় সুন্দর দেখায়—ঠিক যেন একটি আলোক-স্তম্ভ। চারদিকের অসংখ্য মাটির প্রদীপের আলোকশিখা হাওয়ায় হলে অগ্নি শোভার সৃষ্টি করে।

ভবানী মন্দিরটি অতি পুরানো, ছোট ও বিশেষত্বহীন। মন্দিরমধ্যে কালো পাথরের ভবানীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবাদ, কালাপাহাড়ের আমলের এই মূর্তি—কালাপাহাড় নাকি দেবীর নাক কেটে দেয়। তখন থেকে দেবী “নাকটি ভবানী” নামে আখ্যাত হয়েছেন। দেবীর এই নামের কারণ সত্য কিনা পূজারীকে জিজ্ঞাসা করার বললে, ওগুলো বাজে কথা। বছরের

পর বছর দর্শকেরা দেবীর কপালে ও নাকে সিন্দূর ভরুদ ঘষে আসছে, ঘষতে ঘষতেই দেবীর নাক ক্ষয় হয়ে গেছে ও দেবী “নাকটি ভবানী”তে পরিবর্তিত হয়েছেন। দেবী নাকি বড় জাগ্রতা।

বিজয়া দশমী। বাংলাদেশে আজ মায়ের বিসর্জন। সারা বছরের প্রতীক্ষা, আশা আশ্বাসের অবসান করে আজ মা পতিগৃহে যাত্রা করবেন। বিকেলের দিকে অবসর নেই, প্রত্যেক পুজামণ্ডপে মায়ের আরতি করে পাদবন্দনা হচ্ছে। তারপর বাঙালীদের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে জগজ্জননীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল নদীতীরে। সারি সারি বহু সুন্দর প্রতিমা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বিসর্জনের জন্ত। চারদিকে ভিড়, হৈ চৈ—শিশুরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে এসেছে বিসর্জন দেখতে। ছেলে বুড়ো যুবক হৈ চৈ-এর মধ্যে দেবীকে বিসর্জন দিয়ে স্নান মুখে ঘরে ফেরে। সমবয়সী সমবয়সীতে হয় কোলাহুলি, বড়দের করে প্রণাম। মায়েরা সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে আপ্যায়িত করেন। এই দিনে এই ক্ষণে সবাই ভুলে যায় মনোমালিন্য হিংসা-বিদ্বেষ।

কিন্তু এ অঞ্চলে আগমনগীতিও নেই, বিদায়গীতিও নেই, তাই মাতৃবিদায়ের মুহূর্ত মনকে বেদনার করুণ করে তোলে না, তার পরিবর্তে এদেশবাসীরা আনন্দে দেশেরা উৎসবের জন্ত তৈরি হতে থাকে। সুদূর ঋতুস্রাব যে ১৮১০ খ্রিঃ প্রবাসী বাঙালী আছেন, তাঁদের মধ্যে ভৎপরতা দেখা যায়। শিশুরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নৃতন জামাকাপড় পরে। সবাই বেরিয়ে পড়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রবাসে মিলনকে ধুমধাম করে তোলবার জন্ত।

এ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসী টিমচ ও বরুয়া। এদের দেশের দিনের বিশেষ উৎসব “ভুজুরিয়া”। এদের প্রধান দেবী হচ্ছেন শীতলা দেবী। শহরের বাইরে বটের ছায়ায় শীতলা দেবীর মন্দির। যাদের পরিবারে শীতলা মর্জি-এর আবির্ভাব হয়েছে, যাদের মনোমত বিয়ে হচ্ছে না বা যারা নানাবিধ সাংসারিক অসুবিধায় ভুগছে, তারা এই দেবীর কাছে মানত করে। “নওরাত্নের” সময় সবজুর্গা যখন ঘটে অধিষ্ঠিতা হন, তখন এরা নিজেদের গৃহাঙ্গনে জমি নিকিয়ে তাতে একটা নৃতন মাটির কলসী রাখে, তাতে সারমাটি, গোবর ইত্যাদি পূর্ণ করে গম বুনে রাখে। বুনাবার আগে গমগুলি কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, সারমাটিতে পড়ে শীতলাই সেই ভেজা গমের অন্ধুরোগম হয় ও সেগুলি নয় দিনের ভিতর সুন্দর সবুজ ছোট কিশলয়ে পরিণত হয়। এই কচি কিশলয়-

গুলিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবার জন্য একটি কাপড় পর্দার মত টাঙিয়ে রাখে। বীরে বীরে আত্মীয়কূটুম্ব অভিধি অভ্যাগত আসতে শুরু করে, উৎসব জমে ওঠে। পর্দা সরিয়ে লোকেদের এক পাশে বসতে দেওয়া হয়, তাদের গমের সবুজ চারা-গুলো দেখান হয়, এগুলোকে “ভুজরিয়া” বলে। ভোগ দেওয়া, খাওয়া-দাওয়া হয়, গান বাজনা চলে, যে যে বাড়ীতে মানত করা হয়েছে সেই সেই বাড়ীর এক এক জন বয়স্ক পুরুষ বা মেয়ে নয় দিন উপোস করে থাকে—সুখু চা, হুখ, ফল নাখান্না খায়। যার শরীরে দেবীর আবির্ভাব হয়, সে তখন নানারকম প্রহারের উত্তর দিতে থাকে। নয় দিন পর দশেরার দিন মহা ধুম-ধাম করে তারা চলে শীতলা মার্বি-এর পূজা দিতে। মাদলের মত বাজনা বাজতে থাকে। মেয়েপুরুষ সবাই স্নান করে আসে। মেয়েরা নুতন রঙীন শাড়ী পরে গমনাগাটিতে সজে গুজে বের হয়। চার জন বউ বড় কলসীর “ভুজরিয়া” ছোট চারটি মাটির কলসীতে ভাগ করে মাথায় তুলে নেয়। অল্প মেয়েদের কারও হাতে ধুতি থাকে তাতে খুব ধূপ ছাড়তে থাকে। কারও হাতে একটা থালাতে থাকে হলুদ, সিন্দূর ও প্রদীপ।

মাদল বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ সবাই শোভাযাত্রার বেরিয়ে পড়ে। বীর উপর দেবীর ভর হয়েছে সে বাজনার তালে তালে প্রবলবেগে নাচতে থাকে। বউরা “ভুজরিয়া” মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে, আর যারা মানত করেছিল সেই মেয়েরা রাজপথের উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে করতে শীতলা দেবীর মন্দিরে পৌঁছে। সেখানে দেবীর চরণে “ভুজরিয়া” রেখে পূজা দেয়। দেবাবিষ্ট লোকটিকে স্নান করায়, তখন তার শরীর থেকে দেবীর তিরোধান হয়ে যায়—তারপর তারা ঘরে ফিরে আসে।

বিকেলের দিকে রাবণ জ্বালানো উৎসব শুরু হয়। এটা হ’ল জনসাধারণের আনন্দ-উৎসব। আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে একটি খোলা ময়দান আছে। সামনের রাজপথটা বেকে তারি পানে চলে গেছে, রাস্তার দু’পাশে সারি সারি বড় বটগাছ ডালপালা মেলে রাস্তাটিকে স্তম্ভের স্তম্ভল ছায়াকীর্ণ করে রেখেছে, সেই রাস্তা ধরে চললে খোলা ময়দানে পৌঁছান যায়। সেখানেই মেলা বসবে ও সম্ভার ‘রাবণ জ্বালানো’ হবে। বিকেলের দিকে টাকার ঘোড়ার, বইল গাড়ীর বইলের গলার ঘুড়ুর টুং টুং আওয়াজ রাস্তা সুবিস্তৃত করে তুলল। দলে দলে ছেলে, বুড়ো, যুবক, নারী চলেছে রাবণ জ্বালানো উৎসব দেখতে। এদেশে সব আনন্দ-উৎসবেই পুরুষদের মত মেয়েদেরও অব্যাহতি। কত দেশের, কত বহুদূর মেয়ে, তাদের পোশাকই বা কত রকমের। কেউ বা ধাবরা ওড়না পরেছে, কেউ বা কাছা দিয়ে আঠারো হাত শাড়ী পরেছে, কারও বা পরণে শালোয়ার পাঞ্জাবী। কতবে অবিকাংশই পরেছে রংবেরঙের শাড়ী হিন্দুস্থানী প্রধায়।

নাকে নাকছাবি বা নখ, কানে বড় বড় সোনা রূপার ফুল, পায়ে মোটা মোটা পাইজোর, শিঁথিতে লম্বা করে টানা ডগডগে সিন্দূর, চোখে কাজল, গলভরা পান, মাথায় রঙীন ওড়না, মনে করিয়ে দেয় এরা অবাঙালী।

যামবাহনও বিচিত্র রকমের। বইল গাড়ীগুলি বড় সুদৃশ্য। সমস্তে রক্ষিত হুটপুট বইলগুলি টাকার ঘোড়ার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ছোট একখানা কাঠের তক্তা চার চাকার উপর মজবুত করে বসান আছে, দু’পাশে লম্বা সরু সরু কাঠের ফালি। রংবেরঙের জোরাফাটা কাপড়, বা ফুলতোলা রঙীন কাপড় দিয়ে ছাঁকিনারা ও উপরটা ঢেকে দিয়েছে, দূর থেকে মনে হয় একখানা রঙীন নৌকা। গাড়ীর মধ্যে সতরঞ্চি বিছিয়ে, নয়ত খড়ের বিচালী ছড়িয়ে গায়ের বোঝিরা বসে উৎসব দেখতে এসেছে। আর কপাল ঢাকা ঘোমটার নীচে মাঝে মাঝে এক একখানা কোমল যুগ্ম কখনও কখনও ভেসে ওঠে। সেই যুগ্মত্রী দেখলে অবাক হতে হয়। গরীব চাষীদের ধরেও কেমন স্তম্ভের মেয়ে।

কোন কোন বইল গাড়ী দেখতে ভারী মজা লাগে। দু’চাকার উপর সুদৃশ্য একখানা রেলিং দেওয়া কাঠের তক্তা বসানো, তাতে ছোটো ঘোড়া জুড়ে আরোহী বসে গাড়ী চালাচ্ছে, দেখে মনে হয় যেন অতীত যুগে ফিরে গেছি।

উদ্বুক্ত প্রান্তরে মেলা বসে গেছে। মেলাতে স্তম্ভের স্তম্ভের কাগজের ফুল পানী, কাঠের তলোয়ার, বাঁশী ও রকমারি মাটির খেলনা ইত্যাদি শিশুদের আনন্দবর্জিত করছিল। মেলাশেষে শিশুরা তাদের কচি কচি হাতে ওগুলো আঁকড়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরছিল।

ময়দানের একপাশে একটা বরণার ফীণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে, তার পাশে একটা ছোট মন্দির, মন্দিরটি হনুমানজীর। ভিতরে হেত পাথরের তৈরি হনুমান। সেই মন্দিরের একটু দূরে এক বিরাট মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটি ৩০।৪০ ফুট উঁচু, আর তার পরিধিও প্রায় ১০।১৫ ফুট। মূর্তিটির কাঠামো বাশের তৈরি, তার উপর লাল নীল সবুজ কাগজ জড়িয়ে সুদৃশ্য করা হয়েছে। এই বিরাট মূর্তিটি হ’ল হরচারণ রাবণের। দশেরার দিন রামচন্দ্রজী রাবণ বধ করেছিলেন, তারই স্মৃতির স্মরণার্থে বছরের পর বছর এই বিরাট রাবণ তৈরি করে দশেরার দিনে জ্বালান হয়। যত দর্শক মেলাতে আসে সবাই তাতে চিল ছুঁড়ে আনন্দ পায়। সম্ভার সময় তুলল ভাতবের ভিতর রাবণের মূর্তিতে আগুন দেওয়া হ’ল, লোকেরা গালিগালাজ করে আর চিল ছুঁড়ে তাদের মনের রাগ-বিদ্বেষ প্রকাশ করছিল। বহুদূর থেকে রাবণের আগুনের হলুকা আর ধোয়া দেখা যেতে লাগল। যুগ যুগ ধরে রাক্ষসরাজ রাবণের কালীনক মূর্তির অপমান করে আর যতদূর দিয়ে উত্তর-ভারতের জনসাধারণ সীতারান্বিত হরণের প্রতিশোধ তুলছে। এই অস্থান

থেকেই বুঝা যায় রামচন্দ্রজী আর সীতামাই-এর উপর জন-সাধারণের কি প্রগাঢ় ভক্তি আর বিশ্বাস।

উৎসব শেষ হলে দলে দলে হেলেরা আর পরিচিতেরা 'চাদিসোনা' (অল্পন পাতা) মুঠি ভরে নিয়ে এল সকলের হাতে হাতে 'চাদিসোনা' দিয়ে বিজয়র সাদর সম্ভাষণ জানাতে।

খাণ্ডোয়ার পুজার আনন্দ ভবনও নেবে নি, তারপরই এল কোজাগরী পূর্ণিমা তার রক্তভক্ত জ্যোৎস্নাবারা ছড়িয়ে। এল অমাবস্যা, গাঢ় আধারে নগরী ডুবে গেল, অধিবাসীরা ঘরে ঘরে দীপমালা পরিয়ে নগরী আলো করে তুলল। চারদিকে রোশনাই, পটকাবাজী, আতসবাজী, রকমারি বাজী খাণ্ডোয়ার আকাশ-বাতাস বারুদে ভরে দিলে। বড় বড় শেঠদের আবাসগৃহ আর দোকানপাট আলোকমালা পরে ঝলমল করতে লাগল। রাস্তার রাস্তার ব্যাঙপাড়ির হুমিষ্ট বাত শহর সরগরম করে তুলল, সড়ে সড়ে দোকানে দোকানে জাঁকজমক করে পান সুপারির উৎসব চলল। কল্যাণমণ্ডী বোনদের স্নেহবারা অভিযুক্ত হয়ে ভাইদোজ (ভ্রাতৃঘিণীয়া) উৎসবও শেষ হ'ল।

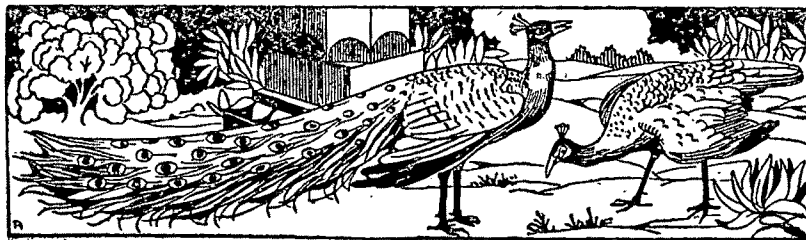
আবার এক দিন বিকেলে দামামা বেজে উঠল, শিকার আওরাজ কানে আসতে লাগল, আজ মোষের লড়াই। আশপাশের গ্রাম থেকে চাষীরা ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা তাদের বলিষ্ঠ মোষগুলোকে নিয়ে এসেছে মোষের টঙ্কের জন্ত। এদেশে বলে "হেলার টঙ্কর", মানে মোষের লড়াই।

এক-একটা মোষ দেখবার মত, খেয়ে দেয়ে সুপুষ্ট, নবরকাস্তি। তাদের মালিকেরা মোষের কপাল মাথা হালুদ আর সিন্দুর দিয়ে রঞ্জিত করে রেখেছে, শিংগুলো রং দিয়ে লাল করেছে, মোষের কালো কুচকুচে রঙের উপর হালুদে আর লাল রং দিয়ে অঙ্কিত চিহ্ন করে রেখেছে, এক-একটাকে দেখলে আতঙ্ক লাগে, মনে হয় জগজ্জননীর হাতের বর্শামুক্ত হয়ে মহিষাসুর বুঝি খাণ্ডোয়ার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে।

সারা ছপুর রকমারি বাজনা বাজতে লাগল। লোকেরা মোষগুলোকে বেশ করে দেখি মদ খাইয়ে টঙ্কের জন্যে তৈরি করতে লাগল। বেলা পাঁচটার মধ্যে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ

এসে ময়দান ভরে ফেলল। পুলিশের লোকেরা চারদিক ঘুরে ঘুরে জনতাকে ঘুরে সরিয়ে ময়দান খালি করে দিলে যাতে মোষগুলি বেশ ভাল করে লড়াইতে পারে, আর ছুটে গিয়ে জনতাকে আহত করতে না পারে। খেলোয়াড়রা মোটী রকমের বাজী রেখে খেলে, যার মোষ জিতবে, সেই এই বাজীর টাকা পাবে। ছু'পক্ষে বিশেষ প্রতিযোগিতা চলে, নির্দিষ্ট সময়ে শিলা ফুঁকল, রাজনা তালে তালে বাজতে লাগল। ছুটো ভীষণাকৃতি "হেলা" নিয়ে তাদের মালিকেরা রণাঙ্গনে এসে দাঁড়াল। উভয়ে উভয়ের মোষকে পিঠি চাপড়ে নিজ নিজ ভাষায় উৎসাহিত করে সরে দাঁড়াল। দর্শকেরা উদগ্রীব হয়ে বেলা দেখতে লাগল।

হেলা ছুটো ক্রীড়াঙ্গনে চুপ করে মিনিট কয়েক দাঁড়াল, ভীত দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল, তারপর মাথা হুইয়ে শিং বেঁকিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করলে, শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি লাগল। একটা হেলা আর একটা হেলাকে শিং দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল প্রাণপণে। ছুটো হেলাই সমান জোহান হলে, সাধারণতঃ শিঙের উপরই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। একটা হেলা আর একটা হেলার শিঙের ভিতর নিজের শিং আটকে প্রবল বেগে ধাক্কা মারতে মারতে পিছে হটিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। ছুটো হেলার পায়ের দাপটে জমিতে ঠকাঠক আওরাজ হচ্ছিল, চারদিকে ধূলা হিটকে পড়তে লাগল, দর্শকেরা ভ্রমমিশ্রিত আনন্দে টেচামেচি শুরু করে দিলে। যারা বাজী রেখে খেলছিল, তাদের মুখ আশা-নিরাশার উচ্ছল ও স্তান হয়ে যেতে লাগল। মোষের মালিকেরা গ্রাম্য কথার মোষগুলোকে বাহবা দিতে লাগল, কোরে কোরে বাজনা তালে তালে বাজাচ্ছিল। হঠাৎ একটা হেলা এক নিমেষে অপর হেলাটাকে শিঙের খুঁতো মেরে কাবু করে পিছু হটিয়ে দিল। সেটা প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। তারপর জমী হেলা বিজয়গর্বে দৃষ্ট ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়াল—চোখ ছুটো লাল টকটকে, নাসারন্ধ্র ক্ষীত। দর্শকেরা কোরে হাততালি দিতে লাগল, মোষের মালিক হাসিমুখে সগৌরবে তার পালোয়ান মোষ আর বাজীর টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে চলল—খাণ্ডোয়ার শারদোৎসবের শেষ পর্ব সমাপ্ত হ'ল।



“কে দিল আবার আঘাত...”

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

সদ্ব্যক্তিগত কথাসাহিত্যিক বিমান। যৌবনের প্রারম্ভে লিখেছে প্রেমের উন্মেষের গল্প, যৌবনে আলোচনা করেছে গভীর প্রেমভক্ত আর আজ অপলিঙ্গমান যৌবনে লিখেছে বসে উদ্বাস প্রেমের কাহিনী। এত যে লিখেছে নরনারীর প্রেমকথা, এক দিক দিয়ে বরতে গেলে বলতে হবে তা সবই প্রায় কল্পনাপ্রসূত, শুধু ঐ প্রথম দিকের প্রেম-উন্মেষের অধ্যায়টি ছাড়া। সেটা ছিল তার নিজের বাস্তব জীবনের আলোচ্য।

বিমানের বৃকে দাগা দিয়ে পালিয়েছে শিখা। যেন সে বিদ্রোহশিখাই। দীপ্তি তার কণিকের, কিন্তু তা মধ্যমলম্পর্শী। কত দিনকার কত লুকাচুরি করে পাওয়া তার দেখা। নদীর বাক ঘুরে কত গাছতলায় বসে কত সজ-রচিত কবিতা, গল্প-পাঠ। পাঠকও শ্রোত্রীর মন নিবিড় হয়ে মিশে একাকার হয়েছে, সে কি কাহিনীর জমজমাট বিয়তি অবলম্বনে, না তরুণ-তরুণীর সারিধোর মোহনমন্ত্রে?

পাহাড়ের পাদদেশে সেই শুভ্র পাথরখানি শিশিরস্নাত হয়ে বৃক পেতে আজও যে অপেক্ষা করে আছে তা বিমান দেখেছে মাঝে মাঝে গিয়ে। ঐখানেই তাদের শেষ দেখা। ঐ বপবপে সাদা পাথরের এক প্রান্তে সেদিন শিখা বসে বিমানকে বলেছিল, আকাশের রং দেখেছ?

একটু ধেম্বে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে আবার বললে, বসো একটু এইখানটায়, কাল ত চলেই যাব।

এই চলে যাওয়া যে চিরকালের জেতেই যাওয়া তা সেদিন কে জানত। সেই সন্ধ্যায় তারা হৃৎকনে বসে বসে স্বর্ধ্যাশ্র দেখেছে একসঙ্গে। সত্যি কত সৌন্দর্যভরা রাঙা আকাশ-খানি অর্ধচ সাঁঝের রানিয়ার অন্তরাল ছিল বুঝি কত অব্যক্ত বাণী-সম্বলিত। সেদিন তাদের মুখ দিয়ে কথা কোটে নি বেশী, হৃদয় ছিল তাদের বিদায়-আবেগে ভরা। বাতাসও ছিল না মুখের সে সন্ধ্যায়। বিনুঝিরে মুহু ভাষণের গুঞ্জন ছিল শুধু। কি তার অর্থ কেউ ত বোঝে নি।

তার পরেই সেই মধ্যান্তিক রেন-হুর্ঘটনা। পুন্নের উপর থেকে ট্রেনের পিছনের কয়েকখানা কামরা লাইনচ্যুত হয়ে একেবারে নদীর বৃকে। কত লোকের অজিম আর্জনাৎ, কত ঘরে হাহাকার। পর পর তিন দিন ধরে হুত ও আহতদের নাম বেরুতে লাগল কাগজে। স্বভদের তালিকার শিখার নাম।

সেই হতে বিমান জীবনের সঞ্চল করেছে কলমকে। কিন্তু সে লেখনীনিঃসৃত রস শুধু আর সবুজ নয়, বিবিধ রঙের। এই দীর্ঘ জীবনভোর ভারতীর চরণে কতই না রং-বেরং ছোপ লাগিয়েছে।

খ্যাতি পৌঁছেছে দেশ ছাড়িয়ে খুব বিদেশেও। বিদেশেও যে এত বাঙালী পাঠকপাঠিকা থাকতে পারে তা জানা গেল এই বাংলা লেখার দৌলতে। কত সমঝদারের চিঠি আসে, কত লোক দেখা করতেও আসে।

সেদিন অপরাহ্নে দেখা করতে এলেন আমেরিকার একটা ভারতীয় মিশনের ব্রহ্মচারিণী ডগিনী ভেদানন্দ বাই। এঁর সঙ্গে অনেক দিন হতে পত্রালাপ চলেছে। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। বিমান ব্রহ্মভরে অভ্যর্থনা করে বসাল। নীতিদীর্ঘ কিন্তু যেন শুভ্র কেশদামশোভিত গাভীরাপূর্ণ অপূর্ব মুখাবয়ব। তাঁর সন্ধানী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বিমানের অন্তস্তল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট। বিমান অবাক হয়ে তাঁর শাস্ত মুক্তির দিকে তাকিয়ে রইল। পৈরিকপরিহিতা আশ্রমবাসিনীর সঙ্গে শুধু যে গভীর তত্ত্বই আলোচনা হ'ল তা নয়। বিমানের গল্প লেখার কথা সহজেই উঠে পড়ল। বস্তুতঃ তাদের পত্রালাপ ত ঐ গল্প মারফতই। সন্ন্যাসিনী হলেও সন্ন্যাস-ধর্মাবলম্বিনী যেন ননু তিনি। সংসারের নরনারীর গুণ-দুঃখের প্রতি দরদকেও তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্তি বলে মনে করেন। তাই তিনি তাঁর চিঠিতে বিমানের অনেক বইয়ের সূত্র সমালোচনা করে পাঠিয়েছেন। আজও সেই সব আলোচনা চলতে লাগল সাক্ষাতে। বিমান মন্তব্যের মত এই মহীয়সী মহিলার কথা শুনছিল। এত দুট্টয়ে এমন মন দিয়ে তার লেখা কেউ পড়ে তা তার জানা ছিল না। নিজের যা কিছু বলবার ছিল তা যেন আজ শুধু। তার মনে হচ্ছিল কি একটা আকর্ষণে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে তার মন এই মহিলার প্রতি। ব্রহ্মা? তা হবে। এই রকম একটা ব্রহ্মার শক্তি তার উপর আরোপিত হয়েছিল—সে বছরকাল আগে। শিখা? হ্যাঁ, শিখারও শক্তিপ্রভাব তার বৃকে তীরের মত আজও বিধে আছে। যেদিন শিখার প্রতি ব্রহ্মা তার অন্তরে সঞ্চারিত হচ্ছিল, বিমানের মনে হয়েছিল তার কৈশোরে হারামোঁ মায়ের কণা। আর আজও ঐ ক্ষণে মনে হচ্ছে মায়ের কণা, সঙ্গে সঙ্গে শিখার স্মৃতিও চিড়ে

জাগে। এ কি অপূর্ণ আলোড়ন অন্তরে! সকল প্রকার
আধার কি একই হয়ে গাঁথা?

হঠাৎ এক সময় অন্ধকারিণী বললেন—আজ উঠি তবে।
বিমান চমকে উঠল। তাই ত সে ছিল কোন্‌ রাজ্যে?

৫

এতক্ষণ অন্ধকারিণী গাভীর্ষ্য রক্ষা করেই কথা করেছেন
যদিও তাতে বনিষ্ঠতার স্নিগ্ধ স্পর্শ লেগেছে ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু
একবারটিও তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে নি। প্রথম দর্শনের
অভিবাদন দূর হতে ক্ষোভ করে মন্তক হেলনই সমাধা হয়েছে,
কিন্তু এখন বিদায়বেলায় ভেদামন্দ বারি উঠে এগিয়ে এসে
দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিলেন পুরোপুরি পাশ্চাত্য প্রধায়
এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি মধুর আবেগভরা হাসির ছটায় সমগ্র
আননখানি হয়ে উঠল উজ্জ্বল। বিমিত্ত, ভস্মিত বিমান সেই
উজ্জ্বল হাসির আলোকে চিনে ফেলে চীৎকার করে উঠল—
“শিখা!”

পরমুহূর্তেই শিখার প্রসারিত হাতখানি নিজের দুই হাতের
মুঠোর চেপে ধরে বললে, বস বস, ব্যাগার কি বল ত?

৬

বলছি শোম, সব বলছি। সেই যে তুমি হাতব্যাপটা
আমার উপহার দিলে যাবার দিন, সেইটাই প্রথম বখরের
মোল পাকিয়েছে। ব্যাগটার মধ্যে টাকাপয়সা নোটবুক
সবই পুরে নিরেছিলাম। ব্যাগটা এত সুন্দর ছিল যে ট্রেনে
বসে ঘেঁষে একবারটি মুটুকেন হতে বার করেছি, অমনি আমার
সামনের বেকির একটি মেয়ে বলে উঠল “বাঃ! কি সুন্দর
ব্যাগটা আপনার? বেচি না একবারটি?” দিলাম ওর
হাতে।

তার পরই যে কি হয়ে গেল কে জানে। হঠাৎ যেন এক
সঙ্গে পাতালে প্রবেশ করলাম। আমার যখন জ্ঞান ফিরে
এল তখন দেখি আমি একটা ডিভি নৌকায়। জেলেরা
পাল তুলে তরুণ করে নৌকা চালিয়ে চলেছে। হাতের
দিকে তাকিয়ে দেখি চুড়ি নেই। কানে হাত দিয়ে বুঝলাম
মূলও গেছে। জেলে তো নয়, এ যে দেখছি ডাকাত।
ওদের রকমসকমেও বুঝলাম দুর্বৃত্তসিদ্ধি। তবে আবার
আমার প্রশ্ন উড়ে গেল। চূপ করে পড়ে রইলাম, চোখ
রাখলাম নৌকার বাইরের দিকে। একটু পরেই দেখলাম
উপ্টো দিক হতে একটা নৌকা আসছে। কাছে আসবার
একটু আগে থাকতেই চীৎকার করে উঠলাম, “বাঁচান, বাঁচান,
ডাকাত ডাকাত!” যুদ্ধের মধ্যে একটা জেলে এসে আমার
মুখ ও গলা চেপে ধরলে। আমি তবুও অক্ষুট কর্তে চীৎকার
করতে লাগলাম। ওদিকে সেই নৌকাও আমাদের
কাছাকাছি এসে পড়ল। তাদের ঠেকাতে এরা লড়াই শুরু
করে দিলে। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় বেশী। জেলেরা

নিরুপায় বুকে আমার ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কলে। আমি
আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

এবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখি একটা হাসপাতালে
কিন্তু আমার কথা বলবার শক্তি নেই। আর আমাকে কথা
বলাতে চেষ্টাও কেউ করছে না। বোধ হয় ডাক্তারের বারণ
ছিল।

পরদিন দুপুরে দেখি নাস একটা ধবরের কাগজ পড়ছে।
আমি হাত বাড়িয়ে কাগজটার দিকে ইদিত করলাম। নাস
ভা মেখেও যেন বুঝল না। কিন্তু বুঝেছিল ঠিক, কিছু পরে
তার নিজের পড়া শেষ করে আমার হাতে কাগজটা দিয়ে
গেল। সেই কাগজে পড়লাম, “রেল-দুর্ঘটনায় আর একটা
মারীর যতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দেহটা ঘটনার তিন
দিন পরে, প্রায় তিন শত মাইল দূরে এত গলিত অবস্থায়
পাওয়া গিয়াছে যে তাহা সনাক্ত করা কঠিন, শুধু তাহার
হাতের মুঠোর প্রাপ্ত একটা ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে
একটা নোটবুকে নাম লেখা আছে ‘শিখা সোম’।”

বিমিত্ত বিস্ফারিত নেত্রে বিমান অক্ষুট কর্তে বললে, কি
আশ্চর্য! তার পর?

তারপর যখন আমার কথা বলার শক্তি ফিরে এল,
একজন পৈরিকবসন সোমাদর্শন প্রৌঢ় এসে আমার প্রাণ
করতে লাগলেন। একে আরও কয়েকদিন দেখেছিলাম
আগে হাসপাতালে। বুঝলাম হাসপাতালটা কোন আশ্রমের
প্রতিষ্ঠান।

আমার মনে তখন আলোড়ন চলেছে। ভাবছি—শিখা
সোম ত মরেছে, আপদ চুকছে। এখন তবে এই মৃতল
জীবনটা নুতন ভাবে চালাই। তাঁর প্রেমের উত্তরে বললাম,
আমার কোন নাম নেই, বাম নেই, আত্মীয়স্বজন আর কেউ
নেই এতু। আপনারা বাঁচিয়েছেন—আমায়, এখন আপনাদেরই
আমার সব। আপনাদের আশ্রয়ের কাছে যদি দয়া করে
জামায় লাগান তবে এ হতভাগিনীর জীবন বহু হয়ে যার।

তিনি এইভাবে বুঝলেন, হিন্দুনারীর সর্বটমস অবস্থা। যে
বালিকা একবার দুর্ভাগ্যের হাতে গিয়ে পড়েছে সে যদি
তাদের হাত থেকে উদ্ধারও পায় তবু হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর
সমিধি দৃষ্টি হতে উদ্ধার পাবার ঘো নেই। সেই ভেবেই হৃদয়
আমি আর সমাজ বা সংসারে কিরতে চাইছি না। তার
কোন হৃদয়ও দিচ্ছি না।

বিমান অবৈধ্য হয়ে এইখানটার বলে উঠল—কিন্তু আমি
ত ছিলাম শিখা।

হ্যাঁ, তুমি ছিলে, কিন্তু—

এইটুকু বলেই উদাস ভাবে জালমার কাঁকে আঁকানের
দিকে তাকিয়ে থাকে শিখা।

‘কিন্তু কি? বিনামের বৈধ্য মানে না—বল বল কিন্তু

কি? ওঃ! ভূমি বুঝি ভালো সেই পুরাকালে রামচন্দ্রই যদি সীতাকে গ্রহণ করতে পারলেন না, তবে আমি কি আর—

বাণা দিয়ে শিখা বললে, না না, তা নয়। আমি বিশ্বাস করি অতীতের রামচন্দ্রের চেয়ে আধুনিক অনেক রামচন্দ্র উন্নত। কিন্তু তবু—

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন কোন অতীতের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে ধীরে অতি শান্তভাবে বলতে লাগল, তবে আমার জীবনের আর একটা অধ্যায় তোমার কাছে আজ ধুলে ধরি বন্ধু।

আবার চুপ করল। বিমান রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

শিখা আবার শুরু করল, আমি তোমাকে যেমন নিবিড় ভাবে ভালবেসেছিলাম তেমন করে অজ্ঞ মেয়েরা ভালবাসে কি না জানি না। আমি যেন তোমার গ্রাস করে ফেলতে চেয়েছিলাম কিংবা যেন তোমার পায়ের শৃঙ্খল হয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। কতবার নিজেকে সামলাতে গিয়েছি, কিন্তু পারি নি। কাছে থেকে তা হবার যেন জো ছিল না। কত বিকার দিয়ে নিজেকে বলেছি—যাকে ভালবাস ভার উন্নতির পথের কাঁটা হয়ে না। কিন্তু বিফলেই তা বলা। রমণীমূলত দীর্ঘা এতই প্রবল ভাবে এই চিন্তে সঞ্চিত হতে লাগল ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে ভূমি আগ্রহ করে তোমার লেখা যখন শোনাতে আক্সম, আনন্দ হ'ত খুবই সম্ভব নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দুর্জয় হিংসা ও অতৃপ্তি ভুজুদ্বিনীর মত মাথা তুলতে থাকত। মনে হ'ত তোমার প্রাণমন ত অস্বস্তি তোমার লেখাতেই পড়ে থাকে, তার মধ্যে আমার স্থান কোথায়? আর যে লেখা লিখতে বসে, যদিও তা আমাকে একবার শোনাচ্ছ, কিন্তু তা ত আমার তরেই নয়। হায়! বিধে দেবে তা বিলিয়ে। আর

তোমার খ্যাতির কাছে ভূমি যাবে বিকিয়ে। আমি থাকব কোথায় পড়ে? অতিমানে অন্তর গুহরে উঠে বলত, তাই হোক তবে। মনে হতে লাগল আমার এ পোড়া মন যেন মরুভূমি। তোমার কাব্যরস এর উক নিশ্বাসে শুষ্ক হয়ে যাবে।

তাই এক এক সময় মনে করতাম দূরে সরিয়ে ফেলি এই হতভাগিনীর জীবনকে। সরিয়ে তোমার মুক্তি দিই এই সংকীর্ণ মনের বাঁধন হতে। কিন্তু সেও বড় কষ্টম। 'ছাড়তে গেলে ব্যথা বাজে।' সে যে বিষম ব্যথা।

এমন সময় দৈব উপায় করে দিলে। আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। মনকে নিদারুণ শক্ত করে অজান্ত-বাসের এ সুযোগ ছাড়লাম না। বিচ্ছেদের তীব্র বেদনা ভেদ করে একটা পরম তৃপ্তি—আত্মপ্রসাদের ফোয়ারা এ জীবনকে সিক্ত করতে লাগল আশ্রমের আশ্রয়ে গিয়ে।

এ পর্যন্ত বলে থামল এবং দুই হাতের মাঝে মাথাটা গুঁজে দিল বুঝি উদগত অশ্রু সংবরণ-চেষ্টায়।

বিমান পাথরের মত ছিল এতক্ষণ, এইবার আস্তে একখামি হাতে শিখার অবনমিত পৃষ্ঠদেশে বেঠন করে চুপ করে বসে রইল—বাক্যহারা। শিখা একটু পরেই মুখ তুলে সোজা হয়ে বিমানের দিকে তাকিয়ে সহাস্ত মুখে বললে, আজ সন্ধ্যা মনে হচ্ছে উপত্যার আশ্রমে প্রেমের সব কণ্টকজাল পুড়িয়ে শুধু কুহুমটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। তপঃক্লিষ্ট ভালবাসার এই অবস্থাটা বুঝি জগতে অতুলনীয়।

অশ্রুস্রাব মিত ও প্রদীপ্ত মুখখানির দিকে বিমান বিম্বরে তাকিয়ে রইল।

আকাশের আলো মিলিয়ে যেতে লাগল। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, তাদের জীবনেরও। স্নিগ্ধ সমীরে ভেসে আসছিল দেবদারু শ্রেণীর শাখা হতে বিবিধ বিহঙ্গমকাকলি।

প্রণাম

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার প্রণামখানি রেখে যাই তাহাদের তরে,
যাহাদের নাম কেহ কোনদিন করে না স্মরণ;
ইতিহাস যাহাদের নামগুলি রাখেনিকো ধরে,
নিঃশেষে মুছে গেছে তাহাদের সব বিবরণ।

অকরুণ পৃথিবীর বুকে যারা এলো অসহায়;
মাসুকের অন্তরে একটুও পেল না সে ঠাই;
পড়েছিল এক পাশে অনাদরে আর অবজ্ঞায়,
যাহাদের তরে গান কোনদিন কেহ রচে নাই।

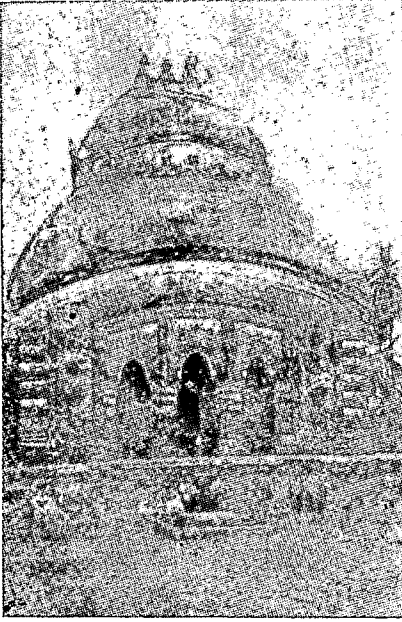
জীবনের স্তর হ'তে যারা শুধু করেছে সংগ্রাম,
নিরস্তির পরিত্যাসে বার বার হয়েছে বিফল;
আলেক্সার পিছে পিছে ঘুরে যারা করে অবিরাম,
সারাটি জীবন ধরে যাদের করেছে আধিভল।

কত আশা করেছিল, কিন্তু যারা পেল নাকো হার,
যাদের জীবনগুলি ধরগীতে হ'ল ব্যর্থকাম;
ক্লান্ত জীবন বহি' চলে গেল কোন অজানায়,
অজানা তাহাদের লাগি রেখে যাই আমার প্রণাম।

বাংলাদেশের মন্দির ও মঞ্চলিপি

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যাতীর্থ

মন্দির দেশ বা জাতির জীবন্ত ইতিহাস। ইহা যেমন প্রতিষ্ঠাতার ধর্মভাব, স্বরূচি, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির পরিচয় দেয় তেমনই গঠনবৈশিষ্ট্য, অলঙ্করণ-পদ্ধতি ও পুত্তলিকা-বিগ্রহাস-কৌশলে সকলপ্রকার সামাজিক বিষয়বস্তুকে নিজদেহে ধরিয়া রাখে। আবার মন্দিরলিপিসমূহ সাহিত্য, ইতিহাস ও সেই সেই কালের অক্ষর-লিখনভঙ্গীকে রক্ষা করে। প্রাচীন পুথিতেও আমরা অতীত যুগের হস্তলিপির নিদর্শন পাই, কিন্তু পুঁথি অপেক্ষা মন্দির-লিপি দৃঢ় পটভূমিতে গঠিত হইলে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় বলিয়া আমরা উহাতে বহু প্রাচীন



হাওড়া জেলার মেলাক গ্রামের রূপনারায়ণ নন্দভীরস্থ ত্রীগোপালজীর অষ্টশাল মন্দির।
রাজা মুকুন্দপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্তৃক ১৫৭৩
শককে প্রতিষ্ঠিত

লিখনভঙ্গীর সহিত পরিচিত হই। মন্দির ও মন্দিরলিপি দেশের গৌরব ও প্রামাণ্য দলিল। এখানে বাংলার কয়েকটি মন্দিরের লিপি ও তাহা হইতে গৃহীত তথ্য সংক্ষেপে লিখিতেছি।

হাওড়া জেলার গডভবানীপুরে মণিনাথ মহাদেবের যে অষ্টশাল মন্দির আছে উহার লিপি সম্ভবতঃ বাংলাদেশে

প্রাচীনতম। লিপিটি এই : শ্রীভগবতো বাসুদেব নারায়ণস্ত।
শুভমস্ত শকাব্দাঃ ১৩০৬২১ আব্দ।

ইহা হইতে আমরা প্রায় ছয় শত বৎসর আগেকার অক্ষর ও সংখ্যালিখনপ্রণালীর সামান্য আভাস পাই। এই লিপি ও নিম্নোক্ত সকল লিপিরই বঙ্গাক্ষরে।

মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটালস্থ বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে সিংহবাহিনীর চতুঃশাল নির্মিত মন্দিরে লিপিবদ্ধ দুইটি ফলক আছে। উহাদের পাঠোদ্ধার কষ্টকর, কিন্তু “শুভমস্ত শকাব্দা ১৪১২” সহজে পড়া যায়। ইহা প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন।

হাওড়া জেলার মেলাক গ্রামের প্রাচীন গোপালজীর মন্দিরে ১৫৭৩ শকাব্দা লিখিত আছে। উহা রাজা মুকুন্দ-প্রসাদ চৌধুরী কর্তৃক স্থাপিত। উচ্চ যত্থানি নিম্নেও তত্থানি প্রোথিত বলিয়া এখনও অটুট আছে।

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার নিকটবর্তী লালগড়ে পূর্বে যে নবরত্ন মন্দির ছিল তাহাতে রুক্ষপ্রস্তরের উৎকীর্ণ সুদীর্ঘ লিপি ছিল। লিপিবদ্ধ প্রস্তরফলকটি এখন চন্দ্রকোণার বর্দ্ধমানরাজের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। উহার লিপি :

শুভমস্ত শকাব্দাঃ ১৫৭৭ শাকেহিম্মনি বানেন্দো বৈশাখে শুক্লপক্ষকে।
তৃতীয়ায় ভূগুদিনে ত্রিংশোজ্জ্বলাবহ (?)। হরিনারায়ণ-নৃপস্ত পত্নী
শ্রীলক্ষ্মণাবতী। ত্রিংশাক্ষরোঃ ক্রীতৌ নবরত্নমিদং দদৌ। রাধাকৃষ্ণ-
পদারবিন্দরসিক। শ্রীবীরভানুর্বাধু। ধ্যাত-ত্রিহরিনৃপতেশ্চ *বলিতা
শ্রীহোলরায়ান্নজ। মাতা ত্রিযুত মিত্রসেন নৃপতেষিধ্যাত কীর্ত্তে ক্ষিতৌ।
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপ ভগিনী রম্যাং দদৌ মন্দিরম্। গিরিধারিপদান্তোজ
নবরত্নমিদং শুভম্। নির্ধার বহু যত্নেন সমর্পিতবর্তী যদা। পৌরাণিক
শ্রীমোহনচন্দ্রবর্তী গোকুলদাস।

লিপিটি চন্দ্রকোণার লুপ্ত ভান রাজবংশের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। সম্ভবতঃ মোহন চন্দ্রবর্তী উহার রচয়িতা ও গোকুলদাস মিস্ত্রী। লিপির মর্ম : বীরভানুর বধ, হোল-রায়ের কন্যা, রাজা হরিনারায়ণের পত্নী, রাজানারায়ণ মল্লের ভগিনী ও রাজা মিত্রসেনের মাতা শ্রীলক্ষ্মণাবতী ১৫৭৭ শকের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় গিরিধারীর প্রীতির নিমিত্ত সানন্দে এই রম্য মন্দির দান করিলেন। লিপিতে অল্পদুপ ও শাদ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ আছে। শাস্ত রস ইহাকে কাব্যের রূপ দিয়াছে। জীলোকের নামের পূর্বে শ্রীমতী না লিখিয়া মাত্র শ্রী ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয়।

চন্দ্রকোণা হইতে পাঁচ কোশ দূরে ঘাঁটাল যাইবার

রাস্তার পাশে নবগ্রামে যে নানা গুপ্ত কক্ষবিশিষ্ট প্রাচীন পঞ্চরত্ন আছে, উহার লিপি : “মবেদরসসংযুক্তশাক্যেচৈব নিশাপত্তৌ। গোপীনাথস্ত বেষ্টোদং ভক্তিতো দত্তবানহম্ ॥” মন্ম—১৬৪০ শকাব্দে গোপীনাথের এই মন্দির ভক্তি-পূর্বক দান করিলাম। লিপিটি সরল শাস্তরসপূর্ণ ও শিলা-ফলকে উৎকীর্ণ।

বাংলার বাহিরে উড়িষ্কার ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে রাজা হরিবর্মার মন্ত্রী ভট্টভবদেবের শিলালিপি দুইটি স্পষ্টপ্রাচীন বাংলা লিপির নিদর্শন।

পূর্বীধামে মার্কণ্ডেয় সরোবরের ঘাটে বাংলার নিজস্ব রীতির ইষ্টক-নির্মিত চতুঃশাল মন্দিরটি বর্দ্ধমানরাজ্য কীর্তিচন্দ্র-নির্মিত। উহার বঙ্গাক্ষরে রচিত প্রস্তরলিপিটি এইরূপ : “শ্রীশ্রীহরি। শুভমস্তশকাব্দাঃ ১৬৬৬ বডসদর্শন মিতেহখে। পঙ্কোদ্ধরত (?) সৌধ সোপানং। রূপ কীর্তিচন্দ্র জননী জনিতং। প্রেষিত হরে কৃষ্ণাতঃ (?)। লিপির ‘ড’ ‘ডু’ হইলেই অর্থসঙ্গতি হয়। মন্ম সম্ভবতঃ এই : রাজা কীর্তিচন্দ্র ১৬৬৬ শকাব্দে এই সরোবরে পঙ্কোদ্ধার, ও সৌধঘাট নির্মাণ করাইয়া মাতৃঋণ শোধ করেন। জলাশয় ধ্বনন ও ঘাট নির্মাণে মাতৃঋণ শোধ হয় প্রাচীনগণ এরূপ ধারণা করিতেন।

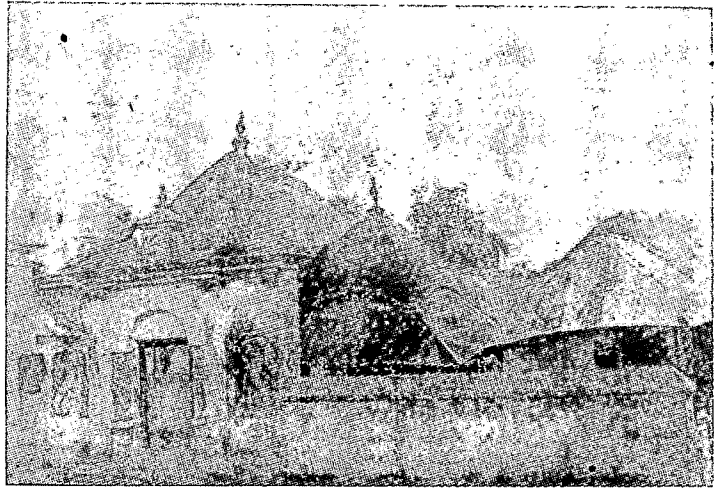
মেদিনীপুর জেলার চেলুয়া বাসুদেব-পুরের (পোঃ সঙ্করপুর) মুক্তারাম ভট্টশাখ্যের পঞ্চরত্ন মন্দিরের লিপি : দহনযমনগঙ্গোস্মিতে শাক বর্ষোদ্ধতির নিলয়মেতৎ শ্রীল-দামোদরায় ॥ কুলকুমুদকলেশঃ শ্রীলমুক্তাচরায়ো। বসুল-পরমভক্তোদত্তভূর্মোদ মাপ ॥ ১৭২৩ শকাব্দাতে কুলরূপ কুমুদরচন্দ্র মুক্তারাম এই মন্দিরটি দামোদরকে দান করেন। লিপিটি পোড়ামাটির, দুই পংক্তিতে সমাপ্ত। ইহার ছন্দ মালিনী, ভাষাসরল, অলঙ্কারপূর্ণ ও শাস্তরসযুক্ত।

নলীয়া জেলার গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী মন্দিরের লিপি :—বেদাঙ্কক্ষণ গোত্র কৈরব কুলাধীপে শকে শ্রীযুতে। কৈলাসপ্রতিরূপ কৃষ্ণনগরে শ্রীমদ গিরীশোৎসবে ॥ নারায়নন্দ-ময়ী শুভেহহনি মহামায়া (?) মহাকালভূৎ। রাজা শ্রীল গিরীশচন্দ্র ধরীপালেন সংস্থাপিতা ॥—রাজা গিরীশচন্দ্র ১৭২৬ শকাব্দে কৈলাসতুল্য কৃষ্ণনগরে শুভ গিরীশোৎসবে আনন্দময়ী প্রতিষ্ঠা করেন।

মেদিনীপুর জেলার রাধাকান্তপুরে (পোঃ সঙ্করপুর)

দাসবংশের স্ত্রীম, পুত্রলিকাবহুল ও অলঙ্কারমণ্ডিত আল-গোছ টুঙ্গী মন্দিরে পোড়ামাটির আটটি ফলকে নয় পংক্তিতে বাংলা পদ্যালিপি :

রাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দদাস স্বর্গে বাস এই সে কারণে : মহা মহা পুণ্যবলে সপ্তপুত্র ক্ষিত্তিলে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞানদাস নামে : যিনি দাতা পুণ্যোদয় প্রকাশিত মহাশয় মধ্যম তৃতীয় সহোদরে : বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া গোপীনাথে আনাইয়া স্থাপন করিলা এই ঘরে : নবাব পৃথিবীপতি তার ভয়ে ব্যস্ত অতি দীমানা ঘেরিয়া খুলিলা গড় : দামামা দরজা পরে জয় চণ্ডীর কৃপাবরে পুঙ্করিণী খুলিলা তার পর :



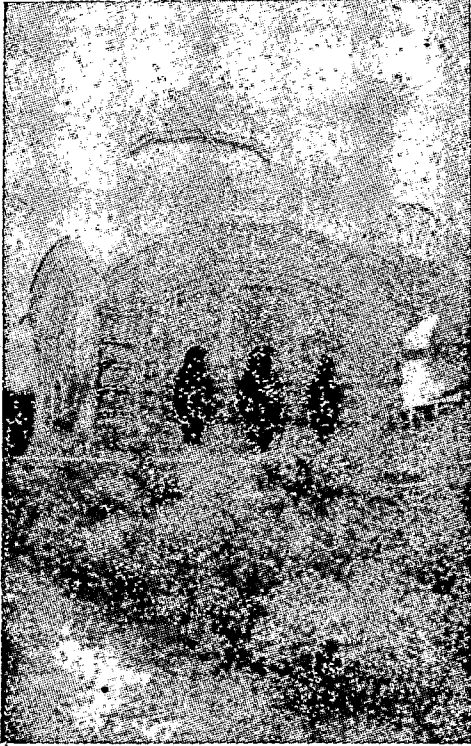
মেদিনীপুর ঝাঁটালের সিংহবাহিনী মন্দির

চতুঃশালরীতি—প্রতিষ্ঠাশক ১৪১২

সকান গাইলা যদি সভাসিংহ নরপতি সেই হেতু কড়া না আইসে : কম্পবান্ ক্রোধভরে আজ্ঞা দিলা অনুচরে হান শির পদাতিক রোষে : বিগড় হইল কাল কাল হৈল পরকাল কিছু না জানিল মহাশয় : তাহাতে ছেদিল মুণ্ড দুর্গা দুর্গা ডাকৈ তুণ্ড শুনি রাজা মানিলা বিস্ময় : কবিতা করিতে তার এই স্থানে আটা ভার হ'ল দুই শতকে বৎসর : রীতি নীতি পিতৃকীর্তি এই বংশে অজ্ঞাবধি বন্দনাই হতেছে স্থলর : আপদ হইল ইথে বৃক হৈল মন্দিরেতে সারাইতে সাধ্য নাহি কার : নারায়ণদাসের বংশে মধ্যমবাড়ীর অংশে যজ্ঞেধর জন্মেছিল সার : সন ১২৫১ সালে গোষ্ঠীর সহিত মিলে নানাযুক্তি করে জনে জনে : কেহ বলে লয়া কর কেহ বলে একেই সার যজ্ঞেধরের কিছুই না লয় মনে : পিতৃকীর্তি ডুবাইয়া কেমনে করিব ইহা সারাইব যা থাকে ভাগ্যোতে : ভজলোকে ডাকাইয়া হীরক মিন্ত্রী আনাইয়া উন্মোচন করিল সারাইতে : সন ১২৫১ সালে গোষ্ঠীর সহিত মিলে মন্দির করিলা সেরামতি : হিসাব করহ সবে ইহাতে নিকাস পাবে কবিতা সমাপ্ত হৈল ইতি :

অর্থ সরল। বাংলার শিবাজী সভাসিংহের আদেশে জনানন্দদাসের মন্তক ছেদন হইলে কাটা মুণ্ড দুর্গা দুর্গা

বলিয়াছিল। যে মজুর একটি কড়ি পাঁচশ্রমকে কাজ করিত তাহাকে কড়া বলে। লিপিতে কোলন বিরাম চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। লিপির বর্ণাঙ্কিত শোধন করিয়াছি।



মেদিনীপুর ভাষাকান্তপুরের দাসদের গোপীনাথ মন্দির
(একরত্ন বা অ'লগোছ টুশী রীতি অহুসারে নির্মিত
স্বর্গীৰ্ণ বাংলা পঁতলিপিয়ুক্ত)

ঐ গ্রামের একটি উৎকলরীতির মন্দিরের লিপি :
৩শ্রীশ্রীকাশীশ্বর মহাদেব স্থাপন। শকাব্দ: ১৭৬৭ সন ১২৫২
সাল মাহ আষাঢ়। জেই হেতু মহাদেব কাশীশ্বর নাম :

কমললোচন দত্ত গীয়াছিল গয়াধাম : পিতার কর্মপরে
কাশী গমন বাসনা : কিন্তু গ্রিহে ভাঙ্গিগণ করিল মান :
প্রীত্যাগমনেতে সিং স্থাপন করিবে : কাশী গমনের ফল
তাহাতে পাইবে : এই হেতু প্রকাশ হইল কাশীশ্বর :
মন্দার সমান কাম মোদক কিংকর : (৭)

বর্ণাঙ্কিত লক্ষণীয়। শেষ পংক্তির অর্থ অস্পষ্ট। কোলন
বিরামচিহ্ন রূপে ব্যবহৃত।

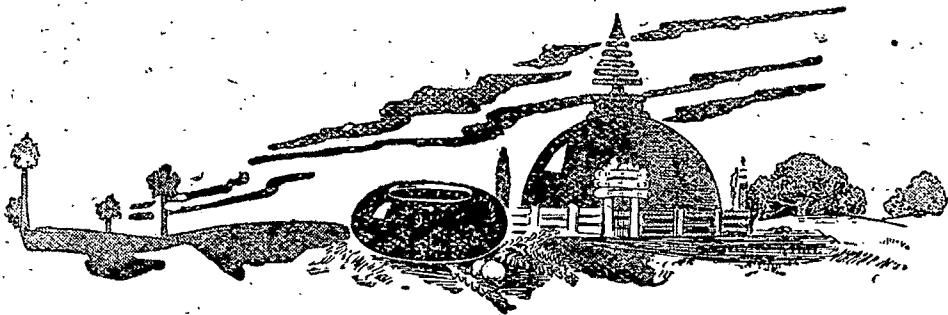


চতুয়া বাসুদেবপুরের গুলাব দত্তের শিবমন্দির।

মন্দিরের উর্দ্ধভাগ গহ্বাকৃতি বলিয়া ইহা

ইসলামীয় রীতিতে নির্মিত

মন্দিরের মত অনেক বাসমঞ্চ ও বহুতলবিশিষ্ট চূড়া ও
পুতলিকাবহন এবং লিপিয়ুক্ত। মেদিনীপুর-পাশকুড়ার
ইটোরা মাদুলোই গ্রামের একটি অষ্টকোণ, ত্রিতল, ত্রয়োদশ
চূড়ার স্থঠাম, সোপানযুক্ত, পুতলিকাবহন মঞ্চের লিপি—
শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ। শুভমন্ত শকাব্দা: ১৭৮০ সন
১২৬৬ ইঙ্গরাজি সন ১৮৫২ সাল। ঐঠাকুরদাস মাইতি।
মন্দিরলিপিতে শকাব্দ ও বাংলা সনই ব্যবহৃত হয়।
এই লিপিতে ঐঠাকুরও ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা অভিনব।



বাংলা ও বাঙালী

শ্রীমুশীলচন্দ্র ঘোষ

২

বাঙালীর আর্থিক ও রাজনৈতিক অবনতির কারণ অল্পসঙ্কান করিতে হইলে প্রথমে পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক সঙ্কোচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। শিল্পের প্রসারের জন্ত ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশেরই তাহার আয়তন এবং লোকসংখ্যার অল্পপাতের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য থাকা দরকার। তাহা না হইলে সেই প্রদেশবাসীর আর্থিক দুর্ভাগ্যতার প্রতিকার করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

কোনও প্রদেশের প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার চাপ অর্থাৎ বসতির হার যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় ভূমির অভাবে খাদ্যোৎপাদন ও শিল্পসম্প্রসারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই হেতু সেই প্রদেশকে বিদেশ হইতে এবং অপর প্রদেশ হইতে খাদ্য ও অন্যান্য বহু নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য আমদানী করিতে হয়। ইহার ফলে সেই প্রদেশবাসীর অর্থ অন্য প্রদেশে ও বিদেশে চলিয়া যায়। একমাত্র শর্করাশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলার মাটি এই শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও ভূমির অভাবে এই প্রদেশে ইহার প্রসারণ হইতে পারিতেছে না। ফলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার চিনি অপর প্রদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। আয়তনের দিক হইতে বর্তমান পশ্চিম বাংলার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল :

প্রদেশ আয়তন ১৯৪১ সালের আদমশুমারী
বর্গমাইল অল্পসারে প্রতি বর্গমাইলে
লোকসংখ্যার চাপ

মাদ্রাজ	১,২৬,১৬৬	৩২১
উত্তরপ্রদেশ	১,০৬,২১৭	৫১৮
মধ্যপ্রদেশ	২৮,৫৭৫	১৭১
বোম্বাই	৭৬,৪০০	২৭০
বিহার	৬২,৭৪৫	৫২১
আসাম	৫০,২২৬	১৪৭
পূর্বপ্ৰদেশ	৩৭,০৫৮	৪০৮
উড়িষ্যা	৩২,১২৮	২৭১
পশ্চিম বাংলা	৩০,৬৮৯	৭৫১ (১৯৪১) ৮০৮ (১৯৫১)

এই হিসাবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আয়তনের দিক হইতে পশ্চিম বাংলার স্থান কেবলমাত্র সর্বনিম্নেই নহে, অধিকন্তু প্রতি বর্গমাইলে তাহার বসতির সংখ্যাও অত্যধিক। বাস্তুহারাণের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে মনে হয়, পশ্চিম বাংলার প্রতি বর্গমাইলে বসতির হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই প্রদেশের অন্ন-বস্ত্র সমস্তা অপেক্ষাও আয়তন-সমস্তাই গুরুতর। ইহাকে জীবনমরণ-সমস্তাও বলা চলে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর বেশীর ভাগ প্রদেশেরই আয়তন, পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্যগুলি সংযুক্ত হওয়ার ফলে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ন্যায়সঙ্গত দাবি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার সঙ্গে কেবলমাত্র দুইটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশীয় রাজ্য—কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং একটি ছোট শহর চন্দননগর এই প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। একেই পশ্চিম বাংলায় তাহার প্রয়োজনানুসারে চাউল উৎপন্ন হয় না, তাহার উপর বঙ্গবিভাগের পর পাটের অভাব হেতু ধানের চাষ কমাইয়া সেই-সব জমিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুসারে পাট চাষের ব্যবস্থা প্রদেশ-সরকার করিয়াছেন। অধিবাসীদের অন্নভাব অপেক্ষা পাট-কলওয়ালাদের পাটের অভাবের জন্য তাহারা অধিকতর চিন্তিত। বাংলাদেশে “অধিক খাদ্য ফলাও” অভিযান ও “বৃক্ষরোপণ-উৎসব” একটা প্রহসনে দাঁড়াইয়াছে। ভারত-সরকার পররাষ্ট্র সমস্তা লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত, প্রদেশ-সরকার নীরব, প্রদেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাক-দ্বন্দ্ব মাতিয়া আছেন। প্রবীণ বাংলা উদাসীন এবং নবীন বাংলা এ বিষয়ে একেবারে উদ্যমহীন। যত দিন বাঙালী তাহার দুর্ব্যবহার এই মূলগত কারণ অর্থাৎ স্থানভাব ঘুচাইতে না পারিবে তত দিন তাহার অন্নভাব, অর্থভাব, স্বাস্থ্যভাব প্রভৃতি কোন অভাবই দূরীভূত হওয়া দূরের কথা, বরং দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে।

শ্রমিক সমস্তা বাংলার অধিক দুর্ভাগ্যের আর একটি কারণ। অর্থভাবে ও অন্নভাবে বাঙালী জাতি আজ ক্রমেই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে এবং একারণে এই প্রদেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা-রোগে প্রাণ হারাইতেছে। বাঙালী জাতি আজ ক্ষয়িষ্ণু। এই কারণে চাষের কাব্য বেশীর ভাগ বাঙালী শ্রমিক

অল্পযোগী হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার কলকারখানা ও ক্ষেত্রের কার্যে নানা কারণে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, সাঁওতাল পরগণা ও রাঁচির শ্রমিকদের দ্বারাই বেশীর ভাগ কৃষিকার্য আঁজকাল চালাইতে হয়। পাটকল, কাপড়ের কল ও অন্যান্য শিল্প-কারখানায় প্রায় শতকরা নব্বুই জনের অধিক শ্রমিক অপর প্রদেশবাসী। কলিকাতা শহরে নানা কার্যে নিযুক্ত প্রায় সমস্ত শ্রমিকই ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত; তাহারা না হইলে চলে না। ১৯৪৮-৪৯ সালের সরকারী বিবরণে প্রকাশ, বাংলা ও আসাম হইতে প্রায় ৩৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মনি অর্ডারযোগে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হইয়াছে এবং সেই সময়ের মধ্যে বাংলায় ও আসামে ৩০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার মনি অর্ডার আসিয়াছে। অর্থাৎ ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা ও আসাম হইতে বাহিরে বেশী পাঠানো হইয়াছে। যদি মোটামুটি ইহার শতকরা ১০ ভাগ টাকা আসাম হইতে পাঠানো হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশ হইতে উক্ত বৎসরে এই প্রদেশবাসীর প্রায় ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বাহির হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত টাকা মনি অর্ডার-যোগে পাঠানো হয় তাহার বেশীর ভাগই কৃষি ও শিল্পকার্যে

নিযুক্ত শ্রমিকেরাই পাঠাইয়া থাকে। বাৎসরিক প্রায় পাঁচ কোটি টাকা প্রদেশের বাহিরে চলিয়া যাওয়া কম কথা নহে।

খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্যও পশ্চিম বাংলা হইতে বাৎসরিক মোটামুটি কত কোটি টাকা অন্য প্রদেশে চলিয়া যায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে দিব।

স্বাধীনতালাভের পর আর্থিক ক্ষেত্রে বাংলার আর একটি নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। বহু বিদেশী কোম্পানী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিদেশবাসীরা ভারতীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যত দূর জানা যায়, বাংলাদেশেই তাহার সংখ্যা বেশী এবং অপর প্রদেশবাসী ধনীরাই ইহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পূর্বে বহু বাঙালী কেরানী এবং অনেক ছোটবড় বাঙালী ব্যবসায়ী নানারূপ মাল সরবরাহ করিত। যাহারা ঐ সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিত তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। উপস্থিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য প্রদেশবাসীদের হাতে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত কাজ এবং ব্যবসা হইতেও বাঙালীদের হটিয়া যাইতে হইতেছে। ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

শাশ্বত

ক্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

জানি জানি মিলাইবে আনন্দের মুহূর্ত চঞ্চল।
আজিকার ফুলোৎসব এক দিন হইবে মলিন,
পুষ্পাশ্রিত প্রাণলতা মধুকান্ত হয়ে যাবে জানি,
এও জানি, আজিকার তুমি আমি রব না নবীন।

যৌবন-চৈতন্তে জরা উগ্রগরী প্রেম-পরিমল
হৃন্দরে আরতি করি হবে যুহু আর মধুময়।
প্রেমের এ পরিণতি সত্য বলে জানি আর যানি।
আজিকার হাতোজ্জল এ আনন্দ, এও মিথ্যে নয়।

মিথ্যে নয় যুধোযুধি এই বসা, এই কথা কওয়া,
মিথ্যে নয় চোখাচোখি, আলিঙ্গন, প্রণাম চুম্বন।
সত্য ছুটি হৃদয়ের রসোজ্জল ভাব বিনিময়।
অতি সত্য আজিকার পরিপূর্ণ এ আনন্দফণ।

সত্য তুমি, সত্য আমি, সত্য এই আনন্দ চঞ্চল।
হৃন্দর এ দাম্পত্য-প্রণয়ের জীলা-শতদল।



পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট

শ্রীশিবব্রত ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট ক্রমশ বেরূপ প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহাতে শীঘ্রই এ রাজ্যে পঞ্চাশের মনুষ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। রাজ্যে আজ অন্ন নাই, বাহা আছে তাহা জনগণের ক্রয়-শক্তির বাহিরে। জনসাধারণ সরকারের নিকট অন্নের দাবি জানাইয়া ব্যর্থ হইতেছে; ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুর্ভিক্ষের এবং অনশনের মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই খাদ্যসঙ্কটের হাত হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের খাদ্য-সমস্তার কারণ জানা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-মন্ত্রিগণের বিরতি, বক্তৃতা, বেতার-ভাষণ প্রভৃতি হইতে আমরা জানিতেছি পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য। অর্থাৎ এখানকার অধিবাসিগণের যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা এ রাজ্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্বল্প এবং এজন্য পরনির্ভর-শীল হইয়া রহিয়াছে। সরকার ইহাই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ বলিয়া প্রচার করেন। খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে সরকারী অভিমত অত্যন্ত বলিয়া প্রকাশ পাইলে জনগণের এ বিষয়ে বলিবার বিশেষ কিছু থাকে না। এই কারণে আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি অঞ্চল কিনা।

কোন অঞ্চল ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে ঐ অঞ্চলের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ, উহার পরজন্মসংখ্যা এবং জনগণের অনুপাতে চাহিদা স্থির করা প্রয়োজন। অতএব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাৎসরিক উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণের প্রতি সর্বাঙ্গের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবস্তু বলিতে প্রধানতঃ চাউলকেই বুঝায়। এ রাজ্যে তিন শ্রেণীর চাউলই উল্লেখযোগ্য। সরকারী হিসাবের সাহায্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কোন শ্রেণীর চাউল কি পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ জানিতে পারি। নীচে ঐ হিসাব দেওয়া গেল:

১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন	
হাজার টন হিসাবে	
আউশ	৩৩৬
আমন	৩৫৫৯
বোরো	১৫
মোট	৩৯১০*

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০-৫১ সালে মোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার টন অথবা ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ২৫ হাজার মণ। চাউল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে আরও নানারূপ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গম, যব ও ভুট্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ রাজ্যে এই তিন প্রকার শস্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নীচের তালিকা হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইবে:

১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন (হাজার মণ হিসাবে)

গম	১১২৭
যব	৬৭৫
ভুট্টা	৬৪৮
	২৪৫০

দেখা যাইতেছে, সকল প্রকার খাদ্যবস্তুর সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বাৎসরিক পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ কোটি মণের মত।

ইহার পর আমাদের জনসংখ্যা ও প্রয়োজন নির্ণয় করিতে হইবে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ হইয়াছে। এই ২৪৮ কোটির মধ্যে শিশু, কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের লোক রহিয়াছে। উহা ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদিগের মধ্যে বিধবা এবং এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা দৈনিক একবার অন্নগ্রহণ করেন। এই কারণে মোট জনসংখ্যা হইতে প্রথমে আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা বাহির করিয়া তাহা হইতে বিধবা এবং অন্নাগ্নি যাহারা একাহারী তাহাদের সংখ্যা বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উহার পর ৫ বৎসরের শিশু হইতে ১৫ বৎসরবয়স্ক কিশোরগণের এবং ৫ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের সংখ্যা বাহির করিতে হইবে। জনসংখ্যা স্থির করিবার পর উহাদের চাহিদা নির্ণয় করা যাইবে।

মোট জনসংখ্যা	২ কোটি ৪৮ লক্ষ
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার	
শতকরা ৫২.২ জন হিসাবে	১,৪৬,৪১,৬০০
প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা একাহারীর সংখ্যা	
শতকরা ৮.৩ জন হিসাবে	২০,৫৮,৪০০
প্রাপ্তবয়স্ক একাহারীর সংখ্যা	
শতকরা ৬ জন হিসাবে	১৪,৮৮,০০০

দৈনিক দুই বার অন্নগ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্কের

মোট সংখ্যা ১,১০,২৫,২০০

৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা

জনসংখ্যার শতকরা ২৫.২ জন হিসাবে ৬২,৪২,৬০০

০ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা

জনসংখ্যার শতকরা ১৫.৫ জন হিসাবে ৩৮,৪৪,০০০

বিভিন্ন শ্রেণীর জনসংখ্যার হিসাব উপরের তালিকা হইতে অমী দেখিতে পাই। এক্ষণে উহাদের খাজের প্রয়োজন কি পরিমাণ তাহা স্থির করা যাক। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্ম গড়পড়তা দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক বা আধসের চাউল

যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্কদের ৮ ছটাক হইলে যাহারা এক বেলা অন্নগ্রহণ করেন তাহাদের ৪ ছটাক, ৫ হইতে ১৫ বৎসর-বয়স্কদের ৬ ছটাক এবং শিশুদের জন্য ২ ছটাক বণাদ করিলেই চলিবে। এইরূপ বরাদ্দের ফলে প্রাপ্তবয়স্ক, একাহারী, কিশোর এবং শিশুগণের মাথাপিছু বাৎসরিক খাজের চাহিদা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৩, ২৬, ৩৬ এবং ১৬ মণ। এখন হিসাব করিয়া আমরা দেখিতে পাইব পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক মোট খাদ্যশস্ত্রের প্রয়োজনের পরিমাণ কিরূপ। উহার পর বাৎসরিক উৎপাদন ও চাহিদার সামঞ্জস্য কবিলে দেখা যাইবে এ রাজ্য প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত না ঘাটতি অঞ্চল:

মাথাপিছু বাৎসরিক ৪৩ মণ হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের মোট প্রয়োজন ৪,২২,২৮,৪০০ মণ

"	"	২৬ " " একাহারীগণের	"	৭২,৭২,৪০০ "
"	"	৩৬ " " কিশোরগণের	"	৩,১০,২২,৪০০ "
"	"	১৬ " " শিশুগণের	"	৪৩,২৪,৫০০ "

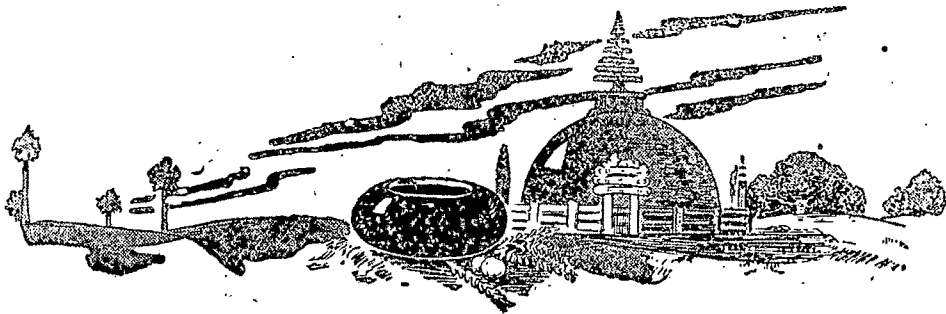
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রয়োজন ৮,৩৩,২৪,৭০০ মণ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১১ কোটি টনের কিছু অধিক এবং চাহিদা ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২৪ হাজার টন। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রতিবৎসর আমাদের রাজ্যে প্রায় ২৬ কোটি টন খাদ্যশস্ত্র উদ্বৃত্ত থাকে। অবশ্য বীজ প্রভৃতির জন্ম কিছু অংশ মোট উৎপাদন হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উহার পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে ধরিয়া ৫০ লক্ষ টন ধরিলেও পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক উদ্বৃত্ত ২ কোটি টন অবশ্যই থাকে।

উপরের সরকারী পরিসংখ্যানগুলি হইতে ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, এ রাজ্যে খাদ্যশস্ত্রের কোন ঘাটতি নাই। ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে অথচ বৎসরের পর বৎসর সরকারী ভাবে এ

রাজ্যকে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া প্রচার করিবার কারণ কি?

ঘাটতি অঞ্চল না হইলেও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবস্থা বহু বৎসর হইতে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ কি হইতে পারে? এই খাদ্যসঙ্কটের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী সরকারী অব্যবস্থা, জোতদার ও ব্যবসাদারগণের অতি-লোভ এবং কালোবাজারীদের প্রতি সরকারী উদাসীন্য। যে খাদ্যসঙ্কট বর্তমানে বাংলাকে ধ্বংসের দিকে টানিতেছে তাহা মনুষ্যকৃত সঙ্কট বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সরকার ও জনসাধারণ যদি সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ দমন এবং সমাজদ্রোহী ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে বর্তমান সঙ্কটের হাত হইতে নিস্তারলাভের আশা সূর্যপরাহত।



বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৯

অমলেন্দু খবর দিলে—একটা বড় রকমের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাকিস্থানে কাপড় আর চিনির অভাব বড় বেশী—পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওগুলি নাকি কালোবাজারীরা চালান দিচ্ছে পাকিস্থানে।

কেম—সীমানার পাহারা নেই—শুক-আপিসের কর্তার করছেন কি?

পাহারা আছে—তত কড়া নয়—আর শুক জাকিসার সবাই তো সাধু নয়। এ ছাড়া চোরাকারবারীরা যা কোশল করছে তাতে ধরাও নাকি মুশকিল।

একখানি কাগজ বার করে তার পাতাগুলি সামনে মেলে ধরলে অমলেন্দু। এই দেখ জলের ওপর ভাসছে যাত্রী-বোকাই নৌকো—জলের তলার দেখ চল আটকানো ট্রাকের মধ্যে রয়েছে নতুন কাপড়, নৌকার নীচে শিকল দিয়ে ঝোলানো ট্রাক দিবা জলের তলা দিয়ে হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে। আর এই দেখ ছবি—রেলগাড়ির ল্যাভেটরির মাথার জলের ট্যাঙ্ক—এতে জল নেই, আছে নতুন কাপড় বোকাই করা। দিবা জুড়লে ছোড়া ছোড়া ধুতি সাড়ি এর মধ্যে সাঝিরে রেখেছে। দেখ—গাড়ির তলার চাকার পাশের লোহার রডে ঝোলানো—বড় বড় বস্তা। এই দেখছ বোমটা দেওয়া মেয়েটি—কালের হঠপুঠি মেয়েটি নিয়ে এ সীমানা থেকে ও সীমানার যাচ্ছে—মাছমুখে ওর হঠপুঠি বোকা কাপড়ের বাঙল হয়ে যাচ্ছে—ভেয়ানি কত রোগা লোক সহসা মেঘবৃত্তিতে বেমানান হয়ে উঠছে। লুঙ্গির তলার—উরুতে কোমরে বুকে পিঠে জামার নীচের কোথায় না এই লুকোচুরি খেলা। চোখ এড়িয়ে এপার থেকে ওপারে গেলেই দশ বিশ টাকা লাভ।

প্রভাত বললে, এ তো সবই দেখছি ধরা পড়ে ছবিতে উঠেছে—তবু চলছে?

হঁ—কোথা থেকে কোথায় যায় জিনিষ তার সন্ধান

কিছু আমাদের গলিতেই পাওয়া যাবে।

কে—কে—?

কিন্তু তারা চুনোপুঁটি নয়—তাদের ধরতে গেলে জাল শক্ত হওয়া দরকার।

আমরা চেষ্টা করব। যদি কোটিপতিও কেউ থাকেন এর মধ্যে—

কোটিপতিদের সাহসই বেশী। স্ফোরণ তীর ঘেরে অনেককে খায়েল করাই তাদের রীতি। অমলেন্দু হাসল।

প্রভাত উত্তেজিত হয়ে বললে, সরকার নিশ্চয় এর ট্রেপ মেবে—কাগজে রোজ বেরুচ্ছে—দেশের, শত্রু চোরাকার-বারীদের ধরিয়ে দাও—

কিন্তু ধরবে কে? আইন কোথায়। আটায় তেঁতুল-বীচি আর নরম পাথরের গুড়ো; হাজার হাজার মণ ধরা পড়েছে—কিন্তু কেউ শান্তি পেলে কি না জানতে পারি নি। আইনের ফাঁক নাকি ওদের কাছাকাছি করতে পারছে না—নতুন আইন তৈরি হচ্ছে। শোন ভা হলো।

একদিন কাগজে দেখলাম—ওয়ুধের দোকানে ওয়ুধ কিনে ক্যাশমেরো চেয়ে মেবেন—মেরো না দেখে নিকটবর্তী পুলিশকে জানাবেন। আপনিও চোরাকারবারী দমনে অনাস্রাসে সহায়তা করতে পারেন যদি ভাষা মূল্য দিয়ে জিনিস নেন, আর ক্যাশ-মেরো দিতে বাধ্য করেন দোকানীকে।—ওয়ুধ কিনে মেরো চাইলাম, দিলে না। পুলিশকে জানালাম সে বললে, ধানার ইন্চার্জের কাছে যান। ইন্চার্জ বললে, আচ্ছা জিনিষটা রেখে যান—এনকোয়ারী করব। গীড়ালীড়িতে একটা ডায়েরিও লিখলে। বললে, আমার অফিসারকে জামাব—কিভাবে কেসটা টেক আপ করা যায়। দু'দিন পরে আসবেন। গিয়ে শুনলাম, কেসটা দায়ের করতে হবে আপনাকেই—আমরা সাক্ষী হিসাবে...বল দেখি তাই চার টাকার ওয়ুধ কিনে আদালত করা উকিল মোক্তার এসব গোয়াবে কি আমাদের মত গরীবের?

অমলেন্দুর কথাগুলি ভাববার মত বটে। যারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোক ব্যবসা বা চাকরি বা ছোটখাটো কাজ করে দিন গুজরণ করে তারা কেন পোহাতে যাবে এই বড়টি। এমনভেই তো দেখা যায়—পকেটমার ধরা পড়লে কিংবা কেউ ট্রাম বাস বা মোটর চাপা পড়লে সংযাত্রীরা সহজে আইনের আওতার আসতে চায় না। তাদের সাক্ষীর অভাবে কত হুজুরি যে চাপা পড়ে যায়। না—জনগণের স্বার্থের জন্য জনগণ কোনদিন সচেতন নয়। তাদের দুঃখপ্রকাশের অকল্পিত মত তাদের উদ্যোগের এবং নাগরিক স্বত্বরক্ষার বোধও যদি উগ্র হ'ত?

অমলেন্দু বললে, আমি অনেক ভেবেছি তাই—এর একটা মাত্র উপায় আছে, তবে সেটিও খুব ঐতিকর নয়।

এমন উপায়? প্রভাত হাসল।

অমলেন্দু বললে, একদিন ক্লাসে লেকচার শুনছিলাম, বিদেশ থেকে এসেছিলেন এক বিশ্বকল্যাণকামী। তিনি বলছিলেন, মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় মানুষকে নিয়ে। প্রাণি-

জগৎ বা পক্ষিজনগতেও একটু লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পাবে—পরম্পরের সহযোগিতায় জীবনধারণ স্তরের হয়, জীবন পরিপূর্ণ হয়। বাহ্যত কিছু প্রতিযোগিতা চোখে পড়লেও সহযোগিতা না থাকলে সৃষ্টির কোন অর্থই থাকে না।

প্রভাত বললে, ওকথা শুধু খ্রীষ্টানরাই বলেন নি, আমাদের শার্লোও—

নিশ্চয়। যারা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন—তারাও জানেন কাউকে বাদ দিয়ে—

তোমার কথাগুলিও উপদেশাত্মক মত ঠেকছে অমলেন্দু।

অমলেন্দু ঈশ্বর উত্তেজিত হয়ে বললে, হাঁ—কারণ আমার কারুর জন্ত ভাবি না—বড় বেনী সেলফ-সেন্টিভ। কোন কোন দেশের লোকে পোড়া চুরুটের টুকরো—ছেঁড়া কাগজ বা সামান্য জঞ্জালও পথের মাঝে ফেলে না—আবার কোন কোন দেশে আম বা কলা খেয়ে তার খোসা পথে ফেলে চলে যায় নির্দিকার ভাবে। আমার খাওয়ার সঙ্গে তোমার অধ-হানির যখন সম্পর্কই নেই—

ধাম—ধাম। যা নেই প্রকৃতিতে—তা এক দিনে চোখ রাঙিয়ে বা লাঠি পিটে—ঠিক করে দেওয়া যাবে না। সে চেষ্টা আমাদেরই করতে হবে।

কি করে করবে?

এস না—সমিতি যে গড়লাম—সেকি কতকগুলো নিয়ম-কাছন খাতায় টুকে রাখবার জন্তে? সেকি ব্রিজ খেলা—আর সন্দের সাহিত্যচর্চা কিংবা সৌখিন হুঃখমোচনের ছিটেফোঁটা দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্তে?

কথাটা ক্রমে হাড়িয়ে পড়ল।

এক দিন অমলেন্দুরা ক্লাবে বসে পরামর্শ করছে কোন উপায়ে এই দুর্নীতি রোধ করা যায়—এমন সময় শশী হাজরা এলেন সেখানে। তাঁকে দেখে প্রভাতেরা রীতিমত বিস্মিত হ'ল। এই কয়েক দিন আগে—ওঁরই এক কর্মচারীকে... কয়েক বস্তা চিনির জন্ত তারা যথেষ্ট অপমান করেছিল—শেষ পর্যন্ত কেসটা পুলিশের হাতে তুলেও দিয়েছে এরা, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। পুলিশ-ভদ্রন্তে ব্যাপারটা কতদূর অগ্রসর হ'ল—কিছুই জানতে পারা যায় নি। আটার পাথর-গুঁড়ো তেঁতুলবাঁচি—চালে কাঁকর মেশানোর ভদ্রন্তের মত ব্যাপারটি নেপথ্যেই চলছে। কাগজে এক দিন যে রিপোর্ট পড়ে যারুয় উত্তেজিত হয়—তার ফলাফলের জন্ত আরও কিছুদিন সে হয়ত অপেক্ষা করে—কিন্তু পৃথিবীতে ঘটনা তো ঐ একটাই নয়। জীবনধারণের কত সমস্যা কত দিকে টানছে মানুষের রক্তিকে, কাছেই বেশ কিছুদিন পরে সে কোতুল কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার ঠিকঠিকানা থাকে না। যারা মানুষের হর্বিসতার সুযোগ নিয়ে উপরে উঠেছে

তারা জানে মনস্তত্ত্বের এই খুজটি—তাই কখনও কখনও সত্ত উত্তেজনার বৃহত্তরলিকে ঘুম পাড়ানোর জন্তে দীর্ঘ নীরবতার দাওয়াই প্রয়োগ করে থাকে। অমলেন্দুরা আগে জানত না এসব তথ্য—আজকাল জানের পরিধি তাদের বিস্তৃত হচ্ছে।

শশী হাজরা লোকটি প্রিয়দর্শন না হলেও—হাডমুখ। সে হাসি কখনও ব্যবসায়ীমূলত ধূর্ততার চৌচের বাঁকা রেখার বাকি ফুটে ওঠে—কখনও শিশুমূলত কোতুকে হয় উজ্জ্বলিত। কথাগুলি তাঁর মিষ্ট—বাণু বাছা ছাড়া কাউকে সহোদন করেন না—সবাই তার বৈষ্ণববাহিত বিনয়ে সর্বদাই বিগলিত হয়ে আছেন। আধ পাঁকা আধ কাঁচা কদমছাঁচি চুল—খুঁক-খুঁকহীন গোলগাল ভরাট মুখ—নবর কান্তি—মেদে ধল-ধলে নয়—প্রোটিন ভিটামিনে লাবণ্যমুগ্ধ। গায়ে একটি হাতকাটা কতুয়া—অধিকাংশ দোকানীর মত আধময়লা নয়—আগে সেটা সংরূপ বা টুইলের ছিল—এখন ধকরে দাঁড়িয়েছে—মাথায় গান্ধী টুপিও একটি; টুপিতে ভিন রঙা ফ্যাগ। একখানা আনন্দবাজার আর একখানা বনুহাতিও প্রত্যহ নেন। বলেন, ছ'রকমের ছানা কাগজ না নিলে সবকিছু জানা যায় না। বড়বাড়ারের বাজার চকে—একদা একখানি ছোট ঘর ভাড়া করে ব্যবসায়ের পট্টা করেন—আজ তার আগাগো চার পাঁচখানি ঘরে সে ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যবসায় শুধু সেইখানেই সীমাবদ্ধ নয়—পাড়াতেও ছোট মুদিখানার দোকানটি আটা চাল চিনি কেরোসিন ভেলের রেশন নিয়ে কেঁপে উঠেছে। এই দোকানের চিনির কয়েকটি বস্তা নিশ্চিতি রাতের নীরবতায় হানাহুতি হবার কালেই ঘটেছিল বিপত্তি।

শশী হাজরা এসেই বললেন, এই যে বাবারা সব এইখানেই এসেছে—আমিও ভাবতে ভাবতে আসছি—সবাইকে এক জায়গায় পাব তো? চল—খ্রীহরির ইচ্ছায়...

অমলেন্দু অগ্রসর হয়ে বললে, আমাদের সবাইকে কি আপনার দরকার?

‘নিশ্চয়—না হলে ছুটতে ছুটতে আসছি কেন।’ অভ্যাস-বশতঃ হাজরা মশায়ের হাত ছুটি ছোঁড় করাই থাকে—অপরিস্রিত কেউ দেখলে ভাববে অজানা ক্রটিজনিত অপরাধে সদাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। একটু ভেবে বললেন কেন আসছি জান? শুনলাম—তোমরা একটি সমিতি গড়েছ—

অমলেন্দু ব্যঙ্গমেশান করে বললে, আজ শুনলেন?

না—আজ কেন শুনব। আমার দোকান থেকে যেদিন চিনির বস্তা পাচার হচ্ছিল—সেই দিনই শুনলাম... বুঝ উদ্ভব কাজ করেছে বাবা। তোমাদের মত ছেলেরা যদি পাড়া রক্ষা না করবে তো পাড়ার বাস করব কোন্ স্তরে? হরি হে—সবই তোমার ইচ্ছা। উদ্দেশ্যে যুক্ত কর উর্ধ্বে তুললেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ওই করেই দোকানটির দক্ষা সেরে

আনছিল—হতভাগা। একটি নয় বাবাজী—আরও আছে—
ছব কলা দিয়ে যে কালসাপ পুষছি—তা জানি, কিন্তু হাতে-
নাতে ধরতে পারি না বলে জবাব দিতেও বাধে। তাবি
ফয়ের জীব—ওকে যদি জবাব দিই—ওর পরিবার ছেলে-
মেয়ে থাকে কি? তাদের হুঃখে ফেলে আমি কেন নিমিত্তের
ভাগী হই। যাক—যা বলতে এসেছি শোন। তোমাদের
কাজ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি—গোবিন্দের ইচ্ছায় এই
মতিগতি তোমাদের বজায় থাক—তোমরা দুর্জনকে সাজা
দেবার ক্ষমতা লাভ কর।

প্রভাত হেসে বললে, কিন্তু হাজরা মশাই—হুঃখ যে এই
দুর্জনরা নিজেদের দুর্জন বলে স্বীকার করে না। তাঁদের
দুর্ভতির দায়ে আমরাই হয় তো সাজা পেয়ে যাব।

না—কখনও না। হাজরার কণ্ঠস্বর অভয় বাণীর পর্যায়ে
উন্নীত হ'ল। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে নয়। তোমাদের
সমিতিকে যতটুকু পারি সাহায্য করব। অবশ্য গতরে পারব
না—সে ক্ষমতা নেই, কিন্তু টাকার জুড়ে তোমরা ভেবো না—
আমার যথাসাধ্য—

কিন্তু এতে তো আপনারও বিপদ কম নয়?

বিপদ। কিছুক্ষণ বিষ্ময়ে চেয়ে থেকে হেসে উঠলেন
তিনি। হাঁ—বিপদ অনেক রকমের আছে। তবে এও
জানবেন—সংগে থাকলে আদেক রাতেও অর হয়—এ
বিবাস আমি রাখি। ব্যবসায়ীর বুলবন হ'ল সত্যতা—গোবিন্দের
ইচ্ছায় এই সত্যতা যদি বজায় রাখতে পারি কোন মিঞাকে
ভরাবার কিছু নেই আমার।

ফতুয়ার ছেব থেকে একটা লাল রঙের জাকজার ব্যাগ
বার করলেন হাজরা মশায়। পাকানো সূতের আলগা
কাঁস ধুলে তা থেকে বার করলেন একখানা একশো টাকার
নোট। নোটখানি এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও বর—আমাকে
তোমাদের সত্য করে নিও। বলেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন,
যদিও আমি ঘোরতর অসভ্য—লেখাপড়া জানি না।

প্রভাতরা বিস্মিত হ'ল। এটা প্রতীক্ষা নয় তো? হাজরা
মশায় কোন্ কোশলের জাল পাভবার জন্ত বদান্ততার অভিনয়
করছেন।

অমলেন্দু বললে, আমরা হুঃখিত হাজরা মশায় যে
আপনাকে সত্য করতে পারলাম না।

কেন? বিষ্ময়ের ঘোর কেটে মুখে তাঁর বেদনার ছায়া
গাঢ়তর হ'ল। এক মিনিট চুপ করে থেকে একট দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলে তিনি বললেন, বুকেছি—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ
না তোমরা? ভাবছ যার দোকান থেকে ব্র্যাকমার্কেটে
চিনি চলে যায়, যার কর্মচারীর নামে পুলিশে কেস দায়ের
করেছে তাকে কি করে...

প্রভাত বললে, সেটা সত্য নয় কি?

হাঁ—খুবই ভায়া কথা। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস কর বাবা—
সে কর্মচারীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—তাকে দূর
করে দিয়েছি দোকান থেকে। আর তোমরা বল তুহির
দায়ে তাকে জেল খাটিয়ে সাজা দেওয়াই। মরুক তার জী
পুত্র বুড়ো মা বাবা—তাদের জঘান্তরের কর্মফল ভোগ করুক
তারা—অসজ্জনের সাজা হোক।

সে যা ইচ্ছা করুন গে—আমরা আপনাকে নিতে পারলাম
না—এজন্ত হুঃখিত।

হাজরা মশায় সখেদে লুলাটে তর্জনী স্পর্শ করিয়ে
বললেন, সবই গোবিন্দের ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।
তবে তোমাদের এ ভুল একদিন ভাদবে বাবা—তখন বুঝবে
শুধু বাইরেটা দেখে মানুষের বিচার করা কত বড় ভুল।
আচ্ছা আসি।

তিনি চলে যেতেই শশাঙ্ক বললে, ভুল করলে প্রভাত—
টাকাটা নেওয়া আমাদের উচিত ছিল।

তুমি জান না শশাঙ্ক—এও এক রকমের ঘুষ। অমলেন্দু
প্রতিবাদ করলে।

ভূপতি বললে, কেন আমরা যদি সবলৈ ঠিক থাকি কিসের
ভয়? টাকাটাও বিশেষ দরকার।

হাঁ—টাকাটা সব সময়েই দরকার—সব কাজেও। সেই
জন্তই তো ছুনিয়ায় এত চোরাকারবার চলছে—আর এত
রকমের আইনকানুন গড়েও তাদের ঠেকাতে পারা যাচ্ছে
না। প্রভাত দৃঢ় স্বরে বললে।

ভূপতি বললে, তুমি একটা দিকই দেখেই প্রভাতদা—কিন্তু
দেখ ত দেখি টাকা ছাড়া কোন ভাল কাজ কি হয়েছে
পৃথিবীতে।

ওটা এক দিন ডিবেইট করার জন্ত থাকুক ভূপতি—আর
একটা সভা আহ্বান করা যাবে।

ভূপতি লজ্জিত মুখে বললে, যাই বল—এ কথা সবাই
স্বীকার করে।

আমরাও স্বীকার করি—তবে এই মুহূর্তে নয়। হাজরা
মশায়ের কেসটা শেষ হোক—টাকা নৈওয়ার বাধ্যবাধকতা
কাটলে পর কাউকেই বিমুখ করব না তাই।

২০

মনটার কি যেন অশ্রুতি লেগে রইল—কিছুই ভাল লাগছে
না। সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে নতুন করে সংগ্রাম সৃষ্টি—তাই
কি করছে মনের প্রশান্তিকে নষ্ট। এতে কার কতটুকু লাভ
প্রভাত জানে না—কিন্তু অকারণে শত্রুত্বি হচ্ছে। অস্তায়ের
বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বা যুদ্ধে মনের মাঝে যে আনন্দের উদ্ভব হয়
তাকে অস্বীকার করা যায় না। এ আনন্দে নিজেদের ধানিকটা
উঁচুতে মনে হয়। কর্তব্যের কঠিন দায়িত্ব বহন করে
মানুষের প্রশংসা অনায়াসে সঞ্চয় করা যায় পরম কষ্টের এই

হয়তো চরম পুরস্কার, তবু মন বলে—এও মিথ্যা। তোমার কাঁপানো গৌরবে পৃথিবী যদি পায়ের তলায় নামল—তুমি কি পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেন না। নাই থাকল যদি পৃথিবী তোমার মূল্য স্বীকার করবে কে? গৌরবে উপরে উঠে সবাইকে কাছে টানবে এ হুঁশা জগৎসৃষ্টির প্রত্যক্ষ থেকে মানুষের মনে আশ্রয় নিয়েছে; কিন্তু শাসন নয়—সেবার দ্বারা মানুষের সন্নিকটে পৌঁছানোর সহজ উপায়টি বার বার ভুলে যাও কেন? সৃষ্টির অহঙ্কারে প্রমত্ত না হলে কৃশা-আবিল দৃষ্টিতে তোমার জগৎ স্বরূপেই উদ্ভাসিত হ'ত। তুমি বুঝতে পারও উপরে কেউ নয়—কারও কৃতিত্বেও কারও মঙ্গল নয়—যে সার্থক হবার সাধনা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করে, পাওনার দর তাকে খালি রাখতেই হবে। সে ধরের অল্প পূরণ করার কৃতিত্ব তার নয়।

আসতে পারি কি তার? যুগ সঙ্কুচিত কণ্ঠ। প্রভাত বাইরে আসতেই ছেলেটি প্রাণের ভঙ্গীতে হাঁসে বুকে পড়ল। প্রভাত তার হাত ধরে বললে, থাক থাক, কিছু দরকার আছে তাই? ও তোমার নাম শুভব্রত না?

হাঁ। সবিনয়ে বললে ছেলেটি। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?

না কাজ আর কি—বেকুব ভাবছিলাম।

তবে থাক—ওবেলাই আসব। শুভব্রত ফেরবার উত্তোপ করছেই প্রভাত তার কাঁধের উপর হাত রাখলে। বললে, চল বলবে।

আপনার ক্ষতি হবে না?

ক্ষতি। প্রভাত হাসল।

এ জীবনে সদাই ঘটে কয়—ক্ষতি তবু হয় না কোনমতে। সত্যি রলেছেন।

আমি নয়—বলেছেন আমাদের কবি। স্বপ্নের সঙ্গে ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই—এর চেয়ে বড় আশ্বাস কেউ আমাদের দেন নি তাই। এস।

হুঁজনে ঘরে এসে বসল। ঘরের মধ্যে দেখবার কিছু নেই তবু শুভব্রত উৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালে। বর্ণহারা দেওয়ালে যে, ক'খানি ছবি টাঙানো আছে—স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের স্পর্শে তাদের দু-একখানির বিষয়বস্তু হুঁজোখ্য হয়ে উঠেছে এবং বাকিগুলিও অচিরে হুঁজোখ্য হয়ে উঠবে তার স্বচনা দেখা দিচ্ছে। বিবেকানন্দের পাগড়ী থেকে মাথা পর্যন্ত একটি সাদা দাগ নীচের দিকে নামছে—রবীন্দ্র-নাথের মুখখানি ঝাপসা হয়ে আসছে তাঁর শুভ আশ্রয় দৈর্ঘ্য উপর দিকে প্রসারিত হওয়ার জন্ত। বইয়ের সেলেক্টার কোন ক্রী নেই—বাখারির বুনের কাঁকে সাদা শুঁড়োর প্রলেপ—ঘুণ ধরেছে, আর তারি সামনে যে টিপসটি রয়েছে তার উপরের বাতিদামটার দুর্দশাও কম নয়। সেটা সত্তা আপানী টেবিল-

ল্যাম্প—পিতলের কলাই উঠে নীচের টিনটা আত্মপ্রকাশ করেছে। একধারে পাতা রয়েছে ছোট একখানি তক্তাপোষ তারই আধ-ময়লা চাদরের উপর হুঁজনে বসল।

প্রভাত বললে, কবিত্বের খোরাক এ ঘরের কোথাও পাবে না—

শুভব্রত মুহূর্তে বললে, যুগে যুগে সবকিছু বদলায়, কবিত্বের রসদও এক থাকে না।

প্রভাত বিস্মিত হয়ে বললে, তাই নাকি? এ যুগের রসদ কি?

বেশী করে লজ্জিত হ'ল শুভব্রত। বললে, আপনি যেন কিছু জানেন না। আপনার লেখা আমি পড়েছি।

প্রভাত বললে, হাঁ এক সময়ে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য ছিল ওর রসদ, আজ অন্ন-বস্ত্রের স্বচ্ছতা জাগছে ওর প্রাণ। অন্নচিন্তা চমৎকার। এ নিঃস্বপ্ন আজ খাটে না।

কিন্তু একি শুধু কান্না নয়? শুভব্রত জিজ্ঞাসা করলে।

কান্না।

হাঁ—কবিতা লিখে আমরা হাসতেও পারি—আবার কাঁদতেও পারি। মানে আমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারব না, তবে আমার মনে হয় কবিতা লেখার উপকরণ বহুলে যাওয়াতে উপভোগেও বাধা পড়ছে।

বুঝতে পারলাম না।

মানে—সবাই হুঃখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে হুঃখের কবিতা পড়বার সময়ই বা কই। আজকের জীবন মানুষকে সব সময়ে ভাঙনা করছে—খামলে পরে কোথায় কি যেন ক্ষতি হইবে যাবে। কিন্তু না থেমে ছুটতে ছুটতে—

প্রভাত হেসে বললে, তবু আমরা কবিতা লিখি এবং পড়ি আর শুনিও। শুনে শুনে আমাদের অল্পকৃতি হুঃখ বা আনন্দে প্রবৃত্ত হয়। আমরা উপভোগ করি বৈকি শুভব্রত।

শুভব্রত বললে, এ লেখার কোন সার্থকতা আছে?

সে উত্তর নিজেই আশা করি পেরেছে। নালে তুমিই বা কবিতা লিখবে কেন। সৃষ্টিটা এমন অদ্ভুত যে, যে যা চায় না তাকে তাই করতে হয়। আনন্দ সব ক্রিনিসের বীজের মত—সুখেও সে আছে, দুঃখেও আছে। কৈ বার কয় তোমার খাতা।

পড়তে পড়তে শুভব্রতের সন্ধ্যা কেটে গেল। গলার সুরে কম্পন জাগল—উজ্জ্বল বা আবোগ তাকে ঠেলে নিয়ে চলল মর্ত্য থেকে কল্প-চারণায়। সে লোকে পৃথিবী রইল পায়ের তলায়—হুঃখ রইল শিথিলে—গ্রহনক্ষত্রেরা দ্যুতিময় দেহ নিয়ে তার চারিধারে আনন্দ-রাশি ছড়াতে লাগল।

সুখ-দুঃখের সাগর পারতে হুঃখ তরঙ্গ দলে জীবনের ব্যথা জীবন-শিল্পী সূটার যে অবহেলে। তোমার আমার অতি সাধারণ জীবনের ব্যথা নয়, নিখিল-মানস ধ্যানলোকে যার জন্ম এবং লয়।

বহু—তোমার বেদনা আমার মর্মে রহিল লাগি
উদয় অরুণ দেবিব বলিয়া সুদীর্ঘ নিশি কাগি।

শিশিরে গলিয়া হুঃখের মেঘ নদীতে নামেও যদি
রূপালী ঢেউয়েতে বন্দী অরুণ ফিরে দিবে হারানিধি;
ভৈল টানিয়া সলিতার মুখে অগ্নি উজ্জল হয়,
দহনের কালে ভিমিরে লেখে সে আপনার পরিচয়।

মাঝের ডাকে স্বপ্ন-জগৎ থেকে বিচ্যুত হ'ল প্রভাত।
অপ্রতিভ শুভ্রত ভাড়াভাড়ি বাতা বন্ধ করে বললে, মিছিমিছি
আপনার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম।

প্রভাত হেসে বললে, সময় তো নষ্ট হবার জুটেই।

হুঃখের বাইরে এল। শুভ্রত হাত তুলে নমস্কার করতেই
প্রভাত তার হাত চেপে ধরলে। কোমল হাত—ওর মুখের
মতই সুন্দর। স্পর্শে আত্মীয়তার স্রব বেজে উঠল। যেন অথ-
জন্মান্তরের চেনা মানুষ—স্নান করে পর বসে ব্যবধান সৃষ্টি করতেও
সঙ্কোচ বোধ হয়।

শুভ্রত অকুণ্ট হ'ল এই স্পর্শে। বললে, একদিন আসবেন
আমাদের বাড়ীতে?

প্রভাতের মুখে ছায়া নামল—বললে, কিন্তু ওই বাড়ীটাই
তো তোমাদের?

কয়েকদিন আগেকার ঘটনা শুভ্রতের স্মৃতিপথে এল।
বুঝলে ও-বাড়ীতে পা দেবার সঙ্কোচ কেন প্রভাতের। সে
মাথা নামিয়ে উত্তর দিলে, হাঁ—ওই বাড়ীটাই। অবশ্য মেজ-
ছোঁটারশাইর সঙ্গে পার্টিশন হয়ে গেছে। বলতে বলতে লজ্জার
ওর স্রগৌর মুখখানি লাল হয়ে উঠল।

প্রভাত ভাড়াভাড়ি তার পিঠি চাপড়ে বললে, আচ্ছা বাব।
আমি এসে ডেকে নিলে বাব আপনাকে। কাল আসব?
এসো।

প্রভাত বাড়ী ঢুকতেই অনন্ত বললেন, আবার ওর সঙ্গে
মাথামাথি কেন—ও পাট তো একদম শেষ করেই দিয়েছে।

প্রভাত বুঝতে পারলে না—পিতা এভাবে বক্তোক্তি
করছেন কেন।

অনন্ত বললেন, যাও তেল মেখে নেয়ে নাও, আজ আমাদের
আপিসে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে আসবে।

প্রভাত যুহু করে বললে, চাকরি আমি করব না।

অনন্ত সহসা চটে উঠলেন, তবে কি লাটসারেবি করবে?

না—লাট-সারেবরাও বেশী দিন এখানে থাকছেন না।

অনন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তুই ভেবেছিস কি বলত?
তোকে যে এতদিন লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেষ্টা
করছি সে কি কথার অব্যাহতি হবি বলে? আমাদের অবস্থা
তুই বুঝবি না—কি করে সংসার চলে তা কি কোন দিন
জানতে চাইবি না?

প্রভাত বললে, বাবা, সংসার যে করে চলে সে জানি—

কিন্তু সংসারের মধ্যে আমাকে নষ্ট করে দেবার জুটই কি
সর্বস্বান্ত হয়ে লেখাপড়া লেখাচ্ছেন?

তার কথা আমি বুঝতে পারি না প্রভাত। তুই বড়
ছেলে—সংসারের অবলম্বন। তোকে লেখাপড়া লেখাচ্ছি
বেশী করে উপার্জন করতে পারবি বলে—আমাদের মত
ডাইনে আনতে বায়ে কুলোর না গোছ সংসার চালানোর
জুটে নয়।

কিন্তু চাকরি করে এম চেয়ে ভাল সংসার চলে না বাবা।
আর চাকরিতে খুব বেশী লেখাপড়ার দরকারই বা কি।

সে বুঝি আপিসে চুকে। সারেবের সঙ্গে হরদম ইংরেজী
চালাতে পারি, কিন্তু একটা নোট দিতে গেলে কলম ভেঙ্গে
যায়। কত বড় বড় বিষয় মাথাতেই ঢোকে না। ওরে
আগেকার দিন আর নেই যে ইংরেজ তার বলে কাজ চালিয়ে
দেবে।

একটা বছর আমাকে মাপ করবেন বাবা—আমি চেষ্টা
করে দেখব—চাকরি ছাড়া আমরা দাঁড়াতে পারি কিনা।

চাকরি ছাড়া করবি কি—ব্যবসা? সে পুঁজি আছে
তোর?

ব্যবসার কথা ত ভাবছি না আমি—

তবে কবিতাপাঠ করে সংসার চালাবে বুঝি?

প্রভাত ভাড়াভাড়ি সরে এল সেখান থেকে। বাবা অভ্যস্ত
উত্তেজিত হয়েছেন। উত্তেজনা বাড়লে ওঁর লম্বুগুরু জ্ঞান
থাকে না—যা মুখে আসে বলেন। হুঃখা মায়ের চেয়ে তার
বাধা বড় ভয়ানক। এমনই কল্লোলকের পৃথিবী কুৎসিত হয়ে
উঠবে। অনবস্তর কুজুতার কুৎসিত নয়—শালীনতা ও সন্ত্রম-
বোধ-মুক্ত মানুষের নির্লজ্জ আচরণে কুৎসিত। সৃষ্টির আনন্দ
মুহুর্তে বিধিয়ে ওঠে—যখনই স্বাধের উলঙ্গ প্রকাশ দৃষ্টিকে
আঘাত করে। মনে হয় সংসারে জীবনধারণের মত কদম্বা
ছিনিস আর নেই। এখানে স্নেহ-ভালবাসার বেসাতি নিয়ে
সবাই চলাফেরা করছে।

চলতে চলতে কখন সে এসে পড়েছে দীপাদের বাড়ীর
সামনে।...কখন যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনিমেয় তার হাত
ধরে টানছে, বলছে—এখনও চোখে তোর কবিতার ঘোর
লেগে রয়েছে যে। এত ডাকলাম দোভলার জানালা থেকে
একবার মুখ তুলে চাইলি না পর্যন্ত।

অনিমেয়কে অহুসরণ করে প্রভাত গেল—ফিকে নীলরঙা
বসবার ঘরে—একবারে তার বিলাতী ব্রোকেডে মোড়া সুদৃঢ়
সোফা—কোচ—অঙা ঘায়ে ঢাকনাখোলা সুরহং অর্গান।
মাঝখানে পালিশ করা টেবিলে মোরাদাবাদী ফুলদারীতে
গোলাপ আর গাঁদার ভোড়া—মাথার উপর সাদা স্নেডের পাখা
—আর লাল কাহুয়ে বিজলী বালব যেন লাল পাপড়ীর
সুদৃঢ় একটা ফুল—সাদা কোরকটিকে সম্বন্ধে ঢেকে রেখেছে

তার বুকের মধ্যে। দেওয়ালের ছবিগুলিতে এখনও শুকনো ফুলের মালা জড়ানো—স্বাধীনতা দিনের ভিনরঙা নিশান—তাও ফুলে নেওয়া হয় নি। কেন ফুলে নেবে? ওদের স্বাধীনতা তো একটি দিনের নয়—প্রতিদিনে তাকে চেবে চেবে উপভোগ করছে ওরা। এই করে বলে প্রতিদিনই ভাবতে পারা যায়—আমরা স্বাধীন স্বাধীন। রাষ্ট্র কিংবা সমাজ—কিংবা সংসার—কোনকিছুর অন্তরালে শৃঙ্খল-বন্ধার প্রভি-গোচর হবে না এই করে বলে। যে ভয় যে সমস্ত প্রভাত-দের গৃহসীমানার যখন তখন ঝড় তুলছে—এই গৃহ সেই পরিধির বাইরে।

প্রভাতের গাভীরা দীপাকে আঘাত করল। সে বললে, আজকাল বড় বেশী গভীর হয়ে যাচ্ছেন প্রভাত-দা—শেষ-কালে না দার্শনিক হয়ে পড়েন।

প্রভাত উত্তর দিলে, বয়স বাড়লে দর্শনের পুঁজিও বাড়ে, দার্শনিক হওয়া আশ্চর্য্য কি।

উক্তিটা বেহুঁরো লাগল। দীপা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, আচ্ছা প্রভাত-দা—এবার হাফিশে জাহাঙ্গির হবে না? কেমন হবে না?

আমরা তো স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম—তাই বলছি।

সত্যিই কি স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা?

বাঃ রে—পাইনি ত ব্রিটিশ এদেশ ছেড়ে যাচ্ছে কেন? এক বছর পরে দেখবেন—ওদের একটি সৈন্তও এদেশে থাকবে না।

তাই নাকি। প্রভাত হো হো করে হেসে উঠল।

দীপা ক্ষুর কণ্ঠে বললে, কাগজে তা হলে মিথ্যে লিখেছে?

না না, মিথ্যে লিখবে কেন। প্রভাত হাসতে হাসতে

বললে, তবে রাষ্ট্র চালানোর জন্যে ওদের রীতিনীতি, আইন কাছন ভাষা—

অনিমেঘ বললে, তুই কি রাতারাতি সব মুছে ফেলতে চাস?

আমরা যা চাই—তা পাই কি? আমরা সবকিছুর জন্যে মূল্য দিয়েছি—তবু এখনও শোষণ হ'ল না।

প্রভাত উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল।

দীপা আর অনিমেঘ দু'জনেই চমকে উঠল। এমন তিক্ত কর্কশ হাসিও হাসতে পারে প্রভাত।

সত্যি এর পর আলাপ জমল না। দীপার কৌতূহল ভিষিত হয়ে এল—অনিমেঘ অন্যমনস্ক হবার ভান করলে। প্রভাতের এই ধরনের হাসিকে ওরা ভয় করে।

দীপার মনে পড়ল আর এক দিনের কথা। যেদিন প্রাইভেট টিউশানি নিতে প্রভাতকে ও বারণ করেছিল—তার পরের দিনের কথা।...

সেদিন সকালে প্রভাত এ বাড়ীতে আসে নি। সন্ধ্যার মুখে দীপাই যেন ওকে বরষা পথের মাঝে। বলেছিল—গেলেন না যে সকালবেলা। ভাবলেন বুঝি কালকের ব্যাপারটা নিয়ে না জানি কি কাণ্ডটাই বাধবে।

বুঝলাম—ম্যানেন্ড করে নিয়েছ তুমি?

আপনি ত ভেবেছিলেন পারব না।

অকস্মাৎ হেসে উঠেছিল প্রভাত। এমন উচ্চ আর কর্কশ হাসি। সে ধরনিত দীপার আত্মতৃপ্তি ধান ধান হয়ে ভেঙে গিয়েছিল। কথাটা কি আত্মপৌরবের মত শোনাল। ব্যাপারটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি দীপা। শুধু মনে হয়েছিল প্রভাতের মিষ্ট স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে।

এর পর দিনকয়েক প্রভাত তাদের বাড়ীতে আসে নি। যেদিন বাড়ীতে এসেছিল সেদিনও কথোপকথনের ঝারাই ছিল সংক্ষিপ্ত—বাক্য। হঠাৎ কিছু না বলে ও চায়ের আসর ত্যাগ করেছিল।

আজও হঠাৎ হাসি ঝামিরে প্রভাত বললে, আচ্ছা আসি।

প্রভাতের অবকাশ না দিয়ে ও বার হয়ে গেল।

দীপা বললে, ব্যাপার কি ছোড়না?

অনিমেঘ বললে, বুঝতে পারলাম না। ও নাকি গড়তে চায়—কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। তার জন্যে ওর মেজাজ খিটখিটে হয়েছে।

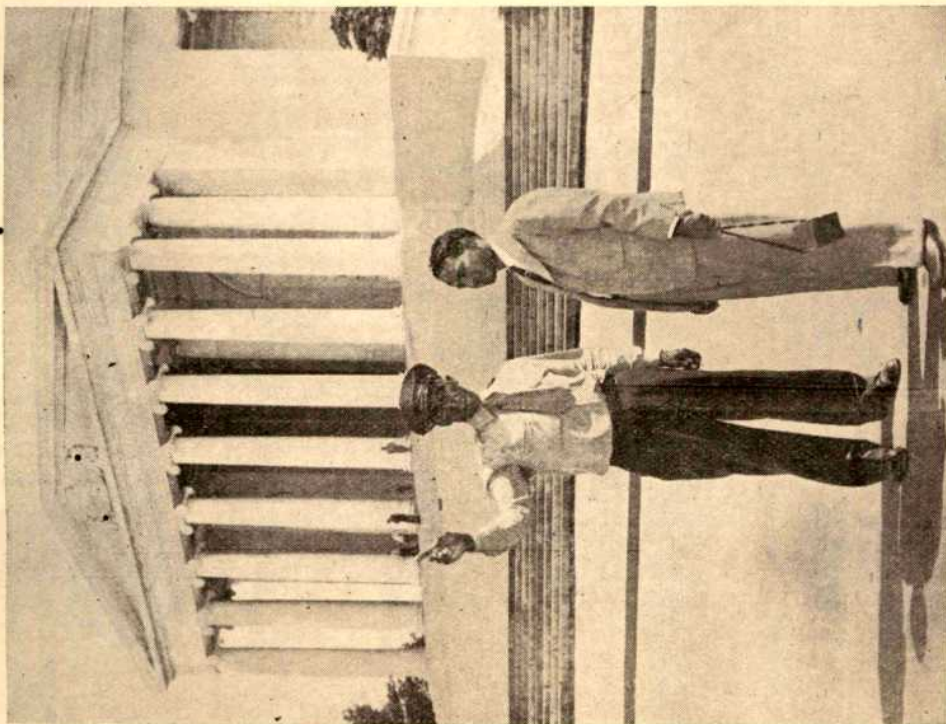
কেন?

কেন—তুই জানিস না?

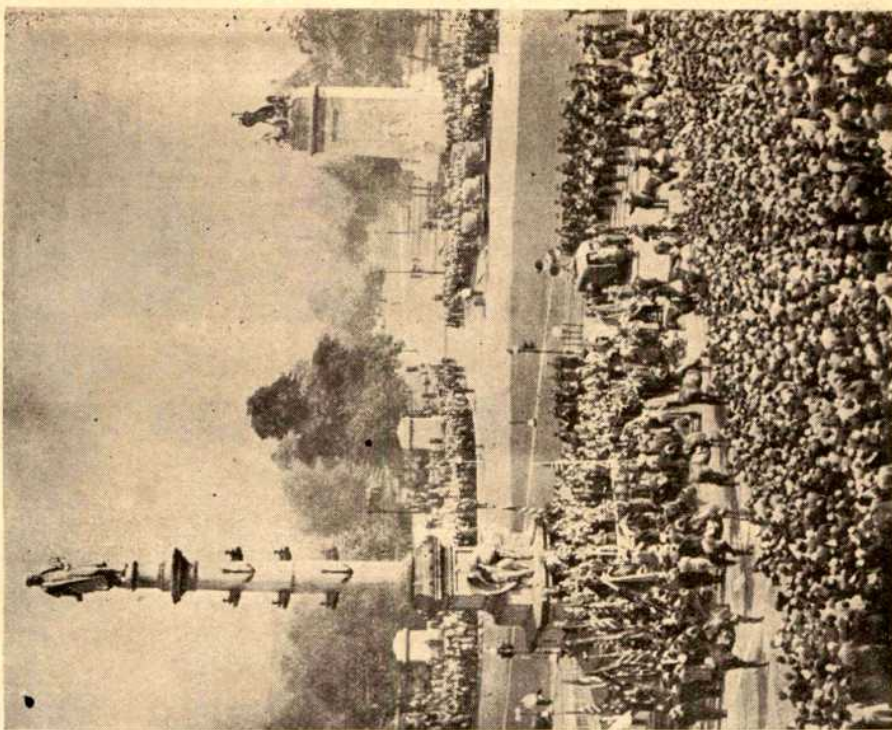
ওঃ—দীপা লজ্জিত হয়ে মুখ ফেরালে।

•(ক্রমশঃ)





ওয়াশিংটনে টমাস জেকারসন শ্রুতি-সৌর পরিদর্শন-রত ভারতীয়
'সেবার অফিসার' পান্থ



আমেরিকার নিউইর্কে কলকাতার স্বাভিভক্তের পারদে দেশ কলকাতা দিবস উদ্‌যাপন



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ম্যাসাচুসেট্‌স



সিউলের পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আনীত চাল বিতরণ

হলদীঘাটের যুদ্ধ

অধ্যাপক শ্রীনিরদভূষণ রায়

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেবার দেশ। বোম্বাই শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকে এই রাজ্য কোটা হইতে দুদারপুর, তথা হইতে সিরোহী এবং সিরোহী হইতে বিওয়ার পর্যন্ত, দৈর্ঘ্যে আনুমানিক ১৫০ মাইল ও প্রস্থে ১০০ মাইল বিস্তৃত ছিল। আরাবলী ও সাতপুরা পর্বতমালা এবং ইহাদের পাখাপ্রাখা ইহাকে যেমন সুরক্ষিত, তেমনই কল্পরময় ও অতর্কিত করিয়া রাখিয়াছে। মেবারবাসীদিগকে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা শক্ত উৎপাদন করিতে হয়। ইহারা যেমন বলিষ্ঠ ও বীর্যবান তেমনই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং নির্ভীক। এই শিশোদীর্ঘ রাজপুত-দিগের বীরত্বকাহিনীর এক অধ্যায় বর্ণনা করিতেছি।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের চারি বৎসর পর (১৫৬০) আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ক্রমে মালব, মেহতলা ও গড়গোনা (১৫৬২) জয় করিয়া তিনি চিতোর দুর্গ অবগোণ করেন (১৫৬৭)। এই চিতোর জয় (১৫৬৮, ২৩ ফেব্রুয়ারী) ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আকবর দুর্ভেদ্য রহস্যর (রণভূক্তপুর) ও কালিঙ্গর দুর্গ অধিকার করিয়া (১৫৬৮) এবং সারবার-বিকানীর-কংসলম্বীর রাজ্যকে মির্জের অধীনে আনয়ন করিয়া ১৫৭৪ সালে সমগ্র রাজ্যস্থানে আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। একমাত্র মেবারের রাণা প্রতাপসিংহই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হন।

ডিজেন্ট এ. সিং আকবর-প্রতাপ সংঘর্ষের কারণ নির্ণয় করিতে পিঙ্গা লিখিয়াছেন :

"Pratap's patriotism was his offence. Akbar had won over most of the Rajput chiefs by his astute policy and could not endure the independent attitude assumed by the Rana who must be broken if he would not bend like his fellows."

বস্তুত: বঙ্গদেশপ্রীতিই প্রতাপের কাল হইয়াছিল। নিজের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিকোশলে আকবর রাজপুতানার সুপতিদের মধ্যে অনেককেই বশীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ তাঁহাদের মত তাঁহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাভাবিক স্বাধীনতা চলিতে থাকার আকবর তাঁহার নজির চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করেন। পণ্ডিতপ্রবর গৌরীশঙ্কর হীরচাঁদ ওয়া মন্তব্য করিয়াছেন, প্রতাপ মানসিংহের সহিত একত্র পানাহার না করিয়া তাহাকে অপমানিত করার আকবর এত ক্ষুব্ধ হন যে, রাণাকে শাস্তা করিবার জন্য কচ্ছবাহ সেনাপতিকেই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।^২

হুইট মন্তব্যেই আকবরের ব্যক্তিগত রাগ বা ক্ষোভকেই যুদ্ধের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজ্য জয় করা ও রাজবন্দ।

হফ্জ্ আলিমিয়া বসিরত বাদশাহ্,

হারুমুন্নাহ্ নরবন্দ আলিমে দিগর।

অর্থাৎ, সাতটি রাজ্য জয় করিতে পারিলেও বাদশাহদিগের অল্প রাজ্য জয়ের বাসনা প্রবল হয়। ইহা ভ্রাম্যসি ৭৭। দিল্লী-মেবার যুদ্ধের ইহা অল্পতম কারণ বটে, কিন্তু স্পেনের দ্বিতীয় 'ফিলিপ' বা প্রতিহিংসাপরাধ প্রতীয়মান হওয়ার আইডানের ভাষা আকবর কেবল নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য লাদারিত হিঙ্গেন না। ভারতের বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণের লোক-দিগকে একত্ববদ্ধে এখিত করিয়া সকলকে রাজকর্মে সমান অধিকার দিয়া তিনি একত্বাভীরতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি চাহিয়াছিলেন। আর এই মহান আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে তিনি কত যত্ন ও লোভনাই না মাঝার পাতিয়া লইয়াছিলেন। সুগম্য পর আশ্রা প্রানাদে করিবার পথে সত্রাটি আকবর যেদিন পীর খালা হুইলুদীল চিন্তী সাহেবের তলমগান-রক্ত এক হল ককিরকে দেখিতে পান সেই দিনটি তাঁর জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসরই তিনি আদেহ-রাজ্য ভাবমল্লের কতায় লিখিত পরিচয়গ্রন্থে অবস্থ হন। এক্ষণে বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সত্রাটি আকবর সাম্রাজ্যিক ভেদ-বুদ্ধিপ্রসূত তীর্থ-কর্ম ও জিজিয়া করের বিলোপসাধন দ্বারা সকল প্রজাকে একই রাজকীয় বিধান ও শাসন ব্যবস্থায় অধীনে আনয়ন করিয়া উদারতা এবং অসাম্রাজ্যিক মনো-ভাবে পরিচয় প্রদান করেন। প্রতাপ ও অজ্ঞাত সুপতিদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বিলোপ ব্যতীত আকবরের পক্ষে নিজেদের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। ইহাই দিল্লী-মেবার সংঘর্ষের প্রকৃত বা সুব্য কারণ।

আকবর মেবারাধিপত্যকে কুটনীতিবলে নিজের অধীনে আনিবার জন্য চেষ্টায় লিপ্ত করেন নাই। ১৫৭৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মানসিংহকে শুজরাট হইতে উদয়পুরের পথে আগ্রার দ্বিগিয়া যাঁতে আদেশ করেন।^৩ মেবারে তখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হইয়াছে। রাণা উদয়ের বর্গারোহণের পর (১৫৭২) প্রতাপ তাঁহার কনিষ্ঠ জাতা জগমালকে বিভাজিত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আর জগমাল শাহী স্ফূপায় জাগির পাইয়া জাহাজ-

^১ V. A. Smith: Akbar, the Great Mogul, p. 161.

^২ রাজপুতনা-কা-ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩৯।

^৩ আকবরনামা, মূলগ্রন্থ, এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৪০।

ডাকিয়া দ্বিজাঙ্গী করিলেন, “আচ্ছা, সত্যি কি আপনি যুদ্ধে যাইতে চান?” বদায়ুনী সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, “হাঁ ছব্বর, এই যে আমার কালো ‘মহাছেন’ (দাড়ী), তাহা আপনার খেদমতে রঞ্জিত করিতে চাই” এবং নিম্নোক্ত কবিতাটি আরতি করিলেন :

কায়ে তু মখাতরা আহত্ খাহম্ করদন্ ।

তা ছোরখ্ কুনম্ রোয়ে আজ তু ইয়া গরহন্ ।

অর্থাৎ, “আপনার সেবার কাজটিতে বিপদ থাকে থাকুক, হয়ত আমার যুগ্মগল রক্তাভ, না হয় গ্রীবা রক্তাশ্রুত হইবে।” বদায়ুনীর ভক্তিতে বাদশাহ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, “ইন্সা আল্লাতাল্লাহ্ আপনি খোশ খবর লইয়া ফিরিয়া আসিবেন।” এই বলিয়া ‘ফাতেহা’ পড়িতে পড়িতে বাদশাহ অঞ্চালনা করিতে উত্তত হইলেন। আনন্দের আতিশয্যে বদায়ুনী কদম্ববৃত্তি করিবার জন্য বাদশাহের পদকমলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন, আর বাদশাহ রেকাবস্থিত পা উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া এক অঞ্জলি আশবকি ইমাম সাহেবের হাতে ঢালিয়া দিলেন। বদায়ুনী বিদায় পাইয়া ‘জ্বেহাদী’ দলের সহিত মেবার অভিযুগ্মে যাত্রা করিলেন। ১১।

শাহী স্কোডের মণ্ডলগড় আগমন-সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রতাপ জমভূমি রক্ষাকল্পে তৎপর হইলেন। পিতৃপুরুষদিগের পূণ্যপাদম্পর্শে পুত্র মেবারের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল তাঁহার নিকট পরিজ্ঞ। মেবারই ছিল তাঁহার সকল স্বর্গ, কর্ষ, চিন্তা ও ধ্যানের মূলে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বের মেবার দিল্লীর সমকক্ষ ছিল। রাণা সঙ্গ ভারতের রাজমুহুর্ত মন্তকে ধারণ করিবার উদ্দেশে সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও বাবর বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ও নানা বিপর্যয়ের ফলে রাণা উদয়ের আমলে মেবার এক ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়। কি অর্থ-সামর্থ্যে কি লোকবলে শাহী পক্ষের তুলনায় তদানীন্তন মেবার ছিল নগণ্য। তাই প্রবল শত্রুপক্ষের আক্রমণকে কি উপায়ে স্তম্ভভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রতাপ তাঁহার আশ্রিত রাজা ও ভৌমিকদিগকে এক মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করেন। সর্বসম্মতিক্রমে ১২ ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, তাহাদিগকে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে মেবারের গিরিকন্দরের সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে মানসিংহ মণ্ডলগড় হইতে যাত্রা করিয়া মোহী-এম হইয়া প্রতাপের শক্তিকে গোপুণ্যে হুগাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র ছয় হাজার সৈন্য।

জয়লাভীর্ণ হুগম পার্শ্ব্য প্রদেশ ‘তুলুঘমা’ বা চক্রবাহের অল্পপযোগী মনে করিয়া স্কোশলী সেনাপতি অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ মেবারসিংহের বিবরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপ গোপুণ্যে অবস্থান করিয়া কচ্ছবাহ সেনাপতির পতিবিশি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, প্রতাপ এমন গোড়া ও স্বাক্ষাত্যাত্মিক ছিলেন যে, তিনি মানসিংহের সহিত কেবল পানাহারে বিরক্ত হন নাই পরন্তু যবনের সঙ্গে যিনি আত্মীয়ভাত্যজে আবদ্ধ তাঁহার সংস্রব অতৃষ্ণ মনে হওয়াতে তিনি উদয়সাগরের তীরে যে স্থানে মানসিংহকে ভোজ্যবস্তুর পরিবেশন করা হইয়াছিল সেই স্থানটি ধ্বনন করাইয়া সেখানে গদাধূল সিকনের ব্যবস্থা করেন এবং “আকবর তাঁহার ফুকা” এই গালি দিয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। “রাজ-প্রশস্তি মহাকাব্য” ও “জয়সিংহ-চরিতে” এই উক্তির উল্লেখ নাই, পরন্তু মেবার রাণাদের রাজচ্ছত্রতলে যে মুসলমান রাজারা, বাজবাহাহর, গোলন্দাজ অধিনায়ক ইসমাইল ১৩ এবং শুররাজবংশীয় হেকিম খাঁ শূর প্রভৃতি রাজ্যচ্যুত মুসলমান রাজারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা অবিস্মারিত সত্য। যদি তাঁহাদের অবস্থিতিতে ও দানাপাণি গ্রহণে মেবারের পুত্র আবহাওয়া কলুষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কচ্ছবাহ সেনাপতির অনগ্রহণে কি করিয়া উদয়-সাগরের তীর দূষিত হয়? স্ব স্ব চৌকায় স্ব-পাকভোজী রাজপুত চারুগণের মস্তিষ্কেই যে এই ধারণার কলন গজাইয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। হলদীখাট রণাঙ্গনে যাহারা প্রতাপের দৃঢ় জীবন পণ করিয়া লড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হেকিম খাঁ শূর ছিলেন অগ্রগণ্য। আর তিনি রাণার এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, সৈন্যদের এক ভাগের কর্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে র্ত্ত হয়।

তখন জুন মাস ১৪ প্রথম রৌদ্র-দীপ্ত রাজস্থান তপ্ত কর্তাহার জায় উত্তপ্ত। পার্শ্ব্য নদী-নিকরীণী তখনও বিস্তৃত;

১৩ আকবরনামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১৯

১৪ আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড। পৃ. ১৭৪

তিন জন ঐতিহাসিক কর্তৃক রচিত একটি কলেজপাঠ্য পুস্তকে এই যুদ্ধের তারিখ এপ্রিল মাসে দেওয়া হইয়াছে। আর “Pratap was defeated”—এই এক কথায় মেবারাধিপতির সংকার করা হইয়াছে। ভিজেন্ট এ. শিখ বলিয়াছেন, “The imperialists narrowly escaped suffering a total defeat.”—Akbar, the Great Mogul. পৃ. ১৫৩।

আবুল কজলের মতে এক প্রহর বেলায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু মেবারস্থিত জগদীশ মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে ইহা প্রাতঃকালে শুরু হয়।

তুগাওরগঞ্জ পর্যন্ত গঙ্গা ক্রক। এই নিদাক্রণ গ্রীষ্মকালে ১৫৭৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি মানসিংহ গোণ্ডা দুর্গের অনতিদূরে বনাস নদীর তীরে অবস্থিত ধমনোর গ্রামে পৌঁছিলেন।^{১৫} প্রতাপ কালবিলম্ব না করিয়া তাহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত কচ্ছবাহ শিবির হইতে তিন মাইল দূরে হলদীঘাট গিরিসঙ্কটে মাত্র তিন হাজার সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ পরিচালনার ভার রাখিলেন নিজ হস্তে, অল্প ভাগ দিলেন হেকিম খাঁর উপর।

অপরপক্ষে মানসিংহ সৈন্য-সমাবেশ করিলেন পক্ষীর আকারে। এই পক্ষীর দ্বার আকৃতিবিশিষ্ট বাহিনীর চক্রে ছিল সৈয়দ হাসিম বারহার অধীনে একদল সৈন্য, মস্তকে জগন্নাথ কচ্ছবা এবং আসফ খাঁর অধীনে অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক সৈন্য; পৃষ্ঠে মানসিংহ স্বয়ং, আর দক্ষিণ পক্ষে সৈয়দ আহম্মদ বারহা ও বাম পক্ষে মোজা কাজি খাঁ, এবং পুছদেশে (rearguard) মেহতর খাঁ। ১৮ই জুন (?) তারিখ উভয় পক্ষ হলদীঘাটের প্রান্তরে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল।^{১৬} প্রথমে আক্রমণ সৈন্যাব্যাক হেকিম খাঁ বিদ্যুৎপথে পশ্চিম দিক হইতে শাহী^{১৭} কোজের চক্রে বা অগ্রগামী দল দুইটির উপর আগতি হইলেন। স্থানটি ছিল বহুর ও কটকাকীর্ণ। তাই বিস্তৃত দল দুইটি একত্র সম্মিলিত হইতে না পারিয়া শত্রুসেনার আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সাহায্যার্থ শাহী মূলবাহিনীর অধ্যক্ষ মানসিংহ দলবলসহ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হেকিম খাঁ জর্জরভাঙারে ঘুরিয়া প্রচণ্ড আঘাতে এই অংশের বাম পার্শ্ব ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অন্তোপায় হইয়া এই পার্শ্বের সৈন্যাব্যাক রাজা লোহরগ স্বপক্ষীয় অগ্রগামী দলের সাহায্যে করিয়া আশ্রয়ের জন্ত দক্ষিণ পার্শ্বে আহম্মদ খাঁ বারহার অধীনস্থ সৈন্যদলের দিকে ধাবিত হন। তখন বাবমান প্রতাপসিংহের পক্ষীয় রাজপুত ও পলায়নপর (লোহরগের) অধীনস্থ রাজপুতদের মধ্যে ভারতম্য করা কঠিন হইয়া উঠিল।

এদিকে মুজাহিদ মোজা বদায়ুনী আসফ খাঁর পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া শান্ত ও সংযত চিত্তে শর নিক্ষেপপূর্বক কাকের-দিগকে “জাহান্মুমে” (নরকে) পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু যখন উভয় পক্ষীয় রাজপুত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া গেল, তখন

১৫ ধমনোর গোণ্ডা হইতে তিন কোশ দূরে অবস্থিত ছিল। রাজপুতানা-কা ইতিহাস, পৃ. ৭৪০। ধমনোর হইতে হলদীঘাট তিন মাইল দূরে, এই স্থানের মাটি হলুদবর্ণের। তাই হলদীঘাট নাম। ঐ পাদটীকা, পৃ. ৭৪০।

১৬ আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৪

১৭ “আজ কেবল কুইয়া”। লো (Lowe) সাহেবের অনুবাদ ঠিক নয়।

আসফ খাঁ বদায়ুনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাঁ সাহেব, এই সময় আমরা ও বেগানা (শত্রু ও মিত্র) রাজপুত সমাজ করা ভ বড় মুশকিল। কি করা যায়?” তিনি উত্তর করিলেন, “আরে তীর ছাড়িতে থাকুন ভ;” হুমম কাকের যে পক্ষেই নিপাত হয়, হটক, ইসলামের ভ লাভই।”^{১৮} বদায়ুনী খোশমেজাজে যদুচ্ছাক্রমে অবিরাম তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ‘গেজার ছোয়াব’ হাসিল করিলেন।^{১৯}

মোজা সাহেব যখন বিধর্মীকুলের ধ্বংসসাধনে রত, প্রতাপ তখন উদ্ধার ভার শাহী বাহিনীর বাম পার্শ্বের উপর পড়িত হইলেন, আর হেকিম খাঁ দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ তখন চরমে পৌঁছিল। রাজপুত অম্বারোহিগণের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া বাম পার্শ্বে অবস্থিত সিক্রীর সেবগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া সমরাদান হইতে বহু দূরে পলাইয়া গেল।^{২০} এই দলের সৈন্যাব্যাক কাজী খান শত্রুসৈন্যের গতি-রোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দক্ষিণ হস্তে তরবারির আঘাত পাইয়া হজরত মুহম্মদের (দঃ) একটি উক্তি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনিও “মোহাজের” (পলাতক) হইলেন। দক্ষিণ পার্শ্বের অল্পতম সেনানায়ক সৈয়দ হাসিম বারহা হেকিম খাঁর আক্রমণ রোধ করিতে সিদ্ধা অথ হইতে পড়িয়া গেলেন। সৈয়দ রাজুর সাহায্যে তিনি পুনরায় অত্যা-রোহণ করিলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই এই পার্শ্বকে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। এদিকে প্রতাপ বাম পার্শ্ব ও কেন্দ্রস্থিত বাম অংশ বিধ্বস্ত করিয়া শত্রুসৈন্য মণ্ডিত করিতে করিতে মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন। মেবাররাজ কচ্ছবাহ সেনাপত্যিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি সে জুহা তবু হো সকে বহাদুরী দিবাও, প্রতাপ সিংহ আ পছা হৈ।”^{২১} অর্থাৎ, প্রতাপ আগত। আপনার সমরকুশলতা এখন প্রদর্শন করুন। প্রতাপ তাহার প্রিয় অথ চৈতকোপরি উপবিষ্ট, আর মাম হস্তীর উপর আসীন। রাজপুতেরা কাছোয়া সেনাপত্যিকে বধ করিয়া তাহার গুপ্ত শোণিতে যুদ্ধের আলা মিটাইতে চেষ্টা করিবে এই ভাবিয়া, মান বাসরশোভিত হাওলা পরিত্যাগ করিয়া হস্তীচালকের স্থানে উপবেশন

১৮ হর তরফকে কাকের কুশতা নোহাদ, সুদ-ই-ইল্লাহ বাশদ।

১৯ “শিহত দর আন আবু চুন কুহু আহলান খতা নমি শোদও ছোয়াব-ই-গেজা হাছিল শোদ” অর্থাৎ, বদায়ুনীর শর-সন্ধান পরীতোপম বিশাল সৈন্যসমূহের উপর অব্যর্থ হইল এবং ধর্মযুদ্ধের পুণ্য সঞ্চিত হইল। (মুস্তাব-উত-ভাওয়ারিখ, ঐ পৃ. ২২৯)

২০ মুস্তাব-উত-ভাওয়ারিখ, ঐ পৃ. ২৩২

২১ রাজপুতানা-কা ইতিহাস — পৃ. ৩৫১

করিলেন। ২২ তীর ও বর্ষা বারিধারায় ভায় তাঁহার উপর
নিষ্কিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু মান কখনও মন্তক অবনত করিয়া,
কখনও ঢালের সাহায্যে শরবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।
ক্রমে চৈতক পৃষ্ঠাচূড় প্রভুর রণোন্মাদনায় উত্তেজিত হইয়া মান-
সিংহের হস্তীর সমীপবর্তী হইয়া অগ্রবর্তী পা ছুটি শুঁড়ের উপর
তুলিয়া ধরিল, আর প্রতাপ মানকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে বর্ষা
নিক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যক্রমে দৌহমণ্ডিত হাওদায় প্রতি-
হত হইয়া উহা মাটিতে পড়িয়া গেল। ২৩ শাহী সৈন্তের
অবস্থা তখন বড়ই সঙ্কটাপন্ন। সৈন্তব্যূহের 'চকু' কণ্ঠিত,
'বাম পক্ষ' ভগ্ন, 'দক্ষিণ পক্ষ' অবসাদগ্রস্ত এবং 'পৃষ্ঠদেশের'
এক দিক অচল। শাহীপক্ষের এই ঘোর অন্ধকারে একমাত্র
মানসিংহই নিষ্কম্প দীপশিখার ভায় উজ্জ্বল। দূর হইতে তাঁহার
শৌর্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া মোল্লা বদায়ুনী বিমোহিত হইয়া
বলিয়া উঠিলেন, "হুদু শমসের-ই-ইল্লাম জন্দ"—অর্থাৎ, হিন্দু
ইসলামের ভরবারি চালনা করিতেছেন।

২৪ ই হুয্যোগের সময় দূরে, বহু দূরে মেঘ-গর্জনের ভায়
ভৈরবনাদ উদ্ভিত হইল, তখন প্রতাপের সৈন্তবর্ষে প্রচারিত
হইল বাদশাহ সৈন্যে রণাঙ্গনে আবিভূত হইয়াছেন,
কিন্তু যিনি এই হুযোগে প্রাঞ্জলগতিতে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন তিনি পশ্চাদ্ভাগের সৈন্তাধ্যক্ষ মেহতর খাঁ। তাঁহার
অধীস্থ তেজোদৃষ্ট সৈন্তদলের যোগদানের ফলে যুদ্ধের পতিভে
সহসা এক অগাধবীর্য পরিবর্তন ঘটিল।

আবুল ফকলের উক্তি হইতে জানা যায়, "মেহতার খাঁর
আগমনের পূর্বে প্রতাপের সৈন্তদের দস্ত ও আফালনের সীমা
ছিল না; তাহাদের স্মৃতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল", কিন্তু
অতীতে এই পশ্চাদবর্তী সৈন্তদলের যোগদানের ফলে যুদ্ধের
গতি বিপরীতযুগী হইল। এই নূতন পরিস্থিতিকে আরম্ভে
আনিবার জন্ত প্রতাপ তাঁহার রণ-হস্তীগুলিকে শত্রুর বিরুদ্ধে
পরিচালিত করিলেন। লোনা নামক হস্তীটি অনেক শাহী
যাতাকে পরাভূত ও শত্রুসৈন্ত দলিত করিয়া সর্বশেষ গজযুক্ত
হাতীটিকে ঘায়েল করিল, কিন্তু সহসা লোনার মাহত গুলীর
আঘাতে নিহত হওয়ায় লোনার আক্রমণের বেগ মন্দীভূত
হইল। ২৪ মুহূর্তমধ্যে প্রতাপের সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী রামপ্রসাদ
লোনার শূল স্থান পূর্ণ করিল। এই মস্ত যাতকে শুভ আফালন

ও শত্রুসৈন্তদের দলিত মণ্ডিত করিয়া রণক্ষেত্রে এক প্রলম্ব-
কাণ্ডের সৃষ্টি করিল। শাহী পক্ষের দুইটি হস্তী 'গজরাজ' ও
'রণমদার' ইহার সহিত ঝাঁটরা উঠিতে পারিল না। কিন্তু
এবারও শরনিক্ষেপপূর্বক শাহীপক্ষ রামপ্রসাদের চালককে
নিহত করিয়া কোশলে হস্তীটিকে রণক্ষেত্রেই কবলিত করিয়া
ফেলিল।

প্রতাপ তখনও রণভাঙবে যত্ন। তাঁহার সহকারী
সেনাপতিগণের অনেকেই, যথা—গোয়ালিয়ররাজ রামশাহ
ও তাঁহার তিন পুত্র শালিবাহন, ভবানী সিংহ এবং প্রতাপ
সিংহ, ২৫ জয়মলের পুত্র রাঠোর রামদাস, শরদাস, খালা-
বীদা ও মানসিংহ, তীমসিংহ সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন।
শত্রুসৈন্তেরা প্রতাপকেও বেঁধন করিয়া শিলাবৃষ্টির ভায় শর-
নিক্ষেপ করিতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তরঞ্জিত; বাহন
চৈতকও ক্ষতবিক্ষত। দেহরক্ষী-পরিবৃত মেবাররাজ এই সমস্ত
বিপর্যয়ে ক্ষেপমাঙ্গ না করিয়া অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধ পরি-
চালনা করিতেছেন। এমন সময় নূতন সৈন্তবলে বলীমান
শাহী বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব হেকিম খাঁর দলকে তাহার সৈন্ত-
শ্রেণীর উপর ঠেলিয়া ফেলিল। সৈন্তদলকে রণক্লাস্ত অবসর
ও বিপর্যাস দেখিয়া মেবারাধিপতি আর শক্তিকল্প না করিয়া
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ২৬ মনে মনে হির
করিলেন আবার নূতনভাবে প্রস্তুত হইয়া শাহী-বাহিনীর
সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন। সৈন্তগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমরণ
করিল—এমনভাবে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধের যবনিকাপাত
হইল। এই যুদ্ধে প্রতাপপক্ষ নিহত হইল তিন শত আশি
জন ও শাহীপক্ষে এক শত বিশ জন হত ও তিন শত জন
আহত।

হলদীঘাটের যুদ্ধে মেবাররাজ যে সাহস, বীরত্ব এবং সৈন্ত-
পরিচালনায় যে বৈপ্লবের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যুগে
যুগে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

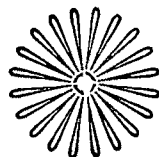
২৫ আকবরনামায় ভবানী সিংহকে ভন সিং করা
হইয়াছে। ওঝাজী এই ভ সংশোধন করিয়াছেন। রাজ-
পুতানা-কা ইতিহাস, ১৪৩।

২৬ মেবারস্থিত জগদীশ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক শ্লোকে
প্রতাপ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লিখিত আছে।
শ্লোকটি দ্ব্যর্থবোধক। এক অর্থে এইরূপ বুঝায় যে, প্রতাপ
প্রাতঃকালে ভরবা রহিতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
মাদপক্ষীয় সৈন্য হিরভিন্ন হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

২২ যুক্তধাব-উত্ত-তওয়ারিখ, পৃ. ২৩২-৩৩

২৩ রাজপুতানা-কা ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৫১

২৪ আকবরনামা পৃ. ১৭৪-৭৫।



পূর্ব বাংলার ব্রতকথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

ঐতিহাসিকেরা অস্বীকার করেন, পূর্ব-ভারতের অবৈদিক আখ্যা-ভাষীদিগকে বৈদিক আখ্যাভাষীরা যুগের চক্ষে দেখিত ও তাহাদের অভিহিত করিত 'ব্রাত্য' বলিয়া। উক্ত নীহাররঞ্জন রায় এই ব্রাত্যদের ক্রিয়াকে ব্রত বলিতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, "আমাদের গ্রাম্যসমাজে বিশেষভাবে নারীদের ভিতর যেসব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অশাস্ত্র, অপৌরাণিক ও অপ্রাকৃতিক এবং মূলত গৃহ বাহ্য ও প্রজনন-শক্তির পূজা, যে পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রাচীন বর্ষশাস্ত্র, বর্ষাহুত্র, কোথাও কোন প্রচলিত ব্রতের উল্লেখ পর্যন্ত নাই; আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণবর্ষ যে এই বর্ষাহুত্ৰটিকে স্বীকার করিত না এ তথ্য পরিষ্কার।" তাহার এই অস্বীকার ও ঐতিহাসিক যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে পরবর্তীকালে ব্রতকথার মধ্যে যে পুরাণের কথা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয়, পূজার দিক হইতে যত মতবিরোধই থাকুক, ব্রত ও তাহার কথার মধ্য দিয়া যে মেয়েদের মন প্রভাবিত ও প্রকাশিত হইত ইহা পণ্ডিতেরা অস্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রত উদ্‌যাপন করিতে ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। মেয়েমাই এখানে প্রধান। কোন মন্দিরে ইহা অনুষ্ঠিত হয় না; সেইজন্য স্থানের স্থিরতাও নাই। সমস্ত ব্রতই যে সমবেত ভাবে করা হয়, তাহা নহে। সমবেত ভাবে যেগুলি উদ্‌যাপন করা হয়, তাহার স্থান—চৌমাথার রাস্তায় কিংবা বটের তলায়। কিন্তু গৃহের আঙ্গিনার মধ্যেও ছোট ছোট মন্ডলে বিভক্ত হইয়া মেয়েরা ব্রত উদ্‌যাপন করে।

ব্রত উদ্‌যাপন যাহারা করেন, তাহাদের মধ্যে বিধবা, সধবা এবং কুমারীরা বিশেষভাবে যোগদান করেন। কতকগুলি ব্রত আবার পৃথক পৃথক ভাবেও আছে।

উপকরণের মধ্যে কোন মূর্তিপূজার প্রচলন নাই। কিন্তু কয়েকটি ব্রতে আলিঙ্গন দিয়া পুতুল-চিত্র আঁকা হয়। কতকগুলিতে অস্পষ্ট ভাবে পিটুলা বা ক্ষীর দিয়া গুরুবাহুর নির্মাণ করা হয়। স্রবচনী ব্রতে গোবরের উপর শিলনোড়ার নোড়া স্থাপন করিবার রীতি আছে; পাটাই পূজার দেখি বনের গাছ আনিয়া বাঁধিয়া মূর্তির মত করা হয়। মনে হয়, ব্রত উদ্‌যাপন বিমূর্ত না হইলেও ইহাতে মূর্তির ধ্যান নাই।

ফুল-ফল-মূল, হরিদ্রা, পান, সুপারি, কলা, ধান, দুর্কা প্রায় প্রতি ব্রতেই প্রয়োজন। স্রবচনী ব্রতে তেল সিন্দুর বিশেষ উপকরণ। 'ডাল'-এর প্রচলন সব ব্রতে না থাকিলেও

কয়েকটি ব্রতে ডালের নৈবেদ্য দিতে দেখা যায়। রন্ধন-ক্রমের শেষে হান নাই। স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র দানও বিশেষ দেখি না।

গ্রামের পরিবেশ ছাড়া ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে বড় একটা দেখা যায় না। ব্রতের কথাগুলির মধ্যেও গ্রামের দরিদ্র সংসারের কথাই বেশী। তবে গ্রাম ছাড়িয়া ব্রত যখন নগরে রাজপুরীতে স্থান পায় তখন হইতেই ব্রতের দেবী জাগ্রতা হন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্রত পালনের ক্রিয়াকর্মের কথা বিশেষ আলোচনা করিব না। আমরা সাধারণভাবে ব্রত-কথাগুলিকে লইয়াই আলোচনা করিব।

এই ব্রতকথার মধ্য দিয়াই বঙ্গনারীর মানস-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মানস-সংস্কৃতি কেন, ভদানীশ্বন কালের সামাজিক দিকের উল্লেখও ইহাতে যথেষ্ট আছে।

কিন্তু ব্রতকথার রূপভেদ আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার নানা পরিবর্তন ঘটয়াছে। পরিবর্তন ঘটনাছে বলিয়াই ব্রত-পূজার মূল অর্থের সহিত কথাগুলির বিরোধ। কিন্তু কথাগুলির সৃষ্টি বঙ্গনারীর মনের রুদ্ধ আবেগের দরুন।

ব্রতপূজার দুইটি প্রধান অঙ্গ—(ক) ব্রতপূজা আর (খ) ব্রতকথা। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রতকথাই প্রধান হইয়া উঠিল। এবং সেইজন্যই আজও ব্রতপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতপূজার মূল কারণ ছিল যাদুশক্তির প্রজননশক্তির ও কৃষিকর্মের পূজা। কিন্তু ব্রতকথার উৎপত্তির কারণ হইল, মাতার স্নেহের প্রকাশ, সখীদের সহিত নববধূর প্রাণের কথার বিনিময় এবং নববধূর প্রতি শাস্ত্রীর অভিযোগ।

ব্রতকথা অনেকে সঙ্কলন করিয়াছেন। কালীনাথ গুপ্ত-বায়ীশ একবানি ব্রতমালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন (১৮৬৭ খ্রি:), কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত ও পুরাণ ইতিহাসের গল্পই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বাংলার সমাজ হইতে এই কথাগুলির উৎপত্তি হয় নাই। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণদের খাতির করিবার কথাও প্রচুর। ইহা ব্রতপূজার আসল অর্থের সহিত মোটেই খাপ খায় না।

পরবর্তীকালে আরও অনেক ব্রতকথা সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কাহিনীটুকুই স্থান পাইয়াছে, গ্রামের মেয়েরা স্থান পায় নাই। অর্থাৎ, এই কাহিনীগুলি সাধুভাষার রূপান্তরিত হইয়া কতকগুলি স্রববিহীন গল্পের সমষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রতকথার আলাদা এক স্রব আছে। ইহার বাক্যগুলি হন্দে হন্দে প্রথিত—খুব সহজে হৃদয় স্পর্শ করিবার মত। কিন্তু

এই ছন্দ আবার আঞ্চলিক ভাষার ছন্দকেই বেশী মাত্র করে। কাজেই আঞ্চলিক ভাষাকে বর্জ্য করিয়া ব্রতকথা সঙ্কলন করা যায় না, করা উচিত নয়।

পূর্ব বাংলার ব্রতকথাগুলিই এখানে বিশেষ ভাবে আলোচ্য। কিন্তু পূর্ব বাংলা বলিতেও আমরা একটি বিস্তৃত অঞ্চলকেই বুঝিয়া থাকি। এই বিস্তৃত অঞ্চলের ব্রতকথাগুলির রূপ বিভিন্ন প্রকার। সেইজন্য এই ব্রতকথাগুলির ক্ষেত্র মূলতঃ পদ্মা-চন্দনা-মধুমতীর তীরের অঞ্চলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইল।

চন্দনা নদীর কণা বর্তমানে অজ্ঞাত থাকিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও ব্রোকের নদনদীর নজ্জায় এবং রেনেলের মানচিত্রে পাওয়া যায়। ব্রোক চন্দনাকে যশোরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে ইহার ধারা অন্ত্যস্ত ক্ষীণ। এখন চন্দনা যশোরের অনেক পূর্ব দিয়া গিয়াছে। পদ্মার গতিও পূর্বে অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত ছিল। কাজেই ঢাকা হইতে যশোহর পর্যন্ত ভূখণ্ডের লোককেই এই অঞ্চলের মধ্যে বলিতে পারা যায়। এখানকার অধিবাসীদের ইতিহাস আলোচনা করাও বড় কঠিন। ব্রত-কথার কোথায়ও মুসলমান আমলের কথা পাওয়া যায় না বরং বণিকসভ্যতার সময়ের কথাই বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। বনপতি সওদাগর আর চাঁদসওদাগরের আমল ব্রত-কথার মধ্যে পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু নগর-সভ্যতার বিশেষ ইঙ্গিত নাই, সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশ। কৃষিকর্মের কথা এগুলিতে প্রধান।

ব্রতকথায় যুদ্ধ-কাহিনীর বর্ণনাও নাই। মনে হয় ব্রতপুজার মূলধারা অনুসরণ করাই ছিল কথার প্রথম প্রয়াস; কিন্তু পর-বর্তীকালে অন্তঃপুরিকার ব্যক্তিগত হৃৎকণ্ঠ কথার মধ্যে একটু একটু স্থান পাইয়া বসিয়াছিল। এই জন্ত কাহিনীর সর্বজনীনত্ব আছেই। তবে বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে অঞ্চলবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি ভূষণ-মামুদপুর প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাহিনী স্থান পায় নাই।

আঞ্চলিক ভাষাও ব্রতকথার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক নতুন রূপ লইয়াছে। গোয়ালন্দ মহকুমার খন্ডরবাড়ীতে মাগুরা বা ঢাকা শাণিকগঞ্জের মেয়ে বিবাহিতা হইয়া আসিভেছে। সঙ্গে আসিভে পেটরা, বেতের ঝাঁপি আর ব্রতকথার খুলি, হস্ত পাবনা সীতাবাড়িয়ার মেয়ে আসিল কাবুখালির বাঁশের ঝাড় আর বেতের-পোলের দেশে। ইহার ভাষা ছাড়িয়া দিয়া আসিত না। কাজেই এই উপায়েও ব্রতকথার কল্পনা এবং ভাষার মিশ্রণ ঘটয়া গিয়াছে।

এই ব্রতকথার মধ্যে এমন একটা স্তর আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে ‘আগমনী’ গানের পরিপূরক। আগমনী গানে আছে মায়ের কান্না মেয়ের জন্ত। বাংলার মেয়ের আঁট

বহরে বিবাহ হইয়া পরের ঘর করিতে যাইতে হইত। সেখানে কত কষ্ট। মায়ের প্রাণ বৎসর অন্তে ভিন দিনের জন্য মেয়েকে দেখিতে পাইবে বলিয়া কত ব্যথা। কিন্তু আগমনী গানে সেই বালিকা বধূটির রণরঙ্গিনী শাশুড়ীর উল্লেখ নাই। আগমনী গানে কভার জীবনের এই গুঁঠাটি উহ।

কিন্তু ব্রতকথায় সেই কত দজ্জাল শাশুড়ীর ঘরে, ঘোষণা পরিবারে, তার অপারগতা লইয়া কি করিয়া দিন কাটাইয়া থাকে, তাহাই চোখের জলে, ছোট ছোট কথার, অলঙ্কার-বর্জিত ভাষায় বলিয়া থাকে। পাটাই পুজার কথার আছে, ‘শাশুড়ী উমেনের ধিকে গরম হাতা নিয়ে আসে বউর জিব-হেয় ঠাণ্ডে দ-হোরলেন।’ অর্থাৎ, শাশুড়ী উমেন হইতে গরম হাতা লইয়া আসিয়া বৌয়ের জিব্বা ঠাসিয়া ধরিলেন।

অবশ্য বধূদের সম্বন্ধে ধারাপ কথাও যে না আছে তাহা নহে। শাশুড়ীরাও সেই সম্বন্ধে অনেক গল্প শৈশব করিয়াছেন। কিন্তু কোন বধু যদি তেমন ‘অলপ্পের’ (অল্পাধু) কাজ করিয়াই থাকে তবে তাহা অনেকটা বেতের শীষের মত। তার কাঁটার শক্তি খুব কম, পথিকের পথের বিষণ্ড তেমন ঘটায় না, শুধু আলগোছে একটু উত্ত্যক্ত করিয়া লয় মাত্র। বলিতে পারা যায়, তার অন্তরের বেদনা পদ্মবের ‘পেলব’ ভঙ্গীতে একটু সহানুভূতি আঁকাঙ্ক্ষা করে মাত্র। আঁকুড় বগীর বৌয়ের ছুঁতাপা, অশোকবগীর ‘বামনী’র হুঃখ, মনসা-ব্রতের ‘গিরন্ত’র বউয়ের কাহিনী নানারকম ভাবে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। চৈত্র মাসে হয় অশোক-বগী। অশোকবগীর অশোকান্ন-মাতা এক বিশ্ময়কর মেয়ে। ব্রাহ্মণদের সমাজে যে যুগ হইতে মেয়ের সমাজ বড় হইয়া উঠিল সেই যুগের চেহারা এই। ব্রাহ্মণের কেবল কতলা-সন্তানই হইত; পুত্রসন্তান আর হইত না। কিছুদিন পূর্বেও পাড়ারীয়ে ইহার জন্ত কতাপ্রতির ছুঁতাপের আর অন্ত ছিল না। ব্রতকথার ব্রাহ্মণ তাই ব্রাহ্মণিকেই দামী করিলেন, শাসাইয়া গেলেন এবার কতলা হইলে ব্রাহ্মণিকে তাড়াইয়া দিবেন।

—একদিন বাউনী পোরাডী। বাউন বলিছে, ‘এই বাউনী! ইবার ঘতি মিয়ে অর, ওর মিয়ে দিখে আর তোর দিখে তাড়ায় দেব।’—কিন্তু কতলাই হইল। ব্রাহ্মণ তখন পুজা করিতে গিয়াছেন।

“উনি কি করেন?”

—মিয়ের ছুঁ খাওয়ায়ে, তেল-কাঁজল দি-ই-য়ে, দিবি ক’রে এক নতুন পাতিজির যদি শুয়ারে একখেন চেলির কাপড় দিখে ঢাক-এ, সরা খুখির উপের দিখে, নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।—

কতলাকে বিসর্জনের সময়েও মায়ের স্নেহ কভার আঁহু-বুজি করিয়া দিল। আজকাল এইগুলিকে আমরা শহরে

বসিয়া বর্ষরতা বলিব; বলিব যে, মেয়েদের উপর স্বামীদের এ কি অভ্যাস! কিন্তু তবু বলিতে হইবে—বাংলার সমাজে এই রকম কয়েকটা যুগ গিয়াছে। আজিও কত কারণে, এই গৃহলক্ষীদের আমরা কষ্ট দিয়া থাকি, তাহা হস্ত রহস্ত চিন্তার পাকে আমরা ভুলিয়া যাই। তাহারা ব্রতকথার ব্রাহ্মণটির মত স্থল বর্ষরতা করেন না, তাহারা হস্ত বা ইবসেনের 'ডলস হাউস'ের অনুরূপ স্তম্ভ আর সভ্য অভ্যাসের করিয়া থাকেন।

যে সব কাহিনী লইয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, সেই রকম একটি কাহিনীই এই অশোকযজ্ঞী, এই কাহিনীকে লইয়া হস্ত 'অশোকা মঙ্গল' লিখিয়া ফেলা যাইত।

গারমী সংক্রান্তির কথার বহুটি ব্রতকথার মজ্জিমা বিশেষ। অলক্ষী বা সতীনকে নানা কন্দী আঁটিয়া ভাড়াইল, সন্তানদের মঙ্গলসাধন করিল। ইহার পর্যবেক্ষণশক্তি অপূর্ণ। শূকরের ব্যবহার দেখিয়া গারমী ব্রতের মধ্য ধরিতে পারিয়াছিল।

—উনি গৃহাটে চাম করতি গেছেন। যা'য়ে দেখেন যে, একটা শূরের বাচ্চা নিয়ে বেড়ায়ে বেড়াতেছে। বেড়াতি বেড়াতি দ্-হানের ক্ষ্যাতে যা'য়ে দ্-হান খা'লো। দ্-হান খা'য়ে আ'সে বাচ্চার ছুধ দিল, আর বাচ্চাগুলো সব ম'রে গেল।

তার পর শুয়েবুটী আবার কিছুক্ষণ পরে কচু খ্যাতে গেল। যায়ে কচু খায়ে আ'লো। কচু খাইরে আইসে বাচ্চাগুলো শুকল, আর বাচ্চাগুলো ভাচ্চা হ'য়ে উঠল।

বোঁ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দেখল। মনে মনে ভাবল, 'তালি ত গারমীর দিন ভাত খালি সন্তান বাঁচেন না; তা আরুও আর ব্-হাত খাব না।'—আরুও যজ্ঞীর বহুটির বুদ্ধির তারিক করিতেই হয়। দাসী হরিণের বদলে নালী বাছুরের মাংস কাটিয়া রান্না করায়। তাহাই ব্রাহ্মণদের খাইতে দেওয়া হইবে। বহুটি টের পাইয়া এক কন্দী আঁটিল—দাসীকে বলিল, —তুমি এক কাজ কর। পুঁই নিয়ে আস। পুঁই হেঁচ গবোরের সাধে বর ভালভলে করে লেপে ধোও।—দাসী তাই করল।

ব্রাহ্মণরা আস্তে খাতি বসল। পাতা করে করে বসে পড়িছে। বোঁ মাজার কাপড় ছড়িয়ে ব্-হাতের থালা হাতে করে যাচ্ছেন। খাতি খাতি পিছলয়ে ঠাস হয়ে পড়ে গেল। পড়ে যায়ে দাঁত লাগে বোঁ অজ্ঞান হয়ে গেল। জাত অপর-জাতিতে গৃহর ভরে গেল। ব্রহ্মভোজ্য নষ্ট হয়ে গেল।—

ছোটখাটো বুদ্ধির এই পরিচয়, বহুদের এই কৃত্ত্ব কথার মধ্য দিয়া ছড়াইয়া নিজেদের উপর আস্থা কিরাইয়া আনিত। আত্ম-সাম্বোধ্যের (self-assertion) ইহা এক বিচিত্র প্রকাশ। বাহির হইতে বাধা পাইয়া পাইয়া, কথার মধ্য দিয়া নিজেদের বিশেষ পরিচয় তাহারা রাখিতে চাহে।

এই সব বহু কোন দিন সাহিত্য রচনা করিতে চাহে

নাই। ছুঃখের সময়টা তাহারা কি ভাবে, কার কাছে, কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছে এ তাহাই ইতিহাস। তাহারা বিপ্লব করিতে পারে নাই।

সখীদের কাছে মনের কথা বলিবার জন্য তাহারা 'শান্তর কব', 'পাচালী পচাল পাড়ে' আর 'গোবর-গোলা দিয়ে' 'বস্ত্রে বস্ত্রে বেরত কথা' বলে। ব্রত অস্ত্রে 'সদ্বা' হলে তেল সিন্দূর 'অধবা' হলে 'ধান-দুবে' দিয়ে ঘরের কাছে লাগিয়া যায়।

এমনি করিয়া ইহাদের জীবন কাটে। পাড়ে জল পড়িলেও ইহারা আশা পায় না, নদীতে 'চোত' আসিলেও ইহারা ভাবনা করে না। স্বামী প্রবাসে থাকিলে সোয়ামী, ঘরে ফিরিলে ঠাকুরগণের ছেলে। এই 'ব্রহ্মেশ্বর'দের নিকট হইতে তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই সাহায্য পায় নাই, পাইয়াছে সতীন। শজারুর মত গায়ে কাঁটা থাকিলেও গলা নরম, অন্তরে অভিযোগ থাকিলেও শজারুর কাঁটার মতোই সেইগুলিকে হুল্লর করিয়া বাজাইয়া চলিতে হয়। ব্রতকথাগুলি তাহাদের সেই শজারুর কাঁটা। ইহাই মধ্য তাহারা সন্তানের জন্য ক্ষীর-ধারা সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে। 'চাপড়ঘড়ী'র বহুটির পুত্রের জন্য মনস্তা সত্যই অতি করুণ। 'চাপড় যায় ভাসে, বোঁকা আসে হাঁতে।' কথাটির মধ্য দিয়া এমন সঙ্করুণ আত্মান হারানো সন্তানটির প্রতি রহিয়াছে যে, পাখত মাতৃমুর্তিই ইহাতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

যত মঙ্গল, তাহা সব 'করে কন্মে' 'পেরন্তর' কল্যাণ বৃদ্ধি করিয়া ভবিষ্যৎ বংশকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। 'অশোকযজ্ঞী' 'সম্পৎ-নারাণির' ব্রত, 'মার্টঘড়ী' সবকিছুর মধ্য মাথের ঐশ উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

শুভরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী হস্ত বেহারারের এক কীর্ষের ব্যবধান। কিন্তু 'আবাগীর বিট'রা সেই ডুলি বা সোয়ামীর সন্ধান জানে না; অথচ এক মিনিটের নোটশে তাহাদের চিরকালের জন্য বাপের বাড়ীতে থাকিতে হইতে পারে। মাথার উপর এই বাঁড়া বহন করিয়া তাহারা সন্তান পালন করিবে, গৃহস্থের কল্যাণ চিন্তা করিবে, পাড়াপড়শীর 'আয়ে' 'কাম' করিবে। 'বতরে'র সময় মুনিষজনের হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত রাঁধিতে হইলে আঙুন ঠেলিবে, বগদারের মলন-মলার পর তাহারা কুলা লইয়া ধান উড়াইবে, হাদু গোলায় তুলিবে, ধান সিদ্ধ করিবে, ছতুন ভাজিবে, চিড়ে কুটিবে। ইহাই মধ্য সময় করিয়া শীতের সকালে ভেমাধার বা মতপের আভিনায় অথবা আগ-হুয়ারে "শ্রীতি ঠির ঠির" করিতে করিতে ব্রতের সরঞ্জাম লইয়া বসে।

অথচ ইহাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী নয়, পরম পুখ বুঝিতে ইহারা মুখিত মায়ের ফোল। মনসাব্রতের নাগ পক্ষীর দিনে বহুদের ইচ্ছা হইতেই তাহাদের চরিত্র বোকা যায়। সাতটি

বধু নিজের নিজের সেরা ইচ্ছার কথা জানাইতেছে। তাহাদের সকলের কথাই প্রায় এক রকমের। সপ্তম বধুটির কথা—
‘আজকের মত দিন হয়, বাপ মার বাড়ী হয়, উৎসেলে মাছ পুড়া দিয়ে পাভা ভাত-খাও শুয়ে ঘুম যায়।’—একটু অলসভাবে হইবার ভয় ইহারা একান্ত মনে কামনা করিত।

ইতুপুজার উমনী-ঝুমনী কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, মাতৃহীনা ভগ্নী দুইটির অন্তর্দৃষ্টি। পিতার প্রতি তাদের প্রেম অগাধ, বিবাহ না হইবার হুঃখ পিতাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়াইয়া মিটাইতেছে। উমনী-ঝুমনীর বাবা যদি মনোবিদ হইতেন তাহা হইলে বৃত্তিতে পারিতেন, ইহা তাহাদের সত্য-কার কথা নহে ইহা তাহাদের মানসিক অভিক্ষেপ (projection)। এই কথার রাজামহাশয়ের অবিবাহিতা কতাকে লইয়াও এক সমাজ। ইতুপুজাটি অবিবাহিতা কতাদের হুঃখকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। তবু ইহারা বাপমায়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পোষণ করে না। বরং তাহাদের উপর ইহাদের গভীর ভক্তি। বাপমায়ের হুঃখ বুঝিবার মত বুদ্ধি ইহারা বিভিন্ন ছড়ার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। একটি ছড়ায়—

আম-কাঁঠালের পিড়ি খানি
বি ম’ ম’ করে
ভারির উপর বাপ বুড়ো
কত দান করে।
বাপ যায় রে নায় নায়
বুড়ো যায় রে তরে (ভীরে)।
শিশু কালে বিয়ে দিলি
সদায় আশ্রম অলে।

অন্তঃপ্রবেশে পাই—

ঝুমঝুমঝুম বাত বাজে
সাজিয়ে ক’নে মতুন সাজে
মা বাপে দেন বরের করে
কতই মনের সাথে।
মা-বাপ কামনা করেন—
ভালো বরে ভালো বরে
দিবেন ব’লে কি—
কপাল যদি মন্দ হয়

মা বাপে তার করবেন কি?

ইহাদের এই সব মনের কথা বাহির হইতে প্রকাশ পাইত না। সকল আবেগ রুদ্ধ করিয়া ইহারা পাম্বাণ-বৃত্তির মত হইয়া পড়িত। এইজন্যই বোধ-হয় আগমনী গানে আছে, ‘পিতৃদোষে ঘেরে পাবাগী হ’ল।’

এই সব ব্রতকথার মধ্যে বাঙালীত্বও অতি পরিষ্কার। বাঙালীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে মনীষীরা সাধারণতঃ যে কয়টি বিষয়ে একমত তাহা হইতে মনে হয়, বাঙালীর বনিয়াদ নিম্নোক্ত—

অষ্টিক, দ্রাবিড় ভাষাভাষী, আল্পীক, আদি অষ্টিকদের লইয়া। এই মিশ্রণ দ্বারাই বাংলার সুদূর অতীতে সমাজ-ভিত্তি গঠিত হয়। অতএব বর্তমান কালের বাঙালীদের মিশ্রণ মনে সেই আদিম মনোবৃত্তি স্থান পাওয়া স্বাভাবিক। জাতির এই মিশ্রণ মন (unconscious mind) উপেক্ষণীয় নহে। জাতির রক্তধারায় প্রাচীন সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। ব্রতকথার মধ্যে জন্মের প্রতি মোহ, বমানীর প্রতি আকর্ষণ বেশ পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নোক্ত আর অষ্টিকেরা সমুদ্রের ধারে বাস করিতে ভালবাসিত, প্রয়োজনও বোধ করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল শিকারের মাংস, বনের কলমূল, মাছ ইত্যাদি। ব্রতকথার মধ্যে মাছের আর ফল মূলের উল্লেখ সূরি সূরি দেখা যায়। গারমী সংক্রান্তিতে ফলমূলের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। পুজার আগে, আদা-কাঁচকলই—ভালের আঁট—ডাবের তুল আর ভাতের সঙ্গে চৌক শাক।

গ্রীষ্মকাল আর বিজয়া-দশমীতে জোড়া-ইলিস মাছ কুটিয়া খরে লইতে হয়। সেই ইলিসের আইস মাড়িছুঁড়ি প্রভৃতি আবার ঘরের এক কোণে বিশেষ অহুষ্ঠান করিয়া পুতিয়া রাখিতে হয়।

আদি বাঙালী হরিণ শিকার করিতে ভালবাসিত। আঁকুড় বধীতে পুড়ুরি টুংগ উপলক্ষে হরিণ-মাংস খাওয়াবার ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। এই আঁকুড় বধীতে দেখা যায়, সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক বাস করিত যাহারা গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণ বিশেষ গণিত মনে করিত না। অগ্ৰচ ইহার মধ্যেই দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা শ্রেণীভেদ বিশেষ ভাবে মানিতেন। সমাজের ইহা এক মিশ্র-সুগের কথা।

সমুদ্রের প্রতি আকর্ষণ মনসা ব্রতের মধ্যে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়।— আড়াইরাজ, মশি-রাজ মা-পন্নার বাহন, ওরা এক ডুবি সাত সমুদ্র পার অয়ে মা-পন্নার কোলে ব’সে হুঃখ খাবার লাগলেন—

এই ব্রত কথায় অতি সরল করিয়া মানুষ্যজাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ যে কোন রূপে হইতে জাত তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। মা-পন্নার বলিলেন, ‘সর্বদাশ। ওরা হ’ল মানুষির বাচ্চা; ওরা পেট ভ’রে খায়, বন ভ’রে হাগে—ওরা মাছ খায়, মিছে কয়; উরা কি দেবপুত্রীর মন্য বোঝে? উয়ের আমে’ কাম নাই।’ ইহা যেন মেয়েদের আলিম্পন অঙ্কন। হাতের এক একটি লীলার টাকার খলি, সিঁদুক, দেবীর চরণ আর কুটম কমল আশ্রয়প্রকাশ করে। মানুষের ব্যবহারের প্রতি বিরূপতা কত প্রচণ্ড ভাবে থাকিলে যে এত সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ বর্ণন করিতে পারা যায়, তাহার গভীরতা কে মাপিবে? দেবপুত্রী কোন্টু জানি না। হয় ত বা নানা শাখাজাতি বা ‘কণ্ঠমের’ প্রাচুর্য আর

উৎপাতে তাহারা জন্মঃ তাহাদের যে অতীতকে ভুলিয়া
স্বাইতে বসিয়াছে সেই অতীত লোক সব্বদেই তাহাদের এত
কল্পনা। অরণ্যকে তাহারা পবিত্র মনে করিত, শুধু আহাদের
জন্মই জীবন নহে, উদ্ধার আনন্দকে বাঁচাইয়া রাখাই তাহাদের
কাম্য। জল, পাহাড়, অরণ্য তাই এত পবিত্র তাহাদের
নিকট। মনের চুঃখ বেশী হইলে এই যুগের বাঙালী অরণ্যে
গিয়া কাঁদিতে বসিত, পাথরে গিয়া মাথা খুঁড়িত। অরণ্যের
প্রতি বুকপূরবে যে তাহাদের পূর্বপুরুষের আত্মা। এইদৃষ্ট
বিনা প্রয়োজনে ইহারা পল্লব-ভাঙিত না, তাহারা দল
পাকাইত না, সংহতিশক্তি তাহাদের ছিল না, আপনার বেদনা
আপনি উদ্ধার করিয়া ঢালিয়া দিত বনদেবীর পায়ে। সেই
চরিত্রই পরবর্তীকালে বাংলার বালিকা বধূদের ব্রতপার্বণের
মধ্য দিয়া দেখা দিল। নিজের চুঃখ স্বামীকে বলে না,
পড়শীকেও বলে না, সন্তানের নিকটও প্রকাশ করে না।
ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, “লাগব স্বীকার করার
মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল, এই প্রাণশক্তি নানা
পরিবর্তনের মধ্যে দিয়াও যুত হয় নাই।” ব্রতের মেতেদের
স্বভাবও এই পরিচয় পাওয়া যায়। মাপপঞ্চমীর সপ্তমা বধূটির
চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে অবাক হইতে হয়। তাহার
রূপ এবং আচরণের মধ্যে যেন একটি বৃহৎ মন জাগ্রত হইয়া
আছে। ইতু-পূজার উম্মনী-ঝুম্মণীর চরিত্রের প্রথম অংশ
আজিও বাংলার মেয়েদের মধ্যে অল্পবিস্তর দেখা যায়।

অগ্নিকন্দের আর নেত্রিটোদের এই অরণ্য ভাবটি ভাঙিয়া
দিল জাবিড় গোষ্ঠী। জাবিড়দের রহস্যবাদ, আধ্যাত্মিক
বিশ্বাস, শিল্পবোধের আভাস ব্রতকথার মধ্যে কতক পরিমাণে
পাওয়া যায়। হঠাৎ কুঁড়েঘরের বদলে ইমারত নির্মিত হওয়া,
যুত বস্ত্রে প্রাণসংকার সব্বই সেই রহস্যের মূল।

একটি ব্রতকথার আছে, “বুনোরা বনে আগুন দেছে।
বিপ্লি হয়ে গেছে, চাকচিকেনি জল অইচে মাঠের মদি। তার
মদি আড়াইরাজ মনিরাক ডুব পারতেছেন।” ইহাতে এমনি
একটি প্রাকৃতিক চিত্রের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়।

যে মেয়েটি ব্রতকথা বলিতেছে সে তাহার বহু দৃষ্টি ভুলিয়া
হরিয়াছে শাওনের বৃষ্টির দিনে পথের দিকে। এক লহমার
চারিদিক সে দেখিয়া লইল। মাঠের মধ্যকার জল যে
চিকচিক করিতেছে তাহাও তাহার বহু দৃষ্টি এড়াইয়া যায়
নাই।

কিন্তু এমনি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া জাতির অতীত বৈশিষ্ট্য
বাহির করা সহজসাধ্য নয়। পলিমাটির বালুকণা ভুলিয়া কে
প্রমাণ করিবে ইহা অমুক পাহাড়ের অমুক পাথরটার কথা?
তবু আবহমান কাল হরিয়া আমাদের মনের মধ্যে যে সংস্কার
বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহাকে যে আমরা অস্বীকার করিতে পারি
নাই—তাহাই প্রমাণ করে এই ব্রতকথাগুলি। অতীত আমা-
দের মধ্যে এখনও জিহ্মাশীল, সেই অতীতকে বুঝিয়া পাইতে
আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্নর জাতি

শ্রীধর্মদেব শাস্ত্রী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

ক—অস্পৃশ্যতা : অস্পৃশ্যতা দানব

দেখিলাম কিন্নর দেশেও গাঙ্গীকীর নাম পৌছিয়াছে।
কিন্তু তাহার হরিজন-উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা পৌছায় নাই।
মানুষ ঘুণায় মানুষের হারা পর্যন্ত মাড়ায় না। একথা পড়িয়াই
আসিয়াছি এত দিন, স্বচক্ষে দেখি নাই; এখানে তাহা
দেখিলাম। কিন্নর দেশে আজও এই ব্যাপার চলিতেছে।
সব্বর্ণ জাতির কোন লোক—শ্রী বা পুরুষ—জল ভরিয়া রাস্তা
দিয়া বাইতেছে এমনভাবে তাহার উপর যদি হরিজনের হারা
পড়ে ত জল অমনি অপবিত্র হইয়া যায়, ইহাই সব্বর্ণদের
বিশ্বাস। তাই কিন্নর দেশের হরিজনদের রাস্তার সাবধানে
চলিতে হয়। শ্রীপরাধ ও আমি চীনী যাঁতেছিলাম।
পথে কয়েক জন লোক বেশ বানিকটী খুঁকিয়া আমাদের
সমস্কার করিল, আর রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া দীর্ঘ গিয়া দাঁড়াইল।

এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল,
“আমরা হরিজন, তাই।” উত্তরবর্ণের ঘরে আমার অম্ব একথা
মনে হওয়ার অন্তরাআ আমার হিকারে ভরিয়া গেল। আমি
যদি হরিজন হইতাম তাহা হইলে আমাকে পথ ছাড়িয়া
দেওয়ার দ্বারা ইহাদের ভূসিঁড়ে হইত না। যে হরিজন দিনরাত
কান্নিক শ্রমে পেটের অন্নসংস্থান করে, হিংস্র জন্তকে যে
তর করে না, স্বল্পে বন-জঙ্গলে একাকী বিচরণ করে, সেই
হরিজন যে, কোন আদনা সব্বকে দেখিয়া কাঁচুমাচু হইয়া যায়,
ইহা সব্বর্ণদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। ইহা যে তাহাকে
হিংস্র জন্তর অধম করিয়া দেয়।

প্রশ্নরূপ হরিজন

রাজপুত বা অন্য কোন সব্বর্ণ জল ভরিয়া রাস্তা
চলিয়াছে। পথে পড়িল হরিজন। উপায়! হরিজনকে
যে শোকা ভাঙিয়া বলিবে—“সরে দাঁড়াও” সে কো-ও নাই।

ভাতেও যে জল অপবিত্র হওয়ার ভয়। তাই রাত্তার পাথরকে লক্ষ্য করিয়া সর্বর্ণ বলিয়া থাকে, 'ঢেলা,' শুভদ্রিস; সরে যা, আমার জল নষ্ট হবে না। ইহা হইতে হরিজন বুঝিয়া লয়, জল ভরিয়া কোন সর্বর্ণ আসিতেছে; তাকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে হইবে। গ্রাম্যকলে যে বাওড়ি হইতে সর্বর্ণ জল ভরে, হরিজনেরা সেই বাওড়ি হইতে জল ভরিতে পায় না। শুনিতে পাইলাম, রামপুরে কয়েকজন সাহসী দর্জি সর্বর্ণদের বাওড়ি হইতে জল আনিয়াছিল। এই জন্য সর্বর্ণেরা মহারাজ পদমসিংহের কাছে নালিশ করে। দর্জিদের বিরুদ্ধে মামলা চলে, আর তাদের প্রজ্যেকের দশ টাকা জরিমানা হয়। রামপুরে এখন সেই বাধা নাই, কারণ রাজ্য বিলীন হওয়ার পরে রামপুরের হরিজনেরা সেই বাওড়ি হইতে জল ভরিয়া পুরাতন প্রথার অবসান ঘটাইয়াছে। রামপুর ত শহর। সেখানে সব ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু সূদূর গ্রামে তুচ্ছ নিবারণের জন্য ভাল কোন বাওড়ি হইতে জল আনিবে এমন হিম্মত কোন হরিজনের নাই। বাওড়ি যে কি তাহা এখানে বলা দরকার। পাহাড়ে যে সব স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা ভূমি হইতে উৎসারিত হয়, জল আটকাইবার জুগ সেই সর্ব জায়গায় খানিকটা গর্ত করিয়া চারিদিক একটু উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গা সিমেন্ট দিয়া বাধান হয়। ইহাকে পাহাড়ের লোকেরা বাওড়ি বলে। কোন পাহাড় ডুবাঈয়া জল তুলিতে হয়। বাওড়িতে হরিজনদের জায়গা পড়িতে নাই।

হরিজন ও মন্দির

কিন্নর দেশের প্রায় সব মন্দিরেরই নিম্নর ভূ-সম্পত্তি আছে। কমবেশী পঁচিশ হাজার টাকা উহার মকুব পায়। তাই মন্দিরগুলিকে জনসাধারণের সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। রাজকোষ হইতেও উহাদের নির্মাণকার্যে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। স্মৃতরাং এই সব মন্দিরে প্রবেশের দাবি হরিজনদের যোল আনা আছে। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ আইনতঃ স্বীকৃত হওয়া চাই এ কথা অনেক হরিজনকে জোর দিয়া বলিতে শুনিয়াছি। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এবিধ ভেদাভেদ এখন আর থাকিতে পারে না।

রামায়ণ পাঠ ও অপরাধ

হিমাচল প্রদেশে রাজ্য বিলীন হওয়ার পূর্বে মহারাজার রাজ্যে হরিজন বালকদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল। গৌরা হইতে রামপুরের পথে চৈতন্য নামে এক হরিজনের সঙ্গে দেখা। চৈতন্য বলিল, সে গৌরায় এক ইংরেজের চাপরাশী ছিল। কোন মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে সে সময়ে তাহাকে রামপুরের মহারাজের আগলতে হাজির হইতে হয়। প্রতিপক্ষের লোকেরা মহারাজের কাছে নালিশ করিল, "হজুর, এই চৈতন্য কুলাী মাধার চড়েছে। তাতে কুলাী হইলেও এ

পড়াশুনা করে। ইংরেজের মকরি করতে করতে কারও কাছে এ রামায়ণ পড়তে শিখেছে। এর রামায়ণ আছে, আর একে তা আমি পড়তেও দেখছি।"

এই কথা শুনিতেই মহারাজার মন মোকদ্দমার মূল বিষয় হইতে সরিয়া গিয়া, কোলাী হইয়াও চৈতন্য রামায়ণ পড়ে এই অবাস্তব ক্যাকড়াতে নিবদ্ধ হইল। রক্তচক্ষে তিনি বলিলেন, "বদমাশি, সুরু করেছ। রামায়ণ পড়বে ত জেলে পুঁওব। বাইরে গিরে লেখাপড়া করো এ কথা আবার শুনেতে পাই ত বাইরে আর যেতে দেব না—জেলে পাঠাব।"

মরার মাংস খাইতেই হইবে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে কিন্নরদের দৃষ্টি নাই। এখানে রাজপুতদেরও ঘেঁষে পুরুষে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই—মলত্যাগের পরে শৌচ করে না। জঙ্গলে দাঁতন মিলে, কিন্তু দাঁতন কেহ করে না। তজ্জাত এ কথা বলিতেই হইবে যে, হরিজনেরা আরও অধিক অপরিচ্ছন্ন। তাহাদের অপরিচ্ছন্নতার মূলে মুখ্যতঃ দারিদ্র্য। জীবা পুরুষ কোন হরিজনের পরিধানই নিরুত্ত কাপড় দেখিতে পাইবেন না। তাহাদের চোজিতে পর্যাপ্ত তালি, শাড়ীর ত কথাই নাই। বিহানা ও গায়ে চাপা দেওয়ার কয়ল ছিন্ন চট হইতেও জীর্ণ এবং অধম। কাজের কঁাকে যখনই ফুরসত পায় তখনই কাপড় হইতে উকুন মারিতে তাহারা বলিয়া যায়। এই উকুন মরার ব্যাপার ঘটার পর ঘটা ধরিয়া চলিতে থাকে। হরিজনেরা মরা গরুর মাংস খায়, চামড়া ছাড়ায়, তাই ত তাহারা হরিজনদের ঘৃণা করে, ইহাই সর্বর্ণদের কথা। মৃত জন্তুর মাংসাহার তকার-জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন হরিজন মরা মাংস খাইবে না ঠিক করিলে সর্বর্ণেরা তাহাকে তাহা খাইতে বাধ্য করে। পথে এক কোলাী যুবকের সহিত আলাপ। কার্যাব্যাপদেশে সে রামপুর গিয়াছিল। কংগ্রেসের কোন ব্যক্তার বক্তৃতায় সে শোনে যে মরা গরুর মাংস খাইতে নাই। কথাটা যুবকের মনে ধরিয়া যায়। বাঙালী ফিরিয়া সে প্রতিজ্ঞা করে মরা গরুর মাংস আর সে খাইবে না। অমুকে মরা মাংস খাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এই কথাটা গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সর্বর্ণেরা প্রমাদ গণিল। মরা মাংস খাইবে না, তার মানে চামড়াও ছাড়াইবে না। মরা গরু বন্দ তবে অপসারণ করিবে কে? তা বাদে সাক-স্মৃতরা থাকিতে আরম্ভ করিলে যে তারা স্বাধীন হইয়া যাইবে, নিজ পায়ের দাঁড়াইবে, আমাদের দাসত্ব অধীকার করিবে। গ্রামবাসীরা পক্ষায়েত ডাকিল। পক্ষায়েতের সম্মুখে কোলাী যুবকের শমন হইল। পক্ষায়েত ও কোলাী যুবকের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তাহা এই:

'শুনতে পাচ্ছি মরা মাংস আর নাকি খাবি না?'

'হাঁ, ছেড়েছি, হিন্দুদের মরা মাংস খেতে নাই। গরু মাংসের তুল্য।'

‘তবে কি তোর বাপ-ঠাকুরদা হিন্দু ছিল না; তুই নতুন হিন্দু হতে যাচ্ছিস?’

‘বাপ-ঠাকুরদার কথা জানি না।’ এখন থেকে আর ও মাংস খাব না।’

‘মরা মাংস তোকে খেতেই হবে, নয়ত গ্রাম ছাড়তে হবে।’

‘মনিব! গাঁ ছেড়ে যাওয়ার জায়গা আমার আছে কি? আপনাদের কাছে মিনতি মরা মাংস খেতে আমার কোর করবেন না।’

‘তা হবে না।’ কংগ্রেসওয়ালাদের কথায় তুই মাথায় চড়তে বসেছিস। তোর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তারা করবে।’

‘যুবককে পরে একঘরে করা হয়। সেলাই কল আনিয়া সে দক্ষিণ কাজ করিতেছে। এখানেও বাদ সাধার—কলটা তার হাতছাড়া করার চেষ্টা চলে। কিন্তু তাহা কলবতী হয় নাই। মাষ্টার অম্বলালজী পরিষ্কার করিয়া বুকাইয়া দেওয়ার সর্বগদের উৎসাহে ভাঙা পড়িয়া যায়। মাষ্টার অম্বলালজী মল্লু গ্রামের সম্মানিত সর্বগ—হরিজন-ত্বিত্ত্বী নিষ্ঠাবান কর্মী।

কোন হরিজন ভাল কাপড় পরিলে অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাকে গালমন্দ সহিতে, ধমক, এমন কি কখন কখনও মারও খাইতে হয়। এরূপ আচরণের কারণ তুস্পষ্ট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কথা তাহারা ভুলিয়া যাক, চিরদিনের মত মোংরা থাকুক, সর্বগেরা ইহাই চাহে।

এক হরিজন বমবিভাগে কাজ করিত। তাহার কার্যকাল মধ্যম শেষ হইল তখন বম-বিভাগ হইতে সে কতকগুলি দেব-দাকুর তত্ত্বা পায়। তত্ত্বাগুলি সে তার ঘরে লাগায়। তাহা গাঁয়ের লোকের অসহ্য হইল। বেচারাকে ডাকিয়া তাহারা বলিয়া দিল—‘তত্ত্বাগুলি বুঙ্গে ফেল।’ ‘বুঙ্গে ফেলিতে হবে কেন?’ এই বেমাদবির জ্ঞত তার প্রহার মিলিল। সর্বগেরা একথাও বলিল—‘তুই ত কোলী। তোর ঘরে দেবদাকুর তত্ত্বার তৈরি হয় ত তোর আর আমাদের মধ্যে তফাৎ থাকল কোথায়? বাপ-দাদা যেমন চলতো তেমন চলতেই তোর কল্যাণ লাটসাংহেব হতে গিচ্ছে ত মরেছ।’ আপন হাতে সে তত্ত্বা খুলিল না, দেখিয়া গ্রামের যুবকেরা তার বাড়ীতে গিয়া ঘরের চাল কাটিয়া নীচে লাগান তত্ত্বাগুলি খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

হরিজনেরা জনসভা করিতে পার না। করিলে পুলিশ ও সর্বগ-জনতার হাতে তাহাদের মারপিট খাইতে ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মনে হইল সর্বগদের মধ্যে এখন অনেক এমন বিবেচক লোক আছেন যাহারা হরিজনদের প্রতি সহ্যবাহার করিতে চাহেন। শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য পুষ্ট হইতেছে।

রামপুরের জনসভায় হরিজনদের আমি বলি, ‘কোলী ইত্যাদি যাহাদের রুজি চামড়া ছাড়া নো, তাহাদের আমি বলছি, চামড়া ছাড়াইতে আপত্তি করা তোমাদের উচিত নহে। চামড়া দেশের সম্পদ। চামড়ার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। অতএব যত পশুর চামড়া যদি নষ্ট হতে দিই ত চামড়ার লক্ষ্য লাঞ্ছা গরুর প্রাণ বাবে। যে সব কোলী এখানে জুতা তৈরি করে তাদের লক্ষ্যও ত চামড়া চাই। যত গো-মহিষের চামড়া যদি তারা নিছেরা না ছাড়ায় তা হলে নিছেরদের প্রয়োজনেই ত বাইরে থেকে তাদের চামড়া আনাতে হবে। তবেই দেখতে পাচ্ছ, হুমকি দিয়েই ক্ষতি হবে।’

যেখানেই কোন কোলীর সহিত কথা হইয়াছে, বলিয়াছি—‘চামড়ার কাজ হীন নহে। সর্বগেরাও আজ ‘শর্মা বুট হাউস’, ‘অগ্রবাল বুট হাউস’, নাম দিয়ে চামড়ার ব্যাপার করছে। তোমরা যারা চিরকাল চামড়ার কাজ করে এসেছ, চামড়া পাকা ও রং করতে শিখে কাঁচা চামড়াকে দামী চামড়ার পরিণত করাতেই তোমাদের কল্যাণ। তাতে সমাজে তোমাদের স্থান উচু হবে।’

কোলীদিগকে চামড়া পাকান ও রং করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত রামপুরে স্থল খোলা দরকার। প্রসঙ্গতঃ কলিয যে সর্বগদের আচরণ অদ্ভুত। গরু ও বলদের কল্যাণে আত্মবন তাতারা লাভবান হইলেও যত গো-বলদকে তাহারা অপবিত্র মনে করিয়া থাকে, ছোঁও না। অথচ গরুকে তাহারা জাবার মাভাও বলে। যত গোমাভার গতি যাহারা করে তাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখা এবং তাহাদের কাজকে হীন মনে করা তাহাদের শোভা পায় না।

এমন যে আবশ্যিক কাজ তাকেও হেয় চক্ষে দেখার সংস্কার সর্বগদের মজাগত হইয়া গিয়াছে। অতএব যত দিন এই সংস্কার দূর না হইতেছে তত দিন শিক্ষিত হরিজনেরা তাহাদের এই পুরাতন রুজিকে হীন মনে করিবেই। হিন্দুধর্ম ছাড়া অত কোন ধর্মে এমনটি দেখা যায় না।

জনসভা করার অধিকার আইনতঃ সকলেরই আছে। আমরা চাই যে প্রিমাচল প্রদেশ-সরকার, বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগ এই মৌলিক অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত না করে। তজ্জন্ত সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

অস্পৃশ্যতার জন্ত অস্পৃশ্যেরাও দায়ী

কোটগড়ের এক সভায় রেড (ভাদ্রী) জাতির একটি লোকের বিরুদ্ধে জনৈক কোলী অভিযোগ করে যে, সে তার হাতের জল ধায় না। অভিযোগের উত্তরে রেড বলিল, ‘কোলীরা আমার হাতে জল ধায় কি যে আমি ধাব?’

কোলীদের মধ্যেই, যাহারা চামড়ার কাজ করে না তাহারা চামড়ার কাজ করে এরূপ কোলীদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতে স্মারিত করিয়াছে—ছাকা, জল বদ করিতেছে। বড় বলিয়া

পণ্য হইতে হইলে নিজেদের অপেক্ষা বাহারা ছোট তাহাদের ঘৃণা করিতে হয় এ শিক্ষা বস্তুতঃ অবর্ণেরা সর্বদেবের কাছ হইতেই পাইয়াছে। তাই পরস্পর সমান হইলেও বড় বলিয়া পণ্য হওয়ার তাগিদে ইহারা অপর কাহাকেও ছোট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যে হরিজন নিজে ‘অস্পৃশ্য’, বাহার-ছায়ায় নাকি কল ‘অপবিত্র’ হয়, সেও পর্যন্ত সমপর্যায়ের তাইদের ঘৃণা করিয়া নিজকে বড় দেখানোর স্বপ্ন দেখিতেছে।

হরিজনদের চারি বিভাগ

হরিজন বলিতে সাধারণভাবে কোলীদেরই বুঝায়। আধিক অসংখ্য দিক হইতে হরিজনদের চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। হালী—জোতদার কোন কোলীকে শ্রেষ্ঠ পাঁচ টাকা দিয়া হালী করিয়া লয়। জোতদারের জমিতে সে লাঙ্গল দেয়, অল্প কর্মাসও তাকে খাটিতে হয়। হালীকে যেদিন জোতদার কাজে লাগার সেদিন তাহাকে সে প্রতি বেলা দুই-খানা করিয়া তিন সন্ধ্যার ছয়খানা রুটি দেয়। একখানি রুটি ওজনে প্রায় তিন হটাক। তা ছাড়া জোতদার শীতের ফসল হইতে বিশ সের ও গ্রীষ্মের ফসল হইতে বাইশ সের গম দিয়া থাকে।

২। রেগতু—কোন কোলী বিশ-চল্লিশ টাকার ঋণের দায়ে স্তন-বাবদ যখন জোতদারের কাজ করে তখন তাহাকে ‘রেগতু’ বলে। রেগতু এক প্রকারের জীভদাস। রেগতুকে জোতদার, সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় দুইখানা করিয়া রুটি খাইতে দেয়। পুরাতন হেঁড়া কাপড়ও সে পায়। ভোর পাঁচটার তার কাজ আরম্ভ হয়, আর শেষ হয় রাজি দশটার। বাড়ী সত্তর ঘণ্টা কাজ করিয়া জোতদারের কাছে সে ছুটি পায়। বাড়ী সে কিরে খালি হাতে, মলিন যুগে। ললাটের লিখনের দোষ দিতে দিতে সে পথ চলে। নিজ সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তার অন্তরে চাপা ক্রমের রোল উঠে।

রেগতু কোলীর অবস্থা বস্তুতঃ পশুরও অধম। অসুখ হইলে বা কাজে না আসিলে জোতদার তাহাকে খাইতে দেয় না। টাকা দিয়া জোতদার তাহাকে বরাদ্দ করিয়াছে, ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেই তবে গোলামি হইতে তার অব্যাহতি। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে অসাধ্য। অল্প কোথাও ত সে কাজ করিতে পায় না। সে উপায়ও নাই। অপর কোন জোতদারের রেগতু হইলে তবে ত সে তাহাকে টাকা দিবে।

৩। বৈটু—জোতদার যাহাকে সামান্য কিছু অর্থের জমি দেয়—অর্থাৎ নিজ খেতিতে বসায়, আশ্রয় দেয় ও কাজ চলার মত কিছু ঋণও দেয়, তাহাকে জোতদারের বৈটু বলে। হাল দিতে বা অল্প কাজ করিতে জোতদার যখনই ডাকিবে তখনই বৈটু আসিতে বাধ্য—নিজ কাজ ফেলিয়া যদি আসিতে হয় তবুও। অল্পখান জমির পাকা ফসল ফাটিয়া লইয়া

জোতদার তাহাকে ভাড়াইয়া দেয়। কাজের দ্রুত জোতদার যে দিন বৈটুকে ডাকে সেদিন সারাদিনের আহাৰ বাবদ সে চার হটাক আটা বা চাল পায়।

৪। ক্বার—জোতদারের বাড়ীতে যে দিনমজুর হিসাবে কাজ করে তাকে ক্বার বলে। মজুরী বাবদ মর্গদ কিছু সে পায় না। দিন বেলায় দুইখানা করিয়া ছয়খানা রুটি সে খাইতে পায়। তদতিরিক্ত ছুটির সময়ে আরও দুইখানি রুটি দেওয়া হয়। তাহা সে বাড়ী-লইয়া যায়।

একটি গ্রামের সকল লোকের বৃত্তির অহুসন্ধান আমরা করি। গ্রামে চৌদ্দ ঘর কোলীর বাস। তার মধ্যে একটি পরিবারের কেবল নিজ জমি আছে। অবশিষ্ট সকলে হালী বা রেগতু। একটি পরিবার পাইলাম—তার চারজন লোকের একজন হালী, একজন রেগতু, একজন বৈটু আর চতুর্থ জন ক্বার।

কোন কোন কোলী সম্প্রতি দক্ষিণ কাজও বরিয়াছে। তাঁতি ও কামারের কাজও হরিজনেরা করে। কিন্তু অবস্থা তাহাদের সকলেরই সমান শোচনীয়। কারিগর হইলেও জমিদারের কবলযুক্ত তাহারা মর্হে। পরিশ্রমিক বাবদ যে ধান গম তাহারা পায় তাহাতে তাহাদের সংসার চলে না। ঋণগ্রস্ত হরিজনদের কাছে স্বাধীনতার কথা, সমান সুযোগের প্রতিশ্রুতি অর্থহীন।

বৈষম্য

পাহাড়্য দেশে সর্বদেবের অধ-স্বত্বাভি ও ভেহার পর্কে বাজনা-বাজান হয়। হিমালয়ের হুগল নামেও বর-যাজার ও শবযাজার বাদ্য বাজিয়া থাকে। কিন্নর দেশে হরিজনেরা বাজনা বাজায়। কিন্তু নিজেদের সমাজে জন্ম-স্বত্বাভি বাজনা বাজাইবার অধিকার তাহাদের নাই। বাদ্য কেবল সর্বদেবেরই অধিকার। অল্প বাতশয় পঞ্চায়েতের সম্পত্তি, কারণ সর্ব সর্ব সর্ব সকলেরই একত্ব চালা দিতে হয়।

কিছু দিন আগের কথা। হরিজনদের একটি বরযাজা বাড়ী হইতে লাড়ঙ্গা যাইতেছিল। বরযাজার লাড়ী ও লাড়া (বর কনে) দুই-ই ছিল। লাড়ঙ্গা পৌঁছিতে, জমিদার শোভা-যাত্রা রুখিল—অপরাধ, বাদ্য বাজিতেছিল। বরযাজীদের উপর লাঠি চলিল—বরও বাদ গেল না। বরযাজীরা তাহার মাথা কাটাইতে বাকী রাখে নাই। রামপুর আদালতে ঐ যোকদ্দমা চলিতেছে।

দত্তনগরে ত্রিধামী দত্তাজয় মহারাজের মন্দির। মন্দিরের আশ্রিনায় স্কুল বসে। পাঠশালার শিক্ষক সহদয় লোক, হরিজন-হিতৈষী। তাহার চেষ্ঠায় এগার জন হরিজন বালক পড়িতে পাইতেছে। পাঠশালায় ঢুকিতে যাইতেছি, দেখি দরজার বাহিরে তিন চারিটি পার্শ্বাঙ্গী স্থলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘পার্শ্বাঙ্গীগুলি এখানে কেন?’ উত্তর পাইলাম

পায়জামাগুলি হরিজন ছাত্রদের। হরিজন বালকদের পায়জামা পরিয়া মন্দিরের চতুঃসীমানার প্রবেশ করার অধিকার নাই। নোট পরিয়া যাইতে হয়।

মন্দিরের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করিলাম, 'বালকদের পায়জামা পরিয়া পাঠশালায় আসিতে দিন।' সামলে বলিতেছি তাহারা আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

হরিজনদের দাবি

তাহারা চাহে :—

১। জমি তাহাদের হউক। যে জমি তাহারা ভোগ করিতেছে তাতে তাহাদের মালিকানা কাগজপত্রে স্বীকৃত হউক। হস্তান্তর জমি তাহাদের ক্ষেত্র দেওয়া হউক। আর যেহেতু তাহারা জমিহীন সেইহেতু জমির নুতন বিলি-বন্দোবস্তের সময়ে হরিজনদের দাবি সর্বপ্রথমে যেন বিবেচনা করা হয়।

২। সর্বস্বাধারণের কুরা বা বাওড়া হইতে জল উত্তার সমান অধিকার এবং অপর শ্রেণীর লোকের ভার মন্দির-প্রবেশের ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে বরষাভ্রাণ্ড ও শবযাত্রার সমান অধিকার।

৩। জনসভার অবাধ অধিকার তাহাদের যেন মিলে।

৪। মরা মাংস খাইতে তাহাদের জোরজবরদস্তি না করা হয়।

৫। এ পর্য্যন্ত হরিজনদের লেখাপড়ার বাধা ছিল। তাই অধিকসংখ্যক হরিজন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দিয়া সরকার এই দিকে উৎসাহ দান করুন।

৬। সংখ্যানুপাতে পকারেতে হরিজনদের জন্ম আসন্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৭। হরিজনদের বহুদূর নিরতিশয় জীর্ণ। ঘর ঘেরা-মতের জন্ম বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা।

খ—চাষবাস ও জীবিকা : জমি জল

যে মাসে আমি কিম্বর দেশে গিয়াছিলাম। সেই সময়টার জলের অভাব থাকে না। সারা বছর তথায় পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যায় এ কথা যেন পাঠক মনে না করেন। বসন্তপক্ষে কিম্বরদেশে বৃষ্টি হয় না। শীতকালে বরফ পড়ে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া জলশ্রোত বহিতে থাকে। বৃদ্ধিমান কৃষক এই জল ক্ষেতে বরিয়া রাখে। প্রায় সর্বত্র জুন মাসের মাঝামাঝি বরফ গলিয়া শেষ হইয়া যায়। তখন পানীর জলের পর্য্যাপ্ত অভাব ঘটে।

এক বৃদ্ধ চাষীর সঙ্গে দেখা। সে বলিল, 'ভগবান শু সব জায়গায় আছেন। ভগবান শু সব জায়গায় বৃষ্টি দেন। আমাদের এখানে বর্ষা-ঋতুই নাই। বাৎসরিক তক বৃষ্টি হয়। তার পরে এদিকে কেন যে ভগবান বৃষ্টি দেন না।' বসন্ত-ঋতুর-পূর্ব মরুস্থলের দিক হইতে দেখিলে এই প্রদেশ কোয়েটা-বেলুচিস্তানের মত শুষ্ক দেশ। সংলগ্ন তিব্বত দেশও অসুস্থ

শুষ্ক অঞ্চল। তাই তিব্বতের কৃষির অবস্থা কিম্বর দেশেই মত। কোশের পর কোশ বরিয়া জল ও অশ্বারূষ জমি। আবাদী জমি কম। খাড়া উঁচু পাহাড় বেশী। আবার ভূমির-পাতও হয় অধিক। সুতরাং খেতির পক্ষে অসুবিধা।

ফলের চাষ

ভগবান এ দেশটাকে যেম ফলের জন্মই বৃষ্টি করিয়াছেন। আমার এক্ষিত্যর থাকিত ত কিম্বর দেশে আমি শ্রেষ্ঠ ফলের চাষই করাইতাম, আর ফলের বিনিময়ে সরকারকে এখানকার অন্যের ব্যবস্থা করিতে বলিতাম। তাহা হইলে শুষ্ক আব-হাওয়ার যে সব ফল জন্মে সে সব ফল কোয়েটা-বেলুচিস্তান হইতে আমদানি করার আর প্রয়োজন থাকিবে না। তার অর্থ রাষ্ট্রগঠনে কিম্বর দেশের যাহা দেওয়ার আছে তাহা দেওয়ার সুযোগ সে পাইবে, আর তার ভিতর দিয়া সে মিছে উন্নত হইবে। চমন (বেলুচিস্তান) অপেক্ষা পাখা-বাটিতে অনেক বেশী ফল উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

কিম্বর দেশে বৃষ্টিপাত কম। অতএব কিম্বর দেশ প্রকৃত পক্ষে চাষ-আবাদের বা বন-বৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নহে। শুষ্ক আব-হাওয়ার ফল—আজুর, আপেল, পুরবানী, বাদাম, আখরোট ইত্যাদির চাষের উৎসাহ এখানে দেওয়া উচিত।

কিম্বর সীমান্ত প্রদেশ

সুতরাং চীনি পর্য্যন্ত ত মোটরের রাস্তা হওয়া চাই-ই, আর নচার পর্য্যন্তও তাহা প্রসারিত করা একান্ত দরকার। কল রপ্তানির সুবিধা তাহাতে ত হইবেই; অত কারণেও তাহা আবশ্যক। কিম্বর দেশ তিব্বত সীমায় অবস্থিত। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় সহিত মোটর ও টেলিফোন দ্বারা এই সীমান্ত প্রদেশের সংযোগবিধান রাষ্ট্ররক্ষার দিক হইতেও প্রয়োজন।

কিম্বর দেশ পরিভ্রমণ কালে এ সম্বন্ধে বহু কিম্বরের সহিত কথা হইয়াছে। কিম্বর দেশের ব্যবসায় তিব্বতের সঙ্গে। তিব্বত হইতে রামপুরে সোহাগা, পশম, লবণ ও কিছু ঔষধ আমদানি হয়। আর ভারত হইতে রপ্তানি হয় চাউল, কাপড় ও গুড়। ভেড়া ও ছাগলের পিঠে এই সব পণ্যের আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। কিম্বর-ব্যবসায়ীদের হাজার হাজার টাকা তিব্বতে খাটিতেছে। তিব্বতী ডাক্তারেরা সময় সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপরে হামলা করিয়া থাকে। আমা-দের বিবেচনায় চীনির আরও ওদিকে ভারত-তিব্বত সড়কের পর অবস্থিত ভারতের শেষ সীমান্ত গ্রাম নগরীয় পুলিশ-চৌকি সংস্থাপন করা আবশ্যক। উহার সহিত টেলিফোনের যোগ-যোগ ব্যবস্থা করাও দরকার।

পশম উৎপাদনের পক্ষে অন্তরায়

কিম্বর দেশে দেবদারু ও চীড় গাছের বন বৃষ্টি করা হয়।

আমার বিবেচনায় তাহা ঠিক নহে। যে সব গাছের পাতা তেড়া-ছাগলের খাদ্য এরূপ বৃক্ষের বন সৃষ্টি করাই এখানে সম্ভব। মনে রাখিতে হইবে যে, তেড়া-ছাগল এ দেশের প্রধান সম্পদ। দেশের লোকের নীতি নিবারণের নিমিত্ত কিম্বদেরা শত শত মণ পশম উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইহা লাভজনক প্রাচীন শিল্প। হুংঘের বিষয়, কিম্বদের উন্নতির পথে আজ নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে। বন-বিভাগ হইতেছে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তেড়া-ছাগলকে বনের শত্রু মনে করা হয়। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় পরিবর্তন হওয়া চাই। যেসব ছাগ-পালন ব্যবসায় যাহাতে সুরক্ষিত হয় এবং উত্তরোত্তর উন্নতির উন্নতি হয় সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। এই ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাব যাহাতে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে একযোগে কাজ করে, ইহাদের মধ্যে থাকিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিম্বর দেশ আজও এই ব্যবসায়কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহা রক্ষার জন্য সরকার সচেতন হইলে, এই ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। নষ্ট হইলে আবার নতুন করিয়া আরম্ভ করা কঠিন হইবে। তাই এই দিকে সত্বর সম্মিলিত চেষ্টা হওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে মেঘপাল লইয়া কিম্বদেরা যখন বাতী করিতেছিল তখন মেঘের পালে সংক্রামক ঘুরে-বা রোগ দেখা দেয় আর তার ফলে বহু তেড়া মরিতেছিল, নিক চক্ষেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। এইরূপ সময়ে একটু ফিনাইল পাইতে পারে রাস্তার কোথাও রাস্তার ভরফ হইতে সেই ব্যবস্থা নাই। শীতকালে কিম্বদেরা তেড়া লইয়া নীচে নামে, আর গ্রীষ্মকালে তেড়া লইয়া তাহারা বগুঁছে ফিরে। এই দুই সময়ে কিছু দিনের জন্ত রাস্তার চিকিৎসার সাধারণ

ব্যবস্থা করিলে শত শত তেড়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

কিম্বদের সম্পদ পশু

কিম্বদেরা পশু ভালবাসে। পশু তাহাদের সম্পদ। নিজেদের বয়ং অনাহারে থাকিবে, কিন্তু পশুদের তাহারা কখনই অনাহারে রাখে না। নিজেদের শিশুসন্তান পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিয়াছে, আর কিম্বরী তেড়ার বাচ্চা পিঠে বহিয়া চলিয়াছে, এ দৃশ্য চক্ষে পড়িয়াছে। গরু-বলদ দেখিয়া মনে হইয়াছে, ওগুলি সম্বন্ধে পালিত। কিম্বদেরা এক নতুন জাতের বলদ সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা হইতেছে তিব্বতী ইয়াক ও ভারতীয় গরুর সহযোগ-জাত সত্তর। নাম তার 'জো'। 'জো'-এর পিঠের লোম লম্বা, আর গোটা লেজটা লম্বা লোমে ঢাকা। সাধারণ বলদ অপেক্ষা জো চারগুণ বেশী কাজ করে। কিন্তু মে মাসের পরে জো রামপুরে যাইতে পারে না—রামপুর গরম জায়গা। কিম্বদেরা ঘোড়া এবং গাভীও পোষে। কিম্বর দেশের ঘোড়ার প্রসিদ্ধি আছে। ঘোড়াকে দানা দেওয়া হয় না। জঙ্গলের বাস-পাতা খাইয়া তার পেট ভরে। কাঠিক মাসে রামপুরে একটি মেলা বসে। ঐ মেলায় কিম্বর, তিব্বত ও স্বীতির লোকেরা ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসে।

কিম্বর দেশের অন্ন-সংস্থান

বগুঁয়া কিম্বরদেশের প্রধান অন্ন। বগুঁয়ার রং কাল—রাইয়ের মত ক্ষুদ্র একরূপ শব্দের দানা। যব, গম আর কোথাও কোথাও বানেরও চাষ হয়। নিজেদের ব্যবহারের জন্ত কিম্বদেরা আলুও জন্মায়। কিন্তু এখানে সর্বসাকুল্যে ছয় মাসের ধোঁরাক মাত্র জন্মে। বাকী ছয় মাসের তিন মাস তাহাদের চলে কলের-উপরে, আর তিন মাস তাহারা কাঠায় বন্য কন্দমূল-ফল খাইয়া। এরূপ দারিদ্র্য অন্য কোথাও আমি দেখি নাই।

জুয়া

শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়

সব ভুলে ভুল, গোলমাল করে বসেছি,

মিয়ার গড়িতে সমাধি নিজেই রচিছি,

দূর বালুচের চক্চকে রোদ পড়েছিল তাই দেখেছি :

মরীচিকা তাকে নদী বলে ভালবেসেছি,

সব গোলমাল ছিড়িবিড়ি করে

অকূল সাগরে ভেসেছি।

রামারণে এক পড়েছি কবে মায়া হরিণের গদ,

যে হরিণ বরা-হোয়ার বাইরে, যে হরিণ দূর কজ,

সে সোনা-হরিণে লোভ করে আমি মনে মনে শুধু পুড়েছি,

মুগরা-নেশার গহ্বর ছিলে অসংখ্য বাণ জুড়েছি,

ভীরগুলি গেছে এদিকে ওদিকে লক্ষ্য হয়নি স্পৃহ,

পিছনের দিকে ফিরে দেখি হায় তুগীর হয়েছ নিঃব।

একদা বিজয় বগ্নে বগ্নে দিন-রাত ছিহ্ন মগ্ন,

অভিযান শেষে সমুখে দেখি বিজয়-ভোরগ ভগ্ন,

কোথায় অরাতি ? সন্ধান নেই। এ কি ভুল পথে ছুটেছি,

তধু আগুনের কল্কি হয়েই ছুটেছি।

একটি জীবন পেয়েছি তাকে বাতী করে জুয়া বেলেছি,

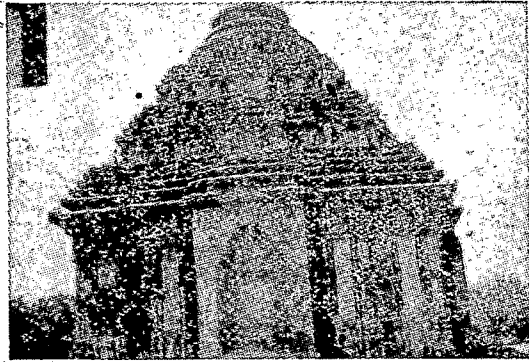
হেঁচো পেছি আমি যত বার দান কলেছি।

কোনারক

ত্রিগোপী রায়

পুরী থেকে কোনারকে যাবার ছুটি পথ আছে। একটা গো-যানে—বিশ-বাইশ মাইল, অপরটি যন্ত্র-যানে—ছাপ্পান মাইল। কোনারকের রাজী আমরা যাত্রা তিন জন। এতটা পথ নির্জন রাজ্যে গরুর গাড়ীতে পাড়ি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ল না, বাসে যাওয়াই স্থির হ'ল।

বিকেলের বাস ঠ্যাণ্ডে গিয়ে জেনে এলাম বাস ছাড়বে সকাল ছটার। এখনও হাতে প্রচুর সময়—এই অবসরে জগন্নাথদেবের মন্দির আর একবার দেখলে মন্দ হ'ত না। সন্ধ্যাও আমার প্রত্যাব সমর্থন করলেন। মন্দিরে ঢুকে মনে হ'ল এই সময়ে মন্দিরে আসাই সব দিক দিয়ে প্রশস্ত। রাজীর ভিত্ত ভিত্ত বেশী নেই, পাণ্ডার অভ্যাচার নেই, গোল-মালগু গা-সহা গোছের, শান্তিতে সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখা যায়। অর্ধচ গুপ্ত কাঠিক মাসে সকালের দিকে মন্দিরে এসে পাণ্ডাদের অর্ধগুপ্ত তার দরুন বারবার আমাদের কি নাহেহালই না তে হয়েছিল।



পাথরের গাঁথুনি দ্বারা বদ্ধ জগন্মন্দির প্রাঙ্গণ ফটক

সন্ধ্যার সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে হুঁচারটে জিনিস কিনে নিয়ে ন'টা নাগাদ হোটেলের দিকে এলাম। রাজিটা এক দুয়েই পার করে দিলাম। দুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেয়ে যখন হোটেল ভ্যাগ করলাম, তখন যড়িতে পাঁচটা বাজে। সামনে অনন্তপ্রসারিত সমুদ্র চাঁদের আলোয় উজ্জ্বলিত হয়ে শতসহস্র ঢেউয়ে কুলে আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের অভ্যর্থনা তারি চমৎকার লাগছে। রোমাঞ্চ লাগছে তোরের হাওয়ায় পথ হাঁটতে। জ্যোৎস্নারাত জন-বিরল উঁচুনিচু পথ দিয়ে আমরা চলেছি তিন জন—ফকিরবাবু, আমি আর শৈলেন্দ্র ভায়া।

বাসে যখন আসন গ্রহণ করলাম, তখন ছ'টা বাজে। শহরে বীরে বীরে আলো ফুটছে। বিরাট ধারার মত পুণিমার চাঁদ চলেছে অস্তাচলের দিকে। বাতাসে এখনও শীতের আমেজ রয়েছে। বাসের হর্ণ বেজে চলেছে। এবার যাত্রা শুরু। আমরা তিন জন ছাড়া ভাটপাড়ার এক ভদ্রলোক এবং একটি তরুণী শেষ মুহূর্তে বাসে এসে উঠলেন। এঁরাও যাচ্ছেন কোনারক।

ট্রিক সাতটার সময় বাস ছুটে চলল পিচঢালা রাস্তা দিয়ে। প্রভাতের আবহাওয়া অন্ধকার আশে আশে কেটে যাচ্ছে। গাছপালা সবকিছু পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। লোকচলাচল শুরু হয়েছে পথে। দোকানপাট ধুলছে একটির পর একটি। পথে রাজী ওঠে, ধান্য ধান্য বাস ধামে এবং আমরাও এই অবসরে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, টুকরো টুকরো আলাপ চালাই। পথের হুঁধারে যমজয়বন্ধ গোছের শ্রেণী, মাঝে মাঝে দেখা যায় বোরো ঘানের ক্ষেত। গুপ্ত কাঠিক মাসে এই ক্ষেতগুলি জলময় দেখেছিলাম। এখন কি-চমৎকার সতেজ সবুজে গাছগুলি প্রাণবান হয়ে উঠেছে। পথে আর কোন বৈচিত্র্য নেই—শুধু মাঝে মাঝে ছ-চারধানা চালাখর দেখা যায়, কোথাও চোখে পড়ে ছোটখাট মন্দির—পঞ্চারী ছ'তিন জন পরিষ্কার।

পচিশ মাইল পথ অভিজ্ঞত করে আমরা পিপিলিতে এসে পৌঁছলাম। এইখান থেকেই পথ ডান দিকে বেঁকে গেছে নিম্নাপাড়া হয়ে কোনারকের দিকে আর সোজা পথ চলে গেছে ভুবনেশ্বরে। কোনারকের রাজী এক উত্তীর্ণ ভদ্রলোক পিপিলিতে আমাদের সঙ্গী হলেন। ভদ্রলোক ধন্দরধারী এবং জমায়িক প্রকৃতির—বাংলাও মন্দ বলেন না; থাকেন গঙ্গামে।

পিপিলিতে গাড়ি দাঁড়াল আবহবর্তী। আমরা এই অবসরে এক এক গেলস জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে দিলাম। ভুবনেশ্বর থেকে যে বাস কোনারক যায়, অদূরে তার আকাং পাওয়া গেল। তখন আমাদের যন্ত্ররথ দ্বারায় সামনে এগিয়ে চলল। এইবার শুরু হ'ল ধুলিধূসর কাঁচা রাস্তা। 'কিছুকণ উঁচুনিচু পথ পার হয়ে বাস হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে জানিয়ে দিলে যে, এইবার সাবধান হওরা উচিত—এই ভাবে যেতে হবে জিশ মাইল। সকালের আলোয় এই যে দীর্ঘ যাত্রা এর কোণার যেন এডভেঞ্চারের নেশা লুকিয়ে আছে।

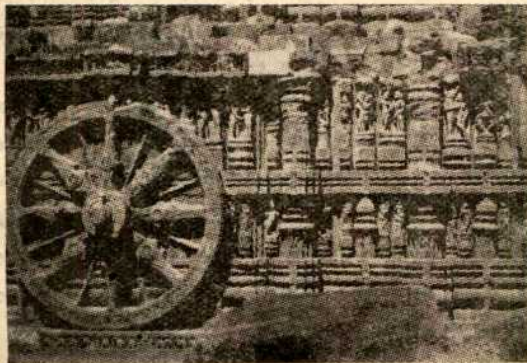
সড়কের হুঁধারে রিজ বানকেন। নীল আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শাদাশাদা টুকরো যেবা। হুঁপাতে দেখা যায় ছোট ছোট নারিকেলশ্রেণী—কোমটিতে কলোকা

হয়েছে, কোমটিতে হয় নি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দেহাতি ছ'চার জন লোক, ছ'একটা চালা। এর মধ্যে হঠাৎ গাড়ির গতি মছর হয়ে এল। নীচে দেখা গেল নীর্ণ একটি নদী, নাম ভার্গবী। উঁচু থেকে রাত্তা ক্রমশঃ নীচু হয়ে সাঁকোর গিয়ে মিশেছে। নদী থেকে এক ফুট উঁচু সেই সাঁকো এবং তা পার হতে হবে ঘাড়ীপূর্ণ বাসে করে। যাই হোক, ধীরে ধীরে বাস নদী পার হয়ে আরও উঁচুতে উঠল।

বাস চলেছে একেবেঁকে। একটা দোলমঞ্চও পার হয়ে গেল। কিছু পরে নিমাপাড়ার এসে বাস থামল। এনমা-পাড়া একটি বড় গ্রাম। থানা আছে, জুল আছে, খাবার দোকান আছে আর আছে হোটেল। শুনেছিলাম, এখানে বুধ তাল কীরকম পণ্ডা যায়। আমাদের চোখে কিন্তু কিছুই পড়ল না।

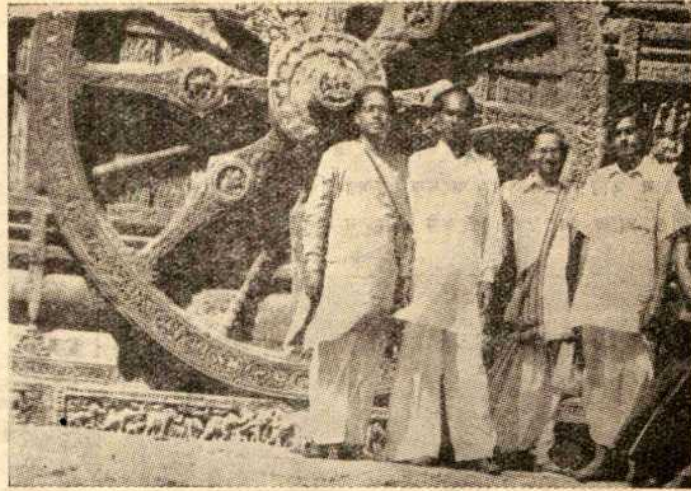
শরীর ধুলিধুলিত, মন প্রান্ত বিপর্যস্ত। একঘেয়ে যাত্রিক আওয়াজ তুলে পুনরায় বাস সামনের দিকে ছুটে চলল। এতক্ষণ পর ফকিরবাবুর অবীর প্রশ্ন শোনা গেল—‘আর কত দূর?’

গোপে এসে পৌঁছান গেল। এটিও একটি বড় গ্রাম। তবে নিমাপাড়ার মত নয়—তার সঙ্গে আকারে না হোক, প্রকারে অনেক প্রভেদ। এখানেও থানা আছে, কোটমত



মন্দিরের নক্সা এবং চক্র

বাজার আছে, একটি ধাবারের দোকানও আছে। এখান থেকে কোনারক ভের মাইল। তালগাছের কাঁকের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে কোনারকের মন্দিরের আভাস—অনেকটা প্যাগোডার মত। অনেক দিনের সমস্তপোষিত বাসনা তা হলে পূর্ণ হবার পথে।



সঙ্গীতগণসহ লেখক (বাম দিকে)

ডান পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছে। তার প্রায় সব-টুকুই বালি, একটু জল। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে চকিতে দেখা হয়, আবার কোথায় লুকিয়ে যায়। নদীটির নাম কুশভদ্রা। ধানিক পরে আবার একটি পুলের উপর এসে পৌঁছলাম—ভার্গবীর পুলের মত। পুল পার হবার পরেই দেখা গেল পথের দু'পাশে চলেছে ঘন বাউয়ের সারি। এবার পথে আর হুলো নেই। যে দিকে তাকাও শুধু বালি আর বালি। আগে সমুদ্র যে কোনারকের মন্দিরের কাছেই ছিল, এই স্রুদ্রপ্রসারিত বালুকারাশি দেখেই তা আন্দাজ করা যায়।

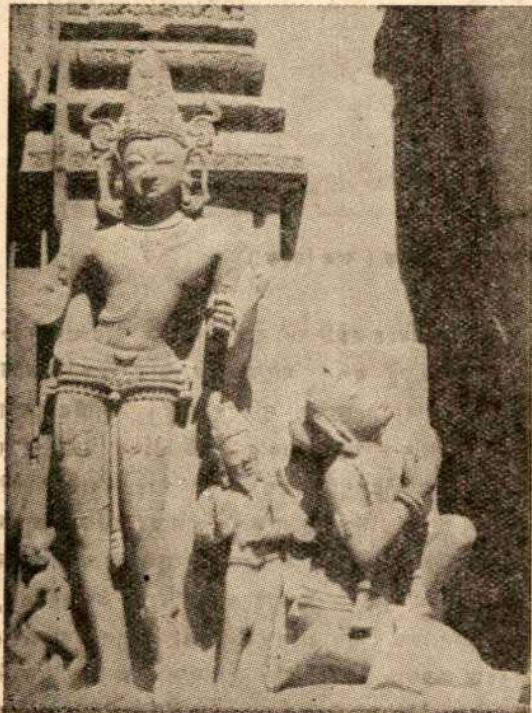
রোদ চড়ছে। প্রভাতের সোনালী আমেজ কেটে গিয়েছে। বাটির মত উপুড় করা আকাশ থেকে সূর্য হঠাৎ রৌদ্রালোকের অজস্র প্লাবন। বেলা এগারোটায় আমরা পৌঁছলাম মন্দিরের পারদেশে। ধাবারের বোলা, ‘ওয়াটার বটল’ নিয়ে বালি ভেঙে ভেঙে এসে ঠাণ্ডালাম মন্দিরের চতুঃসীমার ভিতরে। চারদিকে শুধু নিকষকালো পাথর আর পাথর—ভেঙে-পড়া মন্দিরের এককালের সমৃদ্ধির নিদর্শন। কালের সাক্ষী হিসাবে আজও কোন রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে জগমন মন্দির। জগমন দিয়েই সূর্য্যামন্দিরে ঢুকতে হ'ত।

দূর থেকে জগমনকে একটি অতিকায় রথের মত দেখায়। চকিরশক্তি চক্র এবং সাতটি অংক সম্বিষ্ট যে মন্দির ছিল বিরাট আকারের আজ তার সাহস্রমাজ নিদর্শনই অবশিষ্ট আছে। জগমনে বোধ হয় বারোটি চক্র—ছ'একটি অবিকৃত, বাকিগুলি ভগ্ন। মন্দিরের এক দিকে দুটি অংক যেন গতির প্রতীক, এক দিকে দুটি হস্তী, অঙ্গ দিকে দুটি ব্যাঘ্র।

এবার আমরা স্রুদ্র পারদের সিঁড়ি ভেঙে জগমন মন্দিরের উপরে উঠতে লাগলাম। ধানিকহুয় গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে

সামনে লাগলাম সূর্য্যদেবতার বেদীর উদ্দেশে একেবারে পাতালপুরীতে। ফুলভাপাতা-শোভিত হস্তীস্থ বোদাই-করা চমৎকার একটি পাথরের বেদী দেখা গেল। গাইড বললে যে, প্রথম মন্দিরের নিদর্শনস্বরূপ এই বেদীটাই বর্তমান আছে। এর উপরেই অধিষ্ঠিত ছিল সূর্য্যদেবতার মন্বন্তরিরাম মূর্তি। অজ্ঞাত অনেক সুন্দর জিনিসের সঙ্গে সে মূর্তিও আজ অপহৃত। কেউ বলেন—পুরীর জগন্নাথ

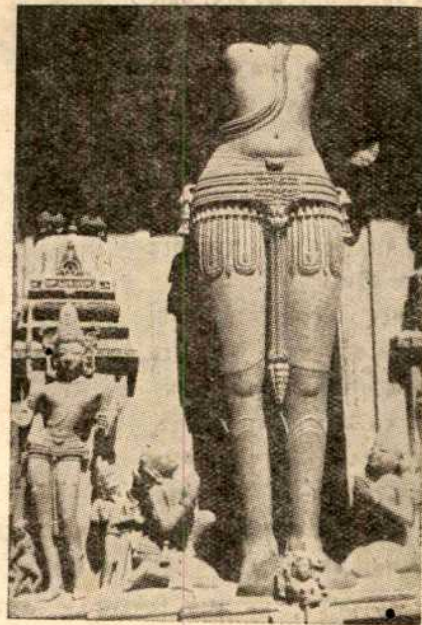
করা। অধিকাংশই ভগ্ন বা বিগতগ্রী—কতকগুলি মূর্তি অবশ্য অতঃপ অবস্থায় আছে। এই ভগ্ন মূর্তিগুলির মধ্যে প্রাচীন



সূর্য্যমূর্তি ও তার পাথের মূর্তিগুলি

মন্দিরের একটি কক্ষের অভ্যন্তরে অঙ্কার কোণে যে মূর্তিটি দেখা যায়, সেইটাই আসল সূর্য্যমূর্তি। পুরীর মন্দিরে ঐ মূর্তিটি আমরা দেখেছি। আসল মূর্তি না হলেও ওটি যে কোনারকের মন্দিরের কোম মূর্তি তাতে সন্দেহ নেই। কেননা পাথরের রঙ, মূর্তির গঠননৈপুণ্য কোনারকের মূর্তিগুলিরই অঙ্গরূপ। কোনারকের অরুণ শুভ্রটিও তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অপসারিত করে জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ-পথের সামনের রাস্তায় এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অঙ্কার কক্ষ থেকে ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় উপরে উঠতে লাগলাম। অনেক উচ্চে উঠেছি, সামনের দিকে অব্যবহিত পুণ্ড্রা, নিচে গাছপালাগুলো ছোট দেখাচ্ছে, মন্দিরগাজে অসংখ্য মূর্তি। কোমটি বাসুকীর মত, কোমটি মোহিনীমূর্তি, কোমটি বা



কোনারকের একটি ভগ্নশীর্ষ সূর্য্যমূর্তি

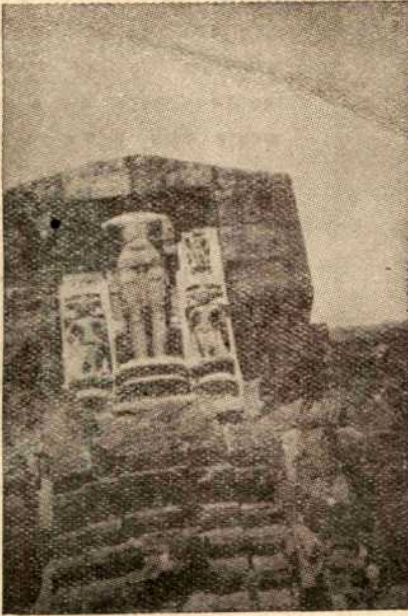
উড়িয়ার ভাস্কর্য্যশিল্পের যে নিদর্শন দেখতে পেলাম, তাতে বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে মন্দিরগাজে কি অপূর্ণ শিল্পকলাই না করে গেছেন সেকালের শিল্পীরা। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সব শিল্পী মূর্তির প্রেরণায় ও অল্পাঙ্গ সাধনায় পাষণকে মূর্খ করে তুলেছিল, আজ কোথায় তারা আর কোথায় বা তাদের উত্তরসাধক বংশধরগণ।

জগন্মন্দির উচ্চতা একশ' পঞ্চাশ ফুট। প্রথম মন্দির ছিল এরও চেয়ে উচ্চ। এত উচ্চে এই বিরাট বিরাট পাথর তাঁরা কেমন করে বহন করে নিয়েছিলেন, তা ভাবতে মন বিনম্র হয়ে আসে ততঃ ওঠে। যেকালে ক্রেন ছিল না, সেই সময়ে এত উচ্চে এই বিশাল আকারের পাথর কেমন করে উত্তোলিত হ'ল। তবে কি এমন কোম যন্ত্র ছিল যা আজকের ক্রেনেরই অঙ্গরূপ?

ছোটখাটো মূর্তি হাজারে হাজারে মন্দিরগাজে উৎকীর্ণ রয়েছে। তা ছাড়া মাহুঘের মস্তকপ্রমাণ কয়েকটি বৃহদাকার মূর্তি—কোমটি মোহিনী, কোমটি যুদ্ধবাহিনী মারী, কোমটি মিলন-রত গ্রী-পুরুষ—কোমটিই অতঃপ বা অটুট নয়। আরও কয়েকটি বিরাট আকারের সূর্য্যমূর্তি নজরে পড়ল, মূর্তিগুলির শিল্পনৈপুণ্য এমনি চমৎকার যে, চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। যেমন ঠাণ্ডাবার দুগ্ধ ভদ্রী, তেমনি তার ব্যঞ্জনা, গলায়

উপবীত, কটিতে অপরাপ কটিভূষণ, পায়ে পাহুকা। মূর্তিগুলি দেখলে মাথা শ্রদ্ধায় তক্তিতে অবনত হয়। সেগুলি সবুজ পাথরে খোদাই করা। কারও হাত ভাঙা, কোনটি মুণ্ডহীন।

জগন্মন্দির আকার একটি বিরাট রথের মত, যে কয়টি চাকা কালের তুল হস্তাবলোপ এড়িয়ে আজও নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, সেগুলি বিশাল আকারের। চাকাগুলিতে অনেক রকমের নক্সা রয়েছে। মন্দিরটি সমস্তই কাটা কাটা পাথর দিয়ে তৈরি; একটি পাথরের উপর আর একটি পাথর; অথচ কি নির্ভূত তাবেই না মূর্তিগুলি মিল খেয়ে গেছে—শুধু জোড়ের চিহ্নটি ছাড়া। প্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরে উঠতে হয়। সোপানগুলির শেষভাগেই প্রধান ফটক। এটি এখন পাথরের গাঁথুনি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফটকের



অপর একটি সূর্য্যমূর্তি

ছ'পাশে এবং মাথার সবুজ পাথরে উৎকীর্ণ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি নজরে পড়ল। নীচে থেকে দাঁড়িয়ে মন্দিরশীর্ষের দিকে তাকালে আরও কতকগুলি মূর্তি চোখে পড়ে। মনে হয় একটি গরুড় পক্ষীর, একটি লক্ষ্মীর। স্পষ্ট ভাবে ভূমি থেকে দেখা যায় শুধু বিশাল সূর্য্যমূর্তিগুলিকে।

একটি মূর্তি ভারি ভাল লাগল। এই হাতভাঙা বিরাট মূর্তিটির ছই পাশে মূর্তিমত্তক দুটি মূর্তি যুক্ত করে হাঁটু গেড়ে বসে আছে; তার ছ'পাশে দুটি দণ্ডায়মান বামনমূর্তি; তার ছ'পাশে আরও দুটি মূর্তি। মাথায় মুকুট, কর্ণে আভরণ, সূর্য্য-মূর্তিটির মতই গলায় উপবীত, কটিতে কটিভূষণ। একজনের হাতে উদ্ধৃত তরবারি, অপরটির হাত ভাঙা। মূর্তিগুলির উপরে

মানা অলঙ্কার, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি। সূর্য্যমূর্তিটির পাথরের তলায় আরও একটি ক্ষুদ্র মূর্তি। শিল্পকৃতির দিক থেকে এটির তুলনা নেই। মূর্তিগুলির গঠন-কৌশল ও শিল্প-সুখমা দেখে মুগ্ধ হলাম।



মন্দিরের উপরকার একটি মূর্তি

জগন্মন্দির পরিদ্রষ্টা শেষ করে এবার নীচে মেয়ে এলাম। আহা! তারি পর পুনরায় উপরে উঠার পালা। হাতে সময় খুব বেশী নেই। এর মধ্যে মন্দির ও ভোগদেব দেখে নিতে হবে। শৈলেন্দ্র ভায়া বিশ্রামের বাসনা জানালে আমি আর ফকিরবাবু ছ'জনে রওনা হলাম ডাকবাংলোর দিকে। মন্দিরের বেষ্টনী-প্রাচীর ছাড়াতেই সামনে চোখে পড়ল অমল-বিস্তৃত বালুকারাশি। সমুদ্রের আভাস দেখা যাচ্ছে দূরে। সমুদ্র এখান থেকে প্রায় তিন মাইল সরে গেছে। মধ্যস্থলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চন্দ্রভাগা নদীভট—সেখানে প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীতে এক বিরাট মেলায় আয়োজন হয়। দিনকয়েক আগে সে মেলা হয়ে গেছে, এখনও এখানে সেখানে তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এবার নাকি লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল এই মেলায়। আর না এগিয়ে আমরা ডাকবাংলোর ঢুকলাম বাংলোর পশ্চাতে একটি নতুন বসানো সূর্য্যমূর্তি দেখতে।

ডাকবাংলোটি বেশ চমৎকার, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। এখানে সর্কফণের ভেত মালী আছে, যে-কেউ এখানে থাকতে পারেন। কিন্তু একটা বিষয় এখানে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে

উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে আসতে হলে খাবার-দাবার কলের বোতল বা ফ্র্যাঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে আসা অবশ্যই উচিত।

এইবার নাটমন্দির এবং ভোগধর দেখবার পালা। ভোগধরের ইমারতের কোনও অংশই আজ আর খাড়া নেই। পাথরের ভগ্ন ভগ্নগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কতকগুলি ভগ্ন খাড়া আছে, কোন কোনটি ভাঙা, কোনটি বা

কাছেই ছিল এককালে স্বর্ধ্যদেবের সহধর্মিণী ছায়া বা মারা দেবীর মন্দির। প্রথম মন্দিরের সঙ্গে সে মন্দিরটিও কালের করাল গ্রাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

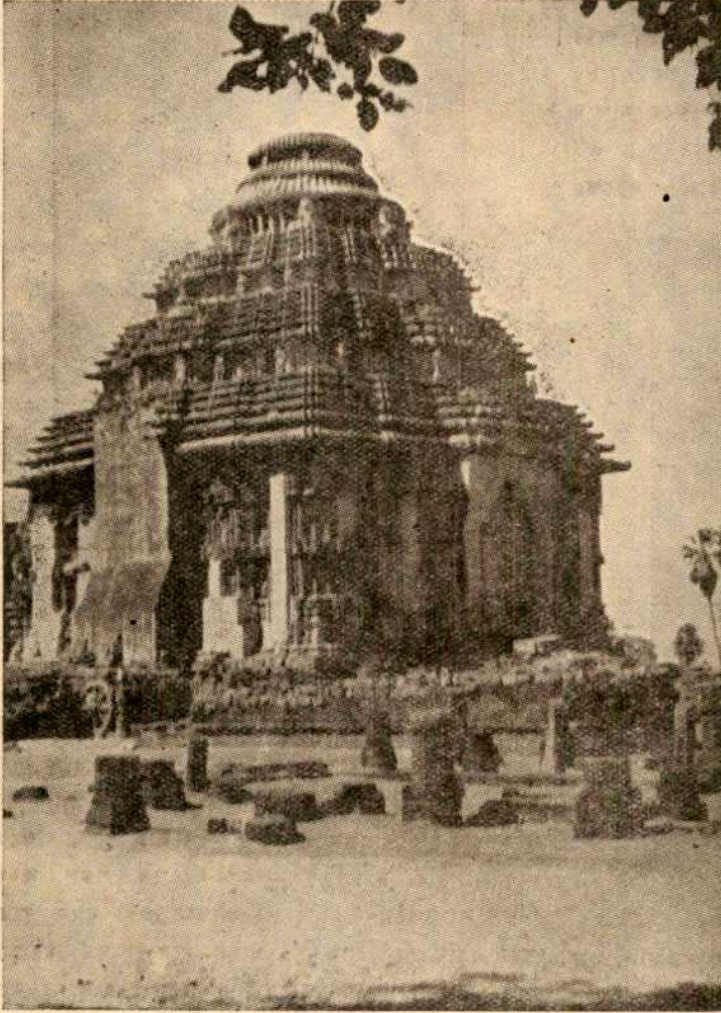
জগন্মন্দিরের ভিতরে কি ছিল, আজ আর তা জানার কোন উপায় নেই। পাছে সমগ্র মন্দিরটি ধ্বংসভূপে পরিণত হয় সেই কারণে ভিতরটা বাস্তুভূপে পূর্ণ করে বাইরে থেকে

পাথরের গাঁপুনি দ্বারা প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মারা বা ছায়াদেবীর মন্দির স্বর্ধ্যামন্দিরের সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশাল বাস্তুভূপের মধ্যে বেঠানী-প্রাচীরটুকুই বর্তমান রয়েছে। নাচঘরের ভগ্নাংশ এবং জগন্মন্দির বহিরংশই কারুকার্যবশিত। স্বর্ধ্যদেবের সপ্ত-অখচালিত সুন্দর রথের ততোধিক সুন্দর এবং অপূর্ণ কারুকার্যবশিত চক্রগুলির কয়েকটি মাত্র বিজ্ঞমান। তন্মধ্যে মাত্র দু-একটি অত্যন্ত অবস্থার আছে, বাকিগুলির কারুকার্য নকসা এবং অলঙ্করণের কিছু কিছু গ্রীহীন হয়েছে, কিছু বা ভেঙেছে। শুধু অত্যন্ত অটুট অবস্থায় দেখা যায় নবগ্রহের নয়নাভিরাম মূর্তিগুলি। কলিঙ্গদেশের প্রখ্যাতদ্বারী প্রতি মন্দিরের সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত থাকত নবগ্রহের মূর্তি। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহের নয়টি মূর্তি একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রান্ত পাথরে আড়াআড়ি ভাবে উৎকীর্ণ। মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা ভারি চমৎকার।

এইবার মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি। প্রথম বড় দেউল বা পুরুষ দেউল (গম্ভীরী); দ্বিতীয়—জগমোহন বা স্ত্রী-দেউল (দর্শকের স্থান বা ভদ্র দেউল)। এই দুয়ের মিলনের মধ্য দিয়েই স্থাপত্যের ঐশ্বর্য বিকশিত হয়েছে। বড় দেউলের মণ্ডক গোলাকৃতি, মাথায় শিরস্ত্রাণ; জগমন্দির মণ্ডক স্তরে স্তরে বিকশিত, বেষ্টীর চূড়া অধিকতর বিস্তৃত।

ভিন্ন রকম পাথরে মন্দিরটি নির্মিত। বেলে পাথর, মাকড়া পাথর এবং মৃগনি পাথর যথাক্রমে ভূবনেশ্বর ও আটগড়, ভূবনেশ্বর, বুর্জা ও নীলসিরি থেকে আনীত।

স্বর্ধ্যদেবের রথচক্রের আবর্তন কল্পনা করে মন্দিরটি পরি-কল্পিত হয়েছে। রথের হু'পাশে বার জোড়া বহুং চক্র বার মাসের প্রতীক। এক দিকে বারটি চক্রশঙ্ক, অপর দিকে বারটি



ডাক বাংলোর দিক থেকে জগন্মন্দির ছবি। সম্মুখের ভগ্ন ভগ্নগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত ভোগধরের নিদর্শন

ধরাশারী। নাটমন্দিরটিও ভেঙে গেছে। তবে এখনও এর চারপাশের দেওয়াল এবং মেঝে ও সিঁড়ি অটুট অবস্থায় রয়েছে। নাটমন্দিরের রঙ লাল, মন্দির-গায়ে বাস্তবজ্ঞ-বাদনরতা নারীমূর্তি উৎকীর্ণ। এক দিকে আছে অখারুত স্বর্ধ্যদেবতার বীরস্বাক্ষর একটি মূর্তি। মূর্তিটির বামে একেবারে ছুনির কাছেই আছে একটি বিকটাকার ভূমীরের মূর্তি। এর

কৃষ্ণপক্ষ। সূর্য্যে সাতটি ষোড়শ রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—সাত রথির বা সাত বারের প্রতীক। কেউ কেউ সূর্য্যের বেদময় রথকে সাতটি বৈদিক ছন্দে—যথা গায়ত্রী, উক্ষিক, অহঃপু, বৃহতী, পংক্তি, জষ্টপু ও অগস্তীর সঙ্গে তুলনা করেন।

মন্দিরের নক্সার সারিগুলি অতি মনোরম। তাদের নামও বিভিন্ন। (১) শাকের ডালি বা পাপড়ি ডালি—ফল-ফুল-শোভিত লতাপাতার নক্সা।

(২) নাগবন্ধিহন্দ—মাহুষের দেহের নীচে সর্পাকৃতি নাগ-নাগিনী পরস্পরকে জড়িয়ে আছে।

(৩) বন্ধনহন্দ—দুই পার্শ্বে বন্ধকাম (জী-পুরুষের মিলন) তার উপরে নর্তকীদের স্থিতি।

(৪) গোলবাই ডালি—এতে দেবী ঘায় একটি লতা বেঁকে ঢেউ তুলে এগিয়ে গেছে, প্রতি ঢেউয়ের মধ্যে একটি শিশু নৃত্য-ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। তার উপরে পৃষ্ঠে পুরুষকে বহন করে পরীকতার উড়ে চলেছে।

(৫) ঝাকরহন্দ—আলংকারিক নক্সা—উপরে নৃত্য ও বাজরতা নারীস্থিতি।

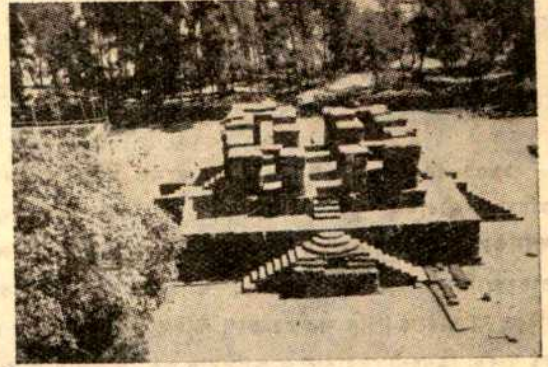
(৬) শিবরহন্দ—জী-পুরুষের মিলন—উপরে নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র নারী।

(৭) বরবাঐরি—এক প্রকার জলজ পুষ্প—মালার আকারে চিত্রিত।

(৮) কান্তি পাবুরা—ফুলের পাপড়ির চিত্র।

(৯) গঠিকাঙ্গুলা বা কেশর পাবুর—আলংকারিক নক্সা।

মন্দিরের নক্সার মধ্যেও নানা রকমের স্থাপত্য হন্দ আছে, যেমন—



অগমনের উপর থেকে নাটমন্দিরের দৃশ্য

(ক) গজগামিনী—নানাতাবে বিচরণরত অমেক বড় হস্তী।

(খ) হংসলহরী—বিভিন্ন ভঙ্গিমায় চিত্রিত হংসের দল।

(গ) মহুয়লহরী—বহু মাহুষের বিবিধ ভঙ্গিমায় চিত্র।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। বিদায়কালে কোনারকের পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে—আধুনিক সভ্যতার মোহ কোথায় আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। উড়িষ্যার ঝগসিরি দেখলাম, উদয়গিরি দেখলাম। দেখলাম কোনারক—যেখানেই গিয়েছি মন শ্রাব্যবিশ্বয়ে আগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। কয়েক শতাব্দী আগে যারা নীরস পাষাণে এই বিচিত্র রূপসৃষ্টি করে গেছেন আজ কোথায় তাঁদের উত্তর সাধকের দল।*

* আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।

স্বর্গ চাহি না আমি

শ্রীনীলরতন দাশ

যুগ যুগ হ'তে জীবনের সাথে জীবনের বন্ধন,
মাটির পরশে তাই জাগে প্রাণে পুলকের স্পন্দন।
হেরি' পৃথিবীর ঝড়-উৎসব অন্তরে মোর জাগে কলরব,
জাম সমারোহ হৃদয়ে আমার তোলে বীণা-বন্ধন—
চন্দ্র স্বর্গ্য মোর তরে হৃদে আলোকের পারাবার।

আকাশ হুম করি না কাহনা; পুষ্পিত এই ধরা
আমারি লাসিহা রূপে রসে গানে গড়ে বরণে তরা।
মাহুষের প্রেম শ্রীতি ভালোবাসা পুরায়েছে সাধ, বধ ও আশা;

মাহুষেরে তুলি' দেবতারে তাই করি নাই সন্ধান—
মাটি ও মাহুষে বন্দনা করি' রচিয়াছি মোর গান।

জীবনের মাঝে আলো ছায়া আছে; তবুও পৃথী মম।
চিত্তের ক্ষুধা নিত্য মিটার বর্ণের স্রব সাধ।
অবন্তের পাশে আছে হলহল, আছে আবিলতা হৃৎকোলাহল,
তবুও চিত্ত এ মহাতীর্থে মুক্ত দিবসধারী—
মর্ত্যের মাঝা মোহ কাটাইয়া স্বর্গ চাহি না আমি।

রাজনগর শ্রীনরীমাধব চৌধুরী

১৯০৬-এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি অনেক ভয়-ভাগাদা করিয়া কীবানন্দ ছুটি পাইলেন। মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে তাঁহার বাহ্য যে কতখানি ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহা জানিতে পারিলেন রাজনগরে আসিয়া। দিন মশেক যাইতে না যাইতে তিনি গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তার পাইয়া শ্রীনরী দেবানন্দকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। হরিমন্দিরগণ সময়ে টেলিগ্রাম করিলেন ডাক্তারের জন্য। মাতার টেলিগ্রাম পাইয়া দেবানন্দ পরদিন রওনা হইল।

শেষ রাজির দিকে অংশন-ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। তাহাদের গাড়ী আসিতে তখনও কিছু দেরী আছে। মালপত্র এক আয়গার রাখিয়া দেবানন্দ প্র্যাটকরমে পারচারি করিতে লাগিল।

সে যে গাড়ীতে আসিয়াছিল তাহা চলিয়া যাইবার পরে কুলিরা প্র্যাটকরমের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। পান, সিগারেট ও ধাবারের কিরীওলালাও নিজ নিজ জিনিষের বাজের পাশে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার মত অপেক্ষমাণ বাজীরা কেহ প্র্যাটকরমের উপর সতরফি পাড়িয়া শুইয়াছে, কেহ বেকিতে বা নিজের টাক, বিছানার উপর বসিয়া চুলিতেছে। অতবৎ অংশন-ষ্টেশনটা সারা দিনের ক্লাস্তি ও হটগোলের পর যেন বিম্বাইতেছে।

গাড়ীতে গরম ও ভিজে বড় কষ্ট হইয়াছে। বিরবিরে হাওয়া দিতেছিল প্র্যাটকরমে। কিছুকণ পারচারি করিবার পর দেবানন্দের শরীর জুড়াইয়া গেল। কিছুকণের মধ্যেই টিকিট-ঘরের কাছে আসিয়া সে থামিয়া গেল।

টিকিট-ঘরের কাছে একটা বড় কাঠের বাজ রহিয়াছে। তাহার উপরে দুই জন লোক, বোধ হয় ষ্টেশনের কুলি কি তেওয়ার, পাশাপাশি ঘুমাইতেছে। নীচে বাজের পায়ে ঠেস দিয়া দুই জন বিহারী পুলিশ বিম্বাইতেছে। একজনর মাথার লাল পাগড়ি কপালের উপর নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে একখানা মরলা জিপলের উপর চারিটি ছেলে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিয়া যাইতেছে। ভজলোকের ছেলে। দেখিয়া মনে হয় বার হইতে চৌদ্দর মধ্যে বয়স। কোমরে প্রডোকের দড়ি বাঁধা, হাতে হাতকড়া। তাহাদের ঘুরের উপর টিকিট ঘরের বাহিরের ঘোড়ালের আলো পড়িয়াছে। দেবানন্দ দেখিল একটু ছেলের মুখখানি নিতান্ত কচি। সেইটিকে ঘলের মধ্যে লকলের ঘোট বসিয়া মনে হইল। ছেলেদের কোমরের

দড়ির অপর প্রান্তে কনেইবল দুইটি নিজেদের পারের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আশামীর পালাইবার চেষ্টা করিলে পারে টান পড়িবে, তাহারা জাগিয়া উঠিবে।

দেবানন্দ কিছুকণ দাঁড়াইয়া ছেলেগুলিকে দেখিল। কোন কুলের নীচের ক্লাদের জাজ হরত। সম্ভবতঃ বন্দে মাতরমের মত মারাত্মক কথা উচ্চারণ করিবার জন্য অথবা কোন দোকানদারকে “বিসাভী লবণ বেচিও না তাই” বলিয়া কোড় হাতে জুহুরোধ করিবার জন্য প্রবলপ্রতাপাদিত সরকারের আদেশে তাহারা প্রেতার হইয়াছে। বিচার হইবে যটা করিয়া। শান্তি হইবে বেত, জরিমানা বা কারাদণ্ড। কুল-কর্তৃপক্ষ মহামান্য ইন্সপেক্টরের আদেশে করিবেন রাষ্ট্রকেশন। দেবানন্দ আবার পারচারি করিতে আরম্ভ করিল। মকী বাজিয়া উঠিল। কুলি, তেওয়ারা এবং দুইজন বাজীরা সকলে উঠিয়া বসিল। কিছুকণ কাটীয়া গেলে গাড়ী আসিয়া পড়িল। জিনিসপত্র লইয়া দেবানন্দ গাড়ীতে উঠিতে যাউতেছে পিছনে শুনি “বন্দে মাতরম”। “বন্দে মাতরম”। কোমরে দড়ি-বাঁধা দুইটি ছেলে কামরা হইতে প্র্যাটকরমে নামিয়া “বন্দে মাতরম” ধ্বনি দিতে লাগিল, তাহাদের হাতেও হাতকড়া। ব্যস্ত বাজীরা এদিকে ওদিকে যাইবার সময় চাহিয়া দেখিতেছে। ঘুরে টিকিট-ঘরের দিক হইতে আবার শব্দ আসিল “বন্দে মাতরম”। দুইজন ছেলে চারটিকে কনেইবলরা ধাক্কা দিয়া আগাইয়াছে। এই গাড়ীতে তাহাদের যাইবার কথা। পুলিশ কোমরের দড়ি ধরিয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া তাহাদের লইয়া চলিল গাড়ীর দিকে।

দেবানন্দ গাড়ীতে উঠিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া প্র্যাটকরমে বাজীদের টেলাঠেলি হুড়াহুড়ি দেখিতে লাগিল। মাথার মত পাগড়ী বাঁধা, হাতে ভারী মোট লইয়া একজন বাজী হন্ হন্ করিয়া যাইতেছিল। দেবানন্দ জানালার দাঁড়াইয়া তাহার দিকে অনামনক ভাবে তাকাইয়া তাবিত্তেছিল স্তম্ভ বড় পাগড়ী বাহার মাথার, বোধ হয় সে পঞ্জাবী হইবে। জানালার কাছে আসিয়া লোকটী একবার উপরেই দিকে চাহিয়া একটু দাঁড়াইল, তার পর আবার পা বাড়াইল। দেবানন্দ ভক্তকণে লাকাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। সে আগাইয়া গিয়া বাজীটিকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—সভীম-দা।

সভীম দাক কিরাইয়া দেখিল দেবানন্দ। মোট নামাইয়া রাখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—আরে, তুমি কতটা বড় হয়ে গেছিলে দেখু। জানালার ভোকে দেখে মনে হ’ল

যেন চেনা লোক। কম আলোতে ভাল দেখতে পাই নি।
ভুল হতে পারে ভেবে ডাকি নি।

দেবানন্দের মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—তার পর
যাচ্ছি কোথায়? কলেজ চলছে না?

দেবানন্দ ছানাইল তাহার পিতার অস্থির খবর পাইয়া
বাড়ী যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

সতীন—আমি যাচ্ছি রাজসাহা, সেখান থেকে আরও
অনেক জায়গায় যাব। তোদের বাড়ী এর ক'টা ষ্টেশন পরে
বলত?

দেবানন্দ—তিনটে ষ্টেশন পরে। এটা দেড়েক লাগে।

সতীন—বদলি হবার পর আর তোর বাবার সঙ্গে দেখা
হয় নি। আমি তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করি। তোর সঙ্গেও কত
দিন পরে দেখা হ'ল। ভাবছি—

দেবানন্দ সাগ্রহে বলিল—কি ভাবছেন সতীন-দা?
বাবাকে একবার দেখতে যাবেন?

সতীন একটু চিন্তিত ভাবে বলিল—তাই ভাবছি, কিন্তু
হাতে অনেকগুলো কাজ আছে। তা থাক। চল এক দিনের
জন্য তোদের ওখানে ঘুরে আসি।

দেবানন্দ অনিন্দে যেন আত্মহারা হইয়া গেল। তার পর
তাহার মোটী তুলিয়া লইয়া, নিজের যে কামরায় উঠিয়াছিল
সেই কামরায় সতীনকে উঠাইয়া তাহার টিকিট কিনিবার জন্য
নামিয়া গেল এবং তাত্তাত্তি টিকিট লইয়া ফিরিল। হুই জন
গাড়ীর এককোণে পাশাপাশি বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দেবানন্দ ও সতীন যখন রাজনগর রোড ষ্টেশনে নামিল
তখন রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ষ্টেশনঘরের দিক
হইতে লঠন হাতে এক জন লোক আগাইয়া আসিল তাহাদের
দিকে। কাছে আসিয়া সে লঠন তুলিয়া বরিয়া দেবানন্দকে
দেখিয়া সেলাম করিল। বলিল—বাবু আইছেন? মাঠাম
গাড়ী পাঠাইছেন।

দেবানন্দ চিনিল তাহাদের বাড়ীর বাঁধা গাড়োয়ান
ইসমাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা কেমন আছেন ছান
ইসমাইল?

ইসমাইল বলিল—আজ্ঞার দোয়ায় কর্তা ভাল আছেন আজ
হুই রোজ। কাল বিয়ানের গাড়ীতে সদরের ডাক্তার সাহেব
কিয়া গ্যালেম।

সতীনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ইসমাইল বলিল—এ বাবুরে
ত চেনলাম না। এনি কি ডাক্তার?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—না, ইনি আমার মাষ্টার মশায়।
বাবার অস্থির খবর শুনে দেখতে এসেছেন।

ইসমাইল বলিল—সেলাম বাবু। কর্তার শক্ত ব্যারাম
হইছে শুনি। আপুনি দেখতি আইছেন ইটি বড় সঠিক কাম
হইছে। এখন চলেন। গাড়ীতে শুয়া দুম ভান, পত্তর

ধানেকের মতি পৌছ্যা যাবান। মালপত্তর আমার মাতার
তুল্যা দ্যান।

দেবানন্দ ও সতীন গাড়ীতে উঠিয়া পাশাপাশি শুইল।
মহিষের গাড়ীর ঝাঁকুনি সঙ্গেও হুই চারিটা কণাবাড়ীর পরে
তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। একটা উচু কাঠের পুল হইতে
গাড়ী গড়াইয়া নামিবার সময়ে হুই জনের মধ্যে গাঢ় লাগিতে
তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা উঠিয়া বসিয়া হাসিতে
লাগিল।

চারদিক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, বিস্তৃত চরা মাঠের
ওপারে আকাশের এক অংশ উজ্জল দেখাইতেছে। একটু
পরে স্বর্ঘ উকি দিবে। দেবানন্দ বাহিরের দিকে চাহিয়া
বলিল—সতীন-দা, চলুন এবার মেয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে প্রায়
অন্ধক পথ এসে গেছি।

তাহারা হুই জন নামিয়া গাড়ীর আগে আগে হাঁটু চালাইয়া
খিরঝিরে হাওয়া দিতেছিল। হাওয়ার সঙ্গে বুঝ মৌল্যেই
একটু মিষ্ট গন্ধ।

তাহারা হাঁটুতে লাগিল। রাস্তার পাশে চাষীদের বাড়ী,
বাঁশের বাড়, আম, কাঁঠাল, কলার বাগান, ভামাক, লক্ষা,
বেগুনের ক্ষেত, ধানের মরাই নজরে পড়িল। এই গ্রাম ছাড়িয়া
আবার হুই ধারে খোলা মাঠ। কিছু দূর গিয়া দেবানন্দ
বাঁ দিকে মাঠের ওপারে দূরে মুরলী বিলের দিকে সতীনের
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বলিল—এ যে দূরে স্বর্ঘের আলোতে
চিক চিক করছে দেখছেন ওটা মুরলী বিল। মত্ত বড় পদ্মবন
আছে-বিলে। বিলে খুব মাছ। আর শীতের সময় কত
রকমের পাখী যে আসে তার লেখাখোখা নেই।

সতীন বলিল—কি নাম বলিল? মুরলী বিল? তোদের
বিলের নাম ত বড় কবিরূপ। ভোরের আলোতে কেমন
বলমল করছে ওদিকটা দেখ।

দেবানন্দ বলিল—আমুন, এ বটগাছটার নীচে বসি।

সতীন বলিল—আরে, রাস্তার মধ্যে বিজ্রাম করলে বাড়ী
পৌছতে দেরি হয়ে যাবে।

দেবানন্দ বলিল—দেরি হবে কেন? আমরা ত এসে
গেছি প্রায়। এ যে গায়ে গায়ে গাছের সার দেখছেন এ গাছ-
গুলোর ওবারে রাজনগর। আর পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলে
কালীবাড়ী দেখা যাবে।

হুই জনে বটগাছের নীচে মুরলী বিলের দিকে মুখ করিয়া
বসিয়া পত্রীর শান্ত্রী উপভোগ করিতে লাগিল।

এমনি ভাবে কিছুকণ কাটিলে পর সতীন বলিল—ওরে,
এবার ওঠ দেখি।

হুই জন আবার হাঁটুতে লাগিল। কিছুকণ পরে জিওলী
নদী দেখা গেল। তার পর কালীবাড়ী পিছনে রাখিয়া তাহারা

রাজমগরে পৌছিল। সতীন বলিল—গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করবি না ?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—গাড়ী কখন আসবে ঠিক আছে ? ইসমাইল ঘুম মিছে আর মোষ হুটো খেয়ালমত টুকটুক করে আসছে। চলুন আমরা এগুই।

আমের মধ্যে ঢুকিয়া কিছুদূর আগাইতে দেবানন্দ দেখিল ইন্স আসিতেছে।

ইন্স আসিয়া দেবানন্দকে জড়াইয়া বলিল। বলিল—কেমন আছ দেবদা ? কাকাবাবু ভাল আছেন।

দেবানন্দ ইন্সের হাত ধরিয়া বলিল—ইনি কে জানিস ? ইনি সতীন-দা, বার কথা তোকে কত লিখেছি।

ইন্স হাত ছাড়াইয়া লইয়া সতীনকে প্রণাম করিতে গেল, সতীন তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিল—ধাক্কা ভাই, প্রণাম করতে হবে না। তোমাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা মনে ছিল অনেক দিন।

ইন্স খুব খুশী হইল সতীনকে পাইয়া। দেবানন্দকে বলিল—এঁকে কোথায় পেলে দেবদা ?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—তাই নী সতীন-দা ?

সতীন হাঁসে হাসিল।

গল্প করিতে করিতে তিন জন চৌলপাড়ায় দেবানন্দদের বাড়ীতে পৌছিল। দোতলার বারান্দা হইতে তাহাদের দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মী দৌড়াইতে দৌড়াইতে নীচে নামিল। সিঁড়ির নীচে তাহার মাকে দেখিয়া বলিল—মা, দাদা এসেছে। সঙ্গে কে একজন আছে। বাবাকে বলব ?

খিনরনী বলিলেন—আমি বলছি। তুই নীচের বৈঠকখানা ঘরে বসতে দে। হাতখুঁধ ধোবার জল দিতে বল। লক্ষ্মী বাহিরের খোলা রকে আসিয়া দেখিল তিন জন উঠানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে।

লক্ষ্মী বাহিরে আসিতে দেবানন্দ বলিল—সতীন-দা, এই ভদ্রমহিলাটিকে চেনেন কি ?

সকলে হাসিয়া উঠিল। দেবানন্দ বলিল—ইনি ক্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, এর কথা আপনাকে বহুবার বলেছি।

সতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর দিকে চাহিল। দেবকন্ডার মত লাবণ্যময়ী সুলক্ষণা মেয়েটিকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। বলিল—তোমাকে আমি চিনি লক্ষ্মী-দিদি। আমাকে ত তুমি চেন না ?

লক্ষ্মী সলজ্জ কণ্ঠে বলিল—আমি আপনার কথা শুনেছি। মা আপনাদের এই ঘরে বসতে বললেন। আপনি বসুন।

রকের এক পাশে রক্ষিত কলসী বড় বাসতি ও জলচৌকি দেখাইয়া বলিল—আপনি হাত খুঁধ ধোবেন ওখানে। আমি লাবান, পাঁচড়া সব আনছি।

লক্ষ্মী ভিতরে চলিয়া গেল।

হাতখুঁধ ধুইয়া জলযোগ সারিয়া সতীন ইন্স ও দেবানন্দের সঙ্গে উপরে গেল জীবানন্দকে দেখিতে। সতীন প্রণাম করিয়া বলিল—দেবুর কাছে আপনার শক্ত অন্তরের খবর শুনলাম ঠেকেন। তাই একবার দেখতে এসাম আপনাকে।

জীবানন্দ শুইয়াছিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন—তোমাকে দেখে বড় খুশী হলাম মাষ্টার। অনেক দিন ধরে ভুগে ভুগে শরীরে আর কিছু নেই।

সতীন জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার কি অন্তর বলে ?

জীবানন্দ বলিলেন, ডাক্তার তো একটা গালভরা নাম বলে গেল। আমি বলি শরীরের চাইতে মনের অন্তর বেশী। সে কথা ঠিক। ভূমি এসেছে, দেবু এসেছে, তোমাদের কাছে অনেক খবর পাওয়া যাবে। ভাল কথা মাষ্টার, তুমি কি এখনও চাকরি করছ, না চাকরি ছেড়ে কোম দলে ভিড়েছ।

সতীন দেবানন্দের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল, চাকরি ছাড়ব কেন স্তর, এমন ভাল চাকরি। স্বয়ং হোটেলটি ফুলার বলেছেন, হেলেরা ডিল ও ব্যায়াম করুক। তাঁর আপত্তি শুধু বন্দে মাতরমে। আমি ত হেলেনদের বন্দে মাতরম বলতে নিষেধ করি।

জীবানন্দ বলিলেন, নিষেধ কর ? কেন বল ত মাষ্টার ? তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন।

সতীন হাসিতে লাগিল। বলিল, আপনি উঠবেন না, শুয়ে থাকুন। আমরা বসছি।

মেঝেতে শীতল পাটি বিছানো ছিল। সকলে তাহার উপর বসিল। লক্ষ্মী একটা দাদা পাথরের বাটিতে বেদানার রস আনিয়া পিতার শয্যার পাশে দাঁড়াইল। যুহু ধরে বলিল, দাদা বেদানা এনেছে, মা রস করে দিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন, বেদানার রস ? দাও।

পিতাকে রস খাওয়াইয়া বাটি হাতে লক্ষ্মী ঘর হইতে বাহিরে গিয়া তখনই ফিরিল। বলিল, বাবা, জ্যেষ্ঠামশাই এসেছেন।

হরিনারায়ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সতীন এই শাল-প্রাংস্ত মহাভুজ বিরাট পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। ডাবিল, তাহার জিমনাটিক-করা দেহকে এই মাহুঘটি ইচ্ছা করিলে এক আছড়ে ছাড় করিয়া দিতে পারেন। সতীন ও দেবানন্দ হরিনারায়ণকে প্রণাম করিল। হরিনারায়ণ তাহাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। দেবানন্দ সতীনের পরিচয় দিল। জীবানন্দ বলিলেন, দেবু মাষ্টারের ঘে পরিচরটা দিল সেইটেই তার সবটুকু নয়। এর অস্ত্র একটা পরিচর আছে। মাষ্টার, এখন এসেছ হুঁচার দিন থাকবে ত ?

সতীন বলিল, হঠাৎ আসা...

হরিনারায়ণ বলিলেন, যাওয়াটা হঠাৎ হবে না। তোমরা

সব বসে। কি কথা হচ্ছিল আমি আসবার সময় ?

জীবানন্দ বলিলেন—মাঠার বলছিল সে ছেলেদের বন্দে মাতরম্ বলতে নিষেধ করে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করছিলাম।

হরিনারায়ণ বলিলেন, সত্যিনের নিষেধের কারণ কি আমি জানি নে, তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে হয়েছে। লায়ন সাহেবের এটি বন্দে মাতরম্ সারকুলার অমার্জিত করাকে মুখ্য স্থান দিলে আমাদের আন্দোলনকে খুব বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। প্রহার, জেল, জরিমানা, রাষ্ট্রকেশন, অস্তিত্বাবক ও শিক্ষকদের ভাঙে মারবার ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হচ্ছে।

জীবানন্দ বলিলেন, সেদিন শুভমলায় কোথায় এক বরযাত্রী দলের শোভাযাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে বরযাত্রীরা বন্দে মাতরম্ বলতে পারে এই ভয়ে।

হরিনারায়ণ বলিলেন, বরযাত্রী কেন হরিনাক্ষরীর্ণনও কোন কোন জায়গায় এ আশংকা বন্ধ করা হয়েছে। এদিকে ঢাকার ব্যাম্ফিল্ড ফুলার যে উপায় আবিষ্কার করেছেন তাতে বঙ্গদেশী আন্দোলনের অনেক কিছু ওলটপালট হতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিবার পরে হরিনারায়ণ বলিলেন, রোগীর ঘরে এত কথাবার্তা ভাল নয়। এস, আমরা উঠি। সত্যিন, আমাদের গ্রামটা বোম্ব হব, এ পর্যন্ত ঘুরে দেখনি।

জীবানন্দ যুহুযুয়ে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আমি শু এখান ভাল আছি।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, বিকেল তক ভাল থাকলে আবার কথা হবে।

পুণে বাহির হইয়া সত্যিন বলিল, আপনি ফুলারের নূতন উপায় আবিষ্কারের কথা বলছিলেন। কি উপায় আবিষ্কার করেছে ? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধবৃষ্টির চেষ্টার কথা বলছেন কি ?

হরিনারায়ণ বলিলেন, সেই কথা আমার মনে উঠেছে বটে। বঙ্গদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার সময়ে এ অঞ্চলের মুসলমানরা কতকটা বঙ্গদেশীভাবাপন্ন হয়েছিল তা আমি লক্ষ্যও করেছিলাম। এখন দেখছি তাদের ধারণা হয়েছে যে, সরকার বাহাদুর তাদেরই সুবিধের জেতে বাংলাদেশকে ছুই খণ্ড করেছেন। কি সুবিধে হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। এই ধারণা থেকে বিলেতী লবণ, চিনি, কাপড় কেনবার জেতে এদের আগ্রহ বেড়েছে।

প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, তোমার সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর আমি ইন্ডের কাছে দেবুর চিঠিগুলোতে আগে পেতাম। সে এখানে এক আয়োজনটি সমিতি গড়েছিল, পুলিশের উৎপাতে সমিতির কাজ বন্ধ হয়েছে, অনেক ছেলে

পালিয়েছে ভয়ে আর অস্তিত্বাবকের তাক্‌মার। সব জায়গাতে বোম্ব হব এই অবস্থা ?

সত্যিন বলিল, কোন কোন জায়গায় এই অবস্থা হয়েছে বটে। কাজের পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই উদ্দেশ্যেই আমি কতকগুলো জায়গায় খোঁজ নিতে বেরিয়েছি।

হরিনারায়ণ বলিলেন, এখানেও খোঁজ নাও। এখানকার হেড মাঠার উৎসাহী লোক। ইন্ড হেড মাঠারের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যাবে। আজ বেলা হয়েছে। ইন্ড, তুমি বরং ব্রাজেনবাবুকে একটু খবর দিয়ে এস বিকেলে তিনি যেন জীবানন্দের বাড়ীতে আসেন।

ইন্ড বলিল, এখন গেলে তাঁকে বোম্ব হব, বাড়ীতে পাওরা যাবে। যাব ?

হরিনারায়ণ—পাবে কি ? দেখে এস। চল সত্যিন, আমাদের বাড়ীতে একটু বসবে।

সত্যিন—আমিও ইন্ডের সঙ্গে একটু ঘুরে আসি না।

হরিনারায়ণ—আচ্ছা যাও। ইন্ডের সঙ্গেই ফিরে এসো।

দেবানন্দ, ইন্ড ও সত্যিন গল্প করিতে করিতে হেড মাঠারের বাড়ীর দিকে চলিল। সত্যিন জুলের ছেলেদের ও মাঠারদের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। করণপুত্রের পাশ দিয়া যাইবার সময় ইন্ড বলিল, চলুন সত্যিনদা, মঙ্গলচণ্ডীর বাড়ীতে একটা প্রণাম করে যাই।

মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের কাছে গিয়া তাহার দেখিল মন্দিরের বাহিরে বাধানো চাতালের এক কোণে একজন বৈরাগী বসিয়া একতারা বাজাইয়া শুন্ শুন্ করিয়া গান করিতেছে। তাহাদের দুই জনকে দেখিয়া সে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল :

বাবু, বুঝবে কি আর মলে

তোমার কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে

একদম দকা সারলে।

ছিল ধান গোলাস্তরা, খেত ইন্দুরে করলে সারা

চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখ না বাবু ধূলে—

ধান নিয়েছে, ধান নিয়েছে, হাত দিয়েছে কুলে

বাবু, বুঝবে কি আর মলে।

ইন্ড ও দেবানন্দ এই বৈরাগীকে আগে রাজনগরে কখনও দেখে নাই, বৈরাগী-বোষ্টমের যুগে এ ধরনের গান কোথাও শোনে নাই। দেবানন্দ সত্যিনকে বলিল, রাধেকৃষ্ণ ছেড়ে বৈরাগী নূতন রকমের গান গাইছে শুনছেন সত্যিন-দা ?

সত্যিন শুনিয়াছে। ইহার আগেও গ্রামাঞ্চলে বেড়াইবার সময়ে এই রকম বৈরাগী দুই চার জনকে সে বঙ্গদেশী গান গাহিতে শুনিয়াছে। যৈমনসিং ও বরিশাল অঞ্চলে ইহাদের বেশী দেখা যায়। গ্রাম হইতে গ্রামে চাষী, মজুর, রাখাল, দোকানী, নৌকার মাঝিদের মধ্যে, দরিদ্র গৃহস্থের কুঠীরে

ইহারা জাতীয় আন্দোলনের নূতন বার্তা পৌঁছাইয়া দিতেছে।

সতীন বৈরাগীর কাছে গিয়া বলিল, এ গান কোথায় শিখলে বাবাজী?

বৈরাগী বলিল, লোকের মুখে মুখে শুনে শিখেছি বাবু।

সতীন—এ রকম গান আর ক'টা জান?

বৈরাগী—বেশী জানি না, হুঁচরটি মাতুর শুনে শুনে শিখেছি। শুনবেন আর একটা?

সতীন মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বৈরাগী আবার গান বলিল:

ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বদনারী

কতু হাতে আর পরো না।

জাগো গো ও জননী ও ভগিনী

মোহের ঘোরে আর থেকে না।

সতীন ইজের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, শুনলে ইজ? বাবাজী, এ গানও কি লোকের মুখে শুনে শিখেছ?

বৈরাগী—আজ্ঞে বাবু। নইলে আর কোথায় শিখবো?

সতীন পকেট হইতে একটি লিপি বাহির করিয়া বৈরাগীকে দিল। বলিল, তুমি কি আজই চলে যাবে এখন থেকে?

বৈরাগী—হুঁতিন দিন থাকবো বাবু। সারা গাঁয়ে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করব। তারপর তিন গাঁয়ে যাব।

ইজ—তুমি এখানে বসে থাক একটু। আমরা এখনই ফিরব। তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। সেখানে গনি শুনিয়ে ভিক্ষে নেবে। কেমন?

বৈরাগী হাসিয়া বলিল, জয় রাধে কৃষ্ণ! তাই হবে রাজাবাবু।

মদলচণ্ডীকে প্রণাম করিয়া তাহার হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিল। ইজ বাড়ীর ভিতরে গিয়া শুনিল তিনি কুলে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার জীকে পিতার অহুয়োব জানাইয়া সে ফিরিয়া আসিল। মদলচণ্ডীর বাড়ী হইতে বৈরাগীকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ীতে ফিরিল। হরিনারায়ণ তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৈরাগীকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এটিকে ছপুর্ববেলা কোথা থেকে আনলে?

বৈরাগী নিজেই উত্তর দিল। হরিনারায়ণকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, বাবুয়া গান শুনে ধরে আনলেম। বললেন, কর্তব্যবাক্তকে গান শোনাবে।—বলেই গান বলল:

রাধা বলেন, শুন সখি আর আমি যাবো না পথে।

বুন্দা বলেন, কেন গো রাধারাগী, কেন আর যাবে না পথে?

রাধা বলেন, সখি পথে বড় ভয়—পথে বড় ভয়

জাতি, মান, প্রাণ নিয়ে হবে যে সংশয়।

সাদা বান্দরে শুনি ছেয়ে গেল দেশ,

লুটে-পুটে কেড়ে ছিঁড়ে করল সকল শেষ।

পথে ঘাটে হাটে মাঠে করে অত্যাচার

রেলগাড়ীতে কত মেয়েদের দিল ছারখার।

শুনলে সে সব কথা লাগে প্রাণে দারুণ ব্যথা,

তবু দেখে দেশের মানুষ অঝোরে ঘুমায়

ওরে অঝোরে ঘুমায়।

বৈরাগী গান শেষ করিয়া বলিল, জয় রাধে কৃষ্ণ। কর্তব্য বাবু, দুটি ভিক্ষে দিতে আজ্ঞা দেন। কত জায়গায় ঘুরতে হবে।

হরিনারায়ণ শুক হইয়া গান শুনিতেছিলেন। বৈরাগীর কথা শুনিয়া বলিলেন, তুমি এই রকম গান কতগুলো শিখেছ, আমি সব শুনব। এখন বেলা হয়েছে। তুমি কাহারি-বাড়ী গিয়ে বসো। ছায়ায়ের প্রসাদ পাবে। বিকুলবেলা গান শোনাবে। কাল সকালে ভিক্ষে নিয়ে যেরো।

তিনি একজন চাকরকে ডাকিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন। সে বৈরাগীকে সঙ্গে লইয়া কাহারি-বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

বৈরাগী চলিয়া গেলে হরিনারায়ণ বলিলেন, এই জিনিসটি নুতন দেখলাম।

সতীন বলিল, এ দিকটাতে বোঝ হয়, এই আরম্ভ হয়েছে। কোন কোন জায়গায় স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকে এর চল হয়েছে। অনেক জায়গায় ভ্রমলোকের ছেলেরা স্বদেশী গান গেয়ে বেড়ায়। যৈমনসিঙে তাদের নাম হয়েছে চারণ-দল, কোথাও বলে ভাট। আরও হুঁচী জিনিস কোন কোন জায়গায় আরম্ভ হয়েছে—স্বদেশী যাত্রা ও কথকতা। পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে স্বদেশী ভাব প্রচার করা হয়। এখনও পুলিশের চোখ পড়ে নি এদিকে।

হরিনারায়ণ বলিলেন, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে নুতন ভাব প্রচার করবার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। বক্তৃতা দেশের ক'জন লোক শুনে আর খবরের কাগজ কয় জনেই বা পড়ে?

কিভাবে রাজনগরে স্বদেশী যাত্রা ও কথকতার প্রবর্তন করা যায় তাহা লইয়া হরিনারায়ণ ও সতীনের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। সতীন বলিল, স্বদেশী পালার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সে পাঠাইবে।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া সতীন ও দেবানন্দ উঠিল।

সন্ধ্যার পরে হরিনারায়ণ ও রাজেনবাবু আসিয়া জীবানন্দের ঘরে বলিলেন। দেবানন্দ ও ইজকে লইয়া সতীন রাজনগর কুলের এসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার যতীনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়াছিল। যতীনবাবু যে এক জন দলের লোক সতীন সে খবর রাজনগরে আসিবার আগে পাইয়াছিল।

কথায় কথায় রাজেনবাবু যৈমনসিঙে গোলমালের কথা

তুলিলেন। বলিলেন, আমার এক উকিল বহুর চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে, সেখানকার মুসলমানদের ধারণা হয়েছে গবর্ণমেন্ট তাদের পক্ষে। তিনি এই মর্মে লিখেছেন—মুসলিম নেতারা প্রকাশ্যভাবেই বলেছেন যে, সরকার হিন্দুদের বিক্রোহী বলে মনে করেন, কাজেই মুসলমানরা কোন শান্তির ভঙ্গ না রেখে তাদের উপর অত্যাচার চালাতে পারে।—মৌলবীরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব শীঘ্র শেষ হবে এবং আবার মুসলমান রাজত্ব কায়েম হবে। কি ধরনের অত্যাচার হচ্ছে চিঠিতে তার একটা কিরিস্তি দেওয়া হয়েছে—মিথ্যা অপবাদ রটনা, রাস্তাঘাটে রাহাজানি, ডাকাতি, দোকান লুণ্ঠ, আগুন লাগান, হিন্দুদের খাতজব্দ্য অপবিত্র করা, হিন্দু বিধবাদের জোর করে নিকা করবার ভয় দেখান ইত্যাদি।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পরে হরিনারায়ণ ও রাহেনাবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন।

রাজে হরিনারায়ণের গৃহে সতীন ও দেবানন্দের আহ্বারের নিমন্ত্রণ ছিল।

আহ্বারের পর হরিনারায়ণ আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। সতীন, ইন্ড ও দেবানন্দ সেখানে বসিয়া আলাপ করিতেছিল। হরিনারায়ণ বলিলেন, দেখ সতীন, এখানে বালক-সমিতি নাম দিবে একটা সমিতি হয়েছিল তোমাকে বলেছি বোধ হয়। পরে এর নাম হয়েছিল আয়োজিত সমিতি। এই সমিতির ছেলেরদের বলা হ'ত জাশনাল ডলাক্টিয়ার দল। লোকের আপদে-বিপদে সাহায্য করা, দুষ্ট লোকদের উপর নজর রাখা, মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদা তুলে দুসের গরীব ছেলেরদের সাহায্য করা, স্বদেশী গান গেয়ে লোকের মধ্যে স্বদেশী জিনিস ফিরি করা, হাটেবাজারে বিলাতী জিনিস না কেনবার জন্ত লোককে অহুযোগ করা—এই সব ছিল নেশনাল ডলাক্টিয়ারদের কাজ। পুলিশের অত্যাচারে ও মুসলমানরা বিগড়ে গিয়ে এদের কারো কারো নামে মোকদ্দমা আনাতে ডলাক্টিয়ার দল প্রায় ভেঙে গেছে। যে নামেই হোক একটা অরগানাইজেশন না থাকলে স্বদেশী ভাব বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হবে। তোমরা ত কর্মীলোক, এর কোন ব্যবস্থা করছ?

সতীন—এই পুরোনো নেশনাল ডলাক্টিয়ার দল দিয়ে চাকার পুলিশদা অহুশীলন সমিতি গড়ে তুলেছেন। করিদপুরে ত্রুতী-সমিতি, বরিশালে স্বদেশবাসক-সমিতি, মৈয়নসিঙে সুহৃদ ও সাধনা-সমিতি এই ভাবে গড়া হয়েছে। কলকাতার মি: মিথিরের অহুশীলন সমিতি পোড়ায় এইভাবে আরম্ভ হয়েছিল।

কি ভাবিয়া সে ধামিয়া গেল। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, এখানে দেবানন্দ ইন্ড এদের মত ছেলে আছে, ভাবনা কি? নতুন জিমিস গড়ে উঠতে দেয়া হবে না।

নানা রকমের আলাপ চলিল। বটখানেক পরে হরি-

নারায়ণ বিদায় লইয়া শয়ন করিতে গেলেন। সতীন ও দেবানন্দ টোলপাড়া রওনা হইল।

দেবানন্দের শয়নঘরে সতীনের বিছানা হইয়াছিল। অনেক রাজ পর্ধ্যন্ত দুই জনের মধ্যে কথাবার্তা চলিল। পিতার অন্তরের সংবাদ পাইবার আগে বরিশালে আসিবার সময় নিজের মানসিক অশান্তির কথা দেবানন্দ সবিত্তারে বর্ণনা করিল। বলিল, সে সময় আপনার ও দেবেন পণ্ডিত মশায়ের কথা বার বার মনে পড়ত। আপনাকে চিঠি লিখে সব জানাব ভেবেছি কতবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে ওঠে নি। আপনি থানিকটা শিথিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন, কোন্ পথে যাব বলে দিলেন না। পণ্ডিতমশাই দীক্ষা দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন, তারপর নিজের সাধনায় ডুবে গেলেন, আমিও চলে গেলাম অজ্ঞান জায়গায়। তিনি দৈপায়ন অম্বুর-মর্দিনীর আবির্ভাবের কথা বলেছিলেন। আমি দেখছি দৈপায়ন অম্বর সব সৃষ্টি লগুঙ করতে চলেছে, কিন্তু অম্বর-মর্দিনীর আবির্ভাবের কোন লক্ষণ নাই।

দেবানন্দের উত্তেজনা দেখিয়া সতীন হাসিল। বলিল, কোন লক্ষণ নেই তাই নাকি ভাবহিস তাই? ওরে অবিশ্বাসী হোস না। অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ হলে তবে না দেবীর আবির্ভাবের শুভ মুহূর্ত আসবে। তোর পথ তোর সামনে প্রসারিত রয়েছে দেবু, সময় হলে কুরাশার পরদা সরে যাবে, সেই পথ দেখতে পাবি।

দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। সতীন আবার হাসিয়া তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, অধৈর্য্য হলেই কি কাজ এগিয়ে যাবে ভাবহিস? অবস্থা অমুকুল, সময় অমুকুল হওয়া চাই। চল, এখন শুয়ে পড়া যাক, অদেক রাত হয়েছে।

দুই জনে শয্যা গ্রহণ করিল।

পরদিন জীবানন্দ ও হরিনারায়ণের কাছে বিদায় লইয়া সতীন ষ্টেশনের পথে রওনা হইল। দেবানন্দ, ইন্ড ও যতীন-বাবু গ্রামের সীমানা পর্যন্ত আসিলে সতীন তাহাদিগকে ফিরিতে বলিল। বলিল, এবার তোরা যের যা। তারপর ষ্টেশনের পথে পা বাড়াইয়া দিল।

অগস্ত্যজীর শরীর থানিকটা সারিয়াছিল মাত্র, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। তাহার নিজের ধারণা হইয়াছিল যে শীঘ্রই ওপার হইতে তাহার ডাক আসিবে। এইজন্য ইচ্ছা পড়াশুনার নিমিত্ত অজ্ঞান পাঠাইতে তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পুরুষকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্ত স্বামীর আগ্রহের কথা তিনি জানিতেন, তাই তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইচ্ছার বাইবার প্রভাবে মত দিতে হইল।

ইজের ইচ্ছা ছিল সে কলিকাতায় পড়িবে। হরিনারায়ণ তাহাতে রাজী হইলেন না। কলিকাতার বর্ধমান উত্তমক পরিবেশে ইজকে ছোট্টোলে রাখিয়া পড়াইতে তিনি তরঙ্গা করিলেন না। সদর টাউনে তাঁহার নিবাস বাড়ী আছে। স্থির হইল সেই বাড়ীতে থাকিয়া সে কলেজে পড়িবে। মাঝে মাঝে তিনি ও জগন্নাথ গিয়া সেখানে থাকিবেন। ইজকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন—এক-এ পাশ করিলে তোমাকে কলিকাতায় পাঠাইব।

পিতামাতার অমুখিতা পাইয়া ইজ কলেজে ভর্তি হইল। হরিনারায়ণ একটু ভুল করিয়াছিলেন। উত্তমক আবহাওয়া সে সময়ে কলিকাতার হাজিমহলেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা বাংলার হাজিমহাজ তখন উত্তমকর মধ্যে বাস করিত। পড়াশুনা যত না হটক, ইজ শীঘ্রই সব রকম হাজি-আন্দোলনের একজন পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইল। মক্কাবন্দ শহরে পুলিশের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয়। ইজের সহজে কিছু খবর পাইয়া পুলিশ তাহার উপর নজর রাখিল। দুই এক বার তাহাকে হাদ্যমায় জড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষের দৃঢ়তার জন্য সফল হইল না। অধ্যক্ষ ইজকে স্নেহ করিতেন। তাহার বিপদাশঙ্কা করিয়া তিনি স্থির করিলেন হরিনারায়ণকে পূজা লিখিবেন ইজকে অন্যত্র সরাইয়া লইবার জন্য।

পিতাকে সুস্থ হইয়া উঠিতে দেখিয়া দেবানন্দ তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। জীবানন্দের ইচ্ছা ছিল বরিশাল কনকারণ্য শেষ হইয়া গেলে দেবানন্দ ফিরিবে। কিন্তু দেবানন্দ কলেজ কামাই হইবার অজুহাত তুলিতে তিনি আর কিছু বলিলেন না। দেবানন্দ যেদিন রওনা হইবে তাহার আগের দিন বন্ধু অতুলের এক দীর্ঘ পত্র পাইল। এই পত্র পড়িয়া তাহার ফিরিবার আগ্রহ আরও প্রবল হইল। অতুল লিখিয়াছে—
ডাই দেবু, আমার বোধ হয় আর পড়াশুনা করা হবে না। বাবার অসুখ সারছে না, আর সারবেও না মনে হয়। সবাই বলছেন মিষ্টির চাষবাস, কাজ কারবার মেথ, বোনদের বিয়ে দাও, ছোট্ট ভাইদের মানুষ কর। বাপ অক্ষম হয়ে পড়েছেন সেক্ষেত্রে বড় ছেলে ভূমি, সব দায় ত তোমারই। মোট কথা, আন্তে আন্তে সংসারের সব ভার এসে বাড়ে চাপছে।

পড়াশুনা হবে না, সেজন্য দুঃখ করি না। পড়াশুনা করে কি বা করবে? ফুলার সাহেবের নুতন শারকুলারের কল্যাণে হিন্দুদের চাকুরি কোটা কঠিন হবে। আসল কথা মন যেমন অস্থির হয়ে উঠেছে তাতে অবোধ ছেলের মত সংসারের ভার কাঁধে বয়ে দিন কাটান শক্ত হবে মনে হচ্ছে।

এক এক দিন এমন সব ঘটনা চোখে পড়ে, এমন সব খবর কানে আসে যাতে স্থির থাকা যায় না। পুলিশের গুণামির দরুন হিন্দু গৃহস্থেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত। কখন কায় বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ে, মেয়েদের অসম্মান করে, জিনিসপত্র চুরি করে—

সকলের এই ভয়। এমাসনের শাসনে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মনে হচ্ছে ঠিক যেন মগের যুদ্ধে বাস করছি।

সলিমুল্লাহ কাছারি-বাড়ী মোল্লাদের আড্ডা হয়েছে। ঢাকা, মৈমনসিং, বোম্বাইখালি থেকে এসে এখানে আড্ডা পেড়ে তারা আশপাশের জায়গাগুলিতে আনাগোনা করছে। পুলিশের কর্মচারীদের সেখানে যাতায়াত করতে দেখা যায়। শোনা যাচ্ছে মৈমনসিংয়ে মুসলমানদের মধ্যে জোর হিন্দুবিষে প্রচার করা হচ্ছে, সরকারী কর্মচারীরা রয়েছে এর পেছনে।

ডাই, এমন অবস্থার মধ্যে মানুষ কি করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে? আমাদের পাপের শাস্তি ভালভাবেই আরম্ভ হয়েছে। মনে হচ্ছে দেশে আগুন শীঘ্রই জ্বলে উঠবে। সে আগুনে কত জন পুড়ে মরবে, কত পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যাবে তাবতে ভয় হয় মনে।

সেদিন বঙ্গদেশবান্ধব সমিতির একজন ছেলের কাছে এক-খানা কাগজ দেখলাম। মাস দুই আগের কাগজ। একটা জায়গায় চোখ পড়ল। জ্যাক (যাকে ঠাট্টা করে 'জ্যাক দি জারেন্ট-কিলার' বলা হয়), এমাসন, টমসন, কার্লামাইল ও রিজলের উল্লেখ করে লিখেছে লোকের মনে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিষয় 'ও বৈরিতাব জাগিয়ে তোলার জন্য এদের মৃত্যু আর কেউ দায়ী নয়। গবর্ণমেন্ট যদি বাংলার বঙ্গদেশী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য কৃশিয়ার গবর্ণমেন্টের মত দমননীতি চালানোই স্থির করে থাকে তা হলে তাদের এ সম্ভাবনার কথাও মনে রাখতে হবে যে, কৃশিয়ার দমননীতির বিরুদ্ধে কৃশিয়ার প্রজারা যেমন প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করেছিল এদেশের লোকেরাও তাই করতে বাধ্য হবে।

ডাই দেবু, তোমার ত অনেক পড়াশুনা আছে। কৃশিয়ার প্রজাদের এই প্রতিরোধ-নীতির বিস্তারিত তথ্য দিতে পার? বঙ্গদেশবান্ধব সমিতির অনেক ছেলে আমার কাছে জানতে চেয়েছে।

দেবু, তিন দিন আগে চিঠিটা এই পর্যন্ত লিখেছিলাম, আরও কিছু লিখব বলে ডাকে ফেলি নি। একটা লেখবার মত খবর আছে। পরন্তু খুলনা থেকে একজন আত্মীয় আসবেন বলে গীয়ার-বাটে গিয়েছিলাম। দেখি বাটে পুলিশের বিশেষ সমারোহ। তাবলাম উচ্চপদস্থ কোন সরকারী কর্মচারী আসবে বোধ হয়। শুনি, তা নয়, কলকাতা থেকে কয়েকজন বঙ্গদেশভক্তমণ্ডলা আসবে বলে পুলিশ খবর পৈয়েছে, তাই এই অভ্যর্থনার আয়োজন। বঙ্গদেশভক্তমণ্ডলা কে এলেন জানিনে তবে আমার আত্মীয় আর তাঁর সঙ্গে এলেন এক অতি দীর্ঘকায় ব্যক্তি যেন একটি সচল শামভরু। রাজীরা নেমে এসেছে আর পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে—কীহা সে আতা? সেই সাহেব-বেশী শালগ্রাম লোকটির দিকে তাকিয়ে পুলিশ বুলি পাণ্টে বললে—“আপ?” বাজখাঁই গলায় হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন শোনা

গেল, “ব্লডী সোয়াইন, গ্রেট আউট!” চমকে উঠে পুলিশ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। আশপাশের যাত্রীরা পর্যাপ্ত সে গর্জনে ভড়কে গেল।

তাবহি এ কাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন আমার আত্মীয়টি? একে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে উঠবেন নাকি? পেছন থেকে সেই গলা বললে, এগিয়ে যাও না হে বাপু। ভাল দেখে গাড়ী ঠিক করো আমার জন্ত। বাজে থার্ড ক্লাস গাড়ী করো না।

শুনে আমার পিত্ত অলে গেল। আচ্ছা লোককে সঙ্গে এনেছেন দেখছি।

তিন জন গাড়ী করে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। গাড়ীতে উঠে ভত্রলোক আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন, কি হে ভ্রাতার, বাড়িচিং শুনে ভড়কে গেলে? রংটা তেমন ফর্সা নয় বটে; কিন্তু আমি এক জন পাকা সাহেব, জন বুলস ওন ভ্রাতার।

এই জন বুলস ওন ভ্রাতারটি কে জান? মূর্ত্ত্যকার সাগরেদ জিংনারায়ণ ওরকে জিতুদা। এর বিস্তারিত পরিচয় পরে দেব। আপাততঃ এইটুকু জানাচ্ছি যে এঁর প্রকাশ পেশা একটি কিলেভী কোম্পানির ট্রাভেলিং এজেন্টগিরি, আর অপ্রকাশ পেশা সিক্রেট প্রোপাগাণ্ডা ও অরগ্যানাইজেশন। আমার আত্মীয় এঁর সত্য পরিচয় জানেন।

জিতুদাকে পেয়ে আমি অকুল কুল পেলাম। স্বদেশ-বান্ধব সমিতির ছেলেরা তাঁকে হেঁকে ধরেছে। পথের নিশানা পাবার জন্ত তারা ব্যাকুল।”

দেবানন্দ বরিশালে ফিরিয়া আসিয়া হোটেলে খোঁজ লইয়া জানিল অতুল ভাহার এখানে চলিয়া গিয়াছে, কবে আসিবে ঠিক নাই।

কনকারেজের জন্ত ভ্রাতাটির দল গঠন করা হইতেছিল। পড়াশুনা ছাড়িয়া দেবানন্দ ও মহেন্দ্র ভাহাদের দলবল লইয়া এই কাজ লইয়া পড়িল। সন্ধ্যার দিকে দেবানন্দ স্বদেশ-বান্ধব সমিতির আজ্ঞায় কাটাইত, অতুলের চিঠিতে উল্লিখিত জিতুদার সূত্রে সে আরও অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করিল। সে বুঝিতে পারিল এই ভত্রলোক স্বদেশবান্ধব সমিতির

সভ্যদের প্রাণে একটা নতুন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, ফরিদপুর, ময়মনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নতুন নতুন লোক আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। সমিতির সভ্যদের সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় হইল। স্পষ্ট করিয়া কিছু না বুঝা গেলেও চারিদিকে যেন একটা প্রস্তুতির আয়োজন শুরু হইয়াছে দেবানন্দের এই রকম মনে হইল।

পরীক্ষা আসিতেছে, পড়াশুনা বিশেষ হয় নাই। বিকিণ্ড মনকে শুঁইয়া দেবানন্দ পড়িতে বসিবার চেষ্টা করে। সেদিনও সন্ধ্যার পরে সে বই বুলিয়া বসিয়াছিল এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল। তাহাদের বাড়ীতে তাহার বন্ধুরা বড় একটা আসে না। মহেন্দ্রকে এত রাজে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মহেন্দ্র, তোমার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?

মহেন্দ্র বলিল, এই মাত্র চিঠিতে খবর পেলাম দেবেন পণ্ডিতমশাইয়ারা গেছেন।

দেবানন্দ শুনিয়া অত্যন্ত বিমূর্ষ হইয়া পড়িল, বলিল, মাস দুই থেকে তিনি সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে-ছিলেন। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন এই রকম একটা ব্যাপার শেষ পর্যাপ্ত হতে পারে।

মহেন্দ্র বলিল, আমি শুনেছিলাম তিনি নানা রকম বিজ্ঞানিক দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর শরীরও একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। যত্নের আগেও নাকি তিনি এই রকম-বিজ্ঞানিক দেখে অজ্ঞান হয়ে যান।

উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে দেবানন্দ বলিল, দেখ তাই, আমার কেমন মনে হচ্ছে পণ্ডিত মশায়ের মৃত্যু আসন্ন বড়ের সম্ভব। আরও মনে হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার আগে বড় উঠে বিপর্যয় ঘটাবে।

দিনকয়েক পরে দেবানন্দ সতীনের একটি চিঠি পাইল। দেবেন পণ্ডিত মশায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া দেবানন্দ যে আশঙ্কার কথা জানাইয়াছিল সেও সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করিয়াছে চিঠিতে।

ক্রমশঃ



পণ্ডিত্যরীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার ব্যক্তিগত অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। আমি এই দিক দিয়া অতিশয় সূতর্কতার সহিত শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কথা বলিতে চাহি, তাহা হয়ত অন্যের অবদিত। এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার মান্থব এক জন আছেন, তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পত্রাদি হইতেই তাঁহার সহিত আমার অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ ও তাঁহার রাষ্ট্রীয় মতামত প্রমাণিত হইবে। ইহা আজ বাঙালী জাতির জানিবার বিষয় বলিয়া আমার এই বিষয়ে লেখনী ধারণের আগ্রহ।

শ্রীঅরবিন্দ বিগায় লইলেন। চন্দননগরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রহিল। স্বদর্শনের কথামত তাঁহার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পত্র দিলাম। পত্রোত্তরে তিনি জানাইলেন তাঁর পণ্ডিত্য-আগমন-সংবাদ তাৎকালীন সরকারের সংশয়-ভাজন শ্রীনিবাস আয়েঙ্কার, ভি. ভি. এন্স আয়ার ও তামিল কবি ভারতীর উদ্যোগে বিপুল জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে আসায় ঘটনাটি সর্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই তিনি যে বাসা-বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর সম্মুখে সর্বদাই ইংরেজ পুলিশের ঘাঁটি বসান হইয়াছিল। তিনি এই পত্রে আরও জানাইয়াছিলেন শ্রীনিবাসের ভ্রাতা পার্থসারথি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতে-ছেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করারও নির্দেশ পত্রে ছিল। পার্থসারথির ছদ্মনামই তিনি পত্রযোগে জানাইয়া-ছিলেন। রাষ্ট্রগুরুরূপে তিনি এই বিষয়ে অতিশয় সূতর্ক ছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারী মিঃ ডেনহাম ভ্রমে মিঃ কাউলির গাড়ীতে একটি বোমা নিষ্ফুট হয়। এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি ধৃত হন তাঁহার সঙ্গীরূপে ধৃত অচ্য দুই ব্যক্তি উভয়েই চন্দননগরের নিকট প্রতিবেশী। আমার সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হেতু এই সময় হইতেই পুলিশের অমুচরবৃন্দ ছায়ার গায় আমার অমুসরণ করিত। কাজে কাজেই তাহাদের ফাঁকি দিতে অনেক সময়ে আমায় কলিকাতার পথে গা ঢাকা দিয়া চলিতে হইত। আমি এই ভাবেই পার্থসারথির সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেক কথার পর স্বামী বিবেকানন্দের কোন একখানি গুপ্তকের নির্দিষ্ট পাতার

অংশবিশেষ হইতে একটি কোড্ অর্থাৎ আক্ষরিক গুপ্তলিপি রচনা করিয়া আমার গোচর করেন, এবং বলেন এই কোডে শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিবেন; আপনিও তাঁহাকে এই কোডেই পত্র দিবেন। যদি পুলিশ আমাদের পত্র হস্তগতও করে, তাহারা কিছুই বুঝিবে না। এইরূপ নিরাপদ পত্রব্যবহার শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার অনেক দিন চলিয়াছিল।

চন্দননগর ফরাসী রাজ্য হওয়ায় ফরাসী পোষ্ট আপিসের ভিতর দিয়াই আমি পত্রাদি প্রেরণ করিতাম। পত্র শ্রীঅরবিন্দের নামে যাইত না। এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের নাম দিয়া পত্রগুলি প্রেরিত হইত। তিনি আমায় কোডেই পত্র দিতেন। সেই গুপ্তাক্ষরে লিখিত পত্রাবলী ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে স্তার চার্লস্ টেগার্ট আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করার সময়ে পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। নতুবা শ্রীঅরবিন্দের তদানীন্তন রাষ্ট্রনির্দেশ কিরূপ ছিল, তাহা প্রমাণ সহ আজ উপস্থিত করিতে পারিতাম। চন্দননগরের বিপ্লবমণ্ডলী শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হয় নাই। সে যুগে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিতচেরীতে থাকিয়া চন্দননগরের মধ্য দিয়া যে রাষ্ট্রনির্দেশ দিতেন, তাহাই বাংলার বিপ্লবী-ল পালন করিত। পরে তিনি ইহা হইতে বিরত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত তাঁহারই নির্দেশে বাংলার বিপ্লবীগণ পরিচালিত হইত। তাঁর এই বৈপ্লবিক নির্দেশের মূলেও ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মসামর্থ্যের সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার অন্তঃপ্রেরণা। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে প্রস্থানকালে শিরিসচন্দ্র ঘোষের নিকট এক ব্যক্তির নাম দয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত সংযোগস্থিত স্থাপন করি। তিনি পরলোকগত স্বরেশচন্দ্র দত্ত। মানিকতলা সম্পর্কিত বোমা নির্মাণের গুরুরূপে হেমচন্দ্র দাসের (কাহ্ননগো) নামই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মানিকতলার বোমার মামলার পর একমাত্র এই স্বরেশচন্দ্র দত্তই বাংলায় বোমা নির্মাণের কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি এম্-এস্‌সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তার পর তিনি রিপণ কলেজের অধ্যাপক হন। তাঁহারই সাহায্যে চন্দননগরে এম্-এস্‌সি ক্লাশের ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক বোমা প্রস্তুতির কৌশল শিক্ষা করেন, এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির গুপ্ত কারখানা স্থাপিত হয়।

স্বরেশচন্দ্র দত্তের নাম শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম, পরে বোমা নিষাণের ব্যাপার লইয়াই তাঁহার সহিত চন্দ্রনগরের সংযোগ স্থাপিত হয়। স্বরেশচন্দ্রের শিক্ষাকোশলে ও মণীন্দ্রনাথের প্রতিভায় চন্দ্রনগরের বোমা শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ভারতের বিপ্লব-ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিশেষত্ব অর্জন করিয়াছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিতারীতে বসিয়া বাংলার বিপ্লবীদের যথারীতি নির্দেশ দিতে লাগিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষে আমি দুই জন ফরাসী রাজপ্রতিনিধির সহিত পণ্ডিতারীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের আগমনে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের জ্ঞান শহরে ইংরেজ পুলিশের বিশেষ উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। বিশেষতঃ বাঙালী দেখিলেই এই সকল গুপ্ত পুলিশ তাহাদের চক্ষে চক্ষে রাখিত। আমি ফরাসী রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত রুদ্দেশী বাজারের সন্নিকটে রাজাপুলের প্রসিদ্ধ ভবনে অবস্থান করিয়াছিলাম। এক দিন অপরাহ্নে নিকটবর্তী পণ্ডিতারীর প্রসিদ্ধ ওদঙ্গল মাঠে যে ফুটবল খেলা হইত, তাহা দেখিতে বাহির হই। এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনী, স্বরেশচন্দ্র ওয়র্কে মণি ফুটবল খেলায় যোগ দিতে আসিতেন। শ্রীঅরবিন্দের স্থালক সৌরীন্দ্রনাথ বসুও এই মাঠে পদচারণা করিতেন। এইখানেই স্বকোশলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। আমার পণ্ডিতারী আগমনের কথা পূর্বেই পত্রযোগে শ্রীঅরবিন্দকে জানাইয়াছিলাম। সৌরীন্দ্র আমাকে লেখাই সঙ্কেতে আমায় মাঠ হইতে দূরে রাখিতে আহ্বান করিলেন। কোম্পানী বাগানের এক পথে দুই জনে মিলিত হইলাম। আমরা এক খোলার বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। যোসেফ ডেভিড নামে এক মাদ্রাজী ছাত্রের সহিত আমার এই বাড়ীতে পরিচয় হইল। ইনি পরে পণ্ডিতারীর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও মেয়র হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া সৌরীন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় আমি যোসেফ ডেভিডের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একখানি পুশ্ পুশ্ ভাড়া করিয়া আমায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট লইয়া চলিলেন। তিনি আমাকে এক জন রমণীর মত সর্বদা মাদ্রাজী চাদরে মুড়িয়া পুশ্ পুশ্ চড়াইয়াছিলেন। যোসেফ ডেভিড এক জন নারীকে লইয়া শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন, এই হেতু পুলিশ গ্রহরীদের এ বিষয়ে কোনই মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। আমি দেখিলাম—বাড়ীর অপর ধারে এক দল গোয়েন্দা পুলিশ হাজা করিতেছে,

আমার একপ্রকার নারীবেশ হওয়ায় তাহারা কিছুই মনে করিল না। আমরা দুই জনে এই বিশাল ভবনে প্রবেশ করিলাম। নিম্নতলেই নলিনীকান্তের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহার অপার্থিব সৌহার্দ্য মেনদিনও অনুভব করিয়াছি। তিনি বলিলেন, মণি অর্থাৎ স্বরেশচন্দ্র আজ আমাদের মৈত্রী।

আহােষের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে শুনিলাম, খেচরান্ন হইতেছে। অন্ধকারের মধ্যে একটি কেবাসিন তেলের ডিবা মিটি মিটি আলো জলিতেছে। স্বরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “রন্ধনের বালাই বিশেষ কিছু নাই। আমরা রাজে খেচরান্নেই উদরপূর্তি করি।” ইহাদের ছুবছার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি দ্বিতলে গিয়া উঠিয়া হলঘরের সম্মুখেই শ্রীঅরবিন্দকে দেখিলাম। বহু দিন পরে আবার তাঁহার হৃদয়ের স্পর্শ পাইলাম।

সন্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন আছ? সাধন কেমন চলিতেছে?” ইতিপূর্বে তিনি বৌগিক সাধনের কয়েক খণ্ড টাইপ করা কাগজ চন্দ্রনগরে আমায় পাঠাইয়াছিলেন—তাহার প্রথমই লেখা ছিল—“you need not make ashan”। কথাগুলি আমার পক্ষে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিত। আমার সাধন ছিল চেষ্টা-প্রসূত। তাহা হইতে বিরত থাকার আদেশ তিনি এই কয়েক খণ্ড কাগজে দিয়াছিলেন। আরও তাঁহার কথা ছিল, “মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিশ্বসি।” এই মন্ত্র আমাকে অনেক কষ্টে ভরসা দিত। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি”। তাঁহার এই কথায় আমার মৃত্যুভয়ও দূর হইয়াছিল। কোন কষ্টই প্রচেষ্টায় সাধিত না হয়, তাহার জ্ঞান নিজেকে সর্বদাই স্থির রাখিতাম। সাধনার কথা বলিতে বলিতে দুই জনে হলঘরের এক পার্শ্বে কয়েকখানি ভাঙা চেয়ার ও একখানি পুরাতন টেবিলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি টেবিলের এক পাশে উপবেশন করিলেন। আমাকেও তিনি বসিতে বলিলেন। দেখিলাম টেবিলের উপর কয়েকটা মটর ভাজা পড়িয়া আছে। অপরাহ্নে ইহাই চর্কণ করিয়া তিনি চা পান সমাপ্ত করেন। তাঁহার দিকে আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া মনে হইল—যেন তিনি অনেক শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রনগরে তাঁহার যে শ্রী দেখিয়াছিলাম, এখানে যেন সে কাস্তি বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি মনে হইল আরও বদ্ধিত হইয়াছে। তিনি আমার অন্তস্তল ভেদ করিয়া যেন প্রসারিত দৃষ্টিতে সাধনার অবস্থার কথা জানিয়া লইলেন। তারপর বাংলার বৈপ্লবিক কর্মের সকল বিষয়ও

অবগত হইলেন। বিদায়কালে তিনি বলিলেন, “প্রতিদিন এখানে আসা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। তোমাকে বাংলায় ফিরিয়া অনেক কাজ সমাপ্ত করিতে হইবে। সপ্তাহে দুই দিন মাত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আজ মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবারে আবার আসিও, অনেক কথা হইবে।”

আমি তাঁহার তৎকালীন অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আমি নীচে নামিবামাত্র বন্ধুদের হস্তরবে সব যেন মুখরিত হইল। সুরেশের খেচরান্ন রন্ধন শেষ হইয়াছে। সে হাঁড়ীর কানা ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সৌরীন্দ্র বলিলেন, “নারীর বেশে আপনি যে পরিমাণে নিরাপদে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই অবস্থায় তাহা যদি পুলিশের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাহারা আপনার অত্মসমরণ করিবে এবং আপনাকে পণ্ডিতারীতে—থাকিয়া বাইতে হইবে। তিনি আপনাকে গোপন পথেই প্রস্থান করিতে বলিয়াছেন।” নলিনী ও সৌরীন্দ্র আমাকে গোপন পথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা একটি গাল পথ। এই দিকটা অন্য লোকের বাড়ীর প্রাচীরে রুদ্ধ হইয়াছে। সেই গৃহের আবর্জনারাশি এইখানেই নিক্ষিপ্ত হয়। সেই পথ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে সোজা পথে উঠা যায়। সৌরীন্দ্রের কথামত আমি এই গোপন পথ দিয়া বাহির হইলাম এবং নিরাপদে রাজাপুলের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিবার সময়ে সৌরীন্দ্র বলিয়া দিয়াছিলেন—মধ্যাহ্নে ওদফলের নিকট কোম্পানীর বাগানে সাক্ষাৎ করিবার জন্য। আমি ষাণ্মাসময়ে বাহির হইলাম। কোম্পানীর বাগানে গিয়া সৌরীন্দ্রের মুখে তাহাদের দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে অবগত হইলাম। সৌরীন্দ্র বলিলেন, “মাদ্রাজের ধনী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কোন এক ভদ্রলোকের সাহায্য এক বৎসরের জন্য এই কয়েকটি প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে, তাহার পর যথেষ্ট তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সাহায্যে আর তেমন ভাবে মিলে নাই। যৎসামান্য বাহা কিছু তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমরা একবেলা কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিতে পারি। এই বিষয়ে আপনি কি করিতে পারেন আমাদের জানাইয়া যাইবেন।”

আমি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার সঙ্গিগণের জীবনোপায় নির্ধারণের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। সৌরীন্দ্রকে বলিলাম, “চন্দননগরে গিয়াই আমি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিব। এই বিষয়ে আমরা এতদিন নীরব ছিলাম। ইহাই আমাদের লজ্জার বিষয়। বাংলার কর্ণধার

শ্রীঅরবিন্দ বিদেশে আসিয়া কিভাবে আছেন, ইহার খবর আমরা রাখি নাই। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।” এদিকে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সেই গোপন পথেই আমি শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রচেষ্টার কথা দুই-চারি দিনেই শেষ হইল। তার পর অধ্যাত্মসাধনার কথাই সপ্তাহে দুই দিন তাঁহার মুখে অনর্গল বাহির হইল। আমি কান পাতিয়া তাঁহার কথাগুলি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম। হঠাৎ, রাজযোগ, তন্ত্র, সহজিয়া—সকল সাধনার উপরে তাঁহার মুখে গীতার “আত্মসমর্পণ-যোগ” মন্ত্রে আমার চিত্ত আলোকিত হইল। “You need not do Asan and Pranayam”—তাঁহার কথায় আসন, প্রাণায়াম দূর হইয়াছে। তাঁর দেওয়া ত্রিমন্ত্র জপের সহিত “স্বা স্বীকেশঃ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি”—এই শ্লোকটিও আমার জপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। “স্বীকেশ” বলিতে তখন নিত্য শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত আমি আর কাহাকেও মনে করিতে পরিভাম না। থাইতাম, শুইতাম তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া। অতি সঙ্কটময় কর্মে আগুয়ান হইতাম এই প্রত্যক্ষ স্বীকেশেরই আদেশে। রোগ হইলে এই স্বীকেশকেই অত্মসমরণ করিতাম। বিদায়কালে আমার কথা তিনি মর্ম্ম দিয়াই অনুভব করিলেন। তার পরে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “তোমার সাধনার নির্দেশ ইহা হইতে আরও বিশদরূপে পাইবে। পূর্বে যে সাধনার কথা টাইপ করিয়া তোমায় পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আমার নিজের নহে। আমি ধ্যানযোগে রাজা রামমোহন রায়ের বাণী যেমনভাবে পাইয়াছিলাম, তদনুসরণে উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর এই লেখাগুলি আমার নিজেরই উপলব্ধির কথা। তুমি ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে।”

আমি বাসায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার টাইপ করা কাগজগুলির মাথায় “Yoga and its object”—এই শিরোনাম লিখিত। এই গ্রন্থই “নীলা” নামে গ্রন্থাকারে আমি বাংলায় তাঁহার প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার প্রথম পুস্তকখানিও যৌগিক সাধন নামে বাংলায় মুদ্রিত হইয়াছে।

আমি অনেক রাষ্ট্রনৈতিক নির্দেশ এবং সাধন-রহস্তের কথা বুক লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। কিছুদিন পরেই তিনি পত্রযোগে জানাইলেন—“Situation just now is that we have Re. ½ or so in hand.” অর্থাৎ, অবস্থা এক্ষণে এমন হইয়াছে যে আমাদের হাতে মাত্র আট আনা পয়সা আছে।

আমি আসিবার সময়ে কয়েকটি টাকা সৌরীন্দ্রের

হাতে দিয়া আসিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ সেই টাকায় কয়েক দিন চলার পর শ্রীঅরবিন্দ এমনই ভাবে অভাব-রাক্ষণীয় তাড়নায় ঘোরতর রিপন হইয়াছেন। তাঁহার পত্র পাইয়া আমার চক্ষে জল আসিল। এই সময়ে আমার হাতে কিছু টাকা চেয়ারের কারবার হিসাবে ছিল। তাহা হইতে পঞ্চাশ টাকা লইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুদিন পরে তাঁহার আর এক পত্র পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তিনি পুনরায় জানাইলেন—“I must ask you to procure for me by Will Power or any other power in heaven or in earth” অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে চাহিতেছি যেমন করিয়া পার আমার জ্ঞাত অর্থ সংগ্রহ কর। তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই হউক অথবা স্বর্গের বা মর্ত্যের যে শক্তির সাহায্যেই পার, অর্থ আমার জ্ঞাত প্রেরণ কর।”

আমি বিহ্বলচিত্ত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎকার নিষ্ফল হয় নাই। আমি যে তাঁহার কত

আপনার ইহা জানিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ দাবি তিনি আমার উপর করিতে পারিয়াছিলেন। সাধনার ইতিহাসে এই তত্ত্বের মূল্য শুধু আমার কাছে অনেকখানি নহে, প্রবর্তক সজ্জের সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে এই দাবির তাৎপর্য কতখানি শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া আমি কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে বিহ্বল হই।

অতঃপর চন্দননগর হইতে যথারীতি তাঁহার জীবন-যাপনের স্বাব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্য নিম্নে আমি ধন্য মনে করি। পরবর্তী সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় তাঁহার পত্রাদির মাধ্যমতাই কিছু কিছু শুনাইবার প্রয়াস পাইব। ইহা ভারতাত্মার বাণী। ভারত-সংস্কৃতির অসাধারণ ঐতিহ্যের এই অধ্যায়টুকু না জানিলে যেমন শ্রীঅরবিন্দের পুণ্যময় মহাজীবনের একটি অংশ অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে, তেমনি ভারতের জাতীয় সাধনায় তাঁর সুগভীর অবদানেরও অনেকখানি মগ্ন-পরিচয় অপ্রকাশিত থাকিবে।

খুন

কৃষ্ণ দাস

অনুবাদক—শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

টিনের পর্দা আঁটা লোহার গেটটার ওপাশে ক্রমশঃ ভিড় বাড়ছে। মানুষ জমছে কাতারে কাতারে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু এক দৃষ্টল কালো মাথার অরণ্য।

মাথখানে গেট, হু'পাশে লম্বা উঁচু পাঁচিল। যেন কোন মকদ্দমের জেলখানা। উঁকি দিয়েও দেখবার জো নেই এদিকে কি আছে না আছে, কিই-বা হচ্ছে না হচ্ছে। মধ্যের উঠানের এক পাশে সপের টবের ফুলগাছগুলোর আড়ালে কি একটা চট-ঢাকা পড়ে আছে।

ভর-হুপুয়ে কাল্লর ভয়ঙ্কর গর্জনে চার পাশ শিউরে উঠেছিল। কিছুক্ষণ বাদে আর কোন আওয়াজ না পেয়ে যেন কিসের ধোঁকে কালো মাথার ভিড় তখন সবে একে একে এগিয়ে আসছিল। অদ্ভুত এক আদিম অসুস্থতির আকর্ষণে গেটের সামনে ওরা ধমকে দাঁড়াতে লাগল। চোখ টান করে মাথা তুলে এ ওর ঘাড়ে প্রায় লাফিয়ে পড়ে কি বুজছিল নাক টেনে টেনে। হাতগুলো সব অদ্ভুত লম্বা—কেমন মাটির দিকে বুলে সটান হয়েছিল।

তৎক্ষণাৎ সারা বাতীর সমস্ত দরজা-জানাল বন্ধ করে দিচ্ছে বললে বীরেশা নিজে অনেক সামলে আনিগন্ডের ভাল্লা হাতে এগিয়ে গেল গেটের কাছে। ভাল্লা চাবি লাগিয়ে

পেছনের পাঁচিলের চোরা-দরজা দিয়ে যখন গিঠ কুঁজো করে গলে বেরুতে গেল—অমনই সারা শরীর অজানা আশঙ্কার ধর ধর করে কেঁপে উঠল।

দীহু চাকরটা কালুকে আগেভাগেই পার করে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল শক্ত শিকল হাতে ধরে। কালুও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল, এতটুকু দেখে তার আনন্দ প্রকাশের ডাক-গুলোও আর গলা দিয়ে বেরুল না। বিষংপ্রমাণ লকলকে লোভাতুর জিভটাও যেন পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে; চোখ-জোড়ায় আশ্চর্য্য নীরবতার ছায়া।

দীহু বললে—দাদাবাবু, পাশের গলিতে ট্যাক্সি ডেকে রেখেছে ক্যান্ডি কি, সরে পড়েন লীগগির।

—তুই কোথায় চললি।—গলা কেঁপে উঠল বীরেশের।

—দেখে আসি, মেজ মা দরজাগুলো ভাল করে এঁটেছেন কি না।—দ্বিতীয় কথার আগেই জ্যামুক্ত-ভীরের মত ছুটল দীহু। পেছনের দরজায় যাক দিগে অসুমান করলে ভেতর থেকে বিল ভাল রকমেই আঁটা আছে। এখানেই দাঁড়িয়ে ভেঁকে বললে—মেজ মা, বাবুকে কোন করেই আগছি, দরজা যেন কারও কথায় খুলো না।—বলেই দীহু পগারপার।

ভেতরের সাদার প্রতীকা না করে দীহু যেমন সরে-পড়ল,

ভেতর থেকেও ভেদনই সাড়া এল না। তার কথা কারও কানে
গেল কিনা তাও বুঝবার জো রইল না।

মাঝের ঘরে কণিকা শিউরে শিউরে উঠছিল। দেয়াল
ঠেস দিয়ে নিজের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছিল।
উপরে নীচে, চার পাশে নিশ্চিহ্ন পাকা ইঁটের মজবুত আশ্রয়
অবলম্বনেও যেন তার স্বস্তি ছিল না। ভীতিগ্রস্ত হুশিভায় সে
সারা হয়ে যাচ্ছিল। একি সর্বনাশ, কালুটা কি করে বলল।

কণিকা ভাবতে পারে না—এমনও ঘটতে পারে কুকুরে।
হোক বিলেতী কুকুর, ডাকবি ডাক, চোর-ডাকাত ভাড়া কর
যত ইচ্ছে। দিন-রুপরে কি সাংঘাতিক কাণ্ড এ। কণিকার
চোখের উপরে ঘটনাটা এখনও ভাসছে,—টেবিলে বসে
সে আর বীরেশ খাচ্ছিল। বৌদি-ঠাকুরপোতে আলোচনা
হচ্ছিল কাল রাজের সিনেমায় যাওয়া নিয়ে। অকস্মাৎ সেই
বজ-সর্জন আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভেদী আর্জনার উঠতে না
উঠতেই খাবার-ঘরের টেবিল-চেয়ারগুলোও যেন চমকে
লাফিয়ে উঠল। এঁটো হাতেই ছুটে দেবরের পেছনে পেছনে
বাইরে যেতেই দেখলে—চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসা একটা
বিকৃত মুখ, ক্ষীণ দেহের সরু গলা, ছুঁপাটা দাঁতালো সাঁড়াশির
চাপে শেষ পর্যন্ত কেটে বসে গেছে। মুঠো ধোলা শির
বেরুনো হাতের ফাঁকে দানা দানা এক দলা ভাত—মাংসের
টুকরোটা পাশে গড়াচ্ছে। প্রচণ্ড আকস্মিকতার আঘাতে
কণিকার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। প্রায়-চেতনালুপ্ত হতভম্ব
বীরেশও যেন-পাথর হয়ে গিয়েছিল।

সহসা সেঁ ঝাকা দিলে বীরেশকে, বললে—দেখছ কি
ঠাকুরপো, ছাড়াও।

ততক্ষণে দীহ চাকরটা এসে পড়েছে ছুটে ছুটে।
আম্বা হাঁকাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ভাগিয়ে কেউ ঘরে নেই—সবাই
স্কুলে গেছে।

এখনও রক্তে রক্তে যেন ঝাকা লাগছে। ভাতগুলোর সেই
চেহারা। কেবল কোনপ্রকারে হাত দিয়ে ধরেছিল ভিখারী
বুড়ী। ভোগে এল না, সঙ্গে সঙ্গাই—।

পাশে কি একটা গা ছুঁয়ে যেতেই কণিকার যেন চকিতে
শরীরের দোলা ধেমে গেল। ও যেন গিয়েও গেল না।
গায়ে গায়ে লেগে রইল। নিশ্চিহ্ন কপাট-জাঁটা অন্ধকারে
কিছুই ঠাঁহর হচ্ছিল না, কিংবা হয়ত মানসিক উত্তেজনায়
চোখের কেমন জড়তা এসে পড়েছিল; তার পাশ ঘুরে যে
দেখবে সে মনেই হ'ল না। তাই কিছুক্ষণ নিষ্পন্দ অন্ধের মত
কাটাতে লাগল। তারপর কখন সে শুধু অহুমান করলে—এ
ছোঁয়া হাম্বুঘের। কিন্তু কি ভীষণ ঠাণ্ডা।

—দিদি নাকি? বীরেশের বুজা বোন ছাড়া এমন ঠাণ্ডা
রক্ত এ বাড়ীর আর কার হবে। কিন্তু কোন উত্তর এল না।
আঁরও ঘেঁষে এল যেম সেই শীতাতুর স্পর্শ।

—আম্বা নাকি?—আবার অক্ষুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে
কণিকা।

—আম্বা নেই।—গলা কাশল থুঁক করে, যেন আরও কি
বলতে চাইছে কিন্তু গলা দিয়ে বেরুচ্ছে না।

বাইরের কালো মাথার ঐ অরণ্য এখন দূর থেকে দেখাচ্ছে
আরও ভয়ঙ্কর। একটা অঘিকাগুর পরে আধ-পোড়া অন্ধারের
তুপ যেন জুড়ে পড়ে রয়েছে পথের এখানটায়।

দিদিকে পাশে পেয়ে সাহস আসছে কণিকার বড়ে।
আগাগোড়া ঘটনার ছবিটা আবার মনের পর্দায় প্রতিবিম্বিত
হচ্ছে। ছেগে উঠছে স্মৃতিতে।

কত করে গেটে রোজ তাল দিতে বলে আসছে; সে কি
আজ থেকে, কালুকে আনা অবশি বলছে—জাখ ঠাকুরপো,
ও কুকুরকে বিশ্বাস নেই, ওর যা আওয়াজ, ওর ছকারে
তোমার দাদারই ভয় করে। কি জানি কবে কার্কে
কামড়ে বসবে, হাদ্যামার পড়তে হবে। তার চেয়ে গেটে
তাল লাগাও—অপরিচিত কেউ আসতে চায়, অপেক্ষা
করবে। দীহ তাল ধুলে দিলে তবে না হয় আসবে।
একটুখানি অপেক্ষা করলে সে তোমার বে না—কিন্তু
কালু কামড়ালে ছেল-হাজুও ত হ'ল পারে। কেবল
তোমাকেই ত নয়—তোমার দাদাকেও নিয়ে টান না পড়ে ত
কি বলেছি।—সেই তাল শেষ পর্যন্ত লাগালেই এক দিন
আগে লাগালে কি এমন ক্ষতি হ'ত। রোজই ত দেখছে
ঠাকুরপো, ভিখারী বুড়ী গেটটার কাছে জবুথবু হয়ে বসে থাকে
—ওর কি ভেদন নড়ার সাধ্য আছে। না হয় বুড়ীকে তাল
তবে ত নিশ্চিহ্ন। ও কথা বললেই ঠাকুরপোর অমনি গলা-
বাজি—থাক না বসে বৌদি, তোমার অত মাথাব্যথা কিসের।
হ'ল ত এখন।

ঠাকুরপোর কি কিছু কম শয়তানি, অন্তরে জলে ঊঠল
কণিকা। কতকাল লজ্জা করেছে—কালুকে খাবার দিলেই
বুড়ী মাটিতে শুয়ে কি করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। তলার ওই
কাঁকটুকু দিয়েই যা একটু-আধটু দেখা যায় কালু থাকে। ওকি
এমনি তাকায়, তাকায় ওর পেটের জালায়। পেটের যে কি
জালা সে ত দাদা-বৌদির দোলাতে ঠাকুরপো বুঝলে না।

—ও বউ গেট নড়ছে যেন—দীহ গেল কোথায়?

—আর জালিও না দিদি, তুমি যেন কিছু জান না—দীহ
গেল কোথায়?—বিকৃত কণ্ঠে কণিকা যেন নিজের অস্তিত্ব
অনুভব করতে চাইল।

—মিছে রাগ করিস, আমি কেমন করে জানব, জিজ্ঞেস
করলেও জলবি—জালাতন।

বগড়া করতে চায় নাকি বীরেশের বিধবা বুজা বোন।
কণিকা সামলে নেয়। চার পাশে যেন অদৃশ্য বিপদ তার ঘিরে
আসছে। না হলে আশ্রিতাও সামান্য কথায় এমনি তাবে

চটে। অন্তরে অন্তরে গুম হয়ে যায় সে—তার অভ্যন্তরে
হেলেনেয়ে, ওই অমন স্বামী, ওদের ভবিষ্যৎ।

নিজের মনের অসুস্থান খাচাই করে নিতে বৃদ্ধা আবার
বলে ওঠে—কেমন যেন আওয়াজ পাচ্ছিল না...ওই ওই যেন
কি ঠেলেছে।

—রেহাই নাও দিদি, ঠেলে ও গেট ভাঙবে কে ভনি।
কণিকার চোখের সামনে মাথা ভুলেছে এক প্রচণ্ড বাধা—
লোহার গেট, মাথার ওপরে দেড় হাত উঁচু পাঁচিল, তাকাতাক
আর হুচালো লোহার পেরেক পোতা। তা ছাড়া ওরা কি
জানতে পেরেছে, বুড়ী ভিখারিণীকে ঘেরে ফেলেছে কালু।
কেমন করে জানবে। দেখতে পাবে কি করে। এক গাছে
উঠে। কিন্তু ফুলের টবের আড়ালে বুড়ীকে এমন করে ঢাকা
দিয়েছে দীহু। এক কোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। খুলে-
পড়া চামড়ার ভলার ঐ মরা হাড়ে রক্ত আসবেই বা কোথেকে।
মনে মনে অনেক যুক্তির অবতারণা করে কণিকা।

গেটের ওপাশে শুকনো কেটে বেতে চাইছে যেন।

ওদিকে দীহু ছুটে চলেছে। সে কোন করার কথা ভুলে
গিয়েই ছুটেছে। তার আগে-পাছে কারা যেন আসছে। ভীষণ
বড়-বড়ার পূর্ব-মুহূর্তের মত ওদের চেহারায় যেন প্রলয়ের
আভাস ধর্মঘম করছে।

বীরেশের চেহারায় গিয়ে ধপাস করে দীহু ঘেঁষের ওপরে
বসে পড়ল। গা দিয়ে তার কালখাম ছুটেছে। চুলগুলো
খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখ যেন বেরিয়ে আসছে, হাড় কাঁপছে
ঠক ঠক করে।

—কি রে, তোর এমন চেহারা কেন?

উত্তর দিতে পারে না দীহু। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে
আছে।

বিরক্ত হয় বীরেশ। বেকরবার মুখে যেন এক আগদ এসে
ছুটল। সে চীৎকার করে উঠল—কি হয়েছে বলতে পারছিল
না হতভাগা।

ভড়িত কণ্ঠে এবারে বলতে লাগল দীহু—আজ্ঞে...সেই
ভিখারী বুড়ী...কেমন করে গেট দিয়ে ঢুকে—

বীরেশ হুকার দিয়ে বললে—চুরি করেছে ত।

—আজ্ঞে না...। আজ্ঞে, কালু ধাবারে হাত দিয়েছিল...।

কালু কামড়ে দিয়েছে।

—বেশ করেছে।

—আজ্ঞে...বুড়ী মরে গেছে...সঙ্গে সঙ্গে।

অবৈধ্য হয়ে বীরেশ চীৎকার ছাড়ল—বুড়ী মরেছে—তা
কাঁদছিল কেন?

—বাবু।—কথা বলতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল দীহু।

কেমন করে বলবে সে—দাদাবাবু ভিখারিণী বুড়ীকে পুলিশে
দিতে চেয়েছে—ও তাকে পারে পড়ে নিরস্ত করেছে। কেমন
করে প্রকাশ করবে—কেন ঐ বুড়ীমা তার শহরের সকল বাড়ী
ছেড়ে দীহু চাকরের মনিবের বাড়ীর গেটে পড়ে থাকে। বাবু
মোটরে হর্ণ দিলেও কেন সরে না। ভিখারিণী কেবল তাকার
ক্যাল ক্যাল করে—কেন দাদাবাবুদের কাছে হাত পেতে ও
পরশা চায় না। কেউ জানে না; সেই আকাল থেকে সে
কাল, সে বোবা...একমাত্র দীহু ছাড়া। তার চোখ কেটে
চৌচির হতে চাইছে, এখনই বুঝি ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটবে
ভীরের মত।

বীরেশ উদ্গাদের মত কি যেন বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ
দীহুর উপর চোখ পড়তেই থমকে গেল। ওর চোখে যেন
ত্রিস্রস্তা জলছে।

আশ্রয়কার ভয়ে নিজেকে মুহূর্তে প্রস্তুত করে নিলে
বীরেশ। হয়ত এর কোন প্রয়োজনই ছিল না—হুতিকের বছরে
মুঠো মুঠো ভাত দিয়ে কিনে নেওয়া চাকর বৈ ত নয়।
ভবু বিশ্বাস নেই—হু' বেলা পেট তোর খেয়ে খেয়ে সেদিনকার
জীর্ণ দেহ লোকটা জোয়ান হয়ে উঠেছে।

দীহুর রক্তলোলুপ দৃষ্টি আগুন হয়ে উঠল। প্রাণপণে
চীৎকার করে সে কি বলতে চাইছিল। কিন্তু—‘ও মা’,
বলতেই বিকট এক আর্দ্রমাদের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ গড়িয়ে
পড়ল।

প্রচণ্ড এক ভয়ের শিহরণ আচ্ছন্ন করে ফেলল বীরেশকে
—যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই তরুণ।



ভূমি-সেনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পরিকল্পনা অস্থায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রে “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইবে। গত ২৪শে জুলাই হুগলী জেলার ত্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জাহ্নীপাড়া থানার আটপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইয়াছিল। তৎপর এই আগষ্ট কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন



আটপুরে নবগঠিত ভূমি-সেনা দলকে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পাটগাছের পোকের আক্রমণ নিবারণের জন্ত ঔষধ ছিটানো দেখাইতেছেন

মহাশয়ের কলিকাতার আবাসে ভূমি-সেনার দ্বিতীয় দল গঠিত হয়। এই দলে কলিকাতাবাসী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি (নারী ও পুরুষ) যোগদান করেন। তৃতীয় দল গঠিত হয় ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-উৎসবের দিনে, কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে অবস্থিত শ্রামবাজার টেনিস ক্লাবে। প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই দলে যোগদান করেন। গত ২৫শে আগষ্ট বর্ধমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার প্রথম “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হয়। এই উৎসব খুবই আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য-সচিব মাননীয় শ্রী কে. এম. মুন্সী, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কৃষি ও খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীনিবুদ্ধবিহারী মাইতি, শ্রম-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ যুগোপাধ্যায়, সেচ-মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, স্বায়ত্ত-শাসন-মন্ত্রী শ্রীধামবেন্দ্রনাথ পাণ্ডা এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন।

গত ২৬শে আগষ্ট হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামেও এক-দল ভূমি-সেনা গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অদ্যাবধি আর কোন স্থানে ভূমি-সেনাদল গঠিত হইয়াছে কিনা জানি না। খাঁড় ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এক ভাষণে বলিয়াছিলেন

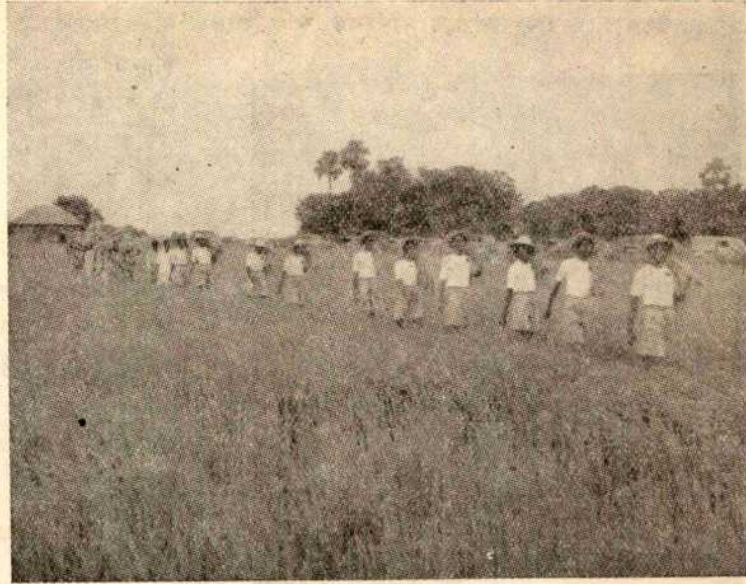
“প্রতি ইউনিয়ন, প্রতি থানা, প্রতি মহকুমা ও প্রতি জেলার এই ‘ভূমি-সেনাদল’ কৃষি-অধিকর্তার নির্দেশে একই আদর্শে অঙ্গ-প্রাপিত হয়ে কাজ করবে। খুবই আশা হয় যে, এইরূপ সর্বাদীপ প্রচেষ্টায় অচিরেই আমরা কৃষয়ুক্ত হব; পহা যতই বজুর হোক না কেন, লক্ষ্যে গিয়ে আমরা পৌছবই। আজ কৃষির এই দুর্দিনে দেশে চাই ভূমি-সেনা। বিবেকানন্দের দেশে ত্যাগি ও কর্মীর অভাব হয় নি। আজও আশা করি বেচ্ছাসেবকের অভাব দেশে হবে না।”

মন্ত্রীমহাশয়ের ভাষণ অস্থায়ী প্রতি ইউনিয়ন, প্রতি থানা, প্রতি মহকুমা ও প্রতি জেলার ভূমি-সেনাদল গঠিত হইয়াছে কিনা, কিংবা গঠনের চেষ্টা হইতেছে কিনা তাহাও অবগত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে কৃষি ও খাদ্যসচিব মহাশয়ের নির্দেশ অস্থায়ী পল্লী অঞ্চলে যদি “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হয় এবং সেই দলে যদি দেশপ্রণেমে উদ্বুদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের প্রকৃত কর্মী যোগদান করেন তাহা হইলে সরকারী কৃষিবিভাগের পক্ষে কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ



বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রের ২৫শে আগষ্টের অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য সহায়তা লাভ করা সম্ভব হইবে। তবে ভূমি-সেনাদলকে সর্বপ্রথমই তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রেরণা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু সেইরূপ শিক্ষা এবং প্রেরণা দিবার ও পরিচালনা করিবার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া

মনে হয় না। আঁটপূরে ও কলিকাতায় যে “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইয়াছে তাহার সহিত আমি কিয়ৎপরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং ভূমি-সেনাদলের কর্মীরা যাহাতে অতি সত্ত্বর শিক্ষা পায় ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে অবহিত হয় সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তার নিকট পত্র ও লিখিয়াছিলাম, যৌথিক আলোচনাও করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার দপ্তর হইতে কোন নির্দেশ আসে নাই, “ভূমি-সেনাদলের” গঠন, শিক্ষা ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়মাবলী আজ পর্যন্ত কোন স্থানে পৌঁছায় নাই। হুঃখের বিষয়, কয়েক মাস হইল আঁটপূরে প্রথম “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইয়াছে, তাহার ‘ব্যাঙ্ক’ ও কোদাল পাইয়াছে—কিন্তু কোদালের ‘সদ্যবহার’ হইতেছে কিনা কেহই দেখিবার নাই। এই কারণে অনেকেই বলিতেছেন, ভূমি-সেনা গঠন একটা “হুজুগ” মাত্র। কিন্তু



বর্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে নবগঠিত ভূমি-সেনার দল



বর্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে সাঁওতাল রমণীগণের ভূমি-সেনা দলে যোগদান

বাস্তবিক পক্ষে সুগঠিত ও সুপরিচালিত ভূমি-সেনাদলের সাহায্যে কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত পল্লী-অঞ্চলের অসংখ্য উন্নতিও সম্ভবপর। ইহাদের সাহায্যে পল্লী-অঞ্চল বহুলাংশে সমৃদ্ধ হইতে পারে।

ত্রিপুরাচল সেনা মহাশয়ের এক ভাষণ হইতে ভূমি-

সেনাদলের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। তিনি বলেন, “দেশসেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই ভূমি-সৈনিকদল গ্রামে গ্রামে, ধানায় ধানায়, প্রতি জেলার নিম্নে যাবে আশা ও কর্মের বাণী—খাদ্যসম্ভার সমাধান করিতে করবে সাহায্য। ভূমি-সেনা-বাহিনী শুধু যে কৃষিকার্যে সাহায্য করবে বা কৃষিযোগ্য জমির পুনরুদ্ধার করবে তাই নয়, এরা উদ্ভব করবে কৃষিকার্যের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, যার অভাবে দেশে শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিজীবী থাকতেও দেশবাসীর খাদ্যের সমুদ্রালন হয় নাই, তাই ভূমি-সেনার কাজ হবে কৃষকের কৃতিত্ব বৃদ্ধি করা—কৃষক-সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা নয়, উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করা, শুধু পরিকল্পনা করা নয়। অনেক স্থল-কলেজে যেমন নেশাভাল ক্যাডেট কোর

রয়েছে সেই রকম ল্যাণ্ড এগ্রিকালচারিষ্ট কোর-এর প্রবর্তন করা দরকার। এই দলভুক্ত ভূমি-সেনারাই ত দেশবাসীকে সচেতন করে তুলবে কৃষিকে উন্নততর ভিত্তিতে স্থাপন করতে, তাদের শিক্ষিত রুচি নিয়ে করবে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের সাধনা, তারা আগিরে তুলবে দেশের মাঝে কায়িক প্রেমের

মর্যাদাবোধ। এরা শিক্ষার আলোক তুলে ধরে দূর করবে সংস্কারের অন্ধকার, সমবার পদ্ধতিতে গঠনমূলক কাজ করে



বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে সাটকা আউশ ধান

দেশকে জানাবে তার উৎকর্ষ, এমনভাবে একযোগে দেশের কৃষি, পশু-পালন, সেচ-ব্যবস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজ করে দেশের এক সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি এনে দেবে। দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কৃষির উৎকর্ষমূলক অনেক ভাষা



বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে ভূমি-সেনাপণ কর্তৃক কম্পাষ্ট প্রস্তুত

আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু গবেষণাগারে উদ্ভূত কর্তৃ-পদ্ধতির সঙ্গে চাষীর যোগাযোগ সব সময়ে ঘটে ওঠে না। গবেষণালব্ধ ফলের সুবিধা কৃষিকর্মীরা যোল আনা গ্রহণ করে

শতাংপাদনে পূর্ণোন্মেষে অগ্রসর হতে পারছেন না। আমাদের ভূমি-সেনাদল এই যোগাযোগ রক্ষা করে উন্নততর বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী প্রবর্তনে চাষীদের সাহায্য করবেন। তাঁদের এই কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য কৃষি-বিভাগ বিশেষজ্ঞ-দের দ্বারা যথাযথ শিক্ষাদান করবেন। যে সব বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করে ভূমি-সেনাবাহিনী কাজে অগ্রসর হবে সেগুলো হচ্ছে (১) বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা, (২) আবর্জনা-সার তৈয়ারী করা, (৩) শাক-সজীর চাষ, (৪) ফসলের রোগ ও কীট শত্রু-দমন, (৫) গবাদি পশুর স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও উন্নতি-বিধান, (৬) আগাছা দমন, (৭) সম্ভবমত সমবার-পদ্ধতিতে চাষবাসের সম্প্রসারণ, (৮) ছোট ছোট সেচ-পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকরীকরণ, (৯) মাছের চাষ বাড়ানো, (১০) শস্তের ফলন বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সংগঠন, (১১) উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির উপায় প্রকৃতি।

জাতিবর্ধনিক্রিষেবে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ



বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে সাটকা আউশ ধান

যে-কোনও লোক এই ভূমিবাহিনীতে যোগদান করতে পারবেন। যে-কোন বিভাগতনের ছাত্র-ছাত্রীরাও এর সদস্য হতে পারবেন। স্থল-কলেজের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সেই অবসরে এক একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চাষবাসের অনেক সহায়তা করতে পারেন। দেশের মাটি ও দেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় মিছেদের

জানবুদ্বির দিক ছাড়াও আর পাঁচ জনকে এতে সহজেই নতুন ভাবে উদ্বীণ করে তোলা যায়। গ্রামে বা শহরভলীতে যেখানে স্থানান্তর নেই, সেই সব অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ছুটির অবসরে শাকসব্জী ও কলের চাষ আরম্ভ করে খাদ্যসমৃদ্ধ সমাধানে উদ্বীণনা সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার শহর-বাসী ছেলে-মেয়েরা এইভাবেই দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপন করে তাদের মাঝে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়তা করে থাকে।

কৃষি ও খাদ্য-সচিবের ভাষণ খুবই জদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সুগঠিত ও সুপরিচালিত ভূমি-সেবা-দলের উপর পল্লী অঞ্চলের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু কৃষি ও খাদ্য-সচিবের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করিতে

হইলে ভূমি-সেবাদলের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত তাহা তাহার বিভাগীয় কর্মচারীগণের উপলব্ধি করা অভ্যাবশ্যক।

পরিশেষে পল্লী-অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে অস্বরোধ করিতেছি তাহারা যেন স্ব স্ব এলাকার “ভূমি-সেবা” গঠনের চেষ্টা করেন। পল্লী অঞ্চলে বহু যুবক কণ্ঠের অভাবে আলস্তে দিনাতিপাত করিতেছেন; তাহাদিগকে কাজে লাগাইলে অনেক দিকেই দেশের উন্নতি সাধিত হইবে। নেতৃত্বের অভাবেই আজ পল্লী অঞ্চলের চরম দুর্দশা ঘটয়াছে। সকল কাজেই সরকারের সুব্যাপেক্ষী হইয়া থাকিলে দেশ কখনিকালেও উন্নত হইবে না। অস্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা সমীচীন নহে।

সে দিন

শ্রীকালিদাস রায়

সে দিন গিয়েছে চলে কিরিয়ে না আর,
দীপ্ততার আবরণে সে প্রতুলতার।

কর বটে ছিল আর হিহু হুহে ভাতে তার,
ছিল না বাঙের বার এত করতার।

পদে পদে আইনের ছিল না বাধন,
দাম দিয়ে ছিল নাকো সাধাসাধন,

কিনিস কিনিতে ঘেরে ওজন দেখিনি চেয়ে,
হ'ত না দালদা দিয়ে হুবেলা রাখন।

ট্রেনে ট্রামে পথে খাটে ছিল নাকো ভিড়,
ছিল না বাহার এত রঙিন শাড়ীর।

মেয়েরা ছাউনি লাগে ঘরেনি মন্থরী লাগে,
অকারণে হ'ত নাকো বাড়ীর বাহির।

মাঝস হরনি এত বর্ষবিবুধ,
কবিতার রসপানে ছিল উৎসুক।

আকাশে আছিল রবি আলোকিত ছিল রবি,
ছিল দেশে রসিকতা হাসি-কৌতুক।

কাব্যে ছন্দ ছিল তক্তি গানে,
কর্ণে মিঠা ছিল স্মৃতি গ্রাণে।

ছিল না সিনেমা মোহ প্রমোদের সমারোহ,
কালো বাজারের নাম শুনিনি কানে।

যুবারা পাকামা নয়, পরিভ্রুতি,
ছিল না তাদের কোন সখী বা দূতী।

পথে রথে এত ছবি দিত না চালিয়া ছবি
তাহাদের মোহানলে নিতি আতুতি।

সার্বজনীন পূজা, দোলের নামে
ছিল না এ মাতামাতি ডাইনে বামে।

অভিনেতা কীড়ারী ছিল না দেবতা পীর।
তুচ্ছ নিত না কেউ উচ্চদামে।

বাধেনি লড়াই হিঁহু-মুসলমানে,
মেঘনা নুখর ছিল ভেটেলী গানে।

বিহারী উড়িয়া বার পয় ছিল নাকো ভায়া,
বাকালীই ছিল প্রভু সকলখানে।

ভাড়াট্টয়া হরনিকো বাড়ীর মালিক,
ভাড়াভ না বাস হতে শুকেরে সালিক।

কুমীর হরনি টেকি, চলিত না এত মেকি।
চোখ রাঙাত না এত জালিক হালিক।

সে দিন গিয়েছে চ'লে কিরিয়ে না আর।

নাই সেই সুখময় শুভ সংসার।

বকে পাষণ দলি' ইংরাজ গেছে চলি'
য়েথে গেছে তার সেই তুরো কালচার।

ভীলজাতির মুক্তিসাধক মোতীলাল তেজাবৎ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভীলরা ভারতের এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন জাতি। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে এই আদিম জাতির কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্তির সমক্ষে যিনি বহুক্ষিণ্ডা অভ্যাস করতেন সেই একলব্য ছিলেন ভীলজাতীয়। গুরুকে দক্ষিণাধরূপ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠদানের কাহিনী স্মরণীয় হয়ে আছে।

ভীলদের বীরত্ব সাহস ও দেশপ্রেম অতুলনীয়। পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রাজপুত রাণাদের আমল পর্যন্ত এদের বহু বীরত্ব-কাহিনীর সহিত আমরা পরিচিত আছি।



ভীলনেতা মোতীলাল তেজাবৎ

বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে রাণা প্রতাপ সৈন্য মুষ্টিমেয় সৈন্যদল নিয়ে প্রবল প্রতাপাবিজিত দিল্লীখর আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেদিন রাজপুতানার আদিবাসী ভীলরা এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল—রাণার চরম ছুর্দিনেও তারা তাঁকে পরিভ্যাগ করে নি। সেদিন এই আদিম জাতির লোকেরা যে বীরত্ব, ভ্যাগ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও প্রকৃত্তির পরিচয় দিয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণাকরে জাজল্যমান থাকবে।

রাণা প্রতাপের সঙ্গে ভীলদের সম্পর্কের কথাই শুধু সাধারণের জানা আছে। কিন্তু রাজপুত জাতির রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভকাল থেকে ভীলরা কত ভাবে যে তাঁদের

সহযোগিতা করেছে তার আর অঙ্গ নেই। কথিত আছে, যে, রাজপুত-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাপা রাবলকে মাত্র তিন বৎসর বয়সের সময় ভীলরা জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করে। পরে যথাসময়ে তারাই তাঁকে সিংহাসনে বসায়। ছেলেবেলার দেবা আর বালিরা নামে দু'জন ভীল এঁর রক্ষণাবেক্ষণ করত।*

ভীলজাতির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এদের স্বাধীনতা-প্রীতির উল্লেখ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ভীলদের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে আসছে। সেইজন্মেই আধুনিককালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আস্থানে ভীলজাতির চিত্ত সহজেই সাদা দিয়েছে। গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভীলরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করে অবর্ণনীয় হুঃখজনক বরণ করে নিয়েছে, দলে দলে পুলিশের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেছে। হুঃখের বিষয়, তাদের সেই ভ্যাগ, তিতিক্কা ও বীরত্ব-কাহিনীর সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত নই।

ভীলরা ভারতের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভীলসম্প্রদায়ের মধ্যে বীর দেশপ্রেমিকদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের সকলের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল রাজস্থানের ভীলদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করব—তাও অত্যন্ত সংক্ষেপে।

আধুনিক কালে ডুন্দরপুরের ভীলদের মধ্যেই সর্বপ্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। শ্রীশিবলালজী কোটকিয়া তাঁর ডুন্দরপুর রাজ্যের ইতিহাসে বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে গোবিন্দ গুরু নামক জৈনিক সাধুর নেতৃত্বে 'ভীল-সুধার' আন্দোলন শুরু হয়। তিনি স্বজাতীয়দের ধর্ম্মীয় এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য্যপ্রণালী নির্দেশ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় যখন জাতির মধ্যে জাগরণের সূচনা দেখা দিলে তখন কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্যে তাঁরা হলেন বড়পরিকর।

কিছুকাল পরে একদিন মানগড়ের মহাডী নামক স্থানে প্রায় সমগ্র বাগড় (ডুন্দরপুর, বাঁশবাড়া আর দক্ষিণ মেবাড়) অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভীল কোনো উৎসব উপলক্ষে জমায়েৎ হলে, উপরোক্ত তিনটি স্থানের পণ্টনের সৈন্য আমদানী

* হমারি আদিম জাতিরা—শ্রীঅখিল বিমর, পৃ. ১১২

+ ডুন্দরপুর : এক সিংহাবলোকন

করে তাদের উপর নির্কিচারাে গুলি চালানো হ'ল। এই গুলি চালানার কলে প্রায় আট শ' লোক মারা গেল, বহু লোক হ'ল আহত। এই প্রকার নৃশংস আচরণ দ্বারা শাসক-সম্প্রদায় সাময়িক ভাবে ভীলদের আন্দোলনের গতিরোধ করতে সক্ষম হলেন।

১৮৯৪ সনে ডুদরপুরের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক মিজেলী কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। অতঃপর এই রাজ্যের শাসন-ব্যাপারে এক নব বিধান প্রবর্তিত হ'ল। এই 'নয়া কাহুন' অনুসারে ভীলজাতি এক শ্রেণীর অপরাধপ্রবণ জাতি (জরায়মপেশা কোম—Criminal tribe) বলে গণ্য হয়।

প্রস্তরযুগসমূহের বাধা অতিক্রম করে গিরিনিবাসিগণ প্রবাহ যেমন সময় সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি মাঝে মাঝে সরকারী বিধিনিষেধ অগ্রাহ করে ভীল আন্দোলন প্রচণ্ড ভাবে আত্মপ্রকাশ করত, সদে সদে সরকার কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে সে আন্দোলনের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করবার জন্তে তৎপর হয়ে উঠতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের এক বৎসর পূর্বে পর্য্যন্তও ব্রিটিশ সরকার ভীলদের উপর পুরোদমে দমননীতি চালিয়েছিলেন। তাঁরা বার বার বহু ভীলকে গ্রেফতার করেছেন, ভীল জননেতাদের নির্কাসিত করেছেন, কোনো কোনো জায়গায় জনতার উপর বিনা নোটিশে করা হয়েছে লাঠি চার্জ, ফলে শত শত লোক আহত হয়েছে। ভীল ভাষায় প্রকাশিত প্রচারপত্র পুড়িকা ভাষণ এবং বক্তৃতাগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে—১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে প্রত্যাক্ষেরী হয়েছে নিষিদ্ধ, কোনো কোনো অঞ্চলে সাক্ষ্য আইন জারী হয়েছে, পুলিশের হাতে ভীল মহিলারা পর্য্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু এত লাঞ্ছনা অপমান এবং নির্ধাতন সত্ত্বেও ভীলজাতি নিজেদের আদর্শে রয়েছে অবিচলিত, তাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমন করা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

২

এই স্বাধীনতাপ্রিয় ভীল জাতির মধ্যে বর্তমান যুগে এমন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যার আদর্শনিষ্ঠার তুলনা নেই। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিকদের সদে এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য—নাম তাঁর মোতীলাল তেজাবৎ। কিন্তু হুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে ভারতের এই অন্ততম শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনো আলোচনা হয়নি।

১৯৪৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে মেবারের তৎকালীন মগরা জেলায় এক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ভীল-পরিবারে মোতীলালের জন্ম হয়। ইনি মোটামুটি একরকম লেখাপড়া শিক্ষা করেন

১৩

এবং হিন্দী ভাষায় মাসুলি জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু নিজের অন্তর থেকে ইনি যে শিক্ষালাভ করেন পুথিগত বিদ্যা তার কাছে তুচ্ছ। অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখেন—দেশপ্রেম এবং মানবতার আদর্শে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জায়গীরদারেরা সকলেই থাকেন ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে মগ, কিন্তু মোতীলালের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। প্রজাদের উপর জায়গীরদার, শুধা সরকারী কর্মচারীদের জুলুমজ্বরদত্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ করে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল—কি ভাবে দুর্গত প্রজাদের হুঃখমোচন করা যায় তাই হ'ল তাঁর একমাত্র ভাবনা। ১৯২১ সালে তিনি প্রথম ভীল আন্দোলনের 'বীড়া উঠালেন'।* তিনি বিভিন্ন স্থানে মেলা ও উৎসবগুলির আয়োজন করে বক্তৃতা দি়া দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁদের অপরিণীম অভাব, দৈন্ত এবং হুঃখদুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। 'মেবার পুকার' নামক দেশাঘ্রবোধ-উদ্বীপক পুস্তিকা গ্রামে গ্রামে বিতরণ করতে লাগলেন। এই সমস্ত প্রচার-কার্যের ফলে অগণিত ভীল নরনারী স্বাধীনতার অগ্নিমস্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করলে। "মারব না হয় মরব"—এই আদর্শে তারা হয়ে উঠল অহুপ্রাণিত।* এমনি ভাবে ভীলদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেখে জায়গীরদার আর সরকারী কর্মচারীরা দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন। সিরোহী, মেবার আর দাঁতা এই তিনটি অঞ্চলের কোনও কোনও গ্রাম আগুন দিয়ে জালিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯২২ সালের ৭ই মার্চ ইডরে বহুসংখ্যক ভীল শহীদ হ'ল।

এই আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছে তখন মহাত্মা গান্ধীর তরফ থেকে শ্রীমণিলালজী কোঠারী সিরোহীতে গমন করলেন। মণিলালজীর মধ্যস্থতার ভীল-নেতা তেজাবৎ আর ব্রিটিশ অফিসার হালিডের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়ে একটা আপোষ-রফার ব্যবস্থা হ'ল। হালিডে ভীলদের ন্যূনতম দাবি পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় তেজাবৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্রিটিশের চিরচরিত নীতির ব্যতিক্রম হ'ল না—'রাজপুতানা একেখী' বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলেন। ফলে ভীলরা আবার গবর্নমেন্টের উপর বিরূপ হয়ে উঠল, আবার তারা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবার উপক্রম করলে। এবার

* আগেকার দিনে পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে কোন হুঃসাহ্য কর্ণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে পানের বিলি তুলে নিয়ে যুধে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একেই বলে বীড়া উঠানো। এর থেকে 'বীড়া উঠানো' কথাটি পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে প্রবাদ-বাক্যের মত প্রচলিত হয়ে গেছে।

আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবার জন্তে সরকার কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৯২২ সালের মে মাসে রোহেরা তহশীলে এক নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরেজ কর্তৃকারীরা পুনরায় গুলীবর্ষণ করলে—ভুল! আর ধলোনিয়া নামে দুটি গ্রাম জালিয়ে দেওয়া হ'ল। এই ঘটনার অভ্যন্তর বিচলিত হয়ে 'রাজস্থান সেবাসঙ্ঘ'র কর্তৃপক্ষ মিছেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে স্থানীয় লোকদের নিকট থেকে এ সম্বন্ধে বোঁদ্ধবীর নিতে লাগলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রমুখ্য এবং অস্তিত্ব স্বত্রে তাঁরা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের যে সমস্ত কাহিনী জানতে পারলেন তার ভুলনা মেলা ভার। তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশিত হ'ল যে, উক্ত দুটি গ্রামে ৩২৫টি পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে আর ১৮০০ লোকের প্রাণহানি হয়েছে, ৬৪০টি ঘর জালিয়ে দেওয়া বা বিনষ্ট করা হয়েছে, ৭০৮৫ মণ খাদ্যসামগ্রী আর ৬০ গাড়ী খাস জ্বালানো বা লুণ্ঠ করা হয়েছে, নিহত এবং অপহৃত পশুর সংখ্যা ১০৮টি। যে সমস্ত মাল লুণ্ঠন করা বা জালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মূল্য ১০,০০০ টাকা।

এই অকথ্য অত্যাচার করেও ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ক্ষান্ত হইলেন না, ভীলদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্তে তাঁরা মোতীলাল তেজাবৎকে সাত বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। মোতীলাল কিন্তু ব্রিটিশের চোখে খুলো দিয়ে ফেরার হয়ে যান এবং পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করতে থাকেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ তাঁকে ধরবার জন্তে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল। তাঁরা আর এক ব্যক্তিকে মোতীলাল তেজাবৎ মনে করে ধরে নিয়ে এল—ব্রিটিশের ভায় বিচারে সে বেচারার হ'ল প্রাণদণ্ড। যাতে ভীলদের মধ্যে নৈরাশ্রের সর্কার হয় এবং তাঁরা জানতে পারে যে তাদের নেতা আর ইচ্ছাগতে নেই, সেই উদ্দেশ্যে গবর্নেন্ট সেই ব্যক্তির ছিন্ন মূণ্ড বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করতে লাগলেন।

এবার আর লুকিয়ে থাকা তেজাবৎের নিকট সমীচীন বলে মনে হ'ল না—জাতিকে আশঙ্ক করবার জন্যে আত্মপ্রকাশ করা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। ১৯২৯ সালের ৩রা জুন তিনি বেচ্ছার ইভর রিসাসভের খেডরজা নামক স্থানে ব্রিটিশ গবর্নেন্টের নিকট ধরা দিলেন। বিচারে তাঁকে সাত বৎসরের জন্তে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। উদয়পুর সেন্ট্রাল জেলে নির্দিষ্টকাল কারাদণ্ড ভোগ করবার পর ১৯৩৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মোতীলাল কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজের ভাবে বসে রইলেন না। ভীলজাতির সর্বাদীণ কল্যাণসাধনকে তিনি জীবনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। দিনকতক বিশ্রাম

করে আবার তিনি নতুন উত্তমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯৩৮ সালে মেবার প্রজামণ্ডল স্থাপিত হওয়ার পর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, ফলে পুনরায় তাঁর কারাদণ্ড হয়। যথাসময়ে জেল থেকে তিনি ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম-বিধাভা এই জননারকের অদৃষ্টে লেগেন নি। '৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় ভীলজাতিও যখন "করেন্দে ইয়ে মরেন্দে" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল তখন তাঁদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মোতীলাল। তাঁর কর্তে ধ্বনিত হয়ে উঠল বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান। বেগতিক দেখে সরকার ১৯৪৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী পুনরায় তাঁকে উদয়পুর সেন্ট্রাল জেলে পুরলেন। এবার তাঁর দেড় বৎসরের কারাদণ্ড হ'ল।

জাতির মুক্তি-সাধনার উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই ভীল-নেতার জীবন একটানা দুঃখবরণের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। স্মরণীয় জীবনের বৈশী ভাগই কেটেছে তাঁর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আর অজ্ঞাতবাসে। বিভ্রাটের জাগতিকদার হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যৌবনেই তিনি বিপৎসমুদ্র কটকাকীর্ণ পথকে বেছে নিয়েছিলেন, তারপর থেকে কটক-মুক্তি মাথার পরে সেই বজুর পথেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। চুরিজনাল এবং আত্মভ্যাগের দ্বারা বজাভীর নর-নারীর হৃদয়ে তিনি নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভীল নরনারী তাঁকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে তা রাজপুতানার বিখ্যাত লেখক অখিল বিনয়ের উক্তিতে সুপরিষ্কৃত। তিনি লিখছেন : "হম করবরী ১৯৫০ মে আপকে দর্শন করনে কা সোভাগ্য প্রাপ্ত হয়। আপ কোটরা ভোপটে (উদয়পুর) মে ১২-১৩ করবরীকে আদিবাসী সম্মেলনকে স্বাগতাত্মক ধে। আপকী বিনব্রতা ঔর সেবা ভাব দেখ কর হম মুগ্ধ হো গয়ে। হমনে দেখা কি ভীল পুরুষ ঔর জিন্না বাতাবিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সে আপকে চরণ মে প্রণাম করতী থী; ঔর আপকা আশীর্বাদ পানে কী ইচ্ছুক রহতী থী। ইসলে মালুম হতা-কি ভীল লোগ আপকে দেবতা সমবতে হৈ, ঔর আপকে নাম পর তরহ-তরহ কী মনোভীয়া মত মানতে হৈ।"

অর্থাৎ, "১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। উক্ত বৎসরের ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে ইনি উদয়পুরের কোটরা ভোপটে সমুদ্রীত আদিবাসী সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত্ত হন। এঁর বিনব্রতা আর সেবার ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি দেখলাম যে, ভীল স্ত্রী-পুরুষেরা আন্তরিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করছে—তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্তে তাদের কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা! এসব দেখে শুনে আমার প্রভীতি হ'ল যে, ভীলরা তাঁকে দেবতা বলে মনে করে, তাঁরা সময় সময় তার নামে বিবিধ প্রকারের মানত পর্যাপ্ত করে।"

মৌড়ীলাল ভেঙ্কাবেতের নেতৃত্বে ভীমদের অভ্যুত্থানের কাহিনী আধুনিক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়, কিন্তু পরিভাষার বিষয়, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সে কাহিনী স্থান পায় নি। ইংরেজ যখন দেশের মালিক ছিল তখন তারা আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের বিদ্বেষ সৃষ্টি করবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বহিষ্ঠূত বা আংশিক বহিষ্ঠূত অঞ্চল সৃষ্টি করে তারা সেগুলিতে স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। আদিবাসীদের মুক্তি-আন্দোলনের কথা হয় তারা কৌশলে চেপে রেখেছে নতুবা তার অপব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। খাসিয়া-বিদ্রোহের নায়ক ভীম সিংকে তারা চিত্রিত করেছে ‘রক্তপিপাসু’, ‘বুনো’ ‘খুনী’ রূপে, নাপারাগি গাইডিলিউকে দিয়েছে যাহুকরী আখ্যা, অজ্ঞের কেণ্ডা ডোরা বিদ্রোহের নায়ক আলুডি ক্রীম রাজাকে (সীতারাম বাজু) কারাশ্রাচীরের অন্তরালে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছে।

দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতার ষথাযথ ইতিহাস রচনার পথে যে সকল বাধা ছিল সেগুলি এখন বহুলাংশে অপসারিত। আজ তাই নতুন করে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন। এই নতুন ইতিহাসে দেশের জন্তে আদিবাসীদের দুঃখবরণ ও বলিদানকে যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এ কথা ভুললে চলবে না ভীম সিং, গাইডিলিউ, ভারতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলনের প্রবর্তক মুণ্ডানেতা বীরসা ভগবাম, নেতা নির্মল মুণ্ডা, আগষ্ট-আন্দোলনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসাদের কমলা মিরি, কাছাড়ী নেতা মধুবন, ভীম জননায়ক মৌড়ীলাল ভেঙ্কাবৎ প্রভৃতির সক্রিয় দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের কাহিনী বাদ দিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে না।*

* লেখকের প্রকাশিতব্য ‘আদিবাসীদের বিচিত্র কথা’ নামক পুস্তকের একটি অধ্যায়।

চারি বেদের পৌৰ্ব্বাপর্য্য

শ্রীবাসনা সেন, এম-এ, বেদান্ত-তীর্থ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর বেদ। অপৌরুষেয় বেদের উপর ভারতের প্রায় সমস্ত গৌরব প্রতিষ্ঠিত। বহু দিন হইতে আমাদের দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ষথাযথ আলোচনাদি না হওয়ায় অনেকের মনে এই অর্থও বেদ সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। আজকাল আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কথা শুনিতে পাই যে, ঋকসংহিতা সকলের পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং তার পর যজুঃসংহিতা ও সামসংহিতা রচিত হয়। অথর্বসংহিতার রচনা বহু পরবর্তীকালে, যেহেতু ইহার ভাষা ঋকসংহিতা অপেক্ষা সরল ও সহজ। তার পর ঋকসংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল বহু পরবর্তী, কেননা ইহাদের ভাষা অগ্ৰান্ত মণ্ডল অপেক্ষা সরল এবং বৈদিক সংস্কৃতির ন্যায় দুরূহ নহে। এই সকল যুক্তি যে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য তাহা আমরা এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া যদি আমরা বেদ সম্বন্ধে মতামত প্রতিষ্ঠা করি তবে যে তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং ভ্রান্তিমূলক হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বেদ সম্বন্ধে নানা প্রকার

মতামত যে ষথাযথ অধ্যয়নপ্রসূত নহে তাহা বুঝা যায়। এ স্থলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঋকমন্ত্র ও সামমন্ত্রে এইমাত্র প্রভেদ যে, ঋকমন্ত্রগুলি গীত হইলে তাহাই সামমন্ত্র হইয়া থাকে। সামগানের আধারীভূত মন্ত্র ঋকমন্ত্রই বটে। সামের আধারীভূত ঋকমন্ত্রকে ‘যোনিধ্বক্’ বলা হয়, ঋকমন্ত্রই যজ্ঞাদি স্বরসংযোগে গীত হইলেই তাহাকে সামমন্ত্র বলে। ‘তেষামৃগ্যত্রার্থবশেনপাদব্যবস্থা’ (জৈমিনি সূত্র ২।১।৩৫), ‘গীতিষ্মসাখ্যা’ (জৈমিনি সূত্র ২।১।৩৬), ‘শেষে যজুঃশব্দঃ’ (জৈ. সূ. ২।১।৩৭)—এই তিনটি সূত্রদ্বারা ভগবান জৈমিনি ঋকমন্ত্র, সামমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রের লক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এজন্য অথর্বসংহিতার মন্ত্ররাশি ঋকমন্ত্রই বটে। শান্তি, পৌষ্টিকাদি দৃষ্টফল কর্মের অভিধায়ক ঋকমন্ত্রগুলি একত্র সঙ্কলিত হইয়া অথর্বসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য আথর্বনিক মন্ত্র ঋকমন্ত্রই বুঝিতে হইবে।

ঋকসংহিতাতেও যে যে স্থলে মন্ত্রদ্বারা গানের উল্লেখ আছে সেই সমস্ত স্থলে সামমন্ত্রই প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। অপ্রগীত মন্ত্রই ঋক্ এবং প্রগীত ঋকমন্ত্রই সাম। এজন্য ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে যে ‘তস্মাদ ঋচি অধ্বাৎ সাম গীয়তে’ (ছা. উ. ১. ৬. ৫)।

আমরা এই প্রবন্ধে গীতিযুক্ত মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া ঋক্-সংহিতাতে সামমন্ত্রের সত্তা দেখাইতেছি।

ঋক্‌সংহিতা পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য বেদ সকল পরবর্ত্তীকালীন রচনা এই যুক্তি অত্যন্ত ভ্রান্ত। তাহার প্রথম কারণ 'সামানি' এই শব্দ ঋক্‌সংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। যদি সামসংহিতা পরে রচিত হইয়া থাকে তবে ঋক্‌সংহিতার মধ্যে তাহার উল্লেখ কিরূপে সম্ভব? অথর্বসংহিতা বহু পরবর্ত্তী ইহাই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। অথর্বসংহিতার ঋত্বিক 'ব্রহ্মা' শব্দ ঋক্‌সংহিতায় উল্লিখিত আছে। তিন সংহিতার একত্র উল্লেখ বহুবার ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দেখা যায়।

অথর্বসংহিতার মন্ত্রসকল ঋক্‌সংহিতায় আম্রাত রহিয়াছে বলিয়া অথর্বসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত হইল না। অন্যথা ঋক্‌সংহিতার মধ্যে এই দুই সংহিতার এবং এই দুই সংহিতার ঋত্বিকগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋচাঃ পোষমাস্তে পুপুশান্
গায়ত্রীং যো গায়তি শক্রীযু।
ব্রহ্মা যো বদতি জাতবিভাঃ
যজ্ঞস্তমাত্রাং বিস্মীত উষ। (ঋ, সং. ৮. ২. ২৪)

এই ঋক্‌মন্ত্রে ঋক্, সাম, অথর্ব এবং যজু এই চারি সংহিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মা অথর্বসংহিতার ঋত্বিক, তাহার নাম এই মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যজুর্বেদের ঋত্বিক অধ্বর্যুকে যজ্ঞের মাত্রার নির্ণাতারূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া যাস্ক বলিয়াছেন—'ঋত্বিক কৰ্ম্মনাং বিনিয়োগমাত্রে' (নিরুক্তম্, উপোদ্ভাতপ্রকরণ ১৮)।

ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্তের মধ্যে 'তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহৃতঃ ঋচঃ সামানি জজিহ্নে। ছান্দাসি জজিহ্নে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদ্ অজায়ত ॥' (ঋ. সং. ৮. ৪. ১৮)। এই পুরুষসূক্তের মধ্যে ঋক্, যজু এবং সামের কথা একত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

'সাম দ্বিবর্ষী মহিতিগ্ভৃষ্টঃ সহস্ররেতা
বৃষস্তবিশ্বান্। (ঋ. সং. ৪. ৫. ৩)
যজ্ঞেরধর্মী প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সৃধ্যো ব্রতপাবেন
আজনি (ঋ. সং. ১. ৬. ৪)

সামসংহিতার মধ্যে অথর্বসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

'তামগ্নে পুরুষাদধ্যধ্বা নিরমন্তঃ মুশ্বে। বিশ্বস্ত বাধতঃ।
তমু ভা দ্যাঙঃ ধ্বিঃ পূজ ইধে অথর্বগঃ বৃহগ্নঃ পুরলরম্।
(সাম বেদ ১. ১. ১)

অথর্বসংহিতা যদি বহু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়া থাকে তবে তাহার উল্লেখ সামসংহিতার মধ্যে পুনঃ পুনঃ কিরূপে সম্ভব হইল? অথর্বসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত না হইলে সামসংহিতায় অথর্বশব্দ ব্যবহৃত হইল কেন? ঋক্-

সংহিতায়ও এই মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। (ঋ. সং. ম. ৬. ১৬. ১৩-১৪), (ঋ. সং. অষ্টক, ৪. ৫. ২৪)।

ঋক্‌সংহিতার বহুস্থানে সামের উল্লেখ হইয়াছে। 'ত্বমর্কেভিস্তং সামভিস্তং গায়ত্রৈশ্চরণয়োঃ' (ঋ. সং. ৬।১।২২) এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে চর্যগিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অর্চনামন্ত্র দ্বারা বদ্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বদ্ধিত করে এবং গায়ত্রীমন্ত্রদ্বারা বদ্ধিত করে।

'অর্চন্ত ত্রকে মহি সাম মন্বত তেন সৃধ্যমবোচৎ'
(ঋ. সং. ৬।২।৩৭)

এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সৃধ্যকে দীপ্ত করেন।

• 'বৃহদিজায় গায়ত মরুতো বৃহহস্তমম (ঋ. সং. ৬।৬।২২)
যজুবর্দ্ধক বিশ্বদেবগণ হ্রাতিমান ইজের উদ্দেশ্যে এই গান দ্বারা দীপ্ত সর্বদা জাগরুক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়া-
ছিলেন।

'উদগাতের শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি
(ঋ. সং. ২।৮।১২)

অর্থাৎ হে শকুনি! উদগাতা যেরূপ সামগান করে সেইরূপ তুমি গান কর। যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্রের স্থায় শব্দ কর।'

সায়নাচার্য লিখিয়াছেন—বোল জন ঋত্বিকের মধ্যে 'ব্রহ্মণাৎ শংসী' নামে যজ্ঞের একজন ঋত্বিক ছিলেন।

'প্র ব ইজায় মাদনং হর্ঘ্যায় গায়ত' (ঋ. সং. ৫।৩।১৫)
অর্থাৎ হে সখাগণ! তোমরা সোমপারী হর্ঘ্য ইজের উদ্দেশ্যে মদকর স্তোত্র গান কর।'

'যা বিধাসাং জনিতায়া মতীনামিভ্যাবিক্
কলশাসোমধানা'

প্রবাং গিরঃ শস্তমানা অবন্ত প্রস্তোমাসো গীয়মানাসো অর্কেঃ
(ঋ. সং. ৫।১।১৩)

অর্থাৎ 'হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করিয়া ঋক্, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসধরূপ। উচ্চাধীমান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক এবং স্তোত্রগণ কর্তৃক গীয়মান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক।'

'বি যধাচঃ কীন্তাসো ভরন্তে
শংসন্তি কেচিবিবিদো মনানাঃ' (ঋ. সং. ৫।১।১০)

'যখন মেধাবিগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন কেহ কেহ স্তুতি করতঃ নিবিস্তমূহ পাঠ করেন।'

অগ্নিজাগার তমুচঃ কাময়ন্তে
অগ্নিজাগার তমু সামানি যন্তি। (ঋ. সং. ৪।২।২৫)

'সন্মজাত কোমল প্রকৃতি অগ্নিকে স্তোত্রের সহিত হব্য প্রদানপূর্বক পোষণ করিয়াছেন।'

'বেমি ভা পুষ্প জসে বেমি স্তোতব আয়ুণে' (ঋ. সং. ৫. ৭।৩৩)
'হে পুষা! তোমাকে প্রসাদিত করিতে ইচ্ছা করি। হে দীপ্তিযুক্ত! তোমায় স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি।'

ঋক্‌সংহিতার মধ্যে চারি বেদের চারি জন ঋত্বিকের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋত্বিক হোতা, সামবেদের ঋত্বিক উদগাতা, যজুর্বেদের ঋত্বিক অধ্বর্যু এবং

অথর্ববেদের ঋত্বিক ব্রহ্মা। এই চারি জন ঋত্বিকের নাম ঋগ্বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য সংহিতাসকল ঋকসংহিতার পরবর্তী রচনা নহে। যজুর্বেদের ঋত্বিকের (অধ্বর্যু) নাম ঋগ্বেদে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রা, প্রিয়ং রক্ষন্তে নিহিতং পদং বৈ’—এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, পাঁচ জন অধ্বর্যুর সহিত সাত জন হোতা গমনশীল অগ্নির প্রিয় স্থান রক্ষা করিতেছেন। এস্থলে যে অধ্বর্যু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা যজুঃসংহিতায় উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। এই অথও বেদের রচনাবিভাগ কেবলমাত্র ভাবার দিক হইতে করিতে গেলে বহু ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্ভাবনা আছে।

উতিভিস্তমিষনো দ্বামহতৌনি মায়াবান ব্রহ্মা দহ্যরত।

(ঋ, সং, ৩৫।১২)

অথর্বসংহিতার ঋত্বিক ব্রহ্মার নাম ঋকসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

‘আজ্ঞানান্ন যতপৃষ্ঠং পূবঙ্গ-দধ্বর্যাবো হবিষামর্জযক্ষম্।

‘হে অধ্বর্যুগণ! যতপৃষ্ঠ, স্থলবিন্দুযুক্ত বর্হিঃহোমকরতঃ প্রদান কর।’

ঋকসংহিতার ২, ৬, ১৩।১৪ বর্ণে যে বারটি ঋকমন্ত্র আছে তন্মধ্যে ১১টি মন্ত্র অধ্বর্যুগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আশ্রিত হইয়াছে।

‘অধ্বর্যাবো ভরতেল্লায় সোম মামত্রেভিঃ সিকতা মদাগন্ধাঃ—

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপ যে, হে অধ্বর্যুগণ! ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, চমসের দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর।

‘অধ্বর্যাবো যো অপো বরিবাসং বৃত্রং জঘান্নাশস্তেব বৃক্ষম্।’

‘হে অধ্বর্যুগণ! যে ইন্দ্র জলাবরণকারী বৃত্রকে অশনি দ্বারা বৃক্ষের ছায় বিনশুণ করিয়াছিলেন, সেই সোমভিলাষী ইন্দ্রের জন্ত সোম আহরণ কর।’

এইরূপ ১১টি ঋকমন্ত্রে অধ্বর্যু শব্দ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

‘অধ্বর্যাবোহপ ইতা সমুদ্রমপানপাতঃ হবিষা যজক্ষম্।’

‘হে অধ্বর্যুগণ! জলের সমুদ্রে প্রমদ কর। ‘অপানপাতঃ’ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যদ্বারা পূজা কর।’

এই সকল বৈদিক মন্ত্র হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিরাট যজ্ঞকে সমুখে রাখিয়া এই চারি সংহিতা রচিত হইয়াছিল। যজ্ঞব্যতিরেকে এই চারি সংহিতার কল্পনা করিতে গেলে ঋত্বিক কর্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবে। চারি ঋত্বিকের একত্র উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, চারি বেদ যুগপৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, নতুবা ঋত্বিকগণের উল্লেখ যদি ঋকসংহিতায় পাওয়া যায় আর সেই সেই ঋত্বিকগণ যে যে সংহিতা অল্পযায়ী যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবেন তাহা ঋকসংহিতার পরে রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয় তবে এই যুক্তি অত্যন্ত আন্তরিক হইবে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের ১ম ও ১০ম মণ্ডলকে পরবর্তীকালীন রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহারাই এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, ১ম ও ১০ম মণ্ডলের মন্ত্র সকল সরল ও সহজবোধ্য। এস্থলে আমরা ১ম ও ১০ম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে এগুলি সরল তো নহেই, উপরন্তু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং নিরুক্তকার যাস্ক এগুলিকে দুর্লভ বলিয়াছেন।* ঋকসংহিতার ১০ম মণ্ডলে ‘স্বণ্যের জর্তরী তুফরী তু’ (ঋ, সং. ১০. ১০৬. ৬) ইহা দ্বারা আপাতঃদৃষ্টিতে কোন অর্থপ্রতীতি হয় না।

‘অম্যাক সা ত ইন্দ্র ঋষিষ্মে সনেনাভং মরুতো জুনন্তি’—

(ঋ, সং. ১. ১৬৯. ৩)

ইহাও প্রথম মণ্ডলের মন্ত্র। নিরুক্তকার যাস্ক এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ‘অবিস্রষ্টার্থা ভবন্তি’। এইরূপ বহু মন্ত্র ১ম ও ১০ম মণ্ডলে পাওয়া যায় যাহার অর্থ সহজবোধ্য নহে।* অপরপক্ষে ২য় হইতে ৯ম মণ্ডল পর্যন্ত ঋকমন্ত্রের মধ্যে বহু সরল ও সহজবোধ্য মন্ত্র আছে। (ঋ, সং. ৩. ৪২. ৪-৫, ৩. ৪৪. ১, ৪. ৪২. ৩, ৯. ১১, ৯. ৮৪, ৫।)

তার পর শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে : ‘অস্ত মহতঃ ভূতস্ত নিঃস্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদযজুর্বেদার্থাদিরসেতিহাসপুরাণ ইত্যাদি। এখানে ‘মহতঃ ভূতস্ত’ শব্দের দ্বারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং চারি সংহিতার একত্র উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় যে ঋগ্বেদ পূর্বে সৃষ্ট হয় নাই। এই চারি বেদ মহান-ভূত যে ব্রহ্ম তাহারই নিঃস্বাসস্বরূপ। এখানে বুঝিতে হইবে যে, নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে বিশিষ্ট রচনাসম্পন্ন বেদ পূর্বেও বিद्यমানই ছিল, সেই বিद्यমান বেদই পুরুষ-নিঃস্বাসবৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপূর্বক বিরচিত হয় নাই; এই কারণে বেদ স্বার্থ-প্রতিপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না; ইহা স্বতঃপ্রমাণ। বিশেষতঃ পরমাত্মার উপাধিভূত নাম ও রূপই ব্যাকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জল ও তাহার ফেনার ন্যায় নাম ও রূপকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না। যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই নাম ও রূপ লইয়াই সংসার। এজন্য এখানে কেবল নামকে (শব্দরাশিকে) নিঃস্বাসবৎ উৎপন্ন বলা হইল। কারণ তাহার নির্দেশেই অপরেরও—

* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০.১০.১২৭) রাত্রিযুক্ত উক্ত হইয়াছে। এই আটটি মন্ত্রের অর্থ অতীব দুর্লভ।

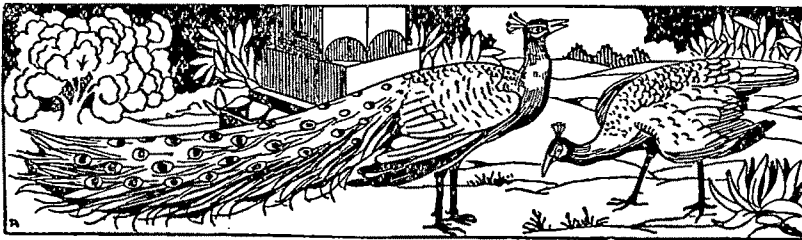
ব্রাহ্মী ব্যাখ্যাদায়তী পুরুষা দেব্যাক্তিঃ বিধা অধি শ্রিগোহধিত। (১) ওঁপ্রা. অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্যত জ্যোতিষা বাধতে তমঃ। (২) ইত্যাদি।

রূপেরও নিঃশ্বাসবৎ উৎপত্তি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। লোকের নিঃশ্বাস যেরূপ অব্যক্তপ্রস্থত অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যের ফলমাত্র তজ্জপ বেদরাশিও পরমপুরুষের নিঃশ্বাসবৎ অনায়াসপ্রস্থত। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ যেরূপ লোকের চেষ্টাসাপেক্ষ, বেদ সেরূপ নহে, এইজন্যই ইহা স্বতঃ-প্রমাণ।

যে কোন মন্ত্রসংহিতা অধ্যয়ন করিলে ইহা স্বস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে যে, কোন যজ্ঞবিশেষ আরম্ভ করিয়াই সেই যজ্ঞে অপেক্ষিত দ্রব্য-দেবতার গুণকীৰ্ত্তন, স্তুতি প্রভৃতি এবং যজ্ঞে যজ্ঞমানের শুভআশংস প্রভৃতি বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্য কোন অর্থ বেদমন্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলে নানাবিধ ক্লিষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে। বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও কল্প প্রভৃতি বেদাদি আলোচনা করিলে এই কথাই স্বস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ঋকমন্ত্র বহুবীর সোমযাগের প্রাতঃ সবন, মধ্যাহ্ন সবন ও তৃতীয় সবন এই তিনটি সবনের বিশেষ পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋত্বিকগণের নানাকর্মের উল্লেখ এই ঋকমন্ত্রসমূহে স্বস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রৌতযজ্ঞ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের সর্বানুক্রমনি প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করিলেও কোন যজ্ঞে কোন দেবতার উদ্দেশে কোন সময়ে কোন মন্ত্র বিনিযুক্ত হইয়াছে তাহাই সর্বানুক্রমণিকারও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই যজ্ঞ প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ আলোচিত হইলে বেদের অধিবজ্ঞ অর্থ প্রথমতঃ পরিস্কুরিত হইবে। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনও এই পক্ষের অন্তর্কুল। অথেষ্টা চরতি মায়ৈয়ং বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুশ্লাম—৮।২।২৪ ঋ. সং. এই ঋকমন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও ভগবান বাস্ক উপোদ্ভব প্রকরণে বেদের

প্রাথমিক প্রথমাবগত যজ্ঞরূপ অর্থকেই বলিয়াছেন। অধিবজ্ঞ ব্যাখ্যা দ্বারা বেদমন্ত্রার্থ গৃহীত হইলে পরে অধিদেবতত্ত্বে বেদার্থালোচয়িতার পরিচয় জন্মিবে। কারণ দেবতার উদ্দেশে হবিঃ ত্যাগই যজ্ঞ। এই দেবতত্ত্বের সহিত পরিচয় হইলে সমস্ত মন্ত্রভাগ যাহা অধিবজ্ঞরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা অধিদেবতরূপে ভাসমান হইবে। অধিদেবততত্ত্বে নিম্নাতপুরুষ আধ্যাত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিবে। এজন্য বেদমন্ত্রসমূহই সাধারণতঃ ত্রিবিধ অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া পরিসমাপ্তিলাভ করিয়া থাকে।

অধিবজ্ঞ, অধিদেবত, অধ্যাত্ম—প্রথমটি উপায় দ্বিতীয়টি উপায়; এজন্যই উক্ত মন্ত্রে যজ্ঞ, অধিবজ্ঞ, অধিদেবত অর্থকে পুষ্প ও অধ্যাত্ম অর্থকে ফল বলা হইয়াছে। ফুল উপায়, ফল উপায়। ইহাই সাধারণতঃ বেদমন্ত্রসমূহের অর্থ। যজ্ঞের ঋত্বিকগণের পৃথক পৃথক কর্ম বিভিন্ন সংহিতায় আশ্রিত হইয়াছে। যেমন ঋকসংহিতায় হৌজ-কর্ম, সামসংহিতায় ওদগাত্র কর্ম, যজুঃসংহিতায় আশ্বর্য্যব কর্ম এবং অথর্বসংহিতায় ব্রহ্মকর্ম আশ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি যজ্ঞেই এই ঋত্বিক চতুষ্টয় অপেক্ষিত এবং ইহাদের কর্মও বিভিন্ন রূপ। এজ্ঞা সোমযাগাদি প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রতি চতুর্বিধ ঋত্বিককর্মারূপে মন্ত্রসমূহ চতুর্বিধ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কোন মন্ত্র বা ঋত্বিক পূর্ববর্তী বা পরবর্তী এরূপ বলার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। অতএব আমরা ঋকসংহিতার মন্ত্রেও অন্য বেদমন্ত্রের ও অন্য ঋত্বিকগণের কর্মের উল্লেখ দেখাইয়াছি। মন্ত্রসমূহের পৌর্বাপর্য্য স্বীকার করিলে ঋকসংহিতাতে পঠিত মন্ত্রসমূহের আনর্থক্য হইয়া পড়িবে। ইহাই বিবেচনা করিয়া ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ বেদমন্ত্রের পৌর্বাপর্য্য স্বীকার করেন নাই।



ফরাসী-কবি লেকঁৎ দে লীন্

ত্রিনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত ফরাসী-কবি লেকঁৎ দে লীন্ (Leconte de lisle) ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে 'রি-ইউনিয়ন' গ্রীপে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ফরাসী-পাঠকসমাজে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন এবং আজও তাঁর কাব্যাবলী বিশ্বের কাব্যরসিকমণ্ডলীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জীবিত কালে কবি লেকঁৎ দে লীন্ ফরাসী-কবিসমাজে বিশেষ আদর ও মর্যাদা পেয়েছিলেন; বড় বড় সমালোচক, সাহিত্যবিদ মণ্ডিত ও মনীষিগণের নিকট থেকে তিনি প্রভূত সন্মতি অর্জন করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে এক বিশিষ্ট কবিদলের আবির্ভাব হয়; এঁরা Les Parnassiens নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁরা সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকার কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসক ছিলেন এবং অভিনব আঙ্গিকে কাব্যে এক সম্পূর্ণ নুতন ধরনের সুর ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। আলফ্রেঁস দে লামারতিন্ (১৭৯০-১৮৬৯), আলফ্রেঁস দে ভিকি (১৭৯৭-১৮৬৩), আলফ্রেঁস দে ম্যুসে (১৮১০-১৮৫৭), জুলি প্র্যাদম্ (১৮৩৯-১৯০৮), জে.-এম. দে হেরেদিয়া (১৮৪২-১৯০৫), ফ্রান্সোয়া কপ্পে (১৮৪২-১৯০৮) প্রভৃতি স্প্রেসিঙ্ক ফরাসী-কবিসমূহ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। লেকঁৎ দে লীন্ এই পানাসিঁয়া (Parnassien) নামক ফরাসী-কবিদলের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, কাব্যে হবে বিজ্ঞান ও কলার পরিমিশ্রণ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও ভাবাহুত্বের মিলন। যন্ত্রযুগ ও রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়েও তাই তিনি কামনা করেছিলেন ভাবজগতের সঙ্গে, সৌন্দর্যলোকের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন; তাঁর কাব্যেও সেইজন্য দৃঢ়মান জগতের সঙ্গে অদৃশ্য সৃষ্টি জগতের মহত্তর সংযোগ সাধিত হয়েছে। নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারার সাহায্যে তিনি গ্ৰীষ্মবীর প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং মানবের আশা-আনন্দে সুরে-দুঃখে ভরা এই মর্ত্য-জীবন নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর অপূর্ণ কাব্য।

লেকঁৎ দে লীন্ *L'univers Visible* অর্থাৎ দৃশ্যমান বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশির সঙ্গে মনের কল্পনারাজির সংমিশ্রণে অপরূপ কাব্যাবলীর সৃষ্টি করেছেন। এই প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু রহস্যময় তা তাঁকে আকর্ষণ করত; তাঁর মনোদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সেগুলি অপূর্ণ কাব্যে রূপায়িত হ'ত; হৃদয়বাহের রঙীন আল্পনার সুরমিত্ত করে তিনি সে সকল ভাব প্রকাশ করতেন। মানব-হৃদয়ের চিরন্তন সুখ-দুঃখ তাঁর হৃদয়-বীণায় বিচিত্র

সুরে বেজে উঠেছিল; তাই কখনও তাঁর কবিতায় শুনি আমন্দময়ী আশা-রাগিণী, আবার কখনও বা অশ্রুভব করি যে, সেখানে ঝঙ্কত হয়েছে নৈরাশ্রের সুর। কখনও তাঁর কবিতা মিলনের আবেগে আত্মহারা, কখনও ভা মর্শ্বভেদী বিচ্ছেদের হাহাকারে প্রতিধ্বনিত। কোথাও তিনি অদৃষ্টবাদের জয়গান করেছেন, কোথাও বা তিনি হয়ে উঠেছেন চূড়ান্ত আশাবাদী, আবার কোথাও তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছে আদর্শবাদ, কোথাও বা তিনি হয়ে উঠেছেন হুঃখবাদী, কিন্তু সবকিছুকে অতিক্রম করে অবশেষে তিনি সেই আনন্দময় সুরেরই বন্দনায় আত্মহারা হয়ে পড়েছেন।

লেকঁৎ দে লীন্-এর কাব্যের অগাধ অন্তলম্পর্শী ভাবরাশি, নভঃপ্রসারী অসীম চিন্তাধারা, স্তনিকীর্ণিত গাভীর্ষ্যপূর্ণ শব্দসমূহ, পরিমার্জিত স্বচ্ছ সতেজ ভাষা, লাগিত্যপূর্ণ বক্তারমর প্রতি-মধুর ছন্দ—এ সমস্তই তাঁকে মহান গৌরবের অধিকারী করে-ছিল ও শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসিয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে ভাবপ্রবণ কবি, বিচক্ষণ দার্শনিক এবং অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক ছিলেন। প্রাচীন কাহিনীসমূহে ও পুরাণে তাঁর দখল ছিল প্রগাঢ়। প্রাচীন যুগের গ্রীক, লাতিন ও হেব্রায়িক সংস্কৃতি সম্পর্কিত পুস্তকাবলী তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে পাঠ করে-ছিলেন। তাঁর কাব্যে এ সকলের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এই সকল কারণে ফরাসী-কবিসমাজে লেকঁৎ দে লীন্-এর স্থান ছিল অনেকটা Maître বা গুরুর মত।

লেকঁৎ দে লীন্ নিজে কিন্তু তাঁর গীতি-কবিতায় পাঠক-বৃন্দের মনে কোনরূপ স্থায়ী আবেদন জাগাতে সচেষ্ট হন নি। তাঁর কবিতা যেন অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ময় কণিক বর্ণনাময়, বাসন্তী হাওয়ার সুরে হতে হঠাৎ ভেসে আসা প্রস্ফুটিত উদ্যান-লতার সুরভি, দক্ষিণের সাময়িক চঞ্চল-বাতাসের হিলোল, কিয়ৎ-কণের জন্য পূর্ণ-চাঁদের ছোয়াংলা-কিরণ।—যা পড়ে বিমুগ্ধ পাঠকের হৃদয় কণিকের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠবে, কিছুক্ষণের জন্য তার মনকে ধোলা দিয়ে ধাবে কবিতার দোহল ছন্দ আর অপূর্ণ ভাষা। ফুল যেমন রূপে-সৌরভে গৌরবে ফুটে উঠে আবার কিছুক্ষণ পরে ঝরে পড়ে যায়—তবু ধারার বুকে রেখে যায় তার সুরাঙ্গিত ক্ষীণস্মৃতি—Parnassien কবি লেকঁৎ দে লীন্-এর গীতি-কবিতাগুলি হ'ল সেই রকম; হরি-দ্রাভ বা শুভ্র ভাব-পুষ্পে বিমণ্ডিত এই কাব্য-লতার এইখানেই হ'ল আসল গৌরব। অস্থায়ী সৌন্দর্য্যবাদই হ'ল এই গীতি-কবিতা করটির মূল-কথা।

লেকঁৎ দে লীন্-এর এই অভিনব কাব্যধারা তদানীন্তন

অনেক ফরাসী-কবির মনে সাড়া তুলেছিল; কাব্যে লেকঁৎ দে লীল্-এর অল্পগামীর সংখ্যা তাই কর্ম নয়। ঐ কবিগোষ্ঠীর বিখ্যাত কবি হ্যুলি প্র্যদম্ লেকঁৎ দে লীল্-এর মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ-সতেজ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। হ্যুলি প্র্যদম্ ছিলেন দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; গণিত বিদ্যাতেও তাঁর অগাধ অধিকার ছিল। *Les Stances et Poemes* (১৮৬৫-৬৬) নামক গ্রন্থরচনা করে এই ফরাসী কবি প্রথম বারের নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পার্শ্বাসিঁজী-কবি জে. এম. দে হেরেদিয়া লেকঁৎ দে লীল্-এর রচনাতত্ত্বী বিশেষ যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। হেরেদিয়া 'কিউবা' দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব ভাল সনেট লিখতে পারতেন। *Les Trophees* (১৮৯৩) নামক গ্রন্থরচনা করে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন।

লেকঁৎ দে লীল্-এর কবিতার উপর যার সামাজ্য প্রভাব পড়েছিল, তিনি হচ্ছেন ফরাসী-সাহিত্যের অমর কবি ও ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগো। আলফ্রেদে দে লামারভিন, আলফ্রেদে ভিকি ও আলফ্রেদে ম্যুসে এই তিন জন কবি ছিলেন উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার রচয়িতা; কাব্যে লেকঁৎ দে লীল্-হানে হানে তাঁর পূর্ববর্তী এই কবিজন্মের সামাজ্য অহুসরণ করেছেন ও তাঁদের গীতি-কবিতার ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। লেকঁৎ দে লীল্-এর এই সব কবিতা নিয়ে ভিক্টর হিউগো ও স্যাং ব্যাঙ্ক্ মূল্যবান আলোচনা করেছেন। প্রতীকতত্ত্বী (Symbolist) দলের বিখ্যাত কবি পোল্ ভের্গার্নে-এর লেকঁৎ দে লীল্-এর উপরে লিখিত একটি মনোজ্ঞ রচনা আছে। শক্তিশালী ফরাসী-সমালোচক ম্যাক্সিম ফরম স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সঙ্গে লেকঁৎ দে লীল্-এর কাব্য বিচার করেছেন। আমাদের দেশের সৌরব-বাঙালী মহিলা-কবি তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) খুব অল্প বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর কবিতার চমকপ্রদ সমালোচনা করে এক অপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। তবে তা বাংলা ভাষার লেখা নয় বলে সাধারণ বাঙালী পাঠকেরা রচনাটির রসাবাদে বঞ্চিত হয়েছেন।

১৮৫৩ সালে ৩৫ বৎসর বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েম্ আঁতিক্' (*Poemes Antiques*) প্রকাশিত হয়। তার নয় বৎসর পরে ১৮৬২ সালে ৪৪ বৎসর বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েম্ বার্বার' (*Poemes Barbares*) বার হয়; তৃতীয় বাইশ বৎসর পরে ১৮৮৪ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে লেকঁৎ দে লীল্-এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েম্ ড্রাগিক্' (*Poemes Tragiques*) ছাপা হয়। কবির শেষ কবিতাগুলি 'ডার্ণিয়ার পোয়েম্' (*Derniers Poemes*) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'শোয়া দে পোয়েজী' (*Choix de Poesies*) নামক পুস্তকে কবির সমস্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি চয়ন করা

হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কাব্যগ্রন্থ রসবেত্তা পাঠকমহলে বিপুল সমাদরলাভ করেছিল, এবং এগুলির কাব্যরস অত্যাধিক রয়েছে অব্যাহত।

ব্যাতনামা প্রাচ্যবিজ্ঞানবিদ ব্যার্নুঙ্ক্ ছিলেন কবি লেকঁৎ দে লীল্-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্যার্নুঙ্ক্ প্রাচীন ফরাসী ও ভারতীয় গ্রন্থ হতে অনুবাদ করে কৃত্ত্ব অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া ভারতীয় ভাব, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। এই ব্যার্নুঙ্কের শিক্ষায় ও সাহায্যে লেকঁৎ দে লীল্ ভারতীয় পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন। সেইজন্য লেকঁৎ দে লীল্-এর কাব্যের উপরে ভারতীয় ভাব ও ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ের বহু ভাবধারা বা ভাষা লেকঁৎ দে লীল্ অধিগত করেছিলেন। এ সমস্তই ব্যার্নুঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফল, কেননা তাঁর নিকট হতেই লেকঁৎ দে লীল্ পেয়েছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতির দীক্ষা। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উপরে লিখিত লেকঁৎ দে লীল্-এর কবিতাগুলি তাঁর প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে গাঢ়তম পরিচয়ের নিদর্শন। হিন্দুধর্ম তাঁর মনে বিশেষ দোলা দিয়েছিল; তাঁর 'ভাগবৎ' (*Bhagavat*), 'সূর্য্য' (*Surya*), 'ব্রহ্মদৃষ্টি' (*La vision de Brahma*), 'শিব' (*Civa*), 'শিবধর্ম' (*L'arc de civa*), 'মায়' (*Le Maya*), প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করলে তা বুঝা যায়। 'যম', 'অগ্নি', 'কাল', 'ব্রাহ্মণ', 'গঙ্গা', 'সাবিত্রী', 'মৈত্রেয়', 'নারদ', 'অদিরা', 'কৈলাস', 'বেদ', 'ভগীরথ', 'ঋষি', 'অঙ্গর', 'কিনর', 'হিমালয়', 'বান্দ্রীকি', 'দশানন', 'লঙ্কার রাবণ', 'রাক্ষস', 'দশরথ', 'রাম', 'লক্ষ্মণ', 'সীতা' প্রভৃতি পুরাণে উল্লিখিত, আমাদের একান্ত সুপরিচিত নামগুলি যখন লেকঁৎ দে লীল্-এর মত একজন ফরাসী-কবির লেখার দেখতে পাই তখন কৌতূহল-মিশ্রিত আনন্দে আমাদের বুক ভরে ওঠে। এই সব কবিতায় লেকঁৎ দে লীল্-এর আগ্রহ ও আন্তরিকতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য-সম্পর্কে তাঁর *L' Orient* ও *Bouddha* কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য। ইসলাম সম্পর্কেও কবি যথেষ্ট উৎসুক ছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁর *Le Suaire 'de Mohammed-ben-Amer-al-Mancour'* ও *Les roses d'Ispahan* কবিতা দুটির নাম করা যায়। তা ছাড়া 'লুঙ্গা' ও 'মজ্জ'র প্রখ্যাত কাহিনী কবি লেকঁৎ দে লীল্-এর হৃদয়তন্ত্রীতে বেঁধে বিভিন্ন রকম তুলেছিল তার স্বচ্ছ রেশ তাঁর দু-একটি কবিতায় সুপরিচ্ছট।

বিভিন্ন জাতের পশু ও পক্ষী কবি লেকঁৎ দে লীল্-এর বিশেষ প্রিয় ছিল। জীবজন্তুর উপরে লিখিত তাঁর কবিতার সংখ্যা তাই কম নয়। পশু-পক্ষীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেকঁৎ দে লীল্ যখন তখন চিন্তা করতেন। তিনি মনে করতেন যে,

পশুরা মাছের অপেক্ষা নির্দোষ ও সরল মনের অধিকারী।
‘জাগুয়ারের স্বপ্ন’ “Le reve du Jaguar”, ‘হস্তীযুগ’ “Les Elephants”, ‘কৃষ্ণ চিত্রব্যাজী’ “La Panthere noire” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।—
একটি যুগের পশুর স্বপ্ন-বাসনা কেমন নিপুণ হাতে কবি লেক্ট দে লীল ফুটিয়ে তুলেছেন তার নিদর্শন-স্বরূপ এই সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাটির “Le reve du Jaguar” কিসদংশের মধ্যস্থবাদ দেখা গেল :

“শেহালা-জীর্ণ শুষ্ক-দীর্ঘ বৃক্ষ-শাখার পাশে—
প্রান্ত শরীরে ফুল হৃদয়ে জাগুয়ার রোজ আসে ;
লেখন করিতে নিজ লাহুল রাগে দংশন করে,
দীর্ঘকণের সুবার আলার স্থিতি ওঠাধরে ।—
... ..

• সুবিপুল ঘন অরণ্য ; যেথা দিব্য দ্বিপ্রহরে
পল্লব আর পত্র-লতিকা রবিরে গোপন করে,
আছাতিয়া সেথা পড়ে জাগুয়ার নরম মাটির ‘পরে,
সমুখের ধাবা লেহন করিয়া সুপরিষ্কৃত করে ;
তজ্রাতে ক্রমে ঢুলু ঢুলু চোখ, জাগুয়ার বোকে আঁবি,
স্বপ্নে দুই নয়নের তারা কাঁপিয়ে স্বপ্ন মাঝি’ ।
ত্যা জন্মা প্রয়াস সংজ্ঞা হারান, শুধুই ঘুমের ভরে
লাহুল কভু সরিতেছে তার, মাঝে মাঝে ধাবা নড়ে ।
... ..

স্বপনে দেখিছে—সুপুটে গাভী হরিৎ-বনেতে চরে ;
বেগে জাগুয়ার পড়ে লাকাইয়া সেই গাভীটির ‘পরে ।
শুভ্রিত সেই শান্ত গাভীটি ফুকারে আর্দ্রধরে,—
নব্বের মাঝে জাগুয়ার তার ধাবাতে শোণিত ভরে ।”

লেক্ট দে লীল ঘন নিবিড় আত্মশক্তির বলে কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করেছেন ; তাঁর অন্তর্লোকের প্রগাঢ় সৌন্দর্য-চেতনার দ্বারা তিনি কাব্যের দেহ ছেড়ে প্রাণের উপর নির্ভর করেছেন । তিনি তাই আড়ষ্ট অভূতাপূর্ণ কবিতাকে দিয়েছেন শক্তিপূর্ণ চকল জীবন ; হৃদয়ের মার্ধ্ব্যকে, শব্দের ব্যঞ্জনাতে সর্বসর্বা করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন সুপরিচিত কল্প-বিলাসপন্থী (romantic) কবিতা । লেক্ট দে লীল-এর কবি-প্রাণ অতৃপ্তবের, অহুরাগের ও আবেগের ক্ষেত্র ; সেই কবি-প্রাণের আছে এক বর্ণাঢ্য রঞ্জনী বৃত্তি, সুগভীর রসলিপ্সা—যা কাব্য-স্বপ্নকে সুষমভাবে করে রঙীন । মনের উপভোগের জন্য তিনি এমন বর্ণ-বিচিত্র কাব্যবস্তুর সৃষ্টি করেছেন যার মূল-কথা হচ্ছে ছন্দ—যে ছন্দে কবি-প্রাণের অপূর্ণ-আনন্দ লাভ-লীলায় হিন্দোলিত হচ্ছে । লেক্ট দে লীল-এর লবু-কবিতার ছিল একটা ‘সুভীল ভাবোন্মাদ’ বা Lyric Enthusiasm ; যা তাঁর “Les Elfes” বা ‘পরীদল’ কবিতায় ইজ্রাজলের মত বিস্ময়করভাবে ফুটে উঠেছে । ভাবে ভাষার ছন্দে কবিতাটি

রীতিমত মোহকর । প্রথমেই অপরূপ দৃষ্ট নয়নগোচর হয় :

“নিবিড় বনেতে ভ্রমিছে যেথায় হরিণেরা দলে দলে,
কৃষ্ণ ষোটকে একেলা সেথায় অধারোহী সে চলে ।
স্বর্ণবচিত পাতুকা তাহার নিশীথে উজলি’ উঠে ;
ঘন অরণ্যে জ্যোৎস্না-কিরণ যেখানে পড়িছে লুটে,
প্রভাসিয়া সেথা দীপ্তি ভাতিছে নীরব বনের মাঝ,
ভেদিয়া ভিমির অধারোহীর বলসে শিবের ভাঙ ।
বনলতা আর শুভ্র কুসুম মতনে আঁবি কেঁপে,
মোহিনীর মল নৃত্য-উছল বনেতে বেড়ায় হেসে ।
... ..

মুহুর-আঁতাসে বাতাসেতে ভাসে পরীরা হৃদয়ভা
কিরিয়া কিরিয়া ঘুরিয়া ঘিরিয়া সাগর-উর্ধ্ব যথা ।
—‘ওগো বীর যুবা । এত পরে ভূমি এ হেন নিশীথক্ষেপে
বলো, কোথা যাও ?’—অপরাধী রাণী কহে বিষম-মনে :
‘দলে দলে যত অন্তঃ-আত্মা কিরিছে সুখিত-মনে ;
এইখানে কেরো, হু’জনে মিলিয়া এসো নাচ করি বনে ।’
তরুণ অধারোহী বীর তার বাগ্‌দস্তা-প্রিয়ার গৃহাভিমুখে
ক্রত অধ চালিয়ে যাচ্ছে, তাই হৃদয়ভা পরী-রাণীর সাদর
আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সে বললে :

‘না, না । মোর প্রিয়া রয়েছে চাহিয়া আমারি আগার পথ,
আগামীকাল্য চালাব আমারি মিলনের মনোরথ ।
সমুখে যাবার পথ দাও মোরে, বনচারী পরীদল,
পায় পথ যার চরণ-চিহ্ন ফুলভরা বনভল ;
মোর বিলম্ব করে দিয়ো নাকো, প্রিয় মোর ক্ষেপে রম্ব,
চাহিয়া দেখ গো, উষার আভাস ভেগেছে রজনীময় ।’—

ঘোবনযুদ্ধা পরীরাণী তবু মদির-আহ্বান জানাল :
—‘অধারোহী গো, দাঁড়াও ক্ষণেক । এনেছি তোমার তরে
পরম-মাণিক সুগন্ধি-মালা—যাহাতে আলো না ধরে ।
গৌরব আর ভাগ্য-রতন দানিবে তোমারি করে,
আহার বসন করেছে বসন চক্ক-কিরণ বরে’ ।’—

কিন্তু :

‘না ।’ বলিল বীর ।—‘যাও তবে ।’ কোপে তুষার-
আঙুলে পরী
যুবার বক্ষ পরশিল, বীর চমকিয়া যায় সরি’ ।

এর পরে দৃষ্টপট ক্রত পরিবর্তনশীল, এবং চরম রহস্যময়
ঘটনায় চিত্রটি বিমণ্ডিত । তরুণ-বীরের কালো বোড়া সবোপে
সম্মুখে অগ্রসর হ’ল, কিন্তু :

চমকিয়া উঠি’ অধারোহী সে সহস্র সমুখে চায় ;
পথ ‘পরে হেরে, আসে সেথা এক সুরাত তুষারকার
কিছু নাহি বলি’ বীরের পানেতে সে যে বাহু যেমি’ ধরে
—‘প্রেতিনী, দামবী, অন্তঃ-আত্মা, আটক কোমো না মোরে ।’

মর্মভেদী দৃষ্টি এবার করুণতম হয়ে উঠল :

‘ঘোমো না আসারে, দেহহীন ছায়া—অপরা-অপদেবতা ।
আমার প্রিয়র আঁখিটি জাগে যে, কাল মিলনেরি কথা ।’
‘ওগো প্রিয়তম, বন্ধু আমার ।’ সে কহে করুণ বরে,
‘মিলন মোদের হবে অনন্ত সমাধির অন্তরে,
আমি আজ মৃত ।’—বার্তা শুনিয়া বীর ওঠে চঞ্চলি,
যাতনায় প্রেমে সমাধির ‘পরে চিরত্তরে পড়ে ঢলি’ ।”

যার উদ্দেশ্যে এই বিপৎসমুদ্র গহন-অরণ্যে যাত্রা সেই
প্রার্থিতা প্রিয়তমা দ্বারা অধারোহীর সমুদ্রে প্রত্যাহ্বাতা পরীর
প্রতিহিংসার কলে মৃত অবস্থার শেষ দেখা দিল ; ভগ্নহৃদয়
অধারোহীর জীবন সাদ হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিভাটির উপরেও
পড়েছে রহস্যময় যবনিকা ।

সেকঁৎ দে লীল শেষ পর্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক-সৌক্যের
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন । বহির্জগতের ব্যর্থ অঙ্গুরণ না করে
মানস-অঙ্গভুক্তিকে স্থিরভাবে রূপ দিয়েছেন । অর্থাৎ, আত্ম-
প্রত্যয়ের ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক-সমুদ্রটি লাভ করেছেন,
মানসোত্তর চৈতন্তকে কাব্য রূপদান করেছেন । তাঁর মনের
পর্দার রূপলোক আর অরূপলোকের অপূর্ব মিশ্রণ হয়েছে ;
সেখানে ফুটে উঠেছে ‘সুমহান্ স্বপ্নরাজি’ ।

দৃষ্টমান প্রকৃতির রূপ-বর্ণনায় কবি সেকঁৎ দে লীল
বিশেষ সাক্ষ্যলাভ করেছেন ; পৃথিবীর বাহুদৃষ্ট তাঁর
যাহ্ন-সেধনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে । যখন পড়ি :

“দ্বিপ্রহর, অগ্নিরাজ, সুবিস্তৃত বরজীর বুকে,
উত্তরু সুনীলাকাশে বসি’ ছড়াইল রৌদ্রকর,
নীলব পৃথিবী । উক বায়ু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমুখে,
আঁধল-বসনাবৃত পৃথ্বী সংজাহারা নিরন্তর ।
বহুধরা সীমাহীন, কান্তার করে না ছায়াদান,
উৎসাহীন নদীবক্ষে গাভীদল তৃকা-বারিহীন ;
অরণ্য সুদূরে, যার ক্ষীণপ্রান্ত পরিদৃষ্টমান,
নিম্পন্দ-নিভুক্ত আজ, স্নগতীরে চির-তজ্জালীন ।”

কিংবা যখন পড়ি :

“নৃত্যের রেশ দূর-সমুদ্রে, সন্ধ্যার বায়ু হেমন্তের,
কখন অথবা সহসা ব্যথিত বিদায়ের সুর সঙ্গীতের

কেলিয়াছে ঢাকি’ ধরণীর বুকে ; নীরব ব্যথার কালিমা হার
রক্ত-রঙীন রূপ বসিয়াছে অন্ত-রবির রক্তিমায় ।
বিশাল-নভের বক্ষে শিথিল শাখাদল মুহু আন্দোলিত ;
সাগরের বুকে রক্তিমায় হার ; সমীরণ-হিরা কি ক্রন্দিত ;
অলস গভিতে সন্ধ্যা আসিছে, ঘনায় সন্ধ্যা উজ্জ্বল সাধে,
বিহঙ্গ-নীড় শাল-শাখাদলে জড়াবে পড়িছে সুনীল-রাতে ।”

তখন সেকঁৎ দে লীল-এর অসাধারণ বর্ণনাশক্তির
পরিচয় পাই । প্রাকৃতিক দৃষ্টের বর্ণনা তাঁর কল্পনার
সংমিশ্রণে অপরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তার
মধ্যে সুপরিষ্কৃত এক নুতন সুর, নুতন ছন্দ, নুতন ভাব ও
নুতন ত্রী । তাঁর চমকপ্রদ বর্ণনার শুণে প্রাকৃতিক দৃষ্ট
আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে । মাঝে মাঝে
তাই তাঁর কবিতা সম্বন্ধে মনে হয় :

“সে যেন সুদীর্ঘযাত্রা সূচির প্রতাপ যদি হ’ত,
বিভিন্ন শব্দের শীর্ষে জাগিতোছে মর্মরের প্রায়,
কোন এক কলোচ্ছ্বাস ধীর-স্থির মহিমার বর্ষে,
ধূমর দিগন্তপ্রান্তে অবসর বিমূর্তিত হার ।”

জীবন-মহাযাত্রা প্রাজ্ঞ-কবি সেকঁৎ দে লীল মর্ত্য-মানবের
প্রতি বলেছেন :

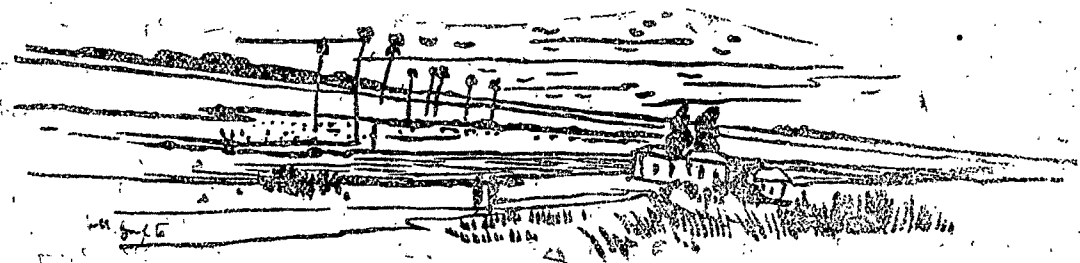
“হে মানব, যদি ভব আক্লাদে বা ক্ষোভে পরিপূর,
চলিয়াছ যিপ্রহরে প্রাপ্ত কান্তারে স্বর্ধাকরে,
যাও । এ প্রকৃতি মিঃষ, পান করে রবি তৃষাতুর :
জীবিত যে দেহ হেথা, ছুখে-সুখে যাবে তাহা মরে ।”

বিশাল-বরজীর চরম-সত্যটি মর্ত্য-মানবের উদ্দেশ্যে জানিয়ে
অমর কবি সেকঁৎ দে লীল আবার পরমুহূর্তেই সান্ত্বনার
আশ্বাস-বাণীতে বলেছেন :

“অত্র আর হান্স কিন্তু, তুমি যদি পার গো ভুলিতে,
ধাকো যদি ভুলে যেতে চপল-পৃথ্বীর এ কামনা,
সমভূলা জান যদি শাপে-বরে, মার্জনা-প্রীতিতে,
বরি’ লবে যদি তুমি বিদ্রাট ও বিষর বাসনা,—”

তা হলে :

“এসো হেথা । স্বর্ধা তোমা’ কহিবে গো বায়ভা মহান ।”



বাত্মী

শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটা একটানা ভীত বাঁশী বাজিয়ে সাওতরীর গীমার বধন
 পুলনাবাট ছাড়ে ভখনও রাভের অন্ধকার আশেপাশের সব-
 কিছুকে কুহেলিকার মত জড়িয়ে থাকে। রাজের অন্ধকারে
 বারী আগে থাকতেই ডেকের উপর বাস ভোরদ সাজিয়ে
 নিজেদের গতি টেনে নিয়ে শুয়ে থাকে, তারা অনেকই সে
 শবে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে। যারা অন্তত তারা
 পাশ ফিরে শোয়। কেবিনের সামনে বেতের চেয়ারটার
 উপর গলা পর্যন্ত একটা পাওলা ব্যাগ জড়িয়ে-অমিহা
 সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। গীমার ছাড়ার সঙ্গে
 রাজির জড়তা ভেঙ্গে সেও একটা ছোট হাই জুমে ঠিক হয়ে
 বসে। ভৈরব নদীর জলকল্লোলের সঙ্গে গীমারের চাকার
 শব্দ, ইঞ্জিনের ঘসঘসানি প্রথমটা তার ভালই লাগে—কিন্তু
 তারপরই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা এমনি বিতী বিরজিকর
 হয়ে ওঠে—সমগ্র স্নায়ুগুলীর মাঝে এমন একটা অসাড়তা
 এনে দেয় যে গীমারের মত সেও যেন কাঁপতে থাকে। এ
 অমিহার বহু বারের অভিজ্ঞতা।

অমিহা সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—কেমন করে
 কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে নীল হয়ে ওঠে...কেমন করে সেই
 নীলের মাঝে আলোর ঢেউ এসে লাগে...পাড়ের ঝোপঝাড়ের
 মধ্য থেকে জঘাটবাঁধা অন্ধকারও কেমন করে আত্মগোপন
 করে। জেলেডিম্ভিলো সব জলের ওপর ভেসে পড়েছে—
 এক দল ছুট ছেলে তাদের ডিম্ব নিয়ে গীমারের সঙ্গে পাল্লা
 দিয়ে দাঁড় বাইবার চেষ্টা করে—কিছুক্ষণ পরে না পেয়ে উচ্চ
 হাসির সঙ্গে কি যেন বলে দাঁড় ছেড়ে দেয়। ছুটি ছেলে
 একটি ডিম্ব নিয়ে গীমারের পথ আগলে ধরে—গীমারের বাঁশী
 বেজে ওঠে—অদ্ভুত ক্ষিপ্রভায় তারা পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে
 বুড়ো আঙ্গুল তুলে কৃতিত্বের নিদর্শন দেখায়—সারেরের
 গালাগাল শোনা যায়।

বসে বসে এই বিচিত্র জীবনের ছবি দেখতে বুঝি ভাল
 লাগে। গীমার বধন ঘাটের ধারে এসে লাগে—সারের
 ছাতের দড়িতে টান দেয়...৩৭ ৩৭ করে বণ্টা বাজে...বিচিত্র
 পতিতে কখনও আগে কখনও পরে যায়...ইঞ্জিন করে বন্ধ...
 এমন কোঁতুক লাগে অমিহার, প্রত্যেক বারই মনে হয় ঘাটের
 কিনারে ভিড়বার সময় কাঠের পাটাতনগুলি বৃষ্টি ভেদে
 বাবে। তারপরে জেলেরা মাছ নিয়ে আসে, চাষারা ডিম্ব
 বোঝাই করে নিয়ে আসে ডাব। বাত্মীদের সঙ্গে দরকষাকষি
 শুরু হয়...কেউ কেনে, কেউ কেনে না। গীমারের বণ্টা
 আবার বাজে, বাঁশীর গভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত সঙ্গ

মিলে কাঁপতে থাকে...চাকার শব্দ শুরু হয়...যারা আসে
 তারা ডিম্ব নিয়ে সরে যায়। গীমার চলে, কাদামাখা উলঙ্গ
 ছেলের দল কাঁকড়া শিকার ফেলে হাততালি দেয়। প্রতিবারই
 অমিহা হাতের বইখানি পাশে রেখে এই বিচিত্র বিশ্বজীনা
 দেখে। বিশ্বভুবনের মাঝে এই যাত্রাটুকু ওর কাছে এক
 খণ্ডকাব্য বলে মনে হয়।

সেদিনও জলসার গীমারঘাটে এমনি রেলিং ধরে দেখে—
 ঘাটে পাকী করে বোঁ এসেছে, শস্তরবাড়ী ধাবে বোধ হয়
 বিয়ের পর প্রথম স্বামীর ঘর করতে। চকচকে টিনের একটা
 ক্যানবাক্স আরও কি কি যেন জিনিস ছুটি ছেলে বরাধরি
 করে গীমারে তুলে দেয়—হয়ত বোঁটির ওরা ভাই। বিচ্ছেদের
 সময় যত নিকটবর্তী হয়ে আসে সঙ্গের মেয়েটির সহিত বোঁটির
 কথা বলা যেন আর শেষ হয় না। অমিহা ওদের পরস্পরের
 সম্পর্ক আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। মা ত নরই, কারণ
 বয়সটা মানান্ন না...বড় বোন বোধ হয়, ঘোমটা পরা মেয়েটির
 মুখ ভাল দেখা যায় না, অমিহার ভবু মনে হয় ওদের হৃৎকনের
 মুখের আদলে মিল আছে, বড় বোনই বোধ হয়—বোধ হয়
 কেন, নিশ্চয়ই। চোখের জল মুছতে মুছতে মেয়েটি
 বোঁটিকে গীমারের উপর তুলে দেয়। তারপর গীমার আবার
 ছাড়ে—বোঁটির বাপের বাড়ীর গাঁ ছবির মত আকাশের পটে
 আঁকা থাকে। বিচিত্র কিছু নয়, আকৃষ্ট হবার মত কিছু নেই,
 নববধু স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে, তবু কেন জানি না কি একটা
 প্রচ্ছন্ন ব্যাধা অমিহার চোখ হুটো হলহল করে ওঠে। বিভূত
 নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলি রোদ লেগে বকবক করে
 মাহের আশের মত। দিক্চক্রবালে আকাশের সঙ্গে মার্চ
 মিশে গেছে—পাকা ধানের ক্ষেতের উপর সূর্যের আলো
 পড়ে অপূর্ণ সুন্দর দেখায়। কোথাও ধানকাটা শুরু হয়েছে—
 কর্ণব্যস্ত নিমুঁত পল্লীজীবন। গীমারের উপর দিয়ে এক ঝাঁক
 জলচর পাখী উড়ে যায়, গীমারের শব্দে তাদের ডানার শব্দ
 ভাল শোনা যায় না—তবু সে তাদের পানে চেয়ে থাকে,
 তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে উদাস
 দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—একটু আগে কি যেন তার হারিয়ে
 গেছে।

হঠাৎ পিছনে চেয়ার টানার শব্দ ফিরে থাকে দেখে,
 সারা হুনিয়ার বিশ্বয় এক সঙ্গে মিলেও সে বোধ হয় তার
 চেয়ে অধিক বিম্মিত হ'ত না। বাইশ বছর আগেকার দেখা—
 তা হোক তবু শুভাংশুই ত—নাক চোখ মুখ সব ঠিক ভেমনি
 আছে শুধু পরিণত বয়সের গাভীধাময় মাথুরো তা ধমধম

করছে। চোখে চশমা, তা থাক সুমিত্রাকেও আজকাল পরতে হয়; অর্ধেক চুল পেকে গেছে, তা যাক তার নিজেরও ত কম পাকে নি। হ্যাঁ ও শুভাংশু, নিশ্চয়ই শুভাংশু—সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একটা বিহ্বলতা, ঠিক তার রূপ দেই, ভাষা নেই ওকে যেন আচ্ছন্ন করে। একজন অপরিচিত পুরুষকে সদোষনের দ্বিধা ও জড়তার কথা ভুলে গিয়ে ও বলে—“শুভাংশু”—কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়। সে লোকটি ওর ডাকে আরও বিস্মিত হয়ে বলে—“হ্যালো, সুমিত্রা! তুমি এখানে?” ওর উজ্জল কণ্ঠস্বরে মনে হয় এ যেন ওর নতুন আবিষ্কার—কলবাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে কিছু কম নয়। সে ধীরে উঠে এক ভদ্রমহিলাকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, কিন্তু সে যে সুমিত্রা, বাইশ বছর আগেকার সুমিত্রা...না না, বাইশ বছর পরের সুমিত্রা! তা কি কল্পনা করতে পেরেছিল। পুরুষ হলে এতক্ষেণে বোধ হয় বিস্ময় আর আনন্দের আভির্ভাষ্য তাকে জড়িয়ে বরড। সুমিত্রা সরে এসে বলে—“আমিও যে সেই কথাই জানতে চাই শুভাংশু। তুমি এখানে?” যুহু হেসে একটা চেয়ার সামনে টেনে শুভাংশু বলে—“বস। বসছি।” সুমিত্রার বুকের ভিতর ভোলপাড় করে ওঠে, আবার সেই ধীরে ধীরে সঙ্গে সঙ্গে হাত পাগুলোর বিজ্রী কাঁপুনি। শুভাংশু সুমিত্রার দিকে ভাল করে চেয়ে বলে, “তুমি যে একেবারে বৃদ্ধী হয়ে গেছ সুমিত্রা!” সুমিত্রা হেসে বলে—“আর তুমি?” শুভাংশু বলে—“বাস্তবিক, উঃ! ইউনিভার্সিটি ছেড়েছি সেই ১৯২০-এ, আর আজ ১৯৪২। উঃ বাইশ—ব-হ-র। হাঁ কি বলছিলাম। আমি একটা সরকারী ফিশারী ক্লীম নিয়ে বাংলার নামা কায়গায় আপাততঃ সার্ভে করে বেড়াচ্ছি—কিন্তু তুমি?” সুমিত্রা ভেমনি হেসে বলে—“আমি বুলনার ইজপেক্টেস অব স্কুলস—সাতকীরার টুয়ে যাচ্ছি।” “ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ—” জ্ঞ কুঁচকে শুভাংশু বলে, “সভীশ একবার বলেছিল বটে—যে তুমি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরী পেয়েছ। ভাল কথা—সভীশ, সভীশের কথা তোমার মনে আছে সুমিত্রা! যে কলেজের সব ক’টি মেথেকে সমান ওজনে ভালবাসত—আর অসীম বৈধব্যসহকারে তোমাদের কাছ থেকে সমান ওজনেই ব্যঙ্গবিজ্ঞপ সহ করত—সভীশ মারা গেছে।”—ব্যথায় শুভাংশুর গলাটা ভারী হয়ে আসে। সুমিত্রা ব্যথিত স্বরে প্রশ্ন করে—“মারা গেছে? বল কি?” “হ্যাঁ ভাই। শুধু কি ভাই, ঠুপিভ বিয়েও করেছিল—বোঁ, আর দুটো ছেলেমেয়েকে পথে বসিয়ে হতভাগাটা সন্মল।” নারীমূলভ সহানুভূতিতে সুমিত্রার ঘন ভয়ে ওঠে, প্রশ্ন করে, “তাদের অবস্থা কেমন?”

শুভাংশু বলে—“হোপলেস। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীয় ধরে বা হয় একেজোও হয়েছে ঠিক ভাই—মানে

বাপের বাড়ী, ভাইদের বিশেষ করে ভ্রাতৃবৃন্দের গল্পনা—বোধ হয় আত্মহত্যা করত যদি-না ছেলেমেয়ে দুটো থাকত। ভাল কথা”—একটু ধেমে শুভাংশু বলে—“মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস—হাতের কাজ সেলাই-টেলাই মন্দ জানে না, তুমি চেষ্ঠা করলে বোধ হয় তাকে এই দীনতা থেকে রক্ষা করতে পারবে।”

“আচ্ছা দেখব—কিন্তু আপাততঃ তোমার হাত দিয়ে কিছু সাহায্য পাঠালে দোষের হবে কি?—আহা সভীশ! বাস্তবিক আমরা তার ওপর ভারী অবিস্মার করেছি।”

“বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের”, একটু হেসে বলে, “কিন্তু ‘পেনাল্টি’ নাকি? কিন্তু তাতে কি সুবিধে হবে সুমিত্রা—সে ওই ভাই ব্যাটারাই মেয়ে দেবে। যাক, ওকথা ছেড়ে দাও, তোমাদের সেই কথা মেয়েটির খবর বল, মোষ্ট ইন্টারেস্টিং, সেই যে অন্তত তাবে নেচে নেচে চলত—আর কলেজের কোন ছাত্রকে দেখলেই চুড়িতে গৌড়া ছোট ক্রমালটা টেনে মুখটা একবার মেজে নিত।” সুমিত্রা ভাবে—ঠিক সেই আগেকার শুভাংশু—সেই উজ্জল প্রাণসম্পদ যা সঙ্কোচের গভীরে ভেদে বস্তুকে নিবিড় করত। হেসে বলে—“তোমার চুলগুলো পাকলে কি হবে তুমি আজও ঠিক ভেমনি ‘সিলি’ আছ।” কথা এখন আর সেই কলেজের মেয়ে নয়—বল মেয়ের মা। এম-এ কেল করেছে ওর বরাত বুলে গেল—এখন ব্যারিষ্টারের বোঁ, ওর ছেলেই শুভাংশু ইয়ারে পড়ছে—আর মেয়েটি, বাস্তবিক শুভাংশু, চলবার ভদ্রীটা ঠিক মায়ের মত পেয়েছে, ভেমনি নেচে নেচে চলে।”

“আচ্ছা প্রফেসর গুপ্তর কথা শুনেছ? বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করেছেন—ওঁকে জেলে দেওয়া উচিত ছিল। আর আজকাল পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ছেলেগুলো একেবারে লাইফ-লেস, আমরা হলে ওঁর প্রফেসরী ছাড়া তুম—তবে অল্প কথা।”

“তা পারতে।” সুমিত্রা মুখ টিপে হেসে বলে—“সেবারে তোমাদের সেই সৌমেন ছেলেটিকে...উঃ ছি ছি...শেষ পর্যন্ত তাকে কলেজ ছাড়িয়ে শুবে ছাড়লে...আমি কিন্তু তোমার উপর ভারী চটেছিলাম।” দুটামির হাসি হাসে শুভাংশু। সুমিত্রা বলে—“আচ্ছা তোমাদের সানের খবর কি? রিমলেন চশমা পরে মিষ্টি মিষ্টি কবিতা লিখত—আর সভীশের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করত। একবার একটা মোটা কবিতার খাতা আমার দ্বিগে বসেছিল, পড়ে অভিমত লিখে দিতে—শেষে সাধা পাড়া আছে। আমার মনে আছে আমি লিখে-ছিলাম, ইম্পাত না হলেও মাছলে বসলে ধার হতে পারে—উঃ বোচারা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। তোমাদের সান কোথায়?” শুভাংশু হেসে বলে—“সানের খবর রাখ না? আরে, সে যে এখন মস্ত বড় ব্যবসাদার—শেয়ার মার্কেটের কত বড় দালাল, লাখ টাকা বখন-শখন বার করে দিতে পারে। রিমলেন চশমা

এখন আর পরে না, মোটা সেলের চশমা পরে—আর শরীরটি এখন আর তনু নেই, একেবারে বণ্ডে পরিণত হয়েছে। তবে এটা সত্যি স্মিট্রা যে তোমাকে বিয়ে করবার জন্ত ও বেচারী একেবারে তেপে উঠেছিল—আর করলেও বোধ হয় ঠিক না।”—হেসে শুভাংশু কথা শেষ করে।

“সিলি”—কপট ফ্রোণের সঙ্গে স্মিট্রা বলে—“কিন্তু বেলা ত বেশ হচ্ছে—আজকে কি আর খাওয়া-দাওয়া হবে না?”

“না হলেও আপত্তি নেই, কারণ আমি ও কাজটা সেয়েই উঠেছি—তবে তোমার আভিয্য নেওয়ার সোভাগ্যকে”—কথা শেষ না করে স্মিট্রার পানে চায়। স্মিট্রা লজ্জিত হয়ে উঠে যায়।

খাওয়া-দাওয়া যৎসামান্য। প্রোট বয়সের ভীর থেকে ওর কলেজ জীবনের উচ্ছল দিনগুলিতে ফিরে এসেছে—কত প্রিয়ারবাট এল, গেল—কে উঠল কে নামল তার খেয়াল নেই। সেই হাসি, সেই গল্প, ক্রীণদৃষ্টি অধ্যাপক বোসের মোটা চশমার ফাঁকের মধ্য থেকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকা... প্রোফেসর বানার্জির অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গী...বিনয়ের পশুপক্ষীর গলার ডাক অহুকরণ করা একেবারে হবছ...হেনাকে বিশ্বর চিনেবাদাম ছুঁতে যারা...সতীশের সচা যারামারি...মীরা...শোভনা...রঞ্জিত আজ তারা জীবনের কে কোন স্তরে অধিষ্ঠিত, এ সকলের মুখের বর্ণনার বাইশ বছর আগেকার ছুটি অন্তরঙ্গ ছাত্র-ছাত্রী আবার যেন প্রথম যৌবনের আনন্দ-বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলিতে ফিরে এসেছে। হঠাৎ শুভাংশু বলে—“কি স্মিট্রা আজকাল আর কবিতা লেখ না, আচ্ছা তোমার সেই কবিতাটি মনে আছে—যেটা তুমি আন্তরিক হলে ‘বিশ্ব-সাহিত্যের পরিণতি’ বলে প্রবন্ধ স্তনে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে লিখেছিলে, কিন্তু সাহস করে নীচে নাম দাও নি—তোমার মনে আছে স্মিট্রা?” সামনে হুঁকে শুভাংশু প্রশ্ন করে। ‘যাও জানি না’ বলে স্মিট্রা লজ্জিত মুখখানি ফিরিয়ে নেয়।

আমার কিন্তু হবছ মনে আছে, এমন কি হুটো বানান ভুল করেছিলে তাও—শুনবে, শোন—

বর্ষার আশীষ তৃপ্ত উদ্বেলিত গিরিদরী তুমি—

প্রাণের বস্তার বেগে বাঁচাইবে এই মর্ত্যতুমি

বাধা দিয়ে স্মিট্রা বলে—“হয়েছে, থাক।”

“থাক কি স্মিট্রা—জান? ইতিহাসে যা কখনও ঘটে নি—যা কেউ কখনও কল্পনা করে নি, তুমি ভাই করেছিলে...যেয়ে হয়ে ছেলেকে উদ্বেগ করে কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলে। কিন্তু মনে আছে—সেবার তোমায় কি ভীষণ জ্বক করেছিলুম? সেই কবিতা হাতে কোরিডোরে তোমার চ্যালেঞ্জ করে বলে-‘তিলুম, পোষ্ট-গ্রাডুয়েটের সেক্রেটারির কাছে নালিশ করব। সত্যিই তোমাকে সেদিন কি নার্ভাস হতে দেখেছিলাম স্মিট্রা—যাকে আমরা ভাল বাংলা বলি বেপখুয়তী—একে-

বারে ঠিক ভাই। তার পর তোমায় আশ্বাস দিয়ে আমি যে কবিতা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম—মনে আছে?”

“আছে—দেখতে চাও”—স্মিট্রা গভীর হয়ে বলে।

“কি পাগল—তুমি কি আজও তা রেখে দিয়েছ”—বিস্মিত হয়ে বলে শুভাংশু।

স্মিট্রা সে কথার উত্তর দেয় না। বলে—তাল কথা—পাগলামি করতে করতে তোমার আসল কথা ফিজেস করা হয় নি—তোমার বো, তোমার ছেলেমেয়ে...পূর্ণ দৃষ্টিতে স্মিট্রা শুভাংশুর দিকে চায়।

শুভাংশু হো হো করে হেসে বলে—“ওনলি ইন ড্রিম্‌স্ (কেবল স্বপ্নে) স্মিট্রা—ওনলি ইন ড্রিম্‌স্।” তার পর নিজের আধ পাকা আধ কাঁচা চুলগুলোর মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে বলে—“কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।” একটু পরে শুভাংশু কেমন গভীর হয়ে যায়, বলে—“তোমাকে দেখেও মনে হচ্ছে বৈ তুমিও বোধ হয় এই কাঙ্ক্ষা করবার সুরোগ করে উঠতে পার নি, কিন্তু তবু তোমায় ফ্র্যাঙ্কলি বলি এ দুর্বুদ্ধি না হলেই ভাল হ’ত।”

স্মিট্রা ওর দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। শুভাংশু নিজের খেরালে বলে চলে—“দেখ স্মিট্রা, সত্যি কথা বলতে কি—“আই ডোর্ট সো ম্যাচ ফিল ফর এ ওয়াইফ বাট, বাট আই লং ফর এ চাইল্ড—এ চার্মিং চাইল্ড”—(প্রীর অভাব ততটা আমি অনুভব করি না, কিন্তু ছেলে—একটি সুন্দর ছেলে আমি চাই)। একমাত্র কৌকড়ানো চুলওয়ালা একটি সুন্দর শিশু আমার ‘বাবা’ বলে গলা জড়িয়ে ধরছে—ওঃ, হাউ ডু আই ফিল ফর ইট, এণ্ড ফিল হাউ প্যাশনেটলি (আঃ, কেমন করে—কি ভীর ভাবে আমি এ অভাব বোধ করছি), হোট সুন্দর শিশুর দিকে চাইলে চোখ কেঁরাতে পারি না...‘হোয়াট এ পিটি’ (কি শোচনীয় অবস্থা)।

স্মিট্রা শুভাংশুর দিক থেকে মুখখানা একেবারে পিছন করে বাইরে জলের দিকে চেয়ে থাকে। শুভাংশু কিছুক্ষণের জন্ত আনমনা হয়ে যায়। তার পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কথার সুর পাণ্টে বলে—“আচ্ছা! তোমার সেই বদমেজাজী মামাটি এখন কোথায়, যিনি যে-কোম ছেলে আর মেয়েকে কথা কইতে দেখলে পৃথিবী রসাতলে ঝাচ্ছে মনে করতেন।” স্মিট্রার দিক থেকে কোন সাড়া আসে না—শুভাংশুর রসিকভাও ঠিক জমে না, ও আন্তে আন্তে রেলিং ধরে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ পরে কথা আরম্ভ করবার চেষ্টা করে বলে—“ইস্ স্মিট্রা, তোমার চুলগুলি বাস্তবিকই বেশী পেকে গেছে—আমার চেয়েও—আচ্ছা চলত আমরার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি কার বেশী পেকেছে”—কথাটা একটু হুঁকে অহুস্রের সঙ্গে বলতে গিয়ে দেখে, স্মিট্রার হুঁ চোখ ছাপিয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা জল করে পড়ছে। ব্যস্ত

হয়ে উঠে শুভাংশু বলে, “ছি ছি—আমি কি তোমার মনে আঘাত দিলাম হুমিড়া—তারি অজায় হয়ে গেল ত।” একটু প্রবোধ দেবার হলে বলে, “দেখ, পাকা চুল বলে সত্যিই তোমায় ব্যঙ্গ করতে চাই নি—বরং এই বরং চুলগুলোর কাঁচা থাকাই যে অগৌরবের হুমিড়া।” ওর ইচ্ছে করে হুমিড়ার মাথার উপর হাত রেখে তাকে শাস্ত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিক সাহস পায় না। এক একবার মনে হয় এই পাকা চুলের প্রাচীর কি এই সহস্রভুতির স্পর্শকে ভগ্নাবস্থায় শিষ্টাচারের গভীকে অটুট রাখবে না। ছোলো বাতাস লেগে হুমিড়ার চুলগুলো—বিশেষ করে পাকা চুলগুলোই যেন উড়ছে বলে মনে হয়। হুমিড়া কান্না আর কিছুতেই চাপতে পারে না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে গিয়ে, কেবিনের দরজা বন্ধ করে। শুভাংশু কেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়—ওর কথার বা আচরণে হুমিড়াকে কোথার ব্যাধা দিলে যেসিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষন্ন মনে সেই কথাই ভাবতে থাকে। হঠাৎ প্রীমারের বাঁশীর গভীর স্বর ঘটি যে অদূরবর্তী সেকথা ঘোষণা করে। আদালী এসে বলে, “আসাহুদী এসে, নামতে হবে।”

শুভাংশু হুমিড়ার রুদ্ধ ঘরে আঘাত করে বলে, “হুমিড়া দোর খোল—এবার আমার নামতে হবে।”

হুমিড়া দোর ধুলে বেরিয়ে আসে—চোখে অস্পষ্ট জলের দাগ, চাপবার চেষ্টা করে না। তারী গলায় বলে, “তুমি সাতকীরে যাবে না?”

“যাব, তবে হু’চার জারগা ঘুরে যেতে হবে”—অজ হেসে শুভাংশু উত্তর দেয়।

“কেন?” অজ রুদ্ধ হয়ে বলে হুমিড়া।

অদ্বুত প্রশ্ন। শুভাংশু উত্তর না দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, “বাস্তবিক আজকের দিনটি তারি সুন্দর কাটল—যেন স্বপ্নের মত। উঃ! বাইশ বছর আগেকার দিনগুলোকে ফিরে পাওয়া—আশ্চর্য্য! বাইশ বছর আগের হুমিড়া……আচ্ছা হুমিড়া, তুমি যখন ইলপেকডনে যাও মেয়েরা তোমায় ভয় করে?” তার কণ্ঠে বেজে উঠে আসল বিদায়ের স্বর।

হুমিড়া এসব কথার উত্তর দেয় না, বলে, “সতীশের বোয়ের ঠিকানাটা দাও সে কি বাইরে চাকরি করতে পারবে?” শুভাংশু বলে, “মিস্টারই”—তারপর নোটবুক থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে ঠিকানাটা টুকে দেয়। হুমিড়া দেখে সেই বাইশ বছর আগেকার লেখা একটুও বদলায় নি। লেখবার সময় নীচের ঠোঁটটাকে ঠিক ভেমন করে কামড়ায়।

প্রীমার ঘাটে ভিড়ল। শুভাংশু টুপিটা মাথায় দিতে দিতে বলে, “আসি হুমিড়া।”

হুমিড়া জলজরা আস্ত চোখ দুটি জুলে ওর পানে তাকায়, তারপর চোখ নত করে কি যেন বলবার ইচ্ছে করে—ওর ঠোঁট দুটো শুধু কঁপে ওঠে—কিন্তু কিছুই বলা হয় না। শুভাংশু নেমে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। নদীর জলের উপর শেষ সূর্যাস্তের আলো ঝলমল করে, আর একটা কোন্ ঘাটে সেই বৃষ্টি নেমে যায়। এবারও হুমিড়া চেয়ে চেয়ে দেখে বটে, কিন্তু সে আর ওর মনকে স্পর্শ করে না। অন্ধকার হয়ে আসে, প্রীমারের সার্কলাইটের আলো ঘুরে ঘুরে হু’পাড়ের উপরে পড়তে থাকে। নদীর উপর নৌকার বুকে দীপ জলে, প্রীমারের ঢেউ পৌছাবার আগে পর্যন্ত আলোর ছায়া জলের তলে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। তারপরে ঢেউ লেগে তারা ভেঙ্গে যায়—নৌকাগুলো হুলতে থাকে—দীপশিখা দূর আকাশে তারার মত মিট মিট করে। ভীরের উপর গ্রাম থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসে—আকাশে সন্ধ্যাতারা দপ্ দপ্ করে জলতে থাকে—হুমিড়া চেয়ে চেয়ে এমনি গ্রামে একটা সংসার রচনার স্বপ্ন দেখে, স্বামী, পুত্র, কন্যা—একমাথা কৌকড়া চুলওয়ালা সুন্দর শিশু ওর কোল থেকে দৌড়ে গিয়ে কার গলা জড়িয়ে যেন ‘বাবা’ বলছে—চকিতে মনে পড়ে শুভাংশুর কথা—‘আই লং কর এ চাইল্ড—এ চার্মিং চাইল্ড—’

হুমিড়া চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে। তারপরে ভাষা-হীন উদাস দৃষ্টিতে ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে; ডেক চেয়ারটার হেলান দিয়ে—চলৎ-অজিহীন রোগীর মত।



নেপালে ভাইপূজা

শ্রীনারায়ণনাথ রায়

নেপাল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বহু দূরে হিমালয়ের নিভৃত কোণে স্থাপিত দেশ। কিন্তু যখন এদেশের আচার-প্রথা, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি লক্ষ্য করি, তখন বাংলার সঙ্গে এর অনেকটা সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। এই একা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন নেপাল ও বাংলার ভাষা তুলনা করা যায়। তুলনামূলক আলোচনার কালে নেপালী ও বাঙালী-দের অতীত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সম্ভাবনার কথা মনে জেগে ওঠে।

আজ 'ভাইপূজার' বিবরণ বলব। বাংলাদেশে যে পার্বণকে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বলে নেপালে তাকেই 'ভাইপূজা' বলে। এই পার্বণের উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্যের কথা ভাবলে বড়ই মনে হয় আমাদের এই নবজাগরণ—এই জাতীয় একতা সাধনের দিনে ইহা ভারতের জাতীয় উৎসব বলে গণ্য হওয়া উচিত।

নেপালে সকল জাতই ঠিক একই প্রথা অনুসারে 'ভাইপূজা' করে না। ব্রাহ্মণ ছাড়া প্রভৃতির নিয়ম এক রকম, আর নেওয়ারদের প্রথা ভিন্ন। আমি আজ নেওয়ারদের ভাইপূজার কথাই বলব।

ভাইপূজা হয় সন্ধ্যার পর। ভাইপূজার প্রথমে ঘরের মেঝেতে প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য এর একটি মণ্ডল আঁকতে হবে। মণ্ডল আঁকবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে জলের আলপনা দিয়ে তার উপরে ভেলের দাগ দিতে হবে। এই ভেলের দাগের উপরে আবার শুকনা চালের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রেখা টানতে হবে। মণ্ডলের বাইরে চার কোণে এবং ভিতরে ঠিক মাঝখানে কিছু কিছু বান রেখে তার উপরে আঁত চাল রাখতে হবে। এই চাল তৈরি করতে খুব সাবধান হতে হয় যেন একটুও না ভাঙে। সেই চালের উপরে ফুল ও ধূনা রাখতে হবে। এই সব রেখে তারপর সকলের উপরে রাখতে হবে 'যজ্ঞকা'। আজুলে তৈরি স্রোতার ছোট পৈতার নাম ও দেশের ভাষায় বলে 'যজ্ঞকা'।

এর পরে ভাই মণ্ডলের দিকে মুখ করে বসবে। বোন তখন 'সগুন' বা 'সগুন' এনে একে একে ভাইদের হাতে তুলে দিবে।† মদ, মাংস, ডিম, আদা, রসুন ইত্যাদি মিশিয়ে

ভাতিক-মন্ত্র পাঠ করে 'সগুন' তৈরি করা হয়। ভাই ভজিত করে ওটা হাতে নিয়ে আপন মাথায় স্পর্শ করাবে, এবং সেই সঙ্গেই (বোন বড় হলে) প্রণাম করবে। বোন যদি ছোট হয়, তবে বোন ভাইকে প্রণাম করবে। তারপর ভাই সেই সগুন বাবে। খাওয়ার নিয়ম—এক একটি জিনিস নিয়ে তার সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাবে। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম। যারা দীক্ষিত তাঁদের প্রত্যেকটি জিনিস খাবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। কোনটি আগে কোনটি পরে খেতে হবে তারও নিয়ম আছে—প্রথমে ডিম এবং শেষে আদা খাওয়ার নিয়ম। 'সগুন' দেওয়া হলেই বোন ভাইকে 'টীকা' বা 'সিন' (অর্থাৎ কঁোটা) দেয়। যেতচন্দন, 'অক্ষতা' (চাল), দুই এই তিন জিনিস দিয়ে কঁোটা দিতে হয়। আগে চন্দন দিয়ে, তারপর দুই ও অক্ষতা দিয়ে কপালে কঁোটা দিতে হবে। যারা যজ্ঞ করেন তাঁরা যজ্ঞভঙ্গ্য দিয়ে সবচেয়ে আগে কঁোটা দেন। 'সগুন' খাবার সময় বোন খই এবং নানা ফলের টুকরা ভাইয়ের মাথায় এমনভাবে ঢেলে দেবে যেন সেগুলি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর মাটিতে বা পড়ল তা ঝাঁটি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর একটি শালপাতার 'দোনা' বা 'টপরা' বা 'ঠাহের' (ঠোঙাকৃতি) মধ্যে নানা রকম কল (তার মধ্যে আধরোটি অভ্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং 'বিমিরা' লেবু, ধাকা দরকার), একটি সুপারি, পয়সা, 'যজ্ঞকা' (এটি ব্যবহারের উপযুক্ত) এবং ফুলের মালা রেখে সেই ঠোঙাটি ভাইকে দিতে হবে। ভাই তা গ্রহণ করে রেখে দেবে।

এর পরে কয়েকটি পলতে একত্র করে তার দুই মুখে আঙুন বসিয়ে বোন ভাই হাতে ধরে ভাইয়ের নিকট আনবে। ভাই সেই আঙুন স্পর্শ করে হাত মাথায় হোঁয়াবে। বোন তারপর সেই পলতেগুলি মণ্ডলের উপর আঁকা আঁড়ি করে এমন ভাবে রাখবে যেন চার দিকগায় বানের উপর জলতে থাকে। তখন মণ্ডলের উপর ধূপ জালিয়ে দিতে হয়। এর পরে ঝাঁটি দিয়ে সব পরিষ্কার করে কেঁলতে হবে। কিন্তু পলতে রাখবার পরে এবং পরিষ্কার করার মধ্যে বাতি নিভতে পারবে না।

সব পরিষ্কার হলে ভাই নিমন্ত্রণ খাবে। এই খাওয়াটা দেবে বোন। কিন্তু এ নিমন্ত্রণে ভাত খাওয়া চলবে না। যে সব জিনিস খাওয়া হয় তার মধ্যে চিঁড়াই প্রধান।

খাওয়ার শেষে ভাই বোনকে শাড়ী ও টাকা ইত্যাদি উপহার দেয়।

ভাইপূজার দিন বোন সারাদিন উপবাস করে আচার-পর্ক শেষ হলে তারপর খায়।

* যে কোন ফুল রাখলে চলবে না। পাহাড়ে থাকে "ওপারি" ফুল বলে ভাই প্রশস্ত। তা না জুটলে "ছাইগঞ্জি" বা গাঁদাফুল দরকার।

† নেওয়ার ভিন্ন অঙ্গ জাতের ভিতরে 'সগুন' খাওয়ার নিয়ম নাই।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলার উন্নয়ন

শ্রীকেন্দারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, “দেখিলাম অনেক কিছু আর বুঝিলামও অনেক কিছু। সেকথা বারাস্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।” এখন বলা যাক সেই সকল কথা।

দেখিলাম যাহা তাহাতে সন্দেহ রহিল না যে, মানুষের ইচ্ছা যদি সম্ভব হইত তাহা সহিত যুক্ত হয় তবে এ জেলার উন্নয়ন অসাধ্য নয়। যাহা প্রয়োজন তাহার তুলনায় যাহা হইয়াছে তাহা সামান্য, কিন্তু তাহা পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্তরূপে অমূল্য। সেচ যেখানে হইয়াছে সেখানেই সোনার ফসল ফলিতেছে এ তো স্বচক্ষেই দেখিলাম, আরও দেখিলাম যে, জলের সমস্তাপূরণও অসম্ভব নয়। সমস্তা এই মাত্র, কি করিয়া বৃষ্টির জল সঞ্চিত রাখা যায়। অবশ্য এ সমস্তা “এইমাত্র” বলার অর্থ এ নয় যে, উহা অতি সহজসাধ্য। বরং ইহাই বলা উচিত যে, অল্পস্ব অর্থব্যয় এবং প্রভূত পরিশ্রম ভিন্ন তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, পিছুপিছুতামহগণ এ বিষয়ে যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও সঠিক এবং কার্যকরী।

কিন্তু শুধু অর্থব্যয়ে যদি এ কাজ করিতে হয় তবে কুবেরের ধনও তাহার জগৎ পর্যাপ্ত নহে। বিদেশী ঠিকাদার, বিদেশী মজুর ও সরকারী ধনদৌলতের সাহায্য ও চেষ্টার অপেক্ষায় যদি দেশের লোক বসিয়া থাকে তবে বাঁকুড়ার এ ক্ষয় কোনদিনই যাইবে না। কেননা উহাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা বাংলা সরকারের তহবিলে নাই ও আগমনের সম্ভাবনাও স্বদূরপর্যন্ত। কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন তাহার এক-দশমাংশও জুটিবে না এবং কেন্দ্রের সাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও কম, কেননা কেন্দ্রীয় লোকপরিষদে বাঁকুড়ার কথা বলিবার লোক কেহ নাই।

পথঘাটের ব্যাপারেও দেখিলাম উপযুক্ত আয়োজন ও পরিকল্পনা যদি থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি স্বল্প ভাবে পুঁজু বিভাগের কাজ চালানো হয় তবে বাঁকুড়ার দুর্গমতম অঞ্চলও সুগম করা সম্ভব হয়। এ জেলার মাটি শক্ত ও কঙ্করবহুল স্তরায় পথঘাট নির্মাণ—বিশেষ যত্ন-সাহায্যে ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে—অতি সুন্দর ভাবে হইতে পারে। যে অঞ্চলে নূতন পথ নির্মিত হইয়াছে সেখানকার কৃষি ও কুটীরশিল্পের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গেই, হইবে স্তরায় পথ নির্মিত হইলে পরে তাহা সংস্কার করা দুঃস্বপ্ন হইবে না।

খোয়াই তো চতুর্দিকেই রহিয়াছে এবং বৃদ্ধি পাই-

তেছে। আজিকার শস্ত-শ্রামল ক্ষেত সামান্য কয় বৎসরেই ধুলায় ধূসর অল্পবয়স প্রাপ্তরে পরিণত হইতেছে। চাষীর সাধ্য নাই একাকী খোয়াই রোধ করে। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় দেখিলাম দুই-এক স্থলে তাহার স্বদৃঢ় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে এখানেও সেই এক কথা, যাহা প্রয়োজন তাহার তুলনায় হইয়াছে অল্পই এবং যে ভাবে ও যে উপায়ে ইহা হইতেছে তাহাতে সমগ্র জেলার সমস্তা-পূরণে যে সময় বা অর্থ লাগিবে তাহা কল্পনারও অতীত। আরও কয়েক স্থলে দেখিলাম, যেখানে চাষী এখনও অপেক্ষাকৃত স্বস্থ ও কর্মঠ আছে এবং যেখানকার স্থানীয় ভদ্র গৃহস্থ শ্রেণী শহরের মোহে পড়েন নাই, সেখানে সেচ ও সংরক্ষণের চেষ্টা গ্রামের লোকেই করিয়া চলিতেছে এবং সেখানে এই দুই বিষয়েই স্থানীয় লোকের অবস্থা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উন্নত। সেখানে সরকারী সাহায্য যথাযথ রূপে প্রদত্ত হইলে তাহার উন্নয়ন সহজ ও দ্রুত হইয়া যায় এবং সরকারী সাহায্যের প্রয়োগ শুধু যে যথাযথ হওয়া প্রয়োজন তাহা নহে উহা সময়মতও হওয়া আবশ্যিক নচেৎ এখানকার চাষীও ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া ধ্বংসের পথে চলিবে যেভাবে অন্য অঞ্চলে ইতিমধ্যেই হইয়াছে।

দেখিলাম স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নও কিছু অসাধ্য ব্যাপার নহে। ম্যালেরিয়া দমনের বিজ্ঞানসম্মত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুই-এক অঞ্চলে ঐ রূপ কাজ চালানোর ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিশেষভাবে কমিয়াছে। মার্গলো-রিয়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়ায় সেখানকার চাষী পুরাদমে ক্ষেতের কাজ চালাইতেছে এবং তাহাতে তাহার দুর্দশাও দূর হইবার আশা বাড়িতেছে। এ ক্ষেত্রেও সমস্তা একই—অর্থবল, লোকবল ও যথাযথ চেষ্টা।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিজ্ঞান পাইতে হইলে এক দিকে প্রয়োজন যশ-ক্ষাস ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, অন্য দিকে চাই পুষ্টিকর খাদ্য। পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যাপারে বাঁকুড়ার সহায় সম্পদ ছিল গোদন এবং দো-ফসলা জমি, যেখানে ডাল, সরিষা ও গম জন্মাইত প্রচুর। চাষী স্বস্থ ও সবল না হইলে বাঁকুড়ার জমিকে সুফলা করা অসম্ভব। আবার সেচ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে দুইটি ফসল স্বপ্নেরও অতীত। জঙ্গল নিষ্কাশন হওয়ায় কাঠের বদলে ঘুঁটের প্রচলনে ক্ষেতে সারের অভাব যথেষ্ট। আবার কৃত্রিম সার শহর হইতে দূরে লইতে হইলে পথঘাটের

অভাব থরচ ও পরিশ্রমও অশেষ এবং ফসল ফলিলেও যদি বহনের খরচেই তাহার দাম চরমে উঠে তবে চাষীর আয় হয় কিসে ?

স্বতরাং সমস্তা বহুমুখী। কিন্তু সকল দিক দেখিয়া বুঝিলাম যে, সর্বোপেক্ষা গুরুতর সমস্তা রহিয়া গিয়াছে দেশের লোকের মানসিক অবস্থার মধ্যে। চতুর্দিকের সমস্তা ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য যে প্রচেষ্টার আবশ্যক তাহার একান্ত অভাবই দেখিলাম সর্বত্র।

যদি দেশের লোককে একথা বুঝান যায় যে, তাহার নিজের উন্নতি করার চেষ্টা করিলে তাহাতে আরও দশ জনের এবং সরকারী সাহায্যও পাইবে, যদি নিজস্ব লোককে সজীব করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে কষ্ট স্বেচ্ছাসেবক দল জোট তেবে সরকারী হাজার টাকায় এখন যাহা হইতেছে তাহা তাহার এক পঞ্চমাংশেই সম্ভব হইবে। বহুদিন পূর্বে বাঁকুড়ায় ঐ চেষ্টা গুরুতর দত্ত মহাশয় করিয়া ছিলেন, কিন্তু সরকারী সাহায্য একেবারে না আসায় তাহা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ব্যাহত হইয়া যায়। সেচের কাজ, পথঘাট নির্মাণ সবকিছুই মান্নবের কায়িক পরিশ্রমে হয় ভাগ, অল্পই হয় বস্ত্র-সাহায্যে, বাঁকুড়ার মত দেশে যেখানে বেশীর ভূমিপৃষ্ঠ অসমতল।

আজ বাঁকুড়ার লোকের বৈশ্ব মানসিক অবসাদ, বৈশ্ব নিদারুণ বর্মবিমুক্ততা, তাহাতে দেশের লোকের মনে নূতন বল আনা সহজ নয়। দেশে নেতৃত্ব নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে একথা আমাদের দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে।

যে নূতন পথটি বাঁকুড়ার অতি দুর্গম অঞ্চলের মধ্য দিয়া চব্বিশ মাইল সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বের গ্রামে অসংখ্য দরিদ্র লোকের বসতি। আমরা পথ দেখিতে যখন গিয়াছিলাম তখন এক স্থলে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা জীপ থামাইয়া বর্ষাতি পরিতেছি এমন সময় এক দল জীলোক ছুটিয়া আমাদের সামনে পথ পার হইল। তাহাদের সকলেরই বস্ত্রের অভাব—জীর্ণ শতছিন্ন কাপড় বৃষ্টির জলে ভিজিয়া যাওয়ায় লজ্জা নিবারণের উপায় নাই। এই বস্ত্রাভাবের প্রধান কারণ অর্থের অভাব তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা টাকা গুলিলে চোরা-কারবারীর কাছে কাপড় পাওয়া যায় একথা সকলেই জানে।

যে পথটি ঐ জীলোকের দল ছুটিয়া, মুখ ফিরাইয়া পার হইল তাহা সবেমাত্র নির্মিত হইয়াছে এবং নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা কুলিকামিনকে দিতে হইয়াছে। অথচ শুনলাম, সে সকল মজুরদের প্রায় সবই ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনিতে হইয়াছিল। স্থানীয় দরিদ্র লোকের ঘরের জীলোকের

লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলেও পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনে প্রস্তুত নয়।

ঐ একই কথা বীরভূমে শুনিয়াছিলাম ময়রাঙ্গী পরি-কল্পনার কাজে। সেখানে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়াছে গঞ্জাম অঞ্চলের উড়িয়া মজুর ও মজুরনী এবং বাঁকুড়ার লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে মানভূম ও ছোট-নাগপুরের গুঁরাও, মুণ্ডা ও কোল।

দেশের অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকের বুদ্ধি অল্প, তাহার স্বাবলম্বনের পথ তখনই দেখিবে যখন শিক্ষিত গৃহস্থের সম্ভান সেকথা তাহাদের বুঝাইবে। সে চেষ্টারও অভাব বেশী স্পষ্ট দেখিলাম, যে কয়জন উৎসাহী লোক এ বিষয়ে চেষ্টিত তাহাদের সাহায্য করা দূরের কথা, সহানুভূতিও কদাচিত্ দু-একজন প্রকাশ করেন।

তবে বাঁকুড়ার উন্নয়ন কি করিয়া সম্ভবপর? সম্ভব তখনই হইবে যখন ইহার উন্নয়নে বন্ধপরিবর হইয়া দেশস্থ কয়েকজন গণসেবক প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাহাদের প্রয়োজন প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবল। তাহার জ্ঞাত উভয় স্থলেই তাহাদেরই নির্বাচিত লোক থাকা প্রয়োজন। তাহাদের প্রয়োজন জেলা বোর্ডের ও জেলা পরিচালকের ভারপ্রাপ্ত অধিকারী-বর্গের সাহায্য। সেক্ষেত্রে তাহাদের সম্ভবত্বে ভাবে উপযুক্ত লোকের জন্য দাবি করিতে হইবে। সর্বোপরি তাহাদের প্রয়োজন দেশের লোকের কায়িক ও মানসিক উত্তম। ইহার জন্য তাহাদের আবশ্যক ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলন।

যদি উপযুক্ত নেতৃত্ব তাহারা লাভ করিতে পারেন তবে সকল সমস্তারই সমাধান হইয়া যাইবে। তবে বহুদিন যাবৎ বাঁকুড়া ঘুরিয়া দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে নেতৃত্বের একান্ত অভাবই স্পষ্ট।

বাঁকুড়ায় কংগ্রেসী দল দুই ভাগে বিভক্ত—নির্জীব ও সজীব। নির্জীব দলে সৎ লোক আছেন যাহাদের সদিচ্ছা ও সঙ্কল্প মনের মধ্যেই থাকে। সজীব দলে স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন অন্য কিছু খুবই কম। স্বতরাং কংগ্রেসের দ্বারা বাঁকুড়ার সমস্তাপূরণ তখনই সম্ভব হইবে যখন উহার বর্তমান কাঠামো বিসর্জন দিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা হইবে।

অন্য দিকে বিভিন্ন দল পরস্পরের বিরোধ সম্বন্ধে চিন্তা ও কংগ্রেসের ধ্বংস-চেষ্টার বাহিরে কিছু ভাবিবার অবকাশ এত দিন পান নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

বাঁকুড়া জেলা ক্ষয়ের মুখে চলিয়াছে কেন সে কথা তো বলিলাম। কিন্তু আশার আলোক যে একেবারে নাই তাহাও নয়। ইতিমধ্যেই দু'চার স্থলে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত হইতেছে শুনলাম। তাহারাই দেশের আশা ভরসা।

অখিল ভারত প্রাচ্যবিজ্ঞা মহাসম্মেলন

ষোড়শ অধিবেশন, লক্ষ্ণৌ

অধ্যাপক শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

বিগত ১৬ই আশ্বিন হইতে লক্ষ্ণৌ শহরে অখিল ভারত প্রাচ্য-বিজ্ঞা মহাসম্মেলনের তিন দিন ব্যাপী ষোড়শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ইন্দোনেশিয়া, চীন, তুরস্ক, ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রাচ্যবিদ্যামোদী সদস্যেরা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মূল সভাপতি অধ্যাপক কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী স্বীয় সুচিন্তিত অভিভাষণে দেশে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার-প্রসারের আনুশঙ্গিক কৃষ্ণ, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা ও নৈতিক অবনতি, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতৃ-বৃন্দের কুরাসাহদ্য বারণা প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা এবং এই সভ্যতা সঙ্কটে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর চর্চার উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছেন—পাশ্চাত্যের অন্ধ অন্ধকরণ পরিহার করিয়া সত্য, ধর্ম ও অহিংসা পুত স্বীয় ঐতিহ্যের উপর জাতিকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন—নিখিল ভারতীয় গবেষণা মন্দির স্থাপন এবং প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি সরকারের সক্রিয় সহায়ত্ব কামনা করিয়া-ছেন—বিচারপূর্বক হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণের সপক্ষে ও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের বিপক্ষে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন—পরিশেষে ভারতে এবং বিদেশে প্রাচ্যবিজ্ঞা চর্চার কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণের উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়াছেন।

স্বাগতকারিণী সভার সভাপতি আচার্য্য শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রাচ্যবিজ্ঞা চর্চার ইতিহাস আলোচনাপূর্বক তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দান গ্রন্থার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভারতীয় জনগণের উত্থান ও পতন, শক্তি ও দুর্বলতার প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রয়োজন বিবৃত করিয়াছেন।

প্রারম্ভিক বক্তৃতার উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মানমৌর্য শ্রীগোবিন্দবল্লভ পহ্লু বর্তমানের পটভূমিকায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া ভবিষ্যতে অন্ধরূপ সর্বভৌমত্বীয় সংস্কৃতিগঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

সম্মেলনে শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণে সংশ্লিষ্ট বিভাগ-সমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং কৃত কর্মের আলোচনা ও কর্তব্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণসমূহ বিভাগ করিতে গিয়া প্রত্যেকের ক্ষমতা আশ্রয় করিয়া সমস্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অথচ অধিকাংশ অভিভাষণই উক্ত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত না হওয়ায় সদস্যেরা সকল সভাপতির ভাষণ

শ্রবণের পূর্ণ সুযোগ পান নাই। তদুপরি বেশীর ভাগ শাখা-সভাপতির ভাষণ মুদ্রিত না হওয়ায় বিশেষতঃ লৌকিক সংস্কৃত শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রী কে. কে. হাডিকী মহাশয়ের সুচিন্তিত ভাষণ অতি অল্প সংখ্যায় পরিবেশিত হওয়ায় বিশেষ অসুবিধা অস্বত্ব হইয়াছিল।

বিভিন্ন শাখায় নানা বিষয়ে প্রায় পৌনে তিন শত প্রবন্ধ পঠিত অথবা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনেক শাখার প্রবন্ধসংখ্যা বেশী হওয়ায় পাঠ এবং আলোচনা বিশেষরূপে ব্যাহত হইয়াছিল। প্রবন্ধ-সম্পর্কে ভবিষ্যতের ক্ষত কর্তৃপক্ষ কয়েকটি নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ ও তাহার সারাংশ প্রেরণের সময় নির্দিষ্ট থাকিলেও তাহা যথাযথ ভাবে অস্বত্ব হইত না। এক্ষত সারাংশ মুদ্রণে বিশেষ অসুবিধা হইত। নূতন ব্যবস্থায় প্রবন্ধ ও তাহার সারাংশ অধিবেশনের অন্ততঃ চারি মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। তাহার অধিবেশনেব এক মাস পূর্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত সারাংশগুলি সদস্যদের নিকটে পাঠাইবেন। সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠের ক্রম এবং সময়সূচী নির্দিষ্ট থাকিবে। এই নিয়ম অস্বত্ব হইলে সদস্যবর্গের বিশেষ অসুবিধা হইবে আশা করা যায়। প্রবন্ধের সারাংশের সঙ্গে মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের অভিভাষণসমূহ মুদ্রিত হইলে আরও ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান ব্যবস্থায় একবার মুদ্রিত ভাষণ সভায় বিতরণ করা হয় এবং পরে কালক্রমে কুর্ধ্য-বিবরণে মুদ্রিত হইয়া উহা দ্বিতীয়বার সদস্যদের নিকট পৌঁছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দুই বার ছাপাইবার অসুবিধাও দূর হইতে পারে।

অধিবেশনে হারদরাবাদের অন্তর্গত পিতলকোরা এবং পাটনার অন্তর্গত কুমারহাদের আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে আলোকচিত্র সহকারে দুইটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন সাহিত্যের স্থান এবং রাষ্ট্রভাষার স্বরূপ নির্ণয় ও উন্নয়ন সম্পর্কিত দুইটি আলোচনা সভারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অভ্যাগত সদস্যদের আনন্দবিধানের ক্ষত লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ নৃত্য ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নামক সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় উপভোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মৌলিক উচ্চারণবিধি সর্বত্র অস্বত্ব না হওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রাচ্যীয় শ্রোতার কাছে স্থানীয়

প্রভাবযুক্ত সংস্কৃত উচ্চারণ প্রতিষ্ঠা বোধ হইবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও প্রাচ্যবিভাগসম্মেলনের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের বিভাগীয় হিন্দী নাটক সন্দেহে বিজ্ঞানমিত্য অভিনয় করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর গ্রন্থালয় একটি চিত্রাকর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহাতে সম্মেলনের সদস্যেরা বহু মূল্যবান সংস্কৃত ও ফারসী পুঁথি দেখার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

মিয়তম শ্রেণীসমূহ হইতে বাধ্যতামূলক সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ, পুণা ভাষারক্ষণ গবেষণাগার এবং হোসিয়ারপুর বিশ্বদানন্দ বৈদিক গবেষণাগার হইতে প্রকাশ্যমান মহাভারত এবং বৈদিক শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্পাদনের ক্ষমতা সাহায্য দান, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনার যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিংহলে বৌদ্ধবিদ্যালয়মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা সিংহলের জনসাধারণ এবং সরকারকে অনুরোধ, মিথিলা সংস্কৃত গবেষণামন্দির, রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, জয়লগন গবেষণা মন্দির এবং মগধ পালি গবেষণা মন্দির স্থাপনের ক্ষমতা বিহার সরকারকে প্রস্তাব জ্ঞাপন, রাজস্থানের ইতিহাস সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উন্মুক্ত করিবার

ক্ষমতা দেশীয় রাজস্ববর্গকে অনুরোধ এবং রাজস্থান পুরাতন মন্দির স্থাপনে সম্ভাষণ প্রকাশ করিয়া সম্মেলনে প্রভাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য পরিচালন এবং এক প্রভৃতিতে ইংরেজীর সহিত হিন্দী ভাষার ব্যবহারও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন আগামী ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষভাগে আচার্য্য ত্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলন পঞ্চদশ শাখার বিভক্ত এবং ইহার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে মাত্র তিন দিন সময়ের মধ্যে সূচুভাবে ইহার সকল কার্য সম্পাদন সম্ভবপর নহে। ফলে এবার পূর্বে বিজ্ঞাপিত হারদই ভ্রমণ কর্মসূচী হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেস এবং ইতিহাস কংগ্রেসের সহিত অধিকার বিভাগ করিয়া লইলে সম্মেলনের ভার লাঘব এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিভূতি সম্ভবপর। হস্তলিখিত পুঁথি সম্পর্কে সম্মেলনের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকি অনেকই আবশ্যক মনে করেন। অথচ বর্তমান ব্যবস্থার তাহার সমাবেশ অসম্ভব।

সম্মেলনে বঙ্গীয় সদস্যসমূহের সংখ্যানুভা অনেকই দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গের ব্যাভাষ্য পণ্ডিতমণ্ডলী এবং অপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইহার সহিত যুক্ত হইলে সম্মেলনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

সমস্যা—পথ কোথায় ?

শ্রীবীণা রায় চৌধুরী

কি কঠিন সমস্যা চারিদিকে! অভাব ও দুর্নীতি চলছে পাশাপাশি। মাহুঘের জায়-অজায় বোমের চেতনা ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তাবহি অক্ষমতার কি বিপুল বোকা আমাদের বইতে হবে, যদি না অগণিত ছেলেমেয়ের সামনে তুলে ধরি উচ্চ আদর্শ, যদি না পরিচালিত করি তাদের প্রকৃত পথে।

নিরাশার অন্ধকারে আজ মন আচ্ছন্ন তাই পথ খুঁজছি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায়। বিদ্যালয়ে, গৃহে বা সমাজে যে সব সমস্যা কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের মনে আশঙ্কার উদ্রেক করে নি, আজ সেই সকল সমস্যা প্রতিনিয়তই আমাদের বিপর্যস্ত করে তুলছে। তাই চাইছি পথ-নির্দেশ, খুঁজছি বেদনার প্রতিকার-পন্থা।

যারা কলুষিত মন নিয়ে তাবিরে তুলেছে আমাদের আর সমাজ এবং রাষ্ট্রের চরম সর্বনাশ করছে—তাদের সম্বন্ধে

আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। তাদের সংস্পর্শ ও কুশিকার প্রভাব থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে হবে। যারা মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশ ও সমাজকে তবিস্ততে যারা নুতন করে গড়বে তাদের প্রতি আছে আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা। জ্ঞান ও শিক্ষা, শক্তি ও দৃঢ়তার এগিয়ে চলছে, তারা মহান আদর্শের দিকে। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ শুধু পিতামাতারই নয় দেশ ও জাতির আশা-ভরসা তারা। তাদের জন্য ভাবনা নেই, কিন্তু সমস্যা আমাদের দুর্বলমতিদের নিয়ে যাদের মধ্যে হয়েছে, অন্যায়ের বীজ উগ্ধ, যারা পারছে না সহজ ও দৃঢ় আত্মশক্তি দ্বারা প্রয়োজনকে জয় করতে। শিকাক্ষেত্র আছি দীর্ঘ কাল যাবৎ, আবার বহু পরিবারের সঙ্গেও হয়েছে নিবিড় পরিচয়। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এলাম এ জীবনে। এদের সুখ-দুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবলতা-দুর্বলতা এবং সেই সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে

এদের পারিবারিক পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সহজেও অনেক কিছু জানার সুযোগ হ'ল। ক্রম পরিবর্তন ঘটছে এদের চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা—এই সমস্ত সদগুণ ক্রমেই যেন এদের মধ্যে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কত জন হচ্ছে উদারগামী, তাই আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছি—কি করে রক্ষা করব এদের। কি করে সত্য পথ দেখাব? দেশের যারা প্রধান আশা-ভরসাহুল সেই ছেলেমেয়েরা যদি সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী না হয়, রাষ্ট্র যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে বিকৃতবুদ্ধি নাগরিকদের অপকর্মের দরুন, তা হলে আমাদের দেশ যে ভগ্নের কাছে কতটুকু হের হয়ে যাবে সেকথা মনে করে আমাদের দারিদ্র্য সহজে সচেতন হতে হবে।

বর্তমান প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা বলব সেগুলি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। আশা করি, সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাঝেই সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার না করে দরদ দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভাববেন। প্রথমেই বালিকা এবং কিশোরীদের—যাদের সম্পর্কে প্রতিনিয়তই আসছি—নির্মে আলোচনা করি। মনস্তত্ত্ববিদ বলেন—মেয়েদের বয়স যখন ১১ থেকে ১৩ বা ১৪ তখন তাদের মন স্বভাবতঃই একটু ভাব-প্রবণ হয়ে ওঠে। এই বয়সে তাদের উপর গৃহে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ দৃষ্টির দরকার। এই সময় তারা পড়ে যষ্ঠ, সপ্তম, কখনও বা অষ্টম শ্রেণীতে।

বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্রীদের উপর কঠিন শাসনের বিষয়ময় প্রতিক্রিয়া সহজে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে বিষয়ে কিছু কিছু বলতে চাই শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সকল পিতামাতাই যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সন্তানদের বিচার করেন। স্নেহ ও সুস্থ শাসন দুইয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু সর্বোপেক্ষা অধিক প্রয়োজন পিতামাতার বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ আর সন্তানদের মনস্তত্ত্ব বুঝার আন্তরিক চেষ্টা। গুরু-শিষ্যের সহকণ্ড অনেকটা পিতামাতা ও সন্তানের সহকণ্ডেরই অনুরূপ। আমরা আদর্শ শিক্ষয়িত্রী হইত না, তবু একথাও বলি যে, যে সব ছাত্রীর সঙ্গে আমাদের বৎসরের পর বৎসর কাটে, যেসব গুরু মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচিত হইছে প্রতি দিন, তাদের আমরা যথার্থই স্নেহ করি, তাই চাই তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ—এই আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করি যে, তাদের পরিচয়ে হোক আমাদের পরিচয়—তাদের জ্ঞানকে আমাদের যুগ উজ্জ্বল হোক। লেখাপড়ার সবাই যে সমান উন্নতি করবে তা আশা করা যায় না, তবে এটাই একান্তভাবে কাম্য যে তারা চরিত্রবলে দেশের যুগ উজ্জ্বল করতে পারে, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যেন আদর্শ সহবাসিণী এবং জননী হতে পারে। সময় সময় মেয়েদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন অভিভাবকদের নিকট

আমাদের ডাক পড়ে। অনেক সময়ই আশঙ্কা হয়, পাছে তাঁরা কঠিন শাসন করে আরও সর্বনাশ করে না বলেন। তাই অভিভাবকদের কাছে এই অনুরোধ তাঁরা যেন ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করে বলেন—অনেকে বলতে পারেন, “এই উপদেশ দেবার প্রয়োজন কি, আপনারা কি পিতামাতার চেয়ে বেশী ভালবাসেন মেয়েদের?” তা হইত নয়, তবে ছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পিতামাতার চেয়ে বেশী বুঝি আর দীর্ঘকালের সাহচর্যে গুরু মনের অলিগলির সঙ্গে পরিচয়ও আমাদের গভীর। পিতামাতার সম্পর্ক গুটিকয়েক ছেলেমেয়ের সঙ্গে আর আমরা হাজার হাজার মেয়ের সম্পর্কে এলাম জীবনে।

অতিরিক্ত কঠোর শাসনের ফলে অনিষ্ট যে মেয়েদের করণ হয় সে সহজে একটি ঘটনার কথা বলছি—একটি ছোট মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে, সে পরীক্ষায় নকল করে। আমরা সাধারণতঃ এর প্রতিকার করি নিজেরাই মেয়েকে বহুনি দিয়ে আর ভালভাবে বুঝিয়ে—কিংবা তার মন্বর কেটে দিয়ে। প্রয়োজন বোধ করলে গুরুজনদের ডেকে জানিয়ে দিই। এক ক্ষেত্রে মেয়ের পিতাকে জানানো হ'ল। অবশ্য তিনি যে বরণের শাস্তিবিধান করলেন তা ছিল সম্পূর্ণই আমাদের অপপ্রত্যাশিত। মেয়ের বাবা কহলেন কি, শাস্তিস্বরূপ মেয়েকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে ঘর-সংসারের কাছে লাগিয়ে দিলেন, আর বাড়ীর বাইরে তার কোথাও বেরনো বন্ধ করে দিলেন। ফলে হ'ল কি—বাড়ীতে বসে থেকে ও দিনরাত শাসনের চাপে মেয়েটির মন বিগড়ে যেতে লাগল, সে হয়ে উঠল একান্ত অবাধ্য। লেখা-পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল জন্মের মত। এক্ষেত্রে পিতা যে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করেছেন সে কথা বলা বাহুল্য।

এর ঠিক ভিন্ন বরণের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মেয়ে ছয় বিষয়ে ফেল করে প্রোভেন্স রিপোর্টে সব নম্বর পাণ্টে বাড়ীতে বাবার হাতে রিপোর্টটি দিলে। পিতা এলেন পরদিন স্কুলে। “দেখুন এ কেন প্রমোশন পেলেন না? সব বিষয়ে পাস-মার্ক রয়েছে ত?” অবাধ হয়ে গেলাম এত বড় ভুল করেছে কি! মেরিট বুক এনে মিলিয়ে দেখি কোনটাই মিলছে না। তবে কি ভুল হ'ল ভুলতে? পর পর চেকিং চলতে লাগল—ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল—সবই কি ভুল হ'ল? পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল সব নম্বরের উপর কালি দিয়ে লেখা—০ কে ৪, ১ কে ৪, ২ কে ৫ ইত্যাদি। মেয়ের পিতাকে দেখানো হল। তিনিও স্বীকার করলেন over-writing (জাল করা হয়েছে)। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমোশনের ক্ষত তিনি অনুরোধ করতে লাগলেন। বললাম, “আপনি এর প্রমোশনের ক্ষত এ অন্তর অনুরোধ করছেন কি করে?”

কিছু কথাকাটা কাটির পর সেদিনকার মত তিনি বিদায় হলেন। পরদিন আপিস কামাই করে এলেন আবার; অত্যন্ত কান্নের চাপ, বহু অভিভাবক এসেছেন মেয়েদের প্রমোশনের জন্য আবেদন জানাতে। পূর্বোক্ত ভ্রমলোকটি পুনরায় এসে মেয়েকে প্রমোশন দেবার জন্য গীড়াগীড়ি করতে লাগলেন। বহু অহরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি অকৃত-কার্য হয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যে পিতা জীবনে সব পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনিও আসেন চার বিষয়ে ফেল করা মেয়ের জন্য অহরোধ করতে। এতে যে প্রকারান্তরে মেয়েরই অনিষ্ট করা হয় সেকথা যে এঁরা ভুলে যান সেইটেই আশ্চর্য।

আমাদেরই কণ্ঠস্থানীয়া কতজন রয়েছে, কেহ কর্ম-হলে, কেহ পরিবারে বহু বা সহস্রখণ্ডীকপে, সময় সময় যাদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি, এ ত গেল এক দিক। কিন্তু আমাদের প্রদত্ত শিক্ষার স্কুলের দৃষ্টান্ত যখন দেখি তখন মন আনন্দে ভরে ওঠে। এমন কত ছাত্রী রয়েছে যাদের কথা মনে করে আমরা গর্বি বোধ করি।

যে সমস্ত কিশোর-কিশোরী আজ ভ্রান্ত পথে চলেছে একান্তভাবে তাঁদের কল্যাণ কামনা করি বলেই তাদের সম্বন্ধে হু'একটি অগ্রিয় সত্য বলতে বসেছি। যে সকল মাতাত্মক দোষত্রুটি আজ তাদের মজাগত হয়ে গেছে, সেগুলো সংশোধন করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রেই হার মানতে বাধ্য হচ্ছি। বস্তুতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পর্যাপ্ত অজ্ঞান আচরণের অভ্যাস যে-রকম বেড়ে যাচ্ছে তাতে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। শিক্ষকতা-কার্যে সংশ্লিষ্ট থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে তা মধ্যাঙ্গিক। ছোট ছেলেমেয়েরা মাহিনার টাকা চুরি করছে, একের কলম, ছাতা, বই, সেলাই অস্ত্র বাতী নিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। অপরাধীর অহুস্ধান করতে ও অভিভাবকের অভিযোগ শুনতে শুনতে আমরা হয়-রাগ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ সকলের প্রতিবিধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে এ রকম এবং এর প্রতিকার কি—এ সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা প্রত্যেককেই আজ গভীর জ্ঞাবে ভেবে দেখতে হবে—ছাত্রছাত্রীরা যাতে উন্ন্যারগামী না হয় সেজন্য সব সময় রাখতে হবে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। কত ছেলেমেয়ে যে স্কুলে যাবার নাম করে দশটা থেকে চারটা অজ্ঞানগায় আড্ডা মারে কিংবা সিনেমা দেখে, কয়জন পিতামাতা তার বোঁক রাখেন। আমরাও অনেক সময় বোঁক পাই না। বিলাসিতা এবং প্রসাধনের দিকেও আজকাল স্কুল-কলেজের মেয়েদের অসম্ভব রকম বোঁক দেখা যাচ্ছে। অনেকে সেজে-গুজে সারাদিন টো টো করেই কাটিয়ে দিচ্ছে। মা বাবা নিশ্চিন্ত নির্বিকার। কত মেয়ে যে দিনের পর দিন প্রস্রি দিয়ে এমিক সেমিক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কত বিভাধিনীই

মা নোট বই হাতে নিয়ে জিটোরিরা মেমোরিয়েল, চ্যাপেল রোডে পাণচারি করছে। এ ধরনের বহিঃস্থী বিকিণ্ড মন নিয়ে তো বিভাভ্যাস হয় না, হয় পিতার বা অভিভাবকের কষ্টার্জিত অর্থের শ্রান্ত। সব রকম ছাত্র আন্দোলনে কিন্তু এদেরই দেখতে পাবেন অগ্রী; বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের হার কম বলে 'ছাত্রমেধ চলবে না', 'অভিভাবক বলি চলবে না', এই সমস্ত ধ্বনি করে বাঙা উড়িয়ে প্রলেখন বের করছে নিঃ-সঙ্কোচে।

উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সকল বিষয়বস্তুর বীজ আজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠছে আমরা চাই তা উৎপাটিত হোক, কিন্তু কিভাবে হবে তা বুঝে উঠতে পারছি না। চাই ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতার সহযোগিতা, চাই প্রাণপণ চেষ্টা। হয়ত সফল হবে না সকল ক্ষেত্রে তবু প্রতি-কারের পথ খুঁজতে হবে। তরুণ-তরুণীদের মাহুষ করবার গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর জুত। আমাদের কর্তব্য তাদের সমুখে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরা, অজ্ঞানের প্রতি তাদের মনে ঘৃণা জন্মানো, সংস্কৃতির প্রতি অহুস্ধান জাগানো। আমাদের হাতে তুলে দেওয়া মেয়েদের চরিত্র এমনভাবে আমাদের গঠন করতে হবে যেন তারা ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল ও জাতিতে গৌরবাবহিত করতে পারে। অবশ্য আজ যে আমরা আমাদের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি সেজন্য অনেকটা দায়ী আধুনিক সমাজ-জীবন ও বর্তমান জীবন-সংগ্রাম। এ ছাড়া সময় এরং ইচ্ছার অভাবও কতকটা দায়ী। এ কথা জানি যে, পিতামাতার বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও কত ছেলেমেয়ে ভুল করে বিপথে যায়। এর মূলে থাকে অনেক কারণ, কিন্তু তবু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এদের যেমন স্নেহ করতে হবে তেমনি শাসনের রাশও শিথিল করে দিলে চলবে না। এদের আনন্দের ধোরাক ও সঙ্গ দিতে হবে, ভাল সঙ্গী খুঁজে দিতে হবে এদের জন্য। প্রতিবন্ধক যে কত, জীবন-সংগ্রাম যে কি প্রচণ্ড সবই জানি, কিন্তু কুসন্তানের জনক ও জননী হয়ে থাকা যে আরও বেশী মধ্যাঙ্গিক।

অনেক দূর এগিয়ে চলে এসেছি জীবনপথ বেয়ে, আমাদের স্নেহের ছেলেমেয়েদের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমরা অস্বস্তি বোধ করছি, তাই বার বার এই কথাই মনে জাগছে, সমস্যা কঠিন—পথ কোথায়? আমাদেরই চোখের সামনে কত তরুণের হচ্ছে সর্বনাশ, কত তরুণী করছে মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত, কত পিতামাতা প্রতিদিন অশ্রু বিসর্জন করছেন। আমরা কখনও দর্শক, কখনও বা ভুক্তভোগী—অক্ষমতার বোকা বহন করছি শুধু। কখনও বা প্রায়শ্চিত্তও করছি আপন নিবুদ্ধিতা ও সন্তানের ভুলের অপরাধের। তাই বলি সময় থাকতে প্রতি-কারের পন্থা আবিষ্কারের জন্য মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক।



আলোচনা



“রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন”

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধের (প্রবাসী চৈত্র, ১৩৫৭) আলোচনা করিয়া (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৫৫৮) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি উক্তি সহজে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

রামনারায়ণের “তর্কপঞ্চানন” উপাধি মোটেই ছিল কিনা এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য আমাদের দৃষ্ট রামনারায়ণের গ্রন্থে “ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তী” উপাধিটিই আছে। শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্তের প্রবন্ধেও “বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক” গ্রন্থে তর্কপঞ্চানন উপাধির উল্লেখ বিখ্যাত হইতেই গৃহীত হইয়াছে। রামনারায়ণের বংশধরগণের মধ্যেও, তাঁহার যে “তর্কপঞ্চানন” উপাধি ছিল পুরুষাঙ্কুরে সেই ধারণাই চলিয়া আসিতেছে। এত দিনের প্রচলিত সত্যরূপে গৃহীত তথ্য যে একেবারে অমূলক তাহা মনে হয় না। রামনারায়ণ যে নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহাও সর্ববাদীসন্মত এবং তাঁহার যে “তর্কপঞ্চানন” উপাধি একেবারে ছিল না তাহাও অনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।

রামনারায়ণের সমসাময়িক রূপে উল্লিখিত পাঁচ জন পণ্ডিতের মধ্যে রামেশ্বর চার্য্যবংশীর জন্মপঞ্জিকা আমরা পাইয়াছি। তাহাতে তাঁহার জন্ম ১৬৪২ শকাব্দরূপে উল্লিখিত আছে। উহা রামনারায়ণের সমকালবর্তী (১৬৩৫ শকাব্দ)। অতীত পণ্ডিতের নাম পুরুষাঙ্কুর-হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

রামনারায়ণের “ভুল ভাগবত” রচনার আখ্যায়িকাটি আমাদের নিকট সত্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ সারা দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত রূপে বৃত্ত হওয়ার একাধিপত্য তাঁহার বংশধরগণই ভোগ করিতেছেন। দক্ষিণ অঞ্চল কেশব রায় চৌধুরীরই

জমিদারী। যদি কুরুরামের পূর্বে কাহারও উক্ত মর্যাদা প্রাপ্তি সম্ভব হয় তবে তাঁহার ভাতার বংশধরগণের মধ্যে বর্তমানে ইহার গ্রহণযোগ্যতা সম্ভবপর এবং রামনারায়ণের পুত্রদের মধ্যে যদি কেহ পাইয়া থাকেন তবে অতীত পুত্রদের বংশধরগণের মধ্যে তাহা বিদ্যমান থাকি নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়। কিন্তু উহার কোন পক্ষই বর্তমানে দৃষ্ট হয় না। রামনারায়ণের চারি পুত্রের মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং নিতান্ত লিপিবদ্ধ প্রমাণাবশতঃ উক্ত প্রচলিত ধারণার অসত্যতা প্রমাণিত হয় না। উহা সত্য হইলে জমিদার কেশব রায় চৌধুরীর সহিত রামনারায়ণের পিতার সম্পর্কের কথা একেবারে অমূলক নয়। পরন্তু উক্ত জমিদার কর্তৃক নির্মিত “মন্দির বাজার” নামক স্থানে একটি শিবমন্দিরগায়ে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৭০ শকে (১৭৪৮ খ্রিঃ অব্দ) তিনি জীবিত ছিলেন। লিপিটি এইরূপ “আকাশদ্বিস স্কোণীমিতে শকে শিবালয়ঃ। ভূপঃ শ্রীকেশবো-কার্য্যদ্বাদেবেন শিলিপনা” (Vareadra Research Society's Monographs No. 4; “The Antiquities of N. W. Sundarban”,—Kalidas Dutt. পৃঃ ৯)। কুরুরামের বংশধরগণের গৃহে রক্ষিত একটি পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৬৮৬ শকেও তিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং বর্ষ হিসাবেও কুরুরাম জমিদার কেশব রায় চৌধুরীর সমসাময়িক। উক্ত সত্যপণ্ডিত থাকাকালীন কুরুরাম সহজে আরও কয়েকটি আখ্যায়িকা তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কুরুরাম যে প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন এই উক্তি একেবারে অমূলক নয়। পুত্র রামনারায়ণ যখন ছাত্রাবস্থায় নবদ্বীপে ভ্রমণার্থে গিয়া নকল করেন (১৬৩৫ শক) তখন কুরুরামের বার্ক্যাবস্থা। ১৬৮৬ শকেও তাঁহার জীবিত থাকার কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। সুতরাং কথিত বার্ক্যাবস্থার পর অন্ততঃ ৫১ বৎসর জীবিত ছিলেন।



অমৃততাজন
সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক বায়োরন্যায় কার্য্যকরী।

দাদেয় মলম
চর্ম্ম রোগে ‘পরিমিত’ শক্তির ‘ন্যায় কার্য্যকরী।
অমৃততাজন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭



ডাঃ বিদ্যাভূষণের উক্ত রামনারায়ণ যদি বুনো রামনারায়ণ এবং কৃষ্ণকান্তের গুরু হন তবে আমাদের আলোচ্য রামনারায়ণ নিশ্চয়ই তিনি নন। এই রামনারায়ণ কখনও নবদ্বীপে অধ্যাপনা করেন নাই, মজিলপুরেই তাঁহার টোল ছিল। এ বিষয়ে ভট্টাচার্য মহাশয়ের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে মজিলপুরের রামনারায়ণ যে তাঁহাদের সমসাময়িক তাহা নিঃসন্দেহ।

কারিকাবলি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা যে প্রকৃতই মজিলপুর-নিবাসী রামনারায়ণ (কোদালিয়াবাসী নন) তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। রামনারায়ণের পুত্র রামপ্রসাদ বিদ্যালকার বহু পুঁথিতে 'মজিলপুর' কথাটি লিখিয়াছেন এবং পৌত্র রামগোপাল ভর্কালকার স্বরচিত 'ভেদজ্ঞান তিমির মিহিরোদয়' নামক দার্শনিক গ্রন্থের (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত মুদ্রায় প্রমুদিত) পুস্তিকায় আপনাকে মজিলপুরবাসী রূপে উল্লেখ করিয়াছেন (সৌর মাসে বিংশাংশে মজুলপুর, দেশতঃ—

পৃঃ ৬০)। রামগোপালের পুত্র রামরূপ ভর্কবাগীশ বাংলা পন্থার হৃদে প্রতিষ্ঠিত, স্বরচিত "জ্যোতীষতাম্রমুজাবলী" গ্রন্থে আপনাকে মজিলপুরবাসীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন— "মজুলপুর-নিবাসী ত্রিরাশরূপ ভর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রমাণ-স্বত্ব প্রতিপাদ্য জ্যোতীষতাম্র মুজাবল্যাং *** পক্ষবিংশ-গ্রন্থঃ।" উক্ত রামরূপ বিদ্যাবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামসেবক শিরোমণি (১২২৩ সন) কোদালিয়াবাসী রামনারায়ণের জামাতা মজিলপুর নিবাসী যাদবানন্দ বিদ্যারত্নের সমসাময়িক এবং যিনি (কোদালিয়াবাসী) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সমসাময়িক, তাঁহাকে কারিকাবলি রচয়িতা (১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ) রূপে কল্পনা করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নয়। রামনারায়ণের ছয় পুরুষ অধস্তন, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও গঙ্গামাহাত্ম্যের বদান্ত-বাদক, 'ভিত্তিকৃত্যম্' শীর্ষক সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থের ও নৃপটকম্ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কবিতার রচয়িতা বিখ্যাত স্মার্ত্ত বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যারত্ন-কয়েক বৎসর পূর্বেও মজিলপুরে জীবিত ছিলেন।



**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সর্কার
এও সন্স

সুখ্যাত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নির্মাণে
সুখিরক ব্যবসায়ী

৪৭
১০৯/১/বি, রাসবিহারী এডিনউ কলিকাতা
ফোন. বি. বি. ১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস

পুস্তক পরিচয়

১। বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)।

২। বাংলার খ্রীশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিখ্যাতসংগ্রহ। বিখ্যাতরত্নী, কলিকাতা। ১৩৫৬, ১৩৫৭। পৃ. ৭৬, ৫৫।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ধারার সহিত উপরিচিহ্নিত করাইয়া দিবার জন্ম বিখ্যাতরত্নী হইতে বিখ্যাতসংগ্রহে শীর্ষক যে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিষয়ের বৈচিত্র্যে, লেখক-নির্বাচনে ও রচনার মনোপ্রাণিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—জনশিক্ষা ও খ্রীশিক্ষা—এই সংগ্রহের দুইটি পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, স্বল্প পরিসরের মধ্যে ও ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম পুস্তিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনশিক্ষার নৃপপ্রায় ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া, বন্ধমান ও গ্রীসমপুরের পাঠশালা হইতে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে জনশিক্ষার বিস্তার, এডাম সাহেবের এডুকেশন রিপোর্ট, হার্ভিঞ্জ স্কুলসমূহের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগরের পরিকল্পনা ও নন্দাল স্কুল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত জনশিক্ষার বিস্তৃত ও তথ্যবহুল বৃত্তান্ত, কোন প্রয়োজনীয় কথা বাদ না দিয়া মাত্র ৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে, অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়া জনসাধারণের হৃদয় ও অনায়াসে জানের পথ স্বগম করিয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তিকায় বাগল মহাশয় বেথুন (বীটন) স্কুল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলাদেশে খ্রীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগের মনোপ্রাণিক বিবরণ দিয়াছেন তাহা সকলেরই চিন্তাকর্ষক হইবে। গত যুগের সমাজ ও শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে যোগেশচন্দ্রের মত অভিজ্ঞ ও সাবধানী লেখক বিরল। যোগ্য ব্যক্তির উপরই এই দুইটি লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (সপ্তম খণ্ড)—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা-৬।

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলি এই গ্রন্থমালার সপ্তম খণ্ড, পূর্ব-খণ্ডগুলির মতই, তথ্য-নির্বাচনে ও সমাহরণ-নেপুণ্যে কেবল স্থপাঠ্য নয়, সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ হিসাবে অপরিহার্য হইয়াছে বলিলেও চলে। বর্তমান খণ্ডে বোল জন গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচনার পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঋনামখ্যাত লেখকদের বৃত্তান্ত। ব্রজেননাথের অনুসন্ধিস্রো ও তথ্যনিষ্ঠার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বর্তমান খণ্ডে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শ্রীশুশীলকুমার দে

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুমতী সাহিত্য-মন্দির, ১৩৬, বোয়ালার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ভারতীয় সঙ্গীতের পশ্চাতে একটি বিরাট ইতিহাস রহিয়াছে। ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া শত শত সুরশ্রুতি ও সঙ্গীতসাধকের কঠোর সাধনা ও সঙ্গীতামৌলী নৃপতিদিগের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলে নব নব রূপে স্ফূর্তিত হইয়াছে। সঙ্গীতকলার এই ক্রমবিকাশ বিবেচনা করিয়া

সঙ্গীতচর্চাগণ সঙ্গীত-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন। সঙ্গীতকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেওয়াই প্রকৃত সঙ্গীতসাধকের লক্ষ্য থাকা উচিত।

সঙ্গীতের এই ক্রমবিকাশকে গ্রন্থাকারে পরিবেশন করা বিপুল শ্রমসাপেক্ষ, কারণ এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার মত নির্ভরযোগ্য পুস্তক বিরল। সেই হেতু সঙ্গীতনায়ক যোগেশচন্দ্র বাগল এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গীতকলার সাধকসমাজ বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—এর মধ্যে দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় পুখুরাজের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আহম্মদ শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে সমুদয় সুরশ্রুতির আবির্ভাব হয় তাহাদের নাম ও পরিচয় এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতকার-গণের রচিত প্রায় একশত গীত ও সেগুলির স্বরলিপি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শঙ্করানন্দ, নায়কগোপাল, বিবেকশ্যামী, রামদাস, হরদাস, তানসেন, জানকীদাস, সাদারঙ্গ, অদারঙ্গ, মিয়াউলমানবী, শেরী, তুলসীদাস, মীরাবাসী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের মধ্যে ধ্রুপদ, টপ্পা, ধোলাল, ঠুংরী প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সমাবেশ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া ক্রিষ্ণে কাহার ধারা ও কাহার রাজত্বকালে একটির পর আর একটির উৎপত্তি হইল তাহা, এবং একের সহিত অপরের প্রভেদ ও প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যে কেবল সঙ্গীত-পিপাসুকেই আনন্দের রসদ যোগাইবে তাহা নহে, ইহার ঐতিহাসিক দিক এবং সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া ভাব ও ভাষার বিবর্তনের দিকটি সর্বসাধারণের জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়

কালো আকাশ—ব্রীজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৮-এ, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

নগরোপকণ্ঠের শিল্পকলার আকাশ যন্ত্র-দানবের দীর্ঘনিঃশ্বাস-বুম-মলিন। এই আকাশের নীচে বাস করে যে সব মানুষ তাহাদের জীবন কারখানার নাগপাশে বাঁধা—যন্ত্রের সেবা করিয়া তাহারাও হইয়াছে মুখরুখে উদাসীন যন্ত্রের ছায়। এমনই এক শ্রমিক জয়ধর—যৌবনের প্রারম্ভে হুস্ক হইয়াছে তাহার জীবনযুক্ত, পক্ষাশোকে পৌছিয়াও সে যন্ত্রের বিরাম নাই। সংসারে রূপা-স্রী, বেকার ও উচ্ছ্বল ছেলে; মরণোন্মুখী ছোট একটি মেয়ে; অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, শান্তির আশাও মরীচিকা। এই সংসারেরই একটি ছেলের মনে আসিয়া পৌছিয়াছে বৃহত্তর জগতের আলো ও বার্তা। অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যকে সে অদৃষ্টের প্রাণী বলিয়া মানিয়া লয় নাই—ধনসামান্যদের প্রশংসা তাহার মনে তীব্র হইয়াই জাগিয়াছে। নূতন সংসার আর বেগবান জীবনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। রূপা জননী এবং মরণোন্মুখী মেয়ের মনেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন। শৈশবকালের বারব্রত, খেলাঘর ও পুতুল-শ্রীতির মধ্যে গৃহীণীপনা ও মাতৃহের বিকাশ। এই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত। এই একটু মাত্র পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লেখক শহরতলীর কালো আকাশের ছবি আঁকিয়াছেন। ছবির পরিবেশ যেমন বিবাদমান, রেখা ও রঙ তেমনই চলছে—কাহিনীতে বেদনার সুর মাখানো। এই কাহিনীই ইনাইয়া বিনাইয়া করণ রসে

ভয়াইয়া দেওয়া নতুন লেখকে পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিয়াও ভাবা ও ভাবকে আভিযা হইতে লেখক অত্যন্ত সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন। কারখানা-জীবনের দারিদ্র্য ও দুঃখবৃত্তি, নীতিভ্রষ্টতা ও কুশিক্ষা, স্বার্থাঙ্কতা ও মুঢ়তা সবকিছুর উপরই তিনি আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে সমস্ত চরিত্র বিকশিত হইবার পূর্ণ হ্রস্বগণ পায় নাই; তথাপি রেখার টানে যেটুকু ফুটিয়াছে তাহাতে চরিত্রগুলি সজীব হইয়াছে—সার্থক হইয়াছে। অচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বৈদিক দেবতা—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়গ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বেদ হিন্দুর পরম প্রকার বস্তু—ইহা তাহার সমস্ত ধর্মকর্মে নিয়ামক-রূপে স্বীকৃত। অথচ বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের সহিত বর্তমান হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের প্রভেদ যথেষ্ট। বৈদিক দেবতা ও আধুনিক হিন্দুর দেবতার মধ্যেও এই প্রভেদের নিদর্শনের অভাব নাই। বর্তমান হিন্দু সমাজে আমরা যে সমস্ত দেবদেবীর সহিত নিত্য-পরিচিত তাহাদের অনেকের কোন সন্ধান বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাহাদের উল্লেখ বেদে পাই

সর্বদাই পুরোভাগে

ভারতীয় জীবন বীমার অগ্রগতির পথে "হিন্দুস্থান" সর্বদাই পুরোভাগে রহিয়াছে। যে আর্থিক সারবত্তা, সংহতি ও সমৃদ্ধি-শক্তি হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য, ১৯৫০ সালের বার্ষিক বিবরণীতেও তাহাই পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা	৭৬,১৬,৬০,৫২৭ টাকা
মোট সংস্থান	১৭,৭০,৭০,৬২৪
বীমা তহবিল	১৫,২৭,৪৭,৫৪৮
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৪০,৪৭,৩৩৮
দাবী-শোধ (১৯৫০)	৭২,২২,৮৫০
নূতন বীমা	১৩,৭৫,৩৯,৮৫১

কিন্তু হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের যে অকুণ্ঠ আস্থা পূর্বাগর তাহার ক্রমোন্নতির পথে পাথের রূপে সহায়তা করিয়াছে, সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহারই জ্ঞাত হিন্দুস্থানের প্রকৃত গৌরব। হিন্দুস্থানও তাহার ঐকান্তিক সেবা দ্বারা সেই গৌরব অক্ষুর রাখিবে, নূতন বৎসরে ইহাই তাহার প্রতিশ্রুতি।

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লি:
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৬

তাহাদেরও স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহার সহিত বৈদিক বর্ণনার খুব বেশি মিল নাই—তাহাদের সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহাদের কোন কোনটির ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহাও মিলে না। পঙ্কান্ডরে, বেদবর্ণিত বহু দেবতা আজ আমাদের নিকট অপরিচিত বা অল্প পরিচিত।

এ অবস্থায় বৈদিক দেবতার স্বরূপ বর্ণনা বা বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিবরণ কেবল কৌতুক্ষরনকই নয়, হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন পরিণতির ইতিহাস আলোচনার ইহা প্রধান অবলম্বন। ইতিপূর্বে রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয় বাংলাভাষায় এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন কারয়াছেন—তাঁহার 'বঙ্গকথা'র বৈদিক যুগযজ্ঞের অপূর্ণ বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে লেখক প্রাচীন বেদাচার্য যাস্তের শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়া ঋগবেদোক্ত প্রধান প্রধান দেবতার পরিচয় দিয়াছেন—সংক্ষেপে ভাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, কোন কোন দেবতা বৈদিকপূর্ব যুগ হইতে বিভিন্ন দেশে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন হিন্দু দেবতা বিভিন্ন নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রতীক—প্রাচীন এবং আধুনিক অনেক পণ্ডিত কর্তৃক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত এই মতানুসারে লেখক অনেক স্থলে দেবতাদের মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে ইংরেজীতে নামকরা প্রামাণিক গ্রন্থ আছে—বাংলায় এতাবৎ বিশেষ কিছুই ছিল না। বর্তমান পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালী পাঠক অনায়াসে বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে সার কথাগুলি জানিতে পারিবেন এবং জানিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রাষ্ট্রভাষা-প্রবেশ—শ্রীবিদ্যুৎ নাসত্তপ্ত। ৩৫, টাঙ্গা
 রোড, কলিকাতা—১৫ হইতে শ্রীবিদ্যনাথ নাথ কর্তৃক প্রকাশিত। ১২২
 পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

রাষ্ট্রিক কারণে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর প্রচারকল্পে বাংলা দেশে বাংলা ভাষার সাহায্যে প্রাথমিক ও উচ্চতর প্রবেশিকা ও পাঠ্যপুস্তক বহু বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার অনেকগুলির পিছনে জ্ঞান নিষ্ঠা ও সাধনা নাই, এগুলি শুধু ব্যবসায়বুদ্ধিপ্রণোদিত প্রকাশ তাহা বলাই বাহুল্য। সুধের বিষয়, 'রাষ্ট্রভাষা-প্রবেশ' এই ছদ্মগ-গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত নহে। গ্রন্থকার রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সহিত যুক্ত থাকিয়া হাতে কলমে কাল করিয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। ফলে এই পুস্তকে পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। আঠারটি পাঠ এবং পরিশিষ্টে গ্রন্থ শুষ্ককোষ আয়ত্ত করিলে হিন্দী ভাষার মোটা-মুটি জ্ঞান হইবে। বাংলা দেশে হিন্দী প্রচারে বাঁহারা সর্বদা ব্যাপৃত, সেই ত্রিখিয়রজন সেন, ত্রিবেষতীরজন সিংহ প্রভৃতি বইখানিকে সমাদর করিয়াছেন। আশা করি, শিক্ষার্থীরা এই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এই জাতীয় ভাষা-প্রবেশিকার যুগাকর-প্রমাণ থাকা অস্বাভাবিক। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকার এই কথাটি স্মরণ রাখিলে আনন্ডিত হইবে।

রাষ্ট্রভাষা-শিক্ষক—ব্রহ্মদেব মজুমদার। চক্রবর্তী,
চট্টাঙ্গী এণ্ড কোং, কলিকাতা। পৃ. ১১৮। মূল্য পাঁচ টাকা।

হিন্দী ও হিন্দুস্তানীর বিভেদ ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে সাধারণ ভাঙানীর কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। ক্রীষক মজুরদার উত্তরবিধ ভাষায় অভিজ্ঞ, অধিকন্তু ভাবাত্তের নিষ্ঠাবান সাধক। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের পঠিসময়ের মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্তানীর বিভেদ ও সামঞ্জস্য বুঝাইয়া রাষ্ট্রতাবাকে সহজে আয়ত্তে আনার কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। অশুলীলনগুলি বিশেষ কাজ দিবে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও নিবেদন করি যে, ১১০ পৃষ্ঠার বইয়ে পুরা তিন পৃষ্ঠাব্যাপী "শুদ্ধ পত্র" লজ্জাকর। হুণের বিষয়, প্রকাশক আশাস দিয়াছেন, বইখানিকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করিয়া প্রচার করা হইবে, ইহা "টাইল প্রিন্ট" মাত্র।

३.

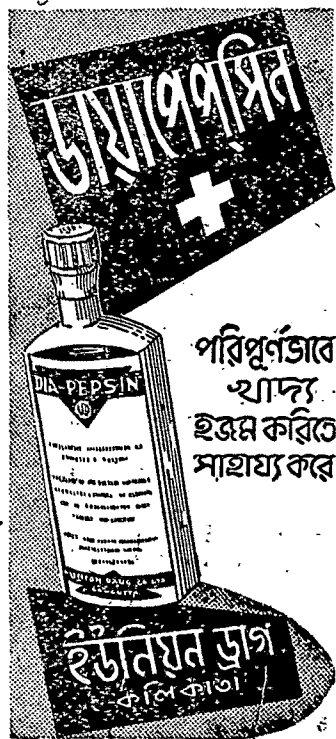
१२५
 ज्ञानी—बुद्धिमान, विद्वान्, ज्ञानी इत्येतेषां अर्थः ।
 १२६

প্রাথমিক বুনিনাদী শিক্ষাকেন্দ্রে। অধ্যাপক-ছাত্রগণের স্থলিখিত প্রবন্ধ-
সমষ্টি।

উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন—ত্রীসন্তোষকুমার দে।
বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য ২০।

মোট পাঁচটি অধ্যায়ে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। যথা—‘উপজীবিকা’ হিসাবে বিজ্ঞাপন, ‘বিজ্ঞাপনের দাম দেয় কে?’ ‘ব্যাপক বিজ্ঞাপন’, ‘পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন’ এবং ‘খুচরা খবর’। আশ্চর্যকাল বিজ্ঞাপনের ব্যবসা একটা প্রধান অয়ের পথ। এহ লোক ইহাতে নিযুক্ত আছেন এবং বহু প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। অংশ কে বল বিজ্ঞাপনের জোরে অচল জযা বেশী দিন চলে না। তবে বিজ্ঞাপন দিতে, অবহেলা করিলে ভাল জিনিষও অচল হইয়া পড়ে। এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে অপর দুই এক-খানি গ্রন্থ থাকিলেও চাহিদার তুলনায় এই শ্রেণীর বাংলা বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। লেখক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আধুনিক জগতের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে পুস্তক লিখিয়া বাঙালী পাঠকের ধর্মবাস্তবজ্ঞান হইয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধ . দত্ত



পরিপূর্ণভাবে
খাদ্য
ইঙ্গ্রম করিতে
সাহায্য করে

হেউতিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা

পরবাসী—শ্রীআদিভাষকর। ৫৬, ব্রিটিশ রোড, কলিকাতা।
মূল্য তিন টাকা।

কাহিনী শুরু হইয়াছে সত্যোনের সংগ্রামময় জীবনকে কেন্দ্র করিয়া।
এম-এসি পাস করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উচ্চাশায় মন যখন পরিপূর্ণ
এমনি সময়ে পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের সমস্ত ভার আসিয়া
পড়িল বাইশ বছরের যুবক সত্যোনের স্বন্ধে। শহর হইল। দূরে
একটা ফ্যাক্টরিতে সহকারী কেমিস্টের পদে সে বাহাল হইল। গল্পের
নায়ক সত্যোনে নয়, বিকাশ—যাব পরিহাস-নৈপুণ্য, অপূর্ণ ব্যক্তিত্ব,
অপরিসীম সহনশীলতা, দয়া দাক্ষিণ্যপূর্ণ ৫ ৩ রহস্যময় চালচলন, প্রাণ-
খোলা ব্যবহার ক হিনীকে আগাগোড়া প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বিকাশ ফ্যাক্টরির ফোরম্যান। ফলতঃ, ফ্যাক্টরীর বড় ছোট সকলেই
তাহার অনুরক্ত। সত্যোনে এখানে নবাগত হইলেও তাহার উপর
বিকাশের কি জানি কেন একটা বিশ্বাসের আকর্ষণ দেখা যাইতে যাহার
ফলে এই দুজনের চারদ্বয়ের লোকটির বিনয়ের অনেক তথ্যই তাহার
কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

বিকাশের ভিতরকার সত্যিকারের মানুষটির পরিচয় যখন সত্যোনে
পাইল তখন সে নিজের কাছেই যেন ছোট হইয়া গেল। অথচ বিকাশ সব
বুঝিয়া এবং সব জানিয়াও কত সহজে বলিতে পারিল—‘ভুল ত মানুষই
করে সত্যোনে।’

বিকাশ ছাড়া আরও যে কয়টি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের
মধ্যে চাক কেমিস্ট ঘোষের স্ত্রী ‘বৌদি’ মনে ছাপ রাখে। একটি খাঁটি
বাঙালী মেয়ের ছবি নৈপুণ্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তার মাতৃ, ভগ্নী ও স্ত্রী-
প্রভৃতি বিভিন্ন বপের মধ্যে।

হুনীতির সম্বন্ধে সব সময়ই পাঠকের মনে একটা কৌতূহল জাগিয়া
থাকে। পুস্তকের শেষে তাঁর সাক্ষাৎ মিলে ফ্যাক্টরির ম্যানেজারের স্ত্রী-
রূপে যখন ম্যানেজার বিকাশকে ভুল বুঝিয়া আঘাত করিতে উত্তত আর
দেই আঘাত প্রতিহত করিতে বিকাশ যখন রুখিয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে।
অত্যন্ত সাবধানী বঃ স্বার্থপর একটি মেয়ে। কিন্তু এরই জন্ত বিকাশ
সর্বস্বত্যাগী। হুনীতিকে না পাইয়া সে গোটা হুনীয়ার মানুষকে
পাইয়াছে।

পুস্তকখানি স্থপাঠ্য এবং আকর্ষণীয় হইয়াছে। সংজ্ঞা এবং স্বচ্ছন্দ
ভাষা। কিন্তু বইখানিতে শরণ চন্দ্রের একখানি উপস্থানের প্রভাব বেগী
করিয়া পড়িয়াছে মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথা, ২। শ্রীশ্রীবিষ্মকর্মা
পূজা ও কথা—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থান—১২০/২,
আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য প্রত্যেকখানি দশ
পয়সা।

পূজা-পার্বণ, ব্রতউৎসব বাঙালী হিন্দুর ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনের
অপরিহার্য অঙ্গ। লেখকের প্রণীত পূজা ও ব্রতকথা বিষয়ক
পুস্তকসমূহদ্বারা সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।
অল্পকাল মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথার দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে এই-
খানি যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।
শিল্পকর্মের দেবতা বিষয়ক। বস্ত্রশিল্পী ও কার-শিল্পীগণ কর্তৃক প্রতি
বৎসর তাঁহার পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে লেখক
এই পূজার কথা বড়ই চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে
তিনি ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রে শিল্পীদের স্থান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন
তাহা মনোজ্ঞ হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শরণ চন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী
—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড
সন্স। ২০৩, ১১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

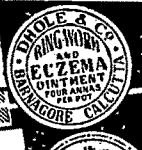
হুডি-একুশ বৎসর পূর্বে একটি সাহিত্য-সভার যোগদানের সুযোগ
অর্জন হইয়াছিল। সেখানে সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত করেক-
জন মনীষী শরণ চন্দ্রের রচনা সম্পর্কে অতুল ও অতিকূল উভয় মতই
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন, তাহা
শরণ চন্দ্রের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে। বর্তমান ‘রচনাবলী’তেও ইহার ছাপ
স্থাপ্ত। বাংলাদেশে বাংলাভাষার খ্যাতি-অখ্যাতি, দীর্ঘস্থায়ী স্বভাব এমন
পত্র-পত্রিকা খুব কমই ছিল বাহাতে কোন-না-কোন সময়ে শরণ চন্দ্রের
রচনা প্রকাশিত হয় নাই। যিনিই আলোচ্য পুস্তকখানির পাতা
উন্টাইবেন তাহারই চক্ষে প্রথমেই তাহা ধরা পড়িবে। ইহা হইতে আর
একটি বিষয়ও আমাদের স্পষ্ট হইল মনে উদিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন সময়ে
প্রকাশিত বিচিত্র ধরণের পত্র-পত্রিকা হইতে রচনা-সঙ্কলন কিরূপ অম-
সাধ্য ব্যাপার! কিন্তু ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক অনুসন্ধান দ্বারা
এই অমসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল রচনা—
বাহার অধিকাংশই হয়ত বর্তমান পাঠক সমাজের আগেচরে থাকিয়া
যাইত; পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার বাংলা-সাহিত্যের যেমন মর্যাদা
বাড়িয়াছে, বাংলা-ভাষীরাও ততোধিক উপকৃত হইয়াছেন।

টোল ও কোম্পানী

দাদ ও কাউন্সেল
এম্বার্স মলম

কিউটা-টোন
পোড়া বেদনা ও চর্মরোগের জন্য

লিমন মলম
খোস পাঁচড়া ও চলকানীর জন্য



বরানগর, কলিকাতা

এই রচনাসমূহের প্রায় সমুদয়ই ১৩১২ সাল হইতে ১৩৪৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একখানি সমাপ্ত ও দুইখানি অসমাপ্ত উপন্যাস ও একটি রূপকথা বাদে অপর সকলই, এক কথায় বলিতে গেলে মনন-সাহিত্যমূলক রচনা ও ভাষণ। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাই হইতে নানা রূপে স্থান পাইয়াছে। 'ঔপন্যাসিক' শব্দ চন্দ্র কেন যে 'অপরোক্ষ' হইয়াছেন তাহার মূল কারণ এই সকল রচনাপাঠে অনুভব করি। শব্দ চন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল যেমন বিচিত্র, তাহার আহরণও ছিল তেমনি প্রচুর। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, বৈদেশিক সাহিত্য তাহার বিশেষ পড়া ছিল। এই সকল আহরণকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া তিনি স্বীয় রচনাকে রসপূর্ণ করিয়াছেন। তবেই তো ভাষা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়াছে। 'কানকাটা' প্রবন্ধে উদ্ভিটার কানকাটা এবং বাইবেল-কবিত কানানাইট জাতির সাদৃশ্য [?] একটি চমৎকার উপমাধারা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। 'দর্শনাত্মক' এবং 'দর্শনা ভাবটির মধ্যে যে মিল, 'কানানাইট' ও 'কানকাটা'র মধ্যেও সেইরূপ মিল! শব্দ চন্দ্র মহাশয় গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগের ঐকান্তিক অনুসারী ও সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তাহার কারাবরণের পর শব্দ চন্দ্র 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধ লেখেন ('নারায়ণ'—বৈশাখ ১৩২২)। ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা' অপেক্ষাও সত্যগ্রহ তথা 'অহিংসা'কে গান্ধীজী কেন উচু স্থান

দিয়াছিলেন, তাহার একটি হুম্মর বাখা লেখক ইহাতে দিয়াছেন। 'সত্যগ্রহী' ও 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্তার' তিনি অতি সহজ ভাষায় খাটি সত্য কথা বলিয়াছেন। চরখার দ্বারা স্বরাজ্যলাভ সম্ভব এ ধারণার প্রতিও তিনি কশাঘাত করিতে ক্রটি করেন নাই। 'মুসলমান সাহিত্য' সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য অগণিধানগোণ। এই পুস্তক শতোক বাংলাভাষীর বার বার পাঠ করা কর্তব্য।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)—সম্পাদক: শ্রীব্রজেন-

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীসজনীকান্ত দাস। স্বর্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১, আপাং সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য সাড়ে চারি টাকা। স্বর্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর তিন খণ্ড পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ৭০খানি ধরিয়া এই চারি খণ্ড বাহির হইল। এই খণ্ডে রামমোহনের বেদান্তঃস্থ, বেদান্ত সার এবং পঞ্চোপনিষৎ (ভলবকার, ইশ, কৈঠ, মাতৃক্য ও মুণ্ডক) প্রদত্ত হইয়াছে। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারের' প্রতিপাত্ত বিষয়ের প্রতিবাদে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিজালঙ্কার ইংরেজী অনুবাদ সহ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রকাশিত করেন। তাহার উত্তর রামমোহন সেন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে'। মৃত্যুঞ্জয়ের উক্ত বাংলা প্রতিবাদ এবং রামমোহনের জবাব দুইই এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। এতদিন রামমোহনের উক্তির সঙ্গে মাত্র পাঠক সাধারণ পরিচিত ছিলেন। বর্তমান সংস্করণে উত্তর-প্রতুত্তর মুদ্রিত হওয়ায় এক দিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের মতামত ও মনোভাব জানা যাইতেছে, অন্য দিকে রামমোহনের বক্তব্যও স্পষ্টভাবে বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ইহা বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য। সম্পাদকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে রামমোহনের জীবিতকালে প্রকাশিত মূল পুস্তকসমূহের সঙ্গে পাঠ্য মিলাইয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছেন। রামমোহনের কোন কোন নবাবিকৃত পুস্তক বাহা ইতিপূর্বেকার সংস্করণগুলিতে স্থান পায় নাই, ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, আবার কোন কোন রচনা অপরের সঙ্গে মিশ্রিতও হইয়াছে। এই শোভন ও পরিপূর্ণ সংস্করণটি শুধু রামমোহন-অনুসারীদেরই নহে, বাংলাভাষার মর্যাদারও বিশেষ কাজে আসিবে। বাংলা-গদ্যের ঐমোহনিতর দ্বারা নির্ণয়কল্পেও এরূপ পুস্তক প্রকাশের বিশেষ মার্কতা আছে।

বর্ষপঞ্জী, ১৩৫৮—শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীগোপাল

ভৌমিকের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত। এন্স আর সেনগুপ্ত এন্ড কোং, ৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩। মূল্য চারি টাকা।

ইদানীং যে ধরণের বর্ষপঞ্জী বাহির হইতেছে, 'প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' এই পঞ্জীখানিতে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখিলে স্থখী হইতাম। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ব্যঙ্গ, জীবন-বীমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বর্তমান ভারত, বহির্ভারত, খেলাধুলা, খাতসমস্তা, চলচিত্র, ব্যক্তিপরিচয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণাই ইহাতে করা হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু তারতম্য হইলেও কোনটিরই বিশুদ্ধ বা বিশেষ বিবরণ পাইতেছি না। ভারতের শিক্ষা-বাবস্থা মাত্র নয় পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। "পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় তারিখ"—এ দেখিতেছি; 'নতীদাহ প্রথা'র উল্লেখ হইয়াছে ১৮২৮ সনে। ইহা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭শ দিবস-দ্বারা গৃহীত করা হয়। কিন্তু এতগুলি বিষয়ের পরিবর্তে, দুই চারিটি অত্যাশ্চর্য্য বিষয় লইয়া এক একখানি বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইলে ভাল হয় না কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিনথিয়া"

পৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে শয়-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আ: শিশি ডা: মা: সহ—২৫ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লি:

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাউথ ৮৮১

সভ্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া

লিমিটেড

বাংলার ব্যাংকিং জগতে বিরাট বিপ্লব সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অল্পমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

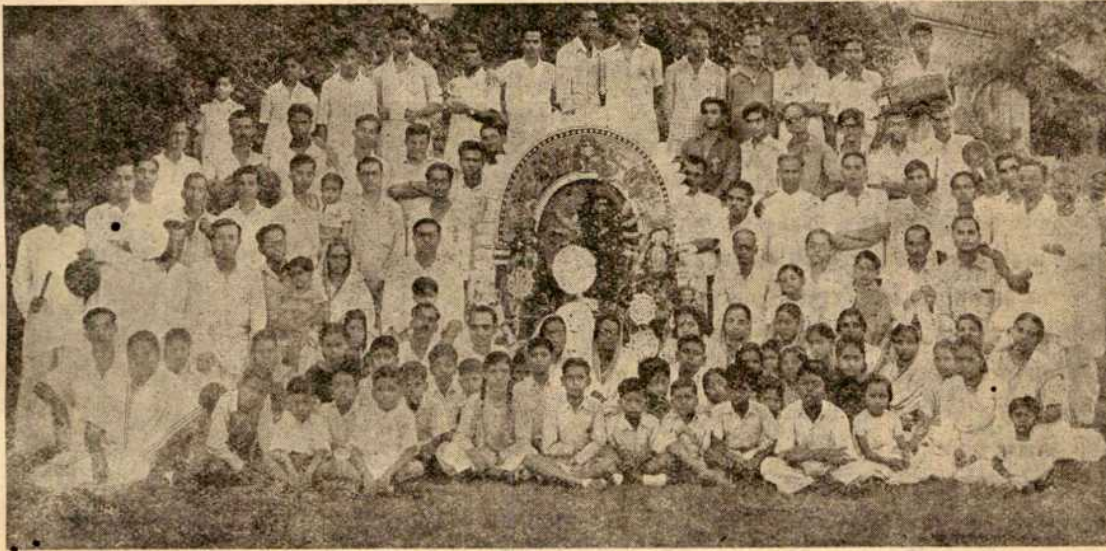
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জি



বেরিলিতে ছুর্গোৎসব

এবার উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে বিপুল সমারোহে ছুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এইচ. কে. কর পূজা-কর্মটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

গুলির মধ্যে চারটি বুনিয়াদী পদ্ধতিতে চলে। এগুলির শিক্ষকেরা ওয়ার্ডা অথবা বলরামপুরে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যালয়গুলিতে বোর্ড যে সাহায্য দেন তাহা যৎসামান্য। তাই পূর্ব বঙ্গের মত এবারও শিক্ষকের



বেরিলিতে ছুর্গোৎসব

স্থানীয় লোক ও প্রবাসী বাঙালীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় এবারকার পূজাহুতান সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বেরিলিতে সমাগত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কীর্তনও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

হরিজন সেবক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় বোর্ড

(১৯৫০-৫১)

৩১-৩-৫১ তারিখান্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী

এই বৎসর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানকর্তৃক ৪০টি হরিজন বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩১টি পশ্চিমবঙ্গে এবং বাকি ৯টি পূর্ব পাশ্চাত্যে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৬৮৪ জন হয়। পূর্ব বঙ্গের ঐ সংখ্যা ছিল ১৪০০। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-

বৃদ্ধির সহিত মাসিক ৫ হারে মাগুসি ভাতা অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন কারণে আটটি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে, দুইটি নূতন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। নূতন বিদ্যালয়গুলির একটি হাওড়া জেলার, অপরটি মেদিনীপুরে। বোর্ডের পক্ষ হইতে নবদ্বীপে দুই বয়স্ক মহিলা-শিক্ষা কেন্দ্রও চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির সাহায্য বাবদ বোর্ড ৮,২৬৯ টাকা ও মাগুসি ভাতা বাবদ ১,৩৬৬৫১০ সাহায্য দিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ২,৬১৫ টাকা। বিদ্যালয়ে সাহায্যের পরিমাণ মোট ১০,২৫০৫১০ টাকা। ৩টি হরিজন ছাত্রকে বৃত্তি বাবদ ৩২৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

দুই জন উৎসাহী কর্মী পাওয়া গিয়াছে। একজন বিদ্যালয়-গুলি পরিদর্শন করেন। অপর জন ভ্রাম্যমাণ চরকা-শিক্ষক।

শহরের মেথরদের কল্যাণ-চেটায় এই বৎসর ৪৭১৪০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। হাওড়ায় একটি মেথরবন্দিতে সেবাকার্য চলিতেছে। হরিজনদের সামাজিক মর্যাদালাভ হইবে এই আশা লইয়া এ প্রচেষ্টা শুরু করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রের উৎসাহী কর্মী জীলালবিহারী প্রধান ওয়ার্ডার শিক্ষা-এহণের ক্ষমতা পাইয়াছেন। পরে এই কেন্দ্রে ত্রিমধুসূদন ত্রিবাণ্ডব গণ ৯ মাস যাবৎ ভগবতী বস্তিতে সাফাই ও পরিচ্ছন্নতার অভিযাসম্পন্ন করে চেষ্টা করিতেছেন। এই কর্ণে প্রতিবেশীদের সহায়ত্ব পাইয়া হইতেছে। সম্ভ্রতি এ স্থানে একটি বহু-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইতেছে।

প্রচারকার্যে ৩০১৮০/০ টাকা খরচ হইয়াছে। গাখী জয়ন্তী দিবস, গাখী প্রয়াগ দিবস, ঠকুর বাপার জন্মদিন ও যুত্ম দিবসে সজ্জের পক্ষ হইতে জনসভার আয়োজন করা হয়। একটি সভায় ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু এবং আর একটিতে ভূতপূর্ব কংগ্রেস-নত্যাগিত ত্রীপুরুষোত্তমদাস টঙ্কন সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিকট বোর্ড ৩,৫০০ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ঠকুর বাপার পরলোকগমনে সজ্জের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে বঙ্গীয় হরিজনদের দারুণ দুর্ভিক্ষপাকের দিনে এই বৃদ্ধ জনসেবক বাংলার ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ঠকুর বাপার দেহাবসানের পর ত্রিনিভোগী হরি হরিজন সেবক সজ্জের সম্পাদক হইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া সজ্জের কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সজ্জের সহযোগী হরিজন উপান বোর্ড এবং হরিজন পুনর্বাসতি বোর্ডের পরিচালিত দুইটি পাঠশালা পরিদর্শন করেন এবং বঙ্গীয় বোর্ডের সদস্যদের সহিত মিলিয়া হরিজন সেবা বিষয়ে পরামর্শ দেন।

এই প্রতিষ্ঠানের বঙ্গীয় বোর্ডের সম্পাদক ত্রিপ্রিয়রঞ্জন সেন।

বাঁকুড়া ত্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

আলোচ্য বর্ষে মঠে ১৫২টি বর্ষস্বত্বীয়া ক্লাস এবং নিম্নমিত্ত-ভাবে ত্রীরামনাম সংকীর্তন করা হইয়াছে। পুস্তকাগার এবং সাধারণ পাঠাগারও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ১৭৪২।

মিশন বিভাগ : মিশনের ভূবাবধানে বাঁকুড়া শহরে দুইটি এবং রামহরিপুর গ্রামে একটি মোট ৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। আলোচ্য বর্ষে এই তিনটি চিকিৎসালয়ে মোট ৬৬০৪৫ জন নূতন ও পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে এবং মোট ১৫২ জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

বাঁকুড়া মিশন প্রাকগৃহ রোগিগণের অস্থায়ী আবাসে মোট ৩০৮ জন রোগী অবস্থান করিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে মোট সাত জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২ জন ছাত্র হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিয়াছে।

সারদানন্দ ছাত্রাবাসে থাকিয়া দশ জন ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই বৎসরে রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬০। একটি বালিকাও এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

মিশন বিভাগ আলোচ্য বর্ষে মোট ৪০ জন ছাত্র ব্যক্তিকে ১৬১৮/০ আনা সাহায্যদান করিয়াছে। মিশনের ১৯৫০ সালের মোট আদ, ৬৮৮১৮০, তদ্ব্যতীত বিভিন্ন জনহিতকর কর্ণে ব্যয় হইয়াছে ৬৭৪০২১৫ পরমা।

মুক-বধিরদের সমাবেশ

কলিকাতার মুক-বধির বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশ ভব্য ভারতবর্ষে মুক-বধির শিক্ষা-প্রচেষ্টা শুরু হয় গণ



মুক-বধিরদের সমাবেশ

শতাব্দীর শেষ দশকে। মুক-বধির বিদ্যালয়ের অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা বামিনীমোহন মজুমদার দীর্ঘকাল ইহাদের সেবায় রত ছিলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহ কেহ এই কার্যে বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। ত্রীমুক্ত নলিনীমোহন মজুমদার মুক-বধিরদের সাধারণ ও শিশুশিক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে উভোগী। তিনি সম্ভ্রতি স্বীয় ভবনে মুক-বধিরদিগকে শিক্ষা ও সমাজগঠন মূলক ছাত্রাচিহ্ন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ আয়োজনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

ডক্টর শৈলেশচন্দ্র সেন

ত্রীশৈলেশচন্দ্র সেন সম্ভ্রতি "Sugarcane Chemistry (ইক্ষু রসায়ন) সম্বন্ধে পিসিস লিখিয়া ডি-এসসি ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন। ডক্টর সেন দারভাঙ্গা জেলার পুয়া ইক্ষু গবেষণা-কেন্দ্রে কর্ণে নিযুক্ত আছেন। বিহারে 'ইক্ষু রসায়ন' বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী আর কেহ নাই। তার জন রাসেল, ডি-এসসি

এক. আর. এস., ডক্টর ডবলু. জি. ওপ, ডি-এসসি. এক. আর. এস. ও অধ্যাপক রিচার্ড ডেডকিন্স—এই তিন জন মনীষী ডক্টর সেবের খিসিস পরীক্ষা করেন।

ডক্টর সুনীলচন্দ্র রায়

ভারত পূর্বঘেটের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফেলো জীহুনীল-চন্দ্র রায়, এম্-এ, “প্রাচীন কাম্বীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি” সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অক ফিলসফি ডিগ্রী পাইয়াছেন। তাঁহার খিসিস অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক আল্টেকার ও অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী কর্তৃক পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। ডক্টর রায় হুঁহুড়ার খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী জীহুনীলচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র।

পরিমল রায়

সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে পরিমল রায় পরলোক-গমন করিয়াছেন। দিল্লী ছিল তাঁহার কর্মস্থল। অর্থনীতিতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কর্মব্যস্ত জীবনের কান্কে কান্কে তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করিতেন। বাঁচিয়া থাকিলে বাংলা-সাহিত্যে রচনা করার ক্ষেত্রে তিনি

একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারিতেন। তাঁর লেখায় যে সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রশংসনীয়।

মণীন্দ্রভূষণ সিংহ

গত ২২শে আখিন বাকুড়ার জনপ্রিয় দেশসেবক মণীন্দ্র-ভূষণ সিংহ ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাকুড়ার ভাটুল গ্রামের রাধিকাপ্রসাদ সিংহের ছোট পুত্র ছিলেন। শৈশবে দেওবরে উচ্চ ইংরেজী স্কুল হইতে তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন এবং বিহার প্রদেশ হইতে মাজদার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তিলাভ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া ল কলেজে আইন অধ্যয়নকালীন ইতিহা পূর্বঘেটের ‘ফরেন’ আপিসে চাকুরি গ্রহণ করেন। তৎকালে ফরেন আপিসে এদেশীয় কর্মচারীর সংখ্যা ছিল অল্প। আত্ম-সম্মানে আবার লাগিলে ইংরেজ সহকর্মীদের তিনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না, সেইজন্য তাঁহাদের সহিত প্রায়ই তাঁর বচসা হইত। ইউরোপের প্রথম যুদ্ধের সময় তিনি সহসা চাকুরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতার ফিরিয়া আসেন। সেই সময় হইতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করি-



সৌন্দর্য রক্ষায় অপরিহার্য

শীতের কক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য লাভিতা বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মের কোমলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। দিব্যভাগে লাগি স্নো ও ক্রীম লাগি ক্রীম ব্যবহার্য্য।

স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কোসমিক্যাল



বার একটা প্রবল আকাজকী তাঁর স্বপ্নের আগুরুক হয়। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি তাঁর জন্মভূমি বাকুড়ার দেশ-সেবার আত্মনিয়োগ করেন। ঐক্মনিলবরণ রাসের সহিত যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে তিনি কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৮ সালে তিন বৎসরের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বার বার তাঁহাকে আটক রাখা হয়। তিনি পনের বৎসরকাল বাকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বাকুড়া সিমিলানীর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। বাকুড়া স্কুলবোর্ড, বাকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, বাকুড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, হিন্দু স্কুল কার্যনির্বাহক সমিতি এবং আরও অনেক সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি বকীর আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং ঐ সময় কংগ্রেস এসেম্বলি পার্টির সম্পাদক মনোনীত হন।

গণেশচন্দ্র তলা

কাঁথির প্রবীণতম সাংবাদিক গণেশচন্দ্র তলা পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ধেরিনীপুর জেলার যখন কোনও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল না সেই সময় কাঁথিতে আনালোক বিস্তারের অগ্রদূত পরলোকগত মহুন্দর দাস মহাশয় 'নীহার প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং "নীহার" (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রকাশ করেন। শুধুমাত্র দিনে কাঁথির তার একটি দূরবর্তী, দুর্গম ক্ষুদ্র শহরে সংবাদপত্র পরিচালনা হুঃসাহসের কাজ ছিল। প্রথম হইতেই গণেশচন্দ্র এই পত্রিকার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন এবং যুত্মার পূর্ব পর্যন্ত তাহা তিনি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। বহুশী আমোলনে "নীহার" গবর্নমেন্টের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে কারণে মহুন্দর বা গণেশচন্দ্র কেহই দেশসেবার পক্ষাংগন হন নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ "নীহার" তাঁহার একমিষ্ট সেবা পাইয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার স্বর্গী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সত্যকিঙ্কর মিত্র

কলিকাতা ছোট আদালতের সুপরিচিত ব্যবহারস্বীকৃত ঐক্মনিকর মিত্র গত ১৫ই কার্তিক তাঁহার ২৯এক, ক্রীক রোহিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। যুত্মাকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

পাঁচমহলের সুপরিচিত মিত্র পরিবারের সারবাহাঙ্গর সারকান্য মিত্রের ষোষ্ঠ পুত্র সত্যকিঙ্করবাবু কলিকাতা ছোট স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। অধ্যয়িক হিসাবে সত্যকিঙ্করের বিশেষ সুনাম ছিল এবং তিনি ভাল খেলোয়াড়রূপেই পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি ছোট্টার স্পোর্টিং ক্লাবে ক্রীড়া খেলিয়াছেন। গত ১৯৩৯ সালে সন্ন্যাসরূপে আক্রান্ত হইবার পর তিনি আইন ব্যবসায় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

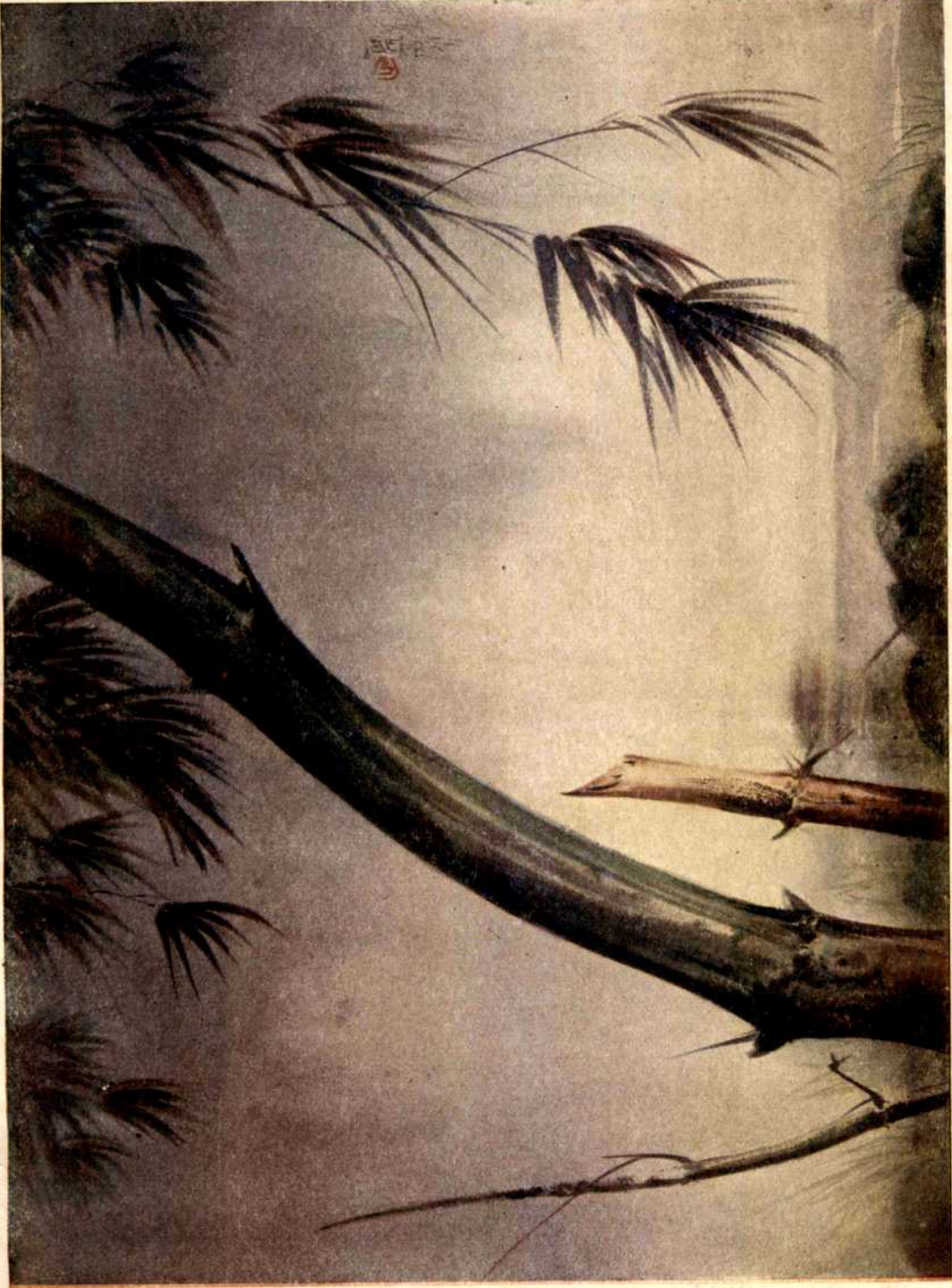
পাটনার ১৯৩৭ সালে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ইহার চতুর্দশ বৎসর পরে পাটনাবাসী বাঙালীরা আবার বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ১৯৫১ সালের অধিবেশন পাটনার অহুষ্ঠিত করিতে স্থির করিয়াছেন। ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে ডিসেম্বর—এই তিন দিন সম্মেলনের অহুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

মূল সম্মেলনটি আটটি শাখার বিভক্ত। ডাঃ শ্রীকামাশ্রমদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। ঐক্মনুল-চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আটটি শাখা ও প্রত্যেকটির নির্বাচিত সভাপতির নাম নীচে দেওয়া হইল :

সাহিত্য শাখা—আচার্য্য ত্রীকৃষ্ণমোহন সেন (শান্তি-নিকেতন), ললিতকলা শাখা—শ্রীদিলীপকুমার রায় (পণ্ডিতেরী), বিজ্ঞান শাখা—অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বৃহত্তর-বঙ্গ শাখা—ডাঃ শ্রীরমেশ-চন্দ্র মহুন্দর (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়), ইতিহাস শাখা—অধ্যাপক শ্রীমরেন্দ্রকৃষ্ণ হিংহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), মহিলা শাখা—(সভানেত্রী নির্বাচন এখনও হয় নাই), শিশু-সাহিত্য শাখা—শ্রীমুখীরচন্দ্র সরকার (কলিকাতা), নিবিল ভারতীয় সাহিত্য শাখা (আলোচনা)—পণ্ডিত শ্রীহাজারী-প্রসাদ দিবেদী (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)।

সম্মেলনে বাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রমোদাহুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হইবে।

ব্যারিষ্টার পি. আর. দাশ এবং পাটনা হাইকোর্টের জজ এস. কে. দাশ এই অহুষ্ঠানের হই জন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা। শ্রীমুখাপতি গুপ্ত ও অরুণচন্দ্র রায় ইহার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সম্মেলনের কার্যালয়ের ঠিকানা লালকুঠি, এগজিভিশন রোড, পাটনা।



হালুকা হাওয়া
শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী

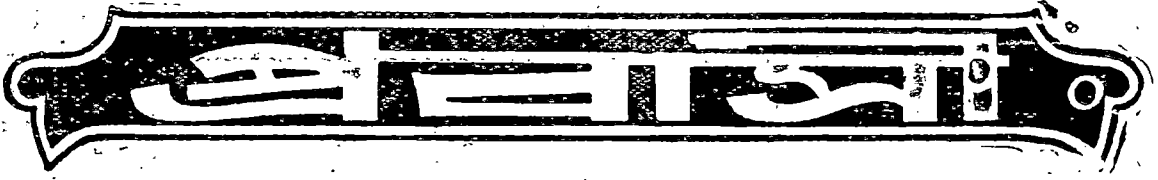
অবানী প্রেন্স, কলিকাতা



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৭ই আগস্ট, ১৮৭১

মৃত্যু : ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১



“সত্যম্ শিবম্ অমরম্
নামমায়া বলহীনেন লভ্যম্”

১১শ ভাগ }
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৮

{ ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের আর একজন কৃতী সন্তান-দেহত্যাগ করিলেন, যিনি কেবল রক্তের সম্পর্কে নয়—ভাব-চিন্তা-আদর্শের সম্পর্কে, কবিগুরুর সমধর্মী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার নিকট হইতে তিনি কতভাবে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন “জোড়াসাঁকোর ধারে”, “ঘরোয়া”, “আপন কথা” প্রভৃতি বইয়ে। চিরকালের জন্য যুগের বালকবালিকাদের আনন্দবিধানের আয়োজন করিয়া গিয়াছেন তিনি “রাজকাহিনী”, “ক্ষীরের পুতুল” প্রভৃতি পুস্তকে। ভারত-সংস্কৃতির ধারক এবং মরমী ব্যাখ্যাতা অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা পাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের “বাগেশ্বরী” বক্তৃতামালার মধ্যে।

যাহারা বাংলার তথা ভারতের অন্তরাত্মাকে বিদেশীর ঘৃণা ও অবহেলার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের শিল্প ও ললিতকলাকে ধূলিস্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরুজ্জীবিত গৌরবে অভিষিক্ত করিয়া, রত্নকল্প উজ্জল রূপে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব যদি কাহারও প্রাপ্য হয় তবে তাহা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের।

আচার্য্য শব্দের ব্যবহার আমরা জানি না, তাই যোগ্য অযোগ্য সকলকেই আমরা ঐ আখ্যা দান করিয়া থাকি। যিনি কোনও শাস্ত্রে কোনও নূতন বিধান বা সংজ্ঞা দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি মনীষিগণের সম্মুখে নূতন জ্ঞানের পথ নির্দেশ করিয়াছেন বা যিনি কোনও বিচার বা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নূতন আলোকের আধার স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আচার্য্য।

ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ললিতকলার স্থান নির্দেশ ও তাহার উদ্ধারের পথ প্রদর্শন বাংলার এই সন্তানেরই পুরুষকারে সম্ভব হয়। তিনি যে শুধু পথ নির্দেশ

করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার উপদেশে ও ব্যাখ্যায় এবং তাঁহার অমৃতময় তুলিকার সক্রিয় সঞ্চালনে ভারতের ললিতকলা নূতন জীবনলাভ করে। দেশে-বিদেশে তাঁহারই চেষ্টায়, তাঁহারই উদ্দীপনায় ভারতের চিত্রকলা খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়। সুতরাং আচার্য্য আখ্যায় তাঁহার অধিকার সুপ্রাপ্ত ও তর্কের অতীত।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে কতিপয় বিদেশীর পদলেহী “লক্ষশাটপটাবৃত” মুখ, বাচালতার দ্বারা তাঁহার গৌরবকে ম্লান করার চেষ্টা করায় দেশবাসীর দৃষ্টিভ্রম ঘটয়াছিল। কিন্তু সে বিভ্রম ক্ষণিক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার তুলিকা ও তাঁহার লেখনী স্বর্ণাক্ষরে বাহা লিখিয়াছে এবং আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছে তাহা অজেয় ও অক্ষয়।

বাংলার আকাশ আজ তমসাক্ষর। যে কয়টি তারকার আলোক আমাদের অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতের আশাপথ নির্দেশ করার জন্য অবশিষ্ট ছিল তাহার মধ্যে অতুজ্জল জ্যোতিষ্ক আজ অপসারিত হইল। আমাদের নিকট রহিল কেবল স্মৃতি। যাহা নশ্বর তাহা পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাহা অক্ষয়, অমর, বাহা পুরুষকারে এবং অজেয় বিশ্বাস ও অদম্য প্রয়াসে অর্জিত, তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে বাংলা মায়ের মানসপটে। আত্মবিস্মৃত বাঙালী এখনও বুদ্ধিতেছে না সে কি হারাইল, যেদিন বুদ্ধিবে সেই দিনই দেখিবে যে, সেই অমরজ্যোতি বাহা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের স্বপ্নে ও উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ম্লান হইতে পারে কিন্তু নিকরূপিত হইতে পারে না।

এই মহামানব গত ১২শে অগ্রহায়ণ বুবার রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাজলি নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

কীর্ত্তিবন্ত স জীবতি।

বাংলায় নির্বাচন

বাংলায় এবারকার নির্বাচনে ভোটদাতাদের সম্মুখে এক বিষয় সমস্তা দেখা দিয়াছে। প্রার্থীদল সকলেই নির্বাচিত হইলে পরে বাংলাকে ভূবর্গে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞা দিতেছেন। নিজের বা নিজ দলের কৃতিত্বের পরিচয় দানে সকলেই শতযুগ। কংগ্রেস ও দলগত ও সমষ্টিগত ভাবে নির্বাচনে দাবি করিতেছে যে, দেশকে স্বাধীন করা হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে সমষ্টিগত করিয়া দেশবাসীর দখলে আনা, জমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা, হুভিক্ষ তৈরী করা, বাণিজ্য পুনর্বিধান করা, সমস্ত পূর্ববস্ত্রের ভোটাধিকার দান, দেশে বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, মদ্যপান নিবারণ, প্রচুর খাদ্য উৎপাদন, সেচ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, বর্ষ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপন ও অহুৎ-উদ্ধার ইত্যাদি সব কিছুই ইহা করিয়াছে। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনার অবকাশ কর্তব্য নির্বাচকের হইয়াছে জানি না।

স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশবাসীর পূর্বপুরুষগণের দান অতি বিরাট এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অবদান অতি মহান একথা কে অস্বীকার করে? কিন্তু এ গৌরবের দাবি বাহারা করিতেছেন তাঁহাদের কৃতিত্ব ইহাতে কতটুকু? দেশীয় রাজ্যের উদ্ধারে সর্দার প্যাটেলের অংশ গৌরবময় কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেসের বাহিরের বহু লোকের ক্ষুদ্র-বৃহৎ অশেষ কীর্তির ইতিহাস কংগ্রেস প্রজ্ঞের রাশিতে চাহিতেছে। জমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা ও আরম্ভ হয় ব্রিটিশ আমলে এবং ইহার ব্যবস্থার বাস্তবহীনের প্রয়াস ও নির্দেশ কংগ্রেস অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। হুভিক্ষ নিবারণে কংগ্রেস সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে তাহা করা হইয়াছে তাহাতে সমস্ত দেশ সন্তোষবিহীন এবং দুঃস্বাদোপকৃত কলুষ ও অনাচারে জর্জরিত হইয়াছে। বর্তমানে এইমাত্র বলা যায় যে, হুভিক্ষ সাময়িক ভাবে তৈরী হইয়াছে কিন্তু রোগ অপেক্ষা তাহার প্রতিকার ভীষণতর হইবার নিদর্শন দেখা দিয়াছে এবং যেভাবে কংগ্রেসের অধিকারীবর্গ ব্যবস্থা করিয়া চলিতেছেন তাহাতে কংগ্রেসেরই দেহ জঘন্যভাবে কলুষিত ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। অল্প সকল দাবি ও ব্যঙ্গ ও কোড়াকের ব্যাপার। শিক্ষা, মাদক নিবারণ, বাণিজ্য পুনর্বিধান, প্রাইমারী শিক্ষা, সেচ ও খাদ্য উৎপাদন প্রায় প্রত্যেকটিই অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত। বানের জলের ন্যায় অর্থব্যয়ে সামান্য ফলই দেখা যাইতেছে। অহুৎ-উদ্ধার ও বর্ষ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনের কীর্তি বাহারা তাহার অমূল্য জীবন রক্ষার চেষ্টা মাজ ও বাহারা করে নাই তাহারাই সেই গৌরবের সবটাই দাবি করিতেছে, ইহা ভারতের অদৃষ্টের পরিচয়।

অন্য সকল দলও নানা কীর্তির দাবি-দাওরা করিতেছেন, তাহাও অনেকের ক্ষেত্রে অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক।

দাবি বাড়িয়া প্রতিজ্ঞার প্রবল আগিলে দেখা যায় অবস্থা আরও অন্ধুত। “আমার দলকে রাষ্ট্রের দণ্ডযুক্তের অধিকার দাও, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব”—এ প্রতিজ্ঞা সকলেই দিতেছেন, শুধু মাত্র সাধারণের রাজপদ লাভের পন্থার নির্দেশ বিভিন্ন। তাহার পর স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিজ্ঞা। ইহাও অশেষ ও বিভিন্ন। যে বাহা খুশী অস্বীকার করিতেছে, “তৎপরে যদুভবিষ্যতি তদুভবিষ্যতি”। ফলে নির্বাচন একেবারে প্রহসনের পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নির্বাচকবর্গও, অন্ততঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এই নির্বাচনকে প্রহসন বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মতই দেখিতেছেন। কর্তব্যমূল্যেই দেখেন যে, তাঁহারা যদি চকুলজ্জার খাতিরে, বা ভাবের বশে, বা হেলাখেলার অযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচনে সমর্থন করেন তবে বাংলা ও বাঙালীর চিতায় আর একটি কাঠখণ্ড যোগানই হইবে, যতপ্রায় বাঙালীকে প্রাণদান করা হইবে না।

বাংলা ও বাঙালী আজ জন্তসর্ষব, শোষিত, দলিত ও মরণোন্মুখ। আরও পাঁচ বৎসর যদি এইভাবে যায় তবে বাংলার সন্তানের যতদেহের উপর অশ্রুপাত করা তিন্ন অল্প কিছু করার থাকিবে না। এসকল কথা দেশবাসী বুঝিয়া দেখুন ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ আহ্বান।

যে লোক বাংলার ও বাঙালীর দুঃবকষ্ট প্রতিনিয়ন্ত্রণ অহুত্ব করে, যে লোক বাংলার দুর্দশার প্রতিকার-চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে এবং সর্বোপরি ইহার প্রতিকার-কল্পে বাহার বুদ্ধি, ক্ষমতা ও স্বার্থত্যাগ আছে সেই লোকই নির্বাচনের যোগ্য। অক্ষম বা স্বার্থপর লোক অযোগ্য ও বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

যে লোক চরিত্রবান, দূরচেতা ও সাহসী, সে-ই নির্বাচনের যোগ্য। অশক্ত ও সুবিধাবাদীর অযোগ্যতার সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভোটদাতা বিচার করুন, এখনও সময় আছে যে ভূমি প্রতিজ্ঞার মূল্য কতটা। যিনি বা বাহারা প্রতিজ্ঞা দিতেছেন তাঁহাদের সে প্রতিজ্ঞা রক্ষার কমতাই বা কতটুকু এবং তাঁহাদের অতীত ইতিহাসে তাহার নিদর্শনই বা কি আছে?

ভোটদাতার জানা প্রয়োজন যে, তাহার ভোটদানের অধিকার কণিকের মাত্র, কিন্তু তাহার “কলাকল তাঁহাকেই, সগোষ্ঠী ও সবাকবে, ভোগ করিতে হইবে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া।” সুতরাং প্রার্থীর যোগ্যতা বিচারের অধিকার তাঁহার আছে ভোটদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। “কথা দিয়াছি” বা “একটা ভোট অযোগ্য লোক পাইলেই বা কি”—ইহা যদি তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে, বা অস্ববিধাস তাঁহাদের দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করে তবে আগামী পাঁচ বৎসর কোনও অভিযোগ করার অধিকার তাঁহাদের থাকিবে না।

কংগ্রেসী সেকুলারত্ব (ধর্ম-নিরপেক্ষতা)

“(১) আমিন নামে একটি লীগপহী মুসলমান ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় এরূপ ‘সুখ্যাতি’ অর্জন করেছিল যে, সুমারদীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেই সময় অসংখ্য অভ্যাচার ও অনাচার সে নিজে ও তার সহকারীরা করিরাছে। ঐ সকল অপরাধ অমুঠান করছে এরূপ বহু ছবি আঁকও খুঁজলে পাওয়া যাবে। দেশ বিভাগের পর সে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল। গত বছর সে ফিরে আসে। আর যার কোথা, Prodigal son ফিরে এলো। ঘরের ঘোঁটাঘোঁটা বাছুরটি কাট এবং ক্ষুধা ও ভোজের ব্যবস্থা কর। কংগ্রেসের সেকুলারী মহাপুরুষগণ তাকে লুকে নিলেন। আমিন হ’ল খড়্গপুর কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি। মাস ছয়েক হ’ল এহেন রঙটিকে তথাকার ‘অবৈতনিক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে। কারণ? আমিনের হাতে ৪,০০০ মুসলমান ভোট রয়েছে।

“(২) বুদাবক্স হচ্ছেন লীগপহী ব্যবস্থা-পরিষদ-সদস্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় তিনিও ছিলেন সুমারদীর অঙ্গভূম হত। সেকুলারী রাজত্বের পর লীগপহীদের বাতাবিক নিয়মে তিনি আসেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসপহীরাও তাকে লুকে নিলেন। গত বছর পূর্ববঙ্গ মুসলমানদের পুনর্বাসতির জন্য এই ভঙ্গলোককে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকার হিসাব চাওয়া হলে জানা গেল তার কোন পাত্তা নাই। পীড়াপীড়ি করলে উত্তর দিলেন, আমি কোন রসিদ মিই নি। আরও চেপে ধরা হলে স্বয়ং ডাক্তার বিধান রায় এগিয়ে এসেন তাঁর পক্ষপৃষ্ঠে বুদাবক্সকে বাঁচাবার জন্য। ‘বুদাবক্স লোকটি ভালই—ভবে যে লোকগুলিকে তিনি টাকা দিয়েছিলেন, তারা যদি পাকিস্তানে পালান তা হলে তিনি আর কি করবেন?’

“ভঙ্গলোক আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিট পেয়েছেন।”

শ্রীজবাহরলাল নেহেরু যে “জান-পান্ডি” তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না যে, কোন রাষ্ট্রের নর-নারী যে ধর্ম-বিশ্বাস বশে চলে এবং ঐ বিশ্বাসের নির্দেশে যে সব আচার-অমুঠান পালন করে তৎসম্বন্ধে সেই রাষ্ট্র কি করিয়া নির্বিকার নীতির অমুসরণ করিতে পারে। কোন যুগে তাহা সম্ভব হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া বড়ই করিয়া থাকেন। তাহা যে মিথ্যা তার দুইটি প্রমাণ পাওয়া যায়, আজ পর্যন্ত কোন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি মনোনীত হইতে পারেন নাই এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোন অ-কম্যুনিষ্ট কোন উচ্চপদে নিয়োজিত হন নাই।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য পরিকল্পনা

গত মাসের “প্রবাসী” পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা

বলিয়াছিলাম যে, ভারতরাষ্ট্রের নর-নারীর জীবনকে নুতন করিয়া গঠন করিবার জন্য অনেকের অনেক রকম পরিকল্পনা আছে, সুতরাং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরই থাকিবে না কেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত সমাধানের জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৎসম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা করেন। তার চার-পাঁচ দিন পরে আর একটি সম্মেলনে তিনি নানা সংখ্যা-তথ্য-বহুল একটি বিবৃতি দান করেন, এবং তাঁর প্রভাবে আগামী নির্বাচনে জয়লাভের আশা করেন। যদি পরিকল্পনা পেশ ও পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকিত, তবে ডাঃ রায়ের মত উদ্বেগের সাকল্য আমরা দেখিয়া যাইতে পারিতাম।

কিন্তু বিশ্ববিধানে সাধারণতঃ তাহা হয় না। ডাঃ রায় ভাগ্যবান লোক, তাঁহার বেলায় এই বিধান উপটোষ গলে আমরা সুখী হইব। তবুও সংশয়ী মন ইতিহাসের শিক্ষা অগ্রাহ করিতে পারে না, এবং সেইজন্যই নিজের সংস্কার অমুসারে বলিতে বাধ্য হয় যে, সংখ্যা-ভেদের সংগ্রহ ও সমাবেশে নয়, ভাবের পবিত্রতা, কর্মের সফলতা ও ইচ্ছার একাগ্রতা পরিকল্পনাদিকে আশাহুগল রূপদান করে। এই তিনটির সমবায় বা সম্মিলন আমরা দেখিয়া যাইতে পারিলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মন খুলিয়া অভিনন্দন জানাইব।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাংলাদেশে শহর ও গ্রামগুলি নিত্যন্ত ঝাপছাড়া ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে গ্রাম্য জীবনের সহিত নাগরিক জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে বাড়ালী জমির উপর একটু বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছে। ফলে চাষের উপর অধিকাংশ লোক নির্ভর করিয়াছে, কিন্তু পরিণামে কৃষিকে উন্নত না করিয়া জমাগত অবনতির পথেই লইয়া গিয়াছে। কারণ শহরের সহিত অর্থাৎ বাজারের সহিত যোগাযোগ না থাকায় দালালের মারফত কাজ করিতে হয়, সুতরাং লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা অপেক্ষাকৃত কৃষী ও উদ্যোগী তাহারা শহরে নুতন জীবিকার অবেশণে বাহির হইয়াছে। যাহারা অক্ষম তাহারা ই এখন চাষের কাজে নিযুক্ত আছে। অপর পক্ষে শহরগুলি এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে এই সকল গ্রাম-উদ্যোগী মধ্যবিত্তকে বাসস্থান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। শহরের অসংখ্যকর বাসস্থান ও বস্ত্রী জীবন তাহাদের কৃত্রিম জীবনযাপনে বাধ্য করিতেছে। টাটকা খাদ্যবস্তুর ও যুক্ত আলোবাতাসের অভাবে শহরবাসিগণ স্বাস্থ্যহীন ও হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িতেছে।

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন গ্রাম ও শহরগুলির মধ্যে একটি অর্থনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন-পরিকল্পনা অস্থায়ী জনপদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার পঞ্চাশ-ষাটটি গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রামসমষ্টি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার বিচার করিয়া বলা যায় যে, এইরূপ এক-একটি গ্রামসমষ্টিতে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক থাকিবে এবং উহার পরিধি হইবে আনুমানিক ৭৫ বর্গমাইল। এই নব-গঠিত শহরগুলির প্রত্যেকটিতে এক হইতে দুই হাজার মধ্যবিত্ত পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল শহরে তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। সেখানে শিক্ষা পাইয়া তাহারা নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জরাজীর্ণ প্রস্তুত করিবে। এই সকল জরাজীর্ণ পঞ্চাশ-ষাটটি গ্রামের লোকদের মধ্যে আবার বিলি-বন্টন করিয়া দিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলের লোকের চাহিদা মিটাইয়া যদি কিছু উন্নত থাকে তাহা তখন কয়লা, কেরোসিন, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি জরাজীর্ণ বিনিময়ে রপ্তানী করা হইবে। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সর্ব-প্রকারেরই ব্যবস্থা থাকিবে এবং জনসাধারণকে সকল বিষয়েই সুযোগ দেওয়া হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অন্ততঃ বিশটি ক্ষুদ্র শহর স্থাপনে সক্ষম হইবেন। প্রত্যেকটি শহরের উন্নয়নের জন্য মোট চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ও অজ্ঞাত বিবিধ প্রয়োজনে আরও বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। আদর্শ নগর নির্মাণের জন্য প্রধান প্রধান ব্যয় হইবে এইরূপ :

- ১। ৫ শত একর জমি দখল (একর প্রতি ২ শত টাকা)— ১ লক্ষ টাকা।
- ২। ১ সহস্র গৃহ নির্মাণ (প্রত্যেকটি ১১০ হাজার টাকার)— ১৫ লক্ষ টাকা।
- ৩। পথ ঘাট, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী— ৫ লক্ষ টাকা।
- ৪। ১ হাজার লোককে বিভিন্ন ব্যবসারে শিক্ষাদান (প্রত্যেকের পিছনে ৭৫০ ব্যয়) ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
- ৫। কলকারখানা নির্মাণ— ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
- ৬। ৬ মাসের কলকারখানার সাজসরঞ্জামের ৮ লক্ষ টাকা।
- ৭। বিবিধ ব্যয় ... ২ লক্ষ টাকা।

মোট ৪০ লক্ষ টাকা

৬০টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য এইরূপ ব্যয় হইবে :

- ১। রাস্তা ২০ মাইল পাকা, ১২০ মাইল কাঁচা ১২ লক্ষ টাকা।
- ২। জল ও চিকিৎসালয় স্থাপন ২ লক্ষ টাকা।
- ৩। গ্রামগুলির ক্ষুদ্র খাল খনন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
- ৪। মাথাপিছু ৭৫ টাকা হারে ৬ হাজার

গ্রামবাসীকে কৃষি সাহায্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

মোট ২০ লক্ষ টাকা

অতএব প্রত্যেকটি নগর নির্মাণ করিতে ব্যয় হইবে ৬০ লক্ষ টাকা এবং এইরূপ ২০টি নির্মাণ করিতে ব্যয় হইবে অন্ততঃ ১২ কোটি টাকা। এই টাকার এক অংশ রাজ্য সরকার ৭৭ বাবদ দিবে। অবশিষ্টাংশ ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের নিকট হইতে তোলা হইবে।

এই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাংলার মধ্যবিত্ত সমস্ত সমাধান স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যবিত্তের সমস্তা এত বিরাট যে কয়েকটি 'স্ট্যাটেলাইট' শহর ও কলোনী নির্মাণ করিয়া ইহার সমাধান হইবে না। দেশের যেখানে যত মধ্যবিত্ত আছে—সে পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশই হউক বা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাই হউক—তাহাদের সকলকে এক জায়গায় জড় করিয়া শহরে পুনর্বাসন করিলে কোন সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাহাদের সকলকে একত্রে পাওয়াও যায় না এবং সে চেষ্টাও বাতুলতা। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-চারী ও ধনী এই তিন শ্রেণীকে লইয়াই দেশ। ইহাদের প্রত্যেককে পৃথক বাসস্থানে সীমাবদ্ধ অবস্থায় রাখিলে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল হইবে না। উহা সম্ভবও নহে। দেহের সহিত নাড়ীর সংযোগ না থাকিলে দেহ যেমন নখর, গ্রাম হইতে দূর মধ্যবিত্তের জীবনও তেমনি মিথ্যা। শহরের কেরানীর পশ্চাতে যে বহু মধ্যবিত্ত সমাজ আছে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং স্ট্যাটেলাইট টাউন গঠন সমস্তার সমাধান নহে।

মধ্যবিত্তের সমস্তা আজ অধোপার্জনের সমস্তা। মধ্যবিত্ত সমাজে যুবক শ্রেণীর চাকুরী নাই। সরকার তাহাদের চাকুরী দিতে পারিতেছে না। তাহারা শিল্প বা ব্যবসায়ের যোগ দিতে পারিতেছে না—কারণ তাহারা হস্তসরঞ্জাম, তাহাদের পুঁজি নাই। বড় বড় ব্যাঙ্ক হইতে তাহারা টাকা ঋণ পায় না, ছোট ব্যাঙ্ক তাহাদের টাকা ঋণ দিতে সাহস পায় না। ইহাই তাহাদের প্রধান সমস্তা। তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা এত কাল কেহ তাহাদের করিয়া দেয় নাই। তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেরণায় নিজেরাই করিয়াছে।

তাহাদের বর্তমান সমস্তার সমাধানের উপায়—তাহাদের উপার্জনের পথ বিস্তৃত করিয়া দেওয়া। এখানেই লক্ষ্য রাখিয়া

শিল্পনীতি সাহায্য করিতে পারে। তাহার জন্ত সর্বপ্রথমে প্রয়োজন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সকল পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলিকে সত্বর কার্যে পরিণত করা দরকার। তাহার দ্বারা গ্রামে সত্তাদরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সহজ হইবে। ফলে নানা প্রকার কৃষিরশিল্প গড়িয়া তোলা যাইবে—যেখানে গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের আয়ের সংস্থান হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সমগ্র দেশের একটি অর্থনৈতিক সার্ভে করা—কোন স্থানে কি কি কাঁচামাল সহজলভ্য এবং কি ধরনের শিল্প সেখানে গড়িয়া উঠিতে পারে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা। অবশ্য এই ধরনের অনুসন্ধান একাধিক বার করা হইয়াছে এবং তাহা লিপিবদ্ধও আছে। তারপর বিভিন্ন আঞ্চলিক শিল্পের উপযোগী টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়া সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষা অন্তঃ তাহার নিজ নিজ গ্রামে গিয়া যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবে। সরকারী সাহায্যে ব্যাক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অসংখ্য শাখা গ্রামের মধ্যে এই সকল শিল্প বা কৃষি অঞ্চল-গুলিতে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। তাহার বিনামূল্যে মূলধন দান দিয়া এই সকল শিক্ষার্থীকে শিল্পে যোগদানে সাহায্য করিবে। যত দিন টাকা পরিশোধ না হইবে তত দিন ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ ইহার উপর তদারক করিবেন এবং সং ও সুপরামর্শ দিয়া শিল্পটিকে প্রতিষ্ঠা করিবেন। তত দিন নতুন শিল্পীও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ব্যবসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

প্রাচ্যে জাপান একমাত্র কৃষিরশিল্পের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সমতা মিটাইয়াছে। জার্মানীতে গোরেরিং-প্ল্যানও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সনে স্বরূপ করিয়া মাত্র চার বৎসরের মধ্যে গোরেরিং-প্লানে জার্মানীর মধ্য-বিত্ত সমাজের আর্থিক চেহারার আয়ুল পরিবর্তন সাধিত হয়।

একটি আঞ্চলিক ব্যাক ইচ্ছা করিলে জনসাধারণের কত উপকার সাধন করিতে পারে অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্যাক (Rural Bank of New South Wales) তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে, সাধারণ ব্যক্তিগণ বিভাগ ও সরকারী এজেন্সী বিভাগ, শেষোক্ত বিভাগটি সরকারের অর্থে চলে। ইহার কাজ কৃষি, শিল্প, গরু-ভেড়া পালন প্রভৃতি প্রয়োজনে কিংবা গৃহনির্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্ত কেহ ঋণ চাহিলে তাহাকে ঋণ দেওয়া হইতে স্বরূপ করিয়া যাবতীয় কাজের জন্ত জনসাধারণকে সাহায্য করা। ব্যাঙ্কের ৫০ জন অভিজ্ঞ ডায়ালগার আছেন। কেহ ঋণ চাহিলে ইহার তাহার সিকিউরিটির মূল্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু এইখানেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হয় না। কোম কৃষক-ভাল উৎপাদন না করিতে পারিলে,

তাঁহারা উন্নতির উপায় বিষয়ে পারিলে নিজেরা বলেন নতুন অল্প বিভাগ হইতে পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ব্যাঙ্কের একটি পাবলিক রিলেশন্স অফিসার আছেন। তাঁহার কাজ উন্নত কৃষিকার্যে কৃষকদের শিক্ষাদান এবং কিসে প্রদেশের আর্থিক উন্নতি হইবে তাহার সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার। এই ভাবে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহারা জনসাধারণকে সাহায্য করিতেছেন। দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামী হইলে এ কাজ এমন কিছু হ্রাস নহে, আমাদের দেশেও ইহা অনায়াসে করা যাইতে পারে। অর্থাভাবে ওজুহাত কোন কাজের নহে, সরকার উদ্যোগদের জন্ত দফার দফার যে অর্থ ধরাত্তী দিতেছেন তাহাতে না হইতেছে সরকারের লাভ, না দেশ-বাসীর, না উদ্যোগদের নিজেদের। এই অর্থদ্বারা এরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে ইতিমধ্যে অনেক কাজ পাওয়া যাইত বলিয়া আমরা মনে করি, এখনও সরকার শিল্পে মূলধন সরবরাহের জন্ত নিজে ঋণ করিয়া, বা শেয়ার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এরূপ ব্যাক প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। প্রাদেশিক সরকার অক্ষম হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এরূপ ঋণ দেওয়ার জন্ত বাধ্য করাইতে পারেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই ঋণ পরিশোধ করা যাইবে।

ডাঃ বিধান রায়ের পরিকল্পনাতে ২০টি ছাটেলাইট শহরের জন্ত ১২ কোটি টাকা খরচ হইবে। কিন্তু ঐ অর্থ যদি উপরোক্ত উপায়ে খরচ করা হয় তাহাতে অধিকতর অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের আর্থিক সমতার সমাধান হইবে।

ভূমি-সংস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সংবাদপত্রে বিরতি-প্রসঙ্গে গত ১৮ই নবেম্বর রবিবার জমিদারী প্রথা বিলোপ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, চাষ এবং চাষীদের বর্তমান দুর্দশার কারণ জমিদারী বা মধ্যবিত্ত স্বত্ব নয়। এই প্রথার উচ্ছেদ হইলেই যে শস্তোৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবে ইহাও ভুল ধারণা, যদি তাহা হইত তবে যে সকল অঞ্চলে রাস্তাওয়ারী ব্যবস্থা আছে তথায় বা এই রাজ্যের বাসমহলের অন্তর্গত জমিতে শস্তোৎপাদন বৃদ্ধি পাইত। ইহা ব্যতীত বর্তমান মালিকানা ও ভূমিস্বত্ব উৎখাত করিতে হইলে শাসনতন্ত্র অনুঘাতী ইহাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার জমির উপর পড়িবে এবং জমি হইতেই তাহা আদায় করিতে হইবে। সুতরাং নতুন ভূমিব্যবহার চাষীর প্রকৃত উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান ব্যবস্থাতেও কৃষক যদি বেশী উৎপাদন করে তবে তাহা কৃষকেরই প্রাপ্য, যেহেতু জমিদারের আয় আইন দ্বারা নির্দিষ্ট।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজন, ভূমির মালিকানা স্বত্ব চাষীর হস্তে অর্থাৎ অগ্রিক ও ভাগচাষী

এই উত্তর প্রকার চাষীদের হাতে অর্পিত হইলেই শতাংশপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না, কারণ প্রত্যেক চাষীকে বিলি করার জন্য পরিমিত চাষের জমি আমাদের নাই। পতিত জমি যাহা আছে তাহার অধিকাংশই বন্যাকুলের বা জলস্রোতে ভাঙিয়া না যায় সেজন্য অথবা গৌ-মহিষাদির খাতের জন্য বাসের জমি হিসাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। অবশিষ্টাংশকে চাষের উপযুক্ত করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করা ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে অসম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানেই আমাদের জমি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং স্বল্প উৎপাদনের ইহাই প্রধান কারণ। জমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া চাষীকে জমির মালিক করিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি আরও বহুলা বিভক্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে এবং এই পরিস্থিতিতে কোন আইন দ্বারা বন্ধ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ক্ষুদ্র জমি হওয়ার জন্য ইহা আরও দ্রুত মহাজনদের করতলগত হইবে, কারণ জীবিকা নির্বাহের জন্য তাহাদের মহাজনদের কাছে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার প্রতিকারের উপায় স্বরূপে তিনি বলেন যে, ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ জমির উপর হইতে অন্য দিকে চালনা করিতে হইবে। একনাই পল্লীবাসীদের কুটীর-শিল্পাদি লাভ-জনক কার্যের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন এবং চাষীদের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আয়তনের জমি চাষ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়টি এমনই জটিল ও ব্যাপক যে তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র বিষয়টি একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর দ্বারা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার প্রতি উদাসীন নহে। তাহার কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যে সেচ-ব্যবস্থা, উন্নত বীজ, সার প্রভৃতির সাহায্যে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা হইতেছে এবং কুটীর-শিল্পের উন্নতিবিধানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলও এখনই পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি-সংস্কারের এ সকল সমস্যার কথা মনে রাখিয়াই হুন্দর-বনের সরকারী জমিতে এই পরিকল্পনা প্রথম কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বর্তমানে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক। জমিদারী প্রথা যে কৃষির হৃদয়টার একমাত্র কারণ নহে তাহা সত্য। জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজন তাহা সরকারের নাই ইহাও সত্য। জমিহীন নূতন ব্যবস্থার ফলে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে ইহাও জানা কথা। জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ সরাইয়া শিল্পের প্রসার করা প্রয়োজন তাহাও বহুশ্রুত বাক্য। কিন্তু [কথা] হইতেছে ইহার প্রতিকারের কি কোন ব্যবস্থা বাস্তবিকই

নাই, তা সরকারের বলিষ্ঠ মনোভাব ও ক্রটিহীন কর্মসূচীর অভাবে প্রতিকার ব্যাহত হইতেছে? আমরা জানি এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যদি সরকারের মনোভাব সেরূপ হয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, জমির মালিকানাধ্বংস চাষীর হাতে অর্পিত হইলে তাহা আরও বিভক্ত হইবে এবং মহাজনদের হস্তগত হইবে। এ ক্ষেত্রে আমরা পঞ্জাবের Land Alienation Act-এর নিদর্শন দেখাইতেছি। সেখানে জমি কেবলমাত্র প্রকৃত চাষীই ক্রয় করিতে পারিবে। চাষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নহে এমন লোক জমি কিনিতে পারে না। আমাদের বাংলাদেশেও কল্লুল হক মহাশয়ের মন্ত্রিত্বের আমলে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৪৩ সালের হুর্ভিক্ষের পর যখন দেখা গেল যে, অধিকাংশ জমি মহাজনের কবলে গিয়াছে তখন হুর্ভিক্ষপীড়িত চাষীদের মধ্যে যাহারা জমি বিক্রয় করিয়াছিল তাহাদিগকে জমি ফেরত দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। ইহা দ্বারা জমি চাষীর হাতেই থাকিবে—ইহার স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তন হইবে। তাহাতে চাষের কোন ক্ষতি হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার জমিদারী প্রথার বিলোপ করিয়া এই ব্যবস্থার দ্বারা মহাজনদের হাত হইতে জমি রক্ষা করিতে পারেন। অপর পক্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমি বিভক্ত হওয়ার যে সম্ভাবনা আছে তাহার প্রতিকারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। ইহার প্রতি-কারে আমাদের উত্তরাধিকারের আইনের পরিবর্তন করা অসম্ভব হইলেও অন্য ব্যবস্থার দ্বারা ইহার প্রতিকার করা যায়। বর্তমানে রাশিয়া প্রভৃতি অত্যন্ত অনেক দেশে বহুলা বিভক্ত মালিকানাধ্বংস সম্মিলিত চাষের পক্ষে অন্তরায় হয় নাই। সমবার সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন চাষীর জমিকে একত্রে চাষ করার পক্ষে কোন অন্তরবিধা নাই। ইহাতে চাষী তাহার নিজস্ব স্বত্ব রক্ষা করিয়াই ফসলের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে আইন দ্বারা জমি একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (land consolidation acts)। কিন্তু যদি জমিদারী প্রথা রহিত না হয় তাহা হইলেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে সরকার উজোগ্রী হইয়া কার্যারম্ভ করিলেই অগাধী ফল লাভ করা যাইতে পারে।

পতিত জমি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। পতিত জমির পরিমাণ আমাদের কম নহে। সে জমির উদ্ধারের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত-সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তাহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে চাষীর উপরই সে গুরু দায়িত্ব নিক্ষেপ করা হইয়াছে। জমির মালিকানাধ্বংস জমিদারের হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চাষীর

হাতে ছাড়িয়া দিলেই সরকারের সকল কর্তব্য শেষ হইবে না।

তৃতীয়তঃ, জমির উপর নির্ভরতা হ্রাস করিবার জন্য প্রয়োজন কৃষ্টিশিল্পের প্রসার। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারের বিহ্যৎ সরবরাহের পরিকল্পনার ক্ষমতা রূপায়ণ। তাহার দ্বারা গ্রামাঞ্চলে শিল্পের বিস্তার করা সহজ হইবে। চাষ হইতে লোক সরাইয়া শিল্পে নিয়োগ করিয়া আপাততঃ আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে নিশ্চয়। কিন্তু কৃষি যদি বর্ধমান অবস্থার থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও শোচনীয় হইবে। আমাদের দেশে কৃষি একক ভাবে কোন দিনই সম্পূর্ণ ছিল না। চিরদিনই কৃষ্টিশিল্প চাষীর অন্যতম জীবিকা ছিল এবং চাষের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহা দ্বারা উপার্জন করিত। বর্ধমানেরও একমাত্র কৃষি কৃষকের অভাব মৌচন করিতে পারিবে না। তাহাকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে সড়ে সড়ে আমাদের কৃষ্টিশিল্পের উন্নতি করিতে হইবে এবং এই দুইটি ব্যবস্থা একই সড়ে করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর বিষয়টিতে জানা গেল যে সুন্দরবন অঞ্চলে সরকারী বাসের জমিতে নির্দিষ্ট কর্তৃস্থচী অস্থায়ী কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার ফলও পাওয়া যাইতেছে। এই ফলের স্বরূপ জনসাধারণ আজও জানিতে পারিতেছে না। ইহার দ্বারা বাংলার ক্ষুদ্রতম জেলায়ও খাজানাব দূর করা যাইবে বলিয়া শুনিতে নিশ্চিত হইতাম। তাহা হাজা সমস্যাটা সমগ্র দেশের। তাহাকে একটি মাত্র সরকারী বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে বিশেষ লাভ হইবে কি? অবশ্য বলা হইবে—পরীক্ষারূপক। কিন্তু স্বাধীনতার চারি বৎসর পরেও যদি পরীক্ষণের কথা শুনিতে হয় তবে বড়ই বিপদের কথা। দেশের বর্ধমান পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ বড় মৈত্রাজজনক। আর নির্বাচনের প্রাকালে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীর কংগ্রেসের কর্তৃস্থচীর বিপরীত ঘণ্টা ভাব ও নীতি প্রকাশ কংগ্রেসের পক্ষে কতিকারক হইবে না কি? কংগ্রেস যে দিন হইতে নিজেকে জনগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করিয়াছে সেই দিন হইতে অভাববি তাহার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদকে তাহাদের কর্তৃস্থচীর অন্যতম প্রধান নীতি হিসাবে রক্ষা করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ইহা বাস্তবিকই হুর্কোষ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় কৃষি ঋণদান

প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আট মাসব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্থান-কার্য পরিচালনা করা হইবে। এই সার্ভের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় সরকার

তাহাদের স্ব স্ব কৃষি ঋণদান বিভাগ সুগঠিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় ইউনিয়নের ২০টি রাষ্ট্রে এই সার্ভে অনুষ্ঠিত হইবে এবং ১৯৫২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রিপোর্টের খসড়া সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছু দিন সময় লাগিবে বলা হইয়াছে।

এই কার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কৃষির অবস্থা অনুসারে ৩৩টি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কতকগুলি জেলাকে এবং প্রত্যেক জেলা হইতে আবার অল্পরূপ উপায়ে আটটি করিয়া গ্রামকে বাছাই করা হইয়াছে। সর্বসমেত ৬০০ শত গ্রামকে এই সার্ভের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রধানতঃ প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের চাষ বা ঐ সংক্রান্ত কার্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করাই হইবে সার্ভের প্রথম কাজ। বিশেষতঃ বর্ধমান অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে তাহাদের আর, ব্যয়, ঋণ, সঞ্চয় ইত্যাদি সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই ইহা করা হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক গ্রামে ১৫টি করিয়া পরিবারকে বাছাই করা হইয়াছে।

কৃষি ঋণদানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃস্থচী ও নিয়ম-কানুন পর্যবেক্ষণ করা হইবে এই সার্ভের দ্বিতীয় কাজ। কৃষকের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি কতদূর সক্ষম—কার্যক্ষেত্রে তাহাদের কি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়—কোন ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অসুবিধার প্রতি-কার করা যায়—ইত্যাদি সকল বিষয়েরই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইবে।

ইহা ব্যতীত কৃষি ঋণ সঞ্চয়ী দেওয়ানী আইন ও লরি কারবার নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রামের বিভিন্ন কৃষি ঋণদান ব্যবস্থার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে তাহারও অস্থান এই সার্ভেতে করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রতি চারটি গ্রামে একজন করিয়া ‘ইনভেস্টিগেটর’ নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার সকল তথ্য সংগ্রহ করিবেন। তাহাদের প্রতি দুই জনের কার্য পরিদর্শনের জন্য একজন করিয়া পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার আবার রিজিওনাল কন্ট্রোলারদের অধীনে কাজ করিবেন। এরূপ পাঁচ জন রিজিওনাল কন্ট্রোলার ও চার জন ডেপুটি রিজিওনাল কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই ভাবে সমগ্র কৃষি ঋণের একটি সম্পূর্ণ সর্বভারতীয় পরি-সংখ্যান সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কৃষি বিভাগের কার্যের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং দেশের বহু দিনের একটি অভাব দূর হইবে।

বলিয়া আশা করা যায়। ইহার দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ অবগত হইয়া ক্রম প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে।

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন গঠিত হয় তখনই ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের সুব্যবস্থা করার গুরু দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয়করণের পূর্বে পর্যাপ্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিল। যাহা হউক, ১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে। আর ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে তাহারাই এই বিষয়ে সচেতন হইয়া সবেমাত্র তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল। রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগেই কর্তৃত্বপূর্ণতার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। জাতির বর্তমান সঙ্কটে ইহা বড়ই দুঃখজনক।

জমির সার উৎপাদন

ধানবাদ হইতে ১৪ মাইল দূরে গুণ গ্রাম সিন্দ্রী। তাহা আজ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমির সার উৎপাদনের কেন্দ্ররূপে রূপান্তরিত হইতেছে। গত ১৪ই কার্তিক এমোনিয়াম সালফেট সারের উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষ অস্থানীয় আয়োজন করা হয়। এই কারখানার ইতিবৃত্ত জানিয়া রাখা ভাল।

“প্রায় দশ মাইল জুড়ে এক শহরের পত্তন হয়েছে; সরকারী পরিচালনার এবং সরকারী মালিকানার এত বড় কারখানা ভারতবর্ষে আর নেই। একটি মাত্র কারখানা থেকে এই পরিমাণ অর্থাৎ দৈনিক হাজার টন, এমোনিয়াম সালফেট তৈরির ক্ষেত্রে, পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানাগুলির মধ্যেই সিন্দ্রির স্থান।

“সিন্দ্রির রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের ইতিহাসে দুইটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হ’ল, ব্রিগেডিয়ার এম. এইচ. কজ। তিনি এই পরিকল্পনার প্রথম উপদেষ্টা রূপে কাজ করেছেন। অপর নাম মিঃ জে. এইচ. হল। তিনি কারখানাটির পরিকল্পনা করেছেন এবং তা গড়ে তুলেছেন। মিঃ হল এখন এই কারখানার রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্রিগেডিয়ার কজ এটির জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হয়েছেন মিঃ বি. সি. মুখার্জি। ইনি উড্ডিয়া সরকারের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন।

“ব্রিটিশ আমলে ভারত-সরকার ১৯৪৩ সালে বাস্তবস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনকল্পে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে নাইট্রোজেন-পুষ্টি জমির রাসায়নিক সার উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করা হয়। তিন জন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের উপরে এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। তাহারাই একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের এবং সেখানে বৎসরে লাভে তিন

লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের ক্ষমতা সুপারিশ করেন। যথাক্রমে একটি ব্রিটিশ ও একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারত-সরকার চুক্তি সম্পাদন করেন পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি আনানো হ’ল ব্রিটেন ও আমেরিকা থেকে। ভারতবর্ষে সরবরাহ করল যন্ত্র-বাড়ী তৈরির লোহা-লব্ধ, মাল-মশলা, লোকজন এবং প্রয়োজনীয় অর্থদান করলেন এই তিনটি রাষ্ট্র।

“স্থান নির্বাচন, জমি ধরিত, বনজঙ্গল পরিত্যক্ত করা, উঁচুনাচু মাটি কেটে সমান করা ইত্যাদি পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলি আরম্ভ হয় ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি; কারখানার ইমারত গড়া আরম্ভ হয় ১৯৪৬ সালের মধ্যবর্তী কালে। পাঁচ বৎসরেই এই বৃহৎ পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষকে বাস্তব সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলবার উদ্দেশ্যের পক্ষে এই কারখানার গুরুত্ব খুব বেশী। সমগ্র পরিকল্পনাটির অর্থাৎ শহরসমূহ কারখানাটি তৈরি করবার খরচ পড়েছে ২৩ কোটি টাকা।

“বিদেশ থেকে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন করে এমোনিয়াম সালফেট বর্তমানে ভারতে আমদানি হচ্ছে। যদি বৎসরে লাভে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন করা যায় তা হলে প্রতি বৎসর ৯ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার মত ভারত-সরকারের আমদানি খরচ বেচে যাবে।

“এখান থেকে যে-সার তৈরি করা হবে তা খুব সস্তা দরে চাষীরা যাতে কিনতে পায় তার ব্যবস্থা হয়েছে।

“কেবল জমির সার তৈরি করার কাজের মধ্যেই কারখানাটি সীমাবদ্ধ থাকবে না। মূলতঃ একটি ভারি রাসায়নিক উৎপাদনের কারখানা হয়ে দাঁড়াবে। কাঁচা কয়লা থেকে পোড়া কয়লা (কোক) তৈরি করা যখন এই কারখানায় সম্ভবপর হয়ে উঠবে তখন ছাপকা, আলকাতরা, বেনজিন এবং গ্যাস ইত্যাদি অত্যন্ত সহজাত উৎপন্ন প্রযোজ্য এবং এখানে প্রচুর তৈরি করা যাবে। তা ছাড়া সিমেন্ট তৈরির পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় একটি বস্তু—ক্যালসিয়াম কার্বনেট স্লাক (গাদ) এখানে তৈরি হবে ঠিক এমোনিয়াম সালফেটের সম-পরিমাণেই, সহজাত উৎপন্নরূপে, প্রতিদিন ১০০০ টন। এমোনিয়াম সালফেট ছাড়া প্রায় ৩০০ টন এমোনিয়াও এই কারখানায় প্রতিদিন তৈরি হবে।”

কম্যুনিষ্ট ও বিড়লা শ্রেণী

গ্রীহমস্তুমার বংশ নেতাজীর একজন একনিষ্ঠ সহকর্মী; তিনি পশ্চিমবঙ্গে “করগুয়ার্ড ব্লক”র অন্যতম নেতা। সংবাদ-পত্রে দেখিতে পাই এই দল জি-বারার বিভক্ত। তিনি উত্তর-কলিকাতার কংগ্রেস কমিটির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে নির্বাচিত হন। গত বৎসর কংগ্রেসী কু-শাসনের প্রতিবাদে দল ত্যাগ করেন, পরিষদের সদস্য পদেও ইচ্ছা করেন।

তিনি একধাণি সাপ্তাহিক পত্রিকার কর্তার; তার নাম “কর্ম্মদল”। সেই পত্রিকার ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে বামপন্থী দলের মিলম অসম্ভব হইল কেন, তৎসম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে কম্যুনিষ্ট দল ও বিড়লা প্রেসবীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম। ভারতবর্ষের অগণিত জনমতের প্রতিধ্বনি ইহাতে শুনা যায় :

“আজ যাহারা ভূরা বামপন্থী একেবারে নামে নেতাজী স্বভাষের কলঙ্ক আরোপকারী বিদেশী দালালদের সঙ্গে আর্ভাত করিতে যাইতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া আমরা একথাই বলিব যে, কম্যুনিষ্টদের পাঁচক্ষে তাহারা যেন পা না দেন। এ প্রশ্নকে আমরা এখানে বলিয়া রাখিতে চাই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আমাদের কোন বিষয় নাই—বা আমরা সেই মহান রাষ্ট্রের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্নও নই। কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির চির পুরাতন নীতিমতে আমরা কোনমতেই সমর্থন করিব না—করিতে পারি না। যদি কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও কর্ম্মদল ভারতের জাতীয়তার প্রতি—ভারতের মহা মনীষীদের প্রতি—ভারতের জনগণের প্রতি দরদী মন লইয়া সংগঠনের পথে পরিক্রমা শুরু করিতেন, তাহা হইলে সারা ভারতের লাঞ্চিত মানুষের স্নেহপুষ্ট সমর্থন তাহারা অবশ্যই পাইতেন—আমরাও তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞা জানাইতাম। কাজেই আজ যে-পথে তাহারা তাহাদের ‘কর্ম্মচক্র’ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সে পথ অতি কর্ম্মনাশ—এদেশের প্রতি তাহা পদে পদে প্রতিকূল। কাজেই কংগ্রেসী ভগামি ও নকল সাম্যবাদীদের নীতিমির বিরুদ্ধে আমাদের লেখনীধারা ছুরির পতিতে ছুটিয়া চলিবে।

“আমাদের সম্পর্কে যাহারা অজ্ঞান আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে আমরা একথাই বলিব যে, আমরা কোনরূপ অজ্ঞাতের পথ ধরিয়া চলি নাই। কাজেই অসত্যের প্রতিবাদে আমরা যে কোন বিপদকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। যে দেশের লোকের হাড় মাংস চিবাঁইয়া বিড়লা আজও রক্তচক্ষু করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীকে ‘Purchasable Commodity’ বলিতে সাহস পায়, যে দেশের যথাসর্ব্ব্বশেষে শোষণ করিয়া বিড়লা ঔদ্ধত্য করিয়া বলিতে সাহসী হয় যে, ‘আগামী নির্বাচন আমরাই চালাইব, মন্ত্রীমণ্ডলও আমরাই গঠন করিব’, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ত গোপন কারণে ইহার উপযুক্ত জবাব দিতে কার্পণ্য করিতে পারেন, কিন্তু যে বাঙালীর দেহমনে আজও সংগ্রামী জীবনের স্রোত ভিমিত আকারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার পক্ষে এইরূপ ধুঁতলা—এইরূপ অশিষ্ট উক্তি কি করিয়া সহ করা সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীকে এই কথাই আজ

বেদনার স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, বিড়লা যেদিন দাপ্তরিকভাবে এই ঔদ্ধত্যচক উক্তি করিয়াছিলেন, সেই দিন তিনি কি করিয়া উহা সহ করিয়াছিলেন? বাঙালীর বিরোধী আত্মা—কাজবশের ভেজঃপ্রভা কি তাহার দেহমনে—তাঁহার মননীতে, শিরায় শিরায় সেদিন কম্পন জাগায় নাই?

“বিড়লার ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী কার্পণ্য করিলেও—বাঙালী করিবে না। কারণ, বাঙালী আজও মরে নাই—তাই আমাদের কৈফিয়ৎ হিসাবে সকলের উদ্দেশ্যে বলিতে চাই যে,

রক্ত বরাতে পারিনে তো একা

তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা

যারা কেড়ে যায় তেজসি কোটি যুথের প্রাণ

এ লেখায় যেন লেখা হয় তাদের সর্ব্বনাশ।”

আমরা হেমন্তবাবুর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমাদের ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, “Purchasable Commodity” কংগ্রেসের বাহিরেও আছে, নহিলে বাংলার নির্বাচন হয়ত অতরূপ ধারণ করিত।

মানভূমির অবস্থা

এই জেলার প্রসিদ্ধ জননেতা শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী বিহার ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছেন। সপ্রতি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রাচীন “সংগঠন” পত্রিকার (সাপ্তাহিক) সম্পাদকরূপে দেশ ও দেশের সেবা করিতেছেন। এই পত্রিকা পাঠ করিলে এ অঞ্চলের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুলিঙ্গার “মুক্তি” যে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাই সংগঠন করিয়া যাইতেছে।

এই পত্রিকার ১১ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিহার প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের নামে যে অপচেষ্টা চলিতেছে, অধিনীত ভাষা-সমূহকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া আমাদের সহযোগী যাহা বলিয়াছেন তাহা বিহার রাজ্যের সীমানার বাহিরেও জামাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা তাহাই করিতেছি :

“বিহার রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার একটা বিপর্য্য আসিল। সপ্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ভাষার মাধ্যম সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে শুধু ইংরেজী নয়, উড়িয়া বাংলাকেও সরাইয়া একমাত্র হিন্দীতেই প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের উত্তর-পত্র লিখিতে হইবে। এই পরিবর্তনে বিহার রাজ্যে কার্য্যতঃ অসুবিধার সৃষ্টি করা হইল। ইহা বাধীন ভারতের গণভক্ত-বিরোধী। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কেমন করিয়া এই নিয়ম প্রবর্তন করিলেন তাহা আমাদের হৃদয়ব্যাপ্ত।

“মানভূম জেলার সদর মহকুমা ছাড়া সর্ব্বত্র রাষ্ট্রভাষার

আদালতের কাজ চলিবে বলিয়া সরকারী ইত্তাহার জারি হইয়াছে। এই সংবাদ দেখিয়া বানবাদ মহকুমার বহু দলিল লেখক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বানবাদ মহকুমার হিন্দী ভাষায় কম দলিলই লেখা হইয়া থাকে। মাহুয়ের সরল সহজ নিজের ভাষাকে বাদ দিয়া এই অভ্যাসের সরকারী জুলুম ব্যতীত কিছুই নহে। ইংরেজ আমলে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা ছিল, পরন্তু বাংলা ভাষাতেই মানভূমের সর্বত্র কোর্টের কার্য পরিচালিত হইত। অথবা গণবিক্ষোভের স্থগিত কোন সরকারেরই সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নহে।

রাষ্ট্রপতি রাডেজপ্রসাদের জন্মভূমিতে আর কতকাল এই অনাচার চলিতে থাকিবে? এই প্রশ্ন আমরা প্রায় প্রতি মাসেই করিতেছি। তাহার সহস্তর এখনও পাই নাই।

“মুক্তি” পত্রিকার দ্বাদশ-বর্ষ-পূর্তিসংখ্যা

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে গুরুলিয়ার “মুক্তি” দ্বাদশ বর্ষ অভিক্রম করিল। এই পত্রিকা রাষ্ট্রপতি রাডেজপ্রসাদ, মৌলানা মজহর-অল প্রমুখ নেতৃবর্গের সহকর্মী নিবারণচন্দ্র দাশ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিচয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অক্ষয়-অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আজ নিবারণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “লোকসেবক সঙ্গ”-ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে নামিয়াছেন এবং “মুক্তি” তাহার সপক্ষে মুক্তি ঘোষাইতেছে। কি অবস্থায় পড়িলে সহকর্মীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারা যায় তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। লোকসংঘের পরিচালক ত্রিঅতুলচন্দ্র ঘোষ সঙ্ঘের মূল নির্বাচনী কর্মনীতিসমূহের মধ্যে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

“লোকসেবক সঙ্গ পক্ষায়ে চেষ্টনার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করিবে।

সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ জেলার পক্ষায়েগুলির কাছে দাবী থাকিবে।

জাতীয় আর্থিক মানের দৃষ্টিতে সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের ব্যয় অ্যাপের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে।

ভোট আদায়ের নীতি পরিহার করিয়া জন-চেতনার ভিত্তিতে সঙ্ঘের নির্বাচনী প্রচার চলিবে।

জনগণের জীবনক্ষেত্রে সঙ্ঘের সেবা ও সহায়তার ঘোষণা যথাস্থে রহিয়াছে সঙ্গ সেখানেই প্রার্থী মনোনয়নের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাপক ক্ষেত্র প্রচারের সমগ্র অভিযানে সঙ্গ অর্থের সহায়তা বর্জন করিয়াছে।

নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক প্রজা সাধারণের জন্ত ঘোষণা প্রতিনিধিদের উপযুক্ত অংশ প্রদান করিয়াছে।

নির্বাচনী জীবনে ব্যাপক জনশক্তি ও বুদ্ধি-প্রদান শক্তির মধ্যে সঙ্গ সামঞ্জস্য বিধানের পথ অনুসরণ করিতেছে।

জেলার শাসন-ব্যবস্থার নির্বাচন ও প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ক্ষমতার অংশ লাভের লক্ষ্য সঙ্ঘের রহিয়াছে।

বিকেন্দ্রীকৃত আত্মশাসনের ভিত্তিতে গ্রামসমূহের জন্ত পঞ্চায়তী শাসনক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য সঙ্গ রাখিয়াছে।

গান্ধীবাদের আদর্শ ও কর্মনীতিই সঙ্ঘের মূল কর্ম নির্দেশ-রূপে থাকিবে।”

নির্বাচনী নির্দেশ-পত্রের ভাব ও কর্ম পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে :

“মুক্তির নির্বাচনী দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক কর্মী গভীরভাবে ইহার বিষয়গুলি পাঠ করিয়া জন-গণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের কার্য করিতে বিপুল উত্তমের অগ্রসর হউন। মুক্তির নির্বাচনী সংখ্যায় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া কর্মীগণ জনচেতনা জাগৃতির জন্য বৈধের সঙ্গে কাজ করুন। লোকের বাহা কিছু প্রশ্ন বুঝাইতে চেষ্টা করুন। প্রচারের সময় এইগুলিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

(১) শাসনের অনাচার দেখিয়া লোকে ভোটের বিষয়ও বিরূপ হইয়াছে—ইহা দূর করিতে হইবে। লোকে উদাসীন হইলে স্বার্থায়েবীদের ভোট পাইয়া অযোগ্য লোক নির্বাচিত হইয়া ক্ষতি করিবে। ভোট রাষ্ট্রীয় অধিকার। ইহা প্রয়োগ করিয়া যোগ্য লোক বাছিয়া দেশের শাসন ভাল করিতে হইবে। সর্বদা যোগ্য লোক বাছাই করিবার চেষ্টা না রাখিলে দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে কি করিয়া? (২) কিছু লোকে কংগ্রেসের শাসনে বিরক্ত হইয়া ব্রিটিশ সরকারের রাজত্ব করিয়া পাইতে চাহিতেছে। এই মনোভাব ক্ষতিকর। জন-গণকে বুঝাইতে হইবে তাহা সম্ভবও নয় এবং স্বাধীনতার মর্যাদার অস্বাভাবিক নয়। কষ্ট হইলেও স্বাধীন জীবন শ্রেয়—স্বাধীন থাকিয়াই নিজেদের শক্তিতে অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতেছে সরকারকে ভোট দিব অর্থাৎ ব্রিটিশকে ভোট দিব। বুঝাইতে হইবে তাহা সম্ভব নয়—ব্রিটিশ আর ভোটে দাঁড়াইতে পাইবে না। দেশের যে কোন লোককে ভোট দিতে হইবে। কংগ্রেসই এখন সরকার হইয়াছে, সরকারের পরিবর্তন চাহিলে কংগ্রেসের পরিবর্তন চাই। তাহা হইলে দেশে অজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। (৩) ভোটের আইন-কানুন ও অধিকার ভালভাবে বুঝাইতে হইবে। সরকারী কর্মচারীদের শাসনে বা চাপে কেহ ভোট দিবে না; এইভাবে কর্মচারীরা কাজ করিলে দণ্ড হইবে—জনগণের বুঝ দরকার। (৪) ভোটের আশায় অপরে মিথ্যা প্রচার বাহা করিবে তাহা বড়োমের প্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে। (৫) ভোটের তারিখ, স্থান প্রভৃতি বিষয়ে অস্তের মিথ্যা প্রচারে সাবধান থাকিতে হইবে। (৬) সভ্য

আশ্রয় করিয়া, সঠিক সংবাদসমূহ লইয়া কর্মীরা প্রচার করিবেন। (৭) অপরের প্রবল বিরোধিতা ও বাগ্মজালে কর্মীরা হির থাকিয়া নিজেদের যাহা যুক্তি তাহা দৃঢ়ভাবে ও বিচারপূর্বক আত্মবিশ্বাসের সহিত জানাইতে থাকিবেন। (৮) জরুরীকালের জন্ত কর্মীরা ব্যাকুল হইবেন না। নিজের কাজ ঠিকমত করার মধ্যোই আমাদের জয়। হিরচিহ্নে বিপুল উত্তম প্রচণ্ড কর্মশক্তিতে কর্মীরা কর্ম করিয়া চলুন—ইহাই কামনা।”

কাপড় লইবার ক্রেতা নাই

গত ৩১শে ভাদ্র সংখ্যায় মানভূম রামচন্দ্রপুর হইতে প্রকাশিত “সংগঠন” (সাপ্তাহিক) একটি অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই অবস্থা কাহার সৃষ্ট তাহা অজ্ঞাত নয়; ভারতের ভাষা ভগ্নতের প্রেক্ষিত মাহুষের খাওয়া-পারার জরুরীকাল লইয়া যে খেলা খেলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। সাধারণের বিষেষের পাত্ত হইয়া কেহ বাচিতে পারে না—এই সামাজ্য কথারটা তাঁহারা কবে বুঝিবেন?

সংগঠনের মন্তব্য উপলব্ধ করিয়া এই কথাটি অরণ্য করাইয়া দিতে চাই। গ্রামবাসী ও শহরবাসী কেহই কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার পাইতেছে না, তাহাও মনে রাখা প্রয়োজন। “দোকানে দোকানে কাপড়ের স্তুপ—গ্রামবাসীদের ডাকা হইতেছে কাপড় লইয়া যাও—তাহারা আসে না।” মাহুষের কাপড় নাই, ডাকা হইতেছে তবু তাহারা কাপড় কিনিতে আসে না—কারণ কি? মাত্র আট গজ কাপড় প্রতি পরিবার পাইবে তাহাও লইতে পারে না। কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ৎ জ্ঞান; কাপড়ের প্রাচুর্য্য ক্রেতার অপ্রাচুর্য্য—তবু দেশ “ভাংটা”।

“গ্রামের বিপণিতে যে কাপড় আসিতেছে তাহার মূল্য ও রকম যাহা, তাহা গ্রামবাসীদের পক্ষে ক্রয় করা সাধ্যাভীত। গ্রামের লোকের প্রয়োজন মোটা কাপড়, টেকসই কাপড় এবং যাহার মূল্য সুলভ। তাহার পরিবর্তে আসিতেছে চড়া দরের মিহি কাপড়। শুধু তাহাই নয় ৮ গজ কাপড়ের মধ্যে ৫ গজের একটি হুতি বা শাড়ীর সঙ্গে ৩ গজ ছিট লইতেই হইবে। অনেকেরই ছিটের প্রয়োজন হয় না। যাহাদের ছিটের প্রয়োজন হয় না তাহারা ছিট লইয়া করিবে কি? তাহার বদলে যদি তাহাদের ৮ হাতি কাপড়ও দুইটি দেওয়া হয় তাহা কাজে লাগে। সরকারী কর্তৃপক্ষের এগুলি চিন্তা করা উচিত।”

রেলওয়ে উপার্জন ও ভারতবর্ষ

‘যোগাযোগ’ কলিকাতা রেলওয়ে-সমষ্টির প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। তার একটি সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের দাবি—বর্তমানে ভারতীয়

রেলওয়ে রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহা সত্য। কিন্তু ইহা আরও সত্য যে, দেশের নমনদীর জলস্রোত সংযত ও সুপরিচালিত হইলে রেলওয়ের উপার্জন অপেক্ষা বহু গুণ অধিক রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে আসিত। জলাভাবে শতহানি ও ব্যভার ধ্বংসলীলার অবসান হইত। এই কথা মনে রাখিয়া নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যের ও হিসাবের বিচার করিতে হইবে:

“বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়ে রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার আয়ব্যয় প্রায় ভারত-সরকারের বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ, অথবা চারিটি প্রধান রাজ্যের বাজেটের, অথবা ছোট আটটি রাজ্যের আয়-ব্যয়ের সমষ্টির সমান। এতদ্ব্যতীত জাতীয় অর্থনীতি, আন্তঃসংযোগ নিরাপত্তা এবং বহিঃশক্তি হইতে আশ্রয়লাভ বিধান রেলওয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত আছে।

এই রেলওয়েতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কর্মী কাজ করেন এবং নানানভাবে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখে, আমাদের ভারতীয় রেলওয়ে। ভারতীয় রেলওয়ে যেন ছোটখাট একটি পুখিবি; এখানে প্রাদেশিক সঙ্গীর্ণতা ও জাতিবৈষম্য নাই, এখানে যেন সকলেই পারস্পরিক বন্ধুত্ব বৃদ্ধি আনন্দ।

১৯৪৭ সালের পরে রেলওয়েতে ভাড়া বাড়ান হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে শতকরা মাত্র ৪৬ এবং ৭৩ ভাগ ভাড়া বাড়ান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার তুলনায় রেল পরিচালনার খরচ বহু অংশে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে জরুরীকালের দাম চারি শত ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভের পর হইতে জরুরীকালের দাম ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে যে পরিমাণে ভাড়া বাড়ান হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রাক-যুদ্ধ সময়ের ভাড়ার মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ পাওয়া যায়।

১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৫১-৫২ সালে ভারতীয় রেলের ৭২৮৯৫, ৮০৪৯৮ এবং ৮২২৪৫ লক্ষ টাকার মূল পুঞ্জির মধ্যে ই. আই. রেলের অংশে যথাক্রমে ১৯৩৯৪, ১৯, ৬৯৯ এবং ১৯, ৮৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল।

ভারতীয় রেলের তৃতীয় শ্রেণীর এবং অন্যান্য দেশের রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিম্নে প্রদত্ত হইল:

ভাড়ার পর্যায়
প্রতি মাইলে ভাড়া
(পাই হিসাবে.)

ভারত	৬
ইউ. কে.	২৬'০৪
ইউ. এস. এ.	২১'৯৬
কানাডা	২০'০৪
সুইজারল্যান্ড	৩৩'৯৬
ফ্রান্স	১৮'১২
ইটালী	১০'৪

গড়পড়তা ঘাতীর নিকট হইতে
প্রতি মাইলে কত পাওয়া যায়

মাথা পিছু
আস

৪'৫৭	২৭০৭
১৩'৯	৩৬৭২
২২'৫	৬১০২
২২'৩	৪১৩২
...	৪০৩২
...	২২৮৯
...	...

ইফ ইঞ্জিয়ান রেলওয়ের কর্ম্মাংখ্যা

একটা হিসাবে দেখিলাম যে, ১১ বৎসরে এই রেলওয়ের কর্ম্মাংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুলনায় বর্তমানে ই. আই. রেল কত রেলকর্ম্মী কাজ করেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :

১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ—	১৩০৫২৫
১৯৪২	১৩৩৩১
১৯৪৩	১৪০২০৬
১৯৪৪	১৫৭৩৬২
১৯৪৫	১৬৪৭৫১
১৯৪৬	১৭১৪৪৩
১৯৪৭	১৮৯৭৮০
১৯৪৮	২২২১০৮
১৯৪৯	২২২৫২০
১৯৫০	২১০৪০৪

ভাগীরথীর দুর্দশা

গত এই কার্তিক “মুর্শিদাবাদ সমাচার” পত্রিকায় কলিকাতা নগরীর আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে স্বাভাৱ্য হইয়াছে তাহা অজানা নয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যেই সমস্ত অবস্থাটা বর্ণনা করা হইয়াছে। দামোদর বাঁধ সম্পূর্ণ হইলেও এই বিপদ দূর হইবে না। কোন কোন ইঞ্জিনিয়ারের মতে কলিকাতার বিপদ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই তর্কে যোগদান করিয়া লাভ হইবে না। কিন্তু তবুও আমাদের সহযোগিতা আলোচনা সম্মোপযোগী হইয়াছে, অঈর্ষ্য হইলে চলিবে না।

“কয়েকদিন পূর্বে সেন-সচিব ক্রীতপুত্তি মজুমদার মহাশয় কলিকাতার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাগীরথী নদীর বর্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

“ভাগীরথী নদীতে যে ভাবে পলি পড়িতেছে, তাহাতে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই নদী মরিয়া যাইবে এবং কলিকাতার বন্দর বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

“সেন-সচিব যথার্থই বলিয়াছেন যে ভাগীরথী নদীর মোহনার নিকটে এমন বিরাট চর পড়িয়াছে যে গঙ্গা নদীর

সহিত বর্ষাকালের কয়েক সপ্তাহ ব্যতীত ভাগীরথীর কোন সংযোগ থাকে না। উত্তর ভাগে জল সরবরাহকারী উপনদীর সংখ্যাও অল্প, আকারও নগণ্য। দক্ষিণ দিকে ময়ূরাক্ষী, অজয়, জলাঙ্গী বা চূর্ণা নদী দিয়া যে পরিমাণ জল ভাগীরথীতে পড়ে উত্তরের ছোট নদীগুলি দিয়া সেরূপ জল আসে না। ফলে ভাগীরথী শুকাইতেছে, চর পড়িয়া নদীর বুক ভরাট হইয়া যাইতেছে। এই বৎসর ভাল বান হয় নাই। অত্যান্য বৎসরের মত ভাগীরথী এবারে কানায় কানায় পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, আশ্বিন মাসেই চর পড়িয়া নদীবন্ধ ভরিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী-বক্ষে জল থাকিবে কিনা বলা কঠিন। ফলে ভাগীরথীর উত্তর পার্শ্ব যে কলকাতা শহর মুর্শিদাবাদ জেলায় পড়ে, সেখানে গ্রীষ্মকালে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও বন্ধ না হইয়া যায়। সুতীর্ণ মোহনা হইতে শক্তিপুর পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল ব্যাপী ভাগীরথী-বক্ষে যেভাবে বাসুকী ভরিয়াছে, তাহাতে নদী মরিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অথচ গঙ্গার তীরে মুর্শিদাবাদ শহর গঙ্গার তীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ফরাক্কান্ন বাঁধ দিয়া ভাগীরথীকে সর্বসময় প্রবাহমান রাখিবার যে প্রায়শ্চর্য্য করিয়াছেন, গত তিন বৎসর হইতে সেই প্রায়শ্চর্য্য মত কি ভাবে কার্য্যাদি চলিতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। ফরাক্কান্ন ব্যারেজ লইয়া তিন বৎসরে ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার কথাও গ্রীষ্মক মজুমদার বলিয়াছেন। তিন বৎসর মরিয়া Data সংগ্রহ করা হইতেছে বটে, অথচ নদী যে শুকাইতেছে তাহার কোন বিহিত এমাবৎ হয় নাই।... ফরাক্কান্ন বাঁধ দিয়া ভাগীরথীকে সুন্যায় ও প্রবাহমান রাখিবার সভ্যকারের চেষ্টা আজও হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কি বিস্তৃত ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? নদী একেবারে শুকাইয়া গেলেই কি ফরাক্কান্ন-ব্যারেজ বাঁধ হইবে?”

মূল কথা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব বাংলার উপর নাই। যে ব্যক্তি সম্পত্তি কেন্দ্রীয় অর্থ-বিভাগের অধিকারী তাহার বাঙালী-প্রীতি তো সকলেই জানে। সুতরাং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের “দৃষ্টি আকর্ষণ” করার চেষ্টা যথার্থ। অল্প কোন পথে সে কাজ করিতে হইবে তাহাই বিচার করা প্রয়োজন।

তেলের প্রতিযোগিতা

রাজনীতি এক অদ্ভুত জিনিস। তাহা এক গোপীন্দ্র লোককে একেবারে ভিন্ন করিতে পারে না, আবার তাহারদের স্বার্থের মিলও কখনও হয় না। ইরানের তেল লইয়া যে বগড়া বাধিয়াছে, তার মধ্যে দেখিতে পাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ ও সামর্য্য দিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করিতেছে; সম্মিলিত জাতিসংঘে তাহার একযোগে কাজ করিতেছে;

তাহারা নানা প্রভাবের সমর্থক। এদিকে আবার এই তৈলের বাজার লইয়া বেশ একটা ‘চাপা’ বিরোধ চলিতেছে। অন্ততঃ ইহাই হইল ঠালিনের মত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিরোধের বার্তা নানা ভাষায় অতি আনন্দের সঙ্গে আমাদের সুনাইতেছে এবং আমাদের মনে এই বিষয়ে যেন কোন সন্দেহ না থাকে তার জন্য পরিসংখ্যানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মারগণমন্ত্রগুলির টেকনিক্যাল উন্নতি তৈলের প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরও বাড়িয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের অধ্যায়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মোট উৎপাদন যখন যৎসামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন তৈলের উৎপাদন বাড়িয়াছিল অসম্ভব।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার তৈল উৎপাদন সম্পর্কে নীচের এই সংখ্যাগুলির (১০ লক্ষ টন হিসাবে) সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য :

১৯১৩	৫২
১৯২৫	১৪৮
১৯৫০	৪৮০

তৈলের উৎসগুলি লইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের লড়াইটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই বিরোধের তীব্রতা ভালভাবে বুঝিতে হইলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তৈল ক্ষেত্র ও তৈল উৎপাদনের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

হুইট প্রদান তৈল অঞ্চল আছে। একটি আমেরিকা মহাদেশ, আর একটি নিকট-প্রাচ্য। আমেরিকার উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন; তন্মধ্যে ২৭ কোটি টনই আর্গেন্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে। নিকট-প্রাচ্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ। ১৯৫০ সালে নিকট-প্রাচ্য হইতে সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ তৈল উত্তোলিত হইয়াছে। অবশ্য এই তথ্য হইতে নিকট প্রাচ্যের তৈল সম্পদের স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে না। ভূতত্ত্ববিদদের হিসাব অনুসারে নিকট-প্রাচ্যে আছে সমস্ত পৃথিবীর তৈলসম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ। একমাত্র সৌদী আরবেই ৩০০ কোটি টন তৈল আকর আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী। তবু সোভিয়েট-প্রাচ্যের তৈলসম্পদ করারও করিতে চায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধের গোড়ার দিকে মার্কিন তৈলপত্রিকা কুওয়েট ও ইরাকে ব্রিটেনকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিতে সক্ষম হন। তাহারা কুওয়েটের তৈল উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ এবং ইরাকের তৈলের শতকরা ২৩.৫ ভাগ

আদায় করিয়া লইলেন। ইহা ছাড়া এংলো-ইরানীয়ান অয়েল কোম্পানীর উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ তাহাদের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য ব্রিটেনকে তাহারা রাজি করাইতে সক্ষম হইলেন। সৌদী আরব ও আবিসিনিয়ার আমেরিকানরা তৈল উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার আদায় করিয়া লইলেন। সৌদী আরবে প্রচুর তৈল আছে। ১৯৪৪ সালের দশ লক্ষ টন হইতে এই অঞ্চলের তৈল উৎপাদন বাড়িয়া গিয়া বর্তমান বৎসরে তাহা তিন কোটি টন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এই ভাবে নিকট প্রাচ্যের তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলে-কোলে ব্রিটেনের নাগাল বহিয়া ফেলিয়াছে। নীচের সংখ্যাগুলি হইতে এই কথা পরিষ্কার হইবে :

নিকট-প্রাচ্যের তৈল-উৎপাদন (দশ লক্ষ টন হিসাবে)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	এট্রি ব্রিটেন
১৯৩৮	২
১৯৫০	৪০.৪
	১২.৫
	৪৪.২

এই হিসাব হইতে দেখা যায় তৈলের প্রতিযোগিতা কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে তৈলের উৎপাদন সম্বন্ধে কোন আভাস পাইলাম না। স্ট্যালিন ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই।

চীনের বর্তমান উন্নতি

কয়ানিষ্ট হই জন বাঙালী অধ্যাপক ত্রিনিদাদ ভট্টাচার্য্য ও ত্রিপিপুরার চক্রবর্তী সম্প্রতি চীন দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিশ-পঁচিশ দিন ভ্রমণ করিয়া তাহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহা সভা-সমিতিতে পরিবেশন করিতেছেন। তাহাদের কথার বিচার করিতে চাই না। আমরা সকলেই নিজের নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে তথ্যাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। তাহারাও তাহা করিয়াছেন।

গান্ধীপন্থী অধ্যাপক জোসেফ কর্ণেলিয়াস কুমারাপ্পা “হরিজন” পত্রিকায় তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছেন। ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের বাংলা “হরিজন” হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

“বাঙ সর্বজন বধেই পাওয়া যায়। অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীও বেশ পাওয়া যায়। দাম বেশ সস্তা। টাকার কাঁপতি হইয়াছে। বটে, কিন্তু উহা অতিক্রম করিবার উপায় গবর্ণমেন্ট লইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থা বুদ্ধিপূর্বক চলিতেছে। লোকের উহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা আছে। সকল কর্মচারীরা লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া চলে। সকলে একই প্রকার কাপড়-চোপড় পরে, এক ভাবে বাস করে। উর্দ্ধতম ও নিম্নতমের প্রভেদ খুব বেশী নাই। চীন দেশের সভাপতি মাও ২,৮০০ কাণ্ডি জোয়ার (এক কাণ্ডি = ১.৩ পাউণ্ড = ৫১ তোলা), থাকিবার একটি বাড়ী ও ব্যবহারের

জন্য একটি মোটরকার পান। উহা একুনে মাসে উর্ধ্বপক্ষে ৬০০ টাকার মূল্য যায়। হাই জেন কেবিনেট মন্ত্রীর সহিত কথা বলি। তাহার মাসিক প্রায় ৪৫০ টাকার সমান বেতন পান। যে যেচ্ছাসেবকেরা আমাদের দেখাওনা করিতেছিল তাহার উহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পায়। ইহা হইতে বুঝা যায়—চীন দেশে এমন নায়কদের পাইয়াছে যাহারা লোকের জীবনযাত্রার মিলিয়া-মিশিয়া থাকে। যে মনোভাব এখানে চলিতেছে তাহা কতকটা আমাদের দেশে ১৯৩০ সালে যেমন ছিল সেই রকম। আমরা চীনের উপর রুশের অপ্রতিভ প্রভাব চলিয়াছে কল্পনা করিয়া থাকি। ঐরূপ প্রবল রুশপ্রভাব সেখানে নাই। বৃহৎ শিল্পে ছুঁড়ি-উৎপাদন, আর সকল সম্পত্তির রাষ্ট্রভুক্তি—ইহাই সোভিয়েট কম্যুনিজমের মূল। কিন্তু চীন সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় এবং ক্ষুদ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থাশীল। চীনের মূলমন্ত্র হইল ভূমি-ব্যবহার সংশোধন ও কৃষি উন্নয়ন। মূলগত এইরূপ পার্থক্য থাকায় হয়ত চীন রুশের অল্প অনুসরণ না করিতে পারে। সেলদোর শ্রমের মজুরী দিবার আদি যে পরিকল্পনা ও শ্রম ধরিয়াজি এখানকার পদ্ধতি অনেকটা সেইরূপ দেখিয়া আমার ভাল লাগিল। শ্রমিকরা বাসস্থান, পরিবেশ ও অন্তরায় এবং হাভধরচ মাসিক প্রায় ১০ হইতে ১৫ টাকার সমান পায়। সেলদোর স্তম্ভ খাতের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উহা অধিক বিজ্ঞানসন্মত। তবে এখানকার ব্যবস্থার সহিত উহার সাদৃশ্য চমকপ্রদ।

“ভূমি-ব্যবস্থা সংশোধন বিষয়ে আপনারা খবর চাহিয়াছেন। ইহার এই বিষয়ে বাস্তব পথে অগ্রসর হইয়াছেন মনে হয়। পরগাছা জমিদারপুত্রি লোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পন্ন চাষী যাহারা চাষ-আবাদ করে তাহাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত প্রজারা উৎপন্ন কসলের ৫০ হইতে ১০০ শতাংশ জমিদারকে ভাগ-দিত। ইহা বর্ধ হইয়াছে। চাষী এখন শ্রমের ফল নিজে ভোগ করিতে পায়। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ উৎপন্ন কসলের প্রায় ১৩ শতাংশ। ঐ রাজস্ব শত্বেই সংগৃহীত হয়। টাকার কাপতি কমাইবার ইহাই অন্যতম প্রধান পন্থারূপে গৃহীত হইয়াছে। পর্ব্বোক্ত জমীদারী ও শিকড়দিগকে পণ্যে বেতন দিয়া থাকেন। সমাজ স্তম্ভের ব্যাপার নাই। তবে যে সব জমিদার বল-প্রয়োগে বিজোহ করিতে চাহিয়াছিল তাহাদিগকে কঠোর-ভাবে দমন করা হয়। তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। যাহারা চাষ করিতে চাহিয়াছে তাহাদিগকে অপর চাষীদের মতই পুনর্বাসনের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

“সোবিয়তে”র নদী : আজ ও কাল

“বিশাল সোবিয়ৎ ভূমি ষষ্ঠবিধ করে বয়ে যায় লক্ষাধিক

নদনদী। সব কটি নদী এক সঙ্গে জুড়ে দিলে দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২০ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি, অর্থাৎ সাড়ে ১২ লক্ষ মাইল। যাতায়াত ব্যবস্থায় নদনদীগুলি বিশিষ্ট স্থান অবিকার করেছে। নবম ও দশম শতাব্দীতে যে সমস্ত নদী জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নীপার, ভল্গা, ওকা ও কামা (ভল্গার উপনদী), দন, উত্তর-দিনা এবং নেভা। বর্টিক সাগর থেকে কক্সগার হয়ে কলভাভিনোপল পর্যন্ত বাণিজ্য-পথ ছিল নীপার। পরে ভল্গা, ওকা ও কামার জলপথ হিসাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দন নদী নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে আঙ্গব-সাগরে। উত্তর-দিনার জলরাশি গ্রহণ করেছে খেত সাগর। নেভার মোহানা বর্টিক সাগরে। এর সব কটিই সোবিয়ৎ ভূমির ইউরোপীয় অংশে প্রবাহিত।

উল্লিখিত নদীগুলির জলযান ব্যবস্থা উন্নত করার কিছু কিছু কাজ জার-শাসিত রুশিয়ায় হয়েছিল। ভল্গাকে যুক্ত করা হয়েছিল নেভার সঙ্গে এবং উত্তর দিনার শেষ ভাগে কতকগুলি খাল কাটা হয়েছিল এবং লকগেট নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেশের জলসম্পদকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাবার উত্তোষ সোবিয়ৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে আর হয় নি।

মহান অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পূর্বে জলবিদ্যুৎ শ্রেন নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয় নি বললেই ঠিক হয় যদিও দেশে জলশক্তির বিদ্যুৎ আভাব ছিল না। সোবিয়ৎ শাসন কায়েম হওয়ার পরেই দেশে জলবিদ্যুৎ শ্রেনের জাল বিস্তারের কাজ শুরু হ’ল। ইউরোপের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ শ্রেন নির্মিত হ’ল নীপারের উপর। তার পর ভল্গার উপর তিনটি শক্তিশালী জলতড়িৎ কেন্দ্র এবং ককেশিয়া, মধ্য এশিয়া ও অচ্চা অঞ্চলের অনেকগুলি নদীর উপর আরও কতকগুলি বিদ্যুৎ-শ্রেন মাথা তুলে দাঁড়াল। তার পরে খনন করা হ’ল কতকগুলি জলপ্রাণী যেমন খেত সাগর, বর্টিক সাগর খাল (ফিনিশ উপসাগরের সঙ্গে খেত সাগরকে যুক্ত করেছে) এবং মস্কা—ভল্গা খাল। নীপার, ভল্গা এবং অন্যান্য নদ-নদীর উপর বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ-শ্রেন নির্মাণ করার ফলে জলযান চলাচলের অনেক সুবিধা হয়ে গেল। আগেকার দিনে যে সব নদী ব্যবহার করা হ’ত না সেগুলি ব্যবহার যোগ্য হয়ে উঠল।

নদী, খাল ও জলাধারের কিনারায় নয়া নয়া বন্দর মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। অনেক নগর যেগুলির নিকটে জলের কোন অস্তিত্বই নেই ভবিষ্যতে সেগুলি জলসিক্ত হয়ে উঠবে। সোবিয়ৎ রাজধানী মস্কা ছ’টি সমুদ্রের বন্দর হয়ে উঠবে। নয়া নয়া যাত্রীবাহী ও মালবাহী জাহাজপথ খোলার আরোজন চলছে। আগামী বৎসরের গোড়ার দিকেই ভল্গা-দন খালে জাহাজ চলাচল শুরু হলে—এই সমস্ত জাহাজপথের কতক-

গুলিতে কাজ আরম্ভ হবে। এজন্য নতুন ধরনের আধুনিক যাত্রীবাহী ও মালবাহী জাহাজ নির্মিত হচ্ছে।

আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোবিয়তে নদীসমূহের যাত্রাস্বত্ব ব্যবস্থা করে কণ্ঠস্থ বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে অনেকখানি সুবিধা হবে, কারণ রেলপথে যাত্রাস্বত্বের চেয়ে জলপথে যাত্রাস্বত্বের খরচ অনেক কম। জলপথ নির্মিত হলে শুধু ধরে যত মাল যাত্রাস্বত্ব করতে পারবে সমান দৈর্ঘ্যের রেলপথে তার ৪০ ভাগের এক ভাগের বেশী ব'য়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণের “সোবিয়ৎ দেশ” পত্রিকার উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক জাণিবার ও ভাবিবার আছে।

রামকৃষ্ণ নগর

“ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামানুসারে গড়িয়া উঠিয়াছে কাছাড়ের প্রথম উদ্বাস্ত উপনিবেশ রামকৃষ্ণ নগর। তার আশেপাশে বহু জনপদ। স্থায়ী অধিবাসী যারা তারা ভাবিতেও পারে নাই এত সহজে স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া আগত উদ্বাস্ত ভাই-বোনই চেষ্টা করিয়া গড়িয়া তুলিবেন জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চভূমিতে এমন একটি সুন্দর উপনিবেশ। দিনের পর দিন স্থানীয় অধিবাসী ও উদ্বাস্তদের সমবেত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে এই রামকৃষ্ণ নগরের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। সবাই বুঝিতে পারিয়াছে ঠাকুরের নামের সার্থকতা আছে আর বুঝিতে পারিয়াছে—চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এর পর ধীরে ধীরে এই উদ্বাস্ত উপনিবেশকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে হাইস্কুল, পোষ্টাফিস, বাজার প্রভৃতি আরও কত কিছু। তার পর বিগত কেন্দ্রস্বামীরা দাঁড়াহাদামায় আগত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছাড় শাখার উদ্বাস্ত পুনর্বাসন ও সাহায্য বিভাগ এখানে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তকে আনয়ন করিয়া আশ্রয়-শিবির পত্তন করেন এবং তাহাদের জন্য একটি স্থায়ী কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু ইদানীং সরকার এই কর্মক্ষেত্রে তুলিয়া লইবার এক আদেশ দেওয়ার এত বড় একটি গঠনমূলক কার্যে সহসা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কর্মী, উদ্বাস্ত ও স্থানীয় অধিবাসীদের মনে কতটুকু আঘাত লাগিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষদর্শীরা বুঝিতে পারিয়াছেন।

“তার পর রামকৃষ্ণনগর বিভাগীঠ। আজ পরম সৌভাগ্য—গৌরবের কথা যে রামকৃষ্ণনগর আদর্শ বিভাগীঠ যুগপৎ আসাম-সরকার ও ভারত-সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। এই দিকে স্থানীয় অধিবাসী ও উদ্বাস্তবৃন্দ সরকারের কাছে পরম কৃতজ্ঞ। কিন্তু এত যে আনন্দ, এত

যে উৎসাহ ও ঝাপি ইহার মধ্যে প্রাণ নাই। তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে গিয়া আমরা বুঝিয়াছি জনসাধারণের আকুল আবেদন, তাহাদের প্রাণনাম ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভের পরও, রামকৃষ্ণ মিশন উপেক্ষা না করিলেও সবিশেষ মনোযোগ দিতেছেন না। জনসাধারণ চায় যে রামকৃষ্ণ বিভাগীঠকে আদর্শ বিভাগীঠে পরিণত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ইহার পরিচালনার ভার নিজে গ্রহণ করুন। আর্থিক, পারি-পারিক অবস্থা ও শিক্ষারতনের প্রয়োজনীয় সব কিছু আজ বিভাগীঠের আছে বলা চলে। এমতাবস্থায় যারা আজ এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের হাত থেকে অপরের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন তাহাদের সদিচ্ছা ও ত্যাগকে অভিনন্দিত ও সাদরে বরণ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার পর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের এই আদর্শ বিভাগীঠ পরিচালনতার গ্রহণের পক্ষে সঙ্কোচ ও দ্বিধার অবকাশ কোথায়?”

করিমগঞ্জের “নবাক্ষণ” পত্রিকা কংগ্রেসের সমর্থক। তাতে এই উপনিবেশ ও বিভাগীঠ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হয়, তার চূড়ক আমরা উদ্ধৃত করিলাম। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় জনগণের মনোগত ইচ্ছা প্রকাশের সাক্ষ্য কামনা করি।

কাশী-লক্ষ্মী-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইয়া থাকে। সম্ভ্রুতি উত্তর-ভারতের নানা পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-প্রদেশের রাজ্য-পাল মিঃ মোদি স্থির করিয়াছেন যে, এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাধ্যক্ষ (Vice-Chancellor) থাকিবেন না। তিনি নিজেই তাদের অধ্যক্ষ। রাজ্যপালের ক্ষমতা ব্যবহার করিবার কারণ জানা যায় নাই। নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে একটি কথা শোনা যায়। লক্ষ্মীয়েব আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের শরীর সুস্থ নয়। তিনি কিন্তু আরার কাশী বিভাগালয়ের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যাপার কি? আচার্য্যজী একটা বিরতি দিলে সুবিধা হয়।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হইতেছে। বর্তমান উপাধ্যক্ষ ডক্টর কে. কে. ভট্টাচার্য্য নিজের পদে থাকিবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজন কিছুতেই মিটিতেছে না। অঙ্গসন্ধান কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার পর তার একটা সুব্যবস্থা হইবে। সাময়িকভাবে একটা গৌজামিল দেওয়া হইবে। টাকা প্রাপ্তির আশায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই দেবিতেনি রাষ্ট্রের হাত-ধরা হইয়া পড়িতেছে। তার ফল কি হইবে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষ শ্রীমজুমদার বন্দ্যোপাধ্যায় বেতন গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ মাসিক প্রায় ৩ হাজার টাকা ব্যয় বাড়িবে। যে সব

আশা-আকাজ্জা করা হইতেছে তাহার পরিণতি সম্বন্ধসাপেক্ষ।
সুতরাং ধৈর্য্য বরিয়া থাকিতে হইবে।

জামসেদপুর মজহুর আন্দোলনের নূতন রূপ

জামসেদপুরের “নব-জাগরণ” পত্রিকার ৩০শে ভাদ্র সংখ্যায় মজহুর ইউনিয়নের পুরাতন নেতৃবর্গের অপসারণ সম্বন্ধে যে আশা-আপত্তার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রমিধানযোগ্য।

আমরা আর্থিক শ্রেণী-বিভাগ বা শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক বুলির সত্যতা স্বীকার করি না। তবুও লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নরনারী সম্বন্ধে হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

“গত ৮ই সেপ্টেম্বর কেবল ইউনিয়ন হইতে ত্রীজনের অপসারণ জামসেদপুর মজহুর আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এযাবৎ জামসেদপুরের মজহুর আন্দোলনের গতি অনেকবার বদল হইয়াছে, আবার পরিবর্তিতও হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের গাভভদ্রী পৃথক ছিল। বিপরীত ভাবাপন্ন লোক অথবা দল দ্বারা জয়-পরাজয়ের লড়াই হইয়াছে, কিন্তু একই দলভুক্ত দুই উপদলের জয়-পরাজয়ের পালা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। কংগ্রেসী ত্রীজন, গোপাল ও সিন্ধের চৌধুরী উপর অনাস্থা প্রভাব গৃহীত হইলে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন কংগ্রেসী ত্রীকিশোরীমোহন উপাধ্যায় ও ত্রীনারায়ণ যুগোপাধ্যায়। উভয় দলের লোকেরাই নিজেদের সক্রিয় কংগ্রেস সদস্য বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন।

কেবল ইউনিয়নের গদীতে এই আরোহণ ও অবরোহণ জামসেদপুর মজহুর ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া স্মরণপ্রসারী হইবে বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক আবদুল বারী নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মজহুর সংগঠনের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা দ্বারা তাহা চিরন্তনে ভাঙিয়া গেল। আবার ত্রীজনের মজহুর ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রভাবও থক্ক হইয়া গেল এবং কিছুদিন হইতে তাহার নেতৃত্বে যে বিশ্বাসের অভাব দেখা যাইতেছিল তাহা এইবার প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করিল।”

সিরিয়ায় ও থাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রবিপ্লব

জলপথে ও স্থলপথে এই দুই রাষ্ট্রের ব্যবধান ভিন-চার হাজার মাইলের কম হইবে না। আকাশযানে এই ব্যবধান ৩০।৩২ ঘণ্টার অভিক্রম করা যায়। দুইটি দেশের বর্ধ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন।

কিন্তু এই দূরত্ব ও পার্থক্য রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে কোন বাধা জন্মায় নাই। দুই রাষ্ট্রেই প্রধান সেনাপতি—আদিব এল শিশাক্লি ও পিন চুন আহ ওয়ান—রাষ্ট্রপতিত্ব আটক করিয়া পদত্যাগপত্র আদায় করিয়াছেন—গণতন্ত্রের নামে। পশ্চিম-

এশিয়া ও পূর্ব-এশিয়ার আরও উদাহরণ আছে। ইরানের প্রধান মন্ত্রী ও সর্বপ্রধান বিচারপতি নিহত হন মসজিদে। টাজ-জর্জানের রাজা আবদুল্লাও সেইভাবে নিহত হন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিহত হন এক জম পাকিস্তানী আফগানের হাতে। যেমন পাকীজী একজন হিন্দুর হাতে নিহত হন। ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী আউল সান নিহত হইয়াছিলেন সমবেত মস্লামগণের মন্ত্রণাগারে—মিস্ত্রের দলের লোকের হাতে। ইন্দোচীনে গৃহযুদ্ধ চার-বৎসর ব্যাপিয়া চলিতেছে। চীন-রাষ্ট্রে সম্প্রতি একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব অন্তর্বিপ্লবের শেষ কোণায় ভবিষ্যৎ জানেন।

সমস্ত বিশ্ব ভাবের রাজ্যে, বিশ্বাসের রাজ্যে, রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতির ক্ষেত্রে অজবিরোধে অভিজ্ঞত। ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, উহার বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এরূপ হৃদ্যায় পড়িয়াছিল। লোকে বলিত পৃথিবীতে সাধু-সন্ত রুমাইতেছেন। বিংশ-শতাব্দীতে আমাদের সে সাধুনাও নাই।

সংস্কৃত পুঁথির তালিকা

ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এদেশের সকল সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রকাশের জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ-সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

প্রাচ্য সম্পর্কিত বৃত্তি ও গবেষণার জন্য এরূপ তালিকার আবশ্যকতা বহু দিন যাবৎ অনুভূত হইতেছে। টি. এস. আরেটস ১৮৯১-১৯০০-সনের চেষ্টায় সর্বপ্রথম সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করেন।

গত ১৯৩৫ সনে কয়েকটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থপ্রেরণায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় নূতনভাবে সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে। উহার সনিকটবর্তী সরকারী প্রাচ্য হস্তলিপি গ্রন্থাগারে অসংখ্য সংস্কৃত পুঁথি আছে। ফলে ঐ কার্য্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সহজতর হয়। ১৯৪২ সনে তালিকা প্রণয়নকার্য্য বন্ধ রাখা হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উহা পুনরায় আরম্ভ করা হয়। তালিকাটির প্রথম বৎস ১৯৪৯ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

টি. এস. আরেটসের ১১৯৫ পৃষ্ঠার তালিকাটি প্রণয়ন করিতে ১২ বৎসর সময় লাগে। নূতন তালিকা প্রণয়ন করিতেও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-পরিমাণ সময় লাগিবে। ইহা ১৬টি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে এবং ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা হইবে ৮,০০০। ইহা প্রণয়ন করিতে অন্তর্ভুক্তসংখ্যক কর্মচারী, মুদ্রণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ আনুমানিক ৮০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

কি নাম রাখা যায় ?

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

ছেলেমেয়ে হইলে তাহার কি নাম রাখা হইবে ইহা লইয়া কোন কোন বাপ-মায়ের চিন্তার অবধি থাকে না। তাঁহারা এই প্রশ্ন নিজেরা সমাধান করিতে না পারিলে হয়ত বা কোন সাহিত্যিকের নিকট উপস্থিত হন এবং নামটা পছন্দমত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তোলেন। এরূপ ক্ষেত্রে যে নামের উপর পিতামাতা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন তাহা না বলিলেও চলে। 'নামেতে কি আসে যায়' একথা ইহারা স্বীকার করেন না। সাধারণ লোকে নামকরণে তত মনোযোগী না হইলেও এ বিষয়ে যে কতখানি সাবধানতা দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ খুবই অবহিত ছিলেন। মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নামকরণের বিধিনিষেধের আলোচনা আছে। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :

ততশ্চ নাম কুর্বাতি পিতৈব দশমেহনি।
দেবপুত্রং নরাধাং হি শম বর্মাদি সংযুতম্।
শমেতি ব্রাহ্মণস্তোক্তং বর্মেতি ক্ষত্রিয়শ্রেয়ম্।
গুপ্তদাস্যকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
নার্থহীনং নবাশস্তং নাপশব্দযুক্তং তথা।
নামজল্যাং জুগুপ্সং বা নাম কুর্ধ্যাং সমাক্ষরম্।
নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতি গুর্ভক্ষরাবিতম্।
স্বধোচ্চারিত্ত তন্মাম কুর্বাদৃ বৎ প্রবণাক্ষরম্। ৩।১০।৮-১১।

অর্থাৎ, জন্মের পর দশ দিন অতিবাহিত হইলে পিতা নামকরণ করিবেন। নামের প্রথম পদ কোন দেবতার নামানুযায়ী হইবে। নামের শেষে শর্মা বর্মা ইত্যাদি যুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণের নামে শর্মা, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস যোগ করিতে হইবে। অর্থহীন, অপ্ৰশস্ত, অপশব্দযুক্ত, অমঙ্গলবাচক এবং বীভৎস রূপ নামকরণ করিবে না। নামের অক্ষরগুলি যেন সম অর্থাৎ যুগ্ম হয়। নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, অধিক যুক্তাক্ষরবর্জিত, স্বধোচ্চারিত এবং ঋতিমধুর নাম রাখা উচিত।

শ্লোকগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। জন্মের পর দশ দিন অতিবাহিত হইলে শিশুর নামকরণের ব্যবস্থা আছে, কারণ প্রাচীনকালে দশ দিন পরে নবজাতকের অশৌচান্ত হয় বলিয়া ধরা হইত। কেহ কেহ বা বার দিনে অথবা এক মাস পূর্ণ হইলে অশৌচান্ত ধরিয়া নামকরণ করিতেন। এ সম্বন্ধে শ্লোক আছে, যথা :

নামধেয়ং দশম্যাকং কেচিদ্বিচ্ছন্তি পার্ধিব।
দ্বাদশ্যামথবা ত্রয়োং মাসে পূর্ণে তথা পরে।

অপরে পুণ্য তিথি বা মুহূর্ত কিংবা নক্ষত্রাদি বিচার করিয়া

নামকরণ করিতেন। অন্নপ্রাশনের সময় অধুনা নাম রাখা হইয়া থাকে।

নামের আন্তে পুরুষবাচক কোন দেবশব্দ রাখার উপদেশ আছে। অনেকে দেবতা বলিতে কুলদেবতাই বুঝিতেন। নামের আদিতে দেবতাবাচক শব্দ থাকায় তৎপূর্বে 'শ্রী' লেখার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল অল্পমান করা যায়, যথা, শ্রীকালিদাস, শর্মা। এখানে কালিদাস শব্দটি পুরুষবাচক এবং কালী কুলদেবতার নাম। বিশিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারেও নামকরণ হইয়া থাকে, যেমন, শ্রীনারদমুনি রায়, শ্রীগোতম দত্ত ইত্যাদি। আজকাল যে প্রকার তিন পদের নাম পাওয়া যায় পূর্বে তাহা অধিক প্রচলিত ছিল মনে হয় না। 'শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস' এখন এইরূপ নামের চলন হইয়াছে। পুরাকালে ইহা অপেক্ষা অল্প পদ যুক্ত নাম বেশী চলিত ছিল, যথা, শ্রীবিষ্ণু শর্মা। শ্রী কথাটার আর পূর্বের মর্যাদা নাই। রেডিওতে আজকাল 'শ্রীচাচিল' ইত্যাদি নামও শোনা যায়। কেহ কেহ ত শ্রী একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিন শব্দের বড় নাম হইলে আর এক অল্পবিধা দেখা যায়। লোকে অনেক সময় সমাসবদ্ধ পদ ভাঙিয়া ব্যবহার করেন। যেমন, 'স্বমতিকুমার গুপ্ত' এবং 'দেবেন্দ্রমোহিনী দাসী' সংক্ষেপে শ্রীমান স্বমতি ও শ্রীমতী দেবেন্দ্র হন। ছোট নামের যথা, 'দুর্গাদাস' এবং বিষ্ণুপ্রিয়ায় এরূপ দুর্গতি হয় না।

অর্থহীন নাম রাখা অবিধেয় কিন্তু আজকাল এমন অনেক নাম দেখা যায় যার অর্থ হয় না, যথা, রিপেন্দ্রকুমার, বিবনামোহিনী ইত্যাদি। অপ্ৰশস্ত নাম, যথা, মাণিকলাল, দিগম্বর, ত্র্যাংটেশ্বর, প্রাণনাথ ইত্যাদি। দেশজ শব্দযুক্ত অথবা লজ্জাবহ নাম এই বর্গের অন্তর্গত। অপশব্দযুক্ত নামে অঙ্গীল ভাবের উদয় হয়। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, 'অপশব্দং গুহ্যকেশাদি'। ইহার আধুনিক নমুনা, যথা, দিগম্বর, বিবসনা দেবী। অমঙ্গলবাচক নাম, যথা, শ্মশানপতি, রাহু ইত্যাদি। যে সকল নামের সহিত কোন বিপদ, দুর্ভোগ বা দুঃখজনক ইতিহাস জড়িত আছে তাহা ইহার অন্তর্গত। সীতা নামের বহু প্রচলন দেখা যাইলেও ইহা অমঙ্গল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জুগুপ্সিত নামে স্বপ্নার উদয় হয়। হাতিমল নাম মারোয়াড়ীদের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্থ কিন্তু কেহ যদি বাঙালীর এই নাম রাখেন তবে তাহা জুগুপ্সিত বলিয়া

বিবেচিত হইবে। ভূবিধর্মসেন, জরংকার, অসিত ইত্যাদিকে এই পর্বায়ে ফেলা যায়।

দুই অক্ষর বা চারি অক্ষরযুক্ত নাম অসম তিন অক্ষর বা পাঁচ অক্ষরের নাম অপেক্ষা প্রশস্ত। নামে অধিক যুক্ত অক্ষর বা অধিকসংখ্যক অক্ষর না থাকিলে তেবেই তাহা স্তম্ভোচ্চাৰ্হ হয়। বেকটেশ্বর, বাগ্গানিল প্রভৃতি নাম মোটেই স্তম্ভধুর নহে। সরোবরে-হাস্তমুখী-নলিনীসুন্দরী নাম অবগমধুর হইলেও অনেক অক্ষরযুক্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য।

পূর্বে যে সকল কথা বলিলাম তাহা ডাকনাম সম্বন্ধে খাটে না। বাঙালীর প্রায়ই দুইটা নাম দেখা যায়, একটা পোশাকী ও অপরটি আটপোরে। আটপোরে বা ডাকনাম আত্মীয়স্বজন আদর করিয়া রাখিয়া থাকেন। ঘণ্টু, পচা, গলা, ধসা প্রভৃতি নাম বাপ-মায়ের যতই আদরের হউক তাহা অপ্রশস্ত বা জুগুপ্সিত। অনেক সময় ডাকনাম চলিত হইয়া যায়, তখন সাধারণে ঐ নাম ব্যবহার করে। দাড়ি-গৌড়ওয়ালা চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়কে থোকা-বাবু বলিলে বিসদৃশ শোনায। কিছুদিন আগে-বেড়িতে হোনাবাবু এই নাম শুনিয়াছিলাম। বক্তা নামটি উচ্চারণ করিয়া নিজেই বলিলেন 'কি নাম রে বাবা!'

শাস্ত্রে বিপরীত বিধান থাকিলেও প্রাচীনকালেও অনেকেরই এখনকার ডাকনামের মত অর্থহীন অপ্রশস্ত বা জুগুপ্সিত নাম ছিল। বহু উপনিষদোক্ত ব্যক্তির নাম এই প্রকারের। নচিকেতা, বৈক প্রভৃতি নাম অর্থহীন। গর্গ (অর্থাৎ ঘাঁড় বা কৈচো), বক, মণ্ডুক, তিতির, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি নাম অপ্রশস্ত। হস্তমান, জাম্ববান, কুকুর ইত্যাদি নামও এই শ্রেণীর। ঐতরেয় প্রভৃতি নাম জুগুপ্সিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজাদের নাম অনেক সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হইত, যথা, রজি, দিলীপ, রঘু, অজ, নৃগ, পাণ্ডু, মরু, কুরু ইত্যাদি। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সকল নামের পূর্বে শ্রী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না যদিও রাম এবং কৃষ্ণের পূর্বে শ্রীর উল্লেখ আছে। অজ্ঞরাজগণের ও তাঁহাদের অধীনস্থ সামন্তশাসকগণের শিলালিপিতে দেখা যায় যে, কেবল রাজারাই ও রাজবংশীয় শাসকেরা শ্রী ব্যবহারে অধিকারী ছিলেন। যতই প্রতিপত্তিশালী হউন না কেন সাধারণ শাসকগণের নামের পূর্বে শ্রী যোগ করা নিষিদ্ধ ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে কেবল পুরুষদেরই নামকরণের বিধিনিষেধ আছে এবং পিতাকেই পুত্রের নাম রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মহাসংহিতায় পুরুষের নামকরণ বিধি বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ। জীলোকের নামকরণ সম্পর্কে মন্ত্র ২।৩৩ শ্লোকে বলিতেছেন :

জীর্ণাং স্থথোচ্চমকুরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং ।

মঙ্গলাং দীর্ঘবর্ণাস্তমশীর্বাদাভিধানবৎ ।

অর্থাৎ, যে নাম স্তম্ভোচ্চাৰ্হ হয়, নিষ্ঠুরতাবাচক না হয়, যে নামের অনায়াসে অর্থ বুঝা যায়, বাহা মনোহর এবং মঙ্গলবাচক, যাহার অন্তে দীর্ঘ স্বর থাকে ও বাহা উচ্চারণে আশীর্বাদ বুঝায়, জীলোকের এই প্রকার নাম রাখা উচিত। যশোদা, স্তম্ভদা ইত্যাদি নাম এই হিসাবে প্রশস্ত। মন্ত্র পুনশ্চ ৩।২, ১০ শ্লোকে বলিতেছেন :

নক্ষত্রক্ষণদীনান্নীং নাস্ত্যপর্বতনামিকাং ।

ন পক্ষ্যাহিপ্রেয্যানান্নীং ন চ জীবণনামিকাং ।

অব্যাক্তান্নীং সৌমানান্নীং হংসবারণগামিনীং ।

তনুলোমকেশদশনাঃ মুষ্ণীমুহুৎস্থিঃ ।

অর্থাৎ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, অন্ত্যপর্বত, পক্ষী, সর্প ও দাসত্ববাচক অথবা ভয়াবহ নামধারিণীকে বিবাহ করিবে না। যে স্ত্রী অবিকলাঙ্গী, মনোহরনান্নী, হংস বা গজগামিনী, যাহার লোম ও কেশ মুহূল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী জীলোককেই বিবাহ করিবে। এই নিয়ম অল্পসারে রোহিণী, রেবতী, বিশাখা, কৃত্তিকা, গন্ধা, যমুনা, স্থর্ণবা ইত্যাদি নাম অবাজ্ঞনীয়। এরূপ নিষেধের কারণ বুঝা যায় না। অন্ত্যপর্বত অর্থে যে পশ্চিম দেশীয় পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যায়। কুল্লকভট্ট স্বীয় টীকায় অন্ত্যপর্বত শব্দের অর্থ করিয়াছেন স্নেহপর্বত।

জীবনান্নী জীলোককে বিবাহ করিবে না বলা হইয়াছে। মনে হইতে পারে পিতামাতা যখন নামকরণের জন্য দায়ী তখন নিরপরাধা কন্যার উপর এ অবিচার কেন? অল্পধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এখানে শাস্ত্রকার বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। যে বাপ-মা কন্যার অবাজ্ঞনীয় নাম রাখেন তাঁহাদের মনঃসিক অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে যে কন্যার অথবা সেই কন্যাজাত সন্তানের বংশজ মানসিক রোগের সম্ভাবনা আছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অদ্বুত নাম রাখাও মনের বিকারের লক্ষণ। শ্রীমহম্মদ টমাস পূর্ণানন্দ পাল এই নাম পিতামাতার উৎকট ধর্মসম্বন্ধ আকাজ্জক পরিচায়ক।

এক এক যুগে এক এক প্রকারের নামের সমধিক প্রচলন দেখা যায়। বহু প্রাচীনকালে ঘাঁড় অতিসম্মানিত প্রাণী বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বয়ং মহাদেব বৃষবাহন নামে খ্যাত ছিলেন। অনেকে বলবান বৃষে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন। বৃষাকপি, ঋষভ, বৃষকেতু প্রভৃতি তখনকার দিনে অতি প্রিয় নাম ছিল। প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অর্বাচীন কাল পর্যন্ত যে সকল রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন পুরাণে তাঁহাদের নাম ধৃত হই-

যাচ্ছে। এই তালিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, নাম-করণে রাজারাও যুগপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। যুদ্ধাদি কার্যে ও বাহন হিসাবে কালক্রমে অশ্ব বৃষের স্থান অধিকার করে। সেই সময়ে রাজগণের নামে অশ্ব শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়, যথা, বিখগশ্ব, যুবনাশ্ব, বৃহদশ্ব, কুবলয়শ্ব, দৃঢ়শ্ব, বার্বিশ্ব, সংহতশ্ব, কুশাশ্ব, পৃষদশ্ব, রোহিতাশ্ব ইত্যাদি। অশ্ব শব্দের প্রাধান্য কমিলে রথ শব্দের প্রচলন হয়। তখনকার রাজাদের নাম, যথা, সুরথ, দশরথ, মীনরথ, সত্যরথ, বৃহদ্রথ, ভানুরথ, চিত্ররথ, শুচিরথ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে যখন পৌরাণিক লৌকিক মানবকল্প শেষ হইয়া দ্বিতীয় কৃত বা সত্যযুগ আসিয়াছিল তখনকার রাজাদের নামে কৃত বা সত্যশব্দ যুক্ত দেখা যায়, যথা, কৃতঞ্জয়, সত্যজিত ইত্যাদি। পরে আরও কিছুকাল গত হইলে মিত্র শব্দযুক্ত নামের প্রাচুর্য দেখা দিয়াছিল, যথা, পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র, বসুমিত্র, বজ্রমিত্র, ভূমিমিত্র ইত্যাদি। শেষ অন্ধরাজগণের কালে বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটয়াছিল। তখনকার নাম, যথা, শিবশ্রী, যজ্ঞশ্রী, চন্দ্রশ্রী, বেদশ্রী, শক্তিশ্রী ইত্যাদি। আজকাল রাজা ও জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের নামের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই নারায়ণ শব্দটি যুক্ত দেখা যায়, যথা, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, জগদ্বিন্দ্রনারায়ণ, রামেশ্বরপ্রসাদনারায়ণ ইত্যাদি। সাধারণের মধ্যে এখন ইন্দ্র এবং নাথ অথবা চন্দ্র কিংবা কুমার সংযুক্ত নাম লোক-প্রিয় হইয়াছে, যথা, দেবেন্দ্রনাথ, কার্তিকচন্দ্র, নরেন্দ্রকুমার, ইত্যাদি। স্বদেশকুমার, চরখারাগী নামে স্বদেশীয়ুগের প্রভাব লক্ষণীয়। অনেক সময় একই বংশের সন্তানদের সমার্থবাচক নাম রাখা হয়, যথা, চারি ভ্রাতার নাম চন্দ্রনাথ, সোমনাথ, শশিনাথ এবং শশাঙ্কনাথ।

সংস্কৃত ভাষা বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার জননী। এ সমস্ত ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ দেখা যায়। আশ্চর্যের কথা এই যে, সংস্কৃত শব্দ অস্ত্রান্ত্র ভাষায় যত বিকৃত হইয়াছে বাংলায় তত নহে। ইহার কারণ যাহাই হউক না কেন ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাংলা নামে প্রায়ই শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। বাঙালী নাম রাখে দেবেন্দ্র, বিহার বা উত্তর প্রদেশে তাহা দেবিন্দ্র হয়। কোন কোন প্রদেশে নামের সহিত পিতৃপরিচয় ও আদি বাসস্থানের নির্দেশ থাকে। কুশলচাঁদ চুণিলাল জয়পুরিয়া—এই নামে বুঝা যায় যে, কুশলচাঁদের পিতা চুণিলাল এবং তাঁহার জয়পুরের অধিবাসী। মোগল আমলেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে; যথা, ভীমসেন বর্হানপুরী, অর্থাৎ বর্হানপুরের ভীমসেন। প্রাচীনকালে অনেকে বংশের বা প্রদেশের নামে পরিচিত হইতেন, যথা, রাঘব অর্থাৎ রঘুবংশজাত, কৌশল্যা অর্থাৎ

কৌশলদেশীয়। মাতার নামানুযায়ীও নামকরণ হইত, যথা, কৌন্তেয়, গৌতমীপুত্র, ঐতরেয়। এখনও এইরূপ নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল যে অস্ত্র প্রদেশের লোকের নামেই আদি বাসস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা নহে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙালী ব্রাহ্মণদের পদবী, যেমন গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি স্থান-নির্দেশক। বৃত্তি অনুযায়ী পদবীও কোন কোন স্থলে দেখা যায়, যথা, কাল্লুনগো, মহলানবিশ, আচার্য, ছুধওয়াল, বুনবুনওয়াল ইত্যাদি।

নাম দেহের প্রতীক। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, নাম তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিন স্থায়ী। মানুষ গত হইলেও তাহার নাম রহিয়া যায়। কীর্তিষ্মন্ত স জীবতি। কীর্তিমান পুরুষ মৃত হইলেও নামের মহিমায় বাঁচিয়া থাকেন। নামের স্থায়িত্ব কীর্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। কাহারও নাম দুই-এক পুরুষ গত হইলে লোকে ভুলিয়া যায়, কাহারও বা নাম সহস্র বৎসরাদিক কালেও লোপ পায় না। পুরাণে গল্প আছে মহারাজ ইন্দ্রদ্রুম পুণ্যকাজ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। বহু যুগ পরে তাঁহার স্বর্গভোগ কাল শেষ হইয়া আসিলে দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন, ‘মহারাজ, এইবার আপনাকে মর্ত্যে যাইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু যদি পৃথিবীর এক প্রাণীরও আপনার নাম স্মরণে থাকে তবে আপনাকে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতে হইবে না।’ অতঃপর দেবগণ মানুষী তত্ত্ব ধারণ করিয়া ইন্দ্রদ্রুমের সঙ্গে ধরাধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনেক লোককে প্রশ্ন করিলেন কিন্তু কেহই বলিল না যে ইন্দ্রদ্রুমের নাম শুনিয়াছে। অবশেষে এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বলিলেন, ‘আপনারা ভূষণ্ডি কাককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি জানিলেও জানিতে পারেন ইন্দ্রদ্রুম কে। আমরা চিরকাল দেখিতেছি তিনি ঐ বটবৃক্ষে বাস করেন, তাঁহার বয়সের ইয়ত্তা নাই।’ দেবগণ ও ইন্দ্রদ্রুম ভূষণ্ডি কাকের নিকট গেলেন। ভূষণ্ডি বলিলেন, ‘আমি ইন্দ্রদ্রুমের নাম শুনি নাই। নদীতীরে তিস্তিড়ী বৃক্ষে এক বক বাস করে। তাঁহার নাম তালজজ্বা। তিনি আমার অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।’ ভূষণ্ডি দেবগণ ও রাজাকে সঙ্গে লইয়া তালজজ্বার নিকট গেলেন। তালজজ্বা বলিলেন, তিনিও ইন্দ্রদ্রুমের নাম শুনে নাই। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, দূরবর্তী এক জলাশয়ে অকুপার নামক এক কূর্ম বাস করেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক প্রাণী ইহজগতে আর নাই, তিনি হয়ত ইন্দ্রদ্রুমকে চিনিতে পারেন। তালজজ্বা পথ দেখাইয়া তাঁহাদের সকলকে লইয়া অকুপারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণ

অকুপারকে প্রশ্ন করিতে তিনি আবেগভরে বলিলেন, ‘মহারাজ ইন্দ্রদ্রায়ের নাম কে না জানে। তিনি পূর্বে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণদের এত গাভী দান করেন যে, তাহাদের ক্ষুদ্রাশ্রমে মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক মহান সরোবরের সৃষ্টি করে। আমি সেই সরোবরে

এখন পর্যন্ত স্থখে বাস করিতেছি।’ সকল কথা শুনিয়া দেবগণ ইন্দ্রদ্রায়কে বলিলেন, ‘মহারাজ আপনি ধন্য; এখন পর্যন্ত জগতে আপনার নাম কীর্তিত হইতেছে। আপনার স্বর্গবাস অক্ষয় হউক।’

জননী জন্মভূমিশ্চ—

শ্রীনির্মলকুমার রায়

দক্ষিণে নাতিউচ্চ রাজমহল শৈলমালা, উত্তরে অতিবিস্তৃত বালুচর, ইহারই মধ্য দিয়া প্রবাহিত গঙ্গা। বর্ষায় আবর্ত-ময়ী গঙ্গা ছুঁলব্যাপী জলোচ্ছ্বাসে দিগন্ত প্রাবিত করিয়া গ্রাম, জনপদ গ্রাস করে আর শীতে ও গ্রীষ্মে ক্ষীণ জলধারা-সমূহ অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ চর সৃষ্টি করিয়া আপন গতিপথকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। ভাঙা-গড়ার, বিনাশ ও সৃষ্টির এই কাজ যুগ যুগ ধরিয়া চলে।

ওপারে সুরিগলি ঘাট, এপারে মণিহারি ঘাট। ওপারে বড় লাইনের বড় গাড়ী, এপারে ছোট লাইনের ছোট গাড়ী। নদী পারাপার ষ্টীমারে করিতে হয়। যাত্রী-সাধারণ ভারত বিভাগ ভুলিয়া যান, কিন্তু একা নদী বিশ ক্রোশের ব্যবধান সহ করিতে চান না। সুরিগলি-মণিহারি পারাপারের কষ্টে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা রেল-কর্তৃপক্ষকে যে সব সুমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন তাহা গল্পে লিখিবার মত নয়।

রাত্রিতে দিনে, বর্ষায় শীতে, প্রাবনে শুষ্কতায়, ষ্টীমার ঘাটে লাগে। সম্মুখেই ট্রেন দাঁড়াইয়া থাকে। সেই খড়ের ঘর, ইলেক্ট্রিক লাইট, ছোট ইঞ্জিনের তীব্র চীৎকার, মজদুরদের হুড়াহুড়ি; মণিহারি ঘাট। কর্ম্মারা জানে আজ যেখানে মণিহারি ঘাট কাল সেখানে প্রকাণ্ড চর। কাল যেখানে ঘাট আজ সে জায়গাটা গঙ্গার গভীর জলতলে। ছয়-সাত মাইল ব্যাপিয়া মণিহারি ঘাটের বিভিন্ন ঋতুতে এই স্থান পরিবর্তন।

ফাল্গুন মাস। পলাশে শিমূলে, কোকিলে মলয়ে বসন্ত আসিয়াছে, কিন্তু সে কোথায়? ধূধূ করে বালুচর। দিনের প্রচণ্ড তাপে ভোর হইতেই বালি তাতিয়া উঠে। একটু বেলা হইলেই ধুলির ঝড় বহিতে থাকে। রৌদ্র-তাপ, ফাল্গুনের লু উপেক্ষা করিয়া মজদুরের দল মাল

উঠায়, নামায় আর রেল-কর্ম্মচারীরা পাট, চা, চিনি, চাল, আটার হিসাব রাখে। স্বাস্থ্যকর পশ্চিমের অধিবাসীরা এই সময়ে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রাস্থ উপভোগ করেন আর কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্রসমাজ বৈজ্ঞানিক পাখার নীচে ও খসখস-পর্দার পশ্চাতে আপিসের কাজ করেন। রেলের কিন্তু দিন-রাত্রি নাই, শীত-গ্রীষ্ম নাই, মলম-লু নাই। রেলের চাকা চলিতে থাকে, রেলের মজদুর কর্ম্মচারী খাটিতে থাকে।

এমন সময় আসিল উদাস্তর বন্যা। ফাল্গুনে জলের বন্যা নয়, এ মালুঘের বন্যা। দলে দলে, দিনে-রাত্রিতে, উদাস্তর দল মণিহারি ঘাটে নামিতে লাগিল। কোথা হইতে আসিতেছে ইহারা? চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল। তারপরে শিয়ালদহ স্টেশন, তারপর এ ক্যাম্প দে ক্যাম্প। তার পরে? কে জানে কোথায়? জল-পাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, আসাম।

হঠাৎ সন্ধ্যায় খবর আসিল রাত্রি আটটায় উদাস্ত-বোঝাই এক ষ্টীমার আসিবে, সারা রাত্রি মণিহারি থাকিয়া ভোরে বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে যাইবে। একে ঘাটস্টেশন তাহাতে রাত্রি, ইহারা থাকিবে কোথায়, খাইবে কি?

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ঝড় বহিয়াছে, চতুর্দিক বালিতে বালিময়। কর্ম্মচারী, মজদুর, ঠিকাদার সকলে অবসন্ন। কিন্তু রেলের কর্ম্মচারীরাও মালুঘ। মালুঘ মালুঘকে না দেখিলে কে দেখিবে? স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হইল; চাল ভাল জোগাড় হইল; বালুচরে অজস্র চুল্লীতে আগুন জলিয়া উঠিল।

যথাসময়ে জাহাজ ঘাটে ভিড়িল। দলে দলে নরনারী শিশু-বৃদ্ধ-যুবা নামিতে লাগিল। অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্ত, রৌদ্র-জলে ক্লান্ত, পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র; হাতে, মাথায়, কাঁধে পোটলা-পুঁটলি, হাঁড়ি, বাসন, কাঁথা, পাটি, হুঁকা,

মুখে অভ্যাস্ত নিরাশা; গায়ে বিষম গন্ধ। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সাদা বালু বিকৃতিক করিতেছে। তাহার উপরে দলে দলে সারি সারি কাহারা চলিতেছে? মানুষ, না মানুষের জীবন্ত কঙ্কাল? হৈ চৈ ডাকাডাকি, ছুটাছুটি, চট্টগ্রাম হইতে বরিশালের ঐশ্বর্যময়ী বাংলা ভাষার অপূর্ব বৈচিত্র্য।

খাওয়ার পান্য আরম্ভ হইল। এমন ক্লশকায় মানুষ এতগুলি খায় কি করিয়া! খিচুড়িতে বতটা চাল ডাল ততটা মণিহারির বালি। কিন্তু কে তাহা গ্রাহ করে? ফান্তনে এদিকে কলেরার প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। ইন্ডেকশন, রিচিং পাউডার, ফিনাইল, ডাক্তার, মেথর ঘাটকে স্তম্ভ রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এত রাত্রিতে কে কাহার কথা শুনে, কে স্থান-অস্থান বিচার করে?

রাত্রি একটায় হঠাৎ একজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, শিগগীর আসুন। একটি স্ত্রীলোকের অবস্থা ভাল নয়।' ডাক্তার হাতে ব্যাগ লইয়া ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'ব্যার্টারের দুই মাসের খাওয়া এক দিনে খাওয়া চাই, চল।'

চরের উপরে এক অতি ক্লশকায় নারীদেহ পড়িয়া আছে। বয়স ১২ হইতে ৩২ বাহা কিছু হইতে পারে। পরিধেয় লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়...

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল দেখিয়াই বলিলেন, 'আর দেৱী নয়, একে কোথায়ও নিতে হবে; প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।'

স্বেচ্ছাসেবক দুইটি শিহরিয়া উঠিল। এই বিস্তীর্ণ বালুচর, অসংখ্য লোকের ভিড়। খড়ের তৈরি বিশ্রামাগারে তিলমাত্র ধারণের জায়গা নাই। একে কোথায় লইয়া যাইবে? কিন্তু উপায় নাই। অনতিদূরে ছিল টালি ক্লার্কদের খড়ের ব্যারাক। রোগীর চেয়ারে তুলিয়া মৃতপ্রায় স্ত্রীলোকটিকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। আত্মীয়স্বজন কেহ আছে কিনা জানা গেল না। থাকিলেও

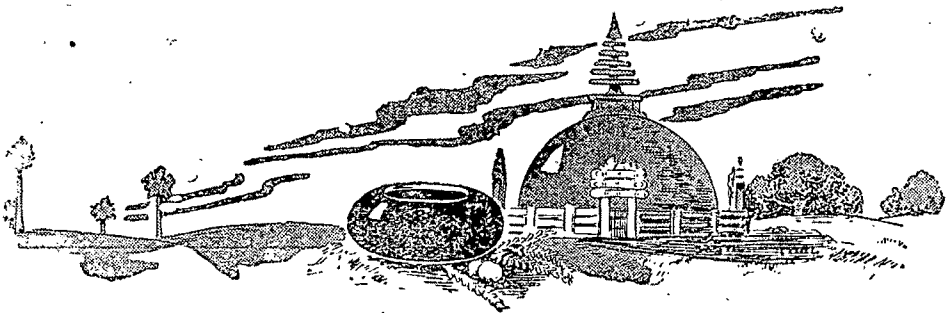
তাহারা বুদ্ধিমানের মত গা-ঢাকা দিলেন। কি ঝগড়াটাই এসময়ে, এই অস্থানে!

ব্যারাকে উপস্থিত হইয়াই ডাক্তার পরম যত্নে স্ত্রীলোকটিকে বাঁশের মাচার উপরে শোয়াইয়া দিল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, 'গরম জল আর ঘরে মাত্র একজন স্বেচ্ছাসেবক। না ছিল যন্ত্রপাতি, না ছিল অন্য কোন ব্যবস্থা। বাহিরে সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ঘণ্টা দুই পরে নবজাত শিশু তীব্র ক্রন্দন-ধ্বনিতে আপনার আবির্ভাব ঘোষণা করিল। চতুর্দিকে দিগন্তবিস্তারী বালুচর, সম্মুখে ক্ষীণশ্রোতা বহুধা-বিভক্ত গঙ্গা, ওপারে নীলাভ রাজমহল পর্বতমালা, উপরে অনন্ত আকাশে খণ্ড চাঁদ—নবজাত শিশুর তীব্র চীৎকার-ধ্বনি বালুচর পার হইয়া, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, রাজমহল গিরি-শ্রেণীতে প্রতিহত হইয়া বুঝিবা সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। জগতে জগতে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মানবশিশুর জন্ম-বার্তা ছড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বলিল, 'একটি সুন্দর শিশু জন্মিয়াছে কিন্তু মাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।

রাতি প্রভাত হইল। পুষ্যসলিলা গঙ্গার তীরে মৃতদেহ সংকার হইল। একটি উদাস্ত-দম্পতি শিশুটিকে গ্রহণ করিতে রাজী হইল। সকলে মিলিয়া শিশুর নাম রাখিল মনোহর। ভোরের গাড়ীতে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, উদ্বেগহীন দম্পতি আর একটি বোঝা ঘাড়ে লইয়া চলিয়া গেল।

মনোহর বাঁচিয়া থাকিবে কিনা জানি না। যদি এক দিন সে তাহার জন্মভূমি খুঁজিতে আসে, পাইবে না। হয় তাহা আবর্তময়ী যোজনপ্রসারী রাক্ষসী নদীগর্ভে, নয় তাহা দূরবিস্তারী, আকারপ্রকারহীন অতিবিরল বনঝাউ-আচ্ছাদিত চরের যে কোন জায়গায়। আর তাহার জননী—?



সূর্যরথ ও সূর্যসংজ্ঞা 'সপ্তসপ্তি'

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"সপ্ত যুগ্মংতি রথমেকচক্রমেকো অথো বহতি সপ্তনামা।

ঋগ্বেদ ১.১৩৪.২।

—(ভাষ্যানুবাদ) একচক্রযুক্ত সূর্যরথ সপ্ত অশ্ব বহন করে। এক অশ্ব অর্থাৎ এক বায়ু সপ্ত নাম বা সপ্ত রূপ ধরিয়া সূর্যের রথ বহন করে। অথবা একচক্র রথ অর্থাৎ একচারী বা অসচায়াভাবে সঞ্চারী আদিত্যমণ্ডলকে সপ্তসংখ্যক রশ্মি বহন করে।

একচক্র রথ—ঋকের তৃতীয় চরণে "ত্রিনাভি চক্রম্"—এই ত্রিনাভির বর্ণনায় সাধারণ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যদ্যপি ত্রীণি চক্রাণি তথাপি তেবামেকরূপত্বাদেকচক্রমিত্যুচ্যতে," অর্থাৎ যদিও তিন চক্র, তথাপি তাহারা একরূপ বলিয়াই একচক্র বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য শুল্কযজুর্বেদ-লাভার্থ স্তবগান করিয়া সূর্যদেবের উপাসনা করিলে, আদিত্যদেব প্রদত্ত হইয়া বাজিরূপ যোগিবরকে অযাতযাম, অর্থাৎ অন্যের অজ্ঞাত যজুঃসমূহ দান করিয়াছিলেন (ভাগবত ১২.৬.৭৯)। নির্ণয়সাগর-যন্ত্রে মুদ্রিত শুল্কযজুর্বেদসংহিতায় এ বিষয়ে যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে সূর্যরথ একচক্র ও সপ্তাশ্ববাহন; সাধারণের ভাষ্যানুসারে একরূপ ত্রিচক্রযুক্ত নহে।

সংস্কৃত কাব্যাদিতে একচক্র সূর্যরথের প্রয়োগ পাই নাই, আছে কিনা জানি না। সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারে সূর্যরথ বিষয়ক নিম্নোক্ত ক্লোকটি আছে :

"একচক্রেণ রথো যন্তা বিকলো বিষদা হয়াঃ।

আক্রামতোব তেজস্বী তথাশার্কো নভস্তলম্।"

অর্থাৎ, সূর্যের রথ একচক্রযুক্ত, সারথি অরুণ বিকলাঙ্গ, অর্থাৎ অনুক-উরুবিহীন, অশ্বাণ বিষমসংখ্যক, অযুগ্ম সপ্তসংখ্যক, তথাপি, অর্থাৎ সেইপ্রকার রথাদি হইলেও তেজস্বী সূর্যনভস্তল আক্রমণ অর্থাৎ উদ্গমন করেন। তাৎপৰ্য,—তেজস্বীর তেজই মুখ্য সহায়, অন্য সহায়ক গৌণ।

বাংলায় কাব্যে ইহার অনেকগুলি প্রয়োগ পাওয়া যায় :

১। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সূর্যবন্দনায়,—

"একচক্র রথে, আকাশের পথে, উদয়গিরি হইতে।

বাহ অশ্বগিরি, একদিনে ফিরি, কে পারে শক্তি কহিতে।"

২। মাইকেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যে—

(ক) "জাগন অরুণে যবে উষা সাজাইতে

একচক্র রথ।"

(খ) "একচক্র রথে

উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে।—মেঘনাদবধ

(গ)

উদয়-অচলে

দিবামুখে একচক্রে দিলা দরশন,

অংশুমালা গলে

বিতরি স্বর্ণরশ্মি চৌদিকে তপন।"

—"সূর্য ও মৈনাকগিরি—মাইকেল গ্রন্থাবলী।

৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কুহু ও কেকা'য়—

"সংহর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র রথের ঠাকুর!

গ্রীষ্মের হর।

উদ্ধৃত কবিতাংশে সর্বত্র 'একচক্র' শব্দ 'একসংখ্যক চক্র' অর্থে গৃহীত হইয়াছে, 'একরূপ ত্রিচক্র' অর্থাৎ 'একাকৃতি তিন চক্র' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা একচক্র শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ।

সপ্ত অশ্ব—(ভাষ্যানুবাদ) (১) অন্তবিক্ষসঞ্চার বায়ুর অধীন বলিয়া সপ্তনামধারী বায়ু—এক অশ্ব বা সপ্তনামা অশ্ব; অথবা (২) সর্পণঞ্চাক বা সপ্তসংখ্যক রশ্মিসমূহ—সপ্তপ্রকার কার্ষে অসাধারণ বা পরস্পরবিলক্ষণ বড়শ্বতুগণ, এক সাধারণ শ্বতু—এই সপ্ত শ্বতু সপ্ত অশ্ব; অথবা (৩) মাসদ্বয়াত্মক বড়শ্বতু, অপর অধিমাশাত্মক এক—এই সপ্ত শ্বতু সপ্ত অশ্ব।

সাধারণ-ভাষ্যে "আদিত্যমণ্ডলকে সপ্তসংখ্যক রশ্মি বহন করে"—এই অর্থ করিয়াছেন। সূর্যকিরণে ভায়লেট প্রভৃতি সপ্ত বর্ণ আছে; ত্রিতল কাচফলকের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে সূর্য-রশ্মি ঐ সপ্ত বর্ণে বিভক্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্যরশ্মি বৃষ্টিকালে জলবিন্দুসমূহের মধ্য দিয়া সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থিত মেঘখণ্ডে পতিত হইলে ঐ মেঘে নানা বর্ণে রঞ্জিত যে রামধনুর উৎপত্তি হয়, তাই সপ্ত বর্ণে চিত্রিত। ঐ সপ্ত বর্ণ সূর্যের সপ্তাশ্বরূপে কল্পনা করিলে, নিতান্ত অসঙ্গত হয় না বোধ হয়।

"আ সূর্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ" (ঋগ্বেদ ৫.৪৫.৯)—এই ঋকের 'সপ্তাশ্ব' শব্দ বিশেষণ, বহুব্রীহিসাধিত শব্দ—'সপ্ত অশ্ব যাহার'। সূর্যের বিশেষণ এই 'সপ্তাশ্ব' শব্দ হইতে সূর্যের সংজ্ঞারূপে গৃহীত বিশেষ্য 'সপ্তাশ্ব' শব্দ অভিধানে ধৃত ও কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অশ্ব' ও 'সপ্তি' শব্দ সমার্থক—সূর্যের অন্য সংজ্ঞা 'সপ্তসপ্তি' শব্দ এই 'সপ্তাশ্ব' শব্দেরই প্রকৃতিগত রূপান্তর।

* সপ্তবর্ণ—violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red (সংক্ষেপে—vibgyor)।

প্রশ্ন

শ্রীপ্রেমাক্ষর আত্মা

আজ আশ্বিনের শেষে আগমনীর স্বর স্রুত হতে না হতে বর্ষা এসে দাঁড়াল আকাশ-প্রাঙ্গণে, তার মিশকালো ওড়না উড়িয়ে। বিদায়ের আগে তার যত কিছু সমারোহ নিয়ে নর্তন স্রুত করে দিলে। সকাল থেকেই অবিশ্রাম বর্ষণ চলেছে বম্ বম্ বম্। শুনতে শুনতে আমার মানস-আকাশেও তার ছায়া এসে পড়ল—কি জানি সেখানেও কি কারণে স্রুত হয়ে গেল বর্ষণ। কোথা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এসে জমতে লাগল সেখানে, অজানা ব্যাখ্যাত্তরলোক করুণ হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ এই অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎফুরণের মত একখানি মুখ একবার চমকে উঠে মিলিয়ে গেল—বিচিত্র এই মাহুঘের মন।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমরা এক ক্লাসে পড়তুম, তখন আমাদের বয়স এগার-বার-তের। সে ছিল স্থলকায়, শুধু স্থলকায় বললে ভুল বলা হবে, সে ছিল বিপুলকায়। শুধু আমাদের ইস্কুল নয়, কাছাকাছি তিন-চারটে ইস্কুলের মধ্যে তার মত দশাসই চেহারার বালক আর একটিও ছিল না। সেইজন্ত তাকে সে পট্টর ছেলেবুড়ো সবাই চিনত। নাম না জানলেও চেহারার বর্ণনা শুনলেই লোকে বুঝতে পারত কার কথা বলা হচ্ছে।

বিশ্বনাথরা ছিল ব্রাহ্মণ। বিশ্বনাথ মুখুজ্জ তার পুরো নাম। কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা, শুধু ক্লাসের ছেলেরা কেন—সারা ইস্কুলের ছেলেরা তাকে মোটা বিশু বলে ডাকত। বিশ্বনাথের চেহারাটাই শুধু অমন ছিল না, সেই শরীরে ঐ বঙ্গসেই একেবারে হস্তীর মত না হোক, হস্তীশিশুর মত শক্তি ছিল। আমরা ক্লাসের ছেলেরা তো কেউ তার সঙ্গে পারতুমই না, তিন ক্লাস ওপরের ফাষ্ট ক্লাসের কেউ তার সঙ্গে পারত না। অত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার মেজাজটি ছিল শরীফ। কখনো তাকে রাগতে কিংবা মারামারি করতে দেখা যেত না, হাজার কারণ সত্ত্বেও। ক্লাসের ছেলেরা তো প্রায়ই বলত—ভাগ্যে বিশেষ শালা ছিল। কিংবা—রিশে বেটা আজ ছুরি আনে নি, পেন্সিল কাটি কি করে—ইত্যাদি।

কিন্তু বিশু নির্বিকার। সে ওসব সম্ভাবণকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না।

মেজাজের মত আহাৰ সম্বন্ধেও তার ঔদার্য ছিল অপরিমিত। আমরা জিজ্ঞাসা করতুম—হ্যারে বিশেষ, তুই নাকি একটা ছোটখাটো পাঠ্য একাই সাবাড় করতে পারিস?

কিন্তু হ্যাঁ না কিছু না বলে শুধু হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হাসতে থাকত আর বলত—কেন রে এক দিন খাওয়াবি নাকি?

তার খাওয়ার কথা শুনেই আসছিলুম, একবার একটা উপলক্ষ্যে চক্ষুর্কর্ণের বিবাদভঞ্জন হ'ল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষ্যে সরকার থেকে এখানকার ইস্কুলের ছাত্রদের এক দিন ভূরিভোজনের আয়োজন হয়েছিল। প্রত্যেক ইস্কুলের ছাত্রের সংখ্যার অনুযায়ী গবর্নেন্ট টাকা দিয়েছিলেন, আর প্রত্যেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিলেন। বেলা দুটো কি আড়াইটার সময় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে বিশ্বনাথের খাবার মাত্রা দেখে আমরা তো অবাক, এমন কি মাষ্টারেরা পর্যন্ত ছুটে এলেন। ইস্কুল স্রুত ছেলের খাওয়া হয়ে গেল, তখনও সে মাংস আর লুচি ওড়াচ্ছে। চার পাশে ছেলে ও মাষ্টারের দল দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে বিশু একা বসে ভোজন চালিয়েছে—সে এক দৃশ্য। শেষকালে অস্থির করবে বলে মাষ্টারেরা তাকে এক রকম জোর করে তুলে দিলেন।

মনে আছে ঐ ভূরিভোজনের পর সে চল্লিশটি পানতুয়া খেয়েছিল। যা হোক সেদিন আহাৰাদির পর আমরা বাড়ীতে না গিয়ে বিশ্বর বাড়ীতে গেলুম দাবা খেলতে।

বিকেল নাগাদ খেলা বথন খুব জমে উঠেছে, তৎকালিক প্রায় মারামারিতে পৌঁছয় এমন সময় বিশ্বনাথের পাড়ার জনকয়েক ছেলে এসে তাকে ধরল। তাদের সঙ্গে যেতে হবে তাদের ইস্কুলে খেতে। বিশ্বনাথের ঐ বন্ধুরা পড়ত তখনকার জেনারেল এসেম্বলির ইন্সটিটিউশনে। এখন যার নাম হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজ। তারা বিশ্বর সঙ্গে আমাদেরও টানাটানি করতে লাগল। আমরা কিছুতেই যাব না—শেষকালে বিশেষ বললে—ওরা যদি না যায় তো আমিও যাব না। ফলে হ'ল কি তারা এক রকম জোর করে আমাদের টেনে নিয়ে চলল।

সেখানে গিয়ে পৌঁছনমাত্র ছেলেদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল মোটা বিশেষ এসেছে বলে। খাবার জায়গা তৈরিই ছিল, আমাদের ধরে তখুনি বসিয়ে দেওয়া হ'ল সেখানে। অল্প ঘর থেকে ছেলেরা লাফিয়ে এসে আমাদের ঘরের পংক্তিতে ঠেসাঠেসি করে বসে যেতে লাগল। সকলের আগ্রহ মোটা বিশ্বর খাওয়া দেখবে। দু-তিন জন মাষ্টারও এসে উপস্থিত হলেন। ছেলেরা বলতে

লাগল—স্ত্রীর মোটা বিস্তকে ধরে এনেছি, ও আসতে চাইছিল না। মাষ্টাররা বললেন—বেশ করেছ।

সকলে মিলে বিশ্বনাথকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, সবার উৎসাহ শুনে সেও উঠল ক্ষেপে। খাওয়ার স্রু ধেকেই সে যেন মরিয়া হয়ে উঠল।

হৈ-হুল্লোড়ের ব্যাপার! পরিবেশন ইত্যাদি তেমন কাছন মাফিক হচ্ছিল না, প্রথমে চারখানা করে গরম লুচি পাতে পড়ল—চারখানায় কি হবে, চারখানায় কি হবে করে ছেলেরা আরও চারখানা লুচি তার পাতে গছিয়ে দিলে। তরকারি আসতে মিনিট কয়েক দেরি হয়েছিল—ইতিমধ্যে বিশেষ হুন্ দিয়েই আটখানা লুচি আড়ে মেরে দিলে। ছেলেরা বিস্তর কাণ্ড দেখে হৈ হৈ করে উঠল। তার পর প্রত্যেকটি পদ বেশ ভাল করে অর্থাৎ আর যারা বসেছিল তাদের সবায়ের চেয়ে বেশী ভো খেলেই, উপরন্তু বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে আধ হাড়ি দৈ সাবাড় করে দিলে ভাল হজম হবার জন্তে।

ইস্কুলের কাছেই ছিল বিস্তদের বাড়ী। টিফিনের সময় বাজে কচুরি জিলিপি না খেয়ে সে বাড়ীতে গিয়ে ভাত খেয়ে আসত। টিফিনের পরের ঘটায় আমাদের ট্রান্সলেশ্যন হ'ত। বাংলা বইয়ের খানিকটা তর্জমা করতে দিয়ে মাষ্টারমশায় অত্র কাজ করতেন। সেটা ছিল বিস্তর ঘুমোবার ঘট। সে ডবল বেঞ্চির ওপর দু'হাত দিয়ে তাতে মাথা রেখে ঘুমোত—আর আমরা চার-পাঁচ জন পালা করে তার পিঠ চুলকে আরাম করে দিতুম। তা না হলে বিস্তবাবুর ঘুম হ'ত না। তার ঠাকুরমা ছেলেবেলা থেকে এখনো পর্যন্ত ঘুমোবার সময় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে এমন অভ্যাস করে দিয়েছেন যে তা না করলে সে ঘুমোতে পারত না। দিনের বেলায় এই নিদ্রাটি না হলে তার বড় কষ্ট হ'ত এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় হ'ত না।

এক দিন কি কারণে জানি না, আমাদের ট্রান্সলেশ্যন-এর মাষ্টারমশায় এলেন না। মাষ্টার না এলে যা হয় অর্থাৎ ক্লাসে খুবই গোলমাল হতে লাগল। পাশের ক্লাসের মাষ্টার এসে দু-তিন বার বারণ করে গেলেন। ফলে মিনিট দুই চুপচাপ থেকে আবার গুণ্ডগোল স্রু হ'ল। এক বার আর এক ক্লাসের মাষ্টার এসে খুব ধমকধামক করে গেলেন। তারই কিছুক্ষণ আগে কালীচরণ ও নিবারণের খুব তর্ক লেগেছিল। মাষ্টার চলে যেতেই আবার তর্ক স্রু হ'ল। ক্রমে কয়েকজন কালীচরণের ও কয়েকজন নিবারণের দলে জুটে গেল। প্রথমে তর্ক, তার পরে স্রু হ'ল গালাগালি। আমরা তখন নতুন নতুন খারাপ কথা শিখেছি, কিন্তু সে সব প্রয়োগ করবার ক্ষেত্র পাই না। একটা

উপলক্ষ্য পেয়ে এইখানে খুব ভোড়ে চলল সে সব। এক পক্ষ একটা বলে তো ও পক্ষ বলে চারটে। যারা নিরপেক্ষ ছিল তারাও বাহাদুরি দেখাবার জন্য মুখ ছোটোতে আরম্ভ করে দিলে। প্রতিযোগিতায় গালাগালি স্রু হয়ে গেল। ঘট্টা কাবার হয়ে গেল। মাষ্টারমশাই একরকম ছুটতে ছুটতে ক্লাসে এসে বললেন—কি ব্যাপার কি?

মিনিটখানেক সব চুপচাপ, কেউ কোন কথা বলে না। কিন্তু মাষ্টারমশাই নাছোড়বান্দা, তিনি টেবিল চাপড়ে হুকার ছাড়লেন—কি হয়েছে। এত চেঁচামেচি কেন হচ্ছিল?

উভয় পক্ষ উঠে অন্য পক্ষের নামে দোষ দিতে আরম্ভ করলে। শেষকালে আবার এক হট্টগোল হবার উপক্রম দেখে মাষ্টারমশায় টেচিয়ে উঠলেন—সায়লেন্স।

আমাদের বিশ্বনাথ বাবাজী এতক্ষণ তাঁর সেই সনাতন 'পোজে' হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন, মাষ্টার-মশায়ের হুকার শুনে ধড়মড় করে উঠে ঠিক হয়ে বসলেন। মাষ্টারমশায়ের কি দুর্মতি হ'ল, তিনি বিস্তকে ডাকলেন—বিশ্বনাথ, কাম হিয়ার (এখানে এস)।

বিশ্বনাথ উঠে গুটিগুটি তাঁর কাছে গেল। মাষ্টারমশায় বললেন—আমি জানি এবং আশা করি তুমি মিথ্যে কথা অথবা কারুর পক্ষ টেনে বলবে না। এতক্ষণ কি হচ্ছিল বল ত?

বিশ্বনাথ কারুর দিকে না চেয়ে বলে যেতে লাগল—কি করে প্রথমে কথাকাটাকাটি হতে হতে ঝগড়া স্রু হ'ল। তার পরে কে কে কার দিকে যোগ দিলে ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে যেতে লাগল। অথচ আমরা সকলেই দেখেছি সে দু'হাতে মুখ লুকিয়ে মাথা নিচু করে ঘুম মারছে। বেশ বুঝতে পারা গেল দিবানিদ্রার অস্ববিধা হয়েছে বলে বিস্তবাবু সবার ওপরেই চটে গিয়েছেন।

এতক্ষণ তো যা হোক চলছিল একরকম। কিন্তু মাষ্টার-মশাই যখন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কে কে গালাগালি করেছে, বিশ্বনাথ তখন সলজ্জ কিশোরীর মত ঘাড় নিচু করে নখ খুঁটতে খুঁটতে উত্তর দিলে—বলব স্ত্রীর? কিন্তু আমার বড় লজ্জা করছে।

মাষ্টারমশায় বললেন—নির্ভয়ে বলে যা, লজ্জা কিসের? বিশ্বনাথ বলতে আরম্ভ করল—স্ত্রীর প্রথমে কালীচরণ নিবারণকে বললে—।

একটা অভ্যস্ত খারাপ কথা।

বিশ্বনাথের মুখ থেকে বাক্যটি বেরোনো মাত্র ক্লাস-স্রু ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। মাষ্টারমশাই—এই চোপ—চুপ কর—সায়লেন্স—বলে চীৎকার পাড়তে আরম্ভ

করলেন। পাশের ক্লাসের মাষ্টার কৌতূহল চাপতে না পেয়ে উঠে এলেন—পেছন পেছন সে ক্লাসের গুটিকয়েক ছাত্রও উঁকি দিতে লাগল।

একটু ঠাণ্ডা হওয়া মাত্র বিশ্বনাথ বললে—তার পর স্ত্রীর, কালীচরণের ঐ কথা শুনে (কথাটি বিশ্বনাথ আবার উচ্চারণ করলে) নিবারণ বললে—

ক্লাসশুদ্ধ ছেলেদের আবার হাসি।

শেষে প্রায় ইস্কুলস্বত্ব মাষ্টার ও ছাত্র আমাদের ক্লাসে এসে হাজির হ'ল আর তার মাঝে বিশ্বনাথ দাঁড়িয়ে গম্ভীর-ভাবে একটার পর একটা খারাপ কথার মালা গাঁথতে চলল। শেষকালে অন্য ক্লাসের একজন মাষ্টার বিস্তৃক থামিয়ে দিয়ে বললেন—খুব হয়েছে, যাও বাবা বিশ্বনাথ এখন নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বস গিয়ে।

বিশ্বনাথ গট গট করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। সেটা ছিল ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা। এই ঘণ্টায় আমাদের যিনি পড়াতেন তিনি ছিলেন অতি ভালমানুষ। বিশ্বনাথ গিয়ে নিজের জায়গায় বসতেই অন্য ক্লাসের ছাত্র ও মাষ্টাররা চলে গেল। ক্লাস একেবারে চুপচাপ—মাষ্টারমণাই চুপ করে নিজের জায়গায় বসে রইলেন। তিনি কারুকে তিরস্কার বা একটি কথাও বললেন না। পাঠ্যপুস্তকে জ্ঞানবৃক্ষের যে সব শাখাপ্রশাখার বিবরণ দেওয়া আছে, ছাত্রদের মধ্যে তারও অতিরিক্ত জ্ঞানের এই প্রসার দেখে তিনি মর্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বসে রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে—বিস্মিত ও হুণ্ডিত হয়ে।

সেদিনকার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমরা প্রায় দু'বছর পড়েছিলাম। সেকার বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পূজোর ছুটির কিছুদিন আগে এক দিন বিস্তৃক এসে আমাদের জানালে যে তার এক কাকার সঙ্গে সে পার্টনা চলে যাবে। পরের দিনই বিস্তৃক ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেল। সেখানে পৌঁছে একখানা পোস্টকার্ড আমাদের লিখেছিল বটে, কিন্তু ওপরে ঠিকানা না দেওয়ায় তার আর জবাব দেওয়া হয় নি। অবিস্তি তার বাড়ী থেকে ঠিকানাটা নিয়ে আসতে পারা যেত, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

প্রায় বছরতিনেক বাদে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে সিনেট হলে বিস্তৃক সঙ্গে দেখা। সেও পরীক্ষা দিতে এসেছে। বিশেষ বললে সে প্রায় বছরখানেক হ'ল কলকাতায় ফিরেছে। বাপের বাপ—সে কি মোটাই হয়েছে—। যেমন মোটা তেমনি লম্বা। দেখা গেল পার্টনার সস্তার খাবারের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। যা হোক, টিফিনের সময় বিস্তৃক বাড়ী থেকে খাবার এল, সে প্রায়

চার-পাঁচ জনের খাবার। আমরাও চার-পাঁচ জনে মিলে তার সবই মেরে দিলাম। বিস্তৃক দোকান থেকে গোটা দুয়েক ডাব আর দু-তিন বোতল লেমনেড কিনে খেলে। চার দিন বেড়ে কাটল। তার পর ছুটির প্রায় তিন মাস বিস্তৃকের বৈঠকখানায় আমাদের দুম আড্ডা চলল। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে দেখা গেল আমরা সদলবলে ফেল করেছি।

পরীক্ষার খবর বের হবার প্রায় মাসখানেকের মধ্যে বিস্তৃক চাকরিতে ঢুকে গেল। তার এক বড়লোক আত্মীয় কলকাতার কোন বড় ব্যাঙ্কে কেশিয়ারের কাজ করতেন। সে তাঁর অধীনে কাজে লেগে গেল। সে সময় বিস্তৃক বয়স সতের, দেখলে মনে হ'ত পঁচিশ বছরের যুবা। মাইনে হ'ল মাসে তিরিশ টাকা। তখনকার বাজারে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি নেহাৎ ফেলনার ব্যাপার ছিল না। এর পরে বিশ্বনাথের সঙ্গে বছরদশেক আর দেখা হয় নি।

সে সময় কলকাতায় এমেচার থিয়েটার ক্লাবের খুব মরশুম পড়েছিল। আমরা জনকয়েক মিলে একটা ক্লাব করেছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই পুরোনো দিনের ইস্কুলেরও কয়েকটি বন্ধু ছিল। এক দিন রাত্রে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মহলা দিচ্ছি, সপ্তাহখানেক বাদে পাব্লিক ষ্টেজে প্লে হবে। রিহার্সাল খুবই জমেছে—দুর্গাদাস বলছে—জাহাপনা দুর্গাদাস সে শ্রেণীর লোকের ওপরে—

—কতখানি ওপরে হে—বলেই বিশাল লম্বাচওড়া একটি লোক ক্লাব-গৃহে প্রবেশ করলে।

আরে বিশেষ বিশেষ বিশেষ—বিশেষ আয়, বিশেষ আয়—আমরা সকলে হৈ হৈ করে উঠলাম। বিশেষ বললে—তোরা যে ক্লাব করেছিস তা অনেক দিন থেকেই শুনছি, আজ মনে হ'ল দেখে আসি কি রকম রাজা উজির মারছিস।

অনেক দিন বাদে তাকে পেয়ে সত্যি বড় ভাল লাগল। বিশ্বনাথ বললে—কিন্তু বাবা! ক্লাব করবার সময় বিশেষকে তো একবারও মনে পড়ে নি। ভাগো আমি এলুম।

তার পর প্রায় পাঁচ বছর একাধারে বিশেষের সঙ্গে খুবই দহরম মহরম চলল। বিশ্বনাথ একাই ক্লাবের সর্বসর্বা হয়ে উঠল। যত পরিশ্রমের কাজ, আমরা সবই তার ঘাড়ে চাপাতুম এবং সে অগ্নানবদনে করে যেত। তার পর এক দিন ক্লাবও উঠে গেল, তার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

প্রায় দশ বছর এমনি চলল—কখনো বা তার সঙ্গে ট্রামে দেখা হয়,—বিশেষ ভাই তুই আরও মোটা হয়েছিস।

—মোটা হয়েছি বলিস নি, বল দেহে সেরেছি।

কখনো বা একই ট্রামে চলেছি, মাঝখানে নিশ্চিহ্ন ভিড়। দু'জনে চোখে চোখে ইসারা হয়েছে। এরই মধ্যে দু'চার বছর অন্তর রবিবার বিকেলে সে আমার বাড়ী এসেছে, কখনও বা আমি তার বাড়ী গিয়েছি। এক দিন বিশুকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার ছেলে কত বড় হ'ল রে?

বিশু বললে—এবার এম্-এসসি পাস করেছে।

—বলিস কি? কোন ক্লাস পেলেন?

—ফার্স্ট ক্লাস।

—বা বা বেশ ছেলে।

বিশু বললে—মাইরি তাই ভাবি, আমার ছেলে হয়ে বেটা এম্-এসসি পাস করলে কি করে।

বিশু আরও বললে, কোন একটা কোম্পানী তার ছেলেকে তিন শ' টাকা মাইনে দেবে বলেছে, বছর দুই বাদে তারাই বিলেতে পাঠাবে।

তার পরে আমি চলে গেলুম বিদেশে। পাঁচ-ছয় বছর আর তার কোন সংবাদই রাখি নি। ফিরে আসবার পর এক দিন ট্রামে দেখা। দেখলুম সে ভয়ানক রোগা হয়ে গিয়েছে—বিশ্বনাথ মুখুজ্জে বলে তাকে আর চিনতে পারা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?

বিশু হাসতে হাসতে বললে—চিরদিনই কি একরকম থাকা ভাল? রোগা হয়ে বুঝতে পারছি মোটা হওয়ার কত অসুবিধা ছিল।

বললুম—কিন্তু হঠাৎ এ রকম রোগা হয়ে যাওয়া তো ভাল নয়! ডাক্তার-টাক্তার দেখাচ্ছিস?

—ওরাই তো না খেতে দিয়ে রোগা করে দিলে। বলে ডায়বিটিস হয়েছে, কিছু খেয়ো না—খাঁ খাঁ করে রোগা হয়ে গেলুম। এখন অবিশ্রান্ত সবই খাচ্ছি, ওদের কথা শুনে গেলে আর বাঁচা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলুম—এখনও ব্যাঙ্কে চাকরি করছিস তো।

বিশু হ্যাঁ করে হেসে বললে—ব্যাঙ্কে এখনও চাকরি করছি বটে, তবে সে ব্যাঙ্ক নয়। সে ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে, শুনিস নি?

—না তো। তোর কিছু গেল নাকি?

বিশু বললে হাজার পঞ্চাশেক টাকা ছিল ওখানে। শুনছি লিকুইডেটররা শতকরা পঞ্চাশ টাকা ফেরত দেবে, আপাতত। টাকা আজ না হয় কাল, না হয় পঞ্চাশ বছরে ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখ এই যে তিরিশ বছরের চাকরিটা গেল। সেই মনে আছে ষোলো-সতেরো বছর বয়সে ওখানে ঢুকেছিলুম—আর ছেচলিশ বছর বয়সে শেষ

হ'ল। যখন ঢুকি তখন নোট গুনতুম, মাইনে হয়েছিল তিরিশ টাকা। ক্রমে এন্টিস্ট্যান্ট কেশিয়ার হয়েছিলুম, পাঁচ শ' টাকা মাইনে হয়েছিল।

বিশু একবার হ্যাঁ করে হেসে বললে—যশে সইবে কেন, আমাদের মত লোকের অত উন্নতি। কি বলিস?

বললুম—যেতে দাঁও বন্ধ, যা বরাতে ছিল তা হয়ে গেছে, তার জন্য আপশোষ করে কি হবে?

—ক্ষেপেছিস তুই! আমি করব আপশোষ? এক হপ্তার মধ্যে চাকরি ঠিক জুটিয়ে নিয়েছি। তবে মাইনেটা একটুক কম হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কত দিচ্ছে এখানে?

—এক শ' টাকা।

বলেই আবার সেই হ্যাঁ হ্যাঁ হাসি। তার পর বললে—ঢুকতেই তো তারা কিছু পাঁচ শ' টাকা আমায় দেবে না? কি বলিস?

সেদিন এইখানেই শেষ হ'ল। তিন-চার দিন পরে আবার ট্রামেই দেখা তার সঙ্গে। কথায় বার্তায় বুঝতে পারলুম, ওদের পৈতৃক সম্পত্তিও ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ জেরা করে এও জানা গেল যে সম্পত্তির ন্যায্য পাওনাও পাও নি। তার কাঁকা অন্যায়ভাবে তাকে ফাঁকি দিয়েছেন।

বললুম—কাকার নামে নালিশ করলি নি কেন?

বললে—তুই কি পাগল হয়েছিস? কাকার নামে নালিশ করব! আমার ছেলেবেলার যা-কিছু আবদার সব চলত কাকার কাছে। আমার খেলবার যা কিছু—গুলি, লাট্রু, যুড়ি-লাটাই, লজ্জুস, চানাচুর—এ সবেরই পয়সা জুটিয়েছে কাকা অস্বাভাবিকভাবে, কখনও না বলে নি। আমাদের সেই সম্বন্ধ কাকা দশজনের প্ররোচনায় পড়ে ভুলে গেল বলে আমিও ভুলব?

বড় রাগ হ'ল। বললুম—বেশ করেছে, দু'আনার গুলি ও চানাচুরের বদলে লাখ টাকার সম্পত্তি দিয়ে খুব বাহাদুর করেছে।

আমার কথা শুনে এবার বিশু এমন হ্যাঁ করে হেসে উঠল যে ট্রামজুড়ে লোক চমকে উঠে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল।

সেদিন সেইখানেই শেষ হ'ল। তার পরেই আমাকে কিছুদিনের জন্যে আবার বিদেশে যেতে হয়। বছর দুয়েক পরে নানান তাড়ায় দেশে ফিরে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম, বন্ধুবান্ধব কারুরই খোঁজ নিতে পারি নি।

সে সময় শীতকাল। বিকেলে কবিরাজের বাড়ী থেকে ফিরছি—শরীর এত খারাপ যে একটু চললেই অসম্ম বোধ

হয়। একটু ঘুরে যেতে হলেও মনে করলুম বিশেষের বাড়ীতে একটু বসে সেখান থেকে একখানা বিজ্ঞা ভাড়া করে ফেরা যাবে। বিশ্বর সঙ্গেও দেখা হবে।

দোরগোড়াতেই বিশ্বর খুড়তুত ভাই লোকনাথের সঙ্গে দেখা। ওদের বাড়ীর সবাই আমাকে চেনে, আমিও প্রায় সবাইকে চিনি। লোকনাথ আমাকে দেখে খুশি হয়ে বলে উঠল, আসুন দাদা আসুন। কেমন আছেন, কবে এলেন—ইত্যাদি সারা হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বিশ্ব এখনও ফেরে নি বুঝি?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকনাথের মুখের ওপরে বিশ্বয়ের একটা চমক খেলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা সামলে নিয়ে বিষয় মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে সে বললে—বড়দা আর আপিস থেকে ফিরবে না দাছ।

—তার মানে?

—আপনি জানেন না বুঝি? বড়দা ত নেই। তার গুটির আর কেউই নেই। এক বছরের মধ্যে সব সাফ হয়ে গেছে—এই বছর দুই আগে।

লোকনাথ বলতে লাগল, ইদানীং বড়দা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি রকম? তাকে ত সারাজীবন একই রকম দেখেছি।

লোকনাথ বললে—হ্যাঁ, বাইরের লোকেরা বুঝতে পারত না, কিন্তু ইদানীং বড়দা একেবারে বদলে গিয়েছিল। অমন লোক যে কি করে এ রকম হতে পারে আমরা তাই বলাবলি করতুম।

—কি রকম হয়ে গিয়েছিল?

লোকনাথ বললে—বড়দা ব্যাঙ্কে বড় কাজ করত জানেন ত—সেই ব্যাঙ্ক গেল ফেল হয়ে বড়দার চাকরিটাও গেল। বড়দা অন্য জায়গায় কম মাইনের একটা চাকরি জুটিয়ে নিলে। অবিশিষ্ট চাকরি না জুটলেও তার ভাবনা কিছু ছিল না, কারণ তার ছেলে সোমনাথ তখন পাঁচশ' টাকার ওপর মাইনে পায়। চাকরি যেতেই বড়দা বাড়ীর সব খরচ কমিয়ে দিলে। জানেন ত সে কি রকম খাইয়ে লোক ছিল। নিজে খেয়ে আর লোকজনকে খাইয়ে সে পাঁচশ' টাকা মাসে ফুঁকে দিত। পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু ছুঁবেলা বাড়ীতে বিরিয়ানি কাবাব উড়ছে—এই ছিল তার ব্যবস্থা। বাপের নতুন ব্যবস্থা দেখে ছেলে বললে—বাবা এবার থেকে বাড়ীর খরচ সব আমার। বাপ বললে—খবরদার, ওসব লবাব করতে চাও ত অন্যত্র যাও। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার আমদানি মতে বাড়ীর সবাইকে চলতে হবে।

হঠাৎ বড়দার এই হালচাল দেখে বৌদিও ভড়কে গেল—সেও কিছু বললে না। তারপরে একেবারে কালিয়া পোলাও থেকে ছুঁবেলা ভাত ভাঁটাচচ্চড়ি। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে কোনও জিনিষ আনবার জো নেই—কে এনেছে? কেউ কোনও জিনিষ কিনতে পারবে না—কে কিনেছে? সোমনাথের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছে, জামা নেই—কিন্তু কারও কেনবার হুকুম নেই। আগের দিনে যেমন যার যা খুশি করত বড়দা সবতাতেই খুশি, সবতাতেই তার হাসি—এ যেন একেবারে তার উল্টো, তার ইচ্ছা ছাড়া আর কারও কোনও ইচ্ছা খাটবে না। বড়দার শরীর ত ভেঙে পড়েইছিল, দেখতে দেখতে বৌদি আর সোমনাথও একেবারে কাঠির মত রোগা হয়ে গেল। ছেলেও বাপের এমন বাধ্য যে, বাড়ীতে যে শাকচচ্চড়ি ভাত হয় তা ছাড়া বাইরে আর কোথাও খায় না, বাপ বারণ করে দিয়েছে। আর বড়বৌদি, তিনি বড়দার চেয়েও ভালমাহুষ ছিলেন। বড়দা যদি ঠাট্টা করে বলত—সরকারের হুকুম হয়েছে আজ থেকে লোকেদের মাথা দিয়ে হাঁটতে হবে, বড়বৌদি বলত—এ রকম হুকুম কেন হ'ল বল দিকিন?

এই রকম চলতে চলতে এক দিন সোমনাথ আপিস থেকে জর নিয়ে বাড়ী ফিল। প্রথম কয়েকদিন তালে-গোলেই কেটে গেল, তারপর জর এক দিন বেশি হতেই বড়দা একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে আনল। ডাক্তার রোগী দেখে বললেন—জ্বরটা বঁকা বলে মনে হচ্ছে, কোনও বিশেষজ্ঞকে ডাকা দরকার।

বিশেষজ্ঞকে ডাকতে হলেই টাকার দরকার। বড়দা কিছুতেই ডাকবে না। শেষকালে আমাদের জেদ ও বৌদির কান্নাকাটিতে ডাক্তার ডাকতে হ'ল, আর সেই সোমনাথের টাকায় হাত দিতেই হ'ল। ডাক্তার সব দেখে বললেন—রোগের সঙ্গে লড়বার শক্তি রোগীর নিজের নেই। ওষুধে যতদূর হয় আমরা তা করব।

কিন্তু কোনও ওষুধেই কিছু হ'ল না। দশ-বার দিন রোগভোগ করে এক দিন শেষরাতে সোমা মারা গেল।

ভোর হবার আগেই আমরা সোমার শবদেহ নিয়ে বেরিয়ে গেলুম, এদিকে বড়দা করলে কি সেই শযায় শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইল। এই ক'দিন দিনরাত সে ঠায় সোমনাথের শিয়রে বসে ছিল, নেহাত দরকারে এক-আধবার ওঠা ছাড়া সে কোথাও যায় নি, কোনও দিন খেয়েছে, কোনও দিন জল পর্যন্ত খায় নি। অনেক বলা-কওয়ার পর বড়দা তখনকার মত উঠল বটে, কিন্তু ঘর ধোয়া-পৌছা হয়ে গেলেই সে আবার গিয়ে ঠিক সেই

জায়গাটিতেই শুয়ে পড়ল যেখানে সোমার বিছানা ছিল। বড়দা খায় না-দায় না দিন-রাত চোখ বুঁজে পড়ে রইল। ওষুধ কিংবা পথ্য দিলে খুঁ করে কৈলে দেয়। একেই রোগে তার শরীর আগে থেকেই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল এখন এই অত্যাচারে মাসখানেক যেতে না যেতেই সে হয়ে গেল সারা। বড়দা মারা যাবার পর বৌদি বোধ হয় মাসতিনেক ছিল, কিন্তু সেও ঐ রকম অত্যাচার করেই মারা গেল। একটি বছরের মধ্যে সব ফরসা।—

এই অবধি বলে লোকনাথ চুপ করলে। মুখ তুলে দেখলুম তার হুঁচোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে—আলাদা হয়ে গেলেও বড়দাকে তারা সবাই খুব ভালবাসত।

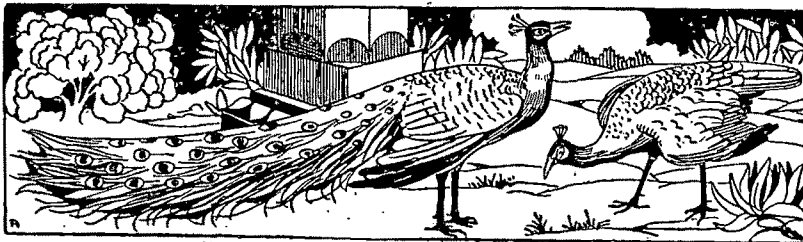
আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম বিশ্বনাথের কথা। তাকে আমি যতটা জানতুম সেই বার-তের বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে আর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি—জীবনের কোনও খানটাই লোকনাথ-বর্ণিত তার শেষ-জীবনের সঙ্গে মেলে না। সে ছিল উদার অপার সাগরের মত। লোকের একটুখানি হাঁসিমুখ দেখবার জন্যে সে সব ত্যাগ করতে পারত। মনে পড়তে লাগল, আমাদের ছেলেবেলার দাবাবড়ে খেলবার কথা—আমরা তিন বার করে চাল ফেরত নিতুম, কিন্তু বিশ্বনাথ একবারও চাল ফেরত নিতে গেলে আমরা এমন গোলমাল লাগাতুম যে, সে হেসে বলত—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা—আমি চাল ফেরত নেব না, এই রেখে দিচ্ছি—। বয়স বাড়ার সঙ্গে তার এই উদার বাড়তে বাড়তে একেবারে অপরাধের সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এজন্য কতবার তাকে কত তিরস্কার করেছি, কিন্তু সবই সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে—আরে যেতে দে, কি বলিস। মনে পড়তে লাগল কি সমারোহের সঙ্গে এষ্ট সংসারে সে এগিয়ে চলেছিল আর কি বিলম্বী ভাবে সে বিদায় নিলে। সমস্ত জীবন ধরে সে নিজেকে বিলিয়েই দিয়ে এসেছিল। যে যা চায়, তার সাধ্যে যতটুকু কলোয় সে কখনও কারকে বঞ্চিত করে নি। এই বিরাট ত্যাগের মধ্যে কোথায় কেমন করে এক বিন্দু অভিমান লুকিয়েছিল

একটি ঘটনার আঘাতে তা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে প্রিয়জনদের মৃত্যুর কারণ হ'ল এবং নিজেও এক রকম আত্মহত্যা করলে।

নানা চিন্তা ও প্রিয়-বিয়োগব্যথায় আত্মহারা হয়ে আছি এমন সময় লোকনাথ বললে—দাদা, অনেক দিন বাদে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, বুঝতে পারছি আর বোধ হয়, কখনও আসার সুবিধাও হবে না—বলুন একটু চা খেয়ে যাবেন।

লোকনাথ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। আমি বসে ভাবতে লাগলুম বিশ্বনাথের কথা, আমাদের ছেলেবেলার কথা—মাঝবের অদ্ভুত জটিল জীবনের কথা। ভাবছিলুম মাঝব কি ঘটনাপ্রবাহকে কখনও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না? তা যদি না পারে তা হলে ঘটনার আঘাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় তাকে আবিস্কার করতেই হবে। একথা কখনই সত্য নয় যে, যে মহাশক্তি অতি নগণ্য কীটানু-কীটকে বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যে রূপান্তরিত করেছেন তিনিই আবার তাকে এই স্বল্প-দুঃখ শোক-তাপ লজ্জা-ভয় অভিমান-ঈর্ষার পুটপাকের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছেন?

লোকনাথের ওখান থেকে চা খেয়ে যখন বাইরে বেরোলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা ও ব্ল্যাক-আউটের সঙ্গে শীতের ধোঁয়া মিলে বাইরে যে অন্ধকার জমাট হয়েছিল তারই ভেতর দিয়ে এক রকম হাতড়ে হাতড়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। একেই রুগ্ন শরীর ঠেলে চলতে কষ্ট হয়, তার ওপরে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বনাথের মৃত্যুসংবাদ শুনে মনের ওপরেও একটা বিরাট ভার চেপে বসেছিল। কখনও দাঁড়িয়ে হাঁপাই, কখনও ধীরে ধীরে চলি। এরই মধ্যে একবার যেন মনে হ'ল সেই জমাট অন্ধকার ঠেলে বিশ্ব আমার পাশে দাঁড়াল। আমি অভিভূতের মত তার দিকে হাত বাড়ালুম কিন্তু ঘনাক্ষারে সেই অশরীরী অহুভূতির কোনও শরীরী স্পর্শ মিলল না।



জনশিক্ষা

শ্রীহরিহর শেঠ

আমার এখানে আলোচনার বিষয় জনশিক্ষা। জনশিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহার আবশ্যকতা, প্রসারের সহজ ও সম্ভবপর উপায় এবং তাহার কার্য্যকরী পন্থা নিরূপণ আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে সম্পর্কে দেশের অসন্তুষ্টি প্রতিরোধের অছিলায়ই ইউক আর বৈদেশিক রাজস্বক্তির স্বার্থ-প্রণোদিতই ইউক তাহার সংস্কার ও উৎকর্ষসাধনের অন্তঃসারশূন্য একটা প্রয়াস মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। তাহা সরকার-নির্দ্ধারিত এক একটা কমিশনের আকারেই দেখা যায়। র্যালে কমিশন স্ভাডলার কমিশন প্রভৃতি তাহারই উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির পর শতাব্দীর একপাদ না-বাইতেই তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের অসন্তুষ্টি হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের চাপে লর্ড রিপনের শাসনকালে স্মার উইলিয়ম হাণ্টারের অধিনায়কত্বে সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। তদবধি এতাবৎকাল মধ্যে মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ক সংস্কারের একটা বাহ্যিক চেষ্টা দেখা গেলেও আমাদের ঠিক উপযোগী শিক্ষা ও তাহার প্রসার হয় নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। যাহারা যখন দেশের মালিক থাকেন, তাঁহাদের প্রয়োজনে, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বাহা কিছু করিবার চেষ্টা হয়। তাহা তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির সহায়ক হইলেও, তাঁহারা যদি বিজ্ঞাতীয় হন তবে তাঁহাদের প্রবর্তিত শিক্ষায় জাতীয় চরিত্রের উন্নতি, জাতীয়তার বিকাশ বা উদ্বোধন তদ্বারা হয়ই না বরং অনেক সময় বিপরীতই হয়।

সংসার সমাজ ও রাষ্ট্র মধ্যে যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা বা প্রবর্তিত করা যায়, তাহার মূলে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকেই। এতাবৎ আমাদের যে শিক্ষা চলিয়াছিল এবং যাহার দ্বারা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে, তাহা প্রবর্তনের প্রথম কাল হইতে তাহার মূলে কি উদ্দেশ্য ছিল? তাহা কি আমাদের জন্য কোন শুভ উদ্দেশ্য লইয়া আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? না তদ্বারা শিশু-হৃদয়ের বা জনগণের সুস্থ মানসিক-শক্তির অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিবার কোন প্রয়াস ছিল? শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সমুন্নত করিয়া মানুষের কর্তব্য পালন দ্বারা জনগণকে নিজ নিজ সমাজ ও দেশের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। শাসকবর্গ সে উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া, তাঁহাদের রাজস্ব কি করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত

হয় ও স্থায়ীভাভ করিতে পারে, নিজেদের পণ্য এদেশে চালাইয়া কি উপায়ে তাঁহাদের দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে, মাত্র এই সকল উদ্দেশ্যই তাঁহাদের ছিল।

লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গকে সূত্র করিয়া যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে রাজা-প্রজার স্বার্থের পার্থক্য স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। প্রকারান্তরে যদিও আমাদের মোহ ঘুচিয়া পথের সন্ধান আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও বৈদেশিক স্বার্থমূলক দীর্ঘ শাসনের ফলে আমাদের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। তাহা আমাদের অস্থিরজ্জ্বার সহিত যেন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ জয় করিয়া আমাদের যতটা না পদানত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রবর্তিত শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনকে জয় করিয়া মানসিক সহজাতবৃত্তিসমূহকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই আজ দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আমরা সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না।

আমাদের সুশিক্ষা দান করা, স্বাধীন মনোবৃত্তি উন্মেষের উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিলই না, শিক্ষার প্রসারও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং যাহা ছিল তাহা শিক্ষার সঙ্কোচসাধন করা। ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম আমলে সরকারেরই প্রচেষ্টায় এডাম সাহেবের দ্বারা দেশীয় শিক্ষার যে বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায়, তখন এক বাংলা দেশেই প্রায় এক লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে প্রায় তাহার শতভাগের এক ভাগে দাঁড়াইয়াছিল। শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেয়ুগের পাঠ্যপুস্তকাদিতে জাতীয়তার উদ্বোধক বিশেষ কিছু যাহাতে স্থান না পায় সে বিষয়ে যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বিত হইত।

আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা আমাদের জাতীয়তার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নৈতিক বনিয়াদের উপর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহা উপযোগী, সংস্কার দ্বারা তাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ যে সে বিষয়ে অবহিত আছেন, অধিকার হস্তগত হওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাখারক্ষণ কমিশন গঠন তাহার একটি উদাহরণ। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা এই কমিশনের

মতেই হইয়াছে। ইহা হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা বা ইহা কতটা কাজে আসিবে তাহা এক্ষণে বলা যায় না, অথবা কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে আলোচনার এখানে আবশ্যক নাই। তবে যদি এই ব্যয়-বাছল্য করিয়া আশানুরূপ ফললাভ নাও হয়—ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যখন অবকাশ নাই, তখন দোষ-ত্রুটি যদিই থাকে পুনঃসংস্কারে কাম্যফল পাওয়া সম্ভব ইহা মনে করিয়া নিশ্চিত থাকা যাইতে পারে। কিন্তু ভাবিবার কথা, এই ব্যবস্থার মধ্যে বা উক্ত কমিশনে ব্যাপক জনশিক্ষার সম্বন্ধে যদি তেমন কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকে তবে তাহার জন্য কি করা যাইতে পারে?

শুনা যায়, ইউরোপ আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষর বলিতে প্রায় কেহ নাই, সেস্থলে দশ বৎসর পূর্বেও সমগ্র ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ৯০ আর বাংলায় ছিল প্রায় ৭৯। ভারতের প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের কথা বলিতেছি না। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বৈদিক যুগের কথাও ছাড়িয়া দিই। বহু পরবর্তী যুগে শ্রাম, কাষোজ হইতে গান্ধার পর্যন্ত বিশাল ভারতের বিরাট সংস্কৃতির কথা ক্রমে তুলিতে বসিলেও আমাদের নালন্দা, ওদন্তপুরী, তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি আজিও প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। এক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যারামসমূহে কম-বেশী দশ সহস্র ছাত্র ও তাহাদের অধ্যাপকগণ অবস্থান করিয়া বিদ্যাদান ও গ্রহণ করিতেন। তখনকার দিনের এই বিরাটত্বের কল্পনা কি স্বপ্নের মতই নহে? প্রাচীন ভারতে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হইত তাহা এখন আমাদের শুধু কল্পনারই বস্তু। সংস্কৃত একটি শ্লোক আছে—

যো দত্তাং জ্ঞানমজ্ঞানম্
কুর্থাৎ বা ধর্মদর্শনম্,
স কুৎসাং পুথবীং দত্তাং,
তেন তুলাং ন ওদন্তবে।

পুরাকালে আমাদের দেশের এই জ্ঞানাহরণ-প্রবৃত্তি কতকটা সহজাতই ছিল। আহার নিদ্রার ন্যায় ইহা মানুষের অবশ্যকরণীয়ের মধ্যেই পরিগণিত হইত। সুতরাং সেজন্য তখন অন্তরের দরদ ছিল। পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ অদম্য চেষ্টায় নিরক্ষরতা দূর করিয়া এক্ষণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষা প্রসার বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ সাধনই ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মূল কার্য-হইলেও, রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্বাস করেন, উচ্চশিক্ষার প্রভাবে শক্তি স্মুরিত হইয়া পরিণামে তাহা হইতে দেশের কল্যাণই

সাধিত হয়। সেইজন্যই তাহারা শিক্ষার পথ সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকমুক্ত করিবার জন্য এত আগ্রহশীল।

সেখানকার রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্য শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার বিষয়ে যে প্রয়াস তাহা আমাদের এই শিশু গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকে স্মৃতিতে করিয়া তোলার জন্য আবশ্যক। বলিতে গেলে ইহাই এখন এখানকার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্রকে গড়িবে সরকার, সেই সরকারকে গড়িবার ভার যখন জনসাধারণের উপর তখন সেই জন-সাধারণ যদি নিজেদের সত্যকার শুভাশুভ বোধ-বিবজ্জিত থাকিয়া স্বার্থজ্ঞান বিরহিত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের কাম্য স্ব-শান্তি উপভোগ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই প্রথম ও প্রধান কার্য, কারণ জনশিক্ষাই গণতন্ত্রের প্রাণ। বলা বাছল্য, এ কার্য রাষ্ট্রের হইলেও এই রাষ্ট্রকে যাহার যেমন শক্তি সে বিষয় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই ব্যাপক শিক্ষার রূপ কি এবং তাহার প্রসার সহজে কি উপায়ে হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। বিশেষজ্ঞগণই সে ভার লইতে পারেন। অনেকেই মনে করেন, এই উভয় বিষয়েই পাশ্চাত্যের অনুকরণ আমাদের ঠিক উপযোগী হইবে না। নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য যথাসম্ভব অভিযান আরম্ভ করা আবশ্যক, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীর গক্ষে তাহা বিনা ব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হওয়া একান্ত দরকার। এজন্য আড়ম্বর-পূর্ণ অট্টালিকা অথবা ট্রেনিং-প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট না হইলে যে হইবে না এমন কোন কথা নাই। প্রশস্ত চালাঘর, অনেক সময় বৃক্ষতল এবং শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা স্বশিক্ষক হইলেই হইতে পারে।

উচ্চ ইংরেজী স্কুল বা কলেজে যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে এবং করিতে সক্ষম তাহাদের শিক্ষা বা শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া সমালোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জনগণের শিক্ষাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। সমাজবন্ধ হইয়া সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করিবার জন্য নৈতিক বনিয়াদকে ভিত্তি করিয়া যে সব বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার দরকার স্থূলতঃ তাহা লাভ করার নামই শিক্ষা। আক্ষরিক বিদ্যার দ্বারা তাহা লাভ হওয়া অনেকাংশে সহজ হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়াও বহুপ্রকারে শিক্ষালাভ করা যায়। এদেশে সে উদাহরণের অভাব নাই।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বৈদিক যুগের স্থান ছিল বহু উর্দ্ধে, কিন্তু শুনা যায় তাহা

ছিল ঋতি ও শ্রুতির যুগ। পুথিপত্র বা গ্রন্থাদির প্রচলন তখন কমই ছিল। তখনকার লোক যে শিক্ষিত ছিলেন না একথা বলা চলে না।

প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিই, বেশী দিন নয়, অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্বক ও আমরাই যৌবনকালে দেখিয়াছি কবির গান, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সচরাচর অল্পপ্রতি হইত এবং লোকে তাহাতে যথেষ্ট আকৃষ্ট হইত। তদ্বারা মনুষ্যত্বের চরম ধর্ম যথা তাগ, সত্যপালন, দান, সত্যীর্থ-পালন, কর্তব্যপালন প্রভৃতির জলন্ত উদাহরণ রাজা হরিশ-চন্দ্র, বাজ্রশ্রবা, কর্ণ, দধীচি, রামচন্দ্র, সীতা, শৈব্যা, শিবি, নটিকেশ্বর প্রভৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া আনন্দ উপভোগের সহিত তাহা অতি সহজে অন্তরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত। আর অনেকেই অশেষ শ্রদ্ধার সহিত তাহা আজীবন স্মরণ রাখিতেন। তাহা হইতে কত সহজে অলক্ষিতে নৈতিক চরিত্রকে সবেল করিয়া মনুষ্যত্বলাভ দ্বারা সমগ্র জাতীয় চরিত্রের মান উন্নত করিত তাহা চিন্তার অবসরও এখনকার নগরসভ্যতাবিলাসী শিক্ষিতাভিমাত্রীদের নাই। বাহিরের সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরের সহিত যদি ভিতরের সজ্জিত না থাকে তবে তাহার পরিণাম কখনও শুভ হইতে পারে না।

যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির কথা বাহা উক্ত হইল সে সবেল উদ্দেশ্যই ছিল আনন্দদানের সহিত লোকশিক্ষা প্রচার। সাধারণের নৈতিক জীবনকে গড়িয়া তোলাই পালা-রচয়িতাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহাকেই লোক-সাহিত্য বলিত। স্বল্প ব্যয়ে সহজে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্ভব সিদ্ধ হইত, অধুনা শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। আরও এক কথা, এখনকার স্কুল কলেজের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা শিক্ষা-মন্দিরের সংস্কারচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বিনা চর্চায় যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে পারিত না। তাহা একেবারে হৃদয়-মনে বদ্ধমূল হইয়া উত্তর-জীবনে কার্যকরী হইত। এখন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঔহাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়গুলিতে হয়ত যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাহার চর্চা না রাখিলে তাহা আর বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

বাহা জীবনে পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারা যায় না, এমন শিক্ষার মোহ সকলের পক্ষে শোভন হইতে পারে না। মনুষ্য-জীবনে জ্ঞানলাভের সহিত যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অর্জন করিয়া মানব-কল্যাণের সহায়ক হইতে পারা যায়, তদপেক্ষা মানুষের কাম্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু নানা কারণে কলেজের শিক্ষালাভ

উপস্থিত অবস্থায় কমসংখ্যক যুবক যুবতীর পক্ষেই সম্ভব। আমার বক্তব্য, মানবতার সাধনা ভুলিয়া শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিয়া মোহে ভুলিয়া থাকিলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কখনও সমুজ্জল হইতে পারে না। আমাদের যুবসম্প্রদায়কে মনুষ্যত্বের সহিত জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাতির কথা ভাবিতে হইলে একথা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না যে, শুধু শহর লইয়াই জাতি নহে। পল্লীসমাজকে অবহেলা বহুপ্রকারে আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির মূল। শহরের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার অহমিকায় সাধারণ অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের স্বত্ব-দুঃখে উদাসীন।

মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল চিন্তাশীল মনীষীর কথা—পল্লী-সমাজের উন্নয়ন ব্যতিরেকে, তথাকার অধিবাসীদের মানুষের মত বাঁচিবার জন্য সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার, স্বযোগ করিয়া দিতে না পারিলে পাশ্চাত্য সভ্য দেশসমূহের ছায় তথাকথিত গণ-তন্ত্রবাদ শুধু ধনিক ও কতিপয় শিক্ষিতের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে যখন নগরসভ্যতা এতটা বিস্তৃতিলাভ করে নাই, যখন দরিদ্র ও ধনিকের মধ্যে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য এত প্রকট হইয়া উঠে নাই, তখন সাধারণ পল্লীর অবস্থা এখনকার অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা বাহা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখনও সেই গ্রামমুখী হওয়া ভিন্ন আমাদের শ্রেয়ঃ নাই। কিন্তু তাহা যদি কালপ্রভাবে হয় ত আবার কোন দিন হইতে পারে; নচেৎ নাগরিক স্বত্বস্ববিধা ছাড়িয়া কয়-জন বাইতে চাহিবেন জানি না। স্বতরাং এখন পল্লীর সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। সেজন্য প্রথম আবশ্যক সরকারী প্রচেষ্টায় জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

জনশিক্ষা ব্যাপক করিতে হইলে দেশ কালকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে সেই প্রাচীন যুগে ফিরিয়া গিয়া শুধু সেই সেকালের গ্রামীণ শিক্ষার আশ্রয় লইলেই চলিবে না। এক্ষণে অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট বয়স অবধি কিঞ্চিৎ আক্ষরিক বিদ্যাল্যলাভ করা সকল ছেলে-মেয়ের একান্ত দরকার। সেজন্য প্রথমে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা আবশ্যক এবং তাহা অনুসরণ করিয়া আধুনিক প্রণালীতে পাঠ্য পুস্তকাদি হইতে শিক্ষার সহিত আধুনিক ক্রটিসম্মত কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে অনেক উপকার হয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যখন রেডিও সাহায্যে রন্ধন,

নীলন, সঙ্গীত এমন কি ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইতেছে তখন ম্যাজিক লঠন, বায়োকেপ বিশেষ করিয়া সিনেমার সহায়তায় যথেষ্ট কাজ পাওয়া যাইতে পারে। আবশ্যক অল্পরূপ ফিল্ম প্রস্তুত করাইয়া, শুধু পুরাণ উপপুরাণাদি হইতে আদর্শ বিষয়গুলি দেখান বা শুনানই নহে, তদ্বারা বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানাদি বিষয়েরও অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হইলেও শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অল্পপাতে গ্রামাঞ্চলে যথাসম্ভব সর্বত্র—অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও নৈশ বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিয়া ও তাহাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া-বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যক। এ সবার জন্য চাই সরকার ও জনসাধারণের শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত আন্তরিক প্রচেষ্টা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বহু ব্যয়সাধ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃত রূপ কি জানি না। মনে হয়, তাহা কার্যে পরিণত হইলে শিক্ষা বিষয়েও বহু গলদ নিরসন হইয়া প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক বিকাশের সহায়তা হওয়া দূরে থাক, শরীর ও মনের উৎকর্ষসাধনের জন্য যে সব শিক্ষার আবশ্যক তাহাও ঠিকমত লাভ করা সম্ভব হয় না, হয়ত সেসব বিষয় সহজসাধ্য হইতে পারিবে। উষর জমিকে উর্বর করিবার অযোগ্য দিবার জন্য প্রাথমিক কাজ হিসাবে যেমন হীরাকুণ্ড, দামোদর, ময়ূরাক্ষী

প্রভৃতি পরিকল্পনা রূপায়ণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে গবর্ণমেন্ট কৃতসঙ্কল্প হইয়া কাজে লাগিয়াছেন সেইরূপ দীর্ঘ অবসাদের ফলে যে জনসাধারণের হৃদয় আলোকহীন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইবার জন্যও প্রথম বিরাট পরিকল্পনার আবশ্যক। তাহার পর শিক্ষারূপ আবাদের জন্য কর্ষণ, বপন, সেচনের কথা।

সমগ্র ভারতের কথা এখানে না-ই ধরিলাম। বাংলার পল্লীসমূহে, যেখানে শতকরা ৭৮ জন বাস করে—তথাকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি।

শিক্ষা বিষয়ে যাহাদের চিন্তা ও প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তাহাদের এদিকে অবহিত হওয়াই এখন আবশ্যক। অন্ন-বস্ত্রের নিমিত্ত যেমন দেশব্যাপী আন্দোলন স্বতঃই সৃষ্ট হইয়াছে এজন্য সেইরূপ সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে আদর্শ স্থির করিয়া কর্মপন্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। তবে ইহাও স্বীকার্য, তাহাদের সদিচ্ছা ও সঙ্কল্পের সহিত বেসরকারী উদ্যম এবং সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আছে।*

* হুগলী ঘুটিয়াবাজার স্মৃতি-মন্দিরের (দি স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার) শারদোৎসব ও জনশিক্ষা বিভাগের উদ্বোধন সভার সভাপতির অভিভাষণ। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৫৮।

পদ্মা

শ্রীজগদীশ সরকার

পদ্মার জল ? মাহুয়ের আঁখিজল।

পদ্মার বুকে করুণ ছলাংছল।

এই পদ্মার ছিল পদ্মের বন,

শতের সুরের ছিল কি অধুরণন।

আমরা সবাই উজ্জল পদ্মার

নায়েতে ভেসেছি সকালে ও সন্ধ্যায়।

পদ্মার বুকে ভাসিয়েছি বান খই,

সেই পদ্মার চিহ্ন তাহার কই ?

হাক্কা হাওয়ায় কাঁপা পদ্মার ঢেউ

মাথেনি এমন আছে তো জানি না কেউ।

সেই ঢেউয়ে আজ অদ্ভুত অভিযাপ ;

পদ্মার ঢেউ—পদ্মার ঢেউ সাপ

হৃদয়ে জড়ায় বুকেতে জড়ায় এসে,

আজো কঁাদি তবু পদ্মাকে ভালোবেসে।

পদ্মার জল ? মাহুয়ের আঁখিজল।

পদ্মাতে সুর করুণ ছলাংছল।

কম্বাকুমারিকায় কয়েকদিন

ত্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়

টিক সন্ধ্যায় আমরা জিবেল্লম পৌছিলাম। সকালে মাদ্রাজ-জিবেল্লম এক্সপ্রেসে মাছুরা ছাড়ারছি; রাত্তায় গাড়ীতে সন্ধ্যায় আহার হইলেও স্নান হয় নাই। তার উপর ভিড়ও ছিল যথেষ্ট।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ; তথাপি গাড়ীতে গরম অসহ্য বোধ হইল। একে সমুদ্রের তীরে শীত জমাট বাঁধিবার সময় পার না; তার উপর আমরা ক্রমশঃ বিসুবরেখার নিকটবর্তী হইতেছি। পথের দৃশ্য মনোহর। পাছাড়ের থাকে থাকে সাজানো শতক্ষেত্র, জামল বনানীর গগনচূষী বৃক্ষরাজি, স্থানে স্থানে আত্র, কদলী ও নারিকেলকুঞ্জ-বাঁধি—সমস্তই চক্ষু জুড়াইয়া দেয়। পথে কয়েকটি ‘টানেল’ পড়িল। ইহার মধ্যে দুই-একটি বেশ বড়। উজ্জল দিবালোক হইতে সহসা নিবিড় অন্ধকারের কালগ্রাস মনকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে।



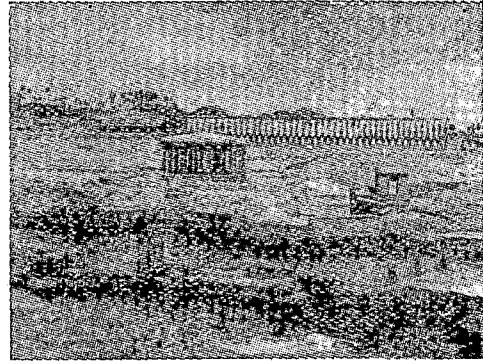
কম্বাকুমারিকার বিচিত্র স্বর্ঘ্যোদয়

কুইলন হইতে সমুদ্রকে প্রায় সঙ্গী করিয়া চলিয়াছি। কখনও ঘন বৃক্ষপ্রাচীরের আড়ালে সমুদ্র হারাইয়া গিয়াছে, আবার কখনও নারিকেলকুঞ্জের ফাঁকে তাহার তটরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

জিবেল্লম ষ্টেশনটি ছোট। কিন্তু ইহা জিবাঙ্গুর রাজ্যের রাজধানী। তাই রাজধানীর সন্মানস্বরূপ জন্ম ষ্টেশনটিকে টানিয়া টানিয়া বড় করা হইয়াছে। রাজিবাসের জন্ম-য়েল-কোম্পানীর যাত্রীনিবাস আছে। তাহার ভাড়া জনপ্রতি চন্দ্রিশ স্বর্গীয় চারি টাকা। ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে বর্ণশালা, ভাড়া কম। বিনামূল্যে থাকিবার ব্যবস্থাও আছে, তবে ‘হুংবেম্বু-হুংমিনাঃ’ না হইয়া সেখানে বাস করা দুঃস্বপ্ন ব্যাপার।

সারাদিনের তাপমাত্রা শরীর শীতল জলে স্নিগ্ধ হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠোরতার ছালা বাড়িতে লাগিল। উত্তর-

ভারতের মানুষ দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া সর্বদা দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে। ভিন্ন প্রদেশের আহাৰ্য্য ভক্ষণে বাহ্যিক অপারগ, ভাষা-দের পক্ষে বেশী দিন দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করা কষ্টকর। কাজেই দুর্ভাগ্যে আমরা বেশী প্রসন্ন হই নাই।



‘মাতৃভাষা’ স্নানের ঘাট ও চত্বর

সকালে খবর লইয়া জানা গেল, ‘ষ্টেট এক্সপ্রেস’ বাস বেলা পৌনে তিনটার সময় জিবেল্লম ছাড়িয়া সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার কম্বাকুমারিকায় পৌছিবে। জিবেল্লম হইতে কম্বাকুমারিকার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল; সিমেন্ট কংক্রিট বাঁধান রাস্তা প্রায় ধূলিহীন। পরিবেশও মনোরম।

জিবেল্লমে দর্শনীয় বিশেষ কিছু নাই। সমুদ্রতীরে নুতনত্বের অভাব। সর্বাধিক ভাল লাগিল ‘পদ্মনাভের’ মন্দির। দক্ষিণ-ভারতীয় বাঁচে প্রস্তরনির্মিত অতি বৃহৎ মন্দির। মন্দিরের দেবতা বিষ্ণু অনন্ত শরনে। মূর্তি অতি বৃহৎ—কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তর যথারীতি অন্ধকারময়। তেলের বাতি সে অন্ধকার দূর করিতে পারে না। ঠাহর করিয়া মূর্তির অবস্থান বুঝিতে হয়। তথাপি মূর্তি ও পরিবেশ ভাল লাগিল।

মন্দিরটি সর্কসাবারগের জন্ম নির্মিত হইলেও ইহা রাজকীয় মন্দির। মন্দিরে জিবাঙ্গুরের মহারাজা আসিয়া পূজা করেন; ইহা বহুদিনের রীতি। ভারদেশে ‘বেঙ্গনেট’ হস্তে সিপাহী থাকে। ইহা রাজকীয় প্রতাপের নিদর্শন।

পুরুষধাত্রীকে কটিদেশের উপরিভাগ হইতে বস্ত্র উত্তুক্ত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা বহু প্রাচীন রীতি; ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া হয় না। সন্ধ্যায় আরতির দৃশ্য সুন্দর। পুরোহিতের দল অপেক্ষাকৃত নিরোপ;

অল্প দক্ষিণায়ই সঙ্কট থাকে। এখানে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিবার রীতি নাই; যুক্তহস্তে নমস্কার করিতে হয়।

সরকারী বাস-এর ব্যবস্থা ভাল। ইহা সমরমত ছাড়ে, অনিয়মিত ভাবে রাস্তার দাঁড়ায় না, আর সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলে। বসিবার ব্যবস্থাও উত্তম, 'সিট' পূর্বোক্তে রিজার্ভ করা যায়।



বামী বিবেকানন্দের নামে উৎসর্গীকৃত মজ্জমান শৈলমুগল

ক্রিবেলয় রেল-স্টেশনের প্রাঙ্গণ হইতেই কঙ্কাকুমারিকার বাস ছাড়ে। আড়াই ঘণ্টার যাত্রা। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ সীমা দেখিবার জন্য প্রাণ চঞ্চল হইয়া আছে। মনে মনে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই।

পথের চারিদিকে সবুজের শোভা-সম্ভার। সতেজ সবুজ ঘানের ক্ষেত মাটির সহিত গলাগলি করিতেছে। পাশে কদলীশৃঙ্খের সারি আর তার পাশে নারিকেলকুঞ্জের ঘন বিস্তার। এদিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাইতেছে; কোনটি শৈবাল ও শল্লভামল, আবার কোনটি রুক্ষ ও বৃন্দ। পথে কয়েকটি বাজার পড়িল; তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান 'নাগের কয়েল'। এখান হইতে মাদ্রাজের 'টিনেভেলি' জেলার সদর টিনেভেলি নগরে যাইবার রাস্তা আছে।

ক্রমে বাস কঙ্কাকুমারিকার নিকটবর্তী হইল। এদিকে-ওদিকে দুই-একটি বাড়ী। তার পর ছোট ছোট দোকান-চড়াই রাস্তা; প্রায় পোষ্ট আপিসের কাছাকাছি আসিয়া চড়াই শেষ হইয়াছে। সেই চড়াইয়ের সীমায় পৌঁছিয়া যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহা সত্যই অনির্বচনীয়। সম্মুখে ভারত-মহাসাগরের উন্নত জলোচ্ছ্বাস, বামে বঙ্গোপসাগরের আবর্ত। আর লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দক্ষিণে আরব সাগরের উদ্ভাস তরঙ্গ। অবশ্য মহাসাগর, সাগর আর উপসাগরের সীমারেখা কোথায়ও নাই—এক দর্শকের মনে ছাড়া। সম্মুখে ঢালু রাস্তা সোজা গিয়া যেন সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। পাশেই দেবী কঙ্কাকুমারীর মন্দির; তারপর বিখ্যাত স্নানের ঘাট—মাতৃভীর্ধ।

সরকারী বাস সরকারী হোটেলের প্রাঙ্গণে আসিয়া

ধামিল। আমাদের এখানেই থাকিবার কথা। কিন্তু আসিবার পূর্বে ঘর ঠিক করা হয় নাই। হোটেলের সাধারণতঃ



কঙ্কাকুমারিকার আরব সাগরে সূর্যাস্ত

ভিড় বেশী হয় না। কিন্তু এখন ছুটির সময়। এখান-ওখান হইতে কয়েকটি পরিবার ছুটি কাটাইবার জন্য কঙ্কাকুমারিকার আসিয়া জুটিয়াছে। তথাপি ভাগ্যক্রমে একখানা ঘর জুটিয়া গেল। হোটেলের ব্যবস্থা ভাল। বিজলীবাতি ও পাখা আছে—হোটেলের নিজের ডায়নামোতে চলে। তবে স্নানের জলের অভাব।

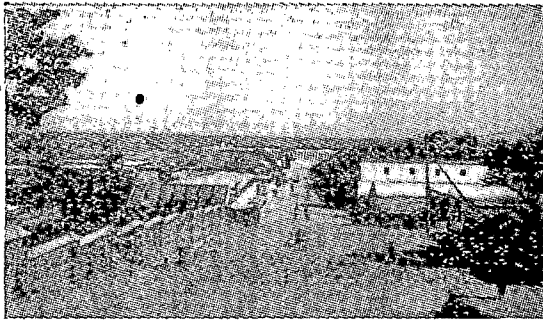
হোটেল ছাড়াও এখানে একটি সরকারী ডাকবাংলো আছে। আর আছে একটি বেসরকারী হোটেল ও বর্ষশালা। বর্ষশালায় যাত্রীর ভিড় যথেষ্ট।

কঙ্কাকুমারিকা একটি ছোট গ্রামবিশেষ। গ্রামে বাজার নাই—অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি দোকান আছে। দশ মাইল দূরবর্তী 'নাগের কয়েল'-এ সমস্ত সরকারী জিনিষ পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সুমিষ্ট আনারস। বছপ্রকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদৃষ্ট বস্তুটিকে অখাদ্য বলিয়া মনে হইল।

কঙ্কাকুমারিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যবৈচিত্র্য নয়ন মুগ্ধ করে। তিন দিক ঘেরিয়া অগাধ জলরাশি। তীরে মাঝে মাঝে সমুদ্রত নারিকেলকুঞ্জ। তীর হইতে একটু দূরে সমুদ্রের মধ্যে উন্নতশির উপলব্ধ। সূর্য দিক্চক্রবালে ঘেঘের আভাস হইতে প্রভাতে দিনমণির আত্মপ্রকাশ আর সন্ধ্যায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষে তাহার আত্মবিলোপ; এই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যে একবার দেখিয়াছে সে আর তাহা জীবনে ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম না হইতে পারিলে এই সৌন্দর্য্য সমপ্রভাবে উপভোগ করা সম্ভব নহে। এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ত্রিচৈতন্যদেব এখানে ভাবে সমাহিত হইয়াছিলেন। মাতৃভীর্ধে অবগাহন করিয়া বামী বিবেকানন্দ জাগরগীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে দুইটি সমান আকারের উপলব্ধ উন্নতশিরে বামীজীর নাম এখনও বহন করিয়া রাখিয়াছে।

কচ্ছাকুমারিকা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ভীর্ণের অঙ্গভূম। সমুদ্রের তীরে দেবী কচ্ছাকুমারিকার মন্দির। দক্ষিণাপথের অঙ্গভূম মন্দিরের তুলনায় এই মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে প্রস্তর-নির্মিত এই মন্দির জাবিড়-ভাস্কর্যের নিদর্শন বহন করিয়া রাখিয়াছে। দেবীর মূর্তি কালো পাথরে নির্মিত। অপূর্ণ ভাহার সৌন্দর্য; সর্বদেহে লাবণ্য যেন মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে। জাবিড়-সভ্যতার ভাস্কর্য-শিল্পের স্থান যে কত উচ্চে ছিল তাহা এই মূর্তি দেখিলেই বুঝা যায়। দেবী কচ্ছাকুমারীর কল্পনাটিও চমৎকার।

দেবী কচ্ছাকুমারী ছিলেন স্বর্গের অপ্সরা। দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিতে তাঁহার বাসনা হয়। তিনি মহাদেবকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেন। কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। তিনি বলেন যে, মহাদেবের পত্নী হইতে হইলে যে শারীরিক ও মানসিক ঐশ্বর্য থাকা উচিত তাহা তাঁহার নাই। সেজন্য তপস্তার দরকার।



দেবী কুমারীর মন্দিরে ঘাইবার রাস্তা

দেবী কচ্ছাকুমারী তপস্তা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহাদেব তাঁহাকে তাঁহার আবাস কৈলাস হইতে যতদূর সম্ভব দূরে গিয়া তপস্তা করিতে বলেন। ফলে, দেবী কুমারী ভারতের শেষপ্রান্তে আসিয়া তপস্তায় মগ্ন হন। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইতে বহুদূরে থাকিয়া তাঁহার প্রতি অমুরাগ বৃদ্ধি করা এক ছত্র সাধনা। সেই সাধনা, সেই তপস্তাই দেবী কুমারীর। দেবীর সে সাধনা এখনও সিদ্ধ হয় নাই—মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ এখনও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটয়া উঠে নাই।

আরতির সময় দেবী কুমারীকে সুন্দর বেশে সাজান হয়। সমস্ত পরিবেশটি অপূর্ণ একটি কাহিনীর মত মনে হয়। দর্শকের মলে মন্দির ভরিয়া যায়। মনে মনে তাহার দেবী কুমারীর এই কল্প সাধনার উদ্দেশে প্রত্যাশা নিবেদন করে। দেবীর মহাদেবী হইবার সাধনা বাহাতে সিদ্ধ হয় তাই তাহার কামনা করে।

মন্দিরের মধ্যে অতীত ভারতবর্ষকে পুনরায় যেন ফিরিয়া

পাওয়া যায়। সহস্র বৎসর পূর্বে এই দেবালয়ে ঠিক যে প্রকারে দেবীর পূজা হইত এখনও পূজা সেইরূপেই হয়। পূজার বিধি বা পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। অবশ্য একথা দক্ষিণাত্যের প্রত্যেক দেবালয় সম্বন্ধেই খাটে।



দেবী কচ্ছাকুমারী

‘মাতৃভীর্থে’ পুণ্যস্থান হিন্দুর বহু আকাঙ্ক্ষিত। পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়া মহাপাতক করিয়াছিলেন। সেই পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি এই ভীর্থে স্নান করেন। সেই স্নানপুণ্যে তাঁহার মূর্তি হয়। মাতৃভীর্থে স্নান তাই “সর্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে”—সকল পাপ হইতে মুক্ত করে।

মাতৃভীর্থে অবগাহনের স্থানটি বড়ই মনোরম। উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে হইলেও ঘাটের চারিপাশ উপলব্ধে ভরা। ঘাটে ঢেউয়ের আঘাত লাগে না, আর লাগিলেও তাহার প্রচণ্ডতা থাকে না। ঘাটের সিঁড়ি বাধানো; মনে হয় পুকুরেই স্নান করিতেছি। ঘাটের উপরে বসিবার জন্য একটি গোলাকৃতি চত্বর আছে—তাহার ছাদ পাথরের। বহু দূর হইতে চত্বরটি দেখা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কচ্ছাকুমারিকা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। লোকসংখ্যা অল্প; বসতিও ঘন নহে। অধিবাসীরা দরিদ্র। তাহাদের উপজীবিকা—ছোটখাটো ব্যবসায় ও কৃষি। অল্প কিছু মৎস্যজীবীও আছে। ভাষা তামিল।

হিন্দুর মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই যেন এখানে একটি গীর্জা তৈয়ারী করা হইয়াছে। গীর্জাটি পুরাতন।



ষ্টেট হোটেলের পাশ হইতে সমুদ্রের দৃশ্য

অশিক্ষিত ও তথাকথিত নির্ধাতিত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য-বর্ণপ্রচার করাই নাকি ইহার উদ্দেশ্য।

মাতৃতীর্থে সমুদ্রস্নান, দেবীদর্শন, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমুদ্রবক্ষে দিমমণির উদয় ও অস্ত দেখিতে দেখিতে কয়েকটা দিন যেন স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। হোটেলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই দাক্ষিণাত্যের লোক। একটি ইউরোপীয় দম্পতিও ছিলেন।

দেবী কুমারীকে প্রণাম করিয়া আবার ভ্রাম্যমাণ হইলাম। এবার টিনেভেলির পথে যাহুরায়।

গোলআলু-সংরক্ষণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পরিপূরক খাজ হিসাবে গোলআলু অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে; বিশেষতঃ বর্তমান খাজ-পরিস্থিতিতে গোলআলুকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। ইহার চাষের বিস্তৃতির পথে বর্তমান সময়ে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা যথাসম্ভব দূর করাও সরকার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কর্তব্য। আলুর চাষ ও সংরক্ষণের জন্ত খুবই সাবধানতা অবলম্বন করাও উচিত। আলুর শত্রু অনেক; নানাবিধ পোকা ও রোগ আলুর খুবই ক্ষতি করে। কেবল যে এই সকল পোকা ও রোগ ক্ষেতে আলুর অনিষ্ট করে তাহা নহে, আলু ক্ষেত হইতে উঠাইবার পর যখন গুদামে রাখা হয় তখনও ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী। সময়মত যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করিলে ক্ষেতে ও গুদামে আলুর ক্ষতি অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যায়। ক্ষেতে যখন আলু জন্মায় তখন হইতেই এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কি শ্রেণীর আলু কিভাবে উৎপন্ন করিলে গুদামে উহার ক্ষতির পরিমাণ কম হইবে সে বিষয়েও জ্ঞান থাকা দরকার। এ সম্বন্ধে পুণা জেলার কৃষকরা খুবই পারদর্শী।

যে সকল কৃষক আলু সংরক্ষণ করিতে চান, আলুর জমিতে জলসেচন সম্বন্ধে তাঁহাদের সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই দরকার। এই বিষয়ে পুণা জেলার কৃষকদের পরীতি এইরূপ : আলু চাষের প্রথম দুই মাসের মধ্যে ৮-১০ দিন অন্তর একবার আলুর ক্ষেতে জলসেচন করা হয়; পরে হয় দিন অন্তর একবার সেচ দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে সময়মত এবং পরিমাণমত জলসেচনের ফলে জমিতে ‘ফাটল’ ধরে না। জমিতে যাহাতে ‘ফাটল’ না ধরে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; কারণ ‘ফাটল’ ধরিলে মাটির নিম্নে নুতন উৎপন্ন

আলু বাহির হইয়া পড়ে এবং স্বর্যাকিরণ ও বায়ুর সংস্পর্শে উহাদের রং সবুজ হয় এই অবস্থায় এক কৃকম প্রজাপতি (tuber moth) উহাদের চোখের উপর ডিম পাড়িয়া যায়।

তথাকার কৃষকদের মধ্যে এই ধারণাও প্রচলিত আছে যে, পরিমাণমত ও উপযুক্ত সময়ে সেচের অভাবে মাটির নিম্নে আলু ‘গরম’ হইয়া যায়; এবং এইরূপ ‘গরম’ আলু বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না। আলুর গোড়ায় মাটি দেওয়া ব্যাপারেও সতর্ক হওয়া দরকার। একটিও আলু যেন মাটির বাহিরে না থাকে। সাধারণতঃ আলুর পাতা যখন হলুদে হইয়া যায় এবং শুকাইয়া যায় তখনই আলু উঠাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু আলু গাছের ডাটা (haulms) সম্পূর্ণরূপে ‘যত’ হইয়া গেলে আলু যদি উঠানো হয় তাহা হইলে এরূপ আলুও বেশী দিন গুদামে সংরক্ষণ করা যায় না; এই ধারণাও কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইরূপ আলুতে শীঘ্রই ‘পচ’ ধরে। মাটিতে যখন প্রচুর আর্দ্রতা থাকে তখনই আলু উঠানো উচিত।

আলু সংরক্ষণ খুবই কঠিন ও সাবধানতার কাজ। আলু উঠাইবার পর ক্ষেতে যখন আলু এক এক স্থানে জড় করিয়া রাখা হয় তখনও তাহাদের চোখের উপর প্রজাপতি ডিম পাড়িয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থাতেও আলু অনাবৃত রাখা উচিত নয়। গুদামে রাখিবার পূর্বে আলু রৌদ্রে রাখিলে উহা ‘উত্তপ্ত’ হইয়া যায়। ইহাও আলুর পক্ষে ক্ষতিকর।

পুণা জেলার কৃষকরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ করেন। ক্ষেতের নিকটে যখন গাছের ছাওয়া-

যুক্ত এক শীতল স্থানই আলু সংরক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত। প্রথমে রৌদ্রের সময়ে যেন সোচ্ছায়ায় থাকে ঐ স্থানে রৌদ্র না আসে। সহজে এইরূপ স্থান পাওয়া না গেলে গাছের নীচে চালাঘর নির্মিত করা হয়। এই ঘরের চারি ধারের বেড়া মাটি হইতে এক ফুট বা দুই ফুট উচ্চ থাকে, যাহাতে ঘরের ভিতর অবশেষে বায়ু চলাচল হইতে পারে। যুদ্ধের বা চালাঘরের তলদেশে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক খণ্ডটি ৪৫ ফুট প্রশস্ত। আলুর পরিমাণের উপর খণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। খণ্ডের প্রশস্ততা পাঁচ ফুটের বেশী করা উচিত নয়। ইহার বেশী হইলে খণ্ডের মধ্যভাগের আলু অতি শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক খণ্ডের চারি ধারে এক হইতে দেড় ফুট প্রশস্ত এবং ছয় হইতে আট ইঞ্চি গভীর একটি জলের নালা



পুণ্য এই ধরনের চালাঘরে গোলআলু সংরক্ষিত হয়

কাটকা দেওয়া হয়। নীচ কাটিবার সময় যে মাটি পাওয়া যায় তাহা ধারা নালার পাড় প্রস্তুত হয়। ইহার পর প্রত্যেক খণ্ড জলে পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। দুই-এক দিন খণ্ডটি এইরূপ ভাবে রাখিলে মাটি জল শুষিত হইবে। খণ্ডটি সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে সজ-উখিত আলু কিংবা পূর্বের উঠানো আলু খণ্ডের উপর গাদা করিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ গাদা চার ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। গাদাটি একটি পাতলা নিমপাতার আবরণে আবৃত করা হয়। ইহার পর গাদাটি সম্পূর্ণ ভাবে ভিজা ঘাসের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে, আচ্ছাদনটি ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি পুরু হইবে। আচ্ছাদনটি জলের নালার পাড়ের বাহিরে আসিয়া পড়িবে। গাদাকে ঘাসের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করা খুবই কৌশলের কাজ। ইহা উপযুক্তভাবে করিতে পারিলে গাদার মধ্যে প্রজাপতির প্রবেশ বহুলপরিমাণে নিবারণ করা যায় এবং সংরক্ষিত আলুও 'ঠাণ্ডা' থাকে। এইরূপ ভাবে বহু গাদা পাশাপাশি করা হইতে পারে। কখনও কখনও গাদার উপর অল্প পরিমাণ চিনি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার ফলে পিণীলিকার আবির্ভাব হয় এবং উহার প্রজাপতির ডিম, পুতলি প্রভৃতি থাকিবে।

ঘাসের আচ্ছাদন দিবার পর কেবল মাত্র দেখিতে হইবে যে গাদার ভিতরকার তাপ খুব নিম্নে যেন থাকে। সাধারণতঃ

নালার জল ভর্তি করিয়া এবং তিন-চার দিন অন্তর ঘাসের আচ্ছাদনের উপর জল ছিটাইয়া দিয়া তাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই জল যখন বাষ্পে পরিণত হয় তখন উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং গাদার ভিতরের তাপ নিম্নে থাকে। নালার জল মাটি চোরাইয়া নিয়ে চলিয়া যায় এবং গাদার তলদেশের মাটিকে আর্দ্র ও শীতল রাখে। গাদা যদি ভাল ভাবে প্রস্তুত করা যায় এবং উহার ঠিকমত তত্ত্বাবধান হয় তাহা হইলে গাদার ভিতরের তাপ ৮৫° ফা. ডিগ্রীর উপরে উঠে না। এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষিত আলু 'ঘামিয়া' যায় না, শুষ্ক এবং শীতল থাকে। নালার জল যেন গাদায় প্রবেশ না করে, কারণ তাহা হইলে জলের সংস্পর্শে আসিয়া আলু অতি শীঘ্র পচিয়া যাইবে।

বিক্রয়ের সময় না আসা পর্যন্ত গাদা এইরূপ ভাবেই রাখা হয়। কিন্তু কোন কোন কৃষক মাঝে মাঝে গাদা খুলিয়া দেখেন এবং গাদার মধ্যে যদি কোন আলুতে পচ ধরে তবে তাহা বাহিয়া ফেলিয়া দেন। দেখা গিয়াছে, এই ভাবে আলু সংরক্ষণ করিলে তিন মাস, এমন কি ইহার বেশী সময় পর্যন্ত ইহা ভাল অবস্থাতেই থাকে।

বিপত্ত যুদ্ধের সময় উপরোক্ত প্রণালীতে আলু সংরক্ষণ করিয়া "ডিস্ট্রিক্ট ডিপার্টমেন্ট"কে সরবরাহ করা হইত। ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম ছিল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈরাগ্যের বাণী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তখন অধ্যাপনা করতাম শান্তিনিকেতনে। ইংরেজী ছাব্বিশ কি সাতাশ সাল হবে। গুরুপল্লীতে যাবার রাত্তায় আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে কবির শিলাইদহের জীবন সম্পর্কে যে কথা হয় তা স্মৃতির ভাণ্ডারে আজও জমা আছে। নন্দলালবাবু বলেছিলেন, কবির সঙ্গে একবার তিনি শিলাইদহে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময়ে ভোরে উঠে এক দিনও তিনি দেখেন নি কবিকে বিছানায় শুয়ে থাকতে। কোন্ ভোরে উঠে কবি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বেশ মনে আছে নন্দলালবাবু এই প্রসঙ্গে পুষ্পিত পাদপের কথা এনেছিলেন। গাছ ফুলে ফুল কত সুন্দর! এই ফুল ফোটার নোঁর পিছনে রয়েছে ভিতরে ভিতরে গাছের সুকঠিন তপস্তা। এই তপস্তা চলেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। কবির তপস্তার দিকটাও খুব অল্প লোকেই জানত। শিলাইদহের আর সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়ীর মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দে তিনি ডুবে আছেন। কেবল বাইরে থেকে যারা তাঁকে দেখেছে তারা ভাবতেও পারত না কি বিরাট তপস্তার আগুন ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার পিছনে।

নন্দলাল কবির যে-তপস্তার কথা আমাদের বলেছিলেন সেই তপস্তায় কবি বিশ্বাস করতেন। ‘বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়’—নৈবেদ্যের এই পংক্তিটি আউড়ে অনেককে বলতে শুনেছি, আত্মপ্রকাশের জন্য কঠিন তপশ্চর্য্যার প্রয়োজন আছে বলে কবি বিশ্বাস করতেন না। যে শুদ্ধ বৈরাগ্যচর্চা জীবনকে অস্বীকার করে, উড়িয়ে দেয় এই জগৎকে মাথা বলে তাকে তিনি নিশ্চয়ই সন্দেহের চোখে দেখতেন। ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে’—এ তো ছিল কবিরই কথা। তিনি ছিলেন জীবন-পূজারী—মুক্ত, শুদ্ধ পূর্ণ জীবনের পূজারী। এই মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ জীবনের গোরবে পৌঁছান সম্ভব শুধু ত্যাগের মধ্য দিয়ে—এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় ছিলেন। যারা বৈরাগ্যবাবিরধির তলায় ডুব মেরেছে তাদের পথকে কবি যেমন স্বীকার করতে পারেন নি, তেমনই স্বীকার করতে পারেন নি তাদের পথকে যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি হয়ে অরূপের রূপের লীলাকে কেমন করে তিনি অস্বীকার করতে পারতেন? সৌন্দর্য্যকে, ভোগকে, আনন্দকে কখনই তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছেন আনন্দলোকে উপনীত হবার জন্য নিরাসক্ত হওয়ার বিপুল প্রয়োজনকে। নিরাসক্ত হতে পেরেছে যারা, কবির ভাষায়, ‘তারা ভোগবতী পার

হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে।’ আত্মপ্রতিচেষ্টে কবি অননুভববীণ ভাষায় লিখেছেন :

“ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটো বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন তাজেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার-চারিদিকে তারি মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্রানি আসে, ক্লান্তি আসে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অরুক্ষণই সে স্নান হয়।”

‘বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়’—এই কথা যে কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল তিনি কিন্তু আসক্তিকে কোথাও প্রত্যাখ্যান করেন নি। ভোগকে লোভ থেকে এবং সৌন্দর্য্যকে আসক্তি থেকে উদ্ধার করবার কথাই তাঁর সাহিত্য আমাদের কাছে বারংবার শুনিয়েছে এবং সেইজন্যই তাঁর সাহিত্য অনায়াসে মহৎ সাহিত্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে. টয়েনবি তাঁর *A Study of History*’র এক জায়গায় লিখেছেন :

We have now, perhaps, established the truth that ease is inimical to civilisation.

মামুষের সভ্যতার আর প্রগতির পথে আরাম যে প্রচণ্ডতম বিঘ্ন—এই কথাটা টয়েনবি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন এবং আপন উক্তিকে ইতিহাসের নানা নজির দিয়ে প্রমাণিতও করেছেন। রবীন্দ্রনাথেরও একই কথা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ জৈনকা শিষ্টাকে লিখেছিলেন : “ক্ষীর নদী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছে?” বিবেকানন্দের অভিধান জড়তার এবং আরামপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। তাঁর কণ্ঠে হৃৎধ্বনি, সংগ্রামের আর মহাবীর্য্যের জয়ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের মতই মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন, হৃৎধ্বনির ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আসে নবজীবনের প্লাবন। তাই জাতিকে অমৃতের তীরে পৌঁছে দেবার জন্তু তার কানে তিনি শোনালেন মরণের জয়গান।

“কিসেরই বা মৃত্যু, ক’দিনের শ্রাণ?

ঐ উঠিয়াছে সংগ্রামগান,

জমর মরণ রক্ত চরণ

নাচিছে সর্গোরবে।”

রবীন্দ্রনাথ—স্বদেশ ও সংসার

হৃদয়ের ভুবনকে তিনি সমস্ত জগৎ দিয়ে ভাগবেসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে ছিল আনন্দের মন্ত্র, জীবনের প্রতি তাঁর অল্পবাক্য ছিল প্রবল এবং প্রচুর। ধৌদীপ্ত মুক্ত মহাজীবন তিনি কামনা করেছিলেন নিজের জন্য—জাতির জন্যও তাই কামনা করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি যখন জীবনের আত্মানে দিক থেকে দিগন্তেরে চলেছে তখন তাঁর স্বদেশ-কর্মকীর্তিহীন হয়ে পড়ে থাকবে পথের এক পাশে—এই চিন্তা কবিকে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু প্রগতি সম্ভব শুধু চলার মধ্য দিয়ে। কোথায় সেই বীরের দল যারা চলবার সাহস রাখে জানা থেকে অজ্ঞানায়, কূল থেকে অকূলে, বন্দরের নিস্তরঙ্গ জলরাশি থেকে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্কুল বক্ষে? সমাজের প্রবীণ ‘পাকা’দের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে না—একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। বিবেকানন্দের মতই তিনি নবীনদের কাছে পাঠালেন তাঁর দুর্জয় আস্থান। তাদের ভবিষ্যৎ খুব নিরাপদ—এমন মিথ্যা আশার কথা তাদের তিনি শোনালেন না। বাণ পিতামহের প্রতিধ্বনি হবে না যারা, পৃথিবী কথা না কপটে যারা বলবে উল্টো কথা তাদের নিন্দা দেশে দেশে রটেবেই, তাদের বিপদ পদে পদে ঘটবেই। রবীন্দ্রনাথ তাই জাতির যৌবনকে শোনালেন প্রাণ-রাত্রির বজ্রনাদের কথা। ‘ফাল্গুনী’তে সর্দার বলেছে ‘সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি—ঐ আমার সর্দারি’। দেশের আসল ‘সর্দার’ তো কবিরাই। কবি ছইটম্যানের ভাষায় কবি হচ্ছেন “The leader of leaders”। কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা পায় ভাব থেকে আর এই ভাবসম্পদ জাতিকে দান করে কবিদেরই রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈপ্লবিক ভাবের প্রেরণা দিয়ে স্বদেশের যুবসমাজকে পরিচালিত করেছেন সঙ্কট থেকে সঙ্কটে যেখানে নেই ঘরের আরাম, নেই নারীকণ্ঠের প্রেমগুঞ্জন, নেই বন্ধুজনের প্রশংসা, নেই লক্ষ্মীর আশীর্বাদ।

‘বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়’—এই কথা যার লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তিনি কিন্তু কচকে দেব-যানীর ভূঙ্গবন্ধনের মধ্যে কিছুতেই বাধা পড়তে দিলেন না। পুরুষকে তিনি নারীমায়া থেকে মুক্ত রাখলেন দেবতাদের সঙ্গীতবীণা বিছা দান করবার জন্য। কচের কথাগুলি কি চমৎকার, কি মর্মস্পর্শী!—

আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনভলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ যুগসম,
চির তৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ-প্রাণে মম,
সর্বকার্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে

মুখশূন্য সেই বর্ণধামে। দেব সবে
এই সঙ্গীতবীণা বিছা করিয়া প্রদান
মৃতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে, তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার মৃত্যু।

‘চতুরঙ্গের’ শতীশকেও তিনি ঘর বাঁধতে দেন নি। দামিনীর যৌবন শতীশের বিবাগী মনকে টানতে পারে নি বাসবঘরের চতুঃদীয়মানার মধ্যে। দামিনীকে নিয়ে ঘর বাঁধল শ্রীবিলাস, শতীশ নয়। বিবেকানন্দের বীরবাণীতে আছে: ‘আশ্রয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান, দূর কর নারীমায়া।’ বিবেকানন্দ অবিবাহিত জীবনের উপরে জোর দিয়েছিলেন। দেশে দেশে সত্যের জন্য লড়াই করবে যারা, স্বদেশকে যারা জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে তারা হবে সর্বভাগী তপস্বী। রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের মত ডাক দিয়েছিলেন তাদের যারা ঘর বাঁধবে না, আরাম খুঁজবে না, নাম চাইবে না, তপস্তার মধ্যে যারা ডুবে থাকবে, যারা দেশবাসীর সম্মুখে আনবে নিকাম পুরুষের ক্ষুদ্র শক্তিরূপ। তাঁর ‘তিন সঙ্গী’ আসল রবীন্দ্রনাথকে চেনবার পক্ষে দীপশিখার কাজ করবে। এই গল্পের নায়ক নবীনবাবু নায়িকা অচিরাকে জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে তা হলে মেয়েদের স্থিতি কেন। উত্তরে অচিরা বলেছে:

“বারো আনার চলে, মেয়েরা তাদের জন্তেই। কিন্তু বাকি মাইনরিটি, যারা সব কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদের চলে না। সব-পেরোবার মানুষকে মেয়েরা যেন চোখের জল ফেলে রাস্তা ছেড়ে দেয়। ...যে মেয়েরা মেয়েলি, প্রকৃতির বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী; তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা করে ঘরের লোকের। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদের সংখ্যা খুব কম; তারা অভিব্যক্তির শেষ কোঠায়। মাথা তুলেছে দুটি-একটি করে।”

মানুষের চরম অভিব্যক্তি তপস্তার মধ্য দিয়ে—এই কথাই রবীন্দ্রনাথ শুনিye গেছেন নতুন ভারতবর্ষের কর্ণ-কুহরে। স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে বর্ষের মানুষ হবে দেবতা—এই বাণীই রবীন্দ্রনাথের বাণী। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। ভারতের উপনিষদ জীবনকে অস্বীকার করতে বলে নি, বরং বলেছে জোবের সঙ্গে বাঁচতে। এই বাঁচার আনন্দকে অল্পভব করবার জন্যই মনকে নিরাসক্ত করবার দরকার আছে আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নিরাসক্ত যৌবনেরই জয়গান। নিজে যিনি তপস্বী ছিলেন তপস্তার প্রয়োজনকে তিনি বারংবার স্বীকার করে গেছেন ব্যস্তির এবং সমষ্টির জীবনকে গৌরবোজ্জ্বল করবার জন্য।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৮-১৯০৯

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের কি বিচিত্র গতি! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসমালা বাঙালী গল্প-পিপাসু পাঠকসমাজকে মুগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়াছিল, বাংলার অন্তঃপুরের সহস্র সহস্র পাঠিকার অবসর-বিনোদনের সঙ্গী হইয়াছিল, আজ মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে আমরা তাঁহার নামমাত্র আর শুনিতে পাই না। কালের নিকষে যোগেন্দ্রনাথের রচনা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একদা সাময়িকভাবে সেগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বাংলার সাহিত্য-সাধক সমাজে তাঁহাকে আজ আমরা স্মরণ করিতেছি। সাময়িকপত্র-জগতে যোগেন্দ্রনাথের ‘কল্পনা’ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও স্মরণীয়।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

১২৬৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৫৮) মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রনাথ জন্মিষ্ট হন। তাঁহার পিতার নাম—গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ যখন ছয় মাসের শিশু, সেই সময় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়।

বিদ্যাশিক্ষা

যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পিতৃব্য প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চাঁপাতলার বাসায় থাকিয়া নয় বৎসর বয়সে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্তমান মহারাজার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করিয়া এফ. এ. শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদশা হইতেই যোগেন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সাময়িকপত্র পরিচালনে ব্রতী হন। তাঁহার পরিচালিত তিনখানি সাময়িকপত্রের কথা আমরা জানি; সেগুলি—

‘সুধাকর’ : ইহা একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, ১২৮৪ সালের ভাদ্র (১৮৭৭, আগষ্ট) মাসে প্রকাশিত হয়।

‘সুধাকর’ প্রকাশ করেন যোগেন্দ্রনাথ; সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল—হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

‘কল্পনা’ : মাসিক পত্র; ইহাও যোগেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত; সম্পাদন করিতেন হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ বর্ষের (১২৯৬ সাল) পত্রিকায় সম্পাদকরূপে যোগেন্দ্রনাথেরই নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

‘অবকাশ’ : ১২৮৮ সালের মাঘ (ইং ১৮৮২) মাসে কল্পনা-কার্যালয় হইতে যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই নামের একখানি “নবন্যাসপূর্ণ মাসিকপত্র” প্রকাশিত হয়।

যোগেন্দ্রনাথ মূখ্যতঃ কথাসিঙ্গী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা বড় কম নহে। আমরা কয়েকখানির উল্লেখ করিতেছি :—

১। প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ঘড়া (ইং ১৮৮৬), ২। প্রণয় পরিণাম (১৮৮৭), ৩। ভগু দলপতি দণ্ড (প্রহসন, ১৮৮৮), ৪। ক’নে বউ (১৮৯০), ৫। বিমাতা (১৮৯৩), ৬। স্ত্রী ও স্বামী (১৮৯৪), ৭। বড় ভাই (১৮৯৪), ৮। কলঙ্কিনী (১৮৯৫), ৯। আমাদের বি (১৮৯৫), ১০। উন্মাদিনী (১৮৯৬), ১১। প্রসন্নকুমারের উইল (১৯০০), ১২। চাঁ-কুলীর আত্মকাহিনী (১৯০১), ১৩। জঙ্গলী মেয়ে (১৯০২), ১৪। প্রতিশোধ (১৯০৪), ১৫। পাহাড়ী বাবা (১৯০৬), ১৬। খুড়ী-মা (১৯০৭), ১৭। শোভাসিংহ (১৯০৮)।

মৃত্যু

১৯০৯ সনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি (১৬ মাঘ ১৩০৫) যোগেন্দ্রনাথ, ৫১ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ‘জন্মভূমি’ দীর্ঘ শোক-সংবাদ লিখিয়াছিলেন; উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের আর একটি নক্ষত্রপাত হইয়া গেল। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাদৃশ উদার প্রকৃতি সহায় বহুবৎসল পরোপকারী নির্মলভাব সজ্জন বহু অধুনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকতে তিনি ক্রমাগত ২৪ খানি উপন্যাস পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সকলগুলিই সুপাঠ্য, বিশেষতঃ ‘ক’নে বউ’ ও ‘খুড়ী-মা’ সর্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গীয় সমাজকে তিনি উত্তমরূপে চিনিয়াছিলেন, তৎপ্রণীত সামাজিক উপন্যাসগুলি প্রকৃত প্রকৃতির মধাধা রক্ষা করিতেছে, সমস্ত পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও মূল্যবান। তাঁহার বিরোধে সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য-সংসার নিত্যন্ত শোকাবুল হইয়াছেন, আমরাও অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।” (পৌষ ১৩০৫)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাগরণ

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্রাম, মালয় উপদ্বীপ, ভিয়েতনাম (ইন্দোচীন) ইন্দোনেশিয়া (ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ) এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ—এই সাতটি দেশ লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গঠিত। কাহারও কাহারও মতে সিংহলকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদিকারী বিভিন্ন পাক্ষাত্য জাতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র জাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জঁকিয়া বসিয়াছে। ১৭৯৬ সালের ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে হল্যান্ড ফরাসীপক্ষে ষোগদান করে। ফলে হল্যান্ডের অধিকৃত সিংহল দ্বীপ ইংলণ্ডের হস্তগত হয়। ১৮২৬, ১৮৫২ এবং ১৮৮৫ সালে সংঘটিত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া লয়। ১৮৮৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ সালের মধ্যে মালয় উপদ্বীপ ইংলণ্ডের আশ্রিত রাজ্যে—প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯১০ সালের মধ্যে সমগ্র ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজগণের হস্তগত হয়। ১৮৮৪ সালে ফরাসীরা টংকিন এবং আনাম অধিকার করে। ১৮৯৩ সালে শ্রামরাজ্য তাহাদের হস্তে লাগুন অর্পণ করেন। ইহার পর ১৯০৭ সালে ফরাসীরা কাম্বোডিয়া এবং ফোচিন চীন অধিকার করিয়া লইল। এই ভাবে সমগ্র ভিয়েতনাম ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হইল। ১৮৮৮ সালে বোর্নিও দ্বীপে ইংরেজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত স্পেনের উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। এ বৎসর স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের জাতীয় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া ঘাইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ গ্রাস করে। ইংরেজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে জাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা তাহারও ছিল না।

বিশ্ব-অর্থনীতি ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বিগত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপন্ন দ্বার এবং আহৃত টেনের ষষ্ঠাংশে নয়-

দশমাংশ এবং সাত-দশমাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সরবরাহ করিত। ষাটশতকের দিক হইতে এশিয়ার যে সমস্ত দেশ বাটতি অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তাহাদিগকে চাল যোগাইত। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চলে প্রচুর চা, চিনি এবং তামাক উৎপন্ন হইত। বিশ্বের কুইনাইন এবং মঙ্গলার মোট চাহিদার পুন বড় একটা অংশও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই মিটাইত। এই অঞ্চলের আরণ্য এবং খনিজ সম্পদও উপেক্ষা করিবার মত নহে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও জাগরণের সাদা তেমন ভাবে অনুভূত হইত না। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইত যে, সাম্রাজ্যবাদিকারী খেতজাতিপুঞ্জ বহুকাল নিরীক্সবাদের এই অঞ্চলে রাজদণ্ড পরিচালনা করিবে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সময় হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল।

এক দিন না এক দিন পরাধীন জনগণের অভ্যুত্থান অবশ্যস্বাভাবী। শাসকগোষ্ঠী যদি অধীন জনগণকে বিশ্বাস না করেন, যদি তাহাদিগকে ক্রমাগত উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা করিয়াই চলেন, যদি কোনদিনই তাহাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে না করেন, তবে শাসিত জাতি যত নিরীহ, নিরীক্ষরোধ এবং শান্তিপ্ৰিয় হউক না কেন, এক দিন না এক দিন তাহারা অবশ্যই স্বাধীনতালাভে সচেষ্ট হইবে। কূটনীতি এবং বাহুবলের সহায়তায় কিছুকাল তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা যায় সত্য, কিন্তু বাহুবল এবং কূটনীতিদ্বারা প্রভুত্ব কামের করা চলে না। জাগ্রত জনগণের রোষ-বহি শীঘ্রই হটুক, আর বিলম্বেই হটুক, বিপ্লবের অগ্নিশিখার আশ্রয়প্রকাশ করিবেই করিবে। বিদেশী শাসনাধীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সরকারী নীতি খেতজ শাসক জাতিসমূহ কর্তৃক পরি-কল্পিত হইয়া তাহাদের ইচ্ছিতে পরিচালিত হইত। নীতি নির্ধারণে দেশবাসীর মতামত গ্রহণ করা দূরের কথা, মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ পর্যন্ত তাহাদিগকে দেওয়া হইত না। সুতরাং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতির মধ্যেই যে তাহার ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল, সে-কথা বলা নিশ্চয়োজ্ঞান।

নিজেদের প্রয়োজনে বিদেশী শাসকবর্গ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাক্ষাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কালক্রমে পাক্ষাত্য শিক্ষা কতকটা বিস্তারলাভও করিয়াছিল। এই শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে এশিয়াবাসী মনে করিত যে, যে শক্তি-বলে খেতজাতি সমগ্র জগতে প্রাধাভলাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কোন দিনই এশিয়াবাসীর আয়ত্তে আসিবে না। কিন্তু

পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত তরুণ এশিয়াবাসী পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-সম্বন্ধ ভাঙারে যেতজাতির শক্তির উৎসের সন্ধান পাইল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রবল জাতীয়তাবোধই পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে চূর্ণ শক্তিতে শক্তিমান করিয়াছে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এশিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিগত করিতে পারিলে সেও পাশ্চাত্য জগতের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইবে এবং পাশ্চাত্য সমাজে তাহার সমকক্ষতার দাবি স্বীকৃত হইবার পথে কোন বাধাই থাকিবে না। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনার ফলে এশিয়াবাসী আবিষ্কার করিল যে, জাতীয়তার প্রেরণায় অসুপ্রাপিত জাতি অসাধ্যসাধন করিতে সক্ষম। এই মবলক জ্ঞান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাগরণে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথম জাতীয়তার উন্মেষ হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেন। অতীতের পুনরুজ্জীবনই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। অতেরা আবার স্ব-স্ব মাতৃভূমিকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিবার সাধনার আত্মনিয়োগ করিলেন। জাতীয়তার নবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বহু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী প্রথম প্রথম শাসকজাতিকে হিতাকাঙ্ক্ষী বহু মনে করিয়া তাহাদের পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষের গোখলে, ফিলিপাইনের ডাঃ রিজল এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাজনৈতিক সংস্থা 'বোদি উতোমো'র প্রতিষ্ঠাতারা এই পন্থায় পড়েন। ইহারা কেহই বিপ্লবের আদর্শে আত্মবান ছিলেন না এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, পাশ্চাত্যের নিকট হইতে অনেককিছু শিক্ষা করিবার আছে। শাসক জাতির সদিচ্ছা এবং উদারতা সত্বেও তাঁহারা কোন সন্দেহ পোষণ করিতেন না এবং বিশ্বাস করিতেন যে, সংস্কারের পথেই তাঁহারা এক দিন স্বাধীনতা লাভ করিবেন। কিন্তু এই ভুল ভাড়িতে বেশী দিন লাগে নাই। তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশী শাসক কোন দিনই স্বৈচ্ছায় স্বীয় শাসনাধীন দেশকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে না। পাশ্চাত্য সত্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালিক বিভিন্ন স্বৈচ্ছাজাতির মধ্যে উদার মনোভাবসম্পন্ন ছ'চার জন পরাধীন দেশের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও একথা বুঝিতেন না যে, উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতাই ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাভাবিক এবং অবশ্যস্বাবী পরিণতি। জাতীয়তাবোধের বিকাশ ব্যতীত স্বাধীনতালভা সম্ভব নহে। এই বিকাশের

জট গণজাগরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদিগণ কিছু দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করিলেন যে, গণ-সমর্থন এবং গণ-সংগঠন ব্যতীত তাঁহাদের স্বাধীনতালভার স্বপ্ন কোন দিনই সফল হইবে না। জন-সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা এবং জাতীয় সংগঠনের ফলে সরকারের সহিত সংঘর্ষ যে অবশ্যস্বাবী একথা বুঝিতেও তাঁহাদের বাকী রহিল না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী যাবতীয় রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। তদুপরি সমগ্রগত তাবে তাহাদিগকে যেতজাতির তুলনার নিকট মনে করা হইত। এইজন্য তাহাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। অভাব-অভি-যোগের প্রতিকারের জন্ত জনসাধারণকে সর্বদাই ঔপ-নিবেশিক সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইত। এই প্রতিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলম্বিত হইত। যে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবহার উপর প্রতিকারের ভার ভুগে ছিল, তাহার উপর জনসাধারণের কোন প্রভাবই ছিল না।

শাসক এবং শাসিত উভয়ের বাস্তববোধের অভাবে ঔপনিবেশিক সমস্তা জটিলতর হইয়া উঠিতেছিল। ইহারা সকলেই অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতেন। ফলে বহু ক্ষেত্রেই সমস্তার সমাধান হওয়া দূরের কথা তাহার জটিলতা বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই চরমপন্থী হইয়া উঠিল। দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ এশিয়াবাসী বুঝিল যে, রাজনৈতিক স্বাভাব্য ব্যতীত প্রগতির পথ চিরদিনই বিঘ্নসঙ্কুল থাকিরা যাইবে। বহু জাতীয়তাবাদী সহিংস আন্দোলনের প্রতি কৃৎসি পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন যে, একমাত্র সমাজ-বাদ বা সাম্যবাদই তাঁহাদের যাবতীয় চূর্ণতির অবসান ঘটাইবে। অন্যেরা আবার অল্প জনসাধারণের স্বার্থাধী এবং বহিরাগতের প্রতি বিদ্বেষের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় এশিয়ার সর্বত্র জাগরণের বেগ ও তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিম্নরূপ রাজনৈতিক জীবনেও ইহার ফলে চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগিয়াছিল। ১৯০৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার সম্ভবত জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপাত হয়। ঐ বৎসর কতিপয় হায় এবং বুদ্ধিজীবীর মিলিত প্রচেষ্টায় ইন্দোনেশিয়ার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (বোদি উতোমো—মহান প্রচেষ্টা) সংগঠিত হয়। প্রথম দিকে ইহার কোন রাজনৈতিক কর্মপন্থা ছিল না। বোদি উতোমোকে গণ-প্রতিষ্ঠান মনে করা ভুল হইবে। বহু বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ শিক্ষিত যবদ্বীপবাসিগণই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর হইতে এবং

প্রধানতঃ ইহারই ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রগতিশীল জনমত এই সংস্কারে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং আরও বিদ্রোহ হইয়া উঠিয়াছিল। শাসকগোষ্ঠী পরাধীনতার স্বত্ব-কামনাকে উপেক্ষা করিয়া যুগধর্মের বিরোধিতা করিলেন। তাহারাই মনে করিলেন—অন্ততঃ যুগে বলিলেন এবং এখনও বলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিলে উপনিবেশগুলির সর্বনাশ হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতিরই যে ভুলের মধ্য দিয়া পথ খুঁজিয়া লইবার অধিকার আছে এই ঐতিহাসিক সত্য তাহারাই বিস্মৃত হইলেন। ফলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অতি দ্রুত দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই বিকোন্ডের বিশেষ কোন বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। তরুণ সম্রাটের গণতান্ত্রিকতার মোহযুক্ত হইয়া নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা, কর্তৃত্বশীলতা এবং সামরিক শক্তিতে আস্থা বিদেশী শাসনের প্রধান ভিত্তি। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এই ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের এই ভিত্তিকে একেবারেই ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে বিজয়দৃষ্ট জাপ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। স্ব-শাসনধীন জনগণকে নিদারুণ সঙ্কট এবং দুর্গতির মধ্যে ফেলিয়া বিদেশী শাসক ‘যঃ পলায়তে সঃ জীবতি’ নীতি অনুসরণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-বাসীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহাদের শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তাহারা বুঝিল, বিদেশী শাসনের ফলে আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারাষ্টয়া তাহারা নিরীক্ষা হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী বহুদিন পূর্বেই অভিযোগ করিয়াছিলেন—ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতীয় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়া নিবীড় করিয়া ফেলিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানের চমকপ্রদ সাফল্য এবং মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের চাঞ্চল্যকর সামরিক বিপর্যয় খেত-

জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা যে একান্তই ভিত্তিহীন চোখে আঁচুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিল।*

কেবল তাহাই নহে। এশিয়ার একমাত্র সাম্রাজ্যাদিকারী শক্তি জাপানের আক্রমণ হইতে মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের আশ্রিত জাতিসমূহকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহাদের এই অসামর্থ্যকে জনগণ বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মনে করিল। খেত এবং গীত শাসনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা এই শিক্ষালাভ করিল যে, ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ এবং নিপীড়নেরই নামান্তর। সাম্রাজ্যাদিকারী জাতিগুলি এত কাল বলিত যে—এখনও সুযোগ পাইলেই বলিতে ছাড়ে না—তাহারা স্ব-স্ব উপনিবেশের অহুন্নত, দুর্বল অধিবাসীদের ন্যাসরক্ষক যাত্রা এবং বিধাত-নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পালন করিবার জন্যই তাহারা উপনিবেশগুলির শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে; ইহার পশ্চাতে কোন স্বার্থবুদ্ধি নাই। কিন্তু এই ধারণা আর টিকিল না। আর এই ভুল ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দাসত্ব-শৃঙ্খল ধুলিয়া পড়িতেছে।

দুর্দশী চিন্তানায়কগণ আগেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইবার কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের ৩০শে নবেম্বর মিঃ সামনার ওয়েলস একটি ভাষণে বলেন যে, মানুষমাত্রই যে স্বাধীন এবং সে যে কাহারও তুলনায় হীন নহে এই আত্মসাবাগী উচ্চারণ করিবার দিন আসিয়াছে। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় মানবজাতির বন্ধন-মোচন করিবে। সাম্রাজ্যবাদের দিন চলিয়া গিয়াছে। জনগণের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করা ব্যতীত গতান্তর নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত উপনিবেশই স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু এখনও হাল ছাড়ে নাই। ইংরেজ ও ফরাসী আজও মালয় এবং ভিয়েটনামে ভিন্ন রূপে এবং ভিন্ন নামে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। জাগ্রত জনসাধারণ এই শাসনের অবসান ঘটাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এই ছইটি দেশের বর্তমান গোল-যোগকে যে নামই দেওয়া হউক না কেন, তাহা যে যুয্যতঃ মুক্তি-সংগ্রাম তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

* “... the nature of defeats suffered by the Western nations in 1942 dealt a final blow to any concept of white superiority that still remained.”—*Time for Decision* by Sumner Wells, p. 238.



বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২১

দীপাদের বাড়ী থেকে বেরুতেই অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা। ওর হাত ধরে অমলেন্দু গলির অভ প্রান্তে টেনে নিয়ে এসে। বললে, সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি। খবর আছে।

খবর? কিসের?

কালোবাজারীর। চুনোপুঁটি নয়—একেবারে কুই-কাতলা।

খবরটা শুনেও প্রভাত বিশেষ উৎসাহিত হ'ল না। বললে, রিপোর্ট যথাস্থানে পাঠিয়েছ?

তোমাকে না জানিয়ে—

আমি পরে জানলেও ক্ষতি হ'ত না।

অমলেন্দু বললে, ব্যাপারটা হাতে-নাতে ধরার মত নয়। ফাঁদ পাতেতে হবে। একটু ধৈর্যে বললে, তা ছাড়া তোমার মতামত না নিয়ে—

কেন অমল? ওর ইচ্ছা: ভাব দেবে প্রভাত বিম্বিত হ'ল।

কারণ আরও ঘন হয়ে দাঁড়াল অমলেন্দু। গলা আরও নামিয়ে বললে, তুমিও ত যাতায়াত করছ এতদিন—কোন সন্দেহ হয় নি?

কোথায় যাতায়াত করছি? কিসের সন্দেহ? বিন্ময়ে প্রভাত বেশী কিছু বলতে পারলে না।

মানে—এই ইয়ে, একটা ঢোক গিলে অমলেন্দু এক নিঃশ্বাসে বললে, এই যে গলির মধ্যে উড়ে-বসি উড়িয়ে ভিম-ভলা প্রাণদা খাড়া হ'ল—এর গোড়াকার কথা জানবার জুড় কোন দিন কোতুল হয় নি তোমার? এই বাজারে যারা হঠাৎ লাঞ্ছিত কোটিপতি হয়ে ওঠে তাদের বনিয়াদের কোন কোন অঙ্গগায় যে অলৌকিক কিছু আছে এ সন্দেহ হয় নি তোমার?

প্রভাতের পায়ের নীচেকার পৃথিবী সহসা হ'লে উঠল। ধন সঞ্চয়ের মূলে কোন ক্ষেত্রেই কি অধ্যবসায় আর সন্ততার সঞ্চর থাকে অবিস্মৃত এই যুগে? বিশেষ করে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের ফলে মানুষের নীতি কি আত্মল বদলে গেছে? নিছকের দেশ বলে—জাতি বলে—জাতিগোড় বলেও একটু মমতা বা সমবেদনা জাগছে না মানুষের মনে? কোথায় গেল মানুষের হৃদয়—যা কালে কালে বেদনার বিগলিত হয়ে স্রষ্টা করেছে মহত্বকে, সুন্দরকে, অনির্বচনীয়কে? হৃদয়ের ওপর চেপে বসেছে মস্তিষ্ক—কুটবুদ্ধির পণ্যে ভরা মস্তিষ্ক, যার বিচারে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য-সঞ্চর ব্যতীত আর সব সঞ্চর অকিঞ্চিৎকর।

খুল ঐশ্বর্য্য—জাগতিক মুখস্থবিধাগুলিকে যার দ্বারা ক্ষয় করা সম্ভব।

প্রভাত বললে, সন্দেহ হয়—সন্দেহ ভঞ্জন কর। কিন্তু আমি ত জানি না—

বাধা দিয়ে অমলেন্দু বললে, আলোর নীচের সবচেয়ে বেশী অন্ধকার, প্রভাত।

ওরা পথ অভিবাহন করতে লাগল। পথের দু'ধারে কত নতুন অট্টালিকা বা প্রাসাদ। এই সব সম্পদের অন্তরালে অকীর্তির কাহিনী নিশ্চয় আছে। বিশেষ করে নরম-সোভন সৌধগুলির জন্ম-রহস্য সন্দেহাতীত নয়। চলতে চলতে মনে হচ্ছে ওদের সংখ্যাও ত কম নয়। তবে কি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাধি? কোন্টিকে বাদ দিয়ে কোন্টির কথা সে ভাববে? কার ছক্কতির নালিশ—কোন্ দ্বার বিচারকের আদালতে পেশ করবে? চালে কাকর, আটায় তেঁতুলবীচি, চিনিতে নরম পাথর গুঁড়ো, সরিষার তেলে শিয়ালকাঁটার বীজ—নারিকেল তেলে হোয়াইট অয়েল, পোয়ালার হুধে গুঁড়ো হুধের ডেজাল, গুঁড়ো হুধও অক্লান্ত নয়। শিল্পের খাত হুজিফুদ, রোগীর পথ্য বালি সাগুদানা, ইন্ডেকশনের সিরাম...না—না—পলিত হুমিত পৃথিবীতে মানুষ মরণোৎসবে মেতেছে—মানুষ ধন সঞ্চয়ের নেশায় মাতাল হয়েছে। এক দিকে পরমাণু বোমা, অল্প দিকে ডেজাল আর কালোবাজার; পাইকারী ও বুচরা হারে যত্নাৎসবতা বিতরণ করছেন ব্যাধি। জলপ্লাবনে একদা ধ্বংস হয়েছিল স্রষ্টা, এবারও ধ্বংসের আয়োজন চলছে সুচারুভাবে। একে সময় মত রুখতে না পারলে—

অমলেন্দুর কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে প্রভাত বললে, এর প্রতিকার করতেই হবে।

নুতন করে ভাবতে বল প্রভাত। ঠিকই বলেছে অমলেন্দু—আলোর নীচের বেশী অন্ধকার। সে অন্ধকারকে আমরা চিনি অথচ ঘূণা করি না। সেই অন্ধকার সর্ব্বক্ষে ছায়াপাত করলে একটুও বিচলিত হই না; কেননা তার আসল চেহারা থাকে জ্ঞানের অগোচরে। কিন্তু সারা দুনিয়ার লোককে সন্দেহ করবে আবার দুনিয়াতে লোককে দেখাবে সেবার আগ্রহ—এর চেয়ে পরস্পর-বিরোধী কার্য্য আর কি আছে। কোন্টী ছায়, কোন্টী অস্তায় এই বোধ ত সঞ্চলের সমান নয়। মানুষের ধাবারে ভাগ বসায় যে পশু তাকে নির্বাতন বা হত্যা করা অর্থহীন নয় এক প্রদেশে—অল্প প্রদেশে সেই পশুর দেবোচিত পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন

হয়। ক্ষতি হু' জায়গাতেই ঘটে, কিন্তু পুরাকালের এক মহতী কীর্তিকলাপের কথা স্মরণ করে মানুষের কৃতজ্ঞতা ভাঙে দেবত্ব আরোপ করে কৃতকৃতার্থ হয়। এমনই বিচিত্র বিধান দেশে-বিদেশে।

আজ মনের প্রসন্নতা যেন নষ্ট হয়েছে। অকারণে রূঢ়তা প্রকাশ করে দীপাদের সে আহত করেছে। সত্যই কি তার মনের গভীরে ওদের ঐশ্বর্যের প্রতি বিত্বকার ভাব সঞ্চিত রয়েছে? অথচ ওদের সঙ্গে তার ভাল লাগে। ওদের অধ্যাতিকার বাণীর মন তার বিষর হয়ে উঠল কেন!...যেন এই অসম্মান ওদের মানায় না! যে কলকঙ্গাগরে আজ লাঞ্ছন পতি কোটিপতিরা ভাসছেন—দীপারা আছে তার নাগালের বাইরে। সম্পদ সঞ্চয় মাত্রই যে নরনাথনের ছরপনের কালিমালিপ্ত নয়—এই সত্য প্রচারের দিন এসেছে। ক্রটি-বিচ্যুতি নিয়ে পরিহাস নয়, শাসন নয়, উদ্ধত পুরুষ বাক্য প্রয়োগও নয়। সহযোগিতা—সেবার আকাজকা—প্রীতি এ সব উপকার না থাকলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না মনুষ্যত্বে, এই স্বাধীনতা অর্জনের আগে এক মহামানব মহৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন নি কি? সাম্রাজ্যের শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে—একান্ত দীর্ঘবেশে তিনি অপমানিত লাজিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুঃস্বপ্নকারীকে ভীত ভৎসনা করেন নি—তার ক্ষমা-সুন্দর বাণী অহংকারলেশহীন আচরণের দ্বারা বুঝিয়েছিলেন—বিষেবে মানুষকে উর্দ্ধে তুলে মহিমা প্রচার করা যায় না—জাতিত্বের মনুষ্য দ্বারা চালিত হয়ে যে গৌরব রচনা করা যায়, তা না জাতির না বা সমাজের মঙ্গল সাধন করে। ভূমি দেশাত্মবোধে জন্মের অহেতুক ঘৃণা—নিজেকে উর্দ্ধে উঠিয়ে অজ্ঞকে পায়ে তলার নামাবার ছবির কামনা! এই মর্যাদাবোধে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে—বলদুর্গত জার্মান জাতি হয়েছে পশুদন্ত। কিন্তু সমস্তা এই, সেবার শক্তি সঞ্চয় না করে সেবার আগ্রহ দেখালে বশবদ দাস ছাড়া অজ কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

সুন্দরী বাইরের ঘরে এসে ডাকলেন, প্রভাত।

কি মা?

ওমা—তুই একা অন্ধকারে শুয়ে আছিস? শরীর ধরাপ হয় নি তো?

না—ভালই আছি।

তবে চট করে একবার ডাক্তার বাড়ী ঘুরে আয় বাবা। ঔর কলিকের পেনটা বেড়েছে যেন।

জ্যা—কখন হ'ল?

অপিস থেকে এসেই বললেন—আজ রাতে কিছু খাব না—পেটের মধ্যে বিন ঘিনে ব্যথা বোধ হচ্ছে। তার পর লুতে না বলতে—

প্রভাত ছুটল পরিচিত ডাক্তার বাড়ী। অবজ্ঞা ডাক্তারকে

সে আসবার অহরোধ করলে না—জানে অহরোধ করবার সঙ্গতি তার নাই। ডাক্তারও জানেন সে কথা। চাকরীজীবী—দিন-আনা-দিন-খাওয়ার দল—পারতপক্ষে ডাকে না ডাকে। আপদে বিপদে ছুটে আসে তার কাছে—পরামর্শ চায়, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়ে নেয়—একবারে ফল না হলে বার বার আসে। একজন ডাক্তারকে ডাকার অর্থ—কম করে চারটি টাকার দণ্ড বহন করা। সে অর্থ ঔষধ পথ্যে ব্যয় করলে—

অনন্তর এ ব্যাধি নুতন নয়—ব্যবস্থাপত্রও মোটামুটি জানা। শুভু ডাক্তারের সন্মতি নিয়ে প্রত্যেক বারে ঔষধ আনতে হয়। গরম জলের সেক—আর গোটী দুই বড়ী—লব্ধা একটি ঘুঘুর সঙ্গে যজ্ঞগার অবসান হয়।

আজ কিন্তু জলের সেক ও বড়ীতে কোন ফল হ'ল না—প্রভাত আবার ছুটল ডাক্তার বাড়ী।

হ—একটা ভাল ঔষধ আছে—ইনজেকশন। কিন্তু-সাদা বাকারে ওষুধটা পাওয়া যাবে কি।

চেষ্টা করব।

বেশ তো—কিন্তু ওষুধ জোগাড় করতেই হবে। বেশী-কণ এ ভাবে যজ্ঞগা পেলে হার্ট ফেল করতে পারে।

কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটল প্রভাত। কেট বললে—ঔষধ নাই, কেউ বললে—অস্ত্র জায়গা থেকে আনিবে দিতে পারি—দাম বেশী পড়বে। কেউ বা বললে, আমার মশাই সোজা কথা—কিপটি পারসেন্ট লাভ নেব—ক্যাশমোমো পাবেন না।

কয়েক দিন আগেকার একটা বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ঔষধের শ্রাঘ্য দামের বেশী দেবেন না—ক্যাশমোমো দাবি করুন। বেশী দাম আদায়কারীদের নাম বাম টিকানা জানিয়ে দিন—

যত সহজে এগুলি বিজ্ঞাপিত হয়েছে—এত সহজে অহুজা-গুলি পালন করা সম্ভব নয়। কালোবাজারীর হাতে পড়ব না বললেই—তাদের কবল থেকে অব্যাহতি লাভ সহজসাধ্য নয়। যজ্ঞগা আর যজ্ঞকে সামনে রেখে শ্রাঘ্য পথে চলবার হুঁসাহস ক'টি লোকের থাকে। কালোবাজারে হাত মেলাতেই হবে—না হলে যজ্ঞগা তো কমবে না, যজ্ঞও আসবে এগিয়ে।

বেশী দাম দিয়ে প্রভাত ঔষধ মিলে—কিন্তু হুঁসাহস দমনে সাহায্য করবার কোন প্রমাণই সংগ্রহ করতে পারলে না। প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলেও—তা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার মনোবল তার থাকবে কি করে। বিপদে সামান্য মূল্য বেশী নিয়ে যে পরম উপকার করলে—তাকে অকৃতজ্ঞের মত ধরিয়ে দেওয়া...কৃতজ্ঞ মন স্বভাবতঃই নত হয়ে পড়ে—যুক্তি দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সাহস তার থাকে না।

বড় কালোবাক্সারীকে ধরবার প্রতিজ্ঞা করেছে প্রভাত, কিন্তু জীবনের নিত্য প্রয়োজনের অংশে ছোট কালোবাক্সারীরা যেভাবে জাঁকিয়ে বসে আছে তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ কি? এ যুগের জীবনটাই কি হুঁসিতির ভারে পড়ু হয়ে যাচ্ছে না? উষর মরুভূমিতে কয়েক কলসী জল টেলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মত ছুঁকর চেষ্টা চালাচ্ছে না কি প্রভাতরা—এবং প্রভাতের সমগোত্রীয়েরা?

২২

তিন দিন ধরেও কলিকের ব্যাথাটা কমছে না অনন্তর। ব্যাথাটা অবশ্য একটানা থাকছে না—কিন্তু আসছে প্রায় বর্তায় বর্তায় আর প্রত্যেক বারের হিতিকালও দীর্ঘ হচ্ছে।

অনন্ত বলছেন, আর পারি না—একটু আফিং বেশী করে দাও—জ্বালা জুড়োই।

ডাক্তারের আশ্রয় মফিরা—ভাই বার তিনেক ফুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রণা উপশম হয়েছে সাময়িক ভাবে। যতক্ষণ আচ্ছন্ন ভাব থাকে যন্ত্রণাটা অল্পভূত হয় না, কিন্তু তার পরেই—

ডাক্তার বলছেন—কোন বড় হাসপাতালে ভর্তি হবার ব্যবস্থা করতে। কেসটা অস্ত্রোপচারের—পিষ্টকোষে পাথর জন্মেই যন্ত্রণার উৎপত্তি। পাথর অপসারিত না হলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হবে না।

ভয়ের কোন কারণ নেই তো?

আজকাল আর্থার হচ্ছে। কত লোকে ভালও হচ্ছে।

সবাই ভাল হচ্ছে কি?

হৃদয়নীর অবোধ প্রাণে ডাক্তার হেসেছেন। ভাল হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করলে—

হৃদয়নী মনে মনে সঙ্কল্প করেছেন—সবই যখন সেই নিয়ন্তার হাত তখন তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানালে কি হয়! দৈব স্বপ্নাদ্য—দেবনির্দেশ কত পথই তো খোলা রয়েছে। কাছে-পিঠে তারকেখর আছেন—হাজার রকমের বার-ব্রত—সাধু-সন্ন্যাসী রয়েছে—এর কোন একটা কি—

এক দিন তিনি এহাচার্য্যের ছয়ারে ধারণা দিলেন। বাবা এর প্রতিকার কি?

পাঁজিপুঁথি খুলে এহাচার্য্য বললেন, নবগ্রহের কবচ ধারণ করাও—শান্তি-বন্ত্যরম করাও—

ব্যয় যা হবে তা ডাক্তারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত। তবু একবারই হবে।

কয়েকটা টাকা আঁচল থেকে বার করে দিয়ে তিনি কাহুতি করলেন, বেশী কিছু দিতে পারব না বাবা—এই নিয়ে যা হয় করুন।

আচ্ছা—আচ্ছা—অশক্ত পক্ষে যে বিধান আছে তাই করে দেব। মনে ভক্তি—আনবে—বিশ্বাস করবে—

প্রভাত শুনে বললে, টাকা ক'টা থাকলে সংসারের কাজে লাগত—

কিন্তু উনি ভাল হয়ে উঠলে—টাকার ভাবনা কি?

হাসলে প্রভাত। টাকার ভাবনা নাই সত্য—কিন্তু যে টাকা আসে মাসকাবারে—তাতে ভাবনা ঘোচে কণ্টক সময়ের জুড়। নাই নাই রব—বার কর্জ—এ সংসার থেকে মুছে গেল কি কোনদিন? উত্তরাধিকারহীন এই সম্পত্তি তাকেও বর্জাবে। সে উপার্জনের ক্ষেত্রে নামবে—সংসার পাতবে—সংসারের সুখসংকরে মনোনিবেশ করে দুঃখের বোঝা ভারী করবে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে অসংখ্য দরিদ্র রিক্তের সংখ্যা বাড়াবে যাত্র। আজ সংসারের যা অবস্থা তাতে তার উপার্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। এ সংসার তার নয় মনে করতে পারে কি সে? মায়ের উপর, ছোট ভাই বোনদের উপর, রুগ্ন বাপের উপর তার কোন কর্তব্য নাই কি? আজ যদি ধবরের কাগজের হকারিটিও থাকত।

প্রভাত বুঝতে পারে, অহেতুক সন্ত্রম-বোধের বাধা না জ্বালালে—কিন্তু বুঝতে পারলেই কি মিথ্যা আত্ম-সন্মান-বোধকে বিসর্জন দেওয়া যায়। সমাজের যে-স্তরে প্রভাতরা আছে—ছেলেবেলা থেকে যে আচার-আচরণে ওরা অভ্যস্ত—তার মোহ সহজে ত্যাগ করা কি এতই সহজ?

দ্বিতীয় দিন কাগজ ফিরি করার সময় সামনে পড়লেন বাবার আপিসের এক ভদ্রলোক। তাঁদের সঙ্গে প্রভাতদের বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। ওর হাতে কাগজের গোছা দেখে প্রশংসাসূচক হাসির সঙ্গে বললেন, বাঃ, চমৎকার! আমি যখন-তখন ভূতো আর নেটুকে (ওঁর ছেলে) বলি—দেখগে যা প্রভাতকে—হীরের টুকরো ছেলে। তাগ্য করেছিলেন বটে অনন্তদা! খালি লেখাপড়াতেই নয়—লোকের আপদে-বিপদে, ভালয়-মন্দে কোথায় না আছে। তা কোথাও লাইব্রেরি করেছ, না গরীবদের বিলোবার জুড় এত কাগজ বয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

তিনি অবশ্য উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নি। আপিসের সময়—মাছুষকে দ্বিজ্ঞানা করা চলে কেমন আছ? কিন্তু তার কুশল অকুশল শুনে নিশ্চিন্ত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার অবসর কোথায়!

আর এক দিন সামনে পড়লেন এক আত্মীয়। বললেন, কাগজের আপিসে কাজ নিয়েছ বুঝি? তা বেশ।

তৃতীয় দিনের আত্মীয়টি কিন্তু প্রভাতের কর্মধারা দেখে শুভিত হয়ে বললেন, তোমার এই কাজ! ভদ্রলোকের ছেলে, নেহাৎ মুখা-সুখা নও—বি-এ পাস করেছ, তোমার এমন চুপ্তি হ'ল কেন! বাপ আপিসের চাকরো, একটি কেরাণী-গিরিও কি ছুটিয়ে নিতে পারলে না? হি।

ভারপর দিন খালি হাতে বাড়ী আসতেই লক্ষ্মী বললে,
আজ সব কাগজ বুঝি বিক্রি হয়ে গেল ?

না—আজ কাগজ নিই নি।

কেন ?

এ কাজ আমার দ্বারা হবে না—আমি সত্যিই অপদার্থ।

লক্ষ্মী বুসী-উপচানো স্বরে বললে, ভালই হয়েছে—আমি
কত দিন ঠাকুরকে বলেছি—দাদার স্মৃতি দাও।

প্রভাত অদ্বৃত্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর পানে চেয়ে বললে, তোর
ঠাকুর ভারি জ্ঞাত।

কিন্তু বসে থাকলে ত চলে না—এর পর অনেক খোঁজ
করে প্রভাত ছোটো টিউশনি নিয়েছিল। একটা শ্রামবাজারে,
আর একটা গোয়াবাগানে। দূরত্ব বেশী নয় বলে, সন্ধ্যার
পর ঘণ্টাভিনেক সময় ব্যয় হ'ত। মাইনে এক জারগার ভালই
—দ্বিশ টাকা। সপ্তাহে মাত্র তিন দিন পড়াতে হয়। আর
এক জারগার প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়, মাইনেও কম—
তুড়ি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ছাত্র বলে অভিযোগের অবসর কম।
অভিযোগ অবশ্য প্রভাত করে নি—কয়েকদিন পড়ানোর পর
ওদের দিক থেকেই স্বর হ'ল সেটা।

এক দিন পড়ার ঘরে এসে বসলেন ছাত্রের বাবা—ধানিক
পড়ার ধরণ লক্ষ্য করে বসলেন, দেখ—মাষ্টার, (বহুসে বক্ত
বলে উনি—এই ভাবেই সন্দোষ করেন, কিন্তু প্রভাতের স্পর্শ-
কাতর মনে—এই সন্দোষনে ঠিক স্নেহের স্বর বাজে না, কেমন
যেন উচু-নীচু ভেদের সৃষ্টি করে), ঘণ্টা মিনিট ঘরে পড়ালে
ছেলেকে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কি ? মাষ্টারের উচিত
নয় কি ছাত্রকে সব পড়া তৈরি করিয়ে দেওয়া ?

প্রভাত নরম গলায় বললে, সব পড়া তৈরি হলেই ত—

না মাষ্টার, কাল তুমি চলে গেলে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম
ইতিহাসের পড়া, ও বললে, ওটা ক্লাসে ঠিক করে নেবে।

ছাত্রের পানে তাকালে প্রভাত। ছাত্র বললে, ইতিহাস ত
ঝাড়া মুখস্থ বলতে হয় না—

বলি গল্পটাও ত কেনে রাখা দরকার। আমি যখন জিজ্ঞাসা
করলাম, ভারতে বিদেশীরা আসত কোন্ পথ দিয়ে আর কেন
আসত—তুই হাঁ করে রইলি কেন ?

বাঃ রে—ওঁ ত ক্লাস ফাইভের পড়া—

হঁ—ক্লাস সিক্স'এ বেমালাম ভুলে বসে আছি। পড়ার

হ্যা হচ্ছে শুধু পরীক্ষা পাস করা—মনে রাখা নয়—নয় ?

প্রভাত বললে, মোটামুটি পরীক্ষা পাস করতে পারে—
এইটুকুই ত তৈরি করতে হবে ছেলেদের—

ও শিক্ষা আবার শিক্ষা। হঁ ! ছেলের বাবা অপ্রসন্ন
স্বরে ছাত্র দিয়ে উঠলেন। বসলেন, যাই হোক—ঘণ্টা মিনিট
ঘরে পড়িও না, একটু কেয়ার নিয়ে—যাতে ছেলেটা কিছু
শিখতে পারে—

আমার অল্প জারগার টিউশনি আছে, এর বেশী সময়
দেওয়া ত সম্ভব নয়। প্রভাত গভীর স্বরে বললে।

ছাত্রের পিতা অবশ্য মুখে কিছু বললেন না—কিন্তু কক্ষান্তর
থেকে ওর কটু মন্তব্য শোনা গেল, আজকাল যেমন হয়েছে
ইকুল—ভেমানি হয়েছে মাষ্টার। সেক্ষেত্র ব্যবসা—ব্যবসা।

ইচ্ছে হ'ল এই মুহূর্তে কাজে ইন্তকা দিয়ে চলে আসে।
অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করলে প্রভাত। সন্মানবোধ উগ্র হলে
আর্থিক অনুরোধ ঘটবেই—এই বাস্তব সত্যকে মর্মে মর্মে
উপলব্ধি করছে ও।

দ্বিতীয় বাড়ীর ব্যবহার আরও বিচিত্র। এখানে ছাত্রটি
উচু ক্লাসের—কিন্তু মেধাবী নয়। বাপের পরমা আছে—
আছে কাজ-কারবার, বিভ্রাটিকা। শুধু দেশ-বিদেশের
বাণিজ্যকে সম্বন্ধ করবার জ্ঞান। একটু শিক্ষা না থাকলে
জগৎটাকে ভাল করে চিনে নেওয়া ও তার সঙ্গে ভাল
যেবে চলা কঠিন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞার সঙ্গে অর্থ উপার্জন
অঙ্গাদীভাবে জড়িত নয় বলেই—বিভবান ব্যবসায়ীর ছেলেটি
স্বাভাবতঃই বিদ্যাবিহীন।

প্রথম কয়েকদিন ছেলেটি পড়ায় মনোযোগ দিলে—অন্ততঃ
মনোযোগ দেবার ভান করালে। স্বকৃত্তকে বাঁধানো বই—
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাতা—হৃদয় দামী ফাউন্টেন পেন—
চমৎকার করে সাজানো ঘর—বিজ্ঞা গ্রহণের আবহাওয়াটা
ভাল বলেই বোধ হ'ল।

এক দিন ছেলেটি বললে, মাষ্টার মশায়—আজ আর
পড়তে ভাল লাগছে না—আজ একটু গল্প করি।

কিন্তু তোমার ক্লাস—

কাল ক্লাসে না গেলেও চলবে। আচ্ছা মাষ্টার মশায়,
এবার কোন টিমের কনসিনেশন ভাল বলুন তো ? ইষ্টবেঙ্গল
না, মোহনবাগান ?—

—আমি জানি না।

—জানেন না ? ছাত্র এ ভাবে বিশ্বয় প্রকাশ করলে—
যেন খেলার কথাটি না জানা একটি অমার্জনীয় অপরাধ।
ছেলেটি মন্তব্য করলে—স্পোর্টস শুধু শরীর গঠন করে না—
মনকে তৈরি করে। স্বস্থ দেহেই স্বস্থ মন—

প্রভাত বললে, আজ তা হলে পড়বে না ?

বললাম তো ভাল লাগছে না। ছেলেটি আবারের
ভঙ্গিতে বললে।

তা হলে উঠলাম।

প্রভাতকে উঠতে দেখে ছেলেটি বললে, চলুন না
কেন—এক জারগার ঘুরে আসি। একটা বই এসেছে—
চমৎকার—বোধের যত সেরা ঠার—মানে দুর্গা খোটে—
নার্গিস, দিলীপকুমার—অশোককুমার—দলিনী জয়ন্ত—

প্রভাত বললে, আমি যাচ্ছি। ও সোজা বেরিয়ে গেল।

পথে এসে তাবলে—এমন ছাত্রের তার নিয়ে হুঁম্বা হুড়িয়ে কি লাভ।

দিন কয়েক পরে অভিজ্ঞতা হ'ল আরও বিচিৎ। সেদিন মাঝ পথে একজন মফঃস্বলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে খানিকটা দেরী হয়ে যায়। মাষ্টার আসবে না—এই সম্ভাবনাতেই ছাত্রাবছারের ছেলেটি বোধ করি পুলকিত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে এ নিয়ে কিছু আলোচনাও চলেছিল।

প্রভাত গেটের ভিতরে পা দিতেই—ছেলেটির ছুটি ছোট বোনই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, ঐ রে—মাষ্টার এসেছে—দাদার মাষ্টার এসেছে। দাদা—দাদা—ওরা লাফাতে লাফাতে ভিতরে চুক গেল।

ওদের ভীত সঙ্ক আওয়াজ প্রভাতের চোখ কান নাকের ডগায় আঙন ধরিয়ে দিলে। কি বিজ্ঞী অতন্ন আওয়াজ! কি—চাকর রাধুনী বাবুন...এদের ডাকবার বেলায় এমনি অবজা-মিশ্রিত ধনি বার হতে শুনেছে প্রভাত। প্রভাতের গোত্র নিশ্চয় এদের চেয়ে উঁচু নয়। যেনেতু বিদ্যা শিক্ষার বিনিময়ে দক্ষিণা গ্রহণের ব্যবস্থাটা একই ধরনের। কিন্তু—উপায় নাই।

ছাত্র অপ্রসন্ন মুখেই এল। বললে, আপনাদের যেমন সময়ের দায় আছে—আমাদের ভেমনি আছে। ম'টার শোটি ঘাটি করতে চান তো? আর ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু।

অহুন্নয় নয়, আদেশ।

এটিও গা-সহা হয়ে আসত হয়ত—কিন্তু জীভাজগৎ ও ছবির রাজ্য বড় গোল বাধালে। আপ্যারাত, যুরগেন্স, সালে, মার্নার মত সুরাইয়া, হুমিডা, অশোককুমার চন্দ্রাবতীরা প্রভাতের অস্বাভাবিক অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করলে। শিক্ষার্থীর মুখে এদের প্রসঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠল।

মাসের শেষে প্রভাত বললে, কাল থেকে আমি আসব না।

কেন—কেন?

আপনার ছেলের জ্ঞান বহুদুখী—বিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু কম হলেও ক্ষতি হবে না।

তা হলে ও ম্যাট্রিকটা দেবে না? একটা ডিগ্রির তো দায় আছে।

কিছু না—পরীক্ষা উপার্জন করতে পারলেই ডিগ্রি নেওয়াটা সার্থক হয়।

ছাত্রের পিতা খুসী হয়ে প্রভাতকে মাইনে মিটিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় স্থানের অভিভাবক অল্প ধরনের। ইনি ব্যবসায়ী না হয়েও আদান-প্রদানের হিসাবটা নিখুঁত ভাবেই রাখতে

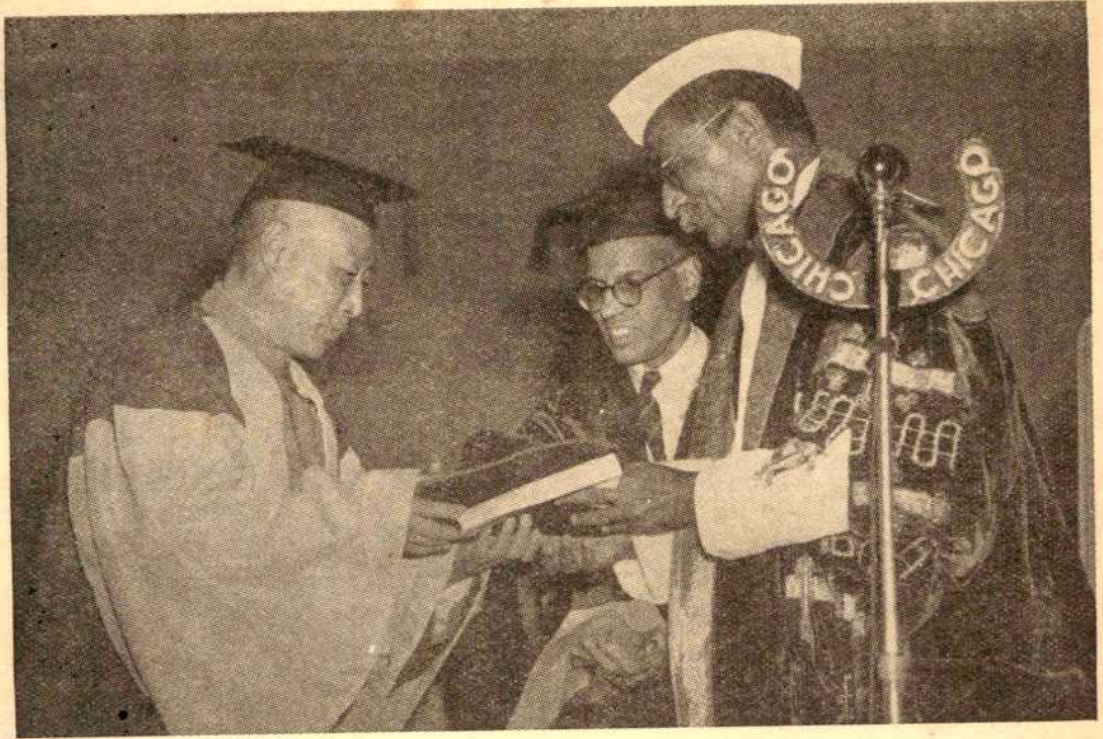
পারেন। বললেন—ছাড়ি বললেই হ'ল, একটি মাষ্টার জুটবে দাও তবে তো। তোমার কি বলে খালান—পড়াতে পারব না—আমি আপিস করব—সংসারের আনা-নেওয়া করব—মা মাষ্টার খুঁজব? একটু থেমে বললেন, তার পর তোমার মাইনের হিসেব—সেও এক অল্প কষার ব্যাপার। ঘণ্টা মিনিটের হিসাব—বাদ দিয়েছ চারটে রবিবার—তার সঙ্গে ছুটি কালতু ছুটি—হু'দিন আরঘণ্টা পড়িয়েই চলে গেছে—এক দিন তোমার ছাত্রের বুকি পেটব্যথা করছিল—সে আসেই নি—। কিন্তু হিসেবে আমার পোসমাল হবে না—সব টোকা আছে ক্যালেন্ডারের পাশায়।

প্রায় পাঁচটি টাকা কম নিয়েই—প্রভাত নিঃশ্বাস ফেলে বৈচেছিল। এ দেশে শিক্ষকের কাজও যে সম্মানের কাজ নয় এই অভিজ্ঞতা তার প্রথম হ'ল।

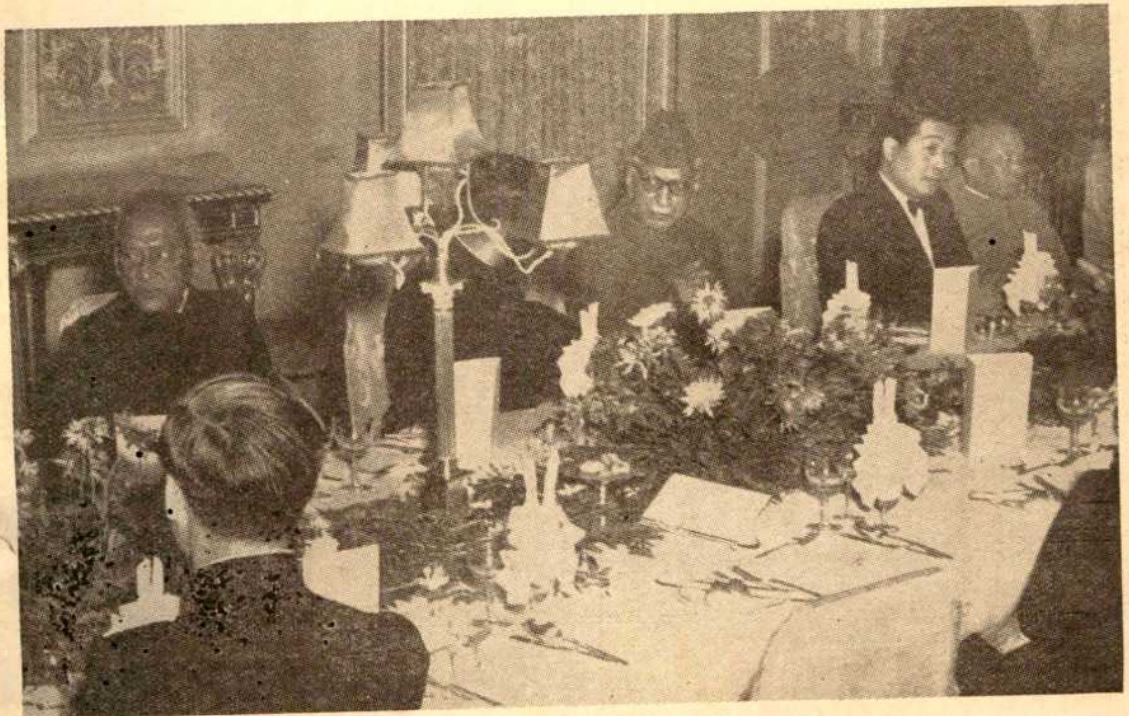
অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদেরও সে আবিষ্কার করলে। সে যে ভদ্র ঘরের ছেলে, যে-কোন কাজ ইচ্ছে করলেই যে নিতে পারে না—তার মান-সম্মানের একটা নিরিখ আছে—যার এদিক-ওদিক হলে—সামাজিক বিপর্যয় (মানসিকও নয় কি?) ঘটতে পারে—এটি সে স্বীকার করলে। এই সম্মান-বোধ এল কোথা থেকে? বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে—না আজন্ম-পোষিত কতকগুলি আচার প্রথাকে মাহুষের চেয়েও উঁচুতে বসিয়ে? তার উপরের মাহুষরা শুধু শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নয়—পোশাকে—চালচলনে—প্রথা পালনে—শিষ্টাচার রক্ষায় এমন একটি জৈবশিক নিয়মে সমাজবিধি গড়ে তুলেছেন—যার ব্যতিক্রম নিজেকে গীড়িত করে তুলবেই। নীচের দিকে যারা রয়েছে তাদের গোত্র ওর গোত্রে মিলবে না। মিলতে চায়ও না সে ওখানে। মুটে মজুর কি চাকর—দারোয়ান—রাধুনী বাবুন—এদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে কি সে? তার শিক্ষা মাথা তুলে বলে—না, না—এ হয় না। আমরা যত দরিদ্রই হই—শুধু খাওয়া-পরা আমোদ আশ্রাদ নিয়ে জীবনকে তুলিয়ে রাখতে পারি না। হয় তো আমরা যা পাই না—তা পাবার জন্য ব্যর্থ অহুঙ্করণ করি—কিন্তু না পেয়ে চোখ বুজে কাদার মুখ শুঁজে স্ত্রী হয়েছি বলে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারি না। নীচের এই স্তর—এ কাদা ছাড়া আর কি।

এই আত্মসম্মান নিয়ে বসে থাকলে সংসার তার দাবি ছাড়বে কেন? নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা—তাই বা কি করে হবে। প্রভাত চেষ্টা করতে লাগল কোন একটা বেগমকারী প্রতিষ্ঠানে অবসর মত আংশিক ভাবে কোন কাজ যদি মেলে। অবস্থা এখনও ওর পক্ষে অবসর বলে কিছু নাই। এখনও আত্মকোত্তর শ্রেণীর পাঠ আরম্ভ হয় নি। তার জন্তও অর্থের প্রয়োজন। পড়ার সময়টি বাদ রেখে যদি কোথাও কিছু জোপাড় করতে পারে—

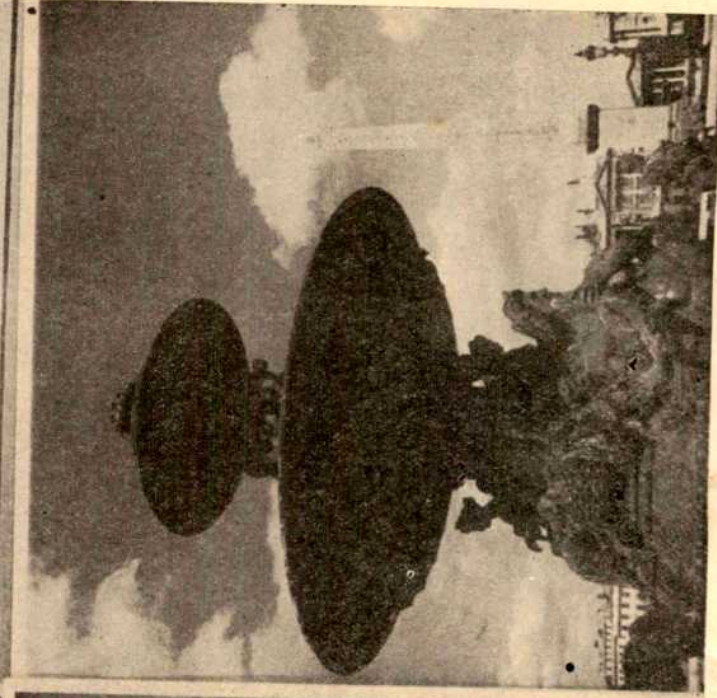
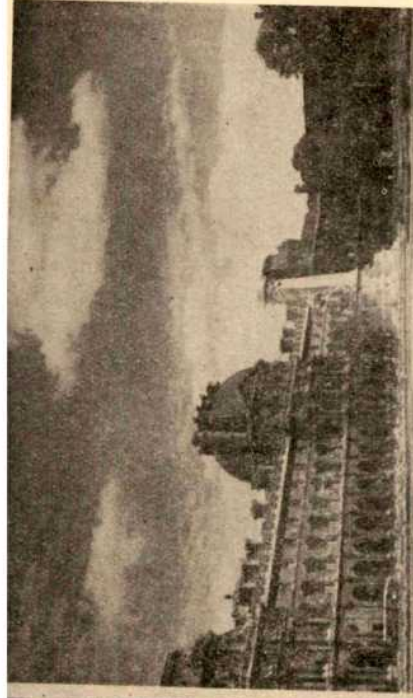
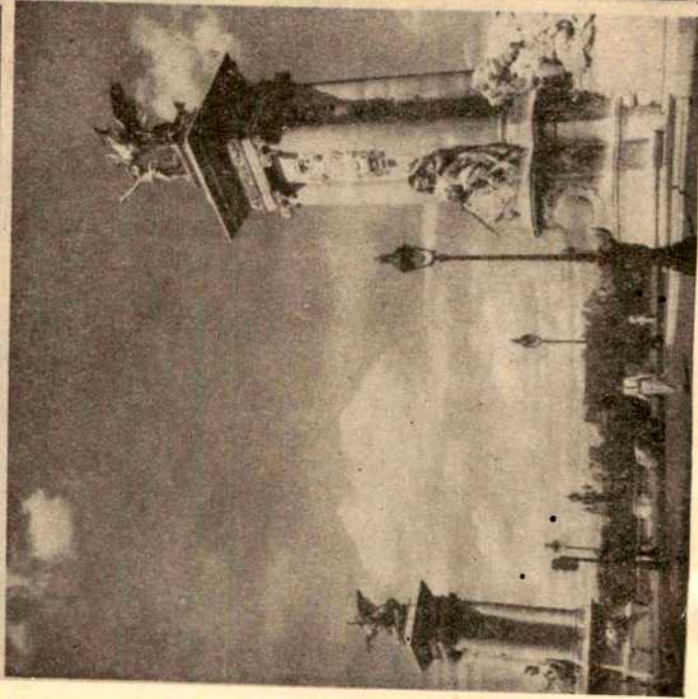
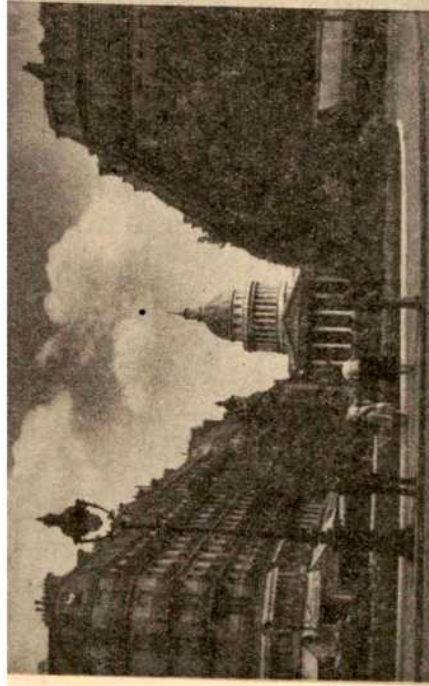
চীনা সাংস্কৃতিক মিশন



দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক চীনা সাংস্কৃতিক মিশনের নেতা ভিং সি-লিনকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান



নিউ দিল্লীতে হায়দরাবাদ ভবনে চীনা সাংস্কৃতিক মিশনের প্রতিনিধিগণের সম্মেলন ও প্রীতিভোজ



উপর হাইলি নীচে : বাম দিকে— ১। প্যাছিরন, ২। একটি রাজপথের দৃশ্য ;

দক্ষিণে—৩। ভূভার মিউজিয়াম, ৪। প্লাস ভিলা কুর্ভ

শেলির "Music when soft voices die" কবিতার ভাবানুবাদ

নানক দেবী

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

মহাত্মা গান্ধীর সর্বমস্তী সভ্যাগ্রহ আশ্রমে অবস্থানকালে বাপুজী এক দিন আমাকে বলিলেন কাণ্ডিওয়াদের নাম। স্থানে যে সব নানা প্রকার গঠনমূলক কাজ চলিয়াছে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিবার জন্ম এবং তাহার বাস্তব রূপের সহিত পরিচিত হওয়ার জন্ম। আশ্রমের সেক্রেটারী হর্গনভাই আমার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, আমাকে সমস্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং আমার পরিচয় জানাইয়া নামা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নিকট চিঠি লিখিয়া দিলেন। সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল। এক দিন সর্বমস্তী রেল ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইলাম কাণ্ডিওয়াদের দিকে অর্থাৎ উত্তর গুজরাটের দিকে।

প্রথমে গেলাম কাণ্ডিওয়াদের অন্তর্গত ওয়ার্কিন রাজ্যের রাজধানী ওয়ার্কিন শহরের বাহিরে, কিন্তু অনতিদূরে পল্লী-অঞ্চলে অবস্থিত এক হরিজন আশ্রমে। ভগিভাই এই আশ্রমটির প্রধান কর্মকর্তা। ষ্টেশন হইতে সোজা আশ্রমে চলিয়া গেলাম। ভগিভাই তখন আশ্রমে ছিলেন। হর্গনভাই ভগিভাইর নামে আমার যে পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন তাহা ভগিভাইর হাতে দিলাম। তিনি চিঠি পড়িয়া আমার পরিচয় পাইলেন এবং আমাকে সম্বাদন করিয়া আশ্রমের ভিতর লইয়া গেলেন।

এই হরিজন আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি গঠনমূলক কাজ চলিতেছিল। এই সব কাজের মধ্যে প্রধান কাজই ছিল হরিজনদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা এবং তাহাদের ভিতরকার জড়তা দূর করিয়া নূতন প্রেরণার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তোলা। আশ্রমে গেলাম, সেখানে কয়েকজন হরিজন আশ্রমবাসীকে দেখিলাম। আশ্রমের ভিতর দিয়া তাহারা মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে যে অমূল্য প্রেরণা লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহারা আর হরিজন নাই। মানুষ হিসাবে মানুষের মাঝে তাহারা তাহাদের স্থান বুঝিয়া লইয়াছে।—এই কেন্দ্রের সাহায্যে আরও কয়েকটি গঠনমূলক কাজ করা হয়; তাহা হইল—বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা, হরিজন বালক-বালিকাদের জন্ম রাজির পাঠশালা পরিচালনা, বাস্তব কর্ম ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া ছুস্মার্গ পরিহার এবং আশেপাশের গ্রামগুলির ভিতরে গ্রাম-উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

সকালবেলা রেলগাড়ী হইতে নামিয়াই এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম। আশ্রমের হরিজন বন্ধুগণই রাত্রাবারা করিয়া থাকে, সেদিনও তাহারা ই করিল। তাহাদের সহিত মেলা-মেশা আলাপ-আলোচনা করিলাম এবং তাহাদের সহিত

একসঙ্গে বসিয়া আহারও করা গেল। সারাদিন আশ্রমেই কাটিল। এই আশ্রমটির সুরুচিসম্পন্ন ব্যবস্থা দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। ছপুর বেলা প্রথম রৌদ্রের তাপে অর্ধ মরুভূমির মত এই অঞ্চল তাতিয়া উঠিল। অসহ্য সে গরম। আশ্রমের মাঝখানে বরটিতে বিশ্রাম করিবার অভিজাত্যে বিশ্রাম পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। একজন হরিজন বালক পাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তার এই সেবা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও কোন ফল পাইলাম না। এত গরম সহ্য করিতে আমি অনন্ত; তাই ভগিভাই বলিলেন যে, যদি আমি এই বালকটির সেবা গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। ভগিভাইয়ের কথার প্রতিবাদ করিলাম না। বালকটি বাতাস করিতে লাগিল। আমি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ দিকে বালকটি বাতাস করিতে করিতে মধুর স্বরে ছড়ার গানের মত কি যেন গাহিতে লাগিল। বড় মধুর লাগিল তার ছড়ার গান। ভিজাসা করিলাম, সে কি গাহিতেছে? সে জবাব দিল, “নানক দেবী”র গান।

গুজরাট ভাষায় সে গান গাহিয়া গেল। গুজরাটি বলিতে পারি না; কিন্তু কিছু কিছু বুঝি। বুঝিলেও কবিতার মন্দ বোকা সহজ নয়; তবু যত দূর সম্ভব বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ঘুমের ঘোরে জানহারা হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শুনা হইল না। বিকালবেলা ঘুম-হইতে উঠিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে গেলাম। সেখানে গিয়াও রাখাল বালকদের মুখে শুনিতে পাইলাম নানক দেবীর গান। ভগিভাই সঙ্গে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, কাণ্ডিওয়াদের যেখানেই যাই না কেন, বিশেষ করিয়া ওয়ার্কিন রাজ্যের সর্বত্রই বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মুখেই এই নানক দেবীর গান শুনিতে পাইব। পরে কাণ্ডিওয়াদের বহু স্থানে গিয়াছি, সর্বত্রই দেখিয়াছি নানক দেবীর গান আকাশবাতাস সুবিস্তৃত করিয়া ভুলিয়াছে। যেমন পূর্ব রাজপুতানা ও মধ্যভারতের সর্বত্র ঝাঁসির রাণীর যশোগাথা শুনিতে পাওয়া যায় তেমনি কাণ্ডিওয়াদে শুনা যায় নানক দেবীর যশোগাথা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁসির রাণী দেশকে স্বাধীন করার জন্ম যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে দেশের জন্ম, দেশের জন্ম, তারতের স্বাধীনতার জন্ম আত্মবিসর্জন দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বীর রমণী এবং স্বাধীনতার উপাসিকা হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছেন। তাই রাজপুতানার মরুস্থল ও

মধ্য ভারতের বনজঙ্গল ও প্রান্তর কাঁপাইয়া রোল
উঠে :

“চমক উঠি সন সঁতরন মে বহ তলোয়ার পুরাণী ধী ;

বুলেলে হর বোলোকে মুহ হমনে শুনি কহানী ধী,

খুব লজী বর্দানী বহ ভো ঝাঁসিওয়ালী রাণী ধী।” ইত্যাদি

ঠিক এমনি ভাবেই নানক দেবীর দীপ্ত সত্যত্বের গৌরব-
গাঁথায় কাণ্ডিওয়ালের আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠে।

কাণ্ডিওয়ালের এক ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজার রাণী হইলেন
নানক দেবী। রাণী নানক দেবী ছিলেন রূপবতী, আর
সাধারণ লোকের নিকট তিনি ছিলেন এক রহস্যময়ী অঙ্গুরী।
গুণের দিক হইতেও তিনি এক মহান্ চরিত্রবলে বিনবতী
ছিলেন ; আর এই চরিত্রই তাঁহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়া-
ছিল। এই চরিত্রবলের জটাই তিনি সকল জ্ঞেয় লোকের
প্রাচ্য আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আর রূপ, গুণ ও চরিত্রের
মাধুর্যে তিনি নারী হইয়াও সকলের নিকট দেবী হইয়া
উঠিয়াছিলেন। মাধবীর সুবাসের মত তাঁর গুণ-সরিমা ও রূপ-
লাবণ্যের কথা সারা গুজরাটের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

গুজরাটের মুসলমান নবাব। সারা গুজরাটের মালিক
তিনি। গুজরাটের ছোট বড় হিন্দু রাজ্যগুলি তাঁর অধীনতা
স্বীকার করিয়া লইয়াছে। যে সব রাজ্য এখনও স্বাধীন
রহিয়াছে, তাহারা স্বাধীন থাকিলেও প্রবল পরাক্রান্ত নবাবের
বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিবার বা করিবার সাহস পায় না।
নবাবের প্রতাপ ও পরাক্রম অপরিমিত। গুজরাটের এই
পরাক্রান্ত নবাবের রাজ্যের নিকটেই নানক দেবীর স্বামীর
রাজ্য। রাজ্য ছোট হইলেও তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই
চলিয়াছেন। এই রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজা কোন দিন কোন
ব্যাকান্ত ঘটান নাই বলিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির প্রতি নবাবের
দৃষ্টি পড়ে নাই।

রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছায় না হইলেও এক দিন নবাবের নজর
পড়িল এই ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্যটির উপর। রাজ্যের রাণী
নানক দেবীর রূপলাবণ্যের জনপ্রতি নবাবকে প্রমত্ত
করিয়া তুলিল। রাণীর অসাধারণ চরিত্রবলের কথা শুনিয়া
নবাব হাসিয়া উঠিলেন। নারীর আবার চরিত্রবল কি ?
শক্তিশালী পুরুষের নিকট সে নিশ্চয়ই মাথা নত করিবে,
ইতিহাস তার বড় সাফী। স্পর্ধায় নবাবের বুক ফুলিয়া উঠিল।
নবাব স্থির করিলেন, এই রূপবতী নারীকে তিনি তাঁহার বেগম
করিবেন, তাঁহার শক্তিমত্তার কাছে চুরমার হইয়া যাইবে রাণীর
চরিত্রবল ও গর্ব, আর সারা গুজরাটের নরনারীকে দেখাইয়া
দিবেন যে কেমন করিয়া সবাই শক্তির কাছে মাথা নত
করে, কেমন করিয়া অপরূপ সুলভ নারী বিলাইয়া দেয় তার
রূপ, যৌবন, মান, গর্ব এবং গর্বের বন সত্যিই এক শক্তিশালী

পুরুষের কাছে—নানক দেবী তো সাধারণ একজন কাকের
রাজার রাণী বই অল্প কেহ নয়।

নবাবের মনে দীর্ঘা পূর্ণমাত্রায় জাগিল। সারা গুজরাট
ব্যাপী যে নারীর এত রূপ, এত লাবণ্য, এত গুণ এবং এত
মহিমা, সে অস্ত্রের অক্ষশাখিনী হইতে পারে না—সে হইবে
তাঁহারই। তার পর নানক দেবী অল্প দেশের রাণী হওয়া
সত্ত্বেও তাঁর রূপগুণের পরিমা তাঁহার রাজ্যের প্রকার যুগে
যুগে, ইহা তাঁহার অসম্ব হইয়া উঠিল। দেশের শ্রেষ্ঠ নারী যদি
তাঁর বেগম না হইল তাহা হইলে তাঁহার নবাবত্বের মূল্য কি ?
নবাব নানক দেবীকে পাইবার আশায় প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন।
নানক দেবীকে তাঁর দরবারে পাঠাইবার জন্ত নানক দেবীর
স্বামীর কাছে দূত পাঠাইলেন।

রাজা দরবারে বসিয়াছিলেন ; এমন সময় নবাবের দূত
আসিয়া তার আগমন বার্তা ও সৌজন্ত জানাইল। দূতযুগে
বার্তা শুনিয়া সভা নিভর হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সভা-
সদস্যদের চোখে যুগে একটা বিকলীর ঝলক খেলিয়া গেল।
রাজা কোন প্রকার অসৌজন্ত প্রকাশ না করিয়া বীর স্থির ও
গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন যে, নবাব যেমন বায়ন হইয়া চাঁদ
ধরিবার আশা না করেন। দূত সেলাম জানাইয়া সভাকক্ষ
হইতে বাহির হইয়া গেল।

দূত সময়মত রাজার নিকট হইতে জবাব লইয়া নবাবের
কাছে আসিল। নবাবকে সেলাম জানাইয়া দূত রাজার উত্তর
ব্যক্ত করিল। উত্তর শুনিয়া নবাব ছলিয়া উঠিলেন, যেমন
করিয়া যুগান্তের আগুন জ্বলিয়া উঠে। সামান্য একজন
রাজা তিনি তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন—ইহা তাঁহার সহ্যের
অতীত। নবাবের হুকুমে রাজধানীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া
গেল। সহজে যাহা সম্ভব হয় নাই তাহা তিনি শক্তিপ্রয়োগে
করিবেন। নবাব নিজে তাঁহার সৈন্তসামন্ত লইয়া নানক
দেবীকে বৃত্ত করিয়া লইয়া আসিতে চলিলেন। কেবল নানক
দেবীকে বেগম করিয়াই তিনি কান্স হইবেন না ; এই ক্ষুদ্র হিন্দু
রাজ্যটিও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন।

নানক দেবীর স্বামী রাজা হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও, তিনি
ছিলেন ক্ষত্রিয়। দূতের নিকট নবাবকে যে জবাব তিনি
পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম তিনি ভাল করিয়াই
জানিতেন। যখনই তিনি এই কথা চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার
দেহের কাছের জটগবগ করিয়া উঠে। সকল প্রকার বিপদের
সম্মুখীন হওয়ার জন্ত তিনি প্রস্তুত হইলেন। ধবর পাইলেন
তাঁর রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত নবাব সৈন্ত লইয়া
আসিতেছেন। রাজা নিজে তাঁহার সৈন্য লইয়া অর্ধপথে
নবাবের গতিরোধ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজার
সৈন্য নবাব-সৈন্যের তুলনায় সংখ্যায় অতি অল্প। তাহাতে
ক্ষত্রিয় রাজা ভীত হইলেন না। অসির কনাংকারে আকাশ-

বাতাস কাঁপাইয়া তিনি তাঁর ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ লইয়া নবাব-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। মস্তকুশির প্রান্তর রক্তের স্রোতে বহিয়া গেল। যুদ্ধের শেষ পরিণাম রাজার জানাই ছিল; কিন্তু ক্ষাত্ররক্ত তাহাতে ভীত হয় নাই। ক্ষত্রিয়বীরের তরবারি সকালনের কোণে বহু নবাব-সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সে যুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীর-গণ জী, পুত্র, পরিবারের কথা ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া গেল নিজের জীবনের মাহাত্ম্য। তাহারাই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিল, হাজার হাজার নবাব-সৈন্যকে বশীভূত করিল, নিজেদের শমন করিল অনন্তকালের জন্য।

রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করিলেন। এ যুদ্ধ রাজ্য রক্ষা করার জন্য নয়, এ যুদ্ধ কেবল স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য নয়, এ যুদ্ধ পররাজ্য হরণ করার জন্যও নয়—এ যুদ্ধ ছিল হিন্দুর এক শাখাত মহিমাময় আদর্শের সম্মান রক্ষার জন্য। রাজা তাঁর দেহরক্ষী সৈন্তগণের সহযোগে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে বহু নবাব-সৈন্ত হতাহত করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে সংখ্যায় বহু গুণ নবাব-সৈন্তের বাহু ভেদ করিয়া রাজা যখন নবাবের সম্মুখে নবাবকে পর-নারীহরণের নির্মম শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন অত্যন্ত এক নবাব-সৈন্তের ভালার আঘাতে রাজা তাঁহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। নবাবের আদেশে রাজা নবাব-সৈন্তের হাতে বন্দী হইলেন। রাজার অবশিষ্ট সৈন্ত আহত রাজাকে উদ্ধার করার জন্য শেষ চেষ্টা করিল, অসীম বিক্রমে নবাব-সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য এবং তাহাদের মহীয়সী রাণী নানক দেবীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিল।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানী ছিল অনেক দূর। রাজার পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছানোর বহু পূর্বেই নবাবের অদ্বারোহী সৈন্য জন্তবেগে গিয়া পুরী আক্রমণ করিল। পুরী রক্ষার জন্য যে সামান্য ক্ষত্রিয় ঘোড়া ছিল, তাহারাই অমিতবিক্রমে পুরীর প্রবেশদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিল না। যুদ্ধের মধ্যে পুরীর প্রবেশদ্বার ভঙ্গ করিয়া নবাব-সৈন্য পুরীতে প্রবেশ করিল। যাহারা পুরী রক্ষার জন্য ছিল, তাহারাও যুদ্ধ করিল, নবাব-সৈন্যদিগকে মারিল এবং নিজেরা মরিল। রাজার বালক পুত্রদ্বয় স্থির থাকিতে পারিল না, যুদ্ধ তলোয়ার হস্তে পুরী-রক্ষকদের সহায়তায় অগণিত নবাব-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু কতক্ষণ! নবাব-সৈন্যের নিকট তাহার আহত অবস্থার বন্দী হইল।

রাণী নানক দেবীও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহিত বন্দী হইলেন। নানক দেবীর বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া নবাব গর্বে উত্তম হইয়া উঠিলেন এবং দাস্তিকতার হাসি হাসিলেন। আজ তিনি

হুনিরাকে দেখাইয়া দিবেন যে, সত্যিই তেজে গর্ভিতা নারী কেমন করিয়া সবলের কাছে তার দেহ, মন ও সত্যিই অহংকার লুটাইয়া দেয়।

যেখানে বসিয়া রাজা তাঁর দরবার করিতেন, সেই দরবার-ক্ষেত্রে নবাবের সম্মুখে বন্দী নানক দেবীকে ও তাঁহার আহত বন্দী পুত্রদ্বয়কে আনা হইল। নবাব দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে এক অপূর্ণ নারী দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি ত রূপবতী নারী নন, নারীরূপে জলন্ত মোহশলাকা। নবাব সে রূপের দিকে ভাকাইতে পারিলেন না। সূর্যের আলোক দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া চোখে আসিয়া পড়িলে চোখ যেমন ঝলসিয়া যায় তেমনই সে রূপের তেজে নবাবের চোখও ঝলসিয়া গেল। আপনা-আপনি নবাবের মাথা নত হইয়া আসিল। যুদ্ধের মধ্যে নবাবের দাস্তিকতা রাণীর রূপের জ্যোতির কাছে ম্লান হইয়া পড়িল। নবাব এক স্বর্গীয় নীতির কাছে হার মানিলেন।

কিন্তু কতক্ষণ! আবার নবাবের মনে জাগিয়া উঠিল রূপের মোহ ও ভোগের স্পৃহা। নবাব শান্ত স্বরে নানক দেবীকে তাঁর বেগম হওয়ার জন্য অত্যাচার জানাইলেন। নবাবের কথা শুনিয়া নানক দেবীর আহত ও বন্দী পুত্রদ্বয় তাহাদের মন্তক নত করিল। পুত্রের সম্মুখে মাতার অপমানে বন্দী পুত্রদ্বয়ের মনে বিষম অন্তর্জ্বালা জাগিয়া উঠিল। আজ রাজপুত্র বালক বন্দী; তাই মাথা নত করিয়া সহ্য করিল নিজের মায়ের অপমান। কিন্তু দুপায়, অপমানে ও ক্রোধে বন্দী নানক দেবী সিংহীর মত গর্জিয়া উঠিলেন এবং বিজলী চমকের মত হঠাৎ অগ্রসর হইয়া নরায়ণ নবাবকে পদাঘাত করিলেন।

ক্রোধে, অপমানে, লজ্জার ও পরাজয়ের জ্বালায় নবাব উত্তম হইয়া উঠিলেন। কষ্টে, কঠে নবাব নানক দেবীকে বলিলেন যে, হয় তিনি বেচ্ছার তাঁর বেগম হইবেন, না হয় তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে হত্যা করা হইবে। হয় বেগমত্ব স্বীকার, না হয় তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মন্তকদান ইহার একটা রাণীকে বাছিয়া লইতে হইবে। আহত সিংহীর মত গর্জিয়া উঠিলেন নানক দেবী এবং অট্টহাস্য হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানক দেবীর পুত্রদ্বয়ও হাসিয়া উঠিল। অশ্রুধারা ভূতপ্রেরিত অট্টহাসি এবং সারা দরবার-গৃহে খেলিয়া গেল বিভীষিকার এক তড়িৎ-প্রবাহ। এই দৃশ্য নবাবের অসহ্য হইয়া উঠিল। রাণীর পুত্রদ্বয়কে হত্যা করার জন্য আদেশ করিলেন। আদেশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দুই জন পাঠানের দুইখানি শাণিত অসি কোষযুক্ত হইল; সঙ্গে সঙ্গে দুইখানি যুদ্ধ অসির ফলক বিজলী খেলিয়া বাওয়ার মত শব্দে উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধের মধ্যে নামিয়া আসিল আহত, বন্দী রাজপুত্রদ্বয়ের কাছে; আর দুইটি ছিন্ন মন্তক ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

রাগী চক্ষু বুজিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন বালক-ঘরের দেহ হইতে কিম্বকি দিয়া উঠা রক্তের স্রোত। কপিকের জন্তও রাগী একটু ছুৎ করিলেন না। নিজের সতীত্বের বিনিময়ে মর্যাদা নবাবের কাছে পুত্রঘরের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন না। হুই চোখ দিয়া তিনি হুই কৌটা চোখের জলও ফেলিলেন না। অচল অটল অবস্থায় বিস্ময়িত নয়নে পুত্রঘরের হত্যা দেখিলেন; চাহিয়া দেখিলেন শূন্য লুটানো পুত্রঘরের ছিন্ন মস্তক। তারপর শীর স্থির ভাবে লুটাইয়া পড়িয়া পুত্রঘরের ভণ্ড রুধির তাঁহার সারা অঙ্গে মাখিলেন।

রুধির-রঞ্জিত রাগীর মুক্তি দেখিয়া নবাব ভীত হইলেন। তখন নবাব দেখিলেন রাগীর মধ্যে সতীত্বের ভেঙ্গে দীপ্ত এক মহাদীপসী নারী; আরও দেখিলেন তিনি নারীত্বের গর্বে গর্বিত ছিলেন্দ্র লৌহধর্মের ছায় ছোয়াতির্ধর এক হিন্দু নারী। অবিকল্প সে ছোয়াতির্ধর মুক্তি নবাব দেখিতে পারিলেন না; রাগীকে পাকীতে জুলিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য হুকুম করিলেন। নবাবের ছকুরের সঙ্গে সঙ্গে পাকী-বাহকগণ পাকী লইয়া উপস্থিত হইল।

পাকীবাহকগণ রাগীকে পাকীতে জুলিয়া লইয়া নবাবের রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিল। পাকীবাহকগণ ক্রমবশেষে চলিতে লাগিল; ভিতরে রাগী বসিয়া আছেন, কোন সাড়া শব্দ নাই। পাকী লইয়া বাহকগণ অনেক দূরে এক প্রান্তরে চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ রাগী পাকীর ভিতর হইতে অটহাস্ত হাসিলেন—সে যেন মহা আশ্রমের শিবাকলরব। পাকী-বাহকগণ সে স্বর শুনিয়া ভীত হইল। মুহূর্তের মধ্যে পাকীর ভিতর একটা ভীষণ পর্জন আরম্ভ হইল; সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ আহত সিংহীর গর্জন। পাকী-বাহকগণ পাকী নামাইয়া পিছনে পড়া নবাব-সৈন্যের ও নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভিতরের পর্জন তীব্র হইতে ভীতভর হইল, পদাঘাতে রাগী পাকীর দরজা ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া বাহির হইয়া রাগী উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। বাহকগণ কিং-কর্ভব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রাগীর অপকৃপ মুক্তি দেখিতে লাগিল; সে মুক্তি নারীমুক্তি নয়, সে মুক্তি দানবদলনী মুক্তি। তাহার রাগীকে বাধা দিল না, ধরিবার চেষ্টা করিল না—তাহার তাহাদের কর্তব্যের কথা জুলিয়া গেল। রাগী উর্দ্ধ-বাসে ছুটিতে লাগিলেন—কোন দিকে, কোথায় তাহা তিনি জানেন না। অনহীন প্রান্তরে তিনি কেবল ছুটিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রান্তরের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের পাশ দিয়া, কটকিত বনের ভিতর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার পদযুগল কল্পরে, পাথরে ও কটকে কতবিকৃত হইল; তথাপি তাঁহার ছুটিবার বিরাম নাই। এইভাবে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। অবসাদে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু

অবসাদ কর্তব্য জুলাইতে পারিল না। মার্ট, প্রান্তর ও জঙ্গল হইতে শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করিলেন এবং চিতা সাজাইলেন। চিতা সাজাইলেন; কিন্তু আগুন নাই। কোথায় আগুন পাইবেন! এই প্রান্তরে কে দিবে আজ তাঁহাকে একটু আগুন তাঁহার নারীত্ব ও সতীত্বের সম্মান রক্ষার জন্য! কোথাও কোন আগু যখন মিলিল না, তখন তিনি বুজিয়া বাহির করিলেন একটুকরা পাথর। দ্বিতীয় পাথরের টুকরা তিনি বুজিয়া পাইলেন না। নিজের পায়ের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সেই পাথরের টুকরায় ঘষিয়া আগুন জ্বলাইলেন এবং চিতার শুষ্ক কাঠে লাগাইলেন। দাউ দাউ করিয়া চিতা জলিয়া উঠিল।

এদিকে রাগীর পলায়ন দেখিয়া বাহকগণ কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ভব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর যখন তাহাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন তাহারা রাগীর পলায়ন-সংবাদ ঘোষণা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া নবাব-সৈন্য সেখানে আসিল, এবং নবাব নিজেও সেখানে আসিলেন। নবাব বাহকদের কথা শুনিয়া সব বুঝিলেন, এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করিয়া রাগীকে ধরিবার জন্য নবাব তাঁহার অঝারোহী সৈন্য চারিদিকে পাঠাইলেন এবং তিনি নিজেও কয়েকজন অঝারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অঝারোহণে ছুটিয়া গেলেন। বন, জঙ্গল, মার্ট, পাহাড় প্রভৃতি সকলে বুজিল। নবাব নিজেও বুজিলেন। কিন্তু রাগীর কোন সন্ধান মিলিল না।

এই ভাবে বুজিতে বুজিতে সকলে যখন নিরাশ হইয়া পড়িল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। সারা বিধে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। নবাব এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া দূরে দেখিলেন এক বিরাট অগ্নিশিখা। মনে করিলেন কোন চিতা জলিতেছে। সেখানে গেলে হয়ত রাগীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তাই সেই দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন।

নবাব সেই চিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন সেই প্রজ্জ্বলিত চিতার এক পাশে কয়ডোটে দাঁড়াইয়া আছে কয়েকজন পাহাড়ী; যেন তাহারা কোন দেবীর উপাসনা করিতেছে। আর দেখিলেন জ্বলন্ত চিতার উপর চক্ষু বুজিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছেন এক অপকৃপ নারী। চিতার চারিদিকের আগুন লোল জিহ্বা বাহির করিয়া সেই রক্তবসনা নারীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। নবাব এই নারীকে চিনিলেন। এই নারীই রাগী নানক দেবী। নবাব ভস্মিত হইলেন। তাঁহাকে বাঁচাইতে কোন চেষ্টাই করিলেন না। পরাজয় ও অপমানের আশ্রয় তাঁহার অন্তর গ্রাসিতে তরিতা উঠিল। কিন্তু হিন্দু নারীর তেজ, নারীত্ব বোধ, সতীত্বের আদর্শের মহিমা এবং ঘৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া নবাবের মন প্রাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তরিতা

উঠিল। নবাব চিত্তার উপবিষ্ট নারীর প্রতি চাহিয়া মাথা নত করিলেন।

যেখানে নানক দেবী চিত্তারোহণ করিয়াছিলেন সে স্থানের উপর একটি শ্রুতিমন্দির আছে। এই স্থান ওয়ার্ডেন শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। সে এক তীর্থক্ষেত্র। পরদিন ভগি-
ভাইকে সঙ্গে লইয়া এই শ্রুতিমন্দিরটি দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, বহু নারী পূজোপচার লইয়া আসিয়াছে, মানভ

করিভেছে, শ্রুতিমন্দিরে সিন্দুর মাখাইতেছে, ধূপ ধুনা আরতি করিতেছে আর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া প্রাণের নিবেদন জানাইতেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আদর্শ চরিত্র নানক দেবীর কথা ভাবিয়া প্রাণ মন তাঁহার প্রতি ভক্তি-
শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। ভারপর মাথা আপনি নত হইয়া আসিল। শ্রুতিমন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই অশরীরী নারী রাণী নানক দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হাতকোড় করিলাম।

রূপের কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চেনে না জানে না যে জন তাঁহাকে
সেও জানে নিরাকার।
পরিচয়ে আর আছে কিবা দরকার ?
ধ্যানী, অনুরাগী, রসিক তাঁহারে জানে,
তঁারি প্রীতিকামী, ফিরে তাঁর সন্ধানে,
সত্যদৃষ্টি তাহাদেরি বাণী
শুনিবার শোনাবার।

২

তন্ময় হয় যে রূপে তাদের
সিদ্ধ শিল্পীমন,
সেই রূপ তাঁতে করে যে নিরীক্ষণ।
কখনো বা তিনি বরাহ, কন্ঠ, মীন,
কুরূপের মাঝে মহারূপ সমাসীন,
ভক্ত মধুপ সব ফুলে করে
মধু যে আকর্ষণ।

৩

কখনো দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ বা
কখনো পঞ্চমুখ,
পদারবিন্দ পূজিয়া কাহারো স্মৃথ।
কেহ তাঁরে দেখে রক্ত ভয়ঙ্কর,
কেহ মনোহর চির-শ্যামসুন্দর,
বহুবল্লভ অনন্ত রূপ
যাতে যার ভরে বুক।

৪

কোনটি তাঁহার খাটি রূপ বটে
কোনটি তাঁহার নয় ?
ভক্তই তাহা করে দেয় নির্ণয়।

যখন যে রূপে দেখেছে সত্য তাই,
অসত্যের যে প্রবেশ সেখানে নাই,
ধ্যানের সে রূপ-পরিমণ্ডলে
সব অমৃতময়।

৫

রূপ নাই তাঁর অন্ধও বলে,
দেখে সে অন্ধকার।
রূপ দেখে সেই বিপুল ভাগ্য যার।
যে রূপের লাগি তৃষিত নয়ন বুঝে,
যে রূপ দেখিলে বচন নাহিক ক্ষুণ্ণে।
সঙ্গ বাহার, সাধনার ধন—
কুচ্ছ তপস্তার।

৬

সেই তাঁরে চেনে, সেই দেয় নাম
ডাকে 'জয় জগদীশ'।
যোগ যার তাঁর সঙ্গে অহনিশ।
পটে ও পাষাণে যে রসমুষ্টি আঁকে—
সত্য সে রূপ, ভক্ত দেখেছে তাঁকে।
রূপের পরিধি খুঁজিছে বাহার
নয়ন নির্নিমিষ।

৭

সে রাগের পথে এক সাথে হয়
রূপ ও কথার শেষ,
বংশীই তাঁর করে পথ নির্দেশ।
সকল চিন্তা চিন্তামণিরে যাচে,
সব দর্শন ফুরায় তাঁহার কাছে,
সব রস এক রসিকে:যেরিয়া
রচে রূপ-পরিবেশ।

কিন্নর জাতি

শ্রীধর্মদেব শাস্ত্রী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

গ—শিক্ষা, পার্করণ, অভাব-অভিযোগ

শিক্ষা ও চিকিৎসা। স্বথের বিষয়, সম্পত্তি শিক্ষার দিকে কিন্নরদের আগ্রহ বাড়িয়াছে। যেখানেই গিয়াছি, লোকে স্কুল খুলিতে আমাদের অনুরোধ করিয়াছে। সারা কিন্নর-দেশে নয়টি স্কুল—সাতটি প্রাইমারী, একটি মিডল ও একটি সোয়ার মিডল। জী-শিক্ষার দিকে কিন্নরদের নজর কম। এদিকে বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। জী-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত কিন্নর-দেশের উন্নতি হইবার নহে। চীনীতে একটি বেশ সুন্দর হাসপাতাল দেখিলাম। কিন্তু ডাক্তার নাই। কেন নাই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, এত দূরে কোন ডাক্তার আসিতে চাহে না। চীনীতে জিনিয়পত্র মহার্ঘ। সিমলার লবণের দর চার টাকা, চীনীতে চল্লিশ টাকা। পকাশ টাকা মণ্ড দরেও চীনীতে গম দুপ্রাপ্য ছিল। আমার মনে হয়, এই দূর দেশে যে সব কর্তৃকারী আছেন তাঁহাদের জন্ত বিশেষ ভাণ্ডার ও রেশনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্নর-দের মিছেদেরই সংবৎসরের ধোরাক নাই।

চীনী কিন্নর-দেশের রাজধানী। এখানে একটি মিডল স্কুল আছে। রামপুর এখান হইতে সত্তর মাইল। সেখানে হাই স্কুল আছে। চীনী ও চীনের আশপাশের লোকেরা ছেলেদের রামপুরে পাঠাইতে চায় না। তা ছাড়া ছাত্রদের ভাষা মাথা-পিছু চল্লিশ টাকা ধোরাকী খরচ পড়ে। তাই চীনীতে অবিলম্বে হাই-স্কুল খোলা আবশ্যক। রামপুর স্কুলকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করার কথা চলিতেছে। সুনীলাম শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরও এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন।

রামপুরে মেয়েদের জন্ত মিডল স্কুল

রামপুরে মেয়েদের প্রাইমারি স্কুল আছে। উহাকে মিডল স্কুলে উন্নীত করা দরকার। অযোগ্য না থাকায়, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক মেয়ে লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না। মনে হয় অধিবাসীরা সহশিক্ষার পক্ষপাতী নহে। চীনের স্কুলে মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। চীনীতে কোন মেয়েকে আমরা স্কুলে যাইতে দেখি নাই।

জীরোগ চিকিৎসা

জীরোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। অস্ত্র দ্বায়ে বাই থাকে। এখানে (কিন্নর-দেশে) বাই পর্যন্ত নাই। তাই এসবকালে অনেক জীলোকের অকালমৃত্যু ঘটে। জীরোগ চিকিৎসার জন্ত এখানে একটি হাসপাতাল একান্ত প্রয়োজন।

আমার বিবেচনায় কতটুকু ট্রাষ্ট হইতে সরহানে একটি হাসপাতাল খোলা উচিত।



চারণ-ভূমির পথে

হিমাচল প্রদেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চিকিৎসা-বিভাগে জন্ত বিশেষ জাঙ্করুতি দেওয়া সরকারের কর্তব্য। তাহা হইলে এখানকার প্রয়োজনমত ডাক্তার ও মেডি ডাক্তার পাওয়া যাইবে।

পর্ক-পার্করণ ও মেলা

কিন্নর-দেশে সৌর বর্ষ প্রচলিত। প্রায় সব ভেহারই সংক্রান্তিতে হয়। প্রধান প্রধান পর্ক হইতেছে :

- ১। বিস্ত বৈশাখ সংক্রান্তি দিন। ২। কাভনী হোলী। ৩। দেওয়ালি—অন্ততঃ যে সময়ে অনুষ্ঠিত হয় তার এক মাস পরে। ৪। কু লৈচ—দশহরা। ৫। আগড়া—২০শে ভাদ্র তারিখে। ৬। ডখরেন—শ্রাবণ-সংক্রান্তি।

পর্ক উপলক্ষে লোকেরা নাচে, গায় ও শক্তি অনুসারে ভাল খায়দায়। আগড়ার দিনে সারারাত জাগিয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে মেলা বসে। মেলাতে দেবতা আনা হয় এবং তাঁকে নাচান হয়। জীলোকেরা গহনা পরে। বহু-পতি প্রথা প্রচলিত বলিয়া সব মেয়ের বিবাহ হয় না। এইরূপ অবিবাহিত মেয়েদের কেহ কেহ এই সময় বেচ্ছায় প্রেম-পরিণয় করিয়া থাকে।

রামপুরের প্রধান প্রধান মেলা

রামপুর কেবলমাত্র কিম্বদ-দেশেরই বড় বাজার নহে; কুম্ভ, ক্ষীতি, তিক্ত, জোমার-বাওর এবং হিমালয়ের অপর দূর দূর স্থানেরও তাহা প্রসিদ্ধ বাজার। এখানে তিনটি মেলা হয় :

১। ২৫শে কাষ্ঠিক ভবা ঘোটাছুটি ১১-১২ই নবেম্বর একটা বড় মেলা বসে। এই মেলায় তিক্ত হইতেও পশম বিক্রয়্য আসে। লাখ লাখ টাকার জিনিষের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। এই মেলাকে লৌদ মেলা বলা হয়। বিক্রয়ের দ্রুত বহু ঘোড়াও আসে।

২। হোলী—এই মেলায় কিম্ব, মুশহর ও কুম্ভ হইতে বহু লোক আসিয়া থাকে। এটা ঘরোয়া মেলা। দেবতা এই মেলায় আসেন।

৩। ২৪শে বৈশাখ—উপরি-উক্ত সব রকমের জিনিষ এই মেলায় বিক্রয় হয়। ভারত হইতে লোকে জিনিষপত্র লইয়া এখান হইতে তিক্তে যায়।

গৃহ-নির্মাণ

কিম্ব-দেশের ঘরের দেওয়াল পাথরে তৈরি, কিন্তু কাঠের ব্যবহারও কম নয়। এখানে কাঠে উই লাগে না। গম শুধা বানের গোলা পুথক করিয়া বানানো হয়। সাধারণতঃ বাস-গৃহের নীচের ডালার পত্তদের রাখা হয়। গৃহ দোভলা বা ডেভলা। দরজা মেহাত হোঁচি। গৃহ নয় ত বেন দরজা-জানালা বহু রেলের প্রকোষ্ঠ। ঘরের ছাদ তিন প্রকারের। চৌরার আশপাশে স্লেট-পাথরের ছাদ দেখিয়াছি। সেখানে পাথর পাওয়া যায়। উঁচা হইতে বাগত পর্বাণ্ড কাঠের ছাদ। পরে মাটির ছাদ, কারণ সেখানে বর্ষা নাই। এই সব ছাদ দেখিয়া পশ্চিম পঞ্জাবের কথা মনে পড়ে।

সরকারী ব্যবস্থা

সরকারী কর্মব্যবস্থা তিন প্রকারের :

প্রত্যেক গ্রামে এক জন সর্দার থাকে। সে জাতিতে সর্বণ। আর থাকে হরিজনশ্রেণী হইতে এক জন হরমণ্ডী। ইহাদের বেতন নাই। সরকারী লোক আসিলে লোকজনকে খবর দেওয়া, লোক ডাকা ইত্যাদি তাহাদের কাম। গ্রাম-বাসীদের পিড়ন করিয়া সরকারী লোকেদের জন্ত তাহারা যে বাস্ত সংগ্রহ করে তার ভাগ তাহারা পায়। তাহাই তাহাদের বেতন।

কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি ঘোড়ী। প্রত্যেক ঘোড়ীতে একজন নব্বদার থাকে। নব্বদার অভিভাভ-বংশের হওয়া চাই। রাজস্বের শতকরা পাঁচ টাকা তাহাদের প্রাপ্য। কিন্তু তাতে কি তাদের চলে। জনগণকে, বিশেষ হরিজনদের উত্ত্যক্ত করার তাহা লাইসেন্স। লাইসেন্স দিলে সরকারের লাভ হয়। এ ক্ষেত্রে হয় কতি—এইটুকু ব্যবধান।

কতকগুলি ঘোড়ীর সমষ্টিকে পরগণা কহে। পরগণার কর্তা হইতেছে জেলদার। জেলদার গরীব লোকের পক্ষে সাক্ষাৎ যমস্বরূপ। তাহার উৎপীড়নে লোকে শশব্যস্ত। জেলদারও অধিকাংশ স্থলে অভিভাভ-বংশের লোক। এই ব্যক্তিও রাজস্বের একটা ভাগ পায়। প্রায় সব পরগণাতেই এক জন পাটোয়ারী থাকে। পাটোয়ারীদের এলাকা খুব ছোট। কতকগুলি পরগণা লইয়া একটি তহশীল। তহশীল তহশীলদারের অধীন। কিম্ব-দেশে সর্বগমেত পঁচানব্বইটি গ্রাম। কুড়িটি ঘোড়ীতে তাহা বিভক্ত।

বরাত বলিতে হইবে, রামপুর ও চীনীর তহশীলদারেরা জনপ্রিয় যোগ্য লোক। তাহারা ছই অনেকই মুশহরের লোক—ভাল মানুষ।

নাম বৈচিত্র্য। সিমলাতে এক কিম্বরের সহিত দেখা—শিক্ষা-বিভাগে এসিষ্টেন্ট ডেপুটি ইন্সপেক্টর। তাহার নাম বাংগ ডুপ ক্লিংগ। তত্বেলোক বি-এ, বি-টি। চীনীতে একটি গ্রাম্য ছাত্রের সহিত দেখা, সে নিজ পরিবারের লোকের নাম এইরূপ বলিয়াছিল। ছাত্রের নাম—ককক ছেরিংগ। পিতার নাম দেশিম ছেরিংগ। মাতার নাম গধে জামী। বোনের নাম জ্বল জামী। ককবংগ গ্রামের ছাত্র নিজ পরিবারের নাম যাহা বলিয়াছিল তাহা এই :

ছাত্রের নাম ঠাকুররাম। পিতার নাম (১) ইলজিং, (২) তিলকরাম, (৩) রঘুদাস, (৪) পরস দাস। মাতাদের নাম (১) গদাধাসী, (২) বর্ষদাসী।

কিম্ব-দেশের যে সব পরিবারে লামাদের প্রভাব সে সব পরিবারে তিক্ততী ভাষার নাম রাখা হয়। চীনীর মিডল স্কুলে দ্বিতীয় ভাষারূপে তিক্ততী পড়ান হয়। উহা পক্তাব রামজীদাস। তিনি বৌদ্ধব্রাহ্মণবলয়ী। খুব সংলোক।

কিম্বর প্রদেশের কৈলাস

কিম্ব-দেশে ভরানক শীত। আমরা চীনী গিয়াছিলাম মে মাসে। পথে প্রায় সর্বোচ্চ উচ্চ শিখরগুলি বরফে ঢাকা দেখিতে পাই। হিমালয় যেন চাঁদ্রির গহনা পরিয়াছিল। কিম্ব-দেশের সর্বোচ্চ শিখর কৈলাস। তাহা সাতা বছর বরফে ঢাকা থাকে। কৈলাসের সর্বোচ্চ ভাগের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২১২৫০ ফুট। উহার নাম বালডংগ। মানস সরোবরের নিকটই কৈলাস আর এ কৈলাস এক নহে। তার উচ্চতা ২২০০০ ফুট। কিম্ব-দেশের কৈলাসের শোভার ভুলনা নাই। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পরে কৈলাস যেন নব-বধুর সাজে সজ্জিত হয়। ধানিক পরে পরে নুতন নুতন শাড়ী পরিয়া নব নব রূপধারণ করে।

সুয়ারসেন হইতে একটি হিমাল্যাদিত উচ্চ শিখর দেখা যায়। দেবকীমন্দন তারদ্বাজ বলিলেন পাহাড়ীরা ঐ শিখরকে হংসদেশক বলিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস জীব মরিয়া

ওখানে যায়। উপনিষদের ঋষিরা জীবকে হংস বলিয়াছেন। তারও আগে ঋগ্বেদে ঐরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

বৃদ্ধ কিন্নরদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিলে, পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণের নিমিত্ত ইজ্ঞপ্রস্থ হইতে রওনা হইয়া হিমালয়ের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে তাহারা কিন্নর দেশের কৈলাসে আরোহণ করেন ও তথায় দেহভ্যাগ করেন। আর তাই এই শিখরকে কৈলাস বলা হয়। যত্না শব্দের স্থলে বর্গবাস বা কৈলাসবাস কথাটি ভারতবাসীরা হামেশা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভ্রমণের প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত

কিন্নরেরা অতি প্রাচীন জাতি। হিমালয়ের এই সব অমূল্য আদিম অধিবাসীরা সময়ের প্রগতির অতি পক্ষান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের এক কোণে অবস্থিত কিন্নরদের হৃদয়ে দুঃখানুভূতি আছে। তাহাদের মধ্যে জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আত্মবিকাশের জন্ত তাহারা ব্যাকুল বলিলেই ঠিক বলা হইবে। কিন্তু জ্ঞানভ্রমত অপর দেশ-বাসীর সহায়তা ব্যতিরেকে ইহাদের বিকাশ হইবার নহে।

অশিক্ষা কিন্নরদের মুখ্য সমস্যা। দুঃখের কথা, স্কুলের অভাবে কিন্নরেরা ইচ্ছা থাকিলেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারিতেছে না। ঘরের কোণে হইলেও ইউরোপ-আমেরিকা অপেক্ষা কিন্নরদেশে বাতায়াক কষ্টসাধ্য। ভাঙার-বৈজ্ঞানিক নাই, তাই চৈকিয়া কিন্নরেরা ভূতপ্রেত ও দেবতার শরণাপন্ন, অসুখ-বিস্মৃতে তাহারা ইহাদের ভরসা। জীলোকের অবস্থা শোচনীয়। হরিজনদের অবস্থা পশুর অপেক্ষাও অধম। হিমালয় প্রদেশের আর কম। অজ্ঞান কিন্নরদেশের শিক্ষা, বাহ্য ও পথ-বাটের সুব্যবহার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকেই সবিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিকাশামূলক অবস্থা সত্ত্বেও কিন্নরদেশ সব দিকে অমূল্য। গান্ধী-স্মৃতি ভাঙার, কস্তুরবা ট্রাষ্ট ও ভারতীয় আদিমজাতি সেবক-সম্ম ইত্যাদির কর্তব্য—দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত এই সব উপেক্ষিত মুক্ত দেশবাসীর উন্নয়নে অবহিত হওয়া।

কুমারসেনের দিকে এবার আমাদের যাত্রা শুরু হইল।

কুমারসেন একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। তাহা আজ নবগঠিত হিমালয় প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ১০ই মে কুমারসেনে পৌছিলাম। নারকুণ্ড হইতে কুমারসেন ছয় মাইল। নারকুণ্ড নর হাকার ফুট উঁচু; কুমারসেন মাত্র পাঁচ হাকার পাঁচ শত ফুট উঁচুতে।

এখানে সকলের মুখেই খাড়াভাবে অভিযোগ শুনিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সরকারী কর্মচারীদের কাছে আমবাসীরা রেশনের জন্ত আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। পরিবাসে থকর দেখিয়া নারকুণ্ডের এক কাঠুরিয়া আমাদের বলে, ‘পঞ্জাবে ত হাজারো বস্তা গম যাচ্ছে,

এদিকে হিমালয়বাসী আমাদের কংগ্রেস-সরকার অনাহারে মারাচ্ছে। যে দাম দিতেই আপনি প্রস্তুত থাকুন না কেন,



দজাজের মন্দির

নারকুণ্ডে গম বা ধান আপনি পাবেন না।’ নারকুণ্ড হইতে কুমারসেন যাইতে যাইতে মনে সংশয় জাগিল, অবস্থাটি কি এতই সঙ্গীন। কিছুদূর অগ্রসর হইতে সামনে দেখিলাম গম-ক্ষেত। দূর হইতে মনে হইল ফলন ভাল হইয়াছে। সব-কিছু নিজ চক্ষে দেখা অভ্যাস। রাস্তার ধারের একটা ক্ষেতে গেলাম। শস্ত পাকিয়াছে বলিয়া মনে হইল। দুটি শীষ ছিঁড়িয়া লইলাম, হাতে ডলিলাম; গুঁড়া হইয়া গেল। একটি দানাও তাহাতে ছিল না। এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিতে পাইলাম, গম ফুলিবার সময় বৃষ্টি হয় নাই তাই কল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীজ রাখার মত গম পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। দেখিলাম পশু দুর্বল, আর মানুষ নির্জীব। একটি লোকের সহিত দেখা। সরকারী চিঠির বলে নারকুণ্ড হইতে ছোলা লইয়া ফিরিতে-ছিল, মাত্র পাঁচ সের। যাইবে সাত জন। সাত জনের জন্ত সাত দিনের ঐ বরাদ্দ। আর তার জন্ত তাহাকে পুরা দুই দিন ব্যয় করিতে হইয়াছে। সে আমাকে বলিল, ‘পরমা দিয়েও গম, যব, ধান, ছোলা কিছুই মিলে না। পাঁচ সেরে সাত জনের সাত দিন চলে? তহশিলদার এর বেশী দেয় না।’

কুমারসেনে পৌছিভেই রেশনের অব্যবহার সন্মুখীন হইতে হইল। কোম দোকানেই খাড়াশস্ত ছিল না। ত্রীদেবকীমন্দির

ভরষাক আমাদের ব্যবস্থা করিলেন, নরত আমাদেরও মুশকিলে পড়িতে হইত।

এই রাজ্যের রাণা ত্রীশোমেশ্বর সিং উদীয়মান যুবক। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে ইনি একটি বালিকা বিভাগের দ্বন্দ্ব তিন হাজার টাকা দিয়াছেন। হিমাচল প্রদেশের সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই জী-শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন, তাই রাণা সাহেবের এই দান খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ। আমাদের পরামর্শে কুমারসেনের অধিবাসীরা কস্তুরবা বুনিয়াদী কলা বিভাগের খুলিবেন স্থির করিয়াছেন। আশা করি, তাহাদের অভিপ্রায় শীঘ্র কার্যে পরিণত হইবে। সিমলাতে হিমাচল প্রদেশের চীফ কমিশনার ই. পী. মুনকে এ বিষয়ে বলিয়াছি।

অন্নকেন্দ্র

কুমারসেনে পৌছিয়া। এখানেও আমাদের দেখিতেই লোকের মুখে সেই 'হা অন্ন' ধ্বনি। ছাত্রবাসের ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, কৃষক, বালক, জী-পুরুষ, সকলে ঘাস ও আগ্রীর (ডুমুরজাতীয় ফল) খাইয়া দিন কাটাইতেছে। একান্ত বিষন্ন লাগিল। একজন হরিজনকে দেখিলাম। গত পনের দিন সে অনাহারে; নারকুণ্ডার ত্রীমূলের সহিত দিন-কয়েক পূর্বে সে দেখা করিয়াছিল। সকাল-সন্ধ্যা ছুন্-চা খাইয়া সে দিন কাটাইতেছে অথবা ধীরে ধীরে মরিতেছে।

পরের দিন সন্তপুর হইয়া চাতান গ্রামে গেলাম। সন্দেশ ত্রীপত্রীখণ্ডী ছিলেন। চাতান কুমারসেন হইতে মাইল চারেক দূর। গ্রামের কাছে সরকারী সমিতির ইন্সপেক্টরের হিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। ত্রীদেবকীন্দ্রনজীর অহুরোধেই নতিনি গ্রামটি দেখিতে আসিয়াছেন। সেখানে সাক্ষাৎ আকালের পরিচয় আমরা পাইলাম। গত তিন দিন সমস্ত গ্রামবাসীরা অনাহারে আছে। কিছু খালের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। এক হরিজনের ঘরে গেলাম। ঘরে তাহাদের একটি দান্য গমও ছিল না। উমান লেপা-পোছা, আগুন জ্বলে নাই।

গ্রামবাসীরা সকলে আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বারংবার আমরা রেশন লইয়া গিয়াছি। এক বিষবা ব্রাহ্মণী আমাদের তাঁহার ঘর দেখিতে অহুরোধ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার পশ্চাতে তিনটি ছোট ছেলে কাদিতে কাদিতে আসিতেছে। জীলোকটি তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন, 'সবুর কর, ঘাম, সরকার অয়ের একটি ব্যবস্থা করবেই, আমি কি করব?' একই ধামিয়া বেচারী বিষবা আরও বলিলেন, 'যাব কোথা? গয়না ছিল, তা শু ধেরে শেষ করেছি। আছে সন্ধ্যা পরণের কাপড়। তা বেচেই তোদের খাওয়াব।' দারুণ লাগিল। ব্রাহ্মণীর ঘরে গেলাম। উনানে আগুন জ্বলে নাই। ঘরে কিছুই ছিল না, বাগন-কোসন আগেই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। সকলেই আমাদের নিজ নিজ ঘর

দেখিতে বলিতেছিল। সমাজকে চাষী অন্ন যোগায়। তার এই দুর্দশা। লজ্জার মরিয়া গেলাম। ত্রীছগনলাল তাই কোকানে গেলেন; কিছু ভাজা ছোলা আনিয়া গ্রামবাসীদের দিলেন। গ্রামে তাহাদের জল আসিল। বুঝিতে পারিলাম, গ্রামবাসীদের সব সন্ধ্যা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, ফেনার শক্তি তাহাদের অভ্যন্তরীণ। চাতানে ইহাও শুনিতে পাইলাম যে, মোহন সিং নামে এক বৃদ্ধ ছুবার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার দ্বন্দ্ব শতক্রমে ঝাপ দিতে গিয়াছিল। টের পাইয়া গ্রামবাসীরা নদীর কিনারা হইতে ধরিয়া আনিয়াছে। সেই দিন দ্বিপ্রহরের আহ্বানের পূর্বে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রবাবু, চিফ কমিশনার ই. পী. মুন, জয়রামদাস দৌলতরাম, ত্রীশোমেশ্বরী নেহরু ও প্রেস ট্রাস্ট-এর নামে এক লিখা তার প্রেরণ করি। ছুপদেব নামে একটু উৎসাহী যুবক তাহা পাঠাইতে কোটগড়ে যায়। কোটগড় কুমারসেন হইতে চার মাইল।

খাইলাম, আনিয়া ভাবে। যেখানে লোকে অনাহারে মরে, সেখানে অন্ন কুচে কি? সন্তপুর হইতে কুমারসেন ফিরিয়া আসিলাম; আবার সেই 'হা অন্ন' রব। ছাত্রবাসের ছাত্রদের কাছে জানিলাম, তাহাদের কোন দিন দুইখানা, কোনদিন বা সওয়া দুইখানা রুটি জোটে, ছুবা তাহাদের পাঁচখানার। ছাত্রের সংখ্যা ৫২।

এক বুড়ী আসিল। হাতে তার লবণ, মাটি-মিশ্রিত, আধ সের হইবে। দাম তিন আনা, বুড়ী বলিল, 'কিছু ঘাস বেটে জলে জলে লবণ দিয়ে খাব। ঘাসও এখন তুখাও।' কুমারসেনের লোকদের আর একটা কষ্ট, তাহাদের হাই স্কুলকে মিডল স্কুলে অবনমিত করা হইয়াছে। তাই দ্বিবিধ ক্ষুধার তাহার। ক্রিষ্ট—ভৌতিক ও মানসিক। হাই স্কুল বন্ধ হওয়াতে, সাভাশ জন ছাত্রছাত্রী বসিয়া আছে। উহাদের দুই জন মেয়ে ও চার জন হরিজন। এই স্কুলকে প্রাইমারী হইতে হাই স্কুলে উন্নীত করিতে ত্রীদেবকীন্দ্রনজীকে মাধার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইয়াছিল। তাই ইহার অবনতিতে তিনি অতিশয় বিমর্ষ। গ্রামবাসীদের অন্নকষ্ট আর হাই স্কুলের কষ্ট দুই-ই সমান ভীত। কুমারসেনের শিক্ষার ক্ষুধা দৃষ্টে হিমাচল প্রদেশের শিক্ষার ক্ষুধার ঝাঁক করা যাইতে পারে। উন্নীতেও তার পরিচয় পাওয়া গেল। গ্রামের পনরটি ছেলেমেয়ে আমাদের কাছে আসে। তাহারা পড়িতে চায়, কিন্তু স্কুল নাই বলিয়া পশু চরায়। উন্নীর দশ মাইল দূরে কিলওয়ারাতে স্কুল আছে। ছোট বালক-বালিকাধের পক্ষে প্রতিদিন তত দূরে যাওয়া সম্ভব নহে। তাওয়াতে স্কুল আছে, ছাত্রসংখ্যা পঁয়ত্রিশ। ঘর নাই। গাছতলায় ক্লাস বসে। শিক্ষার ক্ষুধার ইহাও পরিচায়ক। লেখাপড়ার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দেশের বালক-বালিকারা নিরক্ষর থাকিয়া যাইতেছে। যেখানে গিয়াছি, আর যাহার সন্দেশই কথা হইয়াছে—সর্বত্রই এক অহুরোধ—'আমাদের স্কুল দিন।'

চীনা হইতে কিরবার পথে দণ্ডনগরে আসিয়া (৩০শে মে) সন্নিতে পাইলাম, কুমারসেন ফুলকে দুই বছরের ছুটি পুনরায় হাই ফুল করা হইবে। বুনী হইলাম। নারকুণ্ডায় পৌঁছিয়া স্বধন খবর পাইলাম যে, কুমারসেনের অন্তকষ্ট দূর করার নিমিত্ত হিমাচল প্রদেশ-সরকার ত্বরায় ব্যবস্থা করিয়াছেন—লোকে রেশন পাইতেছে, তখন যোদ্ধাপ্রাপ্তিসম্মান আনন্দ অনুভব করিলাম। চিক কমিশনের ত্রিঘ্ন ও তাঁহার অধীনস্থ রাজকর্মচারীদের স্বত্ববাদ জানাইলাম।

বনৌলী কুমারসেনের লাগোয়া গ্রাম। তথায় একটি আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাকার উৎসাহী যুবকেরা হিমাচল প্রদেশ সেবা-সঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে। এ সম্পর্কে বৈষ্ণব ত্রিদারমাব সিংজীর নাম উল্লেখযোগ্য। চীনাতেও এইরূপ একটি সেবা-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনগ্রসর প্রদেশের জাগৃতির পরিচয় মেলে।

নচার হইতে পৌড়া ফিরিতেছিলাম। পথে এক বৃদ্ধের সহিত দেখা। দেবীলাম লোকটি ক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন।

পারীবাণী ভগবানের নাম করিতে করিতে ধানিকটুর আগাইয়া গিয়াছিলেন। অভিবাদন অন্তে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার নিবাস?” “অল্পু।” অল্পু চীনা হইতেও ধানিকটু দূরে—ও-পাশে। বৃদ্ধ আরও বলিলেন—“হিমাচল-প্রদেশ হয়েছে না, আমরা কিরবারে মরেছি। আগে সিমলা হইতে যত ইচ্ছা লবণ, গুড়, চাল, কাপড় ইত্যাদি আনা যেত। কোন প্রতিবন্ধ ছিল না। গ্রীষ্মে বাড়ী ফেরবার সময় ভেড়া-ছাগলের পিঠে মাল চাপিয়ে দিলেই ত’ত। হিমাচল-প্রদেশ হওয়ার পরে আমাদের পক্ষে সিমলার বাজার বন্ধ হয়ে গেছে; কিরবারে ঠায় মরেছে।” বৃদ্ধের নাম বর্ধ-পাল। বর্ধপাল বৃদ্ধদের মহারাজাকেও একহাত লইতে ছাড়িলেন না—“মহারাজা আপন বৃত্ত বৃদ্ধে; সরকারের সহিত আশ্রয় গণ্ডা মিলিয়ে ভাতা ঠিক করে নিচ্ছে। দিন দিন ফুলছে। আমাদের দুঃখের কথা সে কি ভাবে! স্বধন রাজা ছিল তখনও আমাদের জিজ্ঞাসা করে রাজা হয় নি, আর আজ হিমাচল প্রদেশেও আমাদের জিজ্ঞাসা করে আসে নি। এমন বিপদে আমরা কখনও পড়ি নি।”

বর্ধপালকে বলিলাম—“রাজ্য এখন প্রজার, কোন ব্যক্তি-বিশেষের নহে। হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্র সিমলা, পূর্ব-পশ্চিম সরকারের অধীন, এ কথা ঠিক। সিমলার কতকটা ভাগ হিমাচল প্রদেশের হাতে থাকলে আপনাদের দুঃখ সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরাশ হবেন না। অল্প দিন হয় হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছে। নতুন ঘর, গুছাতেও একটু সময় লাগবেই। আপনাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে স্বধন

দেশ-সেবা করবে তখন আপনাদের অধিক লাভ হবে। হিমাচল প্রদেশ হওয়ার কতি হয় নি লাভই হয়েছে।”

উৎকোচের অভিযোগ

দুইটি মেঘ-শাবক পিঠে লইয়া একজন কিন্নর সারঙ্গ ঘাইতেছিল। সারঙ্গ চীনার চৌদ্দ মাইল ওদিকে, তিরুভ-সীমান্তবর্তী গ্রাম। মেঘের পালে ঘুরে-বা রোগের মতক দেখা গিয়াছিল। ভেড়া তখন কে কিনিবে। এক একটি ভেড়া বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য উমাসুখ প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মেঘগুলি দুই পা যায় আর বলিয়া পড়ে। একবার আদর করে, আবার রাগ করে; মেঘগুলিকে লইয়া একটু যায়, আর ধামে—এই ভাবে উমাসুখ পথ চলিতেছে। উমাসুখের অল্পবয়স্ক মেয়ে, মায়ের পিঠে তার সরহানের চড়াই পার হওয়ার কথা। মাতা-পিতার বোকা না হইয়া, তাহাদের বোকা হাল্কা করার জন্য এক নবজাত মেঘ-শাবক কোলে করিয়া সে পায়ে হাঁটয়া চলিয়াছে। উমাসুখের পত্নীর কথা আর কি বলিব! সে যেন তখন মেঘ-হাসপাতালের অধ্যক্ষ। ইহা দেখিয়া আমি বড়ই অসোম্যান্তি অনুভব করিতেছিলাম। আগ্রহ হইল উমাসুখ ও তার ছোট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলি। বলিলাম—“তোমাদের এ বিপদে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি কি? কি কাজ করব বল?” এ কথার জবাবে উমাসুখ যাহা বলিল তাহাতে আমার অবস্থা আরও বাড়িল। সে বলিল—“বাড়বাগ্নি ক্ষেত্র গ্রাস করতে শুরু করলে কি আর বাঁচার আশা থাকে। এখন সময় এমনই পড়েছে যে সরকারী চাকর্যে যাত্রাই ঘুষখোর হয়ে গেছে। পরস্যা ছাড়া তারা গরীব আমা-দের সঙ্গে কথা কয় না। যে-যত বড় অফিসার তার ঘুষের বহর তত বেশী। কারও কাছ থেকেই আমাদের আশা নেই। এক রামই যাত্র এখন ভরসা।”

কহিলাম—“ঘুষ দাও বলে না ঘুষ নেই। নইলে নেয় কার সাধ্য।”

“লোকে কি গায়ে পড়ে দেয়? সরকারী কর্মচারীরা আমাদের কিছু আশ্রয় নহে।”

এ কথা বলিয়া সে শান্তি অল্প ছাগের কাছে চলিয়া গেল।

বান্দুর ছয় মাইল দূরে শতজুতীরে রাপরী নামক গ্রাম। তথাকার চটিতে পুলিশ ইন্সপেক্টরের সহিত দেখা। পাশের গ্রামে চুরির তদন্তে সে ঘাইতেছিল। দুই দিন আগে এক ফরেষ্ট-চৌকি হইতে খাটী চুরি হইয়া গিয়াছে। ইন্সপেক্টর বলিল—“এখানে এসে মহা মুশকিলে পড়েছি। সব এক মাস এখানে (চীনাতে) এসেছি। ত্রিশ টাকা দিয়ে সিমলা থেকে নতুন জুতো নিয়ে এসেছিলাম। এক মাসেই তা ছিঁড়ে শেষ। খাদ্যদ্রব্য ত কিছুই মেলে না। সঙ্গে জুড়ি দেয় গম নিয়ে এসে-

হিলাম। ফুরিয়ে গেছে। এবার না খেয়ে থাকার পালা। অধিবাসীদের নিজেদেরই খাবার নেই ত আমরা দেবে কোথা থেকে।”

সরহান, গৌরা, চৌরা ও চীনের ডাকবাংলোর তাকীর ব্যবস্থা আছে। কিম্বদ দেশে একাজ করে যেট জাতির হরিজনেরা। ঐ সব জায়গার তাকীর নাশি করিল যে তাহার রেশন পায় না। রোড ইন্সপেক্টর ত্রীলক্ষীচাঁদকে কমান্ডারদের অস্থবিধা দূর করিতে বলিলে সে নিজের অস্থবিধার কথা পাড়িল। রামপুরে রেশনের অস্থায়ী ব্যবস্থা আছে। তারপরে আর ওদিকে দোকানদারের কাছেও খাণ্ডস্ত মিলে না। সরহানে যবের আটা টাকা টাকা সের, আর চাউল এক সেরের দাম দেড় টাকা। সরহানের ওপাশে কোন যাত্রী যায় ত তার পক্ষে উপবাসের পুণ্য অনাস্বাদ-লভ্য। রোড ইন্সপেক্টরকে যেখানে অনাহারে থাকিতে হয়, সেখানে মেঘরদের আর কথা কি?

হিমাচল প্রদেশ-সরকার যদি সিমলা বা নারকুণ্ডায় গমন ইত্যাদি মজুত করিয়া রাখে ত কিম্বেরা মেঘ ও ছাগের পিঠে তাহা চীনা, আর চীনের ওদিককার সব স্থানে অনাস্বাদে লইয়া যাইতে পারে। কিম্বদ দেশে বর্ষা হয় না। এ স্থান কলচায়ের উপযুক্ত। গত দুই বৎসর হইতে এখানে ভয়ানক খাদ্যাভাব চলিতেছে। যেখানে এক মণ যবের দাম পঞ্চাশ টাকা সেখানে আকাল নয় ত কি?

‘পাগলের’ পান্নার

যোগি একটি গ্রাম। চীনের নিকটে। পরীথকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য সন্তোষদাসজীর বাড়ী যাই। সেখানে বিদ্যার্থী শ্রেণিও থাকে। দুই বছর আগে অলোক আশ্রমের বিভাগে সে আমার কাছে পড়িত। সন্তোষদাসজী ওধানকার প্রভাব-শালী ব্যক্তি। কিম্বদ দেশের উন্নয়ন কি ভাবে হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনার প্রবৃত্ত হইব, এমন সময় দীর্ঘাকৃতি একটি লোক আমার পাশে আসিয়া বসিল। পরিচয় নাই, কথা নাই, বার্তা নাই সে বলিল—“চার ছেলে ও চার বিধা জমি আমি সরকারকে দিছি। আপনি মিন। ছেলেদের কোঁজে ভর্তি করে দিন। আমার জমি হচ্ছে চীনের পাশে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোডের সংলগ্ন।” জিজ্ঞাসা করিয়া আচার্য্য সন্তোষদাসজীর কাছে জানিলাম লোকটি এক লামা। নাম তার সনমপান্না জঙ্গ। চিকিৎসা-ব্যবসায়ও সে করে। দুই মিনিট পরে লামা সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিল। তৃতীয় বারে গৌকে তা দিয়া বলিল—“আমার মত দাতা কে? চার চার ছেলে আর চার চার বিধা জমি দিয়ে দিছি। আমার যদি পনরটি ছেলে থাকত তাদের সকলকেই আমি দিয়ে দিতাম।” লামা আমাদের কথা হইতে দিল না। একই

কথা সে বার বার বলিতেছিল। ভুক ভুক করিয়া তার মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছিল।

বলিলাম—“লামাজী, মহাত্মা বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধী মদের অশেষ-নিন্দা করেছেন। মদ আর খাবেন না।”

“হাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু আমার কথা টুকে নাও—চার ছেলে, আর চার-ছ বিধা জমি।”

নোটবুকে তার নাম লিখিয়া লইলাম তবে না অব্যাহতি।

জলও বরাদ্দ

ধিরোগ রমণীয় স্থান, শিমলা-নারকুণ্ডা রাস্তার উপর অবস্থিত। এখানে হাই স্কুল, হাসপাতাল ও আদালত আছে। ধিরোগে টাউন-এরিকা কমিটি আছে। লোকসংখ্যা দেড় হাজারেরও অধিক। পনর শত লোকসংখ্যাকে পাহাড়ে খুব বেশী বলিতে হইবে। জলের এখানে ভয়ানক অভাব। শীতকালে বরফ পড়ে। গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলিয়া পড়িতে থাকে তখন চারিটি চৌবাচ্চায় তাহা भरिभा রাখা হয়। এপ্রিল, মে, জুন তিন মাস জলের এখানে নিদারুণ কষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ে চৌবাচ্চায় তাল খোলা হয়, তখন রেশনের মত বরাদ্দমাত্তিক জল মিলে। মে’র শেষ সপ্তাহে আমরা যখন চীনা হইতে ফিরিলাম তখন শুনিলাম যে এক টাকার এক কলসী জল বিক্রী হইতেছে।

আমাদের মনে হয়, হিমাচল প্রদেশ ধিরোগ কমিটিকে একটি মোটর কিনিয়া দিলে এই জলাভাব দূর হইতে পারে। নারকুণ্ডাগামী মোটর-রাস্তার উপরে আট মাইল দূরে জল আছে মোটরে তাহা লইয়া যাওয়া সম্ভব। অল্প একটি ব্যবস্থাও হইতে পারে। ধিরোগের দুই মাইল নীচে ষাট আছে। নল বসাইয়া ইঞ্জিন সাহায্যে সেখান হইতে জল তোলা যাইতে পারে। মোটর দ্বারা জল-বহনের প্রঙ্গ ব্যবহারিক ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাপেক্ষ। প্রয়োজন বোধ করিলে ঐ জল পয়সা লইয়াও বিক্রয় করা যাইতে পারে। এক কলসীর দাম এক টাকা পড়িবে না। অনেক কম হইবে। এখানকার আবহাওয়া শান্ত ও স্বাস্থ্যপ্রদ, জমি খুবই উত্তম। আর ইহা সিমলারও নিকটবর্তী। পরীথজী ও আমি যখন ধিরোগে যাই তখন কোন লোককে বলিতে শুনিয়াছিলাম—“অল্প সব দিক হইতে ধিরোগ স্বর্গ, জলের কথা বলেন ত নরক।”

নরমেঘের বলি হরিজন

মহাপুরুষ দত্তাজেয়ের নামে শতক্রতীরে দত্তনগর নামক গ্রাম। এখানে ২৮ ঘর লোকের বাস। তার মধ্যে কুড়ি ঘর কোলী (হরিজন) আর চার ঘর ব্রাহ্মণ। দুইটি দোকান। দোকানদার অনন্তরাম হালবাই আদর করিয়া আমাদের

দস্তাভ্রের স্বামীর ও দেবীর মন্দির দেখাইল। কথিত আছে, পরশুরামজী সত্যযুগে এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। দস্ত-নগর হইতে ১৮ মাইল দূরে শতজু তীরে নরমণ্ডে (কুর্জুর স্বয়ং পরশুরামজীর মন্দির বর্তমান। শুনিলাম বার বছর পর অন্তর্গত) পর দন্তনগরে নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরের ছাদ হইতে একটি মোটা দড়ি ঝুলিতেছে। লোকেরা তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যে লোক দড়ি চড়িবে, যজ্ঞের ছয় মাস আগে নিজ হাতে সে ৫৬০ গজ লম্বা একটি দড়ি পাকাইয়া বলির অন্ন প্রস্তুত হয়। বলির দিনে লাখো লাখো লোক তাহা দেখিতে আসে। দড়ির এক দিক উচ্চ শিখরের একটি খুঁটায় বাঁধা হয়, অপর প্রান্ত মন্দিরের পাশে ময়দানের অপর একটি খুঁটায়। যে বলি হইতে চায় সে ঐ উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দড়িতে উপবিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট সময়ে উপর হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মিনিটকয়েক

মধ্যে ৫৬০ গজ ব্যবধান দড়ির উপর দিয়া সে অভিক্রম করে। কাজটি নেহাতই ভয়ানক। যত্নও খটিতে পারে। অনেক সময় বর্ষপের দরুন দড়িতে আগুনও বরিয়া যায়। তাই দড়ি যে চড়ে তাহার পিঠে একটি জলাধার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িতে থাকে। যে লোক এতটা দূর নিরাপদে পৌছিয়া যায়, জনসাধারণ, এমন কি মহারাজ স্বয়ং তাহাকে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। বারি-পাতের জন্তই নাকি এই নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অধিকাংশ স্থলে হরিজন শ্রেণীর লোকেরাই নরমেধ যজ্ঞের বলি হয়।

আমাদের ভ্রমণ-কথা এখানেই শেষ হইতেছে। এই অনগ্রসর সীমান্ত প্রদেশে কত কাক যে করার আছে, এই লেখা পড়িয়া, আশা করি, লোকহিতব্রতী সংস্থাসমূহ তৎসময়ে একটি ধারণা করিতে পারিবেন, আর পারম্পরিক সহযোগিতা-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়া সেই কার্যে অগ্রসর হইবেন।

বৃহত্তর ভারত

ত্রিকরুণাময় বসু

শ্রামল বনত্রী বীপ

ঘেন কাঁচপোকা টিপ

সমুদ্র-মেখলা রূপসীর,—

বৌবন হেথায় নভশির

শস্ত্রে কলে প্রাচুর্য্য সত্তারে,

বসন্তের পুষ্প উপহারে।

প্রশান্তির ধ্রুব বাণী

উৎকীর্ণ রয়েছে জানি

পর্বতের খোদাই অঙ্করে,

মন্দিরের কারুশিল্পে, শরভের স্বচ্ছ নীলাবরে

ছায়াক্রান্ত বনের পাভায়,

চাঁদ-উঠা-জ্যোৎস্নারাত্রে ফুলের সত্যায়।

বহুদিন

এই বীপ রয়েছে নবীন

গভীর প্রাণের রসে,

লগিত শ্রামল রঙে, প্রেমের পরশে।

অকস্মাৎ উঠিয়াছে বসু,

সেই কল্লোলিত স্বর,—

তীর হ'তে তীরে

ধ্বনিত করিয়া কিরে

জীবনের মুক্তির বারতা ;

বিজ্রোহের সেই কথা

অকস্মাৎ

করেছে আঘাত

ভারতের মর্দু-উপকূলে ;

আত্মীয়তা লভিলাম আঙুলে আঙুলে।

প্রাণ যারা দিতে জানে,

প্রাণের নিবিড় যোগ তাহাদের টানে,—

এই সত্য করিহু স্বীকার।

আজ তাই করি অদীকার

ভোমাদের কাছাকাছি

আমরাও আছি,

জয় হউক ইন্দোনেশিয়ার।

তুরাশা

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

এলব নদীর মোহনা। বিপুলবক আটলাণ্টিক মহাসাগরে এসে মিশেছে প্রশান্ত জলধারা। এপারে একটা নৌ-আন্তানা, সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে সুরক্ষিত তার পোতাশ্রয়গুলো। সমুদ্রচারী সাবমেরিনগুলো সেখানে এসে আশ্রয় পায়। দু-চার দিন বিশ্রাম করে, তেল-রসদ গুলি-বারুদ বোঝাই করে নেয়, আবার বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে মাঝ দরিদ্রায়। জলের তলা দিয়ে পথ কেটে চলে হিংস্র হুশিয়ার জলজন্তুর মত। আন্তানার কাছাকাছি এসে যখন হঠাৎ জলগর্ভের তলদেশ থেকে ভেসে ওঠে উপরে তখন তাদের কালো কালো ইম্পাভ-কঠোর চেহারা দেখলে বুক কেঁপে ওঠে, মনে হয় অতিকায় হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী বৃষ্টি! বীরে বীরে ইউ-বোটগুলো এসে আশ্রয় নেয় তাদের নির্দিষ্ট বোলের মধ্যে।

ভাঙ্গায় আছে ছাড়া ছাড়া ভাবে ছোট ছোট দালান-কোঠা ঘরবাড়ী; তাদের ছাদের উপরিভাগ নানাবর্ণে বিচিত্রিত আকাশ থেকে শত্রু-বৈমানিকেরা যাতে সহজে চিনতে না পারে জাহাজগটার আসল চেহারা, সেইজন্মেই এ কোশল। এ আন্তানাটা আগে ছিল না, লড়াইয়ের প্রয়োজনেই গড়িয়ে উঠেছে হালে। শহর এবং লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূর, তারি নির্জন জায়গাটি। কেবল তারাই এখানে থাকে যারা সংশ্লিষ্ট এই নৌ-আন্তানার কাজকর্মের সঙ্গে, তাদেরই ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এই সব ছোটখাটো ঘরবাড়ী। এই ক্ষুদ্র একটু জনপদের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে বনভূমি।

একটা লাইট রেলওয়ে একেবেঁকে চলে গেছে শহরে প্রায় বিশ মাইল দূরে, একধেয়ে নির্জনবাসে যে সব কর্মী ক্লাস্ত ও অবসন্ন বোধ করে, সপ্তাহে দু'দিন এক দিন চলে যায় শহরে, নাচগান, আমোদ-আহ্লাদ করে, প্রচুর মদ খায়, তারপর ফিরে আসে যে-বার কাজে। এমনই করে চলে এখানকার প্রাণহীন জীবনযাত্রা, কঠোর নিয়মের শৃঙ্খল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মানুষগুলো যেন একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রের ছোট ছোট চাকা। মনে নেই কল্পনার প্রসার, কর্মে নেই স্বকীয়তা, আচরণের মধ্যে নেই নৃত্যনৃত্য, সকলেই যেন এক ছাঁচে ঢালা, একই কারখানায় তৈরি।

ওপারে সারাদিন বাঁধা থাকে দু'খানা ড্রেজার (মাটি-কাটা জাহাজ), আর কয়েকটা টহলদারী জাহাজ। টহলদারী জাহাজগুলো একটার পর একটা পালা করে ডিউটি দেয়—উপকূলের দূর ঘেঁষে তারা চক্ষিণ খণ্ডে দেয় পাহারা। শত্রু অথবা সন্দেহজনক জাহাজ যাতে কাছে ভিড়তে না পারে সেইজন্মে তাদের এই সতর্কতা।

উজানের দিকে নদীর ভাঙ্গন শুরু হয়েছে, তাকে ঠেকাবার জন্তে দিনরাত্রি খাটছে এক দল শ্রমিক আর তাদের ইঞ্জিনীয়ার। রেলওয়ে ট্রাকের উপর এসেছে একটা ভার্টিকাল বরলায়, তার সঙ্গে খাটছে একখানা গ্রীম-হ্যামার। হ্যাম-হ্যাম করে পিটে পিটে বড় বড় নরওয়েজিয়ান ওক কাঠের খুঁটগুলো দেখতে দেখতে বসিয়ে দিচ্ছে মাটির মধ্যে, তার পেছনে এসে পড়ছে বড় বড় ব্যালাষ্ট ট্রেন বোঝাই পাথরের বোল্ডার। চৌকর খেয়ে জলের স্রোত ঘুরে বেকে যাচ্ছে; দিনের বেলায় শুধুমাত্র একটু হয় না যান্ত্রিক হাতুড়ির শব্দ, কিন্তু রাত্রিবেলায় বহু দূর পর্যন্ত ভেসে যায় তার তীক্ষ্ণ কর্কশ প্রতিধ্বনি।

আন্তানার অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন জোয়াকিম শীয়ার বিপত্নীক বুড়ো মানুষ; নিকরপাট স্বভাব; নির্জনতার ক্লাস্ত অথবা কাবু হবার পাজ্র তিনি নন। মদের অভ্যাস আছে, ঘরে বসেই পান করেন; শহরেও যান না, অথবা মাভলমায়ও করেন না। যৌবনকাল মত্ততার অতীত তিনি এখন। গম্ভীর মূহুর স্বভাবের লোক, কঠোর নিষ্ঠাবান কর্মী। দীর্ঘ-প্রশিক্ষণ ভূরামীদের মত আছে একজোড়া বিপুল গৌক; যেন দৃঢ়তা এবং সঙ্কল্পের প্রতীক।

পোতাশ্রয় থেকে খানিকটা তফাতে ক্যাপ্টেন শীয়ারের বাংলো। লড়াইয়ের বাসা যেমন হয়ে থাকে আর কি। আড়ম্বরহীন শাদাসিঁদে ঘরপের কুঠি। তারই সংলগ্ন তাঁর আপিস। তার পেছনে আছে প্রকাণ্ড দুটো বেতার-সঙ্কেতের মাণ্ডল। আপিসের মধ্যেও আছে নানা রকম কলকজা, হয়েকরকম সামুদ্রিক মানচিত্র। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই ক্যাপ্টেনের কার্টে আপিস ঘরের মধ্যে। সমুদ্রের উপর বিভিন্ন জাহাজ থেকে বিভিন্ন রকম সাক্ষাতিক খবর এসে পৌছাচ্ছে সেখানে, সেগুলো চালান যাচ্ছে হেড কোয়ার্টারে, আবার হেড কোয়ার্টার থেকে যে সব খবর আসছে তা বিলি হচ্ছে সমুদ্রে। ক্যাপ্টেন রিসিভার কানে দিয়ে ঘন ঘন সংবাদ সংগ্রহ করছেন তাঁর ম্যাপের উপর জাঁকজোক করছেন। এই ওর কাজ, এই কাজেই উনি দিনরাত মশগুল। পাশের আলমারিতেই থাকে মদের বোতল আর গেলাস, কলিং-বেল বাজালেই বেঘারা এসে ঢেলে দিয়ে যায়।

ক্যাপ্টেনের কক্ষা ম্যারিষা, থাকে তার বাপের সঙ্গেই এই পোতাশ্রয়ের বাংলাতে। দিবা ফুটফুটে চেহারা, তরী তরুণী। বছর বাইশেক হবে বোধ হয় বয়স, মাধব এক গুচ্ছ রেশম-চিকণ ময়ূষ বেশ, তাতে সোনালী আভা, রক্তিম

গৌরবর্ণ, নীলাভ ছুটি চকু, যেন আকাশ আর সমুদ্রের নীলিমার প্রতিবিম্ব। ম্যারিয়ার কোন প্রয়োজন নেই এই নৌ-আন্তানার নির্জন নির্ভাগনের মধ্যে পড়ে থাকবার, কোন কাজ করে না এখানে সে, শুধু থাকে বাপের কাছে। শহরে বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে অন্যায়সেই থাকতে পারে। ওর বয়সে এমন একঘেয়ে নির্জনতা হয়ত মানার না ঠিকমত; হয়ত আমোদ-আহ্লাদ আর নাচগানের মজলিশেই ওকে মানার। কিন্তু ম্যারিয়া যেসে না সেদিকে, এই জনহীন সমুদ্রতট তাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। একা একা ঘুরে বেড়ায় নদীর পাড় দিয়ে বনের কিনারে কিনারে। চূপচাপ হাঁড়িয়ে থাকে জলের ধারে, উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কত নুতন নুতন জাহাজ প্রবেশ করছে নদীর মোহনায়, আবার কত কত যাচ্ছে বেরিয়ে। মনে হয় কোন একটি বিশেষ জাহাজকে সে খোঁজে।

সত্যি তাই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ম্যারিয়া এই নির্জন নৌ-আন্তানার প্রতীক্ষা করে বসে থাকে বিশেষ একখানি ইউ-বোটের জন্য, একটি উজ্জ্বল কালো রঙের সাবমেরিন, তার নম্বর U-59, কমান্ডারের নাম জোদলে। বলিষ্ঠ তরুণ, নিতীক, হুঃসাহসী যোদ্ধা। কমান্ডার জোদলে মাঝে মাঝে ফিরে আসে পোতাশ্রয়ে, বোঝাই করে নেয় তেল-রসদ তুলি-বারুদ, আবার তার ইউবোট নিয়ে উঠাও হয়ে যায় দূর নীল সমুদ্রে। জলের তলা দিয়ে পথ কেটে চলে, শত্রু-জাহাজের সন্ধান পেলে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়। রসদ ফুরালে ফিরে আসে আন্তানায়। যেকোন সমুদ্রের উপরেই কোন জাহাজ থেকে রসদ পায় সেবার পোতাশ্রয়ে ফিরে আসতে দেরি লাগে দুই-তিন সপ্তাহ। তা নইলে পোতাশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে এক কি দেড় সপ্তাহের মধ্যেই। প্রায় পনের দিন আগে কমান্ডার জোদলে বেরিয়ে গেছে তার জাহাজ নিয়ে আজও ফিরে আসে নি। মনের মধ্যে একটি রুদ্ধ উদ্বেগ নিয়ে ম্যারিয়া একা একা ঘুরে বেড়ায় সাগর-মোহনার বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে। মাঝে মাঝে সাগ্রহ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূর সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশির মধ্যে। হয়ত কোন কালো বিন্দু ছেপে উঠেছে সেখানে, হয়ত বা কোন জাহাজ। সাঁ সাঁ করে আসে বাতাসের শব্দ, তার সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের ঝঙ্কন, দেখতে দেখতে লেই ক্ষুদ্র কালো বিন্দু হারিয়ে যায় কোথায়।

বাপ জানান মেয়ের মনের কথা; কিন্তু কঠোর নিয়মনিষ্ঠ 'মিলিটারিয়ান' তিনি। স্নেহ-মমতার চেয়ে 'ডিউটি' তার কাছে বড়। তার আচরণের মধ্যে আভাস নেই কোন আবেগ অথবা দুর্বলতার। ইউবোট (U-59) সমুদ্রের কোন অবস্থায় কোথায় কখন থাকে সে খবর তিনি প্রতিনিয়ত পেয়ে

থাকেন বেতার-সংবাদে। কিন্তু সচরাচর মেয়েকে জানান না কিছু। তবে মাঝে মাঝে যে দু'একটি খবর না জানান তেমন নয়। যেমন ম্যারিয়া শুনেছে তার বাপের কাছ থেকে পাঁচ দিন আগে U-59 ছিল হেলিগোল্যান্ড্ বাইটের কাছাকাছি; দুই-এক দিনের মধ্যেই যে জাহাজখানা পোতাশ্রয়ে ঢুকবে এ ধারণা খুবই সঙ্গত। প্রতিদিন প্রত্যুষে উদগ্ৰীব আশা নিয়ে ম্যারিয়ার ঘুম ভাঙে। সে ভাবে কমান্ডার জোদলের প্রত্যাবর্তনের শুভসংবাদ আজকে নিশ্চয় পাবে।

অবশেষে এক দিন সত্যিই ফিরে এসে কমান্ডার জোদলে। হাসিহাসি মিষ্টি মুখে অভিনন্দন জানান ম্যারিয়াকে—জয়লিন ম্যারিয়া সুপ্রভাত।

—হেইল জোদলে! আহ্লাদে আবেগে ম্যারিয়া জড়িয়ে ধরে তট-প্রভাগত নৌ-সৈনিককে। এক নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করে—এবার এত দেরি হ'ল যে।

তেমনি হাসিমুখে জবাব দেয় জোদলে—এবারকার চক্করটা ছিল খুব লম্বা। প্রথমে গেলান অর্কনিক, সেখান থেকে সেটল্যান্ডস, ক্যাপাঞ্জো হয়ে নরওয়ের দরিয়্যা ঘুরে তবে এসাম, পথে একটা জোগানদার জাহাজের সঙ্গে দেখা হওয়ায় রসদ নিয়ে নিয়েছিলাম তাই আর অস্থবিশেষ পড়তে হয় নি।

এবার যে প্রশ্ন করতে গেল ম্যারিয়া তাতে তার নিজেরই বুকখানা একটু কেঁপে উঠল। একটু যেন ইতস্ততঃ করছিল, শুধু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললে—ক'খানা জাহাজ ডোবালে এবার?

—সঠিক হিসেব দেওয়া শক্ত, তবে সবসময় আট-দশখানা হবে বোধ হয়। সব সময়ে তো নিশ্চিত প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করা যায় না, শত্রুর আক্রমণের ভয়ে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে আসতে হয় টর্পেডো ছুঁড়েই। দু'-একখানা জাহাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বৈ কি।

ম্যারিয়ার মুখের উপর একটা করুণ বেদমার ছায়া নামে, নত্ন মিনতির সুরে বলে—আচ্ছা, সত্যিই কি, একটুও অসুস্থকম্পা, একটুও দরদ হয় না তোমাদের মনে। নিরীহ নিরপরাধ বাঙালীদের অকূল সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও।

—দরদ দেখাবার কোন আইন নেই আমাদের ম্যারিয়া, আমরা শুধু জানি লক্ষ্য। আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে শত্রুর মাল অথবা রসদ আছে এমন কোন জাহাজ দেখলেই ডুবিয়ে দিতে। কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ সে বিচারের ভার নেই আমাদের হাতে। আর তেমন বিচার করতে গেলে লড়াই করা চলে না। শত্রুর বিমান এসে যখন আমাদের বড় বড় নগর অথবা কারখানার উপর বোমা ফেলে, তারা তো নির্দ্বিচারেই ফেলে, রেহাই দেয় না নারী, শিশু অথবা নিরপরাধকে। সবার উপরে জঘন্যতম, দেশ, দেশের ক্ষুদ্র হত্যার পাপ নেই, যত্নও গৌরবজনক।

ম্যারিয়া বলে—দেশের উপরেও মনুষ্যত্ব।

হোঃ হোঃ করে অটহাত্ত করে ওঠে জোদলে—তোমার মুখে মানুষ না এমন কথা, তুমি হচ্ছে সৈন্যব্যাকের ঘেরে। তোমার বাপ ক্যাপ্টেন শীয়ার সেনাবিভাগের এক জন প্রধান বীর। ঘেরের মুখে এমন কথা শুনেল নিশ্চয় তিনি হেসে খুন হবেন। যাক ও সব, যাবে তো আমার সঙ্গে আদ্যকে বিকেলে শহরে বেড়াতে।

ঠোট উঠে ম্যারিয়া বলে—শহরে গিয়ে সেই মদ খাওয়া আর নাচনাচি করা তো। ভাল লাগে না ও সব আমার, আমি যাব না।

—আরেনা, না, আদ্যকে মদ খাব না তোমার কথা মিছি। যাব এক বার হাসপাতালে, “পল”কে দেখতে। সেই যে এর আগের চালানে একজন আহত সৈনিককে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, মনে নেই বুঝি তোমার। ঐ যে ছেলোটী টিপেডো ছুঁড়তে গিয়ে আঙনের হকার পুড়ে গিয়েছিল।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় ম্যারিয়া। জোদলের সঙ্গে তার খুব ভাব। U-59 সামুদ্রিক স্কর শেষ করে পোতাশ্রয়ে ফিরে এসে হুঁজনের দেখালাফাং হয়। অনেক কথা হয় হুঁজনাতে। আসন্ন বিদ্যায়ের পটভূমিকার ফণিকের মিলনটুকু ভরে উঠে বেদনার ও নিবিড়তার। ম্যারিয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জোদলে তার সন্মুখাচার কাহিনী, বিপদ-আপদের সবিস্তার বিবরণ। ওরা একসঙ্গে যায় শহরে বেড়াতে। কিন্তু জোদলে একবার মদের আড্ডার ঢুকে পড়লে ভুলিয়ে যায় সেখানে। কার সাধ্য তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ম্যারিয়া তখন একা একাই ফিরে আসে নো-আন্তানায়। তাঁরে এসে যে ক’দিন ছুটি পায় জোদলে, সে চায় মদ খেয়ে আর স্মৃতি করে উড়িয়ে দিতে। ম্যারিয়া চায় তাকে শান্ত এবং ভদ্র জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে, যথেষ্টাচার ও মাতুল্যমির পথ বন্ধ করতে। কিন্তু সহজ নয় সে কাজ।

ম্যারিয়া জিজ্ঞেস করে—কেন মদ খাও অত বল তো। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ব্যভিচারে নিজেকে যে একেবারে উজাড় করে ফেললে।

—মদ না খেলে লড়াই করা যায় না ম্যারিয়া। কোন একটা নেশা এবং উত্তেজনা সৈনিক-জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। প্রতি যুদ্ধে যারা যত্ন-বিভীষিকার মধ্যে বাস করে, জীবনের প্রতি মমতা এবং আশা তাদের কম। তাদের রুচি এবং আকাঙ্ক্ষা সহজেই নেমে আসে পাশবিকতার ভরে। সহজেই তারা হয়ে ওঠে উদাম, মাদকতা এবং উদ্‌যাদনার বলেই তারা উপেক্ষা করে যত্নভয়। নচেৎ সহজে কি কেউ মরতে চায়।

শানিকটা নিজের মনে কি যেন ভেবে নিয়ে ম্যারিয়া বলে—যেহে দাও এই সৈনিকবৃত্তি, কি হবে এমন হুঁজনা

উচ্ছৃঙ্খলতার ডুবে গিয়ে, তার চেয়ে বরং সংযত শান্ত জীবনের মধ্যে ফিরে এসো।

আবার হেসে জবাব দেয় জোদলে—আমি ছাউনেও দেশের আইন আমার ছাড়বে কেন? যত দিন দেহে শক্তি-সামর্থ্য থাকবে তত দিন আমি লড়াই করতে বাধ্য। হঠাৎ যত্না অথবা সাংঘাতিক জখম না হলে যুদ্ধের কবল থেকে আমাদের মুক্তি নেই। আর ছাড়বই বা কি করে এ পথ লোকে বলবে ভীক কাপুরুষ, সে অপবাদ সইব কেমন করে?

ফ্রয়লিন ম্যারিয়া অত্যন্ত দৃষ্টিতে ক্যান্ ক্যান্ করে চেয়ে থাকে জোদলের দিকে; কোন জবাব দেয় না। সেদিন বিকেলে ওরা হুঁজনে গিয়েছিল শহরে মিলিটারি হাসপাতাল দেখতে। ম্যারিয়ার মাথা ঘুরে যায়, অস্বস্তি বোধ করে। উঃ, কি মর্মান্তিক দৃশ্য। সারি সারি খাটায়র উপর শুয়ে আছে শত শত আহত যোদ্ধা। কারও মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কারও পা উড়ে গেছে, কেউ বহির, কেউ পহু, কারও বা মস্তক বিকৃত হয়েছে, কেউ কাতরাচ্ছে, গোড়াচ্ছে, ঘটকট করছে। কারও জীবনদীপ ফীণ হয়ে এসেছে, অচিরেই মিরীপিত হবে, তাকে আলাদা করে সরিয়ে ফেলবার জন্য ট্রেনার-বাহকেরা এসে ছাড়ির হয়েছে। ম্যারিয়ার বুক কাঁপে, অস্বস্তি বোধ করে, বলে—চল, আর ভাল লগিছে না।

বাইরে এসে যুদ্ধ হাওয়ার ও যেন নিশ্বাস কেলে বাঁচে। আইডোকরম্ আর ওয়ুবের গন্ধে হাসপাতালের আবহাওয়াটা যেন কেমন জমাট আর ভারী, তার সঙ্গে বিকলাদ আহতদের আর্দ্রমাদ মিলিত হয়ে কেমন যেন একটা হুঃসহ বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

তার পর দিন আবার ওরা গিয়েছিল শহরে। প্রথমে কথা ছিল, জোদলে মদ খাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি সঙ্কল্প রক্ষা করতে। একটা নাচ-বরের সামনে এসে মিশে গেল মদের আড্ডায়। তরুণী নর্তকীদের দেহসজ্জা ও অঙ্গ-ভঙ্গিতে যৌবন-মাদকতা ফেনিল হয়ে উঠেছে। তাদের ঘিরে ঘিরে ভিড় জমেছে স্বদেশ-প্রভ্যাগত পণ্টনগুলির, যেন গৈছে-ওঠা মদের উপর একদল তুফার্ত মাছি। জোদলের মনের তলায় যে ত্রুটি এবং বুড়ুছু লোভুপতা অনাড় ও নিষেজ হয়ে পড়ে থাকে দিনের বেলায় সম্ভা ও ভদ্রতার চাপে, সে যেন হঠাৎ মাতাল হয়ে ক্ষেপে ওঠে—মূলত মারী ও সুরার গন্ধ পেয়ে। সন্মুখ-পর্যটক বরছাড়া নাবিক, দীর্ঘ উপবাসক্লিষ্ট জানোয়ারের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ভোজ্যবস্তুর সন্ধান পেয়ে। জোদলে মিশে যায় মাতালদের ভিড়ে, ম্যারিয়া নিজেকে সরিয়ে রাখে মজ-লিসের এক পাশে।

পোতাশ্রয়ে ফেরবার শেষ গাড়ী রাজি এগারোটার। একবার মজলিসে ঢুকলে ছনিরাহুহ ভুলে যায় জোদলে। খেয়ালই ছিল না যে কালকে সকালেই আবার বেরতে হবে

জাহাজ নিয়ে সমুদ্র-যাত্রার। যে দু'দিনের ছুটি পেয়েছিল তার মেয়াদ আজই রাত তিনটের পর থেকে ফুরিয়ে যাবে। কাজেই আজ রাতেই তার পোতাশ্রয়ে ফিরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। কথাটা ম্যারিষা নিজেই আশ্রয় করে জানায় জোদলে। হাজার হলেও সৈনিক সে, ডিউটির সময় আসন্ন হয়ে আসছে এ খেয়াল হতেই হঠাৎ যেন সন্ধি ফিরে গেলে, ভবুখনি বেরিয়ে পড়ল নাচঘর থেকে, মদের শেষ গেলসটা এক চুমুকে শেষ করে। যে করেই হউক রাজি এগারোটার ট্রেন ধরতেই হবে। কাল প্রভাতেই আবার শুরু হবে সমুদ্র-যাত্রা, আবার সেই সীমাহীন নীল জল আর লক্ষ লক্ষ ভরদেব নৃত্য। তারই মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দিব্যরাজ টহল দিতে হবে শত্রু-শিকারের সন্ধানে।

নাচ-ঘর থেকে বেরিয়ে কমাভার জোদলে সোজা চলে এল ট্রেনে, সঙ্গে তার ম্যারিষা। গাড়ী ছাড়তে আর বড় দেরি নেই। দুপুর-রাতের গাড়ী, যাত্রীর ভিড় নেই বললেই চলে। পোতাশ্রয়ের টার্মিনাসে ওরা যখন এসে পৌঁছল, তখন নির্জন নিম্নক অঙ্কার জমাট বেঁধে নেমেছে। দূরে ডক আর নৌ-আস্তানার স্মৃতি-লাগান বিজলী বাতিগুলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। রাইফেলধারী স্ট্রল-হেলমেট-পর্যায় প্রহরী মাঝে মাঝে দেখা যায় হু'এক জন। মাত্র হু'এক যাত্রী, জোদলে আর ম্যারিষা নামল ট্রেনে। বানিক দু'ঘেতে হবে হু'এককে একসঙ্গে, তারপর হবে ছাড়াছাড়ি।

সত্যি কথা বলতে গেলে ম্যারিষার মনে মনে যে ভয় একটু না করছিল এমন নয়। বলিষ্ঠ পুরুষ জোদলে, তার ওপর মদ বেয়ে চূব হয়ে রয়েছে। জনহীন রাজির অঙ্কারে হঠাৎ ওর সংযম ও শিষ্টাচারের বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে কতক্ষণ।

ম্যারিষার ভয় মিথ্যা নয়। মদের নেশার সঙ্গে নিঃসঙ্গ তরুণীর নিভৃত সান্নিধ্য হঠাৎ যেন ওর মগজে আগুন বরিয়ে দিল। নিজেকে সে কিছুতেই সামলাতে পারল না। দৃঢ় হুষ্টিতে ধপ করে ম্যারিষার হাত চেপে ধরে বলে, ম্যারিষা, তুমি তরুণী, রূপসী, এই নিবিড় অঙ্কার রাজিতে আমার পাশে একাকিনী, আর আমি হচ্ছি একজন তুষাতুর হুবক। তুমি কি মনে কর আমার পক্ষে সংযত থাকা এতই সহজ।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে প্রথমটা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ম্যারিষা। জোদলে ওকে স্পর্শ করতেই তার সর্বদা ধব ধব করে কেঁপে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ দৃঢ় এবং কঠিন কণ্ঠেই জবাব দিলে, জোদলে তুমি তুলে যাচ্ছ আমি কে। আমি তোমার প্রজু জোয়াকিম শিয়ারের কথা। আমাকে অপমান করবার জন্য তোমাকে যথাযোগ্য শাস্তি পেতে হবে। তুমি তোমার মিলিটারী ডিসপ্লিন (সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলা) অমাত্য করছ।

বিকারপ্রসূত রোগী যেমন হঠাৎ চমকে ওঠে, ক্যাপ্টেন শিয়ারের নাম শুনে তেমনি চমকে উঠল জোদলে। তার শিথিল মুষ্টি খলিত হয়ে পড়ল, ম্যারিষার হাতের কব্জি থেকে। ওরা নিঃশব্দে চলল, বাকী পথটুকু কেউ একটা কথা বললে না। চৌরাতার কাছে এসে জোদলে চলে গেল রেই-ক্যাম্পের দিকে আর ম্যারিষা ফিরে এল বাংলোতে।

পরদিন সকালেই ঘুম ভেঙেছে ম্যারিষার। মনের মধ্যে কেমন যেন অশান্তি জমে উঠেছিল। গত রাত্রির অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ওর মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল, এমন সময়ে ভৃত্য এসে খবর দিলে, কমাভার জোদলে এসেছে—দেখা করতে চায়। ম্যারিষা তাকে সোজা ভেতরে আসবার জেতেই খবর পাঠাল। সামনে এসে দাঁড়াল কমাভার, যেন বড়ের শেষে নিম্নরঙ্গ শাস্ত সমুদ্র। কোন আলোড়ন, কোন চঞ্চলতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। স্থির মাথুঘোর স্নিগ্ধ মুষ্টি তার চোখে; মুখের ওপরে নেমেছে সৌম্য স্নহীতার আভা। ও যেন সম্পূর্ণভিন্ন মানুষ, গত রাত্রির প্রমত্ত মত্তপানী জোদলের সঙ্গে এর যেন কোন সঙ্গ নেই। বিনীত নম্র কণ্ঠে জোদলে বলে, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি ম্যারিষা, গত রাত্রির আচরণের জন্য সত্যি আমি অশ্রুস্ত। আমি তখন হিলাম মাতাল এবং অন্ধ। চলে যাবার আগে ক্ষমা চেয়ে যাই আমার আচরণের জন্য, মনে কোন গ্লানি রেখো না তুমি—এই আমার অনুরোধ।

জোদলের কথা শুনে চোখে জল ভরে উঠল ম্যারিষার। কমাভারের হাত ধরে ষড় করে সে তাকে নিয়ে বসাল একটা চেয়ারে, বললে, তুমি বলবার আগেই আমি ক্ষমা করেছি জোদলে। বিশ্বাস কর, আমি তোমার সত্যিই ভালবাসি।

বানিকক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে ম্যারিষা, আবার বলে—অনেকটা স্বগত উজির মত, তবে কি জান, আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি, তুমি শাস্ত ও হৃন্দর হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এস। তুমি ত্যাগ কর তোমার ঐ প্রমত্ততা, লোভুপতা ও বর্বরতা। আমার জীবনের স্বপ্ন, একখানি অনাড়ম্বর গৃহ, তার প্রভু হবে তুমি আর আমি হব গৃহিণী। আসবাব উপকরণ নাই—বা থাকল প্রচুর, সেখানে থাকবে অহরন্ত ভালবাসা, অপরিণীম ত্যাগ ও বৈধা। আমরা হব ইঁদুর বিদেহ ও প্রতিযোগিতার অতীত; আমাদের জীবনের ব্রত হবে পরসেবা। তেমন একটি শান্তির নীড় আমাদের পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব জোদলে?

অবিশ্বাস আর করুণার হাসি ফুটে ওঠে জোদলের মুখে। সে বলে, তোমার স্বপ্ন হৃন্দর ম্যারিষা, সম্ভব নেই তাতে। কিন্তু তা সফল হওয়া এ যুগে হয়তো একেবারেই অসম্ভব। শুনতে ভাল লাগে তোমার কথা, মনে একটা ক্ষণিকের আবেশও সৃষ্টি করে, কিন্তু তবু তা আমাদের যুগের নাগালের বাইরে। আশিপত্য আর কাড়াকাড়ি এ যুগের মূলকথা।

পরসেবা নয়, আত্মসেবাই আমাদের লক্ষ্য।—একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস কেঁলে, বড়ি দেখে কোদলে বলে, যাক ওসব ব্যর্থ আলোচনা। এবার ভা হলো উঠি, আটটার সময় আমার জাহাজ ছাড়বে।

কোদলে উঠে চলে গেল। হুয়ারের চৌকাঠ ঘরে উদাসীন দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে কয়েক মিনিট নিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যারিরা।

এপ্রিল মাসের শেষাংশে এক দিন বিকেল বেলায়, মর-ওয়ের উপকূলের অদূরে বার্গেন বন্দরের দক্ষিণে U-59 টহল দিয়ে ফিরছিল। সমুদ্রের জলে কেমন যেন কালো ধমধমে ছায়া, আকাশের রং বোলাটে, তরলগুলো ক্রমেই অধিকতর ক্ষীণকায় ও গর্জনশীল হয়ে উঠছিল। নাবিকেরা বুঝল বড়ের পুরাতাস, ব্যারোমিটারের চাপ কমে গেছে। হয়তো সন্ধ্যার আগেই সাইক্লোন উঠবে, এমন সময়ে হাইড্রোকোনে বরা পড়ল একটা জাহাজের শব্দ। একখানা ব্রিটিশ ডেপ্টার ছুটে চলেছে কিং বেগে, হয়তো বড় আসবার আগেই কোন বন্দরে আশ্রয় চায়। জাহাজের শব্দ শুনেই ইউবোটের নাবিকেরা উৎকর্ষ হয়ে উঠল। বেশীকণ প্রতীক্ষা তাদের করতে হ'ল না। পেরি-কোপের দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ল পতাকার। ভিন্ন-চার জন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, “ব্রিটিশ ক্ল্যাগ”, ব্যাল আর কিছু বল-বার দরকার নেই। নাবিকদের জানা আছে যথাকর্তব্য। প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজের নিজের কাজে, আক্রমণের জড় সকলেই প্রস্তুত। টর্পেডো টিউব তড়ি হয়ে গেছে ইতি-মধ্যেই। সাবমেরিনখানা ঘুরে ফিরে সতর্কপণে গিয়ে ৩৭ পেতে বসল ডেপ্টারের পথের উপর। টর্পেডোর রেজের মধ্যে এসে পড়বার অপেক্ষামাত্র, তারপর নিকিণ্ড হবে সেই ভয়ঙ্কর হত্যাবাণ।

ঐ যে এসে পড়েছে—দেখি নেই, সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টেপা হ'ল টর্পেডো টিউবের, একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। বিদীর্ণ হয়ে গেছে ডেপ্টারখানা। ডুবছে বীরে বীরে, ইউবোটের নাবিকদের মুখে উল্লাসের হাসি। কিন্তু লহসা একি। সমুদ্রের ওলদেখ থেকে যেন বিপুল এক জলন্তস্তের প্রচণ্ড শক্তি সাবমেরিনটাকে ছ ছ করে ঠেলে তুলে দিচ্ছে আকাশের দিকে। সর্কমান, শক্ত ডেপ্‌ চার্জ (জলবোমা) মেরেছে। সত্যিই তাই,

ইউবোটখানারও অস্তিত্ব নশ। বাম-পার্শ্বভাগ কেটে গিয়ে ছ ছ করে জল চুকছে। বাঁচবার আশা নেই। সমুদ্রের উপর তখন বড় ঘনিরে এসেছে, বাতাসের জ্বল গর্জন মুহূর্তে হৈকে চলছে, তার সঙ্গে মাতাল হয়ে কেপে উঠেছে উত্তর তরঙ্গদল। ডুবন্ত ইউবোটের ডেকের উপর থেকে ওয়ারলেস অপারেটর কমাগন্ত রেডার-সংকেত পাঠাতে লাগল S.O.S.....S.O.S... S.O.S.....(আমাদের জীবন রক্ষা কর)।

সেই মর্মান্তিক সংবাদ এলুম নদীর মোহনার নৌ-আভ্যায় ক্যাপ্টেন শিয়ারের উঁচু বেতার মাথলেও বরা পড়েছিল। তখন সেখানেও চলছে প্রচণ্ড সাইক্লোন। সাগর-সৈকত আর অরণ্যময় প্রান্তরের উপর দিয়ে মাতাল হাওয়া দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। ক্যাপ্টেনের আদেশ পেয়ে তৎখুনি ছুটল এক দল রেস্‌কু শিপ (উদ্ধারকারী জাহাজ) বড় তুকান অগ্রাহ করে ঝুঁকু সমুদ্রের মধ্যে।

ম্যারিরা শুনেছিল তার বাপের কাছে, কমাগন্ত কোদলের জাহাজ ডুবছে ভাগ্যরয়্যাক প্রণালীর কাছাকাছি। ম্যারিয়ার বুকের মধ্যেও বড় ঘনিরে এল, আকাশ ও নিগন্তকোড়া বড়ের সঙ্গে আঁক ওর অন্তর ও বাহির একাকার হয়ে গেছে। উৎকর্ষ ও উবেগে তার প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠল গুরুিষহ।

পরদিন বড় বেগে গেছে। আকাশ হয়েছে উজ্জ্বল সুনীল-সোনালী রৌদ্রে চারদিক বলমল করছে। বিপদের আশঙ্কা আর নেই। সামুদ্রিক পক্ষী ‘সী-গাল’ সার বেঁধে আকাশের গারে ডানা ছড়িয়ে অলস মেঘের মত মধুর গতিতে ভেসে চলেছে অদূর সমুদ্রের পারে। হাওয়ার দাপট সইতে না-পেরে কয়েকটা স্লুপ আর কিসিংট্রলার আশ্রয় নিয়েছিল নদীর মোহনায়, তারাও ক্রমে ক্রমে নৌকর তুলে ছেড়ে বাচ্ছে। একে একে ফিরে এল রেস্‌কু-শিপের বহর। U-59-এর কয়েক-জন নাবিক রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু কমাগন্ত কোদলের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। সে তলিয়ে গেছে আটলান্টিক মহা-সমুদ্রের অন্তল গর্ভে।

সেদিন ম্যারিরা সারা সকাল ঘরে সমুদ্রভট আর অরণ্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পাগলের মত একা একা টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। বারংবার তার চক্ষু ছুঁ অশ্রু-দ্রাবিত হ'ল, আর বারে বারে সে মুছে ফেলল।



পণ্ডিতারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১২ এবং '১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের হৃদয় কিন্তু গোপন পরিচালনায় বাংলার বিপ্লববাদ পুরানমে চলিয়া ছিল। তাঁহার অধিকাংশ পত্রই “কোডে” (সাহিত্যিক অক্ষরে) আসিত। আমরা তদনুযায়ী কার্য করিতাম। তিনি অর্থ সম্বন্ধে অথবা অল্প কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিপন্ন মনে করিলেও, আমাকে পত্রযোগে তাহা জানাইতেন।

আমি তাঁহার অর্থাত্বে কথ্য পণ্ডিতারী হইতেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম। শুধু অর্থাত্বে নহে—বস্ত্রাত্বে অত্যন্ত দুঃখও স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আমি অতি দ্রুত তাঁহাকে কিছু টাকা এবং বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিলাম। তিনি লিখিলেন, “তারযোগে তোমার টাকা এবং পত্র ও বস্ত্রাদি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়াছি।”

“Your money by wire and letter and clothes reached safely.”

এই সময়ে তাঁহার যে দারুণ অর্থকষ্ট, দূরে থাকিয়া তাহা সম্যক বুঝি নাই। তিনি এক প্রকার নিঃস্ব অবস্থায় পণ্ডিতারী পৌছিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি চিরদিন ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া চলিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। সঞ্চয়-প্রবৃত্তি তাঁহার কোনদিন ছিল না। গীতার মন্ত্রভাব—ভগবানের উপরেই যোগ-ক্ষেমবহনের ভার দিয়া চলার সাধন-নীতিটাই যেন তাঁর তখনকার জীবনে অক্ষরে-অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমার নিকট তাঁহার যেটুকু অর্থ চাওয়া, তাহার মধ্যেও ঈশ্বর-প্রসাদই ছিল—নতুবা তাঁহার সেই দাবিটুকু পূরণ করার প্রাণ লইয়াই আমার পক্ষে নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না।

পণ্ডিতারী গিয়াই তিনি কোন এক বন্ধুর কিছু সহায়তা পাইয়াছিলেন—সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমি তাঁহাকে কতখানি দিতে পারিব, সে বিষয়ে সবিশেষ ধারণা করার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের চিন্তা বাধ্য হইয়াই করিতে হইত; কিন্তু কোথা হইতে অর্থ তাঁহার নিকট আসিবে; তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তবে তাঁহার কার্যের জ্ঞান প্রচুর অর্থ এক দিন আসিবেই—এই বিষয়ে কোনরূপ সংশয় তিনি পোষণ করিতেন না। এক মাদ্রাজী বন্ধু ১০০০ টাকা তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং যাহাতে পণ্ডিতারী বাসকালে অর্থাত্বে তাঁহাকে কোনরূপ কষ্ট

পাইতে না হয়, তাহারও চেষ্টা করিবেন, আশা করিয়া ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বন্ধুটির প্রতিশ্রুতি ও আশা কোনটাই সফল হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে পত্রযোগে আমায় জানাইয়াছিলেন :

“The last time he came, he brought a promise of Rs. 1000 in a month and some permanent provision afterwards, but the promise like certain predecessors may not yet be fulfilled and we sent him for cash. But though he should have been here three days ago, he has not returned and even when he returns, I am not quite sure about the cash and still less sure about the sufficiency of the amount.”

শ্রীঅরবিন্দ শিশুকাল হইতেই ভগবদ্বিখাসী ছিলেন; সেকথা পূর্ব-পূর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। এই পত্রেও তিনি আমায় লিখিয়া জানাইলেন সকৌতুকে তাঁহার নিজের মনেরই কথা—“ভগবান্ যে ব্যবস্থা করিবেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু তাঁর এই দুই স্বভাবটুকু দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তিনি শেষ মুহূর্ত্তটি পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ছাড়েন না।”

“No doubt, God will provide, but He has contracted a bad habit of waiting till the last moment.”

আমি তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া অবধি অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কোন প্রকারে তাঁহাকে কিরূপে অর্থ পাঠাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার যৎকিঞ্চিৎ টাকা ও কিছু বস্ত্রাদি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। শুনিয়া আসিয়াছিলাম—তাঁহাদের পাঁচ জনের জ্ঞান প্রতি মাসে অন্ততঃ ৭৫ টাকা খরচ হয়, আর শ্রীঅরবিন্দের নিজের ব্যক্তিগত খরচের জ্ঞান অন্ততঃ ১০ টাকা হাতে থাকা উচিত। আমি এই ৮৫ টাকা প্রতি মাসে পাঠাইবার জন্য অনুপ্রাণিত হইলাম। আমার আশা পূর্ণ হইল এবং প্রথম দফা টাকা যথারীতি প্রেরিত হইলে তিনি লিখিলেন :

“তুমি এবারকার ৮০ টাকা এবং মার্চ মাসের জন্য ৮৫ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া আমার খুবই আশু হইল।”

“It is a great relief to us that you are able to send Rs. 80/- this time and Rs. 85/- for March.”

শ্রীঅরবিন্দের এই আকৃতি আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সেবার অবদান যোগাইবার প্রেরণা জাগাইয়াই তিনি ধীরে ধীরে প্রকাশ করিলেন—আমার মধ্য দিয়া কত অর্থসংগ্রহ ও অর্থগণ্যের উপায় সৃষ্টির প্রয়াস—তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হই। সে যুগে

তাঁহার অর্থসংগ্রহের সকল প্রচেষ্টাই আমাকে কেন্দ্র করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিল। বাংলায় রাষ্ট্র-সাধনাও যেটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছি তাহাও শ্রীঅরবিন্দের করুণায় সম্ভবপর হইয়াছিল। আমি তাঁর কত আপনার জন মনে করিয়া তিনি আমার উপর একরূপ ক্ষুদ্র দাবি রাখিতেন, সেকথা ক্রমে বলিতেছি। তিনি চাহিতেন প্রচুর অর্থ। আমি তাঁহার কতটুকু দাবিই-বা পূরণ করিয়াছি—তাঁহার চাওয়ার মূল্য সেদিন তেমন করিয়া বুঝি নাই। আজ ভাবিয়া সে চাওয়ার কুলকিনারা পাই না। সেদিন কিন্তু বুঝি আমার সাধনা দিবার ছলেই তাঁহার দাবি পূর্ণ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস—টুকুই তাঁহার নিকট যেন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি আমার নিকট মাসিক ৮৫ টাকা পাইবেন—এই সামর্থ্যসৃষ্টির পর, তিনি আমার তাঁর এক পত্র লইয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ী ম্যাকা ঘাব্সারের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য লিখিলেন :

“এম’ অর্থাৎ মারাত্মা বন্ধুকে একখানি পত্র দিলাম—আমার জন্য যদি তিনি কিছু দেন, অবিলম্বে তাহা আমার নিকট পাঠাইও।”

“I send enclosed a letter to our M. friend. If he can give you anything for me, please send this without the least delay.”

শ্রীযুক্ত ম্যাকা ঘাব্সার একজন অবাঙালী ভদ্রলোক। কলিকাতার বড়বাজারে তাঁহার কাপড়ের গুদাম ছিল। তিনি বাস করিতেন বালিগঞ্জে। আমি খুজিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রথমে আমার পুলিশের চর বলিয়া বিদায় দিলেন, শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানি কিন্তু সঙ্গে রাখিলেন। তাহার পরদিন আমি আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। এবার বুঝিলাম তিনি সংবাদ লইয়া আমার কথা বিশেষ ভাবেই অবগত হইয়াছেন। তার পর শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন চন্দননগরে কি ভাবে ছিলেন এবং কিরূপেই বা পণ্ডিচারী গমন করিলেন, বিশেষ ভাবেই তাহা আমার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু টাকা তিনি আমার হস্তে দিলেন না, সহাস্তে বলিলেন—“আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিয়া টাকা দিতেছি না, ইহা আপনি মনে করিবেন না। শ্রীঅরবিন্দের নামে অনেক টাকাই মধ্যবর্তী লোকের হাতে পড়িয়া শেষ হইয়াছে—ইহা বুঝিয়াই আমরা স্থির করিয়াছি, নোজানুজি ভাবেই তাঁহার হাতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিব, অন্য প্রকারে নহে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। তাঁহাকে লিখিয়া জানাইতে পারেন—আমি ১০০০ টাকা তাঁহাকে ‘গ্রীওলে কোম্পানী’র মাধ্যমে প্রেরণ করিব।” আমি নিশ্চিন্ত হইয়া চন্দননগরে ফিরিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এই

কথা জানাইলাম। তিনি যথাসময়ে ‘গ্রীওলে কোম্পানী’র নিকট হইতে টাকা পাইয়াছেন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত ম্যাকা ঘাব্সারের টাকা পাইয়া তিনি এইবার পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ৪১ নং রু দে ফ্রান্সোয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। পূর্ববর্তী বাড়ীওয়ার ১২০ টাকা ভাড়া বাকি ছিল। এই সময়ে বাড়ীওয়ার বিরুদ্ধে কোন এক পাওনাদার নালিশ রুজু করায় এই টাকা শ্রীঅরবিন্দ নিজের হাতেই রাখিয়াছিলেন—এই কথাও তাঁহার পত্রেই জানিয়াছিলাম।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি চন্দননগর ফিরিয়াই শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় বিপ্লবের কাজে প্রবল ভাবে লাগিয়া যাই। শ্রীঅরবিন্দকেও এই কাজে কতকটা জড়াইয়া ফেলি। তখন অনন্যোপায় হইয়াই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সেই সময়ে পণ্ডিচারী “ফ্রী পোর্ট” বলিয়া বিদেশ হইতে বহু দ্রব্য আমদানী হইত। আমার বিপ্লবী সহযোগিগণ স্থির করিলেন—পণ্ডিচারী হইতে রিভলভার আনা হইবে। ইহার ব্যবস্থার ভার বন্ধুরা আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমার বাধ্য হইয়াই এই বিষয়টি শ্রীঅরবিন্দকে জানাইতে হইল। তাঁহাকে ছয়টি রিভলভার ক্রয় করিবার জন্ত নিবেদন করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমার দাবি অপূর্ণ রাখিলেন না। কিন্তু স্বাভাবিক সতর্কতার বশে, রিভলভারগুলি হস্তগত হইলে তাহা তিনি মাটিতে পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। এইগুলি আমাদের নিকট পাঠাইবার সুযোগ বহুদিন মিলিল না। পণ্ডিচারীতে অনেক বন্ধু তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট তিনি যে তথ্য যোগ-সাধনের নিমিত্তই আশিরাছেন, এই কথাই বলিতেেন। বাংলার বিপ্লবীদের সহিত তাঁহার যে সংযোগ থাকিতে পারে, এই কথা তিনি একেবারেই গোপন রাখিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে দিয়া ঐ রিভলভারগুলি অতি সন্তুর্ণণে ও স্নকৌশলে লইয়া আসা হয়। কিন্তু মাটিতে এক বৎসরকাল প্রোথিত থাকায় যন্ত্রগুলি একপ্রকার অকেজো হইয়াই যায়। শ্রীঅরবিন্দ অতি সতর্কতার সহিত বাংলার বিপ্লব-সংহতির সহিত যোগ রাখিয়া চলিতেন, তাঁহার পত্রে এই কথার সাক্ষ্য দিবে :

“I do not write to you this time about the despatch of the books, because that is a long matter and would delay the proofs, which have already been too long delayed. But I shall write a separate letter on that subject. I have also to write about your Tantric Yoga. But I think I shall have to await what else you have to tell me on that subject before doing so.”

ইহার অর্থ অল্প কেহ বুঝিবেন না। আমি বুঝিলাম

তিনি 'গ্রন্থ' অর্থাৎ 'রিভলভারগুলি' পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন এবং আমাকেও তিনি তাত্ত্বিক যোগ অর্থাৎ বৈপ্লবিক কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন শুধু সাংকেতিক ভাষায় নয়, বিপ্লবের রাষ্ট্রসাধনাকে যথার্থই বীরাচারী শক্তিসাধনা বলিয়াই গণ্য করিতেন আর তাহার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির নয়, জাতির সমষ্টিগত মুক্তি ও ভুক্তি। তাঁহার সম্মুখে সেদিন কত বৃহৎ কর্ম প্রতীক্ষারত, তাহা বুঝি নাই এবং সেইজন্তই তাঁহার চিন্তা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না। তিনি বেরূপ আদেশ করিতেন, তদনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই আমার স্বভাব ছিল। আমার বিপ্লবী বন্ধুগণ কিন্তু আমায় পণ্ডিতারী হইতে রিভলভারগুলি আনাইবার জন্ত ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিলেন। আমি পরিশেষে তাহা কিরূপে আনাইয়াছিলাম, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সময়ে শ্রীমহম্মদের চক্রবর্তী মহাশয় আর. এস. শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠান। আমি সেদিন বুঝি নাই এই শর্ম্মা পুলিশ বিভাগেরই একজন গুপ্তচর। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ত এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পাঠান হয়। এই শর্ম্মা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ পর পত্রে জানাইলেন :

"Your R. S. Sarma I hold to be a police-spy. I have refused to see him, because originally when he tried to force his way into my house and win my confidence by his extravagances, I received a warning against him from within which has always been expected. This was confirmed afterwards by two facts: first, that the Madras police betrayed a very benevolent interest in the success of his mission; secondly, that he came to Pondichery afterwards as sub-editor of a new Pondichery paper, 'The Independent' subsequently defunct and replaced by another, the 'Aryan,' belonging to the same proprietor, who has been acting in concern with the British police agents in Pondichery. In the paper he wrote a very enervating and deprecatory paragraph about me (not by name but by allusion), in which he vented his spite at his failure."

অর্থাৎ,

'তোমার প্রেরিত আর. এস. শর্ম্মাকে আমি একজন পুলিশের গুপ্তচর' বলিয়াই মনে করি। আমি তাহার সহিত দেখা করি নাই; কারণ প্রথম যখন সে আমার বাড়ীতে জোর করিয়া ঢুকিতে চায় ও অতিশয়োক্তি দ্বারা আমার বিশ্বাস উপাদানের চেষ্টা করে তখন তাহার বিরুদ্ধে আমি অন্তর হইতেই সতর্ক হইবার সঙ্কেত পাই। এই রকম সঙ্কেত আমি প্রায়ই পাইয়া থাকি। এই সঙ্কেতেরই সমর্থন মিলে পরবর্তী হইট ঘটনায়। প্রথমতঃ, মাদ্রাজী পুলিশ যে শর্ম্মার উদ্দেশ্য-নিষ্টির ব্যাপারে বেশ উৎসাহশীল, তাহা তাহাদের অজান্ত-সারেই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার পরে সে যখন আবার

পণ্ডিতারীতে আসে, তখন অধুনা-বিভূষিত "দি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট" নামে এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। পরে সে ইহার স্থলাভিষিক্ত "এরিয়ান" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-এইরূপ বলে। এই শেষোক্ত পত্রিকাখানিও একই স্বত্বাধিকারীর কাগজ, যিনি পণ্ডিতারীর ব্রিটিশ পুলিশ-প্রতিদ্বন্দ্ব-গণের সহিত প্রকাশ্যে সংযুক্ত হইয়া কাজ করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পত্রিকায় ঐ ব্যক্তি আমার নাম উল্লেখ না করিয়াও আমার উদ্দেশ্যে একটি খুব হীনতাজনক নিন্দোক্তি প্রচার করে, যাহাতে তাহার ব্যর্থতারই জালা প্রকাশিত হয়।"

শ্রীঅরবিন্দ এই সকল কথা জানাইয়া, ভবিষ্যতে এই প্রকার অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে আমায় নিষেধ করেন। এই সময়ে পণ্ডিতারীতে যে সকল রাষ্ট্র-নৈতিক পলাতক বাস করিতেন, তাহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ পুলিশের অহুযোগে ফরাসী গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হন। শ্রীঅরবিন্দকেও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হইল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তদানীন্তন ফরাসী পণ্ডিত সাহেব ও জঙ্গসাহেবের সহায়তায় এই প্রয়াস ব্যর্থ করেন। এই বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার এক পত্রে আমায় লিখেন :

"Other difficulties are disappearing. The case brought against the Swadesies. (No one in this household was included in it, altho' we had a very charmingly polite visit from the Parquet and Judge d'Instruction) has collapsed into the nether region and the complainant and his son have fled from P.T. (Pondichery territory) and become like ourselves 'political refugees' in C'lore (Cuddalore)"

ভি. ভি. এস. আয়েঙ্কার নামে একজন তরুণ বিপ্লবী পণ্ডিতারী আনিয়া উপস্থিত হইলে, ইংরেজ পুলিশ ফরাসী গবর্নমেন্টের নিকট তাহাকে ধৃত করার জন্ত অহুরোধ জানায়। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী বলিয়া তাহার পণ্ডিতারীতে ছিলেন, তাহাদের সকলের উপর ফরাসী গবর্নমেন্ট তদন্ত শুরু করেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও তাঁহার অতুল প্রতিভায় স্বদেশীরা সে ব্যতায় রক্ষা পান এবং দীর্ঘ দিনের জন্ত পণ্ডিতারী স্বদেশীদের নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়।

আমি বিপ্লবের কর্মে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকিতাম, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ চাহিত সাধনার নির্দেশ। শ্রীঅরবিন্দকে শুধু আত্মসমর্পণ যোগের গুরুস্থানীয় ভাবিয়াই পরিতুষ্ট হই নাই, তাঁহার কার্যে আত্মনিবেদন করার জন্য আন্তরিক যত্ন করিতাম। তাঁহার কর্ম শরীর, প্রাণ, মন দিয়া সিদ্ধ করিতে পারিলে, আপনাকে তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছি বলিয়া মনে হইত। আমি পত্রেরই তাঁহার সাধন-নির্দেশ প্রার্থনা করিতাম। এক

পত্রে তিনি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার অন্তরে চির-গ্রথিত হইয়া আছে। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন তিনি যে কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না, ভগবৎপ্রেরণাই তাঁহার জীবনকে পূর্ণ শুল্কিত করিয়া লইতেছে—পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, তাহা পাঠক-পাঠিকারা অল্পভব করিতে পারিবেন। তিনি লিখিলেন :

"There is no reason for not writing to you. I never now-a-days act on reasons, but only as an automaton in the hands of another. Sometimes He lets me know the reasons of my actions, sometimes He does not, but I have to act or refrain from action all the same, according as He wills.

I shall write nothing about sadhan, etc., until I am out of my present struggle to make the Spirit prevail over matter and circumstances."

তাঁহার বাস্তব অভাব কতখানি তাঁহার ইয়ত্তা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। তিনি মাণিকতলা বাগান-রিক্রয়ের টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিব। তাঁহার বস্তুভাবের পরিচয় তাঁহার পত্রাংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"There is the pressing cry for clothes in this quarter, as these articles seem to be with us to remind us constantly the paucity of matter."

এই বস্তুভাব দূর করার জন্ত মাঝে মাঝে আমি কাপড়ও পাঠাইয়া দিতাম। তিনি মাকার ঘাব্দারের ১০০০ টাকা পাইয়াও আর্থিক ব্যাপারে নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই। আমিও যাহা পাঠাইতাম, তাহা তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। আজ বিশ্বয় বোধ হয়—জাতির নিকট হইতে কতটুকু দান গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত তথা বিশ্বের মানব-জাতির জন্য কি অসাধারণ প্রতিভার অবদানই না রাখিয়া গেলেন!

এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের *Soul of India* নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাহা হাতে পাইয়াই আমায় জানাইলেন—ভগিনী নিবেদিতার *My Master as I saw him* পুস্তকখানিও তাঁহার নিকট যেন প্রেরণ করা হয়। আরও তিনি চাহিলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদ। তিনি ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য, বিপ্লববাদের অন্তরালে নিজেকে কি ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার পত্রের ছত্রে ছত্রে তাহা প্রকাশ পাইত। আমি ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্কেতগুলিই বড় করিয়া ধরিতাম—আর তাঁর বৈপ্লবিক নির্দেশগুলি বিপ্লবীদের জানাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম।

এই সময়ে রাসবিহারী বসু আমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার নিবিড় সম্বন্ধের কথা বিদিত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দের পত্র হইতেই

"automaton" তত্ত্বটি আহরণ করিয়া তিনি আমার নিকট বিশেষভাবে তাহার মর্ম বুঝিয়া লন। ইহার পর এই 'automaton' বা যন্ত্রসাধনা তাঁহার জীবনে কি ভাবে মুক্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ভারতের রাষ্ট্রসাধনার ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে চিরদিন অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

রাসবিহারী যন্ত্রের হাতের যন্ত্রের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই তিনি বসন্তকুমারকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে নগর-প্রবেশকালে লর্ড হাডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তিনি আহত হইলে উৎসব বন্ধ, দিল্লীর দরবার পণ্ড হইয়া যায়। আজ বলিতে বাধা নাই যে, এই বোমা নিক্ষেপ করেন নারীবিশেষ তরুণ বসন্তকুমার আর রাসবিহারীই ছিলেন পার্শ্বসারথির মত। তাঁহার পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক। এই ঘটনার জন্য আমরা শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ নির্দেশ গ্রহণ করি নাই; কিন্তু ঘটনাস্থে তিনি খুশী হইয়াই যে কথা লেখেন, তাঁর পত্র হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"I welcome it as a sign of some preliminary effectiveness thro' you. In this direction, in which hitherto everything has gone against us, also as we have proof of several . . . that the quantity of your power and your work is greatly improving in effectiveness and success."

অর্থাৎ,

"তোমার ভিতর দিয়া কিছু প্রাথমিক কার্যকারিতার লক্ষণরূপে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। এই দিকে যেখানে এতাবৎ সবই আমাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে, সে ক্ষেত্রে ইহা তোমার শক্তি ও কর্মের গুণোৎকর্ষ প্রমাণ করে—তোমার কর্ম কার্যকারিতার সাক্ষ্যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে।"

রাসবিহারী বসু ও ঢাকার অমূল্যলীল সমিতির সাহায্যে ধীরপদে আমায় বিপ্লবক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এদিকে রমেশবাবুর ঋগ্বেদের অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দকে পাঠানো হইল। তিনি পুনরায় আমায় পত্রযোগে জানাইলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর নিকট হইতে তাঁহার জন্য কিছু অর্থ ভিক্ষা করিতে। আমি শ্রীঅরবিন্দের পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেশবন্ধু অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর আর এক দিন আমায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বলিলেন। আমি যথাকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার স্বপ্রসিদ্ধ "সাগর-সঙ্গীত" গ্রন্থখানি বাহির করিয়া বলিলেন—

"শ্রীঅরবিন্দ যদি ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দেন, তবে আমি সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে এই কর্মের জন্য দিব।" শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলে, তিনি "সাগর-সঙ্গীত"

গ্রন্থখানি চাহিয়া পাঠাইলেন। মিত্রাক্ষরে ও অমিত্রাক্ষরে “সাগর সঙ্গীতে”র দুই প্রস্থ ইংরেজী অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দই করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু এই বাবদ উপরোক্ত অর্থসাহায্যও যথাকালে করিয়াছিলেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট বাংলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। মৃদলধারে বৃষ্টি—বর্ষণের বিরাম নাই। কুপ তড়াগ পুষ্করিণী ভাঙিল। দামোদর নদে প্রবল বন্যা দেখা দিল। পূর্বকুলের অধিবাসিবৃন্দ গৃহহীন হইল। বাংলার বিপ্লবী তরুণগণ সেবাত্রিতে তৎপর হইলেন। শ্রীযুক্ত বি. কে. লাহিড়ীর উত্তোগে উত্তরপাড়ার শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ঢাকার শ্রীমাখনলাল সেন মহাশয় সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম। এই সময়েই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহিত আমার প্রথম পরিচয়। এই বাঘা যতীনের কথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমি প্রথম শুনিয়াছিলাম। তিনিও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বীর। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পরবর্তী ঘটনাগুলি স্মরণে এই ক্ষেত্রে উল্লেখ নিম্নয়োজন। বর্দ্ধমানের কাজে আত্মনিয়োগ করার কালে আমি দারুণ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হই। বেহুশ জরাবস্থায় আমি শ্রীঅমৃতলাল হাজরা ওরফে শ্রীশশাঙ্কের উত্তোগে বর্দ্ধমান হইতে চন্দননগরে নীত হই। আরোগ্যলাভ করিলে, পূজার পর বিপ্লবিগণের এক সভায় স্থির হয় যে, পণ্ডিতারী হইতে আমায় ইন্দোচীনে যাইতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরিত রিভলভারগুলি নষ্ট হওয়ায় এবং পণ্ডিতারী হইতে অস্ত্র-সংগ্রহের কাজ বিশেষ অগ্রসর না হওয়ায় ইন্দোচীন হইতে প্রচুর অস্ত্রাদি বাহাতে চন্দননগরে আসিয়া পৌছায়, তাহার আয়োজন আমাকে করিতেই হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-যোগ সেদিন আমায় পাইয়া বসিয়াছে। তাঁহার আত্মসমর্পণ-যোগে জীবনের মমতা রাখিতে নাই। আমি ভাবিয়া স্থির করিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অহুমোদন পাইলে, আমি ইন্দোচীনে গমন করিব। বন্ধুদের এই কথা স্পষ্ট জানাইলাম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা শেষ হইলে, আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। আমায় পুরানন্দপুর সাহেব সাজান হইল। স্বচিকিৎস গুণ্ডরাজি বিসর্জন দিয়া মুখমণ্ডলের শ্রী পরিবর্তিত করা হইল। স্বদর্শন চট্টোপাধ্যায় আমার আদিলী সাজিয়া মাদ্রাজ মেলে আমায় তুলিয়া দিল। মাদ্রাজ ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে আমার পূর্বপরিচিত বন্ধু পার্থসারথির বাসায় গিয়া উঠিলাম। প্র্যাটফরমে আত্মকৃত অপরাধে যে বিপদ

ঘনাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহাতে এই ক্ষেত্রে নিরাপদ বিশ্রাম সম্ভবপর হইল না। মাদ্রাজের প্র্যাটফরমে গাড়ী পৌছিলে এক ব্যক্তি আমায় যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল আমার নাম M. Ray (এম্. রে), কলিকাতার চূণাগলি অথবা চৌরঙ্গীতে আমি বাস করি না, চন্দননগর আমার বাসস্থান ও আমি একজন হিন্দু—এই সংবাদ-বিভ্রাৎ-গতিতে পুলিশের নিকট গিয়া পৌছায়। অল্পকাল-মধ্যে পার্থসারথির বাড়ীটি পুলিশ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়। আমায় খিড়কীর দ্বার দিয়া পার্থসারথি বাহির করিয়া ষ্টেশনে এক গাড়ীতে তুলিয়া দেন। তারপর অতি প্রত্যাষে পণ্ডিতারী যখন পৌছাই, তখন প্রবল বৃষ্টিধারা নামিয়াছে। আমি সাহেবী পোশাকে সরাসরি শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনে উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। পার্থসারথির জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনিবাস আয়েদার এই সময়ে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে পণ্ডিতারীতে বাস করিতেছিলেন—তাঁহারই নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও আমায় এক বিন্দু কালহরণ করিতে না দিয়া, শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনে পৌছাইয়া দিলেন। গুপ্তচরবৃন্দ আমায় দেখিল, কিন্তু একজন সাহেব আসিয়াছে, এই সংবাদই ব্রিটিশ পুলিশ আপিসে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীঅরবিন্দের আরাসস্থলে প্রবেশ করিয়াই আমি সম্মুখে এক তরুণকে দেখিলাম। তাহার নাম শুনিলাম অমৃত। সে আমাকে বিজয় নাগের সহিত দেখা করাইয়া দিল। তারপর আসিল নলিনী, মণি ও সৌরীন—ইহারা সকলেই আমার পরিচিত বন্ধু। আমার সাহেবী বেশ দেখিয়া সকলেই সেকৌতুকে তারিফ করিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দ ঘর হইতে বাহির হইলেন। আমি নতজাহ্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইতে পারিলাম না, সাহেবী পোশাকে তাহা বাধিল। তিনি আমায় দুই বাছ দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, মস্তক আত্মাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিরাপদে আসিয়াছ ত?”

আমি তাঁহাকে সকল কথাই বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, “সাহেব সাজিয়া গোপনে আসিতেছ, নামটাও তো ভাড়াইতে হয়। আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার গরুটুকু যদি রহিল, তো সাহেব সাজার প্রয়োজন কি?” আমি অপ্রস্তুত হইলাম। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম। তারপর দেড় মাস কাল শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে তাঁহার সান্নিধ্যে পণ্ডিতারীতেই থাকিতে হইল। ইন্দোচীনে যাওয়ার জন্য তাঁহার আদেশ মিলিল না।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীমুশীলচন্দ্র ঘোষ

৩

পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত কুটীরশিল্প আছে, নানা কারণে সেগুলির অবস্থা একরূপ মৃতপ্রায় বলা চলে। উপস্থিত যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে ক্রেতার অভাবে এবং অত্যধিক দামের জন্ত তাহাও কাট্টি হইতেছে না। পূর্বে যে সমস্ত কুটীরশিল্প ছিল তাহাদের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে এবং এখনও যেগুলি আছে সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে হইলে পল্লী-অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক শক্তি সরবরাহ করা দরকার, নচেৎ উৎপাদন-ব্যয় কমিবে না। তাহা ছাড়া এই সমস্ত কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদি বাহাতে উপযুক্ত দামে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থাও প্রদেশ-সরকারের করা আবশ্যিক। শ্রম-শিল্প ও বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কোথায় এ বিষয় পরে আলোচনা করিব। বর্তমানে সাধারণ বাঙালীর অর্থ-নৈতিক দুর্গতির প্রধান ও সুস্পষ্ট কারণ নিয়ে দিতেছি। আর এই কারণেই এই প্রদেশকে একটি সমস্তা-প্রধান প্রদেশ বলা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ পাট ও কয়লা-ভিন্ন অল্প বিশেষ কিছু পণ্যদ্রব্য অপর প্রদেশে রপ্তানি করে না, পাট ও পাটজাত দ্রব্য বাহা অপর প্রদেশে এবং বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার মূল্যের সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পায়। কয়লা বাহা উৎপন্ন হয় তাহার বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে ভারতীয় রেলপথে ব্যবহৃত হয়, কতকটা বিদেশে রপ্তানি হয় এবং সামান্য পরিমাণ অপর প্রদেশে চালান যায়।

নিয়ে প্রদত্ত হিসাব হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসরে উপস্থিত বাজার ও কন্ট্রোল দর অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যব্যবহাৰ্য্য দ্রব্যের জন্যই অপর প্রদেশে চলিয়া যায়। উক্ত হিসাবের মধ্যে পাকিস্থান হইতে রেল ও ষ্টীমারযোগে এবং বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত খাদ্য ও নিত্যব্যবহাৰ্য্য দ্রব্য আমদানী করা হয় যথা—চাউল, গম, ময়দা ইত্যাদি, এবং বাহা এই প্রদেশে ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্য ধরা হয় নাই। তাহা ছাড়া অপর প্রদেশ হইতে সূতীবস্ত্র, লবণ, ঘৃত, মাখন, মৎস্য, ফল, আলু ও নানারূপ তরিতরকারী বাহা আমদানী করা হয় তাহার মূল্যও ধরা হয় নাই; কারণ কোনও সরকারী পুস্তিকায় উহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। এই সকল দ্রব্যের মূল্যও বহু কোটি টাকা হইবে। এই বাৎসরিক অর্থক্ষয় কোন সময়ই রোধ করিতে পারা যাইবে না কি?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচুর দুগ্ধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে নানারূপ পরিকল্পনা করিতেছেন। ইহা অর্থের সहाয়-মোটাই বলা যাইতে পারে না। যেখানে খাদ্যোৎপাদনের আবশ্যিকমত জমির অভাব সেখানে গো-চারণ-ভূমি ও গবাদি পশুর খাদ্য কোথা হইতে আসিবে? “অধিক খাদ্য ফলাও”, “বনমহোৎসব” কর এবং প্রধানমন্ত্রীর

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে রেল ও নদীপথে পশ্চিমবঙ্গে আমদানীকৃত কয়েকটি দ্রব্য ও

দ্রব্যের নাম	আমদানীকৃত দ্রব্যের পরিমাণ	নিত্যব্যবহাৰ্য্য দ্রব্যের হিসাব	
		প্রকাশিত ন্যূনতম	মোট
		বাজার ও কন্ট্রোল দর	টাকা
ছোলা	১,৪৩০,৫০৬ মণ	২০ টাকা প্রতি মণ	২৮,৬১০,১২০
ধান	১১৪,৩৯৫ ”	৮ ”	৯১৫,১৬০
চাউল	৪৫৩,৬৮৯ ”	১৭ ”	৭,৭১২,৭১৭
গম	১২,০৪৭ ”	১৬ ”	৩০৪,৭৫২
আটা	৪৫,৯৬৭ ”	১৬ ”	৭৩৫,৪৭২
বাদাম তৈল	৩৪৭,৫২৫ ”	৭৪ ” (পাইপ সমেত)	২৫,৭১৬,৮৫০
অন্যান্য তৈল	৪৬৯,৩৭২ ”	৭০ ”	৩২,৮৫৬,৫৩০
বাদাম	২৩৩,২৯৭ ”	৩৪ ”	৭,৯৩২,০৯৮
সরিষা	৫,০০৪,৪৫৭ ”	৩৩ ”	১৬৫,১৪৭,০৮১
চিনি	৩,৬৩২,৭১৯ ”	৩৫ ”	১২৭,১৪৫,১৬৫
শুভ্র	১,৯৬৩,৪৮৪ ”	২৪ ”	৪৭,১২৩,৬১৬
নারিকেল তৈল	২৫,৩৭৭ ”	১০২ ”	২,৫৮৮,৪৫৮

মোট ৪৪৬,৭৮৮,০১১

নূতন অভিযান. “ধনসম্পদ বাড়াও” পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিকট একটা নিদারুণ পরিহাস মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “মৎস্ত ফলাও” অভিযানের একটি ঘটনার কথা লিখিতেছি। কিছুদিন পূর্বে একটি কৃষি-প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মৎস্তচাষের সরকারী মহকুমা কর্মচারীকে তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া পুষ্করিণীগুলি দেখিয়া তাহাতে মৎস্তচাষের বিষয় উপদেশ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে কর্মচারীটি সেই প্রতিষ্ঠানের লোকদের তাহার আপিসে দেখা করিয়া উপদেশ লইতে বলিয়াছিলেন। পরে জানিতে পারা যায়, টাকার অভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্তচাষের কর্মচারীদের যাতায়াতের ভাতা কমাওয়া দিয়াছেন এবং সেইজন্যই মৎস্তচাষের সরকারী কর্মচারীরা পুষ্করিণী না দেখিয়াই আপিসের চেয়ারে বসিয়া উপদেশ দেন। এই প্রদেশে “খাণ্ড ফলাও”, “মৎস্ত ফলাও”, “দুগ্ধ ফলাও” এবং “বনমহোৎসব কর” এই সব অভিযান ও পরিবল্লনার জন্য বেল্লীর ভাগ বরাদ্দ টাকা ছোট বড় কর্মচারীদের বেতন দিতেই ফুরাইয়া যায়।

পূর্বে লিখিয়াছি, এই প্রদেশে ধানের জমিতে পাটচাষ করান হইতেছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি পাটকল আছে সেই পরিমাণ পাটচাষের জমি নাই। কিন্তু পাটকরের বেল্লীর ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অপর প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। আশা করি, প্রদেশ-সরকার এই বিষয় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে বসতির চাপের হার বৃদ্ধির জন্য প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর স্থায়ী ক্ষতি এবং অস্ববিধার বিশদ বিবরণ নব-গঠিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিশনের কাছে তাহাদের দাবিসহ পেশ করিতে তুলিবেন না।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পররাষ্ট্র বিষয়ে যেরূপ মনোযোগী, নিজরাষ্ট্রের অন্তর্গত বাংলাদেশে তিনি যে আগ্রহ-গিরির সৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাহার সেরূপ লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশেও নানা অশান্তি দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থা চলিতে দিলে ভারত-রাষ্ট্রের এশিয়ার, একটি বৃহত্তর “বলকান” হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক প্রদেশের আয়তন তাহার প্রতি বর্গমাইলের বসতি চাপের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া ঠিক করা দরকার। কেবল বক্তৃতা, নূতন নূতন পরিকল্পনা, অগণিত “বাণী” ও মুখরোচক ধ্বনির দ্বারা ইহার কোনরূপ সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পণ্ডিত নেহরুর বাসভূমি উত্তর প্রদেশের আয়তন ১,০৬,২৪৭ বর্গমাইল, বোম্বাই প্রদেশের আয়তন ৭৬,৪৩৩ বর্গমাইল এবং বিহার প্রদেশের

আয়তন ৬৯,৭৪৫ বর্গমাইল দাঁড়াইয়াছে। আর পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৩০,৬৮৯ বর্গমাইল। কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গের কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা উত্থাপন করিলেই কেন যে ইহা প্রাদেশিকতার দোষে দূষিত হয় তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না।

পূর্বে প্রবন্ধে বাংলার প্রতি বর্গমাইলে বসতির হারের বিষয় আলোচনা করিবার সময় লিখিয়াছিলাম যে, ভারত বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কুচবিহার ও ত্রিপুরা এই দুইটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা ঠিক নহে। ত্রিপুরা রাজ্য এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং উহা পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হয় নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন মোট বর্গমাইল যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিকই আছে।

পূর্বে বাঙালী জাতি সর্বক্ষেত্রে ও সর্ববিষয়ে সমগ্র ভারতের অগ্রণী ছিল। একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, ভারত আজ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার ভিত্তি প্রধানতঃ দেশপ্রমিক বাঙালী যুবকদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের উপর স্থাপিত। সে সময় বাঙালী জাতিকে অপর প্রদেশবাসীরা যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত এখন তাহা প্রায় ইতিহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আন্দোলনের সময় বিখ্যাত রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতীয় আইন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড কার্জনের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “বাংলা আজ যাহা ভাবিতেছে—সমগ্র ভারত কাল তাহাই ভাবিবে।” আজ বাঙালীর অন্নবস্ত্র ও অগ্ন্যাগ্ন সমস্তার সমাধান একরূপ ভারত-সরকারের উপরই নির্ভর করিতেছে একথা বলিলে অত্যাক্তি হয় না। এমন কি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারত-সরকারের প্রভাব অধুত হয়। ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর এই কারণেই ঋষিবাক্য “শান্তম্ শিবম্ অদৈবম্” পর্য্যন্ত তাহার নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

গত অক্টোবর মাসে *Engineering News of India*’র সম্পাদক ডি. সি. ড্রাইভার “A Tiger looks at India” নামক একটি সূচিস্তিত প্রবন্ধে বাঙালী জাতির বর্তমান অবস্থার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

“In India the Symbol of the State should be strength or Shakti. If there is strength, truth will prevail; otherwise it will take refuge in subterfuge. Look at poor Bengal. Once like a tiger it led. What Bengal roared at new moon other Provinces would bleat at full moon. The tiger spirit of Bengal is gone. Now ferocious tigers only appear in West Bengal, painted on its buses.”

নিম্নে ইহার বঙ্গভূবাদ দিলাম :

“ভারতবর্ষের প্রতীক হওয়া উচিত শক্তি। শক্তি থাকিলে সত্যের জয় অবশ্যস্বাবী; অন্যথায় ইহা চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। দুর্দশাগ্রস্ত বাংলার দিকে তাকাও। এক সময়ে উহা ব্যাঘ্রের হাংস নাগকন্ড করিয়াছিল। অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে বাংলা যাহা সদর্পে গর্জন করিয়া যাহা প্রকাশ করিত, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রি অনান্য প্রদেশ-তাঁহা মৃদুস্বরে মাত্র ব্যক্ত করিত। কিন্তু আজ বাংলা তাহার ব্যাঘ্রদর্প হারাইয়াছে। এখন সেই বীৰ্য্যবান ব্যাঘ্র-

সমূহের মূর্তি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র-পরিচালিত মোটর-বাসেই শুধু অঙ্কিত রহিয়াছে।”

ড্রাইভারের উক্তি যে নির্দারণ সত্য তাহা বলাই বাহুল্য। ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতি তাহার এই জীবনমরণ সমস্তার সমাধান না করিয়া কত দিন যে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে তাহা অল্পমান করা শক্ত। যদি আমাদের দেশের নেতারা বাংলার সমস্তাগুলির দ্রুত সমাধান না করেন তাহা হইলে মনে হয়, হয়ত এক দিন সমগ্র বাঙালী জাতি আবার “মাল্লুস আমরা নহি ত মেম” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিবে এবং নিজেরাই প্রতিকারের চেষ্টা করিবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশুরেশচন্দ্র দেব

আজ আমরা যে লোক-শিক্ষকের চম বাধিক তিগোধান-অল্পষ্ঠান প্রতিপালন করতে সমবেত হয়েছি তাঁর জীবনের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া চুকর। কারণ তিনি নিজেকে নিজের কর্মের পশ্চাতে এমন করে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সে গোপনীয়তা দুর্ভেদ্য বললে অসঙ্গত হবে না। অথচ এই লোকটি নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ছিলেন হাসি-খুশীর আধার। গম্ভীর মুখে হাসির উৎস-মুখ থলে দেবার কৌশল তিনি জানতেন। শান্তিনিকেতনের অনেক বন্ধুর নিকট তা শুনেছি। গাম্ভীর্য ও পরিহাস-নৈপুণ্যের এই সমবায় বিধাতৃদত্ত একটি গুণ।

“প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকা দুখানির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক রামানন্দ—নিজের কাজের মধ্যে নিজের নাম দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজল্যমান রাখবার ব্যবস্থা করে গেছেন। একজন ভারতীয় সাংবাদিক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বিলাতের “রিভিউ অব রিভিউজ” পত্রিকায় রামানন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, এই একজন সাংবাদিক যিনি রাজনীতিবিদ বলে অভিহিত হতে পারেন, Journalist as a statesman। সেই সাংবাদিক এখনও বেঁচে আছেন; তাঁর নাম সন্ত নিহাল সিংহ।

আমার নিকট রামানন্দের প্রধান পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনি ছিলেন লোক-শিক্ষক। আজীবন এই কর্তব্য পালন করেছেন—কলেজের অধ্যাপকরূপে বা সম্পাদকরূপে এবং এই কর্তব্য পালনে এমন একটা নিষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন যা বর্তমানযুগে বিরল। পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম।

পণ্ডিতের রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে তিনি কৌলিক সনাতন আচার-আচরণের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সমাজে পণ্ডিতের যে স্থান ছিল, লোকের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব তাঁরা যেমন করে ধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকার করতেন, রামানন্দের জীবনে সেই নিষ্ঠা ও নির্লোভতার পরিচয় পেয়েছি প্রচুর, তাঁর সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, এই স্বল্পবাক্য লোকটির মধ্যে জানের কি অমূল্য ভাণ্ডার লুকায়িত ছিল। এই ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে দেশ-বিদেশের গুণী ও পণ্ডিত লোকেরা তাঁর চারপাশে সমবেত হতেন এই পাড়ার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গোষ্ঠীর সেবায় নিবেদিত-প্রাণ এই আইরিশ-তনয়া সিষ্টার নিবেদিতা নামে পরিচিতা ছিলেন লোক-সমাজে। “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকার প্রতিষ্ঠালাভের মূলে এই বিদেশী নারীর দান ভুলবার নয়। সেইরূপ কত খ্যাত অখ্যাত লোক তাঁকে সাহায্য করতেন।

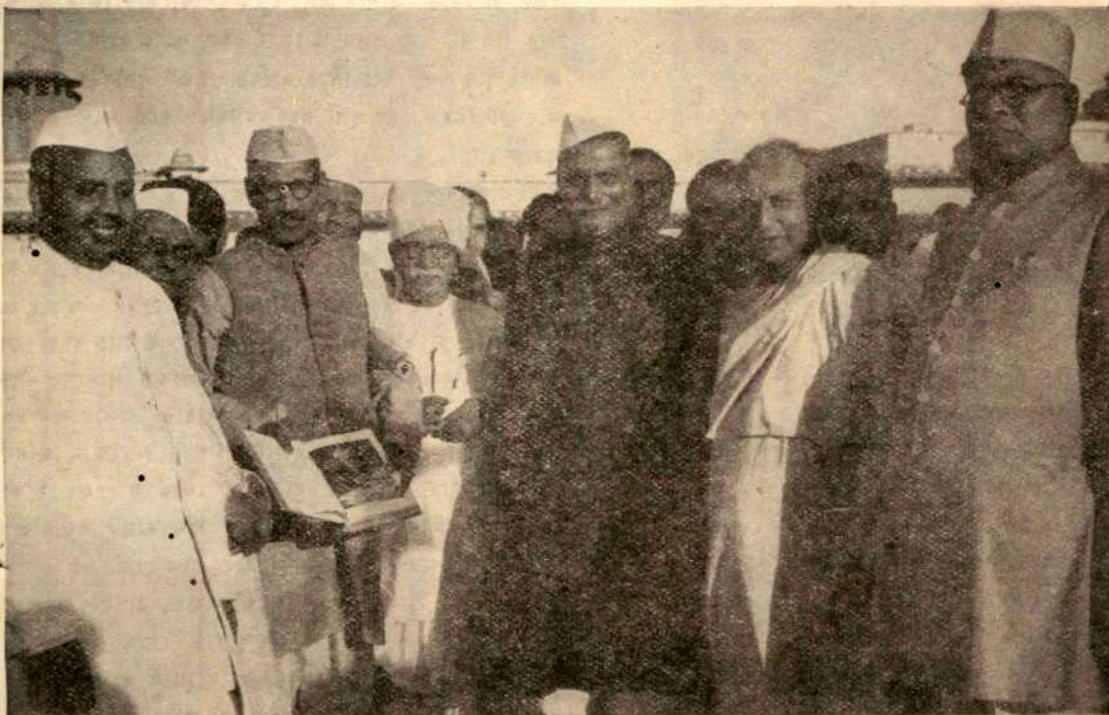
রামানন্দ যখন “প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ” বের করেন, তখন ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশ বিপ্লবী আন্দোলনের বন্যায় পরিপ্লাবিত। এর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তা এখনও জানা যায় নি। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতি বিপ্লবীপ্রধানদের সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই কথা তখনও লোকে জানত; ইংরেজের পুলিশেরও জানা ছিল। এই

আত্মবিলোপকারী লোকটি কি করে এই আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে চালাতেন, লোকে এই সব বিপজ্জনক সম্পর্কের কথা জানত না; শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি নিজের দৈনন্দিন কর্তব্যাদি করে যেতেন। তা তাঁর শক্তির পরিচায়ক ছিল, এবং এ সব সম্ভব হ'ত না যদি তাঁর সহধর্মিণী তাঁকে সাহায্য না করতেন। রামানন্দের জীবনে ও কর্মে মনোরমা দেবী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন।

আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্বে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমার পূর্ববর্তী বক্তা (শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়) তাঁর অভিভাষণে বর্তমান ভারতের সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন তার প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন মনে করি। হতে পারে, বর্তমান যুগের শিক্ষিত-সমাজ কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু তা হলেও যে সর্বক্ষণ তাদের কানে এই কথা শুনানো হবে যে তারা অযোগ্য, তারা হয় এটা সমীচীন নয়।

এরূপ কথা শুনে শুনে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, সত্যি তারা অযোগ্য, তারা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ একটি কথা বলে এরূপ উক্তির নিন্দা করে গেছেন। আয়ারল্যান্ডের ছেলেদের বিদেশী শাসকবর্গ প্রায়ই নাকি শুনাতেন, "Pat, you are no good" "প্যাট, তোমরা কোন কাজের নও।" শুনে শুনে প্যাটেনের মনে এই ধারণা দৃঢ় হইতে লাগল যে তারা সত্যি সত্যি অকেজো, অপদার্থ। কিন্তু সেই প্যাটেটাই যখন মার্কিন মূলুকে পদার্পণ করলে, তখন এই দিক্কাবের কথা তাদের কানে বাজত না, এবং এট প্যাটেটের মধ্য থেকেই দেখা দিলেন অনেক শিক্ষক-অধ্যাপক, পণ্ডিত গবেষক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের নেতা যাদের নাম ইতিহাসে জল্ জল্ করছে। আমাদের দেশের ছেলেরাও সেরূপ উৎসাহ পেলে তাঁদের মত কীত্তি রেখে যাবেন।

• গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রামানন্দ স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।



বেনারসী দাস চতুর্বেদী কর্তৃক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-গ্রন্থ "রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা" উপহার প্রদান। রাষ্ট্রপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান ডক্টর ত্রীকালিদাস নাগ

প্যারিস

ক্রীশেফালী নন্দী, এম-এ

লণ্ডন—ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে পাড়ী ধরে প্রথম গেলাম হারেন পোর্ট-এ। সেখান থেকে ছোট একখানি গিয়ার আমাদের নিয়ে গেল দিয়েপ বন্দরে, আমরা পৌঁছলাম ফ্রান্সে। ছোট গিয়ার, দুই অত্যন্ত বেশী, তার উপর তৃতীয় শ্রেণীর রাজী বেশী হওয়ায় ভিড়ের কষ্টটা অসুভব করলাম বেশ ভালই। আবার ডাঙ্গার নেমে উঠলাম পাড়ীতে। বেশ বোকা গেল ফ্রান্স এসে পড়েছি, দু'দিকে অপূর্ণ সবুজের সমারোহ—তারই মাঝে মাঝে ফুলের রাশি। হাতধূধর মরমারীর কোলাহল, সব মিলে মনটা প্রসন্ন করে তুলল। সন্ধ্যা ছয়টার পৌঁছলাম প্যারিসে; স্টেশনটির নাম সেন্ট লাভারা। হোটেলের সন্ধানে বের হলাম। ঠাই মাই কোথাও। সর্বত্র বিদেশী-বিদেশিনীদের ভিড়। যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে প্রবেশ



দুই জন বিদেশিনী সহ লেখিকা

করা সাধারণ ভারতীয়দের পক্ষে দুঃসাধ্য—বর্ণবিষেয় নয়, অর্থ-সঙ্কট। লণ্ডন মহানগরীতে এক রাজি বাস করতে হলে সাধারণ হোটেলের দক্ষিণ আয়মানিক এক পাউণ্ড, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৩৬/০। প্রথম যখন এক পাউণ্ড তাকিয়ে ফরাসী কাগজে ১৬০ ফ্রাঁ পেলাম, আমার আনন্দ দেখে কে? মনে হ'ল খুব কম খরচায় প্যারিস দেখা সেরে কিরে আসব। কিন্তু “বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল।” কে জানত যে প্যারিস মহানগরীতে এক রাজির বিছানা-ভাড়া ১০০০ ফ্রাঁ। বহু কষ্টে একটি সাধারণ হোটেল পাওয়া গেল যেখানে মাত্র কয়েকটা ঘর খালি ছিল। প্রতিটি ঘরের দর্শনী ৪৭০ ফ্রাঁ। যাক্‌ তবু মনের ভাল। মাল বলতে ত ছোট ছুটি ব্যাগ, সেগুলো হোটেলওয়ালার জিন্দার রেখে বেরিয়ে

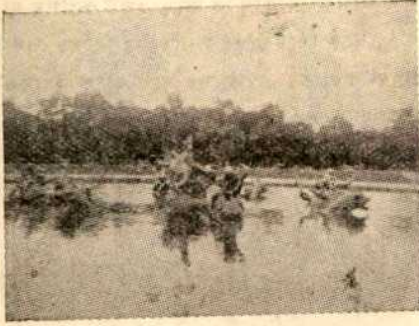
পড়লাম কিছু খাবারের সন্ধানে, তার সঙ্গে কিছু উপরিলাভ হবে—কয়েকটি রাস্তার ও দুই-একটি দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

হোটেলের নীচেই একটি রেস্টোরঁ ছিল। সেখানে প্রবেশ করতে গিয়ে বিষয়ে হস্তবাক হয়ে রইলাম। এত বড় এবং এমন বৃক্বকে চায়ের ষ্টল ত কই কোম দিন দেখি নি। চার দিক দিয়েই লোক প্রবেশ করছে, আর চার দিকেই খাবারের সারি। ব্যাপারটা খানিক পরেই বোধগম্য হ'ল যখন দেখলাম আমিও প্রবেশ করছি আমার বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে। দোকানটি নিতান্তই ছোট—আর তার দেয়াল বলতে কিছুই নেই। রাস্তার দিকটা বাদ দিয়ে তিন দিকেই ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত কেবল বৃক্বকে আয়নার ঢাকা। ফলে যেদিকে তাকাই মনে হয় এর সীমা নেই। কেউ বা দাঁড়িয়েই তরল পানীয়ের সন্ধ্যাবহার করছে, কেউ বা বসেছে, কেউ বা প্রতীক্ষা করছে কারুর জন্ত। আমি একটা টেবিল দখল করে নেই। এবার মুক্‌ হ'ল ভাষা-সমস্যা, কি করে বোঝাই আমি কি চাই। একটি ‘ওয়েটার’ এগিয়ে এল, তাকে বোঝাতে চাইলাম ‘চা ও কিছু খাবার’, সে কেবল তাকিয়ে রইল সহাত মুখে। হঠাৎ মাথার বুড়ি এল, উঠে গিয়ে চায়ের পাঞ্জি দেখিয়ে দিলাম আর রুটি ভিন্ন। সে বুশী হয়ে খানিক পরে এনে হাজির করলে।

সোজানপূর্ণ কোমরকমে সমাপ্ত করার পর দাম দেবার বেলায় সে নিজেই আর একটি ওয়েটারকে নিয়ে এল সঙ্গে করে। সে বুঝিয়ে দিলে কাগজে লিখে যে আমি খেয়েছি চা ৪৫ ফ্রাঁ, রুটি ৩৫ ফ্রাঁ, ডিম ৩০ মোট ১১০ ফ্রাঁ। আমার ত চমুহির। ব্যাপার দেখে ওয়েটার ত হেসেই বাঁচে না। সে আমাকে আতুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, প্রত্যেকটি জিনিষের নীচে দাম লেখা আছে। দেখলাম একটি সাধারণ কলার দাম ৪০ ফ্রাঁ অর্থাৎ আমাদের দেশীয় মুদ্রায় দশ আনা। কোন জিনিষ ২০ ফ্রাঁর নীচে বিক্রী হয় না। শুপাকার কাগজের টাকা দিয়ে কোন জিনিষ কিনতে হয়। শুধুই কাগজের ছড়াছড়ি। সোনা বা রূপার ধার ধারে না, এর হাত হতে ওর হাতে ক্রমশঃ কাগজ উড়ে যাচ্ছে আর জীবনধারণের খরচা ক্রমশঃই চড়ে যাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি অসম্ভব বেড়ে গেছে। তার জন্ত কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে ত মনে হ'ল না। অবশ্য আমি ছিলাম রাজধানীতে, তাই হয়ত নিতান্ত গরীব ও সাধারণ জীবনযাত্রা দেখার সৌভাগ্য হয় নি, কিন্তু রাজধানীতে কৈ চিন্তাকুল মুখ ত দেখলাম না। সকলেই সহাত মুখে আপন

কাজ করে যাচ্ছে, খাবার সময় হোটেলের রেস্তোরাঁর চুকে
বেয়ে নিচ্ছে, বকবকে তকতকে পোশাক-পরা, জীবনটাকে
যেন নিভাস্ত খেলার মতো ভোগ করে ছুনিয়ার সবটুকু সুখ
নিংড়ে নিতে চাইছে। এরাই সত্যিকার সুখী। এ যেন “নগদ

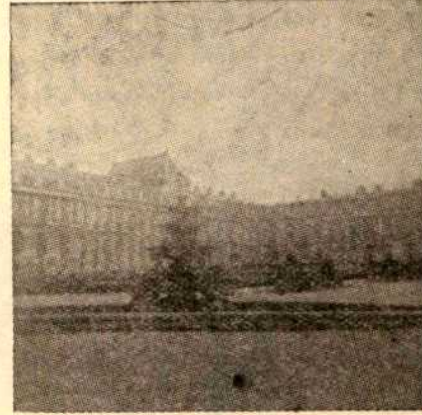
হৌচট বেয়ে যখন রাস্তা পেরিয়ে গেলাম—নিজের চোখকে
বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ’ল না। যদিকে ছ’চোখ যার সবুজ
ঘাসের মেলা, যত্ন করে তৈরি করা ফুলের রাশি। মাঝে
মাঝে ছোট ছোট চেয়ার প্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্ত



হের্সাই প্রাসাদ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র স্রোতধিনী

যা পাও, ভোগ করে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক।” এমনি
আর একটি জাত দেখেছিলাম—স্পেনিশ সেন্টার। আফ্রিকার
উত্তর কোণে ক্ষুদ্র বন্দর। ওখানকার অধিবাসীরা যেন শুধু
হাসতেই পুণিবীতে এসেছে। কোন চিন্তা, দুঃখ, তাবনা যেন
ওদের স্পর্শ করেনি। জীবন ওদের হৃদিস্তার বোকা বয়ে
ভারাক্রান্ত হয় নি। স্পেনিশরা সবচেয়ে প্রাণ-চঞ্চল জাত বলে
বিখ্যাত, তার পরেই ফরাসীরা। জীবনকে ওরা নিয়েছে
নিভাস্ত সহজভাবে। তাই অনর্থক হৃদিস্তার বোঝার এরা
ভারাক্রান্ত নয়।

টিউব ষ্টেশনে এসে মনস্থ করলাম কনকর্ড দেখতে যাওয়া
যাক। দ্বিবেপ থেকে প্যারিস আসার পথে এক ফরাসী
তরুণীহিলার সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি কয়েকটি ত্রুটব্য স্থানের
নাম বলেছিলেন, তার মধ্যে কনকর্ড একটা। ভাষা
বিভ্রাট এড়িয়ে যখন এখানে এসে পৌঁছলাম রাত তখন ন’টা।
অবাক্ বিশ্বাসে ভাকিয়ে রইলাম প্যারিসের প্রশস্ত রাজপথের
দিকে। এত বড় এবং এত জমাকীর্ণ রাস্তা যে কোথাও
ধাকতে পারে তা যেন কল্পনার বাইরে ছিল। ছয়টি রাস্তা
এসে মিশেছে যেখানে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ—লা কনকর্ড।
এখানে মেরী এন্টিগুনেট, চতুর্দশ লুই, যোড়শ লুই এবং আরও
কয়েকজনকে ‘গিলোটিন’ করা হয়। সেই রক্তাক্ত স্মৃতি ফ্রান্স
ভুলতে পারে নি, যা তাকে এনে দিয়েছিল স্বাধীনতার
আশীর্বাদ। প্রতিটি রাস্তার দুই পার্শ্বে অপূর্ণ আলোকমালার
সারি আর প্রতিটি রাস্তা দিয়ে সেকেন্ডে অগন্ত: কুড়িটি মোটর
চলেছে গন্তব্যস্থল অভিযুগে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম রাস্তা
পার হবার জন্ত। কিন্তু কার সাধ্য এই বিংশ শতাব্দীর গতির
সামনে এগিয়ে যার। অনেক ইতস্তত: করে বারকয়েক



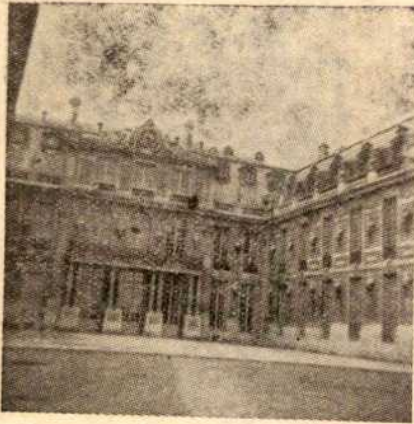
হের্সাই প্রাসাদ

সাজান-গোছান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পার্ক দেখে মনে হ’ল এরা
জানেন কি করে মাহুষের চোখকে তৃপ্তি দিতে হয়। বিধাতার
দাম এরা ছ’হাত ভরে দিতে পেরেছে, পেরেছে সে
আশীর্বাদে ধারাকে নিজেদের তৃপ্তির ছোঁয়ায় সার্থক করতে।

পর দিন ভোরবেলা—অবশ্য আমাদের ভোর নয়, পশ্চিমের
সকাল বেলা দশটার আবার বের হলাম লুতার মিউজিয়মের
উদ্দেশ্যে। পথ জানি না, ভাষা জানি না, শুধু জানি গন্তব্য
স্থানের নাম, তাও ভাল করে উচ্চারণ করতে পারি না। কারণ
আমি বিদেশী, বিদেশীর ভাষা শুধু পড়তেই জানি, তার বদেশীর
উচ্চারণ লোকের মুখে মুখে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তার
ধর রাখি না। তাই যখন নির্ঝাড়ব প্যারিসের রাজপথের
পথিককে জিজ্ঞাসা করলাম লুতার কোথায়, কেউ বা ভাকিয়ে
হাসল, কেউ বা বললে, ঐ দিকে। যাকে দেখলে মনে হয়
এ হয়ত ইংরেজী বুঝবে তাকেই জিজ্ঞাসা করি, কেউবা জবাব
দেয়, কেউবা বিদেশী দেখে রূপা করে আতুল দিয়ে দেবিয়ে
দেয় অতর্কিত জিজ্ঞাসা করতে, কারণ সে আমাদের ভাষা জানে
না। অশেষ দুর্গতি ভোগ করার পর খুঁজে পেলাম আমার
গন্তব্যস্থল প্যারিসের অতীত স্মৃতি-ভাণ্ডার—লুতার মিউজিয়ম।

পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অটালিকা এই লুতার। ফরাসী
বিপ্লবের পূর্বে পর্যন্ত এটা ছিল ফ্রান্সের রাজপুরী। ৪৮ একর
জমির উপর চতুর্দিকে বিস্তৃত এই অটালিকা ফরাসী স্থাপত্য-
শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ফরাসী বিপ্লবের পর এই অটালিকা
ব্যবহৃত হয় ফরাসী সাম্রাজ্যের শিল্পাগার হিসাবে। নানা
বিভাগে বিভক্ত করে এক-একটি অংশে করা হয়েছে এক এক

জাতীয় শিল্পের সমাবেশ। ভাস্কর্য্য-শিল্পের অপূর্ণ নিদর্শন ভেনাস-ডি-মেলো—গ্রীক ভাস্করের পাথর কেটে গড়া মূর্তি ভেনাস দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ মহিমায়, শিল্পী রূপে গেছে অজানার অন্ধকারে, কিন্তু ভেনাস সঙ্গীরবে বোষণা করছে শিল্পের অঙ্গমান। কালের ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারে নি, মূর্তিটির হাত দুটি ভেঙে গেছে, পিঠের স্থানে স্থানে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্য্য বা অপরূপ লাবণ্যের হানি হয় নি। স্থিত হাতে অশেষ লাবণ্যময়ী ভেনাস জগতের সমক্ষে দাঁড়িয়ে বলছে, “আমি মানুষের সেরা মূর্তি।” লোকচন্দ্র



লুভার মিউজিয়াম

অন্তরালে নির্জনে বসে যে শিল্পী এমন অপরূপ প্রতিমা গড়ে তুলতে পারে তার শক্তির কথা ভাবলে মানুষের শিল্প-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাই জাগে। তিল তিল করে গড়ে তোলা তিলোত্তমা—জগতের যত লাবণ্য যত কোমলতা সবই কি একত্রিত হয়েছে এই ভেনাসের মুখে, বক্ষে, দেহ-সুখমার। বিধাতার সৃষ্টি এমন, এ মানুষের প্রেমে মানুষের শক্তিতে মানুষের আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি হয়েছে যে।

লুভার মিউজিয়ামের আর এক অংশে গ্রীক ভাস্কর্যের আরও দু'একটি মূর্তি পাওয়া যায়। একটি বিশ্ববিখ্যাত এপোলোর মূর্তি আর একটি দেবী মিনার্তার। একটি পাথরের মূর্তির গায়ে আর একটি রত্নীত পাথর—দেবীর গায়ে চাঁদরের মত করে বসান হয়েছে। অধিকাংশ মর্ম্মরমূর্তির বিশেষত্ব এই যে, তাদের দেহের প্রতিটি রেখা বক্র বা দেহাবরণের প্রতিটি ভাঁজ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে শিল্পীর নিপুণ হস্তে।

মিউজিয়ামের অল্প একটি অংশে আছে সেরা রত্নীত চিত্র। তাদের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন শিল্প-রীতি অনুসারে। বিভিন্ন দেশের চিত্রাবলী তাদের নির্দিষ্ট ক্রমগায় রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে জা ভিক্টর ছবি, রাকারেলের মাতৃমূর্তি প্রকৃতি জগতের যত সেরা চিত্র। এই দুটো গ্যালারী দেখা যখন

শেষ করে বেরিয়ে এলাম ভবন সন্ধ্যা বেয়ে এসেছে প্যারিসের বুকে। লুভারের অল্প অংশে কি আছে দেখার আর সময় হ'ল না। এই শিল্প-মন্দির কালের হস্তাবলেপ উপেক্ষা করে আত্মবল করেছ জগতের সকল শিল্পানুরাগীকে তার অপরূপ সংগ্রহ দেখবার জড়।

পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটি আপিস বার করা গেল যেখান থেকে বিদেশীদের প্যারিসের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের সঙ্গে থাকে ইংরেজী ভাষা জানা গাইড। ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম, একবেলা দেখাবে ঐতিহাসিক প্যারিস, একবেলা আধুনিক প্যারিস আর দেখাবে



নেপোলিয়ানের সমাধি

বিশ্ববিখ্যাত হেরসার্ট নিকেতন। সকাল ১১টার রওনা হওয়া গেল প্যারিসের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলের উদ্দেশে। প্রথমেই পেলাম সেন্ট ম্যাগডেলিন গির্জা—সপ্তদশ শতাব্দীর এই গির্জাটি বহন করছে গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শন। গির্জার মধ্যে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি সত্যিই হৃদয়। এর পর আমরা দেখতে পেলাম নেপোলিয়ানের সমাধি-মন্দির। সমাধিস্থানটি মেঝে থেকে প্রায় ছ' ফুট নীচে। ঐটির দশ জন শিষ্যের প্রস্তরমূর্তি সমাধি-স্থানটির চার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে যেখানে ঐটির প্রতিমূর্তি রক্ষিত আছে সেই বেদীর উপরিভাগ (অনেকটা আমাদের দেবতার চতুর্ভোলা মত) হতে আলো ঠিকরে পড়ছে সোনালী চিহ্নের ভিতর থেকে। কোন রকম আলো বা সূর্যালোক ছাড়াই বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পিছন দিকের একটি কক্ষে রক্ষিত আছে বিভিন্ন জাতির পতাকা যা করাসীরা জয় করেছিল নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে। মন্দিরের আর এক কোণে নেপোলিয়ানের প্রথম স্ত্রী যোসেফাইনের মর্ম্মর-মূর্তি।

এর পর দেখতে গেলাম বুদ্ধ-মুতিভূক্ত। এই ভক্তের চতুর্দিকে গত দুই মতামুখে নিহত করাসী সৈন্যদের নাম বোদাই করা আছে। এক পাশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধবিরতির তারিখ আর

অপর পার্শ্বে দ্বিতীয় মহানুভবের। মাঝখানে প্যাস বাগানের সাহায্যে অববরত উর্দ্ধমুখী অগ্নিশিখা স্রবণ করিয়ে দিচ্ছে সেই শহীদদের কথা—মার্কো মার্কো কেউ এসে ফুলের মালা দিয়েও এদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।



আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ

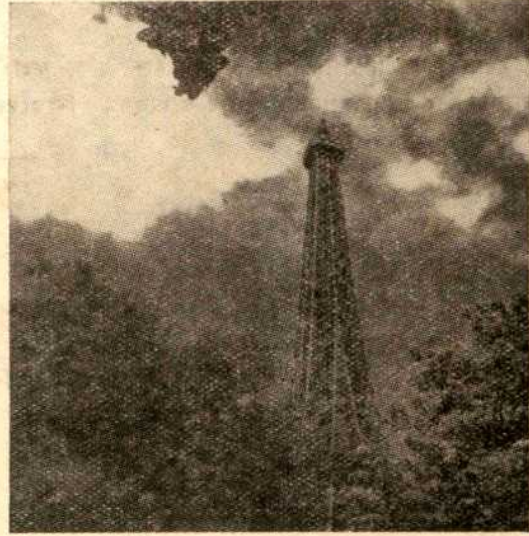
‘প্যাহিয়ন’ করাসী জাতির বরেন্যদের সমাধিস্থান। এখানে আছে তিষ্ঠর হিউগো, এমিল জোলা প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি। প্রবেশপথের উপরিভাগে লেখা আছে, “ফ্রান্স তার জাতির বরেন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ।”

বিষয়বিখ্যাত নোভর্ দাম গির্জা পথিক শিল্পের নিদর্শন। নোভর্ দাম এবং সেন্ট ম্যাগডেলিন উভয় গির্জাতেই করেকটি ‘গোলপ-জানালা’ অর্থাৎ গোলাপের পাপড়ির আকারে জাঁকা কাঁচের জানালা আছে। যুদ্ধের সময় এগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

‘এফেল টাওয়ার’ পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্তম্ভ। আমাদের গাইড বললে, “Eiffel Tower represents Paris more than anything else”। রাস্তার এক পার্শ্বে এফেল টাওয়ার আর এক পার্শ্বে নব্বনলোভন উজ্জান। প্যারিসের আশেপাশে যেখানে একটু কাঁকা জায়গা আছে সেখানেই অপূর্ণ সবুজ ও শোভনীয় ফুলের মেলা। এমন পুষ্পপ্রিয় জাত বোধ হয় আর নেই।

সিন নদীর উপরিস্থিত সেতু পার হয়ে রওমা হলান হের্সাইয়ের উদ্দেশ্যে। চতুর্দশ লুই জুতার প্রাসাদে থাকা পছন্দ না করার গড়ে উঠেছিল এই হের্সাই প্রাসাদ। এমন রমণীয় প্রাসাদ গোটা ইউরোপে বিরল, প্রতিটি কক্ষে অপরূপ লজ্জা, ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত নানা চিত্রে সুষোভিত

প্রাচীরগাছ, এমন কি কক্ষের স্তম্ভোত্তম সীলিং পর্যন্ত অপূর্ণ চিত্রমণ্ডিত—নেপোলিয়ানের করোমেশন, ‘লুই’দের ও তাঁদের প্রেমসীদের প্রতিচ্ছবি প্রভৃতি নানা চিত্র। একটি কক্ষে রক্ষিত আছে সেই টেবিলটি যাতে হের্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।



ইফেল টাওয়ার

সবচেয়ে আকর্ষণ্য হের্সাই প্রাসাদ-সংলগ্ন উজ্জান। চার পাশের নানারকম ফুল ও খালের মিনা-করা গালিচার নীচে ভিয়ে মেমে গেছে পথ—সেই পথ ধরে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুই পাশে নানা জাতীয় বৃক্ষের সারি—কোনটি উঠেছে সমভূমি থেকে, কোনটি-বা মেমে গেছে অনেক নীচে। তারই নিয়ম দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটি শ্রোভস্বিনী, ধাপে ধাপে নিম্নাবতরণ করেছে তার প্রবাহ। পঞ্চদশ লুই-এর কীর্ষি এটি। মার্কো মার্কো জ্যোৎস্না রাতে গভোলায় চড়ে রাজা বেকুন্তেন জল-বিহারে, তাই প্রয়োজন হয়েছিল এই বজ্রসলিলা প্রবাহের। উজ্জানের প্রতিটি বৃক্ষ নাকি টবের উপর স্থাপিত। কারণ সম্রাট দিনের দুই বেলায় বাগানের একরকম রং পছন্দ করতেন না—তাই যাতে তার ইচ্ছানুযায়ী বাগানের রং বদলানো যায় এই ব্যবস্থা।

রাজ-প্রাসাদের অনতিদূরে রাজাস্তম্ভপুংরিকাদের থাকবার জন্য ছোট একটি অটালিকা—চার পাশে উজ্জানের মনোরম পরিবেশে স্থানটি লোভনীয়, ছোট দোতলা বাড়ী, কিন্তু গৃহ-সজ্জায় হের্সাই প্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রাসাদের সর্ব শেষ অধিকার ছিল মেরী এন্টিওনেটের—তারই পরিবার ও বন্ধুবর্গের ছবি ও সম্রাট বোডুয় লুই-এর আবক্ষ প্রতিমূর্তিতে স্তম্ভোভিত। বিশেষ করে মেরী এন্টিওনেটের শয্যা, টেবিল, প্রসাধন-কক্ষ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাজনগর

শ্রীমতীমাধব চৌধুরী

ইজ্ঞাদের জেলার সদর টাউনের আলবার্ট পার্কে বক্তৃতা হইতেছিল। কয়েকজন স্বদেশী প্রচারক আসিয়াছেন বাহির হইতে, তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছিলেন। পার্কের বাহিরে রেগুলেশন লাঠিধারী কয়েকজন পুলিশ দাঁড়াইয়াছিল। ইজ্ঞ কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিল।

বানরীপাড়ার পিটুনি পুলিশের অভ্যাচারের প্রতিবাদে সভা হইতেছিল। বক্তার পরে বক্তা উঠিয়া সে অভ্যাচারের কাহিনী শ্রোতাদের বলিলেন। একজন বলিলেন—বহিরাগত মণের আমল কার্যম হইবে। স্থানীয় লোকেরা ফুলারের আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে সংবাদ বেঙ্গলী কাগজে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা সেন্ট্রাল আপিসে সে টেলিগ্রাম আটক করা হয়েছে। ফুলারের তাঁবেদার বহিরাগতের ম্যাজিস্ট্রেট এমাসনের আদেশে গুর্খারা এক ভদ্রলোকের ঘর ভেঙে দিয়েছে। তাঁর অপরাধ—সেই ঘরে বন্দে মাতরম ধ্বনি দেওয়া হইয়াছিল। রান্নাঘরের মধ্যে এগার বছরের একটি ছেলে বন্দে মাতরম বলেছিল। সেই অপরাধে কালেক্টরের আদালতের সামনে হুইপিং ট্রায়েলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে তাকে বেত মারা হয়েছে।

আর এক বক্তা বলিলেন—ফুলার ঘোষণা করেছে সে নাকি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেবে মেবে। ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি ও অজ্ঞাত সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের পরিবার অস্ত্র পাঠাতে। সরকারী কর্মচারীদের হুকুমে গুর্খারা নাকি রাতে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতরে পর্যন্ত ঢুকে অভ্যাচার করে। গুর্খা গৈলদের কার্পেন্টারের কাছে নালিশ করলে সে জবাব দেয়—তার কথা গুর্খারা শোনে না, সে কি করবে? ডেপুটির মেঠাইওয়ালাদের আদেশ দিয়েছে গুর্খারা যা চাইবে দেবে, দাম চাইতে পারবে না। হুই জন দোকানদারের দোকানঘরের বেড়ায় স্বদেশী-বিজ্ঞাপন ছিল। তারা সেই বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলতে অস্বীকার করায় তাদের বেত মেরে গুরুতর জখম করা হয়েছে।

তৃতীয় বক্তা উঠিয়া বলিলেন—যেমনসিঙে ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে বন্দে মাতরম বলে চীৎকার করছিল। শুনতে পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ‘ক্লার্ক’ তার চাপ-রাসীকে আদেশ করলে ছেলদের ঘরে আনতে। ছেলেরা চাপরাসীকে আসতে দেখে ছুটে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট ভয়ম নিজে তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগল। ছেলদের ঘরবার জত সে লোকের বাড়ীর অন্তর-মহলে ঢুকতেও ইতস্ততঃ করলে না। পুলিশ সাহেব

দোকানদারদের শাসিয়েছে, তারা দোকানে বিলেতী জিনিস না রাখলে বহিরাগতের মত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। সিরাজগঞ্জে ছাত্রদের এক সভা ভাঙতে গিয়ে পুলিশ শহরের পথে বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে, স্ত্রীলোক, শিশু পর্যন্ত বাদ যায় নি। রংপুরে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ফুলারের অভ্যর্থনার জন্য সাত দিন তাঁদের স্পেশাল কনষ্টেবল করা হয়েছে।

চতুর্থ বক্তা বলিলেন—বর্করোচিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ফুলারকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের মননদে বসানো হয়েছে। অভ্যাচারী ফুলার হয়েছে সভ্যদের প্রতিনিধি। ফুলার দ্বন্দ্ব বলেছে, আমি রক্তপাতের জন্তও প্রস্তুত। অতি স্বসংবাদ। দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সকল দেশেই রক্তপাতের ফলে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে ফুলারের কুশাসন তার জন্য দায়ী। কোন সভ্য দেশে এই কুশাসনের তুলনা নেই।

শ্রোতাদের দিকে চাহিয়া বক্তা বলিলেন—আপনাদের একখানা চিঠি পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছেন এক জন মৌলবী। তিনি লিখেছেন, কসাই যখন একটা ভেড়াকে জবাই করবার পরে সেই রক্তমাখা হাত আর একটা ভেড়ার গায়ে আদর করে বুলায় তখন বেচারার প্রাণে ভয় ছাড়া আর কি ভাব হতে পারে? সরকার যখন আদর করে মুসলমানদের পিঠে হাত বুলায় সে আদর কি তাদের ভাল লাগবার কথা? সরকারী কর্মচারীরা প্রকৃত ভাবে দেশের লোকের মধ্যে বিভেদস্থির চেষ্টা করছেন। ইউরোপের কোন জাতি, এমন কি আমেরিকার লোকেরা পর্যন্ত কখনও কি ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছে কোন দিন? মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেলিরে দিয়ে ইংরেজ ভেদনীতি—

সভায় এই সময় বিষয় হটগোল আরম্ভ হইল। লাঠিধারী পুলিশের দল ইহার আগেই পার্কের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। ধাক্কা-ধাক্কি করিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিয়া তাহারা লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিল। বেপরোয়া লাঠি চালনার ফলে সভা ভাঙিয়া গেল। গোলমাল বাধিল ফুল ও কলেক্টরের ছেলদের লইয়া। ইজ্ঞকে ফেল করিয়া গোলমালের স্থিতি হইল।

ইজ্ঞ রাজনগর হইতে সবে বাহিরে আসিয়াছে। শান্তিপূর্ণ সভায় উপর এই ধরনের পুলিশী আক্রমণ ও নির্যাসারে লাঠি চালানো এই সে প্রথম দেখিল। হস্ত সময় পাইলে সেও নিজের সঙ্গীদের লইয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সে সমস্তটুকু পুলিশ তাহাকে দিল না। পিছন হইতে লাঠির গুঁতা পিঠে লাগিতে

সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইল্ল অসীম বলশালী যুবক, রাজনগরের প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, লাঠিয়াল আত্মাহার সর্কারের প্রিয় শাগরেক। শুভা খাইয়া সে আহত ব্যাঙ্গের মত লাফাইয়া উঠিল। চোখের নিম্নে পুলিসের হাত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইয়া সে এক লাঞ্চিত তাকে বরাশাঘাতি করিল। সঙ্গী-দিগকে পার্কের রেলিং টপকাইয়া চলিয়া যাইতে বলিয়া সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পার্ক প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছিল। জনপাঁচেক ছেলে ছাড়া বাকী ছেলেরা ইল্লের কাণ্ড দেখিয়া যত শীঘ্র পারে সরিয়া পড়িল। আট-দশ জন পুলিস লাঠি উঁচাইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। কাছে আসিয়া ইল্লের চেহারা ও লাঠিহাতে তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া তাহার সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বৃত্তিতে দেহী হইল না, ইহাকে ঘাঁটানো হুঁস্কির কাক হইবে না।

ইতিমধ্যে পুলিস-দলের তারপ্রাপ্ত দারোগাটি সেখানে উপস্থিত হইল। হতমস্তি পুলিসটি তাহার অভিযোগ জানাইল। দারোগা আদেশ দিল—উহার লাঠি কাড়িয়া লইয়া গ্রেপ্তার কর। বয়োবৃদ্ধ এক জন কনেটবল বলিল—হেই বাবুজী, লাঠিটো হাতসে ফেলিয়ে দিন।

ইল্ল হাসিয়া বলিল—লাঠিটা ফেলে দিই আর তোমরা লাঠির ছায়ে আমার মাথা ভাঙো, কেমন? এস, লাঠি কেড়ে নাও।

দারোগা অবস্থাটা বুঝিয়া লইল। ইল্লের চেহারা ও হাসি তাকে আকৃষ্ট করিল। সে বলিল—লাঠি ছেড়ে দিন মশাই। কেউ আপনাকে ছোঁবে না। তবে দয়া করে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

ইল্লের সঙ্গী কয়েক জনের দিকে চাহিয়া সে বলিল—আপনারাও আসুন। এক যাত্রার পৃথক কল হওয়াটা ঠিক নয়।

ইল্ল লাঠি ফেলিয়া দিয়া দলবল সহ থানায় চলিল। দারোগা কালের বেলায় খুব হুঁশিয়ার। ইল্ল ও বাকী পাঁচ জন ছেলের মধ্যে কেহ থানা হইতে বাড়ী ফিরিতে পারিল না।

পরের দিন পুলিসকে কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া ও পুলিসকে প্রহার করিবার অভিযোগে ইল্লের ও সেই ব্যাপারে সাহায্য করিবার অভিযোগে বাকী পাঁচ জনের বিচার হইল। সরাসরি বিচার। ইল্লের ছয় মাস ও আর সড়লের দুই মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ইল্লদের এন্টেটের উকিল সংবাদ পাইয়া যখন ছুটিয়া আসিলেন তখন বিচার শেষ হইয়াছে। তিনি আপিলের অনুরোধ ও আপিল আপেক্ষে জামিনের প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট অনুরোধ দিলেন, কিন্তু প্রার্থনা অগ্রাহ করিলেন। ইল্ল দলবল সহ জেলে ঢুকিল।

উকিলবাবু আপিলের দরখাস্ত করিলেন। তার পর বিস্তারিত ঘটনা জানাইয়া হরিনারায়ণকে টেলিগ্রাম করিলেন।

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আদালতের কাজ সারিয়া তিনি ফিরিয়া দেখিলেন ইল্লের এক জন ভৃত্য একখানি খোলা টেলিগ্রাম হাতে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার হাত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া পড়িয়া তিনি মাধার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হরিনারায়ণ টেলিগ্রাম করিয়াছেন—ইল্লকে অবিলম্বে রাজনগরে আসিবার জন্য, তাহার মাধার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শহরের বড় ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সে যেন কালবিলম্ব না করিয়া রওনা হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আদালতের পোশাকেই তিনি ডাক্তারের বাড়ী ছুটিলেন। সমস্ত অবস্থা জানাইয়া তখনই ডাক্তারের রওনা হইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাকে বলিলেন—হরিনারায়ণবাবুকে বলবেন আমি যেমন করে পারি ইল্লকে জামিনে খালাস করে রাজনগরে পাঠাবার চেষ্টা করব।

পর দিন ডাক্তার যখন রাজনগরে পৌঁছিলেন তখন জগন্নাথীর দীর্ঘ রোগভোগের শান্তি হইয়াছে—বড় ছেলের জন্ম কয়েক বৎসর ব্যাপী বিলাপ থামিয়াছে, স্বামীকে ছাড়িয়া পাছে এক দিনের জন্মও বাঁচিয়া থাকিতে হয় এই উৎকণ্ঠা শান্ত হইয়াছে। শেষ নিঃশ্বাস লইবার আগে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া জগন্নাথী যখন চোখের ইন্ধিতে বিদায়-সন্ধ্যা জানাইলেন, হরিনারায়ণ তখন মনে মনে বলিলেন—ভূমি আমার আগে যাবে এ প্রতিজ্ঞা রাখলে, কিন্তু তোমার অভাব কি আমি সহ করতে পারব? কবে আমার সময় আসবে?

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে জগন্নাথীর বাকরোধ হইয়াছিল। তাহার দুই চোখের ভায়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া নীরবে কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছিল। তাহার দুইটি ছেলে, কিন্তু এমনি বরাত যে, মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উত্তরেই অস্থপন্ন। এত ভাড়াভাড়ি সব শেষ হইয়া গেল যে ছোট্ট মেয়েটিকেও লোক পাঠাইয়া আনিবার সময় হইল না।

ডাক্তার আসিয়াছিলেন জগন্নাথীর চিকিৎসা করিতে, হরিনারায়ণের অবস্থা দেখিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইল। বীরভাবে ডাক্তারের মুখে তিনি ইল্লের শব্দ শুনিলেন। তার পর জীর শেষকৃত্য সারিয়া আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার রক্তের চাপ অভ্যবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। হার্টের অবস্থা ভাল নয়।

ডাক্তারবাবু যখন ইল্লের গ্রেপ্তার ও বিচার সম্বন্ধে উকিল-বাবুর মুখে শোনা কথাগুলি হরিনারায়ণকে বলিতেছিলেন, তখন জীবানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাহার শরীর তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। জগন্নাথীর অন্তর্বের সংবাদ পাইয়া তাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সেই যে এ বাড়ীতে আসিয়া-

হিলেন এ পর্যন্ত আর যথুহে ফিরিতে পারেন নাই।

হরিনারায়ণের অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার সেবা-শ্রমচার জন্ত লক্ষীকে আনাইলেন। হরিনারায়ণের বড় ঘেয়ে যুগ্মী শোকে এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে দেখিবার জুই লোকের দরকার, পিতার সেবা সে আর কি করিবে? চিন্ময়ীকে খণ্ডরবাড়ী হইতে আনিবার জন্য জীবানন্দ লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

এই সব ব্যবস্থা করিয়া তিনি ভাবিতে বলিলেন ইজের সহজে কি করা যায়। উকিলবাবু আখাস দিয়াছিলেন বটে ইজকে জামিনে খালাস করিয়া রাজনগরে পাঠাইবেন, কিন্তু জীবানন্দ জানিতেন এ কাজ ভেমন সহজে হইবে না। স্বদেশী-ওয়ালার স্কুল কলেজের ছাত্রদের উপর শাসকসম্প্রদায়ের যে প্রকার বিদ্বেষ ভাব তাহাতে পুলিশ কাহাকেও একবার কোন উপলক্ষে ধরিতে পারিলে তাহার নিরুত্তি পাওয়া দুর্ঘট। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, ইজের আপীলের বিচার যে জেলা জজের কাছে হইবে তিনি পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বেজার তিনি শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগে বদলি হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে ইঁহার অধীনে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। কিছু হৃদ্যতাও হইয়াছিল তাঁহার সঙ্গে। ভদ্রলোক ভাতিতে আইরিশ, ইংরেজ ভাতি সহজে তাঁহার মনে যে একটা বিরূপ ভাব আছে জীবানন্দ তাহা সেই সময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

জীবানন্দ স্থির করিলেন, তিনি নিজে সদরে যাইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলাজজ উভয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া ইজের জামিন সহজে চেষ্টা করিবেন। জীকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। জিন্মনী সাগ্রহে বলিলেন, তুমি আজই যাও। দিদি অকালে চলে গেলেন। কর্তার যা অবস্থা দেখছি তাঁর ভালমন্দ কিছু হলে এত বড় সংসারটা ভেঙ্গে যাবে। ইজকে এখন কাছে পেলে হয়ত তাঁর অবস্থা ভালোয় দিকে যাবে। এমন বিপাকে একটা সংসার পড়তে পারে ভাবাও যায় না। একটু থামিয়া বলিলেন, চিরকাল আমরা এঁদের কাছ থেকে উপকার নিয়েছি, এখন এঁদের এই বিপদে যেটুকু সাধ্য করতে হবে। জেলের মধ্যে ইজ যখন মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাবে—

কথা শেষ না করিয়া জিন্মনী আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিলেন। ইজের অবস্থা মনে আসিতে তাঁহার চোখ ছাপাইয়া জল পড়িতেছিল।

তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ডাক্তারকে রাজনগরে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া জীবানন্দ সেই দিন বিকালে সদরে রওনা হইয়া গেলেন।

উকিলবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে তিনি জেলা

জজের সঙ্গে দেখা করিলেন। পুরাতন আলাপ-পরিচয় খালাইয়া লইয়া ও পারিবারিক কুশল-প্রশ্নাদির পর জেলা জজ হাসিয়া বলিলেন, আই সি রায় বাহাদুর, অতুখের নাম করে আপনি বাবু অখিনী মতের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন। ইট ইজ বিকমিং-রায়াদার ওয়ার্ল্ড দেয়ার। (সেখানকার হাওয়াটি কিন্তু বেশ গরম হয়ে উঠেছে।)

জীবানন্দ একটু হাসিলেন। বলিলেন, আমি একটা ব্যক্তিগত কাজের জন্ত এসেছি। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সঙ্কোচ বোধ করছি।

জেলা জজ হাসিয়া বলিলেন, আপনি পুলিশের লোক, নিশ্চয় কোন স্বদেশীওয়ালার জন্য কিছু বলতে আসেন নি। তবে আর সঙ্কোচ কিসের? নির্ভয়ে বলুন।

জীবানন্দ বলিলেন, স্যার, আমি একজন স্বদেশীওয়ালার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি।

জেলা জজ—‘কি বললেন? আপনি না একজন ডি. এস. পি. এবং রায় বাহাদুর।’

জীবানন্দ স্নান হাসিলেন। বলিলেন, আমার কথাটা দয়া করে শুুন স্যার।

জীবানন্দ ইজের শ্রেণ্ডার, তাহার বিচার ও শাস্তি, তাহার মাতার মৃত্যু ও পিতার শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন।

বীর ভাবে সব শুনিয়া জেলা জজ বলিলেন, বড়ই হুঃখের বিষয়, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি রায় বাহাদুর?

জীবানন্দ—সেটা আপনি বিবেচনা করে বলবেন স্যার।

আমার কথাটা আগে বলে নিই। প্রথমতঃ ইজদের মাইনে-করা উকিল আছে এখানে। তবু ‘ডিক্লেজার’ (আত্মপক্ষ সমর্থনের) কোন সুরোগ না দিহে আৰ খণ্ডার মধ্যে সন্ধানি তার বিচার করা হয়েছে। আমরা আপীলের দরখাস্ত করেছি। আপীল মঞ্জুর হলে তার মাতার আকস্মিক মৃত্যু ও পিতার শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে এই তার সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে জামিন দিতে গবর্ণমেন্টের আপত্তি হবার কথা নয়। তবুও পুলিশ আপত্তি তুলতে পারে। এবার আমার ব্যক্তিগত বিবেদনটা জানাচ্ছি। ইজকে মুক্ত করা আমার কর্তব্য। আমাকে এ বিষয়ে বধ্যসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আজ হু’দিন হ’ল ইজের মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তার পিতা গুরুতর অসুস্থ। ইজ তাঁর একমাত্র পুত্র। ইজের পিতা আমার বাল্যবন্ধু, আমার একান্ত হিতৈষী তিনি। আমার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, আমাকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। আমার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার ইজের পিতা বহন করেছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত আমার পরম বন্ধুর পক্ষে একমাত্র সাধুনা তাঁর পুত্রকে কাছে পাওয়া। এই সাধুনাটুকু যাতে তিনি পান সেই ব্যবস্থা করে দেবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

জেলা জজ সহায়ত্বভূতির সঙ্গে জীবানন্দের কথা শুনিলেন। বলিলেন—আমি আপনার কি সাহায্য করতে পারি বলুন।

জীবানন্দ—ইঞ্জের অপরাধ প্রমাণ করবার মত যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি না আপীলের বিচারের সময় দেখা যাবে। আপীলের সুনানি হতে দেরি হবে। কিন্তু আপনি জানেন প্রত্যেক হিন্দুর অবজ্ঞাকর্তব্য মাতৃশ্রদ্ধ সম্পন্ন করা। কাজেই এই সময় ছাড়া পাওয়া ইঞ্জের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমি আপনার কাছে এই অমূল্যবস্তু চাইছি।

জেলা জজ বলিলেন, রায় বাহাদুর, কান্ধলপত্র না দেখে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারছি নে। তবে জামিনের—আচ্ছা আপনারা কি জামিনের দরখাস্ত করেছেন?

জীবানন্দ—আজ করা হবে।

জেলা জজ—তাই করুন। কি করা যায় দেখব। আই ফিল রায়দার সন্নি ফর ইওর ফ্রেন্ড (আমি আপনার বন্ধুর জন্ত হীতিমত হুৎবেদ্য করছি।)

জীবানন্দ ভাবিতেছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন আছে কিনা সে কথা জজকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু তাঁর শেষের কথা শুনিয়া স্থির করিলেন উহা অনাবশ্যক, বরং ফল ধারণা হইতে পারে। তাহাকে বক্তব্য দিয়া জীবানন্দ উঠিতেছিলেন, জেলা জজ বলিলেন—বহুশ, এ সম্পর্কে আমি আপনাকে একটু উপদেশ দিতে চাই।

ঈশ্বর হাসিয়া তিনি বলিলেন—জানেন, রায় বাহাদুর, আমার চৌদ্দ বছরের ছেলে এক জন হরু 'সিন ফিনার'। কে জানে এক দিন আমার অবস্থা আপনার বন্ধুর মত হবে কি না। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর ছেলেটির বয়স কত হবে?

জীবানন্দ—বহুর সত্তের আঠারো হতে পারে।

—আপনার বন্ধুর আর্থিক অবস্থা কেমন?

জীবানন্দ—বনেদী জমিদার ঘর। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

জজ—আমি একটা কথা বলছি। থিফট এন্ড ইট (এ বিষয়ে ভেবে দেখুন)। আপনাদের দেশে যোল থেকে তুড়ি-বাইশ বছর পর্যন্ত ছেলেদের পক্ষে সফট-সময়। আপনাদের সমাজে ছেলেদের বিবাহ করানোর পক্ষে আঠারো বছর উপযুক্ত বয়স মনে করা হয়, নয় কি? ছেলেটিকে চটপট বিয়ে করিয়ে ফেলুন। ইট উইল বি এ গ্যারাণ্টি অব সেফটি ফর ফিউচার (এটা হবে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার একটা অব্যর্থ উপায়)। ওকে যখন আপনার আমার মত চাকরি করে বেতে হবে না তখন ডাবনার কথা কি? আপনার পছন্দ হ'ল কথাটা?

জীবানন্দের কথাটা খুব মনে লাগিল। তিনি বুঝিলেন জজ বিচক্ষণ লোক। হরিনারায়ণের সাংসারিক অবস্থা বেরূপ দাঁড়াইয়াছে ইঞ্জের বিবাহ করা প্রয়োজনও বটে। চট করিয়া একটা পুরাতন কথা তাঁহার মনে পড়িল। হরিনারায়ণের

বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহার পিতা, হরিনারায়ণের পুত্রের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা কি তাহাকেই করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, আপনার মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আমি এই উপদেশ পালন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

জেলা জজ—ইয়েস, ইট হুড ডু ইট (হাঁ, তাই আপনার করা উচিত।)

জীবানন্দ উঠিলেন। সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমি আজ অপেক্ষা করব আর।

সাহেব একটু হাসিয়া জীবানন্দের কর্মমর্দন করিলেন, তাঁহার কথার স্পষ্ট উত্তর দিলেন না।

১০

চিন্ময়ী খণ্ডরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। বাড়ীতে পা দিয়াই সে মায়ের ঘরে গিয়া মেঝের পড়িয়া কাদিতে লাগিল। লক্ষ্মী তাহার আসিবার খবর পাইয়াছিল। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া অবশেষে তাহাকে জগদ্ধাত্রীর ঘরে পাইল। চিন্ময়ীর পাশে বসিয়া সে তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে উঠিয়া বসিয়া চিন্ময়ী লক্ষ্মীর গলা জুড়াইয়া বসিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল—মাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না তাই, এ ছুৎ যে আমার মরণোত্তর যাবে না!—লক্ষ্মীর চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল।

তিনি একটু শান্ত হইলে লক্ষ্মী বলিল—চিহ্ন চল, কোঠা-মশায়ের কাছে গিয়ে একটু বসবি। তোরা কাদছিস, তাঁর চোখে এক কোঁটা জল নেই। কেমন যেন হয়ে গেছেন—তাঁর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে।

তিনিকে লইয়া লক্ষ্মী হরিনারায়ণের ঘরে চলিল। লক্ষ্মী এই কয় দিন এ বাড়ীতেই আছে। হরিনারায়ণের সেবার তাঁর তাহার উপরে। জিনিসনী সকালে বিকালে আসেন, ডাক্তারের মতামত শুনিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন, গৃহিণী-শুভ সংসারের ব্যবস্থার কোন ক্রটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। ইঞ্জের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন সর্বদা হার হার করে। ডাবেন, বড় ভাই নিরুদ্দেশ, অকালে মা চলিয়া গেলেন, চোখের দেখাটুকু পর্যন্ত হইল না, এদিকে বাপের অবস্থাও এখন তখন। সংসারের এই হাল আর ছেলেটা মিছে রইল জেলে আটক।

তিনিকে লইয়া লক্ষ্মী হরিনারায়ণের কাছে বসিল। মেরেকে দেবীয়া হরিনারায়ণ একদুটে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া কাদিতে লাগিল। একটু পরে লক্ষ্মী চাহিয়া দেখিল হরিনারায়ণের চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। হরিনারায়ণের চোখে জল দেখিয়া তাহার মন যেন একটু হালুকা হইল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের চারদিকে চাহিয়া দেখিল। হরি-

নারায়ণের প্রিয় সেতারটি একধারে অর্থাৎ পড়িয়া আছে, ধূলি জমিয়াছে সেতারের গায়ে। ছোট টেবিলের উপরে ফুলদানিতে ফুল কবে শুকাইয়া গিয়াছে। বড় টেবিলটার উপরে অনেকগুলি বই ছড়ানো রহিয়াছে। রূপার গড়গড়ার গায়ে ধূলি সঞ্চিত হইয়াছে। মাথার বালিশের তোয়ালেখানা ময়লা হইয়াছে। লক্ষ্মী আঁচল দিয়া সাবধানে সেতারের ধূলি মুছিয়া তাহার ঢাকা পরাইয়া সেটিকে যথাস্থানে রাখিল। ফুলদানি বারান্দায় লইয়া গিয়া বালি, শুকনো ফুলগুলি ফেলিয়া দিল। হরিনারায়ণের খাস খানদামা বারান্দায় ঢুলিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া বাগান হইতে ফুল আনিতে বলিল। গড়গড়ার ধূলি মুছিয়া, নল খুলিয়া সেটি খুঁইয়া মুছিয়া আবার নল পরাইয়া রাখিল।

কাছ শেষ করিয়া সে চাহিয়া দেখিল চিনি তখনও মাথা শুষ্কিয়া পড়িয়া আছে। ভাহার মনে পড়িল, চিনি স্বস্তর-বাড়ী হইতে কাল রওনা হইয়াছে, পথে কিছু খাওয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহাকে কিছু খাওয়ানো দরকার। সে চিনির পিঠে হাত রাখিয়া যত্ন করে বলিল—চিহ্ন আর, হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসবি।

হরিনারায়ণের খানসামাকে সে ঘরের মধ্যে বসিতে বলিল। তার পর চিনিকে জড়াইয়া ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘাইবার আগে হরিনারায়ণের কাছে গিয়া বলিল—জ্যেষ্ঠামশাই, চিহ্নকে কিছু খাইয়ে আনি, ওর বোধ হয় সারা-দিন খাওয়া হয় নি। হরিনারায়ণ খাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা হরিনারায়ণকে পথ্য দিয়া, লক্ষ্মী কাপড় ছাড়িয়া মগপ দালানে প্রণাম করিয়া অন্তরের আঙ্গিনায় তুলনীভায়া আসিল। দেখিল বেদীমূলে প্রদীপ জালিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রদীপের সলিটাটি উসুকাইয়া দিয়া, গলার আঁচল জড়াইয়া সে প্রণাম করিল। প্রণাম সারিয়া উঠিতে দেখিল তাহার পাশ দিয়া কে এক জন চলিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী একটু চমকিয়া বলিল—কে?

যে যাইতেছিল সে কিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কে, লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী দেখিল ইন্দ্র। অন্ধকারে ইন্দের মুখের চেহারা ভাল দেখা গেল না। তাহার গলার স্বর লক্ষ্মীর মনের মধ্যে আঘাত করিল।

ইন্দ্র আগাইয়া আসিয়া বলিল, বাবা কেমন আছেন? চিনি এসেছে?

লক্ষ্মী বলিল, আপনাকে ঘেঁড়ে দিয়েছে? জ্যেষ্ঠামশাই আজ একটু ভাল আছেন। চিনি কাল এসেছে। চিনি বড় কানাকাটি করছে।

একটু থামিয়া সে বলিল, আপনি জ্যেষ্ঠামশায়ের কাছে যান। আমি চিনিকে নিয়ে তাঁর ঘরে যাচ্ছি।

ইন্দ্র চলিয়া গেল। সে চোখের আড়ালে গেসে লক্ষ্মী গলার আঁচল জড়াইয়া আবার তুলনী-বেদীতে প্রণাম করিল। একবারে তাহার তৃপ্তি হইল না, তিন চার বার সে বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া জীবানন্দ ইন্দ্রকে বলিলেন, তুমি দাদার ঘরে যাও, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসছি।

ডাক্তার বৈঠকখানার একটু ঘরে ছিলেন। জীবানন্দ ঘরে ঢুকিতে তিনি প্রথমেই দ্বিজাঙ্গা করিলেন, হরিনারায়ণবাবুর ছেলে এসেছে?

জীবানন্দ বলিলেন, সে জামিনে ছাড়া পেয়েছে। আপীলে সুনানির সময় উপস্থিত হতে হবে। ডাক্তার বলিলেন, সে সব পরের কথা। উপস্থিত থাকে যে ছেড়ে দিয়েছে সেইটেই টের অনুগ্রহ করেছে বলতে হবে। ছেলেকে কাছে পেলে হরিনারায়ণবাবুর বাহ্যের পক্ষে ভালই হবে। তাঁর ছোট মেয়ে আসবার পরে থেকে কিছু উন্নতি দেখছি। আপনার মেয়ের প্রশংসা কিভাবে করব জামিনে রাখবাহার। এটুকু বয়সে এমন বুদ্ধিমতী, শাস্ত্র শতাবের কাজের মেয়ে আমার আর চোখে পড়ে নি।

জীবানন্দ যত্ন হাসিলেন মেয়ের প্রশংসা শুনিয়া। বলিলেন, এ যাত্রা দাদা সামলে মিটে পারবেন মনে হচ্ছে কি?

ডাক্তার—ছেলেমেয়েরা কাছে থাকলে ধীরে ধীরে সেয়ে উঠবেন ভরসা করছি। তবে রীতিমত সুস্থ হয়ে ওঠা—মানে আপেকার স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন কিনা সন্দেহ। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারলে তাঁর স্থানপরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে। সে যা হোক, এখনকার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে গেলেম। আপনি এসেছেন এইবার আমাকে ছুটি দিন।

জীবানন্দ—আজ রাতটা থাকুন। কাল ভুঁকে ভাল করে দেখে ব্যবহার কথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। আমার শরীরটাও সুস্থ নয়। আমার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে আপনাকে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আপনার ব্যবস্থা এখনই করছি। সারা জীবন খেটেছেন, এখন একটু বিশ্রাম নিন। আপনার প্রয়োজন পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

ডাক্তারের ঘর হইতে বাহির হইয়া জীবানন্দ হরিনারায়ণের ঘরে গেলেন।

রাজে আহ্বারের পর জীবানন্দ জীকে বলিলেন, তুমি ভাড়াভাড়ি বেয়ে নিয়ে ওপরে এস। অনেক পরামর্শ আছে।

নিজে খাইয়া ছেলেমেয়েদের ভইতে পাঠাইয়া জিনগনী যখন ঘরে আসিলেন জীবানন্দ তখন দুখাইয়া পড়িয়াছেন। জিনগনীর পায়ে শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি

উঠিয়া বলিলেন। বলিলেন, এক গ্রাম জল দাও ত, তেঁটা পেয়েছে।

জল খাইয়া তিনি বলিলেন, ঠিক হয়ে বস বিছানায়। অনেক কথা আছে।

জিনয়নী বিছানায় বসিয়া স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, কি কথা বল।

জীবানন্দ—হাতে আরও দু'মাস ছুটি আছে। তেবেহিলাম একটু সুস্থ হলে কোন ভাল কারাগার গিয়ে মাসখানেক থেকে আসব। কিন্তু সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। হরিনারায়ণদার এই বিপদের সময় তাঁকে কেলে যেতে পারি নে। এখন হাতে ছোটো কাজ রয়েছে। একটা ইঞ্জের সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টা—

জিনয়নী—যেহের বিষয়ে।

জীবানন্দ—ঠিক বয়েছ। ও বাড়ীর চিনি আর লক্ষী এক বয়সের নয়?

জিনয়নী—লক্ষী দু'মাসের বড়। আর তাকে রাখা যায় না।

জীবানন্দ—তাই বলে না দেখে শুনে বিয়ে দেব? তা হবে না। আমার ইচ্ছে কি ছিল জানো? একসঙ্গে দেবু আর লক্ষীর বিয়ে দেব। কিন্তু দেবু যা ভাবগতিক, চট করে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি নে। তাই ঠিক করেছি মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেলা ভাল। এবার চেষ্টা আরম্ভ করব। এখন ইঞ্জের কথা বলছি—শোন। জুজ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে যা বুঝলাম তাতে মনে হয় সে ছাড়া পেলেও পেতে পারে, নচেৎ নামমাত্র শান্তি হবে। কিন্তু তার পরেও ইঞ্জের বিপদ কাটবে না। পুলিশের নজর পড়েছে ওর ওপর। লোকে বলে বাঘে ছলে আঠারো বা। বাঘের চেয়ে পুলিশ সাংখ্যাতিক জীব। পুলিশে ছুঁলে হয় বজ্রিণ ঘা। সবাই একথা জানে। জুজসাহেবও জানেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, 'হেলেটাকে যদি নিরাপদে রাখতে চাও তা হলে ওর বিয়ে দিয়ে ফেল।' এই পরামর্শমত কাজ করতে হলে প্রথমত ইঞ্জের বাপের মত হওয়া চাই, তার পর ইঞ্জের নিজের রাজী হওয়া চাই। ওর বাপকে হয়ত বর্তমান অবস্থায় রাজী করানো যেতে পারে, কিন্তু ইঞ্জ নিজে যদি বৈকে বলে? হেলেদের কার পেটে কি আছে বোঝা হুফর।

জিনয়নী—ইঞ্জকে আগে থেকে বলবার দরকার কি? সে ছাড়া পেলে ও বাড়ীর বটঠাকুর বলবেন। তাঁর কথা সে ফেলতে পারবে না।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন—তুমি ঠিক বলেছ। আজ রাতটুকু কাটুক, কাল হরিনারায়ণদাকে সব কথা বলব।

জিনয়নী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। জীবানন্দ বলিলেন, আর কি ভাবছ? যেটুকু পোলমালের আশঙ্কা ছিল তার মীমাংসা ত তুমি নিজেই করে দিলে।

জিনয়নী—ভাবছি ইঞ্জের বিয়ে দেবার তার ত নিচ্ছ, কিন্তু

ওর বাপের পছন্দমত মেয়ে দেখে বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিতে পারবে কি? বটঠাকুরের শরীরের অবস্থা ভাল নয়।

এবার জীবানন্দ ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা সত্য।

ইঞ্জের পিতা জুজ। যাহা করিবার অর্থাৎ পছন্দমত মেয়ে দেখিয়া বিবাহ স্থির করিবার কাজ তাঁহাকেই হয়ত করিতে হইবে।

জিনয়নী—একটা কথা বলছি, তুমি কি ভাববে জানি নে, তবে আমি মা, অনেক দিকে আমাকে চোখ রাখতে হয়। সে সব কথা তুমি বুঝবে না।

জীবানন্দ একটু আশ্চর্য বোধ করিলেন। বলিলেন—কি বলবে বল না, আমার কাছে বলতে যদি অভ ভাবতে হয়—

জিনয়নী—ভাবছি এখন্য যে কথাটা শুনে তোমার কেমন লাগবে জানি না। তুমি এখানে থাক না, নিজের চোখে কিছু দেখবার সুযোগ হয় নি। অভ কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি বলি কি—

জীবানন্দ বুঝিলেন জিনয়নীর বক্তব্য বাহিয়া যাইতেছে তিনি কি ভাবে কথাটা লইবেন তাহা ভাবিয়া। তিনি জীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তোমার মনের কথা বল। সে কথা যাই হোক না কেন, আমি কিছু মনে করব না।

জিনয়নী স্বামীর কথা শুনিয়া যুহু গ্রান হাসি হাসিলেন। বলিলেন—বলছি। আমি বলি কি আমাদের মেয়েকে কি ইঞ্জের হাতে দেওয়া যায় না? অন্য কোন দিক ভেবে আমি একথা বলছি না কেনো, আমি মা বলে অনেক দিকে আমাকে চোখ রাখতে হয় কিনা?

জিনয়নীর কথা শুনিয়া জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয়, জীর কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিনয়নী বলিলেন—ইঞ্জের জেলে করবে হবার সংবাদ যখন শুনল তখন মেয়ের এমনি অবস্থা হ'ল যে তার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি নি, শুধু ভগবানকে ডাকলাম মনে মনে। বললাম, ঠাকুর, মেয়ে আমার বড় হয়েছে, এ কি খেলা খেলছ তুমি? ছোটটি থেকে দু'জনে মেলা-মেশা করছে, হাসিখুশি, গল্প, ঠাট্টা-মকরা, বগড়া-ঝাঁটি কতই হয়েছে। দোষ আমাদেরই, কেন আরও আগে মেয়ের বিয়ের দ্বন্দ্ব চেষ্টা করি নি। এত দিনে সব ভুলে যেত। বয়স্থা মেয়ের মনে এমন দাগ বসেছে, ভাবতে আমার বুক কেঁপে ওঠে। মেয়ের মুখ যেন আয়না, নিজেও হয়ত ভাল করে বোঝে না হেলেবেলার চীন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

জীবানন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—তোমার কথা এবার বুঝলাম। আমাদের ক্রটি হয়েছে মেয়ের এত দিন বিয়ে না দেওয়া। এবার আমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করব, যত শীঘ্র পারি। কিন্তু তুমি যে প্রস্তাব করলে তা হতে পারে না। অভ কথা হেঁচো দিলেও একটা কথা থেকে

যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, ওরা আমাদের উপকারী যজ্ঞমান বংশ, আমরা ওদের বৃত্তিভোগী পুরোহিতবংশ। ওদের দেওয়া ব্রহ্মোত্তর আমরা এখনও ভোগ করছি। ওরা নিজে থেকে মিথে না চাইলে আমি এ প্রস্তাব করতে পারি নে।

এবার জিনয়নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—তুমি বাপ, তুমি বা ভাল মনে কর তাই হবে।

তারপর হাসিয়া বলিলেন—তুমি শোও, আমি বাতাস করি একটু।

জীবানন্দ শয়ন করিলেন।

পরের দিন জীবানন্দ হরিনারায়ণের নিকট ইঞ্জের বিয়ের কথা তুলিলেন। তিনি সহজেই মত দিলেন। বলিলেন, হেলের বিয়ে দিতে পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারি তাই। তবে খুব ভাড়াভাড়া তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল মেয়ে খুঁজে বের করতে পারবে কি এত শীঘ্র? আমি অশক্ত হয়ে পড়েছি, সব তার তোমার ওপর।

ভাল মেয়ের কথা উঠিতে জীবানন্দ একটু বিমন হইলেন। তখনই সে ভাব বাড়িয়া কেলিয়া বলিলেন, আগে হেলটাকে ছাড়িয়ে আমি। মেয়ের ভাবনা কি?

যথাসময়ে কপড়াজীর শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেল। হরিনারায়ণের শরীর আর ধারাপের দিকে যায় নাই।

জীবানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হরিনারায়ণ স্থির করিলেন আপীলের ফলাফল দেখিয়া ইঞ্জের বিবাহের কথা পাকাপাকি স্থির করা হইবে। বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় কোন পাজীপক্ষের সঙ্গে কথা স্থির করা ঠিক হইবে না। ইঞ্জের কারাদণ্ড হইলে কেহ কেহ হয়ত মেয়ে দিতে ইতস্ততঃ করিবেন।

হরিনারায়ণ পুত্রকে বিবাহ করাইবেন একথা প্রচার হওয়াতে দুই একটি করিয়া সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। হরিনারায়ণ বৃদ্ধ মায়েবের উপর প্রাথমিক কথাবার্তা চালাইবার ও মেয়ে দেখিবার ভার দিলেন। তিনি ভাবিলেন, উপযুক্ত মেয়ের সন্ধান পাইলে জীবানন্দকে মেয়ে দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করিতে অস্বরোধ করিবেন।

রাজনগরে ফিরিয়া মাতার আকস্মিক মৃত্যুর শোকে ও পিতার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া ইঞ্জ কয়েক দিন মুহমান হইয়া রহিল। এগুয়ার, সরাসরি বিচার ও কারাদণ্ডের আদেশ তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। আজ এক বৎসরের উপর স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্ত পুলিশী জুলুম, সরকার-ভোষণকারী এক শ্রেণীর লোকের বিরোধিতা, সাধারণ লোকের ঔদাসীন্য—এই সব ধীরে ধীরে তাহার মনে নৈরাশ্রের ভাব সঞ্চার করিতেছিল। তাহার মনে কেমন একটা ধারণা ক্রমেই বহুতল হইতেছিল যে, স্বদেশী আন্দোলনে তাটা পড়িয়াছে। প্রথমে এই আন্দোলন লোকের মনে যেভাবে দোলা

দিয়াছিল সেই দুর্লুনি ধামিরা গিয়াছে। লোকের মন আবার পূর্বেরকার ঔদাসীন্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। পারিবারিক শোকের আঘাতে মনের এই ভাবটা আরও ঘনীভূত হইল।

ইঞ্জ স্বভাবতঃ আবেগপ্রবণ, উত্তমশীল ও বিশেষ বুদ্ধিমান। শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল, পারিবারিক শোকের আঘাতে যে মানসিক দুর্বলতা আসিয়াছে সেই দুর্বলতা, ও পিতার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ায় তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে সেই অনিশ্চয়তা তাহার দৃষ্টিকে ও বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সে ভাবিল, হয়ত তাহার জেল হইবে। জেল হইতে বাহির হইয়া সে কি করিবে? কোন্ পথে সে চলিবে? এই অজ্ঞানতার কবলে পড়িয়া সে ভাবিল, যদি মন খুলিয়া কথা বলিবার ও পরামর্শ করিবার মত কাহাকেও পাওয়া যাইত। সতীনের কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহার ঠিকানা ত সে জানে না। অনেক চিন্তা করিয়া সে দেবানন্দকে চিঠি লিখিতে বলিল। ভাবিল দেবদা তাহার আবাল্য পরামর্শদাতা গুরু, তাহার সর্বোত্তম সুহৃদ, দেখা যাক সে কি পরামর্শ দেয়।

অনেক রাত জাগিয়া সে দেবানন্দকে চিঠি লিখিল। বর্তমান পারিবারিক বে সমস্তা তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে তাহার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিল। বর্তমান অবস্থায় দেশসেবার কার্যকরী পন্থা কি এই প্রসঙ্গ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিল। পরদিন চিঠিখানি ডাকে দিয়া সে একটু স্বস্তি বোধ করিল।

বিকালের দিকে পিতাকে ঔষধ খাওয়াইয়া সে একটু বেড়াইতে বাহির হইল। চিন্ময়ী ও ইঞ্জ উভয়ে মিলিয়া পিতার শুজ্বার ভার লইয়া লক্ষ্মীকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়াছে। লক্ষ্মী এখন বাড়ী হইতে প্রতিদিন বিকালে আসিয়া হরিনারায়ণকে দেখিয়া যায়।

ইঞ্জ রানবাগানের পাশ দিয়া বনহুগাঁওলা হইয়া মুরলী বিলের ধারে মাঠে যাইবার পথ ধরিল। বনহুগাঁওলায় আসিয়া কি ভাবিয়া সে একটু দাঁড়াইল, তারপর বাঁ-দিকে বিলের পথে অগ্রসর হইল। সেই সময়ে চৌলপাড়া হইতে ইঞ্জদের বাড়ীর কি মুকীর মা লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছিল। চিন্ময়ী লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছিল। মুকীর মা আগে আগে আসিতেছিল। বনহুগাঁওলায় ইঞ্জকে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া মাথার কাপড় টানিয়া মিল। ইঞ্জ তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহার পিছনে লক্ষ্মীকে দেখিতে পার নাই। কয়েক পা গিয়া মুকীর মার গলার শব্দে ফিরিয়া চাহিতে ইঞ্জ দেখিল বনহুগাঁওলায় দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখাচোখি হইতে লক্ষ্মী স্বাক্ষর হইত করিল, এবং মুকীর মার পিছনে অগ্রসর হইল।

নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিয়া ইঞ্জ চলিতে

লাগিল, ভাবিল, লক্ষ্মী বাবাকে দেখিতে যাইতেছে। এবার এত দিন ধরিয়া লক্ষ্মী বাবার যে সেবা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। লক্ষ্মীর যে এত গুণ সে কখনও ভাবে নাই। তাহার মনে হইল লক্ষ্মী যেন আরও বড় হইয়াছে, আরও সুন্দর হইয়াছে। চিনি ওর একবরশী, কিন্তু তাকে কত ছেলেমানুষিট দেখায়। হঠাৎ তাহার মনে হইল লক্ষ্মী ওখানে দাঁড়াইয়াছিল কেন? তার কি তাহাকে কিছু বলিবার ছিল? সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দুই এক পা আগাইয়া ধামিল। ভাবিল লক্ষ্মী আত্মকাল তাহার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না, সে গিয়া কি করিবে? কিছু বলিবার থাকিলে চিন্তকে বলিবে। সে আবার বিলের পথে চলিতে লাগিল।

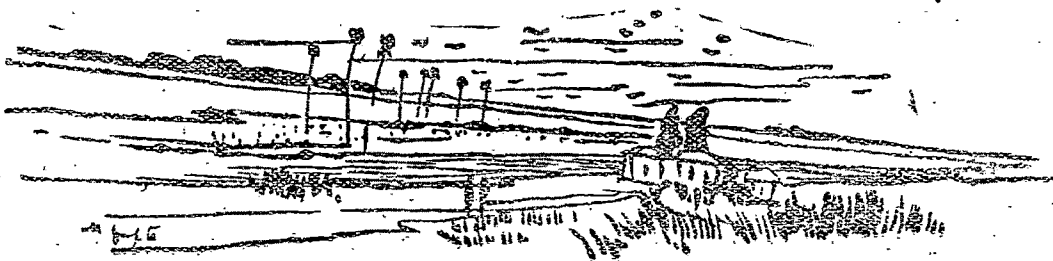
লক্ষ্মী আজ সকালে হরিনারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিল। শরীরটা একটু ধারাপ বোধ হওয়ার বিকালে আর যাইবে না স্থির করিয়াছিল। কিন্তু মুকীর মা আসিয়া বলিল, ছোট দিদিমনি তাহাকে পাঠাইয়াছে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্মী দিদিমণিকে লইয়া যাইবার জন্য। লক্ষ্মী মনে করিল হরিনারায়ণের সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে বোধ হয় তিনি কোন পরামর্শ করিতে চাহে তাহার সঙ্গে। সে জানিত না চিন্ময়ী তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে তাহার অপেক্ষা করিতেছিল বটে, কিন্তু পিতার সম্বন্ধে কোন পরামর্শের অভিপ্রায়ে নহে। সেদিন সে জীবানন্দ কাকাকে তাহার বাবার কাছে বলিতে শুনিয়াছিল যে, পঞ্চকোশীতে একটি ভাল ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শীঘ্রই তিনি পঞ্চকোশী যাইতে-ছেন। খর বর পছন্দ হইলে তিনি মেয়ে দেখিবার জন্য পাত্রপক্ষকে নিমন্ত্রণ করিবেন ও ছুটি শেষ হইবার আগে লক্ষ্মীর বিবাহ দিবেন। হরিনারায়ণ বলিয়াছিলেন—মেয়ে বড় হয়েছে, যত শীঘ্র সম্ভব দায়যুক্ত হওয়া ভাল। তুমি পঞ্চকোশী থেকে ফিরে এস, ইজের জন্য একটি ভাল সম্বন্ধ এসেছে, মেয়েটি তোমাকে এক বার কষ্ট করে দেখতে যেতে হবে। বড় খর, মায়েবকে ওখানে পাঠাতে পারি না।—এই কথাবার্তা শুনিবার পর চিন্ময়ী অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না ইহার এমন অর্থ কেন, কেন নিকটের বন্ধ চোখ তুলিয়া না দেখিয়া দূরে হাতড়াইতে

যাইতেছেন। লক্ষ্মীর মনের কথা সে কিছু কিছু জানে। সুতরাং অন্য কোথাও যাহাতে লক্ষ্মীর বিষের কথা চলিতে না পারে সে চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। কুল-গৌরবে অন্ধ হইয়া তিনি তাহার প্রস্তাব কানে তোলেন নাই, নিজের সংসারের কিসে হিত হয় বুঝিতে চাহেন নাই। আজ তিনি স্বর্গে, তাহার দোষ ধরিতে নাই। তাহার বাবার মনোভাবও কি ঐ রকম? বোধ হয় তাই। নচেৎ লক্ষ্মীকে এত দিন ধরিয়া দেখিয়া, তাহার সুন্দর স্বভাবের এত পরিচয় পাইয়াও দাদার সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহের কথা বলেন না কেন? সব পুরুষ মানুষ অন্ধ। তাহার দাদাও কি অন্ধ?

চিন্ময়ী সঙ্কল্প করিল যেমন করিয়া হটুক সে জীবানন্দ কাকার পঞ্চকোশী যাওয়া বন্ধ করিবে, তাহার বাবার কাছে কথাটা পাড়িবে। সে বুঝিতে পারে জীবানন্দ কাকা নিজে হইতে বাবার কাছে প্রস্তাব করিবেন না। তাহাতে তাহাতে এক বার তাহার মনে হইল, আচ্ছা, দাদার নিজের মনেও যদি মায়ের মত, দিদির মত কুলের বড়াই থাকে, যদি লক্ষ্মীর উপর সত্যি টান না থাকে তাহা হইলে সে কি করিবে? আগে দাদার মনের ভাবটা বুঝিয়া লইয়া বাবার কাছে কথা উপস্থাপন করা উচিত। এখন দাদার মনের ভাব বুঝিবার কি উপায় করা যায়? দাদাকে দেখিয়া মনে হয় তাহার মাধার কি সব চিন্তা ঘুরিতেছে। ইহার আগে মায়ের অন্তরের সময় যখন সে আসিয়াছিল তখনও দাদাকে এই রকম চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া-ছিল। সে সব সময়ে উদ্ভ্রাণ থাকে। সেদিন কাকীমাও তাহাকে বলিয়াছিলেন—চিন্ম, ইজ এত উদ্ভ্রাণ হ'ল কেন? তোমার বড় ভাই সম্রাসী হয়ে খর ছেড়েছে। ইজের এই ভাবটা আমার ভাল লাগছে না। তোমরা যত শীঘ্র পার বিয়ে দিয়ে ওকে বাঁধবার চেষ্টা কর। ও যদি পালায় তোমার বাবা সেই দণ্ডে মারা যাবেন।—কাকীমা যথার্থ হিতৈষিণীর মত কথা বলিয়াছেন। আর দেরি করা ভাল হইবে না।

অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পরে তাহার মনে হইল লক্ষ্মী আজ বিকালে বোধ হয় আসিবে না, তাহাকে জুকিয়া পাঠাই। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া দেখি।

কমণ:



শিশিরকুমার ঘোষ ও জাতীয় রঙ্গমঞ্চ

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

জাতীয়তার উদ্বোধক প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই “অমৃত বাজার পত্রিকা”র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। হিন্দুমেলায় সহিতও তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা কারয়াছি।*

হিন্দুমেলায় নায়ক রঙ্গমঞ্চকেও শিশিরকুমার জাতীয়তার উন্মেষ তথা স্বদেশ-সেবার অন্যতম প্রধান বাহন রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার একথানা আধুনিক ধরণের যাত্রার বই লিখিয়াছিলেন এবং নিজ গ্রাম অমৃত বাজারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নির্দোষ আমোদ এবং সত্যকার শিক্ষা—এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া তাহার ইহা আরম্ভ করেন।

দৃশ্যনাট্যের মধ্য দিয়া জাতির মর্ম্মবেদনা ও মর্ম্ম-কথা ধেরূপ প্রচার করা যায় এরূপ আর কিছু দ্বারাই সম্ভব নহে। এতদিন কলিকাতা এবং মফস্বলের ধনী ও বিত্ত-শালী লোকেরা সখের থিয়েটার বা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া সাময়িক ভাবে সে যুগের সামাজিক ও অন্যবিধ বহু সমস্যাশূলক নাটক-প্রহসন অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে উহাদের বন্ধু-বান্ধব এবং নিমজ্জিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে, প্রথমে ঢাকায় এবং তাহার অব্যবহিত পরে কলিকাতায় এই সাধারণ-অধিগম্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ ন্যাশন্যাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ নামে অভিহিত হয়। শিশিরকুমার কলিকাতায় আগমনের পর এইরূপ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আয়োজনের বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ উৎফুল্ল হন এবং যে সব যুবক ইহার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, “অমৃত বাজার পত্রিকা”য় শিশিরকুমার ইতিপূর্বেই অন্যত্র যে-সব অভিনয় হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিতে থাকেন। সুবিখ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটকের অভিনয় লইয়াই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইল। যখন এই নাটক অভিনয়ের মহলা চলিতেছিল তখনই শিশিরকুমার উদ্বোধনাদির কাহারও কাহারও সঙ্গে পরিচিত হন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু উদ্বোধন ও অভিনেতাদের

অন্যতম ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

“যুব উৎসাহের সহিত আমাদের [‘নীলদর্পণের’] রিহাসাল চলিতে লাগিল। আমি তখন থিয়েটারে গা ঢালিয়া দিচ্ছি। একদিন রসিক নিরোগীর ঘাটের বৈঠকখানায় আমি একাকী বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল না, কেন আমার ঠিক মনে নাই।...আমি একাকী তামাক সেবন করিতেছিলাম। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া আমি সমস্ত্রমে দাঁড়াইয়া উঠলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভুবন নিরোগীর এই বাড়ীতে থিয়েটারের রিহাসাল হয়?’

‘জাঙ্গে হাঁ।’

‘তুমি কি সেই দলের একজন প্রেমার?’

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম।

‘আজ তোমরা এখনও রিহাসাল আরম্ভ কর নাই কেন?’

‘আজ আমাদের রিহাসাল বন্ধ; আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত নাই।’

‘তাই শু; জামরা এলুম তোমাদের রিহাসাল দেখতে’—

‘আমুন ভিতরে বসুন, তামাক ধান।’

‘ধাক্, আর তামাক খাব না। আমাদের তুমি চিনতে পার্চ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারীমোহন রায়।’

আমি তৎক্ষণাৎ শিশিরবাবুর পদধূলি লইলাম, অক্ষয় বাবুকে ও প্যারীমোহন বাবুকে নমস্কার করিলাম।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমার নাম কি?’

‘অমৃতলাল বসু।’

‘তুমি কি লাক্ষ্য?’

‘সৈরিক্সী।’

‘আচ্ছা, সমস্ত পালাটা না হয় আজ নাই হ’ল, তুমি সৈরিক্সীর পাঠটা আমাদের একটু শোমাবে?’

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলাম।...আমি শিশিরবাবুকে বলিলাম—‘আমি আপনার দেখা পড়েছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি যুব বেশী, আপনি যখন বলছেন তখন আমি আমার পাঠ একটু আপনাকে শোনাতে পারি।’

আমি নবীনমাধবের যত্নাশ্রয় পাঠে সৈরিক্সীর অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাহার সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।”

২

শিশিরকুমার জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অতঃপর অমৃতলাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বাহা লিখিয়াছেন তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

“সেদিন ফিরিয়া ঘাইবার সময় শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন,—‘এখন আমি বোম্বাইয়ে হিদারাম ব্যাণ্ডারের গলিতে থাকি; তুমি আমার বাসায় আমার সঙ্গে দেখা করো।’ তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হাড়টিয়া গেল। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। দেখুন সেদিন যুনিভার্গিট ইন্সটিটিউট হলে আমি শিশিরবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—‘তিনি একজন আন্ত বাঙ্গালী ছিলেন। একথাটা যে কত সত্য তা’ আপনারা বোধ হয় আজকাল উপলব্ধি করিতে পারিবেন না; তিনি দেশের সমস্ত অহুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যে নুতন থিয়েটার খোলা হইল, যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম চাশনাল থিয়েটার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবিলেন,—ইহার ভিতর দিয়া কি বাঙালীজাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না? এই যে democratic ষ্টেজ, ইহা ত আর বনী গৃহস্থের ঘোষালের উপর নির্ভর করিবে না; বাঙ্গালীর সর্বাঙ্গীণ ভাব-পুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন? ইহারা ত সাহস করিয়া ‘নীলদর্পণ’ লিখা আরম্ভ করিয়াছে। দেশের মর্মস্থান হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার সহিত সমবেদনার জন্ত লং সাহেবের কারাবাস হইল, সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাঞ্জিয়াছে। ইহারা যদি লঘুদ্রুতি প্রণোদিত হইয়া কার্য করে, তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অনেক আশা করিতে পারে।...কিছু দিন পরে শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটারের একজন ডাইরেক্টর হইলেন।”*

প্রারম্ভিক আয়োজনাদির পর ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা-চিৎপুরস্থ মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ন্যাশন্যাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হইল ‘নীলদর্পণ’। শিশিরকুমার অভিনয় দর্শন করিয়া পরবর্তী ১২ই ডিসেম্বর ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’য় নিজ মন্তব্যসহ দীর্ঘ বিবরণ প্রদান করেন। ইহার মধ্যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একারণ এখানে এই বিবরণটি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,

“নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গত শনিবার নীল-

দর্পণের ‘নবমোবন’ হইয়াছে। যেতাদর্পণের পক্ষপাতত্ব ও অভ্যাসের অনেকই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে একরূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে। সংসারে নানা প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে, কিন্তু ইহা গো চরিত্র রঙ্গভূমিতে দেখিয়া মনোমধ্যে ধোরভর ঘৃণা জন্মে। নুতন ছোঁড়দারী কার্যবিধি আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীন-মাবব বলিলেন যে, ‘আবার যে নুতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্বনাশ’ বাক্য কয়েকটি উচ্চারিত হইয়া-মাঝেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে রোদনে ফল কি?”

শিশিরকুমারের দৃষ্টি শুধু কলিকাতাবাসীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি যনে করিতেন বাঙালী জাতির হিত করিতে হইলে কলিকাতার ন্যায় মফস্বলের জনসাধারণকেও জাতীয় ভাবে ভাবিত করিতে হইবে। হিন্দুমেলার অল্পষ্ঠাত্ব-বর্গকেও এইজন্য তিনি মফস্বলে কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বেলাতেও তিনি নীলদর্পণের এই প্রথম অভিনয়ের পরেই মফস্বলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে কর্মকর্তাদের উপদেশ দিলেন। তবে এবারে ইহার কারণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ছিল। শিশিরকুমার লিখিলেন,

“আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাধাতে গরিব রাইস্বত মূল্যবলুণ্ডিত হইয়া উঠেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলী মধ্যে উঠেবরে হাতধনি উঠিল। কয়েকটি পল্লী-গ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার রুক্ষমগরে, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ঘনবান ভূমিদার-গণকে অহুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাইউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর বিপ্লীড়ন আর নাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব?”

জাতীয় রঙ্গমঞ্চে ‘নীলদর্পণ’ কয়েকবার অভিনয়ের পর অন্যান্য নাটকও অভিনীত হইতে লাগিল। বড় বড় নাটকের সঙ্গে প্রহসনও অভিনীত হইতে থাকে। তখন প্রহসন-সাহিত্য সবে গড়িয়া উঠিতেছিল। মধুসূদনের কয়েকখানি প্রহসনই ছিল তখন একমাত্র সম্বল। অভিন-

নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রহসন-রচনায় তৎপর হইলেন। এই প্রহসন-সাহিত্য রচনায়ও শিশিরকুমার পত্রিকা মারফত যুবকদিগকে কিরূপ প্রেরণা দিতেছিলেন, অমৃতলাল বসু তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,

“এই প্রহসন-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে।... ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে সর্ব ডেপুটী ভৈরব করিবার জন্ত স্থল স্থাপিত হইয়াছিল। Botany, Chemistry, আইন, জরীপকরা, সত্তরণ, দ্বিমুণ্ডাষ্টিক প্রভৃতি নানা বিভাগ আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে সর্ব ডেপুটী হইবার সম্ভাবনা হইত। গভর্ণমেণ্টের সাকুলার প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই অমৃত বাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার Cartoon বাহির হইল; কয়েকজন দ্বিমুণ্ডাষ্টিকের পোষাকপরা বাঙালী যুবক সার গাধিয়া দণ্ডায়মান—তাহাদের কানে চিমটে, কোমরে পিকল। সর্ব ডেপুটী হইবার সমস্ত সরঞ্জাম বর্তমান। আমাদের থিয়েটারের জন্ত প্রহসনের স্থল মাল মসলা পাওয়া গেল। বেশ মজাদার কার্স রচিত হইয়া গেল।”*

৩

যুবকদের এই সাধু প্রচেষ্টায় শীঘ্রই বিদ্র উপস্থিত হইল। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতান্তর ঘটিতে লাগিল। এই সময় শিশিরকুমার পরম্পরের বিবাদ মিটাইবার জন্ত সাক্ষাৎ ভাবে তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইলেন। ১৮৭৩ সনের ১২শে জানুয়ারী তাহার সভাপতিত্বে বিবাদমান যুবকদের লইয়া এক সভা হইল। সভায় উপস্থিতমত বিবাদ-গ্রীমাংসা অসম্ভব বিধায় তিনি একটি সালিশী কমিটির উপর ইহার ভার অর্পণ করিলেন। এই কমিটিতে ছিলেন তাহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল পাল এবং রাজেন্দ্রলাল পাল। যাহা হউক, কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাদ মিটিয়া গেল। ইহাতে শিশিরকুমারের বতখানি হাত ছিল, পরবর্তী ৩১শে ফেব্রুয়ারি ‘ইণ্ডিয়ান মিররে’ প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে তাহা সম্যক জানা যাইতেছে,

Sir,—Now the rupture among the members of the National Theatrical Society has, happily, come to a close. Selfishness, distrust, dictatorial tone and unwillingness to cringe are some of the causes which gave rise to it. This collision would have proved destructive of national entertainments, had not the well-known Editor of the *Amrita Bazar Patrika* intervened between the contesting parties. His good advices and solicitations gradually conquered the obstinacy and party-feeling of each party and at last brought the matter to a happy end. Such is his desire to give the National Theatre a firm stand that

he, in addition to his hard labor as an Editor, willingly embraced all the privations to write a *Natuk* for them and at last produced the pleasing *Noisho nupeea* on the stage the week before last. The three directors of the Theatre now are the Editor of the *Amrita Bazar Patrika*, Babu G. C. Ghose, and another Native gentleman.

We wish prosperous career to the National Theatre. The members of the N. T. Society must feel grateful; that the Editor of the *Amrita Bazar* has meddled in its affairs and when he is there we doubt not the matters will be managed smoothly.

Yours etc.,

A friend to the National Theatre.*

এই পত্রখানি হইতে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্মকর্তাদের বিবাদ ভঞ্জে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার জানা যাইতেছে। উত্তোক্তা যুবক, তাহাদের উপরে চালক থাকা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ উত্তোক্তাদের আগ্রহাতিশয়ে এবং শিশিরকুমারের পরামর্শে তিন জন ডিরেক্টরের উপর সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হয়। এই তিন জন ডিরেক্টর হইলেন শিশিরকুমার স্বয়ং, স্বপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উক্ত পত্রে শিশিরকুমারের ‘নয়শো রূপেয়া’ নামক নাটক রচনা ও অভিনয়ের কথাও জানিতে পারিতেছি। এই নাটকখানি জাতীয় রঙ্গমঞ্চে ১৮৭৩, ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অভিনীত হয়। বঙ্গে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ কন্যার পণপ্রথা হেতু দিন দিন কিরূপ অধঃপাতে যাইতেছিল এই নাটকে তাহাষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। শিশিরকুমার কঠিন সমস্যার বিষয়ও হস্তকৌতুকের সমাবেশে সরস করিয়া তুলিতেন। ‘নয়শো রূপেয়া’ শুধু নাটক নহে, একটি সার্থক রস-রচনাও। শিশিরকুমার ‘বাজারের লড়াই’ ও ‘নিমাই সম্রাস’ নামে আরও দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

থিয়েটারের কর্মকর্তাদের মধ্যে আবার বিবাদ আরম্ভ হইল। ৮ই মার্চ তারিখে শেষ বারের মত অভিনয় করিয়া সাধারণের নিকট হইতে ইহা বিদায় লইল। কর্মকর্তারা কিছুকাল পরে দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল ‘ন্যাশন্যাল থিয়েটার’ নাম বজায় রাখিলেন, অন্য দল ‘হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার’ নামে পরিচিত হইলেন। শিশিরকুমার অতঃপর ইহাদের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংস্রব রাখেন নাই। তবে উভয় দলেরই অভিনয়-কাহিনী তিনি যথারীতি পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে লাগিলেন।

* বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় ভাগ। পৃ. ১১৩-৪। এই পুস্তকে অবিস্মরক বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শিশিরকুমার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরই মফস্বলেও অভিনয়াদির আয়োজন করিতে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়াছি। ইহার দুই দলে বিভক্ত হইয়া মফস্বলে—ঢাকায় ও অন্যান্য গিয়া অভিনয়াদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার অল্প দিন পরেই গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার নামে অভিহিত হইতে লাগিল, এই সময়ে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার এবং বেঙ্গল থিয়েটার নামে আরও দুইটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল থিয়েটারেই সামাজিক ও স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বিভিন্ন নাটক অভিনীত হইতেছিল। 'ভারতমাতা', 'স্বরেন্দ্র বিনোদিনী', 'শরৎ সরোজিনী', 'বীরনারী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মোহন্তের এই কি কাজ', 'হীরকচূর্ণ নাটক', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রভৃতি সমন্বিত যোগ্য বিষয়াদি সম্পর্কেও নাটক প্রহসন রচিত হইয়া অভিনীত হইতে লাগিল। এ সকল নাটকে উল্লিখিত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের উপর শিশিরকুমারও পত্রিকায় লেখনী চালাইতেছিলেন। তিনি পূর্বের ন্যায় অভিনয়াদির সমালোচনা করিয়া রচয়িতা ও অভিনেতাদের উৎসাহিত করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পথে শীঘ্রই বিপ্ল উপস্থিত হইল। 'গজদানন্দ ও যুবরাজের' (পরে নাম পরিবর্তন করিয়া 'হুম্মান-চরিত') অভিনয়ে সরকার হইতে খোরতর আপত্তি হইল। ১৮৭৬ সালে যুবরাজ (পরে, সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আসিলে হাইকোর্টের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের ভবনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পুরনারীদের দ্বারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহকারে

বরণ করান। এই ব্যাপারটিকে বাস্তব করিয়া উক্ত প্রহসন লিখিত। পুলিশ ইহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক তিন মাসের জন্য বাংলা-সরকারকে বাবতীয় অশ্রীল, মানহানিকর ও রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক অভিনয় বন্ধ করিয়া দিব্যর ক্ষমতা দিয়া ১৮৭৬ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী এক অভিনাস জারি করিলেন। পরবর্তী মার্চ মাসেই Dramatic Performances Control Bill নামে একটি আইনের খসড়া আইন-সভায় পেশ করা হয় এবং বৎসরের শেষের দিকে সাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহা আইনে পরিণত হয়। শিশিরকুমার বরাবরই এরূপ স্বাধীনতা-চেষ্টারক আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ১৮৭৬ সনে ১৪ই ডিসেম্বর পত্রিকায় লেখেন,

"নাটক সন্দর্ভীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এইজন্য অনেকগুলি আবেদন প্রেরণ হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্নমেন্ট আমাদের উপর আর একটা শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে দীর্ঘকাল হইয়াছি। গবর্নমেন্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় কার্যের উপর পূর্ণ পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের জুকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সূর্য্য গেল স্বর্ণরথে। অস্ত রবি দিয়ে গেল ডাক,
অবনীর যাত্রা শুরু অজ্ঞাত সে অনন্তের পথে।
উদ্ভাসিত মুক্তি ধীর মহিমার অগ্নি আলোতে
সম্মুখে আনত মৃত্যু সে জ্যোতির সম্মুখে নির্বাক।
ভিন্ন রুচি, স্তুতি, দ্বন্দ্ব, শোক, দুঃখ—সকলি মিলাক।
রচনার মাঝে শুধু নহ ত জীবন্ত কোন মতে,
গুরুর গৌরব তব চিত্রময় এ মহা-ভারতে,
অমর তুমি যে, ওঠে জয়ধ্বনি, বেজে ওঠে শাঁখ।

প্রাণন আনিয়া দিলে, হে বিপ্লবী, ভেঙে দিলে বাঁধ,
রুদ্ধ শ্রোত মুক্ত হ'ল, মুক্তধারা বহে চারি ভিতে।
কলা-সরস্বতী তাঁর দিল ঢেলে সব আশীর্বাদ,
দিল প্রাণে বহুশিখা এ জীবন সফল করিতে।
জাগে চিত্ত, জাগে দেশ, নীলাকাশে জাগে পূর্ণ চাঁদ,
বসন্তের আবির্ভাব নবশ্রী-প্রসন্ন অবনীতে।

দিনাজপুর জেলায় পল্লীর আর্থিক জীবনের রূপান্তর

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

পরিবর্তনশীল জগতে বাঙালীর আর্থিক জীবনও নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। নদীমাতৃক বাংলার সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান সময়ে রেলপথকে কেন্দ্র করিয়া উঠা নব রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই নতুন গতির আওতায় আসিয়া বাঙালীর আর্থিক জীবনেরও বহুপ্রকার ভাঙগড়া শুরু হইয়াছে। বাংলার যে-কোন জেলায় সমাজগড়নের রূপান্তর লক্ষ্য করিলে এই পরিবর্তন পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিবে।

দিনাজপুর বাংলারই একটি জেলা। ধানই দিনাজপুরের প্রধান কৃষিসম্পদ। বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট ধান এই জেলায় উৎপন্ন হয়।

এই জেলায় পূর্বে ধানভান্ডা হইত ঢেঁকিতে। ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলই চালান হইত পল্লী হইতে গঞ্জে এবং গঞ্জ হইতে নৌকায় দূর দূরান্তরে। জেলায় হাজার হাজার ঢেঁকি ছিল। ঢেঁকিতে ধানভান্ডা ছিল পল্লীবাসীর অর্থ-উপার্জননের একটি বড় উপায়। একজনের এক মণ ধান ঢেঁকিতে ভানিতে প্রায় দেড় দিন লাগিত, এবং খরচ পড়িত প্রায় দশ হইতে এগার আনা। জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে ধানের আবাদ ও ঢেঁকির কাজ বহু পূর্বে সীতালদিগকে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছিল।

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সাত-আট লক্ষ মণ ধান-চাউল কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙ্গা বন্দর দিয়া কলিকাতার দিকে রপ্তানি হইত। তখনকার দিনে পুনর্ভবা, কুলীক, নাগর, আত্রাই, যমুনা ও করতোয়া নদীপথে ধান চাউল বাংলার অন্যান্য জেলায় ও বিহারে চালান হইয়া যাইত। এখনও জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমে রেল-স্টেশন হইতে দূরে ধান-চাউল নৌকায় রপ্তানি হয়। পুনর্ভবা ও আত্রাই নদীর তীরে ঝাঁটাবাড়ী, নাজিপুর, নীথপুর, গোপালগঞ্জ, আমতলি, শিহোল ও কালিকামোরার ঘাটে ঘাটে নৌকায় ধান বোঝাই হয়। আত্রাই নদী বাহিয়া ধানের নৌকা যাইত প্রায়ই পূর্ববঙ্গে। পুনর্ভবা নদীতে ধানের নৌকা চলিত মুর্শিদাবাদ, বিহার ও বালিয়ার দিকে। ইটাহার ও বংশীহারি থানা এলাকায় ধান চালান হইত মালদহের দিকে গরুর গাড়ীতে।

ধানের পরই প্রধান ফসল পাট, আখ, সরিষা, লক্ষা, ও পেঁয়াজ ইত্যাদি। আত্রাই নদীর তীরে ভূমির বন্দর হইতে এককালে পাটও রপ্তানী হইত নৌকায়। ডালিম-গাঁও ও কালীয়াগঞ্জের সরিষা ও পেঁয়াজ, এবং সেতাবগঞ্জ ও

কাহারুলের গুড়ও নৌকায় রপ্তানি হইত। নাজিপুর ছিল গুড়ের বড় বন্দর। বৎসরে প্রায় ৭০৭৫ হাজার মণ গুড় নৌকায় চালান হইত।

নৌকাগুলি নারিকেল, কড়াই, এনামেলের বাসন, লবণ, ময়দা, কাপড়, চিনি, কেবোসিন ইত্যাদি লইয়া দিনাজপুরের বন্দরগুলিতে ভিড়িত, এবং যাইবার সময় ধান চাউল, গুড়, পাট, লক্ষা ও অন্যান্য বেসাতি লইয়া নদী পাড়ি দিত।

সেকালে পুনর্ভবা নদীর কূলে বড় গঞ্জ ছিল নীথপুর। কুলীকের তীরে রায়গঞ্জ, টাঙ্গননদীর উপরে কালিকামোরা এবং আত্রাইয়ের তীরে তীরে ছিল মমঝিয়া, চাঁদগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, পতিরাম, রাজামাটি; যমুনার কূলে হিলি, এবং করতোয়ার তীরে ঘোড়াঘাট।

এই জেলার নদীগুলি যে কেবলমাত্র কৃষি ও বাণিজ্যের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নহে, দেশবাসীর ধর্ম, সমাজ-জীবন, এমন কি সভ্যতার মূলেও ছিল নদীর গভীর প্রভাব। পূর্বে নদীগুলিও বর্তমানের মত মৃতপ্রায় শীর্ণকায় ছিল না। মোগল-পাঠান যুদ্ধের সমকালেও করতোয়া নদী এরূপ বিস্তৃত ছিল যে এক তীর হইতে অপর কূল পরিষ্কার দেখা যাইত না।

নদীগুলি ক্রমশঃ হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় আগের মত নৌকায় ধান চাউল ইত্যাদি চালান দেওয়া বাহত হইতে-ছিল। কাজেই এই জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভাঙা-গড়া শুরু হইয়াছিল, এবং রেল চলিবার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-কেন্দ্রেরও পরিবর্তন হইতেছিল। হিলি হইতে পার্শ্বতীপুর পর্যন্ত ছোট রেলপথ হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। পার্শ্বতীপুরের পূর্বাংশে রেল চলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং পশ্চিম দিকে রেল চলিতে আরম্ভ করে ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। দিনাজপুর-কুহিয়া রেল লাইন খোলা হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। জেলার ভিতর দিয়া রেল চলিবার পর হইতেই নদীর তীর ছাড়িয়া রেলের ধারে ধারে গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যাপারীদের বসতি।

রেল-লাইনকে কেন্দ্র করিয়া দিনাজপুর, হিলি, চরকাই, ফুলবাড়ী, বিরল, বাঙ্গালবাড়ী ইত্যাদি রেল স্টেশনের কাছে কাছে এবং উত্তরে শিবগঞ্জে ও সেতাবগঞ্জে প্রায় ৩৮টি চালের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিলির নিকটেই ১৪টি কল। এই জেলায় প্রথম চাল-কল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয় উহা প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ ও আক্কেলপুর

- (১) ১/৫ আনা ও দুই বার খোরাক।
 (২) ১/০ " " "
 (৩) ১/০ আনা খোরাকি নাই।
 (৪) ১/১০ " " (স্ত্রীলোকদিগের)
 ১/১০ " " (পুরুষদিগের)
 (৫) ১/০ " " (স্ত্রীলোকদিগের)
 ১/০ " " (পুরুষদিগের)

(১) (২) (৩) নং মজুরির হারই কতকটা স্থায়ী, এবং জেলার প্রায় ৩ ভাগ স্থানে ইহার চলন আছে। (৪) নং হারের চলন প্রায় ২০১২টি গ্রামে পাইয়াছি। চালের কলেই (৫) নং মজুরির হার চলে। ইহা ছাড়া ধান ও পাট কাটিবার সময় মজুরির হার জেলার সর্বত্রই বাড়িয়া ১২ হইতে ১০ পর্যন্ত উঠিত। তখন সাধারণতঃ উহা ১০ আনার নীচে নামিত না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান—যাহার নিজের গাড়ী বলদ আছে—সেও দৈনিক প্রায় ১১০ টাকা উপার্জন করিত।

ধান ও পাট কাটিবার সময় বিহার ও বাংলার অন্যান্য জেলার মজুর আসিত। ফসল কাটিবার সময় অঞ্চলের কৃষক বিদেশী মজুরের দ্বাহায্য লইয়া থাকে। যখন ধান পাকিতে আরম্ভ করে তখন তাড়াতাড়ি অনেক বিঘা জমির ধান কাটিতে হয় বলিয়া বিদেশী মজুরের সাহায্য লইতে হয়। 'গাতা' প্রথা, অর্থাৎ পল্লীর সকলে বা বহুলোকে মিলিয়া একজনের শস্ত কাটিয়া দিবার রীতিও প্রচলিত আছে। এই জেলার শ্রমিক দেখিতে খুব শক্ত ও জোয়ান হইলেও সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ। মেয়েরাও বাহিরের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। পদ্ধিপ্রথা নাই।

বর্তমান সময়ে খোরাকি ছাড়া মজুরির হার ১০ আনার নীচে নাই, এবং ১১০ টাকার উপরে সাধারণতঃ উঠে না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ চাউলের দাম বাড়িয়াছে প্রায় পাঁচ গুণ। অথচ মজুরির হার ১৯২৬-২৭-এর তুলনায় বর্তমান সময়ে বাড়িয়াছে প্রায় তিন গুণ। মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি সমান তালে হয় নাই। অথচ ঠাট ও কিছু বাড়িয়াছে। ফলে আর্থিক কষ্ট ঘরে ঘরে।

নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রভাবমুক্ত হইয়া রেল-প্রভাবের আওতায় আসিয়া এবং যন্ত্রপন্থায় পা বাড়াইয়া এই জেলার নর-নারী আর্থিক সচ্ছলতা প্রায় হারাইতে বসিয়াছে।

পল্লীশিল্প বাহা ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নদীকে কেন্দ্র করিয়া যে সব উপার্জনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও প্রায় সবই মৃত। অথচ রেলকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই জেলার পল্লীবাসীগণ নানাকারণে বোগ দিতে

পারিতেছে না। কৃষিক্ষেত্র ও পূর্ব আবাস ছাড়িয়া দূরে গিয়া নতুন বসতি স্থাপন করিবার সুযোগ কয়জনের আছে? ভিটার মায়ায় ক্ষেতখামার আঁকড়াইয়া ধরিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়াই রহিয়াছে বেশীর ভাগ নরনারী।

এই জেলার—এই জেলার কেন, বাংলার প্রায় সর্বত্রই পল্লীবাসীর আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন পল্লীতেই উপার্জন-ক্ষেত্রের সৃষ্টি। উহা সম্ভবপর হয় যদি পল্লীতেই কৃষির ভিত্তিতে পল্লীশিল্প ও কারখানা গড়িয়া উঠে। আমরা এমন একটা যুগে আসিয়া পড়িয়াছি যে এখন আর কল ছাড়িয়া ঢেঁকি অন্য কিছু আশ্রয় করা সম্ভবপর নহে। কাজেই যে অঞ্চলে যে কাঁচা মালের যোগান বেশী সেই সব পল্লীর নিকটেই তৎসংলগ্ন কারখানার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। অতীতে এই নীতি অমুসরণ করিয়াই পল্লীশিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছিল। যে অঞ্চলে পাটের আবাদ ভাল সেই সব পল্লীতেই দিনাজপুরের বিখ্যাত চটশিল্পীদের আবাস ছিল। কিন্তু বর্তমানে পল্লী-সমাজের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থকরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত নাই। বর্তমানে কুটীর-শিল্পেরও জন্ম হয় ধনী বা গবর্ণমেন্টের খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া। কাঁচামালের যোগান-ও স্থানীয় লোকের প্রতিভা এবং দক্ষতার কথা বিবেচিত হয় না। পল্লী-সমাজের গড়ন ও আদর্শ বজায় রাখিয়া যদি পল্লীর বিভিন্ন স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহা হইলেই পল্লীবাসী কৃষি ছাড়াও নতুন উপার্জনক্ষেত্র পাইতে পারে।

পল্লীকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে সরকারী আপিস শিল্প-কারখানা প্রভৃতিও কিছু কিছু পল্লীতে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। পল্লীবাসী কৃষকের জন্য যে সরকারী কৃষিক্ষেত্র তাহাও রহিয়াছে জেলা-শহরে, পল্লীতে নহে। এই সব আপিসকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লীতে উপার্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে। কলিকাতার ছাত্রের ভিড় কমাইবার জন্য সরকারী সাহায্যে পল্লী-অঞ্চলে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকার ছাত্রদিগকে আহ্বান করিতেছেন শহর ছাড়িয়া পল্লীতে বাইতে, আর সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় বাবতীয় আপিস ও উপার্জন-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত করিয়া এসব ছাত্রের অভিভাবকদিগকে এবং ছাত্রদিগকেও আকৃষ্ট করিতেছেন শহরের অভিমুখে। এইরূপ অবাস্তব নীতি অমুসরণ করিয়া পল্লীর এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। উপার্জনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশময় পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া না দিতে পারিলে, এবং স্বদেশীয় সংস্কৃতির অমুসরণে সহজ জীবনের আদর্শ প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শুধু শহরবাসীর মুখনিঃসৃত "পল্লীতে ফিরিয়া যাও" উপদেশে পল্লীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না।

মুক্তার জন্মকথা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

অন্ধকার সাঁওসেঁতে একখানা ঘর, সব সময় এমন একটা অস্পষ্টতা জড়িয়ে থাকে যে অনভ্যন্ত লোকের বুকে ওঠা মুশকিল দিন ও রাত ঠিক কোন সময় আসে বা যায়। বড়িতে সময় প্রায় ন'টা। শেফালী তাড়াতাড়ি কোন রকমে জলসিক্ত দেহটা কাপড়ে জড়িয়ে পাশের ছোট্ট বাথ-রুমটা হতে বেরিয়ে এসে এবং ওই অন্ধকার ঘরেই একটা বিবর্ণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে গেল তেলের শিশিটা একেবারেই ফাঁকা। সুতরাং চিরুণীটা একটু অতিরিক্ত জোর দিয়েই রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে চালাতে চালাতে বলল—আমার তাড়টা তাড়াতাড়ি দাও মা, আজকে আবার দেরি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

মা অপর্ণা কিছুটা সজ্জিত হয়ে জবাব দিলেন—তাই তো বেবি, আজ আমার রান্নারও এমন দেরি হ'ল। সকালে উঠে রেশম আনবার টাকা ত ভুই দিয়ে গেলি না, আমার হাতের সব ফুরিয়ে গেছে। অনেক খুঁজে পেতে ছোটো চাল জোগাড় করে আনলাম।

অনভ্যন্ত লোক অবাক হয়ে যাবে, অপর্ণার কথায় নয়, তার উপস্থিতিতে। এই ঘরেই তিনি এতক্ষণ বসে আছেন এবং সেখানে একটা জলন্ত উছনও আছে।

শেফালীর মনটা এ খবরে বড় মুষড়ে পড়ল এবং তার চোখ ছোটো আবার বড়ির পানে গেল। কিংবদন্তি পেয়েছে তার বুঝ, কিন্তু আর আক্ষেপ বা অপেক্ষা করা চলে না। রেশমে যা চাল পাওয়া যায় তাতে সপ্তাহটা পুরো চলে না, আবার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং অপর্ণা যা খবর দিলেন সেটা নতুন কিছু নয়, শুধু আর একটু সময় মত দিলেই হ'ত। একেবারে বেরিয়ে যাবার পোশাকে তৈরি হতে-হতে শেফালীর মুখে একটা গ্লান কোতূকের ভাব জাগে—আর যেদিন চাল ফুরোয় সেই দিনই বুঝি রেশমের দিন।

অপর্ণা অন্ধকারের মধ্যেই একটা সঠিক দৃষ্টিপাত করে সব বুঝে নিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন—দাঁড়া, আসনি বেবি, আর মিনিট পনেরোমাত্র ভাত হয়ে আসছে।

সময়ের হিসেব এই সব ঘরেই নিখুঁত। সময় এত কম যে মান-অভিমানের প্রশ্নও ওঠে না। শেফালী হিসেব করতে লাগে মিনিট পনের হতে, অন্ততঃ মিনিট দশেক জুড়োতে ও ধেতে—এই নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টার ব্যাপার, অতখনি সময় পাওয়া অসম্ভব। বুড়ী হেড মিষ্ট্রেসটি অল্পবয়সী শিক্ষয়িত্রীদের ওপর কি রকম যেন সব সময় চটা। প্রথম পিরিয়ডে দু'এক মিনিট দেরি হলে এমন কিছু জড়ি হয় না, কিন্তু খোঁটা

দেওয়ার সুযোগ ওঠেই হয়। শেফালী এই খোঁটা হজম করার ব্যাপারে এখনও অভ্যস্ত হতে পারে নি, সুতরাং এবেলার মত ভাত খাওয়াটাই তার মূলত্ববী রইল। মুশকিল এই যে, মা একথা কোনদিনই বোঝেন না, তাঁর বিশ্বাস হ'ল, যে না খেয়ে মানুষ কাজ করতে পারে। আর তা হলে কাজ করাটাই বা কিসের জঙ্ক?

ছোট ব্যাগটার জিনিষগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে শেফালী বলল—ভূমি ভেবো না মা, আমি কোথাও কিছু খেয়ে নেব, ভাতটা ঢাকা দিয়ে রেখ, ওবেলার এসে খাওয়া যাবে।

এক গ্লাস জল পেলে হ'ত। সকালে শুধু সেই এক কাপ চা, তার পরে টিউশনির সেই এক রাশ বকুনি, গলাটা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে। অথচ জলের কুঁজোটা মায় দিকের কোণটার এবং জলের সঙ্গে খাবার মত কোন কিছুই ঘরে যে নেই তা শেফালী জানে, কারণ তা হলে মা নিজেই এক্ষেত্রে তা আগে ভাগে তার স্নুখে হাঁজির করতেন। অথচ সব জেনে শুনেও যদি শেফালী এখন এক গ্লাস জল খাবার উদ্ভোগ করে তা হলে তিনি হাঁ হাঁ করে উঠে এমন খোঁজা-বুঁজি লাগিয়ে দেবেন যেটা ঐ হেডমিষ্ট্রেসের খোঁটার মতই শেফালী সইতে পারবে না।

অপর্ণা তখনও ব্যাকুল দৃষ্টিতে তারই পানে চেয়ে, আড় চোখে চাইতে গিয়েও শেফালীর চোখ পড়ে যায়। খাবার স্নুখে এই রকম ধমকে দাঁড়ানোর কৈফিয়ত স্বরূপই সে যেন বলে—হ্যাঁ দীলু নীলু সময়মত জ্বল যায় যেন। গলির মোড়ে খেলছে দেখে এসেছি, সকালে পড়তে বসেছিল ত?

অপর্ণা পূর্ববৎ আগ্রহের সঙ্গে আরম্ভ করেন—হ্যাঁ, কিন্তু তুই...আচ্ছা আর। দুর্গা দুর্গা...

শেফালী ততক্ষণ অনেকটা দূর এসিয়ে গেছে।

প্রথমে আপিসে ঢুকেই সে শুনতে পেল হেডমিষ্ট্রেস তাঁর সহকারিণীর সঙ্গে অদূরে দাঁড়িয়ে তরিতরকারীর রন্ধনভণ্ড নিয়ে গল্প করছেন। বুড়ো বয়সে ভীষ্মরতি আর কি। কেন, আপিসটা তোমার রান্নাঘর না কি। সে নিঃশব্দে ষাভাষ নাম সই করতে করতে একবার আড়চোখে দেখে, হেডমিষ্ট্রেস ততোধিক আড়চোখে ঘড়ি দেখা শেষ করেই তার পানে তাকাবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তাদের এই গোপন কটাক্ষের মিলন হতেই তিনি বললেন—কি শেফালী, আজ বড় সকাল সকাল যে, ব্যাপারখানা কি।

শেফালী বোঝে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবার জড়ই আপিসের কোণে এই রান্নার মসলা-ভণ্ড বিলম্বণ। সে এর উত্তরে একটা

অল্পষ্ট হ'লে ক্লাসের খাড়াখানা নিয়ে চলে এল নিজেদের ঘরে। তা হাড়া আর বলবারই বা কি আছে? এক হয় তাকে এই মসলার আলোচনায় বোণ দিতে হয়। তার চেয়ে শেকালী নিজেদের ঘরে বসে প্রাণভরে জল খাবে, তার অনেক সময় আছে।

ক্লাসেও সেই রকমের এক বকমারি। একটা ছোট ঘেয়ে অনেকটা দেরি করে ক্লাসে এল, শেকালী বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল—এত দেরি কেন? উত্তরে মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করে বেশ সহজভাবেই জবাব দিল—মা রান্নার দেরি করে দিল, আমি কি করব?

হতভাগা মেয়েটি! কেন সংসারে আর কি কোন কথা ছিল না? একেবারে সবল পদক্ষেপে ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে সে যদি বলত রান্নার মাঝখানে পড়ে পা ভেঙে গেল তাই দেরি, তা হলেও শেকালী বুঝি এতখানি বিরক্ত হ'ত না।

ক্লাসগুলো রোজই এই রকম লাগে, আজকে যেন একটু অতিরিক্ত একঘেয়ে আর লম্বা মনে হয়। শেকালী অভ্যাস-মত বকে ঘায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং যতই সময় যাচ্ছে শেকালী ততই সচেতন হয়ে উঠছে, তার ক্লাসি যেন বাইরে না ফুটে বেরোয়।

শেষের একটা পিরিয়ডে এসে সে কিন্তু একটু বেসামাল হয়ে পড়ল। পড়া ছিল উটের কথা, সে নাকি একেবারে বহু দিনের জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে, এমনি আরও কত কি। শেকালী বরাবরই ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। একটা ছাত্রী জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা দিদিমণি, আর কোন প্রাণী আছে যে এমন না খেয়ে থাকতে পারে। শেকালী বলে—শোন ঘায় সাপ নাকি সারা শীতকালটা না খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। একটা মেয়ে তৎক্ষণাৎ ও কোণ থেকে বলে উঠল—আমি বলব দিদিমণি? সবচেয়ে বেশী সময় না খেয়ে থাকতে পারে মাছ। আপেকার মুনি-ঋষিরা নাকি বহরের পর বহর...

শেকালী মাঝপথেই কেটে পড়ল—কথা হচ্ছিল সাপ আর উট নিয়ে, তুমি কোথেকে নিয়ে এলে মাছ, মুনি-ঋষি কত কি...

এমন উপহাসের ভঙ্গীতে সে কথাগুলো উচ্চারণ করল যে, এর পরেও একটা মেয়ে সসঙ্কোচে প্রশ্ন না করে পারল না—তা হলে ওগুলো কি সব মিছে কথা?

শেকালী বিদ্রোহিনীর ভঙ্গীতে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল—সব মিছে কথা, সব...

আর একটা জিনিষ নিয়েও শেকালীর মনটা টিকিমের পর হতেই ধারাপ যাচ্ছিল। হেডমিষ্ট্রেস তাকে টিকিমের সময় ডেকে পাঠিয়েছিলেন—ঠিক যে সময়ে শেকালী চাষের সজ্জানে সাদিনীদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। এটা ওটা সেটা পাঁচটা

কথা মিলিয়ে তিনি শেকালীকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন ক্লাসে পাঠ্যের বাইরে অজ্ঞ বাজে জিনিষ আলোচনার লাজ নাই, কারণ পাঠ্য করাটাই সবচেয়ে আগের কথা। এমন ভাবে কথাটা বলা হ'ল যে শেকালী চমকে উঠল, যেন কাটিকে পাঠ্য করতে না দেওয়ার জুজুই তার এই যত্নমূল-মূলক শিক্ষাদান বিধি। বেশ তাই হবে। সঙ্গে সঙ্গে টিকিম-শেষের ঘণ্টা বেজে উঠল এবং শেকালী আজ সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার মত অনুভব করল—পরের মানসিক উন্নতিবিধানের নিফল ভর্তুকিও করে তার নিজের খাদ্য সজ্জানের সমস্যাটাই নষ্ট হয়ে গেল।

তার এই স্বার্থপরতাই বুঝি শেষের পিরিয়ডে অসহ্য হয়ে ব্রহ্মরুদ্ধ ভেদ করে একেবারে উড়ে মুনি-ঋষি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেল। কলির আর কোন ভেজ না থাকুক স্ফূর্ত ভেজ জিকালবিজুল।

ছুটি হতেই শেকালী সাদিনীদের একটু আড়াল দিয়েই বাড়ীর পানে হাঁটল। দ্বিধে তার এখন ভেদম মনে হয় না কিন্তু আলো কিছুতেই আর সহ্যে না। কিছুতেই না। মাঝপথে একটা ছোট মেয়ে এসে বাধা দিল, বললে—মা আপনাকে আজ আবার ডেকেছে দিদিমণি, সময় হবে, যাবেন কি? সোজা না বলতে ইচ্ছে হয় শেকালীর কিন্তু ভয়ও হয়। টিউশনি এমন সস্তা নয়। শেকালী মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে এসে তাদের বাড়ীতে ঢোকে।

গৃহস্বামিনী অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে বসান এবং সমস্তমত কাজের কথা পাড়েন। মেয়েটিকে পড়াতে হবে এবং পড়ানোর চাইতে তার মনটিকে সেইভাবে গড়তে হবে, শেকালীর এ বিষয়ে তিনি স্তব্ধ ভ্রমোচ্ছিন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। শেকালী বোঝে বনীগ্রহের সেই এক অমুখোণ, সব আছে শুধু মনটা ঠিক করে দাও এবং মনে মনে একটু হাসে, মন ঠিক করে দেওয়ার লোক বরা হয়েছ বটে।

চা খাওয়ার এক কাকের গৃহস্বামিনী আবার বলেন—আর মেয়েটি এত ছেদী হয়েছে, দেখুন না ও বেলায় মিছিমিছি একটা ছবির বই নিয়ে যেতে রইল, যত বলি ইচ্ছলে যা তত গোঁ বয়ে ছবি দেখা তার চাই-ই। ওকে নিয়ে আপনাকে একটু হুর্ভোগ-পোয়াতে হবে মনে হয়।

মেয়েটি অদূরে ঘরের কোণে বসে একটা ছবির বই ওন্টাচ্ছিল; এক কথায় হুঁজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। শেকালী চিমভে পারল কাষ্ট পিরিয়ডের সেই মেয়েটিই বটে এবং মেয়েটি দেখল সে বরা পড়েছে, ভাড়াভাড়ি ঘর যেতে উঠে বেরিয়ে গেল। শেকালীর মনটা একবার আর একটা যেন চাবুক খেল।

কি হুশকিল। মিথ্যা সাজাতে বসলেও বনী-গ্রহের কাজ-কর্মে পোষার না, গরীবের ঘরের বিপর্যায়ভুলোকে ঘরে টান

মারতে হয়। ছবি দেখতে দেহি হ'ল বলা চলে না, বলতে হয় ভাত পেতে দেহি হয়ে গেল।

হবেই না বা কেন? ওসব ঘরে সবই ত মিথ্যা সেজে বসে আছে, মিথ্যা বুঁজে বার করা ওখানেই ত সবচেয়ে সোজা। শেকালী ভাবে মেয়েটি বোকা, ওতে ওর লজ্জার কি আছে? যদি কারও লজ্জা পেতে হয় ত সে শেকালী নিজে।

আজকে এমন অসময় করলি যে। যে ভাড়াভাড়ি হাত পা ঘুরে বোস আর, ভাত ত একেবারে জল হয়ে পড়ে আছে, খেয়ে নে। অপর্ণা দরজা খুলে দিয়েই বলতে থাকেন।

শেকালীর মাথাটা এমন বরে আছে যে কিছুক্ষণ গুম হয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু উপায় নাই, না খাওয়া পর্যন্ত মা তাকে শাস্তি দেবেন না। তার ওপর দীলু নীলু যেকোন বসে পড়ছে, অনর্থক কথা কাটাকাটিতে ওদের ব্যাধাত হবে। সে নিঃশব্দে বেশভূষা বদলে নিয়ে ধাবার জায়গাটার গিয়ে বসল। অপর্ণা কাছে বসে ভাত বেড়ে দিতে থাকেন।

টিউশনির অসংবাদটা মাকে শোনাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু অপর্ণাই খালাসী বাড়িরে দিয়ে আগেভাগে আরম্ভ করেন চাপা কিস্কফলানির সুরে—আজ ত এ বেলায় ঘোটে রান্না হ'ল না।

শেকালী চমকে উঠল, চোখ দুটো তার সোজা পড়ল ঠাণ্ডা উত্তনটার উপর ও তারপরে পাঠরত ভাই ছটির উপর। সেও ভোমনি চাপা সুরে প্রশ্ন করল—তা হলে ভোমরা খাবে কি?

এমন হতাশভাবে শেকালী কথাগুলো উচ্চারণ করল যেন তার নিজের খাওয়াই সংশয়গ্রস্ত। অপর্ণা ভাড়াভাড়ি চকিত বরে বললেন—সে তোকে ভাবতে হবে না তুই খা দিকি। তারপরে একটু থেমে আবার বললেন—ও বেলায়ই বেশী রান্না করেছিলাম, ওই বাসি দিয়েই হয়ে গেল। দীলু নীলু খেয়েদেয়েই পড়তে বসেছে, আর আমি রান্না খাব না, বিদে নেই।

শেকালী সবই বুঝল, সুতরাং খেতে আরম্ভ করে দিয়ে যুগ্মবরে বলল—এবং থাকলেও কোন উপায় নেই না মা? তা এস না, দু'জনে একসঙ্গে কিছুটা খেয়ে নিই।

অপর্ণা বলেন—না যে বেবি সত্যিই খিদে নেই। ও বেলায় তুই না খেয়ে যাবার পর থেকে মনটা ভাল লাগছিল না, তাই অনেকগুলো এদিক ওদিক কাজ করার পর খেতে সেই হুপূর পড়িয়ে গিয়েছিল। আর পেটটা সত্যিই কেমনধারা ভাব করে আছে।

আজ সারাদিনের মধ্যে এই একটি কথায় শেকালীর মাথার তার অনেকটা কমে যায়। সে এবার পরিতপ্তির

ছেলেমাছবি চঙে মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বলল—বেশ তাই হ'ল, কিন্তু এই বেশী রান্নার কথাটা, সেটাও কি সত্যি?

অপর্ণা এবার হস্ত সত্যিই রাগ করেন—তোর আজ হয়েছে কি বল ত বেবি, ইলুল হতে এসেই এই ভর সন্ধ্যার আমার পেছনে লেগেছিস, ভাল করে ছুটো খা দিকি আগে।

শেকালী ভাত খাওয়া ভুলে মায়ের এই অপরাধ মুক্তি দেখে। শেকালী জানে তিনি নিশ্চয়ই সারাদিন কিছুই খান নি অথচ অত বড় মিথ্যা কথাটা বলেও তাঁর চোখে যুগে সৌন্দর্যের কি ছড়াছড়ি। তার নিজের সমস্ত অভিযোগগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁর ওই ক্রান্ত মধুর চাহনিতে। টোটে তার একটা অদ্ভুত আবিষ্কারের পরিতপ্ত হাসি ফুটে ওঠে, যেটা পরক্ষণেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের বিল বিল শব্দস্রোতে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

অপর্ণা আবার জরুটি করেন, দীলু নীলু ফিরে তাকায়। কিন্তু এবারে শেকালী মায়ের জরুটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাঁক পারে—দীলু নীলু দৌড়ে আর দেখি, এই ভাত দুটো খেয়ে আমার উভার করে দিয়ে যা ভাই।

অপর্ণা ব্যস্ত হয়ে পড়েন—সে কি, তুই যে একেবারেই খেলি না, দে দে আর দুটো যুগে দে দিকি, ততক্ষণে ছোট ভাই নীলু এসে দিদির আসনের এক পাশ অধিকার করে বসেছিল, শেকালী তার ব্যগ্র ষাড়টা বা হাতে সোজা করে জড়িয়ে ধরে খাইয়ে দিতে থাকে এবং মায়ের অক্লম্বগের উত্তরে এবারে সে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে যুগ হেসে বলে—বললাম ত বড় মাথা ধরছে, বিদে একেবারে নেই। নীলু তার বহুসোচিত সঙ্কোচ নিয়ে অল্প পাশে বসে পড়ে, অপর্ণা হাঁড়ির অবশিষ্ট ভাত দুটো তার সামনে এগিয়ে দেন। তিনি পরিকার বুঝতে পারলেন শেকালী তার একটি কথাও বিশ্বাস করে নি। শেকালীর খাইয়ে দেওয়ার নিবিড় ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর মনে একটা অপূর্ণ নির্ভরতার রোমাঞ্চ জাগে।

ওদিকে শেকালী সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করে নীলুর ভাত খাওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ, ও বাড়ীর ওই ছোট ছবি-দেখা মেয়েটির কথা মনে পড়ে যায়, সেই তার ছবির মধ্যে মগ্ন ভ্রমর আগ্রহভরা ভঙ্গিটি। কাল হতে এদেরকে আর সন্ধ্যাবেলায় পড়া বলে দেওয়ার সময় হবে না। এটা কি অসংবাদ!

ছেলের আর তর সয় না, একটু দাঁড়া বাপু, রয়ে সঙ্গে যা—অত্যধিক আগ্রহসহকারে মুখ চালানার ফলে এবং শেকালীর কণিক অজমনকতার দরুন তার একটা আঙ্গুলে নীলুর কামড় পড়ে যায়, শেকালীর সমস্ত শরীরে একটা মমতার শিহরণ জাগে।

নীলু একটু অপ্রতিভ হয়ে বা হাতে মাথা চুলকে গিলতে গিলতে বলে—তোমায় লাগল দিদি?

শেফালী তার ছোট মাথার রুক্ষ চুলের গোড়ায় হাত বুলাতে থাকে, গলাটা তার মায়ের মতই বরে আসে, একটু পরে বলে—যা দৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ রে নীলু, আজ ঠিক সময়ে ক্লাসে যেতে পেরেছিলি ত? নে, হ্যাঁ কর।

নীলু এতক্ষণে বুঝি দিদির শোনার মত একটা কথা পায়। অত কাছাকাছির মধ্যেও যতটুকু অদৃশ্যেই সম্ভব, সবটা করে নিয়ে নীলু ভাতটা গিলে নিয়েই যেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—পারব না তবে? এমন ছুট দিগেছিলাম, দাদাকে জিজ্ঞেস কর না কেন। তবে ক্লাসে বসে প্রথমটা পেটে কিছুক্ষণ লাগছিল আর হাতের লেখার খাতাখানাই নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম—বলতে বলতে তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, বলে—আচ্ছা দিদি, তুমি ধৈর্যে যাও নি কেন, অল্প বুঝি? আচ্ছা, তোমাদের ভারি মজা না দিদি, দেয়ি কর আর যাই কর কেউ বকবার নাই, না?

শেফালী বোঝে হাতের লেখার জন্ত নীলু বকুনি বা

আরও কিছু ধৈর্যেছে। মাষ্টারেরই বা কি দোষ, তিনি কেমন করে জানবেন যে, নীলু কতখানি প্রাণপণ করেও কর্তব্যচ্যুত হয়েছে। সে এক হাতে শেষ গ্রাফ ক'টি মাথতে মাথতে ও বাঁ হাতটা তেমনি তার মাথায় বুলাতে বুলাতে আত্মসদানের ভঙ্গিতে বলল—সে হবে, তোরাও লেখাপড়া শিখে বড় হোস।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—এ মজার হাত হতে ওদের রক্ষে ক'রো প্রভু, তুমি উপায় ক'রো।

নীলু শেফালীর হাতের পানে চেয়ে ছিল, ভাত মাখা হতেই সে যেমন মুখ বাড়াতো যাবে অমনি তার গালের উপর এক কৌটা গরম জলের স্পর্শ অসুভব করে চমকে উঠে উপর পানে চাইবার চেষ্টা করল, আন্দাজের সুরে বলল—দিদি তুমি...

শেফালী তার মাথার উপর একটু চাপ দিয়ে ভাতাভাতি বলল—ও কিছু নয় তুই খা দিকি।

অনুরোধ

শ্রীঅমল্যচন্দ্র ঘোষ

যুগে যুগে প্রেরসি আমার।
তুমি আনিয়াছ আজি বসন্ত কুহুম রাজি
মোর করে দিতে উপহার।
আজিকে পূর্ণিমা রাতে কোন দিন তব সাথে
ছিল কিনা মোর পরিচয়
আমি যে গিয়াছি ভুলে, তুমি তাহা কত্বহলে
দেখিতেছ মানিয়া বিশ্বয়।
অঞ্জলিতে ভরা ফুল, পদ আঁশি সমতুল,
ব্যথা কম্প, ছরু ছরু হিয়া,
চকল দখিনা বায়ে অঞ্চল লুটায় পায়ে
বকুলের সুরভি মাখিয়া।
আজিকে ব্যাকুল মন থেকে থেকে অনুখন
খুঁজে কারে আকাশে বাতাসে,
কার আঁখি মোর তরে চির অহরাগ ভরে
অপলক চায় মোর আশে।
নবীন ফাল্গুন মোরে বিশ্বস্তির ঘুম বোরে
দিলে আজ স্বপনের দোলা,
কহা কি করিবে নাকো? যদি তুমি বুঝে থাকো
কেন জেগে আছি আধ-ভোলা?
উতলা মাধবী নিশি, উজলিত দশ দিশি,
উতরোল হিয়া ব্যাধাতুর।

হে প্রিয়া! নয়ন মেল—
পাপিয়া ডাকিয়া গেল—
হৃদি আজি বিরহ-বিধুর।
আজি নব আনন্দের বসন্তের অন্তরে,
যদি এ ব্যথিত প্রাণে মুকুলের আধ-জাগা আঁখি
ভরে' দেয় গানে গানে—
উচাটন হিয়া থাকি থাকি—
তুমি কি গো অভিমানে চাহিবে না মোর পানে—
রোধি' দ্বার নাহি দিবে সাতা?
যামিনী বিকলে যাবে পিক যবে কুহরিবে
উচ্ছ্বসিত পাগলের পারা?
শুধু নিমেষের ভুলে তোমার চরণ মূলে
যদি ক'রে থাকি অপরাধ,
আমার বেদনা নিয়া তোমার ব্যথিত হিয়া
ছুচাইবে না কি পরমাদ?
উছল যামিনী, হায়, বরে' পড়ে বেদনায়
কার তরে বিহ্বল, ব্যাকুল;
ব্যথিত অন্তর মম ফেটে পড়ে দ্রাক্ষাসম—
প্রিয়া লাগি কাঁদিয়া আকুল।
নবীন ফাল্গুন বায় ডাকিয়া ফিরিয়া যায়—
পিয়া! আঁখি তোল একবার!
যদি সোহাগের ডাকে ও বুকে সরম আগে—
বুলো শুধু স্বপনের দ্বার।

সখি মুখ চন্দ্র ছবি

স্বরলিপি—শ্রীঔকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(রাগ ঋষাবতী)

(আস্থায়ী) সখি মুখ চন্দ্র ছবি যব আই বিহারী

মান ধরম সবকো গুমাই॥

(অন্তরা) প্যারে প্যারে নৈনা ওটে ওটে ধারলে

চিতবন মে বশ গেই চিতবতকি আই॥*

[ঋষাবতী ঋষাজ অঙ্গের রাগ, ইহাতে দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়, অত্যাশ্রয় স্বর শুদ্ধ। বাদী মা, সংবাদী সা। আরোহণে গান্ধার ধৈবত বর্জিত। অন্তরা উঠাইবার সময় ধৈবত বর্জিত রাখিয়া শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহার করা হয় যথাঃ—মা পা না না সা। অবরোহণের গতি বক্র ও সাতটি সুরই ব্যবহৃত হয় বলিয়া ঋষাবতীকে বক্র সম্পূর্ণ রাগ বলা হয়। ঋষাবতীর আরোহণে, মাড়, দেশ, সিদ্ধুড়া ও অবরোহণে বাগেশ্বরীর রূপের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ধা মা ও মা সা সঙ্গতি ঋষাবতীকে উক্ত রাগসমূহ হইতে পৃথক করিয়াছে।

ঋষাবতীর মুখ্য অঙ্গ—রা মা পা ধা সা—পা ধা পা ধা, মা গা মা সা

নিষিদ্ধ বিস্তার { মা গা রা সা, গা মা রা সা, রা গা মা পা,
সা না ধা পা, পা ধা না সা, গা ধা না সা, ধা না সা রা।

আরোহণ—সা রা মা পা ধা সা। অবরোহণ—সা গা ধা পা, ধা মা গা মা, সা।

রাগবাচক তান—সা রা মা পা ধা সা রা সা, গা ধা পা ধা মা গা মা সা।]

ঋষাবতী—তেতালা

১ পা গমা পা ধা + | সাঁ | | | | ৩ | গা | ধা সাঁ গা | ০ | ধা | | পা | : |
স খি মু খ চৌ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ পধা পা | মা + | মা গা | রা | ৩ | রগা | সা | ০ | রগা | সরা | : |
যব্ আ ০ ই বি হা ০ ০ আ ০ রী ০ আ রে ০ ০

১ মা | মা, পা + | মপা পা, ধা ধা | ৩ | মা পা | | ০ | পধা | সরি | : |
মা ০ ন, ধ অরু ম, স ব কো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ রাঁ গাঁ | রাঁ + | সাঁ | নসাঁ গা | ৩ | ধা সাঁ গা | ০ | ধা | গা, ধা | : |
ও ও ০ ও মা ০ ০ ০ ০ আ ০ ই ০ ই ই ই ই

১ ধা মা পা ধা + | সাঁ | | | | ৩ |
স . খি মু খ চৌ ০ ০ ০

(অন্তরা)

০ ১ ১ ১ পমা ১ পা, না ১ না ১ না সী ১ ১ ১ ননা সী ১ ১ ১
 ০ ০ ০ প্যা রে, প্যা ০ রে নৈ ০ ০ ০ না ০ ০ ০

০ না সী ১ ১ ১ ধসী র'গী সী ১ ১ সনসী র'সী নসগী ১ ১ পধা ১ পা ১ ১
 ও টে ০ ০ ও ০ ০ ০ টে ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র ০ লে ০

০ ধা পা মা গা ১ গা ১ ১ ১ ১ গা ১ গা রা ১ ১ গরা গা সা ১ ১
 চি ত ব ন মে ০ ০ ০ ব ০ শ ০ গো ০ ই ০

০ সা রা ১, মা ১ পা ১, ধা ১ ১ পধা স'রী ১ ১ ১ রী গী ১ সী ১
 চি ত ০, ব ত ০, কি ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০

০ না ১ নসী গা ১ ধা মা পা ধা ১ সী ১ ১ ১ ১ সী ১ ১ ১ ১
 ই ০ ০ ০ ০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০ মু ০ ০ ০

০ ১ ১ ১ ১ ১ সী ১, গা ধা ১ ১ সী ১ ১ ১ ১ নসী রসী, গা ১ ১
 ০ ০ ০ ০ উ ০, ০ ০ খ ০ ০ ০ এ ০ ০ ০, মু ০

০ গা গা গা গা ১ নসী র'সী, গা ১ ১ গা গা - গা গা ১ ১ গধা পমা গমা ধা ১
 উ ০ ০ ০ এ ০ ০ ০, মু ০ উ ০ ০ ০ মু ০ ০ ০ ০ ০

০ ধা ধা ধা ধা ১ ধা পা মা ১ ১ গা ১ গা মা ১ ১ মা সা ১ ১ ১
 উ ০ ০ ০ খ ০ ০ ০ চৌ ০ ০ ০ লে ০ ০ ০

০ মা রা পা মা ১ ধা পা পা ধা ১ ১ রী ১ গা, সী ১ ১ ধা, গা ১ ১
 স খি মু খ ছ বি মু খ চৌ ০ ০, লে ০ ০, ছ ০

০ পা, ধা ১ মা ১ ধা মা পা ধা ১ ১ সী ১ ১ ১ ১ নসী রসী গা, ধগা ১
 ০, বি ০ ০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০ মু ০ ০ ০ খ, চৌ ০

০ স'গা ধা, ধা পা | ধা মা পা ধা | স'া ত ত ত | ধ'গা স'গা ধ'পা ম'গা | (তান)
 ০০ ছে, ছ বি স খি মু খ চৌ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ (সমূহ)

০ রমা পধা স'া ত | গ'ধা স'গা ধ'স'া গ'ধা | স'গা স'গা ধ'পা ম'গা | রমা পধা পমা গমা |
 আ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ধমা পধা স'া ত | ধা মা পা ধা | স'া ত ত ত | ধ'স'া র'গা স'র'া গ'স'া |
 আ ০ ০ ০ ০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ স'গা ধ'স'া গ'ধা পমা | স'গা স'গা ধ'পা ম'গা | রমা পধা পমা গমা | সা, সমা রমা পধা |
 আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ, আ ০ ০ ০ ০

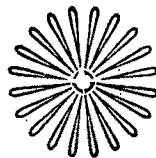
০ ধমা পধা স'া ত | ধা মা পা ধা | স'া ত ত ত |
 আ ০ ০ ০ ০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০

০ প'গা ধ'পা, ধমা গমা | রমা পধা পমা গমা | ধমা পধা স'র'া স'গা | ধ'পা ম'গা মমা স'সা |
 আ ০ ০ ০, ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০, ০ ০ ০ ০

০ স'স'া ধ'ধা, গ'গা প'পা | ধ'ধা মমা, প'পা গ'গা | ধা মা পা ধা | স'া ত ত ত |
 আ ০ ০ ০, ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০, ০ ০ ০ ০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০

০ ধ'স'া র'গা, ম'মা স'স'া | র'র'া ননা, স'স'া ধ'ধা | গ'গা প'পা, ধ'ধা মমা | প'পা গ'গা মমা স'সা |
 আ ০ ০ ০, ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০, ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ স'রা ম'পা ধ'স'া র'স'া | গ'ধা পমা গমা স'সা | ধা মা পা ধা | স'া ত ত ত |
 আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স খি মু খ চৌ ০ ০ ০



বাংলায় কার্পাস-চাষ

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্তী

বস্ত্র-সম্রাজ্ঞী ও তাহার প্রতিষ্ঠা

বর্তমান বস্ত্র-সম্রাজ্ঞীর দিনে ঘরে ঘরে সামান্য পরিমাণ জমিতে কার্পাস জন্মাইয়া চরখার প্রচলন দ্বারা সহজে বস্ত্রাভাব দূর হইতে পারে। বাংলার কার্পাস সহজলভ্য নয় বলিয়াই দীর্ঘ দিনের চেষ্টায়ও এখানে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে সকল প্রদেশে কার্পাস উৎপন্ন হয় তথায় শিশুরাও ক্রীড়াচ্ছলে চরখা কাটিয়া আমদানি পায়। বস্ত্র-শিল্পে বস্ত্র-মূল্যের দশ আনা তুলা বরাদ্দ করিতে ব্যয়িত হয়। নিজে কার্পাস জন্মাইলে নিখরচার সহজে ইহার সমাধান হয়। প্রত্যহ কতক সময় পাড়ার কয়েক জনে মিলিয়া চরখার সূতা কাটিলে এবং এক জনে তথায় রামায়ণ মহাভারতাদি কিংবা কোন পত্রিকা হইতে আকর্ষণীয় অংশ পাঠ করিলে সময়টা বেশ আনন্দে কাটিয়া যায়।

বাংলায় কার্পাস-চাষ লোপ পাইবার কারণ

যে বাংলায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথমে কার্পাস জন্মিত সেখানে দীর্ঘদিন ইহার চাষের প্রচলন না থাকায় ক্রমশঃ ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট ঙ্গেট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে আছে :

"The district of Dacca produces the best cotton in the world. The fibres are fine, silky and strong."

দেড় শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে সূতা

ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হইলে এখানে সে সকল আমদানী হইতে থাকে। বিলাত হইতে আমদানী সূতা অনেক সস্তা বলিয়া ক্রমশঃ চরখা প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। চরখা কাটা বন্ধ হইলে তুলার চাষও উঠিয়া যায়। দীর্ঘদিন ইহার চাষ না থাকায়, বাংলা যেন কার্পাস-চাষের অল্পপোষী হইয়া পড়ে। পাঠ্য পুস্তকাদিতেও এ প্রকার অল্পপোষিতা বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় বহু পাটকল আছে। ইহার অধিকাংশের মালিকই ইংরেজ। বাংলার কার্পাস-চাষ ব্যাপক ভাবে হইলে পাটের চাষ কমিয়া যাইবে এই আশঙ্কা হেতু ইংরেজ বণিকগণ, তথা গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে অবহিত হন নাই। বাংলায় এখন চল্লিশ-পঞ্চাশটি কাপড় ও সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুলার আশ অন্ততঃ এক ইঞ্চির সাত-অষ্টমাংশ লব্ধ না হইলে

কলে ব্যবহার চলে না। বাংলায় এ প্রকার তুলার চাষ নাই বলিয়া এ সকল মিলের আবশ্যক তুলা অভাব প্রদেশ—পাকিস্তান, আমেরিকা, আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

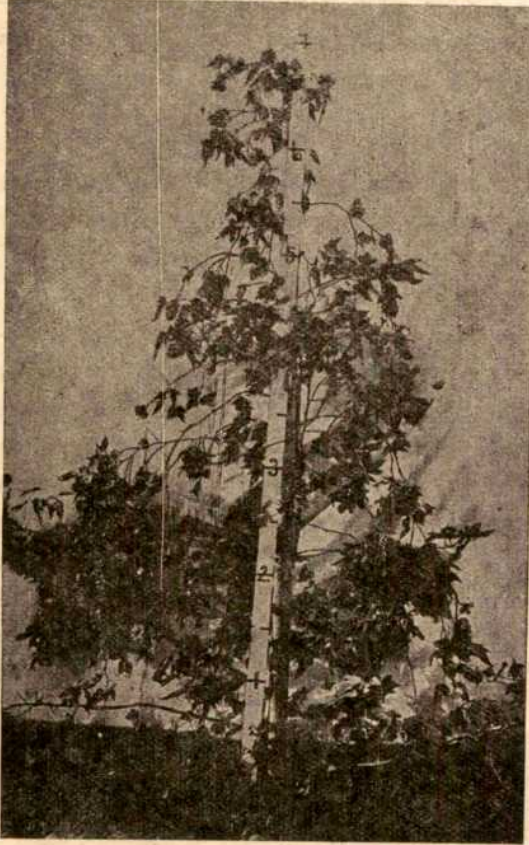
কার্পাস-চাষ-প্রচেষ্টা

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স নামা দেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুলার বীজ আমদানী করিয়া তাহাদের এগ্রিকালচারাল অফিসার হিসাবে আমাকে দিয়া তাহার চাষ করাইয়া ভাল ফল পান। সরকারী কৃষিবিভাগও এ বিষয়ে অল্পপ সাফল্য লাভ করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি ও গবর্ণমেন্টের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং অর্থসাহায্যে ১৩৩৮-৩৯ সন হইতে বিভিন্ন পরিকল্পনামুযায়ী সরকারী কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন জেলায় দশ বৎসর ইহার চাষ হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় কটন কমিটি অর্থসাহায্য ও উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিতেন। বর্ধার জল দাঁড়ায় না এপ্রকার দোআঁশলা মাটি কার্পাস-চাষের বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার চাষে বিধাপ্রতি পঞ্চাশ-ষাট টাকার মত খরচ করিয়া কার্পাসমূল্য বাবদ এক শত পঁচিশ হইতে এক শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।



শিশুরা ক্রীড়াচ্ছলে চরখায় সূতা কাটিতেছে

কলম বিধাপ্রতি তিন মণ হইতে পাঁচ মণ কার্পাস বা এক মণ হইতে দুই মণ তুলা ও দুই মণ হইতে ছয় মণ বীজ পাওয়া যায়। মিশরীয় কার্পাসের মূল্য অত্যন্ত কার্পাসের তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক এবং ইহা বাংলার বিশেষ উপযোগী



ক্ষেতে উৎপন্ন একটি মিশরীয় কার্পাস গাছ

কলম। উপরোক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনামুযায়ী উৎপন্ন কার্পাসের বীজ বিনামূল্যে ছাড়াইয়া তুলা ও বীজ বিক্রয় করতঃ উৎপাদক-দিগকে মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এতদ্বিধা বিনা মূল্যে সার, বীজ দেওয়া হইত। পারিভোষিক প্রদান ও কৃতিপূরণ করিবার ব্যবস্থাও ছিল। কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইবার জন্য একটামাত্র কল থাকিতে উৎপাদকদিগকে বহুস্থলে মূল্য দিতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিত। এজন্য অনেকেরই পর বৎসর আর ইহার চাষে উৎসাহ থাকিত না। এ সকল অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল এমন সময় বঙ্গ-বিভাগ হইল। ইহার পর কি গবর্ণমেন্ট, কি মিল-মালিক সমিতি কিংবা চাক্ষুশী কটন মিলস কেহই বাংলার কার্পাস-চাষের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। আমি পশ্চিম বাংলার

ইহার চাষের কথা বহুরকমে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন পত্রিকাধির মারফতে প্রচার করিয়া আসিতেছি। এ সম্বন্ধে আমার বহু দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে—মদীয়া জেলার ফুলিয়াবন্দর। গ্রামে নানারকম কার্পাস চাষের কাজে লাগাইয়া উৎপাদক-দিগকে আবশ্যকমত বীজ-সরবরাহ করিতে প্ররোচিত হই। মিশরীয় কার্পাসের চাষে এতদিন কেবল আমিই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। চাকার কয়েক রকম উৎকৃষ্ট তুলার বীজের মত, ইহাও যাহাতে বাংলা হইতে বিলুপ্ত না হয়, তাহাই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৪৯ সনের ১৬ই এপ্রিল বাংলার রাজ্যপাল আমার চাষ দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোন স্থায়ী ফলের আশা না থাকায় গবর্ণমেন্টের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতে থাকি।

বর্তমান বঙ্গ-সমাজ ও কার্পাস-চাষ আন্দোলন

দেশ-বিভাগ ও অত্যন্ত কারণে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার মিলগুলি আবশ্যকমত কার্পাস না পাওয়ার বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ১৯৪২-৪০ সালের বিভিন্ন সময়ে দিল্লী ও বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র কার্পাস-চাষের প্রসারকল্পে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। চাষের প্রসার দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষকে কার্পাস বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে না হয় এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান সেক্ট্রাল কটন কমিটিকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। এ সময়ে বাংলার মিশরীয় কার্পাস-চাষ প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিন বৎসরের কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া প্রচার করি। ইহা কৃষিবিভাগের নিকট প্রদত্ত হইলে গবর্ণমেন্ট সুপারিশ করিয়া ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কটন কমিটিকে পাঠাইয়া দেন এবং ১৯৫০-৫১ সনে আমি যাহাতে ইহার চাষ চালাইয়া যাইতে পারি এজন্য ১০২০ টাকা সাহায্য করেন। ইতি-মধ্যে কৃষিবিভাগ হইতেও বাংলায় লম্বা আঁশের কার্পাস-চাষ প্রসারের উদ্দেশ্যে তিন বৎসরের জন্য প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আর একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কটন কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। পশ্চিম বাংলার সরবরাহ-সচিব বাংলার কার্পাস-চাষোপযোগী কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু পণ্ডিত কমি দশ-পনের হাজার টাকা খরচ করিয়া সেচব্যবস্থার সাহায্যে কিভাবে চাষোপযোগী করা যায় তিনি তাহার একটি বিবরণ দেন। যে সকল উচ্চ দোআঁশলা মাটিতে পাট ও আঁশ ধানের চাষ হয় সে সব স্থলেও কার্পাস জন্মানো যাইতে পারে। এই ধানের বিস্তার জমি বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পণ্ডিত আছে। এই প্রকার ৫০০০ একর পণ্ডিত জমিতে কার্পাস-চাষ প্রচলন করিবার ব্যবস্থা হয়।

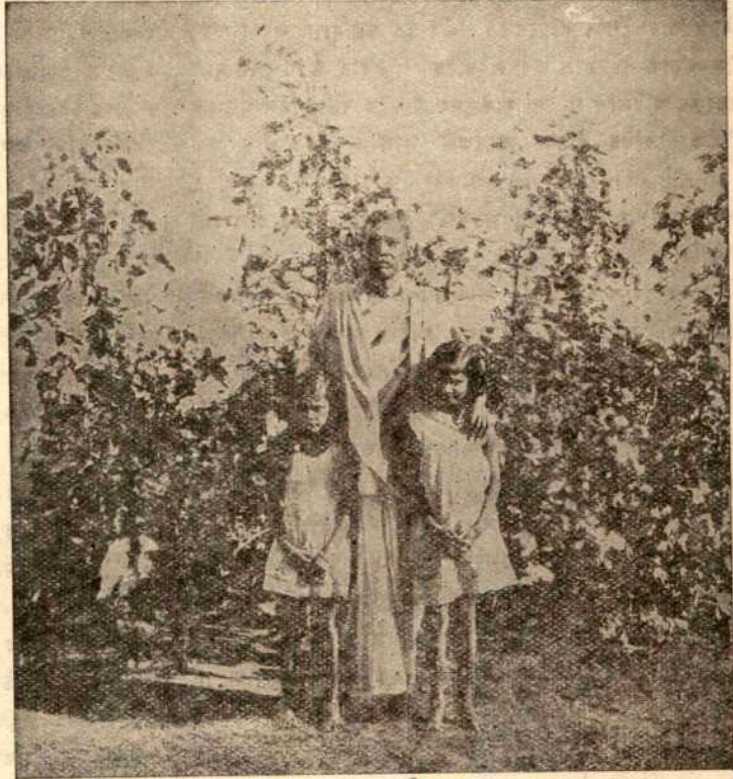
ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটি—বোম্বাই

এই কমিটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় মিল এবং সেগুলির প্রয়োজনীয় ভারত-জাত কার্পাসের উন্নতি ও চাষের প্রসারের জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিবিভাগ কার্পাস-চাষ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলে কমিটি উপদেশ ও অর্থসাহায্য দ্বারা সর্বতোভাবে তাহাদের কার্যে সহায়তা করে। সেখানে কার্পাস-চাষ সম্পর্কে গবেষণা ও অজ্ঞাত কার্য পরিচালনার জন্ত বহু বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। বিভিন্ন প্রদেশের মিল-মালিকদের প্রতিনিধি, কৃষি-বিভাগের প্রতিনিধি ও অজ্ঞাত বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত এক কমিটি ইহার কার্য পরিচালনা করেন। ভারত হইতে রপ্তানি তুলা এবং মিলে বরিদ তুলার উপর যে কর আদায় হয় তাহা এই কমিটির ব্যয়নিরূপার্থ দেওয়া হয়। এতদ্বিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারও অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

পশ্চিম বাংলার দুইটি কার্পাস-চাষ
পরিকল্পনা ও তাহাদের কার্য
(১৯৫১-৫২)

পশ্চিম বাংলা হইতে আমার প্রদত্ত মিশরীয় কার্পাস-বীজ-বৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং কৃষি-বিভাগ প্রদত্ত লম্বা আঁশের কার্পাস-চাষ-প্রচলন পরিকল্পনা ভারতের কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির সভ্যদের দ্বারা বিবেচিত হয়। তাহারা কমিটির সেক্রেটারীকে নবেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৫০) মাসে পশ্চিম বাংলায় গিয়া কতকগুলি কার্পাস-ক্ষেত্র পরিদর্শনান্তে এ বিষয়ে তথাকার কার্পাস সাব-কমিটির সদস্য ও স্থানীয় অজ্ঞাত বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করেন। পরে তাহাদের সম্পাদককে ১৯৫০-এর ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে এখানে পাঠাইয়া দেন। অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা ৯/১২/৫০ তারিখের কাগজে এ বিষয়ে তখনকার অবস্থা সংক্ষেপে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পাদক মহাশয় এই প্রদেশে তিন-চার দিন অবস্থান-কালের মধ্যে এখানকার কয়েকটি কার্পাস-ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। তিনি ফুলিয়াবরয়ার আমার উৎপাদিত মিশরীয় কার্পাস ও কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর এবং সরকারী গ্রুপ-রিসার্চ অফিসারকে লইয়া দেখিয়া আসেন। ইহার পর প্রাদেশিক কার্পাস কমিটির কতিপয় সদস্য ও অজ্ঞাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করিয়া কৃষিবিভাগ প্রদত্ত কার্পাস-

চাষ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। আমার প্রদত্ত মিশরীয় কার্পাস-বীজ-বৃদ্ধি পরিকল্পনাটি তাহাদের দ্বারা সাময়িক ভাবে বর্জিত হয়। আমি প্রাদেশিক কটন সাব-কমিটির একজন সভ্য থাকা সত্ত্বেও আমার বক্তব্য বিষয় জানাইবার কোন সুযোগ যে আমাকে দেওয়া হয় নাই—ইহা পরিতাপের বিষয়। সে যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট আমার পরিকল্পনা-



কার্পাসগাছের কাছে দণ্ডায়মান লেখক

ছায়ায় তিন বৎসরের স্থলে এক বৎসরের জন্ত (১৯৫১-৫২) ইহার চাষের খরচ ১৫৮০ মজুর করেন। আমার পারিশ্রমিক বাবদ তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে মাসিক রুত্তির জন্ত সুপারিশ করিলেও তাহাদের মজুরী টাকার মধ্যে ইহার কোন ব্যবস্থা নাই। বাংলার মিশরীয় কার্পাস-চাষের অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তি-সঙ্গত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অমুযায়ী আমি ফুলিয়াবরয়ার (নদীয়া) প্রায় তিন বিঘা জমিতে মিশরীয় কার্পাসের চাষ করিতেছি।

কৃষিবিভাগ প্রদত্ত তিন বৎসরের কার্পাস-চাষ পরিকল্পনাতে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন। এই পরি-

কলনানুযায়ী এ বৎসরের কার্ঘ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলার ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় ৩,৫০০ একর জমিতে পার্কী নামক লম্বা আঁশের কার্পাসের চাষ হইতেছে। যে সকল জমিতে আশু বান কিংবা পাট চাষের সম্ভাবনা ছিল না, সম্ভবমত সে সকল জমিতেই কার্পাস-চাষ হইতেছে। একত বহু জমি কৃষিবিভাগের ট্রাষ্টের সাহায্যে সাধ্যমত চাষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চাষের ক্ষত যে বরচ হইয়াছে উৎপাদকগণ কার্পাস জমাইয়া তাহার মূল্য হইতে তাহা শোধ করিবেন। এতদ্বির অল্প মূল্য লইয়া সার, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে। এবার কার্পাসের মূল্য বাহাতে অবিলম্বে পাওয়া যার সেই উদ্দেশ্যে বদীর মিল-মালিক সমিতি বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কার্পাস-বীজ-ছাড়ান কল (ginning machine) প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এতদ্বির উৎপাদকদিগকে যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাংলাদেশে ইতিপূর্বে কখনও এত ব্যাপক ও কার্যকরী পরিকল্পনা লইয়া কার্পাস চাষের ব্যবস্থা হয় নাই। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের উদ্যোগে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংশে কর্ণে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারী কৃষি-কর্মচারীরা প্রায় প্রত্যেকেই ইহার সাক্ষ্যের ক্ষত সাধ্য-মত চেষ্টা করিতেছেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহাতে পরিকল্পনানুযায়ী যে ছয় জন ডিমনস্ট্রেটর ও কটন সুপারভাইজিং অফিসার নিযুক্ত ছিলেন, তদ্ব্যতীত কৃষি-বিভাগের অজ্ঞাত কর্মচারীদের এই কার্ঘ্যে আশাহুত্বপূর্ণ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। আগামী বৎসর চাষের জমির পরিমাণ বর্তমান বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

একটি মিশরীয় কার্পাসগাছ

এ সকল গাছে গড়ে ১০০টি করিয়া গুটী হয়। লাগাই-বার পর পরবর্তী চাষের সুবিধার ক্ষত চার হাত অন্তর পংক্তি করিয়া পংক্তিতে দুই হাত অন্তর বীজ পুতিলে প্রতি গাছে এক শোয়া কার্পাস হয়। এই একই ব্যবস্থানে এক বিঘার ৮০০ গাছ হইতে ৫ মণ কার্পাস বা ১৪০ মণ তুলা পাওয়া যায়। মণপ্রতি ৩০০/- মর হইলেও ইহাতে ৪৫০/- পাওয়া যায়। চাষের বরচ ১০০/- টাকার বেশী হয় না।

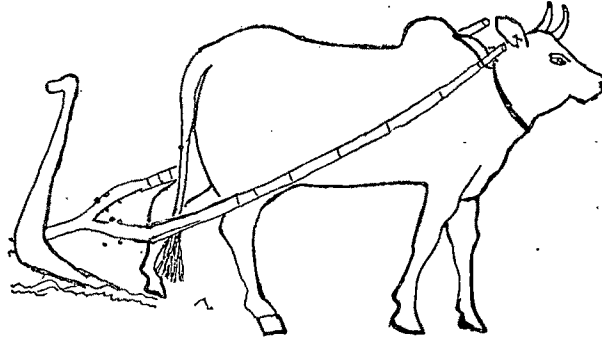
বাংলার মিশরীয় কার্পাস-চাষ

মিশর দেশে জাত কার্পাস গৃহবীর মন্যে শ্রেষ্ঠ কার্পাস বলিয়া গণ্য। ইহার মূল্যও অজ্ঞাত কার্পাসের দ্বিগুণেরও অধিক। বাংলাদেশের আবহাওয়ার সহিত মিশরের আবহাওয়ার কোন মিল নাই। পাকিস্থানের সিক্সপ্রেশনের সহিত মিশরের আবহাওয়ার কতকটা মিল থাকার ভাণ্ডার সরকার

ইহা উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ভাল কল পাওয়া যায় নাই। কাজেই বাংলার ইহার চাষের সাক্ষ্যলাভের পথে বহু বিঘ্ন থাকি স্বাভাবিক। বোল বৎসর পূর্বে চাকেশ্বরী কটন মিলের এগ্রিকালচারাল অফিসার হিসাবে আমি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইহার চাষ আরম্ভ করি। প্রথম চার-পাঁচ বৎসর খুবই ভাল কল পাইয়াছিলাম। ইহার মূল্য মাত্র আশ দৈর্ঘ্যে হইয়াছিল প্রায় দেড় ইঞ্চি এবং এই তুলা ৮০-১০০ মণ মত প্রকৃতির উপযোগী ছিল। বদীর মিল-মালিক সমিতির সম্পাদক "ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতুতপূর্ব" বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। কলমেও বিধাপ্রতি পাঁচ-ছয় মণ কার্পাস বা প্রায় দুই মণ তুলা পাইয়াছি। এ সকল বীজ ব্যবহার করিয়া বদীর কৃষিবিভাগ মুকলই লাভ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির সম্পাদক চাকেশ্বরী কটন মিল কম্পাউণ্ডে উৎপন্ন কার্পাস পরীক্ষা করিয়া ইহার উৎকর্ষ-দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাংলার যে এরূপ উৎকৃষ্ট কার্পাস হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। বিদেশীয় এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ ব্যবহারের পূর্বে যেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশোধন করিয়া লওয়া হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তখন প্রতি বৎসর বীজ বিশোধন না করিয়াই বপন করিতাম। ইহার পর বৎসর (১৯৪১ সালে) ইহাতে এক রকম হ্রস্ব রোগ (fungus disease) দেখা দিয়া যাবতীয় ফললই নষ্ট হয়। ইহাতে বদীর কৃষিবিভাগ বাংলার মাটি মুঠভাবে এই কার্পাস উৎপাদনের অনুপযোগী মনে করিয়া ইহার চাষ হইতে বিরত হন।

চাকেশ্বরী কটন মিলস ও বদীর মিল-মালিক সমিতি এ প্রকার একটি অর্থকরী উৎকৃষ্ট কার্পাসশিল্প রক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আস্থকৃত্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রতিকারের ক্ষত যত্ববান হইবেন এই তরঙ্গা প্রদান করেন এবং ১২০০০/- ব্যয়ে ৫ বৎসরের ক্ষত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বদীর মিল-মালিক সমিতির অর্থাহকৃত্যে কাজ আরম্ভ হয় ও দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই উজ্জ্বলকারা কার্পাসের এই রোগ দূর করিতে সমর্থ হন। তাহাদের গবেষণালব্ধ প্রণালীদ্বারা বিশোধিত বীজ প্রতি বৎসরই 'মাঠে আমি বপন এবং চাষের ব্যবস্থা করিতাম। তাহারা এ কাজ পরিত্যাগ করিবার পরেও গভ পাঁচ বৎসর যাবৎ বধাসম্ভব তাহাদের প্রণালীতে বীজ বিশোধন করিয়া উক্ত বীজ রক্ষাকল্পে প্রতি বৎসর ইহার চাষ করিয়া বিশেষ মুকললাভ করিয়া আসিতেছি। বীজগুলি আট-দশ মিনিট সালফিউরিক এসিডে ডুবাইয়া পরিকার জলে ধোওয়া হয়। তার পর সেগুলির মধ্যে জলে ডুবিয়া থাকে এ প্রকার বীজ বপনের ক্ষত রাখা হয়। এই বীজগুলি ৪ মণ ৬০° সেলসিয়াসে উত্তাপে রাখিয়া পরে

অযোগ্যমত বুমিতে হয়। এভাবে উত্তাপে রাধিবার ক্ষমতা, ইনকিউবেটরের অভাবে আমি সাধারণতঃ বীজগুলি চার ঘণ্টা রোজে রাধি। ইহার চাষ-প্রণালী এইরূপ : জমি বার বার চাষ করিয়া ও মই দিয়া বপনোপযোগী করিয়া এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে বৃষ্টি হইবার পরে, আর জল না হইলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। তার পরে মাটির জো হইলে বীজ পুঁতিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে জমি কোপাইয়া কার্পাসগাছের পোড়া বাধিয়া দিতে হয়। জুন, জুলাই মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইবার পরে বীজ বুনিলে। যে সকল গাছ উৎপন্ন হয় সেগুলি প্রায়ই নষ্ট থাকে না। উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের দ্বারা রীতিমত অনুসন্ধানের পর এ বিষয়ে নীতি



এক-গরুচালিত লাঙ্গল

দক্ষিণে—এক প্রকার কৃষিযন্ত্র



নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার বর্তমান কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার নন্দী মহাশয়ের চেষ্টায় টালিগঞ্জে সম্ভ্রান্ত কৃষিবিষয়ক একটি বড় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েক জন কৃষী যুবকের তত্ত্বাবধানে এখানে কৃষি-সম্পর্কিত বিবিধ কার্য হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-এক জন ব্যাভনামা অধ্যাপক প্রথমে ডক্টর আগার-কারের অধীনে কার্পাস-বিষয়ে গবেষণা করেন। পরে লণ্ডন হইতে বিশেষজ্ঞ হইয়া ডক্টর টিগ্রি লাভ করেন। ইহার সম্ভ্রান্তি এখানে কর্ষে নিযুক্ত আছেন। কার্পাস-চাষ-প্রসার পরিকল্পনামুযায়ী ইহার কার্যভার ডক্টর পি. কে. এগেরী পিএইচ. ডি. মহাশয়ের উপর ছত্ত আছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান তাহান্ন গভীর ব্যুৎপত্তি আছে এবং তিনি দীর্ঘকাল বাংলার কার্পাস-চাষ প্রসারকল্পে কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়াছেন। মিশরীয় কার্পাসের মত একটি অর্থকরী ফসলের বীজ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিশুদ্ধ রাধিয়া দেশে উক্ত শ্রেণীর কার্পাসের প্রসারকল্পে সর্বতোভাবে সাহায্য করা ইহাদের একান্ত কর্তব্য।

গত বৎসরে নদীয়া জেলার ফুলিয়াবন্দরগায়ে (১৯৫০-৫১) যে মিশরীয় কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আশের দৈর্ঘ্য ১.৬ ইঞ্চি। প্রসিদ্ধ মিলকর্মী এম. এল. সাহার মতে মোহিনী মিলস-এ ঐ কার্পাস হইতে ৮০ নং ডানার বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। বর্তমান বর্ষের (১৯৫১-৫২) উৎপন্ন কার্পাস সম্বন্ধে কেশোরাম কটন মিলস তাহাদের ২৪।১১।৫১ তারিখের পক্ষে ইহার দৈর্ঘ্য ১.৬ ইঞ্চি এবং কার্পাস ধুবই ভাল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অজ্ঞাত কার্পাসের মতই ইহাও উৎপাদন করিতে প্রায় সমান যত্ন ও চেষ্টা এবং প্রায়

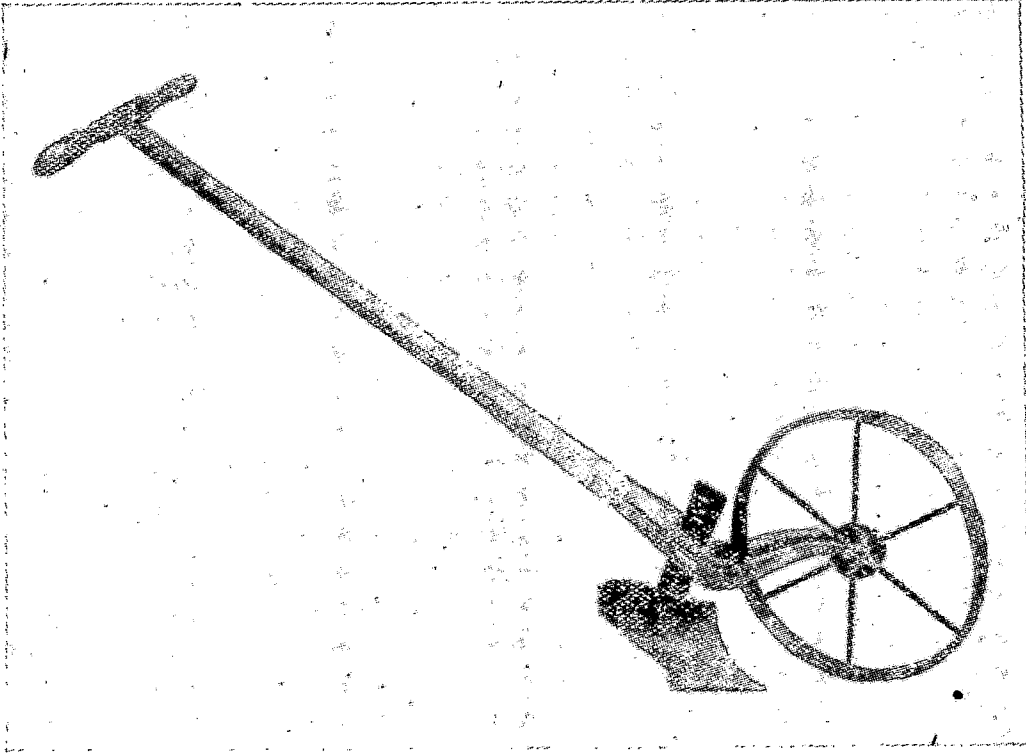
একই রকমের খরচ পড়ে, কিন্তু ফসল হইতে দ্বিগুণের অধিক আয় করা সম্ভব হয়।

এখন মিশরীয় কার্পাস-চাষের প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা বলিতেছি :

১। বাংলার সাধারণতঃ যে সকল ফসল জন্মে তাহাদের তুলনায় কার্পাস উৎপন্ন করিতে অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু কার্পাস-উৎপাদন-সম্পর্কিত কতকগুলি অল্প পরি-শ্রমের কাজ যেমন নিড়ান, পোকা বাছা, কার্পাসসংগ্রহ প্রভৃতি পরিবারের ছেলেমেয়েরাও করিতে পারে। ইহাদ্বারা জমিও অধিকতর সম্বর আবদ্ধ থাকে। ইহাদের সব কাজ মজুর রাধিয়া করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে ইহার লাভজনক চাষ হওয়া কঠিন।

২। ইহা মিশ্রিত ফসল হিসাবে আশু বাম, চীনাবাদাম, কলাই, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্রে জন্মান উচিত। আশু-বানের সহিত উৎপন্ন করিতে হইলে প্রথমে আশু বাম বুমিবার বিশ-পচিশ দিন মধ্যে জমিতে কয়েকবার মই ও বিদে দেওয়ার পর তিন-চার হাত অন্তর অন্তর সারি করিতে হয়। তার পর সেই সকল জাইনে দুই হাত আড়াই হাত ব্যবধানে মাটি কোপাইয়া নিড়াইয়া এবং ঝালাতে সার মিশাইয়া পাঁচ-ছয়টি করিয়া বীজ বুনিতে হয়। বান, কলাই, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্রে কার্পাস জন্মাইয়া আমি সফল পাইতেছি।

৩। পূর্বে হইতে তৈরি জমিতে মে-জুন মাসে বৃষ্টি হওয়া-মাত্র কার্পাস বুনিতে হইবে। কার্পাস বীজ বুনিবার পর প্রায় তিন মাস ইহাতে জলের প্রয়োজন। ফুলকল ধরিলে পর মাটি শুষ্ক থাকা আবশ্যক। এছাড়া বাংলার ঋতু ইহার চাষের পক্ষে



সাধারণ হাত লাঙ্গল—মূল্য ৩৫৬

বিশেষ অল্পকূল। বর্ষার জল সহজে সরিয়া যায় এই প্রকার দোআঁশলা মাটিই কার্পাস-চাষের বিশেষ উপযোগী।

৪। বাংলাদেশে বর্ষার সময় বাড়তি ঘাস ও আগাছা দূরীকরণের জন্য অল্প খরচে যাহাতে কাজ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃনবার পর দেড় মাস প্রায়ই হাত-লাঙ্গল ও বিদে এবং পরে গরুরারা চালিত লাঙ্গল ও বিদে ব্যবহার করিয়া জমি পরিষ্কার রাখিতে হয়। হাতে কোপাইলে ও নিড়াইলে ইহার চার-পাঁচ গুণ খরচ করিয়াও দ্রুত কাজ সমাধা হয় না বলিয়া জমি আগাছায় পূর্ণ থাকে। বর্ষার সময় ক্রমান্বয়ে বেশী দিন রুষ্টিপাত বন্ধ থাকে না বলিয়া, জমির ‘জো’ অল্পঘানী নিধান এবং খোঁড়ার জন্য সময় কম পাওয়া যায়। এ সময়ে আশু বাস ও পাঁচ নিড়াইতে প্রচুর লোক আবশ্যক বলিয়া এই কাজের জন্য লোক পাওয়া কঠিন এবং লোক যদি বা সংগ্রহ হয় তাহা হইলেও অনেক সময় হঠাৎ রুষ্টি আসিয়া পড়ায় কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই বন্ধ করিতে হয়। আমেরিকায় সাধারণ চাষীরা একটু ধকর-চালিত লাঙ্গল ও বিদে সাহায্যে কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমিতে কার্পাস উৎপন্ন করিয়া থাকে। সেখানকার আদর্শে আমাদের দেশেও কার্পাস-চাষে এইপ্রকার কৃষি-যন্ত্রাদির প্রচলন না করিলে ইহাতে অতিরিক্ত

খরচ হয় বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে ইহাতে তত উৎসাহিত হইবে না।

৫। এই প্রদেশে কার্পাস-চাষের ব্যাপক প্রচলন নুতনভাবে হইতেছে বলিয়া ফসল-মূল্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কার্পাস-সংগ্রহে ব্যয়িত হইবে। যে সকল প্রদেশে কার্পাস হয় তাহার নগদ টাকা না দিয়া মণকরা চার-পাঁচ সের কার্পাস মজুরীতে দেওয়া হয়। এখানে লোকে একাডে অনভ্যন্ত বলিয়া দৈনিক] /৫ পাঁচ সের আন্দাজ কার্পাস সংগ্রহ করিবে। এ কার্যে ঠিকা মজুরীতে যথাসম্ভব জীলোক ও অল্পবয়স্কদের নিযুক্ত করিয়া খরচ কমান যায় কিনা চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। এদেশে আশাভরপভাবে কার্পাস-চাষের প্রসার এখনও হয় নাই। বর্তমানে বিনা খরচায় বীজ ছাড়াইয়া তুলা বিক্রী করিয়া উৎপাদকগণকে যথাসম্ভব সত্তর মূল্য পরিশোধ করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা থাকা পর্যন্ত যাহাতে রুষ্টি হিসাবে এক শ্রেণীর লোক এই কার্য অবলম্বন করে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্তমানে পাট-বানের মত এদেশে অল্প পরিমাণে ইহার বিক্রির অভাব বাক্য নাই। সহজে বিক্রির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কার্পাস-চাষ এখানে স্থায়ী হইবে কিনা বলা কঠিন। এবারকার ৩৫০০ একর জমিতে উৎপাদিত

অন্ততঃ ১৪০০০ মণ কাপাসে ৪৫ মণ হিসাবে (ভুলার মণ প্রায় ১১০) ৬,৩০,০০০ মূল্যের মধ্যে মণকরা ন্যূনতম ৫ হিসাবে কাপাস সংগ্রহ ও বিক্রির ব্যবস্থার জন্ত মঞ্জুরী করিলে এই উদ্দেশ্যে ৭০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। কাজেই এখন হইতে নিয়মিত প্রচার করিলে এ প্রকার কাজে বহু লোক যে আকৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। কাপাস-চাষের আয়ব্যয় বিষয়ে একটা হিসাব সংগ্রহ করা আবশ্যক। জমি প্রস্তুত, বীজ বপন ও পরবর্তী কাজ—কসলসংগ্রহ প্রভৃতি বাবদ বিভিন্ন সময়ে কত খরচ হয় বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব লওয়া এবং কাপাস-চাষের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের মন্তব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। কাপাস-উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধিত্বান্বিত ব্যক্তিদের লইয়া এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করিলে কি ভাবে চাষের খরচ কমাইয়া ইহার আয় বাড়াইয়া তাহার পন্থা স্বীকৃত

হইতে পারে। আমেরিকার কাপাস উৎপাদনকারী সমিতির লোকেদের (Cotton Growers' Assn.) মধ্যে এভাবে আলোচনার কালে তথ্য কাপাস-চাষের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

৮। কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর এই মূল্যবান মিশরীয় কাপাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া ক্রমশঃ ইহার উৎকৃষ্ট বীজের পরিমাণ বাড়াইয়া চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা আবশ্যক। এভাবে দেশে পার্শ্বগী প্রভৃতি লম্বা আশের কাপাস চাষের পরিবর্তে এই অর্থকরী কসলের প্রবর্তন সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ইহা করিতে পারিলে প্রচুর লাভ দেখিয়া সাধারণে স্থায়ী ভাবে ইহার চাষে প্রস্তুত হইবে। এখন মিহি কাপড় প্রস্তুতের উপযোগী কাপাস এদেশে জন্মে না। মিহি কাপড়ের চাহিদা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এই কাপাস বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া দেশে উৎপন্ন করিতে পারিলে চাষীদের ও দেশের প্রভুত্ব কল্যাণ হইবে।

ছোট ঘর

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোথায় তোমারে মিরে হারিয়ে গেলাম;
অচেনা পথের মাঝে কুড়িয়ে পেলাম
হবেও বা আর কারো হারান মাণিক,
চেনা চেনা মনে হল অচেনা ধানিক।

তবুও হৃদয়ে তাই কুড়িয়ে নিলাম,
ভুলার হারাই পাছে তোমারে দিলাম।
আমাদের ছোট ঘর; ছোট এ উঠান,
এক কালি আকাশের ছোট ব্যবধান
খুঁচাতে পারি না তাই সরমে মরি,
তুমি যে রয়েছ মোর হৃদয় ভরি।
আকাশের এত আলো, এত অবকাশ;
তার মাঝে তবু যেন পড়েনাক' স্থান।

তুমি আছ কাছে কাছে, বাহিরে জনতা,
সেখান কলহ বাড়ে, ভিতরে মমতা।
একখানি ছোট ঘর, মোরা দুটি প্রাণী,
রাতাসে শুনিতে পাই চলে কানাকানি।

হারান মাণিক কা'র পেয়ে হারালাম,
কিবা তাতে আসে যার? আজ ঠাড়ালাম

মুখোমুখি হৃদয়ে আভিনায় এসে
মাথার উপরে চাঁদ গলে পড়ে হেসে।

ছোট ঘর তাই বুঝি বাহিরে এলাম,
পরিসর ছোট তবু ঠাই শু পেলাম।
সীমানা হারিয়ে যায় হাড়ারে দেয়াল
দেখি দূরে পড়ে আছি, হয় নি খেয়াল।

সমুখে অশেষ পথ, মাথার আকাশ
সীমা নাই, শেষ নাই, আলোর আভাস
কোনোখানে কিছু নাই, দু'ধু মরীচিকা;
তবু যেন মনে হয় কোনো অমায়িকা
আমারে ভুলাতে চায়, কঁদাতে তোমারে;
এ খেলা লাগে না ভাল, আলোকে-আঁধারে।
তবে চল ফিরে যাই সেই ছোট ঘরে
হৃদয়ে সাজিয়ে তুলি প্রেম ধরে ধরে।

সে প্রেমে বাসর-শয্যা সে প্রেমে বুপতি
হৃদয়ে ভরিয়া দিবে মিলন-আরতি;
হৃদয়ে ফিরিব চল, খেঁচো না একেলা,
চল যাই ফিরে যাই শেষ করে খেলা।

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার

ব্রহ্মচারী রমেশ

‘প্রবাসী’র প্রাৰণ সংখ্যায় “বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার” সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের চারি জন সন্ন্যাসী-সদস্য বহির্ভারতে ভারতের মহান বাণী প্রচারের জন্ত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে মরিশাস দ্বীপে অবতরণ করেন। তাঁহাদের প্রেরিত পত্রাদিতে প্রবাসী ভারতীয়গণের জীবনযাত্রার মান, সামাজিক পরিবেশ, রাজনীতিভেদে তাঁহাদের সাফল্য এবং আর্থিক উন্নয়নে তাঁহাদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আশ্রয় যে বিবরণ পাইয়াছি তৎসম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মরিশাস ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব তেজি শত মাইল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের আয়তন ৭১২ বর্গমাইল লোকসংখ্যা সাড়ে চারি লক্ষ; তন্মধ্যে হিন্দু আড়াই লক্ষেরও অধিক। দ্বীপটি পার্শ্বতঃ, অধিকাংশ স্থানই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮ লক্ষ থেকে ৩ হাজার ফুট উচ্চ। এই স্থানের আদিম অধিবাসিগণকে ক্রিয়ল বলে এবং তাহাদের ভাষা ক্রিয়ল নামে পরিচিত।

মরিশাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বুঝি গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিকগণ এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে। তখন এই স্থানে লোকবসতি ছিল না। জটনিক নাবিকের মামাহুসারে এই দ্বীপটির নামকরণ করা হয়—ম্যাসকারেন। ভৌগোলিকগণ ইহাকে কারনি আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইহার কতকাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া হল্যান্ডের সুবরাজের নামে এই দ্বীপের নাম রাখা হয় “মোরিশ”। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ এই উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস আনাইয়া দ্বীপটিকে বসবাস ও কৃষির উপযোগী করিয়া গড়িয়া ভুলিবার জন্ত সচেষ্ট হয়। অবশেষে এই স্থানের কোন প্রকার উন্নতি হইবে না মনে করিয়া তাহারা তাহাদের গড়িয়া ভোলা গৃহাদি ও উপনিবেশের অত্যন্ত যাবতীয় দ্রব্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ওলন্দাজগণ এই দ্বীপ ত্যাগ করিলে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ফরাসী অধিকারে আসে এবং ইহার নতুন নামকরণ করা হয়—‘লেডি ফাঁস’। ফরাসীগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এই ক্ষুদ্র উপনিবেশ ক্রমশঃ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। এই সময় ইংরেজগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র পাড়ি দিতে শুরু করিয়াছিল। তাহাদের লুন্ড দৃষ্টি ইহার উপর পড়িল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতগামী একটি ব্রিটিশ নৌবহরের অভিযাত্রিগণ কর্তৃক এই দ্বীপটির কিয়দংশ

অধিকৃত হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের চুক্তির ফলে দ্বীপটির শাসনভার সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশের অধিকারে আসে এবং এখানে ফরাসী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশের অধিকারের পর দ্বীপটির নাম দেওয়া হয় মরিশাস।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে এখানকার ক্রীতদাসপ্রথা রহিত হয়। তখন আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাসরূপে শ্রমিক আনয়ন বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করিতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই মরিশাস, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কিংবা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়গণের আগমন আরম্ভ হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মরিশাসে সর্বপ্রথম বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ হইতে শ্রমিক আনয়ন করা হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩ হাজার। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রম-ডার্সন কমিটি মরিশাসে জনসংখ্যার বহুলতা, কৃষির উপযোগী ভূমির স্বল্পতা, কলোনির আর্থিক বিপর্যয়, শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদের শ্রমবিমুখতার ওজুহাতে ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধভাবে শ্রমিক আনয়ন বন্ধ করিবার সুপারিশ করেন। ইহার ফলে কিছুদিনের জন্য শ্রমিক আনয়ন বন্ধ থাকে।

মরিশাসের মোট লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ৮০ হাজার; তন্মধ্যে ভারতীয় হিন্দু—২ লক্ষ ৩০ হাজার, মুসলমান ৬৭ হাজার, ভারতীয় খ্রীষ্টান ১০ হাজার, চীনা ২৫ হাজার, ফরাসী ১০ হাজার এবং আফ্রিকান ও বেসাফ প্রায় দেড় লক্ষ।

এই স্থানে অধিবাসিগণের প্রধান উপজীবিকা ইক্ষুচাষ। এই ইক্ষুচাষের জন্যই ভারতীয় শ্রমিকগণকে এই দেশে আনয়ন করা হয়। এই দ্বীপে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন অপেক্ষা কিছু বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইক্ষু হইতে শর্করা উৎপাদনের কলগুলি ফরাসীদের একচেটিয়া এবং ইক্ষুচাষের কৃষির অধিকাংশও তাহাদেরই। কাজেই ফরাসীগণ এদেশের প্রেষ্ঠ বনী এবং এখানকার আর্থিক উন্নতি তাহাদের উপর প্রায় ষোল আনা নির্ভরশীল। মুসলমান ও চীনারা এদেশে ব্যবসাক্ষেত্রে অগ্রণী। অন্যান্য অনেকে মসীজীবী, আবার অনেকে কুটীর-শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় হিন্দু ব্যবসাক্ষেত্রে নামিয়াছে। তবে অধিকাংশ ভারতীয় হিন্দু কৃষিক্ষেত্রের অথবা শর্করা উৎপাদনের কলের শ্রমিক। হিন্দুগণের মধ্যে শনিকশ্রেণী নাই বলিলেও চলে। তাহারা বেশীর ভাগই দরিদ্র। তাহাদের কুটীর-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে কিছু কিছু কৃষির উপযোগী জমি আছে মাত্র। বৎসরে আট-নয় মাস জীপুরুষ সকলেই কোম-না-কোম কার্যে

মিয়ুক্ত থাকে। প্ৰতিদিন এক একটা পৰিবাৰে জী-পুৰুষে পাচ-ছয় টাকা উপাৰ্জন কৰে। বৎসৰে তিনি মাস কাল শ্ৰমিকগণেৰে প্ৰায়ই কাজ থাকে না। বৰ্ত্তমানে জমসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। তাহাদেৱে আৰ্থিক অবস্থাও অবনতিৰ দিকে। তাহাদেৱে ভাগ্যে পুষ্টিৰ খাদ্য খুব কমই ঘোটে। ইহাৰ উপৰ প্ৰায় অধিকাংশ লোক মজপানাসক্ত। মজ খুবই উচ্চ মূল্যে বিক্ৰয় হয়। ওদিকে কিন্তু উৎপন্ন গমৰ পৰিমাণ উল্লেখযোগ্য নহয়। ফল ও শাকসব্জী প্ৰচুৰ জন্মে। গো-দুগ্ধ এখানে প্ৰতি সের ১৬০ মূল্যে বিক্ৰয় হইতে দেখা যায়। প্ৰায় সকলেই চা পান কৰে।

ফৰাসী ভাষা এখানকার রাষ্ট্ৰভাষা ইহা আমৰা উল্লেখ কৰিয়াছি। প্ৰায় সকলেই ফৰাসী ভাষায় কথা বলে। সংবাদ-পত্ৰগুলি ফৰাসী ভাষায় মুদ্ৰিত হয়। বিদ্যালয়ে কেবলমাত্ৰ ফৰাসী ও ইংৰেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দী ভাষায় অল্পৰাগীদেৱ বিদ্যালয়েৰে দৈনন্দিন পাঠেৰ শেষে পুথক ভাবে শিক্ষাদানেৰ সুযোগ দেওয়া হয়। আফ্ৰিকান প্ৰভৃতি অজ্ঞাত অনেক অধিবাসী ফৰাসী ভাষায় অপভ্ৰংশকে মাতৃভাষাৰূপে ব্যবহাৰ কৰে। বৰ্ত্তমানে হিন্দীৰ বহুল প্ৰচাৰেৰে জন্ত ভাৱতীয় প্ৰচাৰকগণ চেষ্টা কৰিতেছেন। তাহাদেৱে প্ৰচেষ্টায় হিন্দী অবজ্ঞাপাঠ্য ও পৰীক্ষাৰ অজ্ঞতম বিষয়ৰূপে গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়। অত্যাৱ সময়েৰে মধ্যে এখানে হিন্দী-ভাষায় কয়েকজন কবি ও লেখক আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়াছেন। দুই-একটি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্ৰিকাও প্ৰকাশিত হইতে দেখা যায়। এখানে কেবলমাত্ৰ প্ৰবেশিকা পৰ্য্যন্ত শিক্ষাদানেৰ ব্যবহাৰ আছে। উচ্চশিক্ষাৰ্থীদেৱ ভাৱত অথবা ইংলণ্ড বাইতে হয়। সেইজন্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এখানে বিৰল।

আমাৰে দেশে যেমন ধৰ্ম্মীয় অস্থানাদি প্ৰতিপালিত হয়, এখানেও তেমন কোন কোন স্থানে ধৰ্ম্মশাল পাঠ-ব্যাখ্যানাদি হইয়া থাকে। এখানকার প্ৰজাবান হিন্দুগণও ইহাকে পুণ্যকৰ্ম্ম বলিয়া মনে কৰেন। ধৰ্ম্মান্তৰিত-কৰণ এদেশেৰে একটা লক্ষণীয় বিষয়। বহু হিন্দু আৰ্থিক উন্নতি এবং জীবনধাৰাৰ মান উন্নয়ন প্ৰভৃতিৰ জন্ত প্ৰলোভনে পড়িয়া ধৰ্ম্মান্তৰিত হয়। জনগণেৰে মধ্যে হিন্দুত্বেৰে মহান ভাবধাৰাসমূহ ব্যাপকভাবে প্ৰচাৰিত হইলে হিন্দুগণকে ভিন্ন ধৰ্ম্মাবলম্বনেৰে হাত হইতে ৰক্ষা কৰা যাইতে পাৰে। স্থানে স্থানে গগনচূড়ী বিশাল গীৰ্জা ৰহিয়াছে। এই স্থানেৰে অধিকাংশ খ্ৰীষ্টান ক্যাথলিক সম্প্ৰদায়েৰে। খ্ৰীষ্টানগণ গীৰ্জায় আত্মক বা নাই আত্মক, মিশ্ৰিত সম্প্ৰদায় বিশেষ প্ৰজা-সহকাৰে গীৰ্জায় যায় ও প্ৰাৰ্থনাদি কৰে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুদেৱ সাধাৰণ উপাসনাৰ কোন নিৰ্দিষ্ট স্থান এখানে নাই। অৰ্ধচ ভাৱতৰে বাহিৰে সৰ্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক হিন্দু এখানে বাস কৰে। গীতাভবন নামে একটা ক্ষুদ্ৰ গৃহ আছে; বাহিৰেৰে আগন্তুকগণ এখানে বিশ্রামেৰে সুযোগ লাভ কৰে।

শাসনভাৱেৰে দিকে লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায়, ভাৱতীয় হিন্দুদেৱ অধিকাৰ নগণ্য নহয়। এখানে প্ৰজাভদ্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত



ইক্ষুক্ষেত্ৰে প্ৰবাসী ভাৱতীয় শ্ৰমিক

হইতেছে। গত ১৯৪৮ সনে এখানকার শাসনভদ্ৰাভদ্ৰা নৃতন নিৰ্বাচন অৰ্হুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং প্ৰত্যেক নৱমাসী স্বাধীন মত প্ৰকাশেৰে সুযোগ লাভ কৰিয়াছে। ফলে ১৯ জন সদস্যেৰে মধ্যে ১১টি আসন হিন্দুদেৱ জন্ত সংৰক্ষিত হয়। অবশিষ্ট ৭ জন স্থানীয় ক্ৰীয়েল এবং ১ জন ইউৰোপীয় কাউন্সিলে নিৰ্বাচিত হইয়াছেন। এই স্থানে ক্ৰমশঃ ৰাজনৈতিক চেতনা জাগ্ৰত হইতেছে এবং শ্ৰমিকগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

মৰিশাসেৰে ইতিহাসে ভাৱতীয়গণেৰে দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্ৰবাসী ভাৱতীয়গণেৰে প্ৰাণপূৰ্ণ চেষ্টায় ও অক্লান্ত পৰিশ্ৰমে এই ক্ষুদ্ৰ দ্বীপটি আজ সুসজ্জ। চাৰেৰে জমি বাড়িয়াছে, আমেৰে সংখ্যা বাড়িয়াছে এই ভাৱতীয়গণেৰেই অধ্যবসায়েৰে ফলে। আবার ৱেলপথ এবং পৰ্ব্বতেৰে ভিতৰে দিয়া ৰাস্তাবাট নিৰ্মাণ, জললাকীৰ্ণ স্থানে শহৰেৰে গড়ন—সবই ভাৱতীয়দেৱে চেষ্টাৰে ফল।

মৰিশাসেৰে পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃষ্টও মনোৰম। ভাৱত সেৱাপ্ৰম সজ্জৰ সাংস্কৃতিক মিশনেৰে সত্যগণকে অভ্যৰ্থনা জ্ঞাপনেৰে জন্ত শহৰ হইতে ২৫ মাইল দূৰে নিউগ্ৰোভ নামক স্থানে একটা সত্তাৰ আৱোজন হয়। এই ২৫ মাইল পথ অতিক্ৰমেৰে সময় মিশনেৰে অজ্ঞতম সদন্ত জ্ঞানচাৰী ৰাজকৃষ্ণ এই স্থানেৰে দৃষ্টাবলীতে যুক্ত হইয়া লিখিয়াছেন—
“চিৱহৰিৎ পৰ্ব্বভয়ম্ব দ্বীপেৰে প্ৰাকৃতিক ও কৃত্ৰিম সৌন্দৰ্য্য দৰ্শন কৰিতে কৰিতে আমৰা নিউগ্ৰোভ অতিমুখে চলিয়াছি; কোথাও ৰাস্তাৰ উভয় পাৰ্শ্বে সাৱিৰক্স আৰেৰে ক্ষেত, আবার কোথাও সবুজ বনৰাজিৰে অত্যন্তে সুসজ্জ শহৰ। প্ৰত্যেক শহৰেৰে সৌন্দৰ্য্য যেমন কোন চিত্ৰকৰেৰে সুবিপুল তুলিকা-স্পৰ্শে সৰ্বদাশ্ৰমৰূপে বিকশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৰাস্তাৰ দুই পাৰ্শ্বে ‘বাংলো’ প্যাৰ্টাৰ্ণেৰে

ছোট ছোট বাড়ী, প্রশস্ত অঙ্গনে নানা প্রকার নাম-না-আনা
স্বপ্ন-বেগুনের ফুল ও পাতাবাহারের গাছ। এক প্রকার
ছোট সারিবদ্ধ বাঁশের ঝাড় দিয়া প্রাঙ্গণ তথা বাগানোটি
ঘেরা। এখানে বর্ণবৈষম্য না থাকায় যে-কোনও
স্থানে ভারতীয়গণ বাস করিতে পারে। শহরের বহু
স্থানে যেতাদ ও ভারতীয়গণকে পাশাপাশি বাস করিতে
দেখিলাম। তবে যেতাদদের অল্পরূপ ভারতীয়গণকেও
বাংলো করিতে হয়।”

ভারতীয়গণ দীর্ঘকাল যাবৎ মাতৃভূমি হইতে বহু দূরবর্তী
এই দেশে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আচার-আচরণে
পরিবর্তন ঘটনাছে। ভারতের মহানু ঐতিহ্যের কথা তাহারা
ভুলিতে বসিয়াছে। কিন্তু এই স্বদূর প্রবাসে থাকিয়াও তাহা-
দের দেশপ্রেমে ভাটা পড়ে নাই। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের আগমনে
তাহাদের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা গিয়াছিল। স্বাধীন
ভারতের সবকিছু জানিবার জন্য তাহারা উৎসুক; সন্ন্যাসী-

প্রচারকদের নিকট তাহারা ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার পণ্ডিত
জবাহরলাল, এবং সর্দার প্যাটেল* সহকৈ নানা কথা জানিতে
চায়; নেতাজীর সংবাদ জানিবার জন্য তাহাদের কণ্ঠই না
আগ্রহ।

মিশনের সদস্তগণ মাত্র দুই দিন এই ধীপে অবস্থান
করিয়াছিলেন। তাহারা এখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা
পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভারতের মহানু আদর্শের
প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পান। স্বাধীন ভারতের
মর্ম্মবাণী ভাগ ও সেবা, মৈত্রী ও শান্তির আদর্শ প্রচারের
উদ্দেশ্যেই ভারত সেবাপ্রম জন্ম এই প্রচারকবাহিনী বহির্ভারতে
প্রেরণ করিয়াছিলেন।

* সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্তগণ গত ১৯৫০ সালের ১২ই
ডিসেম্বর মরিশাস ধীপে অবতরণ করেন। ঐ সময় সর্দার
প্যাটেল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

উদ্ভাস

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি আকাশে উড়েছে চিল

মেঘ কেটে গেছে।

অন্ধকার স'রে গিয়ে জ্যোৎস্না নেমেছে।

পুরনো বিষন্ন দিন : শোণিতসিক্ত দিন

অপগত আজ ;

জ্যোতির আভাস জাগে, রাস্তা চোখে ফিরে আসে

আলোর স্বরাজ।

মেঘ কেটে গেছে আজ মেঘ স'রে গেছে,

মমির নগর ছেড়ে রজনীগন্ধা-বনে

জ্যোৎস্না নেমেছে।

এমন চাঁদের দিন দেখিনি কি আর বার

বুদ্ধ-পুণিয়ার।

এমন জ্যোৎস্না সে কি হালে নি কো প্রেমসীর

হাসির আভাস।

ছিল তো ঐতিহ্য নীল

আলো-হাসি অনাবিল

আমাদের অস্তিত্বের প্রাণ-পঙ্খরে,

তারপর কোথা কবে

নখের আঁচড়ে সে কে

যুছে দিল সব তার শোণিতাকরে।

ইতিহাস ভোলে নি তো, যত করি কমা,

বহু ব্যাধা বহু অশ্রু

পাতা ভ'রে আজও তার হ'য়ে আছে জমা।

এসেছে আলোক,

অকস্মাৎ উদ্ভাসিয়া ওঠে মনোমলোক ;

অজস্র দুর্গম শিলা পেরিয়ে আবার

স্পর্শ পাই স্নিগ্ধ এক নব পুণিয়ার।

মেঘ কেটে গেছে আজ মেঘ স'রে গেছে,

মমির নগর ছেড়ে রজনীগন্ধা-বনে

জ্যোৎস্না নেমেছে।

প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত গদেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাসের (সাত্তাল) "বিবর্তনে কামতা রাজ্য" প্রবন্ধটির শিরোনাম দ্বিধা মনে হইয়াছিল যে, প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধেই তিনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া জায়া মেল—বর্তমান কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস সঙ্কলনই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রবন্ধের পরি-
পূরক হিসাবে প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিতেছি।

কালিকা পুরাণে বর্ণিত আছে যে, নরক বিদেহরাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং প্রাগজ্যোতিষপুর জয় করিয়া কিরাতরাজ ঘোটককে নিহত করেন। মঃ মঃ পদ্মনাথ বিভা-
বিনোদের মতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস ছিল। হিউয়েন সাং এখানে শত শত দেবমন্দির এবং মন্দিরায় কথিত ভাষার সহিত কামরূপীয় ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। নিধানপুর ভাস্কর্যশালনে ভাস্কর বর্দ্ধাকে "প্রকৃষ্ট আর্ধ্য ধর্মের রক্ষক ও শশিশেখর-প্রিয় পিনাকিনের ভক্ত" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্দ্ধাপাল বর্দ্ধদেবের প্রথম ভাস্কর্যশালনেও প্রথমে প্রণাম করা হইয়াছে তাঁকে যিনি আদিদেব অর্ক যুবভীষ্ম, যার গলার এক দিকে দোলে মীমাংসক, অপর দিকে উত্তমকণা সর্প; যার বরবপুত্র এক দিক যুবভীষ্মভক্ত সুনভারনন্দ, আর এক দিক ভাস্কর্যাদিত—যিনি শৃঙ্গার ও রৌদ্ররসের প্রতীক। বাণ এবং অনিরুদ্ধ-
উষার কাহিনী, উলুপী বজ্রবাহন চিত্রাঙ্গদার কথাও আমরা পড়িয়াছি। বর্দ্ধন রাজবংশের পর সেনবংশের শালস্তম্ভ রাজারা কামরূপে রাজত্ব করেন, তাহার পরে আসেন পালেরা। বঙ্গদেশের পালেরদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানা নাই—ইঁহাদের বলা হইত ভৌম পাল ও বারাহীপাল। শালস্তম্ভ বংশের রাজারা "কামেশ্বর মহাগৌরী"র উপাসক ছিলেন। কামাখ্যা ও হাটকেশ্বরের মন্দির তাঁহারা ই নিৰ্মাণ করেন।

কামরূপে এই সময়ে লুইপা, সরঙ্গপা, মীমপা, গোরক্ষপা কানপা, তিলোপা, ভাস্কিপা, কল্পরী, ভুজুর্ক, ভোরা প্রভৃতি চৌরাসী সিকাচার্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। ত্রিভাস্কর-সংগৃহীত মানিকচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান কাম-
রূপেও প্রচলিত ছিল। ডাঃ শহীদুল্লাহের মতে হিন্দী, মরাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতেও নামগীতিকার পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষায় "তেজুরে" ত আছেই। কালিকাপুরাণ ও যোগিনী-
তন্ত্রে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-
মতাবলম্বী বিহৃত তন্ত্রবাদ, সহজিয়াবাদ ও নাথবাদ কামরূপে

বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিতদের মতে আসামে প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অষ্ট্রিকভাষী জাতিদের সময়ে। মাতৃ-
তন্ত্রপ্রধান কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সভ্যতাই অষ্ট্রিক সংস্কৃতির বাহক ও ধারক। বহু যুগ পরে এই মাতৃতন্ত্রবাদ সহজিয়া ও বৌদ্ধ তাত্ত্বিকতার শক্তিবাদের সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়া কামরূপী সভ্যতাকে এক নূতন রূপ দিয়াছিল। দেবী কামাখ্যা তাহারই প্রতীক। তাঁহাকে অষ্ট্রিক ভূমাতাই বলি, (কা-য়েই-খা-ই) বলি বা শক্তির ঘোনি-পীঠস্থানই বলি মূলে তিনি এক আর্ধ্য-অনার্য অষ্ট্রিক বড়-সংস্কৃতির মিলিত প্রকাশ। কোচবিহারের আই পূজা শুৎকালীন শক্তিপূজারই চিহ্ন।

অহমকোষে আসামকে বলা হইয়াছে পণ্ডিত কায়স্থের দেশ বা কলিতা কিংবা কুললুপ্তের দেশ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পরশুরাম যখন তাঁর ক্ষত্রিয়নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করেন তখন কামরূপের রোষ হইতে পরিভ্রাণ পাইবার জন্য অনেক ক্ষত্রিয় নিজেদের কলিত বা কুললুপ্ত বলিত। গুপ্তদের সময় "প্রাগ-
জ্যোতিষভূক্তি" গুপ্ত সম্রাটদের শাসনাধীন একটি প্রদেশ ছিল। বর্দ্ধপালের সময়ও কামরূপ পালসম্রাটদের প্রভাবাধীন ছিল। কবিশরঙ্গের কবিতায় লক্ষ্মণসেনদেবের কীর্তি-বর্ণনায় কাম-
রূপের উল্লেখ আছে—

"জলেকপাদ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি

কেলিমাফল কলিহান

বিনয়তে কামরূপাভিমানং।

কালিকাসের রত্নর দিগ্বিজয়প্রসঙ্গেও কামরূপের উল্লেখ আছে। মান্দার অল্পশাসনে বর্ণিত রাজা বশোবর্মের সত্রিাদ্যও-
কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যমতীর পিতা হর্ষদেব ভগদত্তবংশ-জাত বলিয়া ধ্যাত এবং তাঁহার স্বামী লিচ্ছবীরাজ দ্বিতীয় জয়দেব গৌড়, ওড়্র, কলিঙ্গ ও কোশলাধিপতি ছিলেন।

গৌড়াধিপ রামপালের সময় কামরূপ বিজিত হয়। বাভাজী সেনাপতি-প্রতিষ্ঠিত ময়নাগড় আজও কামরূপ বিজয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। নৃপতি তিল্যদেব সামন্তত্ব স্বীকার করিয়া বর্তমান ভেজপুরে (বাণরাজার শোণিতপুর) রাজধানী পরিবর্তিত করেন। তিল্যদেব গৌড়সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে গৌড়রাজমন্ত্রী-পুত্র বৈদ্যদেব পুনরায় কামরূপ বিজয় করেন। বৈদ্যদেব প্রথমে রাজপ্রতিনিধি ও তাহার পরে স্বাধীন ভাবে কামরূপরাজ্যের পশ্চিম দিকে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজাই কামতা রাজ্য। বৈদ্যদেবের পর রাঘবদেব, ভাস্করদেব, বঙ্গভদ্রদেব, পুণ্ড্রদেব প্রভৃতি কয়েকজন নরপতির নাম পাওয়া যায়। এই সময়

বাংলাদেশে সেনরাজ্যের প্রতিপত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথের মতে গোয়ালপাড়া জেলার অভয়াপুরীর সন্নিকটবর্তী লালমাটির ধ্বংসাবশেষ এই যুগের। হলেখরের নৃত্যপরিচয় গণেশ ও ব্রজা এবং তেজপুরের-সুখ্যমুর্তি বাংলার ও কামরূপের সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচয়। ঢেংবীর ঈশ্বর ঘোষ কামতারাছের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। পুণ্ড্রদেবের-রাজত্ব পৌনঃপুনিক মুসলমান অভিযানের দৃষ্ট-বিখ্যাত। প্রথমে মুসলমানরা পদ্মভূত হইয়া পলাইয়া যায় এবং তাহার আরক-স্বরূপ গৌহাটীর নিকটে ব্রজপুত্রের তীরে কামাই বরশীবোরা স্থানে পাষাণ-গাত্রে খোদিত একটি শিলালিপি আছে :

“শাকে তুরগে যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে
কামরূপং সমাপত্য তুরঙ্গাঃ ক্ষয়মায়নুঃ।”

পুণ্ড্রদেবের মৃত্যুর পর কামতারাছ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কায়স্থ মন্ত্রীবংশ পশ্চিম দিক অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমানদের আত্মগত্য স্বীকার করেন। পূর্ব অংশে অর্থাৎ দরং ও কামরূপ জেলার পূর্বভাগে প্রাচীন পালবংশের বারাহীশাখার রাজারা পুনরায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণকার মাধব কন্দলী এক মহামানিক্য বারাহী রাজার সভাকবি ছিলেন। এই বারাহী রাজা জিপুরাধিপতি, জয়ন্তীরাধিপতি বা কামপুররাজ তাহার সট্টক নির্ণয় এখনও হয় নাই।

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বলি কর
মাধব কন্দলী আরো নাম
সপোনে ঘাচিতে মঞি জানে কায় বাক্যে মনে
অহর্নিশি চিন্তো রাম নাম।

ঐমহামানিক্য বারাহী রাজার অনুরোধে তিনি রামায়ণ রচনা করিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কামতাপুরাধিপতি হর্লভনারায়ণের নামও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে জল জল করে। “কামতা-মণ্ডল, হর্লভনারায়ণ, নৃপবর অম্বুপম”—তাঁহার রাজসভায় হেম-সরস্বতী-ও হরিশ্চর বিপ্র নামে দুই জন কবি ছিলেন। হেম-সরস্বতীর প্রহ্লাদ-চরিত্র বিখ্যাত :

নৃপশিরোমণি দেব মহামানী
হর্লভনারায়ণ রাজা
তাহান্ ভনয় ইন্দ্রনারায়ণ দেব
মহাবীর বীর স্বভাব গম্ভীর
নিতে কৃত্য হরিদেব।

হর্লভনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ “পাঞ্চ গৌরেশ্বর” ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ছোটশিলা নামে এক গ্রামে কায়স্থপ্রবর চক্রপাণি শিকদারের পুত্র কবিরত্ন সরস্বতী নামে আর এক কবি ছিলেন। তিনি মহাভারতের জ্যোৎস্নপর্ব অঙ্কবাদ করেন।

জ্যোৎস্নপর্ব জয়দেব রথ
কৌতুহলে নিপদতি

এই সময়ে রচিত পদ্মপুরাণ নামে একটি আখ্যানিকা পাওয়া যায় যাহাতে হাসেন হুসেনের সহিত দেবী পদ্মাবতীর ভক্তদের ঘোর যুদ্ধ হয়। হাসেন হুসেন বাংলার হুসেন শাহ।

আই পুজার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সমস্ত কামরূপ ছুড়িয়া, বিশেষ করিয়া ব্রজপুত্রের উত্তর তীরে (যেমন ফুলবাড়ী) আই পুজার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কাছাড়ীদের বুঢ়াবুঢ়ী (হরপার্বতী) কেচাইঘাটীর ভায়েখরী, কামাখ্যাপুজার প্রচলন, জলেশ্বরের কাহিনী, বারতুণ্ডার আইগোসানী পূজা প্রাচীন অষ্টিক মাতৃভবাদের সহিত ভল্লোভ শক্তিপূজা মিশিয়া এক মাতৃভববাদে পরিণত হইয়াছে। তখন কামরূপের সীমানা ছিল :

জিংশদ যোজন বিত্তীর্ণ দীর্ঘেন শতযোজনং
কামরূপং বিজানাহী জিকোণাকারযুত্তমম্
নেপালভূতাকাঞ্চনাদি ব্রজপুত্রস্ত সতমম্
করভোয়াং সমাপ্তিযা যাবদিক্রবাসিনী।

বৌদ্ধভাস্করিক বজ্রযোগিনী সাধনার অধ্যয়নের পদ্ধতিতে লিখিত আছে :

“গম্ভাং পুমরপি ওডিরান পূর্ণগিরি কামাখ্যা সিরিহট
ইত্যনেন পূজয়েং ওঁ ওঁ ওঁ সর্ববুজ ডাকিনীয়ে
বজ্রবর্ণনীয়ে বজ্র বৈরোচনীয়ে ১২৭ ১২৭ ১২৭ ফট ফট ফট
স্বাহা। (সাধনমালা গাইকোয়াড় সিরিজ দ্বিতীয় ভাগ ৪৫৩ পৃ.
সাধনসংখ্যা ২৩২।)

ওঁ কামরূপ বজ্রপুষ্পে স্বাহা
ওঁ ত্রিহট বজ্রপুষ্পে স্বাহা
ওঁ নম সর্বগুরু বুদ্ধবোধিসত্ত্ব বজ্রপুষ্পে স্বাহা।

ভক্তসারেও মূল্যবান কামরূপের উল্লেখ আছে। “লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মগধ গোড় প্রভৃতি দেশ হইতে বিভাতিত অনেক বৌদ্ধসন্ন্যাসী পূর্বাঞ্চলে কুড়ীদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কামাখ্যা শক্তিপুজার পাদপীঠ—প্রাচীন অষ্টিক মাতৃভবাদের যোনিপুজার সঙ্গে মিশিয়া বিকৃত ভক্তবাদ এক ধরনের মাতৃপুজার আয়োজন করিয়াছিল। কিছু অনার্য্য-প্রভাব, কিছু লিঙ্গপূজা এবং শৈববাদও মিশিয়া গিয়াছিল। বৈদিক ক্রমকে অনেকে Syncretic দেবতা বলিয়া অভিহিত করেন। ক্রমকে বলা হইত বজ্রবর্ণ। কীর্তের মতে, তামিল ভাষায় শিব বলিতে বুঝাইত রক্তবর্ণ মানুষ। ক্রম ছিলেন অনার্য্যদের দেবতা, পশুপালন তাঁর পেশা। ক্রমের পশুপতি নাম কি ভাবে আসিল ঐতরের জ্ঞানপ্রাপ্ত তাহার কাহিনী আছে। ঋগ্বেদে ক্রমকে পশুপ বলা হইয়াছে। গোবিন্দ গৃহসূত্রে ক্রমের স্থান পশ্চাতে। যজুর্বেদীয় শতকৃষ্ণীয় ভোজে ক্রমকে দহ্য বক্কক ভক্কর প্রভৃতির প্রিয় দেবতা বলা

হইয়াছে। আবার উপনিষদে ক্রমকে পরম ভদ্ররূপেও দেখি।

অসমীয়া সাহিত্যে “আইর নাম” বলিয়া কতকগুলি প্রাচীন কবিতা আছে। এই আই “হুখীয়ায় পুতলা” তাঁর অপর নাম শীতলা “দি ঘোরা বুক জুয়াই”—তাকে পেলে বুক জুড়িয়ে যায়। ভক্ত গোসানী দ্বিজাসা করিতেছে—
কি দিয়া তোমার পূজা করিব—ফল, হুগ, ধন, ধল, অন্ন,
বস্ত্র, ঘন, চিত্ত—আই উত্তর দিতেছেন,

যেই বস্ত্র দিও মাতৃ সেই বস্ত্র চুবা

আপোনর নামে মাতৃ সন্তুষ্ট হোবা।

আইকে বলা হইতেছে :

আই ভগবতী আই, তোমার মান সন্দরী নাই।

অধিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকা এইরূপে কুরা বেড়াই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, “আইদেবী” অধিকা, চণ্ডিকা, ভবানী কালিকারই অঙ্গ রূপ। দিনের শেষে গোখুলিতে মহামায়া রূপে আই আসিতেছেন। সোনার বাঁশী বাজিতেছে, তাঁর হাতে কমলের ফুল “হুখীয়াটো পেলাই দিহে স্মিলা ফুলর মালা”।

এক দিকে মুসলমানদের আক্রমণ, অঙ্গ দিকে ভাইশাখার অহমদের আগমন, অন্তর্বিবাদ, জুঁঞাদের গৃহবিবাদ সমস্ত

কামতা এবং কামপুয়রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া পত্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সময়েই চিকনা নামক স্থানে গৌরালপাড়া জেলার বড়জাতীয় কোচ-নৃপতি বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় হয়। গীতি-রামায়ণ ও বেহুলা আখ্যান রচয়িতা কবি হুর্গাবর কোচবিহারাবিপতিকে ‘কমতা-ঈশ্বর’ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন :

কমতা ঈশ্বর বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর

আটচল্লিশ মহিষী বন্দো ওঠর কোঙর

নিজের বিবরণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, “ত্রিকায়া চন্দ্রবর ভানপুজ হুর্গাবর, বিরচিল গীত বিভোপন”। এই পরিবেশের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। তিনি নব্য আসামের জন্মদাতা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। তিনি শুধু ভক্ত, সাধক, যুগ-প্রবর্তক বিরাট পুরুষ ছিলেন না, কবি, সুরকার, গায়ক ও নাট্যকারও ছিলেন। তিনি তাঁর শেষ জীবন কোচ-নৃপতিদের আশ্রয়েই কাটান ও সমগ্র কোচবিহারে তাঁহার প্রভাব সক্রিয় ছিল। কথিত আছে যে, বীর চিলারায় (সুন্দরজ) তাঁহার ভাষ্যা কমলপ্রিয়া দেবীর মুখে শঙ্করদেবের “পামর মন রামচরণে চিত্ত দেহ” এই গানট শুনিয়া শঙ্করদেবের ত্রিচরণে আশ্রয় লন। কামতা রাজ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফরমোসা

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

সম্ভ্রান্তি* ভারতবর্ষ জাপ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে ও সান-ফ্রান্সিসকো শান্তি-সম্মেলনে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই অসম্মতির অন্তিম কারণ হইতেছে ফরমোসাকে চীনের হাতে প্রত্যর্পণ না করা। ভারত-সরকার মনে করেন যে, শান্তি-চুক্তিতে ফরমোসাকে চীনের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা নিভান্ত প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা কোন দেশের শান্তি আসিতে পারে না। ফরমোসাকে নিজেদের অধীনে রাখা এই সাম্রাজ্যবাদেরই মামান্তর; সুতরাং ইহাতে ভারতের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

ফরমোসাকে চীনের হাতে ফিরাইয়া দিবার যুক্তির মূলে যে স্বাধীনতা রহিয়াছে তাহা হইতেছে—ইহা চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুতঃ ইহার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই ফরমোসা চীনের অধিকারে ছিল। এই বিষয়ট সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব।

ইতিহাস : স্থানীয় ভাষায় ফরমোসার নাম “তাইওয়ান”। ফরমোসা নাম ইউরোপীয়দের দেওয়া, ইহার অর্থ স্তম্ভ। পর্তুগীজ নাবিকেরা এই স্থান দিয়া যাইবার সময় সমুদ্র হইতে এই স্তম্ভের দীপটিকে দেখিয়া ‘ফরমোসা’ অর্থাৎ ‘স্তম্ভ’ এই নাম রাখিয়াছিল।

এই দীপটি চীন দেশের সন্নিকটে; সুতরাং বহু প্রাচীন কাল হইতে চীনারা ইহার ধ্বংস রাখিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রয়োজন না হওয়ায় তখন তাহার এখানে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রা প্রথম এই দীপে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। ১৬২৪ সনে ওলন্দাজরা ইহার পূর্ব-উপকূলে জেলাভিয়া নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে ৩৭ বৎসর বসবাস করিতে থাকে। এই সময় চীন দেশে ‘মাঞ্চু’-রা সিংবংশীয়দের পরাজিত করে। এই পরাজিত সিং বংশের অল্পগত কতিপয় লোক কোকিসল নামে পরিচিত এক দলপতির

ন্যায়কৃত্যে করমোসার ওলন্দাজদিগকে বিভাঙিত করে এবং ইহার একটি বৃহত্তর অংশ দখল করিয়া বসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার 'মাকুরা' করমোসার এই অংশকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করে। সেই হইতে ইহা চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চীনারা এখানে দ্রুত চলিয়া আসিতে থাকে। ফলে তাহাদের সহিত করমোসার আদিম অধিবাসীদের বিবাদ শুরু হয়।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে টাইবেন্সিনের চুক্তির ফলে তাইওয়ান ও তামসিন নামক করমোসার দুইটি বন্দর বিদেশীদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারকেরা তথায় ধর্মপ্রচারের জন্য আসিয়া জুটিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে করমোসার উপকূলে একটি জাপানী জাহাজ ডুবিয়া যায়। এই জাহাজের কোন নাবিককে এখানকার আদিম অধিবাসীরা নাকি হত্যা করে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ জাপানীরা এই দ্বীপটিকে আক্রমণ করে। ফলে চীনের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়, কিন্তু কোনক্রমে এই যুদ্ধ এড়ান হইয়াছিল। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও চীনের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ফরাসীরা করমোসাকে আংশিক ভাবে অবরোধ করিয়া কয়েক মাসের জন্য কীলাং অধিকার করে। ইহার পর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে করমোসা সিমোন্সেসকি চুক্তির বলে জাপানের হাতে সমর্পিত হয়। কিন্তু সেখানকার চীনা অধিবাসীরা ইহাতে প্রতিবাদ করিল এবং সেখানে গণভঙ্গ ঘোষিত হইল। অতঃপর জাপানীরা ইহা বলপ্রয়োগ দ্বারা দখল করে—এই বিদ্রোহী করমোসাকে বশে আনিতে তাহাদের কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

ভৌগোলিক বিবরণ : করমোসা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের নিকটস্থ একটি দ্বীপ। চীন ও ইহার মধ্যে যে প্রশান্তী বিদ্যমান তাহার নাম করমোসা প্রশান্তী। ইহা ৯০ মাইল চওড়া এবং দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল আরও অধিক বিস্তৃত। করমোসার উত্তর ও দক্ষিণে যথাক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সমুদ্র অবস্থিত। করমোসার আকৃতি ভিন্নের মত। ইহা লম্বায় ২২৫ মাইল ও চওড়ায় ৬০-৮০ মাইল এবং ইহার ক্ষেত্রফল ১৩,৪২৯ বর্গ-মাইল। ইহার লোকসংখ্যা ৬৪,০০,০০০ জন (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী)। ইহার রাজধানী তাই হোকু ও অন্যান্য শহরের লোকসংখ্যা নিম্নলিখিত রূপে :

তাই হোকু	...	৩,২৬,৪০৭	জন
তাকাও	...	১,৫২,২৬৫	"
তাইনান	...	১,৪২,১৩৩	"
কীলাং (কীরাম)	...	১,০০,৫১১	"
কাগি		৯২,৪২৮	"

করমোসার উত্তর হইতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত উচ্চ পর্বত-

মালা মেরুদণ্ডাকারে অবস্থিত এবং এই পর্বতমালা ইহার মধ্য ও পূর্বাংশে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার প্রধান জলবিভাজিকা পূর্ব প্রান্তে। এই দিকে পর্বত খাড়া ভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়াছে। হুতরাং অনেক স্থানে প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সমান্তরালভাবে ১৫০০ হইতে ২৫০০ ফুট উচ্চ পার্বত্য প্রাচীর বৃষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি সমতল ভূমি বিশেষতঃ গিরন এই দিকে অবস্থিত এবং ইহার মধ্যভাগে সমুদ্রোপকূলের সহিত সমান্তরাল ভাবে একটি উপত্যকা আছে। সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। করমোসার অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গের মধ্যমরিসন (দীর্ঘাকারামা) ১৪,৭২০ ফুট ও সিলভিয়া (সেটজু জাম—১২,৪৮০ ফুট) উল্লেখযোগ্য। করমোসার পশ্চিম দিক সমতল ভূমিতে পরিপূর্ণ এবং ইহা ২০ মাইল চওড়া।

কর্কট ক্রান্তি (Tropic of Cancer) ইহার মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কিউরোসিও নামক উষ্ণ সমুদ্রশ্রোত ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া এখানকার জল-বায়ু উষ্ণমণ্ডলের অনুরূপ।

করমোসায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং এই দ্বীপটি সারা বৎসর সমান বৃষ্টি পায়। অবশ্য ইহার দক্ষিণ ভাগ শীত-কালে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে অর্থাৎ কম বৃষ্টি পায়। জলবায়ুর উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত হেতু আর্দ্রতা এই দুইটি কারণে এখানে মূল্যবান উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। ইহার বেশীর ভাগ ভূমি শস্য ও তৃণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য অঞ্চলের বৃহত্তর ভাগ ব্যাপিয়া সতেজ বনরাজি প্রসারিত। এই বন ভাল বট কর্ক (ছিপি), কর্পূর ও কার্পাসকে পরিপূর্ণ।

চাউল, ইক্ষু, চা, পাট, মিষ্টি আলু, লিম, চীনাবাদাম প্রভৃতি করমোসার প্রধান ফসল। এখানে চাউল বছরে দুই বার করিয়া জন্মে। ১৯৪৩ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানকার উৎপন্ন-দ্রব্যের একটি তালিকা দেওয়া হইল :

চাউল	১,৪৫,৪০,০০০ টন (৪,৪৮,০০,০০০ বু.)
মিষ্টি আলু	১৪,০০,০০০ "
চিনি	১২,৭০,০০০ "
চা	১৫,৪০০ "

এখানে কলা এবং কমলাও প্রচুর উৎপন্ন হয়। পশুপালনেও করমোসাবাসীরা খুবই ভৎপন্ন।

কীলাঙে কয়লার খনি আছে এবং সিনজোর নিকটে স্বর্ণ-পাওয়া যায়। এখান হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হয়। রৌপ্য, তাম্র, গন্ধক, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য করমোসায় পাওয়া যায়।

১৯৪৩ সালে করমোসা ৪০,০০,০০,০০০ ইয়েন মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করে এবং ৩৪,০০,০০,০০০ ইয়েন দামের মাল আমদানী করে। ইয়েন জাপানী মুদ্রা। এই ইয়েন এখানেও

মুদ্রাক্রমে ব্যবহৃত হইত। পরে চীনা জাতীয় মুদ্রা ব্যবহৃত হইতে থাকে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফরমোসায় যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

রেলপথ (সরকারী)	৮৭৯ মাইল
" (বেসরকারী)	১,৬২৪ "
ট্রাম-রাস্তা	৫০০ "
অজ্ঞাত রাস্তা	১০,০০০ "

ফরমোসার পূর্বে উপকূলে অবস্থিত লান বিমানঘাটি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর উপকূলে চিয়াং ও তাইপী হইয়া পশ্চিম উপকূল ধরিত্তা তাওয়ুয়ান সিনচু, তাইচুং, চিয়াই, তাইনান ও কাওসিয়াং হইয়া পিংটাং পর্যন্ত রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। আর একটি রেলপথ পূর্বে উপকূলের মধ্যভাগে হুয়ালিনচিয়াং হইতে তাইচুং পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফরমোসায় তাইপী, তাওয়ুয়ান, তাইচুং, পিংটাং প্রভৃতি স্থানে সামরিক ঘাট এবং স্কুয়াং, তাইপী, তাইয়ুয়ান, সিনচু, তাইচুং, কাওসিয়াং, পিংটাং, হেংচুন, তাইচুং, হুয়ালিনচিয়াং ও লান-এ বিমানঘাট করা হইয়াছে। এখানে চিয়াং, ফেংসান প্রভৃতি বন্দর আছে।

আদিম অধিবাসী : ফরমোসায় জাপানী ও চীনা ব্যতীত দুই শ্রেণীর আদিম মানুষ বাস করে। একটিকে বলে হাক্কা। ইহারা চীনের অভ্যন্তরভাগস্থ কোয়াংটাং প্রদেশের উপজাতির সহিত সম্পর্কিত। পেপালুন বা বকীভূত বুনো এবং চীন লুন বা বন্ড বর্বর এই দুই শ্রেণীর আদিবাসীর মধ্যে প্রথমোক্তেরা চীনা রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছে, শেষোক্তেরা পূর্বদিকস্থ পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের সহিত মালয়-বাসীদের সম্পর্ক বিতর্কিত। এই আদিম অধিবাসীরা ফিলিপাইন ও ওলন্দাজ অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নেসিট অর্থাৎ দৈনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের গায়ের চামড়া বাদামী রঙের ও মাথা লম্বা। তাহাদের সহিত ইন্দোনেশিয়ার ভায়া ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে নরমুণ্ডশিকার প্রচলিত আছে এবং ইহা তাহাদের সামাজিক মান নির্ণায়ক। বিবাহের সময় এই নৃশংস কার্যকে পাত্রে

গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখানকার লোকেরা উকি পরে। কপালের মাঝখান দিয়া একটি নীল রেখা লম্বের মত অঙ্কিত করে ও নীচের ঠোঁটের মাঝখান হইতে অল্পরূপ একটি রেখা থুতনির মধ্যভাগ পর্যন্ত কাটে। মেয়েরা উপর ও নীচ উভয় ঠোঁটে ও গালে দামারকম উকি কাটে এবং তাহাদের কান পর্যন্ত একটি নীল রেখা ক্রমস্বয়ংক্রিয় করিয়া জাকা হয়। তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিলে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ছেলে মেয়ে উত্তরেরই উপরের দুই কন্ডের দুইটি কণ্ঠদন্ত বা রাজদন্ত তুলিয়া ফেলা হয়। এখানে অবিবাহিত পুরুষেরা আলাদা বাড়ীতে থাকে। এই বাড়ী সাধারণতঃ কাঠের খুঁটির উপর নির্মিত হয় এবং তাহাকে 'অবিবাহিতের বাড়ী' বলে। ইহাদের কেহ কেহ লবণকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করে এবং ইহাদের মধ্যে 'পূর্বপুরুষ পূজা'র প্রচলন আছে।

ইহারা যে ক্রমে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে তাহা ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যায়। উক্ত বৎসরে এখানে ১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২,০৭৬ জন শিক্ষক ও ৭,৪০,৬৯৩ জন ছাত্র ছিল এবং ছয়টি নরম্যাল স্কুলে ২২৫ জন শিক্ষক ও ২,৫০৭ জন ছাত্র ছিল। এখানে চারটি কলেজে ২৩৬ জন অধ্যাপক ও ১,৩৮৫ জন ছাত্র এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৪৫ জন ছাত্র ছিল।

বর্তমান অবস্থা : ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর হইতে ফরমোসা জাপানের উপনিবেশ হিসাবে রহিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালে জাপান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ফরমোসাকে জাপানের হাভ হইতে উদ্ধার করিয়া চীনের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে চীনা জাতীয় সরকার কর্তৃক জেনারেল চেন য়ী এখানকার গবর্নর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

ফরমোসায় কুমোয়িনটাং দলই প্রবল। বর্তমানে চিয়াং কাইশেক সদল বলে এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট চীনারা এই দ্বীপটিকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে, অপর পক্ষে ইহাকে বাধা দিবার জন্ত আমেরিকা চিয়াঙের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেছে।

মহিলা-সংবাদ

গত ১৯৫০ সালের কাব্য উপাধি পরীক্ষায় শ্রীমতী আশালতা দত্তচৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত "গৌপীনাথ মাইতি পদক" লাভ

করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বাগবাজার চতুষ্পাণ্ডীয় পণ্ডিত কালিদাস শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্রী।

উদ্বাস্ত-সমস্যা

শ্রী অজিতকুমার ভট্টাচার্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত-সমস্যা আবার নতুন করিয়া উদ্ভাবন রূপে দেখা দিয়াছে। এক দিক দিয়া নহে, ইহার যতগুলি দিক ভাবিতে পারা যায়, এই সমস্যা ক্রমশঃ ছোট পাকাইয়া যাইতেছে। বঙ্গবিভাগের পুরাতন কান্টনমেন্ট না খাটিয়া আমরা ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের অনিবার্য সমস্যা রূপে বহিরা লইয়া আলোচনা করিব।

প্রাথমিক ভাবে উদ্বাস্ত-সমস্যা সমাধানের দুইটি প্রধান দিক আছে। একটি অস্থায়ী সাহায্য, দ্বিতীয় পুনর্বাসন। অর্থাৎ পুনর্বাসনের পূর্বে উদ্বাস্তদের অস্থায়ী সাহায্যের স্বাভাবিক ভাবেই একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শিবির সংস্থাপন করিয়া সাময়িক ভাবে সাহায্যদানের পর তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করানোতেই এই বিরাট সমস্যার সুরাহা করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তদের সম্পর্কে এই কার্যক্রমই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ধীরে ধীরে তাহাদের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করাইতেছেন। বর্তমানে ষাট ও উদ্বাস্ত সমস্যার স্বাক্ষর এই প্রদেশে খুব বেশী বিস্তৃত। এই দুই দিকেই সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য দিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে অভিমান্যই বলিবার আছে। যেটুকু বলিবার তাহা বিভাগীয় কোন-কোন কর্মচারী সম্পর্কে। সরকারী নীতি ও কার্যক্রম ভিত্তি-পতিতে সম্পন্ন করিতে না পারিলে সমস্ত পরিকল্পনা ও কার্যবারা বিপর্যস্ত হইতে বাধ্য। তাহার ফলে কোথাও কোথাও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সরকারকে দোষের ভাগী হইতে হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের দিকটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সূচু পরিকল্পনার সহিত এই কার্য সমাধা করিতে না পারিলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। শহরে যে সব পুনর্বাসিত হইবে, তাহাদের শহরের উপযোগী জীবিকার সংস্থান হওয়া প্রয়োজন। বহু শিল্পে, সওদাগরী আপিসে, দোকান প্রভৃতি স্থানে যাহারা নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত, তাহাদের শহর কিংবা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস থাকা দরকার। নতুবা অল্পবিধার সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। অপর দিকে, যে সকল পরিবারের গ্রাম্য পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ করা চলিতে পারে, তাহাদিগকে অনর্থক শহরে ভিড় না করাইয়া গ্রামে বসবাস এবং কৃষি বা কুটির-শিল্পে নিযুক্ত করিতে পারিলে সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া

আসিবে। এ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। সরকার প্রতি ইউনিয়ন বোর্ড মারফত যেখানে যেখানে সম্ভব—কৃষক, মজুর, বৃত্তিধারী ও কুটিরশিল্পীদের বসবাসের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনত্ব ও চাপ এত বেশী যে, শুধু এই প্রদেশের মধ্যে সূচু পুনর্বাসিত সম্ভব নহে। তাই সরকার পার্শ্ববর্তী রাজ্য-সরকারগুলির সহিত যোগাযোগ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যায় বহু উদ্বাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থার ক্রটি হয়ত আছে, তাহার উপর উদ্বাস্তদের বাঙালী-প্রবণতা বিহার ও উড়িষ্যার মাটিতে গিয়া যা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত বিরুদ্ধ প্রচারও আছে। এই সব মিলিয়া অর্ধটন ঘটাইয়াছে অর্থাৎ বহু উদ্বাস্ত পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্তমানে হাওড়া ষ্টেশনে যে-সব শরণার্থী ভিড় করিয়া আছে, তাহার সকলেই বাংলার বাহিরের প্রদেশ-প্রত্যর্গত। ভারত-সরকার ইহাদের সম্বন্ধে খুব কঠোর মনোভাব পোষণ করিতেছেন; দায় পড়িয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তাহারাই তাহাদিগকে শহরের বাহিরে কোন স্থানে লইয়া যাইতে চাহিলেও তাহা কেহ ভুলিতেছে না, ফলে কিছু অর্থ খরচাতি বাবদ খরচ হইতেছে। আমরা এই অবস্থার আন্তরিক নিরসন কামনা করি। প্রদেশ-কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় এই অবস্থার অবসানকল্পে পশ্চিম বাংলার সহিত সংলগ্ন অন্য রাজ্যের বাঙালী-প্রধান স্থানগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাইয়াছিলেন। মধ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আগামী নির্বাচনের তেড়-জোড়ের জন্য সে সব দাবি আপাততঃ চাপা পড়িয়া আছে।

জীবনের সব ক্ষেত্রে যেমন দুর্নীতি ও অনাচার প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, উদ্বাস্ত-ব্যাপারেও তেমনি। প্রথম দুর্নীতি দেখিতে পাওয়া যাইবে উদ্বাস্তদের প্রকারভেদে। এমন বহু ব্যক্তি উদ্বাস্ত বলিয়া সরকারী খাতায় নাম লিখাইয়াছে, যাহারা তাহার সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী অংশতঃ বা মোটেই নহে। এক দল পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে বহুকাল যাবৎ চাকরি বা ব্যবসায়সমূহে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। বৎসরে এক বার বা দুই বার দেশের বাড়ীতে গিয়াই গ্রামের প্রতি নিজেদের কতব্য শেষ করিত। তাহারাই পশ্চিমবঙ্গবাসী—সরকারী অফিসের বোঁজখবর সম্বন্ধে ওয়াকিববাহাল থাকার সুযোগ লইয়া উদ্বাস্তদের দ্বারা

নির্ধারিত যাবতীয় সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অপ্রয়োজনে সুবিধা লাভ করিলে যাহা হ্রস্ব, তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ এই ধরনের বহু ব্যক্তি সুবিধালাভের অপব্যবহার করিয়াছে। সকলেই জানেন যে, উদ্বাস্তদের পূর্বসঙ্গের জন্ত প্রচুর পরিমাণে টেট-তোলা টিনের প্রয়োজন হইতেছে। উদ্বাস্ত হিসাবে পাওয়া টিন ও অজ্ঞাত অব্যাদিত চোরাবালিকার বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারটি আরও দুর্নীতিপূর্ণ। পূর্বপাকিস্তান হইতে বহু ‘ভ্রমলোক’ নারী ও বালকবালিকাদের লইয়া পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সাহায্যে বাস করেন, সমস্তপ্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন; অপর দিকে দেশের জমিজমা ও বিষয়-সম্পত্তি দেবিস্বামীর জন্ত বাড়ীতে দুই-এক জন লোক থাকে। অর্থাৎ যাহাকে বলে ‘গাছেরও খাওয়া, ভলারও কুড়ানো’— তাহাই ঘটতেছে। এই পর্ষায় পড়ে সরকারী কর্মচারী, চাকুরিয়া, ব্যবসাদার, ছোটখাটো জমিদার প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকে।

অন্য আশলে যাহারা শরণার্থী, সত্যকারের হিন্দু মিস্ত্রী, উদ্বাস্ত, তাহারাই আজ সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত। অতি সাধারণ তরুর ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যক্তি ইহারা—সহায় নাই, আশ্রয় নাই, একমাত্র সখল সরকারের দয়া ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সহায়ত। কিন্তু তাহাও বৃষ্টি ‘শিক্ষিত’ উদ্বাস্তদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ভুল নীতি ও কিছু মন্তব্যবাক্য লোকের ধ্বংসাত্মক ভাষ্যকথিত রাজনীতির প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ ইহারা হারাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু ইহা তো হইবার কথা নহে। প্রথম যখন ১৯৪৬ সালের ছাড়াইয়ার ফলে এবং পরেও দলে দলে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র হিন্দু-সমাজ তাহাদের জন্ত অকাতরে হৃদয় ঢালিয়া দান করিয়াছে—জমি দিয়াছে, ধর দিয়াছে, সেবা করিয়াছে, নিজেদের ভাগ হইতে খাজ সরবরাহ করিয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়াইয়াছে। সেদিনকার সেকথা কখনই ভুলিবার নহে। কিন্তু আজ কেন এত ভীত ভাবে পূর্ব-পশ্চিম মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে? মুসলিম লীগ আমলে যে-কোন সরকারী চাকুরিতে মুসলমান অফিসারগণ মুসলিম সুবকদের অধিক সুযোগ দিবার ফলে যেমন শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু এবং মুসলিম সমাজে একটা বিজাতীয় বিষেয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজও তেমনই বহু অফিসার দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গীয় হওনায় তাহারা পূর্ববঙ্গীয় সুবকদের বেশী সুযোগ-সুবিধা দিতেছেন বলিয়া পূর্ব-পশ্চিম মনোভাব উভয় বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, অল্প কোন কাজে, সরকারী কর্মচারিগণ কোন কোন পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তিকে সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্ত ব্যস্ত হন। ইহার

ফলে এই মনোভাব দিন দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে সরকারী কার্যে অবস্থানকারী কোন কোন পূর্ববঙ্গীয় কর্মচারীকে বলিতে শোনা যায়—‘সব হারাইয়া আসিয়াছি, আমাদের বাড়তি কিছু উপায় না করিলে চলিবে কেন?’ বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী পূর্ব-বঙ্গাগত এবং জনসাধারণের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের অবজ্ঞা ও ভীতিভীর মনোভাব অতীব হৃৎকলক।

কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে ইহাদের মনের এত পার্থক্য ঘটিল কেন? সেখানেও স্বার্থের কোন বিরোধ বাধে নাই। বরং বহু গ্রামে সাদরে বহু উদ্বাস্তকে বসবাসের জন্ত আশ্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। রোগ অজ্ঞ, সাধারণতঃ উদ্বাস্তদের ‘কলোনী’ করিয়া বিদেশীর মত বসবাসের দ্বারা অনেকাংশে দারী। বিত্তীয় পণ্ডিত জমিতে কলোনী গড়িয়া তোলা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু যেখানে গ্রামের মধ্যে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মতই একই মাটির সন্তান হইয়া বসবাস সম্ভব, সেখানেও এই মনোবৃত্তি থাকিয়া গিয়াছে। বাংলার বাহিরে অজ্ঞাত প্রদেশের ‘বাঙালী-টোলা’র স্বাতন্ত্র্যের মত এই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যও বিভেদ সৃষ্টির সহায়ক। ভূমি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক অসাম্য প্রভৃতির দ্বারা তুলিয়া এই বে বিভেদের প্রকার গড়িয়া তোলা হইতেছে, ইহা নুতন করিয়া সমাজকে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। ইহা ব্যতীত প্রতিবেশীদের সহিত, বাড়ীওয়ালার সহিত, জমিদারের সহিত জুজু কাগণ বা অকারণে বগড়া-বিবাদ এত বেশী বাধিতেছে যে, তাহা সত্যই শোচনীয়। কোথায় সমাধান, না নুতন সঙ্কটসৃষ্টি।

ইহার উপর ভাষ্যকথিত বৈপ্লবিক ও বামপন্থী রাজনৈতিক-দের দাপটে উদ্বাস্ত-সমস্যা আরও বোঝাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যা এত বেশী ব্যাপক ও গভীর যে, যে-কোন সরকারকে ইহা লইয়া হিমসিম খািতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মত সর্ব দিক দিয়া ঘাটতি প্রদেশে ইহার ভাব গুরুতর রূপেই পড়িয়াছে। এই সঙ্কটের সুযোগ লইয়া স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাজনৈতিক নেতারা যে-কোন প্রকারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাইয়া সরকারী ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিতে সর্বদা সচেষ্ট। বাঙালারদের কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্যে যে ইহার মধ্যে নিহিত আছে, ইহা এতটুকুও সত্য বলিয়া মনে হয় না। আসল উদ্দেশ্য—আগামী নির্বাচনে হাভের ভাগ হিসাবে ইহাদের কাজে লাগাইয়া ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। রাণাঘাটে উদ্বাস্তগণ কতক পর পর তিন দিন ট্রেন চলাচল বন্ধ করার মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে বানচাল করিয়া দেওয়া ও এই সুযোগে রেল বন্ধ করিয়া চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া ভাষ্যকথিত ‘বৈপ্লব’ ঘটানই এই শ্রেণীর নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের স্পষ্ট ও সুসংহত প্রতিরোধের ফলে ইহাদের

এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতিজ্ঞার ফলে যে অন্তরঙ্গত্বের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে, তাহাতে কি বাস্তবতার কোন কল্যাণ সাধনের আশা করা সম্ভব? যাহারা নিঃস্বপ্ন হইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী, মানবতার নামে তাহাদের সমস্ত অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকার অগ্রণী, জনসাধারণও সহানুভূতিশীল। পশ্চিমবঙ্গবাসীর একান্ত কামনা—শরণাগত ভাই-বোনেরা তাহাদের দায় ও ভারস্বরূপ না হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সহায় ও সম্পদ হইয়া উঠুক। তাহা না হইলে,

কাহারও মদল হইতে পারে না। তাই এই দুঃস্থ সমস্তার সমাধানে উদ্বাস্তগণকেও আগাইয়া আসিতে হইবে। ভূমি নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া। সরকারী ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার পথে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাভাবিক সহানুভূতিকে কাজে লাগাইয়া এই মাটির সম্ভাবন হইয়া যাইতে হইবে। ভিটার মায়া ভোলা যায় না সত্য; কিন্তু যাহা আর পাইবার নহে, তাহার আশা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মাটি ও মানুষকে আপন করিয়া লইয়া বাস করিতে হইবে। এই পথেই পূর্ব-পশ্চিমের বিভেদ দূর হইয়া যাইবে।

ষাটের পরে

শ্রীকালিদাস রায়

ষাটের উপরে ক্রমে বয়স বাড়িছে মোর যত
নানা দুঃখ আঘি ব্যাধি আর্তি রুপ জুটেছে ভত।
ইহাদেরো আছে প্রয়োজন,
ইহারাও একে একে ছিঁড়িতেছে মর্ত্যের বাঁধন।

বিধাতার করুণার পাণি

সবের আড়ালে আছে মনি আর নাই আঘি মনি।
বুঝিয়াছি ইহাদের সার্থকতা। বিতৃষ্ণা জীবনে
আগাইতে চলিতেছে ইহাদের চক্রান্ত গোপনে।

ইহারা হরিছে মোর অবান্ত্রিত আয়ু,
তুলিছে অসহ্য করি এই বরণীর অলবায়ু।
যুজ্জ্বল-বিভীষিকা মোর হরিতেছে এরা মোরে ঘিরে,
করিতেছে মরণের বরণীয় পৃথিবীর ধীরে।

বিশ্বস্তির অন্তরে নামিতে

ইহারা সোপান হ'য়ে মধ্যপথে দেয় না ধামিতে।

ছিন্ন করে সব পিছুটান,

মরণ আগায়ে আসে পরিজ্ঞাত বঙ্গুর সমান।

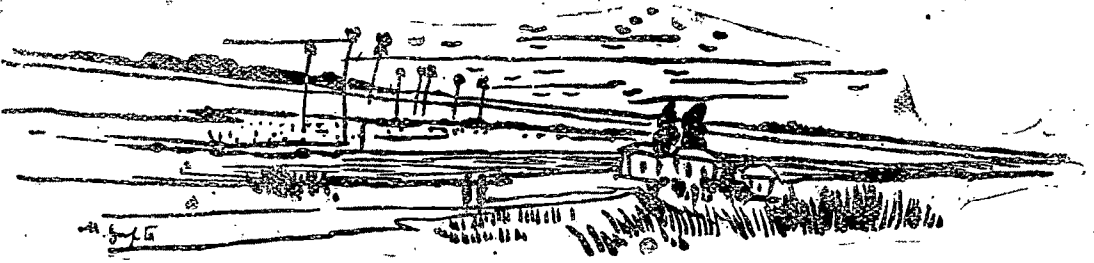
নব আশ্বাস

শ্রীআর্য চক্রবর্তী

কুহেলীমলিন হলুদ চাঁদের হাসি
স্তব্ধ রাত্রি শীতের মন্ত্র জপে
নির্জন পথে সহসা পদধ্বনি
দূর বীথিকায় বায়ু ওঠে নিঃস্বনি।

দূর বীথিকায় বায়ু ওঠে নিঃস্বনি
আধো তন্দ্রার নরম আবেশ ভাঙে
জাগ্রত চোখে শত স্বপ্নের ভিড়
মনের গহনে ব্যর্থ বীণার মীড়।

মনের গহনে ব্যর্থ বীণার মীড়
তবু তারি মাঝে নব আশ্বাস জাগে
গোনার স্মৃতায় গাঁথা মৃত্যুর মালা
কার কথা ভেবে ঘুমে হাসে রাজবালা।



“রামেন্দ্র-রচনাবলী”

ত্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

তখন স্কুলের বষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। ‘ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রহুম্মর ত্রিবেদী মহাশয়ের ‘প্রজ্ঞার জয়’ পড়িলাম। পড়িয়াছি এই পর্যন্ত মনে ছিল, ইহার বিষয়বস্তু কি পরবর্তীকালে তাহা চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারি নাই। এবারে পুনরায় পাতা উন্টাইতে গিয়া বুঝিলাম, কেন ইহা সেই কিশোর মনেও দাগ কাটিয়াছিল। কঠিন বিষয়, কিন্তু এমন সরল ভাষা, বাচনভঙ্গী এত চমৎকার। কৈশোরের কথক ঠাকুরের কথকতা যেন শুনিতোছি। এ তো প্রবন্ধ নয়, এ যে কথকতা। লেখক পাঠককে যেন সম্মুখে রাখিয়া সকল খুটিনাটি তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বঝাইয়া বলিয়া যাইতেছেন। রামেন্দ্র-রচনা যতই পাঠ করিবে, এইট ততই উপলব্ধি হইবে।

রামেন্দ্রাব্যাবৃত্তির সাধক ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দোপাধায় সত্যই বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রহুম্মর “একটা মিশন লইয়া সারা জীবনটা কাটিয়াছেন। ‘নবজীবনের’ প্রথম সম্ভব লেখার সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ‘মিশন’ বা এই সাধনা তাঁহার জীবনের ঐক্যতার স্বরূপ ছিল, কখনই তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দেন নাই। রামেন্দ্রহুম্মর যে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিশ্লেষণ করিলে এই জীবনব্যাপী সাধনার কথা বেশ ফুটিয়া উঠে।” রামেন্দ্রহুম্মর অসম্ভবরকম পরিভ্রম করিতে পারিতেন। পাঁচকড়িবার বলিয়াছেন, “রামেন্দ্র বিনিজ রজনী আংগাঙাড়াই বেদ ও তন্ত্রের আলোচনার কাটায়া দিতেন। এই উৎকট পরিভ্রমের ফলেই তাঁহার যত্ন রোগ হয় এবং সেই রোগেই তাঁহাকে অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়।”

বন্দোপাধায় মহাশয়ের উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা পরিব্র-প্রকাশিত এই রামেন্দ্র-রচনাবলী পাঠে সম্যক বুঝা যায়। এভাবে পাঁচ খণ্ড বাহির হইয়াছে; সম্পাদকদ্বয় বলিতেছেন, এখনও যে সব রচনা গ্রথিত হয় নাই তাহা একত্র করিয়া ছাপাইলে আরও এক খণ্ড হইবে। এই পাঁচ খণ্ডই রয়েল আর্ট পেজী আকারের প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠায় রামেন্দ্র-রচনাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। রামেন্দ্রহুম্মর প্রৌঢ়কালে-মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে তিনি যে কত বিষয় চর্চা করিয়া গিয়াছেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ছিলেন বঙ্গভারতীয় একনিষ্ঠ সাধক। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে তিনি স্বদেশবাসীকে তাহা পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং লিখিয়াও গিয়াছেন যে, এমন দিন কল্পনা করা মোটেই অসাধ্য নয় যখন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষায় উচ্চতম শিক্ষাও প্রদত্ত হইবে। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষাকে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ করার অদ্ব্য প্রয়াস তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। রামেন্দ্রহুম্মর ছিলেন বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, কিন্তু বিজ্ঞানের এমন শাখা নাই যে সম্বন্ধে তিনি পরিপক্ব জ্ঞানলাভ করেন নাই, এবং সেই জ্ঞান মাতৃভাষায় পরিবেশন করিয়া তাহা গৌড়জনকে উপহার দেন নাই। আবার সাহিত্য, দর্শনেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বাংলা-সাহিত্য এবং ভারতীয় দর্শন তাঁহার লেখনীর অগ্রে যেন একান্ত নমনীয় হইয়া যাইত। ভাষার রূপ লইয়া তাহা যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত তখন মনে হইত, যে বিষয়টিকে এত দিন খুবই কঠিন মনে হইয়াছে, এখন যে তাহা একেবারে জল হইয়া গেল।

রামেন্দ্রহুম্মরকে বাঙালী জাতি এত দিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাহার জন্ত রামেন্দ্রহুম্মর আমাদের কাছে এত ‘হুম্মর’, তাঁহার-সেই সাহিত্য ও রচনা দুস্তাণ্য থাকিয়া সাধারণের

নিকট নামমাত্র পর্যাবসিত হইয়া পড়িতেছিল। এই সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহা পুস্তকাকারে গ্রথিত করিতে সক্ষম করিয়া ‘পিতৃগণ’ পরিশোধে অগ্রসর হন। স্বল্প সময়ে তাহারা পাঁচ খণ্ডে রচনাবলী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাহার বাহার চেষ্টায় ও অর্থে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহারা সকলেই বাঙালী মাত্রেয় ধন্যবাদার্থ। এই বিষয়ে সম্পাদকদ্বয়ের উৎসাহ ও পরিভ্রম অবশেষেই স্মরণীয়। দুস্তাণ্য পুস্তক-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পুস্তকের পাঠ তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন। যে সব গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, তাহাও যে-যে পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া সংশোধনান্তর মুদ্রিত হইয়াছে। আবার কোন কোন লেখা যেমন ‘ব্রাহ্মণ কি পুত্র?’—অনুসন্ধানান্তর সম্পাদকদ্বয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে রামেন্দ্রহুম্মরের দুইখানি সূদৃশ চিত্রও সন্নিবেশিত আছে।

এত কথা বলিয়াও রচনাবলীর সামান্য পরিচয় দেওয়াই এখানে সম্ভব। প্রথম খণ্ডে আছে—প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। পুস্তকাকারে গ্রথিত হইবার পূর্বে কোন কোন পত্রিকায় এগুলি বাহির হইয়াছিল, ভূমিকায়, সূচীপত্রে বা প্রবন্ধরূপে তাহার নির্দেশ আছে। এইরূপ নির্দেশ পরবর্তী খণ্ডদ্বয়েও দেওয়া হইয়াছে। কল্প-কথা, চরিত-কথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে—শব্দ-কথা, বিচিত্র জগৎ, যজ্ঞ-কথা। শেষোক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সারু দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অনুমোদনে লিখিত ও বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে পঠিত হয়। চতুর্থ খণ্ডে রহিয়াছে—নানা কথা, জগৎ-কথা, পুণ্ডরীককুলকীর্তি-পঞ্জিকা। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ নামক সূত্রগ্রন্থ গ্রন্থখানি লইয়া পঞ্চম খণ্ড। পাঠক পুস্তক-গুলির নাম হইতে রামেন্দ্রহুম্মরের জ্ঞানের পরিধি কিরূপ প্রসারিত ছিল তাহার আঁচ করিতে পারিবেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু রামেন্দ্রহুম্মর যে সরল মনোহারা ভাষায় তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কল্পজনের রচনার মধ্যে পাই? দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষা-সাহিত্যের আলোচনার সারস্বা এবং প্রাঞ্জলতা একান্ত কাম্য, কেননা লোক-শিক্ষার পক্ষে ইহা অত্যন্ত জাবশ্যক। ‘লোক-শিক্ষক’ রামেন্দ্রহুম্মরের রচনাবলী এহেতু শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও পুস্তক-প্রণেতাদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। নূতন অবস্থায় যে সকল সমস্তার আশু সমাধান প্রয়োজন, রামেন্দ্রহুম্মরের রচনাবলী, বিশেষতঃ ‘নানা কথা’র প্রবন্ধসমষ্টির মধ্যে তাহার সম্ভাবন মিলিবে। রাষ্ট্রপরিচালক ও শিক্ষানায়কদেরও এগুলি পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

রামেন্দ্র-রচনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থাগার, শিক্ষালয় ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রে নিশ্চয়ই স্থান পাইবে। ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বাহাতে এই সকল গ্রন্থ বধ্যবধ ভাবে প্রচারিত হয় সে বিষয়েও উক্ত-প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রামেন্দ্র-সাহিত্যের অমূল্যলীন জাতির জীবনে নব-বলের সঞ্চার করিবে।

* রামেন্দ্র-রচনাবলী (১ম-৫ম খণ্ড)—ত্রীয়েঞ্জেলনাথ বন্দোপাধায় ও ত্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য বধ্যাক্রমে—৮, ৮, ১০, ১০, ১০ ও ১০।

পুস্তক পরিচয়

রাজগৃহ ও নালন্দা—ডক্টর শ্রীঅমলাচন্দ্র সেন। ভারত বিদ্যাবিহার। ২১, বলরাম বোম্ব ট্রাট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

জৈনধর্ম—ডক্টর শ্রীঅমলাচন্দ্র সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার। ২, বক্সিস চার্জ জলিট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

রাজগৃহ ও নালন্দার নাম শুনিলেই শিক্ষিতগণের চিত্তে কৌতুক আগিয়া উঠে। এক দিন এই দুইটি স্থানের গৌরব নানারূপে এই প্রকারেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি ঐ দুইটিতেই ঐ দুই স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং বহু দিন সেখানে বাস করিয়া সেখানকার বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঁহারা ঐ দুই স্থান ভ্রমণ করিতে চান তাঁহারাও ইহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

গুরুদেবের বিশ্ববিদ্যালয়গ্রহ গ্রন্থাবলী প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, ইউরোপের ছাত্র আমাদের দেশেও সহজ ভাষায় ও অজ্ঞের মধ্যে বিবিধ বিতাকে বাঙালী পাঠকদের নিকটে উপস্থিত করা। বর্তমান পুস্তিকাখানির দ্বারা জৈনধর্ম সম্বন্ধে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। জৈনধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, কিছুই উপেক্ষিত হয় নাই। লেখক জর্মানির সুপ্রসিদ্ধ জৈনতত্ত্ববিদ স্ত্রিং সাহেবের ছাত্র। ইনি তাঁহার সর্বত্র সুবিনিত “জৈনমত” নামক পুস্তকখানি পাঠ করার সুবিধাও এই পুস্তিকা-রচনায় লাভ করিয়াছেন। পাঠকেরা ইহাতে উপকৃত হইবেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ—শ্রীজবাহরলাল নেহরু। *Glimpses of World History* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। জে. এফ. হোরাবিন অঙ্কিত ৫০ খানি মানচিত্র সম্বলিত। ১৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২।০।

এই বিশ্বব্যাপ্ত ইতিহাস-পুস্তকখানির বিষয়বস্তু ও রচনাশিল্প নূতন করিয়া বিচারের অপেক্ষা রাখে না; ভারতের প্রধান মজীর লেখা বলিয়া

নহে, এক জন ভারতীয়ের লেখা বলিয়া ইহা ভারতেরই গৌরবের বস্তু। মূল পুস্তকের চিঠির আকারে লেখা ভঙ্গী এবং সাহিত্যগুণযুক্ত ইংরেজী এই ইতিহাসগ্রন্থখানিকেও সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছে। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী এইরূপ একটি বিনাট ও বিখ্যাত গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। বাহার-তাহার পক্ষে এই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। প্রকাশনী ইহাতে হস্তক্ষেপ করাতে শুধু অনুবাদের দিক দিয়া নহে, মুদ্রণ ও গঠনের দিক দিয়াও ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

অক্টোবর ১৯৩০ হইতে আগষ্ট ১৯৩৩-এর মধ্যে কারাগারে বসিয়া জবাহরলাল কল্যা ইন্দিরাকে পুত্রগুলি লেখেন। উপকরণের অভাবে স্বতঃই তাঁহাকে অসুবিধার পাড়িতে হইয়াছিল, ফলে ইতিহাসখানি সর্বত্র সমান সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। পরবর্তীকালে তিনি সংস্কারের দ্বারা অনেক অপূর্ণতা দূর করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্তমান বাংলা সংস্করণে আমরা লেখকের শেষ সংশোধিত পাঠই পাইতেছি।

বইখানি বাঙালীর স্থায়ী উপকারে আসিবে। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী এরূপ দুর্লভ একাধিক কাজে হাত দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। শুধু একটি বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলি। এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে স্বভাবতঃই অনেক হাতের সহযোগিতা আছে, কিন্তু সামঞ্জস্যবিধায়ক দৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছে। ফলে “নাথ” ও “সঙ্গে”র ক্রেশনায়ক সংমিশ্রণ লক্ষিত হইল। ভাল কাজে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মগের মূলুক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা-১। মূল্য তিন টাকা।

ছোট গজের বই নাকি বাজারে তেমন কাঁটে না—অথচ ছোট গল্প নহিলেও মাসিক পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। কথাসাহিত্যের আসর জমাইয়া রাখে ছোট গল্প। জাতির প্রাণশক্তি সভ্যতা সংস্কৃতি সবকিছুকেই প্রকাশ করার মূলে ইহার কৃতিত্ব অনেকখানি। বাংলা-সাহিত্যের এই দিকটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল—অন্ততঃ বিশ্বসাহিত্যের পাশে অকুঠ সাহসে সে দাঁড়াইতে

টোল ও ক্রাউনের

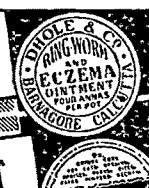
দাদ ও ক্রাউনের

ক্রিউটা-টোল

পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন মূল্য

খোঁস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য



বরানগর কলিকাতা

পারে। এই ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের দানও উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্পের আসরে তিনি যে সব চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করেন সেগুলির মধ্যে অপরিচয়ের দ্বন্দ্ব নাই, তাহার অসাধারণও নহে। নিতা চোখে দেখা মানুষ, প্রতিমূহুর্তে সংঘটিত সব ঘটনা অথচ তাহাদের বিশেষ করিয়া জানিবার বা কার্যকারণের সম্পর্ক লইয়া ভাবিবার অবসর অল্প লোকেরই আছে। শিল্পী তুলিকায় তাহাদের অকপট অস্তিত্বকে বিশ্বয়কেই শুধু বাড়াইয়া তোলে না অতি আপনাত্মক হাটের ভিড় হইতে তুলিয়া ঘরের মাঝখানে বসাইয়া আনন্দ উপভোগ করায়।

কিন্তু শুধু পরিচিত মানুষই নহে, অপরিচিতেরাও মাঝে মাঝে গল্পের মাঝে উকি মারে—তাহাদের আচার প্রথা নিয়ম নীতি আমাদের বিশ্বয়-বর্জন করে। বহুিও ঐ আচার-নিয়মগুলিও একান্ত বাহিরের বস্তু। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ যে মন এবং সব চেয়ে বড় রহস্য সেই মনের লীলা-প্রবাহ তাহা জাতিধর্মের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিখিলের মানব-সত্তাকে প্রকাশ করে অপরূপ মহিমায়। এই মহিমাই ‘মগের মূলক’ গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। পঞ্চমার পরিবর্তন, আগুনে পুড়িয়া সোনা খাঁটি হওয়ার উপমাতেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আর একটি অপরূপ চিত্র পাই ‘গঙ্গাবাত্রা’ গল্পে। বাংলা-বিভাগের অভিযাপ উত্তর-জীবনে এমন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে বাহার তুলনা অসম্ভব প্রায় মেলে না। মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড় এবং যুদ্ধোত্তর জগতে সদৃশতার বিনাশ কি দ্রুত ও মর্মান্তিক ভাবেই ঘটতেছে—‘গঙ্গাবাত্রা’ গল্পে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ‘গার্ড সাহেব’ গল্পটিতেও স্বার্থ-সংকীর্ণ-চিত্ত এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দের মাঝে সহসা নিঃশব্দে আবিষ্কার করিয়া—দুঃস্বপ্নে নহে—অনন্তকালের

নবজীবনে যেন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গল্পের পরিবেশটিও চমৎকার। অস্বাভাবিক গল্পগুলির মধ্যেও পল্লীর স্বর ও ইন্দ্র উত্তেজিতভাবে সজ্জিত, পল্লীর আচার রীতি, কথোপকথনের ভঙ্গি, প্রবাসবাক্য বা উপমার বটী সুশ্রুত হইয়া পল্লী-পরিবেশ ও মানুষগুলিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

ইঙ্গিত—শ্রীহরীবোম্ব হু। গ্রন্থাগার, পি-৫৮, ল্যান্ডডাউন রোড, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

বর্তমানকালের রাজনীতির পটভূমিকায় রাষ্ট্রনায়কদের চিত্র উপস্থাপন-খানিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থের ভাবভূমি অর্থশালী ব্যক্তি—সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রসারিত করার কলাকৌশল তিনি ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়াছেন। বুদ্ধি-কৌশলে পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকেরা তাঁহার নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীমন্তকে সেক্রেটারীরূপে কিনিয়া লওয়াও তাহার পক্ষে অসাধ্য হয় না।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিয়াও শ্রীমন্ত সুখিতে পারে সমাজ বা অর্থনীতির মূল সূত্রটি কোথায় বিধৃত রহিয়াছে। এই বোধের সঙ্গে তাহার মানসিক স্বপ্নের স্বর এবং সে স্বপ্নে শ্রীমন্তের ভাগ্যের গতি কোন গুণ ধরিয়াছে তাহা অবশ্য লেখক বলিয়াছেন—কিন্তু ‘ইঙ্গিতের’ প্রতিপাত্য তাহা নহে। নেতার নেতার আব্রাহামী কলহ, ক্ষমতালাভের মত্ততা, দৈত্যনীতির প্রয়োগ জীবনকে কি ভাবে কলুষিত ও পঙ্কিল করিয়া তোলে—ইঙ্গিতের মূল উপজীব্য এইগুলি। বলা বাহুল্য, লেখক তাঁহার

শীতের রুক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য ও লালিত্য বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মের কোমলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। দিবাভাগে লাবণি স্নো ও রাত্রি লাবণি ক্রীম ব্যবহার্য।

সৌন্দর্য রক্ষায় অপরিহার্য

সৌন্দর্য
সৌ ও ক্রীম

ক্যালকাটা কোসমিক্যাল

যজ্ঞব্য ভাগভাব্যেই শুছাইয়া বলিয়াছেন। উপভাসধানি পড়িয়া মনে হয় না শুধু কল্পনার জগতেই বিচরণ করিতেছি।

আজিকার দিনে যে তিক্ত সত্য মানুষকে প্রায় নৈরাশ্রবাদী করিয়া তুলিয়াছে—‘ইজিত’ তাহারই মর্গার্থ, বহন করিয়া পাঠকমনে কোঁতুহল সঞ্চার করে। গল্পের মধ্যে কিছু রোমাটিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও ইহার সব কয়টি চরিত্রই বাস্তবাত্মক।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নিশান নাও—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভবানীপুর বুক বারো, ১-বি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় “কুটীরের গান” লিখিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন। তাঁহার কবিতায় বৈশিষ্ট্য আছে। “নিশান নাও” তেইশটি কবিতার সমষ্টি। অতিকার না হইলেও এই অব্যুৎ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় সকল কবিতাই কবিত্বে উজ্জ্বল এবং দেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল। যে যুগ এক দিন তরুণের মনে উদ্‌দমনার সঞ্চার করিয়াছিল ইহার অধিকাংশ কবিতা সেই যুগে রচিত। যুগ ভ্রমত বিগত, তাহার আবেগ কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। সেই উদ্‌দমনায় অপরূপ দিনের সূরের রেশ রচনার মধ্যে পাওয়া যায় :

সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া

লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপণ্যয় সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই স্থায়ীভাবে প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

“ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে শরীরে স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আ: শিশি ভা: মা: সহ—২।০ আনা।

ওল্লিওয়েস্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লি:

১১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সিউথ ৮৮১

“মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!”

মৃত্যু পণ! জীবন পণ!

হয় বিজয়! নয় মরণ!

জয় গাঁহ আজি দেশমাতার!

জয় গাঁহ আজি স্বাধীনতার!”

অত্যাচারক্লিষ্ট জনগণের বাণিত আহ্বান বাজিয়াছে:

“তাই আজি নিপীড়িত মানবান্না ডাকিছে তোমায়,
হে সারথি, আনো রথ, আনো শত্রু, আনো হৃদয়ন!”

এম জাগিয়াছে:

“কে এসেছ তরুণ পথিক, দুঃখসাগর কূলে?”

উত্তর আসিয়াছে:

“প্রলয় রাজি এসেছে আজ।

মৃত্যু-মশানে প্রাণসাধনার প্রাণের পূজারী এসেছে বীর,
শৌর্য্যে-বীর্ঘ্যে মুছে দাও গ্লানি, কালি কলঙ্ক শতাব্দীর!”

সকলকে ডাক দিয়া ধ্বনি উঠিয়াছে:

“আজি বহুদায় সব ভেসে যায় পুঞ্জিত জঞ্জাল,
চূর্ণিত হ’ল মিথ্যা শিকল—প্রাণহীন কঙ্কাল।”

ভুবন ভরিয়া সাড়া পড়িয়াছে:

“বেজেছে পাঞ্চজন্ম!

বুকে বকে জাগে পঞ্জরভাঙা মহা-উদ্‌দাম দোল,

শুধুই অস্থি, শুধু কঙ্কাল, শুধু গর্জন-রোল!”

সেই শৌর্য্য কোথায়, সেই হিন্দু কই, কোথা গেল সেই বীর জাতি,
বলিয়া কবি দুঃখ করিয়াছেন:

“বিদেশের বীরনারী চলে একা হিমালয়ের দেশে।
আমাদের পুরুষেরা শাস্ত্র-হাতে অন্ধকার ঘেসে
দাঁড়ায়েছে সন্তপণে।”

অতএব:

“এস ধূর্ত! মেঘজটাজুট উড়িয়ে

উদ্‌দাম বেগে ক্ষুদ্র বিশ্ব শুড়িয়ে,

বহি-নয়নে এস এস শঙ্কর,

উজ্জ্বল কেশজাল মেলি এস প্রলয়ঙ্কর!”

মহাপুরুষের “শেষ বাত্মা”র কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন:

“তাঁহার ললাটে জ্বলে আত্মার অগ্নি জয়টাকা
সংশয় ভিমিরচ্ছদী নিশান্তের বহুবর্ণে লিখা
বিধাদেশের প্রবজ্রোত্তি শিখা।”

‘হের দিগপ্তে উবার আভাস, রাজি শেষ’—এ কথা বলিয়াও সংশয় জাগিয়াছে:

“অধীনতা-পাশ ছিন্ন হয়েছে, কই স্বরাজ?”

কই নবযুগ, নতন প্রাণ,

কণ্ঠে কণ্ঠে প্রভাতী গান?”

যাত্রা শেষ হয় নাই

“ধেমোনা এখন, ধর আরবার চলার সুর।”

ছন্দের সাবলীলতায়, শব্দের বন্ধন, প্রাণের আবেগে এবং আন্তরিকতার কবিতাগুলি কাব্যশ্রিয় পাঠকের চিত্তকে উদ্দীপিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আফগানিস্তানের শিনওয়ারী বিদ্রোহ—শ্রীঅসিত-নাথ রায়চৌধুরী। রায়চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী, ১১২, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪১। মূল্য তিন টাকা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শেষ হইবার কিছু পরেই, ১৯১৯ সনের

যে মাসে আফগানিস্থানের সহিত ব্রিটিশের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপই আফগানিস্থান প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার পূর্বে এই দেশ নামে মাত্র স্বাধীন এবং ব্রিটিশের অর্থভোগী-রাষ্ট্রমাত্র ছিল। সন্ধির সর্তানুযায়ী আমীর 'আফগানিস্থানের রাজা' আখা পাইলেন, দেশ অত্যন্ত রাষ্ট্রের দ্বারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল, ডরাও রেখা পরিবর্তিত হইয়া ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে নুতন সীমারেখা নির্ধারিত হইল। করাচী বন্দর আফগানিস্থানের শুদ্ধবিধান বন্দররূপে স্বীকৃত হইল, ডরাও রেখার উভয় পার্শ্বের জাতিসমূহকে (টাইব) স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা হইল। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রদূত নিয়োগ বিষয়ে আফগানিস্থান নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইল। কিন্তু ইংরেজ এই সন্ধিসর্তে স্থখা হয় নাই। রাজা আমানুল্লা খাঁ তাঁহার দেশে যে নবজাগরণ আনিতে চাহিলেন তাহাতেও ইংরেজ আনন্দিত হইল না। এদিকে আফগানিস্থানের গোঁড়া মুসলমানেরাও আমানুল্লাহর বিপ্লবী সংস্কার প্রচেষ্টা সমূহকে হৃদয়ে দেখিল না। হুতরাং তুরস্বে কামাল পাশা যাহা করিতে পারিয়াছিলেন আফগানিস্থানে আমানুল্লাহ তাহা করিতে সক্ষম হইলেন না—তাঁহার পতন, রাজ্যভাগ অবশ্যস্বার্থী হইয়া পড়িল। গ্রন্থকার সমসাময়িক ঘটনা অতি হৃদয়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ শিন-ওয়ারী বিদ্রোহের নেতা বাচ্চা-ই সাকোর অভ্যুদয়ের সফলতার বিবরণকে একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। লেখকের মতে দম্মা-সর্দার বাচ্চা-ই সাকোকে পরাজিত করিবার শক্তি আমানুল্লাহর ছিল। কিন্তু দেশবাসীর রক্তপাত এড়াইবার জন্যই তিনি 'ইহা হইতে বিরত হন। নাদির খাঁ (পরে শাহ) দেশকে দম্মা-সর্দারের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন ও ধীরে ধীরে জাতিকে আমানুল্লাহ-প্রবর্তিত সংস্কারের পথে চালিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে আফগানিস্থান ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে এশিয়ার অন্ততম শান্তিরক্ষক। আমানুল্লাহ, নাদির শাহ ও জাহির শাহ প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে আফগানিস্থান চলিয়াছে বলিয়াই এরূপ সম্ভব হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র বইখানি একাধারে তথ্যপূর্ণ ও সুপাঠ্য।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

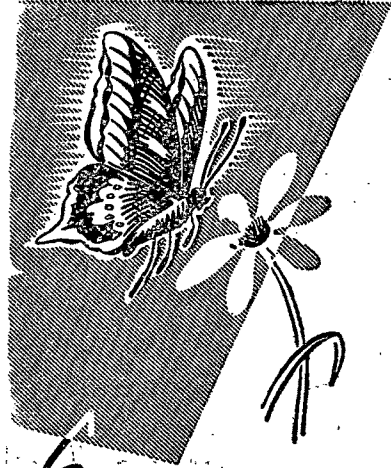
ব্রহ্মসূত্র—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত বাংলা ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি। ৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

শঙ্কর ও রামানুজ কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্রভাবে পূর্বেও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে ক্রমশঃ মূলসূত্র, তাহার বঙ্গানুবাদ এবং শঙ্কর ও রামানুজ ভাষ্যানুসারী বাংলা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে শঙ্কর ও রামানুজের মতভেদ আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে উভয় মতের মর্মার্থ বিবৃত হওয়ার বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশার্থীদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের শান্তিনিষ্ঠা এবং পাকিতা পরিস্ফুট। বাংলা ভাষায় পরিমিত ধর্মসংখ্যক দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর

মন তোর—শ্রীরাখালদাস সোম। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকারের 'বৃহদ' এবং 'বাল্যল-গীতা' ইতিপূর্বে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থেও তাঁহার কল্পনা ও চিত্তশীলতার পরিচয় হুস্পষ্ট। বইখানি ঐহিক, কষ্টপাথর, যজ্ঞ, শ্রীকল, রাবণ ও মন্ত্র—এই ছয়টি গল্পের সমষ্টি। গল্পই বলি, কেননা সাধারণ গল্পের মত



সময়ের সঞ্চয়

উপার্জনের ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের সুযোগ আজ আছে, কাল নাও থাকিতে পারে। তখন আপনার অন্ততাপ হইবে যে, সময় থাকিতে আপনার নিজের ও প্রিয়জনের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল। হিন্দুস্থানের বীমা-পত্র এই সঞ্চয়ের সহায়ক। আজই তা বিক্রয় দেখুন।



হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, ৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

না হইলেও এগুলিতে গল্পের রস বশেষে পরিমাণে আছে। অথবা, বস্তুতে পারি, জীবনের কয়েকটি খণ্ড চিত্র। ঘটনাংশ সামান্য, কিন্তু কথাবার্তার মধ্য দিয়া জীবনের রূপ ও মনের রহস্য চিত্তাকর্ষক হইয়া দেখা দিয়াছে। 'পরিচয়' লেখক বলিয়াছেন: "তুমি, আমি, রাম, ছাম, শমিষ্ঠা, শকুন্তলা—এদের সবাইকে নিয়েই আমার মন! সেই মানসসমুদায়ের স্রাবার্থী—তুমি, আমি, সবাই।" বিভিন্ন লোকের মনের কথা লেখক বাহিরে টানিয়া আনিতে পারিয়াছেন, ইহা কম কথা নয়। প্রথম গল্প 'টাইকে' ছাত্রধর্মঘট উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি কচিমন এবং শিক্ষক-ছাত্রের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা যেমন উপভোগ্য, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। স্থানে স্থানে রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে তিনি ভাবিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার রঙ্গরসিকতা কাহাকেও আঘাত করিবার জন্ত নহে, জাতিকে সচেতন করিবার নিমিত্ত। প্রসঙ্গক্রমে দেশবিদেশের সমাজ এবং রাজনীতি বিষয়ে তিনি একটু আধটু তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অযৌক্তিক নয়।

বিধুর বিভব কাব্য—ঐগন্ধানন কবিরত্ন। শৈলশ্রী—১১, বঙ্কিম চার্জো স্ট্রিট। কলিকাতা-১২। ২য় সংস্করণ। দাম তিন টাকা।

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কাব্য। রচনারীতি প্রাচীন। এ যুগে পৌরাণিক কাব্য বিরল। বাঁহারা স্বাদ বদলাইতে চাহেন, তাঁহার পড়িয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পাণ্ডপত: (নাটক)—ঐরত্নাঙ্গন রায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৭, বঙ্কিম চার্জো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা। মহাভারতের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 'পাণ্ডপত' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। নাটক যদি লোক-শিক্ষার অঙ্গতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে 'পাণ্ডপত' নাটকখানি নিঃসন্দেহে তাহার সার্থকতা প্রমাণিত করিয়াছে। বর্তমানের সজাত-ক্ষুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, 'পাণ্ডপত' পৌরাণিক নাটকে অহুস্রণ ছাড়াপাত লোকমনকে সচেতন করিয়া তুলিবে। খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, "নাটকখানিতে নাট্য-মুহুর্ত স্থষ্টির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ভাষা শুধু সহজ ও সাবলীলই নয়—গতিবেগেরও অধিকারী।"

রিফিউজী (নাটক)—ঐরত্নাঙ্গন রায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল নরনারীর দুঃখ-বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সামাজিক নাটকখানি রচিত হইয়াছে। দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা যে অবস্থার মধ্যে বাস্তবতাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে জীবনাবেগের প্রেরণায় নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী নূতনভাবে বসতিস্থাপন ও আশ্রয়-সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছেন তাহারই একটি খণ্ড-চিত্র এই নাটকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লেখকের আন্তরিকতা আছে, কিন্তু নাটক-রচনার পক্ষে শুধু আন্তরিকতাই একমাত্র মূল্যবান নয়।

শ্রীমঅথকুমার চৌধুরী



**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

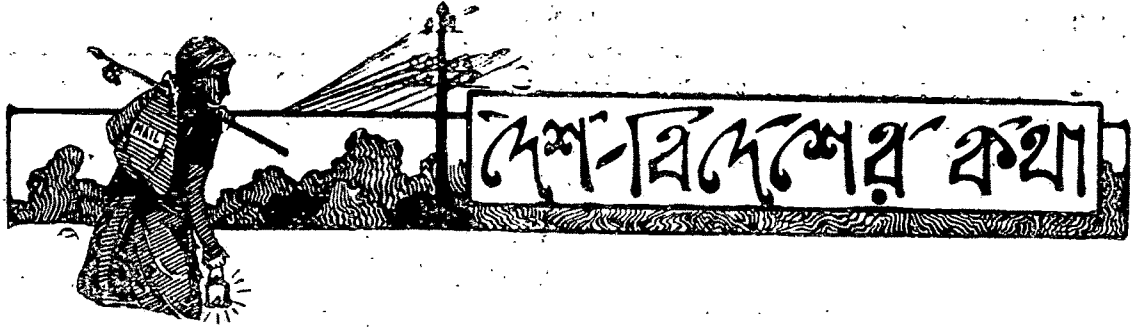
১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রিট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রিটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রিট
ও বহুবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থল

এম. বি. সরকার
এও সন্স

শ্রদ্ধাচলিত নিউজপেপারের নির্দেশে
শ্রদ্ধাচলিত নিউজপেপারের নির্দেশে

১৯৫৮/১ বি. বাসবিহারী এডভিউ কলিকাতা

১৯৫৮/১ বি. বাসবিহারী এডভিউ কলিকাতা



বাংলা-সাহিত্যে গবেষণার জন্য পুরস্কার

১। পরলোকগত অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতি-
হাসিক অম্বসুন্দান-কার্যে উৎসাহ-দানের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-
পরিষদে একটি গচ্ছিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই
তহবিলের আয় হইতে প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা
আছে। সম্প্রতি ত্রিযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, গত
শতাব্দীর স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের সম্বন্ধে লুপ্ততত্ত্ব উদ্ধারে
উৎসাহ-দ্বিবার জন্য পরিষৎ এক শত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ টাকা পরিষদকেই দান করিয়াছেন।

২। মনোবিজ্ঞা ও দর্শনের পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য
“জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি তহবিল” হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
সাইকো-অ্যানাট্রিক্যাল সোসাইটির সভাপতি প্রক্যাত মনোবিৎ
ডক্টর ত্রিপিঠীশেখর বসুকে ছয় শত টাকার একটি বৃত্তি
দিয়াছেন। পরিভাষাগুলি অচিরে মুদ্রিত হইবে।

৩। দিল্লী স্কুল অব ইকনমিকস-এর ত্রিযুক্ত বিবেকরঞ্জন
ডাঃচার্য “উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ”
সম্বন্ধে রচনা লিখিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ‘দীলা
বাংলা রচনা পুরস্কার’ (১৯৫১) লাভ করিয়াছেন।

যামিনীভূষণ অফোর্স আয়ুর্বেদ বিভাগ

ও যক্ষ্মা হাসপাতাল

বঙ্গীয় কবিরাব যামিনীভূষণ রায়, কবিরত্ন, এম-এ, এম-
বি মহাশয় কর্তৃক ১৩২৩ সালে উপরোক্ত আয়ুর্বেদ বিভাগ
ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী
ইহার নিজস্ব গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৪ সালে
কলিকাতার ভদানীন্দ্র মেমর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
কর্তৃক হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। ইহার পর ডাঃ জে.
এম. মৈত্র প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত
বঙ্গী হাসপাতালের গৃহ-নির্মাণের জন্য কলিকাতা কর্পো-
রেশনের নিকট হইতে ২৫,০০০ সাহায্য পাওয়া যায়। ১৯৩২
ঐষ্টাকে কলিকাতার ভদানীন্দ্র মেমর ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাতিপুত্রে বঙ্গী হাসপাতাল
ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ৪৫০০০ টাকা ব্যয়ে ইহার
গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। ইহা কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে
বার্ষিক ২৫০০০ সাহায্য পায়। বঙ্গী হাসপাতালে বর্তমানে

৫০টি ‘বেড’ বা রোগী-শয্যা আছে। আয়ুর্বেদীয় ও পাশ্চাত্য
উভয় পদ্ধতিতে এখানে রোগীদের চিকিৎসা করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে বঙ্গারোগের যেরূপ প্রাচুর্য্য হইয়াছে
তাহাতে আশাহ্রুপ রোগী ভর্তি করা সম্ভব হইতেছে না। ত্রিযুক্ত
অম্বতলাল মজুমদারের বদান্ততার উক্ত হাসপাতালের সংলগ্ন
একটি দ্বিতল গৃহনির্মাণ সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখানে দ্বিগুণ
বেড-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বাড়তি রোগীদের
রাখিবার ব্যয়-সঙ্কলনের কোনরূপ উপায় এখনও হয় নাই।
যামিনীভূষণ অফোর্স আয়ুর্বেদ বিভাগের কর্তৃপক্ষ এতদুজ্জীৱ
সরকার, রাজ্য-সরকার এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্যের
আবেদন জানাইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্যদান করিলে
তাহা যে প্রকৃত স্বদেশসেবা হইবে তাহাতে সন্দেহের অব-
কাশ নাই। এতোকেরই ইহাতে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করা



কর্তব্য। অমৃতভাবুর গুণের মায়ে জিভল গৃহের নাম দেওয়া হইয়াছে 'দেবত্রয় হাসপাতাল ভবন'। পশ্চিমবঙ্গ-প্রদেশপাল ডক্টর ত্রিহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৭ই নবেম্বর ইহার দ্বার উদ্বাটন করিয়াছেন।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ বাকুড়া জেলার লক্ষপ্রতিষ্ঠ আইন-ব্যব-সাহী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আইন ও অজ্ঞাত বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য হাড়াও তিনি বহু সদৃশের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বগ্রামের বহু যুবককে নিজ গৃহে স্থান দিয়া বিজ্ঞানজ্ঞানের অযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রয় প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরমহংসদেবের পরম ভক্ত; দার্শনিক মন্মথনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় গত ২০শে অগ্রহায়ণ ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার মনোহর-পুত্র রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রবণতা তাঁহাকে বহুকাল পূর্বে ত্রিঅম্ববিশের সংস্পর্শে আনিয়াছিল, এবং তৎকালে তিনি "বন্দেমাতরম" পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কবি কায়কোবাদ

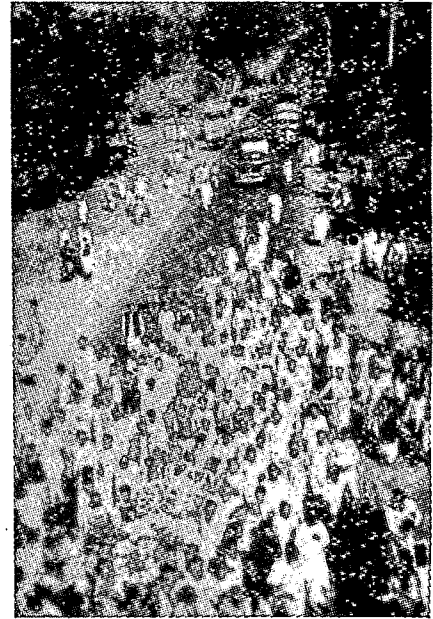
হেমচন্দ্র, মবীনচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের সমসাময়িক কবি কায়কোবাদ পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙালী মুসলমান কবি কায়কোবাদ রবীন্দ্র-পূর্ক যুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন।

"মহাশ্মশান", "অশ্রুমালা", "শিবমন্দির" তাঁহার কবিত্ব-শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই বইগুলির নামকরণ হইতে তাঁহার ভাবধারা ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতার একজন মুসলমান ব্যাখ্যাকার বলেন, "তিনি মুসলমান হইতেও সঙ্গদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি আলাওলের মত এদেশের মাটির সহিত নিবিড় ভাবে সংযোগ

হাপন করেছিলেন, এদের আদর্শ গ্রহণ করে এদের ভাবে ভর করে, এদেশের উপমা দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন।"

"মহাশ্মশান" কাব্য কারবালার হাসান হোসেনের হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া লিখিত। একদা "বিবাদ-সিন্ধু" যুগে বঙ্গ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কারকোবাদের "মহাশ্মশান" কাব্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চিত্র বর্তমা যুগের ভারতীয় মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

কায়কোবাদের অনেকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা ছড়াইয়া আছে। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে আমরা এই কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শোকবাজার একাংশ
(বিবিধ প্রসঙ্গ জটব্য)



অমৃততাজন
সর্বপ্রকার বেদনায় জাগবিক্রোধার ন্যায় কার্যকরী!
দাদের মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু' শক্তির ন্যায় কার্যকরী!
অমৃততাজন লি:-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭





অবানী দেব, কলিকাতা।

বানপ্রস্থ
দ্বিতীয়রজন সেনগুপ্ত

শিল্প-প্রদর্শনী



প্রসাদন

[শ্রীবিপ্র মহাস্তি



রাজপুতানী

[শ্রীহৈমন্তী সেন



শরশয্যা

[শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রবাস

“মতাম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

১৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাস, ১৩৫৮

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলায় নির্বাচনী অভিযান

বাংলায় এখন নির্বাচনের ধুম পড়িয়াছে। বিভিন্ন দল সকল ক্ষেত্রে ও সকল জেলায় ভোট-সমরাদনে নামিয়াছেন। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং পরস্পর হৃদ-কোলাহলে ব্যস্ত। কংগ্রেসের ভাগ্যবিপর্যয় যাহা হইতে পারিত তাহা অনেকটা ঐ কারণে কাটিয়া গিয়াছে। তথাপি লোকমত কোন্ দিকে যাইবে তাহার কোনও স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। গুজব নানা প্রকার শোনা যায়, তাহার সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের উপায় নাই, নির্বাচনের ফলাফল বাহির হইলে তাহা বুঝা যাইবে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে অল্প প্রদেশে তথাকথিত বামপন্থী এবং প্রকৃত বামপন্থী দলের বগড়া-বিবাদের ফলে কংগ্রেসের আশা যেরূপে বাড়িয়াছে, বাংলায়ও তাহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে।

ফলাফল যাহাই হউক, নির্বাচন ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মতবাদ প্রচার যেভাবে চলিতেছে এবং যে দৃষ্টিকোণ দিয়া নির্বাচনের বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় এই নির্বাচনে বাংলার ভবিষ্যতের অন্ধকার কিছুমাত্র কাটিবে না, বরঞ্চ গাঢ়তর হইতে পারে। যেখানে প্রশ্ন কেবলমাত্র দলগত স্বার্থের বা ব্যক্তিগত স্বার্থের সেখানে দেশবাসীর মঙ্গলের কথা স্থান পাইতে পারে না, ইহা বিগত পাঁচ বৎসরের ভিত্ত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

বাংলার বর্তমান অবস্থার নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল এক দিকে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা এবং অল্প দিকে সাহস ও সন্ততার পরিমাপে প্রতিদ্বন্দ্বি মনোনয়ন করা। যোগ্যতার বিচারে অতীতের ভ্যাগ ও নির্ধাতন ভোগ বা আন্দোলন-পরিচালন-ক্ষমতা একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। কেননা এই নির্বাচন পেজনের ভোগের ক্ষমতা বা পুরস্কার বিতরণের ক্ষমতা নহে, ইহা দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা নির্ধারণেরই ব্যাপার। অতীতে যিনি ভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও জিজ্ঞাসীল

ছিলেন, তিনি যে সকল ক্ষেত্রেই বর্তমানের ভার গ্রহণে সক্ষম একথা কি করিয়া বলা যায়?

কংগ্রেস এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরোধী, সেকথা আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি। কেননা দলের আত্মগত বা অর্থ-সামর্থ্য ভিন্ন অল্প কোনও যোগ্যতার পরিমাপ কংগ্রেসের অধিকারী-বর্গ গ্রহণ করেন নাই। যোগ্যতা ও সন্ততার কষ্টি-পাথরে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীগণের অধিকাংশই মেকি বা বিষম বাদ-যুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবেন।

দুঃশ্রম বিষয়, বিরোধী দলের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ স্থলে ঐ একই পরিমাপ বীজিত হইয়াছে। কয়েকজন যোগ্য লোক এবং তাঁহাদের দল গঠনে বহুসংখ্যক অযোগ্য বা সামান্য যোগ্যতায়ুক্ত লোক লইয়াই বিভিন্ন দল নামিয়াছেন। এইরূপ পন্থার ফলাফল শুধু যে অনিশ্চিত তাহা নহে, ইহা জন-কল্যাণের পরিপন্থী। যোগ্যতার বিচারেও টিকিটের মূল্যই কোর করিয়া তুলিয়া বরা হইতেছে, ব্যক্তিগত গুণাগুণের কোনও প্রশ্নই আসিতেছে না।

কংগ্রেসের ভাগ্যে যদি ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঘটে তবে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র-চালনার তাহাদের মনোনীত ধুরন্ধরবর্গ প্রতি পদে, স্বার্থের ভাঙনায়, প্রতিবন্ধকের সৃষ্টিই করিবেন। কেননা যেখানে যোগ্যতার অভাব সেখানে স্বার্থই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়— ইহা আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার বুঝিয়াছি। বাংলার বিগত পাঁচ বৎসরের রাষ্ট্র-চালনায়ও ঐ একই অভিজ্ঞতা আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অযোগ্য দল অযোগ্য মন্ত্রী নির্বাচন করিবে এবং অযোগ্য মন্ত্রী প্রতিদিন দেশের অমঙ্গল সৃষ্টি করিবেন, ইহাই ত স্বাভাবিক।

প্রতিদ্বন্দ্বী দলও ত সেরূপ কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবেন মনে হয় না যাহাতে দেশের ও দেশের স্বার্থ বক্ষার থাকে। ভাঙন দিয়া গঠনের কাজ হয় না ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা এবং দেখা যাইতেছে যে, নির্বাচনেই প্রত্যেক দলসমষ্টিতে গঠন-অপেক্ষা ভাঙনের কাজই অধিক চলিতেছে।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ডাঃ সর্বপল্লী

রাষ্ট্রাধিকারের অভিভাষণ

বর্তমান জগতে সমাজ তথা জাতির কল্যাণের জন্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিষ্পেষিত করিবার যে এক চরম আরম্ভ পরিলক্ষিত হইতেছে, ভারতের দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ও কৃষিরাষ্ট্র ভারতের রাষ্ট্রদূত ডাঃ সর্বপল্লী রাষ্ট্রাধিকার ঘানবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সমাবর্তন অহুতানে তাহার সমালোচনা করেন। জাতির মঙ্গলের জন্ত ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দিয়া তিনি বলেন যে, ব্যক্তিই সকল সৃষ্টির মূল উৎস। ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি।

ডাঃ রাষ্ট্রাধিকার তাহার ভাষণে বলেন যে, দেশকে উন্নত ও সুশিক্ষিত করিতে হইলে, দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, কারিগর ও পুর্নবিদের প্রয়োজন যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। ইহাদের সহযোগিতা ভিন্ন জাতি অগ্রসর হইতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কোন দেশেই আর্থিক স্বাধীনতা আসিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাফল্য ও কর্মক্ষমতার পরীক্ষা হইবে দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পগত উৎকর্ষের দ্বারা। অসংখ্য নিরাশ্রিত ক্ষুধিত জনতার কণ্ঠ জনের অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান সরকার করিয়াছেন, স্বল্পোৎপাদন, কর্মহীনতা, জনসংখ্যাধিক্য এবং দরিদ্রতার তাহার কণ্ঠটুকু প্রতিকার করিয়াছেন—ইহাই আজ জিজ্ঞাস্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সরকারের সার্থকতা নির্ণীত হইবে। ইহাই বিচারের চরম তুলনা। কারণ বুদ্ধ-জনসাধারণকে লইয়া কোন মহান জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দেশের নামারূপ অভাব অনটনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা অবিরাম ঋণোৎপাদন ব্যয়ের কথা, ভূমি সংস্কারের কথা শুনিয়া আসিতেছি তথাপি প্রতি বৎসরই আমাদের সমস্ত লক্ষ টন ঋণ-শুল্ক বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। প্রশ্ন এই, ভূমিকম্প, বড়, ঝড়-বজ্রপাতের ঘনঘটা কি কেবলমাত্র সমুদ্র দেশের আকাশকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে? যুদ্ধের দাবানলে বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি কি ভাবে তাহাদের পুর্নোৎসর্গ অর্থ-নৈতিক অবস্থা এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইতে সক্ষম হইয়াছে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জগৎ এক বিপ্লবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। কেবল অসন্তোষ নহে, সর্বত্র আকোশ ও বিক্ষোভের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের সর্বত্র ইহা পরিব্যাপ্ত। দেশের নেতৃবৃন্দকে দেশের ও বিশ্বের এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং ইহা সমাধানের জন্ত তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

ডাঃ রাষ্ট্রাধিকার বলেন, বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এই কলেজ প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক পুর্নবিদ ও কারিগর সৃষ্টি করিতেছে। এই সকল কর্মী দ্বারাই দেশের নানাবিধ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে। ইহাদের প্রশ্রয় ও বৃত্তিমত্তা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি সফল হওয়া অসম্ভব।

তিনি বলেন, এই বিদ্যালয়তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। মানুষের অন্ত-নিহিত মানবতাকে বিকশিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানবধর্মী কোন বিশেষ ধরনের মানুষ নহে, প্রত্যেক মানুষই তাহার স্বীয় ক্ষেত্রে মানবধর্মী। মানুষের শিক্ষা বা তাহার ব্যবহারিক বৃত্তি এই মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। মানুষ যে কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার মানবধর্ম কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। মানুষ হইতে, মানুষের বৃত্তি হইতে মানুষের মনুষ্যত্ব শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সর্বতোভাবে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করা, অর্থাৎ মানবতার সৃষ্টি করাই বর্তমান ভারতের শিক্ষার আদর্শ। এই মনুষ্যত্বকে বিকাশ করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। কারণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সম্ভব নহে। ব্যক্তিকে ধরু করিয়া সমস্তির কোম, উন্নতি কল্পনা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে শিক্ষা, যে পরিকল্পনা মানুষের আত্মাকে বিনষ্ট করিয়া সমাজের প্রগতি কামনা করে, সেই পরিকল্পনাকে সম্ভাবজনক বলা চলে না।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রগণ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, প্রগতিশীল দেশগুলিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা ব্যতীত তাহাদের অল্প কোন কর্তব্য নাই তবে তাহাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রমাণিত হইবে। অল্প দেশ আমাদের অগ্রগতির দিতে পারে, কিন্তু সে দেশ ও এদেশের জাতীয় আদর্শের পথ নির্দেশ করিতে পারে না। আমাদের সংস্কার, আমাদের কৃষ্টি হইতেই আমাদের জাতীয় আদর্শকে উদ্ধৃত করিতে হইবে।

এই আদর্শ কি তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, ভারতীয় জাতীয় পতাকাই ভারতীয় জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক। পতাকার মধ্যস্থলে অবস্থিত চক্র জীবনের অগ্রগতির প্রতীক। জগৎ পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনই প্রগতির নিদর্শন। মানুষকে এই গতিবেগের সহিত সম পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। পতাকার চক্রটি খেত-পটভূমিকার উপর অবস্থিত। খেত অনন্ত কালের প্রতীক। অনন্তের পটভূমিকার সংসার চক্র আবর্তিত হইতেছে। ইহাকে ভুলিলে চলিবে না—মনে রাখিতে হইবে জীবনের এখানই সমাপ্তি নয়, জীবন অনন্ত কালের। পতাকার গৈরিক অংশ ত্যাগ ও সংযমের

নিদর্শন। ভাগ ও সংযম দ্বারা লোভকে জয় করিয়া জীবনকে সুশৃঙ্খল করিতে হইবে। হরিদ্রাংশ সমৃদ্ধির প্রতীক। এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধিতে, প্রাচুর্য্যে আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে। জাতীয় পতাকার এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ।

খাদ্য

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ তাঁহার অভিভাষণে একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, “আমরা বহুবার বহুভাবে ফসল বৃদ্ধি ও ভূমি-সংস্কারের কথা শুনিতেছি, তথাপি প্রতি বৎসরই সমস্ত লক্ষ টন খাদ্য-দ্রব্য আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে।”

এই প্রশ্নটি এমন একটি স্থান হইতে করা হইয়াছে যাহা রাজনৈতিক দলাদলির বহু উর্দ্ধে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে।

গত চারি বৎসরে বাংলার খাদ্যব্যবস্থা এমন এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সমস্ত বিষয়টির আত্মপরীক্ষা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী জাতিকে এক মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। কেবলমাত্র মৌখিক আক্ষেপ করিয়া বা সরকারের ক্রটিবহুল খাদ্য-ব্যবস্থাকে দোষারোপ করিয়া কর্তব্য সমাধা করিলে আঁজ আর চলিবে না। দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আজ দেশের কেন এ অবস্থা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের উপায় স্থির করিতে হইবে। কারণ এ সমস্তা কোন প্রেয়ী বা দল বিশেষের নহে, ইহা আজ সমগ্র দেশবাসী প্রত্যেকের। নানা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার কথা শুনিয়াও কেন যে আমাদের খাদ্য আমদানী করিতে হয় তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া এবং যাহারা ইহার জন্ত দায়ী তাহাদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

যুদ্ধের মধ্য হইতেই আমাদের খাদ্যভাব দেখা দিয়াছে এবং ভারত বিভাগের পর হইতে আমরা খাদ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরের দয়া ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি। সরকারী মহলের অভিমত এই যে, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করিতে পারি না এবং যতটুকুও আমরা উৎপন্ন করিতে পারি তাহাও প্রকৃতির বিমুখতার ব্যাহত হইতেছে, ফলে আমাদের খাদ্যের জন্ত বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। আর এই খাদ্য ঘাটতির জন্তই আমাদের কাপড়ের অভাবও ঘুচিতেছে না। খাদ্য ডলার অঞ্চল হইতেই বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ডলারের সঞ্চয় কম, সুতরাং ডলার উপার্জন করিতে আমাদের কাপড় রপ্তানী করিতে হয়।

দেখা যাইতেছে, খাদ্য সমস্তা আমাদের অক্টোপাসের মত

আঠেপুঠে জড়াইয়া ধরিয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক বন্নিয়াদই এই খাদ্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া আছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা।

আমাদের দেশে চাষের জমির পরিমাণ বাড়াইবার উপায় কম আছে। সুতরাং উৎপাদন বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ জমি বর্তমানে চাষ হইতেছে তাহাকেই আরও ভাল ভাবে চাষ করা দরকার। অর্থাৎ, এই জমিতে ভাল সার, বীজ ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া যদি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির দ্বারা চাষ করা হয় তবে ফসল বাড়ানো যাইতে পারে। এছাড়া যে সকল জমিতে জলাভাব নাই সেখানেই প্রথমে কাজ শুরু করা আবশ্যক। কারণ এসব জমিতে জলের জন্ত বড় বড় প্রায়নের অপেক্ষা করিতে হইবে না।

এখানে দরকার কিছু ছোট ছোট খাল, পুকুর অল্পখার কয়েক শত টিউবওয়েল, আর ভাল জাতীয় বীজ ও সার। ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ রহিয়াছে এবং সার ও বীজ বণ্টনের ভার আছে কৃষি বিভাগের উপর। কলিকাতার দক্ষিণে সোনারপুর হইতে ক্যানিংয়ের মধ্যে এক লক্ষ বিঘা জমি জলে ডুবিয়া অনাবাদী হইয়া রহিয়াছে। চার বৎসরের মধ্যে একটা খাল কাটিয়া এই জল নিকাশ করা গেল না। এই জমি পরিত্যক্ত করিয়া সার দিয়া চাষ করিলে এখানে ৩০ লক্ষ মণ ধান পাওয়া যাইত। বর্তমান শহরের আদালতের সংলগ্ন বায়ুইবিলের মাঠে বিঘা প্রতি ১৮ মণ ধান ফলিত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বাকারপুর ডাকার পর এস্থান হইতে মাটি লওয়ায় উহা জলাকীর্ণ হয় এবং এখানে ৮৯ বৎসর যাবৎ ফসল ফলে নাই। ইহার ব্যবস্থা সেচ বিভাগ করিতে পারিত। ইহাতে বিশেষ অর্থ বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে।

সার ও বীজের ক্ষেত্রেও একই ইতিহাস। ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের নামে প্রতিটি বৎসর কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে কিন্তু ফল কিছুই পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতে কোন প্রকার নিয়ম বা পরিকল্পনা আছে বলিয়া মনে হয়। পর পর দুই তিন বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খরচের বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। কখনও গমের বীজেই বেশী ব্যয় হইল, কখনও ডালের বীজ দেওয়া হইল, কখনও বা ট্যাপিওকা চারাই বিলি করা হইল হাজার হাজার টাকার। কখনও পারশিয়ান চাকার গুণগান আরম্ভ হইল, কখনও আবার পাম্পের শ্রেষ্ঠত্বই প্রচার শুরু হইল। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হয়, যে মাটিতে যে শস্ত ভাল উৎপন্ন হয় সেখানে সেই বীজ না দিয়া অল্প বীজ দিলে তাহাতে ফসল উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি পাইবে? তার পর কখনও বা বীজ আছে, সার নাই। সারের পারমিট মিলিল কিন্তু মাল নাই—বা মাল পাইতে চাষের সময় উত্তীর্ণ হইয়া

গিয়াছে, ভাগ্যক্রমে যদি দারও পাওয়া যায় ত ভাল নাই—
তখন আবার ক্যানেল কর্তৃপক্ষ জল ছাড়িতে নারাজ। এসব
কারণে অর্থ বামের জলের মত খরচ হইতেছে, কিন্তু খাজরূপ
পরমাণের সঞ্চয় হইতেছে না।

চাষের জমি বাড়ানো যায় কি না সে সম্বন্ধেও ভাবিবার
কথা আছে। পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ
১৪,২৬,০০০ একর। ইহার বেশীর ভাগ জমি অনাবাদী
ধাকার কারণে জলাভাব ও আগাছা জাতীয় জঙ্গল। জলাভাব
উপরোক্ত উপায়ে দূর করা যাইতে পারে। আগাছা
নির্মূল করিবার যন্ত্র ট্রাক্টর। এ সকল জমি যন্ত্রের সাহায্যে
অতি অল্প সময়ে চাষের উপযোগী করা যায়। রাণাঘাট
অঞ্চলে বহু জমি এই ভাবে পতিত আছে। এই সকল জমিতে
কিছু উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন হইয়াছে। তাহারা সেখানে
চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না ঐ দুই কারণে।
নদীরা, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রাক্টর দ্বারা চাষের
উপযুক্ত এক চাপে ৩৪ শত বিঘা জমি অনেক আছে।
ই-আই-আর, বি-এন-আর প্রভৃতি রেল লাইনের দুই দিকে
গবমেণ্টের লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে।
চাষের ব্যবস্থা করিলে উহার কসলেই দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ
হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র খাদ্য
উৎপাদন বাড়িলেই আমাদের কুলাইয়া যাইত। লাখখানেক
একর এখনিই কাছে লাগানো যায় এরূপ জমি পশ্চিমবঙ্গে
আছে কিন্তু সরকারের হাতে ট্রাক্টর আছে মাত্র ৩১টি। ১৯৫০
সাল পর্যন্ত ছিল মাত্র ১০টি, তারও ৫টির লাজল ছিল না। এই
জমিতে উন্নত ধরনের চাষ করিলে ২০ লক্ষ মণ ধান বাড়িত।

ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের ব্যয়ের আরেকটি বিশেষত্ব এই
যে, কর্মচারী, দারোয়ান, চাপরাশি, তাহাদের ভাতা, যাতায়াত
খরচ, আপিসের বাড়ী ইত্যাদিতেই প্রায় বেশীর ভাগ বাহির
হইয়া যায়। অবশিষ্ট মাথা থাকে তাহাতে এটা হয়ত ওটা
হয় না। খাজ বিভাগের এবং কৃষি বিভাগের বাজেটে অত্যন্ত
বিভাগের ছায় কর্মচারীদের বেতন ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করা
থাকিলে খরচ সুবিধে সুবিধা হইত। কিন্তু উন্নয়ন পরি-
কল্পনার খরচ ঢালা হিসাবে দেখানো হয়। তাহাতে খরচের
বিশদ হিসাব পাওয়া যায় না। ফল হইতেছে কি না তাহাও
বুঝা যায় না।

বাংলাদেশে প্রতি একরে চাউল সাধারণ জমিতে ১৮ মণ
জন্মে। খাজমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বলিতেছেন, প্রতি একর জমিতে
১৫ মণ উৎপন্ন হয়।

জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের পরে ধানচাষ বহু গুণ বাড়াইয়া
ফেলিয়াছে। চীনের উৎপাদন আমাদের আড়াই কি তিন গুণ।
ইহারি এত অল্প সময়ে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বজ্রার মধ্যে
যাহা করিতে পারিতেছে আমরা কেন তাহা পারিতেছি না।

দীর্ঘ মেয়াদী জটিল পরিকল্পনার পিছনে যে সময় ও অর্থ অপচয়
করিতেছি তাহার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা আন্তরিকতার
সহিত আরম্ভ করিয়া দিলে এত দিনে অন্ততঃ বাংলার অন-
সমস্তা দূর হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বৃহৎ কোন প্রায়
সম্পূর্ণ ভাবে করিতে গেলে যথেষ্ট সময় ও অর্থের প্রয়োজন।
কিন্তু আমাদের যখন অপেক্ষা করার মত সময় ও ব্যয় করার
মত বেশী অর্থ নাই তখন অপেক্ষাকৃত অল্প খরচের ব্যবস্থাই
গ্রহণ করা উচিত ছিল। গবমেণ্ট যদি এতদিন বছরে একটি
করিয়া জেলারও উন্নতিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেন তাহা
হইলে পাঁচটি জেলাকে অভাব মুক্ত করিতে পারিতেন। আজ
নির্বাচনের মুহূর্ত্তে দেশবাসীর কাছে বলিবার কিছু কথা তাহা-
দের থাকিত। চার বৎসরে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা দুঃসাধ্য কথা
মানি, কিন্তু প্রতি বৎসর ফসল বৃদ্ধির নামে যে বিপুল অর্থব্যয়
হইয়াছে তাহা দ্বারা বছরে দুইটি জেলার উন্নতি করাও শু
অসাধ্য ছিল না। তাহা হইলে এই চার-পাঁচ বৎসরে বাংলার
চেহারা কিরিয়া যাইত।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

দক্ষিণ ব্রিটিশ ইন্সুরমেশন সার্ভিসের একটি পুস্তিকা
আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে পৃষ্ণিবীর খাদ্য ব্যবস্থার
একটি ভাষাপূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ইহার এক অংশে
বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু দৈনিক ক্যালোরি ও প্রোটিন জাতীয়
খাদ্য বরাদ্দের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আমরা কয়েকটি
বিশেষ দেশের হিসাব এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

মাথাপিছু দৈনিক ক্যালোরি ও প্রোটিনের বরাদ্দ :

দেশ	ক্যালোরি		প্রোটিন	
	১৯৪১-৫০-এর	তুলনায়	১৯৪১-৫০-এর	তুলনায়
	১৯৫০-৫১		১৯৫০-৫১	
	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা
	১৯৪১-৫০	পরিবর্তন	১৯৪১-৫০	পরিবর্তন
দেশ	দৈনিক বরাদ্দ		দৈনিক বরাদ্দ	
কানাডা	৩,১৩০	+ ১.৫	৯৩	+ ১
আমেরিকা	৩,১৭০	+ ১.৫	৯১	+ ১
আরজেন্টাইন	৩,১৬৯	— ১	১০২.৬	— ১
বেলজিয়াম	২,৮৯৫	+ ১	৮৫	—
ডেনমার্ক	৩,১৬০	+ ৪	১০২	— ২
সুইজারল্যান্ড	৩,১৯৫	+ ৩	৯৮	+ ৩
চীন	২,০২০	+ ১০	৬২	+ ১০
ইন্দোনেশিয়া	১,৮৮০	+ ৩	৪২	+ ২
জাপান	২,১০০	+ ২	৫৩	+ ২
তুরস্ক	২,৩৪০	+ ৭	৭৩.৫	+ ৮
ভারতবর্ষ	১,৭০০	— ৬	৪৩	— ৫

কেবলমাত্র আরজেন্টাইন ব্যতীত ইউরো-আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশেই ১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ১৯৫০-৫১ সালে খাদ্যের উন্নতি হইয়াছে। আরজেন্টাইনার অধিবাসীরা মেদ-বহুল হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া তাহাদের কিছু কমানো হইয়াছে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া সকল দেশেই খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো হইয়াছে। চীন সমস্ত পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া ও জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভারতের অপেক্ষা শান্ত বলিয়া শোনা যায় না। সেখানেও তাহারা জাতির স্বাস্থ্যকে বিম্বৃত হয় নাই। পুষ্টির ঋতুর অভাবের অর্থ যে জাতির মৃত্যু, বিপন্ন হইলেও ইন্দোনেশিয়া তাহা ভাল ভাবেই জানে। ভারতবর্ষে ক্যালোরি কমিয়াছে শতকরা ছয় ভাগ আর প্রোটিন শতকরা পাঁচ ভাগ। আমাদের প্রত্যেকের সপ্তাহে ৩'৫৬ সের খাদ্য দরকার হয়। রেশনের বর্তমান বরাদ্দ সপ্তাহে ২'৬২ সের এবং ইহাতেও খাদ্যপ্রাণ কতটুকু থাকিতেছে তাহাও উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে। ইহাতে জাতির স্বাস্থ্য যে দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে। রেশন-ব্যবস্থার পূর্বেই আমাদের পুষ্টির খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে মৃত্যুহার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। রেশন চালু হওয়ার পর তাহার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেষ।

ভোর কমিটির তদন্তে আমাদের স্বাস্থ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানা দরকার।

জীবন-মৃত্যুর তুলনামূলক ধতিমান

দেশ	মৃত্যুহার	শিশুমৃত্যু	জীবনের আশা	
			পুরুষ	স্ত্রী
নিউজিল্যান্ড	৯'১	৩১	৬৫'০৪	৬৭'৮৮
অস্ট্রেলিয়া	৯'৪	৩৮	৬৩'৪৮	৬৭'১৪
দক্ষিণ-আফ্রিকা	১০'১	৩৭	৫৭'৭৮	৬১'৪৮
কানাডা	১০'২	৭৬	৫৯'৩২	৬১'৫৯
আমেরিকা	১১'২	৫৪	৫৯'১২	৬২'৬৭
ব্রিটেন	১২'৪	৫৮	৫৮'৭৫	৬২'৮৮
জাপান	১৭	১০৬	৪৪'৮২	৪৬'৫৪
ভারতবর্ষ	২২'৪	১৬২	২৬'৯১	২৬'৫৬

ভারতে মৃত্যুহার ও বিশেষ করিয়া শিশু ও মেয়েদের মৃত্যু-হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক। প্রমুখদের অপুষ্টির খাদ্য গ্রহণ ও শিক্ষিত বাইরের অভাব ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

শিশু (জাতির ভবিষ্যৎ) মৃত্যু হার

এক বৎসরের	১-৫	৫-১০
কম বয়স	বৎসর	বৎসর
ভারতবর্ষ	২৪'৩	১৮'৬
ব্রিটেন	৬'৮	২'১

হৃৎস্রবণের অভাব ও মাতার স্বাস্থ্যহীনতাই ইহার জন্য দায়ী। আমাদের দেশে শিশুর জন্য দুধ পাওয়া দুষ্কর, যাহাও পাওয়া যায় তাহা দুগ্ধল্য ও ভেজালমিশ্রিত।

প্রমুখ-মৃত্যুর সঠিক হিসাব আজ পর্যন্ত হয় নাই। ভোর কমিটির মতে মোট প্রমুখ-মৃত্যুর সংখ্যা বার্ষিক দুই লক্ষ ও প্রসবজনিত রোগপ্রভা জননীর সংখ্যা কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ।

সাধারণভাবে রোগের প্রকোপের নমুনা এইরূপ :

(১৯৩২-৪১ এই কয় বৎসরের গড়পড়তা বার্ষিক হিসাব)

কলেরা—	১,৪৪,৯২৪
বসন্ত—	৬৯,৪৭৪
শ্লেগ—	৩০,৯৩২
জ্বর (প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া)—	৩৬,২২,৮৬৯
আমাশয় ও পেটের অসুখ—	২,৬১,৯২৪
ষন্মা—	৪,৭১,৮০২
অন্যান্য—	১৫,৯৯,৪৯০

মোট— ৬২,০১,৪১৫

অবশ্য এই মৃত্যুহার সম্পূর্ণ নহে। আমাদের গ্রামবাসীরা মরিলে পরে সংবাদ লিখাইবে এতদূর শিক্ষিত এখনও হয় নাই। প্রকৃত মৃত্যুর হার সঠিক সংগ্রহ করা কঠিন। ভোর কমিটিও করিতে পারেন নাই।

রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে ম্যালেরিয়ার মৃত্যু লজ্জাজনক ব্যাপার। ইহার একমাত্র চিকিৎসা কুইনাইন। একজন রোগীর জন্য ৭৫ গ্রেণ কুইনাইন প্রয়োজন মরিলে মোট কুইনাইন দরকার বৎসরে ষোল লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে বড়জোর দুই লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন আমরা পাই। ভারতবর্ষে কালিম্পং এবং নীলগিরিতে আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কুইনাইন প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু কিনাবুরো নামক একটি ডাচ কোম্পানীর স্বার্থে ইংরেজ ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে এদেশে কুইনাইনের পর্যাপ্ত চাহ হইতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হয় তাহা মৎসামান্য এবং কংগ্রেস-সরকার উহার মূল্যও বাড়াইয়াছেন এবং শক্তিও হ্রাস করিয়াছেন। কিনাবুরো কোম্পানী যথেষ্ট দামে জাভার কুইনাইন বিক্রয় করিতেছে। এঁস কেবলমাত্র ডি ডি টি মডাইয়া ম্যালেরিয়া ভাড়াইয়াছে। আমাদের দেশ সরকার সেভাবে যদি অন্ততঃ বৎসরে একটি জেলার ম্যালেরিয়াও দূর করিতেন তাহা হইলেও এত দিনে অনেক কাজ হইত। ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত ১০ কোটি লোকের মধ্যে ১০ লক্ষ মরে বটে, কিন্তু ঐ ব্যাধিবাকী ৯ কোটি ৯০ লক্ষ লোককে জীবন মৃত করিয়া রাখে। ষন্মা, কলেরা, বসন্ত, আমাশয় প্রভৃতি যে কোন রোগের সংস্পর্শে আসিলেই ইহারা আক্রান্ত হয় এবং মরিয়া যায়। কিন্তু দেশের লোক হৃৎকপিড়িত ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া থাকিলেই তাহাদের শোষণ সহজ ও সম্ভব হয়।

অসুস্থ রোগের অবস্থাও কম উন্নত নহে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর নিম্নোক্ত হিসাব বাহির হইয়াছিল :

প্রতি এক লক্ষ লোকে মৃত্যুহার

প্যারিস	১৭৭	কামপুর	৪৩২
মেজিকো	১৭০	লক্ষৌ	৪১৯
নিউইয়র্ক	১২৮	মাদ্রাজ	২৯০
বার্লিন	১২০	কলিকাতা	২৩০
লন্ডন	৯৬	বোম্বাই	১৪০

ডাঃ বেঞ্জামিনের মতে বৎসরে গড়ে ৫ লক্ষ লোক ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগে মারা যায়। কিন্তু তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থা এইরূপ :

যক্ষ্মা হাসপাতাল ও আন্টিটোরিকাম

আন্টিটোরিকাম		যক্ষ্মা হাসপাতাল		অল্প হাসপাতাল	
সংখ্যা	বেড	সংখ্যা	বেড	সংখ্যা	বেড
আসাম	১	২৮	—	১০	২৮
বাংলা	২	৫১	৩	২৭	২৪৭
বিহার	১	১৩০	—	১০	৯৭
বোম্বাই	৮	৫৯৩	৫	১৫	২০২
মধ্যপ্রদেশ	১	১৫১	—	৭	৯১
মাদ্রাজ	৫	৫১৩	১	১৭	৪০০
উজ্জিন	—	—	—	৩	১৩
পঞ্জাব	৯	৬৫৪	৩	১৪	৩৪৮
উত্তর প্রদেশ	৫	২৯৫	—	৮	১৮৪

স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্যহীনতার কারণ সম্বন্ধে ভোর কমিটি বলিতেছেন, “দেশের অধিকাংশ স্থানেই পরিচ্ছন্নতা খুব কম, জনসাধারণের একটি বড় অংশ পুষ্টির খাদ্যের অভাবে বীর্ষহীন, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম, শিক্ষার অভাবে দেশের লোকে অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক এবং রোগ সম্বন্ধে উদাসীন।” যে সকল গ্রামে বীজাণুযুক্ত পানীয় জল, ময়লা জল অপসারণের জন্য পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে তাহাকেই আমরা স্বাস্থ্যকর গ্রাম বলিতে পারি। শতকরা একটি গ্রামেও এই ব্যবস্থা নাই। ডাঃ বিধান রায় পশ্চিম-বাংলার ৭০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৮১টিতে ৮১ সেট ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার নাস বসাইয়াছেন। কিন্তু এখানে অভাব আছে কেবল ঔষধ এবং পথের।

মফসলের মেডিক্যাল স্কুলগুলি উন্নতি গিয়াছে। ঔষধ আরও সুপ্রাপ্য ও স্বল্পমূল্য হইয়াছে। টাইফয়েডের অব্যর্থ ঔষধ ক্লোরোফর্মাইসিন পাকিস্থানে আট টাকায় পাওয়া যায় (শুষ্ক শতকরা ৫—৭৯ ভাগ), কলিকাতায় উহারই দাম ৩২ টাকা (শুষ্ক শতকরা ৪০ ভাগ)। গরীবের পক্ষে এই রোগের

চিকিৎসা অসম্ভব। বাংলাদেশে মফসলে মেডিক্যাল স্কুল থাকায় গ্রামের লোকের ঘেটু হুবিধা ছিল, সেগুলি তুলিয়া দেওয়ার আরও অনুবিধা হইয়াছে। একটু কঠিন রোগ হইলেই মফসলে চিকিৎসার আর কোন উপায় আত্মকাল না থাকায় বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। এখানে হাসপাতালে স্থানান্তর, বাহিরে জ্বরগা পাওয়া কঠিন, ডাক্তারের ফী, মলমূত্র পরীক্ষা, এন্ডরে ইত্যাদির ফী অধিক। অর্থাৎ চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া অধিকাংশ চিকিৎসা-যোগ্য রোগে লোক মরিতেছে। সরকারী হাসপাতালের ফ্রি বেডের সংখ্যা শতকরা ৬৬ ভাগ কমানো হইয়াছে। যে যে হাসপাতালে ‘এণ্ডাউমেন্ট’ হইতে ফ্রি বেডের ব্যবস্থা—(School of Tropical Medicine, Lake Hospital প্রভৃতি) ছিল তাহা অর্থকরী করা হইয়াছে।

ডিসপেন্সারিতে আউট-ডোর রোগীদের কি ভাবে দেখা হয় ভৎসনকে ভোর কমিটি বলিতেছেন যে, এক ঘণ্টায় গড়ে ৭৫ জনকে দেখা হয়, অর্থাৎ এক জন রোগী দেখিতে ডাক্তার ৪৮ সেকেন্ড মাত্র সময় দিতে পারেন। এই তো রোগী দেখার নয়না। ঔষধের অবস্থাও ভয়ঙ্কর। দুই-তিনটা ষ্টক মিকশার ছাড়া বিশেষ কোন ঔষধ ডিসপেন্সারিতে থাকে না।

মাকে মাকে বেতার বক্তৃতায় বা ব্যবস্থা পরিষদে পুষ্টির খাদ্যের তালিকা দিয়া উহা খাওয়ার পরামর্শ অনেক দিয়া থাকেন। কিন্তু একথা বুঝেন না যে মুষ্টিমেষ কয়েক জন ভাগ্যবান ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এই বাজারে এক সঙ্গে ছাচ, মাছ, মাংস, ডিম, মাখন সর্দিবিধ খাদ্য গ্রহণ করা কত অসম্ভব। খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীন খাদ্যের বহুদিন মাংস ব্যবহারই দেশের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ।

দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে সরকারের দরদ কত তাহা যে-কোন বৎসরের “চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার বরাদ্দ” বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়ে।

নিম্নে ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে এই বাবদে কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :

১৯৪৯-৫০	১৯৪৯-৫০	১৯৪৯-৫০
বাজেট	সংশোধিত	অডিটকরা ধরিত
টাকা	টাকা	টাকা
লক্ষ হাজার	লক্ষ হাজার	

গ্রাম্য ডিসপেন্সারি ও

হেলথ ইউনিট ৮০ — ৭১ ৪৫ ২৩,৫২,৮৬৪

চালু হাসপাতালের

উন্নতি ১৫ — ৭ ৮২ ৫,৫৮,১৬২

কলিকাতার সংক্রামক ব্যাধি

চিকিৎসার হাসপাতাল ৩ — ২ ৫০ ১৬,১০০

নতুন এন্ডোলজ সার্ভিস ৬ — ১৩ ৬৮ ৪৫,৪৫৯

যন্ত্রা হাসপাতাল	১৩ লক্ষ — ১১ ২৭ ২,৫১,৪৯৫
নীলরতন সরকার মেডিকেল	
স্কুল	১০ — ৪ ৪০ ২,৪২,৭২৫
ফার্মেসি শিক্ষা	২৥ — ৫০ ২,১০০
হেল্প এডুকেশন	১
জাশনাল ইনফরমেরির যন্ত্রা-রোগীদের	
অস্ত্র সরানো (২০০)	৪ ৫০
আয়ুর্বেদিক কলেজ	১৥ ৫০ ৫০,০০০
দাঁতের মেডিকেল কলেজ	৩ — ১
প্রশুতি ও শিশু কল্যাণ	২ ১ ৫২,২০১
কুষ্ঠ চিকিৎসা	২ ২৪ ১ ৮১ ৩০,৯৫০
ম্যালেরিয়া নিবারণ	২

বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয় কার্যক্ষেত্রে তাহার অনেক কম খরচা হয়। যতটুকু খরচ হয় তাহারও বেশীর ভাগ ‘এন্টারপ্রাইজমেন্ট’ ব্যবদই যায়, ঔষধ ও পথ্যের অবস্থা তো দেখাই গেল।

দেশের সর্বক্ষেত্রে যদি এই ভাবে কাজ চলিতে থাকে তাহা হইলে জাতির ধ্বংসের আর বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভারত-মার্কিন চুক্তি

গত ২১শে পৌষ দিল্লী হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :

“ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত কারিগরী চুক্তির পূর্ণ বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল :—১৯৫০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারত-সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত কারিগরীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধীন মতবাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অদৃঢ় অর্থনৈতিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্রুত ভারতের অসংবদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও এই চুক্তিতে সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং স্বীকৃত হইয়াছে যে, উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যন্ত্রবিদ্যা, যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ ও কারিগরী প্রণালী সম্পর্কে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে উভয় দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর। ভারত-সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা বৃদ্ধির জন্য এবং বিশ্বশান্তি ও রক্ষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রেযারেশির ভাব দূর করার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যবস্থা অবলম্বনকল্পে একযোগে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছে—ইহা বিবেচনা করিয়া কারিগরী পরিকল্পনা সহযোগিতা এবং ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচী নিম্নোক্ত উপায়ে কার্যে পরিণত করিতে সম্মত হইয়াছে :—

১নং অমুচ্ছেদ—এতদ্বারা ভারত-সরকার যে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন ঐগুলি যথাবিধি নির্দিষ্ট একজন মন্ত্রীর সাহায্যে পালিত হইবে। এতদ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাধ্য-বাধকতার আবদ্ধ হইলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিচালন পরিষদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান) মারফত তাহা কার্যকর হইবে।

(১) ভারতে কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য উক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদের ভারতস্থ প্রতিনিধিই কারিগরী সহযোগিতা বিভাগের ডিরেক্টররূপে কাজ করিবেন। তিনি এবং তাঁহার বিভাগের কর্মচারীসমূহ ভারতে মার্কিন কূটনৈতিক কর্মচারীদেরই অন্তর্গত। কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কূটনৈতিক কর্মচারীসমূহ যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন উক্ত অধিকারিক এবং তাঁহার কর্মচারীগণই তদনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(২) কারিগরী ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ-বিশেষজ্ঞ-দিক্কে লইয়া গঠিত একটি প্রত্যক্ষ সহযোগী ও সাহায্যকারী দল প্রেরণ করিবেন। এই সাহায্যকারী দল উক্ত (ডিরেক্টরের) পরিচালনাধীনে কাজ করিবেন। মার্কিন সরকারই ডিরেক্টর এবং বিশেষজ্ঞগণকে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু ভারত-সরকারের নিকট এই সকল ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। যে সমস্ত পরিকল্পনা সাহায্য পাইবে সেগুলি কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে সহযোগিতা এবং ইহা পরিদর্শনের জন্য ভারত-সরকার উক্ত কারিগরী পরিকল্পনা সহযোগিতা সম্পর্কিত ডিরেক্টর এবং সেরজমিন সাহায্যকারী বিশেষজ্ঞ দলকে যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা দিবেন।

(৩) ভারত-সরকার স্বীকার করিতেছেন যে, যেহেতু অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিচালন পরিষদ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের আদালতে অভিযুক্ত না হইবার সুবিধা প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ সুবিধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিগণ ভোগ করিয়া থাকেন এই পরিষদের লোকজনও তাহা ভোগ করিবেন।

২নং অমুচ্ছেদ—উভয় গবর্নেন্ট স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা তহবিল নামে একটি অর্থভাণ্ডার সৃষ্ট হইবে। এই তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত উভয় পক্ষের অমুমোদিত পরিকল্পনাগুলির ব্যয় নির্বাহার্থে ৫ কোটি ডলার জমা দিবেন। ভারত-সরকার কর্তৃক যথাবিধি নিযুক্ত অফিসার এবং (মার্কিন) কারিগরী সহযোগিতা পরিচালন সম্পর্কিত ডিরেক্টর কর্তৃক যোজ্যভাবে এই তহবিলের অর্থ কারিগরী সহযোগিতা সম্পর্কিত অমুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ

কার্যে পরিণত করার জন্য ব্যবহৃত হইবে। উক্ত অমুচ্ছেদের দ্বিতীয় নিবন্ধে বর্ণিত বিশদ অমুখ্যায়ী এই তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ হইবে। উক্ত অমুচ্ছেদের এই ভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে, (ক) অর্থভাণ্ডার হইতে সম্মিলিত অর্থভাণ্ডারে অর্থ হস্তান্তর অথবা অন্যভাবে ব্যয় অনুমোদন করা চলিবে। উভয় গবর্নমেন্টের সম্মতিক্রমে কয়েকটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ঐগুলির জন্য ভারত-সরকারের অনুমোদিত হারে ঋণ বাবদ এই অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার জন্য পঞ্চম অমুচ্ছেদে বর্ণিত চুক্তির সর্তাবলী অমুখ্যায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। এই চুক্তি অমুখ্যায়ী যে অর্থ বরাদ্দ হইবে তৎসম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার (ক) অর্থভাণ্ডারে যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া হইবে সে সম্পর্কে ভারত-সরকারকে মাঝে মাঝে জানাইবেন।

ভারত-সরকারের একটি বিশেষ উন্নয়ন তহবিল রহিয়াছে। ইহার পরিমাণ পঁচিশ কোটি টাকারও বেশী। ভারত-সরকার সম্মত হইতেছেন যে, ভারত-সরকার এককভাবে অথবা ভারতের রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতার প্রত্যেকটি ঋণ-বিধি অনুমোদিত পরিকল্পনার জন্ত স্থিরীকৃত হারে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্ত 'খ' তহবিল হইতে অর্থব্যয় অনুমোদন করিবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত উভয় সরকারের অর্থায়নকালে যদিও উক্ত তহবিল গঠিত হইবে, কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ ও তাহা কার্যে পরিণত করার ব্যাপারটি ভারতের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থার হস্তে ছাড় থাকিবে। চুক্তির সর্ব অমুখ্যায়ী ব্যবস্থার মার্কিন পরিচালক যিনি হইবেন, তিনি ভারতস্থ মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধি-মণ্ডলীভুক্ত হিসাবে থাকিবেন এবং পরিকল্পনা নির্ধারণ ও তাহা কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবেন।

৩নং অমুচ্ছেদ—(১) উভয় গবর্নমেন্ট সম্মত হইতেছেন যে, ভারতের বাহির হইতে উভয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত মাল, উপকরণ ও ঠিকাদার সংগ্রহের জন্ত 'ক' তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্টের দেয় অর্থের একাংশ ভারত গবর্নমেন্টের সম্মতিক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে; এইভাবে যে অর্থ রাখিয়া দেওয়া হইবে তাহা 'ক' তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) পরিকল্পনাগুলির কাজ চালাইবার জন্য যে অর্থ বিভরিত হইবে, তাহা সাহায্য অথবা ঋণ অথবা একসঙ্গে সাহায্য ও ঋণ হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। যদি ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়, তবে তাহা টাকার ভারত গবর্নমেন্টকে প্রত্যর্পণের সর্বো দিতে হইবে; এইভাবে ঋণ শোধ হইতে ভারত-সরকার যে অর্থ পাইবেন এবং এই কারিগরী সহ-

যোগিতা চুক্তি অনুসারে আমদানীকৃত বিক্রয়যোগ্য মাল বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা 'ব' তহবিলে জমা দিতে হইবে। এই চুক্তি যতকাল বলবৎ থাকিবে, ততকাল একমাত্র উভয় গবর্নমেন্টের মধ্যে স্বীকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৩) উভয় গবর্নমেন্ট সম্মত হইতেছেন যে, পরিকল্পনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্ট যে সকল অভিজ্ঞ কারিগর নিযুক্ত করিবেন, তাহাদের সকলের বেতন ও ব্যয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্ট যে সকল ভারতীয়কে ভারতের বাহিরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দিবে তাহাদের বাহিরে জমণের ব্যয়, ছাত্র বেতন, ও অন্যান্য খরচ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত যে কারিগরী সাহায্য দিবে তাহার ব্যয় 'ক' তহবিলে প্রদেয় অর্থ হইতে না দিয়া অন্য তহবিল হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বহন করিবেন। অপরপক্ষে ভারত গবর্নমেন্ট প্রত্যেক ক্ষেত্রে আবশ্যক মত ও চুক্তি অনুসারে স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা দিবে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত চুক্তি অনুসারে যে সকল কারিগর ভারতে আসিবেন তাহাদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র ও যন্ত্রপাতিকে কাষ্টম শুদ্ধ হইতে অব্যাহতি দিবে।

৪নং অমুচ্ছেদ—(১) একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটি একটি সাধারণ পরিস্থিতি স্থির করিবেন এবং কারিগরী সহযোগিতার চুক্তি অমুখ্যায়ী যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে, সেগুলি তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিবেন।

ভারত গবর্নমেন্ট এই কমিটির সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের সংখ্যা সাত জনের বেশী হইবে না।

১। এই কমিটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্ত দায়ী থাকিবেন। তাহারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে কাজ করিবেন।

জনকল্যাণ পরিকল্পনা

উভয় সরকারের মধ্যে চুক্তি-অমুখ্যায়ী সাময়িকভাবে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত তহবিলের অর্থ সাহায্যে যে সকল পরিকল্পনার কাজ হইবে, তন্মধ্যে একটি হইবে জনকল্যাণ পরিকল্পনা।

জনকল্যাণ পরিকল্পনা অমুখ্যায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫০টি শহর-পল্লী উন্নয়ন অঞ্চল গঠিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চল ২ লক্ষ লোকের বসতিযুক্ত প্রায় ৩ শত গ্রাম লইয়া গঠিত হইবে। এইরূপ অনেকগুলি অঞ্চল মদী উন্নয়ন পরিকল্পনা এলাকায় এবং নলকূপ খনন পরিকল্পনা এলাকার সন্নিকটে গঠিত হইবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন যে, এইরূপ ভাবে মার্কিন ঋণ গ্রহণ করিলে আমাদের মার্কিনের প্রভাবে পড়িয়া তাহাদের মানাধি রাষ্ট্রনৈতিক কৌশলের

মধ্যে জড়াইয়া পড়িব, আমাদের “মিরপেক” নীতি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। যদি ইহাই আমাদের ধারণা হয়, তবে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া কোন শক্তি অর্জন করি নাই, এবং শত্রু তাহা বুঝি করিয়া নির্ভর হইবার সম্ভাবনা ঘূর কম। নিজের জাতি সম্বন্ধে এইরূপ হীন ধারণা আমাদের নাই এবং বৃদ্ধির ক্ষমতাও আমাদের জাতিগত মতে। রাজ-নীতির নানা কৌশল আমরা বুঝি ও শিখিতেছি।

যুদ্ধের অপরাধী

কোন ব্যক্তি মরহত্যা করিলে তার কাঁসী হয় বা যাবজ্জীবন তাহাকে কারাগারে কাটাতে হয়। বিজয়ীরা ১৯১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধ হইতে এক নতুন নিয়ম করিলেন যে, রাষ্ট্রপতি ও তাহার পরামর্শদাতারা যখন বিরাট মরহত্যার অপরাধে দোষী তখন তাহাদেরও কাঁসী দিতে হইবে। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লয়েড জর্জ। তিনি ঘৃণা তুলিলেন—“সত্যি উইলিয়মকে কাঁসী দিব” এবং এই প্রতিশ্রুতি-বৃদ্ধি প্রসার করিয়া যুদ্ধান্তে একটি ভোট-যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

সেইরূপ বিতীর মহাযুদ্ধের “হিটলারকে কাঁসী দিব”—

“মুসোলিনিকে কাঁসী দিব”—এইরূপ ধারণা লোকের মনে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইল, বিশেষ করিয়া কৃষিকায়। কিন্তু মিঃ চার্লিস এই বর্বরতার ব্যর্থতা দেখিয়াছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তের দাবি করিয়া যে লাভ হয় না তাহা দেখিয়াছেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে তেজাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় বিজিতকে টাকা ব্যয় দিয়া। ঠালিন কিন্তু এসব যুক্তি মানিতে চাহিলেন না। তিনি ভেহরান (ইরানের রাজধানী) নগরীতে কুজ-ডেপ্ট, চার্লিস ও ঠালিনের যা যুক্তি পরামর্শ হয় ১৯৪৪ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে, তাহাতে প্রস্তাব করেন যে নাৎসি দলের মেতা ও সাময়িক নেতৃবর্গকে কাঁসী দিতে হইবে। এই সারাস্বক প্রস্তাবের বিবরণ চার্লিসের “বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে” বাহির হইতেছে।

“নিউ ইয়র্ক টাইমস্” পত্রিকায় তার সার মর্ম অবলম্বন করিয়া কোন মার্কিন সাংবাদিক এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। চার্লিসের কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য তার অনুবাদ করিয়া দিলাম। “কথায় কথায় ঠালিন বলিলেন : ‘জার্মানীর সাময়িক নেতৃবর্গকে ধ্বংস করিতে হইবে; হিটলারের সমস্ত শক্তি নির্ভর করে এই ৫০,০০০ বিশেষজ্ঞের উপর। যদি তাহাদের বুদ্ধিহীন পাত্তিরা হরা যায়, তবে যুদ্ধের পরে তাহাদের গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে; এই ভাবে জার্মানীর সাময়িক শক্তি ধ্বংস করিয়া বিশ্বশান্তির পথ মুক্ত করিতে পারা যাইবে।’”

চার্লিস এই কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন কুজডেপ্ট ব্যাপারটি লঘু করিবার জন্য বলিলেন যে, ৫০,০০০

হাজার নয়, ৪৯,০০০ হাজারকে গুলি করিয়া মারিলেই চলিবে যদিও এলিয়ট কুজডেপ্ট ঠালিনের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সম্বর্জন করেন। ঠালিন ও মলোটভ চার্লিসকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—‘আমরা ঠাট্টা করিতে-ছিলাম মাত্র, ইত্যাদি, ইত্যাদি।’

চার্লিস এখন বলিতেছেন : “আমি ঠিকই ভাবিয়াছিলাম; ব্যাপার ঠাট্টা বিজ্ঞপের নয়।” এই সম্পর্কে লেখক পোলিশ সাময়িক কর্মচারীদের কথা তুলিয়াছেন। প্রায় ১৫২০ হাজার লোককে কাট্যম জঙ্গলে হত্যা করা হয়—নাৎসি হত্যাকাণ্ডের পর বাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন। ইতিপূর্বে বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে “কুলাকদের ধ্বংস” করিবার নামেও প্রায় ৩০ লক্ষ মরনারীকে না খাইতে দিয়া মরণের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ঠালিনের যুক্তি ছিল একটা, “কুলাকদের (সম্পন্ন চাষীদের) প্ররোচনায় এই লোকসমষ্টি নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অচল করিবার জন্য তাহাদের গুরু মাহিম ভেঙা আগল বিনা প্ররোচনে মারিয়া ফেলে। কোন রাষ্ট্র তাহা সহ করিতে পারে না। রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে চলিবার সাহস থাকিলে তাহা হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য দেয়। আমাদের কমান্ডিদের সেই সাহস আছে কি ?

জাতিসংঘে কৃষি প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রসংঘে সম্মিলিত প্রতিনিধিবৃন্দ ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বর্তমান অধিবেশনে সর্বোপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলিয়া মনে করেন। বর্তমান সমুদাহে এই প্রস্তাবটি রাষ্ট্রসংঘের অর্থ-নৈতিক কমিটিতে উপস্থাপিত হইতেছে। প্রতিনিধিবৃন্দের এক জন সদস্য এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, ভূমি-সংস্কার সমস্যায় আন্ত সমাধান না হইলে ইহা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং বিশ্বের ময়-নাশীর দৈনিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত করিবে।

ভূমি-সংস্কার প্রসঙ্গে জাভিন, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক কমিটির বর্তমান অধিবেশনে বিবেচিত হইবে। ভূমি-সংস্কার সমস্যার সমাধানে সরকারের দায়িত্ব সমধিক। সরকারের নিকট হইতে বাস্তব সাহায্য এই বিষয়ে প্রকৃত কার্যকরী হইবে। সরকারের সহযোগিতায় প্রামোদন পরিকল্পনার দ্বারা দশা ভূমি-সংস্কার সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

গত ২২শে পৌষ তারিখে প্যারিস হইতে যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, উপরোক্ত সংবাদটি তাহার মধ্যে আছে। পরিকল্পনা বিরাট হউক, সামান্য হউক, তাহার সাফল্য নির্ভর করে ব্যক্তির উপর। কোন রাষ্ট্র কেবল তার অর্থবলের সাহায্যে তাহা আশিতে পারে না। ভারতবর্ষের নাগরিকবর্গের নিকট ইহাই প্রথম সমস্যা। “বৃহৎ যুদ্ধের” সাহায্য না পাইয়াও প্রাচীন মিশর, প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন মেসো-

পটে ময়া ও প্রাচীন চীনের লোক ভাহাদের দেশের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছিল। তাহার ইতিহাস হইতে বর্তমান মুদ্রবস্ত্র-বস্ত্র ময়-নারীর অনেক শিবিবার আছে।

একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। প্রাচীন জগতের এই সব মদী-মালা দাস-শ্রমিক দ্বারা কহানো হইত। আদ্যকাল তাহা করানো হয় না। কিন্তু তাহারাই এই সব পরিকল্পনার খবর রাখে, তাহারাই জানেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার স্থান ইহার মধ্যে বেশী নাই; পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গেলে ব্যক্তির স্বাধীনতা কম-বেশী সঙ্কুচিত হইবে। প্রাচীনকালে দাস-শ্রমিক হ্রদ পলাইয়া যাইত। আজ শ্রমিক হয় “বর্ধখট” করে, না হয় কাজে ইতুকা দেয়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই।

ভারতরাত্ত্রের নৌবহর

গত ৬ই পৌষ ভারতব্যাণী “নৌবহর দিবস” প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভারত-সরকার একটি শুভাশুভ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান (ইংরেজ আমলের) কথা তাহার মধ্যে ছিল। আর ছিল এই যুদ্ধাঙ্গের স্মৃতি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নিক্ষেপে প্রস্তুত করিতে স্বাধীন ভারত কি করিয়াছে তাহার কথা। আমরা তাহার মর্মার্থ নিয়ে তুলিয়া দিলাম :

ভারতীয় নৌবহরের সূত্রাচীন ইতিহাস আছে। কিন্তু আধুনিক কালের যে ইতিহাস আমরা জানি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়।

খ্রীষ্টীয় শতক আরম্ভ হইবার পূর্বে হইতেই যে ভারতীয় পোত সমুদ্রে বিচরণ করিত প্রাচীন বর্ধাঙ্গ, ইতিহাস এবং শিল্পকলার নিদর্শনগুলিতে তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে। যদিও ইহাদের অধিকাংশ বাণিজ্যপোতই ছিল, তবু দ্বীপগুলি জয় করিবার সময় জাহাজের সাহায্যে সৈন্যবাহিনী পাঠ করা হইত ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। ভারতে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পও উন্নতিলাভ করিতেছিল। নদীতে চালাইবার উপযুক্ত শুধু নৌকাই যে তৈরি হইত তাহা নহে। সমুদ্রগামী পোত নির্মাণও অগ্রচলিত ছিল না।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও এই নৌশিল্পের চর্চা বৃদ্ধি পায়। মোগল আমলে, বিশেষতঃ আকবর নৌশিল্পের উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। বাংলার ঢাকা শহরে তাহার নৌ-বিভাগের সদর দপ্তর ছিল। আকবরের উত্তরাধিকারীরাও নৌশিল্পকে অবহেলা করেন নাই। দালাবার উপকূলের চোকাগণ্ড (মালদ্বীরা) তাহাদের নৌশিল্পের ক্ষমতা উপকূলে দীর্ঘকাল ঘাবৎ আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল। উৎকল ও অঙ্গরাজ্যে রেলক ভারতসমুদ্রে যে প্রাণান্ত স্থাপন করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাঙালীর নৌবহর স্বাক্ষর করিয়া চমকিত করিয়াছিল।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল : ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতীয় নৌবাণিজ্যের প্রবর্তন করিলেন এবং এই সব পোতে কাজ করিবার ক্ষমতা ভারতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ করিলেন তখন হইতেই ভারতীয় নৌ-বহরের প্রকৃত উৎপত্তি হইল বলা চলে। এই সব পোতে উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী হিসাবে কোম্পানীর বাণিজ্যপোতের লোকদের নিয়োগ করা হইলেও নিম্নতন কর্মচারী এবং ডক শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়।

ভারতীয় নৌবহরের নাম পরিবর্তন করিয়া পরে বোম্বাই নৌবহর রাখা হইয়াছিল এবং বোম্বাইতেই ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে কোম্পানীর যে সব যুদ্ধ হয়, তাহাতে এই নৌবহর বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু শুধু সামরিক ও অসামরিক কাজেই কোম্পানী তাহাদের জাহাজগুলিকে নিয়োগ করেন নাই। বোম্বাইতে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানাও তাহার গতিয়া তুলিতে-ছিলেন। বোম্বাইয়ের বর্তমান ডকটি ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে অধিকৃত এবং ক্রমে ইহা জাহাজ নির্মাণের একটি কারখানা হইয়া উঠে। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কারখানাটি এত উন্নতিলাভ করে যে, পৃথিবীর তৎকালীন যে-কোন শ্রেষ্ঠ কারখানার সঙ্গে তুলনা করা চলিত। ওক কাঠনির্মিত এই জাহাজগুলি ইউরোপের যে-কোন কারখানার জাহাজের অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর বলিয়া তখন সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় নৌবহর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট হস্তান্তরিত হয়। অবশ্য তাহার পূর্বে বহুবার ইহার নামের পরিবর্তন হইয়াছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে অবশেষে ইহাকে রাজকীয় ভারতীয় নৌবহর আখ্যা দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর হইতে ভারতীয় নৌবহর রাজকীয় নৌবহরের একটি শাখা হিসাবে কাজ করিতে থাকে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের বহু নৌযুদ্ধে সহযোগিতা করে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় নৌবহর রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীরূপে আখ্যাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় নৌবহরকে বহুলাংশে প্রসারিত করা হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইহার উচ্চ ও নিম্নতন কর্মচারীদের সংখ্যা ২ হাজার মাত্র ছিল। যুদ্ধের সময় উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ হাজারে উঠে বহু আধুনিক জাহাজও ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়।

স্বাধীনতার পরে : ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর দেশ বিভাগের কালে ভারতীয় নৌবহরের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ৪৩০ জন জাহাজ, ২৩০ জন ক্রিপেট, ১৩০ জন করভেট, ১৩০ জন সার্ভে-ভেসেল, ১৩০ জন কয়েক টন মাইন স্ট্রাইকার (বোমা তুলিবার জাহাজ) এবং ১৩০ জন ক্রাকটউইং মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ৩ হাজার

মাইল উপকূল রক্ষার কাজে ইহাকে মোটেই পর্যাপ্ত বলা চলে না।

সুতরাং নৌবহর প্রসারের পরিকল্পনার ভারতকে যথেষ্ট কাজ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রারম্ভিক কালে কাজ শুরু করিতে হইয়াছে। এই বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই ভারত ব্রিটিশের সঙ্গে এ সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল তাহার ফলে সে ১০৩০ টমের 'একিলিস' নামে একখানি জুজার পাণ্ড এবং ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইহার 'দিল্লী' নাম দেওয়া হয়।

এইভাবে ভারতীয় নৌবহর বৃদ্ধির অঙ্গপাত হয়। ব্রিটিশের নিকট হইতে ভারত ক্রমে "রাজপুত" "রগজিং" ও "রাণা" নামে তিনখানি জুজার লাভ করিয়া একটি ফ্রোটলা গঠন করে। এই সঙ্গে দেশ বিভাগের ফলে যে ফ্রিগেটগুলি ভারতের অংশে পড়ে সেগুলি লইয়াও ভারত একটি ফ্রিগেট ফ্রোটলা গড়িয়া তোলে। প্রত্যেক বছরে ২ শত কর্মচারী আছে। সম্প্রতি মাইন সুইপার ফ্রোটলাও গঠন করা হইয়াছে।

শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা : ভারতে নৌবহরের প্রসার পরিকল্পনার শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় নৌবহরের যোগ্যতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশ বিভাগের পর ভারত তিনটি উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র এবং বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞকে হারাইয়াছিল। অবশ্য এডমিরাল দত্তের সাহায্যে প্রাথমিক অনুবিদ্যালয় কাটাইয়া উঠা গিয়াছিল। ভারতীয় নৌ-কর্মচারীগণকে দলে দলে শিক্ষা দেওয়ার ভার উঁহারা গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডগামী ভারতীয় শিক্ষানবীশদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিভিন্নপ্রকার উন্নয়নমূলক কার্য : ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে নৌবহরের নামের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই দিন হইতে দীর্ঘকালের 'রাজকীয়' শব্দটি ভ্যাগ করিয়া ইহাকে শুধু ভারতীয় নৌবহর নামে অভিহিত করা হয়।

জামনগর ও বোম্বাইয়ের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং কোচিন ও বিশাখাপত্তনমে নূতন শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের নৌবিভাগীয় স্কোয়াড্রন ও জাহাজ ভিড়াইবার স্থান সম্প্রসারণও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে তাহা করা যাইতেছে না। ১৯৪৯ সনে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ হইতে ৪৬-এ উঠে। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি 'দিল্লী' জাহাজে সমস্তই শিক্ষিত কর্মচারী পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু এডমিরালদের সাহায্যে নৌবহর বিস্তারের সমস্ত প্রয়োজন মিটান সম্ভব নহে। তাই নৌ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গড়িয়া তুলিতেও ভারত গবেষণা মনো-যোগী হইয়াছেন।

সম্প্রতি নৌবিভাগের বিমানবহরের জন্য সমুদ্রের উপকূল ঘাঁটি নির্মাণ করা হইয়াছে।

নৌবিভাগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক জন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার অধীনে গবেষণাকার্য্য চালান হইতেছে।

নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা-সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৩ই পৌষ পাটনা নগরীতে নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা সম্মেলনের ২৭তম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকিল, সাহিত্যারসিক ও ব্যাখ্যাকাররূপে তিনি বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের একজন দিকপাল বলিলেও অত্যাক্তি হইবে না।

তাহার বক্তৃতা ভারতবর্ষের শাশ্বত সভ্যতার প্রতি নুতন করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে :

"পূর্বে পশ্চিমে খণ্ডাংশ ছিল হলেও মহাদেশের মত প্রকাণ্ড দেশে আমরা এক মহারাষ্ট্র গড়ে তুলেছি—বাইরের চাপে নয়, নিজের প্রয়োজনে ও ইচ্ছায়। এ মহাদেশের একা কি কেবল হবে রাষ্ট্রীয় একতা, শাসন সৌকর্যের একতা—যা ইংরেজের আমলে ছিল। যদি তাই ঘটে তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক প্রকাণ্ড সম্ভাবনাকে আমরা ব্যর্থ করব। সে সম্ভাবনা হচ্ছে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র এই মহাদেশে। জাতিতে জাতিতে যে মিল ভা রাষ্ট্রীয় ও সাংসারিক প্রয়োজনের গভী ছাপিয়ে অন্তরের একো পরিণত হবে।...

সাহিত্য ও সমাজ : দুইটি চরম মতবাদ

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধের প্রশ্ন স্বতঃই উদ্ভিত হয়। 'সৈদিক থেকে দুটি চরমপন্থী, বিপরীত মতবাদ সম্ভবপর। প্রথম মতামুসারে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে কার্য্য কারণ বা অঙ্গাদী সম্বন্ধ মেই। সমাজের পরিধি বাস্তব জীবনের স্কুল পরিবেষ্টন। সাধারণ জীবনের কার্য্যকলাপ, চিন্তাপ্রবাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সমাজের কারবার। ব্যক্তিমণ্ডলী নিয়েই পরিবার, পরিবারগোষ্ঠী নিয়েই সমাজ। সেজন্য ব্যক্তি-গত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্তা, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ স্বপ্ন-স্বপ্ন, অতি স্কুল স্কুল বিষয় নিয়েই সমাজকে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকতে হয়। কিছু পরিমাণে ব্যক্তিবাস্তব্য বিসর্জন না দিলে পরিবারের গঠন সম্ভব নয়। একইভাবে বিভিন্ন পরিবারমণ্ডলী নিয়ে যখন হয় সমাজের ভিত্তি সংস্থাপন, তখন পরিবারের অপেক্ষাকৃত সঙ্গীর্ণ গভীও হয়ে যায় পুনরায় বিস্তৃততর এবং সার্বজনীন স্তরের নিকট ব্যক্তি ও পরিবারের নিজস্ব স্বার্থ হয়ে যায় অপেক্ষাকৃত অর্থহীন। তা সত্ত্বেও যে কোন স্থির-প্রতিষ্ঠিত সমাজেই পরিবারের তথা ব্যক্তির দাবি উপেক্ষিত হবার নয়—কারণ পরিবার ও ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তাদের বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু এই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে চু হিত্যের—কাব্য দর্শন বর্ধের—সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে? সমাজ জড়

পৃথিবীতেই চিরকাল প্রোথিত—প্রাকৃতিক জীবনের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, দাবি-অধিকার-আইন প্রকৃতির বিচার ও সিদ্ধান্তেই সে নিরন্তর ব্যাপ্ত। কিন্তু সাহিত্যের চির-অগ্নান শতদল প্রকৃতি হইতেই সেই অপার্থিব মানসলোকেরই চির-শোভন মানস-সরোবরে। নিদাঘদাহে যেমন শতদলের শতদলেই গুঁক হয়ে ঝরে পড়ে, বাস্তবতার প্রথম তাপে তেমনি সাহিত্যের প্রাণবন্তও হয়ে যায় রিনট। সেজন্ত সাহিত্যের কমলাস্নান থাকবে পাভ। সেই অবান্তর সৌন্দর্যলোকেই মাত্র যেখানে পৌছাতেই পারে না কোমল পাণ্ডিত্য শোকতাপের দীর্ঘশ্বাস, যেখানে পড়তেই পারে না বরষার ধূল্য মলিন ছায়া, যেখানে শুষ্ক হয়ে যায় ভাগিন্যক বিবাদ-বিসংবাদের কর্কশ কোলাহল।

ঐক্য চরম মতবাদের সমন্বয় সাধন

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড। অসংখ্য রক্তকণা, স্নায়ু, মাংসপেশি, ইন্দ্রিয়াদি সম্বলিত মনুষ্যদেহ বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অংশের সমাবেশ হলেও কি এক অপূর্ণ কৈবিক নিয়মামুসারে একটি সমগ্র অখণ্ড বস্তু। অল্পাধা জীবনধারণ হয়ে উঠত অসম্ভব। ঠিক একই ভাবে, অসংখ্য চিন্তা, অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রমুখ বিভিন্ন—আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ, মানসিক ভাব-সম্বলিত মানব-মনও কি এক অক্ষর্য আধ্যাত্মিক নিয়মামুসারে এক অভিন্ন সমগ্র সত্তা। মৃত্যু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ত কণার কণা। একপে শুধু মানবের কেশ, সমগ্র জগতেরই ইতিহাস অল্পমাত্রাও আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুর মধ্যেও একের, বিরোধের মধ্যেও সামঞ্জস্যের, বিচ্ছিন্নের মধ্যেও সমগ্রের আবিষ্কার ও প্রকাশই জীবন, স্থিতি ও সমুন্নতির কারণ। সে বহু আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি সংযোগ সংস্থাপনের প্রচেষ্টাও মানুষের শাশ্বত প্রচেষ্টা। বাস্তব জগতেও দৃষ্ট হয় যে, চরম আদর্শবাদী ঋষি এবং চরম বস্তুবাদী ভৌতগণ সংখ্যা অপেক্ষা মধ্যপন্থীদের সংখ্যাই অধিক। মনুষ্যজীবনের এই সমন্বয়ের চিত্রও মনুষ্যসৃষ্ট দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলায় পরিফুট হয়েছে। তারই ফলে উপরি-উক্ত দুই চরম মতবাদের মধ্যেও আমরা পেয়েছি একমাত্র গ্রহণযোগ্য আর একটি তৃতীয় সমন্বয়বাদ, যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতার, আকাশ ও পৃথিবীর, আত্মা ও দেহমনের সংঘটিত হয়েছে এক অপূর্ণ মিলন।—প্রথম চরম মতামুসারে দর্শন, ধর্ম, কাব্য প্রকৃতি স্বল্পসংখ্যক তীক্ষ্ণদীর্ঘ দার্শনিকের এবং উদগ্র কল্পনাবিদ্যাসী রনিকল্পনের আদরের বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পদবাচ্য নয়। যে লেখন সম্পূর্ণই অবাস্তব ও স্বকপোলকল্পিত, যার সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পূর্ণই শূন্য মনস্তলে, তা সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেও কতকাল কত পরিমাণে প্রকৃত তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ হয়, সেইটাই চিন্তনীয়। সন্দেহ নেই যে, কেবল মনেরই সঙ্গে

এই একাকী, উদগ্র বেলায় মনই স্বয়ং অচিরে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই অবসাদ থেকেই সৃষ্টি হয় misanthrope বা মানব-বিরোধী দার্শনিকপ্রবরের ও lotus-eater বা দিব্যপুত্রবিলাসী অলস, অকর্মণ্য ভক্তভূপের।

সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা অত্যাধুনিক কালে ভারতবর্ষের মনকে অরণ্য করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন পৃথিবীর অল্প সব দেশে তেমনি ভারতবর্ষে আজ আমরা কর্ম-বাস্তব। অন্নবস্ত্রের কষ্টে ও চিন্তায় জাতি প্রণীড়িত। যেমন অন্য দেশে তেমনি ভারতবর্ষেও আমরা অনেক বদলি সুখের দিনের শেষে আঘাতের ছুংখের দিন এসেছে। এ ছুংখের দিনের একটি প্রধান কারণ যাদের মুখে অন্ন কি পরনে কাপড় আছে কিনা সে খোঁজ নেওয়ার সুখী লোকের প্রয়োজন হ'ত না, সেই অন্নবস্ত্রহীনদের চল আজ আর কাকেও নিশ্চিত থাকতে হচ্ছে না। তাদের দাবি যেটাবার চেষ্টা না করে উপায় নেই। এই চেষ্টার পূর্বতন সুখের পৃথিবীর সমাজ ও ধনতন্ত্র ভেঙে পড়ছে। চারদিকে নুতন সৃষ্টির বেদনা। কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের দাবিই কি এদের-চরম দাবি? সে দাবি যখন মিটেবে তাদের অন্তরাঙ্গা তখন জিজ্ঞাসা করবে না ততঃ কি? যেমন আত্মিকের সভ্যসঙ্কমনেরা শুধু শরীরের দাবি, যেটামতে পূর্ণ সুখের অবস্থা মনে করেন না, সভ্যতার যে সব অশ্রীরা সৃষ্টির আনন্দ না হলে তাদের জীবন উদ্বেগহীন ও অপূর্ণ মনে হয়, তাঁর দাবিও আত্মিকের অন্নবস্ত্রের কাকালোরা পরত করবে। সভ্যতার যে সব সৃষ্টি সাংসারিক কাজে লাগে না, কিন্তু মানুষের বা অমূল্য সম্পদ, তাঁর দাবি যদি তারা না করলে শেষে তবে এই চিরবকিতেরা আবার বকিত হবে। ইতি-মধ্যে তাদের অন্নবস্ত্র কোণাবার বাস্তবায় সভ্যতার অমৃতভাও-গুলি যেন আমরা না ভাঙি। মানুষের সাহিত্য সেই অমৃত-ভাওের একটি।”

এই ব্যাখ্যান যুগোপযোগী হইয়াছে। অত্যাধুনিক-সমিতির সভাপতি ত্রীশ্বাংসুসুয়ার দাশ এই সভ্যই অল্প ভাষায় বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের সমাজিক বৃদ্ধির জন্য বাংলা সাহিত্য যাহা করিয়াছে এবং যাহা করিতে পারে সেই আদর্শের কথাই তিনি বলিয়াছেন। শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন ত্রীশ্বাংসু-চন্দ্র সরকার। তিনি এতৎসম্পর্কে লোক-সাহিত্য, গাথা, গল্প, রূপকথা ও কবিতার উল্লেখ করেন। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের অবলান স্বরণীয়। যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও সুকুমার রায় আধুনিক যুগের শিশু-সাহিত্যের স্রষ্টা। আজ বাহাদুর প্রৌঢ় হয়ে পৌছিয়াছেন পৌর-পৌরী সৌভাগ্যে তাঁহাদের হিংসা হয়।

সুধীরবাবু একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান করিয়াছেন :

“দিন দিন সাহিত্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। আত্মিকের দিনে কেবলমাত্র বইয়ের পাতার মধ্যেই শিশু-

সাহিত্য সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। বেতার ও সিনেমার ভিতর দিয়ে নানা দেশে এক অভিনব শিশু-সাহিত্যের ধারা বৃষ্টি হচ্ছে। এই নতুন ধরণের সাহিত্য—যদি তাদের সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে—খুবই অল্পজ্ঞাতাবে সরল শিশুচিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করছে। এই প্রভাবের ভিতর শিশুদের চিত্তকে বিভাগ্য করবার যেমন অনেক “থ” আছে— তেমনি ভালো দিকে নিয়ে যাবারও বহু উপায় আছে।”

সম্মেলনের এই অধিবেশন সার্থক হইয়াছে যখন দেখি যে নিখিল-ভারত সাহিত্য শাখার সভাপতি বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক ত্রিভাঙ্গারিপ্রসাদ দ্বিবেদী বলিতেছেন :

“যত দিন আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচিত না হচ্ছি তত দিন প্রদেশে প্রদেশে সত্যিকার ত্রিভাঙ্গারি বন্ধন দৃঢ় হতে পারে না।”

যথায় যে ভাষা সম্ভব হইয়াছিল। আজ ভাষাভাষার এত সুবিধা সত্ত্বেও ভাষা হইতেছে না কেন তাহাই প্রশ্ন। অতীতের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :

“বাংলা ভাষা, মৈথিলী, ব্রজবুলি সাহিত্যের একসঙ্গে আলোচনা করলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা পূর্ণ হতে পারে। আসামের অসিনানার পদ্মসুন্দরী এবং নেপালে প্রাপ্ত নাট্যসাহিত্য পদ্মসুন্দরী মৈথিলী ভাষার প্রভাব দেখান হইবে। মণিপুর, বাংলা এবং উড়িষ্যাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং বুদ্ধাবন থেকে তার প্রভাব হিন্দী সাহিত্যে কিছু কিছু এসে পড়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদের সিদ্ধান্তগুলি পরে অযোধ্যার অনেক রামায়ণ সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে। দক্ষিণের বৈষ্ণব সাহিত্য যে আমাদের উত্তর-ভারতের সাহিত্যগুলিকে নব-প্রেরণা দিয়েছিল সে বিষয় সকলেরই জানা আছে।”

পশ্চিম বাংলার রেশনের দোকান

এই বিষয়ে, সিদ্ধ চাল ও আতপ চাল সরবরাহের ব্যাপারে কচকচির শেষ হইল না। কেন এক দোকানে, বিশেষতঃ, সবজি টের দোকানে, আতপ চাল পাওয়া যায়, অল্প দোকানে পাওয়া যায় না, তার রহস্য বুঝা শক্ত। সেই কথাই “আনন্দ বাজার পত্রিকা”র ২৬শে পৌষ সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। এই বিরক্তিকর ব্যাপারের অবসান কবে হইবে?

“কলিকাতার খাদ্য রেশন সরবরাহে কিরূপ অব্যবস্থা হয় সম্প্রতি তাহার একটি ঘটনা আমাদের পোচরে আসিয়াছে। উত্তর কলিকাতার আমহার্ট প্লট এলাকায় রেশনগ্রহীতাদের অনেককে কেবল আতপ-চাউলই দেওয়া হইতেছে; আর বড়-তলা এলাকার রেশনগ্রহীতাদের মধ্যে বাহাদের আতপ-চাউল একান্ত প্রয়োজন তাহারা তাহা চাহিয়াও পাইতেছে না। পাশাপাশি অবস্থিত এই দুই এলাকায় যে এইরূপ সরবরাহ-

বিভাট ঘটতেছে, তাহা উপরোক্তাদিগের অবহেলা ও মনোযোগের অভাব প্রমাণ করে। উত্তর এলাকার লোককে এইরূপ তাবে বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত না করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি আমহার্ট প্লট এলাকার আতপ চাউলের কিছু অংশ বড়তলা এলাকায় এবং বড়তলা এলাকার সিদ্ধ চাউলের কিছু অংশ আমহার্ট প্লট এলাকায় পাঠাইতেন, তাহা হইলেই তাহাদের কর্তব্য পালন করা হইত। কোন রেশন দোকানে মাসিক কি পরিমাণ আতপ চাউলের প্রয়োজন হয় তাহার একটি হিসাব আছে। রেশন দোকানের ম্যানেজারেরা যখন প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য কর্তৃপক্ষের তখন তাহাতে নিশ্চয়ই ‘ইহার’ উল্লেখ থাকে। উপরোক্তাদিগের তদন্তকারী কার্য করেন না কেন—এই প্রশ্নের জবাবদিহির প্রয়োজন। আতপ চাউলই বাহাদের একমাত্র ব্যবহার্য তাহাদের আতপ চাউল সরবরাহ না করার অর্থ আহা হইতে বঞ্চিত করা।”

এই বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রী ত্রিপ্রকৃষ্ণচন্দ্র সেনের দায়িত্ব স্পষ্ট। ভোটমুখে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁর ত একটা আপিস আছে; তাঁরা কি করিতেছেন? এতৎসম্পর্কে সহযোগী “সুগন্ধী” গত ২৭শে পৌষ সংখ্যায় অপব্যয়ের সংবাদে উপর যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁর প্রতি খাতিমস্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

“রেশন কার্ড বদলাইবার নিয়ম

ট্রেটসম্যান, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে রেশন কার্ডের স্লিপ আটবার বিজ্ঞাপন খুব বড় করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বেশ কয়েক হাজার টাকা খবরের কাগজগুলার পকেটে ঢালা হইয়াছে। রেশন কার্ডের মেসার্স যথাসময়ে ফুরার এবং যথারীতি মাথুলী কার্যদার রেশন স্লিপ আটবার দেয়। কবে কখন কোথায় কি ভাবে কাহার স্লিপ আটবে তাহা ২৫ টাকা ইকি দরে দৈনিক ২০০ টাকা এক একটী কাগজে খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। রেশন দোকানে একটা নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিলেই যথেষ্ট, না দিলেও কথা নাই। আসল, জাল, নকল সব রকম রেশন কার্ডের মালিকরা নিজেদের পরজাই স্লিপ আটাইয়া লইবে। যে টাকাটা এই ভাবে খবরের কাগজ-গুলাকে দেওয়া হয় সেটা কার টাকা? কেন দেওয়া হয়? ইলেকশন অফিসার এবং আর পাঁচটা সরকারী মুখপাত্রের পাটোয়ারী বুদ্ধির হাতকর বিবৃতি ছাপিবার জন্তই কি এই ঘুষের ব্যবস্থা?”

ত্রিপুরা রাজ্যে গমনাগমনের সুবিধা

আগরতলা-পাণবরফালি পথে জিপযোগে (অল্প কোন বানে নয়) অল্পতর পথ হিসাবে ডাক চলাচল শুরু হইয়াছে। এলা জাহাজী হইতে। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইহা বাহির হইয়াছে। পথটি এখনও শুধু Zeepable; পথের দুই বাপ অর্থাৎ

formation cutting ও metalling এখনও ঘেরি আছে। তারত ব্যবচ্ছেদের পর ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। আগরতলা হইতে পাথরকান্দির দূরত্ব ১৪৬ মাইল। পাথরকান্দি হইতে করিমগঞ্জ, বরপুত্র দিয়া আসাম লিঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ অন্তঃপর সহজসাধ্য হইবে।

সাবরম ত্রিপুরার অন্ততম বিভাগ—প্রধান নগর (গ্রাম ?) সাবরম হইতেই বিভাগের নাম। কিন্তু এইটি যেম পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা ইহাকে দক্ষিণ-প্রাণ্ডে বেষ্টিত করিয়া আছে। আগরতলা হইতে সাবরম যাইবার দুইটি পথ। (১) আগরতলা হইতে বাসযোগে বিশাল-গড় (পথ একপ্রকার) ; তথা হইতে বাসযোগে উদয়পুর ; উদয়পুর হইতে সাবরম (হাঁটা পথ, অতি কষ্টে গিপ চলে)। (২) ভিতর দিয়া পূর্ববঙ্গের ই-বি-রেলওয়ের আখাউরা জংশন হইতে চট্টগ্রামের পথে ধুম ট্রেনশন ; তথা হইতে নৌকা যোগে ২২ মাইল সাবরম।

কলকলিয়াঘাট হইতে বর্ধনগর পর্যন্ত একটি রেলওয়ে লাইনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারে দাখিল করা হইয়াছে। এই সব সুখবর। আশা করি, ত্রিপুরা রাজ্যের অসুস্থ প্রাকৃতিক ভাঙার এখন মুক্ত হইবে।

বাংলা ভাষা ও পাকিস্থানের শিক্ষানীতি

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের যে একটি ঘূর্বোধ্য নীতি আছে তাহা পাকিস্থানের নাগরিকবর্গের পর্যাপ্ত বিতণ্ডার বিষয় হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ঢাকার “আজাদ” পত্রিকার গত ২৪শে কাপ্তিক সংখ্যায় হুসুল আক্বাস নামে একজন লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধের শিরোনাম “শিক্ষা বিভাগের কীর্তি।” আমরা লেখককে জানি না। কিন্তু “আজাদ” যখন হুকুলম শিরোনাম দিয়া প্রায় তিন কলমব্যাপী প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন, তখন মনে করি তার একটি ভুল আছে।

লেখক পূর্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ডক্টর হুদরৎ-ই খোদার প্রতি হুর্দাবহার সম্বন্ধে যেভাবে ফোড প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধত করিতেছি :

“ওপরের দিকে তাকালে দেখতে পাই—ভাজার (৭) হুদরতে হুদার মত লোক যিনি একাধারে ডি-এসসি, পি-আর-এস, কলকাতা ইউনিভার্সিটির প্রথম বিভাগে প্রথম, বহু গ্রন্থ-প্রণেতা...তার মত লোকের স্থান পূর্ব পাকিস্থানে হ’ল না। নানা বিপাকে পড়ে তাঁকে একেবারে ছিটকে পড়তে হ’ল করাচীতে। দেশে ফিরে আসবার চেষ্টাও যে তিনি করেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁর অপরাধ অনেক।

সব চাইতে বড় অপরাধ বুদ্ধি এই যে, শিক্ষা বিভাগের জনৈক সিলেটবাসী কর্মচারীকে তিনি তাঁর বিভাগে পূর্ববঙ্গের

অসংখ্য অক্ষ ও বেসীকাল চাকরী করেছেন এমন সব কর্ম-চারীকে ডিঙ্গিয়ে সিনিয়র সার্ভিস দিতে রাজী হন নি।”

এখানে অরণ করিতে হইবে যে পূর্ববঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী আবদুল হামিদ একজন ত্রিভটবাসী। এবং পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হইলে ত্রিভটবাসী মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চ পদ ও সরকারী চাকরীতে অনেক সুবিধা পাইবেন এই প্রলোভনেই অনেকে গণভোটের সময় পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দেন। ত্রিভটের মুসলমানসমাজ শিক্ষায় বেশ আগ্রহের এবং বংশধর্যাদায় তাঁদের স্থান প্রায় সুউচ্চ। তাঁদের অনেকেই ভারতরাষ্ট্রে উচ্চপদ অধিকার করে আছেন। এখন তার দ্বন্দ্ব তাঁরা অস্ত জেলাবাসীর হিংসার পাত।

হুসুল আক্বাস সাহেব বাক-বিজ্ঞপ ও ব্যক্তিগত আলোচনা করিয়া ব্যাপারটি লঘু করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহারও প্রয়োজন আছে ; অনেকের গুণাগুণের কথা জানা যায়। হুসুল নীতি সম্বন্ধে অগ্রহাষণ মাসের “ইমরোজ” যাহা টুলিয়াছেন তাহা জানিয়া রাখা ভাল :

“বংসর চারেক আগে পূর্ব বাংলার শিক্ষা সংস্কার কমিটি বলে যে কমিটি গঠিত হয়, তাঁরা এতদিনে তাঁদের বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেছেন। কিন্তু শিক্ষাবিদদের কমিটি-যে বিষয় ছেলেনদের ঘাড়ে চাপাতে সাহস করেন নি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে একেবারে বাধ্যতামূলক করে তুলেছেন। প্রাইমারী শিক্ষার মতো আমরা আরবী তথা উর্দু হরফের প্রচলনের চেষ্টা ও তার সাক্ষ্যই গাওয়ার কথাই বলছি।

মন্ত্রিত্বের গদী বিজ্ঞমাদিত্যের সিংহাসনের মত সমস্ত জ্ঞানের আধার কিনা জানি না, তবে বিশেষজ্ঞদের মতামতকে উপেক্ষা করার মত কোন মুক্তিসমত কারণ আমরা বুঁজে পাই নি। শিশুর মস্তিষ্কও শিশুই, তার ঘাড়ে চাপালেই সে ছিনতার সব জ্ঞান বহন করতে পারবে একথা আমরা বিশ্বাস করি না। মন্ত্রী সাহেব বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে ভাবী নাগরিকদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেছেন বলে মনে করতে পারছি না।

শুধু পূর্ব পাকিস্থানেই নয় কেন্দ্রীয় পাকিস্থানের মন্ত্রীর গদীতেও যে আলকেমি নেই এতদিনে আমরা তা একটু একটু বুঝতে পারছি। বাংলার বা পূর্ব বাংলার কোন কালে নাকি টাকার আট মণ চাউল বিক্রী হয়েছিল। এবার লবণ ১৬ টাকা সের দরে বিক্রী হয়েছে। তখনকার শাসনকর্তাকে কোন জবাবদিহি করতে হয়েছিল কিনা জানি না, তবে তিনি বুঝিতে সঙ্গদ হয়েছিলেন। এবারকার ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বুঁজ হয়েছেন কিনা জানি না, তবে জবাবদিহি করেছেন। এ জবাবদিহিতে কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। পাক ভারতের বাক-বুড়েই হারা জাহাজ বাটতির দোহাই দিতে পারেন, মারণ হুচে তাঁরা কি করবেন সে শুধু অহুমানই করা যেতে পারে—লেখা যায় না।

পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হবে এ কথা যদি ইসলামের অনুবর্তীরা অতি বিশেষ উৎসাহ সহকারে ইসলামী কায়দা কাহ্ন প্রবর্তন করতে চান তাহে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কথা হ'ল কোন্টা ইসলামিক আর কোন্টা ইসলামিক মত এর একটা বিধিব্যবস্থা হওয়া উচিত। কটো বক্তাদের ক্ষুদ্র বিধিসমূহ অতের পক্ষে নয়, বোঝ দোঁড় করাচীতে বিধিসমূহ চাফাতে নয়, বলডাখ বক্তাদের জন্য ইসলামিক রাজ্যের রাজধানী ঢাকা, করাচী, লাহোরে বিধিসমূহ অন্য স্থানে নয়, এমনি নিয়ম হতে পারে না।

তবে মধ্যযুগীয় প্রভু-মনস্তত্ত্বের ধর্মব্যাখ্যাই ষাটা সত্যিকার ব্যাখ্যা বলে চালাতে চান তাঁদের বিশ্বাসকে এতটুকুও অমর্যাদা না করেও বলা চলে যে সেটা সঠিকও নয় সত্যও নয় এবং বিংশ শতাব্দীতে সে একেবারেই অচল ও মর্যাদাহীন।

সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব বাংলার সেক্রেটারিয়েট ভবনকে সংরক্ষিত স্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানকার যত কর্মচারীকে স্বাক্ষরিত ফটোসহ এখন এতে ঢুকতে হচ্ছে। সেক্রেটারিয়েট ভবনকে সংরক্ষিত স্থান ঘোষণা করার কি বৌদ্ধিকতা আছে জানি না। তবে এতে গবর্নমেন্টের Red-tapism-এর ১৮ মাসের বৎসর যদি স্বাভাবিক বৎসরে অর্থাৎ ১২ মাসের বৎসরে পরিণত হয় তা হলেই আমরা বুন্দি হব। সে যাই হোক, এর মধ্যে যে ইসলামিক কারদা কাহ্নের কথা উঠে পড়েছে, সেটাতেই আমরা বেশী কোঁড়হলী হয়ে উঠছি। প্রকাশ, কতিপয় কর্মচারী কটো তোলা অম-ইসলামিক বলে এতে আপত্তি জানিয়েছেন।

মধ্যে ছটা নুতন ইউনিভার্সিটি (রাজসাহীতে ও চট্টগ্রামে) খোলার কথা শোনা যাচ্ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে নানা কারণে সে প্রস্তাব বামা চাপা পড়ে গেছে। শিক্ষার এমনি অবস্থাতে আমাদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবমাই সুস্পষ্ট।

বাংলার খাদি গুরুকুল

নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। বাংলা “হরিজন” পত্রিকার ১৩ই পৌষ সংখ্যায় তাহা বাহির হইয়াছে। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যাবলী নানা পত্রিকার কল; যত্ন পূর্ব্বক তিনি তাহা করিয়া গিয়াছিলেন এবং ভারত-বর্ষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি যাহা করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন বিদেশী ব্যাখ্যাকারগণও তাহার সুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সম্ভ্রতি মার্কিন সাংবাদিক ডিউর সিহান তাঁহার “Lead kindly light”—এই নামের পুস্তকে তাহাই করিয়াছেন। রিচার্ড এগের প্রসিদ্ধ বইয়ের নামের উল্লেখ নাই-বা করিলাম।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, “বর্তমান শিক্ষার ব্যর্থতা বাংলার জনসাধারণের অজ্ঞাত নয়।” আমরা বলিতে চাই যে সারা ভারতবর্ষের, তথা সারা হুনিয়ার জনসাধারণ তাহা বুঝিয়াছে।

“এই রকম সমাজ গঠনের জন্য বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। কারণ রাষ্ট্র গঠনের মূলই শিক্ষা। বর্তমানের ইংরেজ-প্রবর্তিত কেন্দ্রী শিকাপদ্ধতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌলিক বুদ্ধি ও শক্তি বিকাশের প্রধান অন্তরায়। ইংরেজের শাসন চালাইবার পক্ষে এই পদ্ধতি ঠিক ছিল। তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক ইংরেজের শাসন ও শোষণ যত চালাইই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের পক্ষে এই শিক্ষার মোটেই আবশ্যকতা নাই। আজ রাষ্ট্র গঠনের জন্য এমন বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক মজুর দরকার যাহারা শারীরশ্রমের দ্বারা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বৈত্তব বাড়াইতে পারিবে।

এই কারণেই গান্ধীজী শিক্ষার সহিত শারীরশ্রমের গুরুত্ব দিতেম যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক কৃষি, বাবলদী ও কুশলী নাগরিক হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘ প্রায় দুই বৎসর হইল মেদিনীপুর জেলার বদ্বিলা গ্রামে খাদি গুরুকুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গত দুই বৎসরের কাজ খুবই সন্তোষজনক ও উৎসাহপ্রদ। দেখা যায় ছেলেরা আক্ষরিক জানে প্রত্যেক বিষয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে শারীরশ্রমের দ্বারা নিজেদের যাবতীয় ধরনের শতকরা ৪৮ ভাগ বাবলদী হইয়াছে।”

বাংলা “হরিজন” পত্রিকার পরিচালকবৃন্দের নিকট একটা কথা নিবেদন করিতে চাই। বাংলা কাগজে ইংরেজী তারিখ কেন থাকিবে তাহা বুঝি না। আর যদিই তাহা রাখিতে হয় তবে বাংলা তারিখও তার সঙ্গে দিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট

২৪টি দেশে মনোগঠিত আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের (সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের) কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া উহার এক্সিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান লেটার্ড মারকেল ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ ২৪টি দেশের প্রতি দেশে একটি করিয়া জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে—এই কমিটিগুলি কেন্দ্রীয় দপ্তরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। সুইডার-ল্যান্ডের জুরিখ শহরে এই দপ্তর অবস্থিত।

বিষয়ের সর্বত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রসারিত করিবার কার্য এই প্রতিষ্ঠান করিবে। সংবাদের আদান-প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঙ্গীতি বৃদ্ধি করাও ইহার অন্যতম লক্ষ্য। রকফেলার ও কোর্ড ফাউন্ডেশন নামক মার্কিন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অর্থ-

লাহায়ে ইহার কার্য চলিয়া থাকে। ভিন্ন বৎসরের অল্প উক্ত অর্থনাট্যাদি দেখা হইয়াছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ প্রতি দেশে বিপন্ন। কোন দেশের রাষ্ট্র সোচ্চারিত তাহা নিয়ন্ত্রিত করে, কেহ করে নানা কৌশলে। বেকীর ভাগ দেশে ব্যক্তিগত অর্থ বা প্রতিষ্ঠানের সক্তি ভাণ্ডার নানা উপায়ে তাহা করিয়া থাকে। ভারতব্রাহ্মণও তাহাই চলিতেছে।

দার্শনিক সম্মেলন

দিল্লী নগরীতে সম্রাতি এই অস্থান হইয়া গিয়াছে। এরূপ সম্মেলনের যে ইতিহাস দেখিলাম তাহা পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস। লেখক নৈমিত্যায়ণের কথা শুনে নাই; বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কথা শুনে নাই বা বলেন নাই। ইসলামের দার্শনিক সম্মেলনও অসম্ভব। চীন দেশে “বহু দূর”।

ভবুও এই ইতিহাসের মূল্য আছে।

“দেশ-বিদেশের দার্শনিকদের এইভাবে সম্মিলিত হয়ে আলোচনার প্রথম আয়োজন করেছিলেন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। রাষ্ট্রসম্প্রদায়ের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের আত্মতা এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দার্শনিক প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই জাতীয় দার্শনিক সম্মেলনের আয়োজন প্লেটোর পরবর্তীকালে আর হয় নি। বর্ধমানকালে আন্তর্জাতিক ভাবধারার আদান-প্রদানের একটি যোগসূত্র হ’ল রাষ্ট্রসম্প্রদায়ের এই প্রতিষ্ঠানটি।”

বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর “অংশীদার”

পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ এবং শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের আদর্শ লইয়া ইউনাইটেড নেশন্স জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইউ এন চার্টারের মুখবন্ধে লেখা আছে যে, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করা উহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই আদর্শ পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে বহুতুল্য করিতে হইলে তরুণ-তরুণীদের ইউ-এন-ওর কার্যকলাপ এবং উহার সাক্ষ্যের পরিচর জানানো দরকার। মিলিয়া-মিলিয়া মানুষের প্রাথমিক সমাজসমূহ সমাধানের চেষ্টা যতই সকলের মধ্যে দৃঢ়-মূল হইবে, যুদ্ধ ততই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইজন্য তরুণ বয়স হইতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অঙ্গসরণ একান্ত আবশ্যিক। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পত্নী ত্রীমতী এলিয়ানর রুজভেল্ট এই বিষয়টিতে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন এবং হেলেন কেরিসের সহযোগিতায় “পার্টমাস: ইউনাইটেড নেশন্স এণ্ড ইউথ” নামে একটি চমৎকার বই লিখিয়াছেন। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে ইউ-এন-ওর বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপের পরিচর গল্পের মত করিয়া বইটিতে দেখা হইয়াছে। বিধে নুতন আদর্শ, বিশেষতঃ পারম্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার আদর্শ প্রচার করিতে হইলে তরুণ বয়স হইতেই তাহা করিতে হইবে ইহাতে দ্বিগুণ থাকিতে পারে না। এই বইখানি তরুণ-দের উপযোগী হওয়ার সৈদিক দিয়া বিশেষ কার্যকরী হইবে। ভারতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ হইলে ভাল হয়। কলিকাতার

বুক কোম্পানী বইখানি প্রচারের ভার লইয়াছেন। দুই টাকা দাম খুব কম করিয়া বরা হইয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নাকি আগামী দু’ তিন মাসের মধ্যে তাঁর উচ্চপদ হইতে অবসর গ্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শরীর তাঁর ভাল থাকিতেছে না। চির-রুগ্ন রাজেন্দ্র-প্রসাদ যে ভাবে এতদিন লোকসেবা করিয়াছেন। তাহা কেবল মনের ছোরে। আজ এই বয়সে যদি তিনি বিশ্রাম করিতে চান, তবে আমরা তাহাতে হৃষিত হইব না।

স্বভাবতই তাঁহার স্থলে কাহাকে মনোনীত করা হইবে তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দার্শনিক ব্যাখ্যাভা অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে আমাদের মন নিঃসন্দেহ নয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে ভাব ও কর্মধারা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ভালা ভালা; তাহা তাঁহার বুদ্ধিগ্রাহ, হৃদয়গ্রাহ বলিয়া কোন পরিচর পাই নাই।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যিনি ভারতব্রাহ্মণের প্রধান মন্ত্রী হইবেন রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে তাঁহার মত হইবে অপ্রমথ্য। এক জনের নাম স্বভাবতই মনে হয়। তিনি মহারাষ্ট্রের ডক্টর মুন্সুরাম জগদাকর। তাঁহার গুণ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন মনে করি না। আর এক কথা। “সেকুলারিজম”—ধর্মনিরপেক্ষত্ব—প্রমাণ করিতে হইলে কেবল হিন্দুবংশোদ্ভব নর-নারীর মধ্যে এই পদ একচেটিয়া করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, মিরীমরবাদী যে কেহ এই পদের উপযুক্ত মনে হওয়া উচিত। ডক্টর আশ্বকরের নাম করা থাকিতে পারে। আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত দেবিতা পাইলে আমরা সুখী হইব। অবশ্য তাঁর মনোনয়নে “পণ্ডিত” নেহেরুর এই পদের মর্যাদা সম্বন্ধে যে বিদ্ভুটে ভাব আছে তাহা প্রধান বাধা হইবে।

পতোদীর নবাব

গত ২০শে পৌষ ক্রিকেট-বীর পতোদীর নবাব ইফতিকার আলি পোলো খেলিবার সময় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার প্রাণভ্যাগ করেন। বিখ্যাত ক্রিকেট-ইতিহাসে তিনি সুপরিচিত। উইলিংডন হাদপাতালে তিনি যত্নাযুগে পতিত হন। ১৯১০ সালের ১৭ই মার্চ তাঁহার জন্ম হয় এবং লাহোর এচিসন কলেজে তিনি বাল্যকালে অধ্যয়ন করেন। ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে খেলিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। প্রিন্স ললীপ সিংখীর ন্যায় টেস্ট খেলায় যোগদান করিয়াই তিনি শতাধিক রান করিতে সমর্থ হন, কিন্তু ভয়ঙ্কর জ্বর অসময়েই ক্রিকেট খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

পৌরাণিক গাথা

ত্রিগরীশশেখর বসু

পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম, কীর্তিকলাপ এবং বংশ-বৃত্তান্ত কালনির্দেশ সহ পুরাণে ধৃত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীনকালের 'হিষ্টরি' বা ইতিবৃত্ত। পুরাণকার তাঁহার ইতিবৃত্তীয় বিবরণে পৃথিবী কবে ও কিরূপে সৃষ্টি হইল এবং মানবের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন; এ সকল তিনি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী লিখিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতের সহিত তাঁহার কথা অনেকাংশে মেলে। পুরাণকার কি করিয়া জগতের জয় হইবে ও সেই সঙ্গে কিরূপে সকল ইতিবৃত্তের অবসান হইবে তাহারও বিবরণ দিয়াছেন। পুরাণমতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের পুনঃ পুনঃ আবর্তন ঘটে। পুরাণে অতিরঞ্জন থাকিলেও পৌরাণিক কহিনী অবিশ্বাস্য নহে। পুরাণের প্রামাণ্য অত্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। পুরাণে যে সকল রাজার নাম আছে ও তাঁহাদের কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা বাস্তবিকই এক দিন জীবিত ছিলেন। বিশিষ্ট রাজগণের চরিত্র-কাহিনী কোতূহলোদ্দীপক ও সর্বথা স্মরণযোগ্য।

পুরাণ আদিতে পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত ছিল। সৃষ্টি, লয়, বংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশবিবরণ, তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ এবং মনুষ্য বা কালনির্দেশ এই পাঁচটি বিষয় পুরাণের পঞ্চ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। কালক্রমে পুরাণে অত্যন্ত প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে। পুরাণ একাধিক। পুরাণার্থবিশারদ কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস পুরাণগুলির সার-সংকলন করিয়া পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন এবং নানা আখ্যান, উপাখ্যান, শ্রীক-কল্পাদির বিবরণ ও গাথা তাহার সহিত যোগ করিয়া দেন। ইহাতে পুরাণ অধিক লোকপ্রিয় হয় এবং তাহার ইতিবৃত্তীয় মূল্যও বৃদ্ধি পায়। নিজে দেখিয়া যে সকল বিবরণ দেওয়া যায় তাহা আখ্যান, পরের মুখে শোনা কাহিনী উপাখ্যান। শ্রীক প্রভৃতির বিবরণের আর এক নাম কল্পশুদ্ধি। মৃত মহাআগণের রচিত গ্লোক বা গীত গাথা। গাথাগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কতক গাথা উপদেশমূলক; কতক গাথায় বিখ্যাত রাজাদের গুণাবলী এবং কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে; কোনও রাজার কোন বিশেষ দোষ থাকিলে তাহাও কখন কখন গাথায় ঘোষিত হইয়াছে। দুই-একটি ব্যতীত গাথাগুলির রচয়িতার কোন সন্ধান মিলে না। ছড়া ও লোকসঙ্গীত

রচকের মত গাথাকার আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী কোন অর্বাচীন পুরাণকারের রচিত এক বিখ্যাত গাথা আছে। গাথার ভাব ও রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর। মনুষ্য-জীবন ও রাজ্য ঐশ্ব্যাদির নশ্বরতা এই গ্লোকগুলিতে গীত হইয়াছে। গাথাটি উদ্ধৃত করিলাম :
তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈরুদ্বাহভির্বর্ষণাননেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোহভিবীর্ঘাঃ কৃতান্ত কালেন কথাবশেষাঃ।
পৃথুঃ সমন্তান্ প্রচাচার লোকানব্যাহতো যোহরিবিদারিচক্ষুঃ।
স কালবাতাভিহতো বিনষ্টঃ ক্ষিপ্তঃ যথা শাবলিতুলসর্যোঃ।
যঃ কাতবীর্ঘো বুভুক্ষে সমন্তান্ দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্ষুঃ।
কথাপ্রসঙ্গে স্বভাবীমানঃ স এব সংকল্প বিকল্পহেতুঃ।
দশাননাবিক্ষিতরাঘবানাং মৈত্রেয়ঃ সুভাসিত দিগ্‌ব্রহ্মণাম্।
ভ্রম্যপি যাত্তং ন কথং কপেন ক্রতদপাতেন দিগন্তকৃত্য।
কথাশরীরত্বম্বাপ যদৈ মাধ্বাতনামা ভুবি চক্রবর্তী।
ক্রতাপি ভং কোহপি ক্রোতি সাধুর্মমতমাত্মচপি মন্যচেতাঃ।
ভগীরথাত্মাঃ সগরঃ ককুৎস্থো দশাননো রাঘবলক্ষ্মণৌ চ।
যুধিষ্ঠিরাত্মাশ্চ বভূবুর্বেতে সত্যং ন মিথ্যা কল্পে ন বিদ্বাঃ।

বিষ্ণু। ৪।২৪।১০-১৫।

গ্লোকগুলির ভাবার্থ, যথা 'পূর্বে যে সকল মহাপুরুষ উর্দ্ধবাহু হইয়া অনেক বর্ষ তপস্যা করিয়াছেন এবং যে সকল শক্তিমান ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছেন কাল তাঁহাদের কথা মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সব শেষ করিয়াছে। যে পৃথু অরি দলন করিয়া অব্যাহত পরাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতেন তিনি কালবায়ুদ্বারা আহত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শিমূল তুলার মত বিনষ্ট হইয়াছেন। কার্তবীর্ষ রিপুল নিহত করিয়া দুই নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত প্রদেশ আয়ত্তে আনিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু এখন কথা-প্রসঙ্গে তাঁর নাম উঠিলে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বাস্তবিক ছিলেন কিনা। দশানন, অবিক্ষিত ও রাঘবদের ঐশ্ব্যে দিকসকল উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত কিন্তু দিক্‌, কালের জ্রুতিপাতে তাহা ক্ষণমাত্রেরই ভস্মসাৎ হইয়াছে। মাধ্বাতা-নামা পৃথিবীর চক্রবর্তীরাজ আজ কথাশরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথা শুনিয়া কে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন যিনি অল্প বুদ্ধিবশে নিজের উপর মমত্ব করিবেন। ভগীরথ প্রভৃতি নৃপতি, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির আদি সকলেই ছিলেন একথা সত্য, মিথ্যা নহে, কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায় আমরা জানি না।'

দেখা যাইতেছে আমরা এখন কেহ কেহ যেমন পুরাণোক্ত রাজাদের অন্তিহে বিশ্বাস করি না। পুরাকালেও সেরূপ লোকের অভাব ছিল না। মাক্কাতে প্রভৃতি রাজগণ বহুকাল হইতেই কথাস্বরী প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক যুগেও এই প্রকার অবিশ্বাস দেখা যায়। অনেক মনে করেন শেকস্পীয়র নামা কোন ব্যক্তি ছিলেন না।

কার্তিকেয় যখন তারকাসুর বধের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য দিক্‌বন্দিকিন্নরগণ এক গীত গাহিয়াছিলেন। পুরাণকার ইহাকে গাথা বলিয়াছেন যদিও গাথার বিশিষ্ট রূপ ইহাতে নাই। ইহা পুরাণকার-রচিত। পুরাণ বলিতেছেন, তারকাসুর চিন্তাকুল ও বিস্মিত চিত্তে অদূরে ঈদৃশ হৃদয়বিদারক, কর্কশাক্ষরময় গীত শ্রবণ করিতে লাগিল :

জয় অতুলশক্তিধীশিতাপিঞ্জর-

ভুজদণ্ডচণ্ডরগরভঙ্গ।

সুখদ কুমদকাননবিকাসমেধো

কুমার জয় দিতিকুলমহোদধিবড়বানল ॥

যগ্ধুং মধুরমব ময়বরধ

সুরমুক্তকোটবটচরণ নবাকুরমহাসন।

জয় ললিতচূড়াকলাপনববিমলমল

কমলকান্ত দৈত্যবংশধুঃসহদাবানল ॥

জয় বিশাখ বিভো জয় সকললোকতারক

কন্দ জয় গৌরীনন্দন ঘটাপ্রিয়।

প্রিয় বিশাখ বিভো ধৃতপতাকপ্রকীর্ত

পটল কনকভূষণভাস্করদিনকরচ্ছায় ॥

জয় অনিত্যমলীলালুনাখিলারাতে জয়

সকললোকতারক দিতিকাসুরবরতারকাতক।

কন্দ জয় বাল সপ্তবাসর জয়

ভুবনাবলিলোকবিনাশন ॥

মংস্ত ১৫৯১৪০-৪৩ ॥

এই গাথায় কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আজকাল যেমন যুদ্ধ-যাত্রাকালে জাতীয় সংগীত গীত হইয়া থাকে পূর্বে সেইরূপ হইত না। তখনকার দিনে সেনাপতিরই প্রশস্তি গাওয়া হইত। যুদ্ধে নানারূপ বাতের সহিত ঘটাপ ও বাজান হইত। কার্তিকেয়কে ঘটাপ্রিয় বলা হইয়াছে। ঘটাপ্রিয় প্রচলন ক্রমে উঠিয়া যায়। ভারত-যুদ্ধে শজ্জা, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ ইত্যাদি নিনাদিত হইয়াছিল কিন্তু ঘটাপ্রিয় কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কার্তিকেয় অতি তরুণবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাত্র সাত বৎসরের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা ছিল এজন্য তাঁহাকে গাথায় 'বাল সপ্তবাসর' বলা হইয়াছে। তাঁহাকে তারকাসুর বলিয়া-

ছিলেন 'তুমি কি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি বালক মাত্র। তোমার এখনও কন্দুক নইয়া খেলা করিবার বয়স যায় নাই। তুমি সমর-ভীষণ যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বরদিগকে দেখ নাই তাই এ বুদ্ধিবল্লভ ঘটয়াছে।'

যযাতি-গাথা পুরাণে প্রসিদ্ধ। এই গাথা রাজা যযাতির নিজের রচিত। বিষয়বস্তুভোগ দ্বারা কামনার বিনাশ হয় না ইহাই গাথায় গীত হইয়াছে। গাথাটি খুবই লোকপ্রিয় ছিল মনে হয়। একাধিক পুরাণে ইহা ধৃত হইয়াছে। গাথার প্রথম শ্লোকটি এখনও অনেক লোকের মুখে শোনা যায়।

ম জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ত্বয় এবাভিবর্জতে ॥ বিষ্ণু ৪।১০।৯।

গাথার সাতটি শ্লোক আছে। বায়ু ও বিষ্ণুর যযাতি-গাথায় কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। যে শ্লোকগুলি উভয় পুরাণে অল্পরূপে তাহার ভাবার্থ দিলাম। 'বিষয়বস্তুর ভোগে কামনার উপশম হয় না, অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন তাহা না কমিয়া অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয় সেইরূপ ভোগের ফলে বিষয়-বাসনা বাড়িতেই থাকে। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পণ্ড, এবং স্ত্রীলোক আছে তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিল্য মিটে না, সেজন্য অতিতৃষ্ণা ত্যাগ করিবে। দুর্মতিগণ বাহ্য ত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও বাহ্য জীর্ণ হয় না বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিলে সুখের দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারেন। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয় কিন্তু তাহার জীবনের আশা ও ধনের আশা কিছুতেই জীর্ণ হয় না।'

আগুনে ঘি ঢালার উপমা এই গাথায় যযাতি কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়; এখন তাহা সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণবজ্র অগ্নির আর এক নাম, কারণ জ্বলে আগুন দিলে আগুন নিজ পথে কৃষ্ণচিহ্ন রাখিয়া যায়। পুরাকালে বন সাফ করিবার জন্য এই উপায়ের বহুল প্রচলন ছিল। গাথায় কৃষ্ণবজ্র কথা ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। বেদেও অনেক স্থলে কৃষ্ণবজ্র কথা আছে। এখন একথাটার চলন নাই।

পুরাণে আর এক অতি প্রাচীন গাথার উল্লেখ আছে। ইহার রচয়িতা ভগবদ্গীতোক্ত উশনা। ইনি আদি কবি বলিয়া কথিত। ঋব ও তাহার মাতা স্ননীতির মহিমা এই গাথায় কীতিত হইয়াছে। গাথার ভাবার্থ যথা, 'অহো, ইহার তপস্তার বল, অহো ইহার তপের ফল যাহার প্রভাবে ইহাকে সম্মুখে রাখিয়া সপ্তবিগণ অবস্থিত আছেন। আর এই ঋবের স্ননীতি বা স্ননূতা নামী মাতা, ইহার মহিমাই বা পৃথিবীতে কে বর্ণনা করিতে সক্ষম, যিনি ঋবকে গর্ভে

ধারণ করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ ত্রিলোকের পরম স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অচঞ্চলরূপে অবস্থান করিতেছেন।

মাক্ষাতার নামে এক গাথা প্রচলিত আছে। মাক্ষাতা চক্রবর্তী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল। এখন যেমন বলা হয় যে ইংরেজ রাজত্বে স্বর্ধ কখনও অন্ত যায় না, সেইরূপ মাক্ষাতার সম্বন্ধে বলা হইত:

যাবৎ স্বর্ধ উদেতি স্য যাবচ্চ প্রতিষ্ঠতি।

সর্বং তদযৌবনাশ্চ মাক্ষাতুঃ ক্ষেত্রযুচ্যতে ॥ বিষ্ণু। ৪২।১৮। অর্থাৎ, 'স্বর্ধ যেখান হইতে উঠেন ও যেখানে অন্ত যান তাহার অন্তর্গত সমুদয় প্রদেশ যুবনাশপুত্র মাক্ষাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়।' এই শ্লোকের রচয়িতা কে তাহা জানা নাই।

ভগীরথ সম্বন্ধে গাথা আছে, 'ভগীরথ কর্মবলে গন্ধাকে আনয়ন করিয়াছিলেন এইজন্য বংশবিদ্ ব্যক্তিগণ গন্ধাকে ভাগীরথী বলিয়া থাকেন।' নাভাগ বংশে মরুত নামে এক অতি ধনশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে গাথা আছে, 'মরুত রাজার যজ্ঞের ন্যায় যজ্ঞ পৃথিবীতে আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজ্ঞে সর্বপ্রকার যজ্ঞনামগ্রী স্বর্ণনির্মিত ছিল; স্বর্ণপাত্রে সোমরস পান করিয়া ইজ্ঞ আনন্দিত হন, ব্রাহ্মণগণও দক্ষিণায় সন্তোষলাভ করেন। এই যজ্ঞে দেবতার সঙ্গ হইয়া পরিবেশকের কার্য করিয়াছিলেন।' রাম সম্বন্ধে যে গাথা কীর্তিত হইয়াছে তাহা প্রধানত প্রশস্তি-বাচক। ইহাতে রামকে লোহিতচক্ষু, স্নমুখ, সিংহস্কন্ধ এবং মহাভূজ বলা হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যে বেদপাঠের শব্দ এবং ধনুকের টংকার অবিচ্ছিন্ন শোনা যাইত এবং নিয়ত দৌর্য্যতাং ভূজ্যাতাম্ রব উথিত হইত, ইত্যাদি। কাশিরাজ-গোত্রে ধনুস্তরির বংশে অলর্ক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে গাথা আছে, 'অলর্ক ব্যতীত অপর কেহই যুবার গায় উৎসাহ সহকারে ষাট হাজার ষাট শত বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে রাজ্যভোগ করেন নাই।' ষাট হাজার ষাট শত বৎসর উপলক্ষ্য প্রয়োগ, ইহার প্রকৃত অর্থ ছেবটি বৎসর। এত দীর্ঘ রাজ্যকাল কদাচিৎ দেখা যায়। মহা-রাণী ভিক্টোরিয়া চৌষটি বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার নামে গাথা না থাকিলেও তাঁহার রাজ্য-ভোগের ষাট বৎসরে হীরক 'জুবিলি' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্মরণীয় কালের মধ্যে অপর কোন নৃপতির এ সৌভাগ্য দেখা যায় নাই। ভীষ্মের পিতা শন্তনু বা শান্তনুর আসল নাম জানা নাই। তাঁহার নামের নিরুক্তি তাঁহার সম্বন্ধে রচিত গাথায় পাওয়া যায়। 'রাজা সময়পূর্বক যে যে জরাগ্রস্ত পুরুষকে স্পর্শ করিতেন সেই সেই পুরুষই পুনরায় যৌবন-লাভ করিত এবং পরম শান্তি পাইত এইজন্যই ইহার নাম

শান্তনু।' তিনি মহাভিষ অর্থাৎ মহাচিকিৎসক নামে পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে লোকে এখনও বিশ্বাস করে যে, king's evil অর্থাৎ গণ্ডমালা রোগ রাজার হস্ত-স্পর্শে সারিয়া যায়। শান্তনু যেমন 'মহাভিষ' উপনাম পাইয়াছিলেন সেইরূপ মূলক নামে রামের এক পূর্ব-পুরুষ 'নারীকবচ' নামে সাধারণে খ্যাত হইয়াছিলেন। পরশুরামের আক্রমণকালে ইনি নারীবেশ ধারণ করিয়া বিবস্ত্রা নারীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে রক্ষা করেন। তৃণবিদ্ধ প্রভৃতি আরও কতিপয় রাজার নামে গাথা প্রচলিত আছে কিন্তু তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। রাজা জ্যামঘ একজন যদুবংশীয় নৃপতি। তাঁহার সম্বন্ধে একটি বড়ই মজার গাথা প্রচলিত আছে। জ্যামঘের কাহিনী এইরূপ:

রাজা জ্যামঘ অল্পবয়স্ক এবং অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা; কোন কোন পুরাণে তিনি চিত্রা বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। শৈব্যা জ্যামঘ অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এখনও রাজপুতানায় রাজন্যবর্গের মধ্যে এইরূপ অসম বিবাহ প্রচলিত আছে। এক বংশের পুত্র জন্মিলে অপর বংশে যে কন্যা হইবে তাহার সহিত বিবাহ দিবার কথা পূর্ব হইতেই ঠিক থাকে। হযত কন্যার আগে জন্ম হইল এবং তাহার অনেক বৎসর পরে অপর বংশে পুত্র জন্মিল। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব চুক্তি অনুসারে সেই পুত্র ও কন্যার বিবাহ হয়। অনেক সময় কন্যার বয়স বর অপেক্ষা কুড়ি বৎসরেরও বেশী হইতে দেখা যায়। জ্যামঘের বোধ হয় এই প্রকার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বয়স্ক পত্নীর খুবই অল্পগত ছিলেন। পুত্র না হওয়ায় জ্যামঘের মনে খেদ ছিল কিন্তু তিনি শৈব্যার ভয়ে অন্য বিবাহ করেন নাই। একবার জ্যামঘকে যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। তিনি অশ্ব-গজ ইত্যাদির সম্মর্দনজনিত ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সমস্ত শত্রু-সৈন্য পরাজিত করিলেন। চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল। এমন সময় জ্যামঘ শুনিতে পাইলেন কোন নারী 'আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। জ্যামঘ নিকটে যাইয়া সন্ধান লইয়া জানিলেন যে, ঐ কন্যা রাজকন্যা; তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাগণ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই যুদ্ধে হত হইয়াছেন। অত্যন্ত ভয় পাওয়ায় কন্যার আয়ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত ও চঞ্চল হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন 'আমার পুত্র-সন্তান নাই, আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, আমি যদি এই কন্যাকে বিবাহ করি তবে সন্তানলাভ করিতে পারি। বিধাতা স্বয়ং বুঝি আমাকে এই কন্যার দ্বারা দিলেন। ইহাকে এখন নিজ রাজধানীতে লইয়া যাই ও পরে শৈব্যার অনুমতি-ক্রমে ইহাকে বিবাহ করা যাইবে।' তখন রাজা কন্যাকে

রথে তুলিয়া লইয়া নিজ নগরের দিকে যাত্রা করিলেন। অনন্তর দেবী শৈব্যা অনেক আত্মীয়স্বজন, অমাত্য পরিজন ও ভৃত্যগণসহ বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার বাম পার্শ্বে কন্যাকে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে অধরপল্লব ফুরিত করিয়া বলিলেন, 'হে অতিচপলচিত্ত, এই রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ?' রাজা অতিশয় ভয়ে আমতা আমতা করিয়া কি উত্তর দিতেছেন তাহা না বুঝিয়াই বলিলেন, 'এই কন্যাটি আমার পুত্রবধূ।' শৈব্যা বলিলেন, 'আমার পুত্র হয় নাই তোমারও অন্য পত্নী নাই তবে কি প্রকার পুত্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ?' রাজা নিজেকে সামলাইবার জন্য বলিলেন, 'তোমার যে পুত্র জন্মিবে ভবিষ্যৎকালে ইনিই তার ভাৰ্য্য হইবেন।' এই কথা শুনিয়া

শৈব্যা ঈষৎ হাস্তসহকারে বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে।' কথিত আছে, রাজা ও রাণীর মধ্যে পুত্রজন্ম সম্বন্ধে যে আলাপ হইয়াছিল তাহা দৈবক্রমে অতি 'শুদ্ধ লগ্ন হোরাংশকাবয়বাদিতে' নিম্পন্ন হয়। ফলে শৈব্যা সন্তান-প্রসবোচিত বয়স অতিক্রম করিলেও অল্প দিনের মধ্যে গর্ভবতী হইলেন। এই গর্ভে যে পুত্র জন্মিল তাহার নাম বিদর্ভ। কালে বিদর্ভের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। জ্যাম্ব সম্বন্ধে গাথা আছে,

ভাৰ্য্যবস্তান্ত যে কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যথা যতঃ।

ভেষান্ত জ্যাম্বঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূতঃ ॥

অর্থাৎ, জগতে যত স্ত্রী পুরুষ জন্মিয়াছিলেন এবং গত হইয়াছেন অথবা যাহারা জন্মিবেন তাহাদের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যাম্বই শ্রেষ্ঠ।

কবির স্মৃতি

শ্রীকুম্ভদরঞ্জন মল্লিক

কবিতা লিখিয়া পাই নি অর্থ,
পাই নাই কোনো খ্যাতি।
হয়েছি স্বপ্ন-বিলাসী, অলস,
অল্পযোগ কর সাথী।
হিসাবী বন্ধু, ভুল করিয়াছ,
ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন মান লাগি কবিতা লিখি না,
আমি মরি সেই দেমাকে।
ফল পেতে হলে চাষ করিতাম,
ব্যবসা—চাহিলে অর্থ,
মৎস্য ধরিতে জাল ফেলা চাই,
আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ।

অনটন দেয় আঘাত নিত্য
মচকাই তবু ভাঙি না,
সাঁজের প্রদীপে তেল নাহি মোর,
ফুলে আলো করে আঙিনা।
জাঁধার যখন কাটিতে চায় না,
একা বসে বড় ভাবি রে,
অরুণ আমার এসে উঁকি মারে,
আকাশ ভরে যে আবীরে।
বিদ্বান পাই, নিন্দাও পাই,
নানা মুখে নানা ভাষাতে,
সব শুয়াপোকা প্রজাপতি হবে
আমি থাকি সেই আশাতে।

কি অর্থ খ্যাতি পাইবার লাগি
ঝঙ্কারে পিক পাগিয়া?
কি পায় সাধুরা গিরি-গহ্বরে
কঠোর জীবন যাপিয়া?
চিন্তামণির ধনে ধনৌ যারা
তারি কি মুক্তা মনি চায়?
বিশ্বয়ে দেখে বিশ্বরূপ যে
নিতি প্রতি অণু-কণিকায়।
আমি সেই স্মৃতি সেই সে তৃপ্তি—
আমি সেই প্রেম-ভিখারী,
আলোক মাগি যে, আতপ চাহি যে,
সেই হোমানল শিখারই।

ভুবন আমার অমৃতময়,
শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর
আমার অবনী বালকের।
সোনার নৃপুর গুঞ্জরে যেথা,
বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব ছুখ মোর স্বপ্ন মনে হয়
সব ব্যথা বাই পাসরি।
নিখি হিজিবিজি কি পাই তাহাতে?
বন্ধু কহিব কিবা আর—
সেই স্মৃতি পাই, রামধনু আঁকি
উপজে যে স্মৃতি বিধাতার।

মনস্তত্ত্বে এডলারের দান

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে এডলারের দানের কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই ফ্রয়েডের কথা কিছু বলা আবশ্যক; কারণ এডলার প্রথমতঃ ফ্রয়েডের সহকর্মী ছিলেন এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের নির্জ্ঞান মন এবং অবদমন সম্বন্ধে মতবাদগুলি খানিকটা গ্রহণও করিয়াছিলেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে ফ্রয়েডের মতানৈক্য আছে। ফ্রয়েডের বিশ্বাস আদিম যৌন কামনাই বিভিন্ন রূপে নির্জ্ঞান মন বা সংজ্ঞান মনের ভিতর দিয়া আমাদের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। এডলার কিন্তু যৌন কামনাকে অতটা গুরুত্ব দিতে চাহেন না; তাঁহার মতে শক্তির আকাজক্ষাই (will to power) আমাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এডলার বলেন, জাতককে জীবনের পথে চলিতে হইলে তিনটি ব্যাপারে জীবন-পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়। প্রথমটি হইতেছে সমাজের সহিত, দ্বিতীয়টি পেশা ও কর্মজীবনের সহিত এবং তৃতীয়টি প্রেম ও প্রেমাস্পদের সহিত। এই তিনটি ব্যাপারে সে শৈশবে ও বাল্যে যেমনভাবে সাহায্য বা বাধা পায়, সেই অনুসারে তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে।

এডলার বলেন, মানুষ শৈশবে অত্যন্ত অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই অসহায় ভাবটি আমাদের নিকট দুই ভাবে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে; প্রথমতঃ অনুপযুক্ত ব্যবহার বা অনুপযুক্ত পরিবেশের জন্ত এবং দ্বিতীয়তঃ দেহযন্ত্রগত দুর্বলতা, হীনতা বা অসম্পূর্ণতার জন্ত।

মাত্রাতিরিক্ত ভাবে তিরস্কার করা, “আতু আতু” করা, “নাই” দেওয়া, একচোখোমি করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া, অহেতুক শাসন তাড়না করা ইত্যাদি অনুপযুক্ত ব্যবহারের পর্ধ্যায়ে পড়ে। অনুপযুক্ত পরিবেশ নানা ভাবে হইতে পারে; কেহ হয়ত পরিবারের মধ্যে বংশের প্রদীপ, আত্মরে ছুলাল একমাত্র পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিল, কেহ হয়ত পিতার বৃদ্ধ বয়সের শেষ-কুড়ান ছেলে হইল, বাড়ীর আত্মরে চতুর্থ বা পঞ্চম কন্যাটি হয়ত হঠাৎ একটি ভাই লাভ করিয়া তাহার আদর-মর্যাদা হারাইল। কেহ হয়ত পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিল, কেহ বা বিমাতা-প্রতিপালিত বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া ‘মানুষ’ হইল। ইহাদের সকলেরই গৃহ-পরিবেশ স্বস্থ সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূল নহে।

ইহা ছাড়া দেহযন্ত্রগত অসম্পূর্ণতা বা হীনতাবোধও মানুষের সামাজিক আচরণের অসঙ্গতি ও প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে একটা প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দেহগত অসম্পূর্ণতা জাতকের মনে একটা ভয়, অসহায়তাবোধ এবং লজ্জাতুরতা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অনেক সময় অস্বভাবী করিয়া তুলে।

এডলার বলেন, এই সমস্ত প্রাথমিক অন্তরায়ের জন্য তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে;—প্রথমটি হইতেছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (successful compensation) দ্বিতীয়টি—পরাজয় বা পলায়নের প্রচেষ্টা (defeat or retreat) এবং তৃতীয়টি—ক্ষতিপূরণের আতিশয্য (over-compensation) জনিত অস্বভাবী আচরণ।

ক্ষতিপূরণের উদাহরণ—বিথোভেন ডিমস্টেনিস প্রভৃতি। বিথোভেন বধিরতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যের এই অসম্পূর্ণতার সফল ভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া উত্তর জীবনে তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিমস্টেনিসও তাঁহার বাল্যের ভোতলামিকে জয় করিয়া সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ আমরা প্রতিনিয়তই পথে-ঘাটে দেখিতে পাই। ইহা যাহাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়, তাহারা নিজেদের অক্ষমতা বা অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া জীবন-সংগ্রামের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং কল্পনার-জগতে অথবা গৃহ-পরিবারের অভিভাবকদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চায়।

তৃতীয় প্রকার প্রতিক্রিয়ার উদাহরণও বিরল নহে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই “হাবা কালা কাণা খোঁড়ার এক কাটি বাড়া।” তাই দেখা যায়, ছোট্ট হান্কা ব্যক্তিত্বহীন মানুষটি প্রায়ই আত্মপ্রচারণার জন্য আকুল ভাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। কুৎসিত মেয়েটি হয়ত সাজপোশাকের চাক-চিক্যো ও রূপের বাহাদুরিতে লোকের চোখ বলসাইয়া দিতে চায়, জীর্ণ দুর্বল ছেলেটি পুরুষোচিত বীরত্বের অভিনয়ে সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে চায়।

এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় একটা সামঞ্জস্যবিধান বা খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা। এডলারের মতে আমাদের জন্ম ও পরিবেশগত ক্রটির জন্য যথার্থ ক্ষতিপূরণ করিয়া সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যেই আছে স্বস্থ মনুষ্যত্ব। এই সামঞ্জস্যবিধানে একটু এদিক-

ওদিক হইলেই মাত্রাহীনতা বা মাত্রাতিরিক্ততা আসিয়া মানুষকে একটা অস্বাভাবিকত্ব দান করে। স্বতরাং আমাদের যাহা কিছু অস্বাভাবিকত্ব আছে, তাহার মূলে রহিয়াছে আমাদের বাল্য-জীবনে পরিবেশ বা প্রতিপালনের দোষে নিজেদের সম্বন্ধে হীনমন্যতা (inferiority complex) এবং তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেই হীনমন্যতার অল্পভূতি হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা। এইখানেই ফ্রয়েডের সঙ্গে এডলারের পার্থক্য। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের অস্বাভাবিকত্বের মূলে আছে অধিশাস্তা (Super ego) মন বা নীতিবোধের সহিত আদিম যৌন কামনার (id) সংঘাতজনিত অবদমন প্রভৃতি, আর এডলার বলেন ইহার মূলে আছে হীনমন্যতা, সমাজ-পরিবারের সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক ও সহযোগিতার অভাব। সেই ব্যক্তিই হইতেছে স্বাভাবিক চরিত্রবিশিষ্ট, বাহার ব্যক্তিগত “আমি”টির (ego) সহিত সমাজগত “আমি”র (community feeling) একটি সামঞ্জস্য হইয়াছে।

এই সামঞ্জস্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে জাতকের নিজের গৃহ ও পরিবারের সহিত সামঞ্জস্যবিধান। স্বতরাং যে গৃহে জাতকের আত্মসম্মান রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই, সেখানে তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইবে। আবার গৃহের মধ্যে বালকটিকে মহামানী মনুষ্যত্ব দুর্ঘোষন করিয়া মানুষ করিলেও তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইবে। কারণ গৃহের ছোট গণ্ডীটি ছাড়িয়া যখন সে বাহিরের বৃহত্তর সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিবে, তখন সে দেখিবে বাহিরের জগৎ তাহাকে তেমন ভাবে মাথায় করিয়া নাচিতেছে না, তাহার অভীষ্ট মূল্য দিতেছে না। তখনই আসিবে তাহার ব্যর্থতা এবং সমাজ হইতে পলায়নস্পৃহা, গৃহ-মুখিতা, ভীকৃত্য ও লজ্জাশীলতা। আবার যে ছেলেকে বহু দিন ধরিয়া “খোকা” করিয়া রাখিয়া “ছোট ছোট নিষেধের ডোরে” বাধিয়া প্রতিনিয়ত আতু আতু করিয়া মাতাপিতার সতর্ক দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যেই রাখা হয়, সেও জগতের সঙ্গে স্বস্থভাবে কারবার করিতে পারে না এবং ভীকৃ আত্ম-কেন্দ্রিক ও পলায়নপর হইয়া উঠে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার জীবনে তিনটি জিনিষের আহ্বানে (challenge) সাড়া দিতে হয়,—সমাজ, পেশা ও প্রেম। ইহাদের কোনটিকেই অন্য-নিরপেক্ষ এককভাবে বিচার করা চলে না। বস্তুতঃ মানুষ প্রেমের ব্যাপারেও কি ভাবে আচরণ করিবে তাহা নির্ভর করে আমাদের সমাজ ও পেশাগত জীবনে সার্থকতা এবং ব্যর্থতার উপর।

এডলার বলেন, আমাদের অহমটির (ego) সহিত

বাহিরের জগতের প্রথম সম্পর্ক হয় গৃহের পরিজনকে লইয়া। কাজেই এই পরিজনদের নিকট আমরা যেরূপ আচরণ বা অভিজ্ঞতালাভ করিব, তাহারই উপর নির্ভর করে আমরা বড় হইয়া বাহিরের লোকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিব। যে বালক দেখে গৃহে তাহার মাতাপিতার মধ্যে সম্পর্কের মধুরতা ঠিক নাই, সে উত্তরকালে দাম্পত্যজীবনে ঠিকমত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিবে না। যে বালক অত্যন্ত শাসন তাড়নের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, সে বড় হইয়া দুর্দান্ত অথবা জেদী স্বামী হইয়া কিংবা বদমেজাজী পিতা বা গৃহ-কর্ত্তা হইয়া তাহার ক্ষমতার অভিলାষকে চরিতার্থ করিবে। এই ভাবে ক্ষমতার অভিলাষকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আমাদের যে প্রতিক্রিয়া আছে, এডলার তাহার নাম দিয়াছেন “Masculine protest.”

এই প্রতিক্রিয়াটির অভিব্যক্তি নানাজাতীয় হইতে পারে। ইহার ফলে হয়ত ক্ষমতালুকা দুর্বল বালিকাটি নারীমূলভ কর্তব্যকে ঘৃণা করিয়া পুরুষোচিত আচরণ করিয়া তাহার দীনতাবোধকে দাবাইয়া রাখে। আবার ইহারই ফলে হয়ত দুর্বল এঁচড়ে পাকা ছেলেটি সারা জীবনই নারীত্বের অভিনয় করিয়া পুরুষত্বের তেজ শক্তি ও ক্ষমতার পূজা করিয়া থাকে।

হীনমন্যতার প্রতিকার হিসাবে এই “Masculine protest” ছাড়া আর একজাতীয় প্রতিক্রিয়া আছে। ইহার মূলেও ব্যর্থতার ইতিহাস এবং ক্ষমতার জন্য আকুর্পাকু আছে। যে কতৃৎ শক্তির দ্বারা অর্জিত হয় না, তাহা হয়ত অনেক সময় চাতুরী বিশাণঘাতকতা ছলনা কপটতা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। এইগুলিকে এডলার জীমূলভ অস্ত্র (feminine weapons) নাম দিয়াছেন। অবশ্য এই জিনিষগুলি জীমূলভ অস্ত্র হইলেও ইহা একান্তভাবে জীলোকেরই সম্পত্তি নহে। যে পুরুষ প্রতিনিয়ত পরাধীনতা ও বশ্যতার দীনতার ভিতর দিয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহার মধ্যেও এই অস্ত্রগুলি ব্যবহারের প্রয়াস দেখা যায়।

এডলারের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোকের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার বাল্য-শৈশবের অভিজ্ঞতার ফল মাত্র। স্বতরাং মানুষকে বিচার করিতে হইলে তাহার গোপীগত বা জাতিগত বিশেষত্বগুলি জানিলেই চলিবে না; প্রত্যেক মানুষটিকে এক একটি পৃথক এবং (সমাজ-প্রতিক্রিয়াজাত) সম্পূর্ণ একক বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সমস্তা, স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে; সমাজের সঙ্গে কারবারের জন্য তাহার ঘাতপ্রতিঘাত আছে বটে, এবং সেই ঘাত-

প্রতিঘাত তাহার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের ইতিহাস এককভাবে তাহার নিজেরই জিনিষ; সেই ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বটুকু না জানিলে তাহার পরিচয় ঠিকমত জানা হইবে না। এইজন্য এডলারের মনস্তত্ত্বকে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব (individual psychology) বলা হয়।

এই ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে হইলে তাহার বাল্য-শৈশবের ইতিহাসকে বুঝিতে হইবে, আর বুঝিতে হইবে তাহার পরিবারগত জীবনধারা (family style) এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা (life style)।

বাল্যের অভিজ্ঞতার প্রভাবের উপর অনেকখানি জোর দিয়াছেন বলিয়াই এডলার আমাদের নীতিগর্হিত ও পাপের কাজগুলিকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, বেশাবৃত্তি নারীর বৃদ্ধাশ্রিতা বা উদগ্র কাম-ক্ষুধাজনিত ফল ততটা নহে, যতটা বাল্য-জীবনে বঞ্চনা ও ভোগবিক্রমতার মধ্যে 'মানুষ' হওয়াতে অতৃপ্ত কামনাকে স্বপ্নে আসলে বেপরোয়াভাবে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা অথবা পুরুষকে প্রতারণা করিয়া নারীর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রয়াস। প্রায় সমস্ত ব্যভিচারের মূলেই আছে শৈশবের বঞ্চনা বা লাঞ্ছনার ইতিহাস, সমস্ত অস্বভাবী মানসতার মূলেই আছে শৈশবের ভ্রান্ত লালনপালন, সমস্ত পাপের মধ্যেই আছে শৈশবের অহেতুক হীনমন্যতাবোধ এবং বিকৃত উপায়ে তাহার প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা।

এইজন্য রোগের প্রতিকারের দিক দিয়াও ফ্রেডেরী মনোবিজ্ঞানের সহিত এডলারের মনোবিজ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে। মনোবিকলন করিয়া ঘোনক্ষুধার অবদমন-জনিত জটের (complex) গ্রহিণী খুলিয়া নিজের মনের স্তর হইতে অসঙ্গত এবং অসামাজিক কামনার গোপন ইতিহাস সংগ্রহ না করিয়া এডলার সোজাসজি ভাবে রোগীকে উৎসাহ দেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন যে, জীবন-সংগ্রামে পরাজয়ের ভয়ে সে হীনতর কলাকৌশলের বা কাল্পনিক জগতের আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই তাহার রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিকারের উপায় হইতেছে কল্পনার আবাস্তব জগৎ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাহসের সহিত বাস্তব জগতের সম্মুখীন হওয়া এবং জয়ী হইবার চেষ্টা করা। এই জয়ী হইবার জন্য স্বল্প দেহ-যন্ত্রের প্রয়োজনও কম নহে। আমরা সকলেই জানি, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, হাঁপানি, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি অনেক সময়ই আমাদের 'মেজাজ' ও আচরণকে প্রভাবান্বিত করে এবং আমাদের অহম ও সমাজের সহিত সামঞ্জস্যের

ব্যাঘাত ঘটায়। এইজন্যই এডলার মানসরোগের প্রতি-কারের জন্য ঔষধপত্রের ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। ফ্রেডেরীও গণ কিন্তু এই ব্যাপারে ঔষধপত্রের চেয়ে মনোবিকলনকে অধিকতর কার্যকরী বলিয়া মনে করেন।

যাহাকে পাপ বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা শৈশবের হীনমন্যতা হইতে কি ভাবে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তাহা এডলার নানা ভাবে দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি পাঁচ বৎসরের পাপমতি বালিকার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। সেই বালিকাটি তাহার চেয়ে ছোট ছোট বালিকাদের খেলায় আহ্বান করিত এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদিগকে নদীর জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। এই ভাবে পর পর তিনটি বালিকাকে হত্যা করিবার পর সে ধরা পড়ে। পরে দেখা যায়, এই বালিকাটি তাহার জীবনের প্রথম চারিটি বৎসর মাতাপিতার কনিষ্ঠা কণা হিসাবে আদরের ঢুলালী হইয়া 'মানুষ' হইয়াছিল; তাহার পর তাহার দুর্দিন আসিল যখন তাহার আর একটি নবজাত ভগিনীর আবির্ভাব হইল। সে দেখিল সে ক্রমশঃই কোণ-ঠাসা হইয়া যাইতেছে, আদর-বস্তু সমস্তই তাহার নবজাত ভগিনীটিই পাইতেছে। ক্রমে সে তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত ছোট মেয়েকেই সে নিজের হস্তব্য শত্রু বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিল। ইহাই হইল বালিকাটির পাপের ইতিহাস।

অধিকাংশ পাপের ব্যাপারেই এই জাতীয় একটা-না-একটা ইতিহাস আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধূলিধূসরিত হওয়া, অভিমান আহত হওয়া, অবস্থার বিড়ম্বনায় নিজেকে ছোট বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হওয়া, আদর-বস্তু বিকৃত হওয়া, বাহবা এবং হাততালি পাওয়ার সুযোগ হইতে-ভ্রষ্ট হওয়া, এই সমস্ত জিনিষই জাতককে সমাজবিরোধী আচরণে প্ররোচিত করে। এইজন্যই দেখা যায়, সাধারণতঃ যে ছেলে পড়াশুনায় বাহবা পায় না, সেই ছেলেটিই স্কুলের ধর্মঘটের সময় মলপতিত্ব করিয়া ছাত্রনেতা হইবার চেষ্টা করে, স্কুলের আইনশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া, আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া শিক্ষককে অপমান করিয়া বন্ধুহলে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করে।

যাহাকে আত্মাবমানাজনিত জট বা হীনমন্ত্রতা বলে, তাহা কি ভাবে ছাত্রদের পাপের পথে লইয়া যায়, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়। একজন বালক হয়ত ক্লাসে অঙ্ক কষিতে পারে না, সহাত্মভূতিহীন শিক্ষক হয়ত তাহাকে প্রায়ই ভৎসনা করেন, তাহার বন্ধুবান্ধবদের সম্মুখে অপমান করেন। ফলে বালকের আত্মাবমাননা অসহ্য হইয়া উঠিল এবং বিদ্যালয়টিকেই সে হীনমন্যতার কেন্দ্র বলিয়া

মনে করিয়া স্কুল পালাইতে আরম্ভ করিল। ইহার পরেই আরম্ভ হইল অভিভাবকের স্বাক্ষর জাল করিয়া চিঠি লেখা। তাহার পরে স্বরূপ হইল স্কুল-পলাতক অবস্থায় সমধর্মী বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে সিনেমা অভিনয়, বিড়ি ফুঁকিতে শেখা, অসময়ে যৌনচেতনা লাভ করা এবং দলের বন্ধুদের অন্যান্য পাপাচরণগুলি শেখা। স্কুলের বাহিরের জগতে সে দেখে অঙ্কের ভুলের জন্য তিরস্কার নাই, ব্যাকরণের ভুলের জন্য বিদ্রূপ নাই, পদে পদে আত্মব-মাননা ও লাঞ্ছনার ভয় নাই। এখানে নেতাগিরি করিবার সুবিধা আছে, চাল মারিবার সুযোগ আছে। স্কুলের পরিবেশ তাহার আমিত্বকে ছোট করিয়া দেখায়, আর স্কুলের বাহিরের জগৎ তাহার আমিত্বকে বড় করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয়। ফলে শেষ পর্যন্ত সে স্কুল ছাড়িয়া দেয় এবং হয়ত “বয়্যাটে” হইয়া পড়ে। এই বয়্যাটে হইবার পরিণাম যাহাই উদ্ভূত, ইহার প্রারম্ভ যে ছিল হীনমন্যতার মধ্যেই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এডলারের এই তত্ত্বটি শিক্ষার ক্ষেত্রে নানাভাবেই ব্যবহারিক নির্দেশ দিতে পারে। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের অকৃতকার্যতা দেখিয়াও অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদের আত্ম-সম্মানে আঘাত না করেন, বিত্তার তাক লাগাইয়া ছাত্রদের স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা না করেন, “তোমার কিছু হবে না” বলিয়া প্রথম হইতেই যদি তাহাদের অপাংক্ত্যে করিয়া না দেন, তাহা হইলে অনেক বালকই বিপথে যায় না। যোগ্য শিক্ষক অন্যভাবেও তাহাদের বাঁচাইতে পারেন। যে বালক এক বিষয়ে পথের সন্ধান পাইল না, তাহাকে অন্য বিষয়ে পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। ফলে যে বালক অঙ্ক করিতে পারিল না, সে হয়ত ভাল গায়ক হইল; যে তাহাও হইতে পারিল না, সে হয়ত ভাল চিত্র-শিল্পী হইল। এইভাবে তাহাকে আত্মবিশ্বাসের হাত হইতে, ব্যর্থতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন। আত্মবিশ্বাসের অভাব কিভাবে ছেলেদের খারাপ করিয়া দেয়, তাহা এডলার-বর্ণিত আর একটি উদাহরণ হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এই উদাহৃত গল্পটির নায়ক হইতেছে একটি পাঁচ বৎসরের বালক। বালকটির মাতাপিতা বাহিরে যাইবার সময় বাস্তব লিঙ্ককে তালাচাবি দিয়া যাইতেন। ইহাতে বালকটি অপমানিত বোধ করিতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত মাতা-পিতার আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে চুরি অভ্যাস আরম্ভ করিল। আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার এই চুরি-রোগ সারিল না; সে ধরাও পড়ে তবুও চুরি করিয়া

যায়। পিতা বলেন, “দেখো এতে লাভ কি? তুমি যত বার চুরি কর আমি তত বারই ত ধরে ফেলি, এতে আর বাহাদুরি কি?” বালকটি তখন মনে মনে হাসে আর বলে, “কুড়ি বার চুরির মধ্যে অন্ততঃ এক বারও ত আমি ফাঁকি দিতে পারি,—এখানেই আমার বাহাদুরি প্রতিপন্ন হ’ল।”

এডলারীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের এইটুকুই বুঝাইয়া দেয় যে, শিক্ষার ব্যাপারে এই বাহাদুরির পথটিকে নানা দিক দিয়াই খুলিয়া দিতে হইবে; তাহা না হইলে বিপদ আছে। সোজা পথে বালকবালিকারা যদি এই বাহাদুরির পথের সন্ধান না পায়, তাহা হইলে অলিগলির ঝাঁক পথে, পাপের অন্ধকারে এই পথের সন্ধান করিবে। তাহাতে তাহাদের এবং জাতির কাহারও কল্যাণ হইবে না। এই অকল্যাণ হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ভাবীকালের নাগরিক প্রত্যেক ছাত্রটির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষাকে বহুমুখী করিতে হইবে এবং তাহাদের যোগ্যতা ও শক্তিকে চিনিয়া লইয়া যথাযোগ্য পথের সন্ধান দিতে হইবে।

এডলারীয় মনোবিজ্ঞানকে অনেকে হয়ত অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিবেন। ইহার মধ্যে জটিলতা কিছু নাই, নূতন কথা কিছু নাই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু জটিলতা নাই বলিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সত্যটি হেলা করিবার জিনিষ নহে। ইহার মধ্যে যে একটা ব্যবহারিক দিক আছে, যে একটা আশার বাণী আছে, তাহা হইতে শিক্ষক, অভি-ভাবক, চিকিৎসক প্রভৃতি অনেকেই উপকৃত হইতে পারেন। এই মনোবিজ্ঞান আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলিকে মাধুর্যমণ্ডিত করে, দৃষ্টিকে উদার করে। ইহার ফলে আমরা পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারি; আমরা বুঝিতে পারি আজ আমরা বাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, সে নিজের দোষে পাপী ততটা নহে, যতটা সমাজের পাপে, লালনপালনের দোষে, দুর্বল দেহবলের জটিলিতে। এই মনোবিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, দুঃখপোষ্য শিশুটির পর্যন্ত আত্মসম্মানের যথাযথ ব্যবস্থা না করিলে সে ভবিষ্যতে ‘পাপী’ হইয়া উঠিতে পারে। অত্যন্ত অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যার নিকটও আমাদের আচরণকে ভদ্র ও সংযত রাখিতে হইবে, নতুবা আমাদের আচরণের অভিজ্ঞতা তাহাদের ক্রিয়াকলাপকেও প্রভাবান্বিত করিবে এবং ভবিষ্যতে অভদ্র বা অনীতিপরায়ণ নাগরিক সৃষ্টি করিবে।

কথা-সাহিত্যের প্রথম যুগ

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১২৬৪ সাল বা ১৭৭২ শকাব্দা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর কথা-সাহিত্যের এমন তিনখানি স্থলিখিত পুস্তক জন্মলাভ করে যাহা বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুস্তক তিনখানি—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ‘দুর্ভাগ্যজ্ঞের বৃথা ভ্রমণ’ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস; বিষয়-বস্তু, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী—সকল দিক দিয়াই ইহা তৎকালীন বাংলা-সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিতীয়খানি এডভেঞ্চারের কাহিনী, কতকটা আরব্য-উপন্যাসের ধরণে লিখিত; তৃতীয়খানি ডঃ কণ্টার (Caunter)-কৃত *Romance of Indian History—India* অবলম্বনে লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

তিনখানি পুস্তকেরই আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল-হিসাবে কেবল সালেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু উহার সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় তারিখ-অনুযায়ী কোনটি কাহার পরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। বাংলা ১২৬৪ সাল বা ১৭৭২ শকাব্দা ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ হইতে ১২ এপ্রিল ১৮৫৮ পর্য্যন্ত। অনেকে এই পুস্তক তিনখানির প্রকাশকাল ইংরেজী হিসাবে “১৮৫৭” ধরিয়াছেন, ১৮৫৮ সনের হিসাবটা ধরেন নাই।

সাল বা শকাব্দার সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইংরেজী হিসাবে পুস্তকগুলির সঠিক প্রকাশকাল নির্ধারণ করা দুর্ব্বল হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। সমসাময়িক সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রে প্রকাশিত সমালোচনার তারিখ দেখিয়াও প্রায় নিঃসন্দেহে ইহা নিরূপণ করা যায়।

প্রথমেই ‘আলালের ঘরের দুলাল’র কথা ধরা যাক। ইহার আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল—১২৬৪ সাল। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ইহার প্রকাশকাল “১৮৫৭” লিখিয়াছেন। কোথা হইতে তাঁহারা এই ইংরেজী সাল সংগ্রহ করিলেন জানি না, অন্ততঃ পুস্তকে ইহা নাই; সম্ভবতঃ পুস্তকে মুদ্রিত প্রকাশকাল “১২৬৪” সাল হইতেই তাঁহারা এই ইংরেজী সাল অনুমান করিয়া লইয়াছেন। যাহাই হউক, উহা যে ঠিক

নহে, ১৮৫৮ সনে যে ‘আলাল’ প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা প্রমাণ করা যায়। ৮ এপ্রিল ১৮৫৮ (২৭ চৈত্র ১২৬৪) তারিখের *Hindoo Patriot* পত্রে সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

“Those of our readers who have not blessed themselves with this parting gift of the Bengali Year 1264, may obtain that blessing on an application to Messrs D’Rozario & Co. and the earlier the better, for such blessings are apt to be exhausted.”

উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ১২৬৪ সালের চৈত্র, অর্থাৎ ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ—১৭৭২ শকে প্রকাশিত ‘দুর্ভাগ্যজ্ঞের বৃথা ভ্রমণ’। ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাসও নহে, অক্ষয়চন্দ্র সরকার-উল্লিখিত *Romance of Indian History*-হইতে সঙ্কলিতও নহে; ইহা প্রকৃত পক্ষে একজন বাঙালী সৈনিকের এডভেঞ্চারের কাহিনী। আজকালকার বাঙালী পাঠক যে এই পুস্তকখানির সহিত পরিচিত নহেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত সাহিত্যরথী পর্য্যন্ত শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশস্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা-রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এত কাবধরী নয়, বেতাল পচিণ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়,—এ যে এক নতুন সৃষ্টি। ইহাতে কাবধরীর আড়ম্বর নাই, বিভ্রাস্তির স্রসস্তা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিন বার পাঠ করিলাম।...

বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আভ্যুদয় আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির কথা কাহারও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস দুর্ভাগ্যজ্ঞের ভাষা বঙ্গিমচন্দ্রের ভাষার জননী।...উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। (বঙ্গ-ভাষার লেখক, পৃ. ৫২৫-২৭)

আশ্চর্যের বিষয়, অধ্যাপক শ্রীকুমার বাবু বা ডক্টর স্বকুমার সেন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একখানি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। মনসী ব্রজেনলাল মিত্র তাঁহার সুবিখ্যাত ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহ’ নামক মাসিকপত্রের আঘাট ১৭৮০ (জুন ১৮৫৮) সংখ্যায় ইহার সমগ্রাঙ্গ সমালোচনা করেন। সমালোচনার কালটি স্মরণ রাখিলে মনে করা অসম্ভব হইবে না যে, ‘দুর্ভাগ্যজ্ঞের বৃথা

ভ্রমণ' মাসিকে সমালোচিত হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে—১৭৭২ শকাব্দার শেষ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ১৭৭২ শকের চৈত্র মাস (মার্চ ১৮৫৮) হওয়াই সম্ভব, কারণ পরবর্তী ৫ই বৈশাখ হইতে কৃষ্ণকমল কিছু কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন।

আলোচ্য তৃতীয় গ্রন্থ—‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’। ইহার আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল—১৭৭২ শকাব্দা। ডঃ স্বকুমার সেন ইহার প্রকাশকাল “১৮৫৭” বলিয়াছেন। শ্রীকুমার বাবু ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের ১ম সংস্করণের সন্ধান না পাইয়া লিখিয়া বসিয়াছেন যে, ইহার “প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত।” তবে তিনি শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের (‘ভারতবর্ষ’, বৈশাখ ১৩৪২) নজীরে উহা যে “১৮৫৭” তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই ইংরেজী সাল যে ভুল, সম্প্রতি আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ের পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতে গিয়া ১৮৫৮, ১৮ই নবেম্বরের

সংখ্যায় ভূদেবের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের এক দীর্ঘ সমালোচনা পাইতেছি। উপন্যাসখানি ১৮৫৭ সনে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, একখানি স্থানীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে উহা যে দীর্ঘ এক বৎসর পরে সমালোচিত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে মন সায় দেয় না। একে তখনকার দিনে মুষ্টিমেয় বাংলা বই প্রকাশিত হইত, তাহার উপর বইখানি বন্ধুর লেখা; হৃদিশ্রদ্ধা যে স্থায়ী পত্রিকায় উহার সমালোচনা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইতেন, এইরূপ চিন্তা করা অসমীচীন। ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ ১৭৭২ শকে মুদ্রিত হইলেও কোন কারণে প্রকাশিত হইতে কয়েক মাস বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু উহা যে ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

এই সকল কারণে, আলোচ্য পুস্তকগুলির প্রকাশের কালক্রম আমার মতে এইরূপ :—

- ১। আলালের ঘরের ছলাল : ১২৬৪ সাল (মার্চ, ১৮৫৮)
- ২। দুরাকাজ্জের বুধা ভ্রমণ : ১৭৭২ শকাব্দা (মার্চ, ১৮৫৮)
- ৩। ঐতিহাসিক উপন্যাস : ১৭৭২ শকাব্দা (ইং ১৮৫৮)

গোপনচারিণী

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

প্রলয়ের মাঝে স্থিতি হে মূর্তিমতী,
কাজ করে চলো গোপনে গোপনে অতি,
কে গো মায়াবিনী—রূপ নয়নাভিরাম,
গোপনচারিণী, জানি না তোমার নাম।

নয়নের কোণে মধুর জ্যোতির শোভা,
অবয়ের বাণী মুনিজন-মনোমোহা,
নিরলকারা, তোমার অঙ্গবাস—
সমারোহহীন, নাহি বিলাসোচ্ছ্বাস।

অমৃতদেবের স্তম্ভর করে তুমি,
চরণ-পরশে পুলকিত বনভূমি;
তোমার হাসিতে গাছে গাছে ফোটে ফুল,
বনে বনে পাখী কাকলি-কুজন-কুল।

মহামিলনের রাঙা রাখী ল’য়ে করে,
আনন্দ-বরা চোরা কটাক ভরে

সুরে ও বে-সুরে বেঁধে দাও সেই রাখী
আপনি গোপনে চোপের আড়ালে থাকি।

এ মর মহীতে তুমি চির অযুতা,
বিষাভা তোমার রচিত পানে নি চিতা;
পিনাকপাণির প্রলয়-উষাক্ষর
স্বপ্নের সুরে তব বীণে ওঠে রনি’।

যুগে যুগে তুমি আছিলে, আছ ও হবে
মহীয়সী হ’য়ে সত্যের গৌরবে;
মিথ্যারে তুমি বরণ করে নি, তাই
এ মর মরতে তোমার মরণ নাই।

কামনা জাগিয়ে গোপনে কামীর বুকে
কাম্যের রূপে দেখা দাও সন্মুখে,
কে গো মায়াবিনী, রূপ-নয়নাভিরাম
কহ পরিচয়—‘প্রেম’ কি তোমার নাম?

শ্রীধর স্বামীর কুল-পরিচয় ও কালনির্ণয়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বনামধন্য শ্রীধর স্বামি-রচিত ভাগবতটীকা ও গীতাটীকা বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপ্রচারিত এবং উভয় গ্রন্থই বহু স্থানে বহুবার মুদ্রিত হইয়া সকলের নিকট সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। এই শ্রীধর স্বামি-রচিত অপর গ্রন্থ বিষুপুராণের টীকাও বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথমোক্ত টীকাটির স্থায় জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। তদ্রূপিত “বালবোধিনী” নামক সনৎস্বজাতীয় ব্যাখ্যা বোধ হয় অজ্ঞাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে। ভারত-বিখ্যাত এই মহা-পণ্ডিত ও যতিবরের নাম না শুনিয়াছেন, এরূপ লোক শিক্ষিত-সমাজে অতীব বিরল। অথচ এই মহাত্মার কোন প্রামাণিক বিবরণ কেহই এযাবৎ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারদের পরিচয়াদি ব্যাপারে এই পরাধীনতা ও উপেক্ষাভাব বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেই পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর আত্মবিশ্বস্তির যে সকল উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে শ্রীধর স্বামী তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয়াদি বর্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শ্রীধর স্বামীর পুত্রই বিখ্যাত ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ছিলেন। এই প্রবাদ “ভক্তমাল” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

শ্রীশ্রীধর স্বামী জগতে বিদিত ।

শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা কৈল বিস্তারিত ॥

শাক্তরী বিরুদ্ধ গোণ-লক্ষণ-ব্যাখ্যান ।

দুষ্টিয়া স্থাপিতা শুদ্ধ মত বিলক্ষণ ॥

গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণ গর্ভবতী ।

ভ্যজিয়া ঘাইতে বন হইল দৃঢ়মতি ॥

হেন কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া ।

কালপ্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া ॥

সাপু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে ।

চিন্তিত বালক এই কে-বা রক্ষা করে ॥

ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যোতী-উদয় ।

চাল হতে পড়ে গেল বিনা অবলম্ব ॥

ভাঙ্গিয়া ভিতর হতে বাচা নিকলিয়া ।

খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া ॥

সাপু ভাষা দেবি মনে বিচার করিল ।

সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল ॥

এতক ভাবিয়া ভ্যজি গমন করিল ।

অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল ॥

সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইল ।

ভট্টিনামে রামলীলা সাহিত্য রচিল ॥

ভট্টিকাব্য গুজরাটের অন্তর্গত বলভী নামক নগরে ধরসেন রাজার সভায় রচিত হইয়াছিল। চারি জন ধরসেন রাজার অস্তিত্ব শাসনলিপি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—শেষ ধরসেনের রাজত্বকাল প্রায় ৬০০ খ্রিঃ। স্মৃতরাং ভট্টিকবির পিতা ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী কিছুতেই হইতে পারেন না। ভট্টিকাব্যের পুষ্পিকায় কবির পিতার নাম লিখিত আছে “শ্রীস্বামী”—তাঁহার পাঠান্তর “শ্রীধর স্বামী” দুই-এক স্থলে লক্ষ্য করিয়া উভয়ের পিতাপুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। এই ভ্রমাত্মক কল্পনা নির্কিচায়ে অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী গুজরাট নিবাসী ছিলেন, ইহাই প্রচলিত মত।

শ্রীধর স্বামী স্বয়ং তাঁহার টীকাত্রেয়ে ষেটুকু আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এইরূপ। (১) তাঁহার গুরুর নাম ছিল “পরমানন্দ”; গীতাটীকার প্রারম্ভ শ্লোকে তাঁহার ব্যাখ্যা-চাতুর্ঘ্যের স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

শেষাশেষ-মুখব্যাখ্যাচাতুর্ঘ্যং ত্বেকবক্তৃত্বতঃ ।

দধানমুদ্রুতং বন্দে “পরমানন্দ”-মাধবম্ ॥

ভাগবতটীকার বহু স্থলে এই গুরুনাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা সর্বশেষে,

ভাবার্থ-দীপিকামেতাং ভগবদ্ভক্তবৎসলাং ।

“পরমানন্দ”-পাদার্ক-ভৃঙ্গঃ শ্রীশ্রীধরোহংকরোঃ ॥

“পরমানন্দ”রূপে নামটির পাঠান্তরও স্থলে স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা বিষুপুরাণ-টীকায়,

সংশ্রিতশ্রীপরমানন্দ-নৃহরিঃ শ্রীধরো যতিঃ ।

(প্রথমার্শের শেষে ও দ্বিতীয়ার্শের আরম্ভে)

পরমানন্দপদাভোজ-শ্রীধরঃ শ্রীধরো যতিঃ ।

(তৃতীয়ার্শের আরম্ভে)

(২) টীকাত্রেয় ৮কাশীধামে রচিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই ভারতবর্ষের সর্বত্র সহজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাশীতে রচিত হওয়াতেই কুল্লুকভট্টের মনুটীকাও তদ্রূপ সর্বত্র সুপ্রচারিত হইতে পারিয়াছিল।

গীতাটীকার আরম্ভে গুরুবন্দনার পরবর্তী মঙ্গলশ্লোক হইল :

শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশেষমাদরাং ।

বিষ্ণুপুরাণ-টীকার মঙ্গলশ্লোক যথা,

শ্রীবিষ্ণুমাধবং বন্দে পরমানন্দবিগ্রহং ।

বাচং বিবেকধরং গঙ্গাং পরাশরমুখান্ মুনীন্ ॥

বৈষ্ণবের পক্ষে বিবেকধর ও গঙ্গার বন্দনা নিঃসন্দেহ কাশীধার স্মৃতিত করে। (৩) শ্রীধর স্বামী “নৃসিংহ”-দেবতার উপাসক ছিলেন, ইহাই প্রচলিত প্রবাদ এবং তদনুযায়ী পৌরাণিক সম্প্রদায়ে শ্লোকार्কি প্রচারিত আছে :

শ্রীধরঃ সত্বজং বেত্তি শ্রীকৃষ্ণলীলামহোদধঃ ।

পূর্বোক্ত শ্লোকে স্বগুরুকে ‘নৃহরি’র সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া তিনি স্বয়ং তাহার সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ‘বিষ্ণুমাধব’ের বন্দনা করিয়া তিনি স্বকীয় গুরু-পাটেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের টীকায় ইহা স্পষ্টতরভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে :

অথাভঃ পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণলীলামহোদধঃ ।

বিষ্ণুমাধবভোষায় স্বধামতি বিত্তভতে ॥

কাশীর বিখ্যাত ‘বিষ্ণু-মাধব’ তীর্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া অধুনা বৈষ্ণবদের ধ্বংসায় পরিণত হইয়াছে। এই পবিত্র-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াই শ্রীধর স্বামী গ্রন্থরচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিষ্ণুমাধব-ক্ষেত্রের দেবতা ছিল বোধ হয় ‘নৃহরি’ অথবা নৃসিংহ।

শ্রীধর স্বামীর কালনির্ণয় তাঁহার গ্রন্থোক্ত প্রমাণাবলী ও পারিবারিক ইতিহাস হইতে সহজসাধ্য। ভাগবতের টীকায় (৩.২৩৩২) তিনি “বিশ্বপ্রকাশ”ের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (‘রুচকং মঙ্গলদ্রব্যো-গ্রীবাভরণদন্তয়োঃ’)—বিশ্ব-প্রকাশের রচনাকাল ১০৩০ শকাব্দ (১১১১ খ্রিঃ)। বিষ্ণু-পুরাণের টীকারম্ভে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন :

শ্রীমৎচিৎস্বৰ্ণমোহিনীধরচিত্ত-ব্যাখ্যাং বিদীক্ষ্য ক্ষুটিং,
ভগ্নার্গেণ ইত্যাদি।

নানা গ্রন্থকার চিৎস্বখাচার্যের অভ্যুদয়কাল প্রায় ১২৫০ খ্রিঃ; তদ্রচিত টীকা ও তৎসম্প্রদায়ের উল্লেখ করায় শ্রীধর স্বামীর অভ্যুদয়কালের উদ্ধৃতন সীমা ১৩০০ খ্রিঃ অব-ধারিত হয়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগোষ্ঠী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন বংশধারা নানা স্থানে অত্যাধি বিদ্যমান আছে। এই ‘শ্রীধর স্বামী বংশ’ নামে পরিচিত সন্ন্যাস পরিবারের প্রামাণিক বিবরণ কুলপঞ্জী প্রভৃতি নানা উপকরণ হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহার সারাংশ লিখিত হইল। (১)

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে খড়দহের নিত্যানন্দবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপ-চন্দ্র বিহার্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করেন (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৭২৬ শকাব্দ)—“আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণু পূজা হইতে পারে কিনা ?” তৎকালে ইহা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বহু বিদ্বৎগোষ্ঠী এ বিষয়ে পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপত্র সঙ্কলন করিয়াছিল। “বিষ্ণু-নৈবেদ্য-বিচার” নামে ‘সভাবাজারীয় রাজসভাসদ-প্রণীত’ একটি পুস্তিকা প্রত্যুত্তরস্বরূপ ঐ সময়ে পৃথক মুদ্রিত হইয়াছিল (পৃ. ৪৪+১)। তাহার শেষে (পৃ. ৪৪) ভরত শিরো-মণিগ্রন্থ ১৪ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। পঞ্চম স্বাক্ষর-কারীর পরিচয়লিপি অবিকল এই :—“শ্রীধরস্বামিবংশাব-তংস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি।” এই ঠাকুরদাস কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। ১২৯৪ সনের কার্তিক মাসে তাঁহার ২০ বৎসর বয়সে কাশীপ্রাপ্তি হয় (নববিভাকর-সাধারণী, ২২ কার্তিক ১২৯৪, পৃ. ৬৪০)। তাঁহার হাতীবাগানের টোলে ‘সর্ব-শাস্ত্র’ পড়ান হইত এবং ছাত্রসংখ্যা এক সময়ে প্রায় ৫০ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু-সম্বাদ ঘোষণা করিয়া “হিন্দু-রঞ্জিকা”য় লিখিত হয়, “ইহার তুল্য পণ্ডিত বাংলায় আর নাই” (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ সংখ্যা)। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১২৪২-১৩১২ সন) ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র ছিলেন এবং মহেশ-চন্দ্র ঠাকুরদাসের টোলেই প্রথম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন।

(২) আমরা বহু কুলপঞ্জীতে এই সুবিখ্যাত বংশের নামমালা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি। ‘কুলবল্লভম’ নামক ঘটক-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (বন্দ্যাবংশ) ক্রিয়দংশ মুদ্রিতও হইয়াছে (পৃ. ৩২৭-৮)। এই বংশের বিভিন্ন শাখার বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ হইলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সাধারণতঃ ঘটকবংশীয় ব্যবহারাজীব জনমেজয় ঘটক সেকালের একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তিনিই সর্ব-প্রথম কুলপঞ্জীতে শ্রীধর স্বামীর নাম আবিষ্কার করিয়া তদ্রচিত “কুলতত্ত্বদর্শন” গ্রন্থে (যশোহর হইতে ১২৯৫ সনে প্রকাশিত) লিখিয়াছিলেন :—“স্বরেশ্বর নাম্ভার বাড়ুরি নামে খ্যাত, এই বংশে ভট্টনারায়ণ হইতে ১২ পুরুষ অন্তর শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবত ও ভগবদ্গীতার টীপনিকর্তা তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ নার্যাচিগ্রামে বাস, পুস্তকে লেখা আছে কোন জেলায় জানি না।” (পৃ. ৪৮, পাদটীকা)। নগেন্দ্রনাথ বসু (ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথমমাংশ, ২য় সং, পৃ. ২৫৭) একটি নামমালা মুদ্রিত করিয়াছেন; দুঃখের বিষয়, তিনি শ্রীধরের উপাধি ও গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বাদ

দিয়াছেন। আমরা হস্তলিখিত মূল গ্রন্থ হইতে শ্রীধর স্বামীর উদ্ধৃত নামমালা যথাযথ সংশোধন করিয়া লিখিতেছি।

আদিশূরানীত শাণ্ডিল্যগোত্র ক্ষিতীশের অধস্তন ৭ম পুরুষ “গাউ”। যথা, ক্ষিতীশ—ভট্টনারায়ণ—বরাহ—বৈনতেয়—স্ববুদ্ধি—বিবুধেশ—গাউ প্রভৃতি। তাঁহার ছয় পুত্র—“হাঁকুচ” নিধো জহুর্গুণধরভগীরথো। যষ্ঠঃ স্বরেশ্বরশচাপি গাউকন্ত স্ততা ইমে।” এই স্বরেশ্বর ‘নান্দা’ গ্রাম-নিবাসী ছিলেন (পাঠান্তর নান্দা, নাঁদা, নাঁবা)। কোন কোন কুলগ্রন্থে ‘নশাড়ী’ বংশীয় অপর এক বহু পরবর্তী স্বরেশ্বর হইতে এই বংশের নামমালা কীর্তিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। স্বরেশ্বরের ধারায় কৌলীন্য ছিল না—কুলগ্রন্থে তজ্জন্য এই আদিবংশজ গোষ্ঠীর উপাধি ‘বাড়ুরি’ লিখিত আছে। কুলপঞ্জীতে আদিবংশজের নামমালা লিপিবদ্ধ থাকে না। এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটয়াছে দুই কারণে—ভারত বিখ্যাত মহাপণ্ডিতের প্রতি অসাধারণ মর্যাদা প্রদর্শন এবং মেলবন্ধনের পূর্বে এই বংশের একটি সর্বজনবিদিত কুলক্রিয়া। স্বরেশ্বরের অধস্তন

৮ম পুরুষ, অর্থাৎ ক্ষিতীশ হইতে ১৫শ পুরুষ, শ্রীধর স্বামী। যথা, স্বরেশ্বর—প্রহ্লাদ—গুণাকর—গীতানন্দ—গুণার্ণব—যাদবচাচ্য (‘কণ্ঠভরণ’ অথবা ‘কণ্ঠহার’ উপাধি)—মঙ্গলানন্দ মিশ্র—শ্রীধর স্বামী। সাঞ্চাভাঙ্গার গ্রন্থানুসারে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সং পুথির ১১৭.১ পত্র) যাদবের পুত্রই শ্রীধর। আমাদের হস্তগত অপর এক পুথিতে যাদব কণ্ঠভরণের পুত্রের নাম লিখিত আছে “মকরন্দ মিশ্র”। এত অকুলীন গোষ্ঠীর নামমালা সব কুলপঞ্জীতে নাই। কিন্তু, বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক, যে কয়টি গ্রন্থে আছে, সর্বত্র স্পষ্টাক্ষরে শ্রীধর স্বামীকে ভাগবতের টীকাকার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অথচ বিশাল রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে মুখবংশীয় কুন্তিবাস এবং বন্দ্যবংশীয় এই শ্রীধর স্বামী ব্যতীত কৃত্রাপি গ্রন্থরচনার নির্দেশ নাই। বেণীদংহার-নাটক, নৈষধকাব্য প্রভৃতি রচনার কথা পরে কল্পিত হইয়াছে—মূলগ্রন্থে নাই। কয়েকটি কুলপঞ্জীর বচন অবিকল উদ্ধৃত হইল। জনমজ্জের ঘটকের পূর্বোক্ত উক্তি কুলপঞ্জী হইতে সংগৃহীত।—

“শ্রীধর স্বামী ভা(গ)বত্তের টীকাকার” —

(আমাদের নিকট রক্ষিত ২ পত্র)।

“শ্রীধর স্বামী ভাগবত্তত্ত টীকাকারক”

(পরিষদের পুথি, ১১৭।১ পত্র)।

“শ্রীধর স্বামী ভাগবত্তের টীকাকার”

(ঢাকার একটি পুথি, ১৬২।২ পত্র)।

উদ্ধৃত নামমালা হইতে শ্রীধর স্বামীর কালনির্ণয় সহজ-

সাধ্য। বন্দ্যবংশে ৬ জন বল্লালসেনের রাজত্বকালে “কুলীন” হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে ঈশান ছিলেন স্বরেশ্বরের ভ্রাতা হাঁকুচের অধস্তন ৫ম পুরুষ এবং জাহ্নব ও মহেশ্বর অপর ভ্রাতা গুণধরের চতুর্থ পুরুষ, অর্থাৎ প্রপৌত্র। সর্বকনিষ্ঠ স্বরেশ্বরের পৌত্রকে প্রথম কুলীনদের সমকালীন ধরা যায়। এক পুরুষে ৪০ বৎসর ধরিলেও শ্রীধর স্বামীর জন্ম কোন প্রকারেই ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যায় না। শ্রীধর স্বামীর অভ্যুদয়কাল স্তত্রাং নিঃসন্দেহে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা যায়।

শ্রীধর স্বামীর কন্যাকে মুখবংশীয় ফুলিয়ামেলের বিখ্যাত কুলীন মনোহর পণ্ডিতের পুত্র বল্লভ বিবাহ করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত মূল কুলপঞ্জী কয়টিতে ইহা লিখিত আছে। পরন্তু বিজ্ঞানাগরের ‘বহু-বিবাহ’ গ্রন্থানুসারে (পৃ. ২৬) স্বয়ং মনোহরই এই হানিকর বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে একটি কারিকা নানাগ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে :

মনোহর বিয়ে করে নানার বাড়ুড়ী।

পরে কুল ভেঙ্গে পায় শোবার আকুড়ী ॥

এই বিবাহ হইতে ফুলিয়া মেলোৎপত্তির বীজভূত প্রথম ‘নাধা’ দোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীধরের অভ্যুদয় কাল বিবেচনা করিলে মনোহরের পক্ষেই এই বিবাহ করা সম্ভব হয়, মনোহরের পুত্র বল্লভের পক্ষে নহে। মনোহরের পিতৃব্য ছিলেন কুন্তিবাস কবি—শ্রীধর স্বামী ও কুন্তিবাস স্তত্রাং প্রায় সমকালীন ছিলেন ধরা যায়। কুন্তিবাসের জন্ম আমরা ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরিয়াছি (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৩০২) এবং সম্ভবতঃ শ্রীধর স্বামী তাঁহার বয়ো-জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

শ্রীধর স্বামীর অধস্তন বংশধারা অতীব বিস্তৃত—সেহা-খলা, নারীট, ঝিকড়া, হরিপাল প্রভৃতি গ্রামের ভট্টাচার্য-গণ এই বংশীয় বটেন। ইহারা প্রধানতঃ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং উক্ত গ্রামসমূহে প্রাচীনকাল হইতে এই বংশে যে সকল পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সমষ্টিসংখ্যা প্রায় ৩০০ হইবে। আমরা বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান উদ্ধারকর্তা নারীটের ভট্টাচার্য বংশীয় শ্রীনাথদাস মহেশ ন্যায়রত্নের ধারাটি মাত্র নির্দর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীধর স্বামীর একটি মাত্র পুত্র ছিল “শ্রীকর বিভাগর্ব”—সম্ভবতঃ ইহার শৈশবকালেই শ্রীধর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বিভাগর্বের পুত্র (হরিহর) বিভাবল্লভ ও তৎপুত্র রমানাথ বিভানিবাস। কোন কোন পুথিতে বিভাগর্ব ও বিভানিবাসের নাম বাদ পড়িয়াছে। বিভানিবাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ তর্কপঞ্চানন ও তৎপুত্র

জানকীনাথ চূড়ামণি। জানকীনাথের অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন মহেশচন্দ্র। যথা, জানকীনাথ—রাজেন্দ্র সার্বভৌম (২য় পুত্র)—গোবিন্দ তর্কালঙ্কার (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—শ্রীপতি ন্যায়বাচস্পতি (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশ (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—রাধাবল্লভ তর্কবাগীশ—হীরালাল তর্কশিরোমণি—হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মহেশচন্দ্র শ্রীধর স্বামীর অধস্তন ১৪ পুরুষ এবং আদিশূরানীত ক্ষিত্রীশ হইতে অধস্তন ২৮ পুরুষ ছিলেন। তন্মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১৬ পুরুষ (কণ্ঠভরণ হইতে ন্যায়রত্ন পর্যন্ত) অবি-
 ভ্রান্ত ধারায় উপাধিদারী শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মহেশচন্দ্রের ধারাটি প্রায় জ্যেষ্ঠানুক্রমিক—শ্রীধরের জন্ম ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ধরিলেও এই ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ-ধারায় এক পুরুষের গড়পড়তা হয় “৩৭ বৎসর”। ইহা বিশেষ-
 ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, চারি পুরুষে এক শতাব্দী বাংলাদেশে কোন পণ্ডিত-গোষ্ঠীতে কোন কালে লক্ষিত হয় না। মহেশচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষদের বহু পারিবারিক তথা কুলগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। আমরা দুই-একটি উল্লেখ করিতেছি। হুগলীর ১২১০৪ নং তায়দাদে দৃষ্ট হয়, ১২০৯ সনে হীরালাল তর্কশিরোমণি এক খণ্ড বৃহৎ নিষ্কর ভূমির দখলকার ছিলেন। ছোটফুলিয়ার মুখবংশে হরি মিশ্র একজন কুলীন ছিলেন (ঋবানন্দ, পৃ. ১১৪)। তাঁহার এক অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র পুরুষোত্তম সম্বন্ধে লিখিত আছে—
 “নান্দাবন্দ্য গোবিন্দ তর্কালঙ্কারস্ত কণ্ঠাবিবাহাং নৈকস্ত-
 ভঙ্গঃ” (ঘটকেশরীর কুলপঞ্জী, ফুলিয়া প্রকরণ, ৩৩১ পত্র)।
 এতদনুসারে গোবিন্দের অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পশুপুরনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত কৃশারাম তর্কবাগীশ (১১০০-১২১০ সন) প্রথম বিবাহ করেন “নারিটী”-নিবাসী গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশের কন্যাকে—গৌরীকান্তের দৌহিত্রের নাম ছিল রামসুন্দর তর্ক-
 পঞ্চানন (হুগলীর ২০৮৭১ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং গৌরীকান্তের জন্ম ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হইয়াছিল।

পুণ্ডার ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানে শ্রীধরাচার্য্য রচিত “গীতাসারটীকা”র পুথি রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীধর স্বামীর গীতটীকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বটে। ভগবদ্গীতার পরিশিষ্টস্বরূপ ‘গীতাসার’ নামক এক ক্ষুদ্র অতি দুর্লভ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্কুরন সম্বাদে তন্ত্রসম্মত গুঢ় ষোণরহস্য-
 ক্রিয়াদি বর্ণিত হইয়াছে। টীকার পুস্তিকাটি অতীব মূল্য-
 বান্ এবং সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

“ইতি শ্রীগীতাসারটীকা ব্রহ্মসম্বোধিনী সমাপ্তা।

কৃতিঃ শ্রীনরসিংহ-পাদপদ্ম-পরাম্পুঞ্জপবিত্রিতাং

শ্রীশ্রীধরাচার্য্যণাম্। * * *

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জলনিধৌ তত্তদধোপগৃঢ়ে

ক্লদকৃষ্ণাহিপতিবিবলংপাৰ্শ্বমহাদ্রি-জুষ্ঠে।

শ্রীকৃষ্ণেনাবিরলবিবৃষামত্যাভাৰ্থং বিপাঢ়ে

স্বচ্ছং গীতাসুতমুদভবং সঙ্গসান্নাবিভং যং ॥

সংসারেশ্বিন্ তত্ত্বভাংপর্য্যতৃপ্ত্যে, টীকাখ্যাতা ব্রহ্মসম্বোধিনীম্।

“আচার্য্যেণ শ্রীধরেণ ত্রিবেণী-সঙ্গ-স্নানক্ষালিতান্তর্মলেন ॥

“রাগাবিষ্টে” বিক্রমাদিত্যশ্যাকে, মাঘে শ্লিষ্টে সোমবারেণ দর্শে।

সিদ্ধে যোগে বিষ্ণুক্ষত্রকৃষ্টে, সিদ্ধক্ষেত্রে “মাধবাস্থা”বিশিষ্টে ॥

(১৮৭৫-৬ সনের ৪২৫ সংখ্যক পুথি)

নরসিংহের উপাসক এই শ্রীধরাচার্য্য ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া মাধব-মন্দির-সমন্বিত যে সিদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিন্দু-মাধবতীর্থ-সমন্বিত কাশী-
 ধামই বটে। সম্মাস গ্রহণের পূর্বে যোগাভ্যাসরত শ্রীধর স্বামীই এই টীকাকার বলিয়া মনে হয়। টীকাটির রচনা-
 কাল হইতেছে ‘কটপয়াদি’ক্রমে লিখিত “১৪৩২ বিক্রমাব্দ”
 —ঐ সনে বসন্ততই মাঘের অমাবস্তা সোমবারে পড়িয়াছিল
 (= ২১ জানুয়ারী ১৭৩৬ খ্রীঃ)। আমাদের নির্ণীত শ্রীধর
 স্বামীর অভ্যুদয়কাল এস্থলে আশ্চর্য্যরূপে সমর্থিত হইতেছে।
 তাঁহার প্রধান গ্রন্থসমূহ সম্মাস গ্রহণের পর প্রায় ১৪০০ খ্রীঃ
 রচিত হইয়াছিল।



বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৩

এমনি করেই কাটল কয়েকটা মাস।

বাণের অন্তর্বে ভাল দিতে দিতে প্রভাতের উপার্জিত অর্থ নিঃশেষ হতে লাগল। যে সাধনার ও মনোনিবেশ করবে ভেবেছিল তা রইল বহুদূরে। একটা বছর যুধাই গেল—ক্লাস নেওয়ার সঙ্গতি ওর হ'ল না।

জাহ্নবীর প্রথমে অনিমেয়ের সঙ্গে দেখা। সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, এতদিনে সুযোগ হ'ল তাই—শীগগিরই ইউরোপ যাচ্ছি।

তোমাদেরও সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়।

কি করব তাই—বাবা বললেন, যখন পড়তেই যাচ্ছ না—তখন বিজ্ঞানের আদি অন্ত কিছু জেনে নাও। আজকাল ব্যবসা বলতে বর নিজে থাকলে তো হবে না—পৃথিবীটা যে এসিয়ে এসেছে। তাই তালিম দিচ্ছিলাম এতদিন।

কন্যাচুলে ফলসু।

কিন্তু আমার ইচ্ছা শুধু শিল্প-কারখানা দেখা বা ইউরোপের মার্কেট ষ্টাডি করা নয়—ওই সঙ্গে ও দেশের সাহিত্য ও মাহুষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা।

প্রভাত বললে, এ দেশে বসে ওদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা হুঃসাধ্য বুঝি?

অনিমেয় বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, মাহুষের সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখলে যেমন জানলাভ হয়—

তা ঠিক—যাদের সে সুযোগ আছে—তারা কেনই বা তা না জানবে।

অনিমেয় বললে, গিয়ে চিঠি দেব—উত্তর দিতে ভুলবি না তো?

প্রভাত বললে হেসে, আকাশের এক ফোঁটা জল পুকুরে পড়লে কি হয় জান তো?

অনিমেয় হেসে উত্তর দিলে, তাই তো পুকুর ভরে ফোঁটে পলফুল।...

তোমার জীবনের এই আশা সার্থক হোক।

সত্যই কি আনন্দ লাভ করতে পারলে প্রভাত? ওর মনে কি ক্রোধ জাগছে না যে বহু পৃথিবী আজ অনিমেয়ের বিচরণ-ক্ষেত্র হতে চলেছে। কল্লনার আঁকা সমুদ্র নানা বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র বেশধারী নরনারী তাদের রীতিনীতি শিক্ষা সম্বন্ধি নিয়ে ওর জগতে এসে দাঁড়াবে। ও সার্থক হবে—বল হবে। আজ প্রভাত যদি অনিমেয় হতো। না—না—ওর সৌভাগ্য প্রভাতের মনে ঈর্ষার ছায়াপাত করছে—এ

ঈর্ষ্যাই। এই ঈর্ষ্যাকে জয় করতে না পারলে...বড় দুর্বল—বড় একলা, অত্যন্ত নিঃস্ব প্রভাত। প্রবাদ বলে—সকলকারই জীবনে একদিন-না-একদিন সৌভাগ্য স্মিতহাস্তে কটাক্ষপাত করে। কিন্তু যারা মাধার বোকা নিয়ে জন্মেছে অভাবের সংসারে, পেটের ক্ষুধা ও দেহের লজ্জা মিটলেই তো তারা সৌভাগ্যবান। দূর দূরান্তর ভ্রমণ, জ্ঞান-তৃষ্ণার শান্তি বা বিচিত্র আনন্দ বাদে পরিতৃপ্ত হওয়ার হুঃস্বপ্ন তারা কেন দেখে। তারা জন্মায় কোন্ প্রয়োজনে এবং মৃত্যুর পরে রেখে যায় কি সম্পত্তি? অথচ সাধারণ ঘরের ছেলেই অব্যবসারে হয়েছে জ্ঞানভুপকী—মহাসাধক—দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, বুরকর রাষ্ট্রনায়ক—জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। সে দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দেখা যায়—কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এরা।

ভাবতে ভাবতে ও বড় বাড়ীটার সামনে এসে পড়েছে। বৈঠকখানা থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে।

মুহূর্ত্তে প্রভাতের মন বিরূপ হয়ে উঠল। কিছুদিন আগেকার অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতি ভেসে উঠল মনে। সেই দিন থেকে এ বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্কই তো রাখেন নি প্রভাত। মাঝে মাঝে মেজ-ছোঁঠাইয়ার কথা মনে হয়—অতীত দিনের কাহিনীর পাতায় শক্তিময়ী এক নারীর কথা—কিন্তু সেই কাহিনীর পিছনে মাহুষের স্বার্থের কুশ্রী প্রকাশে স্বতঃই বিমুগ্ধ হয়ে ওঠে চিত্ত। যাবে কি যাবে না এই ইতস্ততঃ—ভাব ওর মনকে দোলা দিতে লাগল। অবশ্য সময় সব কিছুই তীব্রতা হরণ করে—বহুদূরের অপ্রীতি এই মুহূর্ত্তে সেদিনকার মত তীব্র বোধ হচ্ছে না। ওর চিন্তার রাজ্যে আর একটি ছয়ার গেল ধুলে। এককালের ধন-জন-সমৃদ্ধ অট্টালিকার গর্বোদ্রুত মূর্ত্তি আজ নাই। ক্ষমতার রশ্মি সংহরণ করে স্বর্ধ্য যেন অস্তাচলচূড়াবলদী হয়েছেন। তবু অস্তাচলগামী সূর্যের মত ছোঁটির্মণ্ডল রচনার সাধ্য এঁদের নাই—এঁদের সামনে রাজির আগর বিজীবিধা। সমস্ত গলিটার মালিকানা স্বয়ং নিঃশেষিত হয়ে এই ভগ্নসৌধে আশ্রয় নিয়েছে—এই সৌধও তাকে পরিপোষণ করতে পারবে কি? ওঁদের মনে যদিই লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার কামনা উগ্র হয়ে ওঠে—সেজন্ম শুধু কি ওঁরাই দায়ী? মাহুষের মনে বাগনার জালা বা থেকে হঠ হঠেছে—দায়ী সেই স্বত্তি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন এমনি করেই পুড়িয়ে মারে—সুন্দর আবরণে সীমারীত না হলে। আজ প্রভাতও কি জলছে না? কোথায় গেল ওর প্রতিজ্ঞা—উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে—এ দেশের বরাদ্দে যতটুকু পাওয়া যায়? অনিমেয় চলেছে সমুদ্র—

পারে—ওর মনে ব্যর্থতার বেদনা প্রবল হয়ে উঠছে। ও হিংসা করছে অনিমেঘের। চারিদিকের ঘটনা ওকে পিছনে ঠেলেছে প্রবল বেগে—প্রতিকূল স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে প্রভাত। বহুদূরে ওর ভীরুত্ব—প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—সেখানে পৌঁছবার আশা বৃষ্টি ছরাশা হ'ল। চিন্তা-রাজ্যের ছয়ার ঝুলে একটি রশ্মি ওর জ্ঞান-বর্তিকায় সংলগ্ন হ'ল। হাঁ—অকূল দরিদ্র্যর ভাসছে ও—দিক্‌হারী পৃথিবী ওকে ভয় দেখাচ্ছে—কিন্তু এই অকূলেও একখণ্ড কাঁঠ যেন ভেসে আসছে। জিলোচন সেনের ডাক সরাসরি উপেক্ষা করতে পারলে না ও—ভাবতে লাগল যাবে কি যাবে না।

ইতিমধ্যে জিলোচন সেন নেমে এসেছেন। ওর কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, কি এত আকাশ পাতাল ভাবছ? আমি ডাকলাম—সুনতে পাও নি? আর আস না কেন? একটি সাহিত্য সভাতে তোমাদের সাহিত্য শাখার কাজ শেষ হয়ে গেল?

এস ভেতরে এস।

প্রভাতকে নিয়ে উনি সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরটিতে এসে বসলেন। বললেন, ভয় নেই, প্রবন্ধ শোনাব না।

প্রভাত অপ্রতিভ স্বরে বললে, কিছু মনে করবেন না।

আরে—না—না, তা হলে তোমাকে ডাকতুমই না। তুমি ত জ্ঞান না—আমাদের দেখে যে রক্ত বয় ভার রঙই আলাদা। এই ঘরে বসে তুমি ভাবতেও পারবে না—একযুগ আগে আমারই কোন পূর্ব পুরুষ কথা-না শোনার শাস্তি-বরূপ অবাধ্য প্রজাকে এই ঘরের দেওয়ালেই জীবন্ত গুঁথে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন—আর সে হুকুম তামিলও হয়েছে।

প্রভাত ভীষণ ভাবে চমকে উঠেই জিলোচন সেন হেসে উঠলেন উচ্চঃস্বরে।

ছেলেমানুষ তোমরা—কাঁকা তেজ আছে মনে—কিন্তু যে শক্তির ওপর দাঁড় করালে তেজকে মনে হবে পৌরুষ—তা নেই তোমাদের। দোষ তোমার নয়—এ কালটাই এই রকম। যাক!—যে কথার জন্ত ডেকেছি—প্রভাতের পানে ভীকু দৃষ্টিতে চেয়ে বসলেন, চাকরি করবে? দশটা পাঁচটার দাসঘত নয়—টিক গোলামি যাকে মনে কর—তা নয়। কল-কাতা থেকে দূরে আমার একটা মহাল আছে। ছোট মহাল, আর কম—ভবু জমিদারির ভগ্নাবশেষ। সেখানকার প্রজারা নেহাৎ চাষী মজুর নয়—তাদের সম্ব আছে—শক্তি আছে—জমিদারকে তারা প্রজারঞ্জক বা রক্ত শোষক কোনটাই মনে করে না। ভবু তাদের চালিয়ে নেওয়াটা সহজ নয়। আমাদের পুরনো নায়েব পারেন নি—তাকে বিদায় করতে হয়েছে।

○ আশ্চর্য্য, ইনি প্রভাতকে নায়েবি দিতে চান। নায়েবি?

প্রভাত সঙ্কচিত হয়ে বললে, নায়েবি করবার মত শিক্ষালাভ করিনি ত।

তা করনি বটে—ভবু সেকালের শিক্ষার এ কালে নায়েবি চলল না—চলবে না। ভয় নেই—বাড়ার জমা খরচ তোমায় করতে হবে না—চেক দাখিলাও লিখতে হবে না—একটা সই দিও শুধু—মামলা-মোকদ্দমা—আরে খাবতো না—এ কালটাই আলাদা রকমের। ও সব বিভীষিকা মোটেই নেই ও মহলে।

তবে—

কথা কি জান—শিক্ষা এ কালের—আর মানুষ সেকালের মিল হয় কখনও। হয় ত জমিদারিও থাকবে না—আর নায়েবরা তার আগেই সরবে—কিন্তু কথটা কি সত্যি নয় যে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করবার জন্ত আইন তৈরি হবে সংসদে?

হয় ত হবে। কিন্তু তাতেও জমিদাররা মোটা রকমের ক্ষতিপূরণ পাবেন।

পাবেন? আহা তাই হোক—হোক এমন আইন। আইন না হ'লে বেচ্ছায় ত কোন দ্বিনিস ছাড়তে চাইব না আমরা।

কিন্তু জমিদারি প্রথাটা নষ্ট হলে—আপনার কতি হবে না?

হবে। কিন্তু দায়িত্ব থেকে রেহাই পাব।

সে কি? আশ্চর্য্যে প্রশ্ন করলে প্রভাত।

পাব না? হো-হো করে হেসে উঠলেন জিলোচন সেন। এ কালটাই যে বেয়াদব—যা আছে তা নিয়ে মানুষের তৃপ্তি নেই। মানুষের মন চার যুদ্ধ করতে—শান্তি তার চক্ষুশূল।

কিন্তু এমনও ত হতে পারে পৃথিবীর চারিদিকে যে অশান্তি ছড়ান রয়েছে তা দূর করবার জন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন।

যুদ্ধের দ্বারা শান্তি! তোমাদের গান্ধীজী কি বলেছেন? হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায়?

কিন্তু যুদ্ধ মাজকেই হিংসা বলছেন কেন?

বলছি এইজন্ত যে হিংসা-অহিংসার প্রভেদটা বড় বৃহৎ।

তোমাকে আমাকে আরও অনেককে নিয়ে ত পৃথিবী—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার—কিংবা আমাদের সঙ্গে আর সকলের মতের মিল নাই। তুমি যুদ্ধ করছ আদর্শ সৃষ্টি করতে—আমি চাইছি সেই আদর্শকে ভাঙতে। আর এক জন চাইছে আদর্শের সংস্কার করতে। এমনি বিভিন্ন মতবাদে আজকের পৃথিবী ভারি হয়ে ওঠে নি কি?

কিন্তু—

ওক'ন নয়—যে ক'দিন জমিদারি প্রথা টিকে থাকে—তুমি রাজী কি কাজটা নিতে?

প্রভাতের মন বললে, না। কিন্তু কাজে সেই প্রতিবাদ ঘনিষ্ঠ হ'ল না। সংসারে একেবারে কিছু না করা চলে না।

টেউ যখন এসিরে আসে চোখ বুজে তার স্পর্শ বাঁচান সম্ভব নয়। সংসারে চলাটা যেমন ধর্ম—তেমনি কর্মের আশ্রয়ে জীবন রক্ষার রুত্তিও আর একটি ধর্ম। এই সব ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্তব্য-রশি দিয়ে অনেক বস্তুকে বেঁধে রাখা হয়েছে—যা থেকে পরিজ্ঞান লাভ সহজ নয়।

সে বললে, আমাকে দিন দুই সময় দিন।

বেশ ত—জাহ্নারির শেষ তারিখে তোমার মত জানিও—অপেক্ষা করব আমি।

ও চলে আসছে—জিলোচন সেন আবার ডাকলেন।

একটা কথা পরিষ্কার হয়ে থাকে ভাল। তোমাকে ডেকে যে কাকড়া দিতে চাইছি—আশা করি এর ভুল অর্থ করবে না। হয় ত শুনে থাকবে তোমাকে নিকটে টানবার যুগে আমার একটু উদ্বেগ আছে; সে আর এমন বিচিত্র কি। কল্যাদায়শ্রুত বাপেরা স্বভাবতই সং পাত্তের সন্ধান পেলে বুশী হন—তাকে আপন করে নেবার চেষ্টা করেন—

প্রভাত মাথা নীচু করলে।

লক্ষ্য করে জিলোচন সেন বললেন, এটা কোম পক্ষেরই লজ্জার কথা নয়—সংসারে এ ঘটেই। কিন্তু একমাত্র সেই উদ্বেগ নিয়েই যদি উপকারকের ভূমিকা অভিনয় করতে হয় ত তার চেয়ে লজ্জা কি থাকতে পারে। তোমাকে ভাল লাগে—অস্বীকার করি না—কিন্তু তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে দলিদ্ধা দিয়ে বেঁধে আমার স্বার্থ সিদ্ধির অহুকুলে টানব না এটা নিশ্চিত জেন। এ বিষয় তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আচ্ছা—যাও।

পথে এসে প্রভাত ভাবলে, হয় ত জিলোচন সেন সরল মনে প্রভাবটি করেছেন—কিন্তু তাঁর মনে যে বাসনা অহুসিত হয়েছে তাকে প্রতিকূল প্রতিবেশে নিয়ে যাওয়া প্রভাতের পক্ষে সম্ভব হবে কি। মনের একটা নরম অংশ আছে—সময়-বিশেষে যা কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে হাত মেলায় কর্তব্যবোধ। তখন অকারণে রূঢ় হওয়া চলে না। না—আজ আর এ নিয়ে ভাববে না সে। হাতে সময় আছে—অনেক ভাববে সে। গভীর ভাবে ভাববে।

২৪

পরের দিন—দীপার একঘানা ছোট চিঠি পেলে সে।

দীপা লিখেছে : আজ দুপুরে একবার আসবেন এ-বাড়ীতে। বিশেষ দরকার। বোধ হয় শুনেছেন—দাদা কটিনেটে যাচ্ছেন—ওঁকে একটা অভিনন্দন দেওয়া দরকার নয় কি? আপনার কি মত? আসবেন অবিশিষ্ট—অনেক—অনেক কথা আছে। দীপা।

সে অনেক কথা প্রভাত জানে। অতঃপর এই উপলক্ষে বিরাট ভোজের আসর বসবে—নিমন্ত্রিত হবেন এ যুগের সমাজ-শিরোমণিরা। একজনকে সভাপতি মাজিরে—গান-

বক্তৃতা-কবিভাগাঠ-হাসি-গল্প-বক্তাবাদ—সব কিছু নিরমিত চলবে। যেমন সাধারণ সভার হয়ে থাকে—প্রচারের পর্বগুলি যান্ত্রিক নিয়মে অহুস্তিত হবে। কিন্তু সাধারণ সভাকে—শোক বা উৎসব যে সভাই হোক, মানুষ যেমন অত্যন্ত সহজে ও দীর্ঘ ভুলে যায়—যেমন একটা সভার পর অল্প সভাটি অনন্ত হয়ে ওঠে না—যেমন প্রারম্ভ সঙ্গীতে কেউ মনোনিবেশ করে না—বক্তৃতাকে ভাল লাগলেও মনে হয় শুছিয়ে বলার, স্রুতিমধুর করে বলার কৌশল মাত্র—কবিতা পাঠে নিম্প্রাণ কর্তার ধ্বনি সভাহলে অর্থহীন হয়েই বাজে—তেমনি ধরণের অহুষ্ঠান হবে এটি। এসব অহুষ্ঠানের সার্থকতা কি? কাকে প্রচারের জন্ত এর অবতারণা?—শোককে, আনন্দকে না আত্মপ্রসাদ লাভের ইচ্ছাকে? আশ্রয়—সুখে বা দুঃখে—সম্পদে বা বিপদে মানুষ সর্বদাই চার প্রসারিত হতে।

ওকে চিন্তায়ুক্ত দেবে দীপা বললে, কি ভাবছেন এত? শরীর কি সুস্থ নেই?

না কিছু নয়। ওরা তখন বড় বারান্দাটা অতিক্রম করছে। হঠাৎ বারান্দার এক প্রান্তে প্রভাতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। মনে হ'ল একজন লোক বারান্দার মেঝে ভেদ করে ভূগর্ভে অদৃশ্য হ'ল। ও বিষয়ে শব্দ করে উঠতেই দীপার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল সেদিকে। বললে, আপনি জানেন না বুঝি ওই বারান্দার নীচের একটি বড় চোরা কুঠুরি আছে।

কেন?

যানে বিদ্রোহীদের জাপানী বোমার কথা মনে আছে তো? তাই থেকে পরিজ্ঞান পাবার একটি আশ্রয় আর কি।

কিন্তু এখন এ আশ্রয়ের মূল্য কি?

দীপা বললে, ভবিষ্যতের জন্ত—যদি কখনও যুদ্ধ বাধে—

প্রভাত বললে, আরও একটা উদ্বেগ সিক্ত হতে পারে।

কি উদ্বেগ?

বর, কোন মানুষকে জুড়িয়ে রাখার দরকার—কোন জিনিষও হতে পারে—

দীপা বললে, আপনি আজগুবি ডিটেক্টিভ উপভাস বানাচ্ছেন প্রভাতদা।

টিক নয়—কেন না—মানুষের বদলে জিনিস রাখতে পারলে আজকালকার দিনে লাভ বেশী। কালো বাজারে যে সব জিনিস পাওয়া যায়—সাদা বাজার থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে তারা মাটির ভলাকেই আশ্রয় করে তো।

দীপা সজোরে হেসে বললে, দেখবেন—আমাদের যেন ও দলে টানবেন না।

এই কথার প্রভাত চমকে উঠল। একথা পরিহাস নাও হতে পারে। এই প্রাসাদের জয়রহস্য কে বলতে পারে ভূগর্ভ-নির্দিষ্ট ওই ঘরেতে নাই।

চলতে চলতে তার বার বার মনে হ'ল—কি আছে পায়ের নীচের এই গর্ভ-গৃহে? এ কি শুধু অনাগত দিনের বিপদ-পাতকে নিবারণ করবার জন্যই তৈরি হয়েছে—না চলতি কালের সঙ্গে এর সম্পর্ক সুনিবিড়।

আচ্ছা, তোমাদের একটা প্রেস চলছে না? হঠাৎ প্রশ্ন করলে প্রভাত।

হঁ—কেন? বই ছাপাবেন? সত্যি যদি ছাপেন কোন বই—কর্মী পিছু কিছু কনসেন্সন পাবেন।

কাগজ? সে তো আত্মকালকার বাজারে দুপ্রাপ্য।

না—তাও দেব। আমাদের ঠিক আছে—নিয়ন্ত্রিত হুলাই—

ওরা সিঁড়ির কাছে এসে পড়ল। সিঁড়ির মুখে অনিমেঘের সঙ্গে দেখা। বললে হাসিমুখে—এঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না, একটা বিদায়-অভিনন্দন দেবেনই। আমার ইচ্ছা ছিল ফিরে আসি কিছু সঞ্চয় করে—

প্রভাতও হাসলে, সঞ্চয় না থাকলে কি কেউ বেশী পাবার অবিকারী হয়? খাবড়ো না—যেতে আসতে হুঁদিকেই তোমার লাভ হবে।

হো-হো করে হেসে উঠল অনিমেঘ। আচ্ছা—আচ্ছা ওপরে যাও। শীর্ষ দিতে দিতে সে বেরিয়ে গেল।

আরও কয়েকটি ছেলে মেয়ে উপরের ঘরে বসেছিল। এরা দীপা আর অনিমেঘের বন্ধু। এদেরই উৎসাহে অভিনন্দনের পরিকল্পনা করা লাভ করবে। কাগজে কলমে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হ'ল। নাচের জুড় কাকে বলা হবে—সঙ্গীতে কে কে অংশ গ্রহণ করবেন—কার কোন কোন নামী কবিতার আবৃত্তি হবে—আর সভাপতি নির্বাচন—এ নিয়ে নানা মতের ব্যুটি হ'ল।

হঠাৎ দীপা বললে, আপনি তো কিছু বলছেন না প্রভাতদা?

আমি! আমি এসবের কিছু জ্ঞানি না তো। তোমরা প্রায়ই যাও সহধর্মী-সভায়—জলসায়—

তা হোক—সভাপতির নাম আপনাকে বলতেই হবে।

প্রভাত বিব্রত হয়ে বললে, থাকে হোক একজনকে—

সে তো নিশ্চয়—খালি চেয়ারে ফুলের মালা দিয়ে আমরা অহুষ্ঠান সূত্র করব না।

প্রভাত হঠাৎ যা বলতে গিয়ে ধেম্মে গেল—তার ভাবাৎ হ'ল এই যে—ভাতেই বা কতি কি? এক জনকে উপলক্ষ্য করে নিজেদের জাহির করার কাজে যে কেউ হলেই তো যথেষ্ট।

একটি ছেলে বললে, সংবাদপত্রের কোন সম্পাদককে বললে ভাল হয়।

একটি মেয়ে সোৎসাহে বললে, ঠিক—ঠিক তাতে রিপোর্টটা পুরো এক কলমে পৌঁছবে।

প্রভাত আর একবার হাসলে মনে মনে। আসল উদ্দেশ্যই ত ব্যক্ত হয়েছে। সভাটি নিছক বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন নয়—

এর পর আলোচনা হ'ল—কোন কাগজের প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক এবং কোন কাগজের সম্পাদক পর-কীর্তন-কুঠ—বা পর-কীর্তন-প্রসঙ্গে আত্ম-প্রশংসায় শতযুগ। যারা ভূরি-ভোজে পরিভূক্ত হয়ে দশ লাইনের বিষয় বস্তুরে হুঁকলমে বিস্তারিত করতে পারেন—এই ভাবের ঘরোয়া অভিনন্দন ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতাই নিঃসংশয়ে সর্বাধিক। এর পর তাঁদের নাম এবং তাঁদের সঙ্গে কার পরিচয় কত নিবিড় এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হ'ল।

প্রভাতের কানে কোলাহলটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও তখন অস্ত রাহে। ও ভাবছে পায়ের তলায় যে গর্ভগৃহ তাতেই কি সঞ্চিত হয়ে আছে বিষম্বর্ণের কাগজ? রাতের অন্ধকারে যা পৃথিবীতে উঠে আসে—নিঃশব্দে চলে যায় স্থানান্তরে—বিনিময়ে এই প্রাসাদের দেহবুদ্ধি ঘটে। অমলেশ্বর কথাতো কি এরই ইঙ্গিত ছিল?

মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে নিলে সে। বিদায় নেবার সময় দীপাকে বললে, তা হলে কথা রইল দীপা—আমার বই ছাপানোর কাজে সাহায্য করবে তুমি। মানে ছাপার খরচ—কাগজ—

নিশ্চয়। কিন্তু এক সর্ভে।

সর্ভ। সে আবার কি? প্রভাত বিস্মিত হ'ল।

সর্ভ এই যে বইখানা আমার নামে উৎসর্গ করতে হবে।

দীপার পানে চাইলে প্রভাত। ওর চোখে অজুত দৃষ্টি। অত্যন্ত কোমল—মর্দ্যপ্রসারী দৃষ্টি। এ দৃষ্টির সঙ্গে কোন কালে পরিচিত ছিল না প্রভাত। এ দৃষ্টির আঘাতে ওর নূতন সত্তা ধেগে উঠল যেন। সবল—সুস্থ পৌরুষময় সত্তা—যা যুগে যুগে দুর্বলকে বল দিয়েছে—আত্মপ্রার্থীকে দিয়েছে আশ্বাস—এবং নারীকে দিয়েছে প্রেমের সন্ধান। দীপার মধ্য সেই শাশ্বতী নারী প্রতিভাসিদ্ধ হয়েছে—ওর দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ-মস্ত শাশ্বতীর ক্ষণদীপ্তি সর্ভ আরোপের মুহূর্তে উদ্ভাসিত হ'ল। প্রভাতের সারা অন্তর কেঁপে উঠল।

দীপা বললে, মনে থাকে যেন।

প্রভাতের দৃষ্টিতেও কি স্বীকৃতি ফুটে ছিল? নতুবা দীপা কি করে অসংশয়ে মেনে নিলে তার দাবি গ্রাহ্য হয়েছে।

২৫

অভাবনীয় সূক্ষ্মার মুহূর্তগুলি ক্ষণজীবী। পৃথিবীর বায়ু-স্তরে তারা কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ক্ষণদীপ্তিময়—নীচের বিরাট অন্ধকার মুহূর্তে সে জ্যোতি গ্রাস করে নেয়।

ভূপতি ম্লান মুখে এসে দাঁড়াল সামনে। প্রভাতদা—একবার আসবে—আমাদের বাড়ীতে? বাবার বড় অনুরূপ? কি অনুরূপ?

তা জানি না...কোন কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারচেন না—অথচ যতবার ডাক্তার ডাকবার কথা হয়েছে—হাত নেড়ে বারণ করেছেন।

রোগীর কথা শুনলে—রোগ আরাম করা যাবে না—চল যাচ্ছি।

গিয়ে দেখলে রোগটি শক্ত। রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন নয়—আচ্ছন্দের মত পড়ে আছেন—কিন্তু ডাক্তারের নাম শুনে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট হচ্ছে—হাত নেড়ে কি ইঙ্গিত করছেন। ইঙ্গিতটি নিষেধেরই নামান্তর।

প্রভাত বললে, ডাক্তার না ডাকলে যন্ত্রণা কমবে না।

রোগী ইঙ্গিতে জানালেন—যন্ত্রণা নেই।

না হলে জীবন সংশয় হতে পারে।

মাথা নাড়লেন ভূপতির বাবা। তাঁর ক্যাসে বুখে ব্লাস হসি ফুটে উঠল। জীবনের প্রতি উপেক্ষার কিংবা জীবন ব্যর্থতার ব্যঙ্গ সে হাসি রহস্যময়।

না হলে আপনার সংসার দেখবে কে? মমতার শক্ত দড়ি ধরে নাড়া দিলে প্রভাত।

শীর্ণ হাড় উপরে তুলে ভূপতির বাবা আবার হাসলেন।

অর্থাৎ দেখবেন ওই ওপরে যিনি আছেন—যিনি তোমার আমার—এই বিশ্বজনের সকলকারই প্রভু।

প্রভাত আপত্তি শুনলে না—বাইরে এসে বললে, ডাক্তার ডাকতে চললাম।

ভূপতি শুকনো বুখে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, ধরে কিন্তু টাকা নেই—আজ মাসের বাইশে।

তাই ত—এ কথাটা ত প্রভাতের মনেই হয় নি। ভূপতির বাবা যন্ত্রণা ভোগ করেও কেন ডাক্তার ডাকার নামে আংকে উঠছেন—এতকণে স্পষ্ট হ'ল রহস্যটা। কিন্তু অর্থাভাবে মানুষ ডাক্তার ডাকতে পারবে না, রোগযন্ত্রণার ঔষধ পাবে না এ কেমন কথা? স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে এটা কলঙ্কের কথা নয় কি?

অবস্থা ডাক্তার এলেন—প্রভাতই নিজের খরচে আনালে, তার মারোয়াড়ী প্রভুর দেওয়া কয়েকটি টাকা তখনও পকেটে ছিল। আর টাকা থাকলে মানুষের কষ্ট দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ডাক্তার বাইরে এসে প্রভাতকে আশ্বাস দিলেন না।

বললেন, তাইটাসিটি নেই—চিকিৎসা করব কি?

তবু একটু চেষ্টা করুন স্যার।

চেষ্টা অবশ্যই করব—আমাদের শিক্ষাই হচ্ছে যে কোন অবস্থাতে হাল না ছেড়ে দেওয়া—কিন্তু যা ক্যান্ডি তা আপনাকে জানালাম, কেননা আপনি তো তাঁর নিকট-আত্মীয় নয়।

এমনটা কেন হ'ল?

ম্যাল-নিউট্রিশন। এ কি আজ নতুন জ্ঞানলেন? আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে শতকরা সমস্ত জনের এই দশা। বিশেষ করে যারা চাকরি করে।

ডাক্তারের কথা সমস্ত মন দিয়ে মেনে নিলে প্রভাত—কিন্তু এ ছাড়া দরিদ্র ঘরের ছেলেদের অবলম্বনীয় সহজ কৃতি আর কি আছে। বিনা পুষ্টিতে আংশিক নিষ্কিঞ্চ হওয়ার অন্ত কোশল তো তাদের জানা নাই। দেবতার দুয়ারে এই পরম পদ লাভের জন্য কত বুকভরা প্রার্থনা আর সামর্থ্য ছাড়া ঘুঘু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জমে—সে আর না জানে কে?

ভূপতির বাবা দুই-এক দিনের মধ্যেই মারা গেলেন—ভূপতির ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন পোয়ভার। দুটি নাবালক ডাই—দুটি অবিবাহিত বোন—বিধবা মা। অতঃপর চাকরি করব না—এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে পারবে না ও। পারলেও না। পরের দিনই কাচা গলায় দিয়ে বাপের আপিসে উমেদারি করতে ছুটল। সদাগরী আপিস—অত আইন-কাহ্ননের বজাট নাই—ইউরোপীয় মনিবের মনে লাগলেই সুরাহা হয়ে যায়। ভূপতি চাকরি পেলে—বাপের দরুন কিছু বোনাসও পেলে—আসর পিতৃদায় থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায় হ'ল।

ফিরে এসে প্রভাতকে বললে, তোমাদের সমিতি থেকে নামটা কাটিয়ে দিও—আর ঘরের খেয়ে বনের ঘোষ তাড়ানো চলবে না।

কেন রসদ যোগাড় করে নিলে কি দেশের কাজ করা যায় না?

না যায় না। 'আমি' জিনিসটা সব দিকেই পথ আগলে দাঁড়ায় প্রভাতদা। নিজে বাঁচার কথাই যদি ভাবব দিনরাত—কিন্তু আমাদের কাজ তো পরকে বাঁচানো নয়, নিজেকেই বাঁচানো।

সেটা একলা একলাই জমে ভাল। আর কিছুদিন গেলে তোমাদের সমিতি—কি তোমার নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারব না। সত্যি বলছি—যে চোরাবালিতে ডুবছে সে কখনও চেউয়ের উৎপত্তি-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না।

প্রভাত অত্যন্ত বিষন্ন হল। ভূপতির মত উৎসাহী কর্মী হলে তাকে ছেড়ে গেল—এই ক্ষতির ক্ষয় নয়। এ যেন অভিলাপ—দু'শো বছর ধরে যা ভিলে ভিলে আহরিভ হয়ে এমনি অকস্মাৎ নেমে আসে। ভারতবর্ষ অন্তঃসারশূন্য হয়েছে—এ কথাটা স্বদেশী যুগ থেকে শোনানো হচ্ছে—কিন্তু সেই অন্তঃসারশূন্যতা কোথায় আর কি ভাবে আরম্ভ হয়ে মর্ষের কভরুরে পৌঁছেছে তা সঠিক বলতে পারে কেউ? ঐশ্বর্যশালিনী ভারতকে সর্কারিজা করেছে শোষকপোত্তী—কিন্তু সে ধন তার সঞ্চিত মণি মুক্তা হীরা মাণিক্য নয়—তার শিল্প-বাণিজ্য সামরিক শক্তিও নয়। কেননা এ সব অপহৃত হলে

কালে পূরণ হবার আশা থাকে। ভূমির শক্ত কেটে নিয়ে সৃষ্টির ভো ভূমিকে চিরবক্ষিতা করে রাখতে পারে না, সে নিঃশেষতা তার সাময়িক। কিন্তু চোর সিঁদকাটি চালিয়েছে গোপন স্বত্বক্ষে—ভারতের প্রাণরক্ত অপহরণের চেষ্টা চলছে বহুকাল ধরে। তার শিক্ষা সংস্কৃতির রূপকে আমূল বদলে দেবার চেষ্টা, তার বণিককে করণিকে রূপান্তরিত করার সাধনা, তার গৃহের তুলসী ও শালগ্রাম শিলা সরিয়ে মরুমুহি ফুলগাছ ও নিরীধর বাদ্যের প্রতিষ্ঠা—সুস্থ স্বস্থ সবল ও সরল প্রতিবেশ থেকে তাকে সংঘাত-সঙ্কুল আবর্তের মধ্যে টেনে এনে পরাশ্রয়ের কলকচিহ্ন ললাটে একে পৃথিবীতে অত্যন্ত অসহায় আর ভীকু আর অসহিষ্ণু জাতির পংক্তিতে নামিয়ে আনা না হলে সর্বস্বত্বহারী মানুষ সামান্য একটা চাকরির জন্য এমন আকুলি-বিকুলি করবে কেন? মনের দূরত্ব আশা আর কল্পনাকে সমাধিস্থ করে এই ভাবে কোনমতে বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার গভজিকা-প্রবাহে ভেসে যাবে কেন? অন্ন হরণ করে—অন্ন ভিক্ষার এই নির্ভর অভিনয়ের মধ্যে কে তাদের ঠেলে দিয়েছে?—অসহায়—পশু—পরনির্ভরশীল—দাসত্ব-সোলুপ জীবনযুদ্ধপরাধু...

প্রভাতের মাধুর্য আশুন জলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে ও বললে, পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নাই। শক্তিমান হলেন তিনি বীর পদমর্যাদা আছে—আর সে পদমর্যাদার সৃষ্টি করে বিত্ত। সুতরাং শক্তির মূলতত্ত্বে বিত্ত ছাড়া আর কিছুকে কল্পনা করা যায় না। এই বিত্তকে যুখে নিন্দা করেও মন থেকে সরিয়ে দেওয়া কি শক্ত! তাই কি সাম্যবাদীরা এরই মূলে আঘাত হানছে নির্ভর ভাবে! কিন্তু সে ভো বাহিরের আঘাত। তারা বনীদের চাইছে গরীবদের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড় করাতে কিন্তু বনকে পরিহার করার মন্ত্র তারা জানে না। সুতরাং বন বর্জন করে সবাই চাচ্ছে সুখী হতে আর এরই মধ্যে জন্মেছে অকল্যাণের অগ্নিস্কুলিঙ্গ। বনসাম্রাজ্য যদি এলো ভো শান্তি আসছে না কেন? কেন কাদার বদলে লোহার দেহ গড়ে বাইরের আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা।

...মনের গভীরে দৃষ্টি ফেলে সংশোধনের কাজ করবেন—এই সমাজ-ক্ষতকে স্নেহ দিয়ে, সেবা দিয়ে আরোগ্য করে তুলবেন ভেমন ভিষক কোথায়?

প্রভাতের সুধুমণ্ডল সঁহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আছেন—ভেমন মানুষ ভো আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। তিনি রাজধানীতে বসে দিনের পর দিন ধরে আত্মগুপ্তির মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। তাঁর প্রার্থনা-সভা শুধু রাম-ভজন-গান-সর্বস্ব—ইহলৌকিক পরিভ্রাণ ক্ষেত্র নয়। ইহলোকে যে সব প্রলোভন মানুষকে মহুয়াত্ব থেকে নামিয়ে দেয়—আত্মদর্শনের প্রথর আলোয় সেইগুলিকে পুখারপুখ নিরীকণ করার মন্ত্র।

ক্ষমতার অহঙ্কার কোন্ হ্রিৎপথে প্রবেশ করে অত্যন্ত সংমাহুষের অন্তরকেও আবিল করে তোলে—ভারই ইঙ্গিত যেন প্রাথমাত্তিক ভাষণগুলিতে পাওয়া যায়। সেই মহাত্মা বলছেন, কংগ্রেস ভেঙে দাও। ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে ওই পবিত্র প্রতিষ্ঠান আর পূর্ব মর্যাদা বহন করতে পারছে না। ওর সংগ্রামী মনোবৃত্তিতে স্থিতিশীলতার লক্ষণ একটি হয়ে উঠছে। সাংবাদিক লক্ষণ। শুধু সংগ্রহ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। মাৎস্তন্যার নীতিতে সে আত্মবান হয়ে ওঠে। আজকার জগৎ বস্তুতাত্ত্বিকতার মন্ত্র জপ করছে—নীতিজ্ঞান সেকালের কুসংস্কার বলে সমাজভঞ্জে বাসা বাঁধছে। তাই কি যুক্তদৃষ্টি ত্যাগী পুরুষ রাজনীতির দুর্গাবর্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে দূর দিগন্তের নিঃশেষিত নীলিমায় অহুলি সন্বেত করে বার বার উচ্চারণ করছেন—সাবধান বাণী! হুঁসিয়ার পথ তুল করো না। আপনাকে জ্ঞান—আপনাকে জ্ঞান।

তাই আজ দিল্লীতে বসে মহামানব আর্ন্তহরে বলছেন, ফের—ফের—অসত্যের পর্বত প্রমাণ বোঝা জমে উঠছে তোমাদের হুঁপাশে। ও বোঝার তলার একদিন সমাধি রচিত হবে তোমাদের—সময় থাকতে যদি সাবধান না হও। সং হও—সাহসী হও। অথবা বনসঙ্করে কালোবাড়ারকে বলিষ্ঠ করো না। এই অতি ক্ষীতি—কেটে যাওয়ার পূর্ব-সূচনা।

রঘু পতি রাঘব রাজা রায়

সব কো সন্মতি দে ভগবান।

শুধু প্রার্থনা ক্ষেত্রে গলা সাধা নয়—সারা মন প্রাণ চেলে দাও এই কষ্টের সাধনায়।

ফিরিয়ে দাও পঞ্চায় কোটি মুদ্রা—পাকিস্থানের প্রাণ্য বলে যা দাবি উঠেছে। ফিরিয়ে নিয়ে এস উৎসাহিত ইসলামী জনকে—তাদের স্বার্থ স্থানকে সংরক্ষ করে—বাসস্থানকে বাধা যুক্ত করে—তারা যেমন নিরুদ্বিগ্নে ছিল—তেমনি নির্ভাবনার মধ্যে পুনঃ স্থাপিত কর তাদের। সত্যকে প্রতিষ্ঠা না দিলে আমার যত্নের মধ্য দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে যাব। হৃদয় প্রতিজ্ঞা তাঁর। হয় জীবন—নয় মরণ।

যত্না পরাজিত হয়েছে—সত্য্যগ্রহী শেষ সংগ্রামে হয়েছেন জয়ী। তবু তিনি জানেন...এ মূল্য তাঁর জীবনরক্ষার মমতা—বশে মিলেছে। এর মধ্যে স্বভঃস্বর্ভূত প্রাণশক্তির মহিমা নিহিত কিনা এ সংশয় তাঁর মনে জেগেছে।

সব্কা সন্মতি দে ভগবান।

এই প্রার্থনা প্রতিদিন চলছে—এই প্রার্থনা আজীবন চলবে। এই প্রার্থনার শক্তিতে উজ্জীবিত হবে ভারত—স্বস্থ—সুস্থ—ভারত আর তার পদমূলে শ্রদ্ধা অর্ঘ্য দেবে সত্য-সন্ধানী অগণিত সন্তান।

২৬

প্রভাত বসে বসে সমিতির কার্যত্বচীর একটা খসড়া তৈরি করছিল—শশী হাজরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঘরের বাইরে, আগতে পারি কি ভাড়া ?

অমলেন্দু প্রভাতের পানে চেয়ে হেসে বললে, আহ্নম।

ঘরে ঢুকেই হাজরা জিত কেটে 'ছ' পা পিছিয়ে অত্যন্ত অপরাধীর মত বললেন, তোমরা কাজে ব্যস্ত রয়েছ জানলে কি জিনিসমানার আসি। তোমাদের মূল্যবান সময়—

না—না—আপনি বহু। এক মিনিট।

শশী বললে না—ঘরের চারদিকে কোঁজুলনী দৃষ্টিতে চাইতে লাগল—একটু ইতস্ততঃ করে বললে, একটা কথা বলব—রাগ করবে না ত ভাড়া ?

• প্রভাত কাগজটা এক পাশে ঠেলে রেখে বললে, কি কথা ?

এই—বার দুই ঢোক গিলে হাজরা বললে, গান্ধীর ছবিটা না রাখলে কি চলে না ? মানে আমাদের বাংলা দেশে—

সবিস্ময়ে চাইলে প্রভাত। বললে, গান্ধীজী বাংলাকে দেখতে পারেন না—এমন অভিযোগ অনেক বার শুনেছি বটে—কিন্তু প্রমাণটা পাই ঠিক উল্টো।

বোধ হয় নোরাখালির কথা বলবে। কিন্তু পেছনে সমস্ত রাজ্যের শাস্ত্রী সেপাই নিয়ে ও রকম খালি হাতে চলার বাহাদুরি—

সে কি—শাস্ত্রী সেপাই—

মিট মিট করে চেয়ে মুচকে হাসলে হাজরা। বললে, ও কথা বিশ্বাস করুক কাগজওয়ালারা যারা রিপোর্ট বানায়—বিশ্বাস করুক বোকারা—যারা ছাপার হরণে যা পড়ে তাই সত্যি মনে করে—কিন্তু—

হাজরা মশায়—আপনার বিশ্বাসে বা অবিশ্বাসে গান্ধীজীর কতি-বুদ্ধি কিছু নেই—হয়ত জানেন ভাল করেই। আকাশে থুঁথু ফেললে সে থুঁথু নিজের গায়েই লাগে। যাক—দিল্লীর ব্যাপারটাই ত দেখলেন।

দেখলাম—মোহলমানদের সঙ্গে চিরকাল উনি আঁতাত করে আসছেন। এ ওঁর একচোখোমি। গান্ধীকে ভালোমানুষ পেয়ে ওরা যে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাজছে এটা বুঝছেন ত ?

কে বুঝে ?

সবাই—যার সঙ্গে দেখা সে-ই বলে—কাজটা কি ভাল হচ্ছে ? ভালমানুষী করে অভ্যন্তরীণ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া—ওদের বাড়ী ঘর দোর সারিয়ে স্থিতি করা—এর ফল কি হবে জ্ঞান ? আর একবার ভাগবটোয়ারা। কথায় বলে না—

ছিল শাল—হ'ল খুল

কাটতে কাটতে নিখুঁল।

যাকগে—আপনার কোন দরকার আছে কি ?

আছে বলেই ত দুটে এসাম। তোমরা ত ভাড়া দেব যত মোষ নন্দ ঘোষের। কিন্তু এ দিকে যে নেপোয় দই মারছে সেটা দেখেও দেখছ না।

বুলে বলুন ত।

বলব আর কি—সামাজ মুদিবানার স্নায়ুকার্কেট দেব কিন্তু টন টন লোহা—আর রিম-রিম কাগজ-যে অন্ধকারে পাচার হচ্ছে নাকের উপর দিয়ে সে বোঁজ রাখ ?

প্রভাতের মুখ গম্ভীর হ'ল—বললে, আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন ?

বেশ ত—বুড়োর কথায় বিশ্বাস না হয়—এক দিন রাত্তিরে পাহারা দাও না। বেশি দূর যেতে হবে না—নিজের বাড়ীতে বসেই—

আপনাকে থাকতে হবে। ওর হাত চেপে বরলে প্রভাত। শশী হাজরা আঁতকে উঠল, আরে—ছাড়—ছাড়—আমার কি গারে শক্তি আছে যে লাটির বা সহ্য করব। ও রাজা-রাজদার যুদ্ধের মধ্যে উলু ঝড়কে টেনো না ভাই। সন্ধান খুলুক চাও—বাতলে দিতে পারি। কিন্তু—

না, থাকতে হবে আপনাকে। একটু ভেবে বললে, কাজটা আপনাকে দিয়েই হাসিল করব।

শশী হাজরা সজ্ঞাসে চীৎকার করে উঠল, ওরে বাবা, ওসব ক্যাসাদের মধ্যে আদ্রি নেই। খাই দাই কঁাসি বাজাই—ও সবের দার দারি না।

না হলে কিছুই হবে না। আপনার মহাজন খ্যাতি আছে—আপনাকে না হলে হবে না। বেশ ত—এই কাজটি করে আমাদের কর্মী-ভালিকা ভুক্ত হন।

তা কি করতে হবে আমার ?

অমলেন্দু বললে, আপনি যেন স্নায়ু কাগজ কিনছেন—এমনি ভাব করে ওদের মনে বিশ্বাস জন্মাবেন। তার পর যা করবার আমরা করব।

হাজরা মুখে যথেষ্ট আপত্তি জানালে—মনে মনে সন্তুষ্ট হ'ল। অন্ধেন্দু বাবুর উপর ও মোটেই খুশী ছিল না। লোহা আর কাগজের বিরাট সঙ্কর আছে ওদের—অজ কালো-বাজারের চেয়ে শতাব্দী জিনিস-ছাড়তেও পিছনা নয় ওরা। বলতে গেলে ওদের তেজী ক্রারবারের দা লেগে হাজরার স্নায়ুকের লাভ প্রায়—আসলের কোঠায় নেমেছে। হাজরার উপর শুধু সরকারের কড়া নজর নাই—পাড়ার বেকার ছেলেরাও যেন উঠে পড়ে লেগেছে। না হলে এ বাজারে রাখব বোয়াল হওয়া তার পক্ষে আশ্চর্যের ছিল না। এখন বাঁড়ের শত্রু যদি বাড়ে মারে—কতি কি। শশী ত আর সত্যের বেসাতি করতে বসে নি—কারও মুখে সত্যের কথা শুনে ওর মনে হয় বড়াই করছে লোকটা। শশী ফুদ হয়ে বলে,

যেখানে পাল পার্শ্বণ বার ভ্রত কুটুম্ব-অভ্যাগত দায়-অদায়
ঠেকিয়ে মাছুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে প্রতিদিন সেখানে
সত্য বলে কিছু থাকতে পারে? তেরশো পঞ্চাশে যারা সত্য-
বাদী ছিল—ভারা না বেতে পেয়ে স্বর্গে গেছে—আর তাদের
যুধের অর কালোর বেচে যারা রইল পৃথিবীতে—ভারাই আজ
ফুলে ফেঁপে হয়ে উঠেছে রাজা আমীর। ভারাই তো সত্যি-
কারের বড় মাছুষ।

অবশ্য মনের এ উগ্রা প্রকাশ সে করলে না। তাকে
উল্লসিত দেখে প্রভাত বললে, যান, পরে এ বিষয়ে পরামর্শ
করব।

যাই কর বাবা—এই বুড়াকে আর ফাসাদের মধ্যে
জড়িও না। গোবিন্দ হে—সবই ভোমার ইচ্ছা।

হাজরা চলে গেলে অমলেন্দু বললে, হাজরাকে বিশ্বাস
কর প্রভাত?

সম্পূর্ণ নয়।

তবে ঠেকে দিয়ে এ কাজ করা হবে কেন?

না হলে আর পথ কি?

একটু ভেবে দেখলে হতো না। হাজরা যে র্যাক-
মার্কেটের কথা বলছে—ওর স্বার্থ না থাকলে—

প্রভাত অবীর হয়ে বললে, কিন্তু কবে আর কাজ করব
আমরা। দিনকের দিন কি অবস্থা হচ্ছে দেশের দেখছ।
কালো বাতারা ফাঁপছে—নীচু গুরের যারা ভারাত টিকে
থাকবে—কিন্তু আমরা মধ্যবিত্তরা এ ভাবে কতদিন বাঁচব
বলতে পার? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে যাদের দান
ছিল সবচেয়ে দামী ভারাই এ ভাবে যুছে ঘাবে স্বাধীন
ভারতবর্ষ থেকে।

অমলেন্দু বললে, দেশময় দুর্নীতি ভোমার আমার চোখের
কতটুকু দূর হবে। যারা রাজ্যভার নিয়েছেন হাতে ভারাই
পারছেন না।

প্রভাত বললে, বড় দুর্ভাগ্য আমাদের যে, পৃথিবীতে যে
সময়ে সবচেয়ে দুরূহের কাল তাই স্বাধীনতা পেয়ে অতিক্রম
করতে হচ্ছে আজ যদি আমাদের ধরে অন্নটাও থাকত।

অমলেন্দু বললে, এই অন্নবঞ্চনা সৃষ্টি করে তেরশো পঞ্চাশে
দেশের যুবশক্তিকে নিজের প্রয়োজনে নিতে পেরেছিল
ইংরেজ। কংগ্রেস মিত্রশক্তির সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা
করলে—স্বর্ভিক্ষের তাকনা দলে দলে মাছুষ এসে ঢুকল
সেনাবাহিনীতে। এবারও যে সেই ব্যাপার আবার ঘটবে
না কে বলতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধ আর শীঘ্র বাধছে না। প্রভাত আশ্বাস দিলে।

কে বললে—যুদ্ধের সাধ আমাদের মিটেছে? যারা যুদ্ধ
করে তাদের ইচ্ছা কতটুকু—যারা যুদ্ধ বাধায় ভারাত কোন
দিন সামনে আসে না।

কিন্তু তাদের চিনি আমরা।

চিনি কিন্তু ধরতে পারি না—শান্তি দিতে পারি না।
আমরা যারা যুদ্ধের হাত ধরে পথ চলছি ভারাত নির্দোষী
পালার বর্ণচোরাদের পক্ষ সমর্থন করছি।

এবার আর ভুল করব না।

কেন করব না—একমুঠো চালের বদলে—কামানের
পাল্লায় যদি অসহোচা আসতে পারি—

কেন আসব?

তাই তো জানি ভাই—অর্থ বারে বারে এ ভুল আমাদের
হবেই। ভুল হয়—কেননা ভুল ঠেকাবার সহজ পথ আমরা
বেছে নিই না।

কেন নিই না?

কাউকে যে বিশ্বাস করতে পারি না।

কেন পারি না?

যাঁকে আপন ছেনে মাধার তুললাম—কিছু দিন পরে
দেখি মাধার উঠে সেই আমাকে হৃদশার মধ্যে টানে। বলবে
কেন এমনটা হয়? হয় এইজন্য আমাদের শিক্ষার গোড়ায়
গলদ রয়েছে—গলদ রয়েছে চারদিকের আবহাওয়ায়।
আমাদের মনে ধনের মোহ যে পরিমাণে রয়েছে—জন-
কল্যাণের আস্থা তার শতাংশের এক অংশও নাই। তুমি
আমি আজ ধনকে বলছি—পৃথিবীর অকল্যাণ—কিন্তু তুমি
আমি যদি দৈবক্রমে লক্ষপতি হই অমনি মনে মনে স্বীকার
করব ধনের চেয়ে কল্যাণকর কিছু জগতে নেই। জীবন
ধারণের যত কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব অর্থে মেলে—আর ভাল
ভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়াটাই তো আমাদের সব কামনার
সেরা কামনা আমরা বঞ্চিত বলেই হস্ততো ধনের নিন্দা করি।

প্রভাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, জানি না ভোমার
মনের এটা সত্যমুষ্টি কি না—

অমলেন্দু হাসলে, ভোমার আমার এবং আমাদের মত
যত বিভ্র-বঞ্চিত সাধারণ লোক প্রায় সকলকারই মনের এই
মুষ্টি। আমরা যা পাই না তারই দোষ কীর্তন করি—পেলে
চূপ করে থাকি। বাইরের দুর্নীতিটা এত ব্যাপক এইজন্য—
মনের দুর্নীতি আমাদের হুরপনের।

প্রভাত বললে, ভোমার কথা শুনে মনে হয়—আমাদের
উদ্ধারের আশা বুঝি নেই।

অমলেন্দু হেসে বললে, মাতিঃ একেবারেই অন্ধকারে
নেই আমরা—মাঝে মাঝে আলো জ্বলছে বৈকি। তাই
তো আমরা বেঁচে রয়েছি এবং ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টাও
করছি। তবে এইটুকু আমার মনে হয়—যে আশাত আমরা
পাচ্ছি তা যথেষ্ট নয়। আরও কঠিন আশাত না এলে নীতির
মানদণ্ডটি ঠিক পথে ফিরবে না। ভিতর থেকে যাতে
বদলাতে পারি—সেই শিক্ষা, সেই পথ নির্দেশ আজ আমাদের

অত্যন্ত প্রয়োজন। চল না এক দিন অন্ধ্রবাসীর কাছে গিয়ে সমিতির উদ্দেশ্য জানাই।

সূর্যনাথ—বল কি? প্রভাত চমকাবার ভান করে হেসে উঠল, অর্থাৎ বাঘের সামনে গিয়ে বলব...বাঘ মশাই, আপনি আর নিরীহ মেঘ শাবককে মেরে উদর পুষ্টি করবেন না—তৃণ ভোজনে অভ্যস্ত হোন।

অমলেন্দু হেসে বললে, উপমা তোমার ছুট হ'ল। মানুষ কিছু হিংস্র বাঘ নয় আর তাকে তৃণ ভোজনে অহরোধ জানানোও বিজ্ঞপ ছাড়া কিছু নয়।

তা হলে—

আমরা বলব—মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষয় যতটুকু সম্ভব আবশ্যক তা আপনাদের আছে—এইবার আপনি—কালোবাজারী পরিত্যাগ করুন। না অমলেন্দু, এভাবে নাটক কমে—দর্শকের হাততালি মেলে—কিন্তু যে মানুষ দর্শক এবং নাটক তাকে ভোলানো যায় না। বন তৃণ আর জলতৃণ সমান জিনিস নয়।

তা হলে হাজার পরণাপন্ন হবেই?

এক যুহুর্ন্ত চুপ করে প্রভাত কি ভাবলে। বললে, আচ্ছা ভেবে দেখি—কি পথ নিলে সুবিধা হয়। ভাল কথা শশাককে দেখছি না কয়েক দিন ধরে?

আর দেখবেও না। অমলেন্দু হাসল।

মানে?

জাহ্নবীর প্রাণেই সে দিল্লী গেছে—একটা ইণ্টারভিউ দিতে।

চাকরির ক্ষয়?

তুমি ভাব কি—আমরা সবাই দেশের সেবা করব—চাকরি করব না?

কিন্তু—

প্রভাত—চাকরি নিলে যে দেশের সেবা করা চলে না এ ধারণা তোমার ভুল।

হবে। আমার একটা উপমা মনে পড়ল। আমার দূর সম্পর্কের এক পিসিমা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। কোন সিদ্ধবাবার কাছে তিনি নাকি মন্ত্র নিয়েছিলেন। দিনে লক্ষ নাম জপ ছিল সে মন্ত্রের বিধি। পিসিমা তাই করতেন—কিন্তু সংসারের যাবতীয় কাজ—রান্না, বাসন মাজা, জল তোলা, গল্প ঝগড়া, হাসি, ঠাট্টা সবই তাঁর চলত সেই সঙ্গে। তিরিশ বছর ধরে পিসিমা মন্ত্র নিয়েছিলেন আর তিরিশ বছর একটানা তিনি এই সব করেছেন—তুমি হিসাব করে বল তো আমরা, সিদ্ধির পথে কতখানি এগিয়েছিলেন তিনি?

অমলেন্দু বললে, সংসারে থেকে ঈশ্বরকে পাওয়ার দৃষ্টান্ত যে নাই—

সে সব অনাধারগণের কথা। আমরা কাদায় ভৈরি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—আমাদের ত্যাগের সঙ্গে ভোগের মিশেলে ভেলের সঙ্গে জলের মতই অবস্থা দাঁড়ায়। তেল ভেসে বেড়ায় ওপরে—

অমলেন্দু বললে, অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমার সম্বন্ধে ভুলন করতে পারি।

আজ থাক। চলতে চলতে ও যুধ ফিরিয়ে বললে, কি জানি অমল—আমার কেবলই ভয় হচ্ছে—শেষ পর্যন্ত এই সব নিয়ে তোমার সঙ্গেও আর তর্ক করতে হবে না। আমাদের প্রত্যেকেরই পথ আলাদা।

কিন্তু সব পথেই কি দিল্লী পৌঁছান যায় না? উঠে:যরে হেসে উঠলে অমলেন্দু।

২৭

মা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার। বললেন, কখন থেকে ভোর আশ্রয় দাঁড়িয়ে আছি বাবা—নীপুণের ডাক্তার-বাড়ী যা। উর কলিকের ব্যাটা আবার বেড়েছে।

সারা রাতই ছুটাছুটি চলল। ইন্সপেকশন—সেক—গরম জল। এ সবের সঙ্গে অর্ধও ব্যয় হ'ল যথেষ্ট। মা তাঁর হাতের চুড়ী বুলে দিলেন। বললেন, যে বুটিতে ভর করে আছি—তা আগে রন্ধে হোক—সুদিন আসে আবার সব হবে।

ভোর বেলায় রোগী একটু সুস্থ হয়ে চোক বুজলে। প্রভাতও বিছানার শুয়ে পড়ল। অসীম ক্লান্তি দেখে—তবু ঘুম আসছে না। ক্লান্তির চেয়ে তীব্রতর কত চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মা যা বলেছেন—সেই তথাকথিত সুদিন আসবে কি? মধ্যাহ্নে ঘরে কবে আসে সুদিন—এলেও তার আয়ু কতই বা দীর্ঘ। একটা মানুষের উপার্জনের হায়ায় অনেকগুলি প্রাণী আশ্রিত। সে প্রাণীগুলিকে সংসারে আনলে কে?...সারহীন জমিতে রিজ স্বাস্থ্য গাছও ফল শাখা-প্রশাখা ছড়ায়—তার ক্রয় শাখার কোটে স্বভাব-ক্ষয় ফুল—আর তাতে ফলে অপরিপুষ্ট ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য সেই অপুষ্ট ফলেও থাকে অনন্য বীজ আর সে বীজের গর্ভে থাকে অঙ্কুর। সব ক'টা তার অঙ্কুরিত না হলেও গাছের যুক্তিকার-রসে ভাগ বসায় তারা। তার পর তাদের মধ্যে চলে আলো ও রস আহরণের প্রতিযোগিতা। বা: রে—সংসার। স্বপ্তি-জীলার এই ধারা না চললে কি স্বপ্তি লোপের আশঙ্কা বেড়ে ওঠে। এই দুঃখ-দৈত—বোগ-মৃত্যু—এরা জীবনের পাশে পাশে চলে কোন্ মহাজীবনের বার্তা বিবোধিত করে। এদের ধারা ছয় করতে পারে না—তাদের জীবনের মহিমাই বা কি। যুদ্ধের মহিমা। এমনি লক্ষ কোটি সংসার নিয়ে দেশ—আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ। দুঃখ-দৈত—অভাব—মৃত্যু—কম হতে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা অবিরাম ক্রমবহনের ইতিহাস,

এই রচনা কোন যুগ হতে আরম্ভ করেছে—শেষ করব কোন কোন যুগে—কেউ জানে না। হাঁ আশাবাদী বলেন এরই নাম যুগ—জীবনযুগ। দুঃখ-উত্তরবর্ণের চেষ্ঠা—ও নাকি জয়গত বৃত্তি। এতেই জীবনের স্বাদ, শোভা, হয়তো বৈচিত্র্যও।

বাবার ভালমন্দ কিছু হলে—এত সব চিন্তাও আর থাকবে না। যখন ঘুপি ঝড় উঠে—কুটীরে বসে কুটিরবাসী বলে—বড় ধামাও ভগবান—বাঁচাও। ঝড় থেমে যখন ঘুঘল ধারে বৃষ্টি নামে তখনও তার প্রার্থনা চলে—বৃষ্টি বন্ধ কর প্রভু—বাঁচাও। বৃষ্টির পর যদি প্রবল শীত আসে তা থেকে পরিজ্ঞাপণ পাবার প্রার্থনা এ একই সুরে চলে—আর প্রথর বৌয়ের তাপে জর্জরিত হয়েও সে সুর থাকে অব্যাহত। একটা-না-একটা অভাব আর তা থেকে পরিজ্ঞাপণের জন্ত পরিজ্ঞাহি রব—এই চলছে সংসারে। তবু সংসারের মত সুন্দর নাকি কিছু নাই—সংসার ছেড়ে যাবার কল্পনার মাহুষ কঁাদে। মাহুষ বলে, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ছুঁবনে। সুবন সুন্দরই বটে!

দাদা।

কি রে? লক্ষ্মীর ডাকে প্রভাত বাস্তবে মেমে এল। সত্যি লক্ষ্মীও কি অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে। ওর সদাপ্রফুল্ল মুখে হৃচ্ছিকার ঘন ছায়া, বেশবাসও কেমন মলিন। যে বিপৎপাতের ভয়ে মাহুষ সর্বক্ষণ সচকিত হয়ে থাকে—তাই বুঝি ওর চিন্তার চেপে বসেছে।

লক্ষ্মী ছ'হাতের আঁচুল দিয়ে আঁচলের প্রান্তে গিট বঁধতে লাগল। বললে, একটা কথা যদি রাখ—

কি কথা রে—অত ভয়ই বা ভোর কেন! প্রভাত ইন্দ্ৰ হেসে ওর হৃচ্ছিকা দূর করতে চাইলে।

ভয় করি সাথে—তোমাদের ছেদের ভো অস্ত্র নেই। একটু চূপ করে থেকে বললে, নন্দীরা বলছিল—ওদের ছোট ছোট ছেলেরদের পড়াতে পারে এমন একজন অল্প লেখাপড়া জানা মৈত্রেয় যদি সন্ধান পাও—

ওঃ এই কথা! তা মেয়ের অভাব কি? বলিস তো কালই ব্যবস্থা করে দিই।

না—তোমাকে আর অত উপকার করতে হবে না। একটা টোক গিলে বললে, আচ্ছা আমিও তো ছোটদের পড়াতে পারি—হুপুর বেলা খালি ঘুমিয়ে ভো কাটাই।

কথাটা বলে আড়চোখে সে প্রভাতের মুখভাব দেখতে লাগল। কিন্তু তার সন্দেহ সত্য হ'ল না। তার প্রস্তাবে প্রভাতের মুখ গভীর হ'ল না—খানিকটা বিশ্বাস আর প্রশংসার আভাসে তা অদ্ভুত দেখাতে লাগল। প্রভাত বললে, তুইও তা হলে সংসারের কথা ভাবিস লক্ষ্মী। একটু ছোট নিখাল টেনে নিয়ে বললে, কেবল আমিই ভাবি না।

না দাদা, তুমিও ভো যথেষ্ট ভাব—না হলে পাঁচটার পর মারোয়ারী ফাঁদে—

ওরে, সে হ'ল মান-বাঁচানো চাকরি। কিন্তু তা করলে চলবে না। পাকা চাকরি আমার নিতেই হবে—

কাজ কি—আর কিছু পড় না।

প্রভাত হাসলে, অর্থাৎ চিরকাল ঝোঁকাই থাকব—বড় হব না। বাবার অনুরোধে মা গহনা বুনে দিলেন—যে আসবাবপত্র নাই—পোষ্টাপিসে একটা সেভিংস ব্যাঙ্কের বই পর্যন্ত নেই যার অস্ত্র অস্ত্রতঃ পাঁচটা টাকা।

তুমি চাকরি করলেই—আমাদের টাকা জমবে।

সেই স্বপ্ন দেখিস বুঝি লক্ষ্মী?

কেন দেখব না—সবাই দেখে আর আমি দেখলেই দোষ?

ঠিক কথা! স্বপ্ন দেখে না কোন্ মাহুষ? কল্পনাই তাকে প্রাণের রসে উচ্ছল করে তোলে। পৃথিবী পুরাতন হয়েও চির নূতন আর ভিজ্র হয়েও বর্ণময়ী এ শুধু কল্পনারই প্রসাদে। আমার কিছু নেই—জটপাকানো বর্তমান আর দুঃখ বালুবাশি-বিভীর্ণ ভবিষ্যৎ—এটা কণ-প্রতীতি না হলে জীবনকে ব্যর্থ বেড়ানো দুঃসাহ্য হতো না কি? এই কল্পনার জের—এই জগৎ ছাড়িয়েও টেনে চলতে হয়—এক জন্ম থেকে বহু জন্মের অমুশ্রুতি একটি সীমাহীন সমুদ্রের মত জীবনের কল্পনা। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝবানের অসংখ্য বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম—এই ভো চলছে যুগে যুগে।

প্রভাত বললে, ইচ্ছে হলে কাজটা নিতে পারিস—আমিও বসে থাকব না। একটা কিছু করতেই হবে আমাদের। কয়েক যত্নবৃত্ত চূপ করে সে বললে, আচ্ছা লক্ষ্মী—ধর আমি যদি কোন কাজ নিয়ে দূরে চলে যাই তোদের অসুবিধা হবে না?

বাঃ রে, কত লোকই তো চাকরি নিয়ে কত দূরে যায়—

ঠিক বলেছিস। আচ্ছা লক্ষ্মী, আর একটা কথা। ধর কেউ আমাদের অনেক অনেক টাকা দিয়ে বললে, তুমি আজ থেকে আমাদের হলে—তা হলে কেমন হয়?

সে তো কিনে নেওয়া। মাহুষকে অমনি করে কেউ কেনে নাকি? আজও কি পৃথিবীতে মাহুষ কেনা-বেচা চলে।

চলে বৈকি। প্রভাত মুখ টিপে হাসলে। তবে সেটা দাসত্ব প্রধার মত ভয়ঙ্কর কিছু নয়। সে প্রধাতি ধর্মের সামিল—কেমন জানিস? যেমন ধর একটা লোহার গেটের মাঝায় খুঁই ফুলের ঝাড়। বাইরে থেকে যে কেউ দেখবে—বলবে—চমৎকার। লোকে ফুল গাছের সবুজ ত্রী বা ফুলের সাদা রঙ দেখে—তার তলার লোহার কথা ভাবে না।

লক্ষ্মী হেসে বললে, এই-নিরে একটি গল্প লিখবে বুঝি?

ভাবছি লিখব। ভাল হবে গল্পটা, মন?

প্রভাতের মুখে যুহু হাসি দেখে লক্ষ্মীর সন্দেহ হ'ল—এটা পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। তার বুঝি নিয়ে—ছেলে-মাহুষি নিয়ে প্রভাত প্রায়ই পরিহাস করে। ওই বর্ণনের হাসি

কিন্তু লক্ষ্মীর ভাল লাগে—যদিও কৃত্রিম জোরে ও প্রাণপণে প্রতিবাদ করে যায়। আজ কিন্তু ও রাগলে না—হাসিমুখে বললে, গল্পটা কিন্তু আমাকে শোনালে হবে না—সাহিত্য-সভায় পড়তে হবে।

সাহিত্যরসিকরা কিন্তু যুধ খোলে না—লক্ষ্মী।

ইস—তাইতে বুঝি তোমার হুঃখ? তা ভয় নেই, এবার সে হুঃখ মোচন হবে। বলে ও দ্রুত নিজস্ব হ'ল ঘর থেকে। অনতিবিলম্বে ফিরে এল হাতে একটি নীল লেফাঙ্গা নিয়ে। সেটা প্রভাতের কোলের উপর ফেলে দিয়ে বললে, পড়।

আশ্চর্য—সিপ্রাই লিখেছে। চিঠি। অপ্রত্যাশিত বস্তু। ওই মেয়েটিকে না দেখে ওর মনে যে ছবিটা উজ্জ্বল হয়ে আছে, সেটা আলম্পরায়ণা সজ্জাসর্ব্ব্ব ধনী ছলারী ছবি। সেই জড় ছবি যে কথা বলতে পারে...

প্রভাত ভাড়াভাড়ি পড়লে :

তাই লক্ষ্মী—আমার একটি অমরোহ। তোমার দাদাকে বলবে—খবরদার যেন বাবার কথা না শোনেন। আজকাল রক্তহীন রোগীকে রক্ত দিয়ে বাঁচান হচ্ছে—কিন্তু যে রোগী সত্যিই বাঁচবে না—তাকে রক্ত দান করাটা নির্বুদ্ধিতা নয় কি? এ যুগে জমিদারী রক্ষা করা যাবে না—তোমার দাদার উৎসাহ বুদ্ধি পরিশ্রম কোন কিছু দিয়েও নয়। সুতরাং এ হুশ্কেটা যেন তিনি না করেন। যদি করেন—নিজেই ডুববেন।

ইতি

তোমার সিপ্রাদি

আশ্চর্য—সজ্জাসর্ব্ব্ব জড়বৎ মেয়েটিও কথা কইতে জানে। চিঠির সামান্য কমটি ছত্রের মধ্য দিয়ে সে যেন অসামান্য হয়ে উঠল। সজ্জিত সম্পদকে যারা মনে করে ছাড়া পাওয়া—কিংবা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির কলে বর্তমান জন্মের ভোগপ্রাপ্তি—এই মেয়েটি অন্ততঃ তাদের পোষের নয়। এ মেয়ে পৃথিবীর বুকে কালের পদধ্বনি শুনেছে—আর শ্রোতের গতি কোন দিকে তাও ওর অজানা নয়। প্রাসাদের রুদ্ধ বাতায়ন ধুলে এ শুধু নীল আকাশের সৌন্দর্য্য দেখেই মুগ্ধ হয় নি—রুদ্ধ মাটির অসমতল উন্নত ভঙ্গিতে যে ইঙ্গিত নিহিত তার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে। সিপ্রা আর যাই হোক—ছলারী নয়—প্রাণময়ী একটি মেয়ে। সাধারণ মেয়েরা যে সুরে কথা বলে—যে চিন্তাভাল আপন মনে বোনে—এবং যে সব সমস্ত আপন বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করবার চেষ্টা করে—সিপ্রা তেমনই মেয়ে। ওকে জীবনের পথে সঙ্গী পেলে—জীবন হয়ত ভারপ্রাপ্ত হবে না।

আপন মনে হেসে উঠল প্রভাত। যেন এই মুহূর্ত্তে সিপ্রাকে লাভ করবার সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়ে গেল। যেন চাকুরি নেওয়ার সঙ্গে সিপ্রাকে নেওয়াও অন্ত্যন্ত সহজ।

হাসলে যে? লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে।

এমনি। আচ্ছা লক্ষ্মী, তুই বিশ্বাস করিস জমিদারী-প্রথা থাকবে না?

বাঃ রে—আমি জানব কি করে?

তবে তাকেই বা ও কথা জানালে কেন?

লক্ষ্মী হেসে বললে, আমার জবানিতে জানিয়েছেন তোমাকে।

তুই কিছুই জানিস না তা হলে? প্রভাত ওর পানে আঁড় চোখে চেয়ে হাসলে। আচ্ছা—আর একটা কথার উত্তর দে ত। এই ধনভর্য্য মানে—পাঁচ জনকে মেরে একজনের বড় হওয়ার দিন অনেক দূরগায়েই শেষ হয়ে আসছে নাকি।

কেন? বিশ্বিত কণ্ঠে লক্ষ্মী বললে, তোমার হাতের পাঁচটা আঙুল সমান? না, তোমার বুদ্ধির সঙ্গে আমার বুদ্ধির তুলনা চলে? পৃথিবীতে যার যেমন বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি সে সেই মত ফলই ত পায়—পায়ের জোরে এক করে দিলেই সব কিছু এক হয় না।

কিন্তু হচ্ছেও ত। পৃথিবীতে এমন দেশ আছে—

লক্ষ্মী হেসে বললে, না গো মশাই না। ওই পায়ের জোরে বলছি এক—কিন্তু এক কথনও হতে পারে। একই যদি হ'ল ত আলাদা আলাদা জিনিস তৈরী হওয়ার মানেটা কি।

এর উত্তরে অনেক কথা বলা যায়। যুক্তি তর্ক প্রমাণ দিয়ে বোঝান যায়—প্রকৃতিতে যেটুকু প্রভেদ তা মানুষের চেষ্টায় অজ্ঞান্যে দূর করা সম্ভব। এই প্রভেদে শক্তিকে মানুষ এমন পর্যায়ে এনেছে—যাতে কল্যাণ অংশ নাই বললেই চলে। বুদ্ধির বলে মানুষ উপার্জন করছে—আবার সঞ্চয়ও করছে—আবার প্রভুত্ব করছে। প্রভুত্ব অহঙ্কার বাড়ায়। সে-ও তত মারাত্মক নয়—যত সর্ব্বনাশ মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাকে ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ রোপ্যের কুঠিন বস্তু মনের কোমল বৃত্তির উপর যতই চেপে বসে মন ততই বেদরদী হয়—নির্ভর হয়। সর্ব্বনাশের বীজ এই সকলকে মেরে নিজে ওপরে ওঠার নেশার মধ্যেই থাকে। শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা এই সর্ব্বনাশকে ঠেকাবার জড়ই কি নয়? কিন্তু লক্ষ্মী তর্কের পাত্রী নয়। ওর সহজাত যুক্তিরও একটা দিক আছে যা হিন্দু-বর্ম্মের মূলগত ভেদের ব্যাপার। এক বিরাট মহান পুরুষের ইচ্ছার বিস্তৃত রয়েছে এই জগৎ—তার ইচ্ছাতেই লীলার বিকাশ—আর লীলার বৈচিত্র্য্য সম্পাদনে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রুচিনিচর্য্য অসংখ্য কুশীলব অসামঞ্জস্যময় জ্ঞান কর্ম্ম প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এসব না থাকলে জগৎ থাকার সার্থকতাই বা কি থাকত। সমুদ্রে যদি ঢেউ না ওঠে—কিসের শোভা।

না...কর্ম্মহীন জীবনের সবই বিবাদ লাগে। বিবাদ শহরের এই একঘেয়ে জীবন। উদয় হতে অস্ত এবং অস্তের পর নিজার পূর্ব্বকণ পর্য্যন্ত চারিদিকে একই দৃশ্য—সর্ব্বকণ

একই চিন্তা আনন্দ বা দুঃখ নিয়ে কালযাপন। একটি দিনের পর আর একটি দিন আসে সামান্যই প্রভেদ নিয়ে—কিন্তু পর পর কয়েকটি দিনকে পাশাপাশি রাখলেই বৈচিত্র্যের বর্ণ বা স্বাদ কোথায়। এ থেকে অন্ততঃ মুক্তি চাই। এই গলি থেকে, বাড়ী থেকে, নিত্য প্রয়োজনের সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে সে অপরিচিত পরিমণ্ডলে—যেখানে নূতন মানুষের তিড়ে নূতন জীবন স্পন্দিত হবে...নূতন বৃত্তিতে ঘন হয়ে উঠবে

আকাশের নীল—আর সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ—নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর দর্পণে প্রতিফলিত করাবে...জন্ম মৃত্যুর স্রোতবাহিত এক অপূর্ণ-দর্শন বস্তুকে বা অগ্নির মত নিত্যদৃষ্ট হয়েও নিত্য ঝিষ্ট নয়।

প্রভাত জিলোচন সেনের প্রস্তাবটা আর একবার ভাল করে ভেবে দেখবে স্থির করলে।

ক্রমশঃ

পাশ্চাত্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিচার

অধ্যাপক শ্রীকাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য্য

জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপনীত হয় নাই, বাস্তব সমস্তার সম্মুখীন হইয়া মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃতি চূর্যোগময়ী। চূর্যোগে বিপন্ন মানুষ অপরের সাহায্যপ্রার্থনা করে। কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন মানুষের সাহায্য অতি মগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন কোন অনন্ত শক্তি-শালী পুরুষের সাহায্যপ্রার্থনা না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ—ভূকম্পন, ঝড়াবাত্যা, বজ্র প্রভৃতি—মানুষের মনে মানুষের শক্তির ক্ষুদ্রতা উপলব্ধ করাইয়া অনন্তশক্তিশালী কোন বিরাট পুরুষের কল্পনা জাগাইয়া দেয়। মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন প্রথমে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের পশ্চাতে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করে। ক্রমে চিন্তাধারার বিকাশের ফলে মানুষ বুঝিতে পারে প্রকৃতির বিভিন্নতার পশ্চাতে একা, একরূপতা বর্তমান। এই উপলব্ধির পর বহু ঈশ্বরবাদ ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদে পরিণত হয়—প্রকৃতির পরিচালক ও নিয়ন্তা রূপে মানুষ একজন্ম সর্বশক্তিমান পুরুষের কথা ভাবে এবং বিপদে তাঁহার ধ্যান করিয়া শক্তি প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এই ভাবে সৃষ্ট হইলেও যুক্তিতর্ক দ্বারা মানুষ সেই বিশ্বাসকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করে। এই বিশ্বাস যে অর্থহীন মিথ্যা বিশ্বাস নহে, ইহা যে যথার্থ বিশ্বাস, প্রকৃতই যে ঈশ্বর বিদ্যমান ইহা প্রমাণ-উদ্দেশ্যে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় আমরা তদ্ব্যে প্রথম প্রধান যুক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি :—এন্সেল্ম নামক জর্মনক মধ্যযুগীয় ধর্মযাজক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ-উদ্দেশ্যে যে যুক্তি উপস্থাপ্ত করেন তাহা ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি (Ontological argument) নামে পরিচিত। ইনি বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এই কথা একমাত্র বুর্খেরাই বলিতে পারে এবং এই কথা দ্বারা বুর্খেরা শুধু নিজেদের ‘বুর্খামির’ই পরিচয় দেয়। ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি

এমন একটি ‘মহত্তম সত্তা’ যাহা হইতে আর কিছু মহত্তর আছে বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। এই মহত্তম সত্তার অস্তিত্ব যদি বাস্তব না হইয়া শুধু কাল্পনিক হয় তবে সেই সত্তাকে মহত্তম বলা অর্থহীন। যে সত্তা কাল্পনিক ও বাস্তব এই উভয় জগতে বিদ্যমান সেই সত্তাই প্রকৃত মহত্তম। সুতরাং ঈশ্বরের তাব বা ধারণা হইতেই তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এন্সেল্ম-এর এই ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিটি আধুনিক যুগের করাসী দার্শনিক ডেকার্ট একটু পরিমার্জিত রূপে উপস্থাপ্ত করেন। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেদের অপূর্ণ সত্তারূপে অনুভব করি, কারণ আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, আমরা যাহা ইচ্ছা করি কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারি না। আমাদের মনে ‘পূর্ণ সত্তা’র ধারণা বিদ্যমান না থাকিলে ‘অপূর্ণসত্তা’ এই ধারণাটি জাগরুক হইতে পারিত না। আমরা যে অপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারি যে-হেতু আমাদের মনে পূর্ণত্বের ধারণা বিদ্যমান। এই পূর্ণ সত্তার ধারণা হইতেই প্রমাণ হয় সেই সত্তা অস্তিত্ববান, কারণ অস্তিত্ব-হীন সত্তা পূর্ণ সত্তা হইতে পারে না। যে সকল স্তম্ভ দ্বারা পূর্ণ সত্তার পূর্ণত্ব, অস্তিত্ব তাহার মধ্যে অন্ততম। সুতরাং পূর্ণ সত্তাকে অস্তিত্বহীন কল্পনা করা বহির্বোধী। ডেকার্ট-এর মতে এই পূর্ণ সত্তাই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্ববান।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট যে আপত্তি উপস্থাপন করেন তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কান্ট বলেন, ভালোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে বাস্তবলোকে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করার সম্ভাব্য নহে। আমি ঈশ্বর নামক একটি পূর্ণ সত্তার ভাবনা করিতে পারি বটে এবং যখন সেই পূর্ণ সত্তার ভাবনা করি তখন তাহাকে অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়াই ভাবনা করি, কারণ অস্তিত্বকে পূর্ণত্বের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে বাস্তবক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। যখন আমি একটি জিন্তুকের ভাবনা করি তখন জিন্তুকের তিনটি কোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান

বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হই। কিন্তু এই ভাবনা হইতে ভাবনা-বহির্ভূত বাস্তব জগতে ত্রিভুজ নামক কোন সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, কারণ জ্যামিতি-পরিকল্পিত ত্রিভুজের অস্তিত্ব শুধু ভাবনার জগতেই, বাস্তব জগতে নহে। কার্ট-এর মতে ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, ভাবজগতের বহির্ভূত বাস্তব জগতে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব আছে। অবশ্য আমি যখন ঈশ্বরকে পূর্ণ সত্তারূপে ভাবি তখন তাঁহাকে অস্তিত্ব-সম্পন্নরূপেই ভাবিয়া থাকি; কিন্তু আমি যখন ঈশ্বরের কথা না ভাবি তখন আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে না। ভাবজগৎ হইতে বাস্তবলোকে অসম্ভব সত্য হইলে আমার জামার পকেটে এক শত মুদ্রা আছে এই ভাবনা হইতে বাস্তব এক শত মুদ্রা পকেটে প্রবেশ করিত। যেহেতু এক শত মুদ্রার ভাবনা হইতে বাস্তব এক শত মুদ্রা উপস্থিত হয় না, সেইজন্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভাবনা হইতে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।

কার্ট-এর পরবর্তী জার্মান দার্শনিক হেগেল ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিটিকে এত সহজে খণ্ডনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। হেগেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বস্তুজগৎ এবং ভাব-জগতের মধ্যে মূলতঃ কোন অজ্ঞানীয় পার্থক্য নাই, কারণ উভয় জগৎ মূলে একই বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি। সুতরাং যাহা ভাবজগতে অবশ্যস্বীকার্য তাহা বস্তুজগতেও অবশ্য অস্তিত্ববান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বের পরমসত্তা ঈশ্বর ভাবজগতে অবশ্যস্বীকার্য হওয়ায় বস্তুজগতে তাহার অস্তিত্বের অনুমান অসম্ভব নহে। হেগেলের যুক্তির যথার্থ্য ভাববাদী দার্শনিকেরা স্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদীরা স্বীকার করেন না। বস্তুবাদীরা ভাবজগৎ ও বস্তুজগতের মূলে কোন বিশ্বচেতনার স্বীকৃতি দ্বারা এই উভয় জগতের পার্থক্য অতিক্রম করিতে রাজী নহেন। সুতরাং ভাবতাত্ত্বিক যুক্তির যথার্থ্য সর্ববাদিসম্মত নহে। কিন্তু যুক্তিটির গুরুত্ব প্রত্যেক দার্শনিকই স্বীকার করেন। পূর্ণত্বের যে আদর্শকে আমাদের মন উপলব্ধি করে তাহা শুধু আমাদের মানসিক কল্পনা নহে, প্রকৃতই সেই আদর্শরূপ পূর্ণ সত্তা ঈশ্বর অস্তিত্ববান—আমাদের মনের অন্তত্বের এই দাবিটি ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিতে প্রকাশিত। পূর্ণত্বের আদর্শ আমাদের অপূর্ণ স্বভাব হইতে সঞ্জাত হইতে পারে না, এই আদর্শ একমাত্র পূর্ণরূপ ঈশ্বরই আমাদের মনে সঞ্জাত করিতে পারেন। আমরা অপূর্ণ-স্বভাব হইয়াও পূর্ণত্বের আদর্শ বা ধারণা সৃষ্টি করিতে পারি—এইরূপ যদি কেহ দাবি করে তবে উত্তরে বলিতে হয়, অপূর্ণ স্বভাব যদি পূর্ণত্বের আদর্শের স্রষ্টা হয় তবে অপূর্ণ কারণকে পূর্ণ কারণের স্রষ্টারূপে গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু ইহা অসম্ভব। সুতরাং ডেকার্ট মনে করেন যে, পূর্ণত্বের ধারণার অস্তিত্ব হইতেই সেই ধারণার স্রষ্টারূপে ঈশ্বর স্বীকার্য। যাহা হউক, সন্দেহাতীত প্রমাণরূপে বিচার করিতে গেলে ভাব-

তাত্ত্বিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই যুক্তিটি এই সত্যকে সমর্থন করে যে, আমাদের মনের অন্তত্বেরে বিভ্রম ঈশ্বরের ধারণাটি অর্থহীন নহে, ইহা যথার্থ।

কারণিক যুক্তি :—এই বিশ্বে যাহা কিছু ঘটে তাহারই একটি কারণ বর্তমান, এমন কিছু এই বিশ্বে ঘটতে পারে না যাহার কোন কারণ নাই। জগতের প্রতিটি ঘটনা কার্যকারণ-সূত্রে আবদ্ধ। ইহাই জগতের নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারেই আমাদের ভাবিতে হয়, এই জগতেরও একটি কারণ বিভ্রম এবং সেই কারণই ঈশ্বর। তাহা স্বীকার না করিলে জগতকে কারণহীন ভাবিতে হয়, কিন্তু কারণহীন কিছুই থাকিতে বা ঘটতে পারে না। কারণিক যুক্তিকে (causal argument) নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা হয় :—

প্রত্যেকটি ঘটনাই কারণ দ্বারা সৃষ্ট;

এই জগৎ একটি ঘটনা;

সুতরাং এই জগৎ একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট।

এই যুক্তির প্রধান প্রতিজ্ঞাটি স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেকটি ঘটনাই একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট ইহা স্বীকার না করিলে চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু ‘এই জগৎ একটি ঘটনা’ এই অপ্রধান প্রতিজ্ঞাটির যথার্থ্য স্বীকৃতি লইয়া তর্ক উঠে। ঘটনা বলিলে এমন একটি ব্যাপার বুঝায় যাহার আদি ও অন্ত বিভ্রম। কিন্তু জগৎকে আদি-ও-অন্তযুক্ত একটি ব্যাপার বলিতে কেহ কেহ রাজী নহেন। এই জগৎ একটি আদিহীন অন্তহীন ব্যাপারও হইতে পারে—কে জানে। জড়বাদীরা জড়কে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করায় জড়জগৎ তাহাদের নিকট অনাদি ও অনন্ত। কারণিক যুক্তিটির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি উঠে কারণ শব্দের অর্থ লইয়া। যুক্তিটির প্রধান প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তে কারণ শব্দটিকে দুই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রধান প্রতিজ্ঞাতে যখন বলা হইয়াছে প্রত্যেকটি ঘটনাই কারণ দ্বারা সৃষ্ট, কারণ শব্দটিকে তখন সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে—অর্থাৎ কারণ শব্দটি দ্বারা এমন একটি ব্যাপার বুঝান হইতেছে যাহা অপর একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু সিদ্ধান্তে কারণ শব্দটি মূল কারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যে কারণ অপর কোন কারণ দ্বারা সৃষ্ট নহে। সুতরাং কারণিক যুক্তিটি দ্ব্যর্থকতাভায়ে দুষ্ট। আরও একটি আপত্তি উঠে। সেটি এই যে, এই জগতের একটি মূল কারণ আছে স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। জগতের একটি মূল কারণ আছে সত্য, কিন্তু সেই কারণ জড় ভিন্ন অজড় কিছু তাহা অনুমান করিবার কি হেতু থাকিতে পারে। জড়বাদীরা জগতের মূল কারণকে ঈশ্বররূপে স্বীকার না করিয়া জড়রূপে চিন্তা করেন। সুতরাং কারণিক যুক্তিদ্বারা জগতের মূল কারণ যে ঈশ্বর তাহা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই যুক্তিটির কোন গুরুত্ব নাই একথা বলা যায় না। ইংরেজ দার্শনিক জন লক, জার্মান দার্শনিক

ইম্যামুয়েল কার্ট প্রমুখ মনীষীরা এই যুক্তিটির প্রশংসা করিয়াছেন। কার্ট বলেন, এই যুক্তিটি সাধারণ-বুদ্ধি ও স্বল্প-বুদ্ধি এই উভয় স্তরের লোকের নিকট সমভাবে শক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত। জন লক বলেন, জগতের মূল কারণরূপে এমন একটা কিছুকে স্বীকার করিতেই হইবে যাহা অনাদিকাল হইতেই বর্তমান। কিন্তু অনাদি কাল হইতে বর্তমান একটা কিছুকে স্বীকার করিলেও সেই বস্তুই যে ঈশ্বর তাহার কি প্রমাণ আছে? সেই বস্তুকে জড়রূপে না ভাবিয়া ঈশ্বররূপে গ্রহণ করা নিছক কল্পনাও হইতে পারে।

সম্প্রতি ডঃ র্যাশড্যাল নামক জৈনিক দার্শনিক কারণিক যুক্তিটিকে ভাববাদের সঙ্গে সমন্বিত করিয়া ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, এই জগৎ মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই বিজ্ঞমান এবং যেহেতু ভাববাদ প্রমাণ করিয়াছে যে, কোন কিছুকে বিজ্ঞমান থাকিতে হইলে চেতনার বিষয়রূপে বিজ্ঞমান থাকিতে হইবে, সেই হেতু আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের চেতনার অতিরিক্ত একটি বিরাট চেতনা বিজ্ঞমান যাহার বিষয়রূপে এই জগৎ মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই অস্তিত্বসম্পন্ন ছিল। সেই বিরাট চেতনাই ঈশ্বর। স্ততরাং নিত্য অনাদি চেতনারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলে মানুষের চেতনার বহির্ভূত জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ডঃ র্যাশড্যাল-এর যুক্তির যথার্থ্য ভাববাদীরা স্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদীরা এই যুক্তিকে মধ্যমাণি দিতে রাজী নহেন। কারণ তাঁহারা একথা স্বীকার করেন না যে, কোন কিছুকে বিজ্ঞমান থাকিতে হইলে চেতনার বিষয়রূপেই বিজ্ঞমান থাকিতে হইবে। স্ততরাং এই যুক্তিটির যথার্থ্যও সর্ববাদিসম্মত নহে।

কারণিক যুক্তিটির আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দ্বিধ প্রমাণরূপে বিচার করিতে গেলে যুক্তিটি ব্যর্থ, কারণ ইহা দ্বারা শুধু একটি অনাদি কারণেরই সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কারণটিই ঈশ্বর কিনা এই প্রশ্নের কোন সমাধান ইহাতে নাই। তথাপি কারণিক যুক্তিটিকে একেবারে অর্থহীন বলা চলে না। উক্ত যুক্তির দ্বারা এই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, জগতের কার্যকারণ-শৃঙ্খলের পশ্চাতে একটি নিত্য বিরাট সত্তা বিজ্ঞমান যাহাকে জাগতিক ঘটনার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য মূল কারণ জড় কি চেতনাময় সত্তা তাহা কারণিক যুক্তি দ্বারা নিঃসন্দ্বিধ ভাবে প্রমাণিত হয় না।

উদ্দেশ্যার্থক যুক্তি :—জাগতিক বস্তুগুলির গঠননৈপুণ্য হইতে উদ্দেশ্যবান ঈশ্বরের অসুমান্য উদ্দেশ্যার্থক যুক্তি (Telcollogical argument) নামে প্রসিদ্ধি। জাগতিক বস্তুগুলির গঠন-কৌশল লক্ষ্য করিলে মনে হয় এইগুলি কোন বিশ্বশিল্পীর শিল্প। আকস্মিক জড়কারণ হইতে এই নিপুণতার প্রকাশ কল্পনা

করা যায় না। কি উদ্ভিদ, কি জন্তু—প্রত্যেকেই আপন আপন প্রয়োজনমত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্বিত। প্রকৃতির বক্ষে যাহাতে নিরাপদে আনন্দের সঙ্গে জীবনধারণ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহ গঠন করা হইয়াছে। ভূচররা যাহাতে বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের ফুসফুস গঠিত হইয়াছে। জলচর জীবদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জড় তাহাদের উপযোগী ভিন্নজাতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্তমান। পশুপক্ষীদের বর্ণ-বিভিন্নতার পশ্চাতেও উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যে সকল পশুপক্ষী শত্রুর হাতে বিপন্ন বোধ করে, শত্রুর কবল হইতে পরিভ্রমণের উপযোগী করিয়া তাহাদের বর্ণবস্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে। পক্ষীর অস্থি-গুলি লঘু নতুবা তাহারা আকাশে উড়িতে পারিত না; দুর্বল পশুগুলি অত্যন্ত সতর্ক ও স্মিগ্র, তাহা না হইলে ইহার শত্রুর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে একজন বিশ্ব-শিল্পী যেন প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠন করিয়া দিয়াছেন। এই বিরাট বিধে প্রচ্ছন্নরূপে মহান শিল্পী যেন তাঁহার অনন্ত বুদ্ধির সহায়তায় বস্তুজগৎ ও প্রাণিজগৎকে নিপুণতার সহিত গঠন করিতেছেন। স্ততরাং জাগতিক বস্তুগুলির গঠননৈপুণ্য হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হয়। ইহাই উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির মর্মার্থ। এই যুক্তিটির যথার্থ্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অনেকেরই সমর্থন করিয়াছেন। এনেক্লেগোরাস প্রাণি-অঙ্গের গঠনবিজ্ঞান দেখিয়া ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির প্রশংসা গাহিয়াছেন। পিথাগোরাস বস্তুনিচয়ের সূক্ষ্মজ্ঞান সূক্ষ্মাল গঠন-বিজ্ঞান দেখিয়া ঈশ্বরকে বিরাট গণিতবিদ আখ্যা দিয়াছেন। প্লেটো *Timaeus* গ্রন্থে উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এরিস্টটল জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে বিশ্বপরিচালনার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিটি ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণরূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইম্যামুয়েল কার্ট এই যুক্তিটিকে 'the clearest, the oldest and best suited to human reason' বলিয়া প্রশংসা করেন। দার্শনিকপ্রবর পেলে (Paley) এই যুক্তিটিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দ্বিধ প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় উৎসাহী বর্ণবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাণি-অঙ্গের বিভিন্ন উপযোগিতা কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির প্রশংসা আরম্ভ করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের ক্রমবিস্তারবাদ প্রচারিত হইয়া বর্ণবিজ্ঞানীদের উৎসাহ অনেকাংশে নিব্বাপিত করিয়া দেয়। ভারতবর্ষে প্রমাণ করেন যে, একমাত্র আকস্মিক পরিবর্তন (chance variations) হইতেই প্রাণিজগতে দেহগঠনের বিভিন্নতা সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাণিদেহে স্বভাব হইতেই কতকগুলি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলি যদি জীবন-সংগ্রামে প্রাণীর

অস্তিত্ব রক্ষার অল্পকূল হয় তবেই সেই প্রাণী বাচিয়া থাকে। কিন্তু যদি এই পরিবর্তনগুলি আশ্চর্য্যকার প্রতিকূল হয় তবে সেই প্রাণী প্রকৃতির বন্ধ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পূর্ব-পুরুষের পরিবর্তনগুলি পরবর্তী পুরুষে আসিয়া থাকে। পরবর্তী পুরুষে আবার নতুন নতুন আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সঞ্চিত হইয়া নতুন-জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রাণিদেহের পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণই আকস্মিক। ইহার পশ্চাতে কোন ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুমান করার হেতু নাই। প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযোগিতা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না, কারণ প্রাণিদেহে শুধু উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয় না, অনেক অঙ্গপ্রযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সৃষ্ট হয়। কিন্তু একমাত্র উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সমুদ্র প্রাণীই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়, অঙ্গপ্রযোগী অঙ্গ-সম্পন্ন প্রাণী সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রকৃতির বন্ধ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য ডারউইন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিধানী ছিলেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু প্রাণিদেহের গঠন-উপযোগিতা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ইহাই তাঁহার মত। শুধু আকস্মিক পরিবর্তন দ্বারা প্রাণীদের গঠনবৈচিত্র্যকে উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না তাহা ডারউইন স্বীকার করিতেন। কিন্তু অল্প কোন কারণ নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আকস্মিকতাকেই আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ইহাই তাঁহার অভিমত। ডারউইন নাস্তিক ছিলেন না। “I deserve to be called a theist”, ‘আমি একজন আন্তিক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য’—এক সময় তিনি এই উক্তি করেন। কিন্তু প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপ-যোগিতা হইতে ঈশ্বরের অনুমান তথ্যসমর্থিত নহে বলিয়া ইনি উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির সাধার্ম্যে আস্থাবান নহেন।

সম্প্রতি নরমান কেম্প মিথ নামক একজন ইংরেজ দার্শনিক উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা প্রশিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, এই যুক্তিতে প্রাকৃত বস্তু ও কৃত্রিম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। কোন একটি কৃত্রিম বস্তুর গঠননৈপুণ্য হইতে জানবুদ্ধিসম্পন্ন কোন নিষ্ঠুরাতাকে অনুমান করা যায়, কিন্তু প্রাকৃত বস্তুর গঠন-কৌশল হইতে এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত কি-না তাহা প্রশ্নের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, উদ্দেশ্যার্থক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে রচয়িতা শিল্পী রূপে চিত্রা করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে শিল্পীরূপে ভাবিলে তাঁহাকে মনুষ্য-সুলভ-গুণ দ্বারা ভূষিত করিয়া বিরাট মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ পরম পুরুষকে এরূপ কল্পনা করা কি স্ববিবোধী নহে? উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি দার্শনিক মহলে আলোচিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে শুধু যে উদ্দেশ্যতোতক নিপুণতাই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, নৈপুণ্যের পাশাপাশি

অনৈপুণ্যও দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি একদিকে যেদূর অসুন্দর, অপর-দিকে সেদূর সুসজ্জিত। প্রাণিজগতের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যে জীবনরক্ষার উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা নহে, অঙ্গপ্রযোগী, অপ্রয়োজনীয়, আশ্চর্য্যকার পরিপন্থী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া অনেক প্রাণী প্রকৃতির রাজ্য হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক অতিকায় জীবজন্তু প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আশ্চর্য্যকার অসমর্থ হইয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিটি একদর্শিতাদোষে দুষ্ট।

সম্প্রতি বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও মনোবিদ বার্ট্রাণ্ড রাসেল উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিটিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উত্থাপিত করিয়া-ছেন। বিশ্বপ্রকৃতিকে যদি আমরা ইচ্ছাহীন, উদ্দেশ্যহীন জড় বলিয়া গ্রহণ করি তবে প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ-জ্ঞান সঙ্গাত হইতে পারে না এবং যথার্থ-জ্ঞান সঙ্গাত না হইলে প্রকৃতিকে ইচ্ছাহীন উদ্দেশ্যহীন জড় বলিয়াও কোন সাংকল্পিত থাকে না। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ বা সত্য জ্ঞান সঙ্গাত হয় স্বীকার করিলে প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্য স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথার্থ ইহা আমরা তখনই স্বীকার করিতে পারি যখন আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃতি বেহ্মাশ্ব আমাদের জ্ঞানের ভিতর দিয়া যথাযথভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকৃতি যদি আমাদের জ্ঞানের ভিতর দিয়া যথাযথভাবে আত্ম-প্রকাশ না করে, অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে যদি প্রকৃতির ঐক্য বা সামঞ্জস্য না থাকে তবে প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যহীন জড়স্বরূপ বলিবারও কোন অর্থ থাকে না, এই বর্ণনাও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যহীন কল্পনা করিবার পূর্বে যথার্থজ্ঞান বা সত্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্যপূর্ণ আত্ম-প্রকাশ স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সত্য এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্যপূর্ণতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, সত্যের সঙ্গে যদি প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে তবে শিব ও সূন্দরের সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য বা ঐক্য থাকিবে না কেন? সত্যকে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ বলিলে শিব-সূন্দরকেও প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ বলিতে হইবে। সত্যশিবসূন্দরকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যে প্রকৃতি দ্বারা সম্ভব হইতেছে তাহাকে উদ্দেশ্যহীন জড়-সত্তা বর্ণনা করা অর্থহীন। সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ চেতন-সত্তারূপে ভাবিতে হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য সত্যশিবসূন্দরের বাস্তব রূপায়ণে পরিপূর্ণ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল উদ্দেশ্যার্থক যুক্তির সাধার্ম্য এই ভাবেই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্দেশ্যকে স্থির নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যরূপে কল্পনা করা চলে না। ফরাসী দার্শনিক বার্মঁস মনে করেন যে, স্থির ও নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের মাপকাঠি দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যকে কল্পনা করিলে প্রাণীদের প্রত্যক্ষ অসম্মত স্বাধীন ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যকে ক্রম-

স্বজ্ঞান ক্রমবিকাশমান উদ্দেশ্যরূপে ভাবিতে হইবে। প্রকৃতি-ক্রমবিকাশের মধ্যে ধীরে ধীরে সেই উদ্দেশ্য সহজে জাগ্রত হইতেছে, ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইতেছে।

নৈতিক যুক্তি :—ভাবতাত্ত্বিক যুক্তি, কারণিক যুক্তি ও উদ্দেশ্যার্থক যুক্তি এই তিনটি যুক্তিকে ধ্বন করিয়া নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে ইম্যানুয়েল কার্ট যে যুক্তি উপস্থাপিত করেন তাহা নৈতিক যুক্তি নামে অভিহিত। ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিতে ভাবজগৎ হইতে বস্তুজগতে অহুমান, কারণিক যুক্তিতে পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত জগতের কার্য-কারণের শৃঙ্খল হইতে অপ্রাকৃত মূল কারণের অহুমান এবং উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিতে কতকগুলি কৃত্রিম বস্তুকে উদ্দেশ্যভেদে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বিধে উদ্দেশ্যপূর্ণ ঈশ্বরের অহুমান ভায়সম্মত বলিয়া কার্ট স্বীকার করেন না। এই যুক্তিগুলির ব্যর্থতার কারণ এই যে, শুধু বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কার্ট মনে করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ একমাত্র নৈতিক চেতনার ভিত্তিতেই সম্ভব। আমাদের নৈতিক চেতনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবি করে, ঈশ্বর অস্তিত্বহীন হইলে নৈতিক চেতনা যথার্থ হয় না :

"Admitting that the pure moral law inexorably binds everyman as command, the righteous man may say: "I will that there be a God. I firmly abide by this and will not let this faith be taken away from me." (Kant's *Metaphysics of Morals*.)

আমাদের নৈতিক চেতনা নৈতিক আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবী করে। নৈতিক আদর্শের প্রতি নিকিরোধ অকুণ্ঠ আনুগত্য হইতেই পূর্ণতরঙ্গী আদর্শ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। পূর্বত্বের আদর্শের দিকে অগ্রগতি হইতে পুণ্য এবং সেই আদর্শ হইতে অপসরণের ফলে পাপ সঞ্চারিত হয়। পুণ্যবান যদিও স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পুণ্যকার্যে প্রবৃত্ত হয় না তবু পূর্বত্বের আদর্শকে বিশ্লেষণ করিলে পুণ্য ও অর্থ এই দুইটিকে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পাওয়া যায়। যদিও পূর্ণতরঙ্গ পূর্ণ আদর্শে পুণ্য ও অর্থ এতদুভয়েই সমন্বিত তবু ইহজগতে পুণ্যবানকে সর্বদা অর্থভোগী এবং পাপাচারীকে সর্বদা দুঃখভোগী হইতে দেখা যায় না। প্রকৃতির রাজ্য যদি নীতির রাজ্যের অঙ্গ হয় তবেই পুণ্যবান সুখী এবং পাপাচারী দুঃখী হইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি রাজ্য পরস্পরনিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র বলিয়া ইহজগতে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের নৈতিক চেতনার দাবি অহুসারে প্রকৃতিতে নীতির অঙ্গ হইতে হইবে, পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা যথাক্রমে নিজ নিজ কর্মফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখের অধিকারী হইবে। কিন্তু পরস্পরনিরপেক্ষ প্রকৃতি-রাজ্য ও নীতির রাজ্য একে অপরের অঙ্গ হইতে হইলে এতদুভয়ের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে অহুমান করিতে হয় বাহার ইচ্ছাস্বরূপী প্রকৃতি নীতির অঙ্গ হইয়া পুণ্যাত্মাকে পরলোকে সুখী ও পাপাত্মাকে দুঃখী

করিবে। সুতরাং আমাদের নৈতিক চেতনার দাবি অহুসারে পুণ্যবানকে সুখী ও পাপাচারীকে দুঃখী হইতে হইলে অর্থ-দুঃখের বণ্টনকারী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অহুমান অপরিহার্য। ঈশ্বর অস্তিত্বহীন হইলে নৈতিক চেতনার দাবির সার্থকতা থাকে না, নৈতিক আদর্শ অর্থহীন হইয়া পড়ে। কার্ট মনে করেন, নৈতিক চেতনা প্রাকৃত জগতের চেতনার দ্বারাই যথার্থ ও বাস্তব, নৈতিক চেতনাকে মায়াময়ীচিকা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং নৈতিক আদর্শের সার্থকতার জন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

জেমস্ মার্টিনো নৈতিক যুক্তিটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে প্রকাশ করেন। প্রত্যেক চেতনাতে আমরা যেরূপ একটি স্বতন্ত্র বাহ্যসত্তার সম্মুখীন হইয়া সেই সত্তাকে অনুভব করি, সেইরূপ নৈতিক চেতনাতেও আমরা একটি মহত্তম সত্তার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নির্দেশ অনুভব করি। সেই মহত্তম সত্তাই ঈশ্বর। নৈতিক চেতনাতে আমরা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাই এবং কর্তব্যাহুসরণের ভিতর দিয়া তাঁহার নির্দেশ পালন করি। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, নৈতিক চেতনাতে আমরা যে মহত্তম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করি সেই সত্তা সমাজ কি ঈশ্বর তাহা কে বলিতে পারে? ডার্কহিম মনে করেন সমাজই সেই মহত্তম সত্তা যাহাকে আমরা নৈতিক চেতনাতে প্রত্যক্ষ অনুভব করি।

সম্প্রতি ডঃ রায়শ্যামল নৈতিক যুক্তিটিকে নূতন রূপ দিয়াছেন। নৈতিক চেতনাতে আমরা যে কর্তব্যনির্দেশের সন্ধান পাই সেই নির্দেশগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক ব্যাপার নহে, নির্দেশগুলি সার্বজনীন ও বস্তুনিষ্ঠ। আমরা যদি বিশ্বাস করি প্রাণীহত্যা হইতে প্রাণীরক্ষাই শ্রেয়ঃ, কৃতঘ্নতা হইতে কৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা হইতে নিঃস্বার্থতাই শ্রেয়ঃ, যদি প্রত্যেকে না হউক, অধিকাংশ লোক দ্বিতীয় কার্যটিকে প্রথমটি হইতে শ্রেয়ঃ মনে করে, তবেই আমাদের বৃত্তিতে হইবে নৈতিক নির্দেশগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক ব্যাপার নহে, নৈতিক নির্দেশ বস্তুনিষ্ঠ, নৈতিক চেতনার বাস্তব ভিত্তি বর্জ-মান। নৈতিক নির্দেশগুলিকে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপে গ্রহণ করিলে কোন এক বিশ্বচেতনার স্বীকৃতি অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে চেতনার ভিত্তিতে নির্দেশগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হইতে পারে। অর্থাৎ, নৈতিক আদর্শের সার্বজনীনতা ও বস্তুনিষ্ঠতা স্বীকার করিলে সেই আদর্শের ভিত্তিরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার প্রয়োজন।

অনেক দোষজটিল সত্ত্বেও নৈতিক যুক্তি আদর্শ জগতের গুরুত্বকে যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া লইবার দাবি আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করে। নিরপেক্ষ নিকিরকার জড়জগতের বিষয় ও ব্যাপারাদি দ্বারা আদর্শ জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না—আদর্শ জগতের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দিতে, আদর্শ জগৎকে

যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহা নৈতিক চেতনার দাবি। কিন্তু নৈতিক দাবিকে বিখ-
প্রকৃতি মানিয়া লইবে, এবং নৈতিক দাবির অমুযায়ী ঈশ্বর
প্রকৃতিই যে অস্তিত্ববান তাহার কি প্রমাণ আছে। সুতরাং
নৈতিক যুক্তিকেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণরূপে
গ্রহণ করা চলে না। অবশ্য কাণ্টের ভাষ্য আদর্শনিষ্ঠ নীতি-
সর্ব্বশক্তি ব্যক্তির নিকট নৈতিক যুক্তিই ঈশ্বরাস্তিত্বের যথাযথ
প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহ্যিক আদর্শ-
জন্যে বস্তুজগতের ভাষ্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না তাহারা
নৈতিক যুক্তিকে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।
নৈতিক আদর্শ ভাবজগতের ব্যাপার। ভাবজগৎ হইতে বস্তু-
জগতে অমুমান ভাষ্যসম্বন্ধ নহে বলিয়া কাণ্ট ভাবতাত্ত্বিক যুক্তিকে
ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নৈতিক যুক্তিতে কাণ্ট
নিজেই ভাবজগতের দাবি অমুসারে বস্তুজগতে ঈশ্বরের
অস্তিত্বের প্রমাণে ভৎসন হইয়াছেন।

ঈশ্বরাস্তিত্বের উপরি-উক্ত চারিটি যুক্তির আলোচনা হইতে
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তন্মধ্যে কোন একটি যুক্তিও নিঃসন্দেহ
ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ নহে। বাহ্যিক
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিখ্যাতী তাহারা উল্লিখিত যুক্তিগুলি হইতে
নিজ নিজ বিধানের প্রচুর সমর্থন পাইবেন। কিন্তু বাহ্যিক
নৈতিক, ঈশ্বরাস্তিত্বের তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে যুক্তিগুলি
ব্যর্থ। চারিটি যুক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নহে। ভাব-
তাত্ত্বিক যুক্তিতে পূর্ণত্বের ধারণা হইতে পূর্ণত্বরূপে যে ঈশ্বরের
অমুমান করা হইয়াছে, কারণিক যুক্তিতে তাহাকেই জগতের
মূল কারণরূপে, উদ্দেশ্যার্থক যুক্তিতে তাহাকেই উদ্দেশ্যপূর্ণ
চেতন সত্তারূপে এবং নৈতিক যুক্তিতে নৈতিক রাজ্যের বিধাতা
পাপপুণ্যের বিচারকরূপে চিত্রা করা হইয়াছে। যদিও অজ্ঞান
ও সন্দেহাতীত প্রমাণরূপে বিচার করিতে গেলে যুক্তিগুলির
যথাযথ প্রস্তাব বিষয়, তবু যুক্তিগুলি এক সঙ্গে ঈশ্বররূপী একটি
পরমসত্তার অস্তিত্বের আভাস দেয়।

শিক্ষার বিবর্তন

অধ্যাপক জীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবময় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ
পর্যন্ত আমাদের জাতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি বিচিত্র-
ভাবে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। হয়ত তাহাই অল্পসংখ্য
করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের বাস্তব
নাট্য অভিনীত হইয়া আসিতেছে। আজিকার যুগ-
সঙ্কীর্ণণেও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তনের
মধ্য দিয়া চলিতেছি। রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তর হইতে দেখিলে
অভিনয়ের জীবন্ত রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও
বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সময়ের অল্পভূতি হ্রাস
করিয়া দেয়। সেইরূপ আজিকার শিক্ষা-বিপর্যয় আমাদের
মনে হয়ত তত স্পষ্ট করিয়া রেখাপাত করে না। কিন্তু
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা একটি প্রভূত ইঙ্গিতপূর্ণ অধ্যায়
বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পরিবর্তন মাঝেই দৃশ্যমান নহে; বস্তুতঃ পরিবর্তনই
উন্নতির সোপান। নব নব পরিস্থিতিতে নতুন নতুন
প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। তাহা পূর্ণ করিবার
উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রকৃতির পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।
কিন্তু শিক্ষার প্রকৃতি ও প্রেরণা স্থপথে চালিত করিলে
যেমন জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়, সেইরূপ বিপথে
চালিত হইলে তাহাই জাতির অবনতির কারণ হইয়া
উঠে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্রে, শিক্ষাব্রতিগণকে

অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রশক্তিই অনেক সময় প্রবল হইয়া উঠে;
নির্বিবাক্যভাবে শিক্ষার কথা না ভাবিয়া, রাজনৈতিক
উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কখনও কখনও শিক্ষার
স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতির মোড় ফিরাইয়া দেওয়া হয়।
ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, তাহা মঙ্গল-
জনক হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে এমন স্ববর্ণযুগ আসে
যখন রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষা-
ব্রতিগণের নিকট উপস্থিত হয় এবং জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের
প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকে। তখনই-জাতির উন্নতির
শীর্ষে আরোহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

আমাদের দেশে একবার এইরূপ এক স্ববর্ণযুগ উপস্থিত
হইয়াছিল। হিন্দু রাজত্বে শিক্ষা ও শিক্ষককে যে সমাদরের
সহিত পোষণ করা হইত তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায়
নানা ভাবে ব্যক্ত আছে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারাও তাহা
প্রতীয়মান হয়। হিন্দু জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদের অনেক
তথ্য এরূপ যে দীর্ঘকালের—হয়ত বংশপরম্পরার—
অমুসন্ধান ও নিরীক্ষা (observation) ব্যতীত তাহা
স্থিরীকৃত হওয়া সম্ভব নহে। দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে
রাজশক্তির পোষকতা ভিন্ন এরূপ তথ্য উদ্ভাটিত হইতে
পারিত না। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ দ্বারা সমগ্র
দেশ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষার কোন্
ক্রটির জগৎ হিন্দু-প্রতিভা বহিরাক্রমণের নিকট অবনত

হইতে বাধ্য হইল সে ইতিহাস অভিনিবেশের সহিত আলোচনা করা কর্তব্য। কালক্রমে শিক্ষার ভারকে কে কি অসমতা প্রাপ্তি হইয়াছিল? শিক্ষা কি বাস্তব জীবন-হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল? শিক্ষা কি উপর হইতে নিঃসৃত হইয়া সমাজদেহে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিত না?

মুসলমান রাজত্বের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির পোষকতা-বজ্জিত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত ও দুর্বল হইয়া পড়িল। আয়ুর্কৌদ ও জ্যোতিষের মত নিরীক্ষামূলক বিষয়গুলির অগ্রগতি পূর্বেই ব্যাহত হইল। পরাধীন জাতির রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির চর্চাও অগ্রসর হইতে পারে না। স্বতরাং কেবলমাত্র স্থিতি কাব্য, ছায়, দর্শন ইত্যাদির চর্চা চলিতে লাগিল। সৌভাগ্য-বশত তখনকার দিনে শাসনশ্রম দেশের রক্তে রক্তে প্রবেশ করে নাই। মুসলমান রাজপুরুষগণ রাজস্বগ্রহণ ব্যতীত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। তাই হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে আপন ধর্মসম্মত জীবনযাপন করিবার বিশেষ কোন বাধা হইত না। সমাজপতিগণ কঠোর অনুশাসন দ্বারা সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় করিলেন; হিন্দু-সংস্কারগুলি যাহাতে শিথিল না হয় তৎপ্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে কেবলমাত্র জ্ঞানার্বেষণের প্রয়াসরূপে গ্রহণ না করিয়া জীবনব্রতের অঙ্গ ও ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করার সংস্কার পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। স্বতরাং সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান প্রেরণা হইল ধর্মসম্মত জীবন যাপন করিয়া, হিন্দু আদর্শ পরিপোষণপূর্বক হিন্দু সমাজকে ধর্মপথে পরিচালিত করা। এই পরিস্থিতিতে ধ্বংসোন্মুখ সংস্কৃত শিক্ষা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগের অন্ধাবারিসিঞ্জে অন্ধজীবিত অবস্থায় রক্ষিত হইল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, হিন্দুদিগের রক্ষণ-শীলতা নব্য শিক্ষিত সমাজের নিকট বিক্রপের বিষয় ছিল। আজ আমাদের রক্ষণশীলতা প্রায় অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু রক্ষণশীলতা ব্যতীত হিন্দু সংস্কৃতির ভগ্নাংশও মুসলমান রাজত্বের অবদান পর্যাস্ত জীবিত থাকিত কি না সন্দেহের বিষয়।

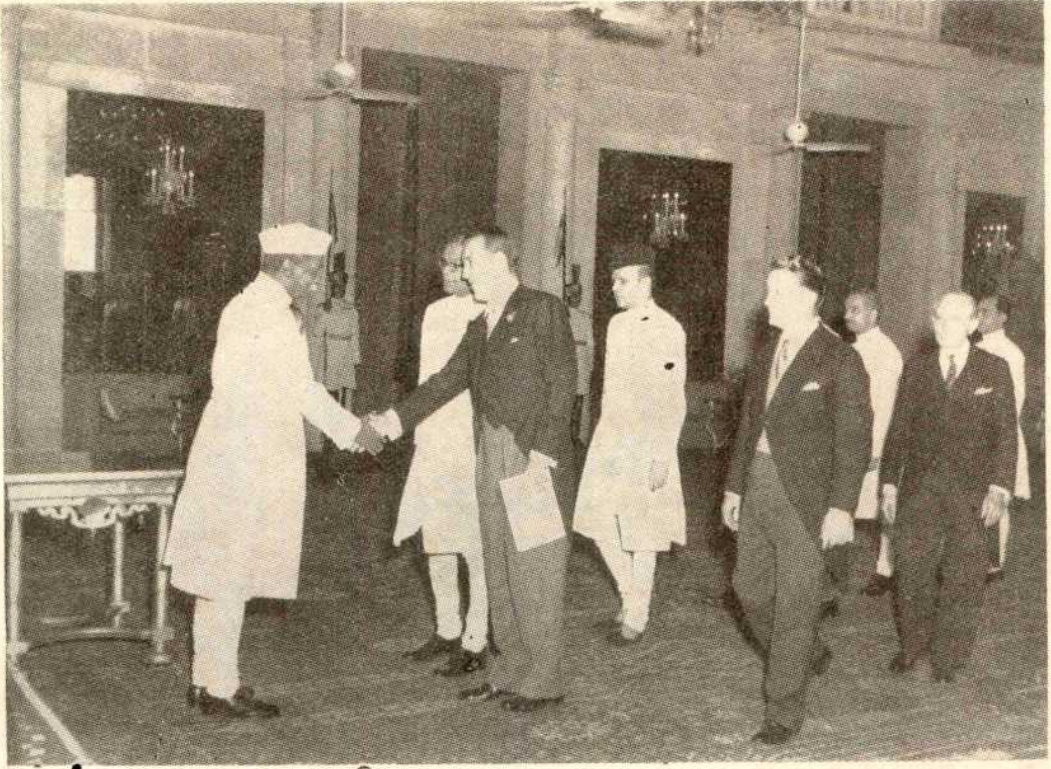
মুসলমান রাজত্বের শেষ অঙ্কে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এক অন্ধকার যুগ সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সংস্কৃত শিক্ষা ত জীবন্ত অবস্থাতেই ছিল; মুসলমান রাজশক্তি যে আরবী, ফারসী মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল তাহাও মনে করিবার কারণ নাই। রাজকাধ্য ফারসী ভাষায় পরিচালিত হইত এবং এইজন্য ফারসী ভাষার চর্চা কথঞ্চিৎ ছিল। কিন্তু বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের

চর্চা—বাহা তৎকালীন ইউরোপকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা বাংলাদেশে একেবারেই ছিল না।

অতঃপর ইংরেজ-রাজত্ব অনুসরণ করিয়া, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইল। ভারতীয়দের শিক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমে হইবে কি সংস্কৃত অথবা আরবী, ফারসীর মাধ্যমে হইবে তাহা লইয়া যে বিতর্ক চলিতেছিল, মেকলের সুপরিচিত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার অবসান হইল; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ইংরেজীর মারফতে পরিচালনা করা স্থির হইল। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানসম্পদ মেকলের নিকট অজ্ঞাত ছিল; সুতরাং তিনি ইহার প্রতি যথোচিত স্তুবিচার করেন নাই। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর নিষ্ক্রিয়তার পর সংস্কৃত ভাষার পক্ষে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনরূপে কার্য্যকরী হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। 'প্রাচ্য ভাষায় সকল গ্রন্থ অপেক্ষা নির্বীচিত কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে'—মেকলের এই উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত ছিল। ইতিপূর্বেই অনেকে ব্যক্তি-গতভাবে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং এই ভাষার ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ইংরেজী-শিক্ষিত-সমাজই মেকলের প্রধান সমর্থক ছিল। অন্যথায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন কখনই সহজসাধ্য হইত না। রাজা রামমোহন রায় লর্ড আম্হাষ্টের নিকট কেবলমাত্র প্রাচ্য শিক্ষার পোষকতা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এরূপ শিক্ষা দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিবে'।*

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পশ্চাতে মেকলের একটি আশা ব্যক্ত হইয়াছিল যে, সমস্ত ভারতবর্ষ ইহার ফলে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে। সে আশা নিফল হইয়াছে। যাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে মেকলের সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে নব্যযুগ সৃষ্টি হইল। আমরা নূতন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইউরোপীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়া গেল। শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের প্রাবন আরম্ভ হইল। বাংলা ভাষাও ইংরেজী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি বিবিধ ভাব-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। একটি প্রতিক্রিয়া হইল এই যে, হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি-সমাদর হ্রাস পাইতে লাগিল। নব্য ছাত্রসমাজ হিন্দু রীতি-নীতির উপর বিক্রপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বিদেশীর আচার-ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়া উঠিল। এই

* 'Calculated to keep the country in darkness'—*Selections from Educational Records, Part I* by H. Sharp, Calcutta, 1920—page 101.

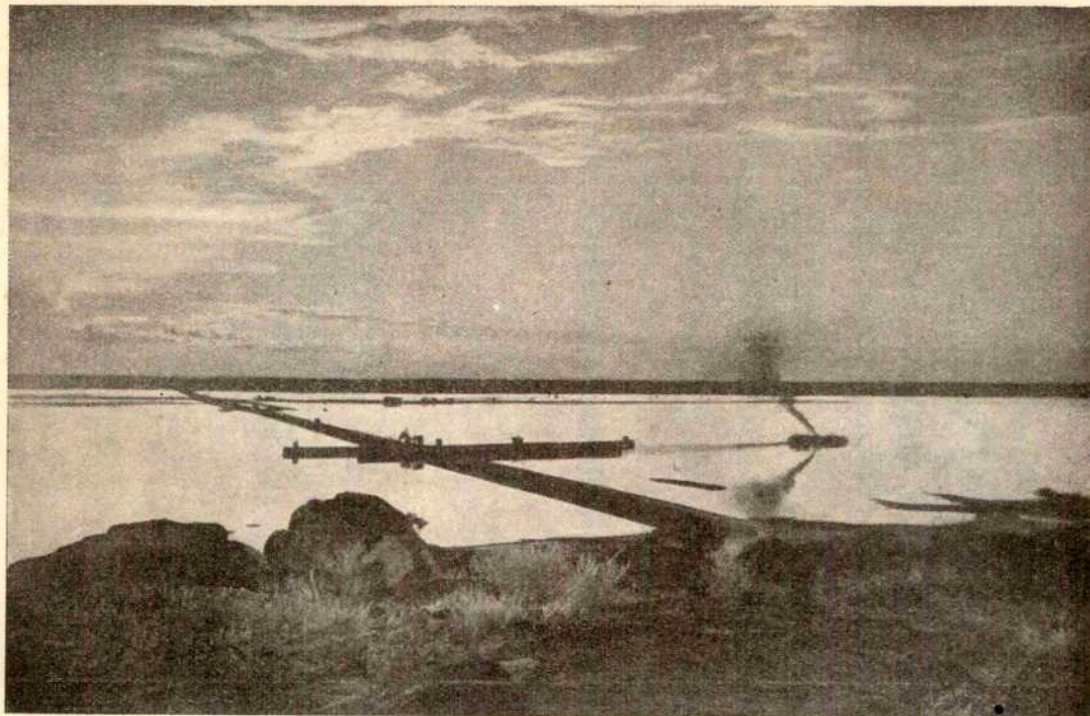


রাষ্ট্রপতি-ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতস্থ রাষ্ট্রদূতের সহিত করমর্দনরত ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

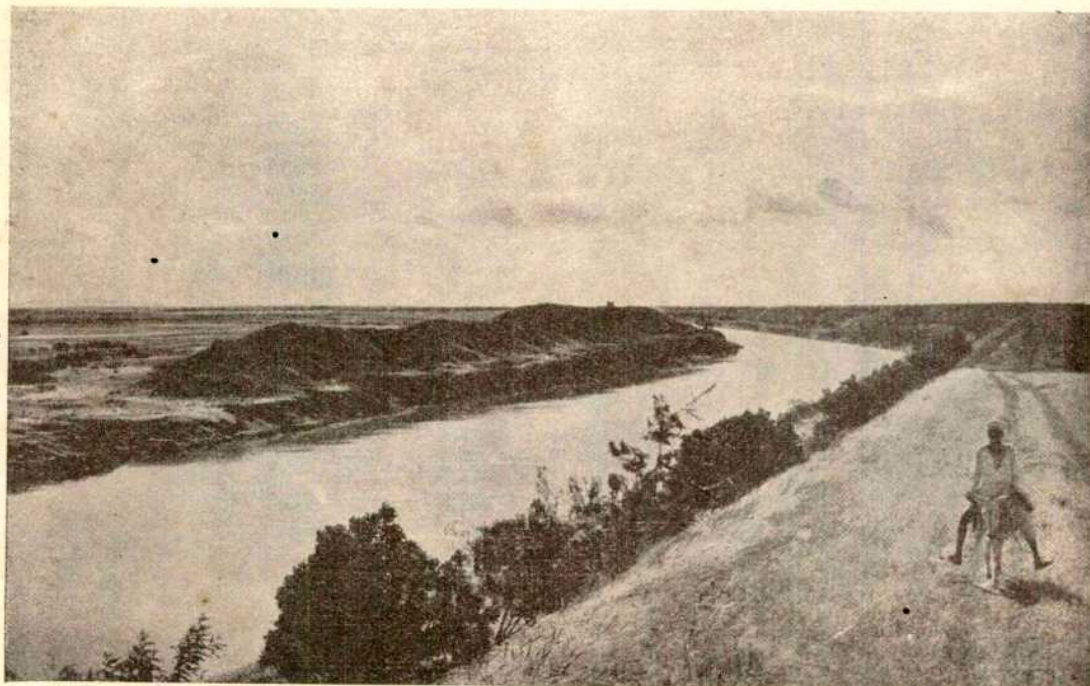


ভারতের প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা 'সিলি কারটলাইকার ফ্যাক্টরির' একটি দৃশ্য

স্থান



গেজিয়ার 'হোয়াইট মাইল' নদীর উপর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত গেবেল আউলিয়া বাঁধ



সেচ-পরিবহন অঙ্গসারে কাটামো গেজিয়ার প্রধান বাঁধ

উচ্চ অলতা অবশ্যই লঘুচিত্ততা ও অনুরদর্শিতার পরিচায়ক। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার মধ্যেও তাহাদের সাধনার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তখনকার ছাত্রগণ আক্ষরিকভাবেই কায়-মনোবাক্যে ইংরেজী শিক্ষার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আজিকার ছাত্রসমাজে শিক্ষার প্রতি যেরূপ নিষ্ক্রিয়তা ও নিরুদ্যমের লক্ষণ দেখিতে পাই, তাহার তুলনায় তখনকার ছাত্রদিগের এই পরাহুকরণমূলক মনোভাব নিন্দনীয় হইলেও এক দিক দিয়া প্রশংসারও যোগ্য। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কার। নব্য-ছাত্রসমাজ সাধারণ ভাবে হিন্দুসংস্কারের প্রতি যতই অবজ্ঞাপ্রদায় হউক না কেন, এই সংস্কারটির প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। ইংরেজী রাজভাষা; সুতরাং অবশ্যই অর্থকরী ছিল। কিন্তু শুধু অর্থোপার্জনের উপায় বলিয়াই নহে, আদর্শবাদ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াও ছাত্রগণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিত।

আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে এই যুগ যতটা অল্পকরণের যুগ, জ্ঞান-সংগ্রহের যুগ, ততটা জ্ঞান-সৃষ্টির নহে। এই সময়ে ইউরোপে নব নব উদ্ভাবনের যে ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহার তুলনায় আমাদের নিষ্ক্রিয় ছিলাম। নতুন ইংরেজী শিক্ষা আমাদেরকে সম্বোধিত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা মনে করিতাম জ্ঞান-সংগ্রহ করিবার জন্ত ত পাশ্চাত্যের জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখেই রহিয়াছে—জ্ঞান সৃষ্টি করিবার কথা তখন একেবারেই মনে উঠে নাই। ইহা সত্য যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অল্প সময়ের মধ্যে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সহজ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসকগণ গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ও ভারতীয়-দিগকে গবেষণার সুযোগ দিবার ইচ্ছা ততটা পোষণ করিতেন কিনা সন্দেহ। কালের গতির সহিত সকল রাষ্ট্রই দেশের নানা প্রকার মঙ্গলজনক অহুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতেছে। তদানীন্তন কালে সেরূপ প্রেরণা ছিল না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বিদেশীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সে প্রেরণা স্বভাবতঃই আরও ক্ষীণ ছিল। নব্য শিক্ষিতকে রাজকাৰ্য্যের সহায়করূপে পাইবার উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল; সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থা সেই ভাবেই গঠিত হইল। ইংরেজ শাসকগণ সংশয়হীনরূপে আপন আপন প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেন এবং তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা কার্য্যকরীরূপে প্রবর্তন করিতে জানিতেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করিতেন। শিক্ষা সীমাবদ্ধ হইলেও বাহাতে খাটি হয়, তাহার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল; নিভুলভাবে ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিষয় বুঝিতে এবং নিভুলভাবে

এই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে ছাত্রগণ অভ্যস্ত হইত।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম উদ্বোধনা কাটিয়া গিয়া ইহার অর্থকরী রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিল; শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সরকারী চাকুরী লাভ। লোকে অধিকতর সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। বাংলা-দেশই ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিল। রাজকাৰ্য্যের জন্য বাঙালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আহৃত হইতে লাগিল। ছাত্রজীবনে পুথির মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়া এবং কর্ম-জীবনে দূরদূরান্তরে কেবলমাত্র ইংরেজ প্রভুর মেজাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে দেশের জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এমন কি মুসলমান রাজত্বের আমরা নিভূতে যে গ্রামীণ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, পল্লীর পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজের সংযোগ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় এই বহিঃকেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষা কল্যাণকর হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। হয়ত ইংরেজী শিক্ষার এই সমাজধ্বংসী রূপের কথা মনে করিয়াই রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষা কমিশন 'গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়' (Rural Universities) গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

অতঃপর স্বদেশীয়গণ আরম্ভ হইল। শিক্ষিত-সমাজের মধ্যেই আন্দোলন প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে। এই শুভক্ষণেই শিক্ষিত-সমাজ প্রথম জনসাধারণের সহিত যোগস্থাপন করিতে উৎসুক হয়। অপর পক্ষে ইংরেজ শাসকগণও ক্রমে ক্রমে উচ্চতর পদগুলি দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত করিয়া শিক্ষিত-সমাজের মতি গতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন। বাহারা স্বদেশী আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া রাজভক্তির পরিচয় দিতেন তাঁহাদের প্রতি, এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্য হইতেও বাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব তাঁহাদের প্রতিও এই অল্পগ্রহ বর্ষিত হইতে লাগিল। শিক্ষাবিভাগেই অধিকতর ভারতীয়করণ নীতি প্রযুক্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার বহু পূর্বেই আমরা শিক্ষানৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ছাংখের সহিত বলিতে হয়, আমরা এই স্বাধীনতার বখাষধ সম্ভাবহার করিতে সক্ষম হয় নাই।

দেশবাসীর করায়ত্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সংস্কার আশাহুরূপ কল্যাণপ্রসূ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে প্রয়োজন ছিল শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া, নিরীকামূলক ও বহিমুখী করিয়া, সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা—শিক্ষাকে পোশাকী রূপ হইতে

প্রয়োজনীয় শিক্ষার রূপে পরিবর্তিত করা; সরকারী দপ্তরে কেরানী-তৈয়ার করিবার সঙ্গীর্ণ উদ্দেশ্যের উপর শিক্ষাকে স্থাপিত না করিয়া, সমাজ-কল্যাণের প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু কার্যতঃ সংস্কার হইল এই যে, ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার যে কঠোরতা ছিল তাহা অনেক পরিমাণে শিথিল হইল; অন্ত্যস্ত বিষয় সম্বন্ধেও কঠোরতা হ্রাস করিয়া ছাত্রদিগের প্রতি অল্পগ্রহ প্রদর্শক করা হইল। দীপ্তিত ফল অবশ্যই লাভ হইয়াছিল; পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থ-ভাণ্ডারেরও অল্পরূপ ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় শিক্ষাবিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনেটে প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ক্রমবর্দ্ধমান ‘পাসের’ অল্পপাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। “The Senate views with alarm”—(দিনেট আশঙ্কার সহিত এই মত প্রকাশ করিতেছেন) তাঁহার প্রস্তাবের এই মুখবন্ধ তখনকার দিনে শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে বিজ্রপের সহিত উচ্চারিত হইত; সকলেই ইংরেজকে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী বলিয়া মনে করিত। শিক্ষার ও শিক্ষালয়ের স্বর্ভুতর ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হইবার প্রস্তাব না আনিয়া, কেবল পরীক্ষায় ‘পাসের’ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ভীত হইলে, ইহা অপেক্ষা উদারতর সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে। অন্তেষ্টের পরিহাস এই যে, আজ স্বদেশীয়েরাই সেই নিম্নিত নীতি কার্যে পরিণত করিতেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তখন দিনেটে প্রস্তাব আনয়ন করিয়া পূর্ব হইতেই সংশ্লিষ্ট সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন ছিল; এখন ছাত্রদিগের মূঢ় অভিভাবক-গণ অর্থের বিনিময়ে ইহা অল্পভব করিতেছেন। তখন শিক্ষার যে গ্লানির সূচনামাত্র হইয়াছিল—তৎকালে এই নীতি গৃহীত হইলে যে অনিষ্ট রুদ্ধ হইত, আজ তাহা সমাজদেহে পরিপূর্ণ বিষক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাদৃশ্যও আছে; তখন শিক্ষার যে সকল সংস্কার করণীয় ছিল, আজও তাহা করণীয়ই রহিয়াছে।

নূতন শিক্ষা সংস্কারের একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্নাতকোত্তর (post-graduate) স্তরের শিক্ষা স্নাতক-পূর্ব (under-graduate) স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত করা হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহার কুফল হইয়াছে এই যে, নিম্নস্তরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইতেছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পর যে দুইটি বৎসর ব্যয়িত হয় তাহা প্রায় ব্যর্থতায় পরিণত হইতেছে। অপর পক্ষে উচ্চতর স্তরে

একাধিপত্যের কুলক্ষণগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে; শিক্ষার সৌকর্যের জন্য একাধিক বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্তব্য তাহা শিক্ষাবিদ মাত্রেই অল্পভব করিতেছেন; নানা শিক্ষা কমিশন অনেক দিন হইতেই অল্পরূপ মন্তব্য করিয়া আসিতেছেন। তথাপি ঠিক এই সংস্কারটির কথা উচ্চারিত হইবে না। বরঞ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে থাকিয়া যে সকল বিষয়-বিশেষের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নানা স্থানে শিক্ষা-পরিবেশন করিতেছে, সেগুলির কর্তৃত্বও কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত করিবার প্রস্তাব উঠিতেছে। কেহ বা এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার দিতে চাহিতেছেন; কেহ বা যুক্তরাষ্ট্রের অল্পকরণে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে সম্বদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। পর পর একাধিক শিক্ষা কমিশনের মন্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার গৃঢ় উদ্দেশ্য কি? ভারতীয়গণ যতই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিতেছে না, ততই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইতেছে কেন? বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার উৎকর্ষের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষার অধুনাতন গতিপ্রকৃতি শিক্ষানুরাগীর হৃদয়ে অধিকতর হতাশার সৃষ্টি করিবে। মহাত্মা গান্ধী ‘আখেরী’ শিক্ষা (Basic education) সম্বন্ধেই শিক্ষাসংক্রান্ত সমগ্র চিন্তা নিঃশেষিত করিয়াছেন; কদাচিৎ তিনি উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু একদা গুয়ার্দ্দা কন্-ফারেন্সে তিনি কার্যতঃ উচ্চশিক্ষার বিরোধিতাই করিয়া-ছিলেন। সার ফিলিপ হার্টগ লিখিয়াছেন:

“A suggestion by Mr. Gandhi that no Government Funds should in future be provided for Universities, except to meet state needs was, I think, fortunately not endorsed by the Wardha Conference. Its adoption would go far to kill higher education in India.” (Some Aspects of Indian Education, Past and Present, by Sir Philip Hartog. Oxford Univ. Press, 1939. Preface, page X.)

মহাত্মা গান্ধী সত্যসঙ্গ ছিলেন; নিজ মনোভাব অবিকৃতভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার অল্পগামীদিগের বাক্যে ও কার্যে মিল স্বতঃসিদ্ধ নহে। আজ দেখিতে পাই শিক্ষার বাহ্যিক আড়ম্বরের নিয়ে শিক্ষার প্রতি অনাস্থা ও অবহেলার প্রবল উদ্ভাস স্রোত বহিতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া নানাস্থানে জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories) স্থাপিত হইতেছে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং সর্বভারতীয় বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর অর্থসাহায্য দেওয়া

হইতেছে। কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষার আদর্শ অপেক্ষা ক্ষমতালোলুপতার ক্রিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র শিক্ষিত-সমাজের প্রতি শ্রায় বিচার করিবার স্পৃহা মন্দীভূত হইয়া, আপন গোষ্ঠীর পোষকতা করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণভাবে শিক্ষা পরিচালন ও শিক্ষিতের জীবনযাপন বিড়ম্বিত হইতেছে।

শিল্পপতিগণ এবং বণিকসম্প্রদায় কারিগরি ও কেরানী-গিরি শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনওপ্রকার শিক্ষার প্রয়োজন দেখেন না। এ সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য জগতের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে বিচলিত করে না। তাঁহারা দুইটি নীতির উপর তাঁহাদের মূনাফার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও বিদেশী মূলধনের সাহায্যে শিল্প পরিচালিত হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ভারতের চতুর্দিকে গুরু-প্রাচীর উত্তোলন করিয়া তাঁহারা অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলিবার অভিলাষী। এমন অবস্থায় শিল্পের উন্নতির জন্য কারখানার অভ্যন্তরে গবেষণার ও সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার্য হইবে কিরূপে? যে শিল্প-

প্রতিষ্ঠান স্বদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের জীবিকার এবং কর্মশক্তি ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র নহে তাহা দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েক জন শিল্পপতি এবং বিদেশীয় পুঁজিপতির হাতে বিপুল ঐশ্বর্য্য তুলিয়া দিয়া এবং দেশীয় শিল্পগুলিকে বিদেশী বিশেষজ্ঞের মুষ্টিগত করিয়া দেশের কোন্ কল্যাণ সাধিত হইবে?

স্বদেশীয়দের শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত কোন্ দেশের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে? হয়ত প্রত্যুত্তর মিলিবে, রাষ্ট্র শিক্ষার বিরাট ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষিতের মর্যাদা রক্ষা, শিক্ষিতের জীবনধারণের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। শিক্ষিতের জীবন বিড়ম্বিত করিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। শিক্ষিতের জীবনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া, কারিগরি ও কেরানীগিরির দিকে শিক্ষার স্রোত বহিতেছে; শিক্ষার স্বচ্ছন্দ গতি প্রতিহত হইয়াছে। ইহার ফলে শিক্ষা ও সমগ্র দেশ কোন্ পরিণামের দিকে চলিতে থাকিবে তাহা স্বদেশের প্রত্যেক কল্যাণকামীকেই চিন্তিত করিয়া তুলিবে।

ভ্রষ্টনীড়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

একটি হৃদয় খোঁজে
সত্য এ মন
কত পথ করে পর্ষটন।
ধু ধু বালুচরে—
বিশীর্ণ প্রান্তরে
অবিরাম চরে,
হেঁটে যেতে 'ওয়েসিস'
অন্বেষণ করে—
একটি হৃদয়
যে মরুবালুতে ঢাকা রয়।
তবু বড়ো-হাওয়া
শত স্বর্ধকণা
প্রদাহের শুধুই লাজমা
তিক্ত স্বাদ আমে।
মেলে না হৃদয় কোনোখানে।
তবু এক দিন
এই মরু-আবরণ ছিঁড়ে
একটি হৃদয়
হবে স্রোতোময়,
ধু ধু বালু ভিড়ে
দেবে পরিচয়—

রৌদ্রে গেলে সে প্রান্তর তেতে'
এই কথা মনে হয়
হেঁটে যেতে যেতে।
মনে হয় একদিন
এ মরু-প্রান্তর
ছিল যে সাগর
ছিল না শুধুই বালুভূপ—
পিঙ্গল ধূসর।
তখন হৃদয় ছিল
সৌরভে উর্মিল,
পাওয়া যেত জীবনের
অনিবার্য মিল।
সে সমুদ্র আজ নেই—
প্রকৃষ্ট হৃদয়,
কঠিন সমর
বালুতে-ককরে চড়া
পরিণত হয়।
সে সমুদ্র নেই জানি
তবু যে হৃদয়
—'ওয়েসিস' খুঁজে ফিরি
ধু ধু মরুময়।

সুদান

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সুয়েজ খাল অঞ্চল ও সুদান লইয়া ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে বিরোধ মনকষাকবি ইত্যাদির কলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল সম্প্রতি তাহা এক নূতন পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে। মিশরের পররাষ্ট্র-সচিব সালে-এল দিম পাশা সম্প্রতি জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে আপোষ-রক্ষার প্রথম সর্ত্ত হইবে মিশর হইতে ব্রিটিশের অপসারণ।



APPENDIX TO REFERENCE NOTE NO. R2214 "THE ANGLO-EGYPTIAN SUDAN"

সুদানের মানচিত্র

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সুদানীদের পরগণনরূপ মাহ্‌দীর পরাজয়ের পর সুদানের উপর ইং-মিশরীয় যৌথ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নীলনদকে মিশরের ধমনী বলা চলে। এই নীলনদের বারি-বিবোধ অঞ্চলের ঐক্যবিধানের উদ্দেশ্যে মিশর আজ সুদানকে নিজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়। ব্রিটিশের ইহাতে আপত্তি।

সুদানে 'ওরাব এল নীল', 'আশিগ পা', 'ইত্তিহাদিয়ান' প্রভৃতি

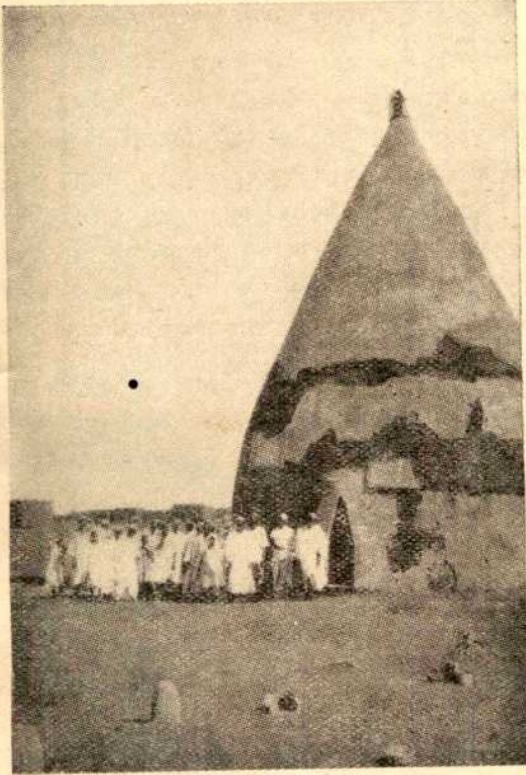
অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে—তন্মধ্যে কোন কোনটি সুদানের মিশরের অভ্যুত্থির পক্ষপাতী, কিন্তু এক দল জাতীয়তাবাদী সুদানী মিশর এবং সুদানের পূর্ণপূর্ণ একোয় প্রস্তাব মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক। বিভিন্ন দলের এই মতানৈক্যের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ সুদানেও নিজের চিরাচরিত কূটনীতির অহুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সুদানে ব্রিটিশ কূটনীতি বানচাল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সুদানের সমুদয় রাজনৈতিক দল—তন্মধ্যে সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী আল উম্মা দলও আছে—সুদান হইতে ব্রিটিশ এবং মিশরীয় সমুদয় সৈন্য বাহিনীর অপসারণের পর গণভোট গ্রহণ করা হোক এই মর্মে মহম্মদ সালে-এল দিম পাশা যে প্রস্তাব আনয়ন করেন তাহাতে একমত হইয়াছে।

মিশরের দক্ষিণ দিকে সুদান অবস্থিত। সুবিখ্যাত নীল নদ ইহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মিশরের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 'রু নাইল' এবং 'হোয়াইট নাইল' এই দুইটি নদী ধারত্মে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলকে আরবীভাষ্য বলে এল গেজিরা—সমগ্র সুদানের মধ্যে এই অঞ্চলটিই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। মধ্যভাগে ইহা প্রায় মকই মাইল প্রশস্ত।

সুদানের উত্তর প্রান্তসীমান্ত লিবিয়া এবং সাহারা মরুভূমি হইতে দক্ষিণের সুদ এলাকার জলাভূমি পর্য্যন্ত সহস্র মাইল ব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্য আছে এবং এই ভূভাগের জনসংখ্যা এবং তাদের জীবন-যাজা-প্রণালী মুখ্যতঃ এই বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত। উত্তর হইতে বতাই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই বৃষ্টিপাতের ক্রমবর্ধমান পরিমাণাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মরু-অঞ্চলের সীমারেখা হইতে পাঁচ শত মাইল দূরবর্তী গেজিরাতেই বৃষ্টিপাত হয় সবচেয়ে বেশী। এই অঞ্চলে প্রায় সকল ঋতুতেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন চারণভূমিতে বিভিন্ন ঘাস এবং শস্যক্ষেত্রেতে বিবিধ মনুষ্যী কসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বাধিকে এরিড্রিয়া এবং লোহিত সাগর পর্কৃতমালা হইতে পশ্চিমে নয় শত মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত 'ফ্রেক ইকুয়ে-টরিয়াল আফ্রিকা'র মধ্যবর্তী—গেজিরা সম্মিলিত, অঞ্চলটি প্রায় ২০০ শত হইতে ৪০০ শত মাইল প্রশস্ত—ইহার অধিকাংশই উন্মুক্ত সমতলভূমি এবং গো-মহিষাদি প্রতিপালন করিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে।

সমগ্র সুদানের মধ্যে গেজিরাই ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে মিশর হইতে নীল নদের তীরবর্তী যে রাস্তা দ্বারা মধ্য-আফ্রিকার সহিত উহার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহার অবস্থিতি, আবার পূর্বদিকে লোহিত সাগর এবং আরব হইতে পূর্বদিকের তৈল করিয়া একটি রাস্তা ইহার ভিত্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অতীতে এই সমস্ত রাস্তা দিয়াই বিদেশীরা বিজয়-অভিযান পরিচালনা করিয়া এই দেশ জয় করিয়াছে, এই পথ দিয়াই বহিরাগতেরা আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।



মাহ্‌দীর সহস্রনির্মিত শেখ খোরাশীর সমাধি

ব্রিটিশ শাসনাধীনে সুদানের আর্থিক সমৃদ্ধি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আসল হেতু নতুন নতুন রেলপথ স্থাপিত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারসাধন। এই ব্যবস্থার দরুন সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইয়াছে গেজিরা—রেল-পথের দ্বারা সমুদ্রের সহিত সংযোগ স্থাপিত না হইলে গেজিরার বর্তমান সেচব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অসম্ভবপর্যন্ত। উক্ত রেলপথ লোহিত সাগর পূর্বদিকের ভিত্তর দিয়া পোর্ট সুদান পর্যন্ত আসিয়াছে এবং মিশরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। লর্ড কিচেনার কর্তৃক সুদান-বিজয়ের উদ্দেশ্যে এই রেলপথ নির্মিত হয়। সেমার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইহার একটি শাখা গমের প্রধান বাজার এল ওবিদ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে

এবং আর একটি শাখা পূর্বদিকে সেমার বাধ অতিক্রম করিয়া কার্গাস-উৎপাদন-অঞ্চল কাসালার ভিত্তর দিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পোর্ট সুদানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গেজিরার ভিতরে এমন কয়েকটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে যেগুলি অতিক্রম করিয়া নাইজিরিয়া এবং পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের তীর্থযাত্রীরা পুরাতন সুদাকিন বন্দরের ভিত্তর দিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। আগেকার দিনে বিভিন্ন পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা দলবদ্ধ ভাবে পদব্রজে আফ্রিকার ভিত্তর দিয়া এই তীর্থযাত্রায় বাহির হইত—মায়েরা শিশুদের পিঠে বাধিয়া লইত। সাম্প্রতিক কালে গেজিরার কার্গাস-ক্ষেত্র হইতে এবং তীর্থ-যাত্রাপথে বিভিন্ন বিরাম-স্থলে নানা প্রকার কারিক পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ অর্জিত হয় তীর্থযাত্রীরা তাহার সাহায্যে সমুদ্রোপকূলে এই ভ্রমণের শেষ পর্বটুকু ট্রেনযোগে সম্পন্ন করে।



সুদানের দুই জন অভিজাত-ব্যবসায়ী সহ মাহ্‌দীর পুত্র সার সৈয়দ আবদ এল রহমান (মধ্যস্থলে)

রেলপথের জায় মোটরকারের বহুল প্রচলনেও গেজিরার মাল চালান ও লোক-চলাচল-ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অজকাল গেজিরার সেচ-অঞ্চলের এলাকাতুস্ত গ্রামগুলির ভিত্তর দিয়া বিস্তারিত মাল এবং লোকজনসহ ক্রমাগত মোটর বাস যাতায়াত করে। ট্রেন এবং মোটর বাস কিন্তু মাল বহনের প্রতিযোগিতা এই মরু-অঞ্চলের সনাতন বাহন উটকে হটাইয়া দিতে পারে নাই। বরং কৃষির প্রসারের দরুন বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে গেজিরা এবং অজকাল মালবহনকারী উটের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিক।

গেজিরা লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট সুদানের অতি ক্ষুদ্র অঞ্চল হইলেও এই দেশের ইতিহাসে ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

খ্রীষ্টীয় এক সহস্রাব্দ হইতে পাঁচ শত বৎসর কাল গেজিরাতে আলোয়া নামে একটি খ্রীষ্টান রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

খারটুমের তের মাইল দক্ষিণে সোবা নামক স্থানে ছিল ইহার রাজধানী। ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক সোবা বিধ্বস্ত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের পতনের পর তিন শত বৎসর পর্যন্ত গেজিরার উপর ফুং রাজ্যের মুসলমানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত



উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সহিত শাসন-বিস্তারের
কর্মে নিযুক্ত উপজাতীয় নেতাদের সাক্ষাৎ

ছিল—তাদের রাজধানী ছিল সেদার। অতীতে গেজিরার ইতিহাসের রহস্যকে বার বার পটপরিবর্তন হইয়াছে। ফুং বংশের রাজত্বকালে বহিরাগত আরব এবং বর্বরদের এদেশে অভিযানে আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদেরকে বন্দীকৃত এবং বহু লোককে হত্যা করে। অবশেষে তাহারা দেশটি দখল করিয়া বসে। ক্রমে ক্রমে গেজিরা এই নবগত জাতিরই বাসভূমি হইয়া দাঁড়ায়।

কালক্রমে গেজিরা বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর সুদানের সঙ্গে ইসলাম-জগতের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। ক্রমে ক্রমে সেদার একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইল। ইউরোপীয়গণ এই শহর পরিদর্শনে সমাগত হইতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে এখানে লাভজনক কার্গাস-শিল্প গড়িয়া উঠিল। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কগণ কর্তৃক সেদার অবিকৃত হইলে ফুং-প্রভুত্ব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়।

মিশরের অধীনে থাকাকালে বিজ্ঞানীদের কুশাসন এবং দুর্নীতি ভাবী মাহ্‌দী বিদ্রোহের পথ পরিষ্কার করিল—১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে খারটুমের পতনে এই বিদ্রোহের অবসান হইল।

এই সময় গেজিরার বর্তমান গঞ্জশহর মেরিলিমিয়া ছিল দক্ষিণ অঞ্চল হইতে বন্দীকৃত দাসবিক্রয়ের একটি প্রধান বাজার। সুদান হইতে বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাস—সময় সময়

তাহাদের সংখ্যা বৎসরে ৫০,০০০ হাজারে দাঁড়াইত—সুদান হইতে চালান হইত।

মাহ্‌দী বিদ্রোহের নায়ক মাহ্‌দী বহু গেজিরায় কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট ধর্ম-মণ্ডলীর (টারিগা) অন্তর্ভুক্ত—এখনও গেজিরায় উক্ত ধর্মমণ্ডলীর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। কথিত আছে, তাঁহার শত্রুর শেখ বোরানীর মৃত্যুর পর তিনি নিজের হাতে তাঁর সমাধি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সুদানের বর্তমান অধিবাসী

বর্তমানকালে সুদানের একই অঞ্চলে এমন অনেক গ্রাম আছে যেগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর উপজাতীয় লোকেরা বাস করে। তন্মধ্যে মাহ্‌দী সৈন্যদের বংশধরেরাও আছে। গেজিরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মুরদের অধ্যুষিত একটি জেলা আছে এবং প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলের বহু গ্রামে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির বাস। গ্রামাঞ্চলের আরবদের মুখাকুতি এবং দৈহিক গড়ন লক্ষ্য করিলে একথা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের দেহে প্রচুর দাস (নিগ্রোয়েড) রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে।



গেজিরায় নীল নদের বুকে ভাসমান বজরা

আগেকার দিনে উপজাতীয়দের মধ্যে প্রায়ই কলহ-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটি হইত। ইহাদের সমাজে নানা কুসংস্কারও ছিল। ইদানীং এ সকল বহুলাংশে কমিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই। জাতির অতীত ঐতিহ্যের প্রতি ইহাদের অচুরাগ অপরিসীম। ইহারা গোষ্ঠী-কথা, পূর্ব-পুরুষদের স্মৃতিগ্রন্থ এবং কৃতিসমূহের কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসে।

এখানকার অধিবাসীরা বড়ই অতিবিসংকার-পরায়ণ। কোনো গ্রামে বেড়াইতে গিয়া গৃহস্থবাটী হইতে খাঙ গ্রহণ না করিলে তাহা শিষ্টাচারবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়।

সুদান বহু মিশ্র জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। এখানে এক দিকে যেমন অল্পবুদ্ধি দাস-শ্রেণীর লোকের বাস, অল্প দিকে তেমনি দৈহিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিরল নহে। সাধারণতঃ শেখ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যেমন আভি-জাত্যপূর্ণ চেহারা তেমনি মর্যাদাজোতক তাঁহাদের আচরণ—তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিও প্রখর।

গেজিরার আধুনিক সেচ-ব্যবস্থা।

গেজিরায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ইহার সেচ-ব্যবস্থা। ইহার দক্ষন এই দেশের এক অংশের ত্রি ফিরিয়া গিয়াছে। সেচ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-যাপন-প্রণালীর আয়ু্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, অবশ্য সমগ্র গেজিরার সামাজ্য অংশমাত্রই সেচ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। নীল নদের পশ্চিম দিকে প্রাচীন গেজিরা। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আজও আগেকার আমলের জীবনধারণাই অমুণ্ডন করিতেছে।

উত্তরদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া উক্ত অঞ্চলে গাছপালা বিরল। দক্ষিণদিকে—যেখানে পাহাড়শ্রেণী সীমা-রেখা রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, গাছপালার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে মাইলের পর মাইল বৃষ্টিয়া একপ্রকার কাঁটা গাছের বোপ ভূপৃষ্ঠকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

গেজিরার অনন্ত-প্রসারিত, উম্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইলে নজরে পড়ে গ্রামগুলি সূদূর দিগন্তে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারিবীধা তুণে ছাওয়া সূক্ষ্মাঙ্গ চালাবিশিষ্ট কুটিরসমূহ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তর অঞ্চলে চাল ছাইবার তুণ জমায় না বলিয়া রৌদ্রদগ্ধ যুক্তিকা দ্বারা সমতল আকারের চালা নির্মিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক কুয়া আছে—পশ্চিম অঞ্চলে মাটি খুঁড়িয়া জল পাওয়া কষ্টকর বলিয়া বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জল বিরাট আকারের দীঘি (হাকির) কাটানো হয়।

নবেম্বর মাসে বৃষ্টিপাতের অভাবে জমি থাকে শুষ্ক এবং অসুন্দর। সেচ-অঞ্চলে কার্গাসগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জাহুরারী মাসে কার্গাস-গুটি যখন কাটিতে থাকে তখন

পাকা তুলার শুভ্রতা সূদূরপ্রসারিত কার্গাসক্ষেত্রগুলিকে এক অপূর্ণ শোভায় মণ্ডিত করিয়া তোলে। তুলা-সংগ্রহ-কারীর দলে দলে মাঠে গিয়া কার্য্যে রত হয়। গৃহস্থদের কুটীরে কুটীরে রাশি রাশি তুলা বস্তাবন্দী করিবার ধুম পড়িয়া



সেচ অঞ্চলের বাহিরের একটি গ্রামের কুয়া হইতে স্ত্রী-পুরুষ চামড়ার থলিয়ার জল তুলিতেছে

যায়—তারপর উটের পিঠে চাপাইয়া সেগুলিকে বীজ ছাড়াই-বার কেন্দ্রগুলিতে লইয়া যাওয়া হয়।

যে বৎসর সূর্য্যষ্টি হয় সেই বৎসরে বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভূ-ভাগ বিবিধ তৃণলতা এবং গুল্মবৃক্ষের প্রাচুর্য্যে সবুজ শোভায় মণ্ডিত হয়। পল্লীগ্রামের মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া খালগুলির ওপারে তাকাইলে নজরে পড়ে যখন সবুজ জনারের ক্ষেত মাইলের পর মাইল অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে সূদূরপ্রসারিত তৃণক্ষেত্রের উপর শাদা রঙের এক প্রকার ফুল অল্প কুটীয়া রহিয়াছে—যেমন সবুজের উপর শাদা ফুলতোলা বিরাট কার্পেট ভূপৃষ্ঠে বিছানো।

জনরাই এখানে উৎপন্ন প্রধান খাদ্যশস্য। নবেম্বর মাসে ফসল কাটা হইলে পর লোকদের বাৎসরিক খাটুনির অবসান হয়। ভাল বৃষ্টি হইলে তাদের খাজাতাব হয় না। তখন তাহারা তীর্থযাত্রায় বাহির হয়। মাঝে মাঝে ভোজের আয়োজনও করে। প্রাচীনকালে এই সময় তাহারা যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইত।

সেচ-ব্যবস্থার ফলে কেবল সেচ-অঞ্চলের নহে তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের অধিবাসীদেরও দুর্গতি এবং দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হইয়াছে। ইহার দক্ষন অনাবৃষ্টি হইলেও ক্ষেতগুলি প্রচুর জল পায় বলিয়া ফসল নষ্ট হয় না, উপরন্তু

কার্পাসগাছ হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়াও লোকেরা বেশ ছ' পরসী রোজগার করিয়া থাকে।

সুদানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

তুলাই সুদানের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য। গত বৎসর তুলা রপ্তানি করিয়া এদেশের প্রায় ২,২০,০০,০০০ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। একা ব্রিটমই সুদানের নিকট হইতে ১,৮০,০০,০০০ পাউণ্ডের তুলা কিনিয়াছিল। আর ভারতবর্ষ



একজন সুদানী সিপাহী

ক্রয় করিয়াছিল ২০,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের। তুলার দর যেভাবে চড়িতেছে এবং উৎপাদনও যেরূপ বাড়তির পথে তাহাতে আশা করা যায় যে, আগামী মরহমে তুলা রপ্তানি দ্বারা সুদানের আয় অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

সুদানের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে তুলার পরেই আরব্য আমারের স্থান—হুনিয়ার বাজারে তাহার এই জিনিসটির এক-চৌতরা কারবার। এই খাদ্যাদ্রব্য রপ্তানি দ্বারা গত বৎসর সুদানের লাভ হইয়াছিল ২,০০,০০০ পাউণ্ড।

এই দেশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরুভূমি, চারণভূমি এবং বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ—এখানকার উপজাতীয় লোকেরাও অল্পদূর। সেইজন্য এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পণ্যদ্রব্য এতদূরত্বেরই একান্ত অভাব। কার্পাস-তুলা এবং জনার ছাড়া সামান্য

পরিমাণ চামড়া, বিদেশের চিড়িয়াখানার জন্য ছুপ্রাপ্য পশুপক্ষী এখানকার রপ্তানিদ্রব্য।

মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া সুদান জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনাসমূহকে কার্য্যকরী করিবার যত্নপাতি, তৈরি মাল এবং অন্যান্য বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল। গত বৎসর সুদান বিদেশ হইতে মোট ২,৫০,০০,০০০ পাউণ্ডের পণ্যদ্রব্য আমদানী করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত ব্রিটেন হইতে আসে ৮০,০০,০০০ পাউণ্ডের আর ভারতবর্ষ হইতে ৩০,০০,০০০ পাউণ্ডের—অধিকাংশই বহন-সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি।

জাতিগঠনমূলক সরকারী পরিকল্পনা

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সুদান গবর্ণমেন্ট একটি দশ বৎসরের পরিকল্পনা লইয়া জাতিগঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই পরিকল্পনার চারিটি অঙ্গ—সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি এবং জনশ্রুতকর কার্য্য।

বর্তমানে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পরিচালনাধীনে ষোল্লটি ফ্যাকাল্টি সম্বলিত একটি উন্নত ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১২০০ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৈচিত্র্য এক লক্ষ। সরকার ষোল্লটি, ওমদারহান এবং অন্যান্য শহরে কডকগুলি শিল্পবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যনীতিবিষয়ক উন্নয়ন-প্রচেষ্টার প্রসারও এই দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত। পরিকল্পনার এই অংশটি কার্য্যকরী করিতে গিয়া কর্তৃপক্ষকে দুইটি প্রবল প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হয়—প্রথমতঃ, এই কার্য্যের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় তাহার অপ্রাচুর্য্য আর দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় অধিবাসীদের চিরচিরিত অভ্যাস এবং কুসংস্কার। দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে প্রতিবন্ধসমূহ বহুলাংশে অপসারিত হইয়াছে। আজ সুদানের প্রত্যেক নগরী এবং মধ্যস্থল শহরে আধুনিক ব্যবস্থা-সম্বলিত হাসপাতালসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাসপাতালের নৌকাগুলি ঔষধপত্র এবং চিকিৎসাবিষয়ক অন্যান্য উপকরণাদি সহ নীল নদ এবং তাহার উপনদীসমূহের বুকের উপর দিয়া বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করে।

সেচ-ব্যবস্থার ফলে গেজিরার যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে আমরা পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি।

গেজিরা উন্নয়ন-পরিকল্পনা

সরকারী কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় গেজিরা উন্নয়ন-পরিকল্পনা সাক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। গেজিরা কণাটার মানে দ্বীপ, কিন্তু এই সুদান গেজিরা আসলে একটি উপদ্বীপ। এখানকার প্রায় পাঁচ লক্ষ একর উর্বর জমিতে ঘোঁষ কৃষির

ব্যবস্থা প্রযুক্তি হইয়াছে। সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই এই যৌথ কৃষির অংশীদার। এই অংশীদারী ব্যবস্থা অস্থায়ী কার্গাসের মরসুমে ক্ষেত চাষ হইতে শুরু করিয়া চারাগাছ রোপণ—তুলা সংগ্রহ, বীজ ছাড়ানো পর্যন্ত গবর্ণমেন্টই চাষীকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করেন। সরকার চাষীর জন্য জমির বন্দোবস্ত করিয়া দেন—ক্ষেতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, চাষীকে বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন সহজে যথোচিত নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। বাজারে তুলা বিক্রয়ের ব্যবস্থাও সরকারী তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। চাষীকে প্রয়োজনবোধে সরকারী ঋণ দিবার ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যেক চাষী প্রায় চল্লিশ একর জমি পান, তন্মধ্যে অন্ততঃ দশ একর জমিতে তুলা উৎপাদন করিতে সে বাধ্য—বাকী জমিতে সে নিজের খুশিমত জমার, তরিতরকারী এবং জন্মান্য ফসল জন্মাইতে পারে।

এমনিভাবে সরকারী ব্যবস্থাবলীনে যৌথ কৃষির দ্বারা যে আয় হয় তন্মধ্যে সরকার লন শতকরা ষাট ভাগ—মূলধন বিনিয়োগ এবং চাষবাসের ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সহায়তা। ইত্যাদির দরুন, আর চাষীকে তার শ্রমের বিনিময়ে দেওয়া হইয়া থাকে শতকরা চল্লিশ ভাগ।

গেজিরা উন্নয়ন-পরিকল্পনা এখনো প্রাথমিক অবস্থায়ই আছে বলা চলে। পরিকল্পিত পাঁচ লক্ষ একরের মধ্যে মাত্র দুই লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং উন্নত ধরনের কৃষির ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু সমগ্র সুদানে ইহাই সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে যতগুলি যৌথ কৃষি-বিষয়ক, পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সবচেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

কিন্তু ইদানীং ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনৈতিক বিরোধের দরুন গেজিরা-পরিকল্পনা এবং সুদানের অপরূপ অজ্ঞাত উন্নয়ন-পরিকল্পনা ব্যাহত হইতেছে। কেননা ১৯২৯-এর নীল নদের জল-রাশি সম্পর্কিত চুক্তি (Nile waters agreement) অনুসারে সুদান নীলনদের জলের কেবলমাত্র শতকরা ক্রিষ্টাব্দিক দুই ভাগ ব্যবহারের অধিকারী—বাকী সমুদয় অংশ মিশরের এলাকাভুক্ত। দীর্ঘকাল যাবৎ এই চুক্তির অদল-বদল একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলেও কারো-কারটুম-লন্ডনের রাজ-নৈতিক বিরোধের সৃষ্ট মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ইহা কার্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

সুদান এবং মিশরের প্রগতি সমস্তা হইতেছে নীল নদের

জলের সমস্তা। অনেকগুলি সেচ-পরিকল্পনাই সুদান-সরকার করিয়াছেন, কিন্তু যে বারিরাশি সুদানকে বিধৌত করিয়া বহিরা হইতেছে তাহার শতকরা দুই ভাগের বেশী কাজে লাগাইবার অধিকার সুদানবাসীর নাই। সরকারী অস্থমতিপত্র ছাড়া কোনো সুদানী চাষী এই মুক্তগতি নদীর অনন্ত বারিরাশি হইতে দুই গ্যালন মাত্র জল পর্যন্তও নিজের



সুদানী সিপাহীর স্ত্রী

ক্ষেতে পাম্প করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। 'নাইল ওয়াটার এগ্রিমেন্ট' এমনিভাবে তাহাদিগকে আটপুঠে আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে মিশরও যে খুব লাভবান হইতেছে তাহা নয়। মিশর নীল জলের বাকী ৯৮ অংশের অল্পমাত্রই ব্যবহার করিতে পারে—শতকরা ষাট ভাগই সরাসরি চলিয়া যায় কুম্বাসাগরে। কাজেই নীল-নদের বারিরাশির অংশীদারিত্ব সহজে একটা যথার্থ সৃষ্ট চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কি সুদান, কি মিশর কাহারো কল্যাণ হইতে পারে না—এটা উভয়েরই মরণ-বাচনের সমস্তা।

বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দরুন সুদানের শুধু অর্থনৈতিক নহে, শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা-সমূহও বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। খারটুম ইউনিভার্সিটি কলেজ সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিকোন্ডের স্কার হইয়াছে, ফলে গত দুই মাস যাবৎ ইহা বন্ধ। ওমদারমান নগরেরও অনেকগুলি বিদ্যালয় এবং অজ্ঞাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খারটুম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। সুদানের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা অব্যাহত থাকিরা যাহাতে দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে সেই জন্য সুদানকে লইয়া সৃষ্ট ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনৈতিক বিরোধের আশু অবসান একান্ত আবশ্যক।

রাজনগর

শ্রীননীমাত্ব চৌধুরী

ইন্ডিয়ান বিলের ধারে মাঠে বেড়াইতেছিল। মাথার তাহার নানা রকমের চিন্তা। সে এক অসমস্ক ভে, যুরলী বিলের ওপারে অসমস্কী স্বর্ষের শোভা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হইল দুই নেটওয়ার ইন্ডিয়ান পাঞ্জার নীচে একজন লোক বসিয়া আছে। নেটওয়ার ইন্ডিয়ান পাঞ্জা দেখিয়া তাহার মনে পড়িল কয়েক বৎসর আগেকার কথা যখন সে ও দেবানন্দ প্রায়ই এই পাঞ্জার আলোচনা করিত, কবিতা আবৃত্তি করিত, লুকাইয়া আনন্দ-মঠ প্রভৃতি বই পড়িত। তাহাদের সেই প্রিয় কাহিনীকে কে অবিকার করিল তাহা ইন্ডিয়ান কোঁজুল হইল। সে ইন্ডিয়ান পাঞ্জার দিকে অঙ্গুর হইল।

খানিকটা দূর হইতে সে বিশ্মিত হইয়া দেখিল ফুলের এলিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার যতীনবাবু একখানি ইন্ডিয়ান উপর বসিয়া এক মনে কি যেন পড়িতেছেন। সে কাছে যাইতে যতীনবাবু তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি হাতের কাগজখানা পকেটে রাখিয়া তিনি বলিলেন—তুমি একা একা এত দূর বেড়াতে এলে? তোমার বাবা কেমন আছেন?

ইন্ডিয়ান বলিল—বাবা একটু ভাল আছেন। আপনি মাঠের মধ্যে বসে কি পড়ছিলেন মাষ্টার মহাশয়?

যতীনবাবু তাহার ইষ্টকালন ভাগ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—একখানা নতুন কাগজ বেরিয়েছে তাই দেখছিলাম। তোমার মোকদ্দমার তারিখ কবে?

ইন্ডিয়ান—তা জানি না। সমরমত খবর আসবে যাবার জন্ত। কি নতুন কাগজ মাষ্টার মহাশয়।

যতীনবাবু—কাগজখানার নাম যুগান্তর। কিছুদিন থেকে বেরুচ্ছে। কলকাতা থেকে একজন একটা মাস সংখ্যা পাঠিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান—কাগজখানার নাম শুনেছি মনে হচ্ছে। দেখি কি রকম কাগজ।

যতীনবাবু পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া ইন্ডিয়ান হাতে দিলেন। কাগজখানা খুলিতেই ইন্ডিয়ান চোখে পড়িল একটা ভারসার লাল কালিতে মোটা করিয়া দাগ দেওয়া। তাহাতে এই মর্মে লেখা ছিল:

“যে দেশে ৩০ কোটি লোক বিমা আপত্তিতে দাসত্বের শৃঙ্খল পরে রয়েছে সে দেশে বীর জন্মাবে কি করে? যে দেশে মুখের আস হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেও, জোর করে

অন্তঃপুরে ঢুক মেরেদের মর্যাদাহানি করলেও লোকে অসহ্যর ভাবে চেয়ে থাকে, এ দুই চোখে দেখেও প্রতিকার করতে এগোয় না সে দেশ বীরের পক্ষে বন্ধ। হাজার বার পদাঘাতে জর্জরিত হয়েও যে জাতির আত্মসম্মানবোধ জাগে না সে দেশ মনুষ্যত্বহীন। বিলাতের এক সভ্য একজন ভারতীয় বাগ্মী ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগের কথা বলছিলেন। একজন সাধারণ শ্রমিক বক্তৃতার শেষে তাঁর কাছে এসে কানে কানে জিজ্ঞেস করল—তোমাদের দেশের লোক সংখ্যা কত? তিনি বললেন—খ্রিস্ট কোটি। শুনে শ্রমিক বলল—তা হলে তোমরা পড়ে মর গিয়ে। একজন সাধারণ শ্রমিক পর্যাপ্ত ভাবে বিমিত হ'ল কি করে এই বিপুলসংখ্যক লোক এক জোটে দাসত্বের ভার বইতে রাজী হয়েছে। আর আমাদের দেশের জানী ব্যক্তিরা একে বলছেন ডিভাইন ডিসপেনসেশন—বিধাতার বিধান। আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফল হয়েছে এই শ্রেণীর বিধাতার বিধান। তপস্বান এই সংস্কৃতির হাত থেকে দেশকে বাঁচান।”

ইন্ডিয়ান যতীনবাবুকে তাহার পরিচয় জানিয়ে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বসিল। তাঁর পর দুই জনের মধ্যে নানা রকম আলাপ আরম্ভ হইল। অবশেষে ইন্ডিয়ান তাহাকে নিজের সমস্ত কথা বলিল। বীর ভাবে তাহার সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—সত্য হইবে এল। চল এবার ওঠা যাক। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব। উত্তর দেবার আগে আমি তোমাকে একটা জিনিস পড়তে দিতে চাই। আমার একখানা সংগ্রহ-খাতা আছে। দেশের স্নান সমস্তা, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের সমস্তা সমাধানের উপায় সবচেয়ে জাতীয়তাবাদী কাগজে যে সকল মত বেরোয় আমি সেগুলো সংগ্রহ করে রাখি সেই খাতায়। তুমি যেকথা জিজ্ঞেস করলে তাঁর উত্তর খানিকটা কয়েকখানা কাগজের সাহায্যে লিখে

ইন্ডিয়ান যতীনবাবুকে তাহার পরিচয় জানিয়ে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বসিল। তাঁর পর দুই জনের মধ্যে নানা রকম আলাপ আরম্ভ হইল। অবশেষে ইন্ডিয়ান তাহাকে নিজের সমস্ত কথা বলিল। বীর ভাবে তাহার সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—সত্য হইবে এল। চল এবার ওঠা যাক। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব। উত্তর দেবার আগে আমি তোমাকে একটা জিনিস পড়তে দিতে চাই। আমার একখানা সংগ্রহ-খাতা আছে। দেশের স্নান সমস্তা, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের সমস্তা সমাধানের উপায় সবচেয়ে জাতীয়তাবাদী কাগজে যে সকল মত বেরোয় আমি সেগুলো সংগ্রহ করে রাখি সেই খাতায়। তুমি যেকথা জিজ্ঞেস করলে তাঁর উত্তর খানিকটা কয়েকখানা কাগজের সাহায্যে লিখে

পাবে। আগে তুমি সেগুলো পড়ে নাও, তার পর আলোচনা করা যাবে।

ইল্ল বলিল—চলুন আপনার বাড়ী গিয়ে খাতাখানা নিয়ে আসি।

৫ যতীনবাবু বলিলেন—আজ রাত হয়ে যাবে। তুমি বাড়ী যাও। কাল সকালে আমি খাতাখানা তোমাকে দিয়ে আসব, তোমার বাবাকেও দেখে আসব।

ইল্লদের বাড়ীর সমুখ দিগ্না যতীনবাবুকে তাঁহার বাড়ীতে ফিরিতে হইবে। বিদায় লইবার সময় ইল্ল বলিল—স্বাষ্টায় মশাই, খাতাখানা আনতে ভুলবেন না।

ইল্ল কাছারি-বাড়ীর পাশ দিগ্না বৈঠকখানা দালানের দিকে যাইতেছে এমন সময় বৃদ্ধ নায়েব ভাড়াভাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিল—ছোটবাবু একটা কথা আছে।

• ইল্ল সেখানে দাঁড়াইল। নায়েব কাছে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—ছোটবাবু, তার এসেছে কাল আপনাকে সদরে যেতে হবে। ও-বাড়ীর দায় বাহাদুর বললেন, তিনি সঙ্গে যাবেন, আর কথাটা যেন কর্তাবাবুকে না জানানো হয়। যা বলতে হয় তিনি নিজেকে বলবেন।

ইল্ল সব শুনিয়া বলিল—আচ্ছা।

সে বৈঠকখানা-দালানের মধ্য দিগ্না পিতার ঘরের কাছে গিয়া চিগ্নায়ী গলা শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। চিগ্নায়ী বলিতে-ছিল—আমার কথা রাখুন বাবা। যদি এ ভাঙা সংসারে আবার ত্রি ফিরিয়ে আনতে চান... ইল্লের মনে হইল কান্নায় চিনির কথা বন্ধ হইয়া গেল। পিতাকে তিনি কি বলিতেছিল তাহা সে অনুমান করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি আর কিছু না বলিতে তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিল না।

পাশের ঘরের ভিতর দিগ্না সে অন্দরে গেল। উঠানে একটা লণ্ঠন হাতে মুকীর মা দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—বাহার বাড়ী থেকে পাড়িয়ে কি একজন সন্টারকে ডাকি, তুমি একটু খাড়াও লক্ষ্মী দিদিমণি। একা ফিরতি মোর ভয় করবি।

ইল্ল বুঝিল মুকীর মা লণ্ঠন লইয়া লক্ষ্মীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যাইতেছে। সে বলিল—মুকীর মা লণ্ঠন আমাকে দাও। বাইরে থেকে কাউকে ডাকতে হবে না, আমি যাচ্ছি। লক্ষ্মীকে ডেকে দাও।

মুকীর মা মাধার কাপড় দিগ্না লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া গেল। লক্ষ্মী জগন্নাথীর ঘরে বসিয়া যুগ্মীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। মুকীর মা তাহাকে ডাকিয়া আনিল। বলিয়া, ছোটবাবু নিজে যেতেছেন দিদিমণি, আমার যাওয়ার কাম কি?

ইল্ল আগে আগে লণ্ঠন হাতে চলিল, পিছনে লক্ষ্মী। দু'জনে নির্বাক ভাবে পথ চলিতে লাগিল, অবশেষে জীবানন্দের বাড়ীর ফটকের সামনে আসিয়া ইল্ল সন্নিহা দাঁড়াইল লক্ষ্মীকে পথ দিবার জন্ত। বলিল—আমি এবার যাই।

লক্ষ্মী এক পা ভিতরে গিয়াছে, ইল্ল বলিল—লক্ষ্মী, একটা কথা বলব।

লক্ষ্মী ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইল্ল বলিল—কাল আমাকে সদরে যেতে হবে। যদি আমার জেল হয়, আমি ফিরতে না পারি বাবাকে তুমি আগের মত দেখো। চিহ্নর ওপর বেশী ভরসা করি নে, তারপর হঠাৎ হয়ত তার খবরবাড়ী থেকে লোক এসে পড়বে নিয়ে যাবার জন্ত। তুমি না দেখলে ফিরে এসে হয়ত বাবাকে আর দেখতে পাব না। দেখবে তুমি?

লক্ষ্মী মাথা নোয়াইল। ইল্ল ফিরিবার জন্ত পা বাড়াইয়াছে, লক্ষ্মী আগাইয়া আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিবার জন্ত। ইল্লের পায়ের উপর সে মাথা রাখিল, মাথা আর উঠে না। ইল্ল লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া লক্ষ্মীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার জন্ত ডাম হাত বাড়াইল। যুহু, কোমল স্বরে বলিল—লক্ষ্মী ওঠ।

ইল্লের নিজের চোখ কেমন যেন জালা করিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইল। লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল। ইল্লের প্রসারিত হাত তাহার মাথায় না লাগিয়া চিবুক স্পর্শ করিল।

জিনহনী দোস্তলার জানালা দিগ্না আলো দেখিতে পাইয়া বলিলেন—কে?

ইল্ল বলিল—কাকীমা, লক্ষ্মীকে পৌছে দিয়ে গেলাম।

জিনহনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ওপরে এসো বাবা, একটু বসে যাও।

ইল্ল—আজ যাই কাকীমা, বাবার ওমুখ দেবার সময় হ'ল, দেবী হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া সে বলিল—তুমি ভেতরে যাও লক্ষ্মী, আমি যাই।

ইল্ল চলিয়া গেল।

পরের দিন ইল্লকে সঙ্গে লইয়া জীবানন্দ সদরে রওনা হইয়া গেলেন। তার পরের দিন বাংলার ইতিহাসে একটা অরণীয় দিন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে স্থির হওয়ার পরে বরিশালের জেলা-কর্তৃপক্ষ বরিশাল “ইন এ ষ্টেট অব মিউটিনি” বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই বিজ্ঞোহ দমন করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল। নবাব সলিমুল্লাহের কাছারি-বাড়ী রেগুলেশন লাঠিধারী রিজার্ভ পুলিশ ও বন্দুকধারী কনষ্টেবলে ভরিয়া গেল। শহরে বন্দে মাতরম্ বলা আগেই বন্ধ হইয়াছিল—সভা, সমিতি, শোভাযাত্রাও নিষিদ্ধ হইল।

কনফারেন্সের দিন সকাল আটটার কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিদের লইয়া ষ্টামার ঘাটে আসিয়া লাগিল। প্রতিনিধিরা সন্বেত কণ্ঠে

চিংকার করিলেন—বন্দে মাতরম্। ঘাটে বরিশালের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত, প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ত। প্রত্যুত্তরে ঘাট হইতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠিল না। ফুলারী সারকুলারে বরিশালে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ। এটি-সারকুলার সোসাইটির সভ্যরা ঘাটে নামিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে লাগিল, সরকারী নিষেধ অমান্য করিয়া সমস্ত রাত্তা তাহারা ধ্বনি দিতে দিতে চলিল।

রাজা বাহাদুরের হাভেলী হইতে প্রতিনিধিরা সভ্যমণ্ডপে যাইবার জন্ত বাহির হইয়া আসিলেন। আগে চলিলেন সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতারা, তাহাদের পশ্চাতে এটি-সারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ। সহসা পুলিশ-সাহেব ক্যাম্প ও লাঠিধারী কনেষ্টবলরা আসিয়া সভ্যদের ঘিরিয়া ফেলিল। ক্যাম্প সভ্যদের হুকুম করিল—ব্যাজ খুলিয়া ফেল। তাহারা অস্বীকার করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ আরম্ভ হইল। রেগুলেশন লাঠিধারা পুলিশ চারদিক হইতে সভ্যদের মাথায়, পিঠে, বাহুতে আঘাত করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জরিত হইয়াও তাহারা ধ্বনি দিতে লাগিল বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্। অনেকের মাথা কাটিয়া রক্তে মুখ, জামা, কাপড় লাল হইল, কেহ কেহ মাটিতে পড়িয়া গেল তবু বন্দে মাতরম্ ধ্বনির বিরাম নাই। বালক চিত্তরঞ্জন চিংকার করিতেছিল বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্। তিন জন কনেষ্টবল তাহাকে মারিতে মারিতে এক ডোবার মধ্য ফেলিয়া দিল। ডোবার জলে বালক যখন নিমজ্জমান ওখনও তাহাদের লাঠি চলিতে লাগিল অবিরাম। অবশেষে একজন হিন্দু কনেষ্টবলের লাঠি ধামিয়া গেল। ছেলেরা ডুবিয়া মরিতেছে দেখিয়া সে তাহাকে জল হইতে উঠাইল। বালক তখন অচেতন্য।

ইতিমধ্যে পুলিশ সাহেব ক্যাম্প সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিল। গ্রেপ্তারের পরেই তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করা হইল। সরাসরি বিচারে তাহার জরিমানা হইল। ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া অমাত্রাধিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি পুলিশকে বলিলেন—‘তাদের মারছ কেন? আমাকে মার’। একজন কনেষ্টবল বলিল—এই ব্যাটারদের মারবার হুকুম নাই।

লাঞ্চিত, প্রহারে জর্জরিত প্রতিনিধিরা অবশেষে সভ্যমণ্ডপে পৌঁছিলেন। তাহাদের সকলের মনে এই লাঞ্চার আগুন জ্বলিতেছিল। তাহারা ভাবিতেছিলেন পূর্ববঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হইয়া অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে। এটি-সারকুলার সোসাইটি ও ভবানীপুর সেবক সম্প্রদায়ের সভ্যরা সভ্যপতির মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গান করিলেন—লাল পাগড়ি ও কাল কোর্টা জুজুর ওর দেখাও কারে? সভার উদ্বেজনা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, গান বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

সভাপতি এ. রত্নলের অজিভাষণ শেষ হইলে কয়েকজন ভক্তলোক সর্বোদে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি বালক ও একটি যুবককে ধরাধরি করিয়া সভ্যমণ্ডপে আনিলেন, তাহাদের সঙ্গে আসিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। বালকটি তাহার পুত্র চিত্তরঞ্জন ও যুবকটি মৈমনসিংহ সুহৃদ সমিতির ব্রজেন গাঙ্গুলি। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা শ্রোতাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আপনারা বিজের চোখে দেখুন পুলিশ এদের কি রকম নির্দয় ভাবে প্রহার করেছে। মারের চোটে আমার ছেলের প্রবল জ্বর এসেছে, জ্বরের ডাঙসে সে কাঁপছে। আমার ছেলে যদি মারা যায় তা হলে আমি গর্কবোধ করব।”

বিভীর্ণ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হইলে বাগেরহাটের এক উকিলের চিঠি সভায় পড়া হইল। তিনি ও তাহার জী কয়েকটি টাকা ও সোনার বালা পাঠাইয়াছেন পুলিশ যে জায়গায় ছেলের রক্তপাত করিয়াছে সেখানে একটি স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিবার জন্ত। চিঠিখানি পড়া হইলে সভায় প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চট্টগ্রামের এক জমিদার সভাপতির টেবিলের উপর পাঁচ শত টাকার এক থলিয়া রাখিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত। মৈমনসিংহের বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারিণী এক মহিলা একুশ টাকা এবং আরও কয়েকজন মিলিত ভাবে পাঁচাত্তর হাজার টাকা দিবেন জানাইলেন।

এই সময়ে প্রকাণ্ড একটি পুলিশ বাহিনী লইয়া পুলিশ সাহেব ক্যাম্প সভ্যমণ্ডপের প্রবেশপথে উপস্থিত হইয়া জানাইল, সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত আদেশ হইয়াছে, সে আরও জানাইল প্রয়োজন হইলে গুলি চালাইবে। এই কথা শুনিয়া সভায় উপস্থিত অনেকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাহারা বলিলেন যে, পুলিশ গুলী চালাইয়া তাহাদের হত্যা করুক, তাহারা নড়িবেন না। সভার পাঁচ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নেতারা মহিলাদের দেখাইয়া বলিলেন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিলে বহু লোকের প্রাণ মষ্ট হইবে, মহিলারাও বাদ যাইবেন না। প্রতিনিধিরা তখন শান্ত ভাবে সভ্যমণ্ডপ ত্যাগ করিলেন। দুই ঘণ্টা পরে একটি গৃহে মিলিত হইয়া প্রতিনিধিরা ও স্থানীয় লোকেরা বিরাট এক সভা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বরিশাল কনকোরেলের প্রতিনিধিদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ দেশময় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। গোলদীঘিতে দুইটি সভায় শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশ সমাজপতি, আশুতোষ চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তীর্থ ভাষার পুলিশ ও পূর্ববঙ্গ-সরকারের আচরণের নিন্দা করিলেন। “আগুন জ্বলিল, পূর্ববঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান” এই শিরোনামায় সংবাদপত্রে পুলিশী আক্রমণের বিস্তারিত

বিবরণ প্রকাশিত হইল। কোন কোন কাগজ লিখিল—
“দেশের উপর দিয়া প্রলম্বকর বড় বহিভেদে, লোকের মনে
বেপরোয়া ভাব”, “উঠ, জাগো ভাই সব, শব-সাধনায় সিঁচি
লাভ করিবার সুযোগ আসিয়াছে।” কেহ কেহ বরিশালের
পুলিসী ভাণ্ডারের নাম দিল—ফুলার লু বা ইষ্টার হাণ্ট, কেহ
লিখিল পূর্ববঙ্গের নাদির শাহ ফুলার, কেহ লিখিল পূর্ববঙ্গের
মহম্মদ ভোগলক ফুলার। লাহোর, মাদ্রাজ, পুনা প্রভৃতি
স্থান হইতে সহস্রভুক্তিহীন ভাষা আসিতে লাগিল। দেশের
বহু স্থানে সভা করিয়া ফুলারী কুশাসনের ভীত নিন্দা করা
হইল। বেঙ্গলী “দি হিয়ার ইজ অন ফায়ার” (“The heather
is on fire”) হেডিং দিয়া লিখিল—বরিশালের ব্যাপারে
সমস্ত ভারতবর্ষে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। যথেষ্টাচারের
প্রতিবাদ করিবার জন্য ভারতবাসী আজ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া
দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতায় লোকের মুখে মুখে ও সংবাদপত্র মারফত
দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইল কাব্যবিপ্লবের গান—

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ'ল জাতির ঘায়ে।

ঐ যে মায়ের দ্বয় গেষে যার বন্দেমাতরম্ বলে।

রক্ত বইছে শত ধার, নাই কো শক্তি চলিবার

এরা মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না, সহ্যে অত্যাচার।

আছে দিব্য চক্ষু যার, খোল ভবিষ্যতের দার

সময় হলে পশুবলের দেখবে প্রতিকার।

১১

আপিলের বিচারে ইজের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড, অন্যদ্বারে
দুই মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ইজদের এন্ট্রের টিকিট
করিমানার টাকা দাখিল করিয়া ইজকে সঙ্গে লইয়া আদালত
হইতে বাড়ীতে ফিরিলেন। জীবানন্দ আপিলের ফল শুনিয়া
একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। আর বিলম্ব না করিয়া
তিনি ইজকে সঙ্গে লইয়া রাজনগরে ফিরিবার ব্যবস্থা
করিলেন। হরিনারায়ণের কাছে ইজকে ফিরাইয়া দিতে
পারিলে তাঁহার একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অবসান হয়।

পরদিন রাজনগরে পৌঁছিয়া ইজকে সঙ্গে লইয়া জীবানন্দ
হরিনারায়ণের ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন স্মৃতি, চিত্রা ও লক্ষ্মী
তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া আছে, হরিনারায়ণ কি
বলিতেছেন। আগে চিত্রার দৃষ্টি পড়িল ইজের উপর। সে
উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল, বাবা, ছোড়দা খালাস
পেয়েছেন।

ইজ পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিল। হরি
নারায়ণ তাঁহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।
জীবানন্দের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ভায়া, তুমি আমাকে
নুতন জীবন দিলে। একটু রহস্যময় হাসি হাসিয়া তিনি

আবার বলিলেন, কিন্তু তোমার ঋণ আমি বাকী রাখব না,
সুদে-আসলে শোধ দেবার চেষ্টা করব।

পিতার কথা শুনিয়া চিত্রা লক্ষ্মীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া
একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, চল, আমরা কাকাবাবু ও
দাদার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি।

জীবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, কাকাবাবু, আপনি
জল খেয়ে লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি শোক পাঠিয়ে
কাকীমা'কে খবর দিচ্ছি যে পাদাকে দিয়ে আপনি কিরিয়েছেন।

জীবানন্দ বলিলেন, আমি স্নান না করে কিছু খাব না মা।
আমি এখন বাড়ী যাই, ওবেলা এসে তোমার হাতের সরভাজা
খাব।

লক্ষ্মীকে লইয়া চিত্রা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ সংক্ষেপে হরিনারায়ণের নিকট ইজের মোকদ্দমা-
সংক্রান্ত সমুদয় কথা বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন, দাদা,
এবার জঙ্গসাহেবের উপদেশমত কাজ করবার আয়োজন
করুন, আব দেরি করবেন না।

হরিনারায়ণ মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিলেন, আমি সে কথা ভেবে
মনস্থির করেছি। ওবেলা তোমাকে সব বলব। রাত জেগে
এসেছ, এবার বাড়ী গিয়ে স্নান-আঁহিক সেবে নাও গে।

লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া জীবানন্দ বাড়ী ফিরিলেন। পথে
লক্ষ্মী বলিল, আপনার নামে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে
কাল। মার কাছে রয়েছে, এখনও খোলা হয় নি।

টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া জীবানন্দ একটু ব্যস্ত হইলেন।
বলিলেন, তুমি ত ইংরেজী কিছু কিছু বুঝতে পার, বুঝে
দেখ নি কেন?

লক্ষ্মী বলিল, মা বললেন, তুমি কি বুঝতে কি বুঝবি, এখন
থাক, ভোর বাবা এসে বুঝবেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া জীবানন্দ জিনিসদ্বারী কাছে মোকদ্দমার
ফিরিস্তি দিলেন। বলিলেন, আমার কাঁধ ঝেঁড়ে মস্ত বড় এক
বোকা নেমে গেল। কত উপকার ওদের কাছ থেকে নিয়েছি,
এবার সামান্য কিছু ঋণ শোধ করার সুযোগ পাওয়া গেল।
সে কথা থাক। লক্ষ্মী বললে, কাল একখানা টেলিগ্রাম
এসেছে। বুঝে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিলে পারতে।

জিনিসদ্বারী বলিলেন, আজ তুমি না ফিরলে ভাই করতাম।
টেলিগ্রামখানা হাতে করে কেন জামিনে আমার মনটা একটু
খারাপ হয়ে গেল। বরিশাল থেকে এসেছে। কভারটা সেজন্ত
কাউকে দিয়ে খোলাই নি।

জিনিসদ্বারী দোভলায় নিজের ঘর হইতে টেলিগ্রামখানা
আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। জীবানন্দ খুলিয়া পড়িলেন।
তাঁহার মুখের চেহারার পরিভ্রম দেখিয়া জিনিসদ্বারী উদ্বিগ্নভাবে
বলিলেন, কি খবর আছে ওতে? কে পাঠিয়েছে?

জীবানন্দ স্নান হাসিয়া বলিলেন, এখানে- বনো, বলছি।

একমুঠা যে হবে আমার বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু বুঝলেই বা কি করতে পারতাম ?

জিনসনী অস্থির হইয়া বলিলেন, কি খবর আছে ওতে আগে বল না।

জীবানন্দ—খবর বুঝি চমৎকার। তোমার ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছে।

জিনসনী মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, দেবু গ্রেপ্তার হয়েছে ? কেন ? কি অপরাধ করেছে সে ?

জীবানন্দ হাসিলেন। বলিলেন, ইন্দ্রই বা এমন কি অপরাধ করেছিল ? ইন্সপেক্টর তার পাঠিয়েছে। গ্রেপ্তারের খবর দিয়ে লিখেছে পক্ষে বিস্তারিত জানাচ্ছে। টেলিগ্রাম থেকে শুধু এই সংবাদটুকু জানা গেল যে, দেবু বরিশাল কনফারেন্স সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়েছে। তোমরা বরিশাল কনফারেন্স সম্পর্কে কোন খবর পাও নি ?

জিনসনী বলিলেন, লোকে বলাবলি করছিল কাগজে নাকি খবর বেরিয়েছে পুলিশ জোর করে কনফারেন্স ভেদে দিয়েছে, লোককে মারধোর করেছে, সুরেন ব'ড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিস যখন মারধোর করছিল ছোটলাট ফুলারের প্রদত্ত ড্রফ্টও তখন নাকি মাঝ নদীতে দাঁড়িয়েছিল। লোকে ফুলারের যুগপাত করছে।

জীবানন্দ—যুগপাত হবে এবার আমার চাকুরির। সে যা হোক, ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই। এমার্সন ও ক্যাম্পের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমি পালিয়েছিলাম। ছেলেকে বাঁচবার চেষ্টা করি নি। একবার মনে হয়েছিল ওকে কলকাতা পাঠাই। তাও বলি, অবস্থা এখন সর্বত্র সমান। চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ক্যাম্প যখন একবার ওকে ধরেছে কিছুদিন জেল না খাটিয়ে ছাড়বে সে সম্ভাবনা নেই।

স্বামী কণা শুনিয়া জিনসনী বিষমভাবে বলিলেন, দেবুকে ছাড়বার চেষ্টা করবে না ? তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল।

জীবানন্দ বলিলেন, দেবুর বাপ পুলিশের চাকুরে না হলে চেষ্টা করা চলত। তুমি কি ভেবেছ দেবুর অপরাধের শাস্তি শুধু তার ওপর দিয়ে যাবে ? সে শাস্তির ভাগ আমাদের নিতে হবে না ? মন ধরাপ করো না। ওঠ, আমার স্নানের যোগাড় করে দাও।

জিনসনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, আমি মিত্রী ভিজিয়ে স্নানের যোগাড় করে দিচ্ছি। তুমি শুভকণ হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

মায়ের কাছে লক্ষ্মী তাঁহার দাদার খবর শুনিল। ইন্দ্র ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাঁহার মুখে কেমন একটু মিষ্ট

হাসির আমেজ লাগিয়াছিল। খবর শুনিয়া সে হাসি অন্তর্হিত হইল।

সন্ধ্যার আগে জীবানন্দ হরিনারায়ণের ঘরে গিয়া বসিলেন। ঘরে শুখন আর কেহ ছিল না। হরিনারায়ণ অনেক দিন পরে বেশ ভাল বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জীবানন্দ বলিলেন, দাদা, আপনাকে আজ অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে। আমার আশা হচ্ছে এ ঝাঝটি সামলে উঠবেন।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, আজ মনটা ভাল আছে তাই বাইরে থেকে দেখে তোমার ঐরকম মনে হচ্ছে। একটু হাঁটবার চেষ্টা করলে নিজেই বুঝতে পারি কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছি।

একটু থামিয়া বলিলেন, এ সব কথা যাক। একটা কাকের কথা বলছি শোন।

জীবানন্দ—কি কাকের কথা বলুন।

হরিনারায়ণ—ইজের বিয়ের কথা স্থির করেছি একরকম। এখন তোমার মত পেলে কথাটা পাকা হয়ে যাবে।

জীবানন্দ একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন—তু'দিনের মধ্যে— স্থির হয়ে গেল ? যেহেতু কোথাকার ?

হরিনারায়ণ একটু হাসিলেন। বলিলেন, তু'দিনের কথা কি বলছ ? এক দণ্ডের মধ্যে স্থির হয়েছে। তবে জানো কি মেয়ের বাপ এখনও এ বিষয়ে কিছু জানেন না।

জীবানন্দের বিশ্বাস বাড়িল। তিনি বলিলেন—আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে, দাদা।

হরিনারায়ণ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর জীবানন্দের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে লক্ষ্মী মাকে আমি নিতে চাই। বোম্বার সঙ্গে পরামর্শ করে মত জানিও।

জীবানন্দ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখে মুখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ। তিনি বলিলেন—দাদা, লক্ষ্মী অনেক ভপড়া করে এসেছিল, তাই আপনার ঘরে তার ডাক পড়েছে।

হরিনারায়ণ যুহুস্বরে বলিলেন—তোমার একথা ঠিক নয় জীব। লক্ষ্মী আমার সংসারের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তার কথা আমি ভুলেই ছিলাম। নিজের মন স্থির করার পরে বুঝিতে পারছি সে আমার অন্তরে কতখানি স্থান অধিকার করে রেখেছে।

একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন—তোমাকে কিছু জানাবার আগে আমাদের তু'জনের মধ্যে কথা স্থির হয়ে গিয়েছে। অবস্থা চির মধ্যস্থ ছিল। বটকাজির পাওনা তার প্রাপ্য। বোম্বাকে জানিয়ে রেখে।

জীবানন্দ বলিলেন—আমি মনে একটা ভাব নিয়ে এসে-
ছিলাম। এখন সে ভাব হাক্স হয়ে গিয়েছে।

হরিনারায়ণ বলিলেন—কিসের ভাব বল ভ।

জীবানন্দ টেলিগ্রামের কথা জ্ঞানাইলেন। শুনিয়া
হরিনারায়ণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর
বলিলেন—ঠিক হয়েছে। দেবু ও ইন্ড দুই বন্ধু। ইন্ড গ্রেপ্তার
হয়েছিল দেবু কি করে বাইরে থাকবে? এ নিয়ে বেশী মন
খারাপ করো না। আমার পরামর্শ শোন। বাড়ী যাও।
বোমার সঙ্গে পরামর্শ করে যত শীঘ্র সম্ভব বিষয়ের দিম স্থির
কর। বিয়েটা হয়ে থাক। তারপর তুমি বরিশাল গিয়ে দেবুকে
ছাড়ানো যায় কি না চেষ্টা করে দেখ। বিয়েটা হয়ে গেলে
আমরা দু'জনে একটা বড় দায় থেকে মুক্ত হই।

জীবানন্দ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—আপনি ভাল
পরামর্শ দিয়েছেন। আমি বাড়ী যাই।

তিন দিন পরে হরিনারায়ণের গৃহে একজন অপ্রত্যাশিত
অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সতীন।

সতীনের বেশভূষার পরিবর্তন হইয়াছে। সে এখন
গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। তাহাকে পাইয়া ইন্ড অত্যন্ত আনন্দিত
হইল। সতীনকে বলিল—সতীনদা, কিছুদিন আগে সারাক্ষণ
কেবল আপনার কথা ভাবছিলাম। ঠিকানা জানা ছিল না
নইলে চিঠি লিখতাম।

সতীনের আসিবার পথের পাইয়া জীবানন্দ আসিলেন, এগি-
ষ্টার্ট হেডমাষ্টার যতীনবাবুও হাজির হইলেন। বরিশালের
পথের সে কিছু জানে কি না জীবানন্দ সে বিষয়ে প্রশ্ন করি-
লেন।

সতীন বলিল—কনকারেল ভেঙে যাবার পরদিন আমি
বরিশালে গিয়েছিলাম। পথের সংগ্রহ করবার জন্য বদে-
শ-বান্ধব সমিতিতে গিয়ে সুনলাম পুলিশ কনকারেলের প্রথম দিন
দেবু, তার বন্ধু মহেন্দ্র বলে একটি ছেলে এবং আরও কয়েকটি
ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ তাদের বেচ্ছালেবকের
বাক্স কেড়ে নেয় ও তাদের ঘরে নিয়ে যায়, কিছু মারধর করে-
ছিল। একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল বরিশালে থাকতে থাকতে।
আমরা কথা বলছি এমন সময় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে
সেখানে এল। সুনলাম ছেলেটির নাম অতুল, সে দেবুর বন্ধু।
আমার পরিচয় পেয়ে অতুল বললে, এটি আমার মামাতো
বোন, মামা সুরমা। কনকারেলের দুই দিনের আবেশনেই ও
যোগ দিয়েছিল। ওদের বাড়ী ভূঁইলাসের রাজবাড়ী থেকে
প্যাণ্ডেলে যাবার রাস্তার ওপরে। নিজের চোখে চিত্তরঞ্জন ও
ব্রজেনকে অসহায় ভাবে পুলিশের মার খেতে দেখেছে।
বললে ব্রজেনের মাথায় লাঠি মারবার সময় সে চেঁচিয়ে গান
বরল—আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে, আমি কি মায়ের
সেই ছেলে—চিত্তরঞ্জনকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়ে মারছে,

যুগ যুগে সে পড়ে গেল, কাদায় ও রক্তে সারা গা, যুগ ভেসে
যাচ্ছে শুকুও থেকে থেকে সে চিংকার করছে—বন্দে মাতরম্।
এই দৃশ্য দেখে সুরমা সারাদিন না খেয়ে কেঁদেছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীন আবার শুরু করিল
—সুরমার যুগে সুনলাম, সত্য চিত্তরঞ্জনের বাবা যখন সারা
পায়ে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, ছেলে
মরে গেলেও তিনি কাদবেন না উপস্থিত মেয়েরা তখন যুগ
নামিয়ে কাদতে লাগলেন। কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে
বললেন, ভগবান, তুমি কি নেই? এতটুকু ছেলের ওপর এই
অত্যাচার তুমি কি চোখে দেখছ না?

অতুলের কথা শুনে আমি মেয়েটির দিকে তাকালুম।
তার চোখে যুগে কেমন একটা হতাশার ছাপ। অতুল বললে,
আমার বাবা যুগ-শস্যায়, ডাক্তার দেখাবার জন্য তাঁকে নিয়ে
শহরে এসেছি। ডাক্তারেরা বলেন, যে-কোন সময়ে শেষ হয়ে
যেতে পারে। তাঁকে ফেলে আমি কনকারেলে আসতে
পারি নি। সুরমা গিয়ে বরল, চল তোমার বদে-শ-বান্ধব
সমিতির সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করে আসি। ওর যুগ চোখের
ভাব দেখে বাবার কাছে থেকে উঠে আসতে হ'ল।

সুরমার দিকে ফিরে অতুল বললে, কি রে, কিছু বলবি?
সুরমা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমার কিছু বলবার আছে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। সুনলাম, সুরমা কিছু বলতে চাইছে,
কিন্তু বলতে পারছে না। তারপর হঠাৎ সে জোরে জোরে
বললে, চোখের ওপর এই অত্যন্ত দেখেও কি আপনারা
সবই চুপ করে থাকবেন? এত লোক, এত বড় বড় নেতা,
সবাই কি পড়ে পড়ে মার খাবার জন্য এসেছিলেন? এরই
জন্তে কি হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল সত্যায়। কত
পুলিস কত গুর্খা ছিল এমার্গনের ভাবে?

অতটুকু মেয়ের যুগে এই কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম।
এমন কথা সে ভাবতে পারল কি করে? ভাবতে শিখল
কার কাছে?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সতীন বলিল, এই মেয়েটির
কথা কয়েক দিন ধরে আমার মাথায় ঘুরছিল। সূলে পড়বার
দময় একটা ইংরেজী কবিতা পড়েছিলেন, A stormy petrel।
কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছিল আমি যেন ঠাঁই পেট্রেলের
পাখার ঝাপটানি শুনিছি মাথার ওপর।

সকলে চুপ করিয়া সতীনের কথা শুনিতেছিল। যতীন-
বাবু বলিলেন, সুরমা যা বলেছিল সেই ধরনের চিন্তা অত
লোকের মনেও জেগেছে। আমি কয়েকখানা কাগজ দেখেছি।
সভ্য লিখেছে, “আমাদের সামনে এই প্রশ্ন উঠেছে আজ গরু
ও ভেড়ার পালের মত চুপ করে মার খাওয়া ভাল না আত্ম-
রক্ষার জন্য লাঠির বদলে লাঠি চালানো ভাল।” অত এক-
খানা দেখলাম লিখেছে, “মা রক্ত চান। রক্ত বিনা মা

সন্তোষলাভ করেন না। যে মিলজের দল নির্বিবাদে মার খায়, প্রজ্ঞত হইয়া যাহারা করজোড়ে প্রহারকারীর কাছে সুবিচার ভিক্ষা করে মা তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না।” একখানা কাগজ আবার লিখেছে, “বাঙালী ছাড়া আর কোন জাতি হইলে মিঃ এলাসনের ছিন্নমুণ্ড ধুলার লুটাইতেছে দেখিতে পাইতাম। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে অস্ত্রের বিক্রমে অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে এবং নিরীহ বালকদের রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে ইংরেজের রক্তপাত করিয়া। এই রক্তপাতের পাপের দায়িত্ব আমাদের অভ্যাচারীদের।”

জীবানন্দ কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার জন্মগল কুণ্ঠিত হইয়াছিল। সজোরে তিনি মন হইতে দ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন, লক্ষণ ভাল নয়—সতীন, কি বলো? ইন্ডিয়ান মিররের মত ঠাণ্ডা মেজাজের কাগজ পর্যন্ত এই মর্মে লিখেছে দেখলাম—ক্ষমতামদমত্ত সরকারের পক্ষে জনসভার দমননীতি চালানো খুবই সহজ, কিন্তু তার ফল কি?—কল হচ্ছে গুপ্ত সমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠা।

হরিনারায়ণ বলিলেন, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পঞ্জাবেও নাকি বরিশালের ব্যাপার নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কালকার হিতবাদীতে দেখলাম খুব গরম গরম কথা লিখেছে, আর ইন্ডিয়ান মিরর যা বলেছে সেই রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

হরিনারায়ণের ঘরের চৌকাঠের বাহিরে একটি বালক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। সকলে আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে ইন্ডের চোখ পড়িল। ইন্ডকে চাহিতে দেখিয়া বালক হাত নাড়িয়া তাহাকে বাহিরে আনিতে ইচ্ছিত করিল। ইন্ড বাহিরে যাইতে সে বলিল, ইন্ডদাদা, মা ডাকছেন সন্ন্যাসী-বাবুকে।

সে সতীনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল। তাহার মুখে “সন্ন্যাসীবাবু” কথা শুনিয়া ইন্ডের মুখে হাসি দেখা দিল। বালকটি দেবানন্দের ছয় বছরের ভ্রাতা উমানন্দ, সকলে আনন্দ বলিয়া ডাকে। ইন্ড ঘরের মধ্যে ফিরিয়া সতীনকে বলিল, দাদা, ও-বাড়ীতে আপনার ডাক পড়েছে।

সতীন উঠিল। মাঠার যতীনবাবুও উঠিলেন। ইন্ড আনন্দকে বলিল, তুমি বাড়ী গিয়ে বল উনি যাচ্ছেন। সে চলিয়া গেল।

তিন জন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। যতীনবাবু পকেট হইতে একখানা খাতা বাহির করিয়া ইন্ডকে দিয়া বলিলেন, এই খাতার কথা তোমাকে বলেছিলাম। কয়েকখানা কাগজ থেকে সংকলন আছে এতে। এগুলোতে জাতীয় আন্দোলনের এক দিককার দৃষ্টি নির্দেশ করা হয়েছে। পড়ে দেখে আমাকে ফেরত দিও।

যতীনবাবু ভূখনকার মত বিদায় চাহিলেন। সতীন বলিল, আমি আজ রাতে চলে যাব। একটা কথা আপনাকে বলছি। আপনার ঢাকায় যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। বরিশাল, করিমপুর, মাদারীপুরে দল গড়ে উঠছে। জিতুদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। এর পর কুমিল্লা, মৈমনসিং প্রভৃতি জায়গায় যাবেন। সবকিছুর ভার এখন জিতুদার হাতে, আমি নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ইন্ড যতীনবাবুর খাতাখানি খুলিয়াছিল দেখিবার জন্য কিন্তু তাহার দুই কান একাধ হইয়া শুনিতেছিল সতীনের কথাগুলি। মাতার মৃত্যু ও পিতার অসুখের জন্য তাহার মনের পুরাতন যে সব চিন্তা চাপা পড়িয়াছিল আবার তাহার মাথা বাড়ি দিয়া উঠিল। নিজের মনকে সে প্রশ্ন করিল, আমিও কি সব ছেড়ে দিয়ে, দেশসেবার জন্য নিয়ে সতীনদার অনুসরণ করতে পারি নে?

জীবানন্দের বাড়ী যাইবার পথে ইন্ড নিজের মনের কথা সতীনকে বলিতে লাগিল। সতীন চুপ করিয়া তাহার কথা শুনিল। ইন্ড জানিত না যে, তাহার অনুপস্থিতিতে হরিনারায়ণ সতীনের কাছে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিক্রমেশ হইবার কলে তাহার জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু, ইন্ডের এখনকার মনোভাব, তাহার নিজের শারীরিক অবস্থা ইত্যাদির কথা জানাইয়া বলিয়াছিলেন, ইন্ড অতি বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ছেলে। দেশের বর্তমান অবস্থায় সক্রিয়ভাবে দেশের উন্নতি কিছু করতে পারছে না ভেবে তার মনে একটা অস্থিরতা এসেছে। আমি যে ওর প্রতি এতখানি লক্ষ্য রেখেছি তা সে জানে না। জীবানন্দের মেয়ের সঙ্গে আমি ওর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি। ইন্ড এতে অমত্ত করবে না মনে হয়। তোমাকে সে খুব ভক্তি করে। আমার বিশেষ অনুরোধ, সকল অবস্থা বিবেচনা করে এমন কোন পথ ওকে দেখিয়ে দাও যে, ওর মনে কোন ক্ষোভ না থাকে, আর আমার কাছে থেকে সরে যাবার কথা না ভাবে।

সতীন হরিনারায়ণকে বলিয়াছিল, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ইন্ডের কথা শেষ হইবার আগে তাহার জীবানন্দের বাড়ী পৌছিল। আনন্দ বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। ইন্ড বলিল, সতীনদাকে কাকীমার কাছে নিয়ে যাও, আমি বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছি।

সে পকেট হইতে যতীনবাবুর খাতাখানা বাহির করিয়া বাহিরের ঘরে বলিল।

সতীন ভিতরে গিয়া জিনিসদিকে প্রণয় করিয়া বলিল। বলিল, লক্ষ্মীদিদিকে দেখছি না কাকীমা, সে কোথায়?

জিন্মনী—সে পাশের বাড়ীতে গিছেছে একটু কাছে, এখনি আসবে।

জিন্মনী প্রথমেই দেবানন্দের খবর জানিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কত দিন জেলে থাকিতে হইবে, তাহার হাত পা বা মাথা ভাঙ্গিয়াছে কিনা। দেবানন্দের প্রসঙ্গ তুলিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া কেলিলেন। তার পর ইন্দের বিচার ও জরিমানার কথা হইল। শেষে হরিনারায়ণ কর্তৃক উপস্থাপিত লক্ষ্মীর সঙ্গে ইন্দের বিবাহ-প্রস্তাবের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন, তাঁদের ঘরের বোঁ হওয়া লক্ষ্মীর বহু জন্মের অপভার ফল। অনেক মত হেলেকে জামাই রূপে পাওয়াও আমার কম ভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও মনের ভর কেন যেন ঘুচেছে না বাবা। দেবু আর ইন্দ্ৰ একসঙ্গে স্বদেশীর কাছে নেমেছিল। ইন্দ্ৰ জেল থেকে ঘুরে এল। দেবুরও জেল হবে জানা কথা। ভয়ের কথা এই যে, অনেক দিন ধরে ইন্দ্ৰ বড় উন্নয়ন। দেখছি— জেল থেকে ফিরে ওর ঐ ভাব আরও বেড়েছে। লক্ষ্মীর ওপর ছেলেবেলা থেকে ওর টান আছে, লক্ষ্মী ওদের ঘরে থাকে, আমরা বিয়ের বন্দোবস্ত করছি, কিন্তু হেলের মুখে হাসি নেই। কর্তার কাছে শুনেছি দেশে নানা রকম সমিতি গড়ে উঠছে। এর পর বাড়ী ঘর ছেড়ে কোন দলে গিয়ে ইন্দ্ৰ যদি নাম লেখায় মেয়েটা আমার ভেসে যাবে। তুমি ওকে একটু ভাল করে বোঝাও বাবা, যাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।...

ওদিকে ইন্দ্ৰ বসিয়া থাড়া খুলিয়া পড়িতেছিল। প্রথমে কয়েক লাইন মন্তব্য :—“স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে প্রথমে যে প্রাণের স্পর্শ ছিল তাহা যেন হার্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিসের জন্ত এমন হইল তাহা চিন্তা করিতে গিয়া কয়েকখানি জাতীয়তাবাদী কাগজের উক্তি আমার চুপ্ত আকর্ষণ করিল। এই উক্তিগুলি হইতে আন্দোলনের একটা বড় ভ্রষ্ট চোখে পড়িল। এই ভ্রষ্ট কি সংশোধন করা যায় না?”

এই মন্তব্যের পরে বিভিন্ন কাগজ হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইন্দ্ৰ পড়িতে লাগিল—

১। “আমাদের সাধনার গতি পরিবর্তন করিবার সম্বন্ধ আসিয়াছে এবার। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণীর যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে কি উপায়ে সেই সংযোগ আবার স্থাপন করা যায় তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আবার আমাদের কাছে এখানে পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে দেশের অন্তরের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে। একদিন আমরা ভুল্লোলকেরা শৈবাল ও ঘাসে আচ্ছন্ন পুষ্করিণীর ধারে পূর্ণকীর আশ্রয়ী দেশের অন্তরকে ঘূর্ণান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ইংরেজের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম। আজ পিছনে ফিরিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের তরুণের দল এখানে এখানে

আতঙ্ক প্রতীতি করিয়া শক্তির চর্চা করিতেছে। আমাদের ইতর সাধারণের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে।

এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্ত পূর্ণকীরে গিয়া তাহাদিগকে বক্তৃতা করিতে হইবে না। স্নেহ ও সহনস্বভাব দ্বারা এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে হইবে। প্রতি যুবককে পাঁচ-ছয়টি করিয়া শিল্পশ্রেণীর পরিবারের সেবার ভার লইতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। বৎসরাধিক কাল এই সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিলে শিক্ষিত ভ্রষ্টশ্রেণীর সহিত শিল্পশ্রেণীগুলির সংযোগ আবার স্থাপিত হইবে।” (নবশক্তি)

২। বাংলায় আজ সমাজ-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। সমাজের পদদলিত, উপেক্ষিত শ্রেণীরা উচ্চশ্রেণীর অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে। আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহাদিগকে পদদলিত করিয়াছি। যে বিদেশী শক্তি অত্যাচারে অত্যাচারে আমাদের জীবন অর্জিত করিয়াছে, আজ তাহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছি সংখ্যানুসারে আমরা মুষ্টিমেয়। আমরা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক প্রবল শক্তিশালী বিদেশী বণিক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেখিতে পাউতেছি আমাদের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন নাই। আমাদের যুদ্ধ চালাইবার রসদ নাই, প্রয়োজনীয় শক্তি নাই।” (সঙ্ঘীবনী)

একবার পড়া শেষ করিয়া ইন্দ্ৰ দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইল এগুলির মধ্যে মূল্যবান ইঙ্গিত আছে। হয়ত তাহার ব্যক্তিগত সমস্ত সমাধানে উদ্ধৃতি-গুলি হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সে নিবিষ্ট মনে পড়িতেছে হঠাৎ লক্ষ্মী ভিতর-বাড়ীতে ঘাইবার উদ্দেশ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং ইন্দ্ৰকে দেখিয়া যেন একটু বিব্রতভাবে ধমকিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্ৰ যে ঘরে আছে সে জানিত না।

ইন্দ্ৰ থাড়া হইতে মুখ তুলিয়া লক্ষ্মীকে দেখিল, তাহার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিল। তাহার মুখে বোধ হয় তাহার অজান্তসারে যুদ্ধ কোতুকহাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল— যতীন দা. তেতরে কাকীমার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা কর।

লক্ষ্মী ভিতরে গিয়া দেখিল সতীন তাহার মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছে। সে কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। সতীন বলিল, তুমি এসেছ দিদি, তোমাদের কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল। একটা কথা বলি তোমাকে শুনে রাখ। দেবুর জন্ত মন খারাপ করো না তোমরা। তোমরা যে যুগে জন্মেছ সে যুগে বাংলার ঘরে ঘরে এ রকম ব্যাপার ঘটবে। মনকে শক্ত করে নিজের কাজ করে যেতে হবে। আমি বড় সুখী হয়েছি দিদি যে ইন্দ্ৰদের ভাড়া সংসার জোড়া দেবার

দেখ তোমার ডাক পড়েছে। ইজের মত ছেলে হয় না। ওকে আমি দেবুর মতই ভালবাসি। তোমরা দু'জন দু'জনকে পেয়ে সুখী হও ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

ক্রিয়মণী আঁচলে চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, বাবা, একটু বস। একটু কিছু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

লক্ষীকে বলিলেন, দুখানা আসন পেড়ে জল গড়িয়ে দে লক্ষী। ইজ বাইরে বসে আছে, ওকে ডেকে নিয়ে আর।

ক্রিয়মণী উঠিয়া দুইখানি পাথরের যেকাবীতে নানা রকম মিষ্টি সাজাইয়া আনিয়া আসনের সম্মুখে রাখিলেন। লক্ষী

জল গড়াইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, বা ইজকে ডেকে আন। ওর মা নেই, নিজে থেকে যত্ন-আত্তি করতে হবে, লজ্জা করবার অবসর নেই রে।

লক্ষী বরে ঢুকিয়া গুলিল, ইজ ও আনিমের মধ্যে দিদির বিবাহের নিমন্ত্রণ-রক্ষা-সম্পর্কিত আলোচনা হইতেছে। তাহার মুখে একটু লাল হইয়া উঠিল। মায়ের উপদেশ অরণ করিয়া লজ্জা দমন করিয়া সে বলিল, মা ডাকছেন ভেতরে।

ইজ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু হাসিয়া আনিমকে বলিল, এস আনিম, এখন থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়া শুরু করা বাক। (ক্রমশঃ)

লোকারাধনা না লোকবঞ্চনা ?

দাদা ধর্মাদিকারী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

বিধবিক্রয়ী আলেকজান্ডারের সময়ে ডায়োজেনিস নামে এক বিবাক্ষী ছিলেন। এই বিবাক্ষীর মন মনুষ্যজাতির উপর কথঞ্চিৎ ভিত্ত হইয়া পিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে ভিত্তবিরক্ত বৈরাগী মনে করিত। তাঁহার সম্বন্ধে এমন তিনটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহা দেশের বতর্মান অবস্থার আমাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইবে।

একদা দিন-দুপুরে লোকে দেখিল ডায়োজেনিস লণ্ঠন হাতে পথ চলিতেছেন। লোকে ত তাঁহাকে পাগল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পাগলামি যে এতদূর গড়াইয়াছে তাহা কেহ ভাবে নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই দিন-দুপুরে লণ্ঠন নিয়ে কেন? দিনের বেলা লণ্ঠন নিয়ে আলো খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি?” ডায়োজেনিস খুব শান্ত ভাবে কহিলেন, “আমি ইমানদার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।”

ডায়োজেনিস সহজে ইমানদার লোক খুঁজিয়া পাইতে-ছিলেন না। দিনের আলো যেখানে পৌছায় সেখানে যদি ইমানদার লোকের দেখা মিলিত তবে তাঁহাকে লণ্ঠন হাতে লইতে হইত না। অগ্রসিদ্ধ স্থানে ইমানদার লোকের খোঁজ করিবেন বলিয়া নিজ হাতে তিনি লণ্ঠন লইয়াছিলেন। তাঁহার মনের কথা ছিল, কে বলিতে পারে বেচারী ইমানদার লোক কোথায় লুকাইয়া আছে? কোন্ কোণে? কোন্ গুহার অভ্যন্তরে? কোন্ অন্ধকার ঘরে? তাই ত লণ্ঠন লইয়া তিনি বাহির হইয়াছেন।

ইমানদারীর ইন্তাহার

আমাদের প্রধান মন্ত্রী জবাহরলালজীও কংগ্রেসে ইমানদার লোকের খোঁজ শুরু করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “এবার টিকেট তাহাদেরই দেওয়া হইবে যাহারা ইমানদার।” ফল

হইয়াছে এই যে, নিজ নিজ ইমানদারী সপ্রমাণ করার পাজা লাগিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকের মাথায় একটি চিন্তা, নিজেকে অপর সকলের অপেক্ষা অধিক ইমানদার প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কেবল ইমানদার হওয়াই যথেষ্ট নয়। আরও দুইটি জিনিষের আবশ্যকতা ছিল। একটি এই যে, লোকে উহাকে ইমানদার বলিয়া জানে, অর্থাৎ সে যান্ত্রগণ্য ইমানদার লোক। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, ইমানদারী সপ্রমাণ করার সময় আসিলে সে যেন নিজেকে অযোগ্য প্রমাণিত না করে।

এ ব্যাপারে সকলের চেয়ে বড় প্রশ্ন হইতেছে এই যে এমন ইমানদার লোক দুনিয়ায় কত জন মিলিবে যাহারা একথা বলিয়া ও প্রতিপন্ন করিয়া বেড়াইবে যে, আমার চেয়ে অধিক ইমানদার লোক আর কেহ নাই। যে নিজেকে নিজেই ইমানদার বলে, লোকে তাহাকে সন্দেহ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ইমানদার সে নিজে ইমানদারীর ঢোল পিটায় না। সে ইমানদার হয়, আর লোকেও তাহাকে ইমানদার বলিয়া মানে। কেহ যদি তাহাকে ইমানদার না-ই বলে তাহাতে তাহার ক্ষেপ নাই। মুক্তিতর্ক ও দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে আপন ইমানদারী প্রমাণ করিতে সে চায় না।

অপরকে বেইমান সাব্যস্ত করার ইমানদারী

কিন্তু এবার ত ইমানদারীকে টিকেটের সত্ত্ব করা হইয়াছে। অতএব টিকেট যাহাদের চাই নিজ নিজ উর্দিতে তাহাদের ইমানদারীর নিদর্শন লাগাইতে হইয়াছে। ইমানদারীর মূল্য তাহাদের কাছে যতটা থাকুক না থাকুক, টিকেটের মূল্য ছিল ততোধিক। তাহারা ছাড়া পৃথিবীতে অপর কোন ইমানদার লোক নাই, ইহা ত সন্মাসরি বলিবার উপায় ছিল না। আর তাহাদেরই সমান বা তাহাদের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন

লোক নিজ নিদর্শন লাগাইয়া সামনে আসিয়া না দাঁড়ায় সে ব্যবস্থা করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অল্প কলা-কৌশলের আশ্রয় তাহাদের হইতে হইল। নিজ নিজ ইমানদারী সপ্রমাণ করা অপেক্ষা অস্ত্রের বেইমানি প্রমাণ করার পরোক্ষ উপায় তাহারা অবলম্বন করিল। নিজের তিল-পরিমাণ গুণকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া পর্বতপ্রমাণ ও অপরের তৃণখণ্ডও সামান্য দোষকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া মুম্বলাকার করার কলায় পারদর্শিতা লাভে তাহারা লাগিয়া গেল। সজ্জনের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা নিজদের তিলপ্রমাণ ক্রটিকে পর্বতপ্রমাণ মনে করেন, আর অস্ত্রের সর্বপরিমাণ গুণকে পর্বতাকার করিয়া দেখেন। কিন্তু ইমানদারীর বস্তমান প্রতিযোগিতায় আত্মসম্মতি আর পরনিন্দাই শালীনতার ও নৈতিকতার মূলমন্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

যথার্থ শ্রেষ্ঠত্বের দীতি

স্বামী বিবেকানন্দের একটি আখ্যান্তিকা প্রসিদ্ধ। শুনা যায় যে তিনি এক সময়ে কোন স্কুলে যাইয়া গড়ি দিয়া বোর্ডে একটি রেখা টানেন ও ছাত্রদের বলেন, দেখ, এই রেখাটি না মুছিয়া, নিশ্চিন্ত না করিয়া, না কাটিয়া, ছোট করিয়া দেখাও। বালকদের কাছ হইতে উত্তর আসিল—সাবধানতার সহিত প্রদত্ত উত্তর। বেশ ধানিক পরে একটি ছেলে নীরবে আসিয়া ঐ রেখার নীচে উহা অপেক্ষা বড় একটি রেখা টানিয়া দিল। ব্যস, প্রথম রেখাটি ছোট হইয়া গেল। উষেদারদের প্রতিযোগিতায় যদি এই দৃষ্ট দেখা যাইত তবে জবাবদারদের পক্ষে ভারতকে নন্দনকাননে পরিণত করা অসম্ভব হইত না।

কিন্তু হইয়াছে একেবারেই উহার বিপরীত। টিকেটের উষেদারগণ লঠন লইয়া ইমানদারীর সন্মানে নহে, বেইমানির খোঁজে লাগিয়া গেল আর দেখিতে পাইল যে, তাহারা হাড়া দেশের আর সকলেই বেইমান। যতগুলি রাজনৈতিক দল আছে তাহারাও সকলে আপন আপন সন্ধানী আলো লইয়া অপর সব দলের বিশ্বাসঘাতকতার উপর রক্ষিপাত করিতে আরম্ভ করিল। জনগণের কাছে সকলে আজ একে অস্ত্রের বেইমানি ও দোষোদ্ধাটনে মশগুল। যে দৃষ্ট তাহারা আমাদের দেখাইতে চাহে তাহা কি নরক হইতে অভিন্ন? দুর্বো-ধমকে বলা হইল, ‘একজন সজ্জন লোক খুঁজে আন।’ এখানে ওখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, ‘কোন সজ্জন মিলিলো?’ দুর্বোধন বলিলেন, ‘ধাকলে তো পাব।’ ধর্মরাজকে বলিলেন, ‘তবে তুমিই খুঁজে আন?’ ধর্মরাজ দুর্বোধন হইতেই সজ্জন খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ‘লোকে ধামকা একে দুর্বোধন বলে, এ লুবোধন।’ ইহাই সজ্জনের দৃষ্টির মূল কথা। কিন্তু শুনেতে পাই রাজনীতিতে উহা অচল। না, ঠিক। অ-রাজনৈতিকতাই আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ হউক।

গণভক্তের বিপদ

মা এক দিন বলিলেন, যে যোদ্ধা চাহিবে না সে যোদ্ধা পাইবে। আর কি? না-চাওয়ার ‘মেনিফেস্টো’ বাহির হইতে লাগিল। প্রত্যেকে টেচাইয়া বলিতে লাগিল, ‘দেখ, আমি কিন্তু যোদ্ধা চাচ্ছি না।’ ইহার অন্তর্ভুক্ত যে অংশ প্রত্যেকেরই মনে ছিল তাহা এই—‘এ কারণেই ত যোদ্ধা আমার প্রাপ্য।’ কেহ বা অল্প স্বরে মনের কথাটা ব্যক্তই করিয়া ফেলিল। কথা হইতেছে গণভক্তের ও সজ্জনতার মিলন কি আদৌ সম্ভব নহে? তাহা যদি সম্ভব না হয় ত গণভক্তের মঙ্গল নাই।

সর্বোদয়-নিষ্ঠার সাধনা

আমাদের দেশে কতকগুলি ঠাঠাশী ও গীঠাশী দিনে মশাল জালাইয়া চলে। ইহা পঞ্চাশ সাধন নহে। তাহারা ঘুনি জালায় না, মশাল লইয়া চলে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করেন ত খুব সম্ভব তাহারা বলিবে যে, এই সব মশাল খুবকে আলো দেওয়ার অস্ত্র। অল্পসিতে জল লইয়া আমরা কি সমুদ্রকে স্থান করাই না? ছোট একটি বাতি জালাইয়া খুবকে দীপ দর্শন করাই না মাকি? করাইয়া থাকি, তাহাতে আর সংশয় কোথায়? কিন্তু পার্থক্য এইখানে যে আরতিতে থাকে আত্মসমর্পণের আকাজক্ষা, আর ইহাতে রহিয়াছে প্রদর্শনের ভাবনা। বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা আপন আপন মশাল লইয়া বাহির হইয়াছে, কিন্তু গণদেবতাকে দীপদানের নিমিত্ত নহে, পরস্পর আপন আপন আলোতে চক্ষু বলসাইয়া দিয়া তাহাদের ধার্মা-লাগাইবার গরজে। ইহা লোকারণ্য নহে, লোক-বঞ্চনা। লোকসেবার ইহা প্রশস্ত পন্থা নহে। গণভক্তকে যদি লোক-বিদ্বেষের বাহনে পরিণত করিতে চাহি ত আমাদের অস্ত্র সব প্রক্টিয়া খুঁজিতে হইবে। সর্বোদয়ে নিষ্ঠাপরায়ণদের এই সাধনা হওয়া চাই।

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নিবেদন

রাষ্ট্রনেতা ত্রিভুবনচন্দ্রসিংহ ও বিভিন্ন পক্ষের প্রধান প্রধান নেতাদের পুনঃ পুনঃ বলি যে, মির্ভাচনের নেশায় আমরা যেন সভ্যতাকে বিদায় না দিই। কিন্তু সম্ভ্রান্তি কিছু দিন যাবৎ কমপক্ষে তিন জন নেতৃপ্রধান একে অস্ত্রের উপর মাথা ধারাপ হওয়ার অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহার কোন ভাল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া দরকার। ইহা যদি পরিহাস মাত্র হয় ত আপত্তির বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু স্বল্পবয়স্ক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অহুগামীরাও তাহাদের একপ রসিকতার অহুকরণ আরম্ভ করিতে পারে। তাহা হইলে ভব্যতার লেশমাত্র থাকিবে না। সুদে এক নেতা অপরকে বলিবে, ‘তোমার বুদ্ধিবৈকল্য ঘটয়াছে।’ উত্তরে অপার ব্যক্তি বলিবে, ‘তোমার মগজ পচিয়া গেল হইয়াছে, দুর্গন্ধে টেকা দায়।’ একপ ব্যাপারের পর আবার যে তাহারা

পরস্পরের উপর অগণ্ডি পুষ্পবৃষ্টি করিবে, ইহা অলীক কল্পনা মাত্র।

পাকীজী আমাদের সার্বজনিক বাদ-বিসংবাদকে এক অতি উচ্চ স্তরে উঠাইয়াছিলেন। জনসভাতেও অহুশাসন ও ভাব্যতা যত্নপূর্বক রক্ষিত হইত। এখন কোন নেতা যদি অপর কোন নেতার প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার মাথা ধরাপ হইয়া গিয়াছে ত জনসাধারণের দৃষ্টিতে সকলেরই প্রতিষ্ঠার হানি ঘটবে। তাই শ্রেষ্ঠদের কাছে নিবেদন নির্বাচনের ক্ষমতা যেন তাঁহার নিজ নিজ বাণী কলুষিত না করেন।

প্রভু-বাসনা

ডায়োজিনিস সম্বন্ধে তৃতীয় গল্প এই যে, নিলামের ক্ষমতা যখন তাঁহাকে দাসের বাজারে রাখা হয় তখন খরিদারেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “তুমি কি কাজ জান?” তিনি বলেন, “আমি একটি মাদ্রাই কাজ জানি, আর তাহা হইতেছে মাদ্রাইয়ের উপর প্রভু কর। ইহাই আমার পেশা। যাহার মালিকের প্রয়োজন সে আমাকে কিনিতে পারে।” বিভিন্ন দল হইতে যাহারা নির্বাচনপ্রার্থী, তাহারা সাধারণ লোক একথা যেন কেহ মনে না করেন। তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি ডায়োজিনিস। প্রভুদের বাসনা তাহাদের মজাগত, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে।

নোকরিসিরির উমেদার

তবে ডায়োজিনিস ও উহাদের মধ্যে ব্যবধান এইটুকু যে, ডায়োজিনিস শব্দগুলি প্রয়োগ করিতেন উহাদের রূঢ় অর্থে, ইহারা করেন অস্বাভাবিক। দরবারী ভাষায় কোন শব্দ কখনও উহার ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তদনুসারে কোন সরকারী চাকর্যকেই সরকারী চাকর্যে বলা হয় না—তাঁহাদের বলা হয় সাধারণের ভৃত্য। উহাদের নাম—পার্লি সার্ভেটস্। হিন্দীতে নোকরী, খিদ্মৎ ও সেবা, এই তিন শব্দের প্রয়োগ তিন অর্থে হইয়া থাকে, কিন্তু এ সবের ক্ষমতা ইংরেজীতে একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়—সার্ভিস্। সংস্কৃতে সার্ভিস্ পর্যায়বাচী শব্দ

হইতেছে সেবা। অর্থাৎ যত সব সরকারী চাকর্যে সকলেই লোক-সেবক। যখন তাঁহারা সরকারী চাকরির ক্ষমতা দরখাস্ত করে তখন তাঁহারা সেবার উমেদার হন। আর তাহাদের মধ্যে কেহ সেবার অধিকার পাইলে, সাধারণতঃ বিনা ঘুষে, বিনা মুখঝামটার কাজ করেন না। আমাদের প্রতিনিধিও আমাদের ‘নোকর’। যখন নির্বাচনপ্রার্থী হন তখন তাঁহারা নোকর-সিরির উমেদার হন। কিন্তু নোকর হওয়ার পরে জন-সাধারণকে ইহারা অধিকাংশই নাবালক বা বিধবা জীলোকের মত অসহায় মনে করেন। তাই অতি উগ্রভাবে তাহারা প্রভু করিতে থাকেন। আজ তাঁহারা আমাদের সম্মুখে খাড়া হইয়াছেন। তাঁহাদের মাথার উপরে লেবেল খাটা—যাহাদের সেবক দরকার, তাহারা আমাদের কিনিয়া লউন। কিন্তু এখানে সেবকের অর্থ মালিক। নিরক্ষর জড়ভাবাপন্ন মূঢ় জনগণ জিজ্ঞাসা করে, “ইহা কিরূপ বিপরীত গণতন্ত্র?”

প্রার্থীদের প্রতি

ডায়োজিনিস সম্বন্ধে তৃতীয় জনপ্রতি এই যে, এক দিন তিনি এমন বলিয়া আছেন, এমন সময় আলেকজান্ডার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আলেকজান্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” ডায়োজিনিস উল্টা প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কে?” জবাব আসিল, “আমি পৃথিবীজয়ী আলেকজান্ডার।” ডায়োজিনিস কহিলেন, “তুমি আলেকজান্ডার ত আমি ডায়োজিনিস।” আলেকজান্ডার অতিশয় গর্বভরে কহিলেন, “আমি তোমার ক্ষমতা কি করিতে পারি?” ডায়োজিনিস কহিলেন, “স্বর্ধকে আবৃত করিয়া ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছি, সরিয়া গেলে মহা উপহৃত হইব।” “আলেকজান্ডার না হইলে আমি ডায়োজিনিস হইতাম”—এই বলিয়া আলেকজান্ডার চলিয়া গেলেন।

ভাল, কোন উমেদারের এ ধরনের কথা কখনও কি মনে হইয়াছে? গঠন-কর্মরত সেবকদের নিকট ইহাই মাত্র অহরোধ যে, ক্ষমতাকাজী ও ক্ষমতা অধিকারী লোকেরা রূপা করিয়া যেন তাঁহাদের ও স্বর্ধের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

হুসেন সাগর, হায়দরাবাদ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালো জল আর কালো আকাশ
আকাশে চাঁদ,
তারার দল,
দূরে দূরে জলে প্রাণীপমালা।
সেতুর উপরে আমরা হুঁক্ষন,
আমাদের মনে আলোক জ্বালা।

মোর মন আর তোমার মন,
উজ্জ্বল জল,
কে বাঁধে সেতু?
হাসিছে স্বপন চাঁদতারার।
শোন অশান্ত দূরের বাতাসে
ওপারের ঢেউ ভাঙে এপার।

আনারকলি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

(সভ্যমূলক নাটক)

পঞ্চাংশ

আনারকলি (পূর্বে আয়েষা) নাম্নী কাবুলের মুন্সী মহিউদ্দিনের পরমা হুম্মরী কস্তা যুবরাজ সেলিমের চিত্রমাত্র দর্শনে মোহিত হইয়া, গোপন প্রেমে আত্মহারা হয়। এবং শিডামাতার বহু অনুনয় সত্ত্বেও অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে অসম্মত হয়। তাহার এই ভাবের বৈলক্ষণ্যের কথা শুনিয়া কাবুলের হিন্দু শাসনকর্তা দেওয়ান মাধব রাও তাহাকে অত্ম-মনস্ত করিবার উদ্দেশে দিল্লী পাঠাইবার পদ্যমর্শ ও সাহায্যদান করেন। সেখানে যাইয়া সে যুবরাজের বাঞ্ছিত প্রণয়লাভে সক্ষম হয়, কিন্তু সেই কারণেই আকবর শাহের কোপদৃষ্টিতে পড়ে; এবং বীরবলের মন্ত্রণার ফলে বিচারান্তে তাহাকে জীবন্তে কবর-দিবার ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। লাহোরে এখনও আনারকলির হুম্মর সমাধি দৃষ্ট হয়, তবে এই নাটকের বাদবাক্য ঘটনা অনেকাংশে কল্পনামূলক।

নাটকীয় পাত্র-পাত্রিগণ

পুরুষ

আকবর শাহ—	দিল্লীর বাদশা
বীরবল—	ঐ, মন্ত্রী
ফৈজী—	ঐ, রাজকবি
সেলিম—	ঐ, যুবরাজ
কাজী সাহেব—	ঐ, বিচারপতি
দেওয়ান মাধব রাও—	কাবুলের শাসনকর্তা
ইলাহী বক্স—	ঐ, নগরপাল
মুন্সী মহিউদ্দিন—	ঐ, সেরেস্তাদার,

আয়েষার পিতা

ওমরাংগণ, আদালতের কর্মচারীবৃন্দ ও প্রতিহারিগণ।

স্ত্রী

আমিনা—	মহিউদ্দিনের স্ত্রী
আয়েষা—	ঐ, কস্তা
মতিজান দর্জিনী—	আয়েষার সখী
রোবেনামা—	কাবুলের কাজীর কস্তা
মেহের-উল্লিসা—	দিল্লীর অন্দরমহল রক্ষী
সাকিনা—	ঐ, বেগমবিশেষ

অন্তঃপুরিকাগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মাধব রাওয়ের সভাগৃহে মুন্সী, মহিউদ্দিন ও দেওয়ান মাধব রাও আসীন। উভয়পার্শ্বে দুই চোপদার কেরামত ও নেয়ামত দণ্ডায়মান।)

মাধব। মুন্সীজী, সেই ফারুসী ব্যেতটা আর একবার

বল ত, যাতে আছে যে “বিদ্যাৎ পড়ুক”, “বিদ্যাৎ পড়ুক” বলতে বলতে বিদ্যাৎ পড়ল। সেটা মনে আছে?

মুন্সী। আছে বই কি, হজুর। সেই অভিনায়ে বিদ্যাতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক— যদি বিদ্যাৎ পড়ে ধনধান্য জলে যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নয়।

মাধব। আমিও তাই বলতে চাই যে, আমরা যেমন বলাবলি করছিলাম সব বড় চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে, একটা লড়াই নেই, একটু লুঠতরাজ নেই, আমাদের বীরপুরুষেরা তবে বীরত্ব দেখাবে কিসে? তেমনি ভগবান যেন আমাদের মনের আঞ্জি শুনেই লাণ্ডিকোটাল থেকে খামকা এক দল ডাকাত পাঠিয়ে দিলেন।

মুন্সী। খোদাবন্দ! তাতে ছেলেদের তাকত দেখাবার সুবিধে হতে পারে বটে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে একটু মুশকিলের কথা হয়ে পড়ে।

মাধব। কেঁউজী, তোমার ঘরে কিছু মুশকিলের কারণ ঘটেছে নাকি?

মুন্সী। মুশকিলও হয়েছে, মুশকিল-আসানও হয়েছে। সেই কথাটা বলতেই ত হজুরের দরবারে আজ সন্কালে ছুটে এসেছি, আর আমার মেয়েকেও আনতে পাঠিয়েছি।

মাধব। তোমার মেয়ে? আয়েষা? কেন তার আবার কি হয়েছে? তার মত সুন্দরী কাবুল শহরে আর একটি নেই।

মুন্সী। সেই ত হয়েছে বিপদ, হজুর। কালো কুৎসিত হলে ত কোন ভাবনাই ছিল না। পাড়ার ছেলেদের জালায় তার একটু জানলার ধারেও দাঁড়াবার জো নেই। আবার যদি বোরখা পরে মেয়েদের সঙ্গে একটু হাওয়া খেতে বেরল ত পড়ল ডাকাতির স্বনজরে।

মাধব। (উত্তেজিত) বল কি মুন্সীজী? তাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে? রাধামাধব!

মুন্সী। আজ্ঞে, যদি ধরে নিয়ে যেত তা হলে কি আর হজুরের কাছে মুখ দেখাতে আসতুম? এই, কেরামত!

কেরামত। জী হজুর!

মুন্সী। এক বার দেখ ত আয়েষারিবি অন্দরমহলে এসেছেন কিনা? বল, মুন্সীসাহেব তাঁকে বাইরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কেরামত। যো হকুম মুন্সীজী। (প্রস্থান)

মুন্সী। যে বীরপুরুষের কথা এখনি হচ্ছিল, তাদের মধ্যে দু'তিন জন যদি সেদিন প্রাণ হাতে করে আয়েষাদের উদ্ধার না করত, তা হলে এই বুড়ো বয়সে আমার মান-ইজ্জৎ সমস্তই খোয়া যেত, আর আমিও দেশত্যাগী হতুম।

মাধব। (উৎকণ্ঠিত) বল, বল কি হয়েছে মুন্সীজী; আমাকে আর সংশয়ের দোলায় ঢুলিও না।

(প্রথমে কেরামত, পরে বোরখাপরা আয়েষা,
পরে ইলাহী বক্সের প্রবেশ)

মুন্সী। এই যে হুজুর, যাদের গল্প তাদের কাছেই এবার ভাল করে সব শুুনুন।

মাধব। আয়েষাদিদি, তুমি বোরখা খুলে ফেলে ভাল হয়ে বসো। ভয় নেই, তোমাকে লুঠ করে নিয়ে যাবার জন্তে এখানে কোন ডাকাত ওং পেতে বসে নেই।

আয়েষা। (বোরখা খুলিতে খুলিতে) বাবা, তুমি কেন ও-সব কথা হুজুরকে বলে দিলে! আমার বুঝি লজ্জা করে না?

মুন্সী। তোমার লজ্জা করবার বয়স হয়েছে, সে কথা তুমি নিজেই তুলিয়ে দাও যে মা! তা ছাড়া আমি এখনও হুজুরকে কিছুই বলি নি, তোমাদের নিজের মুখেই সব শুনবেন বলে তিনি বসে আছেন।

আয়েষা। তুমিই তাঁকে গল্পটা বল না বাবা, তুমি ত সবই জান।

মুন্সী। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, সাতটা বেজে যেতেই তোমার মা মরিয়মকে পাঠালেন মোতীববির ওখানে, আর মজিদকে পাঠালেন ইলাহী বক্সকে ডাকতে। আর আমাকে কোথায় পাঠাতে চান তা যদিও—পষ্ট করে বললেন না, কিন্তু দিনরাত কেবল লেখাপড়া নিয়ে থাকি আর ছেলেমেয়ের কোন খোঁজখবর রাখি নে বলে বকতে বকতে এমন তুলকেলাম বাধিয়ে দিলেন যে, আমি মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্ত আস্তে আস্তে পাগড়ী আর লাঠি নিয়ে রাস্তায় যেমনি বেরিয়ে পড়েছি, অমনি দূর থেকে দেখলুম আমাদের ইলাহী সাহেবের সঙ্গে একটি ছোট্ট মেয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসছেন; দেখে প্রাণটা স্বচ্ছ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যদিও তার ধীর গভীর চাল দেখে কারও হঠাৎ বোঝবার সাধ্য ছিল না যে, সে আমাদের এই নাচুনে আয়েষারানী!

আয়েষা। আমি কিন্তু একবারও কান্দি নি বাবা, তুমি বরং মোতীবদিকে জিজ্ঞেস কর।

মাধব। না দিদি, আফগান মেয়েরা বিপদে পড়লে কখনও কান্দে না, আর আফগান ছেলেরা ত হাসে। কি

ইলাহী বক্স, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনবার জন্ত যে আমরা উৎসুক হয়ে বসে আছি।

ইলাহী। হুজুর, বেশি ত কিছু বলবার নেই। আমিনা বিবির অল্পরোধে তাঁর মেয়েদের খুঁজতে বেরিয়ে, দেওদার বনের বাইরে আবদুল আর আহমেদকে রেখে আমি ভেতরে ঢুকলুম। ঘুরতে ঘুরতে ফুলের মালা, ভাঙ্গা পেয়াল প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণে যখন সন্দেহ হ'ল যে, একই আগেই সেখানে আয়েষাবিবরা ও ডাকাতের দলবল এসে চলে গেছে তখন তাড়াতাড়ি আবদুলদের ডেকে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ছটলুম। একটু পরেই দূরে দুটো আলো দেখতে পেয়ে উর্দ্ধ্বাসে দৌড়ে গিয়ে দেখি দুই বেটা ডাকাত আয়েষাবিবদের সঙ্গে নিয়ে গভীর বনের দিকে চলেছে। বেগুফরা আমাদের সাড়া পেয়েই ফিরে দাঁড়াল, আর মশাল ফেলে ছোড়া উঁচিয়ে আমাদের মারতে এল। আবদুল আর আহমেদ তখন চট করে তাদের ডান হাতে এমন জোরসে দুই লাঠির ঘা কসিয়ে দিলে যে, ছোরাগুলি দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তার পর আমরা তিন জনে তিন জ্বর লাগি মেয়ে তাদের মাটিতে পেড়ে ফেললুম, আর তাদেরই ছোরা তাদের বুকে বসিয়ে মেয়েদের নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে পড়লুম। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে, আগে তাদেরই পাগড়ী দিয়ে তাদের গাছের সঙ্গে কসে বেঁধে ফেলেছিলুম; বোধ হয় এখনও তারা সেই অবস্থায় সেখানেই পড়ে রয়েছে।

মাধব। আর বোধ হয় মামদো ভূতের ভয়ে ও-পথ দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। ভালই হ'ল—আমার দেবদারু গাছগুলো তা হলে একটু বাঁচবে!

আয়েষা। (অনাস্তিকে বাপকে কিছু বলিল)

মাধব। কি, আয়েষা-দিদি! যা বলবার আছে খুলে বল না, লজ্জা কিসের?

মুন্সী। হুজুর, ও বলছে, যিনি এতক্ষণ গল্প বললেন, তিনি আর সব কথা ঠিকই বলেছেন, কেবল নিজের বীরত্বের কথাটা চেপে গিয়েছেন। ডাকাতরা মাটিতে পড়ে যাবার পরেও অত চট করে গাছের সঙ্গে বাঁধা পড়ে নি; শেষ পর্যন্ত লাগি ঘুষি কামড়, কোনটাই বসাতে ছাড়ে নি। শেষে একজন কোথা থেকে এক চাকুছুরি বের করে ইলাহীর হাতের কবজায় বার বার খোঁচা মারায় বাবু বাবু করে রক্ত পড়তে লাগল; তবু ইলাহী সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করে, তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে, তবে ক্রমাল দিয়ে নিজের হাত বাঁধলে। ঐ যে সেই রক্তমাখা ক্রমাল এখনও হাতে জড়ানো রয়েছে, দেখুন না।

মাধব। দেখি ইলাহী? তাই ত। আবার কুমালের উপর একটা শুকনো ফুলের মালা কেন? এ-কি ব্যথা কমাবার ওষুধ নাকি? কোথায় পেলো? কে দিলে?

ইলাহী। আজ্ঞে, কেউ দেয় নি, আমি আপনাই বন থেকে কুড়িয়ে এনেছি। কিন্তু ব্যথা ত কমে না।

মাধব। সাবাস ইলাহী, তোমার হিম্মতের কথা শুনে আমার বড় মেজাজ খোশ হ'ল।

ইলাহী। আমি কেবল নিজের কর্তব্য কাজ করেছি হজুর, তার বেশি কিছু নয়।

মাধব। প্রজার ধেমল কর্তব্য আছে, রাজারও তেমনি কর্তব্য আছে। এই, নেয়ামত!

নেয়ামত। জী, হজুর!

মাধব। খাজাঞ্চীকে বল কোতোয়াল সাহেবকে এক হাজার আসরফী এখনি বক্শিশ করতে।

নেয়ামত। ধো হুকুম, হজুর!

ইলাদী। হজুরের অহুগ্রহ অসীম, কিন্তু (আয়েষার দিকে আড়চোখে চাহিয়া) আমার বক্শিশ আগেই মিলে গেছে।

মাধব। নেয়ামতের সঙ্গে যাও, ইলাহী। আর সর্বদা মনে রেখো যে, দেশ-তোমার মত সুপুত্রই চায়। কিন্তু শুধু দু'জনকে নয়, দলহুদু ডাকাতকেই দেশছাড়া করা চাই, বুঝলে?

ইলাহী। (সেলাম করে) —আল্লার দোয়ায় তাই হবে হজুর। (প্রস্থান)

মুন্সী। এবার তুমি অন্দরে যেতে পারো মা। আমি হজুরের সঙ্গে দুটো কথা বলেই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্ত খবর পাঠাব।

মাধব। মুন্সীজী, তোমার মেয়েকে একটা গান শুনিয়ে যেতে বল না। সকলের মুখেই ত শুনতে পাই ওর ধেমল রূপ, তেমনি গুণ।

মুন্সী। হজুর, আমাদের দেশে মেয়েদের রূপ থাকলেই বা কি, গুণ থাকলেই বা কি? জ্ঞান হতে না হতে তারা হৌরে জহরতের মত লোহার সিন্দুকে বন্ধ হয়ে যায়, ফুটতে না ফুটতে তারা পোকা-কাটা ফুলের মত মাটিতে ঝরে পড়ে। আয়েষার গলাটি মিষ্টি, কিন্তু কোনরকম শিক্ষা ত পায় নি। এই আমি নিজে যেটুকু জানি তাই শিখিয়েছি, আর আপনার বাড়ীর নাচগানের মজলিস দেখে শুনে এক আধটু যা শিখতে পেরেছে! তবে আপনি যে ওর গান শুনতে ইচ্ছে করেন, সে আপনার মেহেরবানী।

—কেরামত! হোসেন খাঁর কাছ থেকে এক জোড়া

বাঁয়া-তবলা আর ঘুড়ুর শীত্র এনে দাও ত, আর ঐ দিলরুবাটা এগিয়ে দাও। (কেরামতের তথাকরণ)

সেই যে ফারসী গানটা আমি ভালবাসি, সেটা হজুরকে শুনিয়ে দাও ত মা!

আয়েষা। (দিলরুবা বাজিয়ে গান) —

হাল মে হবে রবা।

তু আপনে ফজল করি, দমমে রবসাঁই।

সুপ্রদম তোর, মাছি খেনরা

তুদানি, হিসাবে কসো বেসরা।

মাধব। বাঃ বাঃ, বড় সুন্দর। কিন্তু গানটা কিছু গম্ভীর, সুরটিও বড় কৰুণ। ওর বয়সের উপযুক্ত আর একটু হালকাভাবে একটা কিছু গাইতে বল না মুন্সী।

মুন্সী। আচ্ছা আয়েষা, তোমার ছেলেবেলায় আয়াজী যে নাচগান করে তোমাকে ভোলাত, সেইটে হজুরকে দেখিয়ে দাও না?

আয়েষা। সে ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে হজুর হাসবেন নিশ্চয়। (কেরামতের বাঁয়াতবলা ও ঘুড়ুর আনয়ন। মুন্সীর সঙ্গত করণ ও আয়েষার ঘুড়ুর পরা)।

মাধব। তাই ত চাই বিবিজী। আমাদের দেখিয়ে দাও যে ডাকাতরা তোমার হাসিটি চুরি করে নিয়ে যায় নি। তা ছাড়া আমারও ভিতরের ছেলেমানুষটি ত এখনও একেবারে মরে নি, দাড়িগোঁফে ঢাকা চাপা আছে মাত্র। তাকেও মাঝে মাঝে খোরাক দিয়ে জীইয়ে রাখা চাই ত?

আয়েষা। (নাচ ও গান)

কোন এদিসি সখি চতুর না মিলে

মোরে পিকে দুয়ারমে পৌছা দেতি (আরে হাঁ হাঁ)।

মেরে মনমেত আয়া কি যোগন বসু,

আওর মলকে বভুত মদিনে চলু।

সখি হিন্দী কি নগরীমে কাহে রহ,

— নেহি ক্রীতকি চৈন জরা দেতি (আরে হাঁ হাঁ)।

সখি সাত সমুদর পার ভয়া,

মেরে জজমেত চলনে ন জোর হাওয়া,

কোই আতি মদিনে সে এসি হাওয়া,

নব মলকে আবার কো উড়া দেতি (আরে হাঁ হাঁ)।

মাধব। (হাততালি দিয়া) —সাবাস! সাবাস! এই ছেলেমানুষির ভিতর আসলী মাল লুকনো রয়েছে, তা কিন্তু বলে রাখলুম। পরে দেখে নিও। আমাদের চোখ এই দেখতে দেখতে বুড়ো হতে গেল, কিসে কি হয় তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। নাও, আয়েষাবিবি, আমার গলার এই হারটি তোমাকে বক্শিশ করলুম। যার গলায় তুমি মালা দেবে, সে ভাগ্যবান পুরুষ না জানি কোথায় ব'সে দিন গুন্ছে!

মুন্সী। মা আয়েষা, এবার তুমি বাড়ী যাবার উত্তোগ কর গে; জানই ত দেরি হলে তোমার আমার কপালে কি আছে!

আয়েষা। তুমি যে চূপ করে থাক বাব, কাজেই মা যত খুসি বকে যায়।

মুন্সী। তাই ত মাঝে মাঝে হজুরের কাছে পালিয়ে আসি, নিজের গলার আঙুরাজ শোনবার জন্তে! আর একটু বড় হও মা, তখন বুঝবে সে বাধা না দেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ। (হাসিতে হাসিতে আয়েষার প্রস্থান)

মাধব। এমন মেয়েকে তুমি কার হাতে তুলে দেবে মনে করছ মুন্সীজী?

মুন্সী। হজুর, সেই বিষয়েই ত আপনার উপদেশ প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনার মত বন্ধু এই শহরে আমার আর কেউ নেই। আয়েষাকে আমি এত বড় করে ঘরে রেখেছি, পাঁচরকম বই পড়িয়েছি আর গান-বাজনাও কিছু কিছু শিখিয়েছি, এই সব অপরাধে সমাজের মোড়লরা আমার উপর খড়্গহস্ত। তবে কি কুক্ষণে যে মেয়েটা রূপ নিয়ে জন্মেছিল, তাই বুড়োরা যাই বলুক, ছেলেরা ওর জন্তে সব খোয়াতে রাজী।

মাধব। তবে ভাল দেখে একটি পাত্রের সঙ্গে এই বেলা ওর সম্বন্ধ পাকা করে ফেল না? যত দেরি করবে, তত বেশি মুশকিলে পড়বে। আমি ভুক্তভোগী কিনা, তাই জানি। আমার ত মনে হয় ওর উপর ইলাহীর নেকুনজর আছে। তোমার কি বোধ হয়?

মুন্সী। আজ্ঞে, আমার বোধ করবার কোন আবশ্যক নেই। বহু দিন যাবৎ প্রমাণ পেয়েছি যে ইলাহী ওর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমার মেয়েকে ঘেঁ মোটে বাগ মানাতে পারছি নে হজুর, কি করি বলুন? ওর মা আর আমি ওকে বলে বুঝিয়ে, বকে ধমকে, খোশামোদ করে, হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। এক বাকি আছে জোরজবরদস্তি।

মাধব। না না, তাও কি করতে আছে? হয়ত ওর মনে মনে অগ্র কাউকে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু বলতে লজ্জা করে।

মুন্সী। আজ্ঞে না, হজুর, সে খোঁজও নেওয়া হয়েছে। সেরকম কেউ নেই। অথচ, আজকাল ওর ঘরের কাজ করতে মনে থাকে না, লেখাপড়ায় ভুল হয়ে যায়। আনমনে জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, সাত বার ডাকলে তবে এক বার সাড়া পাওয়া যায়।

মাধব। এ সব ত বড় ভাল লক্ষণ নয়! এ যে আমাদের শ্রীরাধিকার বর্ণনার সঙ্গে ছবছ মিলে যাচ্ছে।

দেশে দেশে মানুষের মন সবই এক, কেবল আমরাই ভুল বুঝে “রাম রহিমকে জুদা” করি। যা হোক, চূপ করে বসে থাকলে ত চলবে না, এর একটা কিছু বিহিত করা ত চাই।

মুন্সী। আমার বুদ্ধিতে ত আর কুলচ্ছে না হজুর। জানেন ত মেয়েজাতটাকে চিরকালই আমি একটু ডরাই; ছোট্টই হোক বড়ই হোক, ওদের বেশি ঘাঁটাতে সাহস করি নে। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন, তাই করব। তার উপর আবার এই এক ডাকাতের উপদ্রব হয়ে দিন রাতে স্বস্তি নেই।

মাধব। (একটু ভাবিয়া) এক কাজ করলে হয় না?

মুন্সী। আজ্ঞা করুন হজুর।

মাধব। ওকে দিনকতক অন্য কোথায়ও পাঠিয়ে দিলে হয় না? হয়ত একটু জায়গা বদলালে মনের এই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতে পারে।

মুন্সী। হজুর আমরা গরীব মানুষ, তবু ছেলেমেয়েদের ভালোবাসি। ওকে ছেড়ে থাকা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হলেও, ওর ভালোর জন্যে তাও করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই অল্প বয়সে অমন-সুন্দরী মেয়েকে একলা দূরদেশে পাঠানো কি বুদ্ধির কাজ হবে? কে ওর সঙ্গে যাবে, কে ওর খবরদারি করবে—শেষে হিত করতে বিপরীত হবে না ত?

মাধব। আমি কি সব দিক না ভেবে-চিন্তে একটা মোৎফরক্কা কথা বলে বসবার লোক, মুন্সীজী? তা হলে আর এত বড় একটা রাজ্যশাসনের ভার আমার হাতে এতদিন থাকত না।

মুন্সী। আমাকে মাপ করুন, হজুর। স্নেহে মানুষকে অন্ধ করে ফেলে।

মাধব। আমি ভাবছিলুম ওকে দিল্লী পাঠালে কেমন হয়? সেখানে এক দিকে যেমন ধুমধাম, জাঁকজমক, আমোদপ্রমোদে ছেলেমানুষের মন ভুলবে; অপর দিকে তেমনি আমি চিঠি দিলে প্রাসাদেও ওকে হেপাজত করবার লোকের অভাব হবে না। কি বল, এতে তোমার মত আছে?

মুন্সী। হজুর যা বলছেন সবই ওর ভালোর জন্যে, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার একলার মতে ত কাজ হবে না; দেখি ওর মা কি বলেন।

মাধব। যদি তোমাদের হৃজনের মত হয়, আর অবশ্য আয়েষা যেতে চায়, তা হলে খাজনা নিয়ে আমাদের যে ডাক শীঘ্রই দিল্লী রওনা হবে, সেই সঙ্গে ওকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। ইলাহীকে বলব ওর রক্ষক হয়ে সঙ্গে

যেতে ও থাকতে; আর তোমরাও হয়ত কোন মেয়েকে ওর সঙ্গিনী করে দিতে পারবে।

মুন্সী। হুজুরের দয়ার শেষ নেই। কি ঠিক হয় কাগসই আপনাকে জানাব। (সেলাম করিয়া প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(মুন্সী মহিউদ্দিনের বাড়ীর অন্তরমহল। আমিনা বিবি সেলাইকাষে রত। দূরে জানালার ধারে আয়েষা বই হস্তে আসীন।)

মুন্সী। (বাস্ত হইয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ)—
আমিনা! আমিনা! কোথায় তুমি?

আমিনা। এই যে, এইখানেই বসে আছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা থেকে সকাল ত হুজুরেই হাজির থাকি, আর যাব কোন চুলোয়?

মুন্সী। (বসিয়া পড়িয়া) তোমাকে ত আমি আর কোথায়ও যেতে বলছি নে। কিন্তু আয়েষার এক জায়গায় যাবার কথা হচ্ছে, তাই তোমাকে বলতে এলাম।

আমিনা। আয়েষা? সে আবার কোথায় যাবে? মেয়েমানুষে ত এক বাপের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যায় জানি; তাঁ ও-মেয়ের ত সেরকম কোন গতিক দেখছি নে। আর তার পর তারা যায় শ্বশুর বাড়ী। তা আমার সেইটেই বাকি রয়েছে; এখন যেতে পারলেই আমি বাঁচি, তুমিও বাঁচ। (চোখে কাপড় দিয়া ক্রন্দন।)

(আয়েষা নিজের নাম শুনিয়া কান খাড়া করিল)

মুন্সী। (উঠিয়া দ্বার কাছে আসিয়া)—আমিনা, তুমি হাওয়ায় ফাঁদ পেতে ঝগড়া কর কেন? আমি কি কখনও তোমাকে কোন কটু কথা বলেছি যে, তুমি কথায় কথায় মান-অভিমান কান্নাকাটি কর?

আমিনা। সেইটেই ত আমার এত অসহ্য বোধ হয়। তুমি যদি আমার কথার পিঠে কথা বলতে, যদি আমার রাগের উত্তরে রাগ করতে, যদি আমার গলায় উপরে গলা চড়াতে, তা হলে ত তবু বুঝতুম যে আমার স্বামী একটা মানুষ, আর আমাকেও সে মানুষ জান করে।

মুন্সী। (হাসিয়া) তোমার স্বামী মানুষ নয় ত কি?

আমিনা। (রাগতঃ) জানি নে। দেবতা হতে পাবে কিংবা কলের পুতুল কিংবা বইয়ের পোকা। শুধু এইটুকু জানি যে তার বিয়ে করবার কোন দরকার ছিল না।

মুন্সী। (শান্তভাবে) এত দিনে সেও বোধ হয় সেকথা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আমিনা, শুধু একদিন আধ ঘণ্টার জন্যে যদি নিজেকে ভুলে পরের কথা—তাও পর নয়, নিজের মেয়ের কথা শুনতে পার তা হলে—

আমিনা। কথা বলবার লোক পেলো ত শুনব? বাপ

থাকেন বই নিয়ে, আর মেয়ে থাকেন নিজের ভাবে ভোর। আমাকে কি কেউ পৌঁছে? আমি চুপ করে মুখ বুজে হয় সেলাই করি, নয় রাঁধি, নয় ছাতে একলা পড়ে পড়ে তারা গুনি—আর কি করব? না আছে একটা কাপড়, না আছে একটা গয়না, না আছে পাঁচ জন ভ্রাতালোকের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে যাওয়া আসা, না আছে—

মুন্সী। যা নেই তার জন্তে মিছে হা-হতাশ না করে যা আছে তাই রক্ষা করবার চেষ্টা করলে ভাল হয় না?

আমিনা। আমার আবার কি ছাই আছে? থাকবার মধ্যে আছে—

মুন্সী। একটা হতভাগা স্বামী, এই ত?

আমিনা। ছিঃ ছিঃ, অমন কথা মুখেও এনো না। আমার স্বামীর মত এমন ভাল লোক এই সারা কাবুলে আর একটি নেই। কেবল যদি—

মুন্সী। তা সে বিষয় তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আর একটা জরুরী বিষয়ে যে তোমার মত জানতে চাই। তোমার একটি মেয়েও আছে।

আমিনা। সে পোড়ারমুখীর জন্তে ভেবে ভেবে আমার ত রাগে ঘুমই হয় না। ওদিকে তুমি ত বেশ নিশ্চিন্তমনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও।

মুন্সী। সে দোষ আমার আছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার মেয়ে বাপের শান্তিষ্ট স্বভাবটি পায় নি। বোধ হয় মাতৃকুলের দিকে—

আমিনা। (রাগতঃ) আর যাই কর, আমার মা-বাপ তুলো না, ভাল হবে না বলছি। এখনও আমার বাপের কবরে হিন্দু-মুসলমানে সিম্নি দেয়, তা জান?

মুন্সী। জানি। কিন্তু এমন অপদার্থ লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে কি তিনি স্ববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন বলতে চাও?

আমিনা। ফের আমার স্বামীর নিন্দে করছ? তবে আমি চললুম (উঠিতে উদ্ভত)—

মুন্সী। (ধরিয়া বসাইয়া) না না, বসো বসো। আর ও লোকটার নাম করব না, ভয় নেই। তা যে কারণেই হোক, আয়েষার মন যে আজকাল বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়?

আমিনা। তা আর করি নি? তোমাদের মত কেতাবী বুদ্ধি নাই থাক, আমবা মানুষের মন বুঝি। তার উপর আয়েষা ত আমার পেটের মেয়ে।

মুন্সী। তুমি ওকে পেটে ধরেছ বটে, কিন্তু আমি ওকে হাতে গড়েছি। দুখেদাত পড়বার পর থেকেই ও আমার পড়ার সঙ্গী, আমার খেলার সাথী, আমার গানের

সাগরেদ। কিন্তু এই মানখানেক থেকে যে ওর কি হয়েছে, কেন হয়েছে, কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছি নে।

আমিনা। এ তো অতি সহজ কথা। মেয়ে বিয়ের যুগ্ম হয়েছে, একটা ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক। তোমাদের পণ্ডিতী মন কি না, তাই সোজা জিনিষটাকে প্যাঁচালো করে তোল। আমরা মুখ মেয়ে-মানুষ হতে পারি, কিন্তু সংসার-জ্ঞানে তোমাদের চেয়ে ঢের পাকা।

মুন্সী। তাই ত তোমাকে না জিজ্ঞেস করে আমি সংসারের কোন কাজেই হাত দিই নে। কিন্তু আয়েষা যে বিয়ের কথা মোটে কানেই তোলে না, তা তুমি বেশ জান।

(আয়েষা ক্রমে অগ্রসর হইল)

আমিনা। মেয়ের মত কেউ কখনো নিয়ে থাকে? আমার বাবা আমার কত মত নিয়েছিলেন? একটা ভাল পাত্র ঠিক করে মোল্লা সাহেবকে ডাক, বলুমা পড়ে দিব—বাস, চিরজীবনের মত কাজ ফতে। আবার কি?

মুন্সী। তা ত ঠিক। কিন্তু তুমি মেয়েটাকে কাদিয়ে জোর করে বিদায় দিতে পারবে?

আমিনা। কেন পারব না? মেয়েমানুষ ত সারা জীবন কাদতেই আছে। জন্মবার সময় কাদে, বিয়ের সময় কাদে, মরবার সময় কাদে। উপায় কি বল?

মুন্সী। হজুর একটা উপায় করে দিতে চেয়েছেন।

আমিনা। তোমার রাতদিন কেবল হজুর হজুর। নিজের ঘটে একটা বুদ্ধি বোগায় না, স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলতেও সাহসে কুলোয় না, শুধু হজুরের কাছে হাতবোড় হয়ে আছি।

মুন্সী। তুমি ত জান কত সময় কত বিপদ থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। সাথে কি তাঁকে মেনে চলি? কিন্তু আগে উপায়টা বলি শোন। হজুর বলেছেন কোন নতুন জায়গায় ঘুরে এলে হয়ত মেয়েটার মনের একটা বদল হতে পারে। ওঁদের লোকলস্কর খাজনা নিয়ে শীঘ্র দিল্লী যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ওকে উপযুক্ত সঙ্গী দিয়ে পাঠাতে পারেন, বললেন—মবশ্ব যদি আমাদের মত হয়। কালই তাঁকে এ বিষয় জবাব দেব বলেছি। এখন কি বলতে চাও বল। (মাথায় হাত দিয়া) আমার ত মাথার ঠিক নেই।

আমিনা। কি বললে? দিল্লী? সেই জাহান্নামে ঐ দুধের মেয়েকে একলা পাঠাব? তুমি ঠিকই বলেছ মুন্সীজী, তোমার বুদ্ধিবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি হজুরকে আমার হাজার হাজার সেলাম দিয়ে বলো তাঁর বহু

মেহেরবানী, কিন্তু ঐটুকু মেয়েকে কাছছাড়া করলে পাছে একেবারে হাতছাড়া হয়ে যায় এই আমার ভয়।

মুন্সী। তবে কি এমনি দিনের-পর দিন দে কাটা ফুলের মত নেতিয়ে পড়বে, আর আমরা বসে বসে তাই দেখব?

আমিনা। বলছি ত ধরে বেঁধে একটা ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দাও, সব সেরে যাবে।

মুন্সী। তার আগে একটু ঘুরে ফিরে এলে ক্ষতি কি? স্বেলখানা ত সামনে খোলাই রয়েছে, যাবজ্জীবন কারাবাসে ঢোকবার আগে পৃথিবীটা একটু দেখে শুনে নিক, তার রূপরস ভোগ করে নিক। অন্ততঃ তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখা যাক না, সে কি বলে।

আমিনা। (উঠিয়া) আমি বলছি সে যদি আমার মেয়ে হয় ত কখনো দিল্লী যেতে চাইবে না।

মুন্সী। (উঠিয়া) আর আমি বলছি সে যদি আমার মেয়ে হয় ত—

আয়েষা। (বই ফেলিয়া সামনে ছুটিয়া আসিয়া, দুই জনের দুই হাত ধরিয়া) আমি বলছি আমি মায়েরও মেয়ে, বাবারও মেয়ে, আর আমি দিল্লী যাব নিশ্চয়ই।

মুন্সী ও আমিনা। (একসঙ্গে ফিরিয়া) তবে তুমি সব শুনেছ।

আয়েষা। তোমরা যে চোঁচামেচি করছিলে, আর না শুনে করি কি? এইটুকু ত ঘর।

মুন্সী। (কন্ঠার মাথায় হাত বুলাইয়া) মা, আমরা তোমার উপযুক্ত ঘর-বর কিছুই দিতে পারলুম না, এই দুঃখ।

আয়েষা। (তাঁহাকে আদর করিয়া) না বাবা, তোমরা আমার জন্ত সবই করেছ, আমার কোন অভাব নেই। (থামিয়া) কিন্তু কি জানি আমার আত্মকাল কি হয়েছে। এই ছোট ঘর, ছোট শহর, ছোট কথার মধ্যে দিনরাত থেকে থেকে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। তোমরা দিনকতক আমাকে ছেড়ে দিয়ে দেখ, আমি নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে ফিরে আসব।

মুন্সী। পাখীর ডানা গজালে তাকে বাসা ছেড়ে উড়তে দিতেই হবে; তা আমি বেশ জানি। কিন্তু তোমার মা যে সেকথা মোটেই বুঝেন না, কি করি বল।

আয়েষা। (বাপকে ছাড়িয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া) কেন মা, তুমি আমার জন্ত এত উতলা হচ্ছ? আমি কি এখনও তোমার সেই কচি খুঁকিটি, যার বাড়ী ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে তুমি দশ বার ঘরবার করত?

আমিনা। (কাদিয়া উঠিয়া) তুমি আমাদের একলা

ফেলে কোথায় যাবে মা? সে সোনার পিঁজরায় যে একবার ঢুকেছে, সে কখনও প্রাণ নিয়ে বেরোয় নি।

আয়েষা। (হাসিয়া) কেন বেরবে না? এই ত কাবুল থেকে নওরোজের জন্তে স্বন্দরী মেয়ে পাঠাতে বলেছিল বলে কাজী সাহেবদের রোশেনার ক'বছর আগে দিল্লী বেড়িয়ে এল। শুনেছি উৎসব হয়ে গেলে বেগম সাহিবারা তাকে কত জমকালো পেশোয়াজ, ওড়না, গয়না, খেলনাসব দিয়ে দেশে ফিরে পাঠালেন। আর আমি গেলেই তারা আমাকে খুন করে মাটিতে পুঁত ফেলবে?

আমিনা। ছিঃ আয়েষা, তুমি কি কোন কালেই বড় হবে না?

(মোতীবির প্রবেশ)

মোতী। এ কি কথা শুনেছি চাচিজী? আয়েষা নাকি কাল দিল্লী যাবে? আমার ত কথাটা একেবারেই বিশ্বাস হ'ল না, তাই ছুটে খবর নিতে এলুম।

আমিনা। ওমা, এর মধ্যেই পাড়ার লোকের কানে কথাটা উঠেছে? খন্যি বাপু!

মোতী। না, মরিয়ম তার একটা কুর্তী সেলাই করতে নিয়ে গেল কি না, তাই বললে যে এই সব কথাবার্তা হচ্ছে শুনে এলুম।

আমিনা। তার মত পাড়া-বেড়ানী আর কে আছে বল? এদিকে তাকে দিয়ে ঘরের একটা কাজ পাবার জো নেই। তা তোমার কাছে বলতে কি বাছা, তুমি আয়েষাকে মায়ের পেটের বোনের মত ভালোবাস, ওর যাবার কথা হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও কিছু ঠিক হয় নি।

আয়েষা। হ্যাঁ তাই মোতীবদিদি, ঠিক হয়েছে। বল মা, সব ঠিক হয়ে গেছে, না? আর মোতী, আমরা কাপড়চোপড় বন্ধ করে ফেলি গে। (প্রস্থানোত্ত)

(রোশেনার প্রবেশ)

রোশেনারা। চাচিজী, আয়েষার নাকি দিল্লী যাওয়া ঠিক হয়েছে?

আমিনা। (গালে হাত দিয়া) মাগো, আমি কোথা যাব। আমরা নিজেই যেকথা জানি নে, সে কথা শহরস্বত্ব রাষ্ট্র হয়ে গেল? কাজীসাহেবের বাড়ী কি এখানে? মরিয়ম কি এর ভেতর সেখানেও ঘুরে এল?

রোশেনারা। মরিয়ম কেন যাবে? এই ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের ফতেমী আয়া আমার নতুন চোলিটা খলিফা সাহেবের কাছ থেকে আনতে গিয়েছিল, সেখানে বসে থাকতে থাকতে শুনে যে মরিয়ম এই কথা বলছে। আমি ত শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম। তাই ভাবলুম যাই একবার ছুটে দেখে আসি গে কি ব্যাপার!

আমিনা। এ কথা ত চিরদিন লুকানো থাকবে না মা, তবে আমরা নিজেরাই এখনও মন স্থির করতে পারি নি। হজুর এইমাত্র বলে পাঠিয়েছেন বটে, তাই ভাবছি—

আয়েষা। ভাবতে ভাবতে যে এদিকে গোছগাছের সময় হয়ে গেল মা।—আচ্ছা রোশেনারা, তুই ত একবার দিল্লী গিয়েছিলি। সেটা কি মগের মুলুক? সেখানে যে যায়, সে নাকি ফেরে না? তবে কি তুই মরে ভূত হয়ে এসেছিস?

রোশেনারা। সে দেশে একবার গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না বটে, সে কথা সত্যি। কি রূপ, কি রং, কি রোশনাই, কি তামাশা! কেবল মা-বাপের জন্য মাঝে মাঝে মনটা কেমন করত, না হলে কি আমি আর ফিরতুম? চল, তোর সঙ্গে আমিও আবার যাই তাই, যদিও তোকে দেখলে আমার দিকে কেউ আর ফিরেও তাকাবে না! কোন্ নবাবজাদা হয় ত তাঁর হাজার বেগমের উপর আর একটি বাড়াবার জন্য শাহেন শাহ'র কাছে দিনরাত আরজি পেশ করতে থাকবেন। আর তুইও সে সব বাদশাহী চেহারা দেখে আমাদের জঙ্গলী দেশের মূর্থ রক্ষ লোকদের ভুলে যাবি।

আয়েষা। যাঃ, তোর অত বাজে বকতে হবে না। এখনও আমার অনেক কাজ বাকি আছে, চল।

রোশেনারা। আচ্ছা, দাঁড়া, আমাকে বেগমরা যেসব কিংখাবের পেশোয়াজ দিয়েছিল, তা ত বাজে তোলা থেকে থেকে পোকায় কাটছে। তারই দু'একটা ভাল দেখে নিয়ে আসি, তোর সেখানে কাজে লাগবে। আর আমার চেয়ে তোকে মানাবেও ভাল। (প্রস্থান)

মুলী। মা, তুমি ত নতুন দেশ, নতুন লোক দেখতে চললে, কিন্তু আমাদের সব যে নিয়ে গেলে, আমরা কি নিয়ে থাকব?

আয়েষা। খুরশেদ রইল যে বাবা। আর আমি ত চিরদিনের জন্যে তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি নে—দেখতে দেখতে দিন কেটে যাবে। বরং তোমাদের জন্যে কি নিয়ে আসব, তাই জিজ্ঞেস কর। মা, আমি এমন সব চমৎকার মোগ্লাই খানা আর সাঁচা কলাবতুর কাজ শিখে এসে তোমাকে শেখাব যে, তোমার কাবাবের আর স্বনামের খোশব্ব পাড়াস্বত্ব ভুরভুর করবে। আর তোমার জন্যে কি আনব বাবা? মোগ্লাই ছবি না ফারসী পুঁথি?

মুলী। তুমি নিজে ভালোয় ভালোয় ফিরে এস মা, আমি আর কিছু চাই নে। আমিও ত বুড়ো হয়েছি, হয়ত আর দেখা নাও হতে পারে। (কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ)

(পেশোয়াজ হাতে করিয়া রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। (হাঁপাতে হাঁপাতে) চাঁচাজী, আমি বাবাকে বলেছি, তিনি বললেন তোমার যদি মত হয়, তবে আমি আয়েষার সঙ্গে দিল্লী যেতে পারি। কি বল, তোমার এতে কোন আপত্তি নেই ত ?

মুন্সী। সে কি কথা মা, আমরা ত ওর সঙ্গে কাকে দেব তাই ভাবছিলুম ; তুমি যেতে রাজী আছ শুনে মন থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। আর তুমি আগে সেখানে গেছ, সব জান, এর চেয়ে ভাল সঙ্গী আমরা কোথায় পাব ?

আয়েষা। তবে আর কি, সব গোল মিটে গেল। এখন আর, আমরা সবাই মিলে আমোদ করে একটা গান করি, তা হলে মনের এই অন্ধকার ভাবটা কেটে যাবে। বাবা, তুমি বাজাও, মা তুমি শোন।

(তিন সখীর গান)

চলো যুনাফের, বাধো গাঁঠিরি,
বহুদূর যানে হোবেগা।
আজ ভি যানা, কাল ভি যানা,
আখের যামা হোবেগা।
রুপিয়া দৌলত যিৎনা হ্যায়—
সজি গিরে রহেগা।
মেহরার লড়কা যো কোই হ্যায়
কোই নেই সাধুমে যাবেগা।
যিৎনা দের দুনিয়ামে রহেনা
উৎনাই মোহকবং হোবেগা
করো মোহকবং উসীকোনে
যো নে সাধুমে যাবেগা।

ক্রমশঃ

গ্রামবাসী

শ্রী আশুতোষ সাত্তাল

গুণী মানী ওরা কেউ নয় তাই,
আমাদের গ্রামবাসী,
ওরা যে সরল সহজ মানুষ,
তাই এত ভালবাসি।
দেশ ছাড়বার—গেল কে কোথায়—
কোন ঘাটে মাঠে-নোঙ্গরখানায়,
আজি পরবাসে ভাবি বসে তাই
আর আঁখিজলে ভাসি।

জানি, উহাদের ছিল না বেতাব,
ছিল নাক্সা গাড়ী-জুড়ি,
হকুম করিতে জানিত না ওরা
হলসে বিপুল ভুড়ি।
ছিল নাক্সা কেউ হাকিম ডেপুটি,
যোহিত কান্ডা নয়—চুনোপুটি,
বরাখানা ওরা সব ভেবে কত
হেলায় দিত না ভুড়ি।

আহা, তবু ওরা আত্মীয় ঘোর
নয় নয় কত পুর,
প্রিয়-পরিজন ওরাই আমার—
জীবনের সহচর।
আমার জুড়ে ছিল ওরা ছুধী,
মোর উল্লাসে হ'ত কত সুখী,
ওদের লাগিয়া চিরদিন খোলা
ছিল যে আমার ঘর।

হয়তো জীবনে উহাদের সনে
হবে নাক্সা আর দেখা,
হায় স্বাধীনতা, হায় রাক্ষসী,
ছিল এ ভাগ্যে লেখা।
দুস্তির পদরা খুলি' বার বার—
করিবে হৃদয় শুধু হালকাই,
এ জীবনে হায়, শুকাবে না কত
একটি কতের রেখা।



ভাষ্কর্যের একটি নিদর্শন

[ত্রিআন্তোয সামন্ত]

সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনী

শ্রী বিমল রায়

গত ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রদর্শনীর অধষ্ঠান হয়ে গেছে। উদ্বোধন করেছেন •শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রী বামিনী প্রকাশ সাহুদী। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এই প্রদর্শনীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে চিত্র-প্রদর্শনীর উল্লেখই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। প্রদর্শিত চিত্রাদির সমালোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে বড় একটা দেখতে পাওয়া গেল না।

কাব্য, সাহিত্য, নাটক, গান ইত্যাদি ভাল বলে পরিচিত হলে বহু বার সমালোচনা করে সেগুলির প্রশংসা পাওয়া হয়। ভাষা অথবা সুরে যতটুকু ব্যক্ত করা সম্ভব, তার চেয়ে চিত্রে অল্পাংশে অনেক বেশী প্রকাশ করা যায়। সাধারণতঃ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলতে শুনি ‘ছবি-টবি বিশেষ বুঝি না’। একথা শুনে মনে কোতুল জেগেছে, সহজেই যা বোঝা যায় সেটা তাঁদের কাছে চুক্কোয়া বলে মনে হয় কেন? শিল্পী-মাজেই এই প্রশ্নের একটা সমাধানের পথ খুঁজে দেওয়া উচিত। কারণ সহজ বিষয়কে বোঝা-ই কি দর্শকদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন? তা হলে ছবিও দিন দিন চুক্কোয়া হয়ে উঠবে। দর্শক ছাড়া ছবির মর্যাদা হয় না। শিল্পাহরণীর শিল্পরসের অনুগামী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে শিল্প ক্রমে ক্রমে মরে যাবে। সেই কারণে তাঁদের মনকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে চিত্র-সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যদি একথা সত্য হয় যে, ছবির অর্থ বোঝা চুক্কর, তা হলে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, ছবির মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন আমাদের দেশে নেই। সেই কারণে ভাষার সাহায্যে যথোচিত সমালোচনা না হলে ছবি অধুবাণ করা খুবই শক্ত। আমরা আগে দেখি, পরে ভাষায় প্রকাশ করি। এ ক্ষেত্রে আগে কানে শুনব কি দেখতে যাচ্ছি, তারপর দেখে বুঝতে পারব—ঠিক যা শুনলাম তা দেখা হ’ল কিনা।

সুদূর অতীতে মানুষ যখন গিরি-গুহায় বাস করত, কাঁচা মাংস খেত, রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, উত্তররামচরিত রচনার কল্পনাও যখন তার মনে উদ্ভূত হয় নি তখনও সে

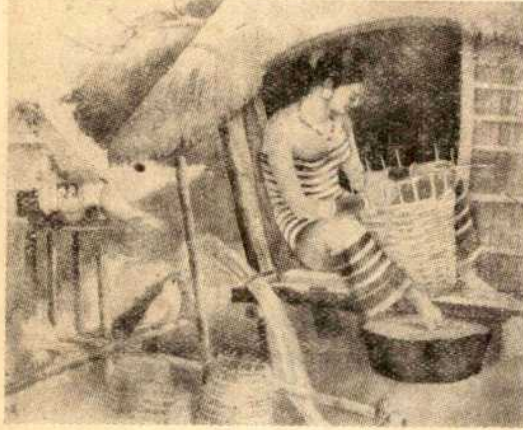
গুহার ভিতরে ছবি আঁকত। কোনও জাতির সভ্যতার বয়স নিরূপণে সেই জাতির ছবির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একথা অনস্বীকার্য যে, সভ্যতার শীর্ষভাগে শিল্পের স্থান।



পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে [ত্রিআমচন্দ্র দাস]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ছবি কাকে বলব? ভাষার সাহায্যে যখন বাংলাদেশের একটা পল্লীর বর্ণনা করি, তখন সেই বর্ণনার ভেতর দিয়ে সেই পল্লীর ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। যখন সেই বর্ণিত পল্লীকে দেখতে যাই তখন মনের চোখে দেখা পল্লীর সঙ্গে সাদৃশ্যের অভাব ঘটে; মনে হয়, না দেখলেই ছিল ভাল। প্রকৃতির এক একটি দৃশ্যপটে সৌন্দর্য লুকানো

আছে—যেটা তার মাহুর্ধ্য। কাটিকে দেখে তার দেহলাবণ্য, তদ্বিমা, আদল, রং ইত্যাদি ঠিক ঠিক বর্ণনা করা হ'ল, কিন্তু তখনও বাকী রয়েল আসল জিনিষ—সে তার স্বাভাবিক সত্তার রূপ বর্ণনা করা। এই সত্তা তার মাহুর্ধ্য--যাকে ভাল লাগা মাহুয়ের জন্মগত অধিকার। মাহুয় তাকেই দেখতে ও দেখাতে ভালবাসে।



হুটির-শিল্প [শ্রীচন্দ্রশীলাল দত্তগুপ্ত]

মনের উপর বর্ণে বর্ণে বর্ণনার ছবি এঁকে দেওয়া—এ হ'ল কথাসিল্পীর কাজ। চিত্রশিল্পীর কাজ রঙে রেখায় রূপায়িত করে ছবিটাকে একেবারে জীবন্ত করে এঁকে দেবানো। কোনও লেখা ভাষা না জানলেও এ ছবি অন্তরহ হ'ল। তামা কঠুই করা যায়—কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে যে ছবির সৃষ্টি, তার স্থান অন্তরে।

প্রদর্শনীতে অনেক রকমের ছবি ছিল, দর্শকও এসেছিলেন অনেক, মতামতও শোনা গেল বিভিন্ন রকমের। প্রশংসা করে গেছেন প্রায় সকলে। কিন্তু তাঁরা ছবি নিয়ে গেছেন খুব অল্পই। শিল্পীকে সুখ্যাতি করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার শিল্পকে সমাদরে গ্রহণ করে তৃপ্তি পাওয়াও শান্তির কথা, গৌরবের কথা।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, দেশের শিল্প-সম্পদের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়সাধন করা, শিল্প-সম্পদের ভাণ্ডারটি তাদের হাতের কাছে তুলে দেওয়া। প্রদর্শনী নূতন নূতন শিল্পীর প্রতিভা-বিকাশের অহুঙ্কার ক্ষেত্র তৈরি করার সহায়তা করতে পারে। শিল্প যে শিক্ষার মন্ত বড় অঙ্গ, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত, তা স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। দেশবাসীর সঙ্গে শিল্পীদের ঘনিষ্ঠতা এবং শিল্প-পরিচয়-সাধন এই প্রদর্শনীর মারফতেই সম্ভব।

প্রদর্শনী দেখে খুব আনন্দ লাভ করা গেল। শিল্পীরা সবাই ছাত্রছাত্রী—আড়থার নাই, জাঁকজমক নাই, সৃষ্টির প্রেরণা

নিজেদের খেয়ালমত যা এঁকেছেন, তাই তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন। ছবিগুলি সুন্দর, কিন্তু দাম অল্প। প্রদর্শনীতে প্রথম



কর্মরতা [শ্রীশচীন রায়]

শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং শিক্ষণ-শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ছিল, যেমন ইণ্ডিয়ান পেট্রিং, ফাইন আর্টস, কমার্শিয়াল আর্ট, গ্রাফিক আর্ট, ভাস্কর্য এবং কাল্পনিক এন্ডগুতো বিভাগের কাজের প্রকারভেদ থাকার একেঘেয়েমি ছিল না। তবে সংখ্যায় কিছু কম হলে ভাল হ'ত।

বর্তমান বাংলার ছাত্র-শিল্পীদের বহুবিধ বাধা-বিঘ্নের সন্মুখীন হতে হচ্ছে। অভাব-অনটন, বাসস্থানের সমস্যা, রং, তুলি, কাগজ, ক্যানভাস ইত্যাদি শিল্পোপকরণের উচ্চ মূল্য শিল্পচর্চার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলে শিল্পীরা শিল্পকলার চর্চা ছেড়ে দিতে পারেন না। শিল্প-সুযোগীরা হুঁএকখানা করে ছবি ক্রয় করলেই এদের উৎসাহ বাড়বে। বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী মিঃ কপিন এদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি প্রদর্শনী দেখে অধ্যাক ত্রীরমেন্দ্রনাথ চক্র-বর্তীকে প্রচুর প্রশংসা করে গেছেন এবং এই আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের একটি প্রদর্শনীর অস্থগঠন বিলাতে সম্ভবপর হতে পারে।

এই প্রবন্ধে যেসব ছবি ছাপান হ'ল, তা ছাড়া এমন আরও ছবি ছিল, যেগুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাদেরও নামের উল্লেখ করা গেল।

শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পেটিংয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র—এর কাজ—গুলো খুব চমৎকার লাগল। ‘শরশয্যা’ ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ছবিটির রেখাবিভাগ, বর্ণপ্রয়োগ, রচনা এবং প্রকাশ অতি সুন্দর। ছবিটিতে ভারতীয় শিল্পকলা-পদ্ধতির অঙ্গসঙ্গণ করা হয়েছে। এতে সংযম এবং মাজাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

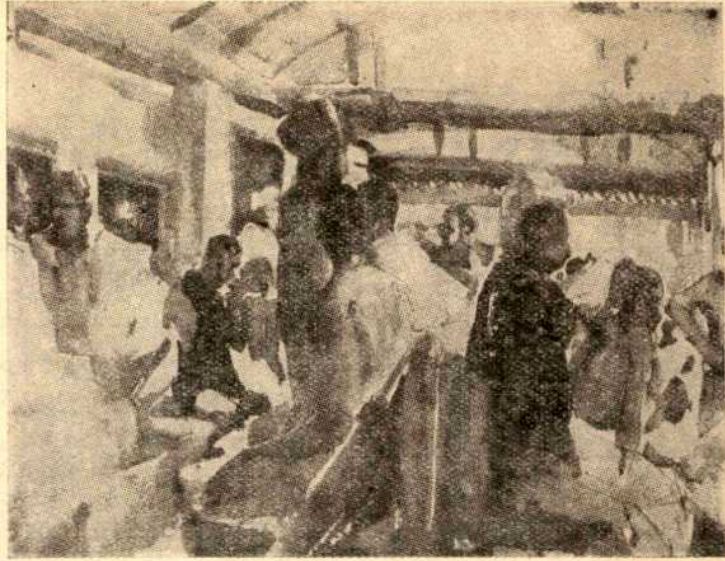
শ্রীচিন্তা দাস, শিক্ষণ-শ্রেণীর ছাত্র—‘প্রতিকৃতি’ প্যাণ্টেলে আঁকা, তুলি ব্যবহার করা হয় নি। ছবিটি সুন্দর হয়েছে। ছবিটি অনাড়ম্বর, কিন্তু এর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত।

শ্রীশচীন রায়, কাইন আর্টস্ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র—‘ট্রেনের কামরা’ রঙে আঁকা স্কেচ, খুব ভাল হয়েছে। গাড়ী চলছে, যাত্রীরা আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুছল, রাজনীতিচর্চায় মশগুল। ছবিতে এই ভাবটি ফুটে উঠেছে। যেন সবটাই চলছে—থেকে নেই। এর আর একখানা ছবি ‘কুটীর-শিল্প’ (কাঠ খোদাই)—কাজে ব্যস্ত দুটি শ্রীলোক, কাছে তারা তখন এই ভাবটা রচনার প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীমতী হৈমন্তী সেন, কাইন আর্টস্ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী—‘রাজপুতানী’ তৈলচিত্র—এর কাজগুলো অধিকাংশই সুন্দর হয়েছে। এর কোন কোন ছবি বিশেষ প্রশংসালভ করেছিল। ছবিতে রাজপুতানীকে ঠিকই চেনা যাচ্ছে। ড্রইং, রং এবং তুলিটার পদ্ধতি প্রশংসনীয়। এর ছবিতে নৈপুণ্য, মাধুর্য্য রুচি এবং সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিপ্রদাস মহাশী, শিক্ষণ শ্রেণীর ছাত্র—‘প্রসাধন’ স্থিতি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রসাধনরতা শ্রীলোকটির দেহভঙ্গিমা অনবদ্য ভাবে পাথরে রূপায়িত হয়েছে। ভাস্কর শ্রীআশুতোষ সামন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র—কারিগরী শিল্প চার ভাগে বিভক্ত করে দেখান হয়েছে—কোন প্রাসাদের প্রাচীরগাছে স্থাপনোপযোগী ভাস্কর্য্যশিল্প। সহজ সরল ভঙ্গীতে সাধারণ মানুষ কে কেমন করে কি তৈরি করেছে তা দেখান হয়েছে। শিল্প-পরিবেশন-নৈপুণ্য চমৎকার।

শ্রীঅসিত সেন, কমাশিয়ারাল তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—‘বাজার’ রেখায় আঁকা একটি স্কেচ, প্রশংসনীয়। শ্রীরামচন্দ্র দাস কমাশিয়ারাল বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—‘ভিজিট পুরী’ একটি নুতন ধরনের পোষ্টার (প্রাচীরচিত্র)—পুরীর পট-চিত্র অবলম্বনে আঁকা, জগন্নাথদেবের মন্দিরদর্শনের জন্ত



ট্রেনের কামরা

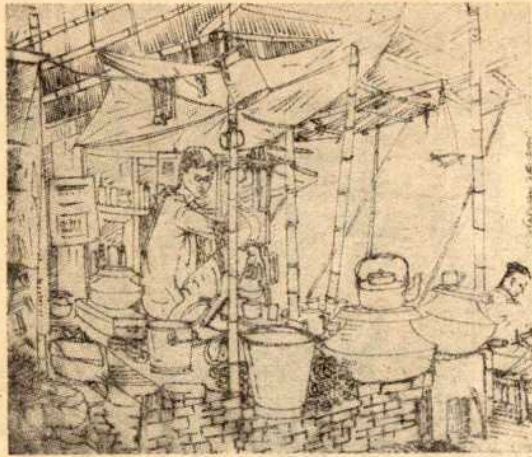
[শ্রীশচীন রায়

আকর্ষণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ছবিটিতে আছে। শ্রীচীনলাল দত্তগুপ্ত—কমাশিয়ারাল তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—‘কুটীর-শিল্প’ ক্যালেন্ডারের উপস্থিত ছবি। ক্যালেন্ডার সাধারণতঃ



প্রতিকৃতি

[শ্রীশচীন রায়



বাজার

[শ্রী রাস্তা সেন

বিজ্ঞাপনের জল ছাপা হয়। একটা সুন্দর ছবির মধ্যে বিজ্ঞাপনের মূল কথা নিহিত আছে। একটু একটু করে একটা ছাপ বোনা হচ্ছে। অনেক রকম অর্থেই ছবিটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ ছাড়া আর যে সমস্ত শিল্পীর ছবি উল্লেখযোগ্য তাদের নাম নীচে দেওয়া হল—

শ্রী অরুণ বসু, মীরা সেন, অজিত বসু, সুভাষ সিংহ রায়, কমল চৌধুরী, সলিলকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্দাস সেনগুপ্ত, শিউলি রায়, সেবিকা নাগ, পরীক্ষিত বসু, সন্তোষ কুমারী, সুমঙ্গল সেন, জগদীশ্বর দাস, রমল সেন, রঞ্জিত দে, কানাই কর্ণাকার, গোষ্ঠ কুমার, জ্যোতির্দয় মজুমদার, সুবীজ দাসবন্দী, অমূল্য চৌধুরী, সুমির্দল বসু, রবি মুখোপাধ্যায়, মদন রায়, মনোহরজ্ঞান ঠাকুর, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র চৌধুরী, শরদী রায় চৌধুরী।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩১৯ সালের চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে আমার কৃষি-সম্পর্কীয় প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; তখন আমি সাবোর (বিহার) কৃষি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি। 'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কাশ্যকেও তখনও জানিতাম না। যখন প্রবন্ধ পাঠাই তখন আমাদের জটনক অধ্যাপক ভ্রমরনাথ ঘোষ মহাশয় এবং কয়েক জন সহপাঠী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'প্রবাসী' অতি উচ্চ স্তরের মাসিক পত্রিকা, ইহাতে নামজাদা ব্যক্তিদের প্রবন্ধ বাতীত আর কাহারও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না; আমার প্রবন্ধ অমনোনীত হইয়া ফেরত আসিবে। সুতরাং আমিও প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমার যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমার এখনও মনে আছে এবং ইহার ফলে যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছিলাম তাহার বলেই আজ পর্যন্ত কৃষি-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিয়া যাইতেছি।

১৩১৯ সালের চৈত্র মাস হইতে 'প্রবাসী'র সহিত আমার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহার বহুকাল পরে। সন ও তারিখ মনে নাই; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় আমাকে তাহার নিকট লইয়া

গিয়াছিলেন; তখন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহের পার্শ্বে প্রবাসী আপিস অবস্থিত ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কাহারও সঙ্গে বিনা কারণে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না, সকল সময়েই লেখা কিংবা পড়ায় ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা তাহার প্রথম কথাতেই পরিবর্তিত হইয়া গেল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমার পরিচয় করাইয়া দিবার পরেই তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি কৃষি-বিষয়ে প্রবন্ধ খুব সহজ ভাষায় লিখতে পার; তোমার প্রবন্ধে এমন কোন বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ থাকে না, যা আমার মত লোক বুঝতে পারে না।" তাহার এই প্রথম কথাতেই আমার আশঙ্কা ও সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রথম কারণ আমাকে তাঁর "তুমি" সম্বোধন, দ্বিতীয় কারণ আমার প্রবন্ধের প্রশংসা। আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে আমার অধ্যাপক ও সহপাঠীগণ যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেকথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কৃষিই যে আমাদের দেশের আসল বস্তু; কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ যত বেশী প্রকাশিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল হবে—আমার কাছে কৃষি-বিষয়ক

প্রবন্ধ অতি মূল্যবান; তুমি লিখে যাও।” তখন বুবিলাম তাঁহার নিকট কৃষির মূল্য ও মর্যাদা কত বেশী।

আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। উন্নত কৃষি-প্রণালীর প্রচারের জন্য ইংরেজী ১৯২২ সালে আমি একটি গল্পের বই লিখিয়াছিলাম; পুস্তকখানির নাম “ভূলের ফসল।” আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ‘প্রবাসী’তে পুস্তকখানির সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সমালোচনার প্রথমেই ছিল—“লেখক চাষা, লিখিয়াছেন গল্প।” তখন আমি ফরিদপুরে, জেলা-কৃষি-কর্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলাম; সমালোচনাতে আমাকে ‘চাষা’ আখ্যা দেওয়াতে আমি খুবই মনঃক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। ইহার পরেই সরকারী কার্য উপলক্ষে যখন দুই-এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসি—তখন রামানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে ‘চাষা’ আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদ করি। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “তুমি যদি প্রকৃতই কৃষিকাজকে ভালবাস, তা হলে ‘চাষা’ উপাধিতে তোমার গৌরব অল্পভব করা উচিত।” এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ‘চাষাই দেশের খাঁটি মানুষ। তুমি সেই রকম খাঁটি মানুষ হবার চেষ্টা কর।’ তাঁহার সেই হাসি আমার এখনও মনে আছে। তখন হইতেই আমি বহু সভায় নিজেকে ‘চাষা’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা সকল সভায় বলিয়াছি।

রামানন্দবাবু আমাকে কয়েকখানি চিঠিও লিখিয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রয়োজনেই চিঠিগুলি লিখিত হইয়াছিল। সেই সকল চিঠিতেও কৃষির উন্নতির

জন্য তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম।

অতি সামান্য দরকারেও রামানন্দবাবুর নিকটে গিয়াছি—কিন্তু তাঁহার নিকট যাইতে কখনও কোন বিধা অল্পভব করি নাই। ১৯২৫ সালে ‘ওয়েসলী এগজিভিশনে’র পূর্বে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে একটি প্রশংসনীয় হইয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনীর কৃষিবিভাগের ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ সময়ে কতকগুলি ছবি, চার্ট প্রভৃতির জন্য কয়েকটি ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি দরকার হয়। একটি ইংরেজী শব্দ ছিল “pedigree bull”, আমি ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলাম “বংশ-জ্ঞানী বাঁড়”। রামানন্দবাবু কয়েকটি ইংরেজী শব্দের অনুবাদ করিয়া দিলেন; আমার pedigree শব্দের বাংলা অনুবাদ দেখিয়া বলিলেন, “খুব সহজ হয়েছে, আমি এত সহজ লিখতে পারতাম না।” যে কয়েক বার তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, এইরূপ স্নেহ, শ্রীতি এবং উৎসাহ লাভ করিয়াছি।

১৩১৯ সালের চৈত্র মাস হইতে অদ্যাবধি ‘প্রবাসী’র সহিত আমার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন আছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রবাসীর বর্তমান সম্পাদক শ্রীকেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার পিতার ন্যায় উন্নত কৃষির প্রবর্তন সম্বন্ধে সচেতন এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের একজন প্রকৃত দরদী। ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত কৃষিসম্পর্কীয় প্রবন্ধসমূহের সংখ্যাধিক্য হইতে। প্রবাসীর “বিবিধ প্রসঙ্গে”র আলোচনাসমূহ হইতেও ইহার পরিচয় মেলে।

ইতিহাসে নাম

শ্রীকালিদাস রায়

জগন্ময়ের ইতিহাসে দেখি যুগে যুগে আসে

এমন মানুষ দেশে দেশে,

এই সৃষ্টি বিধাতার করে তোলে ভোলপাড়

তাতে ছাপ যায় রেখে শেষে।

এ মানুষ শুধু চায় চিরদিন এ ধরায়

ইতিহাসে থাকে যেন নাম

যে দেশে সে জন্মে হার আশা দিয়ে জিনে তার

সে দেশ কত না দেয় দাম।

লক্ষ লক্ষ নারী-মরে প্রাণ দেয় তারি তরে

লক্ষ লক্ষ হারায় সম্বল,

লক্ষ লক্ষ গৃহহার্য হারায় অপত্য দার্য

সারা দেশ হয় হীনবল।

ভায়, ধর্ম, সভ্য নয়

মিছ, দারাপত্য নয়

নয় পরাবীনতা মোচন,

আত্ম-স্বধ বুদ্ধি নয়

বদেশের ঋদ্ধি নয়

নয় বিধে কল্যাণসাধন,

শুধু বিশ্ব-ইতিহাসে

নাম রাখিবার আশে

দেশে দেশে আলস্য অনল।

একের খেয়াল বশে

সহস্র অনলে পশে

বর্গভূমি হয় রসাতল।

তবু লোক নাহি বুঝে

কোটি কোটি তারে পুজে

যুগে যত করে হাহাকার।

মোহাবেশে মনে করে

তাদের কল্যাণ-তরে

বুঝি সে দেবের অবতার।

পণ্ডিতারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

পণ্ডিতারী-বাসকালে আমরা শ্রীঅরবিন্দ নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাকে “অরো” বলিয়া অভিহিত করিতাম। এই সম্বোধন আমরা অতিশয় আদরের সহিত করিতাম। এই “অরো” আমার নিকট ক্ষুদ্র ছিলেন না, তাঁহার সমুদ্রত মহিমা আজিও অল্পভব করি, বিস্মিত হই। অরোর সঙ্গে এই সময়ে আমরা দিব্যরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে তিনি বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেন। যোগসাধনার মধ্য দিয়া আমাদের জীবনকে নূতন ভঙ্গীতে চালিয়া লইবারই যেন তিনি আলো ধরিতেন। আলোচনা দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া চলিত—সারা রাত কোথা দিয়া যেন কাটিয়া বাইত, আমাদের হৃৎ থাকিত না। প্রভাতের পাখীর ডাকে নিজ নিজ শয্যা গিয়া আশ্রয় লইতাম। সে কি অসাধারণ প্রীতি ও অল্পরাগ, সে কি গভীর স্নেহ-ভোরে আমাদের বাধিবার অল্পপ্রেরণা!

আমি বালাকাল হইতে নিরামিষাশী। পণ্ডিতারী আসিয়া দেখিলাম—মৎস্য ও মাংস ভিন্ন দুই বেলা আহারের অগ্র ব্যবস্থা নাই। আমি কয়েক দিন অল্পের সঙ্গে আনুসন্ধি খাইয়া উদরপূর্তি করিতে লাগিলাম। অরো নিরপেক্ষ ভাবেই হাসিতেন। মণি, বিজয়, নলিনী প্রভৃতি পরিহাস করিয়া বলিতেন, “এমন করিয়া কতদিন চলিবে? মৎস্য, মাংস খাইলে আপনি কি জাতিচ্যুত হইবেন?” অরোর মুখে কিন্তু কথা ছিল না—তিনি ভোজনকালে নানা রঙ্গ-রহস্তে সময় কাটাইয়া দিতেন; আমি কিন্তু তাঁহার অন্তরের বাণী শ্রবণ করি। অতীতের সর্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্তি দিতেই তাঁর অল্পপ্রেরণা অন্তরে অন্তরে অল্প-ভব করিলাম। বিজয় প্রভৃতির বাক্য উপলক্ষ্য বলিয়া মনে হইল। আমি সেই দিনই ভোজনকালে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া বসিলাম, “আজ হইতে নিরামিষাশী আমি আর নহি। অরোর যাহাতে রুচি, তাহাই আমার গ্রহণীয় হইবে।” সহতীর্থেরা উল্লসিত হইয়া বলিল, “সাবাস আপনাকে—আপনার সংস্কার, আচার ও নীতি অরোই ভাঙ্গিয়া দিলেন। সন্ধ্যা হইতেই আপনার খাজপাত্রে সমুদ্র-মৎস্য দেওয়া হইবে।”

তাঁহাই হইল। রাত্রে ভোজন-পাত্রের সম্মুখে বসিয়া দেখিলাম—ভাতের সঙ্গে এক বাটি মাছের ঝোল দেওয়া হইয়াছে। আবাল্যের সংস্কার জ্ঞানভঃ ভঙ্গ করিলাম বটে, কিন্তু অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অরো এক বার

আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। বেদনাভরা আঁখি দুটি আমার হৃৎস্থে যেন দ্রব হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি চাহিয়া-ছিলেন আমার নূতন করিয়া গড়িতে, অতীতের সকল সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, “আমি আজ হইতে মৎস্য-মাংসভোজী হইয়াছি।” তিনি হাসিলেন। সেই হাসির মধ্যেই আমার দিচ্ছাস্তের সমর্থন পাইলাম। সেদিন অল্পগ্রাস মুখে উঠিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাইলাম না। ভোজনান্তে বারান্দায় বসিয়া তিনি আত্মসমর্পণের সাধনার কথা বিশদ ভাবে বলিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম—সকল ধর্ম বিসর্জন দিয়াই একের শরণ লইতে হয়। আমিও তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এবার পণ্ডিতারী আসিয়াছিলাম।

এক দিন প্রাতঃকালে ফরাসী পুলিশ কমিশনার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজে মোটোরাট লইয়া শ্রীযুক্ত পার্থ-সারথির সকাশে গিয়াছিলাম। আমি কিন্তু গোপন পথ দিয়া পলাইয়াছি; তার পর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সহিত শ্রীঅরবিন্দের ভবনে প্রবেশ করায় ও ইংরেজ পুলিশ সম্ভবতঃ ফরাসী গবর্ণমেন্টকে তদন্ত করিতে বলায়, পুলিশ কমিশনারের আবির্ভাব। বন্ধুরা সকলেই আমায় গোপন দ্বার দিয়া কিছুক্ষণ দূরে থাকিতে বলিলেন—কমিশনার সাহেব বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া প্রস্থান করিলে, পুনরায় বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই চলিবে। এইরূপ পরামর্শকালে অরো আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি কটিদেশে বস্ত্রও জড়াইয়া তাহারই অর্দ্ধভাগ গায়ে জড়াইতেন। পায়ে এক জোড়া চটিজুতা থাকিত। সেই সৌম্যস্বিক্ত মূর্তি ভুলিবার নয়। তখন তিনি শীর্ণকায় ছিলেন—কিন্তু তাঁহার চক্ষে ছিল অপূর্ণ দীপ্তি, ভাস্কর মুখমণ্ডল। যত্ন হাসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিব পুলিশ কমিশনারকে?” কিন্তু আমায় আর কিছু বলিতে হইল না; তিনি আমার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তার পর অতিশয় গাভীরোঁর সহিত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পুলিশ কমিশনারকে তিনি আমার কথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া বলিলেন। “সব কথা শুনিয়া কমিশনার সাহেব কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, “চন্দ্রনগর হইতে যে ভক্তলোক আপনার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত আপনার সম্পর্ক কি?” তিনি স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “He is my disciple” (তিনি আমার শিষ্য)। কমিশনার

সাহেব করমর্দন কথিয়া হাশ্মমুখে প্রস্থান করিলেন। অরো আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “সব চুকিয়া গেল, তুমি এখন আমার নিকট নিরাপদেই বাস করিতে পার।”

এই সময়ে দেড় মাস তাঁহার নিকটে বাস করি। মধ্যে একখানি প্রশস্ত গৃহে নলিনী, মণি ও সৌরীন বাস করিত। শ্রীঅরবিন্দের সমুখস্থ কক্ষে বিজয়ের সহিত বীরেন বলিয়া এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। ইহার সম্বন্ধে পরে কিছু বলিতে হইবে।

অরোর মুখে ভারতের পুরাণেতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা শুনিলাম। বেদের মর্ম্ম তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইত। উপনিষৎ ও গীতার সত্য-মর্ম্ম অন্তর দিয়া বুঝিয়া লইলাম। ভারতের রাষ্ট্রজীবনের বহু পরিচয় মিলিল—নেতৃপুরুষগণের পরিচয় পাইলাম। অরো এই সময়েই নিজের বাল্যজীবনের কথা কিছু বলিয়াছিলেন। আমি তাহা খাতায় টুকিয়া লইয়াছিলাম। সে কাহিনীটুকু আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি।

আমার ইন্দোচীনে যাওয়া বন্ধ হইল। বিপ্লবী বন্ধুদের অরোধে অল্পযাত্রী রিভলভার আনিবার প্রশ্ন উত্থাপন করা—তাহা তিনি বলিলেন, “ভারতবর্ষ রাজসিকতার মধ্য দিয়া জাগিবে না; ভারতের এক দল মানুষকে গীতার পার্থ-সারথির কথা শুনিতে হইবে। ভারতের নেতৃপুরুষগণ হইবেন গীতার মানুষ। তাঁহাদের গুণাভীত হইতে হইবে। তবেই আসিবে ভারতের মুক্তি।” এই সময়ে তিনি স্পষ্ট করিয়াই আমায় জানাইলেন—অতঃপর রাজসিক কর্ম্মে আমি যেন প্রবৃত্ত না হই। তিনি ভারতকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন। আমিও তাঁর নির্দেশ প্রাণপণে পালন করিব বলিলাম। তিনি আমায় বুক জড়াইয়া ধরিলেন—মস্তক আত্মাণ করিয়া বলিলেন, “আমার কাজ তোমার কাজ; তোমার কাজও আমার বলিয়াই গ্রহণ করিও।”

এই সময়ে তিনি রাতে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেন। আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গী হইতাম। আমরা “পীয়ারে”র শেষ সীমানায় আসিয়া বসিতাম। জেটিকে পণ্ডিতারী লোকে “পীয়ার” বলে। জ্যোৎস্নাবিধৌত সমুদ্রতরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি অতিশয় পুলকিত হইতেন। আমি গান গাহিতাম, সুরেশ ওরফে মণি সেও গাহিত, “অরো” তাল দিতেন। সে রক্ত-রহস্তের কথাগুলি স্মরণ করিলে আজও তৃপ্তি পাই। মনে আছে, এক দিন অলিন্দে বসিয়া তিনি আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন—আমায় ইচ্ছাশক্তির কথা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, “ইচ্ছা সর্বব্যাপী, এই দেখ—আমি will করিব, চিলগুলি তৎক্ষণাৎ ভিন্নমুখে উড়িয়া যাইবে।” সত্যই তাঁহার ইচ্ছামাত্র চিলগুলি ভিন্নমুখী হইল।

যেদিন বিদ্যায়ের পালা আসিল, সেদিন কি ভাবে আমি বাংলায় ফিরিয়া যাইব—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, “যেভাবে তুমি ইংরেজ পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়া চলিয়া আসিয়াছ, তোমায় পাইলে তাহারা সহজে তোমায় ছাড়িবে না। তোমাকে গোপনেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি তাঁহার আদেশানুযায়ী ফরাসী কোম্পানীর বাংলায় যে ঈমার আসে, তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। তারপর নীলাধরাশি বিদীর্ণ করিয়া কলিকাতার বন্দরে যেদিন ঈমার ভিড়িল, সেই দিনই রাজাবাজার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্কমোহন প্রমুখ প্রায় ২০ জন বিপ্লবী ধরা পড়ে। আমি ঐ রাতে রাজাবাজার যাইতে গিয়া অন্তরের সতর্কেষণায় সহসা গতির মোড় ফিরাইয়া চন্দননগরেই উপনীত হই। অরোর আশীর্ব্বাদেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি বলিয়া মনে করিলাম।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের নূতন বাণী লইয়া “আর্য্য” পত্র প্রকাশিত হইল। “বন্দে মাতরম্”—এর ধর্ম্মি “কর্ম্মযোগিন” ও “ধর্ম্মে”র পর “আর্য্যে” অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। “আর্য্য” বাহির করার পূর্বে চন্দননগরে ডেপুটি নির্বাচনের আন্দোলনে আমাদের যোগদান শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশক্রমেই হইয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করি—তাহার মূল এইখানেই নিহিত ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী-ভারতীয় ডেপুটি নির্বাচনে মঃ লে-ম্যার, মঃ পল ব্রুজঁ ও মঃ পল রিশার, এই তিন জন প্রতিনিধি পদ প্রাপ্যরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা এই সময়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মঃ পল রিশারকে ভোটযুদ্ধে জয়ী করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু মঃ লে-ম্যারই বিজয়ী হইয়া ডেপুটি রূপে নির্বাচিত হন। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—

“The election is over, or what they call an election with the result that the man who had the fewer real votes, has got the majority.”

অর্থাৎ,

“নির্বাচন অথবা ইহারা যাহাকে নির্বাচন বলে, তাহার শেষ হইয়াছে। কলে যিনি সবচেয়ে কম ভোট পাইয়াছিলেন, তিনিই সবচেয়ে বেশী ভোটের অধিকারী দাঁড়াইয়াছিলেন।”

তাঁহারই পত্র হইতে আরও জানা গিয়াছিল যে, যেখানে মঃ লে-ম্যার মাত্র তিন শত ভোট পাইয়াছিলেন, সেখানে ৩৩০০ শত লিখিত হইয়াছিল। ফরাসী ভারতের নির্বাচন সম্বন্ধে এই কটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তিনি সেই পত্রেই আমাদের চেষ্টাকেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি অর্থের কথা পুনরায় জানাইলেন।
তিনি লিখিলেন—

"My present position is that, I have exhausted all my money along with your Rs. 60/- and I am still in debt for the Rs. 130/- due for the old rent. I do not like to take more money from Mons. Richard. He has sold one-fourth of his wife's fortune (a very small one) in order to be able to come and work for India."

"তোমার ৬০ টাকা সহ আমার সব টাকাই আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। পুরাতন বাড়ীভাড়া দরুন আমি এখনও ১৩০ টাকা ঋণগ্রস্ত। মঃ রিচার্ডের নিকট আর টাকা লইতে আমি রাজী নহি। তিনি তাঁর স্ত্রী-বন হইতে (যাহার পরিমাণ খুবই অল্প) এক-চতুর্থাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহা দিয়া ভারতে আসিয়া ভারতের কার্য করিবার জন্য।"

এই সময়ে বাগান বিক্রয়ের তাঁহার অংশস্বরূপ ৫০০ টাকা র তাগিদ দিব্যর জন্ত তিনি আমায় পত্রে লেখেন। কোন বিশিষ্ট নেতার নিকট হইতে দেশের গচ্ছিত টাকা আদায়ের দুঃসাধ্যতা উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা লিখিলেন—

"This habit of defalcation of money for noble and philanthropic purposes in which usually the ego is largely the beneficiary, is one of the curses of our movement and so long as it is continued Lukshmi will not return to this country. I have sharply discontinued all looseness of the kind myself and it must be discouraged henceforth wherever we meet it. It is much better and honest to be a thief for our own personal benefit than under these holy marks."

"উচ্চ ও প্রশস্ততার উদ্দেশ্যে দেখাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করার এই অভ্যাস—যাহাতে প্রধানতঃ মাহুষের স্বার্থমূলক উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হইয়া থাকে—তাহা আমাদের আন্দোলনের অভিপাত-বিরূপ; আর ইহা যতদিন না দূর হয়, ততদিন ভারতে লক্ষ্মী-দেবীর পুনরাবির্ভাব হইবে না। আমি নিজে আমার এই শ্রেণীর সকল চিলেমি তীব্রভাবে বন্ধ করিয়াছি এবং যেখানেই ইহা দেখি না কেন, তাহার উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের সোজা-স্বাক্ষর ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে চোর হওয়াও বরং চোর ভাল আর এইরূপ পুণ্যচিহ্নের আবরণে তাহা হওয়ার চেয়ে চোর সাধু আচরণ হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘদিন অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন ছিলেন, কিন্তু সঙ্কট কোন দিনই তিনি প্রতিহত হন নাই। ভাগবত কথ্যের জন্য অর্থগণের পথ চিরদিন মুক্ত বলিয়াই তাঁর ধারণা ছিল। এই সময়ে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সংগঠনের জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমায় পত্র দিয়া লিখিলেন—

"What you have to do is to make some real arrangement not a theoretical arrangement by which my burden of my expenses may be shifted off your shoulders, until I am able to make my own provision. Meanwhile get me Rs. 150 and the Rs. 500 due to me (garden money). If afterwards we can make no other arrangements, we shall then have to consider the question again."

"তোমার যাহা করিতে হইবে, তাহা হইতেছে একটি বস্ত্ততন্ত্র ব্যবস্থা করা—কোন কল্পনামূলক ব্যবস্থা নয়—যাহাতে আমার ব্যয়ভার তোমার স্বাক্ষর হইতে সরিয়া যায়—আমার নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করিতে না পারা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ১৫০ ও বাগান বিক্রয়ের ৫০০ টাকা আমার পাঠাইও। পরে আর কোন ব্যবস্থা যদি আমরা না করিতে পারি, তাহা হইলে এই প্রশ্নটি আবার বিবেচনা করিতে হইবে।"

তাঁহার পত্র পড়িয়া আমি নিরতিশয় চিন্তাশ্রিত হইলাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দাবি পূরণ করিতে পারিয়াছিলাম। এই জন্য আমার কৃতজ্ঞ অপেক্ষা তাঁহার প্রেরণার মূল্যই অধিক বলিয়া আমি মনে করি।

আমি যখন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট ছিলাম, সেই সময়ে বীরেন নামক এক যুবক ৮বিজয় নগরের সঙ্গে থাকিত—পূর্বেই বলিয়াছি। সৌরীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই আমায় বলিয়াছিলেন এবং সে ব্যক্তি যে পুলিশের এক জন গুপ্তচর, এইরূপ উক্তিও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এইজন্য আমি সতর্ক থাকিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—

"Then for important subjects. You write about Biren being here. I do not hold the same opinion as Sowrin etc. do, who are inclined towards a very black interpretation of his character and action. . . . I fail to find in him, looking at him spiritually, those ineffable blacknesses, which were supposed to dwell in him, only flightiness, weakness, indiscretion, childishness, swatvic impulsiveness and self-will and certain undesirable possibilities present in many young Bengalees, in a certain type, indeed, which has done much harm in the past. All these have recently much diminished and I hope even to eradicate them by the Yoga. In fact, the view of his presence here forced in me by that which guides us, is that he was sent here as the representative of this type and that I have to change and purify it. If I can do this in the representative, it is possible in the future to do so in the class and unless I can do it, the task I have set for myself for India will remain almost difficult for solution. For as long as that element remains strong, Bengal can never become what it is intended to be."

"বীরেন সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছ এবং সৌরীন্দ্র প্রমুখ

যাহা বলিয়াছে, তাহা সবটুকু সত্য নহে। বীরেনের এই সকল চরিত্রগত দোষ আমার অধ্যায়দৃষ্টিতে পড়ে নাই। তাহার চাপলা, হুঁকলতা, অবিবেচনা, হেলেমাছবি, একটা সাপ্তিক ভাবপ্রবণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং এরূপ কয়েকটি অবাস্তবীয় সম্ভাবনা দেখা যায় বটে, যাহা এক শ্রেণীর বাঙালী তরুণদের মধ্যে বিদ্যমান এবং অতীতে যাহা যথেষ্ট অনিষ্টই করিয়াছে—এই সকল দোষ এখন অনেকটা কমিয়াছে এবং আমি আশা করি যোগের দ্বারা ঐগুলি একেবারেই নির্মূল হইয়া যাইবে।.....যিনি আমাদের নিয়ন্তা, তিনি তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন—সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে। আর তাহাকে আমার পরিবর্তিত ও বিস্তৃত করিয়া তুলিতে হইবে। একট প্রজ্ঞকের মধ্যে যদি ইহা আজ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র শ্রেণীটির মধ্যেই তাহা করা সম্ভবপর হইবে। আর তাহা যদি আমি না করিতে পারি, তো যে কাজ আমি ভারতের জন্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা সমাধান করা দুঃসাধ্য হইবে। বাংলাও তাহা হইলে যাহা হইবার জন্য চিহ্নিত, তাহা হইতে পারিবে না।”

বীরেন সম্বন্ধে তাঁহার এই আকুলতার মূল্য নিশ্চয়ই অনুধাবনীয়। মানুষকে বড় করিয়া দেখার প্রবৃত্তি যে তাঁহার মধ্যে কতখানি ছিল, ইহা হইতেই তাহার পরিচয় মিলিবে। যদিও বীরেননাথের সংবাদ আর আমার রাখিতে পারি নাই তথাপি শ্রীঅরবিন্দের বাঙালীজাতির তথা ভারতের অভ্যুত্থান ও জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তনকল্পে যে আন্তরিকতা, তাহা চিরদিন আমার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।

শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই বাংলার বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার নিকট যে সকল কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে বাংলার বিপ্লবিগণ তাঁহাকে রাষ্ট্রনেতার আসন দিতে অতঃপর অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল, কিন্তু আমি তখন যে অবস্থায় তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তিনি সর্বদাই জানাইতেন বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠান হইতে যেন আমি বিরত থাকি। তিনি এই সময়ে স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন—

“You must realise that my work is a vast one and that I must in doing it come in close contact with all sorts of people, including Europeans, perhaps even spies and officials.”

“তোমার উপলক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমার কার্য অতি বৃহৎ। এই কার্যের জন্য বহুবিধ লোকের সংস্পর্শে আমার আসিতে হইবে—ভাষা ইউরোপীয়, এমন কি গুপ্তচর ও রাজকর্মচারী পর্যন্ত থাকিতে পারে।”

এই প্রসঙ্গে তিনি এক জন ফরাসী কর্মচারীরও নাম করিয়াছিলেন—চন্দননগরে তিনি কর্মোপলক্ষে এই সময়ে

থাকিতেন। আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম সে ব্যক্তি একেবারেই বুদ্ধিহীন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি তাঁহার অসাধারণ। শ্রীঅরবিন্দও এক দিন ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, “He is a queer sort of fool.”—সে এক বিচিত্র ধরণের বোকা লোক।

স্পষ্টই বুঝিলাম—মঁসিয়ে রিশারের আগমনের পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম হইতে দূরেই থাকিতে চাহিতেছেন—আমাকেও তাঁহার সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রতি পত্রে নির্দেশ দিতেছিলেন। তিনি অতঃপর যে নীতি ধরিয়া চলিতে চাহিতেছিলেন, তাহার আভাস পরবর্তী কয়েক ছত্রে পরিস্ফুট হইবে :

(1) It might be known among our friends that my whole action is about to be such as I have described, so that they may not again repeat that kind of mistake.

(2) Those immediately concerned with me must be aloof physically from Tantrickism: because of the discredit it brings.

(3) Biren and others of that kind must be made to understand that Tantra for us is discontinued until further notices, which can be only in the future.

(4) The written basis of Vedantic Yoga has now become impossible and must be entirely changed and as far as possible, withdrawn from circulation.”

১। আমার বন্ধুদের জানা উচিত যে, অতঃপর আমার সমগ্র কর্ম যেমন বলিয়াছি, সেইরূপ হইবে, যাহাতে যে ভুল তাহার করিয়াছে তাহা আর পুনরাবৃত্ত না ঘটে।

২। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে আমার সহিত জড়িত, তাহাদের ভাবিত্ব কর্ম হইতে তুলতঃ বিরত থাকিতে হইবে—কারণ তাহাতে অপবাদ ঘটায়।

৩। বীরেনের মত লোকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা অনুশাসনা পুনরায় না নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিয়াছি, আর সে পুনরায় স্তূর ভবিষ্যৎ ছাড়া হইতে পারে না।

৪। বেদান্তযোগের সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থাদি এখন অচল হইয়াছে। উহার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং যথাসম্ভব তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।”

তাঁহার পত্র পড়িয়া বাংলার বিপ্লবীরা কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সময়ে পণ্ডিতারীতে ধর্ম-সাধনার ভিত্তির উপর একটা নূতন সাধকমণ্ডলী গড়িতে উত্তত হইয়াছিলেন। মঁসিয়ে রিশারের ইচ্ছানুযায়ী এই সমিতির ফরাসী নামকরণ হইয়াছিল “L'ide Nouvell” (The New Idea)। এই সমিতি কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

রবীন্দ্র-সংলাপ কণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরবিজয়

ঠিক মনে নাই, আশ্রমে পূজাবকাশ বা গ্রীষ্মাবকাশ উপস্থিত। ছাত্র আর অধ্যাপকেরা কয়েক দিনের জগ্ন স্থানান্তরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। আমি সন্ধ্যার পূর্বে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি বলিলেন—

‘আপনি কোথায় যাইতেছেন?’

‘প্রথমে তো মেদিনীপুর, সেখানে আমার ছোটভাই ইন্দুশেখর জেলা-ইঞ্জিনিয়ার। সেখানে এক বার যাইতে হইবে।’

‘তার পর?’

‘তার পর জামশেদপুর, সেখানে আমার পুত্র ব্রহ্মব্রত থাকে, সেখানে না গিয়া পারি না।’

‘তার পর?’

‘তার পর হরিশ্চন্দ্রপুর। সেখানে আমাদের বাড়ী, যাইতেই হইবে।’

‘তাহা হইলে বহুদূর আপনি একবারে ত্রিপুরবিজয়ে বাহির হইতেছেন!’

বাইওকেমিক চিকিৎসা

৩১শে আশ্বিন, ১৩৪৪ সাল। গুরুদেব বরাহনগর-কামারহাটির পথে বালি রেলপুলের নীচেই গুপ্ত নিবাস নামে এক বাগান বাড়ীতে আছেন। তাঁহার শরীর খুবই ক্লান্ত। সাম্ভাব্যিক বিসর্প ব্যাধি হইতে উঠিয়াছেন। লম্বাচুল অনেকটা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দাড়িও দুই পাশে উপরের দিকে কতক ছাটিয়া দিতে হইয়াছে। অনেক কথা হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন ‘শরীর যখন আর চলে না তখন অন্যের উপর ভর করিয়া থাকা ঠিক নহে।’ তিনি বলিলেন সেই গুরুতর ব্যারামের মধ্যে কোন কষ্ট অল্পভব করেন নি। বাইওকেমিক ঔষধ তিনি নিজের ইচ্ছায় খাইতে চাহিয়াছিলেন— যদি নীলরতন বাবু প্রভৃতি ডাক্তারগণের অমত না হয়। তাঁহাদের অমত হয় নি, কেননা তাঁহাদের মতে ওটা ওষুধই নয়। কিন্তু ফলটা যে ঐ ওষুধেরই হইয়াছিল তাহা বলা চলে না। ডাক্তারেরা যথেষ্ট দেখাশুনা করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদক (reporter) বন্ধুত্বের স্ববিধা লইয়া ডাক্তারদের পরামর্শের স্থানে গিয়া ভাল করেন নি। ঐ ওষুধের বিবরণ

পত্রিকায় বাহির হওয়ায় ডাক্তারদের কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

বাকসিদ্ধি

গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন। সকলে তাঁহাকে এখন সংযত হইয়া কথা-বার্তা করিতে বলেন, কেননা তিনি এখন ষাঁহা বলেন তাহাই ফলিয়া যায়। প্রথম প্রমাণ এই যে, তাঁহার উল্লিখিত সাম্ভাব্যিক বিসর্প। যেদিন রাত্রে এই ব্যারামটা দেখা দিল তাহারই একটু আগে সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে তিনি বলিতেছিলেন যে, তাঁহার তো তেমন কোন ব্যারাম হয়ই না। এমন রোগ হয় যে, চারিদিকে সকলে সেবা-শুশ্রূষার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে, রাত জাগিতেছে, ডাক্তার-কবিরাজ মাথার কাছে বসিয়া আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে তো বুঝি ঐ ব্যারাম, নতুবা কিছুই না! ইহা সঙ্গে সঙ্গেই ফলিয়া গেল।

দ্বিতীয় প্রমাণ। এই কিছু দিন হইল, একটা খুব বড় রকম ঝড় হইয়া গেল। ইহার দিন দুই আগে গুরুদেব বলিতেছিলেন ‘এখন আর আগের মত ঝড় হয় না। সে-সব ঝড় গেল কোথায়? মনে আছে, কলিকাতায় আছি। এক ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। সকলে ছিলাম তেতলায়। নামিয়া দোতলায় আসিলাম। মাঝের ঘরের একখানা কবচ ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিকে ভীষণ কাণ্ড। সেই সব ছিল ঝড়। এখন আর তেমন হয় না।’ এই কথার দুই দিন পরে ঐ ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়াছিল।

তৃতীয় প্রমাণ। গুরুদেব সেদিন শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরের বাসায় বাগানবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গল্পগুজব হইতেছিল। গুরুদেব বলিতেছিলেন, ‘আজকাল ডাকাতি হয় না। যদি হয় তো খুব মজা করিয়া দেখা যায়।’ ঠিক ঐ দিনই রাত্রে ঐ বাসাতেই ডাকাতি হইয়াছিল। গুরুদেবের পাশেরই ঘরে প্রশান্তবাবু ছিলেন। তাঁহাকে বেশ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

নিজের মৃত্যুর পূর্বেই লোকসমূহের ভক্ত্যনিত শোক জানা গুরুদেবের সহিত কথা চলিতেছে। তাঁহার ঐ অল্পকালের বিষয়ে বলিতেছিলাম। ঐ সময়ে তাঁহার ব্যারামে দেশ-বিদেশে এত উদ্বেগ হইয়াছিল যে, কয়েক হাজার চিঠি ও তার শাস্তিনিকেতন ডাকঘরে সহসা বাড়িয়া উঠে।

একজ্ঞ কর্তৃপক্ষকে জন দুই অতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইহাই অবলম্বন করিয়া গুরুদেবকে বলিলাম, 'আপনার বস্তুত অভাব হইলে, লোকের মনের ভাব কেমন হইবে তাহা আপনি জানিয়া লইলেন।' গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, 'মরিলে অনেকের জন্ত একুশ হয়, কিন্তু ইহা মনে করিবার সুযোগ অনেকের হয় না, আমার সে সুযোগটা হইয়াছে।'

যমের বুটধরা

ঐ গুরুতব ব্যারামে গুরুদেবকে নিজের লম্বাচুলকে অনেকটা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন 'যম আসিয়া বুটটা ধরিয়াছিল, অমৃতিকে ডাক্তাররা আসিয়া দেহটা ধরিয়া বিপরীত দিকে টানিতে-ছিলেন। ফলে যমের হাতে বুটটা থাকিয়া গেল, ডাক্তাররা দেহটা টানিয়া রাখিলেন।'

কাঁটা

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

স্বলভার সহিত বিকাশের আলাপের আরম্ভটা এইরূপ :
বিপ্লবের গুরুভাঙনের পর বিকাশ রাজির জাগরণটা দিব-
নিজার দ্বারা পূরণ করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু
নতুন জামাতাকে বহু বিভ্রমণা ভোগ করিতে হয়। মাত্র এই
কয়েক দিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। ভালক, ভালিকা
প্রভৃতি যুগ্ম সম্পর্কদিগের নিকট এখনও সে পুরাতন হইয়া
যায় নাই। আহা! সন্তোষে সে তাহার জন্ত নির্দিষ্ট কক্ষে আসিবার
পূর্বেই ভালক-বালাকা ও কিশোরীর দল আসিয়া সেখানে
তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। বিকাশ মনের বিরক্তি চাপিয়া
রাখিয়া তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া কক্ষ ছাড়িয়া ঘাইতে
অনুরোধ করিল। কিন্তু বাঙালীর গৃহে জামাতা নাযক জীবটির
উপর যাহাদের একটা বিশেষ অধিকার বহুকাল ধরিয়া স্বীকৃত
হইয়া আসিতেছে তাহারা এত সহজে ভুলিবার পাণ্ডপাজী
নয়। বিকাশকে ভালরূপে আলাভন না করিয়া কেহ চলিয়া
ঘাইতে সম্মত হইল না।

ইহাদের হাত হইতে মিতার পাইবার আশায় বাহিরে
ভাসের আড্ডায় গিয়া বসিবে কিনা, ইহাই যখন বিকাশ
ভাবিতেছে তখন সৌভাগ্যক্রমে শান্তভী ঠাকুরাণী আসিয়া
সকলকে কক্ষ হইতে বিভাতিত করিয়া চলিয়া গেলেন।
বিকাশ খন্তির নিধাস ফেলিয়া শয্যার দেহ এলাইয়া দিয়া
চোখ মুদিল। ঘুম কিন্তু আসিল না। একটা পরিচিত পদ-
ধ্বনি শুনিতে পাইবার প্রত্যাশায় কান হুট খাড়া হইয়া রহিল।

বহুকাল পরে যুগ্ম পদধ্বনি কানে আসিতেই বিকাশ
চোখ হুটকে ভালরূপে বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।
কিন্তু প্রত্যাশিত স্পর্শ না পাইয়া বাধ্য হইয়াই যখন চোখ
খুলিল তখন দেখিল, কে একটা বালিকা দীর্ঘ অবতণ্ডনে যুগ্ম
আবৃত করিয়া তাহার শয্যার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছে।

বিকাশ ভাবিল, কেহ বোধ হয় কোন ভালিকাকে বধু

সাজাইয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া মজা দেখিতেছে। যুগ্ম
হাসিয়া তাই সে কহিল, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এলো আমার
কাছে বসবে।

বালিকা সে আস্থানে কর্ণপাত করিল না। বিকাশ
কহিল, না আসবে ত ঘোমটাটা খোল। দেখি কেমন সুন্দর
যুগ্মখানি তোমার।

বালিকা শুধুপি কোন কথা বলিল না দেখিয়া বিকাশ
উঠিয়া বলিল, শয্যার কিনারে সরিয়া আসিয়া বালিকার ঘোমটা
খুলিয়া দিল। যুগ্ম সুন্দর একখানি যুগ্ম, ফুটফুটে সাদার রং,
মাথায় এক রাশি কুঞ্চিত জম্বরকৃষ্ণ কেশ, স্ত্রী জর মীচে টানা
টানা দুটি চোখ। প্রথম দর্শনেই বিকাশ যুগ্ম হইয়া গেল।
এত দিনের মধ্যে এই স্ত্রী বালিকাটি কেন ঘে চোখে পড়ে
নাই, তাহা ভাবিয়া সে বিম্মিত হইল।

ঘোমটা খুলিয়া দিতেই বালিকার মুখে হাসি ফুটিল।
বিকাশ কহিল, এস খুসী, বসবে। কি নাম তোমার?

বালিকা কহিল, আমি স্বলভা। তোমার শান্তভী।

বিকাশ কোতুক অল্পভব করিয়া কহিল, ও, তুমি আমার
শান্তভী। তাই বুঝি ঘোমটা দিচ্ছেছিলে? কিন্তু জামাইয়ের
কাছে কি এতটা ঘোমটা দিতে হয়?

স্বলভা কহিল, তুমি ভাল জামাই। তোমার সামনে
একটু ঘোমটা দিব।

মেপথো থাকিয়া যাহারা আলাপ শুনিতেছিল, তাহারা
এইবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্বলভা লজ্জিত
হইয়া দৌড়াইয়া ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

বিকাশের স্ত্রী প্রমীলা আসিয়া বলিল, স্বলভা সম্পর্কে
আমার পিসী হয়। বাবার দূরসম্পর্কের এক মামার মেয়ে।

ইহার পরের বার স্বলভা যখন আসিল তখন তাহার
ঘোমটার মাজাটা অনেকখানি কমিয়াছে। পাভলা ঠোঁট দুটি

পান খাইয়া লাল টুকটুক করিয়া বিকাশের পাশে বসিয়া কহিল, জামাই, তুমি রূপকথা জান ?

বিকাশ হাসিয়া কহিল, না, আমি জানি না। তুমি জান ?
সুলতা কহিল, জানি। কিন্তু দিনে ত বলতে মেই।
রাতে বলব। দিনে বললে রাতকাণা হয়।

তাই নাকি ? বেশ রাতেই এসো তা হলে—

সুলতা বিকাশকে কি চোখে দেখিল, সে-ই জানে। বিকাশ যখনই একা থাকে তখনই সে তাহার নিকট আসিয়া হাজির হয়। বিকাশের টেবিলে নানা ধরণের মাসিক পত্রিকা থাকে। সুলতার প্রত্যহ সব পত্রিকার হবিগুলি দেখা চাই। বিকাশের দক্ষাশিষ্ট সিগারেটের টুকরা ও সিগারেটের খালি বাস্তুগুলির উপর তাহার অপরিণীম লোভ। সিগারেটের বাস্তুয়ের মধ্যে সিগারেটের টুকরাগুলি পুরিয়া এক স্থানে রাখিয়া দেয়, বাতী ঘাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

প্রমীলা হাসিয়া বলে, কি ভাগ্যি তুই আসিস, তাই আর ঘর নোংরা হতে পার না।

সুলতা ধমক দিয়া বলে, পিসীমার সামনে জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে মেই। তুই এখন যা এখন থেকে—

প্রমীলা মুচ্চি হাসিয়া বিকাশের দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ছুদে পিসীমার আদেশ পালন করে।

সুলতা নিশ্চিন্ত মনে ছবি দেখে, বিকাশকে নানা শিশু-সুলত প্রশ্ন ভিজাস করে। বিকাশ কোনটার উত্তর দেয়, কোনটার উত্তর উহার নিকট হইতেই জানিয়া লয়।

সুলতা গভীরভাবে বলে, জানো জামাই, মানুষ মরবার পর কোথায় যায় ? তাহার পর নিজেই তাহার উত্তর দেয়, “জানো না বুঝি ? আকাশে তারা দেখেছ ত ? মানুষ মরলে তারা হয়। আমার বাবা তারা হয়ে আছেন। আমি রোজ দেখি ঐ তারাকে। আমি যখন মরব তখন আমিও তারা হব, বাবার কাছটতে গিয়ে উঠব—”

মানুষের জন্মরহস্য সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব মত আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিকাশ সুলতার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। তাহার জন্য এমন কোনও বিষয় নাই বাহা সে বিকাশকে না জানাইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র পারিপার্শ্বিকের সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ বিকাশের জন্য হইয়া গিয়াছে।

প্রমীলা বলে, সুলতা তোমার কাছেই এমন শান্তিশিষ্ট থাকে। বাইরে ওর ছুরতপনার অন্ত নাই। ওর জ্বালায় পুকুর-ঘাটে কারও তেলের বাটি রাখবার জো নাই। যেই একটু অভয়মত হয়েছ অমনি সে বাটিস্বর তেল জ্বলার দিকে ছুঁতে দেবে। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে কোলে নিতে যাবে, আদর করবে, চুমো খাবে; কিন্তু একটু পরেই দেবে ছেলের গাল কামড়ে। ছেলে যদি কেঁদে উঠেছে ত তখনই তাকে শাস্তা দিয়ে ফেলে ছুটে পালাবে।

সুলতার এই সব ছুটামির কথা শুনিতে বিকাশের খুবই ভাল লাগে। বলে, “ছুটামি আর চাকল্য ছেলেমেয়েদের অলঙ্কার। তোমার যদি মেয়ে হয় তা হলে যেন—” প্রমীলা বিকাশকে কথাটা শেষ করিতে দিল না, তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

সেবার খণ্ডরবাড়ী ঘাইবার সময় বিকাশ সুলতার ঘর কয়েকট খেলনা ও কয়েকখানা ছবির বই লইয়া গেল। সুলতা বই ও খেলনা পাইয়া মহা খুশী। বলিল, জামাই, তুমি রোজ এখানে আস না কেন ?

বিকাশ হাসিয়া বলিল, রোজ আসতে চাইলে যে এরা থাকতে দেবে না।

সুলতা গভীরভাবে বলিল, জামাই তুমি রোজ এসো। এরা থাকতে না দেয় আমাদের ঘরে গিয়ে থেকে।

যত দিন যায়, তত বয়স বাড়ে, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সংসাররূপ জালে ফড়াইয়া পড়িতে হয়। বিকাশের কলেজ-জীবন শেষ হইল, কর্তৃজীবন আরম্ভ হইল এবং তাহাও ধীরে ধীরে নুতনত্বকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া চলিল। প্রমীলা এখন নববয়স্ক হইতে জননী মহিমায় পদে উন্নীত হইয়াছে। ছুই ছেলে, এক মেয়ে এবং সাংসারিক শাসনা কাজ লইয়া এখন সে সব সময় বিভ্রত থাকে। বিকাশের পৃথিবী এখন আপিসের সঙ্গীর্ণ সীমার আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দশটা পাঁচটা আপিস করিয়াও নিজের নাই; গৃহে কিরিয়াও আপিসের অসম্পূর্ণ কাজ সারিয়া রাখিতে হয়। ছেলেমেয়েরা পিতার একটু আদরের প্রত্যাশায় পাশে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের আদর করিবার মত অবসর বিকাশের থাকে না। ছেলেমেয়েরা চীৎকার করিলে, নিকটে দাপা-দাপি করিলে তাহার কাছের ব্যাঘাত হয়, সে বিরক্তি বোধ করে, প্রমীলা বলে, ছেলেমেয়েরা দাপাদাপি মাতামাতি না করে কি তোমার মত মুখ গভীর করে আপিসের হিসেব দেখবে ? সুলতার মত মেয়ে চেয়েছিলে, এখন মেয়ে ছুটামি করলে এত চটলে চলবে কেন ?

সুলতার কথা কিন্তু বিকাশ ভোলে নাই। যদিও এখন খণ্ডরবাড়ী কচিং যাওয়া ঘটয়া উঠে, তা সত্ত্বেও যখনই যায় তখনই সুলতা তাহার হাতমুখ লইয়া বিকাশের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এখন সে আর বালিকা নাই, যৌবনের আভাস তাহার সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বিকাশের নিকট কিন্তু তাহার লজ্জা নাই। মাথার সামান্য একটু ঘোমটা টানিয়া সে বিকাশের নিকট আসিয়া পূর্বের মত নিঃসঙ্কোচে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে। তবে এখন পত্রিকার ছবি অপেক্ষা গল্প-কবিতার প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, দক্ষাশিষ্ট সিগারেটের টুকরার প্রতি তাহার আর আকর্ষণ নাই।

সেদিন আপিস হইতে কিরিয়াক বিকাশ বৈকালিক জল-
ষোপে মনোনিবেশ করিয়াছে এমন সময় প্রমীলা কহিল,
বাবা চিঠি দিয়েছেন। খোকার বিয়ে। লম্বা ছুটির দরখাস্ত
কর।

বিকাশ কহিল, “একঘেয়ে কাজ করতে করতে আহারও
বিরক্তি ধরে গেছে। ছুটিও অনেক পাওনা আছে। দেখি
কি হয়।”

ছুটি মিলিল এবং এক দিন বিকাশ সপরিবারে খণ্ডরালয়ে
আসিয়া হাজির হইল। বহু দিন আসা-যাওয়া না থাকায় সবই
যেন কেমন একটু অপরিচিত অপরিচিত মনে হইতে লাগিল।
মাহারা ছোট ছিল তাহার বড় হইয়াছে, মাহারা বড় ছিল
তাহার আরও বড় হইয়াছে। অবিবাহিতদের বিবাহ হইয়াছে,
মেয়েদের অনেকেই সন্তানের জননী হইয়াছে। স্নানভাতকে
বিকাশ যে আর আগের মতটী দেখিবে না তাহা বুঝিতে
পারিল। হরত তাহার বিবাহ হইয়াছে, হরত সে এখন
খণ্ডরালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শীঘ্রই তাহার অসুস্থ মানস মিথ্যা হইল। শুনিতে পাইল,
স্নানভাত বিকাশের শাস্ত্রীকে কহিতেছে, কৈ গো বৌদি, জামাই
কি এনেছে দাও।

শাস্ত্রী হাসিয়া বলিতেছেন, জামাই কি এনেছে, না
এনেছে, তা জামাইয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর—

“তাই যাই।” বলিয়া সে বিকাশের নিকটে আসিয়া
উপস্থিত হইল। বলিল, “ভাল আছে তো জামাই?”

বিকাশ চোখ তুলিয়া স্নানভাত দিকে তাকাইয়াই চোখ
নামাইয়া লইল। এই যুবতীর সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতে
তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

স্নানভাত কহিল, তোমাকে এবার খুব রোগী দেখাচ্ছে।
শরীরের যত্ন নিছ না বুঝি?

বিকাশ চাহিয়া দেখিল স্নানভাত সীমন্তে সিন্দূর নাই।
বুঝিল, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। কহিল, শরীর
খারাপ হয়েছে বলেই একেবারে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে
এগেছি। ভাল করে শরীর সারাব, তবে যাব।

স্নানভাত আনন্দোদ্ভীর্ণ কণ্ঠে কহিল, এক মাস থাকবে। খুব
আমোদে দিনগুলো কাটানো যাবে তা হলে।

স্নানভাত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে বিকাশেরও মনের সঙ্কোচ
কাটিয়া গেল। ইহার পর পূর্বের মতই উভয়ের মধ্যে
আলাপ জমিয়া উঠিল। স্নানভাত প্রায়ের মধ্য-ইংরেজী
বিভাগে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। ইহার অভিরিক্ত শিক্ষা-
লাভের সুযোগ তাহার হয় নাই। কিন্তু বিকাশ তাহার
সহিত কথা বলিয়া বুঝিল, পড়াশুনার চর্চা এখনও সে ছাড়ে
নাই এবং সে চর্চাও নেহাত নিম্নস্তরের নয়।

দিনগুলি সত্যই আনন্দে কাটিতেছিল। নিত্য দশটার

সময় আপিস ঘাইবার তাড়া নাই, যখন ইচ্ছা শয্যা ছাড়িয়া
উঠিতে পারা যায়, স্নান-আহারের সময় কোনও নিষিদ্ধ
নিয়ম না মানিলেও চলে। বিশেষ করিয়া স্নানভাত আনন্দোচ্ছল
সাহচর্য্য বিকাশের অবসর-দিনগুলি অধিকতর মনোরম করিয়া
ভুলিতেছিল।

এক দিন স্নানভাত হঠাৎ বিকাশকে প্রশ্ন করিল, জামাই,
মেয়েমাহাত্ম্যের বিয়ে না করলে কি চলবেই পারে না?

বিকাশ এরূপ প্রশ্নের জন্ত প্রস্তুত ছিল না। স্নানভাতের
সাংসারিক অবস্থার কথা তাহার অজানা মাই। গৃহে বিধবা
মা হাতী দ্বিতীয় কোনও অভিভাবক নাই। আর্থিক অবস্থাও
এমন লজ্জল নহে যে, বিবাহযোগ্য এই তরুণীকে সংপায়ে
সমর্পণ করা যাইতে পারে। রূপ এবং রূপার পরিপূর্ণ সমন্বয় না
হইলে আজিও আমাদের দেশে কত সংপায়িত করা সহজ
ব্যাপার নয়। স্নানভাত রূপ আছে, গুণও আছে, কিন্তু গৃহে
রূপার অভাব। কাজেই আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।
কিন্তু তাহার সহিত বিকাশের সামাজিক সম্পর্কটা এমন
ধরনের যে, এইরূপ বিষয় লইয়া তাহার সহিত আলোচনা
করিতেও তাহার বাধ-বাধ ঠেকে। তবু সে বলিল, মেয়েদের
বিয়ে না করলে যে চলে না, তা নয়। তবে আজীবন
কুমারী হয়ে থাকতে গেলেও তার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের,
আত্মনির্ভরশীল হবার মত বিশেষ শিক্ষার দরকার।

স্নানভাত স্নান মুখে বলিল, কিন্তু সে পারিপার্শ্বিক আমি
পাই কোথায়, আর সে শিক্ষাই বা আমার দেয় কে?

বিকাশ সে কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। নীরবে
স্নানভাত চিন্তাকূল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ে
এতদিন ধরিয়া যে আনন্দ-লোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল
আজ সর্বপ্রথম তাহার মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ণ বেদনার
আবির্ভাব হইল। স্নানভাত অল্পক্ষণ পরে আবার কহিল,
জামাই, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমার কোনও কাজে চুকিয়ে
দিতে পারো? দেশের কাজে কিংবা রোগীর সেবায়?

এরকম কোনও কাজের সন্ধানও বিকাশের জানা ছিল
না। তাই সে এবারও চূপ করিয়া রহিল।...

রাজ্য প্রমীলা কহিল, “দেখ, তোমাকে বলি বলি করেও
বলতে পারি নি। কিন্তু আর না বলেও থাকতে পারছি
না। স্নানভাত সম্পর্কে আমাদের গুরুজন হলেও সম্পর্কটা খুব
নিকট নয়। ওর সঙ্গে এত মাঝামাঝি করলে পাঁচ জনে পাঁচ
কথা বলতে পারে।”

বিকাশ কথাটা অত্যন্ত হাল্কাভাবে লইয়া মুহু হাসিয়া
চূপ করিয়া রহিল।

কিন্তু নিকট-সম্পর্কী না হইলেও শেষকালে স্নানভাত
সমস্ত তার প্রমীলার পিতাকেই গ্রহণ করিতে হইল। স্নানভাত
মা সামাজ্য কিছু অবিজ্ঞা যাহা ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া এক

বিপন্নীকৃত হুদের হাতে স্নলভাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বামীভাগ্য ভাল ছিল না। তাই বৎসরান্তেই বিধবা হইয়া সে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং পর বৎসরই যাকে হারাইয়া প্রমীলার পিতৃ-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

স্নলভার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কাহিনী বিকাশ চিঠিপত্রের মারফত অবগত হইতেছিল। তাহার এই পরের গৃহে আশ্রয় লওয়া রূপ দুর্ভাগ্যটার জটাই বিকাশ সবচেয়ে বেশী ব্যথিত হইল।

ইতিমধ্যে বিকাশের ক্ষুদ্র সংসারে আরও দুটি নুতন অভ্যাগতের শুভাগমন হইয়াছে এবং সকলের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়া প্রমীলা নিজের শরীরের উপর লক্ষ্য রাখিবার মত সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কন্ডার অন্তঃস্থতার সংবাদে উৎকণ্ঠিত পিতা কন্ডা-জামাতাকে তাহার গৃহে যাইয়া কিছুকাল কাটাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পাহাড়-ঘেরা পল্লীগ্রামটির স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া ব্যাতি আছে। বিকাশ আর একবার দীর্ঘদিনের ছুটি লইয়া সপরিবারে স্বস্ত্রালয়ে গিয়া হাজির হইল।

এবারের মত এমন অন্তরঙ্গভাবে বিকাশ আর কখনও স্নলভাকে পার নাই। স্নলভা এখন আর পরের ঘরের ঘেরে নয়, প্রমীলাদের সংসারেরই একজন। তাহার কর্দমক্কার, সেবানিপুণতার বিকাশ মুগ্ধ হইয়া গেল। স্নলভার সেবার শুণে স্বল্পদিনের মধ্যেই প্রমীলার পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তিমআভা দেখা দিল, অস্থি-চর্খসার দেখে পুনরায় লাবণ্যের সঞ্চার হইতে লাগিল।

স্নলভা না থাকিলে ছোট ছেলে ছুটিকে সামলানো দায় হইয়া উঠিল। হেলের সঙ্গে ছেলেরা দুই সাজিতে, রোগীর সঙ্গে রোগী সাজিতে, অপরের জন্ত সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে সে কোথায় শিখিল, তাহা ভাবিয়া বিকাশ বিস্মিত হইল। বলিল, “এত ষাটুনি খেটেও তোমার মুখে যে কি করে হাসি মেলে থাকে তা ভেবে আমি অবাক হই। তোমার এত খাটবারই কি দরকার? ঘরে ভ লোকজনের অভাব নেই।”

স্নলভা হাসিয়া কহিল, “মেয়েছেলে হয়ে যখন জন্মেছি তখন সুযোগ পেয়েও মেনেদের করণীর কাজগুলো করতে না পারাটাই ছুঃখের বিষয়। নিজের লোকের জন্ত মেয়ে-ছেলের খেটে যে কত আনন্দ, তা ভোঁসরা পুরুষেরা বুঝে উঠতে পারবে না।”

বিকাশও হাসিল। কহিল, “তা না বুঝি; কিন্তু এটুকু বুঝি যে তুমি তোমার শরীরের উপর আলো লক্ষ্য রাখছ না। আদ্যনাতে নিজের দুখখানি একবার দেখো, তা হলেই আমার কথা বুঝতে পারবে।”

অকস্মাৎ স্নলভার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল। সে বিকাশের টেবিলে কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিতেছিল। হৃদয়ের কোন এক উদ্ভাস উচ্ছ্বাসকে প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সে হাতের কাজ সমাপ্ত না করিয়াই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আমি থাকব কি করে? প্রমীলার শরীরও ভোঁ এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে কেমন হয়?

বিকাশ উৎসাহিত হইয়া কহিল, খুব ভাল হয়। স্বস্ত্র মশায়ের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি।

বিকাশকে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইল না। স্বস্ত্র মহাশয়ই বলিলেন যে, স্নলভা তাহাদের সঙ্গে যাক। আরও কিছুদিন সাবধানে না থাকিলে প্রমীলার স্বাস্থ্য পুনরায় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

স্নলভার হৃদয় আনন্দ-উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। স্বাস্থ্যের আয়োজন করিতে করিতে তাহার মন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের স্বল্পশিক্ষিতা বিধবা সে। সাংসারিক অভিজ্ঞতাও যে তাহার খুব বেশী হইয়াছে, তাহা নহে। নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত সচেতনতাও তাহার আসে নাই। তাহার এই আনন্দ যে কোনও অসামাজিক বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই।...

কিন্তু যাহার দৈহিক দুর্বলতা আসিয়াছে, নিজের গৌলন্দ্য সহজে যে সন্নিহান হইয়া উঠিয়াছে, নিজের উপর আস্থা হারাইতে তাহার বেশী দেরি হয় না এবং অসংবত মুহূর্ত্তে যাহা সে বলিয়া ফেলে তাহাই তাহার অবচেতন মনের স্বার্থ পরিচয়। একদিন হঠাৎ প্রমীলার অবচেতন মনের গহনে সঞ্চিত অমূলক সন্দেহের পরিচয় পাইয়া বিকাশের সমস্ত আনন্দ অবলুপ্ত হইয়া গেল।

প্রমীলা বিকাশকে বলিতেছিল, তুমি যে কত দূর অধঃ-পাতে গেছ, তা বুঝবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তোমার লোপ পেয়ে গেছে। এত দিন দূরে ছিল, এবার কাছে পাবে। আমারও এই শরীর, কবে যরি তার ঠিক নেই। নিজের জন্ত ভাবছি না। যত আমার দুশ্চিন্তা ছেলেমেয়েদের জন্ত।

কিনিসপত্র গুছান সহজে কি একটা পরামর্শের জন্ত স্নলভা প্রমীলার কাছে আসিতেছিল। স্বামী-স্ত্রীর আলাপ যখন তাহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কি সহজে আলাপ চলিতেছে, তাহা যখন সে উপলব্ধি করিতে পারিল, তখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহার আর ফিরিয়া যাইবার পথ ছিল না।

প্রমীলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল। সে স্নলভার

প্রবেশ লক্ষ্য করে নাই। বিকাশ লক্ষ্য করিলেও প্রমীলাকে সতর্ক করিয়া দিবার সুযোগ পাইল না।

স্বামীর নীরবতার প্রমীলার কেমন খেন সন্দেহ হইল। সে পিছন ফিরিয়া স্নানভাণ্ডারকে দেখিয়া নির্ঝাঁক হইয়া মুখ নত করিল। নিজের অসংযত উজ্জ্বল জুহুঃখে কোণ্ডে, লজ্জায়, অহুশোচনায় তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। স্নানভাণ্ডার হাত দুটি বরিয়া তাহার নিকট ফমা চাহিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না।

স্নানভাণ্ডার প্রস্তুত হইয়া মত একই স্থানে একই রকম ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। অসাধারণ মনের জোরে সে নিজেকে সামলাইয়া রাখিতেছিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। বিকাশ একটা মাসিকের পাতা উণ্টাইতে লাগিল, প্রমীলা মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল, স্নানভাণ্ডার ভেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে স্নানভাণ্ডার প্রথম কথা বলিল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া সে ধীর কণ্ঠে বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—জামাই, এর জন্ত তুমি হুঃখ করো না, বা পমীর উপর

রাগ করো না। সে যা বলে ফেলেছে হয়তো তা বলবার ভায় ইচ্ছা ছিল না। হয়ত এক বলতে আর বলে ফেলেছে। জিনিসপত্র আমি সব শুদ্ধিয়ে ফেলেছি। পমী, বাড়িগুলো তুই দেবে শুনে নে। আমার শরীরটা বজ্র ধারাপ লাগছে... বলিয়া সে ধীরপদে কক্ষ হইতে নিজস্ব হইয়া টলিতে টলিতে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পর মুহূর্তেই তাহার মুষ্টিত দেহ শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

স্বামীর সমস্ত যখন প্রমীলার মা শুনিলেন যে, স্নানভাণ্ডার যাইবে না তখন তিনি গর্জাইতে লাগিলেন, কহিলেন, পর কি কখনও আপন হয়, না পরের স্নেহ হুঃখ বুকে? ক’দিন ধরে কি লোক দেখাবো দরদরটাই না দেখালে। জামাই বলতে অজ্ঞান, ফেলে-মেয়েগুলো কাছে না থাকলে মুখে ভাত রোচে না, পমীর সেবা করতে না পেলে রাতে ঘুম হয় না। আর খেই সত্যিকারের দরকার হ’ল অমনি বলে বসল, আমি যাব না। অমন মেয়েকে মুখে ঝাঁটা মেয়ে খর থেকে বার করতে হয়—

প্রমীলার বাবা মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু স্নানভাণ্ডার এই অবাধ্যতায় তিনিও যে বুঝে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীশুশীলচন্দ্র ঘোষ

৪

কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, যত দিন পর্যাস্ত তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা বণ্টনের একটা মূলনীতি স্থির করিয়া না দেন ততদিন পর্যাস্ত দেশমুখ-বণ্টননীতি প্রচলিত থাকিবে। দেশমুখ-বণ্টননীতি অস্থান্য মূল ভিত্তির মধ্যে প্রদেশগুলির জনসংখ্যার অনুপাতের উপর স্থির করা হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ইহার মূল ভিত্তি প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি বর্গমাইলের বসতির হারের অনুপাতের উপর ধার্য্য করিলে অধিকতর ন্যায্যসঙ্গত হইত। কারণ খাটোয়পাদনের, শিল্প-প্রসারণের এবং প্রদেশবাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘনবসতি খুবই প্রতিকূল। এই কারণে ঐ সব প্রদেশ-সরকারকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য অপর প্রদেশের তুলনায় বাৎসরিক অনেক বেশী পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহা ভিন্ন বঙ্গবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্তা আরও নানাবিধ কারণে

জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ফলে প্রদেশ-সরকারকে ইহার জন্য বহু অর্থব্যয়ের দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। বঙ্গ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন কিরূপ সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহা ইহার মানচিত্র দেখিলে সহজেই অনুমান করা যাইবে। কংগ্রেস-নেতারা বহুকাল পূর্বে ভারত ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানা পরিবর্তনের ন্যায্যসঙ্গত দাবি মানিয়া লইয়াছিলেন; ইদানীং পণ্ডিত নেহরু ও অপরপর কংগ্রেস-নেতারা ঐ সকল প্রতিশ্রুতি কার্য্যতঃ ভঙ্গ না করিলেও ক্রমে ক্রমে ইহার সঙ্গে এমন সব সর্ভ আরোপ করিতেছেন যাহার দরুন কখনও সে প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। বাঙালী জাতি যে কেবল স্বাস্থ্যের দিক হইতে ক্ষয়িষ্ণু তাহা নহে। এই প্রদেশকে সকল দিক দিয়াই ক্ষয়িষ্ণু প্রদেশ বলিলে অত্যাুক্তি হইবে না। ইদানীং প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল বৃহত্তর বঙ্গের আশা-ভরসা একরূপ কল্পনা-লোকে পাঠাইয়াছেন বলিলেও চলে। তাঁহার মতে কোন প্রদেশের

সীমানা পরিবর্তন করিতে হইলে প্রতিবেশী উভয় প্রদেশেরই মোটামুটি সম্মতি থাকা দরকার। বাস্তব ক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থা কখনও সম্ভব হইতে পারে কি? অনেকে মনে করেন যে, ঐরূপ ধারণা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। যদি কেহ প্রস্তাব করেন, হিন্দু কোড বিলের বিবাহ-বিচ্ছেদ ধারাতে এমন একটি নতুন সংজ্ঞা যোগ করা উচিত যে উভয় পক্ষ মোটামুটি সম্মতি না দিলে কোন আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ঐরূপ প্রস্তাবকে সকলে নিশ্চয়ই প্রজাপোক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন এবং নেহরুজীও যে তাহাই বলিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যত দিন পর্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রদেশের আয়তন ও সীমানা, ভৌগোলিক অবস্থা, লোকসংখ্যা, বসতির হার, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যত দূর সম্ভব সমতা রক্ষা করিয়া পরিবর্তন না করা হইবে তত দিন পর্যন্ত কোন অর্থ কমিশনই এই উপ-মহাদেশকে স্থায়ী ভাবে অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কারণ ইহা ব্যতিরেকে প্রত্যেক প্রদেশে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত অবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার অধিকার আছে কি না তাহা আমার সঠিক জানা নাই, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শুনিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ কমিশনের নিকট কেন্দ্রীয় তহবিল বন্টনের বিষয় যে সমস্ত স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছেন তাহাতে একমাত্র ঘনবসতির জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের খরচ বেশী হয় এই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঘনবসতির জন্য শিল্প-সম্প্রসারণ, খাজোৎপাদন ও নানা বিষয়ের অস্থবিধার কারণে প্রদেশবাসীর এবং প্রাদেশিক তহবিলের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত করেন নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও বিশদভাবে তাঁহাদের দাবি অর্থ কমিশনের নিকট দাখিল করা কর্তব্য।

নিম্নে ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট অনুসারে কয়েকটি প্রদেশের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক দুরবস্থা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। এই প্রদেশ-সরকার যদি যথেষ্ট পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে না পায় তাহা হইলে কোন বিভাগেরই উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইবে না এবং প্রদেশ ও প্রদেশবাসীরা দিনের পর দিন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে চলিতে থাকিবে।

বাজেট ১৯৫১-৫২

(হাজার অল্পপাতে)

প্রদেশের নাম	বাৎসরিক আয়	বাৎসরিক ব্যয়	বাড়তি	ঘাটতি
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪,০৪,৫৪	৩৮,৮০,৭৪	—	৪,৭৬,২০
বোম্বাই	৬০,৬৪,২৫*	৬০,৫২,৭৩	৪,৫২	—
মাদ্রাজ	৫২,৬২,৫০	৬০,২২,৭৮	—	৬৭,২৮
উত্তর প্রদেশ	৬১,২৬,০০	৬১,৫১,০০	—	২৫,০০
পূর্ব-পঞ্জাব	১৬,৬৩,৪১	১৬,৮৪,৮৮	—	২০,২৭
বিহার	৩৫,৯৬,৭৩†	৩১,১২,৯২	৪,৮৩,৮১	—
উড়িষ্যা	১০,৫৬,৩২	১১,৫০,৮১	—	৯৪,৪৯
মধ্যপ্রদেশ	২০,৪৪,৫০‡	২০,৩০,৬০	১৩,৯০	—
আসাম	৯,৬২,৫০	১০,৬০,২৪	—	৯,৮৪

সম্প্রতি প্রদেশ-বিধানসভায় ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় নির্বাচন-দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী কিরূপ অসহায় অবস্থায় উপনীত তাহা খুবই পরিস্ফুট হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এত অধিকসংখ্যায় অপর প্রদেশবাসী আসিয়া জমিশিলে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জন করিতেছে যে, বাংলার রাজ্য-বিধান ও লোকসভায় বাঁহারা মনোনীত হইবার জগ্গ প্রার্থী হইয়াছেন তাঁহাদের অনেক ক্ষেত্রে অপর প্রদেশবাসীর ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে ও হইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় এই প্রদেশের রাজ্য-বিধানসভায় বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থ অপর প্রদেশবাসীর স্বনামী ও বোনামী সভ্যদের ইচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর করিবে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমস্ত শহরে ও শিল্পক্ষেত্রে অপর প্রদেশবাসীর সংখ্যাধিক্য কেবলমাত্র সেই সমস্ত অঞ্চলের বাসিন্দা নিজ প্রদেশের লোকদের প্রভাবান্বিত করিবার জগ্গ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর, উত্তর প্রদেশের পণ্ডিত পন্থের, উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মহতাবের, বিহারের শ্রীযুক্ত জগজীবনরামের পরিভ্রমণ-সূচী স্থির হইয়াছিল। যে সমস্ত জেলায় এবং যে সমস্ত মহকুমায় ভিন্ন প্রদেশবাসীর সংখ্যা কম সেই সমস্ত অঞ্চলে এই সকল নেতা কেন ভ্রমণ-সূচীভুক্ত করেন নাই ইহা ভাবিবার কথা। এই সমস্ত দেশনেতাই আবার প্রাদেশিকতার গন্ধে বিচলিত হইয়া উঠেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই নির্বাচন-দ্বন্দ্ব তাঁহারা নিজেরাই কতদূর প্রাদেশিকতামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

* মজুত আমানত টাকা হইতে ২,০০,০০ লইয়াছে।

† মজুত আমানত টাকা হইতে ১১,০০,০০ লইয়াছে।

‡ মজুত আমানত টাকা হইতে ৯৬,০০ লইয়াছে।

সাধারণতঃ কোন প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে সেই প্রদেশে নানারূপ বৃহত্তর শিল্পের সম্প্রসারণ আবশ্যক হয় ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ শিল্প-সম্প্রসারণ বর্তমান অবস্থায় বাঙালীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে কিনা তাহা বিশেষ ভাবিবার কথা, কেননা নানা কারণে ইহা বহু প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। আমার মনে হয় সর্বপ্রথমে কুটিরশিল্পের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতিবিধান করিতে পারিলে বাঙালীকে তাহার আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। যতই নূতন নূতন বৃহৎ বৃহৎ শিল্প পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবে ততই অধিকতর সংখ্যায় অপর প্রদেশ হইতে শ্রমিকেরা এই প্রদেশে আসিয়া বসতির চাপ ও সেই পরিমাণে খাচ্ছাব আরও বাড়াইয়া তুলিবে। যখন কেবলমাত্র কৃষিকার্যের জন্তই এই প্রদেশে সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও রাঁচি হইতে বহু শ্রমিক আনিতে হয় তখন উপযুক্ত বাঙালী শ্রমিকের অভাবে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবার জন্য অপর প্রদেশ হইতে শ্রমিক লইয়া আসা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। পূর্বে মধ্যবিত্ত বাঙালী যৌথ কোম্পানিতে অংশ (share) কিনিয়া বহু কোটি টাকা হারাইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা আর অর্থ বিনিয়োগ করিবেন কিনা সন্দেহ। বিভ্রাট বাঙালীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ডাইরেক্টর হইবার মত অংশ কিনিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে কতিপয় বাঙালী কেরাণী ও কয়েকটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী জীবিকানির্ভার করিতে পারিবে মাত্র। ভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকগণ তাহাদের উপার্জিত টাকা স্ব প্রদেশে পাঠাইয়া দিবে এবং অপর প্রদেশবাসী ঋাহারা ঐ সমস্ত কোম্পানীতে মূলধন বিনিয়োগ করিবেন তাঁহারা লভ্যাংশ ভোগ করিবেন। ইহাতে বাংলা ও বাঙালীর লাভ কোথায়? সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৬৪০ কোটি টাকা আয়কর আদায় হইয়াছিল। কিন্তু এই আয়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দেয় অংশ কতটুকু তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে মোটামুটি অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহাদের অংশ বেশী নহে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন কোন প্রদেশের কত শ্রমিক কার্যে লিপ্ত আছে তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করিতেছেন। যখন এই অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবে তখন সঠিক বুঝা যাইবে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গবাসী শ্রমিক ও কার্যরত ব্যক্তিদের স্থান কতটুকু।

গত ৮ই ডিসেম্বর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমানগর ষ্টেশনের নিকট উত্তর-কলিকাতা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্প্রদারণ পরি-কল্পনার প্রাথমিক উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, খাচ্ছাব-পাদন বৃদ্ধি এবং দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির জন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আরও বলিয়া-ছেন যে, মফস্বলবাসীদের স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত এবং যাহাতে শহর ছাড়িয়া লোকে মফস্বলে বাস করিতে আগ্রহান্বিত হয় তাহার জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু মফস্বলে বাস করিয়া লোকে কি ভাবে জীবিকা অর্জন করিবে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখি, উপস্থিত কয়েকটি ছোট ছোট শহরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। যদি কেবলমাত্র ঐ শহরগুলিতেই বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত শহরের আশপাশের কৃষিক্ষেত্র-সমূহ কি করিয়া উহার সুবিধা পাইবে এবং কুটিরশিল্পই বা কিরূপে গড়িয়া উঠিবে? যদি ছোট শহরগুলির ভিতরেই কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠে তাহা হইলে অধি-বাসীদের স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া উঠা দূরের কথা বরং কমিতেই থাকিবে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে প্রাদেশিক ও জেলার রাস্তাগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা দরকার যাহাতে শহরের বাহিরে ঐ সমস্ত রাস্তার ধারে কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা ভোগ করিতে সক্ষম হয়। আমি জানি উত্তর-কলিকাতা বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগের উপদেষ্টারসারে পরিচালিত একটি সুপরিচিত কৃষি-প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য দরখাস্ত করিয়া এখনও তাহা পায় নাই; যদিও সেই কৃষি-ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ কোন একটি বাগানবাড়ীতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন কি নিকটবর্তী একটি বাস্তহারা কলোনির অধিবাসীদের দরখাস্ত—যতদূর জানা যায়, এখনও মঞ্জুর হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে কুটিরশিল্প—পূর্বে যাহা ছিল এবং এখনও আছে সেগুলির পুনরুদ্ধার ও সুপরিচালনার ব্যবস্থার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাঙালী যুবক ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের উপযোগী আরও অনেক প্রকার কুটিরশিল্প এই প্রদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে এবং সেগুলির জন্য অপর প্রদেশের শ্রমিকের আমদানী আবশ্যক হইবে না। তাঁত-শিল্পের ন্যায় গৃহস্থঘরের ছেলেমেয়েরাও এই সমস্ত কুটির-শিল্প প্রসারে সাহায্য করিতে পারে। সুইজারল্যান্ডে

যে রূপ নানা প্রকার ঘড়ি তৈরি করিবার ছোট ছোট কারখানা দেখিয়াছি, মনে হয় তদনুরূপ ছোট কারখানা পশ্চিমবঙ্গের সুবন্দের বিশেষ উপযোগী হইবে। এই সব কুটারশিল্প শিক্ষা করিবার জন্য, বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠাইলে বিশেষ ফল হইবে কি না সন্দেহ, কারণ ইহা বহু সময় ও ব্যয়সাধ্য। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার চীন, জাপান, সুইজার-ল্যান্ড, ইটালি এবং অন্যান্য কুটারশিল্পপ্রধান দেশগুলি হইতে কুটারশিল্পে সুদক্ষ ব্যক্তিদের আনাইয়া একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে কতকগুলি স্থানিদ্ধিষ্ট গ্রামে ও শহরে পাঠাইয়া সেখানকার অধিবাসীদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে এই প্রদেশবাসীর প্রভুত অর্থ-

নৈতিক উন্নতি হইবে আশা করা যায়। বাহাতে কুটার-শিল্পগুলি সময়বায় পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠে এবং সেইগুলি অর্থাভাবে এবং মহাজনের ঋণের চাপে ধ্বংস না হইয়া যায় তাহার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় প্রদেশ-সরকারের দ্বারা পরিচালিত একটি করিয়া সময়বায় লব্ধী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থাভাবে ও মহাজনের ঋণের চাপে বহু কুটারশিল্প হয় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে নতুবা মহাজনের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ফলে লভ্যাংশ মহাজনেরাই যোল আনা ভোগ করিতেছে। বহির্বাণিজ্যে, বৃহত্তর শিল্পে ও অপর্যাপ্ত ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কোথায় তাহা পরে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

জন্ম—১৮৫২ খ্রিঃ, ডিসেম্বর মৃত্যু—১৯৩৬ খ্রিঃ, ৫ই ডিসেম্বর

জীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

রামমোহনশেখর আবির্ভাবের কল্যাণপ্রদ ফল জাতি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল উনবিংশতি শতকের শেষ দিক্ হইতে। তৎকালে বাংলাদেশের যে স্বল্প-সংখ্যক ভরূপ সেই জ্যোতির্ষ্ময় অভ্যুদয়কে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। ভারতীয় জাতিগঠনে, বাংলার সামাজিক প্রগতি-বিধানে এবং নির্ভীকতা ও সন্তোষ সহিত সাংবাদিকের কর্তব্য সম্পাদনে মিত্র মহাশয়ের দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার কর্ম-জীবনের গতি ছিল বহুমুখী। দেশ, জাতি ও সমাজের হিতকর কার্য্যে মাত্রই তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিত। এই সমুদয় কার্য্যকে তিনি ভগবানের প্রিয় কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কর্মজীবন আধ্যাত্মিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি বলিতেন যে, কাজ না করিয়া বসিয়া থাকা, সেও মৃত্যু। অন্তিম শয্যায় শয়নের পূর্বে পর্য্যন্ত তিনি লোকহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মধ্যযাত্রা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার মোহ হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিম্মুক্ত রাখিয়া, নিগ্রহ-নির্ধাতনকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া এবং ভগবানে অবিশ্রান্ত ভক্তি-বিশ্বাস লইয়া মিত্র মহাশয় আমত্ব দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাখিল গ্রামে সম্ভ্রান্ত বঙ্গ কায়স্থ পরিবারে কৃষ্ণকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষ বাবরগঞ্জ জেলার চন্দ্রবীপের রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। তাঁহার পিতা গুরুচরণ ছিলেন বান্ধিক, পরোপকারী, আশ্রিত-বৎসল ও সাহসী পুরুষ। এই সমুদয় সঙ্গুণ কৃষ্ণকুমার তাঁহার

পিতৃদেবের নিকট হইতে যেন উত্তরাধিকারস্বত্বেই পাইয়া-ছিলেন। গুরুচরণ ছিলেন একজন দক্ষ অখারোহী। দৈহিক বলের সঙ্গে তিনি মানসিক বলেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-উপদ্রবে বাংলার চাষী-মজুর অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। টাঙ্গাইল অঞ্চলেও নদীর ধারে-বারে অনেক ‘নীলকুঠী’ ছিল। তাঁহার নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী রামদেবপুরে মিঃ বেরি নামক একজন ইংরেজের ‘নীলকুঠী’ ছিল। সে বহু অসহায় লোকের ধানের ক্ষেতে জোর করিয়া নীলের চাষ করাইত এবং অনেক দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান কৃষক-প্রমজীবীকে বলপূর্বক নীল-চাষের জন্ত বেগার খাটাইত। বিপন্ন নিপীড়িত গ্রামবাসীরা গুরুচরণের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে সম্বলিত করিয়া লইয়া বেরি সাহেবের কুঠী আক্রমণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। নীল-কুঠীর খেতাব-পূত্রব ইহা জানিতে পারিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের বাবতীয় সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

গুরুচরণ নির্ধাতিত চাষী-মজুরদিগকে লাঠি, বল্লম, রাম-দা, কোঁচ, সড়কি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বেরি সাহেবকে দিবালোকেই আক্রমণ করিলেন। তিনি স্বয়ং অখারোহণে তাঁহার দলের লোককে পরিচালিত করেন। বেরি সাহেবও অশপৃষ্ঠে আক্রান্ত হইয়া সদল-বলে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত অগ্রসর হইল। সাহেব মৃত্যুকে লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে অশপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার দলের লোকেরা সবে সন্দেশে উর্দ্ধ্বাসনে পলায়ন

করিল। গুরুচরণের আদেশে উত্তেজিত জনতা সাহেবের ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া দিল। সেই দিন সন্ধ্যায় ভাহাকে নৌকায় করিয়া যমুনার অপর পারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। একজন গ্রাম্য 'মেটিভ' ভাঙ্গুদারের হস্তে এই ভাবে প্রেরিত হইয়া সাহেব আদালতে অভিযোগ আনিতে লজ্জা বোধ করিল। পূর্বোক্ত ঘটনার পরে সেই অঞ্চল হইতে নীলের চাষ উঠিয়া যায়। নিষিদ্ধিত অসহায় দুর্বল মানুষের ভয় বৈদনা-বোধ এবং তাহাদের উদ্ধারার্থ বিপদের সম্মুখীন হইবার মত মহদুঃখ ছিল গুরুচরণের বংশগত। কৃষ্ণকুমারের জীবনে ভাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকুমারের বিজ্ঞান-জীবন আরম্ভ হয় ময়মনসিংহ শহরের বড় বিজ্ঞানশালায়। এই শিক্ষায়তনে তৎকালে কোরানের বদ্বাদ্ধবাদক, 'তাপনমালা' ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের স্বনামধন্য প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষক। অপর একজন শিক্ষকও ব্রাহ্ম-বন্দ্যবলদ্বী ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া অপর স্থানীয় জেলা স্কুলে ভর্তি হইলেন। সেই স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যেও কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্ম। এই সকল আদর্শ শিক্ষাত্রুতী তাঁহার মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে ময়মনসিংহ শহরে একটি শাখা ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সমাজের সভ্যদের সম্মেলন ছিল—“যাহা সভ্য বলিয়া বিশ্বাস করিব, কাজেও তাহাই করিব।” এই সঙ্গলবাণী কৃষ্ণকুমারের কিশোর-চিন্তকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। তিনি পরম আগ্রহের সহিত উক্ত সমাজে যোগদান করিয়া সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের কর্মধারা, পূর্বোক্ত সঙ্গল-বাণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়াছে। সেই সঙ্গল তিনি জীবনে কখনও ভুল করেন নাই।

কৃষ্ণকুমার ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া নিয়মিত ভাবে উপাসনায় যোগদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। তখন এত অল্প বয়সে হিন্দু-পরিবারের কোন ছেলেকে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার পিতার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে 'ভ্যাড্যাপুত্র' করিবার জন্য তাঁহার পিতাকে পরামর্শ দিলেন। দৃঢ়চিত্ত স্নেহশীল পিতা তাঁহাদের পরামর্শমত কাজ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। তাঁহাকে একঘরে করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করা হয়। গুরুচরণ ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি বরং পুত্রের সঙ্গে একঘরে হইয়াই থাকিবেন, এইরূপ ভাষা পুত্রকে বর্জন করিবেন না।

ময়মনসিংহ শহরে বাসকালে কৃষ্ণকুমার এমন অনেক সঙ্গী পাইলেন—যাহাদের সহিত এক দিকে যেমন সলালোচনা হইত, তেমনি খেলাধুলা এবং ব্যায়াম-চর্চাও চলিত। সমস্তর,

নৌকাচালনা, অথারোহণ, ৫০।৬০ মাইল দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করা ইত্যাদিতে তিনি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিবার সময় সঙ্গীদের লইয়া সাতার কাটিতেন। তৎকালে ঐ নদের প্রশস্ততা অনেক বেশী ছিল। কৃষ্ণকুমার ও তাঁহার সঙ্গিগণ সাতার কাটিয়া ব্রহ্মপুত্রের পরপারে যাইতেন এবং পুনরায় এ-পারে করিয়া আসিতেন। তাঁহার বাল্যকালে ময়মনসিংহ শহর হইতে বাঘিল গ্রামে যাইতে হইলে বর্ষাকালে নৌকায় নদীপথে যাতায়াত করিতে হইত এবং গ্রীষ্মে পদভ্রমে ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইত। তাঁহাদের গ্রামে হাঁটিয়া যাইতে তিন দিন সময় লাগিত। বালক কৃষ্ণকুমার গ্রীষ্মাবকাশে সঙ্গীর সহিত দীর্ঘ পথ ভ্রমণে তিন দিন হাঁটিয়া, হিংস্র-ধাপদ-সহুল ও দস্যু-উপকৃত মধুপুরের অরণ্যের মধ্য দিয়া স্বগ্রামে যাইতেন এবং অবকাশ-অন্তে শহরে ফিরাই আসিতেন। একবার পূজার ছুটিতে নৌকায় গ্রামে যাইবার কালে ভীষণ ঝড়ের ঘূর্ণে পড়িয়া নৌকাডুবি হয়। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এক জ্যাঠাতুতো ভাই; উভয়ে এক চরে ঝাউ গাছ বরিয়া সারারাত্রি কাটাইলেন। পর দিন প্রভাতে তরল-বিস্কৃত তরা নদী সাতারাইয়া পার হইয়া অপর ভীরে এক জোলা গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া উঠিলেন। নদী-পথে যাতায়াতকালে কৃষ্ণকুমার মাঝিদের সঙ্গে নিজে নৌকা চালাইতেন। এমনই ভাবে তিনি বাল্যকালেই সাহসী, কঠোর পরিগ্রামী ও কষ্টগমি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা গুরুচরণ মিত্র যৌবনকাল হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন। কৃষ্ণকুমারও বাল্যকালেই উত্তম ঘোড়া-সওয়ার হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন। বিরাশি বৎসর বয়সেও তিনি অথারোহণে টাঙ্গাইল মহকুমার কয়েক স্থানে স্বল্পমূল্যে যাতায়াত করিয়াছেন। ঘোড়া যতই দুরন্ত হইত তাঁহার সাহস ও উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পাইত। বাল্যকালে তিনি একবার একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়িতে চেষ্টা করিয়া প্রথমে বিফল মনোরথ হন। ঘোড়াটি এমন দুরন্ত ছিল যে, কেহ চড়িতে গেলে লাফাইয়া উঠিয়া বাধা দিত। তাঁহার ক্ষেপ হইল, এই ঘোড়ায় উঠিবেনই এবং উহাকে শাসিত করিয়া ভবে ছাড়িবেন। তিনি সেই ঘোড়ার লাগাম একটি গাছে বাধিলেন এবং গাছে উঠিয়া ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া পড়িলেন; তার পর প্রচণ্ড বেগে উহাকে অনেক দূর অবধি ছুটাইয়া লইয়া গেলেন। ইহাতে ঘোড়াটি অত্যন্ত ক্রান্ত হইয়া পড়িল। এমনই ভাবে ঘোড়াটিকে তিনি সায়েস্তা করিয়া ছাড়িলেন।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে কৃষ্ণকুমার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি পান। মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তাঁহার

এবল ছিল; কিন্তু অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল অল্পরূপ। শুধুমাত্র তাঁহাকে এক-এ পড়িবার ক্ষমতা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইতে হইল। কলিকাতার আসিয়া তিনি শিক্ষাপুর ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ ছাত্রাবাসে স্থান পাইলেন। বরিশালের স্বনামধন্য অধিনীকুমার দত্তও তখন এই ছাত্রাবাসে থাকিতেন। তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ভারতবর্ষে আনন্দমোহন বসু ওষায় আসিয়া ছাত্রদের সহিত মেলায়েশা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বন্দভাবে ও দেশসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সময় অধ্যক্ষ হেরবচন্দ্র মৈত্রেয়, কালীশঙ্কর স্কুল, দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে পিতার গুরুতর লীলায় সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণকুমারকে স্বগ্রামে যাইতে হইল। ইহাতে পাঠে ব্যাঘাত জন্মে, ফলে সেইবার তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইল না। পিতা স্নহ হইয়া উঠিলে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারীং ক্লাসে ভর্তি হইলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ সমাপ্তির পরে নানা কারণে তাঁহার এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

ইহার পর কৃষ্ণকুমার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। মাত্র ছয় মাস অধ্যয়নের পর তিনি এক-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন ক্লাসে ভর্তি হইয়া ‘প্লীডারশিপ’ (ওকালতি) পরীক্ষার ক্ষমতা লাভ হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষাও শেষ পর্যন্ত দেওয়া হইল না। জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে দুই বৎসর বি-এ পড়িয়া তিনি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন।

ছাত্রজীবনে ময়মনসিংহ শহরে অবস্থানকালে কৃষ্ণকুমার ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করায় পত্রোপকার, মেধাপরায়ণতা, দুর্গভদের উদ্ধার করিবার মনোবৃত্তি বিপদের উদ্ধার, দুর্বলকে রক্ষা ইত্যাদি বিবিধ সদৃশের বিকাশসাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতাদৃশ মহৎ গুণগ্রাম উত্তরকালে তাঁহাকে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবার ত্যাগস্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কলিকাতায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের বিদগ্ধমণ্ডলে থাকিয়া তিনি জীবনাদর্শকে রূপ দান করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইলেন। সেই মণ্ডলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির দ্বারা বরণ্য নেতা এবং দারকানাথ গাঙ্গুলী, কালীশঙ্কর স্কুল প্রভৃতির মত সুযোগ্য সহকর্মীর সন্ধান মিলিল। স্বদেশীয় জয়গণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনাসঞ্চার ও পৌর অধিকার-বোধ আগাইবার ক্ষমতা কৃষ্ণকুমার এবং তাঁহার সতীর্থ-বন্ধু কালীশঙ্কর স্কুল উত্তরবঙ্গে প্রচারকার্যে বাহির হইয়াছিলেন। তখন পর্যন্ত সে অঞ্চলে রেলগাড়ীতে চলাচল-ব্যবস্থা হয় নাই;

সেই কারণে যাত্রাস্রোতের ধুরই অনুবিধা ছিল। তাঁহারা দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নানা স্থানে গিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ—এই এগার বৎসর ভারতের জাতীয় জীবনে একটা সার্থক যুগ বলা যাইতে পারে। কলিকাতায় ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং সিটি স্কুল ও সিটি কলেজ ইত্যাদি এই যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান নেশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। ইহার পর ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন কংগ্রেসের (ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি) প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা অবধি কৃষ্ণকুমার একজন একনিষ্ঠ কর্মীরূপে ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আনন্দমোহন বসু বাংলার ছাত্রগণকে স্বদেশ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার মহান উদ্দেশ্যে ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলে কৃষ্ণকুমার তাহাতে যোগদান করেন। এই সমিতির তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী কর্মী। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় রাজনীতিক প্রগতি সাধনকল্পে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন’ (ভারত-সভা) স্থাপিত হয়। ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন আনন্দমোহন বসু। কৃষ্ণকুমার এই সভার বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

ভারতবর্ষের দ্বার বিরাট দেশে—যেখানে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস, নানা ভাষার প্রচলন, বিবিধ ধর্মমতের বিভ্রামতা ও শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে দেশবাসীর মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও সেখানে জাতির চেতনা সঞ্চার করা কেবল যে রাজনীতিক আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব নহে তাহা বাংলার তদানীন্তন দেশসেবকেরা বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য উনবিংশ শতকের শেষভাগে তাঁহাদের কর্মধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমার ১৮৮১ সনে সিটি স্কুলে মাসিক মাত্র ৪০ বেতনে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে দত্ত ছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁহার বন্ধু কালীশঙ্কর স্কুল গণিত পড়াইতেন। ছাত্রদের চরিত্রগঠন, স্বাস্থ্যোত্তীর্ণতা, শিক্ষাদান ইত্যাদি কার্যে কৃষ্ণকুমার এরূপ যত্ন লইতেন যে, অল্পকাল মধ্যেই তিনি ছাত্রসমাজ ও অভিভাবকগণের নিফট অন্তর প্রিয় হইয়া উঠিলেন। আদর্শ শিক্ষাত্রী বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি ছিলেন তাহাই। কত কল্পমিত-চরিত্র ছাত্রকে উদ্ধার করিয়া তিনি ‘স্বাচ্ছন্দ্য’ করিয়াছেন, কত অমনোযোগী বিপথগামী ছাত্রকে বিভ্রান্তিকার আকৃষ্ট করিয়া সংপথে আনিয়াছেন সেই সকল বিবরণ তাঁহার ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে এই আদর্শ শিক্ষাত্রীর উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা মনস্ত আশ্রয় হইতেই মত হয়।

প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে সিটি স্কুলটি কলেজে পরিণত হইল, পরবর্তীকালে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পদোন্নতি হইলেও তিনি মাসিক ১০ টাকার অধিক বেতন গ্রহণ করেন নাই। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে আনন্দমোহন বসু ও তাঁহার সুরোগ্য সন্তর্পণে এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, অল্পকাল মধ্যেই ইহা দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণসাধনের একটি সমরোপযোগী সংস্থায় পরিণত হইল। কৃষ্ণকুমার এই বিভাগতলে সামান্য পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করিয়াই শুধু নিজের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে এবং উড়িষ্যায়া যাইয়া প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তৎকালে রেল-প্রিমারে যাতায়াতের ব্যাপক ব্যবস্থা না হওয়ায় দূরদূরান্তরে গমন অভ্যস্ত কঠিনাধ্য ব্যাপার ছিল। একবার তিনি অর্থ-সংগ্রহের জন্য আগরতলায় জিপুরার মহারাজার নিকট গিয়াছিলেন। সিটি কলেজের জন্য মহারাজা তিন হাজার টাকা দান করেন। তখন জিপুরার যাতায়াতের জন্য রেলপথ ও প্রিমার ছিল না। নদীপথে আগরতলা হইতে কলিকাতায় নৌকাযোগে প্রভা-বর্তনকালে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাঁহার নৌকা ডুবিয়া যায়। নৌকাডুবি আসর বুঝিতে পারিয়া তিনি মহারাজার প্রদত্ত তিন হাজার টাকার রৌপ্য মুদ্রা ও নোট বাক্স হইতে বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলেন; নৌকাডুবির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাল-তরঙ্গপূর্ণ মেঘনা নদী সাঁতরাইয়া একবজ্রে অপর তীরে উঠিলেন, এবং সেই স্থান হইতে থালি পায়ে কয়েক কোশ হাঁটিয়া গোয়ালন্দে যাইয়া ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কৃষ্ণকুমার সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার এই প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সেবা করিয়াছেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে স্বদেশীগ্রহণ ও বিলাতী বর্জন আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করেন। গবর্ণমেন্ট সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ললিতমোহন দাসকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত রাখিলে সিটি কলেজের নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। তৎকালীন বিদেশী শাসকগণের ব্যর্থতা ছিল যে, চাকুরি হারাইবার ভয়ে তাঁহারা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। কৃষ্ণকুমার এবং তাঁহার সুরোগ্য সহকর্মী ললিতমোহন চাকুরি হাড়িলেন, কিন্তু দেশসেবার ব্রত ত্যাগ করিলেন না।

শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হুগোমোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মসমাজের চেষ্ঠায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই

চেষ্ঠাকে সফল করিবার জন্য যুবক কৃষ্ণকুমার একজন উৎসাহী কর্মীরূপে দিবারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয়তাবাদের আদি উপাত্তা ঋষি রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতীর সহিত কৃষ্ণকুমার পরিণয়হুত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহ উপলক্ষে সামান্য পোল-যোগের সজ্জাপাত হয়। রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সেই সমাজের বিধানমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে রাজনারায়ণ কৃষ্ণকুমারের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন।

লীলাবতী ছিলেন কৃষ্ণকুমারের যোগ্য জীবন-সঙ্গিনী। পতিভ্রতা সহনশীল বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি ছিলেন তাহাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এই বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। ইহাই মন্দিরে প্রথম বিবাহ বলিয়া বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হুইট হৃদয়ের নদী', 'জগতের পুরোহিত ভূমি', 'শুভ দিনে এসেছ দৌহে' ইত্যাদি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহ-সভায় গানগুলি গাহিয়াছিলেন—ডাঃ হুন্দরীমোহন দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ মিত্র, অঙ্গারক চুলিলাল, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য ও স্নেহপুষ্প গায়কগণ।

কৃষ্ণকুমারের দাম্পত্য জীবন সুখ-শান্তিতে কাটিয়াছে। সাধনী লীলাবতী যাবতীর সংস্কার্য্য স্বামীর সহযোগিতা করিয়া ছিলেন। দেশসেবার স্বামীর লাঞ্ছনা নির্ধাতন ভোগের অংশ-ভাগিনী হইতে তিনি কোন দিনই পক্ষাংগদ হন নাই। তিনি একজন স্নেহিকাও ছিলেন। 'বঙ্গনারী'—এই ছদ্মনামে বিভিন্ন বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বপ্ন, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবার কৃষ্ণকুমারের প্রেরণিত কৃতিত্ব 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। তাঁহার সম্পাদনার বাংলা ভাষায় এই সাপ্তাহিকখানি এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (৩রা বৈশাখ) কৃষ্ণকুমার স্বাক্ষরিত গদ্যোপাধ্যায়, হেরবচন মৈত্র, পরেশনাথ সেন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন বড়লাট লর্ড রিপণের শাসনকাল—ইলবার্ট বিলের আন্দোলন চলিতেছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা লইয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাই প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সঞ্জীবনী' অর্ধোপার্জননের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সঞ্জীবনী হইতে যে প্রচুর আয় হইত, তাহা তিনি স্বপ্ন, দেশ ও জাতির সেবায়ই ব্যয় করিয়া

গিয়াছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সঞ্জীবনীর প্রশংসনীর কার্যাবলীর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :

(১) ভারতস্থ ইংরেজদিগের পরিচালিত ইলবার্ট বিল-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিরোধ করিতে এবং দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগ্রত করিতে সঞ্জীবনী-সম্পাদক নির্ভীকভাৱে সহিত লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনীর কল্যাণে বহু বাঙালীর মনে জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগিয়াছিল।

(২) বিদেশী সরকার যখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে খোলা-ভাটি স্থাপন করিয়া অসহায় শ্রমিক লোকদের মধ্যে মজদুরের অভ্যাসের প্রচার দিতেছিলেন, তখন সঞ্জীবনী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দ-মোহন বসু ভারত-সভার পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ফলে গবর্ণমেন্ট খোলাভাটি প্রথা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

(৩) কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি সঞ্জীবনী ইহার সমর্থক ছিল। দেশের অনেক সংবাদপত্র নুতন হুজুগ সুরু হইল বলিয়া কংগ্রেসকে উপহাস করিতে থাকে। কোন কোন সংবাদপত্র কংগ্রেসকে ‘কদ্দরস’ এবং ‘X’mas pantomime’ বলিয়া বিক্রপ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সঞ্জীবনীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণ চিত্তাকর্ষক শিরোনামায় প্রকাশিত হইত এবং কংগ্রেসকে ‘জাতীয় যজ্ঞ’ ও কংগ্রেসের নায়কগণকে ‘হোতা’ বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

(৪) বাংলাদেশের বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে অসংখ্য আফিং ও চণ্ডুর আড্ডা বসানো হইয়াছিল। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা পর্যন্ত এই সকল আড্ডায় যাইয়া আফিং ও চণ্ডু সেবন করিত। সঞ্জীবনীর প্রবল আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে গুরুত্ব করার জন্য এক আফিং কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের তদন্ত সাহায্য করিয়া সঞ্জীবনী দেশ হইতে আফিং ও চণ্ডুর আড্ডা তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল। আসামে সঞ্জীবনীর মত শক্তিশালী নির্ভীক সংবাদপত্র না থাকায় সেখানকার বহু অধিবাসী আফিং-বোর (‘কানিয়া’) হইয়া গিয়াছিল। তদন্ত-কালে পুলিশের সতর্কতার দরুন অনেক সময়ে কমিশনের সদস্যগণ আফিংবোর ও চণ্ডুবোরের আড্ডাগুলি বাহির হইতে বৃষ্টিতে পারিতেন না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক স্বয়ং কমিশনের সদস্যগণকে লইয়া সিংহা লুক্কায়িত আড্ডাগুলি দেখাইয়া দিওন। তাহার ফলে কঠোর আইন পাস হয় এবং দেশ হইতে এই সমুদয় সর্বনাশা আড্ডা উন্নিহা যায়।

(৫) আসামে চা-বাগানে কুলীদের উপর যে অমানুষিক অভ্যাস হইত, তৎসম্বন্ধে দেশবাসী কিছুই জানিত না। সঞ্জীবনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম সেই অভ্যাসচারের কাহিনী সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রকাশ করিতে থাকে। সম্পাদকের

সতীর্থ বন্ধু দারকানাথ গদোপাধ্যায় কত বিপদের মধ্যে দিয়া আসামের চা-বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল অভ্যাসচারের বিবরণ সংগ্রহ করিওন এবং সঞ্জীবনীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিওন। কৃষ্ণকুমারের অগ্রিমদ্বী লেখনী তৎসমুদয় দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিত। তিনি প্রাণম্পর্শী ভাষায় লিখিত অসহায় নিরীহ দেশবাসীর উদ্ধারের জন্য দেশবাসীকে সচেতন হইতে আহ্বান করিওন। ‘চা না কুলীর রক্ত’, ‘আসামে লিঙ্গীর বংশ’ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী সঞ্জীবনীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। লিঙ্গী ‘Uncle Tom’s Cabin’ নামক জনপ্রিয় গ্রন্থে বর্ণিত দাসদের প্রতি অমানুষিক অভ্যাসচারকারী খেতাদ কর্তৃকারী। আসামের কুলী চালান (Indentured labour) প্রায় দাস-ব্যবসায়ের অনুরূপ ছিল। সঞ্জীবনীর একর চেষ্টায় তাহা দূরীভূত হইয়াছে বলিলে অত্যাুক্তি হইবে না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক তাহার সহকর্মীগণকে লইয়া আত্মকটির কেন্দ্রে ধাইয়া আসামে গমনোদ্ভূত কুলী মনমারীকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিওন এবং সঞ্জীবনী পত্রিকার দ্বারা লব্ধ অর্থব্যয়ে স্বদেশে পাঠাইয়া দিওন।

মিঃ মহাশয়ের সাংবাদিক জীবনের সূর্য্যোদ্যে অবদান হইল লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে সঞ্জীবনী পত্রিকার মারফতে বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব এবং সুচিন্তিত কার্যক্রম দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপন। এই ঐতিহাসিক সত্য বর্তমান যুগের অনেকেই জ্ঞানেন না যে, বঙ্গকট আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ়) তারিখের সঞ্জীবনীতে ‘কর্তব্য নির্দ্বন্দ্ব’ শিরোনামায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রস্তাবিত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া নিম্নলিখিত কার্যক্রম প্রদত্ত হইয়াছিল :

“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরশোচ হইবে।... জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, ভবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, ভবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না।

“জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের অহরোবে কোন ‘কাজের জন্য আর অর্ধদান করা হইবে না।

“যত দিন জাতীয় শোকে অবসান না হয়, তত দিন রাজ-পুরুষদের আবির্ভাবে ও ভিরোভাবে আমাদের কেহ যোগ দিতে পারিবে না।

“লর্ড কার্জন বাঙালীর সর্বনাশ করিতে উত্তত হইয়াছেন। যদি তিনি উত্তত ধড়া সঘরগ না করেন, বাঙালী আর রাজ-পুরুষদের সংস্রবে যাইতে পারিবেন না।”

সঞ্জীবনীর উপরোক্ত কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সমর্থন পায়। ইহার ফলে প্রায় চার সপ্তাহ পরে কলিকাতা টাউন হলে অগুষ্ঠিত এই আগষ্টের বিরাট প্রতিবাদ-সভায় বিলাতী বর্জন বা বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর হইতে সঞ্জীবনী পত্রিকার বিলাতী পণ্যের কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত না। ইহাতে সঞ্জীবনীর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, মিত্র মহাশয় ছিলেন উহার পুরোভাগে। তৎকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরূপ লোকপ্রিয়তা ছিল যে, তিনি ‘বাংলার মুকুটহীন রাজা’ (‘uncrowned king of Bengal’) বলিয়া অভিহিত হইতেন। মিত্র মহাশয় ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। বাংলাদেশের যে সমুদয় দেশভক্ত নেতার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে স্বদেশী বা বয়কট আন্দোলন সফল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্ততম।

মিত্র মহাশয় একাদিক্রমে চুন্নার বৎসর কাল নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করিয়া কৃতিত্বের সহিত সঞ্জীবনীর মত সুপ্রচারিত ও সম্ভাষ্য সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই অর্ধাভাবে সঞ্জীবনীর প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

মাতৃভাষায় সংবাদপত্রের সম্পাদনা ব্যতীত মিত্র মহাশয় ‘মহম্মদ চরিত’, ‘বুদ্ধদেব চরিত’ এবং ‘আত্মচরিত’ নামক তিনখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ কয়খানি সাহিত্যক্ষেত্রে সমাদর লাভ করিয়াছে। ‘মানক চরিত’ নামে তিনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ তাঁহার বাড়ী ধানাতলাসী কালে পাণ্ডুলিপি লইয়া যায়। সে পাণ্ডুলিপি অনেক চেষ্টা করিয়াও ফেরত পাওয়া যায় নাই।

‘কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত’ গ্রন্থে বাংলার সামাজিক প্রগতি ও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের অনেক তথ্য-পূর্ণ উপাদান নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তারিত কাহিনীও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা পাঠে সংশয়বাদী বা নাস্তিকের মনেও ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। স্বদেশী যুগের ত্যাগী কর্মী আদর্শ শিক্ষাত্রুতী পরলোকগত অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ রায় মিত্র মহাশয়ের এক যুত্যা-বার্ষিকী সভায় ভাষণ দানকালে বলিয়াছিলেন যে, মিত্র মহাশয়ের আত্মচরিত গ্রন্থখানিকে তিনি বাইবেল বা গীতার ন্যায় পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। ‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকার আরম্ভেই আছে :

“গল্পের বহি রূপে আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, আত্মসেইরূপ আগ্রহের সহিত ইহা আত্মোপাস্ত পড়িয়াছি। গ্রন্থকার মহাশয়ের স্বাভাবিক সরলতা এবং পুণ্ডরীকখানির সহজ ভাষা আমাকে ইহা অতি অল্প সময়ে পড়িয়া শেষ করিতে সমর্থ করিয়াছে।

“কৃষ্ণকুমার মিত্র যৌবনে ও পরিণত বয়সে যেমন মাহুয়টি ছিলেন, তাহার পূর্বাত্মস তাঁহার বাল্যজীবনেই পাওয়া যায়।

“এই পুস্তকে বর্ণিত অনেক ঘটনা উপজ্ঞানবর্ণিত অনেক ঘটনার মত আশ্চর্য।”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন :

“সকালে মিত্র মহাশয়ের মত শিক্ষকেরা ছাত্রদের কল্যাণার্থ যাহা করিতেন, তাহা সকল শিক্ষকেরই জাতব্য ও অনুসরণীয়।

“মিত্র মহাশয় ও তাঁহার কোন কোন বন্ধু যৌবনকালেই ধর্মসাধনা ও ধর্মপ্রচার, সমাজ সংস্কার ও সমাজ গঠন এবং রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কর্ম্মিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বাকসর্ব্বস ও আফালনসার ছিলেন না।

“স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্ত তাঁহার যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অনতিক্রান্ত হইয়া আছে।”

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে যখন বিদেশী সরকারের দমননীতি প্রবল বেগে চলিতেছিল, তখন পূর্ববঙ্গে ফুলারী শাসনকালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (Bengal Provincial Conference) অধিবেশন বল-পূর্ব্বক ভাঙিয়া দেওয়া হয়। প্রতিমিথি ও বেচ্ছাসেবকগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দ্বিবার জন্ত পুলিশ দলবদ্ধ হইয়া নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর লাঠির দ্বারা আক্রমণ চালাইয়া অনেককে আহত করে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা সংঘটিত হইয়াছিল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে—১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। মিত্র মহাশয় পুলিশের নিষ্ঠুর অত্যাচার নিবারণার্থ এবং আক্রান্ত প্রতিমিথি ও বেচ্ছাসেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্ত বীরের ছায় সশস্ত্র পুলিশের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কনফারেন্স যখন ভাঙিয়া দেওয়া হইল, তখন নেতৃবর্গের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেই সভা-স্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহাতে সন্মত হইলেন না। তিনি বিদেশী সরকারের ঐ অন্যায় আদেশ অমান্য করিবার জন্ত দৃঢ়গঙ্গল লইয়া বসিয়া রহিলেন। বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা তাঁহাকে সভামণ্ডপ হইতে লইয়া যাইবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে মিত্র মহাশয় কেন যে

সভাস্থল ভ্যাগ করিয়া গেলেন, তৎসম্পর্কে ‘আত্মচরিত’ হইতে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

“সকলেই সভা পরিত্যাগ করিলেন, এ অপমান সহ্য অপেক্ষা যত্ন ভাল ইহা মনে করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া আমাকে সভা ভ্যাগ করিতে বলিলেন, আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

“আমি বলিলাম, ‘আজ এই স্থানে প্রাণ দিব, কিন্তু এই স্থান পরিত্যাগ করিব না, আপনারা সকলে প্রস্থান করুন।’ অনাধবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। তখন আমার মনে হইল আমি যেন একমাত্র সাহসী পুরুষ। এই ভাব মনে উদ্ভব হওয়া মাত্র আপনাকে অবনত করিয়া অনাধবাবুর সহিত বাহিরে চলিয়া গেলাম।”

মিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত আচরণ ও উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার সত্ত্বগুণাশ্রিত স্বভাবের একটা বিশেষ দিক প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ছিলেন একজন সত্ত্বগুণধর্মী ক্ষত্রিয় বীর—যিনি ক্ষাত্রধর্ম পালন করিতে যাইয়াও রজোগুণের প্রভাব হইতে যনকে নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মিত্র মহাশয়ের জীবনের অন্ততম প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে তাঁহার নির্বাসন। এই সময় আলিপুরের আদালতে মানিকভলা বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীজ ঘোষ প্রভৃতির বিচার চলিতেছিল। অরবিন্দ-বারীজ রাজনারায়ণ বসুর দোহিত্র; কৃষ্ণকুমার তাঁহাদের যেসো-মহাশয়। অরবিন্দ নির্দোষ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সত্ত্বাৎ তাঁহার পক্ষসমর্থনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রধানতঃ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় দেশবাসীর নিকট হইতে অরবিন্দের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সত্তেরো হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। স্বামশখ্যাত ব্যাসিষ্ঠার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মামলা চালাইতে স্বীকৃত হইয়াও শেষ পর্যন্ত মামলার অনানিকালে উপস্থিত হন নাই। তিনি টাকাও ফেরত পাইলেন না। তৎপর মিঃ সি. আর. দাশ (পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) মামলা চালাইতে রাজী হইলেন। যেদিন সি. আর. দাশকে মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হইল, তাঁহার পরদিনই মিত্র মহাশয় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া নির্বাসিত হইলেন। সেই সময় বাংলাদেশের আরও আট জন নেতাকে নির্বাসিত করা হইল।

মিত্র মহাশয়কে আশ্রা জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইল। কাশাগারে নির্জন কক্ষে বদ্ধ বয়সে বন্দী থাকিয়া তাঁহাকে

নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়। চৌদ্দ মাসকাল এ ভাবে বন্দী থাকায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে, তাঁহার দেহের শক্তি নষ্ট হইলেও মনের বল অক্ষুর ছিল। বন্দীজীবনে তিনি ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে তিনি পরমেশ্বরের করুণার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার তাঁহার যে সন্তোষজনক হইয়াছিল, সেই পুণ্য কাহিনী আত্মচরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মিত্র মহাশয় নির্বাসনে থাকাকালে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিলাতের শ্রমিক দলের নেতা মিঃ রায়মুসে ম্যাকডোনাল্ড (পরে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) সন্ত্রাসী ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কলিকাতায় ৬নং কলেজ কোয়ার্টারে (বর্তমানে বঙ্কিম চ্যাটার্জী থ্রিট) মিত্র মহাশয়ের গৃহে আসিয়া তাঁহার পত্নী ও পুত্রকল্যাণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৃহের দেওয়ালে ঝুলানো, ফ্রেমে বাঁধানো একটি ইংরেজী ‘মটো’র (ফ্রাম) প্রতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের দৃষ্টি পড়ে। মটোতে লেখা ছিল—“I shall go in the strength of Lord God” নির্বাসিত জননারকের গৃহের প্রাচীরগাত্রে এই মটো দেখিয়া শ্রমিক-নেতার মনে যে ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা তিনি তৎপ্রণীত *Awakening of India* নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মটোকে মিত্র মহাশয়ের জীবন-বাণী বলা হইতে পারে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুক্তি পাইলেন। কিন্তু পূর্বস্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পাইলেন না। বন্দী-জীবন হইতে মুক্ত হইয়া বৃদ্ধবয়সেও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া মিত্র মহাশয় দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় পূর্বের ন্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। জীবনে কোন দিনই তিনি কর্ম হইতে অবসর লইতে চাহেন নাই। পরাধে কর্মসম্পন্ন ছিল এই ধর্ম-পরায়ণ কর্মবীরের প্রাণধর্ম। জীবনের সায়াক্ বেলায়ও তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে নিগৃহীতা নারীর উদ্ধার ও আশ্রয়ের জন্য “নারীরক্ষা সমিতি” প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাংলার নারীকল্যাণ কর্মের ইতিহাসে “নারীরক্ষা সমিতির” কর্মপ্রচেষ্টার কথা অরণীয় হইয়া থাকিবে। ৮৪ বৎসর বয়সে কলিকাতার বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া কৃষ্ণকুমারের কর্মময় জীবনের অবসান হয়। জীবনদীপ নির্বাণের কিয়ৎকাল পূর্বেও তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—“হে ঈশ্বর, ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্, একমেবাদ্বিতীয়ম্।”

বঙ্কিমচন্দ্র : কবিমানস ও সৃষ্টিলোক

শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি

প্রথম ভাবক : কবিমানস

বাংলার ভাষা ভারতের যুক্তিমতে আত্মাহুতি দিয়া যেসব মহাপুরুষ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্ত-তম। দেশপ্রেমের অহুপ্রেরণায় তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রতিভা এবস্ত্রাকার বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টির কারণ হইতে পারিয়াছিল। দেশ ও জাতির কল্যাণ-চিন্তায় এইরূপ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মনীষী অভিশয় বিরল। তাঁহার যাহা কিছু সাধনা ও কামনার বস্তু ছিল তাহা তাঁহার দেশ ও জাতিকে ফেল করিয়া। তাঁহার এই দুর্লভ দেশপ্রেম সম্পর্কে ক্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ-যোগ্য, “জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, স্বর্গভক্তের বিচারে, সাহিত্য-সৃষ্টির অপূর্ব উদ্ভাদনার—যৌবনের স্বপ্নে, প্রৌঢ়ের কন্দ-জিজ্ঞাসায়, বার্কফোর স্মৃতি-কল্পনায়—এই দেশপ্রেম তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল; দেশের নামে তিনি আত্মহারা হইতেন।”

দেশ বলিতে তিনি ভৌগোলিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ড-টুকুকেই বুঝেন নাই। দেশ তাঁহার নিকট ছিল প্রাণময়ী দেবী। তিনি তাঁহার যে রূপ ধ্যান করিয়াছিলেন তাহা এক দিকে যেমন সুজলা সুফলা শস্যভামলা, অল্প দিকে তাহাই আবার তাঁহার নিকট দশ প্রহরণধারিণী দুর্গা, কমলদল-বিহারিণী কমলা ও বিভাদারিণী বাণী রূপে প্রতিভাত হইয়া-ছিল। যুগ্মী জন্মভূমি চিরময়ী রূপে তাঁহার নিকট ধরা দিয়া-ছিল। এই যে দেবীস্বরূপিণী দেশমাতৃকা ইহারই আরাধনায় বঙ্কিম তাঁহার মন প্রাণ আত্মা, পাণ্ডিৎ দেহ ত বটেই—সবকিছু আত্মা দিয়াছেন। দেশ যে তাঁহার নিকট কি বস্তু ছিল তাঁহার এই পংক্তিগুলিই তাহার চরম নিদর্শন।

“আর বঙ্গভূমি। তুমিই বা কেন মণিমানিক্য হইলে না, ভোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? ভোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেখাইভাম। ইউরোপে, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে, দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।”

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের যে দিকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্ত সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় তাহা হইতেছে এক এক অতি-দুর্লভ কবি-প্রতিভার সহিত অনন্তসুন্দর অজিত জ্ঞানের সমাবেশ—যাহা লাভ করিবার জন্ত তপশ্চর্যা করিতে হয়, সেই তপশ্চর্য্যাই প্রতিভা, যাহাকে মনীষী কার্লাইল বলিয়াছেন, “Genius is the capacity to take infinite

pains”। বাংলা সাহিত্যে সহজাত প্রতিভার অভাব নাই। কিন্তু সহজাত প্রতিভার সহিত ঐ তপশ্চর্য্যার মিলন বঙ্কিম-সাহিত্যে যেরূপ দৃষ্টিশোচর হয় তাহা বিরল। এ সম্পর্কে নিয়ে যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হইল উহা তাঁহারই যেন আত্মকথা : “অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, ‘এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?’ সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্ত অনেক ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথপো-কথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সাধকতা সম্পাদন জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।” (রজনী)

বঙ্কিম দেখিয়াছিলেন তাঁহার বঙ্গভূমির রূপের অভাব নাই। তিনি দেখিলেন বঙ্গভূমির স্থানল বক্ষে ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজিও শুভ্র জ্যোৎস্নার অমৃত বারায় স্নাত হইয়া পলকিত যামিনী নামিয়া আসে। কুলকুমুদিত ক্রম-দলে শোভিতা হইয়া আজিও তাঁহার স্থানাকুল অপক্লপ শোভায় ঝলকিয়া উঠে। কিন্তু মাতার সঙ্গে অলঙ্কার কোথায়? যৈতৈর্ধর্ম্যময়ী হইয়াও মাতা যে তাঁহার দীনার স্তায় দিনাতিপাত করিতেছেন তাঁহার সন্তানগণ যে আত্মপরিচয়হারা, ধূল্যবলুণ্ঠিত, দীনতার পক্ষে নিমগ্ন। জাতির এই হ্রসবতা দর্শনে বঙ্কিমের হৃদয় বিগলিত হইল। জাতির এই হীনাবস্থা দর্শনে তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, “আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণ দেন, জয়দেব, ক্রীহর্ষ, প্রহাগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি এ সকলের স্মৃতি আছে কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবন-সাহিত্য ভগ্নাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবন-চরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে, সুখ-চিহ্নও গিয়াছে। বধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?”

এই যে দেশপ্রেম ইহাকেই ফেল করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি জাতির জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। নৈরাশ্রের যনাককার পথে আশা ও

আকাজ্জার আলোক-বর্ণিকা জ্বলিয়াছেন। সাহিত্যিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য যাহা সেই সৌন্দর্য-পিপাসা ও তাহার নিরন্তর জ্বলি শুধু বঙ্কিম লেখনী ধারণ করেন মাই। আটের গজদণ্ড প্রাসাদে গিডেকে অবরুদ্ধ রাখিয়া তিনি জগৎ ও জীবন হইতে দূরে থাকিতে চাহেন নাই। বয়ঃ জগৎ ও জীবনের জ্বলি তিনি নিছক আটের কল্পনাবিলাসকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ মধ্যার্ধই বলিয়াছেন, "সাহিত্যের মধ্যে ছই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়—জ্ঞানযোগী ও কৰ্মযোগী, বঙ্কিম সাহিত্যে কৰ্মযোগী ছিলেন।"

কিন্তু আসলে বঙ্কিম কবি, দেশপ্রেমের দ্বারা একান্তভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও কবি হইয়া কাব্য-সৃষ্টির আহ্বানকে উপেক্ষা করাও ছিল বঙ্কিমের পক্ষে অসম্ভব। বঙ্কিমের জীবনে গভীর সমস্তা দেখা দিল। এক দিকে কবি-প্রতিভার আয়-প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্বেদনা, অল্প দিকে দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের আহ্বান। কবি-প্রতিভা চার নিব্বরিণীর মত নৃত্য করিয়া সঙ্গীতের সুরধুনী সৃষ্টি করিতে, দেশ ও জাতি দাবি করে কঠোর কল্পসাধন, আত্মোৎসর্গের কঠিন সফল। এক দিকে শিল্পসৌন্দর্যের ছায়া-কানন, অল্প দিকে দেশপ্রেমের কণ্টকাকীর্ণ পথ। আটের লীলাভূমি কল্পনার কল্পলোক, দেশ-প্রেমের ক্ষেত্র রূঢ় বাস্তব জগৎ। এই দুই বিপরীতধর্মী সৃষ্টির সংঘাত বঙ্কিমের জদস্বকে গভীর ভাবে আলোড়িত করিল। সাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে এই ঘনের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত সহ করা কঠিন হইত, কিন্তু অসাধারণ শক্তিমান বঙ্কিম আপনার অজের পৌরুষের দ্বারা এই দুই সৃষ্টির সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন তাহা এই যুগপ্রায় জাতির পক্ষে কেবলমাত্র যুগজীবনীর ভায় ক্রিয়াই করিল না একই কালে তাহা শাশ্বত সাহিত্যের আসন লাভ করিল। স্থান, কাল, পাঠ প্রভৃতি সবকিছুর-গভী অতিক্রম করিয়া মহাকালের বিচারে তাহা সর্বদেশ ও সর্বকালের বলিয়া প্রমাণিত হইল। তাহার রচিত সাহিত্য এক দিকে যেমন উচ্চাদের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, অল্প দিকে তাহাই আবার যুগপ্রায় জাতির নব জাগরণের প্রাণদ মন্ত্রধ্বজপ।

উপরের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্কিমের সৃষ্টি দুইটি বিভিন্ন উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া গদ্য-যমুনায় মত প্রবাহিত হইতেছে। এই দুইটি উৎসের একটি কবি-প্রতিভা অপরটি দেশপ্রেম। বর্তমান প্রবন্ধে আমি প্রথম উৎসকে কবি-মানস ও সৃষ্টিলোক আখ্যা দিয়া উহারই আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বঙ্কিমের কবি-মানসে এই জগৎ ও মানব অদৃষ্টের যে প্রতি-লিপি বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাই তাহার সাহিত্যের মূলভিত্তি। তিনি যেন এহাঙ্গুরে দণ্ডায়মান হইয়া এই পৃথিবী ও তথায়

অনুষ্ঠিত মানব-ভাগ্যের বিচিত্র লীলা সন্দর্শন করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, মহাকালের হিমশীতল করম্পর্শে অহরহ জীবলোকের প্রাণস্পন্দন শুক হইয়া যাইতেছে। এই নিষ্ঠুরা নিরন্তর কবল হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার জন্ত মাহুয়ের কি আকুল অথচ ব্যর্থ প্রয়াস। প্রেম ও ঘৃণা, মিলন ও বিরহ, সফলতা ও বিফলতা, সত্য ও মিথ্যা, হাসি ও অশ্রুর ঘাত-প্রতি-ঘাতে এবং বর্ণ-বিভাগে মাহুয়ের জীবননাটক যেমন বদীন ডেমনি বেদনাঙ্গ। সাধারণ মাহুয় বুঝিতেছে না যে, তাহার প্রেম ও মিলন, বিরহ ও বিচ্ছেদ, মায়ার ও মমতা—তাহার যাহা কিছু প্রেম ও শ্রেয়ঃ এই মহাশক্তির চরণোপান্তে অতি তুচ্ছ খেলনার মত। তাই তাহার পাদক্ষেপে মাহুয়ের সেই সব সাধনার বস্ত্র মুছমুছ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। জগৎ ও জীবনকে শাসন করিয়া যে চর্যার শক্তি আপনার কাজ আপনার মনেই করিয়া যাইতেছে তাহার কাছে মাহুয়ের সাধনার কোন আবেদনই নাই। বহির নয়, অন্ত নয়, সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু অতি নিষ্ঠুর এই মহাশক্তি। এক হাতে সে যেমন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে, অপর হাতে সে-ই আবার সেই সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস করিতেছে। এই শক্তির দাহে বসন্ত আসিতে না আসিতে "ভ্রমরের" গুপ্তরূপ শুক হইয়া গেল; ফুটিতে না ফুটিতে "কন্দ" কুহুম অকালে বরিয়া গেল। "রোহিণী" কণিকের জন্ত গগনপ্রান্ত আলোকিত করিয়া বিস্মৃতির তমসাপারে অদৃশ্য হইল। "হীরা" অলঙ্কারের শোভারূপি না করিয়া পথের ধূলার হারাইয়া গেল। "স্বর্ঘ্য-যুধী"র প্রফুল্ল আনন স্বর্ঘ্যের প্রচণ্ড ভাপে শুক হইয়া গেল। শৈবলিনী মরিচ, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রবক্ষেই শান্তির নীড় খুঁজিয়া পাইল। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর—কেহই রক্ষা পাইল না। কেহ মরিচ, কেহ বাঁচিচাঁও মরিয়া রহিল—এই যে ব্যর্থতা, এই যে ধ্বংস-লীলা ও অপচয় ইহাকে বঙ্কিম দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, এই যে জগৎ-দর্শন বা জীবন-জিজ্ঞাসা ইহাই বঙ্কিমের কাব্যের মূলভিত্তি।

ট্রাজেডির এই যে আদর্শ ইহা বঙ্কিম সেজগীয়ারের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সহিত বঙ্কিমের পরিচয় ছিল অতিশয় নিবিড়। তিনি যেমন ইংরেজী সাহিত্যের কাব্যরসধারা আকর্ষণ পান করিয়া স্বীয় কাব্য-ভাষার নিষ্ঠুরি করিয়াছিলেন তেমনই নবতর কাব্য-সৃষ্টিতে আদর্শ হিসাবে ঐ কাব্যরস-প্রেরণাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের ট্রাজেডিতে নায়ক-নায়িকার যে পরিণাম সেজগীয়ারের ট্রাজেডির নায়ক ও নায়িকারও সেই পরিণাম। ডেস্‌ডিমোনা, অকিলিয়া, লেডি ম্যাকবেথ, জুলিও, ওথেলো, হামলেট প্রভৃতির ভাগ্য লইয়া ঐ নিষ্ঠুর অন্ধশক্তি যে ক্রীড়া করিয়াছে বঙ্কিমের নায়ক ও নায়িকাগণের ভাগ্য লইয়াও সেই একই খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই যত্ন, সেই ধ্বংস, সেই বিনাশ, সেই অপচয়। সেজগীয়ারের ট্রাজেডির

ভক্তকথা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সমালোচক ত্র্যাভলি যে উক্তি করিয়াছেন এখানে তাহা স্বরণযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"The central feeling is the impression of waste. With Shakespeare at any rate the pity and fear which are stirred by tragic story seem to unite with and even to merge in a profound sense of sadness and mystery which is due to this impression of waste. . . . Everywhere from the crushed rocks beneath our feet to the soul of man we see power, intelligence, life, glory, which astound us and seem to call for our worship. And everywhere we see them perishing, devouring one another often with dreadful pain as though they came into being for no other end. All this makes us feel the blindness and helplessness of man. . . . There is no tragedy in its expulsion of evil. The tragedy is that it involves the waste of good."

বঙ্কিমের ট্রাজেডিজগুলি সম্বন্ধে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

শেক্সপীরীয় ট্রাজেডির এই আদর্শ বঙ্কিম তাঁহার কাব্য-সাধনার পরিণত অবস্থায় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার ভারতীয় সংস্কার বাধা দিয়াছে। তাঁহার কবি-জীবনের প্রথম ভাগে, স্বভাবভেদেই যাহা হইয়া থাকে, সৃষ্টি-প্রেরণা ছিল উদ্যম ও উজ্জ্বল; কতকটা অন্ধ। তখন তিনি সবেমাত্র শেক্সপীরার কাব্যরসে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার রক্তে যে সংস্কার মিশিয়া আছে তাহা অপেক্ষা ঐ কাব্যরসাদর্শ তখন অভিশয় প্রবল। কাজেই ঐ কাব্যাদর্শকেই তিনি তাঁহার সংস্কারের উপরে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু কবি-জীবনের পরিণত অবস্থায় যখন সৃষ্টি-প্রেরণা বহিঃস্থী না হইয়া অন্তঃস্থী হইয়াছে তখন তাঁহার সেই স্রষ্ট সংস্কার সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি শেক্সপীরার কাব্যাদর্শে মানব-জীবনের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করিয়াছিলেন তাহাতে সন্তোষ পাইলেন না। হুঃখ ও যত্নকে—তাহা যত সত্যই হউক, শেষ কথা বলিয়া দ্বাণিতে কিছুতেই তাঁহার প্রাণ চাহিল না। যত্নভেদেই যদি সব শেষ হইয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনের আর কি থাকে। এক মহাশূণ্যই কি তাহা হইলে জীব-জগতের শেষ পরিণাম। হুঃখই কি তাহা হইলে সংসারে একমাত্র সত্য বস্তু? এত হুঃখ সহিবার পরে মহত্তর জীবনের বা পরিণতির কোন আশাসই তাহা হইলে নাই? ইউরোপীয় আদর্শে এই হুঃখই পরম সত্য, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কার তাহা মানে না। সেই সংস্কার আমাদের কাছে হুঃখ-নিধার পারে এক মহত্তর ও উজ্জ্বলতর জীবনের ইঙ্গিত দেয়; বসে হুঃখটা পরিণতি নয়—পথ। যে দিন হইতে বঙ্কিমের ভারতীয় সংস্কার প্রবলতর হইয়া উঠিল সেই দিন হইতে তিনি শেক্সপীরীয় ট্রাজেডির আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলেন। নিয়তির নির্ভর লীলাকে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সেই নিয়তিকে স্বীকার করিয়া তাহাকেই জয়

করিবার পহার সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সম্পর্কে মোহিতজালের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"জীবন ও জগৎ, আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধে আমাদের এমন একটা সংস্কার আছে যে আমরা কোন হুঃখকেই চূড়ান্ত মনে করি না, সব ঠিক আছে, কোনখানে অনিশ্চয় বা অবিচার নাই, কোন হুঃখই অমূলক বা অসঙ্গত নয়; এমন কি জ্ঞান কিংবা ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিলে হুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। আমরা কাদি বটে সেটা জীব-বর্ষ, কিন্তু সেই ক্ষণমণ্ডে সান্ত্বনা আছে। এই সান্ত্বনার প্রয়োজন আমাদের প্রকৃতিতে গজ্ঞান ও অজ্ঞানে অভিশয় দৃঢ়মূল হইয়া আছে, ... ভারতবর্ষ জীবনের বাস্তবকেই চূড়ান্ত বলিয়াই গ্রহণ করে নাই। সেই বাস্তবকে ভেদ করিয়া প্রকৃতি ও নিয়তির অন্তরালে একটা বৃহত্তর কিছুই দর্শনলাভ না করিয়া সে ক্ষান্ত হয় নাই... ইউরোপীয় সংস্কার ইহার বিপরীত, তাহাতে হুঃখটা অভিশয় সত্য। উহার শক্তি অপরিমিত; ভগবানও সেই শরভানের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। ... বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ইউরোপীয় কাব্যরসকে অধিগত করিয়া তাঁহার উপভাসগুলিতেও সেই রস একরূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেশন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও মধ্যপথে ভারতীয় বা হিন্দুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয় আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই বা চাহেন নাই।"

যে নিয়তি-লীলার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা মানুষের ভুল-ভ্রান্তিকেই আশ্রয় করিয়া আপনার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, শেক্সপীরার ট্রাজেডির উহাও একটি উপাদান। নায়ক-নায়িকার বহুতকার্য্যেই তাহাদের সর্বনাশ অথবা বিনষ্টির বীজ উগ্ধ থাকিবে। মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করে তাহা রিপূর ভাঙনাতেই করে। কাম, জোষ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য—এই ছয়টি রিপূর মধ্যে কোন্‌ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এইছয় যড়রিপুর উল্লেখ করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা কামেরই উল্লেখ করা হয়। এই কাম সৃষ্টির মূলে। ইহা যেমন সৃষ্টির কারণ তেমনই ইহাই আবার ধ্বংসের ছেতু—ইহা একাধারে স্রষ্টা ও স্রষ্টকর। এই কারণপ্রযুক্তির ভাঙনার মানুষ যে ভুল করে তাহাই তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা মর্শাস্তিক ট্রাজেডির কারণ হইয়া থাকে। নরনারীর পরস্পরের প্রতি যে অহুরাগ আকর্ষণ ও প্রণয় তাহাই বঙ্কিমের ট্রাজেডির উপজীব্য, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব তাহাই তাঁহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার জীবনে ট্রাজেডির রূপ-ববিকা টানিয়া দিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব কি? প্রকৃতি একটা অন্ধ শক্তি। সৃষ্টিই তাহার একমাত্র কাজ, তাহার পবিজ বা অপবিজ কোন সংস্কারই নাই। সে কখন যে কাহার উপর প্রসন্ন হয় তাহারও স্থিরতা নাই। পুরুষ কখনও তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার দয়া-ভিক্ষা করে—কিন্তু পায় না, আবার কখনও বা তাহাকে

জন্ম করিতে গিয়া নির্ভর ভাবে নির্ধাভন করে, তাহাতে নারী পুষ্টিয়া মরে সত্য, কিন্তু সেই আশুদের হুল্লা হইতে পুরুষও অব্যাহতি পায় না; তাহারও সর্বদা অসুস্থ হয়। প্রকৃতি যে পুরুষ অপেক্ষা শক্তিময়ী ইহাই বক্ষিম দেখাইয়াছেন। নারীর মধ্যে তিনি মহামায়া স্বেচ্ছাত্মার প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—সেই ক্ষমা, স্নেহ, দয়া, প্রেম, সবেরই অনন্ত আকর ঐ নারী-হৃদয়। সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি নারী, সর্বসংসারী ধর্মজীবী মত্ত অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা সীলবে সহিয়া নারীই পুরুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ঋষি-দার্শনিক সোপেনহায়ার তাই বলিয়াছেন, “The woman pays the debt of life not by what she does but by what she suffers.” নারীর এই বিরূপ মহিমার মুখ হইয়া বক্ষিম নারীত্বের বন্দনা গান দীপারতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “রমণী ক্রমাধরী, দয়াধরী, স্নেহধরী, রমণী ইখরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।” নারীজগতের বর্ণনা করিবার সময় বক্ষিমের ভাষা বিদ্যাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, চপলতার বাস্পমাত্র সেখানে নাই। তিনি যেমন নারীর পুঙ্খ মন্ত উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, “গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। ভীত জ্যোতির্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী, প্রভাত শুক্রতার-রূপিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।” এরূপ পংক্তি বহু আছে।

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বক্ষিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর যে আলোচনা করিয়াছি তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার এত প্রয়াস তিনি পাইলেন কেন? সবই যদি মিথ্যা, মারা, মৃত্যু বা বিনাশই যখন জীব ও জীবনের অনিবার্য পরিণাম অথবা ইহলোক অপেক্ষা পরলোকই যখন মহত্তর সত্য তখন ঐহিক শুভা-শুভের উপর কোল গুরুত্ব দেওয়া চলে কি? জগৎ ও জীবনের অবশ্যস্বাবী পরিণতিই যখন এক বিরূপ মহাশূন্যতা তখন তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলির মধ্যে আর কি সত্য থাকিতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে ইহার সামঞ্জস্য বুঝিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বক্ষিম এক হুল্লভ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ইহাদের সামঞ্জস্য আবিষ্কার ও সমন্বয়সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এই সমন্বয়-সাধন বক্ষিম-প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক।

বক্ষিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন জগৎ ও জীবনের পরিণাম যাহাই হউক না কেন মানুষের ঐহিক অস্তিত্ব কয়েকটি হুল্লভ নিয়মের অধীন—যেমন সে ইচ্ছা করিলেই আত্মহত্যা করিয়া সকল আকার অবসান বা সকল সমস্তার সমাধান করিতে পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জাগতিক নিয়মের বশেই তাহাকে বাঁচিতে হয়। সদ্দে সদ্দে তাহাকে এই বাঁচার সহিত অঙ্গাধিক্রমে জড়িত সমস্তাগুলির, যথা—সুখা, পিপাসা, রোগ

শোক প্রভৃতির সম্মুখীন হইতে হইবে। বাঁচিতে হইবে অথচ সেই বাঁচার অনিবার্য ফলস্বরূপ যে দুঃখ-কষ্ট দেখা দিবে তাহার প্রতিকার সে করিতে পারিবে না—ইহা এক দুঃসহ অবস্থা। বাঁচাই যখন নিয়তি তখন তাহা যত অন্তর্যমের জড়ই হউক না কেন পূর্ণ মনুষ্যত্বের আধিকারী হইয়া বাঁচিতে হইবে, “নারায়ণ বলহীনের লভ্যঃ”। অতএব ঐহিক দুঃখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা অবশ্য করণীয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী ইহাই বক্ষিমের জীবনবাদ। বক্ষিমের জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবনবাদ উভয়ই সত্য, কোনটির মধ্যে সংশয় নাই, দ্বিধা নাই, দিব্য-জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিতে ইহার স্রব। এই দুই সত্য পরস্পর-বিরোধীও নয়। আদর্শবাদী বক্ষিমের দৃষ্টি এখানে পরম নির্ভর সহিত বাস্তবকে অঙ্গুলণ করিয়াছে। তিনি জীবনকে ঞ্জরূপে দেখেন নাই। তাহা হইলে তাহার জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-বাদের মধ্যে যে-কোন একটিই সত্য হইত। পক্ষান্তরে তিনি জীবনের একটি সমগ্র ও অখণ্ড রূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মানবজীবনকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, কিন্তু মানব-অদৃষ্ট দেখিয়া তাহার অন্তরায় অব্যক্ত বেদনার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই আত্মনার শৈল্পপীরী ট্র্যাঙ্কেডির আদর্শে তৃপ্তি না পাইয়া তিনি হিন্দু সংস্কারের বশে জীবনের পরপারে মহত্তর জীবনের সন্ধান করিয়াছেন।

বক্ষিমের উপজাসগুলি, বিশেষ করিয়া ট্র্যাঙ্কেডিজুলি তাহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানে তিনি মুক্ত বিহঙ্গের মত কল্পনার অনন্ত নীলাকাশে পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিয়া-চলিয়াছেন। মানুষ যে কত অসহায়, নিরস্তির নির্ভর বিধানের নিকট সে যে কত দুর্বল বক্ষিমচন্দ্র এখানে তাহা দেখাইয়াছেন। সবই ষ্ট্রিক আছে, কোথাও কোন জট বা বিচ্যুতি নাই হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার জন্ত সুখের সংসার দুঃখের প্লাবনে ভাসিয়া গেল। বক্ষিমের ভাষায় বলি, “যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় মীল, বড় উজ্জ্বল—কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে।” তারপর বড়-বড়, ধ্বংস-বিলয়ের অবসানে শান্ত শুষ্ক প্রকৃতির কোড়ে বসিয়া নীড়হার্য মরনারী দিগন্তপানে চাহিয়া প্রশ্ন করে, “কি করিলে যেমন ছিল তেমনই হয়।” কিন্তু হায় উত্তর আসে না। তাহাদের ঐ প্রশ্ন বাস্তব-স্তরে কীণ তরঙ্গের কম্পনমাত্র সৃষ্টি করিয়া মিলাইয়া যায়। একটি ভুলের জড়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ভুল যে করে সে তাহার জাতি ও অনিবার্য পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সংশোধনের চেষ্টাও সে করিতেছে, “কিন্তু পারিতেছে না। এক দিকে বিবেকের অহুশাসন অল্প দিকে প্রাণের আকুল আকৃতি এই দোটারনার শ্রোতে পড়িয়া মানুষ তৃণধ্বংসের মত অকূলে ভাসিয়া যায়। সহজাত জ্ঞানের দীপশিখার যাহাকে অন্ডার ব,লিয়া বোধ হইতেছে তাহারই দুর্বীর আহ্বানে লাড়া দিয়া

মাহু অমল হুঃধের সৃষ্টি করিতেছে। বঙ্কিমের নিজের ভাষায় বলি, “.....কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে জলন্ত বহিরাশি দেবদ্বাও উদ্ভাষে প্রবিষ্ট হয়।” একজন একজনের জন্ত সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ বিসর্জন করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। অথচ যাহার জন্ত সে এই আত্মত্যাগে প্রস্তুত সে চেষ্টা করিয়াও তাহার এই অজলি গ্রহণ করিতে পারিতেছে না; হয়ত তাহার হৃদয় তখন আর একজনের দ্বারা প্রণয়ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে যেখানে হইতে প্রতিদানের কোন আশাই নাই। এই যে মানব-অদৃষ্ট ইহাই বঙ্কিমের উপন্যাসের মূখ্য উপলব্ধি।

গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র, রোহিণী, কুল, স্বর্ধামুখী, ভ্রমর, হীরা প্রভৃতি সকলেই একই পথের পথিক। কল্যাণময় অন্তরালোকে তাহারা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিল, যে-পথ তাহারা গ্রহণ করিয়াছে সে পথে কোন দিনই তাহাদের বাঞ্ছিত বস্তু মিলিবে না; বরং স্পষ্টই দেখিয়াছিল ঐ পথের শেষ যেখানে সেখানে তীর্থ-দেবতার দেউল নাই, আছে চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন অভয় গহ্বর। সেখানে আলো নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। আছে অমল আঁধার, অসীম হুঃধ, সীমাহীন অশান্তি আর অপরিণীত অতৃপ্তি। সেই চরম-পরিণতি দর্শনে তাহারা শিহরিয়া উঠিয়াছিল; প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল ফিরিতে। কিন্তু পারে নাই, কোন এক কৃহকিনীর ইচ্ছাকালে আত্মজের মত তাহারা সেই বিনাশের দিকে পূর্বাপেক্ষা দ্রুতপদেই ধাবিত হইয়াছিল। আত্মসংযমের জন্ত রোহিণী কি প্রাণপণ প্রয়াস না পাইয়াছিল। বিধাতার কাছে তাহার নজ্জি-ভিক্ষার কথা পড়িলে পাষণ-হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়, “হে জগদীশ্বর, হে সৌমনাথ, হে হুঃখিজন্যের একমাত্র সহায়। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত হুঃধে পড়িয়াছি—আমার রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ প্রেমবহিঃস্রাব ইয়া দাও—আর আমার পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার আমার অসহ যন্ত্রণা, অমল সুখ। আমি বিধবা—আমার বর্ধ গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু? রাখিব কি প্রভু? হে দেবতা। হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমার হুমতি দাও আমার প্রাণ হির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।” কিন্তু হায়, বিধাতার অসীম কৃপা-পারাবার হইতে এক বিপ্লু পরিমিত কৃপাবারিও রোহিণীর অদৃষ্টে মিলে নাই। রোহিণী আত্ম-সংযম রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার “ক্ষীত, জত, অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয় ধামিল না।” গোবিন্দলালও ঠিক একই ভাবে একই প্রার্থনা বিধাতার কাছে জানাইয়াছিলেন, “হা নাথ। নাথ। তুমি আমার এ বিপদে রক্ষা কর।—তুমি বল না মিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিন্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মত্যাগ করিব।” কিন্তু গোবিন্দলাল ব্যা

হইয়াছিলেন। তিনিও ‘মরিয়াছিলেন’, ভ্রমরও মরিয়াছিল। নগেন্দ্রের অবস্থা তাহাই। কোন অসতর্ক মুহূর্তে আমি না, কুল-নন্দিনী নগেন্দ্রের হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু সেই ক্ষণে তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তখন হইতেই কঠোর হস্তে কুলকে সেই আসনচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু পারেন নাই। আত্মজের চেষ্টা এখানেও ব্যর্থ হইয়াছিল। নগেন্দ্র স্বর্ধামুখীকে বলিতেছেন, “স্বর্ধামুখী। অপরাধ সকলেই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহস্ত। যথার্থ আমি তোমাকে তুলিয়া কুল-নন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই; এমনত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্তবশ হইল না।” স্বর্ধামুখীও কল-মণিকে লিখিত পত্রে ইহা স্বীকার করিয়াছে—“আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।.....” আর কুল? আত্মজের জন্তই ত সে নিশীথিনীর দীরব প্রহরে নগেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অজানা পথে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু হায় পারিল না। আবার তাহাকে ফিরিতে হইয়াছিল। প্রেমের পবিত্র কুসুমের স্বর্ধামুখী, নগেন্দ্রের ভ্রমর গোবিন্দলালের অর্চনা করিতে চাহিয়াছিল। অদেয় বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না। কিন্তু সে আশা কি তাহাদের পূর্ণ হইয়াছিল? হীরা অসঙ্কোচে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠসম্পদ দেবজের চরণতলে অর্ঘ্য দিয়াছিল। কিন্তু বিনিময়ে সে কি পাইয়াছিল? অপমান আর লাঞ্ছনা। কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের অদেয় কিছুই ছিল না। তথাপি এই নববালা নবকুমারের প্রণয়ের উপরুক্ত প্রতিদান দিতে পারিল না। “সমুজের শীতল তরলোচ্ছ্বাসে তাহার সকল সমস্তার সমাবাস হইয়াছিল। মানব-জীবনের এই ভয়াবহ পরিণতি এই চরম সর্বনাশ দর্শনে অনৈক ইংরেজ মনীষী যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিতেছেন,

“The purest reality, the purest beauty, the purest love cannot by its own nature, manifest itself here on earth without disaster but in disaster it can.”

সত্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাহু উন্নত হইবেই। কিন্তু এমন দিন হয়ত কোন কালেই আসিবে না যেদিন সে বঙ্কিমের উপন্যাসমুহে বর্ণিত সমস্তাগুলির হাত হইতে মুক্ত হইবে। এ সব প্রশ্ন সাময়িকও নয়, আর বিশেষ সমাজেরও নয়। সর্বকালীন ও সর্বমানবীয়। ইহাদিগকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া যে সাহিত্য রচিত তাহার আবেদন সকল যুগের সকল মাহুষের কাছে পৌঁছিতে বাধ্য। যদি কোন সাময়িক সমস্তা বঙ্কিমের সাহিত্যের উপলব্ধি হইত তাহা হইলে তাহার

আবেদন সর্বব্যাপী ও সর্বজনীন হইত না—স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা ভাৱার পরিধি চিহ্নিত হইয়া যাইত।

বহুদূর ভাৱার সাহিত্য-সাধনার 'art for art's sake' নীতিকে গ্রহণ করেন নাই, কারণ ইহা ভাৱার কবিপ্রতিভার সম্পূর্ণ বিরোধী। বার্গার্ড শ জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বহুদূর সম্বন্ধে সেই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য, যথা :

"I am of opinion that my life belongs to the whole community and as long as I live, it is my privilege to do for it whatsoever I can. I want to be thoroughly used up when I die for the harder I work the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle for me. It is a sort of splendid torch which I have got hold of for the moment and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations."

যাহারা 'আর্ট'-বিলাসী ভাৱাদের সহিত জীবনের সম্বন্ধ ভুলক্রমে বস্তুত্ব না হইলে উপাদানের অভাবে আর্টের চর্চা সম্ভব হয় না। জীবনটা ভাৱাদের নিকট সম্পূর্ণ শৌণ। পক্ষান্তরে বহুদূর নিকট জীবনই ছিল মুখ্য। তিনি জীবনকে ভাল-বাসিয়াছিলেন। শত কদম্বতা, ক্রটি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও জীবন ভাৱার নিকট অবহেলিত হয় নাই, শুধু তাই নয় আদর্শবাদীর যাহা ধর্ম—জীবনের একটা মহৎ ও উজ্জ্বল রূপ—তিনি ধ্যান

করিতেন। যেখানে তিনি কদম্বতা বা কালিমা লক্ষ্য করিয়াছেন, পাপের কলুষস্পর্শে যেখানে বিষ সঞ্চারিত হইতে দেখিয়াছেন সেখানে তিনি অসহ বেদনাবোধ করিয়াছেন এবং ভাৱার প্রাণ, মন ও আত্মা ভাৱার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। অর্থাৎ, শুধু বেদনা বোধ করিয়া তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, নীতিজ্ঞানের দ্বারা সেই কদম্বতা ও পাপকে দূরীভূত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। নীতিজ্ঞানকে তিনি বিসর্জন দিতে পারেন নাই। কায়ার পশ্চাতে ছায়ার ভাৱ ইহা ভাৱার কবিপ্রতিভার সগোত্র হিসাবে ভাৱার সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। কারণ "জীবন সাহিত্যের বিষয় সেই সাহিত্য আর্টের মত নীতিহীন হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহাতে জীবনের রূপসমগ্রতা প্রকাশ পাইত না। ভাৱার রচনার যে নীতিজ্ঞানের প্রভাব আছে—তাহাতে যদিও 'আর্ট' ক্ষুদ্র হইয়াছে কাব্যের কিছুমান্ন ক্ষতি হয় নাই। কারণ সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে—ব্যক্তির প্রতিভা; এবং জীবনকে যে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে সে-ই তত বড় ব্যক্তি, তাহার যে বাণী তাহাই উৎকৃষ্ট ঠাইল—তাহাই Great Art." (ক্রীমোহিতলাল মজুমদার)।

উপরের কথাগুলির মধ্যে বহুদূর-প্রতিভার মূল স্রষ্টা বিদ্যুৎ রহিয়াছে।

আলোচনা

"নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা"

পঞ্চানন রায়, কাবাতীর্থ

প্রবাসী আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যার প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ ও প্রবাসী ভাদ্র সংখ্যার প্রকাশিত আলোচনা পড়িয়া বুঝলাম ঐ প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য দেবতাপ্রাণ সম্পর্কে বিভূত অসুস্থান হয় নাই। নিম্নবঙ্গে যিনি বারা ঠাকুর নামে কথিত, তিনিই হরত মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের বনাঞ্চলে বৃক্ষতলে কিংবা শহরের চতুষ্পথে মকর সংক্রান্তির রাত্রিতে বড়ায় ঠাকুর রূপে পূজিত হন। স্থানভেদে ইনিই বড়ায় চণ্ডী ও বোড়াই চণ্ডী।

দক্ষিণরায় পৃথক দেবতা বলিয়াই মনে হয়। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতির মত তিনিও হরত মহাবাদেশধারী ছিলেন। মহা-কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা প্রতাপনারায়ণের মাঝা "রায়বাধিনী" রূপে পূজিত। মেদিনীপুর ক্ষীতপাইয়ে ঐ নামের দেবতা আছেন। ঐ বংশের প্রথম রাজা কৃষ্ণরায়ের দক্ষিণ-রায় নামে যে পূজা ছিলেন, কলগ্রহে ভাৱার দ্বারা দেখি নাই। তিনিই কি দক্ষিণরায় নামে পূজিত হইতেছেন?

অক্ষয়বাবুর আলোচনায় "মেদিনীপুরে ঘাটাল মহা-কুমার তাঁর কেবল দুটি মাত্র" উক্তি সর্বপ্রাণে ঠিক নহে।

চেতুয়া বাসুদেবপুর, বৈকুণ্ঠপুর, নির্ভরপুর, চাঁদপুর প্রভৃতি ঐ মহাকুমার বহু গ্রামের মন্দিরেই শীতলা ও মনসা দেবীর সহিত নিয়োক্ত ধ্যানের অমুরূপ পঞ্চানন্দ বা পঞ্চাননের মূর্তি বিস্ত-মান, উহার দুই পাশে উপদেবতা মূর্তিও হয়।

ধ্যান :—স্বিত্ত্বং জটিলং শান্তং করুণাসাগরং বিভূম্।

ব্যাঞ্জচন্দ্রপরিবাসং যজ্ঞহুত্র সমন্বিতম্।

লোচনত্রয় সংযুক্তং ভক্ত্যভীষ্ট ফলপ্রদম্।

ব্যাধীনামাশ্রয়ং দেবং পঞ্চাননমহমভজে।

মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত দাক্ষিণাত্যের দেবতাটির সহিত ইহার মিল আছে। মেদিনীপুরের কেপুত গ্রামে ও হাওড়ার আমতা প্রভৃতি অঞ্চলে বটবৃক্ষতলে ঘটরূপে পঞ্চানন্দ পূজিত হন। শনিবারই উহার পূজার প্রশস্ত দিন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইনি বটুকু ভৈরব। প্রবাদ যে, শিবই পশু বলি গ্রহণের জন্য পঞ্চানন্দ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার নিমন্তলা ও মেদিনীপুরস্থ দাসপুরের নির্ভরপুর প্রভৃতি স্থানে পঞ্চানন্দ ঋশানের দেবতা রূপেও পূজিত। নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইনি পাঁচ ঠাকুর। এই সকল দেবতা সম্পর্কে সত্য নির্ণয়ের জট-ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

বুড়ো শিব

শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

“হে বাবা বুড়ো শিব, তুমি কেপ্পা কর মাথ। ওই বোরেশ্বর পুতের সর্বনাশ হোক, সর্বনাশ হোক, সর্বনাশ হোক। ওকে সঙ্গে দংশাক দেব—ডে-রাতির ঘেন না কাটে ডাবতা। তুমি দেখো, তুমি দেখো, তুমি দেখো।” বগলা বুড়ী মাথা ঠোকে আর বিড়বিড় করে আওড়ায়।

বুড়ো শিবের ‘ঘানে’ তখন শেষ-চৈতনের ধরা রোদ। রোদ তো নয় আগুন। বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও রৌদ্রের উত্তাপ এত। বুড়ীর জক্ষেপ নাই। পাথরের চাতাল রৌদ্রে তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর বগলা বুড়ী মাথা ঠুকিতেছে। রতন মুচী আমগাছটার ছাওয়ার দাঁড়াইয়া ঢাকে কাঠি মারে আর বুড়ীর দিকে চাহিয়া দেখে। বুড়ীর মাথা ঠোকা আর শেষ হয় না। বৈকাল হইয়া আসিলেও এ ধারটার এখনও প্রচণ্ড রোদ। গাছপালাও বেগুন নাই—চাতালের বা পাশে শুধু একটা আমগাছ—কাঁচামিঠে আম। সামনে পালেরদের বৈঠকখানার বাধান বারান্দা। তাহারই উপর বাট হাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ভিড়—অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর। প্রসাদপ্রার্থী। ওবারে একটা ছোট চালাঘর। তাহাতেই একটা উনানে পুজারী ব্রাহ্মণ ভোগ চাপাইয়াছে। পাশে দাঁড়াইয়া মুখুজে-গিন্নী।

বগলা বুড়ীর মাথা ঠোকা শেষ হইয়াছে। সে উঠিয়া আসিয়া আমগাছের ছাওয়ার দাঁড়াইয়াছে।

রতন মুচী হাসিয়া বলে, কি পিসী, অভ মাথা ঠুকছ্যাঁলে ক্যানে গো?

—মরণ তো হয় না, মরণ মাগছিলুম রে যুথপোড়া। বুড়ী জবাব দেয়।

রতনের হাসি এবার স্পষ্ট হয়—তা বেশ, তা বেশ। বুড়ী রাগিয়া ওপাশটার সরিয়া দাঁড়ায়।

মুখুজে গিন্নীর বয়স হইয়াছে—চোখে ভাল দেখিতে পান না। পুজারীকে ডাকিয়া বলেন—তাপো তো তারক, ওই আমগাছের ছাওয়ার বগল দাঁড়িয়ে না। তারক উনানে হুঁ দিতেছিল—মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে। হ্যাঁ গো বগলই। বলিয়াই আবার জিজ্ঞা করে—হুঁ দিতে আরম্ভ করে। বুড়ী ঐদিকেই বাইতেছিল। বোধ হয় পুকুরে যাইবে। ভোগের চালার কাছে আসিয়া বুড়ী নিজের ছায়ার দিকে তাকায়। সাবধানে ছায়া বাঁচাইয়া অঙ্গুর হয়। মুখুজে-গিন্নী হাঁকেন, বগল—অ বগল। বুড়ীর কানে সে স্বর পৌঁছায় না।—বলি ও বগল কানের মাথা খেয়েছিস? মুখুজে-গিন্নী এবার জোরে

জোরে হাঁকেন। বুড়ী দাঁড়াইয়া পড়ে, বলে, আমি কানের মাথা খেজে যাব কেনে, সে খেয়েছে তোমরা।

কথাটা ব্রাহ্মণ-পুজারী তারককেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। কারণ আছে। সেদিন বুড়ী ছেলেদের সহিত ভোগের প্রসাদ লইতে আসিলে ব্রাহ্মণ এক ফোঁটা পায়ের কেলিয়া দিয়াছিলেন। সে নামে মাজ। ব্রাহ্মণের দোষ নাই, নইলে কুলায় কৈ। অনেক সাধাসাধনা করিয়াও বুড়ী আর এক ফোঁটা পায় নাই। রাগটা সেইজন্মই। কিন্তু চোখ তুলিতেই নজরে পড়িল, প্রমত্ততা পুজারী ব্রাহ্মণ তো নয়ই—আর কেহ হইলেও বোধহয় রক্ষা থাকিত, কিন্তু সে স্বয়ং মুখুজে-গিন্নী। বুড়ী পূর্ব সম্বন্ধের দোহাই পাড়িয়া চট করিয়া কথা ঘোরায়। বহু দিন আগে তাহার ‘মনের কথা’ পাতাইয়াছিল।

—ওমা ‘মনের কথা’ তুমি। আমি বলি কে না কে। তা তুমি কিছু মনে কোরো না দিদি—চোখেও পাই নে দেখতে, কানেও পাইনে শুনেতে। তা—কি বলছিলে?” বুড়ী জিজ্ঞাসা করে। শ্রদ্ধা তুলিয়া যায় এই মাত্র সে বলিয়াছে কানের মাথা খাইয়াছে অপরে—সে নয়।

মুখুজে-গিন্নী আর কথা বাড়াইলেন না। গলার স্বর একটু উচ্চে চড়াইয়া বলিলেন—না বগল, এসব ভাল নয়। এই তোর মেয়ের কথাই বলছি। কমলা রে কমলা। মুখুজে-গিন্নীর স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রায়ে উঠে, সে হারাম-জাদীর কাণ্ডটা আজ শোন। সকালবেলা সবে চান সেরে আলোচাল ক’টা নিয়ে এসেছি—ঘাটে বোব বলে। কাল থেকেই মনে করে রেখেছি—বাবার ভোগটা আজ আমিই দোব। চাল ক’টা ধুয়ে সবে সিঁড়িতে জল ঝরতে দিয়ে হাতটা মুছি আর তোর ঐ আফ্লাদী ঘেঁরে ছলং করে দিলে গারে জল। তুই-ই বল না হাতে চাল ক’টা থাকলে আজ কি ভোগই দিচ্ছ কর? ও হারামজাদীকে বারণ করে দিস। আর বলতে, বললে কি জামিন্—হ্যাঁ গো হ্যাঁ একটু সরে গিয়ে বুলেই তো পার। বলে কোমর বেকিয়ে—মুখুজে-গিন্নীর ভোবড়ানো মুখ কিয়ংকাল বিকৃত হইয়া থাকে।

বুড়ী এবার নিজের মাথায় একটা চড় মারিয়া বলে, ‘সবই আমার অদেষ্টে গো। কাকে বারণ করব? আমার বারণটা ভনছে কে? সে হারামজাদীকে বলতে গেলে আমাকেই উণ্টে খা-কতক বসিয়ে দেবে। পিধি বীতে রুত লোক মরে, আমার মরণ হয় না।’ বুড়ী পুকুরঘাটের পথ ধরে। পুকুরপাড়ে আম-কাঁঠালের গাছের ঘন সারি। পৈঠার ছায়া পড়িয়াছে। বুড়ী সেখানে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদে। নিতেকে অভিসম্পাত

দেয়—কুটার যত্ন কামনা করে—‘বোরেশ্বর পুত্রে’র ‘ভে-
রাগিরে’র মধ্যে সর্প-দংশন চাহে। ওখানে ভখন ঢাকের
বাজনা বাজিয়াছে—ভোগ-রক্তন বোধ হয় শেষ হইয়াছে।
এবার ভোগ নিবেদনের পাল। তাহার পরের কাজটুকু
অর্থাৎ প্রসাদবিতরণের অপেক্ষায় বুড়ী বসিয়া থাকে।

প্রসাদ খাইয়া, পুত্রে হাত ধুইয়া, বোরেশ্বর পুত্রে আর
একবার যত্ন-কামনা করিয়া বুড়ী বাড়ীর পথ ধরে। এ পথটুকু
বুড়ী মেয়েকে গাল পাড়িতে পাড়িতে চলে। মেয়ের উপর
বুড়ীর অভিযোগের আর অন্ত নাই। বুড়ী তো নিজেই বলে
সময়ে অসময়ে—কি করব মা, নইলে নিজের প্যাটের মেয়ে।
কিন্তু ব্যাভারটা দেখে—যেন সত্যিনের মেয়ে গো।

২

পূর্ণপ্রাণ লইয়া অনেক হৈ-ছল্লোড়ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু
হৈ-ছল্লোড় যতটা হইয়াছে ফল হইয়াছে তার তুলনার খুবই
কম। কিন্তু এই যে আন্দোলন ইহাতে যাহাদের মাঝায়
আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা—তাহারা বরপক। কিন্তু
কল্পাপক্ষও যে পথ লয় এবং পূর্ণপ্রাণবিরোধী আন্দোলন
যে অতি উৎসাহীরা তাহাদের বিরুদ্ধেও চালাইতে পারে এ
দিকটা বোধ হয় তেমন নজরে পড়ে নাই। কিন্তু আন্দোলন
যদি বা চালান যায়, ফল বোধ হয় কিছুই ফলিবে না।
কেননা নিরস্ত্রের এই সব হিন্দুব মধ্যে বিবাহবন্ধনটা উচ্চ-
শ্রেণীর মত অত সমস্তে রক্ষিত তো হয়ই না বরং এ প্রকার
রক্ষণটাই যেন ব্যতিক্রম। সেজন্য বিবাহ হয়—পত্নী বর্তমান
ধাকিতে অপর বিবাহ হয় ত সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহার যত্নের
পরই আবার নূতন বিবাহের আয়োজন চলে। তাহাকে
ইহার বিবাহ বলে না—বলে, ‘নিকে’।

বগলা-বুড়ীর মেয়ের নাম কমলা। এদের সমাজের নিয়মমত
তাহার বিবাহও হইয়াছিল নবম বর্ষে। কিন্তু স্বামীর ঘরের পাট
চিরকালের মত সারিয়া যখন সে আবার পিতৃগৃহে আসিল
তখন তাহার বয়স ষোল। ঘোড়শী যুবতী—এমন মেয়েকে মা
সর্বদাই আগলাইয়া ফেরে। সমস্তে নূতন আশার স্বপ্নও মেয়ে
বগলা-বুড়ী। মেয়ে তাহার দেখিতে ধরাপ একথা কম
লোকই বলিতে পারিবে—তাহার উপর এই বয়স। বুড়ী
বড়ীম শ্রুতোর জাল বোনে। ‘নিকে’ হইবে কমলার বড় এক
চাখীর ছেলে—একটি ‘মাতর’ ছেলের সঙ্গে। টাকা শু কিছু
পাইবেই আর অমন জামাই পাইলে এত দুঃখ-দারিদ্র্য আর
কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। কিন্তু বুড়ীর এই যে এত যত্নে
বদ্ধিত আশা, একেবারে ইহার মূলে যে কুঠারাঘাত করিল সে
আর কেহ নহে, সে তাহার মেয়ে কমলা নিজেই। বুড়ী তাই
দোজ সন্ধ্যাবেলায় আকাশের তারাগুলার দিকে চাহিয়া
অদৃষ্টকে গালি পাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকেও—ঠাকুর কি

‘নেকন’ নিকেছিলে আমার কপালে গো—আর এ হতচ্ছাড়ী
মেয়েকে বনে এনে ভাও হে ঠাকুর।

এবার আরম্ভ হইল বোরেশ্বরপূর্ণ। বগলা-বুড়ীর এত বড়
আশায় বাদ সাধিয়াছিল তাহার মেয়েই সম্মত নাই, কিন্তু
আত্মবলিক হিসাবে যাহার নাম করিতে হইবে, সে এ
বোরেশ্বরের নিতাই বৈরাগী। শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে।
চাষবাসে মন নাই। বুড়ী তাহাকে অনেক বিশেষণেই
আপ্যায়িত করে। কখনও বলে ‘উড়নচড়ী’, কখনও ‘বাঁশ-
বুকা’, কখনও ‘ড্যাকরা’—এমনি আরও কত কি। ওকে
জমি দিতে চাহিয়াছিল হরেন পাল। লাঙ্গল গরু সবকিছুর
ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু নিতাই সম্মত
হয় নাই। ওর রক্তে কেমন এক ধরণের উগ্র উল্লাস আছে,
তাই চাষবাস করিয়া অমন শান্ত জীবন যাপন করিতে সে
চাহে না। কাছের শহরে পাটের কলে সে কাজ করে—
থাকে সেখানেই। মাঝে মাঝে আসে গ্রামে। পিছুটান
কিছুই নাই, যেটুকু আছে তাহাকে এক কথায় বলা যায়—
তাহা ঐ কমলা।

সেদিনকারই কথা। সকালবেলা কমলা গরু বাহির
করিয়া মাঠে বাঁধিয়া দিতে গিয়াছিল। মাঠের পথে না
কিরিয়া সে একেবারে পাড়ার মধ্য দিয়া আসিল—উড়েছটা
একেবারে চৌধুরীদের বাসন করুটা মাজিয়া দিয়া বাড়ী ফেরে।
ঘাটে বাসন মাজিতেছিল—মুখুজে-গিল্লীর গায়ে জল লাগিয়া-
ছিল তখনই। বাসন মাজিয়া সে ভাড়াভাড়ি বাড়ী ফিরিতে-
ছিল। পথ সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশীদের উঠান
বাগান ডিকাইয়া আসিতে আসিতে বোরেশ্বর খড়ের ঘরটার
দিকে নজর পড়িল।—পারে এক রাশ ধূলা, পাশে একজোড়া
নূতন ছুতা—লোকটিকে চিনিতে কমলার এক মুহূর্তও দেরি
হইল না। সে নিতাই। কমলা এক মুহূর্ত ভাবিল, লোকটা
এত সকালে আসিল কোথা হইতে? থাকে ত বিশ মাইল
দূরে—শহরে, রতনগঞ্জে। হয়ত রাজিশেষে বাহির হইয়া
পারে ইটিগাই আসিয়াছে—বিশ্বাস নাই। এ লোকটা পারে
না এমন কাজই নাই। তাই কমলার আশ্চর্য্য চৈকিল না
বরং ঐ যে লোকটি একইটু ধূলা লইয়া জুতাভোড়াটি গুলিয়া
রাখিয়া বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তাহার জন্ত কমলার
মনে জাগিল উৎকণ্ঠ।

কমলা ঠাড়াইয়া পড়ে। উঠানের একপাশে একটা
শিউলি ফুলের গাছ। এক গাছা ঝাঁটা গাছটির গায়ে ঠেগ
দেওয়ানো ছিল। কমলা ঝাঁটাগাছটি টানিয়া লইল।
উঠানে একরাশ পাতা জমা হইয়া আছে—কত দিন ঝাঁট
পড়ে নাই। কমলার মনে পড়ে—সেবার নিতাই আসিয়াছিল,
তখন দুইশত শিত। গোট। মাথ মাস—আজ দু’মাসের কথা

হইতে চলিল। দীর্ঘ দিনের অস্থপস্থিতিতে ঘাসগুলি পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, অগাধ ছোট চারাগাছও আছে। কমলা পাভাগুলি ঝাঁট দিয়া এক পার্শ্বে জড়ো করিয়া রাখিল। মাগুয়ার এক পার্শ্বে একটা উমান তাহাতে কত দিন রক্তন হয় নাই। উমান পরিষ্কার করিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া দেখিল নিতাই বসিয়া হাই তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া নিতাই বলিল—ইস, এর মধ্যে উঠোন ঝাঁট, উমান-পাভা হয়ে শু গেল সব। বড় বদে লেগেছে যে—কি খাব বল তো?—মুহুর্তে রাগে কমলার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কোথায় সাত-সকালে সে বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করিয়া রান্নার উত্তোগ করিয়া দিল তাহার ছত ছটো মিষ্টি কথা ধরে থাক—উঠিয়াই খাই খাই আরম্ভ করিয়াছে। রাগে মুখ ঘুরাইয়া সে বলিল—কি খাব? ঐ যে খাও না, উমানের পাশগুলো জড়ো করে রেখেছি।—নিতাই শুইয়া পড়িয়া আর একটা বিরাট হাই তুলিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিল কমলা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। বলিল—তোকে কে ডেকেছে রে? গায়ে পড়ে কাজ করতে কে তোকে মাথার দিবি দিয়েছে। যা-যা আমার খাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব'খম।

ইহার পর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। অভিযানে কমলার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে। হাতের ঝাঁটাগাছটা আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সে অদ্ভুত হইয়া গেল। নিতাই হাসিয়া পকেট হইতে ভিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল।

বাড়ী ফিরিতে বাস্তবিকই দেখি হইয়াছে। বগলা-বুড়ী মাগুয়ার বসিয়াছিল। মেয়েকে দেখিয়া আরম্ভ করিল—এই যে গরু বাঁধা হ'ল? সকালবেলা ত বেরিয়েছিলে। কোথায় মকরা করা হচ্ছিল শুনি? কমলা কোন কথা বলিল না। বুড়ী বলিল—হারামজাদী, বিশ দিন বলেছি গরু বেঁধে এসেই আমার ভাত বেড়ে দিবি। বুড়োমাথায় সকালে কিদে লাগে।

এই এখনি এক ছায়গায় জুয়ার জবাবদিহি করিয়া আসিয়া কমলার মন মেজাজ ভাল ছিল না। আবার জুয়ার কথা শুনিয়া স্তর চড়াইয়া বলিল—খেসে না' বেড়ে। রাফোস—সব রাফোস।

বুড়ী সমান চড়া গলায় উঠর দেয়—কে রাফোস রে হারাম-জাদী? সে তুই। পিখিবীতে পড়তে তর লইল না আমি বাপকে খেলে। বাপ'খাণ্ডি আবার আমায় বলে রাফোস। খাবই ত—নিছেই বেড়ে খাব।—বুড়ী উঠিয়া ঘরে গিয়া চুকিল বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া কমলা ফিরিল। বুড়ী বক ঘরে টেচাইতেছে—ওরে সন্ধানী, ও হারামজাদী—শেকল খোল, শেকল খোল। কিন্তু শিকল যে খুলিবে সে তখন আম-বাগানের পথ ধরিয়া সোজা রাসবাড়ী চলিয়াছে।

বুড়ী ভাত বাড়িয়া খাইয়া বক ঘরে বসিয়া বসিয়া মেয়েকে গালি দিতেছিল। হঠাৎ শিকল খুলিয়া গেল—সামনে দাঁড়াইয়া অভয়ার মা। 'শেকল তুল কে দিদি?'

আমার প্যাটের মেয়ে 'বুন'। মেয়েকে ভাত বাড়তে বলেছি ত পোস করে দিল শেকল তুলে। আমার মরণ হয় না গো—বুড়ী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

কৈদে কি করবি বোন। অদেঠ গো। সব অদেঠ। নইলে তোমার অমন মেয়ে—অভয়ার মা সান্ত্বনা দেয়।

অদেঠ, অদেঠ, হা অদেঠ। বুড়ী কপাল চাপড়ায়।

আসি, দিদি আর একটা কথা বলছিহু গো।

কি কথা লো?

আমার অভয়ার নিকে এ মাসের মধ্যেই দেব বোন। ছেলের বাপের কুড়ি বিধে জমি চাষ। সব ধান-জমি। হ'এক বিধে আলুর জমিও আছে। টালির ছাউনি বড় বড় দুখানা ঘর। একটাতে বাপ—একটাতে ব্যাটা। মিন্সের পরিবার অনেক দিন হ'ল গ্যাছে। ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল ওই হরগঞ্জে। তা—বোঁটা বাঁচল না। বুড়ো এসেছিল। দিন ঠিক করে কলেছি—এখন কেবল ভালর ভালর মিটে গেলেই বাঁচি।

বুড়ী মিঃখাস কেলিয়া বলিল—আর আমার মেয়ে। মেয়ে ত নয় খাণ্ডারী। লইলে আমারই আবার দুঃখ কি গা?

অভয়ার মা কৌসু করিয়া দীর্ঘমিঃখাস ছাড়িয়া সহানুভূতি দেখাইল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—ভবে, কথা যখন তুললে দিদি বলি শোন। গাল-মন্দ ক'র না, ভালর লেগেই বলছি। এই সকালে ওবারে কি জেছে গেছি—দেখি মেয়ে তোমার ঐ বোরেরী উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। ভাবহু—একটু দেখিই না ব্যাপারটা। তা দিদি হু'লনে কত হাসি মকরা—আমি গুট গুট চলে জেহু। এমন যদি দিনহুপরে যখন-তখন এমনটি চলে ভবে দশ জনের মুখে হাতই চাপা দেবে কি করে? এপাড়ার যা সব মিলেগুলো—তখনই বেকাঁস করে দেবে। এই বেলা সোজা কর দিদি। পাঁচ জনকে নিয়েই সব কাজকর্ম। আর এমন ব্যাপারে পাঁচ জনে ত পাঁচ কথা বলবেই। আমি সময় থাকতে তাই বলছিহু দিদি, আর কেম এবার রাশ টেনে ধর। আসি তা' হলে—রাগ করিস্নি দিদি।

বুড়ী গুম হইয়া থাকে।

সকালবেলা এই কাণ্ডের পর বুড়ী এবার বোরেরী পোকে গালি দিল। তাহাকে খানিকটা গাল পাড়িয়া এবার অভয়ার মাকে লইয়া পড়িল।

ছিরি দ্যাখ না মাগীর। যেমন মেয়ে তেমন মা। আবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে এসেছে। তোর মেয়ের নিকে তুই দিবি ত আমার কি লা? মন, মন, মাগী।

এমন কাণ্ডের পরে রাগ সকলেরই হয়। তাই বগলা-বুড়ীর রাগ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ঐ বোরেশীর জুড়ই ত তাহার এই সর্বনাশ। বোরেশী অবশ্য গায়ে-ঘরে থাকে না। তবে যখনই আসে তাহাকে জ্বালাইয়া যাইতে ছাড়ে না। এ পর্য্যন্ত বোধ হয় চার-পাঁচ বার বোরেশী বুড়ীকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছে—এবারে শহর হইতে ফিরিয়া একেবারে ছুটি লইয়া আসিয়া বিয়ের কাজকর্ম সব সে মিটাইয়া ফেলিবে, তাহার মেয়েকে সে শহরে লইয়া যাইবে। আর বুড়ী যদি একান্ত না যায় তবে মাস মাস তাহার নামে পোষ্টাপিসে টাকা পাঠাইবে। বুড়ীর অবশ্য আশা আরও একটু উত্থানের ছিল। বোরেশীর না আছে চাল না আছে চুলো। তবে হ্যাঁ নগদ পরস্যা কাষায় শহরের কলে ঐটুকুই যা। তাহার উপর মেয়ের তাহার এমনি পৌঁ যে আর কাহাকেও আমলই দিতে চাহে না। বুড়ী তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাঝে মত দিয়াছিল। কিন্তু মত যাহাকে দিয়াছিল তাহার বোধ হয়, মত ঘুরিয়া গিয়াছিল, কেননা ইহার পর আসিয়া সে আর ওকথা বুঝে আনে নাই। অবশ্য ছোঁড়াটা যে বুঝেই ‘বদ’ তাহা নহে। কমলাকে তো আরশি, চিকুনি, চুলবাঁধা ফিতে, কাঁটা সবই দিয়াছে। কাপড়ও দিতে চাহিয়াছিল, মেয়ে তাহা লয় নাই—আ মনু-মনু-মনু। তাহাকেও হু-এক ঠোঁক মণ্ডামিঠাইও খাওয়াইয়াছে, কিন্তু পরের বারে আবার যে-কে সে। ওকথা আর মনেই নাই। তাই বুড়ী এই টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়িয়া এটুকু স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে, সব অনর্থের মূল ঐ বোরেশীর পো। এই ভাবে দ্বির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে তাই বুড়ো শিবের ‘ধানে’ দ্বিরাজির মধ্যে বোরেশীর পোর সর্গদংশনে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া আসিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। বুড়ীর বড় ছেলে কেঠ বাড়ী সব কাজ সারিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়াছে। বুড়ী পুঙ্খপাট হইতে ছেলের হাত ধুইবার জুড় গাড়ুতে জল আনিতে গিয়াছিল। আসিয়া দেখিল রীতিমত আসন্ন জমাইয়া নিতাই বসিয়া গিয়াছে। কেঠ ও নিতাই মিলিয়া কি একটা পরামর্শ করিতেছিল। বুড়ীকে দেখিয়া আবার সব চূপচাপ। বুড়ী সন্দেহ মনে গঙ্গা গঙ্গা করিতে করিতে দাওয়ার উপর গাড়ু নামাইয়া রাখিয়া উঠানে গিয়া বসিল। কমলা উঠানে পা ছড়াইয়া বসিয়া নিজের পোষা বিড়ালটিকে আদর করিতেছিল। বুড়ী বসিয়া পড়িয়া অভ্যাস দিকে চাহিয়া রহিল—নিতাইকে দেখিতেই পার নাই, ভাবটা এমনি।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। কেঠ হাত ধুইয়া দাওয়ার বুট ঠেস দিয়া বসিয়া আছে—বুড়ী আকাশের তারা গুণিতেছে, কমলা বিড়ালটিকে লইয়া ঘেন আলাদা জগতের মাফুষ। কিন্তু নিতাই চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

—মাসী, অ-মাসী। নিতাই দাওয়া হইতে হাঁকিল।

—কে রে ?

—আমি নিতাই গো মাসী।

—এবার কি মনে করে ভালমানুষের ছেলে—

—অই ভাখ, মাসী যেন কি ? কোথায় এসেই তোমাদের বোঁজখবর করতে এছ—

—ধাক্, ধাক্ বাবা, বোঁজখবর আমাদের আশ্বরাই করব। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও বাছ।

নিতাই আড়চোখে একবার কমলার দিকে চাহিল। সন্ধ্যার ফিকে জ্যোৎস্নার কমলাকে বড় রহস্যময়ী লাগিতেছে—তাহার পানের রসে রাঙ্গা ওঠাধরে এক বলক হাসির বিহ্যৎ খেলিয়া গেল। কে জানিত ইহার মধ্যেই দু’জনের সন্ধি হইয়া গিয়াছে।—সত্যি তো সন্ধ্যার পর দীর্ঘ দুপুর ছিল। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতে কত সময়ই বা লাগে।

নিতাই এবার দাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল—কি মাসী, অভ চূপচাপ কেনে ? আমার উপর গোসা করে আর কি করবে বল ? টাকার জোগাড় করতে হবে তো। তোমার কাছে তো বারো গুণ টাকার কম কথাই চলবে না। এবার কিছু জোগাড়-বাত করেছি—তা’ হলে এই বোশেখেই হয়ে যাক্ কি বল। আমি কলের সাহেবকে বলে দিচ্ছি দুই ছুটি নিম্নে আসব। সাহেব বুঝ ভাল লোক মাসী—ওই তো টাকাগুলো দিলে।

টাকার কথায় বুড়ীর এবার সন্দেহ গেল।—তা বাছা, তোমার ব্যাপার কিছু বুঝি না বাপ্। তোমার কথা তুমিই দিয়েছ—তুমিই ভেবেছ। এবার টাকা হাতে পেয়ে—তবে কথা।

—তবে মাসী তাই হোক। টাকা হাতে নিয়েই কথা-বার্তা হোক। কিছু টাকা আমার কাছে যা আছে এখন দিচ্ছি। পরে কাজের সময় সব মিটিয়ে দোব।

নিতাই অর্দ্ধেক টাকা বুড়ীর হাতে দিল। বুড়ী নিতাইয়ের মাথার হাত দিয়া বলিল, ধাক্ বাবা, তোমার মতি দ্বির হোক—এ তো ভাল কথা। তবে তাই হবে, আর দেয়িই কেন। এবার সাহেবকে বলে করে ছুটি নিয়ে এস। আর আমাকে একটা নক্সাপাড় কাপড় কিনে দিতে হবে বলে রাখছ বাবা।

পুরা আশ বর্টা ধরিয়া ভাবী জামাইয়ের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া বুড়ী উজ্জসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে বুড়ী বলিল, হ্যাঁ বাবা বলি কি—এ বেলা আমার কাছেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ন্যাও না কেনে। ওবেলা চারটে কইমাছ ধরেছি—ঝোল রাঁধব’বন।

নিতাই আপত্তি করে নাই—বিশেষ করিয়া তাহার রাঁধেই বা কে ?

খাওয়াদাওয়া সারিতে রাজি হইল। শুদ্ধা জ্যোৎস্নার ওধারে গন্ধরাজ গাছটার সাদা ফুলগুলো যেন একজু হইয়া

গিয়াছে। অবগুষ্ঠিতা স্ত্রী নববধূর মতই পাছটিকে দেখাইতেছিল। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া কমলার ভারি ভাল লাগিল। ভারী জীবনের রোমাঞ্চময় স্বপ্নে বিভোর হইয়া সে উঠান হইতে উঠিয়া বাটের খেজুরগাছের গুঁড়ির উপর আসিয়া বসিল।

মিতাই মাসীর কাছ হইতে বিদায় লইয়া নিজের ঘরে চলিল। কমলাকে পুকুরঘাটে দেখিয়া মিতাই কমলার দুই চোখে আত্মল চাপ দিল। শক্ত কড়া-পড়া হাত, কিন্তু কমলা বাধা দিল না। খানিক পরে মিতাই নিজেই হাত ছাড়িয়া দিয়া কমলার ডান হাত ধরিয়া টান মারিল।

—উঃ, লাগে না বুঝি।

—লাগে তো লাগে চোখ বোজ্। কমলা চোখ বুজিল। মিতাই কাপড়ের তাঁক খুলিয়া তাহার হাতে একটা কি ফেলিয়া দিয়া ঈষৎ চাপ দিল। কমলা চোখ খুলিল। জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে—সুগন্ধি একটা ফুলের মালা।

* * *

পর দিন বৈকাল। তারক বায়ুন ভোগ র্নাষিতেছে—রতন মুচী ঢাক পিটাইতেছে—পালেদের বাঁধান বারান্দায় আজও এক পাল ছেলেমেয়ের ভিড়। বুড়ী মাথা ঠুকিতেছে—বাবা কালক্রুর তুমি তো সবই বোঝে জাবত। বোরেরীর পোকে খাপ দিচ্ছিলাম—সে খাপ কিরিয়ে দাও দেব। একশো বছর পরমায়ু হোক ছালেটার।—হে বাবা কালক্রুর।

—কোথাও কোন পরিবর্তন নাই। পরিবর্তন কেবল বুড়ীর প্রাণনার। আমগাছটার একটা ডাল বোঝ হয় ছেলেদের

দাপাদাপিতে তাকিয়া গিয়া থাকিবে। মৌমোজ্জল আকাশের এক টুকরা বাবার বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। চক্চকে সিমেন্টের মেঝের উপর মৌমের সেই প্রতিফলনটুকু প্রতিবিম্বিত হইয়াছে কালো শিবলিঙ্গটির অনতিদূরে। শিবলিঙ্গ তাই চক্ চক্ করিতেছে।

বুড়ী মাথা তুলিয়া মূর্তির দিকে চাহিল। কীপদৃষ্টি বৃদ্ধার নিকট কিন্তু মূর্তির এই গুচ্ছলাটুকু এড়াইল না। বুড়ী বিড় বিড় করিয়া নিজেই বলিল—বাবা হাসছে।—তাহার পর বুড়ী বাড়ীর পথ ধরিল। অভ্যস্তনের মত আজ তো তাহার মনে নাই যে, ভোগ-নিবেদনের পরেই প্রসাদ বিতরণের পালা। কেম—কে নামে।

৪

বাবার ঘানের সামনে পাল-বাড়ী। পাশে পালেদের নাটমন্দির। নাটমন্দিরের দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দাঁড়াইয়া পাল-গিন্নী ও তাহার বড় মেয়ে সুধি।

কথা হইতেছে পাল-গিন্নী ও সুধির মধ্যে। পাল-গিন্নী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মেয়েকে বলিলেন—হ্যাঁরে ও তো কেউ খাড়ার বোন্ কন্দি না। ও-মা ও হুড়ীও আবার পেয়াশ চৌকে গো।

সত্যি বাবার 'বামে'র এক পার্শ্বে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতেছে কমলা। আশ্চর্য্যই বটে। উহাকে কোন দিন দেবালয়ে মাথা মোয়াইয়া প্রণাম করিতে কেহ দেখে নাই। আজ কেম সে নিবিষ্টচিত্তে প্রণাম করে—কি তাহার প্রাণনা?

ফিরে দাও

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ফিরে দাও আমার সে সবুজ আমিরে—
কেলিয়া এসেছি ঘারে কৈশোরের ভীরে
অশ্রুধৌত, অমাবিল, সৌন্দর্য্য-পাগল।
সেদিন বিশ্বাস ছিল অচল-অটল
সুমেধ-পরিতপস। মনে হ'ত মোর—
তোমার অদৃষ্ট ছুটি স্নিগ্ধ বাহুডোর
আমার সত্তারে ঘিরে আছে সর্ব্বকণ।
মনে হ'ত বাহা-কিছু করি নিবেদন
সব তুমি শোনো কানে। দিমে দিমে, হায়,
সে কৈশোর লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কোথায়।
প্রাণনার নে-নিমের নাই ব্যাকুলতা।
কোথা গেল বিশ্বাসের সেই সুদৃঢ়তা?
ফিরে দাও সে বিশ্বাস, সেই নিষ্ঠা মোর,
ফিরে দাও আমার সে সোনার কৈশোর।

কেম ছেড়ে গেলে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এক দল সেনা স্টু-পাট করে শুনি যে দেশে,
বজ্রের মতো অশ্বেরা ডাকে—হাঁটতে কেশা :
উদ্রত আর কালো বেশ পরা, শিনিমেয়ে—
হানিরা চাবুক এলো নির্দয় সারথি-সেনা।
ভারা চীৎকারে যুদ্ধের নাম রাজ্যভাগে,
আমি বুঝে কাদি শুনিয়া তাদের অটহাসি,
স্বপ্নের মেঘ তারা চিরে দেয়—আগুন জাগে,
লোহা পেটে যেম বুকের উপর—বিষের কাসি।
বিজয়-গর্বে সবুজ কেশর নাড়িয়া আসে,
সাগর হইতে তারা এসে নাকি তীরেতে কৌলে।
হে মোর চিত্ত। কতো হতাশাই চিন্তাক্রান্তে,
প্রি়া। প্রিয়তমা। কেম ছেড়ে গেলে—কি মোর মোখে ?

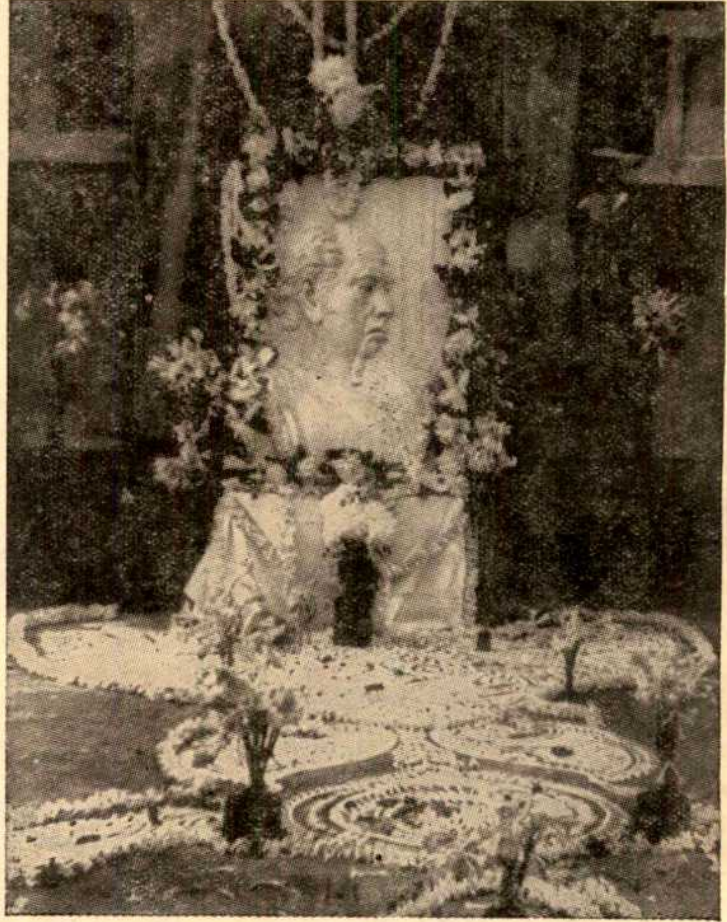
শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ্মে বিগত ৮ই ডিসেম্বর গবর্ণমেন্ট কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্রাফট-এর প্রাঙ্গণে উক্ত শিল্পারতনের অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কর্তৃক এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের অল্প কলেজের স্থায়ী মঞ্চটি ফুলে এবং আলপনার সুশোভিত করিয়া, ইহার উপর কলেজেই রক্ষিত অবনীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ প্রতিমূর্তি স্থাপিত করা হয়। কলেজের অধ্যাপক ত্রিমূর্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুপ ধূনা সহযোগে এই প্রতিমূর্তিটিতে মালাদান করেন। তাহার পর সমবেত ছাত্র এবং অধ্যাপক-মণ্ডলী এই স্বর্ণত মহাপুরুষের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিবেদন করেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া এই দিনটি তাঁহারা শোকদিবস-স্বরূপ পালন করেন।

অবনীন্দ্রনাথ একদা এই বিভারতনটিতেই ভারতীয় শিল্পের সুপ্র গৌরবময় ইতিহাসের মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। যখন সমগ্র ভারতের শিল্পী ও শিল্পরসিকেরা বিদেশীয় শিল্পের অন্ধ অনুসরণ ছিল, যখন ভারতীয় শিল্প দেশবাসীর নিকট অপরিণত এবং অসুদূত বলিয়া প্রতীয়মান হইত তখন অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে, লেখার এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য আমাদের শুধু বহুল্য সম্পত্তিই নয়, ইহা হইতে ভবিষ্যতের বহুমুখী অনুপ্রেরণার সুযোগও বর্তমান। তখনকার দিনে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অথবা তাঁহার চিত্রাবলী এক মনোহর প্রবর্তন আনয়ন করিলেও বহু বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সম্মান দিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ অর্ধ শতাব্দী কাল পরে আমরা “স্বাধীন ভারতে” বুঝিতেছি কি অপমান হইতে তিনি আমাদের দেশকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান কথাগুলি আবার দেশবাসীকে স্মরণ করিতে বলি :

“আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের কর্তব্য থেকে বাঙালী দূর হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলা-
হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বোপরে দেশে সমস্ত গৌরব পুঞ্জের আসনে সর্বোপরে আহ্বান করি।”

মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করে-
ছেন আত্মনির্ভর থেকে, আত্মপ্রাণ থেকে তাকে নিরুত্তীর্ণ দান
করে ভারতের পদবী উদ্ধার করেছেন, তাকে বিশ্বজনের
আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত
ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলার আত্ম-
উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছে থেকে শিক্ষা-
দান গ্রহণ করেছে। একে যদি আজ দেশলক্ষী বরণ করে না
নের, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী ব্যাভিমানদের অর



শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খোঁজার আত্মবিশ্বাস বীকার করে দেশে তবে এই যুগের চরম
কর্তব্য থেকে বাঙালী দূর হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলা-
দেশে সমস্ত গৌরব পুঞ্জের আসনে সর্বোপরে আহ্বান করি।”

সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা

[বাংলা “অমৃত বাজার পত্রিকা” হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ইংরেজের কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব আর নাই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা এক দিনের বা এক ব্যক্তির চেষ্টিয় লব্ধ হয় নাই। সহস্র সহস্র ভারতবাসীর আত্মদানে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর দীর্ঘ-কালব্যাপী বিবিধ প্রচেষ্টার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাকালে বাংলা “অমৃত বাজার পত্রিকা”র নির্ভীক উক্তি সমূহ আজিও আমাদের বিশ্বয়ের উদ্রেক করে। শুধু রাজনীতি নহে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও যে আমরা তখন পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে-ছিলাম, এ কথাও বার-বার আমাদের কর্ণকূহরে প্রতি-ধ্বনিত করান হয়। জাতির সর্বদীপ উন্নতিকল্পে সত্যকার জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা, জাতীয় সাহিত্যের প্রচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা-গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। “পত্রিকা”-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এ সকল বিষয়েও বিভিন্ন প্রবন্ধে আমাদের মনোযোগী হইতে বলিয়া-ছেন। এখানে প্রাচীন বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে জ্ঞানশিক্ষা, জনশিক্ষা, গ্রন্থাগার, টোল চতুষ্পাঠী, কারুশিল্প-বিদ্যালয়, চিকিৎসাবিষয়ক বাংলা পুস্তক রচনা, বিজ্ঞানসভাদি প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ প্রদত্ত হইল। ইদানীন্তন কালেও প্রবন্ধোক্ত বিষয়সমূহের সারবত্তা আমাদের উপলব্ধি হইবে। এ সকল অল্পসংখ্যক প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট রহিয়াছে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে অবস্থা-শিক্ষণীয় কতিপয় বিষয়

বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রথা অনেক দিন যাবৎ প্রবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও সাধারণ্যে ইহা সমাদৃত না হইবার কারণ কি? প্রত্যেক বিষয়েরই একটি প্রত্যক্ষ এবং গৌণ ফল আছে; প্রথমবিধ ফলেই মানব-মন অধিক আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমান জ্ঞান-শিক্ষা-প্রণালীতে প্রত্যক্ষ ফল দূরে থাকুক, পরোক্ষ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। যে দুইটি ফলের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তবেই পাঠক-বর্গ বুঝিতে পারিবেন।

বিদ্যার অর্থকরী ও জ্ঞানকরী দুইটি শক্তি আছে। অর্থাৎ বিভা দ্বারা কর্মক্ষম হইয়া লোকে অর্থ উপার্জনে সমর্থ হয়, এবং বিভাতে জ্ঞান মার্জিত হইয়া মনোযোগ বিমল মানসিক সুখ উপভোগ করেন। যদিও জীলোকদিগকে অর্থোপার্জন করিতে না হউক, তজ্জাত তাহারদিগের এমন অনেক বিষয় জানা নিত্য প্রয়োজন যাহাতে কথঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা স্তূটাকরূপে

সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। এবিধ শিক্ষাদান অভাবে জ্ঞান-শিক্ষার উন্নতি প্রত্যাশা নিফল। প্রায় বালিকা-বিদ্যালয় হাজেই দেখা যায়, দুই চারিখানি সাহিত্য, গণিতের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম, একখানি ইতিহাস, এবং কয়েকটি স্থানের নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কি প্রণালীতে এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, তাহা আগামীতে বলিতে ইচ্ছা রহিল, সংপ্রতি জীলোকের অবস্থা জাতব্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।...

রত্ন জীলোকদিগের একটি প্রধান জাতব্য বিষয়। সংপ্রতি কিরূপে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষক কিম্বা শিক্ষয়িত্রীর উচিত যে তাহারা প্রত্যহ অষ্টাষ্ট পাঠ্য বিষয়ের সহিত রত্ন বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করেন। পরন্তু তাহারদিগকে প্রথমতঃ এদেশ প্রচলিত সাধারণ অন্ন, ব্যঞ্জন, দেশীয় পিষ্টক ও লুচি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। পলায় প্রভৃতি প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষা না দিলেও ক্ষতি নাই। কেননা আমরা সেসব সামগ্রী সচরাচর ব্যবহার করি না।...ক্রমাগত ছয়টি বস্তুর প্রদান পূর্বক, সপ্তম অর্থাৎ অবকাশ দিবসে তাহা পরীক্ষা করিবেন। প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা আমাদের বিবেচনায় বড় কলোপধারণক হইবে না। রত্ন গৃহের একপ্রান্তে, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে রত্ন সামগ্রী লইয়া বালিকাদিগের দ্বারা পৃথক কয়েকদিন রত্ন বিষয়ে যে কয়েকটি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যঞ্জন পাক করাইবেন। বালিকাদিগের দ্রম লক্ষিত হইলে, শিক্ষক তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিবেন। সপ্তাহে না হয় পক্ষান্তে অবশ্যই এরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এরূপ পরীক্ষাতে তিনটি উপকার লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বালিকার শিক্ষিত বিষয় উত্তমরূপে কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। দ্বিতীয়তঃ একত্র পানাহার দ্বারা তাহারদিগের পরস্পর বন্ধুতা ও আমোদ কমিবে। তৃতীয়তঃ এরূপ উপকারী শিক্ষা সন্দর্শনে লোকে আশ্রয়ের সহিত স্বীয় সম্মতিদিগকে বিভ্রান্তিতে প্রেরণ করিবে। এই প্রণালী প্রবর্তন করিলে অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নাই। অতএব যে স্থানে স্থানীয় শিক্ষা-সমাজ আছে, তাহা হইতে এই ব্যয় প্রদত্ত হইবে, যে স্থলে তাহা নাই জাতীদিগের অভিভাবকেরা অর্থ বা দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন।

রত্নের পর জলপানি প্রস্তুত করা জীলোকদিগের একটি প্রধান কর্ম।...এই শিক্ষা কি প্রণালীতে দিতে হইবে সংপ্রতি তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে। সন্দেশ ইত্যাদি প্রস্তুত

করা হান্না অভাবে পল্লীগ্রামে খট্টা উঠে না। অতএব হান্না দ্বারা যে সকল সন্দেশ প্রস্তুত হয় তাহা প্রথমতঃ শিক্ষা না দিয়া, মারিকেল ও ক্ষীর দ্বারা যে সকল মিষ্টান্ন হয়, তাহাই শিক্ষা-দেওয়া কর্তব্য। তৎপরে মিষ্টাই এবং পরিশেষে হান্নার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখাইবেন। এ সকল বিষয় শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা উত্তম হইতে পারিবে। অতএব স্থানীয় লোকেরা কিঞ্চিৎ বেতন প্রদান পূর্বক, এতদ্বিষয়ে পটু গ্রাম্য কোন জীলোককে নিযুক্ত করিবেন। তিনি দিনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বালিকাদিগকে এক স্থানে লইয়া শিক্ষা দিবেন। প্রস্তুত সামগ্রীতে যাহাদিগের অধিক মৈপুণ্য প্রকাশ পাইবে, তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া বিধেয়।

আহার্য বস্তুর ন্যায় পরিষেয় বিষয়েও বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া নিত্যান্ত কর্তব্য। অনেক সময় ক্ষুদ্র একটি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে, কিংবা জীর্ণ বস্ত্র সংস্কার করিতে হুচিকগণকে অনেক পরিশ্রম দিতে হয়। পরিশ্রম দিয়াও অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া হয়, প্রাপ্ত হইলেও মনোমত হয় না। অতএব এইক্ষণ যজ্ঞপ বালিকা বিভাগেই কারপেটের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে পিরিহান, চাপকান, জুজবী ইত্যাদি প্রস্তুত করা, এবং ছিন্ন বস্ত্র “রিপু” করিতে শিক্ষা দেওয়া অত্যাব্যতক। এ সকল শিক্ষা লইলে, কারপেট শিখাইলে কোন ক্ষতি নাই।

এতদ্ব্যতীত বালিকাদিগকে ‘শিকা’, ‘ভাগা’ ইত্যাদি-সর্বদা প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুত করান এবং চিত্র-বিভা শিক্ষা দেওয়া উচিত। চিত্র বলিতে কেহ যেম ফটোগ্রাফ, কি লিথোগ্রাফ প্রভৃতির কথা আমরা বলিতেছি এরূপ বিবেচনা না করেন। কেননা সেগুলি সাধারণের পক্ষে অদৃশ্যপরাহত, ও আকাশ কুহুমবৎ। যাহারা নগরবাসী-তাহারা যে চিত্রের কথা বলি-তেছি, তাহা ভূমিমালা হস্ত করিতে পারেন, কিন্তু লেখক যখন একজন পল্লীবাসী, তখন তিনি পল্লীগ্রামের অভাব বিশেষরূপে জানেন। পল্লীগ্রামস্থ অনেকগুলি ভ্রতে এবং বিবাহে সর্বদাই নানা প্রকার চিত্রের প্রয়োজন হয়। হিন্দু বালিকারা তৎ-সমুদয় না জানিলে সমাজে অনেক অপদস্থ হন। অতএব এটিও বালিকা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ সন্দেহ নাই। ইহাও কোন জীলোক দ্বারা অধ্যাপনা কর্তব্য।

এ সকল শিক্ষাতে বালিকারা যজ্ঞপ গৃহকর্মে নিপুণা ও পরিবারে ব্যবহার্য্য হইবে, তজ্জন তাহাদিগের বুদ্ধিরস্তিরও প্রাথমিক জন্মিবে।...উপসংহারের পূর্বে দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, প্রদর্শিত প্রণালী প্রবর্তিত হইলে, জী-শিক্ষার সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবেই হইবে। যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার স্বকপোলকল্পিত নয়, সাধারণের মত। অতএব নির্দোষভিষ্মক সহকারে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট-অনুরোধ করি,

তাহারা এ বিষয়ে যেরূপ বিশেষরূপে আন্দোলন করেন।
(১৬ ফাল্গুন ১২৭৪ । ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮)

কৃষকদিগকে বিভাদান

গবর্ণমেন্ট সম্পত্তি এক মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত হইয়াছেন। এদেশস্থ হীনাবস্থাপন্ন লোকদিগকে বিভা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট ভারি উৎসাহ দেখাইতেছেন। সব ঠিক হইয়াছে, কেবল টাকার অপ্রতুলতা।

কৃষকেরা এদেশের ছোট লোক। তাহাদের অবস্থাটি কিরূপ, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের বাড়ী পল্লী-গ্রামে, আমাদের তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব। তাহাদের দৈন্য সকলে জানেন কিন্তু কতদূর দৈন্য সকলে জাহ্নন না জাহ্নন, গবর্ণমেন্ট জানেন না।...

কৃষকেরা ভোর হইতে দুই প্রহর ১টা পর্য্যন্ত এবং ৩টা হইতে রাত্ৰ ১ প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে। এ তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। প্রত্যহ ১২।১৩ ঘণ্টা যোরতর পরিশ্রম, এ সামান্য কাণ্ড নয়। কিন্তু পাঠক। কৃষকের সম্পত্তি কখন দেখিয়াছ ? আমরা এখানে একটি তালিকা দিতেছি, এ আশ্চর্য্যময় নয়, আমরা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

বস্তু হইখানা	মূল্য ৬ টাকা
বালা ২	৫০
বদনা কি ঘণ্টা ১	১২
ছোট ঘণ্টা	১০
মেটে হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি নুতনের মূল্য	১১০
টেকি ১টা	১০
নিড়ানি	১১০
কাণ্ডে	৬০
দা	৬০
লাঙ্গল	১১০
মই	১০
বিদে	১০
চরকা	১০
গরু ২টা	২০১
টোকা	২১০
পাটী ৪টা	১০
কাঁধা ২খানা	১০
বস্ত্র ৪খানা (জী পুরুষে)	২১
গামছা ১খানা	১০
ছকা কলুকে	২১৫
বীজ	৫
গহনা	৫০
নগদ	০

সামান্যতঃ একজন কৃষকের স্বধাসর্ব্বস্বের তালিকা উপরে

দেওয়া গেল। আরও কিছু জবাবদি তাহাদের বাটীতে পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল্য নাই। আর একটি কথা বলি। যে মূল্য বরা সিয়াছে সে সমুদায় ঐ জবাবদির নুতন অবস্থার সময়ের। অতএব ভালিকার কৃষকের যে সম্পত্তি দেখান বাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের তত সম্পত্তি নাই।

ইহারা উদরপূর্তি করিয়া আহার করিতে পারে না বলেই ইহাদের শরীর জীর্ণ-শীর্ণ আমোদ-আহ্লাদ বলে করে। তাহা জানে না, করিবার সময়ও নাই। চৈত্র-বৈশাখ মাসে কাঁঠাল সিদ্ধ, চিনা তুরা, আম সিদ্ধ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, অন্ন প্রায় ছুটে না। পরিষের একখানি বস্ত্র, আর গামছাবানি সহল। স্নানান্তে গামছা পরিধান করিয়া বস্ত্র শুখান হয়। ভাদ্র মাসে একটি ভাল আনিয়া তাহাতে পোয়াটেক ছব ও গুড় মিশাইয়া উত্তম আহার করা হয়, আর পৌষ মাসে, চালির গুঁড়া সিদ্ধ করিয়া উৎসব করা হয়। এটা হেন কেহ বলিও না তাবেন যে আমরা বাহিয়া বাহিয়া কৃষকদিগের মধ্যে অতি দৈন্ত লোকদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। কৃষকদিগের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কাহার কাহার অবস্থা ভাল, কাহার অবস্থা মন্দ। একশত জন কৃষকের মধ্যে এক জনের বাটী গোলা আছে, আবার তেমনি একশত জনের মধ্যে পঁচিশ জনের আদৌ মালম নাই তাহাদের চিরকাল খাটিয়া খাইতে হয়।

ইহা ব্যতীত তাহাদের অনেক কতি দিতে হয়। মহা-জনের টাকার সুদ শতকরা ৩৮ টাকা। বাত প্রভৃতি শতের সুদ শতকরা ৫০ টাকা। তাহাদের বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া আছে, কি কোন দৈব-হুর্দিপাকে যদি তাহাদের বলদের মৃত্যু হয়, কি তাহারা স্বয়ং পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে কাছেই মহাজনের শরণাগত হইতে হয়। আর, একবার মহাজনের করায়ত্তে পড়িলে তাহার আর অব্যাহতি পাওয়া ছুড়। যে কৃষকেরা নিজে মহাজনি করে, তাহারা ব্যতীত প্রায় সমুদায়ই মহাজনের নিকট দায়ী।

উপরে যেরূপ বর্ণনা করা গেল, নিম্ন শ্রেণীর লোক মাঝেরই অবস্থা প্রায় সেই রূপ। আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, আমাদের দেশীয় কৃষকেরা উদরপূর্তি করিয়া আহার করিতে পারে না। এরূপ লোকদিগকে বিজ্ঞানদান করিবার পূর্বে অন্নদান করা কর্তব্য। ভূদেব বাবু ও তাঁহার সহচরগণের মত্রে এক্ষণে অনেক গ্রামে পাঠশালা বসিয়াছে। এই পাঠশালাগুলি অভিশয় যত্ন-সহকারে ও নানাবিধ উপায়ে সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ পাঠশালায় ভ্রমলোকের ছেলেরা অনেকে পড়ে, তবু এ যত্ন প্রায় ভূদেব বাবুর পক্ষ হইতে, গ্রামস্থ লোকদিগের যত্ন মাত্র নাই, যদিও প্রথম প্রথম কিছু যত্ন দেখায় বটে কিন্তু যে অল্প দিনের নিমিত্ত। “পেটে নাই ভাত, তা আবার লেখাপড়া

শিখাইব” ডিপুটি ইন্সপেক্টরেরা গ্রামে পাঠশালা বসাইতে গেলেই কৃষকেরা এই কথা বলিয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে বিজ্ঞা দান করিবার নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় স্থির করিয়াছেন। কেন টাকাগুলি জলে ফেলাইবেন? এই টাকা দিয়া যদি একটা পিপলস্ ব্যাঙ্ক করা হয়, যদি তাহাদিগকে মহাজনের হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তবে তাহাদের ধন বৃদ্ধি হইবে, ও ধন বৃদ্ধি হইলে তখন বিজ্ঞা চর্চা করিবার অবসরও পাইবে ইচ্ছাও হইবে। তখন কোন ট্যাক্স বসাইতে হইবে না, গ্রামে গ্রামে ডেপুটিদিগকে উপাসনা করিয়া বেড়াইতে হইবে না, কৃষকেরা আপনাদ্বারা যত্ন করিয়া ব্যয়ের নিমিত্ত কুঠিত না হইয়া বিজ্ঞা শিক্ষা করিবে। গবর্ণ-মেণ্ট যদি এইরূপ একটা কাজ করেন তবেই প্রকালোকের মা বাপের মত কাজ করিবেন। কেন নাম কেনার জন্তে গবর্ণ-মেণ্ট এরূপ অনর্থক টাকাগুলি মাটি করিবেন। (৫ ভাদ্র ১২৭৫। ২০ আগষ্ট ১৮৬৮)

ভূদেববাবুর পাঠশালা প্রণালী

...ভূদেববাবুর প্রণালীতে পল্লীগামস্থ লোকদিগের সমুদায় লাভ ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কম। হঠাৎ দেখিতে গেলে এ প্রণালীর দোষ পাওয়া যায় না, হঠাৎ কেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এ প্রণালীটি প্রায় সর্বদা শুভ বলিয়া বোধ হয়। ভূদেববাবুর অধীন কর্মচারীগণের মধ্যে অমেকে কর্মদক্ষ, বোর পরিপ্রমী ও প্রভুভক্ত। এ সমুদায় সত্বেও পাঠশালায় পরিবর্ধন কেন নাই, কেন ডেপুটিদিগের বিভাগের জ্ঞানার জায়, পাঠশালা যুগে করিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে হয়? কেন পাঠশালা সংক্রান্ত সমুদায়ই নীরস ও উৎসাহ-বিহীন হইয়াছে? পাঠশালা পরিদর্শনে আর সুখ নাই, পাঠশালায় পড়ান আর সুখ নাই, পাঠশালায় পড়িতেও আর সুখ নাই।

গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই পাঠশালা শুধু দরিদ্র লোকের নিমিত্ত থাকুক, কিন্তু ডেপুটি, গুরু ও ছাত্রদিগের ইচ্ছা সাহায্যকৃত বিভাগায়ের সহিত টকর দেওয়া।...এরূপ উচ্চাভিলাষ প্রশংসনীয় সম্ভে নাই, বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেই কিছু না কিছু বড় হওয়া যায়, কিন্তু তা বলিয়া হাত কি। টাকা দিবার কর্তা গবর্ণমেণ্ট, তাহার ইচ্ছা ইহার ঠিক বিপরীত। যদি ডেপুটিদিগের পদোন্নতির প্রত্যাশা থাকিত, যদি পাঠ-শালায় নিমিত্ত পৃথক ছাত্রবৃত্তি থাকিত, তবে এরূপ বড় হইবার চেষ্টায় কাজ দিত, কিন্তু তাহা না হওয়াতে পূর্বে আমরা যাহা বলিয়াছি পাঠশালা সংক্রান্ত সমুদায়ই মৃত্যবৎ হইয়া উঠিয়াছে।...

পাঠশালায় পড়িয়া কি ফল হইবে, পল্লীগামস্থ লোক ইহাই ভাবে, ও এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। যাহারা ভ্রমলোক তাহাদিগের পাঠশালায় পড়িয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি হয়

না।...নিত্য দরিদ্র লোকও পাঠশালার যাইয়া কি করিবে? ভূগোল পড়িলে, ভারতবর্ষে কয়েকটি নদী আছে জানিতে পারিলে, কি সেরাজোদৌলা কোন্ সালে কলিকাতা আক্রমণ করেন জানিলে, পেটের ভাতও হয় না, এক বিধা জমিতে ৭ মণের অধিক বাজতও জ্ঞান যায় না। দরিদ্রলোকের সম্ভাবনায় পাঁচ বৎসর হইতে উপার্জন করিতে আরম্ভ করে, পাঠশালার পড়িলে এ উপার্জনের ক্ষতি, ইহা ব্যতীত গুরু বৈতন, পুস্তকের মূল্য, এমনত স্থলে দরিদ্রলোকের সম্ভাবনাকে পাঠশালায় না পাঠানই লাভ, আর দরিদ্র লোকে ধনীরা ভায় তাহাদের নিজের লাভ বুঝে। তবে পাঠশালায় মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরা পড়িতে পারে, ও এইরূপ লোকেই এক্ষণে পাঠশালা রাখিতেছে...।

পাঠশালা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অনিষ্টকারী নয়, বরং ইষ্টকারী। এই পাঠশালা স্থাপনের নিমিত্ত অনেক ছাত্রের মনে বিভ্রান্ত্যের ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে ও তাহারা পরিণামে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন স্থলে গবর্ণমেন্টের এই দুই প্রণালীতে সখ্যতা বরখাস্ত দেওয়া উচিত। অল্প একটি শুল্ক দিয়া পাঠশালা দিলে এই দুই প্রণালী উভয়ে উভয়কে পরি- বর্জন করিবে। আর নতুবা অনর্থক বৎসর বৎসর এতট টাকা কেন জলে কেলিয়া দেওয়া হয়? হুদেববাবু এই পাঠশালার নিমিত্ত গত বৎসর ১ লক্ষ, ৩১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কাশীকান্ড বাবু ৫১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া- ছেন, ও ব্যয় ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। হয় গবর্ণমেন্ট আরও কিছু টাকা ব্যয় করুন, নতুবা পাঠশালা যে পরিমাণে বাড়াইতেছেন, তাহা না করিয়া সেই অর্থের দ্বারা শুদ্ধ পাঠশালার নিমিত্ত কয়েকটি ছাত্ররত্তি করুন। গবর্ণমেন্টের ভয়, এরূপ করিলে পাঠশালা যাহাদের নিমিত্ত স্থাপিত, তাহারা ইহার কলভোগী হইবেক না, এটা গবর্ণমেন্টের বিষয় ভুল হয়। যদি দরিদ্র লোকদিগকে গবর্ণমেন্ট বলপূর্বক বিজ্ঞা অধ্যয়ন করাইতে চাহেন, সে প্রস্তাব কখনও না। যখন দরিদ্র লোকে বিভ্রান্ত্যের প্রয়োজন বোধ করিবে (যখন তাহাদের প্রকৃত অভাব বোধ হইবে, তখনই প্রয়োজন বোধ করিবে) তখন ডেপুটিমিগকে আর প্রায়ে প্রায়ে উপাসনা করিয়া বেড়াইতে হইবে না। এক্ষণে আমাদের বারো আনা লোকে উপবাস করে, গবর্ণমেন্ট তাহারই টিকানা করুন, তখন কৃষকেরা আপনারা আপনারা পাঠশালা বসাইবে। (২৭শে চৈত্র ১২৭৫। ৮ এপ্রিল ১৮৬৯)

স্কুল ও পাঠশালার ডেপুটি ইনস্পেক্টর

পাঠকগণ অবগত আছেন, হুদেববাবু, উড়ো, মার্টিন, ক্লার্ক সাহেবদিগের দ্বারা ডিভিসনাল ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। উহার উত্তর-মধ্য বিভাগ তাহার তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে নিয়ম ছিল পাঠশালার ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা হুদেববাবুর

অধীন থাকিবেন, ও ইংরেজী ও বার্মিজের স্কুলের ডেপুটিমিগ ডিভিসনাল ইনস্পেক্টরের অধীন থাকিবেন। নতুন বন্দোবস্তে এই নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট এই নিয়ম হইয়াছে, যে জেলা যে ইনস্পেক্টরের অধীন থাকিবে, সেই জেলার উত্তর-মধ্য ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা এক ইনস্পেক্টরের অধীন থাকিবেন। আর একটি পরিবর্তন হইয়াছে। ডেপুটিমিগের মধ্যে বেতন ও গ্রেডের তারতম্য ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার প্রভেদ থাকিল না। যাহারা পাঠশালার ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, তাহারা ইংরেজী স্কুল ও পাঠশালা উত্তর পরিদর্শন করিতে পারিবেন, আবার যাহারা ডিভিসনাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, তাহাদিগকেও পাঠশালা ও স্কুল নির্বিশেষে দেখিতে হইবে। পাঠশালার ডেপুটিরা চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এবং আপাততঃ পূর্বে বেতন ৭৫ টাকা পাইবেন। ক্রমে ইহাদের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হইবার আশা থাকিল। এই প্রণালী দ্বারা পরিদর্শন কার্য ও স্কুলসমূহের উন্নতিসাধন যে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে হইবে তাহাতে আর দুই মন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।...

উপসংহারকালে আমাদের ইনস্পেক্টর হুদেববাবু সম্মুখে গুটিকয়েক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। হুদেববাবু ঘেরপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্যদক্ষ তাহা আর নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহা দ্বারাই যথেষ্ট পাওয়া যাইবে যে, সম্পূর্ণ বিনা সহায়ে তিনি এত বহু উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আর একটি বিষয়ের ক্ষতি হুদেববাবু আমাদের বিশেষ ভক্তির পাত্র। যখন তিনি অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর ছিলেন, তখন পাঠশালাগুলি অতি স্বল্পের সামগ্রী স্বরূপ গণ্য করিতেন। অন্যান্য ইনস্পেক্টরেরাও ঘেরপ স্কুলের উন্নতির নিমিত্ত উদাসীন, হুদেববাবু সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। স্কুল কোন কারণ বশতঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িলে অন্যান্য ইনস্পেক্টরের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় উহা উঠাইয়া দিতে পারিলে আর ছাড়েন না, হুদেববাবু এরূপ অবস্থায় যাহাতে পাঠশালাটি পুনর্জীবিত হয়, তাহাই করিতেন। হুদেববাবুর অধীনে ঢাকার যুবতী বিদ্যালয়ও কখন উঠিয়া যাইত না, শালিধার স্কুলের গবর্ণমেন্ট চান্দাও কখনও বন্ধ হইত না। হুদেববাবু অল্পদিন সম্পূর্ণ ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। অভাববি পরিদর্শন কার্যে বহির্গত হন নাই। আমাদের গ্রন্থ বিখ্যাস, এতৎ প্রদেশের ইংরেজী স্কুলগুলি তাহার তত্ত্বাবধানে ত্রীসম্পন্ন হইবে। আপাততঃ একটি বিষয়ের জন্য সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকেরা তাহার অধীনে স্কুলে আছে। পূর্বে এক মাস দুই মাসের কমে ইনস্পেক্টরের আপিস হইতে সাহায্যের বিল ফেরত আসিত না। এক্ষণে সাত দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। শিক্ষকের এই নিমিত্ত কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। পূর্বে একখানি পত্র লিখিলে তাহার উত্তর পাওয়া

হুগুহ ব্যাপার ছিল, হুদেবাবুর নিকট পত্র লিখিমাত্র উত্তর পাওয়া যায়। হুদেবাবু সত্তর বৎসর সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। (২৫ আশাঢ় ১২৭৬। ৮ জুলাই ১৮৬৯)

পুস্তকালয়

কোন কোন মহোদয় সাহেবের রূপায় একত্রে জেলায় জেলায় এক একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। বেক্স সাহেব, যিনি প্রথমে এই সমুদায় পুস্তকালয় করিবার যত্ন করেন, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ। গবর্ণমেন্টের একত্রে এ সমুদায় ক্ষুদ্র লাইব্রারিতে বিশেষ দৃষ্টি আছে। গবর্ণমেন্টের কাগজপত্র, বুলবুল, সাংসদিক রিপোর্ট প্রভৃতি সমুদায়ই এই সমুদায় লাইব্রারিতে পাঠান হইয়া থাকে। কিন্তু তবু ইহাদের প্রায় তাবতেরই ভয় দশ। যশোহরের পুস্তকালয় মর মর অবস্থা হইয়া একত্রে হেড-মাস্টার উদ্বাচরণ বাবুর হস্তে সিদ্ধাছে। ইনি নিজের মর্যাদা বুঝেন, দেখি ইঁহা দ্বারা কি হয়। কৃষ্ণনগর লাইব্রারির যত্ন হইয়াছে। বরিশালের প্রায় ঐ দশ। কেবল চুচড়ার লাইব্রারিট হুদেবাবুর যত্নে একটু ভাল আছে।...

আমাদের বাদলাদেশে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রারি, আদি ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রারি, অক্ষয়বাবুর উত্তরপাড়ার লাইব্রারি, এলিয়ার্টক সোসাইটির লাইব্রারি ও পবলিক লাইব্রারি এই কয়েকটি প্রধান পুস্তকালয় আছে। তাহার মধ্যে প্রথম দুইটি নিত্য ক্ষুদ্র, সকলের শেষটি সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট। আমরা নিয়ে অনেক অমূল্যকান করিয়া ভ্রমণে যত্ন যত্ন পুস্তকালয় আছে, তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা দিতেছি, পাঠক দেখিবেন যে পুস্তকালয় সম্বন্ধে আমরা কত পক্ষে পড়িয়াছি।

স্থানের নাম	পুস্তকের সংখ্যা
ব্রিটেন :	লক্ষ হাজার
ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন	৭
বলডিয়ান লাইব্রারি, (অক্সফোর্ড)	২ ৮২
আড্‌বোর্টস্‌ এ, (এডিনবরা)	১ ৮০
ট্রিনিটি কলেজ, এ, (ডবলিন)	১ ৩০
উনিবার্সিটি, (এডিনবরা)	১
এ (ব্লাসগো)	— ৭০
এ (সেন্ট আণ্ড্রুস)	— ৬৫
এ (আবারডিন)	— ৪৮
সিমন কলেজ (লন্ডন)	— ৫০
কুইন্স ইন (ডবলিন)	— ৩৫
ব্রিটেনের অন্যান্য স্থানে	১ ২২

ফ্রান্স :

ইম্পিরিয়াল লাইব্রারি (পেরিস)	১১ ৮০
আরসেনাল এ (এঁ)	২ ৬
লেজিবেল্‌ এ (এঁ)	১ ৫৭

ম্যাকারিস এ (এঁ)	১ ৫১
সবরল এ (এঁ)	১ ৮১
হোটেলবিগি এ (এঁ)	১ ৬৫
ফ্রান্সের অন্যান্য স্থানে	৪০ ৩০

ইটালী :

কাসার্ট লাইব্রারি (রোম)	২ —
আম্ব্রুসিয়াম এ (মিলান)	১ —
ব্রিয়া এ (এঁ)	১ ৩০
মারিনিবেটী এ (ক্লোয়েল)	১ ৩০
বোরাল এ (নেপলস)	২ —
সেন্টমার্ক এ (বেনিস)	১ ২০
ইটালীর অন্যান্য স্থানে	৩ ৫০

স্পেন :

মাদ্রিদ লাইব্রারি	২ —
ক্যামেনি :	
রোয়াল লাইব্রারি (মিউনিক)	৬ —
এ এ (ড্রেসডেন)	৩ ২৫
উনিবার্সিটি (পটসডাম)	৩ ৫০
এ (ওলফেন বুটেন)	২ —

প্রাঙ্গণ :

রোয়াল লাইব্রারি (বারলিন)	৫ ৫০
অন্যান্য স্থানে	১৫ —

অষ্ট্রিয়া :

ইম্পিরিয়াল লাইব্রারি (বিয়ান্না)	৪ —
অন্যান্য স্থানে	২১ —

এডভান্স :

কুশিয়ার	৮ ২৫
বেলজিয়ামে	৫ ২৫
রোয়াল লাইব্রারি (হেগ)	১ —
এ এ (কপেনহেগেন)	৪ ৫০
উনিবার্সিটি আপসাল (হুইডেন)	১ ২৫
এ ফ্রিষ্টনিয়া	১১ ৫০
হার্ভার্ড কলেজ, মাসাচুসেট্‌স	১ —
কলিকাতা	১ —

এই সমুদায় পুস্তকের সমষ্টি প্রায় দুই কোটি কুড়ি লক্ষ এবং ইহার প্রত্যেকখানা আত্মপাত পড়িতে যদি গড়ে দুই ঘণ্টা করিয়া লাগে, তবে এই সমুদায় পুস্তকগুলি পড়িতে ষষ্ঠাদশদিগের মত যতদিন পৃথিবী স্থিতি হইয়াছে ততদিন ও আরো হাজার বৎসর বেশী লাগিবে। (৮ কাল্ডন ১২৭৫। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯)

[ইণ্ডিয়ান স্কুল]

সচরাচর প্রভাব করা যত কঠিন, উহা কার্যে পরিণত করা তাহা অপেক্ষা সহজ, কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বিপরীত। শত সহস্র প্রভাব হইতেছে কিন্তু তাহা জীবিত থাকে কদী।

আমাদের দেশে একটি ইন্ডিয়ান স্কুল হয়, ইহা অনেক কাল হইতে প্রভাবিত হইতেছে কিন্তু এত দিন পরে ভগবানবাবুর* যত্নে উহা কার্যে পরিণত হইল।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেক অবগত আছেন, যে বর্ধমানের রুগ্ন দরিদ্র ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ভগবানবাবু বিস্তর যত্ন করিয়াছেন, এমন কি ভগবানবাবু যত্ন না করিলে বর্ধমানের যে সর্বনাশ হইতেছিল, ইহা বোধ হয় গবর্ণমেন্টের ও সাধারণের কর্ণগোচর হইত না। ভগবানবাবু বর্ধমানে যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ঐ রুগ্ন দরিদ্রদের সাহায্যার্থে। ভগবানবাবুর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য একেবারে বিভা ও অন্ন দান।

তাহার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত হইতে ছুতারের ব্যবসায় পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা শুনিলাম যে এই নিমিত্ত একটি হারমোনিয়ম ক্রয় করা হইয়াছে, গৌরা মিস্ত্রী এখানে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভগবানবাবু যে কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কৃত-কার্য্য হওয়া না হওয়া অর্থপাশে। আপাততঃ এই স্কুলের ব্যয়ের ভার আর কাহারও লইতে হইবে না, ছাত্র ও শিক্ষক-দিগের প্রস্তুত সামগ্রী বিক্রয় করিলেই হইবে। আমরা ভরসা করি যে সদাশয় ব্যক্তিগণ ও গবর্ণমেন্ট ভগবানবাবুকে সাহায্য করিবেন। (২৮ ফাল্গুন ১২৭৬। ১০ মার্চ ১৮৭০)

[নবদ্বীপের টোল]

নবদ্বীপে এখন ৩১টি টোল আছে এবং ১০ জন ছাত্র মাত্র অধ্যয়ন করে। টোলের অনেকগুলি মাঘমাত্র। তাহাতে মোটে ছাত্র নাই, অধ্যাপকেরা নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্তি আশায় একটি টোল খুলিয়া রাখিয়াছেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, হরমোহন ভট্টাচার্য্য, রামনাথ ভট্টসিদ্ধান্ত, প্রমথ-কুমার ভট্টরত্ন প্রধান। (১০ আষাঢ় ১২৭৭। ১৩ জুন ১৮৭০)

[নেটিভ ডাক্তার]

এ বৎসর মেডিকেল কলেজ খুলিবার উপলক্ষে ডাক্তার চক্রবর্তী† একটি বক্তৃতা দেন। ডাক্তার চক্রবর্তী অভিশয় পণ্ডিত এবং তিনি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহাতে লোকের অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব নিবন্ধন নেটিভ ডাক্তারেরা চিকিৎসা শাস্ত্রে যথোচিত জ্ঞান পায় না। এ পর্য্যন্ত কয়েকজন ডাক্তার থানকরক পুস্তক বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র, এ বিষয়ে আরো মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। বস্তুত এদেশীয় নেটিভ ডাক্তারগণের হাতে গবর্ণমেন্ট যেরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করেন, তাহার মত তাহারা কিছুই শিক্ষা পান না। কালেজে তাহারা

যে ভিন্ন বৎসর থাকেন, তাহাতে সুবিধা পাইলে তাহারা বিস্তর অধ্যয়ন করিতে পারেন। মেট্রিকা মেডিকা, প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে অনুবাদ না করিয়া যদি এদেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা নিজ পরীকার ফলসহ রচনা করেন, তবে বিশেষ উপকার হইতে পারে। ডাক্তার চক্রবর্তী হয়ত এত দিন বাঙ্গলা ভুলে যান নাই, তদ্বিষয় ডাক্তার চক্রবর্তীকে দে, জগবন্ধু ভট্ট, স্বর্গাকুমার অধিকারী, তিন কড়ি কর প্রভৃতি পুরাতন চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের বিশেষ মঙ্গল করিতে পারেন। (৩১ ভাদ্র ১২৭৭। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭০)

বিজ্ঞান সভা

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় একটি বিজ্ঞান উৎসর্ঘিণী সভা সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি যেরূপ বিদ্যান বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী পুরুষ তাহাতে তাহা কর্তৃক ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যুবকগণের উচিত যে তাহার এরূপ মহদোপকারী সংকল্পের সহযোগী হন। (১ মাঘ ১২৭৬। ১০ জানুয়ারি ১৮৭০)

ইংরেজী সাহিত্য ও অঙ্কশাস্ত্রে এদেশীয়গণ যেরূপ ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন, তাহাতে আমাদের মনে অনেক সময় গৌরব উদয় হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ভারতবর্ষীয়রা অতাপি তাদৃশ পারদর্শিতা দেখান নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রোপযোগী বুদ্ধিবৃত্তির অভাব কি যথাস্থানে এদেশে বিজ্ঞান চর্চা হয় না বলিয়া বাঙ্গালির মধ্যে অদ্যাপি আমরা বিজ্ঞানবিৎ কোন ব্যক্তিকে দেখিতেই পাই নাই তাহা নিম্নরূপে নির্দেশ করা যায় না। বাঙ্গালার কলিকাতা মেডিকেল কলেজে কিয়ৎপরিমাণ বিজ্ঞান চর্চা হয় এবং পরীক্ষাতে এরা যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে বাঙ্গালি যুবকগণকে এবিষয়ে নির্বোধ বলা যায় না, দোষ হয় যে কলেজ ছাড়িলে আর বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তাহাদের এবিষয়ে সুযোগও থাকে না, স্পৃহাও অভাব হয়।

ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা আশীষ জাতির মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা অপেক্ষাকৃত কম। ভারতবর্ষীয়গণ আধ্যাত্ম বিদ্যায় কিছু অধিক ভৎপর। ভারতবর্ষের জলবায়ু প্রভৃতি প্রকৃতিতে দেশীয়-গণের মন বিজ্ঞান অপেক্ষা মনস্তত্ত্বে অধিক নিবেশিত করে, ফল বাঙ্গলা যুবকগণের এ বৃত্তিটি নিহিত বই ইহার অভাব নাই।

কার্য্যানুসারে যখন যিনি বিজ্ঞান চর্চায় বাধ্য হইয়াছেন তখনই তাহাতে কিছু না কিছু সুখ্যাতি লইয়াছেন। কানাই বাবু বিদেশীয়গণের মধ্যে এবিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। আজকাল রাজকৃষ্ণ বাবুও বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিবার সুযোগ পান না, সুতরাং এদেশে যতদূর সম্ভব তাহার ততদূর এবিষয়ে শিক্ষা হয় নাই এবং কানাই বাবু কালেজের তত বিখ্যাত নন সুতরাং

* ভগবানচন্দ্র বসু, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা। এই সময়ে তিনি বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেজিয় ছিলেন।

† ডাঃ স্বর্গাকুমার গুপ্ত চক্রবর্তী, মেডিকাল কলেজের অধ্যাপক।

এরা উভয় যখন এবিষয়ে বদেশীর মধ্যে হটক আর বিদেশীর-
গণের মধ্যে হটক কিছু কিছু প্রতিষ্ঠার ভাঙ্গন হইয়াছেন
তখন বিদ্যালয়ের অনেক যুবকেরই এই প্রতিষ্ঠার ভাঙ্গন হওয়ার
সম্ভব।

মহেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে যদি এখানে সায়েন্স এসোসিয়েশন-
সমিতির সংস্থাপন ও উন্নতি হয়, তাহা হইলে দেশীয় যুবকগণের
আশা তৃপ্তির আর একটি নতুন উপায় হইবে। অল্প আশা
তৃপ্তির নয়, অনেক যুবকের ইচ্ছা। কোন উপায়ে দেশের কিছু
মঙ্গল সম্পাদন করেন, কিন্তু সুযোগ পান না। এ সভাটিতে
তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ার সুবিধা হইবে।

মহেন্দ্রবাবুর প্রতিষ্ঠিত সভার আকৃতি এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে
অঙ্কিত করেন নাই, সুতরাং ইহা কর্তৃক আর আমাদের কোন
কোন আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভব তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে
বলিতে পারি না। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রটি এদেশের সম্পূর্ণ পতিত
ভূমি। ইহার উৎকর্ষ নিবন্ধন আমরা অনেক লাভের প্রত্যাশা
করি। যদি জগদীশ্বরের রূপায় মহেন্দ্র বাবু ইহাতে কৃতকার্য
হন, তবে ক্রমে জানিবে তারতবর্ষে বিধাতা কত রত্ন নিহিত
রাখিয়াছেন। এদেশে কৃতবিদ্যের সংখ্যা চাকুরি অপেক্ষা
অনেক বাড়িয়া পড়িয়াছে, এবং বৎসর বৎসর বাড়িতেছে।
ইহার ফল হইতেছে লোকের বিদ্যা চর্চার উপর তাচ্ছিল্য ও
হতাশা। এক্ষণে যাহারা দেশের মঙ্গলাকাজী, তাহাদের ইহার
প্রতিবিধান করা কর্তব্য। সায়েন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক এটি
কতক পরিমাণে নিরাকরণের সম্ভব।

এদেশীয় যুবা পুরুষগণকে অনেক অর্থ গ্রহণ, বলিয়া কলম
করেন। ইহাদের বর্তমান জীবনযাত্রা প্রণালী দেখিলে এটি
বলিলে মিথ্যে অজ্ঞান হয় না। তাহারা প্রকৃত কালেজ
ছাড়িলে পুস্তকের সঙ্গে সকল সম্পর্ক লোপ করেন এবং
কোথায় ছুটি পয়সা পাইবেন তাহাই লইয়া বিব্রত থাকেন।
কিন্তু তাহাদের অপরাধ কি? তাহারা কি করে? সায়েন্স
এসোসিয়েশন কি অল্প কোন বিজ্ঞান চর্চার সুবিধা হইলে
যুবকগণ বোধ হয়—বোধ হয় কি—নিশ্চয় এক্ষণে অর্থলালসায়

জানশূড় হইয়া বেড়াইবেন না। (২৮ ফাল্গুন ১২৭৬। ১০ মার্চ
১৮৭০)

ঢাকা ইনস্টিটিউট

...ঢাকার নতুন একটি সভা হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ পাঠে
আমাদের ধারণা বোধ হইল উহাতে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক
হইবে না। বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চাই যেন সভার প্রধান
উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এক্ষণে ভাবিতে পারেন যে যাহারা
পর্যাবীন, যাহাদের রাজনৈতিক কোন কমতা নাই তাহাদের
বিজ্ঞান চর্চার সুখই বা কি, ফলই বা কি? কিন্তু আমরা
তত দূর যাই না। তবে উহা যদি কলবয়ের ডিবেটিং ক্লাবের
মত হয় তবে সংবাদপত্রে উহার বিষয় আলোচনা করা না
সভার কর্তৃপক্ষীয়গণকে লজ্জা দেওয়া। কিন্তু ঢাকা অভি
প্রধান স্থান, এমন কি কলিকাতার নিচেই ঢাকা। সেখানকার
প্রধান প্রধান লোকে যদি সভা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন,
তবে ভালই বা কেন না হইবে? তবে বাদালির সভার নাম
শুনিলেই আমাদের ডিবেটিং ক্লাবের কথা মনে পড়ে।
সিঙ্গের জীবন চরিত্র, আভিসনের রচনা প্রণালী প্রভৃতি
প্রস্তাবের নাম শুনিলে এখন আমাদের বমন হয়। যদি ঢাকার
শিক্ষিত যুবকেরা প্রকৃত দেশের মঙ্গল ও আপনার উন্নতি
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সভায় হুহু গণিত, প্রাকৃতিক
শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ করুন। এক দেশের কৃষি অল্প দেশে
প্রয়োগ করা যায় না। কলিকাতার কৃষিসভা কেবল বিদেশীয়
যুবক একত্রে প্রভুত করিবার যত্ন করিতেছেন। কিন্তু কি
উপায়ে এদেশের ভূমি আরও ফলবতী হয় তাহার যত্ন তাহারা
তত করিয়া উঠিতে পারেন না। ভূতত্ত্ববিদ্যা বাদালির চর্চা
করেন না। বাদালায় ভূতত্ত্ব অধ্যাপি কেহ ভাল করিয়া
অনুসন্ধান করেন নাই। তাহার কিছু কারণ আছে বাদালায়
যে চর পড়িয়াছে উহার যুক্তি সংগ্রহ করিতে অনেক শ্রম
করিতে হয় কিন্তু ঢাকায় এই শাস্ত্র চর্চার সর্বোপেক্ষা সুবিধা।
সেখানে নিম্নভূমিও আছে পর্বতও আছে।... (২ বৈশাখ
১২৭৭। ২১ এপ্রিল ১৮৭০)



অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী।

দাদের মলম
চর্ম রোগে 'পরিমাণ' শক্তির 'ন্যায়' কার্যকরী।
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮-২৫-কলিকাতা ৭

জ্ঞাপিত ১৮৯৩



৪ বছরের হিসাবে

১৯৫৫-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর
উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে **১ কোটি**
২৫ লক্ষ টাকার উপর। সেই টাকা হইতে
লাভ সহিত সকল বীমাপত্রে বছর প্রতি হাজার
করা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

ময়াদী বীমায়— } ৮ টাকা
আজীবন বীমায়— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অত্যাশ্চর্য অনিশ্চিত
ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা
রাখিয়া এবং স্বদের হার অর্জিত হার অপেক্ষা
 $\frac{3}{4}\%$ কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে
হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে স্বদ অর্জন, দুমূল্যের বাজারে
অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা
সঙ্গেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের
অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, স্বদৃঢ় আর্থিক সম্ভতি এবং
পরিচালন-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।



- চলতি বীমা ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
- বীমা তহবিল ১৫ " ৯৭ " " "
- প্রিমিয়ামের আয়.. ৩ " ৪০ " " "
- দাবী শোধ ৭ " ২০ " " "

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড।

৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।



“পুথি পরিচয়”

অধ্যাপক শ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রায় সোদা শ' বৎসর পূর্বে হইতে আমাদের দেশে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও আলোচনার সূচনা হয়। সংস্কৃত গ্রন্থের পুথি লইয়া প্রথমে কাজ আরম্ভ হয়। অনেক পরে প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলির দিকে পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—সংস্কৃত পুথির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার পুথিও সংগৃহীত হইতে থাকে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে বাংলা পুথির সংগ্রহ ও আলোচনার সূত্রপাত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই প্রাচীন বাংলা পুথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে পরিষদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং পরিষৎ পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইতে থাকে। পরিষৎ পত্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত ক্রমে ক্রমে পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে নানা পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। পরিষৎ ও অত্যন্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত এই সমস্ত বিবরণের মধ্য হইতে দরকারমত কোন পুথির স্বতন্ত্র বুজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। এই অন্ববিধা দূর করিবার জন্য ক্যাটালোগার ক্যাটালোগোরাম নামক সংস্কৃত পুস্তককোষের অনুসরণে একখানি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকোষ প্রণয়নের কল্পনা পরিষদের আছে। এই গ্রন্থ সংকলিত হইলে নবলব্ধ পুথির আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে—প্রাপ্ত পুথির মূল্য নির্ধারণ সুকর হইবে।

পুথির প্রকাশিত বিবরণ পূর্ণাঙ্গ বা প্রয়োজনানুসারে হওয়ার উপরই এই কোষগ্রন্থের উপযোগিতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ প্রকাশিত বিবরণগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা, অস্পষ্ট। এ বিষয়ে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমি ইতঃপূর্বে উপস্থাপিত করিয়াছি (প্রবাসী, আবেণ ১৩৪৬, পৃঃ ৫৩৯)। অতি ভদ্র এই প্রাচীন পুথি ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। তাই এদিকে ইতিহাসগুরুক ব্যক্তিমাত্রের অবহিত হওয়া উচিত।

বিখ্যাতরতী বিজ্ঞানবনের উপাধ্যায় শ্রীপঙ্কজন মণ্ডল ‘পুথি-পরিচয়’ নামকগ্রন্থে* নতুন ভাবে পুথি আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বিখ্যাতরতী পুথি-শালায় সংগৃহীত জাড়ে পাঁচ হাজার বাংলা পুথির প্রথম পাঁচ শত পুথির মধ্য হইতে বাছিয়া ১৮১ খানির বিশেষ

বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। তবে কি সূত্র অবলম্বন করিয়া বাছাই করা হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লেখা ঘোণাভার বন্দনার পুথির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (২২, ৪৫ সংখ্যা), কিন্তু বাছারামের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থের একটি পরিশিষ্টে শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উপহৃত ২১৮ খানি পুথির মধ্যে ২১খানি পুথির বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সমস্ত পুথির কোন বিবরণ গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হয় নাই তাহাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আর একটি পরিশিষ্টে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। যে পাঁচ শত পুথি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন তাহাদের বর্ণনামূলক নামসূচী ও গ্রন্থকার-সূচী দুইটি নির্ধারিত দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গে লিপিকর, লিপিস্থান, গ্রন্থের মালিক প্রভৃতির তালিকা সংযোজিত হইলে আরও ভাল হইত। গ্রন্থের নামসূচীর মধ্যে পুথির পত্রসংখ্যা ও লিপিকাল উল্লিখিত হওয়ার ইচ্ছা সংক্ষিপ্ত বিবরণের কার্য সম্পন্ন করিয়াছে। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত পুথির বিবরণগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা একটি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকাটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকায় প্রদত্ত পুথিবিবরণ-পঞ্জীর সংক্ষিপ্তসার। উল্লিখিত সূচী দুইটিও তাঁহার পুস্তকে প্রদত্ত সূচীর আদর্শে রচিত বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থের ভূমিকায় পুথিসংগ্রহের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে এবং বাংলা পুথির—বিশেষ করিয়া বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রন্থকারের মতে—পুথি নষ্টল করা ছিল অধমকার দিনের এক প্রধান পেশা। হত্যাকার সুন্দর হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই পেশা অবলম্বন করিতেন। ভেরেটপাতা, ভোজপাতা, গাছের বাকল এবং চামড়ার লেখা বাংলা পুথির কথাও তিনি বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল উক্তির সমর্থক প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না হওয়ার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল অতৃপ্ত থাকিয়া যায়—উক্তির যথাযথ সম্বন্ধে সংশয় হয়। পুথির শেষের দিকে মালিক, লিপিকর, লিপিকাল, লিপিস্থান, পুথির মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইহার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা

* পুথিপরিচয়। প্রথম খণ্ড। বিখ্যাতরতী বিজ্ঞানবনের উপাধ্যায় শ্রীপঙ্কজন মণ্ডল, এম-এ সঙ্কলিত। বিখ্যাতরতী গ্রন্থালয়, ২ বকিম চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা—১। মূল্য দশ টাকা।

অঙ্ক উপস্থাপিত করিয়াছি। বিশেষ আন্দলের কথা, বর্তমান গ্রন্থকার এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ঐতিহাসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পুথির বিবরণ সঙ্কলনে সঙ্কলনিতা মামুলি ধরণে পুথির প্রারম্ভ ও শেষ হইতে যদ্ব্যক্রমে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়াই কাজ শেষ করেন নাই—গ্রন্থের ও পুথির বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচিত গ্রন্থের অল্প পুথি বাহ্যিক বর্ণিত হইয়া থাকিলে মাঝে মাঝে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বত্র এইরূপ না করার কারণ বুঝা যায় না। বিবরণের মধ্যে গ্রন্থের বিষয়-পরিচয় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য গ্রন্থে সেরূপ পরিচয়ের অভাব অনেক ক্ষেত্রে অগ্রবিধার সৃষ্টি করে। ২৮, ৩৫, ও ৬১ সংখ্যক বিবরণ দ্রষ্টব্য। ১৩ সংখ্যক বিবরণে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—‘বিজ্ঞ আত্মারাম সম্ভবতঃ লিপিকর, লেখক স্বকল নিবাসী দ্বিজ মহানন্দ।’ এই অনুমানের হেতু নির্দেশ করিলে ভাল হইত।

আলোচ্য পুথিগুলির বেশীর ভাগই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাহাদুর লিপিকাল পুথির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের ভিত্তর সবচেয়ে পুরাতন যেখানি লেখানি ১০১৩ সালে নকল করা। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে নকল করা আর একখানি পুথি আছে। আধুনিক পুথির মধ্যে যত্নাঙ্কর বিদ্যালয়কারের রাজাবলি ও ত্রিযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সত্য-নারায়ণের পাঁচালি উল্লেখযোগ্য। ছাপা প্রচলনের পরেও কেহ কেহ ছাপা বই নকল করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন। উল্লিখিত পুথি দুইখানির মধ্যে প্রথমখানি যদিবা সেইধরণের হয়, দ্বিতীয়খানি কখনই সেইরূপ নয়। এ জাতীয় পুথিকে

পুথিশালার অন্তর্ভুক্ত করা কতটা যুক্তিযুক্ত বিচার করিতে হইবে।

যে সকল পুথির নকলের তারিখ দেওয়া নাই তাহাদের লিপিকাল গ্রন্থকার মোটামুটিভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে কোন পুথি আনুমানিক ২২৫ বৎসরের পুরাতন। কোনখানি ২০০ বৎসরের, কোনখানি ১৭৫ বৎসরের, কোনখানি বা ১৫০ বৎসরের। কিন্তু লেখা দেখিয়া পঁচিশ বৎসরের কম বেশী পুরাতন বা নতুন বরা যায় কি?

পুথিগুলির অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্রাকৃতি—অনেকগুলির কেবল একটি করিয়া পাতা। এগুলি সাধারণতঃ ‘পাতড়া’ নামে পরিচিত। কতকগুলি পত্র, দরখাস্ত, ছাড়পত্র প্রভৃতিকেও পুথির মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পুথির নাম অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের নিজের দেওয়া মনে হয়। একই বিষয়ের গ্রন্থের দুই রকম নামও দেওয়া যায় (২২, ৪৫)। পদাবলীর পাতাগুলি স্বতন্ত্র পুথিরূপে (৯৪ প্রতীতি) প্রদর্শিত হইলেও কিছু কিছু পাতা একই পুথির বিচ্ছিন্ন অংশ কিনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। পাতার মাপের ঐক্য আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ একই পুথির বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র পুথিরূপে রক্ষিত হওয়ার ব্যাপার কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটা পড়িয়াছে।

শতাব্দিক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত পুথি লইয়া আলোচনার পরেও সংস্কৃত পুথির বিবরণ এখন পর্যন্ত সর্বদা হ্রদয় হয় নাই। বাংলা পুথির অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালব্যাপী আলোচনার ক্রটিবিচ্যুতি আশ্চর্য্যকর নহে। এ বিষয়ে কর্মীর অত্যন্ত অভাব—কাজ করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ দুইই কম। তাই এই নবীন উদ্যম বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য।

সন্ধান

ক্রীষ্ণদীর গুণ

বাঘ-পারাবার পাড়ি দিতে চায় পাখী,
শাখা-দ্বীপ তার আঁধারে লাগায় ঘোর;
চলার—ধামায় পথ পড়ে থাকে বাকী;
কেটেও কাটে না জামলের মাস্তা-ডোর,—
অতঃ সুরেরে অলীমে উড়ায় তাই,
অধরারে ঘেম পাখী বলে—‘বাই বাই’।
কোমল কুসুম-পল্লব পাখা মেলি’
মাটির শাখাটি রবিরে গরিতে চায়;
মাটি হতে শুধু বেড়ে ওঠে মাটি তেলি’,

শাখার শিখরে বাঁধা শেষে পড়ে যায়;
গন্ধ তাহার তাই বুঝি বারে বারে
পৌষাতে চায় চিরন্তনের পারে।
ধূলার ধূসর উষর ধরার মাঝে
মাটির মাহুয়ও অমৃত লভিতে চায়;
বাঁধন এড়াতে কিছুতেই পারে না যে,
তবুও জগতে কিরে কিরে আসে যায়।
ছন্দে-গন্ধে তবু তবুহারা প্রাণ,
সীমায় করিছে অসীমেরই সন্ধান।

পুস্তক পরিচয়

ভারত রাষ্ট্রতন্ত্র—শ্রীচক্রচন্দ্র চৌধুরী। এম্বা পাবলিশিং কোম্পানী, ১২০ সি. রাসবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা—২২। প্রাপ্তিস্থান—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১দি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

ভারত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্রের স্বরূপ কি তাহা জানা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অথচ কনষ্টিটিশন অফ ইণ্ডিয়া অধিগত করা ব্যবস্থাবিশারদের পক্ষেই সম্ভব, আড়াই শত পৃষ্ঠাব্যাপী রাষ্ট্রতন্ত্রসম্বিত ইংরেজী পুস্তকখানির জটিলতা উদ্ধার করা সাধারণজনের সাধ্য নহে। "ভারত রাষ্ট্রতন্ত্র"র সারমর্ম সরল ভাষায় পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গ্রন্থকার একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন। কেবল রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুবাদে সে অভাব দূর করা যায় না। যে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিতে পারা যায় শ্রীচক্রচন্দ্র চৌধুরীর সে জ্ঞান আছে। তিনি খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী এবং বিলাত আমেরিকা ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাই তিনি সহজ ভাষায় ভারত রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিচয়প্রদানের অল্প তাঁহাকে পরিভাষা যুগ্ম করিতে হইয়াছে। ইংরেজী পরিভাষার হিন্দী ও বাংলা প্রতিশব্দের যে সরকারী তালিকা পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নয়, কেননা অনেকগুলি প্রতিশব্দই সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাষ্ট্রসংহতি ও আঙ্গিক রাষ্ট্র, দ্বিতীয় ভাগে শাসনতন্ত্র এবং তৃতীয় ভাগে বিবিধ বিধান আলোচিত হইয়াছে। ভারত-বর্ষ রাষ্ট্রতন্ত্রও নহে, যুক্তরাষ্ট্রও নহে, ইহা ইউনিয়ন বা রাষ্ট্রসংহতি। প্রথম খণ্ডে রাষ্ট্রের স্বরূপ, সংহতি ও আঙ্গিক রাষ্ট্রের পরস্পর সম্বন্ধ, রাষ্ট্রিকতা, মৌলিক অধিকার প্রভৃতির, দ্বিতীয় খণ্ডে কেন্দ্রীয় এবং আঙ্গিক শাসনতন্ত্র, লোকসভা, রাষ্ট্রপরিষৎ, আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীপরিষৎ প্রভৃতির, তৃতীয় খণ্ডে আপেক্ষিক, সরকারী চাকুরি, সদস্য নির্বাচন, রাষ্ট্র-তন্ত্রের পরিবর্তন প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত এবং সমস্ত খণ্ডেই অসংখ্য বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই তিন খণ্ড ছাড়াও পরিশিষ্টে বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা শব্দার্থগঞ্জী এবং অনুক্রমণী দেওয়া হইয়াছে। এই হৃথপাঠ্য এবং জ্ঞানগর্ভ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কৌতুহলী পাঠক ভারত রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দেশের কথা—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। ৫২, বায়াকপুর টাঙ্ক-গেড কলিকাতা-২ হইতে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৭৪। মূল্য তিন টাকা।

দোঁসরা আক্টোবর, ছাব্বিশে জানুয়ারী, কংগ্রেস, বাংলা ও বাঙালী, আমাদের কর্মসূচীর খসড়া এবং গান্ধীবাদ ও হিন্দু মুসলমান সমতা মোট এই ছয়টি অধ্যায়ে পুস্তকখানি বিভক্ত। বঙ্গের তথা ভারতের সাম্প্রতিক সমস্তাগুলি এতই জটিল যে, সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া খুবই শক্ত। তত্ত্বাণীল গ্রন্থকার বর্তমান পুস্তকে স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কংগ্রেসপন্থী হইলেও তিনি কংগ্রেসের দোষত্রুটি সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই তিনি আঙ্গিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির ধারাকে বাচাই করিয়াছেন। কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনেককিছুই ঠিক আদর্শ অনুযায়ী হয় না; কাজেই এ সব ক্ষেত্রে নিভুলতা আশা করা বৃথা। কিন্তু তাই বলিয়া ক্রটি-বিচ্যুতির প্রশংসা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অল্পকাল হইল আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। এক দিকে ভুল-ভ্রান্তি অল্প দিকে অসামঞ্জস্য ও অযোগ্যতা আমাদের অগ্রগতি বাহত করিতেছে। হতবাক পদে পদে এই বাধা তেলিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এক্ষেত্রে অধৈর্য্য হইলে বা কেবলমাত্র সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করিলে চলে না—লেখক এই সত্যটি পাঠক ও দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বহু দিন রোগশয্যায় কাটাওয়া দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে যে সব চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরের দরদ দিয়া মর্মস্পর্শভাবে সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমানেরই চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কাঁজল রেখা—শ্রীমণি বাগচি। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

গল্প জিনিসটি সর্বকালে সকল বয়সের মানুষের অত্যন্ত প্রিয়—বিশেষতঃ শিশুগণের ইহার প্রভাব অপরিমিত। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে এক দিকে বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়—অল্প দিকে কল্পনার রাজ্যে তাহার অগ্রতিহত অভিধান এই দুই বিপরীত ধারায় তাহার চরিত্রের বনিয়াদ স্থাপ্ত হইতে থাকে। আমাদের শিশুরা আজ রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন এবং আমরাও

টোল ও কোম্পানীর



বনানগর কলিকাতা

দাদ ও ক্যাউনের

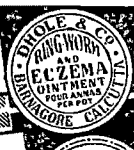
অন্যান্য মলম

ক্রিউটা-টোল

পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

লিঙ্গ মলম

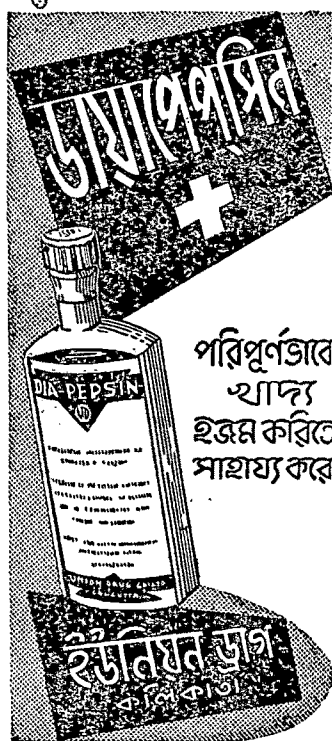
খোস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য





বাস্তবকে অভ্যন্তরীণভাবে উপগন্ধি করিতেছি, এবং সেই কারণেই হয়তো কল্পনার প্রদীপে তৈল-নিষেক করিবার উৎসাহ স্বভাবতই আমাদের হ্রাস পাইয়াছে। সেকালের মা, ঠাকুরমা, দিদিমা যাহারা শিশুচিত্তে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারাও আজ কঠোর বাস্তবের যথোমুখি দাঁড়াইয়া সরসবৃন্তির চর্চ্চা করিবার অবসর বড় একটা পান না, কিংবা যুগের পরিবর্তনে তাঁহাদের রুচিও বদলাইয়াছে। কিন্তু একালের ছেলেরা কি সভাই গল্প শুনিতে ভালবাসেন না? কঠিন ইন্সট্রের তিক্তবাদমাখা গ্রন্থগুলি হইতে অন্ততঃ কিছুকণের জন্তও বিকৃতিজ্ঞানের আকাজ্ঞা কি তাহাদের নাই? গল্প শুনিবার আগ্রহ শিশুদের নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেই আগ্রহকে কল্পনার উজ্জল করিয়া তুলিবার আয়োজনটুকুই যে আজ নাই। লেখক ছেলেদের জন্ত এই আয়োজন করিয়া ধুতাবাদী হইয়াছেন। সেকালের রূপকথার ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া চমৎকার চারিটি গল্প তিনি এই সঙ্কলনে নিষেক করিয়াছেন। গল্পগুলির নাম—কাজল রেখা, কাঞ্চনমালা, মানিকতারা, সোনাগতি। এগুলি অথও বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্য্যন্ত বহুকাল ধরিয়া কত লক্ষ মা-ঠাকুরমার মুখনিঃসৃত হইয়া কত কোটি শিশুর মনোহরণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজিকার যামেদের কাহারও কাহারও বা স্মৃতিপটে এই সব গল্পের ভাড়া ভাড়া টুকরা এখনও হয়তো চূর্ণ হীরকের মত উজ্জল হইয়া আছে। গল্পগুলি শুধু হৃদয়বিচিতিই নহে, এগুলিকে গুছাইয়া বলিবার প্রশংসাও লেখকের প্রাপ্য। তা ছাড়া হুমুদ্রণ ও হৃদয় প্রজ্জ্বলপটে বইখানি লোভনীয়। পড়িয়া ছেলেরা তো আনন্দ পাইবেই—নায়েদারও হারানো গল্পের স্বত্ব ধরিয়া কল্পনালুক শিশুদের লইয়া বিপ্রাহরিক বা সান্ধ্য আসর জমাইয়া তুলিতে পারিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়



মাটির কান্না—জমিদারদ্বন্দ্ব। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; বাংলাবাজার, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

ক্ষেতখামারের কথা, বহুপল্লীর বৃকের কথা জমিদারদের কাব্যে
মধুর করণ হয়ে বাজিয়াছে। তাঁহার কাবালশ্রীর সরল লাভণ্য, সাবলীল
গতি এবং প্রাণের দীপ্তি সহজেই পাঠকের মন কাড়িয়া লয়।

“রাতের বেলায় আঁধারের কোলে ঘুমায় নদীর চর,
জোনাকী মেয়েরা স্বপনের দীপ দোলায় বুকের 'পর'।
শেষ রাত্রেই জোছনার রথে পরীরা নামিয়া আসি
শুভা শামুক কড়ায়ে কড়ায়ে খেলার হেঁথায় হাসি”।

প্রকৃতির এই সব লীলারহস্তে কবি মুগ্ধ। সংসারের দুঃখদৈন্য
অবিচারে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে কোন কোন কবিতায়।
সেগুলিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে কথার মাত্রায় হরের সঙ্গতি রক্ষা করিতে
পারেন নাই। যেমন, 'সোনার মেয়ে'-তে—

“কতটুকু আমি পারিব করিতে, সাধ্য কতবা আছে,
মিথ্যানীতি কসংস্কার তোর চলিতেছে পাছে পাছে।”

‘নির্বাসিতা’য়—

“সোনার খাটেতে শয়ন করিয়া পান সে করিত রূপের গেলাসে জল,
সেই জলে আজি নানান রোগের বীজাণু আসিয়া করিতেছে কলবল।”

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত নাজীরের জ্ঞাত তাঁহার স্মরণবেদনা পাঠকের
হৃদয়ে সাড়া জাগাইবে, কিন্তু তাঁহার 'পাকিস্তান'-প্রশস্তি অনেকেই হয়তো
দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গ্রহণ করিবেন। দেশবিভাগে অথবা বাংলার ও বাঙালীর
কবি উন্নতিত ইহা, ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল।

মহাকবি—শ্রীমজুমদার চক্রবর্তী বি-এ, সাহিত্যবিশারদ,
তত্ত্বব্রত। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২; কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রট, কলিকাতা।

মহাকবি মধুসূদনর জীবনকথা লইয়া বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে একাধিক নাটক রচিত হইয়াছে। তথাপি এ গ্রন্থ পাঠকে আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নাট্যরচনায় লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে।

নরুসী কাঁথার মাঠ—জসিমউদ্দীন। ঘেসিডেলী
লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; বাংলাবাজার, ঢাকা।
৭ম সংস্করণ। মূল্য ১৬০।

কবিতার প্রতি বাঙালী পাঠকমাধ্যমের বিরাগসত্ত্বেও যে কবিতার বইয়ের সপ্তম সংস্করণ হইয়াছে, তাহার নূতন পরিচয় অনাব্যক্ত। জসিম-উদ্দীন বঙ্গসাহিত্যে মুপ্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁহার 'নকুনী কাঁথার মাঠ' ইংরেজীতেও অনূদিত হইয়া বিদেশে সমাদরলাভ করিয়াছে। বাংলার

জেনে রাখো—

যে কোম ১৭ বৎসরের কম ছাত্রছাত্রীকে বিনা চাঁদায় মাত্র ডাক খরচ দিলেই গ্রাহক করা হয়, প্রতিমাসে নিশ্চিত সংখ্যক লওয়া হবে। স্বতরাং সম্ভব যোগাযোগ কর, কারণ আগে এলে আগে পাবে।



ছোটদের সাপ্তাহিক ।

বাৰ্ষিক সডাক ৬৫০

পরিচালক—পোষ্ট বক্স নং ২৫৫২ জি. পি. ও. কলিকাতা।

পল্লীজীবনের, বিশেষতঃ কৃষকজীবনের চিত্র আধুনিক সাহিত্যে আর কেহ এমন করিয়া আঁকেন নাই। এক কবিতা কেবল কথার কৌশল নয়, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতায় সমৃদ্ধ, তাই ইহা সহজেই জ্ঞানকে স্পর্শ করে।

উতল নিউজর্জন—শ্রীআলোক সরকার। ৪৫-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২০। মূল্য এক টাকা।

কাব্যিক রচনা আর কবিতা—সম্ভবতঃ দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আজকাল কাব্যিক রচনা অনেক দেখি, কিন্তু কবিতা একান্ত বিরল। কৃত্রিম কলাকৌশল এই সব রচনার প্রাণকে আড়াল করে দাঁড়ায়। ছন্দ নিখুঁত, শব্দবিশ্বাসে চাতুর্য আছে, কিন্তু নেই সেই জিনিষ যা সোজাহুজি মনকে গিয়ে নাড়া দেয়। এ বইখানি পড়েও সেই কথাই মনে হ'ল। “নির্নিমেষ অবেষণ”, “আশ্চর্য হাওয়ার হাত”, “তরঙ্গিত হেসে ওঠা”, “একমুঠি বসন্তের গান”—কিছুই অত্যাশ্চর্য নেই, কিন্তু সব মিলিয়ে কি হ'ল, সহজে বোঝা যায় না। তরুণ কবিদল নতুন পথ-সন্ধানে উৎসাহ, বাঁকা পথ ছেড়ে কি তাঁরা সোজা পথ ধরবেন না?

আবাহন—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০২, বর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। এক টাকা।

শব্দ ও ছন্দের উপর কবির অধিকার আছে।

রহিতে নারিছু ঘরে—শ্রীকালীদাস ঘটক। মিত্রালয় ২০, আনান্দচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কীর্তনের স্বর শ্রীবিলাসের মর্মে প্রবেশ করে, তাকে করেছিল প্রেমস্বপ্নে বিভোর। কুটবুদ্ধি রাজ্য চক্রবর্তীর দল হ'ল তার শত্রু। তাদের

শয়তানী চক্রান্তে বিপন্ন হলেও শ্রীবিলাস অস্ত্রাঘের কাছে মাথা নোয়াল না; অস্ত্রের বাকে সত্য বলে স্বেদেছিল, তারই অনুসরণে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। শত্রুদের চেষ্টা উদয় হ'ল ঘটনাবিপর্দায়ে। কবিত্বগন্ধি উপজাতি, কিন্তু হুথপাঠ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অগ্নিসম্ভব—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ২০, আনান্দচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪।০ আনা।

লেখক অনুবাদ-সাহিত্যে হুনাম অর্জন করিয়াছেন। আলোচনা পুস্তকখানি তাঁহার মৌলিক উপজাতি। উপজাতির গোড়ায়ই আনন্দ পরিচয় হয় স্বনামধন্য চিত্রাভিনেত্রী রমিতা মজুমদারের সঙ্গে। চিত্রাভিনেত্রীর বিগত জীবনের একটি অতি কল্পণ অর্থাৎ চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়। আজিকার রমিতা তখন ছিল সাধারণ নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক মেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে মিহিরকে বিবাহ করিল। বাপের অমতে এবং ঘটনাচক্রে এমন একটা সময় আসিল যখন এই মিহিরই নিজের স্ত্রীকে বিপথগামিনী হইতে বাধ্য করিল। এখানে সাধারণ অতীত জীবনের উপর যখনিকাপাত হইল। লোক জ্ঞানিল যে মরিয়াছে, কিন্তু সে নমিতা মজুমদার নামে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। পৃথিবীর সমগ্র পুরুষজাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল—স্বপ্ন হইল তার নতুন জীবন। কিন্তু বাড়ালীর মেয়ে রমিতা—শিক্ষিতা রমিতা উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে বাছিয়া লইলেও অস্ত্র সহিত ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহার দেখে মনে দেখা গিয়া



সৌন্দর্য রক্ষায় অপরিহার্য

শীতের কক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য ও লালিত্য বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মের কোমলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। দিব্যভাগে লাভনি স্নো ও রাডে লাভনি ক্রীম ব্যবহার্য।

লাভনি
স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কোসমিক্যাল



বিপর্দায়। এই সময় ডাঃ প্রভঞ্জন সরকারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। প্রভঞ্জনকে আশ্রয় করিয়া সে নতুনভাবে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু প্রভঞ্জন শেষ পর্যন্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বিদেশে পাড়ি জমাইল। রমিতা বিস্মিত হইল, ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু আশা ছাড়িল না। স্থির করিল, প্রভঞ্জনকে কর্মের মধ্যেই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা রমিতার জানা—ফিরিয়া আসিয়া একটি বিরাট হাসপাতাল খুলিতে সে কৃতসঙ্কল্প। রমিতা পর পর পাঁচখানা ছবি তুলিবার কন্ট্রাপ্ট করিয়া বসিল। প্রভঞ্জনকে পরিকল্পনার বাস্তবরূপে দেখিতে হইলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন! রমিতার সঙ্কল্প এই টাকাটা তাহারই হাতে তুলিয়া দিবে, আর নিজে সেবাবন্দী গ্রহণ করিয়া তাহার পাশে থাকিয়া কাজ করিবে।

এইটো মোটামুটি এই। রমিতার চলার পথে আরও বহু নর ও নারী মরিয়াছে। তাহার সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের লিপি-সংখ্যম সহজ সাবলীল ভাষা এবং শাণিত সংলাপ মনোহরকথানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স্মৃতিমালিকা—শ্রীকেনাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীশিবকঙ্কর বাবুতীর্থ সঙ্কলিত এবং মূর্শিনাবাদ, পোঃ খাগড়া, 'বহরমপুর জুবিলী' নামে হইতে প্রকাশিত। ৬২+৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে প্রাতঃকালে স্মরণীয় স্তবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তেইশটি ভিন্ন দেবীর স্তব, দুইটি জাতীয় সঙ্গীত, বহু দেবদেবীর ধ্যান-প্রণাম এবং

মুক্তিকামিন্দ্রিত শিবপূজাবিধি স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশই প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্তবের সংগ্রহ, মাত্র কয়েকটি প্রথম সঙ্কলকের এবং একটি দ্বিতীয় সঙ্কলকের বিরচিত। জাতীয় সঙ্গীতের প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের 'বন্দে-মাतरম্' ও দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন অবিনায়ক'। প্রাচীন স্তবগুলি সুনির্বাচিত এবং সঙ্কলয়িতাদের রচিত স্তবগুলিও ছন্দের মাধুর্যে, শব্দের স্বাকারে এবং ভাবের সরসতায় সমুজ্জ্বল। এই সুগ্রন্থিত মালিকা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাজেরই কণ্ঠে পরিণোভিত হইবার যোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

স্তোত্ররত্নম্—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

শ্রীযমুনাচরণ বিরচিত 'স্তোত্ররত্নম্' পর্যবসিত হইতে সন্মুখ। সম্পাদক চপলাবাবু লিখিয়াছেন—“১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কস্মীরাপে 'আশ্রম' আখ্যায়িক একটি কম্বিনিবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তৎকালকার উষাকালীন প্রার্থনায় যমুনাচরণের 'স্তোত্ররত্নম্' হইতে কয়েকটি শ্লোক গঠিত হইত।...শ্লোক কয়টির ভাবমহিমা ও অসাধারণিক দৃষ্টিভঙ্গি মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে যমুনাচরণের স্তোত্র হইতে যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া মনে অপূর্ণ ভাবাবেশ অনুভব করি এবং সম্পূর্ণ স্তোত্রটির সন্ধান করিতে থাকি।” এই অনুসন্ধানের ফল আলোচ্য পুস্তকখানি। প্রতিটি শ্লোকের সঙ্গে সরল বাংলা ব্যাখ্যা থাকায় সাধারণ পাঠকের বুঝিবার পক্ষে



**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রিট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রিটের
বিপরীত দিকে, আমহাউস স্ট্রিট
ও বহুবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
এও সন্স

সুপ্রস্তুত সিলিকনের ওলেন্ডার নির্মাণে
ওইরকম বড়কারী

৪:৪
১০৯/১/বি, বাসবিহারী এডিনউ কলিকাতা

ফোন, বি. বি. ১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্ট স্ট্র

বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকায় যমুনাচাওঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও সম্পাদক মহাশয় দিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের কোন্ কোন্ স্থলে ইহা হইতে স্রোত উদ্ধৃত হইয়াছে, ভূমিকার পাদটীকায় তাহারও উল্লেখ আছে। পুস্তকখানি সুসম্পাদিত। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি : “বাক্য ও মনের অতীত অথচ বাক্য ও মনের আশ্রয় যে মহৎ সত্তার অপূর্ণ উপলব্ধি এই স্তোত্রের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ তাহারই উদ্দেশ্যে আমার শেষ প্রণতি।”

গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা (প্রথম ভাগ) — শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর, কে, পাবলিশিং কো। ১১-এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য আড়াই টাকা। সচিত্র।

সভা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নিদর্শন অ্যাক্স অফ্ বাবুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপ্লব সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্রূর ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে শত্রু-বাস্তব প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর-করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ভাঃ যাঃ সহ—২।। আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

কোন—সাপ্ত ৮৮১

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনমোহন বসু পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :
লেখক গোকুল মিত্রের বংশধর, সুতরাং এই বংশের অনেক পুরাণ দলিলপত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি এই সূত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত, এরূপও ভূমিকায় বলা হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে গোকুলচন্দ্র মিত্র-প্রসঙ্গে কলিকাতার বহু পুরাতন খবর আমরা জানিতে পারি। কিন্তু বিষয়-বিশ্বাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইলে ইহা অধিকতর সুখপাঠ্য হইত। কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনাকালে এ বইখানির প্রয়োজন হইবে নিশ্চয়।

যে গল্পের শেষ নাই (প্রথম খণ্ড) — শ্রীদেবীপ্র
চট্টোপাধ্যায়। দি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ। ৮৯, হারিসন
কলিকাতা-৭। মূল্য এক টাকা চার আনা।

পৃথিবীর জগৎরহস্য জানিবার কৌতুহল মানুষের যশে-চরিত্র
রহিয়াছে। হিন্দু, ইহুদী প্রমুখ প্রাচীন জাতিসমূহের নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থে
এ বিষয়ে নানা আলোচনা আছে। বিজ্ঞানও বসিয়া নাই। আধুনিক
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি, প্রাণের জন্ম, মানুষের পূর্ব-
পুরুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। আবার ‘পাহাড়ের
বই’ হইতে জীবজগৎের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধেও আমরা নানা নূতন তথ্য
জানিতে পারিয়াছি। মানুষ ও ধর্ম মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের পূর্বপুরুষ ‘মাক’—
শুনিতে কেমন লাগে। অথচ এই সকল জটিল বিষয় গল্পছলে অতি
সহজ ভাষায় লেখক বলিয়াছেন। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে চিত্রাদি
সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। পুস্তকখানি
অল্পবয়স্কদের জন্য লিখিত। এইরূপ সহজ ভাষায় বিজ্ঞান-পুস্তক রচনার
বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

নারীর মূল্য—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স, ২০৩/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

“শ্রীমতী অনিলা দেবী”—এই চন্দ্রনাথে ১৩২০ সালের ‘যমুনা’ মাসিক-
পত্রে লেখকের ‘নারীর মূল্য’ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী বাহির হয়। পরে ইহা
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকৃতপক্ষে
ইহার তৃতীয় মুদ্রণ। শরৎচন্দ্র নারী-জাতির প্রতি কিরূপ দরদী ছিলেন
তাঁহা তাঁহার উপস্থাসরাজি পাঠে আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহা
তাঁহার পক্ষে মোটেই আশ্চর্য্য নহে। তিনি নারী-জাতির দুঃখ-দুর্দশা
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; আবার ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সমাজতত্ত্বমূলক
গ্রন্থাদি পাঠে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের সমাজে নারী-জাতির স্থান
সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন। নারীর দুঃখ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও
আন্তর্জাতিক জ্ঞান তাঁহার মনকে একেবারে দরদে ভরপুর করিয়া তোলে।
বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁহা যেন উপচাইয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের জ্ঞানের
পরিধি যে কত বিচিত্র ও গভীর, স্বল্প পত্রিসময়ের এই পুস্তকখানি পাঠ
করিলে তাহাও পাঠকের সম্যক উপলব্ধি হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

গত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন ব্রাহ্মসম্মেলন, আশ্রমবৈতালিকগণের প্রভাতী কীর্তনের পর আশ্রমচার্য্য শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দ গিরি আশ্রম-পতাকা উত্তোলন করেন। অপরাহ্নে সেবায়তন-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কুচকাওয়াজ করে জাতীয় পতাকা অভিষেক করেন। তৎপরে শ্রীমৎস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে যোগেশ্বর-প্রাঙ্গণে সন্ধান হয়। উক্ত অস্থানেই আশ্রমের শুভ-উদ্‌ঘাটন ও বিভিন্ন স্থানের বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। দ্বিতীয় দিন বালকগণের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় প্রায় দুই শত যোগপন্থাবলী সাধকের সমাবেশে ক্রিয়াযোগ সাধন ও দার্শনিক ভক্তসমূহের আলোচনা হয়। জেলা প্রচার বিভাগের চলচ্চিত্র প্রদর্শন সকলের আনন্দ বর্ধন করে।

অনিলচন্দ্র রায়

ভারতের বাহীনতা-সংগ্রামের অত্যন্ত সৈনিক, বাংলা দেশের অগ্রযুগের কর্মী, এবং পরবর্তী জীবনে সুভাষাবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা অনিল রায় গত ২১শে পৌষ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অন্তর্গত প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। দূরন্ত আত্মিক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অস্ত্রোপচারের দ্বারা বিশিষ্ট সার্জেন ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জির চিকিৎসাবিনে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু অস্ত্রোপচারে আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া ডাঃ চ্যাটার্জি অস্ত্রোপচারে বিরত হন। সহযোগিতা গ্রহণ করা লীলা রায়, ছোট ভাই শ্রীঅমল রায় এবং ছুই জন ফরোয়ার্ড ব্লক-কর্মীর উপস্থিতিতে অনিলবাবু ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অনিলচন্দ্র ১৯০২ সনে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের বিহারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অরুণ রায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। অনিল রায় ১৯২২ সালে ঢাকা হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ. ডিগ্রী লাভ করেন। স্কুলে ছাত্রজীবন হইতেই তিনি বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৯২১ সালে 'ত্রীসজ্জ' নামে তিনি এক সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন নেতাজীর নেতৃত্বে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হইয়া ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৪০ সালে নেতাজীর সহিত ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনে তিনি বিশেষ কণ্ঠস্ব-

পন্নতার পরিচয় প্রদান করেন। ১৯৪১ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁহাকে কারাবাসে কাটাইতে হয়। ১৯৪৭ সালে 'ফরোয়ার্ড ব্লক'র সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং পরে ফরোয়ার্ড ব্লক দুইটি ভাগে বিভক্ত হইলে সুভাষাবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক জীবন ছাড়া অনিলচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং মৌলিক রচনায় ব্যাতিত ছিল। সঙ্গীতজ্ঞ ও কলা-রসিক সমাজে তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল। তিনি অগ্রগামী সত্য নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং "নেতাজীর ডাক" নামে নৃত্য-নাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন। "পার্টী এণ্ড লিডারশিপ", "সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ", "নেতাজীর জীবন-বাদ" প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক তিনি ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সুবক্তা ছিলেন।

বঙ্গবিভাগের পর তিনি উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসন-কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা এবং অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা তিনি সকলেরই ভালবাসা ও প্রভা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সুযোগ্য সহযোগিতা গ্রহণকারী শ্রীমতী লীলা রায় এবং তাঁহার অসংখ্য আত্মীয়স্বজনদের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

প্রমথেশ বড়ুয়া

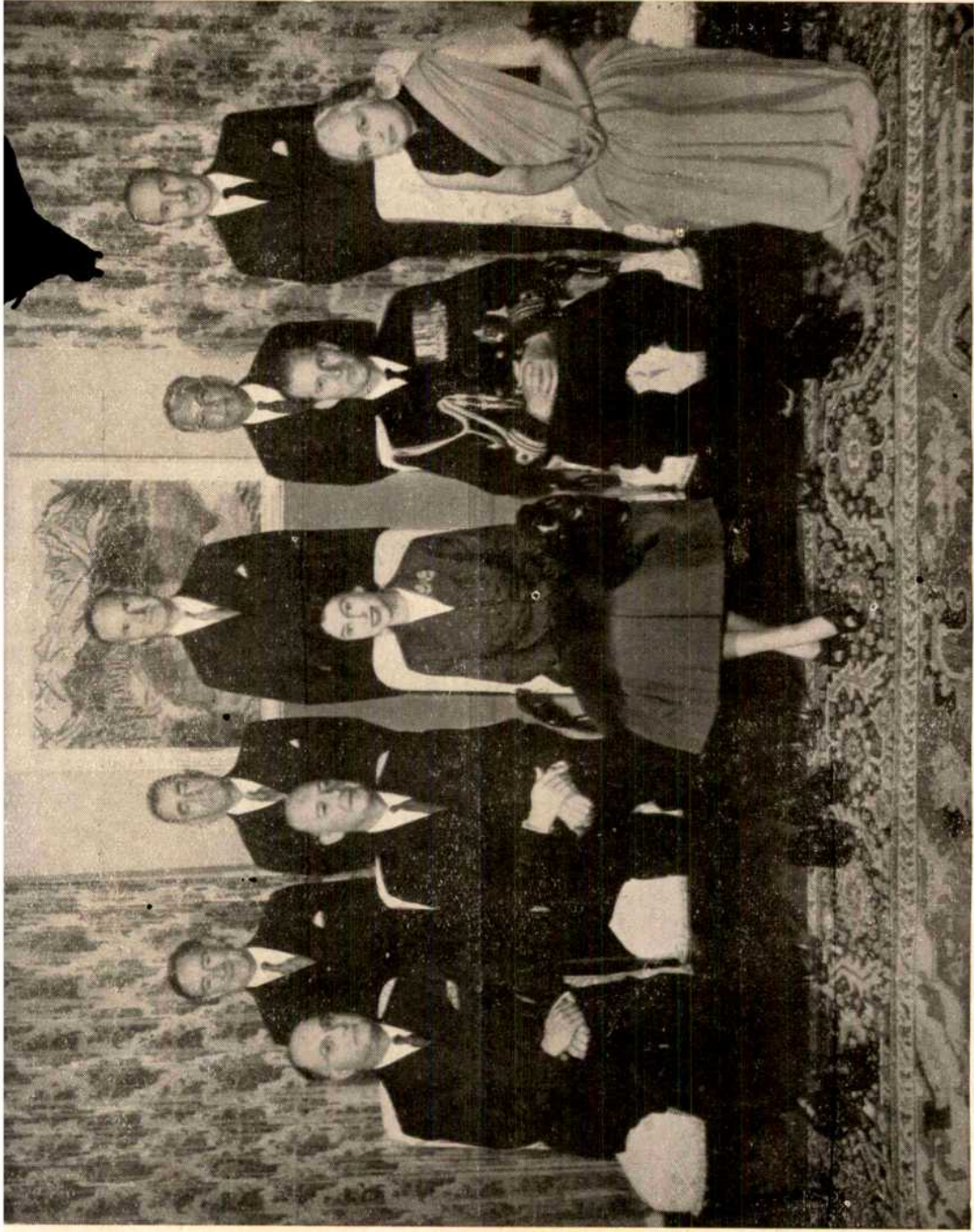
চিত্র-নাট্যকার, চিত্র-পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া অকালে মর্ধ্যলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা গত ২২রা পৌষ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পীগণ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে এক স্মৃতি-সভার আয়োজন করেন। শ্রীভারতবর্ষ বন্দোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রমথেশ আসামের বুড়ীরা অত্যন্ত গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার ছোট পুত্র। প্রভাতচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পরিপোষক। রত্নপুর সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ছাত্রাচার্যের ক্ষেত্রে প্রমথেশের মত অভিজ্ঞতাপরিবারের ব্যক্তির আবির্ভাব অনেককে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে প্রচুর সুনাম এবং সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া বাংলা-দেশের পৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রমথেশবাবুর পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বুদ্ধের বৈরাগ্য
শ্রীমন্তোষ সেনগুপ্ত



ওয়াশিংটনৰ কানাডাৰ দুতাবাসে ব্ৰিটিশ কমনওয়েলথৰ অস্তিত্বত দেশসমূহৰ দুতগণ সহ স্বাক্ষৰকাৰী এলিজাবেথ। সম্মতি স্বাক্ষ। যষ্ট জৰ্জের পরলোকগমন হেতু তিনি ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বঙ্গিয়া বিধোযিত্ত হইয়াছেন। চিহ্নের দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট ক্রীষ্টকৃত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

উপর হাইকোর্ট মন্তব্য করিতেছেন, “এই মারাত্মক অভিযোগের বলে কোন ভিত্তি নাই। দরখাস্তকারী সেল-ট্যাক্স বিভাগের অভি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ তথ্য না থাকা সত্ত্বেও এরূপ গুরুতর অভিযোগ আনা অত্যন্ত হইয়াছে।”

এই রায়ের পর ফাইনাল সেক্রেটারী এবং সেল-ট্যাক্স কমিশনার যদি স্বপদে বহাল থাকিতে পারেন তবে এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়াক্ষম রাখ কি করিয়া পদচ্যুত হইয়া আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। এ বিষয়ে অস্বস্তিকার পত্রিকা, দৈনিক বহুমুখী এবং লোকসেবক কর্তৃক মন্তব্য করিয়াছেন। দেশের বর্ধমান দুর্গতির প্রধান কারণ দুর্নীতি। এইভাবে সংকল্প-চারীরা অসাব্যদের হাতে যদি লাঞ্চিত হন এবং গবর্ণমেন্ট শেখোক্তাদের প্রস্তাব দেন তবে দুর্নীতি কখনও দূর হইতে পারে না। ভারত-সরকারের ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ক্রিয়াক্ষম রাখ অত্যন্ত নৈরাশ্রজনক অবস্থার পত্রিকা যদি কিছু ভুলও করিয়া থাকেন তবে তাহার ক্ষমতা তাঁহাকে এরূপে লাঞ্চিত করা বাংলা-সরকারের পক্ষে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য।

কাশ্মীর সমস্যা ও ডেভাস পরিকল্পনা

গত ৩রা মার্চ প্যারিস হইতে সংবাদ পাঠান হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদে উক্তর ফ্রান্স প্রতিনিধি কাশ্মীর সমস্যা-সমাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বিতীয় দফা বিবরণ পেশ করিবেন। তৎসম্পর্কে তিনি বলেন, কাশ্মীর রাজ্য লইয়া এবং বিশেষতঃ কাশ্মীরকে অসামরিকীকরণের প্রস্তাব লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধ ঘটয়াছে, তাহা একাধারে ব্যাপক ও মৌলিক। তিনি সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত নীতির উল্লেখ করেন :—(১) অসামরিকীকরণের সময় অন্তে উভয় পক্ষের সমস্ত সৈন্যের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম করিতে হইবে; (২) ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী যুদ্ধ-বিরতি রেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত সৈন্যসংখ্যার অল্পাংশে উপরি-উক্ত সৈন্য হ্রাস করিতে হইবে।

গত ১ই মার্চ নুতন দিল্লী হইতে সরকারী ভাবে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয় :

“এখানে অভ্যন্তরীণ সরকারী ভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গণ-কল্যাণ প্যারিসে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অসামরিকীকরণের ক্ষমতা যে ডেভাস পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভারত-সরকার কিংবা ভারতের প্রতিনিধি জি.বি. এম. রাও ও তাঁহার সামরিক উপদেষ্টাদিগকে প্যারিসে আলোচনাকালে একেবারেই জানান হয় নাই। গত ১৩ই অক্টোবর ডাঃ ফ্রান্স যে পরিকল্পনাটি ইহাদের হস্তে দিয়াছিলেন তাহার সহিত ইহার কোনও রকম সাদৃশ্য নাই।

যুদ্ধবিরতি রেখার উভয় পার্শ্বে সৈন্য অবস্থানের বিষয় নহে, অত্যন্ত বিষয়েও ‘ডেভাস পরিকল্পনা’র গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। গিলগিট কাউন্টি সংক্রান্ত বিশাল প্রভুতি করেকটি নুতন বিষয়ও এই পরিকল্পনার সংযোজিত হইয়াছে।”

ঘোড়াঘাটভাবে বলা যাইতে পারে, পূর্ব পরিকল্পনার পাক-অধিকৃত এলাকার ৭,৬০০ সৈন্য (এই সংখ্যার মধ্যে নিম্নমিত পাক-সৈন্য ও অসামরিক কার্যে ব্যবহৃত সমস্ত সৈন্যকেও ধরা হইয়াছে) এবং ভারতীয় এলাকার ২৮ হাজার সৈন্য অবস্থানের প্রস্তাব ছিল। নুতন পরিকল্পনার পাকিস্তান-অধিকৃত এলাকার প্রায় দশ হাজার সৈন্য ও ভারতীয় এলাকার ১৪ হাজার সৈন্য রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেসনোট

ভারত-সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ‘ডেভাস পরিকল্পনা’ প্রকাশের পূর্বে ভারত-সরকারকে কোন কথা জানানো হয় নাই। এরূপভাবে পরিকল্পনা প্রকাশে ভারত-সরকার বিমূর্ত হইয়াছেন। প্রত্যাশার দ্বিতীয় রিপোর্টের ষষ্ঠ পরিশিষ্ট হিসাবে ‘ডেভাস পরিকল্পনা’ প্রকাশিত হইয়াছে। নিয়ে পরিকল্পনাটির অংশবিশেষের বিবরণ প্রদত্ত হইল :

“(১) ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে চুক্তির পর দ্বিধা দিন চরম সীমা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(২ক) যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্ব সাহায্যে লক্ষিত না হয় তাহা দেখিবার ক্ষমতা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে স্থানীয় সরকার-সমূহকে সাহায্যের জন্য এবং সৈন্য-বাহিনী সমাবেশের ক্ষমতা রাষ্ট্রপুঙ্খের পর্যবেক্ষকবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং জীপ, হেলিকপ্টার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে হইবে।

(৩) পশ্চিম দিক হইতে বিনা অনুমতিতে বাহাতে কেহ প্রবেশ না করিতে পারে, তৎক্ষণ পাকিস্তানকে আত্মা কাশ্মীর এলাকার পশ্চিম সীমান্ত দিয়া প্রবেশ বন্ধ রাখিতে হইবে। বাজাই-করা নিয়মিত বাহিনীর দ্বারা এই কাজ করিতে হইবে।

(৪) তিন ব্যাটেলিয়ান ছাড়া সমস্ত নিয়মিত পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে।

(৫) আত্মা কাশ্মীর সমস্ত বাহিনীকে কমাউন্স চার ব্যাটেলিয়ান করিতে হইবে এবং ভারতের নিয়মিত সৈন্যদলের সংখ্যা হ্রাস করিয়া এক ডিভিশন করিতে হইবে।

(৬) নিম্নলিখিতভাবে আত্মা এলাকার চার হাজার অসামরিক ব্যক্তিকে লইয়া একটি পুলিশবাহিনী গঠন করিতে হইবে :

(১) আত্মা দেওয়া আত্মা বাহিনীর পূর্বভাগ

লোকজনের মধ্য হইতে ১,২০০ জনকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে।

(২) কখনও আত্মা বাহিনীতে কাজ করে নাই, এমন ১,২০০ ব্যক্তিকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনও পাকিস্তানী বা পাক-সশস্ত্র বাহিনীর ভূতপূর্ব সৈন্যকে ইহাতে গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) ভাদ্রিয়া দেওয়া আত্মা বাহিনীর ভূতপূর্ব লোক-জনের মধ্য হইতে ৮০০ নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে।

(৪) কখনই আত্মা বাহিনীতে যোগদান করে নাই, এরূপ ৮শত নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনও পাকিস্তানীকে অথবা পাক-সশস্ত্র বাহিনীর ভূতপূর্ব সৈন্যকে উহাতে গ্রহণ করা হইবে না।

এই “পরিকল্পনা” লইয়া নাকি বিশ্ব প্রকাশ করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রনীতির মধ্যে বিশ্বাসের কি থাকিতে পারে? অসত্য-ভাষণ, সত্যের বিলোপ ও রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ। চাণক্য পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া টুম্যান, চার্লিল, ষ্ট্যালিন, নেহরু, মাও-সে তুওর যুগ পর্যন্ত এই নীতি অটুট আছে। ডিক্‌সন যেমন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিকট এক কথা আর পাকিস্তানকে আর এক রকম কথা বলিয়াছিলেন, সেইরূপ গ্রাহাম-ডেভান ও দুই পক্ষকে দু’কথা বলিয়া একটু খেলিয়া লইতেছেন যাজ।

কাশ্মীর সমস্যার আলোচনার মধ্যে নূতন ঘটনা হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ডঃ জ্যাকব মালিকের বক্তৃতা। তাহার মধ্যে নূতন কিছু নাই। মার্কিন ও ব্রিটেনের নষ্টামির বিরুদ্ধে অসংলগ্ন বাক্য বর্ণন এই বক্তৃতাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াবাসী ডিক্‌সন ও মার্কিনী গ্রাহাম এই দুই জনেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কেহ যে তাহা পারিবেন সে বিশ্বাস আমাদের নাই। কি ভাবে ও কোন্ সময়ে তাহা হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। হয়ত তাহা কাশ্মীরের ভাগ্যবিধাতা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিয়া এই রাজ্যের নরনারীর শক্তি ও বৈধের পরীক্ষা করিতেছেন এবং আমাদের তরঙ্গ এই যে, কাশ্মীরবাসী এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

নেপালে আবার বিদ্রোহ

প্রতি ভারতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আজ দেড় বৎসর হইতে নেপালে একটা না একটা গণগোল লাগিয়া আছে। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বসন্তকালে প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের ‘রাণাভক্ত’ের অনধিকার অসহ বোধ করিয়া মহারাজাধিরাজ জিৎসুবন মলদেব ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহারাজা চন্দ্র সমসেরজয় প্রধান মন্ত্রীরূপে মহারাজাধিরাজের সপক্ষে জনমতের সক্রিয় সমর্থন লক্ষ্য করিয়া একটা আপোষ করিয়া লইলেন। তার পর এক বৎসর ঘাইতে না ঘাইতে তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভার গণমতের প্রতিবিম্ব নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি ত্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বিধান পরিষদ গঠিত হইল, দু’তিনটি দলের সমবায়ের মন্ত্রিমণ্ডলী শাসনভার গ্রহণ করিলেন; রাজবংশ, রাণাবংশ, উদারনৈতিক দল ও বামপন্থীরা একত্র হইয়া শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু আরও উৎপত্তী দল গণগোল করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডাঃ কে. আই. সিংহের পরিচয় আমরা পাই নাই। সংবাদপত্রে যাহা দেখিতে পাই, নেপালী সরকারের নানা ঘোষণায় যাহা পাঠ করি তাহাতে মনে হয় এই ভ্রমলোক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। বার বার জেল হইতে পলায়ন করার কৌশল আরম্ভ করিবার শক্তি তাঁহার আছে। পুলিশ বিভাগের ও কারাবিভাগের কর্মচারী-বর্গের সমর্থন না থাকিলে তিনি কখনও এরূপ তেলকিবাজী খেলিতে পারিতেন না। শত শত লোক তাঁহার দলভুক্ত। নেপালী সমাজের একাংশের হৃদয় জয় করিতে না পারিলে ইহা সম্ভব হইত না।

গত ১০ই মার্চ কাঠমুন্ড নগরীতে “জয়ন্তী অবস্থা” ঘোষণা করা হয়। ১৯৪২ সাল হইতে এই অবস্থার সঙ্গে বাঙালীর বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। স্তব্ধতা ইহার সুবিধা-অসুবিধার বর্ণনা অনাবশ্যক। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তে “সর্বময়” ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ২৩শে মার্চের বিবরণীতে বলা হইয়াছে :

“বিদ্রোহী নেতা ডাঃ কে. আই. সিং পলায়নের চেষ্টা করিতে পারেন পূর্ব হইতেই এই সংবাদ জানিতে পারিয়া নেপাল-সরকার তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য আদেশ জারী করেন, কিন্তু রক্ষী দলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সেই আদেশ পালন করেন নাই।”

ইন্ডাহারে বলা হইয়াছে যে, ডাঃ কে. আই. সিং বর্তমানে এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে রত্না গিরিবর্ষা দিয়া তিব্বতে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রত্না হইতে কুড়ি মাইল দূরে তিব্বতের মধ্যে অবস্থিত কাসেরংখ তিব্বতী কর্তৃপক্ষ নেপাল-সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ডাঃ কে. আই. সিং যদি তিব্বতে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাকে নেপাল-সরকারের হস্তে দেওয়া হইবে।

তার পর হইতে সব নীরব আমরা এই বিদ্রোহের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই নীরব মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদজনিত—একথা অবিস্মৃত।

“ভোট দাও নাই চিনি ও কাপড় পাইবে না”

“রঘুনাথপুর থানার যে সমস্ত গ্রামবাসী কংগ্রেসকে অণ্ডাৎ কংগ্রেস-প্রাধিকারী ক্রীষক বিজলীপ্রভা দত্তকে ভোট দেয় নাই, তাঁহার স্বামী-দেবতা উচ্চকণ্ঠে উক্ত গ্রামবাসীদিগকে চিনি ও কাপড় পাইবে না বলিয়া হাঁকাইয়া দিতেছেন। চিনি ও কাপড় জনসাধারণের প্রয়োজনে কো-অপারেটিভ ষ্টোরে রহিয়াছে তাহা জনসাধারণের প্রাপ্য। তাহা হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। আমরা স্থানীয় সরকারের দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি ও জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য সমস্ত জিনিষ নিম্নলিখিত মূল্যে বিনা বাধায় পায়, তাহার ব্যবহার জন্য অহুরোধ জানাইতেছি। রঘুনাথপুর থানার দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবার মাঝে জনসাধারণের উপর জবরদস্তি, জুলুমবাছী এবং খেচ্ছাচারিতা চলিয়াছে। জনসাধারণকে সম্বরণ হইয়া ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রত্যেক গ্রামবাসী তাহাদের প্রাপ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায়সঙ্গত মূল্যে যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা হউক।”

মাননীয় রামচন্দ্রপুর ক্রীষকবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত “সংগঠন” পত্রিকা উপরোক্ত অভিযোগ করিয়াছেন। ইহা স্থানীয় একটি কৰ্মচারীর ধারণাগুলি বলিয়া মনে করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। ২৪ পরগণার আলীপুর মহকুমার পোলিং কৰ্মচারী আমাদের বলিয়াছেন যে, তাঁহার অধীনস্থ সকল লোকে অতি সতর্কতা ও সততার সহিত নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহা একটা ভরসার কথা। সরকারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ যদি এইভাবে আপন কর্তব্যে অটুট থাকিতে পারে তবে দেশে নিরাশার বন্যা আটকানো সম্ভব। তাঁহার কথা সত্য হউক।

নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ

সম্রাতি নেতাজীর জয়ন্তী উৎসব ভারত ও বহির্ভারতের নানা স্থানে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়িতে ভারতীয় চা-বাগান সমিতি ভবনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডক্টর রাধা-বিনোদ পাল অন্ত্যস্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন এবং ঐক সময়েই তাঁহার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি আরও বলেন যে, নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ কেবলমাত্র স্বার্থান্বেষী দলের অপপ্রচার মাত্র।

নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্টি রক্তের ভেগুটি চেয়ারম্যান পণ্ডিত শ্রীমন্ত রাধী নেতাজীর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে বক্তব্যরূপে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন। কিছুকাল পূর্বে ভারতের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এশিয়ার কোন স্থানে নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি

আরও বলেন, নেতাজী ভারতে কিরিবার ক্ষমতা যোগের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

এই দুইটি বক্তৃতা সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, এক দিকে দুই জন দারিদ্র্যভ্রমসম্পন্ন ব্যক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ অস্বীকার করিতেছেন অল্প দিকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার-সচিব আয়ার মহাশয় ততোধিক দৃঢ়তার সহিত কেন বলিতেছেন যে ১৯৪৪ সনে আগষ্ট মাসে বিমান-দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় তিন শত পৃষ্ঠার একখানি বই লিখিয়া তিনি তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আয়ার মহাশয় বর্তমানে বোম্বাই-সরকারের প্রচার-বিভাগের কর্মী; তিনি আপানে গিমাখিলেন এবং নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতেছেন। এইরূপ দুইটি পরস্পরবিরোধী ঘোষণা দ্বারা কার কি স্বার্থোদ্ধার হইতেছে, তাহা আমরা বুঝি না। যদি নেতাজী জীবিত থাকেন তবে তিনি কেন এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা হইতে তাঁহার দেশবাসীকে উদ্ধার করিতেছেন না, তাহাও বুঝিতেছি না।

কম্যুনিষ্ট দলের জয়

বাক্তার “হিন্দু-বাণী” (সাপ্তাহিক) ২২শে মার্চ সংখ্যায় ঐ ফেলোয় নানা রাজনীতিক দলের শক্তিদামণের আলোচনা করার পর বলিয়াছেন :

“সর্বশেষ আসে কম্যুনিষ্ট দলের কথা। এই দলও তাহাদের একটি পক্ষে সংগঠন তৈরি করেছিল সংযুক্ত প্রগতিশীল দল নামে। দিল্লীতে যতকগুলি বেনামী কম্যুনিষ্টের সহায়তায়। এই দলের একটি প্রার্থীও জয়লাভ করতে পারেন নি। সবচেয়ে মজা লাগে এই দলের প্রচার-ফৌশলে। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও প্রজন্মের কর্মী ও স্বল্পসংখ্যক ভোটারদের মনোবল বজায় রাখার জন্য জয়লাভ সুনিশ্চিত বলে প্রচার করে এসেছেন। বাপ্পা দিতে এই দল কংগ্রেসকেও হার মানায়। এদের গত আট-দশ বৎসরের কার্যকলাপ লোকে ভুলে নি। ১৯১১-১৯২২ সালে এই দল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে “জনযুদ্ধ” ঘোষণা করে ইংরেজ-আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল (এরাই আবার আজকাল অন্য দলকে আমেরিকার দালাল বলে গালি পাড়েন।), ইক-আমেরিকার ‘হিজ রাষ্টার ভয়েস’রূপে সেদিন এই দল নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে আপাতের দালাল বলে চীৎকার করেছিল এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নিয়েছিল। মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক দাবী পাকিস্তান প্রস্তাবকে সবচেয়ে আগে সমর্থন করেছিল এই কম্যুনিষ্টরা— তাও আবার মুসলমানদের ‘জাতীয় দাবী’ বলে। রাজা-গোপাল-করমুলার সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল কম্যুনিষ্টরা।

দিনের পর দিন তারা পাকীজীকে জিম্মার দরকার বৃদ্ধি দেবার জন্য চীৎকার করেছেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির পরবর্তী ইতিহাস আরও কলঙ্কময়। যেদিন পাকিস্তান-দাবিতে মুসলীম লীগ হিন্দুদের বিরুদ্ধে ‘প্রত্যাক সংগ্রাম’ ঘোষণা করে কলিকাতার রাজপথে রক্তগড়া বইয়ে দিয়েছিল, সেই ১৬ই আগস্টে মুসলীম লীগের শোকা-ষাড্মার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লীগ ও কম্যুনিষ্ট পতাকার গাঁট-ছড়া বেঁধে অংশ গ্রহণ করেছিল এই কম্যুনিষ্ট পার্টি। তার পর মরহত্যা ও লুণ্ঠনে কলঙ্কিত সুরাবর্ধীর মজলিসভার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব অনীত হলে কম্যুনিষ্ট সদস্যেরা নিরপেক্ষ থেকে পরোক্ষে লীগ-মজলিসভা তথা হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন।”

কম্যুনিজমের প্রতিরোধ—কম্যুনিজমের প্রসার

গত ২৯শে পৌষ ভারতের সংবাদপত্রে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাশাপাশি রাশিয়া পার্ট করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের জগৎব্যাপী অশান্তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। কোন মন্তব্য করিয়া আমরা এই সংবাদের উপর রং ফলাইতে চাই না :

নিউইয়র্ক, ১৪ই জানুয়ারী—ভারতবর্ষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেণ্ডার বোল্‌স্‌ গতকাল বিমারোপে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পৌঁছান এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও রাজদরবারের সহিত আলোচনার জন্য তখনই ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মিঃ বোল্‌স্‌ বলেন যে, তিনি আগামী সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ভারতে কম্যুনিজম প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বোল্‌স্‌ তিনটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন :—(১) যুক্ত-রাষ্ট্র এবং তাহার আদর্শ সম্পর্কে ভারতকে আরও ভালভাবে ওয়াকিবহাল করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য তাহার অমূল্য সম্পদ। (২) ভারতকে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য দান একান্ত প্রয়োজন। চীনে আমেরিকা যে পরিমাণ সাহায্য দিয়াছে ভারতকে সেই পরিমাণ সাহায্য দিলে সাধকতা লাভের খুব সম্ভাবনা আছে। (৩) ভারতবাসীর সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে দৃঢ়তার সহিত তাহার সম্মুখীন হওয়া এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নের দায়িত্ব বিশেষ ভাবে ভারতবাসীরই। মিঃ বোল্‌স্‌ বলেন যে, ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইতেছে তবে মনোরমভাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না।

বোম্বাই, ১৪ই জানুয়ারী—ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রদূত মিঃ এন. ভি. নোভিকভ আজ্ঞা প্রদানে বলেন যে, তাহার দেশ ভারতকে যে-কোনও শিল্প-সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে এবং টাকার অথবা আর অন্য যে-কোনও মূল্যবান বস্তু তাহার মূল্য গ্রহণ করিতে রাজী আছে।

তিনি বলেন, “ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রশ্ন কেহ রহিয়াছে। আপনারা যাহা কিছুই কিনিতে চাহিবেন, তাহাই আমাদের নিকট পাইবেন, আর আমরাও আমাদের দরকারী জিনিসপত্র আপনারদের নিকট হইতে কিনিতে রাজী আছি।”

তাঁহার দেশ শিল্পোন্নয়নে দীর্ঘপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে এবং এই সম্পর্কে অন্য যে-কোনও দেশকে অমেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর কোন দেশই কারিগরী বিভাগ তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, যুদ্ধবিশেষে অর্থনীতিকে আমরা পুনরায় গড়িয়া তুলিতেছি, অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, আমরা যুদ্ধ চাহি না। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা আমাদের দরকার। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাতেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটান আশঙ্কা নাই।

সোভিয়েট সরকার জাতীয় উন্নয়নের জন্য যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন, রুশ-রাষ্ট্রদূত তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন, “রাশিয়ার সম্মুখে জনশক্তি হ্রাসের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছে। রাশিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুবিধ যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করিতেছে এবং শিল্পে যে শত শত “একক্যাডেটর” এবং তদনুরূপ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হইবে তাহার দ্বারা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাজ নিশ্চয় হইবে। গত ২৪ বৎসর যাবৎ রাশিয়াতে কোনও বেকার-সমস্যা নাই। সেখানে বেকার-সমস্যার সমাধান ১৯২৭ সালেই হইয়া গিয়াছে, তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

একটি প্রশ্নের উত্তরে রুশ-রাষ্ট্রদূত বলেন, রাশিয়াতে ব্যক্তিবাদীনতা নাই, একথা বলা ভুল। প্রথমে একজন শ্রমিক, পরে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং এখন একজন কূটনীতিবিদ রূপে তাহার সুদীর্ঘ চাকুরী কালে তাহার ব্যক্তিবাদীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। এইরূপ ধারণা যে কোন পোষণ করা হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না।

মিঃ নোভিকভ বলেন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া তিনি আশঙ্কিত এবং তিনি আশা করেন যে, এই সম্পর্ক আরও আন্তরিক হইবে।

“রয়েল রিপাব্লিক”

এই শিরোনামের “সুপার” (২৫শে মার্চ) দেড় কলম ব্যাপী একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের “আজাদী যুঁটা হার”। দুই একজন ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার সভাপ্রাপ্ত আবিষ্কারকে নাড়াচাড়া করিতেছেন। অথচ আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে আমাদের সহযোগী ১৫ই আগস্টের উৎসব উপলক্ষে বিপুলকার “বিশেষ সংখ্যা” প্রকাশিত করিতেছেন।

এর মধ্যে কোনটা সত্য? দেশবাসী তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

“মুগাস্তর”র এই প্রবন্ধের ভাষা ইংরেজী ভাষার অনুবাদ। নিম্নে তার একটু নমুনা দিলাম। তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকেই বিশেষ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

“...জাতীয় কংগ্রেসের সেই পবিত্র ও মহান প্রতিশ্রুতিকে আমরা সে অগ্রহ এবং পদদলিত করিয়া বর্তমান কংগ্রেসের কর্তব্যরূপ রাউন্ডব্যাটেন-দলপতির আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্রিটিশ-কমন্ওয়েলথের রাজকীয় বক্তৃত্তা ও আহুগত্যা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একটা জাতির আত্মসম্মতিবোধ কতখানি অধঃপাতে নামিয়া গেলে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নামে রাজকীয় বন্দনার এই কুৎসিত দৃষ্টের অবতারণা সম্ভব হইতে পারে, তাহা ভারিবার মত। এই রয়েল রিপাব্লিকের প্রধানমন্ত্রী রূপে আমরা যাহাকে পাইয়াছি, তিনি মাঝে মাঝে মহান গণ-তন্ত্রের আদর্শ, এমন কি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মূলি পর্যায় আওড়াইয়া থাকেন। আসলে ইঁহারা পদ্ধতীন ভারতবর্ষের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নীল রক্তের উপাসক এবং ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী-অভিজাত শ্রেণী ব্রিটিশরাজ ও রাজ্যের প্রান্ত দাস মনোভাবের বাহক। অত্যা হীন আত্ম-অবমাননার এই প্রানিকর দৃষ্ট দেখিবার আগে কংগ্রেসের কর্তব্য এবং তাঁহার ভাবকল্পের উচিত ছিল আরব সমুদ্রের জলে আত্ম-নিমজ্জন করা।...”

“মুগাস্তর” ও “অমৃত রাজার পত্রিকা” একই সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ। কিন্তু দুইটির পরিচালনার এরূপ পার্থক্য দেখা দেয় কেন?

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নূতন অভিযান

“বিহার সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন—বিহার সরকারী ভাষা আইন (১৯৫০ সাল) বিহারে অবিলম্বে চালু হইবে। অর্থাৎ, দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা বিহারে সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে এখন হইতেই ব্যবহৃত হইবে। তদনুসারে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করা হইবার দলিলপত্র দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীতে লেখাইতে হইবে। রানার থানার অভিযোগের প্রথম এতলা (ডাইরী) হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে। ইন্স্পেক্টর, সাব-ইন্স্পেক্টররা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা করিয়া তাহাদের পরীক্ষার মন্তব্য, তাহাদের ও এই সকল স্কুলের হেডমাস্টারদের মধ্য পত্রের আদান-প্রদান, এসেমব্লী ও কাউন্সিলে প্রেস্‌বন্ডার প্রত্যালাপ ও বিহার মেম্বের্টের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম ডায়-এরন হইতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় হইবে। বিচারের স্বাধীনতাসম্বন্ধে হিন্দী ভাষা চলিবে, অর্থাৎ মোকদ্দমার আবেদনপত্র, জবাব দরখাস্ত ইত্যাদি হিন্দী ভাষায় লিখিতে হইবে। অমর, নোটিশ প্রভৃতি হিন্দী ভাষায়

লেখা হইবে ও জারী হইবে। বাদী বিবাদী আসামীর এজাহার ও সাকীদের সাক্য হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে; এবং হয়ত হিন্দী ভাষাতে দিতে হইবে। উকীল মোক্তারদিগকেও হয়ত হিন্দী ভাষাতেই সওয়াল-জবাব করিতে হইবে। এই সময়ে আসন্ন নির্বাচনের প্রাকালে এইরূপ একটা অদ্ভুত বিপর্যয়ের ব্যবস্থা কেন করা হইল, তাহা হয়ত অনেকের বুদ্ধিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সম্ভবতাবে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই নির্বাচনের কাজ হইতে জন-গণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইহা করা হইয়াছে। যে সকল হিন্দীভাষী জনগণ এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন তাহারা সরকারের দৌলতে তাহাদের হিন্দী গোষ্ঠারির অস্বকূল আবহাওয়া পাইয়াছেন তাহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন, এবং যে সকল বঙ্গভাষাভাষী এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন, তাহাদের ভাষার উপর এই নুতন আক্রমণের দিকে তাহাদের মনোযোগ ও শক্তি-সামর্থ্য আকৃষ্ট হইলে নির্বাচনের কাজে তাহাদের শৈথিল্য ঘটতে পারে—এই অভিপ্রায় ইহার পশ্চাতে থাকি বুঝি সম্ভব। তাহা ছাড়া ইহাতে বাংলাভাষীকে বিহার হইতে সর্ব্বলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টাও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহাতে বিপরীত ফল হইবে। এই সময়ে এইরূপ একটা অনর্থের সৃষ্টি করার শত্রু-মিত্র সকলেই সরকারের ও কংগ্রেসের প্রতি আরও বিরূপ হইবে।”

উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য পুস্তকনিষার ‘মুক্তি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষার এই বিতীক্ষণা পাতীকী, বাবু রাধেজপ্রসাদ দ্বর করিতে পারেন নাই। ফলে মহাভারতের সৃষ্টি স্থরপরাহত হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্তান সৃষ্টি এই পাপের এক বৃষ্টি; হিন্দী ভাষা বা অজ কোন ভাষার অহমিক্তা তার অজ রূপ। ফলতঃ দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

বিহার গবন্মেণ্টের অনুদারতা

টাটা কোম্পানী উদার শিল্পপতিগণের অন্ততম, কিন্তু বিহার গবন্মেণ্টের চাপে পড়িয়া তাহাদেরও কতদূর অনুদার হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে ‘মুগাস্তর’ (দৈনিক) পত্রিকার ২রা পৌষ সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অজানিত না হইলেও, নূতন করিয়া বিহারী অ-বিহারী সমস্তাটার গুরুত্ব আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

“গত কয়েক বৎসরে টাটা কোম্পানীর দৌলতে জামসেদপুর শহরের অতি দ্রুত বিস্তৃতি ও উন্নতি ঘটয়াছে। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের থাকায় শহরের জনসংখ্যা যেমন ভারতবর্ষের সর্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, জামসেদপুরেও তাহাই ঘটয়াছে। কিন্তু এই আধুনিক শহরের দ্রুত বিস্তৃতি সত্ত্বেও শহরবাসীদের বনরাসের

সমস্যা মিটে নাই। কলে জমির সমস্যা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। প্রকাশ যে, এই অবস্থার টাটা কোম্পানী তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জমির বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থির করিয়াছেন যে, একমাত্র বিহারীদের মধ্যেই তাঁহারা জমি বন্টন করিবেন। এই সিদ্ধান্তের কলে জামসেদপুরবাসী অ-বিহারী নাগরিকদের মধ্যে ঘণ্টে চাকলা ও প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি হইয়াছে। জামসেদপুরের অঙ্গ-সমিতি, উৎকল-সমিতি এবং পঞ্জাবী ও বাঙালী সম্মেলন সম্মতি কতকগুলি সভা-সমিতি করিয়া টাটা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা বিহারী ও অ-বিহারীদের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা কেবল উগ্র প্রাদেশিকতাই বৃদ্ধি পাইবে না, অধিকতর ইহা জামসেদপুরবাসী অ-বিহারীদের মৌলিক অধিকারকে হরণ করিবে। আমরা জামসেদপুরবাসীদের এই প্রতিবাদকে নিভাঙ্গ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। কারণ জামসেদপুর কোন “প্রাদেশিক” শহর নহে, ইহা সর্ব-ভারতীয় জনগণের শহর। টাটা কোম্পানীর উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে সর্বভারতীয় শ্রমিক, কর্মচারী, কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারদের দান রহিয়াছে, এই অবস্থার টাটা কোম্পানী তাঁহাদের জমিগুলি কেবলমাত্র বিহারীদের জন্য সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না। এই দৃষ্টান্ত হইতে কলিকাতা, বোম্বাই কিংবা অল্প-কোন শহরের কর্তৃপক্ষ যদি ভিন্ন প্রদেশবাসীর নিকট জমি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? ইহা কি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দা ও ইউরোপীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতিরই প্রতীকশি নহে এবং যে নীতির বিরুদ্ধে আজ দীর্ঘকাল ধাবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন চলিতেছে? টাটা কোম্পানীর এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত নীতির একান্ত বিরোধী। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানী এই পর্যন্ত বহু জনহিতকর এবং সামাজিক কল্যাণকর কার্য করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা জমি সংক্রান্ত এই অত্যন্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিবেন।”

এই মন্তব্যের উপর আমরা আর কোন মন্তব্য করিতে চাই না। একটু কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বিহার রাজ্যের অধিবাসী প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব। পাঁচ-ছয় শত বৎসরের মৌলিক বাঙালীকে তাহা প্রমাণ করিতে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ হইতে “ডোমিনাইল্ড” সার্টিফিকেট-রূপী বেড়া ডিনাইবার বেগ পাইতে হইতেছে। গান্ধীজী পর্যন্ত ব্যর্থমর্মেদেও হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে খাণ্ড ঘাট্টি কি প্রকৃত?

ভারত-সরকারের “ভূতপূর্ব এসিষ্টেন্ট এগ্রিকালচারাল কমিশনার” শ্রীমুহূষণ চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত বিষয়ের আলো-

চনা করিয়া সমরোপযোগী কর্তব্য পালন করিয়াছেন। আজ লাভ-আর্জি বৎসর হইতে—১৯৪২-৪৩ সালের হুভিক হইতে—দেশের চিত্তাশীল নর-নারী এই সমস্যা সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছেন; নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি মতে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রী কে. সিংহা ১৯৪৭ সাল হইতে বলিতেছেন যে, ভারতরাষ্ট্র খাণ্ডে ঘাট্টি নয়। “আনন্দবাজার পত্রিকা”র বাণিজ্য-সম্পাদক সংখ্যাভ্যেয়র মানা অক্ষ কথিয়া এই কথার সমর্থন করিয়াছিলেন ১৯৪৯ সালের মে মাসে। আমরা সেই সময় তাহা সমর্থন করিয়াছিলাম। ইন্দুবাবুর ৩৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা সেই মত পরিবর্তনের যুক্তি দেখাইতেছে।

ভবুও বলিতেছি যে, ‘১ কোটি টন (২৭ কোটি মণ) খাণ্ড-শক্তের ঘাট্টি দেশবাসীর বুকের উপর যে অটল হইয়া বসিয়া আছে তাহার কারণ কি? সংখ্যাভ্যেয়র খেলা অম্বা প্রমাণ বা অ-প্রমাণ করিতে পারিতেছে না এবং প্রমাণ বা অ-প্রমাণ করিলেও দেশের নর-নারীর সান্ত্বনা কোথায়।

সিংহা মহাশয় গত দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই সুযোগে তাঁহার যুক্তির সপক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করিলে দেশের মহৎ উপকার সাধন করিবেন।

ইন্দুবাবু পশ্চিমবঙ্গের খাণ্ড-বিভাগীয় মন্ত্রের সমর্থন করিতেছেন। উভয়েই সাহেবের হুভিক কমিশনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া নিজের মত দৃঢ় করিতেছেন, এবং খাণ্ড-বিভাগীয় মানা ভ্যেয়র উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু হুভিক কমিশনের মন্তব্যাদি ত্রিকালীচরণ ঘোষ কৃত ‘বঙ্গদেশে হুভিক’ পুস্তকে সংখ্যাভ্যেয়র সাহায্যে আলোচিত হইয়াছিল। তখনকার মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার যুক্তি অ-প্রমাণ করিতে পারেন নাই। আজও এই তর্ক-মূর্খে কোন পক্ষ দাবি করিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করিয়া তর্কের অবসান হউক।

ইন্দুবাবু তাঁহার পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠার “সমতাপূর্ণ প্রণালী” (integrated plan) কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কথা ও কাজের মধ্যে দূরত্ব বিস্তর। তাহা কে কহাইবেম হইয়াই পোড়ার কথা।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের চাষ

মহাশীপ হইতে পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতির প্রচার-সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষের মানা অহুবিধা সম্বন্ধে যে-সব কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাৎপ্রতি মৎস্য-বিভাগের মহা মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ তত্ত্ব-ভূষণ বাহা বলিয়াছেন তাহা অতিজরুর মাঝেই সমর্থন করিবেন। তিনি সম্বন্ধে মৎস্য-শিকার সম্বন্ধে বলেনঃ

প্রবাস

“সত্য শিবম্ সুন্দরম্

নামমাস্ত্য ব্রহ্মেনৈব সত্যম্”

১৯শ ভাগ }
২য় খণ্ড }

ফাল্গুন, ১৩৫৮

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

বাংলার ভোটযুদ্ধ শেষ হইল, এখন তবিষ্যতে কি লেখা আছে? অবশ্য এক কথা বলা চলে যে, “নীচের তলার” ব্যাপার শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু “উপরের তলা” এখনও খালি এবং সেখানকার নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত শেষ কথা বলা বা লেখা যুক্তিযুক্ত হইবে না। উপরের তলার কথা মনে রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, বাংলার তবিষ্যতে কোনও বিশেষ আলোর রেখা আমরা এখনও দেখিতে পাই নাই।

নির্বাচন যে তাবে হইয়াছে তাহাতে একথা স্পষ্ট যে, দেশের শিক্ষিত সাধারণের অধিকাংশ হয় অবসাদগ্রস্ত হইয়া এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন নহ্ন সাময়িক উত্তেজনার বশে দারিদ্রহীন কার্যকলাপ করিয়াছেন। যেভাবে নির্বাচন চলিয়াছিল তাহাতে মনে হয় অনেক স্থলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা দশ জনও ভোট দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। দেশের তবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ উদাসীন শিক্ষিত বাঙালীর একটা প্রকৃতিগত নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। কেননা উহার প্রতিকার না হইলে জাতির দ্রুত অবনতি রোধ করা সম্ভব হইবে না। এবারের নির্বাচনে বাংলার কোমরুপ প্রকাণ্ড উপদ্রব হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহা দেশবাসীর নিরম্মশ্বলার ভক্তির পরিচায়ক নহে, বরঞ্চ নির্দারুণ অবসাদ ও অবহেলারই পরিচায়ক। বাংলার শিক্ষিত সমাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই পড়ে। এই নির্বাচনে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহার জীবনীশক্তি অতি ক্রীণ এবং চিন্তাশক্তি দারুণ জরাগ্রস্ত।

এ বিষয়ের বিশেষ পরিচায়ক বাংলার সেই সকল সংবাদ-পত্র যাহা এখনও শিক্ষিত বাঙালীর মুখপত্র রূপে পরিচিত। এই নির্বাচনে বিভিন্ন দলের মুখপত্র দুই একটি ছাড়া আর সকলেই অতি সঙ্গঠপণে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া “তুল বাঁচাইবার” চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের

বিভিন্ন নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় বাংলার সংবাদপত্রের এইরূপ নির্দোষ জড়তাব কখনও দেখি নাই। ইহাও বাঙালীর জীবনী-শক্তির হ্রাসেরই পরিচায়ক। সংবাদপত্রের কথা আমরা বুঝিতে পারি, কেননা হয়ত সেগুলির পরিচালকবর্গ নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা আগে করিয়া কাহাকেও চটাইতে চাহেন নাই; এই ভয় ছিল যে, যদি-বা বাহাদের সমর্থন করি তাহারা হারিয়া বিপক্ষ দল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই প্রতিহিংসার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পাঠকবর্গ কি ভৌতিক জরাগ্রস্ত ছিলেন, না হইলে এরূপ বাদহীন, সারহীন বস্ত তাহারা দিমের পর দিন কিরূপে গলাধঃকরণ করিলেন? বস্তুতঃপক্ষে বাংলার ভাগ্যের এই সজ্জিকণে বাংলার সাংবাদিক গোষ্ঠীর এরূপ কর্তব্যে ত্রুটি অতিশয় দুঃখজনক।

এবারের নির্বাচনে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অর্ধাটীনের জয় প্রায় সকল নগর কেন্দ্রে এবং অনেক গ্রাম্য অঞ্চলেও হইয়াছে। তবে সুখের বিষয়, গ্রামের লোক বরঞ্চ অনেক কেন্দ্রে দল অপেক্ষা ব্যক্তিদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহারা টিকিট না দেখিয়া লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং নির্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছে। ভুল-ভ্রান্তি তাহাদের যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু নগরের লোকের মত বিপরীত বুদ্ধির ব্যবহারে নিজেদের মনের জালা মিটাইবার চেষ্টা তাহারা এতটা করে নাই। বোধ হয় শহরে লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি সেরূপ না থাকার তাহাদের বুদ্ধিজন্ম এতটা হয় নাই।

বাংলার নির্বাচনে কোম দলই জয়যুক্ত হয় নাই, কেননা নির্বাচনের ফলে যদি বাংলার ভবিষ্যতের অন্ধকার কিছু লাঘব না হয় তবে সে জয়-পরাজয়ের মূল্য কি? কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই নির্বাচনের ফলে পশ্চিম-বাংলার বিধানসভা অধিকতর কার্যক্ষম বা সবল হইল বা এই নির্বাচনের ফলে বাংলার সমস্তাণুর্ন ভাগ্যপথ কিছুমাত্র সুগম হইল?

আমরা দেখিতেছি সকল দলেরই মধ্যে যে কয়জন চিত্তাশীল বা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত গুণের কথা বলিতেছি, দলগত মতামতের নহে—তাঁহারা প্রায় সকলেই পরাজিত হইয়াছেন। ইহার কারণ প্রত্যেক দলেরই প্রধান চেষ্টা ছিল বিপক্ষের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে পরাজিত করা। এইরূপ হওয়ার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে যোগ্য লোকের নিদারুণ অভাব তো হইয়াছেই, বিরোধীদের মধ্যেও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও অতি অল্প। সুতরাং রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে অধিকারীভাৱে ক্রটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রশাসন প্রতিরূপে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিল, অল্প সংখ্যক বিচারশূন্য বাধাদানের দশের স্বার্থও সেইরূপে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিল। কাওজানশূন্য দলাদলির ফল ঘাহা হয় তাহাই দেশবাসীকে ভতরদিন ভোগ করিতে হইবে যতদিন তাঁহাদের এ বিষয়ে চৈতন্যের উদ্রেক না হয়।

নির্বাচন পরিচালনা সম্বন্ধে এখন লিখিবার সময় আসে নাই, কেননা কতকগুলি “অলৌকিক” ব্যাপারের কোনও ন্যায্যদণ্ড কারণ আমরা এখনও বুঝিয়া পাই নাই, যদিও সে বিষয়ে অল্পসন্ধান আমরা করিতেছি। যথাসময়ে সে সকলের এবং এবারের নির্বাচনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে। আপাততঃ এইমাত্র বলা চলে যে, দেশের লোক এখনও নির্বাচনরূপ বস্তুর ব্যবহারে অভিজ্ঞতার অভাব সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই দেখাইয়াছে।

কলাকল ঘাহাই হউক, এখন কিছুকালের মত দেশের লোক নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিল। বাহারা নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলেই—যিনি বে কোনও দলের হউন না কেন—যদি বিধান সভার ও লোকসভার পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, তবে বাংলার ভবিষ্যৎ এখনও প্রশস্ত হইতে পারে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা

কি পরিবেশের মধ্যে বাংলার তাগানিয়ন্ত্রণ আগামী কয় বৎসর চলিবে তাহার সামান্য আভাস আমরা দিয়াছি। এখন সে বিষয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা কিরূপ তাহাও জানা প্রয়োজন। বলা বাস্তব্য, সেই জ্ঞাতব্য ভাণ্ডার পূর্ণ পরিচয় পাইবার সময় এখনও হয় নাই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমরা তাঁহার আগামী চার বৎসরের কার্যক্রমের একটি নমুনা পাইয়াছি তাহাতে তাঁহার ধারণা সম্পর্কে ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের কয়েকটি প্রধান সমস্যা সমাধানে পরবর্তী চার বৎসর সরকার কি পরি-
কল্পনা অনুসরণ করিবেন, তাহার এক চিত্র সাংবাদিকগণের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে রবিবার ২৪শে মার্চ অপরাহ্নে অসুস্থিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথমতঃ উদ্বাস্ত সমস্যা ও তৎসম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনার কথা অবতারণা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অসুস্থমান সাড়ে একশ লক্ষ উদ্ভাস্তর মধ্যে দেড় লক্ষের মত উদ্ভাস্তর জীবিকা সংস্থান করিয়া দিতে হইবে এবং গড়ে সকলের বর্ধমান আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

উদ্বাস্ত সম্পর্কে ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে আমরা নূতন কিছুই পাই নাই। আমরা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলিতে পারি যে, ঐ সমস্যাপূর্ণ তখনই সম্ভব হইবে যখন ভারত-সরকার পাকিস্থানের হিন্দু সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করিবেন, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে উদ্ভাস্তদিগের নিজেদেরও এ বিষয়ে মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন, কেবলমাত্র পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদের অধোগতি ক্রম হইতে ক্রমতরই হইবে, এবং বর্তমানে যে বিষাক্ত হাওয়া অল্পবয়স বহিতেছে তাহারও বৃদ্ধি অচিরেই হইবে। উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধানে যেভাবে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, তথা তাহার উচ্চতম অধিকারীভাৱে, আয়ত্তের ও ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ডাঃ রায়ের এ বিষয়ে যথেষ্ট ভুল ধারণা আছে, এবং এ বিষয়ে সুযোগ্য মন্ত্রী ও কর্মচারী নিয়োগেও শৈথিল্য ইতিপূর্বে হওয়ার ব্যাপার ক্রমেই বিপরীত দিকে গড়াইয়াছে। সুতরাং সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন ডাঃ রায়ের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন।

প্রসঙ্গতঃ তিনি ছোট ছোট শহর নির্মাণের পরিকল্পনার উচ্চেষ্টা বর্ণনা করিয়া বলেন, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং গ্রামের সহিত শহরের খনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করাই ইহার মূল লক্ষ্য।

এই ছোট ছোট শহর নির্মাণের ব্যাপারে যতটা কাল হইয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি সচতুর রাজকর্মচারী ও তাঁহাদের স্নায়ীর-বন্ধু গোষ্ঠীরই উপকার অধিক হইতেছে। বাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই সকল পরিকল্পনা রচিত তাহাদের অবস্থা “যে তিমিরে সেই তিমিরে।” বস্তুতঃ পক্ষে বাস্তবতার উপায়ে যেমন প্রকৃত উদ্ভাস্তর নৈরাত্ন স্নাত্তর হইতেছে, সরকারী পরিকল্পনার অসামান্য রাজকর্মচারী ও মন্ত্রিমণ্ডলীর চৌর মনোবৃত্তি-সম্পন্ন পার্শ্বচর ও চাটুকারের দৌরাণ্ডো দেশের মধ্যবিত্ত লোকের ব্যর্থতা ও মনের জ্বালা সেইরূপই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং দৃঢ়চিত্ত মন্ত্রীর পূর্ণ সহায়তা এবং বিধান সভার পূর্ণ সহযোগিতা পাইলে মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চেষ্টা এখানে ব্যাহত হইতে বাধ্য।

পরিকল্পনার পরিসর ও সময় নিরূপণ ত এইরূপে মুখ্যমন্ত্রী সহজেই করিলেন, কিন্তু বিচার্য বিষয়—এইটুকু যে, ঐ কার্যধারা কাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। বিদেশী টাকা দিতে পারে, উপদেশ দিতে পারে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাকৃতিক ও টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধানের পথও দেখাইতে পারে। কিন্তু ভারত-সরকারের উচ্চ অধিকারী-বর্গের মনো-রুত্তির পরিবর্তন তাহারা করিতে পারে না, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী ও অধিকারী-বর্গের মধ্যে সাধু-অসাধু বা যোগ্য-অযোগ্যের বাতাইও করিতে পারে না। সুতরাং যত দিন তাহার ব্যবস্থার আভাস আমরা না পাই তত দিন এই সকল পরিকল্পনাই অগ্রবিস্তার আকাশে কুসুমের পর্যায়েরেই থাকিবে। ডাঃ রায় আগে দেখান যোগ্য লোক কোথায় যাহারা এইরূপ পরিকল্পনা গৃহীতভাবে বাস্তবে পরিণত করিতে পারে এবং ইহাও দেখান যে কাহার উপর তিনি এই পরিকল্পনার প্রকৃত উদেষ্ঠ সিদ্ধির বিচার ও ব্যবস্থার ভার তুল করিয়াছেন। তাহার পর আমরা বাহবা দিব।

মুখ্যমন্ত্রী লবণশিল্প ও গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকার সম্বন্ধেও সরকারের পরিকল্পনা বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, তাহাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাহারা যে কর্মের অবকাশ করিয়া দিতেছেন, তাহার আশা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ অথচ কর্মহীন হতাশ যুবকগণ তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

মুখ্যমন্ত্রী ভারত-সরকারের পরিকল্পনায় যে সমাজ উন্নয়নের সুপারিশ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, সম্প্রতি ভারত-মার্কিন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতি-মধ্যেই যে পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন, তাহার সহিত ভারত-সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গতি আছে। কথা হইয়াছে যে, তিন-চার শত বর্গমাইল অথবা গড়ে তিন-চার শত গ্রাম জুড়িয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে। এরূপ পরিকল্পনাজুত প্রত্যেকটি এলাকাকে আটটি বিভাগে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক ৫০ বর্গ মাইল ব্যাপী এক একটি বিভাগে ৫০ হইতে ৭৫টি গ্রাম থাকিবে, ২০,০০০ একর আবাদী জমি ও ৩৫,০০০ অধিবাসী থাকিবে। পরিকল্পনার নুতন গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা নাই, কথা আছে প্রাচীন-শহর প্রতিষ্ঠার কথা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের ইচ্ছা এইসব শহর ময়ূরাক্ষী ও দামোদর উপত্যকার সন্নিকটে স্থাপন করেন। ময়ূরাক্ষী অঞ্চলে তিনটি এবং দামোদর উপত্যকায় দুইটি শহর প্রতিষ্ঠার কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে সব জলা-ভূমিতে আবাদ সম্ভব নহে সেই সব স্থানে নালার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং জল নিষ্কাশন হইয়া গেলেই সেখানে বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। মেদিনীপুর অঞ্চলে কোন নদী-উপত্যকা পরি-কল্পনা নাই; এখানে জমি বহু, এই সব জায়গায় বাঁধ বাঁধিয়া

জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। তৃতীয়তঃ নলকূপ বসাইয়া সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ মোট আটটি পরিকল্পনার আটটি করিয়া বিভাগ করিলে ৬৪টি বিভাগের কাজ-চার বৎসরে শেষ করিবার ইচ্ছা সরকারের আছে। শেষ হইলে দুই লক্ষ গ্রামবাসী এবং ১৬ হাজার মধ্যবিত্ত পরিবার এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। অনেকে গৃহ-নির্মাণের কাজ পাইবে। সরকারের তত্ত্বাবধানে এক হাজার এবং বে-সরকারী তত্ত্বাব-ধানে এক হাজার গৃহ নির্মিত হইবে। সংযোগ-রক্ষার কাজ সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থাও আছে; কেননা শহরগুলি হইতে যাহাতে চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-সেবার কার্য-ধারা সহজেই গ্রামাঞ্চলে প্রবাহিত হইতে পারে তজ্জন্ত এই সড়ক-সংযোগ অপরিহার্য।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে ডাঃ রায় আরও বলেন যে, সমগ্র পরি-কল্পনা ১৯৫৬ সালে শেষ হইবে। ১৯৫২-৫৩ সালে আটটি পরিকল্পনার এক একটি বিভাগের কাজ শুরু হইবে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ঐ আটটির কাজ সমাপ্ত হইলে ২৯টি নুতন বিভাগের কাজ গ্রহণ করা হইবে। তৃতীয় বৎসর ১৯৫৪-৫৫ সালে ঐ ২৯টি শেষ হইলে আরও ২৭টি বিভাগের কাজ লওয়া হইবে। এই ভাবে ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষাশেষি ৮টি পরিকল্পনাই শেষ হইয়া যাইবে।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সমাজ উন্নয়ন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিভাগ এই সব শহরে স্থানান্তর করা হইবে। পরিকল্পনার বিশদ ব্যবস্থার লক্ষ্য সরকার একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; কেননা সরকার যথাসীদ্ধ এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে উৎকণ্ঠিত। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা হইয়াছে। যাহাতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাজে হাত দেওয়া যায়, তজ্জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীগণ প্রভাবিত এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোড-ফাউন্ডেশন' কর্মসূচী অনুসারে শহর এলাকায় যুবকগণকে কৃষি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ধমানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে; এই যুবকগণ স্থানীয় এলাকার গ্রামবাসীকে সেই শিক্ষা দিবে। শহর এলাকায় কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রে পরি-চালনার লোক পাওয়া যাইবে; কেননা গভ তিন বৎসর ধাবৎ আসানসোল, শিবপুর, বাদবপুর ও অন্যান্য স্থানে বহু উদ্যোগ ভেদন শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবক-গণকে বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষাদানের যোগ্যতা ইহাদের আছে।

ইহার ব্যয় সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন, ইহার ধানিকটী ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করিবেন এবং অবশিষ্টটুকু কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন। ডাঃ রায় বলেন, সরকার জনসাধারণকে সুযোগ দিবেন, সেই সুযোগ গ্রহণের কাজ জমিদারগণের।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বৎসর বহু যুবক-যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে বাহির হইয়া আসে ও কর্ম্মভাবে হতাশ হইয়া পড়ে। সরকারের কর্তব্য এই সব যুবক-যুবতীর কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেওয়া। তাঁহারা তাহাই করিতেছেন এবং তিনি আশা করেন, যুবক-যুবতীগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

ডাঃ রায় ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল যুবক-যুবতী বাহির হইয়া আসে তাহাদের কর্ম্মসংস্থান করা সরকারের কর্তব্য। অত্যাশ্রয় তাহারা ব্যাধতার আক্রোশ ব্যক্ত করিবার জন্য তাহাদের অপরিপক্ব বুদ্ধি ও শক্তি কি ভাবে অকাজে ও কুজাজে লাগায় তাহার পরিচয় পশ্চিম-পূর্বকার ইতিপূর্বেই যথেষ্ট পাইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে—নতুন নির্বাচনের বিষয় কলরূপে—আরও অবিকলভাবে পাইবার আশঙ্কাও আছে।

ডাঃ রায়ের এই উক্তির পরের অংশের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, “তাঁহারা তাহাই করিতেছেন”, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন, “তিনি আশা করেন যুবক-যুবতীগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।”

আমরা বলিতে বাধ্য যে, বিগত কয়েক বৎসরের যে চিত্র আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে তাহাতে যোগ্যতার বিচারে সকল কর্ম্মপ্রার্থীর সমান সুযোগের কথা ভাবিতেই পারি না। অসংখ্য চাকুরী, অসংখ্য সুযোগ অতি অযোগ্য, অতি অকর্ম্মণ্য লোকে পাইয়াছে। পার্শ্চর-চাটুকায়ের গোঙ্গিবর্গ, অবিকারী-বর্গের অকেছো বেকার আত্মীয় এবং উপরন্তু ত্যাগী মহাপুরুষ-গণের উমেদারগণ—ইহারা ইতো অধিকাংশ কাজ পাইয়াছে। তাহার পর পশ্চিমবঙ্গের সম্ভ্রামণিগণের পথে চতুর্দিকে কাঁটা দিয়াছেন কতিপয় পূর্ববঙ্গজাত উচ্চ অবিকারী। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীদিগের-মিষ্ট ডাঃ রায়ের বিষয়িত আরব্য উপমস্যের অংশবিশেষ বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

সর্বশেষে বলিব যে, ডাঃ রায়ের দৃষ্টিকোণের বিশেষ পরিবর্তন না হইলে তাঁহার বিষয়িতে আশ্রয় হওয়ার কোনও কারণ আমরা বুঝিয়া পাইব না।

দুর্নীতি দমন

ভারতীয় পার্লামেন্টে আইনসচিব ডাঃ কাটজ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের একটি ধারার মেয়াদ আরও বাড়াইবার জন্য আইন পাস করাইয়া লইয়াছেন। এই আইন পাঁচ বৎসর বলবৎ আছে, উহার সাহায্যে কতকগুলি দণ্ডও হইয়াছে, কিন্তু দুর্নীতির উচ্ছেদ ত বহু দূরের কথা, দুর্নীতি দমনের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টিও হয় নাই। মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এক শ্রেণীর অসাধু বনী ব্যবসায়ীর স্বার্থে দুর্নীতির প্রভ্রম দিতেছেন এইরূপ একটি ধারণা জনসাধারণের মনে বহুল হইয়াছে। সম্প্রতি ত্রিমুখ গোড়ওয়াল তাঁহার রিপোর্টে প্রথমে কৈকে সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাও

করা হইতেছে না। বরং এইরূপ একটি ধারণা জন্মিতেছে যে, প্রভাবশালী মন্ত্রীদের অমুগ্রহীত বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থে হাত দিতে গেলে সং কর্ম্মচারীদেরই বিপদে পড়িতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সেল-ট্যাক্সের ঘটনাটি এ বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দাবি করা হইল যে, যাহারা ট্যাক্স কাঁকি দিতে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের কার্যের তদন্ত একটি ট্রিবিউনাল বসাইয়া করা হউক। প্রথমে একজন স্পেশাল জজ নিযুক্ত করিয়া যে এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার টাকা আনিতে গিয়াছিলেন তাঁহারই বিরুদ্ধে তথ্য ফাঁসের অভিযোগ আনা হইল। স্পেশাল জজ রায়ে বলিলেন যে, আইনানুসারে অভিযোগ ধরুপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিবার কথা তাহা করা হয় নাই। তথাপি পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি রায় দিলেন যে, উক্ত অফিসারকে ডিসমিস করা উচিত নয়। ডিসমিস না করিবার কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, একই ট্যাক্স অফিসারকে অভিযুক্তা এবং বিচারক করিবার ফলে কিছু আভিয্য ঘটবেই, ইহা পরতির দোষ। তাহা হাড়া এই অফিসার ট্যাক্স আদায়ের জন্ত যেটুকু জোর করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্ত, কোন অসাধু মতলবে এরূপ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে পদচ্যুত করিলে সমগ্র সরকারী বিভাগের মনোবল নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বেও ফাইনাল সেক্রেটারী এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারকে নোটিশ দেন যে, তাঁহাকে কেন পদচ্যুত করা হইবে না তিনি যেন তার কারণ প্রদর্শন করেন। ট্রিবিউনাল সে সকল ট্যাক্সের পরিমাণ গ্রাহ করেন নাই।

ইহার পর ট্রিবিউনাল বসে এবং ট্রিবিউনাল উক্ত কোম্পানীর উপর প্রায় সাত্বে চার লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসান। এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ঐ ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনস্থ পেপার মিলকে ২৬ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন, কটন মিলকে ৪০ লক্ষ এবং মোটর কোম্পানীকে ২৫ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসাইতে চাহিয়াছিলেন। কেশোরায়ের উপর তাঁহারা ৪,৩৬,০০০ টাকা ট্যাক্স বসাইয়া দিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেন্টরা ট্যাক্স কাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল ট্রিবিউনালেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, টাকার পরিমাণের প্রকৃতিই কেবল মীমাংসা হইল না। সুতরাং মূলতঃ এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ঠিকই বলিয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহার পর পদচ্যুতির কারণ দর্শাইবার নোটিশ আসে কিরূপে? এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার হাইকোর্টে মামলা করেন। হাইকোর্ট রায়ে ফাইনাল সেক্রেটারী এবং সেল-ট্যাক্স কমিশনারকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে, ফাইনাল সেক্রেটারী কমিশনারকে চিঠি লিখিয়া এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে হয়রানির ও বিলম্বের অভিযোগ আনেন এবং অসাধুতার অভিযোগও করেন। ইহার

বাংলার মদনদীতে যে ছেলে ব্যবসায় চালায়, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথাই বলিয়াছেন। “প্রকৃত সমস্তার সমুদায় হইতে হইলে আমাদেরকে কিভাবে ও কি পরিমাণে প্রস্তুত হইতে হইবে তাহাই মূল কথা। মংস্তচাষে যে মংস্তচাষী লাভবান হইবেন এবং দেশেরও বাহ্যসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এ বিষয়ে আমরা সিংসন্দেহ, কিন্তু মংস্তচাষের অসুবিধা যদি থাকিয়াই যায়, আর আমরা মংস্তচাষ কর বলিতেই থাকি—তাহাতে ক্ষতি বই বৃদ্ধি মোটেই হইবে না, প্রাচুর্য লাভও দূরের কথা। আমাদের অভাবই ভয়ঙ্কর। তাই এ বিষয়ের মূল সমস্যা-গুলির উপর কিছু আলোকপাত করিতেছি মাত্র। সমস্যাগুলি এই—(ক) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পুষ্কর, বাধ, জরুলীতে ও বিলে মংস্তের জীবনধারণোপযোগী জল থাকে না। (খ) যে সমস্ত দীর্ঘপুষ্কর পূর্বপুরুষের খনিত, তাহার তলদেশে বহু জলজ তৃণমি জন্মিয়াছে—উহাতে মংস্ত চাষ অসম্ভব। (গ) যে-সব বিলে প্রচুর জল থাকে, এমন কি চৈত্র বৈশাখ মাসেও দুই হাত জল থাকে, তাহাতে কচুরীপানা জন্মে ও ঐ পানার গাছ পাড়া শিকড় জলের তলে পচিয়া (ভ্যাডড) মংস্ত চাষের অসুবিধা জন্মায়। (ঘ) প্রচুর গভীর জলবিশিষ্ট জলাভে বহু মংস্তাশী মংস্তও বর্জমান আছে। (ঙ) যে কতিপয় জলা (সংখ্যায় নগণ্য) সর্পি পরিবেশে মংস্তচাষের যোগ্য তাহাদের ক্ষয় যথাসময়ে উপযুক্ত মংস্ত-ডিম্ব বা পোনা সংগ্রহের ব্যবহার প্রাচুর্য নাই। (চ) মংস্তবৃদ্ধির (মংস্ত-পোষণ) দিকে দৌক দিলেই ডিম্ব ও পোনা সংগ্রহকে প্রাথমিক অধিকার দিতে হইবে। মংস্ত বিভাগের এ বিষয়ে অগ্রগতি অনেক কারণেই আড়ও বন্ধ। (ছ) বহু পুষ্কর, দীর্ঘ প্রভৃতি মংস্তচাষোপযোগী জলার উপর বহু মালিকানা স্বত্ব মংস্তচাষের বিঘ্নগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। (জ) যে জলায় যে প্রকারের মংস্তের বৃদ্ধির ও পুষ্টির সম্ভাবনা অধিক, সে জলায় সেই প্রকার মংস্তচাষে অজ্ঞতা। (ঝ) জলার মংস্তচাষ পরিমাপের অসুসঙ্গিত্যের অভাব ও মংস্যজীবীগণকে অনেক ক্ষেত্রে পরিহার করার উদ্যম। উল্লিখিত কারণগুলির আন্তঃসম্মান না হইলে মংস্যচাষে পশ্চিমবঙ্গে কলোদয় অসম্ভব।”

পাকিস্তানে হিন্দু

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাকিস্তান পার্লামেন্টে কংগ্রেসী দলের নেতা। সম্প্রতি তিনি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সঙ্ঘের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কলকাতা যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাই শহরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান সরকারের দুইটি কার্যের উপর সেবাদানকার হিন্দুদের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ, ‘টু-নেশন থিওরী’ বা দুই-জাতি নীতি পরিভ্রাণ, দ্বিতীয়তঃ, যৌথ নির্বাচন প্রবর্তন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে বর্তমানে যে সকল হিন্দু এখনও বাস করিতেছে, তাহারা স্থায়ী ভাবেই সেখানে

বসবাসের ইচ্ছা রাখে। সুতরাং এই দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেই সেখানে তাহারা শান্তিতে থাকিতে পারে, এই অধিকার অর্জনের জন্তই হিন্দু জনসাধারণের সংগ্রাম করিতে হইবে।

‘আজাদ’ এই সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় লিখিয়াছেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাসহ তাহা এখানে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইল :

“পাকিস্তান পার্লামেন্টের কংগ্রেসী দলের নেতা মিঃ শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সঙ্ঘের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের ক্ষণ কলকাতা যাত্রার পথে বোম্বাই শহরে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাহার দল পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তন এবং টু-নেশন থিওরী বা দ্বিজাতি-ভেদের প্রত্যাখ্যান চায়; তবেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণ নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু এখনও সেখানে আছে এবং যেহেতু তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেখানে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিবে, সেই কারণে নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্ত তাহাদের সংগ্রাম করা উচিত।

“মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের বোম্বাই-বিবৃতি তাহার দলের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকেই সচেতন করিবে। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যে কোন দলের প্রকৃত রাষ্ট্রাঙ্গত নাগরিকের নিজ অধিকার অর্জনের জন্ত সংগ্রাম করিবার অধিকার কেহই অস্বীকার করিবেন না—অন্ততঃ এহুলামের অসুসঙ্গীতা অস্বীকার করে না। যদি পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের কোন স্বায়সদত অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অর্জনের জন্ত তাহারা সংগ্রাম করুন, তহোতে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুদের কোন আপত্তি নাই; বরঞ্চ যদি সত্যিই কোন অধিকার সংখ্যাগুরুরা ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধলব্ধমেরা উহা সুদৃঢ় ফিরাইয়া দিতে সক্ষম। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে পাকিস্তানের মৌলিক নীতি-বিরোধী অধিকারের দাবী করা হয় বা পাকিস্তানের ভিত্তিসংস্কলক কোন কর্মপন্থা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উহার আপোষ-হীন বিরোধিতা করাই পাকিস্তানের প্রতিটি রাষ্ট্রাঙ্গত নাগরিকের একমাত্র কর্তব্য হইবে।

“পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনপ্রথা কিংবা স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইবে, এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু যে দ্বিজাতিভেদের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা উহার প্রত্যাখ্যান কামনা বা দাবী করা বা তজ্জন্ত কোন ব্যক্তি বা দল পাকিস্তানে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে চাহিলে কোন পাকিস্তানী নাগরিক উহা সমর্থন করিবে না, করিতে পারে না। সোজা কথায়, এই নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। দায়ে পড়িয়া বা চাপে পড়িয়া

বা যে কারণেই হউক, ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় কংগ্রেসকে উক্ত নীতির ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতে হইয়াছে। পাকিস্তানে দ্বিজাতিভেদ-বিরোধী প্রচারণাকে রাষ্ট্রের মূলে কূঠাঝাঝ করার সামিল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পাকিস্তান পাল্টামতে গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত আদর্শ প্রস্তাব আলোচনার বা অন্য কোন সময় মিঃ চট্টোপাধ্যায় টি-নেশন বিষয়টির বিরুদ্ধে কোন উক্তি করেন নাই। আজ বোম্বাইতে হঠাৎ এরূপ মন্তব্য করিবার কারণ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না।

“দ্বিজাতিভেদের অবসান হইলেই তবে পাকিস্তানের সংখ্যা-লঘুগণ নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিবে বলিয়া তিনি উক্তি করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কেবল এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, জাঙ্গিয়া ঘুয়াইলে কেহই কাহারও ঘৃণা ভাঙাইতে পারিবে না, ইচ্ছাকৃত আতঙ্ক ও আশঙ্কা কোন কালে কেহ দূর করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একথাও অরণ্য রাধা উচিত যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে আজ পর্যন্ত মাত্র একবার পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক মৌলযোগ হইয়াছে—তাও আবার দীর্ঘকালব্যাপী বহু ভারতীয় দাঙ্গার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। তার পরও গত এক বৎসরের মধ্যে সত্তর বারের উপর ভারতে সাম্প্রদায়িক তাহাড়া হইয়াছে। পাকিস্তানে পঞ্চাশ সালের সাময়িক উত্তেজনা ও হাঙ্গামার ফল প্রাপ্তি পাকিস্তানী লজ্জা অমুভব করেন; তাঁহারা নিজেদের ইতিহাস অমলিন রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিম্নাংশে দেন। এইটুকু যথেষ্ট যে, দ্বিজাতিভেদবাদী পাকিস্তানী সংখ্যাগরিষ্ঠগণ সাম্প্রদায়িক সম্মুখিত রক্ষার যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন, ভারতের তথাকথিত সেকুলারী সংখ্যা-গুরুরা তাহাতে অক্ষম হইয়াছেন।

“পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু এখনও এখানে বাস করিতেছেন। আমরা জানি, যাহারা আছেন তাঁহাদের অধিকাংশ স্বাধীভাব্যেই আছেন; দেশত্যাগের কল্পনা তাঁহারা করেন নাই। আবার একথাও জানি যে, বহু সংখ্যালঘু পরিবার-পরিজন ভারতে রাখিয়া এখানে জীবিকা অর্জনের জন্তই রহিয়াছেন। এরা পাকিস্তানী নহেন, যদিও স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে নিজেদের পাকিস্তানী বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টাও এরা কম করেন না। একথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা নাই বলিয়া আমরা মনে করি না। তবুও পাকিস্তানীরা ইহাতে আপত্তি করে না বা তাঁহাদের কোন প্রকার অনুবিধা ঘটাইবার মত কাজও করে না; বরঞ্চ তাঁহাদের অতিথি বলিয়াই গণ্য করে।

“পুনরুজ্জ্বল সত্ত্বও আবার আমরা বলিতেছি যে, দ্বিজাতিভেদ অস্বীকার করার অর্থই পাকিস্তানের মূলে কূঠাঝাঝ করা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ সম্পর্কে আর কোন বিতর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে না। যুক্ত নির্বাচনের প্রস্তাব সহিত ইহাকে জড়িত করিয়া মিঃ চট্টোপাধ্যায় অহেতুক আতঙ্কজনক সমস্তার অবতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইবে কিনা, তাহা কেবল মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের কংগ্রেসী বর্ণহিন্দুদের মতের বা ঘািবর উপর নির্ভর করে না—দেশের অভ্যন্তরীণ জৈবিক, এমন কি, সংখ্যা-গুরুদেরও এ বিষয়ে বক্তব্য আছে। অধিকাংশের মতের অস্বীকৃতির অর্থ গণতন্ত্র নহে—ক্যাপিটল; মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় আপত্তি হইবে না।

“দ্বিজাতিভেদের প্রসঙ্গটা না তুলিলেই মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। মোহাম্মদ জীগ দ্বিজাতিভেদকে বাস্তব সত্য বলিয়া গণ্য করে। আজ যাহারা মোহাম্মদ জীগের বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহারাও এ পর্যন্ত ইহা অস্বীকার করেন নাই। দ্বিজাতিভেদ পাকিস্তানের বিনাশ—এ সম্পর্কে বিতর্ক অন্ততঃ পাকিস্তানে নিষ্প্রয়োজন, অকারণ, অহেতুক, উপরন্ত রাষ্ট্রাহুকূল নহে। দ্বিজাতিভেদ স্বীকৃতির ভিত্তিতে সকলের পক্ষে স্ব স্ব স্বাভাব্য বর্জ্য রাখিবার পাশাপাশি বাস করা ও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, ইহাই পাকিস্তানের নীতি এবং শান্তি সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। প্রতিটি পাকিস্তানীকে যে-কোন জাতি, বর্ণ, বর্ণাবলম্বী হউক না, তাকে ইহা অকুঠিচিতে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বজনের উপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রাঙ্গুণ্যের প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে।”

পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কোন্ নেশন ?

পাকিস্তান বলিতেছে তাহারা দুই-জাতি—টি-নেশন বিওরী'র উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাতে মুসলমানেরা নেশন বা জাতি বা নাগরিক, হিন্দুরা নহে। আইন-পরিষদে ও শাসন-ব্যবস্থায় পাকিস্তান হিন্দুগণকে মুসলমানদের সমান নাগরিক অধিকার দেয় নাই। ‘টি-নেশন বিওরী’ অনুসারে হিন্দুরা সেখানে নেশন নহে বলিয়া তাহা দিতেও পারে না। তবে হিন্দুরা কোন্ নেশন, তাঁহাদের রাষ্ট্র কোন্ট ?

কলিকাতায় জবাবহরলাল নেহরু বলিয়াছেন পূর্ববঙ্গের এক কোটি হিন্দুর সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কথা বলিবার অধিকার নাই, তাহাদের অবস্থা দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের সহিত তুলনীয়। পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন হইলে-তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, ইউ. এন. ও. তাহা করিবে। কিন্তু ইউ. এন. ও.-তে সবমোটের প্রতিনিধি ছাড়া কেহ কথা বলিতে পারে না এবং সে সবমোটের সকলের স্বীকৃত সবমোট হওয়া চাই। পাকিস্তান যদি তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার না করে, ভারতবর্ষও যদি তাহাদের ভাষনাল বা নাগরিক

বলিয়া স্বীকার না করে শুধু ইট, এম. ও-তে তাহাদের কথা তুলিবে কে ?

স্বতন্ত্র পাকিস্তানের হিন্দুদের সম্বন্ধে মূল প্রশ্নই অস্বীয়াসিত থাকিয়া যাইতেছে এবং এইজন্যই পাকিস্তানের হিন্দু সম্ভার সমাধান কিছুতেই হইতে পারিতেছে না। পাকিস্তানের হিন্দু। কোন্ রাষ্ট্রের ন্যাশনাল—তাহাদের দেশ কোথায়, তাহাদের নাগরিক অধিকার কোন্ রাষ্ট্রের উপর হইয়াছে—ইহাই মৌলিক প্রশ্ন এবং ইহার মীমাংসা সর্বোচ্চে প্রয়োজন। অতি নিপদাপন্ন লোকও সাময়িকভাবে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আশ্রিত থাকাকালেও তার একটা দেশ থাকে, কোন-না-কোন দেশে তার নাগরিক অধিকার থাকে। পাকিস্তানের হিন্দু। পাকিস্তানের আশ্রিত একথা মানিয়া লইলে তখন প্রশ্ন উঠে তাহারা তবে কোন্ দেশ, তাহাদের রাষ্ট্র কোন্ট ?

হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি, এই 'টু-নেশন থিওরী' মতে পাকিস্তান যদি হিন্দুদের তার ন্যাশনাল বলিয়া না মানে, তবে তার ভারতবর্ষের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে কিনা ? পাকিস্তান বলিতেছে যে, তাহারা মুসলমানের জন্য "হোমল্যান্ড" চাহিয়াছিল। হিন্দুদের তাহারা চায় নাই। নেহরু বলিতেছেন, ভারতবর্ষ আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ হইয়াছে, টু-নেশন থিওরী ভিত্তি মানে নাই। জিন্নার টু-নেশন থিওরী অমুসারে ইংরেজ ভারতবর্ষ ভাগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে তবে কোন্ট সত্য ? যাহারা ভারত বিভাগ দাবি করিয়াছেন এবং যাহারা হাওয়ার আগে সেই দাবি পূরণ করিয়া গিয়াছেন তাহারা যে ভিত্তিতে উহা করিয়াছেন তাহা মানিতে হইবে, অথবা মসনদের সোভে যিনি বর্ত্তিত ভারত মানিয়া লইয়াছেন তাহার কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে ? টু-নেশন থিওরী কার্যতঃ স্বীকার করিয়া মুখে অস্বীকার করিলেই কি উহা হিন্দুদের মত মিলাইয়া যাইবে ?

দিল্লী-চুক্তির সময় কথাটি উঠিয়াছিল। পাকিস্তান তার রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করে নাই, কেবলমাত্র উহা-ইসলামিক রাষ্ট্র হইবে—এই মূলবস্তুটি পালন করাইয়াছে। দিল্লী চুক্তির সময় লিয়াকৎ আলি উহা এড়াইয়া যান। সেকুলার ও থিওক্রেটিক রাষ্ট্রে কিরূপে চুক্তি হইতে পারে এই মূলগত প্রশ্নটি অস্বীয়াসিত থাকিয়া যায়। কামেলা এড়াইবার জন্ত নেহরু সমস্তটিকে বামাচাপা দিয়াছিলেন, কিন্তু কামেলা তাহাকে আরও আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সেকুলার ও থিওক্রেটিক রাষ্ট্রে, অসাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িকতার যে কিরূপ মিশ্রণ ও চুক্তি হয় নেহরু তাহার পরীক্ষা যতই করিয়া চলিয়াছেন ততই ব্যর্থ হইতেছেন।

পাকিস্তানে যৌথ নির্বাচন দাবী

যৌথ নির্বাচন সম্বন্ধে পাকিস্তানী মুখপাত্র বলিতেছে,

কেবল বর্ণহিন্দুদের দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে না। অম্যান্য শ্রেণী অর্থাৎ অবর্ণ হিন্দুদের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণেরও এ বিষয়ে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে এবং তাহাদের সম্মিলিত মতামতের দ্বারা বিষয়টির মীমাংসা হইবে।

ত্রিঘোষণাক্রমণ মতলের পদভ্যাগের পর পাকিস্তান মন্ত্রী-সভায় একজন হিন্দু মন্ত্রী গ্রহণ করার প্রয়োজন হইলে দ্বারিক বাকরূপে উক্ত পদে বহাল করা হয়। আগামী গণভোটের পূর্বাভাসেই বর্ণহিন্দুগণ পাকিস্তানে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যৌথ নির্বাচন দাবি করিয়াছে। পাকিস্তান সরকার দৃঢ়তঃ এই দাবির যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু বলিয়াছেন যে, যদি সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানেরা ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া দাবি করে তবে যুক্তিনির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু দ্বারিক বাকরূপের প্ররোচনায় এক শ্রেণীর তপশীলী স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি তুলিয়াছে। তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সামান্যই হউক না কেন, তাহাদের যুক্তি যতই অসার হউক না কেন, তাহাদের মতকে পাকিস্তান সরকার প্রাধান্য দিবে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য। ইংরেজের ভেদনীতিক পাকিস্তান অসাধারণ দক্ষতার সহিত হৃদয়দম করিয়াছে এবং স্বাধীনতার জন্য এক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করিতেছে। দ্বারিক বাকরূপে মুখপাত্র করিয়া হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিতেছে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট যেমন জিন্নাকে সৃষ্টি করিয়াছিল, পূর্ণ বাধীনতাকামী ভারতকে বিঘ্নিত করিয়া শক্তিশীল করিবার উদ্দেশ্যে, পাকিস্তান সরকারও বিপর্যিতাশ্রিত সহায়-সম্মত হিন্দু জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির হ্রদ্র অন্বেষণ করিতেছে এবং সেদিন যেমন জিন্নার অভাব হয় নাই আজও সে শ্রেণীর লোকের অভাব হইবে না। তাহারা পাকিস্তানে হিন্দু-সংহতিক বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করার পূর্ববদের হিন্দুর সম্মুখে এক ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত করিয়াছে—ইহার উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধন মান সম্মান সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

বাঙালী

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে—মুশিদাবাদ, বহরমপুরের "গণরাজ" পত্রিকায় উক্ত কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপূর্বে তাহা সম্মোহনযোগ্য। ছন্দনামে লেখক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী এতটা কৃপার পাত্র নয়; তাহারা কেবল "ঠ্যাডানি" বাস্তব না, গঠন করে নুতন জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্ত চেষ্টাও করে।

কাঙাল বাঙালী। করিও না গোল, মুখটি বুদ্ধি থাক, বড়িত ভব হোয়েছে অঙ্গ, তাহাতে কি আসে যায় ? হিয়ার ভোম্বার যে ব্যথা কমেছে হিয়ার মাঝারে রাধ,

প্রাদেশিকভার পছন্ট ঘেন না লাগে কাহারো গা'য়।

বিহারে আসামে ঠাণ্ডানী খেয়েও কোরো না অশ্রুপাত,
উৎকল যদি করে উৎপাত, মনে করিও না কিছু।

মেভা সেজে কর নিজেদের মাঝে নিমিত্ত নিম্মাধাত,
নিজেদের দোষে সকলের কাছে মাথা ক'রে থাক নীচ।

প্রদেশে প্রদেশে ঘাইছে মিশিয়া দেশীয় রাজ্য যত
যোগ্য সময় হয়নি বলিয়া কথা ত উঠে না কত।

জিপুরা কিবা কুচবিহারের বেলায় প্রশ্ন শত
অরিয়া অরিয়া কাঁদিয়া আকুল বড় বড় যত প্রভু।

ভোমাদের লাগি ভাবিছেন তাঁরা, ভোমরা কোরো না কথা।
ব্যস্ত করুক ভোমাদের ঘিরি বাস্তহারার দল,

আসামে তবুও বাঁধিও না বাসা, দিও না ভাদের ব্যাধা;
বাঙালী যেখানে বাঞ্ছিত নয়, বেড়ে যাক জঙ্গল।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখ এই সব, মারামারি কর ঘরে,
দলবল নিয়ে যাও বারে বারে দিল্লীর দরজায়,

সাম্যবাদীর পাশব-বৎস বুলুক মাথার 'পরে
ভুলিয়াও তবু ছাড়িও না কত উপদল মহিমায়।

—ত্রিবিজ্ঞ সরস্বতী।

সাদা চামড়ার দাপট

ডঃ ডেনিয়েল মালান দক্ষিণ আফ্রিকার খেতাক প্রভৃৎ
প্রতিষ্ঠার ভিন্ন শতাব্দিকী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনে
ব্যস্ত। সেই সময়েই আর একজন খেতাক রাষ্ট্রপুঞ্জের সভ্য
দাঁড়াইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী অবস্থা সম্বন্ধে নিজের
অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, ইউনিয়ন গব-
র্নেন্ট তাঁহাদের বর্ণ-বিদ্বেষমূলক নীতির ফলে এক গুরুতর
সমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছেন। অশেতকায় অধিবাসী-
গণ মনে করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মাহুয়ের আইন তাগবৎ
বিধানকে লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছে এবং অশেতকায় জাতি-
সমূহ এই স্পষ্ট স্বত্বস্বত্বিত্তে মানিয়া লইবে না, সজবদ মিঞ্জির
প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারা তাহার বিরোধিতা করিবার জন্ম
অগ্রসর হইবে। এই খেতাকট হইলেন মালান সরকার কর্তৃক
দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে নির্বাসিত ইংরেজ বর্ণযাজক হেতারেও
মাইকেল স্কট। ইনি ইতিপূর্বে আরও দুই বার রাষ্ট্রপুঞ্জের
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষদর্শী রূপে মালান সরকার কর্তৃক
অস্বস্ত নীতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু বর্ণ যাহা বলে
বলুক, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব যে মনুষ্য করিতে হয় করুক—তাহার
প্রতি কর্পপাত করিবার অবকাশ ডঃ মালানের মাই; খেতাক-
প্রোবাজ তাহার শাসন ও শোষণের কল্যাণে একটা বিরাট
জমসজ্জকে নিঃশব্দ ও সর্বস্বান্ত করিয়াছে, আইন প্রণয়ন দ্বারা
মাহুয়ের প্রাণ-অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে
গৃহপালিত পশুপালে পরিণত করিতে উজ্জত হইয়াছে। বিধ-
বিধান বলিয়া অজ্ঞাত একটা বস্ত্ত মানব ইতিহাসে ফিরা করিতে

দেখা যায়। সেই বিধান যে লঙ্ঘন করে, সেই বিধানের ঘোষ
তাহাকে তখন সম্বন করে। কিন্তু মালান-জাতীর জীব তাহা
জানিয়াও জানিতে চায় না; বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না।
ফলে নিজেদের ও কোটি কোটি নরনারীকে দুঃখের সাগরে
ঠেলিয়া দেয়।

মিশর-সুদান-টিউনিসিয়া

আজ প্রায় আটশটি বৎসর মিশরদেশ ব্রিটেনের অধীনে
আছে; সেই সঙ্গে সুদানের উপরও কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া
চলিয়াছে। মাহদির পরাজয় ঘটে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে; তখন
মিশরকে বাধ্য করা হয় “সম-অধিকার” (condominion)
স্বীকার করিয়া লইবার জন্য, যদিও মিশরই এই অভিযানের
ব্যয় বহন করিয়াছিল। প্রায় সেই সময়েই ফরাসী সেনাপতি
মার্চেট ইংরেজ সেনাপতি কিচেনারের দাপটে ফেশডা
(Fashoda) হইতে হাত গুটাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইংরেজ
জাতিকেও চটাইতে চাহিল না। উত্তর আফ্রিকায় ফরাসীর
অধিকার বিভাগে প্রশ্ন দিল।

এই ভাবে একটি জটিলতার সৃষ্টি হইল। ইহার ফল আজ
আমরা সকলে ভোগ করিতেছি। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন
মিশরকে স্বাধীনতা দিল। কিন্তু “সম-অধিকার”
(condominion) বজায় রাখিল। আবার ওদিকে ফরাসী
সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে নিজেদের দুর্বল ও
অসহায় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন মার্কিন ও
ব্রিটেনের সাহায্য ছাড়া তাহার চলে না।

সুতরাং মিশর-সুদান-টিউনিসিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের
বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। টিউনিসিয়ার রাজ-
নীতিকেরা আরব-রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বাহিরে নিজেদের দাবি-
দাওয়ার সমর্থনলাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা
ধরিয়া লইয়াছেন যে, স্বঘর্ষা বলিয়া পাকিস্তান ও তাঁহাদের
পক্ষে আছেই, ভারতবর্ষের সাহায্যও প্রয়োজন। সেই
জন্য টিউনিসিয়ার অবিসংবাদিত নেতা এল হবিব বোর্জিবা
এই বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার একধাণি পত্র “স্পট-
লাইটস্” (Spot-Lights) পত্রিকার সম্পাদকের হাতে
পৌছিয়াছে। তিনি এখন ফরাসী কারাগারে বন্দী। তাহার
পক্ষে ভারতবর্ষের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের
সম্পাদকমণ্ডলীর নিবর্ত অমরোষ করা হইয়াছে যেন তাঁহারা
ভারতের জনমতকে তাঁহাদের সপক্ষে আময়ন করেন।
পণ্ডিত নেহরুর বিষয়েও বলা হইয়াছে।

আমরা এল হবিবের এই অমরোষ সমর্থন করি। বিদেশী
শাসনের অঙ্গা যে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে, তাহার পক্ষে
পরাধীনতার বিজুষ্টি একান্তভাবে কাম্য। তাহার উপর
ভারতের রাষ্ট্রনীতি আজ এক শত বৎসর হইতে এই অমরোষণার
চলিয়া জিটিল শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। ভারত সকল
দেশের সর্বাধীন মুক্তির অকুণ্ঠ সমর্থক।

বাংলার পুস্তক প্রকাশক সমাজ

এই সমাজের কার্যক্রমে বাংলার পুস্তক ব্যবসারে একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে হইতে এখন মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের হাতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সকল দায়িত্ব আসিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে; তার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষারও পুনর্গঠন প্রয়োজন। এই দুই কাজ একসঙ্গে না করিলে, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করিয়া বালক-বালিকার শিক্ষার গোড়া দৃঢ় না করিতে পারিলে পুস্তকের বোকা তাহাদের হাত হইতে অন্নবস্তুর না কমাইলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি অসম্ভব এবং মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়া দৃঢ় না করিলে দেশের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে; পুরাতন ব্যর্থতার অহুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। এই ভাবে মানবজীবন এক স্রোতে এখিত।

• এই সব কথাবার মধ্যে নুতনত্ব নিছক নাই, কিন্তু মানব-জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। টোল-মজুর ইত্যাদির শিক্ষা বর্ধমান জগতের নানা সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। স্বাতন্ত্র্য সত্যতার আমলে মানুষ অনেকটা ধস্ত-চালিত হইয়া যাইতেছে এবং অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ব্যক্তির আত্ম-কর্তৃত্ব আরও সঙ্কুচিত হইবে।

এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়া, এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করিয়া উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব হইতে রাষ্ট্র মিথেকে মুক্ত করেন।

শ্রমপাণ্ডার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-প্রকাশ এক বিরাট ব্যবসারে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশে এই ব্যবসারে কত কোটি টাকা মূলধন রূপে ঝাটিতেছে তাহার হিসাব দেওয়াই বলিয়া মনে হয় না; তার বাৎসরিক আয় কত ও কত লক্ষ পরিবার এই ব্যবসারের কল্যাণে জীবনযাত্রার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, তাহার একটু বিশদ বিবরণ সংগৃহীত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এই অবস্থার কলে “বিশ্বভারতী” প্রকাশক সমাজ, এম. সি. সরকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক সমাজ একত্রে করিতেছেন। আচার্য্য বহুনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যের দিকপালদের পুস্তক বিক্রয়ে বাধা দিতে যাহারা চেষ্টা করিবেন, মনে হয় তাহারা “একত্রে” হইবেন।

এই সমস্যার সমাধান কঠিন নয়। কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকবলী যে সর্বজনস্বত্বের হয় তাহা গ্রহণ-লাপেক। সেইরূপ কোন ব্যবসায়ী সমাজের হাতে এমন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া অসম্ভব। এই দুই পক্ষের

মধ্যে একটা আপোষ করিতে কে অগ্রসর হইবেন, তাহাই বিবেচ্য। জল যথেষ্ট খোলা করা হইয়াছে, এখন ছিন্ন-বৃদ্ধিতে সমস্তাপূরণ করা কর্তব্য।

রাজা বর্ষ জর্জ

গত ২৩শে মার্চ ব্রিটেনের রাজা, “কমনওয়েলথের” প্রধান, রাজা বর্ষ জর্জ ৫৭ বৎসর বয়সে মরুজগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এই যত্না আকস্মিক মর। গত তাজ মাসে যখন তাঁহার হৃদযন্ত্রের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়, তখনই বুঝা গিয়াছিল যে, বর্ষ জর্জের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইল; প্রমিষ্ট মন্ত্রি-মণ্ডলী গিয়া রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিমণ্ডলী মিঃ চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত হইল। রাজ্যের পরিচালনে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। বিলাতের লোকের মাংসের অভাব মিটিল না। অজানা ষাণ্ডাঘাত প্রচুর, এবং বিলাতের নর-নারী মাংসের ব্যবহার কমাইতে বাধ্য হওয়ার তাহাদের স্বাভাবিক অবনতি হয় নাই; বরং উন্নতি হইয়াছে।

অপুত্রক রাজার প্রথম কন্যা রাজকুমারী নিক্সিয়ে ব্রিটেনের রাণী হইয়াছেন; কমনওয়েলথের প্রধান হইলেন। তাঁহার পিতার সময়ে সর্কাপেক্ষা বিপ্লবকারী ঘটনা হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৪), যেমন তাঁহার পিতামহের সময়ে ঘটয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)। এই দুই ঘটনার প্রায় সারা ইউরোপ বণ্ড হইতে রাজতন্ত্র (monarchy) লুপ্ত হইল। রাশিয়ার জার, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার কাইজার, তুরস্কের খলিফা বরাপূর্ত হইতে মুছিয়া গেলেন। কেবল রহিলেন ব্রিটেনের রাজবংশ বাতি দিবার জন্ত। এই বিষয়ট একটা আলোচনার বিষয় হইয়াছে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রবিদদের মধ্যে। তাহার রহস্য ভেদ করিবার নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়। তার মধ্যে প্রধান হইল ইংরেজের রক্ষণশীলতা। ইংরেজী ভাষাভাষী মার্কিনীরা পর্যন্ত লঙনে আসিলে রাজা বা রাণীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত ঠেলাঠেলি করে।

এই সমস্ত আর কতদিন টিকিবে তাহা ইতিহাস বলিতে পারে। ইংরেজের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, তাহাদের দেশে যখন রাণীর আধিপত্য হয় তখন দেশের সমৃদ্ধি কাঁপিয়া উঠে যেমন উঠিয়াছিল রাণী এলিজাবেথের সময়, রাণী ভিক্টোরিয়ার সময়। রাজা বর্ষ জর্জের কন্যা দ্বিতীয় এলিজাবেথ নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

তাঁহার পিতৃবিয়োগে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি, এবং গণতন্ত্র বিধানের মাপরিক হইয়াও তাহা করিতে সত্যতা বোধ করি না। আমাদের পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাহা করা হইতেছে তার মধ্যে একটু আভিশ্য থাকিতে পারে, অন্যায় কিছু নাই।

সংশোধন

খুলনা দৌলতপুর কলেজের ত্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ নিম্নলিখিত সংশোধন পত্রটি পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি :

“আপনি লিখিয়াছেন যে ‘মহাশ্মশান’ কাব্য কারবালার হাসান হোসেনের হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া লিখিত। একদা ‘বিষাদসিন্ধু’ চূড়ামণির বক্তা বৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কারবোকাবাদের ‘মহাশ্মশান’ কাব্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চিত্র বর্তমান যুগের ভারতীয় মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। হাসান-হোসেনের বিষাদময় কাহিনী বাহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম ‘মহরম শরীফ’ বা ‘আব্বাসজিন’ কাব্য; ‘মহাশ্মশান’ নহে। মহাকাব্য ‘মহাশ্মশান’ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত। এক দিকে আহমেদ শাহ-আবদালী ও অল্প দিকে বিপুল মহারাষ্ট্র শক্তি; এই যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়াই কবি মহাশ্মশান রচনা করিয়াছেন। ইহা ভারতীয় মুসলমান বীরপুরুষদের শৌর্যবীর্যের শেষ অধিস্থলিস বলিয়া ইহার নাম মহাশ্মশান।”

বাঁকিপুরের সদ্য অমুদ্রিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আমরা বাংলাদেশে শিশু সাহিত্যের প্রবর্তক জরের নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহাদের নাম প্রমদাচরণ সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

বসন্তকুমারী হোম

যে প্রাণধর্মী সংকল্পিত ভারতবর্ষে এখনও চলিতেছে, তার প্রতি বিরূপ হইয়া কেন আমাদের মধ্যে সম্যাসীর প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল তাহা ভারত-ইতিহাসের অজ্ঞাতম রহস্য। বসন্তকুমারী হোম এই প্রাণধর্মের সাধনে মিরত থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জীবনে এমন করিয়া পরকে আপন করিয়াছিলেন, দুহকে নিকটে আনিতে পারিয়াছিলেন। ইহা কথার কথা নয়। ইহা তাঁর প্রকৃতিগত গুণ, বংশগত ঐতিহ্য।

এই গুণের প্রকাশ পাইয়াছিল বসন্তকুমারীর পিতা-কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের মধ্যে। এই লোকটি ছিলেন রাজ-মন্ত্রীর বহুর শিষ্য; স্বাক্ষরকাণ্ড-বিভাগ্য, শিবমাণ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, আমলমোহন বসু, স্বাক্ষরকাণ্ড গাঙ্গুলী প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অজ্ঞাতম। বোড়াল-মজিলপুর, জহনগর, চিংড়িপোতা, হরিনাতি সমাজ একত্রে এখিত ছিল। এই অঞ্চলকে মন্যবাদের পীঠস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেইজন্ত বসন্তকুমারী হোমের নিকট বসিলে কথাগুলো তাঁহার নিকট অনেক তথ্য পাওয়া যাইত যাহা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের

পাওয়া কঠিন। অনেক গবেষক তাঁর নিকট গিয়া। সেই গুণ একান্তে স্বীকার করা উচিত।

তাঁহার স্বামী গগনচন্দ্র হোম ছিলেন সুলভীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর চৌধুরী (সম্ভ্রাস বাবাজী) প্রভৃতির সহকর্মী। শাস্ত্রী মহাশয়ের ইহাদের শিষ্যত্বে বরণ করিবার জন্ত যে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন অগ্নিদাকী করিয়া তাহা জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁহার পালন করিয়াছিলেন। অতিথি-বৎসল বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

বসন্তকুমারী ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ত আমরা শোক করিব না। তাঁহার পুত্রকতার উদ্দেশে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

চারুচন্দ্র দত্ত

গত ৮ই মাঘ ত্রীশ্রবিন্দু আশ্রমের কেন্দ্র পণ্ডিতগণী মগরীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া চারুচন্দ্র দত্ত পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। বিপ্লবী যুগে অরবিন্দের সহকর্মী, সাধনমার্গে ত্রীশ্রবিন্দুর শিষ্য এই দুই ভাব ও কণ্ঠের সমন্বয় বৃষ্টি দেখিয়া আমরা চারুচন্দ্রের জীবনে।

তাঁহার আর একটা পরিচয় ছিল। তিনি সাহিত্যরসিক, বাংলা ভাষায় তাঁহার আশ্চর্য্যজনক ‘পূর্বানোকথা’র সেই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন মজলিশী লোক, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি যে প্রশংসা লাভ করেন তাহা অনেকের স্মরণীয়।

তাঁহার পিতা কালিকাদাস দত্ত কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। চারুচন্দ্রের জীবন-স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কেমন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জনের জন্ত নয় বা স্বাভাবিকতার জন্ত নয়, কিন্তু এই উচ্চপদের দৌলতে নানা গোপন সন্ধান লাভ করিয়া বিদেশী শাসনব্যবস্থাকে বিকল করিতে পারিবেন এই ভরসা চারুচন্দ্র এই পদ গ্রহণ করেন। এই কুটিল পথে চলিবার সাহস বা শক্তি সকলের থাকে না। থাকিলেও বেশী দিন উচ্চপদ, প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলে, কালে যাহা পথভ্রষ্ট হয়। চারুচন্দ্র সেই ভাগ্যবানদের একজন যিনি দুর্গম পথে চলিয়াও কখনও প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। চারুচন্দ্র এই সবই হাসিমুখে সহ করিয়াছিলেন।

জীবনের সারাহে তিনি এই পর অতিক্রম করিয়া বিপ্লবী যুগের সহকর্মীর হাত ধরিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তৃততর লোকে, বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মত অধ্যাত্ম-ব্যাব্যক্ত্য যুব কন্মই দেখিয়াছি। ‘দিব্য জীবন’ (Life Divine) নামক পুস্তকের অনুবাদ তাঁহার নির্দর্শন।

এই বাঙালী প্রবাসের তিরোবানে আমাদের সমাজে যে কতিপয় হইল তাহা অপূরণীয়। আমরা তাঁহার পুত্র ও পত্নীর উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

উপক্রমণিকা

শোনা যাইতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতক পরিবর্তন আসন্ন, এবং সংস্কৃত বিভাগেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতে পারে। আমি এক জন সংস্কৃতাত্মরাগী ও আজীবন সংস্কৃতের ছাত্র; অবসরপ্রাপ্ত আশুতোষ সংস্কৃতাদ্যাপক ও সংস্কৃতবিভাগের অধিনেতা বলিয়া তাহার সহিত আমার একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও আছে। তাই এই সময়ে ইহার সম্বন্ধে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমি কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অল্পরক্ত ব্যক্তিবর্গ ও কর্তৃপক্ষ ইহা এক ঝড় চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

সংস্কৃত মূলত যদিও এই ভারতের ভাষা, তথাপি আর ইহা নিজের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। পৃথিবীতে অগ্রগামী দেশসমূহের অনেকের মধ্যে ইহা বর্তমানে সাদরে অধীত হইয়া থাকে, এবং ইহার বিবিধ বিষয়ে যে বিপুল আলোচনা ও অভ্যয় হইয়াছে তাহা কোন অভিজ্ঞ সংস্কৃত-বিদই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।

শিক্ষাপদ্ধতি

বৎসর পঁয়ত্রিশ হইবে স্বর্গীয় মহাশয় আশুতোষ যখন এই বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন স্পষ্টতই মনে হয়, তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, একমাত্র প্রাচীন বা নবীন পদ্ধতিতে কাজ করিলে চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়ই পদ্ধতিকে যথাযথ ভাবে স্থান দিতে হইবে। এইজন্ত সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকিলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগটি যোগ করেন, এবং দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যাপককে নিযুক্ত করেন; প্রথম, প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত, ইহাদের মধ্যে কেহ-কেহ সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন কতক ইংরেজীজ্ঞ অর্থাৎ সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ। ইহাদের ইংরেজী জানায় মনে করা হইয়াছিল যে, ইহারা বর্তমান বা নবীন পদ্ধতির সহিত পরিচিত আছেন, অথবা ক্রমে ক্রমে শীঘ্রই পরিচিত হইয়া উঠিবেন, অথবা এই পদ্ধতিতে উপলব্ধ তত্ত্বসমূহকে ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবেন। মনে হয় এই জন্তই প্রথম-প্রথম এই শ্রেণীর শিক্ষকগণের কাজ খুবই লঘু ছিল। গুনিয়াছি সপ্তাহে এক বা দুই ঘণ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে পড়াইতে হইত। মহাশয় আশুতোষের অভিপ্রায় ছিল যে, প্রথমে শিক্ষকেরা নিজের প্রগাঢ়

অধ্যয়নের দ্বারা নিজেকেই প্রস্তুত করিয়া, বিশেষত বর্তমান পদ্ধতিতে ও গবেষণায় সংস্কৃত ও সংস্কৃত-সম্বন্ধ অগ্ন্যান্ত বিষয় অধিগত তত্ত্বসমূহ পরিচিত হইয়া ছাত্রগণকে যথোচিতভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন।

মহাশয় আশুতোষ এই ব্যবস্থা করিয়া মনে-মনে আশা করিয়াছিলেন যে, অল্পকাল হইতেও ছাত্রেরা সংস্কৃত পড়িবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবে। কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ তো হয়ই নি, হইবারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

শিক্ষার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আমাদের ছাত্রগণকে সাধারণত বর্তমান গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত পরিচিত করা হয় না। ইহার প্রধান কারণ, যে সকল শিক্ষক প্রধানভাবে এই বিভাগের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং মনে করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বর্তমান পদ্ধতির সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সেরূপ হইলেন না, বা সে বিষয়ে চেষ্টাও করিলেন না। ফলে দেখা গেল যে, প্রাচীন ও নবীন শিক্ষকগণের মধ্যে বস্তুত তেমন কোন ভেদ থাকিল না। আমার মনে হয়, ইহাদের অনেকেই এ প্রশ্নে একবারে উদাসীন। সত্য কথা বলিতে হইলে, বর্তমান পদ্ধতি থাকুক প্রাচীন পদ্ধতিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক অল্পসরণ করা হয় না।

সংস্কৃতে অভিজ্ঞতার জন্ত প্রাকৃত অপরিহার্য। প্রথম আরম্ভ হইতেই মহাশয় আশুতোষ সংস্কৃত বিভাগে প্রাকৃতের অধ্যয়ন প্রবর্তিত করেন। ঐ সময়েও ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতের কাব্যগত ও সাহিত্যিক উচ্চ উৎকর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার আবশ্যিকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা আলোচনা করিব। সম্প্রতি বহু স্থলেই, বহু টোলেই বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত সংস্কৃতবিদগণের নিকটে প্রাকৃত অত্যন্ত অবজ্ঞাত হয়, কিন্তু প্রাচীন অধ্যাপকগণের নিকট একরূপ হইত না। মহাকবি প্রবর সেনের সে তু বন্ধ, এবং সাত বাহনের গাথা সপ্তশতীর প্রশংসা না করিয়া বাণভট্ট নিজের হর্ষচরিত আরম্ভ করিতে পারেন নি। এ দুইখানই প্রাকৃতে রচিত। সুপ্রসিদ্ধ স্বল্প বা সর্বদত্তা য়, বাণভট্ট হর্ষচরিতে, দণ্ডী কাব্যদর্শে, ও ধনঞ্জয়

দশরূপকে গুণাচোর বৃহৎকথার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহা পৈশাচী-নামক একরূপ প্রাকৃতের রচিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত ইহার মূল আজ লুপ্ত, কিন্তু ইহার তিনখানি প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ আছে। যথা সোমদেবভট্টের কথাসরিৎসাগর, হেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, ও বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাকল্পসংগ্রহ। প্রাকৃতের জ্ঞান না থাকিলে পূর্বে কেহ সংস্কৃতবিদ বলিয়া গণ্য হইতেন না। অতি স্পষ্টতই দেখা যায় পূর্বে সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতও অবশ্যপাঠ্য ছিল। সকলেই জানেন, সংস্কৃত নাটক বা দৃশ্য কাব্যগুলি কেবল সংস্কৃতেই নহে, কিন্তু অংশত প্রাকৃতে অথবা স্থানে স্থানে বিবিধ প্রাকৃতেও রচিত হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণের রচয়িতা বিশ্বনাথকবিরাজ “সাহিত্যার্ণব কর্ণধার” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি আঠারটি ভাষা জানিতেন, এই ভাষাগুলির মধ্যে একটি সংস্কৃত এবং অবশিষ্ট সতেরটি হইতেছে বিভিন্ন প্রাকৃত। বিশ্বনাথ ইহাকে কবি অনোচিতরূপে বর্ণনা করিয়া নিজেকে বলিয়াছেন “অষ্টাদশ ভাষা বারবিলাসিনী ভুজঙ্গ।” তাহার পিতা ভাষাৰ্ণবের রচয়িতা নানাবিধ প্রাকৃতে অভিজ্ঞ ছিলেন (“সবভাষা চটুর” = সর্বভাষা চতুর)। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণ-গণ প্রাকৃত ব্যাকরণও রচনা করিতেন। যেমন হেমচন্দ্র ক্রমদীপ্তর, ও পুরুষোত্তম। ইহাদের প্রাকৃত ব্যাকরণ এখনো প্রচলিত আছে, ছাপাও হইয়াছে।

আমাদের অলঙ্কার গ্রন্থগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, প্রাকৃত না জানিলে অলঙ্কারও ভাল করিয়া জানা হয় না। ভোজের সরস্বতীকণ্ঠভরণখানি দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। কিছুদিন পূর্বেও এই বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

প্রাকৃতের প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না। প্রাকৃত কিঞ্চিন্নাত্রও না জানিলে কেহ অতি বড় বৈদাস্তিক বা মৌমাংসক হইতে পারেন, কিন্তু হয়তো এ কথা শুনিয়া কেহ-কেহ বিস্মিত হইতে পারেন যে, প্রাকৃত না জানিলে কোন সংস্কৃতবিদ সংস্কৃতবিদই নহেন, কেননা এইরূপ ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে বা যথার্থভাবে বহু কথাই ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। ইহারা অনেক সময়ে “আর্থ প্রয়োগ” বা “ছান্দস” বলিয়া এই সব প্রশ্নকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন।

অভিজ্ঞগণ জানেন যে, এমন কি ঋগ্বেদেরও ভাষায় বহু প্রাকৃত প্রভাব আছে, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির ভাষায় তো কথাই নাই। মহাকাব্যগুলিরও মধ্যে ইহা প্রচুর।

অযুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহের পাঠ

এই প্রসঙ্গে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক শ্রেণীতে আমাদের দৃশ্যকাব্যগুলিকে যে প্রশালীতে পড়ান হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। দেখিতে পাওয়া যাইবে, শিক্ষকেরা নাটকের মূল প্রাকৃত অংশ পাঠ করিয়া শিক্ষা দেন না, তাহারা ছাত্রগণকে সংস্কৃতের ছায়া শোনাইয়া থাকেন। ইহা স্পষ্টতই বহুস্থলে শিক্ষকের প্রাকৃতের প্রতি অবজ্ঞা সূচনা করে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, যদিও ছাত্রগণ খুব ভালভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, যখন তাহারা ভবিষ্যতে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয় তখন ঐ বিষয়টিকে ভাল করিয়া পড়াইতে পারে না। এইরূপে এমন একটি ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যাহাতে মোটের উপর সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষতি হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, যাহা যা তাহা যদি তা না থাকে, তবে তাহার নিজের গুণও থাকে না। দুধ যদি দুধ না থাকিয়া দই হয়, তবে উভয়েরই স্বাদ প্রভৃতি ভিন্ন হয়, দুধের স্বাদ দইএ থাকে না। এইরূপ প্রাকৃতকে যদি সংস্কৃতে পরিবর্তন করা হয় তবে প্রাকৃতের যাহা কিছু রমণীয়তা ও মাধুর্য্য সবই নষ্ট হইয়া যায়। এই গুণ কথায় বর্ণনা করা যায় না, অভিজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ ব্যক্তিই ইহা অনুভব করিতে পারেন; যেমন দুধ, চিনি ও মধুর মাধুর্য্য কেমন ইহা কেহ কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, আশ্বাদন করিয়াই বুঝিতে হয়। বাহ্যিক ভয়ে আমি একটিমাত্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাঠকগণের অধিকাংশ প্রাকৃতের সহিত পরিচিত নহেন এই আশঙ্কায় আমি এখানে বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

“আজু রজনী হাম ভাগে পোহারনু পেখনু পিয়মুখ চন্দা,
জীবন যৌবন সকল মাননু দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মনু গেহ গেহ করি মাননু আজু মনু দেহ ভেল দেহ।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল টুটল সব সন্দেহা।

ইহার সংস্কৃত ছায়া এই—

অদা রজনী মহং ভাগেন প্রভাতমকারয়ং প্রৈক্ষে প্রিয়মুখ চন্দ্রম্।
জীবনং যৌবনং সকল মনালয়ং দশ দিশো ভূতা নি দন্দ্যঃ।
অদা মম গেহং গেহমমানয়ম্ অদ্য মম দেহো ভূতো দেহঃ।
অদ্য বিধিমে হনুকুলো ভূতজ্ঞাতিঃ সর্বসন্দেহঃ।

পাঠকগণ বিদ্যাপতির মূল ও সংস্কৃত ছায়ার ভেদ নিজেই অনুভব করিয়া দেখুন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে সাধারণ চারী জ্ঞাপুরুষদের কথায় যে অতিগ্রাম্য ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসের অতি উচ্চ ভাষা বসাইলে যে দুর্দশা হয়, সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের স্থানে সংস্কৃত

বসাইয়া পাঠ করিলে তাহাই হয়। পাঠকগণ এখন মূল ও ছায়ায় ভেদ নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিকের এই অবস্থার মধ্যে যখন দেখিতে পাই যে, সংকল্পিত নতুন পাঠ্যসংক্ষেপে (Syllabus) প্রাকৃতিকে সংস্কৃতের সমস্ত ছাত্রের জন্য অবশ্যপাঠ্য না করিয়া ঐ স্থানে ভারতীয় অর্থনীতিকে (general principles of Indian politics) বসান হইয়াছে, তখন নিতান্ত বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। ইহা উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদেশেও এই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক অবশ্যপাঠ্য।

প্রাকৃতিকে অবশ্যপাঠ্য না করায় আমাদের অধিকাংশ ছাত্রের নিকট মহা বস্তু, ল লি ত বি স্ত র, ইত্যাদি বহু-বহু বোদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও অল্পশাসন প্রভৃতি একবারে অবোধ্য থাকিয়া যায়। জৈনগণের আগমগুলিরও সম্বন্ধে এই কথা, কেননা এগুলিও প্রাকৃতিক রচিত। অতএব এ ব্যবস্থা আমাদের নিতান্ত ক্ষতির জন্য, লাভ ইহাতে কিছুই নাই। তাই ইহা কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। সকলে ইহা শাস্ত ও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বৈদিক সাহিত্য

ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক সাহিত্য শিখাইবার বিধান করা হইয়াছে। প্রথম হইতেই ইহা আছে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে এখান হইতে এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যাহাকে বৈদিক পণ্ডিত বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারা যায়। অক্ষম্পদ স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের পর বঙ্গদেশে আর কাহাকেও তাঁহার স্থানে দেখা গেল না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন ছাত্র নিতান্ত দুর্লভ, যে সংহিতা পাঠ হইতে পদপাঠ, বা পদপাঠ হইতে সংহিতাপাঠ করিতে পারে। অথবা যে ঋগ্বেদের এক পঙক্তিও যথোচিত স্বরসংযোগে উচ্চারণ করিতে পারে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের, অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ই ভারতের, বিষয়ও ভারতের নিজের, আর ব্যয়ও কিছু কম হয় না।

নবীন ব্যাখ্যা

আমরা ভারতীয়েরা নিজে বেদের কীরূপ ব্যাখ্যা করি তাহা প্রথমে আমাদেরই জানিতে হইবে। আমাদের ছাত্রেরা নিষ্ঠার সহিত ইহা করুক। কিন্তু তাহাদিগকে আরও কিছু করিতে হইবে, অল্পখা চলিবে না। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা কোন কথা সম্বন্ধে

নতুন কি বলিতেছেন সেই সম্বন্ধে একবারে অজ্ঞ হইয়া থাকিলে চলিবে না, চলিতে পারিবে না। কোন ব্যাখ্যাকে কেহ সত্য বলিয়া সব সময়ে গ্রহণ করিতে বা না করিতে পারেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কে কি বলেন তাহা প্রথমত জানিতে হইবে, তাহার পর তাহা গ্রহণ করিবেন, অথবা উপযুক্ত যুক্তির উপস্থানে খণ্ডন করিবেন।

বৈদিক যজ্ঞের ভাব

সংস্কৃত বিভাগের সমস্ত ছাত্রেরই, বিশেষত বৈদিক বর্ণের ছাত্রদের জন্য ঋগ্বেদের বহু অংশ অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার সহিত সা য না চা র্ঘ্যের ভাষ্যও পাঠ্য। ইহাতে নানা যাগযজ্ঞের কথা আছে। এই যাগযজ্ঞের সম্বন্ধে ছাত্রেরা বাহাতে একটা সাধারণ ভাব পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই বিভাগে কতকগুলি যজ্ঞ-পাত্র সংগৃহীত করা হইয়াছে, বাহাতে অধ্যাপক উহাদের সাহায্যে ছাত্রগণকে যতটা সম্ভব কতকগুলি ব্যাখ্যান দিতে পারেন। এই বিভাগে এইরূপ উপযুক্ত অধ্যাপকেরও অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাখ্যান দেওয়া আর হয় না। যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অবিলম্বে ঐ যজ্ঞ পাত্রগুলিকে সংস্কৃত বিভাগ হইতে নৃতত্ত্ব বিভাগে লইয়া গিয়া রক্ষা করা হইবে।

অবেস্তা

সংস্কৃত বিশেষত বৈদিক সংস্কৃত ও অবেষ্টার পরস্পর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, আমাদের সংস্কৃতের ছাত্রগণ অবেষ্টার ভাষার দিকে চোখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে না। এই জ্ঞান কয়েক বৎসর পূর্বে অবেষ্টার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বৈদিক (অর্থাৎ বি) বর্ণের পাঠ্য করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা গেল যে, পরিবর্তিত পাঠ্যসংক্ষেপে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কেবল ছাত্রগণের প্রভূত ক্ষতি করা হইল। অন্যান্য ঘটনার সহিত ইহা বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত বিভাগ বিপরীত গতিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা ভারতীয় বা অভ্যন্তরীণ, আর্থ বা মূল্য, এইরূপ চিন্তা বা তদন্তস্বারে কার্য কখনো শ্রেয়স্কর নহে, ইহা আত্মঘাতী। অন্তত আমি ইহা বুঝিতে পারি না ভাষা হিসাবে অবেষ্টা পড়িলে কিরূপে তাহা সংস্কৃতের বা সংস্কৃত-ছাত্রের ক্ষতি করিতে পারে।

পাঠ্যসংক্ষেপ (Syllabus)

এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও, বহু পরিবর্তন আবশ্যক।

হইলেও সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) বেদান্ত। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বেদান্তের যদিও বিবিধ সম্প্রদায় আছে, এবং তাহাদের সমস্তই অল্পপেক্ষণীয়, তথাপি কেবল শঙ্কর ও রামানুজের ইমত আলোচ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ মাত্র নাই। ইহার ফলে এই হয় যে, ছাত্রেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ের আলোচনা হইতে বঞ্চিত হয়।

(খ) বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়। বর্তমান ন্যায় বৈশেষিক-বর্ণে অতি স্থষ্টিত্রুটি এই যে, বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়কে একবারেই অবজ্ঞা করা হইয়াছে, ইহাদের নামও করা হয় নি অথচ ভারতের ন্যায়শাস্ত্রে বৌদ্ধ ও জৈনদের দান সামান্য নহে। ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, কোন ভারতীয় ছাত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় তর্ক-শাস্ত্র পড়িয়া ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানিবে না।

(গ) সংস্কৃত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে পাঠ্য-সংক্ষেপে যদিও বড় বড় কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অনেকেই জানেন যে, ব্যাকরণের পড়ান মোটেই সন্তোষাবহ নহে। যে প্রণালীতে ইহা পড়ান হয় তাহাতে ইহা সম্ভবও নহে। ইহাতে বহু বক্তব্য আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটি মাত্র কথা এখানে বলা যাইতে পারে। আমার মনে হয়, আলোচ্য ক্রটিটি ততটা আর কিছুতে নহে যতটা নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে। অতএব কর্তৃপক্ষ ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন যে, বর্তমান পাঠ্য স্থলে কাশিকা কে দিলে চলে কিনা। কাশিকার সম্ভাব্য পাণিনির সূত্র পড়িলে ছাত্রেরা তাহার প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত হইতে পারিবে এবং ইহাতেই দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহজে পাণিনি ব্যাকরণকে তাহারা আয়ত্ত করিতে পারিবে। ইহাকে তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। কেননা ইহা কেবল ব্যাকরণ নহে, ইহা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি বিবিধ দুর্লভ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের আকর।

পাঠ্যসংক্ষেপ সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা যাইতে পারে। ইহা রচনা করিবার সময়ে পাঠ্য পুস্তকসমূহের তালিকা সম্বলন অপেক্ষা পাঠ্য বিষয়গুলিই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য মনে হয়। ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই বেশী উপকার হইবে। বর্তমানে ইহা হয় না। ইহা বলা বাহুল্য যে, পাঠ্যসংক্ষেপ করিতে, বিশেষত দার্শনিক বিষয়সমূহের সম্বন্ধে যদি স্বর্গীয় মহাশয় জে.জি.নাথশীলের পুস্তিকা-

খানিকে *Syllabus of Indian Philosophy in the University*) আদর্শরূপে অনুসরণ করা হয়, তবে প্রভূত উপকার হইবে।

সংস্কৃত সম্পর্কে তিব্বতী ও চীনা

মহাশয় আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী ও চীনা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এক জন সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে আমি এখানে পুনর্বার তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। আমাদের সংস্কৃতের যে ধনকোশ নষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবশত আজ প্রধানত তিব্বতী ও চীনা ভাষাতে আছে, তাহার পুনরুদ্ধারের বীজ তিনি ইহার দ্বারা এখানে বপন করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের এই কথা সাধারণত অনেকেই জানেন না। কিন্তু যদি কেহ বৌদ্ধ ত্রিপিটকের চীনা অনুবাদে গ্রন্থসূচী (*Bunio Nanjio's Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka*, Oxford, 1883) ও পি. কর্দিয়ের রচিত তিব্বতী ভাষায় প্রধানত সংস্কৃত হইতে অনূদিত বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের সূচী (*P. Cordier's Catalogue of the Tibetan Kanjur and Tanjur = Catalogue du fonds tibetan du la Bibliotheque Nationale, Paris 1909, 1915*) এই দুইখানি পুস্তকের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন তবে অতি সহজেই এই বিষয়টি জানিতে পারিবেন। তিব্বতীতে যে কেবল বৌদ্ধ বা ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থেরই অনুবাদ হইয়াছে তাহা নহে, বহু-বহু অন্যান্য গ্রন্থকেও অনুবাদ করা হইয়াছে। যেমন, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদি। যথা মেঘদূত, কাব্যাদর্শ, পাণিনি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যত দিন আমাদের লুপ্ত গ্রন্থসমূহ, যাহা তিব্বতী ও চীনাতে এখনো পাওয়া যায়, পুনরুদ্ধৃত না হয়, বা অনুবাদ প্রভৃতির দ্বারা ইহার আলোচ্য বিষয়কে প্রকাশ করা না হয় কোন ভারতীয় তত দিন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। একাজ খুব শক্ত, সন্দেহ নাই, কিন্তু অসাধ্য নহে। বর্তমান পণ্ডিতগণের পরিশ্রম দেখাইতে পারিয়াছে যে, ইহা কতদূর সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এখানে বস্তুবদ্ধ কৃত অভিধর্মকোশকে পুনে সাহেব (*Lois de la Vallee Poussin*) প্রধানত তিব্বতী ও চীনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যেভাবে ফরাসী ভাষায় ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে পারা যায়।

অতএব ইহা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য যে, আমাদের লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পাঠশালা বা-টোলের ছাত্রগণকে একপভাবে সুরোগ সুবিধা দিয়া উৎসাহিত করা যাহাতে তাহারা ঐ কার্যে

প্রবৃত্ত হয়, আর তজ্জন্য সংস্কৃতের যোগে চীনা-ও তিব্বতী অধ্যয়ন করিতে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যায়।

পুনর্বার আমি এখানে মহাশয় আশুতোষকে স্বরণ করিতেছি, কেন না তিনিই নিজে এই জাতীয় কার্য প্রথমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ করেন। গত ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক লে ভি সাহেব (Prof-Sylvain Levi) শান্তিনিকেতনে অভ্যাগত (visiting) অধ্যাপকরূপে আগমন করেন। সেই সময়ে সেখানে বিশ্বভারতী যথাবিধি স্থাপিত হয়। মহাশয় আশুতোষ তখন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয়কে তাঁহার কাছে প্রেরণ করেন। ইনি ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করিতেন, অধ্যাপক লে ভি তাঁহাকে নিজের সঙ্গে স্বদেশে লইয়া যান এবং বিশেষ ভাবে চীন-ভারতীয় বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করেন। মহাশয় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার অধ্যয়ন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু সেখানে দুই-খানি চীন-ভারতীয় অভিধানের সংস্করণ করেন। এই দুইখানিই প্রধানত সংস্কৃত পাঠার্থী চীনা পাঠকদের জন্ম। ইহাতে সংস্কৃত শব্দের চীনা অর্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারতীয় পাঠকেরও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। এই পুস্তক দুইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বলিয়া প্যারিস হইতেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাদের একখানির নাম ফান-মু-৭-স-মিঙ, ইহার রচয়িতা নি-য়েন। অপরখানির নাম ফান-মু-৭-সিল-৭-সেউ-বে-ন্। ইহার প্রণেতা য়ি-৭-সিং।

ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ আরও একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রণয়ন করেন। *Le Canon Buddhique en Chine*। ইহাতে চীনের বৌদ্ধ সাধকগণের বিবরণ আছে। ইহাও প্যারিস হইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা এখানে তিব্বতী ও চীনা ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের প্রাচীন অনুবাদ ও শত শত বৎসর ধরিয়া ঐ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা মনে করিতে পারি। ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু তথাপি ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। যদি ইহা সেই সময়ে সম্ভব হইয়াছিল, আশঙ্ক্য কাল কেন তাহা না হইবে। চীন, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা যদি সংস্কৃত শিখিয়া নিজ নিজ ভাষায় অত সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে পারেন, তবে বর্তমানে ভারতীয়েরা কেন সেইরূপই কাজ করিতে পারেন না।

ইহা বলাই বাহুল্য, এই কার্যে সরকারের মুক্ত হস্তে দান ও সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। অত্যাধিক কোন বিশেষ

চেষ্টা করা অসম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দিকে কোন অনুরাগ দেখা যায় না। কিন্তু দেশ যখন স্বাধীন তখন এ অবস্থাকে আর দীর্ঘদিন থাকিতে দেওয়া যায় না।

তিব্বতী ও চীনা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা

আমরা জানি, কিছু দিন হইল বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বার তিব্বতী ও চীনা ভাষা শিক্ষাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সন্দেহ নাই, ইহা ভাল। আমার মনে হয় প্রধানত ইহা রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য অথবা এইরূপ অল্প কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিবর্গ যতক্ষণ চীনা ও তিব্বতী হইতে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহকে পুনরুদ্ধৃত করিতে না পারিতেছেন তত দিন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন না। সংস্কৃত বিভাগের ইহা একটা বিশেষ কার্য হওয়া উচিত।

সতর্কীকরণ

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থসমূহের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সাংঘাই সংস্করণের চীনা খ্রিপিটকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রন্থকে পোকা ও উই কাটিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। পরে আবার যখন দ্বারভাঙ্গা ভবনের এক অল্লালোক ঘরের মধ্যে রক্ষিত কাষ্টফলকে মুদ্রিত (Xylographs) ও বহু হস্তলিখিত তিব্বতী গ্রন্থগুলিকে স্বেদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থার জন্ম আমাদের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তখন সেগুলিকে ভাল অবস্থায় দেখা যায় নি।

এখানে ইহা বিশেষ ভাবে বলা আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতী গ্রন্থসংগ্রহটি অতি দুর্বল ও অতি দুর্লভ, বিশেষত প্রজ্ঞাপারমিতা কয়েকখানি পুস্তক। এগুলি সোনালী ও রূপালী কালিতে তহুচিত কাগজে লিখিত। এগুলি প্রদর্শনের বস্তু। দেখিলে চোখ সার্থক হয়। এগুলি একবার কোনরূপে নষ্ট হইলে পুনর্বার পাওয়া সম্ভব হইবে না।

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের সংগৃহীত তিব্বতী গ্রন্থগুলিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রহিয়াছে। মহাশয় আশুতোষ ই এসব সংগ্রহ করাইয়াছিলেন।

বিদ্যার রক্ষা

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিতে পারা যায়। ইহা এই যে, যদি কোন নিতান্ত আবশ্যক হইলেও অতি-অবজ্ঞাত বিদ্যাকে কেহ বিদেশ হইতে উপার্জন করিয়া

স্বদেশে আনয়ন করে তবে যতদূর সম্ভব সর্ববিধ উপায়ে তাহাকে রক্ষা করা উচিত, যাহাতে পুনর্বীর কাহাকেও তাহার উপার্জনের জন্ত দেশান্তরে গমন ও তাহাতে নানাবিধ ক্লেশ ও অর্থব্যয় বা কালক্ষয় না করিতে হয়, দেশের যে কেহ চাহে অনায়াসেই তাহা পাইতে পারে। বিদ্যার রক্ষা বলিতে, যে ব্যক্তি বিদ্যা উপার্জন করিয়া আনিয়াছেন তাহাকে এমন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাহাতে তিনি নিজের ছাত্রকে উপার্জিত বিদ্যা দান করিতে পারেন, এবং এই ছাত্রও নিজের ছাত্রকে ইহা অধ্যয়ন করাইতে পারেন, যাহাতে এইরূপে একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, এই সংস্কৃত বিভাগেরই একটি ভূত-পূর্ব ছাত্র এইরূপ আছেন। ইনি সংস্কৃতে এম-এ, এবং সরকারী বৃত্তি লইয়া চীনে যান। দশ বৎসর চীনা শিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ইহার আছে। চীনা সংস্কৃতে ইনি কিছু কাজও করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে কাজে লাগাইলে লাভবান হইবেন।

চীনা-সংস্কৃত-চর্চা

চীনা-সংস্কৃত-চর্চা সম্পর্কেও মহাশয় আশুতোষের চিন্তা ও কাৰ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানের অধ্যাপক যমকমিসো গুনকে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ও জাপানী মূল অবলম্বনে কতকগুলি ব্যাখ্যান করিবার জন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার ব্যাখ্যানগুলি “*Systems of Buddhist Thoughts*” এই নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে (১৯১২)।

তিব্বতী-সংস্কৃত-চর্চা।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী-সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ উৎসাহের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি তিব্বতী-সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেমন ডক্টর শ্রী অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দত্তীর কাব্যাদর্শ (মূল সংস্কৃত ও তাহার তিব্বতী অনুবাদ); শ্রী দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় জিতারির হেতুতত্ত্বোপদেশ (পুনরুদ্ধৃত সংস্কৃত ও তিব্বতী অনুবাদ); ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, ইহার অনেক পূর্বে মহাশয় আশুতোষের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরো দুইখানি তিব্বতী পুস্তক প্রকাশিত হয়। একখানি ব্যাকরণ, *A Grammar of the Tibetan Language* by H. B. Hanna, 1912), আর অপরখানি অভি-

ধান, (*An English-Tibetan Dictionary* by Lama Dawasamdap Kazi, 1919)।

ফরাসী ও জার্মান

ইহা অনেকেরই জানা যে, অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় সংস্কৃতেও ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতগণের দান-সাধারণ নহে। এইজন্য ঐ দুই ভাষা না জানিলে সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ লাভ করা যায় না এবং তাহা না হইলে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আজ পর্যন্ত গবেষণার সংবাদ রাখিতে পারা যায় না, এবং তাহার অভাবে ঠিক কাজ চলে না। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে ঐ দুইটি ভাষার, অন্তত তাহার অন্যতরটির অধ্যয়ন অবশ্য-কর্তব্য। ইহাতে একটুও বিলম্ব করা উচিত নহে।

সংস্কৃত বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাৰ্য .

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিবেন। সংস্কৃত বিভাগের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতেই ইহার জন্য বার্ষিক প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হয়। সম্প্রতি তো কিঞ্চিৎ ন্যূনাদিক বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু কয়েক জন ছাত্রের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভিন্ন এই বিভাগে আর কী কাজ হইয়াছে? শিক্ষকগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বা সম্মিলিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ অর্থের বিনিময়ে কী দান করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের সেখানে নিয়োগকে সমর্থন করিতে পারা যায়? সংস্কৃত বিভাগ এ পর্যন্ত এমন কি এক পৃষ্ঠাও দিতে পারিয়াছেন যাহা সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে হইতে পারে, যেমন জেকব সাহেবের প্রধান উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা রশকোশ (*Concordance to the Principal Upanishads and Bhagavad Gita*) যাহা কেবল যান্ত্রিক কাজ? মনিঅর সাহেবের স্ত্রপ্রসিদ্ধ ও সংস্কৃতবিদগণের অপরিবর্তনীয় সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান (*Sanskrit English Dictionary* by Monier Williams) প্রভৃতির ন্যায় পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। সাধারণে এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করিতে পারে।

প্রস্তাবিত ও আরম্ভ পুস্তক

কাহারো কাহারো ইহাও জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে যে, দর্শনকোশ বা ভারতীয় দর্শনমহাকোশের কী হইল? ইহার পরিকল্পনা অধ্যাপক শ্রী রাধাকৃষ্ণন স্বাতকোত্তর সাহিত্য শিক্ষণ সমিতির (Council of the Post Graduate Teaching in Arts) তদানীন্তন অধিনেতা শ্রীযুক্ত শ্রীমাদ্রামোদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে

অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং ইহা গৃহীতও হইয়াছিল। এই সময়ে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন মন্তব্য করিয়াছিলেন—“যদি সম্পূর্ণ হয়, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়কে অমর করিয়া রাখিবে।” দুর্ভাগ্যবশত আরম্ভ করিয়াও কিছু দিন পরে ইহা ত্যাগ করা হইয়াছে। কেন?

আরো কয়খানি এইরূপ আরম্ভ উপযোগী গ্রন্থের পরিণাম এই প্রকার হইয়াছে, যথা সাক্ষ্য-যোগ-কোশ ও কালিদাস-কোশ অর্থাৎ কালিদাসের শব্দকোশ ও কালিদাস-অভিধান। এই সমস্ত কাজ চলিতেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ব ও বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্রগণের একটি সমিতির পরিচালনায়। ইহার জন্য কোন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু তথাপি ইহাদের কৃত কার্যের পরিমাণ ছিল প্রচুর। বিশেষরূপে ছাত্রেরাই ইহাতে উৎসাহ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় এ কার্যও বেশী দূর অগ্রসর হইল না। কেন?

যে কয়টি কাজের উল্লেখ করা হইল যদি সেগুলি বস্তুত করার অল্পযুক্ত বলিয়াই কর্তৃপক্ষের মনে হইয়া থাকে তবে অন্য কোন উপযুক্ত কাজের পরিকল্পনা অনায়াসেই করিতে পারা যাইত, কিন্তু এ পর্যন্ত তা করা হইল না।

আরম্ভ আশুতোষ গ্রন্থমালায় সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে কিছু শোনা যাইতেছে না। সংস্কৃত-পুঁথি সংগ্রহ সম্বন্ধেও ঐ কথা। আশা করি এই উভয়ই ঠিক চলিতেছে।

আমরা সংস্কৃত বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যের কথা আলোচনা করিতেছিলাম, যাহাতে এই বিভাগের শিক্ষকগণের নিয়োগকে ন্যায্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারা যাইত। কিন্তু কোন শিক্ষক কোন উপযোগী ও তেমন উপাদেয় গ্রন্থ রচনা না করিলেও যদি তাঁহার অধ্যাপনা অসাধারণ হয় তবে তাঁহার নিয়োগ নিশ্চয়ই ন্যায্যমত বলা যাইতে পারে। এতাদৃশ শিক্ষকের লাভে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে গর্বিত ও গৌরবান্বিত মনে করিবেন। যাহার ভাষায় তাঁহাকে আমরা নিধিগোপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু এরূপ অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগে কয় জন?*

অত্যধিক শিক্ষক

যদিও সংস্কৃত বিভাগের পাঠ্যসংক্ষেপে কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন নতুন বিষয় যোগ করা হয় নি, তথাপি কিছু দিন হইল, সেবতনে বা বিনা বেতনে কতকগুলি শিক্ষককে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? এই সমস্ত নবনিযুক্ত ও পূর্বনিযুক্ত শিক্ষকগণের এক সঙ্গে পড়াইবার ব্যবস্থার জন্য আরো কতকগুলি নতুন

শ্রেণী খুলিবার প্রয়োজন স্বভাবতই তীব্রভাবে অনুভূত হয়, এবং এই জন্য এই বিভাগের চিরাচরিত প্রথাযে ইষ্ঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতি শনিবারেও পূর্ণ ছয় ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়।†

এক সময়ে যখন স্নাতকোত্তর সাহিত্যশিক্ষণ সমিতির অধিনেতা শ্রীযুক্ত শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানিতে পারিলেন যে, এই বিভাগে সপ্তাহে (অর্থাৎ পাঁচ দিনে) আঠার ঘণ্টা করিয়া পড়ান হইতেছে, তখন তিনি তীব্র ভাষায় নিজের অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—“আপনারা কি ছাত্রগুলিকে বধ করিতে চাহেন? আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ইহারা স্নাতকোত্তর ছাত্র? ইহারা কেবল শিক্ষকেরই নিকটে কোন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবে না। ইহাদিগকে পুস্তকালয়ে নিজে-নিজেও অধ্যয়ন করিতে হইবে। কখন ইহারা ইহা করিবে?” মন্তব্য অনাবশ্যক।

পরিবর্তমান প্রয়োজন

এই বিভাগের বস্তুত প্রয়োজন যে কি তাহা নির্ণয় করা হয় শক্ত, কেননা ইহা সর্বদা পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। কোন পদে নিয়োগের জন্য এক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রার্থীগণকে আবেদন করিবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু নিয়োগ করা হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের জন্য। কয়েক বৎসর হইতে ইহাই এই বিভাগের ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ইহা সকলেরই জানা। কিন্তু কেন এমন হয়?

কয়েকটি সম্পাদনীয় প্রস্তাব

পূর্বে যে সমস্ত সংস্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলিকে গ্রহণ করা সম্ভব হউক বা নাই হউক, কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, বর্তমান অবস্থায়, যখন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের অধ্যাপনার কোন ভেদ নাই তখন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য কেবল সংস্কৃত কলেজেই ব্যবস্থা করিতে পারা যায় কিনা। যথা: বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-বৈশেষিক, সাক্ষ্য-যোগ ও স্মৃতি-মীমাংসা।

এখন কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব ও বর্তমান বন্ধুগণ ধীর ও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখুন কিসে ইহার বস্তুত কল্যাণ হয়, এবং তাহাই করুন যাহাতে হয় “বিদ্যার অগ্রগতি” (“Advancement of Learning”)। কেননা ইহাই হইতেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।

* ইংরেজীতে সেক্সপিয়রের সম্বন্ধে এ বিষয়ে কীরূপ কাজ হইয়াছে পাঠকেরা মনে করিতে পারেন।

† পরে ছাত্রগণের গুরুতর আপত্তিতে শনিবারে পড়ান ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আনারকলি

শ্রীইন্দ্রি দেবী চৌধুরাণী

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(দেওয়ান-ই-খাস, আকবর শাহের খাস দরবার।
ডান দিকে শূণ্য সিংহাসন। আশেপাশে সভাসদগণ। বাঁ-
দিকে অপেক্ষাকৃত সামনে যুবরাজ সেলিম ও রাজকবি
ফৈজী আসীন।)

ফৈজী। যাই বল, কাল কিন্তু জান্‌কী-বান্ধ আসর
মাত করে দিয়েছিল। একেই বলি নাচ গান। নইলে
চোঁচাতে আর হাত পা ছুঁড়তে কচি ছেলেও পারে—কি
বল হে শাহজাদা? কিন্তু এত রাত হয়েছিল যে (গা মোড়া-
মুড়ি দিয়া) এখনো যেন আমার আলিস্তি ভাঙছে না।

সেলিম। যা' বললে ভাই। দিনকে রাত আর রাতকে
দিন করা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও আমার যেন আজ চোখ
টেনে ধরছে। কিন্তু শাহেন-শার কড়া হুকুম, রোজ্ঞ এই
ইস্থলে হাজুরে-সই দিতেই হবে; তাই তাড়াতাড়ি চোখে
মুখে জল দিয়ে চলে এলুম।

ফৈজী। (ঘড়ি দেখিয়া) খুব যে তাড়াতাড়ি করেছ
—তা বলতে পারি নে। জাহাঁপনার আসবার সময় প্রায়
হয়ে এল—বারটা বাজে। একে ত কাল শুতে দেবী হ'ল,
তার উপর বাকি রাতটুকু কেবলি মাথায় ঘুরতে লাগল :

(গুন্ গুন্ করিয়া)

গরজত বরষত ভিগঁত আইলি,

তুহাঁরে মিলন—কা আপনে প্রেম পিয়রওয়া। (আরে হাঁ)
কি সুন্দর গান, আর কি মিষ্টি গলা। কেবল যদি তার
সঙ্গে চেহারাটির মিল থাকত। আমাদের জান্‌কী বান্ধ একটু
পশ্চিমে চলেছে—একটু মোটা হয়ে পড়েছে—না সেলিম?

সেলিম। তবু মরা হাতী লাগে টাকা! (হাসিয়া)
ভালই হয়েছে, নইলে তেমন তেমন একজন তাজা সুন্দরী
যদি সত্যি সত্যি বর্ষারাত্রে আমার ছুয়োরগোড়ায় এসে এই
গানটি গাইত, তা হলে তুমি কি করতে বলতে পারি নে—
আমি ত সব ছেড়ে ছুঁড়ে বিবাগী হয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে
পড়তুম।

ফৈজী। তা হলে সে বেচারী যে আশ্রয়ের আশায়
এসেছিল তাও পেত না। লাভের মধ্যে হু'জনকেই ভিজতে
হ'ত, আর আমাকে করুণস্থরে গাইতে হ'ত :

এ কাঁহা যাতে হো—ভিজোগে।

স্বথের বিষয়, গানের নায়িকা আজকালকার দিনে সশরীরে
এসে হাজির হয় না। আর এলে তাকে দিয়ে ফেলবার
মতও আমার কিছুই নেই—এক আমি নিজে ছাড়া। কিন্তু
মেয়েরা উপরি পাওনাটাই কিছু বেশী পছন্দ করে—কি বল
হে? এখানেই ত তোমাদের জিত—দেবারও যথেষ্ট আছে,
নেবারও লোক অনেক। কাজেই আমরা গরীব বেচারারা
মনের দুঃখে একলা ঘরে বসে বসে কবিতা লিখি।

সেলিম। অনেক আছে বটে, কিন্তু—লাখে ন মিল্ল
এক।

(বাস্তোত্তম সহকারে আকবর বাদশাহ ও মন্ত্রী
বীরবলের প্রবেশ এবং সভাস্থ সকলকে যথাযোগ্য
প্রত্যাবাদনান্তর স্ব স্ব স্থানে উপবেশন।)

আকবর। বীরবলজী, আজ কি জরুরী আরজি বেশী
কিছু আছে? কাল সারাদিন শিকারের পর প্রায় সারারাত
নাচগান চলেছে—তার উপর আজ আর স্নানাহারের
বেশী বেলা না করাই ভাল। বাদশাহদেরও মাঝে মাঝে
বিশ্রাম দরকার।

বীরবল। জাহাঁপনা, অর্থী প্রার্থীর অভাব কোনদিনই
হয় না; তবে বেশীর ভাগ আরজি কাল শুনেও চলতে
পারে। কেবল দেওয়ান মাধব রাও কাবুল থেকে যে জরুরী
চিঠি আর খাজনা পাঠিয়েছেন, সেগুলির ব্যবস্থা আজই
করা বিশেষ আবশ্যক।

আকবর। সে চিঠি পড়ে দেখেছ কি? কাল পর্যন্ত
তার জবাব অপেক্ষা করতে পারে না?

বীরবল। আজ্ঞে না, খোদাবন্দ; চিঠির সঙ্গে কিছু
জীবন্ত মালও পাঠিয়েছেন, যাকে ঠিক খাজনার সঙ্গে তোশা-
খানায় চালান দেওয়া যায় না।

আকবর। কি রকম মাল? মানুষ না জন্তু? পোষা
না বুনো?

বীরবল। জজুর, মানুষও বটে, জন্তুও বটে—অর্থাৎ
নারী। তবে একে যুবতী, তার সুন্দরী—সুতরাং পোষ
মানবে কি না, তা শেষ পর্যন্ত ঠিক বলতে পারি নে।

আকবর। বল কি বীরবল? তা এতক্ষণ তুমি এ
কথা আমাকে বল নি কেন? তাকে কি তুমি দেখেছ?
তাকে কোথায় রেখেছ?

বীরবল। জাহাঁপনা, আপনার কাছে যে যা পাঠায়,
সবই ত আগে আমার কাছে পেশ হয়ে তবে আপনার

দরবারে পৌছোয়। এ মেয়েটিকেও আমি দেখেছি। আর আমার এই বুড়ো চোখের সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করতে হয় ত সে অপূর্ণ সুন্দরী—তেমন সুন্দরী ইতিপূর্বে কখনও দিল্লী সহরে এসেছে কিনা সন্দেহ। আপনার হুকুমের অপেক্ষায় তাদের অন্তর মহলের সর্দার সাহেবের জিম্মায় রেখে এসেছি। এখন হজুরের কি আজ্ঞা হয়?

(সভাস্থলে চাকল্যের লক্ষণ প্রকাশ)

আকবর। তাঁর সঙ্গে আর কে কে আছে? পাঠাবার উদ্দেশ্যে মাধব রাও কিছু লিখেছেন?

বীরবল। লিখেছেন কাবুলের সহর-কোতোয়াল আর এক জন সখীসহ মুন্সী মুহিউদ্দিনের কন্যাকে তিনি দিল্লী দেখতে পাঠাচ্ছেন; তাকে আপনার অন্তরমহলে বেগম-সাহিবারা কুপাদুষ্টিতে রাখলে তাঁরা সুখী হবেন, আর আপনিও তাকে দেখে খুশি হবেন।

আকবর। তাদের তিন জনকেই তবে দরবারে ডেকে পাঠাও। দেখছি না তোমার কথা শুনে সবাই অধীর হয়ে পড়েছে—মেয়েরা হিংসায়, আর পুরুষরা আনন্দে।

(বীরবলের প্রস্থান)

সেলিম। জাহাঁপনা, চাঁদ উঠলে যে সমুদ্রের ঢেউ চঞ্চল হয়ে উঠবে, এটাও ত স্বাভাবিক।

আকবর। আর চাঁদ উঠলে যে তারার দল স্নান হয়ে পড়বে, এটাও ত স্বাভাবিক।

ফৈজী। শাহেন-শাহ সূর্যের মত চাঁদ তারা সকলকেই আপনার জ্যোতির অংশ বিতরণ করে তাদের স্ব স্ব কক্ষে চালিয়ে ও জালিয়ে রেখেছেন।

আকবর। সাবাস ফৈজী, কথাটা বেশ ঘুরিয়ে নিয়েছ, নইলে আর কিসের সভাকবি? কথার জাল ফেলে মাছুষ ধরাই ত তোমাদের পেশা। দেখ আবার নতুন আলোর ঝিলিক লেগে তোমার মনের মধ্যে নতুন কোন্ ভাবের ফোয়ারা খুলে যায়। কল্পনাকেও মাঝে মাঝে বালিয়ে নেওয়া চাই ত? নইলে রোজ যে সুন্দর মুখ দেখা যায়, নিত্য কি তাতে নেশা ধরে?

ফৈজী। হজুর ঠিক কথাই বলেছেন। আপনার মনুজ-চরিত্রের জ্ঞান যেমন সুস্থ, তেমনি গভীর।

আগে বীরবল, পরে লাল পেশোয়ার-ওড়না পরিহিতা আয়েষা, পরে সবুজ পেশোয়ার-ওড়না পরিহিতা রোশেনারা, শেষে ইলাহী বক্তার প্রবেশ। ষথাযোগ্য অভিবাদনান্তে আকবরের সামনে শেবোক্ত তিন জনে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। সেলিমের সামনে দিয়া বাইবার সময় আয়েষা মুহূর্তকাল ধমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দুই জনে পরস্পরের প্রতি

যে বিচ্যুতকটাক্ষ হানিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইল না।)

(সভাস্থলের আলোড়ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল)।

আকবর। আমার প্রিয় সুহৃৎ মাধব রাওয়ের পত্রের মর্ম অবগত হলাম। তোমাদের সকলকে দেখেও অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করলাম। পথে নির্বিঘ্নে এসেছ ত? কাবুল-রাজ্যের সব সুশল ত?

ইলাহী। (সেলায়পূর্বক) হজুরের রাজ্য সর্বত্রই নিরাপদ। দিনকতক হ'ল লাণ্ডিকোটাল থেকে একদল দস্যু কাবুল আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু বেটাদের আমরা এমনি শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি যে, সারা পথ আর কোন উপদ্রব করতে সাহস করে নি।

আকবর। সাবাস এই ত চাই। মাধব রাওয়ের যোগ্য হস্তে শাসন ভার দেওয়া অবশিষ্ট দুর্দান্ত সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত আছি। কেবল নিয়মিত সময়ে নিয়মিত খাজনাটি আসে, আর কখনও কখনও সেই সঙ্গে কিছু উপরিতাও হয়—যেমন আজ। বিবিজী, তোমরা বসো, কোন ভয় নেই। (উহারা বসিলে রোশেনারাকে নিরীক্ষণপূর্বক)—তোমাকে যেন ইতিপূর্বে দেখেছি মনে হচ্ছে?

রোশেনারা। (করজোড়ে) জাহাঁপনা, তিন বৎসর আগে নওরোজের কয় দিন আমি দিল্লীতে এসে বেগম ষোধবাজি সাহিবার মহলে ছিলুম। তাঁদের আদর স্বত্ত্ব আর সে সময়ের উৎসব-আনন্দ আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

আকবর। তোমার সখীও সে আনন্দে বঞ্চিত হবেন না। আর তিনিও আশা করি, মাঝে মাঝে আমাদের দেখা দেবেন। তাঁকে দেখাই যে নয়নের এক উৎসব। বোধ হয় মনোরঞ্জন-বিচ্যুত তাঁর কিছু কিছু জানা আছে?

রোশেনারা। হজুর, আমাদের গরীব কাবুল সহরে আপনাদের রাজধানীর বিলাসকলার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র কদাচ পৌছোয়। তবু আয়েষার গলা স্বভাবতঃ মিষ্টি বলে মুন্সীজী সাধ্যমত তাকে নিজের গান শিখিয়েছেন; আর দেওয়ানজীর বাড়ীর নাচের মজলিশে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, তাই দেখে সে একটু আদটু বা শিখেছে।

আকবর। বিবিজীর নাম তবে আয়েষা? তোমার নাম ত মনে হচ্ছে রোশেনারা।

ফৈজী। (জোড়হস্তে)—গোস্তাকি মাফ করেন ত বলি খোদাবন্দ, যে, এর নাম হওয়া উচিত ছিল আনারকলি। কেননা আনারের মতই এর গালেন,

টোঁটের, কাগড়ের রং ও রূপ, আনারকলির মতই ইনি লাজুক, নরম ও নবীন।

আকবর। (সহাস্ত্রে)—তা বেশ ত, নতুন জায়গায় এসে ওঁর নতুন নামকরণ হোক, অবশ্য যদি ওঁর তাতে কোন আপত্তি না থাকে। কি বল বিবিজী? আনারকলি নামটিও বড় মিষ্টি, আর সত্যিই ঠিক তোমার সঙ্গে খাপ খায়। দেখ, তোমাকে দেখে আমাদের সভাকরির ভাবের উচ্ছ্বাস এরই মধ্যে উঠলে উঠেছে।

ফৈজী। শুধু আমার একলার কেন হজুর, ওঁর শুভাগমনে ফুলদানির ফুলস্বন্ধ তাজা হয়ে উঠেছে, ঘরের আলোর রোশনাই বেড়ে গেছে, আর বাতাসে স্তবাস ভেসে আসছে। মানুষের মনের কথা আর কি বলব?

আকবর। ধীরে বন্ধু ধীরে, একেবারে অমন করে সব কবিতার মধু উজাড় করে ঢেলে দিও না। রোস, আগে চক্ষুর্কণের বিবাদভঞ্জন হোক। আনারকলি, তোমার নৃত্যগীতের একটু নমুনা পাব, এমন সৌভাগ্য কি আমাদের আজ হবে? না পথভ্রমে এখনও ক্লান্ত হয়ে রয়েছ?

আনারকলি। (উঠিয়া অভিবাদনপূর্বক)—হজুরের চূর্ণত দর্শনেই আমাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে, আর আপনার ইচ্ছামাত্রই আমাদের পক্ষে মহা মাজ্ঞ আদেশ। কিন্তু আপনাদের এই বিখ্যাত শহরের আমীর ওমরাহের চিত্ত-বিনোদন করতে পারি, এমন কোন শিক্ষাই আমি পাই নি। পাছে হাশ্রাস্পদ হতে হয়, সেই আমার ভয়।

আকবর। কোন ভয় নেই, আনারকলি, স্বন্দরের সর্বত্রই জয়। রোশেনারা, তোমার সখীকে অভয় দান কর। আর দেখ সেলিম, ষাঁ সাহেবের কাছ থেকে বাঁয়া তবলা ও ঘুঙুর আনিতে পাঠাও।

(সেলিম চোপদারকে হুকুম দিতে উঠিয়া গেল, পরে এমন স্থানে আসিয়া বসিল, যেখান হইতে আনারকলিকে ভাল করিয়া দেখা যায়।)

রোশেনারা। (জনান্তিকে)—আয়েবা, মনের জোর কর, দেখ যেন দিল্লীর কাছে কাবুলের মাথা নীচু না হয়। বাড়ীতে বাপমায়ের কাছে যেমন নিঃসঙ্কোচে নাচগান করত, সেই ভাব মনে আনবার চেষ্টা কর।

আনারকলি। (ঘুঙুর পরিতে পরিতে) সেই চেষ্টাই ত করছি, কিন্তু এরা বাপ মায়ের দেওয়া নামটা পর্যন্ত যখন ভুলিয়ে দিলে, তখন মাথার ঠিক রাখা মুশকিল। যাক, যা জানি তাই ত করি, তারপর কপালে যা আছে তাই হবে।

(ফুলদানি হইতে একটি লাল গোলাপ তুলিয়া লইয়া নাচ ও গান)

মাকি লিয়ে সাগরে হৃৎকো বু হৈ,
কিসি মুস্তকী আনে কি আরজু হৈ।
গুলিস্তা সে থাকে হর গুল কো দেখাওয়ে,
ন তেরে এয়সে রঙ, ন তেরে এয়সে বু হৈ।

(নৃত্য অন্তে আনারকলি বাদশাহকে অভিবাদন-পূর্বক তাঁহার সামনে ছোড়হস্তে দাঁড়াইলে পর কিছুক্ষণ সভাগৃহ নিস্তব্ধ রহিল, পরে বাহবা ধ্বনির চোটে ভাঙিয়া পড়িল)

আকবর। আনারকলি, তুমি শুধু ওস্তাদী ঢঙই শেখ নি, তাদের ছলাকলাও কিছু কিছু শিখেছ, নইলে এই স্বন্দর নাচ দেখাতে এত বিনয় করছিলে? তোমার নাচের ভঙ্গীতে এখনও ছেলেমানুষি ভাব আছে, সেটা ভালই লাগে। কিন্তু জানকী বাদ্যের কাছে আর বছরখানেক তালিম দিলে পর তুমি তাকেও হারিয়ে দেবে, তা এখন থেকেই বুঝতে পারছি। আজ তুমি আমাদের যে আনন্দ দিলে, তার বক্শিশ স্বরূপ এই চূণীর কণ্ঠি আর এই পান নাও, লালে লাল মিলবে ভাল।

ইন্ লবে নাজুক পে সুরখি পানকি আনে ত দেও।

কোড়ি কোড়ি বিকে যাবে বুদঝাঁকে চুণি ॥

এখন যাও বিশ্রাম করগে। নইলে—বাদশাহজ্বক কবি বনে গেলে রাজকার্য্য চলা দায় হবে। মেহের উম্মিয়া, বোধবাঈ সাহিবর কাছে মেয়েদের পৌছে দিয়ে তাঁকে বলো যে আমি পরে গিয়ে তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। কোতোয়াল সাহেবেরও অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিও।

(একজন বর্ষীয়সী রমণীর কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নভাবে আয়েষাদের লইয়া প্রস্থান।)

এবার তবে আমরা সভাভঙ্গ করি। বেলা যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু যে কারণে শীত ছুটি পেলুম না, তাতে বোধ হয় কারোই আপত্তি হয় নি।

(দলবলসহ প্রস্থান। ক্রমে ক্রমে সভাভঙ্গ।)

ফৈজী। কি শাহাজাদা, এত গোলমাল সোর সরাবতের মধ্যে তুমি চুপ করে রইলে যে? কেমন দেখলে বল; মনে ধরে?

সেলিম। (আবিষ্টভাবে)—আমার গানের নায়িকা সশরীরে দেখা দিয়েছেন, আজ আমি ধন্য। (আনারকলির হস্তচ্যুত গোলাপ কুড়াইয়া লইলেন।)

ফৈজী। আমাকে যা বলেছ বলেছ, অপরের কাছে কিন্তু এ রকম মনের কথা বেশী বলো না। জান ত দিল্লী

শহরে “প্রেম কি করানা সহেল বড়ানা” নয়। বাড়াবাড়ি করলে শরীরে অন্যত্র যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

(হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।)

২য় দৃশ্য

(জ্যোৎস্নালোকিত অন্তঃপুর—উত্তানের নিরালা স্থানে শ্বেত পাথরের ফোয়ারা। দূরে সানাইয়ে মৃদুস্বরে বেহাগ রাগিণী বাজিতেছে। এক দিক থেকে সেলিম, অপর দিক থেকে মেহের উম্মিসার প্রবেশ, এবং মুকাভিনয়ে প্রকাশ যেন সেলিম তাহাকে বলিতেছে প্রাসাদ হইতে কাহাকে সেখানে ডাকিয়া আনিতে; সে যেন প্রথমে নারাজ ভাব দেখাইল, পরে সেলিমের গলার স্বর্ণহারের প্রলোভন দেখাইবার পর নিমরাজীভাবে চলিয়া গেল। সেলিম ওঠা বসি, ধমকিয়া দাঁড়ানো, পায়চারি করা প্রভৃতি নানারূপে উৎকর্ষ প্রকাশ করিল, পরে—)

সেলিম। (বসিয়া পড়িয়া)—সে কি মনে করবে? সে কি আসবে? সে কি ভালবাসবে? (গুন গুন করিয়া গান)

বেহাগখাওয়াজ

আওয়ে বলমরাজ

বিন দেখে নহি পড়ত চৈন

সাগরি রয়ন মোহে তড়গত শুজরি,

পলক ন লাগি সারি রাত।

চাঁদ পিয়া বিন নিদ ন আওয়ে,

চুক পড়ি জনি তরঙ্গাউ।

(আবার উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে)—এমন অধীর আমি ত আর কখনো হই নি। এ কি নূতনের মোহ, না রূপের নেশা, না প্রথম প্রেমের কুহক-মায়া? যে শাহজাদার একটি কুপাকটাক্ষলাভের জন্ত শত শত রমণী ভিখারিণী; সে কি না একজন সামান্য প্রজার মত একটি অপরিচিতা বালিকার প্রতীক্ষায় দীনভাবে দণ্ডায়মান। যার দর্শন-মাত্রেই আমি এমন আত্মহারা হয়েছি, সে কি আমার এ প্রেমের প্রতিদান না দিয়ে থাকতে পারবে?

(দূরে মেহের-উম্মিসার সঙ্গে আনারকলিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেলিম এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। মেহের উম্মিসা চুপি চুপি কি বলিয়া মাঝপথ হইতে ফিরিয়া গেল। আনারকলি একলা একটু অগ্রসর হইতেই সেলিমকে দেখিয়া সলজ্জভাবে গম্মনোচ্চত হইল।)

সেলিম। (অগ্রসর হইয়া গান)

ঠাড়ি রহে ঘেরে আঁধন আগে

(আনারকলি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল)

সেলিম। আনারকলি, জান আমি কে?

আনার। (কম্পিত কণ্ঠে) জানি। শাহজাদা।

সেলিম। এস, আমরা দু'জনে এখানে বসি। (তথা-করণ)। তোমাকে ডেকে এনেছি বলে ভয় করছে?

আনার। (অপেক্ষাকৃত ভরসাসহ) আফগান-রমণী ভয় কাকে বলে জানে না।

সেলিম। কাল নাচের আগে ভয় করে নি?

আনার। কাল ছিলুম বালিকা। আজ আমি রমণী।

সেলিম। এ পরিবর্তন হঠাৎ কিসে হ'ল? কি করে বুঝলে?

আনার। কিসে হ'ল জানি নে; কিন্তু মনে বুঝছি, প্রাণে বুঝছি; সারা দেহে, সারা হুনিয়ায় বুঝছি।

সেলিম। তোমার কথা যেন আমার কানে গানের মত লাগছে। ঐ কথাই গান গেয়ে বলতে পার?

আনার। পারি, কিন্তু লজ্জা করে।

সেলিম। কিসের লজ্জা? এখানে আমি আর এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনী ছাড়া কেউ তোমার মনের কথা শুনতে পাবে না। তুমি নির্ভয়ে গাও, আমিও নিঃশব্দে শুনি।

আনার। (গান)

আজি হরষ সরসে কি জোয়ারা

প্রাণমে না মিলত কুল কিনারা।

গাও গাও সখি গৌরবন্ধিত,

লীলাচপল রাগ ললিত ললিত।

কোকিল পঞ্চম করণ কানোড়া,

গাও গাও মৃদু মধুর মল্লার।

সরম কি বন্ধন খোলহ খোল,

মরম কি পাল তোলাহুতোল,

প্রেমপবনমে ছোড়হ তরণী,

ভাসি চলি আও প্রাণমে হমারা।

সেলিম। (কিয়ৎক্ষণ পরে) আনারকলি!

আনার। হজুর!

সেলিম। তোমার কাছে আমি হজুর নই, শুধু সেলিম। তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

আনার। মা বাপ ভাই বন্ধু—সকলেই আছেন।

সেলিম। বন্ধু ছাড়া, বন্ধুর বাড়া কেউ নেই?

আনার। আজ্ঞে না, হজুর!

সেলিম। আবার হজুর? বল সেলিম!

আনার। আর কেউ নেই, সেলিম সাহেব।

সেলিম। তুমি বলতে চাও তোমাদের দেশে এমন কোন ভাগ্যবান বীরপুরুষ নেই যার জিন্মায় তোমার হৃদয়খানি রেখে এসেছে?

আনার। আমার হৃদয় পিছিয়ে পড়ে নেই, তাকে আমার দূতস্বরূপ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি হুজুর—সেলিম।

সেলিম। (হাসিয়া) তবে তুমি হৃদয়হীন?

আনার। (হাসিয়া) আমার এক সখী বলতেন, হৃদয়ের বদলে আমার বুকে একটা পাথর বসানো আছে।

সেলিম। পাথরও ত দামী হয়।

আনার। আমরা গরীব মানুষ, দামী পাথরের কি বুঝি?

সেলিম। যদি আমি বুঝিয়ে দিই? দেখি তোমার হাত (হাত বাড়াইয়া)।

আনার। হাতের সঙ্গে হৃদয়ের কি সম্বন্ধ?

সেলিম। হাতের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। দেখেই না পরীক্ষা করে।

(আনার তাহার হাতে হাত রাখিলে সেলিম নিজের আঙুল হইতে খুলিয়া চুণীর আংটি পরাইয়া) এই আংটি যখন দেখবে, তখন আমাকে মনে পড়বে। এখন সম্বন্ধটা বুঝলে ত?

আনার। বুঝলুম। কিন্তু আমার কোন স্মরণচিত্রের দরকার নেই।

সেলিম। আনার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

আনার। আদেশ করুন।

সেলিম। তোমার হৃদয়-দূত কি নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়েছিল, না এই আংটির মালিকের কাছে পাঠিয়েছিলে?

আনার। (নিরুত্তর)

সেলিম। তুমি ত তাকে কখনো দেখ নি; চিনলে কি করে?

আনার। ছবিতে দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি।

সেলিম। স্বপ্ন ভাল, না সত্য ভাল?

আনার। এক এক সময় মনে হয় আমার স্বপ্নই ভাল ছিল; কেননা তার সঙ্গে ছিল আশা।

সেলিম। আর সত্যের সঙ্গে কি আছে?

আনার। হয় দুরাশা; কিংবা নিরাশা, কে জানে!

সেলিম। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না, আনার আমার?

আনার। তোমাকে বিশ্বাস করেই ত বাপ মা, বাড়ী-ঘর, দেশ সব এক মুহূর্ত্তে ফেলে চলে এসেছি।

সেলিম। তবে কাকে সন্দেহ কর?

আনার। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদভরা লোক, এই প্রচণ্ড রাজদণ্ড, এই গোপন মন্ত্রণা, সবকিছুকেই।

সেলিম। তুমি এরই মধ্যে রাজপ্রাসাদের কি কুটিলতা জটিলতা দেখলে বল ত? তোমাকে কি কেউ অনাদর

করেছে? তোমাকে কি কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারে?

আনার। না, আমাকে কেউ কিছু বলে নি। আর বেগম সাহিবাও আমাকে যথেষ্ট যত্ন করেন। আমি খুব সুখেই আছি। কিন্তু এখানকার দেওয়ালগুলো যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়, এখানকার মানুষের মুখের হাসি-কথা আমাদের দেশের সরল হাসিকথা নয়, সেটুকু একদিনেই বুঝতে পেরেছি।

সেলিম। তবে তুমি সত্যি বালিকা নও। কিন্তু আনার, আমিও বালক নই। এই আংটি পরিয়ে তোমার হাতে হাত রেখে শপথ করে বলছি—

আনার। সেলিম, শপথে কাজ কি? আজ থাক, আর একদিন হবে। আজ আমার জীবনের সর্বপ্রথম পর্বদিন, আজ কেবল আশা, কেবল আনন্দ, কেবল প্রেমের কথাই হোক। হয়ত বেশী কথা বলবার সময় পাওয়া যাবে না। আজ আমার মনে হচ্ছে; অগর্ বেহস্ত অনন্ড জমীনন্তু হমিনন্তু ও হমিনন্তু ও হমিনন্তু।

সেলিম। তবে বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করে আর একটা গান গাও, আমার বেহস্তের হরী।

আনার। কি গাইব? তোমাদের সর্বদা মজলিশী গান শোনা অভ্যাস; আমাদের পাহাড়ী গান কি তার মত হবে?

সেলিম। তার মত নয় বলেই ত শুনতে এত ভাল-বাসি। তোমাদের দেশের গজল গাও। কিছুক্ষণের জগ্ন ভুলিয়ে দাও যে আমি দিল্লীর শাহাজাদা, যে আমার সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, জীবনের প্রত্যেক কাজের উপর সহস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ—যে আমার ভবিষ্যৎ গ্রাস করবার জগ্ন শূত্র সিংহাসন ইঁ করে রয়েছে।

আনার। গান

কেরামুলীমে দিল হারে, সনম জানে কি হাম জানে।
বিছি হায় ইশ্ককি চৌসার, লগি হায় জানকি বাজি,
পড়া হায় চশমকা পাশা, সনম জানে কি হাম জানে।
লগি হায় ইশ্ককি বৈড়হি, দিল্ মৈ ইয়ারে কেউকর।
কলিঙ্গা হায় জলতা হায়, সনম জানে কি হাম জানে।
ইধর পানি ধরখতা হায়, উধর বিজলী চমকতি হায়,
একেলি দম্ উলজতা হায়, সনম জানে কি হাম জানে।

(দূর হইতে মেহের-উল্লিসা একটু গলার ইঙ্গিত করিল)

সেলিম। (হাসিয়া) এরই মধ্যে অনন্ডের দূতী এসে হাজির? যাও তবে। কিন্তু বাবার আগে আমার আংটির বদলে তোমার মাথার ঐ গোলাপ ফুলটি আমায় দিয়ে যাও আনার (আনারের তথাকরণ)—আর শপথ করে বলে

যাও যে তুমি রোজ ঠিক এই সময়ে এই ফোয়ারার কাছে এসে আমার জন্তে বসে থাকবে। আসবে ত নিশ্চয় আনার—আমার।

আনার। হাঁ, আসব নিশ্চয় সেলিম—সনম্।

(ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান)।

৩য় দৃশ্য

(বেগম ষোধবান্দিয়ের মহল। উপযুক্ত গৃহসজ্জা, মহামূল্য আস্তরাদি। আনারকলি তাঁহার পদসেবা করিতেছে। সামনের দিকে রোশেনারা একদল মেয়ের সহিত ফুলের মালা গাঁথিতেছে। অন্য একদল জরির কাজ করিতেছে।)

ষোধবান্দি। থাক আনারকলি, হয়েছে। সেই কখন থেকে পায়ে হাত বুলোচ্ছ, হাত ব্যথা হয়ে যাবে যে! তোমার হাতটি কিন্তু বেশ নরম, গায়ে দিলে আরাম হয়। যাও ওদের সঙ্গে না হয় ফুলের মালা গাঁথ গে।

আনার। (উঠিয়া রোশেনারার কাছে গিয়া)—তোরা কি করছিস ভাই?

রোশেনারা। এই এরা বলছে, আমাদের দেশের মত করে মালা গাঁথতে, কিন্তু আমার ঠিক হচ্ছে না। তোর মনে আছে ভাই?

আনার। আছে বই কি। আমাদের নানা রকম বিনি স্তোর হার করে। দেখি?

প্রথমা। তোদের দেশে কি স্ততো পাওয়া যায় না? তবে সেলাই কিসে হয়?

আনার। হ্যাঁ, এক রকম মোটা রঙীন স্ততো তৈরি হয়, তাই দিয়েই সব কাজ চলে।

দ্বিতীয়া। শুনলি ভাই, ওরা নাকি শুধু স্ততো দিয়েই সেলাই করে। (হাসিয়া) কেন, সেখানে বুঝি জরি টরি তৈরি হয় না?

আনার। আমাদের গরীব দেশে জরি করেই বা কে, পরেই বা কে? তাই ত তোমাদের কাছে জরির কাজ শিখতে এসেছি।

দ্বিতীয়া। সেদিন বেরকম সেজেগুজে খাস দরবারে নাচলে গাইলে, তাতে শিক্ষার কিছু বাকি আছে বলে ত বোধ হয় না, কি বল জ্বনাব?

প্রথমা। হ্যাঁ, আমাদের লজ্জাশিক্ষা পাঁচ বছর বয়সে আরম্ভ হয়, কাজেই চিরজীবন সেটা মনে থাকে। তবে ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রথা।

তৃতীয়া। কিন্তু যাই বল ভাই, মেয়েমানুষের একটু

লজ্জাসরম থাকা ভাল। পুরুষ মানুষের সামনে ঐ বেহায়া-পনাগুলো আমি ছ' চক্ষে দেখতে পারি নে।

রোশেনারা। কেন, কিসে তোমরা আমাদের এত নির্লজ্জ ঠাওরালে বল ত?

তৃতীয়া। তোমাকে ত কিছু বলছি নে বোন। তুমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে কেন?

আনার। (ক্ষুব্ধভাবে)—কি করব, শাহেনশা আদেশ করলেন, কাজেই যা জানি তাই করতে হ'ল।

দ্বিতীয়া। আহা! যেন কচি খুকীটি! তবে মায়ের কোল ছেড়ে এত দূরে এলে কেন? আমরা কিন্তু ভাই অমন কলের পুতুল নই, যে দম দিলেই ঘুরব। তার চেয়ে আসল কথাটা বলেই ফেল না কেন, একঘর পুরুষ মানুষের সামনে রূপের ঠমক দেখাবার লোভ সামলাতে পারেনি?

প্রথমা। আঃ, কেন ভাই ছেলেমানুষকে জ্বালাতন করিস? এখন গিয়ে বেগমসাহিবার কানে কথাটা তুলে দিয়ে সকলকে বকুনি খাওয়াবে খন।

আনার। (উঠিয়া সেলায়ের দলের কাছে গিয়া)—আমাকে জরির কাজ শেখাবে ভাই?

এক জন। আর শিখে কাজ নেই, যা বিচ্ছে আছে তাই যথেষ্ট। এমনিতেই বলে রূপের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, তার উপর—

আনার। (হাসিয়া)—আমার আবার দেমাক দেখলে কিসে?

অপর। কেন, সারাদিনই ত আয়নায় মুখ দেখছ, দেখতে পাই। আমরা ত আর চোখ বুজে থাকি নে, কানও খোলা রাখি। তবে মুখটা বন্ধ রাখাই ভাল।—বড়লোকের কথায় গরীবের কাজ কি?

আনার। তোমাদের যে ভাই চারিদিকেই আয়না, মুখ না দেখে উপায় কি বল? ক্রমাগত নিজের ছায়া দেখতে দেখতে এক এক বার যেন আমার বিরক্ত ধরে যায় সত্যি!

প্রথম জন। দেখ আনারকলি, তোমার ভালর জন্তই বলছি; তুমি নতুন এসেছ, কিছু জান না, তাই মান না। আমাদের দেখতে ত কিছু বাকি নেই; অমন কত এসেছে, কত গেছে, কিন্তু আমরা রয়েই গেছি। সাবধান হয়ে চলো, নইলে মহা বিপদে পড়বে।

(আনারকলি অস্থিরভাবে এক কোণে একলা গিয়া বসিল। সাকিনা বেগমের প্রবেশ)

ষোধবান্দি। এই যে সাকিনা, এস আমার কাছে এইখানে বস। (তথাকরণ) তোমাদের সেই বাদীটার

অবশেষে কি হ'ল বল দেখি? এই গোলকধাঁধার মধ্যে কেন যে ঐ কচি কচি স্নন্দর মেয়েগুলোকে পাঠায়, তাই ভাবি। আমরাই বা কতদিকে নজর রাখি বল?

(আনারকলির উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ)

সাকিনা। আর হবে কি দিদি,—যা হয়ে থাকে, তাই। আজ সকালে সন্দারনী তাকে ডাকতে গিয়ে দেখে, সে কাঠ হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। মেয়েটা মরে বাঁচল; নইলে তার কপালে আরও কত লাঞ্ছনাভোগ ছিল, তা কে বলতে পারে? তার বুড়া বাপ মা ভোরবেলা থেকে অন্দরমহলের খিড়কি-দুয়ারে এসে এমন কান্না জুড়ে দিয়েছিল যে, সারাদিন মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে তাই তোমার কাছে একটু বেড়াতে এলাম। (আনারকলিকে দেখিয়া) এটি যে নতুন মুখ দেখছি?

যোধবান্ধি। ই্যা, কাবুল থেকে দেওয়ান মাধব রাও ওকে দিল্লী দেখতে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি সুলীলা বলেই ত বোধ হয়। ওর উপর আমাদের রূপাদৃষ্টি রাখতে তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন।

সাকিনা। তা ত রাখব দিদি, কিন্তু দৃষ্টি যে অনেক রকমের আছে। ও দিল্লী দেখবে, না দিল্লী ওকে দেখবে, তাই ভাবছি। (হাসিয়া) যে দেখবে সেও পস্তাবে, যে না দেখবে সেও পস্তাবে।

যোধবান্ধি। (হাসিয়া) ঠিক বলেছ ভাই। রূপ বড় জালা। যেমন জলে, তেমনি জালায়। আমার এ আবার এক কাঁটা হয়েছে। এখন মা-বাপের গচ্ছিত ধন মা-বাপের হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিতে পারলে বাচি। আনারকলি! . .

আনারকলি। (কাছে আসিয়া) জী হজুর।

যোধবান্ধি। ইনি আমার বোন সাকিনা বেগম, আদাব কর। (তথাকরণ)

সাকিনা। যেমন মিষ্টি নাম, তেমনি মিষ্টি মুখ।

যোধবান্ধি। নামটি আমাদের দেওয়া, কিন্তু মুখটি ওর পৈতৃক সম্পত্তি।

সাকিনা। আর কিছু সম্পত্তি আছে?

যোধবান্ধি। বোধ হয় না। সে খোঁজ নেবার দরকারও নেই। তবে অনেক গুণ আছে; বেশ নাচতে গাইতে পারে।

সাকিনা। সত্যি নাকি? কৈ, আমাকে একটি গান গেয়ে শোনাও দেখি?

আনার। হজুরাণীর মেহেরবাণী।

গান

জয়া ওয়াসল্ পর হো ইসারা তোমারা,
অভি ফয়সলা মামলা হমারা তোমারা।
শুনি হৈ আওর কিসীকে চাতে হৈ
ও দুশমন হমারা পেয়ারা তোমারা।

সাকিনা। আঁহা, গলাটিও যেন মধুঢালা। এরকম গান সারারাত বসে শোনা যায়। আশীর্বাদ করি যেন এমন বরের হাতে পড়, যে আমারই মত গান শুনতে ভালবাসে। কিন্তু এখানে কাউকে ঘেন ইসারা টিশারা করো না, বুঝলে? তা হলে তুমিও বিপদে পড়বে, আর আমরাও লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না, কি বল দিদি? যোধবান্ধি। বয়সটা যে বড় খারাপ সাকিনা, হাজার বোঝালেও বোঝে কৈ? ও জয়নাব, আজ সন্ধ্যাটা কি এই রকম চুপচাপ ভাবেই কাটিয়ে দিবি? নাচগান কিছু হবে না? কাবুলের কাছে দিল্লীকে হার মানতে হবে নাকি?

জয়নাব। আমরা ত হেরেই আছি; সেকথা পাঁচ-জনের কাছে জাহির করে, লাভ কি?

যোধবান্ধি। অমনি তোদের অভিমান হ'ল বুঝি? ছিঃ; ওরা ছ'দিনের অন্ত্রে বেড়াতে এসেছে, ওদের সঙ্গে কোথায় তোরা খুশিমনে মিলে মিশে আনন্দ আহ্লাদ করবি, না রেঘাচেরি রাগারাগি করছিস? নে, তোদের মালাগাঁথা ফুলতোলা রেখে, সেদিন মীরাবান্ধিয়ের যে নতুন গানটা শিখলি, সবাই মিলে একবার ভাও বাৎলে গা' দেবি? যতই দরবারী ওস্তাদী গান হোক না কেন, আমার কানে ভজনের মত অমন মিষ্টি আর কিছুই লাগে না, তা বলছি বাপু। গা' তোরা।

মেয়েরা সম্বরে।

গান

শুনি ময় হরি আওন কি আওয়াজ।
মহল চড়ি চড়ি বাঁউ মোরে সজনী, কর আওয়ে মহারাজ।
দাহুর মোর পপিহা বোলৈ,
কোয়েলা মধুরে সাজ।
বরখে মেহরওয়া, মেহা বোলৈ,
দামিন্ ছোড়ি লাজ।
ধরতি রূপা নওবা নওবা ধরিয়া,
গিন্না মিলনকি কাজ।
মীরা কি চিত ধীরা ন মানে,
বেশি আয়ো মহারাজ।

৪র্থ দৃশ্য

(দেওয়ান-ই-আম, আকবর শাহের আয় দরবার।
আকবর ও বীরবল আসীন। দরবারগৃহ বিশেষ উৎসব-

জ্ঞান সজ্জিত। কিংখাব ও মধ্যমলের আন্তরণ এবং পর্দা, পারস্ত দেশের গালিচা, বোখারার পটবস্ত্র, স্বর্ণ রৌপ্য জহরৎ খচিত পাত্র, ফুল এবং আতর গোলাপজলের ছড়াছড়ি, হয়লাপ।)

আকবর। কি বীরবলজী, এমন আনন্দ-সম্ভার তোমাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন? ঘরে কিছু তক্রার হয়েছে না কি? বল ত আমি মিটিয়ে ফেলি।

বীরবল। জাহাঁপনা, ঘরে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে বটে, কিন্তু সে আমার ঘরে নয়, আপনার ঘরে। কাজেই ভাবনাটা আমার কিছু বেশী।

আকবর। আমারই ঘরে গোলযোগ, অথচ আমি সে বিষয় কিছু জানবার আগেই তুমি জ্ঞেনেছ—এ কি কখনও হতে পারে মন্ত্রীজী? আমি কি এতই অন্ধ, এতই অলস, এমনই বিলাসী?

বীরবল। শাহেনশার কর্ণকুশলতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হিন্দুস্থানের সর্বত্র বিখ্যাত। কিন্তু অনেক সময় বাইরের বড় বড় জিনিষ দেখতে দেখতে ঘরের ছোটখাটো জিনিষ চোখে পড়ে না। সেই জন্তই ঘরের ভার পুরুষরা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে।

আকবর। (বাস্তবাবে) কৈ, যোধবাস্তি আমাকে সম্প্রতি কোন হুংসংবাদ দিয়েছেন বলে ত মনে করতে পারছি নে?

বীরবল। খোদাবন্দ মেয়েরা মেয়েদের উপর দৃষ্টি রাখবার যত সুবিধে পান, বড় বড় ছেলেদের উপর—

আকবর। বড় ছেলে? তবে কি সেলিম কোন গোলমাল করেছে বলতে চাও? হতেই পারে না! সেলিম আমার সেরকম ছেলেই নয়; তার উপর আমিও তাকে কড়া রাশে মানুষ করছি।

বীরবল। হজুর, রাশ হাজার কড়া হলেও তেমন তেমন তেজী ঘোড়াকে সব সময়ে বাগ মানাতে পারে না। মনে রাখবেন, শাহাজাদা আর এখন বালক নয়।

আকবর। বালক ভিন্ন আর তাকে কি বলব বল? নারাদিন ত বাইরে বাইরে সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদ নিয়ে মেতে থাকে, বিষয়কর্মে মোটে মন দেওয়াতে পারি নে। যেন ইস্কুল পালাতে পারলে বাঁচে। তার পর সেদিন পারস্ত-রাজ্যের একমাত্র কন্টার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ এসেছিল, সে একবার মেয়েটিকে দেখতে যেতে পর্য্যন্ত রাজী হ'ল না; যদিচ লোকে বলে তার তুল্য রূপসী হিন্দুস্থানে নেই। এতে কি পাকা বুদ্ধির প্রমাণ হয়?

বীরবল। হয়ত শাহাজাদা হাতের কাছে মনোমত

রূপসী পেয়ে থাকবেন হজুর। ঋব ছেড়ে অঞ্চবেন না যাওয়াই ত বুদ্ধিমানের কাজ।

আকবর। হাতের কাছে ত চিরদিনই রূপের রোশ-নাই বাধা রয়েছে, কিন্তু কখনও ত তাকে হু'দগের বেশী সেদিকে ফিরে তাকাতে দেখি নি। আজ হঠাৎ কি হ'ল?

বীরবল। এসব জিনিষ হঠাৎই হয় জাহাঁপনা—অক্ষণে বা কক্ষণে। এখন বুঝতে পারছি, আমরা এতদিন হু'দ দিয়ে সাপ পুষেছি।

আকবর। বিষদাত তুলে ফেলতে কতক্ষণ? কিন্তু এ সাপিনীটি কে?

বীরবল। যত সহজ মনে করছেন, তত নয়। সেটি আমাদের নবীনা অতিথি।

আকবর। কে, আনারকলি? (উত্তেজিত)—গ্যা? অসম্ভব! সে যে নিতান্ত বালিকা! সে ত সারাদিনই অন্তরমহলে যোধবাস্তির কাছে থাকে শুনি।

বীরবল। সারাদিন সেখানে থাকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টাখানেক অন্তঃপুর-উদ্যানের ফোয়ারার কাছে বসে থাকে এবং একলা থাকে না—একথা আমি বিশ্বস্ত-স্বত্রে অবগত হয়েছি।

আকবর। দেখ বীরবলজী, আমরা আজীবন রাজ-প্রাণাদের দূষিত হাওয়ায় বাস করে মানুষকে কেবল সন্দেহ করতেই শিখেছি, বিশ্বাস করতে শিখি নি। আনারকলি একে সরলা বালিকা, তার উপর বন্ধুপ্রেরিত শরণাগত অতিথি—তার নামে হঠাৎ একটা কুংসিত অপবাদ দেবার আগে ভাল করে অহুসন্ধান করা কর্তব্য কথাটা সত্য কি মিথ্যা।

বীরবল। হজুর, মন্ত্রণা দেওয়াই আমার ব্যবসা; এই করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলুম। আমি কি আমার কর্তব্য জানি নে, না হজুরকে ছেলেমানুষ পেয়েছি, যে জুজুর ভয় দেখাব? স্বয়ং অন্তরমহলের সর্দারই আমার সংবাদদাতা। বলেন ত আমার সাক্ষীসাব্দ তলব করি—

আকবর। (অস্থির ভাবে)—না, না, না, আজ থাক, আর এক দিন হবে। এখনি সব লোকজন এসে পড়বে। আজকের দিনের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।

বীরবল। হজুর, রাজ্যের মজল-অমজল আমার সকলের আগে দেখতে হবে, তাই এই অসময়েও অপ্রিয় কথাটা তুলতে হ'ল, ক্ষমা করবেন। আজ আর কিছু বলব না, কেবল এই বিনীত নিবেদনটুকু করছি যে, নাচগানের সময় আনারকলির উপর আপনি একটু বিশেষ নজর রাখবেন।

(একে একে অতিথি-অভাগতদের প্রবেশ ও যথোচিত অভিবাদনান্তে গালিচায় উপবেশন। বথাসময়ে নহবৎ

বাজিয়া উঠিলে গায়িকার দল সহ আনারকলি ও রোশেনারার প্রবেশ এবং সিংহাসনের বামপার্শ্বে উপবেশন। সেলিম, ফৈজী প্রভৃতি রাজপরিষদবর্গ সত্ৰাটের দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া বসিল। রাজকর্মচারিগণ আত্মর গোলাব তাহুলাদি বিতরণ করিতে লাগিল। নহবৎ থামিলে পর গায়িকার দল উঠিয়া বাদশার সিংহাসনের সামনে আসিয়া সঙ্গতসহ সজ্জী মোবারকবাদী গান ধরিল।)

সমস্বরে গায়িকাগণ। গান

সুপ্রই কানাড়া—রাঁপতাল

শুভ খড়ি শুভ দিন মুহুরত
বৈঠে তখত আজ দিলীপতি নর রে।
আচল কুরানী ধরি, চহ চক ছব ছাড়া,
নগ মোতি নগ হীরা ছত্রে জড়ে হ'।
হমায়ু'কি নন্দন, চর যুগ জীব,
শাহানকে বাদশাহে আকবর রে।

(সভাস্থ লোকের বাহবা ধ্বনি করণান্তর কথার গুঞ্জন আরম্ভ। পরে বাদশা কথা কহিবামাত্র সকলে নিশুন্ম হইল।)

আকবর। বাহবা! বেশ, সুন্দর গান করেছ। মিত্রা তানসেনের শিক্ষা দেখছি বুধায় যায় নি। আনারকলি, এবার তোমার পালা। জান্‌কী বাদ্‌য়েব কাছে মাসথানেক তামিল দেবার পর কি রকম উন্নতি তোমার হয়েছে, আজ উৎসব-রজনীতে এই সমবেত সমঝদারদের সামনে তার পরিচয় দাও। দেখি শাগরেদ কেমন ওস্তাদের মান রাখে।

(আনারকলি ধীরে ধীরে উঠিয়া সলজ্জ ভাবে বাদশাহের সামনে আসিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইল, পরে একটু ভাবিয়া নিম্নলিখিত গানসহ সুন্দর নৃত্য স্বরূপ করিল।)

আনারকলি। নৃত্যসহ গীত

শুকবেলাওল—রাঁপতাল

শওরে মিলন দা, চাওয়ে নি স'ইয়ো ময়নো,
তেরে মিলন দা চাওয়ে নি স'ইয়ো (হাঁ)।
সোনি সোনি, হুরত, মন পরবশ র ইয়ো।
নয়নো কি তপত বুখাওয়ে উনিদা (হাঁ)।
যো লিখা সোই পায়া নি স'ইয়ো।
কহে রঙ্গীরাম, রঙ্গী মাঝে বনোরা।
নয়নো কি তপত বুখাওয়ে উনিদা (হাঁ)।

(নাচিতে নাচিতে যখন সেলিমের সামনে আসিয়া পড়িল, তখন আনারকলি মুহুর্তের জন্ত তার দিকে চোখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল; সেলিমও তত্বেতচ। হু'জনের এই গোপন দৃষ্টি ও হাস্যবিনিময় পার্শ্বস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাদশাহের নজরে পড়িল। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া ক্রকুটি-পূর্বক অনাস্তিকে বীরবলকে কিছু বলিলেন, তাহাতে সে

হস্তের ইঙ্গিতে বাজ্ঞনদারদিগকে নিবৃত্ত করিল। হঠাৎ বাজ্ঞনা থামিয়া যাওয়ায় আনারকলি অপ্রস্তুতভাবে নাচ থামাইয়া 'ন যবো ন তহো' রূপে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। শাহাজাদাও পিতা এবং বীরবলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রমাদ গণিলেন। সভাস্থলে চাকল্য।)

বীরবল। অমাত্যগণ ও বন্ধুবর্গ, শাহেন শা কয়দিন অনবরত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থেকে বিশ্রামের অভাবে আজ হঠাৎ কিছু অস্বস্থ বোধ করছেন। তাই তিনি আমাকে আপনাদের জানাতে বললেন যে, আজকের উৎসব এখন স্থগিত রইল। তিনি আশা করেন যে, শীঘ্রই এই আনন্দরজনীর অসম্পূর্ণ অহুষ্ঠান সম্পূর্ণ করা হবে, এবং সেদিন তিনি নিষ্কটকরূপে আপনাদের সঙ্গস্থ উপভোগ করতে পারবেন। এই আপাত-অশিষ্টতা এবং আশাভঙ্গ আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন, এই তাঁর বিশেষ অনুরোধ।

(বিস্মিত ও বিক্ষিপ্তভাবে সভাভঙ্গ। সেলিমকেও গমনোচ্ছত দেখিয়া আকবর তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বীরবল ভিন্ন আর সকলের ক্রমে ক্রমে প্রস্থান।)

আকবর। (উত্তেজিত) সেলিম, এর মানে কি?

সেলিম। কিসের মানে হজুর?

আকবর। (রাগত:) তুমি বেশ জান কি বলছি।

আর আমার চোখে ধুলো দেবার বুখা চেষ্টা না করে সভ্য কথা বল, যদি ভাল চাও। এই অজ্ঞাতকুলশীল নির্লজ্জ বালিকার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

সেলিম। হজুর, আমাকে যত খুশি গালমন্দ দিন, কিন্তু ভদ্রবরের নিরপরাধ মেয়েকে অথবা কুকথা বলবার অধিকার আপনার নেই।

আকবর। আমার অধিকার-অনধিকার আমি বুঝব, তোমার কাছে তা শিখতে চাই নে। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে, এই অজানা বিদেশী মেয়েটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত তোমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে; না তুমি তার রূপে মোহিত হয়ে তার জাহান্নামে যাবার পথ পরিষ্কার করছ? এ রোগ ত তোমার ছিল না!

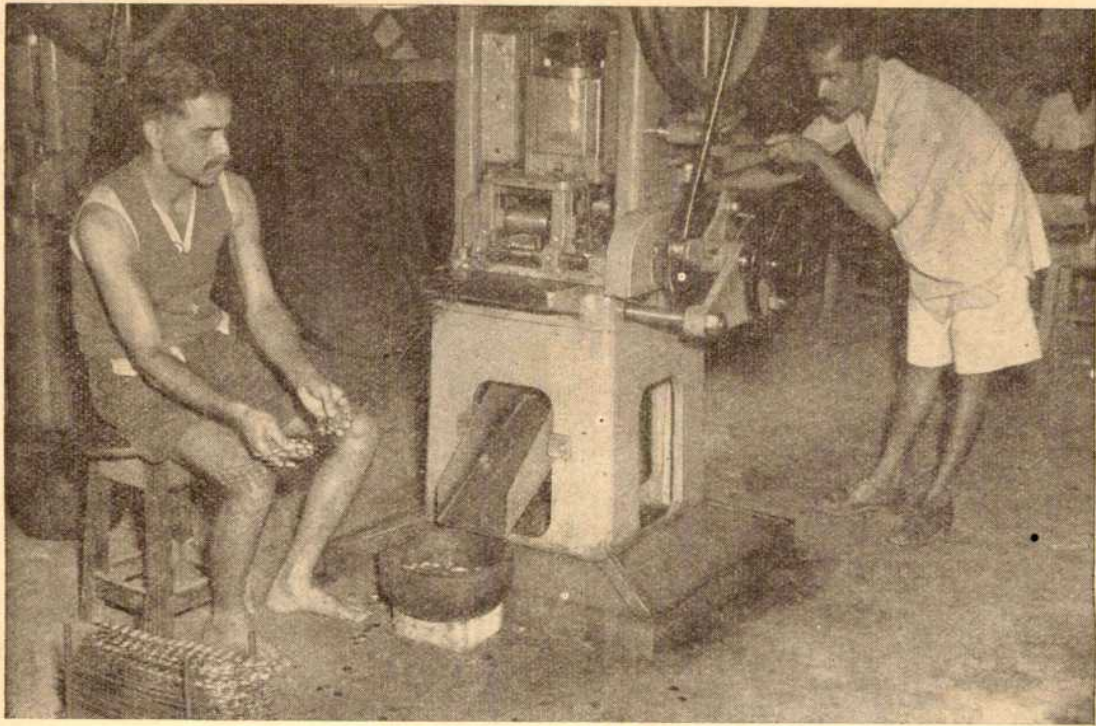
সেলিম। (উত্তেজিতভাবে পাঁচচারি করত:) এ রোগ নয়নারীর সেই চিরকেলে ভালোবাসা রোগ, কখন কাকে আচম্বিতে আক্রমণ করবে, তা কেউ আগে ধাকতে বলতে পারে না। যদি ভালবাসা দোষ হয়, তবে আমি দোষী; যদি সুন্দরকে পাবার ইচ্ছে দোষ হয়, তবে আমি দোষী; নচেৎ নই।



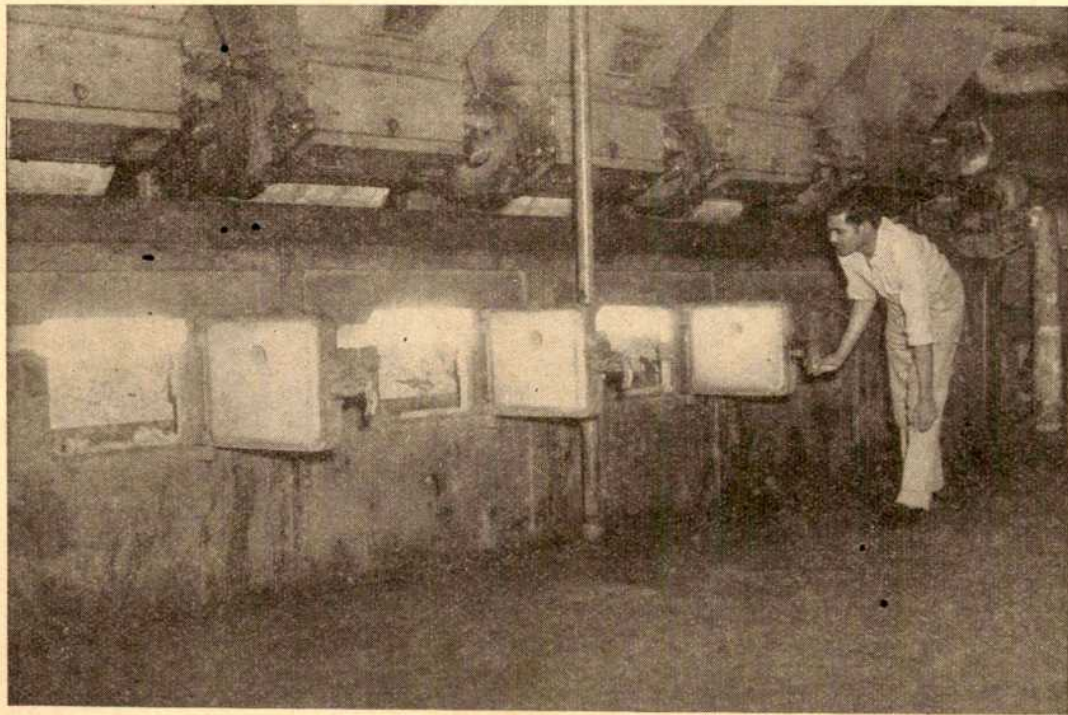
দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র-দিবসে বাংলার সরস্বতী পূজাঘটান দৃশ্যের একটি অঙ্কুর্তি



কোরিয়ায় ৬০তম ভারতীয় এম্বুলেন্স ইউনিটের মেডিক্যাল অফিসার সার্জেণ্ট মুখু কৃষ্ণন ও কুশল কুলকর্ণী
প্যারিসের এক অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধির প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতেছেন



টাকশালে একটি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া ভারতীয় মুদ্রা নির্মাণ



এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা—সিঙ্গি' ফারটলাইজার ফ্যাক্টরি'র 'বয়লার হাউসের' অভ্যন্তরস্থ চুল্লীসমূহ

আকবর। তুমি বেশ জান যে, এক জন ইতরশ্রেণীর রমণী কখনোই শাহাজাদার পাটরাণী হতে পারে না।

সেলিম। না, আমি সে কথা জানি নে; জানলেও মানি নে। একটা সল্‌মাচুম্বিকিপরী জরিজরাবৎমোড়া অচেনা পুতুল রাজকোষে ষথেষ্ট পরিমাণ অর্থদণ্ড দিলেই আমার সম্মানিত বধূ হতে পারবে; আর আমি যাকে ভালবাসি, যাকে চাই, যার জন্ত রাজসিংহাসন রাজমর্যাদা সব ছাড়তে প্রস্তুত আছি, যে আমার জন্ত তার বাপ মা ভাই বন্ধু সব ছেড়ে এসেছে তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেই আমাদের দু'জনকেই অপমানিত লাগিত হতে হবে, এ স্বার্থান্বেষী সমাজের নির্ভর বিধান হতে পারে, কিন্তু কৰুণাময় পরমেশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম কখনোই নয়।

আকবর। (অপেক্ষাকৃত নরমভাবে) সেলিম! রাজা-বাদশাহদের জীবনের কোন নিয়মটাই বা স্বাভাবিক? এই যে আমরা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে বাধ্য হই; এই যে রাজকার্যের তাড়নায় নিজের পরিবারের সাহচর্য ছাড়গে যে বেশী উপভোগ করতে পারি নে; এই যে প্রজাদের অভিযোগ শোনা, তাদের স্বথস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবার জন্ত সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়, নিজের আরাম, নিজের অবসর কাকে বলে তা জানতেও পাই নে; একি খুব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা? তবু ত আমাদের পিতৃপিতামহ এই মহৎ জীবনযাপন করে গেছেন, আর আমরাও আশী করি যে আমাদের পুত্র-পৌত্রগণ নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে সেই গুরুভার বহন করবে। (কিয়ৎক্ষণ ধামিয়া) আমিও এককালে যুবক ছিলাম, আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারি সেলিম; কিন্তু তুমি কি আমার কথা বোঝবার এতটুকুও চেষ্টা করবে না? তোমার পিতৃপুরুষের প্রতি ভক্তি, তোমার দেশের প্রতি কর্তব্য, তোমার বাপমায়ার প্রতি ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবের প্রতি মমতা, সবই কি এই নতুন প্রেমের জোয়ারে স্রোতের মুখে তুণের মত ভেসে গেছে?

সেলিম। (পিতার পায়ে পড়িয়া কাতরস্বরে) জাহাঁ-পনা, পিতা! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাদের স্নেহমমতা কখনো ভুলব না, কিন্তু আজ আমি নিজেকেই ভুলেছি। আমি আপনাদের বংশের কুলদ্বার, আমি আপনাদের অযোগ্য কুপুত্র। আপনারা আমাকে ত্যাগ করুন, কিন্তু সে নিরপরাধ নালিকাকে ত্যাগ করতে আমার আদেশ করবেন না। আপনাদের অন্যান্য পুত্র আছে, তারা আপনাদের মান রক্ষা করবে, বংশের মর্যাদা রক্ষা করবে। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদে, এই ইঙ্গুরীতুল্য দিল্লী শহরে সেই অসহায় বালিকার সর্বনাশ করবার লোক ঢের

আছে, কিন্তু তাকে রক্ষা করবার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সে যে সরল বিশ্বাসে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে বিশ্বাস যদি আজ আমি ভাজি, তবে দিল্লীর তক্তে কেন, নরকেও আমার স্থান হবে না। আপনি ত পিতা, গুরু,—বলুন, এ কার্য কি ধর্মসঙ্গত হবে—ন্যায়সঙ্গত হবে?

আকবর। (বিচলিতভাবে) সেলিম! ধর্মার্থ, পাপ-পুণ্যের বিচার করতে কখনো শিখি নি; আমরা শিখেছি শুধু রাজকার্য, রাজকায়দা, রাজকীয়মর্যাদা, রাজদণ্ড, রাজকর্তব্য। (ভাবিয়া) তুমি এখন যাও, একটু বিশ্রাম করগে। আমিও প্রবীণ মন্ত্রীদেব সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি এ বিষয়ে কি কর্তব্য। যা স্থির হয় তোমাকে কাল জানাব। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও যে, তার আগে তুমি ছলেবলেকৌশলে, কোন রকমেই আনারকলির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা মাত্র করবে না।

সেলিম। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) তাই হবে। কৃষ্ণে আমাদের দেখা হয়েছিল, আর দেখা করে পাপের বোঝা বাড়তে চাই নে। কিন্তু পরামর্শের সময় মনে রাখবেন যে, দুটি ভরণ প্রাণের স্বথ দুঃখ আশা ভয় সবই আপনাদের বিচারের উপর চিরদিনের মত নির্ভর করছে। মনে রাখবেন আপনি আমার স্নেহময় পিতা, কেবল রাজনীতির কঠোর প্রতিমূর্তি নয়। কুমন্ত্রণায় মাছুষকে অমাহুষ করে ফেলে। (বীরবলের প্রতি বিদ্রোহকটাক্ষ হানিয়া) প্রস্থান। আকবরের মাথায় হাত দিয়া নীরবে অবস্থান।)

বীরবল। (হাসিয়া) শুনলেন ত খোদাবন্দ, আমার প্রতি নিষ্কিপ্ত বাক্যবাণ! প্রবীণ শিক্ষকের প্রতি অর্স্বাটীন ছাত্রের সম্মানের বহরটাও তু দেখলেন! যাকে জন্মতে দেখলুম, মাহুষ করলুম, সেও ছোটো কড়া কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না। আজীবন রাজসেবার এই ত যোগ্য পুরস্কার। নাবালক অবস্থাতেই যখন এই মতিগতি, তখন সিংহাসনে উঠলে না জানি কি মূর্তি ধরবেন। স্বপ্নের বিষয়, তখন আমি আর রাজতরণীর কর্ণধার থাকব না।

আকবর। তুমি হাল না ধরলে এ নোকো বানচাল হয়ে পড়বে বীরবল। এখনই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বীরবল। হজুর, আমি যতদিন আছি সাধ্যমত আমার কর্তব্যপালনে ক্রটি করব না। কিন্তু আমাদের কাজ ত শুধু হিতোপদেশ দেওয়া, সে কথা শোনা-না-শোনা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছাধীন।

আকবর। তোমার মন্ত্রণা কি আমি কখনো অগ্রাহ্য করেছি বীরবলজী? আমি এতদিন যে-ভাবে চলেছি, সেই ভাবেই চিরদিন চলব। আমার প্রাণ থাকতে পিতৃ-

পিতামহের শুভ্র-যশে-কখনো কলঙ্ক-স্পর্শ করতে দেব না। সেলিমের এই প্রথম-প্রণয়, তাই সে এত অধীর হয়ে পড়েছে। দিনকতক দেখাশুনা-বন্ধ থাকলেই এ-মশগুল-ভাবটা কেটে গিয়ে তার স্বাভাবিক বাধ্যতা ও প্রফুল্লতা ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে আনারকলিকে ফেরত ডাকে কাবুল পাঠিয়ে দেওয়া থাক, কি বল বীরবল?

বীরবল। আপনি যতটা হালকাভারে নিচ্ছেন হজুর, আমি কিন্তু ঠিক তা পারছি নে। মিলনে বাধা পড়লে প্রেমিকরা থাইবর অপেক্ষা দুর্গম ব্যবধানও অনায়াসে লঙ্ঘন করে থাকে, ইতিহাসে তার বহু নজীর আছে। ও বিষবৃক্ষ নির্মূল করাই ভাল। বেরকম-বেগতিক দেখছি, প্রাণ থাকতে এ-প্রেম যাবে না।

আকবর। (অবসন্নভাবে) তবে উপায়?

বীরবল। জাহাঁপনা, আপনি যে এমন জানী হয়েও আজ শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়েছেন, সে কেবল সন্তান-স্নেহের অন্ধ মায়াময়। আপনি যান, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে

ঈশ্বরে চিন্তা-সমর্পণ করুন, তা হলে আপনার মনের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির স্থিরতা ফিরে আসবে। আপনার শুধু এক সন্তান নয়, সহস্র সন্তানের শুভাশুভ আপনার উপর নির্ভর করছে মনে রাখবেন। আমার উপর ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; এ বিতী রূপারের যথাযোগ্য তদন্ত ও বিচার করে তার ফলাফল আপনাকে অবিলম্বে জানাব। কেবল আপনি কোতোয়ালকে হুকুম পাঠিয়ে দিন যেন বিচার হওয়া পর্যন্ত আনারকলিকে কারাগারে বন্ধ রাখা হয়।

আকবর। বীরবল, তুমি শুধু আমার স্বযোগ্য মন্ত্রী নও, আমার পরম স্বহৃৎ ও স্বার্থ-হিতৈষী। তুমি ঠিকই বলেছ, সেলিমের অভূতপূর্ব ব্যবহারে আমি, কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েছি। তুমি শীঘ্র এই অলক্ষ্য কন্যার বিচারের ব্যবস্থা করে আমার মনে শান্তি দাও; ও-বংশের মান রক্ষা কর।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চোখ

শ্রীকরণাময় বসু

মনে নেই কবে যেন দেখেছি কালো ছটি চোখ,
সে কোন সাগর দীপে বহুদিন আগে, অহা ভাই হোক।

যেখানে উঠেছে ঝড়, যেখানে বেজেছে বাঁশি,

যেখানে লভার ফুল ফুরিয়ে চেয়ে ওঠে নিখাসি,—

সেখানে কি দেশ আছে, সেখানে কি আছে কোন দ্বীপ;
পথ চেয়ে কারো চোখে জল আসে, আচলে কি ঢেকেছে প্রদীপ?

কতো না গোহুলিকাল মেখে মেখে সোনালি রেখার
ললিত ভুলির টানে বিচলিতা যে ছবি আঁকার;

দেই সব মনে রাখা, চিরদিন ভালো লাগা রঙ

জীবনে বাজার হুর গৌড়-সারঙ।

হঠাৎ বুঝায় দেখে: সাঁই সাঁই ওড়ে বাজিহাঁস,

যে নীড় ভেঙেছে ঝড়ে ওরে পাখি মিছে তুই বুজিয়া বেড়াল।

চিরুণ ভুরুর নিচে দেখেছি কালো ছটি চোখ,

সে কোন সাগর দীপে বহুদিন আগে অহা ভাই হোক।

ভারপর গেছে কতো কাল,

তোমার আমার মাঝে ইতিহাস ক্রমাশয় করেছে আড়াল;

তীরে বসে দেখেছি সাগরের ঢেউ উত্তাল,

ভারপর গেছে কতো কাল।

পৃথিবীতে এলো গেল কতো জয়, কতো পরাজয়,

হাওয়ায় উড়ানে দেয় ইতিহাস কালের বলয়।

মনে হয় তুমি আমি কেউ নই, মোরা শুধু খেলার পুতুল,

লভারে কে চেনে বলো, মাহুয়েরা চেনে শুধু ফুল;

তুমি আমি খেলার পুতুল।

সেদিন র'বো না মোরা, তবু এই চিরকীবী প্রেম

মাহুয়ের জীবনে জীবনে চিরদিন রাখিয়া গেলেম।

বসন্ত আসে চিরদিন, ফোথায় সে হরেছে বিলীন,

সে কালের বসন্তসেনা,

শ্রমণের মণিহারে প্রেম শুধু গাঁথা র'বে, তুমি রহিবো না।

মনে নেই কবে যেন দেখেছি কালো ছটি চোখ,

যেখানে উষার আলো করে বলমল,

পাহাড়িয়া বুঝে পথে নেমে আসে গোহুলি-আলোক।

যশোহরে নীল-আন্দোলন ও শিশিরকুমার ঘোষ

ত্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া যশোহর ও নদীয়ায় নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। রায়তদের নামে মিথ্যা মামলা রুজু করা, ধানজমি নষ্ট করা, ঘরবাড়ী পোড়ান, গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠরাজ, জমিদারির কাছারি আক্রমণ, নীলচাষীদের নীলের গুদামে আটক রাখা, নারীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার—একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। জেলার শাসন-কর্তৃপক্ষ তথা ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইংরেজ কুঠীয়ালদের নানারূপে সাহায্য করিতেন। ১৮৬০ সনের ১১শ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর শাসকবর্গ চুক্তিভঙ্গের, অছিলায় চাষীদের উপর জুলুম-জ্বরদস্তি চালাইতে থাকেন। শিশিরকুমার ঘোষ তখন মাত্র বিংশতিবর্ষীয় যুবক। তিনি এই সময় যশোহরে শিক্ষকতা-কর্মে লিপ্ত ছিলেন। তিনি মফস্বল হইতে নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের বিস্তার তথ্য সংগ্রহ করিতেন এবং “M.L.L.”-স্বাক্ষরে কলিকাতার “হিন্দু পেট্রিয়ার্ট” পত্রিকায় প্রকাশার্থ পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। “পেট্রিয়ার্ট” সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাদরে এ সমুদয় পত্রস্থ করিতেন। তিনি নীল-সম্পর্কিত বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রেরিত পত্রাদি প্রকাশের জন্য ১৮৬০, ২৮শে এপ্রিল সংখ্যা হইতে “The Indigo Districts” নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খুলিয়াছিলেন। “M.L.L.”-স্বাক্ষরে শিশিরকুমারের প্রথম পত্র বাহির হয় ১৮৬০, ৩১শে মার্চ তারিখে। পরবর্তী সকল পত্রই উক্ত বিভাগে স্থানলাভ করে। এই “M.L.L.” যে শিশিরকুমার ঘোষ স্বয়ং সে সময়ে পূর্বে তিনটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করি। তৃতীয় প্রবন্ধে আমি “M.L.L.”-স্বাক্ষরযুক্ত পত্র মূল-ইংরেজীতে লব্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি।* শিশিরকুমার এই সকল পত্র লিখিয়া ক্রুর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাও আমরা জানিতে পারিব।

* শিশিরকুমারের উক্ত প্রথম পত্রে ৪৯ জন মোড়ল বা

কৃষক-নেতার গ্রেপ্তারের সংবাদ আছে। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারের নির্দেশক্রমে সরকারী ঘোষণা প্রবণের জন্য কালোপোলে আট-দশ হাজার নীলচাষী সমবেত হয়। এই ম্যাজিস্ট্রেট-পুঙ্খ নীলকর-বন্ধ; উপস্থিত লোকজনকে নীলচাষে প্ররোচিত করিতেই প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে অসম্মত হইলে তাহাদের মধ্য হইতে ৪৯ জন নেতাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে স্বীকার তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখেন এবং পরে যশোহর সদরে চালান দেন। সেখানেও নীল বুনিতে রাজী করাইবার জন্য তাহাদের শাসনো হয়, তাহাদের উপর কিছু কিছু অত্যাচারও যে না হইয়াছিল এমন নয়। অবশেষে পরতালিশ জন মোড়ল নীল বুনিবে বলিয়া একরার-নামা লিখিয়া দিলে তবে হাজত হইতে মুক্তি পায়। অন্য চারি জনকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোলোনী সরাসরি বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার জেরে যে আরও কিছুদিন চলিয়াছিল পরবর্তী পত্রাবলী হইতে তাহা জানা যাইবে। স্বীকার নীলচাষীদের জঙ্ক করিবার জন্য সরকারে রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, কালোপোলে তাহারা তাহাকে সরাসরি আক্রমণও করিয়াছিল।

যশোহর হইতে ১৮৬০, ৪ঠা এপ্রিল তারিখ সম্বলিত এবং “A Native” স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পত্র ১৪ই এপ্রিল ১৮৬০ সংখ্যা “হিন্দু পেট্রিয়ার্টে” প্রকাশিত হয়। এখানিও যে শিশিরকুমারেরই লিখিত এরূপ মনে করিবার সম্ভব কারণ আছে। এই পত্রে কালোপোলের ঘটনার উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে যে, সেখান হইতে নয় শত জন রায়ত প্রতীকার-মানসে কলিকাতায় গিয়াছে। এই সময় যশোহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অষ্টাশীট গ্রাম নীলকরদের বিরুদ্ধে সজ্জবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রামসমূহের অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা আর নীল বুনিবে না। পত্রখানির নিম্ন-লিখিত অংশ প্রণিধানযোগ্য:

Is it that we are weak, wretched and poor—that we are their subjects—that we have no other resource than to suffer patiently whatever punishment our masters will please to inflict upon us, that they thus trample upon us, disregarding justice and the tenets of the Bible. How are we to impress upon the minds of the Government that the ryots have neither taken advances, nor drawn contracts? They will never believe it, for the Planters have convinced them otherwise. Woe to the Bengalee that they are sleeping in indolence. When their wretched countrymen are thus

* ১৯৪৬ সনের ২৬শে আগষ্ট রবিবারের যুগান্তরে “পল্লী-মাগুয়ার ঘোষ ভাষ্য: শিশিরকুমার ঘোষ”, কলিক ১৩৫৬ সংখ্যা “প্রবর্তকে” “শিশিরকুমার ঘোষ” (পৃ. ২৮৭) এবং ১৯৫২, ২০শে জানুয়ারী তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকার রবিবারীয় আলোচনীতে “যশোহরে নীল-আন্দোলনের কথা” শীর্ষক, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধত্রয় প্রদ্রব্য। শেখোক্ত প্রবন্ধে “হিন্দু পেট্রিয়ার্টে” M.L.L.-স্বাক্ষরে প্রকাশিত প্রথম পত্রখানি ছাড়া আরও পাঁচখানি পত্রের প্রকাশের তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

sacrificing their lives for their emancipation from Indigo-slavery; they are passing away their time in idle luxury. Rise, Rise, Ye countrymen—with supplicating hands, fall prostrate before the Governor, catch his feet, and do not let him go, unless he has granted your requests. Should the Governor or any other nobleman ever visit the moffusil—the uncontrolled authority of the Planters will make them compare the Sahebs of the moffusil to the Spaniards who once depopulated America.

২

শিশিরকুমারের 'M.L.L.'-বাক্সের দ্বিতীয় পত্রখানি 'বংশোদ্ভূত, ১৮ই জুন' তারিখ সম্বলিত। ২৩শে জুন ১৮৬০ সংখ্যার 'হিন্দু পেট্রি রটে' ইহা প্রকাশিত হয়। এখানি দৃঢ়-সরল নীলচাষীদের শাস্ত্রের বিরুদ্ধে নীলকর ও ম্যাজিস্ট্রেটের স্বত্বের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পত্রখানির মর্ম এই :

"২৯শে ফাল্গুন মাসে ম্যাদামি কুঠীর জমিদার ভাগিদার মোলোনীর নিকট পাঁচলয়ার কতিপয় অধিবাসীর বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করে। সে বলে যে, দেড় শত গরু দিয়া মাড়াইয়া বহু বিঘা জমির নীল তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল, দেখিতে পার। সে ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে মহেশ চাঁট্‌জোর নামের রতি যুগ্মজোর অধীন প্রায় ষাট জন লোক জের হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাকে ধরিয়া তাহারা মারধরও করে, কিন্তু শেষে সে কোনমতে পলাইতে সমর্থ হয়। মোলোনী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করিলেন। হয় জনকে ধরিয়া আনিয়া হাজতে (নীল-কুঠীর গুদামে) পুরা হইল। সেখানে তাহারা মাসখানেক থাকে। তারপর তাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সরকারী জেলে পাঠান হয়। এই কুঠীর তিন জন ভাগিদার এই ভাগিদারের জগক্ষে সাক্ষ্য দেয়। মোলোনী উহাদের সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট হইয়া বিবাদীপক্ষের অপরাধ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হন এবং দুই দিনের মধ্যে তাহাদের কুড়ি টাকা জরিমানা, অন্য-দ্বায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেট যখন বিচারাসনে, তখন পোন্‌মামি কুঠীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট শিখ সাহেব তাহার পার্শ্বে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে কখনও উপদেশ এবং বক্তব্য দিতেছিলেন, কখনও বা তাহার উপর প্রশংসা-বাণী বর্ষণ করিতেছিলেন। বিবাদী হয় জনই অভিযোগ অস্বীকার করে ও সাক্ষীসাবুদ আনিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, তাহারা অকৃত্য ছিলই না। কিন্তু মোলোনী এই বলিয়া তাহাদের কথা অগ্রাহ করিলেন যে, তাহারা সকলেই নীলকরদের বিরুদ্ধে ছোট পাকাই-য়াছে। তিনি ভাগিদারদের কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, যদিও

তাহারা নীলকরদের কর্তৃত্ব প্রমাণ এবং কুঠীর প্রমাণ... তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে, ষাট জন লাঠিয়াল মিলিয়া এক জন লোককে আক্রমণ করিয়া মারপিট করিলেও সে প্রাণতরে পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল, আর দৈবাৎ তিন জন ভাগিদার আনিয়া উপস্থিত হইল সশস্ত্র আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত। এ মোকদ্দমার আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটয়াছে। এই আক্রমণকারী দলের নেতা এবং মামলার প্রধান বিবাদী রতি যুগ্মজোকে চার জন ভাগিদারই সনাক্ত করিল। কিন্তু এক জন লেখাপড়া জানা লোককে অনর্থক সাজা দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেট যুক্তিযুক্ত নমেন না করিয়া যুক্তি দেন। সাক্ষীরা একবাক্যে বলে যে, তাহারা পূর্বে রতি যুগ্মজোকে চিনিত ও লাঠিয়ালদের সর্দারি করিতে তাহাকে ঐ দিন দেখে। কিন্তু অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, রতি যুগ্মজো ঠিক ঐ দিন ম্যাকলীন সাহেবের কাছে ছিলেন। মোলোনী ইহা বিশ্বাস না করিয়া পারেন নাই। যে-সব সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়া এইরূপে বরা পড়িল তাহাদের উপরে ক্রুরূপে তিনি নির্ভর করিতে পারেন? বিবাদীপক্ষ প্রাথমিক জানান যেম ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়া ব্যাপারটির সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং এরূপ অনাচার আদৌ সংঘটিত হইয়াছে কিনা দেখেন। বহু অহুসন্ধান করিলে এই ব্যাপারের সত্য-মিথ্যা তিনি সহজেই জানিতে পারিবে। সকলেই—তাহাদের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট এবং নীলকর কেহই বাদ যান না—নিশ্চয়ই জানেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ ছেলার সব-মিথ্যুত জব্দ বেশী সাহেব এই মোকদ্দমার ক্রুরূপ কয়লা করেন জানিবার জন্য আমরা অন্তস্ত ব্যগ্র হইয়া আছি। যদি এতগুলি লোকের উপরে এরূপ অন্যায় অবিচার করা হয় তাহা হইলে ইংরেজদের উন্নত এবং গুণাবিত বলিয়া আহির করার কোনও অধিকার নাই। উপরের বর্ণিত বিষয়গুলি সত্য এবং নথি হইতে প্রায় অস্বাভাবিক করিয়া দিলাম; আপনি ইহার উপর নির্ভর করিতে পারেন।

"জারটাদে"র অব্যবহৃত প্রমাণের জন্য মারমুর সাহেব সর্বজ কৃত্যাত। প্রজাদের সাম্প্রতিক ছোট পাকানোর দরুন তিনি পাগলের মত হইয়াছেন। হুলাদী বিশ্বাসের বাণী পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। বিষহরি গ্রাম পোড়ামো হয় নাই, পূর্বে তাড়াতাড়ি মধ্যে ভুল সংবাদ দিয়াছিলাম। মারমুর সাহেব বড়বাণী গ্রামটি একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিষহরি, কাহুড়িয়া, মামরুপুরের মত বহু গ্রামের বান্ধেও নষ্ট করিয়া দিয়া সেই সেই জমিতে নীল বোনা হইয়াছে। হার্শেল মহোদয় উত্তর অঞ্চলের প্রজাদের লইয়া কি এতই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এদিকে মজর দিবার সময় পান না?

পুনশ্চ—উক্ত চার জন ভাগিদার কি মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অপরাধে অপরাধী নয়?”

৩

শিশিরকুমারের ‘M. L. L.’-স্বাক্ষরিত তৃতীয় পত্রের তারিখ ‘যশোহর, ২৮শে জুন ১৮৬০’। পরবর্তী ৪ঠা জুলাইয়ের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়। নীলকরদের অত্যাচার-হেতু নীলচাষীরা কিরূপ সংঘবদ্ধ হয় এই পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। আবার কুঠীমাল-দ্বারা জমিদারের কাছারি আক্রমণ ও উভয় দলে এক ভীষণ সংঘর্ষের বিষয়ও ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পত্রখানি হইতে মূল বিষয়গুলির তাৎপর্য এখানে দেওয়া হইল:

“...নীলকরদের এখন কাজ হইল দূর দূর গ্রাম হইতে আগত দুর্ভাগ্য রায়ভগণকে নতুন নীল-চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করানো। কেনি সাহেবের লোকেরা ঔদ্ধত্যবশে এই রূপ করিয়া কলে। ইহার ফলে সাতাশটি গ্রামের চাষীরা তৎক্ষণাৎ কুঠীর সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস করিয়া দিল। তিনি শেষ পর্যন্ত তাহাদের নীল বুমিতে এই বলিয়া রাজী করান যে, এবারে নীল বুমিলে পরে তিনি এইরূপ দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিবেন। চাষীরা তাহাদের কথা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কেনির মাধ্যম দ্বারা চাপিয়া বসে, তিনি তাহার কথা রাখিলেন না। এক মাস পূর্বে দুর্গাপুরের কয়েক জন লোক রায়নগর কুঠীর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মালিশ করিতে এখানে আসিয়াছিল। এই ম্যানেজার নতুন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করে এবং তাহাদের কয়েকজনকে গুদামে আটক রাখে। এই খেলার ছদয়হীন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা না করিয়া, সরাসরি নদীয়ার লাসিংটন সাহেবের নিকট সিদ্ধা আবেদন করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্ভ্রতি (প্রায় নয় দিন পূর্বে) বিজলী কুঠীর (যাহার মালিক মিসার্স) ওমান সাহেব উম্মেদপুর, কুড়পুর, পোয়ারা, বিষ্টুদি, লক্ষণদি, আরোকানদি প্রভৃতি গ্রামের জনকয়েক মোড়লকে ডাকিয়া আনিয়া ভয় দেখান যে, যদি তাহারা নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে গুদামে আটক করিয়া রাখা হইবে। তাহারা যেন চুক্তি করিতে অসম্মত না হয়। নীল-চাষীরা বাড়ী ফিরিয়া ইহার প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আদীন ও ভাগিদারদের গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলচাষীদের ঐহিক রক্ষাকর্তারা অত্যাচারীদের দয়ার উপর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য তাহারা সর্বশেষে এই অমোঘ উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

গত ২০শে জুন মল্লিকপুর গ্রামের জমিদার এবং মীরগঞ্জের ম্যাক্‌আর্থারের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। মল্লিকপুর

গ্রামের একটি সামান্য অংশমাত্র সে ইচ্ছা লইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, এই স্ত্রে সমগ্র গ্রামের উপরই আধিপত্য করিতে পারিবে। কিন্তু গ্রামের জমিদার তাহার এই ইচ্ছার বাদ সাধিলেন। ম্যাক্‌আর্থার এই বিষয় দূর করিবার সহজ উপায়-স্বরূপ দুই শত শত ল্যাঠিরাশ সহ গিয়া ভজলোকটির কাছারি-বাড়ী আক্রমণ করিল। এ প্রকার অতর্কিত আক্রমণের জন্য রায়ভেরা প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের মধ্যে চার জন ভীষণভাবে আহত হইল; ইহাদের দুই জনকে কুঠীর লোকেরা গাণ্ড করে; অবশিষ্ট দুই জনকে এখানে (যশোহরে) পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পৌঁছবার অব্যবহিত পরেই এক জন মারা যায়। ইহার পরেও নীলকরদের আবাদিগকে অসৎ, এবং মিশনরীদের অপেক্ষা নিজেদের উৎকৃষ্টতর খ্রীষ্টান বলিতেও লজ্জামুগ্ধ করিতেছে না।

মল্লিকপুর গুদামকভাবে লুণ্ঠিতও হইয়াছে। কীনার এই ব্যাপারের অঙ্গসন্ধান করিতে গিয়াছেন। অন্ততঃ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি এইরূপই বলিবেন, যদিও সেখানে যাইবার অল্প কারণই বলবত্তর। মোহাপাড়ার মিঃ ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে মীরগঞ্জের ম্যাক্‌আর্থার-কচার শীতাই বিবাহ হইবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা নিশ্চয়ই সেখানে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমার অর্থ হইতেছে, অনতিকালপূর্বে কীনারের বিরুদ্ধে যশোহরের কয়েকজন রায়ভ একটি আবেদনে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল যে, তিনি নীলকরদের সঙ্গে পামভোজন এবং অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি তখন ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন; ছোটলাটও তাহার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গত সোমবার ২০শে জুন এই বিবাহ হইবার কথা ছিল। রবিবারে মোলোনী এবং সিভিল সার্জন এই ক্ষুণ্ণিতে যোগদানের নিমিত্ত হস্তদস্ত হইয়া সেখানে ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ-অস্থান স্থগিত হওয়ার তাহার বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়েন। অন্ততঃ ক্রিষ্ট চিত্তে মোলোনী সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন। “কীনার সাহেবের একই সময়ে ‘রথ দেখা ও কলা বেচা’ দুইটি উদ্বেগ ছিল—হাদামা সম্বন্ধে ভদ্রতা করাও চলিবে, আবার বিবাহের চর্য্য-চোয়োর আবাদও লওয়া যাইবে। বিবাদীপক্ষের অভিধির হস্তে এ ব্যাপারের কিরূপ নিষ্পত্তি হইবে তাহা বুঝা যুই সোজা। সম্ভবতঃ করিয়াদীপক্ষ এবং তাহাদের সাক্ষীগণকে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা মোকদ্দমা সাব্যস্তিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের সাবধান হওয়া উচিত, হেলিডে সাহেব কিন্তু আর বাংলার ‘গবর্নর’ নন।

আপনাকে একটি অসংবাদও দিতেছি। কালোপোলের সেই কুখ্যাত ‘হামলা’, অর্থাৎ লর্ড ম্যাজিস্ট্রেট কীনারের হেপাফ হইতে হাজার হাজার রায়ভ কর্তৃক কয়েক জন কয়েদীকে ছিনাইয়া লওয়ার ব্যাপারটা খেলা জজ মিঃ বেলীর বিচারে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। বেলী সাহেব সবে

মাত্র ২১শে জুন এখানে আসিয়াছেন। বর্তমান নীল-হাটামায় উক্ত মিথ্যা হামলা লইয়া নীলকর ও তাহাদের বন্ধুরা বেশ একটা সোরগোল তুলিয়াছিল। এই ব্যাপারটি উপলক্ষ্য করিয়াই কীনার সাহেব এই সকল ঐশ্বর্যবানী "বিজোহী" হইয়াছে বলিয়া সরকারে রিপোর্ট করিয়াছিলেন এবং এই অফিসায় এখানে সৈন্তসামন্ত পাঠাইবার আকুল আবেদনও জানাইয়াছিলেন। হামলায় লিপ্ত সন্দেহ লোকদের লক্ষ্য করিয়া তাহার এবং সেনাদের যেখানে সেখানে গুলি ছোড়া এবং গর্দান নেওয়ার অভিযান হইতে রেহাই পাইবার নিমিত্ত যশোহরের অধিবাসীরা নীলকরদের সঙ্গে আপোষ করতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণের অভিযোগ হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই হামলার অভিনয়ে নীলকরদের বড়ই সুবিধা হয়, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজাদের যেকোনও ভাঙ্গিয়া দিবার একটা মন্ত বড় ছুতা পান। অতঃপক্ষে তাহারা নিরপরাধ রায়তগণকে কৈনজ্জমেই বাগ মানাইতে পারিতেন না। আমি রায়ের নকল পাঠাইতেছি। ইহা দীর্ঘ হইলেও সাধারণের নিকট পেশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মিঃ বেলী সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকি যাঁর না। সমগ্র জেলা তাহার প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রায়তদের যে কতখানি প্রিয় হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহাকে এবং যিনি এমন এক জন সুবিচারক পাঠাইয়াছেন, উভয়কেই অশেষ মন্তব্য।

কালোপোলের হামলা যে যশোহরের জেলা জজ বেলীর বিচারে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল, শিশিরকুমার উপরোক্ত পত্রেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পত্রের সংযোজনী-স্বরূপ তিনি রায়ের নকল প্রেরণ করেন। ইহা পাঠে জানা যাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট যে চারি জনকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহাদের এক জনের শাস্তি তিনি বহাল রাখেন, অন্য তিন জন বেকসুর খালাস পায়। বেলীর রায় ম্যাজিষ্ট্রেটদের অবিমুখ্যকারিতা ও নীলকরদের প্রতি তাহাদের পক্ষপাতিত্বের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ হইয়া আছে।

"M.L.L." স্বাক্ষরিত শিশিরকুমারের চতুর্থ পত্রখানি নানা দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ। তাহার বিভিন্ন পত্রে যথাযথ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত কর্তৃপক্ষ মহলে বেশ একটা চাক্ষু্য উপস্থিত হয়। গোপনে গোপনে সরকার জেলা শাসকদের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে লাগিলেন। এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা কে বা কাহারো তাহাদের অবশ্যকার কীর্তি-কথা পেটিয়ট-মারফত সাধারণ্যে প্রকাশ

করিয়া দিতেছে। তাহারও খোঁজ করিতে আরম্ভ করেন। পত্রখানি যশোহর হইতে ২৫শে জুলাই প্রেরিত; পরবর্তী ১লা আগষ্টের (১৮৬০) হিন্দু পেটিয়টে ইহা প্রকাশিত হয়। পত্রের মর্ম এই:

"এখান হইতে লিখিত আমার পত্রসমূহে ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেআইনী কার্যকলাপের কথা প্রকাশিত হওয়ার, কে তাহাদের এইরূপ বৈগ দিতেছে তাহার অমুসন্ধান তাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে? কীনারের ভীত বুদ্ধি এই ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। কে কে 'হিন্দু পেটিয়ট'ের গ্রাহক তাহার অমুসন্ধানে তিনি বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, পাবলিক লাইব্রেরী ব্যতীত আর কোথাও এখানে 'পেটিয়ট'ের গ্রাহক নহেন। এখন কি করা যাইবে? বাহা হউক, ইহার পরেই বিকরণহারা ম্যাকেন্সি সহস্রবের পত্র পাইয়া তাহারা কতকটা সোয়াস্তি পাইয়াছেন। নীলকরদেরই বন্ধু বরদাকান্ত রায় প্রযুৎ গুনিয়া নীলকর-বিরোধীদের অন্ততঃ তিন জন নাম তিনি পাঠাইয়াছেন। নামগুলি পাইয়া জেলা কর্তৃপক্ষ যেন গিলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েক জন তাহাদের পরিচিত, কয়েকজন অপরিচিত। কিন্তু কে যে কাগজে লিখিতেছে তাহা কেমন করিয়া বাহির করিবেন? কিন্তু ইহাদের মধ্য হইতে আনন্দবাবু নাজির, বিষ্ণুবাবু গোষ্ঠী মাষ্টার, শিশিরবাবু শিক্ষক, কৃষ্ণবাবু, গিরীশবাবু এবং আর একজনকে তাহারা এই পত্রগুলির লেখক বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। মিঃ মোলোনি সন্দেহবশে আনন্দবাবুকে ভীষণ ভাবে তিরস্কার করিয়াছেন। কীনারের নিকিত ধারণা, শিশিরবাবুরই এই কাছ। আব্বাস কৃষ্ণবাবুও যেন হইতে পারেন এমন নয়। তাহার ইংরেজী জ্ঞান এবং নীল-বিরোধী মনোভাব সর্বত্র বিদিত। পত্রলেখক যিনিই হউন, গিরীশবাবুও যে ইহার মধ্যে আছেন, এরূপ সন্দেহও তাহারা করিতেছেন। এইরূপ গুজব, আনন্দবাবুকে বরখাস্ত এবং শিশিরবাবু ও বিষ্ণুবাবুকে বেআযাত করা হইবে; আর কৃষ্ণবাবু ও গিরীশবাবুকে কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। কিন্তু আমি বর্তমানে নিরাপদে আছি আর দূর হইতে ভাষা দেখিতেছি। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করা হইতেছে, গুজবও রটিতেছে। আমার সম্বন্ধে যখন এই সব ভণ্ড ভবন আরও কৌতুক অমুভব করি। মোলোনি অপেক্ষা অধিকতর অবিবেচক এবং হৃজতপ্রিয় (rash) কীনার সাহেব আপেক্ষা ধারণা এখনও পোষণ করিতেছেন। তিনি শিশিরবাবু সম্পর্কে প্রত্যেকটি ভণ্ডা, যেমন বাসস্থান প্রতি টুকিয়া লইয়াছেন। আমি আত্মপ্রকাশ করিব না যতক্ষণ না দেখি যে, তাহারা উপরোক্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ষতি করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার বরা পড়িবার আশঙ্কা

হইতেছে, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতিহিংসারূপি চরিত্র হইবে। কারণ তাহারা একাধিক বার হোটেলারের অন্তঃস্বত্বভাজন হইয়াছেন, এবং ফরলং কর্তৃক বিবেচিত ভারতবর্ষের একজন অত্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট গত ১লা আগষ্ট একেবারে বিলাত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছেন। তথাপি আমার আশা আছে, জজ বেলা—যশোহরে এমন উৎকৃষ্ট জজ খুব কমই আসিয়াছেন—সর্বশক্তিমান ম্যাজিস্ট্রেটদের কোপ হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। এই সকল ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রায় প্রত্যহই উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে। এইরূপ একটি কৈফিয়তে কীনার সাহেব স্বীকার করেন যে, হেলিডের পরামর্শ অনুসারে তিনি কিছু করিয়াছিলেন—তিনি তাঁকে স্পষ্ট করিয়াই এরূপ করিতে বলেন। এই কৈফিয়তের একটা খসড়া আমি দেখিয়াছি। ম্যাজিস্ট্রেট মোলোনী ইহা উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের অহমতি দেন নাই।

মাগুরার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টেলর নীলকরদের বহুরূপে আঘাত হইলেও এখন আর গুরুত্ব নহেন। শুধু এই যে, তিনি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন। এতদিন জোরপূর্বক দাবাইয়া রাখিলেও, রায়তেরা বর্তমানে পুনরায় শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। নীল কাটিবার সময় উপস্থিত। বিভিন্ন স্থানের রায়তগণ এক আবেদনে তাহাকে জানাইয়াছেন যে, গ্রামে বসিয়া নীল-গাটগুলির গুজন করিতে হইবে এবং কুঠীতে লইয়া যাইবার পূর্বেই দাম মিটাইয়া দিতে হইবে। 'নচেৎ তাহাদের ধারণা, তাহারা মূল্যবান এক কর্দমও পাইবে না।' টেলর আবেদনে বর্ণিত বিষয়গুলির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া 'মাদাদ' ('Madads') দিতেছেন যাহাতে রায়তেরা কুঠীঘালের খেচ্চাচারমূলক কার্যকলাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

মীরগঞ্জ কুঠীতে বড়ই গোলমাল চলিতেছে। রায়তেরা খুবই উত্তেজিত। মল্লিকপুরের সংঘর্ষের ফলে এইরূপ হইয়াছে। আমি পূর্বে লিখিয়াছিলাম এই ব্যাপার গত মাসের ২০শে ঘটয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এটি ঘটয়াছে ১৮ই জুলাই। কীনার স্বয়ং ইহার তদন্ত করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, 'স্বতন্ত্র এবং ক্ষতগুলি বহু সাক্ষীর বিবৃতির সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একটি সংঘর্ষ নিশ্চয়ই বাধিয়া যায়, আর রোজিয়ারের বাহুঘরের ক্ষতগুলি হইতে প্রমাণিত হয় কুঠীর লোকজনও সশস্ত্র ছিল।' লোক গাপ-ফরার অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আহত লোকদের লইয়া যাওয়া সম্পর্কিত বিবৃতিগুলি এতই পরস্পরবিরোধী যে, এগুলি বিশ্বাস্য নহে।' অকাট্য প্রমাণ থাকার কীনার শেষে এই কথাগুলি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন, 'প্রমাণিত হইল যে, মীরগঞ্জ কুঠী এবং নড়ালবাবুদের মধ্যে পাঁচুর বাড়ীতে

বসিয়া, তাহাকে জোরপূর্বক কুঠীতে বসিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করার একটা মারপিট হইয়াছে; এক পক্ষে পাঁচ শেখ, উজীর মহম্মদ ও বসীরাহীন আজগর, এবং অন্য পক্ষে সক্রী আহত হইয়াছে; পাঁচ গুরুতর আঘাত পাইবার ফলে অব্যবহিত পরেই মারা যায়। প্রত্যেক পক্ষ নিজের আহত ব্যক্তিদের নিজ নিজ হোপাডতে রাখে। প্রতি দলে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক ছিল। নড়াল-পক্ষীয় লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ খুবই সামান্য, আর পাঁচ শেখকে বলপূর্বক বসিয়া লইয়া যাইবার প্রয়াসে গ্রামবাসীরা যে বাধা দিয়াছে তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া চলে না। জন ড্রাইভার এই সময় মীরগঞ্জে ছিলেন।

কীনারের রিপোর্ট আদৌ মিথুত নয়, তথাপি ইহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, রায়তেরা গুরুতর আত্মরক্ষার ব্যাপ্ত ছিল। ঐ সময় জন ড্রাইভার কুঠীতে থাকার এ বিষয়ে তাহার হাত না থাকিয়াই যায় না। তথাপি কীনার তাহাকে ইংরেজ বলিয়াই হয়ত রেহাই দিয়াছেন। নীলকরেরা হয়ত শপথ করিয়া বলিবেন, তাহারা বাংলাদেশের হিউম্বী বন্ধু, তাহাদের তরফে অভিচার খুব কমই হইতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা কিন্তু ভুক্তভোগী এবং কখনও বলিতে ছাড়িব না যে, কোন দেশেই নির্যাস্তা স্বাধীনতার জন্য ন্যায় বিচার এরূপ ভাবে সেই সব লোকদের দ্বারা পদ-দলিত হয় নাই, যাহারা নিজেদের সভ্যতা ও উন্নততর চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য ব্যত। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এই নিরীহ জাতির নিকট কখনও অভিচারী বলিয়া মনে হইতেন না, যদি না নীলকরণ বিজয়ন থাকিত এবং যদি সিবিলাইজেশন গণ-প্রাধান্দিষ্ট কার্য করিতে সক্ষম হইতেন না।

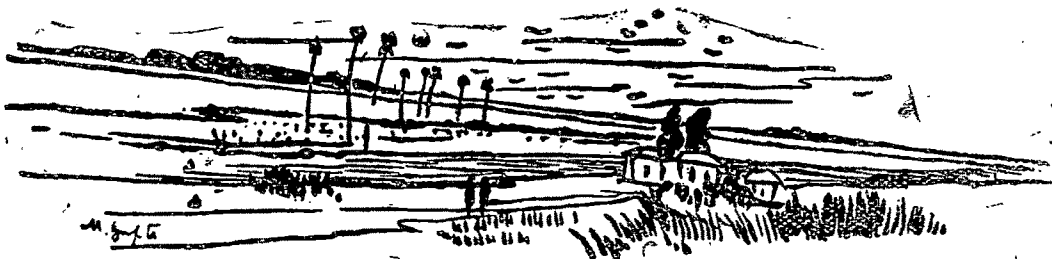
শিশিরকুমার 'হিন্দু পেট্রিয়ারে' 'M.L.L.' স্বাক্ষরিত পঞ্চম পত্র লেখেন যশোহর জেলার অন্তর্গত তারাগঞ্জ হইতে ২রা আগষ্ট তারিখে। 'পেট্রিয়ারে' ৮ই আগষ্ট প্রকাশিত হয়। তারাগঞ্জ হইতে কেন পত্র লিখিতে ছিলেন, তাহার উক্তি হইতেই সেকথা জানা যাইবে। এই পত্র-পাঠে আরও জানা যায়, শোলকোপা, বিজলী, রামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার নীলচাষী রায়ত কুঠীঘাল-দের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কুঠীঘালগণ জোরজবরদস্তি করিয়া নীল তুলিয়া আনিবার জন্য রিভলভার, অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিগাল সংগ্রহ করিতেছিল; গ্রামবাসীরাও বসিয়া নাই, তাহারাও বর্শা, লাঠি, গদা জোগাড় করিতেছে—প্রতিজ্ঞা, মূল্য না পাইয়া নীল ছাড়িয়া দিবে না। শতখানেক পুলিশও মোতায়েন হইয়াছিল।

ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের আচরণ কিরূপ জঘন্য হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখও এই পত্র-খানিতে আছে। যশোহরের সিভিল সার্জন এলিয়ট সাহেব কারাগারে প্রায় পঁচিশ জন নীলচাষীকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তাহারা আগামী বৎসর নীল বুনবে, না আবার জেলে আসিবে।’ নীলচাষীরা একবাক্যে বলে, ‘না সাহেব, তোমরা যদি আমাদের গলা কাটিয়াও ফেল তথাপি নীল বুনিব না। ইহার ফলে আমরা যদি-বা কয়েকজন মারাও যাই, আমাদের দেশের লোকেরা তো স্থখে দিন কাটাইতে পারিবে।’ এই উত্তর পাইয়া সিভিল সার্জন এলিয়ট খুব রাগিয়া যান, এবং কাছে যে ক’জন দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বেজ্ঞদণ্ড দিয়া তাহাদিগকে পাঁচ-ছয় ঘা লাগাইয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে ‘তুম্ লোক বদমান’ এরূপ গালি দিতেও ছাড়িলেন না। ইহার পর শিশিরকুমার যশোহর ত্যাগ করার কারণ সম্বন্ধে এই মর্মে লেখেন :

“তিনি [কীনার] আমাদের যশোহর সংবাদদাতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছেন। শিক্ষক শিশিরবাবুকে সন্দেহবশে জব্দ করিতে নানা দল খুঁজিতেছেন। তাহার বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করিয়াছেন। কীনার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে চাপরাসী পাঠাইয়া চার জন চাষীকে ধরিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের মুখ দিয়া তিনি এই কথা বলাইয়াছেন যে, শিশিরবাবুর পিতা তাহাদিগকে নীল বুনিতে বাধ্য দিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে, কীনার উক্ত চাষী-গণকে কিছু দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। নারেন্দ্র-দারোগাকে ব্যাপারটি তদন্তের জন্য পাঠানো হইয়াছে। তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সে যেন ইহার যথাযথ্যই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই সব নয়, কীনার

প্রকাশ্যে বহু বার ধোষণা করিয়াছেন যে, তিনি উঁহাকে দেখিয়া লইবেন (“উস্‌কো দেখেনা”)। দেবা দাকু, তিনি কিরূপে শাস্তি প্রদান করেন। যত জঘন্য লোকই হউক, শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে কোম সংবাদ দিতে পারিলেই সে কীনারের নিকট খুবই সম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়। চুংথের সহিত বলিতেছি, আমার এমন মৈত্রিক সাহস নাই যে, এইরূপ ‘কেপা’ ম্যাজি-স্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হই। ইনি যখনই আমার বোঁজ পাইবেন তখনই আমাকে নিশ্চিত ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। (“who is sure to ruin me as soon as he has found his man”)। সম্ভবতঃ মিঃ কীনারের ভয় হইয়াছে পাছে কুখ্যাত হাম্‌লার ওজুহাতে কলিকাতা হইতে যে সকল সৈন্য আনাইয়াছিলেন তাহার ধ্বংস তাহাকে বহন করিতে হয়— কারণ জেলা জজ বেলীর বিচারে ইহা তো মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।”

পরবর্তী ২২শে আগষ্ট (১৮৬০) সংখ্যা ‘হিন্দু পেটিয়েন্ট’ ‘M. L. L.’-স্বাক্ষরযুক্ত শিশিরকুমারের আর একখানি পত্র পাইয়াছি। ইহার পূর্বে ও পরে “from our Jessore Correspondent” রূপে আরও কয়েকখানি পত্র বাহির হইয়াছে। এসব পত্রপাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়, এগুলিও শিশির-কুমারের লিখিত। তিনি মফস্বলে বিভিন্ন স্থলে ভ্রমণ করিয়া ‘পেটিয়েন্ট’ সংবাদ পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি ম্যাজি-স্ট্রেটদের চোখ এড়াইবার জন্য যশোহর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীলকর-সমাজের সঙ্গে যোগসাজশে প্রজাকুলের উপর কিরূপ উৎপীড়ন-নিপীড়নে লিপ্ত হইয়া পড়েন এই সকল পত্রে তাহার বিস্তৃত বিবরণও পাওয়া যাইতেছে। আগামী সংখ্যায় এই পত্র-গুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করার বাসনা রহিল।



অন্ধ্রদেশে

শ্রীমলিনীকুমার ভট্ট

গোদাবরী নদীর উপরকার সুবৃহৎ সীকো অতিক্রম করে রাজ্য মেল এসে ধামল হোটেল একটু ট্রেনে—নাম কবুর।

মোটবার্টসহ ট্রেন থেকে নামতেই একজন প্রিয়দর্শন যুবক দ্রুতপদে কাছে এসিয়ে এসে ইংরেজী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—“আপনি কি শ্রীভদ্র, কলকাতা থেকে আসছেন?” তাঁর কথার জবাব দিয়ে প্রতিপ্রসন্ন করলাম—“শ্রীমতী পাঠিয়েছেন আপনাকে?”

“হ্যাঁ, আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি, চলুন আমার সঙ্গে।”

ছ'জনে এক ‘বটকার’ গিয়ে উঠলাম। বটকা হচ্ছে একটি মাত্র গুরুদ্বারা চালিত এক প্রকার যানবিশেষ। কবুরের রাজপথের উপর দিয়ে আমাদের গোধান বীরমহুর গতিতে চলতে লাগল। এমনি ভাবে প্রায় আশ মাইলটাক চলবার পর বাজারে পৌঁছে ডান দিকে মোড় ফিরল এবং ছই তিন মিনিটের মধ্যেই একটি মাতিবৃহৎ সুরম্য অট্টালিকার সামনে এসে ধামল।

আমরা গাড়ী থেকে অবতরণ করতেই উজ্জল সৌরবর্ণ, কীপকার প্রোট এক ভদ্রলোক মিতহাস্তে আমাদের স্বাগত করলেন। পরনে তাঁর শুভ্র বন্ধরের ধুতি, আর একখানি চাদরে দেহের উত্তরার্জি আবৃত। ইনিই হচ্ছেন ‘অন্ধ্র শ্রমিক বর্ধরাজ্য সভা’র কর্ণসচিব, অন্ধ্রদেশের বিখ্যাত বিধান ত্রীমণ্ডলের শ্রীমতী—এঁরই অতিথি হয়ে আমি কবুরে এসেছি।

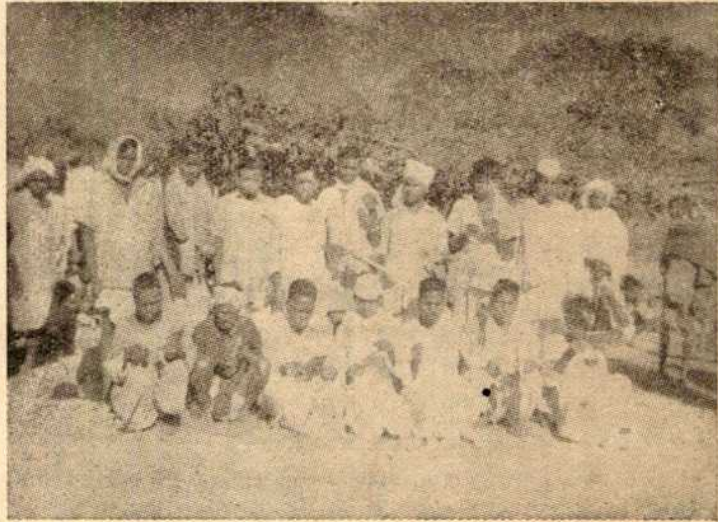
শ্রীমতী আমাদের সঙ্গে করে তাঁর বহির্বাটির একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। খানিক বাদে একজন বেচ্ছাসেবক আমার জন্তে কফি ও ‘ইডলি’ নিয়ে এল। ইডলি হচ্ছে চালের গুঁড়ো আর কলাই ডাল দিয়ে তৈরি একপ্রকার পিঠে।

ঘটনাক্রমে বিশ্রামের পর শরীরটা একটু ঢালা হলে পর শ্রীমতীর পুত্র চন্দ্রবুড়ির সঙ্গে গোদাবরী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। গোদাবরী কবুরের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহমান—শ্রীমতীর বাঁকী থেকে নদীতীর মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্ব।

নদীতটে প্রকাণ্ড এক মহীফলের বন পঞ্জাচ্ছাদনের নীচে প্রাচীন আমলের এক দেবমন্দির। মন্দিরটি বেশ মহাকাশের মূক লাকী—দুগুণ্ডায় ঘরে ঘিরে মিশ্রলভাবে দাঁড়িয়ে

নদীপরপারে আকাশ-বনানীর মিলন-লীলা প্রত্যক্ষ করছে।

বেশ কিছুক্ষণ নদীর ঘাটে কাটিয়ে আভ্যন্তরীণ ফিরে এলে পর আমাদের সঙ্গে দেওয়া হ’ল লক্ষ্মীপতি রাও নামে একজন কন্ঠীয় জিন্দার। তাঁরই উপর আমার আহ্বারাদির ব্যবস্থা করবার ভার। লক্ষ্মীপতি রাও আমাদের নিয়ে গেলেন জনৈক রাজ্যী ব্রাহ্মণ-পরিচালিত, অনতিদূরবর্তী এক প্রকাণ্ড হোটেল—হোটেলটির আশ্রিত্য আছে, ছদ্মিণ জাতের ত্রীকেন্দ্র নয়।



কামিয়াপেটা সম্মেলনে আদিবাসীদের হস্তকোর্টা প্রদর্শন

বেশ পাথরের টেবিলের উপর প্রকাণ্ড এক ধানার আহ্বার্য পরিবেশন করা হ’ল। লক্ষ্মীপতি রাওয়ের নিকট শুভলাভ যিনি ভোজ্যভব্য পরিবেশন করছেন তিনিই হোটেলের স্বত্বাধিকারী। ভদ্রলোক একাধারে হোটেলের মালিক, পাচক, পরিবেশক সবকিছু—সপরিবারে হোটেলেরই বাস করেন। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন।

প্রচুর চাটনি এবং লঙ্কার গুড়ো সংযোগে “রসম” “সম্বরম্” প্রভৃতি মন্ত্রদেশীয় ষাণ্ডবস্ত যা’হোক এক রকম করে যথাস্থানে চালিয়ে দিলাম। প্রচুর দধি, আম এবং খিও পাতে পড়েছিল। কিন্তু দুশকিলে পড়লাম ‘বারধাই’ দিয়ে তৈরি ডেলার মত এক প্রকার ষাণ্ডবস্ত নিয়ে। তেলুগু ভাষায় ষিঙেকে বলে বারধাই। পরিবেশক বললেন যে, তাঁর জী কিছুকাল তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বাংলায় দুখুকে ছিলেন, তখন

তিনি বারখাই দিয়ে এই বাঙালী ধরনের রান্না শিখেছেন এবং বিশিষ্ট বাঙালী অভিনয় করে বহুতে সবে এই আত্মীয় প্রস্তুত করেছেন। কোন্ বদললনা এই মাদ্রাজী মহিলাটির বহুদেশীয় পত্রটির রন্ধনবিভাগ শিক্ষাদাত্রী তা জানি না।

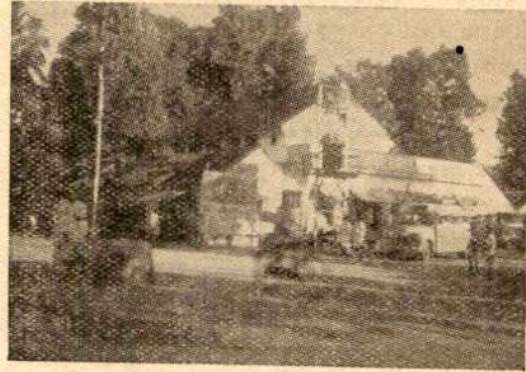


একটি অঙ্গপত্রীর হাটের দৃশ্য

কিন্তু এই মস্তবধু যে এক নিরীহ বঙ্গীয় ভদ্র-সন্তানের উপর রন্ধনশিল্পের মারাত্মক 'এক্সপেরিমেন্ট' চালাবেন তা বোধ হয় তিনি ভাবতেও পারেননি। বারখাই মুখে দিয়েই মুখটা একেবারে বিস্ময় হয়ে গেল—মনে হ'ল যে ভোজনটাই মাটি—এই অপূর্ণ বস্তুটি আসলে প্রচুর তৈল আর লবঙ্গের সঙ্গে সিদ্ধ করে বাটা বিড়ের মত। কালো কালো বাঁচি আর আঁশ দেখে বুঝতে পারলাম, ঘোঁষা থেকে ফুলে একেবারে শিঙার আকারে ধারণ করেছে তাই দিয়ে এ অসম্ভব বস্তু তৈরি, এদিকে ভদ্রলোক একদৃষ্টে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন জীর প্রশান্তি স্তম্ভের জন্তে—ভেতরে পক্ষীর আড়ালে চুড়ির টুং-টাং শোনা যাচ্ছে। বললাম, "কি অপূর্ণ চীজই না হচ্ছে, মনে হচ্ছে ঠিক দেশের রান্না বাচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশক অস্ত্রপূরে গমন করলেন আর যবনিকার অন্তরালে চুড়িগুলো আরও একটু দ্রুততালে বেজে উঠল। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটল, অস্ত্রপূর থেকে প্রেরিত শুপা-কার বারখাই আমার পাজের মধ্যস্থলে পিরামিডের মত শোভা পেতে লাগল এবং নিঃশেষে তা আমাকে অবলীলা-ক্রমে উদরস্থ করতে হ'ল। এমনিভাবে সেদিনকার রাত ভোজন-পর্বের উপসংহার হ'ল বটে, কিন্তু মনে আশঙ্কা জেগে রইল যে রোজই না ভোজন-পায়ে বারখাইয়ের আবির্ভাব এমনিতির বিপর্যয় ঘটায়।

৮ই জুন সকালে ৮টার সময় গোদাবরী নদীতীরস্থ বীর-মন্দিরে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন হ'ল। এই সম্মেলনে যোগদান করবার জেতেই শ্রমিক বর্ধরাজ্য সভা কর্তৃক আহুত হয়ে ককুয়ে এসেছি।

বীরমন্দির অঙ্গ শ্রমিক বর্ধরাজ্য সভার প্রধান কর্মক্ষেত্র। আমাদের মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে অঙ্গদেশের যে সকল বীরসন্তান জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দেশভক্ত' ডেক্সট্রাঙ্গা এর উদ্বোধন করেন এবং উক্ত দিবসেই এই মন্দিরে শ্রমিক বর্ধরাজ্য সভার কার্যালয় খোলা হয়। শ্রমিক বর্ধরাজ্য সভার আদর্শ হচ্ছে সেবার ভেতর দিয়ে দেশের অগণিত মূঢ় মূঢ় জনগণের সঙ্গে যোগস্বাপন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তে 'সভা'র কর্মীদের উত্তোপে অঙ্গ-প্রদেশের ভাইজাগ, কুকা, কুরুল প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি 'শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু



অনকাপন্নী

এঁদের কর্মক্ষেত্র শুধু সমস্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘকাল ধাবৎ অঙ্গের একেজী এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে যেভাবে এঁরা কল্যাণকর্মের অহুষ্ঠান করে আসছেন তা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অহুতরণযোগ্যও বটে। বিশাখাপত্তন জেলার মহুগোলা এবং অনন্তপিরি একেজীর সমগ্র পার্শ্বতা অঞ্চল জুড়ে এঁদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত। শ্রমিক বর্ধরাজ্য সভার কর্মীরা যখন প্রথম এই সকল আদিবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, মজপান নিবারণ আন্দোলন, চরকার হুতাকাটা, বিভাগীয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণ-কর্মের স্বচনা করেন তখন তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ লাভ করতে সক্ষম হন। গান্ধীজী ১৯৪০ এর ২৫শে আগস্টের 'হরিজন' পত্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে এঁদের এই সকল কর্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। এই মহৎ অহুষ্ঠানের প্রতি ঠকর বাপারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে 'মহুগোলা, আদিবাসী কল্যাণ সম্মেলন' উত্তোপে হুতুমেপেটা এবং কামিরাপেটার যে সম্মেলন অহুষ্ঠিত হয় সেটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

শ্রমিক বর্ধরাজ্য সভার কর্মপ্রচেষ্টার এসঙ্গে অনেক দূরে

এসে পড়েছি—এখন বীরমন্দিরে অহুষ্ঠিত সম্মেলনের কথা শুরু করি।



ওয়ালটেন্সারের একটি দৃশ্য

শান্ত গভীর পরিবেশে বন্ধিমন্দিরের ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতের ঘারা সম্মেলনের উদ্বোধন হ’ল। গানটি গাইলে একটি আদিবাসী যুবক। হুদুর কামিয়াপেটার পার্বত্য অঞ্চল থেকে সে এসেছে এই সম্মেলনে যোগদান করতে। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর বীরমন্দিরের সমুদয় প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে পাশাপাশি দুটি পতাকা উত্তোলিত হ’ল—ভারতের জাতীয় পতাকা এবং শ্রমিক বর্ষরাজ্য সত্তার প্রতীক শ্রমিক পতাকা। শ্রমিক পতাকা নীল এবং জরদা এই দ্বিবর্ণরঞ্জিত। পতাকা উত্তোলনের পর সেই আদিবাসী যুবকটি কর্তৃকই গীত হ’ল তেলুগু ভাষায় রচিত ‘শ্রমিক সঙ্গীত’। তার শেষাংশটি এইরূপ:

‘ডানিকি টোড়ুগা, বাণ্ডি শ্রমিকুলা
সুটে ডিপেন্‌চেন’

অর্থাৎ—‘শ্রমিকের রাজ্য কোন্‌ পথে?’

বিপ্লবাত্ত্বের পথে, ঐক্যের আর বিশ্বমৈত্রীর পথে।’

সঙ্গীত সমাপনান্তে শুরু হ’ল মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রদ্ধাজ্ঞের অহুষ্ঠান। শুভ্র বস্ত্র পরিহিত কর্মীরা সার বেঁধে বসে নিবিষ্ট চিত্তে চরকায় হুতা কাটতে লাগলেন—তাদের নিষ্ঠার তাবটি মনকে মুগ্ধ করল।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক দিকের আরও কতকগুলি ব্যাপার সমাধা হলে পর ত্রীমণ্ডলের শর্মা ‘আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও শ্রমিক বর্ষরাজ্যের আদর্শ’ সম্বন্ধে তাঁর মৌখিক ভাষণ দিলেন। এমন চমৎকার ভাষণ শোনা সৌভাগ্যের কথা। শ্রোতাদের মনকে তিনি এমন এক স্তরে নিয়ে গেলেন যেখানে দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে এসে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুদিন আগে মহামতি বিজ্ঞানস্নাতক ঠাকুর আমাদের দেশের জৈনিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে ‘নিবিদল-শাস্ত্রাঙ্গের অগত্য যুনি’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

শর্মাভীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্বলিত শাস্ত্রব্যাব্যাহার শুনে মনে হ’ল এই অভিজ্ঞ এই জ্ঞান-তাপসের প্রতিভা প্রযোজ্য।

পরদিন (২৫ জুন) অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় বীর-মন্দিরে এক বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হ’ল। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, মহিলাবৃন্দ, যুবক ও ছাত্রদের সমাবেশে বীরমন্দিরে আর তিলধারণের জায়গাটুকু পর্যাপ্ত রইল না। কুফা জেলা প্রভৃতির দূরবর্তী স্থান থেকেও শ্রমিক বর্ষরাজ্য সত্তার শাখা কেন্দ্রসমূহের বহু কর্মী সম্মেলনে যোগদান করবার জন্তে সমবেত হয়েছিলেন। সত্তার বিজ্ঞপ্তিপত্র তো প্রচারিত হয়েই ছিল, তার উপর ঢোল-মহরতেও সত্তার কথা প্রচার করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সত্তাহলে বসে ঢোলের আওয়াজ আর ঘোষকের কণ্ঠস্বর কানে আসতে লাগল। শর্মাভীর



বিশাখাপত্তন—জেলপন্নীর একাংশ

বলেছেন—‘ভক্তভী, বহু বৎসর আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। তখন আমাদের যৌবনকাল। জালিয়ান-ওয়ালাবাদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ উপলক্ষে আমরা যে সত্তার আয়োজন করি তার কথা এই লোকটিই ঢোল বাজিয়ে শহরময় ঘোষণা করেছিল।’

যথোচিত গান্ধীর্ষ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সত্তা আরম্ভ হ’ল। শর্মাভী সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত আমার পরিচয়সাধন করিয়ে দিয়ে আমাকে ভাষণ দিতে অহুরোধ করলেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত আমার ভাষণটি ছিল দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ছিল শ্রমিক বর্ষরাজ্য সত্তার আদর্শ সম্বন্ধে আমার ধারণা এবং আসামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা, আর দ্বিতীয় অংশে ছিল পূর্ববঙ্গের বাস্তহ্যারাদের কথা। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমাকে পূর্ববঙ্গের উৎবাস্ত্রদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলতে অহুরোধ করায় আমার ভাষণের দ্বিতীয় অংশটি পরে সংযোজিত করেছিলাম। সত্তার একদিকে যেমন বহু শিক্ষিত লোকের, অতীতকে তেমনি অশিক্ষিত এবং অনেক আদি-

বাসীরও সমাগম হয়েছিল। সকলের বোধসৌকর্য্যার্থে বীরমন্দিরের কৰ্ম্মসচিব, স্থানীয় সংকুল বিভাগীঠের অধ্যক্ষ কে. জি. এন. আগ্রাওয়াও এম-এ আমার ভাষণ মুখে মুখে তেলুগু ভাষায় অনূদিত করেম। আমার ভাষণের পর সভায় কতকগুলি বক্তৃতা হয়। স্থানীয় হিন্দী বিভাগলের প্রতিষ্ঠাত্রী কে. এম. রঙ্গম্মার বক্তৃতা বড়ই মৰ্ম্মস্পর্শী হয়েছিল। রাজি প্রায় আট ঘটিকার সময় সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়।



বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত একটি গরু
সহ তৈলক তিফারী

পরদিন খুব ভোরে দুখ ভাঙতেই মনে পড়ল যে, আজ আর সভা-সমিতির হাদ্যমা নেই, আজ আমি অনেকটা স্বাধীন। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কতকটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করলাম, গোদাবরীর তটভূমি যেন আমাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল—হুনিবার সে আকর্ষণ। তাড়া-তাড়ি শয্যাভ্যাগ করে উঠে শীতালীর বাড়ীর স্নানঘরের রাতা দিয়ে গোদাবরী নদীর তটভূমিতে চলতে লাগলাম। অন্ধকার অধমণ্ড ভাল করে কাটে নি—রাতার হুঁধারের ইটের পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীগুলি যেন স্বপ্নপুত্রীর মত রহস্যময়—রাজিশেষে নব-পরিচিত দেশের জনশূন্য অজানা রাতার চলতে মনে বেশ একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগছিল। ক্রমে একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল—রাতার পার্শ্ববর্তী কোন কোন বাড়ীর মেয়েরা জেগে উঠে ঘরের বারান্দা এবং প্রাঙ্গণ আলপনা (মুণ্ডা) দ্বারা বিচিত্রিত করতে লাগলেন। কস্মুরের মেয়েদের এটি হচ্ছে নিত্যকৰ্ম্ম। ভোরবেলা প্রথমে এই কাজটি সেয়ে তার পর তাঁরা গৃহকৰ্ম্মে রত হন।

বীরমন্দির ছাড়িয়ে আন্দাজ কুড়ি ফুট উঁচু এক রাজপথের উপরে এসে উঠলাম—এই প্রশস্ত বস্তুটি গোদাবরী নদীর গতিপথের সহিত সমান্তরাল ভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিসর্গিত।

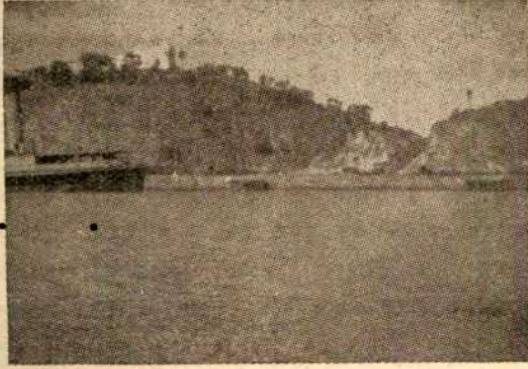
রাজপথ থেকে নিম্নাবরোহণ করে গোদাবরীর তটসংলগ্ন স্রুতপ্রসারিত মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়লাম। স্নানঘরে পূণ্য-প্রবাহিণী গোদাবরীর ফটিকসজ্জা বারিরাশির অব্যাহ বিস্তার। ক্রমে ও-পারের বনশ্রেণীর উপরকার মেঘভূপ বিদীর্ণ করে জবাকুহুমসকাশ বালারূপ আকাশে উঠল, মেঘচ্ছায়ার প্রতিফলনে নদীর বারিরাশি হয়ে উঠল স্বর্ণবর্ণে অমরজ্বিত। আলোর উদ্যেষের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপূর্ব দিকে নীল আকাশের পটভূমিকায় ফুটে উঠতে লাগল সুনীল পাহাড়ের তরদায়িত রেখাসমূহের আদরা। কোন্ মহান শিল্পী যেন বহু প্রযত্নে এক-খানি সুবিস্তীর্ণ নীল ক্যানভাসের উপর বিচিত্র বর্ণবিজ্ঞান ও নিপুণ রেখার প্রয়োগে অপরূপ রূপসৃষ্টি করে চলেছেন। প্রকৃতির উদার উদ্বুদ্ধ ক্ষেত্রে, গোদাবরীর আলোকোচ্ছল বক্ষে একটি নুতন দিনের জন্মলীলা প্রত্যক্ষ করলাম—নদীর পূণ্য-সলিলে অবগাহন করে আমারও যেন হ'ল নবজন্মলাভ।

স্নানান্তে অদূরে নদীতটের তরুশূলে গিয়ে বসলাম। ওপারের বালুচর থেকে রক্তের মত রাঙা লাল বালুকারাশি বোকাই করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পালতোলা নৌকাগুলি গোদাবরীর বুকে পাড়ি জমিয়েছে। গোদাবরীর বর্ষীপ নদীর ঘাট থেকে অনতিদূরবর্তী—নদীর প্রবাহ এখানে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। আন্দাজ আশ মাইলটাক দূরে 'গোদাবরী'র পূর্ব ও পশ্চিম তীরের মধ্যে যোগস্বজ্ঞ স্থাপন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সাকো 'গোদাবরী ব্রিজ'। ক্রমে নদীর ঘাটে স্নানার্থী স্ত্রী-পুরুষের ভিড় হতে থাকে। মেয়েদের পায়ে মোটা রূপার বাঁজু, হাতে মাজাখষা চকচকে বকবকে জলের কলসী। একই ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি অবগাহন স্নান করেন—অঘণা সঙ্কোচ নেই। গৌরকান্তি ব্রাহ্মণেরা একবৃক জলে দাঁড়িয়ে নবোদিত সূর্য্যের পানে তাকিয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করেন; তাঁদের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি যেন নদীবক থেকে অনন্ত অমরজ্বিতমুখে উবিত হতে থাকে। এখানকার এই পূণ্যপরিবেশে গোদাবরীর জলকল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন তারতের তপস্বীগুণ্ড জাতীয় জীবনের জংশনধ্বনি শুনতে পাই।

ঘাটের অনতিদূরে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ছোট জাল দিয়ে কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ মাছ ধরছে। পুরুষদের পরনে মেরুটি, মেয়েদের দেহে যে অপরিহার্য বস্ত্রবস্ত্র জড়ানো লজ্জা শিবারপের পক্ষে তা সম্পূর্ণ উপযোজী নয়। তাদের গায়ের রং মিশকালো—মাধায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এরা যে এদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আদিবাসী তা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না। আর্ধ্য তারতের অধ্যায়-মহিমা এবং অনার্য্য তারতের অপরিহার্য্য দীনতাকে এমন ভাবে প্রত্যক্ষ করবার অরূপ সুযোগ ইতিপূর্বে আর জীবনে হয় নি। অন্ততঃ হুঁহাজার বংসর পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও আর্ধ্য-তারত এবং অনার্য্য-তারতের

মধ্যে যে কি চুস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

এখান থেকে কয়েক রশি মাঝ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন আমলের আর একটি মন্দির। এই মন্দিরটির নাম গৌতম মন্দির। কবিত্ত আছে যে, এই কবুরই ছিল ঋষি গৌতমের উপভাস্থি। এখানেই গোদাবরী নদীর তীরে ছিল



‘বার্চ হিলে’র পাদদেশে বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয়ের দৃশ্য

এই মহাপ্রাণ ঋষির আশ্রম। ভারতের এই বরুণীয় ঋষির স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই সুদূর অতীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। গৌতমের সহিত জড়িত বহু কাহিনী এখনও কবুরে প্রচলিত আছে।

নদীতটে এক নিভৃত মনোরম স্থানে মন্দিরটি অবস্থিত—হুঁকারে হুঁসারি তালগাছ জায়গাটির শোভা বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়ে আছে। তপস্তার উপযুক্ত স্থান বটে। এখানে হুঁদুও বসতেই যেমন মনের সকল চাকল্য দূর হয়ে গেল—মন তরে উঠল একটা গভীর প্রশান্তিতে। মন্দিরের সম্মুখভাগস্থ আলিসার শীর্ষদেশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, দীর্ঘ শ্রোত্রবিমণ্ডিত ঋষি গৌতমের দ্যানগভীর প্রতিমূর্তি হৃদয়কে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে দিলে। প্রত্যন্ত-স্বর্ধের প্রথম রশ্মিমালা মূর্তিটির মস্তকে যেমন স্বর্ণের আশিস্কারার মত অরূপ দাক্ষিণ্যে বয়ে পড়ছে।

মন্দিরভাঙুরে আছে ঋষি গৌতমের শ্বেতবর্ণাশ্রুজিত একটি প্রতিমূর্তি, আর তার পাশেই একটি দেবমূর্তির মস্তকোপরি একটি প্রস্তরনির্মিত সর্গমূর্তি কণা বিস্তার করে বিরাজমান। মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তের প্রস্তরবেদিকার উপরে কণাধর একটি নাগমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মূর্তি দক্ষিণ-ভারতে নাগপূজার বহুল প্রচলনের পরিচায়ক।

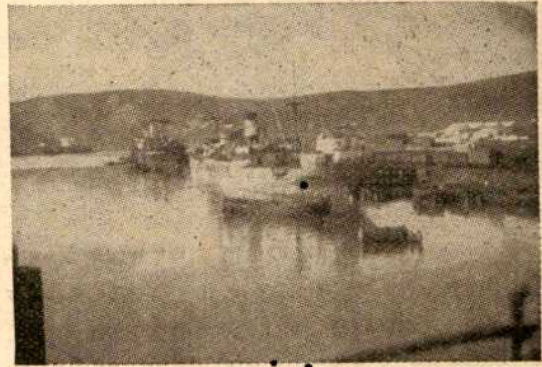
মন্দির পর্যবেক্ষণ করে আশ্চর্য্যের স্রোত এসে বিশ্রামের আয়োজন করলাম।

বিকলে লক্ষ্মীপতি রাণ্ডের সঙ্গে শহর দেখতে বের হওয়া

গেল। শহরটি ছোট কিন্তু ভক্তভক্তে বকবক—বেশির ভাগই ইটের পাঁচিল দিয়ে বেরা পাকাবাড়ী। প্রথমেই আমরা বাজারে এসে উপস্থিত হলাম। বাজারের ঠিক মাঝ-খানে একটি চালাখরের নীচে স্বর্ণকান্তি পাকা আমের স্তম্ভ। এদেশের আম দেখতে যেমন ময়মনসোতন ভেমনি স্বাদেও অমৃণম, আবার দামেও ঢের সস্তা। আমের নামই বা কেমন কবিত্বপূর্ণ—যেমন সুবর্ণরেখা। জাম এবং কলারও ছড়াছড়ি দেখলাম। জামগুলি বেশ পরিপুষ্ট আর মিটোল—জামকে এরা বলে জম্বু। কবুরের পানও অত্যন্ত সুখরোচক, পানকে এরা বলে ভাভুল, চূর্ণকে চূর্ণম্। এখানকার স্থানের নাম, কলের নাম ইত্যাদি সবকিছুতে সংস্কৃত শব্দের ছড়া-ছড়ি দেখে মন চলে যায় প্রাচীন ভারতে। শহরের উপকণ্ঠে ‘জম্বু’-বন দেখে মেঘদূতে বর্ণিত, বিদ্যাপাদে বিশিষ্ট, উপলব্ধিম জম্বুকুলে প্রতিহত-প্রবাহ রেবানদীর কথা স্মৃতিতে জাগে—মনে পড়ে মেঘের প্রতি যক্ষের উক্তি—

তস্তান্তিভৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বাস্তবুঠি-

জম্বুকুলে প্রতিহতরসং তোহমানার গচ্ছে:...ইত্যাদি।



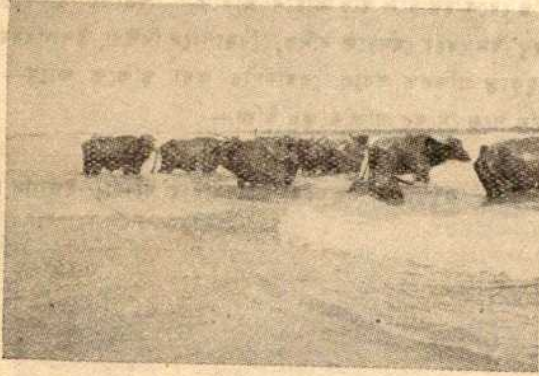
বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তরভাগ

বাজারে আর একটা জিম্মি দেখে মনটা বুঁশ হয়ে উঠল। প্রত্যেক দোকানেই—তা সে যত ছোটই হোক না কেন, নেতাজী স্মৃতিচিহ্নের একখানা বা একাধিক ছবি আছে। নেতাজীকে অজ্ঞদেশবাসীরা দেবতার মত ভক্তি করে। তাঁর নাম ভাড়া উচ্চারণ করে অপরিণীম শ্রদ্ধার সঙ্গে। অজ্ঞদেশে নেতাজীর অহুগামী সংখ্যা কম ছিল না।

এ ছাড়া কত রকমের মাহুয যে বাজারে মজরে পড়ে তার আর অভ্য নেই। গ্রাম্য জী-পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ শহরের মরনারীর চাইতে আলাদা ধরণের। বাজারে সমাগত অনেক গ্রামবৃদ্ধের মাথার পাগড়ি, কানে পিতলের আঙুঠি, নাকে রিং। গ্রামের জীলোকদের মধ্যে অনেকের শাড়ী মালকোঁচা দিয়ে পরা। এটা সম্ভবতঃ মরাঠা-প্রভাবের ফল।

তরুণীদের সর্বাঙ্গে গয়নাগাটির প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। তাদের নাকে নাকছাবি (নিষাটা পুসিয়া) এবং একপ্রকার রিং (যুক্ত পুড়কা), গলায় গিনিসোনার তৈরি কর্ণহার (মাস্ত), আর প্রবালের মালা। বাজারে অনেক পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষও সওদা করতে এসেছে। কইরা নামক পাহাড়ী মেয়েরা বেশ স্বাস্থ্যবতী, দৈহিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—তাদের কর্ণ-ভূষণে পুষ্পগুচ্ছ গোঁজা।

ককবুরে একজনও বাঙালী নেই। শহরের উত্তর-পূর্ব-প্রান্তে একটি পৌড়ীর বৈষ্ণব মঠ আছে। খ্রিষ্ট বৎসর পূর্বে অর্যাসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে নবদ্বীপের জটনৈক বৈষ্ণব এই মঠ



একপাল মহিষের সমুদ্র-স্নান

প্রতিষ্ঠা করেন—বর্তমানে এই মঠাধীশ হচ্ছেন জনৈক উড়িষ্যা-দেশীয় বৈষ্ণব। গত খ্রিষ্ট বৎসরের মধ্যে নাকি বর্তমান লেখক ছাড়া কোন বাঙালী এখানে আসেন নি। তেলুগু আর ইংরেজী ভাষা ব্যতীত এখানে আর কোন ভাষা প্রচলিত নেই। এখানে সকল শ্রেণীর লোকই ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারে। সামাজ্য দোকানদারও কাজচালানো গোছের ইংরেজী জানে। সম্ভ্রান্তি এখানে হিন্দী ভাষা প্রচারের চেষ্টা চলছে।

পরদিন বেলা ন'টার সময় জম্মীপতি রাওকে সঙ্গে নিয়ে রাজমহেন্দ্রীগামী ট্রেন বরবার জল ককবুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত অন্ধ্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ট্রেন যথাসময়ে এসে ষ্টেশনে পৌঁছল এবং গোদাবরী নদীর পুলের উপর দিয়ে ছ'তিন মিনিটের মধ্যে আমাদের গুপারের ষ্টেশনে নিয়ে গেল। ষ্টেশনের নাম গোদাবরী।

ষ্টেশনে নেমেই দেখি কয়েকজন রূপলাবণ্যবতী অঙ্গ মহিলা সম্ভবতঃ পরবর্তী ট্রেনের জঙ্গে বিশ্রান্তি-ভবনে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের লাবণ্যচ্ছটা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য চোখ কলসে দিলে। পরনে তাঁদের বিচিত্র বর্ণের

শাড়ী, অমবগুষ্ঠিত মস্তক বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত—তাঁদের কেশবিভ্রাসের তদ্বী নয়মাক্তিরাম, পৃষ্ঠদেশে দোলাহমান সুদীর্ঘ সুকৃষ্ণ বিহুনিভে চম্পক এবং অজ্ঞাত সুগন্ধি পুষ্পমালা জড়ানো, ললাটে কুঙ্কম-ভিলক, চোখে কাজল, কটিতে কারুখচিত স্বর্ণ-নির্মিত নীবিবন্ধ। হঠাৎ যেন চমক লেগে যায়, মনে হয় অজ্ঞাতা গুহাচিত্রের কতকগুলি নারী-মূর্তি কি কারা পরিগ্রহ করে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ষ্টেশন থেকে আমরা সরাসরি চলে গেলাম রাজমহেন্দ্রীর একটি প্রাচীন মন্দির দেখতে। মন্দিরের দীর্ঘদেশে তথুর্ক, ভৈরব, নারদ, ব্যাস, ভৃগুদেব এবং যোগেশ্বর এই ছয় জন ঋষির ধ্যানাসনে উপবিষ্ট প্রস্তরমূর্তি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তথুর্কর মুখ হবহ যাঁড়ের মুখের মত।

আরও কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরাদি দেখে শহরের বাজারের ভেতরে এক চক্র ঘুরে আসা গেল। ষ্টেশনে ফেরবার পথে গোদাবরী নদীর তীরে এক গাছতলায় প্রকাণ্ড তিড় দেখে এগিয়ে গিয়ে যে দৃষ্ট নজরে পড়ল তাতে হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না। গাছতলায় হুনি জালানো, তার এক পাশে তিনহাত লম্বা আর হাততিনেক চওড়া, বহুসংখ্যক লোহার পেরেক লাগানো একটা তক্তার উপর আসনপিড়ি হয়ে নির্ঝকর ভাবে বসে আছে অস্থি-চর্মসার জটাধারী এক পাঁচমা সাধু। হুনির অপর পার্শ্বে গৌরবর্ণ বিশালকার সাজোয়ান আর এক সাধু গজ্জিকার ধূমে দশদিক আচ্ছন্ন করে সম্ভবতঃ দশমহাবিভার রূপদর্শনের প্রয়াস পাচ্ছে। আমি পেরেকগুলির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ গাঁজার কল্কেতে ত্রক্ষরজ্ঞ-ভেদী একটা টান মেয়ে জোয়ান সাধুট আমাকে চমকিত করে দিয়ে অপূর্ব বাংলায় বললে, “ও মোশাই, ও বংগালী বাবু, এ মোকোল নয়, আসোল শরশ্যা, ও ভীষ্মজী আছে; বিসোয়াস না হোয় তো পেরেকমে হাথ্ লাগাইয়ে দেবুন।” শুনে কৌতুহল হ'ল—হাতের তেলো দিয়ে পেরেকগুলির উপরে সামাজ্য চাপ দিলাম। হাত টনটন করে উঠল। সাধুজী তখন আমার মুখের পানে তাকিয়ে ঈষৎ অবজার হাসি হেসে যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, তিনি বহুবার কলি-কাতায় পেছেন এবং সেই হুবাতেই বলভাষায় এতাদূশ বাক্য-পটুতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই ভীষ্মজী শরশ্যা কাঁধে করে তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়ান। সম্ভ্রান্তি কড়া-কুমারিকা থেকে এসেছেন। এখানে কি একটা যজ্ঞ হবে। তার পর যাবেন উত্তর-ভারতে। পেরেক-শয্যায় উপবিষ্ট সাধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা প্রভুজী, আপনি কি চক্ষিণ বর্গে এই শরশ্যাতেই সুধাসীন থাকেন?” ভীষ্মজী জবাব দিলেন না, দম্ববিকাশ করলেন মাত্র। আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, এর মধ্যে আবার হাসিও আসে। জোয়ান সাধুজীর মুখে

আবার খই ফুটল, বললে, “ভীষ্মকী মৌনী আছেন—কোথা বোলেন না। হাঁ মোশাই, ভীষ্মকীকে ইসমে বোসতে শুভে সব কুহ কোথুতে হয়।” মনে মনে বললাম, “আর ভূমি বাটা হচ্ছ হুঁয়োবন। এই খেল দেখিয়ে পরশা রোজগার করে হু-খউ আর ‘মোটি মোটি রোজি’ বেয়ে শাঁসে জলে ‘পুকটু’ হচ্ছ—আর ভীষ্মকী যে বজ্রাহারে আর শরশয্যার গুঁড়োর চোটে দিন দিন চিমসে মেরে যাচ্ছে সে তো বেচারার চেহারাতেই গুপরিফুট। অস্ত্রমশয্যা লাভ না করা পর্যন্ত যে শরশয্যার হাত থেকে ভীষ্মকীর নিষ্কৃতি নেই তা বুঝতে পারলাম। লোকটার উপর মাসা হ’ল। তার হাতে একটা আবুলি গুঁজে দিয়ে সাজোরান সাধুকীকে বললাম, “সাধুবাবা, ভীষ্মকীকে একটু ভাল করে রসদ যুগিও, নইলে বেশদিন এ খেল দেখাতে পারবে না।” সাধুকী জবাবে কি বললেন তা শুন্নার আগ্রহ রইল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখানেও যে একই নীতি—সেই হুঁয়োর উপর প্রবলের অবরদত্তি। এই বর্ষক্ষেত্র থেকে সরাসরি ষ্টেশনে এসে ককবুরগামী ট্রেন বরলাম।

ককবুর থেকে ফেরবার দিন শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভার কন্মোরা আমাকে ষ্টেশন পর্যন্ত এসিয়ে দিলেন। বিশাখাপত্তন দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বহু দিন ধরেই ছিল, তাই ওয়ালটেটোরের টিকিট কাটলাম।

ট্রেন যখন গোদাবরী নদীর উপরকার পুলের উপর দিয়ে চলতে লাগল তখন ককবুরকে শেষবারের মত একমুহুর দেখে মেবার জুড়ে পেছন ফিরে তাকলাম। রোজকার মত নদীর ঘাটে পুণ্যকামীদের ভিড় জমেছে, নদীতীরে ঐ তো দাঁড়িয়ে সেই বিরাটকায় মহীকুহ যার স্নিগ্ধজ্যোতলে বসে প্রত্যক্ষ করেছি প্রাচীন ভারতের বিরাট অধ্যাত্ম-মহিমাকে। মনে এমনি একটা অনির্বেগ বেদনাপূর্ণ অহুত্ব জাগল যেন কি এক অমূল্য সম্পদ গোদাবরী নদীর ঐ নির্জন তটভূমিতে ফেলে রেখে যাচ্ছে।

ট্রেন ছুটেছে প্রবল বেগে—গোদাবরী চোথের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছ’ধারে নৃতন দৃশ্যপট। কোথাও লাল মাটির প্রান্তর, মাঝে হরিৎ শতক্ষেত্র; কোথাও মাইলের পর মাইল জুড়ে সারিবীধা সরল সমুদ্রত তালীবন, কোথাও বা সুদূরপ্রসারী তালীবনের শেষপ্রান্তে আকাশছোঁয়া হুসর পাহাড়, মাঝে মাঝে পাহাড়ের পাদদেশে ভালপাতার ছাওয়া চূড়াকার চালাবিশিষ্ট পাহাড়ীদের কুঁড়েঘর, গৃহের অনতিদূরবর্তী শত-ক্ষেত্রে মালকৌচামারা, রঙীন শাড়ীপরা পাহাড়ী মেয়েরা ক্ষেত্র-কর্ণে রত। এমনি সব বিচিত্র দৃশ্য আর অনেকগুলো ষ্টেশন পেছনে ফেলে আমাদের ট্রেন বেলা বায়োটার এসে পৌঁছল ওয়ালটেটোর ষ্টেশনে।

‘বেঙ্গলী হোটেল’র কথা জানা ছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে গাড়োয়ানকে সেই হোটেলেই নিয়ে যেতে বললাম। বিশাখাপত্তনের রাজপথের উপর দিয়ে অধ্বনি ছুটে চলল। সুস্থে পেছনে—ডাইমে বাঁয়ে ঘেদিকে তাকাই মজরে পড়ে আকাশছোঁয়া পাহাড়শ্রেণী—দূরে বারু হিলের পাদস্থলে বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয় চকিতে দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

হোটেল পৌঁছে খাদিক বিশ্রাম করেই রওনা হলাম সমুদ্রতীরের উদ্দেশে—বালুবেলার উপর পা ছড়িয়ে বসলাম। সুস্থে নীলকান্তমণিমীল সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গমালা প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে এসে তটভূমির সন্নিকটে শতধা কেটে পড়ছে—ডান



বিশাখাপত্তনের সমুদ্রতীর—দূরে ‘উলফিলস নোভ পাহাড়’

দিকে ক্ষুদ্র একটি শৈল একেবারে সমুদ্রগর্ভে নেমে এসেছে। সমুদ্র গর্জনযুগ্ম, পাহাড় চিরমৌন। সমুদ্রগর্ভোন্মিত এই পাহাড় কত যুগ-যুগান্ত ধরে প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত বুক পেতে সহ করেছে—কে জানে।

ক্রমে নৈশ-অন্ধকারের কৃক যবনিকায় চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে যায়—মাকদরিসায় আহাছের বৃকে বৈদ্যুতিক আলো যেন সমুদ্রতলবাসী কোন অতিকায় দৈত্যের রক্ত-চক্ষুর মত জ্বলতে থাকে। ধীরে ধীরে লোকের ভিড় কমে আসে। নির্জন সমুদ্রতীরে বালুকা-শয্যায় সটান শুয়ে পড়ি—সমুদ্রের মহা-সদীন্তের গুঁটার এবার যেন সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি।

ক্রমে রাত বাড়তে থাকে। সমুদ্রবেলা সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য হয়ে যায়। বালুশয্যা থেকে উঠে লোকালয়ের দিকে পা চালিয়ে দিই।

অভিসারিকা

ঐ অপরূপকৃত ভট্টাচার্য্য

আজ এমন দিনে গৌ কাহ্নে এসে যারে হরু হরু বৃকে থেকো না,
যারে যারে হরু হরু বৃকে থেকো না ।

ওই শুধু ভব লাজ আবরণে অভিসারকণে রেখো না,
ওগো, অভিসারকণে রেখো না ।

অহুরাপে যদি ভরে ওঠে মন মিছে কেন ভব বেদনা,
দীরবতা দিয়ে আপনারে ঢেকে ঘুমে জড়ায়ো না চেতনা ।

ওই অবয়ের ভাষা চেপে রেখে আর
ব্যথা বহিও না প্রাণে অনিবার :
কুরালো সময় দিন গুনিবার
মণিকা । ওগো বগন-পথের মণিকা ।

আজ এমন করে ও চোখে চোখ তুলে সরমে আনন ঢেকো না ।
ওগো, সরমে আনন ঢেকো না ।

হরিণ-মরমা । আমারো মরনে
পড়ে ভব মন-হারা যে,
তুমি তাবো বুঝি তুমি হাড়া কেহ জানে না ।
আশাবন যদি মিরববি
রচে বরষের মধুমাসা যে ।

মনোহরণের বধনিকা তুলে যোর পানে মন টানে না ।
দীল কাকলের রেখা দিয়ে কেন প্রণয়ের লেখা লেখো না ।
কেন প্রণয়ের লেখা লেখো না ।

বহে যদি বাতাস, রাতের অঙ্গ বরে পড়ে ওগো ললনা,
তুমি ফুলতোরে বাঁধো পুলকের রাবী কেন লাজ এত বল না ?
হরে আনন ধানের বিদায়ের গানে
বেদনার সুরে যদি মন টানে,
হর -গুলি শুধু বেঁধে রেখো ভব প্রাণে
মণিকা । ওগো অচপল অভিসারিকা ।
তুমি এমন করে গো মনের হারার ব্যথার পরাপ মেখো না,
যোর বরে অলে দীপ তুলে বরো ভায়ে হৃয়ের লোহাপ মেখো না ।

মহুয়া

ঐ গোপাললাল দে

আবার এলো কি মব বসন্ত কামনের কোণে কোণে,
মহুয়ার ফুলে দোলা দিয়ে বুলে মধুকর গুল্মনে ?
ওগো অচরিতা, আজ একবার স্মৃতির ছায়ার খোলো,
তোমার আমার সেই পরিচয় । বুঝি বা পুরানো ছোলো ?
যেদিন তোমারে প্রথম হেরিছু ভ্রামা সুন্দরী শুভু,
মব বসন্তে ফুল-নিব্বর করায় পুষ্পবহু ;
দূর বন হ'তে সুবাসিত বায়ু ভ্রমর-বিকৃত সনে,
তোমারে আমারে যিরি ব্রহ্মিল ধরণীর এক কোণে ;
সারাস্ত শুধু অবোর কোহনা ভ্রামা-শিখে উঠে মাতি,
নারিকেল-শাখে যুহু ইঙ্গিত ; কেণে কেটে' যার মাতি ।
শুধু রস আবাদ,
মনে ভেবেছিছু এমনি কাটবে, বিধি দিবে পরসাদ ।

ফুল ভেদে গেল রঙ না যেতেই, হেরিছু চকিতহস্ত,
জীবনমুহুরে সখা-সখী কোথা ? বিষম বিশিষ্টহস্ত
হাল ছেড়ে দিই বায়ে বায়ে বস্ত, তুমি ভায়ে বরো নিতি,
প্রথ বন্ধন, কুণ্ঠিত হর ঐতি ।

এমনি সে দশা ; মব বসন্ত কত আসে ফিরে যাহ,
বজ্রা-পীড়িত রাস্ত কপোত দিশা বুঁজে নাহি পার ।
দিন যার কীণ আশা,
মিলাইরা দেখি অনেকখানি যে হারিয়েছে ভালবাসা ।

আজিকে আবার বসেবসাতে চলিরাছে কানাকানি,
পুষ্পলাবীরা আগিতেছে বুঝি ? তারই চলে হাতছানি ।

ওগো, ভেবে দেখ, কত মব কান্দনে,
অমৃত কালে অনাদি জীবনে মিলনের জাল বুনে ।
কিরি কিরি করে রসনিব্বরে 'ভূজ-তোমি' বার,
কোঁড়া কোঁড়া যুহু ভ্রামা বজ্রনা অব্যাহত মাঠে ছার,
শিয়ুলে পলাশে কাকনাশোকে বনান্ত রঙে হাসে,
মহুয়া বনের মিস্ত্রণের বাণী দিগন্তে ভাসে ।

সারা রাত ফুলদোল,
মাঘলের তালে বনবালাদলে নৃত্যের ফলদোল ।
হারাবার মর আজিকার দিন, ভরোনিহুহু বন,
অমর যে প্রেম বায়ে বায়ে তার হটক উজীবন ।

বন্দী বার্না

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৮

যেদিন কথা দেওয়ার কথা ছিল—তার আগেই দেখা করলে জিলোচন সেনের সঙ্গে। বললে, আপনার কথার আমি রাজী। কোথায় যেতে হবে—আর কবে যেতে হবে বলুন।

জিলোচন সেন বিস্মিত মুখে প্রত্যাহার পানে ধানিক চেয়ে রইলেন। এ যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। এই প্রত্যাহারই না কিছুদিন আগে কঠিন মন নিয়ে এই বাড়ী ত্যাগ করে গিয়েছিল। এর মনে সেদিন যে তাপ সঞ্চিত ছিল দারিদ্র্যের পেয়ণে তা কি বাষ্প হয়ে গেল আজ ? ও কি কেকার-কীবনের জ্বালা সর্ব সত্তা দিয়ে অল্পভব করছে ? হয়ত মনে মনে বুঝেই বাংলাদেশের গৃহহরণের ছেলের এ ছাড়া আর গতিই বা কি ? কোমমতে একটা আশ্রয়—উদরপূর্তির জন্য কিছু ভুলকথা—সারা জীবন অমায়ানে বিকিয়ে দেওয়া যায়... সেই নিরুদ্বিগ্ন ছদ্মছায়ায়। যাই হোক, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ করে ভেবে দেখেছ ? হু'মান, হু'মাসের জন্য শহর ছেড়ে অজ পাড়ারগারে থাকতে তোমার অস্ববিধা হবে না ?

না—এমন আর অস্ববিধা কি ?—একটু হেপে বললে প্রত্যাহার, অস্ববিধা বা মনে করি তা একান্ত ভাবে মনেরই ব্যাপার বই তো নয়।

মানে ? জিলোচন সেন প্রতিপ্রগ্ন করলেন। একটু ধৈর্য উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললেন, মমটাই কি আসল নয় ? আমরা হিন্দুরা অবশ্য মনের ওপরেও একটা জিনিস মেনে থাকি।

সে জিনিস যাই হোক—দেহকে চালার যে সকল ইঞ্জির তার মধ্যে মনটাই হ'ল প্রধান। মনের ক্রিয়াজেই স্বপ্ন হুঃখ—লাভ লোকসান—ভাল মন্দ যা বলেন তাই।

বাঃ যে দার্শনিক—এমন নিস্পৃহ ভাবে যদি জিনিসটাকে দেখতে দেখে—তোমার হুঃখকষ্ট কিসের ? ভূমি তো—

কিন্তু আমি মনের তত্ত্বকথা শোনাতে আসি নি। এ বিষয়ে আমার জ্ঞানও কম।

যাই হোক—কথাটা বলেছি ঠিক। জ্ঞানের রাজত্বে মনকে এক পাশে সরিয়ে রাখা কঠিন। মনের যে বার্না আছে—চিন্তার স্রোতে বয়ে সে বার্নার সর্বকণ চলছে সে। চলছেই চলছেই—ষ্টিকানায় পৌঁছল কিনা—আর ষ্টিকানাতেই যদি পৌঁছে গেল তো চলাটাই তার শেষ হয়ে গেল যে। তা হয় না।

প্রত্যাহার চূপ করে রইল। মনের তত্ত্ব অহুসরণ করে উনি

যে অধ্যাত্ম গোলকবাঁধার সৃষ্টি করছেন—তা ওর ভাল লাগছে না। সাদা চোখে পৃথিবীকে যেটুকু দেখা যায় তারই মধ্যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন কবি—অনিভ্যতা আবিষ্কার করেন মাদ্যবাদী—সম্পদ আবিষ্কার করেন ভোগি। এক একটা দিকের দৃষ্টি নিয়ে—এক একজন মানুষ বিচার করেন পৃথিবীকে—আসলে পৃথিবী যা তাই। সে বললে, কবে শহর ছাড়তে হবে—

আচ্ছা সে ধরবে এক সপ্তাহের মধ্যে পাবে। বাস্তব জগতে ফিরে এলেন জিলোচন সেন। কিন্তু একটা জিনিস সত্যিই অবাক লাগছে আমার। ভূমি সত্যিই কি মনে প্রাণে—

না হলে আপনার কাছে এমনি এসেছি ? আমি শহর থেকে বাইরে যেতে চাই—যুক্ত আলো হাওয়া—আর—

কথাটা সম্পূর্ণ করলে না প্রত্যাহার। শহরের দূষিত বায়ুতে মন বিধিরে উঠছে—সুস্থ জীবনে শহর মারীভর ছাড়াচ্ছে—বহু দূরে নিরাপদ ব্যবধান সৃষ্টি না করলে—

জিলোচন সেন বললেন, বেশ, চাকরি নেবার মুখে তোমার এ সন্দেহ ত হতে পারত যে—নিজের কোন স্বার্থ-লিঙ্গির জন্য—

প্রত্যাহার হাসল, হতে পারে—কিন্তু তা ভাবব কেন—স্বার্থটা আমারও যখন কম নয়।

তোমার স্বার্থ ?

কেন চাকরি। আজকালকার দিনে একটা চাকরি পাওয়া—

বস্তির নিখাস ফেলে জিলোচন বললেন, তাই বল। কিন্তু হু'মিনে পাড়ারগা যদি একঘেরে হয়ে ওঠে—

সে ত অনেক দূরের কথা। তা হলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কি—

হাঁ—তৈরি হয়ে থেকে।

প্রত্যাহার চলে যাবার উপক্রম করতেই তিনি বললেন, আজ বাড়ীর মধ্যে একবার আসবে কি ?

বিশেষ দরকার আছে কি ?

দরকার, না—হাঁ—সিপ্রার মা যেন কি বলবে বলছিল।

বেশ চলুন।

বিস্মিত হলেও মনে মনে পুলকিত হলেন জিলোচন। প্রত্যাহার সম্পূর্ণ বদলে গেল কি করে ? সত্যিই কি শহর ওর ভাল লাগছে না ?

যে ঘরে প্রথম দিন দেখেছিল মেজ জ্যেষ্ঠাইমাকে সেই ঘরেই এসে বলল প্রত্যাহার। দেখালে টাঙান রয়েছে সেই ছুটি

প্রতিদৃষ্টি, একটি বহু অলঙ্কারভারপ্রাপ্ত—আর একটি বুদ্ধির দীপ্তিতে সমৃদ্ধ।

মিলোচন সেম ডাকলেন, প্রভাত এসেছে—কোথায় গেলি রে সিপ্রা ?

মেজ কোঠাইমা হাসিমুখে দেখা দিলেন, বসি ছেলে—সেই যে গেলেন—

প্রভাত লজ্জিত মুখে চূপ করে রইল।

মিলোচন সেম বললেন, বোকাপড়া কর তোমরা মারে ছেলেভে। ভবে একটা নতুন খবর দিয়ে যাই তোমাকে—প্রভাত প্রসাদপুরের মহালটার তার নিতে রাজী হয়েছ।

তিনি চলে গেলে মেজ কোঠাইমা বললেন, বস একটু—আমি আসছি।

প্রভাত বিস্মিত হ'ল—ওর ঘরে হুততা থাকা সত্ত্বেও কেমন ঘেন ভাবী হয়ে উঠেছে।

অবিলম্বে জলধাবার নিয়ে ফিরে এলেন মেজ কোঠাইমা, মেঝেয় কার্পেটের আসন বিছিয়ে জলের ছিটে দিয়ে ছায়াগাটি ছাত দিয়ে মুছে রেকাবিটা নামিয়ে বললেন, বস এখানে। আপত্তি তোমার মিছে—জান ত আমাদের এ অভ্যাচারটুকু দইতেই হয়।

প্রভাত হাসিমুখে আসনে বসে বললে, সত্যি অপরাধ করেছি—এখানে না এসে—

আজ্ঞা তার বিচার পরে হবে—আগে জলটা খেয়ে নাও ত।

আপনি জ্বরদন্ত শাসক। প্রভাত হাসতে হাসতে বললে। ওটা আমাদের বংশগত গুণ। স্তন্যে ত এ বাতীর গল—আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি। উনি হাসলেন।

জল খাওয়া হলে প্রভাত চৌকির উপর এসে বসল। বললে, একটা উদাহরণ দিন না আপনাদের শাসনের।

উদাহরণ চাও ? প্রভাত লজ্জা করলে, মেজ কোঠাইমার সুবের হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে মিলিয়ে গেল অকস্মাৎ। উনি বললেন, তুমি মনে করো না—তোমার না আসার কারণ আমি জানি না—কিন্তু তাই যদি সত্যি হয় ত উনি এইমাত্র যা বলে গেছেন তা সম্ভব হয় কি করে ?

প্রভাত বললে, আমরা চাকরি না নিয়ে কি করতে পারি ? একটা কিছু নিয়ে চলতে হবে ত ?

তুমি আজ না ?

প্রভাত লজ্জিত হাতে বললে, সে শুধু দকল্লে—মানান অল্পবিশেষ ক্লাস-মেবার সুবিধা পেলাম কৈ।

তা হলে আশ্বানা মন নিয়ে কাছে নামবে ? মনের অর্ধেক তোমার থাকল যা সরস্বতীর পায়ে বাঁধা—বাকি আশ্বানা কেবে সংসারে ? এতে অল্পবিধা হবে না ?

এ হাক্সা কি-ই বা করতে পারি ?

সত্যিই শাসন করব তোমাকে। তোমরা এ যুগের লেখা-পড়া-জানা ছেলে—এই পৃথিবীর কত জান—কত পড়েছ। তোমাদের জীবনে দু-হুটো যুদ্ধ ঘটে গেল, কত আশ্চর্য জিনিস দেখলে, মানান্ ঘেঁষের মানুষের চেহারা আর কর্মের ব্যাধা দেখলে, তাদের মনের খবরও কিছু কিছু রাখ—তোমরাও বলবে এই কথা ? না প্রভাত—তোমার এই দকল্লে আমি সত্যি দুঃখিত হয়েছি।

দুঃখিত হয়েছেন ! আপনি ?

কেন—আমার মনেও কি তোমাদের ভালবাসতে ইচ্ছা হয় না—?

তা হলে তো স্বখীই হবেন শুনে যে আমি আপনাদের আরও কাছে এসে পড়ছি। প্রভাত ধামবার চেষ্টা করলে।

হাঁ স্বখী হওয়া উচিত আমার—তাই নয় ? তুমিও তাই ভাব তো ? কিন্তু তুমি এ ক'মাস না আসাতে আমাদের লজ্জাও কম ছিল না, ব্যাধাও কম ছিল না। তুমি আজ এসেছও সেই লজ্জা ঘুটিয়ে, তবু মন খুলে আনন্দ করতে পারছি না কেমন ?

কেন—মেজ কোঠাইমা ?

মেজ কোঠাইমা চূপ করে রইলেন। ওর দুটি দেয়ালের হবিতে সংলগ্ন—উবি অস্ত্র জগতে চলে গেছেন বোধ হচ্ছে। প্রভাতও চূপ করে রইল।

এদনি নিশ্চয়তার করেছটা মিনিট কাটল। অকস্মাৎ মেজ কোঠাইমার ধ্যাম তাড়ল যেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, বেশ করে ভেবে দেখ বাবা—তারপর চাকরি নিও।

প্রভাত দ্বিগুণ ক্ষুব্ধ হ'ল। বললেন, আজ্ঞা মেজ কোঠাইমা—আমি কি এতই ছেলেমানুষ যে নিজের ভালমন্দ বেছে নিতে পারি না ?

নিষ্কর পার—এটুকু আত্মবিদ্যাস না থাকলে তোমাদের শিক্ষার গুণ কি ? কিন্তু আমাদের সংসারকে আমরা যতটুকু জানি তুমি হয়তো ততটুকু জান না।

আপনার ইচ্ছা নয় যে—

আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা—তোমাদের বুঝ কাছে পাবার। কিন্তু যে পাওয়ার মধ্যে বাধ্যবাধকতা থাকে সে পাওয়ার গলদও যে ঘটেই। একটু ভেবে দেখো বাবা—তুল বুঝো না।

প্রভাত প্রণাম করে বললে, আজ্ঞা ভেবে দেখব।

পথে এসে আর একবার ভাবলে প্রভাত। ওর আশ্চর্য বোধ হ'ল—সেকালের বনিয়াদি বাতীর শত বিবিনিষেধ শাসন-অবরোধ সত্ত্বেও—এ কালের উচ্চ শিক্ষার আলো না পেয়েও—মেজ কোঠাইমার জ্ঞান বুদ্ধি স্নেহ মমতা মনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে অপূর্ণ ভাবে। পতনোন্মুখ প্রসাদ ঘেন উকেই অবলম্বন করে আশ্রয়লা করছে। প্রেরণা-দায়িনী—অজিরূপিনী বারী। প্রভাতকে দিকটে টানার

অসদৃশি উনি হুত্রে হুত্রে পেরেছেন। মাহুকে কুতজ করে যে অন্তরের মাঝখানে বসানো যায় না—এই সত্য উনি অন্ততঃ উপলব্ধি করেছেন।

মুন্সের আগে পর্যন্ত ওই বাড়ীর কথাই ভাবলে প্রভাত। ও বাড়ীর আভিভাষ্য ওকে মুগ্ধ করছে—ক্রমশঃ যেন কাছে টানছে। শিক্ষার নুতন অর্থ উপলব্ধি হচ্ছে ও-বাড়ীর শক্তিরূপিনী মেয়েদের কথা শুনে। শিক্ষা বলতে ইচ্ছা কলেজের শিক্ষা নয়, উপাধিলাভের কৃত্তিও নয়—জীবনকে সব দিক দিয়ে জানিয়ে সার্থক করে তোলার উপকরণ সংগ্রহ করা। সংসার চালানার নৈপুণ্যই হ'ল পৃথিবীর সবচেয়ে সার্থক শিক্ষা। একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সংসার রাষ্ট্রের পরম সম্পদ—এই সম্পদ নিয়েই জাতির সভ্যতার নিরিখ।

ভাবতে ভাল লাগছে—হবির ওই বহু বসন ও অপরিপাণ্ড অলঙ্কার-ভাড়াভাড়া মেয়েটিকে। ওই মেয়েটি সাহিত্য-রসের সম্ভান রাখে এবং ওর দৃষ্টিতে নুতন লেখকের প্রশংসার স্বীকৃতি। ও কি সাধারণ পৃথিবীর অতি সাধারণ ঘটনা ও মাহুকে ভুলে অন্তঃপুরে বলিনী হয়ে নিজের গৌরবশ্রুতি ঘান করে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে? মহীয়সী মায়ের শক্তির এক কণাও ওর জন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।

ভারপর প্রভাত কখন চলে এসেছে সেই ঘরে, দেয়াল বেঁধে ঘে চৌকিখানা পাতা আছে ভাতেই বসে বিষয়ভরা চোখে ঘরের সাজসজ্জা দেখছে। বড় ছখানা হবির মধ্যে একখানি নাই। নাই মানে সেই বহু বসন ও অলঙ্কার-ভারপ্রাপ্ত মেয়েটি—সোনালী ক্রেমে বাঁধানো মুক্তির মধ্যে নাই—সে যেন শরীর পরিগ্রহ করে সামনে দাঁড়িয়ে যুহু যুহু হাসছে। হাসছে কেন মেয়েটি? এইমাত্র যে প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেল তারই কোড়কে ওর মুখখানি স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে কি? নুতন আদ্যপের আনন্দও হতে পারে। চা ফলখাবার বহুক্ষণ হ'ল শেষ হয়েছে—আলাপও ফুরিয়েছে, এইবার হাত তুলে শুধু একটি প্রণামের সঙ্গে—বিদায়ের আয়োজন। হঠাৎ মেয়েটির যুহু কণ্ঠ কানে বাজল, নতুন কিছু লিখছেন?

এ্যা আমায় বলছেন? প্রশ্ন করে প্রভাত যথেষ্ট সঙ্কুচিত হ'ল। লেখা সম্বন্ধে আর কাকেই বা প্রশ্ন করতে পারে মেয়েটি। সচকিত বলে বললে, না—ভেদন কিছু লিখিনি—তবে লিখব ভাবছি।

শহর ছেড়ে গেলে লেখার সুবিধা হবে বেশ—না?

আপনি কি করে জানলেন?

প্রভাতের এই প্রশ্নে মেয়েটি লজ্জায় মাথা নামালে।

অক্ষুট ঘরে শুধু বললে, আমি জানি।

আপনিও লেখেন বুঝি?

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল মেয়েটি। কোনমতে জবাব দিলে, কাগজ কলম নিয়ে বসলেই তাকে লেখা বলে না।

যত্নে কুতে যদি ন সিধ্যতে—

মেয়েটি মাথা নীচু করেই উত্তর দিলে, চেঁচার দারা সিধ্য না হলে দোষটি অজ কারও কাছে চাপানো চলে কি? নৈবেদ্য উপর নয়। নিজের কম বুড়িকে সমাদর করতে নিজেরই ভো ভাল লাগে না।

কিন্তু নিজের মধ্যে যে রসপিপাসা ব্যক্তিটি আছে সে শুধু ভাল লেখার রসাবাদ করেই ক্ষান্ত হয় না—সেই আনন্দকে স্থায়ী করার জন্ত কাগজ কলম নিয়ে বসে।

ভাই নাকি! মেয়েটির গুপ্তপ্রাপ্তে হাসির রেখা ভরদিত হ'ল।

প্রভাত বললে, জামেন না—মনের একটা অভ্যাস খুঁটি করা? আর খুঁটির আনন্দ না থাকলে জীবনের অর্থই বা কি।

মেয়েটি মুগ্ধ কণ্ঠে বললে, জীবনের অর্থ কি জামি না—কিন্তু আপনাদের লেখা পড়ে তাবি—ষ্টিক যেন আমাদেরই মনের কথা টেনে হুড়িয়ে দিয়েছেন লেখার মধ্যে। আপনাদের নায়ক-নায়িকারা কল্পনার জন্ম নিয়েও বাস্তবের কাঠামোতে সমস্ত বুদ্ধি ও প্রাণসম্মত করা পড়ে যায়। আমরা বলি ষষ্ঠ খুঁটি।...

তবু একবারও আপনাদের মনে হয় না কি যে কল্পনার রাজ্যে যখনই বাস্তবকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—নিজের অভিজ্ঞতার পুঁজিটুকু বুইয়ে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে। আমরা যা নই—তারই স্বপ্ন দেখি—আর লিখিও সেই ভিনিস। কেমনা আমাদের মধ্যে মধ্যে রয়েছে তেমনই একটি কল্পনার রত্নী প্রসাদ—বাস্তবে যার কাছে পৌঁছতে সর্বদাই চেষ্টা করছি।

এটাকে কাকি বলছেন কেন? মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলে। আমাদের বাঁচিরে রাত্বে রত্নবতী আশা—যা কল্পনার দেউলে সর্বদাই বন্দী। বাস্তবের রূপ আঘাত পেয়ে সেই দেউলে আশ্রয় নিই আমরা। সে যে আমাদের সর্বোত্তম ভরসা।

বাঃ—চমৎকার বলে মেয়েটি। এতও বুঝতে পারে সর্বদা যার সোনার শৃঙ্খল, বুদ্ধি যার সেই তারে—ওঙ্কল্য হারিয়েছে।

মেয়েটি হঠাৎ বললে, আচ্ছা আপনি এতদিন আসেন নি কেন এখানে? পাছে ঠকে যান এই ভয়ে? সেদিন বুঝি পালিয়েছিলেন?

প্রভাত বললে, আমরা পদে পদে তুল করি বলেই ঠকবার ভয় পদে পদে এবং ঠকিও প্রায়।

কিন্তু আমরা কাছে ঠকবার ভয় করবেন না। বলে মেয়েটি হাত-পা মেড়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। সে শব্দ হাসির নয়—অকপ্রত্যঙ্গ সকালসন্ধ্যা স্বর্ণালঙ্কারের সুরখুঁটি।

সেই সুরেই আপাততঃ মগ্ন হয়ে গেল প্রভাত। সেই সুরের
তীর খেয়ে গভীর রাত্রি বুঝি নিঃশেষিত হ'ল।

চোখ চাইলে প্রভাত। কোথায় সেই প্রাসাদ—কোথায়
সেই কড়া? তবে হাসির ধ্বনিটি শ্রুতিতে লেগে রয়েছে।
লক্ষী শিরেরে দাঁড়িয়ে অপরিমিত হাসছে। বলছে, মহাকাালের
মন্দিরের নীচের বইত যে নদী তারই নাম শুনলাম তোমার
মুখে। তারতবর্ষের নদীগুলির নাম কি হৃদয়ের দাঁদ।

পরিহাসে তরল নয় লক্ষীর স্বর—অথচ স্বার্থবোধক এই
উজ্জ্বল ভাষণ প্রভাত বুঝতে পারলে। দেওয়াল থেকে
নেমে এসেছিল ছবি—নাহিত্য নিয়ে করেছিল সওয়াল-জবাব।
আত্মসচেতন প্রগল্ভা কিশোরীর অকুণ্ঠ সমালোচনা এককণ
কোন ভগ্নে নিয়ে গিয়েছিল প্রভাতকে? আশ্চর্য—বহু-
ভগ্নের সেই যেহেতু একই কারাগার দাঁড়িয়ে আছে—না তার
হৃৎপাশের ঘটনার স্রোতও গতিময় হয়ে বয়ে চলেছে?
ওকি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তার প্রাণরসবারা পান করছে না?
ওর চেতন-লোকে পলাতক ঘটনা রেখা টেনে টেনে গড়ে
তুলছে না কি স্মৃতির দেউল? সেই দেউলে বুদ্ধির দীপ
জ্বলিয়ে ও আরতি করছে জীবনের। অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে
সেও জড়ত্ব অর্জন করে নি—স্বয়ংসত্ত্বে একটি শ্রামল অঙ্কুর
প্রাণরসে সজীবিত—আলোক-পিপাসু অঙ্কুর, সমস্ত ঐশ্বর্যকে
হৃৎপাশে অবহেলায় ছড়িয়ে দিয়েও শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যে রয়েছে
প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু সত্যই অনভা।

লক্ষীর চোলে খেয়ে চমক উঠল প্রভাত। সুরের ঘোর
তার সর্বাঙ্গে—বিছানা ছাড়তে চাইছে না দেহ।

লক্ষীর স্বর তখনও কানে ভাগছে, সারারাতঃ বুঝি ঘুমোও
নি? কি যে এত ভাবনা তোমার।

সত্য—এ ভাবনার সঙ্গে প্রভাতের পরিচয়ও নূতন। এ
ভাবনা জীবনের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে চায়—সমস্ত
সমস্তার পাঠে উত্তীর্ণ করে দিতে চায় মানুষকে।

সোনার গরাদেবর বাইরে আকাশের টুকরায় তখন
স্বপ্নাঙ্গীরা বসে—একটু পরেই চড়া রোদে নীল আকাশ
বিস্তার হয়ে উঠবে। জীবন তখন বাস্তবের কঠিন স্পর্শের
অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হবে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে—নয়? প্রভাত আলস্ত ভেঙ্গে
উঠে বসল।

লক্ষী বললে, বাইরে একজন কে তোমার ডাকছে। কি
অজুত চেহারা তার।

শশী হাজরা হাত তুলে বললে, আঘাতী ধরে ঠায় হতো
দিক্খি। আজ পিতিজ্ঞে করে বেরিয়েছি বাড়ী থেকে—হয়
এসুপার নয় ওসুপার।

কিছু দরকার আছে?

ওরা বলছেন আজই একটা হেস্তমেষ্ট হয়ে যাক। বুঝতে

পারলে না বাবা—ওই যে ব্ল্যাকমার্কেটের। কিন্তু আমাকে
কি তোমরা রেহাই দিতে পার না?

আজই—কে বললে?

কেন শশী বাবা অমল বাবা সুবোধ বাবা সবাই। সবাই
নাকি ঠিকঠাক করেছে—ওদের বাড়ীতে কি গানবাজনা
আছে—

না না, প্রভাত নিজের ঘরে নিজে চমকে উঠল। এমন
উচ্চ সুর তার কণ্ঠ থেকে বার হতে পারে।

তুমি কাঁপছ বাবা—একটু স্থির হও।

না হাজরা মশায়—আজ কিছুতেই ও কাজ হতে পারে
না। আপনি বলুন গে ওদের—

আমার কথায় ওরা বিধাস করবে কি—তুমি এসে বরং
বলে যাও।

আজ চিঠি লিখে দিচ্ছি আমি। আর ওহেলা দেখা
করব ওদের সঙ্গে। একটু অপেক্ষা করুন আপনি।

চিঠি লিখে শশীর হাতে দিয়ে বললে, নিয়ে যান।
অমলেন্দুকে বলবেন, ওবেলা যেন একটা মিটিং ডাকে—
বুঝলেন?

আজ বাবা।

শশী চলে গেলে প্রভাত আপন মনে বললে, এ আমার
হৃৎসলতা নয় কি? আপন মনেই আশ্বাস দিলে, হোক
হৃৎসলতা—এতেও মানুষ সময়ে সময়ে আনন্দ পায়। একটা
উৎসবের দিনে বিজাট বাধানো ভদ্র কুচিতে বাধেই।

২৯

অনিমেষের বিদায়-অভিনন্দন সমস্ত সে যোগ দেবে না
স্থির করলে। শেষ পর্যন্ত ওর সকল বক্তার রইল না। দীপা
আর অনিমেষ দু'জনেই টেনে নিয়ে গেল। সভাটির উত্তোষ-
আয়োজন রাজসিক এবং কুচিসম্মত। বিত্তবানদের সবাইকে
প্রভাত জানে না—দীপাদের বাড়ীতে ও দেখেছে—এ পরি-
বারের ছোট বড় সকলেরই কুচিভোজ অতুত। সাজিত
আচরণ—বুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রিয় আলোচনা—সবটাতাই শ্রুতীর
সুরটা বক্তার রাধা এ যেন ওদের স্বভাবগত। অভাবের
অমাবস্তায় অন্ধকার যে পৃথিবী—ওরা তার বিপরীত মণ্ডলে
বাস করে—চির পুণিমালোকের অধিবাসী ওরা। ওদের
গোন্ধে প্রভাতের গোন্ধ যেনে না তবু কোথায় যেন কোন
ভারে একটি সুরের সঙ্গতি আশ্চর্য রকমের রয়েছে। দৈনন্দিন
আহার-বিহারের তুলনাক্ষেত্রের উর্দ্ধলোকে আলোষণা যে
মানসগুণ অবলম্বনে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তারই
সমঝুটিতে ওদের মিতালি। এর জন্ম বহুদের পরিহাস সহ
করতে হয়। আর মনে হয় সে পরিহাস কত তুল—বিষয়
জালায়। বাইরের প্রত্যেকটা মানুষের কয়েক রকমের মাঝে —

কিন্তু ভিতরে তার অসংখ্য স্বপ্ন—অসংখ্য বাসনার সে স্বপ্ন-বৈচিত্র্যে বলমূল্য করছে—অসংখ্য তরঙ্গীতে উঠছে সুরের তরঙ্গ, অসংখ্য আগন্তুক রুত্তি পরিপূর্ণ করে রেখেছে সে পরিমণ্ডল। বাইরের সম্পদ, দারিদ্র্য, অহংকার, আনন্দ, বুদ্ধি, বোধি সবই সেই অন্তর-উদ্ভূত সযুগের তরঙ্গ-প্রকাশ মাত্র।

একটির পর একটি অস্থগান প্রমোদ-স্বচীকে অলঙ্কৃত করেছে—সুর হৃদয় সঙ্গীত আরাতি কথা সব মিলে—অথও আনন্দলোক বনীভূত হচ্ছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না—প্রচার-বাসনার ক্ষীণ হয়ে উঠল কে—কোন মালাটিকে অশোভন করবার ক্ষমতা নানা জাতীয় ফুল গ্রহিবদ্ধ হ'ল একটি স্বপ্ন স্বভাব।

প্রমোদ-স্বচী ও আহাৰ দুই-ই সমান তালে চলছে—এমন সময় বেয়ারা এসে জানালে অর্দেন্দু রায়কে—কে একজন বাইরে অপেক্ষা করছে তার জন্য। প্রমোদ-স্বচীর মধ্যে তাঁকে আনি সঙ্গত হবে কিনা বুঝতে না পেরে অর্দেন্দু রায় বললেন, বাইরের বৈঠকখানা খুলে বারুকে বসাতো গে—আমি যাচ্ছি।

সত্যিই তিনি উঠে বাইরে গেলেন। একে দুইয়ে অনেকগুলি মিনিট ঘণ্টার অভিমুখে আবর্তিত হ'ল—তিনি ফিরলেন না। উৎসব-মস্ত কারও চোখে পড়ল না তাঁর অস্থপস্থিতি। রুটি প্রাণী শুধু এ সময়ে সজাগ রইল। দীপা বার দুই বাইরে উঁকি মেরে দেখে এল বাবা আসছেন কিনা—আর প্রভাত লক্ষ্য করলে প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল গৃহকর্তা অস্থপস্থিত। কেমন অস্বাভাব্য বোধ করলে সে। কি জানি কি ঘটল—যে-কথা হয়েছিল কাল সন্ধ্যাবেলার তারই স্বপ্ন পৌছল কি প্রমোদ-বাসরে? উৎসবের দীপাবলী রান হয়ে এল—হাসি আনন্দের কলধর কোন্ পৌরমণ্ডলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলে ধেনু—ও চেনার ছেড়ে উঠে দীপার কাছে এসে বললে, আসছি আমি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে অর্দেন্দু রায়কে ধারপথে দেখা গেল। এক ঘণ্টার মাহুষের এমন অদ্ভুত পরিবর্তনও হয়। গৌরবর্ণের মাঝারি গোছের মাহুষটি সহজ স্বভাবের সকলেরই অন্তরঙ্গ বলে মনে হ'ত। তাঁর পাভলা ঠোঁটের অবিচ্ছেদ্য হাসিটি বাদ দিয়ে তাঁর মুখে কল্পনা করাই যায় না অথচ সেই মুখ নিরুদ্দেশ গাভীরো ধর্ম ধর্ম করছে। প্রমোদ-আসনের বাইরে স্বপ্ন-পীড়িত পৃথিবীতে এই মাত্র বজ-পতনের বিভীষিকা দেখে তিনি ধেনু ফিরে এসেছেন। তাঁর সৌম্য মুখে হঠাৎ বেদনার ক্রুর আভাস লেগে রয়েছে—তবু কুটিল দৃষ্টিতে কুটে উঠেছে অপ্রত্যাশিত আঘাতজনিত ঘৃণা ও ক্ষোভ—আর সেই কালি-মায় স্তম্ভর বা ক্রুর কোন কিছুর চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। প্রভাতকে হাত তুলে ইসারা করে পিছন ফিরলেন তিনি। যন্ত্র-বন্দীভূতের মত প্রভাত তাঁকে অঙ্গসরণ করলে।

বাইরের ঘরের টেবিল ঘিরে হু'লেন মুখোমুখি বসলে। টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি। একটা পিতলের ছোট বুদ্ধ-মূর্তি দিয়ে কাগজখানা চাপা রয়েছে—বাঁধানে উড়ে না যায়। ঘরের জিনিসপত্রগুলি আশ্চর্য রকমে শুদ্ধ। খালি রুক-বক্টিটা টকাটক শব্দে সেই নিশ্চিন্ততার বুকে আঘাত করছে।

সে আঘাত সময়ের বুকে বাজছে—বাজছে মাহুষের বুকে।

প্রভাতের স্বপ্নগিণ্ডে সেই আঘাত এসে পড়ল—গলা শুকিয়ে গেল—অত্যন্ত তৃষ্ণা অস্থত্ব করলে সে।

তার মুখের পানে চেয়ে অর্দেন্দু রায় বললেন, টেবিলের ওপর যা রয়েছে তার অর্থ সম্ভবতঃ তোমার অজানা নয়। কিন্তু আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে—পৃথিবীতে আশ্চর্য বলে কোন বস্তুই কি কল্পনা করতে পারা যায় না। মাহুষের এক দণ্ডের বিশ্বাস পর-দণ্ডেই ভেঙে যায়।

প্রভাত কি বলতে গেল—তিনি বাবা দিয়ে গভীর কণ্ঠে বললেন, যা বলবে জানি। কিন্তু একদিন নয়, দু'দিন নয়—মাসের পর মাস মাহুষের সঙ্গে মিশেও কি মাহুষকে চিনতে পারা যায় না—না তাকে বিশ্বাস করাও স্বাভাবিক। জানি কারও সঙ্গে কারও নীতি মেলে না—কিন্তু নীতিতে না মিললেই তা যে দুর্নীতি হবে এ ধারণা কেমন করে জন্মায়—বলতে পার ?

প্রভাত আর একবার চেষ্টা করলে কথা কইতে—অর্দেন্দু রায় উচ্চ হয়ে উঠলেন। চাপা উৎসবের কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাসঘাতক—প্রবন্ধকের দল। পেছন থেকে ছুরি চালায় যারা তারা সং নয়—কাপুরুষ।

প্রভাত মরিয়া হয়ে বললে, আমার কথা যদি শোনেন—কি শুনব? আমি ব্র্যাক-মার্কেট করি—ভোমরা সাধু, তাই ধরিয়ে দিচ্ছে চাপ? ভোমরা সত্যায় গান্ধীবাদের জিগির তুলে দেশের বুকে নাম কিমতে চাপ?

আপনি উত্তেজিত হয়েছেন।

আশ্চর্য্য কি। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে তোমার স্বভাবের রসদ। অথচ তোমাকে অবাধ অধিকার আমি দিইছিলাম অন্তঃপুরে চুকবার—আমার মেয়েকে মিশতে দিইছি সরল বিশ্বাসে—

আমায় বিশ্বাস করুন। প্রভাত মিনতি করলে।

অসম্ভব। আমার সর্বনাশের জন্য কীদ পেতে রেখে—বিশ্বাস করুন—

না—না। কিণ্ডের মত চীৎকার করে উঠলেন অর্দেন্দু রায়। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে। আমি নিজেই কিছুতেই সাহসাতে পারছি না। হাতের কাছেই রয়েছে বন্দুক—তুমি চলে যাও—চলে যাও—

প্রভাত আঙুল আঙুলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মনে হ'ল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ওকে অঙ্গসরণ করছে—গান্ধিতে ছেয়ে

গেছে সর্বাক। ও কেন প্রতিবাদ করতে পারলে না? অভ্যয়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে—কেন ও প্রতিবাদ করতে পারলে না? কোন্‌খানে ওর দুর্বলতা ওকে ভীর্ণ করে তুললে। সেকি গোপনতা? যে মুহূর্তে ও অসত্যকে আবিষ্কার করেছিল সেই মুহূর্তে কেন সভ্য আচরণের দ্বারা নিজেকে নির্ভীক করতে পারে নি? কিসের সৌভাগ্য—কেন দুর্বলতা? জন্মের গোপন কোণে সম্মান, অর্থ, সাহিত্য, কৃতি কিংবা শারী—কোন আসক্তি ওকে কর্তব্যবিশুদ্ধ ভীর্ণ করে তুলেছিল? আর এই মুহূর্তেও সেই ভীর্ণ সম্মুখবোঝে সে সভ্য ভাষণ উচ্চারণ করতে পারলে না। বেজব্রাহ্মত কুহুরের মত বেরিয়ে এস ঘর থেকে।

উপরের ঘর থেকে নূপুর-নিকণের তালে উজ্জ্বলিত হাসির ধ্বনি—ওকে পথের প্রান্তে তেলে নিয়ে গেল।

৩০

না—শহরে আর থাকা চলবে না। যে-কোন উপায়ে হোক দূরে পালাতে হবে। বহু দূরে—বাংলা থেকে যত দূরে হয়—তাও ভাল। আজই পাকা কথা দিয়ে আসবে ত্রিলোচন মেনকে। উনি কালই যেন ব্যবস্থা করে দেন—কলকাতার বাইরে গুঁর সেই মহালে থাকবার। সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রতিবেশে নিজেকে আড়োপান্ত পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাবে। কিসের ভয়ে সে সভ্যকে একপাটে প্রকাশ করতে পারে না। সভ্য-প্রকাশের বাধা কি জন্ম-দারিদ্র্যে—কোন-মতে উদর-পুষ্টির উপার্জন্য হুওয়ার আশঙ্কায়, না আজগুসম্মিত স্নেহমমতার বন্ধন কাটিয়ে অনাচারী জগতে অভ্যস্ত একাকী হওয়ার দুঃসহ কল্পনায়? এভাবে ভয়ে ভয়ে সব দিক বাঁচিয়ে সভ্যসাধক হওয়ার বড়াই তার লাঞ্জে না। কোন যাহুযই ভয়ের সঙ্গে সভ্যকে জড়িয়ে জীবনের সাধনায় জয়লাভ করতে পারেন নি।

প্রভাত।

কে? চমকে উঠে ও চাইলে—সামনে দাঁড়িয়ে অমলেন্দু। ওর মুখও শুকনো।

ব্যাপার কি? ভোর কি অসুখ করেছে।

শরীরটা ভাল নেই। একটু ঘেমে বললে, তা হাতা আমি ঠিক করেছি কালই কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাব।

কেন—কোন ‘অফার’ পেয়েছিস?

না—হাঁ—এক রকম তাই বটে। মোট কথা শহরের বাতাস আমার সহ্য হচ্ছে না—আমি বাইরে যেতে চাই। প্রভাতের কণ্ঠস্বর কারুণিক যেন।

অমলেন্দু বললে, যদি কেউ আমাদের বাস্তব-ভীর্ণ বলে ডাকে দোষ দেব না।

প্রভাত প্রতিবাদ করলে না—কেমন বিহ্বলের মত চেয়ে রইল অমলেন্দুর পানে।

অমলেন্দু মাম হেসে বললে, যে কথাটা আমি বলতে এসেছিলাম তা আগেই তুই বলে নিলি। মানে—আমিও বাইরে যাচ্ছি।

তুই-ও?

উপায় কি—কাকা চিঠি লিখেছেন শ্রীমতি থেকে—ওখান-কার মিলিটারী অ্যাকাউন্টস্-এ কয়েকটা পোস্ট বালি হয়েছে মাকি।

চাকরি—

আমাদের মত মধ্যবিত্তেরা আর কি করবে। সহায় নেই অল্প পথ ধরব—সম্পত্তি নেই ব্যবসাতে নামব।

ইংরেজ সরকার যা শিখিয়েছেন ‘দেড়শ’ বছর ধরে তারই জাবর কেটে চলতে হবে আরও বেশ কিছুদিন।

প্রভাত ধীরে ধীরে বললে, জাতীয় সরকার হয়েছে, এবার শিকার দ্বারা নিশ্চয় বদলাবে।

বদলাক—আমরাও ততদিনে জীর্ণ হয়ে যাব যে শিক্ষা পেয়েছি তারই ভারে।

আমাদের বংশধর দ্বারা আসবে—

উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমি দেখি না প্রভাত—পৃথিবী আজ তারি গোলমালের মধ্যে চলছে। এ যেন চলছে পরীকার যুগ—কবে ফললাভ হবে সে আশা অবশ্য পোষণ করা অভ্যাস নয়, কিন্তু সেই আশায় বর্তমান দুঃখ-কষ্টকে কিছু না বলাও তার চেয়ে কঠিন।

কিন্তু এই অস্থিরতা—বিধ্বাসহীনতা—আমাদের বেশ দুর্বল করে দিচ্ছে, আর রাষ্ট্রও দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রভাত মন্তব্য করলে।

তবু ধৈর্য্য আমরা সঞ্চর করতে পারছি না। এত বড় ট্রাজেডি হয়ত কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে নি। একটু ঘেমে বললে, বিশ্বাস ভাদে কেন জানিস? যাকে অবলম্বন করে উঠে দাঁড়াতে বাই—দেখি দেও পাক মাথা আশ্রয়—ত্যাগী বলে যার মহত্বের পায়ে সর্বত্র বিক্রিয়ে দিতে বাই, দেখি তার ত্যাগ ভোগের স্বত্বপক্ষে গোপন সঙ্কেত মন্ত। অন্য দৃষ্টান্ত যে মেই তা নয়, কিন্তু তার আলো এত দূরে আছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্শ করতে পারছে না।

অমলেন্দুর আক্ষেপ প্রভাতের অন্তর স্পর্শ করলে। চকল হুমিয়ার আজ আদর্শের সংঘাত অভ্যস্ত স্পষ্ট—তারই মাঝে জাতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। স্বত্তি-পরিষদে আলোচনা প্রভাব যুক্তি তর্কে যোরাটলা হয়ে ওঠে—ভোটের গুরুত্ব আর ভোটের স্পর্ধার তা প্রকৃত কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উগ্র জাতীয়তাবাদের ধ্বংস চাই—ধ্বংস চাই মতবাদের। বড় হুমিরা আরম্ভন-স্বল্পতার দূর প্রতিবেশীকে করেছে নিকট—নৈকট্যের জন্য সন্দেহ অবিশ্বাস প্রবল হয়ে

উঠে। শ্রোতে ভাসতে ভাসতে যুগ্ম কলস যতই নিকটবর্তী হচ্ছে বাত-কলসের দিকে—ততই তার ভয় বাড়ছে—ততই সে চাইছে নিজের ভঙ্গপ্রবণতা পরিহার করে কোন শক্ত আবরণে অস্তিত্ব হতে। তার প্রততিতে বাত-কলসও হুর্ভেত হবার সাধনার মন দিয়েছে। যে হুর্ভেত হতে পারবে—এই প্রতিযোগিতার জন্য তার অসিবার্থ। তাই মরণ তেঁকাত্তে সাংঘাতিক মারণাজের আবিষ্কারে বন-জন-বিভা-বুড়ির প্রয়োগ চলছে পূর্ণমাত্রায়। এর শেষ ফল—মাটির কলসী তাদ্বে কি পিতলের কলসী অর্থম হবে তা নির্ণয় করা নয়—পৃথিবীর ছুরিপাক যে বাড়বে—এ ত সুরক্ষিত।

তারাজ্ঞান মনে হুঁকনে বিপরীত পথ ধরলে। হুঁকনেই যুগ্মে সমিতির কথা তোলা নিরর্থক। সমিতি সৃষ্টি হয়েছিল যাদের অবসর ক্ষণে—তার সময়ের শ্রোতে ভেসে যাচ্ছে—আবার সময়ের শ্রোতেই হয়তো নতুন তৃণগুচ্ছ ভেসে এসে সংলগ্ন হবে সমিতির প্রান্তে। পুরাতনের বিদায় ও নতনের প্রকাশ হুঁকনের তারামায়া রক্ষা করে পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের অস্তিত্ব। যারা আসে প্রয়োজনের ভাগিদে তারা গৃহ নির্মাণ করে সম্বন্ধে রূপ দেয়—সমাজ-সমিতিতে করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। তাদেরই তৈরি নিয়ম-কানুনে জীবনযাত্রার পথ যতখানি সুগম হতে পারে সে চেষ্টার ক্রটি হয় না। কিন্তু সময়ের শ্রোত বামে না এক হওঁর স্বভে, আত্মকের নতুন কাল হয় পুরাতন—সেই কাল-আশ্রিত বিধি-নিয়ম আচার-অনুষ্ঠান সবই বাতিল হয়ে যায় নতুন জীবনের মান নিয়ন্ত্রণে—নব পত্রোদ্যমে বৃক্ষ-বৃক্ষ থেকে ধসে পড়ে যেমন পুরাতন পত্র। পাতা ধসে গেলেও তার স্থিতি-চিহ্নের একটা নিদর্শন রয়ে যায় কিছুকালের জন্য—ক্রমে তাও যায় মিলিয়ে। তারপর তারা আশ্রয় পায় ইতি-হাসের পাতায়। এক দিন কলকাতার বাতবর দেবতে দেবতে চার হাজার বছরের মিশরের মন্দির—তারও আগের মহেশ্বোদারো হর্যাকার যুগ-শিল্প, বৌদ্ধ যুগের শিলালেখ, স্থাপত্য, তক্ষণ-শিল্প এবং আরও পরের আর্ধ্য-সংস্কৃতির চিহ্নসমূহ ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবমানুস্ত অতিক্রম প্রাণীসমূহের নিদর্শন—এই সবের মধ্যে কালশ্রোতের অব্যাহত ধারাটি তার চোখের সামনে সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মাত্র চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে মনুষ্য ও প্রাণীসমাজের বিবর্তন-ধারা—তাদের জীবনযাপন রীতির একটা অক্ষুট আভাস তাদের বাসনা-কামনার অতি কণি একটু ভরস—চৈতন্যদ্বারে এমনি অতর্কিতে বিপুল কালের যাত্রাপথের ইতিভ বয়ে আনে। বিপুল পৃথিবীতে নিরবধি কালের লীলা এমনি অব্যাহত ভাবেই চলছে। তবু মানুষ নিজের কালটিকেই ভাবছে সর্বোত্তম—যারা গত হয়েছে তাদের চেয়ে সে সর্বোপায়ে যোগ্য—বিদ্যায় প্রতিভায় না হোক নিম্ন নিম্ন বুদ্ধিতে ত বটেই। আর তারই জন্য সকলকে ছাড়িয়ে নিজে বড় হবার বাসনা—অতি-

সকলের মেশা—ঐর্ধ্যভোগের লালসা, প্রত্ন পরিচালনার গৌরব—এইগুলি ব্যক্তির জীবনে একমাত্র সাধনার বস্তু হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে হুঁকলন একলা পথিক—মহামানব এই সভ্যকে জীবনে এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ আয়োজন করছেন।

এরা চরম সফট যুগ্মে যুগ্মসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বের কানে ভুলে যাওয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন, মনে হয় মাহুকের হুঁকনিশার অবসান হ'ল, দিগন্তের পারে নব ভাষার কিরণ-লেন্থার সবকিছু কোমল ও মনোরম হয়ে উঠল...কিন্তু হার সে শুধু স্বপ্ন—মাজেই পর্ববসিত হয়।

চমকে উঠল প্রভাত। বাড়ীর ছায়ায় পা দিতেই কোলাহলটা প্রবল আকার ধারণ করল। যেন মায়ের আর্দ্রনাদ—তাইবোনেদের চাপা কান্না—প্রতিবেদীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাদের হোচ উঠান।

তাকে দেবে একজন সবেদে বলে উঠল, আহা—আর একটু আগে যদি আসতে? পাঁচ মিনিটও হয় নি হঠাৎ হাট ফেল হয়ে—

ছনিবার কালশ্রোতে অনন্ত ও আত্ম ভেসে চলেছেন।

৩১

কালশ্রোত চলছে। বসে বসে আক্ষেপ করলে চলে না, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক কর্তব্যগুলিও আপন আপন দাবি নিয়ে সামনে এসে ছাড়িয়ে যায়। চোখের জল মুছে—ভাবনাকে পিছনে ঠেলে—দায়যুক্তির চেষ্টা আসে এগিয়ে। দায়কর্ম্য শেষ করে সে ফিরে এল বাড়ীতে। শোকে শুদ্ধ বাড়ী, মা ভূমিশস্যার পড়ে কাঁদছেন—অবোধ তাই-বোমগুলি ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে আছে। এত দিন পিতৃস্নেহ বলে কোন কিনিম্ন অজ্ঞতব করে নি প্রভাত, বরং এর বিপরীতটাই ওকে সংসার সম্বন্ধে অজ্ঞতা করে তুলেছে। পরিহ্র সংসারে যদি ওরা মাই আসত কি ক্ষতি হ'ত জগতের? পিতার আকাজ্ঞা ছেলে বড় হবে—বিদ্যান হবে—বন আহরণ করবে—যশোমাল্য গলায় পরবে—বাবাকে দেবে নির্ভরতা। কর্তব্যের শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধবেন ছেলেকে যেন সে বেকার বলে না থাকে—যেন সে গুরুজনদের পোষণ করে—নিজের ইচ্ছার অসংখ্য স্রুজ দিয়ে ছেলের ইচ্ছার গতিনিয়ন্ত্রণ চলে। এই স্বার্থপরতাকেও সে বহু বার প্রত্যাক করেছে। প্রত্যাক করে শিটরে উঠেছে—তাই সংসার সম্বন্ধে ওর মোহ তেমনি প্রগাঢ় ও ঘন। আর সেই কারণেই বাপের প্রতি ভীতি পোষণও করত না। না হোক—এই দণ্ডে মনে হচ্ছে একটা সহায় তার পাশ থেকে সরে গেল। পৃথিবীর সঙ্গে যুগোযুগি পরিচয় করিতে হবে এবার।

কি করে চলবে সংসার—মায়ের এই প্রশ্নের কোন সম্ভব

দিতে পারে নি—কি করে দায়বদ্ধ হবে সে সমস্যাও সমাধান করতে পারবে না ও। সামাজিক প্রথা ওকে নিষ্কৃতি দেবে না অসমর্থ বলে বেকার বলে। তথাকথিত ধর্মীয় অহুতান-গুলি সুসম্পন্ন করতেই হবে।

এতদিনের আশা ও কল্পনাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে প্রভাত সামনে থাকালে। সংসারের কঠিনত্ব ওকে আঘাত করেছে—ঘটনা-প্রবাহে ওকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাবে এটি নিশ্চিত। বন্ধুর পৃথিবীতে যারা বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার দাবি নিয়ে এককাল পাশে পাশে চলছিল—তাদের রূপের পরিবর্তন দ্রুত হয়েছে। ওকে একলা উত্তীর্ণ হতে হবে দুস্তর পারাবার।

বাপের আপিসে গেল—দিমপনেরর মাইনে বাবদ কিছু পাওনা ছিল সেটার ভরসা করতে।

পিতার সহকর্মীরা সহায়ত্ব দিয়ে উপদেশ দিলেন একবার কর্তৃকর্তার কাছে গিয়ে-হুঃখের কাহিনী জানাতে। বাপের পদে না হোক যে-কোন একটি পদে হয়তো সে বহাল হয়ে যেতে পারবে। চাকরি ভিন্ন যখন অল্প পত্রা নেই। হেডক্লার্ক বললেন, আসছে সপ্তাহে একখানা দরখাস্ত নিয়ে এস—দেখি সায়েবকে বলে যদি কিছু করতে পারি।

শুনে ওর মনে আশঙ্কা হ'ল না। চাকরি না পেলেই বা কি ক্ষতি।

আপন মনে সিঁড়ি দিয়ে নামছে—একটা বিশ্বাসঘটক ধনিতে সে মাথা তুলে চাইলে।

ও নিশ্চয় কবিতা লিখে আগুনের কর্দ-সত্যর আসে নি।

বললে, তুমি যে ?

আমুন এদিকে। শুভরু ওকে বারান্দার একধারে টেনে নিয়ে গেল। বললে চুপি চুপি, শুভরু জনদশেক লোক নেবে—ভাই একটা দরখাস্ত—

তুমি চাকরি করবে ?

মাথা নীচু করে শুভরুর বললে, কিছু উপার্জন তো দরকার। কাগজে কবিতা বার হলে কেউ পারিশ্রমিক দেন না।

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—প্রভাত সামলে নিলে। প্রকাণ্ড বনেদি বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে—কেউ কোনদিন তা ভাবতে পারে না। সহিস কোচম্যান দারোয়ান—আমলা মুহুরি ও হুঃম বরদারের ঠাসা যে বাড়ী—সেই প্রাসাদের একটি উত্তরাধিকারী বশব্দ ভূতের ভূমিকায় নামবে বলে উভোগ-আয়োজন করছে। কবিতা লিখে টাকা রোজগার করবে—এই চিন্তাই বা আসে কেন শুভরুর ?

কিন্তু চাকরি করবে কেন ? বুটের মত প্রশ্ন করলে সে। এইটাই সোজা বলে মনে হচ্ছে—আর তো কিছু জানি না। লাজুক গলায় শুভরুর উত্তর দিলে।

ভবু বুটের মত প্রশ্ন করলে প্রভাত, তোমাদের তো জমিজমার আর আছে—

জমিজমা। একালে থাকবে কি কারও ? পুরোনো বংশ—সবই প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়তো জানেন না—এককালে এই গলিটার সবই ছিল আমাদের—আজ বাড়ীখানা পর্যন্ত আমাদের নয়। একটি দীর্ঘনিশ্বাস কেলে ও বললে, খণের দার যে কি ভয়ানক যদি জানতেন।

প্রভাত স্থান হেসে বললে, জানি।

না—তেমনধারা জানেন না। বাইরের ঠাট বজার রেখে আত্মীয়বন্ধন নিয়ে চলা—এইভেই কতর হয়ে গেলেন জ্যোষ্ঠা-মশাই। যে জমি আছে তাও গেল চলে। মহাজন তার টাকা ছাড়বেন কেন।

এমন অবস্থা মহাজন কেউ আছেন—

যে টাকা ধার দেয় সে টাকা আদায় করবার কৌশলও জানে—সাধারণ মানুষের চেয়ে বরং বেশীই জানে। আপনি হয় তো দেখেছেন গলিটা ক্রমে ক্রমে হাত বদল করছে ? একদিন-০-

প্রভাতের দৃষ্টি ধুলে গেল। চক্কা লম্বী অত্যন্ত সজর্পণে সৌধ থেকে সৌধান্তরে চলেছেন তাঁর সোনার কাঁপি নিয়ে। মহালের সম্পদকে কারখানার সম্পদ গ্রাস করছে—কিন্তু তার গতি ভেমন দ্রুত নয়। আজ-প্যানিরস্রবের সুবিধা নিয়ে ঘাটতি জিনিসকে কালোবাজারে চালান দিয়ে আর এক শ্রেণী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। লম্বীর রূপাকটাক এদেরই উপরে। পুরাতনকে নিষ্কৃত করবার দ্রুত তারা অত্যন্ত উৎসাহী—বংশ-কৌলীজ যোপ্য-কৌলীজ কিনতে চায় এরা। কিনছেও। কমভাশালী দেবতাকে তুষ্ট করবার মন্ত্র এরা জানে—আইনকে ফাঁকি দেবার কৌশলও এদের আরম্ভে। এরাই আজ প্রভুত্বের জাল বিস্তার করে এই গলির সমস্ত সম্পদকে আত্মসাৎ করবে।

চলতে চলতে ও প্রশ্ন করলে, আর কবিতা লেখ না ?

লিখি।

আশ্চর্য্য তো। কি তার বিষয়বস্তু ? ওর কণ্ঠে কৌতুহল। নানা বিষয়—যা আজকাল সবাইকে নাড়া দেয়—সবাই অহুতব করে।

হুঃখ ? অভাব ?

সে তো চিরকালের—তার একটা মানদণ্ড নেই যে মাগতে পারা যায়—কি চিনতে ভুল হয়। আর আমার যা হুঃখ আপনার তা নয়—

ঠিক বলেছ ভাই। তোমাদের বড় ধরের মর্যাদা যেন সাধারণ ধরের মত নয়—

কিন্তু বড় ধরের মর্যাদা আর থাকছে কৈ—পৃথিবীতে সবাই সমান এই সত্যই তো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কি জানি—মাহুয যদি কাদার তাল হ'ত—তো একটি হাঁচে কেলে এ সত্যের পরীক্ষা সম্ভব হ'ত। মাহুযে মাহুযে জ্ঞান বুদ্ধি ও নানান বিষয়ের এত তফাৎ যে সব মিলিয়ে একটি

সার্বজনীন রূপ দেওয়া চলবে না। ভাঙা থাকবেই, না হলে জীবন-যুদ্ধের অর্থ কি।

জীবনে যে যুদ্ধ করতাই হবে তারই বা মানে কি?

কিন্তু যুদ্ধ না করলে জীবনের বিকাশ কোথায় ভাই। আলোর উত্তাপ নিয়ে কুঁড়ির মধ্যে ফুল করে লড়াই ফুল হবার জন্ত, ভাই ফুল এত সুন্দর।

আপনি কবিতা লিখুন প্রভাতদা—চমৎকার উপমা দিয়েছেন।

এ যুগে উপমার ওপর প্রভা নেই কারও—কেউ পড়বে না সে কবিতা।

কেন?

ফুলকে বুট্টিরে দেখার অবসর কোথায় মানুষের। উদ্ভূত সময় না পেলে রসবোধ জাগে কি মনে? এই শহরে প্রকৃতির স্থান কোথায়—সবই তো ইঁট কাঠ লোহা সিমেন্টের কারবার। সে আয়ত্তি করলে:

‘ইটের পরে ইট—হেথা মানুষ কীট।’

সত্যি প্রভাতদা—এ কথা ভাবলে ভারি কষ্ট হয় মনে। আমরা কোথায় চলেছি। রূপের জগৎ ছেড়ে কোন অসুন্দর জগতে।

শুভঙ্করের স্বর অশ্রু-আভাসে থম থম করছে। সে বেননা প্রভাতের মনেও সঞ্চারিত হ’ল। বর্তমানের অকস্মিকিত ছুটি ভাব-সমৃদ্ধ প্রাণ অতীতের স্মৃতি-সমুদ্রে ডুবে গেল।

গোলদীঘির বেঞ্চে এসে বসলে ছ’জনে। এতক্ষণে আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেছে—গোলদীঘির বাঁশঝো জেমে ভাসছে তার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। প্রকৃতির সামান্য অংশ নীল সবুজ আর কালের পরদার ছড়িয়ে আছে। দীঘির চার পাশের সৌধ থেকে আলোর ভীর্ণ প্রকৃতিকে দৃষ্টবিন্দু করছে—কিরিওয়ালার চীৎকার জীবনযাপনের কর্কশ রীতিকেই একটি করছে। সর্বত্র চলছে শাসন। সত্যি জগৎ অসুন্দর।

প্রভাত বসলে, চল উঠি।

শুভঙ্কর ওর অসুন্দর করলে। বাড়ীর কাছে এসে কোন কথা না বলে পরস্পর ভিন্ন পথ ধরলে। ওদের মনের দুঃখের আলোয় ওরা যেন গম্ভীর পথ বুঁজে পেয়েছে। কল্লনার চড়া রঙে সে পথের গুলি নয় অপরূপ—আশার ঘন নীলে সে পথের আচ্ছাদনী নয় উত্তাপহর, আনন্দের লবু বায়তে সে পথ হয়ে ছন্দে জীলাগ্রমণ্ড নয়। বর্ণহীন স্বাদহীন শোভাহীন পথ—চলার অহুরাগে তা অভিজ্ঞতার উৎসাহ জাগে না—নিভাত না চললে নয়—ভাই ক্লান্তিভরা দেহকে টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

সেই পথে অনন্ত কালের যাত্রা হয়েছে অন্ধ।

প্রভাত বসে বসে ভাবছিল—গলান্ন লাড়ো দিয়ে যবে

চুকলেন অর্ধেক রাত। ওর পাশে চৌকিতে এসে বসে বললেন, আমার মাপ করো বাবা—কাল তোমাকে আঘাত করেছি।

কি জানি কেন—এই কথার প্রভাতের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে কোথায় চলে গেল। হ’হাতে মুখ ঢেকে অবোধ শিশুর মত ও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ওর কান্না দেখে অর্ধেক সাড়নার কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। আর কি সাড়নার কথাই বা বলবেন তিনি। জীবন কণ্ঠস্বর—আত্মা যত্নহীন—পরলোকে শান্তিতে বাস করার সুখ-কল্পনা এ সব তত্ত্ব দিয়ে শোককে নিবারণ করার মূঢ়তা তাঁর নাই। তিনি শুধু হয়ে বসে রইলেন—প্রভাতের শোকের আলা তাঁর মনকেও তারাজ্ঞাত করে তুলল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস কেলে অনেকক্ষণ পরে বললেন, কাল সত্যিই আমার অজ্ঞার হয়েছিল, সত্য মিথ্যা বিচারবোধ হারিয়েছিলাম।

প্রভাত মাথা তুলে বললে, আপনি অজ্ঞার করেন নি—

নিষ্কর অজ্ঞার করেছি। তিনি স্বরে জোর দিলেন। এক জনের কথায় সাক্ষ্যগ্রমাণ যেনে নিলাম যদি—কিন্তু বাবা, বোধ ত যার ছিদ্রে বুঁজে হাজারটা লোক ঘুরছে—তার সন্দেহ সব সময় যুক্তির পথ ধরে চলে না।

প্রভাত বললে, কিন্তু আপনি যদি অজ্ঞার হুমকি না করে থাকেন তা—সন্দেহ আসবে কেন?

এ যুগের এমন একটা খারা—হুমাকার চাষ্য অজ্ঞা বলে কোম ঠ্যাঙার্ড নেই। সরকার বাজারদর বেঁধে দিতে পারেন নি—বেঁধে দিলেও আজকের দরের সঙ্গে কালকের দরের সামঞ্জস্য নেই। বাজারে জিনিসের সরবরাহ নেই—অথচ এমন কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যা না হলে জীবন-ধারণ করা চলে না লাভটা বেশী বলে ভুঁমি না নাও—আমি নেব—আমি না নিই আর একজন নেবে। যত বেশী পারে নেবে। আমার সন্ততার বাজারদর একটুও নাহবে না—অথচ আমার সন্ততার সুযোগ নিয়ে আর একজন হবে বড়-লোক। নিজেই এ ভাবে নিরোধ বানাতে পারে কি কেউ?

প্রভাত কথা কইলে না। এই মুহূর্তে এসব নিয়ে তর্ক করতে ওর ভাল লাগছে না। কে তার পথে চলছে—কে করছে অজ্ঞার—তা নির্ণয় করার তার ও নয়।

অর্ধেক রাত আর একটু এগিয়ে এসে ওর কাঁধে ডান হাত রেখে বললেন, সে যাই হোক—শোকে এমন মুহূর্তে পড়লে ত চলবে না। আমরা যখন রয়েছি—পকেটে হাত দিয়ে কি যেন অনুভব করে বললেন, ইংরেজীতে একটা কথা আছে—প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। সত্যি—খারা তোমার হ’পানে দিন-রাত্রির জন্ত রয়েছেন—তাঁদের উপেক্ষা করা মানুষের বর্ষ নয়। তবু প্রভাত চুপ করে রইল। এমন সহায়ত্বহীন প্রতিবেশী পেয়ে কার না চোখমুখ কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কে না বলে, আপনি যা করলেন, সে ঠিক... এই ঠিক-

বীকারের মধ্যেই সত্যিকারের মনুষ্যত্ব নিহিত নয় কি? কিন্তু ভাবলেশহীন প্রভাতের পানে চেয়ে তিনি বিম্মিত হলেন। অকোমল বৃদ্ধিগুলি কি ওর অন্তরে দুঃখ-নিদা-ভাপে শুকিয়ে গেছে—না দারিদ্র্য নষ্ট করে দিচ্ছে সেগুলিকে? বাই হোক, বানিক ইতস্ততঃ করে ভারী মণিব্যাগটি পকেট থেকে বার করলেন—সেটা প্রভাতের সামনে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, টাকাটা মাহুষের সব না হলো—টাকায় অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। লোকিকতা যুগের আশীর্বাদের চেয়ে এই ভাবের নিরেট কিছু হলো—ব্যবহারিক ভগবৎ..., বলে হো হো করে হাসলেন। হাসি থামলে বললেন, আমরা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব রাখি বলেই—টাকা-আনা-পাই-য়ের পাল্লায় সবকিছুকেই মাপে থাকি। অবশ্য এটা ঠিক রাস্তা নয়। বলতে বলতে ছুখানা দশ টাকার নোট তুলে নিয়ে প্রভাতের সামনে রাখলেন। বললেন, এটা রেখে দাও—দরকার হলে আরও—

এক নিমিষে প্রভাতের উদাসীন অন্তরে আবার ভাবের জোয়ার এল। যুগের পেশী শক্ত হয়ে উঠল—সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরে ফুটল দৃঢ়তা। এ আপনি করছেন কি? উঠিয়ে নিন—

না—না—আমি তোমার পিতৃত্ব্য—আমাকে পর ভাব যদি—

মাপ করবেন। আপন হলে এ ভাবে অপমান করতে পারতেন না।

প্রভাতের দৃঢ় স্বর অর্ধেকেকে রূঢ় আঘাত করলে। নিজেকে সামলে নেবার কোন উপায় খুঁজে পেলেন না তিনি। তাঁর মনে হ'ল সুবিধা পেয়ে প্রভাত কালকের অপমানের প্রতিশোধ নিলে। প্রভাত সত্যিই প্রতিশোধ নিলে।

নোট ছুখানা ভাড়াভাড়ি তুলে নিয়ে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। অন্তরাল থেকে লক্ষ্মী সব দেখছিল—উনি চলে যেতেই সে ঘরে ঢুকে বললে, আচ্ছা দাদা—মাহুষগুলো কি। টাকা থাকলেই কি তারা ভাবে ছুনিরাটা তাই দিয়ে কিনে নেয়া যায়।

প্রভাত রান হেসে বললে, যায় লক্ষ্মী। চার দিকে যে সব ঘটছে—যা খবরের কাগজে ওঠে—আর যা লোকের মুখে মুখে রটে সবই হঠাৎ ঘটছে না বা সেইটাই একমাত্র জিনিষ নয়। ওসব এক একটা কোঁড়ার মত—দুখিত রক্তের মধ্যে ছম্বায় বিশটা—প্রকাশ পায় একটা।

উনি বুঝি ওই বাড়ীটার মালিক? আঙুল দিয়ে লক্ষ্মী দীপাদের তিনতলা বাড়ীটা দেখালে।

হাঁ, অনিমেষ বলে যে ছেলেটি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসে তারই বাবা।

তা তোমাকে উনি টাকা দিতে আসেন কেন?

আমাদের বাড়ীটার দিকে কখনও ভাল করে তাকিয়েছিল? ভাল করে এ বাড়িকে যদি জানতে চাস তো এক দিন ওদের তিনতলা থেকে চেয়ে দেখিস। তা হলে বুঝতে পারবি।

যে সব প্রতিবেশীর মনে দয়া আছে তারা এ ছাড়া আর কি করতে পারেন।

লক্ষ্মী রাগ করে বললে, তারি তো প্রতিবেশী। টাকা থাকলেই বাহাদুরি নেবার লোভ হয়। আমার কি মনে হয় জান দাদা—ওই যে মেয়েটি যার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ও নিশ্চয় ওর বাবাকে বলেছে—

ও বলতে যাবে কেন—উনি নিজে কি—

না—না—ওই মেয়েটি নিশ্চয় বলেছে আমাদের অবস্থা ধারাপ, টাকা দিলে আমাদের উপকার হবে—

থাক এসব অসুস্থান তর্ক। এ নিয়ে আলোচনা ভাল লাগছে না। আচ্ছা, লক্ষ্মী তুমি দেখতো কাল গাওয়া ঘি আনতে হবে কি না। মটরের ভাল, সৈন্দব হুন, মালসা এসব আছে তো? আছে। খালি এক বোকা পাকাটি এনে দিও।

বৈকালে জিলোচন সেন এলেন। বললেন, সবই কর্তৃকল্প, কপালের লেখা। না হলে হঠাৎ এমন হবে কেন।

ওর খেদ প্রকাশকে বাধাযুক্ত করবার জন্য প্রভাত নীরব হয়ে রইল।

জিলোচন সেন বললেন, এই বিপদ না হলে কালই রওনা হয়ে যেতে পারতে। এখন মাসছয়ক হয়তো—

প্রভাত বললে, মাসছয়ক নয়—হয়তো কোন দিনই আপনার দয়া গ্রহণ করতে পারব না।

সে কি। কাজটা নেবে না? প্রচণ্ড বিম্বয়ে তিনি শুদ্ধ হয়ে রইলেন।

না। প্রভাত যুহু স্বরে বললে।

কিন্তু সংসার—

আমাকেই চেষ্টা করতে হবে যাতে কোন মতে চলে।

কিন্তু চাকরির সামান্য আয়ে—পোষ্যও তো অনেকগুলি—সব কথা ভাল করে শুধিরে বলতে পারলেন না তিনি।

সামান্য ভাবেই চলবে সংসার, এমন চলছেও তো অনেক।

না—না—, প্রবল প্রতিবাদ করলেন জিলোচন সেন। আমরা থাকতে তোমাকে এমন কষ্ট করতে দেব না। না, কিছুতে নয়।

ওর যুহু হাসির অন্তরালে কঠিন একটি প্রতিজ্ঞা যেমন আত্ম-পোষণ করে রয়েছে। মনে হয় সামান্য প্রতিবাদে তা উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু যুক্তির রাশি দিয়েও তা দূর করা সম্ভব নয়—এটি অমুভব করলেন জিলোচন সেন। ওর মুখ পাণ্ডু হয়ে গেল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। হুঃখিত স্বরে বললেন, যা ভাল বোঝ কর। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার আমি কি বোঝাবোঁ বল।

তার স্নেহ গতি দেখে মনে হ'ল—আশাহত হয়েছেন। দোরগোড়ায় গিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন প্রভাতের কাছে। গলার স্বর নাড়িয়ে বললেন, সময় করে যদি পার তো একবার আমাদের বাড়ী যেও। সিপ্রার মার বুঝি কি দরকারী কথা আছে।

ক্রমশঃ

তৃতীয় বিএহপালের নূতন তাত্ত্বশাসন

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বৎসরাধিক কাল পূর্বে ভাগলপুর জেলার উত্তরাঞ্চলস্থিত বনগ্রাম কলাবতী বিভাগের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুব্রত বা মহাশয় যুক্তিকার নিয় হইতে একখানি তাত্ত্বশাসন আবিষ্কার করেন। পার্টনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত বিজয়লাল শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে এই আবিষ্কারের সংবাদ জানিয়া আমি তাত্ত্বলিপিখানি পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হই। কিছুকাল হইল বনগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত হেদী বা মহাশয়ের অগ্রদূত আমি ঐ তাত্ত্বশাসন পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। নবাবিস্কৃত তাত্ত্বলিপিখানি বাংলা ও বিহারের প্রাচীন ইতিহাসের উপর অনেকখানি নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এই লিপি সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ সরকারী এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। এখানে আমি সংক্ষেপে লিপিখানির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিতেছি।

তাত্ত্বশাসনখানি সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয় নরপতি তৃতীয় বিএহপাল কর্তৃক কাঞ্চনপুরে অবস্থিত জয়কঙ্কাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং শাসনোল্লিখিত ভূমি তীরভুক্তি অর্থাৎ বর্তমান তীরহতে অবস্থিত ছিল। পালরাজগণের জয়কঙ্কাবারগুলিকে তাঁহাদের সামরিক রাজধানী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এ পর্যন্ত তাত্ত্বশাসনাদি হইতে নিম্নলিখিত পাল জয়কঙ্কাবারের অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছিল—পাটলিপুত্র, মুদগণিরি, বটপুর্নিত, সাহসগণ্ড, বিলাসপুর এবং রামাবতীনগর। কেহ কেহ হরবামা নামক অপর একটি পালজয়কঙ্কাবারের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উহা বিলাসপুরের ভ্রান্ত পাঠমাত্র। তৃতীয় বিএহপালের বর্তমান বনগ্রামলিপি হইতে আমরা কাঞ্চনপুরনামক নূতন পালজয়কঙ্কাবারের বিষয় অবগত হইলাম। কাঞ্চনপুর বিহারের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, বলিয়া মনে হয়।

বনগ্রামলিপি হইতে তৃতীয় বিএহপালের জনৈক অজ্ঞাত-পূর্ব পুত্রের নাম জানা যায়। বলা হইয়াছে যে, উক্ত তাত্ত্বশাসনের দূতক ছিলেন রাজার পুত্র প্রহসিতরাজ। এই প্রহসিতরাজকে তদীয় পিতার মন্ত্রীরূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে। পালবংশীয় রাজগণের নামান্তে পাল শব্দ দেবিত্তে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রহসিতরাজকে কেন প্রহসিত পাল বলা হয় নাই, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পালরাজগণের অবিবাহিতা প্রেমসীদিগের গর্ভজাত পুত্রগণের এইরূপ নামকরণ হইত কিনা, তাহা বিবেচ্য।

বর্তমান তাত্ত্বশাসন তৃতীয় বিএহপালের সপ্তদশ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তারিখটির অনেকখানি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। বাংলার ইতিহাসবিষয়ক অস্তুতম প্রামাণিক গ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ইতিহাসে ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আনুমানিক ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পনের বৎসর তৃতীয় বিএহপালের রাজ্যকাল গণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, তৃতীয় বিএহপালের দ্বাদশ রাজ্যবর্ষে আয়গাহী তাত্ত্বশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল এবং উহার পরে তিনি কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এতদিন তাহা নিশ্চিত জানিবার কোন উপায় ছিল না। পালবংশীয় তিন জন বিএহপাল নামক নরপতির মধ্যে অন্ততঃ এক জন অন্যান্য দ্ব্যক্শিপ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ রাজা বিএহপালের ষড়বিংশ রাজ্যবর্ষে পঞ্চরক্ষানামক বৌদ্ধগ্রন্থের একখানি পুঁথি মকল করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই বিএহপাল পালবংশীয় প্রথম বিএহপাল হইতে পারেন না। কারণ তিনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মাত্র অল্প কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি দ্বিতীয় বিএহপাল কি তৃতীয় বিএহপাল তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যদিও দ্বিতীয় বিএহপালের কোন নির্দিষ্ট রাজ্যবর্ষের উল্লেখ কুড়াপি পাওয়া যায় নাই, তবু অনেকে ষড়বিংশ বর্ষাধিক দীর্ঘ রাজত্ব তাঁহাতেই আরোপ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদারের মতে দ্বিতীয় বিএহপাল আনুমানিক ৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আটশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্তমান বনগ্রামলিপি হইতে জানা গেল যে, তৃতীয় বিএহপাল অন্ততঃ সত্তর বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং ষড়বিংশ বর্ষাধিক দীর্ঘ রাজত্ব তাঁহাতেই আরোপ করিতে হইবে। দ্বিতীয় বিএহপাল অল্প কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বনগ্রামলিপি হইতে জানা যায় যে, তীরভুক্তি অর্থাৎ উত্তর বিহার তৃতীয় বিএহপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পালরাজগণের সহিত বিহারের অধিকার লইয়া ত্রিপুরীর কলচুরিবংশীয় রাজগণের দীর্ঘকাল বিবাদ চলিয়াছিল। একখানি রামায়ণের পুঁথিতে দেখা যায় যে, ১০৭৬ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে তীরভুক্তি কলচুরি গাঙ্গেয়দেবের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মুসলমান লেখক বৈহকীর বিবরণ অনুসারে ১০৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বারাণসীতে গাঙ্গেয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার ইতিমধ্যে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে বারাণসী অঞ্চলে পালবংশীয় মহীপালের লেখ পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারেও মহীপালের কতকগুলি লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণ (১০৪১-৭১ খ্রিষ্টাব্দ) ১০৪২ খ্রিষ্টাব্দে কাশীর নিকটে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ১০৫৯ খ্রিষ্টাব্দের একখানি লিপিও ঐ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। কলচুরিবংশের লেখমালায় রাজা কর্ণকে গৌড়-বাদের বিজেতারূপে উল্লিখিত দেখা যায়। দ্বিবিজয়ী কর্ণ যে

পালসৈন্য পরাক্রম করিয়া বীরভূম জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, পাইকোড় লিপিতে তাহার প্রমাণ আছে। এদিকে তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মহীপালের পুত্র নরপাল কর্তৃক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণ বিহারে নরপালের একখানি লিপিও পাওয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অনুসারে নরপালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল কলচুরিয়ার কর্তৃক পরাজিত করিয়া তদীয় কন্যা যৌবনজীর পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীরভুক্তিতে তৃতীয় বিগ্রহপালের অধিকার এই উক্তির সমর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সময়েও পাল-কলচুরি ঘন্থের অবসান হয় নাই। কারণ কর্তৃক পুত্র যশঃকর্তৃক চম্পারণ্য (উত্তর-বিহারস্থিত চম্পারণ্য) বিদারণের দাবি করিতে দেখা যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগ্রাম ভাষ্যশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দুইটি শ্লোকে রচিত একটি পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টটি এইরূপ :

কোড়াঝাণিরিয়ায় কাছ ইতিঃ সত্ত্বাক্ষণানাং স্থিতি
শুভ্রাং গোহণকো বিজোক্তম গৃহং বিশ্রামভূর্জনাম্।
আশ্রমাদিকহলেতি যজ বিবদো যোগেশ্বরঃ স্বংহতঃ
খ্যাতস্তদ্ব ইতোপি নির্মলবশা ঘটীশনামাজ্জঃ।
যো গোড়াবিপত্তেরসীমগুণ্ড রাজো বিধেয়ো দিশাং
ভূপালেবু বিধায় মৈত্র্যমসমং সন্তুষ্টিচিন্তাবিতঃ।
কৃতা শাসনমেতদাশ্রয়লতঃ কামপাবস্বাহিতিং
বিশ্রামায় চ দীনহঃখিতজনগ্ৰাহুদিহৈবান্ধম্।

শাসনের মূল্যংশে দেখা যায়, রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল কোলাক বা কোড়াঝাণ দেশ বিনির্গত ইটাহাক বা ইটুহোক গ্রাম বাস্তব ঘট্টকশর্মা নামক ব্রাহ্মণকে তীরভুক্তিস্থিত হোন্ধের-বিষয়াত্তর্গত বনুকাবর্ড গ্রামের কিয়দংশ দান করিতেছেন। কিন্তু উল্লিখিত পরিশিষ্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ ভূমি প্রকৃতপক্ষে রাজার ঘট্টীশ নামা জ্ঞানক ব্রাহ্মণ কর্মচারী কর্তৃক তদীয় জামির হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। শাসনগ্রন্থীত ব্রাহ্মণ কোলাক দেশ হইতে আসিয়া তীরভুক্তিতে বাস করিতেছিলেন। শাসনদাতা ব্রাহ্মণ ঘট্টীশেরও একজন পূর্বপুরুষ এরূপ কোলাক হইতে আসিয়া তীরভুক্তিবাসী হইয়াছিলেন। কোলাকবিনির্গত কাছ; তৎপুত্র গোহণক; তাহার কন্যা ইন্দুলা; তৎপুত্র বিবদ; তৎপুত্র যোগেশ্বর; তৎপুত্র ভূদ; তাহার পুত্র ছিলেন শাসনদাতা ঘট্টীশ। এই পরিশিষ্ট হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্থানীয় তীরভুক্তিবাসী ব্রাহ্মণেরা কোলাক-দেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের দূর-সম্পর্কও সগৌরবে প্রচার করিতেন এবং ভূমিদানাদি দ্বারা কোলাক ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করিতে ব্যগ্র ছিলেন। তীরভুক্তিতে কোলাক ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্যাদার এই আভিপ্রাণের সহিত মিথিলাদেশে কোলীজ এবং কুলপঞ্জিকা রাখিবার প্রথার উৎপত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কোলীজপ্রথার জন্ম বাংলা-দেশ মিথিলার নিকট ঐলী। রিজলি কৃত *People of India*, 1915, p. 215; অরুণাচল মিশ্র প্রণীত *History of Maithili Literature*, vol. I, pp. 26ff. প্রভৃতি গ্রন্থে। কিছুকাল পূর্বে মিথিলার গঙ্গোত্রী মূলগ্রামী ব্রাহ্মণের সহিত বাঙালী ব্রাহ্মণ-সমাজের গাঙ্গুলীর অভিন্নতা বিচার প্রসঙ্গে আমারও ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই প্রণের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু উভয় দেশে কোলীজের উৎপত্তি যে একই প্রকারে ঘটয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব-পুরুষেরা কোলাকদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বনগ্রাম লিপির সাক্ষ্য এবং উল্লিখিত কিংবদন্তী মিথিলা ও বাংলার কোলীজের মধ্যে একটি যোগসূত্রের সৃষ্টি করে, সন্দেহ নাই। ঐকি এইরূপ অপর একটি যোগসূত্রের সন্ধান দেয় আদিশূরের কাহিনী।

বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণেই কোলাক ব্রাহ্মণেরা বাংলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুগের বিষয়, বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় আদিশূরের যে বিবরণ দেখা যায়, উহা সর্বোৎকর্ষে পরস্পর-বিরোধী। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৬২৫-২৬ গ্রন্থে। এমন কি যে বৎসর কোলাক ব্রাহ্মণেরা বাংলায় উপস্থিত হন, উহার উল্লেখ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ১০১১ শকাব্দের কথা বলা হইয়াছে। এই কিংবদন্তীসমূহ যে আদিশূরের বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ও বিহারে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, প্রাচীন বাংলার শুরবংশের রাজাদের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু আদিশূর নামক কোন নরপতির অস্তিত্ব বাংলার কোন ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, পূর্ব-ভারতের একমাত্র ঐতিহাসিক আদিশূরের অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রমাণ মিথিলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের ভায়বহী নামক গ্রন্থ ৮১৮ সৎবৎসরে রচিত হইয়াছিল। ইহা বিক্রমসংবৎ, শকাব্দ নহে। কারণ প্রাচীন মিথিলায় শকাব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল। সুতরাং ভায়বহী ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই বাচস্পতি মিশ্রের ভায়বহীকা সংজ্ঞক অপর একখানি গ্রন্থ আদিশূর নামক, গ্রন্থকারের জ্ঞানক লম্বাসাময়িক নরপতির উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা, ৫৭শ ভাগ, পৃষ্ঠা ৬৮ গ্রন্থে। এই আদিশূর নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল-বংশীয় সম্রাটগণের সামন্তরূপে মিথিলা ও তত্রিকটবর্তী বাংলার কিয়দংশ শাসন করিতেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

খাদ্য উৎপাদনে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন কৃষি ও খাদ্যসচিব মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, যদিও কৃষিবিভাগ উন্নত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ, রাসায়নিক সার বিতরণ, উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রের সরবরাহ, বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন শেখর চাষের প্রবর্তন, পোকামাকড়, রোগের আক্রমণ হইতে শস্যরক্ষা প্রভৃতি কাজে ব্রতী আছে, তথাপি এই সকল কাজের জন্ত কৃষি-বিভাগ কোনরূপ কৃতিত্ব দাবি করে না। কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা দেশের কৃষি-প্রণালীসমূহের স্বাস্থ্য ও ব্যাপক উন্নতিসাধন হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি-বিভাগ কোনকালেই উপযুক্ত পরিমাণ উন্নত শ্রেণীর বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি সরবরাহ করিতে পারিবে না। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম বাংলায় মোটা-মুটি তিন কোটি বিঘা জমির চাষ হয়। এই তিন কোটি বিঘা জমির জন্ত মোটামুটি ৫০ লক্ষ মণ বীজের দরকার। কিন্তু কৃষি-বিভাগের পক্ষে এই পরিমাণ বীজ সরবরাহ করা মোটেই সম্ভব নয়। সিদ্ধিরিতে রাসায়নিক সার প্রস্তুতির কারখানায় যে পরিমাণ সার প্রস্তুত হইবে তাহাও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত তিনি দেন।

কিন্তু সমস্তার সমাধান কি—কৃষি ও খাদ্য সচিব এই প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেন যে, এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে কৃষক-সম্প্রদায়ের এবং জনসাধারণের কৃষির প্রতি অতীতের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসাধন অত্যাৱশ্যক এবং সরকারী কৃষিবিভাগ এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসাধনের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়ারে; এই বিষয়ে কৃষিবিভাগের সকলতা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। তিনি তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে বলেন যে, কৃষি বিভাগের উৎসাহে ও প্রেরণায় কয়েক স্থানে সমন্বয় প্রণালীতে কৃষিকার্যের প্রবর্তন হইয়াছে; পল্লী অঞ্চলে ঘাস, জঙ্গল, আবর্জনা, কচুরিপানা প্রভৃতির দ্বারা ‘কমপোষ্ট’ সার প্রস্তুতের প্রতি কৃষক সম্প্রদায়ের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। কেননা তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছেন যে, এইরূপ কমপোষ্ট সার প্রয়োগের ফলে ধান এবং অন্যান্য শস্যের ফলন আশাভীত ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্বে শস্তে ঔষধ ছিটানোর প্রতি কৃষক সম্প্রদায়ের যে কুসংস্কার ছিল তাহা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহে ও চেষ্টায় প্রায় ১৫০টি ছোট ছোট সেচ-পরি-

কল্পনা কার্যকরী হইয়াছে। কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতার প্রতি কৃষক-সম্প্রদায়ের উৎসাহ খুবই বর্ধিত হইয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ কৃষি ও খাদ্য সচিব প্রদান করেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কৃষির উন্নতিসাধনের এবং অধিকতর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কেবল কৃষক সম্প্রদায়ের নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়েরও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। কৃষিকাজ যে হেয় নহে, শ্রেয়ঃ—এই কথাটি এখন সকল সম্প্রদায়কেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং কৃষি ও খাদ্য সচিব যে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী-সাধনকে কৃষিবিভাগের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন ইহা খুবই আশাসের কথা।

কিন্তু নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল আয়োজন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহার বিশেষ কোন ইঙ্গিত এখনও সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে না। এই উদ্দেশ্যে যে দুই-একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে (যেমন ‘ভূমি সেনা’ গঠন), তাহা বেশীর ভাগ কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কৃষির প্রাধান্য ও গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বহু রকমের পূজা-পার্বণ অহুষ্ঠিত হইত; অনেক গান, ছড়া প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, নানা উৎসবেরও ব্যবস্থা ছিল, এখন সেই সকল পূজা-পার্বণ-উৎসব প্রভৃতি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে; প্রবাদবাক্য, গান, ছড়া প্রভৃতি বিস্মৃতির গহবরে চলিয়া গিয়াছে।

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করিতে হইলে পুনরায় কৃষি-সম্পর্কীয় নানা উৎসবের আয়োজন করিতে হইবে; গান, ছড়া প্রভৃতির প্রবর্তন করিতে হইবে; আর একটি বিশেষ কথা এই যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনকে কৃষিমুখী করিতে পারিলেই কৃষির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। কাগজে-কলমে বিভ্রালয়ের ছাত্রদিগকে কৃষিমুখী করিবার অনেক ব্যবস্থার কথা শুনি; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার বিশেষ কোন পরিচয় দেখিতে পাই না। নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিষদ উচ্চ ইংরেজী বিভাগের ওগুলির উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন যেমন পাকা পাখরানা, পাকা কুয়া, খেলার মাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা, কিন্তু এই সকল সর্বের মধ্যে উদ্ভানচরনার উল্লেখ নাই। পল্লী অঞ্চলের বিভ্রালয়সমূহে খেলার মাঠের ভেতন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। খেলার মাঠের পরিবর্তে ‘উদ্ভান’কে প্রাধান্য দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিভ্রালয়ের ছাত্রদের মনকে কৃষিমুখী করিবার অনেক ব্যবস্থাই আছে। অবশ্য সে সব দেশেও

অনেক প্রাচীন উৎসব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বালক-বালিকারা এখনও শতকর্তনে তাহাদের অভিব্যক্তির প্রচুর সাহায্য করে। বড় বড় হেলেরা ট্রাষ্টের চালায় এবং বালিকারা মাঠের কর্মীদের জন্য খাদ্য ও চাউণ্ড চা লইয়া যায়। আমাদের দেশেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে এই কার্যে বালক-বালিকাদের উৎসাহ দিবার জন্য প্রথমে চা পানের আয়োজন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু রকমের আমোদ-প্রমোদ, ভাষাশা প্রভৃতি অঙ্গুষ্ঠিত হয়। গ্রামের কৃষকেরা একত্রিত হইয়া বৃহৎ ভোজেরও ব্যবস্থা করে। গ্রামের মাঠে প্রথমে ক্রিকেট খেলার আয়োজন হয়। ছোট ছোট বালকদের জন্য দৌড় ও অন্যান্য খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, এবং প্রচুর পরিমাণে আইসক্রীম ও লেমোনেড সরবরাহ করা হয়। পরে বিতালয়ে চায়ের ব্যবস্থা থাকে এবং এই সময়ে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়গৃহে কলরবে মুখরিত করিয়া তোলে। এই রকম হালি, কোতুক, আমোদ, চীৎকার বিদ্যালয়ে আর কখনও দেখা যায় না। বিদ্যালয়ের দরজার উপরে শতের মালা ঝোলানো থাকে, শতের শিশু, লতা পাতা, ফুল প্রভৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ বিদ্যালয়গৃহটি সজ্জা করা হয়। বিদ্যালয়ের স্ন্যাক বোর্ড, ডেস্ক প্রভৃতির স্থানে টেবিলের

উপর মানাবিধ খাদ্যবস্তু প্রচুর পরিমাণে রাখা হয়। চারিদিকেই আপেল, পিয়ার, প্লাম প্রভৃতির বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষকদের পত্নী ও কন্যাগণ হেলেরদের যে ঘাড়া চাছে বাইতে দেন। ইহার পরেও আবার খেলাধুলা, গানের আয়োজনও থাকে; ঘাছকর নানাবিধ খেলা দেখায়, এই সময়েই “Harvest Home” (বাড়ীতে শস্য আনয়ন উৎসবের) সঙ্গী-পেঁকা অধিক উদ্‌যাতনা। শতকর্তনের গান (Harvest hymn) গাওয়া হয়; এই গানটির প্রথম চার পংক্তি হইতেছে—

We have ploughed, we have sowed,
We have reaped, we have mowed,
We have brought home every load,
Hip, hip, hip, Harvest Home!

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যশস্য কর্তনের সময় পত্নী অকলে এইরূপ অস্থানীয় ব্যবস্থা করা পুণ্যই বাঞ্ছনীয় এবং এই উপলক্ষে বিদ্যালয়সমূহে দুই-এক দিন ছুটি দেওয়াও সম্ভব। তবে ছুটিতে বিদ্যালয়ের দরজা জানালা বন্ধ থাকিবে না, শিক্ষকগণও অস্থপস্থিত থাকিবেন না; ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া ‘হারভেস্ট হোম’-এর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়সমূহে কৃষিসম্পর্কীয় সিনেমা, নাটিকা প্রভৃতির অভিনয়ও হইতে পারে।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শ্রীনীলরতন দাশ

ভারতগগনে ঝুঁপসফিত নিবিড় ভিমির নানি'
ভাস্করসম তোমার উদয়, হে তরুণ সন্ন্যাসী।
পূর্ব-ভোরণে শঙ্কাহরণ ডঙ্কা বাজালে যবে—
তক্ষা-অলস নেত্র মেলিয়া চমকি' চাহিল সবে।
রক্ত আঘাতে স্তম্ভ জাতিকে জাগালে দৃষ্ট ভেঙ্গে,
নব চেতনার স্পন্দনধ্বনি বকে উঠিল বেঙ্গে।

সম্মুখে ছেরি' কোটি কোটি দীন দরিদ্র নারায়ণ
পতিতপাবন যজ্ঞের তুমি করেছিলে আয়োজন।
হৃগ্ধদের মুক্তির তরে ছেলে দিলে হোমানল,
দীক্ষিত হলো সেবার মন্ত্রে নুতন কর্মিদল।
'কীবে প্রেম করে' যে জন জগতে সেই ভজে দীক্ষয়—
এ বাণী আত্মভোলা এ জাতির পরশিল অন্তর।

বেদ বেদান্ত উপনিষদের গভীর মর্মবাণী
শব সাধনায় প্রাচ্য-প্রাণীতে হ'য়ে গেল জানাজানি।
শর্মের সাধে কর্মযোগের সাধিয়া সমন্বয়
ভারতায়ার শাখত বাণী ঘোষিলে জগৎময়।
ভিখারীর বেশে বিশ্ববিজয় করিয়া প্রতিভাবলে
কিরিলে স্বদেশে তুমি রাজবেশে বিজয়মালা গলে।

তমোগুণে ভরা যুগের মুহূর্তে অস্বস্ত হৃদয় লাগি'
শক্তিসাধনা শিখালে সবারে, হে নবীন বৈরাগী।
নব্য যুগের মহাভারতের তুমি যে সব্যাসাচী,
শব আলানে ক্রৈব্য ত্যজিয়া যাতিয়া উঠিল প্রাচী।
ভগবান্ রামকৃষ্ণের কৃতী শিষ্য যোগ্যভম—
ভাব-জগতের বিপ্লবী বীর সন্ন্যাসী নমোনম।

স্বপ্নচারী

শ্রীসুধীরকুমার সেন

কয়েকদিন ধরে মজা মন্দ হচ্ছে না। অবিনাশ পথ চলতে চলতে হঠাৎ থামে দাঁড়ায়, ভাল করে হুঁহাত দিয়ে চোখ রগড়ায়, তার পর দৃষ্টিকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করে যতদূর নজর যায় তাকিয়ে দেখে। পথের অপর পারে দেওয়াল-সংলগ্ন প্ল্যাফোর্ডের ছোট ছোট লেখাগুলো কষ্ট করে পড়ে। কখনও বা নিম্নের গলার কাছে, গালের উপরে চিমটি কাটে, যতদূর দেহ আকৃষ্টি হতে থাকে তবু ছাড়ে না, তার পর আবার পথ চলে।

কয়েক দিন ধরে অবিনাশের মনের মাঝে একটা অদ্ভুত সন্দেহ থেকে থেকে জেপে উঠছে। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছে যেন সে জেপে নেই—যেন এক শুষ্ক অন্ধকার রাতে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে, তার চোখের সামনে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন এসে এসে সরে যাচ্ছে, আর তারি সঙ্গে কতকগুলো আশাতীত অসম্ভাবিত আকস্মিকতা। বোধ হয় এ শুধু একটা রাতেরই স্বপ্ন।

পথের ওপর দাঁড়িয়ে অবিনাশ চোখ বিক্ষারিত করে এদিক ওদিক তাকায়। চেনা মানুষগুলোর মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখে, চেনা জায়গার সামনে এসে অভ্যস্ত মনোযোগের সঙ্গে বিশেষত্বগুলোকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে—যেগুলো অনেকবার দেখে দেখে তার প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেছে। কয়েক বার সে মালতীকে বলেছে, ‘দেখ, মাঝে-মাঝে আমার মনে একটা অদ্ভুত সন্দেহ জাগছে। কখনও কখনও মনে হয় কি জানো? মনে হয় যে, আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই সব স্বপ্ন দেখছি—যেন সবই মিথ্যা।’

প্রত্যেক বারই মালতীর চোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। হ্যাঁ, অবিনাশ স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে সেই হাসি। নাঃ, মালতীর কাছে এই কথা বলতে গিয়ে সে নেহাত বোকাই বনেছে।

ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, রাতের পর রাত, তবু অবিনাশের মন থেকে সন্দেহের ধোর কাটল না, অথচ তারই জন্ত তার কত না অক্লান্ত চেষ্টা। পকেট থেকে মুঠো মুঠো টাকা তুলে নিয়ে বিজ্ঞানার উপর রেখেছে, একটা একটা করে গুণেছে, আবার সাজিয়েছে, আবার গুণেছে। সিন্দুকের একপাশে শুণীকৃত মোট—ঘরে ধরে সাজান। মোটগুলো গোনা তার রোজকার কাজ। তার গোনা শেষ হলে মালতীকে দিয়ে গোনার হিসাবে কোন গরমিল করা পড়ে কিনা তাই পরখ করতে। নাঃ, স্বপ্ন কখনই নয়। তা হলে হুবহু এমন ভাবে কখনই মিলে যেত না, কোথাও না কোথাও একটু গরমিল—

বাড়ী থেকে বেরিয়েই রাজেন কয়ালের সঙ্গে দেখা। ছেলেবেলার বন্ধু—একসঙ্গে কম পক্ষে সাত-আট বছর খুলে পড়েছে, খেলেছে, বেড়িয়েছে। রাজেন বললে, ‘প্রায় হুঁয়ুগ পরে দেখা, চিনতে পারিস?’

চেনবার মত রাজেনের শরীরে কিছু নেই, তার বর্তমান যেন নির্ভর ভাবে অতীতকে নির্বাসন দিয়েছে। সেই কাঁচা সোনার মত রং, নবর দেহ, হাঁটলে মনে হ’ত যেন নেচে নেচে চলছে—আজকের এই রাজেনকে দেখলে কার মনে পড়বে ছেলেবেলার সেই রাজেন কয়ালের কথা। ময়লা কাপড়, জামাটা ছিঁড়ে নীচের দিকে মেমেছে, দাড়ি বোব হয় সাত-আট দিন কামানো হয়নি, বগলে এক ভাড়া নথিপত্র—সুরম্য অটালিকা হতস্ত্রী হলে যে রকম হয় ঠিক তারই মত তার অবস্থা। তবু চিনল তাকে অবিনাশ, বললে, প্রায় হুঁয়ুগ বছর পরে, ইস, কি হয়ে গেছিস তুই, কোথায় আছিস তাই?’

‘এই যে, এই বাড়ীটার। নীচের তলার দুখানা ঘর, তাই ভাড়া নিয়ে আছি।’

অবিনাশ বিস্মিত ভাবে বললে, ‘কবে এলি, কৈ জানি না ত। এই গলিরই ও-মাথায় আমি থাকি, ওই যে লাল বাড়ীখানা—’

রাজেনের চক্ষু যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল, ‘তা হলে তুই-ই সেই অবিনাশ চক্রবর্তী। ওই বাড়ীতে থাকিস তুই। লটারিতে পকাশ হাজার টাকা তা হলে তুই-ই—’

অবিনাশ সন্দেহ দৃষ্টিতে একবার চার দিক দেখে নিয়ে বলে, ‘হ্যাঁ তাই, আমিই সেই অবিনাশ চক্রবর্তী—’

তার পর তাকে যেন অস্তমনস্ক করবার জন্ত বলে, ‘সেই ছেলেবেলার মনে আছে ত, এক দিন কি বলেছিলুম—’

রাজেন স্মরণ করবার চেষ্টা করতে করতে বললে, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে বটে মনে, বল্ ত—কি বল্ ত—’

অবিনাশ হেসে বলতে লাগল, ‘সেই যে বলতুম, বড় হয়ে যদি খুব বড়মুহুর হতে পারতাম, বুট-ব—’

রাজেন উল্লাসে বললে, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে বটে মনে, বলতিস সত্যি তুই। কিন্তু হ্যাঁ, মিলে গেছে ঠিক অকরে অকরে—পকাশ হাজার। আচ্ছা এখন বাই তাই, বেলা হয়ে গেল, আবার বেয়েই কোটমুখো—’

দারিদ্র্যের এক বীভৎস মুক্তি চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

অবিনাশ চলল। পথের হুঁপাশ দিয়ে জনতার স্রোত

বয়ে চলেছে। মাঝখান দিয়ে ছুটেছে ট্রাম, বাস, মোটর। অবিনাশ একটা একটা করে মানুষ গোনো, তার পর হঠাৎ থেই হারিয়ে যায়। তখন গাড়ীর নম্বর মুখস্থ করতে আরম্ভ করে। প্ল্যাকার্ডগুলোও পড়তে ভেঁলে না।

পরমুহুর্তেই হঠাৎ সে অচমকিত হয়ে যায়। কি যেন ভাবছিল, কি যেন মনের মধ্য থেকে হারিয়ে গেল, কিছুতেই আর তার উদ্দেশ্য পায় না।

স্বপ্ন ও সত্যের মাঝে এই যে অসংলগ্ন মুহুর্তগুলো—এরা যেন বেতালে পা ফেলে চলছে। চেতনা বৃষ্টি দিগ্ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

তবু অবিনাশ চলে আশ্চর্য নেই, ক্লান্তি নেই।

লালবাজারের পথে নিশাপতির সঙ্গে দেখা। লোকটা ফুটপাথের এক পাশে সমস্ত সজ্জিত কতকগুলো লটারির টিকিটের মাঝে কি যেন হাতড়াচ্ছে। নিশাপতি তা হলে আকণ্ঠে ছাড়ে নি। এখনও আশা আছে।

অবিনাশকে দেখে নিশাপতি চট করে উঠে দাঁড়াল। বললে, ‘কেমন, বলিনি অবিনাশবাবু, লাগবে, একদিন না এক দিন লাগবেই—যাবে কোথা?’

আগিস থেকে হেঁটে বাড়ী ফেরে নিশাপতি, ট্রামের ভাড়া আর জলখাবারের পরসী বাঁচায়। সেই টাকা দিয়ে ক্রমাগত মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লটারির টিকিট কিনে চলেছে—আশা এক দিন না এক দিন বরাত খুলবেই। মাঝে মাঝে পথের পাশে গণকের কাছে হাত দেওয়া—সাবু-সন্ন্যাসী পেন্সে ভাদেব পেছনে লেগে থাকে। কে জানে, কবে কোন শুভ মুহুর্তে অদৃষ্ট ফিরবে।

নিশাপতি উঠে দাঁড়াল। হাতে ধানকতক সত্ত্ব কেনা টিকিট। বুক-পকেটের ছেঁড়া জার্সি দিয়ে কতকগুলো টিকিটের কোণ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে সত্যিই নেশায় পেয়েছে।

নিশাপতি অবিনাশকে হাত ঘরে টেনে নিয়ে চলল, ‘আজ্ঞে অবিনাশবাবু, এক কাপ চা খেয়ে যান, অনেক দিন পরে দেখা—’

চারের দোকানের ছোকরাকে ছ’ কাপ চা দিতে বলে অবিনাশের কানের কাছে মুখ এনে নিশাপতি ফিস ফিস করে বললে, ‘এবার বোধ হয় টেলিগ্রাম আসবে।’

অবিনাশ চোখ কপালে তুলে বলল, ‘কিসের?’

নিশাপতি মুচকি হেসে বলল, ‘পেরেছি।’

অবিনাশের বিস্ফারিত চোখ নামল না। নিশাপতি কি পাগল হয়ে গেল। ‘কি বলছেন আপনি?’

চারের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে নিশাপতি ব্যাপারটা খুলে বললে। কাল রাজে সে স্বপ্ন দেখেছে, সেট লেজাসে

তার নম্বর উঠেছে। একটা-না-একটা এবার লাগবেই—হয় প্রথম, নয় দ্বিতীয়, নিদেনপক্ষে তৃতীয়।

ও যেন এক স্বপ্নচাত্রী, অবাস্তবের পথে চলতে চলতে এমনই হয়েছে যে স্বপ্ন থেকে আত্ম আর সে সত্যকে পৃথক করে চিনতে পারে না।

অবিনাশ উঠে পড়ল।...

কিন্তু কোথায়ই বা যাবে? এই হুনিরা ভরাই ত স্বপ্নচাত্রীর দল। এই ত সে নিজের কয়েক দিন ধরে যেন এক স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর যেদিন ছিঁড়বে এই স্বপ্নের জাল... ক্রমপদে বাড়ীর দিকে ফিরল অবিনাশ। ট্রাম একটা যাচ্ছিল, লাফিয়ে উঠল।

ট্রাম ছুটেছে। বাড়ীর পর বাড়ী, গাড়ির পর গাড়ী, জনতা আলো—

জানাল দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে থাকে অবিনাশ, এই বস্তুর অরণ্যে কোথায় স্বপ্নের অবকাশ?

ট্রাম ছুটেছে, কেউ নামে, কেউ ওঠে।

এই—এই ত সেই গলি, এরই শেষ মাধ্যম তার বাড়ী।

লাফ দিয়ে নামল অবিনাশ। আর, তারপর এমন তাবে হাঁটতে লাগল যেন একটা মুহুর্তের এদিক ওদিক—হওয়ার উপরে তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। বাড়ীর সামনে পৌছেই দরজার ধাক্কার সঙ্গে তুলল চিংকার—‘মালতী মালতী—’

দরজা খুলে যায়।

মালতীর চোখে মুখে বিষয়—কিন্তু তার দিকে লক্ষ্য করবার অবকাশ অবিনাশের নেই। লাকাত লাকাত হুতিন সিঁড়ি পার হয়ে সে উঠল দোতলায়। চাবি, চাবি কোথায় গেল? মালতী মালতী—

না: থাক, দরকার নেই, চাবি সে পেয়েছে। মুহুর্তে অবিনাশ ঘরের কোণে গিয়ে সিঁদুকটা খুলে ফেলল।

টাকা—টাকা—টাকা। তাড়ায় তাড়ায় নোট বাঁধ।

এক হুই তিন—

না: ঠিকই আছে। মিথ্যা সন্দেহ।

নিদারুণ অবসাদে মাটির উপর বসে পড়ে অবিনাশ হাঁপাতে লাগল।

বিকেল থেকে কয়বার রাজেন গ্রেসে অবিনাশের বাড়ীতে কড়া বেড়ে ফিরে গেছে। রাজে পথে দেখা।

রাজেন টাকা চায়। একটা নয় দুটো নয়, এক হাজার। আগিসের মাইনে থেকে মাসে মাসে শোধ করবে। টাকা-গুলো মেরে দেবার ফন্দি মন্দ করে নি। এই ত চেহারা, জোর না হয় বছরখানেক, কি দু’বছর, তার পর ত চক্ষু উন্টাবে,

টাকা শোধ করবে কে? ছেলেবেলার বন্ধুদের দাবিতে অবিনাশকে হতুঁত করতে চায়।

হ্যাঁ, মাহুদ বটে নিশাপতি। বলে, ‘আপনার কাছে আসি, হুঁদও বসি, তা বলে মনে করবেন না যে কোন্ দিন বুঝি দশটা টাকা ব্যয় টেঁয়ে বসব। কখনও নয়—রামঃ! আর আমারও ত এল বলে। কে জানে আজ রাতে টেলিগ্রাম হতে পিয়ন-মহাপ্রভু উদর হস নাকি। এই দেখুন না—

জিপুরা লটারির টিকিট।—শুভ মনিব্যাগটার মধ্যে নিশাপতি সেটাকে লক্ষ টাকার সরকারী কাগজের মত সবচেয়ে রেখে দিয়েছে। কে জানে, কোন্ মুহূর্তে টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত হয়।

হ্যাঁ, এমন বন্ধু পাওয়াই ত সুখ, এতটুকু নীচতা নেই। সেও ত অবিনাশের সঙ্গে এক কলেজে পড়েছে, বন্ধু হয়ে একসঙ্গে লটারির টিকিট কিনেছে, ছেঁড়া কাপড়ে ছিন্ন জামা গায়ে রাস্তার রাস্তায় ঘুরেছে, ভাঙা কাপে চা খেয়েছে। সুখভূষণের বন্ধু নিশাপতি। কিন্তু কি উদার। মুখ ফুটে কখনও দুঃখের কথা বলে নি, কখনও অবিনাশের কাছে একটা টাকা ব্যয় চায় নি। অচল, অটল ভাবে খালি টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা করছে—তারও একদিন আসবে।

অপেক্ষা করার সময় ছিল না নিশাপতির—কোথাকার এক লটারির ফল নাকি বেরিয়েছে, যাট হাজার টাকা কাষ্ট প্রাইজ, কে জানে, যেই হল হুদ আর টিকিট পাওয়া যাবে না। ছুটল নিশাপতি। সময় পেলে রাতে দেখা করবে।

রাতে নিশাপতি আসে নি, এসেছে আবার রাজেন কন্ডাল। দ্বীপ অসুখ, মরমর—ডাক্তার আনে এমন পরিস্থিতি ঘটে নেই। ছেলেবেলার বন্ধু রাজেন কন্ডাল, আজ অবিনাশ না দেখলে কে তাকে দেখবে? যদি সে বেঁচে থাকে, আর কোন রকমে যদি চাকরিটা বজায় থাকে, তা হলে যে-করেই হোক সে তার বোনা শোধ করবে। বন্ধুদের অপমান সে জীবন থাকতে করতে পারবে না।

হঠাৎ অবিনাশের মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। জিব কেটে বলে, সব টাকা ত ভাই ব্যাঙ্কে ফিল্ড ডিপোজিটে রেখে দিচ্ছি, কি করব বল, পাঁচ বছর না হলে ত—

‘ফিল্ড ডিপোজিট।’ রাজেনের কর্তব্যর যেন আর্ড চীৎকারের মত শোনাগ, বুঝি তার চোখের সামনে সমস্ত হিন্দী অসুকার হয়ে গেল।

দুনিয়া অসুকারই বটে। বিছানার শুয়ে শুয়ে অবিনাশ এই কথাই ভাবে। মাহুদের জীবন। বুঝি এ অসুকার রাজির স্বপ্নই শুধু। কোথাও মিল নেই, ছল নেই, সামঞ্জস্য নেই। শুধু কতকগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনার আবর্তন মাত্র।

ঘরের মধ্যে খুঁটখুঁট শব্দ হচ্ছে। হুঁদর হলেও হতে পারত—কিন্তু হুঁদর নয়, অবিনাশ দিবি্য করে বলতে পারে।

নিঃশব্দে বালিশের ভল্লি থেকে টক্‌টকি বের করে অবিনাশ জালায়, ঘরের মেঝের, কোণে, দরজা ও সিন্দুকটার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে। একটা বেতাল জানালায় দিকে ছুটে গেল।

ভোর থেকেই দরজার ডাকডাকি—চাঘের কাপটাও শেব করতে পারে নি।

‘আপনি ত এখন অত্যন্ত ব্যস্ত মাহুদ, পাছে বেরিয়ে যান ভাই ভোর হতে না হতেই এলে পড়েছি। এই দেখুন আমাদের প্রেস্পেন্সার, মজুন হলে কি হয়, পুরোমোর বাবা। শুধু হজুরিমল ঝাঁঝিয়ারই রয়েছে হুঁ’ লাখ টাকা ফিল্ড ডিপোজিট। শুনেছেন ত এম. জি. ডোমের নাম? মস্ত বড়লোক—লাখ লাখ টাকার মালিক—মুন্ডের বাজারের টাকা ত। ব্যাঙ্ক খোলার দিন দরজা খোলার ভর সয় না, ঝাঁঝিয়ার রোলগ, আর ভোস সাহেবের ক্যাডিলাক এসে হাজির, কার টাকা আগে জমা হবে। বহুদ ত মশাই, ননি আর লক্ষী কাকে রেখে কাকে চটাই, নতুন ব্যাঙ্ক আমাদের।’

অবিনাশ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, ‘ভাই ত।

লোকটার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, বললে, ‘কিন্তু তা বললে ত হবে না; জটিল সমস্যা মশায়, কিন্তু হয়ে গেল এক মিনিটে মীমাংসা। একেই বলে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের মাথা। ঠিক হ’ল ঝাঁঝিয়া আর ভোস সাহেব, হুঁজনেরই নাম প্রথম ডিপোজিটর হিসেবে ত্রাকটে থাকবে—হুঁ’লাখ হুঁ’লাখ চার লাখ।’

অবিনাশ অসহিষ্ণু হয়ে বললে, ‘কিন্তু আমার টাকা—’

মুন্ডের কথা লুফে নিয়ে লোকটা বললে, ‘আর কোথায় রাখবেন বলুন? দুইশ ডি নেশনাল ব্যাঙ্কের মত এত ‘সেক্’ অথচ ‘এমন হাই ইণ্টারেস্ট’ আর কোথায় পাওয়া যাবে?’

লোকটাকে বিদায় না করলেই নয়। অবিনাশ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা ‘আপনার প্রেস্পেন্সার’ রেখে যান, সমস্তমত পড়ে দেখব।’

‘নিশ্চয়ই,’ বলে লোকটা প্রেস্পেন্সার সমস্ত দস্তাবেজ কাগজপত্র অবিনাশের দিকে এগিয়ে দিলে। ‘দেখবেন পড়ে সমস্তমত। পড়লেই বুঝবেন যে, গভরজের সিন্দুক, আর ব্যবসারে লগ্নী—দুটো ফল এক সঙ্গে পেতে হলে দুইশ ডি নেশনাল ব্যাঙ্ক এক এবং অদ্বিতীয়। আচ্ছা, মনে রাখবেন।’

নমস্কার করে লোকটা বিদায় নিলে।

তবু মনেহ যায় না। মনে হয়, এক দিন লটারির টিকিট কেনার পর যে রাজি এসেছিল, তা আর প্রভাভ হয় নি।

হঃস্বপ্নের শেষ আছে, স্বপ্নস্বপ্নের শেষ নেই। কত বিচিত্র অহুত্বের মধ্য দিয়ে এই মহারাত্রির স্বপ্নভঙ্গ হবে হবে কে জানে ?

নিশাপতি আপিসে যাবার পথে দরজার ডাক দিয়ে জানিয়ে যায় যে, টেলিগ্রাম এখনও আসে নি। বলে, ‘কালরাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, টাকাটা পেয়ে গেছি, লাঞ্চে বিয়াজিগ হাজার। হার, হার, স্বপ্নের স্বপ্ন কি চট করেই না ভেঙ্গে যায়।’

অবিনাশের বেলারই কি শুধু ব্যতিক্রম।

তবু, এ কি এক অস্বস্তিকর অবস্থা। স্বপ্ন যেখানে বাস্তবের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশেছে, অথবা বাস্তবকে যখন স্বপ্ন থেকে পৃথক করে চেনবার উপায় নেই, সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে মানুষ কত দিন বাঁচতে পারে ? দারিদ্র্যের মধ্যে আশৈশব লালিত অবিনাশ জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো ছিল স্বপ্নহীন, চলার পথ ছিল ক্লান্ত, অস্বস্ত, বাস্তবের ধূলি-ধূসরিত। আজ লটারির টিকিটে টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ কোন্ ছেদহীন স্বপ্ন এসে তার চোখে আর মনে বাসা বাঁধল। না, স্বপ্নই সত্য, দৌড়গা মিত্যা ; স্বপ্নভঙ্গে আবার যে অবিনাশ, সেই অবিনাশ।

রাজেন কহালের সঙ্গে ভোরবেলার চায়ের দোকানে দেখা হতেই রাজেন গোড়ারই বললে, ‘কিছু মনে করিস নি ভাই অবিনাশ, সেদিন মনের হুর্দল মুহুর্তে টাকা চেয়ে ফেলে-ছিলাম। তার পর ভেবে দেখলাম, ভুই-ই বা দিবি কোথেকে, দিবিই বা কেন ? ভুইও ত আজীবন হঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করে ভগবানের ইচ্ছের সত্ত্ব হৃৎকের মুখ দেখেছিল। না, টাকা তোর কাছে সত্যিই বার চাই না।’

অবিনাশ বাকশক্তিহীন। বিয়ূতের মত চায়ের কাপটা রাজেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে আর এক কাপ চা চেয়ে নিলে।

রাজেন চারে চুম্বক দিয়ে বললে, ‘সেদিন তোর কাছে টাকা চাওয়ার পর নিজের মনেই অভ্যস্ত লজ্জা হতে লাগল। কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে চেয়েছি তা না দেখলে তোরও বিশ্বাস হবে না।’ তার পর অবিনাশের কানের কাছে যুথ এগিয়ে গলা নামিয়ে বলে, ‘বউয়ের টি-বি। পাঁচটি ছেলেমেয়ে ভাই, সবগুলোই বলতে গেলে ছুধের শিশু। দেখাগুলো করার একমাত্র লোক হচ্ছে আমার বিধবা বোন—কিন্তু তার যা চেহারা, দেখলে মানুষ বলে কিছুতেই মনে হবে না। কি বলব ভাই তোকে, সমস্ত দিনটা যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে,—ধোর হঃস্বপ্ন।’ তার পর চায়ের কাপটা টেবিলের উপরে সশব্দে নামিয়ে রেখে বলে, ‘ওঃ! ভগবান যদি ভাই করতেন।’

রাজেন বিদায় নেয়।

অবিনাশ আবার পথ চলে। তজ্রালু প্রভাত। আকাশে ঘেয়ে কি কুয়াশা নেমেছে।...

শহরের ঘুম ভাঙনও ভাল করে ভাঙে নি। হাতীবাগানের বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় নজরে পড়ে সারি সারি ঘুমন্ত মানুষের দল, কঠোর শ্রমের পর তাদের মুখে কি গভীর প্রশান্তি! কাছেই ট্রামের মজুর, সমস্ত রাত জেগে লাইন মেরামত করেছে।

অবিনাশ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এক জন ঘুমের মধ্যে ডান হাতখানা নাড়ছে, যুথের উপর একটা স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছে। বোধ হয় সে কোন মজুর স্বপ্ন দেখছে, বাস্তবের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই। অবিনাশও হয়ত ওরই মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে—যে স্বপ্নের শেষ নেই।

রাতে ঘুম নেই, অবিনাশ অজ্ঞকারে বারান্দার ঘুরে বেড়ায়। কখনও ছাদে, আবার ফিরে আসে বারান্দায়, ঘরে। মাঝে মাঝে এসে বিছানার শোয়, সিগারেট ধরাবার অছিলায় দেশলাই জ্বালিয়ে মালতীকে দেখে নেয়। আঃ কি অনার্যাস নিজা। মনে পড়ে যায়, অবিনাশও এক দিন এমনিভাবে ঘুমাতে পারত—গভীর শান্তিদায়িনী নিজা। সমস্ত দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, টাকার চিন্তা, আপিসের হাড়ভাঙা ঝগুনি, সন্ধ্যার বাড়ী ফিরে ভাত খেলেই চোখ ভেঙে ঘুম আসত। তুলে তুলে স্নতি কষ্টে মেয়ের পড়া বলে দিত, ঘুমের ঝোঁকে অনেক দিন জুলও বলে দিয়েছে। তার পর কোন রকমে বিছানার গা তালতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে বেহাশ হয়ে পড়ত।

মনে পড়ে, এক দিন ছাদ দিয়ে চোর এসেছিল, মালতী সেদিন অনেক ঠেলাঠেলি করেও অবিনাশের ঘুম ভাঙাতে পারে নি। ঘুম স্বপ্ন ভাঙল শুধু চোর নিচের দরজা খুলে পালিয়ে গেছে। সেদিন নিজের ঘেদ ছিল না, স্বপ্ন ছিল না, জীবনের ক্লান্ত পথে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। মনে পড়ে, একদিন সে একখানা লটারির টিকিটও কিনেছিল। মনে আছে, সেই টিকিট নিয়ে মালতীর সঙ্গে সেদিন রাত্রে তার যে তুলুল বগড়া হয়েছিল, তার পরিণতিতে মালতী রাত্রে ভাত খায় নি। সে কাহিনী বেদনার সিক্ত বাস্তব। কিন্তু তার পরই এল এমন এক দিন, যাকে সে স্মৃতি না হুদ্বিন বলবে ভেবে ঠিক করতে পারে না। হুপরে, ‘অবিনাশচক্র চক্রবর্তী’ এই নামে একখানা টেলিগ্রাম এল। মালতী টেলিগ্রাম খোলে নি, সমস্ত দিন এক অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় কেঁপেছিল শুধু। রাত্রে অবিনাশ বাড়ী ফিরে টেলিগ্রাম খুলল। তার টিকিটের নম্বর উঠেছে। সত্যি, না স্বপ্ন। কে জানে সেদিন থেকেই স্বপ্নের সূচনা হয়েছিল নাকি। তার পর আর এক দিন খবর এল তার বোড়া কাঠ হয়েছিল। চেক এল পঞ্চাশ হাজার টাকা। শুধু আবছা একটা স্মৃতির মত মনে পড়ে।

হেলেনবেলার বিপ্লবী উল্লেখের গল্প পড়েছিল অবিনাশ—
লোকটা এক ঘুমে নাকি হুড়ি বছর কাটিয়েছিল। কে জানে,
সে মিছেও সেই রকম ঘুমেই কাটাচ্ছে নাকি।

বিছানা থেকে উঠল অবিনাশ, বারান্দায় এসে দাঁড়াল।
আকাশে কালো মেঘ এসে সমস্ত তারা ছেয়ে ফেলেছে।
বাড়ীটার অন্তরকার ধ্বংস করছে। এই অন্তরকারে দাঁড়িয়ে
অবিনাশের একটা কথা মনে এল। আজ সকালেই রাজেন
তাকে বলছিল, সমস্ত দিনটা যেন একটা ছঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে
কেটে যায়। কে জানে, যে টাকা আজ তাকে স্বপ্নচরী
করেছে, সেই টাকা হয়ত রাজেনের ছঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে
দিতে পারে।

ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এল অবিনাশ, পা টিপে টিপে এসে
সিন্দূকের সামনে দাঁড়াল। তার পর কোমর থেকে চাবিটা
করে করে সিন্দুক খুলে ফেলল। চাবি ঘোরানোর শব্দে
মালতীর বুঝি একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ‘যাঃ যাঃ’ শব্দ
করে ক্লান্ত হুঁহু ভাঙিয়ে সে আবার পাশ ফিরে গেল।

নোটগুলো ভেদনি সাজানো আছে, ধরে ধরে। অবিনাশ
সেগুলো ছ’হাতে ভুলে নিয়ে পকেটে পুরতে লাগল। তার
পর সে ঘর থেকে বারান্দায় এল, বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে
নীচে নামল, দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। গলির অন্ধ
প্রান্তে রাজেন কন্ডালের বাড়ি।

মাথায় বাতাস দিয়ে জীকে একটু ঘুম পাড়িয়ে রাজেন রাস্তা
আন্দাজ একটার সময়ে শুয়েছিল, জোর বোধ হয় এক বর্গা
ঘুমিয়েছে। এত রাজে কে ডাকে? জন্তু পদে এসে দরজা

খুলে বললে, ‘কে অবিনাশ, এত রাজে ভাই। কোন বিপদ-
টিপদ হয় নি তো?’

অবিনাশের কণ্ঠস্বর শান্ত। বললে, ‘বিপদ কাটাতেই
এসেছি আমি। এই টাকাগুলো তুই-ই নে রাজেন, যাকে
আমি স্বপ্ন মনে করেছি, তোর কাছেই তার সত্যের যাচাই
হোক।’

‘টাকা!’ রাজেন কন্ডাল তন্ত্রিত হয়ে বললে, ‘টাকা
কিসের?’ গরীব বন্ধুর সঙ্গে অবিনাশ হুপুঁর রাজে তামাশা
করতে এসেছে নাকি।

কিন্তু তামাশা নয়, অবিনাশের গলার স্বরে ‘তামাশার
বাপ্পও নেই। স্থির করে সে বললে, ‘আমার লটারির টাকা।
নে ভাই, তাড়াভাড়ি স্বর,’ বলে সে তন্ত্রিত রাজেনের হু’হাতের
মধ্যে নোটের তাড়াগুলো খুঁজে দিতে লাগল।

অবিনাশের মুখ দিয়ে অনেক কষ্টে কথা বেরল। অফুট
স্বরে সে বলল, ‘এর মানে কি অবিনাশ?’

অবিনাশ অবিচলিত স্বরে বলল, ‘বললুম যে, এর মানে
যাচাই করার তার এখন তোর উপর দিয়ে আমি এই অনর্থের
বোঝা থেকে ঝালাস হলো। এত দিন এই চার পানের
হুমিয়ার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না ভাই, যেন ঘুমের
মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। কাল থেকে আমি আবার
মাল্লেশ্বর মত চলে কিরে বেড়াতে পারব। এই আমার পরম
লাভ। আচ্ছা ভাই, আর রাত জাগিস নি, তাড়াভাড়ি শুয়ে
পড় গিয়ে, আমিও বাড়ী গিয়ে একটু স্বস্তিতে বিছানায় গা
এলিয়ে দিই।’

বলে অবিনাশ আবার নিজের মনেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

এতটুকু

শ্রীমাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমি চেয়েছিলাম এতটুকু ঠাই তোমার নিরালা ঘরে,
কেহ থাকিবে না, কেহ শুনিবে না আমাদের আলাপন,
মিনিটে মিনিটে চলে যে সময় হেলার আলস ত’রে
তাই থেকে কিছু দাও দাও বলে করিয়াছি আলাপন।

বেশী কিছু নয় এক মুহূর্ত; অথও অবসর
তোমার জীবনে যেদে বিচ্ছেদে আনিত কি ধ্বংসা?
এতটুকু দিলে ভাঙারে তব হ’ত কি আশান্তর
ক্ষয় ও কতির অক্ষ কবিতা কেবা দিত গল্পনা?

আমার জীবনে সেই মুহূর্ত দাও দাও প্রিয়তমে
নদী-তরঙ্গ বারেক আশ্রয় সমুদ্র-সঙ্গমে।

আমি দেখেছিলাম তোমার নয়নে আমার প্রদীপ জ্বলে,
আমার নয়নে বিশ্বভুবন আলো করা ওই রূপ,
দেখি একাকিনী বৈরাগিণীর আমার হৃদয়-তলে,
আমার পক্ষ ইন্দ্রিয়ে দহে কামনা-গন্ধ ধূপ।

তারি মাঝে আমি চেয়েছি তোমারে ক্ষণ অবসর মাঝে
সংসার ছ’তে নিছকের সরারে নির্জনে নিরালায়,
সেই মুহূর্ত জীবনে আমার কোটি মূল হয়ে রাজে
এতটুকু পাওয়া তারই ছোঁয়া লাগি’ আহি যে প্রতীক্ষায়।

সাহিত্য ও সমাজ

ডক্টর জীরমা চৌধুরী

সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধের প্রশ্ন স্বতঃই উদ্ভূত হয়। সেদিক থেকে দুটি চরমপন্থী, বিপরীত মতবাদ সম্ভবপর। প্রথম মতানুসারে, সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে কার্য-কারণ বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। সমাজের পরিধি বাস্তব জীবনের স্থূল পরিবেষ্টন। সাধারণ জীবনের কার্যকলাপ, চিন্তাপ্রবাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সমাজের কার্যবার। ব্যক্তিমণ্ডলী নিয়েই পরিবার, পরিবার-গোষ্ঠী নিয়েই সমাজ। সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, অতি স্থূল স্থূল বিষয় নিয়েই সমাজকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকতে হয়। এ অবস্থা সত্য যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি-বৃন্দকে নিয়ে যখন এক একটি পরিবার গড়ে উঠে, তখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটি ব্যক্তিত্বের অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি বহুল পরিমাণে বিস্তৃততর, ব্যাপকতর হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ কিছু পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিলে পরিবারের গঠন সম্ভব নয়।

একটি পরিবারে সর্ব-সাধারণ-স্তরের জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই এবং অনেক পরিমাণেই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থত্যাগ ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক সংস্থাপিত করতে হয়। এই ভাবে পরিবারে কেবলমাত্র শুদ্ধ ব্যক্তিস্বার্থের স্থানে যৌথ-স্বার্থই হয়ে দাঁড়ায় প্রধানতর। একই ভাবে বিভিন্ন পরিবার-মণ্ডলী নিয়ে যখন হয় সমাজের ভিত্তি সংস্থাপন, তখন পরিবারের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ গণ্ডিও হয়ে যায় পুনরায় বিস্তৃততর এবং সর্বজনীন-স্তরের নিকট ব্যক্তি ও পরিবারের নিজস্ব স্বার্থ হয়ে যায় অপেক্ষাকৃত অর্থহীন। এক্ষেপে সমাজে ব্যক্তির অপেক্ষা জাতি, স্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষা সমবায়, একের অপেক্ষা বহুর দাবিই হয়ত মুখ্যতর। তা সত্ত্বেও যে কোন স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমাজেই পরিবারের, তথা ব্যক্তির দাবি উপেক্ষিত হবার নয়—কারণ পরিবার ও ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তাদের বাদ দিয়ে নয়। সেজন্য পরিশেষে সামাজিক সমস্যা পারিবারিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা ব্যক্তিগত সমস্যা। সমাজের বিধিনিষেধ এক্ষেপে হওয়া প্রয়োজন যাতে তা পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধতির সাক্ষাৎ কারণ হতে পারে, এবং পরিবারের অলিখিত আইন-কানুনগুলিও সর্বদাই এক্ষেপে হওয়া আবশ্যক, যাতে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত সমস্যার স্বল্প সমাধান এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। এক্ষেপে বৃহত্তর পরিবারের

এবং বৃহত্তম সমাজের ব্যক্তিই মূলকেন্দ্র—ব্যক্তিগত তথা-কথিত ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যাবশ্যক সমস্যাগুলিই সমাজের নিজস্ব সমস্যা, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখই সমাজের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিই সমাজের সমৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। সেজন্য পূর্বেই বা বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাবনা, আদান-প্রদানই সমাজের উপজীব্য বিষয়।

কিন্তু এই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের—কাব্য, দর্শন, ধর্মের—সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে? সমাজ জড় পৃথিবীতেই চিরকাল প্রোথিত—প্রাত্যহিক জীবনের অল্প-বস্ত্র-আশ্রয়, জন্ম মৃত্যু-বিবাহ, দাবি-অধিকার-আইন প্রভৃতির বিচার ও সিদ্ধান্তেই সে নিরন্তর ব্যাপ্ত। এই জগতের উদ্ভবলোকে, অপার্থিব মানসলোকে, আনন্দময় অমৃতলোকে দৃষ্টিপাত করবার তার অবসর বা সামর্থ্য কোথায়? কিন্তু সাহিত্যের চির-অগ্নান শতদল প্রস্ফুটিত হয় সেই অপার্থিব মানসলোকেই চিরশোভন মানসসরোবরে। নিদাঘদাহে—যেমন শতদলের শত দলই শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে, বাস্তবতার প্রথর তাপে তেমনি সাহিত্যের প্রাণবন্তও হয়ে যায় বিনষ্ট। সেজন্য সাহিত্যের কমলাসন থাকবে পাতা সেই অবাস্তব সৌন্দর্যলোকেই মাত্র যেখানে পৌছাতেই পারে না কোন পার্থিব শোকতাপের দীর্ঘশ্বাস, যেখানে পড়তেই পারে না ধবীর ধূলার মলিন ছায়া, যেখানে শুষ্ক হয়ে যায় জাগতিক বিবাহ-বিস্বাদের কর্কশ কোলাহল। সেই দিক থেকে সাহিত্য এক অপার্থিব, অল্পম সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আনন্দের পূর্ণ ত্যোতক যার কণামাত্র এই অপূর্ণ জগতে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য স্বভাবতই সাহিত্য ইহ-জগতের, এই মর পার্থিব জগতের প্রতিচ্ছবি নয়, প্রতিচ্ছবি সে এক অপার্থিব মানসজগতের, এক অবাস্তব কল্পনা-রাজ্যেরই মাত্র।

বাস্তবজগতের অনিবার্য কঠোর ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ব্যস্ত মানব সাময়িক শান্তি সন্ধান করে মনঃকলিত এক স্ব-উচ্চ জগতে—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। যত্নমাংস-গঠিত, জড়দেহেন্দ্রিয়বান, এবং সেদিক থেকে পশুভূলা, মানবের জীবনের অপর একটি দিকও আছে—আত্মার দিক, বিচার-বুদ্ধির দিক, নীতি-বিবেকের দিক—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। বাস্তব জগতের সঙ্গে নাদীর টানে আবদ্ধ থাকলেও মানব আদর্শবাদী, সত্য-সন্ধানী, পূর্ণতা-পিয়াসী—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। এক্ষেপে

আদর্শ ও আনন্দ—যে আদর্শ বাস্তব জগতে চির-অপূর্ণ এবং যে আনন্দ “সর্বং দুঃখং দুঃখম্” সংসারে চির অপ্রাপ্য—সাহিত্য-সৌখ্যের যুগল স্তম্ভরূপ। কিন্তু সমাজের স্তম্ভ সম্পূর্ণ বিপরীত। একপে সমাজ ও সাহিত্যের মূলভিত্তি-গতই বিরোধ। সেজন্য সমাজের সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে আইন-কানূনের গুস্তক, বিধি-বিধানের ধারা; জাতি সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব; দেশ সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে ভূগোল, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

কিন্তু এই সব হচ্ছে “বিবরণী” বা “কাহিনী”ই মাত্র, “সাহিত্য” নয়। সাহিত্য হচ্ছে লঘু দিক থেকে কাব্য প্রভৃতি, গুরু দিক থেকে দর্শন, ধর্ম আলোচনা প্রভৃতি। কাব্যের মাধ্যমে আমরা আশ্বাদ পাই এক অনন্ত সৌন্দর্যলোকের এক অনাবিল আনন্দের পীযুষধারার; দর্শনের মাধ্যমে আমরা লাভ করি এক পরিপূর্ণ আদর্শলোকের শাস্ত শান্তির অমূল্য কৌস্তম্ভমণি। একপে আনন্দ ও শান্তিপ্রদায়ক সাহিত্য নিরানন্দ, অশান্তিসঙ্কুল জীবন, সমাজ ও জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। এই হ’ল সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ সম্পর্কে এক চরম মতবাদ।

দ্বিতীয় চরম মতবাদ হল এই যে, সাহিত্য ও সমাজ কাণ্ড-কারণরূপে অঙ্গাদ্বী ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সমাজের প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, স্বখ-দুঃখ সবই বাস্তব, নগ্ন ও সাক্ষাৎ ভাবে অঙ্কিত হয় সাহিত্যেরই ছত্রে ছত্রে। সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, রক্ত মাংসে গঠিত মানুষেরই সৃষ্টি, দেবতার নয়। মানুষের জীবনে অবশ্য দুটি দিক আছে সন্দেহ নেই—দৈহিক দিক, পার্থিব দিক, এবং আত্মিক দিক ও অপার্থিব দিক। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের দৈহিক, পার্থিব দিকটাই প্রধানতর ও ব্যাপকতর—তাকে পরিবর্জন বা অস্বীকার করে মানুষের মনুষ্যত্ব হয়ে পড়ে অর্থহীন। সেজন্য যে সাহিত্য মানুষের প্রাণের কথার বাহ্যিক অভিব্যক্তিই মাত্র, যে সাহিত্য মানুষের জীবনের মূলমন্ত্রের লিখনাত্মক রূপই মাত্র, সে সাহিত্য যে তার নিতানৈমিত্তিক ভাব-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিবেশ-আবেষ্টন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব হয়েই থাকবে, তাই বা কি করে সম্ভবপর হয়? যে কল্পলোকের নিরন্তর আনন্দ-নির্ব্বা-ধাবায় মানুষের কল্পনাবিলাসী, আকাশবিহারী মন বিলাস ও বিহার করতে উদগ্রীব, তা যতই সাময়িকভাবে স্তম্ভুর হউক না কেন, পরিশেষে কেবলমাত্র “স্বপ্নো হু, মায়া হু, মতিভ্রমো হু।” সেজন্য অবাস্তব, স্বপ্নবিলাসী, আকাশবিহারী সাহিত্যও হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অবাস্তব—শূন্য-

গর্ত বৃহদেবই মত তার ক্ষণস্থায়ী অবাস্তব জীবন, মূল্যহীন অবস্থিতি। অতএব সাহিত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে না, বরং এই সবেব জলন্ত, বাস্তব চিত্রাঙ্কনই সাহিত্যের ধর্ম।

একপে দুটি চরম মতবাদ এক্ষেত্রে পাওয়া যায়—আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ, কল্পনাবাদ ও কঠোর সত্যবাদ। প্রথমটিকে বলা চলে Idealism, দ্বিতীয়টিকে বলা চলে Realism। দর্শনে যেমন সাহিত্যেও ঠিক তেমনই এই দুটি বিপরীতধর্মী শ্রোত নিরন্তর প্রবাহিত দেখা যায়। মানুষের স্বীয় প্রকৃতিতেই যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি নিহিত আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে যুগে যুগে মানুষেরই হৃদয়োচ্ছ্বাস-দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড। অসংখ্য ইন্দ্রিয়, মাংসপেশী, স্নায়ু, রক্তকণা সম্বলিত মনুষ্য-দেহ বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অংশের সমাবেশ হলেও, কি এক অপূর্ব জৈবিক নিয়মানুসারে এক অভিন্ন, সমগ্র বস্তু। অত্যাধা, জীবনধারণই হয়ে ওঠে অসম্ভব। ঠিক একই ভাবে, অসংখ্য চিন্তা, অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ, মানসিক ভাব সম্বলিত মানবমনও কি এক আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে এক অভিন্ন, সমগ্র বস্তু। নতুবা, ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ, সমগ্র ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ে কথার কথা।

একপে শুধু মানবের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাস কিঞ্চিদ্ভিন্ন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুর মধ্যেও একের, বিরোধের মধ্যেও সামঞ্জস্যের, বিচ্ছিন্নের মধ্যেও সমগ্রের আবিষ্কার ও প্রকাশই জীবন, স্থিতি ও সমুন্নতির কারণ। এই সর্বজনীন, মঙ্গলজনক নিয়মের বশবর্তী মানব-মনও বিপরীতধর্মী ভাব-ভাবনার বিপরীতমুখী আকর্ষণে বিপরীত দিকে চালিত হয়ে উদ্যম হয়ে উঠলেও, পুনরায় তাদের মধ্যেই এক অপূর্ব সমতা, স্থিরতা ও স্থিতি লাভ করে। সেজন্য সকল বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি মিলনগ্রন্থি অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা মানুষের প্রকৃতি-গত, স্বভাবজ্ঞ। একপে সকল বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি মিলনের মতের অনুসন্ধান করাও মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম।

বাস্তব জগতেও দৃষ্ট হয় যে, চরম আদর্শবাদী ঋষি এবং চরম বাস্তবাদী ভোগীর সংখ্যা অপেক্ষা মধ্যপন্থীগণের সংখ্যা অধিক। মনুষ্যজীবনের এই সময়ের চিত্র মনুষ্যসৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়েও সমভাবে পরিফুট হয়েছে।

তারই ফলে, উপরি-উক্ত দুই চরম মতবাদের মধ্যেও

আমরা পেয়েছি একমাত্র গ্রহণযোগ্য আর একটি তৃতীয় সমন্বয়বাদ—যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতা, আকাশ ও পৃথিবী, আত্মা ও দেহমনের ঘটেছে এক অল্পম সংযোগ। এই একমাত্র মতানুসারে, পৃথিবীর মানুষ আমরা, দেহমনবান জীব আমরা—এই মাটির পৃথিবীর বুকেই, এই ধরণীর ধূলিতলেই আমাদের সৃষ্টি ও স্থিতি। সেজন্য এই মর জগৎকে, এই জড়দেহমনকে আমরা যে শুধু নিঃশব্দ অবজ্ঞাই করতে পারি না, তা নয়; উপরন্তু, এদের আমরা ভালও বাসি, এদের সঙ্গে আমাদের সত্তার যোগ শাস্ত ও অচ্ছেদ্য। সেজন্য আমাদেরই প্রাণের জিনিষ সাহিত্যে আমরা প্রকাশ করি, আমরা প্রতীক্ষা করি, এই জড়-জগতেরই সত্য, বাস্তব, জীবন্ত, জাগ্রত রূপটির, এই মর দেহমনেরই স্বচ্ছতা, আশা-আশঙ্কা, আলোড়ন-বিলোড়নের মূর্ত, পূর্ণ, যথার্থ, অকৃত্রিম অভিব্যক্তির।

প্রথম চরম মতানুসারে দর্শন, ধর্ম, কাব্য প্রভৃতি স্বল্প-সংখ্যক তীক্ষ্ণবী দার্শনিকের এবং উদগ্র কল্পনাবিলাসী রসিকজনের আদরের বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে “সাহিত্য”-পদবাচ্য নয়। যে লেখন সম্পূর্ণই অবাস্তব, বার সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পূর্ণই শূন্য নভস্তলে, তা সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেও কত কাল, কত পরিমাণে প্রকৃত তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ হয়, সেইটাই চিন্তনীয়। সন্দেহ নেই যে, কেবল মনেরই সঙ্গে এই একাকী, উদগ্র খেলায় স্বয়ং মনই অচিরে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই অবসাদ থেকেই সৃষ্টি হয় misanthrope বা মানববিদ্বেষী দার্শনিকপ্রবরের, ও lotus eater বা দিব্যস্বপ্নবিলাসী অলস, অকর্মণ্য জড়মানুষের। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এরূপ অবাস্তব সাহিত্য “সাহিত্য” নাম-ধারী হলেও সাহিত্য নয়। এরূপে একটি গণিতের জটিল তথ্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক অথবা একটি জায়দশনের পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষবহুল প্রামাণ্য গ্রন্থ অন্যান্য দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান হলেও “সাহিত্য” সংজ্ঞাভাৱে উপযুক্ত নয় নিশ্চয়ই।

অপরূপক্ষে সেই ভাবেই কেবলমাত্র অতি-বাস্তব রচনাও “সাহিত্য”-পদবাচ্য হতে পারে না। কেবল পার্শ্ববিশ্বে, কেবল বস্তুত্বের, কেবল জৈবভাবের অপরিহার্য গণ্ডিতেই কেবল যে মন বিচরণ করে ও আবদ্ধ হয়ে থাকে, সে মন ত জড়েরই তুল্য, স্বজনী শক্তি তার কই? সে মন কেবল লেখক, লিপিকর বা গ্রন্থকারই মাত্র—রচয়িতা, স্রষ্টা বা দ্রষ্টা নয়। কেবলই বাস্তব জিনিষের যথাযথ বিবরণ, কেবলই ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা, কেবলই সংসারের ক্লেশ-ক্লেশ-মলিনতার বীভৎস, নগ্ন চিত্রণ, কেবলই মানুষের জৈবিক বাসনা-কামনার নগ্ন প্রকটন—

আর বাই হোক, “সাহিত্য” নয়। সেজন্য সাধারণ পাঠ্য পুস্তক, ভূগোল, ইতিহাস, রোগমতী বিবরণী সম্বলিত চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম প্রভৃতির বাৎসরিক অধিবেশন গ্রন্থ, কামবিজ্ঞান বা ‘বটতলার’ উপন্যাসাদি কখনই “সাহিত্য” মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। তথাকথিত “প্রগতিশীল”, অত্যাধুনিক, “বাস্তববাদী” কবিদের রচনাও সাহিত্যের ভ্রমাবহ প্রেতাছাই মাত্র, “সাহিত্য” নয়। যথা, “ডাষ্ট-বিনে”র উদগ্র গন্ধে আকৃষ্ট, গলিত ফোটোকাকীর্ণ, শীর্ণ পথের কুকুরের দুর্গন্ধময় মুখিক ভক্ষণ বা প্রায়নয়, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা ভিখারিণীদ্বয়ের উৎকুন ধ্বংসের বা গাত্রকণ্ডুনের বীভৎস চিত্র; আজ সাহিত্যের নামে সরস্বতীর পুত্র মন্দির-অলিন্দে প্রবেশের অল্পমতিলাভ করেছে—সেটাই বিশ্বয় ও দুঃখের কারণ। সাহিত্যে ‘বীভৎস’ ও ‘ভয়ানক’ রসের স্থান আছে, নিশ্চয়ই। কিন্তু তা “রসে” উন্নীত হয় তখনই যখন কেবল অবিমিশ্র, অত্যাগ্র বাস্তবতার শুষ্ক, কঠিন কঙ্করময় ধূলিকণায় লাগে কবিচিত্তের শীতল সঞ্জীবক বারি-ধারার অমৃতময় প্রলেপ। ধরণীর ধূলিপুঞ্জ আকাশের আশী-ধারায় স্নাত হয়ে সরস হলে তবেই হতে পারে কঠিন ভূমণ্ডলের বুক চিরে নবাকুরের গুহ বিকাশ। একই ভাবে— এই মাটির পৃথিবীর ক্লেশ-কাটিন্যের উপর কবি-মানসের সেই অলৌকিক নিষ্করধারা-সম্পাতেই জাগ্রত হয়ে ওঠে সাহিত্য-কিশলয়ের প্রথম প্রাণের স্পন্দন।

সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র প্রক্রিয়া হ’ল এই—বাস্তব ও কল্পনার, বর্তমান ও আদর্শের, জীবন্ত ও মৃত্যুত্বের এক অপূর্ব সংযোগ, সমন্বয় ও সম্পূর্ণতা। পক্ষ থেকে পক্ষের, ধূলিকণা থেকে ইন্দ্রধনুর উৎপত্তির মতই বিশ্বয়কর এই পার্থিব বস্তু ও ভাব থেকে অপার্থিব আনন্দ-রসময় সাহিত্য সৃষ্টি। পক্ষের শত গ্লানি ধন্য করে কোন্ মায়াবীর মায়া-স্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে সহস্র-দল-বিস্তারী সহস্রদল তার অপরূপ সৌন্দর্যে, সৌরভে, শুভ্রতায়। ধূলির শত মলিনতা সার্থক করে, কোন্ চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র কনকায়মান রূপ-মধুরিমা। একই ভাবে সাধারণ জগতের পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক হাসি-কান্নার, মানব-মনের দৈনন্দিন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশা, ঘাত-প্রতিঘাতের অতি তুচ্ছ, অবজ্ঞেয় চিত্রটিও যখন কবির প্রাণের রসে সিক্ত হয়ে সহস্রদলের মতই বিকশিত হয়ে উঠে; দ্রষ্টার মরমী দৃষ্টির অকর্ণালোকসম্পাতে ইন্দ্রধনুর মতই ভাস্বর হয়ে ওঠে, তখনই হয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রকৃত সৃষ্টি। “সকল কাঁটা ধন্য করে” ফুল ফোটবার,—সকল বাধা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবার, সকল কুশ্রীতা, মলিনতা, প্রাত্যহিক-

কতা ও সাধারণতার সাহিত্য-গৌরবে গরীয়ান হয়ে উঠবার এই ত অপূর্ব ইতিহাস।

এরূপে অসাধারণের অসাধারণত্ব নয়, সাধারণেরই অসাধারণত্ব সাহিত্য চির-গরীয়ান। এই অসাধারণত্ব সম্পাদনের মন্ত্র-শক্তিতেই সাহিত্যিকের লেখন উন্নীত হয়, “রচনা” বা “সাহিত্যে” আমাদের লেখন পর্যবসিত হয় “বিবরণী” বা “কাহিনী”তেই মাত্র। বুদ্ধি-সর্বস্ব পণ্ডিতের নিকট বস্তু-নিরপেক্ষ, শূন্যগর্ভ মনের আলোকই যথাসর্বস্ব; সাধারণ মানুষের নিকট মন-নিরপেক্ষ, আধার-বিহীন বস্তু-জাতের কঠোর উপস্থিতিই যথাসর্বস্ব। প্রথমটি ‘Form without matter’; দ্বিতীয়টি ‘Matter without form’। কিন্তু সাহিত্যিকের মনোহর্যে হয়েছে ‘Form’ ও ‘Matter’-এর পরিপূর্ণ সম্মতি। বাহ্যিক বস্তুকে তিনি অন্তরের, অপূর্ব রূপান্তরীকরণ শক্তিতে নিজস্ব করে নিতে পারেন। এরূপে সমগ্র বিশ্বভূমিই সাহিত্যিকের মনোজগতে নবরূপে বিবর্তিত হয়ে পুনরায় নবরূপে প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যের স্বর্ণ-মুকুরে। সেজন্য প্রকৃত অর্থে সাহিত্যিক সত্যই বিশ্ব-প্রকৃতিকে বলতে পারেন :

“আমি আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে

তোমারে করেছি রচনা,

তুমি আমারি, মম অসীম

গগনবিহারী।”

বস্তুতঃ সাহিত্যিকই সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, সর্বাপেক্ষা ধনী— সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিই তাঁর একান্তই নিজস্ব ধর্ম, মনের আগুনে রাঙা।

এরূপে নিপুণ শিল্পীর সামান্য কয়েকটি রেখায় যেমন সাধারণ বস্তুও হয়ে ওঠে এক অপূর্ব চিত্র, তেমনি প্রকৃত সাহিত্যিকের হাতে সাধারণ গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, চিঠি-পত্র প্রভৃতি সবই হয়ে ওঠে এক অপরূপ স্তম্ভর “সাহিত্য”। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করা যেতে পারে।

অতএব সাহিত্য ও জীবন বা সাহিত্য ও সমাজ— অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত হয়েও অভিন্ন নয়।*

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সংগ্রহের (পাটনা) মহিলা-শাখার সভা-নেত্রী অভিভাষণের একাংশ।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীমুখীলচন্দ্র ঘোষ

আমার একজন পাঠক-বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, “বাঙালী” বলিতে তিনি কি বুঝিবেন? উত্তর দিয়াছিলাম যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে বাহারা এই প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী আমি তাহাদেরই “বাঙালী” বলিয়া মনে করি। আর একজন পাঠক-বন্ধুর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা বণ্টনের বিষয়ে প্রদেশের প্রতিবর্গ মাইলের বসতির হার ও মোট জনসংখ্যা লইয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল। আমি প্রতি বর্গমাইলে বসতি-হারের উপর (মোট জনসংখ্যার উপর নহে) ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থবণ্টনের প্রস্তাব করিয়াছি। অশ্রান্ত পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা ও সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া এই দুইটি বিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া প্রথমেই লিখিলাম।

বিদেশী ও অপর প্রদেশবাসী ব্যবসায়ীদের সমকক্ষ হইতে হইলে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিজেদের যে সমস্ত দোষ ও ত্রুটি আছে তাহা সর্বাগ্রে সংশোধন করিতে হইবে।

অপর প্রদেশবাসীরা এখান হইতে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছেন এজন্য তাহাদের দোষ দেওয়া অন্যায়। ইহা উটপাখীর মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র মূলধন ও উচ্চশিক্ষা থাকিলেই যে শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি করা সম্ভব ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইহার জন্য চাই কঠিন পরিশ্রম, চরিত্র ও সততা। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙালীর এই বিষয়ে দুর্বলতা কতটুকু ও কোথায় তাহা পরে আলোচনা করিব।

পূর্বে প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সমস্ত সমাধানের জন্য কুটীর-শিল্প প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয় লিখিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কুটীর-শিল্প প্রসারের ব্যবস্থার জন্য একটি নূতন সংসদ গঠন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিছুদিন পূর্বে এরূপ একটি সংসদ গঠন করিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত কাঁধ্যতঃ এই সংসদ কতদূর কি করিয়াছেন তাহার কোন বিশদ বিবরণ জানা নাই। দেশের বেকার-সমস্ত সমাধান

করিবার পক্ষে কুটীর-শিল্প প্রসারণই অন্যতম উপায়। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান যুক্তরাজ্য যুদ্ধের পর যখন বেকার-সমস্যা লইয়া বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল তখন ইংলণ্ডে শ্রমিক গবর্ণমেন্টের অর্থসচিব স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া সেখানে বেকারের সংখ্যা অনেকটা কমাইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রমিক সরকার কর্তৃক ১৯৪২ সনে প্রকাশিত *Labour Gazette* হইতে জানা যায় যে, তিনি বৃহত্তর শিল্পগুলির উৎপাদন নানা প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যতটা সম্ভব নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে কুটীরশিল্পের দ্বারা করিয়াছিলেন। এসব কুটীরশিল্পের দ্বারা বৃহত্তর কলকারখানার আবশ্যক বহরকমের ছোট ছোট অংশ (Parts) ও সরঞ্জাম (Accessories), এমন কি অল্পশুল্ক পণ্যসত্ত্বেও এই ভাবে উৎপাদন করা হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে।

কুটীরশিল্পের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে। ইহার জন্য একসঙ্গে বেশী মূলধন লাগে না এবং বৃহত্তর শিল্পের ন্যায় শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও কম। তাহা ছাড়া এই শিল্প পরিচালনার জন্য উদ্বৃত্তন কর্মচারীর বিশেষ আবশ্যক হয় না। আর একটি সুবিধা এই যে, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অনেক পরিমাণে স্থানীয় ও নিকটবর্তী বাজারে থাকে।

এই শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে:—(১) শিল্পগুলি প্রদেশবাসীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার অনুকূল হওয়া দরকার। (২) শিল্পজাত দ্রব্যগুলি যতদূর সম্ভব নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং চারুকলা সম্পন্ন দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। (৩) বাহাতে মহাজনদের নিকট বেশী হারে টাকা ধার করিতে না হয় সেজন্য মূলধন সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার একটি সুচিন্তিত সরকারী পরিকল্পনার প্রয়োজন। নিউ-জিল্যান্ডের 'Poor Bank'-এর অনুকরণে প্রত্যেক মহকুমায় প্রদেশ-সরকারের তত্ত্বাবধানে গ্লি প্রতিষ্ঠান (Credit Bank) স্থাপন করিতে হইবে। উপস্থিত সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বারা চলিবে না। (৪) শিল্পজাত দ্রব্যগুলি সম্ভবপর সমমানের (standardised goods) হওয়া একান্ত আবশ্যক। (৫) গ্রামে ও পল্লীতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রসারণের ব্যবস্থা প্রদেশ-সরকারকে করিতে হইবে। (৬) বিভিন্ন কুটীরশিল্পের উপযোগী আধুনিক ছোট ছোট বৈদ্যুতিক ও হস্ত-পরিচালিত যন্ত্রপাতি প্রদেশ-সরকারকে বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া শিল্পগুলির মধ্যে বন্টনের স্ববন্দোবস্ত করিতে হইবে। (৭) লভ্যাংশের বেশীর ভাগ

বাহাতে উৎপাদনকারীরা পায় তজ্জন্য প্রদেশ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই সমস্ত শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদির বিদেশে রপ্তানী করিয়া সরকার কর্তৃক উচিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা। (৮) আবশ্যক কাঁচামাল বাহাতে নিয়মিত ভাবে ও উচিত-মূল্যে শিল্পগুলি পায় এবং উহা কালোবাজারে কিনিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা; (৯) বিদেশ হইতে প্রদেশের উপযোগী নানা প্রকার কুটীরশিল্পে স্বদক্ষ শিল্পীদের আনা ইয়া একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি মহকুমায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের নানা রকমে কুটীর-শিল্পের শিক্ষা দিতে হইবে। স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু ও কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন্ মহাকুমায় কোন্ কুটীরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে তাহা পূর্বেই স্থির করা আবশ্যক।

সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের দ্বারা ছোট ছোট শিল্প পরিচালনার জন্য একটি সরকারী শিল্পসাহায্য তহবিল স্থাপন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা যে একান্ত আবশ্যক ও খুবই সমীচীন তাহা লেখাই বাহুল্য; কিন্তু এই তহবিলের টাকা কাহারো বন্টন করিবেন ও কাহাদের মধ্যে বন্টিত হইবে তাহার উপরই ইহার উপকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। আশা করি, “হু”—মার্কী সভ্যদের দ্বারা এই টাকা বন্টনের ব্যবস্থা না হয় এবং আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে উহা বন্টিত না হয় সেদিকে ডাঃ রায় নিশ্চয়ই বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নচেৎ উপকারের অপেক্ষা অপকারই বেশী হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ঘড়ি তৈরি শিল্পটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে বলিয়া পূর্বে লিখিয়াছি। ইটালিতে আমি দেখিয়াছি যে, নানা প্রকার লেস (Lace) তৈরি সেখানকার একটি প্রধান কুটীরশিল্প। আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক গ্রামে এই শিল্পটি অনায়াসে গড়িয়া উঠিলে বহু গৃহস্থের আয় বর্ধে বাড়াইতে পারে। অবসর সময়ে বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও অনায়াসে ঐরূপ লেস তৈরি করিতে পারে। তবে ইচ্ছামত নমুনা অনুসারে উহা তৈরি করিলে চলিবে না। যদি সমবায় পদ্ধতিতে স্ত্রী-সরবরাহ করিয়া নির্দিষ্ট মজুরীর হারে, বিদেশে ও প্রদেশে চাহিদা আছে এইরূপ নমুনামত লেস তৈরি করিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বহু লক্ষ টাকার লেস, ফিতা ও ঐরূপ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রদেশবাসীরা লাভবান হইতে পারেন। ইহা ছাড়া চুপট ও নানা প্রকার বোতাম তৈয়ারী, চীন ও জাপানের মত

চিত্রিত চীনা মাটির বাগন ও চারুকলা, চীনা মাটির পুতুল, রুমাল, নানারূপ সিল্কের বস্ত্র, মোজা, গেঞ্জি, জুতার ফিতা, লিথিবার নিব, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি বহুপ্রকারের কুটীরশিল্প বাংলা দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। একথা লেখাই বাহুল্য যে, এই প্রদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বেকার-সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে, প্রদেশ-সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন প্রদেশকে বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। অর্থ কমিশনের নিকট বাংলার বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কুটীরশিল্প প্রসারণের বিশেষ দায়িত্বের বিষয় প্রদেশ-সরকারের জানান উচিত।

পাটকল, সূতাকল, কয়লার খনি ও চা-বাগান পশ্চিম-বঙ্গের চারিটি বৃহত্তর উৎপাদন-শিল্প। এই প্রতিষ্ঠান-গুলিতে বাঙালীর স্থান কোথায় ও উহাদের সরকারী প্রকাশিত সংখ্যা কত তাহা নিয়ে দিতেছি :

শিল্পের নাম মোট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

পাটকল	৮০	৪
সূতাকল	৪৪	৩০
কয়লার খনি	২৫৮	১০৫
চা-বাগান	৩৭২ (অবিভক্ত বাংলা) ৩০৪	

চা-বাগানের সংখ্যাগুলি অবিভক্ত বাংলার। উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে চা-বাগানের সংখ্যা কত তাহা জানা নাই। যদিও উল্লিখিত ৩৭২টি চা-বাগানের মধ্যে ৩০৪টি চা-বাগান বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত তথাপি এই ৩০৪টি বাঙালী পরিচালিত চা-বাগানের জমির পরিমাণ মোট চা-বাগানের জমির পরিমাণের শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বাগানই ছোট ছোট। বাঙালীর পরিচালিত কয়লার খনি ও পাটকলের বাৎসরিক উৎপাদন যদি ধরা যায় তাহা হইলে ইহাদের সংখ্যার অনুপাতের হার বেশী হইলেও উৎপাদনের হার ঐ প্রকারই কম হয়। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, বাঙালী-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলি যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত (Public & Private Ltd. Co.s) তাহার অংশীদারদের মধ্যে কতগুলি বিদেশী ও কতগুলি অপর প্রদেশবাসী আছেন তাহার সংখ্যা ও তাহাদের দেয় শেয়ারের টাকার পরিমাণ জানা নাই। তবে অনুমান হয় ইহাও খুব কম হইবে না। একথা আরও বলা আবশ্যক যে, কয়লার খনি-গুলিতেও বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম।

বহির্বাণিজ্যের উপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

বহুলাংশে নির্ভর করে। কিছুদিন পূর্বে রপ্তানী-বাণিজ্যে বাঙালীর অংশ কতটুকু তাহার মোটামুটি অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। তাহাতে জানা যায় যে, রপ্তানী-বাণিজ্যে গত ১৯৪২ সনে মোট ২৫১'৯৩ কোটি টাকার মধ্যে বাঙালীর অংশ ২'৮৭ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ১'১৪ মাত্র। ইদানীং ইহার পরিমাণ সামান্য কিছু বাড়িতে পারে। কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে ইদানীং কয়েকটি বিশেষ দ্রব্য যাহা রপ্তানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ ও মূল্য নিয়ে দিলাম :

১৯৪৮-৪৯ সনে বাংলা হইতে বিদেশে পাট ও পাট-জাত দ্রব্য ১৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ১৩৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ও ১৯৫০-৫১ সনে ১০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা রপ্তানী করা হয়।

১৯৪৮-৪৯ সনে বাংলা হইতে ৫৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ৬২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও ১৯৫০-৫১ সনে ৬৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার চা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু এই টাকার মধ্যে পাট উৎপাদন-কারীদের অংশ যে খুবই কম তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ ইহার বেশীর ভাগ অংশ রপ্তানীকারী, পাট-কলের অংশীদার ও অপর প্রদেশবাসী পাটের মহাজন ও শ্রমিকদের হাতে চলিয়া যায়। চা শিল্পক্ষেত্রের বেলায় পাট-কলের তায় না হইলেও ঐরূপ কতকটা বলা যাইতে পারে।

উপস্থিত ভারত-সরকার ভিন্ন অপর কেহ বিদেশে কোনরূপ কয়লা রপ্তানী করিতে পারেন না। কলিকাতা বন্দর হইতে গত ১৯৫১ সালে জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত ছয় মাসে ৭,১৩,৮২১ টন কয়লা বিদেশে (পাকিস্থান ছাড়া) রপ্তানী করা হয়। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা অনুসারে ইহার মূল্য ২,১৩,২৪,৪২২ টাকা হয়। ঐ কয়লা মাসে ২,১৫,৭৭০ টাকা মূল্যের ২,৪৬৫ টন হার্ড কোকও বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সমুদ্রপথে, রেল ও নদীপথে পাকিস্থানে মোটামুটি প্রতি মাসে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টন নানা বকমের কয়লা ভারত-সরকার চালান দেন। এই চালানী কয়লার উপর ভারত-সরকার কন্ট্রোল দর অপেক্ষা ১১ টাকা টন প্রতি বেশী পাকিস্থান সরকারের নিকট হইতে আদায় করেন। এই সমস্ত রপ্তানী কয়লার মধ্যে কত টন পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার হিসাব সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে উহা মোট রপ্তানীর এক-তৃতীয়াংশ অনুমান করা যাইতে পারে।

উপস্থিত ভারত-সরকার পাট-শিল্পের তায় বিদেশে রপ্তানী কয়লার উপর প্রতি টনে নিম্নলিখিত হারে

‘সারচার্জ’ আদায় করিতেছেন। ইহার পরিমাণ বাৎসরিক কয়েক কোটি টাকা হইবে।

রপ্তানী কয়লার উপর ‘সারচার্জ’-এর হার প্রতি টনে :

অষ্ট্রেলিয়া	১৮
ব্রহ্মদেশ	৫৮
সিংহল	...
নিউজিল্যান্ড	২৮০
জাপান	২৮

মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ-পূর্ব বন্দরসমূহ

(ব্যাঙ্কক, সাইগণ প্রভৃতি), এডেন, পোর্ট সুদান,

পূর্ব-আফ্রিকার বন্দরসমূহ, ভূমধ্যসাগরের বন্দর-

সমূহ, গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড...

উত্তর-ইউরোপীয় ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বন্দর-

সমূহ

একথা সকলেই জানেন যে, কয়লা প্রদেশের ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, কারণ কয়লা কাটিয়া লইলে আর পূরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি রপ্তানী কয়লার আদায়ী ‘সারচার্জ’ এবং পাকিস্থানে চালানী কয়লার উপর লভ্যের অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি করেন তাহা হইলে উহা খুবই ত্রাসজনক হইবে। আমি যতদূর জানি পশ্চিম-বঙ্গ সরকার অর্থ কমিশনের নিকট এরূপ কোন দাবি আজ পর্যন্ত পেশ করেন নাই।

নিষ্কৃতি

সমারসেট মম

অম্ববাদক—শ্রীসব্যাসাচী রায়

আমার অনেক দিনকার বিখ্যাত যে, কোম ভদ্রমহিলা যখন কোন পুরুষকে বিবাহ করতে মনস্থ করেন, তখন তিলার্জ সময় নষ্ট না করে পলারন করা ছাড়া পুরুষের রক্ষা পাবার উপায় নেই। কিন্তু না, এই পছাও সব সময়ে চল দেয় না। আমার এক বন্ধুকে জানি যায় যখন হ'ল হয়েছিল যে বিবাহরূপ অবস্তাবাবী সর্বনাশ সমুপস্থিত, তখন শুধু একটি টুথব্রাশ মাত্র সঙ্গে নিয়ে সেই মুহূর্তে সে নিকটতম বন্দর থেকে জাহাজের একটি টিকিট কেটে সরে পড়েছিল। তার পর বৎসরখানেক নানা দেশে ঘুরে বেড়ানোর পর সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করল; কারণ সে ভেবেছিল জীজাতির মধ্যে একনিষ্ঠতার অতীব আবেশ এবং এক বছরের মধ্যে ভদ্র-মহিলাটি নিশ্চয়ই তাঁকে একেবারে ভুলে যাবেন। কিন্তু জাহাজ থেকে সেই পুরাতন বন্দরে নামতেই যিনি সর্বপ্রথম সোৎসাহে ক্রমাল নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি সেই জুজুদেহা মহিলাটি ছাড়া আর কেউ নন, যার কাছ থেকেই আমার বহুটি পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি শুধু এক জনের কথাই জানি যে এরকম অবস্থায় পড়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল। তার নাম রজার চেয়ারিং। রূথ বারলোর সঙ্গে যখন সে প্রেমে পড়েছিল, তখন তার যৌবন অনেক দিন হ'ল অভিজ্ঞ হইয়াছে; তা ছাড়া তার আগে সে বধেই অভিজ্ঞতাও সঞ্চর করেছিল, যাতে তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রূথ বারলোর এমন একটি অঙ্গ ছিল (অথবা এটিকে অঙ্গ আখ্যা না দিয়ে কমতা বলব কি?) যার দ্বারা যাবতীয় পুরুষ মানুষই আশ্রয়কার অসমর্থ হয়ে পড়তেন। এইজন্যই রজারও তার

বিচারবুদ্ধি, সাবধানতা এবং জাগতিক অভিজ্ঞতা সব বিমূর্ত হয়েছিল।

রূথ বারলোর এই অঙ্গটি ছিল অপরের মনে করুণা উদ্ভেকের ক্ষমতা। শ্রীমতী বারলো হ'বার বিবাহ করেছিলেন এবং হ'বারই বিবাহ হয়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটি ছিল গভীর, ভাসাভাসা এবং করুণ—যেন এই মুহূর্তেই তার থেকে চল উপচে পড়বে। তাঁর চোখ দেখে মনে হ'ত যেন সংসার তাঁর পক্ষে একান্ত হুর্কিসহ। তাঁর চোখের পানে থাকিয়ে আপনার মনে হ'ত: এই ভাবের উদয় হ'ত—আহা, বেচারীর হুঃখট ওর সত্বের সীমা অতিক্রম করে গেছে। আপনি যদি রজার চেয়ারিং-এর মত সন্তুসমর্থ, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ও তাঁর মত প্রচুর বিশ্বাস হওন, তা হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে আপনার মনে এই ইচ্ছা হ'ত—জগতের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে ঐ অসহায়াকে আপনি আড়াল করে রাখেন। ঐ বড় বড় করুণ চোখ দুটি থেকে হুঃখের সমস্ত কালিমা মুছে ফেলতে পারলে, আঃ, কি মহৎ কাজই না করা হয়। রজারের কথাবার্তা থেকে যা বুঝলাম, তাতে মনে হ'ত শ্রীমতী বারলোর সঙ্গে পৃথিবীর কেউই ভাল ব্যবহার করে নি। তিনি নাকি সেই রকম হতভাগিনীদের অস্তম্ভা যারা যখনই যেদিকে চান, সাগর শুকায়ে যায়। বিবাহের পর তাঁর স্বামী তাঁকে মারধোর করত; শেয়ার-বাজারে যে দালালকে দিয়ে তিনি কাজকারবার করতেন, সে নির্ধাত তাঁকে ঠকাত। ঠাকুর চাকর যাদেরই তিনি রাখতেন, টের পাওয়া যেত যে, তারা পাঁচ মাতাল। যে কুহরজানাকেই তিনি পুষতেন সেটি হ'দিন বাদেই মারা যেত।

রাজার যেদিন আমাকে জানাল যে, অবশেষে সে শ্রীমতী বারলোকে বিবাহপ্রস্তাবে রাজী করাতে পেরেছে সেদিন আমি তাকে অভিনন্দন জানালাম—“আশা করি তোমাদের মধ্যে বেশ ভাবসাব হবে।”

সে বললে, “জান তো ও তোমাকে খানিকটা ভয় করে, ও মনে করে তোমার মধ্যে দয়ামাত্রা বিশেষ নেই।”

“আমার সম্পর্কে তাঁর এরকম ধারণা হবার হেতু?”

“তুমি ওকে পছন্দ কর তো?”

“নিশ্চয়ই, খুব পছন্দ করি।”

“আহা, বেচারীর জীবন বড়ই দুঃখে কেটেছে। আমার এত মায়ী হয়, ওর জন্ম।”

“তা ত বটেই।” আমি বললাম।—এ ছাড়া আর কি বলব? আমি জানতাম যে শ্রীমতী বারলো একটি বুদ্ধিহীনা অগচ্ছন্দীকৃত্ত জীলোক। আমার আরও ধারণা হয়েছিল যে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি সর্বদা দুঃসঙ্গ।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের কথা মনে আছে।

আমরা সবাই ব্রিঙ্ক খেলছিলাম। তিনি আমার ‘পার্টনার’ হয়েছিলেন। আমার সমস্ত ভাল ভাল হাতগুলি তিনি আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে বার বার মাটি করেছিলেন। আমি অবশ্য সাক্ষাৎ দেবদূতের মত ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু কারুর চোখে যদি জল ভরে উঠবার কারণ হয়ে থাকে তো সে আমারই, রূপ বারলোর নয়। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার কাছে অনেকগুলি টাকা ছেদে পরে একটি চেক পাঠিয়ে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনদিনই আর তা পাঠালেন না। অগচ্ছন্দ পেরে স্বধনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। স্বধনই কেন যে তাঁর চোখে ওরকম আহত অভিমানের ভাব উৎপাদন করেছে—যেন আমিই তাঁর প্রতি নিদারুণ দুর্ব্যবহার করেছি—তা আমার মাথায় কোনদিনই ঢোকে নি।

রাজার শ্রীমতীর সঙ্গে নিজের বহুবাহুরের পরিচয় করিয়ে দিলে। তাঁকে অলঙ্কারাদি উপহার দিতে লাগল। তাঁকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়িয়ে বেড়ানোও শুরু করল। অদূর ভবিষ্যতেই তাদের বিবাহ হবে একথা বিজ্ঞাপিতও হয়ে গেল। রাজার নিজেকে খুব সুখী বোধ করছিল। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে একটা খুব ভাল কাজই করতে যাচ্ছে এবং সেটা সম্পূর্ণ নিজের ভাগিদেই। এ রকম অবস্থায় সে যে ঘৃণিত আশিক্যে মাঝে মাঝে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি করে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

তার পর হঠাৎ এক দিন তার টনক মড়ল। জানি না কি করে এবং কেন। শ্রীমতী রুধের প্রেম-ভূজম যে তাঁর কাছে পুরোনো হয়ে গিয়েছিল তা মনে হয় না। কারণ শ্রীমতী রুধ কোন দিনই বিশেষ কথাবার্তা কইতেন না। হয় ত তাঁর

চোখের করুণ চাউনি আর রাজারের হৃদয়ে ভেদম মৌচক্কে দিতে পারছিল না। রাজার চোখ খুললো এবং তার স্বাভাবিক বিচক্ষণতা ও সাংসারিক বুদ্ধি আবার ফিরে এল। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, শ্রীমতী রুধই তাকে গৈঁথে ভোলবার মতলব করেছেন। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সেও প্রতিজ্ঞা করল যেমন করেই হোক সে কিছুতেই এটা ঘটতে দেবে না।

কিন্তু কি করা যায়? ব্যাপারটা গভীরে গেছে অনেক দূর। এখন সে সাদা চোখে ভাল করেই বুঝতে পারল কোন বাতুলে গড়া জীলোকের সঙ্গে তাকে বোঝাপড়া করতে হবে। যদি সে সোজাসুজি ছাড়ান পাবার প্রস্তাব করে তা হলে রূপ নিঃসন্দেহে, তাঁর হৃদয়স্পর্শী করুণ চাহনির দ্বারা বেশ মোটা টাকা তাঁর মনোবেদনার সাত্ত্বনা হিসাবে আদায় করবেন। তা ছাড়া কোন ভদ্রমহিলাকে এভাবে পরিত্যাগ করা বড়ই অশোভন। সমাজে বদনাম হয়।

রাজার নিজের মনের কথা মনেই চেপে রাখল। ভাবে কিংবা ভাষায় কোন রকমেই সে ঘৃণাকরেও প্রকাশ হতে দিল না যে, রূপ বারলোর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। রুধের মনোরঞ্জনের দিকে সে সমান মনোযোগী হয়ে রইল। তাকে নিয়ে সে আগের মতই খেলাধুলা, সিনেমায় যাওয়া, ডিনার খাওয়া ইত্যাদি করতে থাকল। নিরামিত সে তাকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে যায় এবং সর্বদাই সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহার করে। কথা ছিল যে, সুবিধামত একটা বাড়ী পেলেই তারা বিয়েটা সেয়ে ফেলবে। এখন তারা দু’জনে মিলে বাড়ী খুঁজতে লেগে গেল। বাড়ীর এক্কেটরা অনেক বাড়ীরই ধর দিলে এবং রাজার রূপকে নিয়ে সেগুলি দেখে বেড়াতে লাগল। মনের মত একটা বাড়ী পাওয়া সত্যিই বড় দুশকিল। রাজার আরও এক্কেটদের কাছে লিখল। বাড়ীর পর বাড়ী তারা দেখে যেতে লাগল। বেশ ভাল করেই তারা দেখল—কয়লা রাখার কুঠরি থেকে শুরু করে চিলেকোঠার ঘর পর্যন্ত তারা খুঁটেরে খুঁটেরে প্রত্যেকটি বাড়ী দেখল। বাড়ীগুলি হয় বেশী বড়, নয় খুবই ছোট মনে হয়—ঠিক পছন্দমত আর পাওয়াই যায় না। কখনও বা বাজার-হাট অভ্যস্ত ঘুরে পড়ে, কখনও বা একেবারে বাজারের প্রায় মধ্যেই বাড়ী পাওয়া যায়। হটোর কোনটাই সুবিধের ঠেকে না। কখনও দেখা যায় ভাড়া বড় বেশী পড়ছে, কখনও বা ভাড়া সস্তা হলেও দেখা যায় বাড়ীটি বেজার ভাড়া-চোরা। কোন বাড়ীটাকে বড় বেশী চাপা মনে হয়, কোনটাকে বা মনে হয় যেন তেপান্তরের মাঠে ঠাঁড়িয়ে আছে। কোনটার বড় বেশী অলঙ্কার, কোনটা বড় বেশী ঠাণ্ডা। প্রত্যেক বাড়ী থেকেই রাজার কোন না কোন খুঁত বার করবেই। রাজারকে পুণী করা ছিল নজর, অথচ তার কারণও ছিল। তাঁর প্রাণের

রুধকে ত সে একটা ঘা-ভা বাড়ীতে রাখতে পারে না। মনের মত ও সর্বোত্তম বাড়ীটি তার চাই-ই। অথচ সে রকম বাড়ী খুঁজে পাওয়া সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। বাড়ী খোঁজা একটা জ্ঞান-হয়রানকারী কাজ এবং শেষ পর্যন্ত রুধ খিটখিটে হয়ে পড়লেন। রজার তাকে আর একটু বৈধা ধরে থাকতে অহরোধ করল। ঠিক তাদের মনের মত, প্রয়োজনমত বাড়ীটি নিশ্চয়ই কোথাও আশেপাশেই লুকিয়ে আছে; আর একটু অধ্যবসায়, আর একটু অপেক্ষা, তা হলেই নিশ্চয় তারা সেটি খুঁজে পাবে। শত শত বাড়ী এই ভাবে তারা দেখে বেড়াল, হাজার হাজার সিঁড়ি তারা ভাদল, অসংখ্য রাস্তাঘর, ভাঁড়ারঘর তারা পর্যা-বেক্ষণ করল। ক্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে রুধ শেষকালে এক দিন রজারকে বললেন, “দেখ, তুমি যদি শিশুর একটা বাড়ী না ঠিক কর, আমাদের সমস্ত অবস্থাটা তা হলে আর একবার ভেবে দেখতে হবে। এ কি, এর রকম ভাবে চললে ত আমাদের কোন দিন বিহেই হবে না।”

“আহা, ও কথা বলো না,” রজার উত্তর দিলে, “আর একটু বৈধা ধর, প্রীজ। দেখ না, এইমাত্র এজেন্টদের কাছ থেকে আর একটা ফিরিস্তি পেয়েছি—অন্ততঃ পোটাঘাটের বাড়ীর খবর আছে এতে। এর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই—”

আবার শুরু হ’ল খোঁজাখুঁজি। বাড়ীর পর বাড়ী, আবার বাড়ী। হ’বছর এইভাবে কাটল। রুধ নির্ঝাঁক ও বীভতান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের সেই করুণ চাউনি গেল বদলে, সেখানে মিরুদু আকোশের ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। মাস্থের সস্থের সীমা আছে। ত্রীমতী বারলো অসীম বৈধার অধিকারিণী ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরও বৈধার বাঁধ ভাঙল।

“রজার, স্পষ্ট করে বল ত আমাদের বিয়ে করবার তোমার সত্যি কোন মতলব আছে কিনা?”—ওরকম শাণিত কণ্ঠস্বর বারলোর গলা দিয়ে এর আগে কখনও বেরোয় নি। রজারের মূহুর, শান্ত, উত্তাপহীন স্বরের কিন্তু লেশমাত্র ব্যতিক্রম দেখা

গেল না, বললে—“নিশ্চয়ই আছে, কি বলছ তুমি। যে যুহুর্ভে একটা মনের মত বাড়ী পাব সেই যুহুর্ভেই আমরা বিয়ে করব। ভাল কথা, এইমাত্র আর একটা বাড়ীর সন্ধান পেয়েছি, মনে হচ্ছে এটা বোধ হয় যেমনট চাই তেমনটি হবে।”

“আমার মরীর ভাল মেই। এইমাত্র আবার একটা বাড়ী দেখতে ছোটবার আমার আর ক্ষমতা মেই।”

“আহা, সত্যি তোমাকে বড় ক্রান্ত দেখাচ্ছে। তোমার উপর দিয়ে কি কম গেছে।”

রুধ বারলো শয্যা গ্রহণ করলেন। রজারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। রজারকে প্রত্যহ বাইরে থেকেই শুভাবধান করে ও ফুল পাট্টিরে সজ্জা থাকতে হ’ল। অবশ্য তাতে সে বিন্দুমাত্র গাফিলতি করল না। রোজ রুধকে চিঠি লিখে জানাতে লাগল কখন, কোথায়, কি রকম বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তাহখানেক পরে সে এই চিঠিটি পেল :

রজার,
আমার বিশ্বাস তুমি আমাদের সত্যি সত্যি মোটেই ভাল-বাস না। আমি একজনকে পেয়েছি যিনি আমার সমস্ত ভার নেবার জন্য বিশেষ উদ্ভাব। তাঁকেই আজ আমি বিয়ে করছি।

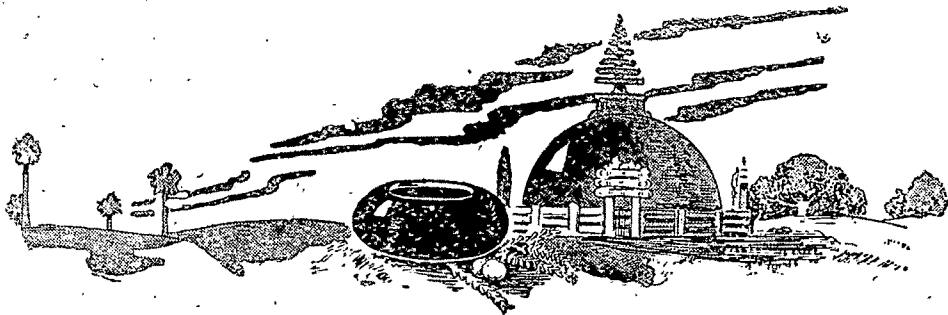
রুধ

বিশেষ লোক মারকত রজার অবিলম্বে জবাব পাঠাল :
রুধ,

তোমার চিঠি আমাদের চরমার করে দিয়েছে। এ আদাত আমি কোন দিনই কাটিয়ে উঠতে পারব না, কিন্তু তোমার সুখই আমার প্রথম ও প্রধান চিন্তা। এই সঙ্গে সাতখানি বাড়ীর ঠিকানা পাঠাচ্ছি। আজকের সকালের তাকেই এগুলি এসেছে। আমার মনে হয় এর মধ্যে একটিকে অন্ততঃ তোমার পছন্দ হবেই। ইতি

হস্তভাণ্ডা

রজার



পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচারী বাসকালে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মাতা মুণালিনী সঘন্থে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিব। মাতা মুণালিনী সঘন্থে আমি সকল তথ্য অবগত হই বর্ধমানের সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকার সময়ে। বাবা ষতীনের মুখেই শুনি মাতা মুণালিনীর কথা। ভূপালবাবু তখন তাঁহাকে স্বীয় গুরু মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মুক্তানন্দ স্বামীর নিকট মাতা মুণালিনী এই সময় যোগশিক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী ডিক্রগড়ে থাকিতেন। ১৯০৭ সনে শ্রীঅরবিন্দ যে তিনটি “পাগলামি”র কথা মাতা মুণালিনীকে জানাইয়াছিলেন, স্বামী নিকটস্থ হওয়ায় সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তই তিনি ডিক্রগড়ে যোগশিক্ষায় নিরতা হইয়াছিলেন। পরে তিনি বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতা মুণালিনীকে তাঁহার পাগলামির কথা শুনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ হইতে হয় বলিয়া পত্নীকে তদন্তার্থী প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। আমিই সর্বপ্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত মাতা মুণালিনীকে প্রস্তুত করিয়া লইতে বলি। শ্রীঅরবিন্দ তদন্তের বলেন, যদি তাঁহার পত্নী তাঁহার লিখিত তিনটি প্রসিদ্ধ পাগলামির লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে পারেন, তবে পণ্ডিচারীতে আসিয়া মুণালিনী দেবীর পক্ষে বাস করা দুঃসাধ্য হইবে না। আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রমুখ্যৎ এই কথা পণ্ডিচারী হইতে শুনিয়া আসিয়া মাতা মুণালিনীর ভ্রাতা শ্রীশিশিরকুমার বস্তু সহিত সাক্ষাৎ করি। শিশিরবাবুর মুখে মাতা মুণালিনী সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পণ্ডিচারী যাইতে সম্মত হন। কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তাঁহাকে পণ্ডিচারী প্রেরণ করার সকল আয়োজন যখন শেষ হইয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণ-বিয়োগের কথা শ্রবণ করি। এই সংবাদ শ্রীঅরবিন্দের নিকট পৌঁছিলে, তিনি আত্মনন্দ করিয়া উঠেন। তাঁহার হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাসে অন্তরের বেদনাই নিঃসারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ দেবী মুণালিনীকে ধর্ম-সঙ্গিনীরূপে পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। মাতা মুণালিনীরও শূন্য-হৃদয় ভরিয়া দিবার অপেক্ষা সহিল না, অকালেই তিনি চির-প্রস্থান করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অপাঠ্য যোগশক্তিবলে সারা

বিশ্বের মানব-চরিত্রের পরিবর্তন আনিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙালী জাতি এবং ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার স্বপ্নভূমির কেন্দ্র। তিনি যোগশক্তির সাহায্যে বিশ্ববাসীকে অসাধারণ চরিত্রে উন্নীত করিয়া জগতে এক দিব্যজাতি-গঠনের ইচ্ছা (Will) করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমার লিখিলেন—

“The attempt to apply knowledge and power to the events and happenings of the world without the necessary instrumentality of physical action. What I am attempting is to establish the normal working of the *shiddhis* in life.”

অর্থাৎ, জ্ঞান এবং শক্তি জগতের সর্ববিধ ঘটনায় প্রয়োগ করিয়া, প্রয়োজনীয় দৈহিক সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীতে কার্য্য করিবার প্রয়াসই আমি করিতেছি। যৌগিক সিদ্ধিগুলিকে জীবনে সহজভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিতেই আমি উত্তত।

বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য আরও লিখিলেন—

“... that is, the perception of thoughts, feelings and happenings of other beings and in other places throughout the world without any use of information by speech or any other data.”

অর্থাৎ, বাক্যে অথবা বাহিরের অন্য কোন প্রকার তথ্যের উপর ভিত্তি না করিয়া সারা বিশ্বের অপর সকল মানুষের এবং স্থানের চিন্তা, সংবেগ ও ঘটনার অল্পভূতি লাভ।

দ্বিতীয়তঃ—

“The communication of the ideas and feelings ... To others (individuals, groups, nations) by mere Transmission of will power.”

অর্থাৎ, কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই অপরের নিকট (ব্যক্তি, সমষ্টি, অথবা জাতির) ভাব ও অল্পভূতি জ্ঞাপন।

তৃতীয়তঃ—

“The silent compulsion on them to act according to these communicated ideas and feelings.”

অর্থাৎ, অতঃপর এই সমস্ত সঞ্চারিত ভাব ও অল্পভূতি অল্পভূতি কর্তৃক করিবার জন্য নীরবতার মধ্য দিয়াই তাহা-দিগকে প্রভাবান্বিত করা।

চতুর্থতঃ—

“... the determination of events, actions and

results of actions throughout the world by pure silent will power."

অর্থাৎ, এমন কি তিনি চাহেন জগতের সকল ঘটনা, সকল কর্ম এবং সকল কর্মফলও নিছক নীরব ইচ্ছা বা যোগশক্তির প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

তিনি এই সকল কথা ধারাবাহিকভাবে আমায় লিখিতেন। ১ম, ২য় এবং ৩য় পর্যায়ের কর্মগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে গুছাইয়া লইতে না পারিলেও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র চতুর্থ পর্যায়ের বিষয়টি সংস্কৃত করিতে তিনি অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন; ইহা জানাইয়া লিখিলেন, যখন পূর্ণ সাফল্য আসিবে, আমি মনে করিব—

"I have got rid of the past *karman* in myself and others."

—আমি নিজেও যেমন প্রাক্তন কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি, তেমনি অপরকেও মুক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছি।

তিনি কোন দিকে যাত্রা শুরু করিয়াছেন, তাঁহার পত্র হইতে অনুভব করিলাম। তিনি অতঃপর যোগশক্তি প্রয়োগেই বিশ্বের যাহা সং, যাহা হিত, তাহাই সিদ্ধ করিবেন, বুঝিলাম। যৌগিক ক্রিয়াকর্মের উপরও তাঁহার আস্থা কতখানি ছিল তাহাও তাঁহার পত্র হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিলেন—

"তুমি যে তান্ত্রিক সাধনা করিতেছ, তাহা দুঃসাহসিক কর্ম, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে এবং ক্রমশঃ তোমার কর্মে উন্নতি দেখিতেছি, তবুও সর্বপ্রথমে মনে রাখিও প্রত্যেক কর্মের সাধারণ লক্ষ্য হইতেছে মুক্তি এবং ভুক্তি "which Tantrics in all ages have pursued" অর্থাৎ—ইহাই হইতেছে সাধকদের চিরন্তন রীতি। কিন্তু বিশেষ অবস্থা এবং কালের জন্ত আমাদের কর্ম করিতে হইবে। যে কর্মের জন্ত big Kriyas or numerous Kriyas are not always necessary—সর্বদা বৃহৎ অথবা বহু ক্রিয়া এইজন্ত প্রয়োজন হয় না। অতীতে যেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে কর্মগুলিকে কার্য্যকরী করিয়াছ সেইরূপ কর্ম সর্বদা বাঞ্ছনীয়।

তোমার কর্মসাফল্য নির্ভর করে দুইটি জিমিষের উপর : Mantra & Tantra. Mantra the mental part, and Tantra the practical part. এই কর্মের যে তাত্ত্বিক উদ্ভেদনা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মনে রাখিও, সর্বদা Angarakshan is as important as Siddhis. হুঃখের বিষয় কলিযুগের তান্ত্রিকেরা সিদ্ধির মোহে অন্ধরূপে বিষয়ে অতিশয় উদাসীন। তাহারা সিদ্ধির দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়া Devils & Bhutas অর্থাৎ

—ভূত ও প্রেতেরই শিকারে আসে। অন্ধরূপে প্রয়োজন, প্রথমতঃ, যোগোপকৃত সিদ্ধি মন্ত্র এবং সিদ্ধ ক্রিয়ার সংযোগ। দ্বিতীয়তঃ, সর্বদা রাক্ষসদের কবলে না পড়িতে হয়, এইজন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা। আমি এই সকল কথা তোমাকে বলিতেছি এইজন্ত যে, যাহাতে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত না হও। মন্ত্র যতক্ষণ অন্তরের বস্ত্র না হয় ততক্ষণ কর্মে বিরত হইয়া যৌন থাকাই ভাল। বেদ এবং তন্ত্র দুই স্বতন্ত্র বস্ত্র। বেদান্তের প্রচার এবং প্রসারতা তুমি নিষ্কিন্বাদেই করিতে পার; কিন্তু তন্ত্র সহজে সাধকের গোপনীয়তা প্রয়োজনীয়।"

তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া উদ্ভিগ্ন হইলাম। তিনি যে তান্ত্রিক ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন, তাহা বৈপ্রতিক কর্ম। বেদান্তের সাধনায় তিনি স্বয়ং যে স্থানে উঠিয়াছেন; আমাকেও সেই স্থানে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম আমার বিপ্লবী বন্ধুদের নিকট গোপন রাখিয়া আমি তন্ত্রোক্ত কর্মেই সহযাত্রীদের সহিত আগাইয়া চলিলাম। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বিপ্লব-কর্ম হইতে আমি যাহাতে নিরস্ত হই, সেই দিকেই আমায় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় মসিয়ে পল রিশার মাদাম রিশারের সহিত জাপান যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিলে "আর্য্য" পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আর্য্য পত্রিকার মধ্য দিয়াই বেদ উপনিষদের মূলতত্ত্ব ও ভারতের সাধন-বিজ্ঞান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রচার করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্য-সাধন কি ভাবে করিবেন, তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিলেন :

"In this review, my new theory of the Veda will appear, as also translation and explanation of the Upanisadas, a series of essays giving my system of Yoga, and a book of Vedantic philosophy (not Shankara's but Vedic Vedanta) giving the Upanisadic foundations of my theory of the ideal life towards which humanity must move."

অর্থাৎ, এই পত্রিকায় বেদ সম্বন্ধে আমার নূতন মত, উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, আমার পদ্ধতি অনুযায়ী যোগের ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও বৈদান্তিক দার্শনিকতা প্রকাশ করিব। (শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ নহে), বৈদিক বেদান্তই এই কাগজে প্রচারিত হইবে। উপনিষদের ভিত্তিতে আমার এই আদর্শের পথেই মানবজাতি অবধারিত চলিবে। তিনি আরও বলিলেন—

"It will be the intellectual sides of my work for the world."

ইহাই জগতের জগৎ আমার জ্ঞানমূলক কর্মের দিক।

আর্য্য পত্রিকা প্রকাশের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে আমায় লিখিলেন। আমি সাধ্যমত কিছু অর্থ তাঁহাকে

প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ চিরদিনই অর্থের দিক দেখিয়া চলিতেন। তাই আবার লিখিলেন—

"We shall have a sound financial foundation to start with."

পত্রিকাখানি তিনি ইংরেজী ভাষায় ১০০০ হাজার কপি এবং ফরাসী ভাষায় ৫০০ কপি প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। তাহার হিসাব মত বার্ষিক ৬ টাকা হারে ফরাসী ও ইংরেজী সংস্করণ মিলিয়া অন্ততঃ ৪০০ কপি সংগ্রাহক যদি স্থির হয় তাহা হইলে ২৪০০ শত টাকায় কাগজ বাহির করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে। এই অবস্থায় আমি কত গ্রাহক করিতে পারি, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি দুই শত কপি আর্থ্য বাংলাদেশে বাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব, জানাইলাম। তদুত্তরে তিনি পুনরায় লিখিলেন—

"As to the review, I do not think we can dispense with the 200 subscribers whom you promise. The difficulty only is that, if there are political suspects amongst them, it will give the police a handle for connecting politics and the review and their frightening the public."

অর্থাৎ, তুমি পত্রিকার জন্য যে ২০০ জন গ্রাহক করিতে চাহিতেছ, তাহা আমি নাকচ করিতে চাহি না। মুশকিল এই যে, তাহাদের মধ্যে যদি সন্দেহভাজন রাজনৈতিক থাকে, তাহা হইলে পুলিশ এই পত্রিকার সহিত রাজনীতিকে জড়াইয়া সর্বসাধারণের মধ্যে পত্রিকা সঞ্চক্ষে ভীতি-সঞ্চার করিবে।

"There should be no entanglement of this review in Indian politics or a false association created by the police, finding it in the house of some political suspects they search."

অর্থাৎ, ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সহিত এই পত্রিকার কোন সংশ্লিষ্ট না থাকে, অথবা পুলিশ এরূপ মিথ্যা সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি না করে, ইহা বাঞ্ছনীয়। সন্দেহভাজন রাজনৈতিকদের গৃহে খানাতল্লাস করিয়া এই পত্রিকা পাওয়া গেলে এইরূপ সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি করা সম্ভব।

'আর্থ্য' সম্বন্ধে আমায় এত সতর্ক করিতেন এইজন্য যে, আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে যখন মিশিতাম, তখন তাহার কথাই প্রচার করিতাম। তৎকালে তাহার লিখিত, "Yoga and its objects" এবং 'বৌদ্ধিক সাধন' আদালতে বিপ্লবীদের বিচারকালে বহু সময় উপস্থিত করা হইত। শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণের মন্ত্র এই যুগে আমি বিপ্লবীদের মধ্যেই প্রচার করিতাম। আমি যে ২০০ কপি আর্থ্য প্রচারের ভার লইব বলিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হইবে, ইহা বুঝিয়াই

তিনি আরও লিখিলেন, "রাজনীতি এবং পত্রিকা একসঙ্গে থাকিলে জনসাধারণ ভয় পাইবে।" তিনি এই কথা বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আরও লিখিলেন, "তুমি যে গ্রাহক সংগ্রহ করিবে, তাহারা যেন mainly interested in Yoga—তাহারা যেন কেবলমাত্র যোগেরই অন্বেষণী হয়। রাষ্ট্রচিন্তা তাহারা যেন পরিত্যাগ করে। তাহারা যেন পুলিশের ফাঁদে পড় না দেয়।

God save us from all mysteries except those of Tantric Yoga.

পূর্বেই বলিয়াছি, মসিয়ে পল রিশারের সহিত সম্মিলিত হওয়ার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলার বিপ্লববাদীদের সঙ্গে একপ্রকার সকল সঞ্চক্ষে পরিণত হইয়াছিলেন। আমাকেও তিনি বিপ্লববাদ হইতে অপস্থত করিতে চাহিলেন। আমার প্রতি তাঁর এই অন্বেষণের কারণ, সেই যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে লইয়া সাধনার নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছি সেই স্থিতি মুছিতে পারেন নাই বলিয়া। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার অপেক্ষা শত সহস্র গুণের মানুষ বাছিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু সীমাহীন অন্বেষণের বশেই তিনি আমাকে টানিয়া রাখিলেন। বিপ্লববাদ হইতে কেন তিনি আমায় সরিয়া আসিতে দাবি করেন, তাহা যুক্তি দ্বারা তিনি প্রদর্শন করিলেন। এদিকে কিন্তু রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লী হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশ তলে তলে সেদিন বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় মুখরিত। এই অবস্থায় ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইলে, বাহাদের শ্রীঅরবিন্দের নামে এই কর্ণে উদ্ভুদ্ধ করিয়াছি, তাহাদের কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলিব, এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব সেদিন কি ভীষণ ভাবেই আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাহার সঙ্কল্পে অবিচলিত। তিনি তাহার কর্মপন্থাকে দুই ভাগে ছকিয়া লইয়াছেন। একটি আর্থ্য পত্রিকার মধ্য দিয়া তাহার মিশন প্রচার; আর একটি তাঁর ভাষায়—

"The second part of my work is the practical, consisting in the practice of yoga, by an ever increasing number of young men all over Country."

এইজ্ঞা তিনি পুরাতন তন্ত্রের প্রবাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন—

"Do not let any add to it by associating Vedanta and Tantra together in an inexpressible fashion."

অর্থাৎ, বেদান্ত ও তন্ত্রকে যেন দুর্বোধ্য ভাবে একত্র জড়াইয়া ফেলা না হয়। তিনি আরও বলিলেন, তাত্ত্বিক কর্ণের ক্ষেত্র অতি অপ্রশস্ত; কিন্তু বেদান্ত এমন

এক বস্তু, যাহার ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত এবং সকল প্রকার মানুষই বহু ধারায় ইহা প্রকাশ করিতে পারিবে। স্বরণ রাখিও তত্ত্ব বেদান্তের মত নহে। তত্ত্বের দ্বারা বস্তুতাত্ত্বিক জয়লাভ হয়। যদিও বর্তমানে ইহা ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত না হইয়া বাহ্যতে মানবজাতিই যোগলাভের সুযোগ পায়, তদনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে, তবুও আমার প্রশ্ন—এই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কৰ্ম করিলে তুমি কি মনে কর আমাদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? আমার মনে হয়, ইহা সম্ভব নহে। কারণ প্রথমতঃ, পুরাতন তত্ত্ববাদ বিক্ষিপ্তভাবে ক্রিয়াশীল হওয়ায় মানুষ-জাতির উদ্দেশ্যসাধনে আর সহায় হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নূতন তত্ত্ববাদ গোড়ায় বিস্তৃত ভাবে আরম্ভ হইয়া কতকটা কৃতকার্য হইলেও, পুরাতন অহঙ্কারের জের ইহার গতিকে ক্ষুদ্র করিতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া ইহার বিকৃতি ঘটিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর বহু কৰ্মসিদ্ধির আশা একেবারেই ব্যাহত হইতেছে। অতএব আমাদের কার্য এখন এক নূতন পর্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পর্যায়ে আমাদের প্রয়োজন—অতঃপর পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এমন ভাবে প্রস্তুত হওয়া যাহাতে কৰ্ম ভাগবত শক্তির উপর অন্ধ নির্ভরতায় হাতড়াইয়া না চলিয়া পূর্ণ চেতনার সহিত অগ্রসর হয়। অতঃপর কৰ্ম হইবে ব্যর্থতা অথবা ভুলভ্রান্তিমুক্ত হইয়া নিছক ভাগবত প্রেরণারই প্রকাশ।

“... with the full divine power working out its will conserved in its instrument.”

কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সিদ্ধ হইবে? ইহার জন্য চাই ভারতবর্ষে অন্ততঃ এমন একজন মানুষ, যাহার ভিতর দিয়া ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে। আমি দেখিতেছি আমার মধ্যেই এই শক্তি পূর্ণ সংবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে; অথচ এই গতির সংবেগ নির্ভর করিতেছে কতকটা আমার শরীর-মনের অশুদ্ধতা দূরীকরণের উপর এবং কতকটা আমার বন্ধুবর্গ ও উত্তর-সাধকদের দোষ-ত্রুটিগুলির বিস্তৃতা সম্পাদনের উপর। আমাকে অধ্যাত্ম-ভাবে এই সকলই বহন করিতে হইতেছে। ফলে আমার দ্রুত উন্নতিও ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং বর্তমান পর্যায়ে সিদ্ধ হইবার জন্য অন্ততঃ কিছু সময় আমার প্রয়োজন। ইহা সিদ্ধ হইলে বাকীগুলি অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। অন্যথায় যে বীজ লইয়া আমরা যোগপথে অগ্রসর হইতেছি তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইবে, অথবা খুব সামান্যই ফলপ্রসূ হইবে। এইজন্যই আমি যে তোমাকে বিপ্লবের কৰ্ম

হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছি, তাহার প্রথম কারণ ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে—

That is the first reason why I call you a *Halt!*

ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণবশতঃ আমি বিপ্লবের কৰ্ম থামাইতে চাহিতেছি। তাহা হইতেছে—

“Others should receive the same power and light. In the measure that mine grows, theirs also will increase in power provided always they do not separate themselves from me by the *ahankar*.”

অর্থাৎ, আমি চাহি আমার মতই শক্তি এবং আলো সকলে লাভ করুক। আমার মধ্যে শক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, যদি তাহার অহঙ্কারবশতঃ আমি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও তদনুরূপ শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন শক্তিশালী সংহতি গড়িতে চাহিয়াছিলেন যে, সংহতি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের মুক্তি আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন,

“The power that is developing, if it reaches consummation, will be able to accomplish its effects automatically by any method chosen.”

অর্থাৎ, যে শক্তি আমি অর্জন করিতেছি, যদি পূর্ণতা লাভ করে, তবে তাহা যে-কোন নির্দিষ্ট পথেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে কার্যক্ষম হইবে।

পূর্বে যে বৈপ্লবিক কৰ্ম গৃহীত হইয়াছিল, তাহা তিনি শেষ হইয়াছে ঘরিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নূতন করিয়া কৰ্ম আরম্ভ করিবার জন্য নিজে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য যত্নের অধেষণে এই সময়ে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। প্রাকৃত শক্তির প্রবল বিরোধিতায় তিনি যে এই পরমাশক্তিকে আয়ত্ত করিবার পথে সর্বতোভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না, তাহা অতিশয় চিন্তার সহিত অনুভব করিতেছিলেন। বিশেষভাবে আমাদের কৰ্মকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিলেন—

“It is specially in the field to which your *kriyas* have belonged and kindred fields that they are still too strong for me.”

আমাদের কৰ্ম তাহার নিকট অতিশয় বেদনাদায়ক বোধ হইল। তিনি চাহিয়াছিলেন সর্বপ্রকার সংশয়মুক্ত হইয়া বাহ্যতে আমি দাঁড়াইতে পারি। তিনি মনে করিতেন, যে শক্তি তাহার মধ্যে অজ্বিত হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বকে প্রবুদ্ধ করিবে। এই শক্তি তিনি আমার মধ্যে ও আরও কয়েক জনের মধ্যে সঞ্চার করিয়া একটি শক্তিশালী

অধ্যাত্ম-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবেন এবং এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কাধ্য করিবেন—তখনই কাধ্য ক্ষত ও সার্থক ভাবে সম্পন্ন হইবে,

“Then a rapid and successful kriya can be attempted.”

কত ব্যথা ও দরদের সহিত তিনি বাঙালীকে যন্ত্র করিয়া তাঁহার অজ্ঞিত যোগশক্তির সাহায্যে কৰ্ম করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সেদিন সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে তাঁহার প্রেরণায় জাতি উদ্ধৃত হইবে, এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

লিভিংষ্টোন

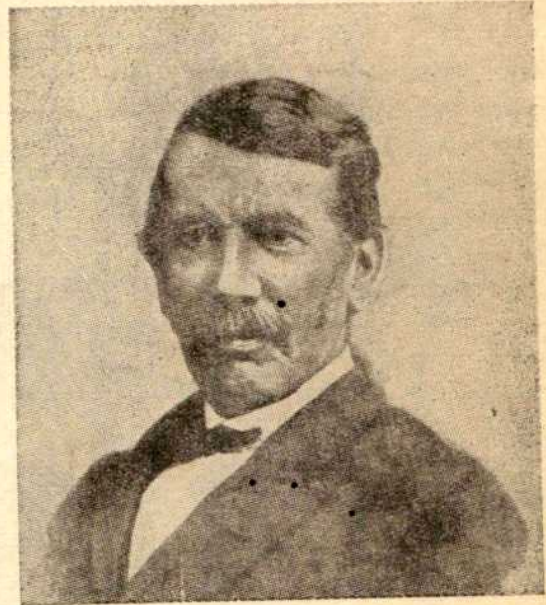
শ্রীআদিনাথ সেন

প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজারেরও অধিকসংখ্যক লোক স্কটলণ্ডের বাণিজ্যকেন্দ্র গ্লাসগো শহর হইতে সাত মাইল দূরবর্তী স্কটল্যান্ডের পল্লীতে ভেতিড লিভিংষ্টোনের অশ্রমস্থান দেখিতে গিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। লিভিংষ্টোন ছিলেন এক জন স্বার্থত্যাগী, জনকল্যাণকামী কর্তৃপক্ষ আদর্শ পুরুষ। তাঁহার ভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শুধু স্কটলণ্ড কেন যে-কোন দেশেই বিরল। তাঁহার কর্মময় জীবনের কৃতিসমূহ স্মরণ করিয়া স্কটলণ্ডের অধিবাসীরা আজও অশ্রুপ্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে। হাজারি অহুসদ্ধামী পর্য্যটক বা অগ্রগামী হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি প্রসারের সহায়তা করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অজ্ঞাত।

ব্রিটেনে বসবাস করা বহু আয়াসসাধ্য। জীবনযাপন সহজসাধ্য হইলে সাধারণতঃ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টার প্রেরণার অভাব হয়, যেমন আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়া, লোকদের অস্তি-সংস্কারপরায়ণতা, সহজ সরল জীবনযাপনের আদর্শ ইত্যাদি আমাদের বাঁচিয়া থাকাকে সহজ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বিলাতের অবস্থা অল্পরূপ হওয়ার সেবানকার লোকদের কর্তৃপক্ষ ও শক্তিশালী হইতে হইয়াছে। ব্রিটেনের প্রতিকূল অবস্থার নিমিত্ত, অথবা বৈধ বা অবৈধভাবে নির্ধারিত দেশত্যাগী অনেককে অষ্ট্রেলিয়ার অনারাদীনিবাস বা আমেরিকার ‘পিউরিটান’ উপনিবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ব্রিটেনের অনেক সমস্তার সমাধান হইয়াছে।

অবশ্য অনেক বর্ণপ্রচার ও সভ্যতা বিস্তারের অল্প-হাতে বিভিন্ন দেশে আধিপত্য-স্থাপন, বাণিজ্যবিস্তার ও পরোক্ষভাবে শোষণের ব্যবস্থা করিয়া ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ স্বার্থবুদ্ধিবশতঃ স্বজাতির উন্নতি-কল্পে আত্মজাতিক অগ্রগতিকে বাহত করা বা অজ্ঞ জাতির অন্তিষ্ঠাধন বর্ধমান বিধের অশেষ অনাতির কারণ হইয়া থাকিয়াছে। নিজের জাতির উন্নতির চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়,

সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যদি জ্ঞানের অপকার না হইয়া উপকার হয় তবেই তাহা প্রশংসনীয়। এই নীতির অহুসরণ



লিভিংষ্টোন

করিয়াছিলেন বলিয়াই লিভিংষ্টোন সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র। অনবরত খোঁচ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। কিন্তু ভগবানের উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া এই বেশপ্রেমিক অভিযাত্রার প্রতিবোধে এবং নিরীহ নিপেষিত মানবের কল্যাণচেষ্টায়, হুঃ, কষ্ট, আপদ, বিপদ, ব্যাধি, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া কর্তব্য পালনের অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ লিভিংষ্টোনের পূর্বপুরুষেরা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। কালক্রমে ইঁহারা স্কটলণ্ডের উত্তর-

পশ্চিমের উচ্চভূমি হইতে সমতলে নামিয়া আসেন এবং ১৭৯১ সনে রাত্তায়ায় পৌঁছেন। লিভিংষ্টোনের মাতৃকুল



রাত্তায়ায় এই বাড়ীতে লিভিংষ্টোন জন্মগ্রহণ করেন।

বিশিষ্ট বর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৮১৩ সনে লিভিংষ্টোনের জন্ম হয়। তাঁহার চরিত্রে মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক হইতে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা বর্ণ্যতাব ইত্যাদির সমাবেশ হইয়াছিল। অল্পবয়সে দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহাকে কারখানার কাজে চুক্তিতে হয়। সেখানে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও পতীর রান্না পর্য্যন্ত তিনি পার্ঠে মিশ্রিত থাকিতেন।

বহু কষ্টে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া লিভিংষ্টোন তৎসাহায্যে রাসপোন্ডে চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষা করেন এবং সেই সন্দেশে বর্ণ্যপ্রচারের কাজের জন্ত প্রস্তুত হন। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন চেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইল না। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচার-কার্য্যে হাইবার ওজ তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বাসনা জন্মে। সৌভাগ্যক্রমে তৎকার ওপনিবেশিক ডাঃ মোকাটের সহিত দেখা হওয়ায়, তাঁহারই আত্মকৃত্যে লিভিংষ্টোন আফ্রিকার উত্তরদিকস্থ উপনিবেশ কুরুমান্নে গিয়া পৌঁছেন (১৮৪১ সন)। আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তের উপনিবেশগুলি অপেক্ষা উত্তর দিকে প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন অধিক মনে হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি চার বৎসর উক্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। ভৌগোলিক আবিষ্কার তাঁহার যুগ্য উদ্দেশ্য হইলেও তিনি বর্ণ্যপ্রচারের সুযোগ অবহেলা করিতেন না। ১৮৪৪ সনে তিনি ডাঃ মোকাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রমণ কালাহারী মরুভূমির উত্তর প্রদেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহার জীও সময় সময় বামীর সঙ্গিনী হইতেন। একবার পথ হারাইয়া জীপুজাদিসহ লিভিংষ্টোন অশেষ দুর্গতি

ভোগ করেন। অন্তঃপর তিনি পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া লিভিয়াটি নামক স্থানে গিয়া পৌঁছেন। এই সময়ে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৮৫৪ সনে বিপৎসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া জাৎবেসী নদীর উপত্যকা হইয়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ উপনিবেশ লোয়াডোতে গিয়া পৌঁছেন। এখানে শরীর সারিয়া উষ্ট্রীতে পুনরায় নুতন দেশ আবিষ্কারের নিমিত্ত সদলবলে পূর্বাভিমুখে রওনা হইলেন। নামা বিপদ-আপদের ভিতর দিয়া জাৎবেসী হইয়া তিনি লিভিয়াটিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অনতি কাল পরে জাৎবেসী উপত্যকা ধরিয়া লুৎসের হইয়া উত্তরে অবস্থিত একটি বিরাট জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন। ইহাই ভিক্টোরিয়া ফলস নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ৪৩০০ মাইল পথের মধ্যে বেশীর ভাগই পদতলে অতিক্রম করিয়া লিভিংষ্টোন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে পূর্ব উপকূলে আসিয়া পৌঁছেন। লিভিংষ্টোন ১৮৫৬ সনে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই অভিযানে তিনি দাসপ্রথা বিলোপ করিবার জন্ত প্রাণ-পণ চেষ্টা করেন। ভ্রমণকার দিনে আরব ও পর্তুগীজ ব্যবসায়-গণ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া



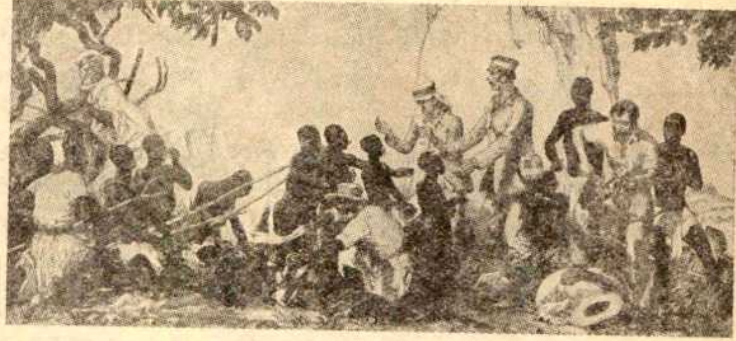
লিভিংষ্টোনের সাহসের পরিচয়ের মডেল—দিগ্গনিনের যন্ত্র হাতে

লিভিংষ্টোন শত্রুদলের সম্মুখীন

নিষ্ঠুর ভাবে বাহকের কাজ করাইত। স্থানীয় লোকেরা সন্দেহ করিয়া প্রথমে লিভিংষ্টোনের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করিত, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইবার পর কোন কোন দলপতি ও তাহাদের অনুচরবর্গ অস্বাচিতভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকে এবং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রেও সাফল্যলাভের পথে অগ্রসর হয়।

দেশে ফিরিয়া লিভিংষ্টোন তাঁহার এই পন্থা-মোল

বৎসরব্যাপী ভ্রমণরুত্তান্ত প্রকাশিত করেন। ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি বিপুল খ্যাতিলাভ করেন। অল্পদিন পরিবারবর্গের সহিত আমদে কাটিলে পর লিভিংষ্টোন গবর্ণমেন্টের ভরফ হইতে কলমাল নিযুক্ত হইয়া আবেশী নদী ও তাহার শাখাপ্রাণা আবিষ্কারের জন্ত প্রেরিত হন। লিভিং-ষ্টোনেরই আবেদনের ফলে অনতিকাল পরেই বিলাত হইতে বিশপ ম্যাকেল্লির অধীনে আর একটি অভিযাত্রী দল প্রেরিত হয়। ইহাদের অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া লিভিংষ্টোন ভ্রমণের দিকে পদাতিত হন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বিশপ ও তাহার অশুচরেরা সকলেই ঘরে মারা গিয়াছে। এই সময়ে অল্পে ভূগিয়া তাহার স্ত্রী গতাপ্ত হন। লিভিংষ্টোন নিজেও অরে ভূগিয়া ভূগিয়া হুইল হইয়া পড়েন। এইবার তিনি কাজের নেশায় একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। এই সময়েই ভ্রমণের হ্রদ আবিষ্কৃত হয়



দয়ার দৃষ্টান্তের মডেল—আরব-ব্যবসারীর হাত হইতে লিভিংষ্টোন কর্তৃক একদল ক্রীতদাসের উদ্ধারসাধন

এবং ঐ অঞ্চলই দাসপ্রচার কেন্দ্রস্থল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ভ্রমণের একটী জাহাজ রাবিতে পারিলে দাসপ্রচার বিলোপে সহায়তা হইবে, এই বিশ্বাসে সম্পূর্ণ নিঃস্বের বরচে প্রায় সর্বশক্তি হইয়া লিভিংষ্টোন সমুদ্রের উপকূলে একটি জাহাজ সংগ্রহ করেন, কিন্তু সেটিকে হস্তের জলপথে কোম-প্রকারেই ভ্রমণের হ্রদে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। পাছে পূর্ণবয়স্কদের হাত পড়ে, এই আশঙ্কায় লিভিংষ্টোন উক্ত জাহাজ নিজেই চালাইয়া ২৪০০ মাইল সমুদ্রপথ পার হইয়া বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন। এখানে প্রায়শ্চল্য জাহাজটী বিক্রয় করেন এবং এখান হইতেই বিলাতে প্রত্যাপন্ন করেন।

এই দ্বিতীয় ভ্রমণরুত্তান্ত প্রকাশিত করিবার অল্পকাল পরেই নীল নদীর উপপতিস্থল আবিষ্কারের জন্ত রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির আশুকুল্যে লিভিংষ্টোন পুনরায় আফ্রিকায় যান। যথেষ্ট সরকারী সাহায্য না পাওয়ার তাহার বাল্যবন্ধু মিঃ কেলী ও বোম্বাইয়ের বজুবর্গ তাহাকে অর্থসাহায্য করেন। সাত বৎসরব্যাপী অভিযানের অবসান হয় তাহার মৃত্যুতে। প্রথমে কয়েক বৎসর তাহার কোম খবর না পাইয়া লোকের

ধারণা হইরাছিল যে, তিনি নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অবশেষে আমেরিকা হইতে প্রেরিত ঠান্ডা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু লিভিংষ্টোনকে ফিরাইয়া আনিতে তিনি সক্ষম হন নাই। লিভিংষ্টোন বলেন যে, তাহার কার্য তখনও শেষ হয় নাই। তিনি কিংকাল পরে বাতাসম্ভার, ঔষধপত্র, ৫৭ জন বাহক পাঠাইয়া দেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে

টান্জানাইকা ও ভ্রমণের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু হুঃ-ব-হুঃগতির মধ্যে লিভিংষ্টোনের দিন কাটিতে থাকে। অবশেষে ১৮৭০ সনে তিনি মারা যান। মর্য্যাদা ওষধ দ্বারা রক্ষিত তাহার মৃতদেহ সমুদ্রোপকূলে আনা হয় এবং তথা হইতে বিলাতে ওয়েস্টমিনস্টার এবেতে সমাধিত হয়।

রাষ্ট্রদ্বারে লিভিংষ্টোনের জন্মগৃহে তাহার সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত বহু দ্রব্য আহত হইয়া সমস্তে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা বহু কক্ষে বিভক্ত। একটি কামরায় আছে তাহার পূর্ব-পুরুষদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। আর একটি কক্ষে আছে লিভিং-ষ্টোনের লাইব্রেরী, হস্তলিপি, চিত্রপটাদি।

সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক লিভিংষ্টোন গ্যালারি, যাহাতে ছবি ও মডেলের (টারো) সাহায্যে তাহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেরণা, সত্য, ভক্তি, সাহস, দয়া, ত্যাগ, সহিত্বতা এবং উৎসর্গ এই সব নামাঙ্কিত মডেলসমূহ আশ্চর্য্যজনক পটভূমিকায় উপস্থিত আলোকসম্পাতে সুপরিষ্কৃত হইয়া সকলের বিশ্ময় ও আশ্চর্য্য উৎসেক করে।



রাজনগর শ্রীনীমাধব চৌধুরী

১২

সেই দিন বিকালের দিকে সতীম হরিনারায়ণের কাছে বিদায় চাহিল। জীবানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হরিনারায়ণ ও জীবানন্দ উভয়েই আপত্তি করিয়া বলিলেন—বিহের দিন স্থির হয়েছে। আর চার দিন পরে বিয়ে। বিয়েটা হয়ে গেলে যেও।

সতীম বলিল—আমার জরুরী কাজ আছে, মইলে থেকে যেতাম। আপনাদের কাছে একটু খুলেই বলছি। আমার গুরুদেবের আশ্রম মহারাষ্ট্রে। আজ ছয়-সাত বছর পরে সেখানে আমার ডাক পড়েছে। আমার এখানকার কাজ এক-রকম শেষ হয়েছে। শীঘ্রই বাংলার আন্দোলন নূতন পথ ধরবে। আমি নূতন কার্যক্ষেত্রের সন্ধান করছিলাম এমন সময় ডাক এল। আর দেরি করতে পারছি না। ছুটি নিয়েরি বটে, কিন্তু চাকরি-স্থলে ফিরে আসতে পারব কিনা জানিনে। স্বাভাব্য আপে একবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেলাম। দেবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, ইজ্ঞকে দেখে গেলাম।

হরিনারায়ণ বলিলেন—ভবিষ্যতে কি করবে স্থির করেছে ?

সতীম বলিল—কিছু দিন আগে স্থির করেছিলাম, কোম জায়গার একটা আশ্রম গঠি দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে গুরুদেবের আদর্শ অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের আদর্শ প্রচার করব। কিছু অর্থসংগ্রহও করেছিলাম। এই কাজ আপাততঃ বন্ধ রেখে মহারাষ্ট্রে যাচ্ছি।

হরিনারায়ণ বলিলেন—তোমার লোকশিক্ষার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা স্থির হলে অর্থের প্রয়োজন হবে। আমাকে একটু জানিও ভবন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

সতীম বলিল—প্রয়োজন হলে জানাব। আপনারা ইজ্ঞের জন্ত উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি তাকে এমন কাজ দিয়ে যাব যাতে তার মনের চাকলা দূর হয়।

কিছুক্ষণ পরে মাঠার যতীন বাবু সতীমের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত আসিলেন। ইজ্ঞকে ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সতীম পথে বাহির হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার মুরলী নিজের ধারে মাঠের দিকে চলিল। মাঠে পৌছিয়া এক জায়গার বাগের উপর সকলে বসিল। ইজ্ঞ যতীনবাবুর খাতাখানি বাহির করিয়া উদ্ভূত অংশগুলি পড়িয়া শুনাইল। পড়া শেষ হইলে সে সতীমকে বলিল—মনে হচ্ছে একটা পথের ইন্দিব আছে, কিন্তু হাতে-কলমে কি তাই কাজ করতে হবে বুঝতে পারছি নে। মনটাও সায় দিচ্ছে না।

উদ্ভিগুণি শুনিয়া সতীম দেখিল যে, এগুলিতে তাহার

লোকশিক্ষা-আশ্রমের আদর্শের সমর্থন রহিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করিয়া সে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিল, উহা ছাপাইবার সময় হয় নাই। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল এই পুস্তিকাখানি ইজ্ঞকে দিয়া যাইবে। মন-শক্তি, হিতবাদী প্রকৃতি পত্রিকার মতব্য শুনিয়া তাহার মস্তক আরও দৃঢ় হইল। সে নিজের মনে বলিল, এই পথই ইজ্ঞের উপযুক্ত পথ। ইজ্ঞের হাতেই তাহার আদর্শের কার্যকারিতার পরীক্ষা হোক।

নিজের চিন্তার অনুসরণ করিয়া কতকটা খেম খগতোজির মত ইজ্ঞ বলিল, মতব্যগুলিতে লোকসেবার আদর্শ প্রচার করা হয়েছে মনে হচ্ছে। লোকসেবা এর আগে কিছু কিছু করেছে। বঙ্গদেশী আন্দোলনের স্বাক্ষরার্থে সময়ে মেখেছি, যাদের কল্যাণ করতে গিয়েছি তাঁরাই পুলিশের কাছে গোপনে খবর দিয়ে বঙ্গদেশীওড়ালাদের ধরিয়ে দিয়েছে। লাঠি-সড়কি-খেলা, জিম্বাষ্ট্রিকের বরাবর রেওয়াজ ছিল রাজনগরে। আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে পাঁচটা ছেলেকে একজন লাঠি খেলতে দেখলে গাঁয়ের কতকগুলো কিশোর লোক পিট পিট করে চেয়ে মেখে, তার পর পায়ে পায়ে থানার খবর দিতে রওনা হয়। এদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না, করেও কোম লাভ নেই।

বীর ভাবে সতীম ইজ্ঞের কথা শুনি। তার পর ইজ্ঞকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে গিয়া বলিল, অত হতাশ হলে চলবে না রে। বঙ্গদেশী আন্দোলন দেশে একটা প্রবল বন্যা এনেছিল। বঙ্গদেশের মুক্তির জন্য আগে থেকে কাজ করছিল তারা এই ভাবের বন্যাকে কাজে লাগাবার জন্য দেশের জনসাধারণকে মুক্তি আন্দোলনের সর্বকল্পে পাবার চেষ্টা করল। সে চেষ্টা সফল হ'ল না। মুসলমানরা তুফাতে মরে গেল। তারতবর্ষের রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে সাজা আগল, অত্যন্ত প্রদেশের লোকেরা বঙ্গদেশী আন্দোলন ও তার বাণীকে উপেক্ষা করল, দেশপ্রেম ও জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদের কাছে নূতন ও অবোধ্য জিনিস বলে মনে হ'ল। তারা তাবল সমস্ত জিনিসটা বাঙালীর নিজের সমস্ত মাজ। সরকার বাহাদুর খোশখোশে বাংলা ভেঙে ছুঁ খণ্ড করেছেন; তা যেমেনা নিয়ে বাঙালীরা অন্য প্রদেশ-গুলোকে সঙ্গে টানতে চাইছে। তারা এগোল না। কলে এত বড় আন্দোলনের বার আনা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই মেখে আদর্শের মধ্যে এক মল দেশপ্রেমিক যুবক একটা অপরিমিত কিন্তু বিপরজ্ঞক পথে পা বাড়াত্তে এসিগেছে। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য রক্তপাত নয়, তারা চায় আত্মাহুতি দিয়ে বঙ্গদেশবাসীর উদা-

নীমতা ঘূর করতে। তারা মেশাশ্রমের আঙনে পুড়ে মরছে দেখে মোহনদেব দেশের লোক এগিয়ে আসবে এই তাদের আশা।

সতীন একটু ধামিয়া ইজের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। ইজ মাথা নীচু করিয়া ভাহার কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সতীন বলিল, আমার কথা বুঝতে পারছিস তাই? না হইয়া বলি মনে হচ্ছে? আসল কথা কি জানিস, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমরা খানিকটা এগিয়েছি, নুতন যে 'এক্সপেরিমেন্ট' (পরীক্ষা) হতে চলছে সেটা জাতিকে আরও খানিকটা এগিয়ে দেবে আশা করছি আমরা। আমাদের দরকার দেশের লোকের সহায়ত্ব ও সমর্থন পাওয়া। এখন্য তাদের মধ্যে খানিকটা স্বাভাবিক চেতনা আগাতে হবে। কি উপায়ে সেটা করা যেতে পারে তার বানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে।

ইজ মুখ তুলিয়া বলিল, কি রকম এক্সপেরিমেন্ট?

সতীন সম্মুখে ভাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আমি তোকে যে মোট বইখানা দিচ্ছি তাতে সে কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের আগে আমার যা করবার ছিল করেছি, আন্দোলনের সময়ও করেছি। তার পর, নুতন উপায় সম্বন্ধে আমাদের হেলেথা যে পরীক্ষা করতে চলছে তার সম্পর্কে আমার ঘেঁটু সাধ্য তা করতে কল্প করি নি। এখন আমি অন্য পথে পা বাড়িয়েছি। অন্য পথ মানে নুতন কার্যক্ষেত্রের অন্বেষণ। তুই ভোর অবস্থা ও সাধারণ কাজ কর।

সতীন বাবুর খাটা থেকে ঐ অংশগুলো কপি করে রাখে। আমি তোকে যে মোট বই দিলাম তাতে লোকশিক্ষার আদর্শ হাতেকলমে কিভাবে কাজে পরিণত করতে হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ পাবি। কিছু দিন কাজ করে দেখ। যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে পারিস মনে কোম কোম থাকবে না। এত বড় কর্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে যে যার-যতটুকু সাধ্য তাই করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। অবশেষে হুঁয় অন্ত যাইতেছে দেখিয়া সতীন বলিল, চল, এবার ওঠা যাক। আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ইজের একান্ত অজ্ঞতা সত্ত্বেও সতীন থাকিতে রাজী হইল না। হরিনারায়ণ ও জীবানন্দ কাছে সতীন বতখানি বলিয়াছিল তাহা অপেক্ষা আরও একটু বিস্তারিতভাবে নিজের উদ্দেশ্যের কথা ইজের নিকট বলিতে হইল। সব কথা শুনিয়া ইজ আর বাধা দিতে পারিল না। শুধু বলিল, মেব্দা নেই, আপনিও চলে গেলেন, প্রয়োজন হলে কার কাছে পরামর্শ চাইব?

সতীন সম্মুখে ভাহার পিঠে হাত বুলাইয়া হাসিয়া বলিল,

পরামর্শের অভাব খুব ভাল লোক পাচ্ছ তাই, ভাবনা কি? তুমি আমার লক্ষ্যদিগের পুরো পরিচয় এখনও পাও নি।

একটু গভীর হইয়া বলিল, কোন দিন ওকে আদার করো না, ওর মনে দুঃখ দিও না তাই।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া সতীন চলিয়া গেল। যাইবার সময় যতীনবাবুকে বলিল, আপনি তৈরি থাকবেন যতীনবাবু, শীঘ্রই আপনার ডাক আসতে পারে।

যতীনবাবু বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি।

হরিনারায়ণ ও জীবানন্দ উভয়ের গৃহে বিবাদের ছায়া। হরিনারায়ণের গৃহ জগদ্বাদীশূচ। তিনি নিজেকে অমুখ, লাঠি বরিয়া কোনমতে একটু-আংটু চলাফেরা করেন। জীবানন্দের ঘেলে বিচারের প্রতীকার জেল-হাড্ডতে। লক্ষ্মীর বিবাহ উপলক্ষে জীবানন্দ উকিলের দ্বারা বেবাদন্দকে জামিনে খালাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জামিনের আবেদন অগ্রাহ করিয়াছেন।

তুই পরিবারে পরিব্যাপ্ত বিবাদের ছায়ায় মধ্যে যতখানি সম্ভব জাঁকজমক বর্জন করিয়া ইজ ও লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে সকলের অপেক্ষা বেশী উৎসাহ ও আমন্দ চিন্ময়। লক্ষ্মীকে সে বাস্তবিক মিছের ভদ্রীর চেয়েও বেশী ভালবাসিত। টুলো পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে পিতৃগৃহে আসার যুগ্মী সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে জানিত তাহার ছোট বোন চিন্ময়ী পীড়াপীড়িতে অল্পস্থ পিতা বাধ্য হইয়া সন্মতি দিয়াছেন। পিতৃবংশের গৌরব এই ভাবে ক্ষুণ্ণ করার সে চিন্ময়ী উপর একটু রুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতি তাহার মনে বিরূপ ভাব ছিল না। বংশগৌরবের নানতার ক্রটিটুকু ছাড়িয়া দিলে রূপে শুণে সে ইজের বোঁ হইবার উপযুক্ত মেয়ে একথা বলিতেই হইবে।

বিবাহের পর দিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মী যখন বধূবেশে পাকী হইতে তাহাদের বাড়ীতে নামিল চিন্ময়ী তখন তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল। তাহার কানে কানে বলিল, তোর শিবপুত্রো সার্থক হ'ল তাই?

বধূবরণ শেষ হইলে নুতন বোকে লইয়া সে পিতার ঘরে গেল। স্বত্তরকে প্রণাম করিয়া উঠিলে চিন্ময়ী তাহার মাথার কাপড় সরাইয়া দিল, পিতার পারের কাছে হুঁজনে পাশাপাশি বলিল। হরিনারায়ণ ছই হাত উভয়ের মাথার রাখিয়া চোখ বুজিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তার পর বলিলেন, ইজ কোথায় যা?

ইজ সেই সময় ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মী মাথার কাপড় দিতে যাইতেছিল, হরিনারায়ণ বলিলেন, থাক মা, আমার কাছে তোমাকে মাথার কাপড় দিতে হবে না।

- ইল্ল পিতাকে প্রণাম করিয়া বিছানার এক পাশে বসিল। হরিনারায়ণ তাহাকে মাথার হাত দিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন। চিন্ময়ী দেখিল এক ছোট্ট ছল পিতার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল।

পর দিন দুপুরের দিকে জীবানন্দ বরিশাল হইতে উকিলের টেলিগ্রাম পাইয়া জানিলেন যে, দেবানন্দের দয়্য মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। উকিল লিখিয়াছেন, আপিল করা হইলে তাহাকে যেন টেলিগ্রামে জানানো হয়।

জীবানন্দ তাহাকে টেলিগ্রাম করিলেন, আপিলের প্রয়োজন নাই।

টেলিগ্রামের কথা জীকে জানাইয়া জীবানন্দ বলিলেন, খবরটা বাইরে যেন প্রচার না হয়। যেরের আজ ফুলশয্যা। পরে সবাই জানতে পারবে।

কিন্তু খবর গোপন রহিল না। বাড়ীতে শ্রমিককে আসিতে দেখিয়া ও কিছুক্ষণ পরে মাকে কাঁদিতে দেখিয়া আনন্দ ইল্লদের বাড়ীতে গিয়া ইল্ল ও তাহার দিক্‌কে সে সংবাদ মিহা আসিল। তাহার আশ্চর্য্য করিল দেবানন্দের কোন সংবাদ আসিয়াছে। ইল্ল তাড়াতাড়ি জীবানন্দের কাছে আসিয়া ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। জীবানন্দকে বাধ্য হইয়া টেলিগ্রামের খবর বলিতে হইল। নিজেকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন সেকথা আর ইল্লকে জানাইলেন না। তিনি তাহাকে বলিলেন, লক্ষ্মীকে আজ আর খবরটা জানিও না, সে মন খারাপ করবে।

- ইল্ল বলিল, সে খবরের দ্বন্দ্ব ব্যস্ত হয়ে আছে, কি করে তার কাছে গোপন রাখব ?

জীবানন্দ আর কিছু বলিলেন না। জিন্ময়ী জামাইকে ভিতরে লইয়া গিয়া কাছে বসাইয়া সাজুমা দিতে লাগিলেন। ইল্ল একটু রান হাসিয়া বলিল, আমাকে কি আর বোঝাবেন ? বিকেলের দিকে গিয়ে ওকে একটু বুঝিয়ে আসবেন।

সে চলিয়া গেল।

ইল্ল ও লক্ষ্মী ছাড়া দেবানন্দের ছেলের খবর ও-বাড়ীর আর কেহ জানিতে পারিল না।

লক্ষ্মীকে সংবাদ দিয়া ইল্ল বাহিরে চলিয়া গেল। দেবদার দয়্য মাস কারাদণ্ডের সংবাদে তাহার নিজের মন এমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল যে, লক্ষ্মীকে সাজুমা দেওয়ার কথা তাহার মনে রহিল না।

বাড়ীর বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সে যতীনবাবুর বাসায় উপস্থিত হইল। তাবিল যদি যতীনবাবুর সঙ্গে কথা-বার্তা বলিয়া মনের ভার কিছু কমাইতে পারে।

যতীনবাবুর বাসায় গিয়া শুনি, আগের দিন রাতে তিনি বঠাং বাহিরে কোথায় গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন কেহ বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল সতীনদা যতীনবাবুকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,

শ্রীহ তাহার ডাক আসিতে পারে—ডাক তাহা হইলে আসিয়াছে ?

অনেক বিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া সে নায়েবের সঙ্গে কতকগুলি জরুরী বৈষয়িক ব্যাপারের পরামর্শে ব্যাপ্ত হইল। পিতার আদেশে নায়েবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বৈষয়িক ব্যবস্থাদি সমস্তই এখন তাহাকে করিতে হয়।

এদিকে তিনি দুপুর হইতে দাদার ফুল-শয্যার আয়োজনে ব্যস্ত। দাদার বিবাহের সফল জিনিস ঘরে ভালোবস্তু হইয়া পড়িয়া ছিল। ঘর বুজিয়া নতুন বিছানাপত্র বাহির করিয়া খাটে পাতিল। ফুল আনাইয়া বিছানার ছড়াইল। মাঝের আলমারী বুজিয়া রূপার ফুলদানি, চন্দনের বাট, গোলাপপাশ, আভরদান, রেকাব, গেলাস বাহির করিল। গোলাপ জল, আভর, গুণ্‌গুলের গন্ধে ঘর সুবাসিত ; চাপা, গন্ধরাজ, বেল-ফুলের গন্ধে আমোদিত হইল। রূপার পিলুছে তেলের প্রদীপ জ্বলাইয়া খাটের পাশে রাখিল। পাথরের টেবিলের উপর রূপার থালায় মিষ্টি সাজাইল, মাঝের বাপের বাড়ীর মোনার পানের ভিবা ভরিয়া পান রাখিল।

মাঝের শাড়ী ও গহনা দিয়া চিন্ময়ী লক্ষ্মীকে সাজাইতেছে এমন সময় ঘোট ঘেয়েকে সঙ্গে লইয়া জিন্ময়ী আসিলেন। চিন্ময়ীর ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার আনন্দ হইল। মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না। তাহাকে ও ঘেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঘেয়ে-জামাইয়ের দ্বন্দ্ব যে নতুন শাড়ী ও কাপড় আনিয়াছিলেন তাহা চিন্ময়ীর হাতে দিয়া গেলেন।

লক্ষ্মীকে সাজাইয়া চিন্ময়ী তাহার চিবুক বরিশা মুখখানি উঠাইল কেমন মানাইয়াছে দেখিবার জন্য। বলিল, আজকার মত দিন আর পাবি না জীবনে। কথাটা মনে রাখিস।

সাজানো শেষ হইলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীর হাত বরিশা তাহাকে সুসজ্জিত শ্রমিককে আনি। ঘরের এক পাশে গদী-জাঁটা চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া বলিল—এখানে বোস। দাদা এসে হাত ধরে খাটে বসাবে। তুই বোস, আমি দাদাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। কি মজা হবে বল দেখি লক্ষ্মী, দাদা এর কিছু জানে না।

সে লক্ষ্মীর মাথার কাপড় একটু সরাইয়া দিল। বলিল—অত লজা ঘোমটা দিস না। চুপ করে এখানে বসে থাক। দাদাকে দেখেই গলে যাসু নি। অনেক খোশামোদ করলে, আদর করলে তবে উঠবি। বুকেহিস ?

ঘর হইতে বাহির হইয়া চিন্ময়ী দরজা ভেজাইয়া দিল। তারপর বিকে দিয়া ইল্লকে ডাকিয়া পাঠাইল। ইল্ল উপরে আসিলে চিন্ময়ী বলিল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। একটু কাজ আছে।

ইল্ল বলিল—কি কাজ রে চিহ্ন যে এমন কড়া ভলব করেহিস।

ইন্ডের জঙ্গ যে নুতন কাপড় জামা জিনসন দিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া চিন্ময়ী বলিল, এইগুলো পরে ফেলুম দেখি।

ইন্ড—কেন রে, হঠাৎ এগুলো পরব কেন?

চিন্ময়ী—আপনার শাওড়ী দিয়েছেন আপনাকে পরতে। আজ পরতে হয়।

চিন্ময়ীর গীড়াপীড়িতে ইন্ডকে সেগুলি পরিতে হইল।

চিন্ময়ী বলিল, আহুন এদিকে।

ইন্ড চিন্ময়ীর সঙ্গে সঙ্গীত কক্ষ প্রবেশ করিয়া একেবারে অবাক হইল। লক্ষ্মী বসিয়াছিল। ইন্ড ও চিন্ময়ীকে আসিতে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিন্ময়ী বলিল, আজ আপনার ফুলশয্যা। মনে ছিল না বুঝি? আজ আর ঘর থেকে বেরুতে পাবেন না। আমি শেকল তুলে দিচ্ছি, কাল সকালে খুলে দেব।

ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

ইন্ড বলিল, চিহ্ন, একটু শোন এদিকে, ও চিহ্ন...

চিহ্ন ভক্তকণ বাহিরে আসিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিতে দিতে বলিল, কাল শুনব ছোড়দা।

ইন্ড চারদিকে চাহিয়া ঘরের সাজসজ্জা দেখিল। ভাবিল চিনি যে এমন চমৎকার সাজাইতে পারে তাহা শুনে জানিত না। ভাবিল চিনির সুন্দর কচি, সুন্দর সাজাইবার হাত। তাহার দৃষ্টি পড়িল লক্ষ্মীর উপর। লক্ষ্মী মাথা হেঁট করিয়া চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। ইন্ড দেখিল শাড়ীতে, অলঙ্কারে চন্দনে, প্রদীপ্ত রূপে রাজেশ্বরীর মত দেখাইতেছে তাহাকে।

ইন্ড মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশ্য মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিলেও লক্ষ্মী সে দৃষ্টির মারুখ্য অনুভব করিল। ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া গলার শাড়ীর আঁচল জড়াইয়া হাঁটু গাড়িয়া ইন্ডের পায়ের উপর সে মাথা রাখিল। লক্ষ্মী কভবার ভাতাকে প্রণাম করিয়াছে, কিন্তু তাহার আজিকার প্রণতিটি ইন্ডের কাছে অতিনব বলিয়া মনে হইল, বড় ভাল লাগিল। হুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া উঠাইতেই ইন্ড দেখিল নববধূর চোখে অশ্রুর আভাস।

লক্ষ্মীর চোখে জল দেখিয়া স্তম্ভিত কক্ষ, পুষ্পাকীর্ণ শয্যা, আতর ও গোলাপজলের স্নিগ্ধ সুবাস অভিক্রম করিয়া ইন্ডের মন উত্তলা হইয়া বাহিরের নক্ষত্রাশিত আকাশের নীচে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ঘেন ছুটিয়া চলিল। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, অন্ধকারকক্ষের অপরিষ্কার গবাক্ষপথে দূর আকাশে দীপ্তিমান ধ্রুবতারার দিকে নিশ্চল দৃষ্টি ক্রিষ্ট, শীর্ণ, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আশৈশব পরিচিত এক ধানি মুখ।

কঠোর প্রয়াসে মনের ব্যাকুলতা দমন করিয়া ইন্ড লক্ষ্মীকে খাটে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বলিল। চিবুক ধরিয়া

তাহার দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরাইয়া পয়স সাড়মা ও স্নেহের স্বরে সে বলিল—

—তোমার চোখে জল কেন আমি জানি। দেবুলা ঘেখানে থাকুন, যে অবস্থায় থাকুন তাঁর আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। আমি যে তাঁর হাতে গড়া মানুষ লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর চোখের জল উপচাইয়া পড়িতে স্বামীর বুকে সে মুখ লুকাইল।

মাংস দুই কাটরা গিয়াছে। জীবানন্দ দরখাস্ত করিয়া ছুটির মেয়াদ বাড়াইয়া লইয়াছিলেন, সে মেয়াদও শেষ হইয়া আসিল। নুতন জামগায় তাহার বদলির আদেশ হইয়াছে। দিন চার-পাঁচ আগে হইতে তিনি রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

হরিনারায়ণের শরীর অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরে চলাফেরা করিতে পারেন, বৈষয়িক কাজকর্মও কিছু কিছু দেখেন। জগন্নাথীর মৃত্যুর পরে সর্বদা তাহার যে বিমর্ষ ভাব দেখা যাইত তাহা দূর হইয়াছে। মুখে একটা তৃপ্তি ও শান্তির ভাব আসিয়াছে। জীবানন্দকে তিনি বলেন, জীব, বৌমা আমার সংসারে ত্রী ও শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। জীবনে যত দুঃখ পেয়েছি তার দাপ বুকে থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় আর কিছু দিন যেন বৈতে থাকি, নাতি নাভনীর মুখ দেখে, তাদের নিয়ে মুখে আছাদে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেন ঘরি।

জীবানন্দের মুখে সন্তোষের হাসি ফুটিয়া উঠে। আশ্বাস দিয়া তিনি বলেন, আপনি শুভাগ হয়ে উঠেছেন দাদা।

হরিনারায়ণ বলেন, জীব, আমার মনে একটা ফোড় রয়েছে দেবুর জন্ত। এই রাজনন্দনের মাটিতে ওর মত একটা ছেলে জন্মেছে বলে আমার মনে পর্ক ছিল কত। জানি নে ছেল থেকে বেরিয়ে ওর মনের গতি কোন্ দিকে যাবে। ও বেরুলে ওকে কলকাতা পাঠিও পড়াশোনা করবার জন্ত। একটা উপযুক্ত ঘরের খোঁজ করো; কলকাতা পাঠাবার আগে বিয়ে দিয়ে দিও। এ বন্ধন যে কত শক্ত বন্ধন তা আমার ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বুঝতে পারছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিনারায়ণ আবার বলিলেন, প্রসন্ন বেয়াদা হয়ে উঠলে আমার ত্রী তার বিয়ে দিতে বলে-ছিলেন। ছেলের উচ্ছ্রাস স্বভাবে রুগ্ন হয়ে আমি সেকথা কানে তুলি নি। হরভ তাঁর কথা শুনেছে ছেলেরা এভাবে পরহাড়া হ'ত না। ছেলেও চলে গেল, মনের কঠে ত্রীও গন্ত হলেন।

একটু পরে হাসিয়া বলিলেন, ভাল কথা, ইন্ডের সেবকা-প্রমের কথা শুনেছ? অনেকগুলো টাকা আদায় করেছে আমার কাছ থেকে—তাঁতশালা, ডাক্তারখানা, নাইট কুল, ছেলেদের আশ্রম, আরও কি সব করবে বলে।

জীবানন্দ নুতন কর্তৃক লেখা হইয়া গেলেন। জিনহনী বখশ বলিলেন, “তোমার শরীর ভাল নয়, আমিও চলি,” জীবানন্দ তখন জবাবে বলিয়াছিলেন, আমার পুরোনো ঠাকুর চাকর নিয়ে যাব, অল্পবিশেষ হবে না। তুমি আপাতত এখানে থাক ও-বাড়ীতে লক্ষ্মী একা পড়েছে হোট অমদ চলে যাবার পর থেকে। অল্প লোকজন, জিন্মাকর্ষ সব ভাল সামলাতে হয় মেয়েটাকে। হুটো কথা বলবার লোক মেই, হাঁক ছাড়বার অবসর মেই। মাসখানেক পরে তুমি যেও।

জিনহনী ভাবিয়া দেবিলেন কথাটা ঠিক। বিরে হইয়াই অল্প বড় সংসারের ভার পড়িয়াছে মেয়ের বাড়ি, তার উপর অমূল্য স্বত্ব। তিনি মাসখানেক থাকিয়া যাওয়াই স্থির করলেন।

জীবানন্দ চলিয়া যাইবার দিন সাতকে পরের কথা।

লক্ষ্মী থালায় হুণের বাটি, ফল, মিষ্টি আনিয়া খুন্তরকে খাওয়াইতে বসিল। তাহার দকালবেলার আহা। খাওয়া শেষ হইলে সে থালা, বাটি ও রেফারি তুলিয়া লইতে-ছিল, হরিনারায়ণ একটু অচমমতভাবে তাহার কাজ দেখিতে-ছিলেন। লক্ষ্মী বাসনপত্র তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তিনি তাহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, বোমা, ওগুলো নামিরে রেখে একটু বসো। একটা কথা হঠাৎ মনে এল তোমাকে বলি।

লক্ষ্মী বাসনগুলি মাঝিয়া খুন্তরের পায়ের কাছে বসিল। হরিনারায়ণ বলিলেন, বোমা, তুমি ছেলেমাছ এত বড় সংসারের ভার পড়েছে তোমার ওপর। ইচ্ছাও এখন হেল-মাছটাই রয়ে গেছে। এই বয়সে আমাকেও সংসারের ভার কীবে নিতে হয়েছিল। আমাকে সাহায্য করেছিলেন তোমার পাণ্ডী। তিনি সাহায্য না করলে কি হ’ত এই বিবর-লক্ষ্মির, এই সংসারেরই-বা কি গতি হ’ত ভাবতে পারি না। তোমাকে সেই কাজ করতে হবে বোমা। এই পুরনো বনেদি পরিবারের সব বিধি-ব্যবস্থা যাতে বজায় থাকে, যারা তোমার সুখাশুখী তারা যাতে সুখ-স্বচ্ছন্দ্য থাকে সেইটে তোমাকে দেখতে হবে।

হঠাৎ খুন্তরের মুখে এই ধরনের কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেও লক্ষ্মী অবনত মস্তকে তাহার উপদেশ শুনিল, বলিল, আমাকে আশীর্বাদ করুন বাবা।

হরিনারায়ণ তাহার মাথার হাত মাঝিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করছি মা, আশীর্বাদ দিমরাতেই করছি। আমার বড় আনন্দ তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়েছ।

লক্ষ্মী তাহাকে প্রণাম করিয়া বাসনগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

জিনহনী পূজা-আহিক সারিয়া উঠিলেন, এইবার রান্নাঘরে যাইবেম। ইচ্ছাদের বাড়ীর কি মুকীর মা হুণ-দস্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে চুকিয়া উঠান হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, অ মা-ঠাকরাণ, শিগ্গীর আসেন।

তাহার চীৎকার শুনিয়া জিনহনীর বুকটা ঘড়াস করিয়া উঠিল। ভাড়াভাড়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি হয়েছে রে মুকীর মা, অমন করে ডাকছিস্ কেন?

মুকীর মা বলিল, কর্তাবাবু পইড়্যা গিয়া ওজান হয়েচেন। আপনি শিগ্গীর আসেন।

জিনহনী চমকিয়া উঠিলেন। গারে একখান চাদর জড়াইয়া তিনি মুকীর মার সঙ্গে চলিলেন। মুকীর মার মুখে ঘটনা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, হরিনারায়ণ জলধোণ শেষ করিয়া কাছারীবাড়ীর উঠানে পাখচারি করিতেছিলেন। তারপর একটু ক্লান্তিবোধ করিয়া তাহার ঘরে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ বৈঠকখানা দালানের সিঁড়িতে উত্তীর্ণ হইবার সময় কিতাবে পা হতকাইয়া সিঁড়ির উপর পড়িয়া যান। পড়নের দশ পাইয়া কাছারিঘর হইতে ইচ্ছা, নায়েব, গোমস্তা ছুটিয়া আসিয়া ধরা-ধরি করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া আসে। তখন হইতে তাহার জ্ঞান মাই। ডাক্তার ডাকিতে লোক গিয়াছে।

জিনহনী হরিনারায়ণের ঘরে চুকিতে গিয়া দেখিলেন বহু-লোক জমা হইয়াছে সেখানে। ডাক্তার হাত ধরিয়া বাড়ী পরীক্ষা করিতেছে, ইচ্ছা পিতার পায়ের উপর মুখ তুলিয়া আকুল ভাবে কাদিতেছে। লক্ষ্মী মাথায় কাপড় দিয়া খুন্তরকে বাতাস করিতেছে। মুন্সী পিতার বুক প্রাণতন বি মালিন করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, পড়িয়া গিয়া বুক ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস উঠিতে লাগিল।

ঘীরে ঘীরে হরিনারায়ণের জীবন-প্রদীপ নিবিয়া আসিতে লাগিল। স্বর্গাণ্ডের সময় তাহার আত্মা দেহভ্যাগ করিয়া লোকান্তরিতা জীর সঙ্গে মিলিত হইল।

হরিনারায়ণ তাহার জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যে সম্বন্ধ রাজনগর ও নবীন রাজনগরের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছিলেন। কাল-প্রভাবে সেই সেতু ভীর্ণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইল। প্রাচীন রাজনগরের ইতিহাসের শেষ পাতার উপর বিরাম-চিহ্ন অঙ্কিত হইল।

কমল:

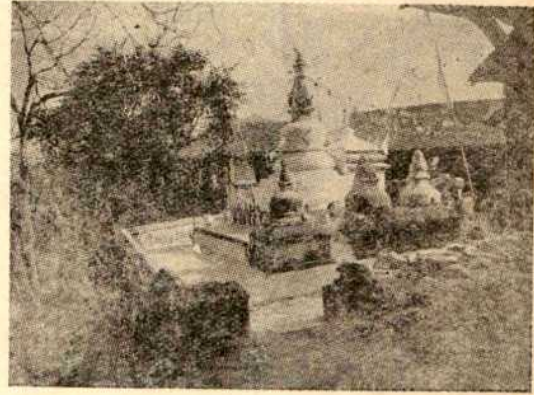
নেপালের বৌদ্ধধর্ম

শ্রীদাশরথি রায়

প্রভু বুদ্ধ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন সেই লুম্বিনী উড্ড্যান তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চল আজিকার নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নেপাল তরাই নামে আখ্যাত। বর্তমানের নেপাল তরাই অঞ্চলেই প্রভু বুদ্ধ জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের নেপাল উপত্যকায় আগমনে, তাঁহার পুণ্যপদম্পর্শে নেপাল যে কেবল বড়ই হয়েছিল তাহাই নহে, এই সময় হইতেই নেপালের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হয়। অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্র মতে শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্ববর্তী ছয় জন বুদ্ধ নেপাল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নেপালের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন নেপাল উপত্যকায় আগমন করেন তখন তথায় কিরাতবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কিরাতবংশীয় রাজগণ যদিও হিন্দু ছিলেন তথাপি তৎকালীন কিরাত-রাজ জিতেন্দ্রি যোগ্য আভি-শেষতা সহকারে প্রভুকে স্বাগত করেন। নেপাল উপত্যকার নামুরা নামক যে স্থানে প্রভু বুদ্ধ ব্যাজী জাতক প্রচার করিয়া-ছিলেন তথায় আজিও একটি চৈত্য বিদ্যমান। প্রভু বুদ্ধ নেপাল উপত্যকায় অতি অল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রচারিত মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া তথাকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপে নেপালে বৌদ্ধধর্মের যে বীজ ভিত্তি নিজহাতে বপন করিয়াছিলেন, তাহা কালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া তথাকার সহস্র সহস্র লোককে শাস্ত্রস্বারাভলে আশ্রয় দান করিয়াছে। ত্রিপিটক হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সমুদয় শাক্যই বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুখ্যাত রাজা বিহুদাত্তের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া এই সকল বৌদ্ধবর্ষাবলম্বী শাক্যই নেপালের বিভিন্ন ভূগম স্থানে পলায়ন করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে অস্বরূপ এই সকল শাক্যই প্রভুর পরি-নির্বাণলাভের পরও নেপালের জনগণের নিকট তাঁহার প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করিতেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণলাভের পরবর্তী কালে নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও তথায় ইহার অধ্যয়ন ও পত্তনের ব্যা-বাহিক ইতিহাস দুস্ত্রাপ্য এবং পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৯ অব্দে যে ঘটনায় নেপালে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বিষয় ইতিহাসে স্বা-করে লিখিত আছে। এই সালে মহান্ সত্রাট অশোক নেপাল

পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সত্রাট প্রথমেই লুম্বিনী তীর্থে গমন করেন। পুণ্যতীর্থ লুম্বিনীতে তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য ফুল চন্দন ধূপ ধূনা গন্ধদ্রব্য ও অজ্ঞাত পুজার সামগ্রী বহন করিয়া চারি দল সৈন্য সত্রাটের সহিত আগমন করিয়াছিল। সত্রাটের সহিত তাঁহার দীক্ষাভক্ত ভিক্ষু উপগুপ্ত ও সত্রাট-কর্তা চাক্রমতীও নেপালে আগমন করেন।



নেপালের নামুরা চৈত্য।

এইস্থানে প্রভুবুদ্ধ সর্বপ্রথম ব্যাজীজাতক প্রচার করিয়াছিলেন। বরজ্জপূরণ-বর্ণিত, সত্রাটের লুম্বিনীতীর্থ পরিদর্শন-কাহিনী বড়ই হৃদয়স্পর্শী। বাহার করুণাকণা লাভ করিয়া চতু-শোক বর্ষাশোকে রূপান্তরিত হন সেই প্রভু বুদ্ধ যেখানে প্রথম পদক্ষেপ করিয়া ধরণী পবিত্র করিয়াছিলেন সেই পুণ্যতীর্থ লুম্বিনী পরিদর্শন-কালে অশোকের বিরূপ মনোভাব হইয়াছিল তাহা সহজেই অহুমের। উড্ডানে প্রবেশ করিয়াই উপগুপ্ত সসজ্জমে দক্ষিণ বাহ প্রসারণপূর্বক কহিলেন, “মহাসত্রাট। এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে আমার প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা এই পুণ্যতীর্থে প্রভুর অক্ষয় কীর্্তি ঘোষণা করিয়া ভূমি এক শুভ নির্মাণ কর।” তজ্জরসাম্রাট অশোক গুরুত্ব আদেশে ভজ্জ অধিবাসীদের মধ্যে এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ-পূর্বক তথায় এক শুভ নির্মাণ করাইয়া শুভগাজে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন :

“দেবান পিৎতেন পিতৃদসিন লাজ্জিন বিসত্তি বসাত্তিসিভেন

“অন্তন আগাচ মহীরিতে হিদ বুদ্ধে জাতে শাক্যবুদীতি

• বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব মায়াদেবীর গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক পদ পাদ-বিক্ষেপ করেন।

“সিলা বিগড়াতি চা কালাপিত সিলাবন্তে চ উসপাপিতে
“হিদ ভগবৎ জাভেতি লুধিনি গায়ে উবলিকে কটে
“অট ভাগিয়ে চ

উৎকর্ণ লিপির অর্থ : দেবতাদের প্রিয়দর্শী অশোক বিশ
বৎসর অভিষিক্ত হইবার পর এই স্থানে আসিয়া পূজা



নেপালের বড়ুনাথের বৌদ্ধমন্দির

করিয়াছিলেন, কারণ শাক্যমুনি বুদ্ধ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই স্থানে একটি অশ্বমুর্তিধোদিত প্রস্তর স্থাপন করেন এবং একটি স্তম্ভ নির্মিত করান, কারণ ভগবান এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লুধিনী গ্রামকে কর-রতিভ করেন এবং (উৎপন্ন ভ্রব্যের) এক-অষ্টমাংশ দিতে আদেশ দেন।

সম্রাট অশোক যে কেবল নেপালে ভীষণধাটনে আসিয়া-ছিলেন তাহা নহে, নেপালের বহু অঞ্চল তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। অতএব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক সম্রাট অশোকের অধীনে নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই অল্পমের। নেপালের বর্তমান রাজ-ধানী কাঠমান্ডুর দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় এক কোশ দূরে “পাটন” বা “অশোক পাটন” নামক স্থানে অশোক এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট পাটনের কেন্দ্রস্থলে এক স্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং এই কেন্দ্রস্থ স্তম্ভের পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে একটি করিয়া আরও চারিটি স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন। এই স্তম্ভ পাঁচটি আজও বিজ্ঞান রহিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাসম্রাট তাঁহার কল্যাণ চাক-মতীকে পাটনের দেবপাল নামক এক সম্রাটবংশীয় ব্যক্তির সতিত বিবাহ দিয়াছিলেন। চাকমতী পরবর্তীকালে তিফু-ত্রক অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করান। চাকমতী প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ

বিহারটি “চা বাহিল”+ নামে খ্যাত। এইরূপে অশোকের মহতী প্রচেষ্টার ফলে নেপালে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নেপালের তৎকালীন অধিবাসী মেওয়াররা সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল।

বৌদ্ধধর্মের যে পৌরবসময় যুগ অশোকের সময় আরম্ভ হইয়াছিল তাহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ অভ্যুত্থান হয়। তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পীঠ-স্থান প্রতিবেশী বঙ্গদেশ হইতে নেপাল তন্ত্রায়ন বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রেরণালাভ করে। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও মহা-স্থবির নেপালে গমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শতরাত্রী নামে খ্যাত মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারত হইতে তিব্বতে যাইবার পথ ছিল নেপালের মধ্য দিয়া। শান্তরক্ষিত, কমলশীল, অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর নেপালের পথে তিব্বত গমন করিবার কালে কয়েক বৎসর নেপালে অবস্থান করেন। এই সকল তান্ত্রিক পণ্ডিত নেপালে তন্ত্রায়ন প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রচার ও প্রভাবের ফলে নেপালের সেই পৌরবসময় যুগ তন্ত্রায়নের যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নেপালের ধর্মসম্পর্কিত ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের ভূম্য। ভারতে প্রথমে ছিল হিন্দুধর্মের প্রভাব এবং হিন্দু-ধর্মের পরবর্তী যুগ হইতেছে বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধধর্মের পৌরবসময় যুগ ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের অবনতি হইয়া ভারতে পুনরায় হিন্দুধর্মের উত্থান হইয়াছিল। নেপালেও সেইরূপ প্রথম যুগে হিন্দুধর্মের ও পরে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পর ভারতে ধর্মপ্ বৌদ্ধধর্মের শেষ রক্ষা পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে নেপালে তেমনটি হয় নাই। একথা সত্য যে, নেপালের বর্তমান শাসকগণ হিন্দু এবং নেপাল পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুসম্রাট। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধান শাসিত নেপালরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হয় নাই। আজ তথায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পাশা-পাশি সগৌরবে বিরাজমান। খ্রীষ্টীয় ১৭৭৫ সালে গোরখা-রাজা পৃথ্বীনারায়ণ সমগ্র নেপাল জয় করিয়া তৎকালীন শাসনভার গ্রহণ করিবার পর নেপালে আর একজনও বৌদ্ধ রাজার অস্তিত্বের কথা জানা যায় না; তথাপি আজও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা নেপালের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়। নেপালের দক্ষিণ ভাগে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক, বাকী অর্ধাভ স্থানে (পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর নেপালে) বৌদ্ধধর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

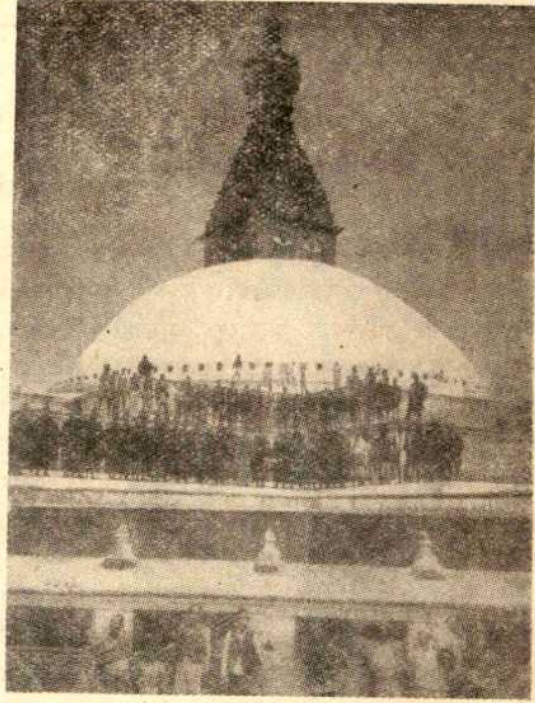
+ চা-বাহিল শব্দ ‘চাকু বিহার’-এর অপভ্রংশ

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নেপালী বৌদ্ধগণ আজ যে ধর্ম আচরণ করে তাহা স্ববিববাদ বা মহাযান কোন পর্যায়ের পড়ে না। নেপালের আজিকার বৌদ্ধধর্ম হিন্দু-বৌদ্ধ এই দুই ধর্মের অপূর্ব সমন্বয়। নেপালে বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে তাহার কারণ দর্শাইয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, নেপালের আদিম অধিবাসী বৌদ্ধ নেওয়ারগণ বৌদ্ধধর্মের সরল অনাক্ষর পূজাপাঠে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া হিন্দুদের পূজার সাদৃশ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা একে একে হিন্দু-পূজাপদ্ধতির সমুদয় আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নহে, জাতি-ভেদ প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু সংস্কার নেওয়ার বৌদ্ধদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বুদ্ধকে তাহারা ভ্যাগ করিল না, কিন্তু মহাদেব, শীতলা, গণেশ ও অজ্ঞান দেবদেবীকে পূজা না করিয়া তাঁহাদের বিদ্বাগভাজন হইবার সাহসও তাহাদের রহিল না। পার্শ্ব কল্যাণের লোভে নেপালী বৌদ্ধগণ তাহাদের হিন্দু-ভ্রাতৃগণ পূজিত প্রায় সব কষ্ট দেবদেবীকে বুদ্ধের সমগৌরব প্রদান করিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে লাগিল। অল্প দিকে আবার নেপালের হিন্দুগণ বুদ্ধকেও তাহাদের অত্যন্ত দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আজ তজ্জই নেপালের বৌদ্ধমঠে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিসমূহ বৌদ্ধধর্মীদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আবার হিন্দু-মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি অজ্ঞান দেবদেবীর সঙ্গে পূজিত হইতেছেন। হিন্দু পুরাণ 'নেপাল মাহাত্ম্যে' লিখিত আছে—“বুদ্ধের পূজা করা শিবপূজার তুল্য।” আবার বৌদ্ধশাস্ত্র স্বয়ম্ভূপুরাণ নেপালী বৌদ্ধদিগকে হিন্দুদেবতা পশু-পক্ষিপাণ্ড শিবের পূজা করার বিধান দিয়াছে।

অতএব নেপালের আজিকার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, তথাকার বহু বৌদ্ধকে আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধকে সহজে পৃথক করিয়া চেনা যায় “শিবমার্গী” ও “বুদ্ধমার্গী” এই দুইটি বাক্যের দ্বারা। নেপালী বৌদ্ধগণ নিজেদের “বুদ্ধমার্গী” বলিয়া পরিচয় দেয় এবং হিন্দুদিগকে তাহারা “শিবমার্গী” বলিয়া উল্লেখ করে। অর্থাৎ, নেপালে যেন একটি ধর্মই বিদ্যমান যাহার দুইটি শাখা—এক “শিবমার্গী”, অল্প “বুদ্ধমার্গী”।

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের কিরূপ সমন্বয় হইয়াছে তাহার অজ্ঞাত দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, একই দেবমূর্তিকে নেপালের হিন্দু ও বৌদ্ধরা বিভিন্ন নামে পূজা করিতেছে। নেপালী বৌদ্ধরা যাহাকে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ বলিয়া পূজা করে—হিন্দুরা সেই মূর্তিকেই মহাদেব বলিয়া তাঁহার চরণে বিজয়দল দিয়া পূজা করিতেছে। মজ্জিম-নাথ বা মংজ্জিমনাথ নেপালের জাগ্রত দেবতা। মংজ্জিম-নাথ ভগবান বুদ্ধ পদ্মপাদির অবতার বলিয়া প্রখ্যাত হইলেও

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় ইঁহার পূজা করিয়া থাকেন। মংজ্জিমনাথের রথযাত্রা নেপালে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় সম্প্র-



নেপালের বৌদ্ধমন্দির বোধনাথ

দায়েরই একটি বিশেষ উৎসব। নেপালের প্রধানমন্ত্রীও এই রথ-যাত্রা উৎসবে যোগদান করেন। মহানকাল মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই পূজা দিয়া থাকেন। মন্দিরস্থিত মূর্তিটি নিঃসন্দেহ অমিত্যজ বুদ্ধমূর্তি হইলেও হিন্দুরা ইঁহাকে শিবমূর্তি বলিয়া পূজা করে। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একটি অতি প্রাচীন কীর্তি। কিন্তু এই মন্দিরে বৌদ্ধগণ শীতলা দেবীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির ও বোধমন্দির যদিও তিব্বতের দালাইলামার অধীন তথাপি এই দুইটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরের সংস্কারকার্য হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় করিয়া থাকেন। নেপালী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর সন্মুখে পশুবলি দেয় না বটে, কিন্তু হিন্দুমন্দিরে গিয়া তাহারা তথাকার দেবদেবীর উদ্দেশে হিন্দুদের মতই পশুবলি প্রদান করে।

নেপালের বৌদ্ধধর্মের এইরূপ সংমিশ্রিত ও বিকৃত রূপ দেখিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, নেপালের বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে লোপ পাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত হইয়া নেপালের বৌদ্ধধর্ম এক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের এই মিশ্রিত রূপ দর্শন করিয়া অনেকে অবশ্য নেপালে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির আশঙ্কা করিয়া-

হেন কিন্তু তাঁহাদের এই আশঙ্কা অযুক্ত। যত দিন স্বরূপনাথ, বোধনাথ প্রভৃতি মন্দিরের চূড়ার চূড়ার প্রত্নবুদ্ধের কল্পনাপূর্ণ আঁবি অঙ্কিত থাকিবে, যত দিন তাহা মাঝে মাঝে সংরক্ষিত হইয়া

নবরূপ ধারণ করিবে, যত দিন পৃথিবীর চতুর্দিক কোট বৌদ্ধ মরমারী লুপ্তি, নাগুরা প্রভৃতির নাম স্মরণ রাখিবে, তত দিন নেপালে ঐক্যবন্ধের বিলুপ্তি হইবে না।

‘উর্দশী’ ও ‘বিজয়িনী’

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্দশী ও বিজয়িনী কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ণ শিল্প-মৈপুণ্যে সৌন্দর্য্যবোধের তত্ত্বটিকে প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বটি কবি কোন অভিন্নবস্ত্রে আমাদের জ্ঞানগম্য করেন নাই, পরন্তু যে সত্য আমাদের মনোবর্ষে অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে, কবি তাঁহার রসচেতন্য তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কাছে নিবেদন করিয়াছেন। জীবন-বর্ষের সহিত যোগ থাকার জন্য বিশ্বয়টি যেমন এক দিকে বিশ্বব্যাপী সত্যের মর্যাদা পাইয়াছে, অপর দিকে ইহা যতঃই কবিতার মর্যাদা দিয়া সহজ ও সর্বাদুশ্লার স্মৃতি লাভ করিয়াছে।

উর্দশী কি, তাহা বলিতে গিয়া কবি প্রথমেই মেন্তিবাচক শব্দসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে যে পরিচয়গুলির মধ্যে আমরা প্রেমকে সৌন্দর্য্যকে সবচেয়ে নিবিড় ও গভীর ভাবে লাভ করিতে পারি, সে সকলের উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে, উর্দশীকে এ সকল পরিচয়ের মধ্যে বাঁধা যায় না, উর্দশী এই নিবিড় আত্মীয়তার পরিচয়কে ছাড়াইয়া যায়। মাতা, কণ্ঠা, বধু প্রভৃতি স্বাভাবিকের আমরা পরিচয়ভেদে বাঁধি, তাঁহাদের আমরা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করি। তাঁহারা একটি বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া থাকে। কিন্তু উর্দশী যেন আপনার একটি স্বতন্ত্র সত্তা লইয়া জন্মনির স্নেহ, কণ্ঠার সেবা, বধুর প্রেম এ সকলকে ছাড়াইয়া একটি মহাব্যাপ্তি লাভ করিয়া আছে। তাহাকে কোন বিশেষ পরিচয়ে বহিতে গেলে তাহাকে যেন স্বরূপে ধরা যায় না। তাই উর্দশীকে নির্দিষ্ট করিতে গিয়া কবি প্রথমে “ইহা নহে” “ইহা নহে” বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ‘উর্দশী’ কবিতার মধ্যে উর্দশী কি কবি তাহা আভাসে ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি শুধু উর্দশীর প্রকৃতি, উর্দশীর আবেদন ও তাহার কিছ্রা বর্ণনা করিয়া উর্দশী সম্বন্ধে একটি ধারণা দিতে চাহিয়াছেন মাত্র। কবিতাটি আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, বাস্তবিকপক্ষে নানা আভাসে, ইঙ্গিতে একটি ধারণামাত্র দেওয়া চলিতে পারে, উর্দশী কি তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সুকঠিন। ইহা জীবন-বোধের বিষয়, সৌভাগ্য থাকিলে ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। ইহাকে প্রকাশ করা হ্রস্ব ব্যাপার।

এই উর্দশীর প্রতিষ্ঠা কোথায়?—কবি বলিলেন, গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে প্রান্তদেহে স্বর্ণাঙ্কল টানি তুমি কোম গৃহপ্রান্তে নাহি আল সন্ধ্যা-দীপধানি দিবার জড়িত পদে কল্পবকে মন্ত্র নেত্রপাতে শিথলাভে নাহি চল সলজ্জিত বাসর-সজ্জাতে শুদ্ধ অর্জুনাতে।

কবি আমাদের জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত মনোরম দুইটি পরিবেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সন্ধ্যাদীপ-আলা কুটীর-ধানিতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও শান্তি সম্মিলিত রহিয়াছে, আর প্রিয়মিলনায়সে প্রতিজ্ঞিত বাসর-সজ্জাটি তাহার বিশেষ মোহমদিরতা লইয়া আমাদের পক্ষে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং আকাঙ্ক্ষিত এই পরিবেশের মধ্যে উর্দশী বরা দেয় না। জীবনে উর্দশীর যখন আবির্ভাব হয় তখন সহসা আমাদের জীবনের সহিত তাহার নিগূঢ় সংযোগটি খুঁজিয়া পাই না, জীবনের মধ্যে তাহাকে সহজ পরিচয়ে মিলাইয়া লইতে পারি না। একটা অতাবনীততা লইয়া অপরিচিততার পরিচয়ে আমাদের চেতনাকে সে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন দেখি—

উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা—

তুমি অহুষ্ঠিতা।

জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ খুঁজিয়া পাই না। অথচ “উষার উদয়সম” এমন সহজে এমন মহিমায়, কোম আবরণ কোম কুণ্ঠা না রাখিয়া সে আত্মপ্রকাশ করে যে, তাহাকে ভুল সুবিবার সম্ভাবনা নাই, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের চেতনাকে এই উর্দশী যখনই স্পর্শ করিয়া যায় তখনই তাহাকে নির্কিচরে মানিয়া লইতে হয়। এ আত্ম-প্রকাশের ইতিহাস নাই, কোম ক্রমবিকাশের ধারা নাই, “বৃন্তহীন পুষ্পসম” এ আপনাতো আপনি বিকশিত হইয়া উঠে।

অথচ কবি জীবনের মধ্যে ইহার স্বীকৃতিকে স্পষ্ট করিয়া বহিতে পারিলেন না। তাহার জন্য একটি লোকাভীত পট-ছমিকা খুঁটি করিয়া উর্দশীর আবির্ভাবটি বুঝাইতে চাহিলেন। আমাদের পুরাণে যে উর্দশীর আবির্ভাবের কথা বলা

হইয়াছে, কবি তাহার সহিত এই উর্কবশীর উপমা দিলেন। এখানে সর্বোপরি এই কথাটি জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পুরাণের উর্কবশী আর কবির উর্কবশী এক নয়। পুরাণের উর্কবশী একটি অলৌকিক কাহিনীর নায়িকামাত্র এবং কবির উর্কবশী সৌন্দর্য-তত্ত্ব-স্বরূপা, ভাব-স্বরূপা। পুরাণের উর্কবশীর মধ্যে যদি এই সৌন্দর্য্যভবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে তাহা আমাদের দ্বারাই আরোপিত, পুরাণকার সে অর্থে উর্কবশীর পরিকল্পনা করেন নাই। কয়েকটি কারণে পুরাণের উর্কবশীর সহিত কবি এই উর্কবশীর উপমা দিয়াছেন। পুরাণের উর্কবশী কাহারও সহিত সম্পর্কিত নয়, তাহার মধ্যে সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, তাহার নৃত্যগীতে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের প্রকাশ এবং তাহার এক হাতে সুধাপাত্র অঙ্গ হাতে বিষ-ভাণ্ড। কিন্তু এই কারণগুলিও বাহ্য, মূল কারণটি হইল রসস্থিতির প্রয়োজনীয়তা। ইহার কথা পরে আলোচনা করা যাইবে।

কবি বলিতেছেন, উর্কবশী যখন আবির্ভূত হয়, তখন সে আপনার মধ্যেই আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় লইয়া আসে। এক দিন এক অস্থূল যুগুর্ভে আমাদের জীবন-সাগর মগ্নিত করিয়া সে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন আমাদের চেতনার একটি নূতন বোম জাগিয়া উঠে, তাহা উর্কবশী-বোম বা সৌন্দর্য্য-বোম। এই সৌন্দর্য্যকে আমরা উর্কবশীরূপে মূর্ত্ত দেখি, সেইরূপ আমাদের মধ্যে প্রথম যে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি জাগিয়া দিয়া যায়, তাহাতেই আমাদের চেতনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই উর্কবশীর এক হাতে রহিয়াছে সুধাপাত্র—সে আমাদের দিগকে আনন্দ দেয়, আমাদের প্রেমকে প্রবুদ্ধ করে। ইহাই তাহার সুধা। তাহার আর এক হাতে রহিয়াছে বিষভাণ্ড—তাহাকে লাভ করিতে আমরা বাসনা-ব্যাকুল হইয়া উঠি, বিক্ষুব্ধ হই, বেদনা পাই। ইহাই তাহার বিষ। এই হাসি-অশ্রু, পাওয়া-না-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, সুধা ও বিষের ক্রিয়া একই সঙ্গে চলিতে থাকে এবং তাহার মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন সৌন্দর্য্যবোধে লীলায়িত হইয়া উঠে। আমাদের চেতনাকে এই উর্কবশী যেদিন স্পর্শ করিয়া যায়, সেই দিনই তাহাকে প্রথম দেখি এবং পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে দেখি। তাহার মধ্যে অসম্পূর্ণতা নাই, তাহা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পরিচিত হয় না—

“যখনি জাগিলে বিধে যৌবনগঠিতা পূর্ণ প্রফুল্লিতা,”
এই সৌন্দর্য্যবোধ বিধের সকলেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত।
সেইজন্য—

যুগযুগান্তর হ’তে ভূমি শুধু বিশ্বের প্রেরণী

হে অপূর্ণ শোভনা উর্কবশী।

এই সৌন্দর্য্য-সত্তাকে মুনিগণ নিরঞ্জন মূর্ত্তিতে ধ্যান করেন, আর যখনই তাহাকে রূপের মধ্যে প্রকাশিত দেখেন, তখনই তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হয়, তখন রূপের মধ্যে তাহাদের আরাধ্যকে দেখিয়া তাহারা পূর্বের তপস্বীতাকে ভুজ্ঞ করেন।

সৌন্দর্য্য-সত্তার নিরঞ্জন মূর্ত্তি ঋষিদের ধ্যানের বিষয়, আর তার রঞ্জনমূর্ত্তি মানব-সাধারণের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সৌন্দর্য্য-সত্তার এই রঞ্জনমূর্ত্তিকেই কবি উর্কবশী বলিয়াছেন, যে উর্কবশী ডান হাতে সুধাপাত্র ও বাম হাতে বিষভাণ্ড লইয়া একদা আমাদের জীবন-সাগর মগ্নিত করিয়া আবির্ভূত হয়। তাহার স্পর্শে জিহুবন যৌবনচঞ্চল হইয়া উঠে, রসিকচিত্তকে তাহা লুপ্ত করে, সঙ্গীতযুগল করে। বিহ্যন্তের চাঞ্চল্য লইয়া সেই আকুলাকালা যখন মায়ী বিস্তার করিয়া যায়, তখন নিখিল বিশ্ব তাহাকে অহুসরণ করে।

এই রঞ্জনমূর্ত্তিতে উর্কবশী যখন আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করে তখন তাহাতে বিচিত্র সৌন্দর্য্য-স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :

অরসভাভলে যবে নৃত্য কর পূলকে উল্লসি,

হে বিলোলহিলোল উর্কবশী,

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিদ্ধমাবে তরঙ্গের দল—

শতশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল

ভব তনহার হ’তে নভতলে ধসি পড়ে তারা

অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা

নাচে রক্তধারা

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচরিতে

অরি অসম্বৃত্তে।

এই সৌন্দর্য্য-স্বরূপে পুরুষের চিত্ত, অর্থাৎ রসিকের চিত্ত তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া সে আত্মহারা হইয়া যায়। এই যে বিশ্বজগতে বিভিন্ন রূপের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ভোক্তা, ইহা উর্কবশীর বিভিন্ন প্রকাশলীলা মাত্র। এই বছর মধ্যে কবি যে একক ভাব-মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছেন, ইহাই কবির উর্কবশী।

এইখানে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে। কবি যদি বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য-সত্তাকে অরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে ইহা কাব্যের বিষয় না হইয়া দার্শনিক আলোচনার পর্য্যবসিত হইত এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। কিন্তু যাহা অদেহী, যাহা বিশ্বব্যাপি রহিয়াছে তাহাকেই রঞ্জনমূর্ত্তিতে পরিচিত করিতে চাহিয়া কবি এক দিকে যেমন বিষয়টিকে বোধের বিষয়, তথা কাব্যের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ইহাকে আত্মসে ইঙ্গিতে রাখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কাব্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রঞ্জনমূর্ত্তিতে প্রকাশিত এই উর্কবশী কিরূপ? সিদ্ধমাবে তরঙ্গের যে আন্দোলন, দক্ষিণ বাতাসে শতশীর্ষের যে শিহরণ, নভতলে তারকার যে স্পন্দন, অন্তরবির বর্ণচ্ছটার দিগন্তে সহসা যে সৌন্দর্য্যোদ্ভাসন,—ইহাদের মধ্যে উর্কবশীর রূপ-জ্যোতিটি বিকীর্ণ হইতেছে। এগুলির মধ্য দিয়া আমরা কণে কণে

উর্ধ্বশীর আভাস পাই, এগুলি উর্ধ্বশীর সত্তাকে প্রমাণিত করে, পরিচিত করে। কিন্তু উর্ধ্বশীর স্বরূপ কি? এই খণ্ড বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য-উৎসগুলি হইতে যে জাবণ্য বিকীর্ণ হইতেছে তাহার সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা কোন্ পরিপূর্ণ মূর্তিতে বিকশিত, কোন্ সাধনার ভাষা লভ্য?

কবি একটি অল্পক্ষেত্রে প্রগগুলির উত্তর দিয়াছেন। ইহাতেই বিষয়বস্তুটি ব্যক্ত হইয়াছে। কবির উত্তরটি জীবন-বোধ হইতে সঞ্জাত বলিয়া ইহা বুঝিবার জন্যও গভীর বোধের প্রয়োজন। এই অল্পক্ষেত্রে গভীর অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনা-ময়। যদি আমরা বোধ দিয়া এই উত্তরটি ঘরিতে না পারি তবে বিচার-তর্কের দ্বারা কখনও ইহা বুঝিতে সক্ষম হইব না। কবিগুরু এখানে উত্তরটি আমাদের বোধের উপর ছাড়িয়া দিয়া রুমহান্ কবি-কৃতি দেখাইয়াছেন। বিষয়টি বুঝিবার পূর্বে প্রগগুলিকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া যাক।

আমরা বিশ্বজগতে রূপের মধ্যে কান্তির যে প্রকাশ দেখি তাহা আমাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আমাদের চেতনার বিকাশে আমাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি গভীরা উঠে। যাহার চেতনার বিকাশ হয় নাই তাহার সৌন্দর্য্যবোধ নাই। সে বিশ্বজগতে রূপকে অতিশয় স্থূলভাবে দেখে, রূপের অন্তঃস্থিত কান্তিকে সে দেখিতে পায় না। রূপ হইল চোখের দেখা, কান্তি হইল মনের দেখা; এই মনোবিকাশ যাহার হয় নাই, পৃথিবী তাহার কাছে রূপের জড়পিণ্ড মাত্র। এক উচ্চতর মানসিকতায় আমাদের মধ্যে এই সৌন্দর্য্য-বোধটি জাগিয়া উঠে। তখন আমরা বিভিন্ন রূপের মধ্যে কান্তির ভোতনা দেখিতে পাই। উর্ধ্বশীর আবির্ভাব আমাদের জীবনে এই সৌন্দর্য্য-বোধের আবির্ভাব। আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের চেতনাকে এক দিন সহসা স্পর্শ করিয়া যায়, আমরা রূপজগতে কান্তির মধ্যে জাগিয়া উঠি। তখন আমাদের নয়ন-সম্মুখে কান্তির দ্যুতি খেলিয়া যায় এবং বিশ্বজগৎ এই কান্তিতে পরিব্যাপ্ত দেখি। এখানে কান্তি একটা ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া’ হিসাবে আমাদের বোধে অমুভূত হয়, ইহা বিচার-বুদ্ধির অতীত। এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—“এক হিসাবে সৌন্দর্য্যমাত্রই অ্যাবস্ট্রাক্ট; সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস-সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ উর্ধ্বশী তাহারই প্রতীক। এর মধ্যে কেবল অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্য্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য্য, সেই সঙ্গে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহ আছে।”

উর্ধ্বশী-কল্পনার মধ্য দিয়া প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্য্যের কথাই বলিতে চান। পৌরাণিক উর্ধ্বশীর মধ্যে পুরাণকার এই তত্ত্বটি সন্নিবেশিত করেন নাই,

রবীন্দ্রনাথ উর্ধ্বশীর মধ্য দিয়া সেই তত্ত্বটিকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। উর্ধ্বশী যতক্ষণ পৌরাণিক উর্ধ্বশী ততক্ষণ, “উর্ধ্বশীতে সেই অনির্জনীয়তা দেহধারণ করেছে, সুতরাং তা অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়”। ততক্ষণ উর্ধ্বশী নারীর দেহ—সৌন্দর্য্যই পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে দিয়া কান্তির উপযুক্ত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যদি ‘স্বর্গীর’ মূর্তিটির মধ্য দিয়া তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত না করিতেন তবে বিষয়টির কোন কাব্যসুষ্ঠি থাকিত না। কাব্যের বিষয় আমাদের রসচেতনাকে স্পর্শ করিবার অপেক্ষা রাখে, নতুবা তাহা আমাদের বোধে সঞ্চারিত হয় না। পৌরাণিক উর্ধ্বশীর উল্লেখমাত্রই আমাদের রসলোকের ভূমি প্রস্তুত হইয়া যায়, আমাদের মন একটি মোহ, একটি বাসনার মধ্য দিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়ে—সক্রিয় হইয়া উঠে। আমাদের চিত্তকে এই সচেতনতা-দিবার জড়ই কবি কৌশলে উর্ধ্বশী-মূর্তির আশ্রয় লইয়াছেন। এই যে সচেতনতা ইহা আমরা আমাদের জীবন-বোধ হইতে গ্রহণ করি। এই জীবন-বোধের ভূমিকার কাব্যের রস আমাদের মধ্যে সহজে সঞ্চারিত হইয়া যায়। এই পৌরাণিক উর্ধ্বশী-মূর্তি যাহা কবি “নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতীক” বলিয়াছেন, ইহা কবির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

যদি কান্তিকে বুঝাইতে গিয়া কবি কান্তির আধারটিকেই বুঝাইতেন তাহা হইলে পৌরাণিক উর্ধ্বশীর বর্ণনায় কবিতাটির সমাপ্তি ঘটিত, কিন্তু যে আধারের মধ্যে কান্তির প্রকাশ, সেই আধারই কান্তির চরম পরিচয় নয়। কারণ আধার সীমাবদ্ধ, কান্তি একটা অসীম ভাব-সত্তা। তাই কবি ইহাকে কোন সীমার পরিচয়ে চরম করিয়া বাধিতে পারিলেন না। বলিলেন—নহ মাভা, নহ কভা, নহ বধু। আবার পৌরাণিক উর্ধ্বশীমূর্তি কবির উর্ধ্বশীর কাল্পনিক আধার মাত্র। কিন্তু ঐ পৌরাণিক উর্ধ্বশী-পাত্রের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যসত্তার প্রকাশ তাহা ত কোনও তত্ত্বের সীমার বদ্ধ নহে, তাহার মধ্যে ত কোন স্থূলতা নাই—তাহাকে আমরা রূপের মধ্যে প্রকাশিত দেখি বটে, কিন্তু তার চরম সত্য ত রূপের মধ্যে নাই। রূপ তাহার প্রকাশের আধার মাত্র। আকাশের মাধ্যমে যেমন আলোর প্রকাশ, আলোর রহস্য আমরা জানি না; তেমনি রূপের মাধ্যমে কান্তির প্রকাশ, কান্তির রহস্য আমাদের অমর্শিগম্য। রূপের মধ্যে রহস্যময়তা নাই, রূপের মধ্যে কান্তির যে দ্যোতনা, তাহাতেই রহস্যময়তা রহিয়াছে। কান্তির এই রহস্যময়তার কথাই বলিতে গিয়া কবি দ্বিতীয় বার উর্ধ্বশীর বর্ণনা করিলেন। ইহার সহিত প্রথম বর্ণনার বিরোধ রহিল না, পরন্তু পৌরাণিক উর্ধ্বশীকেই কবি এই সংযোজনটুকুর দ্বারা আপনার উর্ধ্বশী করিয়া লইলেন। সংযোজনটুকু এইরূপ :

বর্ণের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষনী

হে ভুবনমোহিনী উর্ধ্বশী।

জগতের অশ্রুধারে ধৌত ভব তহুর তনিমা
জ্বলোকের হৃদিরক্তে আঁকা ভব চরণ-শোণিমা
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার—
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

অখিল যানন-বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী

হে স্বপ্ন-সঙ্গিনী।

কবি বলিলেন, উর্কশী যেখানে মূর্তিমতী, সে স্থান আমাদের এই লৌকিক জগতে নয়, তাহার পরিবেশ আলৌকিক, তাহা বর্ণের উদয়াচলে, তাহা আমাদের একটি কল্পনার রাজ্য। এই রহস্যলোকে রহস্তময়ী উর্কশী মূর্তিমতী হইয়া রহিয়াছে। সে মূর্তি কিরূপ? তাহা তহুর নয়, তাহা তহুর তনিমা, তাহার মধ্যে তহুর একটি স্বভাব যেন রহিয়াছে মাত্র, তহুর সুলভা নাই। আমরা রূপজগতে তহুর মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখি, তাই তহুর ভাবেই তাহাকে ধারণা করিতে পারি। উর্কশীর মধ্যে তাই তহুর যেন ভাব রহিয়াছে—তহু নাই। তাহার চরণও যেন কল্পনায় আসে না, চরণ-শোণিমাটি আমরা অমৃত্যব করিতে পারি মাত্র। উর্কশীমূর্তির এই দুইটি ইঙ্গিত মাত্র কবি দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক বর্ণনা তিনি দেন নাই। কারণ উর্কশী বর্ণনার অতীত, কোন রূপের বর্ণনাতেই সেই ভাব-সত্তাটিকে ধরিতে পারা যায় না। আরও দুইটি কথা কবি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—‘মুক্তবেণী’ ও ‘বিবসনে’। মুক্তবেণী অর্থে বুঝায়, যে সৌন্দর্য্যোপকরণ দ্বারা এই সৌন্দর্য্য-সত্তা গঠিত, তাহা সহজ এবং মুক্ত। তাহাতে জটিলতা বা বদ্ধতা নাই। ‘বিবসনা’ কথায় বুঝায়—এই সৌন্দর্য্য-সত্তার প্রকাশ উমুক্ত, কোন আবরণে সে আপনাকে গোপন করে নাই।

এই তনিমা ও চরণ-শোণিমা কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে? কবি বলিলেন, “জগতের অশ্রুধারে ধৌত ভব তহুর তনিমা।” উর্কশীর তনিমা বিশ্বের অশ্রুধারায় ধৌত, তাহার চরণ-শোণিমা নিখিলের হৃদিরক্তে আঁকা—আমাদের অশ্রু, আমাদের হৃদিরক্তই উর্কশী-মূর্তির উপাদান। অর্থাৎ, ইহা আমাদের বোধ-সজ্জাত। রূপের মধ্যে সৌন্দর্য্য-সত্তার প্রকাশ যখন দেখি তখন আমাদের অশ্রু রূপের মধ্য হইতে সেই রূপাভীতকে গড়িয়া তোলে, এই সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে আমাদের হৃদয় হইতে যত রক্ত ক্রমিত হয় আমাদের কল্পলোকে ততই তাহার চরণধানি অধরঞ্জিত হইয়া উঠে। আনন্দের বেদনায় আমাদের অশ্রুর নির্গমন, পাওয়ার একান্ত আকাঙ্ক্ষায় আমাদের হৃদিরক্তের ক্ষরণ। এই আনন্দ-বেদনাতেই বাহা দেহহীন সৌন্দর্য্য-সত্তামাত্র ছিল, তাহাতে যেন দেহের ভাব উপলব্ধি করি, এই হৃদিরক্তের ক্ষরণেই যেন তাহার চরণের আভাস পাই। এইরূপে

আমাদের বোধের মধ্য দিয়া রূপনিবপেক্ষ একটি কান্তিমূর্তি রঞ্জিত হইয়া উঠে। অরূপ সত্তাটি রূপের মধ্য দিয়া আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে এবং আমাদের বোধ তাহাকে একটি রূপের ভাবে কল্পলোকে মূর্তিতে গড়িয়া তোলে। ইহাই উর্কশীর রঞ্জনমূর্তি। এই রঞ্জনমূর্তি প্রকাশ করিবার বিষয় নয়, বর্ণনা করিবার উপাদান ইহাতে নাই, শুধু যাহার অশ্রুধারায় ও হৃদিরক্তে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা তাহারই একান্ত উপলব্ধির বিষয়; যাহারই বাসনা বিকশিত হইয়াছে, সে-ই এই উর্কশীকে বুঝিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের বিকশিত বাসনার কাছেই রূপসৌন্দর্য্য আপনাকে নিবেদন করে। সেই বিকশিত বাসনা-পদের উপর উর্কশী তাহার ‘অভিলষুভার’ চরণধানি রাখিয়াছে। তাহার চরণ অভিলষুভার, ইহাতে তহুর সুলভা নাই। আমাদের কল্পলোকে বাসনা-পদের আসনে অশ্রু-ধারায় এবং হৃদয়ের রক্তক্ষরণে মূর্তিমতী এই উর্কশী বিরাজ করিতেছে—সে আমাদের নিত্য স্বপ্নসঙ্গিনী।

ইহার পর কবি বলিলেন, এই যে উর্কশীবোধ, যাহা আমাদের জীবনে এক অমুকুল মূর্তিতে আগিয়া উঠে, তাহা আর কিরিয়া আসে না। যে রূপের মধ্যে একবার তাহার আবির্ভাব আর তাহাকে সেখানে বুঝিয়া পাই না। সে আমাদের মধ্যে বিপুল আনন্দ, অপার বাসনা জাগাইয়া দিয়া যায়, কিন্তু তাহাকে আর বুঝিয়া পাই না, রূপের মধ্যে তাহাকে পুনরায় ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া কিরিয়া আসি। তাহারই বাসনার বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিয়া ফিরি, একান্তভাবে তাহাকে আশা করি, কিন্তু তাহাকে পাই না। আমাদের সেই একান্ত বাঞ্ছিত উর্কশীর সহিত একটি চিরকালের বিরোধ সৃষ্টি হইয়া যায়। তাই জগতে রূপের মধ্যে যেখানে যত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, সে সবই সেই উর্কশীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।” ঋণ্ডিত সৌন্দর্য্য আমাদের কাছে অথবৎ সৌন্দর্য্যের প্রতি তৃষ্ণাও ব্যাকুল করিয়া রাখে। তাহাকে পাই না, কিন্তু তাহার জন্ত আশা আমাদের জীবনের যাত্রা-টিকে গতিশীল করিয়া রাখে।

পরিশেষে উর্কশী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—“আদর্শ রহণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The Beautiful, এক ভাগে The Good পড়ে।” উর্কশী কবিতার প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে, ‘স্বর্ণ হইতে বিদায়ে’ দ্বিতীয় উল্লেখ পাওয়া যায়। উর্কশী কবিতার আলোচনায় এই উক্তিটির তাৎপর্য্য সহজে বুঝিয়া পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য যখন ধরাছোঁয়ার অতীত একটা সত্তা তখন তাহার মধ্যে ভালমন্দ বিভাগ নাই। ভালমন্দ বিভাগ মনুষ্যকৃত আদর্শের অমুখারী। ভালর আদর্শে যে সৌন্দর্য্য-বোধ, তাহাই লক্ষ্যরূপে আমাদের কল্পনার মূর্তি হইয়াছে। এখানে নিরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সত্তার ‘ডিনোটেশন’ করিয়া আসি—

রাছে। নিরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সত্তা ভালমন্দ বিচারের অতীত। আমাদের জীবনে আগে সৌন্দর্য্য-বোধ, তারপর তারপরে ভাবনা-বোধের প্রতিষ্ঠা। এই সৌন্দর্য্য-বোধে তাই ভালমন্দ, সুখদুঃখ, সুখ ও বিষ একত্র সমন্বিত হইয়া আছে। চিত্রায় রবীন্দ্রনাথ যে উর্ধ্বশীর্ষ কথা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'বলাকা'র উর্ধ্বশীর্ষ ও লক্ষ্যের একটা তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তখন উর্ধ্বশীর্ষ এই পৌরসিকতা (priority) রক্ষা করেন নাই। তখন লক্ষ্যের মান-দণ্ডে উর্ধ্বশীর্ষকে হারিয়ে দিয়া উর্ধ্বশীর্ষ অর্থ সংকীর্ণ করিয়াছেন। বলাকার রবীন্দ্রনাথ যে উর্ধ্বশীর্ষ কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পুরাণের উর্ধ্বশীর্ষ—

একজন তপোভদ্র করি—

উচ্চহাস্য-স্মরণসে কান্তদের সুরাপাত্ত তরি'

নিরে যায় প্রাণ মন হরি'—

হুহাতে ছড়ার তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে

রাগরস কিংবদন্তে গোলাপে

নিজাঙ্গীল যৌবনের গানে।

নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ এ উর্ধ্বশীর্ষ তারই প্রতীক। কিন্তু ইহার মধ্যে নিরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সত্তার ভঙ্গ নাই। চিত্রায় উর্ধ্বশীর্ষ মধ্যেও এ গুণগুলি রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও অতিরিক্ত একটা ব্যাপকতা রহিয়াছে, তাহা সেই সংযোজনটুকুর ব্যাখ্যার দেখাইয়াছি।

তাহা হইলে বলাকার উর্ধ্বশীর্ষ যেমন নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতীক, চিত্রায় উর্ধ্বশীর্ষ ভঙ্গ-বর্ণনা, ভাব-বর্ণনা বলিয়া তাহাকে কেবল মাত্র নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতীক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কবি কাব্যের প্রয়োজনে পৌরাণিক নারী-মূর্ত্তির সাহায্য লইয়াছেন। কোন পৌরাণিক পুরুষ-মূর্ত্তির কল্পনাতেও কবি কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণনা করিতে পারিতেন, অতঃ কোম পাঠিকা সেই ভাবে কবিতাটি বুঝিতে চাহিলে, তাহার কিছুমাত্র ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি তাহার মধ্য দিয়া একই ভঙ্গ গিয়া পৌছাইবেন।

বিজয়িনী কবিতাভেদেও কবি এই নিরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সত্তার পরিচয় দিয়াছেন। পৃথিবীর পরিবেশে উর্ধ্বশীর্ষ-বোধের যে ভাবধন ব্যঞ্জনাটি সৃষ্টি হইতে পারে বিজয়িনী কবিতার তাহারই কাব্যিক অঙ্গবাদ দিয়াছেন। আমাদের জীবনে যে একটি অমূল্য মুহূর্ত্তে উর্ধ্বশীর্ষ-বোধ জাগিয়া উঠে, তেমনই একটি ক্ষণকে কবি এই কবিতায় ধরিয়াছেন। এখানেও কবি বিজয়িনীর কোন বর্ণনা দেন নাই—যে পরিবেশের মধ্যে বিজয়িনী আপনাকে প্রকাশ করে সেই পরিবেশের কথাই বলিয়াছেন। অথচ এত নৈপুণ্যের সহিত পরিবেশটি বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়িনীর রঞ্জিত মূর্ত্তি যেন আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই।

উর্ধ্বশীর্ষ-বোধের সময় আমাদের জীবনে প্রথম যেমন প্রেমামুহূর্ত্তির অমূল্য মুহূর্ত্তের আবির্ভাব হয়, বিজয়িনী যখন স্নানে আসিতেছিল, তখনও পৃথিবীতে একটি অমূল্য মুহূর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অচ্ছাদ সরসীমীরে রমণী যে দিন
মায়িকা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সে দিন কিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিনী—
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া—
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি।

উর্ধ্বশীর্ষ কবিতায় বক্তব্যটি রসোত্তীর্ণ করিবার জন্য কবি যেমন পৌরাণিক উর্ধ্বশীর্ষ-মূর্ত্তির সাহায্য লইয়াছেন, এখানেও তেমন স্নানার্থিনীর উল্লেখ করিয়া আমাদের মনের রস-ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন। ভরুণী নারীর স্নানলীলার উল্লেখ আমাদের চিত্ত যে সৌন্দর্য্য-রসে ও বাসনার আগ্রহ হইয়া উঠে তাই কবির বক্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায়। আমাদের চিত্তের এই ক্ষিপ্রাটিকেই কবির বক্তব্যটি অতিব্যক্ত হইয়া উঠে। বিজয়িনী যে-সৌন্দর্য্য-শ্রেষ্ঠা, সে যে আমাদের কামনা-বাসনার কেন্দ্র—কত সহজে, নিপুণতার সহিত কবি সেই সমস্তটিকে আমাদের বোধগোচর করিয়া দিয়াছেন।

ইহার পর কবি প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করিয়াছেন। উর্ধ্বশীর্ষ-বোধের সময় আমরা পৃথিবীর যে নুতন, মধুর পরিবেশের মধ্যে, যে কান্তি-জগতের মধ্যে জাগিয়া উঠি, ইহা সেই পরিবেশ। এই অমূল্যমুহূর্ত্তে অপূর্ণ নৈপুণ্যে কবি কান্তি-ময় পৃথিবীর পরিচয় দিয়াছেন। উর্ধ্বশীর্ষ-বোধের সময়েই রূপ-জগতের মধ্যে এই কান্তির জগৎটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য্য-বোধ যখন আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন বিধে চতুর্দিকে যেন মধুর রাগিণী ধ্বনিত হইতে দেখি; তখন পৃথিবীতে যে-সকল রূপবস্তুর এক দিন সামান্য বলিয়া, সাধারণ বলিয়া দেখিতেছিলাম, তাহারা একটি নুতন পরিচয় লইয়া আসে, তাহাদের মধ্যে একটি তাৎপর্য্য, একটি সার্থকতা দেখিতে পাই। তখন সেই বসন্ত-দিনের প্রভাতটিতে শুধু খুল রূপই দেখি না, কত স্পন্দন-কম্পন, কত নিখাস-উচ্ছ্বাস, কত ভাস-আভাস ধরা পড়ে, এ সকলই রূপের অন্তর্গত একটি ভাব-সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে। এই সৌন্দর্য্যবোধের পূর্বে বসন্তকালে শুধু রূপই দেখিয়াছিলাম, এখন রূপের অন্তর্গত ভাবের সুরণ দেখিলাম। দেখিলাম ছায়া ও রৌদ্রকর, অরণ্যের স্রুতি এবং পাতার মন্মথ; অর্থাৎ আলো এবং অন্ধকার, শুষ্কতা এবং মৃদুতা উভয়ের সহিত এই উপকরণ-গুলি মিশ্রিত রূপ-জগতের মধ্যে যেন একটা ভাবের কাহিনী রচনা করিয়া চলিতেছে। আজ যেন আকাশের আলো বেদনার সঙ্গীতে বাজিয়া উঠিতেছে। এমনই বিভিন্ন রূপবস্তু হইতে একটা ভাব, একটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইতেছে এবং

সকলেই পরস্পরের সহিত একটি সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রাখা করিয়া এই পৃথিবীর পরিবেশে সুবিমল হইয়া আছে। পুষ্পের মিশ্র বস্তুচাঁড়ি, কোকিলের বিকল কাকলি, মিররিগীর কল-মৃত্যু, সারসের মধুর স্তম্ভিতসিমা, বলাকার চঞ্চল গতি, বনগন্ধ-বহু শ্রাব্য বায়ুর উত্তপ্ত প্রবাহ—এ সকল বিভিন্ন রূপ যেমন ছন্দমিল রাখা করিয়া একটি অর্থপূর্ণ সুন্দর কাব্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে মন-দেবতা যখন ভোগে বাঁধিতে গেল, তখন সে পরাস্ত হইল। এই বিজয়িনী ভ ভোগের সীমার মধ্যে থরা দেয় না, এই সৌন্দর্য্যসত্তা যে বিধ ব্যাপিয়া বিরাজ-মান—ভোগে ইহাকে সীমার মধ্যে চরম করিয়া পাইবে কেমন করিয়া। রূপের মধ্যে ইহার প্রকাশ দেখিয়া আমরা রূপকে বরিতে চাই; ইহাতে শুধু রূপের দ্বারা মাঝে ঠুকিয়া মরি মাত্র, কান্তিকে বহুবিস্তারের মধ্যে বরিতে পারি না। কান্তি আমা-দের চেতনাকে স্পর্শ করিয়া, আমাদেরকে বাসনা-চঞ্চল করিয়া

ভোগে, আমাদের মধ্যে অভিন্ন উপলব্ধি আনিয়া দেয়। কিন্তু কান্তিকে উপলব্ধিই করা যায়, তাহাকে ভোগ করা যায় না। ভোগের জন্য আমরা তাহার আবারটিকে মুষ্টির তিতর চাপিয়া বসি—বাসনা-বিকৃত হইয়া উঠি, আমাদের বোবাটি সুর হয়, কান্তি অন্তর্দাম করে। কান্তির সহিত আমরা এই উপলব্ধির সম্পর্কটি পাতাইতে পারি মাত্র—পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সেখানে প্রকাশ, অন্তরের স্বীকৃতি দ্বারা তাহাকে প্রণাম জানাইতে পারি মাত্র—ভোজ্য ও ভোক্তার সম্পর্ক সেখানে থাকিতে পারে না। ইহা একটি অস্বাভাবিক ভোগ-মাত্র, খুল দেহগত ভোগ মত—দেহের মধ্যে তাহাকে আশ্রয় করা যায় না। মন-দেবও সৌন্দর্য্য-সত্তার কাছে প্রণাম জানাইয়াছেন—ইহাই সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্য-রসিকের যথার্থ সম্পর্ক। রূপের মাধ্যমে যেখানেই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মন সেখানেই ভোগলিপ। কিন্তু যে কান্তি-সত্তা উপলব্ধির বিষয়, কবি মনকেও সেখানে প্রণত করিয়াছেন।

ফাল্গুন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মহান মোহন—পুষ্পাভরণে সজ্জা করিয়া এল,
বিচিহ্নতার চিত্র-বিভবে চিত্ত ভরিয়া এল।
শীতের কুহেলি কাটিয়া গিয়াছে, আকাশ সুনির্মল,
এল প্রফুল্ল ফাল্গুন, এল স্থলে জলে উচ্ছল।

কে জানে কখন বহিবে দখিনা অকস্মাতের কুলে,
সারা অরণ্যে শিহর লাগিবে, ছন্দ উঠিবে তুলে,
হৃদয়-নদীতে কলধ্বনিতে বহিবে স্রোতের ধারা,
জাগিবে জীবন, চারি দিক পানে চাহিবে আশ্বাসায়া।

তুমি কি আসিবে, চাহিবে আবার দীঘল দু-আঁধি তুলে ?
ভুলে-বাওয়া কথা কল-গুঞ্জে বলিবে আবার তুলে ?
স্বরের মতন শুনে যাব শুধু, কে করে অর্থ-স্তার ?
দূরের বন্ধু নিকটে আসিবে, ছাড়িয়া যাবে না আর।

মাঘী পূর্ণিমা এসে কবে বুঝি চ'লে গেছে নাহি জানি,
সেদিন কি-ভুলে চাহিনি উর্কে, শুনিনি তোমার বাণী।
সেই বঞ্চিত মুহূর্ত্তগুলি অঞ্চলে ভরি' অরি,
এস স্বপ্নের বেদনার পারে চঞ্চল মায়াময়ী।

এল ফাল্গুন, ফুলে ফুলে তাই কুঞ্জ ভরিয়া গেল,
বিচলিত যত শুক পত্র শূন্যে ঝরিয়া গেল।
বনে বনে স্রু বাতুল বায়ুর ব্যাকুল আন্দোলন,
কোন দেবতার বাতুল চরণে জীবনের নিবেদন।

ফুল-ফোঁটানোর সঙ্গীতে যেনে ঝরা-পত্রের গান;
বাওয়া ও আসার পদধ্বনিতে এ-পথ স্পন্দমান।
এস অশান্ত, এস বসন্ত, এস তুমি, বারে বারে
জীবনের বীণা বাজিয়া উঠুক অপূর্ণ স্বপ্নারে।

ভারতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শ্রীহরিহর শেঠ

পশ্চিম যেমন গিরি লজ্জনের সাধ হয়, রামনের যেমন চাঁদে হাত দিবার ইচ্ছা হয়, আজ কতকটা আমার দশাও তাহাই। আমাদের দেশে রাজনীতি ও রাষ্ট্রসেবা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি এবং সরকারের দশ কোটি টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর এই বৃহত্তম নির্বাচন উপলক্ষে সর্বত্র যাহা হইতেছে, সংবাদপত্র মারফত অনেক বিষয়—অচিন্তিতপূর্ব ব্যাপার যাহা অবগত হইতেছি, রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জ্ঞান, রাষ্ট্রের উন্নয়ন—জ্ঞান দেশসেবক নেতা অ-নেতাদের যে অক্লান্ত ছুটাছুটি ও অমাহুষিক পরিশ্রম করিতে দেখিতেছি ও হয়ত বা অপরিপাক্ত অর্থব্যয় করিতেছেন বলিয়া অমুভবে আসিতেছে, তাহাতে উহা সামান্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের একটা অতি বৃহৎ সংস্করণ ভিন্ন আমার দৃষ্টিতে ত আর তেমন বেশী কিছু ঠেকিতেছে না। অতিরিক্ত যাহা পাইতেছি, তাহা আর কিছুই নহে—দেশব্যাপী উৎসাহী বিশুদ্ধ ও কপট দেশসেবকদের মধ্যে দুর্নীতি, অসাধুতা সংস্পর্শহীন খাঁটি লোকদিগকে বাছিয়া লইবার জ্ঞান আইন প্রণয়ন দ্বারা একটা নতুন ব্যবস্থা।

কোথায় মনে করিয়াছিলাম, আয়োজনের বিরাট ব্যবস্থা ভিন্ন বৃহৎ ব্যাপারে নতুন ও অসাধারণ কিছু দেখিব। গাড়ী মোটর রিক্স করিয়া নির্বাচকদিগকে আনার সঙ্গে এবার হয়ত বা নবীনতর প্লেনের ব্যবহার বা ঐ মত কিছু কিছু দেখিতে পাইব। কিন্তু মুখের স্বাধীনতা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বা দলবিশেষের মধ্যে বা উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কথা-কাটাকাটি, সত্য মিথ্যা দোষারোপ প্রভৃতি নানা রকমের প্রচারকার্য চলিতে পারিলেও নির্বাচকদিগকে সপক্ষে ভোট দিবার জ্ঞান কোন আকারে অর্থদান ত দুরের কথা, প্রার্থী বা প্রার্থীর হইয়া অপরেরও নির্বাচনের নিমিত্ত নিদিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা বা গাড়ী মোটর করিয়া ভোটদাতাকে ভোটদান কেজ্রে আনাও নিষিদ্ধ। পাছে কেহ অসাধু উদ্দেশ্যে একাধিকবার ভোট দিতে চেষ্টা করেন এইজন্য দেবতা-দানব নিষিদ্ধিষে প্রত্যেককেই দাগিয়া দেওয়ার রেওয়াজও নতুন দেখিতেছি।

এক দিকে এই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধুম—প্রার্থী বা প্রার্থীদের কথা বা প্রতিশ্রুতিমত নির্বাচনের পর দেশমাতাকে অপরূপ ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার কল্পনা, অন্য দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রদ্বয়ের অযাচিত সাহায্যদানের আগ্রহ

বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই উভয়ের সমন্বয়ে না জানি অচিরে আমরা দেশমাতাকে কি অপরূপ রূপই না দেখিব।

রূপক ছাড়িয়া বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা দেখা যাইতেছে তাহার কথা ভাবিয়া আমি বড়ই গোলে পড়িয়াছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার যেমন অফুরন্ত, কোন কোন রাষ্ট্রবিশেষকে তাহার আর্থিক সাহায্য দানে আগ্রহ এবং দেয় সাহায্যের পরিমাণের বহরও তদ্রূপ। ভারতের প্রতি তাহার দরদী হৃদয়ের পরিচয় ইতিপূর্বেও পাওয়া গিয়াছে। আজ কিছু দিন হইতে সংবাদপত্র ও রেডিও মারফত মার্কিন সরকারের আর এক গ্রন্থ ভারত-প্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল তাহা কার্যতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। একটি চুক্তির দ্বারা স্থির হইয়াছে, ভারতবর্ষকে আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্য প্রদান করা হইবে। উদ্দেশ্য—ভারতের অর্থনৈতিক বনিনিাদ স্বদৃঢ় করা। ইহা অবশ্য নিতান্ত একতরফা নহে। বর্তমান ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জ্ঞান প্রার্থী হইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কিছু থাকিবে না।

এই চুক্তির পর কয় দিন না যাইতেই পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভারতস্থিত রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোল্‌স বৃষ্টিতে পারিয়াছেন, উক্ত সাহায্যই যথেষ্ট নহে। তিনি বলিয়াছেন—গত চারি বৎসরে ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে; তবে মন্দর গতিতে। আগামী চারি বৎসর তাহার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটময় হইবে। মিঃ বোল্‌সের মনে হয় এজন্য ভারতকে আর্থিক সাহায্য করা একান্তই প্রয়োজন, ভারতের পক্ষে এই সাহায্য একরূপ অপরিহার্য এবং যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা করিতে পারেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহিত আলাপ-আলোচনার জ্ঞান বিমানযোগে নিউইয়র্ক পৌছিয়াছেন এবং তথায় তিনি আগামী চারি বৎসরে ভারতকে এক শত কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য দিবার অভিপ্রায় জানাইয়া স্থপারিশ করিয়াছেন। মনে হয়, ভারতের দুঃখ ঘুচাইবার জ্ঞান হয়ত তাহাদের দরদী প্রাণ এই সাহায্যও না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিবে না।

পূর্বের পঁচিশ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্যের চুক্তির উদ্দেশ্য বর্ণনায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-

সরকার এবং মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে সংযুক্ত ভাবে কাজ করিতে, আবার বিশ্বশান্তি নষ্ট হইতে পারে এরূপ কোন কারণ দেখা দিলে, ভারতবর্ষ সেই অবস্থা দূরীকরণের জন্য মার্কিন সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা লেখা থাকিলেও নয়া দিল্লীর ঘোষণা হইতে জানা যায় চুক্তির মধ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কোন স্তর নাই। হয়ত এই নতুন সাহায্যও এই ভাবের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা-বিবক্ষিত কোন স্তরে গৃহীত হইবে।

এই নতুন মার্কিনী সাহায্য সম্পর্কে একটা রকম না হইতেই, ভারতস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ এন. ভি. নোভিকোভ বোম্বাইয়ের এক সাংবাদিক বৈঠকে স্থম্পষ্ট এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষকে যে-কোন স্বল্পপাতি ও যান্ত্রিক সাহায্য সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন এবং এই সমস্ত যন্ত্রশিল্পের মূল্য ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় মুদ্রায় (টাকায়) কিংবা অন্য যে-কোন “স্থলভ মুদ্রা” দিতে পারেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের দেশের যে-কোন মাল কিনিতে পারেন এবং তাঁহাদের যে সমস্ত জ্বারের প্রয়োজন তাহাও তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে কিনিতে রাজী আছেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ একথাও শুনাইয়াছেন যে, রাশিয়াতে বেকার-সমস্যা নাই। সোভিয়েট সমাজনীতি এমন যে, উহার মধ্যে আর্থিক সঙ্কটের কোন স্থান নাই, তাঁহাদের যুদ্ধের বরলে শান্তি ও নিরীক্ষিতাই প্রয়োজন।

যখন ভারত গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে কলকারখানা ও শ্রম-শিল্পের প্রসার করিতে গিয়া নানা রকম বিশ্বের সমুখীন হইয়াছেন, যখন তাঁহারা একমাত্র আমেরিকার মুখের দিকে চাহিয়া অসহায় ভাবে দিন গণনা করিতেছেন, তখন এই অবাচিত প্রস্তাব নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

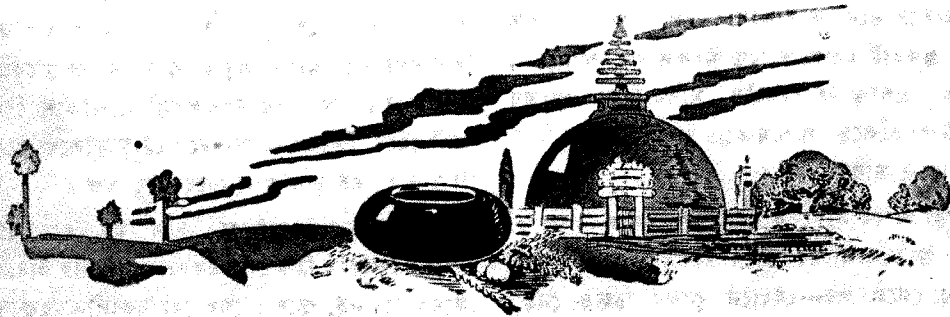
এক্ষেণে দেখা যাইতেছে, এক দিকে ভারতের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ স্থগিত করিয়া ভারতের উন্নতির জন্য আমেরিকার

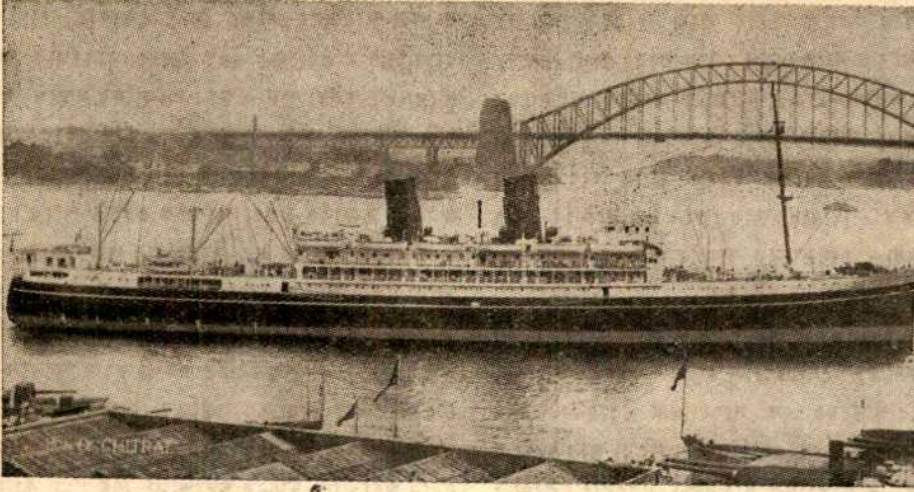
যুক্তরাষ্ট্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, অন্য দিকে সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের দেশের দৈন্য কোথায় তাহা অস্বপ্নান দ্বারা স্থির করিয়াছেন এবং তাহা ঘুচাইবার জন্য স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া শুভ প্রস্তাব আমাদের সমুখে ধরিয়াছেন। চুক্তি যদি হয়, জানি না হয়ত বড়জোর ইহার মধ্যেও বিশ্বের শান্তিরক্ষাকল্পে ভারতকে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

আপাততঃ এই সব সাহায্যের পরও আশু প্রয়োজনীয় আর একটি বড় সাহায্যের স্থান পড়িয়া থাকে। সেটি আমাদের কৃষির উন্নতি বিষয়। নতুন চীনের ভূমিব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি যে অস্বপ্নবর্ণীয় একথা হয়ত অনেকে বলিবেন। চীনের সহিত ভারতের প্রীতির সম্পর্কও বহু শতাব্দীর। ভারতে অনাবাদী জমির অভাব নাই। কেজানে ভারতের দরদে মহাপ্রাণ চীনের হৃদয়ও না এই সময় কাদিয়া উঠে। চীনের অর্থবল কিরূপ জানি না, তাহার জনবল চির-প্রসিদ্ধ। ভারতে সোনা ফলাইয়া অন্নের অভাব মিটাইবার জন্য তাঁহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সাহায্যের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার যুগে যে নিজ লোকবল লইয়া ভারতভূমে না আগাইয়া আসিবেন তাহা কে বলিতে পারে।

ভারতের অনবস্থের হুঃখ ঘুচিবার পর তাহার সংস্কৃতির উন্নতি ও দেশরক্ষার কথা আসে। এককালে যেমন ইংরেজ ‘অসভ্য’ ‘বর্বর’ ভারতকে সভ্য শিষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তেমনি আজ গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে রাশিয়া হয়ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাইবেন, আর দেশরক্ষার অস্ত্র দিয়া ভারতকে রণসজ্জায় সাজাইবার কার্যে আমেরিকা আত্মনিয়োগ করিবেন।

যদি সত্যই আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের ভারত-প্রীতি-বশতঃ ভারতের সমৃদ্ধির জন্য সর্বসা একযোগে সাহায্যের একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয় তাহা হইলে এত সুখ কি পোড়া ভারতের ভাগ্যে সহিবে? তখন তাহার চাপে ভারতের কি দশা হইতে পারে তাহাই আশ্চর্য্যের ভাবনা।





চিঞ্জল জাহাজ

পশ্চিম সমুদ্র-বন্ধে

শ্রীশেফালী নন্দী, এম-এ

৩১শে আগস্ট ১৯৫১ সন, সকালবেলার সোনালী সূর্য্য রাঙা আলো ছড়িয়ে দিলে আরব সাগরের বন্ধে—ব্রীডাময়ী নববধূর মত রক্তিম হয়ে উঠল তার মুখ। আমাদের চিঞ্জল জাহাজ সাড়ে সাত শত যাত্রীসহ অকুল সমুদ্রে পাড়ি জমাল। পাড়ের দিকে একবার চোখ পড়ল—অনেকেই ক্রমাল নাড়ছে জাহাজের বন্ধ থেকে, কেউ বা চোখ মুছে, কেউবা বেদনা চেপে রেখে স্নান হাসি হেসে প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ভারতের ম টি ছেড়ে আমরা অজানা সমুদ্রের বুকে ভাসলাম।

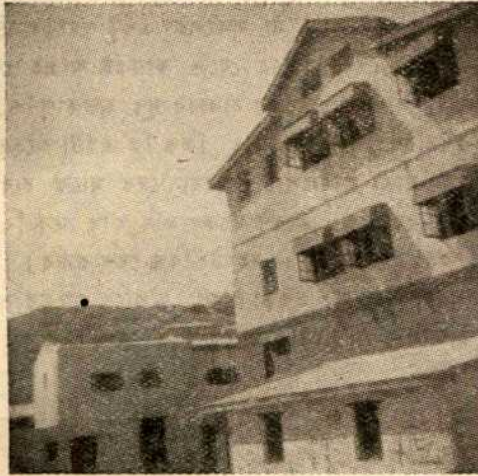
আরব সাগর পাড়ি দিতে এবার লাগল পাঁচ দিন। প্রথম দু'একদিন যাত্রীরা সবাই যেন আশ্চর্য্যরকম শান্ত, ব্যাকরই মনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভেড়ে এসেছে প্রিয়জন, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, স্বজনহীন প্রবাস আ দূর সমুদ্র-যাত্রা—এ সকল মিলে তাদের করে তুলছিল বিহ্বল। নানা-দেশ থেকে এসেছে নানা ভাষাভাষীর দল, সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে পঞ্জাব গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ সন্তানদের। কেউ চলেছে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় মণিমাণিক্য আহরণ করতে, কেউ-বা চলেছে পশ্চিম হতে আলোক-রশ্মি নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিতে ভারতের বুক।

উপকূলবর্তী আরব সাগরের বং স্নান। সাগর বলতে যে ছবি ভেসে উঠে আমাদের চোখে তার দর্শন পাই বেশ খানিকটা দূরে গেলে পর—যেখানে কুলের চিহ্ন নেই,

সীমাহীন জলধি মিশে গেছে দূরে দিক্চক্রবালে; ধূমায়মান মেঘের রেখা যেখানে এক হয়ে গিয়েছে প্রি়ের আলিঙ্গনে। মাঝে মাঝে উঁকি মেবে আমাদের দেখছে উড়ুচ্ মাছের দল। যেটুকু সামান্য শক্তি আছে গুদের পাখায় তাই দিয়ে হাতখানেক লাফিয়ে বা উড়ে ওরা চেষ্টা করছে জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। যে সামান্য ঢেউ উঠছে তাতেই যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ শয্যা নিয়েছে, আবার যখন সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করলে তখন ধীরে স্নেহে অনেকেই এসে ডেকের ওপর বসল। যেদিকে তাকাই শুধু নীলের মেলা, অপক্লপ বং এই নীল সাগরের—যে নীল পাই বাংলার আকাশে, যে নীল দেখি পূবীর সমুদ্রে। সেই নীলের বুক চিরে চলেছি আমরা। ক্রমশঃ সমুদ্রের রূপে মনে হচ্ছে বাংলার কোন গ্রামল প্রান্তরে নীল আকাশের নীচে বসে আছি। কিন্তু না আকাশ ত নীল নয়, এমন ধূসর আকাশ একমাত্র তখনই দেখা যায়, যখন বর্ষণমুখর প্রকৃতি ক্ষণিক বিশ্রামলাভের আশায় শুধু মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রোষে গর্জ্জন করে ওঠে। আরবের উপকূলবর্তী এ আকাশ যেন অভিমানী মেঘে, প্রিয়জনদের অনাদরে ঠেঁগট ফুলিয়ে বসে আছে পা হুলিয়ে, এই বৃষ্টি গাল বেয়ে ঝরে অশ্রু।

আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। একদিন দেখলাম ঠিক যেন একখানি পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশে মেঘের বং নেই, সূর্য্যের শেষ বিদায়কালীন রক্তাভা নেই,

কেবল সোনালী রঙের একটি গোলাকার বস্ত্রপিণ্ড ধীরে নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতায়। আর একদিন দেখলাম অগ্নি রূপ। খানিকটা রক্তিম আভা ও মেঘের সংমিশ্রণে গলিত লাবার মত স্বর্ষ্য ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের কোলে।



জাহাজ হইতে এডেন বন্দর

আগামী কাল অর্থাৎ ৫ই সেপ্টেম্বর পৌঁছব আমবা এডেন বন্দরে। যাত্রীরা এবার বেশ প্রসন্ন চঞ্চল। বার বার জিজ্ঞাসা করছে, “কাল কখন পৌঁছব?” এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত রয়েছে ডাঙার জীব যাত্রীরা আবার কবে মাটির মুখ দেখবে। তারই জন্ত একটা আকৃতি—প্রাণ তাদের ঠাঁপিয়ে উঠেছে—প্রথম দক্ষায় কি এত দীর্ঘ পাড়ি পোষায়? এইজনেই কি পান-কক্ষে যাত্রীর এত ভিড়? ঐ যে নিগ্রো ছেলেটি এত বেশী পরিমাণে পান করেছিল কি লাভ হ’ল তার? টাল সামলাতে না পেরে বেচারী অন্তিম শ্বাস নিলে সাগরজলে। বিপদজ্ঞাপক তীব্র বাঁশী বাজিয়ে যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হ’ল কি ঘটেছে। খানিকক্ষণ খোজাখুঁজিও চলল কিন্তু এই রাত্রি সাগরের কোন্ অতলে যে ছেলেটি সলিলসমাধি লাভ করেছে তার কোনও পাক্তা পাওয়া গেল না।

অবশেষে এডেন বন্দরে এসে পৌঁছলাম। বন্দরটি কিন্তু দূর থেকেই বেশ দেখায়, যেন ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম। পাহাড়ের বুক চিরে যে বাড়ীগুলো উঠেছে সেগুলি যেন

পটে আঁকা ছবির মত। প্রায় সব যাত্রীই নেমে গেল ছোট ছোট থেয়া নৌকায়। সকলেই চাইছে সস্তায় কিছু সওয়া করতে, কারণ এডেনে বাণিজ্য শুধু নেই বলে এখানকার জিনিষপত্র বেশ সস্তা। এখানে ভারতীয় ও বিলাতী উভয় রকম মুদ্রার ব্যবহারই চলে। যারা জাহাজ থেকে নামে নি তাদের কাছে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ অনেকগুলি ভাসমান বিপণি এসে জাহাজের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়াল। এদের যা আয় তার বেশীর ভাগই আসে যাত্রীদের কাছ থেকে।

যাত্রীরা যাতে প্রবাস-দুঃখ ভুলতে পারে তার জন্য হরেক-রকম আনন্দের ব্যবস্থা আছে। নানাবকম খেলা, গীতকক্ষ, ধূমপান-গৃহ, তার উপর আছে পানকক্ষ। ক্রীড়াসমূহে প্রায় সকলেই যোগ দেয়। সব জিনিষই সাধারণ বাজারের তুলনায় ঢের সস্তা, তাই কারুরই বিশেষ অস্ববিধা হয় না। সপ্তাহে দু-তিন বার সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থাও আছে।

জাহাজের ভারতীয় যাত্রীরা একদিন সর্বজাতির লোকদের সহযোগিতায় একটা গানের মঞ্চলিঙ্গ বসাল, পর পর তিন দিন হ’ল এই অস্থান। কারণ ডেকের উপর যতগুলি চেয়ার পাতা যায় তাতে মাত্র এক তৃতীয়াংশ যাত্রীর বসবার ব্যবস্থা হয়। অস্থানটি কিন্তু মোটামুটি মন্দ হয় নি। বাঙালীরা আবার আলাদা ভাবে আর একটা জলসার ব্যবস্থা করলেন। মহাসমারোহে “শেষ বর্ষণ আর শারদোৎসব” উদ্‌যাপিত হ’ল। নিম্নরূপ রাত্রি—বাইরে ঝম



কেন্সেন্ট হোটেল, এডেন

ঝম বুড়ির শব্দ, অতলাস্তিকের বুকের উপর ভাসমান ‘চিঞ্জলের’ বুক হৃদয় প্রবাস-যাত্রী বঙ্গ-সন্তানরা কবিশুদ্ধ নাটকের দুঃখগ্রাস্ত ও ক্ষতি-গোচর রূপদান করছেন অপূর্ণ

প্রদায়, মন্থমুগ্ধ শ্রোতার দল নির্ঝাঁক, অবাঙালীরা ইংরেজী সারাংশ ও ভাবার্থের এবং অপকৃপ স্বরের সমন্বয়ে মুগ্ধ। সমাপ্তির সঙ্গে মুখর গুল্লনে শোনা গেল একটা কথা 'অপূর্ব'।



সুয়েজখালের পার্শ্বের রাস্তা

এবার আমরা লোহিত সাগরে। লোহিত সাগর কিন্তু মোটেই লোহিত নয়। বং তার মোটামুটি কৃষ্ণাভ, কিন্তু তার উষ্ণতা এত বেশী যে যাত্রীরা কেউই প্রায় কেবিনে ফিরে যেতে চায় না। কেবিনের ভিতরেও প্রচুর হাওয়ার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তাতেও গরম কিছুমাত্র কমে না। তিন দিন এ অবস্থায় তাপপ্রধান সমুদ্রের উপর দিয়ে আসার পর আমরা পৌছলাম সুয়েজ খালের মুখে। অপূর্ব এর শোভা। দু'দিক দিয়ে পাহাড় আর পাহাড়, গ্র্যানাইট পাহাড়ের কোল দিয়ে চলে গিয়েছে সুন্দর ছোট সহর। সুয়েজ খালের দিকে মুখ করে ঝাঁড়িয়ে আছে "ইগুয়া মেমোরিয়াল"। তারই পাশে বোধ হয় "ব্রিটিশ দূতাবাস" আর তার কাছে কাছে নানা দেশের পতাকাচিহ্নিত বিভিন্ন কোম্পানির ভবন। লেকের পাড় দিয়ে চলে গিয়েছে সহরের প্রধান রাস্তা, ঝকঝকে পীঠের রাস্তার উপর আধুনিকতম মোটর-গাড়ীসমূহের সমাবেশ। রাস্তার দু'পাশে ঝাউ গাছের সারি। ভারি সুন্দর আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরটি। বাড়ীর ছাদগুলো কোথাও কোথাও বা হলুদ, যেন মনে হয় সূর্য বনের ভিতর থেকে লাল হলুদে সাদা কুটারগুলো উঁকি মেঝে আমাদের দেখছে। তার পরই আমরা এসে পড়লাম একটা লেকে—নাম "বিটার লেক"। সুয়েজের চার পাশের এবং অপর প্রান্তবর্তী পোর্ট সৈয়দের কোনরূপ ছবি তোলা নিষেধ এবং আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ। যারা সুয়েজ বন্দর থেকে পিরামিড দেখতে গিয়েছিল তারাও ক্যামেরা সঙ্গে নিতে পারে নি। পিরামিডের পাশ দিয়েই ত এলাম। কত না বিচিত্র গল্প এবং ঘটনা জড়িত আছে এগুলোর সঙ্গে, এদের দেখলে জীবনের

নশ্বরতা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে। জীবনকে বেঁধে রাখবার জন্য আয়োজনের সীমা নেই, কিন্তু সত্যিই কি সে চেষ্টা সফল হয়েছে?

২ই সেপ্টেম্বর, রাত্রে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছে দেখি চারদিকে বিপণির সারি, আর বণিকসুলভ আত্মহানের আওয়াজে সে অঞ্চলটি মুখরিত। কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের 'ভিসা' দেওয়ার পর কেন জানি না সকলেই একটু শঙ্কাকুল চিন্তে পাড়ে নামল। বিশেষ দূরে যেতে কারুরই আগ্রহ দেখা গেল না। সাধারণ লোকের ব্যবহার খুব জুজুতাপূর্ণও নয়, আবার বৈরিতাচ্যোতকও নয়। কিন্তু কি একটা অহৈতুকী ভীতি যেন যাত্রী আর পোর্ট সৈয়দবাসীদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। বেশী দরকষাকষি আর তর্ক বিতর্ক কেউই করতে চাইল না। সহরটা কিন্তু বেশ সুন্দর। যেকোন বড় সহরের মত চওড়া রাস্তা, দু'পাশে গাছের সারি আর রাস্তার দু'ধারে দোকান, রেস্তোরাঁ আর বেশ বড় বড়



সুয়েট বন্দর

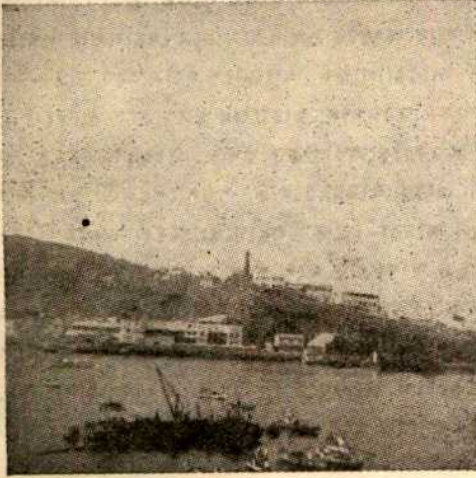
বাড়ী। অবশ্য রাত বলে সবই আলোয় ঝলমল করছিল। এখানকার বিশেষ চিত্তাকর্ষক জিনিস কিছু দেখলাম না, চামড়ার কাজ মন্দ নয়। অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে ছবি কিনল। রাত বাওটায় আবার ভাসলাম ভূমধ্য সাগরের বুকে।

যাত্রীরা একটু গভীর হয়ে উঠেছে। মাটির দর্শন আর বেশ কিছু দিন পাওয়া যাবে না। এবার একেবারে টিলবারী বন্দর।

এবার জলের বং নীলাভ সবুজ। প্রচণ্ড ঢেউ, অনেকেই শয্যা নিলে। কেবিনে কেবিনে ষ্টুয়ার্ড ও ষ্টুয়ার্দ্স এসে মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যায় কার কতটা ঠোণ্ডা দরকার। যারা স্বস্থ তাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ হাস্যকর, যারা অস্বস্থ তারা ভাবছে এখনই যদি এই, বিশ্বে উপসাগরে না জানি কি হবে? এদিকে জাহাজে জালানির অভাব দেখা দিলে। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, জালানি সংগ্রহের জন্য আমাদের জাহাজকে যেতে হবে জিব্রাল্টার প্রণালী

অতিক্রম করে আফ্রিকার উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত বন্দর স্থেটায়। এ খবরে অনেকের মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

যতই আমরা পশ্চিমাভিমুখে এগুতে লাগলাম ততই আমাদের ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়া হতে লাগল। কোন দিন বা এক ঘণ্টা, কোন দিন বা আধ ঘণ্টা। ভূমধ্য সাগরে সূর্য্য অস্ত গেল বেলা ৭টা ৩০ মিনিটে। ডেকের উপরে যাত্রীর ভিড়—রাত্রে সূর্য্যাস্ত দেখার জন্য অনেকেই ব্যাকুল।



স্থেটায় বন্দরের একটি দৃশ্য

১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রে একটি বুলেটিন বের করা হ'ল। তাতে ১৫ই স্থেটায় নামবার জন্য সকলকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, আরও জানানো হ'ল স্থেটাবাসীরা জামা-কাপড়ের সংক্ষিপ্ততাকে পছন্দ করে না, অতএব কেউ যেন সংক্ষিপ্ত পোশাকে অথবা স্নানের পোশাকে ভীরে না নামেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর, 'ক্যালি ড্রেস নাইট'—খাবার টেবিলে কর্তৃপক্ষ একটা করে কাগজের টুপি প্রত্যেককে পরিবেশ দিলেন, খাবার ঘরটি নানা রং-বেরঙের কাগজ আর বেলুন দিয়ে সাজান হ'ল। প্রতিটি যাত্রীর মাথায় একটা করে টুপি—খাবার টেবিলের দৃশ্যটি দেখবার মত। সন্ধ্যা ৭টা বাজতেই আরম্ভ হ'ল ছোট ছেলেমেয়েদের অপরূপ পোশাকের প্রদর্শন। একটি মেয়ে—বছর আঠেক তার বয়স হবে, লম্বা পাঞ্জামা, পুরা আন্তিন জামা, কাঁধের উপর দিয়ে জড়ান উড়না আর মাথায় পালক গোঁজা পুরো টুপি, পিঠে লেখা "Ready for ceuto" পেলে প্রথম পুরস্কার, আর দ্বিতীয় পুরস্কার পেলে "Scarecrow" একটি ছেলে—ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে মুখে রং মেখে আর একটি ছোট পাইপ মুখে নিয়ে তাকে সত্যিকারের খোড়ো মানুষের মতই দেখাচ্ছিল। অবশ্য বাচ্চারা, প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু পুরস্কার

পেলে এবার বড়দের প্রতিযোগিতার পালা, কার মাথায় কত রকম উদ্ভট কল্লনা খেলতে পারে তার নিদর্শন দেখতে পেলাম। প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন তার সর্কান্ডে জড়ানো ছিল, পিড়ানোর স্বরলিপি।



জাহাজ হইতে স্থেটায় বন্দর

১৫ই সেপ্টেম্বর আমরা পৌঁছলাম স্থেটায় বন্দরে। ১৯৩৯ সালের পর ভারতীয় যাত্রীবাহী আর কোন জাহাজ এ বন্দরে নোঙর করে নি। দূর থেকে লাল পাহাড় দেখে মনে হয় এ বুঝি সূর্য্যাস্তের রং, আসলে কিন্তু তা নয়। গ্র্যানাইট পাহাড় বলে তার রং লালচে বাদামী। পাহাড়ের কোলে সাগর—স্বচ্ছ তার বারিধাশি, একটি দুটি মালবাহী জাহাজ, ইতস্ততঃ ভাসমান ছোট-ছোট থেয়া নোকা, নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের বুকচেরা গ্রাম—সূর্য্যাস্তের বর্ণ-সমারোহ, সব মিলিয়ে যেন সে এক বিচিত্র রঙের মেলা। যে দিকে তাকাই দৃষ্টি যেন ফিরতে চায় না।

ছোট এই বন্দরটি বর্তমানে স্পেনীয় মরক্কোর শাসনাধীন। এর রাষ্ট্রাঘাট সবই পুরিফার পরিচ্ছন্ন। এখানকার অধিবাসীরা বেশ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ভারতবাসীদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল জেটীর উপর দাঁড়িয়ে। ছ'জন পদস্থ অফিসার উঠে এলেন উপরে যাত্রীদের টাকা পয়সা লেন দেনের জন্য। বিলেতী বা ভারতীয় মুদ্রা এখানে অচল। ১১০ পেসেট। এক পাউণ্ডের সমান। প্রত্যেককেই পাউণ্ড ভাঙিয়ে দেওয়া হ'ল, আর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে বাড়তি বা অবশিষ্ট মুদ্রা ফিরিয়ে দিয়ে পাউণ্ড নেবার কথা ঐ স্প্যানীয় অফিসারদ্বয় বলে দিলেন। জেটীর বাইরে দাঁড়িয়েছিল মোটর বাস আর ট্যাক্সি। যাত্রীরা যার যেখানে খুশি বেড়াতে বেরল। অনেকেই লক্ষ্য দ্রাক্ষারসের আশ্বাদ গ্রহণ, স্পেনীয় পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ আর তাদের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ। এখানকার চামড়ার কাজ বেশ ভাল। অনেকেই কিনল

কাঠের কবতালের মত এক রকম বস্ত্র যা' নাকি ওরা ব্যবহার করে গান বা নাচের সময় হাতের তালুর সাহায্যে তাল জ্ঞাপন করে—অনেকটা তুড়ি দেওয়ার মত শব্দ হয় তাতে। যে সকল স্ত্রীটাবাসী দাঁড়িয়েছিল পোতাশ্রয়ে তারা মহা কোতুলকের সঙ্গে স্বাত্মীদের লক্ষ্য করছিল আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। আসল কারণ ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না—স্বাত্মীদের ভাষা জানতে চায়, স্বাত্মীরা একটু একটু করে আকার-ইজিতে কয়েকটা কথা ওদের সমঝে দিলে আর উদ্ধারও করলে ওদের হু' একটা কথা। হাসি ওদের স্বভাব। যারা সহরে গিয়েছিল—তারা ইতিমধ্যে ফিরে এল; তারা যে বর্ণনা দিলে তার সার মর্ম হচ্ছে এই যে, এই ছোট সহরটির অধিবাসীদের ভয়ভীতি, বন্ধুত্ব আর শ্রী-শৌচবের তুলনা হয় না।

বাঙালী মেয়েদের শাড়ীর দুটিকে এরা এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে মনে হয়—ওরা যেন বলতে চায় এটা আবার কোন্ জাতীয় পোশাক। যেখানে দেখা গেছে গজদস্তের মত শুভ্রবর্ণা, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত সস্ত্রাস্ত মহিলারা এমন পদ্মিনীশীল যে, শুধু কথা বলার সময় মুখের আবরণটি ঈষৎ সরিয়ে থাকে, সেখানেই কিন্তু দোকান বাজারে মেয়েদের দেখে মনে হ'ল স্বীকৃতির এখানে

প্রচুর স্বাধীনতা। এত ভিড়ের মাঝেও কুংসিত চেহারা চোখে পড়ল না। পাথর কেটে তৈরি, পরিচ্ছন্ন পিচালা রাস্তাঘাট দেখে নয়ন পরিভ্রষ্ট হয়। রাস্তার দক্ষিণ-অবলম্বী বীতি মনে করিয়ে দেয় আমরা ব্রিটিশ রাজত্বের বাইরে এসেছি। প্রত্যেকটি স্বাত্মী উপরে না উঠা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল আমাদের নবপরিচিত বন্ধুরা, শেষে শ্রিতহাস্তে ক্রমাল নেড়ে বিদায় নিলে।

এবার আমরা অতলান্তিকের বুকের উপর। নীমাহীন আকাশ আর অস্তুহীন জলধি মনে এনে দেয় অপূর্ব প্রশান্তি। ঘনকৃষ্ণ বারিরাশি রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠে—মাঝে মাঝে সফেন তরঙ্গমালা জাহাজের গায়ে এসে প্রতিহত হয়। এই ত অতলান্তিকের প্রকৃত রূপ। তরঙ্গহীন সমুদ্র যেন নিশ্রাণ। এবার আমরা চলছি পূর্বাঙ্গলের উপকূল দিয়ে। অবশেষে আমরা বিস্তৃত উপসাগরে এসে পড়লাম। কিন্তু বিস্তৃত ছিল আশাতীত রূপে শান্ত। চক্ষিণ ঘণ্টার পর ঘিরে ঘিরে সমুদ্রের রং বদলে গেল। আগামী কাল আমরা যুক্ত-রাজ্যের তীরভূমির দর্শনলাভ করব। স্বাত্মীরা এখন থেকেই তার তোড়জোড় করছে। স্বাত্মী প্রভাত হ'ল, ২১শে সেপ্টেম্বর জাহাজ এসে পৌঁছল টিলবারী বন্দরে তার গন্তব্য স্থলে।

দুঃখবাদী

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

দিম দায়, দিম দাবে সে ভ' জানি, নয়বো না ভবু বৃত্তা মর,
মতে মতে জীবনের রঙ মিঃশেষ করি, চিত্তময়
হতভাগ্য বেধ জড়ো হয় আর দিগন্ততর শূন্যভাতে
বন্দী-জীবন কেঁদে কেঁদে মরে বৃত্তার মহা আকাঙ্ক্ষাতে।
নয়বো না ভবু। ভোমার চোখে যে বেধা ব্যক্তি আছে অবিদ্যাল,
যেখি মি যে আকও আত্মরতির শেখপ্রভারণা সর্বদাশ,
পলে পলে বহু সঙ্করলোপে দিব্যত্ব বেধে অবে আবার,
জয়রে কথা পাথরের বুকে অলে নাম লেখে বিজ্ঞতার।

বেঁচে থাক। এই; বিজ্ঞ মর, বিশিষ্ট মতে পাণ্ডু লেখ,
বাচি আকাশের ছায়াপথ শুনে প্রত্যাশাকুল নির্ণয়েধ,
তরা বিকেলের রক্ত-আলোর ঝাঁকে জীবনের বহুগুলি,
অলে নাম লিখি, বাসুদেব শেখ কারনার দিবার তুলি।
দিম দায়, তার ছায়ালোকে দেখি অসংশয়িত আত্মনাশে,
যেখি গোধূলির হলদায় প্রিয়ার, ভোমার বৃত্তা নিরুচ্ছ্বালে।

ফক্সধারা

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

আমি রাজে শুই দেহিতে, সকালে উঠিও দেহিতে, ইহা আমার বরাবরের অভ্যাস। সেদিন দুই ভাঙিতেই কানে আসিল পিসীমার সুভীক্ষ কণ্ঠের বন্ধনে আওয়াজ। ইহা প্রায় নিত্যকারের ব্যাপার হইলেও একটু বিরক্তি যে আসিল না, তাহা নহে। পিসীমাই এ বাটির প্রভাবশালিনী বক্তারময়ী কর্ম্মী। কিন্তু সেজন্য কোন অসুবিধা ছিল না। পরিবারের মধ্যে বাস করিতে হইলে কাহারও-না-কাহারও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতেই হয়, আপত্তি করিলে শৃঙ্খলা থাকে না। সুতরাং সে কিছু দিয়া আমাদের কোন অভিযোগ ছিল না, কিন্তু গোলযোগ বর্ধিত হইয়াছে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের আচারহীনতা জইয়া। ছুট ছেলেমেয়েরা সকাল হইতেই দল বাঁধিয়া চা, বিস্কুট, ডিম প্রভৃতি নিষিদ্ধ পানীয় ও খাদ্যগুলি গো-এসে গিলিবে... আচ্ছা তাহাতেও না হয় পিসীমার তেমন আপত্তি নাই। ছেলে-মামুষের অত বিচার করিতে গেলে চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই দুই ছেলেমেয়ের রেছপনা করিবার একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে না? তাহার কি না তাঁহার দ্বিভুল কক্ষের সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সারা বারান্দা ভরাইয়া দ্বিভুলের পূজার ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত স্থান জুড়িয়া যাহা খুশি খাইবে ও খুজাবশেষ ধুয়েছড়াবে ইত্যদ্যৎ: জড়াইয়া রাখিবে? রাগ হইবার কথা নয়? একালের ছেলেমেয়েদের দুর্দান্ত স্বভাব ও নোংরামির ভীত প্রতিবাদ করিতে করিতে সমস্ত জায়গাটিতে গোবরজলের ছড়া দিয়া পথের উপরের ছেঁড়া পাতা ও কাগজের টুকরা, কিসের ন্যাকড়া ও বড়কুটা একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া পথিপার্শ্বের নর্দমার নিকটপ করিতে করিতে আমাদের সদ্যস্নাতা সেকালের পিসীমা পুনরায় স্নান করিতে চলিলেন।

সেদিন শনিবার। কর্ণহুল হইতে সকাল সকাল বাড়ি ফিরিতেছি, কাধাকাছি আসিয়াই শুনিলাম পিসীমার অভ্যন্ত কণ্ঠের সুপরিচিত স্বর। ব্যাপার যে গুরুতর কিছু নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বলিলাম, কি হ'ল পিসীমা? পিসীমা ভবন রাগে গর্গগ করিতেছেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এক নিমিষেই সুস্পষ্ট হইয়া গেল। মেজকাঁকায় ভিন বহুরের ছেলে মিটু পিসীমার অকলসি ডান হাতের মুঠায় ধরিয়া ভবন অপরূপ ভদীতে বহু বহু হাঙ্গ করিতেছে। তাহার গুল দণ্ডে, উজ্জল চক্রে, ঝাঁকড়া চুলে—কোথাও ভয়ের লেশমাত্র নাই।

ব্যাপারটি এই। স্বপাকে ও শুদ্ধাচারে পিসীমা হবিষ্যদের পাঁজটি উদান হইতে নামাইয়া খর হইতে হাত দুইবার জড়

বাহিরে আনিতেছিলেন, এমন সময় পূর্বোক্ত মিটু র পান্নার পড়িয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ কাণ্ডজানহীন অপোগণ্ডি তাঁহাকে দুইটি বাছ দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। কাকীমা বলিলেন, “ও ত দিগম্বর শিশু, দিদি, ওর পরণে ত কাপড়ের কোন বলাই নেই, ও হুঁলে আর দোষ কি?” এই গা-জলানে বেহিসাবী কথায় পিসীমা আরও অধিক জলিয়া উঠিয়াছেন। কথটা তাঁর হিসাব না করিয়া বলা ঠিক হইয়াছে কি? শিশু-দিগম্বর শুধুই যদি তাঁহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া, তাহা হইলে কি তিনি অত রাগ করিতেন, না, রাগে তাঁহার সর্বদা জ্বালা করিত? তাহা নহে। সে দক্ষিণ হস্তে অকল ধরিয়া আছে এবং সেই সঙ্গে বাম-হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার ক্ষুদ্র একপাটি জুতাও ধরিয়া রহিয়াছে যে। সে বস্ত্রটির মোহ সে ভ্যাগ করিতে পারে নাই।

আগে আগে দেখিয়াছি পিসীমা ছেলেদের ভালবাসিতেন বেশ। ইদানীং কেবল তাঁহার আচারপরাধতার উদ্ভাপে তাঁহার হৃদয়ের শিশুপ্রীতির রসটুকু যেন নিঃশেষে বিসর্জ হইয়া উঠিতেছে।

উচ্চকণ্ঠে অভ্যন্ত সমালোচনার মুগ্ধ বুলিগুলি আওয়াজে আওয়াজে আমাদের পিসীমা পুনরায় স্নান করিতে চলিলেন।

নিত্যকার অভ্যাসমত সেদিনও পিসীমা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্নানাদি সাদ করিয়া ঠাকুরের ‘বৈকালকী’ সমাপন করিতে মন্দিরে চুকিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার দক্ষ অদৃষ্টক্রমে ইনিকে বিখাস করিয়া দুর্কা কয়গাছি তুলিয়া আনিতে বলাই ‘কাল’ হইয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

টুনি আমাদের পাড়ার এক মনঃশূন্যের মেয়ে—এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী। মধ্যে মধ্যে সে পিসীমার দুই একটি কাই-করমাস খাটিয়া যেন বস্ত্রিয়া যায়। অবশ্য, স্পর্শ-দোষে কদাপি দূষিত হয় না এইরূপ সনাতন ক্রমমায়েরই সে খাটিতে পার। আত্মও সে দুর্কা তুলিবার অসুস্থি পাইয়া পরমাত্মদে বৃত্ত্য করিতে করিতে বহির্কীর্টিতে গিয়াছিল ও প্রাদর্শের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহিয়া বাহিয়া সমস্ত দুর্কাদলের মধ্য মধ্য উপাগুলি তুলিয়া আনিয়া পিসীমার তুলসীর রেকাবীর একান্তে আলগোছে রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু চক্ৰলম্বিত হস্তভাগি মেয়ে ত দুই চোখে দেখিয়া কোন কাজ করিবে না। দুর্কা সে ভালই আনিয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে জড়াইয়া জীর্ণ-কাপড় থেকে বসে পড়া এক টুকরা স্বল্প স্বভাও যে আনিয়া দিয়াছে। এখন উহারই কাক দিয়া কোন অভাৱ অন্তর্জাত যে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল,

তাহাই ভাবিতে গিয়া পিসীমার গাছ কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে—
“মা গো!” ব্রাহ্মণকতা ও মমঃশূদ্র-কৃত্যর ছৌওয়া কাপড়ের
খুঁত। যে একই কার্পাস তুলার ভৈর্যারি এবং ভগবান্ শুধু
মাহুষের অন্তরের নিষ্ঠাটুকুই দেখেন, বাহিরের নয়—এমনিই
কিছু বলিতে যাইব, এমন সময় দেখি, পিসীমা যেন তাঁহার
ক্লদ দৃষ্টিতে কাহাকে শাসন করিতে করিতে, শীতে কাঁপিতে
কাঁপিতে নদীপথে চলিলেন।

হুজুর শীতের সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেদিকে
কাহারও খেয়াল নাই। পূর্ণোজ্জ্বল একটি উপাদেয় আলোচনা
চলিতেছিল। আচারহীনতার জন্ত পিসীমার নিকট সদা-
লাহিত্য এ বাড়ির ছোট বড় ওরফে আমাদের আধুনিকা ছোট
কাকিয়া বলিতেছিলেন, “মরণ আর কি। খালি মাওয়া আর
নাওয়া। স্বর্গ থেকে সোনার রথ নেমে আসবে তুকে তুলে
নেবার জে। হাতে হাঙ্গা, পায়ে হাঙ্গা—অরুচি আর কি।
ভগবান্”...আর বলা হইল না। দেবিলান, দ্বারপথে সভ্রাতা
পিসীমা গজগজ করিতে করিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পরের কথা। শীত ভখনও যাই-যাই
করিয়াও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। হঠাৎ অসময়ে
মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবল বজা আসিয়া দেখিতে দেখিতে গ্রামের
পর গ্রাম গ্রাস করিয়া ফেলিল। ইহা আপনারা কেহ কেহ
হুজুর প্রভাৎ করিয়াছেন, আর যাহারা প্রভাৎ করেন নাই,
তাঁহার সৎবাদপত্রে ভাহার বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। এতদু-
পলক্ষে স্বমামুষ্য ব্যক্তিগণের নাম সংযোজিত করিয়া রিলিক
কার্যের কর্মীদের সাহায্য করিবার জন্ত সংবাদপত্রের শুভে
শুভে, ছাওবিলের ছেড়ে ছেড়ে হৈ হৈ চলিতেছে। সর্ব্বকর্মে,
সকল সময়ে অগ্রণী ছেলের দল গলায় হারমনিয়ম ও যুদধ
ঝুলাইয়া, খঞ্জনী বাজাইয়া নগরের পথে, গ্রামের পথে সমবরে
সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছে—“ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো।”
রিলিক কার্যের সুবিধার জন্ত ছোট-বড় কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত
হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি হইবে, তাহার উত্তোগ
চলিতেছে। নানাহান হইতে কর্মীরা আসিয়া জুটিতেছেন।
আমাদের সদর বাড়ির ছইখানি ঘরের মধ্যে বড় ঘরটি ও লম্বা
দালানটি তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, স্থির হইয়াছে।
ইহা জ্যাঠামহাশয়ের সন্মতিক্রমেই হইয়াছে। কিন্তু পিসীমাকে
না জানাইয়া বা তাঁহার অম্মতি না লইয়া কোন কার্য করা
এ বাড়ির শ্রীতিও নহে এবং তাহা সম্ভবও নহে। সুতরাং
মা, জ্যাঠাইমা—কাহাকেও লইয়া কাজ চলিবে না, পিসীমার
দয়াক্ষা আমাদের করিতেই হইবে। “হঁহার ভদ্রসন্তান,
হুজুরদের সেবার ভার মাথায় লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন
এবং জনসাধারণের সাহায্যতিক্ষা করিয়া দেশে দেশে
ফিরিতেছেন”—ইত্যাদি বলিয়া আমি পিসীমার নিকট হঁহাদের
মহৎ প্রাণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। আশা হইল,

নিরম, বজ্রহীন নরনারীর দুর্দশার ছবি পিসীমার মনশ্চক্ষের
সম্মুখে ভুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছি। অতঃপর ভদ্রসন্তান-
গণের আভিধেয়তা স্বীকার করিবার জন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি
সর্ত্তে পিসীমার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল এবং ভৎক্ষণাৎ সর্ত্ত-
গুলি তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল। সর্ত্তগুলি এইরূপ :
(১) আহাৰ্য্য গ্রহণকালে উচ্ছিষ্ট পাত্ৰ হইতে অন্ন বা ব্যঞ্জন
কোন অংশ যেন আসনে পতিত না হয়। (২) বামহস্তে
দৈবাৎ অন্নপাত্ৰের স্পর্শ ঘটিলে, সেই হস্ত যেন তুল্যক্রমে নিজ
পরিধেয় সংস্পৃষ্ট না হয়। (৩) প্রভাৎ যেন আর্জবজ্ঞ পরিধান
করিয়া কার্য্যবিশেষটি সম্পন্ন করা হয় অথবা উক্ত কর্ম্মসম্পাদন
শেষে পরিহিত বস্ত্রটিকে যেন শ্রীতিমত সিন্ধু করিয়া লওয়া
হয়। চতুর্থ অথবা সর্ব্বশেষ সর্ত্তটি হইতেছে এই যে, ভ্রমণান্তে
গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যেন কহুই পর্যন্ত হস্ত ও জাম্ব পর্যন্ত
পদদ্বয় প্রক্ষালন করা হয়। অপরিহার্য্য এবং অল্পপেক্ষণীয়
এই সর্ত্তচতুষ্টয় আগন্তুকগণের স্ত্রুতিগোচরীভূত করা হইলে
তাঁহারা হাত সন্মরণ করিতে পারিলেন না। হাসি ধামিলে
এক জন বলিলেন, “আপনারা এই সকল নিয়ম মেনে চলেন?”
যথাসম্ভব পাশ্চর্য্য ধারণ করিয়া বলিলাম, “এই সকল আচার
পালন করা এ বাড়ির মজ্জাগত অভ্যাস। এগুলি পালন না
করার কথা আমরা কেউই ভাবতে পারি না। তাই বলে
আপনারা ভাববেন না যেন, এগুলো মেনে চলতে আমাদের
কোন কষ্ট হয়। না, আমাদের মোটেই কোন অসুবিধা হয়
না।”

আচার-অসুষ্ঠানের জন্ত মধ্যো মধ্যো মন্তভেদ হইতে
ধাকিলেও দেখিলাম, পিসীমার সহিত রিলিকের ছেলেদের
বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতেছে। বজা কমিয়া আসিল।
ছেলেদের এখানকার কাজও প্রায় ফুরাইয়া গেল। এ
অঞ্চলের যাহারা ভিক্ষা দিবার, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত
সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের বাড়িটিকে কেন্দ্র করিয়া
চতুর্দিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য সারা হইয়াছে।
তাঁহারা এখন অন্তঃ পিয়া ভিক্ষা করিতে চান। সুতরাং
এইবার তাঁহাদের বিদায় দিবার পালা। পরহুঃখকাতর এই
পরিচর্য্যহীন পথের ছেলেগুলির জন্ত হৃদয়ের একটি নিভৃৎকক্ষে
বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের বিদায়বেলায়
দেখি, পিসীমা অশ্রুসঞ্ছলচক্ষে একটি ছেলের মাথায় হাত
রাখিয়া তাঁহার কল্যাণকামনা করিয়া বলিতেছেন, ভোমাদের
অনেক কষ্ট দিইছি বাবা, সে সব ভুলে যেও; যদি কখনও
এদিকে আস ভো পিসীমার সঙ্গে দেখা করে যেও আবার।

বর্ধাশেষ। ম্যালেরিয়াটা এবার বেশ কায়রীভাবেই
চাপিয়া বসিয়াছে দেখিতেছি। বাড়ি বাড়ি অসুখ।

ছুটির বার। হঠাৎ এক সময়ে বাড়ি ফিরিয়া দেবি, পিসীমার মুষ্টিমত্তী অমাচার আঘাতের ছোট কাকিমা পিসীমার হবিষ্য নামাইতেছেন। শুভ্র গরদের শাড়ীর উপর ভিজা চুলগুলি এলাইয়া দিয়াছেন—চুলের জলে পিঠের খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে—তাহার এইরূপ মুষ্টি সচরাচর দেবি না—সচরাচর কেন, কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। যথেষ্ট কৌতুকবোধ করিলাম। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি বোধ করিলাম বিষয়। পিসীমার হবিষ্য নামাইতেছেন আমাদের ছোট কাকিমা—তাহার হাতের ছোঁওয়া হল পান করিতে রুচি হয় না, তিনি? এ কি বিষয়। অচিন্তনীয় কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়াই মনে হইল।

ছোট কাকিমা ধীরে স্বস্থে বলিলেন, দিদিমণি আজকাল সকল সময়েই ব্যস্ত থাকেন, সময়মত আসিতে পারেন না, তাই আমিই ছোট্ট ফুটিয়ে রাখি। না হলে যে তাঁর খাওয়াই হয় না, বাবা।

পিসীমা ব্যস্ত থাকেন? কিসে তাহার এত ব্যস্ততা—যার জন্য তাহার আজন্ম বহুমূল সংস্কারের অর্জুনাগুলি উপেক্ষিত হইতেছে? সময়ে আসিতে পারেন না? কেন? কোথায় থাকেন তিনি? তবে কি আজকাল তাহার ‘বাস্তিক’ বাড়িয়া গিয়াছে? শুচিবায়ুপ্রভৃতা শুনিয়াছি ক্রমবর্ধমান এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। তবে কি আজকাল তিনি নদীর ঘাটেই সারাদিন কাটাইতেছেন? এইরূপ বহু প্রশ্ন মুহূর্ত মধ্যে বিছাতের মত আমার মাথায় খেলিয়া গেল। নিমেষমাত্র। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছোট কাকিমার মুখের দিকে তাকাইতেই

তিনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “দিদিমণি এখন কলুপাড়ায় গেছেন, সেখান থেকে বাবেম বাড়ীবন্তিতে। ঘরে যবে অস্থখ। কে কার মুখে জল দেয়, তার ঠিকানা নেই। তাই তিনি নিজের হাতে সেই সব অভাগার সেবার ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন।” আমাকে বলিতে বলিতে ছোট কাকিমার চকু দুইটি সজল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি অস্ত্র দিকে মুখ ফিরাইলেন।

সন্ধান লইয়া একটি বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। ছাচা-বাশের বেড়া-দেওরা খোঁড়া চালা। দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিলাম, পিসীমা সেই চির অস্পৃহজাতির ছোট্ট একটি মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। অপর পার্শ্বে আর একটি বিছানায় আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া অক্ষুট করে গৌড়াইতেছে আর একজন। যেমন নিঃশব্দে আসিয়া-ছিলাম, তেমনই নিঃশব্দে পিসীমার অলক্ষ্যে ফিরিয়া চলিলাম।

ধূসর সন্ধ্যা। ছায়ায় মত্ত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিলেন ঐ আমার সন্ন্যাসিনী পিসীমা। আজ আর কোন বাধা নাই। ছুটিয়া চলিলাম তাহার ঘরে। তাহার পা দুইটির উপর আমার মাথা রাখিয়া বলিলাম, পিসীমা না জেনে অনেক অপরাধ করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তারপর কয়েক ফোঁটা অবোধ অশ্রু আপনাই করিয়া পড়িয়া তাহার চরণ দুইটি সিক্ত করিল।

কুলজী গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

ভারতের জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত অর্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সমস্তাই ছিল জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ভারতের ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে যাহারা কোতুলনী, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস তাহাদের নিকট একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় না হইয়া পারে না। হুঁখের বিষয়, উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক আলোচনাকারীদের মনোযোগ এদিকে উপযুক্ত পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য স্থান পায় নাই। অধিকন্তু, দেশীয় সাহিত্যে এ বিষয় সম্পর্কে যে অমূল্য উপা-

দান পাওয়া যায়, ভারতের কোন প্রদেশেই তাহা সম্যক্রূপে ব্যবহার হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাংলা-সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায় তাহার পুরাপুরি সদ্যবহার এখনও করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এবং অন্য কোন কোন স্থলে পুরাতন বাংলা-সাহিত্য হইতে হুঁচারটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এমন একটি একদেশ-দর্শিতাপূর্ণ চিত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, যাহা সাহিত্যে প্রতিকলিত বৃহত্তর চিত্রের ঠিক বিপরীত।

যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে বাংলা-সাহিত্যের নানা বিভাগ হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়া কোন বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যের বিশাল প্রাসাদের এক

নিভৃত ও উপেক্ষিত কোণ হইতে সামান্য কিছু মালমশলা সংগ্রহ করিয়া হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষুদ্র একটি বিবরণ দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। কুলজী গ্রন্থে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের যে সামান্য পরিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহার কথাই আমি বলিতেছি। সেকালের ঘটক মহাশয়দিগের রচিত কুলজী গ্রন্থগুলি হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের বংশপরিচয় পরিজ্ঞাপক হইলেও, এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধীয় যে দু'একটি ঘটনা অথবা লেখকগণের মন্তব্য দৃষ্ট হয়, তাহা সম-সাময়িক অবস্থার একটা আংশিক ধারণা দিতে পারে। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত লেখাগুলিতে তৎকালীন মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্কী-মোগল শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংশ্রব এবং এই সম্বন্ধে হিন্দু প্রজাসাধারণের মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কুলজী রচয়িতারা তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদিগকে নিজেদের বিবরণ ও মন্তব্যের বাহিরে রাখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সেকালের ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত প্রজাসাধারণের যে সম্পর্ক ও তাঁহাদের প্রতি যে মনোভাবের সামান্য পরিচয় কুলজীগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা পূর্বাপুরি সৌহার্দ ও প্রীতির জ্ঞাপক হইলে সকলেরই আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, কুলজী গ্রন্থে শাসক-শাসিতের প্রীতিমধুর সম্পর্কের পরিচয় এই ক্ষুদ্র লেখকের সংগৃহীত উপকরণ-গুলির মধ্যে পাওয়া যায় নাই। ইহারা সেকালের শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণের ইতিহাস গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া এই সম্বন্ধীয় চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহাদের সহিত কুলজী গ্রন্থের এ বিষয়ে মিল দেখা যায় না। অথচ, বাংলা ভাষায় লিখিত এই শ্রেণীর গ্রন্থবাজিকে সেকালের বাঙালীর মনের কথার অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিয়াও উপায় নাই। যাহা হউক, এখন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করা যাক।

তুর্কী-মোগল শাসনের বিরুদ্ধে খেদোক্তি।

বিদেশী ও ভিন্নধর্মাবলম্বী তুরস্ক-মোগলাদি জাতীয় আক্রমণকারীরা হিন্দুরাজত্বের বিলোপ ঘটাইলে, হিন্দু-সমাজপতিগণ যেমন মনোবেদনা অল্পভব করিয়াছিলেন, হিন্দুশাসনের অভাবে যে সামাজিক বিপর্যয় ঘটয়াছিল তাহাও তাঁহাদিগকে তেমনি উদ্ভিগ্ন ও বিচলিত করিয়াছিল। “গৌড়ীকথা” নামক বিখ্যাত গ্রন্থের নিম্নোক্ত ছত্রগুলি ইহার প্রমাণ:—

হিন্দুর রাজত্বকালে সর্বস্ব ছিল ভাল
বিভাভ্রাঙ্ক্য সর্বপ্রধান।

হিন্দুস্বর্ঘ্য অন্তর্মিত, অজানার আবির্ভূত,
লক্ষীসরস্বতী অভ্যর্থন।
সদাচারশুভ দেশ, বিজশুভ এক বেশ
অর্থের প্রতি একান্ত পূহা।
স্ব-বৃত্তির সোজাপথে, দাসবিপ্র এক পথে
বর্ধনাশে নাহি বলে আহা।
সবে ধন-বশীভূত, সদাচার বহির্ভূত,
নামেমাজ কুলীন প্রোজীর।
কুলীনেতে কুলক্রিয়া, প্রোজির শব্দেই প্রিয়া,
বিজ্ঞানশূন্য সকল গোজীর।
সংজ্ঞা আছে ভট্টাচার্য্য ধন কথাই বিচার্য্য,
রজস্বম-বিশেষ প্রবল।
অর্থকাম পুরুষাৰ্ঘ্য, অপবর্গ অযথার্ঘ্য,
বর্ধকর্ষ নিভান্ত দুর্কল।

বিজ্ঞেতার দাসত্বের প্রতি সমাজপতিগণের ঘৃণা।

ঘটক-কারিকার মতে, অহিন্দু শাসনের নিষ্পেষণে হিন্দু সমাজে বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার উপর, হিন্দু সমাজের অনেক ব্যক্তি ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসকবর্গের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া স্বজাতিদ্রোহিতা এবং “দহ্যতা” (অত্যাচার) দ্বারা সেই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কুলজী-রচয়িতারা বলেন যে, এই শ্রেণীর হিন্দুরা “লবণের” (প্রভুগণের) প্রতি আত্মগত্যা দেখাইতে গিয়া “গো-ব্রাহ্মণ” ইত্যায়ণ পশ্চাৎপদ হইত না:—

কেহ কেহ ধবনের, সুবিশ্বস্ত লবণের,
প্রধান অমাত্য কর্মকর।
প্রধান দাসত্ব পেয়ে, বলায় সে রাই রেয়ে,
সেই ত অনর্থের আকর।
ভাই বন্ধু রাই রেয়ে, দহ্যকার্য্যে দেশ ছেয়ে,
জলপথে স্থলপথে বীর।
পাণ্ডশার সৈন্তগণে, বেচ্ছামত রসদদানে
গোভ্রাঙ্কণ হত্যাভেদে স্থির। ইত্যাদি।

তুর্কী-মোগল শাসকদিগের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া যে সকল হিন্দু নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কুল-মর্যাদা নির্ণয়কারী ঘটকমহাশয়দিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর হিন্দুরা কুলপঞ্জী গ্রন্থে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং ইহাদের ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রভুর প্রদত্ত উপাধিসমূহ মর্যাদা অপেক্ষা অগৌরবের চিহ্ন বলিয়াই তখন বিবেচিত হইত। কুলজী-রচয়িতাদিগের মধ্যে “হুলো পঞ্চানন” সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার দ্বারা রচিত বলিয়া কথিত নিম্নোক্ত ছত্রগুলি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য:—

অতিপাপে মহাপাপে দণ্ড শিরশ্ছেদ।

অহুকলে মাথাযুড়া এই ত প্রভেদ।

এই আজ্ঞা দেয় রায়া ভায়া শিবাদরা।

যবন রাজের দণ্ড সংজ্ঞা শিকোদরা।

তাদের রাজহুে মানী ঐ। মজুমদার।

মল্লিক বিখ্যাস আর রায় সরকার।

চৌধুরী মুল্লী বজ্রী হাকরা ডরফদার।

সমাদার রায় বেয়ে আর ছোয়ারদার।

পকানন হলো কয় দাসহের কথা।

রায় রেয়ে কোজদার অহকার বুধা।

সমাজের উচ্চস্থানে না বলিতে পাও।

রাজদরবারে লোকের মাথাযুড়াতে যাও। ইত্যাদি।

তুর্কী-মোগল শাসনের প্রথম দিকে হিন্দু-সমাজপতিগণ বিদেশী ও বিধর্মী শাসকগণের দাসত্বকারী ঐর্ষ্যশালী হিন্দুদিগকেও যে শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্রবশূন্য বিগত কিন্তু দরিদ্র হিন্দু অপেক্ষা অপবিত্র মনে করিতেন তাহার আর একটি প্রমাণ “মেলমালা” নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের একটি শ্লোক এইরূপ :—

মহিষ্ঠা জগদানন্দো দগ্ধ বাঢ়ী গজেন্দ্রকঃ।

ডিক্তী ত্রী পরমানন্দহো রায়ঃ কুলান্তকাঃ।

“সম্বন্ধ-নির্ণয়” রচয়িতা এই শ্লোকের উপর নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :—

“এই তিন ব্যক্তিই (অর্থাৎ শ্লোকে উল্লিখিত জগদানন্দ, গজেন্দ্র এবং পরমানন্দ) আকবরের সময় রায় রেয়ে পদে অভিষিক্ত ছিলেন। মুসলমানের দাসত্ব করিতেন বলিয়াই বিশেষ নিম্নিত ছিলেন। কিন্তু অর্থবলে লোভীকুলীন মধ্যে কড়া সম্প্রদান করিয়া সমাজে উখিত হন।...সামাজিকগণ যবনের দাস অপেক্ষা স্বাধীন ব্যক্তিবর্গকে অন্তঃসত্ত্ব জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য এই তিন রায় রেয়েকে অপবিত্র ও বিশেষরূপে কুলনাশক বলিয়া উল্লেখ করেন।”

এই প্রসঙ্গে, রাজপুতানার ইতিহাসের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ যে মনোভাবের বশবর্তী হইয়া মোগল সম্রাটের প্রিয় ও প্রধান সেবক মান-সিংহের সহিত একত্র ভোজনে আসীন হইতে পারেন নাই, বাংলার সেকালের সমাজপতিদের মধ্যেও কতকটা সেই মনোভাবই বিद्यমান ছিল, যদিও তাহার অভিব্যক্তি হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাবে।

অবশ্য, একথাও এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, তুর্কী-মোগল শাসকদিগের সেবার রত হিন্দুদিগের প্রতি সমাজের এই বিরূপ ভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং ভিন্নধর্মী-বলয়ী প্রভুর প্রদত্ত সেবকত্বচক উপাধিগুলি পরিণামে

ঘণার ভাব যুক্ত হইয়া অন্যান্য উপাধি ও পদবীর মতই কেবল বংশচিহ্ন রূপে গৃহীত হইতে লাগিল।

যাহা হউক এক্ষণে “মেল-বন্ধন” এবং “লবণ দোষ” “যবন দোষ” প্রভৃতি ব্যাপার হইতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখা যাক।

মেল-বন্ধন।

আধুনিক হিন্দু সমাজে কোন ব্যাপারেই “মেলের” প্রশ্ন উঠে না। কদাচিৎ উঠিলেও উহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয় না। কিন্তু সেকালের বিবাহ ব্যাপারে “মেলের” প্রশ্ন খুব কঠোরতার সহিত বিবেচিত হইত। সে যুগের সামাজিক আবশ্যকতা হইতেই মেল বন্ধনের উৎপত্তি হইয়াছিল। “মেলের” ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, অ-হিন্দু শাসন কালে ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসক-বর্গের সহিত অবস্থিত সংসর্গের ফলে হিন্দু সমাজের কোন কোনস্থলে যে সকল “দোষ” ঘটিয়াছিল, সেগুলিকে যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করাই ছিল “মেল বন্ধনের” প্রকৃত উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগে কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে “মেল” হয়ত একটা নিছক খামখেয়ালী ব্যাপার। কিন্তু কুলজী গ্রন্থের বিবরণ দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তখনকার সমাজপতিগণ তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা একটা সচুদেষ্ণ লইয়াই (অর্থাৎ পূর্বোক্ত “দোষ”গুলি বাহাতে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত না হইয়া সঙ্ঘীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে সেইজন্যই) “মেল” সৃষ্টি করিয়াছিলেন। “দোষ” যুক্ত বংশগুলিকে এক প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য “দোষ”শূন্য ঘরগুলিকেও নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে “মেলমালা” গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশ দ্রষ্টব্য :—

মেল কি পদার্থ হয় করহ শ্রবণ।

মহান্তরানক রূপ যাযে আলম্বন।

যে কালে লক্ষণ সেন নীলাচলে চলে।

হিন্দুরাজ্য শেষ হৈল যবনের বলে।

সেকালে দেশেতে বড় হল অত্যাচার।

কুলেরে রাখিব কিসে, জাতি রাখা ভার।

জাতিগত, ধর্মগত, কুলগত বাদ।

আর কি বলিব, মেলে এই অবসাদ।

ধর্ম্মেতে ভাঙিয়াছে হলে, কিছু নাহি রয়।

অতপূর্বা করে কুল, আর বিপর্যয়।

পর্যায় সম্বন্ধ প্রায় কুলে ছাড়ি দিল।

নানাবিধ বিপর্যয় করিতে লাগিল।

গোপে ঐর্ষ্যা দেখি গোণ স্বীকারে।

বিবাহ করিতে চলে রায় রেয়ে ঘরে।

এইরূপ ভিন্নশত বংসর করে গতি ।
ভারপূর দেবীঘর দুর্জলী সজ্জতি ॥
সেই সব দোষ লয়ে করে এক ঠাণ্ডি ।
রসে রস গুণ করে, তার গুণ গাই ॥

অচিন্দু শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত অবাস্তিত সংসর্গের ফলে এবং তাহাদের দাসত্ব-গ্রহণকারী হিন্দুদের চরিত্র-ভ্রংশের পরিণামস্বরূপ সামাজিক বিপর্যয় রোধ করিবার জন্তই যে মেল-বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা “সারাবলি কারিকা” গ্রন্থেও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে :

মেল বন্ধনের কিবা কব পরিপাটি ।
লবণ যবনাদি দোষে আঁটা-আঁটি ॥
মহিষ্ঠা অগদানন্দ পোড়ারি গন্ধেজ ।
ডিংসাই পরমানন্দ, কষ্ট শ্রোত্রিয়েজ ॥
যবনের দাসত্বে বলায় রায় রোঁয়ে ।
করে জাতিবন্ধু দস্তারভি, দেখে চেয়ে ॥
অজ্ঞ নিকর্ষী কুটুবে পাঠায় সখরে ।
সখর সৈকব ধনি দেখে অসদ্বরে ॥
দ্বিজে লুন ব্যবসায় ব্রাহ্মণ্য বিগড় ।
যবনের দাসত্বে যবনেই গণিত ॥
কেহ অশ্রাব্য, অকথ্য, নীচ পরিবাদে ।
পতিত, ত্যক্ত থাকে স্পর্ধায় প্রমাদে ॥
এইরূপে লোভী দ্বিজে দ্রষ্ট হয় কাজে ।
ক্রমে ভেজে দলে উঠে মজার সমাজে ॥
ইহা দেখি দেবীঘর নব্য কুল বাঁধে ।
সমদোষী কুলীনেরে এক করে সাধে ॥

“যবন দোষ”।

শাসক-সম্প্রদায়ের দাসত্বকেই প্রধানতঃ যেমন “লবণ দোষ” বলা হইত (কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কর্তৃক লবণের ব্যবসায়কেও ঐরূপ দোষ বলিয়া ধরা হইত), তাহাদের সংশ্রবে ভোজন অথবা হিন্দুনারীর সহিত তাহাদের অবাস্তিত সংসর্গজনিত দোষকে তেমন “যবন দোষ” বলা হইত। উভয় দোষই ভিন্নধর্মী শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি শাসিত-সম্প্রদায়ের প্রতিকূল মনোভাবের প্রমাণ। পরা-ধীনতার গ্লানি এবং সময় সময় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা ধর্মের লাঞ্ছনাজনিত মনোবেদনাই যে এই প্রতিকূল ভাবের কারণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

“যবন” সংশ্রবজনিত “দোষ” সম্বন্ধে “মেলমালা” গ্রন্থে সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে :

ছত্রিশ মেলোতে, দোষের জালেতে
বেড়িল কুলীন মীন ।
নানা অপবাদে, করি অবসাদে,
বলেতে করিল স্মরণ ॥

যেকালে গীরালি, জাণে কতগুলি,
হইল দ্বিভেরি দলে ।
সেকালে যবন সংশ্রবে ভোজন,
কুলোতে গালি ঘে বলে ॥
একি অসম্ভব, যে জাতি বিভব,
যতনেতে রাখা দায় ।
যবন গমন, রহিল ব্রাহ্মণ,
তাহা কি সম্ভব পার ?

উদাহরণ ।

হিন্দুনারীর “যবন”-সংসর্গের ফলে কোন কোন মেলের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। যথা “শুভরাজধানী” মেল। “মেলমালা”য় ইহার যে বিবরণ আছে, “সম্বন্ধ-নির্ণয়”কার তাহার উপর এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

“যবন-নীতা কত বিবাহে অ-কৃতপ্রায়শ্চিত্ত। বন্দ্য মকরন্দ বংশীয় মাধব শুভরাজ খাঁ প্রধান।” সময় সময় “যবন” দোষের মিথ্যা অপবাদ রটনার ফলেও কোন কোন নিরপরাধ বংশের “দোষ” ঘটত। ইহার একটি উদাহরণ “ধাঁধা” দোষ। কোন ব্রাহ্মণ-কন্যা নদীতে জল আনিতে গিয়াছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ “ধাঁধা” অর্থাৎ দম্কা ঝড় আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ-কন্যা পথিপার্শ্বে অবস্থিত হাঁসাই খানাদার নামক মুসলমানের গোয়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ঝড় কমিলে কন্যা বাড়ী আসিল। বাড়ীর লোকেরা দেয়ির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, ব্রাহ্মণ-কন্যা মুসলমানের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। সমবয়স্কারা এই ব্যাপার লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করে। ক্রমে ক্রমে ঘটনাটি অবাস্তিত ভাবে পল্লবিত হইয়া সমাজে রাষ্ট্র হওয়াতে কন্যার বংশে “ধাঁধা” দোষ জন্মিল। অল্পকাল আর একটি দৃষ্টান্ত এই : অনুচা কন্যা একাকিনী নদীতে গিয়া কুস্তীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার মৃত-দেহ জলে ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। ইহা লইয়া যবন-সংসর্গের জনরব রটে। ফলে, কন্যার পিতৃকুলে “যবন” দোষ অর্শে।

হিন্দুনারীকে বলপূর্বক ধর্ষণ কিংবা অপহরণের একটি দৃষ্টান্ত “সাহসখানী” দোষ। শাসক-সম্প্রদায়ের সাহস খাঁ (খান) নামক কোন দুর্দান্ত ব্যক্তি সকন্যা ব্রাহ্মণীকে হরণ করিয়াছিল। স্তত্রাং তাহার বংশে “সাহসখানী” দোষ জন্মিল। এই সকল ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য এই যে, উল্লিখিত প্রকারের “দোষ” সম্বন্ধে সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট মানুষগুলিকে সমাজে কোন না-কোন প্রকারের স্থান দেওয়া হইত; আন্তাকুঁড়ে নিষ্কিণ্ড উচ্ছিষ্ট পত্রের মত লোকগুলিকে হিন্দু সমাজ হইতে দূরে নিষ্কিণ্ড করা হইত না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে

স্মরণ রাখা দরকার। তাহা এই যে, উপরি-বর্ণিত “দোষ”গুলি সম্বন্ধে কুলজী-রচয়িতাদের মধ্যেই মতভেদ থাকিতে পারে। কোন কোন ঘটক মহাশয়দের বিবরণে ভুলও থাকিতে পারে। প্রত্যেক “দোষ” সম্বন্ধে সত্যনির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত অনুসন্ধান এবং গবেষণা করা হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। স্মরণ্য বর্তমান যুগের কোন ব্যক্তি কিংবা বংশ যেন মনে না করেন যে, এই সমস্ত মধ্যযুগীয় ব্যাপার তাঁহাদের সম্মান অথবা অসম্মান ঘটাইতেছে। সেকালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সামান্য কিছু পরিচয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে, সামাজিক মান-মর্যাদার তারতম্য নির্ধারণের জন্য নহে।

“পীরালি”।

“পীরালি” ব্রাহ্মণের উপাধির যে ইতিহাস “নীলকণ্ঠের কারিকা” নামক ঘটক-কুলজীতে লিখিত আছে (এই সম্বন্ধে ভিন্ন ইতিহাসও আছে), তাহাতেও সেকালের ভিন্ন-ধর্মী শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত-সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্কের একটি চিত্র পাওয়া যায় এবং ইহাকে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অবস্থার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে বলিয়া মনে হয় না। নীলকণ্ঠের বিবরণটি সংক্ষেপে এইরূপ : বাদশাহের নিয়োগপত্র পাইয়া খান জাহান আলী যশোরের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রধান কর্মচারীর নাম মামুদ তাহির। অপর নাম পীর আলী। এই ব্যক্তি পূর্বে হিন্দু ছিলেন। কথিত হইত, তিনি মুসলমান নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ধর্মত্যাগ করিয়াছিলেন। মামুদ তাহির চেকুটিয়া পরগণার শাসনভার পাইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব নামক দুই ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা কোন রোজার দিন মামুদ তাহির সভাসদ সহ বসিয়া আছেন। প্রজারা নানা উপঢৌকন আনিয়া হাজির করিতেছে। এক ব্যক্তি স্বগন্ধ লেবু আনিয়া ভেট দিল, চারিদিক গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। মামুদ তাহির “বাহবা, বাহবা” বলিয়া লেবুটি নাকের কাছে ধরিলেন। কামদেব ও জয়দেব বলিয়া উঠিলেন : “হজুর, করেন কি ? ভ্রাণেতে অর্দ্ধ-ভোজন। আপনার ত রোজা ভঙ্গ হইল।” ব্রাহ্মণদ্বয় জানিতেন না এই কথার পরিণাম কিরূপ সাংঘাতিক হইবে। কারিকার ভাষায় :

কথায় বিজ্ঞপ্তি ভাবি তাহির অস্থির।

গৌড়ামি ভাদ্রিতে দৌহের মন কৈল স্থির॥

দিন পরে মজলিস করিল তাহির।

জয়দেব কামদেব হইল হাজির॥

দরবারে চারিদিকে ভোজের আরোজন।

সাত সত বক্রি আর গোমাংস রন্ধন॥

পলাতু লস্কন গন্ধে সত্তা ভরপুর।

সেই সভায় ছিল আরো ব্রাহ্মণ প্রচুর॥

মাকে বজ্র দিয়া সবে প্রমাদ পণিল।

কাঁকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল॥

কামদেব জয়দেব করি সোধোষন।

হাসিয়া কহিল খুঁড় তাহির তখন॥

চারিভুরি চৌধুরী আর মাহি খাটে।

ভ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন শাজ্জে আছে বটে॥

নাকে হাত দিলে আর কাঁকি ভো চলে মা।

এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা॥

দুই জনে ধরি পীর খাওয়াইল পোস্ত।

পীরালি হইল তার হইল জাতি নষ্ট॥

কামাল কামাল নাম হইল দৌহার।

ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ি গেল হাহাকার॥

পীরালি অখ্যাতি দিল জ্ঞানমাত্র দোষ।

সর্বদেশে রাষ্ট্র হল কুগ্রহের ঘোষ॥

সংসর্গে পড়িল যারা তারাত মজিল।

শুধু পীরালি দোষ বলি ঘটকে বুঝিল॥

উপসংহার

কুলজী গ্রন্থ হইতে সেকালের শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইল। ঘটককারিকা কিংবা কুলজী গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে। সবগুলি মুদ্রিতও হয় নাই। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও সকল গ্রন্থ সহজলভ্য নহে। এই জাতীয় সমুদয় গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে হয়ত আলোচ্য বিষয়ের আরও অনেক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রবন্ধ-লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয়ের প্রতি অনুসন্ধিৎসুগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করা। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস যাহারা রচনা করিতে চাহিবেন, বাংলা-সাহিত্যের সকল স্তরের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহাদের উচিত। মধ্যযুগের শাসক-সম্প্রদায়ের লেখক দ্বারা ফার্সি ভাষায় রচিত গ্রন্থ অথবা ইউরোপীয় ইতিহাস-প্রণেতা ও ভ্রমণকারীর বিবরণ অপেক্ষা দেশীয় সাহিত্যেই যে এ দেশের প্রজাসাধারণের মনোভাবের অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইবে, তাহা কাহাকেও বোধ হয় বলিয়া দিবার দরকার নাই। অবশ্য, যদি কেহ মনে করেন যে, কুলজী গ্রন্থসমূহে কেবল অলীক কল্পনাপ্রসূত গালগল্পের সমাবেশ আছে তো তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করেন যে, কিছু ভুল কিংবা অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কুলজী গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের একটা মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়, তাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে আরও তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীষ্ট

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীষ্টান নহি প্রভু,
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি
অনুভব করি তবু ।
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই,
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাই,
ক্ষমা-হৃদয় তোমার মূরতি
ভুলিতে পারি কি কভু ?

ধর্ম তোমার নিয়েছে যাহারা,
নিয়েছে তোমার চিনা,
সন্দেহ হয় আমার দয়াল,
তোমারে নিয়েছে কি না ?
তোমার কথা কি একবার তারা ভাবে ?
তোমার স্বর্গে প্রবেশ তারা কি পাবে ?
মমতা-বিহীন কারিতেছে দিন
বহুদুরকে দীনা ।

অপ-বিচারেতে ফাঁসি দিল যারা
জাপান জার্মানীতে,
তোমার চেয়ে যে ক্রুশকেই তারা
বড় করে ভাবে চিতে ।
ইস্পাতে গড়া তাহাদের সব হৃদি,
ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার প্রতিনিধি,
ধরাকে কলুষ কালিমায় চায়
কুৎসিত করে দিতে ।

তোমার আলোকে যাবে কি তাহারা
আঁধারের পথ বাহি ?
তারা যে আলোক সৃষ্টি করিছে
তোমার সৃষ্টি দাহী ।
কি শুভ বেশ পরেছে বর্বরতা ।
মুখেতে বিশ্বশাস্তির বড় কথা,
মোহ আবিষ্ট, মদ-গর্কিত—
স্পর্ধার সীমা নাহি ।

তব প্রেম, ক্ষমা, শাস্তি রাজ্যে
মেঘ-পালকের দেশে,
মেঘ কোথা ? ক্রুর নেকড়ে ব্যাঘ্র
ভ্রমিছে ছদ্মবেশে ।
রক্ত-পাগল, হীন, হিংস্র প্রাণ,
হে ত্রাণকর্তা, তাহারা পাবে কি ত্রাণ ?
তোমার জর্ডনে বিষ-বিসর্পী
কি নদী মিশিল এসে ?

অতীতে যাহারা কটকহার
পরাইল তব শিরে,
কটকিত কি করিতে ধরণী
তারাই এসেছে ফিরে ?
কোনো অপরাধ সাধনে নহেক ভীত,
নহে প্রীতিকামী, স্বার্থলোভেই প্রীত,
করে সমারোহে হিংসার পূজা
দাঁড়ায়ে তোমারে ঘিরে ।

ক্রুশে আরোপিয়া বলেছিল তারা
হাসি' বিজ্ঞপ-হাসি
'পরম-পিতা তো রক্ষিতে স্মৃতে
আসিল না ভালবাসি ?'
রস-বিগ্রহ, জীবন্ত মন্দির
ভাঙে যুগে যুগে দূতেরা হৃদ্ধতির,
লাঞ্ছনা মাঝে দেবতা উঠেন
নব রূপে উদ্ভাসি' ।

বৈষ্ণব মোরা বিশ্বাস করি
তব পুনরুত্থান,
তুমি প্রোজ্জ্বল পাণ্ডু দল
লুপ্তিত ধূলিগ্নান ।
তুমি জাগ্রত, হে অরিসংগীয,
প্রণাম আমার, প্রণতি আমার নিয়ে,
অপাপবিদ্ধ হে মূর্ত প্রেম,
গাহি তব জয়গান ।

ভারতের নিকট মুক্তিকামী টিউনিসিয়ার আবেদন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

টিউনিসিয়ার ফ্রান্সের অধীনতাপাশ মুক্ত হইবার জন্য গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের নেতা সাংবাদিক এন্ হবিব বোজ্জিবা ও বহু জাতীয়তাবাদীকে টিউনিসিয়ার অদূরে একটি দ্বীপে ফরাসী সরকার নির্বাসিত করিয়াছেন। এই পত্রখানি বোজ্জিবা মহোদয় ভারতের উদ্দেশে আরবি ভাষায় লিখিয়াছেন। উহার ইংরেজী অম্ববাদ হইতে তাৎপর্য এখানে প্রদত্ত হইল :

“ফরাসীর বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলন হইতে ইন্দোনেশিয়া ঘাইবার পথে যে ক’দিন ভারতব্রাহ্মে কাটাইয়াছিলাম তাহা আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কাল বলিয়া মনে করি। এই সময় অনেক নূতন কথাও আমি শ্রবণ করি। ভারতবর্ষে—আমি শুনিলাম ইহা এখন শুধু ‘ভারত’ নামেই আখ্যাত, এমন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নেতা এবং পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে দেশাসক্তদের গোভাগ্য আমার খটখাটে যাহারা আমাদের বর্তমান বিপদে সাহায্য করিতে না পারিলেও আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন। ফরাসী গমনের পর ভারত সত্ত্বে যে সমস্ত ধারণা আমার মনে বহুমূল হইয়াছিল তাহারও অনেকগুলি আমার নিকট জাতিমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

দিল্লীতে আমি পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি এশিয়ার মুসলমান, এবং স্বাধীন দেশসমূহে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি। সেখানে আমি ত্রিমননের সঙ্গেও দেখা করিয়াছিলাম। তিনি পদাধিকার বলে সংপ্ৰদামর্শ দিবার যোগ্য ব্যক্তি। আমার দেশের মত পরপদমলিত এবং পররাষ্ট্র কর্তৃক অবিখ্যাত কুর্কর্মে জর্জরিত দেশগুলিকে এইরূপ সং-পদামর্শ দিয়া তিনি ভারতের প্রতি ভাহাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতেছেন।

কলিকাতায় আমি তৎকালীন পবর্গর ডক্টর কাটজুর সঙ্গে আশ্বষটীকাল কাটাই। এ সময়টির কথাও ভুলিতে পারিব না। আমার সৌদর্যোপম ডক্টর জীলানি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। ডঃ জীলানি আমাদের উভয়ের মধ্যে সৌভাব্য কার্য করেন। তিনি উপস্থিত না থাকিলে ডঃ কাটজুর মূল্যবান কথাগুলির মর্ম গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমি আশা করি, ডঃ কাটজুর পরামর্শমত চলিতে সমর্থ হইয়াছি। মহাত্মা গান্ধীর মহৎ আদর্শে তিনি আমাকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এইভাবে চলিলে আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাকল্য-

লাভ করিতে পারিব। ইহার পর হইতে, এই কথাগুলির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া সেইমত কার্য করিয়া আসিতেছি। জীলানির মারফত কাটজু মহাশয়ের কথাগুলির মর্ম অম্বদ্যবন করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাকে পুনরার ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই উপদেশ অনুসারেই আমি আমাদের উৎপীড়ক রাষ্ট্র



এন্ হবিব বোজ্জিবা

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও ফ্রান্সের সঙ্গে আমি যথাসম্ভব ‘নরম’ ব্যবহার করিয়াছি। আপোষরকার মনোভাব লইয়াই আমি আমাদের দাবি অনেকটা লম্বু করিয়া ‘ধাপে ধাপে স্বাধীনতা-পাশন’ পর্য্যন্ত নামাইয়াছি। আমার সহকর্মীরা ইহাতে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন জানিয়াও আমি কল্যাণের প্রতি অক্ষিপ না করিয়া এইরূপ বন্ধ দাবিই করিয়াছিলাম।

আমি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূল্যবান উপদেশগুলি এবং আন্তরিক সহানুভূতিও আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় ডঃ জীলানি উপস্থিত থাকিলেও রূপায়বলতঃ দোভাব্যর কাজ করিয়াছিলেন—এমন একজন লোক যিনি ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন। যাহা হউক, আমি ডাঃ রায়কে আমাদের জাতীয় দাবি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যেরূপ বলিয়াছিলাম, মনে হয় তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে ভারতীয় মুসলমান নেতা মিঃ আরিফের একটি পার্টিতে প্রতিনিধিত্বান্বিত সাংবাদিকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে আমি সমর্থ হই। এবার আমার দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র ডঃ এন্. সন্নকার। তিনি করাসী বেশ ভালই জানেন। এই দিনকার ব্যাপারটি আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি। আমি নিজে সাংবাদিক; একথা আমি এবং আমার দেশবাসীরা ভুলই জানি যে, টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় সাংবাদিকদের যথা—‘হিন্দু ধান ঠাণ্ডা’, ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র সম্পাদকগণ এবং ‘মডার্ন রিভিউ’র ঐক্যদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থন ও সহায়কত্বের উপর আমরা কতখানি নির্ভর করিতে পারি। ডঃ জীলানি আমাকে বলেন যে, ‘মডার্ন রিভিউ’ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজী মাসিক।

মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যাহা অর্জন করিয়াছে আমরাও ঠিক তাই চাই। আমরা করাসী অভ্যুত্থানীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হিন্ন করিতে ইচ্ছুক। আমরা

আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে কি করিতে পারি তাহা আমরাই বুঝিয়া লইব। আমরা আমাদের ভাগ্যবিধাতা কোন বিদেশীকে হইতে দিব না।

আমি নিশ্চিত জানি আমার এই আবেদন পণ্ডিত নেহরু, ডঃ কাটজু, ডাঃ রায় এবং সাংবাদিক-প্রধানদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে। আমার সহকর্মীগণ এবং আমি ভারতবর্ষের বিপদের কথা লম্বাক্ত অবগত আছি। কিন্তু তাহার মহত্বই এইখানে যে, মিছে লজ্জা বিপদের মধ্যে থাকিলেও অত্যাচারের বিপদেরও যথোচিত সাহায্য করিতে কখনও পক্ষাৎপদ হয় না।

টিউনিসিয়া ভারতবর্ষের বিশেষ সাহায্যার্থী। আমরা তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি না। মানবিকতার অধিকার যতটুকু তাহার বলেই আমরা তাহার দ্বারে উপস্থিত। দ্রুত বিধান, ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ আমাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন।”

যখন রবো না আমি*

শ্রীমুনীলকুমার লাহিড়ী

যখনে আমার কেঁদো না গো প্রিয়
ফেলো না'কো কেঁটা আখির জল,
সমাদি-শব্দ-শিরবে আমার
দিও না গো রাজা গোলাপ-দল।
আমার লাগিয়া বিষাদ গাথায়
মেয়ে না'কো কোন করুণ ভান,
সরোর-সারির-চাঁদোয়া দিও না
অশীতল ছায়া করিতে দান।
তার চেয়ে খন ঘাসের ছায়ায়
এ দেহ আমার রহিবে ঢাকা,
বরষাধারায় বোঝানো সে তৃণ—
শিশিরের মাত্রা বৃক্ষেতে আঁকা।
আমারে অরিলে স্বপ্ন যদি পাও
অরিও—ব্যথার তরিত প্রাণ,—

ভুলে যাও যদি ? তাতেই কি ভতি ?
আমি রবো চির নিরতিমান।
তখনো চমিবে বহুগীর বৃক্ষে
এই মত আলোছায়ার খেলা,
ব্যথার গুমরি তাকিবে চাতক
আকাশে ভাসিবে মেঘের ভেলা।
আমি রহিব না, দেখিব না কিছু
অমৃতবাজীত হবে এ প্রাণ,
এত যে মায়ার মোহিনী মন্ত্র
করিবে না মোরে হরষ দান।
চির-গোদুলির আধারে শুখ
স্বপনের সম তোমার সুখ,
হৃদয় মননে ভাসিয়া উঠিবে—
না-ও যদি ওঠে তাতে কি ছব।

* ক্রিস্টিয়ানা রসেটির “Song” কাবিতার ভাবানুবাদ।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—কলিকাতা অধিবেশন

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এবারেও অসুস্থ্যায়ী মানে অস্থিতিত হয়েছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে উক্তরীক্সজ্ঞানার্থ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সভার কার্য সম্পন্ন হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু এই সভার একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে কলিকাতা নগরীর সর্বাগ্রগামী প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করেন। শ্রীনেহরু সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে—ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীকেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে আহবোধ করেন। ভারতবর্ষে যে-সকল জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি সেগুলির প্রশংসা করেন এবং জাতিগঠনের জন্য ইহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁর মতে আগে স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিচয়লাভ করে তার পরে বৈজ্ঞানিকগণকে স্ব স্ব বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে কাজে নামতে হবে এবং এরূপ বিজ্ঞানীদের দ্বারা দেশের লোকের দুঃখোচন হবে।

সভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, রাজ্যপাল উক্তরীক্সজ্ঞানার্থ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস-চ্যান্সেলার শ্রীশুভনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জেট-ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, পশ্চিম-জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান থেকে প্রায় চল্লিশ জন ব্যক্তিনামা বৈজ্ঞানিক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সভাপতি উক্তরীক্সজ্ঞানার্থ মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণে বলেন—ভারতবর্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সমূহ প্রয়োগ করে শিল্প এবং কৃষিকার্যের উন্নতি সাধিত হতে পারে। তিনি প্রচলিত শিক্ষা এবং গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য মত প্রকাশ করেন এবং আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এবং নিম্নলিখিত-ভারত যন্ত্র-বিজ্ঞান শিক্ষা-পরিষদকে এই বিষয় সচেতন হতে বলেন। তাঁর মতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত প্রথম শ্রেণীর কারখানাসমূহ রাখতে হবে যেখানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন এবং প্রস্তুত করতে হবে। এই সকল কারখানার কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যও তৈরি করার ব্যস্থা রাখতে হবে। সভাপতি মহাশয় যৌগিক এবং ব্যবহারিক গবেষণার মধ্যে দুর্দ্ব্যবসায়ী সীমারেখা টানবার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক-গণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি ভারতবর্ষকে কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের

উপদেশ দেন এবং অল্পরূপ উপায়ে ইউরোপে যেমন উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বেড়েছে এদেশেও তা সম্ভব হতে পারে—ভরসা দেন। তিনি যুক্তিকা সম্বন্ধে ভালরূপ অহুসত্যানকার্য চালানো এবং বিদেশ থেকে নতুন নতুন উদ্ভিদসমূহ আমদানী করে কৃষিকার্যে বা উত্তান-রচনায় ব্যবহার করা, জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন। পরিশেষে তিনি বৈজ্ঞানিকদের এদেশের কৃষকদের সহিত সহযোগিতা করতে আহ্বান করেন। তাঁর মতে কৃষকই হচ্ছে ফসল উৎপাদনের প্রধান কারিগর—বিজ্ঞানী এই কারিগরকে অবহেলা না করে ভাঙে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলে আশাহরূপ ফসল উৎপন্ন হতে পারবে। এরূপভাবে বৈজ্ঞানিক-প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত করলে অল্প সময়ের মধ্যে ফসল উৎপাদন উত্তম রূপে বৃদ্ধি পাবে সম্ভব মেই।

অতঃপর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্য স্বাধীনতা আরম্ভ হয়। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞা, শারীরবিজ্ঞা, গণিত, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখাসমূহের সভাপতিগণ স্ব স্ব অভিভাষণ যথাসময়ে পাঠ করেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সভার মধ্যে সমবেত বৈজ্ঞানিকদের নবাবিহীন তথ্যসমূহ আলোচনা করতে নির্দেশ দেন।

রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন উক্তরীক্সজ্ঞানার্থ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর অভিভাষণে বৈজ্ঞানিক বেয়ার প্রবর্তিত 'স্ট্রেন থিওরি' ও তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৮৮৫ সালে ডন বেয়ার এই থিওরি বা মতবাদ দ্বারা কার্বন পরমাণুযোগে তিন হতে সাত পরমাণু-সংখ্যা বিশিষ্ট বলসাকৃতি যৌগিক-পদার্থসমূহের গঠন ও স্থিতির সম্ভাব্যতা বুঝাবার চেষ্টা করেন। বলপরমাণুর ক্ষেত্রে এই মতবাদ ভালরূপ কাজ করেছে, কিন্তু যেখানে পরমাণুর সংখ্যা দু'ব বেশী দেখা গেছে সেখানে তা ব্যর্থতার পথ্যবসিত হয়েছে। চৌত্রিশটি পরমাণুসংখ্যায় কার্বন দ্বারা গঠিত যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ এবং কতগুলি যুগের প্লাণ্ড থেকে নিষ্কৃত মার্কোন এই মতবাদের বিরুদ্ধতা ঘোষণা করেছে। বহু পরমাণুযুক্ত যৌগিক পদার্থগুলি যে পাঁচ বা ছয় পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থগুলিরই অল্পরূপ স্বাধী, কৃত্তিকা প্রমুখ বিজ্ঞানী তাহা প্রমাণিত করেছেন। এই সমস্ত অল্পবিধা দূরীকরণার্থে ইনগোল্ড ও থম্পসন বেয়ারের মতবাদ তির্যক সংশোধন করে আর একটা নতুন পরিকল্পনা (বাহুবিচাতি) পেশ করেন। যাহা হটুক, বেয়ারের স্ট্রেন থিওরির প্রবর্তনে বহু কার্বনবলসাকৃতি যৌগিক-পদার্থ সম্পর্কে গবেষণার অনেক সুবিধা হয়েছে। ডঃ দেশাই তাঁর এই মতামত সম্পর্কে নিম্ন

গবেষণালব্ধ দু'একটি মূল্যবান তথ্যের বিষয় বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি ভারতবর্ষে রসায়নসম্পর্কীয় গবেষণার ক্রমোন্নতির বিষয় উল্লেখ করেন।

পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর এস. রামচন্দ্র রাও। তিনি তাঁর অভিভাষণে ফটিকসমূহের চূষক-গুণাবলী সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন—চূষক-গুণের উপর ভিত্তি করে দ্রব্যসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ডায়াম্যাগনেটিক্স, প্যারাম্যাগনেটিক্স এবং ফেরোম্যাগনেটিক্স। চূষক প্রথম শ্রেণীর পদার্থসমূহকে বিকর্ষণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থকে দ্বৈষ্য আকর্ষণ এবং শেষোক্ত শ্রেণীকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। এই তিন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে ফেরোম্যাগনেটিক্সগুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। চূষকগুণযুক্ত পদার্থসমূহ রেডিও ও বিবিধ স্ত্র শস্তাদি নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়। এলনি, এলনিকো এবং এলকোমাক্স প্রভৃতি করেকটি মিশ্র বাতু দ্বারা এই সমস্ত চূষক তৈরি হয়। এই সকল মিশ্র বাতুর ফটিক অবয়ব দেখে তাদের চূষকগুণ পরীক্ষা করা হয়। ফটিক-পদার্থের বর্ণের সহিত উহার চূষকগুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। বিভিন্ন বাতুর অক্সাইডের উপস্থিতিই উক্ত বর্ণ এবং চূষকগুণের জন্ম দায়ী। 'এমিথিষ্ট' প্রস্তরের মধ্যে 'ফেরিক সৌহ' পাওয়া গেছে এবং উহাতে যে নীল রং দৃষ্ট হয় উক্ত 'ফেরিক' সৌহ বোধ হয় তার কারণ। কতকগুলি ফটিকের মধ্যে সৌহ অধিক পরিমাণে বিস্তারিত এবং ঐ সমস্ত ফটিকের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয়। ডক্টর রাও ফটিকসমূহের চূষক গুণ সম্পর্কে উপরোক্ত মূল্যবান তথ্যসমূহ বর্ণনা করেন এবং উক্ত বিষয়ে এখনও গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞা শাখার সভাপতিত্ব করেন শ্রী এস. রামাশঙ্করম। তিনি বাজ, ইক্ষু, তুলা, তৈলবীজ, ফল ও শাকসব্জী, উদ্ভিদ কোষসমূহের গঠনপ্রণালী ও তাহাদের প্রজননক্রিয়া সম্বন্ধে যে সমস্ত বহু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে তাহা বর্ণনা করেন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য এরূপ গবেষণার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ তি. আর. থানোলকার। তিনি ক্যান্সার রোগ ও তাহার বিবিধ কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে এক বহু মূল্যবান তথ্যসম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—ক্যান্সার রোগের কারণ নির্ণয় এক জটিল সমস্যা। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই রোগের সঠিক কারণ দিতে অক্ষম। নির্দিষ্ট একটি মাছ, মোরগ, পশু এবং মানুষের এই রোগ হয়, অথচ একই শ্রেণীভুক্ত আর কারও হয়

না—এই রহস্য তেজ করার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী গবেষণা করছেন। জীবদেহের স্বাভাবিক স্ত্র স্নেহ বা কোষসমূহের ক্যান্সার স্নেহে পরিবর্তন হওয়া এক বিচিত্র ব্যাপার। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা চলছে এবং অনেক বিজ্ঞানী ক্যান্সারের উৎপত্তির স্নেহে এক শ্রেণীর জাইরাস এবং এনজাইমের কার্যকারিতার উল্লেখ করে গবেষণা করছেন। যাহা হউক, ডাঃ থানোলকারের মতে এখনও এই গবেষণা সম্পূর্ণ হয় নি।

গণিত-বিজ্ঞানের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর বি. বি. সেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে বলেন—গণিতের প্রয়োগে কলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনেক সুবিধা হয়েছে। অনেক সময় গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে যে ফল পাওয়া গেছে তাতে শিল্প-সম্বন্ধীয় অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর হয়েছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে কলিত-বিজ্ঞান আরও বেশী করে গণিতের সাহায্য নেবে।

প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রী বি. আর. শেষচর। তিনি তাঁর অভিভাষণে মিউক্লিক এসিডসমূহের জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জীবদেহের গঠন প্রভৃতির জন্য মূলতঃ এই মিউক্লিক এসিডই দায়ী। তিনি আরও বলেন, জৈব এবং উদ্ভিদ সেলসমূহে দুই শ্রেণীর মিউক্লিক এসিড বিস্তারিত—রাইবোজ এবং ডিসক্সিরাইবোজ। শেষোক্ত মিউক্লিক এসিডই জীবদেহের পক্ষে অবিকল্পিত কার্য্যকারী এবং যে কোন নতুন প্রাণী-দেহ সৃষ্টির স্নেহে এই উপাদানের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়।

খ্যাতনামা রাসায়নিক ডক্টর ষ্টল আরগট গাছদ্বা সম্বন্ধে নিজের আবিষ্কৃত অনেক মূল্যবান তথ্যসমূহ বর্ণনা করেন। মিউইয়র্কের বৈজ্ঞানিক ডক্টর কেনস্ এটিব্যাটটক্স সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ডাঃ শান্তিরূপ ভাটনগর ভারতীয় 'মনোজাইট ভাও'-এর বিবিধ শিল্প-সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন।

বিভিন্ন শাখাসমূহে বহু মূল্যবান মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত ও সমালোচিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের একত্র সমাবেশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কে সভাস্থলে এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী অধ্যুষ্ঠানের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য জাতীয় সরকার যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, বৈজ্ঞানিকদের উচিত যাতে দেণ্ডলি সত্বর কার্যে পরিণত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

“জাহানারার আত্মকাহিনী”

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কালুনগো

“জাহানারার আত্মকাহিনী”র অম্ববাদক শ্রীমাখনলাল শাস্ত্রী বাংলা-সাহিত্যে অপরিচিত ব্যক্তি নহেন। তিনি মিশরের আল-আজহার মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, দরদী সাহিত্যিক এবং হৃদয়ঙ্গমসম্পন্ন সমালোচক। সম্ভ্রুতি তিনি “জাহানারার আত্মকাহিনী”* প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন (?) হইয়াছেন।

এই পুস্তকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ মনে করিয়াই প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক বর্তমান লেখকের উপর সমালোচনার ভার হস্ত করিয়াছেন। সমালোচনার বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া চমু-হির; মন যুগপৎ আতঙ্ক ও সন্দেহে ভরাক্রান্ত হইল। এই পুস্তক কি অম্ববাদ, না অপবাদ? অম্ববাদক লিখিতেছেন, “জাহানারার আত্মকাহিনী কাহ্নীর থেকে পারস্ত-ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি বাংলাভাষায় বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত করে লিখলাম জাহানারার আত্মকাহিনী।” কোন পুস্তকের অম্ববাদ প্রকাশ করিবার সময় পাণ্ডুলিপি কিংবা ছাপা বহির একটা হৃদিস দেওয়া সমীচীন। কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মুখে এইরূপ কোন আত্মকাহিনীর কথা শুনি নাই। কোন ঐতিহাসিক পত্রিকার ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না; অথচ ‘ঐতিহাসিক’ মাখনলাল শাস্ত্রী দাবি করেন, “জাহানারার করুণ কাহিনী মুঘলযুগের অপূর্ণ সম্পদ। এই কাহিনীতে আছে সৌন্দর্য ও বিতীষিকার অপক্লপ সমন্বয়, মানবায়ার শাশ্বত রূপ।” বৎসরাধিক কাল খোঁজ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম, ঐ রকম ছাপা বহির অতিথ কাহ্নীরে নাই। আলিয়া বুটেনশন কৃত ইংরেজী অম্ববাদের নাম মাখনলাল চাপা দিয়াছেন। ইংরেজ-মহিলার বহির নাম “The Life of a Mughal Princess” (G. Routledge and Sons, London, 1931)।

ঐ ইংরেজী বহির সহিত অম্ববাদ বহু পরিশ্রমে মিলাইয়া দেখিলাম, উক্ত ইংরেজ-মহিলার বহি-ই বাংলায় ভর্জমা করা হইয়াছে। “বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত” করিবার ওজুহাতে অম্ববাদক আসলের উপর রং কলাইয়া বিরূপ করিয়াছেন, দীর্ঘ ঐতিহাসিক (?) টীকাটীপনী যোগ করিয়া একখানা পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী ঐতিহাসিক উপন্যাসকে ইতিহাসের মর্যাদা দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ইংরেজ-মহিলার বহি নিহক কাঁকিবাঁকী, ফার্সি বহি হইতে অম্ববাদের দাবি কি তবে একটা স্বদেশী চাল? অম্ববাদক যদি এই তথাকথিত পাণ্ডুলিপি কিংবা ছাপা ফার্সি বহির রচনানৈলী সপ্তদশ শতাব্দীর ফার্সি রচনা বলিয়া ঐতিহাসিক-গণের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন তবে নিশ্চয়ের মুখে চূপ-কালি পড়িবে, জাহানারা জাহানমে যাইবেদ।

শাস্ত্রী মাখনলালের পুস্তক পড়িয়া মনে হইতেছে এই ‘জাহানারার আত্মকাহিনী’ বাবর জাহানীরের ডুজুক বা দিনচর্যা নহে; কোন অংশ কোন বৎসর লেখা হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই।

পুস্তকখানা আসলে ভ্রমণস্মৃতিভাষ্যে রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপ দেওয়ার প্রলোভনে লিখিত। কি ভাবে যোগল রাজকুমারীর আত্মকাহিনী তিনি আবিষ্কার করিলেন সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, জাহানারার কবরের উপর সামান্য ঘাস দেখিয়া মেমসাহেবের ভাবাবেশ হইল, সন্ধ্যা-নিসিনীর কেন এই দৈত্য? কেনই বা কবরের উপর খোদিত শেষ নিবেদনে এই হত্যার অভিমান? আরও কিছু জানিবার জন্য তাঁহার দরদী প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। আশ্রয় লুপ্ত বেড়াইবার সময় তিনি দেখিলেন মুসলমান বুদ্ধের এক খেত প্রস্তরখণ্ড প্রায় পত্তনোন্মুখ; হাত বাড়াইতেই আসিয়া পড়িল এক পাণ্ডুলিপি, কিম্বদন্ত অস্পষ্ট ও হ্রিৎ। সরল বিনিয়ন মেমসাহেবের বহির ভূমিকা লিখিয়াছেন। উহাতে কোন ঐতিহাসিক আলোচনা নাই; বহিখানা Dryden-কৃত *Aurangzeb* নাটক অপেক্ষা মনোমুগ্ধকর বলিয়াই তিনি দারিড এড়াইয়া গিয়াছেন। জেথিকা ওঁহার বহি “India”-কে উৎসর্গ করিয়াছেন। আলিয়ার এই মহান উদারতা মিস মেমোর যগোজীয়ার উপযুক্তই বটে। জাহানারার মুখ দিয়া এই বিদেশিনী মহিলা আমাদেরকে যে সকল কথা শুনাইয়াছেন, তাহা সত্যের অপলাপ মাত্র এবং অত্যন্ত আপত্তিকরক।

যুগবন্ধে ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া অম্ব-বাদক এই মেকী জাহানারার আত্মকাহিনীকে বাবর ও জাহানীরের দিনচর্যা এবং গুলবদন বেগমের ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমপর্যায়ে স্থান দিয়াছেন। যে সমস্ত ঘটনা এই কল্পিতা জাহানারার মুখে শুনান হইয়াছে সেগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তিনি কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই; পাদটীকাগুলি বরং নিজের ঐতিহাসিক জ্ঞানপ্রচার এবং মূল লেখিকার পক্ষসমর্থনের জন্যই যোগ করা হইয়াছে।

* গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা। পৃ: ১৮৬; মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কিন্তু অম্বাবাদের দোহাই দিয়া ঐশলামিক ইতিহাসের এক জন অধ্যাপক পুণানীলা স্বকী-সাধিকা শাহজাহান-মহিতা-জাহানারার নামে এই শ্রেণীর মুখরোচক মিথ্যা কুংসা বাঙালী-সমাজে প্রচার করিবার দার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। যে বহির নাম উদ্দেশ্য করিতেও ঐতিহাসিকগণ কুঠা-বোধ করিয়াছেন, তাহার বাংলা ভাষায় অম্বাবাদ দ্বারা আর যাহাই হউক, বাঙালী পাঠকের ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই আমরা ইতিহাসের নামে এই মিথ্যা-প্রচারের মুখোশ উন্মোচনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

আমরা এই বহির ভুলের ফিরিতির এক ক্রান্তি পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপিত করিতেছি।

১। “জাহাঙ্গীরের মহিষী মানসিংহের ভগ্নী মানবাই” [মুখবন্ধ, পৃ. ৫]

প্রমাণ ? শাহজাহানের দাঁতার নাম মানমতি বা বালমতি পাওয়া যায় (B. P. Saxena : *History of Shahjahan*, p. 1)।

মানমতি সংক্ষেপে “মানবাই” হইতেও পারে। মানসিংহের ভগ্নীর নাম আমরা কোন প্রামাণ্য ইতিহাসে পাই নাই। “জগৎ গোসাইনী” উপাধি, নাম নহে। “গোসাইনী” ফার্সি, সংস্কৃত কিংবা হিন্দী নহে; বাংলার গোসাই শব্দের জ্রীলিঙ্গ হইতে পারে। *Fuxuk-i-Jahangiri*-র মূল ফার্সি পাঠ গোসাইন—ইহা শুধু হিন্দী।

২। “আফিমের বিষ” [পৃ. ৬, মূল poppy juice, p. 7]

এক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হইলেও আফিম ও পোস্তদানা বিভিন্ন বস্তু। এক দীর্ঘ পাদটিকার অম্বাবাদক লিখিয়াছেন, গোরালিয়র জর্গে বন্দী শাহজাহানগণকে “রজমাজার আফিমের জল পান করতে হইতেন।” আমরা জানিতাম এইরূপ পানীয় নেশাবোধের অন্তত, রাজপুতানার অম্বাল, সেখানে হিন্দু

মুদলমানের পক্ষে প্রায় সমান হালাল। মেম-সাহেব poppy juice বা পোস্ত-জিহান জল ঠিকই লিখিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ফলাইয়া শুধুকে অন্তর করিবার অধিকার অম্বাবাদের আছে কি ?

৩। তাঁর [জাহানারার] জীবনীতে—হিন্দু-শাস্ত্রালোচনার বহু পরিচয় পাওয়া যায় (পাদটিকা ১০)।

—যথা ? দুই-একটা বহির নাম, কিংবা কোন সমসাময়িক ইতিহাসের নজীর উদ্ধৃত করিলে পাঠকবর্গ উপকৃত হইতেন।

৪। অম্বাবাদের বয়না :—

“In my palace in Delhi I lived like the *dayfly* in the gardens of Shalimar, which seeks intoxication in the cups of flowers”.....(p. 11)

“দিল্লীর প্রাসাদে শালিমার বাগে মধুমক্ষিকার মত উড়ে বেঁচেছি”.....(পৃ. ১০)।

বিলাতী “ডে-ফ্লাই” কি আমাদের মধুমক্ষিকা ? ইহার পরেই আসিতেছেন, “মণি-মাণিক্যোজ্বল স্বর্ণরেণু পাখার মধ্যে মক্ষিরাজি।” কালো মৌমাছির সোনালী পাখা কেহ দেখিয়াছেন কি ?

৫। “দূরে ঐ ছাদের অপর প্রান্তে...” (পৃ. ১২; I know of a palace on a hill far away above the lake, p. 12)

দেখিতেছি মেম-সাহেবের “রূদ” অম্বাবাদে জমার্ট হইয়া পাখরের ছাদ হইয়া গিয়াছে, এবং উহার “ঐ শান্ত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হচ্ছে” সেই প্রাসাদ।

৬। পুনশ্চ—By the Canal of Firuz Shah—“ফিরোজশাহর পরিবার পাশে আমার উদ্যানবাটিকা” (পৃ. ১৩)।

ফিরোজশাহের পরিখা জাহানারার জন্মের পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল। এই কথা লেখিকা জানিতেন। অম্বাবাদক বাল এবং জর্গপরিবার মধ্যে পার্থক্য নিকরই আনেন। দিল্লী

টোল ও কোম্পানীর

দাঙ্গ ও কাউন্সেল
অন্যান্য মলম



কিউটা-টোল
পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

বরানগর, কলিকাতা

নিম্ন মলম
খোঁস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য



শহরের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমে জেলিকা তরুণ উল্লিখিত ঝালের
বাঁও এখনও আছে, পরিখা কোথায়ও নাই।

৭। বীর পুঠা (পৃ: ২১, ২২)

বলাহুবাধের কুপার মহারাণা প্রতাপের প্রিয় অর্থ “চৈতক”
চৈতক হইয়াছে। এইবার ক্রীমুখ মাধবলাল শাস্ত্রীর দ্বারকত
হুই হুই বার আসিলেন বীর পুঠা। ফাগি বর্ণমালায় ‘ট’ নাই;
পুঠা হিন্দুস্থানী নয়। মেমসাহেব ‘ত’ বর্ণ স্থানে ট উচ্চারণ
করেন; অহুবাদক মেমসাহেবের সুরে সুর বেয়াগুম মিলাইয়া
কেলিয়াছেন। এই কিশোর রাজপুত্র বীরের আসল নাম কি
ছিল জানিতে হইলে কোম ভুলপাঠ্য ইতিহাস কিংবা ওরা-
কৃত ‘রাজপুতানকা ইতিহাস’ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৭)
অহুবাদক দেখিয়া লইতে পারিতেন।

৮। বেগম নুজাহানের জেসেমিন প্রাসাদে আমার কক্ষে
(পৃ: ৩২; Eng. p 42)।

আগ্রাহর্গে মুসাদ্দন বরুজ অর্থাৎ মেমের “জেসেমিন”
প্রাসাদের সহিত নুজাহানের কি সম্পর্ক? উহা নির্দিষ্ট হই-
বার কয়েক বৎসর পূর্বেই বিবধা নুজাহান বিবিবিভবনার
লাহোরে নিকরাসিত। এই কথা পাদটীকায় লিখিলে ‘ইতি-
হাসক’ অহুবাদকের সুধরুণা হইত।

৯। সেই বিরাট চীন বিটগীর ডলার... (পৃ: ৫৫; the
big China-tree)

“চীন” বৃক্ষ মহাচীনে থাকিতে পারে, ভারতবর্ষে কখন-
কালে ছিল না, এখনও নাই। মেমসাহেব নিশ্চয়ই ভূমণ
কাছীরে “চনার” বা চেনার গাছের সারি দেখিয়াছেন। দিল্লী
আগ্রাহর ঐ গাছ জমায় না। অহুবাদক বোধ হয় ঐ গাছের
‘চীন’ এই নামকরণ করিয়াছেন।

১০। “আমি অধুনা কুড়ি ভোরণের মধ্য দিয়া মসজিদে
প্রবেশ করলাম”—(পৃ: ৭১; Through horseshoe-gate
...p. 79)।

তত্ত্ব টীকা—“এই ভোরণের মধ্য দিয়া সাতটি হস্তী পাশা-
পাশি প্রবেশ করতে পারে” (।।)

ঘোড়ার পুর এবং ঘোড়ার পায়ে লোহার নাল (horse-
shoe) কি একই বস্তু? মেমসাহেব সত্তা দরের গাইড-
বুক পড়িয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, বর্তমান সভ্যকালে স্থানীয়
নিরক্ষর লোকেরা বুলন্দনগরওয়াজাকে নাল-দরওয়াজা বলে।
এইজন্য তিনি কণ্ডকটী কয়ার্হ, ক্ষিত অহুবাদক অর্থ করিয়া-
ছেন ঠিক বিপরীত। Pointed arch, Horseshoe arch,
semicircular arch ইত্যাদি খিলানের সংজ্ঞা। বুলন্দ-
নগরওয়াজার মতো কোন “অধুনা কুড়ি” খিলান অহুবাদক
কিংবা অন্য কেহ কি চন্দ্র চক্রে দেখিয়াছেন? ঐ দরওয়াজার
নির্মার্গ নৈলী অর্ধগৃহাকৃতি বা Semi-dome style। শীচে
বে অংশে নিম্ন কণ্টের বিরাট পাল্লা বসান হইয়াছে উহা

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যানুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে ‘হিন্দুস্থান’-এর
উন্নত শ্রেণীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে
২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার উপর।
সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রে
বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা
করা হইয়াছে:

মেরাদী বীমার— } ৮- টাকা
আজীবন বীমার— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অন্তান্ত অনিশ্চিত
ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা
রাখিয়া এবং স্বদের হার অজ্ঞিত হার অপেক্ষা
২% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব
নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।
লগ্নীতে কমহারে হুদ অর্জন, হুমুলোর বাজারে
অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা
সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী
নিরাপত্তা, হুদ অর্থিক সম্ভতি এবং পরিচালন-
ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল ... ১৫ “ ৯৭ “ “ “
প্রিমিয়ামের আয় ৩ “ ৪০ “ “ “
দাবী শোধ ৭ “ ২০ “ “ “



হিন্দুস্থান
কো-অপারেশন
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

অনেকাংশে মূলসমানী Pointed arch-এর মত। শুধুকে অল্প অল্প করিয়া এরূপ দৃষ্টান্ত আর কত দেখাইব। অল্প-বাদক ইহার সঙ্গে এক অভিনব ঢীকা ছুঁড়িয়া দিয়াছেন। ষাহারা এই নাল-দরওয়াজা অভিজ্ঞ করিয়া মসজিদে ঢুকিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন, সাওট হাতী দূরে থাকুক সাওট পর্বত কিংবা সাওতাল ভূ-ভিওয়ালা লোকও পাশাপাশি ঢুকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। ইহাকে নাল-দরওয়াজা কেন বলে সিজীর এককাওয়ালাকে বিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায়। ঘোড়ার ব্যারাম হইলে তাহারা ঘোড়ার নাল কাঠের পাল্লায় মারিয়া দেয়।

১১। “ডুর্কো-বেগমের প্রাসাদ এখনও জলের উপর প্রতি-
বিস্তৃত হচ্ছে; সেই অপরূপ মহলে প্রত্যেকটি খেত প্রস্তর খেন
ক্ষোদিত গজদন্ত।” (পৃ: ৭৭; মূল...*Faery castle...as if*
red sandstone were ivory, p. 86.)

কতেপুর সিজীর বাস মহলের মধ্যে এই প্রাসাদের আশে-
পাশে জল কোথায়?

উর্দু-নী-তিলাওয়ার ডানা ছিল না; সুতরাং অপরূপ
“পরী” হইতে পারে না। মেমসাহেবের “পরীমহল” অপরূপ-
মহল হইল কেন? এই প্রাসাদের কোথাও খেত প্রস্তর নাই।
লাল বেলে পাথরকে লাদা করিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত এবং
ইতিহাসকে অপমানিত করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

১২। বাগানুদী বলেন যে আকবরের বাসকক্ষের সম্মুখে
একটি দোলনার বসে সুরঙ্গিণ যোগাত্যাস করতেন। [ঢীকা
পৃ: ৯১]

ইহা কি লোকস্বর্গে শুনিয়া লেখা হইয়াছে? বদায়ুনী
এমন আছগুবি কথা লিখেন নাই। জিনিষটা দোলনা নয়,
একটা দড়িবাধা বুদ্ধি। প্রতি রাজ্যে আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে
বুদ্ধিতে বসাইয়া উপরে শয়নকক্ষের বাহিরে এই বুদ্ধি বাধিয়া
রাখা হইত। অক্ষিরা যোগাত্যাস করিতেন না, আকবরের
সঙ্গে ভ্রাতালোচনা করিতেন।

১৩। সে পুত্র ঘোষাবাই প্রসব করেন সলিম চিশ্তীর
ক্ষুদ্র কুটীরে [ঢীকা পৃ: ৯৬]

সলিমের মাতার নাম কোন ইতিহাসে লেখা আছে কি?
ঘোষাবাই তথা সিজীর ঘোষাবাই-মহল জনজ্ঞপ্তি, ইতিহাস
নয়। প্রসবের পূর্বে সজাজী চিশ্তীর ক্ষুদ্র কুটীরে বাস
করিতেন না। চিশ্তীর বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে উহার জন্ম

নিশ্চিত হইয়াছিল সুরম্য রঙ্গমহাল। ইহার তথ্যবশেষ এখনও
বিদ্যমান।

১৪। ছলেরা—ছলেরা মেমসাহেব-কল্পিত জাহানারার
প্রথম প্রণয়ী। লেখিকা Explanations-এর মধ্যে তানসেন
নাসির-ই-খলকর পরিচয় দিয়াছেন, অথচ ছলেরার কোন
পরিচয় দেয় নাই। সিমেনার বহি ও নাটিকার বাঁচে গ্রীষ্ম
মাখনলাল বাংলা অনুবাদে একটা পরিচয় লিখিয়াছেন। তিনি
ছলেরাকে “বুলীরাঙ্গ” হজ্জসাল বুলেলা, বলিয়াছেন। হজ্জসাল
বুলেলা “বুলীরাঙ্গ” নহেন, বুলেলাখণ্ডের অন্তর্গত ওরহান রাঙ্গা।
মেমসাহেব-বর্ণিত জাহানারার লীলা অবসানের কয়েক বৎসর
পরে বুলেলা হজ্জসাল সাবালক হইয়াছিলেন। “বুলেলা
বুলীরাঙ্গ” মোগল ইতিহাসে “সোনার পাথর-বাট”। ইহার
সন্ধান ঐতিহাসিক মাখনলাল কোথায় পাইলেন?

সামুগ্ধের যুদ্ধে ছলেরা নেছাবত খাঁর সহিত লড়াই
করিয়া মরিলেন; পিতার সহিত আত্মা হুগে বন্দী হইলেন
জাহানারা। কয়েক বৎসর পরে দারার ছিন্নমুণ্ড উপহারপায়ে
নজর পাঠাইয়াছেন শাহজাহানের কাছে শাহানুশাহ আলম-
গীর। তখন রাজকুমারীর বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, কিন্তু
প্রেমের উবাদনার প্রাণ কিশোরীর মত চঞ্চল। চারিদিকে
সুস্তির পাষণ-প্রাচীর। অন্ধকার মামিয়া আঁসিয়াছে।
মুগাঘন রুদ্ধে বসিয়া আছেন নীরবে একাকিনী মেম-
সাহেবের কল্পিত জাহানারা, সামনে কাগজ-কলম। তিনি
বগত বলিলেন, “আজ রজনীতে আমি যাব না সজাটের
কাছে;...আমি যে আছি আমার যুগের কাহিনী আমাকেই
বলে যাব”—লেখিকা ইহাতেও সত্যকে বিকৃত করিয়া উদ্ভট
কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

জাহানারার মিথ্যা অভিনয়ের ভূমিকায় নামিয়াছেন বহু
অভিনয়, বক্তব্য বা প্রলাপ উত্তম ইংরেজী ভাষায় সপ্রতিভভাবে
বলিয়া গিয়াছেন। বাংলা ‘জাহানারার আত্মকাহিনী’কে
গোদালার ছুধ বলিলে উচ্চ প্রশংসা করা হয়। গোদালা ছুধে
জল মিশায়, বোতলের কালি চালে না। আবারে হুর্ভাগ্য,
পুণ্ডক-সমালোচনা করিতে বসিয়া মোগল ইতিহাসের যুদ্ধ-
বোধ রচনা করিয়া ফেলিয়াছি। মোগল যুগের ইতিহাস
সম্বন্ধে ওরাকিবহাল বে সফল পাঠক এই পুণ্ডক পাঠ করিয়াছেন
তাঁহারা বলিবেন—ছলের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয় নাই, পুণ্ডক-
খানির সর্বত্র অল্পতর ছড়ানো রহিয়াছে।



পুস্তক পরিচয়

রাবণ বধ—কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিরচিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃ. ৫+১২+৫৪। মূল্য ২।০ টাকা।

‘সত্তাবশতক’ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় উমেশ-চন্দ্র মজুমদারের নিকট সংরক্ষিত কবির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে বাছিয়া শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এই খণ্ডিত নাটকখানি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দুই-চারিখানি গল্পগ্রন্থের লেখক হইলেও মজুমদার মহাশয়ের গদ্যসাহিত্যে খ্যাতি নাই, তিনি যে আবার নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাও সাধারণের গোচর ছিল না। এই আবিষ্কারে কবির সাহিত্য-কীর্তি যে বর্ধিত হইল তাহা নহে; পুরাতন সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে রচিত এই নাটকখানি বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি বিচিত্র ভ্রম্মনা হিসাবে বিশেষ কোতূহলের সৃষ্টি করিবে এই মাত্র। ইহাতে লেখক আধুনিক দিনেমাগ্ন প্রযুক্ত ‘ক্লাশ ব্যাক’ পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছেন এবং দিনেমাগ্নসম্বন্ধে দৃষ্টপরিবর্তন স্থান ও কালের ব্যাধ লঙ্ঘন করিয়া এক আশ্চর্য্য অতঃপুর্বে সঞ্চার করিয়াছেন। মাত্র ৫০।৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে সমগ্র রামায়ণের মূল দৃষ্টাবলী পাঠকের চোখের সামনে আবর্তিত হয়, ইহা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ঘটনা লইয়াই নাটক হয় না, দৃষ্ট হইতে দৃষ্টান্তের চরিত্রগুলিরও বিকাশ ও পরিণতি প্রয়োজন। এই নাটকে তাহা হয় নাই, সুতরাং ইহা অভিনয়োপযোগী নহে। ভাষা ক্রিয়াপদে প্রধানতঃ চম্ভিত হইলেও অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন বিশেষ বিশেষণে কণ্ঠকিত। মোটের উপর, এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতেই হইবে। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ মিত্র দীর্ঘ ‘সম্পাদকের নিবেদনে’ নানা প্রশংসার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেন কবির জন্মের তারিখ সম্পর্কে জীবনীকার ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ১২৪৪ সন গ্রহণ না করিয়া ১২৪১ সন গ্রহণ করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কবি ‘হিন্দু হিতৈষী’ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন এ খবরই বা তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা বতদূর জানি হরিচন্দ্র মিত্রই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ‘রাবণ-বধ’ গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখেন নাই, ভাস্কর অমিত্রাক্ষর—গৌরীশী ছন্দে লিখিয়াছিলেন। দুঃখের সহিত শেবে একটি অনুরোধও না করিয়া পারিতেছি না, বইখানি অব্যর্থ-সম্পাদিত, বহু মুদ্রাকর-প্রমাদে কণ্ঠকিত।

শ্রীজৈজ্ঞান্য বন্দ্যোপাধ্যায়

আবর্ত—শ্রীইন্দুপ্রকাশ দাস। গণ-দীপায়ন পাবলিশার্স, ১৭০এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪। দাম দুই টাকা।

একটি মনোভাষা ছেলের অবস্থা-বিপদায়ের কাহিনী এই উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে। নানা চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে আবর্ত সৃষ্টির প্রয়াসও ইহাতে আছে—সে সব একান্তই বাহিরের দিক; নায়কের মনোজগতে এই বিপদায়ের ছাপ সামান্য মাত্রই পাওয়া যায়। গল্পটি আগাগোড়া সমস্তাযুক্তভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হইয়া বেশ খানিকটা দূরেই সরিয়া গিয়াছে। পরিশেষে অবশ্য সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা মিলিয়া মধ্যরেণু সমাপণের হইয়াছে।

সম্ভাব্য বাণীচিত্রের প্রভাবই এই ধরণের গল্প-রচনার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য যে সব বাণীচিত্র আমাদের বর্তমানকে পীড়িত ও

ভবিষ্যৎকে আশাশূন্য করিয়া তুলিতেছে—এটি তাহাদের সঙ্গোত্তর নহে। ইহাতে সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ যথেষ্ট ছিল—গল্পকে ছায়াছবির সঙ্গে ভিড়াইয়া দিবার তাড়াই সে সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়াছে।

আর্থিক লাভকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সাহিত্য-রচনাকে বিষম ব্যাধি বলিয়া মনে করা বাইতে পারে। আজকাল এই ব্যাধির প্রকোপটা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিষম ব্যাধিতে আজান্ত লেখকগণ কিভাবে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন বর্তমান পুস্তকখানি তাহার প্রমাণ।

আমি ছিলাম—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। স্নেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড। ১১২, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

বাংলা কথা-সাহিত্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পরিচয় দেওয়া বাইল। উপন্যাস রচনার তিনি গভীরগতিক পন্থা অনুসরণ করেন নাই—কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সেই সব লইয়া এককালে বাণবিতণ্ডার অন্ত ছিল না। আজ পরিণত বয়সে তাহার বচনায় সে বিদ্রোহের সুর নাই, ভ্রমোদর্শনে তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাহারই নিদর্শন। এটি উপন্যাস হইলেও অতীত স্মৃতি-উল্লেখনের মধ্য দিয়া বাস্তবকেই যেন নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহাকে জীবন-স্মৃতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারত বাস্তবতন্ত্র

শ্রীচাক্রচন্দ্র চৌধুরী

Indian Constitution-এর বাংলা ব্যাখ্যা

...এই গ্রন্থটির অপরিমিত উপকারিতার কথা স্বীকার করা যায় না। —যুগান্তর

...দেশের একটি প্রকৃত অভাব পূরণ করিয়াছেন... এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। —দেশ

...Written in a fascinating and chaste language.....the author's approach and presentation.....clear and vivid. —Modern Review.

দাম আড়াই টাকা, ডাকমাস্তুল আলাদা।

এবা পাবলিশিং কোম্পানী
১২০সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড

১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

ও অত্যন্ত দোকানে পাওয়া যায়।

এ গল্পের নায়ক বানপ্রস্থের পারে গিয়া পৃথিবীকে ঝানিকটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াছে এবং বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা আত্মবরণপট চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। শনজনসমুদ্র সংসারে তাহার সঙ্গী কেহ নাই—কেহ তাহার সম্মান করে না, তাই অতীতকে অত্যন্ত মেহে, মমতার আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্তমানকে উপেক্ষা করিবার প্রয়াস তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে গল্পের গ্রন্থি কিছু শিথিল হইলেও রসোপভোগ ব্যাহত হয় না। নায়কের অপূর্ণ ইচ্ছার পরিপূরক হিসাবে স্বকুমার চরিত্রের অবতারণা। তাহার দেশপ্রীতি ও বলিষ্ঠ সমাজগঠনের প্রচেষ্টা সূচিক্রিত হইয়াছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা চরিত্রের পাশে আসিয়া ঝাড়াইয়াছে এক সমতাসমরী নারী—মণিকা। উভয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ ও দুঃখবরণের মহত্ব কাহিনী হইয়াছে উজ্জল।

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

পূর্ণচ্ছেদ—শ্রীলিলা দেবী। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

তিনটি নর-নারীর অন্তরে ভালবাসার আবির্ভাব ও বন্দ্য এবং আত্ম-ত্যাগের উপর সেই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার করুণ-কাহিনী এই উপন্যাস-খানির বিষয়বস্তু। এই ধরণের কাহিনী দেশী-বিদেশী উভয় সাহিত্যেই প্রচুর আছে। অভিনব প্রকাশভঙ্গীর কোশলে পুরাতন গল্প নতুন রস-স্বষ্টিতে সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে তেমন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িল না। তবে বাঁহারা শুধু সময় কাটাইবার জন্য গল্প পড়িতে ভালবাসেন—এই গল্প তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দাদুবাণী—শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার। বীণা লাইব্রেরী। ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০ টাকা।

গ্রন্থকার মধ্যযুগের বিখ্যাত সাধক দাদুর অমরবাণী হইতে বাহিরে দেড় শতটি বাংলা পদ্য অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সরস। ইহার সাহায্যে পাঠক মূল শ্লোকগুলির রসান্বাদন করিতে পারিবেন।

খুসির খেয়াল—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী। ৮১৩, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-২৫। মূল্য আড়াই টাকা।

খেয়াল, সন্দেহ নাই। আধুনিকতার ঝলক দেওয়া কবিতার বই। কোথাও মনোবিজ্ঞানের ছায়া, কোথাও ব্যঙ্গবিজ্ঞপের চমক। ভাবুকতা নাই, ভাবালুতা আছে। যে যুগে শত্রীরের ক্রান্তি আর মনের অনুভূতি লোকে হালুকা হাওয়ার সঙ্গে শূন্যে উড়াইয়া দিতে চায়, হয়তো সেই যুগেরই উপযুক্ত ছড়া।

“জানালার ভেসে আসে নাইটকুইনের গন্ধ—

এমারেলিন, পুমিলা, প্রান্তিকোরা।

ফেরালের গায়ে একটা টিকটিকি—

গম্বাপাড়ের (?) কুমিরের বাচ্চা।

মত্তবড়ো হাঁ।

ধরেছে চেপে টুটি

সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া

লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অল্পমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিন্দ্রদাস ব্যানার্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-ভাষ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুখবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২৫০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, গোবিন্দ আজী রোড, কলিকাতা-২৭

কোম—মাউথ ৮০১



যেমন মুসলিম

আবিসিনিয়ার টুট চেপে

গোঁফহীন গোঁফে দিচ্ছে চাড়া।”

কাবোর টুট কেহ চাপিয়া ধরে নাই তো?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাড় (প্রথম খণ্ড)—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক—শ্রীঅশোক গুহ। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

“বাড়” এরেনবুর্গের ‘ষ্ট্রম’ নামক ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের যে প্রচণ্ড বাড় বহিরা বার তাহারই পটভূমিকার উপন্যাসখানি রচিত।

অতীত ও বর্তমান যুগের যুদ্ধের পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন যুদ্ধ দুইটি বিবদমান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। একটা সহজ সরল পথেই ছিল তাহার গতি, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। আজ ইহা শুধু একটি দল বা জাতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে পটভূমিকা এবং বিষয়বস্তু উভয় দিক দিয়াই উপন্যাসাদিতে অন্তি-নবত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে। উপন্যাসের ঘটনা স্বল্পপরিসর স্থানে আবদ্ধ নাই—বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। এরেনবুর্গ একথা শুধু অনুভবই করেন নাই, সে অনুভূতিকে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন

“প্যারীর পতনে”, আর তাঁর সে প্রদান পরিপূর্ণরূপে সাক্ষ্যলাভ করিয়াছে “বাড়”—এ। লেখক শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নজিরকেই একঘাতি উপলব্ধি হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি যেমন আধুনিক অভিনব সংগ্রামের জটিলতম রূপকে বৃত্তিতে পারিয়াছেন, তেমনি প্রত্যেক করিয়াছেন তাঁর দানবীর বীজ্যসত্যকে। তিনি নিজে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া আধুনিক যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছেন এবং অপরিমীম দরদ দিয়া প্রত্যেকটি মানুষকে চিত্রিত করিয়াছেন—কোথাও স্থায় মূল্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই। এত বিচিত্র মানুষের ভিড়ের মধ্যেও তিনি নিজের আসল সত্তাকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁর নিপুণ তুলিতে প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন প্যারীর ভদ্র সমাজকে, তেমনি লাসিয়ে আর বার্ট, মাদো এবং লুই, নিভেল, ছামা, কেলার, হিল্ডা, সার্জ ও সীপ প্রভৃতি সকলকেই লেখক একই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়াছেন। পাত্রপাত্রীদের চিত্তাধারা, স্বথ-ছথ, প্রেমশ্রুতি, ঘর বাঁধিবার আতঙ্ক—সে ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরদন বাধা, কোনকিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নাই।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে বাঁহারা যত্ববান হইয়াছেন শ্রীঅশোক গুহ তাহাদের অন্ততম। আলোচ্য পুস্তকখানিও নিপুণ অনুবাদক হিসাবে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন রাখিবে। তাহার ভাষা সহজ সরল অথচ বেগবতী, বলিবার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত



সৌন্দর্য রক্ষায় অপরিহার্য

শীতের রক্ষতা দূর করিয়া মৃদুশীত সৌন্দর্য ও লালিতা বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মের কোমলতা অক্ষুণ্ন রাখে। দিব্যভাসে লাবণি স্নো ও রাডেলিওনিক্রীম ব্যবহার্য।

শোভনি
স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কোসমিক্যাল



শ্রী শ্রীচণ্ডীতত্ত্বসুবোধিনী—(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ১৭-বি, শ্রীমোহন সেন,
কলিকাতা-২৬ হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে
১০, ১০, ১৫ ও ১০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীচণ্ডীর চরিত-ত্রয়ের এবং অর্গলা,
কীলক, কবচ ও বৈদিক দেবীমুক্তের সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যবিশ্লেষণ-
যুক্ত সরল ব্যাখ্যার সহিত ঘটচক্রভেদ-রহস্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীশ্রীজগদ্ধাতার লীলামাহাত্ম্য, তাঁহাকে লাভ করিবার
সাধন-পদ্ধতি, চণ্ডীপাঠের নিয়ম, অর্গলা, কীলক কবচ ও দেবীমুক্তের
প্রতিপাত্ত মূল বিষয়ের আলোচনা এবং মূর্ত্তিপূজা-রহস্য বর্ণিত আছে।

তৃতীয় খণ্ডে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রতি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এবং সুবোধিনী
নামক বিশেষ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে পাঠবিধি, বৈদিক রাত্রিমন্ত্র ও দেবীমুক্তসহ ষড়ঙ্গ মণ্ডলশতী
চণ্ডীর মূল সংস্কৃতশ্লোকাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এই চারি খণ্ড গ্রন্থে লেখক
শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য কীভ'ন করিয়াছেন। চণ্ডীর বহুবিধ সংস্কৃত টীকা বা
সাধনসময়াদি বৃহৎ বাংলা পুস্তকাবলীর মর্মোদ্ঘাটন করা সাধারণ
পাঠকের দুঃসাধ্য; কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনীর যথাচিত সংক্ষিপ্তসার
পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রেরই বিশ্বজননীর অপার লীলামাধুরী মর্মে মর্মে
অনুভব করিতে পারিবেন। চতুর্থ খণ্ডে বৈদিক দেবীমুক্ত চণ্ডীপাঠের
অন্তে পাঠ্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বৈদিক রাত্রিমন্ত্র ও দেবীমুক্ত

চণ্ডীপাঠের পূর্বেই পাঠ্য বলিয়া এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সকল চণ্ডীতে
নির্দেশিত। বারাহী ও মহাভীষ্মের বিধিবাক্য পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক
মন্ত্রাদি বিষয়েই প্রযোজ্য; কিন্তু পৌরাণিক চণ্ডীর মূল আকর ঋগ্বেদীয়
মন্ত্রাদি বেদের প্রাচীনত্ব ও সনাতন ধর্মের প্রতি প্রতীতি রাখিয়া অগ্র
পাঠই সমীচীন। চণ্ডীর প্রথম চরিতের প্রসিদ্ধ মহাকালীয় ধ্যানমন্ত্রেও
প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, শেষের দুইটি চরণকে পূর্বাগর
উল্টা করা হইয়াছে। ইহা যে ভুল তাহা মধ্যমচরিতের মহালক্ষ্মীর এবং
উত্তরচরিতের মহাসরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র দুটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শিবরাত্রি-পূজা ও কথা—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
শ্রীশ্রীঅনন্ময়ী কালীমন্দির, ৮৫, আমহাট্ট স্ট্রিট, কলিকাতা-২। মূল্য
দশ পয়সা।

গ্রন্থকার সুলভ মূল্যে বিবিধ পূজা ও ব্রতকথা প্রকাশ করিয়া হিন্দু
বাঙালী গৃহস্থের বিশেষ উপকারসাধন করিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকের
গোড়ার দিকে শিবরাত্রির পূজা সম্বন্ধে যে তত্ত্বালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে
তাহা লেখকের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। এই পুস্তকে পরম্পর ও
ত্রিগদী ছন্দে ব্রতকথা এবং লিপ্যষ্টকম, শ্রীশ্রীউমানন্দভৈরবপ্রোক্তম্, শ্রীশ্রীহর-
গৌরী আরতি এই তিনটি সংস্কৃত স্তোত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

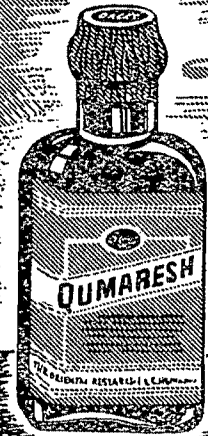
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অদ্বিতীয় লিভার টনিক

“কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়ার নিশ্চিতরূপে
আরোগ্য করে। অধিকতর রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য
পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন
কার্যেও সহায়তা করে। “কুমারেশ” লিভার ও পেটের
পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটা অদ্বিতীয়
লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

কুমারেশ

৭ লিভারকে সুস্থ ও সতেজ
রাখে—



ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া * হাওড়া



ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগোর সম্মান লাভ

‘রম্য্যাল এনিসারটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’ সম্পত্তি লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগোকে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য ‘সার যত্ননাথ সরকার’ পদক প্রদান করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপক কানুনগোর গবেষণাও বিশেষ মূল্যবান। এতদ্ব্যতীত ডিগ্গি, জয়পুর রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যাদি মোগল-রাবপুত ইতি-



ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো

হাসের একটি অঙ্ককারাঙ্কন অধ্যায়ের উপর অভিনব আলোক-পাত করিতে সক্ষম হইয়াছে। অধ্যাপক কানুনগো একজন শক্তিশালী বাংলা ঐতিহাসিক সন্দর্ভ-লেখক। তিনি শের শাহের ইতিহাস, জাঠদের ইতিহাস, দারা শোকোর ইতিহাস প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তকের প্রণেতা।

অধ্যাপক কানুনগো আচার্য যত্ননাথের একজন পুরনো ও প্রিয় শিষ্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক .অধিবেশন

সম্পত্তি সঙ্ঘ-সভাপতি ক্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে সঙ্ঘের কালিকাতায় প্রধান কার্যালয়ে ইহার সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অহুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘের

বিভিন্ন কর্মধারা পর্যালোচনা করিয়া ১৯৪৯-৫০ সালের অহুষ্ঠিত কার্যাবলীর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন—

আলোচ্য বর্ষে ৬টি প্রচারক-দল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মহানু আদর্শ প্রচার করেন। সঙ্ঘ হইতে একটি সাংস্কৃতিক মিশন দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার করেন।

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, যম্মাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র-গুলিতে সঙ্ঘ আলোচ্য বর্ষে বহু তীর্থযাত্রীকে অর্থসাহায্য করিয়াছে। এই বৎসর কুরুক্ষেত্রে একটি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘকর্তৃক ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৯টি বিদ্যার্থী-ভবন পরিচালিত হইয়াছে। সঙ্ঘ হইতে বিভিন্ন ভাষায় জাতিগঠনমূলক কর্মপন্থার নির্দেশ-সহস্রি ৫০খানি পুস্তক, দুইখানি মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ডায়মণ্ড হারবারে শরণার্থীদের জন্য একটি বিদ্যালয় ও কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিল্পশিক্ষালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

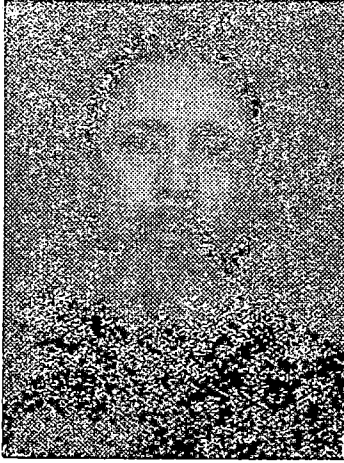
এই বৎসর গয়া, কাশী, সাগর, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানে বিভিন্ন মেলায় সেবাকার্য করা হইয়াছে। সঙ্ঘকর্তৃক আসামে ভূমিকম্প-বিশ্রান্ত অঞ্চলেও সেবাকার্য পরিচালিত হয়। এতদ্ব্যতীত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে কলেরা-ও বসন্ত প্রতিষেধক টিকা এবং ইঞ্জেকসন দান, ৪০ সহস্রাধিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রাণাঘাটে প্রতীকমাণ শরণার্থীদের জন্য একটি সদাশ্রিত খোলা হয় এবং শিয়ালদহ, বনগাঁ, ডায়মণ্ড হারবারে শরণার্থী-শিবির পরিচালিত হয়। ডায়মণ্ড হারবারে একটি শিল্প-শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাও এই বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য কার্য। তা’ ছাড়া গয়া সেবাশ্রমেও এই বৎসর শরণার্থীদের আশ্রয় ও সাহায্যদান করা হয়। বহু লোককে হিন্দুধর্মে পুনরানমন, বৈদিক যজ্ঞ ও বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় অহুষ্ঠানও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

আয়ব্যয়ের হিসাব নিম্নলিখিত রূপে :

আয়—(সাধারণ তহবিল) ৪৯৩,৪০৭৫০; ব্যয় ২৫৭০৭ টাকা, সাহায্য-ভাণ্ডারে আয়—১১৪৪৬/০ এবং ব্যয়—৪১৫৪২/৯ পাই।

প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের ডিগ্রি প্রাপ্তি

ঋষি বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার রাজবৈজ্ঞ কবিরাজ
ত্রিপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়কে ডক্টর অব সায়েন্স (আয়ুর্বেদ-



ত্রিপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

বৃহস্পতি) উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার
বিষয়বস্তু ছিল "সায়ান্স অব পালস"।

কবি ভুজঙ্গধরের স্মৃতি-তর্পণ

গত ১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কবির ভুজঙ্গধর স্মৃতিরক্ষা
সমিতির উদ্যোগে বসিরহাট টাউন হলে বাংলার লক্ষপ্রতিষ্ঠ
কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের একাদশ যুভা-বার্ষিকী
উপলক্ষে এক বিরাট স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন
করা হয়। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক
ত্রিযুক্ত ঘোষণেশচন্দ্র বাগল মহাশয় অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য
করেন। ভুজঙ্গধর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক ত্রিযুক্ত
ঘটীজ্ঞানাপ যুথোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বিভাবিনোদ মহাশয়
কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে সমিতির একাদশবর্ষব্যাপী প্রচেষ্টার বিশদ
বিবৃতি প্রদান করেন।

প্রায় পাঁচ শত নর-নারী কবির স্মৃতি-বাসরে উপস্থিত

হইয়া নিজেদের অন্তরের প্রভা নিবেদন করেন। কবির
বিভিন্ন কাব্যাবলী, অনুবাদ-সাহিত্য, পঞ্চদশী, গীতাকাব্য,
মেঘদূত, চণ্ডীকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি এবং সামাজিক ও
লোকসেবক হিসাবে তাঁহার উন্নত হৃদয়ের তাৎপ্রবণতা,
তাঁহার বিলাসব্যাসমহীম নিরলস জীবনযাপন, ইংরেজী
সাহিত্যের প্রাঞ্জল মর্ম্মানুবাদে নৈপুণ্য প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার
আলোচনা করিয়া ত্রিযুক্ত ঘোষণেশচন্দ্র বাগল একটি সার-
গর্ভ ভাষণ দেন। ত্রিবিজয়মাধব মণ্ডল, যঃ ঘোষণাল,
ত্রিবিজয়ের বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপরেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি স্বরচিত
কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার দ্বারা ভুজঙ্গধরের স্মৃতির প্রতি



কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

প্রভাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভার দুইটি প্রস্তাব গৃহীত
হয়। প্রথম প্রস্তাব ছিল—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে কবি
ভুজঙ্গধরের একখানি তৈলচিত্র রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে
দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁহার কাব্যরাজি হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ
আহরণ করিয়া একখানি সংকলন-গ্রন্থ সংকলনের কথা হয়।
ভুজঙ্গধরের কবিতা হইতে স্মরণোজনাপূর্বক কয়েকটি সঙ্গীত
গীত হয়। তাঁহার রচিত পদাবলীর কতকংশ লইয়া কীর্তনও
করা হইয়াছিল।



অমৃততাণ্ডুল
সর্বপ্রকার বেদনায় জাগতিক যোগার ন্যায় কার্যকরী।

দাদেব মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাণ্ডুল লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭

স্থাপিত ১৮৯৩



চন্দ্রশেখর সেন

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ সরকারী উকিল চন্দ্রশেখর সেন গত ১৭ই মার্চ ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতায় বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবার-পরিজন চট্টগ্রামের সমাধে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বদবিতাপের পর তাঁহার হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন।

যে সকল গুণ থাকিলে আইন-ব্যবসারে উন্নতিলাভ করা যায় চন্দ্রশেখরের তাহা পূর্ণমাত্রায়ই ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বেলাতুল্য বিশেষ অমুরাগী ছিলেন এবং গত তিন বৎসর যাবৎ মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

বিনয়ী, সদালাপী, সকল সংকার্যে উৎসাহী এই ব্যক্তির বিরোধে বাঙালী সমাজের অনেক ব্যথা অনুভব করিবেন। তাঁহার প্রাণিত লোক লাভ হউক।

রমেশচন্দ্র চৌধুরী

অমূল্য সমিতির আর এক জন বিশিষ্ট কর্মীর তিরোবানে

আমরা আত্মীয়বিরোধ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। বিপ্লবী-জীবনের অনিষ্ট ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য অকালে নষ্ট হইয়া যায়। মরমুনসিংহ—বাহিনী-পূরের এক সম্পন্ন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পরেই তিনি বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়েন। রমেশচন্দ্রের পুত্র ও পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

কিরণচন্দ্র ঘোষ

গত ২৬শে পৌষ ষ্টেটসম্যানের ভূতপূর্ব প্রধান রিপোর্টার কিরণচন্দ্র ঘোষ ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রিপোর্টার হিসাবে উক্ত পত্রিকার যোগদান করেন। পরে প্রধান রিপোর্টারের পদে উন্নীত হইয়া ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকেন। ঐ বৎসরই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাংবাদিক মহলে তিনি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।



আমাদের নূতন শোরুম এবং কারখানা

১৬৭ মি ১৬৭ মি/১, বহুবাজার ট্রাট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার ট্রাটের
বিপরীত দিকে, আমহাট ট্রাট
ও বহুবাজার ট্রাটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
এও সন্স

সুপারিশ দিল্লীতে ওল্ডফার নির্মাণে
সুখীক ব্যবসায়ী

৪৪. ব্রাঞ্চ-ফিল্মহাউস স্টাট-বালিগঞ্জ
১০৯/১/বি, রাসবিহারী এডিনিউ কলিকাতা

ফোন: বি. বি. ১৭৬১
গ্রাম-ভিলিয়ার্ড

ম্যাক্সিম লিটভিনফ

সোভিয়েট প্রচারপত্র “প্রাভদা” যোগা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র-মন্ত্রী লিটভিনফ গত ১৭ই পৌষ দেহভ্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া গেল :

তিনি ১৮৭৬ সালে বিয়েলষ্টকে জন্মগ্রহণ করেন। সত্তর বৎসর বয়সে তিনি স্বেচ্ছালৈচ্ছরূপে সেনাদলে যোগদান করেন। সেনাদলে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। সেনাদল ত্যাগ করিয়া তিনি কিয়তে সোভ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯০১ সালে উক্ত পার্টির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত লিটভিনফও গ্রেপ্তার হন। কিন্তু কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি সুইজারল্যান্ডে চলিয়া যান। কিছুদিনের অন্তর সুইজারল্যান্ডই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়া উঠে। ১৯০৩ সালে তিনি পুনরায় রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভদববি রাশিয়াতেই ছিলেন।

পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া তিনি রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ১৯০৭-০৮ সালে হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট তিনি যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা যদি গ্রহীত হইত, তবে ইউরোপের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা অন্য পথে বহিরা চলিত।

সোভিয়েট গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ব্রিটেনে রুশ-দূত নিযুক্ত হন। কিন্তু এ সময় গ্রেট ব্রিটেন বিনা কারণে সোভিয়েট-রাষ্ট্র আক্রমণ করে। তার মধ্যে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল। রাশিয়ায় ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণকে আটক করা হইলে প্রতিজ্ঞা হিসাবে মঃ লিটভিনফকেও লণ্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের শেষভাগে কূটনীতিক বন্দীগণকে মুক্তিদানের জন্য উত্তম সরকারের মধ্যে একটি বুঝাপড়া হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯২৫ সালে মস্কোতে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্ত সম্পর্কে সোভিয়েট মনোভাব বিশ্ববাসীর নিকট ব্যক্ত করেন।

১৯৩৯ সালের মে মাসে মঃ লিটভিনফ সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং মঃ মলোটোভ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে তিনি আমেরিকায় সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত-পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ইহার পর তিনি সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত কার্যভার ত্যাগ করেন।

মঃ লিটভিনফ ইংরেজ ব্যারিষ্টার তার সিডনী লোর কন্যাকে বিবাহ করেন। “শান্তি অবিভাজ্য” কথাটি তাঁহারই রচিত।

লিটভিনফের সময়েই “জিনোভিয়েভের চিঠি” ব্রিটেনের প্রথম শ্রমিক সরকারকে ক্ষমতার আসন হইতে দূর করিতে সাহায্য করে। চাঞ্চিল এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। এই চিঠি জাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। সেইরূপ ১৯৩২-৩৩ সালে মুদ্রাস্ফীতি হইতে আতঙ্কিত হইয়া রায়মসে ম্যাকডোনাডকে রক্ষণশীল দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। ভদববি চাঞ্চিল সোভিয়েটের বন্ধু হইয়া পড়েন, হিটলারের ভয় তাঁহাকে পাইয়া বসে। তার পরের ঘটনাবলী ইতিহাসের অঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল আজ দেখা দিতেছে।

লর্ড লিনলিথগো

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অগ্রভাগ বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ৬৪ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার নাম ব্রিটিশের অধীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মত দীর্ঘ (সাত্বে সাত বৎসরব্যাপী) শাসনকাল অনেক বড়লাটের ভাগ্যে ঘটে নাই। অধিকন্তু এই সময়ের মধ্যে বহু ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ক্রিপস মিশন, কংগ্রেসের দ্বারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে “ভারত ছাড় আন্দোলন” (১৯৪২), ১৯৪৩ সালের বাংলার ময়মূর ইত্যাদি ঘটনা লর্ড লিনলিথগোর সময়ের।

তিনি “পো-দান” একটা ক্যাননে পরিণত করেন। তাঁহার ফল একেবারে নিরর্থক হয় নাই। বলিতে গেলে তাল-মন্দ মিশিয়া লর্ড লিনলিথগো ব্রিটিশ চরিত্রের প্রতীক ছিলেন; “জন বুল” বা “বুল ডগ”—বাঘা কুকুরের প্রকৃতি মানব-দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। আজ তিনি নিদ্রা-প্রশংসার অতীত।

প্রবাসী, ৫১শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৮

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীঅক্ষয়কুমার করাল		শ্রীকমল সরকার	
—“নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা” (আলোচনা)	... ৪৬	— চিকিৎসা (গল্প)	... ৫৫৮
শ্রীঅচ্যুতনাথ রায় চৌধুরী		শ্রীকালিদাস দত্ত	
—শ্রুতাবর্তন (গল্প)	... ৪৬৩	— নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা (সচিত্র)	... ২২৬
শ্রীঅজিতকুমার বসু		—মজিলপুর (ঐ)	... ৫০০
—আমার মৃত্যু (গল্প)	... ৪২২	শ্রীকালিদাস রায়	
শ্রীঅজিতকুমার সেন		—বাবুইয়ের বাসা (কবিতা)	... ৪০৭
—গাহি পুরাতন গান (কবিতা)	... ১৭৮	—বিষ ও দাড়িষ (ঐ)	... ১৫৮
শ্রীঅঞ্জলি সরকার		—হিমালয়ের উদ্দেশে (ঐ)	... ৩২৪
—সম্ভাবনা (চিত্র)	... ২৫৯	শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	
শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়		—কমল ও কপোতী (সচিত্র নাটিকা)	... ২৪
—ষ পৃথিবী হারাল চাঁদ (গল্প)	... ২৩১	শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক	
শ্রীঅপূর্বকুমার ভট্টাচার্য্য		—চুরির হীরা (কবিতা)	... ৩১২
—কথাটারি এই রাত্রে (কবিতা)	... ২৪৯	—বাকুলতা (ঐ)	... ৪২৯
—হে সৈনিক! হে নিতীক! (ঐ)	... ৫২৪	—যোগজ্যেষ্ঠ (ঐ)	... ২১৬
শ্রীঅমরকুমার দত্ত		—সুভ বৈশাখ। ১৩৫৮ (ঐ)	... ১৯
—ভগ্ন ভিটে (কবিতা)	... ২৭৩	—স্মৃতিভোর (কবিতা)	... ১৩২
শ্রীঅমল ঘোষ		শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	
—দূতালিনী তাঁকর রায়চৌধুরী (সচিত্র)	... ৪২	—ভরুণের অভিবান (সচিত্র)	... ১৬৫
শ্রীঅমলেন্দু দত্ত		—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (ঐ)	... ৭১
—এখানে (কবিতা)	... ৪৬২	—মৃগতৃফিকা (ঐ)	২৬৩, ৩৪৫
শ্রীঅমলেন্দু মিত্র		শ্রীক্ষণপ্রভা তাদুড়ী	
—বীরভূমে উদ্ধাস্তপুনর্বাসন কার্য্য (সচিত্র)	... ৩৪৮	—রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	... ৫২
শ্রীঅমলেন্দু সেন		—স্বর্ঘমুখী (ঐ)	... ৪৬১
—ইরো	... ১৫৬	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত		—আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবনবাহা	... ৩২৯
—মধ্যবিন্দু (গল্প)	... ৪৪৬	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
শ্রীঅরোক্ষজিৎ মুখোপাধ্যায়		—অপরূপা (কবিতা)	... ১৭৮
—সংস্কৃত ভাষা	... ৩২৮	শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস (সান্তাল)	
শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়		—বিবর্তনে কামতা-রাজ্য (সচিত্র)	৪৫৬, ৫১৩
—ভাবী কালের ভারতীয় চিত্রের রূপ	... ১৭	শ্রীগোপাললাল দে	
আনিসা বেগম		—‘চিরজীবী জয় ঘোঁষন’ (কবিতা)	... ১৬৪
—“বে নদী মরুপথে...” (গল্প)	... ৩২৫	—‘পিউ, পিউ’ (ঐ)	... ২১৩
শ্রীআশুতোষ সান্যাল		—রবীন্দ্র-সাহিত্যে শ্রেমের প্রগতি	... ৩৫
—একা (কবিতা)	... ১৪৬	—জামলী (কবিতা)	... ৪১৮
শ্রীঊরনারাথ চট্টোপাধ্যায়		শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়	
—স্বরসিপি	৮৩, ৩৪১, ৫৭৫	—সন্ধ্যা (কবিতা)	... ৫২
শ্রীকণিকা দে		শ্রীগৌরনোহল কপাট	
—গণিতশাস্ত্রে ভারত	... ২৩৬	—সেবায়তন (সচিত্র)	... ৫৬২

শ্রীচন্দ্রকিরণ সৌন্দর্যকসা		শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ	
—অর্থমনর্থম্ (গল্প)	... ১৬৮	—আলোকলতা (কবিতা)	... ১৬৮
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী		শ্রীপরিমল গোস্বামী	
—দোমনাথ উৎসব ও সংস্কৃত বিখণ্ডবিধ (সচিত্র)	... ২৫০	—অমরত্বের পঁয়তালিশ বৎসর (সচিত্র)	... ১৬২
শ্রীজগদীশচন্দ্র দে		শ্রীপুখীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	
—হিন্দীগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা	... ৮২	—বারবরদারী (গল্প)	... ৫০৬
শ্রীতন্ময় বাগচী		শ্রীপ্রেমানন্দুর আভরণ	
—অর্থমনর্থম্ (গল্প)	... ১৬৮	—আজি হতে শতবর্ষ পরে	... ২৫০
শ্রীতারকনাথ নাথ		—আমাদের ছেলেরা	... ৭২
—অহঙ্কার কোথায়	... ৪৭০	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	
শ্রীতৃণা সেন		—আবণ-সন্ধ্যায় (কবিতা)	... ৩৪০
—বনিয়াদ (গল্প)	... ১৫৯	শ্রীবিভা সরকার	
শ্রীত্রিযুগ বাগচী		—বাইশে আবণ (কবিতা)	... ৩৬৬
—আঁধারে জিদ (সচিত্র)	... ৭৭	—সীরা (ঐ)	... ৫৭
দাদা ধর্ম্মাধিকারী		শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
—কাণ্ডীর : গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তসমূহ ঘন্ডে আহুত	... ৩৫৫	—বর-কর্তা (গল্প)	... ৩৭
শ্রীদাশরথি রায়		শ্রীবিমলকুমার দত্ত	
—আমাদের কাল্পিত (সচিত্র)	... ২৭	—প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার	... ৪২৫
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য		শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য	
—রাণী রাসমণি ও নবরীণের পণ্ডিত	... ২০	—শিক্ষা ও পরীক্ষা	... ২০৭
—রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন (আলোচনা)	... ১৭৯	শ্রীবিদ্যেশ্বর ভট্টাচার্য	
—রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষ	... ৪০১	—কবি ভবুহরি	... ৪৪১
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়		শ্রীজ্যোত্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
—‘ফের যদি ফিরে আসি’	... ৪৫০	—দামোদর মুখোপাধ্যায়	... ২৫০
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী		—সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিহারত্ন (সচিত্র)	... ৩২
—লুকোচুরি (সচিত্র গল্প)	... ২৭০	ব্রজচরী রমেশ	
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র		—বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার (সচিত্র)	... ৩৩১
—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	... ২৪০	শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	
—কৃষি-সভ্যতার ভারতের স্থান	... ৩২৩	—ভারতীয় চিত্রকলায় অতি-আধুনিকতা	... ৪৬৭
—পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী (সচিত্র)	... ১৩৩	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
—বর্ধমান বীজ-উৎপাদন কৃষিক্ষেত্র	... ৪৫৬	—অশ্বত্থা মানসতা	... ২১৩
—ভূমি-ক্ষয় ও “বনমহোৎসব”	... ৪০৬	শ্রীমতিলাল রায়	
—মিশরের কৃষি	... ৪৪	—ভারতের জাতীয়তা ও শ্রীঅরবিন্দ	৪১৯, ৫৩৬
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশ		শ্রীমদধনকুমার চৌধুরী	
—প্রবাসীর আম (কবিতা)	... ৪৫৫	—নষ্ট তারা (গল্প)	... ৪৩০
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র		শ্রীমহাদেব রায়	
—প্রম (কবিতা)	... ৪৬৭	—কেন হাঁহাকার ধর্ম্ম নিখিলের (কবিতা)	... ৩৪৪
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী		—পুনর্জবা (ঐ)	... ২৩
—মালাবারের লৌকিক সংস্কার (সচিত্র)	... ৪২৮	—রামায়ণে বসন্ত ও তুলসীদাসের রাম-চরিত	... ১১৩
শ্রীননীনাথ চৌধুরী		শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত	
—রাজনগর (উপন্যাস)	৩৪, ১২৩, ২৪১, ৩১৩, ৪৩১, ৪৪৭	—বাঙালীর কথা বাঙালী না ভাবিলে, কে ভাবিবে ?	... ২৬১
শ্রীনরেন্দ্র দেব		—স্পেনের আমেরিকা লুইস—ইউরোপে প্রবাসী বৃদ্ধি	... ৩৭৩
—দুপুর রাতে সুর্য্যোদয় (সচিত্র)	... ৪৪২	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	
শ্রীনরায়ণচন্দ্র চন্দ্র		—চিত্রকূট ধাম (সচিত্র)	... ৪১৪
—আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে	... ৩০৯	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	
শ্রীনীলরতন দাশ		—“জাতীয় গ্রন্থাগারে”র তৃতীয় পর্ব (সচিত্র)	... ৪৭
—আমাদের স্বাধীনতা ও গ্রাম-উন্নয়ন	... ৪০৯	—“জাতীয় গ্রন্থাগারে”র রূপান্তর	... ১৭২
—দেশবন্ধু (কবিতা)	... ২৩০	—“রামমোহন ও পাঁচকড়ি-রচনাবলী” (সমালোচনা)	... ৪৭২
শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দত্তদার		শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়	
—ভরঙ্গ (কবিতা)	... ৪৫৫	—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	... ২৭৪
—বৃষ্টির দুপুর (ঐ)	... ১২১		

শ্রীমতা চৌধুরী		শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
—সংস্কৃত কাব্যে সহধর্মিণী	... ১১৮	—কলের বাঁশী (কবিতা)	... ১২১
শ্রীমতপ্রদ মুখোপাধ্যায়		শ্রীহৃদাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়	
—বন্দী যারা (উপস্তাস)	৪৩, ১৫০, ২১৭, ৩৫৫, ৪০৮, ৫১৮	—চাঁদের নববিধান	... ১৩৭
শ্রীললিতমোহন রায়		—দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য ও জাতি-ষতত্বীকরণ	... ৫২৫
—বর্ণ ও নরক	... ৪৫০	শ্রীহৃদয়কুমার নন্দী	
শ্রীশঙ্কর বসু		—শিল্পে অধিকারভেদ	... ৩০৫
—“পাসিফোন” (গল্প)	... ৩৫৮	শ্রীহৃদয়চন্দ্র কর	
শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত		—রবীন্দ্রনাথের ‘শান্তং শিবমবৈতন্’	... ৩৬৩
—খাতিসঙ্কটে ছানার জলের ক্যালসিয়াম	... ৪৩৮	শ্রীহৃদয়রঞ্জন খাস্তগীর	
শ্রীশতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		—গুরুদক্ষিণা (সচিত্র)	... ৬৩
—পুলিস কর্তৃকারীদিগের প্রতি বহ্নিমচন্দ্রের উপদেশ	... ৩২২	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দেব	
শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত		—অবলা বহু	... ১৫৬
—“মৃত্যুঞ্জয়” (গল্প)	... ৩৫০	—শিক্ষার সমস্তা	... ৪৪৪
শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী		শ্রীহুমায়ী সিংহ	
—অভিসারিকা (কবিতা)	... ৩১	—নিরুপমা দেবী	... ৭০
শ্রীশিবব্রত ঘোষ		শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ	
—বস্ত্র-সঙ্কট	... ৬১	—আমাদের রাষ্ট্রজীবনের মান	... ১৩১
শ্রীশিশিরকুমার কর		শ্রীহীরালাল রায়	
—বীরভূমের কয়েকটি ধানার সেচ-ব্যবস্থা	... ১৪৭	—আপংকালের ব্যবস্থা	... ৪৯৭
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা		শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	
—অজানার দান (কবিতা)	... ৪৪৬	—তুমি আর আমি (কবিতা)	... ৮৬
—জীবনের জয় (ঐ)	... ৫৪১	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত	
—নব বর্ষ (ঐ)	... ৮২	—নিরুপমা রাঢ়া (রাধা ?)	... ৫২৮
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য		—বঙ্গ ও বাঙ্গালা	... ১৮৭
—অজ্ঞেয় মনস্তত্ত্ব (কবিতা)	... ২৪২	—বন-বিসুপ্ত	... ৪৬
শ্রীশৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য			
—বিপ্লবী (কবিতা)	... ৫১২		

বিষয়-সূচী

অজানার দান (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	... ৪৪৩	আমাদের স্বাধীনতা ও গ্রাম-উন্নয়ন—শ্রীলীলরতন দাশ	... ৫০৯
অজ্ঞেয় মনস্তত্ত্ব (ঐ)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	... ২৪২	আমার মৃত্যু (গল্প)—শ্রীঅজিতকুমার বসু	... ৪২২
অপরূপা (ঐ)—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	... ১৭৮	আঁদ্রে জিৎ (সচিত্র)—শ্রীদ্রিষ্ট বাগচী	... ৭৬
অবলা বহু—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দেব	... ১৫৬	আলোকলতা (কবিতা)—শ্রীনাহাররঞ্জন সিংহ	... ১৫৮
অভিসারিকা (কবিতা)—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী	... ৩১	আলোচনা	... ১৭৯, ৪৬৮
অমরত্বের পয়তালিশ বৎসর (সচিত্র)—শ্রীপরিমল গোস্বামী	... ১৪২	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	... ২৪৬
অর্থমর্ষম্ (গল্প)—শ্রীচন্দ্রকিরণ সৌন্দর্যকমা ও	... ১৬৮	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্মরণনা	... ৩৭৬
শ্রীতন্ময় বাগচী	... ২১৩	ইরো—শ্রীঅমলেন্দু সেন	... ২৫৬
অস্বভাবী মানসতা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	... ৪৭০	একা (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্তাল	... ১৪৬
অহঙ্কার কোথায়—শ্রীতারকনাথ নাথ	... ২৭৪	এখানে (ঐ)—শ্রীঅমলেন্দু দত্ত	... ৪৪২
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়	... ২৫০	কথাংরা এই রাতে (ঐ)—শ্রীঅপরূপক ভট্টাচার্য্য	... ২৪২
আজি হতে শতবর্ষ পরে—শ্রীপ্রমোদর আতর্ষী	... ৩২২	কবি ভর্তৃহরি—শ্রীবিবেকর ভট্টাচার্য্য	... ৪৪১
আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবনযাত্রা—শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	... ৪৭৭	কমল ও কপোতী (নাটিকা)—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	... ২৪
আপংকালের ব্যবস্থা—শ্রীহীরালাল রায়	... ৩০৯	কলের বাঁশী (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	... ১২১
আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র	... ২৭	কাগীর : গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তসমূহ ধ্বংসে আহুত—দাদা ধর্ম্মাধিকারী	... ৩৫৫
আমাদের কালিঙ্গ (সচিত্র)—শ্রীদাশরথি রায়	... ৭০	কৃষি-সভ্যতায় ভারতের স্থান—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	... ৩২৩
আমাদের ছেলেরা—শ্রীপ্রমোদর আতর্ষী	... ১৩১	কেন হাহাকার ধ্বনি নিখলের (কবিতা)—শ্রীমহাদেব রায়	... ৩৪৪
আমাদের রাষ্ট্রজীবনের মান—শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ			

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিচারতত্ত্ব (সচিত্র)—	৩২	বর্ধমান বীজ-উৎপাদন কৃষিক্ষেত্র—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৩
ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২	বঙ্গ-সংকট—শ্রীশিবরত্ন ঘোষ	৩৩
খান্দসঙ্কটে ছানার জলের কালসিয়াম—শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত	৪৩৮	বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার (সচিত্র)—	৩৩৩
গণিতশাস্ত্রে ভারত—শ্রীকবিতা দে	২৩৬	ব্রহ্মচারী রমেশ	৩৩৩
গাহি পুরাতন গান (কবিতা)—শ্রীঅজিতকুমার সেন	১৭৮	বাইশে শ্রাবণ (কবিতা)—শ্রীবিভা সরকার	৩৬৬
গুরুদক্ষিণা (সচিত্র)—শ্রীস্বধীররঞ্জন খাস্তগীর	৬৩	বাঙালীর কথা বাঙালী না ভাবিলে কে ভাবিলে ?—	৩৬৬
চিকিৎসা (গল্প)—শ্রীকমল সরকার	৫৫৮	শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত	২৬১
চিত্রকূট ধাম (সচিত্র)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪১৪	বাবুইয়ের বাসা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়	৪৫৭
'চিরজীবী জয় যৌবন' (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে	১৬৪	বারম্বারদারী (গল্প)—শ্রীপৃথীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫০৬
চীনের নববিধান—শ্রীস্বধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়	১৩৭	বিদ্রবী (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৫১২
চুরির হারী (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩১২	বিবর্তনে কামতা-রাজ্য (সচিত্র)—শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস (সাঁছাল) ৪৫৬, ৫১৩	৫১৩
"জাতীয় গ্রন্থাগারে"র তৃতীয় পর্ব (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৪৭	বিবিধ প্রসঙ্গ	১, ২৭, ১২৩, ২৮৯, ৩৮৫, ৪৮১
"জাতীয় গ্রন্থাগারে"র রূপান্তর—	ঐ	১৭২	১৭২
জীবনের জয় (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	৫৩১	৫৩১	৫৩১
তরঙ্গ (কবিতা)—শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দত্তিদার	৫০৫	৫০৫	৫০৫
তরুণের অভিযান (সচিত্র)—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৬৫	১৬৫	১৬৫
তুমি আর আমি (কবিতা)—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৮৭	৮৭	৮৭
দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য ও জাতি-বৃত্তীকরণ—	৫২৫	৫২৫	৫২৫
শ্রীস্বধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়	৫২৫	৫২৫	৫২৫
দামোদর উপত্যাকা পরিকল্পনা (সচিত্র)—	৭১	৭১	৭১
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭১	৭১	৭১
দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যা'নন্দ—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৩	২২৩	২২৩
হুপুর রাতে সূর্যোদয় (সচিত্র)—শ্রীনরেন্দ্র দেব	৫৪২	৫৪২	৫৪২
দেশবন্ধু (কবিতা)—শ্রীনীলরতন দাশ	২৩১	২৩১	২৩১
দেশ-প্রেমের কথা (সচিত্র)—	২৫, ১৮২, ২৮৫, ৩৮৩, ৪৭৯, ৫৭২	২৫, ১৮২, ২৮৫, ৩৮৩, ৪৭৯, ৫৭২	২৫, ১৮২, ২৮৫, ৩৮৩, ৪৭৯, ৫৭২
নব বর্ষ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	৮২	৮২	৮২
নষ্ট তারা (গল্প)—শ্রীমদ্ব্যধিকার চৌধুরী	৫০০	৫০০	৫০০
নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা (সচিত্র)—শ্রীকালিদাস দত্ত	২২৬	২২৬	২২৬
ঐ (আলোচনা)—	৫৮৮	৫৮৮	৫৮৮
শ্রীঅক্ষয়কুমার করাল	৫৮৮	৫৮৮	৫৮৮
নিরুপমা দেবী—শ্রীস্বধা সিংহ	৭০	৭০	৭০
নিরুপমা রাঢ়া (রাধা ?)—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত	৫২৮	৫২৮	৫২৮
নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী (সচিত্র)—শ্রীঅমল ঘোষ	৪২	৪২	৪২
পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১৩৩	১৩৩	১৩৩
"পারিফোন" (গল্প)—শ্রীলঙ্কর-বসু	৩৫৮	৩৫৮	৩৫৮
'পিউ, পিউ' (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে	২১২	২১২	২১২
পূর্ণবা (ঐ)—শ্রীমহাদেব রায়	২৩	২৩	২৩
পুলিস কর্মচারীদিগের প্রতি ব'ঙ্গমন্ত্রের উপদেশ—	৩২২	৩২২	৩২২
শ্রীশতজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩২২	৩২২	৩২২
পুস্তক-পরিচয়	৮৮, ১৮২, ২৭৯, ৩৭৭, ৪৭৪, ৫৬৬	৮৮, ১৮২, ২৭৯, ৩৭৭, ৪৭৪, ৫৬৬	৮৮, ১৮২, ২৭৯, ৩৭৭, ৪৭৪, ৫৬৬
প্রত্যাগর্ভন (গল্প)—শ্রীঅচ্যুতনাথ রায় চৌধুরী	৪৬৩	৪৬৩	৪৬৩
প্রবাসীর আম (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশ	৪৫৫	৪৫৫	৪৫৫
প্রম (ঐ)—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র	৪৬৭	৪৬৭	৪৬৭
প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার—শ্রীবিমলকুমার দত্ত	৪২৫	৪২৫	৪২৫
'ফের যদি ফিরে আসি'—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৫৩	৪৫৩	৪৫৩
বঙ্গ ও বাঙালী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত	১৮৭	১৮৭	১৮৭
বন-বিকুপূর—	ঐ	৪৬	৪৬
বনিয়াদ (গল্প)—শ্রীতৃষা সেন	১৫৯	১৫৯	১৫৯
বন্দী যারা (উপস্থাপনা)—	৫৩, ১৫০, ২১৭, ৩০৫, ৪০৮, ৫১৮	৫৩, ১৫০, ২১৭, ৩০৫, ৪০৮, ৫১৮	৫৩, ১৫০, ২১৭, ৩০৫, ৪০৮, ৫১৮
শ্রীরামমদ মুখোপাধ্যায়	৫৩, ১৫০, ২১৭, ৩০৫, ৪০৮, ৫১৮	৫৩, ১৫০, ২১৭, ৩০৫, ৪০৮, ৫১৮	৫৩, ১৫০, ২১৭, ৩০৫, ৪০৮, ৫১৮
বর-কর্তা (ঐ)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৭	৩৭	৩৭
৩৭	৩৭	৩৭	৩৭

শ্রীবর্ণ-সন্ধ্যায় (ঐ)—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	... ৩৪০	স্পেনের আমেরিকা বুঠন—ইউরোপে অব্যমলা বুদ্ধি—	...
সংস্কৃত কাব্যে সহধর্মিণী—শ্রীমতী চৌধুরী	... ১১৮	শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত	... ৩৭৩
সংস্কৃত ভাষা—শ্রীঅরোক্ষজিৎ মুখোপাধ্যায়	... ৩২৮	স্বর্ণ ও নরক—শ্রীললিতমোহন রায়	... ৪৫০
সন্ধ্যা (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়	... ৪২	স্বরলিপি—শ্রীওকারনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ৩৪১, ২৭৫
সন্ধ্যাবনী (চিত্র)—শ্রীঅঞ্জলি সরকার	... ২৫৯	স্মৃতিভোর (কবিতা)—শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক	... ১৩২
সূর্যমুখী (কবিতা)—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা	... ৪৬১	হিন্দীগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—শ্রীজগদীশচন্দ্র দে	... ৮১
সেবায়তন (সচিত্র)—শ্রীগৌরমোহন কপাট	... ৪৬২	হিমালয়ের উদ্দেশে (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়	... ৩২৪
সৌমনাথ উৎসব ও সংস্কৃত বিশ্বপরিষদ (ঐ)—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	২৫৩	হে সৈনিক ! হে নিতীক ! (কবিতা)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	... ৪২৪

বিবিধ প্রসঙ্গ

অপরোধ কাহার ?	... ৩০১	খেলার মাঠে অভ্যস্ততা	... ৩০৩
আগরতলা কলেজ	... ৪২৪	গাওঁগ্রাম সেবাশ্রম	... ৩৯৭
আকলিক সেনাবাহিনীর আদর্শ	... ১২	গোঁহাটি কটন কলেজের স্বর্ণ জয়ন্তী	... ২০৮
আদিম জাতিসমূহের অবস্থা	... ১১৫	প্রামোদ্রনগরের উত্তোষ	... ৩২১
আন্দামানে বাঙালী "উদ্বাস্ত"	... ৮	চন্দ্রনগরের ভবিষ্যৎ	... ৪২২
আমের আঁটির খাত-মূল্য	... ১৭৭	চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ	... ৬
আসাম রাজ্য ও উদ্বাস্ত	... ৩৯৯	জামসেদপুরে শ্রমিক আন্দোলন	... ১০৮
আসামে মজিবর্গের আশ্রিতবাসিন্দা	... ৪২৩	ঝাড়গ্রাম কৃষি বিদ্যালয়	... ১২
আসামের সঙ্গে ভারতব্রাহ্মের যোগাযোগ	... ৩০২	টিউনিশিয়া রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন	... ২০৮
ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটের হীরক জয়ন্তী	... ৪২৪	টেনে রাহাজানি	... ৩৮৭
ইতিহাসের বিকৃতি	... ১১১	ডাকমাণ্ডুল বুদ্ধি	... ৫
ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈল	... ১০১	দিনেমার বালক-বালিকার সং দৃষ্টান্ত	... ১৬
ইরানে শূনাখুনি	... ১৪	দীঘি পুকুরিণীর সংস্কার	... ৩৮৯
উদ্বাস্ত উচ্ছেদ বিল	... ৭	দুর্জ-সমস্তার সমাধান	... ৪২৩
উদ্বাস্ত কর্তৃক রেলপথে বাধাদান	... ৩০০	দু'মুখো নীতি	... ২০৩
উদ্বাস্ত জনসংখ্যার আর্থিক হিসাব	... ১০৩	দুনীতি ধরিয়া দিলেও ধরে না	... ৪২৪
একটি জাতি কালের গতি	... ৪২৪	ধান দিলে কাগড় পাবে	... ৩২০
এশিয়াতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি	... ১০৪	কবি নজরুল ইসলাম	... ২০৪
ঐক্যের চেষ্টা	... ৯৭	নদী নালার মৎস্য চাষের শিক্ষা	... ১০৭
ওয়ারিং কমিটি হইতে নেহরুর পদত্যাগ	... ৩৮৬	নিউজ-প্রিন্টার অভাব	... ৩২৯
কংগ্রেস দলত্যাগী দল	... ২৯৮	নিখিল-ভারত বুনিয়াদি শিক্ষাসম্মেলন	... ১৬
কর্মচ্যুত ম্যাকআর্থার	... ১৪	নির্বাচন ও কংগ্রেস	... ৪৮১
কলিকাতা শহরের উপর "পাকিস্তান বাজার"	... ৪২৬	নির্বাচনী ঘোষণাপত্র	... ২৮৯
কলিকাতার জাহাজঘাটার শ্রমিকমণ্ডলীর পুণ্য কাজ	... ৩২৫	পকাশ বৎসর	... ১
"কালনেমীর লঙ্কাভাগ"	... ২০৪	পরীক্ষা	... ১৯৮
কালেকটর ফার্ম	... ৩৮৮	পল্লী-উন্নয়নে স্বাভাবিক	... ২০০
কাশিরাড় খাল পরিকল্পনা	১০৫, ৩৮৯	পল্লী-প্রাণ	... ৪০০
কাশ্মীর সমস্তার সমাধান	... ৪৮৪	পশ্চিম পঞ্জাবের নির্বাচন	... ১৩
কুচবিহার	... ১০১	পশ্চিমবঙ্গে "অধিক খাত ফলাও" প্রচেষ্টা	... ১০
কৃষক-প্রজা-মজুর দলের নির্বাচনী কর্মসূচী	... ২৯৫	পশ্চিমবঙ্গে অস্পৃশ্যতা নিবারণ	... ৩২৪
কৃষনপরে সাহিত্য-সম্মেলন	... ১০৯	পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগের প্রাবল্য	... ৩৯১, ৪২২
কোরিয়ার পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রপুঞ্জ	... ৩২৫	পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের আন্দোলন	... ১১০
কোরিয়ার যুদ্ধ	... ১০২	পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃদ্ধি	... ৪৮৮
কৌলীজ প্রথা	... ৩০৩	পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও অচ্ছাদিত-শ্রেণী	... ৩২৩
কাঁথিতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা	... ১০৮	পশ্চিমবাংলা সরকারের কয়েকটি সংস্কার	... ২০১
"খাত নাই, মিথ্যা কথা।"	... ১২৯	পার্লিমেণ্টের প্রতিনিধিদের যোগ্যতা	... ৯৯
খাতোৎপাদন পাঁচ দশক দশমালার পরিকল্পনা	... ৩৯৩	পুলিস	... ১২৭
খেজুর মাহাত্ম্য	... ১৩	পূর্ববঙ্গের অবস্থা	... ১০

পূর্ববঙ্গের মুসলিমের ক্ষোভ
 প্রকৃত ধর্ম ও সমাজের আদর্শ
 প্রাচীন সংহতি আবিষ্কার
 প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন
 প্রেস আইন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট
 বঙ্গ-বিহার সীমান্ত পরিবর্তন
 বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ
 বন-মহোৎসব
 বর্ধমান জেলার ইতিহাস
 বর্ধমানের মোহনপুর বীথির অবস্থা
 বাকুড়া জেলা—ভারতবর্ষের স্বরূপ ?
 বাকুড়া মেডিক্যাল কলেজ
 বাকুড়া সন্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ
 বাকুড়ায় সেচ-পরিকল্পনা
 বাংলার অর্থনীতিক্ষেত্রে অ-বাঙালীর প্রাধান্য
 বাংলার বাহিরে বাঙালী
 বাঙালী-বিহারী সম্প্রতি
 বাঙালীর কৃষি
 বাঙালীর শিক্ষা
 বাঙালীর শিল্প
 বাঙালীর সমস্তা
 বাটা কোম্পানীর মুসলিম কর্মী
 বার্ষপুরে সাহিত্য সম্মেলন
 বারাসাত-বসিরহাট রেলওয়ে
 "বাস্তবহার্য চিঠি"
 বিচারহীনতা ও উগ্র প্রাদেশিকতা
 "বিজ্ঞান ও টেকনোলজি"
 শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ
 বিশাখাপত্তন জাহাজঘাট
 বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
 বীরেন্দ্র-মুতি-মোঘ টাষ্ট দলিল
 বুনিয়াদী শিক্ষার ফাসন
 ব্রিটিশ জনসংখ্যারগণের জীবনযাত্রা
 ভাগচাষ অর্ডিন্যান্সের ফলাফল
 ভাগচাষ-বোর্ডে ভাগচাষীগণের চূড়ান্ত
 ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অবস্থা
 ভারতবর্ষে লৌকগণনা

৩৮৮	ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার স্থান	১৫
৩৮৯	ভারতবর্ষের জাতীয় আয়	১০৪
১১০	ভারত-সংস্কৃতি ও শ্রীঅরবিন্দ	২০৫
৩৮৮	ভারতীয় কাপড়ের কলে তুলার ব্যবহার	১০৪
৩৮৯	ভারতের উন্নয়নে আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি	৩৯২
১৮৭	"ভাষার দৌরাঙ্গা"	২৯৯
৩৮৫	মরুভূমির শস্তাশ্রমল মূর্তি	১২৪
৩৮০	মানভূম সভ্যগ্রহে বিহারী দমননীতি	১২৪
১১২	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী	১১০
১২	মারাতী সাহিত্যের নতি-পরিণতি	১১০
১১	মুসলিম মুনাকাফারী	২০৬
২০৪	মতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নিরালস্য স্বামী	৪৮৯
৩৮১	মবীজ-জয়ন্তী উৎসব	২০৬
৩৮৯	রাজপথে দুর্ঘটনা	৩৮৭
৪৮৯	রাষ্ট্রবিধি পরিবর্তন	২৮
৪	রাষ্ট্রবিধি সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা	১২৩
২০৭	রেল-কর্মীর অবস্থা	৪৮০
৩	রেল ষ্টেশনের নামে বাংলা অক্ষর	৩৯৯
২	লেনিন-ষ্টালিন প্রসঙ্গ	৩৯৩
৩	শক্তরা ঘরেই আছে	৪৮৬
১	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ব্যবস্থা	১১১
১০৮	শিক্ষা-বিভাগের ক্রটি	১১২
৩০২	শিক্ষিত ও অশিক্ষিত	৩০৩
৩৯২	সংবাদপত্র বিধেয়কের সমালোচনা	৪৮৩
১০৯	সংস্কৃত-এসোসিয়েশনের ইতিহাস	৪৯৫
৪৮৬	সংস্কৃত বর্জন ব্যবস্থা	৩০১
১১১	সরকারী সেচ-পরিকল্পনা	১০৫
৩০৪	সরবরাহ-বিভাগের আলস্য অবসর	১০৬
১০৬	সুন্দরবন পল্লী উন্নয়ন কমিটি	২০২
২০৮	সোভিয়েট রাষ্ট্রে নৃতন কৃষি পরিকল্পনা	১৪
৪৯২	সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার	১০১
২০৪	সোভিয়েট দলের নির্বাচনী কর্মসূচী	২০৭
৩০৪	স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎসাহ বসতি	৭
১০৭	স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার	৩৮৫
৩৯২	হিন্দুস্থান হামারা	২০২
১০৩	হীরাবু ও বীথ ও উড়িয়ার উন্নয়ন	১০৬

১

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

উৎসব—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
একহর—শ্রীভিলক বন্ধ্যোপাধ্যায়
কুহেলিকা—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
পাখর ও পাখার—ঐ
পোয়—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীগোবিন্দচরণ সোম

একবর্ণ চিত্র

অবলা বহু
আটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর চিত্রাবলী
আঁত্রে জিদ
আধুনিকতম মার্কিন জাহাজ
আম্বাদেন-বোপের তৈল-বিশোধনাগার
আসানসোল কৃষি-প্রদর্শনী
উদ্বাস্ত-বসতি
ওয়াশিংটন আলী, এস.
জেনারেল ওয়েল্যাণ্ড
কামতা-রাজের চিত্রাবলী
কালিম্পাং চিত্রাবলী
কুটন দেবর
কুশনগরে ভারতচন্দ্র স্মরণোৎসব
কোরিয়া-যুদ্ধের চিত্রাবলী
ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, বিচারক
জহুধরী মন্দিরে পণ্ডিত নেহরু
শ্রীগোপাধেমাস্ত্রিনী
চিত্রকূট চিত্রাবলী
'জ্যোতিষভাষা মুক্তাবলী'র পুস্পিকা
টুয়ান ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
তুলসীদাস কর
দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা—চিত্রাবলী

শ্রীনন্দলাল বহু	...	৬৩
নাভিক-চিত্রাবলী	২৮২	৫৪৪-৮
বাবা ঠাকুর	১	২২৮
বায়া ঠাকুর	১২০	২২৬
ভাটিগাওয়ের মন্দিরে পণ্ডিত নেহরু	৪৮১	২৩২
ভারতবর্ষে খাজসন্তার শ্রেণের জন্ত মার্কিন জাহাজের প্রস্তুতি	২৭	৩৮৫
ভারতে প্রেরিত খাজসন্তাবাহী মার্কিন জাহাজ	৩৮৫	২২৮
শ্রীভাসুর রায়চৌধুরী, বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায়		১, ৪২-৩
'ভেদজ্ঞান তিমির মিহিরোদয়' গ্রন্থের আখ্যাপত্র		৫০৪
ময়ূরাকী—তিলপাড়া বাধের দৃশ্যাবলী	১৫৩	৪৮১
মরিসাসের নিউগ্রোড শহরে হিন্দু মন্দির	১৬৫-৬৬	৩৩৬
মরিসাসের রোজহিল শিবালয়	৭৭	৩৩৪
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার	৪৪০	৪৭
মাও-সে তুং	১২৩	২৭
মার্কিন জেট বিমান	১৬৬	৪৪১
মার্কিন বোম্বার্ক বিমানের চিত্রাবলী	৩৬৮-৭৩	৩৪৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃত্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী	৩৮৪	৩৮৫
মার্কিন-রণসম্ভার	৪৪১	২৬৫-৬৭
মালাবারের অপদেবতা	৪৫৭-৬২, ৫১৩-১৭	৪২২-৩১
মোগল দরবারের ভূমিদান সনন্দ	২৭-৩১	৫০২
আচার্য্য বহুনাথ সরকার—নববর্ষে কিশোর-কিশোরীদের	২২৭	
অভিধান গ্রন্থ	১৮৯	১৬৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪০-৪১, ২৬৬-৬৯, ৩৫৫-৪৯	১৫২
রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের অধিবেশন	৩২	৫২৯
রিজওয়ে, জেনারেল	২৮৯	৫২৯
রিজওয়ে, লে: জেনারেল ও জেনারেল ম্যাকআর্থার	২৭৮	২৭
লাপল্যাগুয়ের চিত্রাবলী	৪১৫-১৭	৪২২-৪৮
শ্রীশৈকালি নন্দী	৫০০	৫৭২
সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্যগণ	৪৪০	৩৩১
সেবায়তন (ঝাড়গ্রাম)-চিত্রাবলী	২৮৮	৫৬২-৬৪
সোমনাথ-চিত্রাবলী	৫৬-৭, ৭৩, ৭৫	৪২, ২৫৫ ৬

কৃতিবাস সচিত

২

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

স্বনামধন্য ও ভ্রাতামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সুবিখ্যাত কৃতিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রাক্ষিপ্ত অংশবর্জিত মূলগ্রন্থ অল্পসংখ্যক ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ। ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন বোলধানি এবং এক বর্ণের তেজিশধানি শ্রেষ্ঠ ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশিল্পী হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্কলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা যবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকীল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধ্বনিকর, অসিতকুমার হালদার, স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির অনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

অ্যাক্টমেন্ট উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মূল্য ১০৪০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১২

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর আবেদন করুন। এই স্বযোগ সর্বপ্রকার দুর্মূল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

প্রবাসী কার্যালয়—১২০১২, আপার মারকুলার রোড, কলিকাতা

ভারত অয়েল মিলের
মানবির তৈল
ব্যবহার করুন।

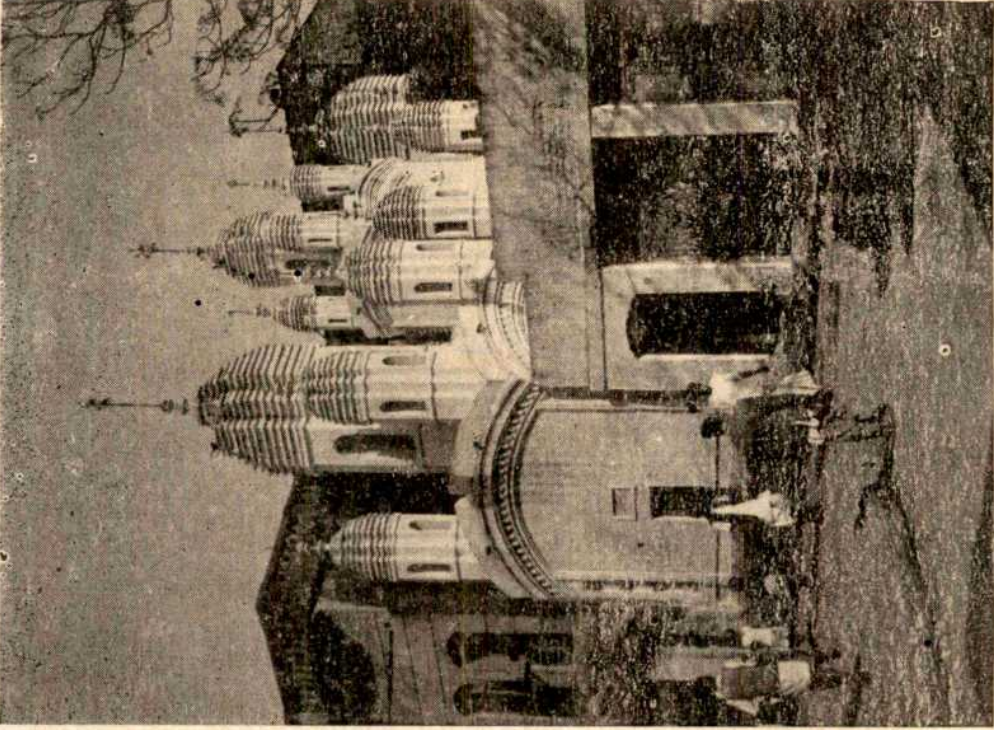
১১



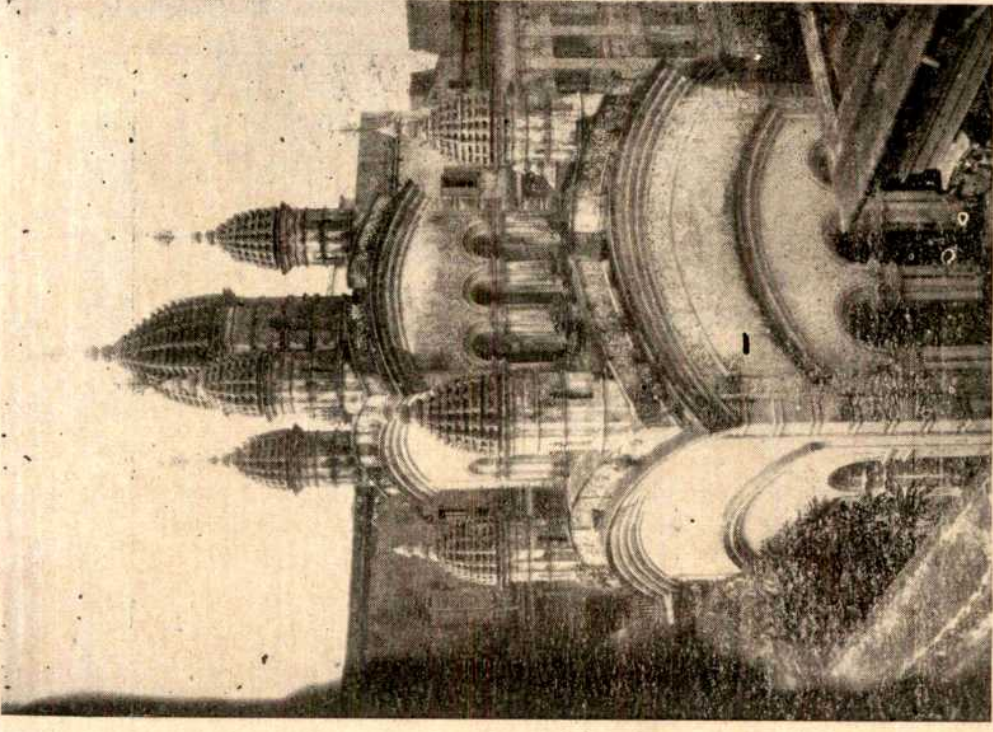
কৃষকের পুত্রের আশ্রমে কৈশর চলে গেল
বাধা পুষ্ট হইল -

এবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাড়
শ্রীমহাবল্লভ সেন স্তম্ভ



ফোর্ট উইলিয়মের দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশী স্থাপিত
নবরঙ্গ ও পঞ্চরক্ত শিবমন্দির



কলিকাতা বলারাম দেবী ইটস্থ ত্রীভ্রী ভবতারণী দেবীর লিপিস্থান নবরঙ্গ
মন্দির। দুই পাশের অষ্টশাল ও সম্মুখের নানিমন্দিরের ক্রিয়াকলাপ দেখা গাইতেছে

কল্যাণ

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

স্বাধীনতা বলহীনেন লভ্যঃ”

১৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫৮

৩৪ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের রূপ

নির্বাচন ও ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ একই কথা—একথা সম্পূর্ণ সত্যও নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। সুতরাং এই যে নির্বাচনের পালা আর শেষ হইয়া আসিল উহাতে পশ্চিম বাংলার, ভাষা ভারতের আগামী পাঁচ বৎসরের ভাগ্যনির্ণয়ের ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহার বিচার করা প্রয়োজন, কেননা আমরা বর্তমানের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের দ্বারা নৌকার বহর ভাসাইয়া চলিয়াছি। এ দ্বারা আমাদের কোন দিকে লইয়া যাইতেছে, কোথায় কখন লাল বজাপ্রবাহে তরী বানচাল হইতে পারে, কাঙারী সাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাদেরই বা রক্তকাপটী সামলাইবার কক্ষতা কতটুকু—এ সকলই বিবেচনা করা প্রয়োজন। অনেকে বলিবেন, “যা হইবার তা হইয়াই গিয়াছে, এখন আগামী পাঁচ বৎসর নীরবে কপালে লেখার ফলাফল গ্রহণ করা হাজি কর্তব্য আর কিছুই নাই।”

এই নিরুত্তম অদৃষ্টবাদের পথেই বাঙালী বর্তমানে চলিতেছে এবং এ কারণেই সে আজ “গত গৌরব হ্রত আসন্ন নত মন্তক লাঞ্জে।” নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের মধ্যে এই ভাবই তাহার ছিল, এবং যদি ভবিষ্যতেও এই ভাবই থাকে তবে বাঙালীর অদৃষ্টলিপিতে “সমাপ্ত” লিখিয়া উহাকে চিত্তের সমর্পণ ভিন্ন আর কর্তব্য কিছুই নাই। এবারের নির্বাচনে বাঙালীর মনের যে চিত্র আমরা দেখিলাম তাহা এক দিকে নৈরাশ্রদম্বক, অত দিকে অন্ধুত।

রূপকের ভাষা হাতিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে হয় এবারের নির্বাচনে আমরা দেখিলাম বাঙালীর—বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাঙালীর—মন হয় শিশুর ভায় অপরিণত, নয় “বাহাদুরের” এত বৃদ্ধের ভায় ভ্রাতৃকর্ণ ও শৈবিল্যপ্রাপ্ত। কেননা দেখিলাম বাঙালী নির্বাচনের উদ্দেশ্য বুঝে নাই, নির্বাচনের কার্যক্রম জানে না এবং এ ব্যাপারে তাহার যে কোনও প্রকৃতপূর্ণ কর্তব্যের আশ্রয় আছে সে বিষয়ে তাহার কোনও

চেতনাই নাই। বাঙালী যে স্বাধীন সে কথাও সে ঠিক কতটা বুঝিয়াছে তাহা বুঝা গেল না, তবে স্বাভাব্য স্বাক্ষর তাহার যে কোনও দায়িত্ব আছে সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

ভবিষ্যতের যে ইচ্ছার কথা বলিয়াছি তাহা রহিয়াছে বাঙালীর এই অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে। যদি ইহা জাতিগত “dementia praecox” হয় তবে সব শেষ। না হইলে বয়স্করীর চিকিৎসার যদি জরাজীর্ণ ষাষ তবে কিছু হইলেও হইতে পারে। আমাদের বিধান শিক্ত বাঙালী নির্বাচক বুদ্ধিমত্তা হিসাবে বিদেশী নির্বাচক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। তবে এরকম অবস্থা হয় কেন?

এবারকার নির্বাচনে শিক্ষিত বাঙালী পুরুষের মধ্যে শত-করা দল জনও ভোট দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমরা আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলি নাই। কলিকাতার যে সকল অকলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকের বাস সেখানকার, বর্ধমান শহরের ও অন্যান্য তিন-চারটি কেন্দ্রের ভোট-কল ঘনিষ্ঠরূপে পূর্বে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি এবং এই বিচার-কল সঠিক কিনা বুঝিবার জ্ঞান নানা স্থানের অনেক তত্ত্বলোককে প্রদত্ত করিয়াছি, তাহাতেও ঠিক এই হিসাবেই আসে।

প্রশ্নোত্তরে কয়েকটি বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। দেওয়ানির পূর্ণ আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়, কেননা তাহার সম্যক বিচার বিরাট ব্যাপার। মাসিকপত্রের সম্পাদকীয়ের আরম্ভে তাহার স্থানের একান্তই অভাব। তবে কিছু বিচার করা প্রয়োজন।

এক স্থলে অবিকাংশ তত্ত্বলোকই বলিলেন, “মশায় যে যার লম্বার দেই হয় রাবণ, ছলে-বলে-কৌশলে ভোট তিকা চলে, ভোট পেয়ে মেলেই তার পর সব কথা শেষ। যদি কেতে তবে নিজমূর্তি ধরে, আর যদি হারে তবে ছুব মারে।” একবার দেখিলাম উপস্থিত আট-দশ জন তত্ত্বলোক সড়লেই মোটামুটি একমত।

আর এক স্থলে এক প্রোট তত্ত্বলোক বলিলেন, “ওসব তো

হয়ে গেছে, এখন যা হবার তাই হবে। আমি তোট দি নাই মশায়, ওসব চ্যাংড়া-ছেলে-ছোকরার ব্যাপারে কি তত্ত্বলোকে যার ?” ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে নানা দুনিয় নানা মত পাওয়া গেল। মোটের উপর বুঝলাম মনের মত লোক, বাহার কথার বিধান করা যায় এরকম, তাহাদের অধিকাংশের বিচারেই, প্রার্থীরূপে দাঁড়ায় নাই, সুতরাং তাহাদের তোট দিবার পুঁহাও হয় নাই। অত দিকে উপযুক্ত লোক বুঝিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বা প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্যতার বিচার করা, এ দুই-ই তাহাদের মানসিক অবসাদের ভারে সম্ভব হয় নাই।

মানসিক অবসাদ, চিন্তা করার অনিচ্ছা এ তো আমাদের জাতিগত ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু আছে ভাবপ্রবণতা, চক্ষুশ্রদ্ধা এবং অথবা বিরাগ (prejudice)। এই সকলের প্রতিক্রিয়া ত ছিলই, আরও ছিল একটা অধিবিশ্বাস যে তোট দিয়া প্রার্থীর মাথা জর করা যায়। তোটদাতার মাথা জর বা বিজর যে হয় সে কথা শিক্ষিত সমাজ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন, এবং বিচার করিলে বুঝিতেন যে, তাহারা যেরূপ স্থাগুভাবে বসিয়া থাকিলে অপরে তাহাদের মাথা পরোক্ষভাবে বিজর করিতে পারে বা প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাদের তোট হরণে দিয়া আসিতে পারে। কিন্তু চিন্তা বা বিচার করিবার মত মহাপাতক করে কে ?

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাগ আছে, অতএব কংগ্রেসের প্রার্থীকে তোট দিব না এই বিচারে অনেক কেজে ভিন্ন পন্থী অভিযোগ্য লোকের নির্দোষনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছেন অনেকে। এবারের নির্দোষনে ঐ বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন মনের মধ্যে যোগ্যতম লোকেরা প্রায় সকল কেজেই হারিয়াছে, অযোগ্য লোকই অধিকাংশ কেজে জিতিয়াছে। বস্তুতঃ এবারের নির্দোষন জুয়াখেলার পর্যায়ে পড়িয়াছে।

কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আছে, তার মধ্যে অনেক কিছু সত্য এবং বেশ কিছু মিথ্যা। কিন্তু সে কারণে যোগ্য প্রার্থী, বাহার ভ্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও জীবন পণ করিয়া দেশসেবার ইতিহাস কাহারও অপেক্ষা অধিক কম মহে, এবং এবারকার “ভ্যাগী দেশসেবী” বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের অপেক্ষা, এবং উপরন্তু বাহার বিগত পাঁচ বৎসরের কার্যক্রমের পরিচর্যও অতি উজ্জ্বল, এরকম কংগ্রেসপ্রার্থীও নীচ লোকের যত্বসহ ও স্বল্পবুদ্ধি লোকের “নিজের মাক কাটীয়া পরের রাজ্যতদ” করার উৎসাহে, নিজের দেশে সামান্য তোটে হারিয়া গেলেন কিরূপে ? সে সকলের শিক্ষিত লোকেরা কি এতই অপদাৰ্থ যে নিজের ও পুত্র-কন্তার ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার শক্তিও তাহাদের নাই ? ভিন্ন পন্থীদের মধ্যেও বাহারা লোকা পথে নিজদের কার্যের পরিচর্য বা চরিত্রত্বের নির্দোষকবিশেষ

বিচার চাহিয়াছিলেন তাহাদেরও অধিকাংশই হারিয়াছেন। সেইজন্য হারার তালিকার এমন বহু লোকের নাম পাওয়া যায় তাহাদের সরকক বিজেতাধিগণের মধ্যে নাই, সে কংগ্রেসদলীয়ই হউন বা বামপন্থীই অথবা মধ্যপন্থী বা বতন্ত্রপ্রার্থীই হউন।

দেশের শিক্ষিত তত্ত্বলোকের উচিত ছিল নির্দোষনে সজির তাবে অংশ লওয়া। তাহা না করার নীচ কন্দিবাজ, চতুর জুয়াড়ী ও কপট ভাগ্যাবেধীর বরাত দুনিয়াছে। নির্দোষনে সাধারণের বিচারে সহায়তা করা তাহাদের উচিত ছিল তাহারা সরিয়া যাইয়া অশিক্ষিত ও অবিবেচক নির্দোষককে তুলিয়া দিয়াছেন তাহাদের হাতে। সুতরাং হয় হইয়াছে টাকার জর মর হইয়াছে জুয়া ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জর।

একজন বিজেতা চাষীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি নির্দোষিত হইলে কট্টোল তুলিয়া দিবেন তাহাতে চাষী চাল পকাশ টাকা মণ ঘরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। বাম-পন্থীরা ভোটারগণকে বামপন্থীকে তোট দিলেই হয় হইতে জিশ বিধা নিজের কৃষি-জমি পাইবে এই ঢালা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। একজন কংগ্রেসবিরোধী অবিবাহিত ব্যক্তি বস্তীর প্রচুর জীতোট সংগ্রহ করিয়াছেন সঙ্গে শাখা-সিঁহরুজা এক জীলোককে লইয়া, যে তার “বামী”কে জেল হইতে বাঁচাইতে চায় এই কথা প্রত্যেককে বলিয়াছে।

তাহার পর মেকী-তোট ও মৃত লোকের তোটে ত কেহ গুলি তরিয়াছে। উপরন্তু তোটদান ও তোট-গণনার মধ্যে অনেক দিম—ও রাতি—সময় থাকার রকম মহাশয়গণ বহুকেই ইচ্ছামত তোট উড়াইয়া ভোজবাজীর খেলা দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই শেষের যাহুকরী ব্যাপার—যে বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই—সকল পক্ষেরই চর অশ্চর্যবর্ণ সুবিধা অনুযায়ী করিয়াছে।

নির্দোষনে জাল-জুয়াচুরি বিশ্বাসভাঙকতার কথা কত বলিব ? এইমাত্র বলি যে, এবারের নির্দোষন নীচতা, জুয়াচুরি ও কুটম্বত্বের পূর্বককার সকল যেকর্ড তদ করিয়াছে।

অথচ একথা সত্য নয় যে, বাংলার শিক্ষিত সমাজ ইচ্ছা থাকিলে ইহাকে অত রূপ দান করিতে পারিতেন না, এবং একথা আরও সত্য যে, সারা ভারতে যদি কোমণ্ড প্রদেশ থাকে যেখানকার ব্যবস্থা পরিষদে উপযুক্ত লোকের নির্ভীক প্রয়োজন তবে সে এই আমাদের “সমজাপুণ” দুর্ভাগ্য পশ্চিম বাংলা, এবং সেই সঙ্গে বলি যে সারা ভারতে যদি অবশ্য অবস্থা কাহারও থাকে তবে তাহা এই অভাগা বাঙালী জাতির।

নিজের প্রদেশে আমাদের ক্তি অবস্থা সে কথা কি কোমণ্ড শিক্ষিত বাঙালীকে বলা প্রয়োজন ? অতঃপ্রদেশে তাহা কিরূপ তাহার পরিচর্য কিছু কিছু নিয়ে উদ্ভূত অংশগুলিতে পাওয়া যাইবে :

১. দেশের বর্তমান শাসন-জীবনের অধীনে দেশের লোকের

যে অবস্থা চলিতেছে—তাহা আজ চারি বৎসর ধরিয়া জন-বিকোচ ও আন্দোলনসমূহের ভিত্তর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সহিত মানভূমের বিশেষরূপের বিবিধ অত্যাচার ও অরাজকতার অব্যাহত দ্বারা সংযুক্ত। এই সমস্ত অন্যান্যের প্রথম প্রবর্তনের প্রয়োজনে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ঘটনাসমূহ আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হইয়া দিনের পর দিন মানভূমকে আলোড়িত করিয়াছে—তাহারই পরবর্তী অব্যাহতরূপে অনাচারের কতকগুলি সূচক ব্যবস্থা ব্যবহিতরূপে মানভূমে কার্যময়ী ও স্বাভাবিক দ্বারা পরিণত হইতে চলিয়াছে। মানভূমের চতুর্দিক দেখিয়া, গ্রামাঞ্চলসমূহে ঘুরিয়া প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, জীবনধারণ সমস্ত বিভাগে অনাচার করিবার সমস্ত উপায়গুলি এমন স্বাভাবিকভাবে কার্যময়ী আসন্ন জমাইয়া লইতেছে যে, প্রতিমিত্ত মানুষের জীবনযাত্রায় উৎপাতের দ্বারা অব্যাহত চলিয়াছে, কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ নাই, সুবিচারের কোনও আশা নাই, কাহাকেও হুঃখ, অসুবিধা জানাইবার, বলিবারও পথ নাই; কারণ ভূমিবার কেহ নাই।

“সমগ্র জেলার অবস্থার দিকে তাকাইয়া এই এক দ্বারা দেখিতেছি। জেলার খাজের ব্যবস্থা—জেলার বস্ত্র, ভূমল, বাজার ও বস্ত্রের ব্যবস্থা—জেলার শিক্ষা, শাসন, আইন আদালত, অধিকার ও অপরিহার্য্য সরবরাহসমূহের ব্যবস্থা—সকল বিভাগে, সকল বিষয়ে এক ব্যবহিত অত্যাচার, অনাচার ও শোষণ মানুষের জীবনকে নিত্য উত্তাপ ও দুর্ভিক্ষ করিতেছে।...

“তাহার পর শিক্ষা-বিভাগ। ইহা জাতীয় কণ্ঠের এক মহান্ অঙ্গ—জাতীয় অগ্রগতির আশা ও ভবিষ্যৎ রূপ এই শিক্ষা লইয়া কাটকা-বাজারের খেলা ও অনাচার চলিতেছে। শিক্ষা বস্ত্রের নাম উঠিয়া গিয়াছে, ইহা আজ বেকগমিশন, বিল, এ্যাণ্ট, এলাওয়েল, রিনিউয়াল, ভিজিটং রিপোর্টের কারসাজীর বাজার—প্রাদেশিকতা সৃষ্টির ব্যবহিত আড়াল-কেজ। ঘুঘ, উৎপাত, অনাচার ও বিভাগীয় অব্যবহার প্রতিযোগিতায় এই কেজ কাহাকেও পিছাইয়া নাই। বহু বাংলা স্কুলের মঞ্জুরী (বেকগমিশন) উঠিয়া গিয়াছে, বহু শিক্ষকের মাতা পাওনা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, বহু তথাকথিত হিন্দী-স্কুল মিথ্যা নামে বহনের জন্য কুপার অঙ্গ প্রস্থান করিতেছে। ইহার মাঝে পড়িয়া জাতীয় শিক্ষার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু এই দুই চক্র এক হুঃখ নিরমিত দ্বারা আবদ্ধিত ও উন্নত হইতেছে—দেখিবার কেহ নাই।

“এই সকলের মধ্যে জন-জীবন গঠনের ও তাহার অগ্রগতি প্রচেষ্টার কেজ কিতাবে চলিতেছে তাহাও দেখিবার। আত্মশাসনের ক্ষমতা, জন-জীবনের বিকাশের ক্ষমতা পকারে প্রভৃতি ব্যবহার যে প্রশংসা মেনে করা হয়, সেই পকারে

কর্মব্যবস্থা এখানে জনজীবন বিদ্যুৎপূর্ণ করিবার ক্ষমতা। জনগণের অধিকারকে বক্ষিত করিয়া, সুবিধামত কিছু কিছু গ্রামে সরকার দ্বারা নিয়োজিত ভাবেদার পকারে করা হইতেছে—এবং তাহার সরকারের হিন্দী প্রচার ও বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের সহায়তায় নিয়োজিত থাকিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধনে অনাচারের রাজত্ব সৃষ্টি করিতেছে। একটি বিশেষ জমিয় লক্ষ্য করিবার কথা—সমস্ত মানভূমে যে সমস্ত লোক অবাঞ্ছিত বলিয়া বহু বিখ্যাত, সেই লোকগুলিই আজ বাড়াই করিয়া সরকারের বে-সরকারী নিষেধ লোকরূপে নিযুক্ত। ইহার জেলার সর্বত্র ভীতি প্রদর্শন করিয়া, শোষণ করিয়া, আত্মগোঁড় করিয়া জনগণের ক্ষতি করিয়া বেড়াইতেছে—ইহাদের অত্যাচারের প্রতিকার চাহিলে সরকার কর্তৃক ইহারাই তত্ত্ব, মীমাংসা ও প্রতিকারের ক্ষমতা ভারপ্রাপ্ত হন—ইহাই অবস্থা।”

মানভূমের বিখ্যাত সাপ্তাহিক “সুজি”র ১৯শে ও ২৬শে ফাল্গুন সংখ্যা হইতে উপরোক্ত অংশগুলি গৃহীত। বলা বাহুল্য, যে যে অংশে এইরূপ বৈরাচার চলিতেছে তাহার অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙালী এবং সেই কারণেই তাহাদের উপর, বিনা প্রতিকারে এবং বিনা ভয়ে, অত্যাচারীর মল হিংস্রক কাজ চালাইতেছে। বাঙালীর হুঃখে বাঙালীই বিচলিত হয় না, সুতরাং প্রতিকার হইবে কি ভাবে? যদি আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিত তবে কেহে এরূপ লোককে পাঠাইতে আমরা চেষ্টা হইতাম যাহার হাতে পায়ে “পাট্টা” শিকল বাধা নাই, যাহার মুখে স্বাধের বন্ধন নাই, চোখে “প্রাদেশিকতা মহাপাপ” এই শব্দযুক্ত তুলি পরাইয়া দেওয়া হয় নাই।

বাংলার কংগ্রেস ও অতি হীন অবস্থায় পৌছিয়াছে এবং যত দিন ত্রিমান অতুল্য যোগ প্রমুখ “নেতা” বকীর প্রাদেশিক চক্রান্ত-চক্রের কেহে অধিষ্ঠিত থাকিবেন তত দিন ঐ হীন অবস্থা যাইবার নয়। আজ নির্বাচনে কংগ্রেস জিতিয়াছে বলিয়া “নেতা” গণ উল্লাসে অধীর। কিন্তু সেদিন দূরে নাই যখন লক্ষ্যভাগের পালা বলিবে এবং তখনই হইবে পরীক্ষা।

ভাঙার দায়ের যোগ্যতম ভিত জন সহকর্মী নির্বাচনে হাটাই হইয়াছেন। যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুই জন অযোগ্যতম, একজন সাক্ষীগোপাল, অল্প জন সং ও যোগ্য, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম। কংগ্রেস দলে যে ১৫০ জনের মধ্যে ভাঙার দায়কে মন্ত্রী হুঁজিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত রক্ত থাকিতে পারে না একথা আমরা বলি না, এবং লোভ দেখাইলে বিপক্ষ দলের মধ্যে হইতে লোক আসিতে পারে না একথাও আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত প্রমুখপূর্ণ প্রদেশে রাষ্ট্রচালনার যোগ্যতা অর্জন করা সহজ নয়; সুদৃষ্টি, বিচার ও সন্তোষ তো চাই-ই, আরও চাই অভিজ্ঞতা এবং কার্যক্ষমতা—এরূপ গুণযুক্ত নবরত্ন কিতাবে সংগৃহীত হয় তাহা অসম্ভব।

ভারত সরকারের বাজেট

ভারত চিন্তামন দেশমুখ পাল্লার্মেন্টে ভারত সরকারের বাজেট পেশ করিয়াছেন এবং নিম্নে তাহা পাস করাইয়া লইয়াছেন। এই বাজেটে ও দেশমুখের বক্তৃতার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

বিগত বৎসরে দেশের আর্থিক অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রীষ্মক দেশমুখ বলেন যে, সাধারণভাবে দেশের আর্থিক অবস্থা দুর্বোধ্যপূর্ণ ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, খাড়াভাব ইত্যাদি সমস্যা ইহার জন্ম দায়ী। মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্বরূপে মুদ্রাস্ফীতি এবং স্বল্প উৎপাদনকেই তিনি দায়ী করিয়াছেন। দেশ বিস্তৃত হওয়ার ফলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অভিবৃদ্ধি অনাবৃদ্ধির ফলেও দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি কোরিয়ার যুদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন আনয়ন করে তাহার প্রভাবে ভারতের দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং দেশমুখের মতে ভারতের ইহাতে করণীয় কিছু ছিল না বলিয়াই মূল্যবৃদ্ধির কথা আসে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থার হস্তক্ষেপ করার অধিকার না থাকিলে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বনে যে আমাদের সরকারের পক্ষে হাত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? এই মূল্যবৃদ্ধি যে বহুলাংশে আমাদের সরকার গৃহীত কয়েকটি নীতির অবজ্ঞার ফলস্বরূপ সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৪৯ সালে মূল্যবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের অহুত্বের ডিভ্যানুয়েন্সন করার জন্তই যে আমাদের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা আজ আর কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে।

এই মূল্যবৃদ্ধির জন্ত সরকার হইতে মুদ্রাস্ফীতিকে দাবাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট বাজেট এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। রপ্তানী শুদ্ধ বাড়াইয়া ও নুতন শুদ্ধ বসাইয়া সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিতরণতঃ, আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত গম বাজারে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের হাত হইতে সরকারী কোষাগারে টাকা চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং টাকার পরিমাণ অনেক কমিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যাংক রেট শতকরা ৩ হইতে ৩০ তাগে তুলিয়া, ব্যাংক ক্রেডিটের পরিমাণও হ্রাস করা হইয়াছে, ফলে সন্ধ্যা তাগে দেশে টাকার সরবরাহ কমান সম্ভব হইয়াছে।

কৃষি উৎপাদন অপেক্ষাকৃত আশাশ্রয় হইলেও অনাবৃষ্টির জন্য খাড়াভাব রহিয়াই গিয়াছে। কচু, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে অনাবৃষ্টির জন্ম খাড়াভাব ঘটাইয়াছে এবং ইহার জন্ম বহু খাদ্য আমদানী করিতে হইবে বলিয়া অর্থদলিত বক্তৃতায় বলিয়াছেন। এখানে একটি প্রশ্নের উত্থাপন

করা প্রয়োজন। কংগ্রেস রাষ্ট্র-পরিচালনভার গ্রহণ করার পর হইতেই কেবল অল্প, অভিবৃদ্ধি, অনাবৃদ্ধি ইত্যাদি কথা শুনা যাইতেছে, প্রকৃতি কি কেবল দুর্ভাগ্য ভারতের সঙ্গেই যুগ্ম করিতেছে, না পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও একাধিকবার হানাদ দিয়াছে? প্রাকৃতিক দুর্ভোগ কি ভারতে বা পৃথিবীতে নুতন?

বহির্বিপাক্যে আমাদের চলতি বৎসরে বিশ্বের লোকসান হইয়াছে। ভারত চিন্তামন দেশমুখ স্বীকার করিয়াছেন যে, ডিভ্যানুয়েন্সন দ্বারা আমরা রপ্তানি বাড়াইতে আশাশ্রয় পাই নাই এবং ঘেটু কল পাওয়ার আশা ছিল তাহাও প্রচুর খাড়া ও কাঁচা মাল আমদানী করিতে কতক নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

ভারতের কলকারখানার অবস্থা এখনও এমন নয় যে, বিদেশে রপ্তানি উত্তরোত্তর বাড়াইতে পারে। কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য চট ও তুলিয়া। কিন্তু পাটের জন্ম চটকলকে কিছু অংশে পাকিস্থানের স্তম্ভিত্বের উপর নির্ভর করিতে হয়। কারণ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্পর্কটা প্রায়ই অনিশ্চিত। পাকিস্থান ডিভ্যানুয়েন্সন না করার কাঁচা পাটের দাম মিটাইতেই বাড়তি মূল্য বাবদ ভারতের কিছু অংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

ষ্টালিং ব্যালান্স সম্পর্কে গ্রীষ্মক দেশমুখ বলেন, ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটেনের নিকট আমাদের ৭৮১ কোটি টাকার ষ্টালিং পাওনা ছিল। দেশমুখ হয় বৎসরের জন্য উহার একাংশ বার্ষিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকার কিস্তিতে তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গ্রীষ্মক দেশমুখ কয়েক সপ্তাহ আগে লন্ডনে কমনওয়েলথ অর্থদলিতের গোপন সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ভারতের প্রতিনিধি রূপে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন যে, ১৯৫২ সালের শেষ পর্যন্ত ষ্টালিং ব্লক সমগ্রভাবে পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সহিত, অর্থাৎ ষ্টালিং ব্লকের বহির্ভূত অঞ্চলের সহিত মেলাপাওনা হইর করিবে। অর্থাৎ ব্রিটেনের ষ্টাটিভি মিটানোর দায়িত্ব একা ব্রিটেন না লইয়া সমগ্র ষ্টালিং ব্লকের মাড়ে তাহা চাপান হইল। ভারতবর্ষের বাজেট হইলে ব্রিটেন তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের ষ্টাটিভির একটা অংশ ষ্টালিং ব্লকের দেশ হিসাবে ভারতের মাড়ে চাপাইর দিতে পারিবে।

ডলারের ব্যবস্থা কিছু দুর্বোধ্য। আমাদের ৩৫ কোটি টাকার ডলার ব্রিটেনে জমা আছে। বলা হইয়াছে যে, ১৯৫১ সালে "নেট" ৭ কোটি টাকা ডলার ডলার আমাদের লইতে হইতে পারে। অতদিকে একথাও বলা হইতেছে, ঐ হিসাব ছাড়াও বিশ্ব ব্যাংক হইতে দেশের কৃষি, রেল এবং বিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্ম ৩১ কোটি টাকা ষ্টালিং হইতে হইয়াছে। এই ডলারের চাপ আমাদের বাজেটেই না কমিতেছে তাহা বুঝা যায় না।

রাজস্ব ব্যাপারে চলতি বৎসরের বাজেটে (১৯৫১-৫২) ২৭ কোটি টাকা বাড়তি হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত বাড়তি হইয়াছে প্রায় ৯০ কোটি টাকা। তবেও আগামী বৎসরের বাড়তি বরা হইয়াছে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের হিসাবে আগামী বৎসরের আর অনুমান করিলে ইহা আরও অধিক হইত। দেশমুখ বলিতেছেন—বাড়তিটা illusory অর্থাৎ ভুয়ো। অন্তরাং এই illusory বা ভুয়ো আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ট্যাক্স কমানো যায় না। কারণ আমদানী শুল্ক ৫১ কোটি টাকা এবং রপ্তানী শুল্ক ২৬ কোটি টাকা যে বেশী আদায় হইয়াছে তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় না। ১৯৫০-৫১ সালে আমদানী শুল্ক আদায় হইয়াছে ১০৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। তাহাপি ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে আমদানী শুল্ক কমাইয়া ৯০ কোটি বরা হইল। ইহার কোন মুক্তিসম্পত্ত কারণ বুঝিয়া পাওয়া যায় না। দেশে বহু জব্যের চাহিদা রহিয়াছে, আমদানী লাইসেন্সনা কমানিলে মাল আসিবে এবং শুল্ক সমান থাকিবে। আমদানী শুল্ক বেশী আদায় হইয়াছে পেট্রল, লুব্রিকেটিং তেল, মদ, মোটর গাড়ী, রং, যন্ত্রপাতি, লোহা, কাগজ, কৃত্রিম রেশম, সুপারি প্রভৃতির উপর। ইহাদের কোনটির আমদানী হঠাৎ কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা অর্থসচিব জানান নাই। রপ্তানী শুল্ক আদায় বেশী হইয়াছে চট, তুলা, কাপড়, মাদানিজ এবং তৈলবীজ হইতে। তুলার অভাবে আমাদের কাপড় হয় না, কিন্তু তুলা রপ্তানীর শুল্কই আদায় হইয়াছে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। কাপড় রপ্তানীতে ১৯৫০-৫১ সালে শুল্ক আসিয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা, এ বৎসরে (১৯৫১-৫২) দেশমুখ মহাশয় আদায় করিয়াছেন ৩ কোটি ২৫ লক্ষ, এবং আগামী বৎসরের জন্য হিসাব ধরিয়াছেন আড়াই কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত কাপড়ের উপর এক্সাইজ ট্যাক্স চাপাইয়াছেন ১৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশে কাপড়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও বিদেশে কাপড় রপ্তানী করিয়া মাত্র তিন কোটি টাকা আদায় করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু দেশবাসীর নিকট হইতে লইয়াছেন ১৭ কোটি টাকা, আগামী বৎসরেও ইহাই বরা হইয়াছে। তাহাপি বাড়তি হিসাবটা illusory হইল কেন?

দেশের গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে সরকার প্রত্যক্ষভাবে এক্সাইজ ট্যাক্স আদায় করেন নিম্নলিখিত পরিমাণ—

দেশলাই	৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
ভাষাক	৩৫ " "
কাপড়	১৭ " "

মূল্যহ্রাস

বিষয়বাপী মূল্যহ্রাসের বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা

চলিতেছে। পণ্যমূল্য কত দূর পর্যন্ত কমিবে অথবা কোথায় গিয়া ছিন্ন হইবে তাহা সঠিক অনুমান করিবার সময় এখনও আসে নাই, সভ্য, তবে মূল্যহ্রাসের কারণ এখন অনেকটা বুঝা যাইতেছে। চাচ্চিল-ট্রুমান আলোচনা হইতে ইহার সূত্রপাত। ধীরে ধীরে বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, চাচ্চিল-ট্রুমানকে কয়েকটি ল্পষ্ট কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, সোভিয়েটের পশ্চিমমুখী অভিযান বন্ধ করিতে হইলে তাহাকে মধ্য-ইউরোপেই বাধা দিতে হইবে, সোভিয়েট রাশিয়া যাহাতে আটলান্টিকের তীরে পৌঁছিতে না পারে তাহা করিতে হইবে। ইহার জন্য বিশেষভাবে ব্রিটেনকে ও ফ্রান্সকে শক্তিশালী করা দরকার। ব্রিটেন ৪৭০ কোটি পাউণ্ডের যে সামগ্রীকরণ প্রোগ্রাম গ্রহণ করিয়াছে তাহা কার্যে পরিণত করিবার সাধ্য বর্তমান অবস্থায় তাহার নাই। আমেরিকা Stock Pile আরম্ভ করার কালে বিশ্বের বাজারে যুদ্ধোপকরণ এবং রপ্তানী জব্যাদির কাঁচা মালের দাম এত চড়িয়া গিয়াছে যে, ব্রিটেনের পক্ষে ঐ দামে জিনিসপত্র ক্রয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাহার পক্ষে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের সাধ্যমত বর্তমান অবস্থায় বেটুকু অল্প-সজ্জা সম্ভব তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার উপায় থাকিতেছে না। উপরন্তু তাহার কলকারখানায় কাঁচা মাল পাইতেছে না। ট্রুমান এই অবস্থার গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং Stock Pile বন্ধ করিয়া মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে সম্মত হন যাহাতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জব্য-মূল্য হ্রাস হইলে কাঁচা মাল কিনিয়া নিজেদের অর্থনৈতিক মান রক্ষা করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিতে সক্ষম হয়।

চাচ্চিল দেশে কিরিবার পর ঠালিংকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাক রেট বাড়াইয়া দেন এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড গণদান কমানিয়াছেন। ইহার ফলে ব্রিটেনের টাকার বাজারে ঋণ-প্রাপ্তি কঠিন হয় এবং ফলে বড় বড় ব্যবসাদারদের পক্ষে আসল ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। ওদিকে আমেরিকা মাল কেনা কমানিয়া দেয়। এই দুই কারণের জন্য জব্যমূল্য কমিতে আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধোপকরণ ও কাঁচা মালের বাজারে, অর্থাৎ চট, লোহা, টিন, তৈলবীজ প্রভৃতির বাজারে মদ্য দেখা দেয়। আমেরিকা মাল কিনিতেছে না এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের বিক্ষেপতা ও উৎপাদকদের মধ্য প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং ফলে মূল্য আরও কমিতে থাকে। বর্মা, নারিকেল-তেল Stock Pile এর একটা উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেন শুকনো নারিকেল ক্রয় কমানিয়া মাত্র সিংহলের নারিকেলের দর পড়িয়া যায়, তখন কোচিন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। এই ভাবে বাজার নামাইয়া ব্রিটেন তার নিজের প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ কিনিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

এদিকে ভারতেও ব্যাক রেট বাড়িল ও ব্যাকগুলিকে ধর্ম-দাম সঙ্কোচ করার ইঙ্গিত দেওয়া হইল। ইহার ফলে বড় বড় একচেটরা ব্যবসাদারের টাকার বিষয় টান পড়িল।

চট্ট, তুলা ও তৈলবীজ ভারতের প্রধান বাণিজ্যবস্তুর অর্ন্তগত এবং তিনটিতেই অসম্ভব রকমে কাটকা চলিতে থাকে। পাট ও চট বিষয়ে ভারতবর্ষের যে একচেটরা অধিকাংশ ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারত-বিভাগের ফলে কাঁচা পাট পাকিস্তানে বেশী গিয়াছে। ভারতে পাট উৎপাদন বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু ভাল পাট এখনও জম্মার শুধু পাকিস্তানে। চটকল এক ভারত ও ভাণ্ডি ভিন্ন আর কোথাও বেশী ছিল না। ভারতেই ছিল বেশী। এখন জাল ও বেলজিয়ামের চটকল কাক বাড়াইতেছে। কিন্তু ইউরোপের ভীতে উৎকৃষ্ট চট ভিন্ন মোটা চট ও বলিয়া তৈরি হয় না। ভারতবর্ষের চটকল এই গুলিতেই তৈরি করে। পাকিস্তানের উৎকৃষ্ট পাটই ইউরোপে চালান যায়, কিন্তু মোটা পাট ভারতে ভিন্ন বিক্রয় হইবার উপায় নাই। এইভাবে পাটের ব্যবসা ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও ইউরোপ এই তিন স্থানে ভাগ হইয়া যাওয়ার পাট-ব্যবসার অচলিত দেখা দিয়াছে। পাকিস্তানের পাটের বহুতম ক্রেতা ভারতবর্ষ। ইউরোপের চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে। ইহাতেই পাকিস্তান তীব্র অসুবিধার পড়িয়াছে। পাকিস্তানী টাকার দর এত পড়িয়া যাওয়ার ইহাই কারণ।

তুলার ফসল এবার পৃথিবীর সব দেশে ভাল হইয়াছে। কলোদাম কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাজারে তুলার অত্যন্ত ক্রেতা। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের কাটকাবাজার বিখ্যাত। এবার সেখানেও দাম পড়িয়া যাওয়ার কাটকা-বাজারে এবং খোলাবাজারে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। তুলার মূল্য হ্রাসেও পাকিস্তান খুব আঘাত পাইয়াছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ মাত্র তিনটি—পাট, তুলা ও চামড়া। চামড়ার বাজার এখনও টিকিয়া আছে, পাট ও তুলার বিপর্যয় ঘটয়া গিয়াছে। তুলা-ব্যবসারীদের বাঁচাইবার জন্য পাকিস্তান তামনাশ ব্যাক চেষ্টা করিতেছে।

পাট, চট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতির দাম পড়িয়া যাওয়ার তাহার মাল মজুত করিয়াছিল তাহার বিষয় বিপদে পড়িয়াছে। ব্যাকের ও বাজারের দেনার চাপে তাহার পড়তি দামেই মাল বেচিয়া দিয়া দেনা মিটাইতে বাধ্য হইতেছে। তাহাতে না কলোদাম সোনা বাহির করিতেছে। ইমকাম ট্যাক্সের ভয়ে ইহার ব্যাকে নিজের টাকা রাখে না, নোটের বাণ্ডিল রাখিতেও ভয় পায়, সুতরাং ইহার এত দিন সঞ্চিত অর্থ সোমার ও কাঁচামালে রাখিয়াছে। এবার সেই সোনাই বাহির হইতেছে। একবারে বাজারে বহু সোনা আসিয়া পড়ায় সোনার বাজারও হু হু করিয়া নামিতেছে।

পড়তির মুখে বাজার বন্ধ করিয়া দিয়া সামলাইবার চেষ্টা

করা হইতেছে, কিন্তু এই চেষ্টা হাচী হইতে পারে না। বাজার পুলিশেই আবার পড়তি আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে একটা কথা, এই মূল্যহ্রাসে বিশেষ ভাবে মজুতদার ও চোরাকারবারীরাই আঘাত পাইতেছে বেশী। সাধারণ ক্রেতাদের এখনও ভয়ের কারণ ঘটে নাই। কৃষিকাজ পণ্যের দর উৎপাদনের ব্যয়ের নীচে নামিবার সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না, তবে এই ভাবে চলিতে থাকিলে তাহা ঘটী আশ্চর্য নয়। সে বিষয়ে এখন হইতেই গবর্ণমেন্টের সতর্ক হওয়া উচিত।

ভারত সরকারের কর্তব্যাক্রমের মধ্যে হরেকরু মহাত্মা এম্বাং মুখ ধুলিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। ব্রিটেনের ব্যাক রেট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যাক রেটও বাড়ান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে কতটা ভাল হইয়াছে তাহা বুঝা যায় নাই। ব্রিটেনে আবার ব্যাক রেট বাড়িয়াছে। আমাদের রিজার্ভ ব্যাক এখনও উহার অনুসরণ করিতে তরসা পায় নাই। ভারতে মূল্যহ্রাসের প্রতিক্রিয়া কোথায় গিয়া আবার দাঁড়াইবে, রিজার্ভ ব্যাক এবং ভারতীয় কিনাঙ্গ বিভাগকে কোথায় গিয়া বাধা দিয়া মোড় ঘুরাইতে হইবে তাহা সমস্ত বাজারের স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ হওয়ার আগে সঠিক বরা যাইবে না। তবে একটা এখন স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, মূল্য-হ্রাসের কর্তা ভারত সরকার নহেন, সুতরাং তাহা রোধ করাও তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে নাই। দেশের বাণিজ্য বেগানে বিদেশের মুখোপেকী সেখানে ভারত সরকারের কর্তৃত্বপূর্ণ ইচ্ছা-মত মূল্যের উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। মূল্যবৃদ্ধির বেলায় ভারত সরকার যেরূপ অসহায় ছিলেন, মূল্যহ্রাসেও তাই। কাজেই এরামূল্য পতনের জন্য তাহারা যে আত্মপ্রসাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভ্রম।

তবে বাজারে এখন জামের অবস্থা চলিয়াছে। সেইজন্য অনেক ক্রেতা—যথা সন্নিহার তেলে—কাঁচা মাল অপেকা ভৈয়ারী মালের দর অনেক নামিয়াছে। এইরূপ জাল যোগে ভারত সরকার অনেক কিছু করিতে পারেন। তাহাতে বাজারের উঠা-নামা কিছু নিয়মিত হইতে পারে।

কোম্পানী আইন কমিটি

ভারতীয় কোম্পানী আইন কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটির রিপোর্টে ম্যানেশিং এক্জেলি বিষয়ে যে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্যকে ম্যানেশিং এক্জেলি এক অমুত্পূর্ণ বস্তু। পৃথিবীর কোন দেশেই এই ভিন্ন নাই। ম্যানেশিং এক্জেলির মধ্যে কোম্পানী পরিচালনের দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি, সমস্ত হিসাবপত্র সিক্রেটের হাতে রাখার কনভেনশন এবং

বিভিন্ন কোম্পানীতে একই ব্যক্তির ডিরেক্টর থাক। (Interlocking directorship) এই করণ সর্বপ্রধান দোষ। Interlocking Directorship-এর অপরিসংখ্যানিক অর্থ Inter-investment of funds। কোম্পানী আইনের ১৯৩৬ সালের সংশোধনে এই দোষ দূর করিবার জন্ত কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ মিট্রদের গ্রুপ ব্যাক গঠন করিয়া আইনের এই ধারা এড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রের স্বাভাবিক অবস্থা কিরূপইহা আশ্রিতে হইলে ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ মিট্র দেওয়ার সরকারি কংগ্রেস কমিটি দৃষ্টান্তের পরে এ আই সি-সির অধিবেশন এই প্রস্তাব পাসও করিয়াছিল, কিন্তু পরে বীরে বীরে কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ মিট্র করিয়া লইয়াছেন। কোম্পানী আইন কমিটিও ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ মিট্র দেওয়ার সুপারিশ করিতে ভরসা পান নাই।

কাঁচামাল জর ও শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্ত কয়েকটি বাপে মিট্রদের কোম্পানীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ অনেক টাকা করে। যেমন কোন কল্যাণ কোম্পানীর করলা সেই কোম্পানী মিট্র বিক্রয় করিতে পারে না, তার ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ বিক্রয় করে। কোম্পানীর ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ ১৮ টাকার মিট্রের অধীনস্থ কোম্পানীর নিকট হইতে সমস্ত করলা কিনিয়া লইয়া বাজারে উহা ২০ টাকার বিক্রয় করিলে কোম্পানীর অংশীদারদের তাহাতে বাণা দেওয়ার কোন উপায় নাই। কোম্পানী যে করলা বাজারে মিট্র ২০ টাকার বিক্রয় করিতে পারে, ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ জন্ত তাহা ১৮ টাকার বেশী দর করিবার কোন উপায় নাই।

ইহা তো আইনসম্মত আদার, বে-আইনি আদারই বেশী চলে। মাল জর প্রথম বাপে বাজার হইতে ১৮ টাকার ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভের এক মদর কোম্পানী করে, দ্বিতীয় বাপে কোম্পানী হইতে ২২ কোম্পানী ২০ টাকার মাল কেনে, তৃতীয় বাপে মূল কোম্পানী ২২ কোম্পানী হইতে ২২ টাকার মাল জর করে। ইহাতে কোম্পানীর জর বাজার দর হইতে অমর্যক ৪ টাকা বেশী দর হয়। ১৯৭ ও ২২ কোম্পানীর মালিক বা অংশীদারেরা ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভের বেনামদার, ইহাদের মারফত বাড়তি টাকার উহাদের পকেটে আসে। কেশোরাম কটন মিলে এই ব্যাপারই মেলট্যান্ডের এগিষ্টার্ট কমিশনার নির্দল রায় বরিয়াছিলেন। সম্ভ্রতি ম্যাকলিয়ার্ড কোম্পানীতেও ইহাই ঘুরা পড়িয়াছে। ঐ কোম্পানীর দুই জন নৃক্ষিপালী ডিরেক্টরকে এইরূপ কার্যকলাপের জন্ত দোষ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষমতারোধ করা হইতেছে শোনা যায়।

Interlocking Directorship-এর ক্ষেত্রে বর্তমান কাল-

কতি করা উচিত ছিল কোম্পানী আইন কমিটি তাহাও করিতে ভরসা পান নাই।

ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ এতদিন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে পরিচালিত হইত। ইহাতে এদের বর্তটা দায়িত্ব ছিল, স্বাধীনতার পরে ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়া তাহাও এড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভের ক্ষমতা বোল আমা রজার রহিয়াছে, কিন্তু দায়িত্ব অনেক হালকা হইয়া গিয়াছে। কতিগ্রহ হইতেছে ইহাদের উপর মালের ক্ষেত্র এবং ইহাদের অধীনস্থ কোম্পানীর অংশীদার।

পূর্ব পাকিস্থানে বাংলাভাষা আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্থানের ভাষা-আন্দোলন অতি তীব্র এবং ব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছে। এই আন্দোলনে যাহারা লড়িতেছে এবং যাহারা প্রচার করিতেছে তাহারা প্রায় সকলেই মুসলমান। আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে পূর্ব পাকিস্থানের শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে এবং বর্তমানের তীব্র রূপ ধারণের পূর্বে বহু দিন যাবৎ ববরের কাগজে ও সভা-সমিতিতে মাতৃভাষার-বিনাশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছে পূর্ব পাকিস্থানের বাংলাভাষা শিক্ষিত মুসলমান।

পূর্ব পাকিস্থান সরকার বোধ হয় তাবেন নাই যে, এই আন্দোলন এত ব্যাপক ও ঐচ্ছিক রূপ গ্রহণ করিবে, অথবা হৃদয় করাচীর কর্তৃপক্ষ মনে করেন নাই যে, পূর্ব পাকিস্থানের শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের মনের কতি সন্মতভাবে এরূপ ভেদের সহিত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। সেই জন্ত প্রথমে এই সকল প্রতিবাদ তাচ্ছিল্যের সহিত অবহেলা করার এই আন্দোলন উত্তরোত্তর প্রবল হইয়াছে ও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ দুইটি। পূর্ববদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা এবং তাহাদের মাতৃভাষায় অপমান হারের অপমানেরই মত। এই অপমানের ফলেই শিক্ষিত মুসলমান রুখিয়া উঠিয়া সক্রিয়ভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতেছে। কলে পাকিস্থান সরকার প্রমাণ পণিতেছেন।

ব্যাপার এই অবস্থার গড়াইয়া আসিবার পর তাহাকে সামলাইবার জন্ত যে অপচেষ্টা চলিতেছে তাহার রূপ ও কৌশল হই-ই রাজনীতি হিন্দুর কাছে সুপরিচিত। সেই চেষ্টা সহজে কলিকাতার "সুপার" নিরূপণ মত্তব্য করিয়াছেন : "পূর্ববঙ্গ আন্দোলনবাহিনীর প্রধান পরিচালক মিঃ এইচ এম. মোহা মরহুমসিংহ এক আন্দোলন সমাবেশে বলেন যে, ১৯৫০ সালের পূর্বে যে সকল হিন্দু পাকিস্থান আগ্রহ করিয়া

বর্তমানে পাকিস্থানে যাতায়াত করে, তাহারাই পাকিস্থানের প্রথম শত্রু। শত্রুদের খুঁড়িয়া বাহির করিবার অস্ত্র আন্দোলনের সতর্ক থাকিতে বলিয়া মিঃ দোহা জানান যে, তাহা আন্দোলন ভারতীয় একেটদের স্বষ্টি; ভিতর হইতে পাকিস্থানকে ধ্বংস করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তিনি আন্দোলনের উত্তম দিকে যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সম্মতজন মনে হইলে পুলিশের হাতে অর্পণ করিতে বলেন। মিঃ দোহা আরও বলেন যে, পাকিস্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী অসংখ্য হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধান পাক সরকারের ‘পবিত্র দায়িত্ব’। পাক সরকার এই পবিত্র দায়িত্ব কি ভাবে পালন করিতেছেন তাহা পূর্ববদের স্থায়ী অধিবাসীদের অজানা নহে। পূর্ববদ ব্যবস্থা-পরিষদে হিন্দু সদস্যগণ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অসহায় অবস্থা সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাই উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পাকিস্থান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত সভীজনাথ সেন, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোহরলাল বরকে নির্দিষ্ট কোন কারণেই দেখাইয়া কিছা আদালতে প্রমাণযোগ্য কোন অভিযোগ দা করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ হিন্দু অধ্যাপককে পাক-নিরাপত্তা আইনে—যাহাকে সাধারণ লোক বে-আইনী আইন নামে অভিহিত করিয়া থাকে—কারার দাওয়া হইয়াছে। পূর্ববদের তাহা আন্দোলন তাহাদের নিজস্ব আন্দোলন। এই আন্দোলন উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান নির্কিংশেষে তাহার বে-পরোয়াভাবে যে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ব্যাপারটাকে বাহিরের ব্যক্তিদের কাছ বলিয়া বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা চালানো হইতেছে ও এই সুযোগে হিন্দু নেতা, অধ্যাপক প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্য-পাক সরকারের বিশ্বস্ত ও অসংখ্য নেতাও পূর্ববদ কর্তৃপক্ষের এই আচরণের প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ন্যায়ের এই প্রত্যক্ষ অভিযান সম্বন্ধে গর্ভিত-চন্দ্রাবত নেকড়ে বাঘের ভাষা মিঃ দোহা পাকিস্থানের স্থায়ী বাসিন্দা, অসংখ্য হিন্দুদের নিরাপত্তা-বিধানের পবিত্র দায়িত্বের বুলি আওড়াইতেছেন।

পূর্ববদের আন্দোলন-নায়ক দোহা সাহেব তাহার বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গ বা আসাম হইতে যে কোন পূর্ববদে গমনকারীকে বানভাসিয়া করিতে ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পুলিশের হাতে দিতে বলিয়াছেন। বরিশা আনিতে বলিলে যাহারা বাবিশি আনে, তাহাদের প্রতি এই নির্দেশ কিভাবে কার্যকরী হইতে পারে, তাহা তাহারও অজানা নহে। ইহা যে তাহা-আন্দোলন চাপা দিবার হীন কৌশলমাত্র তাহাও বুঝিতে তাহারও বিলম্ব হইবার কথা নহে। কিন্তু অত দিকে ইহার গুরুত্ব

অদূরপ্রসারী বলিয়াই আমরা ইহার আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমতঃ মিঃ দোহার উক্তি যদি সরকারী উক্তি হয়, তাহা হইলে উহা নেহরু-লিঙ্গাৎ চুক্তি-বিরোধী। আমদের ভারত সরকার এই ব্যাপারে কি পদা অবলম্বন করিবেন, আমরা এখানে তাহা জানিতে চাই।

হাবড়া উদ্বাস্তু-কলোনী

শ্রীযুক্ত ল্যাবো বদীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তিনি একখানি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। তাহার নাম “জনসেবক”। সুভদ্রা বলিতে পারা যায় যে, তাহার পত্রিকার যে সব মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাঃ বিধানচক্র রায় ও তাহার পরামর্শদাতারা একেবারে তাহাকে ভাঙিয়া করিতে পারিবেন না, এবং প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে তৎসম্বন্ধে তাহার দায়িত্বও আছে।

এই সব কথা বলিলাম গত ১৬ই ফাল্গুন পত্রিকার প্রকাশিত হাবড়া কলোনীর অধিবাসীদের হুখ-হুঃখের বিবরণ পাঠ করিয়া। শ্রীযুক্ত ল্যাবোর রায় লিখিতেছেন :

“সরকারী প্রচেষ্টায় হাবড়ার বাস্তবায়নের জন্তে যে জন-পদ গড়ে উঠেছে, সেটা দেখবার সৌভাগ্য হ’ল সেদিন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ নিয়ে গুরু করতে পারেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এতে সম্পূর্ণ সাকল্যলাভ নির্ভর করছে জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সরকারী আনুসঙ্গিক কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর।

আমরা লক্ষ্য করলাম, কতকগুলি বাড়ী দখল নেবার পর কিছু সংখ্যক লোক দরকারী জিনিসপত্র লগিয়ে চলে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বোঝা গিয়ে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, সাধারণতঃ পানীর জলের প্রবল এবং স্থানীয় জীবিকা-নির্বাহের সমস্যাই স্থানত্যাগ করার কারণ।

স্থানীয় লোকদের জীবিকার প্রস্তুতাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণ বেকার যুবকরা অসংখ্য হাবড়ার উন্নতি করে এ বিষয়ের আর্থনিক সমাধান করা সরকার। উপায় না পেয়ে কেউ কেউ চুরি-ডাকাতির দিকে ঝুঁক পড়েছে। তাই বা ক’জনে পারে?

বড় দিন না কোন অর্থকরী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, তত দিন অন্ততঃ কলকাতা দমদম ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে এ বিষয়ের আর্থনিক সমাধান করা সরকার।

কলোনী থেকে নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন ছই মাইল থেকে ভিন্ন মাইল। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মাইকেল-লিঙ্গা এ পথের জন্তে ১৬/০ থেকে ৫০ আনা নেয়। সাধারণ লোকের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে সরকারী বাস অনর্থক ১/১০ ভাড়া চালু করা সরকার হাবড়া ষ্টেশন পর্যন্ত।

সুন্দরাম, কলোনী থেকে কিছু দিনের মধ্যেই একটা বাস যাবে ডালহৌসী পর্যন্ত। কিন্তু যাহা ভাড়া দিতে হবে, তাবোধ

হর সাধারণের মাগালের বাইরেই যাবে। এ সমস্ত দুর্বলতা পথের-চাকুরীকীদের মধ্যে রেলের সমান ভাড়ার মাহুলী টিকিটের বন্দোবস্ত করলে বোধ হয় কিছুটা সুবিধা হবে। ট্রেন-চলার সময়ও কিছু সুবিধা হওয়া সরকারী ১০টার মাহের অফিস, তারা মাত্র একটি ৮টার ট্রেনের সুবিধা পেতে পারেন, যেটা শিরালদাহে ৯-২৫-এ পৌঁছার। আরও দুটি ট্রেন দেওয়া উচিত, যা সাধারণভাবে ৯-৩০ থেকে ৯-৪৫-এর মধ্যে শিরালদাহে যাবে। এই দুটি ট্রেন প্রত্যেক ষ্টেশনে না থেমে হাওড়া ও মা-বারাসত-মধ্যমপ্রাচ-দয়দয় জংশন দিয়ে শিরালদাহে পৌঁছলে সময় অনেক কম যাবে।

কলিকাতার উপর থেকে জনতার চাপ কমাতে হলে এ সমস্ত কলোনীগুলোকে প্রণয়ন করে ভোলার প্রয়োজন স্বীকার না করে উপায় নাই। হাবড়া কলোনী নির্মাণ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রথম প্রচেষ্টা বলে তার সাকল্যের উপর প্রণয়ন মন্ত্রী কথামত ৬৪টি জনপদ গড়ে ভোলার সাকল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

বুনিয়াদি শিক্ষার সংগঠন

পত আখিন মাসের “শিকারভা” পত্রিকায় ত্রীঅমিলমোহন গুপ্ত এই বিষয়ের অন্তরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ তাব ও প্রণালী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অন্তরঙ্গ প্রবন্ধ হইতে অনেক সময় আমরা “প্রবাসী” পত্রিকার উদ্ধৃত করিয়া থাকি ও মন্তব্যও করি। সাধারণতঃ শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব আমরা পছন্দ করি না। রাষ্ট্রের পক্ষে ভূমিদান করিয়া অথবা মাসিক বা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য করিয়া ব্যক্তিকে বা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে ঠেকিয়া শিবিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। বহু প্রতিষ্ঠান, তাহা যত মহৎই হউক বা তাহাদের কর্তৃকর্তা যত সংই হউন না, ব্যক্তির স্বাধীনতা সহুচিত করিয়া ফেলে। তার কল সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।

অথচ, বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতি লোকের এক হস্তার আকর্ষণ আছে, মহু লোকের পারের খুলা লইবার ক্ষমতা তাহাদের ক্ষমতা করিবার ক্ষমতা কিংবা তাহাদের দেবতার পদে উন্নীত করিবার ক্ষমতা সর্বকালে ও সর্বদেশে যেরূপ ঠেলাঠেলি পড়িয়া যায়, তাহা দেবিয়া মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রমাণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তককে আমরা ফুলের মালার ঢাকিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞারূপে তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছি, অবশেষে তাহাকে হত্যা করিয়াছি। বুনিয়াদি শিক্ষা এই মনোভাব দূর করিতে পারিলে জনতের সর্বাপেক্ষা উপকার করিবে। এই অন্তরঙ্গ তাবের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সর্বদা আগ্রহ থাকা উচিত।

বহিঃরঙ্গের কৌশল সম্বন্ধে অমিলবাবু বাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

(ক) প্রথমতঃ, আমাদের উপাদানে আদর্শ গৃহনির্মাণ করতে হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের বেলায় একথাটা আমরা প্রাইম মনে রাখি না। বুনিয়াদী শিক্ষার মারফতে আমাদের সামনে যে আদর্শ রাখতে হবে তা এমন হওয়া চাই যা আমাদের দীনতম ব্যক্তিও গ্রহণ করতে পারে। গাভীকীর চিন্তাধারায় যে সমাজ-বিপ্লবের পরিকল্পনা পাই এটি তার একটি মূল কথা। আমাদের সামনে আমাদের লোকের পক্ষে সহজসাধ্য কোন আদর্শ দেওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে বুঝতে হবে আমাদের দেবার মত এবিষয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কিছুই নেই। ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি ছাড়া যদি আদর্শ গৃহনির্মাণ সম্ভব না হয় তবে আমাদের আদর্শ গৃহনির্মাণের শিক্ষা দিতে যাওয়া ব্যর্থ হবে।

আর একটি দিক থেকেও বর্তমান অবস্থার স্বামী বরবাড়ী তৈরী করার পক্ষে কোন যুক্তি বুঝে পাই নে। কাঁচা বরবাড়ীর পরিবর্তন সাধন সহজসাধ্য, পাকা বাড়ীর বেলায় তা নয়। আজ বুনিয়াদী শিক্ষা যে কোঠার আছে তাতে এই প্রেয়ী বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র কোন্ প্রেয়ী কি পরিমাপের বরবাড়ী সর্বাপেক্ষা উপযোগী তার কোন চূড়ান্ত পরীক্ষা হয় নি। সে ক্ষেত্রে বিরাট প্রারম্ভিক ব্যয়ে পাকা বরবাড়ী তৈরী করার পক্ষে কোন যুক্তি বুঝে পাই নে। কি বিদ্যালয়, কি শিক্ষকের রাসগৃহ আজ তাই কাঁচা হওয়া বাহনীর বলেই মনে করি। সত্যি যদি কোন দিন মনে হয় পাকা বর কাঁচা বরের চাইতে উৎকৃষ্টতর এবং যদি তা দেশের সর্বসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য করে তোলা যায় তবে সেদিন হয়ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও তার শিক্ষকদের জন্য পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করা চলতে পারে। সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র সমাজের সামনে তুলে বসবে এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার একটি মূল কথা। গৃহনির্মাণের বেলাতেও আমরা যেন বিস্মৃত না হই পরিবেশকে হৃদয় করে ভোলার কথা।

প্রায়ে যুক্ত আলো-বাতাস এবং জলের অভাব থাকার কথা নয়। শহরের মত কলের পোঁতা, বিরাট প্রাসাদের গর্বোত্তম চূড়া বাতাসকে আবিল ও আলোকে ব্যাহত করে না। কিন্তু অজতার ফলে আমরা আমাদের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছি।

পরিবেশকে এই ক্লোজড থেকে রক্ষা করা হবে শিক্ষাকর্মীর অন্যতম প্রধান কাজ। আজ মাহবের মলমুদ্র আমাদের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। বোলা মাঠে আমরা মলমুদ্র ত্যাগ করতে অভ্যস্ত। ফলে এর সারাংশই স্বর্গীয় ভাপে মট হয়ে যায় আর এর তেতরকার কীকাগুগুলি সহজেই হড়াবার সুযোগ পায়। অতি কম খরচেই পাখ্যানা তৈরী করা চলতে পারে। বাঁশ ও বেঁচুর বা ভালপাতা দিয়ে আলোদা বেড়া

তৈরী করে পারাযান। ঘেরা চলতে পারে এবং এক জায়গার নালি কাটার স্থান ভাঙি হয়ে গেলে বেড়াগুলি বুলে নিয়ে নতুন পারাযানা তৈরী করা যায়। বাঁশের চাচ কিংবা বাঁশ দিয়ে বুনেও এ রকম ঘেরা করা চলতে পারে।”

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর সমগ্র ভারতের বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি পাঁচদফা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। রাজ্য সরকারসমূহের মতামত জানিবার জন্ত এবং তাহাদের সহযোগিতার জন্ত উহা প্রত্যেক রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি কাজের জন্ত ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত সরকার প্রারম্ভিক এক কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন। বুনিয়াদী শিক্ষা কলেজের শিক্ষকদিগের শিক্ষাদানের জন্য একটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হইবে। শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষালয় থাকিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য একটি বুনিয়াদী শিক্ষা-কলেজ এবং সেই সঙ্গে দুইটি মিত্র-মানের বুনিয়াদী শিক্ষালয় থাকিবে। ইহা ছাড়াও থাকিবে পাঁচটি সুপারিকলিত বায়োমিট্রী কেন্দ্র, পল্লীনেতাদের শিক্ষা-দানের জন্য একটি কলেজ, একটি গ্রন্থাগার এবং নির্বাচিত অঞ্চলের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষালয়গুলির উন্নয়নের জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা। এইরূপ এক-একটি অঞ্চলে প্রায় এক শতটি গ্রাম থাকিবে। পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য হইল প্রাথমিক শ্রেণী হইতে দ্বিতীয়-স্তরের বিভাগ পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ কার্যকরী করা। ব্যয়ের কত অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন, তাহা রাজ্য সরকারসমূহের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করা হইবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় দফায় ‘নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষার উন্নয়ন করা হইবে এবং সেখানে উন্নত ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। শিক্ষা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণা করিয়া উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা থাকিবে। দরিদ্র ছাত্রগণ যাহাতে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করিতে পারে, সেজন্য যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা এবং তাহার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিবার জন্য বর্তমান বৎসরে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। দ্বিতীয় দফার জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তৃতীয় দফার জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা

হইবে। বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের ও প্রাপ্ত-বয়স্কদের উপযোগী পুস্তকাদির রচনা এবং অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী ভাষা প্রচারের ব্যবস্থা থাকিবে। চিত্র ও বস্তুভার সাহায্যে শিক্ষাদানের বিষয়েও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্ভারণের কার্যে নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পুস্তকাগার প্রভৃতিকে সাহায্যদান, বায়োমিট্রী কেন্দ্র, যুবক-যুবতী কর্তৃক পরিচালিত মদল-কেন্দ্র প্রভৃতির উন্নয়ন চতুর্থ দফার কর্তব্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ইহার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা।

পঞ্চম দফায় অপরাধপ্রবণ শ্রমবর্গের শিক্ষাদানের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া যতদূর সম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য রাজ্য-সরকারসমূহকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে সম্ভব সেখানে পুরাতন গৃহাদি কাজে লাগাইতে হইবে। আগামী ১লা মার্চের মধ্যে রাজ্য-সরকার-সমূহকে মতামত জানাইতে বলা হইয়াছে। আগামী ১৫ই ও ১৬ই মার্চ তারিখে মাদ্রাসীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠক বসিতেছে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর যাহাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন, তদ্ব্যতীত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

১৯৩৭ সাল হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার সাহায্য স্থানে অগ্রাধিকার কর্তৃক করা হইয়াছে। সুতরাং ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্টের পর আশা করা গিয়াছিল যে, নতুন সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য সহজে ভারত সরকার ইংরেজ আমলের “লাল ফিতার ও বিশেষজ্ঞ”গণের হাতে নিজেদের সমর্পণ করিবেন না। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। প্রথমাবধি পুরাতন কর্মচারী-মণ্ডলী বুনিয়াদী শিক্ষাকে গাজীজীর অর্পণত খেলালের মধ্যে একটি নতুন খেলাল বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। তার পর এই নতুন শিক্ষার জন্ত যে বিভাগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহাদের তাহা নাই। ডাইনীরা তাতে সন্তান সমর্পণ করিলে শিশুর যে অবস্থা হয়, তাহাই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে অনেক বলিতে পারেন। অভ্যস্ত ভৎসিত্য সহিত প্রাই-মারী ও বুনিয়াদী শিক্ষা সহজে অহুসমান ও আলোচনা করিবার জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইল। সত্যাপত্তি ত্রিঅঙ্গুলচন্দ্র গুপ্ত।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বোধ হয় একজন বেসরকারী সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-বেধন প্রায় দ্বাবী

প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য করিয়া বর্তমান উন্নতি করিয়াছে সেইরূপ প্রাথমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হইত। সে প্রস্তাবে প্রায় সকলেই এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, এই বহুৎ প্রতিষ্ঠান চালাইবার মত ধরূপ লোকের প্রয়োজন তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে। রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, জাতীর শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আভুতোষ মুখোপাধ্যায় এরূপ প্রশ্ন করিতেন না।

তার পর প্রায় বার মাস পর রিপোর্ট ত সম্পূর্ণ হইল। সভাপতি মহাশয় তাহার বসড়া করিয়া প্রায় প্রতিটি শব্দ কমিটির সভাপণের আলোচনার বিষয় করিলেন। কিন্তু সরকারী দপ্তর তাহাদের মনোমত সংশোধন বা বিফল করিয়া রিপোর্টটি যখন উপস্থিত করিলেন, তখন সময় নাই বলিয়া তাহা মনোনয়ন করিয়া শেষ করা হইল।

একটি বহুৎ সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, জেলায় জেলায় ইন্সপেক্টর, মহকুমা-মহকুমার সাব-ইন্সপেক্টর প্রভৃতি সরকারী দপ্তরমত সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অর্থের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা বরাক ৩ কোটি হইতে ১ কোটি টাকায় নামিয়াছে। সরকারের নিষ্ঠার পরিচয় পাইলাম।

তবে কি বলিব যে, বুনিয়াদি শিক্ষা বাধ হইয়াছে? তাহা হয় নাই। কারণ অজ্ঞাত লোক—মর-মারী, নিষ্ঠার সঙ্গে নুতন মাছুষ গুটি করিয়া নুতন সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সাধনা করিতেছেন। সরকার তাহাদের কানিলেও সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ দৃষ্টি করেন না। তাহারাই বুনিয়াদি শিক্ষার ভারত, তাহার সেবক।

ডাকাত সর্দার ভূপৎ

গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সৌরাষ্ট্রের বারওয়ালা-নিবাসী ভূপৎ নামীয় দস্যু সর্দার সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত চিত্রল গ্রাম হইতে সম্রাতি নাগপুর হইয়া আসামে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ পর্যন্ত ভূপৎ ৩০টি ডাকাতি করিয়াছে এবং ৮১ জনকে হত্যা করিয়াছে।

মেপালের বিজোহী মেডা ডাঃ কে. আই. সিংহের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে সে আসাম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিব্বত যাওয়ার চেষ্টার আছে। বিশেষ আশঙ্কণেই নাকি ভূপৎ তিব্বত অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, নাগপুরের কতিপয় মারোয়াড়ী ভদ্র-লোকের অহুরোধে কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশের পুলিশ এই

ডাকাত সর্দারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু, ভূপৎ বিপদের ঘাঁচ পাইয়া পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

ইতিপূর্বে ভারত সরকার তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় বন্দিয়া দিতে পারিলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাহার যত্নসংবাদ প্রকাশিত হয়। গোয়েন্দা বিভাগ ইহা অব্যবহার করে।

ভূপৎ এবং তাহার সঙ্গীদের আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। তাহার দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বহিরাগত—কাঠি রামোজী বাসিয়া এবং আতের দেবায়ের ছেঁটা। এক সংঘর্ষে আতের দেবায়ের ছেঁটার মৃত্যু হয়। সৌরাষ্ট্রের জাগীরাবাদ ও প্রাক্তন রাজা-মহারাজারা নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভূপৎকে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। পঞ্জাব সরকার ভূপৎ এবং তাহার চার-পাঁচ জন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করার কাজে সাহায্যের জন্য বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারী অধিনীকুমারকে সৌরাষ্ট্রে পাঠান। এ সম্পর্কে তখনগরের মহারাজার ভাই কুমার নির্মলকুমারের এবং ঢোলের ঠাকুরের গেষ্টার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের পরমুহুর্তে পালিয়াটানার মহারাজার রাজকোর্ট সফরের উপর বিলম্ব গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

মধ্যপ্রদেশে ভূপতের অহুচরের সংখ্যা কমপক্ষে আট শত। ইহাদের অর্ধেকেরও বেশী কয়ানিষ্ট। তাহার নিকট হইতে নির্দেশ পাওয়া মাত্র সর্বত্র দাকা ও সুরাজকতা স্থগিত, অন্য পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

পাগাড়োর বর্তমান পীর ভূপতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পাগাড়োর পীরের উদ্দেশ্য হইতেছে মধ্যপ্রদেশকে “কাসিম রেজভী”র দ্বিতীয় হায়দরাবাদে পরিণত করা।

ভূপতের বয়স ৩৫ বৎসর মাত্র। তাহার যুদ্ধের উপরের পংক্তির একটি দাঁত ভাঙ্গা। সর্বদা সে সশস্ত্র থাকে। অনেকেরই বলিয়া থাকেন যে, ভূপৎ অত্যন্ত ক্রিয়াকর্মী। নিম্নে বর্ণিত ঘটনা কিন্তু অন্য সাক্ষ্য দেয় :

একদিন সৌরাষ্ট্রের কোন এক গ্রামে বিসাহরাম নামীয় তাহার এক শত্রুর গৃহে তাহাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তানা দেয়। এমন সময় সাহরামের পত্নী দরজার আসিয়া ভূপতের গতিপথে বাধা দেয় এবং বলে যে, তাহাকে (সাহরামের পত্নীকে) হত্যা না করিয়া ভূপৎ (সাহরামের) ঘরে চুকিতে পারিবে না। ভূপতের চিত্ত বিচলিত হয়। সে লজ্জার মাথা নত করে এবং তাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে। সাহরামের জীবন রক্ষা পায়।

সৌরাষ্ট্র ভ্রমণের পূর্বে ভূপৎ তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধবর দেয়। ঐ কোলে একটি সন্তোজাত শিশু

লইয়া সাক্ষাৎ করে। বিদায় লওয়ার সময় সে জীকে এই মর্মে উপদেশ দেয় যে, যত বিপদই ঘটুক, সে যেন তাহার স্বামীর অচল আত্মপত্ত্য রাখে। তাহার জীবন এবং হেলের ভরণ-পোষণের জন্য সে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছে। বিদায় গ্রহণকালে দুপং জীকে নিশ্চয়ই গুণধনের সন্ধান দিয়া গিয়াছে।

এই ডাক্তার সর্দারের বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় যে একজন রাজনীতিক কর্মী। ডাঃ কে. আই. সিংহকেও ডাক্তার সর্দার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। এরূপ বর্ণনার কোন সার্থকতা দেখি না। বহু তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা উচিত। আর একটা কথা জানা প্রয়োজন, কাঞ্চিওয়ার নৌদাট্রই বা কেন এরূপভাবে বিচ্যুত হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-রাজদার যদি রাজনীতিতে যোগদান করিতে চান, তবে “পেন্সনভোগী” বলিয়া তাহাদের বারণ করা হইতেছে কেন? জীতিভ্রাম-দেহদ্রুণও ত পেন্সনভোগী, তিনি ত আমাদের আর্থিক ভগ্নতের নিরামক।

ভূমিদান যজ্ঞের সূত্রপাত

গত ৩রা ফাল্গুনের “হরিক্ষন” পত্রিকার বিনোবা ভাবের ভেলেদানা সভা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে

“ঐ স্থানের প্রধান সমতা হইল ভূমিসমতা। সকলের মধ্যেই এক কথা, চাষের কাজ আমরা কমি চাই। গ্রামের মোট জমির পরিমাণ ৭,৫০০ বিঘা। জনসংখ্যা ৩,০০০, অর্থাৎ জন প্রতি দুই বিঘার উপর ০.৫০ কমি। বর্তমানে সমস্ত হরিক্ষনই কমিতে প্রম করে ও তাহার পরিবর্তে উৎপদের ১১২০ ভাগ কসল ও একটি কসল ও একডোকা ভূতা পায়।

বিনোবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের কত বিঘা জমির প্রয়োজন। কিছুক্ষণ পরামর্শের পর তাহারা জানাইল ১২০ বিঘা শুকনো ও ১২০ বিঘা জিলা কমিই যথেষ্ট।

ইহা যথেষ্ট কিনা বিনোবা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা সমবারে চাষ করিবে, না ব্যক্তিগতভাবে করিবে? তাহারা সমবারে চাষ করিতে ইচ্ছুক। তৎপর বিনোবা তাহাদের একটি দলখাত লিখিয়া দিতে বলিলেন এবং জানাইলেন যে তিনি তাহাদের জন্য চেষ্টা করিবেন। অন্যান্য গ্রামবাসিগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:

যদি সরকার কমি না দিতে পারে, তাহা হইলে আপনারা কি কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন?

শ্রীমামচন্দ্র রেড্ডী দাঁড়াইয়া উঠিয়া জানাইলেন—আমার পিতার ইচ্ছা ছিল ইহাদের কিছু কমি দান করিবেন। আমি আমার ও ভায়েদের পক্ষ হইতে ভিন্ন শত বিঘা কমি দান করিতেছি।

ইহাই প্রধান ভূমিদান এবং এইভাবে এই যজ্ঞের সূত্রপাত হইল।

ঐদিন আরও একটি কাকের সূত্রপাত হইল। বিনোবাজী হরিক্ষনদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা মর্মে কতজন পামে আসক্ত? উত্তর হইল সকলে। “আপনারা সত্য বলিয়াছেন, তালই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে কতদিন লাগিবে।

হরিক্ষন-সর্দার বহুদের সহিত আলোচনা করিলেন। পরেই তিনি সভাস্থলে দাঁড়াইলেন। সকলে উৎসুক আগ্রহে তাহার দিকে তাকাইল।

মহারাজ, আমরা আজ হইতেই মতপান বন্ধ করা দিই করিলাম।

একজন চিংকার করিয়া বলিলেন, উহাদের দিয়া একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লহি করা ইয়া লওয়া হউক।

বিনোবা তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, মতপান একটি অভ্যাসের ব্যাপার। উহা ধীরে ধীরে দূর হইবে। উহারা যদি নিজেদের কথা রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলেই যথেষ্ট।

তৃতীয় সমতা হইল তাঁতীদের লইয়া। তাহারা যথেষ্ট মত পায় না বলিয়া অভিযোগ করিল; মাসে মাসে আব বেল মত পায়। উহাতে এক সপ্তাহের কাজ চলে। তিনি সপ্তাহ বসিয়া থাকিতে হয়। তাহারা বিনোবাজীকে বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অধিক পরিমাণে মত পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া।

ইহা ত একটি সর্দ-ভারতীয় সমতা।

তাহা হইলে আমরা কি করিব? তাঁতীরা বিনোবাকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, মিল বধন মিল না। তখন কি আমাদের দেশে তাঁতী ছিল না? তাহারা কি বসিয়া থাকিত, না লোকে উলক থাকিত? আবার দেখুন, আপনারা নিজেরাই নিজেদের তাঁতীরা কাপড় ব্যবহার করেন না। কয়ক কি ধাম চাষ করিয়া, চাউল কিনিয়া ধার? আপনারা নিজেরাই নিজেদের কাপড় মট করিতেছেন। বিনোবাজী নিজের প্রতিচানর ইত্যাদি দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখুন কি স্মরণ কাপড়—সম্পূর্ণরূপে হাতে তাঁতীরাই হইয়াছে।

তাঁতীরা বলিল, এখানে তুলা কমার না। বিনোবাজী বলিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু তুলা কি এখানে কখনই জন্মিত না? আপনারা যদি তুলা চাষ ছাড়িয়া দিয়া থাকেন তবে এখন উহা পুনরায় শুরু করুন। এই সমতা কেবলমাত্র এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতব্যাপী এই সমতা। আমি শুনিয়াছি তুলা চাষ করিলে সরকার রাজস্ব আদায় করিবে না। বতদিন চাষ না হয় আপনারা তুলা কিনিতে পারেন। কাপড় কেনা অপেক্ষা তুলা কেনা ভাল।

পাঁচটি পর্য্যন্ত নানা লোক ও মল-তাহাদের সমস্তা লইয়া আসিতে লাগিল। বাসস্থানের বিপরীত দিকে এক নিম্ন ও আম গাছের ছায়ায় সভা বসিল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে অনেক আসিয়াছিল। বিনোবা দাড়াইয়া উঠিয়া তাহার তেলুগু গীতা আবৃত্তি করিলেন। তিনি তাহার ভাষণে বলেন যে, বর্তমান ভারতে বর্ণাশ্রম কঠক অনেক কঠি অধিকার করিয়া রাখা অসম্ভব। তিনি গ্রামশিক্ষকগণ ও মদ্যপান নিবারণের উপরও জোর দিলেন। গ্রামের দারিদ্র্য ও ভাতীদের সুভার সমস্তা মিটিবে না, যদি না তাহার নিষ্কোষ তুলা উৎপাদন করিয়া খুড়া কাটিয়া গ্রামে বুর্সাইবার ব্যবস্থা করেন এবং স্বাস্থ্যের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই উৎপন্ন করাইয়া লন। মদ্যপান বন্ধ না করিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া কঠিন।

যে কঠি পাওয়া গিয়াছে তাহা বক্তৃতির জন্য পাঁচ জনকে লইয়া একটি কমিটি করা হইল। উহাতে হরিজনদের দুই জন প্রতিনিধি, এক জন গ্রামের মাতব্বর, অল্প কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ক্রিস্বেকটেশ রেড্ডী ও দাতা রামচন্দ্র রেড্ডী এই পাঁচ জনকে লইয়া কমিটি গঠিত হইল। জনা গেল রামচন্দ্র রেড্ডীর ভগ্নীর সহিত হারদরাদাদের কন্যাদিষ্ট মেতা নারায়ণ রেড্ডীর বিবাহ হইয়াছে এবং উভয়েই গৌড়া কন্যাদিষ্ট।

এই অশান্ত এবং কন্যাদিষ্ট অধ্যুষিত অঞ্চলেও বহু লোক বিনোবাকীর সহিত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমূহ লইয়া আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, বর্ণাশ্রম বর্ধ সকলেই সমস্ত যুগে মানিয়া চলিয়াছে। আমাদের ভাতীর নিকট হইতেই কাপড় কিনিতে হইবে আর গ্রামের ভেলীর নিকট হইতে তৈল কিনিতে হইবে। এইরূপেই বর্ণাশ্রম বর্ধ টিকিয়া থাকিবে। আজকাল লোকে শেষ পর্য্যন্ত সংসারে অস্তিত্ব থাকিতে চায়।

যুবজনের সেবামণ্ডল

আমরা ইংরেজী ভাষায় লিখিত দুইখানি প্রচারপত্র পাওয়াছি। এই মণ্ডল (Indian Youth Service) গত ১৩৫৬ বৎসরের চৈত্র-বৈশাখ (মে, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর কৈলাসনাথ কার্জু। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ছিলেন। সহকারী সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে মহারাণী হুচাকু দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। সঙ্ঘের সম্পাদক জীহীলাল বসু পান্ডিত্য দেশীর কোয়েকার সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বন্ধুসঙ্ঘলী সেবা প্রতিষ্ঠানের (Friends Service Unit) একজন বিশিষ্ট সহায়ক। বিধব্যাগ্নি শাস্তির বাক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিষ্ঠান

গঠিত হইয়াছে, হীরালাল বসু তাহার প্রত্যেকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই প্রচারপত্রে যে সব কার্যবিবরণী পাওয়া যায়, তাহা খুব উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রা সম্পাদক মহাশয় বিবরণীতে তাহা বীকার করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে পাঠ-চক্র বলে। ৫-৩০ হইতে ৭-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত তাহার কাঙ্ক চলি। নানাবিধ আলোচনা হয় এবং এরূপ ভাব-বিনিময়ের সাহায্যে অনেক পরকে আপন করা যায়। বাদ্যসমস্তার বিষয়, দেবা ধার, আলোচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত-বর্ষের মনোবর্ষণ ও ভারতবর্ষে সংস্কৃতির সমগ্র চেষ্টা যুগে যুগে যাহা ঘটনাছে, তৎসম্বন্ধে এই পাঠচক্রের বিবরণীতে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। ভারতীয় সমস্তা লক্ষ্যে আলোচনা আরও হওয়া উচিত ছিল। এখনও সে চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে।

গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের (democracy ও totalitarianism) বিরোধের ভাসান্সা আলোচনা নিরর্থক। এই দুই মতবাদ দুইটি বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিত্রবরবাদও একটা বর্ধ। এই বিষয়ে প্রচার আর পোষণ না করিতে পারিলে কেবল কান্দা হৃৎকনেরই সার হইবে। আমেরিকা ও সোভিয়েট তাহাই করিতেছে। সেইরূপ নানা সমস্তার আলোচনা করিতে হইবে।

অসংখ্য সেবামণ্ডলের মধ্যে এই সঙ্ঘেরও স্থান আছে। এই সমালোচনা করিলাম সঙ্ঘের সফলতা কামনা করি বলিয়াই।

ভারত-ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রীতি বর্ধিত করিবার জন্য লেডি মাউন্টব্যাটেন গত ছয় বৎসর যাবৎ অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ববীর হাটে-বাণারে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যাতিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের উত্তরাধিকারী বলিলে অন্যায় হইবে না। ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে বিশ্ববিধানের অঙ্গ এই নীতি স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ চলিয়া গিয়াছেন। ক্র্যাক, জমদন, কিলিকস এবং এখন বোল্‌স—এই কূটনীতিবিদগণ এই কাজে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই কাজে হাত না মিলে কখনই তাহা সাধক হইতে পারে না। সেইজন্য এখন লেডি মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ রেল ক্রম প্রতিষ্ঠানের কর্তৃ-রূপে প্রতি ছয় মাসে ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান ঘুরিয়া থাকেন। মিসেস ক্রমশঃ সেই উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতেছেন।

তিনি করাচী গিয়াছিলেন; দিল্লী লাহোর কলিকাতা নারপুর্ব গিয়াছেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহ এই দুই দেশের মধ্যে যোগস্বয় স্থাপন করিবার জন্য সানি উপায়ের কথার বলিয়াছেন।

ঐ যোগস্বল্প দুট করিতে হইলে প্রথমে কর্তব্য এই দুই দেশের মধ্যে অজ্ঞানতাপ্রভৃত নানা ভুল বারণা দূর করা এবং একের সঙ্গে অন্দের পরিচয় সাধনের ভিত্তিতে স্থাপন করা। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে যে শোষণ ও শোষিত সম্পর্ক ছিল সে কথা ভারতবাসীর ভুলিতে আরও করেক যুগ লাগিবে। মার্কিন রাষ্ট্র সম্পর্কেও সেই আশঙ্কা আছে এবং ঐ আশঙ্কার ফলে বাস্তব যে কিছু নাই তাহাও নহে। সে তর-তাবনা দূর করিতে হইলে দুই দিকেরই দোষত্রুটি খোলাখুলি বলা প্রয়োজন। সে আলোচনা সরকারী কর্মচারী বা রাষ্ট্রের উচ্চ অধিকারীর মধ্যে হইতে পারে না। পারে ত্রীমুখ্য কক্ষভেদে প্রমুখ প্রতিপত্তিযুক্ত প্রভাবশালিনী মহিলা বা অসুদূরপাল্লার দ্বারা। পৃথিবীতে আমরা কাহারও সন্তোষ চাহি না সত্য, কিন্তু বন্ধুত্ব চাহি না একথা ঠিক নয়। সুতরাং বন্ধুত্বকেই কেহ আসিলে তাঁহার সন্দর্ভনা প্রয়োজন।

মাহিষ্য জাতির পরিচয়

“মাহিষ্য-সমাজ” নামক একধাণি মাসিক পত্রিকা মাঝে মাঝে পাইরা থাকে। প্রায় ৩১ বৎসর পূর্বে হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। গত এক সংখ্যার “মাহিষ্য জাতির পরিচয়” শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা দেখরা হইয়াছে। তার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

বাংলাদেশে দুই প্রকার কৈবর্ত জাতি আছে। একটি আর্ধ্য, উচ্চ হিন্দু জাতি ও বিস্তৃত, অচট তালিকাভুক্ত জাতি। একটি মাহিষ্য, অচট মার্গব, একটি বিজয়নী, অচট শূদ্রবর্গী, একটি আচরণীয়, অচট অম্বাচরণীয়। আর্ধ্য কৈবর্ত জাতির পিতা কজ্র, মাতা বৈষ্ণা এবং ইহার কয়িকীবা; সুতরাং জন্মতঃ কর্মতঃ ও বর্ষতঃ ইহার বিস্তৃত, এইজন্য ব্রাহ্মণাধি উচ্চ জাতীয়গণ আবহমান কাল ইহাদের জল পান করিয়া আসিতেছেন। ইহাদেরই নামান্তর মাহিষ্য। তালিকাভুক্ত কৈবর্তজাতি নৌকর্মজীবী ও মৎস্য-ব্যবসায়ী; ইহার প্রথম প্রকারের কৈবর্ত হইতে জন্মতঃ কর্মতঃ ও বর্ষতঃ পুংক—ব্রাহ্মণাধি উচ্চজাতীয়গণ ইহাদের জল পান করেন না—ইহাদের নামান্তর কালিক—ইহার মাহিষ্য নহে পরন্তু মার্গব দান। মনুসংহিতায় এই দ্বিতীয় প্রকারের কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে এইরূপ পাওয়া যায় :

মিষাদো মার্গবং হতে দানং নৌকর্মজীবিনম্।

কৈবর্তমিতি যং প্রাহর্য্যাবর্ত নিবাসিনঃ ॥ ১০।৩৪ ॥

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাভে জাত মিষাদ পুরুষের ঔরসে শূদ্র হইতে বৈষ্ণাভে জাত অম্বোগব জাতীরা জীতে নৌকর্মজীবী মার্গব জাতির উৎপত্তি হয়—মার্গবের অপর নাম দান—আর্ধ্যাবর্তবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত এইরূপ নামেতে ডাকিয়া থাকে।

(মনুজ মার্গব জাতি বাংলাদেশে মালো নামেও পরিচিত, মালো ও কেসে কৈবর্ত একই জাতি, বিভিন্ন পরিচয় মাত্র—বিষকোষ ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিশিষ্টেও এইরূপ উল্লেখ আছে।)

এই শ্লোকে দুইট কথা লিখিত হইয়াছে :

(১) মিষাদ হইতে অম্বোগবীভে জাত জাতির একটি শাস্ত্রোক্ত নাম “মার্গব”, অপর শাস্ত্রোক্ত নাম “দান”।

এশিয়াটিক সোসাইটির কোন এক সংখ্যার (১৮৭৭ খ্রিঃ ৯ম বৎ) যবদীপের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল—“যবদীপের কজ্রিগণ মাহিষ্য বা কেবো” অর্থাৎ মাহিষ্য বা কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিল। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল—মাহিষ্য = মাহী-সো-ক = মাহিষ শক্তির প্রতীক।

চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য পিতৃমাতৃ সম্বো একই জাতি—শাস্ত্রেতেই নামভেদ মাত্র। কিন্তু কালিক কৈবর্ত বিভিন্ন পিতামাতার উৎপন্ন বলিয়া মাহিষ্য নহে। চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য উভয়ের জাতীয় বৃত্তি একই। ঔশামস বর্ষশাস্ত্রে কজ্রি পিতার ঔরসে ও বৈষ্ণা ভাষ্যার গর্ভজাত সন্তানের মাহিষ্য কি কৈবর্ত কোন সংজ্ঞা নির্দেশ নাই—উভাদের বৈষ্ণব বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ভীক আছে। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য শাস্ত্র-নির্ভীক বৈষ্ণব বৃত্তি। আবহমান কাল চাষী কৈবর্ত ক’তও এই বৃত্তিতে অগ্রসর হইয়াছে।

“প্রজ্ঞা বা প্রকাশ বা বেদিভব্যা সকর্মজিতঃ”

এই মনু-বচন অনুসারে পিতৃমাতৃ সম্বো ও বৃত্তিসম্বা অনুসারে চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতি অস্তিত্ব।

বাংলা ও আসামে চাষী কৈবর্ত ও দান, উজিয়ার বঙাইত, রাজপুতনার যত্ন, রাজপুতনা ও ইটোয়া অঞ্চলে মাহেত্রী (মাহেত্রী) এবং ভারতের কতিপয় স্থানে কজ্রি রাজপুত জাতিগুলি ভারতের বিরাট মাহিষ্য জাতির এক এক শাখা বলিলে চলে। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, নন্দদা নদীর তীরদেশে এই জাতির প্রাথমিক আবাসভূমি ছিল। এই স্থান সম্ভবতঃ কিয়দংশ। সরযুতট হইতেও দিগ্বিজয়ী মাহিষ্য কৈবর্তগণ মধ্যভারতে গমন করিয়াছিলেন। মাহিষ্য জাতির একতম প্রাচীন কেন্দ্রভূমি মাহিষ্যতী সম্বন্ধে মিঃ রাইস এবং মিঃ ফ্রিট রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অর্গলে বিস্তার আলোচনা করিয়াছেন (এপ্রিল ১৯১০)। নন্দদা ও সরযুতট হইতে মধ্য ভারতের অধিকাংশ পূর্বপ্রান্ত দিরা তাঁহার কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।...

হে অনাদি অতীত, কথা কও

কবির এই কথা উদ্ধৃত করিয়া বর্জমানের “আর্ধ্য” (সাংগাহিক) গভঃ ২২শে কাঙ্ক্ষন সংখ্যার একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

“মুমিত্তে আছে গ্রাম” প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ হইতে এ অংশটি তুলিয়া দিলাম। গ্রামের নাম আকা; তার “সাত দেউলের” ইতিহাস বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন :

“এ গ্রামের কোমণ্ড হমিশ মেলে মা ইতিহাসের পাতায়। লোক-প্রবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সাত-দেউলের লৌকিক ইতিহাস। প্রবাদ আছে সাত-দেউল গুপ্তযুগের। দেউলের শিল্প-চাতুৰ্য্যে প্রকাশমান হয়ে আছে গুপ্ত সম্রাটদের শিল্প-শৌখিনতার সুমহান নিদর্শন।

গগনচুম্বী মিনারের উত্তম সজ্জায় সাত-দেউল আশ্রয় আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। বিলম্বমান রূপভিব্যংশের কীর্তি-বিশোধার্থে স্থাপত্য সাক্ষর্য্যে একটা মাত্র আশ্রয় তাক। দেউল দাঁড়িয়ে আছে। কালের প্রহরী হয়ে আছে দাঁড়িয়ে; গল্প আছে : সাত তাই মাতৃগণ শোষ করতে তৈরী করেছিল এ সাত-দেউল। কে জানে কি যে মাতৃগণ। কেউ-বা বলে : হিন্দু রাজা শালিবাহন ছিলেন আরাপুরের ময়পতি। সম্ভবতঃ, আরাপুরই ছিল তাঁর রাজধানী। আরাপুর, হ্যাচরা, সালহুলা, মীরাপাড়া, আদমপুর ছিল তাঁর রাজ্যের চৌহদ্দি। শালিবাহন রাজার রাজ্যের শেষ নির্দেশ আরাপুরের পূর্ব প্রান্তের সালহুলা জনপদের শিবানী মন্দির।

দেউলের ভাস্কর্য্যশিল্পের ভাব-ভঙ্গিমার কোণারক আর ভুবনেশ্বরের শিল্প-বৈভবের প্রভাব রয়েছে প্রচুর। দেউলের ইটগুলো সুরু ও লম্বা। লম্বা, দুর্গা, কানী ও বিষ্ণুভূতির ধ্বংসাবশেষও রয়েছে এখানে। দেউলের গঠন-ভঙ্গিমা শিব-মন্দিরের মত, তার চূড়াগুলো ধিলেমের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেউলের গায়ে দেব-দেবীর মূর্তি, শিল্পীর পরিভাষার একে বলে ‘টেরাকোটা’ (terra-cotta) অর্থাৎ মাটির মূর্তি গড়ে তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ালে দেওয়া হয় পৈথি। এখানে যে সর মূর্তি রয়েছে তার রূপ এত অদ্ভুত ঐতিহাসিক মূর্তি-ভারে জড়িত রয়েছে সে মূর্তির বিকৃতরূপ-বৈকল্য। মাক কান চোখ হাত মুখ পা এদের সব কাটা। লোকশ্রুতি যে, কাল-পাহাড় বধন হিন্দু দেব-দেবীমূর্তি ধ্বংস করতে শুরু করে তখন এখানেও তার প্রোত এসে পৌঁছে। মূর্তিগুলোর ভাঙা বোঁচা ভাব তারই ফল।

দেউলের চারদিকে এখন ঘন জঙ্গল। মন্দিরের মধ্যে যে দেবতা আছেন তিনি পান মা কোন পূজা। পুহুর কাটার সময়, বাতীর ভিন্দু ঝোঁটার কালে ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠের দ্বার আত্মপ্রকাশ। এই জনপদ-গড়ে উঠবার কালে তিন-চার ফুট মাটির তেতরে পুহুরের পৈঁঠা, হাতী বাবার নিকল ও পুহুরের হমিশ মেলে। শ্রমিকদের মনে কেণে ওঠে গুপ্তযুগের রূপকথা কাহিনী।

এ গ্রাম তৈরী হয়ে উঠেছে এক মদীপর্ন্তের বুকের উপর। ১৯৪৩ সালের বাদে দামোদর তার গতি ঘের এই পথে। মনে

হয় দামোদরের প্রাচীন বরে যাওয়া বুকে পড়ন হয়েছে এই নবীন গ্রাম-সত্যতা, আর তারও আগে এরই বুকে স্থাপনা হয়েছিল শালিবাহনের রাজধানী।

গ্রামের কিছু দূর দিগে বয়ে গিয়েছিল রেহলা বা বহুলা মদী। পারে চলার পথের সঙ্গে সে এখন গেছে মিশে। একশ বছর আগে এক ক্রান্ত পথিক শ্রান্তি বিনোদনের জরুটাই গিয়েছিল সাত-দেউলের পাশে। লেগানে বসে একটা কাটি দিগে সে আপন মনে মাটির বুকে লিগে চলছিল জীবনের অব্যবাহত এক বারতা। ঘুলোর একটু নীচে সে দেখল সোমার মোহর। আকবরের সময়ে যে আশ্রয়ী চলতি ছিল, এ স্বর্ণ মোহর তারই অঙ্গুরণ।

...সাত-আট বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাত-দেউলের খোঁজ নিতে আসা হয়। তাঁরা নিয়ে যান এক বিষ্ণু মূর্তি। গ্রামের বিজ্ঞানসাহীরা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।...”

এই বর্ণনা কিন্তু বর্জমান জেলার বিদ্বান ও পণ্ডিতবৃন্দের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। “আর্য্যো”র “দেশের কথা” চুটিকি কথার তাহাদের পরিচয় পাই। বর্জ্য্যামে বন্দী-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে। তাহাদেরই এই বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। সকল বিষয়ে কলিকাতার যুগের দিকে চাহিয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অতীতকে কথা কহাইতে হয় কি করিয়া তাহা জানিভেন রত্নমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, হর প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ এবং জামেন, আচার্য্য, বহুনাথ ও তাহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ। এই ইতিহাসই যথেষ্ট।

ন্যূট হ্যামস্‌ন

১২ বৎসর বয়সে জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক নরওয়ের ন্যূট হ্যামস্‌ন পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ময়-জগতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু তাবের রাজ্যে লোকের মনে তাহার স্থান অটুট হইয়া থাকিলে, বতদিন বকিত ও সুবার্ত্তের সমস্তা বিশ্বসংসারকে বিরক্ত ও বিহ্বল করিতে থাকিলে।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাহার সাহিত্যিকজীবন শুরু হয়। চামার ছেলে, চামার রক্ত তাহার বমনীতে। সে-রক্তের চীন-তাহাকে জমির দিকে টানিয়া লইয়া আসে আকর্ষণ মূল্যের বাস চালকের অবস্থা হইতে। “হাদার” (“বুড়কা”) তাহার প্রথম গুরুত্ব। কোন প্রকাশক তাহা লইতে বিধায়োষ করিত; অজান্তমনা ও অধ্যাতনামা একজন লেখকের প্রথম বই প্রকাশ করিবার সাহস সকলের থাকে না। কোন সাময়িকপত্রে দেবিদাহি যে, এক জন প্রকাশক অত্যন্ত তাহিল্য সহকারে ঐ “বুড়কা” বইখানি রাখিয়া যাইতে বলিলেন, এবং তাহিল্য-

সহকারে সেদিন লোকালে কাজকর্ম শেষ হইলে তাহা হাতে লইলেন। একটী দরিদ্র অকলের হোটেলের বর্ণনা ছিল তাহাতে। বই পড়িয়া প্রকাশক ছাট হামসনের কুটরে ছুটয়া গেলেন এবং কিছু অগ্রিম টাকা দিয়া বই প্রকাশের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করাইলেন।

তার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে আসিল বিশ্বব্যাপী ব্যাভি এবং বিপুল অর্থোপার্জন। কিন্তু তাহার পরিবার-পরিজনকে লইয়া তিনি কৃষক-জীবন বাপন করিতে লাগিলেন।

যুতাকালে তিনি স্ত্রী ম্যারী আভারসেন, দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার বর্ণবিবাহ কি ছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা দেখি নাই। তাহা অনেকটা ছিল প্রকৃতি-পূজা (Pantheism) বাহা খ্রীষ্টীয় সমাজ কর্তৃক নিন্দা করা হইয়া থাকে। আমরা তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কালীকান্ত শিরোমণি

করিদপুর জেলার কোটালীপাড়ার উমশিরা গ্রামের বিখ্যাত বৈদ্যকরণ-পণ্ডিত কালীকান্ত শিরোমণি গড় ১৭ই কান্তন তাহার ত্রিরাশপুত্র বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গলা-লাত করিয়াছেন।

শিরোমণি মহাশয় বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অথবল না থাকিলেও তিনি বহু ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া বিজ্ঞান ও অন্নদান করিয়াছেন। তাহার অমায়িক ও মধুর ব্যবহার এবং তাহার পাণ্ডিত্যের কলে তিনি দেশস্থ আবালবৃদ্ধ নরনারীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বৎসরব্যিক কাল ধরিয়া তিনি কোটালীপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্ট হইবার পর তিনি দেশত্যাগ করিয়া ত্রিরাশপুত্রে আসিয়া পুনরায় 'আর্য্য বিদ্যালয়' নামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেন ও সংস্কৃত ভাষার সেবার আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ঐয়তুল্য জীবনযাপন করিতেন, তাহার ভায় মিঠাবান ও সদা-চারী ব্যক্তি এই যুগে দুর্লভ। শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ত্রিহরিদাস সিদ্ধান্তবাগিশ, মহামহো-পাধ্যায় ত্রিকালীপদ ভরুচাৰ্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষ সঙ্গীতাহারী ও পরোপকারী ছিলেন।

তিনি স্ত্রী, কনিষ্ঠ পুত্র, এক কন্যা ও বহু পৌত্রপৌত্রী এবং

দৌহিত্র ও দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। অগণিত করিদ-পুরবাসী তাহার তিরোবানে আত্মীয়জনবিরোগ-ব্যথা অনুভব করিবেন। আমরা আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অমিয়কুমার গাঙ্গুলী

"অমৃতবাক্য" ও "মৃগভর" পত্রিকার দিল্লীর সংবাদাতা, তরুণ সাংবাদিক অমিয়কুমার গাঙ্গুলীর যুতাসংবাদে সজ্ঞাদেহ-সেবীমাজেই বিশেষ হৃৎ অশ্রুভব করিবেন। দিল্লীর ইউ-নাইটেড প্রেসের রিপোর্টাররূপে এই তরুণ সাংবাদিক প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অমায়িক, মিষ্টভাষী, সদাশ্রুত এই যুবকের সহিত বাহ্যতই পরিচয়ের সুযোগ ঘটিলে, তিনিই তাহার আচরণে মুগ্ধ হইয়াছেন। নিবিজ-ভারত সাংবাদিক ফেডারেশন গঠিত হইবার পরে এই তরুণ যুবককে দিল্লীর সাংবাদিকগণ সম্পাদক পদের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে বরণ করিয়াছিলেন। ভারতের সাংবাদিকদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতে, বিভিন্ন প্রদেশে সাংবাদিক সভা গঠন করিতে তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না।

যোগের অবস্থা কঠিন হইয়া উঠিলে তিনি অগ্রোপচারের জন্য কিছুকাল পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাহার বিরোধে ভারতের এক জন কৃতী সাংবাদিকের দেহাবসান ঘটিল। মাত্র বয়স ৩৬ বৎসর বয়সে তাহার যুতা হইয়াছে। উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ওগু, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালী-নাথ রায় প্রভৃতি সাংবাদিকগণ যে প্রতিহু প্রস্তত করিয়াছেন, অমিয়কুমার তাহার উত্তরাধিকারী। নুতন যুগে এরূপ লোকের প্রয়োজন যখন সর্বাধিক তখনই ভগবান তাহাকে তাহার পদপ্রান্তে লইয়া গেলেন।

অবনীমোহন রায়

গড় ২৯শে কান্তন জয়পুরিয়া কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অবনীমোহন রায় শৈশবিন্দ্রিয় ত্যাগ করিয়াছেন। ৫০ বৎসরের কিকিচকিক বয়সে তাহার পরলোকগমনে তাহার পুত্র-পরিবার বিপন্ন হইলেন। মহাবিশ্বের ও জনসাধারণের উপাধ্বন্যকর্ম লোকের অকালমৃত্যুতে কত সংসার যে ভাঙিয়া পড়ে, তাহা অবিস্মৃত।

অবনীমোহনের শোকাত্ত পরিবারের উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে সভ্যতার উদ্ভব

ঐগিরীন্দ্রশেখর বসু

প্রাচীন ভারতে আর্থ সভ্যতার উদ্ভব সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে সভ্যতা বলিতে কি বুঝায় প্রথমে তাহার আলোচনা দরকার। কি দেখিলে আমরা বুঝিব এক জাতি অথ জাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য? ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, যে জাতি অধিক সাবান ব্যবহার করে তাহা হাই সভ্যতার অধিক উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে। ত্রৈলোক্যানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত ও মানুষ' গল্পে সভ্য ভাব্য নব্য ভূত লুলু বলিয়াছিল যে, সে সাবান মাখিতেছে, তাহাকে দেখিলে লোকে এখন কোন বিলাতী 'লার্ভে'র ছেলে বলিয়া মনে করিবে। কাঁহারও মতে সংবাদপত্রের সংখ্যার উপর সভ্যতার উৎকর্ষ নির্ভর করে। এটম বোমা তৈয়ারি করিতে পারিলে কি অধিক সভ্য হয়? পোশাক কি সভ্যতার পরিচায়ক? সুদৃশ্য পরিচ্ছদধারী চুরুটসেবী চার্চিল সাহেব কি অর্ধদল গান্ধীর অপেক্ষা অধিক স্বসভ্য? সর্বভূতে সমদর্শী কোপীন পরিহিত বোগী ভোগবিলাসে নিমজ্জিত ধনী ব্যক্তির অপেক্ষা কি কম সভ্য? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে।

সভ্যতার মান। সভ্যতার কোন একটি বিশেষ মাপকাঠি নাই। এক জাতি অথ জাতির অপেক্ষা কতক বিষয়ে বেশী সভ্য এবং অপর বিষয়ে কম সভ্য হইতে পারে। আবার স্বসভ্য জাতির মধ্যেও সময় সময় অসভ্যতা প্রকাশ পায়। কোন জাতির সভ্যতার পরিমাপ করিতে হইলে আমাদের সেই জাতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের খবর জানা দরকার। তাহাদের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রাবিধি, ব্যক্তিগত নৈতিক ধর্ম, গাহস্থ্য সম্পর্ক, বিজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অলুশীলন, সমাজধর্ম, শিল্পাদির অবস্থা, রাজধর্ম, যুদ্ধপ্রবণতা ও যুদ্ধকালীন নীতি, গ্রাম নগর যানবাহন ইত্যাদির অবস্থা কিরূপ জানিয়া সমগ্রভাবে সভ্যতার বিচার করিতে হয়। লোকের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ। সাবান ব্যবহার শারীরিক পরিচ্ছন্নতার নির্দেশক; খবরের কাগজের সংখ্যা দেখিয়া জাতির শিক্ষা বিস্তারের পরিমাপ করা যাইতে পারে; সুদৃশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ সুরুচির পরিচায়ক; এটম বোমার দ্বারা বুঝা যায় জাতি বিজ্ঞান ও শিল্পের অলুশীলনে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, ইত্যাদি। মানবের নৈতিক ধর্ম সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ। নীতিবিরোধী যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অপর

জাতির উপর অত্যাচার কর্তৃত্ব সভ্যতার কলঙ্ক বলিয়া ধরা হয়। অপর পক্ষে যে জাতি বিজ্ঞানের চর্চা করে না, ঐহিক সুখসাধনে তৎপর নহে, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে না, রোগ-প্রতিষেধক উপায় জানে না তাহার নীতিবোধ ও পারদ্রিক ধর্মজ্ঞান চরমে উঠিলেও তাহাকে সভ্য বলা চলিবে না। সকল বিষয়ে সুসমঞ্জস প্রচিতিই (development) প্রকৃত সভ্যতা। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতে কি প্রকার সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার মান কিরূপ ছিল বুঝা সম্ভবপর হইবে।

প্রত্নবিজ্ঞা। কোন জাতির অতি প্রাচীন সভ্যতা কি প্রকার ছিল জানিবার জন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের প্রত্নবিজ্ঞার আশ্রয় লইতে হয়। ক্রীট, ব্যাবিলোনিয়া, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা এই প্রত্নবিজ্ঞার সাহায্যে। পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়ম নগরীর অনষ্ট ধ্বংসাবশেষ হইতে আমরা পুরাতন রোমক জাতির জীবনযাত্রা-প্রণালী অবগত হইয়াছি। প্রাচীন মিশরীয়দের সভ্যতা সম্বন্ধীয় বহু তথ্য তাহাদের রাজাদের পুরাতন সুরক্ষিত কবর আবিষ্কার করিয়া আমরা উদ্ধার করিয়াছি। ভারতে মোহন-জ-দরো খননের দ্বারা তদ্রূপ অধিবাসীদের অনেক পুরাকীর্তি জানিতে পারা গিয়াছে। আরও নানা স্থান খনন করিলে হয়ত প্রাচীন ভারতের অনেক কথাই জানা যাইবে কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞার সাহায্য না লইয়াও ভারতের অতি প্রাচীন সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতবৃত্ত উদ্ধার করা সম্ভবপর। বেদ ও পুরাণের মধ্যেই এই ইতবৃত্ত নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে স্থলিখিত ইতবৃত্ত সংরক্ষিত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীন ইতবৃত্ত। পুরাণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য 'হিষ্টরি'। পুরাণের প্রামাণিকতা 'পুরাণপ্রবেশ' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে সকল কালনির্দেশ আছে তাহা এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

বৈদিককাল। বৈদিক ঋষিদের ও বেদশ্রুত উল্লিখিত নৃপতিদের কাল আলোচনা করিলে দেখা যায় মন্ডু, যম যমীর সূক্তগুলি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। অবশ্য বেদে আরও অতি পুরাতন ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু বৈবস্বত মন্ডুর পূর্বে কোন সূক্ত রচিত হইয়াছিল বলিয়া

মনে হয় না। ৩৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত বেদ স্মৃতিগুলি রচিত হইয়াছিল। অসিত ও দেবল ঋষি সর্বাঙ্গপেক্ষা অর্বাচীন স্মৃতিকারদিগের মধ্যে দুই জন। বৈদিককাল বলিতে এই দীর্ঘ ২৪০০ বৎসরব্যাপী সময় বুঝায়। বেদস্মৃতিগুলি সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলিব।

পুরাকালে ঋষিগণ ও রাজকুলবর্গ নানা যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞে বিভিন্ন দেবতার আবাহন করিয়া তাঁহাদিগকে সোমরস নিবেদন করা হইত। এই উপলক্ষে ঋষিগণ যে মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহাই বেদে সংগৃহীত হইয়াছে। অল্পমান হয় বাস্তবিক বেদমন্ত্রগুলিকে প্রথমে যজুস্, ঋক্ ও সাম এই তিন ভাগে ভাগ করেন। বাস্তবিককাল ২১০০ খ্রী-পূর্বাব্দ। মোটামুটি বলা যাইতে পারে মন্ত্রগুলির গম্ভাভাগ যজুস্, ছন্দোময় পদ্যভাগ ঋক্ এবং যে মন্ত্রগুলি গান করা হইত তাহাই সাম। যজুর্বেদের কোন কোন মন্ত্র সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীন। পূর্বে অথর্ববেদ বলিয়া কোন পৃথক বেদ ছিল না। কৃষ্ণঐশ্যয়ন বেদব্যাস বেদের কতকগুলি স্মৃতি পৃথক করিয়া তাহার নাম দেন অথর্ববেদ। এইরূপে তিন বেদ অর্থাৎ ত্রয়ী কালক্রমে চারিবেদ হয়। কৃষ্ণঐশ্যয়নের কাল ১৪৬০ খ্রী-পূর্বাব্দ।

বেদে পুরাবৃত্ত। বেদ ধর্ম পুস্তক, তাহা ইতবৃত্ত নহে। বেদ হইতে ইতবৃত্ত অল্পমান করিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বেদে রাজাদের যুদ্ধকথা, আর্ষ ও দাসদিগের মধ্যে বিবাদ, তৎকালীন শিল্পাদির অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সকল উক্তি হইতে দীর্ঘ বৈদিককালের সভ্যতার ইতবৃত্ত সংকলন করা যায়। বেদপাঠে দেখা যায় যে, পুরাকালে ভারতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, বাণিজ্য ও বিবিধ শিল্পের প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। গো, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, কুকুর প্রভৃতি পশুপালন করা হইত। নাপিতে মস্তক মুগুন করিত, শিল্পীরা বস্ত্র বয়ন করিত, মেঘলোম হইতে পশমী কাপড়ও তৈয়ারি হইত, লোকে নৌকা করিয়া দুস্তর নদী পার হইত, ধাতব জব্যের বহুল ব্যবহার ছিল, শ্রাকরায় স্বর্ণালংকার তৈয়ারি করিত, রথ ইত্যাদি কাঠের জব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত স্তম্ভক্ষ চুতার মিজি ছিল, রথকে মজবুত করিবার জন্ত তাহা গোচর্মের দ্বারা আবৃত করা হইত, রথে ঘোড়া বা বলদ জোতা হইত। বলদ-বাহিত যুদ্ধরথে চড়িয়া মুদগল রাজার দ্বী ইন্দ্রসেনা অতি কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ধর্মব্রাহ্মণ ব্যতীত বর্ষা তরবারি ও অস্ত্রাশ্রয় অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধাতব শিরস্ত্রাণ ও অঙ্গত্রাণ ব্যবহৃত হইত। বেদে কৃত্রিম লৌহ নিমিত্ত পদেরও উল্লেখ আছে।

খেলা হিসাবে ঘোড়দৌড় হইত। এখনকার সভ্যজাতির মত ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরা হইত কিনা তাহার উল্লেখ নাই, তবে বাজি রাখিয়া পাশা খেলার বিবরণ পাওয়া যায়। বেদস্মৃতি জুয়াড়ির নানা দুর্ভোগের বর্ণনা আছে।

পুরুষে অনেক সময় বহু বিবাহ করিত। এখনকার মত তখনও অসং পুরুষ ও অসতী স্ত্রীলোক দেখা যাইত। ঋষিরা যজ্ঞে প্রচুর স্বর্ণ, গো, অশ্ব, দাস ও দাসী উপহার পাইতেন। গোধনের খুব গৌরব ছিল। চৌরভয় ও রাক্ষসের অর্থাৎ লুণ্ঠপাটিকারী দস্যুদের উৎপাত ছিল। দস্যুদল সাধারণত বনে থাকিত। বনে অনেক সময় দাবানল জ্বলিতে দেখা যাইত। লোকে আগুন লাগাইয়া জ্বলল পরিষ্কার করিত। বেদে বাসস্থানের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে যজ্ঞশালার বিবরণ আছে এবং এক যায়গায় বহু শুভযুক্ত অট্টালিকার কথা আছে, অস্ত্রদিগের লৌহময় পুরীর উল্লেখ আছে। বিজ্ঞার বিশেষ আদর ছিল। বেদে অনেক গভীর জ্ঞানের কথা আছে। কাব্য হিসাবে অনেক স্মৃতি অতি উৎকৃষ্ট। ছন্দোবদ্ধ, ভাবগভীর ঋক্ স্মৃতিগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাদের রচয়িতা ঋষিগণের বিজ্ঞা ও জ্ঞান কত উচ্চস্তরের ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদ চাবার গান মাত্র। এই ধারণা কেবল পল্লবগ্রাহী হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেই সম্ভবপর। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, যাহার পুরাণ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহার নিকট বেদ প্রস্তুত হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করেন। পুরাণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদের নানা প্রকার কদর্ঘ করিয়া থাকেন। পুরাণার্থবিৎ শ্রদ্ধালু জনের নিকটেই বেদ স্বীয় মর্ম উদ্ঘাটিত করেন।

পুরাণ। বেদপাঠে যেটুকু ইতবৃত্ত অল্পমান করা যায় তাহাতে দেখা যায় যে, বৈদিককালে ভারতীয়গণের সভ্যতা উচ্চাঙ্গের ছিল। এ সভ্যতা কিছু এক দিনেই গড়িয়া উঠে নাই, বেদের পূর্বকাল হইতেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। এই সভ্যতা বিস্তারের ইতবৃত্ত পুরাণ হইতে সহজেই পাওয়া যায়। পুরাণ বেদেরও বহু পূর্ববর্তী। নৌভাগ্যের বিষয় পুরাণে ভারতীয় পুরাবৃত্তের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে।—

প্রথমঃ সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণ্যম্ভূতম্।

অনন্তরঞ্চ বজ্রেন্ত্যো বেদান্তম্ভূতম্। ১।১৩।১।

অর্থাৎ, সর্বশাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্তৃক স্মৃত হইল, অনন্তর তাঁহার মুখসমূহ হইতে বেদ সকল বিনিঃসৃত হইল। পুরাণে ৫২৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ কিংবা তাহারও পরবর্তীকাল পর্যন্ত অথও ধারায় ভারতের ইতবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। কালে কালে পুরাণকারগণ পুরাণকে স্বকালাবধিক করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক কাল পৌরাণিক কালের অন্তর্গত।

অনেকে বৈদিক কাল ও পৌরাণিক কালে পার্থক্য দেখেন। তাঁহারা মনে করেন, বৈদিক কাল পৌরাণিক কালের পূর্ববর্তী। এ ধারণা নিতান্ত ভুল। বৈদিক কাল প্রায় ২৪০০ বৎসর ব্যাপী এবং ইহা দীর্ঘতর ৬৪০০ বৎসরের পৌরাণিক কালের অন্তর্ভুক্ত। পুরাণে বেদের পূর্ববর্তী প্রায় ২০০০ বৎসরের ইতিবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। বৈদিক সময় সভ্যতা এইরূপ ছিল এবং পৌরাণিক কালে এইপ্রকার ছিল এই ধরনের উক্তির কোন মূল্য নাই। অল্পশেষে উক্তি কালনির্দেশসহ করা হয় তাহার গুরুত্ব বিচার করা যায়। আমি ভারতীয় সভ্যতার যে বিবরণ দিতেছি তাহা বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংকলিত।

ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব।

যাহাদিগকে আর্য বলা হয় তাঁহারা ভারতে কবে প্রথম আসেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায় না। তবে আর্যেরা মধ্য এশিয়ার পূর্ব তুর্কিস্থান অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষ হইতে প্রথম কাশ্মীরে আসেন একথা অনুমান করা যায়। পরে তাঁহারা পঞ্জাব ও বিজ্জাচলের উত্তর প্রদেশ ক্রমে অধিকার করেন।

অল্প সময়ের মধ্যে আর্যেরা দক্ষিণপথেও রাজ্যবিস্তার করেন। ইলাবৃত বর্ষ, কাশ্মীর, বিজ্জোত্তর ভারত এবং দক্ষিণপথ যথাক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত এবং পাতাল নামে পুরাণে পরিচিত আছে। ইলাবৃত বর্ষ, কাশ্মীর ও উত্তর ভারত, দেবলোক, পিতৃলোক ও মর্তলোক অথবা ইলা, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন নামেও পরিচিত ছিল। দেবলোক হইতে দেবগণ প্রথমে যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁহারা স্বর্গাধিপতি ইন্দের অধীন ছিলেন। ইন্দ্র স্বর্গাধিপতির সাধারণ নাম। ভারতে ইন্দের প্রতিভূর নাম হইল প্রজাপতি এবং তৎপরে মনু। প্রথমে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছিলেন। তখনকার প্রজাপতিদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ইহাদের অধীনে প্রজা বৃদ্ধি পাইল না। তখন স্বায়ত্ত্ব মনু ইন্দের প্রতিভূ হইলেন। ইনিই প্রথম মনু। ইহার প্রকৃত নাম বিরাজ। বিরাজ মনু প্রজাদিগের পালনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইলেন। তাঁহার কাল ৫২৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দ। স্বায়ত্ত্ব মনুর বংশধরগণ ১০০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল রাজার দ্বারা প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ইহাদের সময় প্রজা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বায়ত্ত্ব মনুর সময় হইতে ২০০০ বৎসরকাল পর্যন্ত পুরাণমতে সভ্যযুগ। সভ্যযুগে কোন আইন-কানুন ছিল না, লোকে যদৃচ্ছা চলিত। আইন-কানুন না থাকায় কোনও কাজই মানবধর্মবিগহিত অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এইজন্যই বলা হয়

যে, সভ্যযুগে ধর্ম পরিপূর্ণ বা চতুষ্পাদ ছিল। স্বায়ত্ত্ব মনুর পাঁচ পুরুষ পরবর্তী প্রজাপতির নাম ভরত। ইহার নাম হইতেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। ভরতের কাল ৫৮৩৭ খ্রী-পূর্বাব্দ। বিরাজ মনুর বংশেই আনুমানিক ৫১৬১ খ্রী-পূর্বাব্দে দ্রুপদ আবির্ভূত হন। পুরাণের রূপায় ইহার নাম অদ্যাবধি কীর্তিত হইতেছে। আনুমানিক ৪২১২ খ্রী-পূর্বাব্দে স্বায়ত্ত্ব বংশে বেণ নামক এক প্রজাপতি হন। ইনি ইন্দের বশতা অস্বীকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নৃপতি রূপে ঘোষণা করেন। ইহার ফলে তাঁহার ঋষিদের সহিত কলহ হয় ও তিনি নিহত হন। তখন অরাজক অবস্থা উপস্থিত হয়। বিদ্যা শৈলবাসী নিষাদগণ দেশ অধিকার করে। নিষাদগণ ভারতের এক আদি জাতি। তাহারা হ্রস্বকায়, তাহাদের বর্ণ পোড়া কাঠের ন্যায় ও মুখ খর্বাকার।

নিষাদগণ প্রজাগণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠপাট করিতে লাগিল। রাজ্যের অরাজক অবস্থা দূর করিবার জন্য ঋষিরা পৃথুকে বেণের স্থলাভিষিক্ত করিলেন। পৃথুর নামানুযায়ী ভূমণ্ডলের নাম পৃথিবী হয়। পৃথুই ভারতের প্রথম প্রকৃত রাজা। তিনি কবচ ও ধনুর্ধারণ করিয়া নিষাদদিগকে বশে আনিলেন ও রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। ইতিবৃত্ত প্রস্তুত করাইবার জন্য তিনিই প্রথম সূত ও মাগধ নিয়োগ করিলেন। পৃথুর রাজ্যকালে প্রজাগণের প্রথমত কোন কষ্ট হয় নাই। তাহারা প্রচুর গো-হস্ত্র পাইত এবং একপ্রকার বৃক্ষ হইতে মিষ্ট রস আহরণ করিত। এই রসকে অমাক্ষিক মধু বলা হইয়াছে। প্রজাগণ বৃক্ষের ফলফল হইতে অলংকার প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিত এবং বৃক্ষই তাহাদের পরিধান যোগাইত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বোধ হয় তাহারা বহুল পরিচিত। প্রথমত বৃক্ষের আশ্রয়েই তাহারা বসবাস করিত, ক্রমে বৃক্ষশাখা বিস্তারের অনুকরণে তাহারা কুটীর প্রস্তুত করিতে শিখিল। অধিক অমাক্ষিক মধু আহরণের ফলে মধু বৃক্ষগুলি নষ্ট হইয়া গেল। তখন প্রজাগণ পৃথুর নিকট গিয়া বলিল, ‘অরাজক অবস্থায় ধর্মতী সকল ওষধি অর্থাৎ ঔষধশাস্ত্র গ্রাস করিয়াছে তাহাতে সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ প্রজাপাল নিরূপিত করিয়াছেন, তুমি ক্ষুধার্ত প্রজাগণকে রক্ষা কর’।

অনন্তর পৃথু নানা স্থান হইতে ঔষধশাস্ত্রের বীজ সংগ্রহ করাইলেন, জমি হইতে প্রস্তুতাদি অপসারিত করাইয়া কৃষিকার্যের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত করাইলেন, গো রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং বণিক-পথ নির্মাণ করাইলেন। তিনি নগর ও গ্রামের প্রতিভাগ প্রবর্তন করিলেন। ভূমির যে যে স্থান সম ছিল রাজা

সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন। পুরাণে আছে, পৃথ্বী পূর্বে এ সকল কিছুই ছিল না, বৈণ্য অর্থাৎ বেণপুত্র পৃথু হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। এত পরিশ্রম করিয়া পৃথু যে সভ্যতার গোড়াপত্তন করিলেন তাঁহার মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যেই তাহা লোপ পায়। পুনরায় প্রায় সহস্র বর্ষব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয়। এই সময় পৃথিবী কুশ ভূণে আবৃত্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অরণ্যানী সমস্ত ভূমি গ্রাস করিয়াছিল। অল্পমান হয় বৃহৎ প্রাবনের ফলে এইরূপ ঘটিয়াছিল। অতঃপর নদী-তীরবর্তী দেশ হইতে দশ জন প্রচেতা নামধারী ব্যক্তি আসিয়া অগ্নিগংঘোণে বনের বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিলেন। তাঁহারা মারিষা নামী এক বন্যজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলেন। দশ জন প্রচেতাই মারিষার স্বামী হইলেন।

প্রচেতাগণের দক্ষ নামে এক পুত্র হয়। দক্ষ প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রজাগণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অল্পমান হয় তখন প্রজাগণ পৃথক্ পৃথক্ দলে বাস করিত। হর্ষ নামে প্রায় ৫০০০ ব্যক্তির একটি দল উত্তম বাসস্থান খুঁজিতে গিয়া নষ্ট হইয়া গেল। ‘নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না সেইরূপ তাহারা অদ্যাপি নিবর্তিত হন নাই।’ দক্ষের হর্ষ নামক প্রজাগণ নিরুদ্ভিষ্ট হইলে শবলাশ নামক ১০০০ ব্যক্তির আর একটি দল পুনরায় এইরূপই বাসস্থান খুঁজিতে গিয়া লোপ পাইল। ভারতের কোন কোন প্রদেশে যোগে, আদিম জাতির উৎপাতে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এইরূপ অনেক দল লুপ্ত হইয়াছে। দক্ষের কাল ৩৮৯ খ্রী-পূর্বাব্দ। দক্ষের সময় হইতে ভারতীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবন হয়। দেবলোক বা ইলাবৃত বর্ষ হইতে যে সভ্যতা ভারতে আসিয়াছিল তাহাই এই সময় হইতে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আজ পর্যন্ত অখণ্ড ধারায় চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিক যুগে প্রথম যখন ইউরোপীয়গণ আমেরিকায় যান তখন তাঁহাদের সভ্যতার মান অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। পরে তাহা স্থানীয় পরিবেশের প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া আধুনিক আমেরিকান সভ্যতার রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রকার ইলাবৃত বর্ষের সভ্যতা ভারতে আসিয়া প্রথমত প্রায় লোপ পাইয়াও পরে নবকলবরে উথিত হইয়াছে।

বৈবস্বত মনুকাল। বিবিধ ধর্মবিধি প্রবর্তন। দক্ষের কন্যা অদিতির এক পুত্রের নাম বিবস্বান। বিবস্বান অতি তেজস্বী এবং পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। স্বঘেদে তাঁহাকে গন্ধর্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি পার্বত্য প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র বৈবস্বত। ইনি মনু অর্থাৎ ভারতীয়দিগের প্রজাপালক নৃপতি হন। বৈবস্বত মনুর

কাল ৩৮১৫ খ্রী-পূর্বাব্দ। এই সময়টা ভারতীয় সভ্যতার এক অতি গৌরবোজ্জ্বল যুগ। বৈবস্বত মনু ত্রেতা যুগের প্রথম দিকে আবির্ভূত হন। ত্রেতা যুগের প্রারম্ভ ৩২৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দে। বৈবস্বতের সময় স্থিতিস্থিতির পরিকল্পনা শ্রুতযায়ী সমাজ-সংস্কার, দণ্ডবিধি প্রবর্তন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন ধারার সূত্রপাত হয়। এই সময় যজ্ঞানুষ্ঠানও প্রচলিত হয়, অনেক বিদ্বান ব্যক্তির সহযোগিতা ব্যতীত সর্ববিষয়ে এরূপ আমূল সংস্কার সম্ভবপর হয় নাই। ভৃগু, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গির, মরীচি, প্রচেতা, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ এবং অজ্ঞাত-নামা আরও অনেকে বৈবস্বত নৃপতিকে তাঁহার মহৎ কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহারা দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম, পাণ্ডগুণের ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার-আচার-ব্যবহার বিচার করিয়া বিধিস্থাপনা করিলেন। চতুর্বর্ষ ও চতুরাশ্রম বিভাগ এই সময় প্রথম প্রবর্তিত হয়। ষাঁহার যজ্ঞ, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া থাকিবেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন, ষাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও প্রজাপালন করিতেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন, কৃষি-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির বৈজ্ঞ হইলেন এবং এই তিন বর্ণের পরিচারকেরা শূদ্র হইলেন। ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও পরি-ব্রাজক এই চারি আশ্রম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈজ্ঞের জন্য নিরূপিত হইল। জাতকর্মাদি সংস্কার, ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ছাত্রের কর্তব্য, চতুর্বর্ণের বিবাহ, বিবাহের প্রকারভেদ, অতিথি-সংস্কার, আত্মাদি, বিভিন্ন প্রকারের জীবিকার উপায়, খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়, অশৌচ ব্যবস্থা, কাষ্ঠ বস্ত্র ধাতব দ্রব্যাদির শোধন-ব্যবস্থা, স্ত্রীলোকের ধর্মোপায়, বানপ্রস্থ যতি পরিব্রাজকের ধর্ম, রাজধর্ম রাজ্যাশাসন ও যুদ্ধাদির নিয়ম, ঋণদান, সাক্ষ্য, দণ্ডাদির ব্যবস্থা, চৌর্য নিবারণ ইত্যাদি যতপ্রকার কর্ম সমাজ রক্ষার জন্য আবশ্যিক তাহা সমস্তই বিধিনিষেধের নিয়মাবলী সংহিতাকারে একত্রে গ্রথিত হইয়া মনুসংহিতা বা মানব ধর্মশাস্ত্র প্রস্তুত হইল। কালে কালে এই ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যুগধর্মায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইউরোপে দণ্ডনীতি নেপোলিয়নের সময় প্রথম বিধিবদ্ধ করা হয় কিন্তু ভারতীয় দণ্ডনীতি বহু যুগ হইল ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই ধর্মশাস্ত্র এখনও হিন্দুদিগের জীবনযাত্রা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুর স্বাস্থ্যবিধি, গার্হস্থ্যধর্ম, সমাজধর্ম, রাজধর্ম, যুদ্ধনীতি প্রভৃতির মান কত উন্নত ছিল তাহা বিভিন্ন পুরাণে এতৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পড়িলে জানা যাইবে। বলা

বাছল্য, এই সকল প্রবন্ধের মূল উৎস আদি মনুষ্যত্ব। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় মনীষীদের এখন পর্যন্ত পুরাণের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই।

বিধি প্রতিষ্ঠিত হইতে সময় লাগিয়াছিল।

সকল ব্যাপারে বিনয় বা নিয়মানুবর্তিতা সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ। যে জাতি যথেষ্টাচারী তাহাকে সভ্য বলা যায় না। প্রাচীন হিন্দুর বিনয় এক প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, কিন্তু মনুষ্যত্ব রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সকল লোকে নিয়মানুবর্তী হয় নাই। বিধিসমূহ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু সময় লাগিয়াছিল। কালে বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণের ফলে অনেক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহা-দিগকে সমাজের মধ্যে রাখিবার জন্য বহু নতুন নতুন বিধি প্রবর্তিত করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং মনুসংহিতা ইলা বৃধের সহিত বিবাহিত হইলেও স্কন্ধায় রাজার সহিত সদ্ভতা হইয়াছিলেন। মনুপুত্র পৃথক আচার-ব্যবহারের দোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর পৌত্র নাভাগ এক বৈশ্বকন্যার প্রেমে পড়িয়া পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে বিবাহ করিয়া বৈশ্ব হইয়া যান। তিনি বৈশ্ব হইয়া রাজ্যদেশে প্রজাপালন পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-বাণিজ্যে নিযুক্ত হন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন স্বীয় বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেন। তিনি নিজ পিতাকে সেই রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলে নাভাগ বলিলেন, ‘আমি পিতার আজ্ঞানুসারে যে রাজ্য একবার পরিত্যাগ করিয়াছি তাহা আর পুনরুৎসাহ করিব না। আমি বৈশ্য বৃত্তিতেই অবস্থিত থাকিয়া তোমাকে কর প্রদান করিব। তুমি এই রাজ্য ভোগ কর অথবা ইচ্ছা হইলে পরিত্যাগও করিতে পার।’ লোকে যাহাতে নিজ নিজ বর্ণমর্যাদা অতিক্রম না করে পরবর্তীকালের রাজগণ সে বিষয়ে খর দুষ্টি রাখিতেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, দ্রোণ ও কৃপ ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা কেহই সমাজ হইতে চ্যুত হন নাই। মনুর সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসরকাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন যাবাবর দস্যদল দেখা যাইত। দস্যদলপতির প্রায়ই নিজেদের দেশে রাজার মত প্রজাপালন করিত। তাহারা অপরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠাট করিত। পররাজ্য আক্রমণে তাহারা অন্যায় যুদ্ধের আশ্রয় লইত। রাবণ এইরূপই একজন দস্যরাজ বা রাক্ষসপতি ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও দস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যার প্রসার। বৈবস্বত মনুকালে

জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই সময় পূর্বপরিচিত জ্যোতির্গণের নতুন করিয়া নামকরণ হয়। বৈবস্বত-পিতা বিবস্বানের নামানুযায়ী সূর্যের নাম হইল, ধর্মপুত্র সোমের নামে চন্দ্র পরিচিত হইল, ভৃগুপুত্রের নামানুযায়ী শুক্রগ্রহের নাম হইল। সেইরূপ বুধ, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামে গ্রহগণ নাম পাইল। তখনকার দিনে উত্তর দিক উচ্চ দিক বলিয়া কল্পিত হইত। সর্বোচ্চে অবস্থিত নক্ষত্রের নাম ঋবের নামানুযায়ী ঋব হইল। অল্পমান হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৌরোপার্থ অনুসারে সর্বোচ্চ ঋব হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যোতির্গণের নামকরণ হইয়াছিল। পুলস্ত, পুলহ প্রভৃতি ঋষির নামানুযায়ী সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারকাদের নামকরণ হইয়াছিল। দক্ষ কন্যা বা কন্যাস্থানীয়া ব্যক্তিগণের নাম অনুসারে ২৭ নক্ষত্রের নাম হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর্ দৌহিত্রের নামে চন্দ্রসূর্যগ্রাসকারী ছায়া রাহু নাম পাইল। রাহু যে বাস্তবিক মণ্ডলাকৃতি পৃথিবীর ছায়া তাহা জানা ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৥ ৫৮।৬৩ ॥ পৃথিবীর আকৃতি যে গোলাকার তাহাও জানা ছিল। চান্দ্র, সৌর্য, সাবন ও নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাস এবং পাঁচ বৎসরের লৌকিক যুগ নির্ণীত হইল। দীর্ঘতরকাল পরিমাপের জন্য ১০০০ যুগ অর্থাৎ ৫০০০ বৎসরের কল্প নির্দিষ্ট হইল। কল্পের অন্তর্বিভাগ হিসাবে প্রতি ৭১ যুগের অর্থাৎ ৩৫৫ বৎসরের ‘মনুকাল’ কল্পিত হইল। ‘মনু’ ১৪টি। এই কালের সহিত ১৫টি ২ বৎসরের সন্ধি স্থির করিয়া তাহা ৫০০০ বৎসরের কল্পের সহিত খাপ খাওয়ান হইল। ১৪মনু+১৫সন্ধি=১৪×৩৫৫+১৫×২=৪৯৭০ বৎসর+৩০ বৎসর=৫০০০ বৎসর। স্বায়ম্ভুব মনুকে আদি বিষ্ণু স্থির করিয়া ‘মনু’ কালের সাহায্যে ইতরবৃত্তীয় উদ্দেশ্যে কাল গণনা হইত। পরে আরও নানা প্রকার যুগের দ্বারা কালমাপনা প্রবর্তিত হয়। গ্রহাদির নামকরণ ও যে সকল জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় তথ্য বলা হইল তাহা ৩৭০০ খ্রী-পূর্বাব্দের পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

শিক্ষা। শিক্ষা ও ভাষাকে সভ্যতার মানদণ্ড মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এই আশ্রম কাল উপনয়নের বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া, ২৪ এমন কি ৩৬ বয়স পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহেই থাকিতে হইত। আশ্রমের স্থান লোক-কোলাহল হইতে দূরে শান্ত পরিবেশের মধ্যে নির্দিষ্ট হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিতেই আশ্রমধর্ম পালন করিতে হইত। ব্রহ্মচারীর সমস্ত সময়ই লেখাপড়া,

বিনয়, সদাচার ও ধর্মোচরণ শিক্ষায় কাটিত। তাহাকে কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিতে হইত। সর্বপ্রকার আলস্য ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া গুরুসেবা ও গুরুর সাংসারিক কার্যে সহায়তা করিতে হইত। পরিদেয় ও বিদ্যাপত্রের সকল প্রকার আড়ম্বর ছাড়িতে হইত। গোচারণ, কাষ্ঠাদি আহরণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য ও গুরুর জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইত। মোটকথা, ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থাকিয়া শিল্পের সর্বপ্রকার কার্যিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইত। সব কাজেই, এমন কি শিক্ষা করাতেও, বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। এখনকার মত অবিনীত ছাত্র তখন প্রায়ই দেখা যাইত না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কলহ হইত। কথিত আছে, যাক্ষবক্য তাঁহার গুরুর সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। নগর হইতে দূরে আশ্রম থাকায় ব্রহ্মচারীর কোন প্রকার চিন্তাচঞ্চল্যের কারণ ঘটিত না। ছাত্রেরা একমুখে লেখাপড়া করিত। গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অধিকাংশ ছাত্র নিজেদের সামর্থ্যমত গুরুদক্ষিণা দিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে যাইত। গুরুগৃহে থাকাকালীন শিষ্যরা গুরুর পরিবারভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইত এবং তাহাদের নিজেদের কিছুই খরচ করিতে হইত না, সেইজন্য আশ্রম ছাড়িবার সময় শিষ্যরা গুরুদক্ষিণা হিসাবে স্ববর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্মপাছকা, আসন, ধাত্র, শাক, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিত। শিষ্য অসমর্থ হইলে অন্তত পক্ষে তাহাকে ছত্র ও পাছকা দিতে হইত। কোন কোন শিষ্য বিবাহাদি না করিয়া আজীবনকাল গুরুগৃহে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। আবার কেহ কেহ এক গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অপর গুরুর নিকট নূতন বিষয়ে শিক্ষার জ্ঞান যাইত। তখনকার দিনে সাধারণত এই কয়টি বিদ্যা শিখান হইত—ব্রহ্মবিদ্যা, বেদ, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, বেদান্ত, সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব বেদ অর্থাৎ সঙ্গীত শাস্ত্র, নির্দিষ্টাশ্রম অর্থাৎ ধনরত্নাদি পরীক্ষা বিষয়ক শাস্ত্র, নির্মিত বিদ্যা অর্থাৎ নানা লক্ষণ বিচার করিয়া বিপদের সম্ভাবনা অনুমান; মৃত্যু, অগ্নিদাহ, প্রাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনা এবং যুদ্ধের ফলাফল অনুমান ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত, অর্থশাস্ত্র, গণিত, ভূতবিদ্যা, সর্প ও দেবজ্ঞান বিদ্যা অর্থাৎ দেবতা মানব সর্প প্রভৃতি জাতির নৃতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান, পর্বতাদির সংস্থান অর্থাৎ ভূগোল, বাস্তুশাস্ত্র অর্থাৎ মন্দির বাসস্থান নগর গ্রাম প্রভৃতি নির্মাণ, শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যার বহু পুঁথি ছিল এবং এই পুঁথি ব্রহ্মচারীদের দ্বারা লিখিত হইত। সংস্কৃত সাহিত্যে যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে

পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাষায় লিখিত পুঁথি একত্রিত করিলে তাহার অর্ধেকও হইবে না।

গুরুগৃহে পাঠের স্থিতি এই যে দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের যত গভীর অনুশীলন তথায় সম্ভবপর সাধারণ বিদ্যালয়ে বা কলেজে তাহা নহে। অপর পক্ষে বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য প্রয়োগশালার আবশ্যক হওয়ায় এখনকার ব্যবস্থাই প্রশস্ততর। প্রয়োগশালা না থাকিলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল তাহা বিন্দুমাত্র নহে। সেই সময়কার কোন জাতি বিজ্ঞানে ভারতীয়দের মত অগ্রসর হইতে পারে নাই। আধুনিককালে অন্যান্য সভ্যজাতির তুলনায় ভারত বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় পিছাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী ও শূদ্রাদির শিক্ষা। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অনধিকারীর শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্য প্রকার ছিল। স্ত্রী এবং শূদ্রের আশ্রমধর্ম নাই। অনেক সময় গুরুকন্যাগণ অন্যান্য শিষ্যের সহিত পাঠ লইতেন এবং পিতৃগৃহে থাকিয়াই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতেন। সাধারণ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের অবস্থা এই স্থিতি ছিল না কিন্তু তাঁহাদের ভিতর অনেকেও যে নানা বিদ্যা অর্জন করিতেন, তাহার প্রচুর উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। যথেষ্ট বহু স্ত্রী-ঋষির স্মৃতি আছে। কোন কোন পুরাণকার অনাধা স্ত্রীলোক। পুরাণে মদালসা নামী এক ধর্মশাস্ত্র পারদর্শিনী হুশিক্ষিতা রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। যে সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ শিক্ষার সুযোগ মিলিত না তাহাদের এবং শূদ্রদের জন্য নানা প্রকার লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয় লোকও যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। লোকশিক্ষার ব্যবস্থায় অক্ষর পরিচয় হইত না বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইত না। প্রাচীন কালে নানা প্রকার ব্রত, পার্বণ এবং দানবিধি প্রচলিত ছিল। লোকে পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যান, উপাখ্যান শ্রবণ করিত। রাজগণের নিয়মিত পুরাণ শ্রবণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকের ও শূদ্রদিগের এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোন বাধা ছিল না। ব্রত, পার্বণ ও তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়া অনেক জ্যোতিষিক, ভৌগোলিক ও ইতবৃত্তীয় তথ্য সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণে এই সকল ব্রত ও উপবাসময় বিবিধ দানধর্মকে ‘ধর্ম, অর্থ এবং কাম-সাধক’ বিবরণ বলা হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে যে নানাবিধ ব্রতের বিবরণ দেওয়া আছে তাহা পাঠ করিলেই আমার উক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে। পুরাণ, আখ্যান প্রভৃতি শ্রবণে লোকের ইতবৃত্তীয় কৌতুহল ও ধর্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইত। তাহা ছাড়া লোকে ইহাতে সমাজনীতি, স্বাস্থ্য-

নীতি, সূচাচার প্রভৃতিরও শিক্ষা পাইত। আধুনিককালেও লোকশিক্ষার জন্য কথকতা প্রভৃতি অল্পস্বল্প প্রচলন আছে। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠও অনেক লোকে শুনিয়া থাকেন। আমাদের দেশে নিরক্ষর জনসাধারণ এখনও অল্প দেশের নিম্ন শ্রেণীর লেখাপড়া জানা সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিত।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা। প্রাচীন ভারতে দুই শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত ছিল। এক প্রাকৃত ভাষা অপরটি সংস্কৃত। প্রাকৃত ভাষা প্রকৃতি জাত অর্থাৎ কেহই ইহার সৃষ্টি করে নাই। মানুষ স্বভাবত মাতৃকোড়ে থাকিয়া যে ভাষা শিক্ষা করে তাহাই প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষা প্রদেশে অল্পস্বল্পে ভিন্ন প্রকারের হয়। প্রাকৃত শব্দের আদিম অর্থ অল্পস্বল্পে ব্যাংলা, গুজরাতি, হিন্দী, মরাঠী, ওড়িয়া, তামিল, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষা প্রাকৃত। একই প্রাকৃত ভাষার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। পূর্ববঙ্গের বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বিভিন্ন। প্রাকৃত ভাষা বলিতে আজকাল একটি বিশিষ্ট প্রাকৃত ভাষা বুঝায়। পুরাকালে প্রাকৃত শব্দের এই সন্ধীর্ণ অর্থ ছিল না। আমি প্রাকৃত শব্দটি পুরাতন অর্থেই ব্যবহার করিব। একই প্রদেশের স্থানভেদে প্রাকৃতিক ভাষার মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও সেই প্রদেশের লেখ্য ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় এবং প্রদেশবাসী সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি সেই ভাষা সহজে বুঝিতে পারেন। প্রাকৃত ভাষার কিছু সংস্কার করিয়া লেখ্য ভাষা গঠিত হয়। এই সংস্কার স্বাভাবিক কতকগুলি নিয়মের বশেই হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে একথা সত্য কিন্তু যে সংস্কারের ফলে ইহা এক পূর্ণাবয়ব ভাষার রূপ পাইয়াছে তাহা অতি সূদূরপ্রসারী এবং সুপরিকল্পিত। পরিকল্পনা অল্পস্বল্পে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃতের বর্ণবিন্যাস ও শব্দ, সন্ধি ও সমাস গঠন ও ইহার ব্যাকরণ সূদূর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অল্পস্বল্পে হয় নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অপর সকল ভাষাতেই বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিশ্রিত হইয়া আছে। উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভাগও অন্য ভাষায় দেখা যায় না। সংস্কৃতের শব্দ-সম্পদও অতুলনীয়; এই ভাষায় ১,৮০,০০০ এর উপর শব্দ আছে। যে কোন জটিল ভাব সংস্কৃতে প্রকাশ করা যায়। এক বা একাধিক প্রাকৃত ভাষার আয়ত সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, এইজন্যই ইহার নাম সংস্কৃত। এই ভাষা কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিরাই বুঝিতে

পারিতেন। এখন যেমন লেখ্য বাংলা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির কথা হইয়াছে পুরাকালে সেইরূপ অনেকেই সংস্কৃতে কথাবার্তা বলিতেন। ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন। অপর পক্ষে স্ত্রীলোক এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রাকৃতে কথা বলিতেন। প্রাকৃত হইতে অনেক শব্দ যেমন সংস্কৃতে আসিয়াছিল সেরূপ সংস্কৃত হইতেও নানা শব্দ পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষাগুলিকে পুষ্ট করিয়াছে। বাংলা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাতে এখনও সংস্কৃত হইতে শব্দ দোহন চলিতেছে।

সংস্কৃত ভাষা মূলত বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের ভাষা ছিল বলিয়া ইহাকে ব্রাহ্মী ভাষাও বলা হইত। সংস্কৃত ভাষার আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী লিপি। পরে দেবনাগরী লিপির চলন হয়। সংস্কৃত কোন প্রাদেশিক ভাষা না হওয়ায় বিদ্বানগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ইহা ভারতের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছিল। এই ভাষা সৃষ্ট হইবার পর হইতে বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে গ্রন্থাদি লিখিতে লাগিলেন। ঋতি, শ্রুতি, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি সকল বিজ্ঞান গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত। সংস্কৃত কেবল যে রাষ্ট্র-পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে। অনেক কবি ও বিদ্বান ইহাতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে কাব্য প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারতের মত বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় নাই। যাহার বক্তব্য সকল প্রদেশের লোককে শুনাইবার দরকার হইত তিনিই সংস্কৃতে লিখিতেন। এই ভাষার দ্বারা সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মের আচরণে ও শিক্ষার ধারায় যে মূল ঐক্য দেখা যায় তাহা এই সংস্কৃতের প্রভাবেই। সংস্কৃতের মত এক কৃত্রিম ভাষা যে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা পরম আশ্চর্যের বিষয়। যাহারা এই ভাষা আবিষ্কার ও প্রচলন করিয়াছিলেন তাঁহাদের দূরদৃষ্টি প্রশংসার অতীত। পৃথিবীতে সংস্কৃতের ন্যায় আরও একটি কৃত্রিম ভাষা প্রচলিত আছে তাহার নাম এস্পারান্তো (Esperanto)। ইহা আধুনিককালে সৃষ্ট হইয়াছে। এস্পারান্তো পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধন করিবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা সফল হয় নাই।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। কাহার দ্বারা এবং কবে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন হয় তাহার কোন যথাযথ সন্ধান পাওয়া যায় না তবে এ ভাষা যে খুবই পুরাতন সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার ন্যায় ক্রমে গড়িয়া উঠে নাই। যাহারা ইহাকে চালাইয়াছিলেন তাঁহারা প্রথম হইতেই ইহাকে পূর্ণাবয়ব ভাষারূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ ভাষা লোকসমাজে প্রচলিত না থাকায় তাহার কোন ঐতিহ্য ছিল না সেজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার ইচ্ছামত গঠনে কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। শুষ্ঠা ইহার যে রূপ দিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল। কালে সকল ভাষাই অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয় কিন্তু সংস্কৃতের বেলায় দে কথ্য খাটে না। বৈদিক ভাষা ও সাধারণ সংস্কৃতের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু উভয়ই কৃত্রিম ও সমকালীন। বৈদিক ভাষা সাধারণ সংস্কৃতের প্রকারভেদ মাত্র। ঋগ্বেদে এক স্থানে ॥১০ম। ৭। ১২-৩৭ উল্লেখ আছে যে, ঋষিরা কোন এক সময়ে ভাষাকে চালুনির দ্বারা ছাতু হাঁকার ন্যায় হাকিয়াছিলেন। ইহাতে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তাহাতে 'ভদ্রানন্দী আসিয়াছিল এবং সপ্তহন্দ তাহার চারদিকে নৃত্য করিয়াছিল। এ ভাষা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে নাই। পরে সেই ভাষাকে আহরণ করিয়া বিদ্বানগণ নানা বিদ্যা-মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছিলেন।' ভাষা সংস্কারের কথার উল্লেখ ঋগ্বেদের এই স্তব্ধ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে "এক সময় বেদ ভাষা-সমুদ্রের ধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট ছিল। পরে সেই ভাষার প্রকৃতি প্রত্যাদি বিশ্লেষণ সংসাধিত হইল, তাহা 'ব্যাকৃত' ভাষা বলিয়া গণ্য হয়। এই মহৎ কার্য ইন্দ্র সম্পন্ন করিয়াছেন। তদবধি 'ব্যাকৃত' বাক্য ঋষিদের মুখে অভূদিত হইতেছে" ॥উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বেদ প্রবেশিকা, ১৭৮পৃ॥ তৈত্তিরীয় সংহিতায় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুতের কাহিনী বলা হইয়াছে।

সংস্কৃতের ন্যায় কৃত্রিম ভাষা চালাইতে বিদ্বানগণের সাহায্য ব্যতীত কোনও প্রবল রাজশক্তির আশ্রয়ও আবশ্যক হইয়াছিল অনুমান করা যায়। বৈবস্বত মন্বকালে পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক বিষয়ে নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। হয়ত সংস্কৃত ভাষা সেই সময়-কার সৃষ্টি। ঋগ্বেদে ঋষিরা অনেক সমসাময়িক ব্যক্তিদের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের অথবা সেই ঋষিগণের কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাণ সাহায্যে যথার্থ পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, ইহার বৈবস্বত মন্বর পরবর্তী। বৈবস্বত মন্বকাল ৩৮১৪ খ্রী-পূর্বাব্দ। ঋগ্বেদের কেবল এক স্থানে ॥১০ম। ১৪৮॥ বেণপুত্র পৃথুর রচিত স্তবের উল্লেখ আছে। পৃথু বৈবস্বত মন্বর পূর্ববর্তী। অনুমান হয়, পৃথুর স্তবের ভাষা পরিবর্তিত করিয়া কোন ঋষি তাহা

ইন্দ্রস্তব রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। পৃথুর স্তবের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে 'বেণের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমার স্তব করা হইতেছে'। ঋগ্বেদের একই স্তব যে বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কখন কখন তাঁহারা স্তোত্রগুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতেন। ৮ম। ৩। ১০ শ্লোকে শশকর্ণ ঋষি বলিতেছেন, 'হে অশ্বিনয়, কক্ষিবান ঋষি যেরূপ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যেরূপ ব্যাধ ও দীর্ঘতমা, যেরূপ বেণের পুত্র পৃথু যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপেই আমি স্তব করিতেছি, আমার এই স্তোত্র অবগত হও ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ সকল যজ্ঞে ঋষিরা নূতন স্তব তৈয়ারী করিতেন না। পুরাতন স্তোত্রই অনেক সময় গীত হইত। আবার একাধিক ঋষি একই স্তব্ধ হইত কখনও ব্যবহার করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১ম। ১০০, ৮ম। ১২, ৮ম। ১০২, ২ম। ১০৮, ১০ম। ১৩৭ ইত্যাদি স্তবগুলি দেখিলেই এই কথার পোষকতা পাওয়া যাইবে। বৈবস্বত মন্বর বহু পূর্বকাল হইতেই যে যজ্ঞ প্রচলিত ছিল এবং ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার নামে স্তব পাঠ হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু এই সময়ের স্তব সকল বেদে আহরণ করা হয় নাই। হয়ত প্রাকৃত ভাষায় এই সব স্তব রচিত হইত। বেদের আহাব ও নিবিদ্ মন্ত্রগুলি অতি প্রাচীন; এগুলির ভাষা কোন পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা বলা যায় না।

সভ্যতায় সম্বন্ধীয় কতিপয় তথ্য। বৈবস্বত মন্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের কাল পর্যন্ত ভারতে যে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহার সমগ্র বিবরণ দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন পুরাণগুলি পাঠ করিলে এ তথ্য সহজেই পাওয়া যাইবে। এখানে মাত্র কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক কথা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাচীন কালে ভারতে কার্পাস, মসিনার ছাল, রেশম, পশম ইত্যাদি হইতে অনেকপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারী হইত। রঙ্গু মুগের চামড়া হইতে এক প্রকার অতিশয় কোমল শয্যার আন্তরণ প্রস্তুত হইত। ঋষি ও ব্রাহ্মচারীরা বকল পরিধান করিতেন। তখন চক্রবর্তী সম্রাট খুব কমই ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজারা রাজত্ব করিতেন। রাজধর্ম আলোচনায় দেখা য় যে, রাজারা প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের যনাম রাজা। এ গুণ না থাকিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছে। রাজপিতাও অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহার শাস্তি হইত, এমন কি প্রাণদণ্ডও দেওয়া হইত। রাজপুত্রের বেলাও এরূপ ব্যবস্থা ছিল। রাজা নিজেকে প্রজাদের বেতনভুকৃ ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। কোন কোন রাজার আমলে শস্ত আইন

(arms act) প্রচলিত ছিল। চক্রবর্তী রাজা কার্তবীৰ্য্যজুন আদেশ প্রচার করেন, 'অদ্যাবধি আমি ভিন্ন যে অস্ত্র গ্রহণ করিবে সেই পরহিংসারত বা দস্যু বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে আমার বধ্য হইবে'। তিনিই একমাত্র গ্রাম-পালক, পশুপালক, ক্ষেত্রপালক, ব্রাহ্মণপালক, তপস্বীরক্ষক ও অর্থপালক হইলেন। তাঁহার সময়ে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি যাইত না। মনুসংহিতায় আছে, অপরের তৃণ, শাক, মুক্তিকা, ফুল ও জল না বলিয়া লইলেও তাহা চুরি বলিয়া গণ্য হইবে না। তখন বোধ হয় এই সব দ্রব্যের খুবই প্রচুর্য ছিল। পরবর্তীকালে এই সকল দ্রব্য বিনা অহুমতিতে গ্রহণ করা নরকপ্রদ দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

তখনকার দিনেও প্রজা এবং পশু গণনা হইত ও রাজা তাঁহার হিসাব রাখিতেন। সর্প, পশু ও পক্ষীকে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাইবে না এইরূপ উপদেশ আছে। রোমে গ্যাডিয়েটারদের যুদ্ধ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে নিষেধ সত্ত্বেও মুরগী ও বলবলের লড়াই পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। ক্রকের সময় ক্রীড়াচ্ছলে যে মল্লযুদ্ধ হইত তাহাতেও অনেক সময় প্রাণহানি ঘটিত। মল, মুত্র, রক্ত, খুঁ, বিষ ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্যযুক্ত বস্ত্র জলাশয়ে প্রক্ষালন করা নিষেধ ছিল। অপরের ব্যবহৃত বস্ত্র, জুতা বা খড়ম পরা দুষণীয় গণ্য হইত। যে খাদ্যের উপর কেহ হাঁচিয়াছে তাহা ফেলিয়া দিবার আদেশ আছে। গণ্য অর্থ্যৎ বহু লোকের জ্ঞাত যে অন্ন পাক করা হয় তাহা গ্রহণীয় নহে। হোটেলের অন্ন গণ্য। গৃহকর্তা নিজ ভৃত্যের সহিত একত্রে খাইবেন ইহাই, গার্হস্থ্য ধর্মের উপদেশ। এখনও উত্তর-প্রদেশে কোন কোন পরিবারের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। রোগবহুল গ্রাম পরিত্যাগ করা বিহিত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি কুটুম্ব পালন না করিয়া দান

করে, তাহার দান অসিদ্ধ। পুরাণে আছে যে, স্ত্রীকে হাঁচিতে, হাই তুলিতে বা যদৃচ্ছা ভাবে বসিয়া থাকা অবস্থায় দেখিবে না।

খনিজের উপদেশ। প্রাচীন ভারতের সম্ভ্রাম ঐতিহ্য আজও আমাদের অন্তর্গত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেই ঐতিহ্য স্মরণ রাখিয়া যদি আমরা সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। অতি পুরাকালে খনিজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কাল ৩৬৮৩ খ্রী-পূর্বাব্দ। তিনি এক ধর্মশাসন প্রবর্তন করেন। রাজা খনিজের ধর্ম-শাসন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি :

'সকল প্রাণী আনন্দ উপভোগ করুক। বিজ্ঞান স্থানেও তাহারো স্নেহযুক্ত হউক, সর্বভূতের মঙ্গল হউক এবং সকলেই নিরাতঙ্কতা লাভ করুক। প্রাণিগণের ব্যাধি বিনষ্ট হউক। কাহারও যেন মনঃকষ্ট না হয় এবং সকল প্রাণী সকলের প্রতি মিত্রভাব প্রকাশ করুক। দ্বিজাতিগণের মঙ্গল ও পরস্পরের প্রীতি, সকল বর্ণের সমৃদ্ধি এবং সর্বকর্মের সিদ্ধি হউক। হে জনগণ, তোমাদের সর্বভূতে সর্বদা মঙ্গল বুদ্ধি হউক, তোমরা যেক্রপ নিজের ও পুত্রগণের হিতকামনা করিয়া থাক, সেইরূপ সর্বভূতের হিতকারী হও। ইহাতেই তোমাদের পরম মঙ্গল হইবে। কে কাহার নিকট অপরাধী হয়? কোন মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কাহারও অহিত করিলে তাহার নিজেরই অহিত হইয়া থাকে, কারণ কর্মফল কর্তারই উপভোগ্য। হে মনুষ্যগণ, তোমরা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও। হে বৃদ্ধগণ, তোমরা লৌকিক পাপে প্রবৃত্ত হইও না। এইরূপ করিলে তোমরা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে। যে আমাকে আজ স্নেহ করিতেছে, পৃথিবীতে সর্বদা তাহার মঙ্গল হউক, যে আমাকে ঘেঁষ করিতেছে সেও সর্বদা মঙ্গল উপভোগ করুক।'

নববসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত আসিল আঁজি আমার হৃদয়ে ।
সাজিয়াছে বনভূমি পুষ্পিত শিয়ুলে ।
সজ্জনার শুভ্র হাশ্বে প্রসন্ন বস্ত্রা ;
দিক হস্তে দিগন্তরে সঙ্গীতের স্রবা
আনন্দ-উষ্মল কণ্ঠে ছড়ায় কোকিল ।
নিধিলের অবরুদ্ধ হৃদয়ের ধিল
নিমেষে ঝুলিল আঁজি কোন সাহকর ।
মর্দরধ্বনিতে সারা অরণ্য মুগ্ধ ।

ভোমরা আসিবে যারা শতবর্ষ পরে—
এমনি বসন্ত-দিনে বনের মর্দরে
পুলকে চঞ্চল হবে তোমাদেরও প্রাণ ।
সেদিনও আমার বনে কোকিলের গান
এমনি উঠিবে বাজি । মাহুঘের হিয়া
যুগে যুগে একই সুরে উঠিছে কাঁপিয়া ।

আনারকলি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(কাজী সাহেবের আদালত। পুঁথিপত্র সহ কাজী সাহেব উচ্চ মঞ্চে আসীন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে মামলদার, পেশকার, সেরেস্তাদার, নাজির ইত্যাদি বিরিয়া বসিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুই চাপরাশী দণ্ডায়মান।)

এক জন চাপরাশী। (বাহিরে গিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক) হজুর বীরবল মন্ত্রীজী আপনার সাফাৎপ্রার্থী।

কাজী। তাঁকে সম্মানপূর্বক ভিতরে নিয়ে এস আর তোমরা সকলে বাইরে অপেক্ষা করো—দেখ ঘেন কেউ এখন এখানে না আসে।

(বীরবলের প্রবেশ ও কর্মচারিগণের প্রস্থান।)

কাজী। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) আসতে আজ্ঞা হোক, মন্ত্রীজী। আজ আমার কি স্মরণাত। (নিজপার্শ্বে বীরবলকে বসাইলেন।)

বীরবল। সু কি কু, সে আপনার মজ্জির উপর নির্ভর। আমি ত আপনাকে সংপরামর্শ দিতেই এসেছি; তবে নেওয়া-না-নেওয়া সে আপনার হাত।

কাজী। আমরা রাজত্ব, রাজমন্ত্রীর পরামর্শ রাজারই আদেশ বলে গণ্য এবং মান্য করি। ধর্মের অবিরোধী বা বলবেন তাই করতে প্রস্তুত আছি।

বীরবল। দেখুন কাজী সাহেব, আদালত ও মসজিদ ঠিক এক স্থান নয়। মন্দির মসজিদে লোকে যায় পরমার্থ-সিদ্ধির জন্য; কিন্তু আদালতে আসে স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

কাজী। তা ত বটেই, তবে সে স্বার্থ যাতে ন্যায়তঃ-ধর্মতঃ সিদ্ধ হয়, তাই দেখবার জন্যই ত আমাদের এ জায়গায় বসানো হয়েছে মন্ত্রীজী?

বীরবল। শাস্ত্রীয় অর্থে ধর্ম মানে আইন। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, সফলে একই আইনের একই অর্থ করে? বা একই পাপে একই দণ্ড হয়?

কাজী। তা কেমন করে বলব হজুর? নিজ নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা ন্যায়সঙ্গত ও আইনসম্মত বলে বোধ করি, সেইরূপ রায় দেবার চেষ্টা করি, এই মাত্র বলতে পারি। কিন্তু আইন সম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে বোধ হয়, হজুরের কোন উদ্দেশ্য আছে।

বীরবল। তা নইলে কি ভিজ়ে খসখসের চিক-ঢাকা ঠাণ্ডা অঙ্ককার ঘরের অভ্যন্তর দিবানিত্যের স্বপ্নশয্যা ছেড়ে,

এই গ্রীষ্মকালের দিনদুপুরের বোদ ও ধূলা উপভোগ করার জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি! আপনি বিষয়ী লোক, এক আঁচড়েই সব বুঝতে পারেন। তাই আর বৃথা আপনার অমূল্য সময় নষ্ট না করে, আসল প্রস্তাবে আসা যাক। আজ খোদ রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বিশেষ মামলা রুজু করা হয়েছে, তা আপনি অবগত আছেন নিশ্চয়?

কাজী। হাঁ, আপনি যখন এলেন, আমি তারই কাগজ-পত্র উন্টে পাণ্টে দেখছিলাম।

বীরবল। তার থেকে কি সার সংগ্রহ করলেন জানতে পারি কি?

কাজী। আনারকলি নামে একটি আফগান মেয়ে কাবুলের রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মাসাবিধি বেগমসাহিবাদের আশ্রয়ে থাকে। মেয়েটি বড় আনন্দময়ী ও অনিন্দ্যসুন্দরী; মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর কাছে বেড়াতে আসত। তার মোহিনী রূপ দেখে—

বীরবল। কাজীসাহেব, রূপে মোহিত হবার দিন আপনাবও নেই, আমারও নেই। কাজের কথা আর কিছু থাকে ত শীঘ্র বলে ফেলুন। কবিদের পক্ষে কাল নিরবধি হতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সময় সীমাবদ্ধ।

কাজী। বাচালতা মাপ করবেন হজুর; তাকে দেখলে আমার একটি মৃত্যু কন্ঠার কথা মনে পড়ে। আরজিতে লেখা রয়েছে যে মেয়েটি নীচবংশের হয়েও শাহাজাদার প্রতি চোখ তুলতে সাহস করেছে, এবং সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও বারংবার অন্তঃপূর্ব-উদ্যানে তাঁর সঙ্গে সাফাৎ করেছে। এমন কি, সে এতই দুর্কিনীতা যে, গত উৎসব রজনীতে শাহেন-শাহর চোখের সামনে শাহাজাদার সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টিবিনিময় করতেও কুঠী বোধ করেনি। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অসমাপ্ত উৎসব বন্ধ করেন, এবং এই গুরুতর অপরাধের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ রাখতে আদেশ করেন।

বীরবল। আমি এই শোচনীয় দুর্ঘটনার এক জন প্রত্যক্ষদর্শী। সবই যথাযথ লেখা হয়েছে। এখন আপনি এই গর্হিত আচরণের কি দণ্ড আইনসম্মত মনে করেন?

কাজী। অল্প বয়স এবং অনভিজ্ঞতাগ্রস্ত দুর্ভাগ্যকে আইন সর্বদাই ক্ষমার চক্ষে দেখতে প্রস্তুত। এস্থলে লঘু পাপে গুরুদণ্ডের প্রয়োজন হবে না।

বীরবল। একে আপনি বলতে চান লঘু পাপ ? যে শাহাজাদা দু'দিন পরে দিল্লীর তক্তে বসবেন, তাঁকে কুহক জালে জড়িত করে তাঁর মহৎ বংশে কলঙ্ক লেপন করবার চরভিসন্ধি ত আমার মতে সামান্য বালিকার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ, এবং কঠিনতম দণ্ডের যোগ্য।

কাজী। হজুর, আইন রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ মানে না। এই সরলা বালিকা শাহাজাদাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় ছিল, কিংবা তার অজ্ঞতার স্বযোগ নিয়ে তিনিই নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার চেষ্টায় ছিলেন, তার প্রমাণ কি আছে ? অনুমান ত প্রমাণ নয়।

বীরবল। আচ্ছা বেশ, আপনি আপনার পুঁথিনথি সাক্ষীসাবুদ নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হোন, আমিও উপস্থিত থাকি। কিন্তু নিজের জীপুত্রের প্রতি মায়া বেশী, না এই অজ্ঞাতকুলশীলার প্রতি দরদ বেশী, তাও এই সঙ্গে প্রমাণ হয়ে যাবে, সেকথা মনে রাখবেন।

কাজী। তথাস্তু। চাপরান্ধী !

চাপরান্ধী। জী হজুর !

কাজী। আসামী আনারকলিকে হাজির করে—

আদালতের কর্মচারীদেরও ডাকো।

(অল্পক্ষণ পরে চাপরান্ধী কর্তৃক আনীতা, মলিনবস্ত্র পরিহিতা, ব্রাহ্মমুখী আনারকলির প্রবেশ, পশ্চাতে রোশেনারা ও ইলাহীবক্স। আনারকলি কাজীসাহেব ও বীরবলকে অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে দাঁড়াইল, অন্যেরা চাপরান্ধীর ইঙ্গিতে বসিল। কর্মচারিগণ একে একে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিল।) (কাজী আনারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন) সত্য কথা যদি বল ত কোন ভয় নেই। তোমার নাম কি ?

আনার। আয়েষা খাতুন।

কাজী। তবে তোমাকে আনারকাল বলে ডাকে কেন ?

আনার। এখানে এসে আমার ঐ নতুন নামকরণ হয়েছিল।

কাজী। এ নাম দিলে কে ?

আনার। রাজসভার একজন, তিনি কে, আমি ঠিক জানি নে।

বীরবল। (জনান্তিকে) কিন্তু আমি জানি। তিনি হচ্ছেন রাজকবি ফৈজী। (হাসিয়া) ছেলেবুড়ো সেদিন সকলেই অল্পবিস্তর ঘায়েল হয়ে পড়েছিল; আমি বলি নি যে, আপনি মেয়েটিকে যত অবলা সরলা ঠাওরেছেন, সে ঠিক তা নয় ?

কাজী। তোমার বাপের নাম কি, দেশ কোথায়, বয়স কত ?

আনার। আমি কাবুলের মুন্সী মহিউদ্দিনের মেয়ে, আমার বয়স বোল।

কাজী। তোমার সঙ্গে কে কে এসেছেন ?

আনার। এই ইনি, আমাদের শহর-কোতোয়াল ইলাহীবক্স সাহেব; আর ইনি, আমাদের কাজীসাহেবের মেয়ে রোশেনারা।

কাজী। রোশেনারা, তুমি বলতে পার তোমার সখীর উপযুক্ত বয়স হওয়া সম্বন্ধে এতদিন বিবাহ হয় নি কেন ?

রোশেনারা। হজুর, মা-বাবা বিয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, আয়েষাই কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয় নি।

কাজী। কেন ? কোন গোপন কারণ ছিল কি ? সব কথা খুলে না বললে স্ববিচার হওয়া শক্ত মনে রেখো।

বীরবল। ঘে রকম দেখছি, একটি নয়, খুব সম্ভব অনেকগুলি গোপন কারণ ছিল। স্বাধীন জেনানা হতে পেলো অন্তঃপুরের গারদে কে বন্ধ থাকতে চায় বল ?

ইলাহী। (উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া) আয়েষা খাতুনের নামে কাবুলে কোন দিন কোন কলঙ্কের লেশমাত্র স্পর্শ করে নি। এখানে যে নরাদম তাঁর পবিত্র নামে আভাসে-ইঙ্গিতে অপঘণ আরোপ করতে সাহস করবে, তার জন্য এই তরবারি মুক্ত রয়েছে, সাবধান !

বীরবল। (হাসিয়া) ভেবেছিলাম কাবুল জঙ্গলী অসভ্য দেশ, কিন্তু সেখানেও দেখছি নাটুকে ভাবভঙ্গী বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। গোপন কারণগুলির মধ্যে একটি যে সশরীরে এখানে উপস্থিত আছেন, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকেও সাবধান করে দিচ্ছি যে, একাধিক বার এরকম অনাহুত সাক্ষ্য দিলে তাঁকে কারাগারের ভিতরে একেবারে গোপন থাকতে হবে; তখন সাক্ষ্য ও সাক্ষ্যে দুই বন্ধ হবে।...কাজীসাহেব, এরকম আর কত প্রমাণ পেলে তবে আপনার বিশ্বাস হবে যে, জীলোককে বিশ্বাস করতে নেই ?

কাজী। শাস্ত্রবচন মানতে হলে ত রাজপুরুষকেও বিশ্বাস করা চলে না, হজুর। আচ্ছা রোশেনারা, তোমার বন্ধুর এই বয়সে এমন অস্বাভাবিক বৈরাগ্যের কোন সম্ভব কারণ মেথাতে পার কি ?

রোশেনারা। বাতীতে তার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কখনো আলোচনা হয় নি হজুর, কি করে বলব ?

কাজী। শুধু মুখের আলোচনায় মনোভাব প্রকাশ হয় না, ভাবে হয়, কাজে হয়। এখানে এসে অবধি তোমার সখীর ভাবে কোন বৈলক্ষণ্য, কাজে কোন অমনোযোগ প্রকাশ পেয়েছে কি ? তোমরা ত সারাদিন এক সঙ্গেই থাকতে ?

রোশেনারা। হাঁ হজুর, কেবল সন্ধ্যাবেলা বেগমসাহিবা আমাকে মাঝে মাঝে শহর দেখতে পাঠাতেন, তখন ও একলাই তাঁর কাছে থাকত।

কাজী। তোমরা ত দু'জনেই দিল্লী দেখতে এসেছ শুনে পাই; তবে আয়েষা বিবি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন না কেন?

রোশেনারা। সে সময়টা ওর প্রায়ই মাথা ধরত, তাই যেতে চাইত না; বাপের বড় আছুরে ঘেয়ে বলে কেউ ওকে জোর করে কিছু বলে না।

বীরবল। (জনান্তিকে) আদর দিয়ে দিয়ে যে মেয়ের মাথাটি খাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাজী। আয়েষা, তুমি আমার প্রেমের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি কি সারা সন্ধ্যা বেগমসাহিবীর কাছে বসে থাকতে?

আনার। না হজুর। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে অন্দরের বাগানে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দিতেন।

কাজী। কার সঙ্গে পাঠাতেন?

আনার। সর্দারনী মেহর-উল্লিসার সঙ্গে।

কাজী। তিনি কি বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন?

আনার। না, কখন কখনও গৃহকাজে অন্দরে চলে যেতেন।

কাজী। তখন কি তুমি একলাই বাগানে বসে থাকতে?

আনার। (ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ, বসে থাকতাম, কিংবা বেড়াতাম, কিংবা গান করতাম।

কাজী। তোমার বাবা তোমাকে গানবাজনা লেখাপড়া শিখিয়েছেন শুনেছি। ভাল নাচতে পার, সেকথাও কানে এসেছে—যদিও চোখে দেখবার দৌভাগ্য বোধ করি, কখনও হবে না।

বীরবল। কাজীসাহেব, বাজে কথায় আসল কাজ চাপা দেবেন না। নিজের ও পরের সর্বনাশ করবার জন্য যে কয়টি বিদ্যা জানা আবশ্যক, তার কোনটিই মুন্সীসাহেব আদরের মেয়েকে শেখাতে বাকি রাখেন নি, সে বিষয় আমি নিজেই সাক্ষ্য দিতে পারি।

কাজী। যখন বাগানে বসে থাকতে, দেখানে আর কেউ আসতেন কি? সত্য বল।

আনার। (নত শিরে অক্ষুট স্বরে) হাঁ, কখনও কখনও আর একজন বেড়াতে আসতেন।

বীরবল। (হাসিয়া) সাক্ষ্য বায়ুসেবনটা দেখছি সংক্রামক, তবে সকলের পক্ষে সমান স্বাস্থ্যকর নাও হতে পারে।

কাজী। আয়েষা, লজ্জা করো না, ভয় পেয়ো না, মিথ্যা বলো না। তোমার সাক্ষ্যের উপর রাজবংশের মান ও তোমার জীবন পর্যন্ত নির্ভর করছে মনে রেখো। এ গুপ্তপ্রেমকে কেউ লইয়েছিল, না তুমি কি আপনি উপযাচিকা হয়েছিলে?

আনার। আমার মনই আমাকে এ কাজে লইয়েছে, আর কেউ নয়।

বীরবল। যা হোক, মেয়েটা যেমনই হোক, সত্য কথা বলে দেখে সন্তুষ্ট হলাম। মিথ্যা ত জীলোকের অঙ্গের ভূষণ বা রক্ষাকবচ, যাই বল। কিন্তু ওর আর একটি অঙ্গের ভূষণ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। (জনান্তিকে কাজীসাহেবের সহিত কথা।)

কাজী। আয়েষা খাতুন, তোমার হাতের ঐ আংটিট একবার দেখতে পারি কি? (আনার আংটি খুলিয়া দিল, তাহা দেখিয়া ও বীরবলকে দেখাইয়া) যিনি আসতেন, তিনিই কি এই আংটি তোমাকে দিয়েছেন? (আংটি ফেরত দিলেন।)

আনার। (নিরুত্তর)

বীরবল। মৌনই সম্মতির লক্ষণ। (হাসিয়া) একেই বলে হাতে হাতে প্রমাণ, বা বমাল-গ্রেপ্তার! এর পরেও যদি আমাদের কথায় আপনি অবিশ্বাস করেন কাজীসাহেব, তা হলে কিন্তু আমি নাচাঁর। বিশ্বাস না করবারও একটা সীমা আছে।

কাজী। (আসামীদের প্রতি) আচ্ছা, এখন তোমরা যেতে পার। চাপরাশী, আসামীর সাজা হওয়া পর্যন্ত ফের কয়েদ করে রাখ।

চাপরাশী। হো হকুম হজুর। (আসামীদের লইয়া প্রস্থান।)

বীরবল। এখন কি রায় দিতে আজ্ঞা হয়, কাজীসাহেব? মনের মত প্রমাণ পেলেন ত, না আরও কিছু চাই?

কাজী। প্রমাণে যা বলে, মন যে তাতে সায় দিতে চায় না।

বীরবল। বিচারকের নিজের মন বলে কিছু নেই, সে আইনের মুখপাত্র মাত্র। এ স্থলে আইন-ই-আকবরীতে কি দণ্ডের বিধি আছে, সেই হচ্ছে কথা। আসামী নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছে, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই?

কাজী। (উত্তেজিত ভাবে) ধিক্ এই আইন, ধিক্ এই দৃঢ় ব্যবসা, ধিক্ এই পুণ্ডর মূখোঁস পরে পরের দোষ বিচার করতে বসবার অভিনয়। আজ যদি ঈশ্বর স্বয়ং সত্যই

এই ধর্মাদিকরণে বসতেন, তা হলে আপনি আমি এই বিচারাসনে না বসে ঐ কাঠগড়ায় দাঁড়াতাম তা আপনি বেশ জানেন। এটাও আপনি বেশ জানেন যে, আজ ঐ নিরপরাধ, অসহায়া বালিকাকে আমরা দুই বৃদ্ধে মিলে মিথ্যা বাক্যবাণে জর্জরিত করেছি,—তার যা শাস্তি হবার তা আগামী দিয়ে দিয়েছি। তবু তাকে আরও শাস্তি দিতে হবে?—তা দেব, ভাল করেই দেব। তাকে জীবন্তে গোর দেবার বিধান দেব—হা হা!—যার চেয়ে বটিন দণ্ড আমাদের আইনে নেই। কিন্তু আমাদের আজ থেকে অবসর দিতে আজ্ঞা হোক হজুর। আর যে ক’দিন বাঁচি, দেখি যদি গরীবের সঙ্গে গরীব হয়ে থেকে এ নৃশংস পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। (তাড়াতাড়ি একটা কাগজে কি লিখিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিলেন।)

২য় দৃশ্য

(প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রোশেনারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কাদিতেছে এবং আনারকলি পায়চারি করিতে করিতে মাঝে মাঝে জানালায় মুখ বাড়াইয়া কি দেখিতেছে।)

আনার। ইলাহীবক্স ত এখনও এল না রোশেনারা? তাকে কখন পাঠিয়েছ?

রোশেনারা। অনেকক্ষণ, প্রায় দু’ঘণ্টা হবে। এই এস বলে। একটু স্থির হয়ে বস।

আনার। স্থির? আমি ত স্থির হয়েই আছি, তোমরাই অস্থির হচ্ছে। আমার মনও স্থির, শরীরও স্থির হয়ে আসছে, সময়ও চলছে না; ঘড়ির দম ফুরিয়ে এসেছে। কেবল একটিমাত্র আশা ধরে এখনও বেঁচে রয়েছি।

রোশেনারা। আয়েষা, বোনু আমার, অমন বুড়ো মানুষের মত কথা তোমার মুখে যে শুনতে পারি নে—চুপ কর দোহাই তোমার! এই কি আমাদের সেই ছটফটে মেয়ে, যার হাসি কথা সর্বদা ফোয়ারার মত ঠিকরে পড়ত? সে আয়েষা কোথায় গেল? আমি তার বাপমায়ের কাছে গিয়ে কি জবাবদিহি করব? তাঁরা যে তাকে আমার জিম্মায় এই বিদেশে পাঠিয়েছিলেন—এই নির্ধর্ম, নিষ্ঠুর, নির্দয় বিদেশে! কেন মরতে এই নরকে এসেছিলে আয়েষা?

আনার। যে জন্য এসেছিলাম, আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে রোশেনারা; পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু মেটে নি—বোধ হয় এ পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত কিছুই মেটে না বলে। কিন্তু যেটুকু পেয়েছি, তাই নিয়েই হাসিমুখে পরপারে যেতে পারব।

রোশেনারা। কি পেয়েছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমাদের যা দিয়ে গেল, সে যে বড় ভয়ানক জিনিস। এ আফশোষ, এ অপমান, এ লজ্জা, দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়? কেবলই মনে হচ্ছে কোন্ মুখে দেশে ফিরে যাব? গিয়ে তাঁদের কি বলব?

আনার। মাকে বলো তাঁর দুই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত তেমনি অব্যাহি রইল, কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে দেশে ফিরে গেল না। আর বাবাকে (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া... পরে মুখ তুলিয়া), বাবাকে বলো তাঁর শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, নিজেকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না বলে বেন আমাকে ক্ষমা করেন। বলো আমি কাবুলের মান রেখেছি, মরতে ভয় পাই নি। আর—(আবার জানালায় মুখ বাড়াইয়া) ও যে ইলাহীবক্স আসছে।

(মান মুখে ইলাহী প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইলেন)

আনার। (উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে) তবে তোমার যাওয়া বুখা হয়েছে?

ইলাহী। (নত মুখে) হাঁ। শাহাজাদার সঙ্গে তোমার একটি বার শেষ দেখা করবার প্রার্থনা বাদশাহ কিছুতেই মঞ্জুর করলেন না।

(আনার হতাশভাবে বসিয়া পড়িল)

আমি বাদশাহের সত থয়ের-খার নাম শুনেছি, একে একে সকলের কাছেই গিয়ে করজোড়ে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছি, তাই এত দেরি হ’ল। শুনলাম যে শাহাজাদাও পাগলের মত দিবারাত্র ছুটাছুটি করে এই নৃশংস দণ্ড রহিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনই ফল হচ্ছে না। এমন কি, তিনি নিজেই মজরবন্দী হয়ে রয়েছেন। তাঁর স্নেহময় পিতা এ বিষয়ে একেবারে বজ্রের মত কঠিন ও ভীষণ, কারও সাধ্য নেই তাঁর কাছে এগোয়। (সকলে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে কাতর উচ্চ্বাসে) আয়েষা, আয়েষা! তুমি কখনও আমার কোন কথা রাখ নি। আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে এই শেষ অনুরোধ করছি, শুনবে না কি? চল, এই রাফসপুরী থেকে আজ রাতেই আমরা তিন জনে পালিয়ে যাই। এখানকার সকলেই প্রলোভনের বশ, তা আমি এই অল্প দিনে বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে এই তলোয়ার ছাড়া আর কোন মূল্যবান জিনিস নেই। কিন্তু তোমার ঐ মহামূল্য আংটিটা দিলে নিশ্চয় রাজের প্রহরীরা দ্বার খুলে দেবে, আর ছদ্মবেশে একবার শহরের সিংহদরওয়াজা পার হতে পারলে তার পরে আমার যোড়া

ছুটিয়ে আমি শীঘ্রই তোমাদের নিরাপন্ন স্থানে পৌঁছে দিতে পারব।

(করষোড়ে) আহেবা, এই বয়সে কি তোমার নিজের প্রাণের প্রতি এতটুকুও মায়া নেই? তোমার বাপ-মা, তোমার শৈশববন্ধীদের প্রতি একটুও দয়া নেই।

আনার। ইলাহী, অনেক করে মন বেঁধেছি, আবার আমাকে অস্থির করে তুলো না। যার জন্য এ জীবন, তাঁকেই যখন পাব না, তখন সে জীবনের উপর আমার আর তিলমাত্র মায়া নেই। সব মায়াই ত্যাগ করেছি, কেবল এই ছুটি জিনিসের (হাতের আংটি ও বুকে-ঝোলানো ছবি দেখাইয়া) মায়া এখনও ছাড়তে পারি নি। এ ছুটি আমার নখর দেহের সঙ্গে সমাধিস্থ হবে, পরলোকে আমার অবিনশ্বর প্রেমের সাক্ষ্য দেবে।

ইলাহী। আয়েবা, পুরুষমানুষ হয়ে আমি ভেঙে পড়ছি, আর তুমি এই সেদিনকার কচি মেয়ে, কোথা থেকে মনে এমন অমূল্যবল বল পেলে, তাই ভাবছি। আগে তোমাকে মানবী ভেবে আপন করতে চেয়েছি, কিন্তু আজ তোমাকে দেবী বলে পূজা করতে ইচ্ছে করছে।

আনার। ইলাহী, আমি সামান্য মানবী মাত্র, কেবল প্রেমের বলে মনে এমন অসামান্য বল পেয়েছি। (কিয়ৎক্ষণ থামিয়া) ইলাহী, মৃত্যুর মুখে সামাজিক লজ্জাসরম সঙ্কোচে-দ্বিধা জীর্ণ বস্ত্রের মত আপনাই খসে পড়ে যায়। আমি জানি তুমি বহুকাল থেকে আমার অনুরক্ত ভক্ত, যদিও মুখ ফুটে কখনও সেকথা আমাকে বল নি। আমি তোমার নিষ্ঠার উপযুক্ত প্রতিদান কোন দিন দিতে পারি নি, পারবও না। কিন্তু এত দিনে তার মর্যাদা বুঝতে পেরেছি। তোমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারব না ইলাহী, ক্ষমা কর;—আমি ভীকুর মত রাতারাতি এখান থেকে পালাতেও পারব না, আর প্রাণ থাকতে এ আংটিও (ঠোটে ঠেকাইল) আর কারও হাতে দিতে পারব না। কিন্তু ছোট বোনের প্রথম ও শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে ভাই, রোশেনারা, এদিকে এস ত ভাই! (তথাকরণ) আমি জানি তোমার মন ইলাহীর প্রতি অনুরক্ত। যথার্থ বীরপুরুষের হাতে আত্ম-

সমর্পণ করাতেই নারীজীবনের সার্থকতা। ইলাহী, যা পাও নি তার জন্য জীবনকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে, যে প্রেম ও সেবা তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাকে নম্র চিত্তে গ্রহণ কর ভাই, তোমাদের দু'জনেরই জন্ম সার্থক হোক।

পরস্পরের হাতে হাত মিলাইয়া)

আজ আমি ধর্মসাক্ষী করে তোমাদের যে পবিত্র বন্ধনে বাঁধলাম, দেশে গিয়ে তাকে সমাজের সাক্ষাতে পূর্ণ করো, তা হলেই আমার আত্মা শান্তি পাবে জেনো।

(হাত ছাড়িয়া ও ছাড়াইয়া)

আজ বড় বেশী বকছি—চিরকালই বেশী বকতাম। আজ চিরকালের জন্য মুখ বন্ধ হবার আগে (হাসিয়া) বোধ হয় স্তম্ভিত পুথিয়ে নিচ্ছি।

(পূর্ববৎ হালকা ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া)

ইলাহী, রোশেনারা, আজ আমাদের শেষ দেখা। শুনিছি এরা কাল আমাকে লাহোরে পাঠিয়ে দেবে। (একটু থামিয়া) মোতিদিদিকে বল তার কথাই ফলেছে, পতঙ্গ আলোর বেশী কাছে উড়তে গিয়ে পুড়ে মরছে। কিন্তু সেজন্য তার কোন দুঃখ নেই। সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। যখন আর তা পাবার আশা নেই, তখন মরণই তার পরম বন্ধু।

(রক্তমঞ্চের আলো ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে হইতে শেষে একেবারে নিবিয়া গেল।)

৩য় দৃশ্য

(লাহোর শহরের উপান্তে আনারকলির সুন্দর কবর সামনে ভুলুপ্তিত সেলিম। প্রদীপ হস্তে সখীগণ ধীরে ধীরে কবর প্রদক্ষিণপূর্বক গাঁহিতেছেঃ)

গজল

ক্যা ক্যা পরী জমান থে, আরে চলে গয়ে।
তাঁর উস্কো দেখনে কি ন লায়ে, চলে গয়ে।
আদম রহী ন কোই, ন পদম্বর রহা ইহী।
জরে জমীপে ওয়েভি সমায়ে, চলে গয়ে।
দারা রহা, ন জম, ন সেকন্দর শা বাদশা।
তুস্তে জমীপে শরক্কা আয়ে, চলে গয়ে।

সমাপ্ত



আমার দেশ

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

নব্য বাংলা যে নৈয়ায়িকের দেশ এটা সর্ববাদিসম্মত। এদেশে নানা বিষয়ে নানান মত আঞ্জ নূতন নয়। মতামতের ভাঙা-গড়ার জন্যে, বিশেষ করে এই দেশটাকেই ভারতের ভাগ্যবিধাতা, স্বদূর অতীত যুগ থেকে, স্মৃতিদৃষ্টি করে রেখেছেন। একে একে আর্থ্য ও অনার্থ্যের, জৈন-বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যের, মোগল ও পাঠানের, শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংঘর্ষ এবং সমস্ত চূড়ান্তভাবে এই দেশের মাটিতেই হয়ে গিয়েছে। নবাবী অরাজকতায় অগহিয়ু হয়ে এই দেশেরই কতিপয় ধুরন্ধর বিদেশী বণিকের হাতে এদেশের শাসনদণ্ড তুলে দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আবার বৈদেশিক শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ ভারতের ঐকান্তিক বিদ্রোহের বীজও যে এই দেশেই সর্বপ্রথম উগ্ঠ এবং অঙ্কুরিত হয়েছিল সে বিষয়েও কোন তর্কের অবকাশ নাই।

এদেশে ভাঙা-গড়ার এই যে প্রবণতা, স্থিতি এবং প্রগতির এই যে দ্বন্দ্ব, এটা মোটেই আকস্মিক নয়। বাংলার মাটি, বাংলার বায়ুতেই এ প্রাণ পেয়েছে, আর বাংলার জল, বাংলার ফল থেকেই যুগে যুগে এরস আহরণ করেছে। বাংলার কবি তাই নিঃসঙ্কোচে, বোধ হয় গোপন পূলকের সঙ্গেই, বলতে শেরেছিলেন: “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাই জগৎকে শিথিয়ে গেছেন, “যত মত তত পথ।” বহু মত আর বহু পথ বাংলার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম যে এদেশে একান্তই অভাবনীয় তা তো “পলাশীর যুদ্ধের” কবি তাঁর অননুকারণীয় ভাষায় বহু পূর্বেই বলে গিয়েছেন। তাঁর উক্তি “স্বর্গ মর্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়, তথাপি বাঙালী নাহি হবে একমত।”

যদিও বাংলার মাটিতে, পূর্বে কিংবা পশ্চিমে, কোথাও স্বর্গ নেমে আসবার আশু সম্ভাবনা আদৌ দেখা যাচ্ছে না; আর মর্ত্যালোক হতেও স্বর্গের দিড়ি তৈরি করবার কোনো জরুরি ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা, ঢাকা কিংবা কলিকাতা, কোথাও গৃহীত হয়েছে বলে আজও জানা যায় নাই, তবুও কিন্তু সর্বত্র একটা বিষয়ে সমস্ত বাঙালী একমত হতে চলেছে শনৈঃ শনৈঃ। বিষয়টা হচ্ছে বাংলার অবিচ্ছেদ্য সমগ্রতা—এর বিভিন্ন অংশের অচ্ছেদ্য, অদ্বন্দ্ব, অক্রেদ্য, অশোষ্য অঙ্গাঙ্গি ঘনিষ্ঠতা। অনায়াসলব্ধ এবং আজন্মসেবিত আকাশ-বাতাসের মত যে দেশাত্মবোধ ছিল আমাদের অবচেতন মনে: বিলীন, দেশের অতি অঙ্গসংখ্যক উচ্চ

শিক্ষিতের মনের যা ছিল বিলাস মাত্র, দ্বিধাবিভক্ত বদ্বৈতা আজ অবস্থার চাপে ক্রমশঃ গভীর দাগ কেটে উৎকীর্ণ হচ্ছে আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই মনে। রাজনৈতিক বিরুদ্ধতা আর সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতা প্রকৃতির সেই অমোঘ কার্যক্রমকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাহত করতে বা স্থগিত রাখতে পারবে এমনটি মনে করবার কোনও সম্ভব কারণই নাই। অবস্থার বিপাকে শ্রোতের জলে বহু আবর্তের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাতে করে তার সমুদ্রাভিমুখী গতি কখনও চিরতরে অবরুদ্ধ হয় না।

বাংলার দুর্দশা আজ চরমে উঠেছে। যে বাংলা ধন-ধান্যে শুধু আবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠিতই ছিল না, উপরন্তু বিপুল শিল্পসম্ভারের বহির্কর্ণিণ্ডো সমস্ত ভারতকে সম্বুদ্ধ করে তুলেছিল এক দিন, আজ তার গৃহে গৃহে অন্নভাব, বস্ত্রভাব নিত্যব্যবহার্য তেল-নুন-লবঙ্গের একান্ত অভাব। আমাদের এ দৈন্য মোটেই সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। এর উৎসের অনুসন্ধান করতে হলে বাংলার ইতিহাসের ধারার উজান বয়ে অনেকটা দূরে যেতে হবে।

দেশজোড়া এই দৈন্য যে আমাদের কত গভীর—এর নগ্ন প্রকাশ যে কত লজ্জাকর, কত নির্মম, কত আত্মঘাতী তার পরিচয় আমরা ক্রমাগত পেয়ে আসছি আমাদের স্বরাজের সম্ভাবনা এবং তার প্রতিষ্ঠার পরে থেকেই। পরাধীনতার নাগপাশে আড়ষ্ট এবং আবিষ্ট অবস্থায় দৈন্যের বেদনা আমাদের বতর্টা ছিল, আক্ষেপ ততটা ছিল না। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তা আত্মপ্রকাশ করেছে—শত-শোহধ সহস্রশঃ—বহুভাবে, বহুরূপে।

আমাদের ধর্ম্মান্বিতা, সাম্প্রদায়িকতার উগ্র তাণ্ডব, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে পরপীড়নের প্রয়াস, এমনি-ধারা আরও অনেক পাপ সেই দৈন্যেরই বিকার। এদের উপপত্তি এবং প্রসার যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের ঐ ব্যাপক এবং উৎকট দৈন্য থেকেই প্রধানতঃ সম্ভব হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রায় দুই শতাব্দীর একটানা শোষণের ফলে এই একান্ত লক্ষ্মীহীন দেশে কলিরাজ ধীরে ধীরে তাঁর সিংহাসনখানি কায়েম করে নিয়েছেন। দেশব্যাপী দৈন্যের সঙ্গে বিদেশী-শাসকের ভেদনীতি আর আমাদের অজ্ঞতা সম্মিলিত হয়ে দেশে যে ব্রাহ্মস্পর্শের সৃষ্টি করেছিল তাতে করে এ অকল্যাণ অনিবার্য হয়েই পড়েছিল। যত দিন রাজত্বকে ইংরেজ

সমাসীন ছিল তত দিন ভদ্রতার খাতিরেই হোক অথবা তাদের ১২৪ ধারার ভয়েই হোক কলিরাজ ছিলেন প্রচুন্ন। আজ তাঁর সার্বভৌম আধিপত্য রাত্রি, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট—বাংলার সর্বত্র সমভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে বাঙালীর ঘর ভেঙেছে, ভাইবোনেরা পৃথক হয়েছে; বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর মনের মত ভালবাসা সবই আজ বিপন্ন এবং বিকৃত হতে চলেছে।

বাংলার স্বভাবধর্মের একান্ত বিরোধী এই সব পরিণতি এবং সম্ভাবনা। এ দেশের অভিব্যক্তির ধারায় এদের বিশেষ কোন স্থান নাই। ভাগীরথীর প্রবাহকে ঐরাবত পথভ্রষ্ট করতে পারে নি; জহুমুনিও তাকে গ্রাস করতে পারেন নি। ক্রমোন্নতির পথে আজ হোক, কাল হোক বাংলাও ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে এ সব পাপ এবং লজ্জা। ভাবী ইতিহাসে এদের কথাও বর্গীর হাদ্যামা বা ছিন্নাভরের মন্বন্তরের মতই বাংলার অন্যতম দুঃস্বপ্নের পর্যায়ে পড়বে। বর্তমানের চূর্তোগ আমাদের যতই হোক না, একথা জানা দরকার যে, এ পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক, কাজেই অ-চিরস্থায়ী। কলিরাজের প্রতাপ যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, বাংলার ভাগ্যবিধাতা বলে তাকে মনে করাটা চড়ন-দারকে ঘোড়ার মালিক বলে মনে করার মতই ভ্রমাজ্ঞক হবে।

২

বাংলার মাটি আর বাংলার মনের পরিণতির একটা বিশেষ ধারা আছে। বাংলার কবি বলেছেন, সদ্যস্নাতা, সিন্ধবসনা জননী ভারতবর্ষ স্থলী জনমি হতে বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে অভ্যুত্থিত হয়েছেন। কাব্য হিসাবে তাঁর বর্ণনা অনবদ্য, তাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ও রকম হয় নি মোটেই। ভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রকারে সৃষ্ট হয়েছে।

যেমন সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বিশাল মালভূমি আদৌ সিন্ধু-সীকরসিন্ধু হয় নি। উত্তরে ছিল তার স্ববিশীর্ণ সমুদ্রের মেখলা। ভারতের সেই আদিম বাস্তুভিটা—দাক্ষিণাত্যের ত্রিভুজাকৃতি মালভূমি—ভূ-সৃষ্টির আদি থেকে নিখর নিকম্প ভাবে অপেক্ষা করছিল সমুদ্রের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি হয়ে ভারতের উত্তরার্কের অভ্যুদয়ের আশায়। কোটি কোটি বর্ষের প্রতীক্ষায় তার তৃষিত তাপিত বক্ষ ভেদ করে উঠেছিল নিদারুণ আগ্নেয়োদ্গার। জমাটবাঁধা তার 'লাভা'র পুরু আন্তরণ প্রসারিত রয়েছে সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী ভূখণ্ডে—আধুনিক মধ্যভারত থেকে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত।

তার পরে বিপুল আলোড়নে প্রলয়পয়োধি মহি

করে অভ্যুত্থিত হন হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ প্রাকার। এর দুই প্রান্তে ভারতের দুই সীমান্ত প্রদেশ। হিমালয় দিলে ভারতভূমির উত্তরের সীমারেখা টেনে। সেই থেকে উত্তর-এশিয়ার শুষ্ক শীতল বায়ুপ্রবাহের দক্ষিণমুখী অভিযান বন্ধ হয়ে গেল। আর দক্ষিণের বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বাতাসেরও উত্তরের নিকৃদ্দেশ যাত্রার পথ চিরতরে অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

ভারতের অভিব্যক্তির কিন্তু তখনও পরিসমাপ্তি হয় নি। উত্তরের পার্বত্য ভূমি আর দক্ষিণের মালভূমির মাঝখানে ছিল পূর্ব-পশ্চিমব্যাঙ্গী সমুদ্রের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। বর্তমানের আরব-সাগর আর বঙ্গোপসাগরে ছিল তখন একাকার। প্রকৃতির স্বজনীশক্তির প্রভাবে কালে এ ব্যবধানও অন্তর্হিত হ'ল। উত্তরের হিমালয় আর দক্ষিণের মালভূমি ধৌত হয়ে রাশি রাশি পলিমাটি এসে ভরাট করে দিলে এই নিম্নভূমি। ফলে নবন্যস্ত বিপুল সমুদ্রী পর্য্যবসিত হ'ল গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-সরস্বতী আদি পুতসলিলা শ্রোতস্থিনী-বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমিতে। একে একে রাজস্থান, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ইত্যাদি গঠিত হ'ল।

সর্বশেষে বিশ্বকর্মার ভারত-সৃষ্টি যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হ'ল বঙ্গমাতার আবির্ভাবে। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র উভয়ে মিলে নগরাজ হিমালয়ের পূত-রেণুকণা তিলে তিলে আহরণ করে এনে দশভুজা শতভুজা হয়ে অঞ্জলি দিয়েছে ভারতের এই প্রান্তদেশে ভারতের ভাগ্যবিধাতার পায়ে। তাঁর প্রসন্ন হাসির সঙ্গেই ফুটে উঠেছে এই বাংলাদেশ।

জীব-অভিব্যক্তির ধারা অল্পসরণ করে বিজ্ঞানীরা নিঃশংশয়িত ভাবে দেখিয়েছেন যাহুয় এসেছে সর্বশেষে এই পৃথিবীতে। আর ভারতের ভূ-প্রকৃতির গঠন-বিস্তারের ব্যাপারে বাংলাদেশের স্থান যে সর্বশেষে, বিশ্বকর্মা যে ভারতের আর আর সব জায়গায় হাত পাকিয়ে সর্বশেষে গড়েছেন বাংলাদেশকে সে বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ। বাংলার করি তাঁর জন্মভূমিকে যখন "সকল দেশের সেবা" বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তাঁর কবি-প্রতিভা শুদ্ধমাত্র সত্যকেই আলোকিত করেছে, কোন কল্পলোকের সৃষ্টি করে নাই।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালার উচ্চতম অংশ রয়েছে বাংলার উত্তরে। আর দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগরের জলরাশি। পূর্ব, পশ্চিম উভয় সীমান্তপ্রসারী পর্বতমালা আর সাগরবেলার এমন সমান্তরাল সন্নিবেশ, ভূপ্রকৃতির এমন মণিকাঞ্চন যোগ খুব কম দেশের ভাগ্যেই ঘটেছে। বাংলার যত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—এর গ্রীষ্মের কালবৈশাখী, শরতের হাসি, এর বর্ষার ঘনঘটা, হেমন্তের অপরূপ শোভা—সবারই মূলে রয়েছে উত্তরের হিমালয় আর

দক্ষিণের চলোন্দি—এই দুয়ের অল্পম ঘোঁসাঘোঁসা। এদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফলকেই বৈশিষ্ট্য দেয় নাই; বাংলার মনোজগতেও এই কোমল-কঠোরের প্রভাব অল্প-প্রবিষ্ট হয়েছে ওতপ্রোতভাবে, যার ফলে বাঙালী—বাঙালী।

পারিপাশ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের অধিবাসীদের দেহমনকে যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে একথা মানব-সভ্যতার শৈশবে যেমন সত্য ছিল আজও তেমনই আছে। জড়বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতিতে আত্মহারা হয়ে আমরা মনে করি—জড়প্রকৃতির পরাজয়ের উপরেই বুঝি সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। মানবশিশু হাঁটতে শিখে যদি মনে করে সে মাধ্যাকর্ষণ জয় করেছে; অথবা গোবৎস যদি মনে করে মাতৃগুনে আঘাত করেই সে দুধ আনছে তা হলে তাদের সেই মনোভাবের মধ্যে ষতটুকু সত্য ধরা দেয়, আমাদের দাবির মূল্যও ঠিক ততটুকুই।

আসলে মানুষ প্রকৃতির হাতে গড়া, প্রকৃতির পাঠশালায় পড়া। কাজেই ভূপৃষ্ঠে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের আকৃতি-প্রকৃতিও স্বভাবতঃই বিভিন্ন হয়েছে। মেক্সিকোদেশের এক্সিমো আর সাহারার বেহুইন এদের পার্থক্য চিরন্তন। পার্থক্য শুধু অস্থিমজ্জাগত নয়, মনবুদ্ধিও এদের স্বতন্ত্র।

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বাংলা যে স্বজলা স্বফলা শস্যশ্রামলা এটা ত প্রত্যক্ষ সত্য। এদেশে শীত-গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, অম্লচিহ্নের তীব্রতাও ছিল না। স্বভাবতঃই এদেশের অধিবাসীদের মনের গতি আর হাতের কাজ দুই-ই বিশ্বের বিশ্বয় উৎপাদন করে এসেছে চিরকাল। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির প্রতি অঞ্চলে, প্রতি জনপদে সহজেই বাংলার বিচিত্র ভাবধারা অল্পপ্রবিষ্ট এবং প্রচারিত হতে পেরেছে নানা ভাবে, নানা আকারে। ফলে অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও এদেশে একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য-বোধ গড়ে উঠেছে। জাতিবর্ণসম্প্রদায় নির্কিশেষে প্রত্যেক বাঙালীর মনের উপরে তার স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে আজ একথা সহসা প্রাদেশিকতা-দোষভূত বলে মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু এর সঙ্গে তথাকথিত প্রাদেশিকতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এ হ'ল অতি অন্তরঙ্গ বস্তু, আর প্রাদেশিকতা হ'ল নিতান্ত বাহ্য। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে অহঙ্কারের, সহজ শৌচের সঙ্গে শুচিবাহিষের অথবা আগুনের সঙ্গে আগুনের ধোয়ার যে পার্থক্য এ দুই বস্তুর মধ্যেও ঠিক সেই রকমের পার্থক্য রয়েছে। স্বার্থপরতা খারাপ সন্দেহ নাই; কিন্তু

স্বার্থবোধ শুধু অপরিহার্য নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর বাংলাদেশে এ প্রয়োজনীয়তা আজকার দিনে ষত বেশী, ততটা এর বহু শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের কোন দিনেও হয় নাই।

বাঙালীর স্বার্থবোধ আজ নানা কারণে বিক্ষিপ্ত। বহু সাধনা আর প্রভূত ত্যাগের পরে দেশে বধন স্বাধীনতা এল, আমরা তখন তার পূর্ণ স্বাদ থেকে হল্যম বঞ্চিত। কারণ সেই সঙ্গে আমাদের দেশ হ'ল দ্বিখণ্ডিত।

এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী যে কে তা বলা যেমন শক্ত, এর কারণ যে কি তা বলা ঠিক তেমনই সহজ। দেশ-বিভাগের মূলে রয়েছে আমাদের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ। আমরা যারা অন্তরে এই অবিশ্বাস আর বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেছি, অথবা জ্ঞানে-অজ্ঞানে এর পোষকতা করেছি তারা সবাই এ দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী। বিদেশীর ভেদনীতির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে আমাদের দায়িত্বের মাত্রা একটুও কমবে না। বিদেশী তার সাম্রাজ্য রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম চেষ্টায় যা কর্তব্য মনে করেছে নিখুঁত ভাবে তা করেছে। তার পান্টা-আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণকল্পে কি করেছি?

বিদেশীর প্ররোচনায় আমরা ভুলে গেল্যম—জাতীয় স্বার্থ সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ, ভুলে গেল্যম—জন্মভূমির প্রতি সবারই কর্তব্য রয়েছে, জন্মভূমির উপরে সবারই সমান অধিকার। স্বাধীনতার উষা আচ্ছন্ন হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক-তার কুয়াশায়। স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা ছিল দর্শক, সাম্প্রদায়িকতার বজ্রে তারাই হ'ল হোতা। বিদেশীর দোদীর্ঘ শাসনের অন্ত হতে না হতেই সাম্প্রদায়িকতার ঝড়ে দেশ গেল ছেয়ে।

এমনদারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা অরাজকতারই স্বদেশী সংস্করণ। একে একে কলিকাতায় ও নোয়াখালিতে, বিহার ও পঞ্জাবে আমরা সাম্প্রদায়িকতার নামে অরাজকতার তাণ্ডবলীলাই দেখেছি। রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হলে, অশিক্ষিত দৈন্যপীড়িত দেশে অরাজকতার প্রাচুর্য স্বাভাবিক। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক মনোভাব বধন দেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও সংক্রামিত হয় তখনই দেশের সত্যিকারের বিপদ। সে বিপদ আমাদের আজও কাটে নি।

রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতার ছিপ্রপথে অরাজকতার প্রাবন বাংলাদেশের পক্ষে মোটেই নূতন নয়। রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সময়ে এদেশে এইটাই নিয়ম। গোড়ারাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে, পালবংশের অভ্যুদয়ের আগে স্বদীর্ঘকাল ধরে বাংলায় চলেছিল মাংস্যন্যায়। মাংস্যন্যায় মানে "মৎস্যের তুল্য

পরস্পর হনন, অরাজকতা ও নবহত্যা”। এক বছর দু’ বছর নয়, এক শ’ বছর ধরে সেই যুগের সোনার বাংলায় যা হয়েছিল তার আভিধানিক অর্থ ত বলেইছি ; ব্যবহারিক অর্থের আভাসমাত্রও নিশ্চয় নোয়াখালির অত্যাচারের অভ্যুত্থিকেও অনেক দূর ছাড়িয়ে যাবে।

পাঠান রাজত্বের শেষের দিকে, মোগলশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কামরূপ থেকে কাশী পর্যন্ত কালাপাহাড়ী তাণ্ডবে যা হয়েছিল তার জোড়া ইতিহাসে তুলত। সে ধর্মধর্মীর অত্যাচারের মর্মভঙ্গি কাহিনী এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তার পর মোগল রাজত্বের শেষে, কোম্পানির আমলের আগে এসেছিল এদেশে বর্গীর হান্দামা। তার জীবন্ত চিত্র ভুক্তভোগী বাঙালী কবি গঙ্গারাম তাঁর ‘মহারাত্রি পুরাণে’ একে গিয়েছেন। দু’শ বছর পরে আজ বাঙালী সে কাহিনী ভুলে গিয়েছে। শুধু ঘুমপাড়ানী ছড়াতেই তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিতুকু রয়ে গেছে। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, ভুলে যাওয়াই উচিত। জাতীয় জীবনে ওগুলো সত্য নয়, নিতান্তই দুঃস্বপ্ন। কিন্তু যখন ঘটেছিল তখন ভুক্তভোগী বাঙালী নর-নারীর কাছে সে হান্দামা মোটেই স্বপ্ন ছিল না। ‘মহারাত্রি পুরাণের’ কয়েক পংক্তি পড়লেই পাঠক এর বীভৎসতা আর বর্করতা উপলব্ধি করতে পারবেন :

“মাঠে বেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।

সোনা-রূপা লুটে নেয়, আর সব ছাড়া ॥

কারু হাত কাটে, কারু নাক কান।

একি চোটে কারু বধয়ে পরাণ ॥

ভাল ভাল জীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়।

অছুটে দড়ি বাধি দেয় তার গলায় ॥

এক জন হাড়ে তবে আর জনা ধরে।

.....ভাড়া জাহি শক করে ॥

এই মত বরগী কত পাপকর্ম করিয়া।

সেই সব জীলোককে যত দেয় সব ছাড়িয়া ॥

তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে লাগায়।

বড় বড় ঘরে আগিয়া আসুন লাগায় ॥

কাছকে বাঁধে বরগী দিয়া পিঠ-মোড়া।

চিং করি মায়ে লাধি পায়ে জুতা চড়া ॥

“রূপী দেহ, রূপী দেহ” বোলে বার করে।

রূপী না পাইয়া তবে নাকে জল ধরে ॥

কাছকে ধরিয়া বরগী পুথরে ডুবায়।

ফাকর হইয়া তবে কারু প্রাণ যায় ॥”

এসব কবির অভ্যুত্থি নয়। কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারও বর্গীর হান্দামায় বাঙালী নর-নারীর দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে তাঁর সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ‘চিত্রচম্পু’তে লিখেছেন :

“মারামারী রূপায় রূপণ, গর্ভবতী এবং শিশু, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের তলোয়ার দিয়া কাটিয়া ফেলে, সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণে নিপুণ, তাহার বাংলা জনপদে যেন ছোট প্রলয় ঘটাইল, সমস্ত ধন এবং সাক্ষী জীলোক হরণ করিল।”

এক আধ বছর নয়, বছরের পর বছর—দশ দশ বৎসর—এমনিধারা অমাহুয়িক অত্যাচারের প্রাবন বয়ে গিয়েছিল এ দেশের উপর দিয়ে।

এর প্রায় পিঠাপিঠিই এল এদেশে ‘ছিয়াত্তরের মনস্তর’। এরও মূলে রয়েছে অরাজকতা। সেদিনকার সে অরাজকতার নগরূপ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন ‘আনন্দ মঠে’ :

“১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহার রাজ্যের টাকা আদায় করিয়া লয়েন, কিন্তু তখনও বাঙালীর প্রাণ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাণ্ডিত্য নরাদম বিশ্বাসইন্তা মহুয়-কুলকলর মীরজাকরের উপর। মীরজাকর আত্মরক্ষার অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাকর গুলি ধায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেনপ্যাচ লিখে। বাঙালী কাদে আর উৎসন্ন যায়।”

বাঙালীর সেদিনকার দুর্দশার যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র একেছেন তাতে কল্পনার অতিরঞ্জন নাই—আছে ঐতি-হাসিকের সহানুভূতি আর সমীক্ষা। সমসাময়িক সরকারী কাগজপত্রের প্রমাণপুঞ্জ থেকে সংগ্রহ করে সে দুর্দশার সংক্ষিপ্তসার তিনি যা দিয়েছেন তা এই :

“লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল; ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল। তার পরে মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তার পরে ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পরে জী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, জী কে কিনে? ধরিদ্ধার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাড়াভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। অনেক পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহার বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল; যাহারা পলাইল না, তাহার অবাচ্ছ খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউটা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাচুর্য হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকেও দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টা-লিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে এক বার বসন্ত প্রবেশ করে সে গৃহবাসীরা রোগী কেলিয়া ভয়ে পালায়।”

যা হয়েছিল সেটা সত্যই মনস্তর। এর ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাণ হারাল। বাংলার জমিদার সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হ'ল; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সর্বনাশ হ'ল। • বাংলার গৌরব শক্তিমান কৃষককুল মজুরে পরিণত হ'ল, সুজলা সুকলা বাংলার মাটির এক-তৃতীয়াংশ চাষবাসের অভাবে জঙ্গলে ভরে উঠল। এক-আধ বছরের অনাবৃষ্টিতে বা অজন্মায় এমনটা হয় নাই-। এর মূলে ছিল বহুবর্ষব্যাপী অরাজকতা, শোষণ আর অবাধ লুণ্ঠন।

ছিয়াত্তরের মনস্তর এসেছিল বাংলায় ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাকালে; বাংলায় আর এক ভয়ানক মনস্তর এল ১৯৪৩ সালে—ভারতে ইংরেজ শাসনের অন্ত হবার অব্যবহিত পূর্বে। এই দুই মনস্তরের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান অনেকখানি থাকলেও এদের হেতুর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই অরাজকতা আর শোষণ দুই-ই চরমে উঠেছিল। যাদের হাতে ছিল শাসনযন্ত্র তারা জনকল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সেকালেও বিধা করে নি, একালেও নয়। সেবারও দুর্ভিক্ষের দরুন রাজস্ব আদায়ে কসুর হয়নি, এবারও সারা দেশ যখন প্রণীড়িত, তখনও সমানে বাংলার বন্দর থেকে চাল রপ্তানী হয়েছে—আরব, ইরাক, সিংহল ও আফ্রিকায়। প্রজাকে বঞ্চিত করে তারই অমলক-খাদ্য সংগৃহীত হয়েছে সঞ্চিত হয়েছে, বিদেশী সৈন্যের রসদ বলে। কত না তার নষ্ট হয়েছে, কত না হয়েছে চুরি। এ অন্যায় অরাজকতার যারা প্রতিবাদ করত, প্রাণ দিয়ে এ লুণ্ঠন যারা প্রতিরোধ করত অগ্রসর হতে পারত, বিদেশী সরকার আগেই তাদের অবরুদ্ধ করেছিল কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। ফলে অনশন-মৃত্যুতে পল্লী উজাড় হয়েছে, শহরের হাসপাতালে হয়েছে স্থানান্তর, রাজধানীর পথে পথে অনশন-জীর্ণ মৃত-দেহের ছড়াছড়ি গিয়েছে।

এ দুর্ভোগের অন্ত হতে না হতেই দেশে এল সাম্প্রদায়িক হানাহানি। মূলতঃ এ হানাহানি যে বুদ্ধব্রত কাড়াকাড়ি তাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে 'স্বশৃঙ্খল' কুশাসনের অবাধ শোষণের ফলে দেশে এল মনস্তর, তারই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রেরণা এবং প্রয়োচনায় হ'ল সাম্প্রদায়িকতার জন্ম, বৃদ্ধি। এদেশে এ উপসর্গ চিরস্থায়ী হবে এমন মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল ভেঙেছে; বিদেশীর যথেষ্ট শোষণও বন্ধ হয়েছে। আজ হোক, কাল হোক বাংলা নিজেকে ফিরে পাবেই। আজকার এ আত্মঘাতী মনোভাব তখন হৃৎস্পন্দ বলে মনে হবে—এ সুনিশ্চিত। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে আজ যারা দিগ্বিদিক ভুলে ইতস্ততঃ ছুটছুটি করছেন, আর যারা

চোরের উপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাবার ব্যবস্থা দিচ্ছেন, অতীতের জ্ঞান আর ভবিষ্যতের দৃষ্টি দুই-ই তাঁদের সমান আচ্ছন্ন।

৪

কিন্তু কেন এমনধারা দুর্গতি বাঙালীর যুগে যুগে? কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। নিতান্ত কৰ্ম্মকর্ত্ত্ববাচ্যেও যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তারও একটা না একটা প্রচ্ছন্ন কারণ থাকেই। ভূমিকম্প যে এমন একটা আকস্মিক ব্যাপার, তাও দৈবাৎ হয় না। মাটির নীচেকার তাপ আর চাপের বকেয়া হিসাবের বোঝাপড়ার ফলেই নাকি তা হয়। আমাদেরও অমনিধারা বকেয়া হিসাবের জবাবদিহি, আর তহবিল তছরূপের দণ্ড দিতে হয়েছে নানান রকমের দুর্গতির মারফত—জাতীয় বিবর্তনের বাঁকে বাঁকে। ধর্ম্মজীবী ইতিহাসে ভূমিকম্প নিরর্থক নয়। পৃথিবীর ব্যবস্থিতিতে ওরও প্রয়োজন আছে। বাংলার ইতিহাসের ঐ যে বড় বড় দুর্ভোগগুলো, যারা কিনা জাতিবর্ণনির্বিশেষে আমাদের সবাইকেই পুনঃ পুনঃ নাড়া দিয়ে গিয়েছে, সে-গুলোও সার্থক হবে, যখন বাঙালী ওদের প্রকৃত ইঙ্গিত অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে।

চিরকাল প্রকৃতি এদেশের প্রতি সদয়। জীবিকা এখানে এতই সহজলভ্য যে, অতীতে বাঙালী কখনো জাতীয় স্বার্থের জন্য সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে নাই। মুষ্টিমেয় বিদেশী যখন মারাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ-কল্পে দুর্গ নির্মাণ করল, বহু যোজনপ্রসারী পরিখা খনন করল, তখন লক্ষ লক্ষ বাঙালী, বর্দ্ধমানরাজ বিষ্ণুপুররাজ থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় ভূস্বামী সবাই অসহায়ভাবে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্ধি খাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। বছরের পর বছর অত্যাচারিত, অপমানিত হয়েছে শিক্ষা হ'ল না কারুই।

শৌর্যবীর্যের অভাব এদেশে ছিল না, কিন্তু সংহতির আর সমবেত চেষ্টার অভাব এদেশে চিরকাল। বারো ভূঁইয়ার কেউই কম ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা সম্মিলিত হয়ে বাংলার বিপুল সমৃদ্ধি আর গণশক্তিকে কার্য্যকরী করবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

বাংলার অনতিদূর অতীতের সমৃদ্ধি কেমন ছিল? আর তার কি ব্যবহার হ'ত সেকালে? ১৭০৬ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ান-নাজিম হয়ে ঢাকায় এসে প্রথম পুণ্যাহের পরেই দুই শ' গরুর গাড়ী বোঝাই করে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ নগদ টাকা পাঠিয়েছিলেন দিল্লীতে। এ ছাড়াও 'জায়গিরীর ও খাসনবিশির টাকা' স্বতন্ত্র পাঠিয়েছিলেন। আর পাঠিয়েছিলেন—“হস্তী, টাঙ্গন ও গুহু

নামক একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় পার্কৃত্য অথ, মহিষ, হরিণ, বাজপাখী, জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) বয়ন করা পাদশাহের ব্যবহার্য্য স্থল বস্ত্র, গাণ্ডার-চর্মের ঢাল, লীহট্টের মাদুর (স্বর্ণ ও গজদন্তের), যুগনাভি ইত্যাদি ইত্যাদি।”

বাংলার চাল সেকালে নদী-পথে পাটনায়, আর সমুদ্র-পথে করমণ্ডল উপকূলের বহু বন্দরে, সিংহলে, মালদ্বীপে প্রেরিত হ’ত। বাংলার চিনি গোলকুণ্ডায়, কর্ণাটে, আরবে, ইরানে ইরাকে যেত। স্ত্রী আর রেশমী কাপড়ও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হ’ত বিদেশে।

এত যে ঐশ্বর্য্য, এমন যে সমৃদ্ধি এর কতটুকু অংশ পেয়েছে বাংলার কৃষক, বাংলার কারিগর? বাদশা-বেগম-নবাব-নাজিম-আমীর-ওমরাহদের বিলাস-ব্যসনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে, রাজা-মহারাজা-জমিদার-তালুকদার এঁদের রাজসিক জীবনযাত্রা আর দোল-ভূগোঁসবের খরচ জুগিয়ে থাকত তার বেশীর ভাগই খুব সম্ভব যেত সপ্তদাগরের সিন্ধুকে, আর শেঠের কুঠিতে। বাংলার যারা যথার্থ ধন উৎপাদন করত তাদের অনেকের দুয়ারেই খুব সম্ভব হাতী বাঁধা থাকত না। আর তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালীর উন্নয়ন—এ সব নিয়েও কেউ যে বিশেষ মাথা ঘামাত এমনও মনে হয় না। টাকায় আট মণ চাল—তারা দু’বেলা আঁচাতে পেরেই মহাস্থখে ছিল। তাদের পেটে ভাত ছিল, গায়েও জোঁর ছিল। ডাক পড়লে চাল-সড়কি, লাঠি-সোঁটা নিয়ে রাজার কাজ হাঁসিল করত তারা, নিতান্ত নির্দিকার ভাবে। কোন উচ্চতর ঐহিক আদর্শের সন্ধান কেউ তাদের দেয় নি।

শাস্ত্রে লেখে—দেবতার দানে সমৃদ্ধ হয়ে যে দেবতাকে তার ভাগ দেয় না সে চোর। বাংলার সেকালের বিভ্রাটালী অভিজাত শ্রেণীর প্রায় সবাইকেই স্বচ্ছন্দে ঐ দলে ফেলা যায়। আর তাদের যুগসঞ্চিত সেই পাপের দণ্ড তাদের সঙ্গে সমস্ত দেশকেই ভোগ করতে হয়েছে। বর্গীর হাঙ্গামায় তার আরম্ভ, আর ছিয়ান্তরের মহন্তরে তার পরিণতি—১৭৪২ থেকে ১৭৭০।

তারপরে এদেশে এল ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজের আমলে অবস্থার উন্নতি ত হ’লই না বরং আরও দ্রুত অবনতিই হতে লাগল। শিক্ষিত-সমাজের মন হ’ল গ্রাম হতে বহিষ্কৃত; আর লক্ষ্য হ’ল ‘যেমন তেমন চাকরি দুখ ভাত’। অমবিমুখ বাঙালী সহজ উপায়ে অর্থোপার্জনের আশায় ছুটল শহরে, রাজধানীতে—সরকারী শাসন আর শোষণের সহযোগিতায়। বংশপরম্পরায় সৃষ্টি হতে লাগল রেজা খাঁ আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গার্হস্থ্য সংস্কার। কৃষি আর

শিল্প রইল অবজ্ঞাত হয়ে; সর্ববিষয়ে হয়ে পড়লাম আমরা পরমুখাপেক্ষী। ধনরত্ন যত ছিল, বিদেশীর বাতুলমস্ত্রবলে সব ত উড়ে গেলই; বিল বাঁওড় জলা দীঘি সব গেল মজে, নদীনালা গেল শুকিয়ে; আর বাকিছু গ্রাম সব ভঁরে গেল জঙ্গলে।

এমনি করে শুধু গণদেবতার কাছেই নয়, ধর্ম্মী দেবতার কাছেও আমরা অপরাধী হয়ে গেলাম। যে-দেশের প্রকৃতির স্বয়ং আর ভূমির উর্বরতা চিরদিনই বিদেশীর বিশ্বয়-উৎপাদন করে এসেছে; যেদেশে স্তূর অতীত যুগের কোন ভগীরথের বহু বর্ষব্যাপী তপস্যায় গঙ্গার দুই পাশে, রাজমহল থেকে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত খনিত হয়েছিল অগণিত স্তূরপ্রসারী খাল; যেদেশের শস্য আর কৃষি-শিল্পসম্ভার অসংখ্য বাণিজ্যভরীতে বাহিত হয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চলে যেত দেশ-বিদেশে—বহরের পর বছর, সেদেশ আজ সকল রকমে কাঙাল হয়েছে।

এর দায়িত্ব সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ আমাদের সবারই। বিগত সার্ব শতাব্দীতে যখন অষ্ট্রেলিয়ার অতুর্কর মরু, শস্য-শূন্য প্রান্তর আর ফলহীন বনভূমি বিদেশীর অক্লান্ত চেষ্টায় সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছে, ঠিক সমদময়েই ভারতের তথা জগতের সমৃদ্ধতম প্রদেশ এই সোনার বাংলা তার অধিবাসীদের ঔদাসীন্যে দুর্দশার প্রায় অন্তিম প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই পতিত দেশকে সমৃদ্ধির পথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

এ কাজে রাজনীতির মন্ত্রের চাইতে কর্ম্মক্ষেত্রের সাধনা আর তাগের প্রয়োজনীয়তা ঢের বেশী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য তার রাজনীতি থেকে আসে নি, এসেছে তার শতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত কর্ম্মের ফলে। সেখানে মাহুষের যুগ-যুগ ব্যাপী চেষ্টায় সহস্র সহস্র যোজনপ্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী পরিণত হয়েছে রম্য উপবনে; ধূম ‘গ্রেইরি’র তৃণভূমি পরিণত হয়েছে শ্রামল শস্যক্ষেত্রে, আর উবর-প্রান্তরে ফুটে উঠেছে শুভ্র কার্পাসের রাশি। সেখানে আহাঃনিজা ভুলে, শীতাতপ অগ্রাহ করে মাহুষ দুর্দাগম্য পার্কৃত্য প্রদেশে ঘুরে মরেছে বছরের পর বছর খনিজের সন্ধানে। তাদের সেই অদম্য অধ্যবসায় আর বিপুল তাগের ফলে সেদিনকার শ্রীহীন পর্ব্বত আজ লক্ষ্মীর পাদপীঠে পরিণত হয়েছে। কুলপাবী দুর্দান্ত নদীর তাণ্ডবে তারা স্বর-যোজনা করে মহাদেশের মাঝখানে সমৃদ্ধ বন্দরের সৃষ্টি করেছে। জীবদেহে শিরা-উপশিরার বিন্যাসের মত ঐ বিস্তীর্ণ দেশে প্রসারিত হয়েছে সর্বত্র রাস্তাঘাট, রেলপথ। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই

অখ্যাত অজ্ঞাত ভূখণ্ড মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যেই জীবনের প্রাচুর্য্যে সভ্যতার আলোকে আজ ঝলমল করছে।

সহস্র সহস্র বর্ষের প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারে গর্ভিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বোধ করি এমনধারা ব্যাপক ভাবে কর্মযজ্ঞের অহুষ্ঠান কোন দিনই হয় নাই। সেকালে অশ্বমেধের ঘোড়া অবশ্য রাজ্যে রাজ্যে হানা দিয়েছে; কিন্তু সভ্যতার অভিযান খুব সম্ভব রাজ-সিংহাসন ছেড়ে বেশী দূর যায় নাই। বিংশ শতাব্দীর দীপ্ত মধ্যাহ্নেও এ বিষয়ে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। পূর্বে নিউ-ইয়র্ক আর পশ্চিমে সানফ্রান্সিস্কো এই দুই মহানগরীর মাঝে, আমেরিকার বৃকে গড়ে উঠেছে অগণিত নগর, অসংখ্য কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, শিক্ষায়তন, স্বাস্থ্যনিবাস। আর, কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুই মহানগরীর মাঝে ভারতের বৃকে হাজার মাইল জুড়ে কি আছে? আছে, ময়ূরভঞ্জ-কিওল্লোর-বোনাই, কাঁকেব, বস্তুর-হায়দরাবাদ-রাজ্যের অযত্নবান্ধিত জঙ্গল; তার মাঝে মাঝে আছে আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রাম আর ততোধিক ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র।

কাজেই আজকের দিনে স্বাধীন ভারতে রাজনীতির চর্চার দিক থেকে গঠনমূলক কাজের দিকে শিক্ষিত সমাজের মনের মোড় ফেরান একান্তই দরকার। এদিকে আমাদের যা কাজ তা মুখের কথায় বা কাগজে-কলমে হবে না। এ কাজ হাতে-হাতিয়ারে মন-প্রাণ দিয়ে আমাদের করতে হবে।

পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রিক বিভিন্নতা বাংলায় এই গঠনমূলক কাজের পরিপন্থী খুব সম্ভব হবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উভয় রাষ্ট্রকে সমভাবে অহুপ্রাণিত করবে না; তবুও একথা স্থনিশ্চিত যে, জাতীয় স্বার্থবুদ্ধিই উভয় রাষ্ট্রের জনগণকে বিপদের পথ থেকে সম্পদের অভিমুখে পরিচালিত করবে।

ইংরেজের অধীনতার যুগের কথা বাদ দিলে, সমস্ত বাংলা

এক রাষ্ট্রের স্বদৃঢ় শৃঙ্খলে একতাবদ্ধ খুব বেশী দিন কখনও থেকেছে বলে মনে হয় না। প্রাচীনকালে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগড়ী প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হ'ত। পাঠান আমলেও 'গৌড়-মগল' প্রায়ই বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হ'ত। মোগল আমলের পূর্বাঙ্কেও বাংলার বার-ভুইয়াদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভূম্যধিকারীই ছিলেন। এঁরা ছিলেন নিজ নিজ রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতি। এমনধারা রাষ্ট্রিক বিভিন্নতা বঙ্গের সামগ্রিক কৃষ্টি ও সমৃদ্ধিকে বিন্দু-মাত্রও ব্যাহত করে নাই।

চৈতন্যদেব যখন ভক্তির মন্ত্রে, জাতি-বর্ণ-নির্কিশেষে এদেশের কোটি কোটি নরনারীকে উদ্ধৃত্ত করেছিলেন, প্রেমের বন্যায় সমস্ত দেশকে প্রাবিত করেছিলেন তখন এ-দেশের রাজশক্তি ছিল মুসলমানের, আর বিচার ছিল কাজীর। নদীয়ায় কাজী-নিমাই সংবাদের উপসংহারে কাজী বলছেন নিমাইকে :

“গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।

দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচ।

নীলাশ্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।

সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

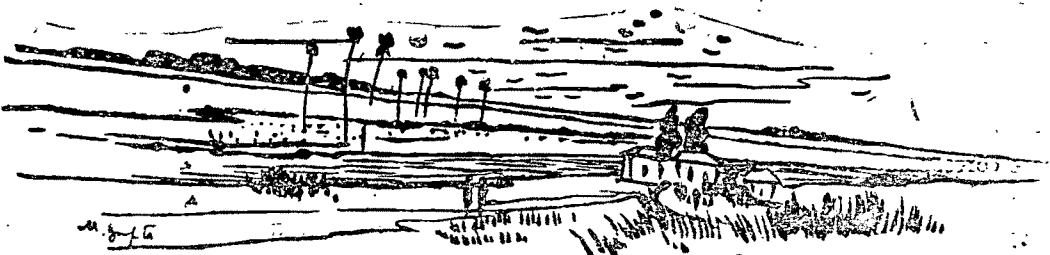
ভাগিনার জোখ মায়া অবশ্য সহ্য।

মাড়ুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।”

(ত্রিপ্রচৈতন্য চরিতামৃত—আদিলীলা)

পাঁচ শ' বছর আগে এই ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মনোভাব। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ঠিক এমনধারাই ছিল। আর বছর পাঁচেক পরে আবার এ মনোভাবই এদেশে ফিরে আসতে বাধ্য। কারণ তৃতীয় পক্ষ তার ভেদনীতিসহ অপসারিত হয়েছে।

উভয় বঙ্গের মধ্যে যুদ্ধেরণবিভীষিকা ধারা কালে অকালে অহরহ দেখছেন বা দেখাচ্ছেন, তাঁদের বলি প্রজাতান্ত্রিক দেশে আজকার দিনে, সত্যিকারের জনমতকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ-বিগ্রহে রত হওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে এবং খুব সম্ভব অচিরে তা অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াবে। আর বাংলাদেশ ত স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়।



যশোহরের নীল-আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রথমেই একটি কথা বলিয়া রাখি। নীল-আন্দোলনের সঙ্গে শিশিরকুমার ঘোষের যোগাযোগের বিষয় কতকটা জানা থাকিলেও ইহা যে কত ঘনিষ্ঠ, গভীর ও ব্যাপক ছিল ১৮৬০ সনের 'হিন্দু পেট্রিয়ার্টে' প্রকাশিত পত্রাবলী হইতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম্যনাট্য লাইব্রেরীতে রক্ষিত উক্ত সনের 'হিন্দু পেট্রিয়ার্টে'র ফাইল হইতে 'M. L. L.' স্বাক্ষরযুক্ত ছয়খানি পত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার করার দৌভাগ্য আমার হয়। প্রথম পত্রখানি ব্যতীত আর সমুদয়ই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সম্বলিত, তন্মধ্যে এই কথা কয়টিও আছে—“from our Jessore correspondent”। এই ধরণের ভূমিকায় স্বাক্ষরবিহীন এমন কয়েকখানি পত্রেরও সন্ধান পাই যেগুলি 'M.L.L.' তথা শিশিরকুমার ঘোষেরই লেখা বলিয়া বুঝা যায়। এই পত্রগুলির পরিচিতিস্বরূপ আমি “যশোহরে নীল-আন্দোলনের কথা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি এবং গত ডিসেম্বর মাসের (১৯৫১) মারামারি “আনন্দ-বাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় আলোচনী”তে প্রকাশার্থ প্রেরণ করি। এই প্রবন্ধটি পরবর্তী ২০শে জানুয়ারী সংখ্যায় উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ প্রবন্ধে 'M.L.L.' স্বাক্ষরের প্রথম পত্রখানি ছব্ব উদ্ধৃত করি। উক্ত স্বাক্ষরযুক্ত অষ্টাদশ পত্রের প্রকাশের তারিখও আমি ইহাতে দিয়াছিলাম। এখন, মূল আলোচনায় আসা যাক।

গত সংখ্যায় যশোহরে নীল-আন্দোলন সম্পর্কে শিশিরকুমার ঘোষের 'M.L.L.' স্বাক্ষরযুক্ত কয়েকখানি পত্র হইতে তথ্যাদি প্রদান করিয়াছি। উহাতে আরও বলিয়াছি যে, 'M.L.L.' স্বাক্ষর ছাড়া এমন কয়েকখানি পত্রও পাইয়াছি যাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-বলে শিশিরকুমারের লিখিত বলিয়াই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। এরূপ পত্র হইতেও কিছু কিছু তথ্য পূর্বে প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছি। এখানেই স্বাক্ষরযুক্ত এবং স্বাক্ষরবিহীন কতকগুলি পত্রের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিব। নীলকর ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের যোগসাজসে প্রজাকুল কিরূপ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, এ সমুদয় হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

'M.L.L.' স্বাক্ষর ও তারিখবিহীন “from our Jessore correspondent” ভূমিকায়ুক্ত একখানি পত্র ১৫ই আগষ্ট, ১৮৬০ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ার্টে' প্রকাশিত হয়। পত্রের শেষাংশে সম্পাদককে সোধন করিয়া লেখা হয়, “You know this hand, please give the above a

place in the Indigo districts columns.” অর্থাৎ, “এ হস্তাক্ষর আপনার জানা, অল্পগ্রহপূর্বক ইহাকে ‘ইণ্ডিগো ডিস্ট্রিক্টস’ স্তম্ভে স্থান দিবেন।” ইহা হইতে বুঝা যায়, পত্রখানি নিশ্চিত শিশিরকুমারের লিখিত। ইহার কিয়দংশের তাৎপর্য এই :

“বর্তমান ঋতুতে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেটগণের গতিবিধি বড়ই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া তাহারা বহু নীলকরদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তই সমস্ত সময় ও মনোযোগ নিয়োজিত করিতেছেন। এক দিকে যখন তাহারা কুঠীতে হুলা না লইয়াই নীলগাছ পৌছাইয়া দিবার জন্ত প্রজাদের বাধ্য করিতেছেন, অল্প দিকে তখন কুঠীর দ্বয়ভেরা তাহাদের নাকের ডগার উপরই ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। এই [আগষ্ট] মাসের ৬ই মধ্যরাত্রে মাগুরার অন্তর্গত ঝিনাইদহ থানার ঘোরালা গ্রামে আসরং কাজীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। টাকাকড়ি, সোনারূপা এবং অস্ত্র-বিস্তার জিনিসপত্র ডাকাতেয়া লইয়া যায়। বাড়ীর লোকদের উপর তাহারা উৎপাতও করে, কিন্তু ঝিনাইদহ কোন্ প্রাণ-হানি হয় নাই।

শুনিতেনহি মিঃ স্বীনার সত্তর জন পুলিশ লইয়া মাগুরার গিয়াছেন রায়তদের নীলগাছ কাটিতে বাধ্য করিবার জন্ত। স্বীনার ও টেলরের উপর ছোটলটি বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। টেলর বর্তমানে মাগুরার মহকুমা হাকিম। ধবর পাইলাম কুঠী-ওয়ালারা ‘নারকীর আইনে’র নীলগাছ নষ্ট করার বারায় ফেলিয়া রায়তদের বিরুদ্ধে পুনরায় মিথ্যা মামলা রুজু করিতেছে। স্বীনার ও টেলরের পক্ষপাতিত্ব সকলেই জানেন। তাহাদের বিচারে প্রজাদের দুর্গতির আর সীমা-পরিমীমা থাকিবে না।...নীল-ভরূপ মামলাগুলির কি বিচার হয় দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। আমি যদি আপনাকে সংবাদ সরবরাহ করিতে না-ও পারি, আমার বহু এম-এল-এল নিশ্চয়ই আপনাকে সকল সংবাদ দিবেন।”

জেলা-কর্তৃপক্ষের আরও কতকগুলি অনাচারের বিষয় এই পত্রে উল্লিখিত হয়। নীলকরদের সঙ্গে তাহাদের আহার ও বাস এবং নানা আন্দোল-প্রমোদে যোগদান, একজন নিরক্ষর জমাদারের বেতন-বৃদ্ধি, ডাকাতিতে লিপ্ত সন্দেহে নীলকর ওটসের গোমস্তাকে তলব করায় ঝিনাইদহের দারোগার সাময়িক কর্তৃত্বাতি কালোপোলের মিথ্যা-প্রমাণিত ‘হামলা’য় স্বীনারের সাহায্যকারী প্রসন্ন দারোগার পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পত্র-লেখক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। বিশেষতঃ শেযোক্ত ব্যাপারটি জেলা জজের বিচারে যখন মিথ্যাই প্রমাণিত হইয়াছে তখন দারোগা-পুস্তকে এরূপ ভাবে সম্মানিত করা ন্যায়ধর্মবিগর্হিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

২

শিশিরকুমারের M.L.L. স্বাক্ষরিত ষষ্ঠ পত্রখানিতে (হিন্দু পেট্রিফট, ২২শে আগষ্ট) তারিখ দেওয়া হইয়াছে ৮ই আগষ্ট। তবে ইহা পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি তখন মফস্বলে দুর্গত রায়তদের অবস্থা সম্বন্ধে তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পল্লী-অঞ্চলে নীলকরদের অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী এই পত্রখানিতে আছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীলকরদের যে তখন বিশেষ সাহায্য করিতেছিলেন তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি। পত্রখানির প্রথমে শিশিকুমার নিজের সম্বন্ধে এই মর্মে লেখেন: “মিঃ স্কীনারের কঠোর সন্ধানী-দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশ্যে আমি অনবরত স্থান বদলাইতেছি। আমাকে এখন একজন ‘ফেরারী’ বলিলেও হয়। আমি মিঃ মোলোনির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকল নীল অঞ্চলে ঘুরিতেছি। বর্তমানে হাজরাপুর কুঠীর সমীকটে আছি। মোলোনি সাহেব ক্যাপটেন হাওয়ার্ডের অধীন একশত জন সিপাহী লইয়া প্রথমে বিনাইদহ, সেখান হইতে মাগুরা এবং এখন, যদি আমার তুল না হইয়া থাকে, তদীয় বন্ধু বিজলী কুঠীর ওমানের সঙ্গে রহিয়াছেন।”

ইহার পর শিশিরকুমার নীলকরদের অত্যাচারের মর্মস্বাদ কাহিনী ব্যক্ত করেন। ইহারও কতকটা এখানে প্রদত্ত হইল:

“বড়ই দুঃখের বিষয় নীল কমিশন এ জেলার আগমনের সময় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখানে আসিলে তাহারা বুঝিতে পারিতেন—এ জেলায় রায়তেরা সুখী ও সম্পৎশালী এই মর্মে মিঃ করলং যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কতখানি সত্য। এই উক্তির মত লজ্জাকর মিথ্যা আর নাই। কমিশনের সম্মুখে অত্যাচারের শতাংশও বর্ণিত হয় নাই। এখনও নীল অঞ্চলে গৃহদাহ, লুণ্ঠভরাজ প্রভৃতির অবশেষ দৃষ্টপোচর হইবে। আরও দেখা যাইবে—নারীদের উপর কুঠীরালাদের অত্যাচার করার দরুন কত পরিবার সমাজচ্যুত হইয়াছে, নীলকরদের অদম্য অর্থ-কুণ্ঠা মিটাইবার নিমিত্ত কত ধনী ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এটি অতি সত্য কথা যে, পুরুষের অল্পপরিমাণে গ্রীষ্মকালে দিয়া নীলক্ষেতের মাটি ভাঙানো হইয়াছে। কুঠীর অভাবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ষাটাইতেও তাহারা দিবা করে নাই। পুরুষদের নীল চাষ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জী ও কন্যাগণকে নীলকুঠীর

গুদামে আটক রাখিয়া নিরতিশয় দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি যে গ্রাম হইতে এই পত্র লিখিতেছি সেই গ্রামের রামভদ্র অধিকারী নামক এক ব্যক্তিকে তাহার বাড়ীতে গন্ত ক্ষেত্রারী মাসে হাজরাপুর কুঠীর সাহেব ওটস আক্রমণ করে। রামভদ্র পলাইয়া যায়, কিন্তু বাড়ীর জীলোকেরা তাহার অঙ্গসংরক্ষণ করিতে পারে নাই। লাঠিরালাদের কোপ পড়িল বাড়ী ও আসবাবপত্রের উপর। তাহারা বাড়ীটি ধ্বংসা করে, আর আসবাবপত্র লুণ্ঠ করিয়া লইয়া যায়। বাড়ীর জীলোকদের এণ্ডার করিয়া পরিষের বস্ত্র ছিনাইয়া লইয়া উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করাইয়া রাখে। অবশিষ্ট কাহিনী লিখিতে আমার সংকল্প উপস্থিত হইতেছে। এই লোকটিকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে। রামভদ্র ওটসের বিরুদ্ধে স্কীনারের আদালতে মামলা রুজু করে (ভূমিতেছি, স্কীনার ওটসের আর্মার), কিন্তু স্কীনার সংকল্পে ইহা ডিসমিস করিয়া দেন। আর একটি সম্মানিত পরিবার—লাউতারার সাহায্য করেক মাস পূর্বে ওটসের হস্তে অন্তরূপ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাহাদেরও ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত হয় ও শেষে পোড়াইয়া দেওয়া হয়, স্কীনারের আদালতে মামলা রুজু হইলে তিনি এটিও ডিসমিস করিয়া দেন। এইরূপ বহু ঘটনা ঘটয়াছে—আমি ব্যক্তিগত ভাবে যাহা লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে নীলচাষের ক্ষতির কথা ছাড়া দিলেও এ অঞ্চলে বনী-দরিদ্র, পাণী-পুণ্যাত্মা এমন লোক নাই যাহারা নীলচাষের দরুন ছাড়াও কোন-না-কোন রকম নির্যাতন ভোগ করে নাই।...

ইতিপূর্বে ওটস সাহেবের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাথরি, পানামি, শ্রীরাধপুর, বোগরু, রামচন্দ্রপুর, হরি-শঙ্করপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি একতাবদ্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নীল বুনিবার সময় এইরূপ আক্রমণ অনিচিত। আমি শুধু কয়েকটি বড় বড় গ্রামের নাম করিলাম, বহু ছোট ছোট গ্রামেও বিষম উত্তেজনা দেখা যাইতেছে।... ওটসের কথা ছাড়া এখন বিজলী কুঠীর ওমান সাহেবের কথা কিছু লিখিতেছি।

নীলচাষী ও জনসাধারণ ওমান সাহেবকে নীলকরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী বলিয়া মনে করে। তাহার কুঠী এবার প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, যদি-না মোলোনি তাহার সাহায্যার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের সকল ক্রমতা প্রয়োগ করেন। তাহার দেওয়ান ইশানচন্দ্র হকুম জারি করে যে, গ্রামগুলির সকল বাশবাড় কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং জীলোকগণকে কুঠীতে বসিয়া আনিতে হইবে যদি নীলচাষীরা নীল কাটিতে অস্বীকার করে। শত শত লাঠিরালা নিযুক্ত করিয়া বাশগুলি কাটিয়া ফেলা হইল, কিন্তু হকুমের দ্বিতীয় অংশ কার্যে পরিণত করিতে বাধা পাওয়া গেল। বাহারা দোমরা ছিল তাহারাও নীলকরদের বিরুদ্ধে যোগ দিল। মিঃ

টেলিফোন বিচারে ইশানচন্দ্রের তিন মাস কারাদণ্ড ও এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। শোলকোপা গ্রামটি বাংলাদেশের একটি খুব বড় গ্রাম। এখানকার পুরুষ অধিবাসীদের সংখ্যাই আট হাজারের উপর। ইহাদের অধিকাংশ দীর্ঘশ্রম মুসলমান। বিষ্টুদি, উমেদপুর প্রভৃতি গ্রাম কম বড় নহে। ওমান সাহেবকে এইরূপ আঠাশটি মোজার সঙ্গে যুক্তিতে হইতেছে।...

মীরগঞ্জ কুঠিতেও গোলমাল চলিতেছে। চাষীদের ফ্রোম এতটুকুও হ্রাস পায় নাই। গুজব, বিদ্রোহী জন সিপাহী লেখানে পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে সঠিক বলিতে পারিতেছি না।...মিঃ স্কীনার শিশিরবাবুকে আদালতে অভি-যুক্ত করিতে যাইতেছেন; কিন্তু আমি পুনরায় বলি তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, হালিডে সাহেব এখন আর বাংলাদেশ শাসন করিতেছেন না।”

৩

শিশিরকুমার বর্ষাকালে যশোহরের উত্তরে মাগুরা মহকুমা অঞ্চলে ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ও তাঁহার সহকারী-দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমটি হইল, ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’র যশোহর সংবাদদাতা সন্দেহে জেলা-কর্তৃপক্ষ অনবরত তাঁহাকে নানা ভাবে মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইতে চেষ্টা করিত। এজন্য তাঁহার দূরে দূরে থাকার প্রয়োজন ছিল। তবে দ্বিতীয় কারণই মুখ্য। এই সময় জেলা-কর্তৃপক্ষ মফস্বলে গিয়া ‘বিদ্রোহী’ প্রজাদের দিয়া নীলগাছ কাটাইবার জন্ত বিভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় লইতেছিলেন। বহির্জগতের নিকট সে সমুদয় ফাঁস করিয়া দেওয়া ছিল শিশিরকুমারের অভিপ্রায়। তিনি নিদারুণ বর্ষার মধ্যেও—যখন উত্তর অঞ্চল স্রবৎ হ্রদে বা ছোটখাটো সাগরে পরিণত হইয়াছে তখন জীবন-বিপন্ন করিয়াও নৌকাযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও নীলকরদের জিম্মাকলাপের বিষয় জানিয়া লইয়া ‘পেট্রিয়টে’ প্রকাশ করিতেছিলেন। ১৮৬০, ৫ই সেপ্টেম্বরের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ যে পত্রখানি বাহির হয় তাহা পাঠে জানা যায়, প্রচুর বারি-পাত হেতু শিশিরকুমার শোলকোপায় যাইতে পারিতেছেন না। সেখানে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ নীলকর এবং রায়তদের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ আসন্ন। এ বিষয়ের উল্লেখের পরে শিশিরকুমার এই মর্মে লেখেন:

“শোলকোপা-কুঠীর ওমান সাহেব কয়েক শত লাঠিয়াল কোপাড করিয়াছেন। গুজব, তিনি তাহাদের রিভলভার ও গোলাগুলি দ্বারা সজ্জিত করিবেন। ইহা অনেকটা অত্যাচার

সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তো পূর্বেই লিখিয়াছি যে, ওমান সাহেব গত কয়েক মাস ধরিয়াই গোলাবারুদ বন্দুক সংগ্রহ করিতেছেন, অস্ত্রাধারী—আত্মরক্ষা। এ সুযোগ হইতে তিনি হাতিবেন না। এই সংঘর্ষ যদি সত্যি বাবে তাহা হইলে ইহা মারাত্মক রকমের হইবে। হাজার হাজার সশস্ত্র লাঠিয়াল এক দিকে, অল্প দিকে ছয় হাজার মুসলমান—যাহারা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এক বার এই আসন্ন সংঘর্ষ প্রতিরোধে তৎপর হউন না?”

ইহার পরে শিশিরকুমার লেখেন যে, তিনি সদর যশোহর হইতে এখন চলিশ মাইল দূরে রহিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ২রা সেপ্টেম্বর যশোহর ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াও তিনি দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছিলেন। জেলা-কর্তৃপক্ষ নীলকরদের কতখানি সহায় হইয়াছেন তাহার নিদর্শন-স্বরূপ এই পত্রে শিশিরকুমার দারোগা কর্তৃক সন্তোষ প্রাপ্ত একখানা পরওয়ানারও উল্লেখ করেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই: “যখনই নীলকরদের নিকট হইতে আবেদন আসিবে যে, রায়তেরা সংঘবদ্ধ ভাবে নীলকরদের জব্দ করিবার জন্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হেথা-সেথা বিচরণ করিতেছে তখনই যেন তাহাদের বেআইনী জনতা বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়।” শিশিরকুমার লেখেন, “এরূপ পরওয়ানা গত ১২ই মার্চও একবার দেওয়া হয়। এখন পরওয়ানা পাঠাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য—যে সকল রায়ত নীলকরদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে না, সরকারী সহায়তায় তাহাদের আটক করিয়া রাখা।”

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্কীনারের কীর্ষিকাহিনীর কথাও শিশিরকুমার এই পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ওমান সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদয়তা। ওমানের বিরুদ্ধে গৃহদাহ, নরহত্যা প্রভৃতির যে সব অভিযোগ আসে তাহা তিনি নিঃসঙ্ক ভাবে ভিসমিস্ করিয়া দেন। মল্লিক-পুরের সংঘর্ষকে—যাহাতে এক জন নিহত ও চারি-জন গুরুতররূপে আহত হয় আর দুই জনকে একেবারে গাপ্ করিয়া ফেলা হয়—স্কীনার একটা সামান্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। একদিন দুই শত মোড়ল (গ্রাম্য নেতা) তাঁহার নিকট আবেদন লইয়া গেলে তিনি তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। আবার আবেদনকারীদের কারাগারে পুরিয়া রাখার কথা বলিয়াও ভয় দেখান। কালোপোলের মিথ্যা হামলা লইয়া কতই না জাঁক করা হইল। কুঠিয়াল চার্ডন সাহেব একে একে নাম করিয়া দেখাইয়া দিলে মিঃ স্কীনার উপেক্ষাশূন্য নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে চালান দিতে হুকুম দিয়াছিলেন। ইহার পর শিশিরকুমার লেখেন:

“এহেন স্কীনারকে ছোটলাট বাহাদুর মিঃ গ্রাণ্ট কতকাল আর এখানে বহাল রাখিবেন? মহাশয় গ্রাণ্ট কি যশোহরের হুজি লক্ষ অধিবাসীর মঙ্গল চান না? তাঁহার কি এই অভি-
মত যে, এক জন যেতাদের জন্ত লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণকার নিপীড়িত
হইবে?”

8

পরবর্তী পত্রে শিশিরকুমার ঘোষ নীলকরদের ‘নগদ
রুপেয়া’র মহিমার কথা ব্যক্ত করেন। এ পত্রখানি বাহির হয়
১৮৬০, ৩রা অক্টোবরের ‘হিন্দু পেট্রিয়ারে’। তিনি এই মর্মে
লেখেন,—কিরূপ লাভজনকভাবে টাকার ব্যবহার করিতে
হয় তাহা কেহ জানে তো এই নীলকরেরা। মামলাগুলিতে
তাঁহাদের জয়লাভের মূলে রহিয়াছে এই টাকা। গুরুতর
অপরাধে অপরাধী হইয়াও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদা-
লতের চক্ষে ধূলা দেওয়া, নিপীড়িতদের প্রতিশোধ লইতে
অনিচ্ছা, গবর্ণরদের মোহাক্ষর করিয়া রাখা, পুলিশকে পোষ
মানানো, জমিদারদের দমন করা, রায়তদের ঘাড় মটকাইয়া
দেওয়া—এ সমুদয়েরই মূলে রহিয়াছে এ যুগের যাত্রা—
রুপেয়া। নীলকরেরা টাকার ‘সদব্যবহার’ করিতে খুব ভাল
করিয়াই জানে। উৎকোচ, উপঢৌকন যে আকারেই দর-
কার হউক, কুঠীর সিন্দুক অমনি খুলিয়া যায়। গরিব চাপ-
রাশী, সুপুষ্ট সেরেসাদার বা অভিজাত সিবিলিয়ান—যখন
যাহার বাহা প্রয়োজন হয়, কুঠীয়াল সাহেব তখনই তাহা
সরবরাহ করিতে মুক্তহস্ত। নীলকুঠীর সাহেবেরা আগে
হইতেই তাহাদের টাকা জোগাইতে থাকে, কারণ কখন যে
তাহাদের সাহায্য দরকার হইবে তাহা তো আর জানা
নাই। যে-কোন সময় নরহত্যা বা অনুরূপ ঘটনা ঘটিতে
পারে, কাজেই পূর্ব হইতেই তাহাদের হাত করিয়া রাখা
আবশ্যক। যেমন, মামলাকারীরা সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিষ্টার
নিযুক্ত করিয়া রাখে।

ইহার পর শিশিরকুমার সাহুতি গ্রাম সম্পর্কে একটি
বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। কালোপোলের কুখ্যাত
প্রসন্ন দারোগার অনুরোধক্রমে স্কীনার এই গ্রামে এক
দল পুলিশ মোতায়েন রাখেন এই ওজুহাতে যে, সিন্দুর কুঠী
এবং সাহুতি গ্রামের লোকেদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধিবার
আশঙ্কা। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু অল্পরূপ। শিশিরকুমার বলেন,
সাহুতির মথুর আচার্য্য নামে একজন ধনী ব্যক্তির নিকট
হইতে কুঠীয়াল সাহেব জরিমানা প্রভৃতি বাবদে প্রায় পাঁচ
হাজার টাকা দোহন করে। ইহার পর মথুর আর এরূপ
দাসত্ব স্বীকার না করিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে কুঠীর বিরুদ্ধে
দাঁড়ান। নীলকর তাঁহাদের জব্দ করিবার জন্ত অনেক
চেষ্টা করে, যশোহর আদালতেও বহু মামলা রুজু হয়; কিন্তু

যখন দেখিল কিছুতেই গ্রামবাসীদের, বিশেষতঃ তাহাদের
নেতা মথুর আচার্য্যকে জব্দ করিতে পারা গেল না তখন
অল্প উপায় ধরিল। নীলকর ভাবিল, এক দল পুলিশ
যদি এখানে স্থিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের উপায়ে
গ্রামবাসীরা শায়েস্তা হইবে এবং নীলকুঠীর বশুতা স্বীকার
করিবে। প্রসন্ন দারোগাকে দিয়া পুলিশ আনাইবার চেষ্টার
ইহাই নিগূঢ় কারণ। স্কীনার অনেকবার উপরওয়ালার
দ্বারা ভৎসিত হইয়াছেন। এবারে পুলিশ স্থাপনের ঝুঁকি
নিজে না রাখিয়া নদীয়া বিভাগের-কমিশনার মিঃ লাসিং-
টনের নিকট কাগজপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৫

‘হিন্দু পেট্রিয়ারে’ শিশিরকুমারের শেষ পত্র বাহির হয়
১৮৬০, ১২শে ডিসেম্বর তারিখে। পত্রখানিতে এই বলিয়া
আক্ষেপ করা হয় যে, যশোহরের রায়তগণ পুনরায় ধ্বংসের
সম্মুখীন হইয়াছে। নীলকরেরা যে এক বিধা জমিতেও
নতুন করিয়া নীলচাষ করাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহা নহে,
কিন্তু অল্প দশ রকম উপায়ে তাহারা অত্যাচার উৎপীড়ন
করিতেছে। তাহাদের নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার মাত্রা পূর্ব-
গামীদেরও ছাড়াইয়া যায়। যে-সব ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম
প্রথম প্রজাদের সপক্ষ ছিলেন তাহারাও কিরূপে নীল-
করদের বন্ধু হইয়া উঠেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত শিশিরকুমার
উক্ত পত্রে এইরূপ দিয়াছেন :

“আমরা মাধুরায় মিঃ টেলরের আগমনে প্রথমে বড়ই
সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিবার পরই তাহার
অপকপাত ও চাষ্য ব্যবহারের পরিচয় পাই। এরূপ লোক
প্রেরণের জন্ত ছোটলাট বাহাদুরকে বিশেষ বজ্রবাদ দি’ এবং
আমরা ধানিকটা আশঙ্ক হই। কিন্তু দুঃখই যাহাদের লসার্ট-
লিখন তাহাদের ছোটলাট বাহাদুর কি করিবেন? নতুবা
এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আমরা একজন মাত্র লোকের
অনাচারের বিরুদ্ধে এমন করিয়া কাদিয়া মরিব কেন? বহু
দেশে যখন অভ্যাস আচরণের জন্ত রাজরাজতা পর্য্যন্ত সিংহাসন-
চ্যুত হন সেই সময়ে আমরা এক জন সামান্ত পুলিশ কর্মচারীর
সম্মুখে হাবা-বোবা হইয়া থাকি কেন?”

ন’হাটায় মিঃ সন্ডির বাড়ীতে টেলরকে দলে টানিবার
জন্ত এক জবর সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ওমান, ডুরাও
সন্ডি এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল। গত ১ই জ্যাজ
[২৪শে আগষ্ট ’৬০] এই সভা হয়। ইহার পর অবধি টেলরের
অন্ততঃ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। টেলর সাহেব
সেরেসাদার মদন লাহিড়ীকে অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করেন
—ছোটলাট কর্তৃক বরা না গড়িয়া, নীলকরদের সাহায্য করি-
বার সম্পূর্ণ নিরাপদ উপায় কি আছে।

মধুর লাভীকে বুঝাইলেই ইহার সত্যতা নির্ণীত হইবে।
ভায় মাসের ঐ স্মরণীয় সভার দিন হইতে মিঃ টেলর প্রায়ই
চার-পাঁচ জন নীলকর পরিবৃত্ত হইয়া ঘোরাফেরা করিতেছেন।
তাহার গৃহ একটি স্বীকৃত নীলকর সভায় ("Planter's
Association") পরিণত হইয়াছে। প্রায়ই তিনি এই সকল
বন্ধুর সঙ্গে খামাপিনা করিতে যান। তখন অবশ্য তাহার ঘর
খালি থাকে।"

শিশিরকুমার ইহার পর বলেন যে, রায়তেরা নদীয়া
বিভাগের কমিশনারের নিকট টেলর ও নীলকরদের যোগ-
সাজসে অত্যাচার-উৎপীড়নের বিষয় জানাইয়া বাংলায় এক
দীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছে। সতি, ওমান, ডুরাও
প্রমুখ নীলকরদের ইজিত মাত্রেই ম্যাজিস্ট্রেট টেলর রায়ত-
দের গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিতেছিলেন। শিশিরকুমার
লিখিলেন :

"চুক্তিভঙ্গ আইনের মেয়াদ (মাত্র ছয় মাস) ফুরাইবার
উপক্রম হইলে নীলকরেরা সাততাত্তাতি রায়তদের বিরুদ্ধে
কোঁকদারী আদালতে কতকগুলি মামলা রুজু করেন, আর
মিঃ টেলর ইহার প্রত্যেকটিতেই রায়তদের দোষী সাব্যস্ত
করিলেন। ইহা ছাড়া তাহার একলাসে ৪র্থ আইন অনুসারেও
বহু মামলা রুজু হয়; ইহার প্রত্যেকটিতেই মিঃ টেলর নীল-
করদের অহুকুলে ডিক্রী দেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ম্যায়-
পন্নায়ণ জেলা জজ মিঃ বেলী শেষ পর্যন্ত সুবিচার করিবেন।
তিনি ইতিমধ্যেই প্রথম মামলার মিঃ টেলরের রায় বাতিল
করিয়া দিয়াছেন। এই মামলার রায়ভেদা হাজার বিধা জমি
হইতে বেদখল হইয়াছিল। ছোটলাটের খুবই সুনাম ভাঙিতে
পাই। তিনিও কি অবশেষে বদলাইয়া গিয়াছেন, তা বিভিন্ন
নীল-অঞ্চল হইতে যে ক্ষম্বনের রোল উঠিতেছে তাৎপরি মনঃ-
সংযোগ করা তাহার একার পক্ষে অসম্ভব? মিঃ টেলরের
জুড়ি মিঃ ফল্‌কন সম্বন্ধে কিছু লিখিবার এখন সময় নাই।
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ জেলায় এই রকম দুই
জন ম্যাজিস্ট্রেটকে বাহাল রাখিয়া আমাদেরকে ইহাই বুঝাইয়া
দেওয়া হইতেছে নাকি যে, আমরা একটি ভিন্ন জাতি এবং
স্বাধীন জাতির ম্যায় ব্যবহার আমরা কাহারও নিকট হইতে
প্রত্যাশা করিতে পারি না? উপরোক্ত রায়তদের কয়েক
জনকে ছয় মাসের জেল দেওয়া হইয়াছে। এক শত টাকা
জরিমানা দিলে 'আসামী'রা সন্তুষ্ট হইতে রেহাই পাইতে
পারে।"

১৮৬০ সনের শেষ দিকে এরূপ অত্যাচার-অনাচার
চলিলেও, এই বৎসরের নীলকরদের দৌরাআর বিষয় নীল
কমিশনের সম্মুখে, বিশেষতঃ সংবাদপত্র মারফত বেরূপ সর্বত্র

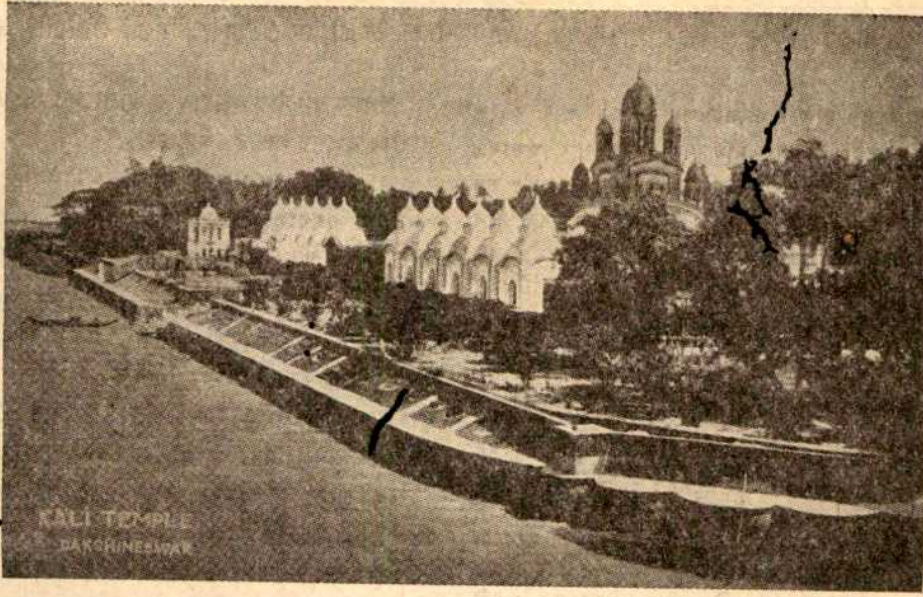
জানা জানি হইল তাহাতে তাহাদের মর্যাদা আর রহিল
না। ইহার পরেও বহু বৎসর নীলচাষ বঙ্গদেশে বিত্তমান
ছিল, নীলকরের অত্যাচারও কম-বেশী নানা স্থানে চলে,
কিন্তু তাহারা পূর্বগৌরব ও প্রতিপত্তি কখনও ফিরিয়া
পায় নাই। প্রজাকুল নীলকর সমাজের দৌরাআর তিষ্ঠিতে
না পারিয়াই এরূপ সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের এই
সংঘবদ্ধ প্রয়াস বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অভিনব। নীল-
করদের ও জেলা-শাসকগণের ব্যাপক অত্যাচার-উৎপীড়নে
বাঙালীজাতির স্নানদেহ নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। প্রায়
পনের বৎসর পরে ১৮৭৪, ২২শে মে সংখ্যা 'অমৃত বাজার
পত্রিকা' ইংরেজী স্তম্ভে (তখন 'পত্রিকা'র ইংরেজী বাংলা
দুই অংশ ছিল) শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৬০ সনের নীল-
হাঙ্গামা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :

"It was the indigo disturbance which first taught the
natives the value of combination and political agitation:
Indeed it was the first revolution in Bengal after the
advent of the English. If there be a second revolution
it will be to free the nation from the death grips of
the all-powerful police and district Magistrates.
Nothing like oppression! It was the oppression which
brought about the glorious revolution in England and
it was the oppression of half a century by indigo
planters which at least roused the half-dead Bengalee
and infused spark in his cold frame."*

অর্থাৎ, নীল-হাঙ্গামাই সর্বপ্রথম এদেশীয়দিগকে সংঘ-
বদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করিতে শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ
ইংরেজদের আগমনের পরে বাংলাদেশে ইহাই প্রথম
বিপ্লব। দ্বিতীয় বার যখন বিপ্লব দেখা দিবে তখন পুলিশ
ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের অত্যাচার হইতে আমরা রেহাই পাইতে
পারিব। অত্যাচারের মত কিছুই নহে! অত্যাচারের
ফলে ইংলণ্ডে সেই গৌরবময় বিপ্লব আসিয়াছিল; বাংলা-
দেশেও নীলকরদের অর্ধশতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের দরুন
অধর্মুত বাঙালী জাতি গা-ঝাড়া দিয়া উঠে এবং তাহার
অগাধ দেহে আবার চেতনার সঞ্চার হয়।

* কার্তিক ১৩৫৬ সংখ্যা 'প্রবর্তক' উদ্ধৃত। এই সংখ্যা
'প্রবর্তক' হইতে বৈশাখ ১৩৫৭ সংখ্যা পর্যন্ত ছয়টি প্রবন্ধে
শিশিরকুমার ঘোষ সম্বন্ধে প্রথম যুগের 'অমৃত বাজার পত্রিকা',
স্থির সৌদামিনীর স্মৃতিলিপি (এখনও অপ্রকাশিত), শিক্ষা-
বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট, কবিবর রবীন্দ্রচন্দ্র সেন, রসরাজ
অমৃতলাল বসু প্রমুখ সমসাময়িক ব্যক্তিদের রচনা ও উক্তি
এবং শিশিরকুমারের নিজস্ব গ্রন্থাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর
করিয়া আমি আলোচনা করি।

—লেখক



১২৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত পরমহংসদেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন কালীমন্দির, অষ্টশাল ও দ্বাদশ শিবালয়

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যাতীর্থ

গ্রাম হিসাবে কলিকাতা নূতন নহে। এখানকার ঘোষাল বংশের ইতিহাসপ্রসঙ্গে কুলগ্রহে আট শত বৎসরাদিক প্রাচীন এই গ্রামটির উল্লেখ আছে।* কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায়।† এখানে নগর গড়িয়া উঠে প্রায় দুই শত ষাট বৎসর পূর্বে হইতে; কিন্তু নগর পত্তনের অনেক আগেই এখানে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

এখানকার বাঙালী জাতির প্রাচীন মন্দিরগুলিতে প্রধানতঃ তিনটি মূল রীতি দেখা যায়—(ক) নিজস্ব, (খ) মিশ্র, (গ) বৈদেশিক। এই মূল রীতিত্রয়ের সমগ্র উপরি-

ভাগগুলি এখানে দেখা যায় না।* এখানকার মন্দিরগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাদের গাত্রে অলঙ্করণ-বাহুল্য কিংবা পুত্তলিকাবিন্যাস বিরল। নিজস্ব রীতির ত্রিচূড় অষ্টশাল মন্দিরই এখানে বেশী। মিশ্ররীতির পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের সংখ্যা তদপেক্ষা কম। একরত্ন বা আলগোছ টুকী নাই। বৈদেশিক রীতির মধ্যে উত্তর ভারতীয় ও বিলাতী পদ্ধতির দুই-একটি আছে। উৎকলীয় আদৌ ছিল না। বর্তমানে নিমন্তলা ষাট স্ট্রীট নিবাসী রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একটি খাঁটি উৎকলীয় রীতির মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমার আলোচনা বেশীর ভাগ মধ্য এবং উত্তর কলিকাতার প্রাচীন ও লিপিবদ্ধ মন্দিরগুলিতেই নিবদ্ধ।

শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের লেনে কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির অবস্থিত।† উহা অষ্টশাল রীতির ত্রিচূড় ও আমলাযুক্ত একটি বিরাট মন্দির। মধ্যে তিনটি কক্ষের কেন্দ্রস্থটিতে বিশাল শিবলিঙ্গ ও পার্শ্বের দুইটির উত্তরস্থটিতে ধাতুময়ী দশভুজা দুর্গা এবং দক্ষিণ দিকস্থটিতে বাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে। দুই পাশের কক্ষ দুইটির দ্বারের উপর তিনটি আধুনিক লিপি ও মধ্যের শিবগৃহের দ্বারশীর্ষে প্রাচীন লিপি বর্তমান। লিপিটি ধাতুফলকে উৎকীর্ণ;

* “পশুপতির সন্তানগণ কলিকাতার ঘোষাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং কলিকাতাকে আমরা অনেক প্রাচীন গ্রাম বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি। অন্ততঃ নূনকালে আট শত বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন”—সম্বন্ধ নির্ণয় চতুর্থ পরিশিষ্ট পৃ. ২৭। এই পশুপতি রাজা আদিশুর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্ততম বাৎস গোত্রীয় ছান্দস হইতে অষ্টম পুরুষ।

† “কালীপাড়া মহাশয়ান কলিকাতা কুঠিমান, দুই কূলে বসাইল হাট। পাষাণে রচিত ষাট, দুই কূলে ষাটী ঠাট, কিঙ্করে বসায় নানা ষাটী।”—ভাগীরথীর শুটদর্শন, কবিকঙ্কণ চণ্ডী। পৃ. ২৯৫। বদবাসী সংস্করণ।

- ইহার শেষভাগ আবৃত থাকায় পড়িতে পারা যায় নাই।
লিপিটি এই :

শ্রীশ্রীমহেশ্বর ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠা সন ১০৬১ ভাং ৩১শে
চৈত্র শ্রীমন্মহারাম সেন দাস সাং দীর্ঘ গঙ্গা হাং সাং হুভানটী
সভাবাজার। শ্রীতুলসী মন্দির প্রতিষ্ঠা উক্ত ঠাকুর বাড়ী সন
১২৬১ সাল ৩১শে চৈত্র ভদ্রপদ প্রপৌত্র শ্রীমঙ্গল সেন দাস
প্রসিদ্ধ হাল কলিকাতা সভাবাজার। শ্রীশ্রীসীতানবমী ব্রত
স্থাপন (নীচের দুই লাইন পড়া গেল না)।*

নন্দরাম সেকালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান
ছিলেন। মন্দিরের নিকট দশ বিঘা জমির উপর তাঁহার
সাততলা বিরাট ভবন ছিল। সেকালের কলিকাতায়
“নন্দরাম সেনের বাড়ী” একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া-
ছিল। বর্তমানে তাঁহার অন্যতম বংশধর শ্রীকমলাকান্ত সেন
নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটে বাস করেন।

বহুবাজারে ১৮নং কেনডারডাইন লেনে মিশ্ররীতির
তিনটি মন্দির আছে। যাকেরটি নবরত্ন। পাশের দুইটি
পঞ্চরত্ন। মন্দির তিনটির চূড়াগুলি বহু খাঁজযুক্ত। তিনটিই
শিবমন্দির। পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন শিবমন্দির বাংলায় খুব কমই
আছে। এই কলিকাতাতেই মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিংপুর
রোড সংযোগের নিকট আর একটি নবরত্ন শিবমন্দির
অবস্থিত। মেদিনীপুরের কানাসোল গ্রামের কাড়েশ্বরের
মন্দিরটিও নবরত্ন। শিবমন্দির প্রধানতঃ অষ্টশালই দেখা
যায়, এইগুলি তাহার ব্যতিক্রম।

উক্ত মন্দির তিনটি কোর্ট উইলিয়মের দেওয়ান ত্রিলোক-
রাম পাকড়াশী নির্মাণ করাইয়া ইহাদের সম্মুখে একটি বৃহৎ
জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। বর্তমানে জলাশয়টি ভরাট
করাইয়া বস্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রাচীন মন্দিরগুলি
হইতে স্থানটির নামও মন্দিরতলা হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে
কষ্টিপ্রস্তরের স্তম্ভ ৩৮ বৈশ ও ৫২ উচ্চতার শিবলিঙ্গদ্বয়
বর্তমান। পাকড়াশী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সর্বমঙ্গলা
দেবী ও জামাতা ফুলিয়া মুখুটিবংশীয় রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের
বংশধর ৬১-এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীদত্তীশচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায়, বি-এল, মহাশয় মন্দিরগুলি সংস্কার করাইয়া
উহাদের পশ্চিমেরটির গায়ে নিয়ের লিপিস্থ বর্ধন-ফলক
স্থাপন করেন।

“In 1765 this Navaratna Temple of Maheswaram
has been founded by Dewan Trilokram Pakrasy, the
ancestor of the present Sevait Satish Mukhopadhyaya,

• পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি-এ, মহাশয় এক সময়
লেখককে বলিয়াছিলেন, ঐ মন্দিরলিপিতে ভুল আছে।
নন্দরামের দুই শত বৎসর পরে তাঁহার প্রপৌত্রের সময় দেখিয়া
লিপি অজান্তে বদলে বলিয়া দেন হয়।

B.L., of 61 Wellington Street, Calcutta, who repaired
the temple.”

পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজ্যপালের সহিত উক্ত মুখো-
পাধ্যায় বংশের সম্পর্ক আছে।

৩১.২নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে নীলমণি বিদ্যালঙ্কার
নীলকণ্ঠ শিবালয় সন ১১৭৮ সালে স্থাপন করেন।
প্রাচীন মন্দির এখন লুপ্ত। নূতন মন্দিরটি ছাদযুক্ত
গৃহ।

শোভাবাজারে রাজানবরত্ন ষ্ট্রীটে রাজা শ্রাব রাধা-
কান্ত দেবের দুর্গামণ্ডপের পশ্চিমে যে নবরত্ন মন্দির আছে
তাঁহার বক্রীয় মিশ্র, মিশরীয় ও তুরস্কীয় রীতির বিচিত্র
সংমিশ্রণ দেখা যায়। চূড়াগুলি কতকটা পিরামিডের ধরণের,
উহাদের শীর্ষে তুরস্কদেশীয় খাঁজকাটা ক্ষুদ্র গম্বুজ, উপরের
চক্রগুলি ষট্‌কোণ। মন্দিরগায়ে কতকগুলি ফলকে মিশরীয়
ফিফ্‌স্ ধরণের পুতলিকা আছে, কিন্তু ইহাতে কোন লিপি
নাই। বর্তমান রাজবংশধরগণের কেহ কেহ মনে করেন
উহা রাজা রাধাকান্ত দেবের পূর্বে নির্মিত। রাজা বাহা-
দুরের জন্ম ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ও মৃত্যু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ—ইহা
হইতে মন্দিরের বয়স কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।
পূর্বোক্ত রাজবংশীয়গণ মন্দিরে মিশরীয় প্রভাব স্বীকার
করেন। এইরূপ আর একটি মন্দির চিংপুরে সিদ্ধেশ্বরীতলার
পশ্চিমে আছে। উহাতে ঐ সকল মিশ্রণের সহিত জোড়-
বাংলা বা দ্বিশাল ধরণের ছাদও বর্তমান।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের শেষাংশের প্রাচীন মসজিদটির
উত্তরে মদনমোহন দত্তের পুত্রগণ প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ অষ্টশাল
মন্দির অবস্থিত। ইহার শিবলিঙ্গ কলিকাতার মধ্যে বৃহত্তম।
মন্দিরটির পশ্চিম দ্বারের শীর্ষে কৃষ্ণপ্রস্তরে কোদিত নিম্নোক্ত
সংস্কৃত লিপি আছে। লিপিটি বন্ধাকরে, অক্ষরগুলি সেকালে
হস্তলিপির ধাঁচের :

“অদৌষধীশ ধরণীধরলিঙ্গরাজি।

প্রখ্যাত শাক সময়ে পিতৃরাজৈরভৎ।

সংস্থাপিতঃ মদনমোহন দত্ত-

পুত্রৈর্দুর্গেশ্বরায় শিবলিঙ্গমস্থুং হুসৌধে।

মর্থ :—পিতা মদনমোহন দত্তের আদেশে তাঁহার
পুত্রগণ ১৭১৬ শকাব্দায় উত্তম দৌড়ে দুর্গেশ্বর নামক শিব-
লিঙ্গ স্থাপন করেন। লিঙ্গে পাদুপীঠে “শ্রীরসিকলাল দাশ
দত্তঃ শ্রীহরলাল দাশ দত্ত সন ১২০১ সাল” ও “শ্রীগদাধর
দাস ভাস্করঃ” নামগুলি উৎকীর্ণ আছে। এই বিশাল
লিঙ্গের স্থপতি যে একজন বাঙালী ইহা গৌরবের বিষয়।
নিকটে মদনমোহন দত্ত লেন। ইনি হাটখোলার দত্তবংশীয়
প্রসিদ্ধ জাহাজ-ব্যবসায়ী ছিলেন। খ্যাতনামা রামজলাল

সরকার ইহারই প্রসাদে লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া স্বীয় বুদ্ধি-বলে ব্যবসায় চালাইয়া পরে বিরাট ধনী হইয়াছিলেন। মন্দিরচূড়া হইতে একটি বৃহৎ শৃঙ্খল লগ্নমান।

স্বর্গবাগান মন্দির ষ্ট্রীটের যে মন্দিরটির শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইবার পর ১৯২৬ সালে কলিকাতার কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তাহা আধুনিক উত্তর-ভারতীয় রীতিতে নির্মিত। মন্দিরগাত্রে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত লিপিটি এই :

শকাব্দ ১৭২৫।

শাকে বাণ যুগাঙ্কিচন্দ্র গণিতে মেঘোনবিশেষ দিনে।

বারেছমিস্তম্ভ বিপ্রকুলজঃ সৌম্য দশম্যাং তিথৌ।

ত্রিভামাতিবকো দদৌ স্বরধ্বনী ক্লেদোপকণ্ঠে শিব।

ঐশ্বর্য পূণ্যবন্তো মুদা বরিতয়োঃ পিত্রোঃ স্বয়ংব্রতঃ ॥

লিপিপ্রস্তরে উৎকীর্ণ। মর্ম্ম :—ত্রিভামা নামক ব্রাহ্মণ-পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় মাতা ও পিতার প্রীতির জন্য গঙ্গাতীরে ১৭২৫ শকাব্দের বৈশাখ মাসের উনিশে মঙ্গলবার দশমী তিথিতে শিব স্থাপন করেন। নূতন মন্দিরটি ছোট্টোলাল কানোড়িয়ার ধর্ম্মপত্নী ত্রিভামাকীবাদী সন ১৩৩২, ৬ই কার্তিক প্রতিষ্ঠা করেন।

ঠানঠানিয়া কালীমন্দিরের পাশে পশ্চিম দিকে যে অষ্টশাল শিবমন্দিরটি আছে, উহার অস্পষ্ট লিপি :

ত্রিমন্দিরে সম্ব্যাপি ত্রিমং পুণ্ডীখরঃ শিবঃ।

মন্দিরে ত্রিপ্রিয়াদাত্তা শকাব্দে হস্তিযুগে বসৌ ॥ (?)

শকাব্দ ১৭২৮। সন ১২১৩ সাল, ১ বৈশাখ।

মর্ম্ম :—ত্রিমন্দিরে ত্রিপ্রিয়া দাসী উক্ত শকে ত্রিমং পুণ্ডীখর শিবস্থাপন করেন। নিকটে ত্রিসিদ্ধেশ্বরী কালী-মাতার মন্দির শব্দর ঘোষ কর্তৃক ১২১০ সালে নির্মিত হয়। উহাতে বাংলা ভাষায় “ত্রিশ্রীদুর্গা। শব্দরের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে” দুই পংক্তিতে লিখিত আছে।

কিছু দূরে মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের একটি অষ্টশাল শিব-মন্দিরে একরূপ বাংলা পদ্যাংশ :

“ত্রিঐশ্বর্যকাজীউর ত্রিচরণ ভরসা।

ত্রিমুখদন সেনের হৃদয় মাঝে হয় বিরাজে।

সন ১২৫৩ সাল।”

গড়পারেব একটি অষ্টশাল শিবমন্দিরের ১২৫৭ সাল লিখিত। একরূপ বেধুন রো'র কালীমন্দিরে বাংলা পদ্য :

“ত্রিঐশ্বর্যকাজী জয়তি।

কালিকে চরমকালে তব রাঙ্গা পায়।

ঈশ্বরের মন-প্রাণ সকলী মিলায় ॥

শকাব্দ ১৭৮৭, সন ১২৭২ সাল।”

মন্দিরটি নবরত্ন ; সোপানে ত্রিঈশ্বরচন্দ্র নান ক্ষোদিত। প্রধান ফটকের দুই পার্শ্বে অষ্টশাল শিবমন্দিরদ্বয় অবস্থিত।

আমহাষ্ট্র ষ্ট্রীট ও সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের ৩কেন্দারনাথ শিবের অষ্টশাল সন ১২৭৫ সালের ২রা মাঘ নির্মিত।



কলিকাতা বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ ত্রিঐশ্বর্যভারিণী মন্দির-সহ দুইটি অষ্টশাল শিবমন্দির [কটো—পিছন দিক হইতে কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের একটি অষ্টশাল শিবমন্দিরের লিপি :

“মহেশ্বর মহেশোৎসব তৎপদাকাজিগা সদা।

প্রতিষ্ঠিতঃ ত্রিমহেশচন্দ্র সেনেন ভক্তিভঃ ॥

সন ১২৯০ সাল। মহেশ-পদাকাজী—ত্রিমহেশ সেন কর্তৃক মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ॥

গ্রামবাজার বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ লিপিহীন নবরত্ন কালী-মন্দির ও অষ্টশাল শিবমন্দিরদ্বয় এবং নাট্যমন্দির উক্ত বলরাম ঘোষের ভ্রাতৃপুত্র, দেওয়ান তুলসীরাম ঘোষের পৌত্র হরপ্রসাদ ঘোষের সহধর্ম্মিণী কর্তৃক সন ১২৯৫ সালের ৫ই বৈশাখ, বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবরত্ন মধ্যে হরপ্রসাদ কর্তৃক স্বপ্নদৃষ্ট তৈলচিত্রাভূষায়ী পূর্ণাঙ্গ ত্রিভবভারিণী দক্ষিণা কালীমূর্তি কষ্টিপাথরে ও মহাকাল মর্্ম্মরে নির্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত। ঐ সঙ্গে ত্রিধর শালগ্রামও আছেন। অষ্টশাল দুইটিতে ত্রিহরপ্রসন্ন ও ত্রিহরেশ্বর লিঙ্গদ্বয় বর্ত্তমান। হরপ্রসাদ অকালে পরলোকগমন করিলে তাঁহার পত্নী দয়াময়ী দাসী ও পুত্র সারদাপ্রসাদ ঘোষের তত্ত্বাবধানে মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। একরূপ স্থাণম মূর্তি ও মন্দির বঙ্গে বিরল। সারদাপ্রসাদের পুত্র ত্রিভূপেন্দ্র

নাথ ঘোষ পৈতৃক রীতি অনুযায়ী দেবসেবায় বৃত্তগীল।
মন্দিরগুলি তাঁহারা সংস্কার করাইয়াছেন।



পটলডাঙ্গা বেনিয়াটোলায় প্রাচীন অষ্টশাল শিবমন্দির

বহুবাজার কপালীটোলায় কালীমন্দির অষ্টশাল ও উচ্চ
পীঠের উপর গঠিত। উহার লিপি :

“শ্রীকালীমাতা জয়ন্তি।

দেবায়ং শ্রীরাধকৃষ্ণ দাস ও ৮রামকৃষ্ণ দাস।

২৯শে ফাল্গুন সম ১২৯৬ সাল।”

পটলডাঙ্গা, বেনিয়াটোলায় প্রাচীন অষ্টশালের পুরাতন
দুইটি লিপির ফলক আচ্ছাদিত প্রায় হইয়া ভূপাঠ্য হইয়াছে।
নিম্নফলকের “শ্রীযুত জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (?) ও শ্রীরমা-
কান্ত” নামগুলি কষ্টে পড়া যায়। এই শিবমন্দিরের কুটিমে
যে আধুনিক মন্দির-ফলক আছে তাহার লিপি :—৮দারদা-
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী বাৎ ১৩৫১। শক ১৮৬৬
বিঃসঃ ২০০১। ইং মে ১২৪৪-এ সংস্কার করেন। অপর
কোন মন্দিরে এরূপ সকল প্রকার অর্থ ব্যবহার হয়
নাই। মন্দিরের বর্তমান মালিক বেনিয়াটোলা নিবাসী
শ্রীধরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দেবতার বহু অলৌকিক কাহিনী
অবগত আছেন।

কলিকাতার নানাস্থানে যুগ্ম বা ততোধিক শিবমন্দির
আছে। উহাদের কোনটিতেই লিপি দেখি নাই।
আহিরীটোলায় প্রাচীন অষ্টশালের লিপি বর্তমান বিদেশী
মালিকের কুতিতে আবৃত। শোভাবাজারের গঙ্গার নিকটে
একটি প্রাচীন স্ব-উচ্চ, খাঁজযুক্ত নবরত্ন আছে। উহাতে
কোন দেবতা বা লিপি নাই। বাগবাজারের মোড়ের
অষ্টশালগুলিও প্রাচীন। জগন্নাথ ঘাটের জগন্নাথ মন্দিরটি
পাইকপাড়া রাজবংশের লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। নগরের সকল
মন্দিরের আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

মন্দিরের মত কলিকাতার বহু প্রাচীন চকমিলান বাটার
উত্তর বা পূর্বাংশে চণ্ডীমণ্ডপ আছে। এরূপ মণ্ডপযুক্ত
চকমিলান প্রাশাদের চারিদিকের দুই তলেই অলিন্দে যুগ্ম
স্তম্ভশ্রেণী থাকে। মণ্ডপে উঠিবার সোপান কোথাও মধ্য-
স্থলে গোলাকার, কোথাও বা সমগ্র মণ্ডপব্যাপী চতুর্কোণ।
মণ্ডপের কুটিমে দুই সারি স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভ আবার বহু
ক্ষুদ্র স্তম্ভের সমষ্টি। কুটিমের মধ্যস্থলে উত্তর বা পূর্ব-
প্রান্তে দেবতার বেদী। দুই তলেই দুই পাশে চারিটি
বাতায়ন ও দ্বারযুক্ত কক্ষ। নীচের দক্ষিণের বা পূর্বেরটিতে
দেবীর বোধন হয়। অন্য দিকেরটি পূজকের বাসা বা
ভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত। দ্বিতলের বাতায়ন হইতে ললনা-
গণ পূজা দেখেন। কোন কোন মণ্ডপের নিম্নাংশেও
কয়েকটি কক্ষ থাকে। ছাদের কার্গিসের কড়ির প্রান্তে
স্থল দাক্ষিণ্যের নিদর্শন দেখা যায়। ইহাই বাংলার
প্রাচীন সৌধনির্মাণ রীতি। কোন কোন মণ্ডপে লিপিত
আছে। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে প্রিন্স দ্বারকানাথের
বসতবাটার মণ্ডপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমলে “ও তদ্
বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি বৈদিক বচনসমূহ উৎকীর্ণ
হইয়াছে। তদবধি এখানে আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মে
ব্রহ্মোপাসনা চলিয়া আসিতেছে। ১১ই মাঘ এখানকার
প্রাঙ্গণেই মাঘোৎসব হয়। দ্বারকানাথের আমলে মণ্ডপে
সাড়ঘরে দুর্গোৎসব হইত।

১০নং নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের মিত্রবাটার মণ্ডপে নিম্নোক্ত
লিপিটি আছে :

“আধ্যমিজেণ মিজেন রাধাকৃষ্ণেণ বা পুরা। প্রবর্তিতা
মহাপূজা শারদীয়ায় মণ্ডপে ॥ অবিচ্ছিন্ন চ বা তত্ত্ব পুত্র
পৌত্রাদিভিঃ কৃত্য। জগদদ্বা প্রসাদেন প্রাপ্তা সাত্ত শতং সমাঃ ॥
১৮৩১ শকাব্দাঃ ॥

মর্মে :—রাধাকৃষ্ণ মিত্র যে দুর্গোৎসব প্রবর্তন করেন,
তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ কর্তৃক চলিয়া
বিশ্বমাতার রূপায় ১৮৩১ শকে শতবর্ষ পূর্ণ করিল। এই
মিত্রবংশ ধনকুবের রামজুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ জামাতার
ধারা।

উত্তর কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত
মন্দিরগুলিও প্রাচীন রীতির। উহার নিকটে আরও এক
স্থানে দ্বাদশ শিবালয়াদি আছে।

মহানগরীর এই সকল মন্দির ও মণ্ডপ বাঙালীর প্রাণের
দেবতার পীঠ। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের কল্যাণকর
রুচির পরিচয় বহন করিতেছে। বর্তমান পরিবেশে
এগুলির উপযোগিতা অস্বাভাবিক করা কঠিন। জাতি আবার
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠুক।

পল্লী-অঞ্চলের মেয়েদের উপার্জনের পথ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতা শহরের উপর ছোট-বড় অনেক মহিলা সমিতি বা মহিলা-পরিষদ আছে। ইহাদের কোন শাখা-প্রশাখা পল্লী অঞ্চলে আছে কিনা জানি না এবং যদি থাকে তাহারা পল্লী-অঞ্চলের মেয়েদের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য কি ভাবে চেষ্টা করিতেছে অথবা তাঁহাদের কি ভাবে সাহায্য করিতেছে সে সম্বন্ধে নিজের কোন জ্ঞান নাই।

বঙ্গ-তেত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন ফরিদপুরে ছিলাম তখন সেখানকার মহিলা-সমিতির কার্যাবলীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ফরিদপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (অধুনা স্বর্গত) মিঃ জে. এন. রায়ের পত্নী শ্রীমতী কনকলতা রায় এই মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা ছিলেন; ইনি পরলোকগত ডাঃ পি. কে. রায়ের কন্যা।

ফরিদপুর এবং অন্যান্য বহু জেলার পল্লী অঞ্চলের জীলোকগণ পুরাতন কাপড় দ্বারা যে সকল কাঁথা প্রস্তুত করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সকল কাঁথা পল্লী অঞ্চলের জীলোকগণের “শিল্পীমনে”র যথেষ্ট পরিচয় দেয়। পুরাতন কাপড়ের পাড়ের সূতার সাহায্যেই এই সকল কাঁথা প্রস্তুত হয়। কাঁথাগুলির উপর নানা রঙের নানা রকমের চিত্র থাকে। অনেক সময়ে দূর হইতে কোন কোন কাঁথাকে ‘শাল’ বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল কাঁথা দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে এবং দেশ-বিদেশের বহু প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ করিয়াছে। বাংলা-দেশের পল্লী-অঞ্চলের “কাঁথা-শিল্পের” কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে পল্লী অঞ্চলের বহু শিল্পকলা যেমন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে “কাঁথা-শিল্প”ও সেই অবস্থায় পৌছিয়াছে।

এই সকল কাঁথা দেখিয়া শ্রীমতী কনকলতা রায়ের মনে হয় যে, যে সকল জীলোক এইরূপ কাঁথা প্রস্তুত করিতে পারেন তাঁহারা অনায়াসেই নূতন কাপড় এবং নূতন সূতার সাহায্যে নানা রকম ডিজাইনের ‘বেড কভার’ (বিছানার ঢাকনি), ‘টেবিল ক্লথ’ (টেবিলের ঢাকনি) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন। ফরিদপুরের মহিলা সমিতির কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান কাজ ছিল—পল্লী-অঞ্চলের দুঃস্থ জীলোকগণকে ‘বেড কভার’, ‘টেবিল ক্লথ’ প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজ শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপার্জনের পথ স্বগম করিয়া দেওয়া, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বিনী করা। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের শিল্প-বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিষ্টার এ. টি ওয়েষ্টন শ্রীমতী কনকলতা রায়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরিদপুর মহিলা সমিতির অধীনে এক জন মুসলমান যুবক

নিযুক্ত হয়। ইহার নাম ছিল মকবুল মুখা। শিল্প-বিভাগ হইতে ইনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেন। আমার উপর পল্লী-অঞ্চলের দুঃস্থ জীলোক নির্বাচনের ভার ছিল।

শ্রীমতী কনকলতা রায় তখন কাপড়, নানা রঙের নূতন সূতা এবং নানারকমের ‘ডিজাইন’ আঁকিয়া মকবুলকে দিতেন। ‘বেড কভার’ বা ‘টেবিল ক্লথের’ কি ‘সাইজ’ হইবে, প্রত্যেকটি কি ‘ডিজাইনের’ হইবে ইত্যাদি তিনি মকবুলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন। পল্লী-অঞ্চলের নির্বাচিত জীলোকগণের মধ্যে মকবুল কাজ বটন করিয়া দিতেন এবং বটনের সময় কি ভাবে কাজ হইবে তাহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া বলিতেন। জীলোকগণ যখন কাজ করিতেন, মকবুল যাইয়া দেখিতেন কাজ ঠিক-ভাবে হইতেছে কিনা এবং প্রত্যেকের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যেকের কাজ শেষ হইলে মকবুল তাহা সংগ্রহ করিয়া শ্রীমতী কনকলতা রায়কে দিতেন। তখন তিনি প্রত্যেক কাজে কত কাপড় লাগিয়াছে, কত সূতা লাগিয়াছে এবং প্রত্যেককে কাজের জন্ত কি পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহা হিসাব করিয়া প্রত্যেক জিনিষের (বেড কভার বা টেবিল ক্লথ) মূল্য নির্দ্ধারিত করিতেন। এই সকল জিনিষ কলিকাতায় হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনে প্রেরিত হইত এবং তাহারাই উহার প্রধান বিক্রেতা ছিল। ইহা ব্যতীত শ্রীমতী কনকলতা রায় তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বহু জিনিষ নিজে বিক্রয় করিতেন। যে সকল উচ্চ সরকারী কর্মচারী ফরিদপুরে যাইতেন তাঁহারাও শ্রীমতী কনকলতা রায়ের নিকট হইতে না কিনিয়া পারিতেন না। এই কাজের ফলে ফরিদপুর শহরের নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চলের প্রায় দুই শত জন দুঃস্থ জীলোক মাসিক দশ টাকা বিশ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ বাহা ঘটে, এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল; অর্থাৎ শ্রীমতী কনকলতা রায়ের ফরিদপুর হইতে চলিয়া আসিবার পর ফরিদপুর মহিলা সমিতির মৃত্যু ঘটে। আবার প্রায় দুই শত জন জীলোককে দুঃখকষ্টের জীবন অতি-বাহিত করিতে হয়।

এইরূপ কত রকমের কুটীর-শিল্পের প্রবর্তন করিয়া পল্লী-অঞ্চলের কত দুঃস্থ জীলোককে স্বাবলম্বিনী করিয়া তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারা যায়। কিন্তু কবে কে? আমরা বড় বড় পরিকল্পনা লইয়াই ব্যস্ত; ছোট ছোট পরিকল্পনায় আমাদের যে মন উঠে না।

জরা

ত্রিকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিড়ম্বনা কি অভিশাপ নহে জরা,
জরাও বিপুল সমুদ্র নায় ভরা।
তাহার প্রধান ভোগই অতীন্দ্রিয়,
যৌবন চেয়ে নহে কম লোভনীয়।
নীরব বহির্জগতের শব্দ,
মুদিত কমলে ভ্রমর আবদ্ধ।
শক্তি তখনো ধরে—
স্বস্তির কোমল স্বর্ণে সে পুনঃ
নব মোচাক গড়ে।

২

জরাই করায় সর্বস্বান্ত ত্যাগী,
মামুষকে করে চকোরের স্থবভাগী।
তখন কামনা কিছুই থাকে না আর,
কর্মে ও ফলে ছুয়ে নাই অধিকার।
পাষণ হইয়া এ থাকায় আছে স্থব
রামচন্দ্রের পেতে পারে পদযুগ।
দেবীক্লে রাখে না দূরে—
এ শব-সাধনা নিজ অন্তঃপুরে।

করে তবু হতে অর্দ্ধমুক্ত মন—
অনাশ্বাদিত রসের আশ্বাদন।
অন্ধকারেও আনন্দে রহে জাগি'
নিশীথ-রাত্তির সূর্যোদয়ের লাগি।
এই জীবনের জরা অজ্ঞাতবাণ,
অভিষেকের মে এনে দেয় আশ্বাস।
শোষা সে নয় নয়,
বিশীর্ণা বেবা প্রত্যাসন্ন
মুক্তির কথা কয়।

৪

গুটি কেটে আহা বাহিরিবে প্রজাপতি,
তাহারি লাগিয়া চলিয়াছে প্রস্তুতি।
শিশু গরুড়ের পাখায় আসিছে বল,
স্থায় ভূষণ করে তারে চঞ্চল।
সদাগর তার কন্ডায় পণ্যভার
ভূকানের পথে পাড়ি তার নৌকার।
ভাবে সে কণে কণ—
ভরা গলার তরঙ্গে সব
রূপের নিরঞ্জন।

মায়ের কোল

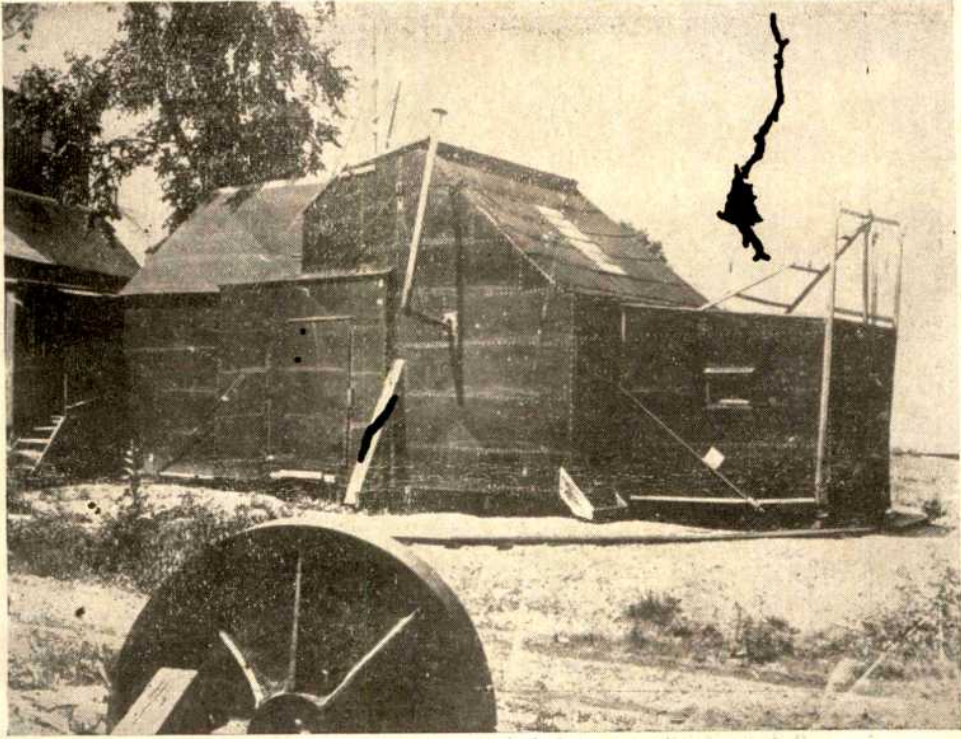
ত্রিকালিদাস রায়

বহু সখী মিলে হেথা করিলাম নানা বসে খেলা।
পশ্চিমে ঢলেছে সূর্য্য, ঝিকিমিকি বেলা।
পানীরা গাহিছে গাছে দিনাস্তের গান।
বধূরা 'জলকে চলে', মাঠ হ'তে ফিরিছে কৃষাণ।
ঘরমুখো গরুগুলি, শূন্য হ'ল মাঠ,
ধেম আসে কোলাহল, ভেঙ্গে যায় গ্রামাস্তের হাট।
হেলাভরে করি খেলা, এবে কণে কণে
মা'র কথা পড়ে শুধু মনে।

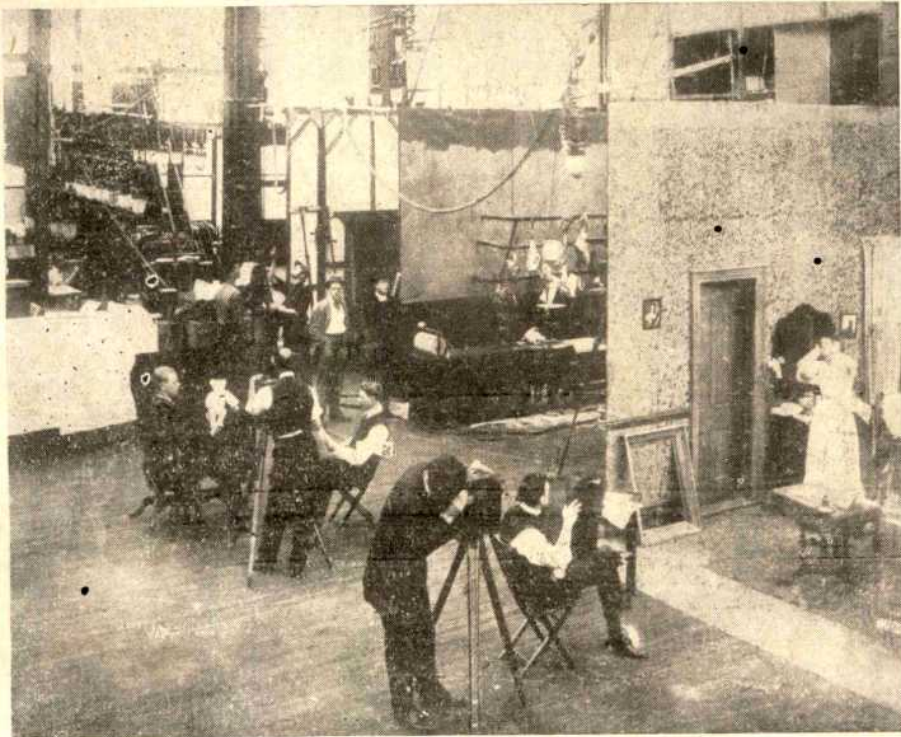
সঙ্গীরা সবাই নাই, অনেকেই ফিরিয়াছে ঘরে,
মার কোলে বসি তারা বুঝি গল্প করে।
ক্লান্ত হ'ল দেহ-মন। মন আর লাগাতে না পারি,
তবু খেলে যাই কেন? জিতিনাকো শুধু যাই হারি।

ধরিয়া রেখেছে মোরে নতুন খেলুরা অকারণে।
মার মুখ পড়ে শুধু মনে।

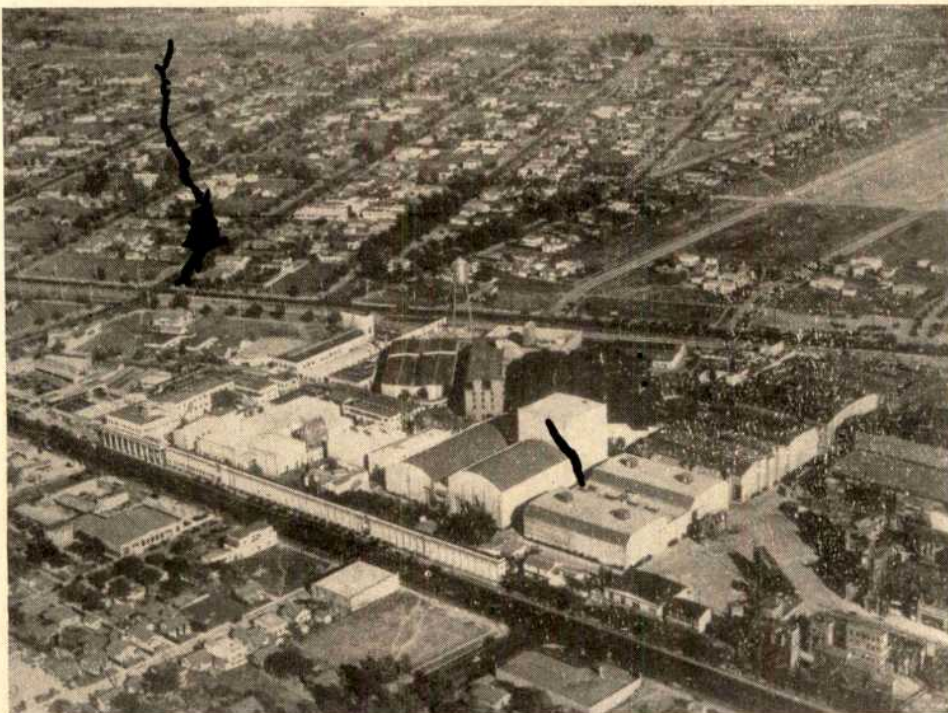
অনেকে ফিরেছে ঘরে। এসেছে নতুন সব সাখা,
সাধ যায় তাহাদের সাথে রই মাতি।
রোদের নাইক তেজ, ঝিকিমিকি বেলা,
আজিকার মত তবে সাজ হোক খেলা।
খেলা ভালো লেগেছিল, খেলা মোর মনটি ভুলানো।
তবু ভাবি এর চেয়ে মায়ের কোলটি আরো ভাল।
মোর পথপানে চেয়ে আছে মা যে ভবিষ্যৎ নয়নে,
মায়ের কোলটি পড়ে মনে।



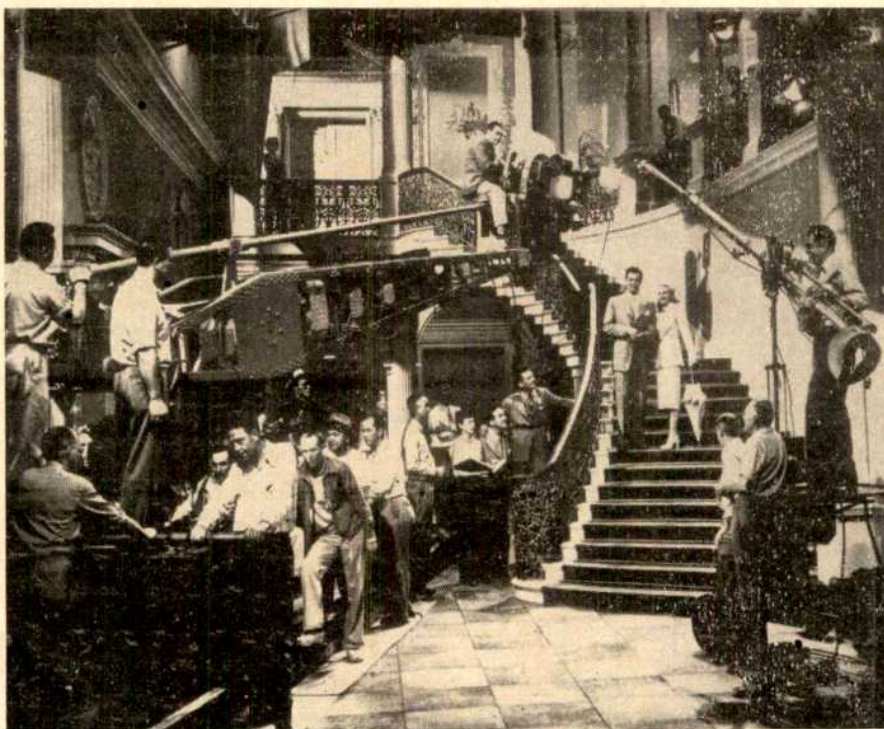
নিউ জারসীর, ওয়েস্ট অরেঞ্জ-এ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও



১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের, নিক্কাক চলচ্চিত্রের যুগের একটি স্টুডিও



এরোপেন হইতে ক্যালিফোর্নিয়ার কালভার সিটির মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার ষ্টুডিওর দৃশ্য



আধুনিক চলচ্চিত্রের ফিল্ম তোলার দৃশ্য

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩৬

পরের দিন বাইরের ঘরে বসে প্রভাত কর্দ তৈরি করছিল—একখানি রিক্সার টুং টুং আওয়াজ তার কানে এল। গাড়ীটা ওদের দরকার এসে থামল। কোতুহলী প্রভাত মুখ তুলে দেখলে এক অবগুণ্ণবতী বয়সী ওদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছেন। বেশ দোহারা চেহারার গৌরবর্ণ এক মহিলা—পরের গতির সঙ্গে কিছু আভিজাত্য বহন করে চলেছেন। পরিচিত কোন আত্মীয়ের সঙ্গে তার সাদৃশ্য প্রত্যয়ের মনে জাগছে না—অথচ উনি শোকে সহানুভূতি দেখাতে এসেছেন—এটী নিশ্চিত। অনভিবিলম্বে লক্ষী এসে—~~অনভিবিলম্বে~~ বললে, দাদা—মেজ কোঠাইমা এসেছেন। বড়বাড়ীর মেজ কোঠাইমা।

এ্যা! প্রভাতের বিশ্বয় কাটলে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা ভাল আগুন পেতে দে—আর—আর যে কি করা উচিত প্রভাত ভেবে ঠিক করতে পারলে না। ওর আনন্দকে ছাপিয়ে লজ্জাটা প্রবল হয়ে উঠল। যে সঙ্কোচবশে অনিবেশকে কোন দিন বাড়ীর মধ্যে আহ্বান করতে পারে নি তারই আঘাতে সে বিব্রত হয়ে বসে রইল। কেন এলেন মেজ কোঠাইমা?

একটু পরেই মেজ কোঠাইমা এ ঘরে এলেন। বললেন, এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন বাবা? এ ত আমার খাতির হুড়োবার জায়গা নয়—লৌকিকতা করতেও আসি নি।

তবু আপনি এসেছেন—! কৃতজ্ঞতায় প্রভাতের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হ'ল—চোখের কোল হ'ল বাষ্পাচ্ছন্ন।

মেজ কোঠাইমা বললেন, না এসে যে পারলাম না বাবা। আমরা প্রতিবেশী—পরস্পরের বিপদে আপদে যদি সাহায্য না করি তবে মানুষ হয়ে কয়েকি কেন? বল তুমি—হির হও।

হ' চোখের বাষ্প শুকল হয়ে গুণ বেয়ে গড়িরে পড়ল। প্রভাত উঠে এসে প্রণামের স্তম্ভী করতেই উনি বললেন, অশোচে প্রণাম করতে নেই—এমনিতেই তোমাদের আশীর্বাদ করছি। এখন আর সব চিন্তা রেখে কি করে দার উদ্ধার হবে সেই কথা ভাব। অবশ্য উপায় একটা করবেনই ভগবান।

আমি একটা কাজ সেরে আসব মেজ কোঠাইমা, লক্ষী বললে।

সে কি রে—আমি কি এখনই যাচ্ছি যে, ঠাকুর দেখার মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবি অবাক হয়ে।—পরে প্রভাতের পানে চেয়ে বললেন, একটা অহরোধ তোমাকে আমি করব বাবা, বল রাখবে?

বলুন।

মানে আর বুঝে আছি রচ করবে। লোকের কথায় নেচে দামসাগর, যথোৎসর্গ করবে না বল।

দামসাগর? সে সাধ্য আমার কোথায়? কোন রকমে তিল-কাকন সেয়ে দায়যুক্ত হতে চাই।

বেশ ত—কিছু কম লোক খাওয়ালে বা খাটি পালং দান না করলে, কি যথ না দাগলে পূর্ণপূর্ণযেরা কিছু কম উঠতে উঠবেন না। আমি শুনেছি—মানুষের নিজের কর্ম অহুসাজ্ঞা যে কল ভোগ করতে হয় তারই কের শুধু সঙ্গে যায়। নইলে যতই সোনা উৎসর্গের আড়ম্বর কর না কেন—এমন কোন মন্ত্র নেই যা মানুষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেনে তুলতে পারে।

জানি মেজ কোঠাইমা—আগল জিনিস হ'ল শ্রদ্ধা-ভক্তি যা মানুষকে বহু থেকে একের আশ্রয়ে নিয়ে যায়—ক্রমে সেই একও নাকি থাকে না। যাই হোক—সে সব বড় সাধনার কথা আমরা আলোচনা করতে পারি না—কেননা আমরা বুঝি অল্পই।

লক্ষী বললে, আচ্ছা মেজ কোঠাইমা—এ লোকের কর্ম আর এক জন্মে কেন মানুষ ভোগ করে? দেহটা ধ্বংস হলেও—

মেজ কোঠাইমা হেসে বললেন, এ ত আমার কথা নয় মা, —যারা অনেক জানেন, অনেক বোঝেন—পণ্ডিত আর ধার্মিক মানুষ—শুধি যারা—তারা ই বলেন, দেহটা খোলস মাত্র—আত্মা অবিসম্বর—বার বার কর্ম অহুসারে আত্মা সেই খোলস বদলান। গীতারও ত বলেছে—জীর্ণ বস্ত্র ছেড়ে মৃত্যু বস্ত্র পরিধানের মত আত্মা নিরন্তর খোলস বদল করছেন।

কিন্তু আত্মাকে ত দেখা যায় না।

দেখা ত অনেক জিনিসই যায় না—তাতেই কি মেনে নেওয়া যায় জিনিসটি নেই? আচ্ছা বল ত বাতাসের কি রূপ? আবার এমন অনেক জিনিস দেখেছি—যার রূপ বলতে পার না তুমি।

কিন্তু বাতাসকেও অহুতব করা যায়।

আত্মাকে অহুতব করা যায়, সে অহুত্ব তুমি আমার আমার হয়ত আসে না, কিন্তু যারা পরাবিত্তার পণ্ডিত—তারা জানেন এ সব।

আমি শুনেছি এই আত্মা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হয় না, আগুনে পোড়ে না, বাতাসে বিকৃত হয় না। পদ্মপাতার যেমন জলের দাগ লাগে না—কিছুই তাতে লেগে থাকে না। তবে কেমন করে অহুত্বের কর্মফল সে বয়ে নিয়ে যায়—আর যে যুক্তি, যে বাসনা এক জন্মে তার কর্মের ফল তারী

করে তা জ্ঞানান্তর পর্যন্ত অনুসরণ করে? প্রভাত প্রশ্ন করলে।

মেজ জ্যেষ্ঠাইমা বললেন, কথকথা কি আমিই বুঝিয়ে বলতে পারি? তবে যেমন শুধুছি—কথক ঠাকুরের মুখে—সেই মত বলছি শোন। এক দিন কৰ্ম্ম আর কৰ্ম্মকল নিয়ে কথক হাছিল। জ্ঞানান্তরের বাসনা কেমন করে আত্মকে আশ্রয় করে জীবকে সেই কৰ্ম্মকল ভোগ করার ভারই কথক হাছিল। কথক ঠাকুর বলেছিলেন, দেহ নষ্ট হলেও বাসনা নষ্ট হয় না। এর একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি শোন। যেমন ধর, একটা রুমালে কয়েকটি গোলাপ ফুল মুড়ে নিয়ে এসেছ। দু'দিন পরে ফুলগুলি শুকিয়ে গেলে যখন ফেলে দিলে রুমাল থেকে—তখন ফুল রইল না তো? কিন্তু গন্ধও কি লেগে রইল না সেখানে? তেমনি বাসনা, ওই গন্ধের মত।

প্রভাত কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে, কিন্তু আত্মা কি করে নবজন্ম গ্রহণ করেন? তিনি তো আকারহীন কোন পদার্থ—

আমাদের দেহটা পঞ্চভূতে গড়া মান তো? বেশ। এখন কথক হাছে এই আধারে আত্মা কি করে আগমন? আমাদের শাস্ত্রে বলে—দেহ ক্ষয় হলে আত্মা ব্যোম আশ্রয় করে। ব্যোমে জল-সঞ্চারী মেঘের সঙ্গে মিশে বৃষ্টিধারায় সে নৈবেদ্যে আসে পৃথিবীতে। সেই মাটিতে দেহ ধারণোপযোগী পশু জন্মায়। পশুভূত্রে আশ্রয় নেয় আত্মা—সেই পশু-কণা মাহুয়ের রক্ত মাংস মজ্জা দি পোষণ করে।

লক্ষ্মী বুধী-উপঢানো স্বরে বললে, বাঃ সুন্দর তো! আমরা এই রকম কথক কিছু শোনাবেন মেজ জ্যেষ্ঠাইমা।

সব কথক সব সময়ে কি ভাল লাগে মা। মনের অবস্থার কথক কখনও কান দিয়ে মনের মধ্যে পৌছয়, কখনও বা আর এক কান দিয়ে বার হয়ে যায়। জানীরা বলেন, কিছুই নাকি নষ্ট হয় না পৃথিবীতে। সিপ্রা সৈদিক কি একটা বই থেকে পড়ে শোনাগে—আশ্রম্য কথক। নাকি আজ অবধি পৃথিবীতে যত দেশের যত মানুষ জন্মেছে—তার যত কথক বলেছে—যত কৈশিক, হেসেছে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে—সবই পৃথিবীর বায়ু-স্তরে রেফর্ড করা রয়েছে। যেমন কথক বা গানের ধ্বনিতে রেফর্ড তৈরী হয় আমরা গ্রামোফোনে তা অবিকল শুনি। তেমনি শক্তিম্যান যন্ত্র তৈরী হলে ইতিহাসের অনেক সত্য আমরা বুঝতে পারব। যাই হোক—কৰ্ম্ম অনুসারে যে ফল এ তো আমরা হাতে হাতে দেখছি।—মেজ-জ্যেষ্ঠাইমা হাসলেন। একটু থেমে বললেন, আমাদের বাড়ীটা কেই দেখ মা।

আপনি তো কত বোঝেন—আপনি কেমন—

ঠেকাতে পারি না। কেমন করে পারব মা—কৰ্ম্মকল খণ্ডন করার সাধ্য তো আমার নেই। যারা বাসনার বাশ অলক্ষীর সেবা করলেন—তার লক্ষীর প্রসন্নতা আশা করবেন

কোন মুখে? আমাদের বড় হলঘরে তো গেছ—ওই ঘরেই লক্ষী-বিদায়ের বাজনা প্রথম বেজেছিল। সেই সর্বনাশা ধ্বনি আমি চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারি মি। কেন জান?

বানিক চূপ করে মেজ জ্যেষ্ঠাইমা কি যেন ভেবে নিলেন। পরে বললেন, শুনেছ তো ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গল্প। পঞ্চ ভূলে ক'জন মেছুনি এক দিন এক বাগান-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল রাজিকালে। সে বাগানে নামা জাতীয় ফুলের গাছ—রাজিকালে সেই সব ফুল ফুটে এমন গন্ধ বার হাছিল যাতে করে মনে হওয়া আশ্রম্য নয় নন্দনকাননের মধ্যেই বৃষ্টি এসে গেলাম। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত মেছুনিরা ঘুমেতে পার নি সেই সুন্দর গন্ধে। ওদের মাহের চূড়ান্তে ছিল আসটে-গন্ধওয়াল ভাকড়া—তাই শিরের রেখে ভবে তারা ঘুমোতে পারে। আমাদের বাড়ীটাতেও...আচ্ছা আর এক দিন বলব সে কথক। আজ অনেক বকেছি—এখন উঠি, কেমন?

উঠবেন। প্রভাত যেন বাস্তব জগতে ফিরে এস। আরও কিছু বলুন না এই রকম কথক—ভারি ভাল লাগছে।

পাগল ছেলে। এ সব গল্প বেণী শোনে না।

কেমন—বেণী শুনেলে সংসার ভাল লাগবে না?

না বাবা—অশান-বৈরাগ্য আর আসল বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল ভরাং সে আমি ছাতি। তবে যখন কোন কিছুই ভাল লাগছে না—সংসারে টানাটানি—উপার্জন কম—জীবনের সাধ-আশা মনে হাছে, সবই নষ্ট হয়ে গেলে—তখন এ সব কথক শোনাতেও অকল্যাণ হয়। এসব কথক শুনেলে কেমন একটা আলস্য যেন মমকে গুরিয়ে তোলে—কাজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় সংসারের বাইরে, সবাইকে ফেলে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা—এইটে প্রবল হয়ে ওঠে। এ ভাব সন্ন্যাসের মত—কিন্তু সন্ন্যাসীর নয়। এই কাজ থেকে, কর্তব্য থেকে পালানোর ভাবটাই মাহুকে নষ্ট করে দেয়।

তা হলে হুঃখ ভোগ করাটাই বৃষ্টি—

কিসের হুঃখ? যত দিন যাবে বুঝবে—হুঃখ স্থায়ী নয়—যেমন নদীর জল বয়ে চলেছে তেমনি হুঃখের স্রোত। যখন টেউ লাগে তখনই তা বৃষ্টি—যখন টেউ চলে যায় তখন আনন্দ হয়। যেমন অন্ধকার মানে একেবারে আলোর অভাব নয়, কিছু কম আলো; তেমনি হুঃখ মানেও সাগর-পরিমাণ হুঃখ নয়—কিছু কম সুখ। আসলে সুখ বা হুঃখ ওই জলের স্রোত—এক জায়গায় কখনও থাকে না।

লক্ষ্মী বললে, ঠিক বলেছেন জ্যেষ্ঠাইমা—কাজ করতেই হয়। পিপড়েকে দেখ—মৌমাছিকে দেখ—পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ার—

দেখ প্রভাত, যেয়ে আমার কত বোঝে। হুঃখের জঞ্জাল ঠেলে ফেলা যায় শুধু কাজের হাতিয়ার দিয়ে। মেয়েদের

কাজ তাই অকুরন্ত—আশারও অবশ্য শেষ নেই। আমরা যদি ভেঙে পড়তাম—তা হলে হা-অরের সংসারে লক্ষ্মী-পুঞ্জের আয়োজন করত কারা। আচ্ছা, উঠলাম।

প্রভাত বললে, একটা কথার উত্তর দিয়ে যান। আমাদের শাস্ত্র কি বলে যত্না সহক। কোথায় যার মাহুষ—

এক দিন মচিকেতা এই প্রশ্ন করেছিলেন যমরাজকে।

কি উত্তর দিয়েছিলেন যমরাজ?

যত্নর দেবতা তিনি—তিনি শুধু জানেন এই তাঁর কর্তব্য।

যে দেবতা সব কিছু সৃষ্টি করেন—যে দেবতা-পালন করেন—যিনি ধ্বংস করেন—তাঁরাও নিজ নিজ কর্তব্য করে যান শুধু। কেন সৃষ্টি স্থিতি, কেনই বা মর—এই জ্ঞানের অধিকারী যাত্র এক জন—নিয়ামক শুধু তিনিই—সেই পরম পুরুষের জ্ঞানবার জড়ই কর্তব্য ভক্তি যা জ্ঞানমার্গের গুণভা।

• কেউ জেনেছেন তাঁকে?

—জেনেছেন বৈ কি—কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি বা প্রকাশ করার ক্ষমতা কৈ—যে তাঁকে জানতে পারব বা জানাতে পারব।

ওসব কথা থাক প্রভাত। তোমাদের অঙ্ক কথার যেমন নিয়ম আছে এমব আলোচনারও তেমন নিয়ম আছে। এ বিষয়ে কিছু পড়াশুনো না থাকলে—

তা হলে আমাদের এই শিক্ষা কিছুই নয় বলছেন?

তাই কি বললার, তুমি সাহিত্যের ছাত্র হয়ে যদি বিজ্ঞানের তত্ত্ব না বুঝতে পার, যদি দর্শন তোমার কাছে শক্ত হৈকে সে মোঘ নিষ্ফল তোমার সাহিত্য-শিক্ষার নয়।

সে ঠিক—যায় যা লাইন—

শিক্ষার কথার একটা কথা মনে পড়ল। কিছুদিন আগে ওদেশের কোন সায়েব নাকি বেড়াতে এসেছিলেন আমাদের দেশে। তিনি শুনেছেন এ দেশে শিক্ষার প্রসার নেই—বিশেষ করে মেয়েরা সবাই প্রায় অশিক্ষিত। সত্য মিথ্যা পরীকার কোতুল নিয়ে সায়েব গেলেন এক গরীব কেরানীর ঘরে। গিয়ে যা দেখলেন তাতে আশ্চর্য হলেন। তার পর তিনি চিঠি লিখলেন তাঁর জীকে—তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, যা শুনে এসেছি এতকাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, তা সম্পূর্ণ ভুল বলেই মনে হচ্ছে। কল্পনা করতে পার কি একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে—মুণ্ড বড় একটি সংসার চালাচ্ছে কি সুন্দর ভাবে। মেয়েটির মা ঈশ্বর ঘরে—বাপ করেন আপিসে চাকরি। আরও ছোট ছোট ভাই-বোন তাদের ষাণ্ডওয়ানো আদর আকার মেটানো এ-সবও আছে। আশ্চর্যের কথা—ওইটুকু ছোট মেয়ে বাপকে আপিসের খাবার দিলে। ছোট ভাই-বোন ছটিকে নাওয়ালে, খাওয়ালে—মাকে পথ্য দিলে। যেমন যাত্র চলে নিতুল—তেমন আমরা এ একটি দিন অশুখলায় চালালে সংসার। তুমি কি এখনও বলবে, এ মেয়ের

শিক্ষা-দীক্ষা নেই? বই পড়েনি বলে সে সংসার চালানার দায়িত্ব বহন করতে পারে না? এমন সম্পূর্ণ শিক্ষা আমাদের দেশে ত চোখে পড়ে নি—যে শিক্ষার সংসার চলে এমন অনায়াসে। বলতে বলতে উনি সদর-দরজার এলেন। হেসে বললেন, তাই বলে মনে করো না আমি বই পড়ার নিষেধ করছি, শিক্ষার যে আর একটি দিক আছে—যেটা জীবন-যাপনের পক্ষে বেশী দরকারী সেইটিকে বাদ দেওয়া যার না—শুধু তাই বলছি।

উনি চলে গেলে প্রভাত লক্ষীর পানে চেয়ে হাসল। বললে, কথাটা আমাদের পক্ষেও খাটে—কি বলিস?

সন্ধ্যাবেলায় তক্তপোষে বসে বসে প্রভাত ঐ সব কথাই ভাবছিল। শিক্ষা বলতে কি বোঝার তার অর্থ আচ্ছ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে। মন থেকে অনেকখানি গ্লানিও গেছে যুছে। জীবনে নানান সমস্যা আছে,—ঘটনার চাপে গ্রহিবদ্ধ হয় সেই সব সমস্যা—তাদের জ্বাংগ পথ হয়ে যায় অন্ধকার—সরল পথ বহু শাখা-বাহু মেলে বিভ্রান্ত করে পথিককে।...

টুং টুং টুং। একখানা রিক্সা যেমন অদূরে থামল। প্রভাতের চিন্তাভঙ্গ হ'ল। জানালা দিয়ে দেখলে একখানা রিক্সা থামল গিয়ে তেঙলা বাড়ীটার সামনে। রিক্সা থেকে নামলেন তুল-বগু দীর্ঘকায় এক মাহুষ। অত্যন্ত বিষ্ময়ে প্রভাত লাফিয়ে উঠল তক্তপোষ থেকে। এ মাহুষকে যে প্রভাত ভাল করেই চেনে। অভিজাত-গক্কো বংশ-কৌলীজ-গৌরব-পুণ্ড ইনি কেন এসেছেন—কাকন-কুলীন অর্ধেন্দু রায়ের কাছে। এ কি নিমন্ত্রণের ব্যাপার অথবা? কোতুলহলী হয়ে পুরো আর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল প্রভাত। আর ঘণ্টা আগে যেমন স্নান ভক্তিতে ও-বাড়ীতে চুকেছিলেন জিলোচন সেম তেমন ক্লান্ত পা টেসে বেরিয়ে এলেন। অর্ধেন্দু রায় উজ্জল হাসির ঘারা তাঁকে প্রত্যাগমন করেছিলেন—বিনায়ও দিলেন উজ্জল হাসি দিয়ে। জিলোচন সেনের মুখখানা দেখা গেল না, রিক্সা ক্রান্ত অবসর মাহুষটিকে বহন করে টুং টুং শব্দে ফিরে চলল।

৩৪

ডিসেম্বর প্রায় শেষ হয়ে এল। আর একটা দিন মাত্র বাকি। সকালটা কেমন শ্রীহীন লাগছে। কাল হরতো সে স্বপ্নই দেখেছে, কিন্তু তা স্বপ্ন-স্বপ্ন বা হুঃস্বপ্ন নয়। তারই মনের চিন্তা নানা গলি ঘুঁজি দিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছবার জন্ত প্রাণপণ করেছে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে মরেছে সে। এত সঙ্গীণ তার জগৎ। গলির এ প্রান্তে একটি আধুনিক মৌখ. আর মাঝখানে একটি পুরাকালের প্রাসাদ—বন্দীশালার হু' প্রান্তে ছোট ফটক—হুটাই রক্ত। মাথার উপরে আকাশ নেই—পায়ের তলায় মাটি নেই—চারিদিকে আছে ভয়াল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আজকের সকালটা পর্যন্ত বিষন্ন হয়ে রয়েছে।

এখনও কেউ উঠেন নি। কলে জল এসেছে—তার ধারায়

খোয়া ওঠা মেঝের পড়ে ছড় ছড় শব্দ উঠছে—কি বিজী শব্দ ! কলটা বন্ধ করে ও পথে ঘেরিয়ে পড়ল। শীতের সকাল—গলিটা এখনও নিরুপ্ত। বন্ধ জানালার কাঁকে আলোর রেখা—একটা ভরল ধোয়ার চাদর, শীতেরই বাষ্প যেন—গলিটা সেই চাদর মুড়ি দিয়ে আলুস্ত উপভোগ করছে। প্রভাত বার ছই গলিটা পরিষ্কার করলে। গলিটা ক্রমাগত পাশ করেছে। কোন বাড়ীর দরজা কচি ছেলের কান্না, কোনটার বা বুড়ো মানুষের কান্না—কোনটার প্রভাত—তোজ পাঠে স্মরণীয় পঞ্চকল্প ও পঞ্চ পুণ্যলোকের নাম ধ্বনিত হয়ে উঠল। এখনি কল-ভলায় বাসনের ও বাড়ীর ছয়দ্বারে ছয়দ্বারে কি-এর কড়া-নাড়ার কর্কশ ধ্বনি উঠবে। কয়লা-ভাঙ্গার শব্দে—আর উলুনে আঁচ দেওয়ার ধোয়ার বন ছালে গলিটা জাহি জাহি ডাক ছাড়বে।

গলির ও-মোড় থেকে বেরুলেন এক ভজলোক—সর্বদা তাঁর আলোয়ানে ঢাকা। মাথার উপরে আলোয়ানটা ধোমটার মত রয়েছে—চলার সঙ্গে সঙ্গে খসে খসে পড়ছে মাথা থেকে—ডান হাত দিয়ে আবার সেটা উঠিয়ে দিচ্ছেন। চলতে চলতে তিনি প্রভাতের সামনে এসে পড়লেন। প্রভাতকে দেখেই চমকে উঠলেন এবং আলোয়ানটাকে টেনে নাক পর্যন্ত ঢেকে কেলে পাশ কাটাতে চাইলেন।

প্রভাত তাঁকে চিনতে পেরে ডাকলে, এত ভোরে কোথায় চলছেন হাজরা মশায় ?

কে—প্রভাত ? আর যাবু কোথায় বাবা—রোজ প্রাতঃ-স্নান শেষে ভবে লোকানে গিয়ে বসি। নইলে যে কালের চাপ—মাওয়ার সময় ত থাকে না। হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ—

একটু দাঁড়াবেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

না বাবা—ওবেলা বরঞ্চ আসব তোমাদের সমিতি-ঘরে, সেই সময় শুধিয়ে। এখন বেলা হয়ে গেলে—গোবিন্দ—গোবিন্দ। হু হু করে তিনি চলে গেলেন। প্রভাত অবাধ হয়ে তাঁর গমনপথের পানে চেয়ে রইল। সে বেশ বুঝলে—হাজরা মশায় ওকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছেন। উনি যে আর সমিতি-ঘরে আসবেন না এটা নিশ্চিত। কেন ? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত এই রহস্যের উপর আলোকপাত হ'ল। অর্দেন্দুর হাতে তার লেখা চিঠিখানির আবির্ভাব...টিক টিক সমস্ত ব্যাপারটাই দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরাই সমাজের শিরোভূষণ—সর্বজনমহাম্য। সেকালের পল্লীসমাজ আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন—এখনকার সমাজপতির বৈশবল্য করেছেন। তাঁরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাণ্ডিত্য ব্যবস্থা করেন না—শহরের সবচেয়ে চওড়া সড়কে দাঁড়িয়ে রোপ্যদণ্ড হেলিয়ে পথ-নির্দেশ করেন। আইনের দ্বারা ওই রোপ্যদণ্ডের স্পর্শে নানান অর্থে প্রযুক্ত হয়। সামান্য দোষীর দণ্ড শাসন-বিধান আছে—অসামান্য দোষের শাস্তি দেবার বিধান আইনে নেই,

কারণ যে ধরনের অপরাধ আজ অস্বীকৃত হচ্ছে তা আইনে ছিল অস্বীকৃত।

দীপাদের বাড়ীর দরজা বুলে কে যেন বার হ'ল। এদিক পানে সে ফিরে চাইল কিনা কে জানে, কিন্তু এদিকে না এগিয়ে সে বিপরীত পথে চলতে লাগল। মনে হ'ল দীপাই যেন। ভেতনি ধু তন্নিয়ার ও পথ চলছে—গায়ের কার কোটটা অত্যন্ত পরিচিত।

আশ্চর্য্য। এই ছ'দিনে পৃথিবী কি হঠাৎ বদলে গেল। দীপাও তাকে সন্ধান করলে না ? ও কি ঘরে নিচ্ছে—প্রভাত ওর বারাক্কে অপদস্থ করবার জন্য সুযোগ অব্যবহৃত করছে। আশ্চর্য্য কি। অসম ক্ষেত্রের জানা-চেনা—সামান্য কৃষাণ্য এমনি সহসাই অস্পষ্ট হয়ে যায়। অনিমেয়ও থাকলে কি করত, কে জানে।

যাক পুরাতন পৃথিবী এমনি করেই যুছে যাক। তার শোভা, সম্পদ, আমন্দ, আশা—দৃষ্টিতে বা অন্তরে জাগিয়ে রেখে কি লাভ। স্মৃতিতে শুধু দুঃখের দাহন। শেষ হোক সে দহন।

মা বললেন, দায়টা কি করে উদ্ধার হবি ভাবছিস বাবা ?

প্রভাত বললে, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি নি মা।

আমার গলার হার আছে—সাদে তিন ভরি সোনা। এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলাম—শুভ অভাবেও বার করি নি। সেইটে বেচে—

প্রভাত অপরাধীর মত মাঝের পানে ভাকালে। ওর মাথা হেঁট হয়ে গেল লজ্জায়। পিতৃদায় উদ্ধারের পৌরুষ ওর কোথায় রইল ? সত্য পালনের দৃঢ়তা—কারও কাছে মাথা হেঁট না করার সঙ্কল্প—অভ্যন্তরীণ শান্তি দেবার উৎসাহ—বিন্দুমাত্রও ত অবশিষ্ট নেই। ও অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—ভীক—অনভোপায়—আত্মচিন্তাজর্জর—লক্ষ কোটি বিন্দুর মধ্যে জ্যোতিহীন একটি বিন্দু—জন্ম ও মৃত্যুর চক্রপথে—উদয়-বিলয়ের মুহূর্তে সামান্যমাত্র দাগ কাটাতে পারে না। সেই ভাল—লক্ষ কোটির মধ্যে আত্মগোপন করেই বাংলার সংসার পরিপুষ্ট করবে।

লক্ষী বললে, বড়দাকে এ সব কথা এখন বলে লাভ কি ? চেষ্টা করলে বাবার আপিসে ওর চাকরি একটা হবেই।

স্বনয়নী বললেন, সে আর ক'টা টাকা—

লক্ষী বললে, আমিও কাক করব মা।

মাকে অবাধ হয়ে চাইতে দেখে ও হেসে বললে, আপিসের চাকরি নয়—এই গেরস্ত বাড়ীর জামা ইজের সেলাই—কাপড়ে চাদরে ফুল তোলা—

আর আমি বসে বসে তোদের অন্ন ধ্বংস করব ?...

বাঃ রে—তা কেন ? তুমিও কাক করবে—মানে বড়দা খবরের কাগজ কিনে আনবে—তুমি ঠোঙা বানাবে

বসে বসে। হেসে খেলে আট আনা পরসাদ দিন আসবে।

সেই লক্ষ্মী—এতও ভাবতে পারে? পাকা সংসারীর মত উপায় বার করছে সংসার চালানার। ও কবে শিখলে এই সব? দীপার মত অগ্নি সামনে নিয়ে সঙ্গীত-সাধনা—অথবা চায়ের টেবিলে রাজনীতি, সমাজনীতির ভূকোলা-বিস্তার—মোটর-বিহারের পথে দেশ-বিদেশের ভূগোল ইতিহাস স্বাস্থ্যতত্ত্বের অবতারণা—সঙ্গীত-কলা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের স্তূপ আলোচনা—এ সব কি ওর জীবনে নিষিদ্ধ বস্তু হয়েই রইল। ও কি এমন করেছে অকাল-গৃহিণীত্বের উত্তাপে স্বাভাবিক জীবন-বিকাশের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে না?

কিন্তু প্রত্যন্তেরও যথেষ্ট কর্তব্য রয়েছে। যে, জমিতে আশ্রয় পেয়ে বৃক্ষের অঙ্কুর মাথা তুলেছে—সেই জমির সারে ও সচেতন তাকে বাঁচিয়ে—বাড়িয়ে তোলার দায়িত্বই না সর্ব-প্রথম। তার পর তার সবুজ পাতা ফুলের কুঁড়ি ফলের শোভা এই সব নিয়ে মাথা ঘামানো চলবে।

আগে জীবন—তার পর রুচি সংরক্ষণ উচ্চাশা।

নিজের ঘরে ঢুকে প্রভাত কিছুক্ষণ শুশুতি বিন্ময়ে চারিদিকে চাইলে। কড়িকাঠ থেকে দেয়াল—ঘরের আসবাব-পত্র, বই রাখা ছোট বাথরুমের র‍্যাক—আব ময়লা বিছানার ওয়াল্ড—তুলো-বেল-করা বালিশ—ঘরের কোণে চালের ছালা—আনাড়ের পেতে, হাঁকো আর ভামাক রাখার টিন। দৃষ্টি পড়ল দেয়ালের গায়ে—রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী আর বিজ্ঞানাগর। কি নির্ভীক প্রশান্ত মুখ—বুদ্ধি-প্রোচ্ছল দৃষ্টি—জ্ঞান-ভাস্বর প্রশস্ত ললাট—দুটসকল-আশ্রয়ী—পাতলা অধরোষ্ঠ। সাধারণ ঘরের ছেলে সব—যুগ ও জীবনকে উদ্ভল করেছে প্রতিভাসিত হননি—সমস্ত কালের উর্ধ্বে রয়েছেন প্রতিষ্ঠিত। সেই কাল—সে কালের জীবন—তপস্যা—সমস্তই বুঝি স্বভাব ছিল। হুঃখ ছিল—হুঃখের কুংসিত সর্বগ্রাসী গ্লানি হয় ত ছিল না। সেদিন পৃথিবী নানামুখী সমস্তা ও আবর্জনা ছিল না লক্ষ্যহার—সমান্তর সত্যের রূপটি এমন সর্বাঙ্গিক হলনার ধোঁয়ার আবৃত হয়ে যায় নি। আজ কুরাশা-মলিন জগতে যদি ওঁরা থাকতেন...সে ভালই হয়েছে—আজিকার এই সংখ্যাত-সঙ্কল স্বার্থকলুষিত ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতা পৃথিবীকে দেখেন নি ওঁরা। ভালই হয়েছে—ওঁদের কালের হুঃসহ বেদনা—স্বাধীনতার স্রষ্টালোকে কি মধ্যান্তিক হয়ে মনের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে—তা অস্বস্ত্য করতে হয় নি ওঁদের। শেষ হয়ে গেছে ওঁদের যুগ—বিশ শতাব্দীর পূর্বসূরী, সংগ্রাম-পর্বের স্বর্ণযুগ। ওঁরা কোন প্রেরণাই দিতে পারবেন না একালের-প্রোভে-ভাসা বড়-কুটোদের—প্রোভে হয়ে-পড়া বেতসলভাদের। ওঁদের সামনে রেখে মিথ্যা আশার প্রলুব্ধ হওয়া কেন আর।

ভক্তপোষের উপর উঠে একে একে ছবিগুলি নামিয়ে নিলে প্রভাত। এই ঘরে ওঁদের আর মানায় না—এই কারাগারে কোন্ স্বাধীনতার বাণী বহন করে ছবিতে মানুষের উপাভূত হয়ে থাকবেন! মধ্যবিভক্ত জীবনে অভিশাপ নেমেছে—মধ্যবিভক্ত নিশিচু হয়ে যাবে—পণ্ডিতের যুগে মধ্যবিভক্ত কোন প্রয়োজন নেই।

ভক্তপোষে বসে বইয়ের র‍্যাক থেকে একখানি সাদা কাগজ টেনে নিলে প্রভাত। কলম নিয়ে অতঃপর সে লিখতে বসল। সে লেখা কোন কোতুলী পাঠকের চিত্তবিনোদন করবে না।

সে লেখার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নেই—সে লেখার জীবন-ভয়ের বিশ্লেষণও কেউ আশা করবে না। অতি ক্ষুদ্র অস্বস্তি আর অশরীরী ভাব নিয়ে তার ভাষাকে রহস্যময় ও কেনিস করে তোলার চেষ্টাও সে করছে না। অন্তত স্থল সাহিত্যের সবর্জিত এক আবেদন-পত্রের খসড়া তৈরি করছে সে। অস্বস্তিকার আবেদন—অন্তত দীন প্রাণনার বশব্দ ভূত্যের আকৃতি ফুটিয়ে সে চাইছে নিজের বাঁচতে—আশ্রিত প্রাণীগুলিকে বাঁচাতে। হাজার হাজার মধ্যবিভক্ত ঘরের বেকার ছেলে প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে আর লোকের মুখে শুনে থাকে আরও করবার আশার ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে প্রাসাদের ছায়ায় ও কারখানায়—সেই রুজি আরও করবার জন্ত ওর সর্বস্ব পণ রইল আজ। চাকরি—চাকরি—চাকরি চাই।

ঘরে অন্ধকার নেমেছে—রেডিওটা কোণায় যেন আর্ন্তনাদ করে উঠল। ওকি—কিসের কোলাহল? রেডিয়োতে অস্বাভাবিক কোলাহল—অনেক অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বর—চাপা কারার গুলন—

উঠে ও জানালার বারে এল। ঘোষণা চলছে:

আজ অপরাহ্নে প্রাণনাসভার ধাবার মুখে মহাত্মা গান্ধী আতভারীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। আজ অপরাহ্নে—

বার বার অশ্রুরক্ত কণ্ঠের ঘোষণা।

পৃথিবীতে অন্ধকার নামছে—সঙ্গীর্ণ হয়ে আসছে তার পরিধি। হিংসা, লোভ, অসত্য, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মোটা মোটা লোহার গরাদগুলি কারাগৃহের সীমানা নির্দেশ করে স্পষ্টতর হচ্ছে; সেই সঙ্গীর্ণ ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে মানুষ?

৩৫

শোক যত প্রচণ্ডই হোক—জীবন-গতিকে আলোড়িত করে খানিকক্ষণের জ্বল; ক্রমে তার তীব্রতা হ্রাস হয়ে আসে। ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে কিছু দিনের জ্বল প্রতিধ্বনিত হ'ল আর্ন্তরোদন ধ্বনি—তার পর তার তীব্রতা কমতে লাগল।...পৃথিবীরোগের তীব্রতা সহসা নূতন করে

অহুতব করলে প্রভাত—শিশুরাষ্ট্রের বুকে এই শক্তিশেলের
• আঘাত...তবু জাহ্নবির গিয়ে ফেড়ারি পড়ল—ফেড়ারিও
একে ছুঁয়ে এগুতে লাগল। সংসার মাহুকে ধরে রাখতে
পারে না—ধরে রাখতে পারে না তার স্থিতিতে। শুধু যে
মাহুগুণি মহত্বের প্রভাবে জড়তা পরিহার করে চৈতন্যের
অভিমুখে নতুন নতুন: অঙ্গের হচ্ছিল, কিংকর্ষব্যবিস্মৃত হয়ে
ভারা 'হায় হায়' করতে লাগল। তার পর এক দিন...

মুণ্ডিতমণ্ডক প্রভাত পকেটে চাকরির আবেদনপত্রখানি
নিরে আপিসের উদ্দেশে রওনা হ'ল। যেতে যেতে ফুটপাথে
দেখলেন নানান বয়সের ফিরিওয়াল। জীবনধারণের নিত্য-
প্রয়োজনীয় কত জিনিস সাজিয়ে—ফ্রেতা আকর্ষণের জড়
চাঁকর করছে। ধমকে দাঁড়াল সে। পৃথিবীতে এরাও
রয়েছে সমাজের নিয়ন্ত্রণে—জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত কিন্তু বিব্রত
নয়। এদের পৃথিবীটা প্রভাতদের মত কি? নিশ্চয় তা
নয়। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা এরা জন্মের সঙ্গে
সঙ্গেই পায় এবং যে-কোন উপায়ে উপার্জন করে। তবু প্রশ্ন
থেকে যায়—অন্নময় কোষের রক্ষণ-কার্যই কি জীবনধারণের
সর্বোত্তম সমাধান। যে চিত্ত জ্ঞানের আলোর উদ্ভাসিত
হয় নি—যে আলোকে আত্মদাণ করে জাগে নি রসসঞ্চয়ের
আনন্দ এবং সেই মহৎ আনন্দ জগতের বস্তুর উপকরণ
নির্মে—জগদভীড় কর্তৃক ঐশ্বর্যলাভের সাধনায় বহু বারায়
নিজেকে প্রদারিত করে দিতে পারে নি, সেই ছুঁছ নখর
জীবনের আদর্শ তো সকলের নয়। তবু প্রাথমিক ক্ষেত্রে
এদের সহজ জীবনীশক্তির বিকাশ প্রভাতকে লুপ্ত করছে।
ওর পায়ে যদি আজ অর্ধক্ষুণ্ণতার ভারি পাথরটা বাঁধা না
থাকত। যদি ওর মাথায় না চাপত অসহায়তা, বোম,
ভাইয়ের দায়িত্ব।

প্রভাত পা চালিয়ে দিলে। *খালি চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা।
এ-ও তো বিলাস মাত্র—সামনে চলার পথে বাধা। সে যা
হতে পারে নি—কল্পনায় তা টেনে এনে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত
করা শুধু। সে তো অনেক কিছু ভাবতে পারে। তার
বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র-গৌরব তাকে যে-কোন সম্মানের পদে
প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তার চারপাশে যারা ভিড় জমিয়ে
আছে তারা সবাই মহৎ নয়, বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান বা চরিত্রবান
নয়—অথচ তাদের মোটরের ধূলা-ফাদা মেখে নিত্য তাকে
পথ চলতে হচ্ছে। তারা রূপার চক্ষে দেখে তাকে—ঘৃণা
করে তার দারিদ্র্যকে। তাদেরই বাড়ীতে মায়ের শেষ সম্বল
হারগাছি বাঁধা দিয়ে পিতৃদায় থেকে উদ্ধার হয়েছে সে। যে
উপার্জন করে সংসারের অভাব পূর্ণ করতে পারে না, তার
বিভাবুদ্ধি জ্ঞান বীরত্ব চরিত্রব্যাপ্তি সবই মিথ্যা। ওই একটি
মাত্র মানদণ্ড আছে যাতে মাহুকে যাচাই করে নেয় সমাজ।
গোলাপফুলের নৌন্দর্য্যে ও শৌণ্ডিক্যে শ্রীত হন দেবভারা, কিন্তু

মাটির আশ্রয়ে আশ্রিত না হলে তার রূপ-রস-গন্ধভরা প্রাণ-
লীলার মহিমা অহুতব করতেন কোন্ দেবতা?

আরও দ্রুত চলতে লাগল প্রভাত। পথ জনসঙ্কুল—
মাহুয়ের জমাটবাঁধা লাইন এগিয়ে চলেছে একই দিকে।
মাঝে মাঝে বড় রাস্তার মোড়ে ট্রাক্টর পুলিশের সত্বেও তা
বিছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং সেই অবসরে তার গতির বেগটা
চোখে পড়ছে। এই অসংখ্য মাহুয যাত্রা করেছে মাটির
আশ্রয়-সন্ধান। মাটির রসে শাখা পত্র ফুল ফলে পূর্ণ-
বিকশিত হবার বাসনা তাদের মনে। এই তো জীবন। জন্ম
ও মৃত্যুর মাঝধানের সময়টুকু। প্রাণী বা পদার্থকে ধরে
চৈতন্যের ক্ষণকালীন প্রবাহ—মাটির প্রদীপ তেল-সলিতার
উপকরণে অগ্নি উৎপাদনের রহস্য। একটানা স্রোত পথে
পথে ভেঙে পড়ছে বহু বারায় রূপান্তরিত হয়ে—বিরাট
অটলিকার অভ্যন্তরে মিশিয়ে যাচ্ছে। লালদীঘির চারি ধারের
বিরাটকার সৌর-দৈত্যেরা আশ্চর্য্য কিপ্রকার এাস করছে
এই বারায়গুলি।...

প্রভাতের পিতৃবন্ধু বললেন, দরখাস্ত এনেছ? দাও।
দরখাস্তের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। একই হেসে
বললেন, আমরা যে স্বাধীন হয়েছি তা এর শেষ লাইনেই
জানতে পারছি। নয় কি? বলে সেখানটায় আহুল
রাখলেন।

প্রভাত কিছু বুঝতে পারলে না।

তিনি হাসলেন শব্দ করে, এখন 'ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট
সারভেন্ট' অর্থাৎ বশব্দ ভূত্য বললে ভুল হবে। লিখতে
হবে—'ইওরসু ফেব্‌লি' অর্থাৎ আপনার বিধিত বুলে?
এটা কারেক্‌সন্ করে দাও।

প্রভাত আদেশ পালন করলে। লোহার পেটের মাথায়
জুঁই ফুলের ঝাড়টিকে মনে পড়ল। মিষ্টগন্ধী কোমল সুন্দর
ফুল—কিন্তু যাকে অবলম্বন করে ওর সৌন্দর্য্যের প্রকাশ—

দরখাস্ত নিয়ে বড়বাবু চলে গেলেন। প্রায় এক ঘণ্টা
অপেক্ষা করতে হ'ল প্রভাতকে। একটি ঘণ্টায় এই অভিনব
জগতের কিছু আভাস পেলে ও। এই জগৎ যে জীবনধারণের
গানিমুক্ত নয়—তা বুঝলে।

বড়বাবু ফিরে এলেন হাসিমুখে। বললেন, লাকি
চ্যাপ, চল—সারোব তোমায় ডাকছেন। বোম করি কালই
এ্যাপারেন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে। বাড়ী গিয়ে মাকে
বলবে—যেন ঠাকুর-দেবতার পূজা মানত করেন—আর
ফেরবার পথে ফিরিঙ্গী-কালীকে প্রণাম করে যেও।...

সত্যিই চাকরিটা হয়ে গেল। পাঁচটার পর জনতার
স্রোতে নিজেকে মিশিয়ে ও বাড়ী ফিরলে। মনে মনে ক্রুদ্ধ
হ'ল—কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দেবতা বিশেষের উপর নয়—
সমস্ত পৃথিবীর উপর। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলে—এই পথেই

উন্নতি করতে হবে। এই মাটি থেকে রস শোষণ করে ও শুধু বাঁচবে না—সমৃদ্ধ হবে। অর্থের শাখায় ফুটেবে গৌরবের ফুল—যশের শৌরভে সে ফুল দ্রাস্তরের লোকের প্রশংসা, শ্রীতি আকর্ষণ করবে এবং সেই ফুল এক সময়ে জন-প্রকার উত্তাপে পরিণত হবে আত্মতৃপ্তির সুপক ফলে।

গেল—গেল—গেল। মোড়ের মাথায় ছাণা গাড়ীতে সংঘর্ষ হয়ে গেল—দু'ভাগে বিভক্ত জনতা শুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। এ-ও নিত্যকার ব্যাপার। বেষ্ট্র ভাগ লোকই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করে আবার লাইন-রচনা করলে—ওদের দাঁড়াবার সময় নেই। দুর্ঘটনা জীবনে হয়ত ঘটে নি—কিন্তু চার পাশে ঘটেছে অসংখ্য বার। বারা দুর্ঘটনায় পড়ে জীবন দিয়েছে কিংবা অদহানির দরুন অকর্মণ্য হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে এদের শুকাৎ অনেকখানি—এই দশটা-পাঁচটা-পঞ্চ-চলিয়ে দলের। পিতৃ মাতৃহারা ছেলেরা আপিসে ভিক্ষা করতে এলে—এদের অনেকেই অমান বদনে বলে, মাণ কর। আমাদেরই বলে কে দেয়।

আজই এমন ঘটনা ঘটেছে আপিসে। পথে বটল দুর্ঘটনা, জীবনের পথে পথে এই দুর্ভাগ। মনে বেদনা জমলে সহজে বার হতে চায় না—আনন্দকে বহু সাধ্যসাধনার আয়োজন করে আনতে হয়।

হাত মুখ বুজে বাইরের ঘরে বসল প্রভাত। ঘরের মুখে আত্ম ভাব দেখেছে—ছোট ভাইয়েরা আনন্দ প্রকাশ করেছে। লক্ষ্মী হেসে বলেছে মাকে, বড়লি যাবার সময় আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিলাম যে, চাকরি হবে না।

প্রভাত উৎসাহিত বোধ করেছে না—চাকরিসাভের কতিয়ে ওর এতটুকু আনন্দ নেই। ওর মনে হচ্ছে পৃথিবী আর বাইরে দাঁড়িয়ে নেই—এই ঘরেতেই গুটিয়ে এল। জানালা দিয়ে ঘেঁটু আকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে বাঁধা যে ক'টি নন্দ্র তাই জগতের সীমা, ওর পরিচয়ের পরিধি। যে করটি মাহু আছ আপা আখালে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাদের চারিদিকে ওকে ঘুরতে হবে দিনের পর দিন। মনে হতেই সে উদ্বেজিত হয়ে উঠল। না—না—না—এভাবে সর্ধীর্ণ হয়ে ও বাঁচতে চায় না—বাঁচতে পারবে না। ওর চাই বাইরের বিস্তৃত পৃথিবী—অধুরন্ত আকাশ—সংখ্যাহীন নন্দ্র—ঘাদের মুক্তিকার কল্পনার সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে জীবন হবে রসগ্রাহী বিস্তীর্ণ বেগবান ও আনন্দময়।

প্রভাত দা।...

কে ?—

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভঙ্কর ডাকলে। ওর চুল উকঝুক—মুখ শুকনো। ওকি চাকরি পেয়ে ওর কল্পনার পৃথিবীকে হারিয়েছে—প্রভাতের মত ?

এস—ঘরে এস।

শুভঙ্কর অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে ঘরের মধ্যে এল।

বলো।—

না—বিছানার ওপর বসব না। অশৌচ কিনা।

ওর খালি পায়ের পানে চেয়ে প্রভাত প্রশ্ন করলে, কে মারা গেলেন ?

যেজ জ্যোতাইমা।

হঠাৎ ?

হঠাৎ নয়—হ্যা—হঠাৎই। একটা ঢোক গিলে শুভঙ্কর বললে, আপনাকে ত পর মনে হয় না—শুধুম। তবু খানিক ইত্তভত্ত করে সে মাথা নামিয়ে কুঠিত করে বললে, ওর যত্ন ত বাতাবিক নয়—উনি আত্মহত্যা করেছেন।

আত্মহত্যা। প্রভাত ভীষণ ভাবে চমকে উঠল।

হ্যা—জানেন ত—দেবার দ্বারে আমাদের বিষয়-সম্পত্তি আর ত কিছুই নেই। আঘাত সহ্যে পারলেন না... অশ্রু-বাপে ওর স্বর অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

প্রভাত কোন প্রশ্ন না করে সেই বেদনাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

বাইরে গ্যাসের আলো জ্বলল—ঘরের মধ্যকার অন্ধকার সে আলোর দ্বিগুণ তরল হ'ল মাত্র। কারও মন থেকে অন্ধকার মুছে গেল না।

বহুক্ষণ পরে শুভঙ্কর বললে, আপনি যাবেন কি একবার ? মেজ জ্যোতাইমা বলছিলেন...

লাজুক শুভঙ্কর কথা শেষ না করে উত্তর-প্রত্যাশার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেই অন্ধকার ঘরে। তার পর ধীরে ধীরে চলে গেল।

৩৬

হলঘরের পাশে ছোট ঘরটিতে মেজজ্যোতাইমা বসে ছিলেন। শুধুমত অপরাহ্নের আলো আকাশ থেকে মুছে যায় নি; ঘরের মধ্যে আলোর চিহ্নমাত্র নেই। এই ঘরটি আকারেও যেমন ছোট সজ্জাতেও তেমনি রিক্ত। ছোটমত একটা তক্তপোষ ছাড়া ঘরে দ্বিতীয় আসবাব নেই। দেয়ালে একখানিও ছবি নেই, পলস্তার ওঠা বর্ণহীন দেয়াল। কড়িকাঠের আলকাতরা ধূসর হয়ে এসেছে—সেখানে আলোর কাহ্নস বুলছে না। দীপ জালানোর কোন ব্যবস্থাই এ ঘরে নেই। তক্তপোষটাও নয়—একটা সত্তরঙ্গ পেতে শুস্তার কাকগুলিকে অদৃশ্য করার আয়োজনও কেউ করেন নি। গজ শোকন্তরু বাতীটার প্রতীক যেন এই সর্বরিক্ত ঘরখানি, আর সেই ঘরের মেঝের বসে শুভবসনা মেজ জ্যোতাইমা—

প্রভাত তার অধরে মেঝের উপর বসল।

মেজ জ্যোতাইমা বললেন, সবই ত শুনেছ। কর্মফল কেউ খণ্ডন করতে পারেন নি আজ পর্যন্ত।

• তিনি চুপ করলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন না, সম্ভবতঃ চোখের জলও নয়। তরল অঙ্গকারে তাঁর শুভ্ররেখাময় দেহটি সামান্য নড়ে উঠল শুধু। এই একটুখানি চাকল্যের মধ্য দিয়ে বহু হুঃখ-বেদনাকে ঘেন বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি।

প্রভাত বললে, আপনি অনেক জানেন, আপনাকে আমি—

সব জেনেও মনের ছুরতপনা ধামানো যায় না বাবা। এমনি মায়া মহামায়ার। যাক, তোমাকে কেন ডেকেছি শোন। আমরা আর ক'টা দিন মাজ এখানে আছি। তাঁর কাছ শেষ হয়ে গেলে শহর ছেড়ে বাইরে যাব।

বেশ ত, কিছু দিনের জন্ত—

কিছু দিনের জন্ত নয় বাবা—বেশ কিছু দিনের জন্ত। হয়তো...কিন্তু আমরা যদি না-ই ফিরি তাহলেও হুঃখ নেই। এই বাড়ীর দু'একটি জিনিষ তোমার জিন্মায় রেখে যাব—

প্রভাত ব্যাকুল স্বরে বললে, কিন্তু আমার যে বলবার আছে জ্যোষ্ঠাইমা। আমি যদি আপনাকে না যেতে দিই এই বাড়ী থেকে?

তা ভো ভূমি পারবে না বাবা।—মেজ জ্যোষ্ঠাইমার মুখে শ্রান হাসি। একটু ধেমে বললেন, বোধ করি সব কথা শোন নি তুমি। আর শোনানোর নেইও বিশেষ কিছু। নদীর জল যেমন নীচু জায়গা পেলে নেমে যায় তেমনি নাবাল জমিতে পা ফেলে এ বাড়ীর লক্ষ্মীও আজ চলে গেছেন। এ বাড়ীতে আমরা থাকব কোন্ অধিকারে?

কিন্তু কোথায় যাবেন? শুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে প্রভাত।

ভগবান দয়া করে মাথা পৌঁছবার একটু ঠাই রেখেছেন—সেইখানেই যাব।

তবু আমি যদি না যেতে দিই আপনাদের?

প্রভাতের উজ্জ্বল চোখের পানে চেয়ে মেজ জ্যোষ্ঠাইমা বিম্বিত হলেন। বললেন, ভূমি একথা বলছ কেন বাবা?

কেন—আপনিও তা জানেন। এক দিন আপনাদের কাছে আসতে চেয়েছিলাম। বলেছিলেন, এখন নয়। আজও কি বলবেন—

না—আজ সেকথা বলব না। সেদিন তোমার দিকটাই দেখেছিলাম বাবা—আজ আমার দিকটাতেও ভূমি ভাল করে দেখ। তা হলেই কোথায় ভুল—কোথায় অসদতি বুঝতে পারবে।

না—কোথাও এর ভুল নেই। আমার অবস্থা বুঝ সচ্ছল নয়, তবু—

অবস্থার কথা আমি বলিনি, মাম-সন্তান রাখার কথাও নয়—তবু একটা কথা ভুলে যেনো না যে, যে-কোন ভাল জিনিষ পেতে হলে তপস্যাও করতে হয় তেমনি কঠিন। উমা অপর্ণা হয়েছিলেন বলেই শিবকে পেয়েছিলেন।

কিসের তপস্যা?

—সিপ্রার তপস্যা সবে আরম্ভ হ'ল—

না—না মেজ জ্যোষ্ঠাইমা—প্রভাত আর্জ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

কেন নয়? চিরকাল বড়-বাড়ীর কোলে যুগ যুগিয়ে—রইল যে, মান-সন্তানের কাচের স্বরে রঙীন বাতি জালিয়ে—পঙ্কর হৃদয়ের মিল পড়লে সুর করে—বাইরের পৃথিবী কেমন সে ধর সে বেবে না? পথে যে কত কাঁদা তার হিসেব রাখবে না? তার শিক্ষা শেষ না হলে তোমাকে লাভ করার যোগ্যতা সে পাবে কেমন করে। না বাবা, আজ নয়—সংসারে মানুষকে টানলেই সে সংসার ভরে ওঠে না—সুখেরও হয় না। যে সংসারের ঘে সুর সেই সুরের পরিচয় যে নিজেই হয়। না মিলে জীবন সুখের হয় না—সংসারে শান্তি থাকে না।

শূন্য ঘর, তবু প্রভাতের মনে হ'ল সমস্ত ঘর জুড়ে যা রয়েছে তা এই প্রাসাদের কোন অংশে বুঝি নেই।

মাথা নীচু করে প্রভাত বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাড়ীতে স্তম্ভনয়ী তখন চীৎকার করছেন; আর পারি না বাপু, চিরকালই কি ছুত্তের ব্যাগার বাটবো। চাকরি হ'ল—এইবার বিয়ে-বা করে সংসারী হ'। আমার ছুটি দে সংসার থেকে।

এই সংসার। এখানে আসবার জন্তও তপস্যা করতে হয়।

ঠোটের কোণে হাসি ফুটে-না-ফুটে মিলিয়ে গেল। সত্যই ত সংসারে আশ্রয় নেবার জন্ত তপস্যা করতেই হয়। লক্ষ্মী আর সিপ্রা যেমন এক নয়—তেমনি ওই প্রাসাদের গোছে এই গৃহের গোছও মিলবে না। ওখানে ভাঙা-চোঁরার মধ্যে যে শ্রানি এখনও লেগে রয়েছে তাকে তপস্যার দ্বারা নিঃশেষে মুছে না ফেললে এখানকার অগৌরব বইতে পারবে কেন সিপ্রা।...এই ভাঙা-কলভলা, অপরিহার্য উঠান, সঙ্গীত আকাশ, তিন দিকের দেয়াল-আঁটা সঁাভসঁেতে ঘর আর তেল-হুন লক্ষ্মীর আলাপ...। আশ্রয় দেবার অহিমায় সিপ্রাকে এই কারাগারে বন্দী করার ব্যবস্থা কি সাহসে যে করলে প্রভাত।

বহুক্ষণ ঘুম এল না। কেমন যেমন অবস্থিতে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল প্রভাত।

চোখের উপর আলোর স্পর্শ—কোমল নয় ভীতাই। সে আলো পথেরই। কিন্তু চোখ চাইলেই সামনের তিনভলা বাড়ীর ভেতলার বরটাই নজরে পড়বে। ও-ঘরে সারা রাত ঘরে কোমল নীল আলো জ্বলে, সারা রাত ঘরে আকাশ ঘরে আনে কত স্বপ্ন আর ঐখ্যের সন্তান—কত কল্পনার স্বপ্ন ভাঙে আর গড়ে। ও-জগৎ প্রভাতদের নয়—ওকে সামনে রেখে নিজা যাওয়াও কি কঠিন।

চোখ না চেয়েই প্রভাত জানালার কাছে উঠে এল এবং জানালাটা বন্ধ করেই আবার শুয়ে পড়ল।

সকালে কিন্তু জানালাটা খুলতেই হ'ল। তারপর সারাদিন সংসারের কাজ ও নিজের চিন্তার সঙ্গে সাধনের ভিততলা বাড়াটাও কখন মিশে গেল আত্মব্যাভাবে। সন্ধ্যাবেলায় কৰ্ম-শ্রান্ত হয়ে ধরে আসতেই মনে হ'ল জানালার বাইরে প্রভাতের জীবনেরই একটি অংশ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে পড়েছে। বিশ্রাম-মুহুর্তে সেই অংশটা বিপ্লবীর ভূমিকা নিয়ে ওকে উদ্ভাসিত ও উত্তেজিত করে তুলবে। সুতরাং জানালাটা বন্ধ করে দিতেই হবে।

প্রদীপ-হাতে লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে এল। প্রভাতকে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, ওমা, এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? থাকে থাকে না? আজ সন্ধ্যা দিতে বজ্র দেয়ি হয়ে গেল। বলতে বলতে ও এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। প্রদীপটি উচু করে ধরে বারকক্ষে আন্দোলিত করে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম জানালে। কার উদ্দেশে প্রণাম জানালে লক্ষ্মী?

কৌতূহলী প্রভাত জানালা থেকে সরে এসে লক্ষ্মীর পিছনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। যা নিত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধে সে সরিয়ে রেখেছিল, এই যুগ ও জীবনকে মিশ্রিত করবার বিন্দুমাত্র কমতা যাদের নাই বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জন্মেছিল, সেই

সব প্রতিভাশালী কর্মবীর বরেন্দ্র হাহুয়ের ছবি আবার দেয়ালের গায়ে কে টাঙিয়ে দিয়েছে। শুধু টাঙিয়েই দেয় নি—বেড়ে যুঁহে পরিপাটি করে সেগুলিকে নতুন রূপ দিয়েছে অমুখ্যল। প্রদীপের আলোকানিত আলোর সৃষ্টিগুলি যেন সজীব হয়ে উঠল।

প্রদীপ পিলসুজের উপর রেখে লক্ষ্মী প্রভাতের পানে ফিরে বললে, ছবিগুলো ভাল করে বাঁধিয়ে দাও যদি তা হলে খুলো আর পোকার নষ্ট করতে পারে না।

আসছে মাসে-মাইনে গেলে বাঁধিয়ে দেব—কি বলিস? প্রভাত প্রসন্ন হাতে জবাব দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের মনে হ'ল—এই দুর্দশাশ্রম কুন্ড বরে চারিদিকের দেয়াল থাকবে, জীর্ণ লোহার পরাণে দেওয়া একটি মাত্র জানালাও থাকবে—আর সে জানালাটা বন্ধ করা চলবে না এবং দেয়ালের গায়ে থাকবে ওই ছবিগুলি। সকালে গঙ্গাজল ছিটকে ও সন্ধ্যায় প্রদীপ জালিয়ে লক্ষ্মীর মত কল্যাণী মেয়েরা এই ঘরের অন্ধকারকে ও অন্তর্ভুক্ত করে নেবার সাধনাও করবে প্রভাত। মন্দ কি, যুগ-যুগান্তর ধরে চলুক না এই জয়-পরাজয়ের খেলা—জীবন-মীলার প্রবাহ, অন্তর্ভুক্ত থেকে শুভে, ভয়সা থেকে জ্যোতিতে, যত্ন থেকে অযত্ন লোকে উত্তরণের সাধনা।

সমাপ্ত

দ্বিপ্রহর

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জানালার পারে হাতছানি দেয় দ্বিপ্রহর,

চোখেতে চলেছে ছপুয়ের রোদে সূর্য চোলাই।

লোনা দেওয়ালের গর্ভেতে ঢোকে বুন্দো-ভয়র,

ভয়রের এই গান থেকে দেখি রক্ষা নাই।

হুয়ে কি পড়েছে বহু দূরে বন কাঁঠ-চাঁপার?

শেয়াল-কাঁটার বনে বনে কাঁপে হলদে ফুল।

বরজে বরজে অবশ অন্ধ পান-পাণ্ডার,

পান-পাণ্ডাগুলি হুয়ে যে পড়েছে—নেইক ভুল।

ঝাঁঝ করে মাঠ, খটখটে ঘাট, গীতাভ ঘাস—

গীতাভ সে-বাঁস ছেড়ে ছায়া খোঁজে গরু-বাছুর,

ঘুনি-হাওরার-ঘুলিদের ওঠে নাতিশাস,

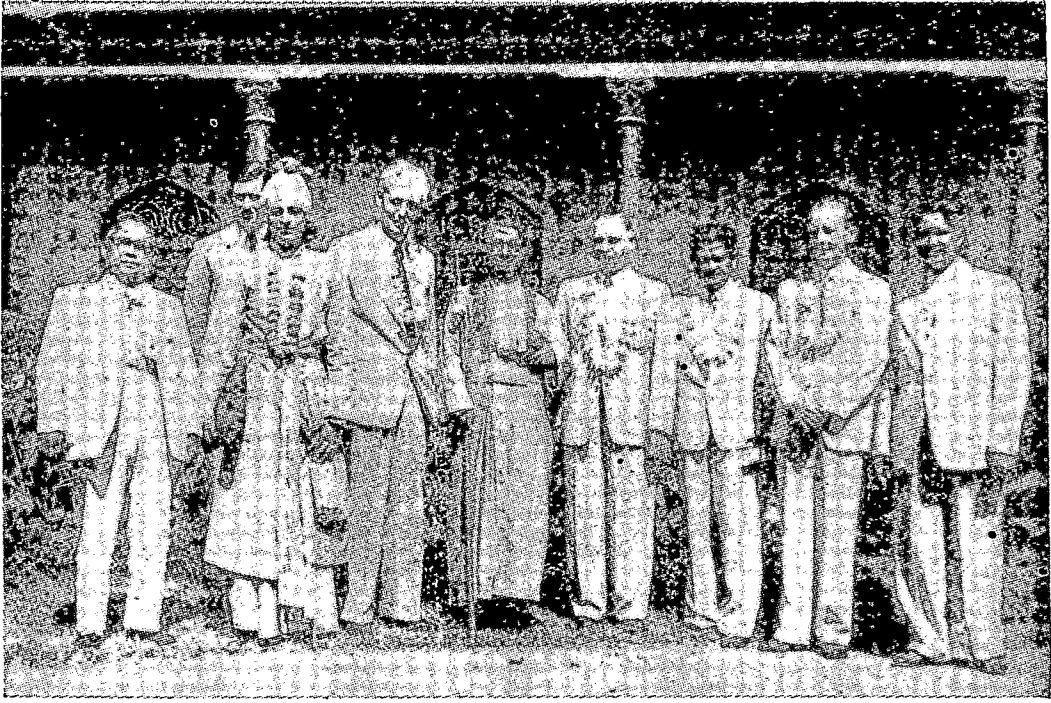
রোদের-বেলায়-বরা-পাতা যায় কতো সে-দূর?

আকন্দ-বন ছাড়ায়ে ওদিকে ঘুরে ডাঁক,

ঘুঘু ডেকে করে—কণ্ঠেতে তার বিরাগি-হুয়।

খেয়ী হুহুরের ক্ষত চৌকরায় ঘুঁড় কাক;

গর্ভে কিম্বদন্তি বান-চোর যতো কেত-ই-হুয়।



দক্ষিণ আমেরিকার লর্ড টাউনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারক-দলের সংবর্ধনা।
 বাম হইতে দক্ষিণে—ডাঃ জে. বি. সিংহ (প্রথম), ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (দ্বিতীয়), ব্রিটিশ সিনিয়র গবর্নর স্যার
 চার্লস উলী (তৃতীয়), স্বামী অবৈতানন্দজী (চতুর্থ) প্রভৃতি

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

ব্রহ্মচারী রমেশ

ভারতের বাহিরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য প্রভৃতিতে লিঙ্গ ভারতবাসীর যে একটি মোটামুটি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহা চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি। ভারত মহাসাগর অঞ্চলেই ভারতীয়েরা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। সেখানকার জিহ্ম লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয়। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত দেশে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা নিম্নোক্ত কম নহে। তাহাদের একটি পরিসংখ্যান নিয়ে প্রদত্ত হইল :

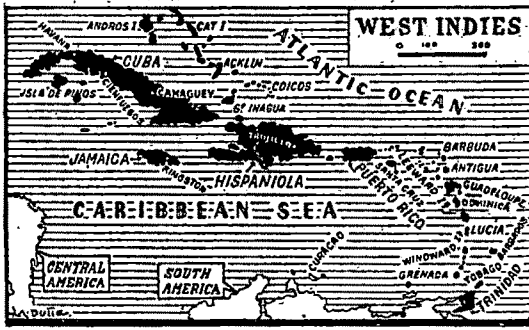
ব্রহ্মদেশ	১,০০,০০০
সিংহল ও মালয়	৭৫,০০০
মরিশস ও দক্ষিণ-আফ্রিকা	২,৫০,০০০
ক্যামেরোনিয়ান অঞ্চল	৫,০০,০০০
জিনিদাদ	২,০০,০০০
ব্রিটিশ সিনি	১,৫০,০০০
ডাচ সিনি	৬০,০০০
জামাইকা	২০,০০০
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	১,৩০,০০০

ইহাদের মধ্যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে ৫০%, যুক্তরাষ্ট্রে ৪০%, এবং বাকী ১০% লোক অজ্ঞাত রাষ্ট্রে

বাস করে। প্রবাসে ঐ সকল ভারতীয় পুরুষাভুত্রে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বাস করার কালে তাহারা ক্রমশঃ নিজ নিজ আদর্শ ও স্বাভাব্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। স্বাধীন ভারতের পক্ষ হইতে সেসকল তাহাদের সহিত যোগস্বজ স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাক্ষর-বিধানের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় আজ আসিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক দূতগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের সমাভম আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। এশিয়ার বহু অঞ্চলে তাহার নিদর্শন আছে। কেবল এশিয়ায় নহে, ইহার বাহিরেও অজ্ঞাত দেশে ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যাদির বিস্তারলাভ ঘটয়াছিল।

কাল-প্রবাহে ভারতের প্রচারকার্য ব্যাহত হয়। সাংস্কৃতিক দূতের পরিবর্তে হাজার হাজার ভারতবাসী অমিকরূপে গন্ত শতাব্দীর প্রথম হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত হইতে থাকে। ইহার ফলে আজ আফ্রিকা, ফিজি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মরিশস, দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে



পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

বহু ভারতীয়কে পুরুষাভুজকে বসবাস করিতে দেখি। এই সকল ভারতীয় নিজ নিজ পূর্বপুরুষগণের মহান ঐতিহ্য ভুলিতে বসিয়াছে। তাহাদের ভিতর অতীতের আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার পুনরুজ্জীবনের জন্ত বর্তমানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বহির্ভারতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে আমরা গত শ্রাবণ ও পৌষ সংখ্যার প্রবাসীতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

সংঘ হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশন বৎসরাধিক কাল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রিটিশ গিনিতে ভারতীয় সংস্কৃতির আবহাওয়া সযত্নে নানা ভাবে প্রচারকার্য করেন। তাহাদের প্রচারে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ সফল পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জিনিদাদ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট মিশনের প্রচারকার্য বাহাতে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় তদ্বশেষে পজও লিখিয়াছেন।

সংঘের এই সাংস্কৃতিক মিশন গত ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাস

হইতে ১৯৫১ সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বহুশত শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচারকার্য করিয়াছেন। তাহারা ৩৬১টি জনসভায় ভারতীয় সংস্কৃতির মহান আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাদের চেষ্ঠায় ১৪৯টি বৈদিক বজ্র, ১১৩টি ধর্মবিষয়ক বিবিধ অস্থান, ১১টি বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন অস্থিতি হয়। দ্বিতীয়, উপনিষদ, বেদান্ত, বৈদিক প্রার্থনা, তুলসীদাসের রামায়ণ, লজ্জারায়ণের ব্রজকথা প্রভৃতি

বহুসংখ্যক পুস্তক সঙ্ঘ বিমানমধ্যে বিতরণ করেন। ভারতীয়-গণ তাহাদের মাতৃভাষা (হিন্দী) প্রায়ই ভুলিতে বসিয়াছে। তাই মাতৃভাষার প্রতি অহুয়াগ যত্নের নিমিত্ত মিশনের প্রচেষ্টায় তথায় পাঁচটি হিন্দী পাঠশালা খোলা হইয়াছে, বিভিন্ন স্থানে আটটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের ভিতর দিয়া এই গঠনমূলক কাজ খুবই সমরোপযোগী। এই বিষয়ে “আনন্দবাজার পত্রিকা”র ১৩৫৮ সালের এই তারিখ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে :

“পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জিনিদাদে ভারতীয় হিন্দু শ্রমিকগণ চালা ভুলিয়া কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। প্রধানতঃ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশনের প্রেরণাভেই জিনিদাদের প্রবাসী ভারতীয় হিন্দুগণ তাহাদের সংস্কৃতি অক্ষুর রাখিবার এই উত্তোগে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। স্থানীয় ইউরোপীয় এবং নিগ্রো সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অস্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দুধর্মের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশভূমি হইতে বহু দূরে এক দ্বীপদেশে অবস্থান করিয়াও দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিক তাহার সংস্কৃতির প্রতি যে মমতা ও প্রীতি



ভারতীয় শ্রমিকদের প্রথম অবতরণ-কেন্দ্র—ত্রিভু টাউনের একটি অটালিকা

অক্ষুর রাখিয়াছে তাহাতে শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্বই নহে, দরিদ্র ভারতীয় শ্রমজীবীর সাংস্কৃতিক মহত্বও প্রমাণিত হইতেছে।”

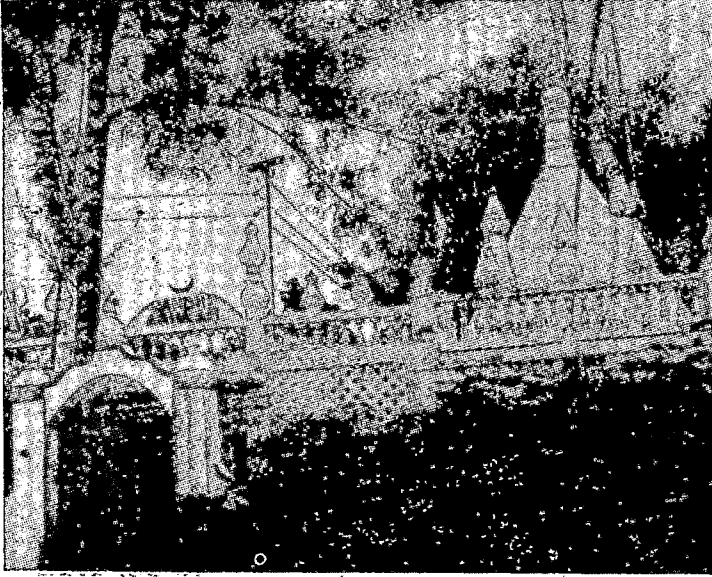
মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই এক দিন ভারতের সংস্কৃতি পতিয়া উঠিয়াছিল। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা, তাকর্ষ্য প্রভৃতি এমনই সুন্দররূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল যে, তাহার পরিচয়ে আজিও বিশ্বের

অভিভূত হইতে হয়। তাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশন মন্দির প্রতিষ্ঠার এত যত্নশীল, জিনিদাদে আগমনের পর মিশনের উদ্যোগে একটি মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বৈদিক শান্তি-যজ্ঞ, বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ভজন-কীর্তন প্রভৃতিরও আয়োজন হইয়াছিল। জিনিদাদে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “প্রবাসী ভারতীয়গণকে লক্ষ্য করিয়াই

bring about a general wellbeing of all people irrespective of caste, creed or colour.”

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই প্রচারক দল ভারত হইতে ১২০০০ মাইল দূরে অবস্থিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে ব্যাপকভাবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির

প্রচার করিতেছেন। পূর্বেরকার ইতিহাস জানিতে পারিলে, এরূপ প্রচারের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা আমাদের



জিনিদাদে শাক্তী স্মৃতি-মন্দির ও শিবালয়

অগতের অত্যাচার জাতিগুলি ভারতের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিচার করিবে। সুতরাং প্রবাসী ভারতীয়গণের চরিত্রবত্তা, আদর্শ জীবন-স্থাপন-প্রণালী যেরূপ সকলকে মুগ্ধ করে। ভারত এক দিন তাহার মহান আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে জগৎপুত্র হইয়াছিল। স্বাধীনতার পর জগতে পুনরায় সেই অধ্যাত্ম-বাদের প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে।”

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের ব্যাপক প্রচারের জন্য সচেষ্ট। সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক প্রচার ব্রিটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জনগণের মনে গভীরভাবে রোপিত করিয়াছে, তাহারা অমেকে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী ও নিম্নোক্ত নেতা ডাঃ এক. এ. জিচলো মিশনের প্রচারকার্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন,

“Hindu religion and culture have always been characterised by its liberal Catholic outlook and as such Indian Cultural propaganda conducted by the Bharat Sevasram Sangha would not only be beneficial to the Hindus of the colony, but it is sure to

বড়ই করুণ। ভারতীয়েরা যেহেতু এই-সুদূরদেশে গমন করে নাই। ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহের এক একটি সংস্থা (Recruitment bureau) গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সমগ্র দেশে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শ্রমিক সংগ্রহকারী সংস্থাগুলি ইহার সুযোগ বিশেষভাবে গ্রহণ করে। তাহারা নামারূপ প্রলোভনে ডুলাইয়া ভারতীয় শ্রমিকগণকে বিদেশে পাঠায়। তাহাদিগকে বহির্ভারতে প্রেরণের সময় পথিমধ্যে তাহাদের অর্থ-সুবিচার দিকে লক্ষ্য রাখা হইত না। এই প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগামী কাহাজে খাদ্যাভাবে ও আধি-ব্যাবিভে শতকরা পনের জন শ্রমিক ইহলীলা সংবরণ করে।

পথে এইরূপ অসহনীয় দুঃখভোগের পর কর্মক্ষেত্রেও তাহাদিগকে বহুবিধ অপ্রীতিকর ঘটনার সন্মুখীন হইতে হয়। কর্মে নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদিগকে একজন কর্তার ওত্থাব্যবহারের অধীনে থাকিতে হইত। তাহাদিগকে সাধারণতঃ ইক্ষুক্ষেত্রে ও জলপাই, কোকো, বাদাম প্রভৃতির জমিতে শ্রমিকের কার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। কর্মে

নিষোগের পর অমিকগণকে যে অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত তাহা অতীব বেদনাদায়ক। তাহাদের বাসস্থানগুলি সর্বাসময়ের উপযোগী ছিল না। ১০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট লম্বা ব্যারাকগুলিকে ১০-১৬টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া যতদূর

সুযোগ দান করা হয়। কলে তাহারা পুষ্কভাবে বসবাসের অল্প ক্রমি পায়। তাহাতে সামান্য কুটির নির্মাণ করিয়া থাকিবার ব্যবস্থাও করা হয়। কবিই তাহাদের প্রথম উপজীবিকা হইল। স্থায়ী ভাবে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা



স্থায়ী অবস্থানসম্পত্তি কর্তৃক জিন্দাদে একটি
হিন্দু-মন্দিরের ঘরোয়াঘাটন

সমস্ত অমিকে পরিপূর্ণ করা হইত। এই বদ্ধ গৃহগুলিতে ভারতীয় অমিকগণ কয়েকটি জীবন যাপন করিত। তাহাদের সাত দিনের মধ্যে এক দিনও কর্মে বিরতি থাকিত না। প্রতিদিন ছয়-সাত আনা পারিশ্রমিকে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর ভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। চিকিৎসার ব্যয়ই ছিল না। অসুস্থতাবিবন্ধন কার্যে অগ্রপস্থিত থাকিয়া কৈফিয়ৎ দিতে বিলম্ব হইলে তাহাদিগকে নির্দয় ভাবে বেজাদাত করা হইত।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল অমিককে পঞ্চবার্ষিক চুক্তিতে (অর্থাৎ, পাঁচ বৎসর পরে বিনা খরচে তাহাদের ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হইবে) লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে, চুক্তির সর্ব পালন করা দূরে থাকুক, তাহাদের সামান্যতম দাবিগুলি পূরণও কর্তৃপক্ষ করণাত করেন নাই। কখনও কখনও আবেদন-নিবেদনের পর তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অগ্রমতি দান করা হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও অনেকে স্বদেশে ফিরিতে সক্ষম পাইত না, কারণ সমুদ্রপথে তাহাদের অসামান্য কষ্ট ভোগ করিতে হইত। ইহার পর তাহারা সম্ভবতঃ ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করে যেন তাহাদিগকে পৃথক ভাবে থাকিবার



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে জিন্দাদে নবনির্মিত
একটি হিন্দু-মন্দির

তাহাদের ছিল না; এই পূর্বসমনকে তাহারা সাময়িক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। সুযোগ পাইলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে এই আশা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। তাহাদের সমস্ত ইচ্ছাই ব্যর্থতার পর্যাবসিত হয়। সেইজন্য পরে এই দুই প্রবাসকেই ভারতীয়েরা স্থায়ী বাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করে। পুরুষাশুক্রমে এই সুদূর প্রবাসেই তাহারা স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। তাহাদের একান্তিক নির্ভর ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই দীপদেশ ক্রমশঃ শান্তাশ্রম জন্মপথে পরিণত হয়। বর্তমানে এই উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার মান, পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্থিক সম্বলতা, স্বাস্থ্যের বিভিন্নতা এবং শিক্ষা ও পরিবেশের দরুন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে উকিল, ব্যারিষ্টার, চিকিৎসক, বড় বড় শিল্পপতি, দ্বিতীয়

শ্রেণীতে ছোট ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষেত্রের মালিক, সরকারী চাকরিয়ী এবং তৃতীয় শ্রেণীতে অশিক্ষিত শ্রমিক। শেষোক্ত শ্রেণীই—প্রবাসী ভারতীয়। কৃষিই ইহাদের একমাত্র সম্বল। তাহারা শতক্ষেত্রে শ্রমিক যোগাণ্ড, উপনিবেশের উন্নতি



জিনিদাদে হিন্দু-মন্দির

সম্বন্ধিত তাহাদের দান প্রশংসনীয়; কিন্তু তাহাদের জীবন-যাত্রার মান অতি নিম্নে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখেন না। তাহাদের সম্ভান-সম্মতিগণ উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। জিনিদাদের অধিবাসী সাড়ে সাত লক্ষ। তাহাদের জন্ম একটিও উচ্চ ইংরেজী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই। এই স্থানে ১ লক্ষ ২০ হাজার হিন্দুর বাস। কিন্তু হিন্দুর বর্ষ ও সংস্কৃতির অহুসীলনের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান একটিও এই স্থানে দেখা যায় না। শিক্ষাদীক্ষার বঞ্চিত হইলেও আত্ম-তাহাদিগের মধ্যে একটি প্রাণচাক্ষুসী লক্ষিত হইতেছে। তাহারা বর্ধমানের নিজেদের বাবীন ভারতের অধিবাসী বলিয়া গর্ব অশুভব করে। আশা করা যায়, শীঘ্রই তাহারা নূতন আলোকের সম্মান লাভ করিবে।

শতাধিক বৎসরের মধ্যে এখানকার ভারতীয়গণের সামাজিক জীবনে গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছে। তাহারা পাক্ষাত্য ভাবে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ভারতীয় রীতি-নীতিও তাহারা ভুলিতে বসিয়াছে। কয়েক জন করিয়া নির্ভাবান ব্রাহ্মণ এক-একটি কলোনিতে থাকেন; তাহাদের চেষ্টায়

কোনও কোনও স্থানে ধর্মীয় অস্থানাদি উদ্ঘাপিত হয়। কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। কোনও কোনও স্থানে শিব-পূজা, মহাবীর পূজা, দ্বিতা ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। এক স্থানে শিবমন্দির ছাড়া ধর্মীয় অস্ত্র/কোনও প্রতিষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দুদের মধ্যে ক্রান্তিভেদ এবং শ্রেণী-বিভাগও আছে। সনাতনী হিন্দু, আধ্যাত্মমাজী, কবীরপন্থী প্রভৃতিই প্রধান। সনাতনীগণ ছুঁমার্গকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে এবং আধ্যাত্মমাজীগণ মুক্তি পূজার বিরোধী। সেইজন্য কোনও প্রচারককে ভারতীয় সনাতন আদর্শ ও হিন্দু ধর্মের আগন্তুক বৈশিষ্ট্য প্রচারের সময় ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

বিদেশে হিন্দুদের সংগঠনী প্রতিষ্ঠা বস্তুগত হইতে পারে নাই। যদি তাহারা অনৈক্য পার্থক্য ভুলিয়া সংজ্ঞাবদ্ধ না হয়, তবে রাক্ষসাত্মক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যিক বাহ্যিক মাধ্যমে ব্যায়ামাগার, পাঠাগার, ছাত্রাবাস ও জনহিতকর সংস্থাসমূহ গড়িয়া উঠিবে। বর্ষ ও সংস্কৃতিবুলক অবস্থার ঐগুলিকে সম্মুখিত রাখিবার জন্ত শিক্ষিত সন্ন্যাসী প্রচারক প্রেরণ করা দরকার। জিনিদাদে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারক দলের পক্ষ হইতে প্রেরিত এক পত্রে জানা গেল যে, এই স্থানে ভারতীয় ভাষার কোনও সংবাদপত্র নাই। সেইজন্য পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন ও সহযোগিতাকে দৃঢ় করিবার জন্ত হিন্দী ভাষায় পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা আবশ্যিক। ইহা দ্বারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচারের পথ সুগম হইবে।

সঙ্ঘের প্রচারকদল বহির্ভারতে হিন্দু—তথা ভারতীয়গণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। যদিও হিন্দুগণ আপনাদের বর্ষ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে; যদিও তাহারা মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে তবুও এই প্রচারক দলের প্রচারের ফলে বহির্ভারতে হিন্দুদের ভিতর একটি জাগরণ আসিয়াছে। বর্ষ ও সংস্কৃতির প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় প্রেম, মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সঙ্ঘের প্রচারকগণের উদ্যোগে অস্থগিত জনসভায় তাহাদের কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তাহারা নিজেদের হিন্দু তথা ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অশুভব করেন। তাহারা এই প্রচারক দলকে বহির্ভারতে স্থায়ীভাবে প্রচারকার্যে নিয়োজিত রাখিবার জন্ত সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ এবং ভারত-সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

প্রায় এক বৎসর অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে সন্ন্যাসিগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ২২টি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। জিনিদাদে প্রধান কেন্দ্রের ভার স্বামী পূর্ণানন্দের উপর অপিত হইয়াছে। কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত পূজা, আরতি, বৈদিক সন্ন্যাস, যজ্ঞ, তজ্ঞকীর্তন, হিন্দী পাঠ-

মিশ্রিত চলিতেছে। স্বামীজী এ স্থানে একটি গঠনমূলক
কল্পনাও প্রণয়ন করিয়াছেন।

স্বামীজী লিখিয়াছেন, “প্রচারের জন্য একটি মোটর
গাইয়াহি। ৪ মাসে বার্ষিক ৮০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ



ত্রিনিদাদে ভারতীয় শ্রমিকের কুটার

করিয়া দূর দূর গ্রামে গিয়া ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, গীতাব্যাবা, শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও উৎসাহদান, স্থানীয় ধর্ম-সংসদে সাপ্তাহিক প্রার্থনা-সভা পরিচালনা, যজ্ঞ, পূজা, আরতি সম্পন্ন করা ও করান, আমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দী স্কুলগুলি পরিদর্শন, বৈদিক সন্ধ্যা শিক্ষাদান, ধর্মীয় অস্থানাদি সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা বা সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমবেত সম্মেলনে সমালোচনার যথাযথ মীমাংসা, আমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন ও কার্যাবলী স্তূরূপে পরিচালনার পরামর্শ দিতেছি। হিন্দী স্কুলগুলি বাহাতে ভালভাবে চলে, সেই দিকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। এক একটি ছেলা ধরিয়া ধরে ধরে বাহাতে ধর্মীয় অস্থানাদি সম্পন্ন হয় এবং প্রতিদিন দক্ষায় বাহাতে গৃহের সকলে প্রার্থনায় যোগদান করে, সেই দিকে চেষ্টা করিতেছি। এই সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতেছি। হিন্দী স্কুলের শিক্ষকগণের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া স্কুলগুলিতে একটি বোর্ড গঠনের চেষ্টা করিতেছি। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার ও ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, বাহাতে হিন্দীভাষা এধানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যপাঠ্য ভাষারূপে গৃহীত হয়।...”

সংজ্ঞের সম্মানী প্রচারকগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিশেষ সকলতার সহিত প্রচারকার্য সমাপ্ত করিয়া ব্রিটিশ গিনিতে (দক্ষিণ আমেরিকা) গমন করেন। সেই স্থানেও তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের সভ্যগণ এটকিনসন বিমানঘাটিতে অবতরণ করিলে প্রদেশের

চীফ সেক্রেটারী অনায়েবল মি: জন গুচ, সরকারের শাসন-পরিষদের সভ্য মানবীর ডা: জে. বি. সিংহ, ইন্ডোগায়েনিজ গুড্‌উইল সার্ভিসের সভাপতি মি: জে. প্রভুদাস, কেন্দ্রীয় সংবর্ধনা সমিতির সভাপতি মি. এস. পি. সিংহ, সম্পাদক মি: দীনদয়াল সিংহ প্রমুখ সত্তর জন বিশিষ্ট ভারতীয় তাঁহাদিগকে



ত্রিনিদাদে কোকোর বাগানে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিক

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিমানঘাটি হইতে একশ মাইল দূরবর্তী জর্জ টাউন শহরে সপ্তভগণ নীত হন। শহরে পৌঁছিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বেতারকেন্দ্র হইতে মিশনের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হয় এবং প্রদেশবাসীর পক্ষ হইতে মিশনকে স্বাগত সন্ধ্যা জ্ঞানানো হয়। মিশনের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রদেশের সর্বত্র ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং বেতারকেন্দ্র হইতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

ব্রিটিশ গিনিতে প্রায় দেড় লক্ষ ভারতীয় প্রবাসী স্থায়ীভাবে বাস করে। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা এক লক্ষ একশ হাজার। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ শতাধিক বৎসর পূর্বে এই দেশের চিনির কলগুলিতে শ্রমিক হিসাবে আগমন করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ইহাদের ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান হইতে তিন শত ভারতীয় স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছে। বহুদিন মাতৃভূমি হইতে দূরে থাকার কলে প্রবাসী ভারতীয়গণ নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে অজ্ঞ। পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য আবহাওয়ার ভিত্তর থাকিতে থাকিতে ব্রিটিশ গিনির প্রায় বাইশ হাজার হিন্দু ধর্মভ্রষ্ট গ্রহণ করিয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) মধ্যাহ্নে ব্রিটিশ গিনির গবর্নর হার চার্লস উলী মিশনের সভ্যগণকে এক সম্বর্ধনা-সভায় আপ্যায়িত করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে স্থানীয় টাউন হলে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে উলী পৌরোহিত্যে

এক বিরাট জনগতায় মিশনকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের সভ্যগণের পরিচয় প্রদান করিয়া ব্যারিষ্টার হুগ্গীম সিং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষকে বক্তবাদ জানাইয়া বলেন, “কেবলমাত্র প্রবাসী ভারতীয়গণই বহির্ভারেতে এই



ত্রিনিদাদে আর্থাসমাজ মন্দির

সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের জন্ত সঙ্ঘের নিকট ঋণী থাকিবে না,—জগতের অভ্যন্তর সম্প্রদায়ও সঙ্ঘের নিকট সম ভাবে ঋণী থাকিবে।” সভাপতি হার চার্লস উলী মিশনকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন, “আজিকার স্থিতি আমার দীর্ঘকাল সিংহলে অবস্থানের পুণ্যস্থিতি জাগাইয়া দিতেছে। আমি সেখানে ভারতীয় সন্ন্যাসীর যে উদারতা ও মহাত্মবৃত্তার পরিচয় পাইয়াছি তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।” তিনি আরও বলেন, “আমরা ভারতের নিকট চিরকণী থাকিব। এই জাতীয় প্রচারক প্রেরণের জন্ত ভারতের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। এই জাতীয় সাংস্কৃতিক মিশন—যাহার আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান, তদ্বারা কেবল এখানকার ভারতবাসীর নহে, অভ্যন্তর সকল সম্প্রদায়েরই প্রভূত কল্যাণ হইবে। প্রেম ও মৈত্রীই ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিলে বিশ্বের আধুনিক সমুদয় সমস্যার সমাধান সহজ হইবে।” পরিশেষে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক-দলকে সর্বপ্রযত্নে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

জর্জ টাউনের মেয়র মিঃ আর. বি. গজরাজ জনসাধারণের পক্ষ হইতে মিশনকে সংবর্দ্ধনা জানাইয়া বলেন, “আজ দক্ষিণ আমেরিকা ভারতের সংস্কৃতির প্রচারকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে গিয়া নিকেকে গৌরবাহিত মনে করিতেছে। ফেননা ভারতীয় সন্ন্যাসীর পদার্পণ এই দেশে ইহাই প্রথম।” সংবর্দ্ধনার উত্তরদান-প্রসঙ্গে মিশনের নেতা স্বামী-অরোভানন্দজী বলেন, “মিশনকে সন্মানিত করিবার জন্ত আপনাদের যে আকুল

আগ্রহ, তাহা ভারতের স্নাতন আদর্শ, তথা সভ্যতার অন্তরের গভীর প্রকার পরিচায়ক। ভারতবর্ষ হইতে এত সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়াও ভারতের সংস্কৃতিকে ধরিয়া ধারিবার জন্ত আপনারা যে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভারতবাসী হিন্দুর নিকট আদর্শরূপে প্রতিভাত হইবে।” প্রবাসী ভারতীয়গণের দায়িত্ব, তথা কর্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলেন, “বিদেশে বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশকে মাতৃ-ভূমিরূপে মান্য করিয়া তাহার উন্নতি-প্রগতির সহিত নিকেকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিলেও ভারতমাতাকে বিস্মৃত হইলে নিদারুণ কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রদান করা হইবে। বিদেশে ভারতীয়গণকে দেখিয়াই বিজাতীয়গণ ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শ ও সভ্যতার বিচার করিবে।”

স্থানীয় সরকারের শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য ডাঃ জে. বি. সিংহ সম্মেলনে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার আদর্শ, তথা সংস্কৃতি মিশনের দ্বারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে নৈতিক ও ধর্মীয় আগ্রহ আনিয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। জনগতায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

মিশনের সদস্যগণ চারি মাসকাল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গিনিতে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান আদর্শসমূহ প্রচার করেন। তাহাদের প্রচারের ফলে সকল শ্রেণীর মন-মারীর মধ্যে অপূর্ব সাড়া পড়িয়াছে। সকলেই মিশনের নিকট হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ ও তাৎপর্য জানিবার জন্ত বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত। মিশনের প্রচারকগণ ব্রিটিশ গিনির প্রচারকার্য সমাপ্ত করিয়া ভারতের পথে নিউইয়র্ক হইয়া লণ্ডন শহরে পৌঁছিয়াছেন। ত্রিনিদাদের বিমানঘাটিতে সদস্যগণকে বিপুল সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বহুদূর হইতে শত শত প্রবাসী ভারতীয়—সদস্যগণকে প্রত্যাগী নিবেদনের জন্ত সমবেত হইয়াছিল। স্বামীজী তাহাদিগকে মাতৃভূমির মহান আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রক্ষা করিবার আবেদন জানাইয়া ভাষণ দেন। স্বামীজী পুনরায় বিদেশে মিশন প্রেরণ করিবার আশাস তাহাদিগকে প্রদান করেন। মিশনের প্রচারের প্রত্যাব প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে এমনভাবে পড়িয়াছিল যে, বিদ্যাকালে তাহারা অর্জসংবরণ করিতে পারে নাই।

জাহ্নবীরী (১৯৫২) প্রথম সপ্তাহে মিশন লণ্ডন মগরীতে অবতরণ করেন। লণ্ডনেও তাহারা অত্যধিক জন। ডাঃ থাকর ও ডাঃ কুহুটী তাহাদের প্রচারকার্যের এবং অবস্থানের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় রাজ-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সুরক্ষাভান মিশ্র এবং নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ডাঃ কৃষ্ণন কুমারিয়ার কর্তৃক মিশনের সদস্যগণ সংবর্দ্ধিত হন। ১০ই ও ১১ই জাহ্নবীরী স্থানীয় ভারতীয় রাজগণের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে মিশনের সভ্যগণ ইণ্ডিয়ান প্রিন্সিপালস, হাউস ফ্রিসেন্ট, চিগউইক, আলকোট প্রভৃতি ভারতীয় এবং

প্র ছাত্রনিবাসগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ছাত্রগণের সহিত নামায়ে আলোচনা করেন। লণ্ডন শহরে মিশনের সদভাগ ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সভাসমিতি, বর্দালোচনা, ছাত্র-মাঝে মৈত্রিক আদর্শ ব্যাখ্যা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রচারকার্য চালাইতেছেন। ২০শে জানুয়ারী মিশনের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ট্রুডেন্টস্ বারো হলো অস্থিতি ভারতীয় ছাত্রগণের এক সম্মেলনে মিশনের নেতা স্বামী জৈবতানন্দজী 'আদর্শ ছাত্র-জীবন' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

লণ্ডন শহরে প্রচাররত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশনের চিত্রপটাদি হইতে ঐ স্থানের প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত হইতে আগত ছাত্রগণ ব্যতীত শতাধিক বৎসর পূর্বে হইতে এই স্থানে বহুসংখ্যক হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা দশ হাজারেরও কিছু বেশী, তন্মধ্যে বাঙালী, মাদ্রাজী ও পঞ্জাবীই প্রধান। অল্পসংখ্যক গুজরাটী এবং সিন্ধীও আছেন। ব্যবসায়ী, অধ্যাপক এবং বৈ-সাময়িক কর্মচারী ছাড়াও প্রায় ছয় শত হিন্দু চিকিৎসক আছেন। আর্থিক অবস্থা প্রায় সকলেরই সচ্ছল। লণ্ডনে হিন্দুর সামাজিক তথা ধর্মীয় চরবহার প্রতি যে-কোন ধর্মপ্রচারকের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়।

এখানে অল্পসংখ্যক ভারতীয় মুসলমানের বাস। তাঁহারা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চারিটি মসজিদ পরিচালনা করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে এই মসজিদগুলিতে তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। অল্পসংখ্যক শিখও তাঁহাদের গুরুদ্বারে সমবেত হন। কিন্তু হিন্দুর কোন মিলনের স্থান নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহাদি অস্থান উদ্‌ঘাপনের যাজক আছেন; কিন্তু হিন্দুর বিবাহ, উপনয়ন, প্রভৃতি অস্থান সম্পন্ন করার কোন পুরোহিত নাই।

বহুসংখ্যক হিন্দু খেতাক রমণীয় পানিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু হইয়াছেন। হিন্দু সমাজে ঐ নবগত খেতাক রমণীগণ যদিও হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর প্রীতিশীল তথাপি তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্মের মহান বাণী শুনাইবার মত কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই তাহাদের সন্তানসন্ততি হিন্দুধর্মের কোন শিক্ষা না পাইয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে।

হিন্দু এসোসিয়েশন নামে একটি হিন্দু-প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার কর্তৃপক্ষ অনেক ট্রিন হইতেই একটি হিন্দু মন্দির অথবা মিলনক্ষেত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারকগণের আদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। প্রচারকগণের উদ্যোগে অস্থিতি একটি সম্ভার লণ্ডনের হিন্দুদের মিলন-

ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য একটি ভবনের ক্ষয় উপযুক্ত চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই উহার উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন হইবে।

যদিও বিদেশে বহুসংখ্যক হিন্দু একত্রে বাস করেন তথাপি ধর্ম তথা সংস্কৃতির প্রচারের অভাবে শত শত হিন্দু ধর্মাত্মর



স্বামী জৈবতানন্দজী কর্তৃক ভিনিনামে একটি মন্দিরের
ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন।

গ্রহণ করিতেছে। বহির্ভারতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় এক কোটি হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। ভারতরাষ্ট্র হইতে তাহাদের সামাজিক তথা ধর্মীয় সজা রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিবেও না। তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে এই সমস্ত দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসী হিন্দুগণের ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত রাখিতে হইবে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বর্তমানে এই প্রচারকার্যে লব্ধী হইয়াছেন। এই প্রচারকার্যকে ব্যাপকভাবে পরিচালনের ক্ষমতা উহার প্রধান কর্মক্ষেত্ররূপ কলিকাতার "ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন" নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা সঙ্ঘের পরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধান বনাম পাট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বোস

নূতন সেজাস প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার লোক-বল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না। তবে বাংলার মজী-মহোদয়গণের বিরূতি থেকে মনে হয়, পশ্চিম বাংলার আত্ম-মানিক লোকসংখ্যা এখন আড়াই কোটি। ১৯৩১-৪১ দশকে লোকসংখ্যার হার ধরে হিসাব করলেও এ অনুমানই সঠিক বলে মনে হয়। ১৯৪১-এর পর লোকসংখ্যা শতকরা দুই জন করে বছরে বেড়েছে বললে পাওয়া যায় :

বর্ষ	লোকসংখ্যা
১৯৪১	২,১১,৯৬,০০০
১৯৪৭	২,৩৭,৪০,০০০
১৯৪৯	২,৪৫,৮৭,০০০
১৯৫০	২,৫০,১১,০০০

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, বর্তমান পশ্চিম বাংলার সমস্ত হ'ল ন্যূনকল্পে আড়াই কোটি লোকের বাওয়া-পয়ার সংস্থান করা।

১৯৪১-এর সেজাস অনুযায়ী ভারত ইউনিয়নের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলায়ই লোকের বসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। পশ্চিম বাংলার পরই ব্রজপ্রদেশ ও বিহারের স্থান—

রাজ্য	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা
আসাম	... ১৪৭
পশ্চিম বাংলা	... ৭৫১
বিহার	... ৫২১
উড়িষ্যা	... ২৭১
মধ্য প্রদেশ	... ১৭১
ব্রজ প্রদেশ	... ৫১৮
মাল্লাজ	... ৩৯১
বোম্বাই	... ২৭০
পূর্ব পঞ্জাব	... ৪০৮
ভারত ইউনিয়ন	... ৩৬৭

স্বাধীনতা অর্জনের পর 'প্রদেশ'গুলির নাম পাণ্টে রাখা হয়েছে 'রাজ্য' এবং তাদের পরিধিও পরিবর্তিত হয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যের পরিধিই বিভারলাভ করেছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার পরিধির ইতর-বিশেষ কিছুই হয় নি বলা চলে—মাত্র কোচবিহার রাজ্যের ১৩০০ বর্গমাইল সংযুক্ত হয়েছে (এই আলোচনার কোচবিহারের কথা বলা হয় নি)। পরিধি বিভারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলির লোকসংখ্যাও কিছু কিছু

বেড়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু লোকের চাপ যে সেই অনুপাতে অত্যধিক হয়েছে তা মনে হয় না। ১৯৫১ সনের সেজাসই সে প্রশ্নের জবাব দেবে। পশ্চিম বাংলার কথা আলাদা। ১৯৪১ সনের তুলনায় লোকের চাপ পশ্চিম বাংলায় যে বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লোকসংখ্যা আড়াই কোটি ধরে হিসাব করলে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬০। লোকসংখ্যার গুরুত্ব সম্যকরূপে এতেও বোঝা যায় না। সেজন্য দেবার প্রয়োজন লোকসংখ্যার অনুপাতে কর্ষণযোগ্য (কর্ষিত ও পতিত) জমির পরিমাণ কিরূপ। এইভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত জন লোককে নির্ভর করতে হয় মাত্র দশ একর জমির উপর। যে দেশে (বিশেষতঃ যে দেশ কৃষিপ্রধান) মাত্র এক একর জমির উপর একাধিক লোককে নির্ভর করতে হয়, সে দেশে লোকবসতি-সমতা ও খাদ্য-সমতা যে সঙ্কটজনক হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

অনুসন্ধানের ফলে অব্যাপক মহলামবিশ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, প্রতি সপ্তাহে বাংলার অধিবাসী গড়ে ৩'৫৮ সের খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। গবর্ণমেন্টের খাদ্যনীতি এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বীকার করে নি', অর্থাৎ, যদি ধরে নেওয়া যায় যে মাথা-পিছু গড়ে—সাত্বে চার মণ (অথবা সপ্তাহে সাত্বে তিন সের) চাল প্রয়োজন, তা হলে পশ্চিম বাংলার ২,৫০,১১,০০০ অধিবাসীর জন্য বছরে প্রয়োজন হবে ১১,২৫,৫১,০০০ মণ (বা ৪১,৬৯,০০০ টন) চাল। কিন্তু লোকসংখ্যা আড়াই কোটির বেশী হলে এতেও ফলাবে না। পশ্চিম বাংলার ২,৩৫,০০,০০০ একর জমির মধ্যে মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে চাষ-আবাদ চলতে পারে। ১,৪১,০০,০০০ একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় বিশ লক্ষ একর জমি চাষ-যোগ্য হলেও পতিত। একর-প্রতি উৎপাদন-হার ৮০৬ পাউণ্ড ধরে কর্ষণযোগ্য (কর্ষিত ও পতিত) ১৪১ লক্ষ একর জমিতে একমাত্র ধানই চাষ করা হয়েছে যদি ধরে নেওয়া যায়, তা হলেও মোট ৫১ লক্ষ টনের বেশী চাল আমরা পাই না। এই ফসল পেলে পশ্চিম বাংলার চাহিদা কোন রকমে মিটতে পারে। কিন্তু একমাত্র ধান বোনাও চলে না বা সব পতিত জমি এখনই ধানচাষে লাগান যায় না। ধান বোনা হয় গড়ে ১ কোটি একর জমিতে এবং তা থেকে পাওয়া যেতে পারে (৮০৬ পাউণ্ড উৎপাদন হার ধরে) ৩৬ লক্ষ টন চাল অথচ আমাদের প্রয়োজন ন্যূনকল্পে ৪১,৫৯,০০০ টন চালের

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে কতকটা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। পতিত জমি উদ্ধার করে যে বিশেষ সুবিধা হবে তাও মনে হয় না, কেননা কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ পশ্চিম বাংলার সামান্য—যাত্রা বিশ লক্ষ একর। অধিকাংশ পতিত জমিই হচ্ছে বাঁকড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও দার্জিলিং জেলায়। ফ্লাউড কমিটির মতে—

জেলা	শতকরা কত জমি পতিত কিস্তি কৃষিযোগ্য
বীরভূম	৮'০
বর্ধমান	৬'৬
বাঁকড়া	১৫'১
হুগলী	৬'৩
হাওড়া	৬'৩
মেদিনীপুর	১১'১
মুর্শিদাবাদ	১২'৫
নদীয়া	১৪'৬
২৪ পরগণা	৪'৪
দার্জিলিং	১১'২
জলপাইগুড়ি	৬'৮
দিনাজপুর	১৪'৩
মালদহ	৮'৯

এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চাষযোগ্য সব জমিতেই প্রায় চাষ করা হয়। সুতরাং পতিত জমিকে চাষে লাগিয়ে ফসল বাড়ানোর কল্পনা অবাস্তব। সেচের ব্যবস্থা, মালার সংস্কার এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায় না করা পর্যন্ত পতিত জমি উদ্ধারের কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে। তা ছাড়া বর্তমান পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেন্টের অর্থসদতির কণাও ভাবতে হবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে জমির উদ্ধার-সাধনের অর্থই হ'ল ব্যয়বাহুল্য এবং তাও সহজসাধ্য হয় যদি নাকি একসঙ্গে একটানা বিস্তৃত জমি পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার যে পতিত জমি রয়েছে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, ১০০ একর ব্লক-ওয়ার্ডা পতিত জমির পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগেরও কম। গবর্ণমেন্টের বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হলে হয়ত পতিত জমির কতক পরিমাণ উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তার পূর্বে নয়। পূর্নাক্ষরে নদ-নদী মজে যাওয়ার ফলে কর্তৃত্ব জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃই কমে আসছে; নদীর তল ভরাট হয়ে আসায় জলপ্রাচীরের প্রাচুর্যবও বেড়েই চলেছে। আর আছে প্রকৃতির খেয়াল। তাই ফসল না বেড়ে ক্রমশঃই কমে আসছে। আরও দেখছি নদীগুলির দুই কুলে মতই শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে, চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ ততই বেড়ে যাচ্ছে—

জেলা	কৃষকের অযোগ্য জমি ক্রপস্ সার্ভে	সেটেলমেন্ট রিপোর্ট	- হ্রাস ও + বৃদ্ধি
বর্ধমান	৩১৪,৪২৬'০৫	৩০১,৯৯৫'০০	+ ১২,৪৩১'০৫
হুগলী সদর	৪২,২০৯'৬৯	৪২,০৯৬'৫৪	+ ১১০'১৫
শ্রীরামপুর	৪২,৪৮৬'৩১	৩৮,৯১১'৪৫	+ ৩,৫৭৪'৮৬
হাওড়া	৬৬,০৬৭'২২	৬৩,৯৩৬'৮৫	+ ২,১৩০'৩৭
মেদিনীপুর	৫৯৭,৬৬৪'৫৯	৫৩৩,০৮৫'৪৭	+ ৬৪,৫৭৯'১২
ব্যাংকপুর	২১,৮৭১'৩০	১৭,৪৮০'৫৩	+ ৪,৩৯০'৭৭
বারাসাত	৩৮,৩৪৬'৫৯	৩৩,৫১০'২২	+ ৪,৮৩৬'৩৭
ডায়মণ্ড-			
হারবার	১০২,২৭৮'০৫	৯৯,৫৮৪'৩৯	+ ২,৬৯৩'৬৬

উপরের হিসাবগুলি পশ্চিম বাংলার গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত মি: ইসাকের রিপোর্ট হতে নেওয়া। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কলকারখানা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কর্তৃত্ব জমি—কৃষকের অযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছে। অল্প দিকে বাংলা-বিভাগের পর বাস্তবহারীদের আগমনের ফলে নানা নগর গড়ে উঠছে। গবর্ণমেন্টের 'ম্যাটেলাইট' টাউন পরিকল্পনা কার্যকরী হলে আরও কিছু চাষের জমি মট্ট হবার সম্ভাবনা। অতএব যৌক যা দেখছি তা চাষের জমি বাড়ার দিকে নয়, কমে আসার দিকেই এবং বাংলাদেশে চাষের জমি হ্রাস পাওয়ার অর্থই হ'ল ধানের জমির হ্রাস, সুতরাং পশ্চিম বাংলার প্রধান সমস্যা হ'ল ধান চাষের জমির সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন।

পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় প্রধান কৃষিকাজ জ্বা হ'ল পাট। বাংলা-বিভাগের পর পশ্চিম বাংলার পাটের চাষ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে—

বর্ষ	পাটচাষের জমির পরিমাণ
১৯৪৩-৪৪	২৪০'৫ সহস্র একর
১৯৪৪-৪৫	১৯৩'৫ " "
১৯৪৫-৪৬	২০২'৮ " "
১৯৪৬-৪৭	১৫২'০ " "
১৯৪৭-৪৮	২৬৬'৪ " "
১৯৪৮-৪৯	৩৪৯'৯ " "
১৯৪৯-৫০	৪৯৮'০ " "
১৯৫০-৫১	৬৫০'৭ " "

ধানের প্রধান প্রতিযোগী হ'ল পাট; তাই পাটচাষ বাড়লে ধানের জমি হ্রাস পায়। পতিত জমিতে চাষ করার ফলে পাটচাষ বৃদ্ধি পেলেও, কিছু পরিমাণ ধান-জমিতেও যে পাটচাষ করা হয়েছে তা পশ্চিম বাংলার খাদ্য-সচিব স্বীকার করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার পাটচাষ বাড়-সমস্ত সমাধানে সহায়ক না হয়ে, প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। 'ফসল বাড়ানো' আন্দোলন এবং গবর্ণমেন্টের খাদ্য-সংগ্রহ নীতি ধানচাষীকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি; পাটচাষই তার কাছে

অধিকতর সোভনীয় মনে হয়েছে। অল্প দিকে আছে পাট-কল ওয়ালাদের বিপুল অভিযান। 'জুট মিলস্ এনোসিয়েশন' তাদের বিপুল অর্থসম্পত্তি নিয়ে পশ্চিম বাংলার পাটচাষ বাড়ানোর সপক্ষে যে ব্যাপক আন্দোলন চালিয়েছিল তাতে আমরাও যোগ দিয়েছি; 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপাধিকারের দোহাই দিয়ে গবর্ণমেন্টও সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। আজ ভারত ফলে হয়েছে বানের ক্ষেত্রে পাটের আবির্ভাব। খাজ আমদানীর ক্ষয় চাই 'ফরেন এক্সচেঞ্জ', আর পাট বেচে পাই 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' এবং পাটের ব্যাপকতার অর্থ হ'ল খাজ-উৎপাদন হ্রাস। অর্থাৎ কষাটা দাঁড়াল, পাটচাষের ফলে খাজের অভাব হ'ল ভীতভর এবং সেই খাজাভাব মেটাতে বেচতে হল পাট।

'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপাধিকার তখনই হয় সার্থক যখন ঐ অর্জিত টাকার বদলে এমন সব পণ্য আমদানী করা যায় যা দেশের স্বনামের সহায়ক হয়, অর্থাৎ যদি ভোগ্য-পণ্য আমদানী না করে উৎপাদন-সহায়ক পণ্য (যাকে বলে প্রোডাকশন গুড্‌স্) আমদানী করা যায় তবেই 'ফরেন এক্সচেঞ্জ'র সফল হয়। ভারতের পক্ষে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপাধিকারের অল্পতম প্রধান উপায় হ'ল পাট বা পাটজ পণ্য রপ্তানী। পাট ও পাটজ পণ্যের প্রথম কেন্দ্র হ'ল পশ্চিম বাংলা। ভারত-বিভাগের পূর্বে পাট ও পাটজ পণ্য রপ্তানী করে ভারত যে টাকা উপাধিকার করেছে তার একটা নগণ্য অংশ ব্যয় হয়েছে খাজশুল আমদানী করতে।

স্বর্কলভার স্বযোগ নিয়ে রপ্তানিকারক দেশগুলির চড়া দর হাঁকাও কিছু বিচিত্র নয়।

বাংলার অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে, পশ্চিম বাংলার পাট-শিল্পই হয়ে উঠেছে বাংলার আর্থিক বিপর্দায়ের অল্পতম প্রধান হেতু। যে শিল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা ও লক্ষ লক্ষ লোক পাটকে, সেই শিল্প দেশের অর্থনীতিকে বিপর্দায় করছে একথা সহজে মন মানতে চায় না—সুতরাং কথটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। বাংলার অর্থনীতিতে পাট-শিল্পের স্থান কতটুকু? পাটশিল্পে বহু লক্ষ টাকা মুনাফা হলেও বাঙালী পাটচাষীর অবস্থা কি খুব সচ্ছল? পাটশিল্পে লাভের ষোল আনা ইয়া 'মিডলম্যান' (ফড়িয়া) আর পাট-কল ওয়ালাদের ধরে। চাষী পাট উৎপাদন করতে যে অসামান্য পরিশ্রম করে তার বদলে পাট বেচে যা পায় তাতে সে 'সাবসিষ্টেন্স লেভেলের' উপরে উঠতে পারে না; পাটের বদলে অপর কোন ফসল চাষ করলে অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমে ঐ 'সাবসিষ্টেন্স লেভেলের' উপরুক্ত উপাধিকার করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সেদিক থেকে পাট-চাষের ফলে পশ্চিম বাংলা যে বিশেষ লাভবান হয়েছে তা বলা যায় না। বিতীতঃ, পাট-কলগুলি পশ্চিম বাংলার অবস্থিত হলেও তাদের মালিক প্রায় ষোল আনা ই বাংলার বাইরের লোক। কেরাণী-শ্রেণীর কিছু লোক বাদ দিলে প্রমিত শ্রেণীর অন্যান্য অর্ধেকাংশ বাংলার বাইরের লোক এবং এরা যা উপাধিকার করে তাও চলে যায় বাংলার

বর্ষ	কাঁচা পাট ও পাটজ পণ্য রপ্তানি
১৯৪০-৪১	৫৩,২৩,০৬,০০০ টাকা
১৯৪১-৪২	৬৪,৩১,২৭,০০০ "
১৯৪২-৪৩	৮৫,৪২,৫০,০০০ "
১৯৪৩-৪৪	১,৭০,৫১,৫০,০০০ "
১৯৪৪-৪৫	১,৪৩,৭২,১৭,০০০ "
১৯৪৫-৪৬	১,১৩,২৪,৬৬,০০০ "

১৯৪০-৪১-এ মাত্র শতকরা ২৭ টাকার খাজশুল (অর্থাৎ ভোগ্য-পণ্য) আমদানী করলেও ১৯৪৫-৪৬-তে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭১ টাকার। তা হলে কথটা দাঁড়াল এই যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর পাট ও পাটজ পণ্য বেচে যা 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপাধিকার করা হয়েছে তার প্রায় সবটাই আমরা খেয়ে শেষ করে দিয়েছি। 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' অধিকতর পরিমাণে উপাধিকারের প্রয়াসে পাট রপ্তানির প্রতি বৎ অধিক নজর দেওয়া হবে, বান উৎপাদনের পরিমাণ ততই হ্রাস পেয়ে আসার কথা, অর্থাৎ যে পথে আমরা চলেছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার পক্ষে খাজ সম্বন্ধে বাবলসী হওয়ার সম্ভাবনা অদূরপর্যন্ত; পক্ষান্তরে খাজ সম্বন্ধে আমাদের এই

শত ডাল, ময়দা প্রভৃতি খাজপণ্য আমদানী	রপ্তানীর শতকরা হিসাবে আমদানী
১৪,৩৪,৮৫,০০০ টাকা	২৭
১৫,০২,০৩,০০০ "	২৩
৩০,৮৫,০০০ "	১-এর কম
৮৭,৩০,৫২,০০০ "	৫১
৯৯,৫৩,৯৯,০০০ "	৬৯
৮০,২৬,৪৮,০০০ "	৭১

বাইরে। সুতরাং বাংলার আর্থিক সম্বন্ধিতে তাদের স্থান নগণ্য।

এ কথায় প্রাদেশিকতার বিভীষিকা কেউ কেউ দেখলেও এখানে শুধু দেখাতে চেয়েছি বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাট-শিল্পের স্থান কোথায়। তা হলে কি পাটশিল্পের কোন দামই নেই বাংলার অর্থনীতিতে? আছে বৈকি। ট্যাক্স ও শুক বাবদ থেকে যা আদায় হয় তার একটা সামান্য অংশ পশ্চিম বাংলা সরকার পান। পাট বিক্রয় করে সেল-ট্যাক্স বাবদ পশ্চিম পাটশিল্প বাংলা সরকার পান আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা। শুক হিসাবে পাট ও পাটজ পণ্য থেকে আদায় হয় বছরে প্রায় ৭৫০ লক্ষ টাকা; অথচ তা থেকে পশ্চিম বাংলার কষা

মাত্র ১০৫ লক্ষ টাকা। আর ইন্কাম ট্যাক্স বাবদ পশ্চিম বাংলা-সরকার পান প্রায় ৬ কোটি টাকা। ইন্কাম ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ পাট ও পাটজ পণ্য থেকে যা আদায় হয় তার একটা নগণ্য অংশ এই ৬ কোটি টাকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পাট ও পাটজ শিল্প থেকে পশ্চিম বাংলার পাওনা মোটামুটি একুশে প্রায় দুই কোটি টাকা। পশ্চিম-বাংলার শুধু খাজ বাজেটই যেখানে ২৫ কোটি টাকার উপর সেখানে তার সবচেয়ে বড় আয়ের পথ থেকে তার প্রাপ্য মাত্র দু'কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা স্থানীয় অধিবাসী-

দের খাজ থেকে বঞ্চিত করে পাট বেচে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' উপার্জন করছে সারা ভারতের খাজ-সমস্ত সমাধানের ক্ষমতা। আর এই স্বার্থভাগের ক্ষমতা সে পাচ্ছে পাটশিল্প থেকে আন্দাজ দু'কোটি টাকা মাত্র। পাটশিল্প নিয়ে পশ্চিম বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা এ থেকেই বুঝা যাবে। খাজ বাটতির ক্ষমতা প্রতি বৎসর যে পরিমাণ খাজশস্ত্র পশ্চিম বাংলাকে আমদানী করতে হচ্ছে বাংলা এবং ভারতের বাইরে থেকে, তার মূল্যও সম্বলান হয় না পাটশিল্প থেকে পাওয়া এই দু'কোটি টাকা দিয়ে।

সুখমা

শ্রীশ্রীমাপদ চট্টোপাধ্যায়

শৈলেশ অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসেছে। কিন্তু অল্প বারে বাড়ী ফিরে যে আনন্দ সে পায়, আজ তার কণামাত্রও পেলো না। পদ্মপুত্রের পদ্মগুলো যেম ভাদের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, গ্রামের নিকটের শালবনের সে আকর্ষণ-শক্তি আজ আর নেই।

সুখমা কিনা বিয়ে করলে জগদীশকে। জগদীশ, যার বয়স চল্লিশের কোঠার এসে পড়েছে, মাধান্তরা যার টাক, নিত্য গৌন্দাড়ি না কামালে যার মুখ কাঁচাপাকা গৌন্দাড়িভে বিসদৃশ মনে হয়, সেই বিগতযৌবন বিগতসৌন্দর্য জগদীশকে কিনা সুখমার মত মেয়ে বিয়ে করলে। অথচ সুখমার সৌন্দর্যের সীমা নেই—সে শিক্ষিতা, সে আধুনিক। দোষের মধ্যে তার মা-বাপ নেই, সে মামার ঘরে মাহুয। অর্থের অভাবেই যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে, তা বুঝতে অবশ্য শৈলেশের বাকি নেই। কিন্তু সুখমা তো আপত্তি করতে পারত। বলতে পারত, “আমি বিয়ে করব না।” শৈলেশের সঙ্গে তো তার সেই কথাই হয়েছিল। সুখমা বলেছিল, “আমি তোমার; তোমার ছাড়া আর কারো হব না।” শৈলেশও বলেছিল, “পড়াশুনা শেষ করে অর্থ উপার্জন করি। তার পর তোমার বিয়ে করা কে চেকার। যদি না দিতে চায়, জোর করে নিয়ে চলে যাব। যাবে ত আমার সঙ্গে?” সুখমা রাজী হয়েছিল, বলেছিল, “ভালবাসা যার এক জনকে। যাকে ভালবাসা যার তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করাও যায় না। যে মেয়ে এক জনকে ভালবেসে আর এক জনকে বিয়ে করে তাকে আমি অসন্তী বলতে কুণ্ঠিত হব না।” সেই সুখমা সব কথা ভুলে বিয়ে করলে জগদীশকে। শৈলেশের মনে হ'ল আর এখানে থাকা চলে না। আজই সে

চলে যাবে কর্ম্মস্থলে। যেখানে সুখমা সেখানে তার স্থান নেই।

সুখমার মামা হরিমোহন ছিলেন মফস্বল শহরের এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। শৈলেশ সেই কলেজেই পড়ত। এক গ্রামে বাড়ী বলে হরিমোহনের অন্তঃপুরে তার ছিল আবাস গতি। সুখমাকে সে-ই তার স্কুলে পৌঁছে দিয়ে কলেজে যেত, ছুটির পর আবার তাকে স্কুল থেকে বাসায় পৌঁছে দিত। তাদের বাসার বৈকালিক জলযোগ অন্তে সুখমার সঙ্গে এ-ও-তা নিয়ে আলোচনা সেরে একেবারে রাজে সে হোষ্টেলে ফিরত। সন্ধ্যার এক ঘণ্টা সুখমাকে পড়াতেও হ'ত। এ সুযোগে উভয়ের মধ্যে যে বনিষ্ঠতা হ'ল তা একমাত্র হরিমোহনের মত লোকই উপেক্ষা করতে পারেন। শৈলেশ ছিল আবার কবি। তার লেখা মাঝে মাঝে দু'একটা আধুনিক কাগজে প্রকাশিতও হ'ত। তার লেখার বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। নিজের লেখার সুত্র ধরে সুখমার সঙ্গে শৈলেশের আলাপটা বেশ জমে উঠছিল। শৈলেশ যত সব তরুণ সাহিত্যিকের লেখা এনে-দিত সুখমার হাতে, সুখমা সে সব গোপ্যাসে গিলত। তার পর দু'জনের আলোচনা আরু হ'ত। এই সময়েই প্রেম সত্ত্বে সুখমা একটা ধারণা করে নিয়েছিল এবং শৈলেশের প্রেম-নিবেদনের উত্তরে সে তার মতামত প্রকাশও করেছিল।

সুখমা ম্যাট্রিক পাস করে যখন কলেজে ভর্তি হ'ল তখন শৈলেশের কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে। সে অনেক চেষ্টা করেও পরীক্ষার অক্ষতকার্য হতে পারল না। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তাকে যেতে হ'ল কলকাতার এম-এ, পড়তে। ছুটিতে গ্রামে এসে দু'জনায় দেখা হ'ত, কথাবার্তা হ'ত; কিন্তু সাহিত্য সত্ত্বে আলোচনাটা আগের মত জমত না। তার

পর শৈলেশের পড়া শেষ হ'ল, সুসমাও আই-এ পাস করে গ্রামে এসে বাস করতে লাগল। কিন্তু শৈলেশের অদৃষ্টে গ্রামে বাস করা ঘটল না। চাকরি পেয়ে সে কলকাতাতেই থেকে গেল। সওদাগরি আপিস, ছুটি নেই বললেই হয়। তাই উভয়ের দেখাশোনাও হয়ে গেল বন্ধ। শৈলেশের সংসারেও এক বিববা পিসীমা ছাড়া আর কেউ ছিল না যে, তাকে আসবার জন্য তাগিদ দেয়। এক ছিল সুসমার তাগিদ—সে তার মনে। সুসমাকে পেতে হলেও চাই অর্থ, চাই কিছু সঞ্চয়। প্রেমের নীড় বাঁধতে গেলেও চাই নীড়বাঁধার উপকরণ। সুসমার মাথা তো তার ডিগ্রী দেখেই তার হাতে ভাষীকে সমর্পণ করবেন না। তাই ছ'চার দিনের ছুটিতে যথা হেল কোম্পানীকে টাকা না দিয়ে শৈলেশ কলকাতাতেই থেকে যেত এবং মনে মনে ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনার জাল বুঝত।

ইতিমধ্যে সুসমাদের সংসারে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। গরমের বন্ধে সুসমার মাথা বাড়ী এসে বিববা জী, নাবালক পুত্র ও অনুরূপ সুসমাকে রেখে হঠাৎ মারা গেলেন। মরবার সময় তিনি এক কীর্তি করে গেলেন। হরিমোহনের মধুর স্বভাব এবং গভীর ধর্মজ্ঞানের জন্য গ্রামে তাঁর যেসব ভক্ত ছুটে-ছিল জগদীশ তাদের এক জন। কয়েক মাস জগদীশের পত্নী-বিরোগ হয়েছিল। হরিমোহনের সঙ্গে আলোচনা করে সে শৌকে সান্ত্বনালভ করত। তাই তাঁর কাছে সে প্রায়ই আসত। হরিমোহনের মৃত্যুশয্যার পাশে সেও ছিল। হরিমোহন হঠাৎ তার হাত দুটি ধরে বললেন, “বাবা, আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। সুসমার বিয়ের জন্য কিছু বেখে যেতে পারলাম না। বড় ভাল মেয়ে, ওকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। বল গ্রহণ করলে, তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।” মুহূর্ত্ত মাতুলের এই অপ্রত্যাশিত প্রভাবে সুসমা বিমূর্ত্ত হয়ে গেল। নিজেই নামলে সে কিছু বলবার আগেই জগদীশ তার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বললে, “সুসমাকে আমি এই গ্রহণ করলাম। ওর জন্য আপনার চিন্তা নেই।” মৃত্যুপথযাত্রীর পাণ্ডুর মুখ কণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন; “তার পর যে চোখ বুজলেন, তা আর খুললেন না। শৈলেশ এত সব কথা জানত না। তার পর হয়ে গেল সুসমার সঙ্গে জগদীশের বিবাহ। বিবাহের আগে সুসমা অনেক বার মনে করেছে জগদীশকে সব কথা জানিয়ে তার কাছ থেকে মুক্তিপ্রার্থনা করে। কিন্তু রমণীর দুর্জয় লজ্জা এসে তাকে বাধা দিলে। সে কিছুই বলতে পারল না। কৈশোরের কল্পনা আর যৌবনে বাস্তব রূপ পেলে না।

হুই

পিসীমা শৈলেশের জন্য পরিপাটি করে রাখছিলেন। শৈলেশ রান্নাঘরে গিয়ে তাকে বললে, “পিসীমা আজ

বিকালের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।” পিসীমা বিম্বিত হয়ে বললেন, “সে কিরে। কত কাল পরে এই কাল রাতে এসেহিস আর আজ বিকেলেই চলে যাবি? হু'দিন থাক। তার পর কাল ভোকে ওরা আশীর্বাদ করতে আসবে।” ‘আশীর্বাদ’ আর ‘ওরা’ কথা দুটো তার কানে গেল কিমা সে-ই জানে। অথবা তার মনের অবস্থা এমন নয় যে, সে ও দুটো কথার অর্থ পরিগ্রহ করতে পারে। সে হু'হু করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একেবারে রাস্তার এসে পড়ল। কোথায় যাবে তার কিছু স্থিরতা নেই, সে অত্মমনস্কভাবে সামনের পথ দিয়ে হেঁটে চলল। কিছু দূর এসে তার খেয়াল হ'ল সে জগদীশের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই জগদীশের বাড়ীর সদরদরজা। একটু ইতস্ততঃ করে শৈলেশ সেই দিকেই পা চালিয়ে দিলে।

জগদীশ অবস্থাপন্ন লোক। গৃহের চারি দিক ‘ইউর’ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মধ্যে সুবহুৎ অননের অনেকটা স্থান জুড়ে বড় বড় সাত-আটটা শানের মরাই। তার পর বসবাসের দালানঘর। জগদীশ গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিভাগের প্রধান শিক্ষক। কৃষির আর থেকেই তার সংসার বেশ চলে যেতে পারে, পরের চাকরি করার দরকার হয় না। কিন্তু জগদীশ তার ক্ষেতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলি বড় করে যত আমদ পায় ফুলের ছোট ছোট ফেলেদের মানুষ করতেও ঠিক ভতই আমদ পায়। শিক্ষকতা তার পেশা নয়, দেশ। শৈলেশ জগদীশের সদর দরজায় পা দিতেই একেবারে জগদীশের সামনে পড়ে গেল। জগদীশ তেল মেখে কাঁধে গামছা নিয়ে বেরিয়েছিল স্নান করতে, আর তার সঙ্গে মাঠে আকের ক্ষেতে জলধরানো ঠিকমত হচ্ছে কিনা তার তদ্বির করতে। আজ রবিবার। ফুলে যাবার ভাড়া নেই। শৈলেশকে দেখেই সে একমুখ হেসে উজ্জ্বল হয়ে বললে, “আরে, শৈলেশ যে? এস, এস, তার পর ভাল ছিলে ত? শুনেছি যে তুমি এসেছ। কাল আমি যেতাম তোমার ওখানে।” বলে সে শৈলেশের হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। মরাইগুলো পার হয়েই ঘরের বাবান্দার উঠে ডাকল, “ওগো, কে এসেছে দেখ।”

সুসমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শৈলেশকে দেখে ধমকে দাঁড়াল। মুহূর্ত্তের জন্য তার গণ্ডে একটা লোহিতাভা এসেই মিলিয়ে গেল। সে নিজেকে সংযত করে বললে, কে শৈলেশ-দা, ভাল ছিলে ত? শৈলেশের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। সে মুখ তুলে সুসমার দিকে চাইতে পারল না। ঘাড় নেড়ে সুসমার কথার জবাব দিলে। জগদীশ বললে, তেল মেখে ফেলেছি। তা না হলে হু'দণ্ড তোমার সঙ্গে গল্প করেই যেতাম। আজ আবার আকের ক্ষেতে জল ধরানো হচ্ছে। আমি না কাছে থাকলে ভাল করে চারায় জল দেবে না। তুমি ভতকণ গল্প কর, আমি খুব ভাড়াভাড়া আসবার চেষ্টা করব।”

সুখমা শৈলেশকে জগদীশের পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, বললে, চা খাবে এখন? শৈলেশের বুক হুরু হুরু করতে শুরু করেছে। সে যেন তার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সুখমা এখান থেকে চলে গেলেই যেন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কোন রকমে শুষ্ক কণ্ঠে বললে, তা দিতে পার। সুখমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুখমা তার দিকে পিছন ফিরতেই শৈলেশ তার উপর দৃষ্টি ফেলল। এ সে জুল কলেছে পড়া চকল মেয়ে সুখমা নয়,—এ জগদীশের গ্রহিণী, বীর হির সুখমা। শৈলেশের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল। একটু পরেই সুখমা চা নিয়ে এল। শৈলেশ তখন অনেকটা লামলে উঠেছে, সুখমার দিকে মুখ তুলে চাইতেও পারল। বাঃ, সুখমার গায়ের রঙ ত বেশ উজ্জ্বল হয়েছে, দেখতে ঠিক আগের মতই আছে, তেমনি কচি, তেমনি মিষ্টি। সুখমা ফিক করে হেসে বললে, কি দেখছ?

শৈলেশের মুখও ধুলে গেল, বললে, তোমার সৌন্দর্য।

সুখমা বললে, ভেবেছিলাম তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু ছাড়া নি দেখছি—

শৈলেশ মুখ আঁধার করে বললে, কখনও যেন না ছাড়ি। কিন্তু তুমি যে কখনও আমার কবিতা লেখা নিয়ে ঠাট্টা করবে, তা কল্পনাও করি নি—শেষের কথা মতো একটা ব্যাধার সুর বন্ধ হ'ল।

সুখমা কিন্তু আদৌ লজ্জিত বা ব্যভিভ হ'ল না। তেমনি হাসিমুখে বললে, কল্পনা আর বাস্তবে অনেক তফাৎ আছে শৈলেশদা। জগৎটা কাব্য নয়।

শৈলেশ বিরস মুখে বললে, সে তুমি যখন বিয়ে করছ তখনই বুঝেছি—

সুখমার মুখ বিবণ হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের চাকলা দমন করে সে বললে, মেয়েদের বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় কি? বিয়ে করাতে আর কি দোষ হয়েছে?

শৈলেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, তোমার মনে আছে কি না জানিনা—কিন্তু আমার বেশ মনে আছে: তুমি বলেছিলে একজনকে ভালবেসে যে আর একজনকে বিয়ে করে সে অসভ্য।

সুখমার ভর্ক করতে শেখা শৈলেশের কাছেই। সে অকুণ্ঠ ভাবেই বললে, কিন্তু অপরিণত বয়সে কি বলেছি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ নেই। তা ছাড়া ভালবাসা সম্বন্ধে আমি জানতাম কি। কতকগুলো বাক্য গল্প উপভাস পড়ে, আর তোমার সঙ্গে কাব্য আলোচনা করে প্রেম সম্বন্ধে সে বয়সে আমার যে ধারণা হয়েছিল, তা আমি ঠিক বলে মনে করি না—

শৈলেশ বেদনার নির্বাক হয়ে গেল। পরমুহুর্তেই বেদনার স্থান অধিকার করলে জোষ, একটা দিকল আক্রোশও

বলা যেতে পারে। সে বিজ্ঞপত্রা কণ্ঠে বললে, তা হলে আমাকে তুমি কখনও ভালবাস নি। ভালবেসেছ, ঐ বিগত-যৌবন, দোজবরে, টাকমাথা, টাকাওয়াল জগদীশকে—

সুখমা সংযত কণ্ঠে বললে, “দেখ, আমার স্বামী সম্বন্ধে তুমি একটু সম্মান করে কথা বলো। কেন তাঁকে ভালবাসব না, কিসের অভাব তাঁর? তিনি শিক্ষিত ভদ্র, সম্পত্তিশালী—আর রূপ-মৌবনের কথা বলছ? দেহ ও মনের যে রূপ থাকলে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে পারে সে রূপ তাঁর আছে।”—বলে একটু থেমে আবার সে বলে চলল, “আর যৌবন? মানুষের যৌবনের বিচার সব সময় বয়স দিয়েই হয় না। যৌবনের যশস্কতি থাকলে জীবনকে উপভোগ করা যায়, কর্তব্য উৎসাহ জন্মে সে শক্তি তাঁর যথেষ্ট আছে। আর, আমার বয়সও ত নেহাৎ কম হয় নি—?”

অতিআধুনিক তরুণ সাহিত্যিক এবার অকৃত্রিম বিন্মরে নির্বাক হয়ে গেল। কয়েক মাস বিবাহিত জীবন ঘাপন করে সুখমার মত মেয়ের যে এমন পরিবর্তন হতে পারে, তার চিন্তাধারা যে এমনি ভিন্নমুখী হতে পারে, তা সে ধারণাও করতে পারে নি। সত্যিই বাস্তব আর কল্পনার অনেক তফাৎ।

এই সময় ঘোল-সতের বছরের একটি তরুণী একটা ডিসে করে কয়েক খিলি পান নিয়ে সারা দেহে রাজ্যের লজ্জা জড়িয়ে এসে ঘরে ঢুকল, সুখমা বললে, শৈলেশদাকে পানগুলো দে—

মেয়েটি কম্পিত হতে শৈলেশের দিকে পানের ডিসটা এগিয়ে দিলে। শৈলেশ দুটো পান তুলে নিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললে, ‘মাধুরী না? হঁস, মন্ত বড় হয়ে গেছে যে?’ মাধুরী জগদীশের বোন। সে মুখে লজ্জার আবার মেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুখমা হেঁকে বলে দিলে, “উম্মনে ডালে চাপিয়ে এসেছি। তবু গেলো নামিয়ে দিস—” তার পর শৈলেশের দিকে চেয়ে কোন ভূমিকা না করেই বললে, “মাধুরীকে বিয়ে করবে?” শৈলেশ উত্তেজিত হয়ে বললে, “দেখ সুখমা, এতক্ষণ যা বললে সব সহ্য করলাম। কিন্তু আমাকে এমনধারা অপমান করবার কারণ কি, তা আমার বলবে—”

সুখমা ভালমাছের মত বললে, “বা রে। এটাতে আবার অপমানের কি আছে? মাধুরী বেশ মেয়ে, আমার থেকে চের বেশী সুন্দরী। তোমার সঙ্গে যানাবে ভাল।”

শৈলেশ গৌ হয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না। সুখমা একটু এগিয়ে এসে শৈলেশের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে অহুময়ের স্বরে বললে, “সত্যি বলছি, ওকে তোমার বিয়ে করতে হবে। আমার এ অমরোষ তোমাকে রাখতেই হবে।” সুখমার কণ্ঠে যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠল তাতে শৈলেশের অন্তর আবার চকল হয়ে উঠল। সে সুখমার চোখে নিজের

দৃষ্টি স্থাপন করে বললে, “সত্যি বলছ তুমি, আমার সঙ্গে পরিহাস করছ না? তুমি বলছ, আমি মাথুরীকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে?”

সুখমা হৃদয়ের উৎকর্ষা দমন করবার চেষ্টা করে বললে, “হ্যাঁ, সত্যিই আমি সুখী হব।”

শৈলেশ আর একবার সুখমার দিকে তাকাল। তার পর বীরস্থির কণ্ঠে বললে, “বেশ এতে যদি তুমি সত্যিই সুখী হও তা হলে মাথুরীকে আমি বিয়ে করব। তোমাকে কণা দিলাম।” এক যুহুর্ভ নীরবতার পর আবার বললে, “কেমন, সুখী হলে তুমি?”

সুখমা উভকণ্ঠে নিজেকে সামলে নিরেছে। হৃদয়ক অভিনেত্রীর মত যুগে একমুখ হাসি টেনে সে উত্তর করলে, “বা রে। সুখী হব না। বরষা আইবুড়ো বোন নিয়ে বামীর যে কি হুড়াবুড়া তার তুমি কি বুঝবে। তোমার মত সংপাঙ্ক বিয়ে করতে রাজী হয়েছে জানলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। অনেক দিন পরে রাতে তাঁর সুনিদ্রা হবে।” শৈলেশের মনে এই একটু আগে যে ঈর্ষা রঙের আভা দেখা দিয়েছিল তা নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। “ও সেই জন্ত—” বলে সে উঠে দাঁড়াল, সুখমাকে আর কিছু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুখমা অপলক দৃষ্টিতে তার গমনস্থল বৃষ্টির

দিকে চেয়ে রইল। একটু পরেই জগদীশ ফিরল, বললে, “কি গো, শৈলেশ চলে গেছে? হ’ল বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথা?”

সুখমা হেসে বললে, “এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। রাজী হয়েছে। আমাকে ঘটক-বিদায় কি দেবে বল?”

“এই যে দিই—” বলে জগদীশ সুখমার দিকে এসিয়ে যেতেই সুখমা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে শৈলেশ বাড়ী গিয়ে পিসীমাকে বললে, “পিসীমা, আজ আর আমার যাওয়া হ’ল না। তুমি আমার বিয়ের জন্ত ব্যস্ত হয়েছিলে, ও পাড়ার জগদীশের বোনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পার—”

পিসীমা আনন্দে গ-গদ হয়ে বললেন, “কথাবার্তা আর চালাতে হবে না, ও ঠিক হয়েই আছে। কাজ যে ওয়া আশীর্বাদ করতে আসছে।”

শৈলেশ আশা করেছিল, বাসরঘরে সে একবার সুখমার সাক্ষাৎ পাবে। কিন্তু সারাদিন বেটে সুখমার নাকি শরীর ভাল নেই। কতাসম্প্রদানের পর সে সেই যে নিজের শোবার ঘরে ঢুকেছে, আর বার হয় নি।

তাজমহল

জীনীলরতন দাশ

প্রেমবিহ্বল বিরহ-পাগল ওগো সত্রাট-কবি,
মর্দু মিঙাড়ি রক্তে রচিলে কার মর্দুর-ছবি?
তোমার মানসী বর্ণ-সীতা কি মহীরসী নিরুপমা—
পাথরে পাথরে রূপায়িত হলো মুরতি ভিলোত্তমা?
হেরি প্রেমসীর করুণ আঁখির একটি বিন্দু বারি
রুদ্ধ করিতে কালের দুয়ার রচিলে সমাধি তারি।
মমতাক লাগি মমতায় গড়া পাষাণের মায়াপুরী,
ইজ্ঞামুর বর্ণে বর্ণে চলে দেখা লুকোচুরি।
প্রেমের পূজারী ফেলিল নীরবে বিরহের আবিভ্রল,
অশ্রু-মদীর সলিলে ফুটল শত ধেতু-শতদল।
পাতাল ফুড়িয়া উঠিল হেথায় অপরা উর্বরী,
অপলক চোখে তারে চেয়ে দেখে এহ-তার-রবি-শশী।

এ যে ফটকের বিরহ-কাব্য রচিত প্রিয়ার হৃৎ—
মিটায় বিরহী-চিহ্নের স্মৃতি সুধাসম যুগে যুগে।
যুনার কূলে মর্দুরে গাঁথা এ ঘেন শোকের সীতা,
চিরবিরহের সাগরবেলায় জ্বলিছে প্রেমের চিতা।
সতী-শব শিরে করিয়া ধারণ শুভ গিরির মত
শিলাময় ঘেন হয়েছেন শিব হেথা ভপতা-রত।

ওগো মহারাজ, তুমি নাই আজ, আছে তব ইতিহাস,
পাষাণে পাষাণে স্মৃতিতেই তব বৃকের দীর্ঘবাস।
বিরহ-কাতর তোমার হিয়ার ‘ঈশান্ত কন্দন’—
মৌন পাষাণ কারাগার-মাঝে লভিয়াছে বহন।
তাই তব প্রেম-বিরহ যে বাজে নিবিলের বৃকে বৃকে,—
বিশ্ব যে হায় আছো শোকময় তোমার বিরহ হৃৎ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ

বঙ্কিমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপন নিবেদন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ‘সাহিত্যে কর্ণমোহি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপভাস ও সমালোচনা-সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ, গুরুগভীর গবেষণা এবং লঘু হাস্য ও ব্যঙ্গরচনা—সর্বত্রই বঙ্কিম তাঁহার অনামাভ প্রভিতার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অমমুকরণীয় ভাষায়—‘বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্জবেরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি এসন্ন চতুর্ভুজ বৃত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।’ বঙ্কিমের এই বহুভুজ প্রভিতার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; ইহার স্বল্প-পরিমিত পরিধির মধ্যে উপভাস-সাহিত্যে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ লক্ষ্যে সংক্ষেপে হ’ একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

উপভাস রচনার বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কি? ‘উত্তর চরিতে’র আলোচনা-এসঙ্গে বঙ্কিম কাব্যের উদ্দেশ্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, ‘কাব্যের গোপ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন—চিন্তাভ্রমজনন। কবিরা...সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ স্বপ্নের দ্বারা জগতের চিন্তাভ্রম বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তট গোপ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।’ উপভাস রচনার বঙ্কিম এই উত্তর উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কিন্তু বাহ্য গোপ উদ্দেশ্য তাহাই কেমন করিয়া বীরে বীরে মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল, বঙ্কিমের উপভাসের আলোচনা-এসঙ্গে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উদ্দেশ্য ও ভাবধারার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া বঙ্কিমের উপভাসকে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। ‘হর্গেশ-নন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘স্বপ্নালিনী’ প্রথম পর্যায়ের উপভাস। এই সময় বঙ্কিমের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। আয়েষার সংঘম, স্বপ্নালিনীর পতিভক্তি, কপালকুণ্ডলার সারল্য, মমোরমার সরলতা, সংঘম ও নিষ্ঠা। লপ্তী-কন্যার প্রতি বিষমার মাতৃস্নেহ এবং বিক্রম আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহার ঐকান্তিক পতিভক্তি, জগৎ সিংহের পুরুষোচিত বীরত্ব ও ওদার্য্য, মবকুমারের পটুপকার-প্রয়তি, পলাতকের কতলু খাঁ ও পশুপতির শোচনীয় জীবনাবসান পরোক্ষে চিত্তভ্রম সহায়ক হইতে পারে; কিন্তু এ সকল স্থলে উপন্যাসের গোপ উদ্দেশ্য একেবারেই অন্তরালে রহিয়াছে এবং আধ্যাতিকার মাধ্যমে বঙ্কিম কোন বিশিষ্ট বাণী প্রচার করেন নাই।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে আধ্যাতিকার পরিবেশন-ওণে কোন

বিশিষ্ট বাণী নহে—মানব-জীবনের প্রতি উপন্যাসিকের দৃষ্টি-তদীরই পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমের প্রথম পর্যায়ের উপভাসে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিতদী কি? বঙ্কিম অদৃষ্টবাদী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে থাকিয়া এক অদৃষ্ট মহাশক্তি মানব-জীবনের উপর ক্ষুজের প্রভাব বিস্তার করে। এই সত্য প্রথম হইতেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথম পর্যায়ের তিনখানা উপন্যাসেই (‘হর্গেশনন্দিনী’ ও ‘স্বপ্নালিনী’তে অদৃষ্ট গণনার তিত্তর দিয়া এবং ‘কপালকুণ্ডলা’র স্বপ্নতর এবং শ্রেষ্ঠতর উপারে) তিনি এই অদৃষ্ট মহাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই রহস্তময় বিরাট শক্তি মানবের ক্ষুজ শক্তিকে উপহাস করিয়া, কখন কখনও ইহার গতিরোধ-প্রয়াসী অসহায় অজ্ঞ মানবকে অলক্ষ্যে ছুরীর বেগে নিজ নিজ নির্ধারিত ত্যাগপথে চালিত করিতেছে, কোথাও এতটুকু নড়-চড় হইবার উপায় নাই। বঙ্কিম ইহার কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে কোমরুপ শৃঙ্খলার স্বল্প আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; মানবের অদৃষ্টের নিয়ন্তা সহায়ত্বহীন, বিচারহীন অন্ধ শক্তি।

কিন্তু বঙ্কিম এই দৃষ্টিতদী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি নিয়তিকে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বমর নীতির রাজত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। কতলু খাঁ এবং পশুপতির জীবনের পরিণতিতে ইহার আভাস থাকিলেও ‘বিষয়ক’ হইতেই এই দৃষ্টিতদী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এই সময় হইতেই বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন ধারার সূচনা এবং এই উপন্যাসে বাহ্য নীতির নিয়ম, ক্রমে তগবর্ত্তিত্ত বিকাশের সঙ্গে তাহাই এশী বিধানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

‘বিষয়ক’ পাশাপাশি নিয়তি ও নীতির বিধান লক্ষ্য করা যায়। কপালকুণ্ডলা মমোরমার ম্যায় কুলও ত্যাগহতা, পলাতকের মঙ্গল, দেবেজ ও হীরা নিজ নিজ জীবনে স্বরোপিত বিষয়কের ফলভোগ করিয়াছে। এই উপন্যাসে অসংঘমের দুঃখময় পরিণতির তিত্তর দিয়া বঙ্কিম এই সত্য প্রচার করিয়াছেন যে, চিন্তাভ্রম ব্যতীত সুখ নাই এবং ইহার অন্য প্রাথমিক প্রয়োজন সংঘমশীল। ইহাই-বিত্তীয় পর্যায়ের উপন্যাসের বিশিষ্ট বাণী।

‘ইন্দ্রিয়া’, ‘রাধারাণী’ ও ‘স্বপ্নলজ্জরী’ রচনাকাল হিসাবে দ্বিতীয় পর্যায়কল্প হইলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহাদের স্থান স্বতন্ত্র। হাল্কা গল্পের মাধ্যমে ‘বদদর্শনে’র পাঠকবর্গের চিত্তবিশোধন এ স্থলে-বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ‘চন্দ্রশেখরে’ নীতিবেদ্য বঙ্কিমের কঠোর স্পষ্ট এবং এই উপন্যাসে

শৈবলিনীর অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পরিকল্পনার পক্ষাভেদে রহিয়াছে অসংযম-অসহিষ্ণু বন্ধিমের কঠিন অহুশাসন। একে ক্রমে রামানন্দ স্বামী বন্ধিমের নীতিপ্রচারের সুবপাণ্ডবরূপ।

‘চন্দ্রশেখর’ের গোণ উদ্ভেদ সাধারণভাবে নীতিশিক্ষা দান নহে; এই উপন্যাসে সর্বপ্রথম হিন্দুধর্মের প্রতি বন্ধিমের অহুশাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই ‘চন্দ্রশেখর’ের বিশিষ্ট অঙ্গ এবং পরবর্তী উপন্যাস ‘রজনী’তেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ‘চন্দ্রশেখর’ চন্দ্রশেখরের প্রতি রামানন্দ স্বামীর উপদেশ (চন্দ্রশেখর ৩১) এবং ‘রজনী’তে সন্ন্যাসী-ঠাকুর ও শচীশঙ্কর প্রমোদত্তর (রজনী ৩৬) ‘বর্ষভৃত্য’ের গুরু-শিষ্য-সংবাদ অঙ্গন করা ইহা দেখে।

বন্ধিম নিজের বলিয়াছেন, প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিক ছিলেন।* এই সময় তিনি পাশ্চাত্য নিরীশ্বরবাদী বা সংস্কৃত-বাদী দার্শনিকগণের চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। কিন্তু ‘প্রথম জীবন’ অনির্দিষ্টকাল এবং বন্ধিমের কোন উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে ‘নাস্তিক্যগম্বী’ নহে। তাহা হইলেও ‘চন্দ্রশেখর’ের পূর্বে তাহার অপর কোন উপন্যাসে হিন্দুধর্মের প্রতি অহুশাসনের নিদর্শন নাই।

নাস্তিক বন্ধিমের মনে কবে, কেমন করিয়া দীশ্বর-বিশ্বাস এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অহুশাস জন্মিল তাহার পূর্ণ ইতিহাস আজ হয়ত জানিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বন্ধিমাহুজ পূর্ণ-চন্দ্র ও জাতুশঙ্কর শচীশচন্দ্র দ্বারা লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যাত্ব অসম্পূর্ণ। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেনঃ

‘[বন্ধিম] যখন হুগলীতে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন কয়েক বৎসর পিতৃদেবের নিকট থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুকাল চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল; তথাপি রবিবারে, রবিবারে কাটালপাড়ায় আসিতেন। এইরূপে বন্ধিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম শিক্ষা হইল।...তাঁহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব।...’

বন্ধিমচন্দ্রের চুঁচুড়া থাকাকালেই পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে [১৮৮১ খ্রি:]। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্তন হয়। ইহার পর দ্বারা লিখিতেন, তাহাই হিন্দুধর্ম বুঝিবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন; ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই উদ্দেশ্য থাকিত।†

শচীশচন্দ্রের লিখিত বিবরণ এইরূপ: ‘১৮৮২ সালের চৈত্র মাসে—ইংরেজী ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে—বন্ধিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হইলেন।...এই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে ধর্মভাব সন্নিবিষ্ট হয়...। ১৮৮০ সালের শেষভাগে বন্ধিমচন্দ্রের

হৃদয়ে ধর্মভাব বদ্ধমূল হয়...ধর্মভাবের অচেনা পূর্ব হইতেই কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্নপ্রসবী তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাত্ত্বিকমনে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছেন। লোক-চক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তার পর দুই-তিন বৎসর যাইতে না যাইতে বন্ধিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগাক্রান্ত—মরণাপন্ন। বন্ধিমচন্দ্র কাদিতে কাদিতে নিশিষেবে দুমাইয়া পড়িলেন। নিম্নিতাবস্থায় নবদুর্বাদলমুখ্য বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্দোষ আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্যলাভ করিল। তদবধি বন্ধিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্মভাব বদ্ধমূল হইল।’*

পূর্ণচন্দ্র ও শচীশচন্দ্র উভয়ের মতে হুগলী বদলী হইবার পর হইতে বন্ধিম হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ‘চন্দ্রশেখর’ এবং ‘রজনী’ উভয় উপন্যাসই তৎপূর্বে ‘বদমর্শনে’ প্রকাশিত হইয়াছে। শচীশচন্দ্র যে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহার সন তারিখ দেন নাই; কিন্তু তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার হিসাবমত প্রথমোক্ত ঘটনা ১৮৮০ সালের দুই-তিন বৎসর পূর্বের কথা এবং শেষোক্ত ঘটনা ঐ সালের শেষের দিকে ঘটয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বন্ধিমের জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভকাত সন্তান এবং তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে,† অর্থাৎ ১৮৬৭ সালের দ্বৈত-আষাঢ় মাসে। সুতরাং ১৮৮০ সালের পূর্বে প্রথমোক্ত ঘটনা সম্ভব হইলেও, দ্বিতীয়োক্ত ঘটনা হয় ত ইহার পরের কথা। সুতরাং শচীশচন্দ্রের হিসাবে কোথাও কিছু পরমিল হইয়া থাকিবে। দ্বারা হউক, এই উভয় ঘটনার পূর্বেই ‘চন্দ্রশেখর’ সম্পূর্ণ এবং ‘রজনী’ অন্ততঃ আংশিক প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কারণ ‘চন্দ্রশেখর’ ‘বদমর্শনে’ সম্পূর্ণ হইয়াছে বন্ধিমের দ্বিতীয় বার বিবাহের কিকিঞ্চিক চৌক বৎসর পরে ১৮৮১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় এবং পরবর্তী সংখ্যা হইতেই ‘রজনী’ প্রকাশিত হইতে থাকে। হিন্দুধর্মের প্রতি বন্ধিমের অহুশাসনের প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবেও এই উভয় উপন্যাসের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। বন্ধিমের ধর্মমত এই সময় পর্যন্ত দানা বাঁধিয়া উঠে নাই একথা সত্য; কিন্তু তিনি সংসার কাটাওয়া কঠিন যুক্তিকার পদার্পণ করিয়াছেন।

দ্বারা দীর্ঘরাত্রিপ্রেত জীবনধারণ করেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের শক্তি সঞ্চেদও বন্ধিম সচেতন হইয়াছেন। প্রথম

* শচীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ‘বন্ধিমচন্দ্র’ প্রবন্ধে উল্লেখ: বন্ধিম এসল, ১৭১ পৃ।

† ‘বন্ধিমচন্দ্রের ধর্ম শিক্ষা’—বন্ধিমএসল, ২০০ পৃ।

* বন্ধিম-জীবনী, ১৪৩-৪ পৃ:।

† এ ১১৩ পৃ:।

পর্যায়ের উপভাসে এবং “বিষয়কে” কুন্দমলিনীর চিত্রে মানুষ নিয়তির হস্তে জড়নক হাজ। শেষোক্ত উপভাসে নগেন্দ্রনাথ ধরোপিত বিষয়কের ফলভোগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও (নিয়তি না হইলেও) প্রবৃত্তির সম্মুখে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। ‘চন্দ্রশেখরে’ এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মিশ্রণ লক্ষণীয়। এই উপভাসে ভাগ্যহতা দলনীর পার্শ্বে দেখিতে পাই রামানন্দ স্বামীকে, যিনি সাধনা দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনানুসারে শৈবলিনী ও ফণীর উপর সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। ‘রজনী’তে সন্ন্যাসীঠাকুর রামানন্দ স্বামীর ভাব অভিমানব নহেন, কিন্তু তিনিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বন্ধিমের ভাবধারার ক্রমোত্তরোত্তর নিদর্শন হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ।

পরবর্তী উপভাস ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’ও ‘বিষয়কে’র ভাব অসংস্কারের কুফল প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপভাসে বন্ধিম প্রবৃত্তির দুর্ঘটনীয়তার উপর—এতদধীন—কোর দেন নাই; গোবিন্দলাল কতকটা রেছায় প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথও গোবিন্দলালের চরিত্রাঙ্কনে এই মৌলিক পাণ্ডক্য পরোক্ষ এবং নঞর্থকভাবে হইলেও, মানুষের শক্তিতে বন্ধিমের ক্রমবর্ধমান প্রত্যয়ের অভ্যন্তর নিদর্শন এবং ‘পরিশিষ্টে’ সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্র শুধু নীতিবেত্তা বন্ধিমের নহে, বিশেষ করিয়া ভগবদ্ভক্ত বন্ধিমের পরিচয় দেয়। ‘রজনী’তে সর্গভাগ্যী অমরনাথের চিত্রে যাহার কণি আভাস, ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’ সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্রে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথম সংস্করণে উপভাসের পরিসমাপ্তি গোবিন্দলালের মৃত্যুতে এবং ১৮৯২ সালের চতুর্থ সংস্করণে, অর্থাৎ ‘আনন্দমঠ’ ‘দেবী চৌধুরাণী’ ও ‘সীতারামে’র পরবর্তীকালে তাহার এই নূতন পরিণতি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই ভিন্ন উপন্যাসের ভাবধারার সাদৃশ্যের ইহাই মূল কারণ।

‘রাজসিংহ’ দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ উপভাস। এই উপভাসে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের জয়-পরাজয়ের মধ্যে বন্ধিম ঐশ্বর্য নিয়ম লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তিনি ইহার ব্যাখ্যায় প্রয়ুক্ত হইয়াছেন। (রাজসিংহ—উপসংহার)। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণভালাভ করিয়াছে ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপভাসে ‘সিপাহী’ হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধারে’র পরিকল্পনার। যিনি ভক্ত তাঁহার ‘সকল রুত্তিগুলিই সম্পূর্ণ অমূল্যজিহ্ব’, সুতরাং তিনি দক্ষ; তিনি ঈশ্বরানুগ্রহীত, সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি ‘নৈমগ্নিক নিয়মের সাহায্যেই অভিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে’ সমর্থ হইবেন—এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই বন্ধিম এই চিত্রটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। ‘সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা।’ (বর্ষভঙ্গ ১৯ অষ্টব্য)। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য বাহাই

হউক, কালবৈশাখীর বড় প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটনা থাকে এবং দেবী চৌধুরাণী যেভাবে ইহাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। কিন্তু ‘কপালকুণ্ডলা’র বন্ধিম প্রকৃতিকে নিরোদ্ধিত করিয়াছেন নির্ধর্ম ধ্বংসকারী। একেই সেই প্রকৃতিকেই তিনি ভক্তের উদ্ধারকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাও গুঢ়াৎপূর্ণ। ‘সীতারাম’ উপভাসেও আধ্যাত্মিকার পরিবেশন শুধু মনে হয় যেন চরম সঙ্কটকালে সীতারামের প্রার্থনার সাক্ষাৎ দিয়াই ‘নিরুপায়ের উপায়’ তাহার এবং তাঁহার জীপুত্র কান্তার সন্ধানকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (সীতারাম ৩২১-২৩ অষ্টব্য)।

ঐশ্বর্য শক্তি এবং ঐশ্বর্য বিধানকে প্রাধান্য দিতে গিয়া বন্ধিম কোন কোন উপভাসে নিয়তিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে (দলনী ও মবারকের জীবনে) তিনি নিয়তিকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে রাখিয়াছেন এবং একটি ক্ষেত্রে (চকল-কুমারীর জীবনে) নিয়তির প্রভাব একেবারেই উপেক্ষণীয়। কিন্তু কোন সময়েই বন্ধিম নিয়তিকে অস্বীকার করেন নাই। (চকলকুমারীর ক্ষেত্রেও অদৃষ্ট গণনা অন্ততঃ ব্যর্থ হয় নাই) এবং তাহার শেষ উপভাস ‘সীতারামে’ ত্রীর অদৃষ্ট গণনার ভিতর দিয়া তিনি নিয়তিকে পুরাপুরি প্রাধান্য দিয়াছেন।

প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে এবং পরবর্তীকালেও যে সকল উপন্যাসে নিয়তির পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহার কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্য-শক্তির বিরাট অপচয় পাঠককে বিশ্ববিস্মিত করে। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলায় ব্যর্থ জীবনের সার্থকতা কি? তাহাদের এবং মনোরমা, কুন্দ ও দলনীর জীবনের শোচনীয় পরিণতির পশ্চাতে বিশ্বস্ততার কোন সে নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে? পাঠকের মনের এই সঙ্কল্প এবং অস্বস্তি প্রশ্নের সহজ বিচারবুদ্ধিপ্রসূত কোন সহজত্তর নাই। যে সকল স্থলে নিয়তির পরিকল্পনা নাই, সে সকল স্থলেও যে কোথাও কোথাও করণ ক্রিয়াক্রতির চিত্র পাওয়া যায় না তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ প্রতাপ ও ভ্রমরের মৃত্যুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি অমূল্য জীবনের পরিণতি ঘটই দুঃখের হউক, ইহাদের আত্মত্যাগ শিরশ্চক নহে, স্বার্থতার মধ্যেও ইহাদের জীবনে পরম সার্থকতা রহিয়াছে। নিয়তি ও ঐশ্বর্য বিধানের পরিকল্পনার এই মৌলিক পাণ্ডক্য লক্ষণীয়।

মানবের অদৃষ্টের মধ্যে শৃঙ্খলার স্রষ্টা আবিষ্কার করিতে গিয়া বন্ধিম কখন কখনও নিয়তির অমতিক্রমণীয়তার সহিত ঐশ্বর্য বিধানের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। ‘রাজসিংহ’ মবারকের মৃত্যু শুধু নিয়তির বিধান নহে, মবারক রূপেই মোহে প্রেমাস্পদার উপর যে অত্যাচার করিল, দলিত, লালিত ভালবাসা তাহার প্রতিশোধ লইল। প্রকৃতির নিয়মে

ইহাই অলম্বনীয় প্রতিশোধবিধি (nemesis); ইহাই ঐশী
বিধান। 'সীতারামে' ভোরাব খাঁর আক্রমণ হইতে নগর-
রক্ষা ব্যাপারে বক্রিম পুরুষকার, নিয়তিঃ এবং ঈশ্বরের মঙ্গল-
বিধানের প্রদর্শন সমন্বয়সাধন করিয়াছেন এবং একই উপভাসে
গদ্যারামের মৃত্যু সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এমনভাবে
তত্ত্ব জীৱ-অদৃষ্ট-গণনাই সকল হয়, নাই; বক্রিম দেখাইতেছেন
যে, সীতারাম রক্ষা করিলেও বিধাতার জ্ঞান বিচারে গদ্যারাম
অব্যাহতি পায় নাই; পরন্তু ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হইয়া অসম্মত
সাহায্যে রাজকার্য্যে ত্রি ধৈ অহুচিত হস্তক্ষেপ করিলেন;†
ভ্রাতার মৃত্যুর নিমিত্তরূপিণী হইয়া তাঁহাকে তাহার শাস্তি
পাইতে হইল। কিন্তু বক্রিমের বর্ণনামূল্যে ইহাই বলুক, বাস্তব
জগতের সীমারহিত জীবনে মানবের অদৃষ্টের হস্তের রহস্য কোম
বাবাধরা নৈতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা চলে না। হয়ত এই
কারণেই তিনি কখনও পৃথক পৃথক ভাবে নিয়তি বা ঐশী
বিধানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কখনও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-
সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, কখনও দার্শনিকের উচ্চাসন হইতে
প্রচার করিয়াছেন, 'স্বপ্ন হুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—স্বপ্ন
হুঃখের কোন বাহ্যিক অভিত্ত নাই।' (ধর্মতত্ত্ব ২। 'চন্দ্রশেখরে'
রামানন্দ স্বামীীর মূখেও অস্বরূপ উক্তি শুনিতে পাই।
চন্দ্রশেখর ৩১)।

'আনন্দমঠ' হইতে বক্রিমের উপভাসে নুতন সুর লক্ষ্য করা
যায়। ইহাই তৃতীয় পর্য্যায়ের উপভাসের বিশিষ্ট সুর।
'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' তৃতীয় যুগের
'জমী'। জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বক্রিম হিন্দুধর্মের গুণ তত্ত্ব
যেমন বুঝিয়াছেন, 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি যাহা বিশদরূপে বিশ্লেষণ
করিয়াছেন—'জমী'তে তাহারই মর্ম্মকথা তিনি যথায়োগ্য
কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণার ভিত্তর দিয়া সাধারণ পাঠকের
সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বক্রিম বলিয়াছেন, 'ভগবদ্গীতার
যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপভাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত।' (ধর্মতত্ত্ব ১১)। তাঁহারই ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, 'ধর্ম-

তত্ত্বে' যাহা উপদেশ, 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতা-
রামে' তাহাই উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। এই 'জমী'তে বক্রিম
প্রধানতঃ ধর্মোপদেশ। সুতরাং তাঁহার ধর্মব্যাপ্য সম্বন্ধে
সংক্ষেপে দুই-একটি কথা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম জীবনে বক্রিম যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতবাদ
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অগস্ত কোমৎ
(Augusto Comte) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে
ভগবদত্তক বক্রিম এই পাশ্চাত্য মনীষীর মতবাদের সহিত
যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া গীতার বাণী অবলম্বনে ধর্মের এমন
এক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন যাহা সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক-
ভাব বহু উর্দ্ধে। এই ধর্ম মানবধর্ম বা মনুষ্যত্ব। শারীরিকী,
জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জনী—এই চতুর্বি
বৃত্তির উপযুক্ত সৃষ্টি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যে ইহার পূর্ণ
বিকাশ। ইহা অমূল্যলব্ধপেক এবং অমূল্যলব্ধত্বের মূল
কথা এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা তাহাদের
এইরূপ অমূল্যলব্ধ করিতে হইবে যাহাতে কোন বৃত্তি অপর
কোন বৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অহুচিত ও অসঙ্গত বৃত্তি না পাইতে
পারে। কিন্তু বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যের মাপকাঠি কি? বক্রিম
বলেন, যখন সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে, অর্থাৎ যখন
কলাকাজকা রহিত হইয়া ঈশ্বরানুভূতিপ্রেরিত বলিয়া মানুষ তাহার
অহুষ্ঠের কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, তখনই বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য
সাধিত হইল বুঝিতে হইবে। ইহাই গীতোক্ত নিকাম ধর্মের
গুণতত্ত্ব, ইহাই ভক্তি।† 'জমী'তে বক্রিম হিন্দুধর্মের শাস্ত
সত্য এই ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

'আনন্দমঠে'র স্বল্প-পরিসর 'উপক্রমণিকা' বিশেষ তাৎপর্য্য-
পূর্ণ এবং এই উপক্রমণিকার বাণী সম্মুখে রাখিয়াই আমা-
দিগকে সন্তান-সম্প্রদায়ের কার্য্য ও আদর্শের বিচার করিতে

* ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষীর মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে
বক্রিম কোমতের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। (ধর্মতত্ত্ব, ফ্রেডপত্র ৭)
কোমৎ বলেন,

'Religion in itself expresses the State of perfect
unity which is the distinctive mark of man's existence
both as an individual and in society, when all the
constituent parts of his nature, moral and physical are
made to converge towards one common purpose.'

বক্রিম ধর্মের এই ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু
নিরীধরবাহী কোমৎ ঈশ্বরের স্থানে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার
Cultus of Humanity প্রচার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, গীতার
বাণীপুষ্ট বক্রিম ঈশ্বরবিহীন ধর্ম স্বীকার করিতে পারেন নাই; তাঁহার
মতে বৃত্তিসমূহকে ঈশ্বরমুখী করিয়া নিকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্মের বিশিষ্ট
লক্ষণ। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের
'দার্শনিক বক্রিমচন্দ্র' ১১, ৩৫-৪৬ পৃ. দ্রষ্টব্য)

*। গঙ্গাধর শামী জীৱ ভাগ্য গণনা করিয়া বলিয়াছেন, "তোমার
অদৃষ্ট এক পরম পুণ্য আছে।...সময় উপস্থিত হইলে স্বামী সলসল
গমন করিও।" (সীতারাম ১১৩)। ইহার বঙ্গবর্ণনাক পুরে তাঁহারই
নির্দেশে জয়ন্তী ও ত্রি ভৈরবী বেশে তৎপ্রদত্ত মন্ত্রপুত্র (?) ত্রিশূল হস্তে
সীতারামের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। (সীতারাম ২৮)। চন্দ্রচূড়
স্বামী তৎকর্ত্ত্বক জীৱ অদৃষ্ট গণনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই যথায়োগ্য
নির্দেশ দিয়া থাকিবেন এবং পরবর্ত্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা নিঃসংশয়ে
বলা যাইতে পারে যে, ইহাই জীৱ 'পরম পুণ্যের' সময় এবং জয়ন্তীর
আমুকুল্যে এই সময় পরোক্ষে তিনি সীতারামের যে সাহায্য করিলেন
তাঁহাই তাঁহার 'পরম পুণ্য'।

† গঙ্গারামের মন্ত্র মার্জনা শিক্ষা ব্যাপারে জীৱ যে পরোক্ষ হাত
রহিয়াছে, তাঁহার কর্ম্মভাগ সম্বন্ধে সীতারামের জেয়ার উত্তরে তিনি এ
কথা স্বীকার করিতে পারেন নাই। (সীতারাম ৩৭)।

† 'যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুভূতী হয়, সেই
অবস্থাই ভক্তি।' এবং 'ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য।'
(ধর্মতত্ত্ব ১১)।

হইবে। সভ্যানন্দ ঠাকুর (সন্তান-সম্প্রদায়ের ইনিই শক্তির উৎস) সর্বভাষী হইয়া দেশভাষাকার সেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রীতি বঙ্গিমের দেশপ্রীতির পরিচয় দেয়, কিন্তু অত্যাধ প্রীতিবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি তাঁহার দেশপ্রীতিকে ঈশ্বরমুখী করিতে শিকালান্দ করেন নাই। বঙ্গিমের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও সাধনার এই অসম্পূর্ণতার ক্ষুদ্রই অঙ্গের যুগুর্ভে তাঁহার নিকট বিসর্জনের আহ্বান আসিল। কারণ সাধনার সিদ্ধিলাভের জন্য 'জীবনসর্ক' পণই যথেষ্ট নহে, ইহার জন্য চাই ভক্তি।

ভক্তিতত্ত্বের দিক দিয়া 'আনন্দমঠে'র যেখানে পরিসমাপ্তি, 'দেবী চৌধুরাণী'র সেখানে আরম্ভ। 'আনন্দমঠে' বঙ্গিম ভক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন, 'দেবী চৌধুরাণী'তে 'প্রফুল্ল'র চরিত্রে তিনি ভক্তির আদর্শকে বাস্তব রূপ দিয়াছেন, প্রফুল্ল নিকাম কর্ম-সাধনার অর্থাৎ ভক্তির প্রতীক। দেহী মাজ্জকেই কর্ম করিতে হইবে; কারণ,

নহি কচ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈগু পৈঃ।

ভগবদ্গীতা ৩।৫

অর্থাৎ, 'কেহই কখন নিকর্ম্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।' অথচ বিষয়ের ধ্যান বিনাশের হেতু :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সন্তপ্তেহুপশান্তয়ে।

সদাং সজ্জায়তে কামঃ কামাং কোণোহভিজায়তে।

কোণাদ ভবতি সমোহঃ সমোহাং স্থতিবিভমঃ।

স্থতিভ্রংশাদবুদ্ধিনাশো বুদ্ধিমাশাং প্রপত্ততি।

ভগবদ্গীতা ২.৬২, ৬৩।

সীতারামের চরিত্রে ইহাই বঙ্গিমের প্রতিপাদ।

তাহা হইলে কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি ?

যজ্ঞার্থং কর্মমোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

ভগবদ্গীতা ৩।৯

অর্থাৎ—যজ্ঞার্থ, অর্থাৎ ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম তত্ত্বির অন্য কর্ম 'বন্ধনমাত্র', অতরাং অমুষ্ঠের নহে। 'যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দিষ্টপ্রভেদ, তাহাই অমুষ্ঠের। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাজ্ঞাশূন্য হইয়া তাহার অমুষ্ঠান করিতে হইবে।' (বসুভট্ট ১৪)। ইহাই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায়। ইহাই কর্মসম্যাস, ইহাই ভক্তি এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইহাই প্রফুল্লের জীবন-বাণী।

প্রফুল্লের জীবন কর্মের ভিতর দিয়া পূর্ণতা লাভ করিল এবং তাঁহার অনাগজ্ঞ মনের সোনার কাঠির স্পর্শে ব্রহ্মবিশ্বের সংসারের ছড়তা ছুটিল। পক্ষান্তরে, কর্মভ্যাগের অভিমানের ফলে জীর নিকাম সাধনা অপূর্ণ রহিয়া গেল এবং শ্রী প্রত্যাবর্তন করিলে এক দিকে সীতারামের আসক্তি, অপর দিকে জীর অনাগজ্ঞের বিকার—উজ্জয়মিলিয়া সীতারামের জীবনের ব্রত ব্যর্থ করিয়া দিল। নিকাম সাধনার ব্যাধ্যা হিসাবে 'সীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'র পরিপূরক : 'দেবী চৌধুরাণী'তে নিকাম সাধনার প্রণালী ও পরিণতি এবং 'সীতারামে' এই সাধনার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যাত হইরাছে।

কিন্তু ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ যত বড় জিনিষ হট্টক, আর্টের বিচারে ইহা উপন্যাসের গৌণ উদ্দেশ্য। 'জয়ী'তে প্রকৃতপক্ষে এই গৌণ উদ্দেশ্যই মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টির অমূলক নহে। তাহা হইলেও মোটের উপর বলা যাউতে পারে যে, সীতারাম সারভঙ্গ সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গিমের চরিত্র-সৃষ্টি ও প্রতিবেশ-পরিচয়না অল্প শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় দেয়।

উজ্জীবন

শ্রী অরুণবরণ চক্রবর্তী

বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে আছো আমি আশার উল্লুপ।
প্রবল বজ্রার হাঝে অনির্বাক্য দীপবানি হাতে
এখনো চলেছি পথ। কতবার অন্ধকার রাতে
হারিয়েছি দিক। তবু বেঁধেছি সাহসে ভগ্ন বুক।

সহস্র-সমস্তা-খেরা জীবনের নাহি কোন স্বাদ।
কোনমতে ছই হাতে পথ কেটে কেটে অগ্রসর।
তবুও পথের হবে শেষ। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠস্বর—
মুক্তি-মত্ত মানবের ধ্বনিবে সে জয়ের সংবাদ।

"এ জীবন মহাসত্য—তার লয় নাই—নাই কয়।"

আমি তো চলেছি গেয়ে জীবনের এই জয়গান।

শোষিত লালিত বুক কবকের যুগ-বন্দী প্রাণ

মজুম আলোর মেয়ে পুনরুজ্জীবিত ঘাতে হয় :

দিকে দিকে পথে পথে সাগরে বন্দরে সগৌরবে

মজুম হুগের ধ্বজা ঘাতে ওড়ে আপন বিভবে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

১৮৬৯-১৯১২

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক, নির্ভীক সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক 'দেশের কথা'র রচয়িতা সখারাম গণেশ দেউস্করকে আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু একদা বাংলা-সাহিত্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি এক দিকে যেমন বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার অগ্নিগর্ভ রচনাবলী আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মর্ম্মমূলেও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিবাসী ত্রিবেদী, শুকুল, পাঁড়ে প্রভৃতি উপাধিদারী কণোজিয়া ব্রাহ্মণ এবং সিংহ-উপাধিদারী রাজ-পুত্দের দ্বারা সখারামও ছিলেন জাতিতে অবাঙালী। কিন্তু বাংলা দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির সহিত একাত্ম হইয়া যান। বস্তুতঃ এই দারিদ্র্যব্রতধারী মরাঠী ব্রাহ্মণ যে-ভাবে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে অশ্রুকার উল্লেখ করে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম : বিদ্যাশিক্ষা

সখারাম গণেশ দেউস্কর মহারাষ্ট্রের এক বিদ্যাহুবাগী ব্রাহ্মণ-পরিবারের কৃতী সন্তান। ইহাদের আদি নিবাস—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বত্তুগিরি জেলায় ছত্রপতি শিবাজীর আলবান নামক দুর্গের নিকটবর্তী দেউস্ গ্রাম। সখারামের পিতামহ সদাশিব, স্থানিকের নিকট হইতে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ বৈদ্যানাথের নিকটস্থ করো গ্রাম প্রাপ্ত হন। “করো গ্রামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্র গণেশ সদাশিব কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। গিধোড়ের ভূতপূর্ব মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বৈদ্যানাথ দেওঘরে বাস করিতেন। তিনি গণেশ সদাশিবকে আশ্রয় দেন। ১২২৬ সংবতের পৌষ মাসে শুক্লা-চতুর্দশী তিথিতে (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯) তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে বাঙ্গলা দেশে বিখ্যাত ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা-প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন।”

সখারাম গণেশ দেউস্কর—এই নামের মধ্যেই তাঁহার নিজের নাম, পিতৃনাম ও বংশ-পরিচয় নিহিত। তাঁহার নাম সখারাম, পিতার নাম গণেশ এবং বংশের নাম দেউস্কর। সখারামের জীবন স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভিবাহিত হয় নাই। সারা জীবনই প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছিল। এই

হুর্ভাগ্যের স্রুতপাত হয় তাঁহার শৈশবেই—সখারামের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার মাতা লোকান্তরিতা হন। সাক্ষী পত্নীর মৃত্যুর পর সখারামের পিতা আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সখারামই ছিলেন—একপত্নীব্রত পুত্রবৎসল পিতার নয়নের মণিস্বরূপ।

পত্নীবিয়োগের পর সখারামের পিতা নিজের এক ভগিনীর উপর এই মাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের ভার অর্পণ করেন। সখারামের এই পিতৃষসা-যেমন ছিলেন বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাহুবাগিনী, তেমনই গৃহকর্মে সুনিপুণ। “তাঁহার মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অগ্নিকার ছিল। তাঁহারই যত্নে, উপদেশে, পরিশ্রমে সখারামের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।” এই পুণ্যবতী মহিলার আদর্শ ও শিক্ষাদান সখারামের উত্তর-জীবনে পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইনি শিশু সখারামের হৃদয়ে মরাঠী-সাহিত্যের প্রতি যে অল্পরাগ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে উক্ত সাহিত্যের রত্নবাজি আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের সম্পদ-বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

সখারাম শৈশবাবধিই বাঙালী শিশুদের মত বাংলা শিথিতে আরম্ভ করেন। সখারামের পিতা যে কাশীতে অল্প কাল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সে কথা আগেই বলিয়াছি। পুত্রকেও বাল্যকালেই ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদের সহিত পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন।

কিছু কাল বেদ অধ্যয়নের পর সখারামকে দেওঘর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। মাইকেলের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তখন এই স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁহার শিক্ষার গুণে সখারাম বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অল্পরক্ত হইয়া উঠেন। বাংলা ভাষার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মরাঠী ভাষা এবং সাহিত্যও সম্বন্ধে আয়ত্ত করিতে সুরু করেন। যোগীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রটির মনে শুধু যে সাহিত্যের প্রতি অল্পরাগই উদ্দীপ্ত হইল তাহা নহে, বাল্য-বয়সেই বাংলা রচনায় তাঁহার হাতে-খড়ি হইল। ইতিহাসচর্চায় তাঁহার অসাধারণ অল্পরাগ ছিল। সখারাম নানা ঐতিহাসিক সন্দর্ভ লিখিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। এই তরুণ লেখকের রচনাবলী তখনকার প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিক-

পত্রিকাাদিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' লেখা বাহির হওয়া কম কথা ছিল না। 'সাহিত্যে' রচনা প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন লেখকেরা বাংলা-সাহিত্যের আসরে জাতে উঠিতেন, একথা বলিলে কিছু মাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। সমাজপতির সমালোচনার কষ্টিপাথরে বাচাই হইয়া সখারামের রচনা যে খাঁটি সোনা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায়, অল্পশীলন দ্বারা রচনার কিরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশাত্ম-বোধের বীজও দেওঘরে এই স্বযোগ্য শিক্ষকের প্রযত্নে ছাত্র-জীবনেই সখারামের হৃদয়ে উদ্ভূত হয়।

কর্মজীবন

পারিবারিক অভাব-অনটনের দরুন সখারামকে অল্প বয়সেই জীবিকার সংস্থানের জন্য মনোযোগী হইতে হইল, তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হইল সামান্য শিক্ষাত্রতীরূপে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যালয়ে সেকেন্ড পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে সখারাম মাসিক ১৫ বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েও তিনি অবসরকালে রচনাচর্চা করিতেন, 'হিতবাদী'তে নিয়মিত ভাবে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত; একবার সখারাম তাঁহার একটি রচনায় বৈদ্যনাথের তদানীন্তন মহকুমা হাকিমের অন্যায্য আচরণ সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটিত করেন। 'হিতবাদী'র উক্ত প্রবন্ধের লেখক যে সখারাম, বিশেষ কোন সূত্রে তাহা অবগত হইয়া হাকিম-পুঙ্গব তাঁহার উপর ভয়ানক রুষ্ট হইলেন। ঐ হাকিম ছিলেন দেওঘর বিদ্যালয়ের স্কুল-কমিটির সভাপতি। সখারামকে শায়েস্তা করিবার জন্ত তিনি ক্রুতসঙ্কল্প হইলেন, তাঁহার প্রতিকূলতায় সখারাম কর্মচ্যুত হইলেনই, এমন কি দেওঘরে বাস করাও ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি ১৮৯৭ সনে সপরিবারে দেওঘর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেওঘর পরিত্যাগ কিন্তু সখারামের পক্ষে শাপে বর হইল। দেওঘরের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে কলিকাতার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আসিয়া তিনি নিজের প্রতিভা বিকাশের অল্পকূল ক্ষেত্র পাইলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তখন 'হিতবাদী'র সম্পাদক; তিনিই এই সময়ে বিপুল সখারামের সহায়ক হইলেন। সখারাম মাসিক ৩০ বেতনে 'হিতবাদী'র প্রক-সংশোধকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কর্মদক্ষতাগুণে অচিরেই তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল, তিনি ক্রমশঃ কাব্যবিশারদের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ১৯০৭ সনে পীড়িত কালীপ্রসন্ন যখন স্বাস্থ্যদেহে জাপান যাত্রা করেন, সেই সময়ে

সখারামের সবল হস্তেই তিনি 'হিতবাদী'র পরিচালন-ভার গ্রস্ত করিয়া যান। স্বদেশ-প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে কাব্যবিশারদের মৃত্যু হইলে (৪ জুলাই ১৯০৭), 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষ সখারামকেই স্থায়ী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন; তাঁহার বেতন হয় মাসিক ২০ টাকা।

ইহার চার পাঁচ মাস পরেই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশন কিরূপে লোকমাগ্ন তিলকের অমুগামীদের দ্বারা দক্ষিণে পরিণত হয়, সে কাহিনী স্ববিদিত। যেদিন এই কাণ্ড হয়, সেই দিনই সুরাট হইতে হিতবাদীর স্বত্বাধিকারিগণ তিলকের বিরুদ্ধে হিতবাদীতে লিখিবার জন্ত সখারামকে তার করেন। তার পাইয়া তেজস্বী মরাঠা ব্রাহ্মণ সখারামের আত্মমর্য্যাদাবোধ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তিলকের নিকট তিনি স্বদেশ-কতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিলক ছিলেন তাঁহার গুরু। সেই দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গুরুকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্ত লেখনী ধারণ!—এ কথা চিন্তা করিতেই তাঁহার সমস্ত অন্তর কর্তৃপক্ষের এই অত্মায় অমুরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রীতিমত ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, বরং ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় তাহাও স্বীকার, তবু এ কাজ তাঁহার দ্বারা হইবে না। তিনি নিজের দারিদ্র্যের কথা, পরিবার-পরিজনের অন্নসংস্থানের কথা—সকলই ভুলিয়া গেলেন; সখারাম এক কথায় 'হিতবাদী'র চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনায় সখারাম স্ব-মতের প্রতি যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা সাংবাদিক জগতে বিরল। বাস্তবিকই "মতের স্বাতন্ত্র্যে তাঁহার অকপট অহুসার ছিল। জীবিকার জন্ত তিনি পরমতের অল্পবর্জন ও আত্মমতের বলিদানে সম্মত হন নাই।"

ইতিহাসে সখারামের গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সারা জীবন প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ইতিহাসের চর্চায় রত ছিলেন। 'হিতবাদী'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার অল্প দিন পরেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রাশনাল স্কুল—জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

দেশ-সেবা

মহারাত্রের সম্ভান হইয়া সখারাম বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে আপন জন বলিয়া মনে করিতেন। বাঙালীর স্বথ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাজ্জার সহিত ছিল তাঁহার নাড়ীর যোগ; বাঙালীদের তিনি স্বজন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার

অমুদ্রা ছিল গভীর। এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন—বাঙালীর সর্বপ্রকার জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। সখারাম ‘যুগান্তরে’ও মাঝে মাঝে লিখিতেন। এই দলের সহিত তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে বঙ্গদেশে ১৯০২ সনে সর্বপ্রথম শিবাজী-মহোৎসবের সূচনা হয়।

জীবন-সাম্রাজ্য

দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল সখারামের নিত্য সহচর। একে ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার জীবন জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর দ্রুত ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার শরীরও ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে আবার পুত্র ও পত্নী—উভয়েই তাঁহার মাম্মা কাটাঁইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বেশী দিন তাহাদের বিয়োগ-ব্যথা সখারামকে সহ্য করিতে হইল না,—১৯১২ সনের ২৩এ নবেম্বর (৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৯, কার্তিক-শুক্রাচতুর্দশী) দেওঘরের কয়লা গ্রামের বাড়ীতে তিনি অকালে দেহরক্ষা করিলেন।

স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন সখারামের একজন গুণ-গ্রাহী। সখারামের মৃত্যুর পর তাঁহার গুণকীর্তন করিতে গিয়া স্বরেশচন্দ্র যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে এই দরিদ্র সাহিত্যসেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যেন একেবারে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

“পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউকর আর ইহুদগতে মাই। ইনি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশায়বোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবার আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদ-পত্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সখারাম বাবু কর্ম্মী ছিলেন—ইনি কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাঙালীকে আপনাদর করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা সেই ক্ষতিতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।...”

সাহিত্যসেবীর চিরন্তন অভিলাষ দারিদ্র্য দেউকরের চির-জীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সেই দারিদ্র্যের যাতনা ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাতে তিনি ধরায় বন্দন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর অধঃস্থলের অতীত হইয়াছেন। তৎপূর্ব্ব কর্ম্মসম্পাদিত পঞ্চপ্রান্ত পথিকের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া করুণার পরিচর দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাঁহাকে শান্তি দান করুন।” (“বসুমতী” হইতে ১৩১৯ সালের মাঘ-সংখ্যা ‘সাহিত্যে’ উদ্ধৃত)।

রচনাবলী

সখারাম তাঁহার কর্ম্মসম্পাদিত জীবনের স্বল্প অবসরটুকু বাংলা-সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি সরল ও বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতেন। তাঁহার রচনার সমারসে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির অধোগতির ইতিহাস—‘দেশের কথা’ সমধিক প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকখানি এদেশবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের ও শেষণের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিলে তেজস্বী সখারাম গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, মামলা শুনানির পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সখারামের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালাভুক্তমিক তালিকা দিতেছি; বঙ্গনী-মধ্যে উদ্ধৃত সাল-তারিখযুক্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। এটা কোন্ যুগ?। ১৮ ভাদ্র ১২৯৯ (২-২-১৮৯২)। পৃ. ২৪+১ শুদ্ধিপত্র।

“যুগকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার।” “এটা কোন্ যুগ?” (প্রথম প্রস্তাব) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধের এই প্রথম প্রস্তাবটি গত বৎসরের কার্তিক মাসের ‘সাহিত্য ও বিজ্ঞানে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রস্তাবটি সংশোধিত এবং স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া ভূবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংপ্রতি তাহা পুনঃ সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল।...বেঙ্গনাথ দেওঘর ১২৯৯ সাল জ্যৈষ্ঠ।”

২। মহামতি রানাদে।? (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৯০১)। পৃ. ৩৬।

“এই প্রস্তাবের অধিকাংশ পূর্বে প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।”

৩। বাণীর রাজকুমার। ১৩০৮ সাল (২৭ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৬০।

“এই কাহিনীর সংগ্রহে আমার প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক স্রব্ধে সাতারা-রাজের পারসীমবীণা ত্রীযুক্ত দত্তাশ্রয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের রচিত ‘মহারাজী লক্ষ্মীবাইয়ের জীবনচরিত’ নামক উৎকৃষ্ট মারাত্ম গ্রন্থ হইতে আমি অশেষ সাহায্য পাইয়াছি।”

৪। বাজী রাও। ১৩০৮ সাল (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৯০২)। পৃ. ১৬২।

“রাও বাহাদুর কানীনাথ মারায়ণ সান্নে বি, এ, (ডেক্যান কলেজ), ত্রীযুক্ত বিদ্যনাথ কানীনাথ রাজওয়াড়ে ও স্রব্ধ ত্রীযুক্ত দত্তাশ্রয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের নিকট আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রদেয়। ইঁহাদিগের অস্তু চেষ্টায়

মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস সংক্রান্ত চূর্ণিত প্রাচীন কাগজপত্র সংগ্রহীত না হইলে এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে হুঃসাধ্য হইত।”

৫। আমলদী বাজি। ? (২৫ মার্চ ১৯০৩)। পৃ. ২১. ÷ ৬০।

“শ্রীমতী কানী রাই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আমলদী বাজির যে অতি প্রকাণ্ড—রম্য আট পেছী ৪২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। উহার সারসংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব ‘সবী’ পত্রিকায় [১৩০৭, মাঘ-চৈত্র; ১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়] ‘আমি: ইতঃপূর্বে কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে যথাসম্ভব পরিবর্তন ও সংশোধনানন্তর তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।”

৬। শিবাজীর মহত্ব। আষাঢ় ১৩১০ (জুলাই ১৯০৩)। পৃ. ২০।

শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত। ইহা প্রথমে “কলিকাতা ১৩০৯ সালের শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে রচিত” হয়।

৭। দেশেশ্বর কথাঃ

১ম ভাগ। ১৩১১ সাল (১৬ জুন ১৯০৪)। পৃ. ৩৪২।

পরিশিষ্ট ভাগ। (২৩ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ৩৭।

“জাতীয় মহাসমিতির আরম্ভ কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে ‘দেশের কথা’ প্রচারিত হইল। মিঃ উইলিয়াম ডিগ্‌বী সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত দাদা ভাই নোরোজী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, ভারতের দারিদ্র্য ও শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বর্তমান পুস্তকের রচনার তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থদ্বয়—মিঃ ডিগ্‌বীর *The Prosperous British India*, শ্রীযুক্ত নোরোজীর *Poverty and un-British rule in British India* এবং দত্ত মহাশয়ের *The Economic History of British India* প্রত্যেক ভারত-সভ্যদের অবশ্যপাঠ্য। অথচ এই সকল গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। অবকাশের অভাবেও অনেক এই অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন না। বাহারা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের অসুবিধা আরও অধিক। এই সকল শ্রেণীর পাঠকেরা বাহাতে পূর্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ের সারমর্ম অবগত হইতে পারেন তদ্ব্যতীত এই ক্ষুদ্র পুস্তক সর্বজন-বোধগম্য ভাষায় রচিত হইল। বিবিধ সরকারি রিপোর্ট ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।”—ভূমিকা।

৮। কুবকের সর্ববিশাশ। ইং ১৯০৪ (২৮ জুলাই)। পৃ. ২৭-১৪৪।

“দেশের কথা হইতে পুনর্মুদ্রিত।”

৯। শিবাজীর দীক্ষা। ভাদ্র ১৩১১ (৭-৯-১৯০৪)। পৃ. ৪০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-দ্বিখিত ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতা সহ। শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত।

১০। শিবাজী। বৈশাখ ১৩১৩ (১-৬-১৯০৬)। পৃ. ২৪।

শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে...বিনামূল্যে বিতরিত।

১১। তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। আশ্বিন ১৩১৫ (৪-১০-১৯০৮)। পৃ. ২১০ + ৪০।

১২। বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ? আশ্বিন ১৩১৭ (১০-১০-১৯১০)। পৃ. ১২৪।

‘বংসোন্মুখ জাতি’র প্রতিবাদ। “কলিকাতা জাতীয় বিজ্ঞান-সম্মেলনের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত।”

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাঃ—মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় সখারামের এমন অনেক প্রবন্ধ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যেগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছিঃ

১২৯৮, আশ্বিন-পৌষ ‘বেদবাস’ কৃষ্ণাবতার কোন যুগে?

১২৯৯, বৈশাখ ‘সাহিত্য’ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

ভাদ্র-আশ্বিন ‘প্রতিভা’ কৃষ্ণবৎ বধ(সমালোচনা);

অগ্র., চৈত্র ‘সাহিত্য’ শাস্ত্রের অন্তর্গত অত্ববাদ

অগ্র., চৈত্র ‘সাহিত্য’ পেশওয়ে বালাজী

কান্তম এ বিখ্যাত

কান্তম এ রাজীরাও ও মন্ডানী

১৩০০, আষাঢ়, ভাদ্র ‘সাহিত্য’ হৃদয়পতি মহাত্মা শিবাজী

ভাদ্র ‘ভারতী’ সুবিধিয়ারে আবির্ভাব-

পৌষ ‘সাহিত্য’ কাল

মাঘ ‘ভারতী’ প্রাচীন মহারাষ্ট্র

শকরাচার্য

১৩০১, বৈশাখ, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ‘সাহিত্য’ মহারাষ্ট্র সাহিত্য

জ্যৈষ্ঠ ‘সাহিত্য’ পৃষ্ঠার আলোচনা

মাঘ ‘ধরঙ্গী’ মহুপ্রোক্ত সনাতন ধর্ম

কান্তম এ শিবাজীর স্বার্থভাণ

১৩০২, বৈশাখ ‘সাহিত্য’ মহারাষ্ট্র সাহিত্য

আশ্বিন-আশ্বিন এ নারায়ণ ঠাকুরের বধ

আশ্বিন এ আক্‌বল খাঁর অভিযান

অগ্রহায়ণ ‘ভারতী’ বৈদিক আলোচনা

১৩০৩, আষাঢ় ‘ভারতী’ সুরাপান (শাজীর

বিচার)

১৩০৪, বৈশাখ	'ভারতী'	বালুকেস্বর (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিলাতযাত্রা) মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ	১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	পৃথ্বীরাজ-রাসো
			আষাঢ়	ঐ	ভারতে শক-শোণিত
			মাঘ	ঐ	মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত
পৌষ	'সাহিত্য'		রচনার নিদর্শন		

১৩০৫, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,	ভাদ্র, চৈত্র	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
অগ্র, ফাল্গুন	'সাহিত্য'	সমর্থ রামদাস বাবী	
১৩০৬, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	ভাদ্র	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য
আশ্বিন	'ভারতী'	কিষ্কিন্ধ্যা	
চৈত্র	'সাহিত্য'	আওরঙ্গজেবের বন্দনাব	
	'ভারতী'	বদীর শকোৎপত্তি রহস্য	
১৩০৭, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্রীয় জাতির	
আষাঢ়	'সাহিত্য-সংহিতা'	অভ্যুদয়	
শ্রাবণ	ঐ	ভাস্করাচার্য	
		ব্রহ্মদেশের আচার	
		ব্যবহার	
কার্তিক	'সাহিত্য'	ঐতিহাসিক কাগজপত্র	
মাঘ	'ভারতী'	ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক	
১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ	'প্রদীপ'	ঐকজাতির বাবীনতা-	
ভাদ্র, পৌষ	'সাহিত্য-সংহিতা'	লাভ	
		আজ্ঞা সাহিত্য	
১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ	'বদন্দর্শন'	ভারতে আন্দালী	
শ্রাবণ-অগ্র	'প্রদীপ'	ভূষণ	
১৩১২, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	শিবাজী প্রসঙ্গ	
১৩১৩, ভাদ্র	'সাহিত্য'	বোপদেবের পরিচয়	
১৩১৫, ফাল্গুন	'সাহিত্য'	রাজা কুফরাও	
		খটাওকর	
চৈত্র	'বদন্দর্শন'	প্রাচীন ভারতে ইতিহাস	
		ও ঐতিহাসিক	
১৩১৬, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	মালবে মহারাষ্ট্র	
		অধিকার	
ফাল্গুন	'বদন্দর্শন'	ওজরাধে মহারাষ্ট্র	
		অধিকার	
১৩১৭, বৈশাখ-আষাঢ়	'বদন্দর্শন'	ভারতীয় ইতিহাসের	
		উপকরণ	

প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা, প্রসাদগুণ ইত্যাদি যে সকল গুণে রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়, সখারামের রচনাবলীতে তাহা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দেশের কথা' হইতে উদ্ধৃত রচনাংশসমূহে ইহার প্রমাণ মিলিবে—

"ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বুটশ শাসনের—ইংরাজের প্রমত্ত পাশ্চাত্য-শিকার প্রবানভম্ম অক্ষল। এরূপ অমুঠান এদেশে পূর্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা যে-দেশের সামগ্রী, সেই দেশের রীতির অহুকরণে ইহাকে পরিচালিত করিতে না পারিলে, অক্ষলভাভের সম্ভাবনা স্পষ্টপর্দাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আন্ত অক্ষল-লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, তত্ত্বাত্ত প্রজা-সমাজের নিয়ন্তর পর্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে। আমাদের দেশে অজ্ঞতার দ্বন্দ্ব অনেকই এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্যন্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই কমতাপ্রিয় যথেষ্টাচার রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদের যুক্তিমেরতা বা সংখ্যার অন্ততা অস্বত্ব করিয়া প্রতীকারে উদ্যত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয় না, আন্দোলনের অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

যদি জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহায়ত্ব প্রকাশ পায়, এতদুপলক্ষে যদি সমগ্র সমাজ আহুল আলোড়িত হয়, রাজপুরুষেরা যদি বুঝিতে পারেন যে, মহাসমিতির প্রার্থনাসমূহ সমগ্র দেশবাসীর অহু-মোদিত, সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে ভারতীয় সমাজের অন্ততল পর্যন্ত মর্ষবেদনায় বিকোচিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাহার কংগ্রেসের প্রার্থনার কর্ণপাত করিতে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এই কারণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অকিঞ্চিৎকৃত ও অশিক্ষিত জন্মসাবরণকে বুঝাইয়া দিয়া, দেশের বর্জনশীল হুংসারিচ্ছের কথা, আমাদের শোচনীয় অযোগ্যতার কথা তাহাদিগের হৃদয়দয় করা ইয়া দিয়া, কংগ্রেসের প্রতি সকলের অহুরাগ-বর্জনপূর্বক এই শুভাশুভানের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর অবশ্যকর্তব্য। দেশের প্রত্যেক সুসন্তানের এই কর্তব্যভার কৃজে গ্রহণ করা উচিত। ১৮৩০ সালের পার্লামেন্টের প্রণীত বিধানে ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাপত্রে আমরা যে সকল অধিকার পাইয়াছি, যে-অংশসমূহের আধার

পাইয়াছি, তাহা দেশের অনেকেই সম্যক্ অবগত নহেন। তাই আমরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া অবনতির ধরপ্রোভে ভাসিয়া যাইতেছি। বৃষ্টি ভারতের সকল প্রজা, অতি নিম্ন-শ্রেণীর প্রজা পর্যন্ত, যাহাতে আমাদের রাজদত্ত প্রকৃত অধিকারের বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে, সে অধিকারের পূর্ণফললাভের জন্য যাহাতে সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠে, দেশের প্রত্যেক সুসজ্জনকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞতার জন্যই এত দিন আমাদের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে। বর্গীয় বহুমুখবাহু বহুদিন পূর্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

‘সুশিক্ষিত বাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাদ্যাদীর সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে নী-মিলিলে তাহা ঘটবে না, সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।……বাদ্যাদীর হয় কোটি ষাট লক্ষ (একশ প্রায় ৮ লক্ষ) লোকের দ্বারা যে কোনও কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাদ্যাদীর লোক-শিক্ষা নাই। [বঙ্গদর্শন ১২৮৫ সাল অগ্রহায়ণ সংখ্যা—“লোক-শিক্ষা” প্রবন্ধ]

‘এক্ষণে বাহাতে সে অজ্ঞতার নিরাকরণ হয়, দেশের আপামর জনসাধারণে আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে, জাতীয় মহাসমিতির সহিত প্রতিকার-প্রার্থনায় সকলে সাগ্রহে যোগদান করিতে পারে, রাজপুরুষেরা যাহাতে মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারী বলিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। এই সুমহান পবিত্র কর্তব্য-সাধনে উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া যাহারা জাতীয় মহাসমিতির প্রতি উপহাস বা উপেক্ষা-প্রকাশ করিবেন, তাহারা দেশের শত্রু ও সমাজের শত্রু বলিয়া চিরকাল সুখী-সমাজের ঘৃণার ভাজন হইবেন।

‘বুদ্ধ ভারতহিতৈষী হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতির বিগত অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবাসীকে যে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—

‘তোমরা কি মুহুর্তের জন্য মনে কল্পনা কর যে, কোন রাজ-শক্তি স্বতঃপ্রসূত হইয়া তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিবেন? যে সকল অধিকার তোমাদিগকে প্রদান করিলে শক্তিপ্রিয় শাসকদিগের শক্তির হ্রাস ঘটে, ন্যায়ের হিসাবে তোমাদের সহস্র দাবী থাকিলেও গবর্ণমেন্ট কি সে সমুদায় সহজে ছাড়িবেন? যে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে রাজার স্বদেশবাসিগণ উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন, রাজা কি তাহা বিনা বাক্য-ব্যয়ে ত্যাগ করিবেন? তোমরা কি স্বপ্নেও ভাব যে, ঔদার্যনৈতিক অথবা যে কোন গবর্ণমেন্টই হউক, শুদ্ধ ন্যায়ের

অনুরোধে তোমাদিগের দুঃখ-বিমোচনে অগ্রসর হইবেন? এরূপ অলীক চিন্তার আশ্রয়-বন্ধন করিও না। ভারতে এবং বিলাতে অবিশ্রান্ত ভাবে, অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে আন্দোলন করিতে হইবে, বিলাতেই আন্দোলনের রাজ্য অধিক হওয়া আবশ্যক। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিতা গবর্ণ-মেন্টকে যদি ক্রমাগত উত্ত্যক্ত ও আলাতন করিতে পার, তবেই তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে আমার অবিবাস নাই, কিন্তু তোমরা যে রূপ ঔদার্যনৈতিক সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। আন্দোলনে একাগ্রতা অবলম্বন কর, তোমাদিগের অর্থ, সামর্থ্য সমস্তই জাতীয় উন্নতিকল্পে উৎসর্গ কর, ভারতে সংবৎসর-ব্যাপী মহাসমিতির আন্দোলন প্রদীপ্ত রাখ, বিলাতের প্রত্যেক নগর ও গ্রাম তোমাদিগের প্রার্থনার ধ্বনিতে যুগ্মিত কর, কর্তৃপক্ষের জডকীতে ভীত হইও না, প্রাণপণে ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এই ধারণা অঙ্কিত কর যে, তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহা কিছুতেই ছাড়িবে না, তোমাদিগের প্রার্থনার পূরণ না হইলে, ইংরাজ জাতিকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম দিবে না। জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন কর যে, তোমরা সমস্ত, অর্থ, এমন কি জীবন পর্যন্ত পাত করিয়া সঙ্গ্রহ-সাধনে প্রসূত হইয়াছ, কার্য দ্বারা আপনাদিগের ঘোষণা প্রতিপাদন কর। দেখিবে, ক্রীড়াগমে তুম্বারের ন্যায় তোমাদিগের উন্নতি-পথের কণ্টক তিরোহিত হইয়াছে।

‘ভারতের সংবাদপত্রসমূহকে প্রায়ই গবর্ণমেন্টের দোষ কীর্তন করিতে দেখি। গবর্ণমেন্টের অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু তোমাদিগের নিজের দোষই সর্বাধিক অধিক। তোমরা নিজে কর্তব্য পালন করিবে না, স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে সর্বস্ব-পণে আত্ম-বিসর্জন করিবে না, শুদ্ধ গবর্ণ-মেন্টের দোষ দিলে চলিবে কেমন? তোমাদিগের উন্নতি তোমাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্র-দায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদে বিন্মত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভগ্নামি ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাজ্যদিন জুলিয়া এক মনে, এক ব্যামে উদ্বেগ-সংসারণ-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত, অক্লান্ত ও অসন্ধিচিত্তে কার্যে ব্যাপৃত হও, দেখিবে, আশু তোমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে। নচেৎ এক্ষণে তোমাদিগের আন্দোলনে যে রূপ একা-গ্রতা ও আন্তরিকতার অভাব প্রবল রহিয়াছে, তাহা থাকিলে কিছুই লাভ হইবে না।

‘আবার বলি, গবর্ণমেন্টকে গালাগালি দিলে, তোমাদের নিজের দোষ চাপা পড়িবে না, অন্যান্য দেশের গবর্ণমেন্টের ন্যায় তোমাদের গবর্ণমেন্টও আপনাকে সর্ববিষয়ে সমধিক জ্ঞানবান ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। ইহারা ইচ্ছা করিয়া কখনই তোমাদিগকে এক ভিলার্ড অধিকার প্রদান করিবেন না, বরং উত্তরোত্তর প্রবৃত্ত অধিকারের সন্ধোচে প্রদান পাইবেন। যে দেশে প্রজাশক্তি হীনবল, সে দেশে রাজশক্তির

এইরূপ ব্যবহার ঘটাই থাকে। রাজশক্তির একুপ অত্যাচার-নিবারণে প্রজাসাধারণের সর্বদা চেষ্টা করা সর্বভোভাবে বিবেচ্য। প্রজারা যদি রাজ্যের অবিচার বন্ধ করিতে না পারে, তবে সে দোষ প্রজাদিগের—রাজ্যের নহে, এক কথা স্মরণ রাখিও।

“ফলতঃ আমরা অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মিঃ ডিগবী মহোদয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীর দৈনিক আয় গড়ে জন প্রতি দুই আনা ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উহা ছয় পয়সায়

পরিণত হয়। অধুনা উহা দৈনিক তিন পয়সায় দাঁড়াইয়াছে। অল্পপূর্বের সম্মানদিগের আর কি ছরবস্থা হইতে পারে! অতএব আর উদাস্ত প্রকাশের সময় নাই। ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষদিগের কুটিলতায় আমরা যে বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সময় থাকিতে বন্ধ-পরিকর ভাবে চেষ্টা না করিলে পরে অমৃতপ্ত হইতে হইবে। মিঃ ডিগবী বলিয়াছেন,—

“India is not far from collapse.” (‘দেশের কথা,’ পৃ. ২৮৫-২১)

নন্দদাতীরের ওঙ্কার মাক্কাতা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

গ্রীষ্মের এক মনোরম প্রভাতে আমরা নন্দদাতীরে অবস্থিত “ওঙ্কার মাক্কাতা” দেখতে রওনা হলাম। ঝাঙোয়া আসার পর থেকে স্থানীয় ঔষ্টব্য স্থানসমূহের অল্পসন্ধান করে জানতে পেরেছিলাম যে, প্রায় ৪৮ মাইল দূরবর্তী ওঙ্কার মাক্কাতা অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সেই থেকে সেখানকার মন্দিরের বিষয়ে হিন্দী ও ইংরেজী পুস্তক হতে নানা কাহিনী ও জনপ্রবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। এক দিন সে স্থান প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ এসে গেল। একজন উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী আমাদের অতিথি হয়েছিলেন, তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নন্দদাতীরস্থ এই প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করা। তাঁরই জন্তে হঠাৎ এই যাত্রার আয়োজন হ’ল।

নন্দদাতীরে যে সকল দ্রব-মন্দির ও তীর্থস্থান আছে, তার মধ্যে মধ্য-প্রদেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত এই “ওঙ্কার মাক্কাতা” এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বহুদূর থেকে যাত্রীরা তীর্থদর্শন করতে আসে। তারা ঝাঙোয়া থেকে ইন্দোর লাইন ধরে ট্রেনে পরবর্তী স্টেশন মোরটকাতে নামে ও সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে, বাসে বা পদযাত্রাে মাক্কাতা পৌঁছে। তা ছাড়া ঝাঙোয়া থেকে সারাদিন মোটর সার্ভিসও চলে। আমরা একথানা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করেছিলাম।

আমাদের মোটর নিয়ে যে শহরের জনাকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে বাইরের নির্জন পথ ধরল। হ’বারে কোথাও গ্রাম্য শব্দশ্রবণ, কোথাও বা পতিত অহর্যর জমি, মাঝে মাঝে হ’একটা ছোট পাহাড়ী বর্ণা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলছিল। রাস্তার পাশে একটা-দুটো গ্রাম, তারপর খানিকটা জঙ্গল, আবার গ্রাম-আবার জঙ্গল—এভাবে সমস্ত পথটা মাক্কাতা পর্যন্ত চলে গেছে। কোন কোন গ্রাম বেশ জীলম্পন্ন, আবার কোন কোন গ্রাম নিভাঙাই ছোট। তবে একটা বিশেষ লক্ষ্য

করলাম। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সামনেই বেশ বড় বাঁধানো এক একটা ইঁদারা আছে, আর তার পারে রংবেরঙের বাঁধা-পরা বহু গ্রাম্য বধূর ভিড়। তাদের কেউ বা বসে বসে পিতলের ষড়াক্ষে ঘলে সোনার মত বকুবকু করে তুলছে, কেউ-বা দড়ি দিয়ে টেনে ইঁদারা থেকে জল তুলছে, কেউ-বা মাথায় জলতরা ধাপর নিয়ে মল-গতিতে ঘরে ফিরে চলছে। স্বামীজী শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে বললেন, পথে পূর্ণকুম্ভা নারী দেখলে যাত্রা শুভ হয়।

এক এক স্থানে মোটর ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। কোথাও বা এক দিকে গভীর বাদ, অন্য দিকে নিবিড় অরণ্য, কোথাও বা অরণ্যের স্থানে স্থানে পলাশ-ফুল ফুটে বন আলো করে আছে। কোথাও বা শালের বড় বড় পাতা শুকিয়ে হাওয়ায় ধবে এগার-ওগার বিছিয়ে আছে, দেবদারু, ধরের প্রভৃতি নানা জঙ্গলী গাছের কঁকে কঁকে প্রভাত-স্বর্ষ্যের সোনালী আলো ঝলমল করছে। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিন ঘণ্টা চলে আমরা মাক্কাতা পৌঁছলাম। স্বামীজী দূর থেকে সর্বপ্রথম সেই মন্দিরের চূড়া দেখতে পেয়ে আমাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ও আমাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন। আমরা আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে সেখানে পড়লাম। উপর থেকে ঝাপে ঝাপে উপলম্বয় সোপান ও রাস্তা অতিক্রম করে বহু নীচে নামলাম। হ’বারে ছোট ছোট দোকান; তাতে হালুইকররা বসে ফুলুবি, কিলিপি, জুটি এসব ভেঙ্গে শু পীড়িত করেছে।

যাত্রীরা স্নান করে শুচিসত্ত্ব হয়ে পূজা সমাপন করে ফের-বার পথে এসব দিয়ে জলযোগ করে, কাজেই দোকানীদের এতে প্রচুর অর্থাগম হয়।

নীচে নেমে নন্দদাতীরে দাঁড়িয়ে সামনের দৃশ্য দেখে চোখ

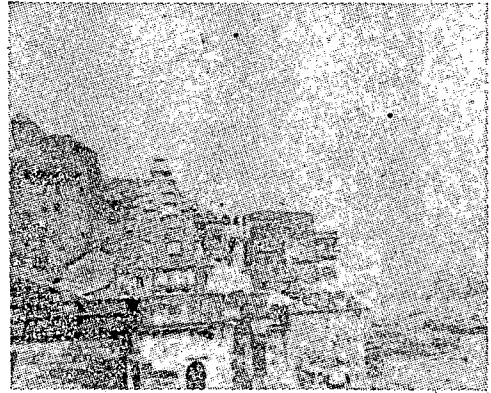
জড়িয়ে গেল। কি মনোরম এই পার্বত্য স্থান। নিয়ে স্বচ্ছ-সলিলা নন্দদা বয়ে যাচ্ছে, অপর পাড়ে “ওঙ্কার মাছাতা”র মন্দির-শিখর অতি উচ্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর দু’দিক থেকে গাচ সবুজ পাথরের গাঁথুনি উঠেছে। সারি সারি দোকানপাট, ঘর-ছন্ন মন্দির স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে ছবির মত সাজানো আছে, আর পাশে দাঁড়িয়ে মাছাতার রাজপ্রাসাদ। সরু পাথরের রাস্তা একে-বেকে উপরে উঠে গেছে। নন্দদাতীরে পাহাড়ের উপর সে সফীর্ণ রাস্তা, আর চুনকাম করা সাদা বাতীগুলি অতি সুদৃশ্য দেখাচ্ছিল।

ভারতের পুণ্যভোরা নদীগুলির মধ্যে এই নন্দদা একটি। সাধারণতঃ যাত্রীরা উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর মাছাতা সঙ্কে অবিকল্পিত সচেতন হইলেও মধ্যপ্রদেশে নন্দদাকে অতি পবিত্র মনে করা হয়। কিংবদন্তী আছে যে, নন্দদা গঙ্গার চরেও পবিত্র, এমন কি গঙ্গাও বৎসরে একবার কৃষ্ণবর্ণ গাভীর মুষ্টিতে এসে নন্দদায় অবগাহন করে পাপক্ষালন করেন ও শুদ্ধ হয়ে খেতবর্ণ ধারণ করে স্বস্থানে ফিরে যান। এরূপ বলা হয়, গঙ্গাস্নানে যে পাপ নাশ হয়ে থাকে নন্দদা-দর্শনেই সেই পাপ দূর হয়ে যায়।

নন্দদা ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে, তার উৎপত্তি ও বিলয় সহজেই লোকের দৃষ্টিগোচর হয়, সে কারণে নন্দদার তীর্থযাত্রীরা শুধু নন্দদায় অবগাহন করেই সন্তুষ্ট হয় না, কেহ কেহ নন্দদাকে পরিষ্কারও করে। তারা এই পুণ্যভোরা নদীর উৎপত্তি-স্থান অমর কটক থেকে বিলয়স্থল ভরোচ পর্যন্ত এবং পুনরায় ভরোচ থেকে অমরকটক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে ও মনে করে এরূপ প্রদক্ষিণ দ্বারা শ্রেষ্ঠফল লাভ হয়। সাধারণতঃ নদীর উৎপত্তি-স্থল অতি দুর্গম। সুদূর হিমালয়ের মধ্যে গঙ্গাযমুনার উৎপত্তি-স্থলের সন্ধান কম জোকেই রাখে। কিন্তু দেশের মধ্যবর্তীস্থলে যে সকল নদীর উৎপত্তি, তাদের উৎপত্তিস্থল সাধারণ লোকেরা শুধু যে খুঁজে বের করেছে তা নয় যেহান থেকে নদীর ধারা আরম্ভ হয়েছে, সেটিকে চিহ্নিত করে আশপাশে মন্দির তৈরি করে তাকে তীর্থস্থলে পরিণত করেছে।

এই নন্দদা রেবা রাজ্যস্থ সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর শিখর অমর-কটক থেকে নির্গত হয়ে মধ্যভারত ও বোম্বাই প্রদেশের ভিতর দিয়ে আট শত মাইল প্রবাহিত হয়ে আরবসাগর-সংলগ্ন কাশে উপসাগরে পতিত হয়েছে। নন্দদা অমরকটক-শিখরের যে স্থান থেকে অবরোধন করেছে সেই স্থানটিকে লোকেরা নন্দদাকুণ্ড নাম দিয়েছে এবং তার পাশে কয়েকটি মন্দিরও তৈরি করে রেখেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে নদীটি দু’ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এক ভাগ অমরকটক থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, লোকেরা তার নাম “কপিলধারা” দিয়েছে। জনশ্রুতি, এখানে মন্দিরে যে পদচিহ্ন দেখা যায় তা কপিলযুনির। সেখান থেকে নদীটি বহু দূর পর্যন্ত জলদীর্ণ স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলপুত্র নগরের উপকণ্ঠে এসে এক অপূর্ণ দৃশ্য রচনা করেছে। প্রায়

ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে জলধারা নিয়ে পতিত হয়ে একটি মনোরম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, তার নাম “ধূমধারা”। তার পর নন্দদা দু’ মাইল পর্যন্ত মন্দির-প্রান্তরের ভিতর দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে। সে স্থানটিকে “মার্কেল রকস্” বলা হয়। এর



নন্দদাতীরে ওঙ্কারের মন্দির

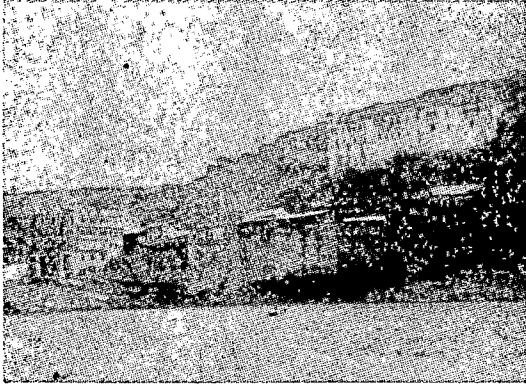
দৃশ্য অতি মনোরম। দেশ-বিদেশের বহু লোক এই মার্কেল রকস্ দেখতে যায়। জ্যোৎস্না রাতে এই স্থানের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। নন্দদার প্রসার সেখানে মাত্র বিশ গজ; সেখান থেকে নির্গত হয়ে নন্দদা সাতপুরা ও বিদ্যাপর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিকে উর্বরা জমিতে পরিণত করে দুই শত মাইল প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে এসেছে যেখানে সাতপুরা পর্বত ও বিদ্যা পর্বতের ব্যবধান অতি সামান্য।

এক স্থানে নদীটি প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে পতিত হয়ে দুইটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, তার একটি মাছাতারে ও অল্পট পুণ্যশাভে। নন্দদা মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে যতদূর প্রবাহিত হয়েছে, ততদূর পর্যন্ত তার তলদেশ প্রান্তরময়। মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে নদীটি ইন্দোর রাজ্য ও মধ্যভারতের ভিতর দিয়ে এক শত মাইল পথ অতিক্রম করেছে। নন্দদাতীরে হোলকার বংশের রাজধানী প্রাচীন নগর “মণ্ডলেখর” অবস্থিত। সেখানে রাণী অহল্যাবাই বহু মন্দির, স্নানের ঘাট ইত্যাদি তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। অহল্যাবাইয়ের সমাধি মঠও সেখানে আছে।

গঙ্গাতীরে যেরূপ বড় বড় শহর আছে, নন্দদাতীরে তদুৎকৃষ্ট বিশেষ কিছু নেই, সেকারণে নন্দদার জল স্বচ্ছ ও নিরুদ। ঐশ্যকালে নন্দদা বহু দূর অবধি শুকিয়ে যাওয়ার দরুণ অপরি-সর হয়ে যায়, বড় বড় বালুচড়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু বর্ষায় পর্বত-চড়া থেকে জলপ্রবাহ স্বর্ণ মেঘে আসে; তখন নদীটি বিপুল জলোচ্ছ্বাসে ফুল প্রাণিত করে প্রবাহিত হয়।

অমরকটকের নন্দদাকুণ্ডের কিছুদূরে একটি দেবালয় আছে, তার নাম “নন্দদামাইকা মন্দির”, এবং তার কিছুদূরেই আর একটি শিবমন্দির আছে। প্রতি-বৎসর হাজার হাজার যাত্রী

শিবরাত্রির সময় নর্ষদাকূণ্ডে স্নান করে এই শিবমন্দিরে পুজো দিতে আসে। নর্ষদা সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে যে, শিবের তেজ থেকে নর্ষদার উৎপত্তি, তাই নর্ষদা শিবকণ্ঠ। সে কারণে নর্ষদাকূণ্ডে স্নান করে শিবলিঙ্গকে বিদ্যপূজা দিয়ে যে পুজো করবে, শিবের বরে তারই মুক্তিলাভ হবে।



নর্ষদাতীরে সিদ্ধনাথের মন্দির

লোকেরা বলে যে, সময় সময় এই কূণ্ডের জল হুবে পরিণত হয় এবং কূণ্ডের মধ্যস্থিত যেসব প্রস্তরখণ্ড আছে, সেসব শিব-লিঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

নর্ষদা নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, কলিযুগের পূর্বে মৈকাল দেব নামে এক জন রাজা ছিলেন। তাঁর নর্ষদা নামী একটি অপরূপ স্ত্রী ছিল। তাঁর হেমলা ও বিমলা বলে দুটি সহচরী ছিল। নর্ষদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বড় অহুরাগিণী ছিলেন, তাই মৈকাল দেবকন্যার জন্য একটি অতি রমণীয় উদ্যান তৈরি করিয়ে দেন।

নর্ষদা অধিকাংশ সময়ই সহচরীদের সঙ্গে উদ্যানে থাকতে ভালবাসতেন। এক দিন নর্ষদা তাঁর দুই সহচরীসহ উদ্যানে বসে আছেন, এমন সময় সম্রাসী-রাজপুত্র এক রাজপুত্র, নাম “সোনাকান্ত”, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নর্ষদার প্রণয়াকাজী ছিলেন এবং সে উদ্যানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। রাজকন্যা রাজপুত্রকে পতিরূপে বরণ করতে স্বীকৃত হলেন এবং সেই অঙ্গীকারের সাক্ষ্যরূপ হুঁজুনে মিলে একটি অতি সুরভিপূস্পরূপ রোপণ করলেন। তারা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হলেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি চিরকাল অহুরক্ত থাকবেন—নর্ষদা বা রাজপুত্র অন্য কারও সঙ্গে পরিণয়হুঁজে আবদ্ধ হবেন না। আর তাদের সেই অস্বাভাবিক প্রেম এই সুগন্ধি পুষ্পের মতই জগতে গৌরব বিতরণ করবে।

এর পর অনেক দিন চলে গেল, অপর এক রাজপুত্র নর্ষদার পানিপ্রার্থী হয়ে এলেন। রাজা তাকেই রাজকন্যার পাজিরূপে

মনোনীত করলেন, শুভবিবাহের দিন বার্ষ্য হ’ল। তিনি কন্যার মতামত গ্রহণ আবশ্যক বলে মনে করলেন না। রাজ্যে খুব উৎসবের ঘট। সেদিন তরুণী নর্ষদার শুভ বিবাহ, এমন সময় সম্রাসী-রাজপুত্র সে রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তিনি বিবাহ-সাজে সজ্জিতা নর্ষদাকে ও তাঁর দুই সখীকে শাপ দিয়ে নদীতে পরিণত করে দিলেন। নর্ষদা নদী ও অমরকটকের নিকটবর্তী দুটি উপনদী নাকি রাজকন্যা ও তাঁর সখী হুঁজুনের রূপান্তর।

অমরকটকের এক মাইল উত্তরে নর্ষদার একটি শাখা চলে গেছে, তাঁর নাম “সনৈমরা”। “সনৈমরা” একটি দর্শনীয় স্থান। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। এই নদীর অনতিদূরে একটি উদ্যান আছে, সেই উদ্যানে উপরোক্ত কাহিনীতে বর্ণিত রাজকন্যা নর্ষদার উদ্যান বলা হয়। এই উদ্যানেই নর্ষদা ও সম্রাসী-রাজপুত্র সুগন্ধি পুষ্পরূপ রোপণ করেছিলেন। এখনও সে জাতীয় বৃক্ষ সেই উদ্যানে জন্মে থাকে এবং চকুগীড়া উপশমের জন্য তাঁর পুষ্প ব্যবহৃত হয়। এই উদ্যানের কিছু দূরেই চার-পাঁচ মাইল ব্যাপী বিল আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে পৌরাণিক কাহিনীতে ‘উক্ত নর্ষদার পিতা রাজা মৈকাল দেবের রাজপ্রাসাদ এখনও সেই বিলের অপর পারে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। কিন্তু কোন দর্শকই নাকি সে স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারে নি।

আমরা নর্ষদার বহু শ্রীতল জলে আনন্দে স্নান করতে লাগলাম। নদীর পূণ্যসলিলে অবগাহনে শরীর ত্রিধ হয়ে গেল। নর্ষদার জল হুঁহাতে নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল ‘যেন বিবাহসাজে সজ্জিতা তরুণী নর্ষদার মূর্তি। মনে হ’ল এইরূপ কাহিনীর স্রষ্টাদের কল্পনা কি মনোহর, কি বিচিত্র।

স্থানান্তে আমরা ওয়ারেখরের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলাম। নদীর এপার থেকে ওপারে বেঁধে নৌকায় বসে পার হয়ে ওয়ারেখরের মন্দিরে যেতে হয়। এই মন্দিরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপে বহু মন্দির আছে। এগুলো শিবপুরী, ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরী এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিনপুরীর চারদিকে নদীটি এ ভাবে প্রবাহিত হয়েছে, দেখে মনে হয় যেন ও এই অক্ষরের আকারে তা বিছিয়ে আছে, তাই মাক্কাভার অপর নাম “ওয়ার মাক্কাভা”। দ্বীপটি প্রায় দেড় মাইল লম্বা, দ্বীপের মধ্যবর্তী সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী একটি উপত্যকা দ্বারা হুঁভাগে বিভক্ত। পূর্ব দিকে নদী থেকে ৪০০।৫০০ ফুট উঁচু পর্বতমালা উঠে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সমতল ভূমিতে মিশে গেছে। মাক্কাভার বিপরীত দিকে নর্ষদার দক্ষিণ ভীর পর্বত-সমাকীর্ণ। হুঁপর্বতের ভিতর দিয়ে গভীরসলিলা নর্ষদা বয়ে গেছে। নদীর বহু জলে নানা আকারের ছোট বড় বহু মাছ জলে ভাসছে। এগুলো

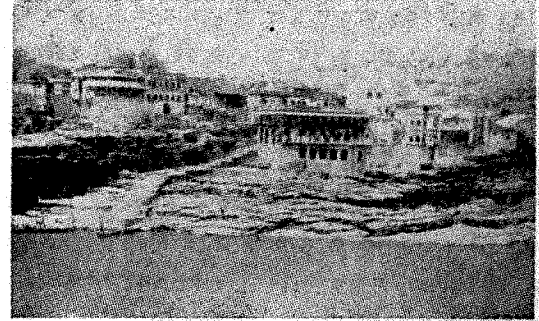
মন্দিরের আশ্রিত, এদের বরা নিষেধ। সব রাজাই ছোলা ভাঙা মটর ভাঙা কিনে মের, আর জলে একটা হুটো করে হাততে থাকে। শত শত মাছ মাথা বের করে তা খেতে আসে।* যুক্তগতিতে এরা জলের উপর চলাকেরা করে, মাছ কত করে না। কি সুল্লর মর্দনায় বন্ধ জলে মাছের এই খেলা।

মর্দনার দক্ষিণ তীরে অমরেশ্বরের মন্দির। এ মন্দিরে ইন্দোর রাজ্য হতে আগত বাইশ জন ব্রাহ্মণ দৈনিক শিবপূজা করেন। ত্রিশ হাজার শিবলিঙ্গ মাটি দিয়ে তৈরি করে পূজা অর্থে নদীতে বিসর্জন করা ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজ। অমরেশ্বরের মন্দিরের কাছেই বীরেশ্বরের মন্দির—তার প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর। বিষ্ণুপুরীতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত। ত্রিভুজাভেদমন্দির ছািপের সমুদয় মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটি পাহাড়ের পূর্ব কিনারে অবস্থিত। খুব উঁচু উঁচু ভিত্তি মন্দিরটিকে সুদূর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সেই ভিত্তিসমূহে ও মন্দিরের উঁচু ভিত্তিগোলে বহু হস্তীমূর্তি খোদিত আছে। হস্তী মূর্তিগুলি বড় সুন্দর ভাবে খোদাই করা। অবিকাংশই যুদ্ধের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, কোন কোনটার পায়ের নীচে শারিত্ত মহামূর্তি। মন্দির জীর্ণশায় পতিত হওয়ার কতকগুলি মূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়। তার মধ্যে ছয়টি নাগপুর মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের দু'পাশে আঠারটি ভিত্তি এবং তার উপর ছাদ। এই ভিত্তিগুলি প্রায় চৌক ফুট উঁচু এবং সেগুলোতে বহু কারুকার্য আছে। মন্দিরটি অতর অবস্থার খুব সুদৃশ্য ও বিরাট ছিল সন্দেহ নেই। বর্তমানে মন্দিরের ছাদ ও চূড়া ধ্বংস পেছে এবং অনেক ভিত্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে। ইংরেজ সরকার তার কতক জীর্ণসংকার করে উপরে সাধারণ একটি ছাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

ছািপের উত্তর কোণে একটি পুরানো মন্দির আছে, তার নাম সোমনাথ। মন্দিরে কালো পাথরে তৈরি সুবিশাল এক শিবলিঙ্গ, বাইরেও টিক এই রকম মন্দির বা ছািপের কৃষ্ণমূর্তি। কিংবদন্তী আছে যে এই বিরাট শিবলিঙ্গ খেত পাথরে তৈরি ছিল। দর্শক পরক্ষণে কি হবে জানবার ইচ্ছে নিয়ে মূর্তির বিকে চাইলেই নাকি তা তার চোখের সামনে প্রতিভাসিত হয়ে উঠত। একবার বাদশা আগরজকেব এই মন্দিরে আসেন ও এই কথা শুনে মূর্তির বিকে ঢেয়ে নিজে ভবিষ্যৎ জন্মে কি হবে তা দেখতে চান। তিনি তখন দেখতে পেলেন এক শূকর-মূর্তি। রাগে অন্ধ হয়ে তিনি সেই বিরাট মহাকালের মূর্তিতে আগুন লাগিয়ে দেন। সেই থেকেই ঐ খেতমূর্তি কৃষ্ণমূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

এ সব মন্দির ঘেঁষে আমরা সেই বিখ্যাত তৈরবলিলা দেখতে গেলাম, যেখানে বহু পূর্বে মরবলি হ'ত। বিষ্ণুমন্দির

ও জৈন মন্দিরের মধ্যে একটি দালা আছে, তার নাম রাবণ-দালা। সেই দালার তীরে এক বিরাট রাক্ষুসে মূর্তি আছে। মূর্তিটির দশটি বাহু, লম্বায় মূর্তিটি দশ ফুট। কেউ কেউ বলেন, ইহা রামের শত্রু রাবণের মূর্তি, আবার কারও কারও মতে



মর্দনা মধ্যস্থ ছািপের ওপর মন্দিরসমূহ

তৈরবের পত্নী মহাকালীর এই মূর্তি। মূর্তির গলদেশে সাপের হার, হাতে তলোয়ার ও মরুস্ত। মূর্তির শূন্য উদর মহাব্যরক্তে পূর্ণ হবার জন্য উন্মত। আর সেই উদরের উপর বড় এক যুদ্ধমূর্তি।

মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেই বিখ্যাত পর্কতশূল বা খেত তৈরবের ভক্তরা লাড়িয়ে নীচে শিলাময় পাথরদেশে পড়ে আত্মাহুতি দিয়ে রাক্ষুসী মহাকালীর রক্তপিপাসা নিবৃত্ত করত। ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বখশ ভরত সিং মাকাতা দখল করেন তখন সেই মহাকালী ও তৈরবের পূজারী রাজ এক জনই ছিলেন। অন্যেরা তবে পূজার কার্যে অঙ্গসহ হ'ত না। সেই পূজারীর নাম ছিল গৌসাই দরিদ্রনাথ। কঠোর তপস্তাবলে দরিদ্রনাথ সেই মহাকালীকে 'ছুনিয়' এক গল্পের আবহ করে রাবেন ও সেখানে অপর এক কালীমূর্তি স্থাপন করে পূজা করতে থাকেন। দরিদ্রনাথের পূজার কালী সত্যই হন। তৈরবের কাছে দরিদ্রনাথ মানত করেন ও প্রতিজ্ঞা দেন— প্রতি বৎসর মধ্যে মধ্যে তিনি মরবলির ব্যবস্থা করে তৈরব ও মহাকালীর রক্তপিপাসার উপশম করবেন কিন্তু তার সর্ব এই যে, তাঁরা রাজাদের প্রাণ হরণ করে বখশ খুসী নিষেধের উদরপূর্তি করতে পারবেন না।

এই মরবলিপ্রথা বখশ প্রচলিত ছিল তখন মাকাতা ছািপ গোয়ালিরের সিহিরায় অবস্থিত ছিল, সুতরাং তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তারা এসব বিষয়ে হতক্ষেপ করতে পারতেন না। ১৮২৪ সনে একজন ইংরেজ শাসনকর্তা এই 'তৈরব-শিলা'র মরবলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি :

"যেদিন মরবলির উৎসব হবে, সেদিন আমি খুব ভোরে উঠে তৈরবের প্রতীক মূর্তির কাছে গেলাম। সে একটা কালো

প্রভরবেগে, তাতে লাল সিঁচুর মাঝানো আছে। যে তরু তৈরবের নিকট আগ্নবলি দিবে, সে এই শিলার উপর লাকিয়ে পড়ত। কিছুকণ পর বামদাও বাজিরে শোভাযাত্রা করে সেই তরু এল, যে আঁহ নিজের প্রাণ বলি দিবে। সে পাথরের প্রতীকের কাছে কিপ্রণমে উপস্থিত হ'ল, তার চোখে যুখে একটি হরত উল্লাস। আমি কিছু পরে তার কাছে গেলাম, ও তাকে অনেক বুঝিয়ে এই জীবন প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। বাকী জীবন আমি তার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করব এই প্রতিজ্ঞা দিলাম। আমার সঙ্গে নৌকা ছিল, আমি তাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনতার নিকট থেকে দূরে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সব অমুদোষ বার্য হ'ল, সে দুচতার সহিত উত্তর দিলে যে, তৈরবের বলি বন্ধ করা মনুষ্যজতির অতীত। দেখলাম এই অবস্থার বলপ্রয়োগ ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। সে যখন তৈরববুড়ির সন্মুখীন হ'ল, তখন তার ভিতরের কুসংস্কারগুলি প্রবল শক্তি ধারণ করল। চারদিক থেকে বর্ষার জনতা টেঁচিরে আর হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে লাগল। সে তার দুগ্ধ অদভদ্রী দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে আমার কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে। সে তৈরবের সামনে নারকেল উৎসর্গ করে মৈবেদ্য দিলে। তার পর একটি শুকনো লাউ বের করে তা থেকে তার সজ্জিত অর্ধ সেবামকার পুকারিগীর সামনে টেলে দিল। পুকারিগী একটি নারকেলের মালার কারণ এনে তাকে পান করতে দিল। কারণ দেবার পূর্বে নিজের হেলেকে ধানিকটা বাইরে দেখাল যে তাতে বিবাক্ত পদার্থ কিছু নেই। কারণের কতকটা বুড়ির উপর টেলে দিয়ে তরুটি কারণ পান করলে।

“পুকারিগী তরুকে তার হাতের রূপোর আংটিগুলি বুলে দিয়ে দিতে বললে। আংটি বুলে দেবার সময় লোকটির চোখে যুখে পতীর হৈর্য দেখা গেল। সে তার প্রথম আংটি বুলে নিজের যুখে রেখে দিল, তার পর একে একে হ'হাতের আংটিগুলি বুলে পুকারিগীকে দিলে। জনতার মধ্য থেকে একটি লোককে বুঁজে বের করে বললে তার শেষ আংটি তাকে দেওয়া হোক; এই লোকটি তার সঙ্গে উজ্জিন্নী থেকে এসেছিল। এই সময় দেখা গেল অনেক লোক তাদের হাতের রূপার বাজু, গয়না, সুপারি ইত্যাদি তার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চায়। সে হির চিতে তাদের জিনিষগুলি নিয়ে যুখে রেখে আবার তাদের ফিরিয়ে দিল। অবশেষে পুকারিগী তাকে একটি পান ধেতে দিলে। সে পান নিয়ে দৃঢ় পাককেপে স্থান ত্যাগ করলে।

“চারদিকে জনতা হাততালি দিয়ে উঠল। সে যখন পাহাড়ে চড়ছিল, তখন মাকে মাঝে লতাগুণ্ডে তার দেহ ঢেকে রাখিল। অবশেষে সে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ার দাঁড়াল।

যদিও সে যুড়ার যুখোমুখি দণ্ডারমান, তবু তার দেহ ঝুঁ, ভদি বীরহব্যাক্ত। কিছু সময় সে আবেগের সহিত হ'বাহ হোলাতে লাগল, মনে হ'ল মজ্জ উচ্চারণ করছে, তার পর হির হ'ল। হ'হাত ছোঁড় করে জনতাকে বিদায় অভিমদন জানাল। তার পর তার কোমরের বলি থেকে নারকেল, আয়না, ছুরি, চূণ ইত্যাদি ছুঁড়ে কেলতে লাগল। কয়েক যুহুর্ডের জন্য একটি পিছু হটল, পরযুহুর্ডেই একাত পৌকষের সহিত পাহাড়ের উপর থেকে ঝাপ দিল। সামনে পা রেখে সে প্রচণ্ড বেগে নীচে পড়তে লাগল এবং অর্ধ পথে একটি টিলার চূড়ার লেগে মাথা নীচু হয়ে পা উণ্টে গেল এবং সেই অবস্থায় ১০ ফুট নীচে পড়ে তৎক্ষণাৎ সে যুড়্যুকে আলিঙ্গন করলে। এই যুড়কের ভিতর বা বিশ্বাস ও শৌর্য ছিল, তা এ ভাবে ধ্বংস না করে সে তা কপত্তের বড় কাছে লাগাতে পারত।”

কাপ্তিক মাসের প্রথম ভাগে মাদ্রাসার বাৎসরিক মেলা বসত। প্রায় ২৫,৩০ হাজার রাজী জমায়েৎ হ'ত। আর এই সময়ই হ'ত নরবলির আয়োজন। ১৮২৪ সালের পর যখন মাদ্রাসা ইংরেজের অধীনে আসে তখন নরবলি বন্ধ হয়। সাধারণতঃ এই মেলার সমস্ত নবর মাদ্রাসার রাজারই প্রাপ্য, কিন্তু পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী ভীল-পরিবারের লোকেরা চার দিন মেলার নবর বা পায়ে লুঠ করে নিত। এর কলে প্রকাণ্ডে রাজার ভৃত্যদের ও ভীলদের মধ্যে খুব যুদ্ধ লেগে যেত। মেলার বহু পূর্বে থেকেই হ'দল যুড়ের জন্য তৈরি হতে থাকত। উত্তরণের লোকেরাই নাকি বেশ লম্বা লম্বা নব রাখত যাতে নবর ও মৈবেত কেড়ে নিতে পারে।

মাদ্রাসা এখন একটি ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা হাজারও নয়, কিন্তু এককালে ইহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। বর্তমান মাদ্রাসার রাজা জাতে “ভীলালা।” এই রাজারা চৌহান রাজপুত ভরত সিংহের বংশধর, ইমি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভীল সর্দারের কবল থেকে মাদ্রাসা অধিকার করেন। দরিদ্রনাথ গৌসাইনের আমন্ত্রণে চৌহান ভরত সিংহ এসে নাথু ভীলকে হত্যা করেন ও তার কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজপুতরা ক্রমে রক্ত-পিপাসু তৈরবের ভক্ত এই পার্শ্ব্য জাতির সঙ্গে বিবাহ-সংঘ হাপন করেন। তাদের বংশধররাই বর্তমানে ভীলালা নামে পরিচিত। ভীল বাঁটি পার্শ্ব্য জাতি, কিন্তু ভীলালা হচ্ছে রাজপুত ও পার্শ্ব্য ভীলের সংমিশ্রণ।

সমুদ্র মন্দির দর্শন করে মহাদেবের পূজা দিয়ে আমরা নীচে যেয়ে এলাম এবং নদীর বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। অপরাহ্ন স্বর্ষের রক্তিম আভার নীল আকাশের সঙ্গে সঙ্গে নরদ্বার নীল জলও রাজা হয়ে উঠল। আমরা যুদ্ধ হয়ে এই স্থানের অপরাপ শোভা দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হ'ল তারতের দেবস্থানগুলো কি সুন্দর প্রাকৃতিক পরি-

বেশের মধ্যে অবস্থিত। এক দিকে হাফাতার মসজিদ-হস্তনির্মিত নামা কারুকার্যপূর্ণ মন্দির, দেবমূর্তি, সৌর বেলুপ মনে বিশ্বাসের সৃষ্টি করে, অপর দিকে ভেদমি প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি—গহন কাছার ধূসর পর্বতমালা, সলিলবিপুল শ্রোতবিনী মনকে মুগ্ধ করে দেয়।

হেলোমেয়েরা মাছের জন্ত ছোলা মটির ভাঙা কিলে মিটেছিল, ওগুলো মুঠো মুঠো ভরে জলে ছুঁতে লাগল। বাম্বীজীও শিশুদের একজন হয়ে গেলেন, তিনিও পরমানন্দে মিছের খাবার থেকে ইকরো ইকরো করে মাছগুলোকে খাওয়াতে লাগলেন। দল বেঁধে সারি সারি ছোট বড় নামা আকারের মাছ জলের উপর মাথা তুলে ওগুলো বেতে এল। মাঝে মাঝে হ'একটা মাছ জলের উপর তেলে ডিগবাজী বেঁধে নীচে তুলিয়ে যেতে লাগল। দিনান্তের আভার তাদের আশগুলো রূপার মত রিকমিক করে উঠছিল। শিশুরা মাছদের নামা রকম খাবার দিয়ে ও তাদের খেলা দেখে বিশেষ কৌতুক ও তৃপ্তি বোধ করলে। একদল ডুবরী হেলোমেয়ে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। তাদের বিচিত্র বেশভূষা ও কুচকুচে কালো দেহের সবল গঠন দেখে মনে হ'ল, এরা বোধ হয় ভৈরব

শিলার যে পাহাড়ী ভীলরা আত্মবিসর্জন মিত তাদেরই বন্ধুতি। তারা গ্রাম্য হিন্দীতে আমাদের বলতে লাগল, "তোমরা জলে পরমা ছুঁতে দাও, আমরা তুলে আনব।" আমরা কৌতুহলী হয়ে পরমা নদীতে ছুঁতে কেলতে লাগলাম। আন্ডর্যের বিঘর, ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব রেখে সে পরমাগুলো বুকে বের করে আনতে লাগল। মরীর বহু জল এদের দৌরাছো ভীরের কাছে খোলা হয়ে উঠল। মরীতীরে বেশ খামিককণ বিশ্রাম করে আমরা খাণ্ডোরা-ফিরবার উত্তোপ করলাম।

আবার সেই পাহাড়ী রাতার গাড়ী চলতে শুরু করল। গাড়ীর দোলার রাত শরীয়ে ভজা আসতে লাগল। আর সেই ভজাভিত্তি চোখে চিহ্নের মত তেলে উঠল—মর্দনাতীরে সু-উচ্চ ওঝারেরের মন্দির, বজ্জলিলা শ্রোতবিনী মর্দনা, সেই বিতীমিকামর ভৈরব শিলা, এমনি আরও কত বিচিত্র ছবি। মন বিশ্বাসবিষ্ট হয়ে ধূসরধূসর পূর্বের কোন্ এক অজানা রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। হঠাৎ ঝাঁহুনি বেয়ে ভজা ছুটে গেল, কেপে দেখলাম খাণ্ডোরা পৌছে গেছি। বর রাজ্য ছেড়ে বাতব জগতে এসে পৌছলাম।

আশা

শ্রীআর্য্য চক্রবর্তী

সবন আকাশ নীল অঙ্গন মোহ
গোবুলি লগ্নে রাজির সমারোহ,
শব্দ-আকুল হংসবলাকা চলে
ক্রান্ত পাখা মেলে দখিন বিলের জলে,
ব্যর্থ রজনী, বক্যা প্রতিশ্রুতি,
নেতারের সুরে সঙ্করণ বিশ্বতি।

মেঘ উত্তর কাল চৈত্রের পথে,
হুণিশ করে কুচুড়ার শাখা,
বিহ্বল-কশা ভীকু ধরণীর হুখে,

চোখের দৃষ্টি কালো পর্দার ঢাকা;
উৎসুক চোখে কোনো বাধা নাহি বোকে,
বলমেহর দৃষ্টি কুহার খোঁজে।

জলন্তরক রিমিবিমি বর্ষণে
পাগল হাওয়ার এলোমেলো আদ্যপোনা,
রাত শরমে দীর্ঘ প্রহর গোনা:
ভাল বগ্নের প্রাতি রিত মনে।
মিশ্র আধারে রূপালি বটী বাবে
আলস উবা নৃতন আলোর সাথে।

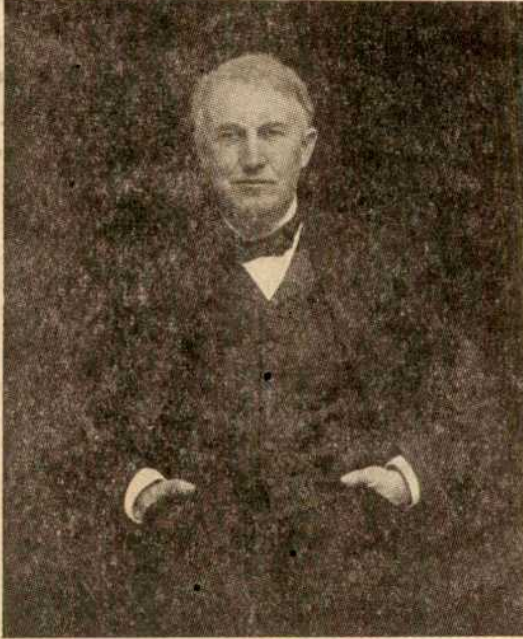


টমাস আলভা এডিসন ও চলচ্চিত্র শিল্প

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বর্তমান যুগে যে সকল আবিষ্কার দ্বারা মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, যেগুলির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা বিদ্যমান, তন্মধ্যে অনেকগুলিরই আবিষ্কার বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)। চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্ভাবনের জন্ত সত্য জগৎ বিশেষ ভাবে তাঁহারই নিকট ঋণী।

১৮৮৯ সনে এডিসন কর্তৃক প্রথম তাঁহার চলমান ফ্রিমাশিল চিত্র এবং তাঁহার অনতিকাল পরে ‘এডিসন কিনেটো কোপ’ উদ্ভাবিত হয়। প্রথম চলচ্চিত্র ষ্টুডিওও এডিসনেরই আবিষ্কার এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এডিসন কোম্পানীর জন্ত ফিল্ম চলচ্চিত্র তুলিবার উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।



টমাস আলভা এডিসন

তাঁহার অজ্ঞাত যে-সমস্ত আবিষ্কার দ্বারা পরোক্ষভাবে ফিল্ম-শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে সেগুলি হইতেছে—টেলিফোনে বার্তা প্রেরণাদির পদ্ধতির উন্নতিবিধান, কনোগ্রাফ, ইন্সকেনডিসেন্ট ল্যাম্প (ভাষার প্রদীপ), ইলেকট্রিক ডায়নামো, কিনেটোগ্রাফিক ক্যামেরা এবং চলচ্চিত্রের ক্যামেরার জন্ত কটোগ্রাফিক ফিল্ম।

প্রথম দশ বৎসর চলচ্চিত্রে কেবলমাত্র ৫০ ফুট দীর্ঘ ফিল্ম-স্ক্রো বিভিন্ন প্রকারের ফ্রিমাশিল এবং স্থানীয় সাময়িক ঘটনাদি প্রদর্শিত হইত। পরে, এডিসন কোম্পানির উদ্যোগে প্রযোজিত “দি লাইফ অব এন আমেরিকান ক্যারাম্যান” (একজন আমেরিকান ক্যারাম্যানের জীবন) এবং “দি ট্রেন

রবারি” (ট্রেনে ডাকাতি) এই দুইটি ছবির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীমূলক চিত্রের প্রবর্তন হয়।

১৯০৯ সালে চলচ্চিত্রের ডিরেক্টরের অগ্রণী ডেভিড মার্ক গ্রিকিং প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূলের সত্বংসরবাণী চমৎকার আলো এবং প্রীতিকর আবহাওয়ায়ুক্ত পরিবেশে ফিল্ম চলচ্চিত্র তুলিবার উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানিসহ ভ্রমণ গমন করেন। সেখানে হলিউড এবং ইহার পারিপার্শ্বিকে এই নুতন আর্টের মাধ্যমে একটি বিশিষ্ট মার্কিন শিল্প ক্রমে বিকাশলাভ করিতে থাকে।

১৯২৭ সন পর্যন্ত চলচ্চিত্র ছিল শুভমাত্র মুক ছায়াচিত্র। কিন্তু অবশেষে টেলিফোন এবং বেতারের বাক্যালাপ ও কণ-



শব্দবাহী মলসম্বিত এডিসন “পিপহোল” কিনেটোকোপ যন্ত্র নাদির যে সমস্ত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে চলচ্চিত্র শিল্পেও সেগুলির প্রবর্তন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইল। ১৯২৭ সনে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র “জাপ সিদ্ধার” নির্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক, ডিরেক্টর, অভিনেতা সকলেই স্ব স্ব মূল টেকনিক বা কলা-কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সত্বে সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং বিস্ময়কর ক্রান্ততার সহিত ইহাতে সাফল্যলাভ করিলেন। অচিরেই সংলাপ সঙ্গীত এবং শব্দের “একেই” চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এমনি ভাবে মৌন ছবিগুলি যুগের হইয়া উঠিল—চলমান মুক ছায়াচিত্র পরিণত হইল সবাক চলচ্চিত্রে।

বাংলা ও বাঙালী

ক্রীশ্ণলীলচন্দ্র ঘোষ

৬

অর্থনৈতিক বিপর্যয় হেতু পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই আজ বেকারসমস্তা ও তাহার ফলে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা জাতীয় জীবনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেই কুটীরশিল্পের প্রসার কমিয়াছে ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের অবনতিও ঘটিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, যন্ত্র-চালিত বৃহৎ কারখানায় কুটীরশিল্প অপেক্ষা অল্পসংখ্যক শিল্পী অধিক উৎপাদন করে। এদেশে যখন বৃহৎ শিল্প ও কারখানা বিশেষ ছিল না তখন দেশের জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা এখনকার অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কারণ সেই সময় দেশের আর্থিক কাঠামো গ্রাম্য অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন সাধারণতঃ গ্রাম ছাড়িয়া অর্থ উপার্জনের জন্য লোকদের শহরে ও শিল্পক্ষেত্রে যাইতে হইত না।

আমাদের দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রায় শতকরা নব্বই জন কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে। যে কয় মাস কৃষিক্ষেত্রে কোন কাজ থাকে না সেই কয় মাস বিনা উপার্জনে তাহাদের দিন কাটাইতে হয় অথবা উপার্জনের জন্য গ্রাম ছাড়িয়া অন্তঃস্থ যাইতে হয়। সেই সময় নিজ গ্রামে থাকিয়া তাহাদের জীবিকা উপার্জনের পক্ষে একমাত্র কুটীরশিল্পই বিশেষ উপযোগী।

সর্বপ্রথম জাপানই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে কুটীরশিল্পের উপকারিতা বুঝিয়া একই সঙ্গে তাহার বৃহৎ কারখানাগুলি ও কুটীরশিল্পসমূহ হৃদয়ভাবে সুপরি-কল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিয়াছিল। জাপানে প্রস্তুত প্রত্যেক জিনিসই বিশ্বের বাজারে এত সস্তাদরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে যে, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের, যুক্তরাজ্যের, এমন কি জার্মানীর বড় বড় শিল্পপতিরও ব্যবসাক্ষেত্রে জাপানের প্রতিযোগিতা কি করিয়া বোধ করিবে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাপান তাহার বৃহত্তর কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের অনেক অংশ নিকটবর্তী গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে বৈজ্ঞানিক শক্তি পরিচালিত কুটীরশিল্পগুলির দ্বারা অল্পখরচায় তৈরি করাইয়া দেশ-বিদেশে সস্তাদরে মাল চালান দিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে তাহার বৃহৎ ও কুটীরশিল্পে মিশ্র উৎপাদনের দ্বারা প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্যের সকল দেশের বাজারে নানারূপ রেশম, দেশলাই, ঘড়ি এবং সাবান ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। এই ভাবে জাপান তাহার জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো যে কিরূপ সুরল করিয়াছিল তাহা সুবিদিত। সকল ক্ষেত্রেই যে উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন খরচ কমাইতে পারা যায় তাহা ঠিক নয়। ইহার দ্বারা অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়।

আমি পূর্বে প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্যের শ্রমিক সরকার নিজেদের দেশের বেকারসমস্তা ঐরূপ মিশ্র উৎপাদনের দ্বারাই সমাধান করিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছিলেন। বাহাদুরের ধারণা যে যাত্রিক শিল্পের প্রসার ভিন্ন এবং যাত্রিক যুগে কুটীরশিল্পের দ্বারা দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারা যাইবে না তাহাদের অবগতির জন্য আমি ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার হইতে প্রকাশিত ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে শ্রমিক সংখ্যাচুপাতসহ মোট কারখানার সংখ্যা নিম্নে দিলাম :

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ শ্রমিক ও কারখানার সংখ্যা :

শ্রমিক সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা	মোট শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)
১১-২৪	১৫,৬৪০	২৬২
২৫-৪৯	১২,৭০০	৪৪৬
৫০-৯৯	৯,৭১০	৬৮৩
১০০-২৪৯	৭,৮১০	১২১২
২৫০-৪৯৯	২,৯২০	১০১৭
৫০০-৯৯৯	১৩৩০	৯০৮
১০০০-১৯৯৯	৫৯০	৮০১
২০০০-৪৯৯৯	২৫০	৭৪০
৫০০০ ও তদুর্ধ্ব	৬০	৪০৮

বৃহৎ ও ছোট ছোট কুটীরশিল্পগুলি হইতে মিশ্র উৎপাদনের দ্বারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রিক শিল্পোন্নত দেশ যে কতটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা উপরে প্রদত্ত বিবরণী হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রদেশের ছোট ছোট শহরগুলির ও পল্লী-অঞ্চলের উন্নতি-সাধন না হইলে কুটীরশিল্পের প্রসার সম্ভবপর নয়; কারণ ঐ সব স্থানের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অগ্রগত স্ব-স্ববিধার ব্যবস্থা না থাকিলে যথেষ্টসংখ্যক শিল্পী পাওয়া কঠিন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি নতুন

শহর (Township) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহা যে কতটা সাফল্য অর্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ আছে। আশঙ্কা হয় বহু অর্থব্যয়ে তৈরি ঐ সব পরিকল্পনার খণ্ডাগুলি শেষ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরেই থাকিয়া যাইবে। মাত্র কয়েকটি আদর্শ নগর তৈরি করিলে প্রদেশের জনসাধারণের কি বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য ইহার দ্বারা পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাাদের কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি বাস্তুহারাাদের মধ্যে জমি বিতরণের বিষয়ে কয়েকটি কথা প্রদেশ-সরকারের গোচরে আনিতেছি। উনিয়াছি যে, অনেক শক্তিশালী ধনী ও মতলব-বাজ লোক বাস্তুহারাাদের নামে ভাল ভাল জমি প্রদেশ-সরকার কর্তৃক বন্টন করাইয়া পরে কিছু বেশী মূল্য দিয়া তাহাদের নিকট হইতে স্বনামে ও বেনামে হস্তান্তর করিয়া লইয়াছেন ও এখনও লইবার চেষ্টা করিতেছেন। একথা সত্য হউক আর নাই হউক, প্রদেশ-সরকার কর্তৃক বাস্তুহারাাদের মধ্যে জমি বন্টনের এইরূপ একটা সত্ত্ব থাকা উচিত যে, বাহাদের মধ্যে ঐ সমস্ত জমি বন্টন করা হইবে তাহারা অন্ততঃ ১০ বৎসরের পূর্বে উহা দান, বিক্রয়, লীজ, বন্ধক দেওয়া অথবা কোনরূপ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। যদি তাহা করেন তাহা হইলে ঐ সমস্ত জমি উচিত মূল্যে প্রদেশ-সরকারকেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ সত্ত্ব থাকিলে মতলববাজ লোকেরা সহজে বাস্তুহারা-দিগকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া সরকার কর্তৃক বন্টিত জমি লইতে পারিবেন না।

যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ড তুলিয়া দিয়া কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এক্ট-এর অধিকরণে একটি 'কর্যাল ইমপ্রুভমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট এক্ট' পাশ করেন তাহা হইলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। বেরূপ ভাবে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এই শহরের উন্নতি-সাধন করিয়াছে এবং শহরটিকে চতুর্দিকে বেরূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত করিতেছে ঠিক সেইভাবেই ঐ এক্ট অনুসারে প্রত্যেক জেলাকে অথবা কতিপয় জেলা একত্র করিয়া কয়েকটি ট্রাষ্ট গঠনের ব্যবস্থা করিলে প্রদেশের ছোট বড় শহরগুলির ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দ্রুত উন্নতিবিধান করিতে পারা যাইবে।

প্রদেশ-সরকারকে প্রস্তাবিত ট্রাষ্টগুলির জন্য কোনও ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট যে প্রকারে তাহার ব্যয়ভার বহন করে ঠিক সেই পদ্ধতিতে ঐ ট্রাষ্টগুলির আয়ের ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা

বাইতে পারে। জেলার ছোট-বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া পল্লী-উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক শক্তির ব্যবস্থা, নলকূপ স্থাপন, রাস্তা তৈরি, মধ্যবিত্তদের বাসের উপযোগী গৃহ-নির্মাণ, পুষ্করিণীর পুকোঁদার, অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার ইত্যাদি নানারূপ জনহিতকর কার্য ঐ ট্রাষ্ট অথবা ট্রাষ্ট-গুলির কর্মসূচী হইবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেয়ারম্যান, ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার অথবা ডেপুটি ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, স্থানীয় বার এসোসিয়েশন-গুলির সভাপতি, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ হইতে মনোনীত কয়েকজন সভ্য, সরকার হইতে মনোনীত কতিপয় সভ্য এবং বেসরকারী অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের লইয়া ঐ সকল ট্রাষ্ট গঠন করিলে ভাল হয়। ট্রাষ্টের ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী হওয়া দরকার বাহাতে সকল রকম জনহিতকর কার্য ট্রাষ্টগুলি সম্পন্ন করিতে পারে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের বেরূপ 'ডিবেঞ্চার' দ্বারা টাকা সংগ্রহের ক্ষমতা আছে সেইরূপ ক্ষমতা প্রস্তাবিত ট্রাষ্টগুলির থাকা দরকার। ইহার দ্বারা স্থানীয় পুঁজিপতিরা ঐ সমস্ত ডিবেঞ্চার খরিদ করিয়া একই সঙ্গে ট্রাষ্টগুলির আর্থিক অবস্থা দৃঢ় করিতে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে স্থখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ট্রাষ্টের সভ্য-সংখ্যা যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত, নচেৎ ঐগুলি কাঙ্ক্ষকরী হইবে না, কেবল রাজনৈতিক দলাদলির মঞ্চ হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রস্তাবিত ট্রাষ্ট ছাড়া, আসানসোলের খনি অঞ্চলে বেরূপ হেলথ বোর্ড আছে ও যেভাবে উহা কার্য করিতেছে, বেঙ্গল মাইনিং স্টেটলুমেন্ট এক্টের অধিকরণে প্রত্যেক জেলায় সেইরূপ একটি করিয়া হেলথ বোর্ড স্থাপন করা আবশ্যক। যদি জেলাগুলিতে কর্যাল ইমপ্রুভমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট এবং হেলথ বোর্ডগুলি পাশাপাশি কার্য করে তাহা হইলে অচিরেই প্রদেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সকল দিক হইতে উন্নত হইবে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এবং কলিকাতা করপোরেশন যেমন একই স্থানে নিজ নিজ কার্য চালাইতেছে, ঠিক সেইভাবেই স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ঐ সমস্ত ট্রাষ্টের সঙ্গে কার্য করিতে থাকিবে। অনেকে মনে করেন উপস্থিত জেলা-বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ডগুলির দ্বারা জনসাধারণের অর্থক্ষয় ছাড়া বিশেষ কিছুই উপকার হইতেছে না।

প্রদেশ-সরকার যদি ঐ সঙ্গে তাহাদের স্টেট ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মারফত পল্লী অঞ্চলে সাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলার সদর রাস্তাগুলিতে (Trunk

Road) বৈদ্যুতিক ট্রামওয়ের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে প্রদেশের বহু স্থানে অনেক ছোট বড় শহর আপন হইতেই গড়িয়া উঠিবে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য একটি গরীব ব্যাঙ্কের কথা আমি পূর্বে প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। উহা নিউ সাউথ ওয়েলস্ সরকার-পরিচালিত রুর্যাল ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্ নামে পরিচিত (ভুলক্রমে নিউজিল্যান্ড বলিয়া লেখা হইয়াছিল)। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইহার প্রধান আপিস এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে ইহার অনেকগুলি শাখা আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ ৬১৬ লক্ষ পাউণ্ডের উপর অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি টাকা এবং সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪৬ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৬ কোটি টাকা মোটামুটি ছিল। ঐ ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে। একটি সরকারী এজেন্সি বিভাগ ও অপরটি সাধারণ ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার উপর শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় ও ব্যাঙ্ক লগ্নি টাকার উপর শতকরা ৪ হইতে ৪৬ টাকা হারে সুদ গ্রহণ করে। কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নের উপযোগী পুস্তক প্রকাশ, ফিল্ম তৈরি, পড়িবার জন্য বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। তিন জন কমিশনার ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করেন ও অনেকগুলি অভিজ্ঞ ভ্যালুয়ার আছেন যাহারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের জমি উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ দিবার পূর্বে আবেদনকারীর কার্যদক্ষতা বিচার এবং জমি ও সম্পত্তির মূল্য ইত্যাদি স্থির করিয়া দেন। ব্যাঙ্ক ছোট ছোট চাষের উপযুক্ত জমি একত্রীকরণের জন্য (amalgamation of small holdings) টাকা ধার দিয়া কৃষকদের বিশেষ উৎসাহপ্রদান করিয়া থাকেন। গরু, মেঘ, মুরগী ইত্যাদি নানাপ্রকারের পশুপালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করাইয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের বৃত্তি দিয়া ব্যাঙ্ক বিদেশে পাঠায় এবং তাহাদের ঐসব বিষয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার ও বহু জনহিতকর কার্যের নিমিত্ত সাধারণকে ঋণ দিবার ব্যবস্থাও এই ব্যাঙ্কে আছে। ব্যাঙ্ক নিজ কর্মচারীদের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে ও ঐজন্য বৃত্তি দিয়া থাকে। ইহার সরকারী বিভাগের টাকা প্রদেশ-সরকার দিয়া থাকেন, সাধারণ বিভাগের টাকার জন্য সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করা হয়। প্রদেশের ও প্রদেশবাসীর যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় এবং মহাজনের নিকট হইতে কৃষিজীবী, শিল্পী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের টাকা ধার করিতে না হয় ইহাই ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ-সরকারের সাহায্যে ঐরূপ একটি রুর্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যিক। আমার মনে হয়, যদি ঐ ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের শতকরা ২০ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখিয়া বাকী শতকরা ৮০ টাকার অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৪০ টাকা অংশীদারদের মধ্যে নগদ বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট শতকরা ৪০ টাকার দ্বারা ব্যাঙ্ক অথবা প্রদেশ-সরকার কর্তৃক জমি সংগ্রহ করিয়া প্রতি ছয় মাস অন্তর অথবা প্রতি বৎসর অংশীদারদের মধ্যে ১০ বিঘা, ২৫ বিঘা, ৫০ বিঘা ও ১০০ বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি কিংবা বসতবাটী নির্মাণ করিয়া লটারি দ্বারা পুরস্কার-প্রাপ্তদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার খরিদ করিবার আগ্রহ বেশী হইবে। উক্ত লটারিতে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম উঠিবে তাহাদের নিজ নিজ নির্বাচিত গ্রামে ঐরূপ জমি বিতরণের ও গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা ব্যাঙ্কগুলির করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত 'রুর্যাল ব্যাঙ্ক' বাহাতে যে-কোনও স্মৃতি তহবিল অথবা জনহিতকর ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টীস্বরূপ কার্য করিতে পারে, আইনসঙ্গতভাবে সেইরূপ ক্ষমতা ঐ ব্যাঙ্কের থাকা দরকার। আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় ও ছোট-খাটো স্মৃতি তহবিল এবং জনহিতকর ট্রাষ্ট আছে—ভবিষ্যতে আরও হইতে পারে। যদি ঐ সমস্ত স্মৃতি-তহবিলের এবং ট্রাষ্ট ফণ্ডের টাকায় প্রস্তাবিত রুর্যাল ব্যাঙ্কের অংশ খরিদ করা যায়, অথবা দীর্ঘকাল মেয়াদে কতকাংশ অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় তাহা হইলে স্মৃতিমন্দির, স্মৃতিমূর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ অপেক্ষা ইহাতে দেশের ও দশের অনেক বেশী কল্যাণসাধন হইবে। মনীষী ব্যক্তিগণের স্মৃতিরক্ষার ইহা অপেক্ষা মহৎ উপায় আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভাণ্ডার ও কাঁবগুরু-রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারের পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাদত্ত দানের দ্বারা মঠ ও মন্দির তৈরি করা অপেক্ষা জনহিততর কার্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

“পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অভিন্ন পরিমাণেও কিছু স্বদেশের কৃত উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাট্ট প্রভৃতির তার এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় হুজুর বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাত্তাব ঘটবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠ-মন্দির চলি-

তেছে, এদেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয় স্থান
‘আপনি রচনা করিবে না?’

যদি প্রস্তাবিত ‘কণ্ঠ্যাল ব্যাঙ্কে’র পল্লী উন্নয়ন ফণ্ডে
আর্মীদের সমাজ এরূপ স্বৈচ্ছাদত্ত দানের টাকা জমা দিবার

ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বাংলা ও বাঙালী যথার্থই
রবীন্দ্রনাথের আকাজক্ষা পূর্ণ করিয়া অধিকতর উজ্জ্বলভাবে
তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে পারিবেন।

ভুল

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

শান্তদী অনপূর্ণা সকালবেলা গেছিলেম পাশের বাড়ীতে তাঁর
কুনীদিদির সঙ্গে কোথায় ভাল ভেল পাওয়া যেতে পারে সেই
নিম্নে কথা বলতে, তখন পূজবধু সুষমা রান্নাঘরেই ছিল। কিন্তু
কিছুক্ষণ পরে যখন অপ্রসন্নচিত্তে ফিরে এলেন তখন দেখেন
রান্নাঘরে কেউ নেই, একেবারে খোলা, শুধু একবারে ভাতের
হাঁড়িটি সোঁ-সোঁ করছে। দেখে ত মনটা গেল আরও বিগড়ে।
কথা আরম্ভ হয়েছিল ভেল নিয়ে এবং জিনিষটি পিচ্ছিল বলেই
হোক বা যে কারণেই হোক সেটার মাধ্যমে বাজারের সমস্ত
জিনিষের ভালমন্দ আলোচনা হয়ে গেছে; এবং আজকে
আর কাউকে বলে দিতে হবে না যে জিনিষের ভালমন্দ হুটো
দিক আর মাই, এখন সব মন্দসর্ব্বত্র। বাজারের জিনিষ ত
আছেই—তার উপর ঘরের এই বাহুঘণ্ডলিও...

—বলি ও বোঁ, কাপের মাথা ধেরে বসে আছ নাকি।

এটা অবশ্য অনপূর্ণার চালাকি। প্রথম বারের ভাঙেই
কেউ আর কথা বলে না। কিন্তু উপায় কৈ, যা দরাজ গলা
তাঁর তাতে বাড়ীর লোক দুইয়ের কথা সমস্ত পাড়ার লোক
সুনতে পাবে অথচ মাথা পাওয়ার মত মুখরোচক শব্দটাও
প্রয়োগ করতে হয়।

সুষমা ঘরের ভেতরে এক কোণে তার ছোট কাশ্যবান্টটার
সামনে বসে একটা ছোট কাপড়ে লতাপাতাওয়ালা করেকটি
ফুল তুলছিল। শান্তদীর হাজারে তার দ্রুতচঞ্চল হাত হতে
ক্রেমটি পড়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি ‘মাই মাই’ বলে জিনিষ-
গুলোকে কোমরকমে সামলে রেখে একরকম দৌড়ে বাইরে
এসে শান্তদীর কাছে দাঁড়াল। বয়স তার ষোল-সতেরো
হবে, বয়সের তুলনায় চোখদুখের চেহারা আরও কচি-কচি
মনে হয় এবং চলাকোরা ভাবভঙ্গী থেকে মনে হয় বকুনি ধেতে
সে ভালরকম অভ্যস্ত।

শান্তদী ভেলের ভালমন্দ পরীক্ষা করার মত মুখভঙ্গী করে
ভীক্ষুদৃষ্টিতে অসহ্যতবেশা বধূর আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করতে
করতে বন্ধার দিয়ে ওঠেন—ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

সুষমা স্তোভো আঁচলটি এক হাতে গুহিরে তুলতে তুলতে

ও অত হাতে পাওয়ার একটি বুটিকে লাক্ষীমানার ভঙ্গীতে
জড়িয়ে ধরে অভ্যস্ত সঙ্কুচিতভাবে উত্তর দেয়—না ত।

অনপূর্ণা আরও ঘলে ওঠেন—মা! না! না! খুব কথা
শিখেছ বা হোক। বলি এদিকে ত চোখের মাথা ধেরে
হুটো দরজাই খোলা রেখে বসে আছ, কুকুরে যে সব ধেরে
গেল।

কথা হচ্ছিল রান্নাঘরের মেটে বারান্দায়। একবার
সুষমা ভীষণ বিরক্তভাবে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা
করে কিন্তু অনপূর্ণা এমনভাবে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছেন যে তিনি
একটু সরে না দাঁড়ালে পাওয়ারও যায় না।

অনপূর্ণা সরবার একটুও চেষ্টা না করে বরং সুষমার এই
বিপর্য্য ভাবটা উপভোগ করতে করতে নির্বিকার চিত্তে বললেন,
খাঁক, এখন আর লোককে ভেঙেহুড়ে কাজ দেখাতে হবে না,
খুব হয়েছে। আর না খেলেও, ধেতেই বা কতক্ষণ। আর
ইস্কুলের ভাত কখন হবে শুনি, ওরা কি আজ না ধেরেই যাবে
নাকি?

সুষমা প্রায় অক্ষুটবরে জবাব দেয়—আজ যে রবিবার মা।

অনপূর্ণার আর সঙ্ক হয় না, একেবারে বগদার হয়ে বলে
কলেন—বনিয়া বা হোক তর্ক শিখেছিলে বোঁমা। তাই
হোক, ওই করেই আজ পেট ভরুক।—বলতে বলতে তিনি
রান্নাঘরের দোরগোড়া ছেড়ে শোবার ঘরের বারান্দার দিকে
উঠে যান।

সুষমা এবার অকস্মাৎ অভ্যস্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেবল ঘন
ঘন শান্তদীর গতিপথের দিকে তাকায় আর আঁচলটাকে
এলোমেলোভাবে নিজের হাতের ওপর জড়ায়। কি মারাত্মক
ভুল!

ঠিক তাই হ’ল। শোবার ঘর থেকে যথাসময় ডাক
আসে—বোঁমা এদিকে এস। বরটো এবার কটিন কিন্তু শান্ত,
মনে হয় বক্তা এবার বলবার মত সঠিক কিছু একটা বুঁজে
পেরেছেন।

সুষমা গিরে ঘরে দাঁড়ায়, দেখে শান্তদীর হাতে সেই

ফ্রেমটি। তিনি বার বার করে সেটি ঘুরিয়ে কিরিয়ে দেখছেন, মুখখানা মোটেই প্রসন্ন নয়। সুসমার পদশব্দে মুখ তুলে তিনি তার পানে কিছুক্ষণ অদ্ভুত ভঙ্গিতে চেয়ে রইলেন, তার পরে হঠাৎ একটা জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার মত করে বললেন—আচ্ছা বোমা, বাঙালীরা কার বলতে পার?

এর একমাত্র উত্তর হয়, আপনার—সুতরাং সুসমা কিছুই বলে না।

—বাঙালী আমার। একার নয়, তোমাদের সকলের, কিন্তু বলতে পার আমি একাই বা কেন তোমাদের পেছনে ছুড়ের মত খেটে মরি আর এদিকে তোমরাই বা কেন নবাবের মত ফুল লতা পাতা নিয়ে সময় কাটাও। কেন? জবাব দাও, চুপ করে থেক না।

কিন্তু চুপ করে থাকারটাই ত এর একমাত্র উত্তর, সুতরাং সুসমা নতমুখে চুপ করে থাকে। শুধু এক বার এক মুহূর্তের জন্য সে অত্যন্ত আত্মচোখে দেখে নেয় শাস্ত্রীর হাতে তার অমন পাথের সেলাইটির কি দশা হ'ল।

ওই চোরা চাউনিটুকুই যথেষ্ট। অল্পপূর্ণা ফ্রেমভুক্ত সেলাইটিকে এক হাতে কঠিন পুলিশী ভঙ্গিতে ধরে বললেন—কথা ত এদিকে বার হয় না, কিন্তু কাজের বেলায় হাজার রকমের অকাঙ্ক করতে শিখো। কেন, এইটে দিয়ে কার কতটুকু উপকার হবে তুমি? আর গেরস্তর বাঙালী, এ কি এই রকম বিবিধনা করার জায়গা নাকি। না ছোট্ট মুকুটের মত খেলবারই সময় আছে? তুমি না ঘরের বোঁ, গেরস্ত বাঙালীর ভালমন্দ কিসে হয় সেটুকু বোঝ না?

প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে ফ্রেমটি অল্পপূর্ণার হাতে এক বাপ করে বেশী নিশীড়িত হচ্ছিল, ওদিকে সুসমার অবস্থাও তেমনি। তার কাণ দিয়ে শাস্ত্রীর কথামূল বিশেষ বাচ্ছিল না, সে শুধু সেলাইটির অবস্থা নিয়ে বিভ্রত ছিল। শেষের প্রশ্নে যখন সেটির ওপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়ল তখন সে আর পারল না, এক রকম আতকে উঠে শাস্ত্রীর দিকে ছ' পা এগিয়ে এসে বলে ফেলল—ওটা...ওটা...

হাঁ ওটা তোমার মাথা আর আমার মুখ। যাও আর সং হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, রাত্রা দেখ গিয়ে। আর মনে রাখবে এ সব খেলার সময় তোমার আর নেই। যাও। বলতে বলতে অল্পপূর্ণা নিজেকে সেলাই সমেত জড়পদে নিজের পুঙ্কার ছোট্ট ঘরটিতে চলে গেলেন। সুসমা কিছুক্ষণ পাথর হারে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, সেলাইটি যে চিরদিনের মত তার হাত ছাড়া হয়ে গেল সে বুঝতে পারল, কিন্তু তার অবশ মন শুধু দুটো কথাই বার বার অক্ষুটস্থরে বলতে লাগল—ওটা...ওটা...ওটা...

যার কোন মাথাযুগু সত্যিই নাই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এর বেশী বলাই বা যার কেমন করে। বোঁ হয়ে

শাস্ত্রীকে ত আর বলা যায় না যে ওটা আমার স্বামী অত রুমাল করছিলেন, বিশেষ করে যখন মোটে এক বছর বিয়ে হয়েছিল। সে-ও গেরস্ত বাঙালীর মধ্যে অর্থাৎ যে সব বাঙালীতে এ রকম সৌখীন সেলাইয়ের বিশেষ চর্চা নাই, সেখানে সেলাই হয় কাঁথা থেকে আরম্ভ করে খুব জোর আসন পর্যন্ত, শাস্ত্রীর ভাবার বাতে কারও কোন উপকার হয় সেই রকম। কিন্তু সুসমা বেশ ছোট্ট বয়সেই এই সেলাইটা কোন স্নেহে কার কাছে শিখে ফেলেছিল, কিন্তু সে এমন লাজুক যে বিয়ের পরে পুরো একটা বছর লেগেছিল তার স্বামী শক্তিময়ের এটা আবিষ্কার করতে। তার পরেই তার এই অমুরোব বা আকার ঘাই বর্ল। সুসমা শাস্ত্রীর তারগতিক প্রথম হতেই চিনেছে। কারণ গরীব ঘরের মধ্যে সে এবং বহুনি খেয়েই মানুষ। তাই সেলাইয়ের সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সে অত্যন্ত সন্তর্পণে বার করেছিল এবং একটু একটু করে এই এক সপ্তাহে সে এতটুকু তুলেছে। আর মোটে ছ'দিন, আসছে শনিবার শক্তিময় বাঙালী আসবে...তখন...?

সুসমা ইতিমধ্যে এসে চুপ করে উদুনগোড়ার বসে পড়েছিল, কিন্তু রাত্রার কোন জিনিষ তার চোখেই পড়ছিল না। হঠাৎ কেন্দ্র ভাঙে উৎসর্গে পড়ার শব্দে সে সচকিত হয়ে ওঠে এবং তাত্ত্বিক ভাঙে হতে হাঁড়িতে একটু জল ঢেলে দিয়ে আবার চুপ করে বসে পড়ে। ওঘরে শাস্ত্রীর হাঁড়িটুকুর শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোঁ হয় কোথায় কতটুকু কি ভাবে আছে দেখছেন।

শক্তিময় কাজ করে কলিকাতায়। সাধারণ গরীব গেরস্ত ঘরের ছেলে—কি প্রকার বিজ্ঞা ও চাকুরি সংগ্রহ করতে পারে সেটা সহজেই অনুমের। কলিকাতা হতে এ গ্রামটা মাইল চলিশেরও ওপর, সুতরাং ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা সম্ভব হলেও শক্তিময় পারে না, তার শরীর খুব ভাল নয়। সম্রাতি তার একজন পরিচিত লোক কলিকাতার একটি মিস্ট্রি দোকান করেছে, সেইখানেই সে থাকার একটু জায়গা পেয়েছে। দিনে আপিসে কাজকর্ম আর রাত্রে দোকানের হিসেবপত্র দেখা—এই রকম করে কোন রকমে চলে যায়। বাঙালীতে তার মা, বোঁ ও ছোট্ট দুটি ভাই, দুলে পড়ে। বাঙালীতে তাকে কিছু কিছু পাঠাতেই হয়, অদ্ভুত তাই দুটোর দুলের মাইনে আর মাঝে মাঝে বই টাই এটা সেটা কেনার জন্য কিছু। এই হ'ল সুসমার স্বামী আর এই ঘরের সে বড় বোঁ সুতরাং তাদের ঘরের কাজই হ'ল আলোনা এবং সেটি একমাত্র খাওয়ার সংস্থান করা। কোথায় কতটুকু কি ভাবে আছে সেটি যথেষ্ট ঢেকে গুছিয়ে তোলা।

তবুও মাঝে মাঝে এই অকাঙ্কের দেশা সমস্ত প্রয়োজন-বৃত্তিকে অতিক্রম করে বেগে ওঠে, নইলে শক্তিময় বলবে—

বোঁ, তা হলে কথা রইল ওই রকম একটা ফুল তুলে রাখবে। দেখ ভবন যজ্ঞা, কেমন আমি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব, এ রকম বোঁ কার আছে দেখব ভবন, হ্যাঁ।

সুখমার লারা অন্তর তরে উঠেছিল কিন্তু সেও ছাড়ে নি। কথা ছিলাম গত রবিবার শেষ রাত্রির দিকে বিছানায় শুয়ে। এখুনি শক্তিময় উঠে ষ্টেশনের পথে যখন হবে। সুখমা অনেকখানি সন্ধ্যা চোর করে কাট্টে অশ্রুট বয়ে বলে ফেলল— তুমি আমাকে বোঁ বলবে না বল।

শক্তিময় গর্কো উজ্জ্বলিত হয়ে উঠছিল, হঠাৎ এ কথার একটু বিস্মিত হয়ে কিন্তু ভবুনি ব্যাপারটা বুকে নিয়ে সুখমাকে একেবারে বুকের মাঝে টেনে এনে একটা মজার জিনিস পেরেছে সেই ভাবে হাসতে হাসতে বললে— বাঃ রে তা হলে তুমি কার বোঁ শুনি ?

না...না...তা...ওরা...সুখমা অন্ধকারের মধ্যেও লজ্জার লাল হয়ে ওঠে। সে হয় ত বলতে চায় তার অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে এই নাম ডাকটা শুনেছে এবং সেটা কত ভাল লাগে।

শক্তিময় তাকে আরও মিথিলা ভাবে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলে—না, না, না, এ ছাড়া কি আর কথা শেখনি বোঁ...খুঁড়ি...সুখমা, সুখি আমার সুখি। হ'ল ?

সুখমার জীবনে এই যেন প্রথম নামকরণ হ'ল, সে লজ্জার পালাবার পথ পায় না, স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে অর্ধশ্রুট বয়ে বলে—ছাড়। বাদে, তোমার জিনিসগুলো বেঁধে দিতে হবে না ?

শক্তিময় বাহুবল্লভ একটুও আলগা না করে ছেলেমানুষি চঙে মাথা নেড়ে বলে—কি হবে। আমার জিনিস বাঁধাই আছে।...

এ শনিবার সে বাঙালী আসে মি কিন্তু লিখেছে আসছে শনিবার আসবেই। ভবন ? ভবন সে তাকে কি দিবে ?

তাড়ের সময় হয়ে এল, সুখমা হাঁড়িটা নামাবার উত্তোপ করিতে থাকে। ভিজে ভালভা সমস্ত হাত দুটো তার যন্ত্র-চালিতের মত হাঁড়ির ধারে বলে যায়। কিন্তু হাঁড়ি তার চোখে পড়ে না, ও যেন ক্রমশঃ সেলাইয়ের কাপড়টা। সুখমা অভ্যস্ত অতমমতভাবে হাঁড়িটা যথাহানে নামিয়ে মাড় গালতে বলে যায়।

তুল করেছে তার স্বামী। এরকম বোঁ বয়ে বয়েই আছে, এ নিয়ে গর্ক করার কিছু নাই, শুধু আছে দুর্দলতার লজ্জা। সুখমা কোর করে হাঁড়িটাকে একরকম শক্ত করে জড়িয়ে ধরে।

তার পর হুপুরবেলা। খাওয়ারাওয়ার পাট অনেককণ চুকে গেছে। অন্নপূর্ণা দক্ষিণ দিকের বায়ান্দার মাহুর পেতে কাঁধা জড়িয়ে হুমোছেন, সুখমা শোবার ঘরে ক্যানবাসটির

সামনে ট্রিক সেই কারপাটে বসে চূপচাপ কানমালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে যেখানে ঝাপটা এসে পুঁই-মাচার কাছে মিলে গিয়েছে সেই কোণে অভ্যস্ত লুকানো-সহুচিত ভঙ্গীতে একটি অপরাধিতা লতা তার গুটিকয়েক ফুল নিয়ে ধীরে ধীরে মিথেকে বাইরের আলোর মধ্যে মেলে বরছে, সুখমার দৃষ্টি ট্রিক সেইটির উপর নিবদ্ধ। ও লতাটিকে সে মণ্টুকে দিয়ে ঘোণাড় করে কত যত্নে লাগিয়েছে, কতদিন তার ভয় হয়েছে শান্তকী পুঁইভাটা হিঁড়তে গিয়ে লতাসত্ত্ব টেনে উপড়ে না কেলেন। আজ সেই লতা পাতার পাতার ফুলে ফুলে ভেগে উঠছে, সুখমার বড় প্রিয় ফুল ওটা, কেবল ফুলটা নয়, ওর লতাপাতা সবসত্ত্ব সবটা নিয়ে। সে স্বামীকে একবার সলজ্জ নম্রভাবে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কোন্ ফুল ভাল লাগে ?

সাত দিন আগের সেই রাত্রিশেষ। শক্তিময় একটু ভেবে নিয়ে হেসে বলেছিল—আমি ভাল চিনি না, তোমার যেটা ভাল লাগে সেইটাই। তবে সবচেয়ে ভাল আমার এই লজ্জাবতী লতা...বলতে বলতে নিবিড় আবেগে...

বৌদি ! ও বৌদি ! কোথা হতে ছুটতে ছুটতে এসে মণ্টু পিছন থেকে তার ছোট হাত দুটো দিয়ে সুখমার চোখ দুটো চেপে ধরে এবং নিজের চোখ দুটো যথাসম্ভব বড় বড় করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—জান বৌদি কি এনেছি ? বল দেখি, তবে বুঝি।

কিন্তু সন্ধ্যা সন্ধ্যা হাত দুটো ভিজে মনে হওয়ায় সে চমকে ওঠে এবং বৌদির মুখটা যতটা সম্ভব নিজের দিকে ঘুরিয়ে এনে হঠাৎ চিন্তাগ্রস্ত ভাবে বলে—কাঁদ কেন বৌদি ? কি হয়েছে তোমার ? জ্বর ?

সুখমা ভাঙাভাঙি আঁচলে চোখ দুটো মুছে মণ্টুকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—দূর বোকা, জ্বর হবে কেন। বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, চোখে কি একটা পড়ল এখুনি। আচ্ছা কই কি এমেলিস দেখি ? চকোলেট বুঝি ?

মণ্টু বৌদির কাছে প্রায়ই 'হু'এক পরমা করে ঘোণাড় করে কিন্তু নিত্যন্ত স্বার্থপরতার মত সেটা একা নিজের ভোগে না লাগিয়ে মাঝে মাঝে বৌদিকেও কিছু ভাগ এনে দেয়। সুতরাং এতে মতুন অসুমান করার কিছু নাই।

মণ্টু কিন্তু একটুও দমল না, সন্ধ্যা সন্ধ্যা নিজের প্যাণ্টের পকেটটা চেপে ধরে বলল—হ'ল না। আবার বল।

—তবে বুঝি গাছে ফুল ধরতে লেগেছে ? বলতে বলতে সুখমা অভ্যস্ত স্নেহের সন্ধ্যা তার কপাল থেকে এলো-মেলো ফুলগুলো উপর দিকে ওঠিয়ে তুলতে থাকে। হঠাৎ তার কপালের এককোণে দেখে একটা ছোট চির ও একটু রক্তচিহ্ন।

মটু সেটা বুকেতে পেয়ে বলল—ও কিছ নয়, একটু কপি লেগেছিল। পারলে না ত, বেশ ভবে এই দেখ—বলে সে পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড ফুলপত্র বার করল, করে সেটা সুসমার সামনে রেখে হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে হুঁহাত বাড়িয়ে বৌদির গলাটা জড়িয়ে ধরে প্রায় তার কাণে কাণে বলল—ওটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে, এবার আমারটা করবে ত ?

সুসমা ফুলটা দেখেই চমকে উঠেছিল। মটু তার চুরি-করা সেলাইয়ের অত্যন্ত মনোযোগী শাখী, রৌজ ইকুল ঘাবার আগে এবং ইকুল থেকে এসে তার একবার বোঁজ নেওয়ার চাই, কতদূর হ'ল এবং রবিবার দিন এই সময়টা (এইটাই একমাত্র সুসমার চুরির সময়) সে বৌদির কাছে বলে তার কাছ দেখে। পরন্তু বিকেলেও তাদের মধ্যে চুপি চুপি এই-মিমে কথা হয়েছিল। সুসমা যে লতাপাতা-ওয়ালা ছোট ছোট ফুল তুলছে সে মটুর মোটেই পছন্দ নয়, সে বলে ফুল এমন হবে যা দূর থেকে দেখা যাবে ও দেখান যাবে। ফুলের মত ফুল, সে কোন্টা ? সুসমা অনেক ভেবে উত্তর দিয়েছিল সে রকম বড় ফুল হ'ল ফুলপত্র, তবে খুব কম দেখা যায়। তাই বুঝি ! তা হলে এটা কি ?

মটু মহানন্দে বৌদির গলা হাতে একটা হাত জড়িয়ে নিয়ে ফুলপত্রটা একেবারে তার বুকের সামনে উঠিয়ে আনে এবং বিজয়গর্বে বলে—দেখলে ত ? আচ্ছা, তোমার ক্রম কই বৌদি, আমারটা এবার আরম্ভ করবে ত ?

শেষের কথাটা বড় লাড়ুক লাড়ুক শোনার। কিন্তু পরক্ষণেই মটু কি একটা ভেবে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং বেশ স্পষ্ট গলায় বলে—আর দেখো, তখন আমার মজাটা হ্যাঁ। আমি ত ওদের বলেই রেখেছি, তখন দেখব এমন বৌদি ওদের কার আছে, এমন বড় ফুল ওদের কার কাছে থাকে। জানো, স্বপন বলছিল—

সেই এতই কথা ! সুসমা আর সইতে পারে না, মটুকে

একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলে—কিন্তু সেলাই ত আমি জানি না লক্ষ্মী ভাইটি আমার।

—জানো না ! আদর খেতে খেতে বড় বড় চোখ করে মটু বৌদির দিকে মুখ তোলে।

—না রে।

—যাঃ, ওই যে হুচ্ছিল। ওটা কোথায় দেখি—বলতে বলতে মটু এদিক ওদিক তাকায়, তার একটু বিশ্বাসও হয় না।

—ওটা ফুল হুচ্ছিল ভাই, ওতে হবে না।

—বাঃ বেশ সুন্দর ফুল উঠছিল ত। মটুর কণ্ঠস্বরে এবার উদ্বেগ প্রকাশ পায়।

শিশুর এই প্রশংসাও আজ সুসমা সইতে পারে না, সারা অন্তর তার কান্নার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আর নয়। সে যথাসম্ভব শান্ত হয়ে বলল—উঠছিল ত। কিন্তু কি রকম করে সব ধুলে গেল, বোঝ হয় কোথাও আলগা থেকে যাচ্ছে।

এর উত্তরে মটু সহসা আর কিছু বলতে পারে না, একটু চিন্তিত-বিশগ্ন ভাবে চুপ করে থাকে। সুসমা তার মনের ভাব বোঝে, মিছেকে সামলে নিয়ে ফুলটা এতকণে আদর করে নিজের হাতে ছুলে নেয় এবং অল্প হাতে মটুকে জড়িয়ে ধরে শান্তনার সুরে বলে—তার কি হয়েছে। আবার ত মনে আসবে, তখন হবে। কি বল ?

মটু নিজের দিকটা ততকণে সামলে নিয়েছে, তার মনে পড়ে বৌদির দিকটা, সেও ভেমনি—সুসমাকে জড়িয়ে ধরে বলে—তাই বুঝি ভূমি কাঁদছিলে বৌদি। দূর, তাতে কান্নার কি আছে ? আমি ত কত ভুলি—বলতে বলতে তার হঠাৎ কি একটা মনে পড়ে যায়, সে আবার বলে—হ্যাঁ জানো বৌদি, স্বপন কাল বলছিল যে ওদের বাড়ীতে একটা খুব ভাল বিলেতী ফুল এসেছে, আমাকে একটা ডাল দেবে বলেছে।

কিন্তু স্বপন ও কথা মোটেই বলে মি। সে যা বলেছিল তা কেউ জানলো না।

একটা ছড়া

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

২১শে বৈশাখ, ১৩৫০ সাল। স্বর্গীয় রামানন্দবাবু তখন বড় কাতর, শয্যাশায়ী। ঐ সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবী ও জামাতা শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের কাছে রাজ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত থাকতেন। আমি প্রায়ই তখন তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। ঐ দিনেও গিয়াছিলাম। সেদিন একটু ভাল ছিলেন। কথাবার্তার মধ্যে নিম্নলিখিত ছড়াটা আমাকে লিখিয়া লইতে বলিয়া মন্তব্য করিলেন—
তাঁহার বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় রোগশয্যায় নিজের কল্পাকে ইহা শিখাইয়াছিলেন। মনে হয় ইহার মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক কথা আছে। ছড়াটি এই :

এক যে রাখাল গরু চরায়
গামছা মাখায় দিয়ে
তার মাকে ধরে নিয়ে গেল
জামান ফকিরে।

পিসিমা কাদে মাসিমা কাদে
চালে নাচে ঝিঞে।
পুঁঠি মাছটি গান করছে
নেউলে বাজায় শিঞে।

রত্নদেব

ত্রিবিধুগেখর ভট্টাচার্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে) রত্নদেবের কথা ক্ষুদ্র হইলেও অতি উপদেশ্য। ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই ইহার মহিমার গান করা হইয়া থাকে (“রত্নদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ গীয়তে,” ৯, ২১, ২)। ভাগবতকার কেন এরূপ বলিয়াছেন, পাঠকগণ নিজেই তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আমি কেবল কথাটা তুলিয়া দিতেছি।

পুরাকালে পুরুবংশে রত্নদেব নামে এক অতি দয়ালু ও দাতা রাজা ছিলেন। শিবি ও হরিশ্চন্দ্র হইতে তিনি কম ছিলেন না। তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। বাহা পাইতেন তাহাতেই তাঁহার চলিত, তাহাই তিনি দান করিতেন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সপরিবারে কষ্ট পাইতে হইত। তিনি একবারে অবসর হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি দান করা পরিত্যাগ করেন নি। বাহা পাইতেন, কেহ চাহিলে তাহাই তিনি দান করিতেন, নিজের বলিয়া কিছুই রাখিতেন না, তাহাতে তাঁহার খাওয়া হউক আর নাই হউক।

একদিন তাঁহার আহাতির কিছুই নাই। সপরিবারে কষ্ট পাইতেছেন। এইরূপে তাঁহার ৪৮ দিন কাটিয়া গেল। এমন কি পান করিবার উপযুক্ত জলও তাঁহার ছিল না। দৈববশে পরদিন প্রাতে কিছু ভাল খাদ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে তিনি সপরিবারে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। শরীর তাঁহার কাঁপিতেছে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা সকলেরই মধ্যে ভগবানকে দর্শন করেন (“হরিং সর্বত্র সংপশ্যন”)। তিনি অতি শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত ঐ লব্ধ খাদ্য হইতেই সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে রাজা যখন অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতে বাইবেন, তখন আর একটি অতিথি

উপস্থিত হইল। এ ছিল শূদ্র। রাজা ইহাকেও হরি মনে করিয়া অবশিষ্ট খাদ্য হইতে খাওয়াইলেন। এই অতিথি গেলে আর একটি নিকৃষ্ট জাতীয় অতিথি উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে কতকগুলি কুকুর। সে বলিল ‘মহারাজ, এই কুকুরগুলি ও আমি বড় ক্ষুধার্ত, অন্নদান করুন।’ রাজা বহুমান ও সৎকার করিয়া বাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই দিয়া সেই অতিথিকেও নমস্কার করিলেন।

তখন রাজার নিকটে কেবল একটুমাত্র জল আছে, যা একজনের মাত্র কোনরূপে চলিতে পারে। রাজা তাহাই পান করিবার জন্ত উদ্যত হইয়াছেন। এমন সময়ে একটি চণ্ডাল উপস্থিত হইয়া বলিল, ‘মহারাজ, আমি এক অমঙ্গল ব্যক্তি। আমাকে একটু জল দিন।’ তাহার ঐ করুণাপূর্ণ কথায় রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যে কথা বলিলেন ভাগবতকার তাহা অমৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (“ইদমাহামৃতং বচঃ।” সেই কথাটি এই (৯, ২১, ১২)

“ন কাময়েহং গতিমীশ্বর্যং পরা-

মষ্টদ্বিসন্ধি মপুনর্ভবং বা।

আর্ত্তিং প্রপতে হখিল দেহভাজা-

মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।”

অর্থাৎ—ঈশ্বরের কাছে আমি পরমগতি প্রার্থনা করি না, অগ্নিমা প্রভৃতি অষ্ট সন্ধি চাই না, আমার পুনর্জন্ম হইবে না ইহাও চাই না, আমি চাই, আমি যেন সমস্ত জীবের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুঃখকে পাই, বাহাতে তাহাদের দুঃখ না থাকে। ১

১। এই কথাটাই অজ্ঞ এক জায়গায় আছে, বাহা অনেকের আরা, অনেক সহজে মনে রাখিতে পারেন—

“ন ব্রহ্ম কাময়ে রাজ্যং ন বর্গং ন পুনর্ভবম্।

কাময়ে দুঃখভগ্নানাং প্রাণিমাষাৰ্ত্তিনাশনং।”

অর্থাৎ, আমি রাজ্য চাই না, বর্গ চাই না, পুনর্জন্ম হইবে না ইহাও চাই না, আমি চাই দুঃখভগ্ন জীবগণের দুঃখের নাশকে।



গান

ରଚନା—ଶ୍ରୀଗୋପେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পুরিয়া—তেতালা)

এসেছি প্রভু তোমার মন্দিরে দরশন দাও হে
শ্রীম-সুন্দর আজি শুনিব বাঁশী প্রাণ তরে ।
তোমার অরূপ রাশি ত্রিভুবনে বিকাশে
গোপেশ যাচে রাতুল চরণে রাখ মোরে ॥

$\left. \begin{array}{l} 0 \\ \text{ক্ষা না ধা ক্ষা } | \text{ গা ধ্বা না ধ্বা } | \text{ গা ি ধ্বা গা } | \text{ ধ্বা ি সা ি } | \end{array} \right\}$
 $\left. \begin{array}{l} \text{এ সে ছি প্র } \quad \text{ভু তো মং র } \quad \text{ম - ০ দি } \quad \text{রে - ০ - } \end{array} \right\}$

^০না^১খা^২না^৩খা^৪ | ^১জা^২খা^৩সা^৪সা^৫ | ^২সা^৩।^৪।^৫সা^৬ | ^৩সনা^৪খা^৫সা^৬সা^৭ |
 দ র শ ন দা ০ ও হে গা - - য সূ ০ ০ ন্দ র

০ সা - ক্ষা ক্ষা ক্ষা | ১ গা ধা গা গা | ২ গক্ষা ধনা ধাঁ না | ৩ ধক্ষা ধা ক্ষা গা ।।
আ ০ জি শু নি ব বাঁ শী প্রা ০ ০ ০ ০ ৭ ভ ০ ০ ০ রে

^০ গা গা গা গা | ^১ ক্ষা ধা সা সা | ^২ সা সা সা সা | ^৩ না খা সা া |
 { তো মা র অ রু প রা শি জি ভু ব নে বি কা শে }

০
না ঋঁ গাঁ ঋঁ | ১
না ঋঁ গাঁ | ২
না ঋঁ না | ৩
ধন্না ধা ঞ্না গা ॥
গো পে শ যা চে রা তু ল চ র ণে রা খ ০ ০ মো রে

আলাপী তান :—

१। ना - धा - ना - गा । त त त त । काः नः धा का । गा धा गा त ।
आ ० ० ० - - - - ० ० ० ० ० ० ० -

२। $\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} & 0 & & & & 1 & & & & 2 & & & & & 3 \\ \text{धा}^1 - \text{ना} - \text{धा} - \text{का} & | & \text{धा} & \text{का} & \text{गा} & \text{ता} & | & \text{गा} & \text{का} & \text{ना} & \text{धा} & | & \text{काधा} & \text{गका} & \text{धा} & \text{गा} \\ \text{आ} & 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$

বোলতানঃ—

୦	୧	୨	୩
୭। ଗଞ୍ଜା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ନଦୀ । ନଦୀ ସମସ୍ତ ନଦୀ ଶାଖା । ଶାଖା ନଦୀ ନଦୀ ଶାଖା । ଶାଖା ନଦୀ ଶାଖା ନଦୀ ।			
ଏଠି ୦୦ ୦୫ ୦୦	ହିଁ ୦୦ ୦୦ ୦୦	ଅଠ ୦୦ ୦୦ ୦୦	ଡୁ ୦୦ ୦୦ ୦୦

আশতান :—

৪। নখা গন্ধা ধনা সর্সী | সর্না ধন্ধা গন্ধা গা |
 আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৫। স্বর্সী নধা সর্না ধন্ধা | ধনা ধন্ধা ধন্ধা স্বর্গা |
 আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আশ ও কল্পনযুক্ত তান :—

৬। স্বর্সী সর্না সর্সী নধা | ননা ধন্ধা গন্ধা গা |
 আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আশতান :—

৭। নখা গন্ধা গন্ধা গন্ধা | ধন্ধা ধনা ধনা স্বর্না | ধন্ধা গন্ধা ধনা স্বর্না | ধন্ধা গন্ধা ধন্ধা স্বর্গা |
 আ ০

আশ ও কল্পনযুক্ত তান :—

৮। নখা গন্ধা স্বর্গা স্বর্সা | স্বর্গা ধন্ধা গন্ধা গন্ধা | গন্ধা ধনা ধন্ধা ধন্ধা | ধন্ধা ননা ধনা ধন্ধা |
 আ ০

৯। ধনা সর্সী নধা নধা | ধন্ধা ননা ধন্ধা গন্ধা | ধন্ধা ধন্ধা স্বর্গা ধন্ধা | গন্ধা নধা গন্ধা স্বর্গা |
 ০

অন্তরার তান :—

১০। গন্ধা ধনা সর্সী সর্সী | সর্সী সর্সী সর্সী | নধা গা স্বর্সী সর্সী | নধা সর্না ধন্ধা গা |
 আ ০ ০ ০ - - - - ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বাঁট :—

১০। গন্ধা ধনা সর্সী সর্সী | নধা সর্না ধন্ধা গা | গন্ধা ধনা সর্না ধন্ধা | গন্ধা ধন্ধা গা স্বর্সা |||
 এসে ছিপ্র ভুতো মার ম ০ ন্দি রে ০ দর শন দা ০ ওহে ঞা ০ ০ম স্ব নর

পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

সে অনেক কথা, প্রায় ১২ বৎসরের ইতিহাস। অতিশয় দীর্ঘ এবং বিচিত্র ঘটনাবলী। শ্রীঅরবিন্দ সন্ধ্যা বে প্রায়, যে আশঙ্কার কথা “প্রবাসী” সম্পাদক মহাশয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় “নবসংজ্ঞা”র উদ্ধৃত প্রবন্ধ লইয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ পত্রবাহিনী উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হইতেও মুক্তি পাইব।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রকাশ্যভাবে গিয়া উপস্থিত হই। তৎপূর্বে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর “রয়েল ক্লেমেন্সি” ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই অধিকাংশ রাজবন্দী মুক্তিতে আসেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই বারীন্দ্রকুমার, হৃদিকেশ, উল্লাসকর প্রভৃতি মুক্তি পাইয়া আন্দামান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অল্পকাল অবস্থান করতেন। আমাকেও আহ্বান দিয়া তিনি এই সময়ে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

“I have thought to delay your visit for a short time, until I saw my way more clearly on certain important matters, but I now believe that is not necessary and it will be as well for you to come as soon as it may be.”

অর্থাৎ, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে আমার পথের স্পষ্টতা না দেখা পর্যন্ত তোমায় এখানে আসিতে বিলম্ব করিতে হইবে; কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস যে, আর তাহার প্রয়োজন নাই; তোমার স্ববিধামত যত শীঘ্র হয় আসিতে পার।

তাঁহার পত্র পাইয়া আমি তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। এই সময়ে তাঁহার কিছু ভাবান্তর নজরে পড়িল। তিনি যথার্থীতি দিতলের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করেন। কিন্তু আমার বন্ধুরা কেহই আর সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আমাকেই থাকিতে হয়। তারপর মীরা দেবী আসিয়া উপবেশন করেন। শ্রীঅরবিন্দ ট্রেনের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকেন। আমরা উভয়েই নিম্নলিখিত নেত্রে ধ্যান করি। সন্ধ্যার আলো জলিয়া উঠিলে মসিয়ে বিশার আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। মসিয়ে বিশার এই সময়ে তাঁহার রচিত একখানি ফরাসী গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূবাদ করার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের সহায়তা লইতেন। ইহাই “আর্থা”

পত্রিকায় “Eternal Wisdom” নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইত।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে টাইপ-রাইটার লইয়া দীর্ঘ সময় কার্যতৎপর দেখিয়াছিলাম। তাঁহার শরীর অধিকতর ক্লান্ত হইয়াছিল। মীরা দেবীর উৎকর্ষার সীমা ছিল না। তিনি আমাদের একদিন স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, “যে গরুর দুধ শ্রীঅরবিন্দ পান করেন, সেই গাভীটির নিশ্চয়ই ক্ষয়-রোগ হইয়াছে। ঐ গরুর দুধপান তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইবে।”

এই সময় হইতেই শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যের দাগ্ধি মীরা দেবীই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই ইহাতে প্রীতি অনুভব করিলাম। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। ইহার পূর্বে আমি দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, শ্রীঅরবিন্দ রক্ষ-মাধ্যম স্নান সারিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একটা আয়নার ভাঙ্গা চিরুণীর সাহায্যে কেশ আঁচড়াইয়া লইতেন। তারপর তিনি ভোজন-পাত্রের সম্মুখে বসিতেন। আমি বসিয়া বসিয়া মাছি তাড়াইতাম। “শ্রীঅরবিন্দ কয়েক গ্রাম অন্ন গ্রহণ করিয়াই উঠিয়া পড়িতেন। আমি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়া উঠিতাম। মীরা দেবীর তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণের পর হইতে তাঁহার প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, অপরাহ্ন ও নৈশভোজনের স্বব্যবস্থা হইল। শ্রীঅরবিন্দ আত্মভোলা শিবের মত, নিজের স্বপ্নের দিকে কোন দৃষ্টিই তাঁহার থাকিত না। মীরা দেবীর যত্নে শ্রীঅরবিন্দের শ্রী ফিরিল।

এই সময়ে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে আমরা মসিয়ে বিশারের বাড়ী যাইয়া রাজি-ভোজন সমাপ্ত করিতাম। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মীরা দেবীর অন্তর তখন এমনই ভরিয়া উঠিতেছিল যে, মসিয়ে বিশার তাহা লক্ষ্য করিয়া অভিভূতের ন্যায় আমাদের কাছে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, “আমি ক্রমেই মীরার মন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। মীরার সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছেন শ্রীঅরবিন্দ।”

এক দিন অপরাহ্নে আমরা তিন জনেই ধ্যানমগ্ন। ধ্যান-শেষে মীরা দেবী ও আমি ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়ের কথা প্রসঙ্গ মুখে শ্রীঅরবিন্দ

শুনিতে লাগিলেন। মীরা দেবী বলিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরলোকের অপাধিব দৃষ্টির কথা। তাঁহার অসাধারণ দর্শনের কথা আমি বিস্মিত হইয়া শুনিলাম। আমার ধ্যান জাগ্রত শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া। তাঁহার রক্তচক্ষু শ্রুতি ও জ্যোতির্ময় মূর্তি আমার চিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আমি মাদাম মীরার অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা শুনিয়া যুগপৎ পুলকে ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের এইরূপ ধ্যানের শেষে প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, “মতি! তুমি, আমি”—তারপর হস্ত-প্রসারণ করিয়া মীরা দেবীকে দেখাইয়া বলিলেন, “আর এই নারী আমরা তিন জনে সম্ব।” তারপর শ্রীঅরবিন্দ সজ্জের ভবিষ্যৎ নির্দেশচ্ছলে বলিলেন, “এই তিন জনেই আমরা জগতের পরিবর্তন আনিব।” সেদিন আমি মীরা দেবীকে নতুন চক্ষে দেখিলাম। তিনিও যেন আমায় বড় আপন করিয়া লইলেন। কিন্তু এক দিনের কথায় সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। সেদিন আমার এক বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মীরা দেবী শ্রীঅরবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, পরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আমার সহিত আপনি কি সম্বন্ধ অল্পভব করেন?” আমি হাসিয়াই বলিলাম—“আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ ভগ্নীত্বের। আমরা উভয়েই শ্রীঅরবিন্দের নিকট নীক্ষিত।” তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—“না! না! I like to be Mother.”

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আমি কি ভাবে মীরা দেবীকে মাতৃত্ব বরণ করিয়া লইব, বুঝিতে পারিলাম না। আমি তন্ত্র-সহজিয়ার সাধনার আত্মশক্তি মহামায়ার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের ধর্মপত্নী যুগালিনী দেবীকে আমি স্বাভাবিক গুরুশক্তি স্বরূপেই অধ্যাত্ম-মাতৃত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাতা যুগালিনী পরলোকগমন করিলে, আমাদের তাঁতশালার নাম রাখিয়াছিলাম “যুগালিনী বস্ত্র বয়ন কার্যালয়।” মীরা দেবীর মাতৃত্বের দাবী আমার অস্বস্তিকর মনে হইল। এই দিন হইতেই মীরা দেবীর সহিত যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছিল, বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহার উপর আঘাত পড়িতে শুরু করিল। বিশেষতঃ এক রাত্রির ঘটনা এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতে আর যেন নিরাময় হওয়ার কোনই আশা রহিল না।

এত দিন আমাদের রাত্রির অধিবেশন-চক্র স্থিতলের বারান্দায় হইত। অকস্মাৎ তাহা নিম্নতলে অস্থিতি হওয়ায়, আমার চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। আপন অন্তরের অস্থিভূতি দিয়া স্থির করিয়া লইলাম—শ্রীঅরবিন্দের

আরোহণ-যুগ শেষ হওয়ায় অতঃপর তাঁহার অবতরণের পালাই শুরু হইয়াছে এবং তাহারই লক্ষণস্বরূপ তিনি নিম্নতলে চক্রান্ত্রাণের আয়োজন করিয়াছেন। তথায় গিয়া উপবেশন করিতেই, শ্রীঅরবিন্দের মুখে নানা অশরীরী আত্মার বাণী প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকজন অপরিচিত আত্মার কথা আমরা নীরবে শুনিবার পর, শুনিলাম—রাজা রামমোহন রায়েব আত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁর মুখে অনেক অধ্যাত্মযোগের কথা আমরা শ্রবণ করিলাম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। ইহার পর আসিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীঅরবিন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন আত্মচেতনায়। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া পরে তিনি বলিলেন, “আমাদের সাম্প্রতিক ভিত্তির উপর নতুন সমাজ, নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কর্ম হইবে উপর হইতে।” তারপর তিনি মাথার উপর প্রায় অর্ধ হস্ত পরিমাণ হাত উঠাইয়া বলিলেন, “এই বিজ্ঞানভূমি হইতেই সকল কর্ম স্বসম্পন্ন হইবে।” পরিশেষে আমার দিকে চাহিয়া করুণার্জ চক্ষে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন “মতিলালের সাধন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, সে আমার কথা বুঝিবে; কিন্তু he puts a wall between him & me,” অর্থাৎ, সে আমার ও তার মধ্যে একটি প্রাচীর রাখিয়া দিতেছে।” আমার মনে হইল, এই কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইলেও, ইহা যেন মীরা দেবীরই অস্থিভূতির প্রতিধ্বনি। কারণ শ্রীঅরবিন্দ যে সজ্জের এষণা পাইয়াছিলেন, সেখানে মাদাম মীরা ও আমার মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপনের কথা ছিল। আমি তাঁহাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই বলিয়াই কি শ্রীঅরবিন্দের মুখে এইরূপ পরুষ বাক্য উচ্চারিত হইল। আমি সেই পক্ষে কিরূপ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা “জীবনসঙ্গিনী” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই সে কথার পুনরুল্লেখ এখানে নিম্নয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর এই প্রসঙ্গ লইয়া অবশ্য কোনই আলোচনা করেন নাই। ইহার পরেও মাদাম মীরার সহিতও আমার হৃদয়সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই। সেবার বিদ্যাকালে শ্রীঅরবিন্দ যেমন আমায় বুক ধরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন, আমি মীরা দেবীরও হস্ত ধরিয়া ভগ্নীত্বের স্নেহ-রসায়নে নিজেকে অভিযুক্ত করিয়াই সেখান হইতে ফিরিয়াছি। মসিয়ে রিশার আমাদের এই বিদ্যাকালীন দৃষ্ট দেখিয়া বিশ্বয় বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে চোখে এই আভাসই যেন দেখা দিয়াছিল।

মসিয়ে রিশার ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই চন্দননগরে আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত

হন। তখন তাঁর মুখেই মাদাম মীরার সহিত তাঁর চির-বিচ্ছেদ হইয়াছে, শুনিলাম। তাঁহার কথায় বুঝিলাম—মাদাম মীরা এক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের নিকটই বাস করেন।

মসিয়ে রিশারের মর্মপীড়া দূর করার যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম। আমার গৃহদেবীও অতি সতর্কতার সহিত মসিয়ে রিশারের চিত্তক্লেশ-নিবারণের প্রয়াস করিলেন। মাদাম মীরা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কি ভাবে অন্তরলোকে এক দিব্যপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি সেই কিশোর বয়সেই স্বতঃই “কৃষ্ণ” নামে অভিহিত করিতে ভালবাসিতেন এবং পরে ঘটনাক্রমে তাঁর স্বামীর সহিত কি ভাবে পণ্ডিতারীতে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার হয় ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট “কৃষ্ণ” বলিয়াই চিনিতে পারেন এই সকল কথা বিশদভাবে লিখিয়া পণ্ডিতারী হইতে আসিবার সময়ে আমার হাতে একটি নিবন্ধ দিয়াছিলেন। আমি তৎকালে মীরা দেবীর ছবির সহিত “প্রবর্তকে” তাহা প্রকাশ করি। ঐ ছবি ও লেখা আমার গৃহে মসিয়ে রিশার হঠাৎ দেখিতে পাইয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। আমায় মুঠাঘাত করিয়া সেই যে বাহির হইলেন, আর ফিরিলেন না। শুনিয়াছি তিনি চন্দননগর হইতে শান্তিনিকেতন হইয়া সর্বমতীতে কিছুদিন ছিলেন, তারপর প্যারিস যাত্রা করেন।

পণ্ডিতারী হইতে শ্রীঅরবিন্দ পত্রে তাঁহার আদর্শের মর্মবাণী লিখিয়া আমায় উদ্ধৃত করিতেছিলেন। একটি পত্রে তিনি লিখিলেন :

“Our first object shall be to declare this ideal, insist on the spiritual change as the first necessary and group together all who accept it and are ready to strive sincerely to fulfil it. Our second shall be to build up not only an individual but a communal life on this principle”

অর্থাৎ, আমাদের প্রথম কর্ম হইবে এই আদর্শের ঘোষণা করা, অধ্যাত্ম পরিবর্তনের উপরে জোর দিতে হইবে সর্বত্র। এবং যাহারা অকপটে ইহা স্বীকার করিবে ও ইহা সিদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইবে, তাহাদের একত্র করিতে হইবে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ম—এই নীতির উপর শুধু ব্যক্তিজীবন গড়িয়া তোলা নয়, পরন্তু একটা সম্বন্ধজীবনও গড়িয়া তুলিতে হইবে।

চন্দননগর হইতে আমাদের প্রকাশিত *Standard-bearer* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি যে আদর্শের কথা চমৎকার যুক্তি ও অল্পপ্রেরণাপূর্ণ ভাষায় ঘোষণা করিলেন তাহাতেও এই আশার বাণীই ফুটিয়া উঠিল। ইহারই শেষাংশে ছিল :

“It is with confident trust in the spirit that inspires

us that we take our place among the standard-bearers of the new humanity that is struggling to be born amidst the chaos of a world in dissolution and of the future India, the greater India of the re-birth that is to rejuvenate the mighty outworn body of the ancient Mother.”

অর্থাৎ, যে ভাবশক্তি আমাদের উদ্ধৃত করে, তাহারই উপর স্বল্প প্রত্যয় স্থাপন করিয়া, আমরা সেই নূতন মানব জাতির পতাকাবাহীদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছি, যে জাতি একটা বিলুপ্তমান জগতের প্রলয়-বেদনায় নবজন্মেরই তপস্যা করিতেছে। আর সেই ভবিষ্যভারত, যে বৃহত্তর ভারতের নবজন্মে আমাদের এই প্রাচীন দেশমাতৃকার জীর্ণদেহ নবমূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহারও প্রবর্তকদের মধ্যে আমাদের স্থান হইবে।

এই সম্বন্ধ-স্থিতির প্রেরণাটিকেই চন্দননগরে রূপায়িত করিতে গেলে, তিনি উৎসাহ দিয়াই আমায় আবার লিখিলেন :

“The Samgha at Chandernagore is a thing that has grown up with my power behind and you at the centre and it has assumed a body and temperament, which is the result of this organisation.”

অর্থাৎ, চন্দননগরে আমার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ও তোমাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে—এইরূপ সংগঠনের ফলে উহার একটি আকৃতি ও প্রকৃতিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বারীজরুমারের কর্ম-প্রচেষ্টা ও দেশের অগ্রাগ্র কর্ম-ধারার সহিত তাহার পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন :

“Our whole principle is different and you have to insist on our principle in all that you say or do. Moreover, you have got a clear form for your work in association and that form as well as the spirit you must maintain, any loosening of it or compromise would mean confusion and an impairing of the force that is working in your Samgha.”

অর্থাৎ, আমাদের মূল তত্ত্ব অন্য হইতে পৃথক। তুমি যাহা বলিবে ও করিবে, তাহা এই মূল তত্ত্বের উপর জোর দিয়াই তোমাকে করিতে হইবে। অধিকন্তু তুমি ইহার জন্য সম্বন্ধরূপ যে স্বচ্ছ বিগ্রহ পাইয়াছ, সেই সংস্থা ও এই তত্ত্ব বজায় রাখিয়াই তোমায় চলিতে হইবে। ইহা কোন-রূপে যদি শিথিল হয় অথবা কিছুর সহিত যদি আপোষ করিতে হয়, গোলযোগ বাধিবে ও যে শক্তি তোমার সম্বন্ধে লীলায়িত হইতেছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে।

পত্র শেষে এই দুই ছত্র আমায় পুনরায় উদ্ভাটনের ন্যায় পণ্ডিতারীর পথে ছুটিাইল :

“Meanwhile your visit may help to get things into preparatory line both in the motor-power and in the outward determination.”

অর্থাৎ, ইতিমধ্যে তোমার উপস্থিতি অন্তরের বিদ্যুৎ-বল ও বহিঃস্থী সঙ্কল্প নিরূপণের সকল ব্যাপারকে পরিণতির দিকে আনিতেই সহায়তা করিতে পারে।

এবার তাঁর পত্রে আমার সঙ্গীক পণ্ডিতারী গমনের অল্পমোদন ও দীর্ঘ দিন তথায় থাকার নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন। আমি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁর কথার অনুসরণ করিলাম ও ১৯২১ সনের জুন মাসে উভয়ে পণ্ডিতারীতে গিয়া পৌঁছিলাম।

প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিতে গেলে আমার সঙ্গে আমার পত্নীও তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতা হইলেন। প্রণাম করিতে তিনি একপ্রকার ধ্যানস্থা হইয়াই পড়িলেন ও তদবস্থায় শ্রীঅরবিন্দও দীর্ঘক্ষণ মুদিত নয়নে তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। ধ্যানভঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের চরণধূলি লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে, আমার হাতে এক তাড়া নোট দিয়া শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জন্য যে নূতন বাড়ী লওয়া হইয়াছে, সেই বাড়ীতে গিয়া আমাদের উঠিতে বলিলেন।

মীরা দেবীর সন্ধান লইতে গিয়া অবগত হইলাম যে, তিনি উপরেই আছেন—যে ঘরখানিতে গত দুই বার পণ্ডিতারীতে আসিয়া আমি অবস্থান করিয়াছিলাম, সেখানেই তিনি এখন থাকেন। দ্বার ঠেলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিস্থিত হইয়া দেখিলাম তিনি পূর্ববেশ পরিবর্তন করিয়াছেন। পরিধান লালপেড়ে শাড়ী, চরণ-মুগল অলঙ্কারজিত—ভারতীয় মাতৃমূর্তির ন্যায়। আমি তাঁহাকে প্রণাম জানাইলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম—আমার পত্নী মীরা দেবীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে ইন্ধিতে প্রণাম করিতে বলিলাম। তিনি তবুও স্থির দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রণাম করিলেন না।

আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। মাদাম মীরা দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। আমি নূতন বাসা-বাটাতে উপস্থিত হইয়াই আমার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি মীরা দেবীকে প্রণাম করিলে না কেন?” বারবার প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে কোনই উত্তর পাইলাম না। আমি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে দশম বর্ষীয়া বালিকা বধুকে ঘরে আনিয়াছিলাম, কথায় কথায় আমার শাসন অধিকমাত্রায় হইত। আমি ক্রোধ ভরে আবার বলিলাম, “মাদাম মীরাকে প্রণাম না করিয়া অতিশয় গহিত কর্ষ করিয়াছ।”

তিনি উন্নত শিরে বলিলেন, “তোমার মাথা শ্রীঅরবিন্দের চরণে নত হইলে, আমিও চেতনাহার্য্য ন্যায়

তাঁহার চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু এখানে তোমার প্রণতি আমার ভাল লাগে নাই।” আমি পক্ষষকণ্ঠে “কেন? কেন?” বলিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিলাম। তিনি মাথার সিন্দূর দেখাইয়া বলিলেন, “আমি মসিমে রিশারের দ্রুৎ দেখিয়াছি। যে নারী পতিত্যাগিনী, তাহার স্বামী সৌভাগ্যহীন হয়। তাহার চরণে মাথা নত করিয়া এই পবিত্র সিন্দূর আমি স্নান করিতে পারিব না।”

তখনই বুঝিলাম—আমার পণ্ডিতারী আসা ব্যর্থ হইবে। মীরা দেবীকে মা বলিতে হইলে, গৃহদেবীকে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু কেমন মনে হইল—তিনি আমার অপরিভাজ্য।

প্রতিদিন প্রভাতে সঙ্গীক শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া বসি। তাঁর মুখে অনর্গল উপদেশবাণী শ্রবণ করি। আমার পত্নী ধরিয়া বসিলেন, আমাদের গৃহে শ্রীঅরবিন্দকে একদিন নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। তিনি নিজেই বলিলেন, “চন্দননগরে অবস্থানকালে অতি সম্ভর্পণে আপনার আহারের ব্যবস্থা করেছে। আজ আপনাকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাবার ইচ্ছা হয়েছে।”

শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “হবে, হবে, তোমার ইচ্ছা সফল হবে।”

আমার স্ত্রী বলিলেন, “কবে হবে?”

শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন, “কালই।”

পরদিন আসিল। পর-পর কয়েকদিন চলিয়া গেলেও শ্রীঅরবিন্দের যাওয়া ঘটিল না। আমার পত্নী নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। ঘোড়শোপচারে শ্রীঅরবিন্দের পূজা দিবার প্রেরণা তাঁহার ব্যর্থ হইল। তিনি ক্রতবুৎ আশা ছাড়িলেন না। কথায়-কথায় একদিন তিনি আবার শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন, “আপনি অন্যত্র গিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষায় অসমর্থ, কিন্তু আমি যদি কিছু খাবার পাঠাই, আপনি খাইবেন ত?”

শ্রীঅরবিন্দ সহাস্তে বলিলেন, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নিমন্ত্রণ-রক্ষার আমার অনেক বাধা আছে, খাবার পাঠাইও, খাইব।”

অত্যন্ত শ্রীতি-সহকারে আমার স্ত্রী নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং কি জন্য তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি খাইতে দেওয়া হয় নাই, ইহাও যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে অশ্রু-সাগর উথলিয়া উঠিল। তাঁহার ব্যথার ভার বহিয়া পণ্ডিতারীতে বাস করিতে আমিও যেন অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। নানা উৎপাতে আমারও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু

শ্রীঅরবিন্দের প্রেমে ও স্নেহে অভিভূত হইয়া আমি তবুও দিনের পর দিন অভিবাহিত করিতে লাগিলাম।

ঠিক এই সময়ে চন্দননগর হইতে তার পাইলাম—
“Won't Kakima come, strong Sangha need.”
মধ্যের কথাটি অস্পষ্ট। ভাবে বুঝিলাম, প্রবর্তক সজ্জ তাঁহার প্রত্যাবর্তন চায়। আমার পত্নীও বলিলেন, “আমি তোমার বাধা হইয়া এখানে থাকিতে চাহি না। আমায় পাঠাইয়া দাও, যোগ-সিদ্ধ হইলে তুমি চন্দননগরে ফিরিও।”

শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলাম, তিনি আমার পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এই ব্যক্তিটির যোগের সিদ্ধি তুমি ভিন্ন অন্যে আনিবে না, তোমার বাওয়া বন্ধ থাকিবে।”

ইহার উপর আর কথা নাই। নানা নির্ধাতন সহিয়া আমাদের দিন অভিবাহিত হইতে লাগিল। তারপর ঐ আগষ্টে শ্রীমান অরুণচন্দ্র আবার তাহা জানাইল, “সম্মুখে ১৫ই আগষ্ট, শীঘ্র আপনি আহুন।” টেলিগ্রামের শেষ কথা—“Our victory is here.”—আমাদের সাফল্য এইখানেই।

শ্রীঅরবিন্দকে এই তার দেখাইলাম। তিনি কোন দিন কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম করিতেন না; কিন্তু এই টেলিগ্রামের উত্তর দিতে তিনি নিজেই আদেশ করিলেন, “Write a big ‘No’ there.”—ওখানে লিখে দাও একটা প্রকাণ্ড ‘না’।

তার পরদিন আবার অরুণ তার করিল—“ফিরিয়া আহুন, অন্যথা eternal separation অর্থাৎ চিরবিচ্ছেদ। এই “separation” শব্দের অর্থ যদি সজ্জ হইতে বিদায় মনে হইত, আমি ক্ষেপ করিতাম না। এমন ঘটনা আমার জীবনে বহু ঘটয়াছে। কিন্তু আমি এই শব্দের অর্থ মৃত্যুই বুঝিলাম। আমি তিন দিন একাগ্রচিত্তে ভাবিলাম। তারপর কে যেন আমায় জোর করিয়াই লিখাইয়া লইল—“অরো! আমি চলিলাম, আজ হইতে আপনার সঙ্গে হইল আমার eternal separation।”

নিষ্ঠুর বিধাতা এমন করিয়াই পণ্ডিতারীর সহিত আমার বিচ্ছেদ আনিয়া দিল। আমার স্ত্রী গুনিয়া বলিলেন, “তুমি কিরে চল, অরুণের টেলিগ্রাম উপলক্ষ্য। আমি এসে অবধি দেখছি, অরবিন্দ তোমার আপনজন, কিন্তু তোমার সাধনার স্থান এ নয়।”

আমি একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় ১০ই আগষ্ট তারিখের প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ ব্যথিত স্বরে “আর প্রয়োজন নাই,” এই কথা বলিয়াই নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আমার পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবী অপস্থত হইতে

চাহিল। আমি টলিতে টলিতে বাগায় ফিরিলাম। তাঁহার বাণী আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছিল—“আর প্রয়োজন নাই।” কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা কি সত্যই ছিন্ন হইল? সারাদিন চিন্তা করিলাম। আমার মনে হইল শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সম্বন্ধ মর্ত্ত্যবাসীর চক্ষে হয়তো চির-বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অমৃতময় অন্তর-যোগ কোন দিন ছিন্ন হইবে না। সে সাধ্য আমারও নাই; শ্রীঅরবিন্দেরও নাই। আমি এই দিনই সন্ধ্যার সময়ে আবার শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি গভীর কণ্ঠে বলিলাম, “চলুন, আপনার ঘরে চলুন।”

তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন, “না, না।”

আমি তবুও জিদ ধরিয়া বলিলাম, “আহুন, আপনার ঘরে।” এতক্ষণ তাঁহার শুভ্র শরৎ যেন অন্তরের ক্ষোভে ও অভিমানে কম্পিত হইতেছিল। অকস্মাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন তিনি প্রশ্ন হইলেন—শিবের ন্যায় শাস্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

তিনি শয্যাগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাঁর চরণে প্রণত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভবিতব্য রুদ্র-বাণায় বুঝি স্বর বাধিয়াছিল।

আমি কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম—বিদায়, আজ আমি চির-বিদায় লইতেছি।

চারি চক্ষে অমৃত নিবার বারিল। আমিও কাদিলাম। শ্রীঅরবিন্দের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। তিনি আমার আবার বকে তুলিয়া বলিলেন—“একনিষ্ঠ হও। তোমার মধ্যে সত্য ও আলো আবিস্কৃত হোক।”

শ্রীঅরবিন্দের মুখের এই শেষ আশীর্বাণী মাথায় বহিয়াই সেদিন পণ্ডিতারী হইতে ফিরিয়াছি। আজও সেই স্মৃতি বকে রাখিয়াই কঠোর কর্মপ্রবাহে বাপ দিয়া চলিয়াছি। তারপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগের কথা বকে বজ্রের মতই বিদ্ধ হইয়াছে। আমার কাহিনীর শেষ এইখানেই করিতে হইবে।

এক্ষণে “প্রবাসী” সম্পাদকের প্রয়োত্তরে আমার কি বলিবার আছে সেইটুকুই অতি সংক্ষেপে বলিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিব।

ভারতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে সাধনায় নারীবিগ্রহের দৃষ্টান্ত আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় উৎসর্গের দেবীমূর্ত্তি প্রত্যেক নরনারীর শ্রদ্ধা পাইয়াছেন—মাতৃরূপে, অধ্যাত্ম

সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পূজা ও অধিনেত্রীরূপে কেহ কেহ বরণীয়াও হইয়াছেন। অধ্যাত্মাভ্যুত্তির আগুনে কি নর, কি নারী, কাহারও পূর্বজীবনের স্মৃতি-সংস্কার থাকে না, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া তাহাকে নবজীবনের আনন্দ দান করে। এই দিব্যজীবনেরই কষ্টিপাথরে সাধনার আশ্রয় নিরূপণ না করিলে, দিল্লীল্লাস্ত জাতির জীবন সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিধাতার নির্দিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু এইখানে আর একটি জিনিসও বুঝিবার আছে। নরনারীর সম্বন্ধে যে অমৃতধারা, তাহা ভারতের সাধনায় কোনদিন উপেক্ষিত হয় নাই। ভারতের গুরু চৈতন্য যেখানে অধ্যাত্ম লক্ষ্যের সন্ধানে সর্বস্বত্যাগী হইয়াই ছুটিয়াছে, সেখানেও পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ত সমাজের নিত্য বিধানকে অতিক্রম করিলেও দূরে রাখিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করে নাই। বৃদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণপ্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্মরূপ মহাপুরুষগণ প্রবল ধর্ম্মাবির্ষণে বা বিশেষ প্রয়োজনে ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রাকৃত সঙ্গ ত্যাগ করিলেও, কোথাও অধ্যাত্ম সম্বন্ধ বর্জন করেন নাই। তাই গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদামাংগকে ভারতের সাধননিষ্ঠ নর-নারী বা তত্ত্ব সাধনগোষ্ঠীকুল কেহই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—সাধনার জন্যই গুরুশক্তিরূপে তাহাদের আজ পর্য্যন্ত পূজার যোগ্য অর্ঘ্য দিয়াই আসিতেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম স্বভাবতঃই আমাদের অন্তরে প্রশ্ন সৃষ্টি করে—আর প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত ভারতের অন্তর্দৃষ্টিবান সাধন-প্রাণ হইতে আশঙ্কা-সংশয়ের ছায়াও মুছিবার নয়। ভগ্নী নিবেদিতার ন্যায় একনিষ্ঠা মহানারীও মনে-প্রাণে অন্তরাশ্রায় ভারতের ভেদে দীক্ষিতা, অবগাহিতা ও উৎসর্গীকৃত হইয়াও, ভারতীয় দেহ বা রক্তধারার অভাব কি মর্গ দিয়া অমৃতভব করিয়াছিলেন, তাহা যাহারা জানেন, তাহারা হই বুঝিবেন—ভারতের এই দ্বিধার মর্ম্ম কি। শ্রীমতী মীরা দেবীর উৎসর্গ ও যোগ্যতার কথা আমি কোনদিন অস্বীকার

করি নাই—তঁার অমৌকিক প্রতিভা ও সাধনার মহিমা যোল আনা স্বীকার করিয়াও আমি উদাত্ত কণ্ঠে এই কথাই বলিয়া যাইব—শ্রীঅরবিন্দের গুরুমহিমা যে ভারত স্বীকার করিবে, সেই ভারত মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তাহার পুণ্যাস্থি ও ভস্মকণা ভারতের সপ্তসরিদ্বার জলে বিসর্জন দিয়া, সপ্তসাগরকে তীর্থে পরিণত করিয়া যে গৌরব অমৃতভব করিবে অথবা পুষ্পচন্দনচর্চিত যোগিদেহ পদ্মাসনে বসাইয়া মন্ত্রোচ্চারণে স্থলে বা জলে সমাহিত করার যে সনাতন ভারতীয় বিধান, তাহারই অমৃতবর্তনে যে স্বথ ও সাধনা পাইব, তাহা মীরা দেবীর নির্দেশমত শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহাযোগীর দেহ কফিন-শয়নে কবরস্থ করিলে ভারত কখনও অমৃতভব করিবে না—করিতে পারে না।

আমি এইজন্যই আন্তরিকতার সঙ্গে বলিব—শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তার ঋণিরূপে, ভারত-প্রতিভার সিদ্ধ বাণীমূর্তিরূপে চিরদিনই আমাদের ও প্রত্যেক ভারতবাসীর পূজা ও অমৃতসরীয় রহিবেন—শ্রীঅরবিন্দের ঈশ্বরত্ব ও নিরঞ্জনত্ব তাঁর অতীন্দ্রিয় ও অতিমানস যে “বিন্দু-নাদ-কলাতীতঃ স্যোমাতীতঃ নিরঞ্জনঃ” অপ্রাকৃত গুরুকায় ও গুরুশরূপ, তাহাও আমাদের নিত্য স্বীকার্য্য ও নিত্যার্য্য হইবে। মীরা দেবীর উৎসর্গসিদ্ধ জীবনের অবদানও ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত বহুদিন স্মরণ করিবে ও বহন করিবে, কিন্তু আধ্যাত্মভারতের গুরুশক্তি ও মাতৃশক্তি যিনি হইবেন, তাহাকে ভারতীয় রক্তধারা ও ভারতীয় সত্যবিভূতি অঙ্গে লেপন করিয়াই আবিস্কৃত হইতে হইবে।

ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক সংস্কৃতিকে বিদায় দিয়া বা কণামাত্র অবজ্ঞা করিয়া যে অভিনব নীতির প্রবর্তন অথবা বিশ্বমিলনের চেষ্টা ও আয়োজন, তাহার পশ্চাতে যত বড় শক্তিশালী মহাপুরুষেরই সমর্থন থাকুক, বুদ্ধকে মাথায় রাখিয়া তাহার বৌদ্ধবাদ ও সংহতির বিনায়ের ন্যায়ই, ভারতাত্মার অস্বীকারেই কালক্রোড়ে ভাসিয়া যাইবে। মহাভারতের সংগঠনে তাহা প্রধান ও কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে কখনও সার্থক সহায় হইবে না।

স্কুলে ছেলদের স্বাস্থ্য

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

আমি শিক্ষক। পঁচিশ বৎসর হইল স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছি। সাত-আট বৎসর পূর্বেও স্কুলে একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, যেখান হইলোনা এখন অষ্টম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীতে উঠিয়াছে তখন তাহারা বেশ একটু বড়সড় হইয়াছে। এখন আর সেটা দেখিতে পাই না। এখন দেখি—ছেলেরা পঞ্চম-ষষ্ঠ

শ্রেণীতে যেমন ছিল, নবম-দশম শ্রেণীতেও ঠিক তেমনই রহিয়াছে; একটুও বাড়ে নাই। মজরে পড়ার মত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য-বান ছেলে স্কুলে এখন আর একটুও দেখিতে পাই না।

একে ত দেখের এইরূপ অবস্থা—তাহার উপর সকলকেই প্রায় সারা বৎসরেই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে দেখি। কাহারও

দেহে রক্ত নাই, মুখে প্রফুল্লতা নাই, চোখে জীবনের স্ফোতি নাই। এই সব ছেলের স্বাস্থ্যের ভিত্তি হলো তিন-চার রকমের ব্যবস্থা আছে। পেটের ভাত জীর্ণ হইতে না হইতে তাহাদিগকে অবাঞ্ছিতকিন দেওয়া; গ্রীষ্মের বিপ্রহর রৌদ্রে দাঁড় করা ইয়াও তাহাদিগকে ড়িল করান; ফুটবল, ক্রিকেট খেলান; তাহাদের রক্তহীন দেহে বৎসরে দু'চারবার অন্তঃ কলেরা বসন্তের টিকা দেওয়া। যবে বসিয়া বুঝি—ইহাতে বলবান ছেলেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে—স্কুলে বসিয়া বুঝিতে পাই না।

ইহার উপর ছেলেদের পুষ্টিকের বোকা তাহাদের দেহের ওজনের অপেক্ষাও বেশী। তাহা ছাড়া বছরে তিনবার পরীক্ষা, স্কুল স্পোর্টস্, ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্, লীগ, হকি—কত কি, মরণ করিতেও শীড়া বোঝ হয়। সর্বোপরি ভয়াবহ ব্যাপার—এই সব ছেলের নৈতিক চরিত্রের অধোগতি। শহরের সিনেমা-গুলি এই অধোগতির পক্ষে প্রধান সহায়ক হইতেছে। ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে আত্মকাল বীভৎস ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্তৃপক্ষ ইহাদিগকে পাস করাইবে না। ডিপার্টমেন্ট ইহাদের স্কুল তুলিয়া দিবে। ইহাদের কিছু আসে যায় না। ইহারা কারিগরী বিদ্যা শিখিবে না। ইহারা চারু করিতে পারিবে না। ইহারা কি করিবে তাহা জানে না। ইহারা কি চারু—তাহাও ইহারা বলিতে পারে না। আমি শিক্ষক, আমি জানি ইহারা খাদ্য চারু। সকলেই বলিবেন—ইহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

ইহাদিগকে কাহারও গুলি করিয়া মারিতে চারু? ইহাদের উপর কেন এত জুলুম? ইহাদিগকে খাটিয়া খাইতে বলিবার কাহার অধিকার? সন্তানের ক্ষুধা কাহারও বুঝিবেন? সন্তান খাদ্য চাহিলে কোন্ পিতামাতা তাহাকে খাটিয়া খাইতে বলিবেন? জাতীয় সরকারের অনাধ্যক্ষ বিজ্ঞানের কি প্রয়োজন? এই সব বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা দেশের হাজির সংখ্যা অপেক্ষাও বেশী। তাহাদের পাদ্যের বহু প্রয়োজন। তাহাদের বসন-ভূষণের আশু প্রয়োজন। দেশের হাজির সে প্রয়োজন মিটাইবে না। অবিলম্বে সমস্ত বিভাগ তুলিয়া দিয়া তাহারা চাষে নামুন। সম্মুখে বর্ষা।

স্কুলের পরিদর্শক আছেন। প্রতি বৎসর একবার করিয়া স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। স্বাধীনতা-লাভের পর তাহাও না আসিলে চলে দেখিতেছি। তাহারা আসিয়া স্কুলের হিসাব-পত্র দেখেন। ক্লাসে গিয়া—শিক্ষক পড়াইতে থাকিলে ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন, ছাত্রেরা পড়া বলিতে থাকিলে শিক্ষককে পড়াইতে বলেন। স্কুল কমিটির মেম্বরগণ যবে বসিয়া সংবাদ রাখেন—কোন শিক্ষক কয়টি টিউটনি করিতেছেন, কোন শিক্ষকের কবে স্কুলে পৌছিতে হ'মিনিট বিলম্ব

হইতেছে। প্রধান শিক্ষক তদারক করেম—শিক্ষকেরা দাঁড়াইয়া আছেন কিনা। কোন্ ছেলে কতটুকু ঘুম খাইতে পাইতেছে, কোন্ ছেলে মাজ চারিটি ভাত খাইয়া স্কুলে আসিতে পাইতেছে না, কোন্ ছেলে চারিটি ভাত পাইতেছে ত একটু ভাল পাইতেছে না, কোন্ ছেলের একটি করিয়া ছিন্ন হাক প্যাট হাক সার্ট বৈ দুইটি করিয়া নাই, এ সব সংবাদ কাহাকেও লইতে দেখি নাই। ছেলেদের শীর্ণ মলিন মুখের দিকে চাহিয়া কাহারও মুখমণ্ডলে বেদনার আভাস ফুটিয়া উঠিল দেখিলাম না। আমার পুত্র আছে, কন্যা আছে। আমি তাহাদের খাওয়া-পানীয় কথা আগে ভাবি। আমি বলি—আগে তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, লেখাপড়া পরে হইবে। এই সব ছেলে আগে চারিটি খাইয়া-দাইয়া বাঁচিয়া থাকুক, লেখাপড়া তাহাদের পরে হইবে—ইহা বলিবার কি আজ বদদেশে কেহ নাই?

চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে একবার এক সরকারী অনাথ আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে অনাথ ছেলেমেয়েদের চারি বেলা খাবারের ব্যবস্থা দেখিয়া অরাক হইয়াছিলাম। দুধ, মি, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারী, ভাত, ডাল, রুটি প্রচুর। সকলেরই গোলগাল চেহারা। কাহারও হাড় বা শিরা বাহির হইয়া নাই। আমার আগেকার সহকর্মী হ'একজন সেখানে চাকরি করিতেছেন দেখিলাম। তাহাদেরও খাইয়া-দাইয়া সুপুষ্ট চেহারা হইয়া গিয়াছে। সেখানে ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা না হইতেই বোপার বাড়ী যায়। সেখানে ডাক্তার আছে, মেয়ে ডাক্তার আছে, ডিসপেনসারি আছে। সেখানে ভাত আছে, তীতি দিয়া কাপড় বুনান হয়। আরও কত কি আছে সেখানে। আমাদের সব স্কুলে নাই কেন? অনাথ ছেলেমেয়েদের কত ব্যয় করিবার নিমিত্ত এত অর্থ তো সরকার পাইয়া থাকেন। এই অর্থ তাহাদের নিকট হইতে আদায় হয় আমাদের স্কুলের ছেলেরা তাহাদের সন্তান। আমাদের স্কুলের ছেলেরা একবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পার না। দেড় গজ প্যাটের কাপড়ের জুতা তাহাদিগকে খালি পেটে, শুষ্ক মুখে কণ্ট্রোল আপিসে ছুটিতে হয়। কণ্ট্রোল অফিসার বমকাইয়া তাড়াইয়া দেন।

খাজ ইহাদের চাই। প্রচুর খাজ চাই। খাজে ইহাদিগকে ডুবাওয়া রাখিতে হইবে। ছেলে ইচ্ছায় খাইবে; হাঁসের মত খাইবে, কেলাইবে, ছড়াইবে—তবে তাহারা সুস্থ-সবল থাকিবে। আমার বারণা ছিল দুর্বল ছেলেকে অধিক খাজ দিলে তাহার কতি করা হয়। এখন সে বারণা গিয়াছে। আমার বলবান ছেলেও মারা গিয়াছে। আমার এমন ছেলে—যাহার প্রতি মুহূর্তে যত্নভর করিয়াছি সেও রৌক করিয়া খাইয়া-দাইয়া, এমন কি রোগে কুপথ্য করিয়াও সুস্থ-সবল হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। ছেলের ক্ষুধা নাই অথচ তাহাকে খোর করিয়া খাওয়াইলেই তাহার কতি করা হয়।

• হুর্কল পিভামাতার হুর্কল ছেলেও অধিক খাও পাইলে সুখ-
সবল হয়। বহু দিন হইতেই বাঙালীর খাও নাই। প্রকৃতপক্ষে
আজীবন ‘খাও চাই’ ‘খাও চাই’ বলিয়া চীৎকার করিয়া
গিয়াছেন। আজ বাঙালী মাঝেই হুর্কল। বাঙালীর
ছেলেমাও হুর্কল। হুর্কল পিভামাতার হুর্কল ছেলেমেয়ে
বলিয়া আচ্ছন্ন বাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চান, আমি
বলি তাঁহারা সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিপরায়ণ। তাঁহারা
জাতির শত্রু। কোথায় কিসের দিকে দৃষ্টি দিয়া, কি
দেখিয়া তাঁহারা বাঙালীর কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতেছেন?
আজীবন বাঙালীর সহস্র সহস্র ছেলের মাকে থাকিয়া, আত্মিও
বাঙালীর সহস্র সহস্র ছেলের যত্নমলিন মুখের দিকে চাহিয়া
আমি দেখিতেছি বাঙালী ডুবিয়াছে। নিভাস্ত দরিদ্র পিতা-
মাতাও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের পেট তরিয়্যে খাওয়াইতেছেন,
আজীবন দেখিয়াছি। আজ বাঙালীর ছেলেমেয়েদের খাও
নাই। বাঙালী মরিয়াছে।

বাঙালীর খাও নাই—ইহা সত্য। অধিক খাও উৎপন্ন
করিতে হইবে—ইহাও সত্য। কিন্তু বাঙালীর ছেলেমেয়েদের
প্রচুর খাও দিবার মত খাও বাংলাদেশে নাই—ইহা সত্য নয়।
বাংলার ছেলেমেয়েদের যুগের এস কাহারা কাড়িয়া
খাইতেছে? হুলের ছেলেমেয়েরাই যদি না খাইতে পাইয়া
মরিল তবে শিক্ষা-সংস্কারের কি প্রয়োজন? কিসের জড়ই
বা শিক্ষাদপ্তর, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাবিভাগ? ছেলেদের বেতন
বাড়াইয়া, শিক্ষকের বেতন-বাটী টাকা, মাসগি তাতা, পাচ
টাকার ব্যয়সা করিয়া, সরকারী স্কুল, বেসরকারী স্কুলের
প্রভেদ রাখিয়া, প্রথম শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে
বিভেদ সৃষ্টিপূর্বক, আপনা হইতে বহু স্কুল উঠিয়া যাইবার—
খাটতি সাহায্যের বাজি খেলিলেই কিছু জাতিগঠন হইল না।
শিক্ষকদের ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সরকারের দরদ আমরা
কতকটা বুঝিয়া লইয়াছি।

শিক্ষকদের খাদ্যের কথা ভাবিতে গিয়া সকলেই অনেক
কটুক্তি করিলেন—ভুলিলাম। শিক্ষকদের পেট তরিয়্যে।
এখন শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার পালা চলিয়াছে। ইহাতেও
শিক্ষকেরা কৃতজ্ঞ। শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিতে সকলেই চায়।
শিক্ষকের ব্যক্তিও নিজেদের কম জানী মনে করে না। ইহা
স্বাভাবিক। একটা মাকড়সার নিকট হইতেও শিক্ষকেরা
শিক্ষালাভ করিতে প্রস্তুত। সবই চলিতে থাকুক। কিন্তু

অবিলম্বে যে সকলের—হুলের ছেলেদের উপর দরদের
প্রয়োজন, পুঙ্খকতার প্রতি-পিভামাতার বৈরুপ দরদ থাকে।
হুলের ছাত্রছাত্রীদের উপর বাঁহাদের দরদ নাই তাঁহাদের শিক্ষা
বিভাগে থাকা উচিত নয়। পিতা-মাতা প্রভৃতি পুঙ্খকতার যুগ
দেখিয়া তাহাদের শরীরের রানি বুঝেন। শিক্ষার গলদ
বুঝেন না।

বাঁহারা বলেন, চাকরী না পাইয়া লোকে শিক্ষকতা গ্রহণ
করে, তাঁহারা স্কুল বলেন। চাকরী না পাইয়া বাঁহারা
শিক্ষকতা গ্রহণ করেন তাঁহারা শিক্ষাবিভাগে বেশী দিন
থাকিতে পারেন না। দশ বৎসর শিক্ষকতা করিলে মাহুয
অপদাৰ্ণ হইয়া যায় বাঁহারা বলেন, তাঁহারা শিক্ষকদের
দায়িত্বের কথা বুঝেন না। শিক্ষকতা করা সহজ নয়। আত্মীয়-
বন্ধন, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিতে হইবে; চিরদারিদ্র্য বরণ
করিতে হইবে; অপমান, লাঞ্ছনা অঙ্গের আভরণ হইবে;
অবজ্ঞা সর্বদা চারিদিকে উদ্ভত রহিবে; সমাজের কোনও
অংশে তাঁহাদের এতটুকু স্থান রহিবে না; রাজ্যের কোনও
কার্যে তাঁহাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হইবে না; আজীবন জ্ঞান-
সমুদ্রের কূলে বসিয়া তাঁহাদিগকে উপলব্ধও কড়াইতে হইবে;
সেকি সহজ কথা। অশিক্ষককে ট্রেনিং দিয়া অশিক্ষক করা
যায় না, বরং শিক্ষককে অবসর দিয়াও শিক্ষার উন্নতি হয় না।
শিক্ষার উন্নতি কিসে হয় শিক্ষকেরা জানেন। আজীবন শিশুর
মধ্যে থাকিয়া বাঁহাদিগকে শিশু হইয়া যাইতে হয় তাঁহারা
জাতিগঠন করিতে জানেন না ত কাহারা জানেন? সে সব
প্রশ্নই আজ শিক্ষকদিগের নিকট বড় প্রশ্ন নয়। শিক্ষকদিগের
খাদ্যাভাবের প্রশ্নও আজ আর তাঁহাদের নিকট বড় প্রশ্ন নয়।
ছাত্রদিগের জীবনের প্রশ্নই আজ তাঁহাদের নিকট সবচেয়ে
বড় প্রশ্ন। জাতি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে সাবধান হইতে
হইবে।

আমি সরকারী স্কুলের শিক্ষক নই। সরকারী স্কুলের
শিক্ষকেরা হয়ত ইহার বিপরীত বলিবেন। সরকারী স্কুলের
সবই ঠিক থাকিতে হইবে। সরকারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীও নাকি
বড় লোকের ছেলে। বড়লোক বাঙালীই বা আজ কে
আছেন? খাদ্যই বা কোথায়? বাংলাদেশের স্কুলের ছাত্র-
মাঝেই সব মধ্যবিত্ত সম্ভ্রদারের ছেলে। বাংলার মধ্যবিত্ত
সম্ভ্রদার ডুবিতেছে। বাঙালীর স্কুলের ছেলেমেয়েরাও মরিতে
বসিয়াছে—ইহার প্রতিকার চাই।



দেবানন্দ

শ্রীনীমাধব চৌধুরী

১

কেলের মেঘাদ শেষ হইবার কয়েকদিন আগে দেবানন্দ স্থির করিয়াছিল কেল হইতে বাহির হইয়া সে রাজনগর যাইবে। তাহার আবাস্য বন্ধু ইন্ডের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ হওয়াতে তাহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। সে ব্যাকুল-হইয়াছিল তাহাদের দুই জনকে দেখিবার জন্য।

ছাড়া পাইবার দুই দিন আগে পিতার পত্র আসিল। পত্রে তিনি তাহাকে সোজা তাঁহার কর্মস্থানে চলিয়া আসিবার জন্য লিখিয়াছেন। অগত্যা মনের ইচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে পিতার কর্মস্থানে রওনা হইতে হইল।

দেবানন্দ আসিয়া পৌঁছিল। তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী কেল-প্রত্যগত পুঞ্জের গা হইতে জামা খুলিয়া লইয়া জীবানন্দ অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলেন। পিতার ঘুরের ভাব দেখিয়া দেবানন্দ মনে মনে হাসিয়া বলিল—আমি কেল তালই ছিলাম বাবা।

জীবানন্দ বলিলেন—চেহারা দেখে কেমন ছিলে কিছু বুঝতে পারছি। এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম কর। তার পর কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হবে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা, পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে।

দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল রাজনগরে যাইবার কথা পিতাকে এখনই বলিবে কিনা।

জীবানন্দ বলিলেন—তুমি এত দিন যে সকল কারণে পড়া-শুনায় অবহেলা করেছ সে সম্বন্ধে এখন আর কিছু বলা নিরর্থক। কতি যা হবার হয়েছে। তবে সর্বদা একটা কথা মনে রেখ। তোমাকে লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে হবে। ইন্ডের মত তোমার বিস্তৃত জমিদারী নেই যে বলে থাকে। একতর তোমার কাজের স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কুচিত করতে হবে।

পিতা ইন্ডের কথা ভোলায় সুযোগ পাইয়া দেবানন্দ বলিল, কলকাতা যদি যেতে হয়—আমি কয়েকটা দিন রাজনগরে কেন ঘুরে আসি না বাবা? যা কি আমার কথা কিছু লেখেন নি?

জীবানন্দ পুত্রকে এখন রাজনগরে পাঠাইতে অনিচ্ছুক। তাঁহার স্ত্রী জিন্মনী লিখিয়াছিলেন—“দেবু শীঘ্র খালাস হবে। সে যেন একবার রাজনগরে আসে। তাকে দেখবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।—উত্তরে জীবানন্দ সংক্ষেপে জ্ঞানাইলেন—দেবু পরে রাজনগরে যাবে। ইন্ডকে সংসারে

আটকাবার জন্য অনেক কষ্টে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে, দেবুকে রাজনগরে পাঠাতে চাই না এখন। কি জানি তার সংস্পর্শে ইন্ড যদি আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার বাপ মা নেই, কে তাকে ঠেকাবে? সংসারে মন বশুক ওর, পরে দেবু রাজনগরে যাবে।

পুঞ্জের কাছে এত কথা না তাকিয়া তিনি বলিলেন—তা লিখেছেন। আমি জানিয়েছি এখন আর রাজনগরে গিয়ে দেবুর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। একেবারে পরীক্ষা দিয়ে যাবে।

দেবানন্দ নিরাশ হইল, কিন্তু পিতার কথার প্রতিবাদ করিল না।

ট্রান্সকার সার্টিকিটের জন্য ও কলেজে স্থান পাওয়া যাইবে কিনা জানিবার জন্য কলিকাতার পত্র লেখা হইল। সাত আট দিন লাগিল উত্তর আসিলে। উত্তর আসিলে স্থির হইল দেবানন্দ কলিকাতার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়া কলেজে ভর্তি হইবে এবং হষ্টেলে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবে।

শিয়ালদহে পৌঁছিয়া ট্রেনের বাহিরে যাইবার পথে পিছন হইতে হঠাৎ কে দেবানন্দকে জড়াইয়া বলিল।

চমকিয়া দেবানন্দ পিছন ফিরিয়া দেখিল মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র বলিল—তুই কোথায় চলেছিস দেবু?

দেবানন্দ—তুই যাচ্ছিস কোথায়?

মহেন্দ্র বলিল যে, সে কলেজে ভর্তি হইয়া পটলভাঙ্গার কলেজ হষ্টেলে স্থান পাইয়াছে। তাহার এক আত্মীয় সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দেবানন্দ হষ্টেলে থাকিবে শুনিয়া মহেন্দ্র তাহাকে আড়াল না। বলিল, চল, আমার হষ্টেলে উঠবি। তিন মাস কেল যেটেইস, রায় বাহাদুরের ছেলে হলেও সরকারী কলেজে ভরগা পাবি না, কেন মিহিমিহি ঘুরে মরবি? তার চেয়ে আমার কলেজে ভর্তি হয়ে যা। তা হলে দু'জন এক সঙ্গে থাকতে পারব।

কুলির মাথার মোটবার্ট চাপাইয়া দুই বন্ধু পটলভাঙ্গার মহেন্দ্রের হষ্টেলে গিয়া উঠিল।

সেই দিনই দুপুরে দেবানন্দ কলেজে ভর্তি হইল। হষ্টেলের একটি ঘরে দুইটি সীট খালি ছিল। সেখানে তাহার স্থান পাইল।

হষ্টেলের যে ঘরটিকে দেবানন্দ ও মহেন্দ্র অধিকার করিল, সে ঘরে ভবেশ বলিয়া একটি ছেলে থাকিত। ভবেশ তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র। সে বড়লোকের ছেলে, অত্যন্ত বাবু-মাহুষ। তাহার দুই মাথা কলিকাতার থাকেন। একজন

ব্যারিষ্টার ও অল্পজন ডাক্তার। হঠেলে তাহার যথেষ্ট খাতির। কমেজেও তাহার প্রতিপত্তি আছে ভাল বক্তা ও ছাত্রনেতা বলিয়া। হঠেলের সকলে জানিত বি-এ পাস করিয়া সে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাতে যাইবে।

আলাপ হইবার পরে দেবানন্দ ও মহেন্দ্র গুনিয়া আনন্দিত হইল যে ভবেশ এটি-সারকুলার সোসাইটির উলটিয়ার হইয়া কনফারেন্সের সময় বরিশাল গিয়াছিল। তিন জনের মধ্যে শ্রীহই বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

দেবানন্দ ভবেশের যত ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইতে লাগিল তত মুগ্ধ হইল। পাঠ্য পুস্তকে বিশেষ অমুহুর্তি না থাকিলেও ভবেশ নানা রকমের বই, বেশীর ভাগ ইতিহাস ও রাজনীতির বই পড়িত। সে বড় বড় নেতাদের সঙ্গে মিশিত, বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিত, এটি-সারকুলার সোসাইটির জন্য বহু পরিশ্রম করিত। তাহার সমস্ত কাজের মধ্যে এমন একটি আন্তরিকতার সুর ছিল যে দেবানন্দের তাহাকে বড় ভাল লাগিল। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল কতকটা স্নেহপ্রবণ অঙ্গ ও অঙ্গগত। ছোট ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কের মত।

কলিকাতায় আসিয়া দেবানন্দ বাংলার প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে স্থান লাভ করিল। শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা তখন স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার উদ্বেল। পার্কে পার্কে প্রতিদিন সভা চলিতেছে। সভায় স্বদেশী গ্রন্থ ও বিলাতী রজ্জ্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা হইতেছে, ফুলারী দমননীতির প্রতিবাদ করিতেছেন বড় বড় নেতারা। সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন গরম গরম প্রবন্ধ, দেশের নানা স্থানে সভা-সমিতি ও দমননীতির সংবাদ পরিবেশন করিতেছে। সহরের বুদ্ধিবী-সমাজে, ছাত্রমহলে উত্তেজনার স্রোত বহিতেছে।

দেবানন্দ কয়েকদিন পার্কে পার্কে ঘুরিয়া বক্তৃতা শুনিয়া রেড়াইল। সন্ধ্যার সময় হঠেলে ফিরিলে ভর্ক-বিভর্ক সুর হইল। অল্প ঘর হইতে ছেলেরা আসিয়া ভবেশের ঘরে বসিত ও আলোচনার যোগ দিত। কিছু কাল এই ভাবে চলিবার পর দেবানন্দের খামকটা বিরক্তি করিয়া আসিল। সে আবিলা—এখানে দেখছি ছেলেরা সবাই কেবল লড়া-চণ্ডা কথা বলে, কাজ কেহ করে না এক ভবেশ-না ছাড়া। বক্তৃতায় প্রত্যেকটি ছেলে যেন হরেক্ষণে ব্যানার্জির, বিপিনচন্দ্র পালের কুজ এক একটি সংকরণ। কিন্তু মিঠা ও আন্তরিকতা তাহার ও মধ্যে দেখা যায় না। সান্ত্ব আড্ডা ও ভর্ক-বিভর্কের অল্প পড়া-শুনা করা হয় না।

আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সে ভবেশকে বলিল, ভবেশ-না, রোজ বক্তৃতার চোটে আমার হাঁক ধরে গেছে। সন্ধ্যাবেলার আড্ডাটা বন্ধ করুন।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—চট করে বন্ধ করা যাবে না, তবে আমি চেষ্টা করব। এবার চল একদিন এটি-সারকুলার সোসাইটির সভায় নিয়োগ যাই।

ভবেশের সঙ্গে সোসাইটির সভায় কয়েক দিন ঘুরিয়া সোসাইটির কাজের ব্যাখ্যা সে লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার মন সন্তুষ্ট হয় নাই। সে আবিলা বরিশাল কনফারেন্সের পরেও এই ধরনের কাজে কিছু ফল হইবে বলিয়া ইহারা এখনও বিশ্বাস রাখেন। আশ্চর্য্য বটে। ভবেশ তাহার মনের ভাব কিছু বুঝিল। কয়েক দিন পরে সে বলিল—দেবু, ছেলেরদের ভর্ক-বিভর্ক রোজ শুনছ, এবার বড় দলের মানে নেতৃস্থানীয়দের আলোচনা একটু শোনা ভাল। কাল আমার ছোট মামা ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের বাড়ীতে যাবার কথা আছে। আমার সঙ্গে যাবে?

ব্যারিষ্টারের কথা শুনিয়া দেবানন্দ যাইতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। বলিল—আমি পাড়াগেঁষে মানুষ, তাঁদের অপরিচিত। আমাকে বাদ দিন ভবেশ-না।

ভবেশ ছাড়িল না। বলিল—এত সঙ্কোচ কিসের? কি ধরনের আলাপ হয় তাঁদের মধ্যে চুপ করে শুনে যাবে। আমার মামা মিঃ রায় অনেক কাগজে ইংরেজীতে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন। ছাত্রমহলে তাঁর কিছু প্রতিপত্তি আছে। ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে তিনি উৎসুক।...

ভবেশের অহরোধে দেবানন্দকে তাহার সঙ্গে চক্রেবড়ে রোডে মিঃ রায়ের গৃহে যাইতে হইল।

ফটক, লন ও পাড়ীবারান্দাওয়ালা বৃহৎ অটালিকা। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী। আদালী, বুর, বাবুটি, খানসামা, আদ্যা সবই যথারীতি আছে—ইংরেজী কায়দার ডাইনিং রুম, ড্রিং রুম, বিলিয়ার্ড রুম, টেনিস লন, ব্রেক-ফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার সে গৃহের ব্যবস্থা। স্বদেশী রীতির মধ্যে প্রণামটার চল আছে। পারদামা ও ড্রেসিং গাউন পরিহিত মোটা চুকট হাতে ব্যারিষ্টার সাহেবকে দেবানন্দ বন্ধুর ইদিতে প্রণাম করিল। ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—“এটি কে ভবেশ?” ভবেশ বলিল—“আমার বন্ধু সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র, নুতন এসেছে। এর বাবা রায়বাহাদুর, পুলিশের ডি-এস-পি।”

“তাই নাকি? বেশ, বেশ। ভেতরে আলাপ করিয়ে দিও। ভেরী গ্যাড-টু মিট ইউ (তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তারি পূর্ণি হলাম)। তোমার বাবা রায়বাহাদুর ডি-এস-পি? বেশ, বেশ। বোয়! বোয়!”

বয় আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন—বাবুকো সেলাম দো।

ভবেশ দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। মিঃ রায় বলিলেন—বাই দি বাই, ওহে ভবেশ,

আজকের বেদনী ও ইভিয়ান মিররে আমার দুটো আর্টকেল
বেরিয়েছে। কলেজে তোমার বন্ধুদের পড়ে শুনিও।

ভবেশ বলিল—আচ্ছা।

দেবানন্দকে লইয়া ভবেশ উপরে উঠিল। পালিশ করা
কাঠের সিঁড়ি, মারফানে কার্পেট বিছানো। সিঁড়ির মাথার
বহর পনের একটি সুতী, ডামবর্ণ মেয়ে বিছনি দোলাইয়া কি
একটা গানের সুর ভাঁজিতেছিল। ভবেশের সঙ্গে অপরিচিত
একটি ছেলেকে উপরে আসিতে দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া জি
কুঁচকাইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। উপরে উঠিয়া ভবেশ বলিল—
শুভ মর্নিং কিটি। মামী-মা কোথায় রে? কিটি বলিল, শুভ
মর্নিং।—কুঁচকানো জর নীচের চোখ ঘুমাইয়া ইদিতে সে যে
প্রশ্ন করিল, তার মানে এ আবার কোন আনাড়ীকে নিয়ে
এসেছ? ভবেশ এই ইদিতের জবাব না দিয়া দেবানন্দকে
লইয়া ডাইনিরুমে বসাইল।

দেবানন্দ এই প্রথম তখনকার দিনের বিতশালী ব্যারিষ্টারের
বাসভবনের ডাইনিরুমে প্রবেশ করিল। ঘরের আসবাব ও
সাজাইবার কায়দা দেখিয়া সে বিম্মিত হইল। তাহার ঠিক
লম্বুখে দেয়ালে মহারাজা ভিক্টোরিয়ার প্রকাণ্ড অয়েল পেটিং।
অন্ত দিকের দেয়ালে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের ছবি। ঘরের
কোণগুলিতে কাল পাথরের তেপারার উপরে রূপালি ক্রেমে
বাঁধা ছোট ছোট ছবি, অনেকগুলি বিলাতী দৃশ্যের, কতকগুলি
পরিবারের লোকজনের।

তাহাকে বসাইয়া রাবিয়া ভবেশ অল্প কক্ষে গিয়াছিল।
কিছুক্ষণ পরে এক জন মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে লইয়া
সে ঘরে ঢুকিল। বলিল—দেবানন্দ, মামী-মাকে প্রণাম কর।
দেবানন্দ প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার
বাবা রায় বাহাদুর ডি-এস-পি? বিলাত গেলে তুমি এস.পি.
হতে পারবে। তোমাকে দেশে ভবেশ চটপটে বুজিমান
হলে বলে মনে হয়। আমার বাবাও রায় বাহাদুর, তিনি
একজিকিউটিভ সার্ভিসে ছিলেন। আমার দুই ভাই, এক জন
জুডিশিয়াল সার্ভিসে, এক জন খাটালের এস.ডি.ও.।
গবর্ণমেন্ট সার্ভিসে যাবে, না ভবেশের মত ব্যারিষ্টারী পড়বার
ইচ্ছে তোমার? তোমার বাবা যদি রাজী হন এক-এ পাশ
করেও যেতে পার। উনি গ্রেজ ইনের নামকরা ছাত্র ছিলেন,
সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

দেবানন্দ দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। তিনি
বলিলেন—বোন, দাঁড়িয়ে কেন? ওরে কিটি শোন দেখি।

কিটি জি কুঁচকাইয়া এক হাতে বিছনি টানিতে টানিতে
ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে চাহিয়া মিসেস রায়
বলিলেন—কি অসভ্যতা হচ্ছে কিটি, বিছনি ছেড়ে দাও।
চোখ মিটমিট করছ কেন? সভ্য হয়ে বস এখানে।
ভবেশদাদার নুতন বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ কর এর বাবা

গবর্ণমেন্ট সার্ভিসের লোক, রায় বাহাদুর। ইচ্ছে করলে
হেলেকে বিলেত পাঠাতে পারেন।

কিটি বলিল—তুমি বিলেত যাবে সত্যি? টেবিলে বেতে
জান? না এখনও হাত দিয়ে মেখে বাও?

ভবেশ—আমি ত হঠেলে হাত দিয়ে মেখে ডাল-তাঁত খাই
কিটি।

কিটি—তোমার কথা আলাদা। তুমি খাঁটি বড় লোক।
তা হাড়া সত্যি সত্যি বিলেত যাক।—দেবানন্দের দিকে
ফিরিয়া সে বলিল—তোমাদের বাড়ীতে বাবুটি আদ্য আছে।

দেবানন্দ কিটির বয়সের মেয়ের এই বয়সের কথাবার্তার
কৌতুক বোধ করিতেছিল। যত হাসিয়া সে বলিল—আমরা
বাবুটির হাতে খাই না।

কিটি দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—বাবুটির হাতে
খাও না? এঃ, বলছ কি গো? ওমা, মা, শুনছ—

কিটির মা অত্যন্ত গিয়াছিলেন। কিটির বক্তব্য শেষ হইল
না।

দেবানন্দ অত্যন্ত অবগতি বোধ করিল। সে ভবেশকে
বলিল—আপনি বোধ হয় এবেলা এখানে থাকবেন। আমি
হঠেলে ফিরি?

কিটি এক লাফে উঠিয়া দেবানন্দের হাত চাপিয়া বলিল।
বলিল—রাস হ'ল বুঝি? বস, বস, মা তোমাকে না খাইয়ে
যেতে দেবেন ভেবেছ? বাবুটির রান্না ময়, মিষ্টি খেতে
দেবেন। তোমরা মিষ্টি খেতে খুব ভালবাস, না? আমরা
খাই কেক, পুডিং, স্কাউটইচ। হাজার চাইলেও মা আবখ্যার
বেনী রসগোল্লা দেবেন না আমাকে। বিলিটা কাক পেলেই
রসগোল্লা চুরি করে বেয়ে দেয়। বিলিকে জান? আমার
ছোট ভাই।

বয় আসিয়া জানাইল মেমসাহেব খানা-কামরার
ডাকিতেছেন।

জলযোগ সারিয়া হঠেলে ফিরিবার সময়ে দেবানন্দ
ভবেশকে বলিল—কই, আপনার আমার বাড়ীতে রাজনীতি
চর্চা শুভলভ না।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—রাজনীতি চর্চা হয় সন্ধ্যার পরে।
আর এক দিন তোমাকে নিয়ে বাবু, তখন শুনবে—আজ শুধু
পরিচয় করিয়ে দিলাম। সাক্ষ্য আড্ডার অনেক আসেন। খুব
তর্ক-বিতর্ক হয়, তুলন উদ্ভেদনার ব্যপ্তি হয় কোন কোন দিন।

ভবেশ আশিত সন্ধ্যার পরে এই আড্ডার শেষের দিকে
উপস্থিত সকলের মেজাজ কোমল ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে।
মিসেস রায় নিজে কথাবার্তা কম বলেন যতক্ষণ পলিটিকাল
আলোচনা চলে। শেষের দিকে আলোচনা রাজনীতি ছাড়িয়া
বরোয়া হইয়া উঠে। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্র,
বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতা, নাচ, গলক, শিকার, এডভেঞ্চার,

ইংরেজী ও কন্নড় সাহিত্য ইত্যাদি আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। দলের মধ্যে মিঃ গাঙ্গুলী বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু ধর রাখেন। তিনি জরদেব ও তারুচন্দ্র হইতে আশ্রয় করেন, সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে শ্লোক পর্য্যন্ত মুগ্ধ বসেন। ভবেশ আজ্ঞার শেষের দিকে বড় থাকে নাই। সে শুনিয়াছে এই সময়ে আজ্ঞা খুব জমিয়া উঠে।

২

কয়েকদিন পরে বিকালের দিকে ভবেশ দেবানন্দকে বলিল—আজ চক্রবেড়ে যাছি। তুমি যাবি?

দেবানন্দ—আজ ছাত্রসমূহের চক্রবর্তী ও মৌলভী লিঙ্কও হোসেন নাকি গোলদীঘিতে বক্তৃতা দেবেন। সেখানে যাবার ইচ্ছে আছে।

ভবেশ—বক্তৃতা রোজ হচ্ছে, গেলেই হ'ল। আজ মামাবাবুর ওখানেও সভা আছে। ছোট লাট—ভূপেন বোস, জে চৌধুরী ও সুরেন্দ্র বাঁড়ুজেকে ডেকে নাকি ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে খুব বসকেছেন, শুধু বসেই। কি ব্যাপার হয়েছে শোনবার ইচ্ছে আছে।

সেদিনকার অভিজ্ঞতা দেবানন্দের মনে খোঁচাইতেছিল।

তাহার মনে হইল একটা ক্রিম, আলাদা ভগতে উহার বাস করে। সে ভগতের সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ নাই। সে বাইবার উৎসাহ প্রকাশ করিল না।

ভবেশ—আজকের দিন চুণ। তোকে নিয়ে যাবার জন্তে কিট আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে। না নিয়ে গেলে বেয়ে ফেলবে। বাইরে থেকে দেখতে ওর ধরণ-ধারণ ওরকম হলেও ওর মনটা খুব ভাল।

কিটির আগ্রহের কথা শুনিয়া দেবানন্দ একটু আশ্চর্য হইল, কথটা সে বিশ্বাস করিল না।

ভবেশ নিজের মনে বলিয়া চলিল—মম গভর্নমেন্টের কাছে পড়ে, বাবুজির দ্বারা অধ্যাদ্য ধায়, আবার কার কাছে নাকি শিবপুজা শিখেছে। ও একটা অভূত যেরে ওদের সার্কুলে। ওর বদেখী গান শোনাও একদিন। বেশ ভাল গাইতে পারে।

ভবেশ এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করিবার পর দেবানন্দকে রাজী হইতে হইল। কিটির শিবপুজা করিবার কথা শুনিয়া তাহার লক্ষীর কথা মনে পড়িল। কিটকে শিবপুজা করিতে শিখাইল কে?

চক্রবেড়ে পৌঁছিতে ভবেশদের একটু দেরী হইয়া গেল। ব্যারিষ্টার সাহেবের নীচের বলিবার ঘরে ভখন আসর জাঁকিয়া উঠিয়াছে। দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভবেশ ঘরের এককোণে ছুইখানা চেয়ার অবিকার করিল। কেহ তাহাদের লক্ষ্য করিল না।

আলোচনা চলিতেছিল বদেখী আন্দোলনের অবস্থা সম্বন্ধে।

মিঃ দ্বায় বলিলেন—মাজোরারী চেয়ার ম্যান্চেস্তারে টেলিগ্রাম করেছে বিলাতী কাপড় বিক্রী হচ্ছে না, তারা কনট্রাক্ট করতে পারবে না। ম্যান্চেস্তার থেকে তাদের সহপা-
দেশ দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে তার করা হয়েছে, আবার চেষ্টা হচ্ছে দেশী মিলগুলোর সব কাপড় কিনে কেলে যাতে বাজার হাভের মধ্যে আনা যায়।

মিঃ গাঙ্গুলী—আর একটা চেষ্টাও হচ্ছে। ম্যান্চেস্তারের কাপড়ে দেশী মিলের ছাপ দিয়ে মাজোরারীদের হাতে দেওয়া হচ্ছে। তারা দেশী বলে সেই কাপড় চালাচ্ছে। ব্যাপার বরা পড়াতে হৈ চৈ আরম্ভ হয়েছে।

মিঃ গোহ—ইংলিসম্যান গবর্ণমেন্টকে বলেছে, ষ্ট্রাইক এট দি ফ্রট অব দি এজিটেশন (আন্দোলনের গোষ্ঠীর আঘাত কর)। আবার ভয় দেখিয়েছে, আমাদের বৈর্যচ্যুতি হ'ল বলে।

মিঃ মিটার হাভের সিগারেট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—উহ, হ'ল বলে নয়, হয়েছে। কলকাতার ইউরোপীয়ানরা সেবর-র্যাটলিং (ভরোয়াল ঘুরাইতে) আরম্ভ করেছে। বলেছে পঞ্চাশ বছর সুরবারি ধাপবদ্ধ ছিল এবার ধাপ থেকে বের করতে হবে।

মিঃ গোহ—শুনলাম ক্লাইভ স্ট্রিটের মার্কেটের আপিসের কেরাণীদের ভাক (বরখাস্ত) করবে বলে ভয় দেখিয়েছে।

মিঃ মিটার—ছোটলাট ফ্রেন্ডারের মিটিঙে কি হ'ল শুনেছেন?

মিঃ দ্বায়—মিটিং হ'ল কোথায়? মিঃ বস্তুকে ছোটলাট বললেন আপনি ও আপনার বন্ধুরা মিলে ছাত্রদের খেপিয়ে ভুলছেন কেন? মিঃ বস্তু বললেন—আমরা কিছু করি নি, ছাত্রদের খেপিয়েছে গবর্ণমেন্ট। ছোটলাট বললেন, কড়া রিপ্রেসিড মেজার (উগ্র দমননীতি) নিয়ে তিনি সবাইকে চিট্ করবেন। মিঃ বস্তু আর কোন কথা না বলে চলে এলেন।

মিঃ মিটার—মিঃ সুরেন্দ্র ক্যানার্কিও পুলিশ কমিশনারকে টিক এই কথা বলেছেন।

মিঃ গাঙ্গুলী—আজ 'বায়' শুনলাম পুলিশ কমিশনারের ইলিতে করপোরেশন নতুন বাই-ল (উপবিধি) পাশ করছে পাবলিক কোয়ার ও পার্কে মিটিং বন্ধ করার জন্য।

মিঃ ডাটা উত্তেজিতভাবে বলিলেন—করুক, আমরা ফুট-পাথে মিটিং করব। এ বাই-ল পাশ করানো বড় সহজ হবে না।

মিঃ গোহ শিকা বিভাগের ডিরেক্টর পেডলারের লয়ালটি সারসুলারের কথা তুলিলেন। বলিলেন, টেক্সট বইয়ের

মধ্যে দিয়ে রাজতন্ত্র শেরবার নির্দেশ দিয়েছেন মিঃ পেডলার।
তখনই হাজি ও মাষ্টারদের বয়সকট মিটিয়ে বাওয়া নিয়ন্ত্র করে
নুতন একটা সারকুলার বেরুচ্ছে।

মিঃ ডাটা—মিটিয়ে বাওয়া বন্ধ করে সারকুলার বের
করলে সব হেলে রাজতন্ত্র হয়ে যাবে। দি আইডিয়া।
তখনই তনু ওয়ার্ডের হুল-কলেজের ছেলেরা মিলে সেদিন এক-
রাশ বিলিভী কাগজ ও চিনি কিনে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে
দিয়েছে।

মিঃ গেই—ইংলিশম্যান বলেছে, মুসলমান ও মাডোয়ারীরা
বাঙালীদের উপর তারি চটে গিয়েছে এই বদেশী আন্দোলন
চালাবার জন্যে।

মিঃ মিটার—সব মুসলমান চটে মিঃ পার্টিশন
(দেশবিভাগ) আর বদেশী নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে করেকটি
দল দেখা যাচ্ছে। এক দল খোলাখুলি বলছেন লর্ড কার্জন
মুসলমানপ্রধান নুতন একটা প্রদেশ সৃষ্টি করে মুসলমানদের
উপকার করেছেন। কিন্তু তাঁদেরই আর এক দল বলছেন,
পার্টিশন মুসলমানদের ক্ষতি করবে, গোটা বাঙালী জাতকে
চূর্বল করবে। এরা বদেশীর সমর্থন করছেন। একটা দল
বলছেন, শিকার অংশের হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার
মুসলমানেরা চাকরি পাচ্ছিল না। পার্টিশনের কলে মুসলমান-
দের চাকরির সুবিধে হবে। হোলতান কাগজখানা খোলা-
খুলি বলছে যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের শত্রু, শুধু মুসল-
মানদের বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়া দরকার নিজেদের
আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্যে।

দেবানন্দ মনোযোগ দিয়া এই আলোচনা শুনিতেছিল।
আলোচনা তাহার মন্দ লাগিতেছিল না, কিন্তু সে ভাবিতেছিল
—ইহারা নিজেরা কি করিতেছেন সে বিষয়ে ত কিছুই বলিতে-
ছেন না। তাহার ভাব দেখিয়া ভবেশ উঠিবার ইচ্ছা করিল।
সে উঠিতেছিল, মিঃ গেইর কথা শুনিয়া আবার বলিয়া
পড়িল।

মিঃ গেই—“সোনার বাংলা” লিকলেটে নিয়ে ‘পায়োবীর’
‘ইংলিশম্যান’ ও ‘বাকী’ এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো খুব
শাসাতে আরম্ভ করেছে বাঙালীদের। বেসলী খোলাখুলি
বলছে—এটা এংলো-ইণ্ডিয়ান কমিউনিটির কীর্তি।

মিঃ মিটার—“গিভ দি ডগ এ ব্যাড নেম বিফর বিটিং ইট”
—ইংরেজের এটা চিরকালের অভ্যাস। এদিকে আবার এলেকট্র
প্রোটোকটের দল সন্ত্রস্তি কাজে মেমেছে। আমার এক
আত্মীয় বললেন, সেদিন গোল দীঘিতে ইউরোপীয়ান পোশাকে
একজন লোক ইংরেজীতে বক্তৃতা দিচ্ছে—ইংরেজরা আমাদের
শত্রু, তাঁদের মার। তাদের ভাড়িয়ে দাও। এ দেশ থেকে
—কাছেই পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে চূপ করে। এতে
সহজেই লোকের সন্দেহ হয়। যে-কোন ছুতোয় একটা পোল-

মাল বাধিয়ে দিয়ে বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা দৃষ্টমণীতি
চালাতে গবর্ণমেন্টকে বাধ্য করতে চায় এংলো-ইণ্ডিয়ানরা।

মিঃ গাজুলী—একটা মহার ব্যাপার বলছি শুধুন। বিহারে
বদেশী প্রচার করবার জন্যে বাঙালী ছেলেরা একটা নুতন
ট্যাকটিক্স (কৌশল) নিয়েছে। রাত-বাটে, হাটে-বাড়ারে
কাগজের একটা স্লিপ লোকের হাতে দিয়ে বাঙালী ছেলেরা
সরে পড়ে। স্লিপে লেখা থাকে—বদেশী ক্রিসিস ব্যবহার
করুন। তার নীচে ইনষ্ট্রাকশন (উপদেশ), “এই স্লিপের
সাহায্যে কপি করে আপনার সাত জন বন্ধুর মধ্যে বিতরণ
করুন। না করলে এক লক্ষ গোল ও ব্রাহ্মণ বধের পাশ
আপনাকে লাগবে।” বদেশীর জন্যে যাদের কোন উৎসাহ নেই,
পাপের ভয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে বদেশী প্রচারের কাজ করে
থাকে। আচ্ছা বুদ্ধি বের করেছে বটে।

মিঃ গাজুলীর গল্প শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন।
পর্দা সরাইয়া সৌম্যবৃত্তি, কিতকটি সাহেবি পোশাক-পরা,
হাতে সিগার একজন ডব্ললোক ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, শুভ
ইভনিং রায়, শুভ ইভনিং অল অস-ইউ।

ভবেশ শিয়রের দেবানন্দকে বলিল, ইনিই ডক্টর চক্রবর্তী
যার কথা ভোকে একদিন বলেছিলাম।

দেবানন্দের মনে পড়িল ভবেশ একদিন তাহার মামার বন্ধু
ব্যারিষ্টার ডক্টর চক্রবর্তীর কথা বলিয়াছিল বটে। বলিয়াছিল,
তাঁহার অগার পাণ্ডিত্যের জন্যে সমব্যবসায়ীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা
করেন, তাঁহার বারাল স্পষ্টবাদিতার জন্যে একটু ভয়ও করেন।
ডঃ চক্রবর্তী আসন এগণ করিলে ভবেশ দেবানন্দসহ
তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, নমস্কার ভয়, কেমন আছেন?

ডঃ চক্রবর্তী বাঁ হাতে সিগার মুখ হইতে সরাইয়া করমর্দন
করিয়া বলিলেন, কে ভবেশ? ধবর ভাল শু?

ভবেশ দেবানন্দের পরিচয় করিয়া দিয়া বলিল, আমার
বন্ধু, জিলিয়ার্ট ষ্টুডেন্ট (ভোখোড় ছাত্র) ও একটু (সজিহ)
বদেশীওয়াল।

ডঃ চক্রবর্তী—তেরি গ্যাড টু মিট ইউ (তোমাদের সঙ্গে
দেখা হয়ে তারি খুশী হলাম)। বসো তোমরা।

ভবেশ ও দেবানন্দ ছইখানা চেয়ার ডঃ চক্রবর্তীর কাছে
সরাইয়া লইয়া বলিল।

মিঃ ডাটা ও মিঃ গাজুলী বরিশালে হাজিদিগকে বেজ-
প্রহারের কথা বলিতেছিলেন।

মিঃ ডাটা বলিলেন—ইংরেজরা নিজেদের সত্য জাত বলে
পর্ক করে। বরিশালের মত এট্রোসাস (অত্যাচারহীনক)
ব্যাপারের কথা কেউ কখনও শুনেছে?

মিঃ গাজুলী—গবর্ণমেন্ট বোম্ব হয় ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজের
বন্দে মাতরমের ব্যাখ্যা যেনে নিয়েছে। বন্দে মাতরম নামে
বাইও এণ্ড বীট, বাণো আর মারো।

ডঃ চক্রবর্তী উচ্চ হাচ করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তেরি গুড ট্রান্সেলেশান আই মাষ্ট সে (এ কথা বলতেই হবে যে তারি চমৎকার অনুবাদ হয়েছে)। বাইও এও বীট। পাছে আমরা তাদের মার লাগাই সেই ভয়ে তারা আগে থেকে আমাদের মার লাগাতে শুরু করেছে।

ফুলারের এন্টি-বদেশী সারফুলারের কথা উঠিল। মিঃ ডাটা বলিলেন, ফুলারের ফেলেরা বদেশী মিটিঙে যোগ দিলে মাষ্টার-মের স্পেশাল কনেটবল নিযুক্ত করা হবে। দি ফানি আইডিয়া। পড়ানো বন্ধ করে দিয়ে মাষ্টাররা স্পাইগিরি করুক আর কি।

ডঃ চক্রবর্তী—মেতার কিয়ার। পূর্ববদ ও আসামে ফুলার ও লায়ন, পশ্চিমবদে ফ্রেকার ও কারলাইল আর গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ায় হারবার্ট রিজলে—দে আর ডুইং এ গুড টীম ওয়ার্ক (এরা একসঙ্গে বেশ কাজ করছে)। এদের সঙ্গে আছে নন্দী-ভূদীর দল, বরিশাল ও রংপুরের এমার্শন, মৈমনসিংয়ের টম্পসন ও ক্লার্ক। এখানে কারলাইল কর্মান জারি করছে ফুল-কলেজের মাষ্টার ও অধ্যাপকদের উপর, ওখানে করছে ফুলার ও লায়ন।

ডঃ চক্রবর্তী হাতের সিগার এস-ট্রেতে রাখিয়া সোজা হইয়া বলিলেন। দেবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা বদেশী আন্দোলন করে ইংরেজের ভাত মারবার দ্বন্দ্ব হাত বাড়িয়েছ। তোমাদের সিলি কাগজগুলো বলছে, বদেশী মানে “রিতাইভ্যাল অব ইণ্ডিজেনাস ইণ্ডাস্ট্রিজ” (দিশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন), এটা ত এন্টি-ব্রিটিশ আন্দোলন নয়। অতএব গবর্ণমেন্টের উচিত বদেশীর সাহায্য করা। তাই শুনে লর্ড মির্টো বললেন, বদেশীর উপর আমার বড় সিম্প্যাথি (দরদ)। ব্যস, কিন্তু ফুলারও বলে উঠলেন—আমারও।

ভিনি এস-ট্রে উপর হইতে সিগারট তুলিয়া লইলেন। অশ্রমনরূপে করেকবার সিগারট টানিলেন। আবার উহা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, পার্টিশনের বিরুদ্ধে আবেদন, নিবেদন, সভা-সমিতি চলল। ইংরেজ মনে করল, বাঙালীবাদুর দল একটা আর্টফিসিয়াল (কৃত্রিম) আন্দোলন পাকিয়ে তুলছে। সভা-সমিতি করে যখন কিছু হ’ল না, তখন বয়কট ও বদেশী আরম্ভ হ’ল। ইংরেজ শাসকেরা অপেক্ষা করতে লাগল। আন্দোলন যত দেশময় ছড়াত্তে লাগল তত তাদের লো কুফিত ও চক্ষু রক্তবর্ণ হতে লাগল। ইতিহাসে ভীক ও অকুশল্য বলে বর্ণিত বাঙালী যদি ইংরেজের ব্যবসারে আঘাত করবে তবে তারা এদেশে এসেছে কেন? কিসের দ্বন্দ্ব পর্জীক, ওলন্দাজ, ফরাসীদের সঙ্গে এত লড়াই করে তাদের হাত থেকে ভারতীয় বাণিজ্য কেড়ে নিয়ে তাদের বাড়িয়েছে?

ডক্তর চক্রবর্তী একটু চুপ করিয়া কণকাল কি

ভাবিলেন, তারপর আবার শুরু করিলেন—ইংরেজ এদেশের বাণিজ্যে একচেটে অধিকার লাভ করবার দ্বন্দ্ব রাজ্য বিভার করেছে। এদেশের বস্ত্র-শিল্প, মো-শিল্প ধ্বংস করে ম্যাক্কেটার ও ল্যাক্সারারের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্মচার অপ-প্রয়োগ করে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য করারও করেছে। আজ বিলিভী পণ্য বর্জন করে ইংরেজের এত সাধের বাণিজ্যে আঘাত করতে বাঙালী বন্ধপরিবর। এটা কি বরদাস্ত করা যায়।...বয়কট বন্ধ করবার দ্বন্দ্ব আইন পাস করতে হয় মাস মেগে ঘাটবে। এ ছয় মাসে ইংলিশ ট্রেড উড বি ডেড (ইংরেজের বাণিজ্য খণ্ডম হয়ে যাবে)। তাই ফুলার কর্মচারীদের উপদেশ দিয়েছে “hammer them until they come to their senses.” (সুস্থি না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীদের হাড়ভী পেটা করতে থাক)। এই শু নবে কলির সন্ধ্যা।

ডঃ চক্রবর্তী আবার সিগার ধরাইলেন। ঘরের সকলে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া ভিনি হাসিলেন। ভবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়া ভিনি বলিলেন, ডোর্ট গেট ফারি মাই ফ্রেন্ডস। (দাবড়ে যেও না) ভিনি মিঃ রায়ের দিকে ইলিভপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। মিঃ রায় ডাকিলেন—বোয়। বোয়।

ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

উপরে উঠিবার সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠিয়া ভবেশ ডাকিল, কিট। কিট।

সিঁড়ির পাশের ঘরে কিট তখন যেম গভর্নমেন্টের কাছে পড়িতেছিল। ভবেশের ডাক শুনিয়া—“প্রিন্স এক্সকিউজ মি” (আমার মাপ করুন) বলিয়া ঘর হইতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। ভবেশের সঙ্গে দেবানন্দকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার একটু লজ্জা হইল। ইহার কারণ সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। সে ধমকিয়া দাঁড়াইল। কিটর লজ্জা নুতন জ্বিনিল। ভবেশ উহা লক্ষ্য করিল। কিট বড় চালাক মেয়ে। নিজের লজ্জিত ভাব ঢাকিবার দ্বন্দ্ব তখনই সে কলরব করিয়া উঠিল। বলিল, গুড ইভনিং ভবেশ-দা, গুড ইভনিং ভবেশদার ফ্রেন্ড (বন্ধু)। ভবেশ-দা, এই তোমার বিকেলে আসা? জান না এখন গল্প করতে বসলে গভর্নমেন্ট মার কাছে লাগাবে—কিট নট গার্ল (কিট ছটু মেয়ে)। গল্প পেলে আর পড়াতে মন দেয় না।

ভবেশ—দেবী হয়ে গেল রে। নীচে আলোচনা শুনছিলাম।

কিট অভিমান করিল। বলিল, ঐ ছাই আলোচনা শুনতে গিয়ে যদি ঘরে আমার পড়বার সময়টিতে ওপরে এলে?

ভবেশ—তুই পড় গিয়ে। আমরা এখন যাই। আসছে রবিবার আসব।

কিট—রবিবার সকালে এখানে থাকে ভবেশ-না? আমি মাকে বলে রাখব? কিড—

ভবেশ তাহার ইচ্ছান্ততঃ করিবার কারণ বুঝিল। সে দেবানন্দকে ধাইতে বলিতে চাহে। তাহাদের বাড়ীর বাবুটির দ্বারা দেবানন্দ ধাইবে কি না তাহার সন্দেহ হইল। দেবানন্দ ধাইবে না ভবেশ জানিত। তাই বলিল—সকালে ত আসতে পারব না কিট। অনেক কাজ আছে। বিকেলের দিকে আসব।

কিট নিজের বিহুনি টানিতে টানিতে বলিল—তুমি একাই আসবে ত ভবেশ-না?

ভবেশ হাসিল। বলিল—দেবানন্দের সেদিন বিড়ম্ব কোয়ারের মিটিঙে বক্তৃতা দেবার কথা আছে। ও ত আসতে পারবে না।

কিট ছই চোখ কপালে তুলিয়া দেবানন্দের কাছে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল—মিটিঙে মিঃ ডাটার মত স্পীচ দেবে তুমি? স্পীচ দিতে পার তুমি?

একটু ধামিয়া কিট আবার বলিল, আচ্ছা তা হলে শনিবার এস ভবেশ-না। আমি একটা নুতন বদেশী গান শিখেছি, তোমাদের শোনাব।

ভবেশ—আচ্ছা দেখব। দেবুর সহজে সময় হয় না আবার।

কিট—ওর বুঝি ভাল লাগে না আমাদের বাড়ী আসতে?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—সে কথা ওকেই জিজ্ঞেস কর না।

কিটর জ্ঞ কুঞ্চিত হইল। বলিল—আমার বয়ে গেছে জিজ্ঞেস করতে। ভাল লাগে না—আমি কি বুঝি না?

কিটর এই অভিমান দেবানন্দের ভাল লাগিল। কোম কথা না বলিয়া সে মুহু হাসিল।

হঠাৎ কিরিবার পথে ডক্টর চক্রবর্তীর সহজে আলাপ হইল দুই জনের মধ্যে। ভবেশ বলিল—ডক্টর চক্রবর্তী অসাধারণ পণ্ডিত। তাহার সাধারণ কথাবার্তার রস আছে, কিন্তু এই রস অনেক সময়ে ভিজ-মুহুর। অনেকের তাই অপছন্দ। এক বার তাঁকে উত্তেজিত করতে পারলে জানবার মত অনেক কথা অনর্গল তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

দেবানন্দ—বাঙালীদের কি কি দোষের কথা তিনি বলতে গিয়ে ধেম গেলেন?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—তুমি লক্ষ্য করেছিস দেখছি। ডক্টর চক্রবর্তী বলেন কতগুলো জিনিস বাঙালীকে দমিয়ে রেখেছে। সুবিধে পেলেই তিনি সেগুলোকে আক্রমণ করেন।

ভবেশ—বাঙালী জাতির স্বভাবগত ত্রুটি সহজে ডক্টর চক্রবর্তীর অভিমত দেবানন্দকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিল।

বাড়ী কিরিয়া সে রাখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেবানন্দের মুখ আসিল না। এলোমেলোভাবে ডক্টর চক্রবর্তীর বক্তৃতার কথা ভাবিতে লাগিল। বুঝাইয়া পড়িবার আগে সে শুনি কিটি বলিতেছে—এ বাড়ী আসতে ওর বুঝি ভাল লাগে না? নিজের মনে উত্তর হইল—কিট আছে, কাছেই ভাল লাগে।

ক্রমশঃ

স্রষ্টব্য:—এখানি নুতন উপভাস। গত সংখ্যার আশ্রমে 'ক্রমশঃ' ছাপা হইয়াছে।—সম্পাদক, 'প্রবাসী'

প্রভাত

ত্রিশূরীর গুপ্ত

স্রষ্টার সারসে তব ওগো মহাকবি,
অবগাহি' উত্তীর্ণ এ স্তম্ভ প্রভাতে;
মুগ্ধ হোলো মোর মন; রবি-রশ্মি-পাতে
হেরিলাম বিশ্বলোকে নন্দনের ছবি।
নারিকেল-রূপারির শোভন শাখার
আলো-হারা দ্বারা বোনে; নদীজল-বারা
বাজাইরা 'নারদের' স্নিগ্ধ একতারা।

গ্রাম-প্রান্ত উদাসিনী প্রবাহিয়া যায়;
পাখীরা কুজন করে; অলস আক্লাদ
অভীভের 'আরণ্যক' জীবনের স্বাদ
ঘনাইয়া আনে মনে; হে মহিমময়,
জীবনে—জগতে জানি রয়েছে সজাত
অন্ধকার—অবিচার; তবু এ প্রভাত
সমস্ত ছাপারে প্রাণে জাগায় বিশ্বয়।

ভারতীয় দর্শন মহাসভা—পুণা অধিবেশন

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

ভারতীয় দর্শন মহাসভার ষড়বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের অন্যতম ঐতিহাসিক নগরী পুণাতে হইয়া গিয়াছে। অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কাণ্ডসন কলেজের ওয়াদিয়া মন্দিরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅমূলচন্দ্র হুথোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনের কার্য সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সঙ্গীতকলানিধি শ্রীকুরাণ্ড কুলমন্ডিকর উদ্বোধন-সঙ্গীত ও উপাসনা সমাপন করিবার পর পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এম. আর. জয়াকর মহাসভার প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পরে মহাসভার অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক এন. এ. নিকম দেশবিদেশের দর্শনানুসারী মনীষীদের প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী এন. ভি. গ্যাডগিল মহোদয় সভায় বরণ্য অভিধ্বনি উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির উপাধ্যক্ষ দানবীর শ্রীপ্রতাপ শেঠী তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলে পর তিনি এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। 'জগতের পুনর্গঠনে দর্শনের দান' বিষয়ে তিনি একটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান হতাশা ও ছরবছার কথা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে সব বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ-বিসম্বাদ দৃষ্ট হয় তাহার উল্লেখ করেন। দার্শনিক দৃষ্টিতে এ সকল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তিনি দার্শনিকদের নিকট আবেদন জানান। রাজনীতি, সমাজনীতি ও বর্ষজগতে যে সব বিক্ষুব্ধ মত ও পথ আজ মানুষের মনকে আন্দোলিত ও বহুবিভক্ত করিয়াছে তাহাদের সমন্বয়-সাধন এবং এক উদার মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন—দার্শনিকগণ তাহাদের চিন্তা-ধারা ও কর্ম ধারা এই গুরুত্বব্যা পালন করিতে পারিবেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় 'মানবীয় ব্যক্তিত্ব' (Human Personality) সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। অবশেষে মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া সকলকে বক্তব্য দেন।

প্রথম দিনের অপরাহ্নকালীন অধিবেশনে 'প্রাচ্য ও পশ্চাত্য দেশের মানুষের স্বরূপের প্রত্যয় ও শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি' বিষয়ে এক আলোচনা-সভা হয়। ইহাতে ইউনেস্কো'র (unesco) পক্ষ হইতে মি: জ্যাকেস হাবে এবং ভারতীয় দর্শন মহাসভার পক্ষ হইতে মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, ডা: ইন্ড্র সেন, জে এন চাব, মহাদেবন, অধ্যাপক ওয়াদিয়া, বর্তমান লেখক

প্রভৃতি যোগদান করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা মানুষের শিক্ষাদীক্ষার তাহার আধ্যাত্মিক স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার এবং প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মধ্যে বর্ধ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক ওয়াদিয়া এস পি কলেজে 'বর্ধনীরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন' (The Philosophy of a Secular State) সম্বন্ধে জনসাধারণের উপযোগী একটি বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে 'দর্শনের ইতিহাস শাখা'র সভাপতি অধ্যাপক আর. রামানুজাচারী এবং ম্যার ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখার সভাপতি ড: কালিদাস ভট্টাচার্য্য দুইটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহার পর অভিভাষণকে দর্শন বলা যায় কি না' (Is Existentialism Philosophy?) এই সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা হয়। ইহাতে ড: রাস-সিহারা দাস, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, এন. এ. নিকম তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন এবং অপরাপর প্রতিনিধিরা আলোচনায় যোগদান করেন। বৈকালে মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, দর্শনের ইতিহাস এবং জ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখাগুলির পৃথক অধিবেশন হয়। এগুলিতে দর্শনের অনেক নূতন তথ্য বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। তাহার পর এস পি কলেজে সাধারণের জন্য 'দর্শন ও জীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ড: কল্যাণী মল্লিক, মহাদেবন, মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া প্রভৃতি প্রতিনিধিরা এ সকল বক্তৃতা দেন। এইদিনকার দুইটি প্রমোদ-অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। তাহার একটি হইতেছে স্থানীয় শরীরচর্চা কলেজে মহারাষ্ট্র মণ্ডলের সত্যদেব ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রদর্শন। ইহাতে পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকা হইতে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকেরা যে ক্রীড়ানৈপুণ্য ও ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করেন তাহা দর্শকদের মনে যুগপৎ আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিয়াছিল। রাত্রিতে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্য ও গীতের সঙ্কে মার্চকাফারে উপস্থিতদের এখিদের ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ এবং সোফ্রেটিস ও ক্রিটোর কথোপকথন উপস্থিত সকলের চিত্তবিনোদন করে।

শেষ দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে 'মনোবিজ্ঞান শাখা'র সভাপতি ড: বি. এল. আন্ড্রেস এবং 'সমাজবিজ্ঞান শাখা'র সভাপতি অধ্যাপক এস. ভি. দাওকর তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর এক বিভক্ত-সভার 'নিরীখর বর্ধ সম্ভব কি না?' এই প্রশ্নের আলোচনা হয়। ইহাতে অধ্যাপক আর. পি. সিং, এম. আর. কুলকারণী প্রভৃতি যোগদান করেন। বৈকালে পূর্বদিনের মত শাখাসভাগুলির অধিবেশনে অনেক

তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। তাহার পর ত্রিমতী প্রেমলোলাবাই জি-ঠাকরুণী তাঁহার যাববেদ্য “পর্ণকুটীরে” মহাসভার প্রতিনিবিশদের এক প্রীতিতোজে আদর-আপ্যায়ন করেন। সর্বলোকবরেণ্য ভারত-পুরুষ মহাত্মা গান্ধীর শ্রুতি-বিজড়িত এই মনোরম “পর্ণকুটীর” দর্শনে সকলের মনে এক অপূর্ণ তাবের সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যায় এস পি কলেজে ‘এক বিশ্ব-জমীন দর্শনের সম্ভাব্যতা’ বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা হয়। মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, অধ্যাপক বি. এল. আক্কেয়, ডঃ মহাদেবন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এরূপ

দর্শনের বীজ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বেদ ও উপনিষদে নিহিত আছে। বৈদিক ঋষি মানব-সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগে উদাত্ত হয়ে গাহিয়াছিলেন—‘একং সদ্বিপ্রা বহুয়া বদন্তি’। ইহাই দর্শননিচয়ের মহাসময়ের মহামন্ত্র এবং এক উদার বিশ্বজনীন দার্শনিক মতবাদের মূল সূত্র।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে ভারতীয় দর্শন মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসে মহীশূরে হইবে। দর্শন মহাসভার রক্ত জয়ন্তী আরও এত দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নূতন কথা

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত অত্যন্তম। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যত দূর পর্য্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল আর কাহারও সময়েই ততদূর ছিল না। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি স্বকীয় শৌর্যবীর্যাদির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইহা অহুমান করা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে, এই কারণেই তাঁহার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনের অনেক দাবিদারকে বঞ্চিত করিয়া সমুদ্রগুপ্তকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বস্তুতঃ তিনি সম্রাট হইবার পূর্বেই কোভবংশীয় কোন নৃপতিকে এবং অচ্যুত ও নাগসেনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন—ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁহার দ্বিজজন্ম-বর্ণনা আরম্ভের পূর্বেই ‘উপরোক্ত নৃপতিদ্বিগকে তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন’ ইহা লিপিবদ্ধ করিবার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নহে—‘উপরোক্ত নৃপতিদ্বিগকে তিনি সম্রাট হইবার পূর্বেই (অর্থাৎ তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়) এবং মহেন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিদের, সম্রাট হইবার পর পরাস্ত করিয়াছিলেন’ ইহা বুঝান হাড়া। দাক্ষিণাত্যের বিজিত নরপতিগণের মধ্যেই ত কোভবংশীয় নরপতির নাম উল্লেখ করা চলিত। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলে এখনও কোভজাতির অস্তিত্ব আছে। (*Indian Antiquary* vol. III.) উত্তরাপথের বিজিত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে হরিষেণ তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে পারিভেদ। পূর্ব পঞ্জাব, দিল্লী অঞ্চলে কোভসামাজিত কিছু যুজা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা ঐ অঞ্চলেই রাজত্ব করিতেন। *Journal of Bihar and Orissa Research Society*-র এক সংখ্যায় কোভবংশীরেরা পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেন এবং সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদের পরাস্ত করিয়া পাটলিপুত্রে অধিকার করেন,

এইরূপ লিখিত হয়। *Journal of Indian History*-র একটি সংখ্যাতেও ইহার সমর্থক মত আছে। কিন্তু ইহা স্মৃতিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এই মতকে যদি মানিতেই হয় তাহা হইলে বরঞ্চ পুষ্পপুরকে কাঞ্চকুজের সমার্থক ধরিয়া লওয়াই (হিউয়েন সাঙের মতে) ভাল; কারণ তাহা হইলে যুজার প্রাপ্তিস্থানের সহিত পুষ্পপুরের (কোভবংশীরের রাজ-বাহীর) স্থানগত বৈষম্য থাকে না। কিন্তু যুজারাক্স নাটকের দাক্ষ্য অম্বাষা পুষ্পপুরকে পাটলিপুত্রে বরাই ভাল (“তিদীস্রোবি অম্বুরকুৎসলয় হুদীঅং রিঅ হিঅঅং পুষ্পউরবাসী মণিআরসেধ বি চন্দনদাসোণাম”—যুজারাক্স প্রথমক)। তাহা হইলে তিনি পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিবার সময়ে কোভনৃপতি কর্তৃক আক্রান্ত হন—এই মতটাই প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেমন যে নিম্নলিখিত কথাটি বলিতেছেন, বিশেষ বুঝা গেল না। তিনি বলিতেছেন, “পুষ্পপুর” may denote পাটলিপুত্রে; but then we can hardly be definite about its connection with Samudragupta’s victory over the three kings.”

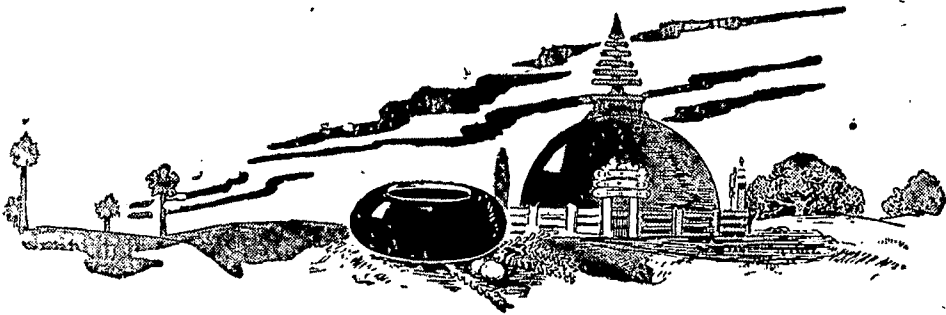
বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলার অন্তর্গত সোপার নামক স্থানের কাছাকাছি একটি শিলালিপিতে কোভ জাতির উল্লেখ আছে; এবং সাহারাপুরের কাদস যুজার কাদর উল্লেখ আছে। ডঃ ইন্ডাজীর মতে, এই দুই স্থানের যে-কোন একটিতে কোভজাতির অবস্থিতি ছিল; কিন্তু এই মত স্মৃতি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ পুষ্পপুর—হয় পাটলিপুত্রে না হয় কাঞ্চকুজ, এই দুইটির কোনটিই সাহারাপুর বা সোপারের নিকটবর্তী নহে। কোভবংশীর নৃপতিবৃন্দ যখনই রাজত্ব করুন না কেন, উত্তরাপথের বা দাক্ষিণাত্যের কিংবা প্রত্যন্ত নরপতি-

সিপের মধ্যে তাঁহাদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলিত, হরিষেণ ইচ্ছা করিয়াই তাহা করেন নাই। উহাদের মধ্যেই যদি কোতকুলক প্রভৃতি নৃপতির নামোল্লেখ করিতেন তাহা হইলে সমুদ্রগুপ্ত যে সিংহাসনাভিষিক্ত হইবার পূর্বেই বঁহাদের জয় করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইত না। বস্তুতঃ কোন কারণ ব্যতিরেকেই যে অল্প সকলকে বঞ্চিত করিয়া 'সমুদ্রগুপ্তই সিংহাসনে আরোহণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে' ইহা ঘোষণা করিবার মত নির্বুদ্ধিতা চন্দ্রগুপ্তের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহা ছাড়া, পৌর্যবীর্যাদির কথা বাদ দিলে অল্প সকল উত্তরাধিকারীই সমুদ্রগুপ্তের সমকক্ষ ছিলেন, তুল্য কুলক কথাটির লক্ষণার্থ তাহাই। সুতরাং অল্প সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকেই সম্রাট করা হইল কেন? তিনি যে ষোষ্ঠ পুত্র বা তৃতীয় অধিকারী ছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ তাহার বিপরীত প্রমাণই আছে। ষোষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের তৃতীয় অধিকারী। তিনি রাজা হইলে অসম্ভব জাতীয় মুখমণ্ডল নান হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। যে তৃতীয় অধিকারী নহে তাহার সিংহাসনপ্রাপ্তি দর্শনে অন্য সকলের মনে অবশ্যই কোতের সন্ধার হইতে পারে, চন্দ্রগুপ্তের এই অসম্ভব আচরণের কারণ কি? নিশ্চয়ই তিনি সমুদ্রগুপ্তের পরাক্রম দর্শনে বিশেষ খ্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 'কিন্তু তাঁহার জীবদশায় সমুদ্রগুপ্ত কখন পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, "বীরোধগুপ্তকে কেচিৎস্বরণমুপপত্তা স্বস্ত বৃত্তে প্রণামে", বা 'সংগ্রামে যুদ্ধবিজিতা নিত্যমুকাপকায়ঃ,'

এলাহাবাদ প্রশস্তির এই কথাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চন্দ্রগুপ্তের জীবদশায় সমুদ্রগুপ্তের বিপুল পরাক্রম চন্দ্রগুপ্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বস্তুতঃ উপরোক্ত বাক্যগুলি "একেন ঘেন কণাহুযুগ্মাচ্যুত নাগসেন গ * * * * * দটৌগ্রাহিতৈব কোত-কুলকং পুষ্পাস্থরে জীড়তা" এই পরবর্তী বাক্যের ভূমিকা বা আপেক্ষা মাত্র ইহা বলিলে বোধ হয় অসম্ভব হয় না।

অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কুমার অবস্থার যদি তিনি অচ্যুত ও নাগসেনকে পরাভূত করিয়া থাকেন তাহা হইলে পরবর্তী কালে আবার তিনি তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন কেন? এই নাগসেন ও অচ্যুত যে উত্তরাপথের বিজিত নাগসেন ও অচ্যুত হইলে তিনি এইসম্পর্কে তো কোন প্রমাণ নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রথমে পরাভূত হইয়া আবার হয়তো তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ভয়ে পরবর্তীকালে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দক্ষিণাপথের নৃপতি-বৃন্দকে পরাজিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে স্ব স্ব সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অথচ আর্ধ্যাবর্তের নরপতিবৃন্দের রাজ্য স্ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পক্ষে তো এই ব্যবহার-বৈষম্য শোভা পায় না। ইহার হেতুবশত বলা যাইতে পারে যে, হয়ত তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্তী বলিয়া উত্তরাপথের নৃপতিবৃন্দকর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া তিনি উত্তরাপথ স্ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই হেতুটি 'পরাক্রম', 'অধমেধপরাক্রম', 'কৃতান্তপরম-সর্বরাজোচ্ছেষ্তা' সমুদ্রগুপ্তের মনকে প্রমোদ্য নহে। দ্বিতীয় কারণটি এই হইতে পারে যে, কোনও কারণে তিনি আর্ধ্যাবর্তের কোন কোন নরপতির উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য আর্ধ্যাবর্তের কোন রাজ্যকেও বিধায় না করিয়া সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কি কারণে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবনের এক অধ্যায়ের নুতন আলোচনার স্বরূপাত্ত করিতেছে মাত্র; এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।



রঘুনাথ দত্ত

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী রঘুনাথ দত্ত মহাশয় গত ২০শে ফাল্গুন কলিকাতায় বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার কাগজের ব্যবসায় বিশেষরূপে কতিপয় হইল। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাহারাও তাঁহার অভাব গভীরভাবে অনুভব করিবেন।



রঘুনাথ দত্ত

রঘুনাথ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে বেনিয়াটোলার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত ভোলানাথ দত্ত ১৩৪, পুরাতন চীনাবাজারে যে কাগজের দোকান চালাইতেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না।

১৯০৪ সনে স্বদেশী যুগে দোকানে কাগজের চাপ বৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁহার পিতার আদেশক্রমে বিতালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার ব্যবসারে সুযোগ্য সহকারী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি তাঁহার দক্ষতা ও কর্মকুশলতার দ্বারা মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স নামক কাগজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন। ১৯০৮ সনে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির গুরুদায়িত্বভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাভ্যাসের সুযোগ তাঁহার হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে তিনি হাতে-কলমে নির্ভরযোগ্য শিক্ষালাভ করিয়া নিজ

অব্যবসায় ও কর্মনিপুণতার দ্বারা শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯১০ সনে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সন্মিলিত বোণায়োগ স্থাপন করেন। একটি জার্মান প্রতিষ্ঠান তাঁহার এই কার্যে বাধা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার অদম্য উৎসাহের নিকট বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের দুর্বলতাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং পরেও নানা বাত-প্রতিবাতের মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু রঘুনাথ সততার সহিত ও নির্ভীকভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালিত করিতে থাকেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার উন্নতিসাধন করেন। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধি, সততা ও কুশলতার সাক্ষ্যের এক সুসুন্দর কীর্তি ঘোষণা করে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির সুখ্যাতি ও সুরক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়। দত্ত মহাশয়ের সকল প্রচেষ্টা কেবল যে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই নিহিত ছিল তাহা নহে, অন্যান্য ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর সুনাম বৃদ্ধি করিতেও তিনি তৎপর হইয়াছিলেন।

তিনি রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স ও শ্রীহর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড টাইলিং মিলস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা পেপার ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, বেঙ্গল মিলওয়ান্স এসোসিয়েশন, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার, ক্যাম্পবেল হাসপাতাল, অবিনাশ স্মৃতি প্রমুখি ভবন, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ডে. এন. পাল কোম্পানী, হুগলী ইঙ্ক কোম্পানী, ষ্ট্যান্ডার্ড গেস্টনারী ম্যাচফ্যাকচারিং লিমিটেড, বাম্বা'লাইম এণ্ড কেমিক্যাল কোম্পানী প্রভৃতি বহু ব্যবসায়ী ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নিঃস্বার্থভাবে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানকে এবং দুঃস্থ ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অগ্রযুগে বিপ্লবীদের সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকিলেও গোপনে অর্থ ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করিয়া দেশের ও দশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন।

‘প্রবাসী’ ও ‘মডার্ন রিভিউ’ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিও রঘুনাথের গভীর অঙ্গুরাগ ছিল। বহু সময় বহু ব্যাপারে তাঁহার অনন্ত-শ্রমজ প্রীতি ও উদারতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সাহিত্য-সেবীদেরও তিনি নানাভাবে সহায়তা করিতে কৃটিত হইতেন না। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা আত্মীয়বিরোগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

পুস্তক পরিচয়

যাঁদের দেখেছি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। নিউ এজ পাবলিশার্স
লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা—১। মূল্য তিন টাকা।

জীবন-চরিত, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা বাংলা-সাহিত্যের একটা
অঙ্গ হিসাবে বহুদিন থেকে স্থান পেয়ে আসছে। কিন্তু এ তিনটির
সংমিশ্রণে সাহিত্যের পাঠে নতুন রসের পরিবেশন হেমেন্দ্রবাবুর রসালো ও
নিপুণ লেখনীতেই সম্ভব হয়েছে। হেমেন্দ্রবাবুর পুস্তকে আমরা যে শুধু
সাহিত্যের ও নাটকের ক্ষেত্রে মহারথীদিগের নতুন চিত্র, নতুন পরিচয়
পাই তাহা নয়, সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা খ্যাতি অর্জন
করেছেন, তাঁদের কয়েক জনেরও স্থলর আলোচ্য এই স্মৃতিচিত্রের মধ্যে
পাওয়া যায়।

এই বইয়ের যেমন একদিকে দেখি শরণ চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল,
মিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্রকে, তেমনি অন্মদিকে আমাদের সামনে একে-
বারে জীবন্ত হয়ে দাঁড়ান। ওস্তাদ করমভূঞা খাঁ, গায়ক জমীন্দার,
খেলোয়াড় শিবদাস ও অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এবং বিশেষভাবে উজ্জল
পরিচয় পাই বাংলার চিত্রকলার পুনর্জাগরণের অসুতম পথিকৃৎ এক জনের,
যাঁর কথা বাংলার লোকে ভুলতে বসেছে—তিনি রজনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক কথায় বলতে গেলে, হেমেন্দ্রবাবু বাংলার বিগত গৌরবময় যুগের
অনেক স্তম্ভগুলির পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর এই লেখার মধ্যে দিয়ে।
তবে ইতিহাস ও ঘটনার শুকনো শব্দকে তাঁর একান্ত নিজস্ব রসালো-
ক্ষমতার গুণে, ভাষার ও ভাবের ক্ষীরমধু যোগে, পরমানে পরিণত করেছেন
তিনি। পাঠক সকল দিক দিয়েই তৃপ্ত হবেন।

শ্রীকেন্দারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মন—শ্রীজীবনময় রায়। রজন পাবলিশিং হাউস।
মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক উৎসর্গে লিখিতেছেন, 'পরাদীনতার ভীত জালা যাঁদের প্রাণ
অগ্নিময় করে তুলেছিল, ...সেই সব যুত্মাশ্রয় ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে এই
গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।' হুতরাং বোকাই যায় যে, উপস্থাপন হইলেও বইখানি
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আংশিক চিত্র। গল্পটি প্রধানতঃ প্রেমের
গল্প, তবে নায়ক-নায়িকারা বা উপনায়ক-নায়িকারা কেহ কেহ স্বাধীনতা-
সংগ্রামের সহিত জড়িত। অনেকগুলি পুরুষ ও নারীর জীবনের জটিল
সমস্তা লইয়া গল্পাংশ রচিত। লেখক পাঠকদের কৌতুহল শেষ পর্যন্ত

অদ্বিতীয় লিভার টনিক

"কুমারেশ" লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে
আরোগ্য করে। অধিকন্তু রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য
পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন
কার্যেও সহায়তা করে। "কুমারেশ" লিভার ও পেটের
পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটা অদ্বিতীয়
লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

কুমারেশ

৭ সিল্ডারকে দুখ ও মতেজ
রাখে—



ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া * হাওড়া

ত পারিষাদেহন—ইহা তাঁহার কৃতিত্বের কথা। ঘটনাপরম্পরা সাধারণ চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার ভাষা বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছন্দগতি; যদিও কথ্যভাষায় গল্পটি লেখা, মাভিজাত্য আছে। আজকাল অনেক আধুনিক লেখকের গ্রাম্যতা এমন কি ইতরতা দোষদুষ্ট হইতে দেখা যায়, বর্তমান যার সমাজিক জীতে তাহার কোন স্পর্শ নাই। নারীচরিত্র-অগ্রগুণের সীমার চরিত্র যদিও অল্প সকলের চেয়ে ছোট তবু সে-ই সকলের অপেক্ষা বেশী টানে। বইখানিতে যেখানেই লিখলমে ছবি আঁকিয়াছেন, সেখানেই তাহা তাঁহার হাতের হইয়া উঠিয়াছে, তা সে বাঙালী বধু মালতীর ছবিই হউক কি আরই ছবিই হউক। বনজঙ্গলও তাঁহার হাতের স্পর্শ প্রাণ পাই-টির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা আর পাঁচ জন লেখকের চ গভ্যনুগতিক পন্থায় লিখিত নহে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ মারা আনিমিত হইয়াছি।

শ্রীশান্তা দেবী

গান্ধী ও ষ্টালিন—লুই ফিসার। অনুবাদক—শ্রীকমলা দত্ত। পার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ২৮২। মূল্য ১।

মার্কিন লেখক লুই ফিসারের নাম এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচিত নহে। মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও সাধনার আদর্শ তাঁহাকে

ভারতবর্ষে টানিয়া আনিয়াছিল। এই মহামানবের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বর্তমান সমস্তাবস্থার পৃথিবীর অনেক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। জগতে আজ বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক চিন্তা ও কর্মধারা প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার কোনটা হয়ত আপাতদৃষ্টিতে শুভ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরিণাম বিবেচনা করিয়া স্মৃতি ব্যক্তিরা এগুলিকে তাগ করিয়া আপাতকঠোর দুর্গম পথেই চলিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের ভালমন্দ সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের নিরিখেই নিরূপিত হওয়া উচিত। বিশ্ব-কল্যাণ ব্যক্তি ও জাতীয় কল্যাণেরই পূর্বতমাত্র।

এই অনুবাদ-গ্রন্থ চতুর্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে বর্তমান জগতের এক বা একাধিক সমস্যা লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগতায়িতা, জাতীয়তা এবং বিশ্বশান্তি এই আলোচনার মুখ্য বিষয়। গান্ধী ও ষ্টালিন বর্তমান যুগের এই দুই বিরাট পুরুষের আদর্শ এবং কর্ম-পদ্ধতি, বিচারের মানদণ্ড ও দূরদৃষ্টির মধ্যে যে কি বিরাট পার্থক্য, লেখকের আলোচনার তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক জন ক্ষীণকায় হইয়াও বিরাট নৈতিক ও আত্মিক শক্তির অধিকারী, আর একজন বাহ্যতঃ মহাশক্তিশালী হইয়াও নীতির মানদণ্ডে কতই না দুর্বল বলিয়া প্রতিভাত হন—সকলকে দাবাইয়া বড় হইবার কি বিরামহীন চেষ্টা তাঁহার। পৃথিবীর অস্তিত্ব সমাজের আদর্শের সঙ্গে ক্রমশঃ আদর্শের পার্থক্য কোন্‌খানে লেখক তাহা অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইতিহাসের নানা কালের নানা দেশের মনীষিগণের প্রচারিত উচ্চ



সৌন্দর্য্য বক্ষায় অপরিহার্য্য

শীতের কক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লালতা বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মের কোমলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। দিব্যভাগে, লাবণি স্নো ও রাড্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহার্য্য।

লোশন
স্নো ও ক্রীম

গ্যালকাটা কোসমিক্যাল



আদর্শকে রূপদানের অক্ষমতাই আজ রূপ কম্যুনিজমের জন্ম দিয়েছে। এই সকল আদর্শ আংশিকভাবেও সফল হইলে, বিশ্বমানবের মঙ্গলসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রণীয় প্রতিক্রিয়াশীল নৈতিক ভিত্তিহীন আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি একনায়কত্বের সহিত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। লেখকের মতে হিটলার ও ষ্টালিনের নীতির মধ্যে শ্রেয় কোনটিই নহে—তা একই মিথ্যার দুইটি দিক মাত্র। ইহারা উভয়েই পাশব শক্তির অন্ধ উপাসক, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়ের নিকট মূল্যহীন, উভয়েই নিজেকে, নিজের জাতিকে, নিজের চিন্তা ও কর্মধারাকে জোর করিয়া জগতের সকলের উপর চাপাইয়া দিতে বাঞ্ছ। আর মহাত্মা গান্ধীর নিরলস সাধনা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও বিশ্বমানবের মুক্তির জন্ত। সত্য তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলই তাঁহার একমাত্র কাম্য—ইহাই সকলকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারিবে। এ জন্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা গান্ধীজীর নিকট খুবই পবিত্র, জাতির স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তির ইহাই উৎস। ফাসীবাদী কিংবা কম্যুনিষ্ট এই দৃষ্টিভঙ্গীর মর্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

এই পুস্তকে সোভিয়েট ও হিটলারী আদর্শের বিশ্লেষণ পাঠকের চিন্তার ধোঁরাক যোগাইবে। বর্তমান জগতে গান্ধীবাদের সার্থকতা কোথায় তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইবে। অথচ লেখক বৈদান্তিক হিন্দু নহেন, খ্রীষ্টিয়ান, সোভিয়েটেরও শত্রু নহেন। পুস্তকের অনুবাদ হুঙ্গর হইয়াছে।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

কোণার্ক—জীবনকৃষ্ণ শেঠ। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দেড় টাকা।

এখানি কবিতা-পুস্তক। কুড়িটি কবিতায় বইখানি সম্পূর্ণ। জগন্নাথ,

ধর্মপদ, কোণার্ক হৃদয়মন্দির, শূন্যবেদী, লিয়াখিয়া—এই গজকবিতা কোণার্ক-সম্পর্কিত। অবশিষ্ট কবিতাগুলি ছন্দে রচিত।

‘কোণার্ক হৃদয়-মন্দিরে’ পাই—

‘চিরন্তনী মানুষের এই আলোক-সাধনা,
‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’।

এই বাণী মানুষের অন্তরাত্মার চিরকালের বাণী।
‘শবরী’তে আছে,

‘ধীরে ধীরে নীল মায়া উঠিল ছলিয়া,
ধীরে তার অভিনব হ’ল রূপান্তর...’

তাপনী, শবরীবালা উঠিল শিহরি
আনন্দ-প্রাপ্ত তনু। সন্মুখে শ্রীরাম
সুনীল নীল-রূপ নয়নাভিরাম।

‘তপস্তা’ সার্থক আজি।

‘প্রেম’ চতুর্দশপদী কবিতা,

‘এই তো প্রেমের রীতি,—হৃদয়বিষে ভরা
এ জগতে সত্য কিবা আছে তার আগে?’

‘অভ্যে’ আছে,

‘দুঃখের ভূমিকা’ পরে মানব-জীবন
শোভিছে নিকষশরী কনক-লিখন।’

‘লিয়াখিয়া’ পাই,

‘সোনার আলোক খলে ভরা বুক তার,
খেয়ালি জোয়ার তার, সোনালি-জোয়ার।...
লিয়াখিয়া অপরূপ নদী।

যাহারে সে খুঁজেছিল শেষেছে কি তারে?’

শেখদান, অপর্ণা, বুদ্ধদেব, ময়ূরাক্ষী, ধর্মপদ প্রভৃতি কবি পাঠকের মনে রেখাপাত করে। কবিতাগুলির মধ্যে আকর্ষণ ছন্দ সাবলীল। ‘কোণার্ক’ কাব্যমোদী পাঠকের চিত্তকে করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ

যুগবহি—জীগোতম সেন। পূর্বাচল পাবলিশিং
ভবানীচরণ দত্ত লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৫২, মূল্য দুই টাকা।

আজিকার দিনে ছনিয়ার প্রতিটি দেশের সমাজে যে
চলিতেছে সেই পরিবেশে উপভাসের কাহিনী-অংশ গড়িয়া

সত্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নি

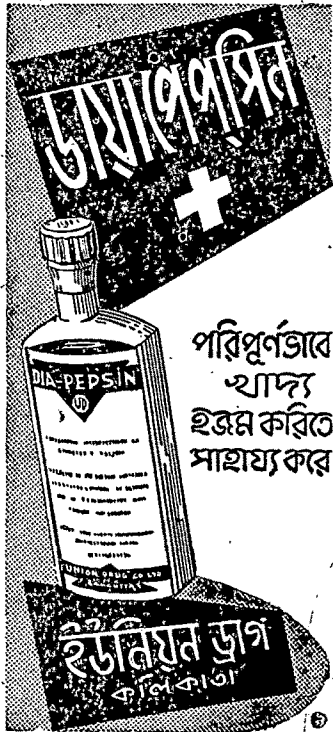
ব্যাঙ্ক অফ বাবু

লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্ক জগতে বিরাট বিপণ্য সম্বন্ধে
সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার
বিক্রয়ের অমুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয়
ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জি



ক লাইন বাধিয়া কট্টেলের দোকানে দাঁড়াইতে হয় এই গল্পের সূচনা—ইন্দ্রজিৎ এই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

খন ধনী-সমানকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী আবর্তিত হইতে দেখি, একটা অস্বাভাবিকত্ব যেন সকল পাত্র-পাত্রীকে পাইয়া বিলাত-ফেরত অজিত দান্তিক ধনী যুবক তাকে বরণ করিয়া যায়, কিন্তু স্বজাতার উদ্ভট আচরণের অর্থ কি? হঠাৎ পালী মেয়ে একগুপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন-হইয়া উঠিল। একগুপ প্রাণপাঠকের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক গল্প-উপস্থাসের পাত্রপাত্রীর আচার-আচরণকে ফুটাইয়া বজকাল অনেক সাহিত্য-সেবীর উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থের লেখকও দেখিতেছি এই প্রোত গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। ধানিতে লেখকের আশাশ্রীপ্ত মনোভাবেরও পরিচয় পাই—সত্যত এই বইয়ের প্রচ্ছদপট। আশ্রয় পূর্ণভেজে প্রচ্ছলিত হইয়া কিন্তু এই অগ্নিদাহের পরই একটা কিছু গড়িয়া উঠিবে—এই ইতিহাসের টানাপোড়েন।

শ্রীশুরেশচন্দ্র দেব

বদান্ত দর্শন (১ম খণ্ড চতুঃস্থত্রী)—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ স্বামী চিদ্দানন্দ পুরী সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্যালয়। কলিকাতা, বাগবাজার, কলিকাতা। ২১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা। "ব্রহ্মসূত্র" উপর শঙ্করাচার্যের যে ভাষ্য আছে তাহাই ইহা মনে প্রসিদ্ধ। অবৈত বৈদান্ত সম্বন্ধে ইহাই সর্বপ্রধান ও

মৌলিক গ্রন্থ। ইহার প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন পণ্ডিত কালীচরণ বৈদ্য-বাগীশ বিগত শতকের শেষভাগে। কিন্তু উক্ত অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদমাত্র ও প্রাঞ্জল নহে। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক বৈদ্য দর্শনের দ্বিতীয় বঙ্গানুবাদ হয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বোষ ওরফে স্বামী চিদ্দানন্দ পুরীর সহযোগিতায়।

সমালোচ্য গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রের উপর বিস্তৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শঙ্কর-ভাষ্যের উপর রামানন্দ সরস্বতী-কৃত 'রত্নপ্রভা' টীকাও ইহাতে সানুবাদ সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতী তীর্থের "বৈদাসিক শ্রায়মালা" অনুবাদসহ ষাণ্ময় পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভাষ্যানুবাদ ব্যতীত "ভাবনীপিকা" নামক স্বকৃত ব্যাখ্যায় অনুবাদক বাচস্পতি মিশ্রের 'ভাস্য', আনন্দগিরির 'শ্রায়নির্ণয়' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাবলীর সারাংশ দিয়াছেন। সাধারণতঃ অনুবাদ মূলানুগ ও সাবলীল, ব্যাখ্যা সহজবোধ্য, সারগর্ভ, তবে স্থানে স্থানে প্রাঞ্জলতার অভাব দৃষ্ট হয়। এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি বাংলা বৈদান্ত-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার দাবি রাখে। ইহা ঘারা পাঠক-পাঠিকা বৈদান্ত দর্শনের দ্রবোধা তত্ত্ব অধিগত করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতাপাঠের ভূমিকা—শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা-৩১, ঢাকুরিয়া—১নং রথাল্ল বানার্জী লেনস্থ 'ব্রহ্মলীলিতা' প্রচার প্রতিষ্ঠান' হইতে শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৪+২৬ পৃঃ। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।



আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি.সরকার

এও সন্ন

শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের নির্মাণে
শ্রীমদেবকুমারী

ব্রাহ্ম-হিন্দুস্থান মার্চ বালিগঞ্জ
১০৯/১/বি, রাসবিহারী এডিন্ডি কলিকাতা

ফোন, বি, বি, ১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্ট

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা, ভাষ্য, আলোচনা, ব্যাখ্যান বহুকাল হইতে বহুভাষায় নানাভাবে হইয়া আসিতেছে। গ্রন্থকার মোহাবিষ্ট নর-নারীর জন্ত গীতার চির অমৃতময়ী মহিমা প্রচার করিয়াছেন। গ্রন্থে নব্বটি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সারগর্ভ মুখবন্ধ গ্রন্থের গৌরব বাড়িয়াছে।

ব্রহ্ম ও আত্মশক্তি (অবতরণিকা ও মঙ্গলাচরণ), (১+৫২) পৃঃ, মূল্য পাঁচ নিকা।

ব্রহ্ম ও আত্মশক্তি—(প্রথম ভাগ—পূর্বাঙ্ক), পৃঃ ১১০+৪০। মূল্য সাড়ে চারি টাকা। উভয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ প্রণীত এবং কলিকাতা-২, পাইকপাড়া, ৬নং তারিগীরেণ ঘোষ লেনস্থ “স্বরেশ স্মৃতি-মন্দির” হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার এক জন গৃহী ভক্ত, বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনেপ্রাণে যেভাবে সারা জীবন ইষ্টচিন্তা করিয়াছেন, বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন—সেই সব চিন্তাধারাই গ্রন্থকার পরিবেশন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে নানা স্তব, স্তুতি, সঙ্গীত, কবিতা, মহাপুরুষদের বাণী এবং সাংসারিক বহু শাস্ত্রবাচ্যও প্রদত্ত হইয়াছে। বিষয়ী লোকও মনোব্রাজ্যে কিরূপ ইষ্টভগ্নয়তা লইয়া মাতোয়ারা থাকিতে পারেন তাহার একটি উজ্জল চিত্র গ্রন্থদ্বয়ে সুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের অবতরণিকা হইতে অবতারবিষয়ক বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

“আত্মশক্তিরই সাহায্যে অবতারলীলা—ভীরু শক্তিতে অবতার কালীর এক ভিন্ন রূপে মানবের পরিজ্ঞাপকর্তা। অবতার যে সকল কাজ করেন, সে সকলই জগদধার শক্তিজাত। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ আয়ান ঘোষের নিকট কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলীলা সবই যোগ-মায়ার সাহায্যে, কারণ তিনি স্বয়ং নিগুণ ও নিজের ব্রহ্ম। যেমন ছাদের নল দিয়া জলধারা নাচে প্রবাহিত হয়, সেই সচ্চিদানন্দের শক্তিও সেইরূপ অবতারের ভিতর দিয়া বাহির হয়।”

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীঅনিলবরণ রায়। গীতা-প্রচার কার্যালয়, ১০৮১১, মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮। মূল্য পাঁচ নিকা।

পুস্তিকাখানির প্রথমে ও শেষে ‘জয় শ্রীঅরবিন্দ’ ও ‘নর-নারায়ণ’ লিখক দুইটি কবিতা আছে। ইহা ছাড়া প্রথম জীবন, রাজনৈতিক

জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন এবং শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থা অধ্যায় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ-জীবন সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট কোতূহল রহিত আলোচ্য পুস্তিকাখানি পাঠে তাহা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইবে। ‘মাদার’ ও ‘শ্রীঅরবিন্দ’র দুইখানি ছবি আছে।

আকাশ-পথের যাত্রী—শ্রীহরমো মিত্র। চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

পুস্তকখানির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধারানী দেবী লিখিয়া আসে লেখিকা প্রায় বত্রিশ হাজার মাইল আকাশ পথে উড়ে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত অবধি। বহির্বিষয়ে নানা অভিনব পরিবেশের মধ্যে তিনি যে-সকল ঘটনা ও আশ্চর্য্যের পৌটিকায় কুড়িয়ে রেখেছেন, তার মধ্যে তাঁর যাত্রা নিকীহ-পরায়ণা নারীমনের স্বাভাবিক রূপটি অপরিবর্তিত।

গ্রন্থখানি পাঠে লেখিকার উক্তির সার্বিকতা অনুভূত হইবে। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার অল্পকাল পরে স্বামীর সঙ্গে তিনি সকল দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেন। গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিদিষ্ট অঞ্চলগুলিতে তাঁহাদের অবতরণ। তাঁহারা ঐ সকল স্থানের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। নানা খুঁটিনাটি বস্তুও এড়াইয়া না। নারীমূলক স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ঐ সকল দেশের রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায় লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সব স্থানের উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষা, কলা, আয়োজ্য-প্রমোদের আয়োজনাদি কথার উল্লেখ করিতেও লেখিকা নাই। বিদেশে দেশীয় রান্না খাইয়া তাঁহার কি আনন্দ! ভাষায়, নিউইয়র্কে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ‘স্বামীজীর হাতের রাঁধা ডালনা, মাছের ঝোল, ডাল ও ভাত খেয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করল।

ডাবলিনে ডি. ভ্যালেরার সঙ্গে কথোপকথন সংক্ষিপ্ত হইবে। এদ। পুস্তকখানির পাতায় পাতায় ছবি। লেখিকার সরল চিত্রাদি সহযোগে বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলীকে প্রাণবন্ত করিয়া এখানির বহুল প্রচার কামনা করি। তবে একটি কথা না বলি। স্থানের নাম, লোকের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজী বঙ্গাক্ষরে দিলে ভাল হইত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র

টোল ও কোম্পানীর

দাদ ও ক্রাউনের

মেসার্স মল্লম

কিউটা-টোন

পোড়া বেদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন মল্লম

হোস পাঁচড়া ও চলকানীর জন্য






বরানগর, কলিকাতা

হোস পাঁচড়া ও চলকানীর জন্য

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর উন্নততর পরিমাণ দাঁড়াই যাচ্ছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর। সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রে বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

দী বীমার— } ৮- টাকা.
ন বীমার— }

যাতে মূল্য হ্রাস এবং অগ্ৰাণ্ণ অনিশ্চিত পক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা এবং স্বদের হার অর্জিত হার অপেক্ষা ৫% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে হ্রদ অর্জন, দুমূল্যের বাজারে অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, স্বদৃঢ় আর্থিক সম্ভতি এবং পরিচালন-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল ১৫ " ৯৭ " " "
প্রিমিয়াটমের আয় ৩ " ৪০ " " "
দাবী শোধ ৭ " ২০ " " "



হিন্দুস্থান

কো-অপারেশনাল
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
৪৯ং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

ইহার উদ্বোধন হয়। এই উৎসবের প্রবর্তক ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরে দেবালয়, ধর্মশালা, এবং দান্তব্য চিহ্ন প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের পালার্মো

সঞ্জীবচন্দ্রের "পালার্মো" পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম পঠন পুস্তক বলিয়া হইয়াছে। বোর্ড-কর্তৃপক্ষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সন্মানসূচক বিষয়ে ইহা পঠন-পাঠনের নির্দেশ দিয়া "পালার্মো" যে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিতে তাহাতে দ্বিধা নাই। পরিষদের স্মৃতি ও স্মরণীয়তায় সন্তোষ প্রকাশ করা মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড সাধারণের বিশেষ বাদাই হইয়াছেন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কুমারী বললতা বেড়া, এম-এ, আইন-পরীক্ষায় এল-এ-এস-এ উপাধি পাইয়াছেন। ইনি মেদিনীপুরের বিশিষ্ট জমিদার এডভোকেট শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ বেরার দ্বিতীয় কন্যা। পশ্চিমবঙ্গ সন্মেলনের ও মেদিনীপুর সন্মিলনের বিশিষ্ট শ্রীযুক্তকুমার বেরার ভগ্নী।

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

বিখ্যাত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-প্রশাসনিক শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ, ডিপ-লিট, ভারত-সরকার কর্তৃক মনোনীত কমনওয়েলথ টেকনিক্যাল কো-অপারেশন ব্যবস্থাপনা অট্টেলিয়ার লাইব্রেরী সেমিনারে যোগদানের জন্য যাত্রা করিয়াছেন। জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র এবং ভারতের প্রশাসন-আন্দোলন ও শিল্প সম্বন্ধে বিশিষ্ট লেখক।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিনথিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুবিধ অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
১।১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭
কোন—সিউ ৮৮১



পূর্ব-আফ্রিকার নাইরোবিতে ভারতীয় কমিশনারের সেক্রেটারী কর্তৃক অহুষ্ঠিত প্রীতি-সম্মেলন

নাইরোবিতে প্রীতিসম্মেলন

২৬শে জানুয়ারী, ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার ভারতীয় কমিশনারের প্রথম সেক্রেটারী—নাইরোবিতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অধ্যক্ষের জন্ত এক বিরাট প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন। প্রায় দেড় হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

মুদরাবাদে প্রবাসী বাঙালীদের ছুর্গোৎসব

এই বৎসর সর্বপ্রথম হায়দরাবাদে প্রবাসী বাঙালী সমিতি বিপুল সমারোহে সার্বজনীন ছুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বাঙালী-সমাজ হাড়া স্থানীয় অত্যন্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও ঈর্ষানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীঅবনীশ চৌধুরী প্রতিমা নিৰ্দ্ধারণ করেন এবং শ্রীপ্রমোদলাল মুখোপাধ্যায়ের সহকারীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অহুষ্ঠান সর্বাক্রমে সমাপ্ত হয়।

১১ই অক্টোবর ত্রিশনংকুমার মণ্ডলের পৌরোহিত্যে বিজয়া সম্মেলনের অহুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আনন্দি, হাঙ্কোচুক, নাট্যাভিনয় ইত্যাদিতে সতাপুহ আনন্দযুগের হইয়া উঠে। শ্রীপুঙ্গবেরু দাস ও শ্রীবাসন্তিকা বহু অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শক-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। শ্রীনিরঞ্জন সাহা ও শ্রীতোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের উভয়কে রৌপ্যপদক ও রৌপ্যনির্মিত 'কাপ' উপহার প্রদান করেন।

ললিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফটোটািপ ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী ললিতমোহন গুপ্ত মহাশয় গত ২৩শে ফাল্গুন স্বীয় বাসগৃহস্থ ভবনে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতে ফটো এন্‌এন্‌সিৎ কেন্দ্রে অগ্রদূত উপেক্ষিকেশ্বর রায়চৌধুরীর (ইউ. রায় কোং) সহকারী হিসাবে তিনি কার্য আরম্ভ করেন। পরে তিনি



অমৃততাজন
সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী।

দাদের মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাজন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭

স্বাগিতা: ১৮৯৩



স্বাধীনভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ভারত ফটোটাঁপ ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা করিয়া রক প্রযুক্তিকারক এবং চিত্র-মুদ্রাকররূপে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তৎকর্তৃক প্রকাশিত আট জন বঙ্গ-মনীষীর পটচিত্র-সম্বলিত চিত্র-পুস্তক একদা স্তবীসমাবেশের নিকট বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছিল। 'প্রবাসী' ও 'মহাৰ্ণ রিভিউ' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

চন্দ্র দাস সম্প্রতি ইহলোকে

দাস ময়মনসিংহ জেলার

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ১ই অক্টোবর

সময়ে আমেরিকায় গিয়া তিনি সেখানে

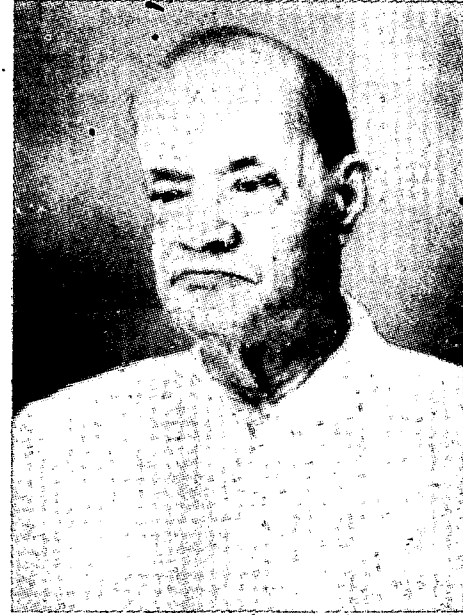


ললিতমোহন গুপ্ত

তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং অধির-আপ্যায়নে সকলেই বিশেষ প্রীত হইতেন। সাহিত্য এবং সাহিত্যসেবীদের প্রতিও তাঁহার সত্যীর অনুরাগ ছিল। কুরুপ সামান্য অবস্থা হইতে নিজ পরিশ্রম, কর্মপটুতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠারলে রক-প্রযুক্তি ও চিত্র-মুদ্রণ ব্যাপারে তিনি অনন্তসামর্থ্য কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রমুখ্যৎ আমরা অনেক কথাই শুনিয়াছি। এরূপ একজন বিশেষজ্ঞের যত্নে বাঙালীমাঝেই দুঃখ অমুভব করিবেন।

ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দাস

লক্ষ্মী শহরের ধ্যাননামা হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার গিরিশ-



গিরিশচন্দ্র দাস

কলেজে ভর্তি হন এবং ষষ্ঠাশ্রমে এম-ডি ডিগ্রী লাভ দেশে ফিরিয়া তিনি চিকিৎসা ব্যবসারে বিশেষ কৃতিত্ব করেন। লক্ষ্মী শহরে একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি উদারহৃদয় এবং বহু গুণাবিত ছিলেন।